॥ বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র ॥

৩৭ বর্ষ ১৩৭৬

[১৪ সংখ্যা হইতে ২৬ সংখ্যা পর্যন্ত]

সূচিপত্র

সূচিপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশিত হল

দাম ৪·০০

রূপনারায়ণ যেখানে ভাগীরথীর সঙ্গে গিয়ে মিশেছে তারই অদূরে পুরনো ভাঙা বাংলো-বাড়িটা — রূপনারায়ণের ধারে। রূপনারায়ণের জল আর বাংলোটার মাঝে মরুভূমির মত ধু ধু করছে বিশাল এক বালুচর। একেবারে কাছে-পিঠে জনপদ বলতে বিশেষ কিছু নেই, আছে শুধু কয়েকটি গাছ আর একটি শ্মশান।

দিনের বেলার এখানকার নির্জন নিস্তব্ধ পরিবেশই রাতের বেলায় যেন এক ভৌতিক রহস্যময় রূপ ধারণ করে। শ্মশানে পড়ে থাকা মড়ার খুলি থেকে বেরিয়ে আসে হুহু দীর্ঘশ্বাস, তালগাছের মাথায় থেকে থেকে কাঁকিয়ে কেঁদে ওঠে শকুনশিশু, চাঁদের আবছা আলোয় সঞ্চরমাণ অশরীরী ছায়ার মত ডানা মেলে নিঃশব্দে উড়ে যায় কালো কালো বাদুড়, বাংলোটার পরিত্যক্ত ঘরগুলির মধ্যে আতঙ্কিত চামচিকের দল

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নতুন উপন্যাস

সাক্ষী বালুচর

মাঝে মাঝে ডানা ঝটপট করে ওঠে, থেকে থেকে শিয়ালেরা যেন ভয় পেয়ে চিৎকার করে ওঠে, আর গাছপালার ভেতর দিয়ে [illegible] হাওয়া দীর্ঘ বালুচরের ওপর দিয়ে কোনও এক অতৃপ্ত আত্মার বুকফাটা [illegible] মত ভেসে ভেসে দূরে দিগন্তে মিলিয়ে যায়।

এক অপরাহ্নে এখানে পালিয়ে এসে উঠেছিল দুটি যুবক যুবতী। একটি মাত্র রাত তারা ছিল এই পরিত্যক্ত ভাঙা [illegible] সেই একটি রাতে, নিশাল বালুচরকে সাক্ষী রেখে অভিনীত হয়ে গেল সেখানে এক শ্বাসরুদ্ধকর মর্মান্তিক নাটক। [illegible] হাহাকারে আর অতৃপ্ত [illegible] আকুল আর্তিতে নিয়ত [illegible] একটি যন্ত্রণাকাতর বিদেহী আত্মা যার নায়ক।

আঁধার পেরিয়ে
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ॥ উপন্যাস ॥ দাম ৫·০০

কল্প কুহেলি
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ অলৌকিক কাহিনী ॥ দাম ৮·০০

গাছের পাতা নীল
আশাপূর্ণা দেবী ॥ উপন্যাস ॥ দাম ৬·০০

ঝড়
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ॥ উপন্যাস ॥ দাম ৮·০০

প্রেমিক
মনোজ বসু ॥ উপন্যাস ॥ দাম ৬·০০

বেণীসংহার
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ গোয়েন্দা-উপন্যাস ॥ দাম ৪·০০

নগ্ননির্জন
বুদ্ধদেব গুহ ॥ উপন্যাস ॥ দাম ৪·০০

পূর্ণ অপূর্ণ
বিমল কর ॥ উপন্যাস ॥ দাম ১০·০০

সূর্যসাক্ষী
নরেন্দ্রনাথ মিত্র ॥ উপন্যাস ॥ দাম ১৪·০০

শঙ্খকিয়া
সুবোধ ঘোষ ॥ উপন্যাস ॥ দাম ৮·০০

প্রেমের চেয়ে বড়
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ॥ উপন্যাস ॥ দাম ১২·০০

বেগম মেরী বিশ্বাস
বিমল মিত্র ॥ ঐতিহাসিক উপন্যাস ॥ দাম ২৫·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড

অফিস : ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিঃ ৯ ॥ ফোন ৩৪-৮২৪৭
বিক্রয়-কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা ৯

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৭ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১৪
শনিবার ১৭ মাঘ ১৩৭৬

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮০ ২৩-৪৫৪১

চাঁদার হার

কলিকাতায়

বার্ষিক	—	২৫.০০
ষাণ্মাসিক	—	১২.৫০
ত্রৈমাসিক	—	৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	—	৩০.০০
ষাণ্মাসিক "	—	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক "	—	৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	—	৩০.০০
ষাণ্মাসিক "	—	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক "	—	৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	—	৫২.০০
ষাণ্মাসিক "	—	২৬.০০
ত্রৈমাসিক "	—	১৩.০০

এশিয়া অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	—	৩৯.০০
ষাণ্মাসিক	—	১৯.৫০
ত্রৈমাসিক	—	১০.০০

দাম ৫০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাসুল ৭ পয়সা

DESH

Saturday 31, Jan. 1970

যুক্তফ্রণ্টের ভাবমূর্তি

পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রণ্ট সরকার কিছুদিন ধরেই এক বড় রকমের সংকটের মধ্যে পড়েছেন। সম্প্রতি এই সংকট জটিল আকার ধারণ করেছিল। রাজনৈতিক গবেষক এবং ফ্রণ্টের কোনো কোনো নেতার মুখেও 'গেল গেল' রব শোনা গেছে। তার ওপর বিধানসভার শুরুতেই এক গণ্ডগোল। মনে হয়েছিল, এবার বুঝি সত্যি সত্যিই কিছু-একটা ঘটে যাবে। গত রবিবার ফ্রণ্ট শরিকদের বৈঠকের পর অবশ্য যায়-যায় অবস্থাটাকে সামলে নেওয়া গেছে। শোনা যাচ্ছে, ফ্রণ্টের শরিকদের কলহ-বিবাদ এখন নাকি একটা আপসের দিকে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, তাঁরা সকলেই ধীরে ধীরে আপসের দিকে এগুচ্ছেন। খুবই ভাল কথা, আপস যদি হয়ে যায় তবে তো বাঁচাই গেল। আগেও এরকম বৈঠক ও আপসের কথা শোনা গেছে কিনা!

তবে আপস হয়ে যাচ্ছে বলা আর আপস হয়ে যাওয়া এক কথা নয়। যেমন ধরুন, গত রবিবার যখন ঘরের মধ্যে শরিকদের বৈঠকে আপস হচ্ছে তখন নীচে রাস্তায় সমর্থকদের মধ্যে দলীয় হামলা-হুজ্জুত চলছে। ফ্রণ্টের নেতারা বৈঠকে বলবেন যুক্তফ্রণ্টের ভাবমূর্তি অম্লান রাখতে হবে, আর পরমুহূর্তে একাধিক জায়গায় আমরা শরিকী বিবাদ ও খুনোখুনি দেখব—এ থেকে অন্তত নিতান্ত নাবালকেও বুঝবে বৈঠকী-আপসটা কী জিনিস। কাজেই অনুমান করা চলে, ফ্রণ্টের শরিকদের মধ্যে যে মনোমালিন্য ও কলহ তা আপাতত ওপরে ওপরে চাপা দিয়ে রাখার চেষ্টা হলেও ভেতরের বিবাদ এত সহজে ঘুচে যাবার নয়। এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন, বাংলা কংগ্রেস আর সি পি এম-এর মধ্যে যে ফাটল ধরেছে তা ওপর ওপর ঢাকা দিয়ে রাখলেই দুই শরিকে জুড়ে যাবেন। এ অসম্ভব। তবে এইমাত্র ভরসা যে, রাজনীতিতে কিছু কিছু অসম্ভবও সাময়িকভাবে সম্ভব হয়ে যায়।

এই রাজ্যে যে একটা অরাজকতার অবস্থা চলেছে এ কথা আজ ফ্রণ্টের একাধিক নেতাও স্বীকার করে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। লক্ষ করলে দেখা যাবে, অরাজকতা নির্যাতন লুঠপাটের কথা যখনই ওঠে তখন অধিকাংশ শরিকই মার্কসিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ তোলেন। অর্থাৎ ধরে নিতে হবে, এই রাজ্যে বিশৃংখলতা সৃষ্টির জন্যে এই রাজনৈতিক দলটিই দায়ী। অভিযোগের সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বও এঁদের ওপর পড়ে—কেননা, স্বরাষ্ট্র দপ্তর এঁদেরই হাতে। প্রশ্ন হল, যে রাজনৈতিক দলটি সরকারীভাবে আইন-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে নিজেরাই বিশৃংখলা সৃষ্টি করেন সেই দলটিকে কত দিন অন্যান্যরা সহ্য করবেন? অন্যদের যে ধরনের বক্তব্য, তা থেকে তো মনে হয় — তাঁরা সবাই সাধু, যত গণ্ডগোল ওই জ্যোতিবাবুর দলই করে থাকেন। তা হলে জিজ্ঞাস্য, সাধু অ-সাধু আপস কত দিন টিঁকতে পারে।

নেতারা যতই বলুন এবং যেভাবেই বলুন — একমাত্র দলীয় রাজনৈতিক সাঙ্গ-পাঙ্গদের কথা বাদ দিলে সাধারণ মানুষের কাছে যুক্তফ্রণ্টের ভাবমূর্তি তেমন কিছু নেই। বরং দেখা যাচ্ছে, যে কোনো সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে এই যুক্তফ্রণ্ট একটি রহস্যবিশেষ। মুখ্যমন্ত্রী এক কথা বলেন, উপমুখ্যমন্ত্রী অন্যরকম; হরেকৃষ্ণ-বাবু একরকম বলেন, সুশীলবাবু অন্য কথা। ভাবমূর্তিটাই বা কোন্ উপায়ে গড়বে? শুধু বৈঠক করে, কাগজে বিবৃতি দিয়ে, মিছিলে গলা ফাটিয়ে? মনে হয় না এভাবে কোনো মূর্তিই গড়া যায়, যা যায় তা হল ভাঙাচোরা আকারহীন একটা কিম্ভূত মূর্তি।

যুক্তফ্রণ্ট ক্ষমতা পাবার পর দেখতে দেখতে অনেকগুলি মাস কেটে গেল; এর মধ্যে আমরা কী পেয়েছি তার একটা হিসেব হওয়া দরকার। প্রতিশ্রুতি যা ছিল — তার কতটা পাওয়া গেছে। কোথাও কোথাও সরকারী তহবিল থেকে টাকা দিয়ে দিয়ে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানকে টিঁকিয়ে রাখা ছাড়া আর কী হয়েছে? অন্য দিকে পূর্বের অবস্থা কোথাও বড় সহনীয় হয়ে আসে নি। দ্রব্যমূল্য কি কমেছে? চাকরি-বাকরির সুযোগ কি বেড়েছে? কলকারখানা কি খুলেছে? নতুন করে কিছু কি বসছে? শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনোরকম সঙ্গতি কি এসেছে? স্কুল-কলেজে গণ্ডগোল কি থেমেছে? সাধারণ মানুষের নির্যাতন কি সুবিচারের দ্বারা রোধ করা হচ্ছে? এরকম শত প্রশ্ন যে কোনো লোকই তুলতে পারেন। যদি তোলেন, আমরা মনে করি না — খুব একটা সদুত্তর তিনি পাবেন। যদি না পান তবে যুক্তফ্রণ্টের ভাবমূর্তির কী হবে?

মৎস্যশিকারী ও জলকন্যা
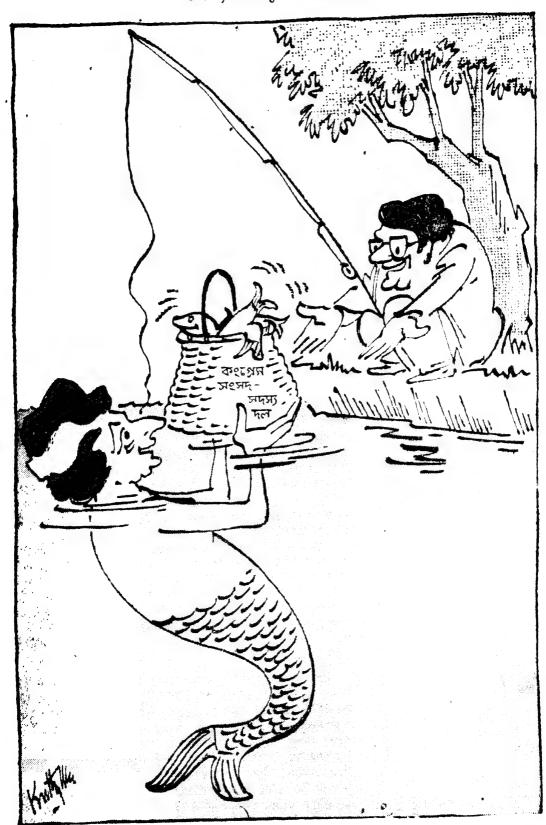
[সাত নম্বর যন্তর মন্তর রোডের দখল নিয়ে ইন্দিরাপ্রস্থে প্রাচীন ও অর্বাচীন কংগ্রেসীদের মধ্যে আদর্শগত যে বাগ্‌যুদ্ধ হয় তার সম্ভাব্য কিছু নমুনা এখানে তুলে ধরা হল। আগামী দিনের হিন্দি ছবিতে কমেডিয়ানদের মুখে এই সব সংলাপ শোনা যাবে।]

অর্বাচীন কংগ্রেস : আরে হঠো ইয়ার। হিঁয়া পে ক্যায়া কর রহে হো?

প্রাচীন কংগ্রেসী : তুম্‌ কোন সে চিঁড়িয়া হো ভাই?

অর্বাচীন কংগ্রেসী : চিঁড়িয়া নেহি, ম্যায় কাংরেসি হুঁ কাংরেসি। ইয়ে মকান মনজিল হামারা হ্যায়। হঠো হিঁয়াসে।

প্রাচীন কংগ্রেসী : আরে বড়া হঠানেবালা আয়া। ইয়ে মনজিল থোড়েই তেরা হ্যায়। ইয়ে কাংরেস কা মুখ্ইয় কারিয়ালয় হ্যায়। ম্যায় কাংরেসি হুঁ। ইয়ে মনজিল হামারা হ্যায়।

অর্বাচীন কংগ্রেসী : এ কাংরেস কি বাচ্চে! বাতা তো সাহি, তেরা কাংরেস কোন বানায়া?

প্রাচীন কংগ্রেসী : দাদাভাই নৌরজী, ডবলিউ সি বোনারজি, মোতিলাল নেহরু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, মহাত্মা গাঁধী, রাজাগোপাল আচারি, বাবু রাজেন্দর পরসাদ, আচারিয়া কৃপালনী, পুরুষোত্তমদাস ট্যানডন, সরদার বল্লভভাই প্যাটেল, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, পট্টাভি সীতারামৈয়া, জবাহরলাল নেহরু, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস, লালবাহাদুর, কামরাজ, মোরারজীভাই......

অর্বাচীন কংগ্রেসী : খামোশ।

প্রাচীন কংগ্রেসী : কিঁউ?

অর্বাচীন কংগ্রেসী : পহ্‌চান লিয়া। উও সব সিনডিকেটবালাকে নাম মত বোলো। ইয়ে মনজিল তেরা হ্যায় নেহি। কভি না থা, না কভি হোগা। ম্যায় হু কাংরেসি, ইয়ে মনজিল হ্যায় হামারা।

প্রাচীন কংগ্রেসী : তো ভাই, তুম বাতাও তুমহারা কাংরেস কোন বানায়া হ্যায়?

অর্বাচীন কংগ্রেসী : মেরা কাংরেস বহুৎ গতিশীল হ্যায়, যেইসে রাজধানী এক্‌স্‌প্রেস। উও হর স্টেশন পর রুখতী নেহি। উস কি সিরফ তিন স্টপ হুয়া। মোতিলাল, জবাহরলাল আউর দিদিজী।

প্রাচীন কংগ্রেসী : সমঝ লিয়া, তুম হো এক্‌স্‌প্রেস কাংরেসি। তো ফির তুমহারা ঝাণ্ডা ক্যায়া হ্যায়?

অর্বাচীন কংগ্রেসী : তিরঙ্গা ঝাণ্ডা হ্যায়।

প্রাচীন কংগ্রেসী : ইয়ে কৈসে হো সকতা। তিরঙ্গা তো হামারা ঝাণ্ডা হ্যায়।

অর্বাচীন কংগ্রেসী : তেরা বাপকা ঝাণ্ডা হ্যায়।

প্রাচীন কংগ্রেসী : গুস্‌সে কি বাত কেয়া হুয়া? মেরা কহনেকা মতলব ইয়ে থা কি, এক্‌স্‌প্রেস কাংরেস কে লিয়ে কোই এক্‌স্‌প্রেস ঝাণ্ডা তো হোনা চাহিয়ে।

অর্বাচীন কংগ্রেসী : তুম কহতে হো কি তুম কাংরেসি হো।

প্রাচীন কংগ্রেসী : জরুর ম্যায় কাংরেসি হুঁ।

অর্বাচীন কংগ্রেসী : তো বাতাও তুমহারা প্রোগ্রাম ক্যায়া হ্যায়।

প্রাচীন কংগ্রেসী : এ আই সি সি অধিবেশন মে হর সাল সোসালিজ্‌মকা প্রস্তাব লেনা।

অর্বাচীন কংগ্রেসী : ঝুট বাত। উও তো দিদিজীকি প্রোগ্রাম হ্যায়।

প্রাচীন কংগ্রেসী : উন্‌-কে বাপ-কি প্রোগ্রাম হ্যায়।

অর্বাচীন কংগ্রেসী : গুস্‌সেকি বাত কেয়া হুয়া?

প্রাচীন কংগ্রেসী : গুস্‌সেকি বাত নেহি, ইয়ে হিসট্রি হ্যায়। জবাহরলাল নে সোসালিজ্‌মকা প্রস্তাব লেনা চালু কর গিয়া থা।

অর্বাচীন কংগ্রেসী : তুম উসকা মানতা হ্যায়।

প্রাচীন কংগ্রেসী : কিঁউ নেহি। উস্‌ প্রস্তাব পর হাত উঠাতে উঠাতে জিন্দগী খতম করকে লায়া হ্যায়। তো ভাই তুম বাতাও, সচ বাত বোলো গে?

অর্বাচীন কংগ্রেসী : কিউ নেহি, জরুর বোলুংগা।

প্রাচীন কংগ্রেসী : তুমহারে দিদিজীকা কিয়া।

অর্বাচীন কংগ্রেসী : দিদিজীকা কিয়া।

প্রাচীন কংগ্রেসী : বোম্বাই এ আই সি সি মে তুম কিস পর হাত উঠায়া থা— সোসালিজ্‌ম ইয়া সোসাজিল্‌ম কা প্রস্তাব পর।

অর্বাচীন কংগ্রেসী : শুরু শুরু মে এইসা ভাষণ হোনে লাগা কি, ম্যায় সমঝ গিয়া কালহি ভারতমে সোসালিজ্‌ম চালু হো যায়ে গা। উসকো বাদ দিদিজীনে কহা, সোসালিজ্‌ম ধীরে ধীরে লানে হোগা। অভি তুমলোগ সিরফ ইস প্রস্তাবকে উপর হাত উঠাও।

প্রাচীন কংগ্রেসী : আরে ভাই, আহমেদাবাদমে ভি হামলোগ এইসা হি কিয়া। তো হাম দোনোমে ফারাক কেয়া হ্যায়।

অর্বাচীন কংগ্রেসী : হাম তো প্রোগ্রেসিভ কাংরেসি আউর তুম হো রিঅ্যাকশানারি।

প্রাচীন কংগ্রেসী : ক্যায়সে?

অর্বাচীন কংগ্রেসী : ইউ পি মে তুমহারে সরকার কো গিরানে কে লিয়ে মুঝে সি পি আই কা সমর্থন মিলতা হ্যায়। আগর হাম প্রোগ্রেসিভ না হোতে তো সি পি আই থোড়াই হামারা সাথ হাত মিলাতা। লেকিন তুমহারা সাথী তো হ্যায় জনসং আউর স্বতন্ত্র। উও তো থোড়াই প্রোগ্রেসিভ হ্যায়।

প্রাচীন কংগ্রেসী : ডি এম কে কেয়া প্রোগ্রেসিভ হ্যায়? উও কিঁউ তুমকো মদত দেতা হ্যায়। তব্‌ শুনলো, অভি হামভি বহোৎ প্রোগ্রেসিভ বন গিয়া হ্যায়।

অর্বাচীন কংগ্রেসী : ক্যায়সে?

প্রাচীন কংগ্রেসী : পচ্ছিম বাঙ্গালমে কেরালামে সি পি এম কা সাথ হামারা ভি কুছ হামদরদি হোনেবালা হ্যায়। মিত্রতা হো যায়েগা।

অর্বাচীন কংগ্রেসী : সি পি এম কা সাথ মিত্রতা! তুমহারা সাথ! সচ্‌?

প্রাচীন কংগ্রেসী : সচ্‌। তো দেখো, কাংরেস কা দো বয়েল থা, দো বয়েল হি রহেগা। এক বয়েল তো ম্যায় হুঁ, আউর দুসরা তুম হো। ভেদ কাঁহা হ্যায়?

দৃশ্যপট

আবার আণবিক অস্ত্রপ্রসঙ্গ

আণবিক অস্ত্র তৈরী করার প্রশ্নে দেশে আবার একটা জোর বিতর্ক শুরু হয়েছে। এবারের এই বিতর্কের সূত্রপাত একটা খবরকে কেন্দ্র করে। খবরটা হলো, ভারত সরকার নাকি আণবিক বোমা তৈরীর খরচা পরীক্ষা করে দেখতে রাজী হয়েছেন।

এই খবর বের হবার সঙ্গে সঙ্গে দু' পক্ষই সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। যাঁরা ভারতেও আণবিক অস্ত্র তৈরীর দাবিদার তাঁরা বলছেন, ঠিকই হয়েছে—এত দিনে আমাদের সরকারের কিছুটা চৈতন্য উদয় হয়েছে। এঁরা চান, সরকার আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বোমা তৈরী শুরু করে দিন। বিরোধী পক্ষও চুপচাপ বসে নেই। তাঁরা বলছেন, যে খবর বেরিয়েছে তা যদি সত্য হয় তা হলে বুঝতে হবে সরকার তাঁর ঘোষিত সংকল্প থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। কারণ, ভারত সরকার এর আগে পরিষ্কার জানিয়েছিলেন যে, আণবিক অস্ত্র তৈরী করা হবে না। এঁরা এখনও দৃঢ়ভাবে মনে করেন, বোমা তৈরীর ব্যাপারে পা বাড়ানো ভারতের পক্ষে চরম মূর্খামি।

সরকার প্রকাশিত সংবাদটা সম্পর্কে "না সমর্থন, না প্রতিবাদের" নীতি গ্রহণ করেছেন। প্রধানমন্ত্রীকে গুজরাটে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিলেন : সত্যিই কি ভারত সরকার আণবিক বোমা তৈরীর খরচা পরীক্ষা করে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? প্রধানমন্ত্রী এড়িয়ে গিয়ে বলেছেন : কাগজে কী কী খবর বেরিয়েছে আমি তা দেখিনি। সুতরাং মন্তব্য করতে পারব না। অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের বড়সাহেব ডঃ সারাবাইও প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করতে নারাজ।

আসলে প্রধানমন্ত্রী এবং ডঃ সারাবাই যেটুকু বলেছেন তার ফলে কিন্তু খবরটা সমর্থনই করা হয়েছে। যদি ওরকম কোনও সিদ্ধান্ত আদপে নাই হয়ে থাকত তা হলে দুজনে তা সম্পূর্ণ অস্বীকারই করতে পারতেন—সংবাদপত্রে ঠিক কী লেখা হয়েছে তা না দেখার বা কোনও মন্তব্য না করার প্রশ্নই উঠত না।

ভারত সরকার ঠিক কী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা এখনও অজানা। তবে, আণবিক অস্ত্র তৈরীর ব্যাপারে সরকার যে নতুন পথে এগোতে চাইছেন সেটা এই খবরের মধ্যেই পরিষ্কার। এ ব্যাপারে হয়ত আরও খবর কিছু দিনের মধ্যেই শোনা যাবে। অন্তত পার্লামেন্ট খুললে তো সদস্যরা প্রশ্নটা তুলবেনই। তবে, এই-সব অস্ত্রশস্ত্র তৈরীর ব্যাপারে কোনও দিনই কোনও রাষ্ট্র সব কথা প্রকাশ্যে বলে না। ভারত সরকার তার ব্যতিক্রম ঘটাবেন, এমন আশা করাও মূর্খামি।

*

চীন বোমা ফাটাবার পর থেকেই ভারতেও আণবিক অস্ত্র তৈরীর জোরদার দাবি ওঠে। চীন এখন একেবারে পারমাণবিক অস্ত্রের যুগে গিয়ে পৌঁছেছে। আমাদের দেশে বাহাত এখনও আণবিক অস্ত্র তৈরীর প্রশ্নটা দাবির পর্যায়েই থেকে গিয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে লড়াইয়ের পর দাবিটা আরও শক্তি সঞ্চয় করে। যাঁরা এই বোমা তৈরীর সমর্থক তাঁরা বললেন : এবার তো দেখা গেল যে, অন্য রাষ্ট্র মৌখিক নানা প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও বিপদের সময় বাইরের সাহায্য নাও আসতে পারে। সুতরাং, এবার আর অপরের উপর ভরসা না করে আণবিক অস্ত্র তৈরীর কাজে লেগে যাও।

আমাদের সরকার কিন্তু বরাবরই এই দাবির বিরোধিতা করে এসেছেন। পার্লামেন্টে এবং বাইরে শাস্ত্রীজী এবং শ্রীমতী গান্ধী দুজনেই বারংবার ঘোষণা করেছেন : না, আমরা বোমা তৈরী করব না। আমরা নীতিগতভাবে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে।

কংগ্রেস দলের ভেতরেও বারবার বোমা তৈরীর দাবি উঠেছে। কিন্তু সেখানেও বার বারই সে দাবি নাকচ হয়ে গিয়েছে। কংগ্রেস দলও একাধিক প্রস্তাব নিয়ে বলেছেন : পারমাণবিক অস্ত্র তৈরী করা অনুচিত।

একবার শুধু শাস্ত্রীজী লোকসভায় বলেছিলেন : বোমা নয়, তবে অ্যাটমিক ওয়ারহেডের অস্ত্র তৈরীর কথা বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। যেমন শোনা যায় ইজরাইল করেছে, সাধারণ গোলা গুলির অগ্রভাগে অর্থাৎ মাথায় কিছুটা আণবিক বিধ্বংসী [illegible] ছুঁইয়ে দেওয়া তেমন প্রস্তাব [illegible] দেখা যেতে পারে। পরে, এ নিয়ে যখন নেপথ্যে বৈদেশিক চাপ পড়ে তখন শাস্ত্রীজী ব্যাখ্যা করেছিলেন আমি বলিনি অ্যাটমিক ওয়ারহেডের অস্ত্র আমরা তৈরী করতে চাই। আমি বলেছিলাম, সামরিক দিক থেকে এইসব অস্ত্রের কোনও মূল্য আছে কিনা তা বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে।

এখানে এ কথাটা বোধ হয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দুই প্রধান বিশ্বশক্তিই, অর্থাৎ আমেরিকা এবং রাশিয়া দু' পক্ষই ভারতের আণবিক বোমা বা অস্ত্র তৈরীর ঘোর বিরোধী। এখন তো এ নিয়ে তাঁরা এক আন্তর্জাতিক চুক্তিই করে ফেলেছে। শুধু ভারত কেন, নতুন করে কোন রাষ্ট্রকেই তাঁরা এখন আর বোমা তৈরী করতে দিতে রাজী নন। আর রাশিয়া ... বলেই আমাদের দেশের কমিউনিস্টরা আণবিক অস্ত্র তৈরীর প্রস্তাবের ঘোর বিরোধী।

ভারত সরকার প্রকাশ্যে যাই বলুন আমেরিকা এবং রাশিয়া দু'পক্ষই বি... বহু দিন থেকে সন্দেহ করছে যে, ভা... আণবিক বোমা না হোক, আণবিক ... তৈরীর ব্যাপারে গোপনে অনেক ... এগিয়েছে। এই ব্যাপারে দু' দেশই ... সংগ্রহের প্রাণপণ চেষ্টাও করে যাচ্ছে। ... ইয়র্কস টাইমস ১৯৬৬ সনে সি আই ... সম্পর্কে যে বিখ্যাত ধারাবাহিক প্র... প্রকাশ করেছিলেন তার একটা অংশে ছি... বর্তমানে ভারতে মার্কিন গোয়ে... সংস্থার প্রধান কাজ হলো ও দে... আণবিক প্রস্তুতি সম্পর্কে খোঁজ... নেওয়া।

*

আমাদের দেশে যাঁরা আণবিক ... বা অস্ত্র তৈরীর বিরুদ্ধে তাঁরা অনেক ... যুক্তি দেখান। প্রথম যুক্তিটা হলো খর... তাঁরা বলেন, বোমা তৈরীর খরচ এত ... যে, ভারতের মত দরিদ্র দেশের পক্ষে ... তার বহন সম্ভব নয়। দ্বিতীয় যু... শুধু একটা বোমা তৈরী করলেই তো

না, আণবিক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হলে অনেক বোমা চাই এবং সেইসব বোমা নিয়ে লড়াই করার জন্য উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম প্রয়োজন। চাই আধুনিকতম বিমান, চাই নিখুঁত র‍্যাডার ব্যবস্থা, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এইসব ব্যবস্থা করা ভারত তো দূরের কথা, ব্রিটেন, ফ্রান্সের মত রাষ্ট্রের পক্ষেও সম্ভব নয়। এ'দের তৃতীয় আপত্তি : 'অল আউট' যুদ্ধ, অর্থাৎ পুরোপুরি লড়াই যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ আণবিক অস্ত্র বা বোমা অকেজো। 'অল আউট' যুদ্ধ হলেই যে আণবিক অস্ত্র ব্যবহৃত হবে তেমনও নয়। আর তা ছাড়া, কারু সঙ্গে আমাদের 'অল আউট' যুদ্ধে নামার সম্ভাবনাও নেই। যা হতে পারে সেটা হলো সীমায়িত যুদ্ধ—যেমন হয়েছে চীনের সঙ্গে, পাকিস্তানের সঙ্গে। এ সব যুদ্ধে আণবিক অস্ত্র অকেজো। এর জন্য চাই আধুনিকতম প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র। তাই এ'রা বলেন : আণবিক অস্ত্রে অর্থ ব্যয় না করে আধুনিকতম প্রচলিত অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করাই আমাদের প্রধান কাজ হওয়া উচিত।

যাঁরা বোমা তৈরীর পক্ষে, তাঁদেরও যুক্তি আছে। প্রথম যুক্তি : আণবিক বোমা ও অস্ত্র তৈরীর প্রশ্নটা যতটা না এখনই এই বোমা নিয়ে লড়াইয়ে নামার তার চেয়ে অনেক বেশি জাতীয় সম্ভ্রমের। আণবিক বোমা ভারতের সামরিক সম্ভ্রম অনেকটা বাড়িয়ে দেবে। যেমন চীনের সম্ভ্রম বাড়িয়েছে। চীনকে যে আজ প্রায় সকল রাষ্ট্র ভয় করে চলে তার প্রধান কারণ চীনের হাতে আণবিক অস্ত্র আছে। ছোট-বড় কোনও রাষ্ট্রই আজ এইজন্যই চীনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে সাহস পায় না—যদিও কারু কারু মনে তেমন একটা ইচ্ছা আছে। খরচের প্রশ্নে এ'রা বলেন : আণবিক অস্ত্র অন্যান্য অস্ত্রের ব্যয় অনেকটা কমাতে বাধ্য। কারণ, যখন অন্যান্য রাষ্ট্র দেখবে ভারতের হাতে আণবিক অস্ত্র আছে তখন তারা মনে সাধ থাকলেও ভয়ে ভারতের উপর হামলা করতে সাহস পাবে না। সুতরাং, আণবিক অস্ত্রের বলে বলীয়ান হয়ে আমরা অস্ত্র-শস্ত্রের খরচা অনেকটা কমাতে পারি। আন্তর্জাতিক গ্যারান্টি এবং সীমায়িত যুদ্ধের প্রসঙ্গে এ'দের বক্তব্য : আমরা যখন কোনও সামরিক জোটে নেই তখন আক্রান্ত হলেই ভিন্ন দেশ আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে সেটা ধরে নেওয়া মূর্খামি। জোটে থাকলেই যে বড় বিপদের সময় অন্যান্য রাষ্ট্র আমাদের সাহায্যে আসবেই তা ধরে নেওয়াও অন্যায়। নাও আসতে পারে। তা ছাড়া যুদ্ধ যে সব সময় সীমায়িত যুদ্ধই হবে তেমন গ্যারান্টি বা কোথায়? এ'রা আশঙ্কা করেন, চীন বা পাকিস্তান যে-কোনও সময় ব্যাপক লড়াইয়ে নামতে পারে। এর মধ্যে চীনের হাতে আবার আণবিক অস্ত্র আছে। সুতরাং, আমাদেরও আণবিক অস্ত্র চাই-ই।

ভারত সরকার দীর্ঘদিন এইসব যুক্তি উড়িয়ে দিয়ে এসেছেন। এখন যে এইসব যুক্তি তাঁরা মেনে নিয়েছেন তেমন কোনও প্রকাশ্য ঘোষণা নেই। তবে, এখন বিভিন্ন খবরে মনে হচ্ছে, সরকার এ ব্যাপারে নতুন বক্তব্য পেশ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। এই 'নতুন চিন্তাধারা' প্রস্তুতিপর্বেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হবে, না আরো এগোবে, এখনই তা হলফ করে বলা কঠিন।

> **'শেষ নমস্কার'** — বিশিষ্ট কথা-সাহিত্যিক **শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষের** এই নূতন উপন্যাসের প্রথম পর্ব 'শ্রীচরণেষু—মাকে' আগামী সংখ্যা থেকে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হবে। অনুভূতির আন্তরিকতায়, স্বীকারোক্তির সাহসে ও ঘটনার সমারোহে এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু চিরায়ত, রচনারীতি শুভ্র প্রসন্নতায় সমুজ্জ্বল।
>
> —সম্পাদক

✻

আমরা যখন আণবিক অস্ত্র ও বোমা তৈরীর বিতর্কে ব্যস্ত, তখন কিন্তু গোটা পৃথিবীর অগ্রগামী দেশগুলি আণবিক শক্তি শিল্পে নিয়োগের প্রতিযোগিতায় প্রাণপণে লড়ছে। পশ্চিমের প্রায় সব ক'টি রাষ্ট্রের আজ ধ্যানজ্ঞান, কিভাবে আণবিক শক্তি শিল্পে নিয়োগের প্রতি-যোগিতায় একে অপরের চেয়ে এগিয়ে যেতে পারে।

পশ্চিম দুনিয়ার সব অর্থনীতিবিদ, রাষ্ট্রনায়ক এবং বৈজ্ঞানিক আজ জানেন যে, পৃথিবীতে আর একটা শিল্পবিপ্লব আসছে। এই শিল্পবিপ্লব হবে আণবিক শক্তিকে ভিত্তি করে। আণবিক শক্তি যে যত দক্ষতার সঙ্গে শিল্পে নিয়োগ করতে পারবে সেই রাষ্ট্র শিল্পোৎপাদনের প্রতি-যোগিতায় তত বেশি এগিয়ে যাবে। তাই এ বিষয়ে একটা তীব্র গোপন প্রতিযোগিতা চলছে। কেউ কারু গোপন তথ্য অপরকে জানাতে রাজী নন।

বৈজ্ঞানিকরা বলেন, এই ব্যাপারে নাকি জার্মানরা সবচেয়ে বেশি এগিয়ে। ১৯৬৭ সনে আমি জার্মানীতে দেখে-ছিলাম, রাষ্ট্রনায়করা কি অধীর আগ্রহে এই শিল্পবিপ্লবের যাত্রারম্ভের জন্য অপেক্ষা করছেন। তাঁরা মনে করেন, এই ক্ষেত্রে একবার যাত্রা শুরু হলে কেউ আর শিল্পোৎপাদনের প্রতিযোগিতায় তাঁদের সঙ্গে পেরে উঠবেন না।

আমাদের বৈজ্ঞানিকরা যে এ ব্যাপারে কিছুই করে উঠতে পারেননি তা নয়। তবে, এই ব্যাপারের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যে পরিমাণ অর্থ ও অভিজ্ঞতা প্রয়োজন তা আমাদের নেই।

তা সত্ত্বেও আমাদের বহু বৈজ্ঞানিক নাকি দাবি করেন, হুকুম পেলেই যেমন তাঁরা আণবিক অস্ত্র ও বোমা তৈরী করতে পারেন, হুকুম এবং অর্থ পেলেই তেমনি নাকি তাঁরা শিল্পে আণবিক শক্তি নিয়োগের ব্যাপারেও বহু পশ্চিমা রাষ্ট্রের সমান দক্ষতা দেখাতে পারেন।

নবারুণ গুপ্ত

ফাঁসিকাঠের খেলা

দেশদ্রোহী কিংবা গুপ্তচর অপবাদ দিয়ে লোককে ঘটা করে ফাঁসিকাঠে লটকে দেওয়া ইদানীং দেখা যাচ্ছে ইরাকে একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফাঁসিও আবার দেওয়া হচ্ছে এক আধ জনকে নয় বিশ পঁচিশ ত্রিশ কী আরও বেশি লোককে দফায় দফায়। নতুন সরকারও দেশে পত্তন হয়েছে ১৭ জুলাই ১৯৬৮ সনে একটা ফৌজী বিদ্রোহের পর। তারপর থেকে হরদম শোনা যাচ্ছে দেশটা গুপ্তচরে ভরে গিয়েছে। গুপ্তচর সন্দেহে যাদের ধরা হচ্ছে তাদের ওপর মায়া-দয়া কিছু দেখানো হচ্ছে না। বলতে গেলে তাদের এক রকম সটান ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিচারের অভিনয় একটা না হচ্ছে যে তা নয়, তবে সে সবই বিশেষ কোর্ট, কেবল গুপ্তচরদের মামলা বিচার করবার জন্যেই তাদের সৃষ্টি। সে কোর্টের বিচারে খালাস তো কেউ হচ্ছেই না, চরম শাস্তি ছাড়া আর কিছুও তাদের বরাতে জুটছে না। এমনি করে বছর দেড়েকের মধ্যে পঞ্চাশ জনের ওপর "বিদেশী চরকে" ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হয়েছে ইরাকে। তাদের মধ্যে অনেকেই ইহুদি যাদের ওপর আরবদের বেজায় রাগ।

গুপ্তচর বৃত্তির অজুহাতে ইরাকে ইহুদিদের শাস্তি অনেকের কাছেই কেমন যেন ঠেকেছে। ও দেশে যে সব ইহুদি বাস করে তারা রাষ্ট্রদ্রোহী হয়ে উঠবে এতটা বুকের পাটা তাদের আছে এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত। লোকে বলে আসলে ওটা সরকারের ঘর সামলানোর চেষ্টা—ঝিকে মেরে বউকে শেখানো আর কি। নির্বাচনের গণতান্ত্রিক পথে তো আর সে সরকার ক্ষমতা পায়নি—পেয়েছে গায়ের জোরে, সেনাবাহিনীর সাহায্যই তার ভরসা, তাও আবার সকলের নয়, একটা অংশের। কাজেই যাঁরা দেশ শাসন করছেন তাঁদের সদাই ভয় কী জানি কখন কী হয়, যে চোরাপথে তাঁরা ক্ষমতা পেয়েছেন সেই চোরাপথেই তা আবার হারিয়ে না যায়। তাই তাঁরা চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখিয়ে ক্ষমতা বজায় রাখতে চাইছেন। কথায় কথায় গুপ্তচরদের ফাঁসি দিয়ে তাঁরা দেখাতে চান তাঁরা ভীষণ কড়া, কারুর বেয়াদপি একটুও সহ্য করতে রাজী নন। দেশের লোক থাক, দাক, আমোদ আহ্লাদ করুক তাতে তাঁদের আপত্তি নেই। কিন্তু বেঁকা পথ যদি কেউ ভুলেও ধরে তা হলে তার আর রক্ষে নেই, ফাঁসিকাঠ তাঁদের তৈরিই আছে, কেবল একটু হুকুমের ওয়াস্তা।

দিন কতক চুপচাপ থাকার পর ফাঁসি-কাঠের খেলা আবার শুরু হয়েছে বাগদাদে। একুশে থেকে পঁচিশে জানুয়ারির মধ্যে চার দিনে জন পঁয়তাল্লিশ লোককে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার অপরাধ আর গুপ্তচরগিরির নয়—একেবারে সোজাসুজি দেশদ্রোহিতা। যাদের চরম দণ্ড দেওয়া হয়েছে তারা সবাই নাকি গোটা পাঁচ বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগসাজসে ক্ষমতা দখলের চেষ্টায় ছিলেন। রাষ্ট্র পাঁচটি হচ্ছে আরবদের পরম শত্রু ইস্রায়েল, তাদের চক্ষুশূল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানি, ব্রিটেন আর ইরান। চক্রান্তটা আসলে নাকি আমেরিকার। ইস্রায়েল আর ইরানকে শিখণ্ডী খাড়া করে সে-ই নাকি ইরাকের বিপ্লবী সরকারকে উচ্ছেদ করতে চেয়েছিল। তলে তলে সব ব্যবস্থা করেছিল নাকি সি আই এ। ক্ষমতা দখলের চেষ্টাও হয়েছিল ২০ জানুয়ারি। কিন্তু তা নাকি বিফল হয়েছে সরকার খুব সতর্ক ছিলেন বলে। চটপট তাঁরা চাঁইদের ধরে ফেলেছেন, তারপর খামখা সময় নষ্ট না করে বিশেষ কোর্ট বসিয়ে বিচারের পালাও শেষ করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহীদের সবাইকে বেহেস্ত পাঠাবার ব্যবস্থাও করেছেন।

বিদ্রোহের আয়োজন বাগদাদে সত্যিই হয়েছিল কি না, হলে তার সঙ্গে ইস্রায়েল-আমেরিকা-ইরানের কতটা যোগ ছিল তা জানবার কোনও উপায় নেই। সি আই এর ফাঁদ তো সারা দুনিয়াতে পাতা, কখন কাকে তাতে ধরার চেষ্টা যে হয় তা কেউ জানে না। এমন কী ধরার পরও ব্যাপারটা স্পষ্ট জানা যায় না, আঁচ করা যায় মাত্র। তার ওপর কোনও আরব রাষ্ট্রের সঙ্গেই আমেরিকার সদ্ভাব নেই, ইরাকের বেলায়ও ব্যতিক্রম হবার কথা নয়। তা ছাড়া ইদানীং ইরাকী সরকারের নীতিগতিও খানিকটা পালটেছে। তাতে আমেরিকার (আর ইস্রায়েলেরও) আরও অস্বস্তি বোধ করবার কারণ ঘটেছে। ইরাকী মন্ত্রিসভায় আধিপত্য বাথ দলের। তাদের নিরীহ সমাজতন্ত্রী দল বলেই লোকের ধারণা ছিল। উগ্রপন্থী তারা তো নয়ই, কম্যুনিস্ট দরদীও নয়। লাল চীন তো নয়ই, রুশীদেরও কোনও প্রভাব তাদের ওপর ছিল না। হালে হাওয়াটা কিন্তু বদলেছে। রুশিয়ার প্রতিপত্তি ইরাকে বেড়েছে। বাথ দলও যেন সোভিয়েট ইউনিয়নের দিকেই ঢলে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে। খোদ মন্ত্রিসভাতেও ঠাঁই পেয়েছেন একজন সোভিয়েট বান্ধব—আজিজ শরিফ। তাঁকে দেওয়া হয়েছে বিচার দপ্তরের ভার। আবার পূর্ব জার্মানিকেও স্বীকৃতি দিয়েছে ইরাক।

কী আমেরিকা, কী ইস্রায়েল কারুরই এ সব ব্যাপার ভালো লাগার কথা নয়। বলে না হোক, ছলে কাজ সারবার ফন্দি আঁটা তাদের পক্ষে বিচিত্র নয়। ফৌজী বিদ্রোহ দেখতে দেখতে ইরাকে অনেক গুলোই ঘটে গেল রাজতন্ত্র উচ্ছেদের পর। আর এক দফা বিদ্রোহ ঘটাবার জন্যে যদি আরও দু পাঁচ জন জঙ্গী নেতা তৈরি থাকেন তাতেও অবাক হবার কিছু নেই। ফৌজী শাসনতন্ত্র হচ্ছে প্রায় তাসের প্রাসাদ কখন যে বাতাসে ভেঙে পড়ে তার কোনও হদিসই আগে থেকে টের পাওয়া যায় না। যাঁরা ক্ষমতা দখল করেন তাঁরা তাই সর্বদাই ভাবেন, কী জানি কোথা দিয়ে কখন কী ঘটে যায়। ভীতু লোক যেমন ঝোপে ঝাড়ে ভূত দেখে তাঁরাও তাই। নিজেদের দোষ অন্যদের ঘাড়ে ফেলাও তাঁদের পক্ষে খুবই সম্ভব। আবার তেমনই সম্ভব ওদের সঙ্গে বিদেশী রাষ্ট্রের গোপন মিতালি। পারলে ইরাককে সব লণ্ডভণ্ড করে দিতে ইস্রায়েলের তো আপত্তি নেই, আমেরিকারও আছে বলে বোধ হয় না। তফাতের মধ্যে এই, ইহুদিরা রেখেঢেকে কিছু বলছে না, করলেও কিছু লুকোচ্ছে না। আমেরিকা যা করছে তা অতি গোপনে, খোলাখুলি কিছু কবুল করতে সে রাজী নয়।

তবে দেখা যাচ্ছে এবারে বেধে গেছে ইরাকের সঙ্গে ইরানেরও। দু' দেশের মধ্যে সম্পর্ক আগেও ভালো নয়। মন কষাকষি চলছে অনেক দিন ধরে। ইরানের শাহকে দু' চোখে দেখতে পারেন না ইরাকী সরকার। তাঁদের রাগটা পড়েছে যে সব ইরানী ইরাকে প্রবাসী তাদের ওপরও। সেটা আরও বেড়েছে ইরানী শাতিল আরবের ওপর কর্তৃত্ব নিয়ে দু' দেশের মধ্যে বিরোধের পর থেকে। ইরাক আর ইরানের সীমানায় শাতিল আরব। সেখানে কার প্রভুত্ব থাকবে তা নিয়ে মাস কয়েক আগে এক চোট হয়ে গেছে বাগদাদের সঙ্গে তেহরানের। জর্ডান মাঝে পড়ে থামিয়ে না দিলে দ্বন্দ্ব অনেক দূর গড়াতো। ইরাকের রাগ আরও বেড়ে গেছে ২০ জানুয়ারির সরকার দখলের চেষ্টার পেছনে ইরানের হাত ছিল এই সন্দেহে। বাগদাদ থেকে ইরানী রাষ্ট্রদূতকে পত্রপাঠ দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইরানও ছেড়ে কথা কয়নি। ইরাকী রাষ্ট্রদূতকে তারাও বিদেয় দিয়েছে। বেশ দেখা যাচ্ছে, ইরাক আর ইরানের মধ্যে দিব্যি একটা জট পাকিয়ে উঠেছে, যা খোলা খুব সহজ হবে না। অথচ এমন হবার কথা নয়। শিয়ারা দু' দেশেই সংখ্যাগুরু আর পশ্চিম এশিয়ায় ধর্মের মিলের চেয়ে বড় মিল আজ আর কিছু নেই।

২৮।১।৭০

'খাজুরে গুড় কত কইর‍্যা ?'

ওঁরা নিশ্চয় কোনো চকচকে একটি মোটর-গাড়ি থেকে নেমেছেন। ভদ্রলোকের পরনে সেই রকম কেতাদুরস্ত স্যুট—যার সচিত্র বিজ্ঞাপন মধ্যে মধ্যে খবরের কাগজে দেখা যায়—অর্থাৎ কোনো এক যুবা একটি

খেজুর রস চুরির স্মৃতি রোমন্থন করে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আজও রোমাঞ্চিত হন

বিশিষ্ট স্যুটিংয়ের পোশাক পরে দিগ্বিজয়ীর মতো দাঁড়িয়ে এবং কটি তরুণী মন্ত্রমুগ্ধের মতো বিকচ দন্তে এবং ফুল নেবে তাঁর দিকে চেয়ে রয়েছেন; আর ভদ্রমহিলা ঠিক বিজ্ঞাপনের মতোই সুবেশিনী, সুরূপা, প্রসাধিতা এবং মাথায় একটি কেজি দেড়েক ওজনের নকল খোঁপাধারিণী। নিখুঁত মেড ফর ঈচ আদার!

এঁরা বাজারের মধ্যে ঢুকে পড়তে, আমি চটি, চাদর, ধুতি এবং চটের থলেতে উদ্ধৃত পালংশাকের শীষ সমেত সভয়ে পাশ ঘেঁষে দাঁড়ালুম। কিন্তু কী আশ্চর্য, আমি যে দোকান থেকে কিছু খেজুরে গুড় কেনবার চেষ্টা করছি, সেইখানেই থমকে গেলেন তাঁরা। তারপর জিজ্ঞাসু এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গুড়ের হাঁড়ি,

পাটালী, মুচি ইত্যাকার ব্যাপারগুলোর দিকে তাকালেন।

মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করছিলুম, এঁরা কী বলবেন। নিশ্চয় ভদ্রমহিলা এরপরে আঙুল বাড়িয়ে ইংরিজিতে জিজ্ঞেস করবেন : 'হোয়াট্স্ দ্য স্টাফ্ হি ইজ সেলিং?' আর ভদ্রলোক 'শ্রাগ' করে বলবেন, 'আই ডান্নো। আ কাইন্ড্ অব ইণ্ডিয়ান ক্যাণ্ডী, আই বিলিভ।'

কিন্তু—আমার কান দুটোকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে দিয়ে, আমার সর্বাঙ্গে শিহরন জাগিয়ে (একটু হলেই চটের থলিটা হাত থেকে পড়ে যেত), বেলা ন'টার সময় বাজারে দাঁড়িয়ে আমি স্বপ্ন দেখছি কি না এই রকম কূট-সংশয় আমার মনে সঞ্চারিত করে দিয়ে, তীক্ষ্ণ মধুর স্বরে ভদ্রমহিলা বললেন, 'খাজুরে গুড় কত কইর‍্যা ?'

আমি আশা করেছিলুম, ভদ্রলোক চমকে একটা লাফ দেবেন, প্রশ্ন করবেন 'হোয়াট ল্যাংগুয়েজ আর ইয়ু স্পীকিং? ইজ্ দ্যাট্ গ্রীক?' তার বদলে ঠোঁট থেকে চুরুট নামিয়ে তিনি মৃদু হাস্য করলেন। আমাকে আবার স্তম্ভিত করে দিয়ে বললেন, 'হঃ, এইগুলিন্ আবার খাজুরে গুড়। ভেলির লগে মিশান দিয়া—'

এবার পূর্ববঙ্গীয় গুড়ওলার উত্তেজিত হওয়ার পালা।

'কী কইলেন, ভেলি মিশান! পায়ালের দুধ যদি এট্টুও কাটে—পয়সা ফিরৎ দিয়া—'

কোথায় দেড় কেজির খোঁপা—কোথায় বিজ্ঞাপনের স্যুট। পরবর্তী অংশটুকু বিশুদ্ধ বাঙাল ভাষায় সংলাপ—স্বামী-স্ত্রীর মুখ দিয়ে গোমুখীর মতো পদ্মার প্রবাহ নামতে লাগল। দেখলুম, এঁরা গুড়-বিশারদ, সহজে দোকানদারকে ছাড়বেন না। সুতরাং আমিই পাশের দোকানের দিকে পা বাড়ালুম।

বাজারের বাইরে এসে, শীতের লাল রোদ্দুরের মধ্যে দাঁড়িয়ে, হঠাৎ আশ্চর্য একটা ভালো-লাগার অনুভূতিতে মন ভরে গেল আমার। কতদিন মনে হয়েছে—আমরা সরে যাচ্ছি, বেশে-বাসে, ভাষায়, জীবনযাত্রায়, রুচিতে—পুরোনো একটা বাংলা দেশের কাছ থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি আমরা। কিছু অর্থ-স্বাচ্ছন্দ্য থাকলেই ছেলেমেয়েদের আর আমরা বাংলা-মাধ্যম স্কুলে পড়াই না, এখনকার ছেলেরা ধুতি পরতে ভুলে গেছে, একটা স্তরের মেয়েরা যে-ভাবে চিবিয়ে বাংলা বলেন, তাতে সন্দেহ হয়, তাঁরা সদ্য কানাডা কিংবা হামবুর্গ থেকে ভারতে এসে এখানকার ভাষা শিখতে শুরু করেছেন। বিদেশী গানের শিস্ যাঁদের ঠোঁটের আগায়—বিদেশী নাচের স্টেপিং-এ যাঁরা এর মধ্যেই তালিম পেয়েছেন, তাঁদের কাল্চারের চেহারা যেখানকারই হোক, এ দেশের নয়।

গাড়ি পার্ক করে আজও তেলেভাজা খাই

তা ছাড়া কালচারের রূপটাই তো এখন আন্তর্জাতিক। বাঙালী কৃষক এখনো পুরোনো কাস্তে দিয়ে ধান কাটে, দূরের পথে লাল ধুলো উড়িয়ে তাল গাছের পাশ দিয়ে এখনো গোরুর গাড়ির চলে যাওয়া, এখনো টিয়া রঙের শাড়ী পরা মেয়েটি নাকে রুপোর ফুল নিয়ে ভয়ে ভয়ে বাসে ওঠে, এখনো পুরোনো মাঝি পুরোনো নৌকোয় কাদায় ভরা খেয়াঘাটে পারাপার করে, এখনো মেহেদী আর অ্যাশ-শ্যাওড়ার মাঝখানে ফালি রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে কলুর ঘানি ঘোরবার শব্দ শুনি, কারা যেন মেথি ফোড়ন দিয়ে রান্না চাপিয়েছে—নাকে আসে তার গন্ধ। অথচ শহরে, মধ্যবিত্ত স্তরটা ছাড়লেই—একটা আন্তর্জাতিক চেহারা। বাঙালীকে আর বাঙালী বলে চিনি না—পাঞ্জাবী, মারাঠী, সিন্ধী, দাক্ষিণীর সংগে সে একাকার।

নিজের দল জিতলে সর্বাগ্রে ইলিশ মাছের কথাই মনে পড়ে

আজ মনে হল, কোথায় যেন থেকে যায় পিতৃ-পুরুষের একটা ধারা—ইচ্ছে করলেই নিজেদের আমরা বদলাতে পারি না। তখন দেড় কে-জি নকল খোঁপাটা মায়া, মিস্টার টিপটপও তখন সেই পুরোনো কাস্তে, সেই নদী, সেই গোরুর গাড়ির পথ, মেথি-ফোড়নের সেই গন্ধ টের পান নিজের ভেতর। অতঃপর প্রশ্ন : 'খাজুর গুড় কত কইর্যা ?'

আর রক্তের মধ্যে এই ধারাটা থাকে বলেই লণ্ডনে দুর্গাপুজোর উৎসব, আমেরিকায় বিজয়া সম্মেলন, কানাডায় বাংলা নাটক। এ শুধু দূর বিদেশে থেকে স্বদেশকে স্মরণ করা নয়, এ আমাদের সেই উত্তরাধিকার, সেই মৌলিক চরিত্র। ওপরের স্তরে আমরা যত খুশি আন্তর্জাতিক হতে পারি, কিন্তু এই ভিতটা কি সহজে বদলায়, বদলাতে পারে ?

পূর্ব বাংলার একটি মুসলিম তরুণ সরকারী চাকরির সূত্রে বদলি হয়ে এসেছে কলকাতায়। সোজা জিজ্ঞেস করল, 'স্যাশে যান নাই কদ্দিন ?'

জানালুম।

'ঈস—কতকাল খায়েন নাই কীর্তিখোলার তাজা ইলিশ, চাঁদপাশার মুসুরির ডাইল। ভালো লাগে আপনের ? এইখানে আসবার আগে আছিলাম রাওলপিণ্ডিতে। ধুর—না আছে খাইয়া সুখ, না আছে কথা কইয়া—বাংলা দেশে পা দিয়া বাচলাম।'

বাংলা দেশ এবং বাঙালী। পূর্ব আর পশ্চিম। দাগটা বাইরেই, ভেতরে পড়েনি।

আর এক দিনের কথা মনে এল। কিছু প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সাহিত্য-তত্ত্ব নিয়ে অত্যন্ত বিদগ্ধ আলোচনা করছিলেন—হঠাৎ কথার ফাঁকে একজন বলে ফেললেন, তাঁর দেশ করিমগঞ্জ থেকে কিছু ভালো শুঁটকি মাছ এসেছে।

আর একজন শ্রীহট্টীয়—যিনি মার্কসীয় একটি আধুনিক নন্দন-গ্রন্থ সম্বন্ধে তেড়ে বক্তৃতা করছিলেন, চকিতে থেমে গেলেন। সোৎসাহে বললেন, 'তা হলে আজ আপনার বাড়িতে আমার নেমন্তন্ন !'

কাল বদলাবে, রুচি বদলাবে—তবু বংশধরের কাছে আমরা রেখে যাব বাংলা দেশের এই স্বাদ—এই উত্তরাধিকার। যখন আমরা থাকব না, তখনো শোনা যাবে : 'খাজুর গুড় কত কইর্যা ?'

গৌড়-সারং

বনফুল

দুপুরে খাওয়ার সময় মনটা খারাপ হয়ে গেল। বাবুর্চি বললে যে-কোন মুর্গিটা রাজপুরের হাট থেকে কিনে এনেছিলাম সেটি নাকি পালিয়ে গেছে। সে বাজার গিয়েছিল আর একটি মুর্গি কিনতে, পায়নি। তার বদলে চুনো মাছ কিনে এনেছিল কিছু। চুনো মাছের ঝোল দিয়েই ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হয়েছে আজ। মনটা সত্যিই খারাপ হয়ে আছে। অথচ আমার বাবুর্চি বদরুদ্দিনকে বরখাস্ত করবার উপায় নেই। আমি অবিবাহিত লোক। সংসারের বন্ধনে নিজেকে বাঁধবার প্রবৃত্তি হয়নি। নানারকম খেয়াল নিয়ে মেতে থাকি। সম্প্রতি প্রজাপতি সংগ্রহের জন্য বেরিয়েছি। আমার সঙ্গে থাকে একটা তাঁবু, একটি বিছানা, কিছু বাসনপত্র, কিছু বই, আর আমার [illegible] জন্য যে সব সরঞ্জাম লাগে তাই। এ সবেরই ভার বদরুদ্দিনের উপর। সে নিপুণভাবে আমার দেখা-শোনা করে। লালন-পালন করে বললেই ভালো হয়। তার চাল-চলন কথাবার্তা হাত-নাড়া অনেকটা মেয়েমানুষের মতো। ঢিলে আঙরাখা পা-জামা গেঞ্জি না পরে সে যদি শাড়ি ব্লাউজ পরত তাহলে কিছু বেমানান হত না। মুচকি মুচকি হাসে কেবল। কথা বড় একটা বলে না। না, বদরুদ্দিনকে বাদ দিয়ে আমার সংসার অচল। লোকটা অত্যন্ত ভালো মানুষ। তাছাড়া ওকে ছাড়া আমার চলবেও না তো। ঠিক করেছি এবার যখন হাটে যাব মুর্গি একেবারে কাটিয়েই নিয়ে আসব। তাহলে আর পালাবে না। তাঁবুর ছায়া পড়েছিল খানিকটা, তারই উপর কম্বল বিছিয়ে শুয়ে-ছিলাম রোদের দিকে পিঠ করে। মুর্গির কথাই ভাবছিলাম। হঠাৎ অনুতপ্ত হয়ে পড়লাম। ভাবলাম কাল একটা বেগুনী রঙের অদ্ভুত প্রজাপতি দেখেছিলাম। সেটা ধরতে পারিনি। ধরতে পারলে আমার সংগ্রহে একটা নূতন ধরনের প্রজাপতি হত। বেগুনির সঙ্গে শাদা আর হলদে ফোঁটা আর কোনও প্রজাপতির পাখায় দেখিনি আগে। সেই হাতছাড়া-হওয়া প্রজাপতির কথাটাই আমার বারবার মনে হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমি কেবল মুর্গিটার কথাই ভাবছি। অথচ আমি যে খুব একটা পেটুক বা খাদ্যরসিক লোক তা নই—তবু ওই মুর্গি আর বদরুদ্দিনই আমার মন জুড়ে বসে আছে। আর একটা কথা ভেবে অনুতাপ হচ্ছে। বদরুদ্দিনকে বলেছিলাম যে তোমার মাইনে থেকে মুর্গির দামটা কেটে নেব। যদিও আমি নিতাম না, তবু বলতে গেলাম কেন ও কথা। বদরুদ্দিন অবশ্য কিছু বলে নি, মুখটা কাঁচুমাচু করে দাঁড়িয়েছিল কেবল। তার সেই মুখটা মনে পড়ল হঠাৎ। শীতের দুপুর। পায়ের কাছে রোদটা চমৎকার লাগছে। দূরে একটা শিরীষগাছের শুকনো ডালে বসে আছে একটা চিল। এদিক ওদিক চাইছে মাঝে মাঝে। হঠাৎ একটা সূক্ষ্ম সুরের তান ছেড়ে সে উড়ে গেল। পরে দেখলাম আর একটা চিল এসেছে। হয়তো তার সঙ্গিনী বা সঙ্গী। দেখতে দেখতে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল তারা। আমার তন্দ্রা এল একটু। আমার আধ-বোজা চোখের ভিতর দিয়েই কিন্তু যা দেখতে পেলাম তাতে আমাকে উঠে বসতে হল। দূরে মাঠে কতকগুলো খঞ্জন চরছে, আর তার ভিতর রয়েছে কয়েকটা হলদে-মাথা আর সাদা-মাথা খঞ্জন। এককালে পাখি দেখার নেশা ছিল। বাইনাকুলারটা সঙ্গেই আছে। তাঁবুর ভিতর ঢুকে বার করে নিয়ে এলাম সেটা। চোখে লাগিয়ে দেখতে লাগলাম তন্ময় হয়ে। কি সুন্দর! শীতকালের অতিথি ওরা। কত দূর থেকে এসেছে। হঠাৎ পাখিগুলো উড়ে গেল। দূরবীনের ভিতর দিয়েই দেখতে পেলাম তিলিয়া আসছে। তিলিয়া গোয়ালার মেয়ে। মাঠের ওপারে তার বাড়ি। এই মাঠে তার ছাগল দুটো চরে। মাঝে মাঝে লম্বা দড়ি দিয়ে বেঁধে দিয়ে যায়। তিলিয়াকে একটা খাঁচা কিনে দিয়েছি। বলেছি, প্রজাপতি ধরতে পারলে এর ভিতর পুরে রেখে দিস। আমি প্রজাপতি পিছু এক আনা করে দেব। তিলিয়া কিশোরী। আসন্ন যৌবনের আভাস তার সর্বাঙ্গে। চোখ দুটি অপরূপ। তিলিয়া আমাকে কয়েকটা ভালো প্রজাপতি ধরে দিয়েছে। ভাবলাম আজও বোধ হয় কয়েকটা প্রজাপতি ধরে নিয়ে আসছে। কাছে যখন এল তখন তার হাতে দেখলাম একটা চিঠিও রয়েছে। খামের চিঠি।

"পিওন দিলে চিঠিখানা—"

চিঠি খুলে অবাক হয়ে গেলাম।

বাতাসী চিঠি লিখেছে দীর্ঘকাল পরে।

লিখেছে—"খেয়ালী বন্ধু, তুমি কোথায় এখন। যার কাছে এ ঠিকানা পেলাম সে বললে তুমি হয়তো কিছুদিন পরেই অন্যত্র চলে যাবে। তবু তোমাকে এই চিঠি লিখছি। কারণ জীবনে সব কথাই তোমাকে বলেছি। প্রথম যখন গৌড়-সারং শিখেছিলাম, তোমাকে শুনিয়েছিলাম তা। প্রথম যখন ভাল বেসেছিলাম তা-ও তুমি জানো। তুমি নির্বিকার, তুমি বিচলিত হওনি। অনেক কথাই বলেছি তোমাকে তবু। আজ আর একটা কথা বলবার জন্যে তোমাকে এই চিঠি লিখছি। লিখছি, কারণ তোমাকে সব কথা না বললে আমার তৃপ্তি হয় না। আগামী ১৯শে মাঘ আমার বিয়ে। জানি তুমি আসতে পারবে না। আশীর্বাদও করবে না কি? এখন কি নিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে আছ? পাখি, প্রজাপতি, গাছপালা, না মেঘ? জানতে পারলে পরজন্মে তাই হবার জন্য প্রার্থনা করব ভগবানকে। এক লাইন চিঠি লিখবে কি? চিঠিটা পড়ে পকেটে রেখে দিলাম। সময় মতো একটা উত্তর লিখে দেব। কিম্বা হয়তো লিখব না।

তিলিয়ার দিকে চেয়ে বললাম—'খাঁচায় প্রজাপতি এনেছিস না কি। কটা ধরেছিস?'

তিলিয়া হেসে বললে, 'প্রজাপতি নয়, মুরগি এনেছি। আপনার যে মুরগিটা হারিয়ে গিয়েছিল সেইটে ধরে এনেছি?'

খাঁচার ভিতর থেকে বেশ একটি ভালো মুরগি বার করলে তিলিয়া।

অবাক হয়ে গেলাম দেখে।

"আমার কেপনাটা তো কালো রঙের ছিল, এটা তো দেখছি সাদা। তাছাড়া এর ঝুঁটি যে রকম বড় তাতে মনে হয় এটা কেপনা নয়। কোথা পেলি এটা?"

তিলিয়ার মুখখানায় মেঘ নেমে এল হঠাৎ। ভারি অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল বেচারি।

'কোথা থেকে আনলি এ মুরগি?'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—'পাশের গাঁ থেকে কিনে আনলাম।'

'কেন কিনতে গেলি কেন।'

'আপনি যেন বদরুদ্দিনকে কিছু বলবেন না। ওর মাইনেও কাটবেন না। বড্ড গরীব বেচারি—"

"ওর মাইনে কাটব কি করে জানলি তুই।"

"বদরুদ্দিন আমাকে বলেছে। ও আমাকে সব কথা বলে।"

বাতাসীর কথা মনে পড়ল।

আর মনে পড়ল তিলিয়া হিন্দুর মেয়ে বদরুদ্দিন মুসলমান।

"কত দাম নিয়েছে মুরগির—"

"চার টাকা।"

আমি পকেট থেকে টাকা বার করে দিলাম তাকে। প্রথমে নিচ্ছিল না, ধমক দেওয়াতে নিল।

'বদরুদ্দিনকে কিছু বলবেন না তো—"

"না—"

"মাইনে কাটবেন না?"

"না, না, না—তুই পালা—"

তিলিয়া হাসতে হাসতে চলে গেল।

আমি চোখ বুজে বসে রইলাম। অনেক দিন আগে বাতাসী যে গৌড় সারংটা শুনিয়েছিল আমাকে, সেইটেই যেন শুনতে পেলাম আবার।

৩

য়ুরোপ-সফর শেষ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথেই গান্ধীজির নেতৃত্বে ভারতবর্ষে অসহযোগ-আন্দোলনের যে সব সংবাদ রবীন্দ্রনাথ পেয়েছেন তাতে যে তিনি যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন এণ্ড্রুজকে লিখিত কয়েকটি চিঠিতে (Letters to a Friend দ্রষ্টব্য) তার নিদর্শন আছে। কিন্তু দেশে ফিরে অসহযোগের যে চেহারা তিনি দেখলেন তাতে তিনি সম্পূর্ণ নিরাশ হলেন। গান্ধীজির সঙ্গে মতবিরোধের সূত্রপাত হল এইখানেই। এই বিরোধের মূলে আছে স্বরাজের স্বরূপ এবং তার যথার্থ সাধনা সম্বন্ধে কবির সারাজীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ সুস্পষ্ট ধারণা এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টি। অসহযোগের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ এই সময় একাদিক্রমে শিক্ষার মিলন, সত্যের আহ্বান, চরকা প্রভৃতি প্রবন্ধ (কালান্তর গ্রন্থে সংগৃহীত) প্রকাশ করেন। গান্ধীজি একটিমাত্র উত্তর দেন ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রে The Great Sentinel নামক প্রবন্ধে। এই রচনাগুলি আমাদের দেশের সমকালীন ইতিহাসের অন্যতম দলিল। এগুলির প্রাসঙ্গিকতা আজ বেড়েছে ছাড়া কমেনি।

ইতিমধ্যে রোলাঁ গান্ধীজির প্রতি এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকাটির প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন। ১৯২৩ সালে তিনি গান্ধীজির উপর ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি রচনার উদ্দেশ্যে উপাদান সংগ্রহের সূত্রে গান্ধীজির রচনাদি পাঠ করছিলেন। এই প্রসঙ্গে কালিদাস নাগকে লিখিত এক পত্রে গান্ধী রচনায় প্রকটিত 'মধ্যযুগীয়' মনোভাব সম্বন্ধে রোলাঁ অসন্তোষ প্রকাশ করেন। কালিদাস নাগ ১৯২২ সালের মে মাসে তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির প্রতিলিপি রোলাঁকে পাঠিয়ে দেন। এই চিঠিতে কবি পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধগুলিতে বিস্তৃতভাবে যা বলেছেন তাই সংক্ষেপে সূত্রাকারে বিবৃত করেছেন। চিঠিখানির দীর্ঘ অংশ জর্নালে উদ্ধৃত করে রোলাঁ সংক্ষেপে মন্তব্য করেন : 'আমার চিন্তার সঙ্গে এই চিঠি হুবহু মিলে যাচ্ছে' (Elle est d'accord, avec ma pensee).

১৯২৩ সালের মার্চ মাসে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত একখানি চিঠিতে গান্ধীজি সম্বন্ধে পূর্বোক্ত মত ব্যক্ত করে গান্ধীজির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতবিরোধ যে মৌলিক জীবনাদর্শের বিরোধ এবং সমকালীন যুগ-সংকটের পটভূমিতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সে কথা বিস্তৃতভাবেই তিনি ব্যাখ্যা করলেন। রোলাঁ লিখলেন : 'এ যেন সন্ত পল্ এবং প্লেটোর মধ্যে বিতর্ক। কিন্তু অকুস্থল ভারতবর্ষ হওয়ায় এবং দিগন্ত বিস্তৃত হয়ে যেন সারা পৃথিবীকেই আলিঙ্গন করেছে এবং সমগ্র মানবসমাজই যেন এই 'মহান বিতর্কে' অংশ গ্রহণ করছে।' অনতিকাল পরে রোলাঁ-রচিত মহাত্মা গান্ধী নামক যে ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়, তাতেও এই মতবিরোধ সম্বন্ধে তিনি বিস্তৃত আলোচনা প্রসঙ্গে ঐ প্লেটো ও সন্ত পলের তুলনাটিই ব্যবহার করেন এবং দেখা যায় ভাষাও প্রায় অভিন্ন। সেই সঙ্গে গান্ধীজি এবং রবীন্দ্রনাথ এই দুইজনের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য সম্বন্ধেও মন্তব্য করলেন : 'গান্ধীর মধ্যে আছে বিশ্বাসের শক্তি এবং অপার করুণা যার মধ্যে দেখি আগামী দিনের নতুন সমাজ গড়বার মিলনসূত্র। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেখি সেই মুক্ত, বিরাট এবং প্রশান্ত প্রজ্ঞা যার মধ্যে সমস্ত বৈচিত্র্য সমেত সমগ্র প্রাণলোকই যেন বিধৃত।' পরিশেষে এই মতবিরোধে তাঁর নিজের স্থানটি যে রবীন্দ্রনাথেরই পাশে সে কথাও স্পষ্ট করেই বললেন : 'মহাত্মা গান্ধীকে যতই শ্রদ্ধা করি, আমাদের স্থান রবীন্দ্রনাথেরই পাশে.' *

('Tout en le venerant, nous sommes avec Tagore'. **Mahatma Gandhi, p. 137 f.n.)**

এই প্রসঙ্গ আঁদ্রে কার্প্লেকে লিখিত একখানি চিঠির (২৯শে নভেম্বর, ১৯২৪) উল্লেখ এবং আংশিক উদ্ধৃতির প্রয়োজন। এই চিঠিতে গান্ধীজি এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পার্থক্যের বিশ্লেষণ ছাড়াও একটু বিশেষ কৌতূহলের উপকরণ আছে : এটি পড়লে জানা যায় রোলাঁ এই সময় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও একখানি জীবনী-পুস্তিকা রচনা করার কথা ভেবেছিলেন। কেন নিরস্ত হলেন তার ব্যাখ্যাও আছে চিঠিতে। তিনি লিখছেন : 'প্রশ্ন করেছেন একখানি রবীন্দ্র-জীবনী কেন লিখছি না। লেখবার আকাঙ্ক্ষা তো আছে।...(কিন্তু) গান্ধী-চরিত যে ভাবে লিখেছি ঠিক সেভাবে রবীন্দ্র-চরিত লেখা যায় না। তার কারণ, রবীন্দ্র-চরিত অনেক বেশী জটিল, চিন্তা সম্পদে অনেক বেশী সমৃদ্ধ এবং গভীরতর অর্থে ভারতীয়।'

১৯২২ সালের ৪ঠা এপ্রিল কালিদাস নাগের সঙ্গে আলাপসূত্রে ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে রোলাঁ ওয়াকিবহাল হলেন এবং বিশেষ করে শুনলেন যে গান্ধীজির সঙ্গে মতবিরোধের দরুণ স্বদেশে রবীন্দ্রনাথ প্রায় পরিত্যক্ত। শেষোক্ত সংবাদে রোলাঁ খুবই বিচলিত হলেন। দেখা যায় জর্নালে বারবার উদ্বিগ্নভাবে লিখছেন 'রবীন্দ্রনাথ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছেন', পিয়ার্সন প্রমুখ ভারতাগত বন্ধুদের সঙ্গে এ-বিষয়ে বারবার আলোচনা করছেন এবং প্রায় ১৯২৫-এর শেষ পর্যন্ত আঁদ্রে কার্প্লে প্রভৃতি বন্ধুদের নিকট চিঠিপত্রে উত্তেজিতভাবে মন্তব্য করছেন। এই উদ্বেগের কারণ খুবই স্পষ্ট। স্বদেশ থেকে স্বেচ্ছায় নির্বাসিত রোলাঁ নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই এই নিঃসঙ্গতাকে জানেন এবং সেই জন্য রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষ অনুরূপ অবস্থায় কতখানি কষ্ট পেতে পারেন সেটা তাঁর পক্ষে কল্পনা করা কঠিন হয় নি। এই উদ্বেগের সঙ্গে কিঞ্চিৎ উত্তেজনাও ছিল, তার কারণ কর্ম-নীতি নিয়ে গান্ধীজি এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে মতবিরোধ সম্বন্ধে রোলাঁ বহুবার আলোচনা করেছেন, তাতে গান্ধীজির মনোভঙ্গিতে অন্যান্য নানা সদগুণের পরিচয় পেলেও তিনি যে বুদ্ধির বা যুক্তির দুর্বলতা, অস্বচ্ছতা এবং বিভ্রান্তি

লক্ষ্য করেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ১৯২৩-এর এপ্রিলে লণ্ডনে এণ্ডরুজের সঙ্গে তাঁর আলাপের যে রিপোর্ট তিনি জর্নালে সংক্ষেপে লিখেছেন তার মধ্যে এর নিদর্শন আছে। রবীন্দ্রনাথ বিদেশ থেকে ফিরলে, গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর বিরোধটা যখন ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল, তখন ১৯২১ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে রুদ্ধদ্বার কক্ষে গান্ধীজির সঙ্গে এই মতবিরোধ নিয়ে তাঁর দীর্ঘ আলাপ হয়। এণ্ডরুজই ছিলেন একমাত্র সাক্ষী। কৌতূহলী রোলাঁর প্রশ্নের উত্তরে এণ্ডরুজ সেদিনকার আলাপের একটা সংক্ষিপ্ত-সার তাঁকে শোনান। দেখা যায় দুটি মূল বিষয়ে আলাপ চলে। রোলাঁ জর্নালে লিখেছেন : 'আলাপের প্রথম বিষয়টি ছিল মূর্তিপূজো। গান্ধীজি এই মূর্তিপূজোর সমর্থন করেন, কারণ তাঁর বিশ্বাস জনসাধারণ এখনি (অর্থাৎ বিনা প্রস্তুতিতে) নির্বস্তুক তত্ত্বের নাগাল পাবে না। জনসাধারণকে চিরকাল নাবালক হিসেবে গণ্য করাতে তবে রবীন্দ্রনাথ এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন নি। আলোচনার দ্বিতীয় বিষয়টি ছিল 'ন্যাশ্-নালিজম্'। গান্ধীজি এই ন্যাশ্-নালিজমের সমর্থন করেন। তিনি বলেন অন্তর্জাতিকতার আদর্শে পৌঁছাতে হলে স্বাজাত্যবোধের ভিতর দিয়েই যেতে হবে,—ঠিক যেমন যুদ্ধের ভিতর দিয়ে গেলে তবেই শান্তিতে পৌঁছন যায়। (মারাত্মক যুক্তি!) এই জন্যই তিনি ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর জন্য কয়েকবার সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁকে নিরস্ত্র করবার জন্য এণ্ডরুজ যখন বিশেষ চিঠি লেখেন। গান্ধীজি আমল দেন নি।' 'মারাত্মক যুক্তি!' এই ক্ষুদ্র মন্তব্যটিই রোলাঁর মনোভাবের পরিচায়ক। অতঃপর ১৯২৫-এর ১৯-শে অক্টোবর কালিদাস নাগকে লিখিত এক পত্রে পূর্বোক্ত বিষয়ে আরো স্পষ্ট করেই বললেন : 'ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সাময়িক প্রয়োজনের দাবিতে গান্ধীজি রাজনীতি এবং ধর্মনীতি যে ভাবে মিশিয়ে ফেলেছেন তা স্থলবিশেষে মনকে নিদারুণভাবে প্রহত করে। বস্তুত মিশ্রণ একে বলা যায় না, বলা উচিত দুই ভিন্ন প্রকৃতির ভাবের সহ-অবস্থান (Juxtaposition)। অপর পক্ষে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা এবং উদ্দেশ্য ঊর্ধ্বতর-স্তরাশ্রয়ী এবং প্রভাবের দিক থেকে সুদূরপ্রসারী। রবীন্দ্রনাথের বাণী তাঁদেরই জন্য উচ্চারিত যাঁরা জ্ঞানে ও সংস্কৃতিতে শ্রেষ্ঠ, যাঁরা আছেন শ্রেণীগত, জাতিগত, কালগত সকল বেড়ার বাইরে।'

ইতিমধ্যে ১৯২৪ সালের গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ চীন-জাপান সফরে বেরিয়েছেন, সঙ্গে অন্যান্যদের ভিতর কালিদাস নাগও আছেন। রোলাঁর কৌতূহল অদম্য, তিনি চিঠিপত্রের মাধ্যমে কালিদাস নাগের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। এই সময় (২৬শে জুন) জাপান থেকে লিখিত কালিদাস নাগের এক পত্রে রোলাঁ জানতে পারলেন যে রবীন্দ্রনাথ সদলবলে পেরু সরকার কর্তৃক নিমন্ত্রিত হয়েছেন এবং কালিদাস নাগেরও কবির সহযাত্রী হবার সম্ভাবনা। সেই চিঠিতেই কালিদাস নাগ রোলাঁকে পেরু সম্বন্ধে খোঁজ খবর এবং প্রয়োজনীয় পরিচয়পত্রাদি দিয়ে সাহায্য করবার জন্য অনুরোধ করেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই অনুরোধ সম্বন্ধে কিছু জানতেন এমন সঠিক প্রমাণ নেই। তবে রোলাঁ এটাকে রবীন্দ্রনাথেরই অনুরোধ মনে ক'রে নানা জায়গায় নানা ব্যক্তিকে এবং প্রতিষ্ঠানকে কবির আসন্ন সফরের খবর দিয়ে সতর্ক ক'রে রাখলেন এবং চিঠিতে জানালেন যে দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রাকালে যখন কবি ফ্রান্সে উপস্থিত হবেন তখন সাক্ষাতে অন্যান্য পরামর্শ দেবেন।

অক্টোবরের গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ প্যারিসে এলেন কিন্তু সঙ্গে এণ্ডরুজ বা কালিদাস নাগ নেই, আছেন রোলাঁর অপরিচিত ইংরেজ সেক্রেটারি এল্মহার্স্ট। রোলাঁ তখন আছেন ভিল্‌ন্যভে। খবর শুনে তিনি উদ্বিগ্ন হলেন, তার কারণ দক্ষিণ আমেরিকার রাজ্যগুলির মধ্যে পেরুই ছিল সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল এবং সেই জন্যই সেখানকার রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে কবির জড়িয়ে পড়বারও আশঙ্কা বিদ্যমান ছিল। এই বন্ধুজনোচিত আশঙ্কা যে একেবারে অমূলক ছিল না পরবর্তী কোনো কোনো ঘটনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যাই হোক, যাত্রার ঠিক আগের দিন লিখিত এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ রোলাঁকে জানালেন যে পেরু যাত্রার আগে পূর্ব-সংকল্প অনুযায়ী রোলাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা তাঁর ছিল কিন্তু অকস্মাৎ খবর পেলেন যে নির্ধারিত সময়ে পেরু পৌঁছতে হলে অবিলম্বে শেরবুর্গ থেকে জাহাজে ওঠা দরকার। তাই এ-যাত্রা আর দেখা হল না, ফেরবার পথে নিশ্চয়ই যাতে দেখা হয় সে চেষ্টা তিনি করবেন। সম্পূর্ণ চিঠিখানি রোলাঁ জর্নালে উদ্ধৃত করেছেন। রোলাঁ নিরাশ হলেন, তার চেয়েও বেশী ক্ষুব্ধ হলেন। জর্নালে লিখলেন, 'ভাগ্যে আমি এই প্রাচ্য-দেশীয় ঔদাসীন্যতার উপর নির্ভর করি নি।' অর্থাৎ কদিন পূর্বেই প্যারিসে সদাশিক্ত রাণাকে (কবির পরিচিত ব্যবসায়ী) পেরু সংক্রান্ত নির্দেশক কাগজপত্র একখানা সীল-করা খামে পুরে রবীন্দ্রনাথের হাতে দেবার জন্য পাঠিয়েছিলেন এবং একখানি চিঠিতে (৯ই অক্টোবর) জানিয়েছিলেন যে পত্রযোগেই হোক বা মৌখিক আলাপেই হোক পেরুযাত্রার পূর্বে কবির সঙ্গে তাঁর সরাসরি কথাবার্তার বিশেষ প্রয়োজন। এই সুযোগটি রোলাঁ পান নি। জর্নালে এবং শ্রীমতী কার্পেলে ও কালিদাস নাগকে লিখিত চিঠিপত্রে রোলাঁ যে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন তার একটা কারণ খুবই ব্যক্তিগত এবং কালিদাস নাগকে লিখিত পত্রে (২১শে অক্টোবর) রোলাঁ নিজেই তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে পেরু যাত্রার জন্য খোঁজ খবর বিজ্ঞপ্তি পরিচয়পত্র ইত্যাদি যা তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম সহকারে সংগ্রহ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ যেন তার

যথার্থ মূল্য না দিয়ে একটু হালকাভাবে উপেক্ষাই করলেন। এই ধারণা রোলার কিসে হল বলা কঠিন। কাগজপত্রগুলি রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন বলেই মনে হয়, তবে কখন কী ভাবে পেয়েছিলেন সে বিষয়ে অনুমান করাও কঠিন। সেগুলি সম্বন্ধে কবির কোনো রকম মন্তব্যই কোনো সূত্রে পাওয়া যায় না। যাই হোক, রোলা উক্ত ধারণার বশবর্তী হয়েই জর্নালে একটু রূঢ় ভাষাতেই লিখছেন : 'আমার কাছ থেকে বিস্তৃত সংবাদ না নিয়ে রবীন্দ্রনাথের এই আকস্মিক পেরু যাত্রা তাঁর পক্ষে অবিমৃষ্যকারিতার পরিচায়ক হয়েছে।' কিন্তু এই ক্ষোভের আরো একটি কারণ ছিল যা নেহাৎ ব্যক্তিগত নয় এবং তাও রোলা জর্নালে এবং অন্যত্র ব্যাখ্যা করেছেন। এই সময় রোলার মনে একটা ধারণা ক্রমে বদ্ধমূল হয়ে উঠছিল যে শুধু য়ুরোপই নয় সমগ্র মানবসমাজই প্রথম মহাযুদ্ধের চেয়ে ঢের বেশী ভয়ংকর এক বিভীষিকার সম্মুখীন। এই বিভীষিকাকে রোলা য়ুরোপ এবং এশিয়ার মধ্যে এক ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ হিসেবেই কল্পনা করছিলেন বলে মনে হয়। তাঁর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার কারণ, তাঁর বিশ্বাস বিশ্বের কল্যাণশক্তিকে অচিরে সংহবদ্ধ প্রতিরোধে রূপান্তরিত না করতে পারলে মানুষের সমাজ সভ্যতা সব কিছুই বিনষ্ট হয়ে যাবে। আসন্ন এই ক্রান্তিকালের উল্লেখ করে কালিদাস নাগকে লিখলেন (২৬শে জানুয়ারী, ১৯২৫) : 'সময় ফুরোচ্ছে। আয়ু শেষ হয়ে আসছে। স্পষ্ট দেখছি ঝড় আসছে। সম্ভবত এক সুদীর্ঘ প্রদোষছায়া নেমে আসবে আমাদের সভ্যতার উপর। দিনের এই শেষ মুহূর্তগুলি আমাদের সদ্ব্যবহার করা উচিত।' চিঠির এই অংশটি জর্নালেও টুকে রেখেছেন। এই প্রসঙ্গেই চিঠিতে রোলা জানালেন যে য়ুরোপ ও এশিয়ার শ্রেষ্ঠ মনীষীদের একত্র করে একটা আত্মিক এবং মানস প্রতিরোধের কেন্দ্র গড়ে তোলার কাজে তিনি ব্যাপৃত এবং এই সংগঠনের কাজে রবীন্দ্রনাথের সক্রিয় সহযোগিতা এবং 'উপদেশ' তাঁর কাছে অপরিহার্য ছিল। বিলাপের সুরেই লিখলেন : 'রবীন্দ্রনাথ আমার সঙ্গে দেখা না করেই চলে গেলেন। একেই বলে নিয়তি।' রুদ্ধ ক্ষোভের ঝাপটাটা গিয়ে পড়লো কালিদাস নাগের উপর। তাঁর সম্বন্ধে নালিশ : রবীন্দ্রনাথের চীন ভ্রমণের তথ্যাদি রোলাকে তাঁর পাঠাবার কথা ছিল কয়েক মাস ধরে তিনি অপেক্ষা করে আছেন, আজ পর্যন্ত পাননি। এই উদাসীনতার উপর মন্তব্য করতে গিয়ে রোলা ভারতবাসী সম্বন্ধে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অগভীর এবং একপেশে সাধারণ উক্তিগুলির মধ্যে একটি এখানে করলেন : 'ভারতবাসীরা যুগ-যুগান্তের ধ্যানে অভ্যস্ত; তাঁরা জীবনকে ফুরিয়ে যেতে দেয় কিন্তু প্রতি দিনের ক্ষুন্নিবৃত্তি করে (le pain quotidien) এমন সব ছোটোখাটো কর্তব্য পড়েই থাকে।' কথাটা ঐতিহাসিক কালিদাস নাগকে বলা হলেও, রবীন্দ্রনাথের প্রতিও একটু তির্যক ইঙ্গিত আছে এমন সন্দেহ হয়, এবং তাতেই উক্তিটির অগভীরতা আরো বেশী প্রকট হয়ে ওঠে। এইখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, যে প্রস্তাব নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ ও পরামর্শ করবার জন্য রোলা এতটা ব্যাকুল হয়েছিলেন, সেটি কিন্তু নতুন নয় : রোনিগার নামক সেই সুইস-জার্মান প্রকাশকের সহায়তায় 'বিশ্বসাহিত্য-গ্রন্থমালা' প্রকাশকে কেন্দ্র করে পূর্ব-পশ্চিমের মিলন ও সহযোগিতার ক্ষেত্র নির্মাণের প্রস্তাব। নূতনত্বের মধ্যে শুধু এইটুকু দেখা যায় যে, এই প্রসঙ্গে প্রস্তাবিত এই ক্ষেত্রটিকে দুই-একবার বিশ্বভারতীর 'য়ুরোপীয় শাখা' বলেও উল্লেখ করছেন।

যাই হোক, সকলেই জানেন এ যাত্রা রবীন্দ্রনাথ পেরু পর্যন্ত পৌঁছতে পারেননি, মধ্যপথে অসুস্থ হয়ে বুয়েনস এয়ারিসে শ্রীমতী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর আতিথ্যে কিছুকাল কাটিয়ে দেশে ফেরেন। এই সংবাদ রোলা এলমহার্স্টের নিকট শুনলেন। শেষ পর্যন্ত কবি যে পেরু যাননি তাতে যেমন নিশ্চিন্ত বোধ করলেন, তেমনি তাঁর অসুস্থতার জন্যও গভীরভাবে উদ্বিগ্ন এবং বেদনার্ত হলেন। কিছু দিনের মধ্যেই রোলা আবার খবর পেলেন যে ১৯২৫-এর অক্টোবর নাগাদ চিকিৎসার জন্য রবীন্দ্রনাথের সুইটজারল্যাণ্ডে আসবার সম্ভাবনা। রোলা আবার উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, ভিলনোভের শ্রেষ্ঠ হোটেল, Hotel Byrone-এ কবির থাকবার ব্যবস্থা করলেন, নিকটস্থ ভালমঁর বিখ্যাত সানাটরিয়মের অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। অবশেষে আগস্টে পাকা খবর পেলেন যে চিকিৎসকের নির্দেশে কবির য়ুরোপযাত্রা এবারকার মতো স্থগিত। এবার রোলার ক্ষোভ প্রায় হতাশায় পর্যবসিত হল। আবার ভিলনোভে তাঁদের সাক্ষাৎ কোনো এক অনির্দেশ্য ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত রইল। এ প্রসঙ্গে জর্নালে যে মন্তব্যটি রোলা করলেন তাকে হতাশাজনিত প্রলাপোক্তিই বলতে হবে : 'ভারতবাসীদের উপর নির্ভর করা প্রায় অসম্ভব।' ক্ষোভের কারণ হিসেবে রোলা নিজে যাই নির্দেশ করে থাকুন, সেই ক্ষোভ প্রকাশের আতিশয্যটি লক্ষ্য করলে বুঝতে বাকি থাকে না যে

উপরেও প্রতিষ্ঠিত নয়, এ-নির্দেশ ধর্মান্ধতা-প্রসূত (কবি এই প্রসঙ্গে idolatry শব্দটি ব্যবহার করেন ধর্মান্ধতার প্রতিশব্দ হিসেবে)। কবি গান্ধীজিকে প্রশ্ন করেছিলেন 'নিছক বস্তু হিসেবে 'অপবিত্র' বলে কিছু আছে, তা কি আপনি সত্যিই বিশ্বাস করেন?' গান্ধীজি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রীতিতে প্রশ্নটি এড়িয়ে গিয়ে উত্তর দিলেন যে ভারতবাসীর পক্ষে 'মূর্তিপূজা' (idolatry) মঙ্গলজনক বলেই তিনি মনে করেন। রবীন্দ্রনাথ তদুত্তরে বলেন, 'তাহলে বলা হ'ল, ভারতবাসীর পক্ষে মিথ্যার প্রয়োজন আছে। আর ভারতবাসীকে যদি মিথ্যা দিয়েই ভোলাতে হয় তাহলে এটাই প্রমাণ হয় যে ভারতবাসী স্বরাজের উপযুক্তই নয়, ইংরেজের প্রভুত্বই তার পক্ষে স্বাভাবিক।' ভবিষ্যতের কর্মনীতি সম্বন্ধেও সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির সঙ্গে কিছু আলাপ করবার চেষ্টা করেছিলেন। গান্ধীজি সংক্ষেপে তাঁকে জানিয়ে দেন যে, ইংরেজের উদারতার নিকট তাঁর অনেক প্রত্যাশা আছে, অন্ততঃ 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' জাতীয় একটা কিছু ইংরেজ সরকার স্বেচ্ছায় দান করবে এই তাঁর বিশ্বাস। এইখানে তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক প্রভেদ : তাঁর মতে এই ভিক্ষালব্ধ স্বরাজ যদি ভারতবর্ষ কোনো-দিন সত্যিই পায়, তাহলেও বিশ্বসমাজে তাকে চিরদিন ভিক্ষুক হয়েই থাকতে হবে। তাঁর মতে স্বরাজকে ভিক্ষা করে পাওয়া যাবে না, তাকে কর্মের দ্বারা সৃষ্টি করতে হবে, এবং তার জন্য কাজ করা প্রয়োজন সমাজের নিচের তলায়, গ্রামের যে সমাজ-জীবন ইংরেজের শাসনের ফলে বিধ্বস্ত হয়েছে তাকে আবার পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। এই জন্য কবি নিজে শান্তিনিকেতনের আশে-পাশে সমাজ-উন্নয়নের কাজে লেগে গেছেন। এইখানে রোলাঁ স্বয়ং একটি মন্তব্য করলেন : 'দেশের সংস্কার দুইভাবে হতে পারে, মাথার দিক থেকে (অর্থাৎ রাষ্ট্রশক্তির উপর মহল থেকে) অথবা তলায় (অর্থাৎ মূলের) দিক থেকে। দ্বিতীয়টিই অবশ্য একমাত্র কার্যকরী এবং স্থায়ী, কিন্তু এই একটা প্রশ্ন ওঠে যে সেটা স্বভাবতই সময়সাপেক্ষ এবং বর্তমান বিক্ষুব্ধ ও উন্মত্ত যুগে এই রকম দীর্ঘসূত্রী কাজের অবকাশ পাওয়া কঠিন।' তদুত্তরে রবীন্দ্রনাথ একটি উপমার সাহায্যে জানালেন যে, একটি শিশু তালগাছ তার শিকড় দিয়ে মাটিকে শক্ত করে ধরতে হয়তো দশ বৎসর নেয়, কিন্তু একাদশতম বৎসর থেকে তার বৃদ্ধি হয় ত্বরান্বিত।

নিদারুণ হতাশার সঙ্গেই কবি বললেন যে ভারতবর্ষে গান্ধীজির নেতৃত্ব বিফল হল তার কারণ সেই নেতৃত্বকে তিনি অন্ধবিশ্বাস এবং যান্ত্রিক অনুবর্তিতার উপর স্থাপন করেছিলেন। এমন কি তিনি স্বরাজ-প্রাপ্তির একটা বিশেষ দিনও স্থির করে দিয়েছিলেন। আশু ফলপ্রাপ্তির এই মোহে শিক্ষিত সম্প্রদায়ও আচ্ছন্ন হয়েছিল, এমন কি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও মুক্ত ছিলেন না। বুদ্ধি দিয়ে বিচার করা দূরের কথা তাঁরা এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশকেও দেশদ্রোহ বলেই মনে করতেন। সেই নির্ধারিত দিন পার হয়ে গেল, মহাত্মাজির ব্যক্তিত্বের জাদুতে যে জাগরণ এসেছিল তা নিষ্ফল হ'ল। রবীন্দ্র-নাথের মতে গান্ধীজির প্রধান এবং মারাত্মক ভুল হ'ল এই যে, তিনি রাজনৈতিক সমস্যাকে সামাজিক সমস্যার ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছিলেন। তিনি অস্পৃশ্যতার বিরোধিতা করলেও সামাজিক বর্ণবিভেদকে কখনো আক্রমণ করেন নি। সমাজদেহে এইসব বহু শতাব্দীর রোগ নিরাময় না ক'রে রাজনৈতিক ফললাভের চেষ্টা বালির উপর ভিৎ বাঁধবার সামিল।

গান্ধীজির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতভেদ সম্বন্ধে রোলাঁর মনোভঙ্গী ... আনুপূর্বিক অনুসরণ করেছেন তাঁরা বুঝবেন কবির বক্তব্য বিনা মন্তব্যে লিপিবদ্ধ করলেও কবির প্রতি রোলাঁর সমর্থন নিঃসন্দেহ। তবে রোলাঁ লক্ষ করেছেন, ভারতবর্ষের দুর্দশাজনিত বেদনায় এবং হতাশায় এই মহাজ্ঞানী কবি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। রোলাঁ লিখছেন : 'অনিচ্ছাসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ বারবার ফিরে-ফিরে গান্ধীজির এবং গান্ধীপন্থীদের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করে ফেলছেন। কবির মনকে অধিকার করে আছে গান্ধী চরিত্রের যেটা ক্ষুদ্রতার দিক (যেহেতু নিজেও তিনি স্বীকার করেন, কিন্তু সেই-খানেই থেমে থাকতে পারেন না) : অর্থাৎ গান্ধীজীর নীতিগত গোঁড়ামি এবং কুসংস্কারভিত্তিক আচারসর্বস্ব অনুশাসন যা ভারতবর্ষের জনসাধারণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পেরেছিল।' বস্তুত অসহ-যোগের মধ্যে যে একটা অন্ধতা এবং অদূর-দর্শিতা ছিল সেটাই যে কবির বেদনার এবং ক্ষোভের একটা প্রধান কারণ সেটা রোলাঁ বুঝেছিলেন এবং যে দৃষ্টান্তগুলি তিনি সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করেছেন তার থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তিনি কবির বেদনা বা ক্ষোভকে অযৌক্তিক মনে করেননি। দৃষ্টান্ত-গুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : ১৯২১ সালে আসামে রেল ধর্মঘটের সময় কুলিদের মধ্যে যখন কলেরার প্রকোপ দেখা দিয়েছিল, অনেকের অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখেননি, ফলে বহু সহস্র ব্যক্তির বিনা চিকিৎসায় প্রাণহানি ঘটে। এই সময় স্বয়ং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস গান্ধীজীর নির্দেশ মানতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। আর একটি দৃষ্টান্ত বিশেষ কারণে উল্লেখ-যোগ্য। গান্ধী-আশ্রমের একটি শিশুও যদি কোনো অন্যায় করতো গান্ধীজি তাকে

শাস্তি দিতেন নিজে অনশন করে। এই অনশন যে-ভাবে প্রচারিত হত তার ফলে সেই শিশুর মনে একটা অপরাধ-বোধের বোঝা চাপানো হত। এর নিষ্ঠুরতা কবিকে গভীরভাবে আঘাত করে। আশ্চর্যের বিষয় রোলাঁ এই ব্যাপারটিকে উপলক্ষ্য করেই মন্তব্য করেন যে এই রকম কোনো-কোনো ক্ষেত্রে কবির 'স্পর্শকাতর' মন গান্ধীজির প্রতি একটু বেশী কঠোর হয়েছে, কেননা স্পষ্টতই গান্ধীজির উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা। শিশুমনের উপর এই moral coercion কবির মনকে কেন এবং কতখানি পীড়িত করেছিল, তার গভীরতা রোলাঁ বুঝতে পারেন নি বলেই শুধু, কবির 'স্পর্শকাতরতার' উল্লেখ করেছেন, তাঁর সকরুণ অন্তর্দৃষ্টির উল্লেখ করেননি। ডস্টয়েভস্কির পাঠকেরা বুঝবেন, তিনি হলে যে শুধু বুঝতেন তাই নয়, শুধু এই জন্যই কবিকে শ্রদ্ধা করতেন। তবে রোলাঁ ডস্টয়েভস্কি নন, সেটা মনে রাখতে হবে। যাই হোক, অসহযোগের মধ্যে যে 'অন্ধ স্বেচ্ছাচার' (fanatism tyrannique) ছিল তা যে পূর্ব ও পশ্চিমের মুক্তমনের পক্ষে সমভাবেই পীড়াদায়ক সে-কথা রোলাঁ স্পষ্ট করেই জর্নালে লিখলেন। এই জবরদস্তির জন্য রবীন্দ্রনাথ নিজেই যে জনতার নিকট কখনো কখনো প্রকাশ্যে একটু লাঞ্ছিতও হয়েছিলেন সে বিষয়ে অধ্যাপক মহলানবীশের নিকট শোনা কাহিনীর উল্লেখ করলেন। কিন্তু এ-বিষয়ে সবচেয়ে চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত রোলাঁ দিয়েছেন কবির কাছেই শুনে। গান্ধীজীর সঙ্গে মতবিরোধ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ তখনো তাঁকেই নেতা বলে মানতেন। তাই তিনি প্রশ্ন করেন, 'দেশের কাজে আমাকে ডাক দিচ্ছেন না কেন? আমাকে কি কোনো কাজের ভার দিতে পারেন না?' উত্তরে গান্ধীজি বলেন, 'চরকা কাটুন।' 'আর কিছুই না?' —'আর কিছুই না। চরকা কাটুন।' কবি কোনোদিনই চরকা কাটেননি।

রবীন্দ্রনাথের চরকা প্রবন্ধটি যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা বুঝবেন, এটি তারই উত্তর অর্থাৎ সরলভাষায় একটি snub। রোলাঁ ঐ প্রবন্ধের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বলে মনে হয় না। তাই তিনি snubটা দেখেননি, তবে জবরদস্তিটা যে ভালো করেই লক্ষ্য করেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এই সময় গান্ধীজির আদর্শ ও কর্মনীতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা য়ুরোপের বৃহত্তর পাঠকসমাজের উদ্দেশে প্রচার করবার প্রস্তাবও রোলাঁ করেন। তখন রোনিগার উপস্থিত ছিলেন, পূর্ব পরিকল্পিত প্রকাশনের ব্যাপারে বৈষয়িক আলাপ আলোচনা করছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং অধ্যাপক মহলানবীশের সঙ্গে। রোলাঁ প্রস্তাব করেন, সম্প্রতি Eurasische Berichte নামক যে পুস্তিকামালাটির প্রকাশ সুরু হয়েছিল, তার পরবর্তী সংখ্যাটি রবীন্দ্রনাথের জন্য নির্দিষ্ট হোক। তার মধ্যে অসহযোগ সম্বন্ধে গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর মতবিরোধটি যদি তিনি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন তাহলে 'ন্যাশনালিজম'-এর সমস্যা নিয়ে য়ুরোপেও যাঁরা ভাবছেন তাঁদেরও চিন্তার খোরাক জুটবে। রবীন্দ্রনাথ অসম্মত হন। কারণ হিসেবে নাকি তিনি বলেন যে এই সময় ভারতবর্ষের এই আভ্যন্তরীণ বিরোধকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরলে সেটা নিন্দনীয়ই হবে। রবীন্দ্রনাথ যদি এইটুকুই বলে থাকেন তাহলে বুঝতে হবে যে এই ব্যক্তিগত কারণটি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনায় তাঁর আগ্রহ ছিল না। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা যাঁরা সযত্নে অনুসরণ করেছেন তাঁরা বুঝবেন এই অসম্মতির একটি গভীরতর তাৎপর্য আছে এবং এই অসম্মতি সর্বতোভাবে তাঁরই যোগ্য। ইতিহাসের একটি বিশেষ মুহূর্তে স্বাধীনতা সংগ্রামের কর্মনীতিতে তিনি যে মৌলিক বিভ্রান্তি লক্ষ্য করেছিলেন সে বিষয়ে দেশবাসীদের এবং দেশের নেতাকে সতর্ক করে দেবার প্রয়োজন এবং দায়িত্ব তিনি অনুভব করেছিলেন। দেশের ব্যাপক বিরূপতা সত্ত্বেও তিনি নানা প্রবন্ধে এ-দায়িত্ব পালন করতে কসুর করেননি। কিন্তু তাঁর কথায় কেউ কর্ণপাত করুক বা না করুক, তাঁর বক্তব্য ছিল দেশের কাছেই। কিন্তু এই ব্যাপারে য়ুরোপকে প্রত্যক্ষভাবে টেনে এনে তার রায় বা সমর্থন আদায় করবার প্রচেষ্টা তাঁর কাছে অর্থহীন। সমগ্র বিশ্বকে তাঁর যা বক্তব্য ছিল তা Nationalism গ্রন্থে বছর দশেক পূর্বেই বলা হয়ে গেছে। প্রকৃত স্বরাজ গড়বার যে অপূর্ব সুযোগ এসেছিল, রবীন্দ্রনাথের মতে, ভ্রান্ত কর্মনীতির ফলে তা অবশ্যই পণ্ড হয়েছে, কিন্তু তাই বলে আজ কোনো একটা আন্তর্জাতিক মঞ্চে চড়ে সেই পুরাতন বিতর্কের পুনরাবৃত্তি করার অর্থই হল গান্ধীজিকে বিশ্বসমক্ষে অভিযুক্ত করা। তা তিনি করবেন কেন? তাঁর মতে গান্ধীজি ভুল করেছেন কিন্তু তাই বলে নেতা হিসেবে তাঁর মহত্ত্বে এবং সততায় তো তিনি কোনোদিনই আস্থা হারাননি। এই নেতার ভুলের জন্য যে ব্যর্থতা এবং তার জন্য যে দুঃখ এবং ক্ষোভ তা অনিবার্য এবং ব্যক্তিগত। তা তিনি এড়াতে পারেন না বলেই বন্ধুমহলে তা নিয়ে বারবার আলোচনা করে মনের ভার লাঘব করবার চেষ্টা করছেন। বিশ্বের আদালতে সওয়াল-জবাব করবার মতো বিষয় তো এটি নয়। গান্ধীজির প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাবটি বুঝতে, মনে হয়, রোলাঁর আরো বেশ কয়েক বছর সময় লেগেছিল।

(ক্রমশ)

বলেছেন। নিরপেক্ষ নির্ভীকভাবে, যে মামলায় যা প্রমাণ থাকে, তাই আদালতে বিচারকালে উপস্থাপিত করেছেন তাঁরা।

এইবার দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় একালের কথা। ইদানীং সরকারী উকিলের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষের সাক্ষী দায়রা আদালতে অভিযোগ করেন যে, সরকারী উকিল তাঁকে তাঁর গৃহে পুলিসকে দিয়ে গ্রেপ্তারের ভয় দেখিয়েছেন, নিজে হাতে প্রহার পর্যন্ত করেছেন মিথ্যা করে কিছু বলতে তিনি অসম্মত হওয়ায়। অভিযোগ উত্থাপিত হয় ও প্রমাণিত হয় যে, 'কেস-ডায়রি'র পাতা বদল করানো হয়েছে, নতুন স্কেচ্-ম্যাপ দারোগাবাবুকে দিয়ে ইচ্ছানুযায়ী মিথ্যা করে প্রস্তুত করানো হয়েছে সরকারী উকিলের নির্দেশে। অজস্র অপ্রকৃত, অসত্য উক্তি করেন সরকারী উকিল নিজেও। পুলিসেরও পুলিস বা বিচার সংক্রান্ত দলীয় রাজনীতির প্রতি অন্ধ আনুগত্য হয়ত এর কারণ। কিন্তু যে বিচারালয় উপদ্রুত ও অত্যাচারিত মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল তার পবিত্রতা যাঁরা মিথ্যা সাক্ষ্য সৃষ্টি করে ক্ষুণ্ণ ও কলুষিত করেন তাঁরা সর্বাধিক নিন্দনীয়। কোনও আইনজীবীর কর্তব্য হতে পারে না মিথ্যা সাক্ষ্য সৃষ্টি করা।

আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস ও ধারণা যে, আইনজীবী মাত্রেই হবেন সর্বাংশে ভদ্রলোক, সত্যনিষ্ঠ ও সৎপ্রকৃতির। সরকারী উকিলের দায়িত্ব অনেক বেশি। তিনি কোনও ব্যক্তিবিশেষের উকিল নন। তিনি সর্বসাধারণের। তাঁর একমাত্র কর্তব্য আদালতে ন্যায়বিচারে সহায়তা করা নির্ভীক ও নিরপেক্ষভাবে। সর্বসাধারণের প্রদত্ত অর্থ থেকে তিনি তাঁর পারিশ্রমিক পান। সরকারের মধ্যে যত রাজনৈতিক দলই থাকুক না কেন, তাঁদের মধ্যে যত মতপার্থক্য বা মত-বিরোধ থাকুক না কেন, সরকারী উকিলের উচিত নয় কোনও দলের দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়া; কোনও দলের সহিত সংশ্লিষ্ট থেকে বা কোনও দলের নীতি বা নির্দেশে চলে চাকুরি বজায় রাখার চেষ্টা করা। ঐরূপ আচরণে সাময়িক সুবিধা ও অর্থোপার্জন হয়ত হতে পারে, কিন্তু মানুষ হিসাবে মর্যাদা—যা কখনও অর্থমূল্যে দিয়ে নিরূপণ করা যায় না, তার হানি হয় সুনিশ্চিত। পৃথিবীর সর্বত্র আইনজীবীরাই সংস্কৃতি, স্বাধীনতা ও রাষ্ট্র-পরিচালনার দায়িত্ব ধারণ ও বহন করে থাকেন। সেই সম্মানিত পদ থেকে বিচ্যুত হওয়ার মত কোনও কাজ কোনও আইনজীবীর কর্তব্য নয়। আইনজীবীরা যদি আইনের মর্যাদা রাখতে সর্বপ্রযত্নে সচেষ্ট না থাকেন তা হলে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে। এর মধ্যে সে-কাল এ-কাল নেই। এ সর্বকালের জন্য অপরিবর্তনীয়

একটি মাত্র গ্রন্থ যা দেশের লোককে অখণ্ড-ভাবে তুলে ধরেছে। সেকালে কটা ব্রাহ্মণের বুকের পাটা ছিল যে বলে—লোকরুচি যাকে সমর্থন করে, গ্রাহ্য করে তাকেই তোমাকে গ্রাহ্য করতে হবে। যা লোক-সমর্থিত নয় তা হয়তো রসোত্তীর্ণ নয়—ভাল করে ভেবে দেখ, বিভাইস করো। সংস্কৃত সাহিত্যের বা সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের অনেক স্ফীতকায় গ্রন্থই তো দেশী বিদেশী অনেক স্কলারের লেখা আছে—কজন করেছেন ভরতের এইসব উক্তির তাৎপর্য নির্ণয়? নাট্যসংগীত নিয়ে ভরত যে এতখানি লিখেছেন কজন ভেবেছেন তা নিয়ে বা তুলে ধরেছেন তাঁর বক্তব্য? নৃত্য এবং সংগীত যে নাট্যের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হল অথবা যে তাণ্ডব নিয়ে এত ব্যাপার, তার স্বরূপটাও কে ভেবেছে? প্রসঙ্গে নাট্যে তারই বা কতটুকু আলোচনা হয়েছে—এইসব বড় বড় বইয়ে। যাঁরা সংগীতজ্ঞ তাঁদের কথা ছেড়েই দিলাম, কিন্তু যাঁরা মহামহোপাধ্যায় ব্যক্তি তাঁদের আলোচনায় এই চিন্তাগুলি কেন আসেনি সেটাই আশ্চর্যের বিষয়। এই প্রাচীন সংগীতজ্ঞ সেদিন একটা [illegible] বলেছেন—একে বলে রাখু। কিন্তু এইরকম উপকরণ নিয়ে দু হাজার বছর আগে যে ভরতমুনি তাঁর গ্রন্থ লিখে গেছেন সেটা এখন তাঁর অজানাই রয়ে গেছে।

একদা ব্রাহ্মণদেরই একটা অগ্রণী দল [illegible] ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। নাট্যশাস্ত্র এঁদেরই মুখপাত্র। তাঁরা বলেছিলেন বেদ তো বেদে না হয় শূদ্রদের অধিকার নেই, তা বলে তোমরা তাদের চিরকালের জন্য অশিক্ষিত করে রাখবে? তা হয় না। এই আন্দোলনের ফলে অনেক কিছু ঘটেছিল, তাদের মধ্যে নাট্যসংস্থাপন একটা মস্ত বড় "অ্যাচিভমেণ্ট"। নাট্যরচনা মানে সাহিত্য, সঙ্গীত এবং নৃত্যের ভিত্তিস্থাপন যা থেকে পরবর্তীকালে এই তিনটি বিষয়েরই শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। ব্রহ্মার পরিকল্পনা নিয়েই নাট্য সংগঠিত হয় যা থেকে ব্রাহ্মণেতর সম্প্রদায় সুশিক্ষা লাভ করতেন নানা বিষয়ে। ব্রহ্মাই ভরত এবং তদীয় সহযোগিদের সঙ্গীত সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই সহযোগীদের মধ্যে নারদ ছিলেন অন্যতম। বলতে গেলে নাট্যসঙ্গীত তিনিই রচনা করেন। এই সঙ্গীতই হচ্ছে মার্গসঙ্গীত। সব শাস্ত্র এই কথাই বলে। গ্রামরাগগুলিও যে নাটকে প্রযুক্ত হয়ে এসেছে তার প্রমাণ মতঙ্গ, কাশ্যপ প্রভৃতির বিবিধ উক্তি। রাগ-সঙ্গীত এক সময় নাটকে (দশরূপকে) বহুলভাবে প্রযুক্ত হত। এমন কি বিভিন্ন সময়ে অর্থাৎ কালনির্দেশে গাইবার যে পদ্ধতি তাও এসেছে নাট্যপ্রয়োগ থেকে। নৃত্যের প্রগতিও এইভাবে নাট্যের মাধ্যমে সাধিত হয়েছে। বাদ্যযন্ত্রের সম্মেলক বা একক অনুষ্ঠানের নূতনত্বও এই নাটকেই সম্পাদিত হয়েছিল। আচার্য ভরত বলছেন—

যথা বর্ণাদৃতে চিত্রম্ শোভতে ন নিবেশনম্।
এবমেব বিনা গানম্ নাট্যম্ রাগম্
ন গচ্ছতি॥

এই "রাগ" শব্দ কিসের ইঙ্গিত বহন করে?

নাট্যশাস্ত্রের যে এতগুলি অধ্যায় তা ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পর সম্পৃক্ত। যদি প্রক্ষিপ্তও বলেন তাহলেও তা উত্তম প্রক্ষেপ তাতে বিষয়টি বুঝতে সুবিধাই হয়েছে। সমগ্র জাতি তাদের আচার, ব্যবহার, আর্ট, শীল এবং চিন্তা, প্রত্যেকটির বিচারে অভিনয়, সঙ্গীত এবং নৃত্যকে বোঝাতে হয়েছে বলেই এই মহান গ্রন্থের এতগুলি অধ্যায়। আরও পরবর্তীকালের শাস্ত্রকার দেখলেন এ ছাড়াও রয়েছে বহুতর দেশী সঙ্গীত যাদের ঐতিহ্য স্বীকৃত হয়ে এসেছে। এগুলিকেও তাঁরা তাঁদের গ্রন্থে সম্মানজনক স্থান দিলেন।

যাঁরা এতটা বুঝতেন, এতটা চিন্তা করতেন তাঁরা আচার্য স্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা যখন এক্ষেত্রে আর রইলেন না তখন আমরা আর কী আশা করতে পারি? তারপরে যেটুকু থাকা সম্ভব সেটুকুই থেকে গেছে। শুধু প্রয়োগবিদ্যাটুকু। কাজ নিশ্চয়ই চলে, চলেছেও। মিস্ত্রীদের দিয়েও তো তিনতলা বাড়ি তোলা যায়, দেখতেও তা মন্দ হয় না। কিন্তু ইঞ্জিনীয়ারের অভাব তাতে ঘোচে কি? আদৌ না।

কাশ্মীরী সুর

হিমালয়ের উত্তর অঞ্চল। এখানে সারি সারি পৃথিবীর চূড়া আর তাদের কোলে একটি স্বর্গরাজ্য। তবে নেপালের মতন ভারত বহির্ভূত নয়। ভারতবর্ষের এক অচ্ছেদ্য অংশ, উত্তর পশ্চিমের প্রত্যন্ত ভূভাগ।

মর্তের স্বর্গ কাশ্মীর। বানিহাল গিরিপথের শেষেই, অন্ধকার সুড়ঙ্গ পার হলেই উন্মুক্ত হয়ে যায় সে ভূস্বর্গের তোরণ। ভুবনে অতুলন তার রূপলোক দৃষ্টিকে পরিপূর্ণ করে দেয়। প্রকৃতির এক অনুপম সৌন্দর্যের জগত। উদার সুনীল আকাশ। নীচে দুই ধারে দিগন্ত ছোঁয়া তুষার মৌলির অনন্ত শুভ্রতা। মাঝখানে ঘন সবুজের শালভূমি কাশ্মীর উপত্যকা। তার বুকে একটি শুক্তি মালা রচনা করে প্রবাহিনী ঝিলম্—ভেরিনাগের ঝর্ণাধারায় তার উৎস।

হিমানীমণ্ডিত পর্বতের শ্রেণী। তার আলো ঝলমল পশ্চাৎপটে সারবন্দী পপ্লার পথের দুধারে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। শ্যামলে হরিতে বর্ণময় শস্যক্ষেত্র আঁকা। চেনারের বন। জাফ্রানের ক্ষেত। নয়নানন্দ পুষ্পিত প্রান্তর। উদ্যানে বাগিচায় অজস্র রঙীন ফুলের সমারোহ। সরোবর। শিকারা।

পাহাড় নদী হ্রদ বনানীর কোলে কোলে জীব রূপেরও মেলা। রূপ-রাজ্যের সন্তান-সন্ততি। মলিন বসনেও যেন গন্ধর্ব গন্ধর্বী সব।

সৌন্দর্যের এই দৃশ্য নিকেতনে আর এক মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে সুন্দর। সে সংগীত ধ্বনি। এই অপূর্ব রূপ-রঙের জগতে স্বভাবেই সুর জাগে। অন্তরীক্ষে সংগীতের সৃজন হয়ে ছড়িয়ে পড়ে প্রকৃতির নন্দন বনে। মনোহরণ নিসর্গ থেকে কাশ্মীরের কাব্য-সংগীত প্রেরণা পায়।

লাইলাক ফুলে ভরা বন প্রান্তর, আকাশের পটে ছবির মতন পাহাড়, পাহাড়ের হ্রদে ফোটা ফুল, নির্ঝরের কলতান, উদ্যানের শোভা মুখর হয়ে ওঠে সংগীতে। গীতকারের অন্তর-মাধুরী তার

সঙ্গে মিলে যায়। মানুষের বিরহ মিলন গাথার সঙ্গে এক হয়ে মেশে নৈসর্গিক রূপাবলী।

মানুষের মনোলোকের সুর-গান হতে গিয়ে এই সুন্দরের জগতও কখন সংগীত-কারের কণ্ঠে ধরা দেয়। একই রূপদৃষ্টির অংশ কাব্য, সুর ও দৃশ্য চিত্র যুক্ত হয়ে যায় অঙ্গে অঙ্গে।

এমনি কত সুরের গান নাম-না-জানা ফুলের মতন কাশ্মীরের আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে থাকে। কাশ্মীরী সংগীতের যে অংশে কাব্য তা প্রকৃতির অপরূপ রূপরসে ভরপুর।

তার মধ্যে একটি প্রাণের সুর আকুল করে তোলে কাশ্মীরের পাহাড় নদী প্রান্তর। সে সুরের নাম রাস্ত্-ই-কাশ্মীর। বিধুর মধুর সেই সুরের রেশ বনে বনান্তরে পথে বিপথে গুঞ্জন করে ফেরে। হাব্বা খাতুনের সৃষ্টি রাস্ত্-ই-কাশ্মীর। সে সুরে কাশ্মীরের রূপ-ভাব প্রাণবন্ত।

হাব্বা খাতুন না জুনী? কাশ্মীর সুলতানের প্রিয়তমা বেগম না অখ্যাত গ্রামাঞ্চলের কিষাণ কন্যা, কৃষক বধূ? একই সত্তার দুই রূপ। দুই জীবনই সংগীতে আপ্লুত। আর সেই সংগীতের সূত্রে ধরা একটি বিচিত্র বিয়োগান্ত জীবন-নাট্য।

চাষীর ঘর থেকে সুলতানের মঞ্জিল। আঁকাবাঁকা অনেকখানি পথ এই দুই প্রান্তকে ভাগ করে রেখেছিল। ভাগ্য গুণে ও সংগীতগুণে দুস্তর পথ সে উত্তীর্ণা। সেই উত্তরণের কাহিনীও সংগীতে পূর্ণ। জুনীর গানের সুর, হাব্বা খাতুনের নিজের গান। যে সুরের সঙ্গে মিশে আছে তার করুণ জীবন। যেসব গানে তার দুঃখ সুখের সঙ্গে কাশ্মীরের রূপ জগত মিলে গেছে। তার ভাবনা বেদনা ভরা জীবন সংগীত।

জুনী থেকে হাব্বা খাতুনের জীবন-নাট্যের সব দৃশ্য জড়িয়ে আছে গানের সুরে। তার নিজের রচনা গান। নিজের দেওয়া সুর। নিজের সুকণ্ঠের পরিবেশন।

কিন্তু তার অনেক আগে থেকে আছে কাশ্মীরী সংগীতের ধারা।

কাশ্মীরের নৈসর্গিক পরিবেশে যেমন, তেমনি তার মন্দিরে দরবারে যুগ যুগ ধরে সংগীতের ঐতিহ্য। তারই উত্তর সাধনায় হাব্বা খাতুনের সহজাসিদ্ধি। জুনী-হাব্বার প্রায় দু' হাজার বছর আগে থেকে কাশ্মীরের সংগীত প্রসঙ্গ জানা যায়। এই সুদীর্ঘ কালের সংগীত চর্চার পরে তবে সৃষ্টি হয়েছে রাস্ত্-ই-কাশ্মীর। হাব্বা খাতুনের জীবন ত সুলতানী আমলের শেষ সময়ের কথা, আকবর যখন কাশ্মীর রাজ্য অধিকার করলেন।

হাব্বা খাতুনের রাস্ত্-কে কেউ কেউ বলেছেন—রাগ। কিন্তু তা পূর্ণাঙ্গ রাগ কি না সে আলোচনার এখানে দরকার নেই। রাস্ত্-কে এ অধ্যায়ে সুর বলেই উল্লেখ করা থাক।

তবে রাস্ত্-ই-কাশ্মীর কাশ্মীরী-সুরের জগতে একটি নতুন সংযোজন। এই সুর-সৃষ্টি বোদ্ধাদের স্বীকৃতি পেয়েছিল। রচয়িত্রীর সুনাম, প্রসিদ্ধি তখন খুবই ছড়িয়েছিল কাশ্মীরে। সংগীতজ্ঞা হিসেবে হাব্বার অবশ্য এইটিই একমাত্র পরিচয় নয়। অজস্র কাব্য সংগীত হাব্বার রচনা। সেসবের সুরও তাঁর নিজের। কিন্তু বেশির ভাগ গানই লুপ্ত হয়ে গেছে। মাত্র সেই কটি বেঁচে আছে যা কাশ্মীরের রোমান্টিক শ্রেণীর কিংবা জনসাধারণের প্রিয়। হাব্বা খাতুনের মৃত্যুর কয়েক শ' বছর পরে, কাশ্মীরের আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় যখন তাঁর সৃষ্টির কথা জানতে পারে তখন অতীতের পুনরুদ্ধার করবার জন্যে গবেষণা আরম্ভ হয়। তারই ফলে প্রকাশ পায় তাঁর রচনাবলীর কিছু কিছু রত্ন।

যেমন সংগীতের ক্ষেত্রে তেমনি কাশ্মীরের গীতি কবিতাতেও হাব্বার স্মরণীয় দান আছে। কাশ্মীরী কাব্যের একটি নিজস্ব সম্পদ 'লোল' গীতিকবিতা সম্পূর্ণ রূপ পায় হাব্বার হাতে। কাশ্মীরের কাব্য সাহিত্যে তাঁর স্বভাব কবিত্বের এমন নিদর্শন আছে যার দ্যুতি উত্তরকালে উজ্জ্বলতর হয়েছিল। কিন্তু কাব্যের আলোচনার এখানে অবকাশ নেই। শুধু এ কথা বলে রাখা যায় যে, তাঁর কাব্য ও সংগীতের মধ্যে ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তাঁর সুরসৃষ্টি প্রায় সবই কাব্যকে অবলম্বন করে। বলা যায়, 'রাস্ত্' ভিন্ন তাঁর প্রায় সমস্ত গানই কাব্যসংগীত।

গীত রচনাই হাব্বার জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। সংগীতই তাঁর সমস্ত হৃদয় অধিকার করে ছিল। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই, সংগীতের কোন শিক্ষাই তিনি কারো কাছে পাননি, তেমনি কাব্য রচনায় উপযুক্ত বিদ্যা চর্চাও বিশেষ হয়নি তাঁর। স্বভাব কবিত্বের সঙ্গে মিশেছিল সংগীতের চেতনা। অন্তরের সেই যুগ্ম প্রেরণাতেই সংগীতের জন্ম।

কাশ্মীরের আকাশে বাতাসে যে সুরের আবহ, দীর্ঘকালের যে সাংগীতিক ঐতিহ্য, তাই হাব্বার সংগীতমানস গঠন করেছিল। নানা ধারায় বৈচিত্র্যময়, ঐশ্বর্যময় কাশ্মীরী সুরের জগৎ। তার রূপরেখার একটি পরিচয় দিয়ে তার পরে হাব্বা খাতুনের জীবন কথা আরম্ভ করা যায়।

হাব্বার জন্মের দু' শ' বছর আগে প্রথম ইসলামী প্রলেপ পড়ে কাশ্মীরে। তারও অন্তত দেড় হাজার বছর আগে থেকে কাশ্মীরে সংগীতের ধারা চলে আসছে। সেই প্রাচীন কাল থেকে মধ্যযুগে চাক সুলতান-দের পতনকালে অর্থাৎ হাব্বার সময় পর্যন্ত তার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য। কাশ্মীরী সংস্কৃতির অঙ্গ সেই সংগীত।..

বৈদিক সাহিত্যে কাশ্মীরের উল্লেখ নেই। প্রথম তার নাম পাওয়া যায় পাণিনির ব্যাকরণে, পতঞ্জলির মহাভাষ্যে। কিন্তু সম্রাট অশোকের সময় থেকে কেন্দ্রীয় ভারতের সঙ্গে এই ভূস্বর্গের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ। কাশ্মীরে সংগীত চর্চার কথাও তখন থেকেই জানা যায়।

অশোকের পুত্র জালক কাশ্মীরে অবস্থান করতেন মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিস্বরূপে। জালকের রাজসভাতেই এক শ' সংগীতগুণী ছিলেন। তাঁরা নিয়মিত সংগীত পরিবেশন করতেন সংগীতপ্রিয় জালক ও সভাসদদের জন্যে।

কাশ্মীরের রাজ সভায় সংগীত অনুষ্ঠানের সেই হয়ত সূচনা। আর কেন্দ্রীয় ভারতবাসীর উদ্যোগেই তার প্রবর্তন। জালকের সভা-গুণীরা যে সকলে কিংবা অধিকাংশ ভারতীয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কাশ্মীরে তখন থেকেই ভারতীয় সংগীতের চর্চা।

তারপর থেকে অনেক কাশ্মীরী রাজাদের দরবারেই সংগীতের আদর দেখা গেছে। [illegible] ছাড়া, কাশ্মীরের মন্দিরে মন্দিরে সংগীতের আর এক ধারা। এক দিকে রাজসভা [illegible] অন্য দিকে মন্দির আশ্রয়ী চর্চা কাশ্মীরের সংগীত জগতে ঐতিহ্য সৃষ্টি করে।

যে সংগীত লোকসংগীত নয় কাশ্মীরে তার এই দুটি প্রধান ক্ষেত্র। দরবার ও মন্দির। তার মধ্যে মন্দিরের সংগীত শিল্পীরা বিশেষ এক শ্রেণীর নর্তকী দেবদাসী। সংগীত ও নৃত্যের উপচারে মন্দির বিগ্রহের আরাধনা [illegible]। [illegible] থেকে বারো বছরের মধ্যে দেবদাসীরা মন্দিরের সেবায় আত্মনিবেদন করে। সংগীত ও নৃত্য পদ্ধতি তাদের শিক্ষা হয় উপযুক্ত গুরুর অধীনে।

অষ্ট শতকের আগে থেকেই কাশ্মীরে বড় বড় মন্দিরে দেবদাসীদের [illegible] দেখা যায়।

রাজসভাতেও সুকণ্ঠী গায়িকা-নর্তকীরা সংগীতের চর্চা করেছে বিভিন্ন রাজাদের আমলে। পুরুষ গুণীদেরও অভাব ছিল। কিন্তু নটীদের কথাই পাওয়া যায় বেশি। সুদীর্ঘ হিন্দু যুগে কাশ্মীরী সংগীতক্ষেত্রের এই এক বৈশিষ্ট্য—মন্দির ও রাজসভার দুই ধারাতেই নারী শিল্পীর প্রাধান্য। দু' দিকেই কাশ্মীরের সংগীত জগৎ নটীদের গীত-নৃত্যে দীপ্যমান।

রাজারা দুই ক্ষেত্রেই উদার পৃষ্ঠপোষকতা প্রকাশ করেছেন। দরবারে মন্দিরে সংগীত গুণের জন্যে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা পেয়েছে কলাবতীরা। কলাবিদদের তুলনায় তাদের প্রতিপত্তি নূন ছিল না।

সকল সংগীতপ্রেমী নৃপতিদের নাম চিহ্নিত নেই ইতিহাসে। অনেক নট নটীদের কথাই লোপ পেয়েছে বিস্মৃতির জগতে।

কয়েকটি নাম, কিছু পরিচয় মাত্র বেঁচে আছে।

আট শতকের রাজা ললিতাদিত্য ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। সংগীতপ্রিয় রূপেও ললিতাদিত্য খ্যাতিমান। অনেক সংগীত-শিল্পীদের তিনি পোষকতা করেছেন দরবারে, মন্দিরে। তাদের মধ্যে একজন নটীর নাম ইতিহাসে থেকে গেছে। রাজ-নর্তকী ইন্দ্রপ্রভা। ললিতাদিত্যের রাজসভা ইন্দ্রপ্রভার গানে, নৃত্যে ও রূপে যেন অমরার ইন্দ্রসভা হয়ে উঠেছিল।

ললিতাদিত্যের সময়ে মন্দিরে দেবদাসী-দের সংগীতচর্চাও স্মরণ করবার মতো। কাশ্মীরের কবি-ঐতিহাসিক কলহন তাঁর 'রাজতরঙ্গিণী' মহাগ্রন্থে এ বিষয়ে একটি আশ্চর্য কাহিনী বর্ণনা করেছেন—

একদিন শিকারে বেরিয়েছেন ললিতাদিত্য। তারপর লোকজন থেকে অনেক দূরে বনের মধ্যে সদলে এসে পড়েছেন। এমন সময় হঠাৎ শুনতে পেলেন—নারীকণ্ঠে মধুর সংগীত। রাজা অতিশয় বিস্ময় বোধ করলেন। এই বিজন অরণ্যে গান গায় কে রমণী? সন্ধান করতে গিয়ে যা দেখলেন, তাতে আরো বিস্মিত হলেন। একটি জংগলাকীর্ণ ঢিবির পাশে বসে গান গাইছে দুটি সংগীতনিপুণা [illegible]। দেখে মনে হল দুই ভগিনী।

গান শেষ হলে ললিতাদিত্য জিজ্ঞাসা করলেন—এই জনমানবশূন্য স্থানে তারা কেন গাইছে? কাকে শোনাবার জন্য এমন সুন্দর গান?

গায়িকারা বললে: তা আমরা জানিনা। কিন্তু এই ঢিবির পাশে নির্দিষ্ট গান গাওয়া আমাদের পরিবারের পবিত্র প্রথা। বংশানুক্রমে এখানে গানের ধারা চলে আসছে।

রাজা চিন্তা করে লোকজনদের আদেশ দিলেন স্তূপটি খনন করাতে। সেখানকার মাটি, জংগল পরিষ্কৃত হতেই দেখা গেল দুটি মন্দির।

ললিতাদিত্য চমৎকৃত হলেন। বুঝতে পারলেন, গায়িকাদের পূর্বপুরুষীয়ারা দেবদাসী নিযুক্ত ছিলেন এই মন্দিরে। সেই সূত্রেই এখানে গান গাইবার পারিবারিক প্রথা। তারপর কবে কালের প্রকোপে কিংবা দৈব দুর্ঘটনায় মন্দির আবৃত হয়ে গেছে মাটির স্তূপে, জংগলে। উপলক্ষ অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিন্তু নিষ্ঠার সংগে গান শোনাবার প্রথা জীবন্ত আছে বংশের ধারায়।

ললিতাদিত্যের এক পুরুষ পরে জয়াপীড়। তিনি বাংলার ইতিহাসেও স্থান করে নিয়েছেন। একদা ভারত পরিক্রমায় তিনি আসেন পুণ্ড্রবর্ধন নগরে। গৌড়ের নটী-শ্রেষ্ঠা তখন কমলা।

কমলার শাস্ত্রীয় নৃত্য দেখে জয়াপীড় মুগ্ধ হলেন। ক্রমে কমলার সংগে পরিচয় ও শেষে পরিণয় হয় তরুণ কাশ্মীর রাজের। তারপর নৃত্যগীতনিপুণা কমলাকে তিনি রাণীরূপে নিয়ে স্বরাজ্যে ফিরে গেলেন।

নৃত্য ও সংগীতের বিচক্ষণ বোদ্ধা ছিলেন জয়াপীড়।

হর্ষদেব, জয়দেব প্রভৃতি কাশ্মীরপতিও সংগীতের অনুরাগী ও পৃষ্টপোষকরূপে বর্ণিত হয়েছেন।

তাঁদের পরে আর একজন সংগীতপ্রিয় রাজার কথা জানা যায় যা রূপকথার মতন চিত্তাকর্ষক। তিনি চন্দ্রবর্মা, দশ শতকের প্রথম ভাগে কাশ্মীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

একদিন তিনি সভায় অবস্থান করছেন, এমন সময় রঙ্গ নামে এক ডোম্ব গায়ক উপস্থিত হল। সংগে তার দুই কন্যা—হাম্‌সি আর নাগলতা। নীচ বংশ হলেও গানে তাদের অসামান্য প্রতিভা।

রঙ্গ নিবেদন করলে—মহারাজ, যদি অনুমতি করেন আমার মেয়েরা আপনাকে গান শোনাবে।

অবসর সময়ে রাজা গান শুনলেন হাম্‌সি আর নাগলতার। শুনে অভিভূত হয়ে পড়লেন। বিশেষ হাম্‌সির গান তাঁর মনে ইন্দ্রজাল রচনা করলে। এমন চিত্ত অবশ করা গান তিনি শোনেননি কখনো। সামান্য ডোম্বী হাম্‌সির সংগীত তাঁর সমগ্র চেতনা আচ্ছন্ন করে দিল।

অবশেষে চন্দ্রবর্মা হাম্‌সিকে বিবাহ করে নিয়ে এলেন অন্তঃপুরে। তাঁর অন্য মহিষীও ছিলেন। কিন্তু হাম্‌সিকে করলেন তাঁদের মধ্যে প্রধানা। অস্পৃশ্য এক ডোমনি সংগীতগুণে হল পাটরাণী।

কাশ্মীরের ইতিহাসে সন্ধান করলে এমন সব সংগীতপ্রেমী রাজাদের কথা আরো হয়ত জানা যেতে পারে।

হিন্দু আমলের সেই সব যুগে কাশ্মীরী নারীদের স্বাধীনতা ও মর্যাদা ছিল যথেষ্ট। সংগীত নৃত্য ইত্যাদি চারুকলার চর্চার অবাধ সুযোগ সে নারী সমাজে দেখা যেত। রাজসভায় নটীদের কিংবা মন্দিরে দেবদাসী-দের কথা তো বলাই বাহুল্য কারণ সংগীত সেখানে নটীদের অবলম্বন। কিন্তু অপেশাদার গায়িকাও হিন্দু যুগে ঘরে ঘরে দেখা গেছে এবং তা সকল অবস্থার নারী-দের মধ্যেই। সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলাদের মধ্যে কলাবিদ্যারূপে উচ্চশ্রেণীর সংগীতচর্চা আদরের বস্তু ছিল।

সেকালের কাশ্মীরী মহিলাদের মার্জিত সংস্কৃতির কথা জানিয়েছেন বিল্‌হন কাশ্মীরী। এগারো শতকে দাক্ষিণাত্যের কল্যাণ দরবারের সভা কবি বিল্‌হন কাশ্মীরী। তাঁর রচিত ও বহুপঠিত চরিত-কাব্য 'বিক্রমাঙ্কদেব চরিত'। তার শেষ সর্গে কাশ্মীরের মহিলাদের সংস্কৃতির উৎকর্ষের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে সেসব বিবরণের স্থানাভাব।

বিল্‌হনের পরের শতকে অর্থাৎ বারো শতকের প্রথমে কাশ্মীরের রাজা ছিলেন উচ্ছলদেব। রাজা হবার তাঁর কথা নয়, কারণ সে উত্তরাধিকার নিয়ে জন্মাননি। রাজা হলেন ঘটনাচক্রে। তার আগে থেকেই জয়মতীর সংগে তাঁর পরিচয়। তখনকার কাশ্মীরের একজন শ্রেষ্ঠা নটী জয়মতী। নৃত্যগীতে পারদর্শিনী, সংগীত সমাজের মনোহারিণী। কোন সামাজিক পরিচয় নেই, তবু সমাজে বিপুল মর্যাদা। সংগীতগুণের জন্যেই তাঁর সমাদর। তাঁর অনুরাগীদের মধ্যে একজন ছিলেন উচ্ছল।

তারপর ভাগ্যচক্রে তিনি কাশ্মীরের সিংহাসন পেয়ে গেলেন। বিবাহ করলেন জয়মতীকে। রাণী ও পত্নীরূপেও জয়মতী আদর্শ। উচ্ছলের জীবন প্রেমে, সংগীতে, আনন্দে, রাজকীয় কর্তব্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। এক উত্তম ও জনপ্রিয় রাজা বলে প্রজাদের মধ্যে কীর্তিত হলেন উচ্ছলদেব।

কিন্তু জয়মতী-উচ্ছলের অপূর্ব সুখের সেই সব দিন অকস্মাৎ নিষ্ঠুরভাবে শেষ হয়ে গেল। দুর্জন রাজকর্মচারীদের ষড়যন্ত্রে নিহত হলেন উচ্ছল। শোকবিহ্বলা জয়মতী সহমরণে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। উচ্ছলদেবের সংগীতসভা স্তব্ধ হয়ে গেল।

উচ্ছলের মৃত্যুর শতকেই স্বনামখ্যাত কলহন রচনা করেন তাঁর 'রাজতরঙ্গিণী।' কাশ্মীর রাজাদের এই ইতিহাসগ্রন্থে তিনি দেবদাসী ও অন্যান্য অনেক নটীর উল্লেখ করেছেন।

কলহনের প্রায় দু শ' বছর পরে কাশ্মীরে আরম্ভ হয়েছে মুসলমানী শাসন। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে এই অভূতপূর্ব পরিবর্তনের সব ফলাফলের হিসাবনিকাশ স্বতন্ত্র বিষয়। এখানে শুধু প্রাসঙ্গিক বক্তব্য এই যে, এতকালের নারী স্বাধীনতা ইসলামী আমলে লুপ্ত হয়ে গেল। বোর্খা এল। হিন্দু যুগে মহিলারা রাজ্য শাসন কাজেও অংশ নিয়েছেন প্রয়োজনে। অভিষেকের সময় রাজার পাশে বসে অভিষেক বারি নিয়েছেন রাণী। মুসলমানী আমলে বেগমের সে অধিকার বর্জিত হল।

সম্ভ্রান্ত মহিলারা নিজেদের অলংকৃত করবার অনেক সুযোগ হারালেন। তাঁদের একাধিক কলাচর্চার পথ ও পরিবেশ রুদ্ধ হয়ে গেল। সংগীত-নৃত্যের অনুশীলন সামাজিক মর্যাদাচ্যুত হল সম্ভ্রান্ত মহিলা-দের মধ্যে। অনেক ক্ষেত্রে লালসার শিকারে পর্যবসিত হবার আশংকা দেখা দিলে। বিদগ্ধা, উচ্চশ্রেণীর নারীদের অংক থেকে নেমে একটি বিশেষ শ্রেণীর পেশা হল সংগীত ও নৃত্য।

অন্য দিকে, মুসলমান শাসনকর্তাদের

সময়ে ভারতীয় সংগীতে ইসলামিক বহির্জগতের নানা ধারার সংমিশ্রণ কাশ্মীর ক্ষেত্রে ঘটল। তার ফলে ভারতীয় সংগীতের ভারতীয়ত্ব অনেকখানি তরল ও বিজাতীয় হয়ে উঠল এখানে। কাশ্মীরী সংগীতে এই নতুন সমন্বয় সুলতান জয়নুল আবিদীনের আমলে ও তাঁর দরবারের উদ্‌যোগে বিশেষ করে দেখা গেল।

কাশ্মীরের প্রথম মুসলমান শাসকবংশের স্থাপক শাহ মীরের (রাজ্যকাল ১৩৩৯-৪২ খৃঃ) পরবর্তী সপ্তম ব্যক্তি জয়নুল আবিদীন (১৪২০—৭০ খৃঃ) এ রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সুলতান। কাশ্মীরের মুসলমান রাজাদের মধ্যে তাঁর তুল্য সমদর্শিতা আর কেউ প্রদর্শন করেন নি। অন্যত্রও দুর্লভ অন্যান্য গুণের সঙ্গে জয়নুল আবিদীন দস্তুর মত সংগীতপ্রেমী ছিলেন। সংগীতে তাঁর আগ্রহ ও আনুকূল্যের জন্যে বিখ্যাত ছিল তাঁর দরবার। সন্ধ্যাবেলায় তিনি গীত ও নৃত্যশিল্পীদের সঙ্গে সানন্দে যাপন করতেন। ইরাণ তুরাণ প্রভৃতি বহির্দেশের গুণীরাও সমাগত হতেন তাঁর সঙ্গীত-সভায়। কৃতী শিল্পীদের তিনি পুরস্কৃত করতেন।

মধ্যযুগের কাশ্মীরী সঙ্গীতে ইরাণী তুরাণী প্রভাব এইভাবে পড়ে জয়নুল আবিদীনের আমলে। তাঁর ও পরবর্তী সুলতানদের সময়ে মধ্যযুগীয় কাশ্মীরের সংগীত নানা বিভিন্ন উপাদানে গড়ে ওঠে। সেই বিকাশের ধারায় সব চেয়ে বেশি ছাপ রেখেছে পারস্য ও তুর্কীস্থানের সংগীত।

সুফিয়ানী কালাম কাশ্মীরের ক্লাসিকাল সঙ্গীত। ওস্তাদ-সাগীর্দ পরম্পরায় তা যেমন অনুশীলিত তেমনি রক্ষিত হয়ে এসেছে। স্বরলিপিতে গ্রথিত হয়নি কখনো।

সব সময়েই সম্মেলকভাবে গীত এই সুফিয়ানী কালামও ইরাণী সংগীতের দান। এ গানের নামকরণেও পারস্যের সুফী সম্প্রদায়ের প্রভাব।

কাশ্মীরী সংগীতে এই সূত্রে ফারসী সংগীতের পঞ্চাশটির বেশি মোকামাৎ (থাট বা ঠাট) এসেছে। তার মধ্যে কিছু ভারতীয় নাম লক্ষণীয় : ভৈরবী, ললিত, কল্যাণ। ফারসী কয়েকটি নাম হল ইস্ফাহানি, দুগাহ্, পঞ্জাগাহ্, রাস্ত্-ই-ফারসী, সেহ্গাহ্ ইত্যাদি। প্রচলিত তালঃ সেহতালস্, নিমদুর, দুর-ই-খফীফ, তুর্কী জার্ব—ভারতীয় থেকে পৃথক।

গানের সঙ্গে হাফিজ নাঘমা নৃত্যের কথাও বলা যায়, গানের অর্থ শরীরের গতিভঙ্গিমায় প্রকাশ বা ব্যাখ্যা করা যার লক্ষ্য। সঙ্গত যন্ত্র হিসেবে তুম্বক্‌নারি, সন্তুর, সাজ ও সেতার উল্লেখ্য। মিজমার নামে একপ্রকার বাঁশি, গীটারের ধরনের তম্বুরও কাশ্মীরে প্রচলিত অন্যান্য যন্ত্র। খুরাসানের প্রিয় সংগীতযন্ত্র রবাবও জয়নুলের আমলে কাশ্মীরে আসে বিদেশী সংগীতজ্ঞদের সঙ্গে। উদ-ও জয়নুলের সময়ে কাশ্মীরে প্রচলিত হয়। শেষের কটি লোকসংগীতের বাদ্যযন্ত্র। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা যায় যে, কাশ্মীরে সবচেয়ে প্রচলিত লোকসংগীত-গুলি সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হয়, সঙ্গে কিছু নৃত্যও থাকে। যথা—ছকরি, তুম্বুর নাঘমা, বাচা নাঘমা ইত্যাদি। এই সব লোক-সঙ্গীতের মধ্যে সব চেয়ে জনপ্রিয় হল, ছকরি। বসন্তকালে কাশ্মীর যখন অপরূপ শোভা ধারণ করে, কাশ্মীরীরা তখন প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে ছকরি গানে মেতে ওঠে। সঙ্গে বাজে রবাব। সুরের সঙ্গে রূপের হিল্লোল জাগে ফুলময় উপত্যকায়।

ইরাণ তুরাণ ছাড়া জয়নুলে আবিদীনের সঙ্গীত দরবারে তাসখন্দ, সমরখন্দ প্রভৃতি মধ্য এশিয়ার সংগীতকেন্দ্র থেকেও গুণীরা আসতেন। বড় বড় আসরের আয়োজন করতেন সুলতান। তাঁর আমলের কাশ্মীরী সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে যোধভট্ট বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। স্বরচিত সঙ্গীতগ্রন্থ তিনি উৎসর্গ করেন জয়নুল আবিদীনের নামে।

জয়নুল আবিদীনের দরবারে শুধু ভারতের বাইরে থেকে নয়, ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকেও সংগীতগুণীরা কাশ্মীরে আসতেন এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতেন।

খুরাসান থেকে যত ওস্তাদ এই সুলতান বংশের সময়ে কাশ্মীর দরবারে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে মুল্লা উদী এবং মুল্লা জাদা বিখ্যাত। তাঁরা যথাক্রমে গায়ক ও বংশী-বাদক। ফারসী সঙ্গীতের আর একজন প্রসিদ্ধ গীতশিল্পীর নাম জামিল।

জয়নুল আবিদীনের সংগীত দরবারের ধারা তাঁর পরবর্তী দুই সুলতানই ভালভাবে বজায় রাখেন। বরং তাঁর পৌত্র হাসান শাহের আরো বিরাট ব্যাপার হয়েছিল সংগীত দরবার।

আবিদীন পুত্র হায়দর শাহ (১৪৭০-৭২ খৃঃ) শুধু সঙ্গীতপ্রেমী ছিলেন না। তিনি সংগীতজ্ঞ এবং কুশলী যন্ত্রী। তাঁর পুত্র হাসান শাহও (১৪৭২-৮৪ খৃঃ) সংগীতজ্ঞ। কিন্তু সংগীতজ্ঞদের ও দরবারের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে আরো বড়। পিতামহ জয়নুল আবিদীনের মতন তাঁরও ছিল ব্যাপক দৃষ্টি। বাইরে থেকে বহু গুণী সমাগম তিনি দরবারে ঘটিয়েছিলেন। বিশেষ করে বলবার কথা—তিনি দাক্ষিণাত্য থেকে সংগীতজ্ঞ আমন্ত্রণ করে এনে কাশ্মীরী সঙ্গীতে নতুন রীতির সৃষ্টি করতে চান। তাঁর সময়ে সংগীত বিষয়ে অনেক পরীক্ষা হয়েছিল কাশ্মীরের সংগীত দরবারে। তিনি সংগীতের জন্য একটি বড় বিভাগেরই পত্তন করেছিলেন এবং শ্রীবর হন তার অধ্যক্ষ।

হাসান শাহের সময় কাশ্মীর দরবার পেশাদার সংগীতশিল্পীদের পক্ষে মহা আকর্ষক হয়ে ওঠে। এক হাজারেরও বেশি শিল্পী তিনি নিয়মিত বেতনে নিযুক্ত রাখেন দরবারে। (এই ব্যয় বাহুল্য তাঁর পক্ষে অবশ্য পরম ক্ষতিকর হয়েছিল।) তার মধ্যে নটীদের সংখ্যাই বেশি। রত্নমালা, দীপমালা ও নৃপমালা—নৃত্যপটিয়সী এই তিনজন রূপে গুণে দরবারের তিনটি রত্ন। শ্রীবরের রাজাবলিপাটক গ্রন্থ থেকে আরো অনেক শিল্পীদের কথা জানা যায়। শ্রীবর নিজেও ছিলেন উচুদরের গুণী। যেমন সুকণ্ঠ গায়ক, তেমনি সুমিষ্ট বংশীবাদক তিনি।

হাসান শাহের সংগীত দরবার জয়নুল আবিদীনের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী হয়েছিল সঙ্গীতের কলুসে।

হাসান শাহের রাজত্বের পঞ্চাশ বছর পরে এই সুলতানী আমল শেষ হয় মীর্জা হায়দর দুঘলাতের কাশ্মীর আক্রমণের ফলে (১৫৩৩ খৃঃ)। মঙ্গোলদের শাখা চুঘ্‌তাইদেরই একটি উপশাখা দুঘলাৎরা। কাশ্মীরের শাসনকর্তা হয়ে মীর্জা হায়দার দুঘলাৎও দরবারী সংগীতের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন।

দুঘলাৎ শাসনের পরেই কাশ্মীরের চাক্ সুলতানী আমল। চাক্ সুলতানদের পতনের পর কাশ্মীরের সংগীত দরবারের আর শ্রীবৃদ্ধি হয়নি। দরবারী সংগীতের বিকাশও রুদ্ধ হয়ে যায়। এই চাক্ সুলতান আমলেই জুনীর জীবন। শেষ চাক সুলতানেরই বেগম হাব্বা খাতুন। কাশ্মীরের সুরের জগতে যাঁর দান—রাস্ত্-ই-কাশ্মীরী। সুলতানী আমলে গজল, কাওয়ালীর বিশেষ চর্চা আরম্ভ হয় কাশ্মীরে আর শেষের সৃষ্টি কাশ্মীরের নিজস্ব সুরঃ রাস্ত্-ই-কাশ্মীর।

কাশ্মীরের কলি যেমন স্বভাব সৌন্দর্যে ফুটে ওঠে, এই রূপরাজ্যে তেমনিভাবে এই সুরের জন্ম। ফুলের বনে, মাটির ঘরে, হ্রদের শিকারায় দিকে দিকে যে নন্দনলীলা তারই আর এক রূপলোক সঙ্গীতের জগতে।......

পাম্পোসের কাছে চান্দাহার গ্রাম। জম্মু-শ্রীনগর রাজপথ থেকে একটু দূরে ছবির মতন ছোট্ট গ্রাম চান্দাহার। সেখানকার গ্রামাঞ্চল জাফরান ক্ষেতের জন্যে বিখ্যাত। সেখানে এক দরিদ্র কৃষকের সংসার। সেই ঘরে একটি সঙ্গীতের ফুল ফুটেছিল। তার নাম জুনী। ছবির মতন রঙীন উপত্যকায় একটি ঘর আলো করা শিশু। গোলাপী গায়ের রঙ, নিখুঁত মুখের ছাঁদ, যেন নিপুণ তুলিতে আঁকা মুখ চোখ ভ্রূ।...

প্রকৃতির সেই অপরূপ পরিবেশে জুনী বড় হতে থাকে। আর এক আশ্চর্য এই চাষীর সংসারে—গন্ধর্বী শিশু গান গায় নিজের মনে। কারুর শেখানো গান নয়,

পাহাড়ের সরোবরে ফুলদল ফোটে;
এসো যাই পুষ্পময় প্রান্তরের বুকে।
বিকশিত লাইলাকে আকুল বনানী—
আমার করুণ সুর শোনোনি কি তুমি?...

ইউসুফ খাঁর হাব্বা খাতুনের বিবাহিত জীবনের চোদ্দ বছর পূর্ণ হল। চোদ্দ বছরের নিরবচ্ছিন্ন মধুমাস। তারপর অকস্মাৎ দুর্যোগের ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল তাঁদের সঙ্গীতময় কাব্যময় জীবনধারা। ১৫৮৬ খৃঃ। বাদশা আকবরের দুর্ধর্ষ মোগল বাহিনী কাশ্মীর আক্রমণ করলে।

তার অনেক আগে থেকেই আকবরের লুব্ধ দৃষ্টি ছিল কাশ্মীরের ওপর। প্রথম যৌবনে ১৫৬০ খৃঃ তিনি একবার কাশ্মীর অধিকারের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তারও আগে থেকে তিনি মোগল সাম্রাজ্যের অংশ মনে করতেন কাশ্মীরকে। কারণ চাক সুলতানদের আগে মীর্জা হায়দর দুঘলাৎ কাশ্মীর জয় করেছিলেন হুমায়ুনের পক্ষে। তা ছাড়া, মীর্জা হায়দর তাঁর আত্মীয়। মীর্জা হায়দরের জননী এবং বাবরের জননী দুই সহোদরা। এসব কারণে আকবরের দাবি কাশ্মীরের ওপর। মীর্জা হায়দরের পরে কাশ্মীরের পাক সুলতানরা বরাবর আকবরকে তুষ্ট রাখবার চেষ্টা করতেন। ভেট পাঠাতেন মাঝে মাঝে বাদশার দরবারে। ইউসুফ খাঁও আকবরের বিরোধী ছিলেন না। তবু তাঁর জীবনস্বপ্ন ছিন্নভিন্ন করে কালান্তক মোগল বাহিনীর অভিযানে আক্রান্ত হল কাশ্মীর।

হতভাগ্য ইউসুফ খাঁ বন্দী হলেন। আকবর তাঁকে নির্বাসিত করলেন সুদূরে বিহারে। পাটনা জেলার বিসওয়াক গ্রামে সামান্য বৃত্তি নিয়ে কাশ্মীরের সুলতান নির্বাসন দণ্ড ভোগ করতে লাগলেন। স্বদেশে ফেরবার জন্যে অনুনয় করেছিলেন। কিন্তু ব্যর্থ হয় সে প্রার্থনা।...

অতি কষ্টকর জীবন দাঁড়াল ইউসুফ শাহের। বৃত্তির অংথা তাঁর অভ্যস্ত বিলাস ও অভিজাত জীবনের পক্ষে অকিঞ্চিৎকর। রুক্ষ বিহার অঞ্চলে গ্রীষ্মের দাবদাহ শরীর মন অতিষ্ঠ করে তোলে। আরো অসহ্য বোধ হয় কাশ্মীরের শীতল, পুষ্পিত সৌন্দর্যের স্মরণ-মননে। গুলমার্গ, সোনমার্গে হাব্বা খাতুনের সঙ্গ স্মৃতিতে আকুল হয়ে ওঠেন। বিরহের এ কাল নিশির আর শেষ হবার আশা নেই। কবি, গায়ক, বিদ্বান ব্যক্তিদের সঙ্গে যাপন করতে ভালবাসতেন। নির্বাসিত জীবনে সেসব অভাবও শোচনীয়। সমস্ত মিলিয়ে মনের মধ্যে কাশ্মীরের জন্যে নিরন্তর হাহাকার।

হাব্বা খাতুনকে নিয়ে কাশ্মীরে যে সুলতানী জীবন তার জন্যে ছ' বছর মর্মক্রন্দনের শেষে ইউসুফ খাঁর মৃত্যু ঘটল (১৫৯২ খৃঃ)। সেই বিসওয়াক গ্রামেই তিনি সমাধিস্থ হলেন।

ওদিকে ইউসুফ খাঁর বন্দী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাব্বা খাতুনের জীবনে আবার দুঃখের দিন আরম্ভ হল। ইউসুফ খাঁকে পাটনায় নির্বাসিত করার কথা বেগমকে জানানো হয়েছিল কিংবা তাঁকে স্বামীর সঙ্গে বাসের অনুমতি দেওয়া হয় কিনা, ইতিহাস এ বিষয়ে নীরব।

হাব্বা নিজের রচনা সুর ও কাব্যের জগতে এমনই মগ্ন থাকতেন যে, জাগতিক অনেক সংবাদ তাঁর কাছে পৌঁছাত না। অন্য ধাতুতে গড়া তাঁর একান্ত শিল্পীমন রাজনীতির সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেনি। তাই কাশ্মীর মোগল সাম্রাজ্যের মধ্যে চলে যাওয়ার সব তাৎপর্যও তাঁর ধারণায় আসেনি। সুলতানের যে দুর্দৈব ঘটেছে, তিনি বন্দী হয়েছেন এইমাত্র জানলেন তিনি। ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার কোন স্থান মনে ছিল না, নিজের একটি আলাদা সঙ্গীতের জগতে যেমন বাস করতেন তেমনি অনেকখানি রইলেন বটে, কিন্তু দয়িতের বিচ্ছেদ মর্মান্তিক হল। তাঁর এতকালের সঙ্গীত ও কাব্যের শ্রেষ্ঠ সহৃদয় সমঝদার কোথায় হারিয়ে গেলেন—এ বেদনা বহন করা দুঃসাধ্য। পৃথিবীর সব আনন্দ তাঁর কাছে নিঃশেষ হয়ে গেল।

তিনি প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়লেন কাশ্মীরের পথে, প্রান্তরে। পাহাড়ে, নদী সরোবরের তীরে, গ্রামে, বনে—সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কোথায় তাঁর দরদী জীবনসঙ্গী? অন্তরের তীব্র ব্যথা ফুটে উঠতে লাগল সঙ্গীতে—

বল বন্ধু, কখন্ জাগো আমার হাসবে,
আর আমার প্রেম আবার ফিরে আসবে?
বল কখন্?

প্রতীক্ষা করেছি কতকাল;
মন এখন অসাড়, অলস, আশাহীন।
কি মধুর সে প্রেমের আচরণ:
আমার প্রেমকে সাজাব অলংকারে,
হেনায় রাঙাব আমার বাহু।
তার শরীর নিষিক্ত করে দেব সুবাস চুম্বনে,
স্বর্ণ ভৃঙ্গার ভরে আনব সুরায় তার জন্যে।
আমার মনের হ্রদে প্রেমের কুমুদ ফোটে।
বল বন্ধু, কখন্ ভাগ্য আমার হাসবে?
তার বিরহে আমি শুকিয়ে যাচ্ছি
জুঁই ফুলের মতন।...

হাব্বার এই সময়ের আর একটি গানঃ

প্রেম আমায় গ্রাস করেছে অন্তরে।
তপ্ত উনানে নিক্ষেপ করেছে আমায়;
আমি জ্বলে যাচ্ছি নিঃশেষে।
কে বুঝবে আমার যন্ত্রণা?

নিজের অস্থিরতার কথাও অন্য গানে প্রকাশ পেয়েছে—

প্রেম আমায় গলিয়েছে বরফের মতন।
পাহাড়ের নদীর মতন বেঁধেছে আমায়।
কিন্তু আমি অশান্ত ঝরনাধারা,
কোন বাঁধন মানি না।

তাঁর অন্য একটি গান—

রমজানের উৎসব করছে জগৎ;
প্রেমিক পালন করছে ঈদ।
কিন্তু প্রেম যদি চলে যায় দূরে,
কেমন করে হবে ঈদ?

প্রেমাস্পদের উদ্দেশে নিজের অন্তরকে মেলে দিয়েছেন হাব্বা কোন কোন গানেঃ

আমার হাত রাঙিয়েছি হেনায়,
কখন্ সে আসবে?
প্রেম আসবে অপরূপের সাজে।
এখনো এসো, আমার কামনা:
আমি মরে যাচ্ছি তোমার জন্যে।
তোমাকে ছাড়া কেমন করে
কাটবে আমার দিন?...

বাইরের জগতের কোন সংবাদ রাখতেন না বলে বুঝতে পারতেন না, কেন ফিরছেন না তাঁর দয়িত! কিন্তু পরিভ্রমণেরও বিরাম নেই উপত্যকার সর্বত্র।

এমনি করে হাব্বা খাতুনের শেষ জীবনের যাযাবরী দিনগুলি ঝরা ফুলের মতন পথে প্রান্তরে বনতলে ঝরে যেতে থাকে। ভরা দুঃখের ভ্রাম্যমাণ দিন। ঘুরতে ঘুরতে গুরেজ উপত্যকায় কিছুদিন কেটে যায়। এখানকার লোকেরা শ্রদ্ধা করত তাঁকে। মূর্তিমতী একটি শোক গাথা যেন কিংবা উপত্যকার কোন নাম-না-জানা মলিন কুসুম।...

এখানে যে ছোট পাহাড়টিতে তিনি গান গেয়ে দিন কাটাতেন সেটিকে এখনো সবাই হাব্বাবল (হাব্বার পাহাড়) বলে।

কিছুদিন পরেই গুরেজ থেকে চলে যান। এক জায়গায় বেশিদিন থাকতে পারতেন না। অস্থির মন তাঁকে স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াত হারানো প্রেমিকের সন্ধানে।

অবশেষে নিরাশ, হতাশ্বাস হয়ে হাব্বা খাতুন পান্থা ছকের কাছে একটি পাহাড়ে এসে কুটির বাঁধলেন। তারপর একদিন এখানেই তাঁর সব খোঁজার, সব যন্ত্রণার সমাপ্তি ঘটল। একটি সামান্য কবরে সমাধিস্থ হলেন স্বাধীন কাশ্মীরের শেষ বেগম। কাশ্মীর সংস্কৃতির একটি চিরপ্রস্ফুটিত পুষ্প। একটি করুণ কাশ্মীরী সুর।

তার বহু বছর পরে আধুনিক কাশ্মীর সরকার হাব্বা খাতুনের সমাধি নতুন করে নির্মাণ করে দেন। আর তার চারদিকে একটি তৃণ শ্যামল ভূমিতে গড়া ফুলতল।

সেখানেই স্তব্ধ হয়ে আছে কাশ্মীরের নিজস্ব একটি সুর। ঘুমিয়ে আছে রাস্ত্‌-ই-কাশ্মীর।

রাজহংস সদৃশ নীহারিকা সাইগনাস। পাশে অতিকায় উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা যাচ্ছে

যে ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থল অদৃশ্য

মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য উদ্ঘাটন করতে গিয়ে আজকের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যাদের নিয়ে রীতিমত বিতর্কের সম্মুখীন হয়েছেন **কোয়াজারস** তাদের অন্যতম। কোয়াজারস সংক্ষেপিত নাম। সম্প্রসারিত অর্থে কোয়াজি স্টেলার রেডিও সোরসেস বা অবজেকটস। বাংলায় বলা চলে **আপাত নাক্ষত্র বস্তুসমূহ।** জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে এদের আবিষ্কার সামান্য কয়েক বছরের ঘটনা। আর আবিষ্কার মুহূর্ত থেকেই এরা বিশ্ববিজ্ঞানীদের মনে এক অন্তহীন বিস্ময় এবং লক্ষ প্রশ্নের মায়াজাল রূপে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। মহাশূন্য থেকে ভেসে আসা ক্ষীণ আলোক রশ্মি এবং কিছুটা বেতার তরঙ্গ, এরাই একদিন কোয়াজারের অস্তিত্বের সংবাদ বহন করে এনেছিল। সেই আলো এবং বেতার তরঙ্গ পরীক্ষা করে অনেকেই সিদ্ধান্ত করেন, কোয়াজারেরা আমাদের থেকে বহু, বহু দূরে অবস্থান করছে। অতএব প্রথম প্রশ্নের ঝড় উঠল। একদল বিশেষজ্ঞ প্রশ্ন তুললেন, যদি তাই হয়, তাহলে ঐ সমস্ত বস্তুর শক্তির উৎস অত্যন্ত ব্যাপক এবং জোরাল হওয়া দরকার। কিন্তু হিসেব কষে তাঁরা ঠিক ঠাহর করতে পারলেন না, ব্যাপক বলতে কতটা ব্যাপক অথবা জোরাল অর্থে কত বেশি জোরাল হওয়া উচিত। যে সমস্ত আলোকরশ্মি বা বেতার তরঙ্গ অকল্পনীয় দূরত্ব পথ ধরে এগিয়ে আসছে, তাদের শক্তির আধারটি এত বড় হওয়া উচিত যা কারুর কারুর কাছে কল্পনা করতে বাধছে। তবে কেউ কেউ হিসেব কষে দেখেছেন, যে কোন নক্ষত্র থেকে কোয়াজার আয়তনে অনেক বড় হলেও পুরো একটি ব্রহ্মাণ্ড বা গ্যালাকসি থেকে অনেক ছোট। অতএব আবার প্রশ্ন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি, বড় কোন বস্তুকে যেমন কাছে থেকে পুরোপুরি কখনও দেখা যায় না, ঠিক তেমনি যে সমস্ত গ্যালাকসি আমাদের খুবই কাছে রয়েছে তাদের সবটা আমরা দেখতে পারি না। কোয়াজারও যদি আয়তনে অনেক বড় হয় তাদেরও দেখতে পাওয়ার কথা নয়? বিশ্ব-সৃষ্টির এই নতুন রহস্য সম্পর্কে প্রখ্যাত প্রবন্ধকার জন নেওয়েল সম্প্রতি কতকগুলি চমকপ্রদ তথ্য পরিবেশন করেছেন।

এ কথা ঠিক, নানারকম পর্যবেক্ষণ চালিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মোটামুটিভাবে কোয়াজারদের দূরত্ব সম্পর্কে যে সমস্ত হিসেব দিয়েছেন তাদের সবগুলিই বিতর্কের বাইরে নয়। তবে তাদের প্রচণ্ড শক্তির উৎস সম্পর্কে সঠিক কোন সিদ্ধান্তে কেউই পৌঁছতে পারেন নি। অতি সম্প্রতি সাসেক্স-এর **হারসটমনসকসস্থিত রয়েল অবজারভেটরির জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডঃ লিনডেন-বেল** তাঁর নিজস্ব একটি তত্ত্ব বলতে চেয়েছেন, অনেক কোয়াজারই নাকি আমাদের এত কাছে রয়েছে যে তাদের উপর সহজে পর্যবেক্ষণ চালনা তেমন কোন কঠিন ব্যাপার নয়। ডঃ লিনডেন-বেল-এর বিশ্বাস, পৃথিবী থেকে মাত্র কয়েক হাজার আলোক-বৎসর দূরে আমাদের নিজস্ব সর্পিল গ্যালাকসি বা ব্রহ্মাণ্ড, নাম যার 'ছায়াপথ', যার মধ্যে আমাদের সৌরমণ্ডলের মত আরও অনেক নক্ষত্রমণ্ডল অবস্থান করছে, এই কেন্দ্র বিন্দুতে অবস্থান করছে একটি কোয়াজার। এখন সে মৃত। অন্ততঃ প্রজ্বলনের পর তার সমস্ত শক্তির সঞ্চয় শেষ হয়ে গেছে। তাঁর বিশ্বাস, খুঁজে দেখলে অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডজগতেও হয়ত এই ধরনের আরও অনেক কোয়াজারের সন্ধান মিলবে। তারাও এখন মৃত। তাদেরও শক্তি আজ নিঃশেষিত। তাদেরও বাস ঐ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র রাজ্যে, যারা জ্যোতির্বিজ্ঞানী-চোখে চির অদৃশ্য হয়ে বিরাজ করছে। সে সমস্ত অঞ্চল থেকে কোন আলোক বা বেতার সংকেত ধরা পড়ে না। ফলে অনেকে মনে করেন ঐ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জগতের কেন্দ্রস্থল সম্ভবত ফাঁকা।

নতুন এই তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করার আগে কোয়াজারের জন্মরহস্য সম্পর্কে ডঃ লিনডেনবেল কি বলেন সেটা একবার দেখা যাক। মহাকাশের ভাসমান গ্যাস কঠিন জমাট বেঁধে একদিন সৃষ্টি করেছিল খণ্ড খণ্ড আপাত গ্যালাকসি বা আপাত ব্রহ্মাণ্ড জগত। গ্যাস তার স্বাভাবিক ধর্ম অনুসারে ঐ আপাত 'ব্রহ্মাণ্ড-জগত'এর কেন্দ্রে এসে আরও কঠিন অবস্থায় জমাট বেঁধে সৃষ্টি করে এক-একটি অতিকায় নক্ষত্র। সাধারণ নক্ষত্রের চেয়ে এদের তেজ ছিল অনেক বেশী। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড প্রজ্বলন ক্ষমতা। যে সমস্ত কোয়াজারকে আমরা দেখতে পাই তারা আসলে এই নক্ষত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। সবগুলি না হলেও এই নক্ষত্রগুলির

সান্তাক্রুজ বিমানবন্দরে একটি বোয়িং-৭০৭ জেট ইঞ্জিনের সচাপ তেলের নলের ৩০০ সেন্টিমিটার ভেতরে রেখে দেওয়া হয়েছে তেজস্ক্রিয় ইরিডিয়াম-১৯২-এর আধার

কিছু সংখ্যক কোয়াজার, যারা আয়তনে বৃহৎ, ক্ষমতায় অসীম! যাদের প্রচণ্ড শক্তির কথা ভেবে মানুষ বিস্মিত!

সময়গতির সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ নক্ষত্রের মত অতিকায় এই নক্ষত্রগুলিও একদিন স্বতঃস্ফূর্ত প্রজ্জ্বলনের মধ্যে দিয়ে তাদের সঞ্চিত পারমাণবিক জ্বালানি শেষ করে ফেলল। আর সেই সঙ্গে তাদের উপরে প্রতিক্রিয়া শুরু করল আর এক ধরণের প্রচণ্ড বল। যার নাম মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। এই আকর্ষণ শক্তির ফলে কোয়াজারদের বস্তুকণা তাদের কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে এসে জমাট বাঁধতে শুরু করে। কোয়াজারের আয়তন বড়, তার ভরও অনেক বেশী। অতএব সেই মাধ্যাকর্ষণ বলের পরিমাণটা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। এদিকে মাধ্যাকর্ষণ বলকে প্রতিহত করার মত আর কোন রকমের শক্তি তার মধ্যে সঞ্চিত নেই। ফলে প্রচণ্ড সংকোচন। এই সংকোচনের ফলে কোয়াজারদের আয়তন আগের চেয়ে অনেক ছোট হয়ে আসে। আগের চেয়ে তার ব্যাসার্ধ খাটো হয়ে যায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই ব্যাসার্ধের নাম রেখেছেন 'সোয়ারৎসচাইল্ড রেডিয়াস'। সৃষ্টিতত্ত্ববিদদের মতে কোন নক্ষত্র যদি সংকোচনের ফলে 'সোয়ারৎসচাইল্ড রেডিয়াস' লাভ করে, তখন তার মহাকর্ষ অভিকর্ষবল এত বেশী বেড়ে যায় যে, সেই বলকে উপেক্ষা করে আলো বা অপর কোন বিকিরণ নক্ষত্রের বাইরের জগতে আর চলে যেতে পারে না। ফলে বহির্জগতের মানুষের কাছে তখন তা অদৃশ্য হয়ে যায়। ডঃ লিনডেন-বেল-এর অভিমত, আমাদের নিজস্ব ব্রহ্মাণ্ড জগতের কেন্দ্রে যে কোয়াজারটি রয়েছে সেটি এমনই একটি দশার মধ্যে উপস্থিত। তাই তাকে আমরা দেখতে পাই না। তাই মনে হয়, আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থল বুঝি ফাঁকা। তবে এই সঙ্গে এ কথাও ডঃ লিনডেন-বেল যোগ করে দিয়েছেন, শক্তিশালী এই কোয়াজারকে [illegible] হয়ত প্রত্যক্ষ করা না গেলেও এর [illegible] পরিমণ্ডলে আজও [illegible] মাধ্যাকর্ষণের অসংখ্য ক্ষুদ্র বস্তুকণা প্রতিনিয়ত [illegible] কোয়াজারের কেন্দ্র বিন্দুর অভিমুখে।

প্রশ্ন উঠেছে, যখন কোন নক্ষত্র 'সোয়ারৎসচাইল্ড রেডিয়াস' পেয়ে যায়, তখন তার শেষ পরিণতিটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে? এর উত্তর একমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করেই দেওয়া সম্ভব। কারণ বলে দেওয়া হয়েছে 'সোয়ারৎসচাইল্ড রেডিয়াস' লাভ করার পর সমস্ত নক্ষত্রই আমাদের চোখে অদৃশ্য হয়ে যায়। অতএব তখন তাদের বস্তুসমষ্টির মধ্যে কি ধরনের বিবর্তন ঘটছে তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের পর পরিণত বিজ্ঞানীরা কি বলছেন শুনুন। এঁদের মতে, ঐ ধরনের সংকোচনশীল নক্ষত্র জগতে 'সময়' পেছন দিকে ছুটে চলেছে। আর সেই সঙ্গে সেখানকার বস্তুকণারা আলোর চেয়েও দ্রুত গতি নিয়ে গমন করার ক্ষমতা পেয়ে গেছে। কখনও কখনও সংকোচনশীল কোয়াজারের দেহ থেকে কিছুটা অংশ ছিটকে বাইরে চলে যাওয়াও অসম্ভব নয়। এই বিচ্ছিন্ন অংশ বাইরে বেরিয়ে এসে ব্রহ্মাণ্ড জগতের মাঝে মাঝে ধূলোর মেঘ সৃষ্টি করে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এ ধরনের মেঘ ইতিমধ্যে লক্ষ্যও করেছেন।

কয়েকটি মূল্যবান পর্যবেক্ষণ চালিয়ে ডঃ লিনডেন-বেল-এর ধারনা হয়েছে, অনেক ব্রহ্মাণ্ড জগতের কেন্দ্রস্থলেই কোয়াজারদের খোঁজ পাওয়া যাবে। তাদের কেউ কেউ বয়সে এখনও নবীন। তারা অবিরাম প্রচণ্ড শক্তিতে পুড়ে চলেছে। আবার কেউ হয়ত দীর্ঘ চিতা দহনের পর হিম হয়ে গেছে। সম্প্রতি জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আর 'সংকোচনশীল নক্ষত্রের' উপর বড় বেশী নিবদ্ধ। উদ্দেশ্য, তাদের জটিল রহস্যের মধ্যে হয়ত তাঁরা একদিন আর এক ধরনের নক্ষত্রের গুপ্ত রহস্যের কথা উদ্ঘাটন করতে পারবেন। তারা **'পালসার'**। বিচিত্র এই নক্ষত্রেরা একটা নির্দিষ্ট বিরতির ফাঁকে ফাঁকে প্রচণ্ড পরিমাণ বেতার রশ্মি বিকিরিত করে থাকে। মনে হয় সুদূর ব্রহ্মাণ্ড জগৎ থেকে এইমাত্র একটি সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ সময় জুড়ে কে যেন পৃথিবীর দিকে বেতার সংকেত ছুঁড়ে পাঠাল। তারপর প্রায় এক সেকেণ্ডের মত বিরতি। তারপর আবার সেই বেতার সংকেত; আবার বিরতি। পালসারের আবিষ্কার অতি সাম্প্রতিক ঘটনা। তাদের থেকে ভেসে আসা অমন সুনির্দিষ্ট এবং নিয়মমাফিক বেতার তরঙ্গ অনেকের মনেই একদিন দারুন বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল। তাঁদের জিজ্ঞাসা ছিল বুঝি ব্রহ্মাণ্ড জগতের কোন উন্নততর প্রাণীরা কি ঐ সংকেতের সাহায্যে পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে চাইছে? জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণা 'পালসার' নক্ষত্রেরা এখন দারুন সংকোচনশীল অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলেছে। অল্পদিনের মধ্যেই তারা হয়ত 'সোয়ারৎসচাইল্ড ব্যাসার্ধ' পেয়ে যাবে। এখন যেটুকু বা বেতার-রশ্মি তাদের মাধ্যাকর্ষণ বল ভেদ করে বিকিরিত হচ্ছে, তখন তা হয়ত আর হবে না। সম্পূর্ণভাবে অদৃশ্য হয়ে গিয়ে আমাদের দৃষ্টিপথ থেকে তখন পালসারের তারা হারিয়ে যাবে। আর হারিয়ে যাওয়ার আগে যদি কিছু সুযোগ মেলে সেই অবসরে বিশ্বরহস্যের অস্পষ্ট পাতার কিছুটা অংশের পাঠোদ্ধারও হয়ত আমরা করে ফেলতে পারব।

তেজস্ক্রিয়-বীক্ষণে ভারত

সম্প্রতি বোম্বাই-এর সান্তাক্রুজ বিমান বন্দরে এয়ার ইণ্ডিয়ার একটি বোয়িং-৭০৭ বিমানের জেট ইঞ্জিন পরীক্ষার জন্যে বিশেষ

এক ধরনের ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়েছিল। বিশেষজ্ঞরা যেমন রঞ্জন-রশ্মির সাহায্যে ছবি তুলে প্রাণী দেহের খুঁটিনাটি অংশ পরীক্ষা করে থাকেন, কতকটা অনুরূপ পদ্ধতিতেই প্রযুক্তিবিদরা গামা রশ্মির সাহায্যে ছবি তুলে জেট ইঞ্জিনের খুঁটিনাটি অংশগুলি ঠিক আছে কিনা অথবা ঠিকমত তারা কাজ করছে কিনা পরীক্ষা করে নেন। গামা রশ্মির উৎস হিসেবে এখানে কাজে লাগান হয়েছিল তেজস্ক্রিয় ইরিডিয়াম-১৯২।

এই পদ্ধতিতে যে বস্তুটিকে পরীক্ষা করার কথা তার উপর অত্যন্ত ক্ষমতা সম্পন্ন গামা রশ্মি নিক্ষেপ করা হয়ে থাকে। যে সমস্ত অস্বচ্ছ পদার্থ সাধারণ আলোর কাছে বাধা স্বরূপ, তাদের অনেকেই গামা-রশ্মির কাছে দুর্ভেদ্য নয়। গামা রশ্মি তাদের ভেদ করে যায় এবং নির্দিষ্ট কোন জায়গায় রাখা বিশেষ ধরনের ফিলম-এর উপর পড়ে রঞ্জন-রশ্মি ছবির মতই ছবি সৃষ্টি করে। তখন ঐ ছবির মধ্যে ধরা পড়ে পরীক্ষাধীন বস্তুর সমস্ত রকমের খুঁটিনাটি অংশ। তার ভেতর কোথাও কোন চিড় পড়েছে কিনা, সূক্ষ্ম কোন ফুটো অথবা ওয়েল্ডিং-এর মধ্যে ত্রুটি যদি কিছু থাকে সমস্তই ঐ ছবির মধ্যে ফুটে ওঠে। এর ফলে পরীক্ষাধীন বস্তুটি ত্রুটিপূর্ণ এবং সেক্ষেত্রে কুশলীরা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। অত্যন্ত আধুনিক এই পদ্ধতির সাহায্যে বিজ্ঞানীরা এমন বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি, যেমন ইঞ্জিন, রেল বা মোটর ইঞ্জিন থেকে শুরু করে ধাতু, রাসায়নিক, সার, তেল এবং গ্যাস ও পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের জটিল যন্ত্রপাতির গুণাগুণ নিখুঁত পরীক্ষা করে থাকেন। আর এই পরীক্ষার কাজ শুধু যে ঐ সমস্ত যন্ত্রপাতি তৈরি করার সময়েই করা হয়ে থাকে তা নয়, যন্ত্রপাতি চালু করার পর মাঝে মাঝে ঐ একই পদ্ধতিতে এদের দেখে নিতে হয় এদের মধ্যে একটুকু ফাটল বা ওয়েল্ডিং-এর দিক দিয়ে গোলমাল আছে কিনা, যা সময়মত ধরা না পড়লে আর্থিক ক্ষতি এবং দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে।

বোয়িং জেট ইঞ্জিনের কথাই ধরা যাক। এই ইঞ্জিনগুলি নির্ভুল কাজ করছে কিনা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তার হিসেব রাখা হয়ে থাকে। ওড়ার ব্যাপারে একটুকু ত্রুটি ধরা পড়লেই তাদের সমস্ত অংশ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হয়। ধরা না পড়লেও প্রতি দু হাজার ঘণ্টা ওড়া শেষ করার পর একবার করে পরীক্ষা করে নেওয়ার রীতি আছে। সেক্ষেত্রে খুব বেশী নজর রাখা দরকার 'টারবাইন ভ্যানগুলির' উপর। এ ব্যাপারে অতি-শক্তিসম্পন্ন শব্দ বা রঞ্জন-রশ্মি ব্যবহার করে কোন লাভই হয় না। একমাত্র পথ আইসোটোপ রেডিওগ্রাফি বা তেজস্ক্রিয়-

জেট ইঞ্জিনের টারবাইনের তেজস্ক্রিয়-বীক্ষণ চিত্র। এই ছবিটিতে টারবাইনের কোন ত্রুটি ধরা পড়ে নি
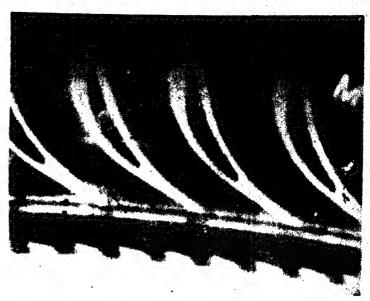
বীক্ষণ ব্যবস্থা। সম্প্রতি সান্তা ক্রুজ বিমান বন্দরে জেট ইঞ্জিন পরীক্ষা করার জন্যে যে তেজস্ক্রিয়-বীক্ষণ ক্যামেরা কাজে লাগান হয়েছিল সেটির নির্মাতা ট্রম্বের ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র। ক্যামেরাটির যাবতীয় অংশও তৈরি করেছেন ঐ গবেষণা কেন্দ্রের কুশলীরা। এর জন্য চার মিলিমিটার লম্বা এবং দুই মিলিমিটার ব্যাসের একটি আধারের মধ্যে রেখে দেওয়া হয়েছিল ইরিডিয়াম-১৯২। ইরিডিয়াম-১৯২ থেকে নির্গত গামা রশ্মি টারবাইন-ভ্যানের মধ্যে দিয়ে গমন করে ক্যামেরার মধ্যে রাখা ফিলম-এ ছবি তোলে। পরে ফিলমটি ডেভেলপ করে নেওয়া হয়। ভারতে বোয়িং-৭০৭ বিমান বাহিনীর সম্প্রসারণের ফলে এই ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে অতিকায় বোয়িং-৭৪৭-এর ক্ষেত্রে এর চাহিদা আরও বাড়বে। আর এখন থেকে এ কাজটি নিজেদের তৈরি ক্যামেরার সাহায্যে ভারতেই সেরে নেওয়া সম্ভব হবে। এতে করে সময়ও যেমন বাঁচবে সেই সঙ্গে বেশ কিছু পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা খরচের হাত থেকেও আমরা রেহাই পাব।

ফসল উৎপাদনে সূর্যরশ্মির অভূতপূর্ব প্রয়োগ।

উপযুক্ত পরিমাণ সূর্যের আলো না পেলে গাছপালা ভালভাবে বেড়ে উঠতে পারে না একথা সকলেরই জানা। গাছের পাতায় বা অন্যত্র যে সবুজ কণিকা থাকে, যার নাম ক্লোরোপ্লাসটিডস তারাই মুখ্যত উদ্ভিদ দেহে সৌরশক্তিকে কাজে লাগাতে সাহায্য করে। এ কাজে প্রধানত দৃশ্যমান আলোক ব্যবহৃত হলেও সম্প্রতি একদল সোভিয়েত বিজ্ঞানী উত্তর মেরু অঞ্চলে গবেষণা চালিয়ে লক্ষ্য করেছেন, সেখানকার কিছু কিছু গাছপালা সূর্যের প্রায় অনালোকিত রশ্মি বা যেমন ইনফ্রারেড রশ্মি থেকেও নিজেদের খাদ্য উৎপাদন করার মত শক্তি সংগ্রহ করে থাকে। তবে যেভাবে এই রশ্মিটিকে এরা কাজে লাগায় হয়ত তা সাধারণ আলোক-সংশ্লেষণ বা ফটো-সিনথেসিস থেকে কিছুটা ভিন্নতর।

কিন্তু তার চাইতেও চমকপ্রদ তথ্য পরিবেশন করেছেন আরও কয়েকজন সোভিয়েত বিজ্ঞানী। এ'রা লক্ষ্য করেছেন, আয়না বা অনুরূপ কোন প্রতিফলক থেকে সূর্য রশ্মি কেন্দ্রীভূত করে যদি গাছপালার উপর নিক্ষেপ করা যায় তাহলে তাদের অনেক কম সময়ে বাড়িয়ে তোলা সম্ভব। সেই সঙ্গে তাদের ফসল উৎপাদনের ক্ষমতাও। তবে হ্যাঁ, এই অতিরিক্ত রশ্মির পরিমাণ এমন একটি সীমার মধ্যে বেঁধে রাখতে হবে যাতে করে গাছের জৈবিক উপাদান না নষ্ট হয়ে যায়। আর সেই সঙ্গে গাছের উপর প্রতিফলিত রশ্মির প্রয়োগ এক নাগাড়ে না করে কিছুক্ষণ বিরতি রেখে করা দরকার।

বিভিন্ন আবহাওয়ায় বীজের উপর অতিরিক্ত সূর্যরশ্মি নিক্ষেপ করে এ'রা দেখেছেন, টমেটো এবং শশার উৎপাদন শতকরা প্রায় কুড়ি ভাগ বৃদ্ধি করা সম্ভব। ব্যাপারটা খারাপ আর কি হোল? টমেটোর

ক্ষেত্রে এতে করে প্রতি হেকটারে একশ সেণ্টানারের মত উৎপাদন গিয়ে দাঁড়াবে। আর শশার ক্ষেত্রে পরিমাণটি হবে হেকটার প্রতি পঞ্চাশ থেকে আশি সেণ্টনার?

দানা জাতীয় খাদ্যের বেলায় নতুন এই পদ্ধতিটি কিন্তু আরও উৎসাহ ব্যঞ্জক। সূর্যরশ্মির এই নতুন প্রয়োগ ব্যবস্থায় ধান, গম প্রভৃতি গাছ অনেক কম সময়ে স্বাভাবিকের চেয়ে আকারে অনেক বৃদ্ধি পায়, সেই সঙ্গে তাদের ফসল উৎপাদনের ক্ষমতাও। আরও চমকপ্রদ তথ্য হল, এর ফলে তাদের দানার মধ্যে প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের পরিমাণও নাকি অনেক বেড়ে যায়। এ'দের বক্তব্য, ভবিষ্যতে সূর্যরশ্মিকে নিয়ন্ত্রিত করে উৎপাদিত শস্যের মধ্যে প্রোটিনের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। একই উপায়ে চিনি, স্টার্চ, ভিটামিন, তেল এবং বিভিন্ন ধরনের পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রীও যাতে খাদ্যকণার মধ্যে আরও বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হতে পারে তার জন্যেও এ'রা পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। বুভুক্ষু পৃথিবীর কাছে এটি নিঃসন্দেহে একটি সুসংবাদ।

সমরজিৎ কর

শামশিদ্দ জেলে এবং সমুদ্র

বঙ্গোপসাগর—নীল জল আর নীল আকাশ—সীমাহীন মহা বিস্ময়ে একাকার।

সমুদ্রের কিনার!

ভয়ংকর পরিবেশ। পেটের দায়ে বাঁচার লড়াইয়ে মানুষ হাড়ের মজ্জা গলিয়ে মেদ মাংসের স্বেদ ঝরিয়ে রক্তগর্ভ সাগরের বুকে জাল পেতে যেসব রুপোলি সোনালি মাছ ধরে এনে তীরের বালি-রাশির উপরে ঢেলে রেখেছে সূর্যতাপে শুকনো করার জন্যে, সেখানে সামুদ্রিক অথবা নিশাচর অরণ্যচারী প্রাণীরাও আসে পেটের দায়ে—প্রাণের লড়াইয়ে। ভয়ংকরতার এ পরিবেশ অনেকটা মানুষেরই তৈরি এখানে। তাই পা ফেলতে হলে চার চোখ মেলে তাকাতে হয়। নইলে পদে পদে বিপদ। মরণ ওৎ পেতে আছে।

সমুদ্র ঢেউয়ের পাহাড় ছুঁড়ছে শত শত, প্রতি মুহূর্তে, লোফালুফি করছে, ভেঙে ছিটিয়ে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। ফেনা ওগরাচ্ছে গর্জমান ভয়ংকর সমুদ্র। মহাভীমকান্তি। তবু সামান্য মেদমাংসের পিণ্ড ক্ষুদ্র মানুষ সেই ভয়ংকরকে দুঃসাহসে জয় করে নোঙর করেছে তীরে। বাতাসে প্রচণ্ড ঝড়ের বেগ, মেঘের চিক্কুর, বজ্রপাত, অন্ধকার সাগরজলে বাড়বানলের বিস্ময়কর আগুন-খেলা—তবু কম্বল কাঁথা-মুড়ি দিয়ে ঘুমোতে হয়—হাড় কাঁপতে থাকে কনকনে ঠাণ্ডায়—বুকের ভেতরে গুরগুর করে প্রাণবস্তুটা কাঁপতে থাকে কবুতরের মতন। কয়লা ধরিয়ে আঁচ জ্বালিয়ে কাঁচা জ্বালানী পোড়াবার মতন করে হাত পা সেঁকাতে হয়। খেনো চোলাই চালতে হয় গলায়। অকাল বর্ষণ থেমে গেলেও মাঝি শামশিদ্দ বিড়বিড় করে:

'মাথা খারাপ শালা আসমানটার! কি দরকার ছ্যালো এখন পৌষ মাসে পানি ঢালবার। মাছগুলো সব পচবে। আর ঐ পচা গন্ধে রাজ্যের জীবজন্তুর ঝাঁকপাখি জুটবে।'

ফ্লাশ লাইট ফেলে তীরভূমিটা দেখে নেয় শামশিদ্দ। বড় বড় কটা কচ্ছপ উঠেছে ডাঙায়। শিয়াল, খাঁকশিয়াল, ভোঁদড়, ভাম, উদবিড়াল, গেছোবাঁদর, সমুদ্রে-কাঁকড়া, সাগরবিছা জুটেছে ওখানে। কুমীর এগিয়ে চলেছে পায়ে পায়ে হেঁটে হামাগুড়ি দিয়ে—সবাই এখন আত্মীয়। আহার টেনে নিয়ে চলেছে যে যার ডেরায়। বাঁশের চেরা ফটকায় বার কয়েক শব্দ করতে কিছু জীব জন্তু ছুটে পালাতে চেষ্টা করলে। কয়েকটা কুমীর শুয়ে পড়ে মাছ চিবোচ্ছে—নড়বার নাম নেই। শামশিদ্দ বলে, খা শালারা, কত

আর খাবি, আল্লার মাল, তোরাও আল্লার জীব, প্যাট ভরে খা।'

শামশিদ্দর জোয়ান বেটা গহর আলি বলে, 'যাব, শালারগুলোকে লাঠি দিয়ে সুটিয়ে 'ঠেণ্ডা' করে দিয়ে এসবো বাজী?

শামশিদ্দ বলে, 'যা-না, সিদনে তবে কোজি তিনেক একটা সমুদ্দুরে কাঁকড়া দাড়া বাগিয়ে তেড়ে করতে বাজী গো বাজী গো বলে চিল্লাতে চিল্লাতে পরাণ নিয়ে পেলিয়ে এলি কেন? গুলেছাঁচের পানা সাগর-বিছের হুলে পা তুলে দিয়ে তার কামড় খেয়ে তিন দিন পড়ে রইলি জ্বরে হয়ে—তুই জানিস কি—তোর মতন বোকার মুণ্ডু কচ্ছপেও মুচড়ে খাবে—খালি গতরে বল থাকলেই তো হবে না—মাথায় বুদ্ধি থাকাও দরকার।'

গহর কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে এবার। কুয়াশায় চারদিক ঢেকে আসছে। বিরাট আকাশ জোড়া তারা ঝিলমিল করতে থাকে মেঘ কেটে গেছে। পাশের নৌকোর লোকগুলোও জেগে গেছে। আলোতে জোর দিয়েছে—কথা বলছে। গহর বল, মানুষকে সব শালাই ভয় করে। সাগর-বিছে, কাঁকড়া আর সাপকে শুধু আমি ডরাই। বাঘ, কুমীর, কচ্ছপকে আমি ডরাই না। বাঘ যদি ধরে শালাকে ঠ্যাং মুচড়ে, ল্যাজ ধরে আছড়ে মেরে ফেলব। মেরে শালার মাথা কাটিয়ে ঘি দিলেই যেথা যেথা কামড়াবে-আঁচড়াবে ভাল হয়ে যাবে।'

পাঁচু ঘোড়ুই গলা ঘড়ঘড় করে শুয়ে শুয়েই। সে বলে, কেঁদো বাঘ, নেড়ো বাঘ হলে নাহলে মদ্দামী দেখাতে পারিস, সোঁদর বনের বাঘ হলে? যে তোর গলার নলী ছিঁড়ে দেবে, এক থাবা মেরে নাড়ী ভুঁড়ি বার করে দেবে? এক ঝটকায় পিঠে তুলে নিয়ে চলে যাবে?'

গহর আর কিছু বলে না। নৌকোর খোলভরা সেলে মাছ, আড়টাংরা, সিলং বোয়াল, ট্যাং, কোটা-ঘাগর, শিমুলে, ইলিশ পমফ্রেট, ভেকুটি, ভাঙ্গা তারুই, চাঁদা, চিংড়ি

—বহু রকমের মাছের আঁসটে গন্ধে গা বমি বমি করে। ওয়াক করে হড়হড় শব্দে অনেকখানি পিত্তি তুলে ফেলে গহর।

সবাই শুয়ে পড়ে আবার। পাঁচু বলে, আমার ঠাকুরদা বলত, জানিস পাঁচু, সাগরে যেতে গেলে সাগরদ্বীপ থেকে তিন ভাঁটা নিচে যেতে হয়, তীরে মাছ ঢেলে রাখলে রাত্তিরে সেই মাছ খাবার জন্যে বাঘ কুমীর তো আসেই, তাছাড়া অশরীরী অপদেবতা শাঁকচুন্নী ভূতপ্রেতরাও আসে! শাঁকচুন্নী হল মেয়েমানুষ! এসে নাকি নৌকোর কাছে দাঁড়িয়ে খনাখনা গলায় বলবে, এ্যাঁই পাঁচু, মাঁছ দেঁ! মাছ নাঁ দিঁলে ঘাড় মটকে দোব!'

পাঁচুর কাছে সরে গেলে পাছে সে মনে করে ভীতু—তাই গহর কাঠ হয়ে পড়ে থাকে। শীতের ঠেলায় কাঁপতে কাঁপতে নন্দ মাঝি ভাঁওা-কীর্তন জুড়েছে চিৎকার করে।

শামশিদ্দ বলে, 'ভূতপেত্নির কথা মিছে কথা। আমার কক্ষনো চোখে পড়েনি। তবে মানুষ অনেক কিছু বানিয়ে বলে, জ্ঞানআলি বলে একটা লোক ছ্যালো মোর নৌকোয়—সে ভেদবমি হয়ে মরে গেল সাগরের নোনাপানির হাওয়া সইতে না পেরে। তার সর্দি রক্ত আমেশা হামেশা লেগেই থাকত। সে অমনি আজান-গপ্প বানাত। বলত, জানো চাচা, সাগরের পানিতে একবার আমি পীর বদর গাজিকে রুপোর 'আসা-বাড়ি' হাতে নিয়ে সোনার খড়ম পায়ে দিয়ে হেঁটে যেতে দেখেছি। পীরের গপ্পটা না হয় সত্যি কিন্তুক আর একবার বললে, রুপোর মতন চকচকে, বোয়াল মাছের মতন গা—একটা অপরূপ সুন্দরী মেয়েমানুষ একেবারে উলঙ্গ—পানির ওপরে উঠে নাচতে লাগল পিদিমের শিখার মতন—তারপর টুব করে ডুবে গেল!

পাঁচু ঘোড়ুই হিকিয়ে হিকিয়ে হাসতে লাগল। তারপর বললে, তা দাদা, এই সাগরে এসে সব কষ্ট সওয়া যায়, ঐ মেয়েমানুষ না পাওয়া, বা তার মুখও না দেখতে পাওয়ার কষ্টটা সওয়া যায় নে!'

আলিমদ্দিও জেগে ছিল। সে বললে, মোর বউটা তো শালা অগ্রানের ধানকা ছাড়তেছে টানা নিশ্বেসের! খালি দোরের বাজুর মাথায় মাটির 'কাঁতে' (দেওয়ালে) ঝুমকো ফুলের তারার মতন চুনের ফোঁটা দিচ্ছে সারি দিয়ে রোজ সকালে একটা করে। আর রোজ গুনে গুনে দেখতেছে গণ্ডা গণ্ডা করে! শালীর চেহারাটা যা না পাঁচুকাকা—শালা চ্যাম্পিয়ান। ভুলতে পারিনি। খালি স্বপন দেখি আর মেজাজ খারাপ করে।'

হারান চিৎকার করে নৌকোর কাঠে চাপড় মারে—'শালা!'

শিয়াল ডাকছে দূরে—তীরভূমির পিছনের শর খড়ি হোগলা হেতাল গেঁয়ো হরকোচ বনের মধ্যে। ফণী মনসার ঝোপটা ছবির মতন দেখা যায়।

বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বালুরাশি—ধূধূ করছে!

ভোর হয়ে গেল।

সবাই তখন ঘুমোচ্ছে। দিনকে মানুষ ভয় করে না। কিন্তু শামন্দির চোখে ঘুম নেই। বল্লম হাতে নিয়ে সে নেমে পড়েছে কুয়াশা ঢাকা আলো আঁধারির মধ্যে।

সূর্য উঠলে অরণ্যের ওপারের আকাশ সাদা করে, পাখিরা উড়ে চলেছে।

শামন্দি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। আর এক পা ফেললেই সাগর বিছের তীক্ষ্ণ [illegible]

সে। হুলটা খাড়া করে বাগিয়ে বসে আছে জল থেকে উঠে এসে ডাঙায় কোনো শিকারের সন্ধানে। ছ' ইঞ্চি লম্বা ধারালো ঐ সূঁচটা পায়ের তলায় গেঁথে গেলে যন্ত্রণায় জীবন বার হয়ে যাবে। তাছাড়া হাফ ডায়াল কাছিমের পিঠের মত শক্ত আবরণীর নিচে থেকে কযাতে দাড়া বার [illegible] বিছেটা!

বল্লম দিয়ে উল্টে দিলে বিছেটা হুল নেড়ে মাটিতে বিঁধিয়ে দিয়ে উল্টে পড়বার চেষ্টা করতে লাগল। বল্লম পিঠে মারলেও বেঁধে না। অথচ তার নিচে নরম প্রকৃতির বিছের মত একটি প্রাণী বাস করছে! জলের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে থেকে শিকার ধরে গেঁথে খায় লাঙ্গুল দিয়ে। প্রকৃতির কি বিচিত্র জীব সৃষ্টির খেয়াল!

বড় একটা পাথরের পাশ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ ফড়্ করে একটা লাল সমুদ্রে কাঁকড়া বেরিয়ে পড়ে ওদিক থেকে এদিকে আড়াল হল। লোকটা শুধু হাতে থাকলেই তাড়া করত। পাঁচু খোড়ুই হলে হাতে গামছা জড়িয়ে নির্ভয়ে ধরে ফেলত। একবার তার হাতে একটা কাঁকড়া এমন চিপ্টে ধরলে যে গামছা কেটে হাড়ে বসে গেল। তার ছোট সাঁড়াশির মত দাড়া। পাথরে ঠুকে কাঁকড়াটাকে মেরে ফেলেছে তবু দাড়া এমন মরণ-কামড়ে এঁটে গেছে যে ছাড়ানোই কঠিন।

খেলা জুড়ল শার্মাদ্দ। কাঁকড়াটার সামনে লাঠিটা এগিয়ে দিতেই সে দাড়া দিয়ে কড় কড় করে কামড়াতে লাগল। তারপর শক্ত জিনিস দেখে ছেড়ে দিয়ে ছুটতে লাগল। শার্মাদ্দ জোরে একটা খোঁচা মেরে তার দাড়া দুটো ভেঙে দিলে। সেখান থেকে খানিকটা এগিয়ে এসে দেখলে মাছগুলো ভিড়ে গেছে। দুর্গন্ধে শ্বাস টানা দায়। একটি বিরাট কচ্ছপ তখনো পড়ে রয়েছে, পেট ভরে আহার করে নিয়েও। কুৎসিত মুখটা বার করে আছে। বল্লম দিয়ে খোঁচা দিলে সে হাত পা মুখ চোখ লুকোল। ফোঁস ফোঁস করে গর্জন করতে লাগল। শার্মাদ্দ পিছন থেকে গিয়ে তার পিঠে উঠে দাঁড়াতে সে গড় গড় করে টেনে নিয়ে যেতে লাগল জলের দিকে। লাফ দিয়ে নেমে পড়ে এক খোঁচা মারতেই ছুটতে ছুটতে কচ্ছপটা বেলাভূমি পার হয়ে গিয়ে ঝপাং করে জলে পড়ে গেল।

বাঁশের উঁচু পাঁচিলে বিরাট ঘের দিয়ে তার মধ্যে মরা গরু, ছাগল শিয়াল কুকুর ফেলে দিলে কচ্ছপরা জোয়ারের সময় আসে—আর খাদ্যের লোভে ভাটা পড়ে গেলেও সরে না, আটকা পড়ে যায়—তখন কচ্ছপ শিকারীরা এসে তাদের ধরে নিয়ে যায়। তিয়োররা মাংস বিক্রি করে নগরে গঞ্জের হাটে বাজারে তাদের কাছ থেকে পাইকারী দরে কিনে নিয়ে গিয়ে। চণ্ডাল, ধাঙড়, মুচিরা এ কাজ করে। তাদের কীর্তিকলাপ দেখেছে শার্মাদ্দ। সাগর বিছেও ধরে নিয়ে যায় কেউ কেউ—বিক্রি করে শহরে—বাতের তেল হয় নাকি ঐ বিছে থেকে!

শার্মাদ্দ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুঁটকি মাছ দেখছিল। বালি-জড়ানো ছড়ানো মাছগুলো পা দিয়ে বল্লমের লাঠি দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছিল। জীবজন্তুতে মাছ খেয়েছে আবার তারই উপরে পায়খানা করেছে। এক এক নৌকোর মাছ এক একদিকে গাদা আছে। অন্য নৌকোর লোকজন এল।

পরেশ হাজরা কাছে এসে বললে, ইস! তোমার যে বিস্তর মাছ হে স্যাঙাৎ! ভেক্‌টি, ইলিশ, বড়-চেলাও শুকোতে দিয়েছ যে দেখছি! আমি শুধু 'থর' জালে ধরা রূপোপাটি, তেল টাপ্‌টি, চিংড়ি, ক্যাসা, বাচ, টাংরা, পাবদা, ফলুই ...রুই, চাঁদা, বোম্‌লা এইসব শুকোটি করতে দিইচি।'

সাগরের বাতাসে শার্মাদ্দর লম্বা পাৎলা দাড়ির গোছা উড়ে যাবার জন্যে

: সকলে হৈ মেরে পীরের নাম নিয়ে সমুদ্রে নেমে যায়...

আছাড়-কাছাড় খায়। দু-একটা কথা বলাবলি করে প্রাতঃকৃত্য সেরে এসে নৌকোয় উঠে আঁচের ধারে বসে হাত পা সেঁকে গরম করে, চা রুটি খায়। এক ঘটি করে নুন দেওয়া লাল চা চাই সকলের। বেলা নটার সময় আসে স্টীম লঞ্চ। তারা মাছ মেপে নেয়। শার্মাদ্দ মাঝির সাতটা জেলে মাছ পড়েছে—দশ কেজি থেকে ষোল কেজি এক একটা মাছের ওজন। মোট ছিয়ানব্বই কেজি। ছিয়ানব্বই টাকা। আর লোটা ঘাগর চল্লিশ কেজি। কুড়ি টাকা। খোকা ইলিশ দশ কেজি, কুড়ি টাকা। মোট দাম একশো ছত্রিশ টাকা। জালের দু-বখরা, নৌকোর দু-বখরা, মাঝির এক বখরা, দাঁড়ি চারজনের চার বখরা। তাহলে মোট ন-বখরা। পনেরো টাকা এগার পয়সা করে বখরা পিছু। সারাদিন সমুদ্রের সঙ্গে লড়াই করে পনেরো টাকা মাত্র পাওয়া গেল আজ। তবে শার্মাদ্দর একার জাল-নৌকো-মাঝি আর ছেলে গহর দাঁড়ির বখরা নিয়ে ছ-বখরা। নব্বই টাকার মতন। অন্যান্য দিন একশো দেড়শো টাকা পর্যন্তও হয়। তবু সে আক্ষেপ করে: 'শালারা 'লঞ্চো' করে লিয়ে যেয়ে ফ্রেজারগঞ্জে, কাকদ্বীপে 'ডায়মণ্ডহারবড়ায় তুলবে, হিমঘরে রাখবে, এক টাকায় কেনা মাল দু-টাকায় ছাড়বে। তাদের কাছ থেকে পাইকের দেশ গাঁয়ের হাটে বরফ দিয়ে লিয়ে যেয়ে সাড়ে তিন টাকা চার টাকা কেজি বিক্রি করবে। আমরা সাগর ছেঁচে মুক্তো কুড়োচ্ছি, বাইরের লোক মজা মাঁরতেছে।'

সবার নৌকো থেকে মাল নিয়ে লঞ্চ চলে গেলে রান্না খাওয়া করে নেয় মাল্লা-মাঝিরা। কারো কিছুর অভাব পড়লে লঞ্চের খালাসী কুলী কামিনদের বলে দিতে হয়।

'হিমঘরের মালিক কে?' শুধোলে শার্মাদ্দ উত্তর দেয়: লোকে বলে সরকার। আসলে কিন্তু কোনো মাড়োয়ার বাবু। সরকার কি এসব চালাতে পারে? চোর আর ঘুষখোরের হাতে সরকার আমাদের নাস্তানাবুদ। যেটা ভাল চলে সেটা বেসরকারী ব্যবসা-বাণিজ্য। আমাদের শির-দাঁড়া ঠিক নেই, খালি বলে থালা ঘটি কল-কারখানা জমিজিরেত সব সরকারে নিয়ে নাও! চালাবে কারা? এদেশের সৎ ভদ্দর লোক মানুষেরা? সরকারী সব ব্যবস্থা তারা কেমন চালাচ্ছে? আরে বাবা, আগে খাঁটি মানুষ হও, তারপর রাজ্যের মতন কঠিন ব্যাপারের ভার নিও। কাঁচা মাটির পাত্তরে মদ ঢেলে লাভ নেই। শার্মাদ্দ মাঝি মুর্খ হতে পারে কিন্তু অকম্মাদের সে ঠিক চিনতে পারে! শালা, আমার যদি একখানা লঞ্চো থাকত, মাছ ধরে পাহাড় করে ফেলতুম। এই যে একশোজন জেলে সাগরের সঙ্গে লড়াই কচ্ছে, গায়ের জামা নেই, কাপড় নেই, অন্ন নেই, হিমঘর নেই বলে মাল রাখতে পারিনি—এসব কে দেখে? মাইনে করা সরকারী লোক কি এই তুফান ভরা সাগরে এই কাঠের নৌকো নিয়ে লড়াই করে সারা দেশের মানুষের মুখে রোজকার মাছ ধরে এনে যোগান দেবে? তারা তীরের চারপাশে ঘুরে বেড়িয়ে এসে রিপোর্ট দেবে সাগরে এ বছর মাছ নেই। ব্যারেক তারা তাই করে নইলে আমাদের মতন গরিবদের ভাতেভাত যেত!'

শার্মাদ্দ কোনো দলের লোক নয়। রাজনীতি বোঝে না। সে কাজ চায়। ছেলেটা তার ষাঁড়ের মতন—মাথায় কিছু নেই—হাজার কথা বুঝায় কিন্তু কিছুই তেমন বোঝে বলে শার্মাদ্দর মনে হয় না। মুখখিস্তি গালাগাল করলেও সে নীরবে ঘাড় চুলকোয়। ছাঁচিতেল চাপড়ায় পাথর কোঁদা আবলুস কালো চেহারায়।

'দরিয়ার পাঁচ পীর বদর বদর!'

সকলে হৈ মেরে পীরের নাম নিয়ে সমুদ্রে নেমে যায় নৌকো নিয়ে। জোর তুফান চলেছে। নদীতে তিন ভাটার টানে যতদূর যাওয়া যায় তত দূরে এসে সকলে মোটা মোটা দড়ির সেলে মাছ ধরা

জাল নামিয়ে দেয় পঞ্চাশ 'বেঙ' (দুই বাহু দুদিকে প্রসারিত করলে যতখানি হয় তাকে এক 'বেঙ' বলে) নিচে। উল্টো দিকে মুখে বাঁশ লাগিয়ে দিয়ে চোঙা মত বিশাল-চড়ু 'থর' জাল নামিয়ে দেয়। এলোপাথাড়ি কাজ করলে শামদ্দি তার ছেলে গহরকে গালাগালি করে। তার মা মাসি উদ্ধার করে। নৌকোর ঢেউয়ের তালে তাল রেখে ঢেউ কাটিয়ে ধাক্কা বাঁচাতে শিখতে হয়। হাল কষে শামদ্দি। প্রলয়ঙ্কর বারিধির রণোন্মাদ উচ্ছ্বাস। চিৎকার করলেও শোনা যায় না—ইসারায় কথা বলতে হয়।

মোটা তার বাঁধা জালের মুখপাতে চচ্চড় কড়কড় করে শব্দ ওঠে। নৌকোকে টেনে নিয়ে চলে সমুদ্রের মাঝের দিকে। আবার কোলের দিকে ঠেলে আনে। দূরে যতদূর দেখা যায় সমুদ্র আর আকাশ এক হয়ে গেছে। মোচার খোলার মত বিন্দু, বিন্দু নৌকোগুলো ভাসছে। পান-পায়রা আর গাঙচিল উড়ছে পাক খেয়ে খেয়ে।

ইরান শুধোয়, 'আচ্ছা শামদ্দি-দা, এই সাগরের কি কূল-কিনারা কেউ করতে পেরেছে?' শামদ্দি বলে, 'দরিয়ার পীর আর আল্লা ছাড়া আর কেউ হদ্দহদিস বলতে পারবে নে।' পাঁচু ঘোড়ুই একটু লেখাপড়া জানে। সে বলে, 'কূল-কিনারা আছে, পৃথিবীর বাইরে তো চলে যায়নি। এই বাংলার মাটি শেষ—তারপর জল আর জল—বঙ্গোপসাগর তারপর ভারত মহাসাগর—তারপর দক্ষিণ মহাসাগর তারপর কুমেরু অঞ্চল—ভূগোলে এইসব কথা বলে। কুমেরুতে এখন লোক যায়। সাগরের তলায় কি কি আছে বিজ্ঞান জানে।' শামদ্দি বলে, তোর মাথা! আচ্ছা, এই বলুক তো দেখি সুন্দরবনের কুল খানটা থেকেন জোয়ার ভাটা ওঠে? বলুক তো দেখি মায়ের পেটে কি ছেলে আছে? বলুক তো দেখি, কার কবে কোথায় কখন মরণ হবে? ওসব খোদা-আলি [illegible] দরিয়ার পীর বাবা [illegible] পীর আমার ঠাকুরদাদাকে খোয়াব [illegible] এই সাগরের ওপারে [illegible] শুধু অন্ধকার। [illegible]'

পাঁচু হেসে বলে, 'পীর দেবতার নামে যেসব কীর্তি-কাহিনী মানুষেই তৈরি করেছে। আজগুবি [illegible] লোক মানুষেরা ভালবাসে—যেমন শিশুরে ভালবাসে। মূর্খ মানুষেরা অনেকখানি সরল শিশু। কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা কখনো প্রমাণ না করে আজগুবি গল্প বলবে না।' শামদ্দি বলে, খোদা ছাড়া সম্পূর্ণ জ্ঞান কারো নেই, এই দুনিয়ার কাছে সবাই সরল শিশু। এই সাগর আকাশ আর মাটি সবই আমাদের কাছে আজগুবি গল্প—এদের মহাভারত—কেউ পড়ে শেষ করতে পারে না।'

আকাশের মধ্যে পার হয়ে যায় সূর্য।

জাল টেনে তুলবার সময় গহর, পাঁচু, ইরান, আলিমদ্দি যেন লড়াই করতে থাকে। এলো গা থেকে তাদের ঘাম গড়িয়ে পড়ে। গহর হাঁফাতে থাকলে শামদ্দি বলেঃ 'এই রকম করে টান—এই রকম করে!' সহসা ভীষণ বেগে টান ধরে জালে। মোটা কাছি তবু ছাড়ে না শামদ্দি। হাতে কাছি বসে গেল নৌকোর কাঠের সঙ্গে সেঁটে গিয়ে। তারপর হঠাৎ ঝাঁকানি খেলে নৌকোটা। [illegible] হাড় চামড়া উদ্‌ড়ে গিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। হাতভা গালে পড়ের রক্ত

চুষতে লাগল শামন্দি। তার দাড়ি বেয়ে বক্ত ঝরে পড়তে লাগল। তবু তার কী আনন্দ! বললে, 'পাঁচু, মাছ পড়েছে! শালা, বড় বড় সেঙ্গে মাছ, জাল ভরে গেছে, কী রকম করে চোঁচা টান মারতেছে দেখ! যাক, শালা ভাসিয়ে লিয়ে যাক এখন! কেরদানি মরুক। তল্লাক হোক বাছাধনরা। সিদিনের মতন হাঙর, কুমীর, শুশুক পড়ে জাল না ছেঁড়ে আবার। এক ঘটি পানি আন গহর। পিয়াসে ছাতি ফেটে গেল মোর।'

কিন্তু জালায় নাকি জল নেই। তা কেমন করে হবে? শামন্দি বলে, 'পানি তো কাল সন্ধ্যেয় দেখিচি কলসী দুই ছ্যালো। তাহলে জালা ফুটো হয়েছে ঘটির ঘা লেগে? তুই তো পানি তুলে ছেলি গহর। শালার পেটের মন কি কাজের দিকে আছে, ঘরের দিকে ছুটেছে। জোয়ান বউ ঘরে থাকে যার তাকে সাগরে যে আনে সে শালা, তার বাপ শালা! এখন কি 'পেচ্ছাব' করে খাব?'

বেলা তিনটে পর্যন্ত সকলে জাল তুলে ফেললে। সত্যিই শামন্দির আন্দাজ ঠিক। বড় বড় সেলে, আড়, লোটা বাগর মাছ পড়েছে তাদের জালে। একটা খোঁড়া ভেকটি পড়েছে মণ খানেক হবে। সেলে মাছ পড়েছে উনিশটা। পাঙশ পড়েছে কয়েকটা বাগাতেক গেছের। জল তোলার পরেই ওরা দাঁড় বেয়ে জোয়ারের টান ধরে তীরের দিকে চলে আসতে লাগল পঁচিশ-খানা নৌকো নিয়ে সকলেই। জ্যান্ত মাছ-গুলো জল সমেত নৌকোর খোলের মধ্যে ধড়াস ধড়াস শব্দ করে নৌকো কাঁপিয়ে আছাড় খাচ্ছে। শামন্দি গলায় মদ ঢালতে লাগল। তার ছেলে গহরও।

পরেশ মাঝির নেশা ধরেছে। সে নাচছে। কাপড় খুলে পড়ে যাচ্ছে। তাকে ধরে আছে দুজনে—পাছে সাগরের জলে পড়ে যায় ঝুপ করে। ভীষণ বেগে নৌকোগুলোকে টেনে আনছে জোয়ারের স্রোত মোহনার দিকে। পাল তুলে দিয়েছে সকলে।

সন্ধ্যা পর্যন্ত তীরে এসে ভিড়ল নৌকোগুলো। জাল থেকে মাছ ছাড়িয়ে কুঁচো মাছগুলো চরের উপরের বালিতে ঢেলে দিয়ে এল সকলে। নৌকোয় এসে গা-হাত ধুয়ে মুছে প্রথমে চা-রুটি খেলে সবাই। পাশের নৌকো থেকে জল ধার নিলে শামন্দি দু-কলসী।

রাত্রে মাছ ভাত আর তেঁতুল গোলা জল খেয়ে সকলে কাঁথা কম্বল মুড়ি দিলে। অঘোর অচৈন্য নিদ্রায় তারা হারিয়ে গেল।

টিম টিম করে আলো জ্বলছে প্রতিটি নৌকোয়। ছামাড় দরমা-হোগলা ঘেরা ছৌঙের মধ্যে সবাই ঘুমোচ্ছে। ঢেউ

: গিয়ে দেখব হয়তো মেয়েটা মরে গেছে। থাক তার চেয়ে বরং যেয়ে কাজ নেই

আছাড় খাচ্ছে ভাষাহীন বিষম আক্রোশে।

শামন্দির সহসা ঘুম ভেঙে গেল। তার মাথার কম্বলের উপরে কিসে যেন কড় কড় করে নখ ফুটিয়ে আঁচড়াচ্ছে না? বাঘ না কুমীর?

হঠাৎ সে পায়ের দিকের সমস্ত কাঁথা-কম্বল উল্টে এনে চেপে ধরতে গেল জিনিসটাকে। চেপে ধরেওছে সে। পাঁচু ককিয়ে উঠল।

শামন্দি বলে উঠল, 'ধেৎ তেরি শালা! তোর হাত? মুই মনে করি কুমীর, না হয় বাঘ?'

পাঁচু উঠে বসল। সে নাকি স্বপ্ন দেখছিল। তার বউ নাকি তার গলা জড়িয়ে ধরে বলছিল, তুমি সাগরে ছিলে, আমি গংগা সাগরের মেলায় গেছিনু—সেখেন থিকে কদ্দুর গা—দেখা করলে না কেন?'

'হা, বউ মনে করে আমাকে তুই জড়িয়ে ধরবি! বেটা গহরটার পাশে তো শোবার উপায় নেই। সে শুধু লতিমন লতিমন বলে আমাকে পাঁঝা করে ধরে। চল সব কাল বাড়ি চলে যাই। খোরাকীও পেরায় ফুরিয়ে গেছে। আর আমার বউ বছরের বুড়ো হাড় কাঁপতেছে।'

পাঁচু পাগলের মতন হঠাৎ শামন্দিকে জড়িয়ে ধরলে। আবেগে গদগদ হয়ে শুধোলে, 'সত্যিই শামন্দি-দা যাবে? কালই বাড়ি ফিরবে?'

'পাগল না মাথা খারাপ, মেয়ে মানুষের জন্য ঘরে ফিরে যাবি? এখন সবে মাছ পড়তে শুরু করেছে। যেদিন তিনটে মাছ পড়বে সিদিন চলে যাব।'

পাঁচু আবার শুয়ে পড়ল। ঢুস্ করে। মরার মতন।

ঘণ্টাখানেক পরে আবার ঘুম ভেঙে গেল শামন্দির। দেখলে পাঁচু কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। সেকি!

'কি হয়েছে তের পাঁচু?' আদর ভরা গলায় শুধোলে শামন্দি।

পাঁচু কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'ছেলে মেয়েদের জন্যে বড্ড মন কেমন করছে শামন্দি-দা।'

শামন্দি আর কিছু বললে না। আজ দীর্ঘ একুশ দিন। এই নির্মম নিষ্ঠুর ভয়ংকর পরিবেশ। অসহ্য কষ্ট। মানুষ তো দুর্বল হবেই। শামন্দিরও চোখে জল এল। একটা দৃশ্য তার মনে পড়ল। আসবার দিনে বাইরে এসে গহরের জন্যে অপেক্ষা করছিল। হঠাৎ জানালা দিয়ে চোখে পড়ল গহর আর তার বউ দুজন দুজনকে জড়াজড়ি করে কাঁদছে।

সহসা শামন্দি বললেঃ চুপ কর পাঁচু, কালই চলে যাব। ঢের হয়েছে, লোভ করে লাভ নেই। লোভে পাপ পাপে মৃত্যু। আত্মা হল ভগবান, সে যখন কাঁদছে, চল শালাকে মুক্তি দিই।'

পাঁচু বললে, 'আসবার সময় মা কালীর দিব্যি শামন্দি-দা, বড় মেয়েটার টায়ফয়েড জ্বর দেখে এসেছিলুম। ওষুধ পথ্যির পয়সা দিয়ে আসতে পারিনি। গিয়ে দেখব হয়তো মেয়েটা মরে গেছে। থাক, তার চেয়ে বরং যেয়ে কাজ নেই!'

শামন্দি আর কি বলবে ভেবে পেলে না। চুপচাপ বসে রইল পাথরের মতন।

সাগরের জলের পাহাড় ভেঙে পড়তে লাগল শুধু সারারাত তাদের নৌকোর গায়ে একটানা।

—আবদুল জব্বার
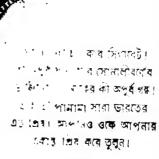
সম্প্রতি এদেশে ফেডারাল প্রতিনিধি সভার নির্বাচন হয়ে গেল। সাধারণত তিন বছর অন্তর এই নির্বাচন হয়ে থাকে। গত নির্বাচন হয়েছিল ১৯৬৬ সালে। ভোট দেওয়া এদেশে বাধ্যতামূলক—অধিকার সত্ত্বেও ভোট না দিলে জরিমানা হয়। এবারে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৬৬ লক্ষ, প্রতিযোগিতায় দাঁড়িয়েছিলেন ছোটবড় দশটি দল, তাছাড়া ৫৯ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী। এবারো নির্বাচনে জিতেছেন লিবারাল-কান্ট্রি পার্টি কোয়ালিশন—১৯৪৯ সাল থেকে এঁরাই প্রতিবার নির্বাচনে জিতে আসছেন—কিন্তু এবারে জেতার ব্যাপারে আগে থেকে কোনো নিশ্চয়তা ছিল না, এবং নির্বাচনের ফলাফল থেকে অনেকের অনুমান বিজয়ী কোয়ালিশন সরকার পুরো তিন বছর না টিঁকতেও পারে।

গতবারের নির্বাচনের সঙ্গে এবারের তুলনা করলে বোঝা যায় এই রক্ষণশীল দেশের রাজনীতিতেও উল্লেখ্য পরিবর্তন শুরু হয়েছে। এখানকার প্রধান রাজনৈতিক দল দুটি—এদের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ান লেবার পার্টি হচ্ছেন আমাদের কংগ্রেসের মতই পুরনো সংগঠন। তার তুলনায় লিবারাল পার্টি বয়সের হিসেবে অনেক অর্বাচীন। তাছাড়া আরো দুটি দল আছে। সংখ্যায় ছোট হলেও অস্ট্রেলিয়ান নির্বাচনী ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের ফলে যাঁদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি প্রচুর। এই দুটির মধ্যে কান্ট্রি পার্টি হচ্ছেন ফার্মারদের রাজনৈতিক সংগঠন; এবং যদিও শহরবাসীদের তুলনায় ফার্মারেরা সংখ্যায় অনেক লঘু, পার্লামেন্টে তাঁদের অনেকগুলি প্রতিনিধি পাঠাবার বন্দোবস্ত আছে। অন্য দলটির নাম ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি (সংক্ষেপে ডি এল পি)। ১৯৫৫ সালে অস্ট্রেলিয়ান লেবার পার্টিতে কমিউনিস্ট প্রাধান্যের বিরোধিতা করে ঐ দলের কিছু মাতব্বর সদস্য বেরিয়ে এসে ডি এল পি-র প্রতিষ্ঠা করেন। এই দলের শুধু ফেডারাল সেনেটে চারজন প্রতিনিধি আছে; কিন্তু এতাবৎ প্রতি নির্বাচনেই এই দল শতকরা সাত আট ভাগ ভোট পেয়ে এসেছেন। এদেশে প্রেফারেন-শিয়াল ভোটিং ব্যবস্থা প্রচলিত; এবং ১৯৫৫ সাল থেকে প্রতি নির্বাচনেই লিবারাল পার্টির জয় নির্ভর করেছে ডি এল পি ভোটারদের কাছ থেকে প্রেফারেন্স ভোট পাওয়ার ওপর।

১৯৬৬ সালের নির্বাচনে লিবারাল-কান্ট্রি পার্টি মিলিতভাবে ভোট পেয়েছিলেন শতকরা পঞ্চাশ ভাগ, লেবার পার্টি শতকরা চল্লিশ এবং ডি এল পি শতকরা সাত। শেষোক্তের প্রেফারেন্স ভোট পাওয়ার ফলে ফেডারাল প্রতিনিধি সভায় লিবারাল সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন ৫৯ জন, কান্ট্রি পার্টি ২১ জন—অর্থাৎ মোট ১২৪ জনের প্রতিনিধি সভায় লিবারাল কান্ট্রি পার্টির মিলিত প্রতিনিধি সংখ্যা ছিল ৮০। লেবার

পার্লামেণ্টারী লিবারাল পার্টির ডেপুটি নেতা এবং প্রধানমন্ত্রী গর্টনের প্রতিদ্বন্দ্বী উইলিয়ম ম্যাকম্যাহন।

পার্টির প্রতিনিধি ছিলেন ৪২ জন, তাছাড়া স্বতন্ত্র ২ জন। এবারকার নির্বাচনে লিবারাল পার্টির ভোট কমে গেছে শতকরা সাত ভাগ, কান্ট্রি পার্টির শতকরা এক ভাগ, ডি এল পি-র শতকরা প্রায় দেড় ভাগ। অপরপক্ষে লেবার পার্টির সমর্থনে ভোট বেড়েছে শতকরা ছ'ভাগেরও কিছু বেশী। এবারে মোট ১২৫ জনের প্রতিনিধি সভায় লিবারাল পার্টির সদস্য নির্বাচিত হয়েছে, ৪৬ জন; কান্ট্রি পার্টির ২০ জন; এবং লেবার পার্টির ৫৯ জন (অর্থাৎ গতবারের চাইতে ১৭ জন বেশী)। গতবারে লিবারাল কান্ট্রি পার্টি কোয়ালিশনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল ৩৬, এবারে তা কেটে দাঁড়িয়েছে মাত্র সাত।

এরকম নাটকীয়ভাবে লিবারাল পার্টির জনসমর্থন কমে যাওয়ার কারণ কি তা নিয়ে এদেশে এখন খুব বিচার বিশ্লেষণ চলেছে। অনেকের মতে এর জন্য পার্টির নেতা এবং প্রধানমন্ত্রী জন গর্টনই মুখ্যত দায়ী। দু'বছর আগে দুর্ঘটনায় হ্যারল্ড হোল্টের মৃত্যুর পর গর্টন যখন প্রধানমন্ত্রী হন তখন তাঁর সম্পর্কে সাধারণ মানুষের বিশেষ কোনো ধারণা ছিল না। কিন্তু তাঁর মন্ত্রিসভার গঠন নিয়ে তখনই বিরূপ সমালোচনা শুরু হয়েছিল—এমন কয়েকজনকে তিনি ক্যাবিনেটে স্থান দিয়েছিলেন রাজনীতি ক্ষেত্রে যাঁদের একমাত্র পরিচয় ছিল গর্টনের অনুগত পার্ষদ হিসেবে। ক্রমে গর্টনের চরিত্রের অন্য নানা দুর্বলতা প্রকট হতে শুরু করে। তিনি ভেবে চিন্তে অথবা বিভাগীয় বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে কাজ করেন না; নানা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন বা প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে থাকেন যার পিছনে যুক্তি কিম্বা তথ্যের সমর্থন যোগাতে তিনি অপারগ। বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের স্থায়ী প্রধান-কর্মচারীদের প্রতি তাঁর দুর্ব্যবহারের কথা বাজারে রটে; তাঁর অত্যধিক পানাসক্তি, স্ত্রীলোক বিষয়ে দুর্বলতা এবং স্বদেশে ও বিদেশে অসংযত খামখেয়ালি আচরণ সম্পর্কেও নানা গুজব শোনা যায়। আমাদের ভাষায় বেলেল্লা অথবা চোয়াড়ের অস্ট্রেলিয়ান ইংরেজিতে প্রতিশব্দ হচ্ছে ল্যারিকিন (larrikin)। গর্টন প্রধানমন্ত্রী হবার কয়েক মাস পরেই এখানকার অন্যতম প্রসিদ্ধ অধ্যাপক এনসেল সাহেব "দি নেশান" পত্রিকায় তাঁকে "ল্যারিকিন লীডার" আখ্যা দিয়ে কড়া সমালোচনা করেন।

গর্টনের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ জমে উঠেছিল ফেডারাল পার্লামেন্টে তার প্রথম নাটকীয় প্রকাশ ঘটে এই বছরের গোড়ায় মার্চ মাসে। লিবারাল পার্টির একজন অত্যন্ত স্বাধীন প্রকৃতির সদস্য এডোয়ার্ড সিনজন (Edward St. John) প্রথমে পার্লামেন্টে এবং পরে পার্লামেন্টের বাইরে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দায়িত্বহীনতার অভিযোগ আনেন। সিনজন আমার বিশেষ পরিচিত; চিন্তাশীল, প্রগতিপন্থী এবং দৃঢ়চেতা হিসেবে এদেশে তাঁর প্রভূত খ্যাতি; আন্তর্জাতিক জুরিস্ট কমিশনের অস্ট্রেলিয়ান শাখার তিনি সভাপতি। দায়িত্বহীনতার উদাহরণ হিসেবে প্রমাণাদি সহকারে তিনি যেসব ঘটনার উল্লেখ করেন তা নিয়ে এদেশে কয়েক মাস ধরে খুব আলোড়ন চলে। পরে তিনি এ সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ বই লেখেন; নাম : A Time To Speak;

প্রকাশক সান বুকস, মেলবোর্ন। লিবারাল পার্টির অধিকাংশ সদস্য কিন্তু নির্বাচনের কথা স্মরণ করে নেতৃত্ব থেকে গর্টনকে সরাতে রাজী হন না। ফলে সিনজিন পার্টির সদস্য পদ ত্যাগ করেন। যদিও তিনি এবারে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হতে পারেন নি; গর্টনের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তাঁর সোচ্চার আন্দোলন লিবারাল পার্টির জনসমর্থন লাঘব করায় অনেকখানি সাহায্য করেছে বলেই এদেশের রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা।

লিবারাল ভোট কমে যাওয়ার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে ফেডারাল সরকারের সঙ্গে স্টেট সরকারগুলির দ্রুতবর্ধমান বিরোধ। উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত এদেশে ইংরেজদের ছটি স্বতন্ত্র উপনিবেশ ছিল; ১৯০০ সালের কমনওয়েলথ অব অস্ট্রেলিয়া অ্যাক্ট অনুসারে তাদের যুক্ত করে ফেডারেশন গঠিত হয়। কিন্তু ফেডারেশনের সদস্য স্টেটগুলি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার ব্যাপারে বিশেষ সচেতন। যে ক্ষেত্রে লেবার পার্টি ফেডারাল সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি কাম্য মনে করেন, সে ক্ষেত্রে লিবারালরা স্টেটগুলির বিশিষ্ট অধিকারের ওপরে এতাবৎ বেশী জোর দিয়ে এসেছেন। বর্তমানে শুধু ক্যানবেরাতে নয় সবকটি স্টেটেই লিবারাল গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠিত; তা সত্ত্বেও যে তাঁদের মধ্যে সম্প্রীতির অভাব ঘটেছে তার কারণ গর্টনের আমলে ফেডারাল সরকার স্টেট সরকারগুলির ক্ষমতা খর্ব করার নীতি অনুসরণ করে-

প্রধানমন্ত্রী জন গর্টন

ছেন। এখানকার প্রধান দুটি স্টেট হচ্ছে ভিক্টোরিয়া এবং নিউ সাউথ ওয়েলস; দুটি স্টেটেরই লিবারাল নেতৃত্ব ক্যানবেরার শক্তি সম্প্রসারণের বিরোধী। লিবারালদের মধ্যে এই প্রকাশ্য কলহ স্বভাবতই ভোটারদের মনে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে।

তবে অনেকের মতে সবচাইতে যেটি প্রধান কারণ সেটি হলো গর্টনের রাজনীতিতে ডি এল পি'র অনাস্থা। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ডি এল পি-র মুখ্য প্রস্তাব তিনটি : নিরাপত্তার জন্য মার্কিনের সঙ্গে সহযোগিতা অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়; কমিউনিসট সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একমিউনিসট রাষ্ট্রগুলিকে সবরকমভাবে সাহায্য করা অস্ট্রেলিয়ার অবশ্য কর্তব্য; এবং আত্মরক্ষার জন্য অস্ট্রেলিয়ার সামরিক শক্তি বাড়ানো বিশেষ প্রয়োজন। এখন গর্টন প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরই ঘোষণা করেন যে, তিনি ইজরায়েলের অনুসরণে অস্ট্রেলিয়াকে একটি দুর্গ হিসেবে গড়ে তোলার পক্ষপাতী—সংবাদপত্রের ভাষায় এই নীতির নামকরণ হয় "ফর্ট্রেস অস্ট্রেলিয়া"। এ নীতি যে একেবারেই অবাস্তব প্রচুর কড়া সমালোচনা সত্ত্বেও সে কথা স্বীকার করতে তাঁর অনেক সময় লেগেছে। তারপর তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির প্রতি নানাভাবে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করতে থাকেন; ফলে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে বিশেষ করে প্রতিবেশী মালয়েশিয়ার সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে। অথচ তিনি অস্ট্রেলিয়ার সামরিক শক্তির উন্নতির জন্য প্রায় কোনো ব্যবস্থাই করেননি, বরং গত বাজেটে সামরিক খাতে খরচা শতকরা পাঁচ ভাগ কমানো হয়েছে। নির্বাচনের কয়েক মাস আগে যখন সোভিয়েট ইউনিয়ন দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে একটি নিরাপত্তা সংগঠনের প্রস্তাব তোলে তখন গর্টন সরকারের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী গর্ডন ফ্রীথ একটি প্রকাশ্য ঘোষণায় এই প্রস্তাবকে মোটামুটি সমর্থন জানান। এই ঘোষণা কিন্তু ক্যাবিনেটে আলোচনার পরে করা হয়নি—এটি সম্পূর্ণভাবে গর্টন এবং ফ্রীথের মস্তিষ্কপ্রসূত। গর্টন এবং ফ্রীথের বিচারে ভারত মহাসাগরে রুশ সামরিক শক্তির সম্প্রসারণে তাতে সমান শঙ্কিত হবার হেতু নেই; বরং রুশের সহযোগিতাই অস্ট্রেলিয়ার কাম্য।

গর্টনের এই পররাষ্ট্রনীতিকে ডি এল পি শুধু আক্রমণ করে না; ঐ পার্টির নেতারা প্রকাশ্যে জানান যে এই নীতির আমূল পরিবর্তন না হলে তাঁদের সমর্থকেরা নির্বাচনে লিবারাল প্রার্থীদের প্রেফারেন্স ভোট দেবেন না। গর্টন প্রথম দিকে এমন ভাব দেখান যেন ডি এল পি'র সমর্থন ছাড়াই লিবারালরা নির্বাচন জিততে পারে। কিন্তু তাঁর নিজের দলের ক্যান্ডিডেটরা ভয় পেয়ে তাঁর ওপরে প্রবল চাপ দিতে থাকেন, এবং ফলে একেবারে প্রায় শেষ মুহূর্তে গর্টন ডি এল পি'র অধিকাংশ দাবি মেনে নেন। কিন্তু লিবারালদের শিক্ষা দেবার জন্য ডি এল পি নেতারা ঠিক করেন যে, কতগুলি বাছাই করা নির্বাচন কেন্দ্রে তাঁদের সমর্থকেরা লিবারালদের পরিবর্তে অন্য
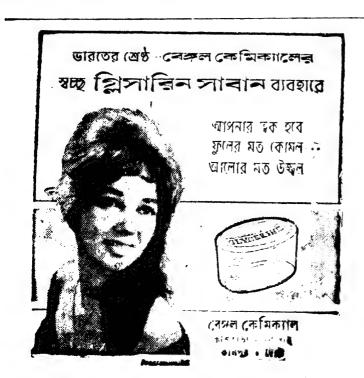
"চুপ!...মিঃ গর্টন তাঁর নীতির পুনর্বিবেচনা করছেন"
নির্বাচনের পূর্বে মেলবোর্নের প্রধান দৈনিক দি এজ (The Age) পত্রিকায় অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত কার্টুনিস্ট ট্যানার-এর আঁকা ব্যঙ্গচিত্র।

কোনো প্রার্থীকে প্রেফারেন্স ভোট দেবে। যেসব কেন্দ্রে লিবারালরা হেরেছেন তার অনেকগুলি ক্ষেত্রেই হেরে যাওয়ার প্রধান কারণ হলো ডি এল পি-র প্রেফারেন্স ভোট না পাওয়া। তাছাড়া অন্য দলের চাপে নিজের নীতি পরিবর্তনে রাজী হওয়ার ফলে গর্টনের ওপরে ভোটারদের আস্থা অনেকটা কমে যায়।

ইতিমধ্যে লিবারালদের দুর্বলতার সুযোগে লেবার পার্টি আবার নিজেকে জনসাধারণের সামনে প্রতিষ্ঠিত করায় উদ্যোগী হন। এদেশে লেবার পার্টির মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে দক্ষিণপন্থী এবং বামপন্থী-দের লড়াই চলছে। পার্লামেন্টে লেবার পার্টির নেতা গফ হুইটল্যাম Grough whitlam মোটামুটি দক্ষিণপন্থী; কিন্তু পার্লামেন্টের বাইরে যে লেবার পার্টি সংগঠন তাতে বামপন্থীদের প্রাধান্য বেশী। অস্ট্রেলিয়ান লেবার পার্টি এখানকার ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের ওপরে খুব বেশী নির্ভরশীল এবং যদিও রাজনৈতিক দল হিসেবে এদেশে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব নিতান্ত নগণ্য, অনেকগুলি প্রধান ট্রেড ইউনিয়ন স্পষ্টতই কমিউনিস্টদের দখলে। বনেদী দল হওয়া সত্ত্বেও যে গত বিশ বছর ধরে লেবার পার্টি বারবার নির্বাচনে হেরেছে তার একটা বড় কারণ হলো ঐ পার্টির ওপরে কমিউনিস্টদের পরোক্ষ প্রভাব এবং এদেশের ভোটাররা বেশীর ভাগই কমিউনিস্ট বিরোধী। এবারকার নির্বাচনের আগে বামপন্থীরা ঠিক করেন যে, তাঁরা প্রকাশ্যে হুইটল্যামের নেতৃত্ব স্বীকার করে নেবেন এবং ভোটারদের কাছে লেবার পার্টির যে ছবিটি তুলে ধরা হয় তা হচ্ছে মোটামুটিভাবে দলীয় ঐক্যের। যেসব ক্ষেত্রে দক্ষিণ এবং বামপন্থীদের মধ্যে বিরোধ প্রবল সেগুলিকে যথাসাধ্য এড়িয়ে এমন একটি কর্মসূচী দেশের সামনে উপস্থিত করা হয় যাতে প্রধান ঝোঁক পড়ে আর্থিক উন্নয়ন এবং নানাবিধ সোস্যাল সার্ভিসের ওপরে। লেবার পার্টির সমর্থনে ভোট বাড়ার এটা একটা বিশেষ কারণ। অবশ্য বামপন্থীরা মনে করেন যে, যেহেতু পার্টির সংগঠনে তাঁদের প্রাধান্য বেশী; সেহেতু হুইটল্যামকে তাঁরা প্রয়োজন মত পরিচালিত করতে পারবেন। যাঁরা হুইট-ল্যামকে ব্যক্তিগতভাবে জানেন তাঁদের অনেকেরই আশঙ্কা সংকটের মুহূর্তে বামপন্থীদের চাপ অগ্রাহ্য করার মত চারিত্রিক দার্ঢ্য তাঁর নেই।

প্রতিনিধিসভার নির্বাচন শেষ হবার পর পার্লামেন্টে লিবারাল পার্টির নেতা নির্বাচনের প্রশ্ন ওঠে। যিনি নেতা হবেন তাঁর ভাগ্যেই প্রধানমন্ত্রিত্ব। গর্টনের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড়ান প্রথমে তাঁর ক্যাবিনেটের অন্যতম প্রতিষ্ঠাবান মন্ত্রী ডেভিড ফেয়ারবার্ন; তারপরে দাঁড়ান অর্থমন্ত্রী এবং পার্লামেন্টারী লিবারাল পার্টির এতাবৎ ডেপুটি নেতা উইলিয়াম ম্যাকমাহন। দলীয় নেতা নির্বাচন যেহেতু গোপনে হয়েছে তাই প্রার্থীদের মধ্যে কে কত ভোট পেয়েছিলেন জানা যায়নি; তবে ওয়াকিবহাল মহলের খবর হল খুব অল্প ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতাতেই গর্টন শেষ পর্যন্ত আবার নেতা নির্বাচিত হয়েছেন। গর্টনের আপত্তি সত্ত্বেও পার্লামেন্টারি লিবারাল পার্টি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ম্যাক-মাহনকে আবার ডেপুটি নেতা নির্বাচন করেছেন। গর্টন তার শোধ নিয়েছেন ম্যাকমাহনকে অর্থমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে নতুন ক্যাবিনেটে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ দিয়ে। ফেয়ারবার্ন গর্টনের প্রতি অনাস্থাবশত নতুন ক্যাবিনেটে কোনো পদ গ্রহণ করেননি।

আমাদের দেশে কংগ্রেস পার্টির তুলনায় এদেশে লিবারাল পার্টির অবস্থা এখনো মোটামুটি চলনসই, তবে তা যে কতদিন বজায় থাকবে বলা শক্ত। ভারতবর্ষের মত কঠিন কোনো আর্থিক সমস্যা অস্ট্রেলিয়ার নেই, বরং এদেশের দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি নিতান্তই প্রত্যক্ষ। মানুষের চাইতে চাকরির সংখ্যা এখানে বেশী, ফলে বেকার নেই বললেই চলে। তাছাড়া সম্পদের বণ্টনে এদেশে সমতা অনেকখানি সুপ্রতিষ্ঠিত—সুতরাং সে সূত্রে ব্যাপক বিক্ষোভের আশঙ্কা অবর্তমান। তা সত্ত্বেও এই নির্বাচনের ফলাফল দেখে লিবারালরা নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তিত হয়ে উঠেছেন। এঁরা নিজেদের নামে উদারপন্থী বললেও আসলে এঁরা নিতান্তই রক্ষণশীল। অথচ গত কয়েক বছরের মধ্যে এদেশের অবস্থার বিস্তর পরিবর্তন সূচীত হয়েছে। যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ওপরে এঁরা এতদিন একান্তভাবে নির্ভর করতে অভ্যস্ত তার উপস্থিতি এ অঞ্চল থেকে এখন সম্পূর্ণ ভাবেই অপসৃত। অপরপক্ষে ভিয়েতনামের অভিজ্ঞতার পরে দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়াতে মার্কিন আর কতদিন নিরাপত্তা যোগাবে তাও ক্রমে নিশ্চিত হয়ে উঠেছে। আগে এখানে মুখ্যত ব্রিটেন থেকেই স্ত্রী-পুরুষ বসবাস করতে আসত; গত কয়েক বছর ধরে ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ থেকে আগত স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে। এদের মধ্যে ইতালিয়ানরা সংখ্যায় সব চাইতে বেশী; তাছাড়া আছে গ্রীক, মাল্টিজ, পোল, চেক, হাঙ্গেরিয়ান, অস্ট্রিয়ান ইত্যাদি। এদের আচার আচরণ, খাদ্য, রুচি, পারিবারিক সংগঠন, সামাজিক উৎসব এবং ক্রিয়াকর্ম ইংরেজদের থেকে অনেকটা আলাদা; তাছাড়া এরা অনেকে স্বভাবতই ইংরেজী ভাষা জানে না। ফলে এদেশের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে নানা সংঘাত এবং সমস্যা ক্রমে দেখা দিচ্ছে। তাছাড়া শিক্ষিত অস্ট্রেলিয়ান তরুণ-তরুণীদের মধ্যে এসিয়া সম্পর্কে আগ্রহ গড়ে উঠছে, অথচ দেশের রক্ষণশীল নেতারা দীর্ঘকাল ধরে এসিয়াকে কিছুটা আতঙ্ক এবং অনেকটা অশ্রদ্ধা মিশিয়ে দেখতে অভ্যস্ত। অস্ট্রেলিয়ার এখন বিশেষ প্রয়োজন সুবেদী, সম্মুখগামী এবং যথার্থ উদারনৈতিক নেতৃত্বের। কিন্তু লিবারাল পার্টির মধ্যে সে জাতীয় নেতৃত্বের প্রতি-শ্রুতি নিতান্ত অল্প। ফলে দেশের যাঁরা তরুণ নাগরিক তাঁদের সংগে লিবারালদের মনের ব্যবধান ক্রমেই বেড়ে চলেছে। গর্টনের নেতৃত্বে এই ব্যবধান কমবার কোনো আশা নেই, এবং নেতৃত্ব যদি না বদলায় তাহলে আগামী নির্বাচনে লিবারাল পার্টির হারবার সম্ভাবনা প্রবল।

শিবনারায়ণ রায়

২৩ ডিসেম্বর, ১৯৬৯ মেলবোর্ন ॥

সিমোনের মনোগহনে

মমত্ব, ঐ এস এস-এর জন্য সিমোনের মনে প্রকৃত করুণাবোধ জেগেছিল; কার্লের কাহিনী শ্রবণে তাঁর ক্রমবর্ধমান বিতৃষ্ণা সত্ত্বেও তিনি তাঁর হাত ধরতে দিয়েছিলেন তাকে; পুঁজরক্তে আকৃষ্ট হয়ে কার্লের ক্ষতের উপর উড়ে আসা মাছিটিকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন; কার্ল ধন্যবাদ জানিয়েছিল; পেট্রলের টিনগুলোর উল্লেখে তাঁর সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে দেখে তিনি উঠে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছিলেন, কিন্তু কার্লের আকুল মিনতি ঠেলে ফেলে চলে যেতে পারেননি ["থাকুন আরেকটু, দয়া করে থাকুন, আমাকে সব বলতেই হবে"], মনের মধ্যে জ্বালা-ধরানো ও ত্রাশ-ভরানো সেই নিষ্ঠুর বীভৎস কাহিনী—মর্মান্তিক অন্তর্দাহ সত্ত্বেও তিনি শুনেছেন শেষ পর্যন্ত।

অবশেষে অবশ্য এল যখন আসল অপরাধের বিবৃতি। বলতে বলতে কার্ল আবেগে উত্তেজনায় কেঁপে-ওঠা থেমে-আসা তার হাত দুটি অন্ধ চোখের উপর চেপে ধরেছিল, যেন সে ঐ দৃশ্য আর দেখতে চায় না। ঠিক সেই মুহূর্তেই সিমোনের করুণানুভূতি লুপ্ত হল, তাঁর মন কঠিন হয়ে উঠল। যুদ্ধ তো এখনো শেষ হয়নি, দিনের পর দিন হাজার হাজার ইহুদী নিশ্চিহ্ন হচ্ছে, তাদের এবং তাঁরই প্রায় সমস্ত আত্মীয়পরিজনের—যে দশা হয়েছে, যে-কোনো সময়ে সেই পরিণাম তাঁর নিজেরও উপর ঘনিয়ে আসতে পারে। নিজের হাতটি তিনি সরিয়ে নিলেন কার্লের কাছ থেকে, ঐ হত্যাকারী হাতের সঙ্গে তাঁর হাত আর মিলবে না। আপন পাপের জন্য ছেলেটি যে অন্তর থেকে অনুতপ্ত, তা সিমোন বুঝেছিলেন। কিন্তু তিনি ক্ষমার বাণী উচ্চারণ করতে পারেননি...

বিবেচনা বিশ্লেষণ

আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে : "খ্রীষ্ট-যাজক হিসেবে আমি কি ক্ষমা করতাম?" ধরুন কার্লের মৃত্যুশয্যায় আমি আহূত হয়েছি। আমার সম্বল : ঈশ্বরের নামে অনুতপ্ত পাপীর পাপ ক্ষমা করার অধিকার, খ্রীষ্টের কাছ থেকে প্রাপ্ত অধিকার : পুনরুত্থানের পর তিনি যে তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশে বলেছিলেন, "পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ কর। যার যার পাপ তোমরা ক্ষমা করবে, তাদের পাপের ক্ষমা হবে।" তাই কার্লের সামনে দাঁড়িয়ে আমি একটুকু দ্বিধাগ্রস্ত হতাম না; সে ক্যাথলিক, পাপ-স্বীকার করেছে সে, সত্যি সত্যি সে অনুতপ্ত। আমি বলতাম, "ঈশ্বরের নামে আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম।"

আসল প্রশ্ন কিন্তু এই : সিমোন হলে আমি কি করতাম? বরং সিমোন হলে আমার কি করা উচিত ছিল?

আমি কি করতাম, তা জানতে গেলে নিজেকে বসাতে হয় সিমোনের স্থানে, মনে মনে হাড়ে হাড়ে—জানি না তা সম্ভব কি না—প্রবিষ্ট হতে হয় এই নির্যাতিত ইহুদীর জীবনে ও মানসিকতায়, যার চোখের সামনে নাৎসীদের হাতে নিপীড়িত ও নিহত হয়েছে তার কত সঙ্গী ও নিকটাত্মীয়, যাকে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে হচ্ছে বন্দীশিবিরের ভয়াবহতায়, ঘৃণা ও পরিবাদের কালো ছায়ার নিচে, আর যার মাথার উপর প্রতিনিয়ত ঝুলেছে মৃত্যু খড়্গ। যে-কোনো দিন, যে-কোনো ক্ষণে তাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে ঐ যারা কার্লেরই আপনজন! আমি কি পারব সিমোনের ঐ হতাশা, ক্রোধ স্নায়বিক পীড়া, মর্মান্তিক যন্ত্রণা আরোপ করতে নিজের উপর? আর...আর মনে হবে না কি তখন ঐ কার্ল এই চূড়ান্ত অপরাধে অংশ তো নিয়েছেই, আর এখন, শেষ আসরে বুঝে চায় অব্যবহিত ক্ষমা, যাতে সে শান্তিতে মরতে পারে!

আরেকটা কথা বিবেচ্য : অন্যের প্রতি কৃত পাপের মার্জনা করার অধিকার আমার আছে কি? কোনো পাড়ার ছেলের দল যদি 'সি আই এর কুত্তা, আমেরিকা ছাড়ো' স্লোগান দিতে দিতে, ফলের খোসা ছুঁড়তে ছুঁড়তে আমার বিরুদ্ধে ধাওয়া করে, আমি সেটা ক্ষমা করতে পারি—সেক্ষেত্রে ও পূর্ণ-অধিকার রয়েছে [শুধু অনুরোধ : সি আই এ-র কুত্তা বলবে না, 'সি আই এর কুত্তা' কথাটা আমার কাছে তত নয়, অন্তরেই যেন কেমন অশালীন শোনায়!]; কিন্তু অন্য একজন বিদেশী পাদ্রী এইভাবে অপমানিত হলে [আমি তো কলকাতার একমাত্র শ্বেতাঙ্গ কুত্তা নই...] আমি কে যে, তাঁর হয়ে অপরাধ ক্ষমা করে দেব? যে পাপ বা অপরাধের শিকার আমি নই, তা ক্ষমা করে দেওয়ার চেয়ে অহংকার আর কি হতে পারে?

এদিকে কার্লের কথা যদি ধরা যায়, তার পক্ষ থেকেও বলবার মতো অনেক কিছু আছে। কতই বা বয়স তার· বয়ঃসন্ধির উত্তেজনা তাকে সম্মোহিত করে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, তিলে তিলে তার মগজধোলাই সম্পন্ন করেছে তার প্রভুরা...। যুদ্ধের হিংসাতপ্ত আবহাওয়ার মধ্যে একটি হুকুম সে তামিল করেছে। অন্যায় হুকুম, ভয়াবহ হুকুম—কিন্তু যা না মানার অর্থ হত নিজেরই মৃত্যু। জিজ্ঞাসা করতে পারি : একটি পরিবারকে হত্যা করার আদেশ মানার চেয়ে বিশেষত· তারা যখন এমনিও মরবে, অমনিও মরবে—ফায়ারিং স্কোয়াডের গুলির মুখে আপন মৃত্যুবরণে প্রস্তুত হতে পারত, এমন বীর আমাদের মধ্যে ক'জন আছে? নিজের কথা স্বীকার করি : এ ক্ষেত্রে কি করা উচিত হত আমি জানি; তবে, কি করে ফেলতে পারতাম· তা ভেবেও শিউরে উঠি।

আপনার কাছে সব কিছু আমাকে বলতেই হবে

অপরাধের বোঝা এত গভীরভাবে চেপে বসেছিল কার্লের মনে যে রুশ গোলার থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টামাত্র সে করেনি। আরো ঝুঁকি সে নেয় এক ইহুদীকে তার মৃত্যুশয্যায় ডেকে এনে। আত্মপক্ষ-সমর্থনের প্রয়াস সে করে নি, বলে নি "মাথার উপর দিয়ে গুলি চালিয়েছিলাম বুঝলেন..." কৈফিয়ত দেয়নি, "এক হিসেবে, আমি অফিসারের আদেশ মেনেছি মাত্র...আসলে দায়িত্বটা তাঁরই"। সে শুধু বলেছে, "আপনার কাছে সব কিছু আমাকে বলতেই হবে।"

একদিন এক মানুষ—মানুষ· তবু ঈশ্বরেরই পুত্র—ক্রুশে অর্পিত হয়েছিলেন : তাঁর নাম যীশু। তাঁর দু পাশে একই শাস্তি ভোগ করছিল দুই হত্যাকারী দস্যু। একজন যীশুকে ব্যঙ্গ করছিল, আরেকজন তা শুনে তাকে ভৎসনা করে বলল, "ভগবানের ভয়ে এতটুকু তুমি ভীত নও? আমরা ও'র সমান দণ্ডে দণ্ডিত· কিন্তু আমাদের বেলায় এতো যথাযোগ্য প্রাপ্তি, আমরা আমাদের কৃতকর্মের প্রতিফল ভোগ করছি মাত্র। কিন্তু ইনি...ইনি তো কোনো দোষে দোষী নন।" নিজ মুখে পাপের স্বীকৃতি শোনার অপেক্ষা করছিলেন ঈশ্বর-মানব এবং শোনামাত্র ক্ষমা করেছিলেন।

ভগবানের কাছ থেকে ক্ষমা লাভের যোগ্যতা কার্লের ছিল—নয়তো সুসমাচারের বাণীর মূল কোথায়...? এদিকে কার্লের গুলিতে যারা জীবন দিয়েছে, তাদের হয়ে ক্ষমা ঘোষণার অধিকার সিমোনের ছিল না। আর তখন যা তাঁর মনের অবস্থা—ঐ বীভৎস কাহিনী, আর সেই হত্যাকাণ্ডের অন্যতম হোতা তার সম্মুখে—আকস্মিকতা ও তাঁর আবেগজনিত উত্তেজনায় পর্যুদস্ত তাঁর পক্ষে, শারীরিকভাবেই হয়তো অসম্ভব ছিল বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে বলার মতো কোনো কথা খুঁজে পাওয়া।

আজ পর্যন্ত তাঁর মনে হানা দিয়ে চলেছে এই প্রশ্ন : তিনি কি ঠিক কাজ করেছেন? ঔদার্যের পরাকাষ্ঠা দেখাতে পেরেছিলেন কি?...কার্লের উদ্দেশে তিনি কি বলতে পারতেন না : "বুঝেছি তোমার কথা; ভগবান তোমাকে ক্ষমা করেছেন, শান্তিতে মর...।"

আমি যদি সিমোন হতাম, ঈশ্বরের কাছে এই আমার প্রার্থনা, আমি যেন সেই মুহূর্তে প্রাণপণ চেষ্টাতেও ঐ কথাগুলি উচ্চারণ করতে পারার সাহস ও শক্তি খুঁজে পেতাম!

অন্য প্রশ্ন

কার্লের প্রতি তাঁর আচরণ নিয়ে সংশয় জেগেছে সিমোনের মনে; কিন্তু কার্লের মায়ের প্রতি তাঁর বিবেচনা ও বদান্যতার কথা চিন্তা ক'রে তিনি আত্মতৃপ্ত বলে মনে হয়। তবু এইখানেই আমার তাঁকে এক প্রশ্ন করার আছে : তিনি কি উচিত কর্ম করেছেন? পুত্রশোকাতুরা মাকে মৃত পুত্রের পতনের খবর না শোনানো তাঁর সহানুভূতির পরিচয় নিশ্চয়ই, কিন্তু পরিণামী বিচারে শ্রেয় কি? ঐ ভদ্রমহিলা সারা জীবন ধরে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করবেন এই কথা ভেবে যদিও তাঁর পুত্র পিতামাতার আদেশ অমান্য ক'রে এস এস-এ যোগ দিয়েছে, সভ্য হয়েছে এমন এক বাহিনীর যা বহু নিষ্ঠুর ও জঘন্য অপরাধে অপরাধী, তবু সে নিজে কিছু করেনি', নিজে সে শেষ পর্যন্ত 'ভালো' থেকেছে...। কিন্তু সত্যি সত্যি সান্ত্বনা পাবেন কি? ক্ষণে ক্ষণেই কাঁটার মতো বিঁধবে না ঐ প্রশ্ন : 'এস এস-এ যোগ দিয়েও, গুলি দিয়েও, গুলি না খেয়ে, ভালো থাকা সম্ভব কি?'...

কার্লের মা-র কি জানার অধিকার ছিল না যে, তাঁর পুত্র এক সুন্দর মৃত্যুবরণ করেছে, এস এস-এ যোগ দেওয়ার পাপের উপর নির্দোষের রক্তপাতের পাপ জমিয়েও প্রায়শ্চিত্ত করেছে সব কিছুর জন্য, অনুশোচনার অশ্রুতে ধৌত হয়েছে?

আমার পাঠিকাদের মধ্যে যাঁরা মা আছেন, যাঁদের বোধ হয় একটি ছেলে আছে কার্লের মতো—হয়তো বখে যাওয়া, নষ্ট হয়ে যাওয়া ছেলে—তাঁদের জিজ্ঞেস করি : ছেলের দোষ-অপরাধের প্রতি অন্ধ থেকে 'সে ভালো ছেলেই আছে' এই মিথ্যা বিশ্বাসটাকেই আপনাদের মনের মধ্যে গ'ড়ে তুলবার বৃথা প্রয়াস চালিয়ে যেতে চান, না চান সন্দেহাতীতভাবে জেনে যেতে—আপনাদের ছেলে তার বহুবিধ স্খলনের পরেও শেষ পর্যন্ত মর্মে মর্মে দগ্ধ হয়েছে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অনুতাপে, চেয়েছে ক্ষমা, বরণ করেছে প্রায়শ্চিত্ত, আপনাদের সুশিক্ষা ও প্রার্থনা ব্যর্থ হয়নি?

॥ ২৩ ॥

এয়ার কণ্ডিশন করা ঘর, বিনা অনুমতিতে এক ঝলক হাওয়ারও প্রবেশ অধিকার নেই। একটা বিশাল টেবিলের ওপাশে বসে আছে অরূপ। ফর্সা রং, ছোট-খাটো চেহারা, তার ওপর আবার খুব মাজা দিয়েছে, টাই বেঁধেছে নিখুঁত, চুলে নিশ্চয়ই ক্রিম লাগায়—না হলে একটা চুলও উড়ু উড়ু হয়নি,—এং, অরূপ আবার বুক পকেটে সাদা রুমাল গুঁজেছে। প্রথম প্রথম স্যুট পরলে এরকম রুমাল গোঁজে অনেকে। সব মিলিয়ে ঘরখানা এবং অরূপকে মনে হচ্ছে ছবির মতন, বাস্তব নয়।

বেয়ারার কাছে স্লিপ লিখে ঢুকতে হয়েছে দীপুকে। ঢুকে দেখলো, অরূপের সামনে ওদেরই কলেজের আর এক বন্ধু হিরণ্ময় বসে আছে। হিরণ্ময়কে এর আগে কখনো স্যুট পরা অবস্থায় দেখেনি দীপু। প্রথমে ভেবেছিল, হিরণ্ময়ও বুঝি এখানে চাকরি করে। কিন্তু তার বসে থাকার ভঙ্গি অন্যরকম, খানিকটা কৃপাপ্রার্থীর মতন। হিরণ্ময়কে কেক ও কফি খাইয়েছে অরূপ, টেবিলে উচ্ছিষ্ট পেয়ালা-পিরীচ। অরূপ কিন্তু দীপুকে কফি খাবার জন্য কোনো অনুরোধ করলো না।

হিরণ্ময়ের সঙ্গে ছিল আগে তুই-তুকারির সম্পর্ক কিন্তু সে আজ তুমি বলে কথা বলতে শুরু করেছে। মাত্র তো তিন-চার বছর দেখা হয়নি। দীপুকে দেখে হিরণ্ময়ের মুখে প্রথমটায় সামান্য একটু অখুশীর ছায়া খেলে গেল, তারপরই সোল্লাসে বললো, আরে, দীপু? ভাগ্যিস আজ এখানে এসেছিলাম, তাই তোমার সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল। তুমি এখানে প্রায়ই আসো নাকি?

দীপু হেসে বললো, না, আজই প্রথম এলাম।

মাত্র মাসখানেক হলো অরূপ অফিসে আসছে, কিন্তু এর মধ্যেই বড় অফিসারদের মতন কম কথা বলা অভ্যেস করে ফেলেছে। অফিস ঘরে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা জমাবার ইচ্ছেও তাই নেই, সে শুধু হাসিমুখে তাকিয়ে আছে।

দীপু হিরণ্ময়কে জিজ্ঞেস করলো, তুমি তো আসানসোলে কি একটা চাকরি করতে না?

-হ্যাঁ, এখনো সেখানেই আছি। তুমি তো গেলেই না। কতবার তোমাকে বলেছি, আসানসোলে একবার বেড়াতে এসো! এসো না একবার, অরূপকেও ধরে নিয়ে এসো—

দীপু জানে অরূপ আর কোনোদিন তার সঙ্গে কোথাও বেড়াতে যাবে না। কিন্তু হিরণ্ময়কে বললো, হ্যাঁ, যাবো একবার।

—তুমি এখন কোথায় আছো?

—আমি তো সেই আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়িতেই—

—না, মানে, চাকরি করছো কোথায়?

-চাকরি পাইনি এখনো।

—পাওনি? বসে আছে?

অরূপ এবার বললো, দীপু চাকরি-টাকরি করতে চায় না। আমাদের মতন পরিশ্রম করে টাকা রোজগার করা ওর ধাতে নেই।

দীপু অরূপকে জিজ্ঞেস করলো, তুই বুঝি খুব পরিশ্রম করছিস?

—নিশ্চয়ই। সাড়ে ন'টায় আসি, বেরুতে বেরুতে সাড়ে পাঁচটা, ছ'টা হয়ে যায়।

—অতক্ষণ এক চেয়ারে বসে থাকা সত্যিই পরিশ্রমের ব্যাপার। হ্যাঁ রে, এতবড় ঘরে তুই বসিস, তোর একা একা ফাঁকা ফাঁকা মনে হয় না?

—ওসব মনে হবার টাইম কোথায়? অনবরত ফাইল সই করাতে আসে, তাছাড়া আমার একজন স্টেনো আছে।

—ছেলে না মেয়ে?

—ছেলে। কেন?

—না, এমনিই জিজ্ঞেস করলুম। তাকে তুই ডিকটেশান দিস? ইংরিজিতে? তোর ভয় করে না?

—ভয়? হাঃ হাঃ হাঃ।

অরূপের হাসিটা কৃত্রিম। সদ্য রপ্ত করতে শুরু করেছে তো। অরূপের কথাবার্তাও অন্যদিনের মতন নয়, গলার আওয়াজটা ভারিক্কী করতে চাইছে। এসবই এয়ার কণ্ডিশানড ঘর ও বড় টেবিলের গুণ। অরূপ যে তাকে এখনো কফি খাওয়াচ্ছে না, এই নিয়ে দীপু একটা খোঁচা দেবে ঠিক করেছিল, কিন্তু কিছু বললো না!

হিরণ্ময় বললো, নিজের কর্মচারীকে ডিকটেশান দেবে, তাতে আবার ভয় কি? বুঝলে দীপু, ফিজিকাল লেবার না হলেও এত বড় দায়িত্ব, তাতে একটা মেণ্টাল স্ট্রেইন—

দীপু অদৃশ্যভাবে ভুরু কুঁচকে হিরণ্ময়ের দিকে তাকালো। হিরণ্ময়ের কথার মধ্যে স্পষ্ট একটা তোষামোদের সুর ফুটে উঠছে। কি দরকার ওর তোষামোদ করার? হিরণ্ময় নিজে অন্য জায়গায় চাকরি করে—অরূপ তার কলেজের বন্ধু।

দীপু অরূপকে জিজ্ঞেস করলো, এই অফিসটা পুরোপুরি তোর দায়িত্বেই রয়েছে বুঝি?

—মোটামুটি তাই। ছোট কাকাও সপ্তাহে তিন চারদিন আসেন।

—হিরণ্ময়, তুমি কি এখন ছুটিতে?

—হ্যাঁ, এই কিছুদিন, মানে ব্যাপারটা কি জানো, আমার স্ত্রীর ঠিক আসানসোলের ওয়েদার স্যুট করছে না।

—ওঃ হো তুমি তো বিয়ে করেছো। শুনেছিলাম বটে—

—দুটো ছেলেমেয়েও হয়েছে।

—দুটো?

—চমকে উঠলে কেন? চার বছর তো

হয়ে গেল, এর মধ্যে দুটো ছেলেমেয়ে হওয়া এমন আর আশ্চর্য কি!

—না, আমি সেজন্যে জিজ্ঞেস করিনি। আমি জিজ্ঞেস করছিলাম, দুটো না দুটি? নিজের ছেলেমেয়ে সম্পর্কে লোকে কি বলে? দুটি ছেলেমেয়ে, না দুটো ছেলে-মেয়ে?

—এ আবার কি কথা? ওর মধ্যে তফাৎ কি?

তফাৎ নেই? কানে লাগলো যেন।

—দীপু, তোমার ঐ সব পাগলামি এখনও আছে দেখছি।

অরূপ জিজ্ঞেস করলো, দীপু, তুই আজ হঠাৎ এলি যে? কোনো দরকার ছিল?

—না, এমনিই।

দীপু এ ঘরে ঢুকেই বুঝতে পেরেছে, অরূপকে তার কিছু বলা যাবে না। সে [illegible] অরূপের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অরূপের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আছে। কিন্তু হিরণ্ময়ের [illegible] একটা [illegible] কুকুরের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

অরূপ তাকে চাকরি দিতে চেয়েছিল। সে চাকরি নিলে কি অরূপ তার জন্যে এই রকমই একটা ঘরে বসতে দিত? কিংবা অরূপের সঙ্গে এক [illegible]? [illegible] [illegible] দীপুর [illegible] কিছুতেই [illegible] [illegible] দিন এখানে এসে বসতে পারতো না। সে চাকরি নেয়নি বলেই কি অরূপ তার সঙ্গে আজ একটু [illegible] [illegible] চাল দেখাচ্ছে?

হিরণ্ময়কে [illegible] [illegible] [illegible] দীপুদের [illegible] ইউনিয়নের সেক্রেটারি ছিল হিরণ্ময়, খুব হাঁক ডাক ছিল, মেয়েদের সঙ্গে ভাব করতে পারতো পটাপট। পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই মামা না পিসেকে ধরে ভালো চাকরি পায়, বিয়েও করেছে বড়লোকের মেয়েকে। কিন্তু হিরণ্ময়ের চেহারায় একটা বিনীত কুকুরের চেহারা ফুটে উঠেছে কেন? দীপু নিশ্চিত জানে, হিরণ্ময়ের গেঞ্জিটা ছেঁড়া। [illegible] [illegible] [illegible] টাই [illegible] [illegible] হোক, কেউ যদি [illegible] হিরণ্ময়—বসদের কাছে তার গেঞ্জিটা যদি ছেঁড়া না বেরোয়—হাজার টাকা দিতে না পারলেও দীপু নিজের কান কেটে ফেলতে রাজী আছে। বয়েসের তুলনায় হিরণ্ময়কে দেখাচ্ছেও একটু বেশী বয়স্ক, কথা বলার সময় মুখখানা হাসি হাসি—কিন্তু চুপ করলেই কপালে একটা রেখা ফুটে উঠছে। ছেঁড়া গেঞ্জির মতন হিরণ্ময় যেন, আরও কিছু লুকোতে চায়।

দীপুরও গেঞ্জি ছেঁড়া থাকে অনেক সময়—একদিন খুব বৃষ্টিতে ভিজে শান্তাদের বাড়িতে গিয়েছিল, শান্তার মা বলেছিলেন, শিগগির জামা খুলে ফেল, ঠাণ্ডা লেগে যাবে! দীপু কিছুতেই জামা খুলবে না—তলায় যে ছেঁড়া গেঞ্জি! শান্তার মা যত জোর করছেন, দীপু তত না না বলছে, শেষ পর্যন্ত শান্তা, সুরভিদি, রিনি সবাই মিলে বলতে লাগলো, ভিজে জামা খুলে [illegible] একটা জামা পরতে—তখন আর কথা না বাড়িয়ে দীপু হুট করে [illegible] বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল বৃষ্টির মধ্যেই। পরে শান্তাকে দীপু বলেছিল, তোমাদের বাড়ি থেকে [illegible] চলে আসাটা সেদিন খুব খারাপ হয়েছে, না? শান্তা মুচকি হেসে উত্তর দিয়েছিল, তুমি জামা খোলার ভয়েই তো চলে গেলে! কেন জামা খোলোনি, তাও জানি! দীপু জিজ্ঞেস করেছিল, কি জানো? শান্তা বলেছিল শুধু আমি কেন বাড়ি শুদ্ধ সবাই বুঝতে পেরেছে। তাই নিয়ে কি হাসি। দিদি তো হাসতে হাসতে একেবারে—। দীপু বলেছিল, কি বুঝেছে তোমার বাড়ির লোকেরা? [illegible] [illegible] হয়েছে! আমি [illegible] [illegible] [illegible] খুলিনি—। শান্তা [illegible] [illegible] বলেছিল [illegible] [illegible], তোমার গেঞ্জি ছেঁড়া ছিল না? দীপু তখন অপ্রস্তুতভাবে স্বীকার করেছিল, তোমরা কি করে বুঝলে? শান্তা বলেছিল, ও তো মুখ দেখলেই বোঝা যায়। তুমি এমন করছিলে! কি [illegible] তুমি দীপুদা, গেঞ্জি ছেঁড়া থাকলে কি হয়েছে তাতে! লোকের সামনে ছেঁড়া গেঞ্জি বেরিয়ে পড়লে মান নষ্ট হয়ে যায়? শান্তা মাঝে মাঝে বড় পাকা পাকা কথা বলে। দীপুর সামনে এমন ভাব দেখায়, যেন দীপু নিতান্ত শিশু!

হিরণ্ময়কে ভুলিয়ে ভালিয়ে কোনো পুকুরের পাড়ে নিয়ে গিয়ে জলে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে কেমন হয়? তারপর জল থেকে উঠে হিরণ্ময় যখন কোট, জামা সব খুলে ফেলবে—তখন ছেঁড়া গেঞ্জি বেরিয়ে পড়লে ওর মুখের অবস্থা কেমন হয়—

হিরণ্ময় আর অরূপের কথাবার্তায় দীপু অন্যমনস্কভাবে হুঁ-হাঁ দিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। এক সময় হিরণ্ময় অরূপকে বললো, এবার ওঠা যাক। অনেকক্ষণ আড্ডা দিয়ে তোমার সময় নষ্ট করলাম। দীপু, তুমিও উঠবে নাকি? চলো তাহলে, বেরিয়ে কোথাও বসে চা-টা খাওয়া যাক!

দীপু বললো, অরূপ, তুইও বেরোবি নাকি? চল, কোথাও একটু চা বা কফি খেয়ে আসবি?

অরূপ কায়দা করে হাতের ঘড়ি দেখলো। নিবিষ্ট হয়ে ভাবলো এক মিনিট। তারপর বললো, না, আমি আর এখন বেরুবো না—কয়েকটা কাজ সারতেই হবে। তারপর অরূপ কাঁধের এমন একটা ভঙ্গি করলো, যার অর্থ, মিটিং শেষ হয়ে গেছে। একটা ফাইলের পাতা ওল্টাতে লাগলো।

দীপু হাসা পরিহাস ভালোবাসে বলে সহজে মানুষের ওপর রাগ করে না। অন্যদের ভুল ব্যবহার দেখলেও মনে মনে হাসে। কিন্তু আজ অরূপের ব্যবহারে সে বেশ অবাক হলো। অরূপ কি তাকে ইচ্ছে করে অপমান করতে চাইছে? হিরণ্ময়কে কফি কেক খাইয়েছে, অথচ ওকে দিল না। এমন [illegible] [illegible] [illegible] প্রকারেও [illegible] [illegible] করলো। কি এমন জরুরী কাজ [illegible] [illegible] পনেরো কুড়ি মিনিট ঘুরে আসতে পারে না? নিজেই অফিসের মালিক, তাও একটুকু স্বাধীনতা নেই? দীপুর সঙ্গে তার যে রকম বন্ধুত্ব, তাতে দীপুকে দেখে তার অনেক বেশী খুশীর ভাব দেখানো উচিত ছিল। নাকি অফিসের বস হয়ে দীপুর মতন বন্ধুদের সে আর পাত্তা দিতে চায় না? কিংবা অফিসের নিয়ম কানুনই এই রকম? দীপু এর আগে কোনো বন্ধুর সঙ্গে তার অফিসে দেখা করতে যায়নি।

দীপু হিরণ্ময়কে বললো, চলো, তাহলে যাওয়া যাক। দীপু মনে মনে ঠিকই করে ফেলেছে, এ অফিসের বাইরে একবার পা দিলে সে আর জীবনে কোনোদিন এখানে ঢুকবে না। তাতে অরূপের কোনো ক্ষতি হবে না অবশ্য, তারও হবে না।

দরজা ঠেলে ঘর থেকে সবে বেরুবে, এই সময় হিরণ্ময় বললো, এক সেকেন্ড! অরূপের সঙ্গে আর একটা কথা বলে আসি!

হিরণ্ময় টেবিলের কাছে গিয়ে ঝুঁকে নিচু গলায় ফিসফিস করে কি যেন বলতে লাগলো। দীপুকে শুনতে দিতে চায় না। এসব ব্যবহার দীপুর অসহ্য লাগে, কিন্তু খুব রাগের মুহূর্তে দীপু শান্ত হয়েও যেতে পারে। সে দরজা ঠেলে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো। সাদা দেয়ালের দিকে মুখ করে পড়তে লাগলো দেয়ালের বিভিন্ন রেখা। নতুন রং করা হয়েছে, তবু তাকিয়ে থাকলে অনেক কিছু দেখা যায়। শান্তার মুখ তো দীপু দেখতেই পাচ্ছে। কোথাও অপমানিত হলে কিংবা খুব রাগ

হলেই দীপু দেখতে পায় শান্তার মুখ।

হিরণ্ময় বেরিয়ে যাবার পর দীপু ওর সঙ্গে দু'এক পা মাত্র এগিয়েছে, তখন অরূপ আবার মুখ বার করে বললো, দীপু, শুনে যা একটা কথা।

দীপু ঘুরে দাঁড়ালো, ঠাণ্ডাভাবে বললো, না, আজ যাই। তুই তো ব্যস্ত আছিস।

—শোন না, একটা কথা—

অরূপ হাতছানি দিয়ে দীপুকে ভেতরে ডাকলো। দীপু ঢুকতেই অরূপ ফিসফিস করে বললো, হিরণ্ময়ের সঙ্গে তুই গিয়ে কি করবি? ওকে কাটাতে পারছিস না?

দীপু কোনো উত্তর দিল না।

—তুই বুঝতে পারিস নি, তখন থেকে ওকে কাটাবার জন্য আমি কত চেষ্টা করছি!

দীপু বললো, কেন, ওকে কাটাতে চাস কেন?

—তখন থেকে বকবক করে মাথা ধরিয়ে দিয়েছে একেবারে। ও চলে যাক, তুই বোস্। তোর সঙ্গে কথা আছে।

দীপু একটা নিশ্চিন্ত নিশ্বাস ফেললো। আর কিছু না, অরূপ এখন এটুকু না করলে তার মনের ওপর আর একটা বোঝা দাঁড়াতো। [illegible] কখনো অরূপের সঙ্গে দেখা হলে তার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করবে সেই নিয়ে চিন্তায় পড়তো নিশ্চয়ই।

দীপু বললো, হিরণ্ময়কে বললাম ওর সঙ্গে যাচ্ছি। এখন কি করে ভুলবো না বলি?

—তুই না গেলে পারিস, আমি বলছি।

—না, না, সেটা বড় খারাপ হবে। আমি বরং ওর সঙ্গেই যাই।

—ধ্যাৎ! তুই চুপ করে বোস্ না। আমি ম্যানেজ করে দিচ্ছি।

অরূপ উঠে দরজার কাছে গিয়ে বললো, হিরণ্ময়, তুমি একাই যাও। দীপু একটু থাকবে, ওর সঙ্গে আমার একটু প্রাইভেট কথা আছে।

হিরণ্ময় একটু বিগলিতভাবে হেসে বললো, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। আচ্ছা, আমি তাহলে আবার পরশুদিন আসবো!

নিজের চেয়ারে ফিরে এসে অরূপ বললো, শুনলি তো, আবার পরশুদিন এসে জ্বালাবে! উঃ!

—কেন, হিরণ্ময় আসছে কেন?

—আর কেন! চাকরি চায়।

—চাকরি? কেন, ও তো ভালো চাকরি করে শুনেছি।

—কি ভালো চাকরি? পাঁচ ছ'শো টাকা মাইনে পায় বোধ হয়, তাও আসানসোলে। দু'টি ছেলেমেয়ে হয়েছে, ওর বউয়ের চিরকাল ঝি-চাকর-রাঁধুনী রাখা অভ্যেস—খরচপত্তর চালাতে পারছে না। তাই ওর ইচ্ছে, যদি এখানে একটা হাজারখানেক টাকার কাজ পাওয়া যায়। আমি একবার বলে দিয়েছি, এখানে কিছু খালি নেই এখন—

—তুই আমাকে যে চাকরিটা দিবি বলেছিলি, সেটা এখন খালি নেই?

অরূপ হঠাৎ দার্শনিক হয়ে উঠে বললো, পৃথিবীতে কোথাও কিছু কি খালি থাকে? নেচার অ্যাভোরস্ ভ্যাকুয়াম!

দীপু একটু ঝাঁঝালো ভাবে বললো, আমি পৃথিবী কিংবা নেচারের কথা জিজ্ঞেস করছি না। আমি জিজ্ঞেস করছি এই অফিসের কথা।

—টু বি ভেরি ফ্র্যাংক, তুই যদি চাকরি নিতে চাস, তাহলে এখনো চাকরি খালি আছে। কিন্তু হিরণ্ময়ের জন্য নেই।

—তুই বড় চালিয়াৎ হয়েছিস, অরূপ। আসলে তোর চাকরি দেবার কোনো ক্ষমতাই নেই। এসব তোর বাবা এখনো কন্ট্রোল করেন। তুই জানিস তো, আমি তোর আন্ডারে চাকরি করবো না, তাই তুই বারবার ও কথা বলতে পারিস!

—তুই একবার রাজী হয়ে দ্যাখ, তোর চাকরি আমি এক্ষুনি ঠিক করে দিতে পারি কিনা।

—তোর যদি সত্যিই ক্ষমতা থাকে, তাহলে তুই হিরণ্ময়কেই চাকরি করে দে। ওকে দেখে মনে হলো, ও বড্ড অসুখী!

—পৃথিবীতে অসুখী লোক ওরকম কত আছে। ওর থেকেও বেশী অসুখী আছে। যাক গে, বাদ দে হিরণ্ময়ের কথা এখন। চা খাবি না কফি খাবি?

—কফি আর কেক।

বেল টিপে আর্দালিকে অর্ডার দিয়ে দিল অরূপ। তারপর ড্রয়ার থেকে সিগারেট কেস বার করে দামী ফিলটার টিপ্‌ড সিগারেট একটা দীপুর দিকে এগিয়ে দিয়ে নিজে একটা ধরালো। প্রথমবার ধোঁয়া ছাড়লো, মুহূর্তের অনামনস্কতা, সঙ্গে সঙ্গে অরূপের মুখখানা বদলে গেল! একটা গাঢ় ছায়া নেমে এলো। আঙুলে দিয়ে টাইয়ের ফাঁসটা আলগা করতে করতে অরূপ বললো, তোর সঙ্গে আমার দেখা করার খুব দরকার ছিল। আমার জীবনে একটা সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটে গেছে।

—কি?

—স্বপ্নার সঙ্গে আমার বিয়ে হচ্ছে না।

—ও হ্যাঁ, এই মাসেই তো তোর বিয়ে হবার কথা ছিল। কেন হচ্ছে না কেন?

—সে অনেক ব্যাপার আছে। দীপু, আমি তোর হেল্প চাই!

[ক্রমশ]

ভারতের অর্থ ব্যবস্থা সম্পর্কে শ্রীমতী হিক্সের অভিমত

বিশ্ববিখ্যাত অর্থ বিজ্ঞানী স্যার জন হিক্সের (Sir John Hicks) পত্নী লেডি জন হিক্স (Lady John Hicks) সরকারী আয়-ব্যয় নীতি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না একজন বিশেষজ্ঞ। ভারতে কর ব্যবস্থা এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে আর্থিক সম্পর্কের উপর তাঁর সাম্প্রতিক কয়েকটি মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। বিশেষ করে আর এক মাস বাদেই যখন কেন্দ্রীয় সরকারের আগামী বাজেট পার্লামেন্টে উত্থাপিত হবে তখন আমাদের উচিত এই বিশ্ববিশ্রুত বিশেষজ্ঞের অভিমত আমাদের কাজে লাগানো যায় কিনা সে সম্পর্কে একটু চিন্তা করা।

কৃষি ক্ষেত্রে বিশেষ করে খামারগুলির উপর কর ধার্য করার আগে জমির নতুন করে জরিপ করা প্রয়োজন বলে অধ্যাপিকা হিক্স মনে করেন। ভূমি রাজস্ব হার নির্ধারণ করার আগে কৃষিগত সম্পদের এবং সব খামারের বর্তমান মূল্য কত তা নিরূপণ করা দরকার; এই জন্যই প্রয়োজন জমি-জরিপ সংক্রান্ত সমীক্ষার (cadastral survey)। কৃষি ক্ষেত্রেই হউক আর অ-কৃষি ক্ষেত্রেই হউক কোন অবস্থাতেই করের হার এমনভাবে ধার্য করা উচিত হবে না যাতে বিনিয়োগ-স্পৃহা বা উৎপাদন বাড়াবার অনুপ্রেরণা বাধাপ্রাপ্ত হয়। "সবুজ বিপ্লব" সম্পর্কে শ্রীমতী হিক্স একটি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন, "The most important thing seems to me is to pay more attention to agricultural output. The Green Revolution is all very nice. but one cannot be very sure of it, unless it stood the test of a couple of bad monsoons." "সবুজ বিপ্লবের" ধারা অব্যাহত রাখতে হলে এমন কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত হবে না যা কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদনের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তাই শ্রীমতী হিক্স সাধারণ কৃষকদের উপর অতিরিক্ত কর ভার চাপানোর বিরোধী। কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়াবার আগ্রহ কৃষকদের মনে অব্যাহত রাখার জন্য তিনি পাঁচ একর পর্যন্ত জমি রাজস্বমুক্ত রাখার সুপারিশ করেছেন। তিনি কৃষি সম্পদের উপর কর ধার্য করারও বিরোধিতা করেছেন। কারণ তার ফলে কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন-প্রচেষ্টার উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। শ্রীমতী হিক্সের মতে সম্পদশালী কৃষকগণ এমনিতেই বেশি কর দিতে বাধ্য হবেন। কারণ তাঁদের সম্পদ যতই বাড়বে, ততই তাঁরা ভোগ-সামগ্রী ক্রয়ের পরিমাণ বাড়াবেন। ভারতে অধিকাংশ ভোগ-সামগ্রীর উপর অন্তঃশুল্ক ধার্য করা হয়েছে। সুতরাং অধিক পরিমাণে অন্তঃশুল্ক দেওয়ার মধ্যে সেই সম্পদশালী কৃষকগণ আরও বেশি করে সরকারকে অর্থ প্রদান করবেন। কৃষকদের মধ্যে যাঁরা কোনও রকমে জীবনধারণ করতে প্রাণান্ত হন (Subsistence farmers), তাঁরা মোটেই অন্তঃশুল্ক প্রদান করেন না।

শ্রীমতী হিক্সের এই যুক্তির সঙ্গে হয়ত অনেকেই একমত হবেন না। অন্তঃশুল্ক তো শহরের অধিবাসীদের আরও বেশি করে দিতে হয়। শুধু অন্তঃশুল্ক বেশি করে দিতে হয় এই যুক্তির ভিত্তিতে ধনী কৃষকদের সম্পদ করের আওতা থেকে বাদ দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না। ভারতে জাতীয় আয়ে কৃষি ক্ষেত্রের অবদান শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি, আর কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলির মোট রাজস্বে কৃষি ক্ষেত্রের অবদান মাত্র শতকরা ২৭ ভাগ, এ কথা ভুললে চলবে না। কৃষক হলেই গরীব হবে এ ধরনের যুক্তি এখন অচল। ফুড কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া এখন বেশ ভাল দামেই খাদ্য সংগ্রহ করে। পাটচাষীরাও ভাল দামেই কাঁচা পাট বিক্রি করে থাকে। এক শ্রেণীর কৃষকের সচ্ছলতা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। কৃষি ক্ষেত্রে আরও কর ধার্য করার অর্থ এই নয় যে গরীব চাষীদের উপর কর ধার্য করতে হবে।

অধ্যাপিকা হিক্স কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে আর্থিক সম্পর্ক বজায় রাখা সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ দিয়েছেন। তাঁর মতে অস্ট্রেলিয়ার ন্যায় ভারতেও একটি স্থায়ী ফিনান্স কমিশন (Finance Commisinon) গঠন করা উচিত। শ্রীমতী হিক্সের মতে রাজ্য সরকারগুলি (একমাত্র সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধি-সম্পন্ন রাজ্য পাঞ্জাব ছাড়া) কৃষি উৎপাদনের মাধ্যমে রাজস্ব বাড়াবার ক্ষেত্রে বিশেষ তৎপর হয়নি; কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনি কেরালা সরকারের প্রশংসা করেছেন। "But Kerala is doing very well", —তাঁর এই উক্তি যে রাজনৈতিক তাৎপর্য বিহীন অথচ রাজ্য সরকারগুলির অর্থ ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহ ব্যঞ্জক তা নিঃসন্দেহে বিচার্য। আয়করের সর্বনিম্ন সীমা কমাবার পক্ষে শ্রীমতী হিক্স মত দেন নি। মদ্যপান নিবারণ ব্যবস্থাকেও তিনি গ্রহণ করেন না; কারণ তার ফলে রাজস্বের ক্ষতি হচ্ছে। রাজ্য সরকারগুলির বিক্রয়-কর ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি ভাল অভিমত দিয়েছেন; তবে তাঁর মতে বিক্রয়-কর ব্যবস্থার প্রশাসন আরও ভাল হওয়া উচিত।

রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়ার বাৎসরিক প্রতিবেদন

১৯৬৮-৬৯ সালের আর্থিক অবস্থা পর্যালোচনা করে রিজার্ভ ব্যাংকের বাৎসরিক প্রতিবেদন এ বছর বেশ দেরীতে প্রকাশিত হয়েছে। সাধারণত, প্রতি বছর আগস্ট অথবা সেপ্টেম্বর মাসে রিজার্ভ ব্যাংকের Report on Currency and Finance বেরিয়ে থাকে। কিন্তু ১৯৬৮-৬৯ সালের প্রতিবেদনটি বেরিয়েছে ১৯৭০ সালের ১৬ জানুয়ারী তারিখে। রিজার্ভ ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৯৬৮-৬৯ সালের বৈশিষ্ট্য ছিল খাদ্য-সামগ্রী উৎপাদনের উচ্চ হার বজায় রাখা, শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য পুনরুজ্জীবন এবং বৈদেশিক মুদ্রা তহবিলের লক্ষণীয় উন্নতি। ১৯৬৮-৬৯ সালে জাতীয় আয় বেড়েছিল শতকরা ৩ ভাগ এবং মুদ্রা সম্পদের সরবরাহের পরিমাণ বেড়েছিল শতকরা ১১ ভাগ। বছরের শেষ দিকে মূল্যস্তরের অবস্থা আশংকার দিকে গেলেও অধিকাংশ সময়েই মূল্যস্তরের পরিবর্তন বেশি চোখে পড়েনি। ১৯৬৮-৬৯ সালের আগে পর পর চার বছর জিনিসপত্রের দাম সবসময়ই ঊর্ধ্বমুখী ছিল, কিন্তু এই বছরেই দাম বেড়ে যাওয়া প্রতিরোধ করা হয়েছিল। জিনিসপত্রের দাম যতটা বেড়েছে তার অধিকাংশই ঘটেছে শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদিত দ্রব্যে; কিন্তু খাদ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে দাম কিছু পরিমাণে কম ছিল। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৯৬৮-৬৯ সালেও মুদ্রার পরিমাণ বেড়ে যাবার হার কমে গিয়েছিল। ১৯৬৮-৬৯ সালে মুদ্রার পরিমাণ ৮ শতাংশ বেড়েছিল। বিকল্পভাবে বলা যেতে পারে, ১৯৬৬-৬৭, ১৯৬৭-৬৮ এবং ১৯৬৮-৬৯ সালে যথাক্রমে ৪১২ কোটি টাকা, ৪০০ কোটি টাকা এবং ৪২৯ কোটি টাকা নতুন সৃষ্ট হয়েছিল। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির আমানত এবং প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ উভয়ই ১৯৬৭-৬৮ সালের চেয়ে বেশি হয়েছিল। ১৯৬৭-৬৮ সালে ব্যাংকগুলির মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৪১১ কোটি টাকা; ১৯৬৮-৬৯ সালে তার পরিমাণ হয়েছিল ৪৮২ কোটি টাকা। ১৯৬৭-৬৮ সালে ব্যাংকগুলি মোট ৩৩৯ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছিল; ১৯৬৮-৬৯ সালে তার পরিমাণ ছিল ৩৬৩ কোটি টাকা। কিন্তু ১৯৬৬-৬৭ সালে ব্যাংকগুলি থেকে ঋণ পাওয়া গিয়েছিল মোট ৪০৬ কোটি টাকার।

সুব্রত গুপ্ত

ব্রিটিশ কাউন্সিল সম্প্রতি অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে খ্যাতনামা ভাস্কর শিল্পী বারবারা হেপওয়র্থ-এর একটি ভাস্কর্য প্রতিলিপি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রদর্শনীতে পাঁচটি ছোট ভাস্কর্য নিদর্শন ও পাঁচটি ড্রয়িং ছাড়া ৩৭টি ভাস্কর্য কাজের বিভিন্ন স্থিরচিত্র দেখা যায়।

সমসাময়িক ভাস্কর্য শিল্পক্ষেত্রে বারবারা হেপওয়র্থ একটি উল্লেখ্য নাম। এই মহিলা ভাস্কর ১৯০৩ সালে ওয়েক-ফিল্ড শহরে জন্মগ্রহণ করেন ও লীডস আর্ট স্কুল ও লণ্ডনের রয়াল আর্ট কলেজে শিল্প শিক্ষালাভ করেন। ১৯৩৭ সালে লণ্ডনে তাঁর প্রথম একক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়, নিউ ইয়র্কে হয় ১৯৪৯ সালে। ১৯৬৮ সালে টেট গ্যালারী তাঁর সমসাময়িক ভাস্কর্য শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। খ্যাতনামা ভাস্কর হিসাবে দেশে ও বিদেশে তিনি বহু ভাস্কর্য কাজ করেছেন—তাদের মধ্যে কনট্রাপন্টুয়েল ফর্মস (হার্লো নিউ টাউন, এসেক্স—১৯৫১), উইংগড ফিগার (জন লিউইস পার্টনারশিপ লিঃ, লণ্ডন, ১৯৬৩), ও সিংগল্ ফর্ম (ডাগ হ্যামারশোল্ডের স্মৃতিকল্পে—ইউনাইটেড নেশনস, নিউ ইয়র্ক, ১৯৬৪) উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া অ্যাবারডিন, বার্মিংহম, লীডস, ব্রিস্টল, ম্যাঞ্চেস্টার, ওয়েকফিল্ড এবং ইউরোপ ও আমেরিকার বহু মিউজিয়ামে তাঁর ভাস্কর্য নিদর্শন দেখা যায়। ১৯৩১ সালে লীডস্ শহরে তিনি খ্যাতনামা ভাস্কর হেনরী মূর-এর সংস্পর্শে আসেন ও তারপর থেকে তিনি সোজা কাঠ ও পাথর স্তূপের ওপর খোদাই কাজ করে ভাস্কর্য শিল্পের নানা নিদর্শন গঠন করতে শুরু করেন। পরে তাঁর কাজে বিখ্যাত ভাস্কর ব্রাঙ্কুসির প্রভাবও দেখা যায়। তাঁর ভাস্কর্য শিল্পের বৈশিষ্ট্য হল নেগেটিভ ফর্মের ওপর প্রাধান্যদান—অর্থাৎ নীরেট কাঠ বা পাথর স্তূপকে কেটে বা খোদাই করে তিনি ভাস্কর্য শিল্পের বিশেষ তাৎপর্যটুকু ব্যাখ্যা করেন। অবশ্য এই প্রসঙ্গে আর্কিপেঙ্কো-র নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—তিনিও নেগেটিভ ফর্মের ওপর বিশেষ গুরুত্বদান করেন।

প্রদর্শনীতে ১৯৩৭ সাল থেকে শুরু করে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত গঠিত নানা ভাস্কর্য নিদর্শনের স্থিরচিত্র দেখা যায়। প্রধানত তিন শ্রেণীর ভাস্কর্য গঠন কৌশল চোখে পড়ে। প্রথম, দীর্ঘ ও লম্বমান নানা বিমূর্ত আকার। এগুলির অধিকাংশই আকারে বিরাট ও উন্মুক্ত স্থানে রাখার উপযোগী। এগুলির স্থিরচিত্র দেখে বোঝা যায় যে ভাস্কর সুদীর্ঘ, ভারী ও নীরেট কাষ্ঠস্তূপ বা প্রস্তর খণ্ডের ওপর প্রয়োজনমত খোদাই করে করে নানা বিমূর্ত আকার গঠন করেছেন এবং প্রয়োজনমত প্রায় সব ক্ষেত্রেই মাধ্যমের চাহিদা অনুযায়ী আকারের আন্তর্জনিক সঙ্গতি ঘটিয়েছেন। প্রত্যেক কাজেই তিনি ছোট বা বড় নানা হলো অর্থাৎ গর্ত সৃষ্টি করেছেন ও নেগেটিভ ও পজিটিভ ফর্মের সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই তিনি বিমূর্ত রূপসৃষ্টি করেছেন। পরিকল্পনা ও গঠন কৌশলের দিক থেকে এগুলি অপূর্ব। মৌলিক নিদর্শন দেখা না গেলেও বিভিন্ন স্থির চিত্রগুলি লক্ষ্য করলে এই মহিলা ভাস্করের অদ্ভুত প্রতিভা ও খোদাই কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। দেখে স্পষ্ট মনে হয় যে, যে যে স্থানে ভাস্কর ছোট বড় নানা হলো সৃষ্টি করেছেন সেখানে সেগুলি না থাকলে যেন সত্যিই আকারের কোনও তাৎপর্য চোখে পড়ত না। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই টু ফিগারস (১৯৪৫)-র নাম করা যায়। পাশাপাশিভাবে রাখা লম্বমান দুটি আকার—বাঁদিকের আকারটিতে তিন স্থান খোদাই করে ভাস্কর তিনটি হলো সৃষ্টি করেছেন এবং পাশের আকারটিকে অন্যভাবে খোদাই করে মধ্যস্থলে ঈষৎ লম্বমান হলো। করে দুটি আকারের পরস্পর নির্ভর একটি সামগ্রিক আকার তথা রূপের সৃষ্টি করেছেন। এই সঙ্গে টু ফর্মস ইন এচেলন (১৯৬১)-রও নাম করা চলে। দ্বিতীয় পর্যায়ের গঠনরীতিতে এক দুর্বার গতিবেগের পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলির অধিকাংশ ধাতুর পাতে ডিম বা বৃত্তাকারে গঠিত—যেমন ওভাল স্কালপচার (১৯৪৩) বা স্প্রিংগড্ ফিগার (১৯৫৬)। প্রথমটিতে গতিবেগ ও দ্বিতীয়টিতে যেন সংগীত-যন্ত্রের বিশেষ কোনও প্রতীকের ছন্দরূপ ফুটে উঠেছে। তৃতীয় শ্রেণীর নিদর্শনে চোখে পড়ে গঠন শৈলীর নিছক সরলতা।
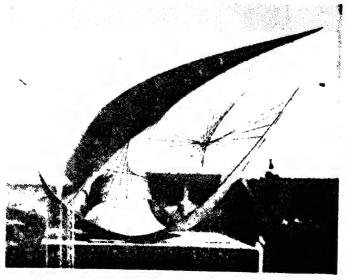
স্প্রিংগড ফিগার —বারবারা হেপওয়ার্থ

নীরেট-কঠিন কাঠ বা পাথরের স্তূপকে সোজাভাবে দাঁড় করিয়ে রেখে তিনি তারই মধ্যে ওপরে, পাশে বা নীচে, ছোট একটি মত্র হলো সৃষ্টি করে অপূর্ব বিমূর্ত আকার সৃষ্টি করেছেন। দেখে মনে হয়—এই! এ ত' অতি সহজ! অথচ মজার ব্যাপার এই যে, এই সহজ সরল একটি আকারের মধ্যে ঠিক কোন স্থানে ও কতটুকু হলো সৃষ্টি করা উচিত—সেটা অনেকেই কল্পনা করতে পারেন না। যেমন সিংগল ফর্ম (ব্রোঞ্জ—১৯৬১-২) বা ছোট্ট মৌলিক ব্রেঞ্জ নিদর্শন ইজিয়ন (১৯৫৬)। যাঁরাই ছোট কাজটির ছোট্ট হলোটুকু ভাল করে দেখেছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন যে মায়াময় চোখ জাতীয় এই ছোট্ট হলোটি যেন নানাভাবে তাঁদের ধরে রাখতে চায়। প্রদর্শনীর প্রত্যেকটি নিদর্শনই দেখার মত ও দেখে শেখার মত। বিশেষ করে তরুণ ভাস্করগণ প্রদর্শনীটি দেখে লাভবান হবেন সন্দেহ নেই। এটির আয়োজন করে ব্রিটিশ কাউন্সিল সকলের ধন্যবাদ ভাজন হলেন।

*

শিল্পী শ্রীমতী রেবা হোড় সম্প্রতি কেমল্ড গ্যালারীতে তাঁর প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। আমাদের দেশে মহিলা শিল্পীর সংখ্যা অল্প—কৃতী তথা সুপরিচিত শিল্পীর সংখ্যা আরও কম। প্রতিষ্ঠিত মহিলা শিল্পীর একান্ত ছোট মহলে শ্রীমতী রেবা হোড় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। কলকাতার সরকারী আর্ট কলেজে শিক্ষালাভ করার পরে তিনি নানাস্থানে প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন ও জাতীয় পুরস্কারও লাভ করেন। প্রদর্শনীতে তেল রঙে আঁকা ১৪টি রচনা দেখা যায়।

শিল্পীর সাম্প্রতিকতম কাজের বৈশিষ্ট্য হল তাঁর রঙ ব্যবহারের প্রণালী। মনে হয় রঙের পাত্রটি নানা উজ্জ্বল রঙে পরিপূর্ণ রেখে বিভিন্ন রঙে ব্রাশ প্যাচুলা ডুবিয়ে তিনি একের পর একটি কমপোজিশন রঙের মায়াজালে ঘিরে ফেলেছেন। তাঁর অংকন রীতি সমবিমূর্ত, কিন্তু দেখে বোঝা যায় যে তাঁর রচনায় রঙই প্রধান উপজীব্য বস্তু। রচনায় সমবিমূর্তভাবে আকার ফুটে উঠলেও শিল্পী যেন আকারকে প্রধান দেন নি—বিভিন্ন রঙের ছোট, বড়, সোজা বা আঁকা-বাঁকা টানের মধ্য দিয়েই তিনি সমবিমূর্ত আকার সৃষ্টি করেছেন—শুধু তাই নয়, কয়েকটিতে প্যাচুলার সূক্ষ্ম অঙ্কন বা ব্রাশের সূক্ষ্ম [illegible] প্রয়োজনমত ব্যবহার করে সুফল লাভ করেছেন। লাল, নীল, বেগুনী, হলুদ ও সবুজ রঙ ব্যবহার গুণে দেখে বোঝা যায় যে কেবলমাত্র রঙের মধ্য দিয়ে তিনি বক্তব্যটুকু ব্যাখ্যা করতে পারেন। আর একটি গুণ—পরিচ্ছন্নতা—[illegible] ছোট বড় [illegible] প্রায় প্রত্যেক রচনা [illegible] [illegible] উদাহরণ হিসাবে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লাল, নীল ও সবুজ রঙ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে শিল্পী উৎসব ও উৎসবে [illegible] [illegible] জনজীবনের আনন্দ উচ্ছলতা সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। এটিতে ইমপ্যাস্টো প্রথায় রঙ ব্যবহার লক্ষণীয়। কয়েক স্থলে কেবলমাত্র চার পাঁচটি বৃত্তকে প্রতীকরূপে অবলম্বন করে তিনি তাঁর বক্তব্য পরিস্ফুট করেছেন—যেমন চিত্রকুন। এই [illegible] একটি ছোট্ট রচনাও চোখে পড়ে [illegible] [illegible] মনে হয় লাল ও সবুজ রঙ [illegible] পটভূমি থেকে যেন একটি আবছা মূর্তি ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছে। আর একটি ছবিরও উল্লেখ করা চলে [illegible]। নীল ও গাঢ় বেগুনী রঙের পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে আঁকা আল্ট্রামেরাইন নীল রঙের তিনটি মূর্তি মনের পটে দাগ কাটে। অপরাপর ছবির মধ্যে উত্থান ও গ্রুপ-এর নাম করা যায়। তবে বিভিন্ন রঙের ছোট ছোট প্রলেপের ফলে কয়েক ক্ষেত্রে কিছু পৌনঃপুনিকতার আভাষ পাওয়া যায়—ফলে দু একটি রচনার মধ্যে চিন্তাধারা বা রঙ ব্যবহার কৌশলের কোনও পার্থক্য চোখে পড়ে না।

চিত্রপ্রিয়

বৈশাখের ঠাঠা রোদে, গরমের তীব্রতা গড়ের মাঠের তাঁবুগুলোর ভেতর নিঃসন্দেহে বাইরের চেয়ে দ্বিগুণ। খেলা পাঁচটায়, কিন্তু জান বেরিয়ে যাওয়া সেই অসহ্য গুমোট পরিবেশে দাশগুপ্তকে দেড়টা থেকে শরীর এলিয়ে শুয়ে থাকতে দেখে প্রশ্ন করলাম, "কি ব্যাপার, আজ যে দারুণ লড়বে বলে মনে হচ্ছে।" মুচকি হাসল দাশগুপ্ত। কিন্তু মাঠে নামবার সময় টীমে দাশগুপ্তকে না দেখতে পেয়ে আমরা সবাই অবাক। শুনলাম আনফিট বলে শেষ মুহূর্তে ও নিজেই খেলতে চাইল না। অনুশীলনে ওর শারীরিক ফিট্‌নেস ও সাহস দেখে ওর খেলার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কারোরই এতটুকু সন্দেহ ছিল না। কিন্তু খেলার মাঠে ওর নার্ভাসনেস আমাদের রীতিমত ভাবিয়ে তুলত। ওর এই বিপরীত ব্যবহার আমার কাছে ছিল বিস্ময়ের ব্যাপার।

এই জাতীয় মানসিক দুর্বলতাকে ডাক্তার গ্রাহাম হোয়ে নাম দিয়েছেন 'সাইকিক হ্যামারেজ'। ফুটবলার কিংবা এ্যাথলীটস ছাড়াও ছাত্র, শিক্ষক, অভিনেতা, বক্তা ও গায়ক প্রায় সকল শ্রেণীর ভেতরেই এ জাতীয় রোগে অনেকেই ভুগে থাকেন।

আর এক উপসর্গ ম্যাচের আগে ফুটবলারদের ভেতরে দেখতে পাওয়া যায়—অনিদ্রা, ক্ষুধামান্দ্য, বমিবমি ভাব এবং ডায়রিয়া। ইংরাজিতে একে বলা হয় 'সাইকো-সোমাটিক-ডিসঅর্ডারস'। ফুটবলারের দেহে এবং মনে এর উৎপত্তি অবশ্য ভয় এবং কোনো অজানা ফলাফলের উদ্বেগ থেকেই উঠে আসে। অল্পাধিকরে এ রোগে পৃথিবীর সব ফুটবলাররাই ভোগে। ... বাড়াবাড়ি হলেই ফুটবলারের ভবিষ্যৎ জীবন অন্ধকার।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে এই ক্ষতিকর মানসিক অবস্থাকে ফুটবলারদের পক্ষে সংযত করা কি সম্ভব? এর উত্তরে আজকের স্পোর্টস-বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ধৈর্য সহকারে নিয়মিত অনুশীলনে অনায়াসেই তা সম্ভব। এ সমস্যা সমাধানের প্রধান দুটো উপায় হল (১) মনের দ্বারা শরীরকে আয়ত্তে রাখা। (২) পেশীকে শিথিল করে, অতি-পরিশ্রান্ত মস্তিষ্ককে আলগা হতে দেওয়া।

(১) জীবনের আর সব আদর্শের সংগে ফুটবলারকে আরও একটা মহৎ আদর্শ তার সমগ্র সত্তায় জড়িয়ে রাখবার চেষ্টা করতে হয়। সেটা হল—খেলার হার কিংবা জিতকে খুব সহজে মেনে নেওয়া। লক্ষ্য রাখতে হয় পরাজয়ের বেদনা যেন তার সত্তাকে মুচড়ে না দেয়। তেমনি জয়ের উল্লাস তার অহংকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ফানুসের মত না করে তোলে। এ দুটোর কোনোটার বাড়াবাড়ি হলে সৃজনশীল মন তার ভারসাম্য হারাবে এবং নিঃসন্দেহে ফুটবলারের পক্ষে তা ভীষণ ক্ষতিকর। তাই শান্ত মন এবং দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে ফুটবলারকে মাঠে নামতে হয়। **এছাড়া: এই হারজিতের বাইরে, খেলার নিজস্ব একটা নৈর্ব্যক্তিক আনন্দ আছে—যা খেলোয়াড়ই কেবল ছুঁতে পারে। খেলার বাইরের কারও পক্ষে তা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।**

কিছু কিছু ফুটবলারের বদ অভ্যাস
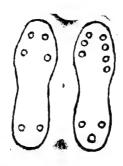
আছে খেলার সময় উত্তেজিত স্বরে স্ব-খেলোয়াড়দের ধমকানো বা নির্দেশ দেওয়া। এতে তার নিজের খেলার যেমন ক্ষতি হয়, সেই সংগে সংগে সমস্ত দলেরও সে ক্ষতি করে। ফুটবলারের মনে রাখা উচিত যে তীব্রগতির এই ফুটবল খেলায়, খেলা চলাকালীন নতুন কোন চিন্তা বা অপরের নির্দেশ গ্রহণ করবার ক্ষমতা ফুটবলারের মস্তিষ্কে থাকে না। সে শুধু আগে শেখার এবং অভ্যাসেরই পুনরাবৃত্তি করে। তাই অনুশীলনের সময়ে ফুটবলারের উচিত কথা যত কম বলা, মন সেইদিকে নজর রাখা এবং ম্যাচের সময় নিজের খেলোয়াড়দের ধমক না দিয়ে—উৎসাহ দেওয়া।

(২) এ পৃথিবীর সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে একটা বিশেষ ছন্দে। গতির সংগে বিশ্রামের সংযোজনেই এই ছন্দের সৃষ্টি।

একটা মটরগাড়ি কিংবা রেলের ইঞ্জিনও একনাগাড়ে ছুটে চলতে পারে না। কিছুদূরে যাবার পর তাকে বিশ্রাম দিতে হয়। না হলে আপনা থেকেই সে অচল হয়ে যাবে। এক-টুকরো লোহাকেও যদি ক্রমাগত হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করা যায়, তাহলে একটা সময় আসবে যখন সেই লোহাও ভেঙে দু টুকরো হয়ে যাবে। আমাদের শরীরের হৃদপিণ্ড যা জন্মলগ্ন থেকে মৃত্যুর ক্ষণ পর্যন্ত একটানা ধুকধুক করে খেটে চলেছে, তাকেও এই ছন্দ মানতে হয়।

শরীর এলিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকাকে যদিও সাধারণভাবে বিশ্রাম বলা হয়, কিন্তু ফুটবলারের পক্ষে শুধু এইটুকুই যথেষ্ট নয়। কেননা পেশী ও স্নায়ুর প্রচণ্ড উদ্দীপনার হাত থেকে সে শুয়ে থাকলেও, সম্পূর্ণ মুক্তি পায় না। এই উদ্দীপিত পেশী ও স্নায়ুকে সংযত করবার জন্য যে মানসিক প্রচেষ্টার অনুশীলন করতে হয়, তাকে ডাক্তার জ্যাকসন নাম দিয়েছেন 'প্রোগ্রেসিভ মাসকুলার রিলাক্সেসন'। প্রথমে পায়ের ওপর এর পরীক্ষা করতে হয়। শরীরকে সম্পূর্ণ এলিয়ে দিয়ে শুয়ে (ঘর অন্ধকার হলে ভাল হয়) মনে করতে হবে বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলটা আমার শরীরে নেই। কিছুক্ষণ পরে ওই জায়গাটার সাড় চলে যাবে। এবং আবার ঐ পায়ের অংশটা নাড়াবার চেষ্টা করতে গেলেই 'টেন্‌সন' বা উদ্দীপনা সম্বন্ধে ফুটবলারের মোটামুটি একটা ধারণা তৈরি হবে। এবং সেই সংগে তৈরি হবে পেশী কতটা এনার্জি গ্রাস করে তার জ্ঞান। এবং এইভাবে অনুশীলনের দ্বারা ধীরে ধীরে ফুটবলার শিখতে পারবে কি করে একে এড়ানো যায়। এ অবশ্য প্রথম প্রথম খুব কঠিন লাগবে। কিন্তু মনের জোর দিয়ে নিয়মিত অভ্যাস করলে ছ' মাস পরেই সমস্ত শরীরের প্রধান প্রধান পেশীগুলির

ওপর তার দখল আসবে। প্রথমে পা, তারপরে কোমর, বুক হাত হয়ে চোখ, কান ও কণ্ঠের ছোট ছোট পেশীগুলোর ওপরও অভ্যাস করতে অসুবিধা হয়। তাই যদি সম্ভব হয় একটু বেশী দামে ভাল চামড়ার বুট কিনলে এই বাড়া-কমার অসুবিধায় ভুগতে হয় না বা কড়ার জন্য কষ্টও পেতে হয় না। এবং টেঁকেও বেশীদিন।

বুটের মাপ দেবার সময় অথবা কেনবার সময় দেখতে হবে পায়ের পাতা যেন চেপে না থাকে। অর্থাৎ পায়ের আঙুল যেন সহজভাবে নাড়ানো যায়। গোড়ালি কিন্তু টাইট থাকবে। অনেকে খুব নীচু (অনেকটা এ্যাথলীটসদের রানিং শুয়ের মত) গোড়ালির বুট পরে। তাতে সমস্ত শরীরের ওজন পায়ের পাতার ওপর এসে পড়ে—যা ফুটবলারের পক্ষে ক্ষতিকর। এছাড়া খেলবার সময় প্রায়ই পা থেকে বুট খুলে বেরিয়ে যাবার সম্ভাবনাও রয়েছে।

ছ'টি 'স্টাড' লাগানো বুট পরে যদিও প্রায় এদেশের সব ফুটবলাররাই খেলে, তাহলেও শুকনো মাঠে এর একটা বিশেষ অসুবিধা এই যে চারটি স্টাডের ওপর দেহভার পড়ার প্রায়ই খেলাচলাকালীন অবস্থায় স্টাড উঠে যায়। এতে ফুটবলারেরও বিশেষ অসুবিধা হয়। সেই তুলনায় শরীরের ওজন চারিয়ে যায় ঘোড়ার ক্ষুরের আকারে সামনে দিকের ৭টি স্টাডে। পায়ের পেশী, বিশেষ করে পায়ের গুলি এতে বিশেষ আরাম পায়। স্টাড খুলে যাবার সম্ভাবনাও খুব কম।

ফুটবলারের ক্রেপ ব্যানডেজ অথবা অ্যাংকলেট ব্যবহার করা উচিত নয়। অ্যাংকেল যদি সহজভাবে চারদিকে না ঘুরতে পায়, তাহলে জোরে ছোটা, শুটিং, ড্রিবলিং এবং ফুটবলের সূক্ষ্ম কাজগুলি কিছুতেই করা সম্ভব নয়। তাই ফুটবলারের মনে রাখা দরকার যে অ্যাংকলের চোট ছাড়া কিছুতেই এই সব পরা উচিত নয়। শুধু সিনগার্ড সব সময় ব্যবহার করা যেতে পারে।

ল্যাঙট অথবা সাসপেনসার ব্যবহার করলে হয়। এবং এই সবগুলিতে দক্ষতা এলে খেলার সময়তেও যে পেশীর প্রয়োজন লাগছে না, তাকে বিশ্রাম দিতে পারে। সেই সঙ্গে বিরতির সময় ৫ মিনিটের ভেতরেই দ্বিতীয়ার্ধের জন্য দ্রুত পেশীর এনার্জি পুনরায় সঞ্চয় করে নিতে পারে।

বুটঃ—আমাদের দেশের অধিকাংশ ফুটবলারই খেলা অথবা অনুশীলনের পর বুটকে কাদামাখা অবস্থায় ফেলে রেখে দেয়। পরের খেলার আগে, বুটের চামড়া যখন শক্ত হয়ে ওঠে, পায়ে দিতে লাগে তখন বুটকে আচ্ছা করে জল দিয়ে ভিজিয়ে নরম করে মাঠে খেলতে নামে। এর ফলটা অবশ্য একান্তই সাময়িক। কয়েক মিনিট পরেই হাওয়া ও রোদ লেগে বুটের চামড়া আবার সেই আগের মতই শক্ত হয়ে যায়। ফুটবলারকে এ ব্যাপারে বিশেষ করে মনে রাখতে হবে খেলার প্যান্ট, সাসপেনসর মোজা ও ইউনিফর্ম যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে তেমনি বুটেরও বিশেষ যত্ন নিতে হবে। কেননা এই বুটই তার ভাল খেলার প্রধান অবলম্বন। বুটের কাদা ছুরি দিয়ে না চেঁচে, জলে ধুয়ে, ভেতরে খবরের কাগজ পুরে হাওয়ায় শুকোতে দিতে হবে। রোদ অথবা আগুনে শুকোলে চামড়া তার নমনীয়তা হারাবে। বুটের উপর ভাগে নিয়মিত কালি এবং তলায় চর্বি অথবা গ্রীজ ব্যবহার করা উচিত। বাজারে সস্তাদরে যে ফুটবল বুট পাওয়া যায়, তা অতি অল্পদিনেই ছেঁড়ে। একটু জল লাগলেই পায়ে হল হল করে। আবার শুকিয়ে গেলে গুটিয়ে পায়ের তুলনায় ছোট হয়ে যায়। এবং এগুলো প্রায় কাঁচা চামড়া দিয়েই তৈরী হয় বলে এবং 'টাইট ফিটিংয়ের' জন্য পায়ের আঙুলে কড়া পড়ে। এবং এই কড়ার জন্য ফুটবলারের খেলতেও বিশেষ কোমরের স্বচ্ছন্দ গতিবিধিতে যথেষ্ট আড়ষ্টতা আনে। কাজেই কেউ যদি সাহস করে, এইসব না পরে খেলে, তাহলে ফুটবলারের খেলার যথেষ্ট সুবিধা হবে। অসুবিধার কোন ভয় নেই।

ল্যাঙট ব্যবহারে দেখা গেছে, এ শুধু কোমরকে অবথা আড়ষ্টই করে না, জঙ্ঘার দুপাশে ঘায়ের সৃষ্টি করে। এবং এ নিয়েই খেলতে হয় বলে ঘা কিছুতেই শুকোতে চায় না। সাসপেনসার সেই তুলনায় ঘায়ের সৃষ্টি কম করে। এবং এই সাসপেনসার ক্ষেত্রে রোদে শুকোতে না দিয়ে সব সময় হাওয়ায় শুকিয়ে নিতে হয়।

আমাদের এই গরম ঘাম-প্যাচপ্যাচ আবহাওয়ায় কি খেলায়, কি অনুশীলনে এমন ইউনিফর্ম ব্যবহার করতে হবে, যার ভিতর দিয়ে বাইরের বাতাস শরীরের ভিতরের ঘাম শুষে নিতে পারে। কাজেই সব সময় গেঞ্জি জাতীয় জিনিসের ইউনিফর্ম ব্যবহার করা উচিত। বিরতির সময় কোন খেলোয়াড় যদি এই ইউনিফর্ম বদল করে শুকনো ইউনিফর্ম পরে দ্বিতীয়ার্ধে খেলতে নামে তাহলে শরীরের দিক থেকে সে অনেক বেশী স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করবে।

খুব ভাল ফল করছে এবং গান-বাজনাও শিখছে। আমরা সবাই প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মশাই-এর কথা জানি। তিনি নিজের হাতে রান্না করতেন, বাসন মাজতেন, আবার রাস্তার আলোয় পড়াশুনো করতেন। এত সব কষ্ট আর বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও সে ভদ্রলোক আমাদের কারুর চেয়ে কম লেখাপড়া শেখেন নি! বিদ্যায় বুদ্ধিতে সবাই বিদ্যাসাগর না হলেও, এ রকম কষ্ট করেও লেখাপড়ায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করার ঘটনা মোটেই বিরল নয় জগতে। অনেক অবস্থাপন্ন মা বাবা মনে করেন, তাঁদের মেয়ে কি দুঃখে "চাকর বামুনের কাজ" করতে যাবে? মেয়ের হাতে হলুদের ছোপ লেগে যাবার আতঙ্কে তাঁরা অস্থির হন। কিন্তু মানুষের অবস্থার চেয়ে অনিত্য বস্তু সংসারে আর কি আছে? কত রাজার মেয়ে ভিখারিনী, হচ্ছে, এ তো জগতের নিয়ম। অবস্থা ভাল হওয়া সত্ত্বেও ঘরের কাজকর্ম জানলে সে তো গৌরবের কথা। বাড়িতে চাকর বামুন থাকতেও যে গৃহিণী গৃহস্বামীকে বা ছেলেমেয়েকে নিজের হাতের রান্না পরিবেশন করতে পারেন তিনি সংসারের সত্যিকারের গৃহিণী আর তিনি সুখী। লোকজন বা পাচক বামুনের হাতে একেবারে অসহায় হয়ে থেকে তাদের অভাবে চোখে সরষের ফুল দেখার মধ্যে আভিজাত্য কতখানি আছে জানি না, তবে লজ্জা এবং কৌতুকের খোরাক সত্যিই অনেকখানি আছে। আমরা দেশকে স্বাবলম্বী করার জন্যে কত বড় বড় বুলি আওড়াই, বই লিখি আর কত হইচই কাণ্ডই না করি! কিন্তু নিজের মেয়ে বা ছেলেকে স্বাবলম্বী করতে আমাদের যত আপত্তি। তাদের একেবারে অসহায় আর পরমুখাপেক্ষী করে রাখার জন্যে আমাদের চেষ্টার অন্ত নেই।

নিজের কাজ নিজে করে নিয়ে স্বাবলম্বী হতে পারলে তার চেয়ে বড় সম্মান আর কি আছে? আমাদের দেশে সেই প্রাচীনকালে আশ্রম ধর্ম পালনের মধ্যে দিয়ে কি এই শ্রমের মর্যাদা দিতেই শেখানো হয়নি? রাজার ছেলেকেও মুনির আশ্রমে থাকতে হয়েছে, সেখানে কঠোর জীবন যাপন করতে হয়েছে। যতদূর জানি, সারাদিন কাজকর্মের পরে রাজকুমারদের গা-হাত-পা টিপে দেবার জন্যে বোধ হয় ঋষি ঠাকুরের আশ্রমে কোনো চাকরের বন্দোবস্ত ছিল না। আমি দেখেছি, ছোটরা মোটেই কর্মবিমুখ বা অলস নয়। তারা কাজ করতে চায়, দায়িত্ব দিলে খুশী হয়। ছোটবেলা থেকে তাদের এই শিক্ষা দেওয়া উচিত যে পড়ালেখা বা গানবাজনা শেখার মত ঘরের কাজকর্ম করাটাও একটা দৈনন্দিন কর্তব্য। মা বাবার মত সংসারে তাদেরও দায়িত্ব আছে। এতে ছোটবেলা থেকে তারা কাজ করাকে অপমানজনক বা হীনতাসূচক কিছু বলে ভাবতে পারে না। সংসারের প্রতি, মা বাবার প্রতি, ভাইবোনেদের প্রতি তাদের আকর্ষণ বাড়ে, ছোটবেলা থেকে স্বাবলম্বী হলে আত্মবিশ্বাস বাড়ে। ভবিষ্যৎ জীবনে কোনো বড় দায়িত্ব নিতেই তারা সংকোচ করে না বা ভয় পায় না। তা ছাড়া বাড়ির প্রত্যেকেই যদি নিজের নিজের কাজকর্মের কিছু কিছু ভার নেয় তাহলে স্বভাবতই গৃহিণীর ওপর সব চাপ পড়ে না এবং তাঁকেও "সর্বংসহা" হতে হয় না। এতে সংসারেরও মঙ্গল কারণ ভাঙা স্বাস্থ্য নিয়ে গৃহকর্ত্রী সকলের বোঝাস্বরূপ হয়ে থাকলে কারুরই আনন্দের কারণ হয় না। তাছাড়া আজকালকার আর্থিক সংকটের দিনে লোকজনের বাড়াবাড়ি কমলে সুরাহা হয় অনেকখানি। সত্যি যে, শ্রমের মর্যাদা না বুঝলে ছেলেমেয়ে কোনোদিনই নিজেকে সুস্থ বা স্বাধীন নাগরিক বলে ভাবতে পারবে না।

শ্রীমতী

কেমন ভিজে ভিজে—ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে। পশ্চিম দিকের কাঁঠাল গাছটার পাতা বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। আর নীচেকার শুকনো পড়ে থাকা পাতাগুলোর ওপর পড়ে টস্‌ টস্‌ শব্দ হচ্ছে। চোখ বুজে শব্দটা শুনলে অনেকটা, বৃষ্টি শেষে পাতা বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ার মতো। চোখ জ্বালা করছে গৌতমের। কি যে ছাই-ভস্ম স্বপ্ন! আজকাল মাঝে মাঝেই সে স্বপ্ন দেখছে। আগে যে একেবারেই দেখত না, এমন নয়। তবে সেগুলো ঘুম ভাঙার পর অথবা এক-আধদিন পর প্রায় কিছুই মনে থাকত না। কিন্তু এখন সে প্রায়ই দেখে। এমন কিছু স্বপ্ন নয়—আজকের মতো। এই সব স্বপ্ন-টপ্নের একটা মোটামুটি ব্যাখ্যা সে অনায়াসে দাঁড় করাতে পারে—এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। কিন্তু ব্যাখ্যার চেয়ে ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে বেশী। তার বিরক্তি লাগল ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে—ভীষণ বিরক্তি।

"তুমি কখন উঠলে? এত ভোরে!"

মালার সদ্য ঘুম ভাঙা ফোলা ফোলা মুখের দিকে সে তাকাল। চুলগুলোও মালার ফেঁপে ফুলে আছে। একটা হাই তুলল ও। তারপর একটু কাছে এগিয়ে এল। আবার জিজ্ঞেস করল, "কখন উঠলে?"

"অনেকক্ষণ।"

"কেন, রাতে ঘুম হয়নি?"

"কি জানি কেন, ঘুমটা ভেঙে গেল।"

"শরীর খারাপ লাগছে না তো?"

"না না।"

মালা ভেতরে চলে গেল।

গৌতমের খারাপ লাগল, সকালের প্রথম কথাটা মিথ্যা বলল বলে। অথচ এর কিছু দরকার ছিল না। তবু সে নির্বিকারে মিথ্যে বলল। এতে তার কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হল না। চিন্তারও লাঘব হল না। স্বপ্নের উৎপাতটা যে বন্ধ হবে, তাও তো মনে হয় না।

সে একজন তরুণ লেখক। মানে, মাঝে-মধ্যে এক-আধটা মনস্তাত্ত্বিক গল্প লেখে। কিছু কিছু লেখক ও ছোটখাট পত্র-পত্রিকার সম্পাদক তার বন্ধু বলে মাঝে মাঝে তার গল্প ছাপায়; তাই সে লেখক। সে এই স্বপ্নের একটা সুষ্ঠু না হোক, মোটামুটি ব্যাখ্যা অন্তত দাঁড় করাতে পারে। কিন্তু করতে ভাল লাগল না। মনে হল, অযথা মাথায় কতগুলো জট পাকানো। একেই তো কিছুদিন ধরে কোন কিছু ভাল লাগছে না। কোন কোন ব্যাপারে, কি কি বিষয়ে তার ভাল লাগছে না, তা সে কিছুই জানে না। অথচ ভাল লাগছে না তার অনেক কিছু। একটা অসন্তোষ তার মনের মধ্যে যেন ছায়া হয়ে আলগোছে ঘিরে রেখেছে। তার বারবার মনে হয়, একটা তীব্র প্রতিবাদ করা দরকার। এরকম নীরবে জ্বলে পুড়ে না মরে একটা সরব সোচ্চার প্রতিবাদ করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু কি কি বিষয়ে, কেন কোন ব্যাপারে? তার কোন স্পষ্ট বিষয় খুঁজে পাচ্ছে না। অথচ তার দৃঢ় বিশ্বাস, বিষয়গুলো তেমন অস্পষ্ট নয়। ছক কেটে নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে বসতে পারলে সমস্যাগুলো নিশ্চয় মূর্ত হয়ে উঠবে।...ঠিক এই মুহূর্তে সে একটা সমস্যার কথা ধরে ফেলল:—সময়। তার সময় কোথায়! সমস্যাগুলো নিয়ে ভাববার কখন সে সময় পাবে। তার হাতে বস্তুত কোন সময় নেই। অথচ বাড়ির সবাই ও অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবরা বলে, তার হাতে নাকি যথেষ্ট সময়। আশ্চর্য! এই সময়ের কথা ভাবতে গিয়ে সে কেমন অবসাদ বোধ করল এবং বিস্মিত হল অন্য সকলের তার সম্বন্ধে অজ্ঞতা দেখে।

"বাবা, চা খাবে এসো।"

গৌতম দেখল, তার পাঁচ বছরের মেয়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

"চল।"

"চল।" বলল গৌতম।

•

চা খেতে খেতে গৌতমের মন আরো খারাপ হয়ে গেল। তার সামনে বসে মেয়ে ও তিন বছরের ছেলে বাপী চা খাচ্ছে দেখে। সে অনেকবার আপত্তি জানিয়েছিল মালাকে, এইটুকুন বাচ্চাদের চা দেওয়া নিয়ে। মালা কথা শোনেনি। উত্তরে বলেছে, "ওতে কিছু দোষ হবে না। অনেকটা দুধে অল্প একটু চা মিশিয়ে দেই। ওতেই সন্তুষ্ট ওরা। আমরা সামনে বসে খাই আর ওরা জুল জুল করে তাকিয়ে থাকে।"

"তাকিয়ে থাকে বলেই দিতে হবে? ওভালটিন দাও।"

"আমরা খাই বলে—"

"চা-টা এমন কিছু অমৃত নয়।"

"কাল থেকে আমি চা খাব না।" মালা মুখ ভার করে অসহিষ্ণুভাবে বলল।

গৌতম কোন কথা না বলে চুপ করে যায়। মা-ও মালাকে সমর্থন করে, "আজকাল সবাই চা খায়। ওতে কিছু ক্ষতি হবে না।"

তারপর থেকে গৌতম কোন কথা বলেনি এ ব্যাপার নিয়ে। বিরক্ত হয়ে চুপ করে থেকেছে। নিজের অসন্তোষ নিজেই পুষে রেখেছে।—বাচ্চারা অনেক কিছুই চাইতে পারে, অনেক কিছুই করতে পারে, তাই বলে কি সব মেনে নিতে হবে? আশ্চর্য!

মনে মনে মেনে না নিলেও গৌতম চুপ করে গেছে। মালার জিদই বজায় থেকেছে। আজও যেমন বিরক্ত হয়ে চুপ করে থাকতে হচ্ছে। সে এই মুহূর্তে ভেবে অবাক হল মালা তার কথা বজায় রাখবার এত আত্ম-বিশ্বাস পেল কোথা থেকে। ও নিশ্চয় ভেবেছিল, এই কথায় কাছে গৌতম নতি-স্বীকার করবে। এর কি সূত্র হতে পারে? তার কোন দুর্বলতা? গৌতম মালার দিকে আড়চোখে তাকাল। ও খাবার প্লেটগুলো গুছোচ্ছে। বাচ্চা দুটো এখনো চা খাচ্ছে। মালা ক্রমশ মুটিয়ে যাচ্ছে। ওর রঙ আরো ফরসা হয়েছে। গলার দুটো যেন ভাঁজ পড়তে যাচ্ছে। তার রেখা সুস্পষ্ট। এখন এই গলাটাকে, কী যেন বলে,—কম্বুকণ্ঠ বলা যায় হয়তো। ও যদি আরো মুটিয়ে যায়, তাহলে হাঁসফাঁস করবে। সে আর একবার আড়চোখে তাকাল। এই সকালের তাজা মুখেও মালাকে—মালার চোখ দুটোকে কেমন যেন বিষণ্ণ মনে হল তার। প্রিয় কোন একটা কিছু হারাবার পর মানুষকে যেমন বিষণ্ণ ও অন্তর্মুখীন দেখায়, অনেকটা সেই রকম। গৌতমের এসব কথা ভাবতে খারাপ লাগল। তবে কি তার অনেক সমস্যার মধ্যে এটাও একটা? বুকের মধ্যে কি নিয়ে আসতে হবে? বাচ্চা দুটো তার দিকে বার বার তাকাচ্ছে। গৌতম ওদের দুটি লক্ষ করে, ছলছল করে ওদের দিকে তাকাল। ওরা কার মুখের আদল পেয়েছে—আমার না মালার? এ নিয়ে সত্যি সে কোনদিন ভাবেনি। মা অবশ্য অনেকদিনই কি কি যেন বলেছিল এইসব নিয়ে।—মনে করতে পারল না। আজকার স্বপ্নের কথা আবার তার মনে পড়ল। কই, ওদের সাথে স্বপ্নে দেখা ঐ সব মুখের কোন মিল তো খুঁজে পাচ্ছে না। তারা যেন আরো সুন্দর আরো [illegible]—নিষ্পাপ। সত্যি কি তাই? স্পষ্ট কিছু মনে করতে পারল না।

অন্যমনস্কভাবে হঠাৎ তার মনে হল, বেলা হয়েছে। অফিসে যেতে হবে।

মুখ হাত ধোয়া করছিল গৌতম। জ্বর হয় নাকি! চারদিকে নাকি পক্স-টক্স লেগেছে। তবে অবশ্য গা হাত পা ব্যথা টেথা করছে না। হয়তো অত ভোরে ঘুম ভেঙে যাওয়ার জন্য এরকম লাগছে। কিছুই ভাল লাগছে না। তার ওপর এই পাখার হাওয়াটা অসহ্য লাগছে। এখনো তো তেমন গরম পড়েনি; অথচ অফিসে ঢুকেই সবাই যেন পাখা খুলে বসতে পারলে বাঁচে। কি যে হয়েছে! অফিসে এলেই সবার যেন গা দিয়ে গরম ছোটে। এত গরম জিনিস খায় এরা! অনেকের বাড়িতেই তো পাখা নেই জানি। বাড়ি ফিরে গিয়ে তখন কি করবে। কথাটা ভাবতেই গৌতম মনে মনে লজ্জিত হল ঃ মানুষ সম্পর্কে এরকম চিন্তা করা খারাপ—খুব খারাপ। বিশেষ করে নিজের সহকর্মীদের সম্পর্কে। তার মনে এই কথাটা এল কি করে! ঘুরন্ত পাখার দিকে তাকিয়ে গৌতম অবাক হয়ে

ভাবতে লাগল। কি অদ্ভুতভাবে হাস্যকর—লজ্জাজনক চিন্তা-ভাবনা! কেমন চুপিসাড়ে এসে যায়, টের পাওয়া যায় না। তখন শিক্ষা, যুক্তি যেন ঘুমিয়ে থাকে। অনেকটা—অনেকটা সেই ঘুমের ভেতর স্বপ্নের মতো।...না না স্বপ্ন-টপ্ন নিয়ে আর ভাববে না। সকালটাই মাটি হয়েছে আজ।

বেলা প্রায় দুপুরে গড়িয়েছে। কাজটাজ তেমন কিছুই করেনি গৌতম। কাজের কথা ভাববার চেষ্টা করল সে। অনেক কাজ বাকি। সিরিয়াসলি ফাইলপত্র টেনে নিয়ে বসল গৌতম। কিন্তু বাধা পেল।

"একটা কথা ছিল রায়বাবু।"

"আমার সঙ্গে?" অবাক হয়ে তাকাল গৌতম।

"হ্যাঁ।"

"বোসো।"

ছেলেটি কিছুক্ষণ দ্বিধা করে বলল, "একটু বাইরে গেলে ভাল হয়। কনফিডেনশিয়াল।"

গৌতম আরো অবাক হয়। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছেলেটিকে দেখতে লাগল। ছেলেটি দেবাংশু—সুধীরবাবুর বড় ছেলে। সুধীরবাবু তার সহকর্মী। সিনিয়রমোস্ট ম্যান। প্রায় বছর দুই হল দেবাংশুকে এই অফিসে ঢুকিয়েছে। জুনিয়ার ক্লার্ক। বছর বিশ বাইশ বয়স। কেমন নিরীহ—ভাল ছেলের মতো দেখতে। গৌতম হঠাৎ ভারী গলায় বলল, "এখানে তো কেউ নেই। এখানে বসেই বল না।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও দেবাংশু বসল যেন। কিন্তু বসে সে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কিছু বলল না। গৌতম লক্ষ করল, ওর মুখ ক্রমশ গম্ভীর আর লালচে হয়ে উঠছে। একটা প্রচণ্ড সংকোচ ও যেন কিছুতে কাটিয়ে উঠতে পারছে না।

গৌতম একটা সিগারেট ধরাল। সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে সিগারেট টানতে লাগল। অর্থাৎ দেবাংশুকে সংকোচ কাটিয়ে ওঠার সময় দিতে লাগল। গৌতম ভেবে অবাক হচ্ছিল, কি এমন গোপনীয় কথা দেবাংশু বলতে চায়। তার সঙ্গে ওর এমন কোন সম্পর্ক নেই যাতে করে গোপনীয় কথা হতে পারে। সে ভেবে যেন কিছু কূলকিনারা পাচ্ছে না।

"বুঝছেন রায়বাবু—" বলবার চেষ্টা করল দেবাংশু। গৌতম আলতোভাবে ওর দিকে তাকাল। কিন্তু দেবাংশু কথা শেষ না করে দ্বিধা করতে লাগল। গৌতম কোন কথা না বলে চুপ করে রইল। সে এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে, দেবাংশু তাকে ওর গোপনীয় কথা না বলে উঠবে না। অতএব তার দিক থেকে তাড়া দেবার কোন অর্থ হয় না। তবে সময় নষ্ট হচ্ছে। তা হোক। আজ তো অনেক সময়ই নষ্ট করেছে। কিছু ভাল লাগছে না। কোন কাজ করতেও না। একটা অসুস্থ মানুষের মতো অবস্থা।

"আজ ক'দিন ধরে বাবা অফিসে আসছেন না।" দেবাংশু বলল।

"কি হয়েছে সুধীরদার?" গৌতম উৎকণ্ঠা প্রকাশ করল। সুধীরদার খবরটা যেন তার আগেই নেওয়া উচিত ছিল। এখন মনে হচ্ছে, সত্যিই সে ক'দিন ধরে সুধীরদাকে অফিসে দেখতে পায়নি।

"বাবার অপারেশন হয়েছে।"

"কই, তেমন কিছু তো খবর পাইনি। কি হয়েছিল?" গৌতম অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল। 'কি হয়েছে'র উত্তর দিতে গিয়ে দেবাংশু আবার দ্বিধা করতে লাগল। শেষে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে এক সময় সে উত্তর দিল, "বাবার—বাবা ভ্যাসেকটমি করিয়েছে।"

কথাগুলো শুনে গৌতম হঠাৎ ঝাঁকুনি খেল। অবাক হয়ে সে দেবাংশুর দিকে তাকাল। যেন কমার ছলে দেবাংশু অপারেশনটা করিয়েছে। এইবার সে বুঝতে পারল, দেবাংশু কেন এত সংকোচ—দ্বিধা করছিল। প্রৌঢ় সুধীরদা কেন ভ্যাসেকটমি করল হঠাৎ, তার কারণ খুঁজতে লাগল গৌতম। কি কারণ থাকতে পারে? চিন্তা করতে গিয়ে সে দিশেহারা হয়ে পড়ল। ওঁর সাংসারিক জীবনের অনেক কথাই তো গৌতম জানে। এখন অন্তত এইসব করার কোন কারণ সে খুঁজে পাচ্ছে না।...আবার এই বয়সে ছোকরাটাকে হবে নাকি? সেই লজ্জায় তাড়াতাড়ি—

"তুমি কি করে জানলে, তোমার বাবা ভ্যাসেকটমি করিয়েছেন?" গৌতম সোজাসুজি প্রশ্ন করল।

"বাড়ির অবস্থা দেখে অনুমান করলাম। তা ছাড়া আমার অনুমান অমূলক নয়।"

"এতদিন ছুটি নিয়ে বাড়িতে বসে আছেন কেন সুধীরদা? এই অপারেশনে তো দু'একদিন বিশ্রামই যথেষ্ট।"

"বোধ হয় ভয় পেয়েছেন, তাই।"

"হঠাৎ এই বয়সে এসব করাতে গেলেন কেন?" অনেকটা স্বগতভাবে গৌতম বলল।

"ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার একেবারে ছোট বোনের বয়স দশ। আমরা একটু বেশী ভাইবোন; কিন্তু তাই বলে... বুঝলেন রায়বাবু, প্রদ্যোত—প্রদ্যোতবাবুই এ সবের মূলে।" দেবাংশু উত্তেজিত হয়ে উঠল। তার ঠোঁট কাঁপছে। মুখটা টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। হিসহিসে গলায় বলতে লাগল, "ইচ্ছে করে ওর সব অঙ্গ উপড়ে আনি। আমি ওকে খুন করব—খুন।"

"এই দেবাংশু আস্তে—আস্তে; আশপাশে শুনতে পাবে।"

দেবাংশু নিজেকে কোনরকমে সংযত করল। কিন্তু রাগে উত্তেজনায় একটা পেপার ওয়েট হাতে চেপে ধরে রাখল। তারপর আবার কিছুটা হিসহিসে গলায় বলতে লাগল, "বাড়ি ঢুকতে লজ্জা করে। বড় বড় সব বোন, কিছু না বোঝে এমন নয়। আজকালকার মেয়ে। আমার বাবা মা ভাই বোনের দিকে তাকাতে লজ্জা করে। হঠাৎ এই সবের কারণ, ভাবতে লাগলাম। অফিসে খোঁজ খবর নিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা জানতে পারলাম। আমাদের কম্পাউণ্ডার প্রদ্যোতবাবু প্রমোটার হয়েছেন। বাবাকে নানারকম বুঝিয়ে সুঝিয়ে, বেয়াড়া সব ঘটনার রেফারেন্স টেনে, ভয় দেখিয়ে রাজী করান। এতে তার লাভ আছে। প্রত্যেকটা কেসে কিছু টাকা পান। বাবাকেও নাকি বোঝান হয়েছে, সেও টাকা পাবে। এইসব নোংরা জিনিস কি আর বলব। আমি ঠিক করেছি, ওকে আজ রাস্তায় ঠ্যাঙাবো।"

"না না দেবাংশু ওসব করতে যেও না।"

"কি বলেন রায়বাবু! ওকে মারা দরকার।"

"তাহলে আমাকে এসব কথা বলতে এলে কেন?"

এই প্রশ্নে, দেবাংশু কোন কথা বলতে পারল না চট করে। পরে কিছুটা হতাশার সুরে বলল, "জানেন, কাউকে কোন কথা না বলতে পেরে, আমি ভীষণ অসহায় বোধ করছিলাম। লোকটাকে একটু চেক করা দরকার। জানেন, ঐ লোকটা অনেক বয়স্ক লোককে—যারা দু'দিন বাদে রিটায়ার করবে তাদেরও ভুলিয়ে ভালিয়ে তার কার্যসিদ্ধি করছে। তারা অনেকে এর ওর কাছে ওর সম্পর্কে অভিযোগ জানিয়েছেন।"

"ঠিক আছে দেবাংশু, আমি যা বলবার বলব প্রদ্যোতকে।"

দেবাংশু উঠে ধীরে ধীরে ওর সেকশানে চলে গেল।

সমস্ত ঘটনাটা ভাবতে গিয়ে গৌতম অবাক হল। কি যে সব ঘটছে আজকাল! কত তাড়াতাড়ি আমাদের চিন্তা ভাবনা রীতি সমাজব্যবস্থা পাল্টে যাচ্ছে—কি দ্রুত! তা না হলে সুধীরদা এত কাঁচা খেলা নয়; যা দেখাল তাই দেখল আর বলল। নিশ্চয় কোথাও গণ্ডগোল ঘটেছে। তাছাড়া এই প্রদ্যোত। একটা আস্ত আহাম্মক। এই ধরনের অনেক অভিযোগ এর আগে সে শুনেছে। না, ওকে একটু সংযত করা দরকার। [illegible] প্রয়োজন জানে না [illegible] নিয়ে টানাটানি। অথচ এই লোকটার কোন বাচ্চা-কাচ্চা নেই। [illegible] বছর ধরে [illegible] একটা [illegible] দিতে পারল না স্ত্রীকে। তবে এদিকে অন্য [illegible] নিয়ে যাচ্ছে।

গৌতম আর একটা সিগারেট ধরাল। [illegible]

বিরক্তিভরে দূরে ছুঁড়ে ফেলল। চারিদিকে শুধু ফ্যামিলি প্ল্যানিং ফ্যামিলি প্ল্যানিং। যেখানে সত্যিকারের প্রয়োজন, সেখানে তো সে কিছু দেখতে পায়নি বা পাচ্ছে না। অথচ যত আলোড়ন উত্তেজনা সব এই মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্তদের মধ্যে। যাদের যতটুকু সামর্থ্য আছে তার চেয়ে কম সন্তান নিয়ে স্বার্থপরের মতো সুখে থাকবার চেষ্টা করছে। সে একটা ক্রোধ অনুভব করতে লাগল। প্রচার দরকার; কিন্তু তার একটা শালীনতা থাকা দরকার। সে কিন্তু এর মধ্যে বিন্দুমাত্র খুঁজে পাচ্ছে না। তার সবচেয়ে খারাপ লাগে ঐ লাল ত্রিকোণ প্রতীকটা। এত অশ্লীল যে তাকান যায় না। দেখলেই তার ওটাকে যাচ্ছে তাই ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। অশ্লীল, চূড়ান্ত অশ্লীল! অথচ ফ্যামিলি প্ল্যানিং এক তরফা শুধু মেয়েদের নয়। না; যৌন ব্যাপারটায় আর কোন গোপনীয়তা থাকছে না!

গৌতম উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ঘড়ির দিকে তাকাল। প্রায় একটা। সে ক্যান্টিনের দিকে পা বাড়াল। যেতে যেতে হঠাৎ কথাটা মনে পড়ল। আগেই পড়া উচিত ছিল। দেবাংশু সব গোলমাল করে দিয়েছে। আড়াইটার সময় সবিতা মেট্রোর লবির নীচে এসে দাঁড়িয়ে থাকবে। কি যে ওর দরকার, কে জানে। ফোনে কারণ জিজ্ঞেস করায় ও কিছু বলেনি। সবিতা সম্পর্কে তার পরিষ্কার করে ভাববার সময় এসেছে। তার বিশ বাইশ বছর বয়স হত, তা হলে পুলকিত হয়ে ছোটা যেত সবিতার কাছে। একটা নির্জন জায়গা দেখে, কোমর জড়িয়ে ধরে গদগদ করে প্রেমের বুলি আওড়ানো,—হয়তো ভাল লাগত তাতে। কিন্তু পঁয়ত্রিশ বছরে পা দিয়ে এইসব কথা চিন্তা করতেও অস্বস্তি লাগে, বিরক্তি বোধ হয়। কি যে চায় সবিতা তার কাছে! গৌতম এইসব নানান কথা ভাবতে ভাবতে অফিসারের চেম্বারে ঢুকল। অফিসার মিঃ বাসু একটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে। সে একবার ভাবল, বেরিয়ে যাবে কিনা। শেষে সোজা সামনের চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

"আপনার অফিসের পর গেলে হয় না?" মিঃ বাসু মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল।

মেয়েটি তাদের টাইপিস্ট। গৌতমের সঙ্গে বিলক্ষণ আলাপ আছে। মেয়েটি ঘাড় চুলকোবার ভান করছিল। গৌতম তাড়াতাড়ি চোখ ফেরাল। খুব খারাপ লাগছিল তার! বিশ্রী লাগছিল দেখতে মেয়েটির জামার বগলের কাছটা। এরা কি নিজেদের সম্বন্ধে তেমন সচেতন নয়?

"আচ্ছা যান। এতে আমার খুব অসুবিধা হয়।"

মেয়েটি বেরিয়ে গেল।

"কি ব্যাপার রায়।" গৌতমের দিকে তাকাল মিঃ বাসু।

"আমারো ঐ একই ব্যাপার।" বলে হাসতে লাগল গৌতম।

"দেখুন, আপনারা যদি একে একে সবাই বেরিয়ে যান অফিস থেকে, তাহলে কি করে চলে। যদি একটা কিছু ঘটে যায়, আমি কি কৈফিয়ৎ দেব ম্যানেজমেন্টকে।"

"আমার দাঁতটা ক'দিন ধরে ট্রাবল দিচ্ছে। একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছি আজ, তাই।" গৌতম অনায়াসে মিথ্যাটা বলল।

"কাল, কি আর বলব।"

চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসেই গৌতমের রাগ গিয়ে পড়ল সবিতার ওপর। ওর জন্যই এই অবলিগেশন।

সবিতা ঠিক দাঁড়িয়েছিল। চোখে একটা সানগ্লাস থাকা সত্ত্বেও গৌতমের দূর থেকে ফিল্মস্টার ফিল্মস্টার মনে হচ্ছিল।"

গৌতম হাসতে হাসতে কাছে এসে প্রায় কানের কাছে মুখ এনে বলল, "তোমাকে দূর থেকে ফিল্ম স্টার ফিল্ম স্টার মনে হচ্ছিল।"

"তাই নাকি? ওটা তোমারই মনে হয়েছে। অন্য কেউ তো তাকাল না।"

"মেয়ে হিসেবেও তাকায়নি?"

সবিতা হেসে ফেলল।

"আমি অবশ্য মনে হওয়ার কথাই বলেছি।"

"ও।"

"এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি?"

"কোথায় যাবে?"

"সে তো তুমি জান।"

"সিনেমা দেখাবে?"

"এই জন্যে আসতে বলেছ?"

"না না, অন্য কাজ আছে। দেখাবে?"

"অসম্ভব।"

"তোমাকে বিশেষ সিনেমা দেখতে দেখি না।"

"দেখি। তোমার সঙ্গে তো অনেক দেখেছি। তবে সত্যি বলতে কি, আমার তেমন ভাল লাগে না। তায় আড়াই তিন ঘণ্টা বসে থাকা আমার পোষায় না। সিগারেট খেতে পারা যায় না।" বলতে বলতে গৌতম পকেট থেকে সিগারেট প্যাকেট বার করল।

"তবে চল, কোথাও গিয়ে বসি।"

"রেস্টুরান্টে?"

"চল।"

"বেশ গরম পড়েছে।" অনেকটা আত্মগতভাবে বলল গৌতম।

"বিকেলের দিকে তো বেশ ঠাণ্ডা পড়ে।"

"এখন তো মোটেই ভাল লাগে না। এই দেখ, কেমন ঘেমেছি।"

"ঘাম দেখছি কেবল তোমারই আছে।"

গৌতম একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে হাসলো। তারপর বলল, "হঠাৎ দেখা করতে বললে কেন?"

"এমনি। অনেকদিন তোমাকে দেখিনি।" বলে হাসতে লাগল সবিতা।

"সে কি, এই তো দিন তিনেক আগে দেখা হল!" গৌতম বিস্মিত হল।

"তাই কি কম হল।" তেমনি দুষ্টুর মতো হাসতে লাগল সবিতা।

"দেখ, যেভাবে কথা বলছ যেন তুমি আমার নব-বিবাহিত স্ত্রী। বাপের বাড়ি অনেকদিন আছ, তাই লুকিয়ে এসেছ দেখা করতে।"

কথাটা শুনে সবিতা লাল হয়ে উঠল। কিন্তু তেমনি হাসতে হাসতে চতুরভাবে বলল, "এসব তুমি ভাল জান।"

"যে রকম মনে হল, তাই বললাম।"

"তোমার ছেলেমেয়ে বউ কেমন আছে?"

"ভাল।" বউ ছেলেমেয়ের কথা আসতে গৌতম অস্বস্তি বোধ করল। ঠিক কেন, বুঝতে পারল না। পরস্পরের কথা তারা মোটামুটি জানে, তবুও।

"একদিনও ওদের দেখালে না।"

"তোমাকে তো আমন্ত্রণ জানিয়েছি।"

"তুমি অস্বস্তি বোধ করছ?"

"কেন?"

"শুদ্ধ ভাষায় কথা বলছ যে।"

"ও। মোটেই না।"

দুজনে চুপ করে রইল। আপাতত আলোচনারই কোন প্রসঙ্গ খুঁজে পেল না। ওয়েটার পর্দা সরিয়ে মুখ বাড়াল। গৌতম সবিতার দিকে তাকায়। সবিতা চোখের ভাষায় যেন বলল, যা ইচ্ছে হয় বল। গৌতম যা বলার বলল। ওয়েটার চলে গেল।

"এইভাবে অফিস থেকে চলে আসা একটা অবলিগেশন।" গৌতম অনেকটা বিরক্তির সুরে বলল।

"আমিও তো এসেছি।"

"তোমার সরকারী অফিস; আর আমার মার্চেন্ট ফার্ম।"

"সরকারী অফিস বুঝি অফিস নয়?"

গৌতম হেসে ফেলল। বলল, "তোমাদের এসব চালু আছে। ওপেন সিক্রেট।"

"ওইটুকুই তো সুবিধা; তা ছাড়া আর কি আছে।"

"আচ্ছা সবিতা, একটা কথা বলব। অফ কোর্স তুমি যদি না রাগ কর।"

"বল।"

"তুমি এখনো বিয়ে করছ না কেন? তোমার আগের দায়দায়িত্ব তো অনেক লাঘব হয়েছে। ছোট ভাই-বোন দুটিও তো চাকরি পেয়েছে। এখন তো আর বলতে পারবে না, সংসারের জন্যে।"

"হচ্ছে না তাই।"

"বাজে কথা। কিন্তু বয়েস—"

"আমার তেমন বয়েস হয়নি।" সবিতা হাসতে লাগল।

"বিয়ে না করলে অবশ্যি চিরকালই কুমারী—হয়তো যুবতীও থাকবে।" গৌতম হাসতে হাসতে বলল, "জান, তোমার ওপর মাঝে মাঝে ভীষণ বিরক্ত হই। ভাবি, তোমার সঙ্গে আমার এত কি প্রয়োজন। যদি বিবাহিত না হতাম, তা হলে একটা কথা ছিল। তুমি হেসো না সবিতা, সত্যি বলছি। আজই বিরক্ত হয়েছিলাম যখন ছুটির জন্য হাত কচলাচ্ছিলাম। অথচ দেখ, না এসে পারলাম না। এসে আবার ভীষণ ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে, আসাটা আমার প্রয়োজন ছিল।"

ওয়েটার খাবারের ডিশগুলো টেবিলের ওপর রেখে পর্দা টেনে দিয়ে চলে গেল।

"থামলে কেন? বল।"

"তুমি ঠাট্টা করছ?"

"না না সত্যি বলছি।"

"তবে হাসছ কেন।"

"তুমি যদি বল, হাসব না।"

"সবিতা", গৌতমের গলাটা সহসা কাঁপতে লাগল। "তোমায় একটা চুমু খাব।"

"কি বলছ!" মুখটা লাল হয়ে উঠল সবিতার। হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

"ডোণ্ট বি সিলি। ডোণ্ট ক্রিয়েট এ সীন, সবিতা।"

সবিতা আস্তে আস্তে বসল।

"তুমি রাগ করেছ?"

সবিতা হাসল। হাসিটা কেমন ম্লান দেখাল। তারপর হঠাৎ সবিতা মুখটা এগিয়ে আনল গৌতমের দিকে। গৌতম ঠোঁটের ওপর ঠোঁট রাখল।

বড় ক্লান্ত বোধ করতে লাগল গৌতম। বাস স্টপে আরো কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, কে জানে। একটা সিগারেট ধরাল সে। যাবার সময় সবিতাকে তার সবিতার মতোই মনে হল। হঠাৎ যে কি হল তার! বড় ভাল লাগছিল ওকে। ও যেন দিন দিন আরো আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। ও-ও যে মালার মতো মুটিয়ে যাচ্ছে! গৌতম ভেবে অবাক হচ্ছে, ও এখনো কেন বিয়ে করছে না। কোথায় যে অসুবিধা ওর, সে বুঝে উঠতে পারছে না। ওর সঙ্গে আলাপ তার আজ ছ' সাত বছর। কিন্তু সত্যিকারের কতটুকু জানে ওর সম্বন্ধে। কেন যে তার সঙ্গে সবিতা ঘনিষ্ঠতা ক্রমশ নিবিড় করে তুলছে, বুঝতে পারছে না। ঠিক করেছিল ওর সঙ্গে সম্পর্কটা আজ পরিষ্কার করে ফেলবে। কিন্তু কি হল? হঠাৎ কাঁধের কাছে একটা হাত পড়তে গৌতম চমকে উঠল। ঘুরে তাকিয়ে দেখল নিশীথ হাসছে। "কি মাল, দাঁড়িয়ে আছিস? দূর থেকে দেখলাম ঝোড়ো কাকটা দাঁড়িয়ে আছে।"

গৌতম হাসল। বলল, "বাসের জন্য।"

"কোথায় যাবি।"

"আর কোথায়, বাড়ি।"

"সেই ব্যারাকপুর?"

গৌতম হাসল।

"চল ঘুরে আসি।"

"রাত হয়েছে।"

"রাত কোথায় রে শালা। এই তো সবে সাড়ে সাতটা।"

"ফিরতে রাত হয়ে যাবে রে।"

"রাখ রাখ হয়েছে। চল এবার। বিয়ে করে তো শালা লেখাও প্রায় ছেড়েছিস। বন্ধু-বান্ধব ছাড়বি নাকি? চল চল।"

গৌতম অনিচ্ছা সত্ত্বেও চলল নিশীথের সঙ্গে।

"লেখা-টেখা ছেড়ে দিলি?" যেতে যেতে নিশীথ বলল।

"না। আবার আরম্ভ করেছি।"

"যাক, সুমতি হয়েছে।"

"তোর লেখা কেমন হচ্ছে।"

"মোটামুটি।"

"চললি কোথায়?"

"চল কোথায়। বুঝলি, গেল শনিবার দারুণ একটা দাঁও মেরেছি। মোট টাকা রে। পাপের টাকা। খরচ করতে হবে। খচ খচ করছে।"

খুদাবক্স গ্রন্থাগার, পাটনা

এক ঐতিহ্যময় গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগারে রক্ষিত কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি।

মহম্মদ মাক নামে জনৈক আরবকে খুদাবক্স নিয়োগ করেছিলেন গ্রন্থ সংগ্রহের কাজে। মাকির মত পুস্তক শিকারী সত্যিই বিরল ছিল। সিরিয়া, আরব, মিশর ও ইরাণ থেকে মাকি দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে আনেন। স্পেন থেকে মুরেরা বিতাড়িত হলে বিখ্যাত করদোভা গ্রন্থাগারের অনেক বই এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে। মাকির তীক্ষ্ণ চোখ অনেকগুলিকে উদ্ধার করেছিল। পাণ্ডুলিপি ক্রয়ের জন্য খুদাবক্সের খ্যাতি দেশ বিদেশে এমন ছড়িয়ে পড়েছিল যে, পুরনো বইয়ের অধিকাংশ ব্যবসায়ী খুদাবক্সকে না দেখিয়ে বই বিক্রি করতেন। একবার গ্রন্থাগারের প্রাক্তন দপ্তরী কতকগুলি পাণ্ডুলিপি চুরি করে লাহোরের জনৈক ব্যবসায়ীর কাছে চালান দেয়। উক্ত ব্যবসায়ী সেগুলি সমস্ত খুদাবক্সকে পাঠিয়ে দেন বিক্রির জন্য। কারণ তিনি জানতেন দেশে এই একটি লোক আছেন যিনি উচিত দাম দিতে দ্বিধা করবেন না।

১৮৯১ সালে ২৯শে অক্টোবর খুদাবক্স গ্রন্থাগারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার তদানীন্তন ছোট-লাট স্যার চার্লস ইলিয়ট। খুদাবক্স অবশ্য স্বনামে গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠিত করেননি। তিনি নাম দিয়েছিলেন ওরিয়েণ্টাল পাবলিক লাইব্রেরি। ভাবীকাল তাঁর এ বিনয় মেনে নেয়নি। ওরিয়েণ্টাল পাবলিক লাইব্রেরী কেউ বলে না, সবাই জানে খুদাবক্স লাইব্রেরী। ১৯৩৪ সালে ভূমিকম্পে গ্রন্থাগার ভবনটি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর একটি নতুন ভবনে গ্রন্থাগারটি স্থানান্তরিত করতে হয়।

একবার ব্রিটিশ মিউজিয়াম গ্রন্থাগারটি কেনার অভিপ্রায় জানায়। খুদাবক্সের বিনীত উত্তর, "আমি গরীব। তাঁরা পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড দিতে চান। তা আমার পক্ষে রাজকীয় সম্পদ। কিন্তু যে জন্য আমি ও আমার পিতা জীবন উৎসর্গ করেছি তা কি বেচে দিতে পারি?" পারেন নি। আর পারেন নি বলেই দেশ পেয়েছে এই অমূল্য সম্পদ।

চার হাজার পাণ্ডুলিপি নিয়ে গ্রন্থাগারের পত্তন হয়েছিল। আজ পাণ্ডুলিপি, বই ও পত্রপত্রিকার সংখ্যা প্রায় বাহান্ন হাজার। বিশেষ আকর্ষণ হল চার হাজার দশ একুশ আরবী ও চার হাজার একশ চুরাশী পার্শী পাণ্ডুলিপি। তাছাড়া আছে মূল্যবান উর্দু, তুর্কী, হিন্দী ও সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি। তালপাতায় পুঁথি আছে দুশ আর সাতশ মিনিয়েচার পেণ্টিং।

গ্রন্থাগারকে বৈশিষ্ট্য যে পাণ্ডুলিপিটি দিয়েছে তা হল তারিখ ই-খানদান তিমুরিয়া অর্থাৎ তৈমুর বংশীয়দের জীবন আলেখ্য। আকবরের সময়ের বহু খ্যাতিমান শিল্পীর তুলির স্পর্শ এতে রয়েছে। সব শুদ্ধ একশ তেত্রিশটি ছবি এতে আছে। প্রত্যেক পাতার নীচে শিল্পীর নাম দেখা যায়। শিল্পীদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন খাজা আবদুস সামাদ। তাঁরই কাছে হুমায়ুন ছবি আঁকতে শিখেছিলেন। একশ তেত্রিশটি ছবির মধ্যে ঊনসত্তরটি তিমুরের জীবন আলেখ্য—বাল্যকাল থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত নানা ঘটনা শিল্পীদের নিপুণ তুলিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তার মধ্যে যুদ্ধ আর অবরোধের দৃশ্যই বেশী—দিল্লী থেকে দামাস্কাস, তুষারাবৃত বাদকসান থেকে নীল নদ পর্যন্ত তিমুরের বাহিনীর দুর্বার অভিযান। যুদ্ধ দৃশ্য ফোটাতে অপূর্ব ক্ষমতার পরিচয় দিলেও শিল্পীরা আনন্দ পেয়েছেন প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকতে। তিমুর বাগানে বিচরণ করছেন, দূরে মসজিদের মিনার আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে, গাছে গাছে ফুল ও ফল, পাখি গান করছে ছোট নদী কুলু কুলু শব্দে বয়ে যাচ্ছে এক শান্ত সুন্দর পরিবেশে। উজ্জ্বল নীল আর সোনালী রং শিল্পীর হাতের কাজে আরও রঙীন, আরও গাঢ় হয়েছে।

তারপর যে পাণ্ডুলিপিটি সহজে চোখ আকর্ষণ করে সেটি হল 'পাদশাহনামা'—শাহজাহানের শাসন ইতিহাস। মোগল ও হিন্দু চিত্রশৈলীর অপূর্ব সমন্বয় এই পাণ্ডুলিপিতে ঘটেছে। এর পরেই নাম করতে হয় 'শাহেনশাহনামা' পাণ্ডুলিপির। তুরস্কের ওসমানীয় সুলতানদের নানা বিবরণ এতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। মোগল রাজবংশের অনেকের শিলমোহর ও স্বাক্ষর এই পাণ্ডুলিপিতে আছে। একটি স্বাক্ষর চন্দ্রভাগিনী জাহানারার। এই পাণ্ডুলিপির আর কোন কপি পৃথিবীর কোথাও নেই।

ফার্দৌসীর 'শাহনামা'র পাণ্ডুলিপিটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, যদিও মূল শাহনামা থেকে এতে দশ হাজার ছত্র কম আছে। এটি লিখিত হয়েছিল ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে। কাশ্মীর ও কাবুলের শাসনকর্তা আলি মর্দান শাহজাহানকে পাণ্ডুলিপিটি উপহার দিয়েছিলেন। কতকগুলি পার্শী মিনিয়েচার পেণ্টিংএর শোভা বর্ধন করেছে।

পারস্যের মিস্টিক কবি জামি ও সাদীর কবিতা সঙ্কলন বেশ কয়েকটি আছে। এই পাণ্ডুলিপিগুলির হস্তলিপি দেখার মত। হাফিজের একটি কবিতা সঙ্কলন আছে। হুমায়ুন ও জাহাঙ্গীরের কাছে এই পাণ্ডুলিপিটি ছিল নিয়তির নির্দেশ জানার উপায়। শাসন কার্য পরিচালনা এবং যুদ্ধে যাবার আগে তাঁরা এটি খুলতেন নির্দেশ লাভের জন্য। তাঁদের দুজনেরই হস্তাক্ষর এতে আছে। কোন্ কোন্ উপলক্ষে তাঁরা এই পাণ্ডুলিপির শরণাপন্ন হয়েছিলেন তা লিখে গেছেন। ঔরংজেবও ঐ একই উদ্দেশ্যে পাণ্ডুলিপিটি ব্যবহার করেছিলেন।

বাবরের অন্যতম পুত্র কামরাণের কবিতা সঙ্কলনে জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের হস্তাক্ষর আছে। কামরাণের এই কবিতা সঙ্কলনের কপিও পৃথিবীর কোথাও পাওয়া যাবে না। জামালুদ্দিন আবু দুয়াকুব আল মুতাসামি বিন আবদুল্লার হস্তলিখিত (১২০০ খৃষ্টাব্দ) কোরাণ আর একটি বিশেষ আকর্ষণ। তাছাড়া আছে তাব্রিজের বিখ্যাত মির আলি এবং মির ইমাদ হোসেন কাজাবিনি, আবদুল্ল রসিদ দৈলামি ও সৈয়দ আলি খাঁর মত হস্তলিপিশিল্পীদের অমর কীর্তির নিদর্শন নিয়ে কতকগুলি পাণ্ডুলিপি।

আরবী পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় তিন বৃহৎ খণ্ডে 'তফসির-ই-কবির' এর। অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসীম ধৈর্যের নিদর্শন। গ্রানাডার জাহাবির নানা শল্য অস্ত্রের বিবরণ দিয়েছেন একটি পাণ্ডুলিপিতে। জাহারবি ইউরোপে আবুল কাসিম নামে সুপরিচিত। গ্রন্থাগারের একটি বিশিষ্ট সম্পদ হল পয়গম্বর মহম্মদের ভাই হজরত আলির একটি চিঠির অংশাবশেষ। চিঠিটি লেখা হয়েছিল প্রথম হিজরী শতাব্দীতে (খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী) মিশর বিজয়ী অমর বিন আসকে।

ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষায়—যেমন ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, ইতালীয়, স্পেনীয় ও ল্যাটিন—পাণ্ডুলিপি ও দুষ্প্রাপ্য বইয়ের সংখ্যাও কম নয়। এগুলির মধ্যে নেপোলিও° বোনাপার্টের স্মৃতিকথা, 'হিস্টোরিয়া দ্য ইতালিয়া', তুর্কীদের ইতিহাস ও স্যার ওয়াল্টার স্কটের 'ওয়েভারলি নভেলস'-এর প্রথম সংস্করণ এক সেট বিশেষ উল্লেখযোগ্য।
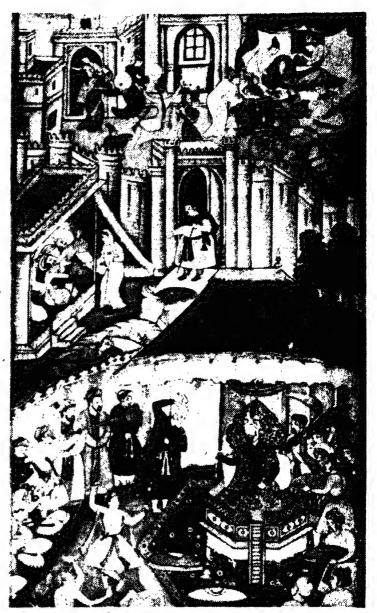
খুদাবক্সের জীবদ্দশায় দেবদূতেরা নাকি আসতেন এই গ্রন্থাগারে। তিনি স্বপ্নে স্বর্গীয় নির্দেশ পেতেন। একবার নাকি পয়গম্বর স্বয়ং এসেছিলেন। খুদাবক্স তার বিবরণ দিয়েছেন। "একদিন রাতে স্বপ্ন দেখলাম, গ্রন্থাগারের পাশের গলিতে বহু লোক ভীড় করেছে। আমি বেরিয়ে এলে তারা চীৎকার করে বলল, 'স্বয়ং পয়গম্বর তোমার গ্রন্থাগারে এসেছেন আর তুমি তাঁকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছ না।' তাই শুনে আমি পাণ্ডুলিপি কক্ষে ছুটে গেলাম। কাউকে দেখতে পেলাম না। তিনি চলে গেছেন। কিন্তু 'হাদিস'-এর দুটি পাণ্ডুলিপি খোলা। লোকে বলল, পয়গম্বর পড়েছেন।"

পাণ্ডুলিপি দুটিতে খুদাবক্সের স্বহস্তলিখিত নির্দেশ আছে—'কোন কারণেই এ দুটি পাণ্ডুলিপি যেন গ্রন্থাগারের বাইরে না যায়।'

এ গ্রন্থাগার শুধু মর্ত্যে নয়, স্বর্গেও দুর্লভ।

আকবরের জন্ম। "তারিখ-ই খানদান তিমুরিয়া" পাণ্ডুলিপি থেকে গৃহীত চিত্র।

ইতিহাসের আলোতে ত্রিপুর রাজ গোবিন্দমাণিক্য দেব ও তাঁহার মুদ্রা

শ্রীবসন্ত চৌধুরী ও শ্রীপরিমল রায়

ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্য বাংলাদেশের সাধারণ পাঠকের কাছে রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের লেখা উপন্যাস 'রাজর্ষি' পরে নাট্যায়িত বিসর্জনের নায়ক হিসেবে সুপরিচিত। কবি তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসের নায়ক হিসেবে ত্রিপুরার একজন রাজাকে কেন বেছে নিলেন এর

গোবিন্দ মাণিক্য

মুখ্যদিক গৌণদিক

মুখ্য দিক—শি (মধ্যে শিবলিঙ্গ) বঃ শ্রীশ্রীযুতগোবিন্দমাণিক্য দেব শ্রীগুণব তীমহাদেব্যৌ

গৌণ দিক—ত্রিশূল সহ বাম মুখী ত্রিপুরা সিংহ। শক ১৫৮২

টঙ্ক মুদ্রা (রৌপ্য); ওজন—১০·১০ গ্রাম; মাপ—২৩·৬ মিঃ মিঃ

কারণ হিসেবে ত্রিপুরার রাজ পরিবারের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। ত্রিপুরার রাজ পরিবারের কাছ থেকেই তরুণ কবি পেয়েছিলেন তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতি। সেই সম্পর্কের কৃতজ্ঞতা বোধ থেকেই হয়ত ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্য যাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সেই সময়ে কবির কল্পনাকে বিশেষ ভাবে নাড়া দিয়েছিল তাই তাঁকেই কবি তাঁর উপন্যাসের নায়ক রূপে বেছে নেন। এই প্রসঙ্গে রাজর্ষি লেখার প্রেরণা হিসেবে একটি ঘটনাও উল্লেখযোগ্য। 'জীবন-স্মৃতি'—১৯১-১৯২ পৃষ্ঠা। কবি লিখছেন—"......স্বপ্ন দেখিলাম, কোন এক মন্দিরের সিঁড়ির উপর বলির রক্ত চিহ্ন দেখিয়া একটি বালিকা অত্যন্ত করুণ ব্যাকুলতার সঙ্গে তার বাপকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—বাবা, একি! এ যে রক্ত! বালিকার এই কাতরতায় তাহার বাপ অন্তরে ব্যথিত হইয়া অথচ বাহিরে রাগের ভান করিয়া কোন মতে তার প্রশ্নটাকে চাপা দিতে চেষ্টা করিতেছে।—জাগিয়া উঠিয়াই মনে হইল, এটি আমার স্বপ্নলব্ধ গল্প। এই স্বপ্নটির সঙ্গে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের পুরাবৃত্ত মিশাইয়া 'রাজর্ষি' গল্প মাসে মাসে লিখিতে লিখিতে বালক-এ বাহির করিতে লাগিলাম।"

গোবিন্দমাণিক্যের পুরাবৃত্ত বা ইতিহাস স্বভাবতই কবি পেয়েছিলেন ত্রিপুর রাজ পরিবারের কাছ থেকে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে ত্রিপুর রাজ বীরচন্দ্রের একটি চিঠির অংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার রাজবংশের একজন স্মরণীয় পূর্বপুরুষকে নিয়ে নবন্যাস লিখছেন জেনে সন্তোষ প্রকাশ করে বীরচন্দ্র লেখেন—"আপনি ত্রিপুর ইতিহাস অবলম্বন করিয়া উপন্যাস লিখিতে যত্ন করিয়াছেন, ইহাতে আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। যে যে স্থলে ইতিহাসের সহায়তা প্রয়োজন হয়—আমি আদরের সহিত নানা মূল হইতে তাহা সঙ্কলন করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি।...... ঐতিহাসিক কোন বিশেষ ভাগের সম্বন্ধে সংকীর্ণ সময় মধ্যে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলে কেবল রাজ রত্নাকর হইতে যে সহায়তা পাওয়া যায়, তাহাই দিতে পারিব। ......রাজরত্নাকরে গোবিন্দমাণিক্যের ও তাঁহার ভ্রাতা ছত্রমাণিক্যের চরিত যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা নকল করান হইয়াছে।

'রাজর্ষি'র কোন্ কোন্ স্থলে ইতিহাস রক্ষিত হয় নাই, তাহা রাজরত্নাকরের উক্ত উদ্ধৃত ভাগ দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।"

এই চিঠিতে উল্লেখিত ইতিহাসের সূত্র রাজ-পরিবার রক্ষিত রাজমালা বা সরকারী রাজবংশের ইতিহাস। মনে রাখতে হবে

মুখ্যদিক গৌণদিক

(উপরে শিবলিঙ্গ) শ্রীশ্রীযুতগোবিন্দ মাণিক্য দেব শ্রীগুণব তীমহাদেব্যৌ

টঙ্ক মুদ্রা (রৌপ্য); ওজন—৯·৯৫ গ্রাঃ; মাপ—২৪·১ মিঃ মিঃ

এই ইতিহাস রাজানুকূল্যেই লিখিত। তাই এই রাজ-উপাখ্যানে স্বভাবতই রাজ-পরিবারের গুণাবলী বেশী পরিমাণে কীর্তিত। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে ইতিহাস সর্বত্র রক্ষিত হয়নি তাতে উপন্যাসের মা[illegible] ক্ষুণ্ণ হয়নি—কারণ নিছক ইতিহাস আর ঐতিহাসিক উপন্যাস এক নয়। রবীন্দ্রনাথের কল্পনা সেই গোবিন্দমাণিক্য কে বরণ করেছে যে কর্তব্যে কঠিন কিন্তু

মুখ্যদিক গৌণদিক

মুখ্য দিক—শ্রীশ্রী (শিবলিঙ্গ চিহ্ন) যুত গোবিন্দ দেবঃ

গৌণ দিক—চাঁদ সহ ত্রিপুরা সিংহ বামমুখী শক ১৫৮২

এক চতুর্থাংশ টঙ্ক; ওজন—২·৫০ গ্রাঃ; মাপ—১৬·৬ মিঃ মিঃ

অন্তরে কোমল, আর এই গোবিন্দমাণিক্যকে তিনি পেয়েছিলেন সরকারী রাজবংশীয় ইতিহাস থেকে। উপন্যাসের পুরুষ আর ইতিহাসের পুরুষের মধ্যে তফাৎ থাকে—গোবিন্দমাণিক্যের বেলায় তার ব্যতিক্রম না হওয়াই স্বাভাবিক। রাজবংশের অনুকূল্যে লিখিত ইতিহাস ছাড়াও অন্য মত যা পাওয়া যায় বিভিন্ন সূত্র থেকে, সেই সব মিলিয়েই একটি নির্ভেজাল ইতিহাস রচিত হতে পারে। গোবিন্দমাণিক্যের বেলাও রাজবংশীয় ইতিহাস এবং অন্য সূত্রে পাওয়া ভিন্ন মত সংকলন করে একটি নিরপেক্ষ চিত্র রচনা করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

গোবিন্দমাণিক্য তাঁর পিতা কল্যাণমাণিক্যের মৃত্যুর পর শকাব্দ ১৫৮২তে রাজ্য লাভ করেছিলেন।

> "পনর শ' বিরাশি শক জ্যৈষ্ঠ মাস তাতে।
> ত্রয়োদশ দিন ছিল বুধবার যাতে॥
> গোবিন্দমাণিক্য রাজা হইল রাজন।
> গুণবতী মহারাণী বিখ্যাত ভুবন॥"
>
> 'রাজমালা'—কালীপ্রসন্ন সেন।

গোবিন্দমাণিক্যের প্রাপ্ত তারিখ যুক্ত মুদ্রাগুলিতেও এই শকাব্দেরই উল্লেখ আছে।

কল্যাণ মাণিক্যের সময় মোগলদের সঙ্গে ত্রিপুরার যুদ্ধ হয়েছিল এবং হয়ত তারই ফলস্বরূপ ত্রিপুরা গোবিন্দ মাণিক্যের সময় থেকেই কিছুটা মোগল বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। গোবিন্দমাণিক্য তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নক্ষত্র রায় (ছত্র মাণিক্য)-কে মোগল শাসনকর্তার কাছে রাজপ্রতিভূ হিসেবে প্রেরণ করেন। মনে মনে অসন্তুষ্ট নক্ষত্র রায় প্রায় দেড় বছর বাদেই মোগল সাহায্য পুষ্ট হয়ে ফিরে এসে ভ্রাতাকে রাজ্যচ্যুত করেন। এই প্রসঙ্গে দুটি মত বর্তমান—সরকারী রাজবংশীয় ইতিহাস বলছেন উদার গোবিন্দ মাণিক্য ভ্রাতৃ রক্তপাতে বিমুখ হয়েই স্বেচ্ছায় রাজ-সিংহাসন ত্যাগ করেন। ভিন্ন মতে উভয় পক্ষের তুমুল যুদ্ধের কথা উল্লেখিত। এই প্রসঙ্গে আরোও কয়েকটি ব্যাপার দৃষ্টিগ্রাহ্য। নক্ষত্র রায় মোগল রাজ-পুরুষের কাছে তাঁর প্রতিভূ থাকা কালেই প্রমাণিত করেন যে তিনি মৃত রাজা কল্যাণ মাণিক্যের রাজ্যলাভের পর বিবাহিত পত্নীর সন্তান; সুতরাং রাজ-সিংহাসনের তিনি বৈধ উত্তরাধিকারী। মোগল শাসনকর্তা শাহ সুজা যে নক্ষত্র রায়ের প্রতি কোন কারণে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং তাঁর উত্তরাধিকারের দাবি বিশ্বাস করেছিলেন সেটা মোগল শক্তি দিয়ে তাঁকে সাহায্য করাতে প্রমাণিত। গোবিন্দ মাণিক্যের বংশধরের দ্বারা লিখিত ও কালীপ্রসন্ন সেন সম্পাদিত সরকারী রাজমালায় গোবিন্দমাণিক্য স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগের উদার বর্ণনা লিপিবদ্ধ। ইংরাজীতে লেখা রাজমালার সার সঙ্কলয়িতা রেভারেণ্ড জেমস লঙ্ সাহেবও সরকারী রাজমালার মতই সমর্থন করেছেন। ঐতিহাসিক কৈলাসচন্দ্র সিংহ সংগৃহীত ভিন্ন রাজমালার সূত্রে থেকে গোবিন্দ মাণিক্য পুত্র রামদেবের সঙ্গে নক্ষত্র রায়ের তুমুল সংগ্রামের বিবরণ পাওয়া যায়। সম্ভবত রাজা গোবিন্দ মাণিক্যকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছানর সময় পাইয়ে দেবার জন্যেই রামদেব এই যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন।

কল্যাণ মাণিক্যের রাজত্বকালে তাঁর সেনাপতি হিসেবে মোগল শক্তির অপ্রতিরোধ্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকায় গোবিন্দ মানিক্যের যুদ্ধ থেকে বিরত হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। নক্ষত্র রায়ের বংশধরদের কাছে রক্ষিত রাজমালায় নক্ষত্র রায়ের নিজ শক্তিতে যুদ্ধ করার ব্যাপার বিশ্বাসযোগ্য নয়—; নক্ষত্র রায় যে মোগল শক্তির আনুকূল্য পেয়েছিলেন—সেটা নিশ্চিত। গোবিন্দ মাণিক্য দেশে পশুবলি

শ্রীগোবিন্দঃ
(তারিখ বিহীন)

নিষিদ্ধ করে গোঁড়া ধর্মাবলম্বীদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। নক্ষত্র রায় সম্ভবত এই প্রজাবর্গের সমর্থন পেয়েছিলেন।

রাজ্যচ্যুত গোবিন্দমাণিক্য, রানী গুণবতী ও কিছু বিশ্বস্ত অনুচরবর্গ সহ সীমান্তবর্তী দুর্ধর্ষ উপজাতি রিয়াংদের আশ্রয় নেন। রাজ্যভ্রষ্ট গোবিন্দমাণিক্যকে রিয়াংরা কোনরূপে সাহায্য করেনি। রিয়াংদের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে রানী গুণবতী তাদের অভিশাপ দিয়েছিলেন — তারও উল্লেখ আছে। গোবিন্দ মাণিক্য রিয়াংদের কাছে হয়ত রাজ্য পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে সহায়তা আশা করেছিলেন—সেটা রিয়াংরা দিতে নারাজ হয় এবং এই আশাভঙ্গজনিত ক্ষোভ থেকেই রানী যে অভিশাপ দিয়েছিলেন, সেটা মনে করা একেবারে অযৌক্তিক হবে না। রিয়াংদের কাছে থাকা আর নিরাপদ মনে না হওয়ায় গোবিন্দমাণিক্য রসাঙ্গ (আরাকান) রাজের আশ্রয় নেন। আরাকান রাজ সঙ্গসু-ধর্ম গোবিন্দ মাণিক্যকে সাদরে আশ্রয় দেন।

এদিকে মোগল রাজবংশেও পট-পরিবর্তন হয়ে যায়। উত্তরাধিকারের লড়াইয়ে পরাজিত শাহ সুজা ভ্রাতা ঔরঙ্গজেবের হাত থেকে বাঁচতে পালিয়ে আরাকানে এসে উপস্থিত হন। আশ্চর্য যোগাযোগ দুই রাজাহারা পলাতক রাজপুরুষদের মিলন। গোবিন্দ মাণিক্য কিন্তু শাহ সুজার সঙ্গে আগের তিক্ত সম্পর্কের কথা মনে করেও অত্যন্ত সদ্ব্যবহার করেন। এতে তাঁর ঔদার্যও যেমন প্রমাণিত হয় তেমনি রাজনৈতিক

ছত্র মাণিক্য

মুখ্যদিক গৌণদিক

শ্রীহরগৌরীপ দপদ্মমধুপ শ্রীশ্রীযুতছত্র মাণিক্যদেবস্য
ত্রিশূল সহ ত্রিপুরা সিংহ বাম মুখী শক ১৫৮৩
টঙ্ক মুদ্রা; ওজন—১০·৩৫ গ্রাঃ মাপ—২৪·০০ মিঃ মিঃ

দূরদর্শিতারও আভাষ পাওয়া যায়। কারণ তখনও উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বে শাহ সুজার ভাগ্য পরিবর্তনের সম্ভাবনা ছিল। সেই কথা স্মরণ রেখেই সম্ভবত গোবিন্দ মাণিক্য সাহ সুজার সঙ্গে সদব্যবহার করেছিলেন এটা খুবই স্বাভাবিক। পরে যদি সাই সুজা ক্ষমতাসীন হন তাতে গোবিন্দ মাণিক্যের সুবিধা হতে পারে এই ভেবেই নানাভাবে শাহ সুজার মনোরঞ্জন করার প্রয়াস করেছিলেন। এই অনুরক্তিতে প্রথম দিকে তাঁর আশ্রয়দাতা আরাকানরাজ গোবিন্দ মাণিক্যের প্রতি কিঞ্চিৎ বিরূপ হন—অবশ্য পরে তা ছিল না। শাহ সুজা আরাকানরাজের বিরাগ ভাজন হন এবং হয়ত বা ঐ কারণেই কিছুকাল অন্তে গোবিন্দ মাণিক্যকে আরকান ত্যাগ করতে হয়।

এর পরের ইতিহাস অস্পষ্ট। গোবিন্দ মাণিক্য ছত্র মাণিক্যের মৃত্যুর পর আবার সিংহাসন লাভ করেন। ছত্র মাণিক্যের রাজ্যকাল বিভিন্ন ঐতিহাসিকের মতে দুই থেকে ছয় বছর। ছত্র মাণিক্যের মুদ্রায় তাঁর রাজ্যলাভের বছর শকাব্দ ১৫৮৩। ছত্র মাণিক্যের মৃত্যু রহস্যাবৃত। সরকারী রাজমালায় বসন্ত রোগে তাঁর মৃত্যু হয়, এরূপ উল্লেখিত। ভিন্ন মতে তিনি নিহত হন। এই মৃত্যু বিষয়ে একটু আলোচনা প্রাসঙ্গিক। বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত আর এক রাজমালায় ছত্র মাণিক্যের মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ নেই। অহোম রাজ রুদ্র সিংহের ত্রিপুরা রাজসভায় পাঠানো দূতেরা ত্রিপুরা সম্বন্ধে যে ইতিবৃত্ত রেখে গেছেন, সেই "ত্রিপুরা বুরুঞ্জী" (ত্রিপুরা দেশের কথা)তে আমরা ভিন্ন মত পাই। এই ইতিবৃত্ত বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। এই বুরুঞ্জীর অনুবাদক শ্রীত্রিপুরচন্দ্র সেনের অনুবাদ থেকে কিছু রহস্যময় উক্তি উদ্ধৃত করা দরকার। অহোম দূতেরা এসেছিলেন গোবিন্দ মাণিক্যের পৌত্রদের রাজত্বকালে। সেই সময় সিংহাসন নিয়ে ভ্রাতৃবিরোধে জয়ী ভ্রাতা মহেন্দ্র মাণিক্য পরাজিত রাজা রত্ন মাণিক্যের জীবন বিনাশের পরিকল্পনা কালে এই উক্তিটি করেন—"...রত্নমাণিক্যকে বধ করিতে মামুদ ছাফি নিষেধ করিতেছে, অথচ না করিলেও অমঙ্গলের আশঙ্কা আছে। পূর্বে গোবিন্দ মাণিক্যকে সরাইয়া দিয়া ছত্র মাণিক্য রাজা হইয়াছিলেন। তখন গোবিন্দ মাণিক্য পলাতক অবস্থায় ছিলেন। পরে আবার গোবিন্দ মাণিক্য ছত্র মাণিক্যকে বধ করিয়া রাজা হইয়াছিলেন; এখন রত্ন মাণিক্য বাঁচিয়া থাকিলে আমারও সেইরূপ হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।"

ছত্র মাণিক্য হতই হন বা রোগে মারাই যান গোবিন্দ মাণিক্য দ্বিতীয়বার সিংহাসন লাভ করেন রাজপুরুষদের সহায়তায়। ছত্র

মাণিক্যের রাজত্বকালে কিছু সংখ্যক রাজপুরুষ, মোগল আনুকূল্যে পুষ্ট রাজপুরুষদের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন তা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। তাঁদের সহায়তা গোবিন্দ মাণিক্য পেয়ে থাকতে পারেন। প্রসঙ্গত আর একটি কথা বলা যায় যে গোবিন্দ মাণিক্য সিংহাসনের প্রতি মোটেই উদাসীন ছিলেন না—সেটা তাঁর সাদরে সিংহাসনারোহণ থেকেই প্রমাণিত। যদিও ছত্র মাণিক্যের পুত্র উৎসব রায় পিতার সিংহাসনের বৈধ উত্তরাধিকারী ছিলেন, তবুও তাঁকে সিংহাসন না দিয়ে রাজ প্রতিভূ হিসাবে মোগল দরবারে পাঠান। গোবিন্দ মাণিক্যের এই আচরণে ঔদার্যের নিদর্শন থাকলেও সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে দূরে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলেন। এতে তাঁর রাজনৈতিক কূট বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। মতান্তরে উৎসব রায় প্রাণ ভয়ে ত্রিপুরা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এবং তিনি বা তাঁর উত্তরাধিকারিরা কেউই আর ত্রিপুরায় ফিরে আসেননি। উৎসব রায় আর তার বংশধরেরা ঢাকার কাছে রাজার দুয়ারিতে বসবাস করেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও উল্লেখযোগ্য। সরকারী রাজমালা থেকে একেবারে বাদ দেওয়া হয়েছে ছত্র মাণিক্যের স্বীকৃত ছয় বৎসর রাজত্বকালের শাসন দিনপঞ্জী। তার জায়গায় স্থান পেয়েছে রাজ্যচ্যুত গোবিন্দ মাণিক্যের ইতিবৃত্ত। এই বিচিত্র পক্ষপাতিত্বের কারণ অজানা।

দ্বিতীয়বার সিংহাসন পেয়ে গোবিন্দ মাণিক্য তা দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করার জন্য অনেক সংস্কার ও কল্যাণমূলক কাজ করেছিলেন, যাতে তাঁর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দূরদর্শিতা প্রতিফলিত। তিনি সমাজের প্রভাবশালী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে অনেক ভূ-সম্পত্তি দিয়েছিলেন। অনেক ধর্ম মন্দির তৈরী করিয়েছিলেন—তার মধ্যে চন্দ্রনাথের শিব মন্দির উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া তিনি গোমতী নদীতে বাঁধ দিয়ে কৃষির উন্নতিতে সাহায্য করেছিলেন—ঐতিহাসিক নিদর্শন বাঁধের নাম হয় আইলা। মুদ্রা সংস্কারের কাজেও গোবিন্দ মাণিক্য তাঁর অর্থনৈতিক দূরদর্শিতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। বিদ্যোৎসাহী রাজা হিসাবেও বিশেষ কীর্তি তিনি রেখে গেছেন বিখ্যাত বই "বৃহন্নারদীয় পুরাণ" অনুবাদ করিয়ে। স্থাপত্য শিল্পের ব্যাপারে তিনি মন্দির নির্মাণ ছাড়াও শাহ সুজার নামে একটি মসজিদ কুমিল্লায় তৈরী করেন। মতান্তরে এই মসজিদ শাহ সুজার নিজের তৈরি বলা

রাম মাণিক্য

মুখ্যদিক | গৌণদিক

মুখ্য দিক—শি (মধ্যে শিবলিঙ্গ) বঃ শ্রীশ্রীযুত রাম মাণিক্য দেব শ্রীমতী রত্নাবতী মহাদেব্যৌ

গৌণ দিক—ত্রিশূল সহ ত্রিপুরা সিংহ, বাম মুখী। শক ১৫৯৮

টঙ্ক মুদ্রা, ওজন—৯.৩ গ্রাঃ; মাপ—২২.৭ মিঃ মি

হয়ে থাকে। এই মসজিদ তৈরির ব্যাপারে ধর্ম সম্বন্ধীয় উদারতা ছাড়াও মোগল রাজশক্তির সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষার উদ্দেশ্যও থাকতে পারে। এটা রাজনৈতিক বুদ্ধির নিদর্শন। গোবিন্দ মাণিক্য সমাজ সংস্কারেও অনেক কাজ করেছিলেন। ত্রিপুরাবাসীর জন্য পরিষ্কার লবণ ব্যবহারের অভ্যাস চালু করা থেকে এটা বিশেষভাবে মনে হতে পারে। তিনি এক বণিকের কাছে দুইটি হাতির বিনিময়ে ২০০ মণ নুন কিনে উদয়পুরবাসীদের মধ্যে বিতরণ করেন এবং এই নুন ব্যবহারকারীরা ভবিষ্যতে তাঁর ও তাঁর উত্তরাধিকারিদের কখনও বিরুদ্ধাচরণ করবে না—এই প্রতিজ্ঞা পাশে আবদ্ধ করেন। এত লোকহিতকর কার্য সত্ত্বেও তাঁর মনে যে একটা বিদ্রোহের সম্ভাবনার ক্ষীণ আশঙ্কা সব সময়েই ছিল—এই নুন বিতরণ তার নিশ্চিত প্রমাণ। রাজ্যলাভের পর কঠোরভাবে বিদ্রোহ দমন করে গোবিন্দ মাণিক্য সম্ভবত পূর্ববর্তী দুর্ব্যবহারের শোধ নিয়েছিলেন। সব মিলিয়ে গোবিন্দ মাণিক্য নিঃসন্দেহে একজন আকর্ষণীয় পুরুষ—অন্তত তাঁর কর্মকাণ্ডে তা প্রমাণিত। প্রখ্যাত ঐতিহাসিকগণ গোবিন্দ মাণিক্যের তারিখ যুক্ত মুদ্রার ভিত্তিতে তাঁর রাজত্বকাল স্থির করেছেন ১৫৮২ শকাব্দ। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় রাজত্বকাল যে ১৫৯৮ শকাব্দের পরে ছিল না সেটা তাঁর পুত্র রাম মাণিক্যের ১৫৯৮ শকাব্দে উৎকীর্ণ মুদ্রায় প্রমাণিত।

মুদ্রা পদ্ধতিতেও গোবিন্দ মাণিক্যের স্বকীয়তার নিদর্শন পাওয়া যায়। যদিও তিনি প্রচলিত মুদ্রা পদ্ধতি অনুসরণ করেন কিন্তু ছোট মুদ্রা প্রচলন করে তিনি নিজের রাজ্যকাল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য করেন। ১৫৮২ শকাব্দের দুইটি বিভিন্ন ধরনের টঙ্ক মুদ্রা, গোবিন্দ মাণিক্যের ও রাণী গুণবতী নামাঙ্কিত শিবলিঙ্গ যুক্ত, এই প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছে।* সম্ভবত ত্রিপুরার মুদ্রায় এই প্রথম শিবলিঙ্গ চিহ্ন উৎকীর্ণ করা হল—"রাজার মস্তক শিবলিঙ্গ সম্মুখে।" রাজমালা কালীপ্রসন্ন সেন। যদিও গোবিন্দের পিতা কল্যাণ মাণিক্যের—"শ্রীশ্রীযুত কল্যাণমাণিক্যদেব" লিখিত ১৫৭৪ শকাব্দে উৎকীর্ণ অর্ধ টঙ্ক পাওয়া গেছে, কিন্তু গোবিন্দ মাণিক্যের কোন অর্ধ মুদ্রা এখনও পাওয়া যায়নি। গোবিন্দ মাণিক্যই সিকি মুদ্রার প্রচলন করেন এবং এই সিকি মুদ্রায় মুদ্রণ ১৫৮২ শকাব্দের ভুল পড়েই তাঁর শাসনকালের সময়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। এই সিকি মুদ্রা তিনি প্রতি কাহিনী [illegible] রাজাদের সঙ্গে যুক্ত করে প্রচলন করেন [illegible] এবং উত্তরাধিকারীদের হাতে নির্দেশ দেন যে এতদ্বারা রাজা নিজ নামে সিকি মুদ্রা প্রচলনের অধিকারী হইবেন। গোবিন্দ পিতা কল্যাণদেবের ১৫৭৪ শকের সিকি মুদ্রা ছাড়াও তাঁর ভবিষ্যৎ পুরুষদের মধ্যে রামমাণিক্য, রত্নমাণিক্য, ধর্মমাণিক্য, ইন্দ্রমাণিক্য ও কৃষ্ণমাণিক্যের যথাক্রমে ১৫৯৮, ১৬০৭, ১৬৩৬, ১৬৬৬ ও ১৬৮৯ শকাব্দে উৎকীর্ণ সিকি মুদ্রা পাওয়া গেছে এবং তাদের মুদ্রণ ধরণও গোবিন্দ মাণিক্যের মুদ্রার অনুরূপ। গোবিন্দ মাণিক্যের এক ধরনের তারিখ বিহীন মুদ্রা পাওয়া গেছে। যদিও তাঁর ছোট দুই মহিষী শ্রীমতী [illegible] ও শ্রীমতী [illegible] যথাক্রমে [illegible] ও [illegible] টঙ্ক মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে কিন্তু গোবিন্দ মাণিক্যের এ রূপ মুদ্রার কোন উল্লেখ নেই।

---

* প্রকাশক প্রাপ্তি ও আলোকচিত্রের [illegible] জন্য সংগ্রাহক শ্রীগোবিন্দ [illegible] মহাশয়ের কাছে কৃতজ্ঞ।

প্রবন্ধের সাহায্যে ব্যবহৃত গ্রন্থ তালিকা

১ শ্রীরাজমালা [illegible] সম্পাদিত রাজমালা

২ কৈলাসচন্দ্র সিংহের সংগৃহীত রাজমালা

৩ ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষা অধিকার প্রকাশিত 'রাজমালা' বাংলা সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত।

৪ ত্রিপুরা দেশের কথা—উপেন্দ্রচন্দ্র সেন [illegible] মিউজিয়ামে রক্ষিত ত্রিপুরা বুরঞ্জীর অনুবাদ।

৫ জে এ এস বি (নিঃ সাঃ ১৯-১৯২৩ খৃঃ) এন কে ভট্টশালী

শান্তিনিকেতন / সেকাল-একাল

সম্প্রতি "দেশ" পত্রিকায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীযুক্তা মীরা-দেবী লিখিত ঠাকুরবাড়ি ও শান্তিনিকেতন সংক্রান্ত কিছু চিত্তাকর্ষক "স্মৃতিকথা" প্রকাশিত হইয়াছে। আমার ন্যায় অসংখ্য পাঠক-পাঠিকা ইহা পড়িয়া বিশেষ তৃপ্তি-লাভ করিয়াছেন ইহাতে সন্দেহ নাই। সর্বশেষ অংশে (৫ই পৌষ '৭৬ পৃ ১০৮—১১০) লেখিকা শান্তিনিকেতনের বর্তমান অবস্থা সংক্রান্ত ২।৩টি বিষয়ে বেশ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁর প্রধান বক্তব্য হচ্ছে যে, বর্তমানে কতগুলি বিরাট অট্টালিকা প্রতিষ্ঠা করিয়া কবিগুরুর আশ্রমের আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে। বর্তমানে একটি আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য শান্তিনিকেতনের পুরাতন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহগুলি যুগোপযোগী নহে। একথা সত্য, কিন্তু তার জন্য বিদ্যালয়গৃহগুলিকে বিলাসবহুল বিরাট অট্টালিকাগুলি দ্বারা একটি বিলাসবহুল শহরের আকৃতি দেওয়া হইয়াছে ও হইতেছে। আমাদের দেশের মামুলী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বহু-নগরীতেই স্থানাভাব দেখা যায়। ঐ কারণে দ্বিতল বা ত্রিতল অট্টালিকার ব্যবস্থা আবশ্যক। শান্তিনিকেতনে জমির কোন অভাব নাই। খেলার মাঠ ফুলের বাগান এমন কি ছায়াযুক্ত বৃক্ষশ্রেণী—"বনরাজিনীলার" জন্য যথেষ্ট জায়গা পাওয়া যায়। এমত অবস্থায় ছোট ছোট বাড়িতে বিশ্ববিদ্যালয় কুঠিগুলি ছড়াইয়া দিলে আশ্রমের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্যকরূপে বজায় থাকে। এই ব্যাপারে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছুটা কিম্বা ঢাকা নগরীতে রমনামাঠের বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা অনুকরণীয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও কবিগুরু উভয়েই শান্তিনিকেতনকে প্রাচীন মুনি ঋষিদের আশ্রমের আদর্শ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু শহুরে সাধারণ বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ের অনুকরণ করার ইচ্ছা এঁদের আদৌ ছিল না।

অপর একটি ব্যাপারে মীরা দেবী নিশ্চয়ই খুব ব্যথিত হইয়াছেন। সেটি হল "সত্যম শিবম্ অদ্বৈতম"—যা ঐ আশ্রমের মূলমন্ত্র তাকে অংগচ্ছেদ করিয়া "সত্যম্ অদ্বৈতম্" করা হইয়াছে। এটা বোধ হয় কোন অত্যুৎসাহী "Secularism" ভক্ত শিল্পীর কর্তা স্থানীয়ের "কারসাজী"। "শিব" বলিতে শুধুমাত্র গোঁড়া হিন্দুদের দুর্গা বা কালী পুজার শিবকে বোঝায় না। শিবের অন্য অর্থ বহু ব্যাপক—শুভ, মঙ্গল, সমৃদ্ধি ইত্যাদিও বোঝায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রাজা রামমোহন রায়ের ঠিক পরেই ব্রাহ্ম-সমাজের শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন। তিনিই ব্রাহ্মসমাজের সর্বপ্রথম সংগঠনকারি-রূপে প্রখ্যাত। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তাঁর ঘোর আপত্তি সর্বজনবিদিত। তিনি "শিবং" কথাটি কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা "জলবৎতরলং"। এমতাবস্থায় "শিবং" কথাটি লোপ করিয়া দেওয়া একপ্রকার সাংস্কৃতিক "Vandalism" অমার্জনীয় অপরাধ তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংরাজ কবি Keats-এর ছত্রটি

> Truth is beauty, beauty is truth
> That is all ye know
> and need to know"

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। "সত্যং শিবং সুন্দরম্" Keats-এর বহু বহু পূর্বে আমাদের প্রাচীন ঋষিদের আশ্রমে রচিত হইয়াছিল। বোধ হয় শান্তিনিকেতন কর্তৃপক্ষ ঐ পরিবর্তন ব্যাপারে তাঁদের মতামত প্রকাশ করিবার সুযোগ পান নাই।

"It is never too late to mend"—এইটি মনে রেখে "শিবং" কথাটি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে। এজন্য আন্দোলন প্রয়োজন। ছাত্রছাত্রীদের পোশাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে মীরা দেবী যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। "Plain living and high thinking" জিনিসটি আমাদের দেশেরই ঐতিহ্য। প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্বে Herbert Spencer ছাত্রদিগকে এ বিষয়ে অনেক উপদেশ দিয়াছেন। আজকাল বহু বিদেশী Tourist ভারতে আসেন যাঁদের পোশাক পরিচ্ছদ অতীব সরল। পায়ে মোজা নেই—সামান্য চপ্পল শোভিত পদে বহু European যুবক যুবতী এদেশে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। তাঁদের "আত্মকর্ষকমং দেহং" আমাদের ঈর্ষার বিষয়। তাঁরা আমাদের দেশের ছাত্রদের হইতে অনেক পরিমাণে স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান। কেহ কেহ ধনীর সন্তান। শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছাত্রীরা অবুঝ নহেন। এ বিষয়ে তাঁদের নিকট আবেদন করিলে ইহা ফলপ্রসূ হইবে সন্দেহ নাই। ইতি

শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার
কলিকাতা-১৯

কাবুলিওয়ালা

গত ৩৭ বর্ষ ১১ সংখ্যা 'দেশ'-এ নিয়মিত ফিচার বাংলার চালচিত্রে কাবুলি-ওয়ালা পড়ে এই আলোচনার অবতারণা করছি। কাবুলিরা বিদেশীয় মুসলমান—দেহ বা 'স্থান' অর্থাৎ আফগানিস্থান, তুর্কিস্থান, পাকতুনিস্থান, বেলুচিস্থান, লাগোয়া—এই দিক থেকে আমাদের ভারত ওরফে পাকিস্তানের ভাষায় হিন্দুস্থানের মুসলমানদের চেয়ে জবরদস্ত মুসলমান বলে অন্তত আমরা এই হিন্দুঘেঁষা মুসলমানরা মনে করি। ইসলামের অনু-শাসন অনুযায়ী টাকার সুদ বা কাবুলিদের ভাষায় নজরানা একেবারে সোজাসুজি হারাম। এই হারাম শব্দটার অর্থ কাবুলিরা বেশ ভালোভাবেই জানে, কেন না ওরা উর্দুভাষার পোকা। বাংলার চালচিত্রে জব্বার সাহেব কাবুলিদের এই হারামি ব্যবসা সম্পর্কে যা লিখেছেন তা বাস্তবতায় ষোল আনা টাইটুম্বুর। কিন্তু লেখকের একটি অপ্রাসঙ্গিক কথা আমাদের ব্যথিত করে তুলেছে। কথাগুলি জব্বার সাহেবের নিজের—যেমন—"মেয়ের কি মুসলমান হয় কোনদিন?" মুসলমানির একটা বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি আছে—সে কথা জব্বার সাহেব জেনেও বড় বেশী বাচালতা করেছেন। অপ্রাসঙ্গিক এই কথাগুলি ছাড়াও ফিচারটি পূর্ণাঙ্গ হতে পারতো।

হাফেজ আমির আলি
কলকাতা-১৬

লেখকের বক্তব্য,

হাফেজ আমির আলী সাহেবের পত্র পড়ে ব্যথিত হলাম। আমাদের সামাজিক রীতি যা, সে-সম্বন্ধে আমার ঘৃণা-বিদ্বেষ আদৌ নেই। কাবুলির সঙ্গে নিভেজাল একটি রসিকতা করা হয়েছে। পাঠক যদি রসিকতাও না বোঝেন এবং তাকে সিরিয়াসলি দেখেন তাহলে কারও সম্পর্কে, হিন্দু কী মুসলমানদের সম্বন্ধে কোনো কিছুই লেখা তো-সম্ভব হবে না। যদি রসিকতার রসও কারো তিক্ত লাগে তবে

সাহিত্যের উপর পুলিসের জুলুম

"সংবাদে প্রকাশ, শ্রীমান বুদ্ধদেব বসু প্রণীত "এরা ওরা এবং আরও অনেকে" নামক একখানি গল্পের বইতে যুবক-যুবতীর প্রণয় সম্পর্কে এমন বর্ণনা আছে, যাহা অল্প বয়স্কেরা পড়িলে খারাপ হইয়া যাইতে পারে, এই অজুহাতে কলিকাতার ডিটেকটিভ বিভাগের ডেপুটি পুলিস কমিশনার বইগুলি বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন এবং গ্রন্থকারের নিকট প্রতিশ্রুতি লইয়াছেন যে, তিনি এক বৎসর ঐ পুস্তক পুনঃপ্রকাশ করিবেন না এবং তাহার পর ডেপুটি কমিশনারের অনুমতি লইয়া ঐ কার্য করিবেন।"

বোঝাই যাচ্ছে, খবরটা অনেক কালের। কেননা বুদ্ধদেব বসুকে শ্রীমান বলে সম্বোধন করবেন, এমন সাংবাদিক এখন কেউ আছেন কিনা সন্দেহ। খবরটি ঠিক সাঁইত্রিশ বছর আগের, ইং ১৪-১-৩৩ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় থেকে উদ্ধৃত। সে সময় আমি ঠিক এ পৃথিবীতে ছিলাম না, অন্যত্র ব্যস্ত ছিলাম, তাই তখন আমার পক্ষে খবরটি পড়া সম্ভব হয়নি। পুরোনো ফাইল খোঁজার ধৈর্যও আমার নেই—কয়েকদিন আগেকার আনন্দবাজারে "অতীতের পৃষ্ঠা থেকে" কলমে এই অংশটুকু পুনরুদ্ধৃত হয়েছে।

আমার অমূলক ধারণা ছিল, সেই সময় আনন্দবাজার পত্রিকা ছিল বেশ রক্ষণশীল কাগজ। বুদ্ধদেব বসু তখন কুখ্যাত তরুণ লেখক, বয়েস মাত্র চব্বিশ-পঁচিশ, অথচ ওঁকে সমর্থন করে একটি প্রভাবশালী দৈনিক পত্রিকায় সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল—এ ব্যাপার দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছি। যতদূর মনে হয়, তখন সি আই এ-র উপদ্রব ছিল না, আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদও এ দেশের যুবকদের চরিত্র নষ্ট করার জন্য কোনো গরজ দেখায় নি—এবং এর কিছুকাল পরেই বুদ্ধদেব বসু ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন—কিন্তু সাহিত্য সৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর তখনকার এবং বর্তমানের অভিমত অভিন্ন। সাহিত্যকে আদালতে টেনে নিয়ে যাওয়া, একালের মতন তখনও ছিল পুলিসী গুণ্ডামির ব্যাপার।

যাই হোক, আমি সেই সাঁইত্রিশ বছর আগেকার সম্পাদকীয়র অংশ পুনরুদ্ধার করে দিচ্ছি এখানে।

"উদীয়মান সাহিত্যিকদের রচনা অনেক অস্তগামী ব্যক্তির ভাল লাগে না, না লাগাই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ যে-বয়েসে, যে-কালে "চিত্রাঙ্গদা" "বিজয়িনী" লিখিয়াছিলেন, সেকালের বিজ্ঞান উঁহাতে, এমন কি, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্যসৃষ্টিতে চরিত্রহীনতা দেখিয়া শঙ্কিত হইয়াছিলেন। আমরা এমন কথা বলি না যে, নূতন "আধুনিক সাহিত্য" বলিয়া পরিচিত উপন্যাসগুলির সবই ভাল, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, সমাজে এক শ্রেণীর নীতিবাগীশের আবির্ভাব হইয়াছে, যাঁহারা নিতান্তই ঈর্ষাবশতঃ পুলিশ দ্বারা সাহিত্য নিয়ন্ত্রণ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। এই শ্রেণীর লোকের প্ররোচনায় পুলিস বিভাগের এভাবে হস্তক্ষেপ করা অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে।

"উপন্যাসের নরনারীরা কিভাবে প্রেম নিবেদন বা হৃদয় বিনিময় করিবে তাহার 'হুকুম' যদি পুলিস নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা হইলে বাঙ্গলা সাহিত্যের অতি শোচনীয় দুর্দিন সমাগত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।.. বাহুবল দ্বারা সাহিত্যও এ দেশে নিয়ন্ত্রিত হইতে চলিল, ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।"

এ সম্পর্কে আমার আর কিছু মন্তব্য করা সংগত হবে না, কারণ বুদ্ধদেব বসুর অন্য একটি বই নিয়ে এখনও মামলা চলছে, কোনো মন্তব্য 'সাব জুডিস' হতে পারে। তবে এটুকু নিশ্চয়ই বলা যায়, সাঁইত্রিশ বছর আগে বর্ণিত অবস্থা এখনও প্রায় একই রকম রয়েছে।

"প্রতিশ্রুতি" ও "আমরা"

দুটিই নবীন লেখক-লেখিকাদের কাগজ। "প্রতিশ্রুতি"র এক বছর পূর্ণ হয়েছে, এবং এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটির এক বছরে প্রায় চার শো নতুন লেখক লেখিকার রচনা প্রকাশিত হয়েছে—যাঁদের মধ্যে অনেকেই সদ্য লিখতে শুরু করেছেন। সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, "প্রতিশ্রুতি দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করে প্রমাণ করল, কেবলমাত্র নতুন লেখকদের লেখা দিয়েও একটা সাপ্তাহিক চলতে পারে প্রমাণিত হল, শত সমস্যা জর্জরিত বাঙালী সাহিত্যকে ভালোবাসেন, সুযোগ পেলে যে-কোনো সাহিত্য প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত থাকতে চান শুধু পড়ার জন্য নয়, লেখার জন্যও।" এ বছর থেকে অবশ্য কিছু কিছু প্রতিষ্ঠিত লেখকদের রচনা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সম্পাদক, ব্রজেন্দ্র-কুমার ভট্টাচার্য।

"আমরা"ও তরুণ ও নবীন লেখকদের পত্রিকা। সম্পাদক অঞ্জন সেন, তাঁর বয়েস এখন সতেরো। কাগজটি বেরুচ্ছে দেড় বছর ধরে। নবীন ও প্রবীণ লেখকদের গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ এতে স্থান পায়।

জীবনানন্দ দাশের স্মৃতিরক্ষা

'খোয়াই' একটি নতুন কবিতার পত্রিকা। সম্পাদক গৌরী বসু। এই পত্রিকার পক্ষ থেকে জীবনানন্দের স্মৃতিরক্ষার জন্য একটি সুন্দর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বছরের সব সেরা নতুন কবির স্বীকৃতি-রূপে তাঁর একখানি কবিতার বই এঁরা প্রকাশ করবেন এবং সেই বৎসরের বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কবির একটি সংকলন প্রকাশ করবেন জীবনানন্দের জন্মদিন ৬ই ফাল্গুনে—এবং একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে সেই কবিকে সম্বর্ধনা জানানো হবে। খোয়াই পত্রিকাটি বেশ ঝকঝকে ও সুনির্বাচিত, আশা করি, এঁদের অন্যান্য উদ্যোগও সার্থক হবে।

ঈগল

সম্পাদকের নামহীন এই নতুন কাগজটি, উদ্যোক্তাদের মতে, "স্বদেশ ও বিদেশের অভিনব সাহিত্য আন্দোলনের স্রষ্টা ও সহায়কদের পত্রিকা।" "বর্তমান দশকের শুরু থেকেই প্রচলিত রীতিতে হতশ্রদ্ধ" হয়েছেন যে-সব তরুণ লেখকরা, তাঁদের নিজস্ব নতুন গল্প-কবিতা প্রকাশিত হবে এতে। প্রথম সংখ্যায় সামুয়েল বেকেট সম্পর্কে শেখর বসুর আলোচনাটি বেশ গভীর।

মহাভারতের অনুবাদ

কবি পি লাল মহাভারতের ইংরেজী অনুবাদ করার জন্য নেহরু-স্মৃতি ফেলো-শীপ পেয়েছেন। অনুবাদ সম্পূর্ণ করতে তাঁর প্রায় দশ বছর সময় লাগবে। তাঁর অনূদিত গীতার অনুবাদ যথেষ্ট প্রসিদ্ধ হয়েছে।

দিল্লিতে যে ভারত-অস্ট্রেলিয়া সাহিত্য সেমিনার হয়ে গেল, সেখানে এক ভাষণে পি লাল তাঁর অনুবাদ পদ্ধতির বর্ণনা করেন। তিনি অনুবাদকেও এক ধরনের সৃষ্টি বলে মনে করেন, এবং ট্রান্সলেসানের বদলে ট্রান্সক্রিয়েশান শব্দটি নিজের কাজ সম্পর্কে ব্যবহার করতে চান। প্রতি মাসে তিনি ৯০০ শ্লোকের অনুবাদ করে যাচ্ছেন—গভীর রাত্রে কিংবা ভোরবেলা তিনি লেখার কাজ করেন।

এর আগে দু'বার মহাভারতের অনুবাদ হয়েছে। নব্বই বছর আগে কিশোরীমোহন গাঙ্গুলি মহাভারতের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন—তাঁর সময় লেগেছিল দশ বছর। মন্মথনাথ গুপ্তও একটি অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন গত শতাব্দীতে।

তবে ঐ দুটিতেই আদি রসাত্মক অংশ বাদ দেওয়া আছে। পি লাল মনে করেন, এ যুগের পাঠকরা সেসব অংশ নিশ্চয়ই সহ্য করতে পারবেন—তিনি কিছুই বাদ দেবেন না। তাঁর মতে, ঐ সব অংশ মোটেই ভালগার নয়।

সনাতন পাঠক

রাজনৈতিক প্রবন্ধ

ঔপনিবেশবাদ থেকে সাম্যবাদ। হোয়াং ভ্যান চি। অনুবাদ : কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। এশিয়া পাবলিশিং, কলকাতা-বারো। দাম পাঁচ টাকা।

আজিকার উত্তর ভিয়েতনাম। সম্পাদনা : পি জে হনি, অনুবাদ : দীপক চৌধুরী। এশিয়া পাবলিশিং, কলকাতা-বারো। দাম পাঁচ টাকা।

দুটি বইয়ের লক্ষ্য এক : নানা প্রকারে ভিয়েতনাম-চর্চা। ভূমি সংস্কারের বিস্তৃত আলোচনা আছে দুই বইয়ে কারণ ওটি হল মস্ত চাবিকাঠি। হুণানে মাও যে বীজ পুঁতেছিলেন তাই আজ দিকে দিকে ফলদায়ক বৃক্ষ হয়ে উঠছে। ১৯৫৫ সালে উত্তর ভিয়েতনাম আলাদা হয়ে যাবার পর সেখানে চীনের কায়দায় ভূমি সংস্কার আরম্ভ হয়। বিপ্লবের কাজে চাষীদের লাগানো আরেকটি মোক্ষম অস্ত্র। ভূমি সংস্কারের শুরু এইভাবে : বহু লোককে জোতদার ও জমিদার শ্রেণীতে ভাগ করা; তাদের তালিকা বানিয়ে গণ-আদালতে শাস্তির ব্যবস্থা। অথচ তারা সবাই বড় জোতদার বা জমিদার ছিল না। এক সঙ্গে তিনটি পাখি মারা ছিল এই নয়া সংস্কারের উদ্দেশ্য। প্রথম, মার্কামারা কম্যুনিস্ট-বিরোধীদের এই ধাক্কায় সরিয়ে দেওয়া; দ্বিতীয়, আতংক সৃষ্টি করে সকলকে বুঝিয়ে দেওয়া যে, কম্যুনিস্ট শাসনের বিরোধিতা বিপজ্জনক; তৃতীয়, নতুন লোকদের জমি বণ্টন করার প্রকৃত রহস্য, চিরকালের মতো তাদের তাঁবে এনে ফেলা। অন্নামিজ পর্বতমালা এখন আর দুর্ভেদ্য-দুর্গম নয়। তার চেয়ে ঘোরতর শক্তি সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস বদলে দিয়েছে। উত্তর-পূর্ব এশিয়ায় চীন যদি ক্ষমতা বিস্তার করতে চায় তাহলে ভিয়েতনাম-ই হচ্ছে সোজা রাস্তা। ইতিহাস নির্দিষ্ট করে দিয়েছে এই দুই দেশের নিকট সম্পর্ক। সেই জন্য বোধহয় মাওকে হো-চি মিন বলেছিলেন : চীন এবং ভিয়েতনামের সম্পর্ক বরাবরই বন্ধুত্বপূর্ণ। বস্তুতঃ, সম্পর্ক বহু শতাব্দী জুড়ে। প্রায় এক

হাজার বছর ধরে চীন ভিয়েতনামকে নিজের শাসনে রেখেছিল। চীন সংস্কৃতি ভিয়েতনামেরও অন্যতম সংস্কৃতি; যেমন ভারতের অনেকখানি ইংরেজ সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস। এমন কি চীন বর্ণমালা ভিয়েতনামীদের 'চু-ভা' অর্থাৎ 'আমাদের অক্ষর।' প্রেসিডেন্ট হো-র মৃত্যুর পর অবস্থা কী দাঁড়ায় সেটাই লক্ষণীয়। আগে দেখা গেছে কমরেড হোর অনুপস্থিতিতে দল একাধিকবার টলমল হয়েছে। হো-র প্রখর বুদ্ধি ও সাক্ষিত্ব নিজের দেশের দুই বিপরীত বৃহৎ শক্তির সমর্থককে ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিল; তেমনি রুশ ও চীন দু'পক্ষকে তিনি রেখেছিলেন সামলে। বর্তমান নেতৃত্ব কতদিন দোরগোড়ার থাবা বাগিয়ে বসে থাকা বাঘ ঠাণ্ডা রাখতে পারবে? অবশ্য সশস্ত্র আক্রমণ যদি কেউ করে তো করবে চীন। থাইল্যাণ্ড বা লাওস বাদ। বিনা মার্কিনী মদতে দক্ষিণ ভিয়েতনাম ইচ্ছে করলেও উত্তরে হানা দিতে পারবে না। যাক, আমেরিকা ঘরেবাইরে যেভাবে নিন্দিত হচ্ছে তাতে সম্মানটুকু বজায় রেখে ভিয়েতনাম থেকে সরে আসতে পারলেই যথেষ্ট। নতুন করে অপদস্থ হবার জন্য দক্ষিণকে ইন্ধন যোগানো তাদের পক্ষে অসম্ভব বলেই মনে হয়।

বিশেষ করে প্রথম বইটি থেকে আরেকটি শিক্ষা পাওয়া যাচ্ছে। ভারত ও ব্রহ্মদেশের সেটি জেনে রাখা উচিত; যদিও বাইশ বছরে কেউ প্রথম ভাগ শেখে না। বাইরের আক্রমণ হয়তো সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করা যায় কিন্তু ভিতরের নাড়ী-নক্ষত্র এলোমেলো হয়ে গেলে তাকে সামলানো কঠিন। সেটা সচরাচর ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হবার পরই ঘটতে থাকে। বোতাম টেপার মতো সহজ সমালোচনা করা যায়, কিন্তু তার আগে ভাবা দরকার ওই একটুখানি বাংলা-বারান্দার মতো দেশ ভিয়েতনাম কেন আজ ইতিহাসের কেন্দ্রে। কেন হো-চি মিন সাক্ষাৎ জনগণ-মন অধিনায়ক, কেনই বা তিনি 'বিংশ শতাব্দীর সেন্ট!' জন্মেই মানুষ বিপ্লবী হয় না কিংবা বিপ্লবের সাঁতার শেষ করে তবে জলে নামে তা নয়। ভিয়েতনামের জনগণ জানত, মানুষ হিসেবে বাও-দেই বা দিয়েম-এর সঙ্গে চাচা হোর বিস্তর তফাত। চারদিকের দুর্নীতি, দুরাচার এবং পাপচক্রের পেশকারদের প্রতি দারুণ ঘৃণাই তাদের ধীরে ধীরে বিপ্লবী করে তোলে। তাছাড়া, দেশে যখন প্রবল দারিদ্র্য তখন মান্দারিনদের আরাম-বিলাস, সুখী-সুখী জীবন দেখে তারা বিতৃষ্ণ হয়েছিল। ঔপনিবেশিকতার পরে নতুন শাসনব্যবস্থায় যখন দুর্নীতির ঢালাও শয্যা সাজানো চলতে থাকে তখনই মানুষের ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্যের সংঘাত শুরু হয়। সেই সংঘাত শেষ হয় সর্বনাশা বিপ্লবে। এই বই দুটির সব তথ্য ও মতামতে সায় না দিলেও চলবে, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে বই দুটি বিশেষ ইণ্টারেস্টিং। কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং দীপক চৌধুরী দু' জনেই প্রতিষ্ঠিত লেখক; তাঁদের উপযুক্ত অনুবাদ বই দু'খানির প্রতি আগ্রহ বাড়িয়েছে।

৩২৬।১৮।৩২৩।৬৮

বিপ্লবীর স্মৃতিকথা

আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী শ্রীমতিলাল রায়। প্রবর্তক পাবলিশার্স ৬১, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ দাম দু' টাকা পঁচাত্তর পয়সা।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে শ্রীমতিলাল রায় একটি বিশিষ্ট নাম। শ্রীঅরবিন্দের সাহচর্যে এবং আদর্শে অনুপ্রাণিত শ্রীমতিলাল রায় সুখ্যাত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এবং তৎপরবর্তী সন্ত্রাসবাদী সংগ্রামের অন্যতম যোদ্ধা হিসেবে বাংলাদেশের বৈপ্লবিক সংগঠনগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। আলোচ্যগ্রন্থে শ্রীমতিলাল রায় তাঁর বিচিত্র বিপ্লবী জীবনের কিছু স্মৃতিকথা গ্রন্থাকারে সাজিয়ে পরিবেশন করেছেন। তবে শ্রীরায়ের আলোচনা প্রচলিত ইতিহাস পুস্তকের মত তথ্যবহুল এবং ক্রমবদ্ধভাবে পরিবেশিত হয়নি। স্মৃতিচারণার সূত্রে বিগতদিনের বৈপ্লবিক প্রয়াসের নানা কথা তিনি ইচ্ছেমত সাজিয়েছেন। কিন্তু আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীরায় এমন কিছু তথ্য এবং ঘটনার উল্লেখ করেছেন যার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনেকখানি। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে মহারাষ্ট্রের স্বদেশ-চেতনার যোগাযোগ, স্বাধীনতা আন্দোলনে অরবিন্দের ভূমিকা ও তাঁর চাঞ্চল্যকর অজ্ঞাতবাস, বারীন্দ্রকুমার ঘোষের নেতৃত্বে সশস্ত্র গুপ্ত সংগঠন, বিপ্লবী নায়ক চারুচন্দ্র, বন্দীশালায় মুক্তি-পরিকল্পনা, মৃত্যুঞ্জয়ী কানাইলাল ও সত্যেন্দ্রনাথের ফাঁসী, বীরেন্দ্র দত্তগুপ্তের স্বীকারোক্তি ও ফাঁসী, চন্দননগরে বোমা-তৈরির উদ্যোগ,

পুলিনবিহারী দাস ও অনুশীলন সমিতি, বীর বালক ননীগোপাল ও ডেনহ্যাম-হত্যা-প্রচেষ্টা, বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর রোমাঞ্চকর জীবন, বীর শহীদ যোগেন্দ্রনাথ, মহাযুদ্ধের সুযোগ ও অস্ত্র সংগ্রহ, বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে গীতা-তন্ত্র-বেদান্তের অনুপ্রেরণা, চন্দননগরে গুপ্ত বিপ্লবীদুর্গ, অরুণাচলে বোমা, বাদুড়-বাগান ও রাজাবাজারে বিপ্লবকেন্দ্র, বীর বসন্তের ফাঁসী, লাট্টু সান্যাল, জন্মবীর বিশ্বাস ভ্রাতৃদ্বয়, দিল্লীর ষড়যন্ত্র বিস্তার প্রভৃতি অগ্নিযুগের ছোটবড় পরিচিত অপরিচিত বিচিত্র দুঃসাহসিক প্রয়াস এবং আত্মত্যাগের অসাধারণ কিছু খণ্ডচিত্র রচনা করেছেন শ্রীরায়। লেখক স্বয়ং এসব ঘটনা এবং চরিত্রের খুব নিকটে থাকায় গ্রন্থস্থ প্রতিটি আলোচনা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তাছাড়া শ্রীরায় বাংলার বিপ্লবী প্রয়াস সম্পর্কে এমন কিছু তথ্য পরিবেশন করেছেন যা এতকাল আমাদের কাছে অপরিজ্ঞাত ছিল। এদিক থেকে গ্রন্থখানির গুরুত্ব অসাধারণ। সর্বোপরি লেখকের দেশানুরাগ আন্তরিক এবং অকুণ্ঠ হওয়ায় প্রতিটি চরিত্র ও ঘটনা প্রাণস্পর্শী হয়ে উঠেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বর্ণিতব্য বিষয় লেখকের আবেগবহুল ভাষা ব্যবহারে উচ্ছ্বাসপূর্ণ হয়ে উঠেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এই আবেগটুকু ঐতিহাসিক নীরসতাকে লাঘব করে গ্রন্থের বিষয়কে অ-স্পর্শনীয় করে তুলতে সক্ষম হয়েছে। সব মিলিয়ে 'আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী' বাংলাদেশের জাতীয় জীবনের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন, একথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে। ১১৪/৬৮

প্রাপ্তি স্বীকার

কিশোর কবি সুকান্ত। সুবোধ চক্রবর্তী। শ্রীমতী কল্পনা চক্রবর্তী : কাঠাল-পুরী, চাকদহ, নদীয়া। মূল্য ৩·০০।

বরাহনগর আলমবাজার মঠ। শ্রীসুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। শ্রীপ্রশান্তেন্দু ভট্টাচার্য : ২১বি, রতনবাবু রোড, কলিকাতা-২। মূল্য ১·৭৫।

প্রাচীন বাংলা কাব্যের ধারা। প্রশান্ত সেনগুপ্ত। আলফা পাবলিশিং কনসার্ন : ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য ৭·০০।

দুর্লভ এক খেলায় আমি। শৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। সোনালি সেন : ৭৫ বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১৯। মূল্য ৩·০০

চলো গল্পের দেশে যাই। অনিলবরণ রায়চৌধুরী। রণজিৎকুমার সেন : ২২৯।৮।এ ডি রায়বাহাদুর রোড, কলিকাতা-৩৪। মূল্য ২·০০।

অরণ্যদেব

লী ফক

॥ চিত্র-সমালোচনা ॥

পিঞ্জরে কে পঞ্ছী

(শোভা চিত্র)

'পিঞ্জরের পাখি' 'পিঞ্জরে কে পঞ্ছী' হল জেলের কাহিনী। একজন খুনের আসামী (বলরাজ সাহনী), অপরজন পকেটমার (মহম্মদ)—এই দুই জেল পলাতক কিছু দিনের জন্য বাইরের জগতে আত্মগোপন করে নাটক তৈরি করে গেল। এরই কাহিনী নিয়ে এই হিন্দী চিত্র, 'পিঞ্জরে কে পঞ্ছী'।

প্রিজন ভ্যান থেকে পালিয়ে পাহাড়-অঞ্চলের এক শহরে তারা ছদ্মবেশে ঘুরে

বেড়িয়েছে, রেস্তোরাঁয় খেতে গেছে, বাজারে গেছে—সব সময় ছদ্মবেশেও নয়। একটি খালি বাড়িতে দুই পলাতক বলরাজ সাহনী ও মহম্মদ এসে উঠলেন, তাঁরা জানতেন না নতুন ভাড়াটে এলেন বলে। যথা সময়ে এসেছেন মীনাকুমারী। সদ্য-বিবাহিতা, স্বামী অভী ভট্টাচার্য সঙ্গে আসেননি। সে আর এক গল্প, স্বামী ডাক্তারের পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত জানতে না পারছে তার ক্যান্সার হয়নি ততক্ষণ তাকে স্ত্রীর কাছে থেকে দূরে থাকতেই হবে।

অতএব এদিকে মীনাকুমারী এবং দুই জেল-পলাতক বলরাজ সাহনী ও মহম্মদকে নিয়ে গল্প তৈরি হয়েছে। অস্বীকার করব না, হিন্দী ছবিতে সাধারণত যে ধরনের

এ-আর-সি প্রোডাকসন্স-এর "রূপসী" (পরিচালনা : অজিত গাঙ্গুলি) চিত্রে সামিত ভঞ্জ

গল্প দেখি সে তুলনায় এই কাহিনীর মূল আঙ্গিকে কিছুটা নতুনত্ব আছে। এই গল্পে পরিচালক-কাহিনীকার-সুরকার সলিল চৌধুরী বলতে চেয়েছেন যাদের জেল হয় তারাই স্বভাবতঃ অসৎ নয় এবং জেলের বাইরে যারা আছে তাদের অসততা মাত্রাহীন। বলরাজের পূর্ব-জীবনের ঘটনায় (ফ্লাশব্যাকে) এবং পরে তাদের উভয়ের ব্যবহারে তাই প্রতিপাদ্য বিষয়।

মীনাকুমারী প্রথম পরিচয়েই অতি সরল ভাবে বলরাজকে চাচাজী এবং মহম্মদকে দেবরজী বলে বিশ্বাস করে গিয়েছেন। মীনাকুমারীকে বলরাজ ডাকেন বহু, মহম্মদের তিনি ভাবী। এই মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠার পর প্রথমে মহম্মদ ও পরে বলরাজের মধ্যে প্রেম মমতা, আত্মত্যাগ ইত্যাদি মহৎ গুণগুলি প্রকাশ পেতে লাগল। তাঁদের অন্তর রূপান্তরের ভিতর দিয়ে নাটকীয় আবেগও সৃষ্টি হল খুব। মীনাকুমারী পরে বলরাজ ও মহম্মদের আসল পরিচয় পেয়েও তাঁদের ঘৃণা করতে পারলেন না। শুধু গভীর যন্ত্রণায় বললেন, একটার পর একটা মিথ্যা নিয়েই কি তাঁর জীবন কাটবে?—এই রকমই একটা যোগসূত্র। ছবির সংলাপ খুব সুন্দর। কিছু সিচুয়েশনও ভাল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ওই মুহূর্তটি, মীনাকুমারী যখন বলরাজ ও মহম্মদের প্রকৃত পরিচয় জানলেন। নিজেকে তিনি তখন স্বামী প্রেমে বঞ্চিতা বলেই ভাবছেন। ভালবেসে তাঁদের বিয়ে অথচ স্বামী কেন দূরে সরে রয়েছেন তা স্ত্রীর অজানা।

ক্লাইম্যাক্সের আগে অভী ভট্টাচার্য ফিরে এসেছেন। বলরাজ ও মহম্মদের একমাত্র কাম্য ছিল, মীনাকুমারী ও অভী ভট্টাচার্যের

"ঋষি অরবিন্দ" (পরিচালনা : দীপক গুপ্ত) ছবিতে সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় ও দিলীপ রায়

যেন মিলন ঘটে। তাঁরা অভীকে ভুল বুঝেছিলেন। অভীও জানতেন না, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কী সম্পর্ক এঁদের। তাই গোপনে অভী পুলিশকে খবর দিয়েছেন। অজ্ঞান অবস্থায় মীনাকুমারীকে কাঁধে তুলে তাঁকে যখন বলরাজ ও মাহমুদ হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছেন তখনই অভী পুলিস নিয়ে এসেছেন তাঁদের ধরিয়ে দেবার জন্য। পুলিসের গুলিতে বলরাজ প্রাণ হারান, বুকে গুলি লাগতেই বলরাজ 'আল্লা' বলে চিৎকার করে উঠলেন। বলরাজ জাতিতে মুসলমান, কিন্তু হিন্দু ঘরের বউকে নিজের "বহু" বলে গ্রহণ করতে তাঁর বাধেনি। নাটকের এই উপকরণটিও সলিলবাবু কাজে লাগিয়েছেন। পুলিস এসে তাঁদের ঘিরে ফেলবার পর মীনাকুমারী তাঁর দুই পরম আত্মীয়ের জন্য ডুকরে কেঁদে উঠেছেন, অভী ভট্টাচার্য তখন নিজের বোকামির জন্য অনুতপ্ত।

গল্পটিকে ক্লাইমাক্সে টেনে নিয়ে যাওয়ার পথে কৃত্রিমতা ও অযৌক্তিকতা অনেক দেখা গেলেও প্রথম চিত্র পরিচালনার কাজে সলিল চৌধুরী আবেগসম্পন্ন নতুন ধরনের হিন্দী ছবি তৈরির কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। প্রধান তিন শিল্পী—বলরাজ সাহনী, মাহমুদ ও মীনাকুমারী—অভিনয়ও করেছেন খুব চমৎকার। ছবির গানগুলি বাঙালী শ্রোতার মন তেমন ভোলাতে পারবে মনে হয় না, কারণ এই সুরে বাংলা গান তাঁরা অনেকদিন ধরেই শুনছেন।

টীকা-টিপ্পনী

এবার ভারতের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে (চতুর্থ) ভাল ছবি আসেনি এরকম একটা অভিযোগ চারদিকে শোনা যাচ্ছে। মৃণাল সেনের কিন্তু অন্য মত। তিনি দিল্লি ঘুরে এসেছেন, ছবিও দেখেছেন অনেক। অনেক ছবিই তাঁর ভাল লেগেছে। যেমন, 'ইফ', 'ভয়েস অব ওয়াটার', 'ব্যারিয়ার', 'প্রোলোগ', 'লুসিয়া', 'রবিনস্ স্প্রাই', 'ফানি ওল্ড ম্যান', 'রেড অ্যান্ড গোল্ড' ইত্যাদি। মৃণালবাবু মনে করেন না, সব ফেস্টিভালেই বেশির ভাগ ছবি ক্লাসিক পর্যায়ের হবে। তিনি ভেনিস ঘুরে এসেছেন। বললেন, সেখানেই বা কটা ভাল ছবি ছিল?

ফেস্টিভালের একটা আলাদা সার্থকতা আছে বলে মৃণালবাবু মনে করেন। "ধরুন, আফ্রিকার ছবি। এই ছবির টেকনিক্যাল কাজ ভাল না হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে এই ছবির মূল্য অনেক। কারণ, তাতে আমি আফ্রিকাকে পাচ্ছি"—মৃণালবাবু আমাকে এই কথা বলেন। প্রকৃতপক্ষে, ফেস্টিভালের বিশেষ মূল্য বোধ হয় এইখানেই। ফেস্টিভালে গিয়ে সেদিক থেকে মৃণালবাবু লাভবান। লাভবান তিনি ভারতের সব ফেস্টিভাল দেখেই। কথায় কথায় মৃণালবাবু বললেন ভারতের প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (১৯৫২)-এর কথা। আমরা জানি, ঐ উৎসব কয়েকজন প্রগতিপন্থী পরিচালকের জন্ম দিয়েছিল। তাঁদের মধ্যে মৃণালবাবু একজন। তখন তিনি ছিলেন শুধু সহকারী পরিচালক। জীবিকা হিসেবে আরেকটি কাজ ছিল তাঁর। মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ-এর কাজ। ম্যাটিনি শো-র আগে পর্যন্ত ফেস্টিভালের ছবি দেখেছেন, তার আগে ডাক্তারদের সঙ্গে দেখা করার পালা। ডি সিকা, রোজেলিনি এবং পৃথিবীর বিখ্যাত পরিচালকদের ছবি কোনটাই বাদ যায়নি। ছবি দেখেছেন আর মনে মনে ভেবেছেন স্বাধীনভাবে কী ছবি তৈরী করা যায়। পরবর্তী কালে ভাল ভাল ছবি করলেনও তিনি। তাঁর সর্বাধুনিক ছবি 'ভুবন সোম' তো বিদেশের সমালোচকদেরও প্রশংসা কুড়িয়েছে।

এবারের ফেস্টিভালও মৃণালবাবুকে দিয়েছে অনেক। কী সেই দান?—জিজ্ঞাসা করলাম মৃণালবাবুকে। "আমার পরের ছবি সম্পর্কে একটা স্পষ্ট প্রত্যয় নিয়ে ফিরে এলাম—" জানালেন মৃণালবাবু।

প্রসঙ্গত বলে রাখি, মৃণালবাবুর পরের ছবি কলকাতা শহরের ওপর। একদিনের গল্প। নাম এখনও ঠিক হয়নি। দুজন ছাড়া শিল্পী নতুন।

❋

জনপ্রিয় অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে সেদিন অনেক কাছের মানুষ করে দেখতে পেলেন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের বন্দীরা। ১৯ জানুয়ারী আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের চারদিন ব্যাপী সঙ্গীত উৎসবে সৌমিত্রবাবুর যোগদান অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য। অনুপকুমারকেও তিনিও দিয়েছিলেন সেখানে। শুধু এঁরাই বা কেন, সমস্ত শিল্পীরই বোধ হয় এই ধন্যবাদ পাওনা, যাঁরা উপস্থিত থেকে সেদিন কয়েদীদের আনন্দ দিয়েছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল যে কোন প্রথম শ্রেণীর অনুষ্ঠানের মতই। সৌমিত্রবাবু দরাজ কণ্ঠে আবৃত্তি করলেন রবীন্দ্রনাথের 'দুঃসময়' কবিতাটি। পরিবেশের দিক থেকে কবিতাটি সুনির্বাচিত। কারণ, বে-রসিক বিচারকের কানে এখনও মাঝে মাঝে গুমরে ওঠে,

"তোমারে আজিকে ভুলিয়াছে সবে,
শুধাইলে কেহ কথা নাহি কবে,
এ হেন নিশীথে আসিয়াছ তবে
কী মনে করে।"

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের বর্তমান ওয়েলফেয়ার অফিসার অমরনাথ রায় এবং জেলার সুনীলবিকাশ রায়কেও এই প্রসঙ্গে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না। কারণ, এই

অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করতে ওঁরা যেভাবে এগিয়ে এসেছেন তা সত্যি তারিফ করবার মত।

—বিচক্র

বোম্বাই বিচিত্রা

বম্বের সংস্কৃতিজগতে, বিশেষ করে বাঙালী মহলে, 'বিকাশ' এখন একটি সুপরিচিত নাম। আপাতদৃষ্টিতে এটি একটি ইমপ্রেসারিও সংস্থার নাম। এই সংস্থা যাঁর মেরুদণ্ডের ওপর ভর করে বিকশিত হচ্ছে সেই ভদ্রলোকের নামও বিকাশ মুখার্জি। সামান্য কিছু দিনের মধ্যেই স্থানীয় সংস্কৃতিজগতে বিকাশবাবু নিজের আসন প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছেন। বছরে বেশ কয়েকবার বোম্বাইবাসী বাঙালী তথা বঙ্গসংস্কৃতিপ্রেমী বোম্বাই-বাসী বঙ্গসংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের কিছু নমুনা চাক্ষুষ করার সুযোগ পাচ্ছেন বিকাশ মুখার্জির সৌজন্যে। অধুনা বিকাশবাবু এম জি এন্টারপ্রাইজ নামে মলিনা দেবী এবং গুরুদাসবাবুর নাট্যসংস্থাকে বম্বেতে এনে বম্বেবাসীর প্রশংসাধন্য হয়েছেন। মলিনা দেবী এবং গুরুদাসবাবু তাঁদের সহকর্মীদের নিয়ে স্থানীয় রঙ্গমঞ্চ রবীন্দ্র নাট্যমন্দিরে মোট চারটি নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। রানী রাসমণি, ঠাকুর রামকৃষ্ণ, বিবেকের উইল এবং নিষ্কৃতি। নাটকের দিক থেকে স্থানীয় লোক প্রীত হয়েছেন 'নিষ্কৃতি' দেখে, কিন্তু রাসমণি এবং রামকৃষ্ণ দেখতে ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন বেশী। রামকৃষ্ণের দুটি শো হয়েছে। রাসমণিরও আর একটি শো হতে পারে।

সাধারণ মানুষের কাছে অতীত মানেই ইতিহাস এবং ঐতিহ্যসম্পন্ন, সুতরাং মঞ্চে যখনই স্মৃতিমন্থন হয় তখনই দর্শক শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়েন। রামকৃষ্ণের মুখের কথা দর্শকদের কানে বাণী হয়ে প্রবেশ করে, গুরুদাসবাবুকে মঞ্চে 'দেখা দে মা—দেখা দে মা' বলে ব্যাকুল হতে দেখে দর্শক বিগলিত হয়ে পড়েন। নাট্যদর্শকের সমালোচনার শক্তি তার নিজের ভক্তিভাবের কাছে পরাজিত হয়ে যায়, ফলে নাটক শেষ হলে দর্শকদের চিনতে অসুবিধে হয়। সকলের মুখ-চোখের ভাব আলাদা, নাটক সম্বন্ধে কথা বলতে ভয়, ভক্তিভাবের কানমলা খাওয়া সব বিব্রত মুখমণ্ডল। যে নাটকের প্রধান পাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ, যে নাটকে বিবেকানন্দের উপস্থিতি, যে নাটকে দৃশ্যের পর দৃশ্যে স্বয়ং মা কালীর দর্শন সে নাটকের সমালোচনা যে ধৃষ্টতা তা বিংশ শতাব্দীতে বম্বের মত বম্বেটে প্রদেশেও অনায়াসে

"কব, কিঁউ ঔর কাঁহা" (পরিচালনা : এ হিঙ্গোরাণী) ছবিতে ববিতা

উপলব্ধি করলাম। রানী রাসমণি এবং শ্রীরামকৃষ্ণ দেখে দর্শকরা যে আনন্দ লাভ করেছেন, সে আনন্দকে নাট্যরসাস্বাদনের আনন্দ বলা হয়ত ঠিক হবে না, কিন্তু সে আনন্দলাভের কী নাম আমার জানা নেই। সুতরাং এ প্রসঙ্গ এখানেই থাক।

নাটকপর্ব শেষ হবার কয়েক দিন পর শ্রীমতী বিমল রায়ের বাড়িতে মলিনা দেবীর সঙ্গে দেখা হল। এঁদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হলে কেন যেন মনে হয় ইতিহাসের সঙ্গে মুখোমুখি বসে আছি। বলার চেয়ে শুনতে বেশী ভাল লাগে। দেখানোর চেয়ে দেখতে ইচ্ছে করে অনেক বেশি। অনেকক্ষণ বসে অনেক কথা বললেন মলিনা দেবী। অভিনেত্রী-জীবনের সুখ-দুঃখের কথা, সংসারী-জীবনের অনেক সারকথা, নাট্যসংস্থা চালানোর নিষ্ঠা এবং ঝামেলার কথা, শিল্পীদের অনেক মান-অভিমানের কথা। এঁদের নিষ্ঠা, এঁদের সারল্য, এঁদের সততা, এঁদের শ্রদ্ধা এঁদেরকে চিরকাল শ্রদ্ধেয় এবং স্মরণীয় করে রাখবে বলে আমার ধারণা। এখনো মলিনা দেবী মঞ্চের শিল্পী, চলচ্চিত্রের অভিনেত্রী, তাঁরই সঙ্গে গৃহিণী, মা, দিদিমা। জীবনে অনেক কিছু করেছেন, অনেক দেখেছেন, অনেক ঠকেছেন, আবার রেখেছেনও অনেক। কথায় কথায় পুরনো দিনের, নিউ থিয়েটার্সের কথা উঠল, বিমল রায়, নীতীন বোসের, দেবকী বোসের কথা উঠল, শ্রদ্ধায় এবং স্মৃতিমন্থনে সজল হল মলিনা দেবীর চোখ, আন্তরিকতার স্পর্শে গলার স্বর গেল ভিজে। কলকাতা থেকে তের শো মাইল দূরে মাউন্ট মেরীর পাঁচ নম্বর বাংলোয় বসে প্রায় ভুলে যাওয়া নিউ থিয়েটার্সের অদেখা ছবি ফুটে উঠতে লাগল আমার চোখে। মলিনা দেবী বলছিলেন ওঁর রাঁধুনী-খ্যাতির কথা। আউটডোর সুটিং হলেই পার্ট না থাকলেও ইউনিটের সবাই আবদার করত এবং জেদ ধরত মলিনা দেবীকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য। ওঁর হাতের রান্না না হলে কিছুতেই জমবে না। এখনো নাকি মলিনা দেবী নিজে হাতে কুটনো কোটেন, বাটনা বাটেন এবং তারপর রান্না করেন। রান্না করতে যিনি এত ভালবাসেন খাদ্যের প্রতি তাঁর নিজের কতটা অনুরাগ তা আন্দাজ করতে না পারলেও এটা অনায়াসেই

বোঝা যায় যে, উনি রাঁধতে এবং খাওয়াতে খুব ভালবাসেন। উনি খাওয়াতে ভালবাসেন এটা বুঝলেও, আমি যে খেতে ভালবাসি এটা হয়ত ওঁকে বোঝাতে পারিনি।

ইচ্ছে আছে বম্বের নায়িকাদের কাছে মলিনা দেবীর রান্নার গল্প করব, বিশেষ করে আউটডোর স্যুটিং-এর সময়, কিন্তু আজকাল ক'জন নায়িকা রাঁধতে জানেন জানি না। কিন্তু এটা জানি যে, আজকাল আউটডোরে যদি হোটেল কাছে না থাকে তা হলে নায়ক, নায়িকা, পরিচালক, প্রযোজক প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা, কুক যায়, ইউনিটের খাবার ব্যবস্থা আলাদা, নইলে লাঞ্চ-মানির ব্যবস্থা।

সরল শর্মা

পীযূষ বসু পরিচালিত "স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে" ছবিতে তরুণকুমার ফটো-দেশ

বোম্বাইয়ে নাট্যাভিনয়

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

বোম্বাইয়ে রবীন্দ্র নাট্য-মন্দিরে সম্প্রতি দুটি বাংলা নাটক অভিনীত হল। আলবেয়ার কামুর 'ক্যালিগুলা' অবলম্বনে 'তুঘলক' এবং পিটার উস্তিনভের ছোট গল্প অবলম্বনে "একটি শহরের মৃত্যু"। অপেশাদার নাট্যদল 'প্রতিবিম্ব'-এর নাট্যকার-পরিচালক প্রদীপ পালকে নাটক দুটির জন্যে অকুণ্ঠ সাধুবাদ দিতে হয়। লেখার গুণে দুটি নাটকই উপভোগ্য। ক্যালিগুলার অন্তর্দ্বন্দ্বের তথা অস্থিরতার মূল সুরটি ধরেছেন তুঘলকের ভূমিকাভিনেতা মিলন মুখোপাধ্যায়। দলগত অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য। শ্রীমতী বসুর খবরানা উল্লেখ্য। আলোকসম্পাত সুন্দর। দ্বিতীয় নাটকটি বক্তব্যের গুণে অসাধারণ হলেও অভিনয়ে দুর্বল। স্বপন গুপ্তের শশধর বিশ্বাসযোগ্য।

"আজকাল" নাটকাভিনয়

গত ২৪ জানুয়ারি এস এস কে এম হসপিটাল, আর জি কর আণ্ড আর ও পল ক্লিনিকের নন মেডিক্যাল স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব চান্দু চট্টোপাধ্যায় রচিত "আজকাল" নাটকটি সরলা রায় মেমোরিয়াল হলে মঞ্চস্থ করেন। অভিনয় প্রায় সকলেরই ভাল হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অজয় পাণ্ডা (চঞ্চল), বাঁকে বসু (অনিমেষ), প্রশান্ত রায় (বাবলু), রমেন চক্রবর্তী, আলোক ও রমার ভূমিকায় শ্রীমতী কীর্তি গাঙ্গুলির অভিনয়। নাটকটি পরিচালনা করেন শ্রীদেবু মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশম্ভু পাল সুষ্ঠুভাবে।

রবীন্দ্রসদনে লোকনৃত্য

সম্প্রতি রবীন্দ্র সদনের উদ্যোগে পুরুলিয়ার ছৌ-নৃত্য এবং দার্জিলিং অঞ্চলের পাহাড়ীয় নৃত্যের যে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হল, তার জন্য একদিকে একটি মহৎ প্রয়াসের জন্য উদ্যোক্তারূপে রবীন্দ্র-সদন কর্তৃপক্ষ যেমন ধন্যবাদার্হ, তার একদিকে লোকনৃত্যের প্রাণবন্ত এবং উদ্দীপনাময় পরিবেশনার জন্য শিল্পীরাও অভিনন্দন যোগ্য। কেবল প্রেক্ষাগৃহের শূন্যতা ছিল বেদনার কারণ। কেননা শহরে নামজাদা শিল্পী নেই বলে যাঁরা এই অনুষ্ঠানকে উপেক্ষা করেছেন, তাঁরা যে একটি অভিনব আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, এ কথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি।

দুটি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থাপিত উল্লিখিত লোক-নৃত্যের আয়োজনের মধ্যে অবশ্য পুরুলিয়ার ছৌ-নৃত্যের কলানৈপুণ্যই সর্বাধিক বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে। লোক-গানে বা লোক-নৃত্যে যে সারল্য থাকে, একই সুরের বা ছন্দের যে পৌনঃপুনিকতা থাকে, ছৌ-নৃত্য কিন্তু তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। নৃত্যকলার এক ঐশ্বর্যময় দৃষ্টান্ত এই ছৌ-নৃত্যের প্রচলন পুরুলিয়াতেই যে সীমাবদ্ধ তা নয়। ছন্দ ও লয়ের ক্ষেত্রে, সুপরিকল্পিত ছন্দোবদ্ধ পদক্ষেপ, বহুমূল্যের পোশাকসজ্জায় মুখোশ ও পোশাক-পরিচ্ছদের নিখুঁত পারিপাট্যে এবং সর্বোপরি একটি পৌরুষদৃপ্ত ভাবব্যঞ্জনায় ছৌ-নৃত্য অনায়াসে দক্ষিণ ভারতীয় কথাকলি নাচের সমকক্ষতা দাবি করতে পারে। যে সকল উপাখ্যান অবলম্বনে এঁদের নৃত্য-পরিকল্পনা, সেগুলিও সংগৃহীত হয়েছে রামায়ণ মহাভারত থেকে। ধমসা, ঢাক, সানাই প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের ক্ষেত্রেও এঁদের দক্ষতা অসাধারণ। চালান, কাটান নিয়ে পাঁচটি বিভিন্ন তালে পরিবেশিত একটি একক-নৃত্য, মধু রায় এবং গোকুল রায়ের দলের অথবা কুদলুঙর মাহাতো কিংবা জামবাদ আর কোনপোড়ার নাটুয়ার বিভিন্ন নৃত্যানুষ্ঠান অকৃত্রিম আঞ্চলিক নৃত্যের আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশনার জন্য বহুদিন স্মৃতিপটে অম্লান থাকবে।

"প্রথম কদম ফুল" (পরিচালনা : ইন্দর সেন) ছবিতে তনুজা

অরবিন্দ মুখার্জি পরিচালিত 'নিশিপদ্ম' ছবিতে অসীম চক্রবর্তী ও সাবিত্রী চ্যাটার্জি
ফটো-দেশ

এঁদের তুলনায় অবশ্য পাহাড়ী-নৃত্য অনুষ্ঠানটি অপেক্ষাকৃত সরল, লঘু, কিন্তু সহজ হৃদয়াবেগের স্পর্শে রসমণ্ডিত। দার্জিলিং লোকরঞ্জন শাখা, লেপচা সংবাদ এবং সেণ্ট্রাল স্কুল অব টিবেটান পাহাড়ী-অঞ্চলের সুর ও ছন্দকে বিচিত্র-ভঙ্গিতে ফুটিয়ে তোলে।

—আনন্দবর্ধন

কারাগারে সংগীতানুষ্ঠান

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে বন্দীদের চিত্তবিনোদনের যে-সমস্ত ব্যবস্থা আছে,

নির্মল মিত্র পরিচালিত "প্রথম বসন্ত" ছবিতে অজয় গাঙ্গুলি, অনুপকুমার ও অজন্মা ভৌমিক
ফটো-দেশ

...ের মধ্যে বার্ষিক সংগীত-সম্মেলন একটি উল্লেখযোগ্য আয়োজন। এবারেও কারাগার কর্তৃপক্ষ ১৯শে জানুয়ারী আধুনিক শিল্পীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তাঁদের এই আয়োজনকে সার্থক করে তুলতে, আর তার পরের দিন ধ্রুপদী সংগীত শিল্পীদের। দ্বিতীয় দিনের নির্বাচিত শিল্পীদের প্রায় সকলে এবং প্রথমদিনের প্রায় সত্তরজন শিল্পী অনেকেই এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। আধুনিক সম্প্রদায় প্রভৃতি জনপ্রিয় শিল্পী উপস্থিত সংগীত আসরে হিমাংশু বিশ্বাস ও শ্রোতৃমণ্ডলীকে পরিতৃপ্তি দিয়েছেন। হাস্যকৌতুকে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও রবি ঘোষের যুগ্ম পরিবেশনা, জহর রায় এবং সুশীল দাসের কৌতুক উপভোগ্য হয়েছিল। মূক অভিনয়ে যোগেশ দত্ত সকলকে প্রচুর আনন্দ দিয়েছেন। সবিতাব্রত দত্তের কথা ছিল আবৃত্তি করবার। কিন্তু তিনি মুকুন্দ দাসের গান গেয়ে প্রভূত উদ্দীপনার সঞ্চার করেন। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আর কাজী সব্যসাচীর আবৃত্তি আর ঝুমকি, ঝর্মকি এবং সোনালি রায়ের নৃত্য সেদিনকার অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে বন্দনা সেনের কথক, সুনন্দা পট্টনায়কের ভৈরবীতে খেয়াল এবং একটি ভজন, দেশ রাগে সত্যেন রায় চৌধুরীর সেতার উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান।

এর আগে রাজীবলোচন দে-র পাখোয়াজ সহযোগে প্রবীণ শিল্পী জয়কৃষ্ণ সান্যাল শুদ্ধ কল্যাণে ধ্রুপদ এবং আড়ানায় ধামার গেয়ে একটি গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। শিশুশিল্পী উমা পালের খেয়ালও বেশ ভাল হয়েছে। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন সোম তেওয়ারী বাহাদুর খাঁ, শ্রীকান্ত বাকরে মৃন্ময় ধর, আমির হোসেন ও সম্প্রদায় এবং [illegible] মায়া চট্টোপাধ্যায়। বিভিন্ন শিল্পীর সঙ্গে সংগত করেন কেরামতুল্লা খাঁ, মহাপুরুষ মিশ্র সুরেশ তেওয়ারী প্রভৃতি।

শ্যামল মিত্র নাইট

আসরে একের পর এক শুধুই আধুনিক গান ক্লান্তিকর লাগবারই কথা। শ্যামল মিত্র নাইট-এর শ্রোতারা কলামন্দিরে গত ২২ জানুয়ারি সন্ধ্যায় প্রায় তিন ঘণ্টার মত আধুনিক গান শুনেও কিন্তু ক্লান্তি বোধ করেননি। এর কারণ একাধিক। এক, গান পরিবেশন তথা অনুষ্ঠান পরিচালনায় সুপরিকল্পনা, শিল্পীদের দুটি করে গান; দুই, শ্যামল মিত্রর সুর রচনার বৈচিত্র্য, তাঁর সুরের গানই শিল্পীরা গেয়েছেন; তিন, প্রথম সারির শিল্পীদের যোগদান।

বহু যন্ত্র সমেত অর্কেস্ট্রা শ্রোতারা পছন্দ করেননি। হলে গুঞ্জন শোনা যায়। প্রকাশ্য মঞ্চে সুরকার অর্কেস্ট্রার উপর এতটা গুরুত্ব না দিলেও পারতেন। যাই হোক অনুষ্ঠানের মাঝখানে শ্যামল মিত্র শ্রোতাদের আশ্বাস দেন অর্কেস্ট্রার আয়তন কমানো হবে। তাঁরা প্রতি শিল্পীর মুখে বেশি গান শুনতে চাইলে শ্যামল মিত্র বললেন, এখন তা সম্ভব নয়। তা ছাড়া অন্য গান শিল্পীরা গাইতে পারেন না, আমার দেওয়া সুরের গানই তাঁরা গাইবার জন্য এসেছেন। "তা হলে আপনাকে বেশি গান [illegible] করতে হবে"—শ্রোতাদের দাবি শোনা গে[illegible] শ্যামল মিত্র হেসে বললেন, আচ্ছা [illegible]

অনুষ্ঠানে যোগদানকারী শিল্পী[illegible] ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা [illegible] মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সলিল মিত্র (মৌচাকের নায়ক) উৎপলা সেন, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, ইলা বসু, বনশ্রী সেনগুপ্ত ও [illegible] নন্দী। শ্যামল মিত্র তো ছিলেনই। তা ছাড়া উত্তমকুমার একবার মঞ্চে এসে দাঁড়ান। [illegible] ইয়ুথ কয়ার এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। কানন দেবী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন, প্রধান অতিথি ছিলেন সরযূবালা দেবী।

শালিকয়া শীশমহলে চতুর্মুখ প্রযোজিত "অনেকের মধ্যে" নাটকে নাট্যকার-নির্দেশক অসীম চক্রবর্তী ও চিত্রিতা মণ্ডল

আমার গল্পের সিনেমা ... ইত্যাদি।

("রূপদর্শী"-কে)

হেমেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[দেশ—বিনোদন সংখ্যায় রূপদর্শী রচিত মৌলিক চিত্রনাট্য পড়ে প্রযোজক হেমেন গাঙ্গুলী এই কবিতাটি লিখেছেন।]

নাট্য লেখার স্পর্ধা নেই
বিচিত্র বা চিত্র,
তবু রূপ দর্শে হলো
শ্রদ্ধানত চিত্ত।

প্রেমিক-পাগল-কবির ঠাঁই
রাঁচীতে সদা মিলবে ভাই,
বলে গেছেন প্রবীণ সুরী শেক্সপীর নাম।
উদ্ধায়ু তাই বাতাস বয়
"বাপ, এ-ছেলে বাঁচলে হয়"
অপ্রতিষ্ঠ সরাইয়ে যা'র প্রারম্ভের ধাম।

সিনেমা শুনি গুণীর মুখে
কলির সেরা আর্ট
তাই যদি হয়, কাহিনীতেই
পণ ধরো শেষ শার্ট
অর্থবিহীন বাক্ তো শুধু অনর্থের ঘাঁটি,
কবি কালিদাসের কথা আজকে খাটে খাঁটি।
বাচা বিনা সাংকেতিক আকস্কের ছবির।
নাটক-হরণ নাট্য নিয়ে সমীক্ষণ-গিরি
হিমালয়ের দুকান মলে দর্শকেরই মর্মে
পশিল আহা আকুল-করা "কিউ" ঝাঁপানো ফর্মে

তারপরেতে ছ'দিন শেষে প্রেক্ষাগৃহ খালি।
যতই আভিধানিকভাবে শাণাও শত গালি,
যতই লেখো "অমার্জিত", "অবিস্মরণীয়",
যতই দূর মহোৎসবে সিংহ-হাতী নিও—
সর্পিলী সেই "কিউ"-এর ঢেউ চলবে দিকে অন্য।
প্রযোজকের জ্বলবে চিতা টেকনিকাল্লার-মন্য।
সেই আগুনে দু' হাত সেঁকে আনবে রুটি কেউ?
হঠাৎ রাতে অরণ্যে কোন্ ডাকছে যেন ফেউ॥

দুঃস্বপনের "সিকো"র শেষ। তপন বলে : "কাট"।
গৌর ভণে: আহা গো মরি, বাছা রে ষাট-ষাট।

কাহিনী বিনা নাগিনী হয়, সঙ্গীন কত কিছু
সাগিনা হয় না কো।
শিল্প মানে যাথার্থ্য—অনুভবের "এক্স"।
বাদ যদি দাও দ্বিতীয়টিকে, কালীমাতাও "সেক্স"।
ভরত-মুনি, অ্যারিস্টটল, বামন এবং দণ্ডী,
চত্বারি বেদ, কোরান, যীশু, কনফুশাস ও চণ্ডী,
শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণ আর ছন্দোজ্যোতিষ ব্যর্থ?
সহজ হাসি, কান্না যমজ—নিছক অপদার্থ;
পুরাণ ঋক্ অবদ্য আর সাধু কেবল নব্য?
যেহেতু এক বাক্সে কালো মিলিমিটার দ্রব্য
একটি কোনো আঁকা মুখের ছোট্ট বাঁকা তিলকে
হাজার মোমের বাতি জেলে তাল করে, আর দিলকে
সপ্তশতী বর্ণে সাজায় বোম্বাইয়ে-মাদ্রাজে,
হংকং-এ বারব্যাংকে এবং রোম-প্যারিসের সাঁঝে?
অথবা সেই বাক্স লোটে
হলুদ-বরন কান্না,

হাজার হাজার ফিটে কেবল
ঘুঁটের ধোঁয়ায় রান্না,
মৃত্যু এবং মহামারী, শব-সাধনায় সৃষ্টি
বাদে-নাদে-বিসংবাদে ধূম্রলোচন কৃষ্টি?

শ্রান্ত হয়ে সূর্য ঢলে, আবার ওঠে পূবে।
এরই মধ্যে শিল্প-রীতি সংজ্ঞা যাবে ডুবে?
নব্য কত "ইস্‌ম্" এলো। "প্রিস্‌ম্" হলো কানা।
হঠাৎ-নবাব দরবারী গায়। হাসতে তবু মানা।

এই হেন কোনো এক সাংকেতিক সংকটের
ক্যাকটাস্-কণ্টকিত ক্ষণে
বাড়িয়ে একটি পা—পার্বতীয় মোজা পরা,
ব্যান্ডেজ-ঢাকা—
নতুন শশাংক তুমি এনে দিলে,
এঁকে দিলে চান্দ্রম মাটিতে
পর্যটক পদাঙ্কের অশোক-স্বাক্ষর।
প্রতিটি অক্ষর
ছবি হয়ে, কবি হয়ে, গল্প ও সংলাপ হয়ে
অবিন্যস্ত কেশ আর সংযত ভ্রূভঙ্গী হয়ে
সাদা আর কালো কিম্বা মন্দ বা ভালো
চোখের বেদন আর হৃদয়ের সংবেদন
হলো শত সাগিনার খরোষ্ঠী
যে-সাগিনা মরেনি কখনো
"শত শত সাম্রাজ্যের ধ্বংস-স্তূপ পরে
ওরা কাজ করে"—
বিস্ফীত পেশীতে আর ভয়শূন্য
পরভুক্ আগাছাই আছড়িয়ে মরে,
জন্ম নেয় নতুন সমাজ :
স্বপ্ন আর আশা আর ভবিষ্যের কারুকৃত

তবুও ভাবো : দিয়েছি বেশী হাজার কয়েক টা.
মন ভরেছে। যদিও কাটা পকেট মম ফাঁকা!
("স্বপ্ন-সিকো" আঁকতে বসি) ডরনা তবু কিউ?
এই ছবিতে লাগবে নাকো হয়তো কোনো "কিউ"-
সেই সময়ে শিল্প মানে কলার কাঁদি খেয়ে
(আপনি-আমি দুই শরিকে ডুয়েট-গান গেয়ে!)
বাইরে-ঘরে, বাজারে-হাটে, পাড়ায় পাড়ায় যেয়ে
হাজার কয়েক টিকিট কিনে মুখ-চেনাকে দিও।
(এমনতর প্রায়শঃ "অয়, জানুতি পার নাকো")।

আমার তুমি ভূলুণ্ঠিত ধন্যবাদ নিও।
লেখক এবং লেখনীকে প্রণাম চতুরঙ্গ।
সূত্রধার-বিদূষকের নব্য অহমিকা—
সরস্বতীর সিঁদুর-টিপে রক্ত-লিপি-লিখা
—সেই তোমাদের জয়।

তপনবাবু, দিলীপ-অনিল-সায়রাবাবু কয় :
ধন্য তুমি, গৌরবাবু, ধন্য মন-প্রাণ।
হেমেন গাঙ্গুলী ভণে : সঞ্জীবিত ক্ষুধিত পাষাণ॥

পশ্চিমবঙ্গ যুক্তফ্রন্টের সম্মিলিত অসমাপ্ত বৈঠকের তিনটি গৃহীত প্রস্তাব বর্তমান সপ্তাহের বিশেষভাবে আলোচনার বিষয় : ২৫ জানুয়ারি রবিবার যুক্তফ্রন্টের বৈঠক শেষে আহ্বায়ক শ্রীসুধীনকুমার সাংবাদিকদের বলেন : ফ্রন্ট ভাঙেনি। এই সভা শুরুর আগে যে অবস্থা ছিল, এখন মনে হচ্ছে তার অনেক উন্নতি হয়েছে। দুপুর একটা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত একটানা পাঁচঘণ্টা কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকটি চলে। বিধান সভায় গত ২১ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রীকে নিগ্রহের ঘটনার নিন্দা, সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিধানসভায় ফ্রন্ট পরিষদীয় দলের ঐক্যবদ্ধ রূপ প্রকাশে ব্যর্থতায় ক্ষোভ এবং শরিকী সংঘর্ষের প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে তিনটি সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলাজনিত অবস্থার উন্নতি এবং অরাজকতার অবসান সম্পর্কে বিভিন্ন দলের প্রস্তাব নিয়ে আবার ৩০ জানুয়ারি ফ্রন্টের বৈঠক বসছে। আলোচ্য বৈঠক শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে গোলমাল শুরু হয়। রাস্তার আলো নিবিয়ে দেওয়া হয়। ইট-পাটকেল ছোড়া আরম্ভ হয়ে যায়। ফলে ২ জন গুরুতরভাবে জখম এবং কয়েকজন আহত হন। হামলাকারীদের মুখে স্লোগান—"সি পি এম জিন্দাবাদ, জ্যোতি বসু যুগ যুগ জিও।" যথাসময়ে পুলিসকে খবর দেওয়া হয়।

দেশী সংবাদ

১৯ **জানুয়ারি**—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী আজ তারাপুরে অবস্থিত ভারতের প্রথম ৪০০ মেগাওয়াট পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রটি জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেন। এই অনুষ্ঠানে তিনি বলেন : আজ শ্রীজওহরলাল, ডঃ হোমি ভাবা এবং তাঁদের স্বপ্ন আংশিকভাবে সফল হয়ে উঠেছে।

পেট্রোলিয়াম ও রাসায়নিক দফতরের মন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন তিনটি বিদেশী তেল কোম্পানীকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা যদি নিজেরা আমদানি করা অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল-প্রতি ১·২৮ ডলার না কমায় তা হলে ওই তেল আমদানির জন্য উক্ত কোম্পানী-গুলিকে যে বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুর করা হয়েছিল তা জানুয়ারির মাঝামাঝি সময় থেকে ২০ শতাংশ কমিয়ে দেওয়া হবে।

২০ **জানুয়ারি**—জীবন বীমার প্রিমিয়াম কমছে—তবে সব ক্ষেত্রে নয়। কয়েক শ্রেণীর নন-প্রফিট জীবনবীমার ক্ষেত্রে জীবনবীমার ধরন ও মেয়াদ অনুযায়ী প্রিমিয়াম কমবে হাজার প্রতি পোণে এক টাকা থেকে সওয়া চার টাকা পর্যন্ত।

আজ আদি কংগ্রেস গোষ্ঠীভুক্ত এম এল এ-দের সভায় শ্রীফজলুর রহমান নতুন দলপতি নির্বাচিত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস পরিষদ দল সরকারীভাবে দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল। ওই গোষ্ঠীর পরিষদ দল থেকে শ্রীসিদ্ধার্থ-শঙ্কর রায়কে "বহিষ্কার" করার ফলে দলনেতা নির্বাচনের প্রয়োজন হয়। কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠী বিধানসভায় আলাদা বসবেন। কিন্তু দলের নাম দুই গোষ্ঠীরই এক—পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস পরিষদ দল।

২১ **জানুয়ারি**—বিধানসভা কক্ষের লবিতে খাস মুখ্যমন্ত্রীর কক্ষের সামনে একদল বিক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রী তাঁদের বক্তব্য শোনার দাবিতে সভা-কক্ষে গমনোদ্যত মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জির পথরোধ করেন এবং এই নিয়ে ধাক্কাধাক্কি বাধে। উত্তেজিত মুখ্যমন্ত্রী ক্রুদ্ধ-স্বরে নিরাপত্তা ব্যবস্থার অভাব সম্পর্কে পুলিসের কৈফিয়ত তলব করেন। বাধা ঠেলে যাওয়ার সময় তিনি দৃঢ়কণ্ঠে পুলিস দলকে ওই বিক্ষোভকারীদের বের করে দিতে বলেন।

বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগে পশ্চিমবঙ্গের পূর্ত দপ্তরের প্রায় এক শ' অফিসার ও কর্মীকে সাময়িকভাবে [illegible] করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রায় [illegible] ভিজিলেন্স কমিশনের কাছে রিপোর্ট করা

হয়েছে। অভিযুক্তদের মধ্যে [illegible] অফিসাররাও রয়েছেন।

২২ **জানুয়ারি**—মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জি উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুকে চিঠি পাঠিয়ে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে, যতদিন তিনি মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন, সংবিধানকে অমান্য করার চক্রান্ত সহ্য করবেন না। শ্রীবসুর চিঠির জবাবে তিনি একথাও বলেছেন যে, শ্রীবসু সংবিধানের ভুল ব্যাখ্যা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই গাজল থানার অফিসার-ইন-চারজকে বদলি করা হয়েছিল বলে তিনি জানতে পারেন। সেইজন্য ওই বদলির আদেশ বাতিল করেন তিনি।

২৩ **জানুয়ারি**—কলকাতা হাওড়া ও শহর-তলির সর্বস্তরের অগণিত মানুষ আজ সকাল থেকে রাত—প্রভাত ফেরি, শোভাযাত্রা, প্রতি-কৃতিতে মাল্যদান, শঙ্খধ্বনি, জনসভা, আলোকসজ্জা ও বাজি পোড়ানো প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে নেতাজীর ৭৪তম পুণ্য জন্মদিন উদ্‌যাপন করেছে।

২৪ **জানুয়ারি**—এখন থেকে নেতাজী দিবসের অনুষ্ঠান কলকাতা পৌরসভা স্বতন্ত্র-ভাবে করবে, একজন্য যথাসাধ্য ব্যয় করবে এবং অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানে অর্থ সাহায্য করবে না বলে মেয়র শ্রীপ্রশান্ত সুর আজ এক বিবৃতিতে জানান।

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে স্বাগতম; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাড়াহুড়ো একে কার্যকরী করার জন্য যেভাবে অগ্রসর হচ্ছেন তাতে সুফল না হয়ে কুফলই বেশী হবে। এই ব্যবস্থা প্রচলন সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ প্রধান-শিক্ষক সমিতির অভিমত এই।

২৫ **জানুয়ারি**—সংসদের অধিকাংশ বিরোধী নেতা আজ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে বলেছেন : চণ্ডীগড় পাঞ্জাবকে দেওয়া হোক, আর হরিয়ানাকে নতুন রাজধানী গড়ে তোলার জন্য দেওয়া হোক পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ।

ধানবাদের ডেপুটি কমিশনার শ্রী আর আর প্রসাদ গত সন্ধ্যায় এখানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ধানবাদ পলিটেকনিকের খাতায় নাম রয়েছে এমন বহু ছাত্র কুখ্যাত সমাজবিরোধী এবং তাদের বিরুদ্ধে ডাকাতি ও চোরাচালানির অভিযোগ আছে। জেলা কর্তৃপক্ষ পলিটেকনিকের ভারপ্রাপ্তদের কাছে এদের বের করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা সত্ত্বেও এই সব সমাজবিরোধী বছরের পর বছর পলিটেকনিকে ছাত্র হিসেবে রয়েছে।

বিদেশী সংবাদ

১৯ **জানুয়ারি**—ঢাকার কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটি গত কালের ঘটনার প্রতিবাদে আজ সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করেছে। ঢাকা থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, গতকালের ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৩০০ জন আহত হয়েছেন। ছাত্রদের অভিযোগ এই যে, দক্ষিণপন্থী মুসলিম দল জমাৎএ ইসলামী ছাত্র, শিক্ষক ও সাংবাদিকদের উপর সংগঠিতভাবে হামলা চালায়।

২০ **জানুয়ারি**—আজ ওয়ারশতে প্রায় দু' বছর বাদে আবার চীন-মার্কিন কূটনৈতিক আলোচনা শুরু হয়। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে আলোচনায় নেতৃত্ব করেন রাষ্ট্রদূত ওয়াল্টার জে স্টোয়েসেল। চীনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন চীনা দূতাবাসের চার্জ দ্য এফেয়ার্স লেই ইয়াং।

২১ **জানুয়ারি**—আজ লনডনে তিনদিনব্যাপী ভারত-ব্রিটেন আলোচনা শেষ হয়েছে। আলোচনাকালে বিশ্ব পরিস্থিতি এবং সোভিয়েট রাশিয়া ও চীনের পররাষ্ট্র নীতি নিয়েও কথাবার্তা হয়। ব্রিটিশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন ডেনিশ গ্রীনহিল এবং ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন বহির্বিষয়ক দফতরের সচিব শ্রীকেবল সিং। জানা গিয়েছে যে ব্রিটেন এই বৈঠকে পশ্চিম এশিয়া সংকট নিরসন সম্পর্কে হতাশার মনোভাব প্রকাশ করেছে।

২২ **জানুয়ারি**—আজ সকালে দামাস্কাস-এ আমেরিকার পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি করার অভিযোগে ৭জন ইরানীকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। এর আগে সিরিয়ার বামপন্থী সরকারকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ২২জন ইরানীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে।

২৩ **জানুয়ারি**—দুনিয়ার তামাম শহরের চারদিকে শুধু হই-চই, গোলমাল, চীৎকার—একেবারে কানে-তালা-লাগা গোছের অবস্থা : এভাবে যদি চলতে থাকে—নির্ঘাৎ ২০০০ সালের মধ্যে অধিকাংশ শহরবাসীই বিলকুল কালা বনে যাবেন। নিউইয়র্ক আকাদমী অব সায়েনসেস কর্তৃক প্রকাশিত 'দি সায়েন্সেস' পত্রিকায় এ খবর বেরিয়েছে। বিজ্ঞান লেখক জন সোলোমন লিখেছেন : এতে স্রেফ শ্রবণশক্তিই নয়—শরীরের আরও অনেক কিছুর ক্ষতি হতে পারে।

২৪ **জানুয়ারি**—সোভিয়েত ইউনিয়নের শল্য চিকিৎসক ডাঃ ভ্লাদিমির ডেমিখব আজ এই মর্মে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, এক বা দুই বৎসরের মধ্যেই সোভিয়েত ইউনিয়নের ফুস-ফুস হৃদযন্ত্র, যকৃৎ এবং অন্যান্য অঙ্গ সংযোজনের কাজ শুরু হবে।

২৫ **জানুয়ারি**—উত্তর ভিয়েতনামের সরকারী সংবাদ প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রপতি নিকসনের জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বাণীর ওপর মন্তব্য করে বলেছে, শ্রীনিকসন ভিয়েতনাম প্রশ্নে তাঁর কঠোর মনোভাব থেকে একটুকুও নড়েননি।

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীঅজিত গুপ্ত

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৭ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১৫
শনিবার, ২৪ মাঘ, ১৩৭৬

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার

কলিকাতায়

বার্ষিক	—	২৫.০০
ষান্মাসিক	—	১২.৫০
ত্রৈমাসিক	—	৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	—	৩০.০০
ষান্মাসিক „	—	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক „	—	৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	—	৩০.০০
ষান্মাসিক „	—	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক „	—	৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	—	৫২.০০
ষান্মাসিক „	—	২৬.০০
ত্রৈমাসিক „	—	১৩.০০

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	—	৩৯.০০
ষান্মাসিক	—	১৯.৫০
ত্রৈমাসিক	—	১০.০০

দাম ৫০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাসুল ৫ পয়সা

DESH

Saturday 7 Feb. 1970

পশ্চিমবঙ্গ : যানবাহন সমস্যা

গত বিশ বাইশ বছরে পশ্চিমবঙ্গে আর কিছু না হোক রাস্তাঘাটের সংখ্যা অনেক বেড়েছে বলে শোনা যায়। কোথাও কোথাও হাইওয়ে তৈরী হয়েছে, কোথাও বা যোগাযোগের ব্যবস্থার জন্যে নতুন সড়ক গড়ে তোলা হয়েছে; তাছাড়া বিস্তৃত ও বিক্ষিপ্ত গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে শহরের সংযোগ সাধনের জন্যে পাকা রাস্তাও তৈরী করা হয়েছে। আজকাল প্রায় প্রত্যেকটি জেলায় এই রকম সড়ক কিছু কিছু দেখা যাবে। কংগ্রেস আমলেই রাস্তাঘাটের উন্নতির কাজ শুরু হয়েছিল যে তাতে দ্বিমত হবার উপায় বড় নেই। কিন্তু যে উদ্দেশ্য নিয়ে পথঘাট তৈরী—যাতায়াতের জন্যে যানবাহনের ব্যবস্থা—তার অবস্থা কী রকম? নিঃসন্দেহে খুবই শোচনীয়। অধিকাংশ জায়গায় মানুষের প্রয়োজনের তুলনায় বাসের সংখ্যা এতই অপ্রচুর যে তা থেকেও না থাকার মতন। কোথাও কোথাও শুনেছি বাসের অভাবে টেম্পো গাড়িতে কোনোক্রমে পা রেখে ঈশ্বর-নাম জপতে জপতে কাজেকর্মে যেতে হয়। এরকম অবস্থা বহুদিন থেকে চলছে, কারও নজর দেবার ফুরসত নেই। হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান, চব্বিশ পরগণার গ্রামাঞ্চলের দিকে তাকালে এ-দৃশ্য অনবরতই দেখা যাবে। যেমন ধরা যাক, হুগলির ধনেখালি-চিনসুরা-হরিপালের কথা; সেখানের জনৈক ভুক্তভোগীর মতে : এ রাস্তায় আঠারোটা বাস চলার কথা, চলে মাত্র দু তিনটি। এই রকমই সর্বত্র।

আমাদের সমস্যা নানা রকম; তার মধ্যে বড় বড় সমস্যাও আছে। স্বীকার করা যাক, সরকার এখন বৃহৎ সমস্যায় মগ্ন। কিন্তু এই যানবাহন সমস্যাও যে খুব ছোট তা নয়। মানুষ যদি কাজে-কর্মে, আপদে-বিপদে, প্রয়োজনে যানবাহনের অভাবে তার গন্তব্য স্থানে যেতেই না পারল তবে অত অর্থ ব্যয় করে পথঘাট তৈরী করাই বা কেন! অনেকেই এখন তাই বিশ্বাস করেন যে, রাস্তাঘাট তৈরী করে জনসাধারণের যাতায়াতের সুবিধের চেয়ে সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে মালপত্র আমদানিকারীদের অর্থাৎ ব্যবসায়ী সমাজের। অর্থাৎ যারা লরি, টেম্পো কিনে বা ভাড়া করে মাল আনা-নেওয়া করতে পারে। আমাদের রেল কোম্পানিরও নাকি মতিগতি এই ধরনের, যাত্রীর চেয়ে মালের কদর তাঁরা বেশি বোঝেন। যাই হোক, সরকারের উচিত জেলার রাস্তাঘাটের সঙ্গে সঙ্গে যানবাহন সমস্যার দিকেও মনোযোগ দেওয়া।

কলকাতা শহরের কথাও এই প্রসঙ্গে এসে পড়ে। কলকাতার যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রধানত তিন শরিকের হাতে—ট্রাম, সরকারী বাস, বেসরকারী বাস। এর মধ্যে প্রথম দুটি মোটা লোকসানের বোঝা বয়ে চলেছে। লোকসানের খাতে আরও অর্থব্যয় নিশ্চয় সম্ভব নয়, কাজেই ধুলোভরা ঝড়ঝড়ে ট্রামগাড়ি আর জবুথবু হাড়গোড় ভাঙা বেসরকারী বাস দিয়েই কাজ চালানো হচ্ছে। আগে, কংগ্রেস আমলে শোনা যেত, এ-সব প্রতিষ্ঠান থেকে বিস্তর টাকা আসতে পারে, কিন্তু মাথাভারী প্রশাসন, দুর্নীতির জন্যে কোনো কাজ হচ্ছে না। যুক্তফ্রণ্ট তো অনেক দিন হল শাসন ক্ষমতায় এসেছেন, কিন্তু ট্রাম বা সরকারী বাসের কোনো উন্নতি কি আমাদের চোখে পড়েছে। আগে যে ভোগ ভুগেছি, এখনও তাই, বরং যাত্রীসংখ্যা আরও বাড়ার জন্যে ট্রাম-বাস ধরা নিত্যকার এক বিরক্তিকর অভিজ্ঞতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারের উচিত অনতিবিলম্বে এর একটা ব্যবস্থা করা। এক দু পয়সা ভাড়া বাড়িয়েও যদি অধিকসংখ্যক ট্রাম-বাসের সুব্যবস্থা করা যায় মনে হয় না ভুক্তভোগী যাত্রীরা তেমন আপত্তি করবেন, কেননা ভোগান্তি কমলে এই বাড়তি ব্যয়ও অতটা গায়ে লাগবে না।

বেসরকারী বাসের বেশীটা চলে কলকাতার উপকণ্ঠে, কিছু কিছু শহরের মধ্যে, তবে যেগুলি শহরের মধ্যে চলে সেগুলি ঠিক শহরের বাস নয়, সুবিধের জন্যে শহরে আনা হয়েছে। এই বাসগুলি আমাদের অভাব কিছুটা মিটিয়েছে ঠিকই, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য।

কলকাতার ট্যাক্সি এক অদ্ভুত জিনিস। যাত্রীর প্রয়োজনের চেয়ে ট্যাক্সি চালকের মরজি, ইচ্ছা-অনিচ্ছাই এক্ষেত্রে গণ্য, অর্থাৎ আমার প্রয়োজনে ট্যাক্সি থামবে কী থামবে না এটা ট্যাক্সিঅলাই স্থির করবে, যাত্রী নয়। ইদানীং এসপ্লানেড অঞ্চলে সন্ধ্যের পরও কিছু ট্যাক্সি বেআইনীভাবে শেয়ারে যাত্রী নিয়ে যাওয়া-আসা করে। আমাদের তাতে আপত্তি নেই, আপত্তি এই যে, শেয়ারে যাবার জন্যে স্থায়ী ট্যাক্সি বন্ধ করে দেওয়া হোক। শোন যাচ্ছে, শীঘ্র হাজারখানেক নতুন ট্যাক্সি কলকাতার পথে দেখা যাবে। কলকাতার যানবাহন সমস্যা এমনই যে, এই স্বল্প সংখ্যক ট্যাক্সিতেও কষ্টের লাঘব বিশেষ কিছু হবে না।

বেচারি অভুক্ত বেড়াল!
জানলা বেয়ে এক
টুকরো চাঁদের আলো
ঘরের মেজেয় এসে
পড়তেই মনে করেছে
দুধ।
তাই চেটেই আনন্দ!
মিনি ফ্রন্ট
নব কংগ্রেস

[শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "পোনুর চিঠি"র ভাব অনুসরণে লিখিত]

সত্যি নেতাজী, কমরেড নেতাজী তোমার ভাগ্যি দেখে না, তোমার উপর আমার খু-উ-ব হিংসে হচ্ছে। হিংসে করছি বলে রাগ করলে না তো, নেতাজী। তোমার আর ভয় নেই নেতাজী, এবার তুমি স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে এস। এতক্ষণে নিশ্চয় তুমি শুনে ফেলেছ নেতাজী, আমাদের কমরেড জ্যোতিদা মানে জ্যোতি বোসদা, জ্যোতিদা না বলে জ্যোতি বোসদা বলছি বলে তুমি আবার আমাকে পোঁদপাকা ছেলে বলে ধরে নিও না নেতাজী, কি করব বল, তুমি যদি এ সমিস্যের পড়তে, তুমি কি বলতে বল? সমিস্যেটা কি বলছি শোন। আমাদের এখানে এখন যুক্ত ফ্রনট সরকার চলছে তো, যুক্ত ফ্রনট কি জান তো, উঃ সে দারুণ কমিক, আমরা ছোট ছোট ছেলেরা যেরকম আড়ি আড়ি ভাব খেলি, তোমাদের ছোট বেলায় তুমিও এ খেলা খেলেছ নেতাজী, খেল নি? এখন আমাদের যুক্ত ফ্রনটের রাজত্বে মুখ্যমন্ত্রী উপ-মুখ্যমন্ত্রী আর অন্যান্য মন্ত্রীরা সেই খেলা খেলছেন। হি হি হিহি, কি যে মজা নেতাজী, না দেখলে তোমার পেত্যয় হবে না। এ মন্ত্রী ও মন্ত্রীকে গাল পাড়ছে, চোদ্দ পার্টির সরকার তো, এ পার্টির লোকেরা বাগে পেলে ও পার্টির লোকেদের প্যাঁদাচ্ছে, উপ-মুখ্যমন্ত্রীর পার্টির লোকেরা মুখ্যমন্ত্রীকে কুকুর দেখাচ্ছে, দুয়ো দিচ্ছে, একেবারে কেলোর কীর্তি করে ছাড়ছে সবাই, বিশ্বাস কর নেতাজী, এক বর্ণও আমি বাড়িয়ে বলছি নে, মাইরি মা কালীর দিব্যি, তোমার গা ছুঁয়ে আমি একথা বলতে পারি। আমি ছোট এইটুকুন ছেলে, আমি আর কতটুকুই বা বলতে পারছি বল? তা একদিকে এইসব কেলোর কীর্তি চলছে—তুমি কি বলতে চাইছ নেতাজী, তা আমি জানি। তুমি তো এই কথা বলবে যে এতই যদি সব ঘটছে, সত্যি সত্যিই ঘটছে তো তার পরদিন আবার ওরা এক সঙ্গে বসছে কি করে, যুক্ত ফ্রনট সরকার যুক্ত আছে কি করে, মুখ্যমন্ত্রী আর উপমুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি দাঁড়ানো ছবি কাগজে ছাপা হচ্ছে কি করে? এই তো তোমার প্রশ্ন? তা এর জবাব তো আগেই দিয়ে দিয়েছি নেতাজী, বলেছি তো এরা সেই আড়ি আড়ি ভাব ভাব খেলার কায়দায় রাজত্ব চালাচ্ছেন। খেলাটা তোমার মনে আছে নেতাজী? তবে শোন, বেশ মন দিয়ে শোন আর ভাল করে মিলিয়ে নাও এদের সঙ্গে। খেলতে খেলতে যখন ঝগড়াঝাটি আমাদের মধ্যে খুব বেড়ে যায়, খু-উ-ব, তখন আমরা এই ছড়াটা বলি:

আড়ি আড়ি আড়ি, কাল যাব বাড়ি
পরশু যাব ঘর, কি করবি কর
হনুমানের লেজ ধরে টানাটানি কর

এইবার নেতাজী, তুমি যুক্ত ফ্রনটের দাদাদের কাণ্ডকারখানার সঙ্গে, ওদের নিজের নিজের পার্টির প্রস্তাব, সভাসমিতির ভাষণ, যুক্ত ফ্রনটের সভায় ওদের কেলোর কীর্তির সঙ্গে ছড়াটা লাইনে লাইনে মিলিয়ে দ্যাখ, কি,

মিলছে কি মিলছে না? হনুমানের লেজটা বুঝতে একটু অসুবিধে হচ্ছে? না নেতাজী, যুক্ত ফ্রনটের নেতাদের কি আমি ল্যাজওয়ালা হনুমান বলতে পারি? ছিঃ। ও'রা না পূজনীয় গুরুজন। গুরুজনদের সম্পোক্কে খারাপ কিছু বলতে নেই, জান, মা বলেছে তাতে জিব খসে যায়। আর দাদা বলেছে, জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব হচ্ছে মানুষ আর মানুষের শ্রেষ্ঠ অংশ হচ্ছে জিব্। দাদা যেমন সপাসপ জিব্ চালায় তুমি দেখো নেতাজী ও একদিন খু-উ-ব বড় বিপ্লবী নেতা হবে। হনুমানের লেজটা আসলে একটা প্রতীক। আজকাল আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে প্রতীক ছাড়া কিছু বোঝানো যায় না তো। জান নেতাজী ওটা আমরা সিনেমা থেকে পেয়েছি, তুমি কি সিনেমা টিনেমা দ্যাখ, নেতাজী? আসলে তুমিও আজ আমাদের কাছে প্রতীক, জ্যোতিদা মানে জ্যোতি বোসদা তোমাকে দেশপ্রেমিক বলছে, উঃ নেতাজী, তুমি এবার আমাদের লাল ঝাণ্ডা পার্টির ছেলেদের কাছে দেশ-প্রেমিকের প্রতীক হয়ে গেলে, ভাবতেও গা শিউরে উঠছে, শরীর শিরশির করে উঠছে! তুমি যদি আজ থাকতে নেতাজী, তোমার গলায় লাল রুমালের ফাঁস লাগিয়ে দিতাম। দাদা বলেছে, কমরেড জ্যোতি বোসের কাছ থেকে ক্যারেকটার সার্টিফিকেট বাগানো খুব শক্ত, জানো। দাদা তো ওদেরই দলে, ও খুব ভাল জানে। ওটা নিশ্চয়ই খুব দামী জিনিস, না হলে দাদা ও কথা বলত না। আর ক্যারেকটার সার্টিফিকেট নাকি বাঙ্গালীর কাছে খুব দামি জিনিস। সত্যি নেতাজী? তাহলে তুমি কিন্তু ওটা আবার হারিয়ে ফেলো না, খবরদার খবরদার। তুমি ওটা বরং যত্ন করে বাঁধিয়ে রেখো, বাইরের ঘরে টাঙিয়ে রেখে দিও। পাঁচজন যেখানে আসা যাওয়া করে সেইখানে এমনভাবে ওটা রেখো, যাতে সহজেই এটা লোকের নজরে পড়ে। তোমার সম্পর্কে লোকের ধারণা ভাল হবে। তোমাকে যে কত কথা লিখতে ইচ্ছে হচ্ছে, লিখছি, কিন্তু ছোট ছেলে তো, তাই খেই হারিয়ে ফেলছি, তুমি নিজগুণে ক্ষমা করে নিও। লিখতে লিখতে গোটা কতক কথা বাদ পড়ে গিয়েছে, সেগুলো বলে নিই। শুরুতেই সমিস্যের কথা বলেছিলাম। সেটা হচ্ছে এই, আমাদের এখানে দুই জ্যোতি, দুজনেই দুটো আলাদা লালঝাণ্ডা পার্টির নেতা, দুজনেই মন্ত্রী, দুজনেই কমরেড, দুজনেই দাদা। তাই বারবার আমাকে এক জ্যোতিদার কথা বলতে গিয়ে বারবার আমাকে জ্যোতি বোসদা বলতে হচ্ছে। একজন তো বোস আর একজন ভট্টাচার্য। এই আমার সমিস্যে। আচ্ছা শরটে এমন কিছু বের করতে পারো যা বললে চট করে ওদের দুজনকে আলাদা করে বোঝা যায়। এবার বুঝলে তো সমিস্যেটা। তারপর আড়ি আড়ি ভাব ভাব খেলার আড়ির শোলোকটাই শুধু বলেছি, ভাবের শোলোকটা বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম। ওটা হবে: "এক কাঁদি কাঁচকলা, এক কাঁদি ডাব কে নিবি কাঁচকলা, কে নিবি ডাব। বোকারা নিক কাঁচ-কলা, আমি নিই ডাব ভাব ভাব ভাব।" তুমি এক কাজ করো নেতাজী, যুক্ত ফ্রনটের দাদাদের এই মন্তরটা শিখিয়ে দিও। এই মন্তরটা এক পায়ে দাঁড়িয়ে নাকের ডগাটা দু-হাতের আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে সামনের দিকে মুখ করে একবার বাঁ দিকে মুখ করে একবার আর ডানদিকে মুখ করে একবার, তিনবার চেঁচিয়ে পড়তে বোলো, তাহলেই, যত শক্ত ঝগড়াই হোক না কেন নিমেষে মিটে যাবে। দাদারা হনুমানের লেজ ধরে যেরকম টানাটানি শুরু করেছেন, এছাড়া, সত্যি বলছি নেতাজী, আর দাদা-দের বাঁচাবার কোনও ওষুধ নেই। ওই যাঃ! ভাগ্যিস মনে পড়ল, হনুমানের লেজ কি, তাতো বলা হয়নি। ওটা হচ্ছে যুক্ত ফ্রনটের প্রতীক। নেতাজী, কমরেড নেতাজী, তুমি আমার লাল সালাম গ্রহণ করো। ইতি—তোমার খু—

দৃশ্যপট

পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট

এই লেখা যখন প্রকাশিত হবে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি তখন কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে কেউ সঠিক জানেন না। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর দল বাংলা কংগ্রেস যদি নিজেদের সিদ্ধান্ত মত এগোতে পারেন তাহলে অল্পদিনে এ রাজ্যে বড় রকম ওলট-পালোট ঘটে যাবে—খুব সম্ভবত এই সরকারই পাল্টে যাবে। আর যদি তাঁরা তা না পারেন, যদি সি পি আই এবং ফরওয়ারড ব্লকের আপত্তি তাঁরা মানেন তখনও এই সরকারই চলতে থাকবে—শুধু যুক্তফ্রন্টের উত্তাপটা আরো বাড়বে, আরো বেশি করে মনে হবে সরকার গেল গেল, যদিও আসলে সরকার যাবে না।

এটা মোটামুটি যুক্তফ্রন্টের সকলেরই জানা যে অজয়বাবু আর এ সরকার নিয়ে এগোতে চান না। তিনি এবং তাঁর দল সি পি এম-এর সঙ্গে আর একদিনও এগোতে অনিচ্ছুক। তাঁরা সি পি এমকে বাদ দিয়ে বিকল্প সরকার গঠনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

এটাও মোটামুটি সর্বজনবিদিত যে সি পি আই এবং ফরওয়ারড ব্লক এখনই সি পি এমকে বাদ দিয়ে বিকল্প সরকার গঠনে অরাজি। তাঁরা যে নীতিগতভাবে এই প্রস্তাবে অরাজি তা নয়, তাঁদের আপত্তিটা মোটামুটি কৌশলগত। তাঁরা বলছেন, হ্যাঁ, সি পি এমকে বাদ দিয়ে এখানেও কেরলের মত বিকল্প সরকার গড়তেই হবে; তবে তার জন্য আরও কিছুটা সময় প্রয়োজন, সি পি এমকে জনগণের কাছে আরও একসপোজ করা দরকার। তারপর এপ্রিল মাস নাগাদ চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

সি পি আই এবং ফরওয়ারড ব্লক বিধানসভা চালু থাকতেও কিছু করতে অনিচ্ছুক। তাঁরা মনে করেন, তাহলে সি পি এম বাইরের সঙ্গে সঙ্গে বিধান-সভার ভেতরেও লণ্ডভণ্ড করার চেষ্টা করবে এবং বাজেট পাশই বন্ধ করে দিতে চাইবে। সি পি আই এবং ফরওয়ারড ব্লক এই সুযোগটা সি পি এমকে কিছুতেই দিতে চান না। তাঁরা বলছেন, যা করার বাজেট অধিবেশনের পরই করা হোক। ততদিনে সি পি এম-এর "মুখোশটাও" আরও ভালো করে খুলে যাবে এবং বিধানসভার বাইরে ওদের মোকাবিলা করার জন্য প্রায় ছয়মাস সময় পাওয়া যাবে।

বাংলা কংগ্রেস, ফরওয়ারড ব্লক, সি পি আই, এস এস পি, গোর্খা লীগ, ফ্রন্টপন্থী পি এস পি এবং বরদা মুকুটমণির সমর্থক বলশেভিক পার্টি মোটামুটি একমত যে সি পি এম-এর সঙ্গে আর ফ্রন্ট সরকার চালান যাবে না। তাঁরা সি পি এমকে বাদ দিয়ে বিকল্প সরকার গঠনেও রাজি। কিন্তু কখন কিভাবে সি পি এমকে বাদ দেওয়া যায় এই প্রশ্নে এঁরা সকলে একমত নয়। কাজটা এখনই করে ফেলা ভাল—এই মত পোষণ করেন শুধু বাংলা কংগ্রেস, পি এস পি এবং গোর্খা লীগ।

*

সি পি আই এবং ফরওয়ারড ব্লক যখন কিছুতেই এখনই চূড়ান্ত ব্যবস্থা নিতে রাজি নন, তাহলে বাংলা কংগ্রেস কী করতে পারে? এই প্রশ্নে বাংলা কংগ্রেসের মধ্যেই মতভেদ আছে। শ্রীসুশীল ধাড়া মনে করেন : বাংলা কংগ্রেসের এককভাবেই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত এবং তাহলে সি পি আই ও ফরওয়ারড ব্লক শেষ পর্যন্ত [illegible] হবে সেই ব্যবস্থা সমর্থন করতে। [illegible] যুক্তি : মুখ্যমন্ত্রী সি পি এম-এর বির[illegible] চূড়ান্ত ব্যবস্থা নিলে সি পি আই [illegible] ফরওয়ারড ব্লকের সামনে তিনটি মাত্র [illegible] খোলা থাকবে—(১) বাংলা কংগ্রে[illegible] সমর্থন, (২) সি পি এম-এর পক্ষ [illegible] তাঁদের নেতৃত্বে সরকার গঠন, অথবা [illegible] অন্তবর্তী নির্বাচনের সম্মুখীন হও[illegible] শ্রীধাড়া মনে করেন, সি পি আ[illegible] ফরওয়ারড ব্লক কিছুতেই সি পি এ[illegible] নেতৃত্বে সরকার গড়তে পারবে ন[illegible] অন্তবর্তী নির্বাচনের সম্মুখীন হতে [illegible] পাবে না। সুতরাং তাঁরা বাংলা কংগ্রে[illegible] সমর্থন করতে বাধ্য হবেন।

বাংলা কংগ্রেসের আর একটা [illegible] যাঁদের নেতা শ্রীঅহীন মিশ্র, কিন্তু শ্রী[illegible] প্রস্তাবে রাজি নন। তাঁরা বলছেন, [illegible] দুই দলের ওপর কিছু চাপিয়ে [illegible] অন্যায় হবে। তাঁরা কৌশলগতভাবেও [illegible] কিছুটা অপেক্ষা করার পক্ষপাতী।

এই অবস্থায় অজয়বাবু কী [illegible] সেটাই দেখার। মুখ্যমন্ত্রী আগে[illegible] করেই ফেলেছিলেন তিনি ৩ [illegible] ব্যবস্থা নেবেন। ব্যবস্থাটা [illegible] জ্যোতিবাবুর হাত থেকে স্বরাষ্ট্র [illegible] কেড়ে নেওয়ার। এই ব্যবস্থা নিলে [illegible] পি এম সরকার ছেড়ে বেরিয়ে যাবে [illegible] দলের নেতারা ঘোষণা করে রেখেছেন।

*

প্রধানমন্ত্রী কী বলেন, তা[illegible] অজয়বাবুর সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে। [illegible] মন্ত্রী যদি মুখ্যমন্ত্রীকে জানান যে তি[illegible] এখনই ব্যবস্থা নেওয়া হোক [illegible] অজয়বাবু ৩ ফেব্রুয়ারি রাত্রেই [illegible] ব্যবস্থা নেবেন।

আর যদি তিনি বলেন, না, [illegible] ফেব্রুয়ারি কলকাতা গিয়ে আপনার [illegible] কথা বলব, তাহলে মুখ্যমন্ত্রী [illegible] করবেনই।

ইতিমধ্যে সি পি এম-এর নেতারা [illegible] বসে আছেন, তাঁদের হয়ে গিয়েছে। [illegible] চেষ্টার অবশ্য ত্রুটি রাখেননি। [illegible] শরিক দলকে বহুভাবে অনুরোধ [illegible] ছিলেন, প্রধানমন্ত্রীর কাছে পর্যন্ত [illegible] গিয়েছিলেন; কিন্তু লাভ হয়নি। [illegible] করলে ফ্রন্ট সরকারে তাঁরা থাকতে প[illegible] সেই কাজটা অর্থাৎ কর্মী ও [illegible] বাহিনীকে একটু সংযত করা—এখন নেতৃত্বের পক্ষে অসম্ভব।

১-২-৭০

নবারুণ গ[illegible]

উলটো চাপ

দেবরাজ

চার বছর আগেও দুনিয়ার মানচিত্র তন্নতন্ন করে খুঁজলেও লেসোথো বলে কোনও দেশের পাত্তা পাওয়া যেত না। কারণটা সোজা। তখনও ও নামের কোনও রাষ্ট্রের পত্তন হয়নি। আফ্রিকার দক্ষিণে যে দেশের নাম আজ লেসোথো তখন ছিল সেটা পরাধীন, বিলেতের মহারাণীর মুকুটে ছোট্ট একটি মুক্তো, তবে কালো। কালা আদমির ওই দেশটির নাম ছিল সেদিন পর্যন্ত বাসুটোল্যান্ড। প্রায় এক শতাব্দী ইংরেজের অধীনে থাকার পর সেটি স্বাধীন হয়েছে ৪ অক্টোবর, ১৯৬৬। বিদেশীর দেওয়া নাম ছেঁড়া জামার মত ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দেশটা নিয়েছে নিজের সাবেকি নাম—লেসোথো। ছোট্ট এতটুকু একটা দেশ হলে কী হয় স্বদেশের ভাষা আর সংস্কৃতির ওপর সেখানকার লোকদের টান যে খুব, স্বাধীন হবার পর জন্মভূমির নতুন নামকরণেই তা প্রকাশ পাচ্ছে। আয়তনে প্রায় বেলজিয়ামের সমান দেশটিতে বাস করে কুল্লে ন লাখ লোক। তাদের দেড় লাখই থাকে বিদেশে।

বিদেশটা অবশ্য দূরে নয়, একেবারে ঘরের কাছে। সেটা হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা। কালা আদমিদের দক্ষিণ আফ্রিকার শাদা চামড়ার লোকেরা ঘেন্না করলে কী হয়, চাকর-বাকর মুটে-মজুর তো চাই কাজকর্ম করা, পথঘাট ঝাঁট দেওয়া কিংবা কলকারখানায় খাটবার জন্যে। কালা আদমিদের দিয়ে ওসব ছোট কাজ করিয়ে নিতে শাদা সাহেবদের কোনও আপত্তি নেই, শুধু তারা মাথামাখি না করলেই হলো। গরীব লেসোথোর লোকেদের দক্ষিণ আফ্রিকায় রুজি রোজগারের কোনও অসুবিধে হয়নি —হবেও না যদি তারা না শাদা মনিবদের সঙ্গে সমান অধিকার দাবি করে। তা ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকা বাদ দিয়ে কোথায় তারা চাকরি বাকরি খুঁজতে যাবে? আর যাবেই বা কেমন করে? লেসোথো হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকারই একটা ছিট মহল। তার চারদিকেই দক্ষিণ আফ্রিকার এলাকা। বাইরের জগতের সঙ্গে তার যোগসূত্র যে ছোট্ট ১৬ মাইল লম্বা রেল লাইন তা গিয়ে মিশেছে দক্ষিণ আফ্রিকার রেলপথের সঙ্গে। খোলার মধ্যে মশগুল ওপরে আকাশ, কিন্তু হাওয়াই জাহাজে দেশবিদেশের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখবে এমন সঙ্গতি তো লেসোথোর নেই।

গোড়া থেকেই লেসোথো সরকার যে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে বুনিয়ে চলার চেষ্টা করছেন সেটা নেহাত প্রাণের দায়ে। তাঁদের দেশের জিয়নকাঠি-মরণকাঠি তো উগ্র বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকার হাতে। চাইলে সে দেশ অক্লেশে লেসোথোর টুঁটি টিপে ধরে তাকে মেরে ফেলতে পারে। তার জন্যে লড়াই করা দূরে থাকুক, দুটো একটা গুলিও ছুঁড়তে হবে না। দক্ষিণ আফ্রিকা এলাকা মাড়িয়ে লেসোথোর লোকেদের কোথাও যাওয়া চলবে না, এ হুমকি দিলেই যথেষ্ট। তখন ঘরে বসে পাথর চেবানো ছাড়া তাদের করার কিছু আর থাকবে না। তেমন কিছু দক্ষিণ আফ্রিকা অবশ্য করেনি, করবে বলে শাসায়ওনি। কিন্তু করলে তারা যে নিরুপায়, লেসোথোর লোকেরা তা বিলক্ষণ জানে। কাজটা যে আন্তর্জাতিক আইনের বিরোধী তাতে ভুল নেই, কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? কোন্ মহাশক্তির লেসোথোর জন্যে এমন দরদ উথলে পড়ছে যে তাকে দক্ষিণ আফ্রিকার কোপ থেকে বাঁচাতে আসবে?

লেসোথোর সরকার তাই দক্ষিণ আফ্রিকাকে চটাননি তো বটেই বরঞ্চ তাকে খানিকটা তোয়াজ করে চলেছেন। প্রধানমন্ত্রী চীফ (অর্থাৎ সর্দার) লীবুয়া জোনাথান দেশ স্বাধীন হবার আগে থেকেই দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের সঙ্গে একটা বনিবনার চেষ্টা করে যাচ্ছেন আর তাতে ফলও কিছু পেয়েছেন। ভেরউয়েডর্ যখন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখনও তিনি গিয়ে তাঁর কাছে দরবার করেছিলেন; আবার ভেরউয়েডর্ খুন হবার পর ভরস্টারের সঙ্গেও দেখা করেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার সাহায্য তিনি পাচ্ছেন বটে, তবে আফ্রিকার জাত ভাইরা তাঁকে একঘরে করে রেখেছে। লেসোথোর স্বাধীনতা উৎসবে যোগ দিতে আফ্রিকার ঐক্য বিধায়িনী সমিতির (অরগ্যানিজেসন অব আফ্রিকান ইউনিটি) পক্ষ থেকে সেখানকার রাজধানী মাসেরুতে কেউ আসেননি। কিন্তু সর্দার লীবুয়া জোনাথন করেন কী? জলে বাস করে তো আর কুমিরের সঙ্গে ঝগড়া করা চলে না। দক্ষিণ আফ্রিকাকে বয়কট করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে উগ্রপন্থী আফ্রিকার দেশগুলি তা তিনি মেনে নেননি। তার সঙ্গে দিব্যি কাজকারবার তিনি চালাচ্ছেন। তাঁর ধারণা তা না করলে নিষ্ঠুর দক্ষিণ আফ্রিকা তাঁকে পিঁপড়ের মত পিষে মারবে।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কালা আদমির দুশমন দক্ষিণ আফ্রিকার মহরম মহরম দেশের অনেকেরই পছন্দ নয়—বিরোধী দলগুলির তো বটেই, খোদ রাজারও। লেসোথোর রাষ্ট্রপ্রধান হচ্ছেন রাজা, যদিও বিলিতী রাজার মতই তাঁর নিজস্ব ক্ষমতা কিছু নেই। সংবিধানের এ বিধান এখনকার রাজা দ্বিতীয় মোশুশুর পছন্দ নয়। সে সংবিধান চালু হতে না হতেই তিনি বলেছিলেন সর্বময় কর্তা তিনি হতে চান না বটে কিন্তু হাবা কালা হয়ে থাকতে তিনি রাজী নন। তখনই ও নিয়ে তাঁর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী সর্দার লীবুয়া জোনাথানের সংঘর্ষ বেধে গিয়েছিল, তাতে জিত হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীরই। রাজনীতিতে আর তিনি যোগ দেবেন না বলে তখন রাজা অঙ্গীকার করেছিলেন। কিন্তু দায়ে পড়ে তিনি তা করেছিলেন—মন তো তাঁর তাতে সায় দেয়নি। মাঝে মাঝে গোপনে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করেছেন, তবে তেমন একটা কিছু করে উঠতে পারেননি। বিরোধী দলগুলির নেতারাও উগ্র স্বাদেশিকতায় দীক্ষা নিয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে সরকারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তাঁরাও ভালো চোখে দেখেননি। জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে যে নির্বাচন লেসোথোয় হয়ে গিয়েছে তাতে তাঁরা ও ব্যাপার নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে জোর প্রচার চালিয়েছিলেন।

তাঁদের সে প্রচার মাঠে মারা যায়নি বলেই মনে হচ্ছে। নির্বাচনের পালা শেষ হতে না হতেই প্রধানমন্ত্রী সংবিধান খারিজ করে দিয়ে বিরোধী দলের নেতা কংগ্রেস পার্টির মোখেহলেকে জেলে পুরেছেন, রাজাকেও নজরবন্দী করে রেখেছেন রাজপ্রাসাদে। সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচনও বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। সান্ধ্য আইন জারী করা হয়েছে রাজধানী মাসেরুতে, টহল দিচ্ছে সেখানকার পথে পথে ফৌজী দল। বিরোধীরা বলছে এত কাণ্ড করার পক্ষে কোনও যুক্তি নেই কেননা অরাজকতা দেশে দেখা দেয়নি। তাদের অভিযোগ নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রীর ন্যাশনাল পার্টি হেরে গিয়েছে বলে গদি বজায় রাখার জন্যেই জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। হেরে যে তাঁর দল গিয়েছে এ অভিযোগ সত্যি বলেই মনে হয়, জিতলে এত কাণ্ড প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয়ই করতেন না। তবে তিনি পালটা অভিযোগ এনেছেন বিরোধী দলগুলির বিরুদ্ধে এই বলে যে তারা দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাজাকেও জানিয়েছেন সরকার বিরোধী চক্রান্তে রাজা নাকি কথার খেলাপ করে মদত দিয়েছেন বিরোধী দলগুলিকে। সে অভিযোগ রাজা অবশ্য অস্বীকার করেছেন। তাতে প্রধানমন্ত্রী মোটেই ঘাবড়াননি; জোর গলায় তিনি বলেছেন দেশের লোক তাঁরই দিকে, নির্বাচন তিনি আবার করবেন হাওয়াটা ঠাণ্ডা হলে। আপাতত তিনিই লেসোথোর সর্বেসর্বা।

দুঃখ-সুখ এ দুয়ের লেভেল ক্রসিং-এ

অরুণাভ দাশগুপ্ত

এখন তেমন কোন দুঃখ নেই,
এখন তেমন কোন সুখ নেই,
দুঃখ-সুখ এ দুয়ের লেভেল ক্রসিং-এ
নিরালম্বতায়
না-টানা না-ছাড়া সুতো—এভাবেই বেঁচেবর্তে আছি।

এখন তেমন কোন দুঃখ নেই,
দুঃখের গভীরে ডুবে, অশ্রু-ঘাম-রক্ত ছেনে ছেনে,
সারাৎসার জেনেছি এখন,—এ শুধু নেহাতই ভঙ্গী
যাকে স্বল্পায়াসে
ঢিলে গহনার মতো প্রয়োজনে খুলে রাখা যায়॥

জলপুলিশ ও প্রেমিকপ্রেমিকা

কমলেশ চক্রবর্তী

কখন কারে চোখে হারাই ঠোঁটের কোণে আটকে রাখি
মিষ্টি হাসি
এসপ্লানেডে দেখা হ'লে করজোড়ে ঠাণ্ডা কফি
দুপুরে রোদে
পর্দা ঢাকা নির্জনতায় ঘর্মমাখা হাত দুটি তার
ছুঁয়ে দেখি
বাল্য প্রণয় এই দুপুরে কতোটুকু কাঁপন ধরে
চোখের নিচে
চোখের নিচে ছুঁয়ে দেখি দুপুর রোদে মিষ্টি হাসি।

নদীর পারে ব'সে দেখি কলস্বনা পদ্মা কখন
ফিরে আসে
উড়িয়ে দিয়ে রেশমী রুমাল নদীর দিকে প্রতীক্ষিত
হাত বাড়াই
দু হাত দিয়ে আদর করে চুমু দিলেই মাঝি বলে
সন্ধ্যে হ'লো
ওপার থেকে জলপুলিশের তাড়া খেয়ে নৌকা ভেড়ে
গঙ্গাঘাটে
গঙ্গাঘাটে সন্ধ্যে হ'লো হাত বাড়াই, ফিরে আসে।

ফেরার পথে ট্যাক্সি কাঁপে আলোয় নাচে রাস্তা জুড়ে
ঝরা পাতা
বুকের ভাঁজে মুখ লুকাবো মুখ লুকাবো ঠোঁটের নিচে
ঝরলে পাতা
পাহারোলা বলবে ডেকে ও পথ দিয়ে হাঁটা বারণ
রাত্রি বেলা
কাঁধে হাতের স্পর্শ রেখে আইন ভেঙে গড়ের মাঠে
যুবক হবো
যুবক হবো রাত্রি বেলা ঝরলে পাতা ঝরা পাতা।

একটি ধানের শীষ এবং এক ফোঁটা শিশির

ফণিভূষণ আচার্য

গাঢ় নীল দিগন্তে এক ফোঁটা চোখের জলের মতো
দাঁড়িয়ে আছে আমার মা
ধন্দে পাতা সুনিবিড় আত্মদানের অশ্রু
আমার শিকড়ে শিকড়ে দুধের ধারা ঢেলে দিয়ে
হলুদ পাতার মতো মাটিতে মাটি বাতাসে বাতাস

আমি জন্মান্ধের মতো হাতড়িয়ে খুঁজি আমার শৈশবকে
ছিপছিপে একটি নদী...জ্যোৎস্নায় দুধের ধারা
নম্রনীল আকাশ এবং মিহিন্ ঘুমপাড়ানি

নতুন ধানের ক্ষীরে আমার মা জেগে আছে
পৃথিবীর কোমলতম গলায় শুনবো আমার ডাকনাম
ক্যাকটাসের দিগন্ত পেরিয়ে
আমি জন্মান্ধের মতো হাতড়িয়ে খুঁজি
একটি ধানের শীষ এবং এক ফোঁটা শিশির
আমার মা

ওঠা নামার সিঁড়ি দিয়েই যাতায়াত

বিশ্বেশ্বর সামন্ত

কোনো দিন নিজের কাছে দাঁড়িয়ে অপরিচিত মনে হয়,
অন্য এক মনুষ্যজনের দেখা পেয়ে যাই অনিয়মের মধ্যে
যার অধিষ্ঠান,
দুর্বিনীত হয়ে ওঠাই যার উল্লাস,
অন্তরঙ্গ কপাট খুলে বাইরে তাকালে আকাশের মধ্যেও
কিছু মেঘ জমে থাকে হৃদয়ের ওদিকে কালো ছায়া পড়ে,
আমারই সব দিকে অনাত্মীয় কারাগার শৃঙ্খলের শব্দ,
হাত উঁচু ক'রে কোথাও ছুটে যেতে পারি না,
প্রতিধ্বনির মতোই কপালের দিকে ফিরে আসি একেক
ঝাঁপ পড়ে যার লৌহ-যবনিকা,
আমার ওপর দিয়ে কে যেন ধুলো উড়িয়ে হেঁটে যাচ্ছে
অনিয়মের দিকে যেখানে শৃঙ্খলাহীন বাইরে পা দুলে ওঠে
মাটি সরে যায়,
শেষ পর্যন্ত ওদিকেই যেতে হবে? নষ্ট আত্মার দিকে?
যেখানে ময়লা জমে আছে অশুচি লেগে থাকে সমস্ত শরীরে,
একেক ফুলগুলি ছিঁড়ে পুজার্চনাই যেন মূল্যহীন মনে হয়,
যখন ওরা ঝিমিয়ে পড়ে অনাবশ্যক ভেসে যায় সমুদ্রের দিকে,
তখন আলোকিত প্রভাতেও নিজের কাছে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ
অপরিচিত মনে হয় কেননা অনিয়মের মধ্যে
আমি চাপা পড়ে গেছি,
সব সময় আমার ভেতর কে একজন সন্ন্যাসী কম্বল জড়িয়ে
বসে থাকে॥

‘ধানবাদ’

একটা বীভৎস ঘটনা ঘটেছে ধানবাদে।

মারামারি, খুনোখুনি এখনকার দিনে নতুন কিছু নয়—ওতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। সেই ‘স্তিল জেরো—কাল-কুত্তা’ ছবির ফরাসী পরিচালককে নিয়ে সুনন্দর জার্নালে আমি কিঞ্চিৎ পরিহাস-বিজল্পনা করেছিলুম মনে আছে; কিন্তু মধ্যে মধ্যে ভাবি, তাঁর ব্যাখ্যাও একেবারে উড়িয়ে দেবার নয়—ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ এবং অনীহা আমাদের মর্মে মর্মে এমনি সঞ্চারিত হয়ে গেছে যে, ইট-পাটকেল, টিয়ার গ্যাস, লাঠি-বোমার রণক্ষেত্র থেকে অদূরেই আমরা স্বাভাবিক দিনযাত্রা নির্বাহ করতে পারি। একটু আগেই এক বন্ধু বলছিলেন যে, গত তিন-চার দিন ধরে বিশেষ উপদ্রুত কলকাতার একটি অঞ্চলে অত্যন্ত জরুরী কাজে আজ তাঁকে যেতেই হবে: ‘কী করা যায় বলুন—ও তো আছেই, ওর সঙ্গেই মানিয়ে নিতে হবে।’

কলেজের মত হোস্টেলেও একসঙ্গে থাকার সুযোগ দেওয়া হোক

মানিয়ে নিতে হবে—নিঃসন্দেহ। কিন্তু ধানবাদের ব্যাপারটা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। আমাদের কণ্ঠ কোথাও পৌঁছোয় কিনা জানি না, কিন্তু কখনো কখনো আমাদের মতো কমন ম্যানদের চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে: ‘যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়—এবার এগুলো বন্ধ হওয়া উচিত।’

খবরের কাগজ থেকে যেটুকু সংবাদ মেলে, তা থেকে জানা যায়' বাজারের রাস্তায় ক'টি মেয়েকে অসম্মান করা নিয়ে ঘটনার সূত্রপাত—তারপরে বিপর্যয় কাণ্ড—এখনো পুকুর ছেঁচে মৃতদেহের সন্ধান চলছে। এবং, লাঠি-রাইফেলধারী পুলিস বাহিনী দিয়ে ঘিরে একটি ছাত্রাবাসের সমস্ত ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

কোনো মন্তব্য করা এখনো সমীচীন নয়। কিন্তু এই নোংরা ঘটনার সঙ্গে—সব ছাত্র অবশ্যই নন—কিছু ছাত্রও সংশ্লিষ্ট রয়েছেন—এ কথা ভাবতেই বীভৎস লাগে। যতদূর মনে পড়ছে, কিছুকাল আগে কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা তোলপাড় কাণ্ডের সঙ্গে ছাত্রী-অপমানের ব্যাপারটা জড়িয়ে ছিল। বাংলা দেশের একটি কলেজের সাম্প্রতিক গোলযোগেও মেয়েদের মর্যাদার প্রশ্ন এসে পড়েছে বলে কাগজে দেখেছি।

আপাতত একটি দৃশ্য ফুটে উঠল চোখের সামনে। বছর কয়েক আগে, পুজোর সময়। খোদ পাটনা শহরের বাজারের ভেতর দিয়ে চলেছি একটি মোটর গাড়িতে। কালটা সন্ধ্যা, উৎসবটা পুজোর, ফলে জনারণ্য। দু-হাত করে এগিয়ে মিনিট পাঁচেকের জন্যে দাঁড়িয়ে যেতে হচ্ছিল। আমাদের পাশাপাশি একটি রিক্শ আসছিল—ভিড়ের মধ্যে, মোটর আর রিক্শর গতিবেগে কোনো পার্থক্য নেই। সেই রিক্শয় ছিল সালোয়ার-কামিজ পরা দুটি প্রিয়দর্শিনী কিশোরী—নিরীহ এবং সরল চেহারা তাদের।

এই মুহূর্তে তাদের মুখ বিবর্ণ-

তরুণ-তরুণী প্রত্যেককেই বোরখা ব্যবহার করতে হবে

চোখে পৃথিবীর আতঙ্ক। কারণ, তাদের রিক্শ ঘিরে প্রায় নৃত্যচ্ছন্দে চলেছে একদল তরুণ। গান, মন্তব্য এবং হাসির যা উল্লোল উল্লাস চলছে, তা আর যাই হোক, শালীনতার পর্যায়ে পড়ে না। ভিড়ের মধ্যে একবার যেন একটি পাহারাওলাকে দেখা গেল, রিকশর গায়ে লাঠি ঠুকে একবার যেন কাদের বললে—‘হটো—হটো’—তারপরেই সে নিশ্চিহ্ন হল। মোটরে বসে ক্লীব-ক্রোধে এই কাপুরুষতার আমরা কাপুরুষ সাক্ষী হয়ে রইলুম—কী আর করতে পারি! আর আমাদের গাড়িতেও তো মেয়েরা ছিলেন। এবং আমার দুর্ভাগ্য, এই তরুণদের সম্পূর্ণ পেশাদার মস্তান বলে আমি ভাবতে পারলুম না।

পার্কে, লেকের ধারে, ময়দানে—মেয়েরা সঙ্গে থাকলে প্রায়ই যে অশ্লীলতার আঘাত সইতে হয়, তাকে আমি গুরুত্ব দিই না। ওটা নতুন কিছু নয়। পথে মেয়েদের উদ্দেশে কিছু গান, শিস, টীকা-টিপ্পনী—এগুলো ভালো জিনিস নয় বটে, কিন্তু

ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজগুলিতে অধিক সংখ্যক ছাত্রী চাই

যৌবন ধর্মে ও তো আবহমান কাল ধরেই চলে আসছে। কিন্তু সন্দেহ হয়, এ ব্যাপারে একটা মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনও ঘটে গেছে কোথাও।

পথ-চলতি ছাত্রীদের প্রতি এরকম হৃদয়দ্রাবী সংগীত আমাদের কালেও উৎসারিত হত: "তোমার বাড়ির পাশে ভাড়াটিয়া হতে চাই/তোমার গাড়ির তলে পড়িয়া মরিতে চাই।" কিন্তু এই নায়কেরা জানত যে কাজটা তারা ভালো করছে না, তাদের একটা চক্ষুলজ্জা ছিল, সামাজিক শাসনের ভয়ও ছিল। কলেজে আমার এক সহপাঠীর বাসনই ছিল, সহপাঠিনীদের ঘোড়ার গাড়ির পেছনে নিষ্ঠাভরে সাইকেল চালানো। কো-এডুকেশনের ক্লাসে যেখানে মেয়েরা বসতেন, সেখানে লাল পিঁপড়ের বাসা ভেঙে দিয়েও একজনকে চরিতার্থ হতে দেখেছি। কিন্তু তারপরে বিস্তর ঢেউ ভেঙেছে বঙ্গোপসাগরে। এখন যে-কোনো মিশ্র শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ছেলে-মেয়েরা সহজেই মেশেন, কৃত্রিম দূরত্ব-সৃষ্টির কুশ্রীতা দূর হয়েছে—বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময় ছেলেবেলার চেনা একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্য আমি বেয়ারার হাতে স্লিপ পাঠিয়ে অপেক্ষা করতুম—এখনকার ছাত্রছাত্রীদের কাছে এসব রূপকথা মনে হবে। আজকে তাঁদের সম্পর্ক স্বাভাবিক, সরল প্রীতি এবং বন্ধুত্বে স্নিগ্ধ।

তবু—তবু যত্রতত্র পাইকারী হারে মেয়েদের অসম্মান করবার একটা মৌলিক অধিকার—অকারণে অশ্লীল হওয়ার ব্যাভড়ো একদলকে পেয়ে বসেছে মনে হয়। উচ্চ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট ছাত্রাবাস থেকে কেন আসে ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে অভব্য গান, কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি, বীভৎস স্নান-প্রদর্শনী? এখনকার দিনে—এই সহজ মেলামেশার যুগেও? এ তো শুধু তারুণ্যের স্বাভাবিক উচ্ছলতা নয়। প্রতিবাদে আগে লজ্জিত হওয়ার রেওয়াজ ছিল, এখন কেন মনে হয় মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ?

এ কথা জানি, দেশের ছাত্রসমাজ সজীব, উজ্জ্বল, চিরকাল তাঁরা নতুন চিন্তার সামনে—তাঁরা আমাদের গর্বের বস্তু। এ সমস্ত ইতরতার প্রতিবাদ তাঁরাই করেন, রুখে দাঁড়ান। তাঁরা সব চাইতে প্রদীপ্ত আর প্রাণবন্ত বলে তাঁদের দীপ্তি যেমন আমাদের চকিত করে, তাঁদের কোনো অংশের বিকৃতিও আমাদের তেমনি চোখে লাগে। সেই জন্যই ধানবাদের ব্যাপারটা এত বেশি কদর্য হয়ে উঠেছে। মেয়েদের অসম্মানকে কেন্দ্র করে এতগুলি মানুষের মৃত্যু এবং একটি ছাত্রাবাসের সব ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হল (নিশ্চয়ই তাঁদের পনেরো আনাই নির্দোষ)—সাম্প্রতিক কালে এত বড় দুঃসংবাদ আর আমার চোখে পড়েনি।

বলতে পারি না—বিশেষ ধরনের চলচ্চিত্রের নায়কেরা এই সব প্রেরণা জাগান কিনা; সে সব ছবিতে যে-ভাবে প্রেমের বন্যা বয়ে যায়—তা থেকে কেউ কেউ উদ্দীপনা পান কিনা; অনিশ্চয়তা এবং অন্যান্য মনোবিকার এর জন্য দায়ী কিনা। কিন্তু গ্লানি যে জমে উঠছে, চোখ খোলা থাকলে তা প্রত্যক্ষ না করে উপায় নেই। ধানবাদের ব্যাপারে ছাত্রদের কোনো ভূমিকা যদি সত্য হয়—তা হলে এ লজ্জা মুছে ফেলবার দায়িত্বও ছাত্রদেরই—দেশের বলিষ্ঠ এবং সংগ্রামী তরুণেরা সে দায়িত্ব কোনো মতেই এড়াতে পারেন না।

সোনালী কাজের ফল

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

সমস্ত সোনালী কাজ একদিন পুড়ে হবে কালো
বিন্যাস, ঘরের কোণে লেগে যাবে ধুলো-ঝুল সবই
যেন বাড়িওলা আজ মানুষের আড়ালে বসালো
গেরস্ত বাদুড় আর সুগভীর, শূন্যতার কবি।

এই বাড়ি, সামনের ফটকে
এখন নিশ্চিন্তে গরু ঢোকে
সাপটে মুড়িয়ে খায় মানুষের যত্নমাখা গাছ
আনাচকানাচ
পূর্ণ ঝুরোঝুরো মঠ-মাটি
একদিন উঠোনে কপাটি, খেলা হতো।

আজ বন্ধ দরজায় অন্তত
তালা দাও, বাড়িওলা, মানো
সোনালী কাজের ফল ভোগ করবে নিশ্চিত বাগানও!

এক প্রশ্ন—শেষ প্রশ্ন

প্রভাকর মাঝি

কি পেলে হঠাৎ করে মনে হয় নিজেকে সম্রাট,
উবে যায় রঙ-চটা সময়ের সব বিবর্ণতা—
রাত্রি প্রচ্ছদ ছিঁড়ে চমকে উঠে সোনালী সকাল,
স্বপ্নের কিংখাবে মোড়া এ পৃথিবী একটি রূপকথা!

কি পেলে জীবন ফিরে পায় তার আশ্চর্য সুরভি,
সে কি খ্যাতি? প্রতিপত্তি? স্বাস্থ্য? সুখ? প্রেম? **ভালবাসা?**
ধর্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম, সংসারের সাফল্য, বিজয়,
বরাতে বরাদ্দ যতো হয়, বাড়ে সতত পিয়াসা।

নিরালোক অন্ধকারে নাকি দূর জ্যোতির্বলয়েতে,
চেতনার অতীতে সে কোথাও রয়েছে কোনোখানে।
চকিতে চঞ্চল করে হাওয়ায় হারিয়ে যায়, পরে
অদৃশ্য সুতোয় বেঁধে নিরন্তর টানে, টানে, টানে।

শিল্পে ও সাহিত্যে, কালে কালান্তরে, সব তর্ক ঠেলে
চরাচরে এক প্রশ্ন—শেষ প্রশ্ন, কি পেলে? কি পেলে?

ঘুণপোকা

মৃণাল দত্ত

রক্তের ভিতরে এক নিঃশব্দ ঘুণপোকা আছে, টের পাই
কিন্তু তাকে দেখি না, বুঝি যে সে নিঃশব্দে লুকিয়ে আছে
রক্তেরই ভিতরে—
তার কাজ শুধু অবিরাম কেটে যাওয়া, কেটে কেটে
কেবল ঝরিয়ে যাওয়া, কেবল খসিয়ে যাওয়া আয়ু।

গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে তাই এত দাহ, এত অগ্নিজ্বালা
পাঁজরের ঠিক নিচে অক্ষত ফুসফুসে, কেউ
নিপুণ ধারালো দাঁতে কেটে যাচ্ছে জটিল গ্রন্থিরক
কিছু একটা ঘটে যাচ্ছে, টের পাই
কুরে কুরে খাচ্ছে কেউ বক্ষের পিঞ্জর
ছিঁড়েখুঁড়ে নিচ্ছে কেউ সব দড়িদড়া।
এখন জন্মের কাছে আর কোনো ঋণ নেই, শুষে নিচ্ছে কেউ
ধমনীতে সব রক্তস্রোত।

কবে যে বসন্ত এলো, কবে গেলো, কিছুই জানি না—
কেবল জানি যে রুক্ষ শীত
আগ্রাসী ধারালো দাঁতে অবিরাম কেটে যাচ্ছে পাতা
পোকামাকড়ের দাঁত কেটে বসছে মাঠের আনাজে
রক্তের ভিতরে,
এরকম কোনো এক নিঃশব্দ ঘুণপোকা আছে, টের পাই
কিন্তু তাকে দেখি না, বুঝি যে সে পোকামাকড়ের মতো
লুকিয়ে রয়েছে
রক্তেরই ভিতরে—
তার কাজ শুধু কুরে কুরে খাওয়া, অবিরাম কেটে যাওয়া
কেটে কেটে
কেবল ঝরিয়ে যাওয়া, কেবল খসিয়ে যাওয়া আয়ু—।

সারা
ভারতে
তারিফ পেয়েছে
পানামা
Panama
CIGARETTES
ভারতের এই ধরণের বৃহত্তম
জাতীয় উদ্যম

"শ্রীচরণেষু" — প্রথম চিঠি, মাকে

তার প্রথম চিঠি "শ্রীচরণেষু, মা!" চিঠি লিখে লিখে আমাম-শোধের যে-খেলায় সে নেমেছে, তার প্রথম চিঠি মাকে লেখাই তো ভাল। যিনি মূল, যিনি ধাত্রী, তাকে এনেছিলেন, ধরেছিলেন। প্রাণের ঋণ, ধারণের ঋণ। রক্তের, স্তন্যের; স্নেহের নীড়ের। ঘিরে থাকার, ঢেকে রাখার, দৃষ্টি দিয়ে পিছনে ছোটার—মমতায়, উৎকণ্ঠায়, আতঙ্কে। অহর্নিশ "ভালো হোক"-ভাবনায়।

[এই ব্যক্তিটি কে, একে কি আমি চিনি, দেখেছি কখনও? কী করে চিঠিগুলো আমার হেপাজতে এল, স্পষ্ট মনে করতে পারছি না। যেন এক জাদুকর, হঠাৎ কোথা থেকে একদিন সামনে এসে দাঁড়াল, টেবিলের উপরে ছুঁড়ে দিল কাগজের বান্ডিল, সম্মোহক দৃষ্টিতে আমাকে বিদ্ধ করে বলল, 'সাজিয়ে নাও'। রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনীতে যেমন ঘটে। তার চোখে শীত, তার স্বরে শীত, মানে শীতে যেন শিটিয়ে-কঠিন, আর আদিষ্ট আমি কাগজগুলো হাত বাড়িয়ে ধরে অনিশ্চিত, কম্পমান। "সাজিয়ে দাও", হুকুম শুনেই আমি 'অবশ্য অবশ্য' বলে একটু একটু হাসতে গেলাম, সেই হাসি কাগজ ছেঁড়ার ফড়ফড়ের মতই শোনাল, সাজাব যে কিন্তু কীভাবে তার কূল পাচ্ছিলুম না, খেলা ভেঙে গেলে যেভাবে পড়ে-থাকা তাস কুড়িয়ে সাজিয়ে তুলি, সেইভাবে?

কতক্ষণ সে ছিল মনে নেই, কখন দেখি মগ্ন হয়ে গিয়েছি সেই পত্রস্তূপে, আর পড়তে-পড়তেই টের পেয়েছি আমাকে কী করতে হবে। আগাগোড়া ঢেলে সাজালাম আমার নিজের প্যাটার্নে, তাতে উন্নতি কিছু হল কিনা জানিনে। জানি, যেহেতু সে উপস্থিত, আছে কোথাও আছে, হঠাৎ না-জানি কখন আবার আবির্ভূত হবে, অতএব নিরুপায়, গুছিয়ে তুলতেই হবে।

"কেননা আমি পৌত্তলিক", তার লেখা প্রথম বাক্যটি এই ছিল, এভাবে আবার অন্বয় হয় নাকি! তাই ঘুরিয়ে, যেভাবে লেখা হয়ে থাকে, মানে লেখকেরা লিখে থাকেন, সেই অভ্যস্ত ছাঁচে তার গলগলে তারল্য ঢেলে দিলুম। একটু চিটচিটে হোক, নইলে পড়া যাবে না।

এইবার শুরু।]

(ক)

তার প্রথম চিঠি "শ্রীচরণেষু মা।"

যে-পুজোয় সে বসেছে বয়সের বেশ কয়েকটা বাঁক পার হয়ে এসে, তার উদ্দিষ্ট দেবতা অনেক, কেননা সে পৌত্তলিক, কেননা সে বহুর সঙ্গে বাসনায় ঘৃণায়, আশায় হতাশায়, আচারে-অভিচারে—এবং কৃতজ্ঞতাতেও—লিপ্ত। যত পুতুল আর প্রতিমা আজ সুদূর-উদ্ভাসে ঝাপসা চোখে ধরা দিচ্ছে তার প্রথমটি মা হবেন না তো কে!

কিন্তু কেন। বোঝাপড়ায় সব চুকিয়ে দেবার দুর্মর সাধ তাকে কেবলই মর্মরিত করে কেন। কোন্ ঋণ শোধ হয় কবে, আর দেউলিয়া দশায় দাঁড়িয়ে কি কেউ ধার মিটিয়ে দিতে পারে?

তবে হয়ত কথাটা ঋণ নয়। পাপবোধ। যাদের প্রতি পাপ করেছি, তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব। যাদের সঙ্গে করেছি, তাদের ভাগ দিতে ডাকব, আরও কে-যেন একদিন ডেকেছিল না? কী নাম, কী নাম যেন তার—রত্নাকর' সে সাড়া পায়নি, আমি পাব। আর যারা অন্যায় করেছে আমার প্রতি, তাদের, তাদের প্রত্যেককে ডেকে ডেকে চুল ছিঁড়ে অভিশাপ দেব। দেব, যেহেতু আমি রক্তমাংসের মানুষ, জিতেন্দ্রিয় নই, আমার সত্তায় ত্রিগুণাতীত কোনও দৈবী আবেশ নেই, অতএব আমি বলে যাব। একে আমার সওয়াল বলতে চান বলুন, জবাব বলতে চান বলুন, কাউকে অভিযোগ, কাউকে নালিশ—এই আমার শেষ টেস্টামেন্ট, আখেরী বোঝাপড়া। আসলে বোঝাপড়া এই পৃথিবীর সঙ্গে, পরিচিত মানব-মানবীর—একটু আগে যাদের দেব-দেবী বলেছি—সমষ্টি কে-পৃথিবী। যার জরায়ুতে এতকাল বাস করেছি, শ্বাস নিয়েছি, কখনও ফুঁসেছি দমবন্ধ করে, যে জুগিয়েছে কত সুখ আর

ঘাতক অসুখ, তার সঙ্গে একটা হেস্তনেস্ত না করে চলে গেলে 'পুনর্জন্ম' নামক একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাবে না! অন্ততঃ অতৃপ্ত আত্মা প্রেত হয়ে ফিরে আসবে। ইহজন্মের কোনও জের তাই রেখে যেতে চাই না।

[খ]

হঠাৎ একটা কঠিন অসুখে পড়ে শীতের শেষ-বেলায় সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে এই-সব ভাবছিল। অদ্ভুত এই খেয়ালটা এসে-ছিল তার মনে, চিঠি লিখে-লিখে হারানো সবাইকে ডাকার, মুমূর্ষুর শয্যাপাশে যেমন ডাকে। ডাক্তারবাবুর উপস্থিতিকে উড়িয়ে দিয়ে, সকলকে কাছে ডাকা, তখন মুখে কথাও ফোটে না, মাথায় কপালে হাত বুলানো, চোখে জল, মুখে ফোঁটা কয়েক গঙ্গাজল।

সেদিন কী-যেন-কেন তার কেমন ধারণা হল, সে বেশি দিন আর বাঁচবে না। আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ধারণাটা মনের মধ্যে আস্তে আস্তে বসে গেল, টিউব-ওয়েলের নল যেমন স্তরের পর স্তর ফুঁড়ে মাটিতে পশে। আকাশের আকার ডিমের খোলাটে সাদা খোলার মতন, শীত কিনা তাই নীরঙ। অনন্ত-টনন্ত এ সব মাথায় তখন আসছিল না, হতাশ ছাই-ছাই ডানার কয়েকটা পাখি তখনই ক্লান্ত ফিরে আসছে। বিড়বিড় করে সে নিজেকে বলল, শীতের বেলা যাক কেমন হঠাৎ বুজে যায়, সোনালরঙায় ভরা সিন্দুকটায় ঝপাং করে ডালা পড়ার মতো। বেলাটা এই জ্বলছিল, এই নিভে একেবারে ধোয়া-মোছা চিত্রা হয়ে গেল।

পেটের যন্ত্রণাটা তখনই নড়ে চড়ে উঠল, যেন গর্ভস্থ ভ্রূণ যার বিনাশ [illegible] বৈদ্যেরও অসাধ্য, হাতড়ে হাতড়ে একটা লাথি খেল সে, কুঁচকে যাচ্ছে ঠোঁট, চোখের কোণ, দুই ভুরুর বিভাজিকা কপাল, তলপেট চেপে ধরেও ত্রাণ নেই।

বিস্তারিত আকাশের [illegible] মরা মাছের মত চোখ দুটি ন্যস্ত করে সে বিড়-বিড় করে বলে উঠল, "এইবার আমি যাব। স্বদেশে ফিরব।" ভিতরে ভিতরে এই সে প্রথম যথার্থ প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল, স্বদেশ! স্বদেশ! একটা আকস্মিক আলোড়নের মত। যেখানে সে আছে, এই শয্যা, এই ঘর, তার নয়, সাময়িক সরাই শুধু, এই যন্ত্রণার আগে এবং পরে আছে যা তার উৎস, যা পরিণাম। যেখানে সে সহজ, স্বচ্ছন্দ, শান্ত। তার স্বদেশ।

কষ্ট হবে না? হবে। দুঃখ পাবে সে তো—সে বিচার করে দেখুক—কতবার যে-বিদেশে যাই, ফেরার সময় ঘরের হাতছানি সত্ত্বেও, একটু টনটন করে। এত আলো, এত ঐশ্বর্য, ঝকঝকে রাস্তা, বিলাস, আরাম মসৃণতা, এ সব ছেড়ে সেই শহরে আবার, যেখানে কত ধুলো, সব কত চাপা-চাপা, অভাব সর্বত্র।

তবু সেই স্বদেশের শহর তাকে টানে আজ আরও দূরের, সামনের, [illegible] পিছনেরও, আর-এক স্বদেশ তাকে [illegible] টানছে। সেখানে গেলে এ-দেশ থাকবে [illegible] পায়ের তলার এই মরমী মাটি, শয্যার উষ্ণ[illegible] এই স্বাদ, প্রাণ, মোহ, পরিজন, কত [illegible] কত ক্ষত। এ সব ছেড়ে যেতে একটু লাগ[illegible] বইকি, বিদেশ ছেড়ে আসতেও যেমন লাগে। তবু ফিরতে হবে, ফিরতে চাই, যদিও [illegible] জানিনে সেই অস্তিত্ব কেমন, তা জানি[illegible] অন্তত মনে নেই। সেখানে সবই [illegible] বায়বীয়, অথবা বায়ুর চেয়েও [illegible] নীরূপ যা ভাসমান। মোহানার নদী [illegible] প্রার্থিত [illegible] সমুদ্রেও, [illegible] সূক্ষ্মাকারে আকাশে ফেরে।

স্বদেশে ফেরার আগে [illegible] দুঃখ-আঘাত-অভিমানের খোপে খোপে সে [illegible] করে চিঠি লিখে রেখে যাবে ভাবল। [illegible] সব অর্পিত [illegible] পূর্ণাহুতি। [illegible] মানুষের [illegible] সই যেমন তার উইল।

মনে মনে ডাকল সে অনেককে একে একে, যারা জীবিত; যাদের জীবদ্দশায় [illegible] বলে ফেলা অসম্ভব বলে সে [illegible] জানত। ডাকল তাদেরও, যারা মৃত। মৃতদের কাছেও নতজানু হয়ে স্বীকা[illegible] [illegible] করলে তবে সে মুক্ত। তাই ক[illegible] [illegible] টেনে, মাথায় অস্থির সে [illegible] [illegible] শিরোনামায় লিখল, "শ্রীচর[illegible] মা।"

[গ]

শ্রীচরণেষু মা, সম্বোধনের এই লিখেই তোমার যে ছবিটা ফুটে উঠছে [illegible] উড়ানো, প্রায়-জীর্ণ একটি ফটো, মাঝে মাঝে যাতে স্মরণদিনে একটা মালা ঝুলিয়ে দিই। কত বয়সে [illegible] মনে আনতে পারছি না, যদি[illegible] [illegible] তোলা হয়েছিল নিশ্চয়, [illegible] সেই ফটোওয়ালারা তেপায়ার উপরে [illegible] [illegible] কালো কাপড়ে মাথা [illegible] যে রকম ছবি [illegible] তুলত। তোমা[illegible] ছবিটি, ধরো তোমার বিয়ের সময় তারও আগে, খর-খর একটি [illegible] [illegible]কুমারী, নকল, চাঁদ-আঁকা পট [illegible] রেখে গালে হাত দিয়ে উদাস, [illegible]কে যেসব ছবি ডাকে পাঠা[illegible] কিংবা যারা দেখতে আসত, [illegible] হত তাদের হাতে। যারা পছন্দ[illegible] আসত, তাদের শোনাতে তুমি [illegible] গাইতে, বলো না মা, বলো না [illegible] ওসব রেওয়াজ হয়েছিল আর এক[illegible] তোমাদের কালে শুধু মুখে [illegible] স্নানের ঘাটে কোনো গৃহিণীর হঠা[illegible] পড়ে যাওয়া, তারপর কুণ্ঠিঠকুঞ্জি

মেয়ে পর্যন্ত কিনা, ক'টা পদ জানে রাঁধতে, পারবে ক'জনের হাঁড়ি ঠেলতে। যারা দেখতে আসত তারা বাটা-ভরা পান গাল ভরে যেত, আর বড় চুল খুলিয়ে, পা-পা হাঁটিয়ে, দেখত চলন, কখনও শাড়ি তুলিয়ে পায়ের গোছ গড়নও দেখত। খুশী হলে বলত, "যেন লক্ষ্মীর ছাপ।"

যে ছবিটা এখন দেখছি, সেটা ঝোলানো আছে এই বাড়িরই কোনও ঘরের দেয়ালে। ওটা বোধ হয় একটা গ্রুপ থেকে আলাদা করে নেওয়া, তোমার মৃত্যুর পরে, যখন মাথা খুঁড়ে মরছি ছবি কই, ছবি কই, যেভাবে হোক আবিষ্কার করা চাই, নইলে ছাই বাঁধিয়ে রাখব কী, ঘটা করে স্থাপিত করব কোন্ প্রতিকৃতি শ্রাদ্ধবাসরে?

এই গ্রুপের কুণ্ঠিত, একান্ত ছবিটা তোমার জবুথবু অশক্ত বয়সের, মুখটা যখন মাকড়সার জাল, মায়াবী ভিরু ভিরু চোখ দুটি চশমার পরে, কাচে ঝাপসা। বেশি নড়া-চড়া করতে পারতে না, এক ঠায় বসে তোমার চোখ দুটি দুপরে গড়িয়ে বিকালের সূর্যের মতন ঘুরে ঘুরে যেত। ফটোটা তোলার আগে তোমাকে ধরে ধরে চেয়ারে বসানো হয়েছিল, তোমার ঠোঁটে তখন কয়েৎবেল-মাখা আচার লেগেছিল। আঁচলের কোণে মুখটা মুছেছিলে। তবু কিন্তু হাসি ছিল না, মা, তখন তুমি হাসতে না, তোমার হাসি ঢের আগেই ফুরিয়ে গিয়েছিল। এই ছবিটা দেখতে দেখতে আরও যত ক'টা ছবি ভেসে উঠছে, সবই ওই এক-ধারা বিষণ্ণ, গম্ভীর, ভিতু-ভিতু। হয়ত অনেক ঘা খেয়েছিলে বলে একটা ভরই হয়ে গিয়েছিল তোমার মুখমণ্ডলের প্রসাধন, চর্চিত মুখে যেমন স্নো-ক্রীম, তোমার মুখেও তেমনই একটা আতঙ্ক লেপা থাকত। একটা ভরসার নিশ্চিন্ত খুঁটি তোমার আগেই নড়ে গিয়েছিল, তোমার প্রথম যখন দাঁত নড়ে তারও অনেক আগে, তোমাকে সজ্ঞানে যবে থেকে জেনেছি, তবে থেকেই তুমি একটি কাঁপা-কাঁপা স্নায়ুর পুঁটুলি।

তোমার যৌবনকাল আমি দেখিনি। মানে স্মরণে আনতে পারছি না, স্মরণে রাখিনি। অর্থাৎ পাতা কেটে তুমি চুল বাঁধতে যখন, তুমিও বাঁধতে, নইলে বাবা যেদিন-যেদিন হঠাৎ-হঠাৎ আসত, সেদিন খাটে পা দুলিয়ে মুখ তুলতে কী করে, কিংবা যে বয়সে তুমি ঝুপঝাপ ডুব দিতে পুকুরে, কলসী বুকে দিতে সাঁতার, পাড়ে ভিজে পায়ের ছোপ এঁকে শপশপে কাপড়ে ঘরে ফিরতে। তুমিও কি ছিলে কোনও প্রভাপের শৈবালিনী? ক্ষমা করো, এসব আমার বলার কথা নয়, বলা উচিত কিনা ঠিক করতে পারিনি।

(আমার জন্মকালে যে মেয়েরা যুবতী ছিল, তাদের আর দেখা যায় না। তারা নেই। আর তখন যারা জন্মাল? হাহাকারের মত টের পাচ্ছি, তাদেরও কেউ আর যুবতী নেই, কেউ বিগত, কেউ জরতী। আজ তাদের বয়স দিয়ে আমার বয়সটাকে মাপি, কুন্‌কো দিয়ে চাল মাপার মত।)

কী জানি কখনও ভাবি, সেই বুড়িতে-বুড়ির কালটাও এক হিসাবে ছিল ভাল। জুড়োতে যখন হবেই, তখন তাড়াতাড়ি জুড়িয়ে যাওয়া, সেই বা মন্দ কী। মুখের শিরাগুলি তো কষ্টের রক্তেও ফুটেন্ত। দীর্ঘকাল যৌবনকে ধরে রেখেছি বলে যারা দাপাদাপি করি, তারা বুঝি না যে আসল সময় থেকেই না-হক খানিকটা সময় খোয়া যাচ্ছে, বেশিক্ষণ ধরে হুবুডুবু খায় যে, তার জিৎ, না তাড়াতাড়ি পাড়ে যে পৌঁছে গেল, জিৎ তার? ভালমন্দ যা কিছু আছে যত শীগগির সম্ভব চুকে যাক, ক্ষণায়ু প্রাণীদের জগতে যা দেখি—জনন, প্রজনন সব লহমায় পার। তারা কি ঠকে? আমাদের সীমিত বিচারে তাই বটে। কিন্তু তুচ্ছ আপেক্ষিক অর্থে। মহাকালের পরমায়ু কোনও মানুষও তো পায় না!

মা, তোমার সেই পাড়ে-বসা রূপেই বেশি দেখেছি। একের পর এক থেকে, ক্রমাগত না-পাওয়ায় না-পাওয়ায় নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই পাড়ে পৌঁছে গিয়েছিলে।

তোমাকে আকুলিত হতে কখনও কি দেখেছি, কোনও হাসিতে কি ঠাট্টায়, জাঁতি হাতে সুপারি কুচোতে কুচোতে পড়োশিনী-দের গায়ে গড়িয়ে পড়ায়? মনে পড়ছে না। গানের কথা তো ওঠে না, তখন গৃহস্থ বাড়ির মেয়েরা গান কমই গাইত, বেশির ভাগ জানতই না।

তবে তারা শুনত। চিকের আড়ালে ধোঁয়া ধোঁয়া মুখ, মাথায় ঘোমটা, সারা গায়ে আলোয়ান জড়ানো, দল বেঁধে পালাগান কি কীর্তন শুনতে যেত, বাচ্চাদেরও নিয়ে যেত কোলে বা কাঁকালে। তুমি চলেছ, আশেপাশে ফিসফিস, চাপা হাসি, ঠিক তখনই হয়ত আসরে দুই সৈনিক তরোয়াল খুলেছে, আমি সেই ঝনৎকারে উত্তেজিত তোমাকে ঠেলছি, 'ওমা দ্যাখো, দ্যাখো না!' জয়দেব, হরিশ্চন্দ্র—কেঁদে তোমার চাদর ভাসিয়েছি, কখনও তুমি যখন মুগ্ধ, মগ্ন, ঠেলে ঠেলে তোমাকে বিরক্ত করেছি, বায়না তুলেছি "বাইরে যাব, বাইরে যাব বলে।" সরিয়ে দিয়ে তুমি বলেছ "যা না, ওই তো মাঠে।" আমি যেতাম না। ওই বয়স থেকেই আমি একটু ভিতু।

ওই ভয়-ভয় ভাবটা আমি কি তোমার কাছ থেকেই পাই? রাত্রে পেঁচার ডাক

শয়নে চমকানো, স্বপ্নে আঁতকে ওঠা, সন্ধ্যায় গা-ছমছম, দেয়ালের দাগে নানা না-জানা মানুষের ছাপ খ'ুজে পাওয়া, বট-গাছের গোড়ায় তেলে-সিন্দুরে মাথামাখি রঙটা তো ভয়াবহ রকম, সর্বত্র অশরীরী কিছুর অস্তিত্ব কল্পনা, কারা যেন কাঁচা মাছের আঁশ চিবোয়, দুপুরের কুকুরের ক'কিয়ে কান্না—সব সেই থেকে আমার স্নায়ুতে জড়ো করে করে জমিয়েছি। আজও এই বেমানান বয়সেও পুষে রেখেছি। ওরা যাচ্ছে না, কিংবা ওদের যেতে দিচ্ছি না, কারণ গেলে তো বেবাক সাদামাটা হয়ে গেল, যা-দেখতে পাই ভয় ব্যতিরেকে তার বাইরের কিছুর অনুভব আমি কী করে পাব।

আমাদের সেই আধা-শহরের বাড়িটার চারপাশে মৃত্যু যেন সততই হালকা পায়ে ঘুরে বেড়াত। টিনের চালটা মাঝরাতে কেন যে থেকে থেকে কটকট ডেকে উঠত, পেয়ারা গাছে ঝোলা বাদুড়গুলো কাকে যে দেখতে পেয়ে দুদ্দাড় উড়ত, আমি কিছুই বুঝতাম না, খালি কাঁথার নিচে আরও গুটিগুটি তোমার গায়ের গন্ধ নিতাম।

[ঘ]

জীবনে প্রথম কবে সজ্ঞানে কাঁদি মনে নেই, কবে কী দেখে প্রথম হেসে উঠি ভুলে গিয়েছি তাও, কিন্তু প্রথম দেখা মৃত্যুটি মনে আছে—আমার দাদার। এক অর্থে তোমারও বোধ হয় মৃত্যু সেই দিনে, হঠাৎ চিৎকার করে উঠেই পাথর হয়ে গেলে, তার আগের আর পরের তুমি একেবারে আলাদা, কে বা কারা যেন তোমাকে ধরে রইল, ধীরে ধীরে উঠিয়েও নিতে চাইল, তুমি উঠছিলে না, জাপটে রইলে দাদার দেহটা, তোমার প্রথম সন্তানের, ওরা জোর করতেই ঠাস করে পড়ে গেলে মাটির উপরে। হয়ত তখন তোমার সম্বিত ছিল না। দৃশ্যটা জমজমাট ছিল, মৃত্যুর দৃশ্যে পরে দেখেছি সিনেমায় যেমন নেবে, প্রতীকী ধরনে, কই, তেমন করে তো নিবল না!

তখন আমার বয়স কত আর, নয় কি দশ, একটু একটু মনে পড়ছে, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ার মত। মৃত্যুকে সেই থেকে আমার ভয়, আবার মৃত্যু আমাকে টানত। আজ স্বীকার করি, কেউ কোথাও মরছে শুনলেই পরে সেখানে যেতাম ছুটে, ভিড়ের সঙ্গে মিশে উঠোনে নাওয়া নেই

খাওয়া নেই দাঁড়িয়ে থাকতাম, ড্যাবডেবে চোখে দেখতাম ডাক্তার গলায় নল জড়িয়ে বেরিয়ে আসছে, ওষুধ আনতে ছুটছে কেউ, কিংবা কমপাউণ্ডারের হাতে ছুঁচে-ভরা ইনজেকশন, আমার চোখের পাতা কাঁপছে অধীর অপেক্ষায়, কখন চাপা ফোঁপানিগুলো হা-হা কান্নায় ফেটে পড়ে, শুনতে পাব! যদি রোগী না মরত, যদি অন্তত মৃত্যুটা পিছিয়ে যেত, বোঝাতে পারব না কী যে হতাশা, কী যে অবসাদ আমাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যেত! যেন কেউ কথা দিয়ে কথা রাখল না, চোখে-কানে শোককে চাখার নোনতা স্বাদ পেতে দিল না, সেই নীচ, নিষ্ঠুর, অদ্ভুত মনোভাবটা কথায় বোঝানো যাবে না। আর কারও ভিতরে ভিতরে এই জিনিসটি আছে কিনা জানি না, আজ সসঙ্কোচে লিখে দিচ্ছি আমার আছে।

দাদার মৃত্যুর পরদিন সকালের সেই ছবিটা। সুধীর মামার চেহারাটা মনে পড়ছে শবের শিয়রে দাঁড়িয়েছিলেন, হয়ত সারারাতই ছিলেন, তোমার মাথায় হাত রেখেছিলেন, আর তখনই কী বিশ্রী চিৎকার করে উঠলে তুমি মা! পাগলের মত মাথা নেড়ে নেড়ে বলে উঠলে "না—না—না!" সকলে মিলে যা পারেনি, সুধীর মামার একটুখানি ছোঁয়াতেই তাই হল, চুলখোলা, আলুথালু তুমি ছিটকে সরে গেলে, [illegible] মাথা ঠুকছিলে।

সুধীর মামা গেলেন পেছনেও। এবার জোর মুঠিতে ধরলেন তোমার শাঁখা সমেত হাতের কব্জি, 'ছি, আর, ওরকম করে না, শান্ত হও', পট করে শাঁখাটা ভেঙে গেল, ফুটল তোমার সাদা চামড়ায়, অল্প একটু রক্ত দেখা দিল। রক্ত দেখে একটু থমকে তুমি ডুকরে উঠলে ভাঙা গলায়, "বলে দাও সুধীদা, কী রইল আমার, আমি কী নিয়ে থাকব!"

দৃশ্যের ফ্যালফ্যালে দর্শক আমি একটু দূরে অবোধ দাঁড়িয়েছিলাম, যেন সেদিন সকালে আমার এই পড়া, কিন্তু এক ফোঁটা মানে বুঝছি না। মৃত্যুতে কী যায়, কার যায়, কিছুই তখন বুঝতাম না তো!

সেই দর্শক অকস্মাৎ দৃশ্যেই উৎক্ষিপ্ত হল কখন আমাকে টেনে নিয়ে গেছেন সুধীর মামা, বসিয়ে দিয়েছেন তোমার কোলে বলেছেন "ওর দিকে তাকাও, একদিন ওই তোমার সব হবে।"

কী ঠাণ্ডা হাতে আমাকে তখন তুমি চেপে ধরেছিলে মা, আমার শরীর সিরসির করছিল। তোমার চাহনি বিহ্বল, দেখছ আমাকে, অথবা দেখছ না কিছুই, কিংবা সেই মরা দৃষ্টি কি তখন ঘরে ঘরে একটি মরা মুখের সঙ্গে আমার মুখটা মিলিয়ে দেখছিল?

নীচু গলায় হরিধ্বনি দিতে দিতে ওরা যখন দাদাকে তুলল, তখন আমাকে কোলে জাপটেই পিছু পিছু ছুটে গেলে তুমি, সকলে মিলে ঠেকাতে আমাকে কোলে নিয়েই ফিরে এলে

ওরা ফিরে এল দুপুরের পরে। শূন্যতা হাতে নিয়ে কেউ যে ফেরে, ফেরা যায়, সেটা তখন বুঝতাম না, বুঝেছিলাম অনেক বিজয়ার বিসর্জনের সন্ধ্যায়, আরও বড় হয়ে, কিন্তু সেদিন ওরা ফিরল, কিন্তু দাদাকে ফিরিয়ে আনল না, দাদা আর নেই, ফিরবে না সেটা তখনই যেন প্রথম নির্ভুল জেনে আমিও হঠাৎ গলা ফাটিয়ে কেঁদে উঠলাম, যে দাদা অঙ্ক ভুল হলে মারত, যে এদিক ওদিক বেরিয়ে গেলে বাঁচা যেত, বাজার থেকে কখনও আমার জন্যে যে সন্দেশও আনত, সে আর ফিরবে না বুঝে সব মিলিয়ে তার জন্যে কাঁদলাম।

মা, তখন তোমাকে আর ধরে রাখা যাচ্ছিল না, মাথা নাড়ছিলে বেভুলের মত, আঁচলের দিশা নেই, হঠাৎ কী-হল, সুধীর মামার কাঁধ খামচে ধরে, এবার তুমি নিজেই ধরলে, কেবলই বলছ, "কোন্ পাপে আমার

এমন হল, বলে দাও তুমি সুধীরদা, বলে দা—ও!"

আমি আজও সেই দৃশ্যটা দেখছি। তোমার রুক্ষ চুলে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন সুধীর মামা, খুব নম্র, খুব ধীর স্বরে বলছেন, "পাপ? সে কথা তো আর জানা থাকে শুধু একজনের—যিনি ওপরে। মানুষ তো পাপ-পুণ্যের হিসাব রাখে না!"

সুধীর মামা। অনেকদিন নামটা মনে ছিল না, আজ তোমাকে এই চিঠিটা লিখতে বসে অবশ্যম্ভাবী ফিরে এল। পুরনো একটা পানা পুকুরে নাড়াচাড়া দিচ্ছি কিনা তাই একের পর এক মরা মাছ ভেসে উঠছে।

সুধীর মামা কে, কোন্ সম্পর্কে মামা জানতাম না, তুমিও কোনদিন বলে দাওনি। তখনকার কালে এসব দরকারও হত না। কাছে যে আসত, হাত বাড়িয়ে তাকেই নিতাম, মন এইভাবেই তৈরি থাকত কিংবা তৈরি করা হত। যেন স্বতঃসিদ্ধ কয়েকটি মানুষ, বিনা প্রশ্নে জল, হাওয়া, সকালের ফেনাভাত বিকালের মুড়ি-পাটালির মত স্বীকৃত, গৃহীত। গুরুজন, ওদের মান্য করতে হয়, এইসব শিক্ষা মজ্জায় মজ্জায় মিশে যেত।

চট করে কেউ কাউকে প্রণাম করছে আজকাল আর বড় একটা দেখিনে। ওপাঠ টা বোধ হয় উঠতে বসেছে।

সুধীর মামা, জীবনের সেই সকালে যেন একটি নিয়ম, একটি অভ্যস্ততা, একটি পৌনঃপুনিকতা। আজ ছবিটা অস্পষ্ট, তাই ঠিকঠিক বর্ণনা হয়ত করতে পারব না, শুধু প্রস্থহীন একটা দৈর্ঘ্যের কথাই মনে পড়ছে। ওঁর পাশে সব কিছু কত ছোট, আমি তো সেই বয়সে কখনও ওঁর কোমর ছাড়িয়ে উঠতে পারিনি। মা, মনে হয় না যে, তুমিও ওঁর বুক ছাড়াতে পেরেছ। উনি ফরসা ছিলেন কিনা মনে নেই, পল্লীগ্রামে সে সময়ে ঠিকঠিক যাকে ফরসা বলে সেরকম লোক বেশি দেখা যেত না তো, পুকুরের জলে, মাঠের রোদে অন্তত পুরুষদের চেহারা কেমন একটা পোড়া-পোড়া হয়ে যেত। সুধীর মামাও, অনুমান করি, ছিলেন তামাটে।

ওঁর আর যেসব অনুষঙ্গ মনে পড়ছে, তার মধ্যে একটা ছিল কমফরটার, উনি সর্বদাই গলায় জড়িয়ে রাখতেন। (মা, তুমি ঠাট্টা করে বলতে, 'মহাদেবের সাপ!' হাসতে হাসতে জবাব দিতেন সুধীর মামা —'মহাদেবই তো, দেখছ না নীলকণ্ঠ হয়ে আছি।' তুমি ভ্রুকুঞ্চিত করতে। কিন্তু সুধীর মামা যেই কণ্ঠনালীর কাছে ফুলে-ওঠা নীল শিরাটা দেখিয়ে দিতেন, তুমিও হেসে ফেলতে তখন—'উঃ, এই মানে!')

ওই কমফরটার, প্রায় সুধীর মামার গায়ের চামড়ার মত, নিতান্ত গরমের ভর-দুপুর ছাড়া ওঁকে কমফরটার-ছাড়া দেখিনি। থেকে থেকেই খকখক কাশতেন, ওঁর কাশির ধাত, কখনও কখনও দেখেছি দমক পারছেন না সামলাতে, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, গলার সেই নীল শিরাটা বুঝি পাইপের মত ফেটে যাবে। হাত বাড়িয়ে এক গ্লাস জল নিতেন সুধীর মামা, সুস্থির হয়ে হাত বোলাতেন জিরজিরে বুকে, কেমন লাজুক হেসে বলতেন, বুকেই আঙুল ঠেকিয়ে, 'বিলকুল জখম, ভিতরে কিছু আর নেই, ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।'

মা, তুমি বলতে 'মাথায় তো আছে। যা আছে তারই খানিক আমার এই ছেলে দুটোকে দাও না।' সুধীর মামার চোখ দুটো প্রদীপ্ত হত—'দেব, দেব। ওরা বিদ্যায় বুদ্ধিতে মানুষের মত মানুষ হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবে, দ্যাখোই না।'

শীতে দেখতাম সুধীর মামা আরও নুয়ে-পড়া, গলাবন্ধ পাটোকলে কোটের উপর জড়াতেন একটা বেখাপ্পা কমলা রঙের দোলাই, আরও শীর্ণ, জবুথবু, নিষ্প্রাণ ঠেকত। তখন আরও বিশেষ করে চোখে পড়ত ওঁর হাতের লাঠি। লাঠি ছাড়া ওঁকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। ঠিক ভর দিয়ে চলতেন না, তখনও না, লাঠিটা কেমন একটু আগে ফেলে ফেলে এগোতেন, যার ফলে টকাটক আওয়াজ উঠত, বেশ খানিকটা দূর থেকেই বোঝা যেত উনি আসছেন, মনে হত যেন লাঠি ঠুকে ঠুকে সুধীর মামা পরীক্ষা করছেন মাটিটা কত খাঁটি।

আর মনে পড়ছে সুধীর মামার নাকের লম্বা দুটি চুল, শুঁয়োপোকার মত লাগত, অনেকটা বেরিয়ে এসে গোঁফের চুলগুলোর দলে মিশে যেত। (স্মৃতির ব্যাভার কী আশ্চর্য দেখছ? এত কিছু ভুলে গুলে খেয়ে নাকের দুটি চুল অ্যাদ্দিন বাদে কোথা থেকে তুলে এনেছে!)

চেয়ারে ঢুলতে ঢুলতে যখন নাক ডাকাত সুধীরমামার, ওই চুল দুটি তখন কাঁপত। আমার তলপেটে তখন হাসির সুড়সুড়ি লাগত। তোমাকে ডেকে দেখিয়েছি কতদিন! চেয়ারে বসে ঘুম তো, একটু সাড়া শব্দেই ছুটে যেত। সিধে হয়ে বসতেন সুধীর মামা, পিটপিট চেয়ে বলতেন, 'কী রে, কী দেখছিস?" নজরটার নিশানা দেরি হত না ধরে ফেলতে। চুল দুটো সোজা টানটান করে ধরে বলতেন 'ওঃ, এই! শুধু কি এই দুটি? ভাল করে চেয়ে দ্যাখ, আরো অনেক আছে, একটা ঘন অরণ্য। এই নাক কোথায় গেছে কেউ জানে না। কেউ জানে না। কেউ ঢুকে ফিরে এসে বলেনি, দিশাহারা নিবিড় বন, শ্বাপদসঙ্কুল, তীর ধনুক হাতে আদিম প্রাণী কিংবা— মুচকি হেসে সুধীর মামা জুড়ে দিতেন, বলা তো যায় না, হয়ত তপস্যারত মুনি ঋষিদেরও সাক্ষাৎ পেয়ে যাবি!'

(ক্রমশ)

পরিস্থিতি / যশোদাজীবন ভট্টাচার্য

দরজায় টোকা পড়ল আবার।

আদিত্য উঠে দাঁড়াল। বিদ্যুৎ বলল, 'তুমি বোসো।'

বিদ্যুতের গলা কাঁপছে। কপাল, চিবুক, নাকের ডগা চক-চক করছে। ঘষা-মাজা, ঘামতেল-মাখা মাটির মূর্তির গায়ে বিকেলের আলো পড়লে যেমন দেখায় ঠিক তেমনি। চারদিকে একটা যাই-যাই বিদায়-বিদায় ভাব। ভয়ে-ভাবনায় চোখের তারা নিথর। লুকিয়ে থাকা খুনের আসামী যেন। বাইরে সশস্ত্র পুলিস! দরজা খুলে দিলেই যেন বাঁধ-ভাঙা বেনো জলের মত হুড়-হুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়বে, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সব। তখন আর কথা বলার, বাধা দেবার সাধ্য থাকবে না, অবকাশ পাবে না। হাতে হাত-কড়া পরিয়ে টানতে-টানতে নিয়ে যাবে থানায়। কোনো ওজর-আপত্তি টিকবে না। তাকে বাঁচাবার জন্যে এখানে কেউ নেই।

কোথায়ই বা ছিল? থানা-পুলিসের নাম হলেই বাহাত্তর সালের চট্টগ্রাম বুঝি জীবন্ত হয়ে ওঠে। কানের কাছে ছল-ছলিয়ে ওঠে কর্ণফুলি। তার স্রোত, তার ঢেউ, তার আবর্ত। সে একটা দিন গেছে। গুলি লেগে বুকে-পিঠে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেছে খালেদের। যেন হয়নি কিছুই। দিব্যি জুল-জুল করে তাকাচ্ছে ব্যাটা। পালাবার পথ খুঁজে পায়নি আদিত্য। বন্ধুকে ফেলে কোথায়ই বা যায়! এক হাড়, এক প্রাণ দু'জন। হ্যাঁ, মরি তো এক সঙ্গেই মরবো। যা থাকে কপালে! আজ যেমন বিদ্যুৎ, তেমনি আদিত্য বলেছিল সেদিন, 'তুই শুয়ে থাক। আমিই যাচ্ছি।'

সে একটা দারুণ মুহূর্ত। কী হয় কী হয় ভাব! ঘরে-বাইরে শুধু আতঙ্ক আর আতঙ্ক।

ওদিকে সালাম আর বরকতের নামে গান বাঁধছে কবিরা। ঘরে-ঘরে মা-বোনের চোখে জল। কাগজে-কাগজে তাদের

দিগ্বিজয়ের কাহিনী মানেই খবর। ঢাকা চট্টগ্রাম-খুলনা-বরিশাল—দাউ-দাউ করছে চারদিক। দাবানল! বুকের মধ্যে ঘৃণা! মনে-মনে জ্বলছে আদিত্য, খালেদ, জুলেখা, বিদ্যুৎ—ওরা সবাই। আর কি জেহাদ! আমাদের মুখের ভাষা, বুকের রুধির! কে নেবে, কে?

আর আজ?

ঘটনা ভিন্ন। স্থান-কাল-পাত্রের বিভেদ দুস্তর। তবু এদিন আর সেদিনের মধ্যে একটা গোপন মিল খুঁজে পেতে চাইছে আদিত্য। সেই মন, সেই মানুষ সেই দাবী। বাঁচার জন্যে প্রাণপণ লড়াই। সময়ের তুচ্ছ হেরফের শুধু। অভিজ্ঞতার দাম দেবে কে? এত সহজেই কি মুছে ফেলা যায় সব। বরং সময় বুঝে বিদ্যুৎ এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। মনে পড়িয়ে দিতে চাইছে সব। তফাৎ যা রয়েছে সেটা ওপর-ওপর।

তাই বা কেন? এই তো বিদ্যুৎ! আজকেই কি আসার কথা ছিল ওর? দু'দিন আগে কিংবা পরে এলেও ক্ষতি ছিল না। অথবা না এলেও আফসোস ছিল না আদিত্যর। বরং সেটাই হত স্বাভাবিক। কারণ এখন আর সে অত সহজে দুঃখ পায় না, কাবু হয় না। চট করে নিজেকে ভেঙে, মুচড়ে, দুমড়ে ফেলতেও পারে না আগের মত। তার অজান্তেই কর্ণফুলি আর গঙ্গার জল অনেক দূর অবধি গড়িয়ে গেছে। যার ঠিকানা কেউ জানে না। কথা সে নিজেই রাখে না এখন। রাখতে চায় না। আদপে কথাই সে দেয় না কাউকে। দিয়ে লাভ? দুঃখ তাড়িয়েও সুখ আছে নাকি আবার? জেল যদি ফুরিয়েই আসে তখন সলতেটা উসকে দিলে লাভ? তৃপ্তি? কোথায়? কিসের? আলোর? উত্তাপের? পাগল, পাগল! তার চেয়ে নিভতে দাও। জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাক সব। আফসোসের বদলে বরং সান্ত্বনা খুঁজে পাবে তখন। তুমি ছিলে, একদিন বেঁচেছিলে তুমি। তোমার নাম আদিত্য—যার তেজ, যার ঔজ্জ্বল্য অফুরন্ত না হলেও ষোল আনাই ছিল খাঁটি। এই ভস্মশেষ পরিণতি তার প্রমাণ। চিরদিন কেই বা বাঁচে? তোমার বাবা দাঙ্গায় মারা গেছেন। বোন অপর্ণার অমন সুন্দর শরীর শেয়াল আর কুকুরের আহার হল শুধু। করণীয় কিছুই ছিল না তোমার। কারণ তুমি তখন একা, ভয়ঙ্করভাবে একা। একা আর নিরস্ত্র। নিরস্ত্র আর অসহায়। সারাক্ষণ পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছিল তোমাকে। আর মা, তোমার মা? পাগল হয়ে সেই যে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে আর ফিরে এলেন না! তুমি তখন জেলে। এবং সরকারের হাতে প্রমাণ রয়ে গেছে, পাকিস্তানে তোমার অস্তিত্ব কী ভয়ংকর! কিন্তু খালেদ, জুলেখা, বিদ্যুৎ, আদিত্য তুমি নিজে—তোমাদের স্বপ্ন, আশা, সংগ্রাম—দেশ, কাল, শতাব্দী—সব, সব, সমস্ত কিছু মিলিয়ে মানুষ, আহা মানুষ!—'আ-হ্!'

চাপা গলায় প্রায় আর্তনাদ করে উঠল আদিত্য। ভেতরে-ভেতরে শুরু হয়ে যায় এক অসহ্য দাপাদাপি। গাল, কপাল, চিবুক পলকে রাঙা হয়ে উঠল। চোখের পাতা ভারি আর ফোলা-ফোলা। অনেকক্ষণ অবধি কাঁদলে যেমন হয় আর কি। গলার পাশে ঠিক কণ্ঠনালীর গা-ঘেঁষা দড়ির মত শিরা দুটো মোটা আর নীল হতে-হতে বুঝি ছিঁড়ে পড়বে এইবার। আবেগে, আশঙ্কায় ঠোঁট কাঁপছিল আদিত্যর।

'ব্রুট'! দাঁতে দাঁতে ঘষল আদিত্য। পা-পা করে গোঁয়ারের মত এগিয়ে গেল।

বাধা দিল না বিদ্যুৎ। জানে, বাধা দেওয়া বৃথা। মন, মেজাজ, মর্জি—চিনতে তো বাকি নেই আর। ক'বছরের অদর্শনেই কেবল আমূল পাল্টে যাবে তেমন বিশ্বাস তার নেই। পায়ে-পায়ে সঙ্গ নিল বরং। আলতো হাত রাখল কাঁধে। গম্ভীর, গাঢ় স্বরে ধমকে উঠল যেন।

'আদু!'

চমকে উঠল আদিত্য। আমূল কেঁপে উঠল যেন। এই সেই ডাক! নিজের কানেই অচেনা ঠেকে এখন। কিন্তু মনটা দমে যায়। চোখের সামনে দেয়াল-দরজা-খিল ঝাপসা হয়ে আসে পলকে। মা ছাড়া সংসারে আরেকজন এমন করে ডাকতো। তার নাম জুলেখা। আদিত্য বিদ্যুতের চোখে চোখ ডুবিয়ে কিছু দেখতে চাইল। কিছু বলার বাসনা নিয়ে দেহ-মন-মস্তিষ্কের সমস্ত স্নায়ু টান-টান করে উদগ্র, উন্মুখ হয়ে উঠল।

বুকের ভেতরে অস্পষ্ট কাঁপুনি অনুভব করল বিদ্যুৎ। এই আদিত্যকে সে চেনে না। অন্তত এই মুহূর্তে তাকে অপরিচয়ের ব্যবধানে দুস্তর, দুরধিগম্য মনে হচ্ছে তার।

'মনটা ভাল নেই।'

'এমন সময়ে থাকবার কথা-ও নয়।'

'অথচ আমি জানি যা হবার তা হবেই।'

'তবু ভয়!'

'আসলে বয়স, বয়স আমাদের ক্রমশ একা, অসহায়, পঙ্গু করে.....'

'আমি ওসব মানিনে।'

'আমিও।' আদিত্য থমকে গেল। সর্বাঙ্গ ক্লান্ত, শিথিল মনে হল তার। যেন বহু দূর থেকে কাঁপা আর ভারি আর বিষণ্ণ গলায় এতকাল অত্যন্ত গোপনে লুকিয়ে রাখা নিজের দুর্বলতার কথাটাই অকপটে বলে ফেলে। 'তবু মনটা কেন যে দমে যায়! কেন যে হাতের মুঠোয় নিজেকে রাখতে পারিনে সব সময়! ভাবলে ঘেন্না হয়, নিজের ওপরেই রাগ হয় আমার।

'তবু মানুষ, আমায় মানুষ আদু!' যেন বিদ্যুৎ নয়, আদিত্যর বুকের গভীরে থেকে কথা বলছে দূরাগত কোনো ভবিষ্যৎ। কিন্তু চোখে সে তার অতীতকেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে এখন। কান পাতলেই যেন শুনতে পাবে ফের, 'আমরা বেঁচে আছি। তুমি, আমি, জুলেখা, খালেদ—আমরা এখনো টিকে আছি। এই সত্তরের পৃথিবীতে যথেচ্ছ বিচরণের সুখ আমাদের রক্ত-মেদ-মাংসের ভেতরে হয়তো তেমনি অটুট। কিন্তু অশান্ত, অস্থির, বিভ্রান্ত বাসনা সকল আমাদের ক্লান্ত, বিবর্ণ, বিষণ্ণ করে শুধু। আদু, সংসারে বেঁচে আছি তাই সংসারের জন্য কিছু করণীয় রয়ে গেছে আমাদের। কারণ আমরাই আমাদের শেষ নই। কারণ আমাদের পরেও রয়ে গেছি আমরাই। ভিয়েৎনাম, কঙ্গো, লিউবা, পাকিস্তান, চীন, রোডেশিয়া—সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আমরাই নৌ-চালকের মত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছি। এই আকাশ, অফুরন্ত হাওয়া, পাতা থেকে পাতায় চুঁইয়ে-পড়া বেলবরণ রোদ, ...'

বিদ্যুৎ ঘনিষ্ঠ হল আরো। প্রায় বুকের কাছে টেনে নিল আদিত্যকে। এক সময় ওরা ঠিক এমনি করেই বেদনার নৈঃশব্দ্যের পরিমাপ করতো। কথাটা এই মুহূর্তে আবার মনে পড়ল আদিত্যর। অনেক কথাই মনে থাকে। স্মৃতিশক্তি বড় প্রখর। অথচ জীবনে কিছুই হল না। কিন্তু সত্যিই কি কিছু হতে চেয়েছিল আদিত্য? কথাটা ভাবতে গিয়ে মুষড়ে পড়ে যেন। বিদ্যুৎ কী করে, এখনো বলেনি। আদিত্য মনে-মনে ঠিক করে ফেলে, সে আর জানতে চাইবে না। কারণ, তা হলে নিজের সম্পর্কে মিথ্যে কথা বানিয়ে বলা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

খুট করে শব্দ হল। খিল খুলে দরজার আধখানা পাট মেলে ধরল বিদ্যুৎ।

'বলুন, কাকে চাই?'

'আদিত্যবাবু আছেন?'

'আছেন, বলুন।'

'আপনি?'

'আমি আদিত্যর বন্ধু।'

'আমি ওঁর প্রতিবেশী। পাশের বাড়িতেই থাকি। আমার নাম.....'

'আচ্ছা!' যেন তারিফ করল বিদ্যুৎ। তারপর বেশ খানিকটা তৎপরতার সঙ্গে বলল, 'আদিত্য ঘুমোচ্ছে।' কথাটা নিজের কানেই বেখাপ্পা ঠেকে। ঘরে বউ থাকলে এমন করে সাফাই গেয়ে লোক ফেরায়। ভেতরে-ভেতরে এক জাতীয় অস্পষ্ট অপমানবোধ তার নিঃশ্বাস ভারি করে তোলে। বিরক্তি এবং উৎকণ্ঠার এক মেশামেশি, ঘেঁষাঘেঁষি সহাবস্থানই তাকে ক্ষিপ্ত অথচ স্তিমিত করে রাখে। খুব নিস্তেজ আর আড়ষ্ট গলায় প্রশ্ন করে বিদ্যুৎ, 'কিছু বলবার আছে?'

'সকাল থেকে পিওন ওঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

'কেন?'

দরজার বাকি আধখানা পাট খুলে দিলে আদিত্য। তাকে ব্যস্ত, ব্যাকুল মনে হল। এখন একটুতেই হাঁপিয়ে ওঠে। লক্ষ করে নিজের ওপরেই ঘৃণা হতে থাকে। বিদ্যুৎ যেন এমন মানুষের দেখা পেতে চায়নি। এই সেই আদু! বাহান্নর চট্টগ্রাম কি ভোলা যায়? কর্ণফুলির পাড়ে সেই সাজানো শহর? গলফ্ খেলার মাঠ, ইউরোপিয়ান ক্লাব, গীর্জা, কালীবাড়ি, কোর্ট, জেলখানা, জালালাবাদ পাহাড়, দোকান, বাড়ি, মানুষ...! অনেক দিনের অনেক কথা ভুলবি কিরে হায়! মাথা ঝিম-ঝিম করে। স্মৃতি বড় নিষ্ঠুর। কেন যে এলুম! জুলেখা কোথায়? খালেদ? দেখলে লজ্জায় মুখ লুকোবে সবাই। ঘৃণায় থুতু ফেলবে। এই মানুষটাকেই বিশ্বাস করেছিল তারা! ভাল-বেসেছিল। আদিত্য, শিল্পী আদিত্যকে! এই ভীরু, অক্ষম, অপদার্থ মানুষটাকে! জীবন-শিল্পী না ছাই! ভাবলে কান্না পায়। কাছে থাকলে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হত জুলেখাকে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে বিদ্যুতের। এই ঘরে হাওয়া নেই। পদ্মা-মেঘনা-কর্ণফুলির হাওয়া! দম বন্ধ হয়ে আসছে। অথচ ছুটে পালাবার সাধ্য নেই। পায়ে বুঝি বেড়ি পরিয়ে দিয়েছে কে! এর নাম মায়া! নাকি পিছুটান? এখন কাদের নিয়ে ছবি আঁকে আদু? নাকি ছেড়ে দিয়েছে সব? বেলা নটা অবধি বিছানা আঁকড়ে পড়ে থাকার এই স্বভাব না জানি কতদিনের চেষ্টায় গড়ে তুলেছে আদু! দরজা-জানলায় খিল তুলে দিব্যি নাক ডাকাচ্ছিল। কেমন নিশ্চিন্ত, নির্ভয়! আর বাইরে, বিপুল বিশ্ব ফেরিঅলার মত হেঁকে চলেছে রোজ। বেলা যায়! তোমার ঘুমের অবসরে হয়তো ভিয়েৎনামের কোনো গ্রাম, সবুজ শস্যের প্রান্তর জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে গেল! তুমি জানলে না! কিছুই করলে না তুমি! দক্ষিণের নিষ্ঠুর মানুষেরাই এই মুহূর্তে একটি সহায়হীন, নির্বোধ কিশোরের প্রাণ-হরণের খেলায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে! অথচ এ ব্যাপারে তোমার-আমার আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু, হয়তো অনেক কিছুই করণীয় ছিল! কারণ এই অন্যায়, অপরাধ, পাপের দায়ভাগ আমাদের সকলের। আমরা প্রতিবাদ করতে পারতুম, বাধা দিতে পারতুম। কিন্তু সাধ্যের কথা ভেবেও আমরা কিছুই করিনি। দরজা-জানলার পাল্লা ভেজিয়ে দিব্যি ঘুম আর জাগরণের ভেতরে নিজেকে স্বেচ্ছায় সমর্পণ করে সুখী, তৃপ্ত হতে চেয়েছি!

'এই যে আদিত্যবাবু!' পাওনাদারের মত প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন ভদ্রলোক। আদিত্য কেন দেখতে পারেন এমন আশা

বুঝি ছিল না। অত্যন্ত গূঢ় আর গোপনীয় অথচ জরুরি খবর দেবার মত গলার স্বর ঘন এবং ভারি করে বললেন, 'আপনার খাওয়া হয়েছে?'

'না!'

'একটা টেলিগ্রাম ছিল হয়!'

আদিত্য ভেবে পায় না, তার খাওয়ার সঙ্গে টেলিগ্রাফের যোগাযোগটা কোথায় আর কতটুকু! মনে-মনে বিরক্তি বোধ করে, তবু সুরে যথাসম্ভব শান্ত ও সংযতভাব বজায় রেখে বলে, 'কই দেখি।'

'দেবো!' ভদ্রলোক আকাশ থেকে পড়েন। আদিত্যর বেকামি দেখে ভড়কে যান খানিক।

'তাহলে?' আদিত্য বিরত বোধ করে। কিছু বা বিভ্রান্ত, বিচলিত। দ্রুত বলবার তাগিদে একটার গায়ে অন্য কথাটাই জড়িয়ে, জট পাকিয়ে প্রায় হোঁচট খেতে-খেতে তার বুকের গভীর থেকে বেরিয়ে আসে। বলে, 'তাহলে......তা......আমি এখন কোথায় যাই? টেলিগ্রামটা? আমার টেলিগ্রাম?'

'পিওনের কাছে। আমি ফিরিয়ে দিয়েছি।' তারপর আদিত্যর ফ্যাকাশে মুখের দিকে চেয়ে থমকে গেলেন। কী ভেবে তাকে সান্ত্বনা দেবার অছিলায় বলেন, 'পারলুম না। রাখবার সাহস হ'ল না মশাই।'

ভেতরে-ভেতরে উষ্ণ, উত্তপ্ত হতে থাকে আদিত্য। কথায় ঈষৎ ঝাঁঝ মিশিয়ে বলে, 'তাই বলে একটা টেলিগ্রাম......আজ যে রোববার!' সে যেন হতাশ হ'ল আরো। কেমন বিষণ্ণ, চিন্তিত মনে হল তাকে। শোকে-দুঃখে ভয়ংকর অসহায় দেখাচ্ছে। শেষ রাত্রে কোনো দুঃস্বপ্ন দেখেছে কিনা মনে পড়ে না আদিত্যর। আগে এমন ছিল না। স্বপ্ন, তিল, জড়ুল, হাঁচি, টিকটিকি ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামাবার ইচ্ছে কিংবা অবকাশ ছিল না তার। এখন যেন কী হয়েছে! কর-রেখার চর্চায় কত মূল্যবান মুহূর্ত কেটে যায়! তবু অপচয়ের বেদনা আর আগের মত আহত করে না তাকে। এমন কি ছবি আঁকা, এঁকে নাম আর টাকা করার তুচ্ছ ব্যাপারটাকে অবধি সে ছেড়ে দেয় ভাগ্যের হাতে। নিশ্চিন্তে, নির্ভাবনায় হাত-পা গুটিয়ে সুদিনের মুখ দেখার প্রবল আর গোপন বাসনা নিয়ে দিব্যি চুপ-চাপ বসে আছে আদিত্য। বন্ধুদের জানার কথা নয়। ভেতরে-ভেতরে কী নিপুণ ধৈর্য আর নিষ্ঠুর প্রতীক্ষা নিয়ে অহরহ শুধু ভাঙছে, নিজেকে ভেঙেই চলেছে আদিত্য। কদিনেই বুড়িয়ে গেছে কেমন। এখন হাই তুলতে গিয়ে অবধি ঠাকুর-দেবতার নামে দোহাই পাড়ে! হাঁ-করা মুখের সামনে তিনবার তুড়ি দেয়। এবং বিশ্বের যাবতীয় খ্যাতি, গৌরব, বিত্তের স্বাদ পাবার উদগ্র বাসনাই মাঝে-মাঝে তাকে অস্থির, বিষণ্ণ এবং ক্লান্ত করে তোলে।

'আপনি কী করলেন বলুন তো?'

ভদ্রলোক যেন বুঝতে না পেরে চেয়ে রইলেন। চোখে পলক পড়ে না এমনি স্থির, নিশ্চল চাউনি।

'আমি যে বুঝতে পারছিনে কিছুই!'

আদিত্যর গলায় কুয়াশা জড়ানো। আবছা, সুদূর এবং শীতল শব্দগুলিই উচ্চারণের মহিমায় আবহাওয়া গম্ভীর ও ভারি করে তুলছিল ক্রমশ। তাকে আর্ত মনে হচ্ছিল বার-বার। সদ্য মাতৃহীন শিশুর মত অসহায়। কিন্তু অকপট সারল্যের চিহ্নগুলিই মুখ থেকে, চোখ থেকে কালের ব্যবধানে লুপ্ত হতে থাকে। যে কারণে তার কথা, উচ্চারণের প্রতিটি ভঙ্গি, হাত ও চোখের মুদ্রাগুলি আবরণের নিখুঁত উপমা হলেও নিজের কাছেই কেমন ফাঁকা, শূন্য, প্রাণহীন ঠেকে। এবং নিজেকেই নিজের কাছে নির্বাসিত মনে হয়।

'হয়তো আবার আসবে পিওন।'

'যদি না আসে?'

'পাগল! টেলিগ্রাম যে!'

'আজ রোববার, সে খেয়াল আছে?'

'তা হোক।'

ভদ্রলোক নেতিয়ে পড়লেন। কথায়-কথায় বুঝি আর এগুবার সাহস হল না। অপরাধীর মতই মুখ কাঁচু-মাচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। শেষে খানিকটা সাফাইয়ের ভঙ্গিতে কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য আর্দ্র ও নরম করে বলে যান, 'পাশের বাড়ির মাসীমাকেও রাখতে দিইনি। কেন জানেন? টেলিগ্রামের নাম শুনেই আমার বুকের মধ্যে কেমন করছিল। হাত-পা অবশ হয়ে আসছিল।' চোখের পাতা বুঝি ভিজে ভারি হয়ে উঠল। গলাটা ধরা-ধরা। খানিক থেমে ঢোক গিলে শেষে বলেন, 'জীবনে কারো কোনো ক্ষতি যেন না করি, আদিত্য-বাবু। আপনাদের বাপ-মায়ের আশীর্বাদে আজ পর্যন্ত করিনি। ভগবানকে ডাকুন। বলুন, বাকি জীবনটাও যেন নির্বিবাদে কাটিয়ে দিতে পারি। আপনাদের পাঁচজনের মুখে হাসি দেখতে চেয়ে যদি......বলতে-বলতে কেমন ঝিমিয়ে পড়েন। আফিম-খোরের মতই চোখের পাতা বুজিয়ে অনর্গল বিড়-বিড় করেন ভদ্রলোক। 'পিওনের ঝোলায় সাপ আছে, না ব্যাঙ আছে তা তো জানিনে। যদি খারাপ খবরই থেকে থাকে? তাহলে তো যতদিন বাঁচবেন আমাকেই দুষবেন? দেখা হলেই ভয়ে-ভাবনায় কাঁটা হয়ে উঠবেন। মনে-মনে গাল পাড়বেন। বন্ধু-বান্ধবকে শুনিয়ে বলবেন, এই লোকটা আমার সর্বনাশ করেছিল। পারতপক্ষে আমার মুখ দেখতে চাইবেন না। অথচ ভালো খবর পেলে আমার কথা মনেও পড়বে না। আদর করে এক কাপ চা যে ডেকে খাওয়াবেন সে খেয়ালটুকুও থাকবে না।'

আরো কী বলতে যাচ্ছিলেন, আদিত্য বাধা দেয়। কিছু না বলে ঘরের ভেতরে চলে যায়। ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল। চোখের পাতা জড়িয়ে আসছিল। কথা শুনতে-শুনতে এক সময় নিজেকে বধির মনে হল আদিত্যর

সারাটা দিন চুপ-চাপ কাটিয়ে দিয়েছে তারপর। ঘুম আর আসেনি। অথচ কথা বলার ব্যাপারেও সংযমী সে নয়। অন্তত বিদ্যুতের মনে পড়ে না। বরং এই আদিত্যর দিকে চেয়ে, তার কথা ভেবে শঙ্কায়-সন্দেহে নিজেকেই ক্লান্ত করা, অকারণ মলিন করা শুধু। মানে নেই। সংসারে তো কত কাজ! এতদিন পরে এই হুট করে দেখা দিতে আসাটাই কেমন অস্বস্তিকর ঠেকে।

ছবি দেখছিল বিদ্যুৎ। আদিত্যের আঁকা ছবি। দেখতে-দেখতে মন কেমন করে। স্থান-কালের ব্যবধান ঘুচিয়ে কোথায় যে তলিয়ে যায়! ধীরে-ধীরে স্পষ্ট, প্রকট হচ্ছে জীবনের এক-একটা অনির্বচনীয় দিন-ক্ষণ মুহূর্ত। অতীত, কিন্তু অবিস্মরণীয়! দেহ-মন ঝিম-ঝিম করে। এ যেন এক নতুন অনুভব। বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে সহসা যার হদিশ খুঁজে পাওয়া ভার। কে যেন অদৃশ্য হাতে চোখের সামনে খুলে দিচ্ছে একের পর এক আশ্চর্যের দরজা! বিদ্যুৎ অস্থির অথচ অভিভূতের মতই দেয়ালের গায়ে চোখ বুলোতে-বুলোতে এগিয়ে যায়! যেন নিজেরই চারপাশ দিশে হারিয়ে ঘুরতে থাকে কেবল। এ-ঘোরার শেষ নেই; হয়তো শুরুও নেই! অথচ ঘুরতে-ঘুরতে সে যে এক সময় ক্লান্ত হবে, হাঁপিয়ে উঠবে, পায়ে পা জড়িয়ে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে যাবে তেমন কোনো লক্ষণও ছিল না কোথাও।

আচমকা থমকে দাঁড়াল বিদ্যুৎ। খুব কাছে, বড় বেশী নিকট মনে হচ্ছে তাল-তমালের ছায়ায় ঢাকা শান্ত, স্নিগ্ধ দিঘী। অন্ধকার, নির্জন অরণ্য। আসন্ন রাত্রির দিকে উড়ন্ত বকের পাতি ভ্রূ-রেখার মত নিখুঁত, নিপুণ। এদিকে মধ্যাহ্নের শালবন। রাঢ়ের গ্রাম। খোয়াই। ঘরে-ফেরা রাখাল বালক। অন্যদিকে ভর-দুপুর নারিকেলের বন। সাপলা-শালুকে টলমল আরো একটা দিঘী। বাবুই পাখির বাসা, সারি-সারি শীতের খেজুর। সব মিলিয়ে দেশ, বাঙলা দেশ। কিন্তু একা, বড় নির্জন, বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে সব। কেমন জীর্ণ, বিষণ্ণ, নিথর। অথচ এমন যেন ছিল না। এমন নিস্তেজ, নিঃশোষিত মনে হত না কিছুই। বরং ভয়ংকর উষ্ণ, অফুরন্ত, প্রাণবান ছিল আদিত্য। মাঝে-মাঝে চমকে দিত তখন।

সে ক্ষমতা তার ছিল। হয়তো তারই ছিল শুধু। আর যেদিন তার ছবির ভেতরে ছিল প্রাণ, ছিল তেজ, ছিল কিছু না বলে পলকে মনকে বেঁধে রাখার এক আশ্চর্য মহিমা।

চোখের পাতা বুজিয়ে একবার পেছন ফিরে দেখতে চাইল বিদ্যুৎ। কিন্তু কী ব্যাপার! সবকিছুই অন্ধকার ঠেকে যে! মুহূর্তের জন্যে আগে-পিছে সর্বত্র ফাঁকা, শূন্য, ভয়াবহ মনে হল আদিত্যর। কাছে-পিঠে হয়তো আর কেউ নেই, কিছু নেই তার! একদিন যারা ছিল আজ তারাও উধাও। আদিত্য, জুলেখা, খালেদ, সে নিজে—কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে সব। সব যেন মৃতের মত নিষ্প্রাণ। মমীর মত স্মৃতি। সুদূরে, অস্পষ্ট, কুয়াশা জড়ানো মনে হয়। কিন্তু কেন এমন হয়? কেন হচ্ছে? ভুলে যাবার কথা তো নয়। একদিন পরস্পরকে খুঁজে পাবো, খুঁজে নেবো—এই ছিল বিশ্বাস। আজ কোথায়, কে কোথায় আছো সব! চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করে বিদ্যুতের। কাউকে পাবো না, কিছুই কি পাবো না তাহলে?

ছবির গায়ে চোখ রেখে চমকে উঠল হঠাৎ। চক-চকে ধারালো চাউনিটাই নিজেকে হাতে-হাতে জ্বলে ভরে ওঠে। নিজাকে ধরে রাখা যাচ্ছে না, আড়াল করে লুকিয়ে রাখার সাধ্য বুঝি আর নেই। ও কে! কে ও! বড় চেনা-চেনা মনে হচ্ছে যে! বড় বেশী কাছের! অথচ ঠিক আগের মত আপনা ভেবে ছুটে যাবার সাধ্য নেই। আমি কি হেরে যাচ্ছি, আমি কি পিছিয়ে পড়ছি নাকি?

'কিছু নয়। ওটা স্টাডি।'

সন্দেহ নিরসন করতে চাইল আদিত্য। শিল্পীর মতই যথার্থ নির্বিকার মনে হল তাকে। যেন এখানে নয়, দেহ রেখে তার মন-প্রাণ ঘুরতে বেরিয়েছে কোথায়! বিদ্যুতের এই যে এমন উপস্থিতি, শারীরিক এই যে আবির্ভাব তা আকস্মিক যতই হোক, কিন্তু অস্বাভাবিক কখনো নয়। কথাটা কেমন করে ভুলে গেল আদিত্য? আরেকটু যদি সহজ, স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ হ'ত আজ! প্রার্থনার মতই মনে-মনে নিজেকে শুনিয়ে কথাটা ভাবলে বিদ্যুৎ। আজ আর বুঝি কিছুই বেঁধে রাখে না তাকে, রাখতে পারে না। তেমন করে খুশিতে, আবেগে ভরে তোলে না বুঝি কারো আসা কিংবা যাওয়া। কেমন নিস্পৃহ, উদাস, অবিচল। ভেতরে-ভেতরে সে হয়তো নিজেকে স্বার্থপর, নিষ্ঠুর, করেই গড়ে তুলতে চায়। প্রস্তুতি চলেছে না জানি কতকাল থেকে। গলায় কিছুমাত্র জড়তা কিংবা টান না রেখে, বাইরে একটু-একটু করে জমে ওঠা অন্ধকারের দিকে চেয়ে কথা বলে আদিত্য, 'ও মালতী।' অল্প হাসল।

শব্দ না হলেও বিদ্যুৎ টের পায়। আদিত্য পরিহাস করছে তাকেই। স্ত্রীলোক সম্পর্কে এখনো শুচিবাই কাটিয়ে ওঠা গেলো না। বিদ্যুৎ হয়তো পারবে না, সারাজীবন চেষ্টা করেও পারবে না আদিত্যর মত অমন সহজে উন্মুক্ত হতে। আমরণ অনাধুনিকই থেকে যেতে হবে। অথচ কোনো আফসোস হচ্ছে না। ভেতরে-ভেতরে কোনো কষ্ট, কোনো অনুতাপ, পিছিয়ে পড়ার জন্যে কোনো যন্ত্রণা, কোনো হাহাকার। একটু সেঁকেলে বলবে সবাই? তা বলুক। আমার পথ, তোমাদের পথ এক নয়। তুমি একা। একাকিত্ব তোমার রোগ। তোমার বিলাস। তাই যা খুশি করে যাচ্ছো। একটা কিছু করে সবাইকে চমকে দিতে চাও। কিন্তু সংসারে যে আমি আছি, আমারও দল আছে—পাল্লায় ওজন করলে এদিকটাই ভারি হবে, ঝুলে পড়বে, সেকথা কেমন করে ভুলে গেলে আদিত্য? তোমার না অতীত ছিল? একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন না তুমিই দেখেছিলে একদিন? তারপর কী হল? তোমার ভাবের ঘরে এমন করে সিঁদ কাটল কে? অথচ আমি কিন্তু সেই বিদ্যুতই রয়ে গেলাম। তোমার মত পাল্টে যেতে পারিনি। আমার রুচিতে বাধে। ঘেন্না হয়। তবু তোমাকেই ভালোবাসি, তোমাকেই। কারণ, তুমি যে শিল্পী। বন্ধু। এ আমার গর্ব। আমাদের সকলের। একদিন ছিলে মাথার মণি। সুখের মুখ দেখতে পাওনি তখন। অর্থের, আরামের, স্বাচ্ছন্দ্যের সন্ধান হয়তো দিতে পারিনি। কজনই বা তেমনি ছিলাম? তবু হৃদয়ের উত্তাপে উষ্ণ ছিলাম সবাই। সারাক্ষণ তোমাকে জাগিয়ে রেখেছি, রাখতে চেয়েছি। ভুলে গেলে, সব ভুলে গেলে আদিত্য? আচ্ছা, তুমি কী? কী হলো বলো তো? জুলেখা, খালেদ, আমি, তুমি—আমরা সবাই কী ছিলাম মনে আছে? তবু জানি, ফিরবে! আবার একদিন ঘরে ফেরার সময় হবে, ঘরের কথা মনে পড়বে তোমার! কিন্তু সে কোন ঘর, কার ঘর আদিত্য? তখনো কি বেঁচে থাকবো আমি? এই দেশ, জন্মভূমি, জুলেখা, খালেদ, আদিগন্ত মাঠ-ঘাট-স্বপ্নের আকাশ! বিপুল প্রত্যাশা নিয়ে কেঁপে ওঠা, জেগে ওঠা প্রসন্ন সকাল! ভাবলে কান্না পায়। চোখে জল আসে। মন কেমন করে। বিদ্যুৎ কিছু বলতে চায়!

'আর, একদিন আশাহত, তোকে দেখে বেঁচে থাকার ইচ্ছে হ'ত আমাদের। তোকে পেলে আমরা তখন অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারতাম।'

বড় করুণ, ক্লান্ত বিষণ্ণ মনে হয় বিদ্যুতকে। এ যেন সে চায়নি। ঠিক এ রকমটি নয়। এই আদিত্যর সঙ্গ পাবার সাধ তাকে ব্যাকুল করেনি কোনোদিন। এই আদিত্যের দেখা পেতে সে আসেনি আদৌ।

'সত্যি?'

চোখ মটকে তাকালো আদিত্য। ঠাট্টার মত শোনালো গলাটা। আলতো আর বাঁকা হাসির সূক্ষ্ম রেখাটাই চাপা ঠোঁটের ফাঁকে দুলে উঠে সরামুখে নোংরা জলের মত ছড়িয়ে পড়ে পলকে। গা ঘিন-ঘিন করে। আদিত্য তখনো খুঁচিয়ে রক্তাক্ত করে তুলতে চেয়ে বলে 'এখন আর পারিসনে বুঝি'

'পারি।' বেশ গম্ভীর মনে হল বিদ্যুতকে।

'প্যারিস?' ভুরু কপালে তুলে চেয়ে রইল আদিত্য। যেন বিশ্বাস হচ্ছে না।

বিদ্যুৎ হাসতে চাইল। কেমন দীন, করুণ মনে হল তাকে। বেশ ধীর মন্থর স্বরে দৈববাণীর মতই একটুও নিঃশ্বাস না ফেলে যা বলে গেল আদিত্যর রক্তের ভেতরে না জানি সেই শব্দগুলিই কী দুঃসহ বেগ আর আবর্ত রচনা করে। তার নিরুচ্ছ্বাস মুখে-চোখে আশঙ্কার অতি পরিচিত ছায়া-গুলিই দুলতে থাকে এবার। থেকে থেকে সেই বিলুপ্ত বাসনা-সাধ-স্বপ্নগুলিই যুদ্ধের দিনে দূরাগত বিমানের শব্দের মতই আমূল কাঁপিয়ে তোলে তাকে।

'পারি! আর পারি বলেই তো এমন করে আসা। তুমি ঘুমিয়ে আছো, মরে যে যাওনি তার প্রমাণ তোমাকেই ঘিরে রয়েছে। ছবিগুলি শ্মশানের, যেখানে ফসল ফলে না, ফুলও ফোটে না। অথচ চেষ্টা করলে, মনে-প্রাণে চাইলে এই শ্মশানকেও জীবনের কোলাহলে পরিপূর্ণ করে তোলা যায়। মৃত্যুর সমস্ত গরিমা তুচ্ছ করে সেখানে তখন জীবন, কেবল জীবনের জয়ধ্বনিই শুনতে পাবে তুমি! এটা কিন্তু নিছক রাজনৈতিক স্লোগান নয় আদু, যাকে তুমি মনে-প্রাণে ঘৃণা করার তালিম নিচ্ছ। নিজেকে প্রমাণ করাতে চাইছো আগা-পাশতলা পক্ষপাতশূন্য এক বিরাট ব্যক্তিত্ব।'

'আমি!' চমকে উঠল আদিত্য। আহত, বিরক্ত মনে হল তাকে।

'হ্যাঁ, তুমি।' গলায় ধমকের সুর ফুটিয়ে কথা বলে বিদ্যুৎ। একটু ঝাঁঝালো মনে হয়। বুকের ওপরে চিন্তার ক্লান্তিতে ঝুলে-পড়া চিবুক অল্প দুলিয়ে, স্বরে যথাসম্ভব গাঢ়তা এনে ধীরে ধীরে আদিত্যকেই অবশ, আড়ষ্ট করে তোলে। সাপের ফণার মত নাকের পাটা ঠিক আগের মতই ঈষৎ ফুলিয়ে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলতে থাকে বিদ্যুৎ, 'তালিম নিচ্ছ। কারণ তুমি তা নও। তবু হতে চাইছো। বুক ফুলিয়ে এমন এক জগতে বিচরণ করতে চাইছো যেখানে অর্থ, যশ, প্রতিষ্ঠার গা ঘেঁষেই নিন্দুক আর স্তাবকের এক দিব্য সহাবস্থান। কারণ, নাম করতে হলে এই

দুটো দলকেই জীইয়ে রাখা প্রয়োজন। অথচ ঠাণ্ডা মাথায় খানিকক্ষণ ভাবলেই টের পাবে, এর চেয়ে ভণ্ডামী আর হয় না। বলতে পারো, সত্যিই কী চাও তোমরা? এই অর্থ, এই প্রতিষ্ঠা পেলেই ক্ষান্ত হবে কি?' তিক্ত হাসি হেসে ইজেলে চড়ানো নতুন ক্যানভাসটার সামনে এসে দাঁড়ালো বিদ্যুৎ। তীক্ষ্ণ চোখে দেখে নিল একবার। একটা মানুষ, তবু জানোয়ারের অস্পষ্ট অবয়ব ফুটে উঠেছে মাত্র। আদিত্যর মুখে জবাব নেই। নির্বাক, নিঃস্পন্দের মতই সে দাঁড়িয়ে। অপলক বিদ্যুতের চলা-ফেরা, কথা বলার প্রতিটি মুদ্রা নিখুঁতভাবে লক্ষ্য করে শুধু। কী যে তার করণীয়! বড় চিন্তিত, বিষণ্ণ দেখায় তাকে।

সরে গেল বিদ্যুৎ। জানলার গরাদে পিঠ এলিয়ে দিতে দিতে সেই পুরোনো কথারই জের টেনে বলে, 'হবে না। কারণ যা পাচ্ছো তা কাম্য নয়। আবার কী চাও, সেটাও স্পষ্ট নয় তোমাদের কাছে। জীবনে বেঁচে থাকার, হয়ে ওঠার ধারাবাহিক ইতিহাসটাকে উল্টে দিয়ে, অস্বীকার করে তোমরা চাইছো গরম গরম একটা কিছু পেতে। বাজারের চাহিদা দিয়ে কথা। সমাজ-সংসার নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার থাক। মানুষের কাছে তোমরা যেতে চাও না। কিন্তু কেন? এই রাগ, এই অভিমান, এই পাগলামির আবার অর্থ হয়? তোমরা স্বাধীনতা চাও। কার স্বাধীনতা? শান্তির? সমাজ-সংসার নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার বুঝি আর নেই?'

দম নেবার জন্যে থামল খানিক। তাকে ক্ষুব্ধ বিষণ্ণ মনে হচ্ছিল এখন। সে যেন ভাবেনি, কল্পনা করেনি কোনোদিন, আদিত্য এমন করে মরে যাবে! তিলে তিলে নিজেকেই মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে! কথাটা ভাবলে মন কেমন করে। ফাঁকা, শূন্য, উদাস ঠেকে সব। বুকের ভেতরে মুচড়ে ওঠে কেবল। এর নাম ভালবাসা? এর নাম টান? কিন্তু বিদ্যুৎ ভুলে যেতে চায়। সব কিছু ভুলে থাকতে, নতুন করে জন্ম নেবার কামনা হয় ফের। আবার নতুন সংসার, বন্ধু, পরিজন ফিরে পাবার চিন্তা তাকে অস্থির, উন্মনা করে তোলে। কিন্তু শুরুটা যেভাবে আর যেমন করেই হোক না কেন, শেষটা তো ঠিক এমনি, এইরকমই হবে। বিদ্যুৎ বোঝে, অনুমান করতে পারে সব। বয়স তো কিছু কম শেখায়নি তাকে। অভিজ্ঞতা যত সামান্যই হোক, এইটুকুই বা ক'জন পায়? পেছনে যারা আসছে, এই তুচ্ছ পুঁজির দিকে চেয়েই হয়তো হিমসিম খাবে তারা। ভাববে, একটাই তো জীবন! সময়ের পরিসর কত অল্প! অবকাশ আর কতটুকুই বা মেলে? তবু এতো দেখা, এতো পাওয়া যায়? অসম্ভব। এ যে অসহ্য সুখ! দুঃখ ভাবনার অতীত, অনির্বচনীয়।

'আমাকে মনের মত করে পাচ্ছো না বলেই কি এতো ক্ষোভ?'

আদিত্যর গলায় শ্লেষ। নিজেকে রেখে-ঢেকে চলার স্বপক্ষে সে আজো নেই। যে যা-ই ভাবুক। বিদ্যুৎ টের পায়। সে এখন ক্রমশ ক্ষুব্ধ, বিরক্ত এবং সোচ্চার হবে যেন। শারীরিক ক্লান্তির কথা অবশ্য ভাবা যায় না। কিন্তু ভেতরে কোথায় একটা খাঁ-খাঁ শূন্য গ্রীষ্মের মাঠ, নদী, বালিয়াড়ির ছবিই পলকা সুতোয় বেঁধে টাঙিয়ে রেখেছে কে! মন-প্রাণ সেই দিকেই ছুটে যাচ্ছে বলে চোখের গাঙে ডাকে নোনা জলের দুকূল-ভাসানো বান। রক্তের গভীরে তৃষ্ণা; শরীরে, সর্বাঙ্গে তীব্র, গোপন আর অমোঘ দহন। এ এক নতুন অনুভব অথবা দুঃখের স্মৃতির মত এক দুর্বার আবেগ যা তাকে ক্ষণকালের জন্যে উদ্বেল অশান্ত করে তোলে।

'ক্ষোভ আমার হয় না।' বিদ্যুৎ হাসল। হাতের পিঠে দ্রুত চোখ মুছে নিয়ে জানলা ছেড়ে সামনে এগিয়ে যায়। অন্ধকার ঘরে গোল সামান্য। একদিন আগুনে ছিল অসহ্য উত্তাপ নিয়ে জ্বলতে পারতো এই বিদ্যুৎ। কাছাকাছি সবাইকে উষ্ণ, উত্তপ্ত করার শক্তি ছিল অসীম। অথচ আজ কী করুণ মনে হয়! ভিখিরির মত ম্লান! নাকি আছে, ঠিক তেমনি আছে বিদ্যুৎ? বোঝা যায় না! অনুমান করতে কষ্ট হয়। আসলে হয়তো আমিই নিবে যাচ্ছি। চিন্তা-ভাবনার সেই ধার আর নেই। দিন-দিন ভোঁতা হয়ে যাচ্ছি! লোকে ভুল বোঝে। ভাবে, আদিত্য, লোভের হাতে বিকিয়ে গেছে। কেউ কাউকে বোঝে না। বোঝা যায় না। বুঝতে চায়ও না কেউ। এই যেমন আমি এখন, এই মুহূর্তে বিদ্যুৎকে নিয়ে বানিয়ে বানিয়ে কত কী ভাবছি। বিদ্যুৎ-ও হয়তো তা-ই। ওর বুকের ভেতরে হাত রাখতে ইচ্ছে করে। হৃৎপিণ্ডের শব্দ ছুঁয়ে সময়কে পরখ করা যায়। আমরা বুড়িয়ে যাচ্ছি কিনা জানিনে। কিন্তু মরে যাচ্ছি! নিজের অজান্তে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছি। কথাটা বলতে গেলে হাসবে। দুঃখ পাবে কেউ কেউ। তাদের হয়তো আশা ছিল। ভবিষ্যতের পথ চেয়ে বসেছিল তারা। আমরাই ভরসা ছিলুম তাদের। কথাটা বড় গোপনে বয়ে বেড়াচ্ছিল, বড় সন্তর্পণে গোড়ায় জল ঢেলে, সার দিয়ে তাকে সুন্দর, সবুজ করে তুলতে চেয়েছিল সবাই। অথচ কিছুই হল না। ফুল-ফল, পাতা--পল্লবের সমস্ত আশা মুছে দিলে কে! 'ক্ষোভ হয় না আমার।' আরেকটু ঘনিষ্ঠ হল বিদ্যুৎ, কথাটা উচ্চারণ করল ফের। মুখ থেকে মেঘ ভাঙা রোদের মতই হাসির ক্ষীণতম রেখাটুকু অবধি অপসৃত হল কখন! তাকে ভয়ংকর গম্ভীর মনে হল। কেমন ক্লিষ্ট, চিন্তিত। এখনো নিজেকে পলকে পাল্টাবার ক্ষমতা রাখে বিদ্যুৎ! মন স্থির করতে পাঁচ মিনিটও লাগে না! আমিই শুধু কেমন হয়ে যাচ্ছি, কেমন! নিজেকে চেনা যায় না, বুঝতে পারিনে সব সময়! অথচ এমন ছিল না যেন। এমন হবার কথা ছিল না আমাদের! নিজেকে ফাঁকি দিয়ে চোখ এড়িয়ে চোরের মত পালিয়ে বেড়াবার মানে হয়? আমি যেন কী! আমি যেন কেমন হয়ে যাচ্ছি! সহজ, সরল জীবনের পথ ছেড়ে এ কোথায় এসে দাঁড়ালুম! খাতেম, জনলেখা, বিদ্যুৎ তোমরা কি মরে গেছো? তোমরা কি ঘুমিয়ে ছিলে এতকাল? আমি নেই, আমি নেই, তোমাদের সেই আদু আর নেই তবুও বাঁচা, এই না-থাকার জন্যে কি প্রাণপণ লড়াই আমার! বাঁচা, বেঁচে থাকা শুধু টিকে থাকা। আর কিছু না জীবনের কাছে আর কোনো দাবীই নেই আমার।

কী ভেবে আদিত্যর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিষ্পলকে চেয়ে রইল বিদ্যুৎ। যেমন সময়ে দীর্ঘ ব্যবধানে প্রবাসী প্রিয়জনের মুখে চোখ অবশেষে সর্বাঙ্গে ছটফট করে [illegible] চাইনি আর্দ্র [illegible] হাতে-হাতে সহসা ক্লান্ত ও অর্থহীন [illegible] স্নেহে-করুণায়, প্রেম-প্রণয়ে [illegible] লালিত হাতে-হাতে আচমকা থমকে দাঁড়া আদিত্য। বড় অন্ধকার, নিরুত্তাপ মনে হল সব। আজ এই যে বিদ্যুতের কাছে আসা, দূরে যাওয়া, কথা বলা, নির্বাক চেয়ে থাকা এবং তার সারাদিনের শারীরিক উপস্থিতিটুকু অবধি কেমন অলৌকিক অথবা কুয়াশাময় ঠেকে। এমন করে আঘাত পেতে সে চায়নি। তারা পরস্পর এত দূর হয়ে যাবে তা ভাবেনি কোনোদিন। তবু, যা হবার তা হয়, তা-ই! এবং আশ্চর্য! মানুষের হাতে মানুষেরই ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘটনাগুলি না জানি কী অবলীলায় ঘটে চলেছে! হয়তো কিছুই চায়নি তারা, কিছু না! অথবা যা চেয়েছিল অর্থাৎ যা দিয়ে সাময়িকভাবে নিজেকে ভোলাতে কিংবা আনমনা করে দিতে চেয়েছিল, সেই চাওয়ার ভেতরে শাঁস-জল বলতে কিছুই ছিল না।

'ঘৃণা?' ধরা গলায় প্রশ্ন করল আদিত্য। কেমন ভীত, বিষণ্ণ, আড়ষ্ট মনে হচ্ছিল

তাকে। হয়তো পূর্ব স্মৃতি ফিরে পেয়েছে আবার। একে-একে সব কথা, সকলের কথাই মনে পড়ছে তার। যে কারণ দ্বিধার সঙ্কোচে নিজেকে লুকোতে চেয়ে সে এখন অশান্ত, অস্থির কিন্তু অসহায়। এবং বিদ্যুৎ আজ এমনি করেই পেতে চেয়েছিল তাকে। মনে-মনে সে হয়তো এমনি এক অসহায়, অক্ষম মুহূর্তের অপেক্ষাই করছিল। নইলে কথায়, কোলাহলে সে আগের মতই ভরিয়ে তুলতে পারতো সব। এমন কি তাকেও টেনে নিয়ে যেতে পারতো সেখানে: সেই দিন-ক্ষণ-মুহূর্তের মাঝখানে! এ জীবনে যাদের দেখা, যেখানে যাওয়া আর হয়ে উঠবে না! অথচ আমি পালাতে চাইনি। এমন করে লুকিয়ে থাকার, নিজেকে লুকিয়ে রাখার বাসনা আদৌ ছিল না আমার। লোকে ভাবে, আমি কী! অতীত যার এত উজ্জ্বল ছিল, এমন সম্ভাবনাময়, সে মানুষটাই মিইয়ে যায় কী করে! চোখ জ্বালা করছিল আদিত্যর। পাশের বাড়ির উঠোনে কাঁচা কয়লা জ্বলছে। ধোঁয়ায় ভরে যাচ্ছে ঘর। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে ক্রমশ। টেলিগ্রামটা এবার পেলে ভালো হত। অন্তত ছুটে বাইরে যেতে পারতো। চীৎকার করে কিছু বলা যেতো কাউকে। ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠার বদলে হাউ-মাউ করে নিজের সর্বনাশ অথবা সৌভাগ্যের কথাটাই সবাইকে শুনিয়ে নিশ্চিন্ত, নির্ভার হওয়া যেতো। নিদেন পক্ষে টেলিগ্রামের খবর পড়ার অছিলায় আলো জ্বালিয়ে অন্ধকার তাড়িয়ে ঘরের আবহাওয়া পাল্টে দেয়া যেতো।

'ঘৃণা আমি করিনে, আদু।' খুব ধীর, শান্ত গলায় বলে বিদ্যুৎ। ভেতরের সমস্ত আবেগ, রাগে-দুঃখে-অভিমানে ঠাসা ভাবাবেগের বিন্দু পরিমাণ আভাসটুকু অর্থাৎ কথা কিংবা আচরণের গা থেকে কঠিন সংযমের ন্যাতা দিয়ে মুছে ফেলে উদাসীর মত বলে, 'করলে আজ আর এখানে আসি ?'

'আমাকেই দেখতে এসেছো তাহলে', ঠাট্টা করে আদিত্য। শুনে অবাক হতে চায়।

'না, কেবল তোমাকেই দেখতে এসেছি বলা ভুল হবে।' বিদ্যুৎ হাসে। অথচ আহত হওয়া উচিত ছিল তার। কারণ প্রচ্ছন্নভাবে হলেও তাকে আঘাত করতেই চেয়েছিল আদিত্য। সে যেন বোঝে না, বুঝতে চায় না এ সব। তাই সরল, সহজ সুরে বলে, 'আমি নিজের সঙ্গেই দেখা করতে চাই। নিজেকেই নতুন করে খুঁজে পেতে চাই তোমাদের মধ্যে। কারণ একদিন বেঁচে ছিলুম, আমরা আমাদের মধ্যে বেঁচেছিলুম আদু। কথাটা তুমি হয়তো ভুলে গেছো কিংবা ভুলে যেতে চাও। আমি পারিনে।'

'সেটা তোমার অক্ষমতা।'

'অস্বীকার করিনে।'

'তাহলে এত আফসোস কেন ?' নিষ্ঠুর, কর্কশ মনে হল আদিত্যকে। কথা তো নয়, যেন ঝামা ঘষে দিচ্ছে বিদ্যুতের মুখে-চোখে, বুকের ভেতরে। 'কী ছিলুম সেটা বড় কথা নয়, কী হয়েছি সেইটেই বিচার্য। পৃথিবীতে আমার আগের মুহূর্ত অবধি মাতৃগর্ভের অন্ধকারেই তো দিব্যি ছিলুম সবাই। ভূমিষ্ঠ হবার পরে সেই অন্ধকারের জন্যে যদি কেউ বায়না ধরে তুমি তাকে, পাগল বলবে না ?'

'আমাদের অতীত আজ অক্ষমের অন্ধকার স্বর্গ মনে হচ্ছে তোমার কাছে ?' ভুরু কুঁচকে গেল বিদ্যুতের। ধিক্কারের মত শোনালো কথাগুলি। 'তুমি ফুরিয়ে যাচ্ছো। নিঃশেষ, রিক্ত হচ্ছো দিনকে দিন। পথের ভিখিরিটাও যে সর্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ নিয়ে তোমার চেয়ে সুখে আছে তা কি মানো ?' বিদ্যুৎ বুঝি কেঁদে ফেলবে এবার। কথাগুলি ভারি আর ভেজা-ভেজা মনে হচ্ছে তার।

আদিত্যর মুখ লাল হচ্ছিল ধীরে-ধীরে। কান গরম হচ্ছিল। বুকের ভেতরে কেমন এক অস্বস্তি। যেন ঘর-বাড়ি ভেঙে পড়ছে কোথাও। হাজার মানুষের মাঝখানে গালের ওপরে ঠাস করে চড় কষিয়ে দিলেও এতখানি কষ্ট হত না। অপমান এত তীব্র মনে হত না আদিত্যর। আমি তোমাদের কিছুই করিনি। কেবল একা থাকতে চাই। ভালো লাগে না, একটুও ভালো লাগে না তোমাদের। এমন কি জুলেখা এসে সামনে দাঁড়ালেও বলবো, তুমি যাও। অনেক হয়েছে, এবার তুমি যাও। আমি বিশ্বাস করিনে। আর ভালোবাসিনে তোমাদের। তোমরা মিথ্যে। তোমাদের বেঁচে থাকা, স্বপ্ন দেখা, ভালোবাসা সব, সব মিথ্যে। কেবল কথার বঁড়শিতে হৃদয় গেঁথে প্রাণ হরণের হিংস্র, কুৎসিত ছল ছাড়া কিছুই জানো না তোমরা, কিছু না। যে কারণ, একা আর নিশ্চিন্ত হতে চেয়ে আমি দূরে থাকি, নিজেকে লুকিয়ে রাখি সারাক্ষণ।

'ভিখিরির স্বাধীনতা আছে।'

'কিন্তু স্বেচ্ছাচারিতা নেই!'

'স্বেচ্ছাচারিতা ?' থমকে দাঁড়াল আদিত্য। ঢোক গিলল। ভেতরে যুক্তি-তর্কের ধার যেন ভোঁতা হয়ে আসছে। পুরানো বাড়ির আনাচে-কানাচে, দরদালানের কোণায়, ভাঙা সিঁড়ির নিচে চুন-সুরকির তলায় চাপা-পড়া একদা বৈভব আর বিত্তের, বল আর বীর্যের সাক্ষ্য বহন করে চলা অস্ত্রের মতই মরচে ধরা মনে হচ্ছে আজ। বৃদ্ধের মতই স্থবির আর অক্ষম মনে হচ্ছে নিজেকে। বিদ্যুতকে ঘায়েল করার মত অস্ত্র একদিন তার হাতেই ছিল। আজ তা অনুমান করতে পারে আদিত্য। সে আমার প্রতিভা। যার কাছে মাথা হেঁট করতো সবাই। জুলেখার কাছে যার আকর্ষণ ছিল সবচেয়ে তীব্র। আদিত্য আবার প্রশ্ন করল, 'স্বেচ্ছাচারিতা ? কার সঙ্গে।' বিরক্ত মনে হল তাকে।

'নিজের সঙ্গে।'

আদিত্য কথা বলে না আর। চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে থাকে। চোখ-মুখ বুঝি আবেগে টস-টস করে বিদ্যুতের। আগে যেমন হত। জোরে শ্বাস নিচ্ছে। উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে বিদ্যুৎ। আদিত্যর ভালো লাগে না সব। ভালোলাগার একটা সীমা থাকা দরকার। নইলে ঠকতে হয়। বিদ্যুৎ মরবে! এমনি করেই নিজের সর্বনাশ ডেকে আনবে একদিন। তখন আর পালাবার পথ খুঁজে

পাবে না। তাই হয়। মানুষ যে নিরন্তর নিজের হাতেই মরে, মার খায়।

রাত গভীর হলে একে-একে জানলা-দরজা খুলে দিয়ে ঘরময় পায়চারি শুরু করে আদিত্য। মাথার ভেতরে এক বিশাল শূন্য প্রান্তরের স্মৃতি নিয়ে সহায়-সম্বলহীন নির্বোধের মত সে কেবল ঘুরে বেড়ায়। যেন আর কোনো কাজ নেই। এ ছাড়া গতি নেই তার। ঘুম? হয়তো বাকি জীবনে আর কোনোদিনই ঘুমোবার অবসর পাবে না। ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখার চিন্তাটুকু অবধি মনে হবে অবাস্তব।

চোখ মেলে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে প্রায় শেষবারের মতই সব কিছু দেখে নিতে চেয়ে হতাশ হল আদিত্য। তবু কান্না পাচ্ছে না। কষ্ট হচ্ছে না আগের মত। কেবল হতাশা, নিছক হতাশার বিনিময়ে দীর্ঘদিনের শ্রম আর নিষ্ঠার আর বিশ্বাসের চিহ্নগুলি বিস্ময়ের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত, নির্ভার ও সুখী হতে চাইল। এর নাম পলায়ন? কিন্তু কোথায়? প্রশ্নটা আচমকা আহত করে তাকে। কিন্তু আগের মত জীবন যেন অস্পষ্ট, জটিল কিংবা মীমাংসার অতীত মনে হচ্ছে না আদৌ। বিদ্যুৎ কোথায়? পা টিপে-টিপে আরো ঘন, আরো গভীর এক অন্ধকারের দিকেই এগিয়ে যায় আদিত্য।

'বিদ্যুৎ, বিদ্যুৎ! দরজা খোল!'

'সব দোর খোলা আছে, আদিত্য।'

'আমি তাহলে যাই?'

'কোথায়?'

'অন্ধকার সরিয়ে তুই দাঁড়া। আমি যাবো।'

'তোর পথ চিরদিনই খোলা।'

'আমি যে দেখতে পাচ্ছিনে কিছুই!'

'ভোর হোক।'

'তা আর হয় না, বিদ্যুৎ। বড্ড দেরি হয়ে গেছে।'

'এখন সারা শহরে কার্ফিউ। সঙ্গিন উঁচিয়ে পুলিস টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে সর্বত্র।'

'আমার ভয় নেই। হারিয়ে যাবার দুঃখ নেই আর।'

দমকা হাওয়ার মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল আদিত্য। হাঁ-করা দরজাটা তেমনি পড়ে রইল পেছনে। গরুর চোখের মত জানলাগুলি অপলক। দূরে, বহু দূরে কে আবার কাকে ডাকে। রাস্তায় ভারি-বুটের শব্দ। ঝিঁঝির ডাকের মত একটানা সিটি বেজে চলেছে কোথায়! দুলতে-দুলতে, ভাসতে-ভাসতে ছুটে চলেছে আদিত্য! মাঝে-মাঝে চঞ্চল হলে ভেতরে নিদারুণ উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা নিয়ে সে বুঝি হাঁপিয়ে ওঠে। নিরুপায়, তাই এমন করে চুপ-চাপ পড়ে থাকা। রাস্তা জানা থাকলে দরজা খুলে বেরিয়ে আসতাম কবে। একলা ঘরে নিশ্চল পড়ে থাকার চেয়ে দুর্ভাগ্য আর নেই। অসহ্য ঠেকে সব। অথচ এমন করে কিছুই বুঝিনি যেন।

অন্ধকারে চরাচর লুপ্তপ্রায়। বিদ্যুৎ আছে কি নেই বোঝা ভার। নিঃশ্বাসের শব্দটুকুও শোনা যাচ্ছে না আর। অথচ প্রাণ খুলে গান গাইতে ইচ্ছে করছে এখন। চেঁচিয়ে ডাকতে ইচ্ছে করছে ওদের—একদিন যারা কাছের ছিল! জুলেখা, খালেদ, বিদ্যুৎ তোমরা কোথায়! কাঁদতে ইচ্ছে করে! সুখের গরবে ফেটে চৌচির হবে। এই বুকের ভেতরেই বিরহের, বিচ্ছেদের গভীর বেদনা দুঃসহ, শীতল হতে-হতে একদিন কঠিন, অসাড় করে তুলেছিল সব। এসব কথা ভাবতে অবাক লাগে আদিত্যর। আস্তে আস্তে সে যেন চেতনায় ফিরে আসে। কোথায় অনর্গল ঘণ্টি বাজিয়ে চলেছে কে। কাছাকাছি জাহাজের নোঙর তোলার শব্দ। মনে কেমন করে। হাত-পায়ের খিল খুলে যাচ্ছে। পাখির পালকের মত হাল্কা মনে হচ্ছে নিজেকে। আরো দ্রুত ছুটতে থাকে আদিত্য। অন্ধকার কাঁপিয়ে দিয়ে আরেকবার চেঁচিয়ে ওঠে, 'আমি যাই!' ছেলেবেলায় অন্ধকার বিছানায় আষ্টে-পিষ্টে মাকে জড়িয়ে ধরার স্মৃতি বুকের গভীরে তোলপাড় হতে থাকে। মা, আমার মা, তুমি কোথায়! আমার দেশ, জন্মভূমি! দক্ষিণ-দুয়ারী সেই ঘর! উঠোনে আলপনা আঁকা গৃহলক্ষ্মী গৃহিণীর হাতের স্পর্শ জুলেখা, খালেদ, বিদ্যুৎ......তুমি, ও আমরা সবাই......কে কোথায় হারিয়ে সব।

'আজ, এই অক্ত!' ভারি গলায় শাসনের নিপুণ ভঙ্গি ফুটিয়ে আচমকা নিজেকেই ডেকে উঠল আদিত্য।

আদিত্য যায়। দরজাটা খোলা থাকে জানলাগুলি খোলা। ঘুম আর আসে না। ভোর হয়। সূর্য ওঠে। আকাশ, গাছ, বাড়ি স্পষ্ট, প্রখর হয় ধীরে ধীরে। আর পৃথিবীতে অবিরাম মানুষের যাওয়া আসা, আসা আর যাওয়া। তার পেছনে পড়ে থাকে ঘর-দোর, অন্ধকার শূন্য ক্যানভাস। অথচ কত যত্নে তিল-তিল করে গড়ে তোলা সব। তবু জানে, আদিত্য বিশ্বাস করে এখন, হয়তো ঘণ্টি বাজিয়ে আচমকা সামনে এসে থমকে দাঁড়াবে কেউ। আফ্রিকার কালো মানুষের স্বাধীনতা কিংবা ভিয়েতনামে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণার মত গম্ভীর, গাঢ় স্বরে বলে উঠবে, 'টেলিগ্রাম'। একটি পায়ের শব্দ, ঘণ্টির আওয়াজ অথবা কারো কণ্ঠস্বর! কিছু একটা বেজে উঠবে হঠাৎ। হয়তো এখুনি বুকের ভেতর থেকে চীৎকার করে উঠবে কেউ। অপলক চোখে থাকে আদিত্য। তার চোখে ঘুম নেই।

॥ ২৪ ॥

স্বপ্নাদের বাড়ি অরূপদের বাড়ি যাবার পথেই পড়ে। অরূপের গাড়ি অনাবশ্যকভাবে সেখানেই একটা ট্রাফিক জ্যামে আটকে গেল। বিরক্তিতে কুঁচকে উঠলো অরূপের মুখ। দীপু হাসছে। অরূপ বিড় বিড় করে বললো, ধ্যাৎ তেরি, আর একটা রাস্তা ছিল, সেটা দিয়ে গেলেই হতো। শুধু শুধু এটা দিয়ে—

দীপু বললো, স্বপ্না দেখলে ভাববে, তুই ইচ্ছে করে ওদের বাড়ির সামনে গাড়ি থামিয়েছিস্।

—স্বপ্না এটুকু অন্তত জানে, আমি সে ধরনের ছেলে নই। আমি দিন পনেরো হলো এ রাস্তা দিয়ে যাইও না। আজই হঠাৎ মনের ভুলে—

—মনের আর দোষ কি বল্! আগে তো প্রত্যেকদিন বিকেলে এখানে আসত। কি এমন ঝগড়া হয়েছে, চল্ না, স্বপ্নার সঙ্গে দেখা করে আসি।

—ঝগড়া তো হয়নি।

—তবে কি হয়েছে?

—বলবো। চল, বাড়িতে যাই আগে—ভালো করে খুলে বলতে হবে, না হলে তুই বুঝতে পারবি না। দীপু, স্বপ্নার সঙ্গে আমার বিয়ে না হোক, তবু স্বপ্নার কোনো ক্ষতি হয়, তা আমি চাই না। সত্যি ওকে আমি ভালোবাসি।

—কি হয়েছে কি, বল না?

—বলবো, বাড়িতে গিয়ে বলবো।

—তোরা এখনও বড্ড ছেলেমানুও। সামান্য মান-অভিমান নিয়ে—আমি বলছি, যে-রকম জ্যাম হয়েছে, সহজে রাস্তা পাবি না। গাড়িটা সাইড কর, স্বপ্নার সঙ্গে দেখা করে যাই।

—না। তা হয় না। তা ছাড়া স্বপ্না এখন বাড়িতে নেই। কলেজ থেকে আজকাল আর ও সোজা বাড়ি ফেরে না।

—কোথায় যায়?

উত্তর না দিয়ে অরূপ একটা উদাসীন ভঙ্গি করলো। অরূপের ছোট ফর্সা মুখখানিতে সত্যিকারের বিষাদের ছায়া। দীপু একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করলো। হঠাৎ তার একটু ক্লান্তি লাগছে। এই ক্লান্তির কোনো কারণ সে চট করে বুঝতে পারলো না। অরূপ এখন নিজেকে নিয়ে খুব ব্যস্ত, স্বপ্নার কথা তার মন জুড়ে আছে—সেই কথাগুলো সে কারুর কাছে বলতে চায়। সে এখন সর্বক্ষণ নিজের কথাই শোনাবে, দীপুর কোনো কথা শোনার উৎসাহ তার নেই। সে একবারও জানতে চায় নি, দীপু তার কাছে কোনো প্রয়োজনে এসেছে কিনা। অথচ দীপু এসেছিল তার দাদার খোঁজ-খবর নেবার জন্য অরূপের বাবার সাহায্য নিতে।

কিন্তু সে কথা দীপু এখন বলতে পারবে না অরূপকে। অরূপ যে খুব ব্যস্ত। পাইকপাড়ায় বউদি এখন চাপা দুশ্চিন্তায় অধীর হয়ে পাখির মতন টলটলে চোখে তাকিয়ে আছে, আর দীপুকে এখন শুনতে হবে অরূপের প্রেমের শৌখিন মান-অভিমানের কাহিনী। এ সম্পর্কে তার কিছুই করার নেই, সে আর কি সাহায্য করবে অরূপকে! শুধু শুনে যাওয়া এবং মাঝে মাঝে মন্তব্য করার ভূমিকা তার এখন।

ট্র্যাফিকের জট খুলে গেছে, আবার চলছে অরূপের গাড়ি। দীপুর ক্লান্তিবোধ ক্রমশ বাড়ছে। ইচ্ছে হলো, হঠাৎ অরূপের গাড়ি থেকে নেমে পড়তে। এখন একটা ছেলেমানুষী প্রেমের ঝগড়ার কথা কিছুতেই তার শুনতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু অরূপকে এ কথা বললে, অরূপ মনে আঘাত পাবে। গাড়ি চালাতে চালাতেও অরূপ রাস্তার লোকদের ভালো করে দেখছে না, অন্যমনস্ক তার চোখ, সে সম্ভবত দীপুকে যা-যা বলবে, মনে মনে তাই গুছিয়ে নিচ্ছে। অরূপকে কোনো রকমে নিবৃত্ত করা যায় না? দীপু এক দৃষ্টিতে অরূপের মুখের দিকে তাকালো—অনেক সময়, এর পর কি ঘটবে, তা সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বুঝতে পারে। কিন্তু এখন কিছুই বুঝতে পারলো না, তার নিজের মন বড় অস্থির হয়ে আছে।

অরূপের বাড়ির সামনে গাড়ি থামতেই দীপু আগে নেমে দাঁড়ালো। এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে, বৈঠকখানায় অরূপের বাবা বসে আছেন। কোমরে একটা ব্যথা ওঠায় অরূপের বাবা এখন আর বাইরে বেরোন না, বাড়িতে বসেই অফিসের কাজকর্ম চালান। অরূপের বাবার সামনে দুজন লোক বসে আছেন, তাঁদের পিঠ দেখতে পাচ্ছে দীপু। এই তো সুযোগ, এখনও অরূপকে বলে তার বাবার সঙ্গে যদি একটু কথা বলা যায়। সে যদি বলে, অরূপ, স্বপ্নার কথা আমি একটু পরে শুনবো। তার আগে আমার দাদার সম্পর্কে একটু খোঁজ নেবার ব্যবস্থা করে দিবি তোর বাবাকে বলে? এ তো খুবই সাধারণ ব্যাপার, মানুষ তো বন্ধুকে এ রকম অনুরোধ করেই। তবু দীপু বলতে

পারলো না, কি রকম এক আড়ষ্টতা যেন তাকে চেপে ধরেছে, অরূপকে এই সামান্য অনুরোধটুকুও সে করতে পারছে না। অরূপের যে শোনার মন নেই—।

গাড়ির সব দরজা বন্ধ করে অরূপ বললো, দাঁড়া, বাবাকে চাবিটা দিয়ে আসি। তারপর আমরা দোতলায় বসবো।

অরূপের বাবার ঘরের দিকে দু' তিন পা এগিয়েই দীপু চিনতে পেরেছে। এক মুহূর্তের জন্য সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু এখন আর দাঁড়াবার কোনো মানে হয় না। রত্নেশ্বর ঘোষালের মুখোমুখি বসে আছেন অধ্যাপক দাশগুপ্ত —যাঁর অ্যাকাউণ্টেন্টস ফার্মে দীপু কিছু-দিন কাজ করেছিল, আর দীপুর বাবা রাসমোহন।

অধ্যাপক দাশগুপ্তই দীপুকে প্রথম দেখেছেন, হাসিমুখে বললেন, এই যে দীপঙ্কর, কেমন আছো? তোমার দাদার খোঁজ পাওয়া গেছে, ভালোই আছে। বোধ হয় কালই ছেড়ে দেবে—।

রাসমোহন একবার দীপুর দিকে তাকালেন, কোনো কথা না বলে আবার চোখ নামিয়ে নিলেন। মনে হলো, ছেলেকে
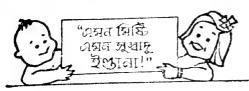
দেখে তিনি লজ্জা পেয়েছেন। দীপু কি করবে বুঝতে পারছে না। বাবাকে সে এখানে দেখবে কল্পনাও করেনি। বাবাও তাহলে শেষ পর্যন্ত দাদার খবর নিতে বেরিয়েছেন!

রত্নেশ্বর ঘোষাল দীপুকে বললেন, বসো। তারপর অরূপকে বললেন, খোকা, বম্বেতে টেলিগ্রাম দুটো পাঠিয়েছিস? স্টেট ট্রেডিং করপোরেশন থেকে কিছু খবর এসেছে?

অরূপও চেয়ার নিয়ে বসলো। দৃশ্যটা এ রকম, বসবার ঘরে সোফা-কোচের বদলে টেবিল চেয়ার, টেবিলের এক পাশে রত্নেশ্বর ঘোষাল, বাকি তিনদিকে প্রফেসার দাশগুপ্ত, রাসমোহন, অরূপ আর দীপু। দীপুর সঙ্গে রাসমোহনের এ পর্যন্ত একটিও কথা হয়নি, যারা জানে না, তারা হয়তো ভাববে ওরা দু'জন পরস্পরের অচেনা। হয়তো ওদের দু'জনের সঙ্গে আলাপও করিয়ে দিতে পারতো।

পাঁচজন মানুষ বসে আছে এক ঘরে, তবু যেন পাঁচটা জলের ধারা। রত্নেশ্বর ঘোষাল নিজের ব্যক্তিত্ব ও ক্ষমতা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন, মাত্র দশ বারো বছরে তিনি সাধারণ অবস্থা থেকে বিপুল বড়লোক হয়েছেন। কিন্তু তাঁর ভাব দেখলে মনে হয় তিনি বংশ পরম্পরায় এই সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি। নানান অজুহাতে মানুষ তাঁর কাছে কৃপা চাইতে আসবে, এইটাই যেন স্বাভাবিক। অধ্যাপক দাশগুপ্ত সস্নেহে দীপুর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, তারপর, তুমি এখন কি করো টরছো? দীপু হালকাভাবে বললো, এই, বিশেষ কিছু না—। অথচ, এই অধ্যাপক দাশগুপ্তের ব্যাগ থেকে দীপু এক সময় টাকা চুরি করেছিল—উনি জানেন সে কথা। এবং অধ্যাপক দাশগুপ্ত নিজেও যে একজন চোর এবং ঘুষখোর, সে কথাও দীপু জানে। কিন্তু হেসে কথা বলছে পরস্পর। এই কথাটা ভেবেই অবশ্য দীপুর হাসি পাচ্ছে।

ছেলের কাছে নিজের একটা দুর্বলতা ধরা পড়ে গেছে বলেই সম্ভবত রাসমোহন মুখখানা কঠোর করে আছেন, আর তাকাচ্ছেন না দীপুর দিকে। টেবিলের ওপর রাখা ডান হাতখানার দিকে চেয়ে আছেন এক দৃষ্টে। যেন উনি জ্যোতিষীর মতন দেখছেন নিজের করতলের রেখা। কিন্তু জ্যোতিষীরাও কি নিজের হাত নিজে দেখে?

অরূপ বললো, দীপু, তুই বলিস নি তো যে, তোর দাদা—। অরূপের কথার মধ্যে সে-রকম কোনো আগ্রহ নেই। দীপু জেনে, অরূপ ছটফট করছে কতক্ষণে ওপরে গিয়ে সে স্বপ্নার কথা বলবে। এ ছাড়াও; দীপু বুঝতে পারলো, সব ব্যাপারটার মধ্যে একটা মজা আছে। তার দাদা কম্যুনিস্ট পার্টির সমর্থক হিসেবে জেলে গেছে, আর তার খোঁজ খবর নেবার জন্য বাবাকে আসতে হয়েছে একজন শিল্পপতির কাছে, সরকারী মহলে যাঁর বিশেষ জানাশুনো।

রাসমোহন বললেন, তা হলে উঠি।

রত্নেশ্বর বললেন, বসুন, একটু চা দিতে বলেছি। তা হলে, চিন্তা করবেন না। হোম সেক্রেটারি তো বললেনই, ও'রা কেস তুলে নিচ্ছেন। এখনও রিলিজ করে আনা যায়। কিন্তু আপনার ছেলে কি আর আপনার কথা শুনে আসতে চাইবে?

—না, থাক। তার দরকার নেই। শুধু খবরটার —না—

—আপনি জেলে ওর সঙ্গে দেখা করতে চান? সে ব্যবস্থাও করা যেতে পারে—

—না, না।

বাবা জেলখানায় দাদার সঙ্গে দেখা করতে গেছে, এই দৃশ্যটা কল্পনা করতেই দীপুর অদ্ভুত লাগলো। দাদা যা চমকে উঠতো! দাদা কি তখনও বাবার ওপর রাগ করে থাকতে পারতো? না, অসম্ভব। দাদা যা নরম মানুষ, হয়তো কেঁদেই ফেলতো। আহা, সত্যি যদি সম্ভব হতো—বাবা যদি অহমিকা ছেড়ে সত্যিই দেখা করতে যেতো, সব ভুল বোঝাবুঝি ঘুচে যেত এক মুহূর্তে। দীপু তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, আমি দেখা করতে যাবো, আপনি একটু ব্যবস্থা করে দেবেন?

রত্নেশ্বর ঘোষাল দীপুর কথায় তেমন গুরুত্ব দিলেন না। দীপুর দিকে না তাকিয়েই বললেন, থাক, যখন দু' একদিনের মধ্যে ছাড়া পেয়ে যাচ্ছেই—

অরূপ বললো, চল্, দীপু, আমরা ওপরে যাই—

দীপু উঠে দাঁড়ালো, কিন্তু বাবার সঙ্গে একটাও কথা বলা হবে না, এটা তার খুব খারাপ লাগলো। অথচ কি কথা বলবে? বাবার সঙ্গে তার বাড়িতেই কথা হয় খুব কম, আর এখানে—। তবু সে বললো, বাবা, আমি বউদির সঙ্গে দেখা করে এসেছি কাল, বউদি ভালোই আছেন।

রাসমোহন ছেলের দিকে তাকালেন, যেন এই অবান্তর কথাটা তাঁকে শোনাবার জন্য তিনি বিরক্ত হলেন। বস্তুত, তাঁর ছেলে যে বউকে নিয়ে অন্য বাড়িতে থাকে অন্য লোকদের সামনে এ কথাটা শুনিয়ে দেওয়া তিনি সত্যিই পছন্দ করলেন না। শুধু বললেন, ও।

রত্নেশ্বর হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে অরূপকে বললেন, সাড়ে ছ'টা বাজে, তুমি শিগগির হাত মুখ ধুয়ে তৈরী হয়ে নাও! তোমাকে হাওড়া স্টেশনে যেতে হবে এক্ষুনি—অনীতা আর তপন আসছে আজ।

অরূপ দারুণ হতাশ হয়ে বললো, আমাকে এখন হাওড়া স্টেশন যেতে হবে? ড্রাইভারকে পাঠালে হয় না?

—না, শুধু ড্রাইভারকে পাঠানো খারাপ দেখায়। তাছাড়া এই নতুন ড্রাইভার তো তোমার দিদি জামাইবাবু কারুকেই চেনে না।

—ক'টায় ট্রেন?

—সাতটা পঁচিশে। আমি ফোন করেছিলাম, রাইট টাইমে আসছে। বেশী সময় নেই, তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও।

বাবার মুখের ওপর কথা বলার বিন্দুমাত্র সাহস অরূপের নেই। মুখের বিমর্ষ ও বিরক্ত ভাব ও লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করলো। দ্বিধাগ্রস্তভাবে তাকালো দীপুর দিকে।

দীপু বললো, আমি তা হলে আজ যাই, কাল দেখা করবো এখন। স্বপ্নার প্রসঙ্গ দীপুকে বলা হলো না, এটা অরূপের কিছুতেই সহ্য হচ্ছে না। সে মিনতি করে বললো, দীপু তুই-ও আমার সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে চল্ না।

—না, আমি আর হাওড়ায় যাবো না।

দীপু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লো। বেড়িয়েই খুব দ্রুত হাঁটতে লাগলো। বাবা এবং অধ্যাপক দাশগুপ্ত যদি এখন বেরিয়ে পড়েন, তাহলে তাঁদের সঙ্গে দীপু দেখা করতে চায় না। এখন ওর খুব স্বস্তি লাগছে। যে-কোনো কারণেই হোক, আজ অরূপের কাছ থেকে প্যানপ্যানানি প্রেমের কথা তার একদম শুনতে ইচ্ছে করছিল না। কি অলৌকিক ভাবে দীপু বেঁচে গেল। অরূপের দিদি জামাইবাবুকে এ জন্য ধন্যবাদ জানানো উচিত—ভাগ্যিস আজ ও'রা কলকাতায় আসা ঠিক করেছিলেন

হাজরা পার্কের কাছে এসে দীপু থামলো। এবার সে কোথায় যাবে? বাস স্টপের রেলিংয়ে দীপু ওর লম্বা শরীরটা বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো। এতবড় শহর, অথচ এক এক সময় মনে হয়, কোথাও যাবার জায়গা নেই। একটা সিগারেট ধরিয়ে দীপু ব্যগ্রভাবে বাসের নম্বর দেখছে, অথচ ঠিক কোন্ বাসে উঠবে, তা এখনও ঠিক করেনি। ভিড়ে ভর্তি বাস, রাস্তাতেও অজস্র মানুষ—এরা সবাই কোথায় যাচ্ছে? এত সব লোকজন গঙ্গার পাড়ে বেড়ায়, অন্যদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে? কিছু লোক বোধ হয় শুধু রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে, রাস্তার শোভাবর্ধন করার জন্য। মোড়ের মাথায় জটলা করছে একদল ছেলে, দীপুরই বয়েসী ওরা, কিন্তু দীপু এ রকম ভাবে আড্ডা দিতে পারে না।

(ক্রমশ)

cali-cut
ক্যালি-কট স্পেশাল
খুচরো দোকানেই পাওয়া যায়।

সারকাস

মাঠের ধান খামারে উঠে এসেছে—খামার থেকে গোলায়। হাতে এখন টাকা পয়সা পড়েছে চাষীদের। ঠিক সময় বুঝে এসেছে সারকাসের দল। পানামা সারকাস।

নীল লাল সবুজ হলদে আলো জেবলে চারটে বিরাট শালের খুঁটি পুঁতে বিশাল তাঁবু গেড়েছে বাখরাহাটে—ধানকাটা জমিতে। জমির মালিক মাখন পাল—ঘোড়ার গায়ের মতো লাল চাদর গায়ে, পায়ে নিউকাট জুতোতে হাঁটু পর্যন্ত মোজা পরা, ঘন ঘন বিড়ি টানছেন পাশে গেস্টদের চেয়ারে বসে নিজের মাজা-ভাঙা বুড়ীকে নিয়ে—তিনি বললেন, 'পনোণ্দিনের কনট্রাক'—ছ-শো টাকা দিয়েছে বেটারা। শো চললে ফের 'এক্সটিনশন' করব।'

'এত টাকা আপনি কেন নিলেন?'

'বলেন কি মশায়, এ কি বাপকেলে জায়গা? এই যে এতটা গর্ত খুঁড়ে ওরা খেলবার জায়গায় 'টৌবিল' করেছে এ সব ভরাট করবে কে? তারপর এ জমিতে কি আর-বছরে আর ধান হবে? মাটি বসে যাবে, লোকে গ্যালন গ্যালন 'পেসাব' করবে. হাতী যেখান দিয়ে যায় সত্তর হাত মাটি কাঁপে—তারপর বাঘ ডাকছে, সিংহ ডাকছে—ঐ উর্বশী মেনকারা কত কীর্তি করছে—বসুমাতা তার ফসলের ডালা গুটিয়ে নিয়ে পালাবে। আমাকে আবার 'পরাচিত্তে' পুজো করতে হবে। সার দিতে হবে। অচ্ছা, কি সার দোব বলো তো বাবা?'

'মাটি পরীক্ষা করে দেখে যা যা অভাব পড়বে দেবেন।'

'যদি ধঞ্চে, গোবরা কিম্বা ধাপার সার দিই?'

শূন্যে বারের খেলা চলছিল। একজন যুবক এক যুবতীর দুলে-এসে-ছেড়ে-দেওয়া দু'খানা হাত ধরে নিলে; আবার ছেড়ে দিতে সে শূন্য বার ধরে নিয়ে স্টেশনে ফিরে গেল। অন্য আর এক যুবতী। তারপর জোকার দুলে যেতেই তার পা না ধরে পায়জামা খুলে দিলে! সে দ্বিতীয়বার দুলতে গিয়ে বার না ধরতে পেরে নিচের জালে এসে পড়ল। কটকি একটুখানি ঘাগরা দিয়ে লজ্জা ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা দেখিয়ে হাসাতে লাগল সকলকে।

তারপর পানামা সারকাসের অদ্বিতীয় দ্বিতীয় খেলা। অন্ধকারে, শূন্যে বার থেকে বারে যাওয়া। দর্শকদের কাছে মাইকে আবেদন : দয়া করে আপনারা যেন কেউ টর্চের আলো মারবেন না, বিড়ি বা সিগারেট খাবেন না। অন্ধকারে লক্ষ্যভ্রষ্ট

হবার সম্ভাবনা আছে আমাদের ফ্লাইং এঞ্জেলদের।'

স্বপ্নালু নীলাভ ক্ষীণ আলোতে মাত্র চকচাক রেডিয়ামের মতো যুবক যুবতী আর দোলায়িত শূন্যে চলমান বারটিকে চোখে পড়ে। অপূর্ব! খেলাটি শেষ হলে জালে-ভেঙ্গে-খেয়ে-পড়ে-যাওয়া মেয়ে দুটি নেমে আসে। সালাম জানায়। তাদের মোহিনী বুকের চূড়ায় শুধু ব্রেসিয়ার বাঁধা আর জঙ্ঘায় মাত্র খানিকটা জাঙিয়া! দর্শক চক্ষু পরিতৃপ্ত। দু-ট্রিপ খেলা। এ উপ-শহরের যুবকদল মারামারি করে টিকিট সংগ্রহ করছে।

'ব্ল্যাক নাইট ফ্লাইং'-এর পর বামন জোকার

বামন জোকার—হাসানর ভঙ্গি[illegible]

বীরেন গায়েন আসে মিউজিক পার্টির কনসার্টের সুরে তাল দিয়ে অদ্ভুত হাস্যকর ভঙ্গি করে দ্রিমি দ্রিমি নাচতে নাচতে। তার হাতে কাঠের ফাঁপরা—পেটন বাড়ি। সঙ্গে কাবলাকান্ত আর এক কালো বামন। চক্ষু গোলকে চুন দেওয়া খুদে পাঁচ বছরের আর একটি ছেলেকে সং সাজানো হয়েছে! সে সং দেওয়া ভুলে যেয়ে মাঝে মাঝে ঘুরে বেড়ায়—সারকাস দেখতে আসা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ভাব করে।

'প্লাসটিক বোনলেস'-এর খেলায় একটি ছ-সাত বছরের মেয়ে। ঘোষণায় 'প্লাসটিক বোন'-এর খেলা বললেই সংগত হত। জোকাররা নানা ভঙ্গি করে লোক হাসাচ্ছে।

আমার ডান পাশে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ অফিসার বসে আছেন আপাদ মস্তক জন্তু জানোয়ারের গায়ের-লোমে-তৈরি কোট প্যান্টের উপর ওভার-কোট মুড়ি দিয়ে। বাঁ পাশে দুটি পরিচিত মহিলা, একজন বধূ/অন্যজন তার ননদিনী। দুজনেই কলেজের ছাত্রী। তাদের পাশে জমির মালিক মাখন পাল। আমরা প্রথম সারিতে। দ্বিতীয় সারিতে কয়েকজন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি। তাঁদের মধ্যে ডাঃ ইন্দুভূষণ ঘোষ। যিনি সোচ্চারে অট্টহাস্যে তাঁর দীলখোলা অভিমত অথবা বাহবা জানাচ্ছিলেন।

সারকাসের ম্যানেজার অরবিন্দ রায় মশায় এসে সিগারেট দিয়ে কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা জিজ্ঞেস করে গেলেন।

ব্যালেন্সের খেলা দেখানো হচ্ছে।

ব্যালেন্সের খেলায় নাকি পানামা সারকাসের জুড়ি নেই আর ভু-ভারতে। পায়ের উপর কাঠ খণ্ড নাচাচ্ছে, লুফছে, ঘোরাচ্ছে একটি একটু পিঠ কুঁজো মাদ্রাজী মেয়ে। তারপর চারটে বোতলের উপর চৌকি তার উপর বোতল আবার চৌকি, আবার বোতল চৌকি—তার উপরে একটা পিলসুজ বসিয়ে বাচ্চা মেয়ে তার শরীরকে দোমড়াচ্ছে, মুড়ছে। সারা গ্যালারি আর চেয়ার ভরা লোক হাততালি দিচ্ছে। ৬০ পয়সা, ৮০ পয়সা, ১·৫০ পয়সা, ২·৫০ পয়সার লোকজন—সবাই খুশী!

তারপর তারের উপর চীনে-ছাতা হাতে চারটি মেয়ের নাচ। বাজনা বাজছে তালে তালে। একটি সুন্দরী অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যবতী—হঠাৎ পড়ে গেল! জনতার তাচ্ছিল্য ধ্বনি। আবার সে উঠল। আমাদের কাছ

নাকি খারাপ অসুখ আছে! মেয়েটির উরুর পিছন দিকে চক্রাকার একটি দাদের চিহ্ন দেখা যায়। যৌবনপ্রমত্ত চেহারা। মেয়েটি হাসে। তাকায় সে কোনো সুদর্শন যুবকের দিকে। যার দিকে সে তাকায় এবং হেসে দেয় দর্শকরা আবার সেই ভাগ্যবানটিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নেয় একবার।

আমার পাশের বধূটি আমাকে রীলে করতে বললে ডাক্তারবাবুর গোপন বক্তব্যটিকে। আমি বললাম: 'ঐ মেয়েটির নাম নাকি দ্রৌপদী—পাঁচটা বর, বাইশটা দে-বর আছে—তাই অসুখ করেছে।'

'কি অসুখ?'

'বহুবল্লভাদের যে সব অসুখ করতে পারে!'

বধূটি আবার তার ননদিনীকে কি রীলে করলেন খোদা জানেন!

তারপর এল ম্যাজিক। একজন বর্ণাঢ্য পোশাকের যুবক নানান কিছু দেখাচ্ছে আর নাচছে তালে তালে। তার খেলা শেষ

পাঁচটা বর, বাইশটা দে-বর আছে—তাই অসুখ করেছে

হলে ব্যালেন্সিং ট্রাপিজ—শূন্যে হাতে বায়ে দোল খাওয়া।

এরপরে পাঁচ ফলার বর্শা পতন।

সারা তাঁবুভরা লোক স্তম্ভিত!

কিন্তু লোকটা মরল না, যদিও ভয়ঙ্কর বজ্র পতনের ঝঞ্ঝনা বেজে উঠল একসঙ্গে, অর্কেস্ট্রা সুরে। লেডি সাইকেলিংটা সামনের পুরুষ দর্শকদের জন্য দারুণ উপভোগ্য! মেয়েগুলি যখন হেঁট হয়ে সাইকেলের প্যাডেল ঘোরায় তখন তাদের ওপর চক্ষু স্থির হয়ে থাকে, পা যখন দুদিকে প্রসারিত করে বসে সাইকেল চালায় লক্ষ্যগোচর হয় তাদের নিরাবরণ পদমূল পর্যন্ত। সাইকেলের খেলা চলে অনেকক্ষণ। দু' চাকা এক চাকার সাইকেলে আরোহিনীরা নানান গতিভঙ্গি দেখায়। সেই দৃষ্টি আকর্ষণকারিণী মেয়েটি—যার নাম দিয়েছি আমরা দ্রৌপদী—তার সাইকেলে তুলে নেয় দশজনকে!

ইন্দুবাবু চিৎকার করে বলে ওঠেন: 'ফ্যামিলী প্ল্যানিং-এর দরকার নেই!'

তারপর রাশিয়ান ব্যালান্স! একটি মেয়ে ক্লিপের মতো একটি স্ট্যান্ড মুখে রেখে শূন্যে পা তোলে।

এরপর আসে আসামের জঙ্গলচারী কৃষ্ণকায় হাতী। তার পিছনে ল্যাজ ও টুপির হাওয়া দিতে দিতে আ... জোকারের দল। শেষ মাথায় বামন বাঁ বন গায়েন! হাতীর পিঠে বাঘ সোয়ারী ...ল।

ম্যানেজার অরবিন্দ রায় বলেছিলেন, দাঁত আছে বলেই এটি হাতী নয়। এটি হস্তিনী। আগের হাতীটি মারা গেছে। একবার অসুখ করলে এ আকার জীব আর বাঁচে না। এটির দাম? না না, লাখ টাকা নয়। ছ-হাজার টাকা। খায় কতটা? যত দিতে পারেন। কথায় বলে, 'হাতীর খোরাক!' এক মণ চাল দিলে খেয়ে নেবে সব আধ ঘণ্টার মধ্যে। আমরা আধ মণ চাল দিই। রুটি দিই সের সাতেক। তারপর কলাগাছ, নারকেল পাতা, বটপাতা, খড়—এইসব খায়।'

বাঘটি সুন্দর বনের। তবে শালবনের বাঘের মতোই, লম্বায় খুব বড় নয়। দাম নাকি ১০ হাজার টাকা। সিংহ আছে তিনটি। আফ্রিকান লায়ন। একটি তো বিরাট বড়। ওদের দাম ৫।৬ হাজার টাকা। আসামের চিতা বাঘ আছে তিনটি। প্রত্যেকটির দাম তিন হাজার টাকা।

সারকাসের মালিক—এস এস লাল। থাকেন ব্যারাকপুরে। আগে ছিল তাঁর শখের চিড়িয়াখানা। অরবিন্দবাবু ছাড়াও আরো তিনজন ম্যানেজার আছেন। প্রত্যেকের মাইনে ৩০০।৩৫০ টাকা।

মেয়ে আছে ১৫।১৬টি বাঙালী, নেপালী, আর মাদ্রাজী। তাদের মাইনে ৫০ থেকে ১০০ টাকা। সারকাসের পোশাক আর খোরাকী পায়।

অরবিন্দবাবু নাকি আগে ছিলেন পুলিসে। শিলচরের লোক। রাইস মিল

আছে। সারকাসের মেয়েরাই নাকি তাঁকে যাদু করে এ লাইনে এনে ফেলে। ১৫ বছর পানামা সারকাস চলছে। ২৬৮টা জায়গায় খেলেছে। ক্রমে ক্রমে এর অনেক উন্নতি হয়েছে। তবে সরকারের ট্যাক্স বড্ড বেশি।'

এখানের বাখরাহাটে তাঁরা ইলেকট্রিক সংযোগ পেয়েছেন। বর্ষাকালটায় তাঁদের বসে থাকতে হয়। মালিকের লোকসান যায়। প্রতিদিন ১৫০০শো টাকা খরচ। গত বছর লস্ গেছে। সব মিলিয়ে প্রায় ২০০ জন লোক আছে পানামা সারকাসে। বিশ কিলো গো-মাংস লাগে বাঘ আর সিংহ সাতটার জন্যে। বাখরাহাটে চাল আনাজ বেশ সস্তা এবং সবই টাটকা পাওয়া যাচ্ছে। শুধু বীফটা আনতে হচ্ছে দূর থেকে। বাখরাহাট হিন্দু-প্রধান বলে বীফটা নাকি চালাতে দেয় না।'

মজার গান চলছে : গোলেমালে, গোলেমালে পীরিত কোরো না, পীরিতি কাটালের আঠা জড়ালে আর ছাড়বে না। গোলেমালে পীরিত কোরো না।

টিয়া পাখির খেলা চলছে এবার। পাখি রিকশা টানছে; আর একটা পাখিকে ঠোঁটে শূন্যে ঝুলিয়ে দোল খাওয়াচ্ছে। পাখি কামান দাগলে সারা পরিবেশ কাঁপিয়ে! তারপর মইয়ের উপরে উঠে নাচ দেখানো। একটি সুন্দর-মুখ—ষোড়শী যে রিং মাস্টারের ফাজলামি বা ফষ্টিনষ্টি পছন্দ করে না, পছন্দ করে সেই দ্রৌপদী—সে তিনটি বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে অদ্ভুত নাচ দেখিয়ে যায়।

তারপর আসে ঘোড়ার তামাশা।

ঘোড়া নাকি শোয় না?

একটি নকশা দেখানো হয়।

এক জোকার চলেছে হেঁটে।

মাস্টার শুধোয়, 'এই কোথায় যাচ্ছ?'

জোকার বলে, শ্বশুরবাড়ি যাব। একটা ঘোড়া কিনতে যাচ্ছি।'

'আমার ঘোড়া আছে।' ঘোড়া এল।

'এর নাম ঘোড়া? এর পিছনে দাঁড়ি কেন?

'ওটা ল্যাজ।'

তখন ঘোড়াওয়ালার ল্যাজ আছে কিনা জোকার দেখে।

পরে অভিযোগ : ঘোড়া ফাটা! অর্থাৎ তার মুখটা ফাটা। তারপর পেটের নিচে তাকিয়ে দর্শকদের হাসানো। আদি রসাত্মক কিছু না বলে জোকার কিন্তু বলে, 'এই রিং মাস্টার, তোমার ঘোড়া আধখানা। এর পায়ের তলায় ফাঁকা!'

রিং মাস্টার বলে, সবায়েরই তাই থাকে।'

তখন জোকার পা ফাঁক করে হাত চালিয়ে দেখে, সত্যিই তো!

অতএব ঘোড়া পছন্দ। দাম কত? পাঁচ শো টাকা।

পাঁচ সিকে?

আচ্ছা, তাই দাও। ঘোড়া কিনে জোকার-ডনকুইকসোট পিঠে উঠতেই সে মনিবের শ্বশুরবাড়ি না নিয়ে গিয়ে কেবলই পাক খেতে থাকে এবং এক সময় শুয়ে পড়ে। মরার মতো চোখ বন্ধ করে থাকে।

রিং মাস্টার এসে বলে, ঘোড়া মারা গেছে। সৎকার করা লোক ডেকে আনো। সে লোক ডেকে এনে দেখে ঘোড়া নেই। শেষে কার্পেট তুলে অনুসন্ধান করতে থাকলে তাকে দেখানো হয় সৎকারের জন্য ঘোড়াকে একটা কাঠের উপর তুলে বেশ করে চটের মধ্যে বাঁধা হয়েছে।

তখন জোকাররা সবাই লাইন দিয়ে কাঁদিতে বসে। অবিকল মেয়েদের গলা। একজন গালে হাত দিয়ে কাঁদছে : 'ওগো আমার শ্বশুরের ছাওয়াল গো! ওগো আমার মন্দ মানশষ গো! ওগো তুমি বিহনে আমার রাত কাটবে কেমন করে গো।'

বামন বীরেন গায়েন চিৎকার করে কাঁদে : 'ওগো আমার ভাতার-বাবা গো!'

তখন অট্টরোলে হেসে লুটোপুটি খায় সকলে।

আমার পাশের বউটি হঠাৎ হেসে আমার গায়ে মাথা কুটতে গিয়ে এক থাবড়া সিঁদুর লাগিয়ে দিলে কাপড়ে।

সবাই তখন 'বলো হরি হরি বোল, হরি' ধ্বনি দিয়ে মরা ঘোড়াকে মাথায় তুলেছে। ঘোড়াটি নড়েও না!

পাঁচ সিকেতে যে ঘোড়া কিনেছিল তার কান্না তখন দেখে কে! তাকে ধরে রাখা দায়! সহমরণে যেতে চায় যেন সে! পাশের ননদিনীটি এত হাসছিল যে আমি সেই হাসিতে সংক্রামিত হচ্ছিলাম। বললাম, 'ওকে ধরো।'

ডাক্তার হাহা করে হাসছেন।

দারোগা সাহেব হাসছেন দমকে দমকে ভুঁড়ি নাচিয়ে নাচিয়ে। কিন্তু আশ্চর্য একটি দৃশ্য আমি আগাগোড়া লক্ষ্য করছিলাম। কমরেড আদ্যনাথ মণ্ডল আদৌ হাসছিলেন না। গম্ভীর হয়ে আড়াই ঘণ্টা বসে আছেন ডান দিকের গেস্ট সিটের ঠিক মাঝখানটাতে। বোধ হয় সারকাসের মেয়েদের নগ্নতার রোমান্টিক আবেদন তাঁর মেজাজটা বিগড়ে দিয়ে থাকবে।

ব্যাপারটা নিয়ে ইন্দুবাবুকে বলতে তিনি বললেন, 'হালকা হৃদয়বৃত্তির লোক ও'রা না! তারপর একটা অঞ্চলের প্রধান তো—লোকজন দেখলে কি ভাববে?'

'কিন্তু উনি হাসিটিকে চেপে রেখেছেন কোন শক্তিতে?'

'সেইটাকে উপলব্ধি করতে পারলে তো মশায় আমিও একজন ঐ রকম ভারী লোক

হয়ে যেতাম। ও'রা বোধ হয় হাসি ভাল বাসেন না, ভালবাসেন কান্না! তার মধ্যে বিপ্লবের বীজ আছে। কমরেড বলেছেন...' তিনি হেসে গলা খ্যাঁকার দিয়ে কিছু বলবার জন্যে তৈরি হতেই আমি বললাম, 'থাক।'

দানিয়েল রিচার্ড যিনি সিনেমার কোন সার্কাসে নাকি মোটর সাইকেলে জাম্প করা দেখিয়েছেন, তিনি ভীষণ গর্জন তুলে এসে জাম্পিং করে গেলেন দু-দু-বার। লোহার খাঁচার মধ্যে ভীম গর্জন তুলে ভীম রাও মোটর সাইকেল চালালেন।

টারজেন বিশ্বনাথ এলেন ভারোত্তলন করতে। ৩০০ পাউন্ড ওজনের বারবেল তুললেন তিনি মাথার উপরে। ২৭৫ পাউন্ডকে দাঁতে খিঁচে তুললেন। তারপর ১৫০ পাউন্ড পায়ের উপর নেওয়ার পর আরো পাঁচজনকে চাপিয়ে পায়ের শক্তি দেখালেন।

এরপরের দৃশ্য : মিসেস তুতীন সান্যালের হাতী বুকে রাখা। বিশেষ যোগ-বলে তিনি নাকি ঐ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। তিনি পিঠে কোমরের নিচে বালিশ দিয়ে শুলেন। বড়সড় চেহারা। মধ্যম বয়স। কোলের উপর, বুকের উপর বালিশ দিলেন। কপালে ফেটি বাঁধলেন। একটা তক্তা দেওয়া হল ঠিক জঙ্ঘার উপর দিয়ে। তিনি হাত দুটি উরুর নিচে ঢোকালেন। তারপর ইঙ্গিত মতো হাতীকে তোলা হল। সম্পূর্ণ ভার পড়ল এক সেকেন্ড। হাতী নেমে গেলে তিনি উঠে চলে গেলেন।

ডাক্তার ইন্দুভূষণ ঘোষ তো তাজ্জব! মুখে বাক সরে না। বললেন, 'বুঝুন ঠ্যালা!' কানে কানে বললাম, 'যারা বুকে হাতী রাখতে পারে তারা পুরুষ ছাওয়ালদের কি, মনে করে?'

তিনি হেসে উঠলেন।

বধূটি বললেন, 'কি ব্যাপার?'

'না, কিছু না। আপনাদের শুনতে নেই।'

'শুনি না।'

'বলছিলাম যারা হাতী বুকে রাখতে পারে তারা পুরুষদের কি মনে করে?'

আমাকে বউটি চিমটি কাটলে। আবার সে ননদিনীকে রীলে করলে কথাটি। সে হাসতে হাসতে আমাকে চোখের কোণ দিয়ে তীর হানলে. বউটি 'তুই হাসছিস' কেন, তুই কি জানিস?'

বললাম, 'আধুনিকারা অনেক কিছু আজকাল জানে!'

ননদিনী গম্ভীর হয়ে গিয়ে মুখ ভেঙচে দিলে!

হঠাৎ দেখা গেল দুটি মেয়ে তির্যকভাবে মাটি থেকে ঊর্ধ্বে উঠে যাচ্ছে দুদিকে পতাকা দেওয়া একটা করে হালকা হাত দশেক বাঁশ হাতে নিয়ে মোটা তারে পা দিয়ে দিয়ে। আবার নেমে আসছে তারা। আবার উঠে নিচে নেমে এল। তারপর তাদের এক-জন পাছার তলায় খানিকটা লোহার পিঁড়ি বসিয়ে অতি দ্রুত গতিতে। এটি নাকি ভারতীয় রকেট। জোকার বললে, 'রাশিয়ান রকেট ঊর্ধ্বে যায়, ভারতীয় রকেট নিচে নামে? অন্যজন বলে, 'কারণ স্পীড আমাদের বেশি।'

তারপর সব মেয়েরা এসে দেখায় জিমন্যাসটিক।

তখন সুদর্শনা যৌবন পাগল দ্রৌপদী আমাদের মধ্যে বার বার তাকিয়ে হেসে দেওয়া ছোকরাটিকে দেখায়। দুজনে কথা বলাবলি করে হাসে।

ডাক্তারবাবু বলেন, 'মরেছে বেটা!'

দারোগা বললেন, 'আপনি তো আছেন।' ইনজেকশন থাকতে ওসবকে আর কেউ ডরায় না।'

এরপর শেষ দৃশ্য। তিনটে সিংহ, তিনটে চিতা বাঘ, একটি বাঘ, দুটি ছাগল এল। রেলিং ঘেরা হয়েছে তার আগে। ভেতরে তিনজন মানুষ। লোহার কাঁটা দাঁড় করানো আছে দুটি। মাস্টারের হাতে ছড়ি আর হান্টার। বাঘটা শিক্ষিত। যদিও আফিম খাইয়ে খাইয়ে তাদের নাকি অনেকটা অহিংস্র করা হয়েছে। বড় সিংহটি ভয়ঙ্কর। একটি চিতাবাঘ ভীষণ রাগী। পুরুষ বাঘের খাঁচার মধ্যে মাদী চিতা বাঘ রাখা হয়। সিংহ তিনটিকে বাচ্চা বেলায় আনা হয়েছিল।

দুর্গন্ধে অস্থির। উঠে পড়েছিলাম।

কনকনে শীত। গেটের কাছে অরবিন্দ-বাবু। নমস্কার করে চলে আসবার সময় তিনি বললেন, 'বাচ্চাদের আর একদিন আনবেন।'

তাঁর মুখ থেকে মদের গন্ধ বের হচ্ছে উদ্ভট।

সেই গন্ধ আমাকে সারকাসের নেপথ্য-জীবনের রোমান্স আর ট্রাজিডির ইশারা করলে। অরবিন্দবাবু বাস ধরার পথ পর্যন্ত সাথে এলেন কথা বলতে বলতে : 'সুখ নেই স্যার, ঐ আলো বাজনা নাচ ঐ যুবতীদের যৌবন—ওখানে সুখ নেই। মিথ্যা বালুচর—চোরাবালির দহ—মরীচিকা!'...'আমাদের চাইতে আবার আরো দুঃখী মেয়েরা—তাদের যৌবন গেল, দেহ গেল তো ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল—তাদের সংসার হল না যৌবনে—সংসার করলে ঈর্ষা-হানাহানি...শেষ জীবনটা তাদের বহু ভোগ্যা পতিতাদের মতো নিঃস্ব-নিঃসম্বল—অসহায়!' হেসে বললেন, 'আর সংসারটাও তো সারকাস!'

—আবদুল জব্বার

একটি প্রাচীন রোগ ও তার প্রতিকার
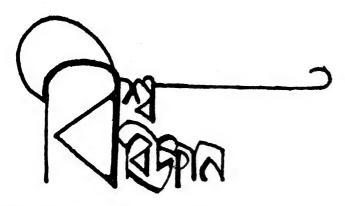
হ্যাঁ রোগটা যেমন প্রাচীন, আর তার আক্রমণ বা প্রভাবও যাঁরা বয়সে প্রাচীন তাঁদের ওপরই বেশী। বাইবেলীয়, এমন কি তারও পুরনো আমল থেকে এই রোগটির উল্লেখ পাওয়া যায়। তখন লোকে একে বলত, 'কাঁপুনি বেতো রোগ'। অদ্ভুত এই ব্যাধি শরীরে কখন যে দানা বাঁধতে শুরু করে রোগী নিজেই তা টের পায় না। ধীরে ধীরে দেহের সমস্ত পেশী বা স্নায়ুতন্ত্র সে গ্রাস করতে থাকে। তখন শরীরের বিভিন্ন অংশ অহেতুক কাঁপতে শুরু করে। দেহের পেশী নমনীয়তা হারিয়ে শক্ত হয়ে যায়। এ সময়ে হঠাৎ চোখে পড়বে, যখন কেউ হেঁটে চলেছেন, তখন তাঁর বাহু দুটি সাধারণ স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন আন্দোলিত হয়ে থাকে ঠিক তেমনটি যেন হচ্ছে না। কতকটা অনড় ভাব। মাঝে মাঝে হাত দুটি কাঁপতে থাকে অথবা সব সময়েই তারা যেন অত্যন্ত মৃদুভাবে কেঁপে চলেছে। আর এই কম্পন পা অথবা চোয়ালেও লক্ষ্য করা যেতে পারে।

অবশেষে রোগের প্রভাব বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের বিভিন্ন অংশ, যেমন কাঁধ, হাত পা প্রভৃতি শক্ত বা অনমনীয় হয়ে যায়। ফলে চলাফেরা করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। সামান্য একটি দৈহিক কাজের জন্যে প্রচুর কষ্ট সহ্য করতে হয়। সেই সঙ্গে দুর্বলতা এবং মানসিক ব্যর্থতা রোগীকে গ্রাস করতে থাকে। দেহের কাঁপুনি মাঝে মাঝে এমন ভয়ঙ্কর হয়ে পড়ে যে, কারুর কারুর ক্ষেত্রে খাওয়া-পরার কাজ চালানও বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। চালাফেরা, লেখা, কোন কিছু গিলে খাওয়া, চোখের পাতা নড়ান, এমন কি বিছানায় শুয়ে পাশ ফেরাও অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। শুধু এটুকুই আশার কথা, রোগটি মানুষের বুদ্ধি-চেতনাকে নষ্ট করে ফেলে না, যদিও দৈহিক অসামর্থ্য মনটাকে বেশ কিছুটা ভেঙে দিয়ে যায়। তাছাড়া রোগটির প্রভাবও এত ধীরগতিতে চলতে থাকে যে, দীর্ঘকাল মোটামুটি অসুবিধে ছাড়া চট করে প্রাণান্তকর কোন কিছু ঘটার মত আশঙ্কা থাকে না। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে 'কাঁপুনি বেতো রোগের উপর একটি প্রবন্ধ' এই শিরনামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন সোরেডিচ-এর একজন সাধারণ চিকিৎসক জেমস পার্কিনসন। এই রোগ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে প্রবন্ধটিতে তিনি মন্তব্য করেন : 'এটি এমন একটি রোগ যা দেহের মধ্যে একটা অহেতুক কম্পন সৃষ্টি করে, পেশী কমজোর হয়ে যায়। শরীর সামনের দিকে ঝুঁকে পড়তে চায়। সাধারণ-ভাবে হেঁটে চলতে গিয়ে পায়ের ধাপ পড়ে যেন দৌড়নোর মত। দৈহিক এবং মানসিক অনুভূতি ব্যাহত হয়।' সেই থেকে রোগটির নাম হয়ে গেল **পার্কিনসন রোগ।**

কেন এবং কিভাবে পার্কিনসন রোগ শরীরের মধ্যে দানা বাঁধতে শুরু করে বিশেষজ্ঞদের কাছে আজও তা রহস্যাবৃত হয়ে রয়েছে। তবে লক্ষ্য করা গেছে 'এনসেফালিটিস লেথারজিকা' নামে মস্তিষ্কে ভাইরাস সংক্রামণঘটিত এক ধরনের রোগের আক্রমণের পরই অনেকেরই মধ্যে পার্কিনসন রোগ চোখে পড়েছে। ১৯১৭-১৯২০ সালে বৃটেনে শেষবারের মত মস্তিষ্কের ঐ রোগটি মহামারীরূপে দেখা দিয়েছিল। অনেকেই এতে মারা যান। যাঁরা রক্ষা পান তাঁদের অনেকের মধ্যেই পার্কিনসন রোগ ধরা পড়ে। শেষের এই হতভাগ্যদের দলটির কেউ কেউ আজও জীবিত রয়েছেন। তাঁরা আজ পঙ্গু, অথর্ব অথবা স্থাণু হয়ে জীবনের অবশিষ্ট মুহূর্তগুলি শুধু গুণে চলেছেন।

কোন কোন বিশেষজ্ঞ মনে করেন বর্তমানে কোন কোন ওষুধের অত্যধিক ব্যবহারের দুরুনও এ ধরনের রোগ হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ ক্লোরোপ্রোমাজিন নামে এক ধরনের ঘুমের ওষুধের কথা বলা চলে। কারুর মত, বার্ধক্য হেতু শরীরের শিরা-উপশিরা কঠিন হয়ে গিয়েও এই রোগটি হতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিষাক্ত কার্বন-মনোক্সাইড বা ম্যাঙ্গানিজও এই রোগটির উৎপত্তির অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। অনেক সময় কারুর মাথায় আঘাতের ফলেও পার্কিনসন রোগ হতে দেখা গেছে।

তবে অদ্ভুত একটি ব্যাপার চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা কিন্তু লক্ষ্য করেছেন : এঁরা দেখেছেন এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির 'অগ্র-মস্তিষ্কের মূলদেশে যে স্নায়ু-কোষের গুচ্ছ থাকে যার ইংরেজী নাম বেসাল গ্যাংগ্লিয়া, তার মধ্যেকার বেশ কিছু সংখ্যক কোষ যেন নষ্ট হয়ে গেছে। গত দশ বছর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, শুধু স্নায়ু-কোষেরই ক্ষতি নয়, মস্তিষ্কের জীব-রসায়নজনিত ত্রুটিও এই রোগের ফলে ধরা

পড়েছে। বেসাল গ্যাংগ্লিয়ার বৃহত্তম খণ্ড যার নাম কাউডেট নিউক্লিয়াস তার মধ্যে ডোপামাইন নামে এক ধরনের রাসায়নিক বস্তু থাকে। এই রাসায়নিক বস্তুটির কাজ অনুভূতির কোন সংকেত যখন একটি স্নায়ু-কোষের মধ্যে দিয়ে অপর স্নায়ু-কোষে বিচরণ করে তখন তাকে যথাযথ নিয়ন্ত্রিত করা। দেখা গেছে পার্কিনসন-রোগীর কাউডেট নিউক্লিয়াসের মধ্যে এই ডোপামাইনের মাত্রা অনেক কম।

কিন্তু কে এই ডোপামাইন যে প্রাণীদের যাবতীয় অনুভূতির উপর কর্তৃত্ব চালিয়ে তাদের নিয়ম মাফিক পথ ধরে কাজ করিয়ে নেয়? শীত এবং উত্তাপ, স্থূল দৈহিক আঘাত এবং মানসিক স্পর্শ, শব্দ, বিদ্যুৎ, আলোক প্রভৃতি ভৌতিক শক্তির প্রভাব এরাই তো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মস্তিষ্কের স্নায়ু মণ্ডলে উপস্থিত হয়ে যাকে আমরা বলি মানসিক চেতনা, তাকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে? আধুনিক শারীরতত্ত্ববিদদের মতে এই চেতনার রকমফের অথবা তার বাহ্যিক প্রকাশের নিয়ন্ত্রক হিসেবে জীব-রাসায়নিক বা বাইয়ো-কেমিক্যাল পদার্থ ডোপামাইনের ভূমিকা অপরিহার্য।

অণুবীক্ষণযন্ত্রের আধুনিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের ঠিক কোন কোন অঞ্চলে এই ডোপামাইন বাস করে বিশেষজ্ঞরা তা জানতে পেরেছেন। এর জন্যে তাঁরা মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ স্থানের কোষ-কলা বিচ্ছিন্ন করে ঠাণ্ডা করে জমাট বাঁধিয়ে নেন। তারপর সেই জমাট কোষ-কলাকে শুকিয়ে ফরম্যালডেহাইড বাষ্পের সংস্পর্শে রেখে দেওয়া হয়। ঐ বাষ্প কোষের মধ্যেকার প্রোটিনের সান্নিধ্যে এসে ডোপামাইন এবং অনুরূপ রাসায়নিক যোগকে আইসোকুইনোলিনস-এ পরিবর্তিত করে। এই পরিবর্তিত রাসায়নিক যোগকে যখন অতি-বেগুনী রশ্মির মাধ্যমে দেখা হয় তখন তার উপর পরিষ্কার একটি প্রতিপ্রভা লক্ষ্য করা যায়। মস্তিষ্কের কোষকলা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বিচ্ছিন্ন করে এই পদ্ধতিতে পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, অতি-বেগুনী আলোর সংস্পর্শে এসে ডোপামাইনঘটিত স্নায়ুকোষ উজ্জ্বল সবুজ রংএর প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করেছে। একই পদ্ধতিতে বেসাল গ্যাংগ্লিয়ার উপর পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, ডোপামাইন শুধুমাত্র ওই 'সাবসটানসিয়া নায়েগ্রা'র স্নায়ুকোষের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত থাকে; কিন্তু কাউডেট নিউক্লিয়াসের অতি সূক্ষ্ম স্নায়ু-তন্তুর অগ্রভাগেই ডোপামাইনের অস্তিত্ব ধরা পড়ে, কিন্তু তার স্নায়ুকোষের অন্যত্র এই জীব-রাসায়নিক যৌগটি চোখে পড়ে না।

আর এখান থেকেই পাওয়া গেল অদ্ভুত একটি সূত্র। দেখা গেল ঐ 'সাবসটানসিয়া নায়েগ্রা'র সঙ্গে 'কাউডেট নিউক্লিয়াস' অত্যন্ত 'কাউডেট নিউক্লিয়াস' অত্যন্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্তুর বন্ধনীতে যুক্ত। কেউ কেউ মনে করেন, সাবসটানসিয়া নায়েগ্রার স্নায়ুকোষ সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে তৈরি করে ডোপামাইন। এই ডোপামাইন প্রয়োজনের তাগিদে সূক্ষ্ম স্নায়ু-তন্তুর মধ্যে দিয়ে কাউডেট নিউক্লিয়াসে গিয়ে জমে থাকে। শারীরিক বা মানসিক সংঘাতে যখন দেহের স্নায়ুতন্ত্র সক্রিয় হয়ে ওঠে শুধুমাত্র তখনই স্নায়ুতন্ত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করার জন্যে কাউডেট নিউক্লিয়াস থেকে জমে থাকা সেই ডোপামাইন নিসৃত হয়। যদি কোন কারণে আঘাতের ফলে সাবসটানসিয়া নায়েগ্রার ক্ষতি হয় অথবা তার সঙ্গে কাউডেট নিউক্লিয়াসের সংযোগকারী সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্ত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করার, তখন স্নায়বিক স্পন্দন বা ডোপামাইন বা উভয়ের মধ্যে আর চলাচল করতে পারে না। নিউক্লিয়াসের মধ্যেও কোন ডোপামাইন বিমুক্ত হয় না।

কিন্তু স্নায়ু-কোষের কার্যাবলীর উপর এই ডোপামাইনের মূল প্রভাবই বা কতটুকু? জীব-রাসায়ন বিজ্ঞানীদের কাছে এটাই একমাত্র বড় প্রশ্ন। সাউথ হ্যাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিজ্ঞান এবং জীব রাসায়ন বিদ্যার অধ্যাপক ডঃ এডোয়ার্ড সেজউইক-এর মতে কাউডেট নিউক্লিয়াসের স্নায়ু-কোষের মধ্যে ডোপামাইন অগ্রসর হয়ে তাদের কার্যাবলী সংহত করে। কাউডেট নিউক্লিয়াসের অন্যান্য স্নায়ুতন্তুর অগ্রভাগ তখন অ্যাসেটাইলকোলাইন নামে আর এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ নিসৃত করে। এই দ্বিতীয় পদার্থটিই সেখানকার কোষসমূহের মধ্যে স্পন্দন বা উত্তেজনা ঘটায়। অনেকের মতে ডোপামাইনের অনুপস্থিতি অ্যাসেটাইলকোলাইনের দ্বারা সৃষ্ট কাউডেট নিউক্লিয়াসের স্নায়বিক প্রক্রিয়া ব্যাহত করে। আর এরই পরোক্ষ ফল শরীরের বিভিন্ন অংশের অব্যাহত মৃদু কম্পন অথবা দেহ-পেশীর মধ্যে অনমনীয় অবস্থার সৃষ্টি। যার নাম দেওয়া হয়েছে পার্কিনসন রোগ। যদি এই তত্ত্ব বাস্তবক্ষেত্রে যথাযথ মিলে যায় তাহলে ঐ ধরনের রোগের নিরাময়ের ব্যাপারে চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মূল লক্ষ্য গিয়ে দাঁড়াবে, উত্তেজক অ্যাসেটাইলকোলাইন এবং তার সংহতকারী ডোপামাইনের মধ্যে কিভাবে একটা সাম্য অবস্থা রক্ষা করা যায় সেটাই আবিষ্কার করা।

বিগত ১৯১০ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী সময় থেকে এ পর্যন্ত বেলেডোনা ঘটিত ওষুধ ব্যবহার করে পার্কিনসন রোগ নিরাময়ের ব্যাপারে যথেষ্ট সুফল পাওয়া গেছে। অ্যাট্রোপিন, হাইওসাইন প্রভৃতি ওষুধও অনেক ক্ষেত্রে অ্যাসেটাইলকোলাইন এবং ডোপামাইনের মধ্যে যথাযথ সাম্যতা বজায় রেখে রোগের আংশিক উপশমের ব্যাপারে সহায়তা করেছে। কিন্তু মুশকিল হল, এই সমস্ত ওষুধ রোগ নিরাময়ের ব্যাপারে কিছুটা সাহায্য করলেও পরবর্তীকালে রোগীর মধ্যে কিছু কিছু বাজে উপসর্গও টেনে আনে। তাঁদের মধ্যে জিভ শুকিয়ে যাওয়া, দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হয়ে যাওয়া অথবা বমি বমি ভাব লক্ষ্য করা গেছে।

বিকল্প ব্যবস্থা স্বরূপ আরও একটি কথা বিশেষজ্ঞরা অবশ্য ভেবে দেখেছেন। এঁদের লক্ষ্য, ডোপামাইনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। এবং সেটি এঁরা করতে চান লেভোডাইহাড্রোক্সিফিনাইলঅ্যালানিন বা সংক্ষেপে এল-ডোপা নামে এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ ব্যবহার করে। স্নায়ু-কোষের অগ্রভাগের তন্তুর মধ্যে থাকে ডোপামাইন। পার্কিনসন রোগের ফলে সেই তন্তুর অনেকগুলিই নষ্ট হয়ে যায়। এ ধরনের চিকিৎসার মূল উদ্দেশ্য হবে অবশিষ্ট যে তন্তুগুলি বেঁচে থাকে তাদের মধ্যে এল-ডোপার সাহায্যে ডোপামাইনের মাত্রা বৃদ্ধি করা। সেখানে সরাসরি ডোপামাইন যোগান সম্ভব নয়। কারণ রক্তপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে ডোপামাইন মস্তিষ্কে গিয়ে পৌঁছতে পারে না। এই বাধাটি কিন্তু এল-ডোপা সহজেই অতিক্রম করতে পারে। এল-ডোপা মস্তিষ্কে গিয়ে তার মধ্যেকার ডোপ-ডিকার্বোক্সাইলেজ নামে এক ধরনের জারক-রসের সান্নিধ্যে এসে ডোপামাইন-এ রূপান্তরিত হয়ে যায়।

তবে চিকিৎসার ব্যাপারে এল-ডোপার ব্যবহার খুবই সীমিত। কারণ অত্যন্ত বিশুদ্ধ অবস্থায় এটিকে সংগ্রহ করা খুবই শক্ত। যেটুকুও বা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় তাতে খরচ এত বেশী পড়ে যে সাধারণের পক্ষে তা কতকটা নাগালের বাইরে চলে যায়। তবে নতুন এই ওষুধটির প্রয়োগের ফলে দেহ-পেশীর কাঠিন্য রোগের জড়তায় যাঁরা ভোগেন তাঁদের অনেকেই বেশ সুফল পেয়েছেন। কিছু কিছু কুফল এক্ষেত্রেও অবশ্য দেখা গেছে, যেমন বমি বমি ভাব, দাঁড়ানর সময়ে রক্তচাপের বৃদ্ধি প্রভৃতি। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে এ সমস্ত উপসর্গ দূর করার উপায় আবিষ্কার করা অসম্ভব হবে না। ইতিমধ্যে অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে এই ওষুধটি মিশিয়ে দিয়ে বমি ভাবটা অনেকটা দূর করা গেছে। আরও বিভিন্ন পদ্ধতির কথা ভাবছেন বিশেষজ্ঞরা। সাফল্যমণ্ডিত হলে, হয়ত এল-ডোপা একটি বহু পুরাতন রোগের নিরাময়ের ব্যাপারটা ত্বরান্বিত করতে পারবে। তখন দেহ-পেশীর কাঠিন্য বা সদা স্পন্দনের জড়তায় যাঁরা জীবিত অবস্থাতেই আংশিক পঙ্গুর জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়ে থাকেন, তাঁরা তার হাত থেকে রক্ষা পাবেন।

সমরজিৎ কর

আবার সেই নূতন করে কিমনোর বাহার, ঘুরে ফিরে চোখ ওখানেই আটকে যায়। মুখে চোখে হাসির ছটা। যে যেদিকে পারল বেরিয়ে পড়ল। নূতন বছরের শুরুতে লম্বা ছুটি। আমাদের পুজোর বন্ধ। যারা ব্যবসায়ী তারা ১৯৭০ সালের জন্য হিসাব গুনছেন। যাঁরা মাস মাইনার মানুষ তাঁরা গত বছরের তুলনায় বেশী বোনাস পকেটে বাড়ি ফিরলেন। এক কথায় জাপানের সবটুকুই বাড়-বাড়ন্ত, ভরা যৌবন। রাজনীতির খেলাতেও সাতো-সান আমেরিকা ফেরৎ এসেই শুনিয়ে দিলেন, বাজী মাৎ—১৯৭২ সালের মধ্যেই ওকি-নাওয়া ফেরৎ পেয়ে যাচ্ছি। তা নিয়ে অনেক বাক-বিতণ্ডা চলল—চলছেও। কিন্তু নূতন নির্বাচনে পুনরায় মানুষের দল তাদের প্রতিশ্রুতির স্বীকৃতিতেই ভোট দিল সাতো-সানকে। না, তারা আজও সেই বিভীষিকাময় দিনগুলো ভুলতে পারেনি। যে দেশে চালের অভাবে রেশন করেও চাল পেত না মানুষ, আজ সে দেশ দু বছরের চাল মজুত করে মাথায় হাত দিয়েছে এত খাবার নিয়ে করবে কি? এমন কত কি আছে আজ জাপানের সামনে। লিখতে গেলে শেষ নেই। কিন্তু এসব যেন কেমন একঘেয়ে হয়ে পড়েছে মনে হয়। কদিন আগে একবার দেশে গেলে আমার বোন সিপ্রা বলেছিল, কি লেখ বিকাশদা, আজকাল ওসব রাজনীতিটীতি কটকটে কিছু আমরা বুঝি না। তাই ভাবছিলাম কী লেখা যায়। আবার এমনি করেই ঘরে বসে পরিবার-পুত্র নিয়ে আটপৌরে বাঙ্গালী মতে ছুটিটাও কাটিয়ে দিলাম। না, ঘরে বসা আর হল না, ছুটি পেরুতেই বাইরে বেরুতে হল। লম্বা পাড়ি।

বেশ শীত পড়েছে জাপানে। বরফ পড়াও শুরু হয়ে গেছে। গাছের পাতা ঝরা শেষ। তাদের গায়ে গায়ে ওষুধ আর খড় দিয়ে জামা পরান। এমনই এক রোদ ঝলমলে দিনে উঠলাম "হিকারী" (বিদ্যুৎ)তে। সব থেকে দ্রুতগামী ট্রেনের নাম। তিন ঘণ্টা দশ মিনিটে ৬০০ মিঃ মিঃ পাড়ি জমালাম। নামলাম ওসাকাতে। ওসাকা এখন তামাম দুনিয়ার দৃষ্টি কেন্দ্র। এক্সপো-৭০ নিয়ে তুমুল মাতামাতি।

জাপানীদের সাথে সাথে বিদেশীরাও সেদিন Meiji Shrine এ জড় হয়েছে। (Jan 1, 1970)

পৃথিবীতে প্রায় দেশই এসেছে সেখানে পসরা সাজাতে। কৃষ্টি আর উদ্ভাবনী শক্তির প্রতিযোগিতাতে সকলে বিভোর। তার মাঝেই ভারতের এক প্যাভেলিয়ান উঠবে: প্রথমত শুনেছিলাম ভারত এখানে কোন স্থান নেবে না। যা হোক গতবার শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এসে আমাদের প্যাভেলিয়ানের শুরু করেছেন। সে প্যাভেলিয়ানের বেশ জাঁক আছে। ৫৬৩৭ স্কোয়ার-মিটার যায়গা জুড়ে তার স্থান। পৃথিবীর প্রথম দশটি বৃহৎ প্যাভেলিয়ানের একটি। এর চারুকলার উপর সারা ভারতব্যাপী এক প্রতিযোগিতা হয়েছিল। স্থাপত্য-শিল্পের অধ্যাপক জাংবির সচদেব-এর অংকনই সেখানে সকলের স্বীকৃতি আদায় করে। এর বহির্ভাগ-এর জন্য খরচ পড়বে চারশ' মিলিয়ন ইয়েন আর ভেতরের কারুকার্য সাজ-সজ্জাতে আরও দুশ' মিলিয়ন ইয়েন খরচ পড়বে। সব মিলিয়ে দশ মিলিয়ন ইয়েন এতে খরচ হবে। মনে হচ্ছে বেশ দর্শনধারীই হবে। হোটেলগুলোতে স্থান পাওয়া প্রায় অসম্ভব। কাগজে কাগজে ছেলেমেয়ের চাহিদা বেড়ে গেছে। পরে এ বিষয়ে বিস্তারিত লেখা যাবে। ওসাকাতে এখন বেশ রম-রমা ভাব। দুদিন থেকেই ছোট্ট একটা বিমানে চলে এলাম শিকোকু দ্বীপে। কিউস্-হনস্ আর হাকাইতোর মালার নীচে যেন লকেটের মত। সেখান থেকে এক আরও ছোট্ট জল-বওয়া জাহাজে রওনা হলাম ছোট্ট দ্বীপ মিসাকাজিমা। সারা জাপান জুড়েই এমন মানুষ থাকা আর না থাকা ছোট ছোট দ্বীপের ছড়াছড়ি। সেই মেইজী যুগে যখন শিল্পোন্নতির সূত্রপাত, তখনই জাপানের মানুষ এমন ছোট ছোট দ্বীপ খুঁজে নিয়েছিল তামা-দস্তা প্রভৃতি নানান ধাতুর শোধনাগার হিসাবে ব্যবহারের জন্য। মাটি খুঁড়লেই চলে আসে সমুদ্রের লোনা জল। মাত্র হাজার তিন মানুষের বাস। তারাই মদৎ দিচ্ছে এক বিশাল কারখানাকে। প্রতিদিন জল দিয়ে যাওয়া হয় ওই জাহাজে

করে। গোটা-পাঁচ মাল্লা আর আমরা তিনজন বহিরাগত। বিদেশী আমিই একা। চারদিকে জল আর জল। মাঝে মাঝে কুমীরের পিঠের মত ছড়ান ছিটোন দ্বীপ। সে সব দ্বীপে মানুষজন বড় কেউ থাকে না। আমার পাশে একজন মানুষ। কার্তায়ামা-সান। কাজের মানুষ। মাথায় হেলমেট। পরনে কাজের জার্সি। কোম্পানীর নাম লেখা। অবশ্য জাপানে বড় ছোট সকলেরই এক রকম পোশাক। কাজের সময় কলকারখানাতে পোশাক দেখে কে বাবু কে কুলি বোঝা যাবে না। তবুও বোঝা যায় সে সাধারণ মানুষ। জাহাজের মালপত্র নামে তারই হিসাব রাখে। বছর তিরিশের মাঝামাঝি। চোখে চশমা। কথা বেশী বলছিল না। আমিই ভাব জমালাম। ইদানীং জিজ্ঞাসাবাদের সূত্রপাতই হচ্ছে কেমন ছুটি কাটল। আনন্দে ছুটি কাটান মানেই বেড়ানো, হই হই আনন্দ, সঙ্গে আছে পান-পাত্রের আবরণ উন্মোচন। মনটা আমার তখন উত্তরেরই প্রত্যাশা করছিল। কথা বলতে বলতেই বেন্তো খুলছিলাম। একটা বাক্সে দ্বিপ্রাহরিক আহার ব্যবস্থা। কিছুটা ভাত, মাছ-ভাজা, মিষ্ট বীন, হয়ত

বা কয়েক টুকরো চিংড়ী ভাজা—এরই নানারকম হেরফের। যদি অভ্যাস করতে পারেন তাহলে সারা জাপানে রাস্তা-ঘাটে খাবারের সমস্যা নেই, কি রাত কি দিন। উত্তর না পেয়ে চোখ তুললাম, দেখি কাতায়ামা-সান মিটিমিটি হাসছে। হাসতে হাসতেই বলল, "সারা ছুটিটা কাজ করেছি। জান, গত মাসে আমি বাড়তি সময় কাজ করেছি ১৮০ ঘন্টা।"

"তাহলে তো পয়সা অনেক পেয়েছ।"

"তা অবশ্যই, মাইনার চাইতে বেশী।"

"দেখো শুধু কাজ করলে তোমার বৌ কেমন রাগ করবে।"

কি যেন ভাবল, দূরে একবার চাইল তারপর আপন মনেই কাজে চলে গেল।

মিসাকাজিমাতে হোটেল নেই, ছোট্ট একটা "রিওকান"। বড় ছোট সকলকেই ওখানে জড় হতে হবে। জাপানী রিওকান অনেকটা বাড়ির মতন। আত্মীয় স্বজনের বাড়ি বেড়াতে গেলে যেমন সে বাড়ির মানুষ ব্যস্ত হয়ে পড়ে,—নিজের কাছে নিজের বাড়িও মনে হয় না, আবার পরও মনে হয় না,—এ অনেকটা তেমনই। বাড়ির সকলেই তোমার তদারক করবে, গৃহকর্ত্রী রান্না-বান্নার আগে জিজ্ঞাসা করে যাবে কি খেতে ভালবাস তুমি। হাত পা ধোবার জল। বাড়ির কর্তা দু-একবার এসে কুশল প্রশ্ন করবে। খাবার সময় বাড়ির মেয়ে বউ তোমার পাশে বসে এটা-ওটা খেতে বলবে। এমনই এক রিওকানে জমা হয়েছি কয়েকজন। বাইরে বেশ বরফ পড়ছে। কাজ বন্ধ। কাতায়ামা-সান—আমি আর সকলে বসে ঠান্ডা দিনে সাকে গলাধঃকরণ করবার কথা ভাবছি। কাতায়ামা সানকে সাকে পরিবেশন করতে সে বলে উঠল "না"। আমি অবাক হয়ে তাকালাম। শহর বাজারে আমার চারপাশে দেখেছি রাতের পর রাত মানুষে ফূর্তি করে কত নিশুতি রাতে বাড়ি ফিরছে। কাজকর্মের পর দল বেঁধে নয়ত একা একাই পানপাত্র নিয়ে বসে পড়েছে। অবাক হলেও, অবাক হবার আরও কিছু বাকী ছিল। বলল, "আমি শুধু কাজ ভালবাসি, ওই আমার নেশা। জান, আমার বউ জন্মান্ধ। আমি জেনে শুনেই বিয়ে করেছি।" আমি স্তম্ভিত। বাকীটুকু ওর মুখ থেকেই শুনলাম। আমার চোখের উপর ভাসতে লাগল ওর কথাগুলো।

ছোট্ট একটা মেয়ে। জন্মের আগে বাবা-মা দুজনেই খুশী। প্রথম সন্তান। মা বলে "ছেলে", বাবা বলে "মেয়ে"। মেয়েই হল। খুব সাধারণ। এই হল ইউকির জন্ম ইতিহাস। কিন্তু মেয়ে কিছু চাইতে জানে না। প্রথম প্রথম তেমন খেয়াল না করলেও, দেখা গেল ইউকি অন্ধ। বাবা-মার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। বছর না

ঘরোয়া পরিবেশে শ্রীযুত দেবু চৌধুরী এবং শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী চৌধুরী

যেতেই মা নূতন সন্তানের আশায় দিন গুনল। বাবা বুকে করে রাখল প্রথম সন্তানকে—সে যে অন্ধ। মায়ের অবহেলা পড়ল। পরের দুই ভাই এসে মার দিনের সময়টুকু কেড়ে নিল। বাবা কিন্তু ফেলতে পারল না। ইউকি বড় হল। কিন্তু সে অন্ধ। একটা ইন্দ্রিয় নেই বলেই অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলো বেশী সজাগ হল। বিশেষত মনটা। এমন করেই বাবার বুকে লেপটে থেকে কাটল ২১টা বছর। বাবা বৃদ্ধ হচ্ছেন। সিরাইনের বন্ধু-পুরোহিতকে প্রায় বলেন, কি হবে এ মেয়ের তিনি মারা গেলে। মা দুই ছেলে নিয়ে ব্যস্ত। ইউকির দুঃখের মাঝে শুধু ওইটুকু সম্বল—পিতা। ওইটুকুই অবলম্বন, তাই সেইটুকুর অনুপস্থিতি ইউকি কোনদিন ভাবল না। কিন্তু ভাবনার আড়ালে ইউকির জীবনে নেমে এল আর এক অন্ধকার। পিতা চিরকালের মত তাকে ছেড়ে চলে গেলেন। আশ্রয় তখন সেই পুরোহিত। অন্ধ ইউকি বোধ হয় সেদিন ভাগ্যকে দোষারোপ করল। কিন্তু ভগবানের আশীর্বাদের মতন সেদিন হাজির হয়েছিল কাতায়ামা-সান। বছর চব্বিশের কাতায়ামা, পেশীবহুল দেহ নিয়ে আগামী দিনের মতন জীবনে ছুটে চলেছে। কিন্তু মনটা ছোট্ট শিশুর মত কোমল। সে কোমলতার তুলনা নেই। তাতে বাহবার আকাঙ্ক্ষা নেই। সমাজের চোখে যা অবহেলিত, দয়ার পাত্র, তাই সে বুকে তুলে নিতে চায়। অমনই এক দুঃখের প্রয়োজনে বৃদ্ধ পুরোহিত ইউকিকে তার হাতে তুলে দেবার প্রস্তাব করলেন। জন্মান্ধ ইউকি।

পৃথিবীর কিছুই চোখে দেখেনি কোনদিন। কি অবস্থা কাতায়ামা? তার সামনে আনন্দ উচ্ছল পৃথিবী। সে অন্ধ নয়। যে কোন মুহূর্তে সেদিন ইউকিকে নিজের জীবনের যৌবন-স্রোতে ভাসতে পারে। এমনই মুহূর্তে সেদিন সে ইউকিকে নিজের জীবনের সাথী করে নিল। কাতায়ামা সানের বাবা-মা রাগ করলেন। আশেপাশের অনেক বুদ্ধিমান মানুষ হাসল। কিন্তু কাতায়ামা সান এক অপার আনন্দে জীবন-স্রোতে পাড়ি জমাল। জাপানের আধুনিক জীবনে এই বোধ প্রথম এক দৃষ্টিহীনের সঙ্গে স্বাভাবিক মানুষের স্বাভাবিক স্বেচ্ছা-মিলন।

তারপর সে যোগ করল, "প্রথম বছর বেশ কষ্ট হয়েছে। একা রেখে যেতাম। রান্না-খাওয়া সবই প্রায় নিজের হাতে। এ জীবন অনেকটা নেশার মতন। ইউকির সুখ দুঃখ আমায় বড় বাজত। তারপর একদিন ওরও মা হবার শখ হল। তখনই বাড়তি কাজ শুরু করলাম। টাকা জমালাম। আমার প্রথম সন্তানের সময় ছয় মাস কাজ করিনি। সে আজ বছর চার হয়ে গেল। এখন মেয়ে বড় হয়েছে। ইউকিও সব মানিয়ে নিয়েছে। সবই করতে পারে। রান্না বাসন মাজা। টেলিফোন আছে বাড়িতে। দোকানে বললেই জিনিসপত্র দিয়ে যায়। সকলেই আমার প্রতিবেশী, চেনা মানুষ। শুধু দামগুলো আমি দিয়ে দিই। হয়ত চোখে দেখে না বলেই বেশী অভিমানী; আমার এই দেহ আর কর্মশক্তি ছাড়া কিছুই আমার নয়। একটা ছোট্ট বাড়ি করেছি,

সেটাতেও ইউকির নাম।” সবশেষে হাসতে হাসতে বলল, “যার চোখ আছে সে তাড়াতাড়ি করতে পারে, ইউকির একটু দেরী হয়, এই যা তফাৎ।” পাশে বসে নিজেকে বড় ছোট মনে হল। জীবনে বহু গুণী-ধনী জনের সংস্পর্শে এসেছি, নিজেকে ধন্য মনে করেছি। অফিসের কোন বেয়ারাকে তার অসময়ে দুটো পয়সা ধার দিয়ে দশবার তাগাদা করেছি, কারোর জন্য এতটুকু করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছি। কিন্তু এই স্বল্পশিক্ষিত, সামান্য উপার্জনশীল, নাম না জানা বিরাট মনের মানুষটার পাশে বসে নিজেকে সত্যিই বড় ছোট মনে হতে লাগল।

*

"This is indeed India . . . . the one land that all men desire to see and having seen once, by even a glimpse, would not give that glimpse for the shows of all the rest of the globe combined . . . ." MARK TWAIN. **Following the Equator, Vol. II.**

কথাটা অনেকেই জানেন না। কথাটা বুঝি অনেক তর্ক-বিতর্কের বাইরে ভারতীয় সংগীত সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। তা না হলে টোকিওর “Coffee-Music” — “Spagattee-Music” — “Snack-Music” এমন সব দোকানে আজ টুং টাং করে সেতারের ধ্বনি শোনা যাবে কেন।

পণ্ডিত রবিশংকর এসেছিলেন টোকিওতে। তারপর এলেন শ্রীযুত দেবব্রত চৌধুরী। ছোট করে দেবু চৌধুরী; আটপৌরে নামটাই বুঝি বেশী মিষ্টি। মানুষটার ব্যবহারও তেমনই মিষ্টি। সঙ্গে ছিলেন ও'র স্ত্রী মঞ্জুশ্রী চৌধুরী। তবলা সংগত করলেন সীতারাম শর্মা। গত বছরের শেষাশেষি উনি এখানে বাজালেন। বাজিয়ে আসছেন সারা ইউরোপ আর আমেরিকা ঘুরে। বেশ রেওয়াজী হাত। অল্প বয়স। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বাজনার হাত আরও জমাট হবে মনে হয়। গত ২২ ডিসেম্বর আমরা ও'র বাজনা উপভোগ করলাম। তার চাইতেও ভাল লাগল এই ভেবে যে, জাপানের সামনে ভারতীয় সংগীত পরিচিতির যে সূত্রপাত পণ্ডিত রবিশংকর করেছেন, তাকেই আর এক ধাপ এগিয়ে দিয়ে গেলেন দেবু চৌধুরী।

স্বল্প পরিচয়ে একটা মানুষ কতখানি আপনার হতে পারেন দেবু চৌধুরীকে না জানলে হয়ত জানা হোত না। টেলিফোন করতেই গেস্ট কার্ড পাঠিয়ে দিলেন। তারপর একদিন লিখব বলেই ও'র কাছে কিছু শুনলাম। নিজের চেষ্টাতেই সারা দুনিয়া ঘুরছেন। এক যায়গা থেকে আর এক যায়গার সমস্ত খরচ-খরচা নিজেকে বাজিয়েই সংগ্রহ করতে হচ্ছিল। অল্প বয়সে ভারতীয় সংগীতবিদের এত বড় কলিজার জোর বড় একটা দেখা যায় না।

১৯৪৬ সালে স্বর্গীয় শ্রীযুত পাঁচুগোপাল দত্ত মহাশয়ের কাছে প্রথম সেতার শেখা শুরু করেন। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত ওস্তাদ মুস্তাক আলী খাঁ সাহেবের কাছেই তালিম নিচ্ছেন। নিজের গুরুর প্রতি অসীম শ্রদ্ধা। তাই বলে কারুকে ছোট মনে করেন না। তিনিই একমাত্র সংগীতবিদ গত বছর ইউরোপের MONTREUX-Vevey Music Festival-এ বাজাতে যান। তারপর আফগানিস্তান, ইরান, সুইজারল্যানড, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, জাপান, থাইল্যান্ড-এ পাড়ি জমান। আপাতত দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভারতীয় কলা কেন্দ্রের সঙ্গে জড়িত। ও'র মতে, সেতারের জনপ্রিয়তা অবশ্যই কাম্য, তবে সে জনপ্রিয়তার জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা বা কোথাও কোন রকম 'রফা'র পক্ষপাতী উনি নন। মূলত ভারতীয় রাগ সংগীতকে নিজস্ব ধারায় মানুষের মনে স্থান করে দেওয়ার প্রচেষ্টাতেই উনি আগ্রহী। এতে যদি সময় বেশী লাগে, তাতেও তিনি পেছ-পা নন।

একটা কথা বড় ভাল লাগল। সংগীত সমাজে ও'র বাজনার ঘরোয়ানা অবশ্যই খানদানী। কিন্তু বংশগতভাবে সংগীতের উপর ও'র কেউই তেমন আগ্রহী ছিলেন না। উনি প্রমাণ করতে চান যে, প্রতিভার জন্য সব সময় সংগীতের খানদানী রক্তে প্রয়োজন হয় না। এমন অনেকেই আ... যাঁদের পিতা প্রপিতামহের নাম ...র ভিত্তিতেই তরে যাচ্ছেন, আবার ...কুর অভাবেই তাঁদের চাইতেও ভাল হয়ে অনেকেই কোথায় তলিয়ে যাচ্ছে। এমনই এক ভাবধারার বিরুদ্ধে যেন দেবু চৌধুরীর আবির্ভাব। সবশেষে আজ ভারতের প্রথম সারির সংগীতবিশারদদের প্রতি ও'র একটি আবেদন ছিল। তাঁরা যেন তাঁদের উত্তরসূরীদের জন্য কিছুটা স্থান করে দেন। নয়ত তাঁদের বিরাট প্রতিভা আর ব্যক্তিত্বের আড়ালে হয়ত কোন সত্যকারের ভাবী প্রতিভা চিরকালের জন্য হারিয়ে যাবে।

সেদিন ২৪ জানুয়ারী এখানের ভারতীয় ছাত্র এবং শিল্প শিক্ষাবিদ্দের পরিচালনায় ভারতীয় জাতীয় দিবসকে স্মরণ করে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়ে গেল। সভাপতির আসন অলংকৃত করে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীযুত শিশিরকুমার ব্যানার্জী এবং প্রধান অতিথি হিসাবে আসন গ্রহণ করেন বিখ্যাত সাহিত্যিক ইউকিও মিসিমা। শ্রীযুত ব্যানার্জী তাঁর ভাষণে সমগ্র উপস্থিতিবৃন্দের উদ্দেশ্যে বলেন যে আমরা এসিয়াবাসী হিসাবে আমাদের এই আনন্দ সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই। নাচ-গান-বক্তৃতা, সব মিলিয়ে এই অনুষ্ঠান বেশ উপভোগ্য হয়েছিল।

একটা খবর, সেদিন অনুষ্ঠানে ঢুকবা মুখেই দুই আমেরিকানকে দেখলাম মুণ্ডিত মস্তক, গেরুয়া পরা, গলায় কাঠে মালা, মুখে “হরে কৃষ্ণ—হরে রাম”, হাতে এক বই, কিনতে হবে। তারপর সে আমা 'Lord Krishna' এবং 'হরে কৃষ্ণ'র মাহাত্ম্য শোনাতে শুরু করল। কি আর বলব শুধু ভাবলাম, নবদ্বীপের ছেলেকে শে পর্যন্ত আমেরিকান বাবাজীর কাছে 'হরে কৃষ্ণ'র মাহাত্ম্য শুনতে হল। না—এ কলি-কাল এতে আর ভুল নেই।

বিকাশ বিশ্বাস

ধাঁধার সূত্রে বের্নার্দাঁ

না, ছেলেটি রোজ আসে না, বিধাতাকে ধন্যবাদ। কিন্তু এলেই যা বিরক্ত করে! বাণীব্রতের আবার এক বাতিক আছে : সাংস্কৃতিক ধাঁধা। "বলুন তো ফাদার, বাঙালী হলে নিউটন্ কি লাইব্‌নিৎস্‌কে 'দাদা' বলতেন? উত্তর : না, নিউটন্-ই লাইব্‌নিৎসের চেয়ে চার বছরের বড়। "জোন্ অব্ আর্ক্ লেখিকা হলে তাঁর জীবতকালে তাঁর লেখা কি কেউ ছাপতে রাজি হত?" উত্তর : তাঁর মৃত্যুর পরেই মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার।

কোনোটা আমি পারি, কোনোটা পারি না। সত্যের খাতিরে স্বীকার করব, বেশীর ভাগই পারি না। গতকালেরটা কিন্তু পেরেছিলাম...

প্রশ্নটা ছিল : "কোন্ ফরাসী গ্রন্থ বালক রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল?" বাণীব্রতকে আমি প্রতি প্রশ্ন করেছিলাম : "বিষবৃক্ষ-পূর্ব কালে কোন্ ফরাসী গ্রন্থের দু-দুটি অনুবাদ বেরিয়েছে?"

আসলে উভয় প্রশ্নেরই উত্তর এক : বের্নাদ্যাঁৎ স্যাঁপিয়ের-এর 'পল এ ভির্জিনীয়্' [১৭৮৭] নামক উপন্যাস বাংলা অনুবাদ করেছিলেন রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ['পাল ও বর্জিনিয়া ইতিহাস' ১৮৫৬] এবং কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ['পৌল ভর্জীনী', ১৮৬৮]। মূল গ্রন্থটা অভাবনীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করে, য়ুরোপের যাবতীয় ভাষায় অনূদিতও হয়।

বের্নাদ্যাঁৎ স্যাঁপিয়ের [১৭৩৭-১৮১৪] জাঁজাক্ রুসো-র বন্ধু ও শিষ্য। গুরুর মতো তিনিও স্নায়বিক রোগে ভুগতেন; বলতেন "এক শো গোলাপের গন্ধ আমাকে যা আনন্দ দেয়, তার চেয়ে বেশি দুঃখ দেয় একটি মাত্র গোলাপের কাঁটা।" এদিকে তিনি আরও বলতেন : "বৃষ্টি পড়লে আমি ভাবি, এক সুন্দরী কাঁদছে।" ৫৬ বছর বয়সে তিনি তাঁর প্রকাশকের যুবতী কন্যাকে বিবাহ করেন; এঁর পুত্র কন্যার নামই পল ও ভির্জিনীয়্। স্ত্রীর মৃত্যুর পর, ৬৩ বছুর বয়সে তিনি আবার বিয়ে করেন।

বের্ন্যার্দ্যাঁৎ স্যাঁপিয়ের এক অদ্ভুত ধরনের বিজ্ঞান চর্চা করতেন, পদার্থবিদ ও জ্যোতিষীদের কথা মানতেন না; তাঁর কাছে প্রকৃতির বিধানবলীই ছিল "শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য, যৌক্তিকতা, সামঞ্জস্য, সুখ ও আনন্দের" আকর। তাঁর মতে গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি নিয়ে ততটাই মাথা ঘামাতে হয়, যতটা মানুষের চোখে তারা ধরা পড়ে, যতটা মানুষের হৃদয় ও আবেগ জীবনের সঙ্গে তারা সম্পৃক্ত।

ফলের ভারে গাছের শাখা নুয়ে আসে কেন? আমাদের হাত যাতে অনায়াসে ফল পাড়তে পারে।...ছারপোকা কালো হল কেন? সাদা চামড়ায় সহজেই ধরা পড়বে বলে।...কুল দিব্যি মুখে ধ'রে যায়, ন্যাশপাতি তেমনি ধরে যায় হাতের তেলোয় —তাই ওদের আকার-আয়তন এমন; আর ফুটির গায়ের লম্বালম্বি রেখাগুলোর উপযোগিতা এই যে, পারিবারিক ভোজে সমানভাবে ফলটিকে ভাগ করে নেওয়া যায়।

'ভারত কুটীর'

আধুনিক সংস্করণে 'পল এ ভির্জিনীয়্' গ্রন্থের পরিশিষ্টে মুদ্রিত হয় লেখকের আর এক রচনা : 'ভারতীয় কুটীর'। সুধী পাঠক অবশ্যই 'পল এ ভির্জিনীয়া'-র সঙ্গে পরিচিত। 'ভারতীয় কুটীরের' সঙ্গে কিন্তু অনেকের মোলাকৎ না-ও ঘটে থাকতে পারে। তাই বাখানিতে চাহি সেই বিদেশী আখ্যান/ চুপাট করে, গোল না ক'রে শুন পুণ্যবান" [হায় কাশীদাস।]

লণ্ডনের রয়াল সোসাইটি কুড়িজন সদস্যকে পাঠিয়ে দিয়েছে পৃথিবীর চার কোণে। সঙ্গে দিয়েছে সাড়ে তিন হাজার প্রশ্নের এক তালিকা—ওঁরা যে-যে দেশে যাবেন, সেই সেই দেশের পক্ষে প্রযোজ্য নানান জিজ্ঞাসা, যেগুলির উত্তর গ্রথিত, বিন্যস্ত ও সম্পাদিত হয়ে গড়ে তুলবে এক সম্পূর্ণ ও বিশাল বিশ্বকোষ, বিবিধ তত্ত্বে-তথ্যে-আলোচনায় সমৃদ্ধ এক অতুলনীয় জ্ঞানভাণ্ডার। এঁদের মধ্যে যিনি পাণ্ডিত শ্রেষ্ঠ—হিব্রু, আরবী ও হিন্দু (!) ভাষায় পারদর্শী—তাঁর জন্য নির্দিষ্ট

হল সব জ্ঞানবিজ্ঞান-শিল্পকলার লালনভূমি এই ভারতবর্ষ।

হল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালি, তুরস্ক, মিশর, লেবানন, পারস্য পেরিয়ে সেই পণ্ডিতপ্রবর পৌঁছোলেন ভারতে, গঙ্গা তীরবর্তী বারাণসীতে—ভারতের 'আথেন্স'। এখানে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তাঁর পর্যালোচনা চলে। বহু দুর্লভপ্রাপ্য গ্রন্থ এবং ন' হাজার পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ পাউন্ড ওজনের বিপুল সংখ্যক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ক'রে, দায়িত্ব নির্বাহ হয়েছে ভেবে, বিলেতের উদ্দেশে ফিরতি-পাড়ি জমাবার জন্য তিনি যখন প্রস্তুত—হঠাৎ তাঁর প্রবল এক খট্‌কা লাগে, অসন্তোষ দানা বেঁধে ওঠে মনের মধ্যে। এ কি নিয়ে ফিরে চলেছেন তিনি? সত্যি সত্যি তাঁর সমস্যাবলীর জট ছাড়াতে পেরেছেন এই Pandeet-বর্গ? সেই সাড়ে তিন হাজার প্রশ্নের একটিরও কি সত্যিকার উত্তর দিয়েছেন কেউ? বরং তাঁর চোখে আরো বেশি ধোঁয়াটেই তো হয়ে উঠেছে সব। তার উপর প্রশ্নগুলি তো পরস্পর সংশ্লিষ্ট, একটির উত্তরের অস্পষ্টতা-দ্ব্যর্থতা অন্য এক প্রশ্নের সঠিক উত্তরকেও আচ্ছন্ন করেছে, নিতান্ত সহজ স্বতঃসিদ্ধ-

গালি পর্যন্ত কেমন ঘোরালো হয়ে উঠেছে। শুধু কি তাই? এক-একটি প্রশ্নের গড়ে পাঁচটি করে উত্তর পেয়েছেন তিনি। তাঁর সহকর্মীরাও যদি অনুরূপে ফসল তুলে থাকেন, তবে তো সাড়ে তিন হাজার প্রশ্নের মোট উত্তর সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে সাড়ে তিন লাখে : সাড়ে তিন লাখ প্রতিবন্ধক পেরিয়ে সত্যের টিকির সন্ধান পাবে রয়াল সোসাইটি।

জুতো, বীবরের পশমে তৈরি টুপি। এমন কি বাছুরের চামড়ায় বাঁধাই সোসাইটির সেই প্রশ্নাবলীর গ্রন্থখানিও তিনি রেখে আসতে বাধ্য হলেন। খালি পায়ে, খোলা মাথায় তাঁকে ব্রাহ্মণ সকাশে উপনীত হতে হল।

ইচ্ছে ছিল, ব্রাহ্মণের সন্নিহিত হয়ে তাঁকে তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন। কিন্তু নয়-খানি মাদুরের ব্যবধানে তাঁকে থামিয়ে

থেকে আরেকজন, তারপর আরো একজন, তিনজনের মুখে মুখে ধারাবাহিত হয়ে প্রশ্নটা এসে পৌঁছোল য়ুরোপীয় পণ্ডিতের কাছে। তাঁর তিনটি প্রশ্নের উত্তর ব্রাহ্মণ দিলেন এইভাবে : "শুধু ব্রাহ্মণদের দ্বারাই সত্যকে পাওয়া সম্ভব; সত্যের নিবাস চতুর্বেদ [Beth—যা নাকি লক্ষাধিক বছর আগে রচিত হয়েছিল এবং তা-ও এমন এক ভাষায় যা শুধু ব্রাহ্মণদেরই জানা]

পুরুষোত্তম তীর্থে

এমন সময় সাহেব জানতে পারলেন, "ওড়িক্সার জাগ্ননাথে" [লেখকের মতে জায়গাটি গঙ্গার একটি মোহানায় অবস্থিত!] আছেন নাকি ব্রাহ্মণ শিরোমণি; একমাত্র তিনিই সব প্রশ্নের উত্তর জানেন। বিদেশী পণ্ডিত স্থির করলেন, যাবেন সেখানে।

ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির কলকাতাস্থ শাখার ডিরেক্টর নিজ জাতি ও বিজ্ঞানের প্রতি সম্মান নিবেদনের সুযোগ ছাড়লেন না : পণ্ডিতকে তিনি দিলেন একটি পাল্কি, আটজন কুলি, দুজন করে বেয়ারা পাচক ও পিওন, ছাতা-বরদার একজন, ভিস্তিওলা একজন, মোটঘাট এবং [ব্রাহ্মণ ও তদীয় পত্নীর উদ্দেশে] উপহার সামগ্রী বহন করে নিয়ে যাবার জন্য দুটো উট, অশ্বারোহী সিপাই [লেখকের বর্ণনায় Reispoute রাজপুত] এবং একজন নিশানধারী। পণ্ডিতমশায় যেতে যেতে ভাবছিলেন, কোন্ কোন্ প্রশ্ন দিয়ে শুরু করা যায় : মহাপ্লাবনের কাহিনীর আন্তর্জাতিকতা, জগৎ সৃষ্টির কাল-নিরূপণ, না কি রাজ্য শাসনের সর্বোৎকৃষ্ট প্রণালী?...অকস্মাৎ তাঁর মনে হল, তিনটি প্রশ্ন করলেই যথেষ্ট; ঐ তিনটি প্রশ্নই সকল জ্ঞানের মর্মরহস্যে প্রবেশের উপায়ের সন্ধান দেবে।

এক, সত্যকে পাওয়া যায় কোন্ পথে? যুক্তির পথে তো নয়—যুক্তিধারা যে জনে জনে ভিন্ন।

দুই, সত্যের আধার কোথায়? বইয়ে তো নয়—এক বই যা বলে, আরেক বই উল্টো বলে।

তিন, সত্যকে কি প্রকাশ করতেই হবে মানুষের কাছে? প্রকাশ করতে গেলে যে ঝগড়া বাধে।

চলতে চলতে এগারো দিনের দিন দেখা গেল মন্দির চূড়া। জগন্নাথ দর্শন হল। এই জগন্নাথ নাকি ব্রহ্মার সপ্তম অবতার। অনুতপ্ত পাপীরা তাঁর সামনে শপথ করছে, তাঁর উৎসবের দিনে তাঁর রথচক্রতলে পেতে দেবে নিজেদের। অশুচি ফিরিঙ্গি বলে সাহেবকে স্নান করতে হল তিনবার, গা থেকে খুলে ফেলতে হল পশুদেহজাত যা কিছু : পশমের কোট, ছাগ চর্মের

পণ্ডিতমশায় যেতে যেতে ভাবছিলেন কোন্ কোন্ প্রশ্ন দিয়ে শুরু করা যায়

দেওয়া হল। রাজাদের গমনাধিকার নাকি ঐ মাদুর পর্যন্ত, মোগলদের ভিন্ন, একমাত্র মোগল-সম্রাটই সামনা সামনি গিয়ে তাঁর পদ চুম্বনের অধিকারী।

ভারতীয় ভাষায় সুন্দর একটি ভাষণ প্রস্তুত করে নিয়ে এসেছিলেন সাহেব; তাঁকে নিরস্ত করে বলা হল, ব্রাহ্মণই আগে আলাপ করবেন। মহাশয়ের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন ব্রাহ্মণ। প্রশ্নটা আওড়ানো হল প্রথমে এক ফকিরের (!) কাছে, সেখান

এবং মানুষের থেকে সত্য গোপন অনেকাংশেই বিবেচনার পরিচয় যদিও তা ব্রাহ্মণদের গোচরে আনা অবশ্য কর্তব্য।"

একেকটি উত্তর উচ্চারিত হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে ভক্তবৃন্দের সম্মিলিত তুমুল করতালি। উত্তর শুনে বিদেশী পণ্ডিত উল্লাসে ফেটে পড়েন : "ভগবান তবে তো অবিচারক—যদি ব্রাহ্মণদেরই থাকে শুধু সত্যে অধিকার। আর ব্রাহ্মণেরাও অবিচার করেন—যদি সত্য শুধু তাঁদের কাছেই

ভাষণীয়।" ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে এবার বিক্ষোভ ও অসন্তোষ জেগে ওঠে। ঈশ্বর নিন্দা ওরা ক্ষমা করতে রাজি, গুরু নিন্দা কখনোই নয়। ওদের উত্তেজনা শান্ত করে কিন্তু ব্রাহ্মণ ঘোষণা করলেন : য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে ব্রাহ্মণেরা বিতর্কে বসে না, রীতি।

ঝড় উঠল যখন

কোট, টুপি, জুতো নিয়ে বেরিয়ে এলেন বিদেশী, ভারতের মতো তাঁর একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই দরকার। কিন্তু ফিরিঙ্গিকে কে থাকতে দেবে কোথায়? তেষ্টা পেলে জল মিলল বটে কিন্তু দেখালেন জলের পাত্রটি তাঁর ছোঁয়ায় দূষিত হল বলে তৎক্ষণাৎ ভেঙে ফেলা হল। পুনরায় পালকিতে উঠে বসা ছাড়া তাঁর গত্যন্তর রইল না। ফেরার পথ ধরল বাহকেরা, সাহেবের মাথায় ঘুরতে লাগল প্রবাদ বাক্যটি : "ভারতে এসে ধৈর্যহীন য়ুরোপীয়েরা ধৈর্য শেখে, ধৈর্যবানেরা ধৈর্য হারায়!" নিজে তিনি ধৈর্যের সীমা পেরিয়েছেন; আর তবু এখনো পর্যন্ত অজানা সেই তিন প্রশ্নের উত্তর। ভারতে ব্রাহ্মণদের কাছে এসে তবে কি লাভ হল তাঁর!...এমনি যখন ভাবছেন, আকাশ আঁধার করে হঠাৎ উঠল এক প্রচণ্ড ঝড়। পালকিবাহকেরা আশ্রয়ের খোঁজে ইতস্তত ঘুরতে ঘুরতে পথ হারাল প্রান্তরে। ঘণ্টা তিনেক খোঁজাখুঁজির পর এক কুটিরের সন্ধান মিলল। মশালচি ছুটে গেল সেই দিকে নিভে-যাওয়া মশাল ধরিয়ে নিতে। খানিক পরে তার উচ্চ কণ্ঠ চিৎকার : "এগোবেন না, আর এগোবেন না সাহেব, —ওখানে অচ্ছুতের বাস।"

অচ্ছুৎ শুনে সাহেব ভাবলেন বোধ হয় কোনো হিংস্র জন্তু-টন্তু হবে, পিস্তলটা চেপে ধরলেন। মশালচিকে জিগ্যেস করলেন, "অচ্ছুৎ আবার কি হে?" সে উত্তর দিল, "বিধর্মী অনাচারীকে অচ্ছুৎ বলা হয়।" রাজপুতদের সর্দার বলল, "এ দেশে নিচু জাতের মানুষের ওটার নাম। ওরা উচ্চ জাতের কাউকে ছুঁলে, ওদের হত্যা করা পর্যন্ত অনুশাসন সম্মত। ওই অচ্ছুতের বাড়িতে ঢুকলে ব্রাহ্মণের হাতে আমাদের আপাদমস্তক গোময়ে স্নান করতে হবে দেহ ক্ষালনের জন্য।" একে একে সবাই বেঁকে দাঁড়াল, কেউ আর

ওদিকে এক পা-ও নড়তে রাজি নয়। ইংরেজ ভদ্রলোক বললেন, "থাকো তবে—সে তোমাদের খুশি; আমার বাপু বৃষ্টি থেকে গা বাঁচানো নিয়ে কথা...তা সে যে-জাতই হোক!"

প্রশ্নাবলীর খাতা, নিজের রাত-পোশাক, পিস্তল আর পাইপ নিয়ে তিনি লাফিয়ে নেমে পড়লেন পাল্কি থেকে, কুটির দ্বারে গিয়ে করাঘাত করলেন। অচ্ছুৎ লোকটি দরজা খুলে বিদেশী অতিথিকে শরণার্থী দেখে আশ্চর্য ও পুলকিত হল। সাহেবের জলবল আছে দেখে শুকনো কাঠ, নারকেল আর কলা নিয়ে এসে রাখল তাদরে সমনে : "এই নিন কিছু ফল, ফলাহারে জাত যাবে না; আর এই শুকনো কাঠ—গা তাতানো আর বাঘখেদানোর কাজে লাগবে...ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন।" তারপর সাহেবের আপ্যায়ন। আহার্য সাজিয়ে দিল লোকটি, তারপর ঘরের এক কোণে বউ আর দোলনায় ঘুমন্ত বাচ্চার কাছে ফিরে গেল। সাহেব বললেন, "মহদাশয়, আপনি আমার চেয়ে অনেক বড় সজ্জন : আপনাকে যারা ঘৃণা করে তাদেরও উপকার করে থাকেন। আসুন, আমার সঙ্গে একাশনে বসে আমাকে সম্মানিত করুন, নচেৎ আমি ভাবব আপনি আমাদের দুরাত্মা মনে করছেন—আর তাহলে এক্ষুনি আমি বৃষ্টি আর বাঘের খপ্পরে পড়ার ঝুঁকি নিয়েও কুটির ছেড়ে চলে যাব।"

লোকটি তাঁর পাশে এসে বসল, দুজনে একত্রে আহার সমাধা করলেন। আহারান্তে ধূমপান করতে করতে সাহেব বললেন, "সবচেয়ে সুখী মানুষ যে-কজনকে আমি দেখেছি, আপনি তাঁদের একজন। আর সবচেয়ে সুখী যাঁরা, তাঁরাই তো সবচেয়ে জ্ঞানীও বটে।" এই বলে সাহেব তাঁর জীবন-দর্শনের কথা শুধোলেন। লোকটি বলল, 'ভারতীয় বলে গণ্য হতে পারিনি, নিজেকে তাই মানুষ করে তুলেছি; সমাজের কাছে স্বীকৃতি না পেয়ে আশ্রয় নিয়েছি প্রকৃতির কোলে; দুঃখের কাছে পাঠ নিয়েছি বলে আমার চেয়েও বেশী যে দুঃখী তাকে সাহায্যের জন্য আমি সদা প্রস্তুত। আমার স্ত্রীকে, শিশুকে এমন কি কুকুরটিকে পর্যন্ত সুখী করবার চেষ্টা করি; দিনান্তে আনন্দময় ঘুমের মতো, জীবন সায়াহ্নে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় থাকি।"

বিদেশী পণ্ডিত এবার তাঁর প্রশ্ন তিনটির কথা পাড়েন। লোকটি একে একে উত্তর দেয় :

'না, ইন্দ্রিয় দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে সত্যকে পাওয়া যায় না, তাতে ভুল ঘটতে পারে; পাওয়া যায় আন্তরিক হৃদয় দিয়ে—যা প্রতারিত হতে পারে, কিন্তু নিজে কখনো প্রতারণা করে না।

'সত্যকে খুঁজতে হবে প্রকৃতিরই মধ্যে।

ঘরের এক কোণে বউ আর দোলনায় ঘুমন্ত বাচ্চার কাছে ফিরে গেল

মানুষের বা গ্রন্থের ভাষার মতো দুর্বোধ্য নয় প্রকৃতির ভাষা, নয় জনে জনে ভিন্ন; বই মানুষের সৃষ্টি, প্রকৃতি ভগবানের।

'আর সত্য জানাতে হবে কাকে? সরল হৃদয় দিয়ে সত্যকে যে খোঁজে, তাকেই।'

একজন অশিক্ষিত গ্রাম্য অস্পৃশ্যের মুখে এমন উত্তর শুনে য়ুরোপীয় পণ্ডিত বিস্মিত। লোকটির মুখে তিনি তার জীবনের কথা শুনতে চাইলেন।

মর্মস্পর্শী সে কাহিনী।

অস্পৃশ্যের গল্প

হ্যাঁ, একদিন স্বপ্ন ছিল তার, শহরে যাবে, 'যমুনা [Gemna]—তীরবর্তী' দিল্লীতে, দেখবে সেখানকার মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী। দিনের বেলায়—অস্পৃশ্য সে—তার পথ রুদ্ধ; পিছু ধাওয়া করে পাহারাওলা হাঁকল, 'খবরদার [Kaber-Dar]. তাই রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সে প্রবেশ করল নগরীতে। যা দেখল ঘুরে ঘুরে, তাতে চিরকালের জন্য শহুরে জীবন দেখার সাধ তার মিটে গেল। এ কোন্ নরকপুরী... বন্দী-বোঝাই কারাগার, পায়ে বাঁধা শিকল, হাসপাতালে শবদেহপুঞ্জ, অগণিত ভিখিরি আর তাদের পিছু পিছু সিপাইয়ের তাড়া, গণিকাদের ভিড়...। স্বয়ং মুগল বাদশা পর্যন্ত সুখী নন একটুও, তাঁর নিজের পুত্র তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, তাঁর প্রাসাদে লাগিয়ে দিয়েছে ক্ষিপ্ত জনতা।

'জীবিতদের মধ্যে যখন শান্তি খুঁজে পেলাম না, খুঁজতে গেলাম মৃতদের কাছে। গোরস্থানগুলোতে গিয়ে বসে থাকতাম দিনের পর দিন, মৃতের আত্মীয়-স্বজন কবরের উপর যে-খাবার রেখে যেত, তা-ই খেয়ে দিন কাটত, আর বসে বসে ভাবতাম—ভালো লাগত ভাবতে। মনে মনে বলতাম : এই তো এখানে জীবনের সব শঙ্কাভয়ের বিনাশ। মৃত্যুকে মনে হত কাম্য। এই সময়ে এক প্রকৃত সঙ্গীর দেখা পাই আমি : এই কুকুরটি। পথের ধারে না খেয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরছিল; দেখে মায়া হল বড়, শুশ্রূষা করে বাঁচিয়ে তুললাম।

বললন, "ঈশ্বর করুন, ভালোয় ভালোয় আপনি দেশে ফিরে যান—যে দেশে গুণীরা আছেন, সুহৃদেরা আছেন, মানুষের সুখের জন্য যে-দেশের মানুষ পৃথিবীময় সত্যের অন্বেষণে ঘুরে বেড়ায়।"

সাহেব উত্তর দিলেন, "অর্ধেক পৃথিবী আমি ঘুরে বেড়িয়েছি। সর্বত্র দেখেছি ভ্রান্তি আর কলহ। শুধু আপনার কুটিরেই আমি শান্তি পেয়েছি, সুখ পেয়েছি।"

ফিরে এলেন কলকাতায়। সেখান থেকে চন্দননগর। চন্দননগর থেকে জাহাজে উঠে (!) দেশে ফেরার পালা শুরু। লণ্ডনে পৌঁছে সোসাইটির প্রেসিডেন্টের হাতে তাঁর সংগৃহীত হাজার পাউণ্ড পাণ্ডুলিপি আর দুর্লভ পুস্তকগুলি তুলে দিলেন। প্রেসিডেন্ট সেগুলি আবার অর্পণ করলেন ব্রিটিশ মিউজিয়মের হাতে; সেখানে পণ্ডিত, গবেষক, সাংবাদিকরা আজ পর্যন্ত সেগুলি নিয়ে টীকা-ভাষ্য-অনুবাদ-প্রশস্তি-সমালোচনা রচনায় ব্যাপৃত।

সাহেব শুধু সাগরপারের সেই অচ্ছুৎ মানুষটির উত্তর তিনটি গেঁথে রেখে দিলেন নিজের মনে। তবে যদি কেউ তাঁকে জিগেস করে, তাঁর দীর্ঘ ভূ-পর্যটনে সবচেয়ে মূল্যবান কোন্ জ্ঞান তিনি আহরণ করে এনেছেন, তিনি উত্তর দেন : "সত্যকে খুঁজতে হয় সরল হৃদয় দিয়ে; প্রকৃতিতেই সত্যের অধিষ্ঠান; সত্যকে প্রকাশ করতে হয় সজ্জনের কাছে।"

আর একটা কথা তিনি সেই সঙ্গে জুড়ে দিতে ভোলেন না : "তেমন বউ পেলে তবেই সুখ!"

ভারতকুটির আখ্যায়িকা

পূর্বে রচনাটির অনুবাদ হয়েছে বাংলায় : 'ভারতকুটির আখ্যায়িকা' [১৮৬৬], শ্রীরজনীকান্ত ঘোষ প্রণীত। গ্রন্থটি যে আর এক গ্রন্থের অনুবাদ, সে কথাটা অনুবাদক [ক্যাথিড্রাল মিশন কালেজের এক অধ্যক্ষ] উল্লেখ করেন নি কোথাও। উৎসর্গপত্রে অবশ্য আছে : 'কোন একটি নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া আপনকার মনস্তুষ্টি সাধন করিব, এই সংকল্প করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম, এমন সময় হঠাৎ বিলাতী কটেজের আকার মদীয় মনোমুকুরে আবির্ভাব হইল। অনুচিকীর্ষা বৃত্তিটিও আনুষঙ্গিক বলবতী হওয়ায় তদ্দণ্ডে উহার গঠনকৌশল্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবলোকন করণান্তর বঙ্গীয় পদ্ধতি অনুসারে এই সামান্য কুটিরখান্ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।"

অনুবাদ গুণরহিত নয়। অনুবাদক কখনও কখনও প্রসারণপদ্ধতি অবলম্বন করেন : 'ব্রাহ্মণদের দেশ' হয়েছে "অলীকামোদ-পরতন্ত্র দেবার্চক ব্রাহ্মণদিগের দেশ"; 'যেহেতু তুমি ফিরিঙ্গি'-কে তিনি করেছেন "তুমি ফিরিঙ্গি, ম্লেচ্ছ জাতি, তোমাদের বিষ্ঠা-চন্দনে ভেদাভেদ নাই"; 'জগন্নাথ ধামের ব্রাহ্মণশিরোমণির' সম্পর্কে বলা হয়েছে, "পুরুষোত্তম তীর্থে সর্বশাস্ত্র-বিশারদ সুধীরাগ্রগণ্য ধীমান ভগবান স্বার্থপর শাস্ত্রী নামধেয় এক মহামান্য পণ্ডিত অবস্থিতি করেন।"

বাঙালী অনুবাদক নবদ্বীপের কথা উত্থাপিত করার প্রলোভন সামলাতে পারেন নি। "পথিমধ্যে শ্রীপাট নবদ্বীপস্থ নৈয়ায়িক অধ্যাপকগণের নাম শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতে মনস্থ করিলেন।"

অনুবাদের ভুল অবশ্য আছে একাধিক : academicieus-কে তিনি করেছেন 'ছাত্র-সম্প্রদায়'; ডক্টর [পণ্ডিত অর্থে] বহুস্থানেই হয়েছে 'চিকিৎসক' বা 'ডাক্তার সাহেব'।

বের্নার্দ্যাঁ-র একটা ভুল অনুবাদক সংশোধন করেছেন : 'হিব্রু, আরবী ও হিন্দুভাষা' হয়েছে "হিব্রু, আরবী ও ভারতবর্ষস্থ ভাষা-বৃন্দ"; আর একটা ভৌগোলিক ভুল কিন্তু তিনি শুধরোন নি : "অতঃপর ভ্রমণকারী কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া অর্ণবপোতারোহণ করত চন্দননগরে গমন করিলেন..." এই অর্ণবপোত কি মেইল-জাহাজ যে কলকাতায় থামবে না?

ফয়েল দিয়ে মোড়ানো
যাতে আরও বেশী তাজা থাকে !
৩০ প.
১০ টি
TAJ MAHAL
MADE IN INDIA
CIGARETTES
ভেতরে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল দিয়ে মোড়ানো থাকে ব'লে তাজ মহল সিগারেট আরও তাজা পাবেন—কিন্তু তার জন্যে কোন বাড়তি দাম দিতে হবে না।
তাজ মহল
সিগারেট
শতকরা ১০০ ভাগ দেশী সিগারেট
গোল্ডেন টোবাকো কোং প্রাইভেট লিমিটেড, বোম্বাই-৫৬ ■ ভারতের এই ধরণের বৃহত্তম জাতীয় উদ্যম
GT (TM) 95 BEN

(৫)

১৯২৬ সালের সাক্ষাৎকারে ভারতবর্ষের রাজনীতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত রোলাঁ শান্তভাবে এবং নিরপেক্ষভাবেই সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করতে পেরেছিলেন তার কারণ এ-ব্যাপারে তাঁর মনে কোনো সন্দেহের বা উদ্বেগের কারণ ঘটেনি। কিন্তু উদ্বেগ ছিল রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ফাশিস্ট প্রেসের মিথ্যাপ্রচার সম্বন্ধে এবং তার প্রতিকারের জন্য তাঁর তীব্র ব্যাকুলতা সেই উদ্বেগকে দ্বিগুণিত করেছিল। কিন্তু বাধা ছিল বিস্তর। প্রথম বাধা রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের প্রতি রোলাঁর নিজেরই একটা গভীর সম্ভ্রমবোধ। তার উপর তাঁর শারীরিক অসুস্থতার দিকে লক্ষ্য রেখেও তাঁকে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে ইতালির প্রসঙ্গ না তুললে রোলাঁ গায়ে পড়ে কথা তুলতে পারছেন না। তার চেয়ে বড় কথা, তিনি আদৌ ইংরেজি জানেন না বলে নিভৃত আলাপের সুযোগ পাচ্ছেন না। অনুবাদক হিসেবে মাদলিনের মধ্যস্থতা সব সময়েই অপরিহার্য এবং সেইজন্য মন খুলে আলাপ করবারও সুযোগ নেই।

অতএব রোঁলা রবীন্দ্রনাথকে ছেড়ে অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্রকে ধরলেন। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে রোঁলা বুঝলেন রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনার ফলে যেসব তথ্য এবং ঘটনা জানতে পারলেন তার থেকে রোলাঁ কবির ইতালি সফরের একটি সমগ্র চিত্র মনে মনে এঁকে নিতে পেরেছিলেন। পরে গৌদ্রে কার্পলের (ইতালিতে তিনিও রবীন্দ্রনাথের দলের সঙ্গে কয়েকদিনের জন্য মিলিত হন এবং তিনিও একজন প্রত্যক্ষদর্শী) নিকট শুনেছিলেন তাতেও তাঁর ঐ চিত্রটি সমর্থিতই হয়। এ-বিষয়ে রোলাঁ জর্নালে যা লিখেছেন তার মধ্যে বর্তমানের নানা বিরোধী মনোভাবের আন্দোলন-জনিত নাটকীয়তা থাকলেও তাঁর বর্ণনা এবং মন্তব্যগুলি অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত এবং অনেক ক্ষেত্রেই সংগতিহীন। সেইজন্য কবির ভিলনাভ্ ত্যাগ করবার পর শান্ত পরিবেশে স্থিরমস্তিষ্কে কালিদাস নাগ (৬।৭ জুলাই) এবং এবং বন্ধু জাক্ মেসর্লিনকে (১৬ই জুলাই) লিখিত সুদীর্ঘ পত্র দুখানির সঙ্গে মিলিয়ে এই সময়কার জর্নাল পড়া দরকার, তাহলেই রোলাঁর মনোভাব এবং বক্তব্য সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার এবং নির্ভুল ধারণা করা সম্ভব হবে। এইভাবে রোলাঁর অনুসরণ করে কবির ইতালি সফরের পশ্চাৎপটের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন।

রোলাঁর মতে রবীন্দ্রনাথের ইতালি সফরের পশ্চাতে একটা রীতিমত ষড়যন্ত্র ছিল। বৎসরকাল পূর্বে ইতালি থেকে শান্তিনিকেতনে আগত ফর্মিকি ও তুচ্চি নামক অধ্যাপকদ্বয় বিখ্যাত 'ভারতবিদ্' হলেও আসলে ছিলেন ছদ্ম-ফাশিস্ট। ইতালি সফরের নিমন্ত্রণ নিয়ে দৌত্য করেন অধ্যাপক ফর্মিকি কিন্তু নিমন্ত্রণটি যে ইতালি সরকারের অর্থাৎ মুসোলিনির সেকথা তিনি সম্পূর্ণ চেপে গিয়েছিলেন। যথেষ্ট দ্বিধা থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। কিন্তু যাত্রার ঠিক পূর্বে জাহাজে স্থানাভাবের অজুহাতে ফর্মিকি কবিকে কৌশলে তাঁর সহযাত্রীদের কাছ থেকে পৃথক করে ফেলেন। ফর্মিকি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সহকর্মী এবং বন্ধু, তদুপরি তিনি বিখ্যাত পণ্ডিত, কাজেই রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতই কোনো সন্দেহ করেননি। নেপলসে অবতরণ করে তিনি প্রথম জানলেন যে আসলে তিনি ফাশিস্ট সরকারের অতিথি। তখন অবশ্য আর পশ্চাদপসরণের পথ ছিল না। তারপর চললো যাকে বলে কণ্ডাক্টেড ট্যুর, মুসোলিনির সঙ্গে একাধিকবার সাক্ষাৎকার, গঠনমূলক কাজের পরিদর্শন এবং নানা শ্রেণীর নারীপুরুষের সঙ্গে সাক্ষাতে মুসোলিনির এবং ফাশিজ্‌মের অকুণ্ঠ প্রশস্তিশ্রবণ। আগাগোড়া ফর্মিকি রবীন্দ্রনাথকে ছায়ার মতো অনুসরণ করছেন, নিরালায় কারো সঙ্গে কথা বলবার উপায় নেই। বন্ধু ডিউক স্কোটির সঙ্গে সাক্ষাৎ হল বটে, কিন্তু ফর্মিকির উপস্থিতিতে তিনি শুধু বললেন যে তাঁর মুখ বন্ধ। কবি বিখ্যাত দার্শনিক ক্রোচের সঙ্গে দেখা করতে চান, মুসোলিনি ফর্মিকিকে ব্যবস্থা করতেও আদেশ দেন কিন্তু নানা অজুহাতে ফর্মিকি বাধার সৃষ্টি করতে লাগলেন। অবশেষে বিমানবাহিনীর এক তরুণ সৈনিকের সহযোগিতায় একদিন ভোররাত্রে হোটেলের নিভৃত কক্ষে কবির সঙ্গে ক্রোচের সাক্ষাৎ ঘটে। কিন্তু বর্তমান ইতালি সম্বন্ধে ক্রোচে একটি কথাও বলেননি, সাহিত্য, আর্ট ইত্যাদি নিয়েই আলাপ করেছেন। জাক্ মেস্‌লিন-কে লিখিত পত্রে রোলাঁ সক্রোধে লিখলেন: 'একথা যদি মনে করা যায় যে ক্রোচে কিছু বলেননি তার কারণ তিনি রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বাস করতে পারেননি, তাহলে সেটা ঘোরতর অসম্মানসূচক—রবীন্দ্রনাথের প্রতি যতটা না হোক, তাঁর নিজেরই প্রতি।' ইতিমধ্যে ইতালির উদ্দেশ্যে

কবি যে সব প্রশস্তিবাক্য উচ্চারণ করেছেন সে সব নির্বিবাদে মুসোলিনির প্রতি আরোপ করে ফাশিস্ট প্রেস পরমানন্দে মিথ্যা প্রচার শুরু করলো এই মর্মে যে, রবীন্দ্রনাথ ফাশিজমের একজন বড় সমর্থক। সংবাদ হিসেবে সত্য মনে করে L' Humanite প্রমুখ liberal কাগজগুলিও এর প্রতিধ্বনি করে চলছিল। পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্বন্ধে রোলাঁ কালিদাস নাগকে লিখিত পূর্বোক্ত পত্রে জানালেন: 'জাপানে প্রদত্ত স্বাজাত্যের বিরুদ্ধে সেই বক্তৃতা পাঠ করার পর য়ুরোপের একটি ক্ষুদ্র বিদগ্ধ গোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথকে গুরু বলে, ন্যায়ধর্ম ও মুক্তির বিগ্রহ বলে প্রণাম জানিয়ে আসছেন।—ভেবে দেখো তাঁরা কী পরিমাণে বিভ্রান্ত হলেন যখন জানলেন যে য়ুরোপের সবচেয়ে ঘৃণ্য সেই পাশবিক নিপীড়ক, নরঘাতক, আমেন্দোলা ও মাত্তিয়োত্তির হত্যাকারী মুসোলিনির সরকারী অতিথি হলেন রবীন্দ্রনাথ!' অতএব কালবিলম্ব না করে এই মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রতিবাদ প্রয়োজন।

সুযোগ অবশ্য এলো, রবীন্দ্রনাথ নিজেই ইতালি সফরের কথা তুললেন। রোলাঁ এই

সুযোগে অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্রের সহযোগিতায় কবিকে পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্বন্ধে খানিকটা বোঝাতে সক্ষম হলেন। ফাশিস্ট প্রেস তাঁর সম্বন্ধে যে মিথ্যা প্রচার করছে তার প্রতিবাদ করতে কবি সহজেই রাজি হলেন। রোলাঁ অবশ্য সেটুকুতে সন্তুষ্ট নন, তিনি চান ফাশিজমের দ্বারা যাঁরা উৎপীড়িত হয়েছেন, স্বেচ্ছায় নির্বাসন বরণ করে যাঁরা য়ুরোপের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছেন, সেই সব অগণিত রুদ্ধকণ্ঠ, হতাশ্বাস, ছন্নছাড়া মানুষের হয়ে কবি উদাত্ত কণ্ঠে এই ফাশিস্ট সরকারকে প্রকাশ্যে ধিক্কার দিন। রোলাঁ এক-একবার একটু চাপও দিতে লাগলেন এই বলে যে ইতালির জনগণের উপর এই নির্যাতনের প্রতিবাদ যদি কবি যথাসময়ে না করেন তাহলে ভারতবাসীদের উপর ইংরেজ সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়বে। রবীন্দ্রনাথ দ্বিধান্বিত কিন্তু পরিশেষে একটা interview-এর আকারে তিনি ইতালি সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করতে রাজি হলেন। এইখানে, মনে হয়, রোলাঁ একটু অতিরিক্ত আশা করে ফেলেছিলেন এবং তার জন্য অচিরে আশাভঙ্গের প্রতিক্রিয়াটাও একটু অতিরিক্ত রকমের হয়েছিল। যাই হোক, পরম উৎসাহে রোলাঁ উপন্যাসকার দুয়ামেল্ এবং প্রকাশক রেনিগারকে টেলিগ্রাম করে দিলেন এবং তাঁরা অবিলম্বে এসে উপস্থিত হলেন। দুয়ামেলের সঙ্গে পরামর্শের পর স্থির হল যে তিনি একটা questionnaire বা প্রশ্নপত্র রচনা করবেন এবং কবি সেই সব প্রশ্নগুলির উত্তর প্রসঙ্গে তাঁর ইতালি সফরের অভিজ্ঞতা বিবৃত করবেন। যথাসময় এই প্রশ্নপত্র কবিকে দেওয়া হল। সেটি নিয়ে কবি ঘরের দরজা বন্ধ করলেন এবং সারাদিন ধরে তার উত্তর রচনা করলেন।

৩০শে জুন সন্ধ্যায় কবি সবাইকে তাঁর ঘরে ডাকলেন, তাঁর লিখিত বিবৃতিটি পড়ে শোনাবার জন্য। এই সন্ধ্যার বিবরণ রোলাঁ জর্নালে বিশদভাবেই লিখেছেন। কবি তাঁর রচনাটি পাঠ করলেন, যথারীতি মগ্ন রইলেন তর্জমার কাজে। শ্রোতারা লক্ষ্য করলেন রচনাটি আদৌ প্রশ্নোত্তর হিসেবে লিখিত নয়, এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রবন্ধ। প্রবন্ধে কোনো এক অনামিক ইতালীয় অধ্যাপকের সঙ্গে শান্ত শিষ্ট ভাষায় কবি ফাশিবাদ সম্বন্ধে খানিকটা তাত্ত্বিক আলোচনা করলেন এবং পরোক্ষভাবে জানালেন, এই ফাশিবাদকে তিনি সমর্থন করেন না, কিন্তু সেটা আবেগহীন তত্ত্বালোচনার ভাষাতেই জানালেন। মুসোলিনির সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তার মধ্যে কিছু প্রশংসার ভাবও আছে এবং আলোচনা প্রসঙ্গে নেপোলেয়ঁ এবং আলেকজান্ডারেরও উল্লেখ করলেন, যদিও প্রবন্ধের শেষ কয়েক লাইনে কর্মবীরদের চেয়ে চিন্তানায়কদেরই যে তিনি বেশী মূল্য দেন সেকথারও উল্লেখ করলেন প্লেটোর মতো দার্শনিকসুলভ নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে (platoniquement)।

রোলাঁ তাঁর প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করেছেন একটু অতিনাটকীয় ঢঙেঃ 'আমরা স্তম্ভিত (atterres) হয়ে শুনছিলাম, পরস্পরের দিকে তাকাতেও পারছিলাম না। কবির পাঠ শেষ হলে একটা তুষারশীতল নিস্তব্ধতা নেমে এলো।' নাটকীয়তা বাদ দিলে উক্তিটির মধ্যে যা বাকি থাকে তা হল রোলাঁ ও দুয়ামেলের নৈরাশ্য। কবি তাঁর নিজের বক্তব্য বলেছেন কিন্তু তাঁরা যে কথা, যে ভাষায়, শুনতে চেয়েছিলেন (এবং যার জন্য প্রশ্নগুলিকে বিশেষভাবে তাঁরা সাজিয়েছিলেন) তা তাঁরা পেলেন না। শান্ত শিষ্ট ভাষা এবং নির্লিপ্ত ভঙ্গী সম্বন্ধে আপত্তির ভাব দেখে মনে হতে পারে তাঁরা খড়্গ-আস্ফালন সহ একটা জিহাদ-জাতীয় কিছু প্রত্যাশা করেছিলেন। তদুপরি, যাঁকে একাধিক প্রকাশিত রচনায় রোলাঁ নিজেই প্লেটোর সঙ্গে তুলনা করেছেন তিনি প্লেটোর মতোই কথা বলবেন, তাতে তাঁর সোচ্চার নৈরাশ্যটি, কিছু না হোক, কৌতুককর।

যাই হোক, এই নৈরাশ্যের ফলে রোলাঁ এবং দুয়ামেল দুজনেই যে সাময়িকভাবে একটু অসহিষ্ণু হয়েছিলেন জর্নালের এই অংশটির ভাষার মধ্যেই তা প্রকটিত। বিশেষ করে দুয়ামেল ছিলেন একটু অতিমাত্রায় সাদাসিধে, তাঁর সত্তাকে রোলাঁ নিজেই 'স্থূল এবং অমার্জিত' (lourde et brutale) বলে বর্ণনা করেছেন। রীতিমত হঠকারিতার সঙ্গেই দুয়ামেল কবিকে জানালেন যে তাত্ত্বিক আলোচনায় তাঁর যুক্তিতর্ক প্রশংসনীয় হলেও, ইচ্ছা করলে যে তিনি তাঁর বক্তব্যকে স্পষ্ট ও বাস্তব করে তুলতে পারেন গান্ধী প্রসঙ্গেই তিনি তার পরিচয় পেয়েছেন এবং তিনি এও জানেন যে প্রয়োজন হলে কবি তাঁর চিন্তাকে ভাষার দ্বারা সম্পূর্ণ গোপন করেও ফেলতে পারেন। শুনে কবি অপ্রস্তুত হলেন, তাঁর বুঝতে বাকি রইল না যে, শ্রোতারা তাঁর বক্তব্য শুনে আদপেই সন্তুষ্ট হননি। কবি একটু বোঝাবারও চেষ্টা করেছিলেন যে, তাঁর রচনায় ফাশিবাদ সম্বন্ধে সরাসরি ধিক্কার না থাকলেও, সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের ভাষায় তাঁর বিতৃষ্ণা তিনি প্রকাশ করেছেন। শ্রোতাদের বিরূপতা তাতে প্রশমিত হয়নি। দুয়ামেল কবিকে অনুরোধ করেন তাঁর রচনাটির প্রকাশ যেন আপাতত স্থগিত রাখেন। কবি আপত্তি করেননি। আড়ালে কিন্তু দুয়ামেল রোলাঁকে শাসালেন যে এই সাক্ষাতের একটা রিপোর্ট তিনি প্রকাশ করবেন, তাহলে যদি

কবি বাধ্য হন তাঁর নির্লিপ্তভাব ত্যাগ করে ফাশিবাদ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধিক্কার বাণী উচ্চারণ করতে। রোলাঁ দ্যুয়ামেলের এই অসংগত, অশিষ্ট আচরণে খুবই বিরত বোধ করলেন এবং তাঁকে সাক্ষাতের জন্য আহ্বান করে যে একটা ভুল করেছেন তার জন্য মনে মনে অনুতপ্তও হলেন।

কিন্তু দোষটা শেষ পর্যন্ত দ্যুয়ামেলের উপর চাপিয়ে দিলেও রোলাঁ নিজেও যে বেশ খানিকটা অসহিষ্ণু হয়েছিলেন এবং তার ফলে বিচারেও যে খানিকটা ভুল করে-ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। জর্নালে তাঁর তৎসাময়িক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, তিনি কেবল তাঁর নিজের মহৎ উদ্দেশ্যের কথাই ভেবেছেন, ইতালির আতিথ্য গ্রহণ করার পর সদ্যপ্রত্যাগত রবীন্দ্রনাথের দিক থেকে তখন ভাবতে পারেননি। তাঁর ভাবা উচিত ছিল, ইতালিতে রবীন্দ্রনাথ গুপ্তচর অথবা আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক হিসেবে যাননি, স্বেচ্ছায় হোক বা ঘটনাচক্রেই হোক তিনি গিয়েছিলেন সরকারের অতিথি হিসেবে। তাঁকে যা দেখানো হয়েছে বা শোনানো হয়েছে তিনি তাই দেখেছেন বা শুনেছেন। তিনি যা দেখেছেন বা শুনেছেন তার মধ্যে মুসোলিনি বা ফাশিবাদের বিরুদ্ধতা কিছুই ছিল না। ক্রোচে কিছুই বলেননি, যদিও বলবার যথেষ্ট সুযোগ তাঁর ছিল। ফর্মিকির আচরণ সন্দেহজনক, ডিউক স্কোটি যে বলেছিলেন তাঁর মুখ বন্ধ তাতেও মনে খটকা জাগে। কিন্তু তার বেশী কিছু নয়। অতএব কবির নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যে এমন কী ছিল যার ভিত্তিতে তিনি মুসোলিনিকে অথবা তাঁর গবর্নমেণ্টকে প্রকাশ্যে অভিযুক্ত করতে পারেন—তাও ইতালির জনগণের নিকট শ্রদ্ধাভক্তির অভূতপূর্ব নিদর্শন পাবার পর? বস্তুত, অপপ্রচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং ফাশিবাদের বিরুদ্ধে অত্যাচার এবং স্বাধীনতা হরণের প্রকাশ্য অভিযোগ এই দুইয়ের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ, সাময়িক উত্তেজনা বশে রোলাঁ তা ভুলে-ছিলেন বলেই মনে হয়। রোলাঁ অসহিষ্ণুভাবে জর্নালে লিখলেন : 'ফাশিবাদের বিষয়ে তথ্যভিত্তিক কিছু বলতে কবি অনিচ্ছুক, কেননা তিনি বিচারে অক্ষম। তিনি কিছুই দেখেননি, কিছুই শোনেননি, কিছুই বোঝেন নি, কিছুই জানেন না। অতএব তিনি হস্ত-প্রক্ষালনপূর্বক দূরে সরে দাঁড়ালেন।' জর্নালে যাঁরা এই উক্তিটিই শুধু বিচ্ছিন্নভাবে পড়বেন তাঁরা রোলাঁর প্রতিই অবিচার করবেন। কেননা, যথারীতি, এই অধৈর্য স্থায়ী হয়নি। অচিরে রোলাঁ নিজের ভুল বুঝতে পারলেন এবং কালিদাস নাগকে চিঠিতে (৬।৭ই জুলাই) লিখলেন : 'রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যাচ্ছলে আমাদের যা বলেছেন সে কথা তো সত্য : "আমি যা বলেছি, তার বেশী কিছু আর বলতে পারছি না, তার কারণ এর চেয়ে বেশী আর কিছু আমি দেখিনি।" বস্তুত তাঁকে দেখানো হয়েছিল ফাশিজমের একটা অলংকৃত এবং সুসজ্জিত মঞ্চদৃশ্য।'

অন্তত এইটুকু বুঝতে রোলাঁর বিলম্ব হয়নি যে বর্তমান ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যা নিজে প্রত্যক্ষ করেননি বা শোনেননি, শুধু-মাত্র অনুমানের উপর, অথবা রোলাঁর মতো অপর কারো শোনা খবরের উপর নির্ভর করে ফাশিস্ট সরকারকে প্রকাশ্যে অভিযুক্ত করতে তিনি পারবেন না। সেটা করা যে তাঁর পক্ষে অযোগ্য হত তা রোলাঁ কোনো সময়েই পুরোপুরি বুঝেছিলেন কিনা বলা কঠিন। যাই হোক, দ্যুয়ামেল ফিরে যাবার পূর্বে রোলাঁ তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করলেন যে, তাঁদের কর্মপ্রণালীর কিছু পরিবর্তন আবশ্যক। কবির উপর শুধুমাত্র চাপ দিয়ে কোনো ফল পাওয়া যাবে না, তার চেয়ে বরং চেষ্টা করতে হবে ফাশিবাদের দ্বারা উৎপীড়িত ইতালীয় রেফুজীদের মধ্যে বাছা বাছা কয়েকজনের সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ করিয়ে দেওয়ার। তাঁদের নিগ্রহের কাহিনী যদি একবার তাঁদের মুখেই কবি শোনেন তা হলে ফাশিস্ট ইতালির স্বরূপটি তিনি প্রত্যক্ষ দেখতে পাবেন, এবং তাঁর ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে মনস্থির করতেও দেরী হবে না। এইবার রোলাঁ ঠিক রাস্তা ধরেছেন। সত্যের সমর্থনে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে কবিকণ্ঠ কখনো নীরব থাকেনি—এ আমরা ১৯২৬-এর আগেও বহুবার দেখেছি, পরেও বহুবার দেখবো, তবে তা কবির আপন স্থিরপ্রত্যয়-সাপেক্ষ। অতঃপর রোলাঁ সেই যোগাযোগ-সম্পাদনের কাজে মনোযোগী হলেন।
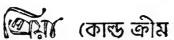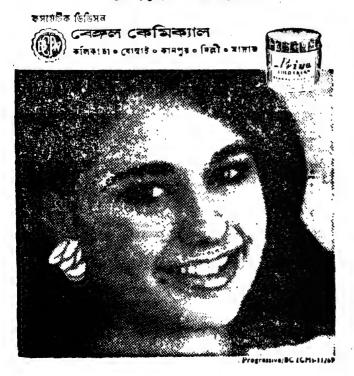
ইতিমধ্যে কবির ভিলনাভ পরিত্যাগ করবার দিন এগিয়ে এলো। যাবেন জুরিখে, সেখান থেকে ভিয়েনায়, তারপর য়ুরোপের নানা স্থানে। এবারের সাক্ষাৎ-

কারে ভারতবর্ষ ও ইতালিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিতর্কের যে ঘূর্ণিঝড় উঠেছিল রোলাঁ তার প্রভাব কাটাতে পারেন নি, জর্নালে তাই এই রাজনৈতিক প্রসঙ্গই প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তিনি অর্ধমনস্কভাবেই লিখে রেখেছিলেন তাতে পলিটিকস ছাড়াও আলোচ্য বিষয়ের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় : সংগীত, গাইশা-নৃত্য, জাপানী নাটক (এবং তার অভিঘাতে নাটকের প্রকৃতি সম্বন্ধেই কবির নূতন চেতনা), বর্তমান সভ্যতায় যন্ত্রের প্রভুত্ব ইত্যাদি। রাজনৈতিক প্রসঙ্গে রোলাঁর ঈষৎ অধৈর্য সত্ত্বেও কবির প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধার কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয়েছিল এমন নজির কোথাও নেই। বিদায়কালে শ্রীমতী মহলানবীশের অটো-গ্রাফ খাতায় রোলাঁ লিখলেন : 'ফরাসী ভাষায় একটি পুরাতন প্রবাদ আছে : "সূর্যকে যে পেয়েছে তার রাত্রির ভয় নেই।" রবির সহযাত্রী, তোমরাই ধন্য।' রোলাঁ লক্ষ্য করছেন সদলবলে হোটেলের উদ্যানপথ অতিক্রম করে কবি চলেছেন রোলাঁরই বাসস্থান 'ভিলা ওল্‌গায়'। উদ্যানের মালীরা যে-যার কাজ ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দূরে থেকে সবিস্ময়ে এবং সসম্ভ্রমে এই দৃশ্য দেখছে : ঠিক যেন চোখের সামনে দিয়ে বাইবেলের কথিত মোজেসের মতো কোনো মহাপুরুষ চলে গেলেন। একদিন জনৈক স্ত্রীলোক হোটেলের সিঁড়ি দিয়ে অপরিচিত কবিকে নামতে দেখে উত্তেজিতভাবে দৌড়ে এসে রোলাঁকেই খবর দিয়েছিল : 'এইমাত্র আমি হোটেলের সিঁড়িতে স্বয়ং মঙ্গলময় ভগবানকে (le Bon Dieu) দেখলাম।' এটিও রোলাঁ জর্নালে টুকে রেখেছেন এবং পরে কালিদাস নাগকে লিখিত পত্রে এই ঘটনার উল্লেখ করে সানন্দে মন্তব্য করলেন : 'কবি তো মঙ্গলময়ই বটে। তাঁর সমগ্র সত্তাটিই যেন কল্যাণ রশ্মি বিকীর্ণ করছে।'

৪ঠা জুলাই, বিদায়ের ক্ষণ সমাগত। রোলাঁ সঙ্গে এসেছেন স্টেশনে। প্রায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কবি মোটরগাড়িতে মাদ্‌লীনের সঙ্গে বসে রইলেন। খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রোলাঁ কথা বলছেন। অবশেষে যখন ট্রেনের কামরায় কবি উঠলেন, রোলাঁ হস্তচুম্বন করে তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। তাঁর দুই চক্ষু তখন অশ্রুপূর্ণ। কবিও হাত তুলে বারবার প্রীতি নমস্কার জানালেন। কবিকে বিদায় দিয়ে বিষণ্ণ হৃদয়ে মাদ্‌লীনকে নিয়ে রোলাঁ ফিরলেন। রোগে এবং জরায় জীর্ণ কবির শরীর, সে কথা মনে ক'রে রোলাঁর ধারণা হ'ল, এই 'মহান বন্ধুটি' আর হয়তো কখনো এখানে আসতে পারবেন না, এমন কি, স্বদেশেও ফিরতে পারবেন কিনা তাই বা কে বলতে পারে। বিষণ্ণ মনে রোলাঁ ভাবলেন এই মহান প্রতিভা বৃদ্ধ বয়সে বিফল প্রায় হতে বসেছে। তার কারণ, তাঁর কবিস্বভাব এবং ঘটনাচক্রে তাঁকে যে সামাজিক এবং রাজনৈতিক ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়, এ-দুইয়ের মধ্যে এমন একটা অসামঞ্জস্য রয়েছে যার সঙ্গে সমন্বয় তাঁর মধ্যে হতে পারে না, ফলে বেদনা এবং অস্থিরতা থেকে তিনি নিষ্কৃতি পান না। এই প্রসঙ্গে কালিদাস নাগকে লিখিত পত্রে (৬।৭ জুলাই) তিনি লিখলেন : 'রবীন্দ্রনাথকে যত বেশী ঘনিষ্ঠভাবে জানা যায় ততই স্পষ্ট বোঝা যায় যে কবি আখ্যাটি কত গভীরভাবে তাঁর সত্য পরিচয় বহন করছে। তাঁর ব্যক্তিত্বটি ঐশ্বর্য সমৃদ্ধ এবং জ্যোতিষ্মান কিন্তু তার মধ্যে প্রাধান্য তাঁর কবিসত্তার। তাঁর মনের অন্যান্য সমুদয় লক্ষণ এই কেন্দ্র শক্তির অনুগত। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, তাঁর অন্যান্য সকল কর্মপ্রয়াস তাঁর কবিমনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সেখানে তিনি সত্যিই স্বরাট—বিশ্বের মহত্তম কবিদের একজন।' কবি সুইট্‌জারল্যান্ডে এসেছেন, তাঁর প্রতিবেশী হয়ে কদিন কাটিয়ে গেছেন, সে-সুখস্মৃতি রোলাঁ মনের মধ্যে লালন করছেন সানন্দে এবং সগর্বে। পূর্বোল্লিখিত চিঠিতেই তিনি লিখলেন : 'কবির অসাধারণ ব্যক্তিত্বটি আমাদের এই ক্ষুদ্র দেশের জনগণের মনে কী গভীর রেখাপাত করেছে সে বিষয়ে নিশ্চয়ই তোমাকে বেশী করে বুঝিয়ে বলতে হবে না।—আমাদের প্রিয় এবং মহান বন্ধুটি এখানে কয়েকটা দিন কাটিয়ে গেলেন, আমাদের এই ক্ষুদ্র সুইস্ আবাসস্থলটির পক্ষে এটা একটা আশীর্বাদস্বরূপ। এখান থেকে কবি যাত্রা করার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে গেল, ঝড়-ঝঞ্ঝা হানা দিল, বৃষ্টির বিরাম রইল না। কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে আমরা লালন করছি সেই জ্যোতির স্পর্শটি।' দুয়ামেলের হৃদয় পরিবর্তনটিও কম বিচিত্র নয়। ভিলনোভ পরিত্যাগ করবার কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা যায় কবির সামনে সাময়িক উত্তেজনাবশে বাচালতা করার জন্য তিনি অনুতপ্ত। সে সময় কবিকে বিচার করতে বসা যে তাঁর পক্ষে অসমীচীন হয়েছে সে কথা জানিয়ে রোলাঁকে তিনি যে চিঠি দেন তার একটি অংশ ৮ই জুলাই তারিখে কবিকে লিখিত এক পত্রে রোলাঁ উদ্ধৃত করেন। 'দুয়ামেল্‌' বলছেন : 'কোনো কোনো গ্রন্থের প্রত্যক্ষ আবেদনের চেয়ে তার 'সৌরভটি' ঢের বেশী মর্মস্পর্শী। ঈশ্বর যে মনটির মাঝখানে তাঁর আসন পেতেছেন, এই সৌরভ যেন তারই অত্যাশ্চর্য বিকিরণ। অগণিত কবি আছেন যাঁদের কাব্য আমরা পড়ি, প্রশংসাও করি। কিন্তু প্রাণকে জাগায়, প্রাণের শক্তিকে উদ্দীপিত, মহিমান্বিত করে যে জাদু, তাকে বিকীর্ণ করতে পারেন এমন কবির সংখ্যা খুবই কম। রবীন্দ্রনাথ তাঁদেরই একজন।'

কবিকে স্টেশনে বিদায় দিয়ে বিষণ্ণ মনে ঘরে ফিরে জর্নালের পাতায় যে সব স্মৃতিকথা রোলাঁ লিখেছেন তার পরিচয় পূর্বেই দিয়েছি। সেই সূত্রে ঈষৎ ইতস্তত করে কিঞ্চিৎ সলজ্জভাবে একটি বিচিত্র এবং খাপছাড়া উক্তি তিনি করেছিলেন যার একটি সংক্ষিপ্ত টীকা আবশ্যক। রোলাঁ লিখেছেন : 'কবিকে আমি গভীরভাবে ভালোবাসি এবং ভক্তি করি কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্বীকার করব। যতবারই তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছি প্রত্যেকবারই একটা অসহিষ্ণু এবং 'শরতনস্যলভ' ইচ্ছা আমার হয়েছে যে, কথার মাঝখানে হঠাৎ উঠে পড়ি এবং স্থানত্যাগ করি—এবং

এইভাবে গুরুগম্ভীর শিষ্টাচারের যে চাপ মনের মধ্যে অনুভব করছি সেটা ভেঙে দিই।' উক্তিটির মধ্যে রোলাঁর স্বভাবসিদ্ধ naivete-এর পরিচয় আছে। ভক্তি ও ভালোবাসার সঙ্গে 'শয়তান-সুলভ' বিদ্রোহ এবং অশিষ্ট আচরণের ইচ্ছার মধ্যে যে সুপ্রকট বিরোধ আছে তা কোনো বয়স্ক, বুদ্ধিমান এবং আত্মসচেতন ব্যক্তির অগোচর থাকবার কথা নয়। এই রকম কোনো ব্যক্তি এই জাতীয় খাপছাড়া উক্তি ডায়েরীভুক্ত করবার পূর্বে তার পশ্চাতে যে বিচিত্র অনুভূতিটি আছে সেটিকে অভিজ্ঞতা ও মনোভঙ্গীর পারম্পর্যের সঙ্গে মিলিয়ে আত্মবিশ্লেষণের দ্বারা বুঝবার চেষ্টা করবেন এইটেই স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত। কিন্তু রোলাঁর যে আত্মসমীক্ষার ক্ষমতা আদৌ ছিল ছিল না সে কথা আগেই বলেছি, এই উক্তিটি তার অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে একটি। রোলাঁ উক্তিটিকে বিনা ব্যাখ্যায় ডায়েরীভুক্ত করলেও সাবধানী পাঠক বুঝবেন যে উক্তিটিতে সুচিন্তিত মতের লেশমাত্র নেই (কেননা সুদীর্ঘ পঞ্চাশ পাতা ধরে যে সশ্রদ্ধ কৌতূহলের সঙ্গে রোলাঁ কবির কথা টুকে গেছেন তার মধ্যে এর সমর্থন পাওয়া যায় না), আছে শুধু বিক্ষুব্ধ স্নায়ুর দীর্ঘকালব্যাপী অবদমনের বিরুদ্ধে সাময়িক আক্ষেপ। ১৯২৬ সালের বিশেষ Context-টির কথা মনে রাখলে রোলাঁর এই অবদমিত মানসিকতা সহজবোধ্য হবে। এই সঙ্গে কবির আলাপ সম্বন্ধে রোলাঁর আরো কয়েকটি বিক্ষিপ্ত উক্তি স্মরণ রাখা প্রয়োজন। এবারকার জর্নালের গোড়ার দিকে দু-একবার রোলাঁ মন্তব্য করেছেন যে রবীন্দ্রনাথ 'জন্মবক্তা, মনে হয় যেন তিনি নিজের কণ্ঠস্বর শুনতে ভালোবাসেন, তাঁর আলাপনকে ঠিক আলাপন বলা যায় না, বলা উচিত এক-একটি দীর্ঘ স্বগতোক্তি। এই উক্তিগুলির সঙ্গে আলোচ্য উক্তিটির নিকট-সম্বন্ধ। প্রথমত 'কবির আলাপমাত্রেই স্বগতোক্তি', কবির বচন-রীতির সাধারণ বর্ণনা হিসেবে এ কথা যে সত্য নয় সে-বিষয়ে বিস্তৃত মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। রোলাঁর সঙ্গেই আলাপের যে তিনটি অনুলিপি Rolland and Tagore গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে (তার মধ্যে দুটিই ১৯২৬ সালের) তার একটিও স্বগতোক্তি নয়। তাছাড়া ১৯২১ সালে কবির সঙ্গে রোলাঁর যে তিনবার সাক্ষাৎকার ঘটে তার যে বিস্তৃত বিবরণ জর্নালে লিখেছেন তার মধ্যে কোনো জায়গাতেই কবির আলাপকে তিনি স্বগতোক্তি বলে সন্দেহ করেন নি। তবে ইংরেজি না-জানার দরুণ কবির সঙ্গে সরাসরি আলাপের অসুবিধে নিজের দিক থেকে যে অনুভব করেছেন অথচ কবির পক্ষেও একজন তৃতীয় ব্যক্তির মাধ্যমে দীর্ঘকাল আলাপ চালানো যে ক্লান্তিকর হতে পারে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অচেতন ছিলেন তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। উপরন্তু, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের যে একটা ভার ছিল, প্রথম সাক্ষাতেই রোলাঁ সেটা বুঝেছিলেন এবং সেই জন্যই ফরাসী চাচুরদের ভূমিকায় তাঁর উপস্থিতিকে গীর্জার অভ্যন্তরের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। এই সমস্ত তথ্য মনে রেখে ১৯২৬-এর ভারক্রান্ত আবহাওয়ায় আলাপ-আলোচনার গতি প্রকৃতি অনুসরণ করলে রোলাঁর তৎকালীন মানসিক অবস্থাটা সহজবোধ্য হবে। এবার কখনো কখনো রবীন্দ্রনাথের উক্তিগুলিকে যে স্বগতোক্তি বলে মনে হয়েছে তার দুটো কারণ। প্রথমত, ভারতবর্ষের দুর্গতি কবির মনে একটা obsession মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে কথা পূর্বেই বলেছি, তার ফলে ভারতবর্ষের প্রসঙ্গ যখনই উঠেছে—তখনই কবি বিস্তৃতভাবেই নিজের মন্তব্য বলে গেছেন, স্বভাবতই রোলাঁর নিকট উক্ত বিষয়ে কিছু শোনবার প্রত্যাশা তাঁর বিশেষ ছিল না। দ্বিতীয় কারণটি গুরুতর। এবার দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ-আলোচনা হয়েছে প্রতিদিন বহুবার করে এবং দীর্ঘকাল ধরে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে প্রতিবারই একজন interpreter-এর সাহায্যে দীর্ঘ-কাল স্থায়ী আলাপ চালানো কখনো

কখনো কবির পক্ষে যে অত্যন্ত ক্লান্তিকর হয়েছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। সেই জন্য একদিকে তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যস্থতায় বাধা-গ্রস্ত এবং ক্লান্তিকর আলাপ এবং অপর পক্ষে তার বিকল্পস্বরূপ অস্বস্তিকর এবং অসৌজন্যমূলক নীরবতা, এ দুটিকেই এড়িয়ে যাবার জন্য কবি যে কখনো কখনো ইচ্ছাপূর্বক দীর্ঘ, অবিচ্ছিন্ন বিবৃতির আশ্রয় নিয়েছেন বা নিতে পারেন সেটা অনুমানে বুঝে নেওয়া রোলাঁর পক্ষে কঠিন ছিল না। কিন্তু রোলাঁর মন যে ঠিক শান্ত, প্রকৃতিস্থ ছিল না তা আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি। ইটালি সম্বন্ধে তাঁর অনেক কথা কবিকে বলার ছিল। ইংরেজী জানলে নিভৃত আলাপে সরাসরি সে সব আলোচনা করে নিষ্পত্তি করে ফেলতে পারতেন। দোভাষীর সাহায্যে সে সব প্রসঙ্গের আলোচনা অনুকূল সুযোগ-সাপেক্ষ। সে সুযোগ তার আসে না। এদিকে সমস্ত ইটালি সম্পর্কে নানা অনুমান [illegible] রোলাঁর মনকে বিক্ষুব্ধ করে রেখেছে, [illegible] দাবির কাছে তা প্রকাশ করতে পারছেন না, এমনি সময় [illegible] সম্বন্ধে এক [illegible] ফলে [illegible] [illegible] কবির [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] ঠিক [illegible] [illegible] রোলাঁ প্রায় সংক্ষেপে [illegible] লিখলেন : 'রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষের পক্ষে এইভাবে বাক্যালাপ চালানো সত্যিই প্রায় অসম্ভব। তিনি নিজেই বলেছেন, যেখানে তিনি সরাসরি কথা বলতে পারেন না, সেখানে তিনি কিছু বলতেই পারেন না। সত্যিই তো, ভিলন্যভে এসে তিনি [illegible]ভাবে নিরুৎসাহই হলেন। ঠিক যেন দুই বধির ব্যক্তির পরস্পরের মধ্যে আলাপের ব্যর্থ চেষ্টা।' এর পরেও রোলাঁ আলোচ্য উক্তিটির সংশোধন বা ব্যাখ্যার চেষ্টামাত্র করেন নি, সেটা ফাইল চাপাই থেকে গেল। তৎসত্ত্বেও পরবর্তী চিঠিপত্র থেকে যে সব উদ্ধৃতি দিয়েছি তার থেকে পাঠকমাত্রেই বুঝতে পারবেন যে, উক্তিটি সাময়িক স্নায়ু-বিকারের প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। এর থেকে রোলাঁর মনের সরল সততার আভাস যেমন পাই, তেমনি এর মধ্যে সূচিত হয় আত্মবিশ্লেষণের সতর্কবুদ্ধির এবং সাধারণ কল্পনাশক্তির অভাব।

রোলাঁর অন্য এবং প্রকৃত পরিচয়টাও পাওয়া যায় ইতালিঘটিত ব্যাপারে রবীন্দ্র-নাথের সমর্থনে যে সব চিঠিপত্র তিনি এই সময় লেখেন তার মধ্যে। কবি ভিলন্যভ ত্যাগ করবার পরদিনই তিনি ফাশিস্ট সরকারের উৎপীড়ন দেশত্যাগী অধ্যাপক জিউসেপে সালভেমিনিকে এক পত্রে (৫ই জুলাই) লেখেন : 'আপনার সঙ্গে আলাপ না করে এবং আপনার মুখে পদনত ইতালির পর মুক্ত ইতালি এবং তার শহীদদের কথা না শুনে যাতে রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপ ত্যাগ না করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। কেননা, অপপ্রচারের দ্বারা ফাশিস্ট প্রেস রবীন্দ্র-নাথকে স্বদলভুক্ত বলে ঘোষণা করছে। এ বিষয়ে প্রকাশ্যে যথাযোগ্য প্রতিবাদ করবার ইচ্ছাও তাঁর আছে। কিন্তু তার পূর্বে তাঁর মতকে দৃঢ় প্রত্যয়ের উপর বদ্ধমূল করা প্রয়োজন। আপনার উপর এইভাবে চাপ দিচ্ছি বলে ক্ষমা করবেন। কিন্তু আপনার স্বার্থ (cause) সকল মুক্ত মানুষেরই স্বার্থ। (সংখ্যায় তাঁরা খুব বেশী নন।) আমার প্রবল আকাঙ্ক্ষা যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে আপনাদের সমর্থন ঘোষণা করেন।' অতঃপর ৬ই জুলাই থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে কালিদাস নাগ, [illegible] তার বন্ধু, ডাক্ মেসালিন্, অধ্যাপক মহলানবীশ, মাদাম [illegible] এবং মার্সেল মার্তিনে-কে যে-সব চিঠিপত্র রোলাঁ লেখেন তার মধ্যে কবির প্রতি তাঁর অনুরাগ, শ্রদ্ধা এবং সর্বোপরি তাঁর সুগভীর loyalty-র মর্মস্পর্শী পরিচয় আছে। ফাশিস্ট প্রেসের অপপ্রচারে

খেটে খেটে সারা!
সংসারের যাবতীয় কাজে গৃহিণীর শরীরের
গ্লুকোজ প্রতিমুহূর্তে ক্ষয় হচ্ছে
ক্লান্তির মানে হ'ল, শরীরে
গ্লুকোজের প্রয়োজন। আর
গ্ল্যাক্সোজ-ডি হল এমন বিশুদ্ধ
গ্লুকোজ পাউডার, যা খেলে মুহূর্তে
দেহের শক্তি ফিরে আসে।
আপনার শরীরের গ্লুকোজ অনবরত ক্ষয় হ'য়ে যাচ্ছে। আর সেই গ্লুকোজ
যখন একেবারে কমে যায় তখন আপনার ক্লান্তি আসে। সেই সময়ে আপনার
একটু গ্লুকোজ খাওয়া বিশেষ দরকার। মনে রাখবেন যাঁরা গ্লুকোজ ব্যবহার
করেন তাঁদের প্রায় সবারই পছন্দ মিষ্টি স্বাদের গ্ল্যাক্সোজ-ডি। এতে মুহূর্তে
আপনার শরীরে শক্তি ফিরে আসে। আপনি একে জলে, দুধে, ফলের
রসে কিম্বা সোজাসুজি প্যাকেট থেকে খেতে পারেন।
নিমেষে শক্তি অথচ কত কম দাম
গ্ল্যাক্সোজ-ডি
গ্ল্যাক্সোর তৈরী গ্লুকোজ পাউডার
GLAXOSE-D
ACA-GL 46 ben

পশ্চিমবঙ্গের অর্থসংকট

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৯৭০-৭১ সালের বাজেট ২০শে ফেব্রুয়ারী বিধানসভায় উত্থাপিত হবে। বাজেট তৈরি করার আগে সরকারকে নিদারুণ অর্থসংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছে। যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের ৩২ দফা কর্মসূচীর অনেকগুলোই টাকার অভাবে কার্যকর করা সম্ভব হচ্ছে না বলে সরকার জানিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপে শিক্ষামন্ত্রীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বিধানসভায় শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন যে, বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা টাকার অভাবে করা সম্ভব হচ্ছে না; মন্ত্রিসভার একটি সাব-কমিটি জিনিসটি নিয়ে বিবেচনা করছেন। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে এ ব্যাপারে টাকা আদায় করারও দাবি উঠেছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ সাহায্য করতে অক্ষম। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী এ কথাও জানিয়েছেন যে, "শিক্ষণ" হচ্ছে রাজ্য সরকারের ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত; রাজ্য সরকার যদি মনে করেন যে, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের বিনা বেতনে শিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়া উচিত, তবে তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান রাজ্য সরকারকেই করতে হবে। প্রয়োজন হলে রাজ্য সরকার অন্য খাতে ব্যয়ের পরিমাণ কমাতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা এ বছর থেকে চালু করেছেন; তার জন্যও রাজ্য সরকারকে প্রচুর টাকা খরচ করতে হবে। শিক্ষার সুব্যবস্থা করা যে-কোন সরকারেরই প্রাথমিক কর্তব্য। কিভাবে যে শিক্ষা-কর্মসূচীর রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান হবে, সরকার নিজেই তা এখনও স্থির করতে পারেননি। অনুমান করা হয়েছে, উপার্জনশীল নাগরিকদের একটি অংশের উপর "শিক্ষা সেস" (Education cess) চাপানো হতে পারে। বিকল্প কোন উৎস থেকে এ ব্যাপারে অর্থের সংস্থান করা যায় কিনা তা-ও সরকার ভেবে দেখছেন।

অর্থসংকটের আরেকটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে বেতন কমিশনের (Pay commission) সুপারিশগুলিকে সরকার যথাযথভাবে কার্যকর করতে পারবেন কিনা সে সম্পর্কে অনিশ্চয়তা। সরকারী কর্মচারী, সরকারী স্কুল-কলেজের এবং বে-সরকারী স্কুলের শিক্ষকদের জন্য বেতন কমিশন যে প্রশংসনীয় সুপারিশ দিয়েছেন তা এখনই কার্যকর করার মত আর্থিক সঙ্গতি সরকারের নেই বলেই সকলে জানেন। আশা করা যায়, রাজ্য সরকারের আগামী বাজেটে এ সম্পর্কে কিছু ইংগিত থাকবে। কলকাতা পৌরসভাও সরকারের কাছে অন্ততঃ ছয় কোটি টাকা অগ্রিম চেয়েছেন; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ-কাজও টাকার অভাবে বন্ধ আছে। সরকার কিভাবে এই সংকটের মোকাবিলা করবেন—এই প্রশ্ন সবার মনে এখন বিশেষভাবে দেখা দিয়েছে। শহরে জমি ও অন্যান্য সম্পদের উপর কর ধার্য করার একটি প্রস্তাব সম্প্রতি খুব জোরদার হয়েছে। কিন্তু শহরে সম্পত্তির উপর কর ধার্য করার ক্ষমতা কার—এ নিয়েও একটি বিতর্কের সূচনা হয়েছে। সরকার মনে করেন, এই কর ধার্য করার ক্ষমতা সরকারের আছে; আবার, কলকাতা পৌরসভা দাবি করেছেন যে, এ-জাতীয় কর ধার্য করার ক্ষমতা একমাত্র পৌরসভারই আছে। যা হোক, এ ধরনের নতুন কর ধার্য করার মাধ্যমেই রাজ্য সরকারের আর্থিক সঙ্গতি বাড়তে পারে।

বেকার-ভাতা দেওয়ার কর্মসূচী যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের বত্রিশ দফা কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যার তীব্রতা এতই বেড়েছে এবং আর্থিক সঙ্গতি এতই সীমাবদ্ধ হয়েছে যে, সরকারের পক্ষে এক অংশ পরিমাণ বেকার-ভাতা দেওয়াও সম্ভব নয়। সরকারের পক্ষে এখন পূর্ব-নির্ধারিত অর্থ প্রদানের কোনও কর্মসূচীই সুষ্ঠুভাবে অনুসরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তার উপর নতুন এমন কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্ভব নয়, যার অর্থসংস্থান করতে সরকার অক্ষম।

তাই বাজেট তৈরি করা এবং তা গ্রহণ করার পূর্বমুহূর্তে আজ সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে, কিভাবে সরকার আরও বেশী করে অর্থ সংগ্রহ করবেন অথবা আর্থিক সঙ্গতি বাড়াবেন। একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার যে সুবিধাগুলি ভোগ করেন, রাজ্য সরকার সেই সুবিধা ভোগ করেন না। প্রয়োজনবোধে কেন্দ্রীয় সরকার বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করতে পারেন অথবা নতুন মুদ্রা ছাপতে পারেন। রাজ্য সরকারের পক্ষে সরাসরি বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করা সম্ভব নয়। একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই এই সুযোগের অধিকারী। তা ছাড়া রাজ্য সরকারের নতুন টাকা ছাপার কোনও অধিকার নেই। রাজ্য সরকারের আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে পরোক্ষ কর—যেমন, অন্তঃশুল্ক, বিক্রয়কর, আমোদ-কর প্রভৃতি। অন্তঃশুল্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির উপর কর ধার্য করেন কেন্দ্রীয় সরকার, অবশ্য রাজ্য সরকার তার কিছু অংশ পেয়ে থাকেন। বিক্রয়কর এবং আমোদকরের হার বাড়াবার মত অবস্থা এখন পশ্চিমবঙ্গের নেই। তবে সম্প্রতি যে কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে এখন উৎপাদন বৃদ্ধির ক্রমবর্ধমান হার পরিলক্ষিত হচ্ছে তার ফলে অন্তঃশুল্কে রাজ্য সরকারের রাজস্ব বাড়বে। ভূমি রাজস্বের পরিমাণ পশ্চিমবঙ্গে এখনো আশাপ্রদ নয়। তিন একর পর্যন্ত জমির উপর রাজস্ব মকুব করা হয়েছে। আয় বাড়াবার একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে কৃষি ক্ষেত্রে করের পরিমাণ কিছু বাড়ানো। কিন্তু এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে যদি সরকার কাজ করেন তবে আর্থিক সঙ্গতি বাড়াবার একটি বড় সুযোগ অবহেলিত হতে পারে।

রিজার্ভ ব্যাংকের নয়া নির্দেশ

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির কাজকর্ম পরিচালনার নীতি নির্ধারণ এবং নির্দেশ দেবার ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া সম্প্রতি নিজের হাতে নিয়েছেন। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির তত্ত্বাবধায়করূপে (Custodians) নিজেদের ইচ্ছা সর্বত্র প্রয়োগ করার ক্ষমতা ভোগ করেন না। সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির তত্ত্বাবধায়কদের জানিয়েছেন যে ২৫ লক্ষ টাকার বেশি ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে, যৌথ মূলধনী কারবারের শেয়ার ও ডিবেঞ্চার প্রভৃতি ক্রয়ের মাধ্যমে ১ লক্ষ টাকার বেশি বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে এবং শেয়ার ও ডিবেঞ্চার প্রভৃতির বিপক্ষে ৫ লক্ষ টাকার বেশি ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাংকের সম্মতি ছাড়া কোন কিছুই করা সম্ভব হবে না। তাছাড়া ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নিয়োগ, জমি, দালান প্রভৃতির ক্ষেত্রে নির্ধারিত সীমার বেশি ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে এবং মুনাফা ব্যবহার করার ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলিকে রিজার্ভ ব্যাংকের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে।

সুব্রত গুপ্ত

অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে সম্প্রতি ক্যালকাটা আর্টিস্টস সংস্থার সভ্যগণ তাঁদের একটি যৌথ প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। কয়েকজন তরুণ শিল্পী সভ্য পরিচালিত এই সংস্থাটি গত কয়েক বছর যাবৎ নিয়মিতভাবে প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করে শিল্পীমহলে পরিচিত হয়েছেন। প্রদর্শনীতে ছজন শিল্পী সভ্যের ৩৫টি রচনা ও একজন ভাস্কর শিল্পীর ছয়টি ভাস্কর্য নিদর্শন দেখা যায়।

পেণ্টিং-এ —শ্রীমতী সন্তোষ রোহাতগী

বিশেষ কোনও শিল্পীগোষ্ঠীর প্রদর্শনী-ভুক্ত রচনাবলীর কথা বলতে গেলে প্রথমেই তাঁদের পূর্ব অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীর রূপটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে ও তারই পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রতিকতম রচনাবলীর গুণাগুণ বিচার করতে হয়। ক্যালকাটা আর্টিস্টস-এর সভ্যগণ বিভিন্ন দপ্তরে শিল্পকাজে নিযুক্ত আছেন। দৈনন্দিন দপ্তর-সংক্রান্ত কাজ করার পরেও যে অবসর সময়টুকু তাঁরা মৌলিক শিল্প-চর্চায় নিয়োজিত করেন তা থেকে তাঁদের যথাযথ শিল্পনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে বর্তমান প্রদর্শনীতে দু'একজন ছাড়া কেউই কোনও বৈশিষ্ট্য দেখাতে পারেননি। শ্রীমতী সন্তোষ রোহাতগী, অমিতাভ ব্যানার্জী, শ্যামল বোস ও মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর কাজ প্রথমেই চোখে পড়ে।

এঁদের মধ্যে প্রথম জনের রচনা বিমূর্ত-সমবিমূর্ত শ্রেণীর। শিল্পী নানা রঙের ছোট ছোট টানে রচনাক্ষেত্র ভরিয়ে ফেলেছেন ও তাদের মধ্য থেকেই বহিরেখার মধ্য দিয়ে বিশেষ কোনও মূর্তি ফোটাতে চেষ্টা করেছেন। সব ক্ষেত্রে অবশ্য তাঁর প্রচেষ্টা সফল হয়নি। তবে পেণ্টিং-ডি ও পেণ্টিং-এফ, বিশেষ করে শেষোক্তটি গেরুয়া ও সবুজ রঙ ব্যবহার ও পৃষ্ঠভূমিতে ইঙ্গিত মাধ্যমে প্রকাশিত মূর্তির জন্য অনেকের ভাল লাগে। অমিতাভ ব্যানার্জী দু-এক স্থলে তাঁর পরিকল্পনাকে নতুনভাবে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। ১১ ও ১২নং কম্পোজি-শনে দেওয়াল-চিত্রের কিছু প্রভাব দেখা যায়। তবে ভিজে কাগজের ওপর উজ্জ্বল লাল ও হলুদ রঙ সুকৌশলে ব্যবহার করে "রাষ্ট অফ"-এ তিনি বিশেষ মুহূর্তটির গুরুত্ব ও পরিবেশ ফুটিয়ে তুলেছেন। একটিতে আমেরিকান শিল্পের কিছু প্রভাব দেখা যায়, যেমন ড্রিম উইদিন এ ড্রিম। শ্যামল বোস বরাবর হালকা রঙ ব্যবহারের পক্ষপাতী ও এবারেও তাঁর ছবিতে সেই বিশেষত্ব প্রথমেই ধরা পড়ে। হালকা রঙের স্তরভেদ ও তারতম্যের জন্য ল্যাণ্ডস্কেপ প্রথমেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে শ্যাডোজ যেন কিছু আড়ষ্ট। মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর রচনার প্রধান গুণ রঙীন কাচের মত রঙের বিচিত্র কারুকার্য। রচনাক্ষেত্রটি যেন তিনি ছোট বড় লম্বমান নানা ব্লকে বিভক্ত করেছেন ও পরে সেই-গুলিই উজ্জ্বল লাল, নীল ও হলুদ রঙে ভরে ফেলেছেন। এই প্রসঙ্গে হর কি পৌরি উল্লেখযোগ্য। রঙের কারুকার্য ও জলে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের জন্য টেম্পলস মন্দ লাগে না। তবে রচনাক্ষেত্র অতিরিক্তভাবে ভাগ করার ফলে কয়েকটি যেন প্রাণহীন হয়ে পড়েছে, যেমন নাইট সিন। এটির আড়ষ্টতা ও কৃত্রিমতা যেন সহজেই ধরা পড়ে যায়। বেণু লাহিড়ীকে যেন ঠিক এই গোষ্ঠীভুক্ত বলে মনে হয় না। তুলনামূলক-ভাবে বিচার করলে তাঁর ছবিগুলি দুর্বল বলে মনে হয়। বারিদ গোস্বামীর কালি-কলমের কাজে কোনও নতুনত্ব দেখিনি তবে গতিবেগের আভাসের জন্য অ্যানিম্যাল-২ ও বিশেষ করে কিশওয়াইফ উল্লেখযোগ্য। শংকর ঘোষের সব কটি ভাস্কর্য নিদর্শনই সেজান্‌দ্রি প্লাস্টারের মাধ্যমে তৈরী। আকারের দিক থেকে টর্সো ও লম্বমান, রেখাভিত্তিক লেডির নাম করা যায়।

*

ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত কয়েকজন কৃতী শিল্পীর প্রদর্শনী ইতি-পূর্বে দেখেছি। তবে এই কলেজের ছাত্র-

অ্যাগনি ইন ইক্সটেসি

—অমিতাভ ব্যানার্জী

ছাত্রীদের বার্ষিক প্রদর্শনী দেখার সুযোগ ইতিপূর্বে হয়নি। এবারে আহূত হওয়ায় ধর্মতলা স্ট্রীটে স্থাপিত কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন বিভাগের নানা কাজ দেখলাম। সমগ্র প্রদর্শনীতে কলা বিভাগের ১৫০, কমার্সিয়াল বিভাগের ৮২ ও ভাস্কর্য

বিভাগে ৬টি, অর্থাৎ মোট ২৩৬টি নিদর্শন দেখা যায়।

কলা বিভাগের নানা নমুনা দেখে মনে হল ছাত্রছাত্রীরা নিসর্গ ও দৃশ্যমান জগতের নানা বস্তু স্কেচ করেছেন ও সেই সঙ্গে স্টিল লাইফ ও প্রতিকৃতিও এঁকেছেন।

মাধ্যম হিসাবে তাঁরা জল ও তেলরঙ দুই-ই ব্যবহার করেছেন। অধিকাংশ রচনাই রিয়ালিস্টিক, যদিও ইমপ্রেশানিস্টিক নিদর্শনও দু'-একটি চোখে পড়ে। নির্বাচিত ছবিগুলি দেখে বোঝা যায় যে, ছাত্রছাত্রীরা নিষ্ঠাসহকারে আপন আপন রুচি ও মাধ্যম অনুযায়ী কাজ করে গেছেন। তবে একথা সত্যি, উল্লেখ্য রচনার সংখ্যা অত্যন্ত কম—অর্থাৎ যে কয়েকজনের কাজে প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁদের সঙ্গে অপরাপর ছাত্রছাত্রীর কাজের মানের পার্থক্য অতি সহজেই ধরা পড়ে। কলা বিভাগে যে দুজন ছাত্রের রচনা অনেকের ভাল লাগে, তাঁদের নাম বিমল দাস ও গোবিন্দ পাল। প্রথম জন ইমপ্যাস্টো প্রথায় রচিত আর্ট নুন-এ একটি সরল, পরিচিত গ্রাম্য পরিবেশের অবতারণা করেছেন। চাপা তেলরঙে আঁকা লেবার-এরও নাম করা যায়। দ্বিতীয় জনের জলরঙের স্কেচগুলি প্রশংসনীয়—বিশেষ করে শিয়ালদা ইন নাইট। ভিজে কাগজের ওপরে রঙ ব্যবহার করলেও শ্যামবাজারের রাত্রির দৃশ্যে ঠিক পরিবেশ রচিত হয়নি। আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা পিকনিক। যেন ছড়িয়ে-দেওয়া রঙ মাধ্যমে শুভ্র কিংবা সাদা আহাররত মুরগীদের একটি বিশেষ রূপ প্রকাশ করেছেন। অন্যান্য রচনার মধ্যে অ্যাট নাইট (মঞ্জুশ্রী চাটার্জী), সানবাথ (দিলীপ দেবনাথ), মুঙ্গেরের গঙ্গা ও স্কেচ (সমীর ঘোষ), প্রতিকৃতি ১১৬, ১১৮ (বিপ্লব রায়) ও স্কেচ (দিলীপ পাল)-এর নাম করা চলে। লিনোকাট ও বিমল দাসের এচিং মন্দ লাগে না।

অল্প নিদর্শন থাকলেও কমার্শিয়াল বিভাগের কাজ ভাল লাগল। শো-কার্ড থেকে শুরু করে পত্রিকার পত্রসজ্জা, ফোল্ডার, বিজ্ঞাপন, প্রচ্ছদপট, রেকর্ড কভার প্রাচীরপত্র ও প্রচার পদ্ধতির নানা আধুনিকতম নমুনা এই বিভাগে দেখা যায়। বিশেষ করে প্রাচীরপত্র পরিকল্পনা ও লেখাপানা বাখার দিক থেকে অরুণ ব্যানার্জী ও জহরলাল নন্দন (ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল) প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। অপরাপর ছাত্রদের মধ্যে কার্তিক ভৌমিক (ফলো দি প্রাচীরপত্র), তপন বিশ্বাস (বিজ্ঞাপন ও ক্যালেন্ডার), নৃপেন্দু চট্টোপাধ্যায় (বকং রেকর্ড কভার), অমর লস্কর (বিজ্ঞাপন-জীবন বীমা), প্রদীপ নন্দী (রেকর্ড কভার) এর নাম করা যায়। ভাস্কর্য বিভাগে প্লাস্টার ও মাটির কাজ দেখা যায়। গঠন-কৌশল ও মাটির গুণকে প্রয়োজনমত নারীদেহের ছন্দ ও লালিত্যে রূপায়িত করার জন্য পরমানন্দ চক্রবর্তীর রিডিং মন্দ লাগে না, যদিও মুখের অংশটুকুর দিকে ভাস্কর অধিকতর নজর দিলে নিদর্শনটি সুন্দরতর হত। রেখাভঙ্গিক, চাঁদকর-এ অবশ্য তিনি প্রগতিবাদের পরিচয় দিয়েছেন। সামগ্রিক গঠন কৌশলতার দিক থেকে তিনি কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। সম্মুখ ভাগের গঠনপ্রণালী বিষয়ে আর একটু সচেতন হলে ভাস্কর্য কাজটি আরও সুন্দর হয়ে উঠত।

*

ভ্রম সংশোধন

শিল্পী সুনীল দাসের প্রদর্শনীর সমালোচনা প্রসঙ্গে (দেশ, ২৪ জানুয়ারী) মুদ্রাকর প্রমাদের জন্য প্রথম প্যারাগ্রাফের তৃতীয় লাইনে "বলেছিলাম" স্থলে "বলেছিলেন" মুদ্রিত হয়েছে। বাক্যটি হবে এইরূপ : "শিল্পী সুনীল দাস ইতিপূর্বে যখন তাঁর একটি বৃহদাকার একক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন তখন বলেছিলাম যে তাঁর সাম্প্রতিক অঙ্কনরীতি দেখে অনুমান করা হয় যে, হয় তিনি দেশের অতীত চিত্রকলাধারার আশ্রয় নেবেন, না হয় তাঁকে সমসাময়িকতার গণ্ডী ভেঙে..." ইত্যাদি।

চিত্রপ্রিয়

[শ্রীশচীন দেববর্মনের আত্মকাহিনীর ভূমিক হিসাবে শ্রীসলিল ঘোষের এই লেখায় পাঠক শিল্পীর জীবনের কয়েকটি ঘটনার কথা জানতে পারবেন তা-ছাড়া শিল্পীর মেজাজ ও মানসিকতার অন্তরঙ্গ পরিচয়টিও এই রচনায় পরিস্ফুট। পরের সংখ্যা থেকে শ্রীদেববর্মনের আত্মকথা শুরু হবে।]

মীরা বৌদি বললেন—"কর্তা, আপনার কি এখন মুড আছে, সলিলকে আপনার সেই পুজোর গানগুলি শুনিয়ে দিন না।"

কর্তা তাঁর শীর্ণ শরীর আর রোগা দাড়ীভর্তি চিবুকের সরু, লম্বা পা শোফাতে উঠিয়ে মুখে পান রেখে কি যেন ভাবছিলেন। পরণে সিল্কের লুঙ্গি, গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবি। কর্তার মুখে শিশুসুলভ সরল হাসি দেখা দিল, জবাব দিলেন—"হারমোনিয়ামটা নামিয়ে দিতে বল।"

একটু পরে মেঝেতে কার্পেটের উপর বসে গান ধরলেন—"সুবল বল বল বল ভাই।"

এক লাইন গেয়ে, গান থামিয়ে শচীনদা বলেন—"বুঝলে সলিল, গ্রাম্য কথাগুলি রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। এতদিন গ্রাম ছাড়া হয়ে থেকেও এখনও সেই কথাগুলি ঘুরে ফিরে মনে আসে। আমাদের দেশে 'ভাই' কথাটা ব্যবহার হয় যেমন 'কোথায় হে ভাই, বল দেখি'। আমি মীরাকে বলেছিলাম এই কথাটা দিয়ে একটা গান লিখতে। তারই ফল এই গান আগামী পুজোতে বেরোবে।" ভাটিয়ালী সুরে কীর্তনের আখর দেওয়া গানটি সবাই এখন শুনেছেন।

গানের আনন্দ উপভোগ করা ছাড়াও আমি কিছু মনে মনে খুব গর্ব বোধ করেছিলাম সেদিন। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুরকার, সংগীত-শিল্পী শ্রীশচীনদেব বর্মন শুধু আমার জন্য বিশেষ করে গান করছেন একান্ত নিরালায়, ৬৩ বছর বয়সে, এ পরম সৌভাগ্য ছাড়া আর কি বলা যায়। সেদিন এরকম আরও কয়েকটি গান শচীনদার মুখে শুনেছিলাম, যার রেশ কখনও মুছে যাবে না আমার মন থেকে।

প্রায় ত্রিশ বছর বম্বেতে শচীনদা ও আমি দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জগতে বাস করলেও, আলাদা জগতে বিচরণ করলেও, সচরাচর আমাদের মধ্যে নিয়মিত কোন দেখাশোনা না হলেও শচীনদা ও মীরা বৌদির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বা তাঁদের যে প্রীতি স্নেহ আমি পেয়েছি, তার কারণ হল আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গত শুভময়। শুভময়ই এই যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয় ঘটনাচক্রে। সে তখন মস্কোতে। শচীনদা ১৯৬১ সালে মীরা বৌদি সহ গিয়েছেন সেখানে আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিরূপে। সেখানে শুভময় ও তার স্ত্রী সুপ্রিয়ার সঙ্গে তাঁদের হয় পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতায় তা পরিণত হয়। শুভময়ের ব্যবহার দুজনকেই মুগ্ধ করে। ফিরে এসে শচীনদা আমাকে সব খবর দেন। শুভময় তখন "দেশ" পত্রিকাতে নিয়মিত "মস্কোর চিঠি" লিখছে। শচীনদা শুভময়ের সব লেখা নিয়মিত পড়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। এই হল সূত্রপাত।

তারপর যখনই শচীনদার কাছে গিয়েছি নানারকম বাহানা নিয়ে শচীনদা কখনও আমাকে হতাশ করেননি। সকলেই জানেন, শচীনদার শরীর গত পাঁচ বছর ধরে খুব ভাল নয়। খুব নিয়মমত চলেন। তাঁর কাজেকর্মে, দৈনন্দিন জীবনে সর্বত্র রয়েছে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার ছাপ। বম্বের চলচ্চিত্র শিল্পে তাঁর মত নিষ্ঠাবান নিয়মানুবর্তী শিল্পী আর নেই যদি বলি, তবে কোন অত্যুক্তি বলে ভাববেন না। উনিও যখন কোন কাজের জন্য আমাকে ডেকেছেন, সব কিছু ফেলে আমাকে ছুটে যেতে হয়েছে কাঁটায় কাঁটায়। সময় নির্ধারিত করে সময়মত না গেলে বা কোন কাজ কোনদিন করে দেব বলে সময়মত না দিলে শচীনদা অসন্তুষ্ট হবেন। উনি নিজেও পারতে কখনও কথার খেলাপ করেন না।

ঠিক সময়মত টেলিফোনে মনে করিয়ে দেবেন।

কয়েক বছর আগে (১৯৬৫ সালে) বম্বেতে বাংলাদেশের বাউল সঙ্গীতের একটি অনুষ্ঠান, হয়েছিল যাতে যোগ দিয়েছিল বাউল বৃন্দাবন দাস ও সনাতন দাস প্রভৃতি আরও অনেকে। শচীনদাকে বলেছিলাম—"আপনাকে এই অনুষ্ঠানে অবশ্যই আসতে হবে।" তাঁর শরীর তখন খুব ভাল না। চোখ, হার্ট ইত্যাদির একটা গণ্ডগোলে ভুগছেন। বেশী ঘোরাফেরা, রাত্রে দেরী করা, এসব সহ্য হয় না। ভেবে ছিলাম হয়ত আসতে পারবেন না। কিন্তু অনুষ্ঠানে ঠিক সময়মত শচীনদা ও মীরা বৌদি এসে হাজির। ভেবেছিলাম কিছুক্ষণ শুনে শচীনদা হয়ত চলে যাবেন। কিন্তু [illegible]

পদক্ষেপ করেননি। অথচ লোকরুচির প্রতি ছিল এ'দের অগাধ শ্রদ্ধা। এ'দের সহজাত প্রতিভার সঙ্গে শিক্ষিত পটভূমের সংযোগ হওয়াতে বাংলার কাব্য সঙ্গীতে একটা সার্থক এবং সফল ধারার প্রবর্তন ঘটেছিল যা অনায়াসেই এদের ব্যক্তিত্বকে জনমানসে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। এ'দের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকেও শচীন দেব বর্মণের একটি একক প্রচেষ্টা ছিল। সেটি হচ্ছে কাব্য সঙ্গীতে লোকসঙ্গীতের মূল্যায়ণ। রাগসঙ্গীতের অতি দক্ষ শিল্পী হয়েও লোকসঙ্গীতের বহু দুর্লভ সুরমাধুর্য প্রকাশ করার জন্য তিনি ব্যাকুলতা অনুভব করতেন। অতএব রাগসঙ্গীত এবং লোক-সঙ্গীত এই দুই বিষয়কে অধিকার করেই শচীনদেব বর্মনের সঙ্গীত চিন্তা বর্তমান। এই চিন্তা সুদীর্ঘ শিক্ষা, প্রতি, বৈদগ্ধ্য, অভিজ্ঞতা ও নিষ্ঠায় সুপরিণত ও সুপরি-কল্পিত। তাই বাংলায় শচীনদেব বর্মন কেবলমাত্র একজন শিল্পী বলে পরিচিত নন, তিনি বোধ করি আধুনিক কাব্য-সঙ্গীতেরই প্রতীক।"

শার্ঙ্গদেব অতি সুন্দরভাবে শচীনদার সঙ্গীতের মূল্যায়ন করেছেন স্বল্প কথায়।

শচীনদার বিষয় লিখতে গিয়ে মনে পড়ছে বিভিন্ন সময়ে, তাঁর নানান কথাবার্তা। তাঁর সহজ সরল সরস নানান প্রকাশভঙ্গী। ভূরি ভূরি উদাহরণ রয়েছে এসবের আমার কাছে। একদিন বিকেলে আমি শচীনদার বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। ভাবলাম— অনেক দিন যাইনি, দেখা করে আসি শচীনদা কেমন আছেন। শচীনদা কিন্তু আগে না জানিয়ে যখন তখন কেউ আসে, অযথা সময় নষ্ট করে, এসব খুব পছন্দ করেন না। খাতির চক্ষুলজ্জা [illegible] সবকিছুর— [illegible] নানাভাবে [illegible] করে। কিন্তু আমি মাঝে মাঝে [illegible] হঠাৎ যদি কখনও গিয়ে পড়েছি ত শচীনদা কখনও অসন্তোষ প্রকাশ করেননি। খুশীই হয়েছেন। সেদিন বিকেলে গিয়ে দেখি শচীনদা একলা বসে আছেন খাবার টেবিলে, চেয়ারে পা গুটিয়ে বসে, পায়ে মোজা পরনে লুঙ্গি, গায়ে চাদর জড়ান। এক [illegible] চা আর টোস্ট মধু দিয়ে খাচ্ছেন। মীরা বৌদি তখন কলকাতাতে। টেবিলে রঙিন পেপার দেওয়া কভারে একটা খাতা পড়ে রয়েছে— উপরে ইংরিজীতে নাম [illegible]— [illegible]। কৌতূহলী জিজ্ঞাসা করে খাতাটা হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম— "এটা কি কোন নতুন ছবির গল্প—সুর দিচ্ছেন?" শচীনদার নিজস্ব বাঙাল ভাষায় যা বলেছিলেন তার মর্ম হল "আরে না বোকা— আমার একটা গল্প মনে ধরেছিল, সেটা লেখা আছে। এক প্রযোজককে শোনালাম। তারও ভাল লেগেছে, কিন্তু বলে কিনা কিছু পাল্টাতে। আমি কোথায় গল্পের [illegible] চলচ্চিত্রের গল্প দিতে চাই আর প্রযোজক কিনা ওর মধ্যে [illegible] ভরাতে চায়। আমি বলে দিয়েছি— আমার দরকার নেই— গল্প দেব না।" কি উপভোগই না করেছিলাম শচীনদার ওই বলার ধরন।

আরেকদিন [illegible] শচীনদার টেলিফোন পেলাম, "তুমি একবার আসতে পারবে, একটা কাজ আছে, একটু সাহায্য করবে।" আমি একটু মজা করার জন্য বললাম—"বলেন কি, আপনার যদি কিছু কাজে আসতে পারি সে ত আমার সৌভাগ্য। ছেলেবেলায় আপনার সেই প্রথম রেকর্ড "ডাকলে কোকিল রোজ বিহানে" শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম। তখন থেকেই আমি আপনার ভক্ত, কোন আলাপ না হলেও বহুকাল পর্যন্ত। এখনও গানটা পুরো মনে আছে। আমার ফেটে গলায় আপনাকে শুনিয়েও দিতে পারি। সাহায্যের কথা কি বলছেন, আপনার হুকুম—কখন আসব বলুন।" শচীনদা অবশ্য পাঁচ টাইম অ্যাপয়েন্টমেন্ট সম্বন্ধে খুব সচেতন। সঠিক ঘণ্টা মিনিট টাইম দিয়ে দিলেন—বললেন—"দেরী কোর না, পরে আবার অন্যরা আসবে।" কাজ তেমন কিছুই না। শচীনদার কাছে অনুরোধ এসেছে পত্রিকা সম্পাদকের কাছ থেকে, তাঁর লেখা একটা প্রবন্ধ চাই। শচীনদা সেটা মোটামুটি লিখেছেন। লেখাটা শুনে মতামত জানাতে হবে। ভাল কপি করে দিতে হবে। এই সামান্য ব্যাপারেও শচীনদা নিখুঁতভাবে সব কিছু করেছিলেন। তাঁর ছেলেবেলার স্মৃতি কথার যে চিত্রটি তিনি ফুটিয়েছিলেন তা খুবই মধুর।

চলচ্চিত্রের গল্প থোকার ব্যাপারে শচীনদার একান্ত নিজস্ব প্রকাশভঙ্গী আরেকদিন যে কি উপভোগ করেছিলাম বলার নয়। 'দেশ' পত্রিকার সহযুক্ত সম্পাদক আমার মেজদা শ্রীসাগরময় ঘোষ বম্বেতে বেড়াতে এসেছেন। শচীনদা বললেন ওঁকে
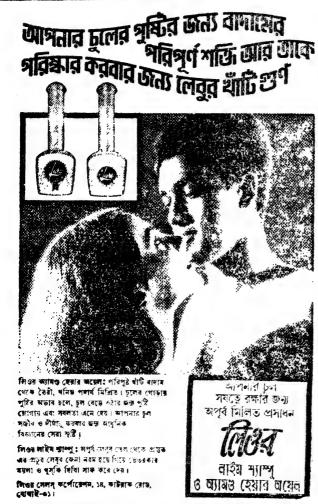
নিয়ে একদিন এসো। তাঁর সঙ্গে আমি কিছু আলোচনা করব। নির্দিষ্ট সময়ে আমরা পৌঁছলাম। নানা আলাপ-আলোচনা হল সাগরদার সঙ্গে—কলকাতার ছাত্রজীবন—সঙ্গীতে উনি কি কি করতে চেয়েছেন, তাঁর নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা—কোন তত্ত্ব তাকে পথ দেখিয়েছে ইত্যাদি। নানা বিষয় কত কি সব কথা হল আজ মনে নেই। কিন্তু দারুণ উপভোগ্য হয়েছিল সে আলোচনা—অনেক মূল্যবান কথা বলেছিলেন শচীনদা, যা সাগরদাকেই তাঁর 'বৈঠকী' লেখার মধ্যে দিয়ে কোনদিন প্রকাশ করতে অনুরোধ করব। কিন্তু শচীনদা গল্প খোঁজা সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তা ভোলার নয়। "আমার জন্য ভাল কিছু গল্প বা গল্পের বইয়ের সন্ধান দিন। দেব আনন্দ আমাকে মানে। ভাল গল্প পেলে ওকে অনুরোধ করব ছবি তুলতে। কিন্তু একটা কথা, এখানকার ছবির ডিরেক্টর-হিরোইনদের জানেন ত। গল্পে কেউ বেশী কম হলে, চলবে না। নায়ক-নায়িকার চরিত্র 'ফিফ্‌টি-ফিফ্‌টি' হলেই ভাল। নায়ক আশী বা নায়িকা কুড়ি বা তার বিপরীত হলে ঝগড়া বেঁধে যাবে। নায়ক-নায়িকা ব্যতিক্রম কম-বেশীর মধ্যে ষাট চল্লিশ পর্যন্ত চলতে পারে, তার বেশী নয়।" খুব মজা পেয়েছিলাম শচীনদার এই বিবৃতিতে, যা কাগজ-কলমে লিখতে গিয়ে অর্ধেক রস নষ্ট হয়ে গেল, তাঁর মুখে শোনার চাইতে। সাগরদা ৫০ : ৫০ বা ৬০ : ৪০'র নায়ক-নায়িকা সম্বলিত কোন গল্পের সন্ধান পেয়েছিলেন কিনা জানি না।

আরেকবার প্রমাণ পেয়েছিলাম শচীনদার বাংলাদেশ সম্বন্ধে প্রীতি। বম্বেতে ত্রিশ বছরের অধিক বাস করে বোম্বেতে এখানে হলেও তাঁর মন পড়ে আছে বাংলাদেশে, সেখানকার গান, নদী, সবুজ মাঠ ইত্যাদির মধ্যে। তাঁর সঙ্গে মেলামেশায় বহু নিদর্শন পেয়েছি এসবের।

একদিন শচীনদার আহ্বান পেলাম। যথা সময়ে পৌঁছানর পর শচীনদা জানালেন, বাংলাদেশ থেকে আমন্ত্রণ এসেছে, গান করবার। "তুমি ত জান আমি সভা-সমিতি, জলসা ইত্যাদি বিশেষ যাই না। পাবলিকে গান করাও ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু এখানে আমাকে যেতে হবে। দু'চার কথা বলে, গানও করতে হবে বলে অনুরোধ এসেছে। আমি এই কথাগুলি বলতে চাই, তুমি ফেয়ার কপি করে দাও।" শচীনদার বক্তব্য ছিল—"আপনাদের সম্মুখে গান করার এই আমন্ত্রণ, আমার কাছে যেন মনে হল বাংলা মাটির আমন্ত্রণ, বাংলা মায়ের আমন্ত্রণ।" রবীন্দ্র সরোবরের সেই অনুষ্ঠানে শচীনদা দুই-এক মিনিট তাঁর বক্তব্য বলে শ্রোতাদের গানে মাতিয়ে দিয়েছিলেন।

শচীনদা ও মীরা বৌদি সাধারণতঃ শীতকালে দু'তিন মাস কলকাতাতে কাটানর চেষ্টা করেন। শচীনদার কথায়—"আমি শীতকালে কলকাতায় কাটাতে চাই, সেখানে তখন ভাল মাছ তরিতরকারী পাওয়া যায়। আর তা ছাড়া সকালে লেকের ধারে একটু বেড়ান—আর একেবারে পুরানো বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বসে একটু আড্ডা দেওয়া। বম্বের চিত্র জগতের ব্যস্ততার বাইরে, একটু নিরিবিলি দিন কাটাব। ওতেই আমার আনন্দ। কিন্তু সে উপায় কোথায়। খবর বেরিয়ে যায় যে আমি কলকাতাতে এসেছি। নানারকম তখন অনুরোধ আসতে থাকে প্রোগ্রাম করার। সকালে লেকে বেড়াতে গেলে, ছেলেমেয়েরা চিনে ফেলে। হঠাৎ দেখলাম কেউ এসে ঢিপ করে প্রণাম করে কোন গানের অনুষ্ঠানের বা চলচ্চিত্রের গানের কথা জিজ্ঞাসা করে। রটে যায় আমি এখানে। তখন বাড়িতে শুরু হয় ভীড়। আর আমাকে বম্বেতে পালিয়ে আসতে হয়।"

শচীনদাকে দেখেছি, ওই ধরণের কোন অনুষ্ঠান জলসা ইত্যাদিতে গান করা খুব পছন্দ করেন না। আমাকে একবার বলেছিলেন—"নিজেকে কিছুটা দুর্লভ বা rare করতে চাই। তুমি ত জান চলচ্চিত্রে এক সময় আমি বহু স্থান থেকে এমন কি নিজের পরিচালনায় যে সব ছবিতে কাজ করেছি তার প্রযোজক পরিচালকদের কাছ থেকে গান করার অনুরোধ পেয়েছি বহু। কিন্তু আমি সচরাচর এসব গান করার অনুরোধ উপেক্ষা করেছি। তোমাকে আমি হাতে গুনে বলতে পারব যে, কটা ছবিতে আজ পর্যন্ত কটা গান করেছি, নিজের গলায়। যতটুকু স্মরণ আছে বাংলা ফিল্মে নয়টি গান ও হিন্দী ছবিতে সাতখানা—মোট ষোলটি গান আমি আজ পর্যন্ত করেছি, চলচ্চিত্রের সহিত প্রায় ২৫ বছর জড়িত থেকেও এখন পর্যন্ত প্রায় ৮০ খানা ছবির সঙ্গীত রচনা করে।"

শচীনদার কথাতেই তাঁর ফিল্মে গান করার ইতিহাস বলি। "কলকাতায় কয়েকটি ফিল্মে (যেখানে আমি সঙ্গীত পরিচালনা করিনি) আমার নিজের রচিত সুরে গান
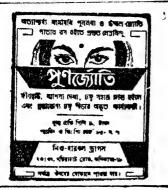
সহকারী শিল্পীদের সঙ্গে শচীন দেববর্মন

গেয়েছি। সে সব সন তারিখ এখন আর মনে নেই। তবে একটা বেশ মনে আছে যে, ইংরজী ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল, এই সাত বছরের মধ্যে নিম্নোক্ত বাংলা ছবিতে আমি নিজে গান করেছিলাম, সেই সব ছবির প্রযোজক বা পরিচালকদের বন্ধুত্বের দাবীতে। আমি একখানা গান করলে ছবির মর্যাদা বা মূল্য বৃদ্ধি হবে বা আমার অনেক বন্ধু এমনও অভিমান দেখাতেন যে, আমি যদি অন্তত একখানা গান না করি তাহলে তারা ছবি তোলাই বন্ধ করবেন। আমি তাঁদের এই স্নেহ প্রীতির দাবী অগ্রাহ্য করতে পারিনি। তবে আমি দুটি শর্ত দিতাম, যাতে তাঁরা সর্বদাই রাজী হয়েছেন। প্রথমটি—আমি যে গান করব, তার সুর আমিই রচনা করব (অন্য কেউ সঙ্গীত পরিচালক হলেও না)। দ্বিতীয়টি—সেই গান কোন প্লে-ব্যাক হবে না অন্য অভিনেতার মাধ্যমে। ছবির ব্যাক-গ্রাউন্ড সঙ্গীতরূপে, গানটি থাকবে কোন বিশেষ পরিস্থিতিকে ফুটিয়ে তোলার জন্য।"

"আমি সর্বপ্রথম স্বর্গত প্রীমধু বসুর 'সেলিমা' ছবিতে (১৯৩৫) নিজের সুর রচনায় একটি গান করেছিলাম। কথাগুলি এখন আর আর মনে নেই। তারপর, নাম মনে নেই আরেকটি বাংলা ছবিতেও বিখ্যাত সেই ভাটিয়ালী গানটি গেয়েছিলাম, 'ওরে সুজন নাইয়া—কোন বা কন্যার দেশে যাওরে চাঁদের ডিঙ্গা বাইয়া।'

'বাংলাদেশে সে সময় খুব সম্ভবতঃ "নন্দিনী" নামে একখানা ছবি নির্মিত হয়েছিল। আমি কাজীদাকে (কাজী নজরুল ইসলাম) খুব শ্রদ্ধা করতাম। এই একটি-মাত্র ছবিতে আমি কাজীদার লিখিত গান ও তাঁর সুরে একটি গান করেছিলাম—'চোখ গেল, চোখ গেল, কেন ডাকিস রে—চোখ গেল পাখীরে।' এই গানটি ছাড়া আমি অন্য কারো সুরে কোন গান চলচ্চিত্রে গাইনি, একমাত্র নিজের রচিত সুর ছাড়া।"

এর পর 'অভয়ের বিয়ে' (১৯৭১) নামে একটি বাংলা ছবিতে গান করেছিলাম, নিজের সুরে, হিন্দী গান, 'প্যারে বিন্দ বেতর উসে ইয়াদ কিয়ে যা।' বম্বে এসে যখন হিন্দী ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনা শুরু করলাম, তখন আমার হিন্দী ছবির প্রযোজক ও পরিচালকরা সর্বদাই তাদের ছবিতে গান গাইবার অনুরোধ করত। বম্বেতে যে ছয়টি ছবিতে আমি গান গেয়েছি প্রতিটিই নিজের সঙ্গীত পরিচালনায়।"

১৯৪৬ সালে বম্বেতে ফিল্মিস্তানের 'Eight Days' ছবিতে লোকসঙ্গীতের সুরে একটা গান করেছিলাম—যার প্রথম লাইন "উম্মীদ ভরা পনছী, থা খোঁজ রাহা সজনী"। গানটি কে লিখেছিলেন মনে নেই।

তারপর ১৯৫৭ সালে স্বর্গত বিমল রায়-এর 'সুজাতা' ছবিতে ভাটিয়ালী সুরে একটি গান করেছিলাম, যার প্রথম লাইন হল—'শুন মেরে বন্ধুরে।' গানটি লিখে-ছিলেন মজরু সুলতানপুরী। বিমল রায়ের অপর ছবি 'বন্দিনী'-তেও (১৯৬০) আমি লোকসঙ্গীতের সুরে আরেকটি গান করে-ছিলাম—'ও মাঝি—মেরে সজন হায় উস্ পার'—লেখক শৈলেন্দ্র। তারপর নবকেতনের 'গাইড' ছবিতে (১৯৬৩) একটি গান—'উওয়া কোন হায় তেরা'—শৈলেন্দ্রর লেখা। সম্প্রতি ১৯৬৯ সালে বালাজী-র 'তলাশ' ছবিতে একটি গান করেছি—'মেরে দুনিয়া হায় মা তেরে আঁচলমে'—সুলতানপুরীর লেখা।

এর পরেও ১৯৬৯ সালে শচীনদা, শক্তি সামন্তর 'আরাধনা' ছবি ও দেব আনন্দের 'প্রেম পূজারী'-তেও গান করেছেন।

রেকর্ডে গান করা সম্বন্ধে শচীনদার বক্তব্য হল 'হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্টস'-এর রেকর্ডে আমি প্রথম গান করি। আমার প্রথম গান রেকর্ড করেছিল এরা এবং সবগুলিই খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এতে বেশীভাগই ছিল বাংলা গান, কিছু হিন্দী। হিন্দুস্থানে সবশুদ্ধ ৫৫টি রেকর্ড করেছি, সব গান সংখ্যা হল ১১০। এর মধ্যে ৯৪টি বাংলা গান ও ১৬টি হিন্দী গান।

পরবর্তীকালে আমার গান এইচ এম ভি রেকর্ড করেছে ও এখনও করছে। এখানেও বেশীভাগই বাংলা গান ও কিছু হিন্দী। এইচ-এম-ভি'র রেকর্ড সংখ্যা আমার জানা নেই।

১৯৩০ সাল থেকেই শচীনদার গানের সঙ্গে আমি পরিচিত। তাহলেও শচীনদাকে প্রথম দেখি সম্ভবতঃ ১৯৪৬ সালে বম্বের কুপারেজ খেলার মাঠে, রোভার্স' প্রতিযোগিতায়। শচীনদা ১৯৪৪ সালে বম্বেতে এসে, তখনও কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত, নিজের কাজে। কিন্তু যত কাজই থাকুক না কেন কলকাতার বিভিন্ন স্পোর্টস সম্মেলনীর কোন খেলায় শচীনদার অনুপস্থিতি ভাবাও অসম্ভব। সঙ্গীতের পরেই বোধ হয় শচীনদার বিশেষ আকর্ষণ হল খেলাধূলো—প্রধানতঃ ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস। একদিন আমাকে বলেছিলেন—'আমি পয়লা নম্বরের টেনিস খেলোয়াড় হতে পারতাম, কিন্তু কি করব, গানের গলার জন্য আমার প্রিয় টেনিস খেলা ছাড়তে হল। খেলা অত অভ্যাস করলে গলা নষ্ট হবার আশংকা দেখা দিয়েছিল। তা না হলে কলেজে ছাত্রজীবনে উঠতি চ্যাম্পিয়ন টেনিস খেলোয়াড় ছিলাম।"

শারীরিক অসুস্থতার আগে পর্যন্ত শচীনদাকে সর্বদা রোভার্স' কাপ বা ক্রিকেট

টেস্ট খেলার মাঠে দেখা যেত। কোন খেলা দেখা বাদ দিতেন না।

শচীনদার নিজের কথায় তাঁর জীবন-কাহিনী আপনাদের বলার আগে মীরা বৌদির বিষয় দু'চারটি কথা বলতে চাই। শচীনদার সঙ্গীত জীবনের সাফল্যের মূলে মীরা দেবীর প্রেরণা, উৎসাহ, সাহচর্য সম্পূর্ণ বর্তমান। মীরা বৌদি শুধু ভার্যা বা গৃহিণীই নন, এক ধারে একই সঙ্গে শচীনদার একান্ত সচিব, ম্যানেজার, গান-রচয়িতা সব কিছু। উনি নিজেও সঙ্গীতজ্ঞা, ভাল গান করেন। একদিন শচীনদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—"বৌদি গান করেন না?—ওঁর একটা আসর বসাতে চাই।" শচীন কর্তা কৌতুকের হাসি দিয়ে উত্তর দিয়েছিলেন—"মীরা সঙ্গীতচর্চার আর কোথায় সময় পায়, আমার ইনকাম ট্যাক্সের হিসাব রাখতে রাখতেই ওর সময় চলে যায়।" কথাটা খুবই সত্যি। শচীনদা সব কিছু ভুলে গিয়ে একান্ত মনে ত্রিশ বছর যে সঙ্গীত সাধনায় রত একাগ্র চিত্তে অন্য কোন কিছু চিন্তা না করে, তা সম্ভব হয়েছে মীরা দেবীর জন্য। শচীনদার অন্যান্য সব কিছু, গুরুভার মীরা দেবী নিজের উপর নিয়ে সুষ্ঠুভাবে তা পালন করে যাচ্ছেন। সদা হাস্যময়ী সঙ্গীতে সুপণ্ডিতা মীরা দেবীও অসাধারণ ও বহুগুণ-সম্পন্না। শচীনদা আমাকে বলেছিলেন—"মেলোডিতে অনেক সময় মুশকিলে পড়ে যাই। গানের কোন আইডিয়া, কোন কাজ বা কোন সুর মনে এল, কিন্তু তা থেকে সঙ্গে সঙ্গে যে কেউ গান লেখে দেবে, যাতে সুরটাকে ধরে রাখতে পারি, তার অভাব বোধ করতাম। শ্রীগৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, শ্রীরবি গুহ মজুমদার তাঁর প্রিয় লেখক, কলকাতার বাসিন্দা। প্রয়োজনে কাছেপিঠে তাদের কি করে পাবেন। শচীনদা বহু সময় নিজের গানের লাইন বা কাজের আইডিয়া দিয়ে দেন গান রচয়িতাকে। তার উপর ভিত্তি করে গান লেখা হলে শচীনদা সুর দেন। এইরকম একটি বিখ্যাত গান, গৌরীপ্রসন্নর লেখা—"আড় বাঁশী শুনে আর কাজ নাই—সে যে ডাকাতিয়া বাঁশী"। ইদানীং মীরা বৌদি এইরকম শচীনদার জন্য বেশ কয়েকটি বাংলা গান লিখেছেন যা শচীনদা পুজোতে রেকর্ড করেছেন।

দাম্পত্য জীবনে এঁদের দুজনের যে সমঝওতা, যে মধুর হাসিখুশী, হিউমার, সংবেদনশীল সহানুভূতির সম্পর্ক দেখেছি তার তুলনা মেলা ভার। বহু সময় এঁদেরকে দেখে আমার মনে হয়েছে "আইডিয়াল কাপল্"। শচীনদা যেমন সব কিছুতে মীরা বৌদির উপর নির্ভরশীল, তেমনি মীরা বৌদিরও 'কর্তা'-ই হল ধ্যান-ধারণা। মীরা বৌদি শচীনদাকে ত্রিপুরার রীতি অনুযায়ী 'কর্তা' বলে সম্বোধন করেন এবং কোন কোন সময় 'আপনি'ও বলেন। এই প্রসঙ্গে এঁদের দাম্পত্যজীবনের মধুর সম্পর্কের একটি ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। শান্তিনিকেতনের 'কারুসংঘ' বম্বের জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারীতে প্রদর্শনী করছে, তাদের বাতিক শাড়ি, চাদর, কাঁথা ইত্যাদির। শচীনদার বাতিকের গলার চাদর খুব পছন্দ এবং গলায় চাদর উনি সর্বদা ব্যবহার করেন। শচীনদা ও মীরা বৌদিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম, প্রদর্শনী দেখে, চাদর কিনে নিতে। মীরা বৌদি শচীনদার জন্য কয়েকটি চাদর ও অন্যান্য আরও কিছু কিনলেন। এর মধ্যে শচীনদা একপাশে আমাকে ডেকে নিয়ে প্রদর্শনীতে টাঙানো একটি সুন্দর শাড়ি দেখিয়ে বললেন—"মীরাকে কিছু বলবে না। এই শাড়িটা খুলে, ওর অজান্তে, আমাকে যাবার সময় দিয়ে দিও। মীরার কাছে এখন দাম দিও না। আমার পকেটে এখন টাকা নেই, তোমাকে আমি পরে দিয়ে দেব। বাড়িতে ফিরে মীরাকে সারপ্রাইজ দিতে চাই।" আমি বললাম—"ঠিক আছে"। শচীনদা কিন্তু সেদিন আখেরে আর মীরা বৌদিকে 'সার-প্রাইজ' দিতে পারেননি। কারুসংঘের কর্মীরা শাড়িটা খুলে অনবধানতাবশতঃ অন্যান্য সব সওদার সঙ্গে মীরা বৌদির সামনেই প্যাক্ করে দিয়েছিল। মীরা দেবী বললেন, শাড়ীটা কে নিল। তখন শচীনদা বাধ্য হয়ে বললেন—ওটা আমি নিতে বলেছি। তুমি দামটা তাহলে দিয়েই দাও। সেদিন শচীনদার মীরা বৌদিকে "সারপ্রাইজ" দেবার প্রচেষ্টা বানচাল হওয়াতে আমি খুব দুঃখিত হলেও, আমরা সবাই খুবই কৌতুকান্বিত ও আনন্দিত হয়েছিলাম।

সলিল ঘোষ

"এই দুর্দিনে বাঁধা আয়ে সংসার চালানো যে কি! ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। অনেক কাটছাঁট করতে হয়। আর এর পুরো ঝক্কিটাই মেয়েরা নিয়ে নেন নিজেদের ওপর—হয় নিজের বরাদ্দ কমিয়ে অথবা একেবারে ছেঁটে ফেলে। কিন্তু শরীর মাটি ক'রে এই ব্যয় সংকোচ পরিণামে ভালো হয় না। সেইজন্য বাড়ীর আর সকলের সঙ্গে আমিও বোর্নভিটা খেয়ে নিই। একচুমুকে ক্লান্তি দূর হয়, বেশ ঝরঝরে লাগে। শরীর সুস্থ-সবল রাখতে যে পুষ্টি, শক্তি ও সামর্থ্যের প্রয়োজন, বোর্নভিটায় তা পুরোমাত্রায় রয়েছে।"

বোর্নভিটা পুষ্টিকর, শক্তিদায়ক। সুষম পারিমাণে কোকো, দুধ, চিনি ও মল্ট মিশিয়ে এটি তৈরি করেছেন ক্যাডবেরি—প্রাণোচ্ছল পানীয় প্রস্তুতে বিশেষজ্ঞ ব'লে যাঁদের খ্যাতি একশ' বছরেরও বেশি। এর কোকো-সমৃদ্ধ স্বাদ ছেলেমেয়েদের ভারী পছন্দ!

ক্যাডবেরির বোর্নভিটা খাবেন—
শক্তি, উদ্যম—এবং স্বাদের জন্যে

বাংলার চালচিত্র

॥ ১ ॥

গত ১৭ জানুয়ারী ১৯৭০, দেশ পত্রিকায় 'বাংলার চালচিত্র'-এ আবদুল জব্বার সাহেবের বাস্তব চিত্রটির জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি।

গোহত্যা নিষিদ্ধ করা একান্তই প্রয়োজন। জনস্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ রেখেই তা করা উচিত। সরকার এ ব্যাপারে অগ্রণী হলে—সাম্প্রদায়িকতার কথা উঠতে পারে। এবং এটাই স্বাভাবিক। অতএব মুসলমান তরুণদের আগ্রহী হতে হবে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠার পথে—এটি মস্ত বড় অন্তরায়।

ভারতের মধ্যে বাংলা দেশই গোহত্যার ব্যাপারে এগিয়ে আছে। বাৎসরিক খতিয়ান লক্ষ করলেই তা জানা যাবে। আরও একটা ক্ষেত্রে বাংলা দেশ সকলের ওপরে থাকার অধিকার অর্জন করেছে। সেটি হল—সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা। উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য আছে বলেই মনে হয়। মাঝে মাঝে গোহত্যা নিষিদ্ধকরণের জন্য আন্দোলন চলছে। হিন্দুদের অনেকেরই ধারণা—এ আন্দোলন মুসলমানদের স্বার্থের পরিপন্থী। বস্তুত আইন করে গোহত্যা বন্ধ করা হলে—আজকের তরুণ মুসলমান সমাজ কম খুশী হবে না।

শেখ নজরুল ইসলাম,
হাওড়া

॥ ২ ॥

গত ১৭ জানুয়ারী ১৯৭০, দেশ পত্রিকায় 'বাংলার চালচিত্র'র কয়েকটি অংশ সম্বন্ধে সাধারণ একজন পাঠক হিসাবে আমার মতামত লিখলাম।

বৈদিক যুগে গো-মাংস খাওয়া হত এ ধারণা ভুল। শ্রীশ্রীজগৎগুরু শংকরাচার্যের হয়ে কয়েকজন এম পি, লোকসভাতে খাদ্য-মন্ত্রী রামকে এক চ্যালেঞ্জ রাখলে খাদ্যমন্ত্রী নিরুত্তর হন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, যদি কেহ প্রমাণ করাতে পারেন যে, বৈদিক যুগে গো-মাংস ভক্ষণ করা হত তা হলে জগৎগুরু 'গো-হত্যা নিষিদ্ধকরণ আন্দোলন' প্রত্যাহার করবেন।

চীন দেশের হিন্দুরা যা কিছু কিছু চামার, মুচি, মেথর যদি গো-মাংস খান তবে বলতে হবে হিন্দুসভ্যতা এখনও তাদের মধ্যে তেমন গভীরভাবে প্রবেশ করে নি। তবে আমাদের দেশে তথাকথিত মুচি, মেথররাও দ্রুত ঐ বদ অভ্যাস পরিত্যাগ করছেন। তবে একটা কথা, ওরাও কখনও গো-হত্যা করেন না। মরার পরেই ঐ সম্প্রদায়ের কতক লোকের কিঞ্চিত রুচি।

'কমিউনিসট হিন্দু' বন্ধুরা গো-মাংস খাচ্ছেন। আধুনিকরাও। ...ডাক্তাররাও বিধান দিচ্ছেন 'খাও না অনেক প্রোটিন আছে'। ঐ সব উক্তিগুলি ডাহা অসত্য ও বানানো। শূকরের মাংসে প্রচুর 'প্রোটিন' আছে। যদিও শূকর খেতে হিন্দুদের বাধা নেই তবু সাধারণ হিন্দুরা অভক্তির জন্য ও ফিতা ক্রিমির ভয়ে ঐ মাংস তাঁরা গ্রহণ করেন না। সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে পড়েছিলাম 'ছারপোকায়' নাকি প্রচুর প্রোটিন আছে। লোক কি ছারপোকা খেতে আরম্ভ করবে নাকি?

শত শত গ্রাম থেকে হাজার হাজার হিন্দু ছেলে কলকাতা এসে 'মুসলমান হোটেলে' আট আনার ভাত, চার আনার গো-মাংস মোট ৭৫ পয়সায় একবেলার খাওয়ার কাজ সমাধা করেন এমন বক্তব্য কলকাতা প্রবাসী গ্রামের ছেলেদের প্রতি কুৎসা ছাড়া আর কিছুই নয়। এখন প্রায় সব জায়গায়ই স্কুল কলেজ হয়েছে, দরিদ্র ছেলেরা সাধারণত ঐ সব জায়গাতেই পড়েন। কলিকাতায় আসেন মেধাবী ছাত্ররা জলপানি নিয়ে আর আসেন ধনীর দুলালরা। মোটের উপর কলকাতা প্রবাসী ছেলেরা গ্রামের হতে পারেন কিন্তু তারা হা-ঘরের নন।

শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র রায়,
মেদিনীপুর

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

আপনাদের 'আলোচনা' বিভাগে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সম্বন্ধে যে সব মন্তব্য প্রকাশিত হচ্ছে তাতে আশান্বিত হওয়া যায় কিনা সন্দেহজনক।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত চার খণ্ডে প্রকাশিতব্য 'ভারতকোষ' গ্রন্থটির জন্য দীর্ঘ ছয় বৎসর আগে চল্লিশ টাকা জমা দিয়া মাত্র তিনটি খণ্ড (প্রথম খণ্ড ১৯৬৪, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৬৬ এবং তৃতীয় খণ্ড ১৯৬৮ সালে) হস্তগত হইয়াছে। চতুর্থ খণ্ড এখনো প্রকাশিত হয় নাই। এই সম্বন্ধে বহু খোঁজ খবর করিয়া সঠিক সংবাদ জানাও সম্ভব হয় নাই যে কবে শেষ খণ্ডটি প্রকাশিত হইবে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্মকর্তাদের এ বিষয়ে কি বক্তব্য জানিতে ইচ্ছা করি। পরিষদ সম্বন্ধে আশান্বিত হওয়া যায় কী?

মিরা ভট্টাচার্য,
কলিকাতা-৪৭

শাহী শিরোপা

সাম্প্রতিক 'দেশ'-এ প্রখ্যাত কথাশিল্পী শ্রীপ্রমথনাথ বিশী মহাশয় রচিত 'শাহী শিরোপা' রহস্য কাহিনীটি পড়িলাম। এই ধরনের লেখা উপহার দেওয়ার জন্য অধ্যাপক শ্রী বিশী মহাশয়কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তবে 'মগ্নচৈতন্য' এবং 'জাগ্রত চৈতন্যে'র মধ্যে যে পার্থক্য তিনি করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিতেছি না! তিনি লিখিয়াছেন, "দীর্ঘকাল দুই চৈতন্যের লড়াই চলেছে বাদশাহজাদের মনের মধ্যে"। এই দুই চৈতন্যের একটি হইল 'মগ্নচৈতন্য' এবং অপরটি হইল 'জাগ্রত চৈতন্য'। অবশ্য জাগ্রত চৈতন্য বলিতে অধ্যাপক বিশী মহাশয় যদি মনের চেতন স্তর (conscious stage) এবং মগ্ন চৈতন্য বলিতে তিনি যদি মনের অবচেতন স্তর (sub conscious stage) বা নির্জ্ঞান স্তর (unconscious stage) বুঝিয়ে থাকেন তাহা হইলে মনোবিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে বুঝিতে কিছুটা সুবিধা হয়। মনোবিজ্ঞানে 'জাগ্রত চৈতন্য' এবং 'মগ্ন
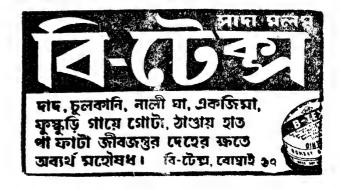
চৈতন্য' এই দুই পদের পরিচয় না পাওয়ার জন্যই প্রশ্ন জাগিয়াছে। সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার মাধ্যমে এই প্রশ্নটি লেখকের সমনে তুলিয়া ধরিলাম। উত্তর পাইলে আন্তরিক কৃতজ্ঞ থাকিব।

অজিত ভট্টাচার্য,
টাকী

রোগশয্যায়

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের লেখা সম্পর্কে আবু সৈয়দ আইয়ুবের আলোচনা নিশ্চয়ই আমাদের জিজ্ঞাসা জাগায়, নতুন করে ভাবায়। চিন্তার এই স্পষ্টতাকে শ্রদ্ধা করে সম্প্রতি 'রোগশয্যায়' বইটির আলোচনা প্রসঙ্গে ২১নং কবিতার সম্পর্কে তিনি যে মন্তব্য করেছেন, তার সম্পর্কেই আমার কিছু প্রশ্ন আছে।

নন্দনতাত্ত্বিক বিচার বা রসের বিচারকে যদি শ্রেয়োনীতির থেকে একান্তভাবেই সরিয়ে আনতে পারা যায়, তাহলে কলা-কৈবল্যবাদীদের বিরুদ্ধে সব অভিযোগই তো অর্থহীন হয়ে পড়ে। আইয়ুব নিজেও আশা করি তা বলবেন না, কারণ "কাব্যকে হৃদয়াবেগের প্রকাশ বলে ক্ষান্ত হ'লে চলবে না, সে আবেগ যে বিষয় থেকে সঞ্জাত, যে পরিস্থিতির উপর আশ্রিত, তার কথাও সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়ে" (কবিতা ও প্রেম : পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা): আর পরিস্থিতি বা বিষয় তো আমাদের মূল্যবোধের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত হয়ে থাকতে পারে না।

তাই তিনি যে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির প্রসঙ্গ এনেছেন, তাঁকে নিয়ে নাটক তখনি সার্থক হবে, যখন চারিত্রিক বিরোধ একটা যথার্থ, সুষম সামঞ্জস্য পাবে, না হ'লে তাকে সুন্দর বলে কখনোই মনে হবে না। Duncan-এর হত্যার রাত্রে যে লেডী ম্যাকবেথ সে কখনোই 'রসোত্তীর্ণ সুতরাং নিখুঁত' হত না, যদি না তাকে আমরা Night walking scene-এ দেখতে পেতাম। এই সংগতি বা সামঞ্জস্য বোধ, Richards-এর ভাষায় 'Balance of oppesites' সমস্ত সৎ কবিতার মর্মে থাকতে বাধ্য। এইজন্যই তাঁর ব্যবহৃত 'বিশুদ্ধ নান্দনিক' এই কথাটা এত বেশি সন্দেহজনক যে মনে হয়, যুক্তিতে কোথাও ফাঁকি রয়ে গেছে। কারণ "উত্তম কাব্যের গভীরতম তাৎপর্য কোনো গহনরেষ্ঠ মহাসত্যের দিকে নিয়ে যায় রসিকচিত্তকে (কবিতা ও প্রেম : পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা) আইয়ুবের এই উক্তির সঙ্গে তাঁরই উদ্ধৃত Bradelyর "which (i.e. the meaning of poetry) we feel would satisfy not only the imagination but also the whole of us.."—

এই 'whole of us'-এর পরিপ্রেক্ষিতেই 'বিশুদ্ধ নান্দনিক' অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ।

এই শব্দটা আরো সন্দেহজনক মনে হয়, তাঁর কীটস স্মরণ দেখে। সেই বিশেষ কবিতাটিকে মনে না রেখে, শুধু অই পংক্তিটি সরিয়ে অনেক জ্ঞানগভীর ব্যাখ্যা হয়ত সম্ভব, তবু মনে হয় উচিত কাজ হচ্ছে কবিতাটির মধ্যেই তাকে রাখা। এ প্রসঙ্গে আমি F. R. Leavis-এর একটি উদ্ধৃতি দিতে চাই, যদিও একটু দীর্ঘ, তবু আশা করি তা অপ্রাসঙ্গিক হবে না:

"Clearly, the urn for Keats is the incitement and support to a day dream; the dream of a life that, without any drawbacks, shall give him all he desires—shall be former warm and still be enjoyed, remaining, 'among the leaves' free from all the inevitable limitations that the nightingale, the 'light winged Dryad', has never known' ..... The use of the word 'truth' corresponds strictly to the attitude towards reality analysed above .... in calling what seemed to him the supreme thing in life 'Beauty', he expressed a given bent—the bent everywhere manifested in the quality of his verse, in its 'loneliness'. His concern for beauty meant, at any rate in the first place, a concentration upon the purely delightful in the experience to the exclusion of "disagreeables."

সুতরাং বিশুদ্ধ নান্দনিক দৃষ্টিকে আমি কীটসের সাক্ষ্যে গ্রাহ্য মনে করতে পারি না।

এই সমস্তই এসেছে, মনে হয়, ২১নং কবিতাটিকে ব্যাখ্যা করতে যেয়ে আইয়ুব যে অসুবিধার সম্মুখীন হ'য়েছেন, তাকে এড়াতে। কবিতাটির নবম পংক্তিতে যে 'সুন্দর ও অসুন্দরের' ভেদের প্রশ্ন তোলা হয়েছে তা কি শ্রেয়োবোধ থেকে আসেনি? ফুলদানীর গোলাপ হচ্ছে 'সৌন্দর্যের পরিণাম', কোনো শক্তি তাকে এনেছে 'অপূর্ণের, কুৎসিতের প্রতিপদে পীড়া এড়ায়ে'—এই গোলাপই 'জ্যোতির্ময় বিরাট গোলাপের' প্রেরণা। সুতরাং আইয়ুব যখন বলেন 'মহাকালের পরিপ্রেক্ষিতে নান্দনিক দৃষ্টি দিয়ে দেখতে গেলে সকল বীভৎসতার মধ্যেও অনাদ্যন্ত ইতিহাস চিত্রিত একটি বিরাট সুন্দর রূপ ফুটে ওঠে'—তখন এই উক্তিকে এই কবিতা কোনো সাক্ষ্য দেয় না। এর সুন্দর রূপ বীভৎসতাকে এড়িয়েই ফুটে উঠেছে, মধ্যে নয়। কারণ 'কুৎসিত' শব্দটা এই কবিতায় এমন এক অভিজ্ঞতাকে ধরে রেখেছে যাকে কবি অই শব্দের উচ্চারণ দিয়েই অস্বীকার করে গেছেন। 'কারা তর্ক ক'রে বলে, সৃষ্টির সভায়/সুশ্রী কুশ্রী বসে আছে সমান আসনে/প্রহরীর কোনো বাধা নাই।' এখানে স্পষ্টতই সমান আসন নেই তাছাড়া এই 'প্রহরী' কে? এটা কি পঞ্চম পংক্তির 'যে শক্তি'রই রূপান্তর নয়? আর এই শব্দটাই কি প্রমাণ নয় যে, দৃষ্টিটি 'বিশুদ্ধ নান্দনিক' নয়—শ্রেয়োবোধে অত্যন্ত প্রখর? যদিও 'সমগ্র স্বরূপে দেখার অঙ্গীকার আছে, তবু 'অপূর্ণ', কুৎসিত' আবার আবির্ভূত হয়েছে 'বিকৃতি' শব্দের মধ্যে, সঙ্গে 'স্খলন'-এর অনুষঙ্গ। অবশ্য 'বিকৃতি না ঘটায় স্খলন'—এই পংক্তির অর্থ এমনভাবে করা যায় যে, বিকৃতি থাকে কিন্তু স্খলন ঘটায় না। আমার মনে হয়, কবিতাটির অন্য পংক্তির সম্পর্কে রেখে তা করা সম্ভব নয়—কারণ তাহ'লে 'শক্তি' 'ভেদ' বা 'প্রহরী' ইত্যাদির সঙ্গত ব্যাখ্যা প্রয়োজন, কবিতা থেকে যার সমর্থন পাওয়া যাবে।

তাই আইয়ুব যখন বলেন এ জগৎ মঙ্গলময় একথা সত্য নাও হ'তে পারে, তবু জগৎ—মানবিক জগৎও—সুন্দর, তখন তা ব্যক্তিগতভাবে মেনে নিলেও এ কবিতাটির প্রসঙ্গে একেবারেই মানতে পারি না।

বীরেন্দ্র চক্রবর্তী
বরানগর

সোলঝেনিৎসিনের বহিষ্কার সম্পর্কে রুশ বক্তব্য

গত নভেম্বর মাসে সোভিয়েট লেখক সঙ্ঘ থেকে আলেকসানদার সোলঝেনিৎসিনকে বহিষ্কারের ফলে সারা পৃথিবীতে এই নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে যায়। সোলঝেনিৎসিনের মর্মস্পর্শী "খোলা চিঠি" রাজনীতি নিরপেক্ষ সাহিত্য প্রেমিকদের মন স্পর্শ করেছিল।

সোভিয়েট দেশের বাইরে এই প্রতিক্রিয়া সোভিয়েট লেখক সঙ্ঘ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারেন নি। তাঁরা এর একটা বিস্তৃত ব্যাখ্যা তৈরী করেছেন। এর আগেও দুজন রুশ লেখককে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে, পাসতেরনাকের নোবেল প্রাইজ উপলক্ষে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল এবং তখনও পশ্চিমী প্রেস এবং নিরপেক্ষ দেশগুলি সমালোচনায় তৎপর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তখন রুশ কর্তৃপক্ষকে ব্যাখ্যা দেবার ব্যাপারে আগ্রহী হতে দেখা যায় নি।

যাই হোক আমরা সাধারণত পশ্চিমী প্রেস থেকেই সংবাদ সংগ্রহ করি, এখন দেখা যাক, এর কোনো উল্টো পিঠ আছে কিনা এবং সোভিয়েট বক্তব্য কি।

সোভিয়েট প্রেস এজেন্সির পক্ষ থেকে জনৈক সংবাদদাতা এই বহিষ্কারের ব্যাপার নিয়ে বিভিন্ন লেখকের মতামত সংগ্রহ করেন। সেইগুলিই প্রশ্নাকারে সাজানো হয়েছে।

কবি সের্গেই মিখালকভের বক্তব্য : সোলঝেনিৎসিন তাঁর রচনাবলী রুশ এবং অন্যান্য ভাষায় প্রকাশের জন্য বিভিন্ন দেশের প্রকাশন সংস্থার কাছে পাঠাতে শুরু করেন। বিদেশে কিছু লোক এগুলির সম্পর্কে এই বলে প্রচার করেছে যে, এই লেখক সমাজতন্ত্রের মতাদর্শ, সোভিয়েট সমাজ ব্যবস্থা এবং প্রতিটি সোভিয়েট নারী-পুরুষ যা কিছু পবিত্র বলে গণ্য করে তার বিরুদ্ধে "সাহসের সঙ্গে" "সত্যকারের প্রতিভাবান লেখকের মতন" দাঁড়িয়েছেন। সোলঝেনিৎসিনের ভক্তদের এইসব দাবি একদম ভিত্তিহীন নয়, কারণ এই রচনাবলীতে গ্রন্থকারের উক্ত বিশ্ববোধটিই হুবহু প্রচারিত হয়েছে। আর ঠিক এই কারণেই রচনাগুলিকে সোভিয়েতের পত্র-পত্রিকা এবং প্রকাশক ভবনের সম্পাদকরা একদা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী রচনাগুলিতে যে-সব সংশোধনের প্রস্তাব তুলেছিলেন তিনি তাতে সম্মত হন নি।

যাঁরা এক জীবনাদর্শের ধারক সেই সমগ্র লেখক-সমাজের উনি বিরোধিতা করেছেন। তাই লেখক ইউনিয়নের নিয়মাবলীর সঙ্গে সংগতি রেখে ওঁকে শেষ পর্যন্ত সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

কবি নিকোলাই গ্রিবাচেভের কাছে প্রশ্ন : ব্রিটেনের টাইমস পত্রিকা লেখক ইউনিয়ন থেকে সোলঝেনিৎসিনের বিতাড়নকে তাঁর কণ্ঠরোধের প্রচেষ্টা নামে অভিহিত করেছে। আপনি কি বলেন?

উত্তর : টাইমস পত্রিকার যে নির্ভেজাল সত্যের পেটেন্ট নেওয়া আছে, তা কে বললো? আসলে কেউ সোলঝেনিৎসিনের হাত চেপে ধরে নেই, তাঁকে কাগজ কলম থেকে বঞ্চিতও করেনি। আমাদের দেশে এমন বেশ কিছু সংখ্যক গ্রন্থকার আছেন, যাঁরা লেখক ইউনিয়নের সদস্য না হয়েও লিখে এবং বই ছাপিয়ে চলেছেন।

প্রশ্ন : বি বি সি খবর দিয়েছেন যে, ৬০ জন লেখক সোলঝেনিৎসিনের এই বহিষ্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। কথাটা সত্যি?

উত্তর : বি বি সি-কে এই পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে যে, তারা যেন তাদের মস্কোর সংবাদদাতার ওপর একটু কম আস্থা রাখে। আর সংবাদদাতার কাছে [illegible] জন্য লাইসেন্স কেটে দেওয়া উচিত।

প্রশ্ন : লন্ডন টাইমস পত্রিকা সোলঝেনিৎসিনের রচনাবলীকে রুশ সাহিত্যের ক্লাসিক আখ্যা দিয়েছে। এ বিষয়ে আপনার মত?

উত্তর : এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক, যে সমস্ত স্তুতি এই "স্বয়ং খেতাব" দখল হাতে বিলিয়ে চলেছেন তাঁরা আমাদের সাহিত্যকে ঠিক চেনেন না।

প্রশ্ন : দেশের লেখক সংগঠনগুলির ওপর লেখক ইউনিয়ন থেকে সোলঝেনিৎসিনের বহিষ্কার এবং রুশ ফেডারেশনের লেখক ইউনিয়নের তাঁর তথাকথিত "খোলা চিঠি"র কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে?

উত্তর : সারা দেশ জুড়ে লেখক সংস্থাগুলি সর্বসম্মত বিশেষ প্রস্তাব গ্রহণ করে ঐ বহিষ্কার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছে। আমাদের নেতৃস্থানীয় লেখকরা লেখক ইউনিয়নের সঙ্গে একই মত প্রকাশ করেছেন।

এবার আমাদের কয়েকটি প্রশ্ন : দেশের প্রতিটি স্ত্রী-পুরুষ যাকে পবিত্র বলে মনে করে, তার বিরুদ্ধে লিখতে যে চায়, সে তো উন্মাদ। সোলঝেনিৎসিনের রচনায় তো সেরকম কোনো বিকট বিষয় আমাদের চোখে পড়েনি। তা ছাড়া, দেশের প্রতিটি নারী-পুরুষই কোন্ ব্যাপারকে পবিত্র মনে করে—তার নিরিখ কি?

সম্পাদকরা লেখা বদলাতে বললে, কোন লেখক খুশী হয়? সোভিয়েট রাশিয়ার অন্যান্য লেখকরা কি সবাই সম্পাদকদের মতামত মেনে নেন? তাহলে খুবই আশ্চর্য ব্যাপার।

লেখক ইউনিয়নের সদস্য না হয়েও যদি সোভিয়েট দেশে লেখা ও ছাপানো সম্ভব হয়, তবে লেখক ইউনিয়নের সদস্য হবার প্রশ্নটি এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?

সোলঝেনিৎসিনের বহিষ্কারকে দেশের সবাই একবাক্যে মেনে নিয়েছেন, এটা সত্যি বলে মেনে নিচ্ছি। কিন্তু কেউ যদি মেনে না নিতেন, তাহলে তাঁকেও কি লেখক সঙ্ঘ থেকে বহিষ্কৃত করা হতো না?

একটি নতুন পত্রিকা

রাঁচী থেকে প্রখ্যাত এবং সম্মানিত হিন্দী লেখক শ্রীশিবচন্দ্র শর্মা 'স্থাপনা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করছেন এ মাস থেকে। পত্রিকাটি মূলত হিন্দী ভাষায়, কিন্তু বাংলা এবং অন্যান্য সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার জন্য কিছু কিছু অনুবাদেরও ব্যবস্থা থাকবে। শিবচন্দ্র শর্মা নিজেকে এই পত্রিকার সম্পাদক বলেন নি, বলেছেন উৎক্ষণক, শব্দটির অর্থেই তাঁর উদ্দেশ্যের প্রকাশ।

"স্থাপনা"র প্রথম প্রকাশের দিনে পত্রিকার কর্তৃপক্ষ একটি নতুন ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। সভাপতি, প্রধান-অতিথির বদলে তাঁরা দু'জন লেখককে পত্রিকাটির প্রথম পাঠক এবং

দ্বিতীয় পাঠক হিসেবে বরণ করেছিলেন। প্রথম পাঠক হিসেবে আহ্বান করেছিলেন বাংলা দেশের একজন লেখককে, দ্বিতীয় পাঠক ছিলেন দিল্লির হিন্দী লেখক শ্রীরাজেন্দ্র অবস্থী। ও'রা দু'জন ছাড়াও সভায় রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক ডঃ পাণ্ডে, লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক শ্রীরাধাকৃষ্ণ অধ্যাপক হরিনারায়ণ সান্যাল এবং শিবচন্দ্র শর্মা সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করেন।

পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা আমরা দেখেছি। সাহিত্যে নতুন চিন্তা ও সৃষ্টিকে প্রতিষ্ঠা করাই পত্রিকাটির উদ্দেশ্য। এই সংখ্যায় নবীন প্রবীণ লেখকদের মধ্যে আছেন মনমোহন, মঞ্জুশ্রী শর্মা, বহাও দানিশ, রাজমোহন ঝা, কালীকিংকর, মণিকান্ত মিশ্র, বীরেশ্বর গাঙ্গুলী, অমলেন্দু চট্টোপাধ্যায়, বররুচি, অসিতকুমার হালদার, দিনেশ্বর প্রসাদ, বিদ্যাভূষণ এবং শিবচন্দ্র শর্মা। অকালমৃত প্রতিভাবান হিন্দী সাহিত্যিক রাজকমল চৌধুরীর আলোচনা এবং পাণ্ডুলিপির অংশ বিশেষ চিত্তাকর্ষক।

সনাতন পাঠক

অনুবাদ

প্রফেসর। যোসেফ মুণ্ডশশেরি। অনুবাদঃ মিলীনা আব্রাহাম। সাহিত্য অকাদেমী, কলকাতা-২৯। চার টাকা পঞ্চাশ।

অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও একথা স্বীকার করতে আমরা বাধ্য যে, আমরা আমাদের প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সাহিত্যপ্রয়াস ব্যাপারে নেহাৎই অজ্ঞ। অথচ, প্রতিবেশী সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের ওয়াকিবহাল থাকা শুধু প্রার্থিত নয়, নিঃসন্দেহে অবশ্য প্রয়োজনীয়। রাজ্যভেদে ভাষা এবং জীবনযাত্রার ইতরবিশেষ পার্থক্য থাকলেও মানসিকতা, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার এবং জীবনবিন্যাসপদ্ধতির ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন হয়েও একই সূত্রে গাঁথা। সেদিক থেকে বিচার করলে, প্রতিবেশী সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল এবং মনস্কতা আরো বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। এবং তা নিজ প্রদেশের সাহিত্যের কল্যাণের জন্যেই। এ বিষয়ে সাহিত্য অকাদেমী কিছুটা তৎপর হয়েছেন, এটা আশার কথা। আলোচ্য অনূদিত উপন্যাসখানি এই মহৎ প্রয়াসের একটি ফল।

শ্রীযুক্ত যোসেফ মুণ্ডশশেরি বর্তমান মালয়ালাম সাহিত্যে এক সর্বজনশ্রদ্ধেয় নাম। শ্রীমুণ্ডশশেরি প্রধানত বস্তুবাদী সাহিত্য সমালোচক হিসেবে মালয়ালাম ভাষাভাষীদের কাছে সুপরিচিত। সমালোচনার বাইরেও ঔপন্যাসিক হিসেবে মালয়ালাম সাহিত্যে তাঁর একটা সুনির্দিষ্ট স্থান রয়েছে। যদিও তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা মাত্র তিন; কিন্তু এদের মধ্যে তাঁর প্রথম সৃষ্টি, 'প্রফেসর' উপন্যাসখানি বিষয়বস্তুর দিক যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। উপন্যাসের নায়ক মিস্টার লোপাস, এক আদর্শবান বেসরকারী কলেজের অধ্যাপক। তাঁর বিচিত্র করুণ জীবনকাহিনী সংগ্রথিত হয়েছে উপন্যাসে। কাহিনীচয়নে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী সর্বত্র নিরাসক্ত এবং বস্তুবাদী। অধ্যাপক জীবনের সংগ্রাম এবং বঞ্চনা বৃহত্তর সমাজ প্রেক্ষাপটে অনেক সম্পর্কিত উপন্যাসের কেন্দ্রে ... ... প্রত্যক্ষ নেই। লেখক শ্রীমুণ্ডশশেরি স্বয়ং কিছুকাল বে-সরকারী কলেজের অধ্যাপনা কার্যে বৃত ছিলেন। ফলে, উপন্যাসে চিত্রবদ্ধ বাবস্থায় সমস্যা— খৃস্টান কলেজ কর্তৃপক্ষের অপশাসন এবং হৃদয়হীনতা, সমসাময়িক সমাজের নানা ছবি, দারিদ্র্য লাঞ্ছিত অধ্যাপকের পারিবারিক জীবনের দৈন্যদশা, বহুবিধ সামাজিক কুপ্রথা—সব কিছু লেখকের ব্যক্তি অভিজ্ঞতাসূত্রে আহরিত বলে জীবন্ত হয়ে উঠতে পেরেছে। উপন্যাসের একেবারে শেষে মিস্টার লোপাসের করুণ মৃত্যু এবং লেখকের সমবেদনাধন্য আশাবাদ কোন কোন পাঠকের কাছে সেন্টিমেন্টাল বলে প্রতীয়মান হলেও এই অংশে লেখকের আশাবাদী এবং প্রগতিধর্মী জীবনদীক্ষা একটা সুস্পষ্ট রূপ পেয়েছে। ফলে, উপন্যাসখানি নিছক তথ্যচিত্র না হয়ে প্রকৃত শিল্পগৌরব পেয়েছে।

অনুবাদ কর্ম স্বচ্ছন্দ, অনায়াসগতি। সংলাপ অংশে অনুবাদ কিছুটা কেতাবী হলেও বর্ণনাংশে প্রাণস্পর্শী এবং সাবলীল।

৩২৭।৬৯

রম্যরচনা

গল্পের মতো। অমিতাভ চৌধুরী। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-১২। মূল্য চার টাকা।

পেন-পিকচারের মানে যাই হোক এই বইয়ের অন্তর্গত রচনাগুলি যথার্থ কলমে-তোলা ছবি। এক সময় এই জাতীয় রচনাকে আমরা আদর ক'রে নাম দিয়েছিলুম রম্যরচনা। তাতে হয়তো স্নেহ প্রকাশ হয় কিন্তু সব কথা বলা হয় না। যে লেখায় ইতিহাসের আভাস থাকে, টাটকা মানুষের কথা থাকে দেশাচার-লোকাচার আর সাংস্কৃতিক পরিচয়—তা অবশ্যই রম্য কিন্তু রম্যতার ঊর্ধ্বেও আরেকটু কিছু। প্রচলিত ইতিহাস নয়, সাংবাদিকতা নয়, এমন কি শুনতে গল্পের মতো তবু গল্পও নয়। এদের প্রত্যেকটির আলাপ আছে এই জাতীয় লেখায় কিন্তু তার বিস্তার নেই। অমিতাভ চৌধুরী তাই এই সংকলনের নাম দিয়েছেন গল্পের মতো। আসামের চা-বাগানে যারা আজ 'গিরমিটিয়া' তাদের কথা গল্প-সমান কিন্তু সেই সঙ্গে ইতিহাসের খসে-পড়া এক টুকরো পলেস্তারাও বটে! লেখক পেশায় সাংবাদিক কিন্তু স্বভাবে তাঁর সাহিত্য; সেইজন্যে এ-বইয়ের অনেক জায়গায় যা নেহাৎ খবর হতে পারত তা অনায়াসে সাহিত্য হয়ে উঠেছে। তবু লেখক 'রবীন্দ্র-মেলা' রচনাটি সংকলন থেকে বাতিল করলে পারতেন। এতে স্থায়ী পাঠের আরাম নেই। অন্যদিকে লৌকিক ছড়া, গান রয়েছে কয়েকটি লেখায়; তাতে লেখককে অধিকতর ঘনিষ্ঠ মনে হয়। যেমন, 'শাহজলাল' নামের লেখাটি। শ্রীহট্টের ছোট্ট ছবি আছে এতে, আর রাখাল ছেলের মুখের গান। 'প্রমীলা রাজ্য' রচনাটি গল্পের মতো ইতিহাস। শ্রীহট্ট থেকে যে বাইরে খোজা চালান যেত, জয়ন্তীয়ার নরবলির

দ্বিতীয়িকা, 'খোজকর' শব্দটির উৎপত্তি যে খোজা করা থেকে এসেছে—এসব প্রয়োজনীয় খবরগুলি অমিতাভবাবু আমাদের জানিয়েছেন। খুবই পাংশু হতে পারত এমন কতকগুলি ব্যক্তিগত লেখা আছে এই সংকলনে কিন্তু লেখার গুণে দিব্য জমাট হয়ে উঠেছে। যেমন ট্রেনের কামরায়, 'বৌদি যাও পিয়া, সৌদি আরাবিয়া' অতি নিখুঁত লিপিপ্ত কৌতুকের নমুনা। 'কৃপাসিন্ধুতে' লেখক এইভাবে চিত্রকল্প রচনা করেছেন : পায়ের কাছে ছোট্ট সুটকেশ রামভক্ত হনুমানের মতো পড়ে ছিল। রবীন্দ্রনাথের মাথা যার কাছে নত ছিল, শান্তিনিকেতনের সেই ভরতের কথাও তিনি ভুলতে দেননি। এ সবই লেখকের কৃতিত্বের পরিচয়। মাত্র একশ সাতাশ পাতার বইতে অমিতাভবাবু এক সর্বগ্রাসী আগ্রহ সঞ্চার করতে পেরেছেন। ৩৩৮/৬৯

শিকার কাহিনী

অভিশপ্ত সুন্দরবন। বিশ্বনাথ বসু। **পরিবেশক :** সিগনেট বুক শপ : কলকাতা-১২। দাম চার টাকা পঞ্চাশ।

সুন্দরবন পৃথিবীর মহাবিস্ময়। এই ভয়ঙ্কর, দুর্গম অরণ্যের হিংস্র প্রাণীর কথা, বিশ্বেবিশ্রুত রয়েল বেংগল টাইগারের পরাক্রমের কথা সর্বজনবিদিত। এই সুন্দরবনের ইতিহাস আজকের নয়। স্মরণাতীত কাল থেকে এই অরণ্যের সান্নিহিত জনপদ সুন্দরবনের নামে আতঙ্কিত। এখনও কত লোমহর্ষক জনশ্রুতি প্রচলিত রয়েছে এই অরণ্যকে ঘিরে। আলোচ্য গ্রন্থ, 'অভিশপ্ত সুন্দরবন'-এ এমনি কিছু ভয়াবহ ঘটনার কথা গল্পাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তবে তফাত এই যে, আলোচ্য গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাগুলি বাস্তবমিশ্রিত কল্পকাহিনী নয়। সম্পূর্ণত লেখক শ্রীবিশ্বনাথ বসুর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং সুনির্দিষ্ট তথ্যের ওপর এতদ্বিষয়ক কিছু প্রবন্ধ রচনা করে এবং গ্রন্থপ্রণয়ন করে সুন্দরবন-প্রেমিক শ্রীবসু বাঙালী পাঠকের কাছে অল্পবিস্তর পরিচিত হয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি বহু দুঃসাহসিক শিকার-অভিযানে সংশ্লিষ্ট থেকে সুন্দরবনের ভয়ঙ্কর রূপ প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পেয়েছেন। গ্রন্থখানির সবচেয়ে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এ গ্রন্থের রচনাগুলি তথাকথিত কেতাবী শিকার-বিষয়ক শিক্ষণগ্রন্থ নয়। সুন্দরবনে শিকারব্যপদেশে নিজ চোখে দেখা কিছু অভিজ্ঞতাকে তিনি সরসভাবে পাঠকের সামনে উপস্থিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। সুন্দরবনের বাঘ মাত্রেই প্রকৃতিগতভাবে নরখাদক। এই ভয়ংকর নরখাদক বাঘ শিকারের অভিজ্ঞতাই গ্রন্থের বেশির ভাগ রচনা জুড়ে আছে। রয়েল বেংগল টাইগারের ধূর্ততা এবং ক্ষিপ্রতা, এক গুলিতে চমকপ্রদভাবে দুটি বাঘ শিকারের অভিজ্ঞতা, সুন্দরবনের কুমীর এবং বুনো মোষের হিংস্রতা এবং দৌরাত্ম্য—ইত্যাদি বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক চমৎকার কিছু শিকার প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। প্রত্যেকটি রচনা স্বতন্ত্রভাবে বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। বর্ণিত ঘটনাগুলি লেখকের রচনাগুণে সরস। এবং, বাহুল্যবর্জিত ও যথাযথ হওয়ায় আকর্ষণীয়। সুন্দরবনের হিংস্র প্রাণীদের আক্রমণ প্রসঙ্গে অরণ্যচারী দরিদ্র কাঠুরে এবং মধু সংগ্রহকারীদের দুঃখময় জীবন সংগ্রামের কাহিনী লেখক সুগভীর সহানুভূতির সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। এদিক থেকেও বইটির একটা বিশেষ মূল্য রয়েছে। তবে, যাঁরা সুন্দরবনের অরণ্যপ্রকৃতি এবং হিংস্রপ্রাণীর জীবনযাত্রা এবং আচরণবিধি সম্পর্কে খুঁটিনাটি সব কিছু জানতে চান, এ গ্রন্থ তাঁদের নিরাশ করবে। লেখক এ রকম উদ্দেশ্য নিয়েও বইখানি রচনা করেননি। কিন্তু বাস্তব আরণ্য-অভিজ্ঞতাকে সরসভাবে তুলে ধরে পাঠকমনে সুন্দরবন সম্পর্কে একটা কৌতূহল সঞ্চার করাই বোধ করি লেখকের অভিপ্রেত। সেদিক থেকে গ্রন্থখানির সাফল্য সন্দেহাতীত।

২০৩/৬৯

নাটক

বেনজু। রমেন লাহিড়ী। ডি লাইট বুক কোম্পানী, ২৪ অরবিন্দ সরণি, কলকাতা-৫। মূল্য—আড়াই টাকা।

রমেন লাহিড়ীর নাটকের লম্বা তালিকা। অশেষ নৈপুণ্য বলতে হবে, এর মধ্যে ছোটয়-বড়য় প্রায় তিরিশের কাছাকাছি নাটক তিনি রচনা করেছেন। আলোচ্য নাটকটি তিনি দুদিনে লিখেছেন। নাটক সাহিত্যের দুরূহতম শাখা বলেই জানতুম। এখন মনে হচ্ছে কথাটি ঠিক নয়। টিউব থেকে টুথ পেসট বার করার মতো অতি সহজ ব্যাপার। এত সহজ বলেই কিনা কে জানে, বাংলা নাটক কিছুতে সাহিত্য হতে পারছে না। সক্ষমতা হচ্ছে নিজস্ব বোধের ব্যাপার, তা কেউ চেষ্টা করে অন্যের মধ্যে চালান করতে পারে না। তবু এতগুলি নাটকের যিনি জনক তাঁর কাছ থেকে মোটামুটি সম্পন্ন আশা করা অন্যায় নয়। 'বেনজু' নাটকটি গোড়া থেকে অসংখ্য রকমের কৃত্রিম। সরল গাঁয়ের ছেলে, প্রকৃতির উদারতা, তার ওপর জেলে মাউথ-অর্গ্যান বাজনা—এইভাবে নাট্যকার সাজিয়ে তুলেছেন তাঁর নায়ককে তারপর তাকে ফেলে দিয়েছেন এক [illegible] খপপরে। উদ্দেশ্য [illegible] মাউথ অর্গান, বায়ুদের ধোঁয়ার [illegible] গান ইত্যাদি জীবনের সুন্দর ও সুকুমার জিনিসকে প্রকাশ করা। উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নেই কিন্তু মঞ্চে চালাবার পর সেটা কী দাঁড়িয়েছে? একটুও বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। এমন কি কথাবার্তাগুলো পর্যন্ত আড়ষ্ট, দুটির মাঝখানে অনেক ফাঁক। নবনাট্যের দর্শকরা এইসব নাটক পছন্দ করেন নাকি? তা যদি করেন তাহলে বুঝতে হবে এই সমালোচক অতি পাষণ্ড, নাটকের আবিষ্কারে সে অক্ষম। নাট্যকারের স্বীকারোক্তিতে প্রকাশ, অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট ছবিটি তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। এত দুর্বলভাবে প্রভাবিত হওয়া কি ঠিক? ১৪০/৬৯

পত্রিকা

তূণীর—সম্পাদক : শ্রীতপন কুমার দে। ৪বি, দুর্গাপিতুরি লেন, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত। দাম : ১·২৫ পয়সা।

এই মাসিক পত্রিকাটির সাম্প্রতিক সংখ্যায় সূচীপত্রে অন্নদাশঙ্কর রায়, বিমল মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী, মনোজ বসু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ সাহিত্যিকদের নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে দেখলাম। চলচ্চিত্র সংক্রান্ত কয়েকটি রচনাও আছে। এমনিতে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কিছু নেই, তবে সম্পাদনাকার্যে মন দিলে হয়তো ভবিষ্যতে পত্রিকাটি পাঠকের মনোরঞ্জন করতে পারবে।

আসছে ভারত সফরে। দেখা যাক আমাদের ছাত্ররাই বা কি ভূমিকা নেয়।

কস্তুরবা গান্ধী ক্রীড়ানুরাগিনী ছিলেন

নাফেনের সংবাদদাতা খবর দিচ্ছেন, মহাত্মা গান্ধীর সহধর্মিনী কস্তুরবা গান্ধী ক্রীড়ানুরাগিনী ছিলেন, খেলাধুলোও করতেন। তাঁর আরও খবর :

আগামী মাসে কস্তুরবা গান্ধীর জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হবে। খবরে প্রকাশ, ১৯৪২ সালে "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনকালে মহাত্মা গান্ধী যখন পুনার আগা খাঁর প্রাসাদে আটক ছিলেন, তখন শ্রীমতী কস্তুরবা গান্ধী সেখানে থাকাকালে সুশীলা বহিন, মীরা বহিন, মণি বহিন, ডাঃ গিলডার, পিয়ারেলাল এবং আরও অনেককে ব্যাডমিন্টন খেলার পদ্ধতি শিখে নিয়েছিলেন।

মুকুল ভাই কলারোথি "বা আন্ড বাপু" গ্রন্থে লিখেছেন যে, একদিন বেশ কিছুক্ষণ কস্তুরবা এবং বাপু পিংপং (টেবিল টেনিস) খেলেছিলেন।

এছাড়া কস্তুরবা গান্ধী ক্যারাম বেশ ভালই খেলতে পারতেন। তিনি সাধারণত মীরা বহিনের সঙ্গে বেশী ক্যারাম খেলতেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল এই যে, খেলায় হেরে গেলেই তিনি বড় বেশী মুষড়ে পড়তেন। তাই মহাত্মা গান্ধীর যেসব শিষ্য বা শিষ্যা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে খেলতেন তাঁরা তাঁকে উৎফুল্ল রাখার জন্য নিজেদের মধ্যে ষড়যন্ত্র করে কস্তুরবার কাছে খেলায় হেরে যেতেন।

মুকুল ভাই কলারোথি তাঁর উক্ত গ্রন্থে আরও লিখেছেন যে, শ্রীমতী কস্তুরবা গান্ধী যখন জীবনের শেষ পর্যায়ে শয্যাশায়ী, তখনও তিনি বিছানায় শুয়ে শুয়ে ক্যারাম খেলা দেখতেন। সেই সময়ে মীরা বহিন যদি খেলায় জয়লাভ করতেন, তা হলে তিনি খুব আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন।

আগামী মাসে কস্তুরবা গান্ধী জন্মশতবার্ষিকী উৎসব কালে শ্রীমতী কস্তুরবা যেসব খেলা খেলতেন, সেই সবের মডেল বা আলোকচিত্রের এক প্রদর্শনীও অনুষ্ঠিত হতে পারে।

একলব্য

মাত্র ৪ বছর বয়সে পায়ে স্কেটিং রোলার উঠেছে। ৭ বছরে আরম্ভ হয়েছে নিয়মিত ট্রেনিং। ১২ বছরে পূর্ব জার্মানীর চ্যাম্পিয়ন স্কেটার। ১৬ বছরে ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ। ১৭ বছরে গ্রীনোবেল অলিম্পিকে ফিগার স্কেটিংয়ে রূপোর মেডেল। অষ্টাদশী গ্যাব্রিয়েল সেফার্ট আজ ফিগার স্কেটিংয়ে বিশ্ব বিজয়িনী

কৃতীর ক্রীড়া ভূমিকা

লব্ধ প্রতিষ্ঠ উকীল স্বর্গীয় জানকী নাথ বসুর দেশবরেণ্য সাত পুত্র সতীশচন্দ্র বসু, শরৎচন্দ্র বসু, সুরেশচন্দ্র বসু, সুনীলচন্দ্র বসু, সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি সবাই যেমন এস সি বসু, তেমন ফরিদপুরের গভর্নমেণ্ট প্লিডার স্বর্গীয় নলিনীকান্ত সেনের আট পুত্র সবাই পি কে সেন। প্রমোদ, প্রদ্যোত, প্রফুল্ল, প্রশান্ত, প্রণব, প্রভাত, প্রতাপ ও প্রসূন। সবাই স্ব স্ব ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সবাই খেলাধুলোয় কিছু না কিছু সুনামের অধিকারী। তৃতীয় ভাই টি বি স্পেশালিস্ট স্বনামধন্য ডাঃ পি কে সেনের টেনিসে খুবই ভাল হাত। এখনো সাউথ ক্লাবের নিয়মিত খেলোয়াড়। সপ্তম প্রতাপ সেন ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের সহকারী সাধারণ সম্পাদক এবং সাউথ ক্লাবের কমিটি মেম্বার। টেনিস, হকি এবং বাস্কেট বলে ছিল সমদক্ষতা। প্রথম ডিভিসনেও হকি খেলেছেন নিয়মিত। অন্যান্য ভাইরাও স্কুলে, কলেজে, ক্লাবে খেলাধুলো করেছেন সুনামের সঙ্গে। তবে কৃতী খেলোয়াড় হিসাবে কলকাতার বর্তমান পুলিস কমিশনার পি কে সেনের খ্যাতিই সবচেয়ে বেশী।

স্বাভাবিক নিয়মেই আই সি এস এবং আই পি এস অফিসাররা ক্রীড়ানুরাগী হয়ে থাকেন, খেলাধুলোও করেন। লালবাজারে পুলিস কমিশনার পি কে সেনের ঘরে অনেকবার গিয়েছি। এ প্রশ্ন মনে আসেনি। সেদিন প্রাক্তন পুলিস কমিশনারদের ছবির দিকে তাকিয়ে প্রথমেই প্রশ্ন করলাম, "আচ্ছা, এদের মধ্যে কে কে খেলাধুলোয় কৃতী ছিলেন?"

পি কে সেন বললেন, কিছু না কিছু খেলাধুলো তো সবাই করেছেন। ফেয়ারওয়েদার বেশ ভাল টেনিস খেলতেন। আর কে কোন্ খেলায় দক্ষ ছিলেন তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি, বলে ফোন করলেন পুরনো দিনের অফিসার রবার্টসনকে। রবার্টসন জানালেন, চার্লস টেগার্ট ওয়াজ এ গ্রেট পোলো প্লেয়ার। কলসন ওয়াজ ইকোয়ালি গুড ইন পোলো।

পি কে সেনকে বললাম, পুলিসে বাঙালী হিসাবে আপনি এবং রঞ্জিত গুপ্তই বোধ হয় ওঁদের উত্তর সাধক। বললেন, হ্যাঁ, পুলিসে তো বটেই, বাঙালীদের মধ্যেও আর কেউ পোলো খেলে না। ওঁর ছেলে আশীসের কথা মনে করিয়ে দিতেই বললেন, হ্যাঁ, আশীস ভালই খেলত। পোলো বিশারদরা ওর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক আশার বাণীও শুনিয়েছেন। কিন্তু উনিশ শো আটষট্টিতে ঘোড়া থেকে পড়ে যেয়ে চোট খাবার পর ও এখনো পুরোপুরি পটু হয়ে ওঠেনি।

—'পোলোর কথায় পরে আসছি। আগে আপনার অন্যান্য খেলাধুলোর কথা বলুন।'

বললেন, কি আর বলব, সবই তো তুমি জান। বললাম, হ্যাঁ জানি। ক্রিকেটে, টেনিসে, হকিতে আপনি ইউনিভার্সিটি ব্লু, বাস্কেট বলে বাংলার প্রাক্তন অধিনায়ক আর হকিতে মোহনবাগানের প্রথম লীগ বিজয়ী দলের

পুলিস কমিশনার পি কে সেন

সেণ্টার হাফ। তবু আপনার খেলাধুলোর সূচনার কথা জানি না। ভালভাবে জানি না আপনাদের সময়ে খেলাধুলোর পরিবেশ ও সুযোগ সুবিধার কথা।

পুলিস কমিশনার বলতে আরম্ভ করলেন, 'ক্রিকেট অ্যান্ড হকি ওয়াজ মাই ফেভারিট গেম। ফরিদপুর জিলা স্কুলে দুটো খেলাতেই ভাল ছিলাম। তারপরে প্রেসিডেন্সী কলেজে। তখন নামকরা হকি টিম ছিল গ্রীয়ার ও মোহনবাগান। ওই দুই দলের কর্মকর্তারা ঘুরে ঘুরে কলেজের খেলা দেখতেন আর ভাল খেলোয়াড়ের সন্ধান করতেন। সেই সুবাদেই খেলার সুযোগ ঘটল গ্রীয়ার ক্লাবে। '৩২ সালের পর ওখান থেকে মোহনবাগানে। মোহনবাগানে তখন সব নামকরা খেলোয়াড়দের সমাগম। জয়পাল সিং, প্রভাস দাস, কালি দেব, শৈলী, এইচ কে মিত্র প্রভৃতি।

বাধা দিয়ে প্রশ্ন করলাম, অন্যান্য দল কেমন ছিল?

'ওঃ ভেরি গুড। কাস্টমসে তখন সৌকত, ডিফাল্টস, সীম্যান, ডেভিসের মত খেলোয়াড়। রেঞ্জার্সে ওয়েলস ব্রাদার্স। বি এন আরে টাপসেল, গ্যালিবার্ড, আর কার। তোমাকে বলব কি মুকুল, তখন বাংলার হকি দল এখনকার অল ইণ্ডিয়া দলের চেয়েও ভাল ছিল।'

—'বাইরে থেকে খেলোয়াড় আমদানি হত না?'

—'মোটেই না। ১৯৩৫-এ আমরা যেবার প্রথম লীগ চ্যাম্পিয়ন হই সেবার আমরা ১০ জনই বাঙালী। অবাঙালী ছিল মাত্র একজন। সেও আবার এখানকার কলেজ ছাত্র।

—'ক্লাব থেকে আপনারা কি পেতেন?'

—'শুধু স্টিকস, জার্সি আর মোজা। প্যাণ্ট, কেডস নিজেদের কিনতে হত। ক্লাবে যাতায়াতের জন্য ট্রাম-বাস ভাড়া দিতে হত নিজেদের পকেট থেকে। এ জন্য অন্যান্য ভাইদের চেয়ে আমি ৫ টাকা বেশী মাসোহারা পেতাম। মোহনবাগানে খেলার সুযোগকে আমরা গ্রেট অনার বলে মনে করতাম।'

—'আপনাদের সময়কার স্পোর্টসম্যানশিপ কেমন ছিল?'

—'তোমাকে শুধু একটি উদাহরণ দেব। একদিন খেলার সময় বড় রকমের চোট খেয়ে আমি পড়ে গিয়েছি। মার্মিন ছুটে এলো। তুমি ভাবছ মার্মিন আমার হাত ধরে টেনে তুললো। মোটেই না। উল্টে আমাকে প্রায় লাথি মারতে উদ্যত হল। বলল, লজ্জা করে না? খেলতে খেলতে পড়ে গিয়েছ আবার কাতরানি আরম্ভ করেছ। শীগ্গির ওঠো। স্টিক নাও, দর্শক-সমর্থকদের উত্তেজনার খোরাক জুগিও না। আমাদের সময়ে স্পোর্টসম্যান ছিল এই ধরনের।

—'আপনার জীবনের স্মরণীয় ঘটনা সংক্ষেপে বলবেন?'

—'খেলোয়াড় জীবনের অনেক ঘটনা। আর পুলিসের চাকরিতে তো ভূরি ভূরি তবে একটি ঘটনা আমার জীবনে অলৌকিক ঘটনার মত। যার সঙ্গে খেলাধুলোর সম্পর্ক নেই। তবে তোমাদের সম্পর্ক আছে।'

—'বলুন না!'

—'তোমাদের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সুরেশবাবু একদিন এসে বললেন, আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। আমার জিজ্ঞাসু চোখ দেখেই বললেন, না না, পুলিসের কোন ব্যাপার নয়। আপনাদের খেলাধুলোরও কিছু নয়। তবে হ্যাঁ, একজন বড় খেলোয়াড় দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের জন্য যিনি জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে গিয়েছেন তাঁর জন্যই আপনার কাছে আসা। শুনেছিলাম বাঘা যতীনের মুখের আদলের সঙ্গে এবং আজাদ হিন্দ বাগে মহা বিপ্লবীর মর্মর মূর্তি গড়ার ভার নিয়েছেন যে শিল্পী তিনি আমার সিটিং চান। সিটিং দিয়েছিলাম।'

জীবন পথে বিপরীতধর্মী দুজনের আর কোথায় মিল? না, ডানপিঠে হিসাবে।

মুকুল

যাত্রিক পরিচালিত "এখানে পিঞ্জর" : অপর্ণা সেন ও উত্তমকুমার

ফেলিনির নতুন ছবি

নিও রিয়ালিজম, নুভেল ভাগ প্রভৃতি কয়েকটি ফিল্ম আলোচনায় এক সময়ে ঝড় তুলে দিয়েছে। বেশী সুবিধে হয়েছে সমালোচকদের লক্ষণ বিচারের ভিতর দিয়েই ছবির বিচার-বিশ্লেষণের কাজ অনেকখানি সেরে ফেলেছেন। এই নামের আবিষ্কারকও কি সমালোচক নন? বড় পরিচালকরা কিন্তু এই লক্ষণ বিচার ও শ্রেণী বিভাগ কখনও বিশেষ পছন্দ করেননি। সম্প্রতি ফেদারিকো ফেলিনি তাঁর নতুন ছবি "দি স্যাটিরিকন" (The Satyricon) সম্পর্কে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, ফিল্মের ক্ষেত্রে এই diagnostic approach-এ তিনি মোটেই বিশ্বাসী নন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, এই নতুন ছবিতে তিনি তাঁর পুরানো স্টাইলে, নিও-রিয়লিজম-এ ফিরে এসেছেন কিনা। ফেলিনি জবাবে শুধু বলেন, তাঁর সব ছবিই এক সঙ্গতি-পূর্ণ "পার্সোন্যাল ভিশন"-এর অংশ।

আমেরিকায় শীগ্গির ছবিটির মুক্তি পাবার কথা। নিরোর সময়ে রোমের পটভূমিতে এই ছবি, প্রাচীন রোম নিয়ে খুবই বিতর্কমূলক কাহিনী, রীতিমত সাংঘাতিক।

"It deals with love and fear, friendship and surprise, all of the common experiences of humanity"

ফেলিনি

জনৈক সমালোচক বলেছেন, মানুষের এমন বিশেষ কোন পাপ নেই যা এ ছবিতে দেখানো হয়নি।

পেট্রোনিয়াসের উপন্যাস, সবে পুরোটা লাটিন থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। এত শতাব্দী ধরে এর ভয়ানক কিছু অংশ লাটিন ভাষাতেই আচ্ছাদিত ছিল। রোম সম্বন্ধে এতকাল যে সব ছবি হয়েছে তাতে প্রাচীন রোমের প্রকৃত পরিচয় মেলেনি বলেই ফেলিনির ধারণা। এ ছবি রোমকে বাস্তব ও নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখবার সুযোগ দেবে বলে ফেলিনির বিশ্বাস।

Do I approve or disapprove? It depends. The picture is full of nostalgia for a Christ who has yet come.

এই ছবি তৈরির কালে অনেকেই অস্বস্তি ভোগ করেছেন। ছবি মুক্তি পেলে যে রক্ষণশীল সমাজের শান্তি বিঘ্নিত হবে তাতে সন্দেহ নেই। ফেলিনি বলেছেন, ছবিটি যখন আমি তৈরি করি তখন অনেকেই আমাকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছিলেন। বলেছেন,

What the hell are you doing?

ফেলিনি অস্বীকার করেন না, প্রাচীন রোমের যে নৈতিক পরিচয় তিনি তাঁর দৃষ্টিতে প্রকাশ করেছেন তা বাস্তবিকই shocking. "Any artistic creation

পুনার ছাত্রদের ছবি : "ডিজঅ্যাপয়েন্টেড"

is always offensive", ফেলিনি প্রসঙ্গত বলেন।

ফেলিনির এই ছবির শিল্পীরা সকলেই নতুন। তাঁর পরের ছবির প্রস্তুতিও চলছে। সেটা হবে সমসাময়িক ইতালির তরুণদের নিয়ে। ফিল্মে স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর অভিমত কী জানতে চাইলে ফেলিনি বলেন, আমরা স্বাধীন বলেই আমাদের দায়িত্ব বেশী। চলচ্চিত্রকারকে নিরাসক্তভাবে উঁচু ভাবনার স্তরে দর্শকদের কথা চিন্তা করতে হবে, তাঁদের "হিপনোটাইজ" করা আজকের চিত্র পরিচালকের কাজ নয়। পরিশেষে ফেলিনি বলেন, আমি ছবি পরিচালনা করি না, আমার কেমন যেন মনে হয় ছবিই আমাকে পরিচালনা করে।

॥ চিত্র-সমালোচনা ॥

পুনায় ছাত্রদের প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন প্রচেষ্টা

ভারতীয় চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশান্বিত হবার আশ্বাস পাওয়া গেছে পুনা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের ছাত্রদের কাজ দেখে। গত ২৩ জানুয়ারি প্রিয়া সিনেমায় এবং ২৪ জানুয়ারি ইণ্ডিয়া ফিল্ম লেবরেটরিতে পুনার ছাত্রদের তোলা কিছু অল্প দৈর্ঘ্যের ছবি এবং একটি কাহিনী-চিত্র দেখে এ কথা মনে হয়েছে। ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ শ্রীজগৎ মুরারিও ছাত্রদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা পোষণ করেন। বি এফ জে এ আয়োজিত সাংবাদিক সমাবেশে শ্রীমুরারি জানান যে, বিশেষ করে ফটোগ্রাফী, এডিটিং এবং অভিনয় সংক্রান্ত বিভাগগুলিতে ছাত্রেরা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বাইরের ছবিতেও এই বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরাই বেশী কাজ পাচ্ছেন। প্রসঙ্গত "ভুবন সোম" ছবির ফটোগ্রাফির কাজে ইনসটিটিউটের ছাত্র শ্রীমহাজন যে দক্ষতা দেখিয়েছেন এবং অবিমিশ্র প্রশংসা পেয়েছেন—সে সম্পর্কেও আলোচনা করলেন অধ্যক্ষ শ্রীমুরারি।

অল্প দৈর্ঘ্যের ছবিগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে, "ডিস-অ্যাপয়েন্টেড" ছবিটির কথা। রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থের 'বঞ্চিত' ও 'অপরপক্ষ' কবিতা দুটি এ ছবির ভাব অবলম্বন। পরিচালকের পরিমিতিবোধ সত্যিই অবাক করে। নেহাত প্রয়োজন ছাড়া কোথাও একটি সংলাপ ব্যবহৃত হয়নি। অথচ ট্রেন-যাত্রিণী নায়িকার মনে প্রতি মুহূর্তে কত কথার ভিড়। অতীতের কত স্মৃতি, ভবিষ্যতের কত ভাবনা। ক্যামেরার চোখ সেই চিন্তায় কখনো জটিলতা এনেছে, কখনো টানেলের ভিতর দিয়ে ছুটে চলা ট্রেনে ঘন অন্ধকার ছড়িয়েছে মনের গভীরে, কখনো দূরে একটি আলোকবিন্দুর ইশারা, কখনো হঠাৎ ছুটে যাওয়া একটি ট্রেনের গতিশব্দে চিন্তায় এ'কেবেঁকে শুয়ে থাকা ট্রেন-লাইনের দিকে তাকিয়ে শূন্যতার উপলব্ধি, ফুটপথে পড়ে থাকা একটি চন্দ্রমল্লিকার নীরব দীর্ঘশ্বাস—এ ছবিকে সার্থকতার মর্যাদা দিয়েছে। সাহিত্যের ভাব আর সিনেমার ভাষার এক আশ্চর্য মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক কুলবন্ত সিং। শিল্পীদের অভিব্যক্তিরও বুঝি তুলনা নেই।

"দি এপিটাফ" ছবিতে আবার অন্য মেজাজ। ফুটপাথে পড়ে থাকা এক অজ্ঞাত-পরিচয় মৃতদেহকে কেন্দ্র করে কিছু কৌতূহলী মানুষের জটলা। তারই মধ্যে থেকে জীবনে বীতশ্রদ্ধ এক যুবকের সরকারী ব্যর্থতার সমালোচনা, অন্য এক [illegible] আপন জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের চেষ্টা, [illegible] রাজনীতিকের ভোটের [illegible] এক জোচ্চোরের মৃতদেহ সৎকারের নামে চাঁদা তুলে আত্মসাৎ, আধুনিক অতি-চালাক যুগের হৃদয়হীনতার একটি সুন্দর দলিল এই ছবি। একেবারে শেষে আর এক সর্বহারা মানুষের মৃতদেহের খোলা চোখ দুটি বন্ধ করে দেবার মধ্যে আছে শাশ্বত মানবতার প্রকাশ। গুরুচরণ সিং এ ছবির চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক।

তুলনায় বরং "পিয়া কে ঘর" কাহিনী-চিত্রটি সাদামাটা ভঙ্গীতে চিত্রায়িত। [illegible] বিবাহিতা যে বধূটি একটু নিরালয় [illegible] চেয়েছিল তার স্বামীকে—তার [illegible] এ পৃথিবীর কোথাও একটুকু [illegible] অবশিষ্ট নেই। [illegible] কিছু [illegible] ছবির সৌন্দর্যহানি ঘটিয়েছে। [illegible] অনায়াসে বর্জন করা চলত। [illegible] কারও একার কাজ নয়, ইনস্টিটিউটের সমষ্টিগত প্রচেষ্টা। [illegible] না হলেও [illegible] এ ছবির [illegible] আছে।

সব [illegible] ভবিষ্যতে পুনা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের ছাত্রদের কাছে আমাদের দেশ [illegible] করতে পারবে।

"নৃত্যারম্ভ"

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার-এর সহযোগিতায় বিবেকানন্দ হলে দক্ষিণ কলিকাতার সাংস্কৃতিক সংস্থা নৃত্যের তালে তালে "নৃত্যারম্ভ" নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেন। রচনা : শ্রীশৈলেন পাল চৌধুরী। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লোকনৃত্য ও উচ্চাঙ্গ নৃত্যকে অবলম্বন করে এই নৃত্যনাট্যটির রূপ দিয়েছেন [illegible] দাশগুপ্ত। রীতা রায় খেয়াল গান সুন্দর গেয়েছেন এবং সমর ঘটক ভাংড়া ও [illegible] নাচ খুব ভাল নেচেছেন। গ্রন্থনায় ছিলেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। যন্ত্রসংগীতে দীনেশ চন্দ্র সেতার বাজিয়েছেন। কণ্ঠসংগীতে ছিলেন অমর ঘটক, রীতা রায়, আনন্দ মুখো, প্রদীপ বসু ও সংস্থার ছাত্রীরা। নৃত্যে যোগ দেন সংস্থার ছাত্রবৃন্দ।

টালি-টিপ্পনী

প্রজাতন্ত্র দিবসের সরকারী খেতাবপত্রের তালিকা বেরিয়েছে। বাংলা রঙ্গজগৎ থেকে তিন তিনজন এ বছর সরকারী সম্মান পেয়েছেন। বিশিষ্ট নট ও নাট্যকার শ্রীশম্ভু মিত্র হয়েছেন পদ্মভূষণ, আর পদ্মশ্রী খেতাবে সম্মানিত হয়েছেন প্রবীণ সংগীতকার শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক ও প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক শ্রীঋত্বিককুমার ঘটক। ভেবেছিলাম, "খেতাবধারী"দের মধ্যে এই নিয়ে বেশ একটা উচ্ছ্বাস দেখতে পাব, কিন্তু দেখলাম এ ব্যাপারে কেউই তেমন উল্লসিত নন। "ঠিক আছে", এই পর্যন্ত।

টালিগঞ্জের স্টুডিও-পাড়ায় অবশ্যই মিশ্র প্রতিক্রিয়া। নামী শিল্পীদের মধ্যে একজন বললেন, "সরকারী খেতাব-টেতাবে আমাদের আর বিশ্বাস নেই। ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলির মত অভিনেতারা যেখানে খেতাব না পেয়ে চলে গেলেন, সেখানে অভিনয়ের জন্যে কে খেতাব পেলেন বা পেলেন না তার মূল্য সামান্যই।" একজন নায়িকা বললেন, "অভিনয়-জগৎ থেকে ইতিপূর্বে বম্বের বৈজয়ন্তীমালা পদ্মশ্রী খেতাব পেয়েছেন, অথচ যে সুচিত্রা সেন সুদূর মস্কোতে ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন, তাঁকে তো আজ পর্যন্ত এমন কোন সম্মান দেওয়া হল না!" একজন বড় পরিচালকের সঙ্গেও এই নিয়ে কথা হচ্ছিল। তিনি বললেন, ফিল্মে যে কিসের ভিত্তিতে এই সম্মান দেওয়া হয়, সেই ব্যাপারটাই আমার কাছে আজও অস্পষ্ট। ধরা যাক, সরকার স্থির করলেন অভিনয়ের জন্যে কাউকে সম্মান "খেতাব" দেবেন। কী দেখে দেবেন? অভিনয়ের জন্য উত্তমকুমার গত বছর জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন, এ বছরের প্রজাতন্ত্র দিবসের জাতীয় সম্মানেও কি তাঁর কথা ভাবা উচিত ছিল না?

খেতাব নিয়ে এমনিতর নানা প্রশ্ন আজ বিভিন্ন মহলে। আমার মনে কী প্রশ্ন? ঋত্বিক ঘটকের মর্যাদা বৃদ্ধিতে আমি খুবই আনন্দিত শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিকের এই সম্মানও আমাদের কাছে আনন্দের ও গৌরবের। ফিল্মে রবীন্দ্র সংগীতকে পপুলার করার পেছনে তাঁর অবদান অনেকখানি। শুধু কি তাই, সুর-শিল্পীরূপেও তাঁর অবদান কম নয়। কর্ম-বহুল জীবনের সীমায় এসে এতদিনে তিনি জাতীয় স্বীকৃতি পেলেন। সরকার-প্রদত্ত এই সম্মানকে শ্রীমল্লিক অবশ্য অচঞ্চল চিত্তেই গ্রহণ করেছেন।

বিশিষ্ট নট ও নাট্যকার শ্রীশম্ভু মিত্রকে টেলিফোন করে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেমন লাগছে?" না, তিনিও খুব আনন্দিত মনে হল না। আর আনন্দিত হবেনই বা কেমন করে! তিনি তো আর একচক্ষু নিয়ে বসে নেই। শ্রীমিত্র ভালো করেই জানেন, যে মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে আজ তিনি রাতের পর রাত অভিনয় করছেন, নতুন নতুন নাটকের পরিকল্পনা করছেন, সেই আধুনিক মঞ্চের জনক শ্রীসতু সেন আজো খেতাবহীন অবস্থায় দুরন্ত দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করছেন।

"শান্তি" (পরিচালনা : স্বদেশ সরকার) ছবিতে [illegible] চট্টোপাধ্যায়

*

প্লাস্টিক, কন্টিনিউটি, ফোকাসিং, এডিটিং কিংবা রং মেখে সং সেজে সংলাপ পাঠ, শিল্পী ও কলাকুশলীদের প্রাত্যহিক রোজনামচা। অনেকে আবার বেকার তো একেবারেই বেকার। বাড়ির বন্ধ ঘরে দিন কাটে, দিনান্তে একবার ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীর ক্যান্টিনে এসে সময়কে হত্যা করেন। এই [illegible] যন্ত্রণাময় জীবনের মধ্যে কী করে বৈচিত্র্য আনা যায়, এরকম একটা ফিকির খুঁজছিলেন টালিগঞ্জের শিল্পী ও কলাকুশলীরা। ২৬ জানুয়ারীর প্রজাতন্ত্র দিবসে তাই ও'রা সদলবলে বেরিয়ে পড়লেন খোলা আকাশের নীচে নতুন জীবনের সুর খুঁজতে। হন্তা, কড়াই সমেত তিন গাড়ি শিল্পী ও কলাকুশলীর একটি দলকে সেদিন রূপনারায়ণ নদীর ধারে দেখা গেল "পিকনিক" করতে। ছোট বড় ভেদাভেদ নেই, সমস্ত একজন প্রোডাকশন বয় কিংবা ইলেকট্রিসিয়ান এক-সঙ্গে ভোজনে বসলেন বড় পরিচালক ও নামী শিল্পীদের সঙ্গে।

সাধারণত ফিল্মের বড় ভোজে বড় বড় তারা আর জ্যোতিষ্কেরাই আলো ছড়ায়, আর যাঁরা ফিল্মের প্রদীপকে তুলে ধরে রাখে সেই অবজ্ঞাত পিলসুজদের গায়ে শুধু তেলই গড়ায়। এখানে সবার মুখেই এক [illegible]

সমাপ্তিপথে "দক্ষযজ্ঞ"

সুজাতা মুভিজের পৌরাণিক বাংলা ছবি "দক্ষযজ্ঞ"র চিত্রগ্রহণ সমাপ্তপ্রায়। রমেশ নাইডু ছবিখানির প্রযোজক ও সংগীত পরিচালক। যুগল মিত্র ছবিটির পরিচালক। সতীর বাহান্ন পীঠস্থানের দৃশ্যাবলী এতে চিত্রায়িত হয়েছে; এ ছাড়া দেবীর দশমহাবিদ্যার রঙিন দৃশ্যাবলীও রয়েছে।

নাট্য-সমালোচনা

ছায়ায় আলোয়

(থিয়েটার ওঅকশপ)

বিষয় একই—সেই অভাবক্লিষ্ট নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবার, বাড়ির কর্তা কর্মবিমুখ, ছেলে পঙ্গু, রোজগার করে সংসার চালাবার দায়িত্ব গৃহকর্ত্রী ও তার কন্যার। সমস্যা একটি—অন্ধকারে আশার আলো নিয়ে আসে এক যুবক। দারিদ্র্যের সুযোগ নেয়, তারপর বাড়ির বিবাহযোগ্য কন্যাকে বিপদে ফেলে পালিয়ে যায়। ছায়ার আলোর হদিস নিয়ে এসেছিল ওই যুবকই, নাম শ্যামল। বাড়ির কর্তা হারানবাবু হাতে স্বর্গ পেয়েছিলেন একটি সংবাদ শুনে—তাঁর নিঃসন্তান কাকা নাকি মরবার আগে সম্পত্তি ভাগ করে দিয়ে গেছেন ভাইপো ও ভাইঝিদের মধ্যে। হারানবাবুর প্রায় বিশ হাজার টাকা পাবার কথা। সংবাদ-বাহক শ্যামলের খাতির ওই বাড়িতে রাজপুত্তুরের মত, সে হারানবাবুর কন্যা মালতীর অন্তর জয় করবে সেটা আর বেশী কথা কী। শেষ পর্যন্ত সেই ছায়াই থেকে যায়, বিশ হাজার টাকা মরীচিকার মত পথ ভুলিয়ে ওই পরিবারকে আরও বিপন্ন করে।

নাটকটি অনূদিত। মূল নাটক "জুনো অ্যান্ড দি পিকক"। নাট্যরূপ দিয়েছেন অশোক মুখোপাধ্যায়। এই নাটকে শ্রীমুখোপাধ্যায় আধুনিক নিম্নমধ্যবিত্ত মানসিকতা, তার যন্ত্রণা ও আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। নাট্যকারের এই তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী নজর দেখা গেছে ছোট-ছোট ঘটনায়, পাত্র-পাত্রীদের সংলাপে। পরিচালনায় (চিন্ময় রায় ও বিভাস চক্রবর্তী) বৈশিষ্ট্যে নাটকটি আদ্যন্ত গতিসম্পন্ন ও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। প্রথম অংশে নাটকটিতে কমেডির সুর, যা দর্শককে রীতিমত আনন্দ দিয়েছে। শেষাংশে মেলোড্রামায় সংক্রমণ, যা বিদগ্ধ দর্শকের কাছে ক্লান্তিকর। বিষয়বস্তুর গোটা চিত্রটি অর্থাৎ মধ্যবিত্ত জীবনের সমস্যা আধুনিক শৌখিন মঞ্চে নতুন না হলেও বিভিন্ন চরিত্রের কথা ও প্রসঙ্গ পরিবেশনের গুণে নাটকটি আগাগোড়াই ভাল লাগে।

সুখভোগ্যতার অন্যতম কারণ প্রায় প্রত্যেক শিল্পীর উঁচুমানের অভিনয়। বিভাস চক্রবর্তী, মায়া ঘোষ, মানিক রায়চৌধুরী—এই তিনজন শিল্পী দর্শককে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছেন তাঁদের অভিনয়ের সাবলীলতায়। অন্যান্যদের মধ্যে তাপসী গুহ, লক্ষ্মী মণ্ডল, তরুণ ঘটক, অশোক মুখোপাধ্যায়, অজিত সরকার, চিন্ময় রায় প্রমুখ শিল্পীরাও চমৎকার অভিনয় করেছেন। বস্তুত অভিনয়ই নাটকটির প্রধান আকর্ষণ। এবং টিম-ওয়ার্কের গুণেই বিশেষ করে এই সুপ্রযোজিত নাটকটি দর্শককের দৃষ্টি ও মন আকৃষ্ট করে রাখে; দর্শককে নড়তেও দেয় না, অন্যমনস্ক হবার সুযোগও না।

"ধরতী" হিন্দীচিত্রে রাজেন্দ্রকুমার ও ওয়াহিদা রেহমান

বিভিন্ন উৎসবে "গুপী গাইন..."

আরও তিনটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শনের জন্য "গুপী গাইন বাঘা বাইন" ছবিটি নির্বাচিত। উৎসব তিনটি হল : প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, ওকসা, জাপান (এপ্রিল); ভিয়েনা চলচ্চিত্র উৎসব (২-৯ এপ্রিল); মেলবোর্ন ও সিডনি উৎসব (৫-২০ জুন)। সত্যজিৎ রায়ের এই ছবির ব্যবসায়িক প্রদর্শনীর জন্য বিদেশের বহু চিত্রপরিবেষক ইতিমধ্যেই প্রযোজক নেপাল দত্তের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন।

এখানে পিঞ্জর

প্রফুল্ল রায়ের কাহিনীর ভিত্তিতে কলামন্দিরের "এখানে পিঞ্জর" ছবির কাজ প্রায় শেষ। একালের সমাজজীবনের দ্রুত পরিবর্তন ও বিবর্তনের পটভূমিতে কাহিনী রচিত। উত্তমকুমারকে ছবিতে লেখকের ভূমিকায় দেখা যাবে। অপর্ণা সেন, দিলীপ মুখার্জি, কল্যাণ চ্যাটার্জি, রত্না ঘোষাল, দোলনচাঁপা দাশগুপ্ত, জহর রায়, তরুণকুমার প্রভৃতি ছবির অন্যান্য বিশিষ্ট শিল্পী। চিত্র পরিচালনা করেছেন যাত্রিক গোষ্ঠী। ভূপেন হাজারিকা সংগীত পরিচালক।

"[illegible]" (পরিচালনা : অজিত গাঙ্গুলি) ছবিতে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল ঘোষাল ও কামু মুখোপাধ্যায়

"আবিরে রাঙানো" ছবির কাজ শুরু হয়েছে সত্যদেব চট্টোপাধ্যায়ের গান রেকর্ডিং-এর মাধ্যমে—ওই অনুষ্ঠানে কণ্ঠশিল্পী ললিতা ধরচৌধুরী, মান্না দে ও চিত্র-পরিচালক অমল দত্ত

আর ভজন। এ'রা ছাড়াও সম্মেলনে সুভাষ চাকলাদার, কুমকুম ভট্টাচার্য, কাজল চক্রবর্তী প্রভৃতি আরও কয়েকজন শিল্পী কণ্ঠসংগীতের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে মায়া চট্টোপাধ্যায়ের কথক এবং লিপিকা গুপ্তের ভরত-নাটাম প্রশংসনীয়। বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানে শান্তাপ্রসাদ, অনিল ভট্টাচার্য, গোবিন্দ বসু প্রমুখ শিল্পীরা তবলায় সহযোগিতা করেন।

—আনন্দবর্ধন

পার্ক সার্কাস মিউজিক্যাল কনফারেন্স

পার্ক সার্কাস মিউজিক্যাল কনফারেনসের বার্ষিক অধিবেশন ১২ ফেব্রুয়ারি কলা-মন্দিরে শুরু হচ্ছে। ১৪ তারিখ পর্যন্ত চলবে। অধিবেশনের প্রধান শিল্পীরা হলেন : আমির খাঁ, ডি ভি যোগ, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, এ টি কানন, আমনাদ খাঁ, সুনন্দা পট্টনায়ক, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মণিলাল নাগ, শিপ্রা বসু, মহম্মদ ইউসুফ, মায়া চট্টোপাধ্যায়, সুমিত্রা মিত্র, সংযুক্তা পাণিগ্রাহী।

সর্বভারতীয় সংগীত সমাজ

মহাজাতি সদনে সর্বভারতীয় সংগীত সমাজ কর্তৃক আয়োজিত এবারকার সম্মেলনে বেশ কয়েকজন অশ্রুত কিংবা অনতিশ্রুত শিল্পীর সমাবেশ দেখা গেল। এ'দের মধ্যে সকলেই যে নবাগত অথবা বহিরাগত, তা নয়। এমনও কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী আছেন, এ বছরের সম্মেলনগুলিতে যাঁদের অনুপস্থিতি কিছুটা বিস্ময়েরই সৃষ্টি করেছে। যেমন, বেহালার অনুষ্ঠানে একই শিল্পীকে বহু সম্মেলনে পেয়েছি, অথচ শিশিরকণা ধর চৌধুরীকে সেদিন সম্ভবত এই মরসুমে সর্বপ্রথম সম্মেলনে বাজাতে দেখা গেল। শিল্পীকে যেমন দেখা গেল বেশ কিছু দিনের ব্যবধানে, তিনি যে রাগটি পরিবেশন করলেন, অপ্রচলিত আর নব-সৃষ্ট রাগের ঘনঘটায় সেই কলাবতীও যেন অনেক দিন অবগুণ্ঠিত ছিল। শিশিরকণার দরদী এবং নিপুণ সুর-মূর্ছনায়, বিশেষত আলাপ-অংশে রসনিবিড় ব্যঞ্জনায় এই রাগটির সার্থক বিকাশ তাই বিশেষভাবে উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। শুধু শিশির-কণাই নয়, আর-একজন শিল্পীকে এই সম্মেলনে দেখতে পেয়ে খুশী হলাম। জয়জয়ন্তী রাগে সর্বপ্রকার বাহুল্যবর্জিত অথচ সূক্ষ্ম অলংকারসমৃদ্ধ সরোদের একটি অনুষ্ঠানে বুদ্ধদেব দাশগুপ্তও পরিণত শিল্প-রচনার স্বাক্ষর রেখেছেন। সেতারে সুব্রত রায়চৌধুরী 'নন্দকৌষ'-এর আলাপটি ভারী সুন্দর বাজিয়েছেন। কল্যাণী রায় বাজিয়েছেন মালকোষ। অবশ্য নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেতারে নট-ভৈরো আর তোড়ি শুধু যন্ত্রসংগীতের মধ্যেই নয়, সমগ্র সম্মেলনে বিশেষভাবে চিহ্নিত হবার যোগ্য। কণ্ঠসংগীতে আমীর খাঁ কিন্তু এবারে তাঁর সুনাম অনুযায়ী সার্থকতা অর্জন করতে পারেননি। গুণ-কেলি, দেশকার এবং গুর্জরী তোড়ি—এই তিনটি রাগ তিনি শুনিয়েছেন। নারায়ণ রাও ব্যোশীর দরবারী কানাড়া, নাসির আমেদের যোগকোষ, শম্ভু মুখোপাধ্যায়ের ইমন রাগে ধ্রুপদ উল্লেখ-যোগ্য। সুনন্দা পট্টনায়ক তাঁর পূর্ববর্তী দু-একটি অনুষ্ঠানের তুলনায় অনেক ভাল গেয়েছেন রায়েসা কানাড়ায় খেয়াল

ঋত্বিক ঘটকের নতুন ছবি

ঋত্বিককুমার ঘটক কিছুকাল রোগ-ভোগের পর আবার ছবি করছেন। তিনি পুরুলিয়ার লোকজীবনের উপরে একটি ছবি তৈরি করবেন। ইতিমধ্যেই তিনি পুরুলিয়া সফর সেরে ছবির কাজ অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। সুশীল করণ ছবিটি প্রযোজনা করছেন।

সলিল দত্ত পরিচালিত "কলঙ্কিত নায়ক" ছবিতে অপর্ণা সেন ও উত্তমকুমার

"বাঁচতেই হবে" নাট্যাভিনয়

[illegible]মশঙ্কর মিশন কলেজের অধ্যক্ষ ও [illegible] শ্রীশঙ্করদাস বাগচীর ৫২তম [illegible]দিন উদ্‌যাপিত হল ১৪ জানুয়ারি [illegible]-হলে। এ উপলক্ষে এদিন অভিনীত [illegible] "বাঁচতেই হবে"। নাটকটি আধুনিক [illegible]-চেতনার পটভূমিতে রচিত। [illegible] শঙ্করদাস বাগচীর। শ্রীবাগচীর আগের চারটি নাটকই ক্ষয়িষ্ণু সমাজব্যবস্থার পটে লেখা। সে গুলি যেমন দর্শক মনে [illegible] থোরাক জুটিয়েছিল, এটিও তাই। বরং বলা চলে এটি বুঝি আরো বেশী। রূপধর্মী [illegible] দিয়ে নাট্যকার এখানে [illegible] এক শ্রেণীর প্রতি আঘাত এনেছেন। [illegible] অসুবিধা হয় না, সে শ্রেণীভুক্ত [illegible] ধনী আর নির্ধনের সংঘর্ষময় জীবন [illegible] করই না নাটক লেখা [illegible] নির্ধনের জয় আর ধনীর পরাজয় [illegible] অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু কেন ধনীর [illegible] এ কথা আজকেই বা স্পষ্ট করে [illegible] পেরেছেন? হ্যাঁ—শঙ্করদাস বাগচীর "বাঁচতেই হবে" নাটকে সে কথা স্পষ্টস্পষ্টি [illegible] হয়েছে।

[illegible] ভদ্র ছিলেন নাট্য নির্দেশক। [illegible] এবং আরো কয়েকজন শিল্পী ছিলেন [illegible] যাঁরা সকলেই কলেজের, হয় [illegible] অধ্যাপক, নয় কর্মী। মুখ্য [illegible] চরিত্রে দর্শকচিত্ত জয় করেছেন [illegible], কালীপদ চক্রবর্তী, শিখা ভট্টাচার্য, রেণু ঘোষ, দেবব্রত সেনগুপ্ত এবং টুকুন ভট্টাচার্য।

সারকাস শিল্পের সমস্যা

চার-পাঁচ বছর থেকে শুরু করে আশি-পঁচাশি বছর পর্যন্ত সব বয়সের মেয়ে-পুরুষে সারকাসের ক্রীড়া-কৌশল দেখে বিস্মিত ও মুগ্ধ হন—সেই জনপ্রিয় শিল্পটি আজ প্রায় মৃত্যুর মুখোমুখি। অতীতের অনেক নামকরা সারকাসের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেছে আজ। সুতরাং এই শিল্পটিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতা অবশ্য প্রয়োজন।

মুমূর্ষু সারকাস শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়েছেন ইনডিয়ান সারকাস ফেডারেশন। গত ২১ জানুয়ারি গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রী টি পি নারায়নন উপরোক্ত তথ্য জানিয়ে বলেন, ভারতের প্রায় ছটি রাজ্যে সারকাস প্রমোদকর মুক্ত। পশ্চিমবঙ্গেও যাতে তা হয় এই উদ্দেশ্যে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করবেন বলে জানালেন।

এছাড়া শহরের কেন্দ্রস্থলে, ময়দান অঞ্চলে সারকাস প্রদর্শনের জন্য অনুমতি দেওয়ার জন্যও তাঁরা আবেদন জানাবেন। এই সব অঞ্চলে যদি অন্যান্য প্রদর্শনীর অনুমতি দেওয়া যায়, তবে সারকাসের অনুমতিও পাওয়া উচিত বলে তাঁদের ধারণা।

ফেডারেশনের পক্ষ থেকে শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীরাজনও সারকাসের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

'অন্তর' (পরিচালনা অসিত সেন) হিন্দী চিত্রে শর্মিলা

"আলেয়ার আলো" মুক্তি প্রতীক্ষায়

ইউনিট প্রোডাকশনস অব ইণ্ডিয়ার প্রথম নিবেদন "আলেয়ার আলো" ছবিটি বর্তমানে মুক্তির প্রতীক্ষায়। এই ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক মঙ্গল চক্রবর্তী স্বয়ং। গোপেন মল্লিক সংগীত পরিচালক।

"আলেয়ার আলো" ছবিটির বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করেছেন সৌমিত্র চ্যাটার্জি, সাবিত্রী চ্যাটার্জি, অনুপকুমার, সন্ধ্যারানী, কালী ব্যানার্জি, ভানু ব্যানার্জি, মঞ্জু দে, শেখর চ্যাটার্জি, বনানী চৌধুরী, জোৎস্না বিশ্বাস, মৃণাল মুখার্জি, অজিতেশ ব্যানার্জি, সাধনা রায়চৌধুরী, জোৎস্না ব্যানার্জি, অমিয় দাস এবং রাধামোহন ভট্টাচার্য।

আবিরে রাঙানো

অমল দত্তের পরিচালনায় প্রগতি চিত্রমের 'আবিরে রাঙানো' ছবির একটানা আট দিনের শুটিং ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে সম্প্রতি সম্পন্ন হয়েছে। চিত্রনাট্য সংলাপ রচনা পরিচালক অমল দত্তের। কয়েকটি বিশেষ চরিত্রে নতুন শিল্পীর আয়োজন। সংগীত-পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন সত্যদেব চট্টোপাধ্যায়।

[illegible]নাথ চিত্রমন্দিরের "রাজকুমারী" (পরিচালনা : সলিল সেন) ছবিতে দীপ্তি রায় উত্তমকুমার ও অসিতবরণ

আশু মৈত্র প্রতীক্ষিত "প্রেম পূজারী" ছবিতে দেব আনন্দ ও ওয়াহীদা রেহমান

বেঙ্গল মোশান পিকচার ডায়েরী—১৯৭০

শ্রীবাগীশ্বর ঝা সম্পাদিত ১৯৭০ সালের "বেঙ্গল মোশান পিকচার ডায়েরী অ্যানড জেনারেল ইনফরমেশান" চলচ্চিত্র সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় নানাবিধ তথ্যে পরিপূর্ণ। চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম-ঠিকানা ছাড়াও চলচ্চিত্র উন্নয়নে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সরকারী সহায়তা, দাদাসাহেব ফালকে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এবং পুনায় ফিল্ম ইনসটিটিউট সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এবং ভারতের চলচ্চিত্র শিল্প সম্পর্কে বহু সংবাদ এই ডায়েরীতে রয়েছে। সুরুচিপূর্ণ প্রচ্ছদ, সুন্দর ও প্রায়-নির্ভুল ছাপা ডায়েরীটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁদের কাছে শ্রীঝা সম্পাদিত এই ডায়েরীটি নিঃসন্দেহে অত্যাবশ্যকীয়। দাম পনের টাকা মাত্র। এটির প্রকাশক : শট পাবলিকেশনস। ৩বি, ম্যাডান স্ট্রীট, কলকাতা-১৩।

বৈতানিকের রবীন্দ্র-নাট্যোৎসব

রবীন্দ্রনাথের শততম জন্মবার্ষিকীতে বৈতানিকের শিল্পীগোষ্ঠী সর্বপ্রথম তাঁদের রবীন্দ্র নাট্যোৎসবের শুভ সূচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নাটক প্রযোজনায় কিছু বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য ও পরিবেশনায় কিছু স্বাদ বদলের প্রচেষ্টা সাহস ও নিষ্ঠার সঙ্গে এঁরা প্রথমাবধি করে এসেছেন। এঁরা বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের অসামান্য নাট্যরসসমৃদ্ধ ছোটগল্প ও কবিতাগুলি নিয়ে নাটকরূপে তাঁদের প্রয়োগ পরীক্ষায় উৎসাহী। আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারী থেকে তাঁদের চারদিনব্যাপী তৃতীয়-রবীন্দ্র-নাট্যোৎসব শুরু হবে রবীন্দ্রসদন প্রেক্ষাগৃহে।

এবার নাট্যোৎসবের প্রধান আকর্ষণ "শকুন্তলা" নৃত্যনাট্য। রবীন্দ্রনাথের কথায় ও গানে শকুন্তলার পূর্বমিলন ও উত্তরমিলন সম্পূর্ণ নূতন রীতির নৃত্যনাট্যের মাধ্যমে পরিবেশিত হবে। "বাল্মীকি প্রতিভা"র অতি পরিচিত অভ্যস্ত অভিনয় পদ্ধতির পরিবর্তে 'ব্যালে'র ঢঙ-এ পরিবেশিত হবে। গল্পগুচ্ছের অনবদ্য গল্প "ক্ষুধিত পাষাণ" মঞ্চস্থ হবে পূর্ণাঙ্গ নাটকরূপে এবং পূর্ণাঙ্গ নৃত্যনাট্যের আকারে "সামান্য ক্ষতি" কবিতাটি মঞ্চস্থ হবে। প্রায় শতাধিক কুশলী শিল্পী এই নাট্যোৎসবে যোগ করেছেন।

"নল দময়ন্তী"র মুক্তি আসন্ন

জে এস প্রোডাকশন্সের "নল দময়ন্তী"র মুক্তির বিলম্ব নাই। মহাভারতের অমর উপাখ্যানটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন মণি বর্মা। পরিচালনা করেছেন গোপালকৃষ্ণ রায়। কালীপদ সেন ছবিটির সংগীত পরিচালক।

অসীমকুমার ও সাবিত্রী চ্যাটার্জি ছবিটির নায়ক-নায়িকা। অন্যান্য চরিত্রে রয়েছেন রবীন ব্যানার্জি, জহর রায়, কালীপদ চক্রবর্তী, গঙ্গাপদ বসু, লীলাবতী দেবী, দীপিকা দাস, মণি শ্রীমানী, জয়নারায়ণ মুখার্জি, গীতা দে, পদ্মা দেবী, জ্যোৎস্না ব্যানার্জি প্রভৃতি।

"দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন"

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের জন্মশতবর্ষে মিত্র প্রোডাকশন্স উপহার দেবেন "দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন" ছবিটি। স্বাধীনতা-সংগ্রামের মহান নায়ক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সম্পূর্ণ জীবনালেখ্যটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। পরিচালনা করছেন অর্ধেন্দু মুখার্জি। সুরসৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছেন হেমন্তকুমার মুখার্জি।

বিভিন্ন চরিত্রচিত্রণে রয়েছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন : অনিল চ্যাটার্জি, বাসন্তী দেবী : লিলি চক্রবর্তী, ভুবনমোহন দাশ : হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশবন্ধুর জননী নিস্তারিণী দেবী : চিত্রিতা মণ্ডল, বিপ্লবী অরবিন্দ : নির্মল চ্যাটার্জি, বিপিন পাল : দীপক মুখার্জি, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় : রাধামোহন ভট্টাচার্য, মহাত্মা গান্ধী : ভোলা দত্ত, কুমারকৃষ্ণ মিত্র : জীবেন বসু।

নাট্যোৎসব

কলকাতার বিশিষ্ট নাট্যগোষ্ঠী 'থিয়েটার ওঅর্কশপ' একটি নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছেন। নাট্যোৎসবটি অনুষ্ঠিত হবে দমদমে ৬ মার্চ থেকে ৮ মার্চ। তিন দিনে থিয়েটার ওঅর্কশপের মঞ্চসফল তিনটি পূর্ণাঙ্গ প্রযোজনা 'ছায়ায় আলোয়', 'হাঁড়ি ফাটিবে' ও 'লালিতা' এবং একাঙ্ক 'ভিয়েতনাম' মঞ্চস্থ হবে।

একটি অধ্যাত্মরসমণ্ডিত নৃত্যানুষ্ঠান

পরমাত্মার প্রতি [illegible] অভিসার, কৃষ্ণ-মিলনের জন্য [illegible] আকুলতা, পরমব্রহ্মের সঙ্গে জীবব্রহ্মের ঊর্ধ্বচারী [illegible] এই [illegible] মানবাত্মার সেই সম্পর্ককে [illegible] নব আঙ্গিকে চৈতন্যের ক্রমোন্মীলন [illegible] ঊর্ধ্বাভিমুখী ক্রমবিকাশ, এক স্তর থেকে আর এক স্তরে উত্তরণের দ্যুতির [illegible] এই সুগভীর জীবনবোধকে [illegible] উচিত জীবনসত্যকে ভাবসমৃদ্ধ [illegible] ব্যঞ্জনায় সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুললেন রোশন ঘোষ, গত ২৫শে জানুয়ারী দক্ষিণ কলিকাতার একটি প্রেক্ষাগৃহে। রোশন ঘোষ ভরত-নাট্যমের একজন সার্থক শিল্পী। ইতিমধ্যে য়ুরোপের [illegible] অঞ্চলে নৃত্য পরিবেশন করে সুনাম অর্জন করেছেন। 'পিলগ্রিমেজ অব দি সোল'—এই নামে পরিচিত উল্লিখিত নৃত্যানুষ্ঠানটি শ্রীঅরবিন্দের দিব্যজীবনের তত্ত্বরসে অভিষিক্ত এবং পণ্ডিচেরীর আশ্রমের শ্রীমায়ের অনুপ্রেরণায় পরিকল্পিত। সাতটি দৃশ্যে চেতনার ক্রমবিকাশের স্তর-পারম্পর্যের উপস্থাপনায় গভীর ভাবানুধ্যান এবং কল্পনাশক্তির পরিচয় আছে। মীরার ভজনের নির্বাচিত কলিগুলিও অভীপ্সিত ভাব-ব্যঞ্জনার সহায়তা করেছে। রোশন ঘোষের দু' ঘণ্টাব্যাপী অবিরাম ক্লান্তিহীন নৃত্য-পরিবেশনায় তাঁর সুন্দর ভাবাভিব্যক্তির মুহূর্তগুলি মনে গভীর রেখাপাত করে। অনুষ্ঠানটিকে অধিকতর ব্যঞ্জনাবহ এবং সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলেছে তাপস সেনের সুপরিকল্পিত আলোকসম্পাত। স্বল্পায়তন মঞ্চে তাঁর আলোক-নিয়ন্ত্রণের কৌশলটি সবিশেষ লক্ষণীয়।

—আনন্দবর্ধন

অরণ্যদেব ✡ লী ফক

এই নিন আপনার জেট-প্লেন। এ-রকম প্লেন আরও অনেক দেব। জলের দরে দেব।
তা দরদাম এবারে ঠিক করে নিলেই তো হয়।

পাজী রাজা চার্ল —
রাজা চার্ল, এ-রকম প্লেন আরও কুড়িখানা দেব। সব মিলিয়ে দাম চাইছি মাত্র ৩০ লাখ ডলার। আসল দামের তিরিশ ভাগের এক ভাগ। রাজী?
নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!

কিন্তু কথা হচ্ছে, এই প্লেনগুলি নিয়ে আমি করব কী?
প্লেনগুলো তুমি যেভাবেই জোগাড় করো না কেন, এখানে তারা অবশ্য নিরাপদেই থাকবে ----
??!!

না, না, চোরাই মাল নয়।
বাজে কথা বাদ দাও পার্স। আমি বরং রটিয়ে দেব যে, অজ্ঞাত কিছু লোক বে-আইনীভাবে আমার রাজ্যে কিছু প্লেন এনে নামিয়েছে।

এবং সেই কথা বলে প্লেন-কোম্পানির কর্তাদের কাছ থেকে খেসারত বাবদে কিছু টাকাও আমি আদায় করতে পারব। কী বলো?
টাকাটার ভাগ যদি আমরা পাই তো মন্দ কী!

পূর্ব-পুরুষেরা ছিলেন লুটেরা।
রাজী!
কী, রাজী?

তাহলে যাও, যত পারো প্লেন লুট করে আনো!
চললুম!
ভট-ভট

ওদিকে লুটেরাদের পাহাড় থেকে --- অরণ্যদেব ---
"সমুদ্রের উপরে আকাশ থেকে আবার প্লেন লুট ---"
নাঃ, এবারে একটা বিহিত করা দরকার!

চন্ডীগড় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের সিন্ধান্ত ঘোষণা আলোচ্য সপ্তাহের বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা। পাঞ্জাবকে চন্ডীগড় দেওয়া হবেঃ—কেন্দ্রীয় সরকার ৩০ জানুয়ারি নয়াদিল্লিতে একটি ইস্তাহার প্রচার করে এই সিন্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। চন্ডীগড়ের অপর দাবিদার হরিয়ানা ক্ষতিপূরণস্বরূপ পাবে পাঞ্জাবের ফিরোজপুর, ফাজিলকা তহশীলের হিন্দীভাষী এলাকা এবং চন্ডীগড়ের সঙ্গে সম্প্রতি যুক্ত এলাকার প্রায় ৬টি গ্রাম। তা ছাড়া হরিয়ানা নিজের নতুন রাজধানী গড়ে তোলার জন্য ২০ কোটি টাকা পাবে। ১০ কোটি টাকা সাহায্য হিসাবে এবং ১০ কোটি টাকা ঋণ হিসাবে পাবে। যতদিন না হরিয়ানা তার নিজের রাজধানী তৈরি করে নিতে পারে ততদিন চন্ডীগড় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসাবে থাকবে এবং ততদিন এখনকার মত হরিয়ানার রাজধানীও থাকবে সেখানে। ১৯৬৬ সালে পাঞ্জাব রাজ্য ভেঙে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা এই দুটি রাজ্যের সৃষ্টি হয়। চন্ডীগড়কে পাঞ্জাবের রাজধানী করার দাবিতে সন্ত ফতে সিং যে অনশন সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেছিলেন, কেন্দ্রের উপরোক্ত ঘোষণার পর তিনি তা প্রত্যাহার করেন। কিন্তু হরিয়ানা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। রাজ্যের আট-টিরও বেশী জায়গায় সেনাবাহিনী তলব করা হয়। উচ্ছৃঙ্খল জনতা বেপরোয়া অগ্নিসংযোগ, হাঙ্গামা ও লুঠ-তরাজ চালায়। পুলিসের গুলিতে এ পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা ৮। আহত হয়েছে বহু লোক।

'সম্প্রদায়ের' বিরুদ্ধে সংগ্রামকে মারকসবাদীরা দুর্বল করে দিচ্ছেন। তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকারে সংকট সৃষ্টি করছেন। পশ্চিমবঙ্গের কুটীরশিল্পমন্ত্রী শ্রীশম্ভু ঘোষ এবং বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীভক্তিভূষণ মণ্ডল (দুজনেই ফরওয়ার্ড ব্লক) আজ এই মর্মে অভিযোগ করেন।

১ ফেব্রুয়ারি—আজ জনসঙ্ঘ পাঞ্জাব সরকারের নিকট এইমর্মে এক চরমপত্র দেন যে, চন্ডীগড় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের সিন্ধান্ত ১০ ফেব্রুয়ারির পূর্বে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করতে হবে। এর ফলে পাঞ্জাবের অকালি-জনসঙ্ঘ কোয়ালিশন সরকারে ফাটল দেখা দিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের নব কংগ্রেস মনে করেন সরকারী ক্ষমতা কুক্ষিগত করে সি পি আই (এম) সংবিধান বিরোধী কাজ করে যেভাবে সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছে তাতে যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রহসনে পরিণত হয়েছে।

দেশী সংবাদ

২৭ জানুয়ারি—পশ্চিম বাংলার উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু এবং সি পি এম-এর সেক্রেটারি জেনারেল শ্রী পি সুন্দরায়া গুরুত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনার জন্য আজ বিমানযোগে রাজধানীতে আসেন। শ্রীমতী গান্ধী, শ্রীজগজীবন রাম, শ্রীওয়াই বি চবন, শ্রীদীনেশ সিং প্রমুখ ক্ষমতাসীন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সি পি এম নেতৃদ্বয়ের রুদ্ধদ্বার কক্ষে কয়েকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

গতকাল মধ্যাহ্নের কিছু পর কলকাতা ময়দানে রেস-কোরসে এক উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিস অন্তত ৭০ রাউনড কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে। ক্ষিপ্ত জনতা রেস-কোরসের চেয়ার, টেবিলে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং হাতের কাছে যা পায় ধ্বংস করে।

২৮ জানুয়ারি—যুক্তফ্রন্ট সরকার এখন যেভাবে চলছে "এইভাবেই চলবে" বাংলা কংগ্রেস ৩১ জানুয়ারির পর আর এই সরকারে থাকতে রাজী নন। বুধবার গভীর রাত পর্যন্ত দলের সম্পাদকমণ্ডলী মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে বসে রাজ্যের সর্বশেষ পরিস্থিতি আলোচনা করে আবার মুখ্যমন্ত্রীর উপর চূড়ান্ত সিন্ধান্ত গ্রহণের সকল ক্ষমতা দিয়েছেন।

আজ সকালে পশ্চিম দিনাজপুরের খাড়ি-গোবিন্দপুর গ্রামে পুলিস ও জনতার মধ্যে এক খণ্ডযুদ্ধ হয়। পুলিস প্রায় ২০ রাউনড গুলি করে। উভয় পক্ষের প্রায় ৪০ জন আহত হয়। প্রকাশ : ৩০ জন সশস্ত্র পুলিস কনসটেবল ওই গ্রামে কিছু লুটের মাল উদ্ধার করতে গেলে এবং ওই সম্পর্কে কয়েকজনকে গ্রেফতার করলে প্রায় দুহাজার লোক তীর-ধনুক, বর্শা ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে পুলিসকে আক্রমণ করে এবং পুলিসের ৬টি বন্দুক ও ধৃত ব্যক্তিদের ছিনিয়ে নেয়।

২৯ জানুয়ারি—পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টের বর্তমান পরিস্থিতিঃ—বাংলা কংগ্রেস আর একদিনও অপেক্ষা করতে রাজি নন। ফ্রন্টের কয়েকটি শরিক দল মাসচুক্তিভাবে বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে একমত হলেও তাঁরাই সি পি এম-এর সঙ্গে 'শো-ডাউনে' রাজি নন এবং সি পি এম চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছে সঙ্গে সঙ্গে পর পর তিনদিন রাজ্যব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট করার জন্য প্রস্তুত।

কেরল বিধানসভায় আজ এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে। সি পি এম সদস্যদের মারমুখী আচরণ, তীব্র প্রতিবাদ ও সভার কাজকর্মে বাধা সৃষ্টির ফলে অধ্যক্ষ বারবার অধিবেশন মুলতবি রাখতে বাধ্য হন। অধ্যক্ষ শ্রীদামোদরণ পোট্টি আজ পাঁচজন সি পি এম সদস্যকে বর্তমান অধিবেশনের শেষদিন পর্যন্ত সাসপেনড করেছেন।

৩০ জানুয়ারি—দীর্ঘ প্রায় পাঁচ ঘণ্টা আলোচনার পর আজ রাত্রে সি পি আই অফিসে যুক্তফ্রন্টের বৈঠক ভেঙে যায়। শ্রীজ্যোতি বসু উত্তেজিতভাবে বেরিয়ে এলেন। তারপরই সুশীল ধাড়া। আরও বেশী উত্তেজিত। উচ্চ-কণ্ঠে বলতে বলতে বেরোচ্ছেন : ঠিক আছে এবার থেকে আমরা যা ভাল মনে করি তাই করব। আমরা কারো চোখ রাঙানিকে ভয় করি না। আমরা পরিষ্কার বলছি, কিছুই হলো না আজ সব আলোচনা মাটি হয়ে গেল। শ্রীঅজয় মুখার্জি বেরিয়ে এলেন তারপর। সুশীল-বাবুর কথা শুনে শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন : থাক সুশীল, এখন ওসব কথা থাক।

৩১ জানুয়ারি—মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছেন যে, শ্রীবসু গোপন সরকারী তথ্য ফাঁস করে দিয়ে মন্ত্রীগুপ্তির শপথ ও সংশ্লিষ্ট আইন ভঙ্গ করেছেন। উপমুখ্যমন্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রী 'হুঁশিয়ার' করে দিয়ে বলেছেন, আপনার আচরণের আইনগত তাৎপর্য খতিয়ে দেখে সে সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী-রূপে 'উপযুক্ত ব্যবস্থা' নেওয়ার ক্ষমতা এখন আমি হাতে রেখে দিচ্ছি। সরকারী তথ্য ফাঁসের আইনগত পরিণতি থেকে শ্রীবসু রেহাই পেতে পারেন না।

বিদেশী সংবাদ

২৭ জানুয়ারি—প্রেসিডেনট নিকসন বলেছেন, পশ্চিম এশিয়ায় সামরিক ভারসাম্য ইজরায়েলের প্রতিকূলে হতে চলেছে দেখা গেলে, মার্কিন সরকার তাকে আরও অস্ত্র দেবে। তিনি বলেন ইজরায়েলের ন্যায় একটি মিত্র রাষ্ট্র যদি তাদের আত্মরক্ষার জন্য আরও অস্ত্রের প্রয়োজন বোধ করে, তবে আমরা নিশ্চয়ই এগিয়ে যাব।

২৮ জানুয়ারি—প্রাগ-এর এক সংবাদে প্রকাশ, চেকোস্লোভাক প্রধানমন্ত্রী মিঃ চেরনিক সামরিক সরকারের নেতৃত্ব থেকে পদত্যাগ করেছেন। দলের প্রশাসনিক প্রেসিডিয়ামের সভাপদও তিনি ত্যাগ করেছেন বলে জানা গিয়েছে।

২৯ জানুয়ারি—ইসলামাবাদে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফেয়ারল্যানড যোশেফ আজ এখানে ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানকে পুনরায় অস্ত্র বিক্রয় সম্পর্কে যে নিষেধাজ্ঞা আছে তা প্রত্যাহারের সম্বন্ধে তিনি তাঁর অভিমতের কথা নিক্সন সরকারকে জানিয়ে দিয়েছেন।

৩০ জানুয়ারি—রেডিও পাকিস্তান আজ জানিয়েছে যে, আমেরিকা ও পাকিস্তানের মধ্যে শীঘ্রই একটা ঋণ-চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। এই চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্তান কি পরিমাণ অর্থ পাবে তা বলা হয়নি। তবে তা ৯ কোটি ১০ লক্ষ ডলারের কম হবে না। এ ছাড়া পাকিস্তান মোট ১০ লক্ষ টন গম চাইবে। এর মধ্যে ২ লক্ষ টন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য।

৩১ জানুয়ারি—প্রেসিডেনট নিকসন গতকাল এক টেলিভিসন বৈঠকে বলেন যে, চীনের কাছ থেকে পরমাণু আক্রমণের সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকার প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থায় এমন সব ক্ষেপণাস্ত্র যথেষ্ট পরিমাণে রাখা হবে যাতে পরমাণু অস্ত্রের আক্রমণের মোকাবিলা করা সহজ হয়। আমেরিকা অবশ্য তার নিজের দেশ ও সংলগ্ন আরও কয়েকটি দেশের নিরাপত্তার কথাও ভাবছেন।

১ ফেব্রুয়ারি—সোভিয়েত সরকারী সংবাদপত্র ইসভেস্তিয়া সোভিয়েত নাগরিকদের পরামর্শ দিয়েছেন, সামাজিক প্রীতি-ভালবাসা দেখাতে গিয়ে আপাতত চুমু খাওয়া বন্ধ রাখুন। সোভিয়েত ইউনিয়নে ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ কমানোর জন্যই এই উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

আপনার পরিবারের সবাইকে সুস্থ ও সুখী রাখবার জন্য
ওদের খেতে দিন

ফেরাডল সুস্বাদু ভিটামিনপূর্ণ পুষ্টিকর টনিক

সযত্নে পরিকল্পিত আহারেও একান্ত প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজ পদার্থগুলির ঘাটতি থাকতে পারে। ফেরাডল আদর্শ খাদ্য-সম্পুরক যাতে যাবতীয় একান্ত প্রয়োজনীয় ভিটামিনগুলি ও আয়রন রয়েছে সুস্বাদু শক্তিসঞ্চারক মল্ট বেস্-এ। ফেরাডল ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, শরীরে উদ্যম এনে দেয়, আপনার পরিবারের সবাইকে বাড়তি শক্তি এনে দেয় এবং সারাবছর সুস্থ রাখে। দুধের সঙ্গে অথবা টোস্ট বা রুটির ওপর মাখিয়ে ফেরাডল দেবেন—ওর মল্টের চমৎকার স্বাদ শিশুদের অতি প্রিয়। আপনার পরিবারের সবাইকে নিয়মিতভাবে ফেরাডল খেতে দিন—সুস্বাদু ভিটামিন-পুষ্টিকর টনিক।

পার্ক-ডেভিস উৎপাদন

ফেরাডল সারা পরিবারের স্বাস্থ্যের জন্য

AISONS-7269-BEN

প্রচ্ছদ : শ্রীপ্রণবেশ মাইতি

অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের
সমাবেশ...
হাকোবা
এমব্রয়ডার্ড কাপড়
RATAN BATRA/FC BEN.328

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৭ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১৬
শনিবার ২ ফাল্গুন ১৩৭৬

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

*

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

*

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৪৫৪১

*

চাঁদার হার

কলিকাতায়

বার্ষিক	—	২৫.০০
ষাণ্মাসিক	—	১২.৫০
ত্রৈমাসিক	—	৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	—	৩০.০০
ষাণ্মাসিক "	—	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক "	—	৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	—	৩০.০০
ষাণ্মাসিক "	—	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক "	—	৮.০০

ভারতের বাইরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	—	৫২.০০
ষাণ্মাসিক "	—	২৬.০০
ত্রৈমাসিক "	—	১৩.০০

অন্যান্য অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	—	৩৯.০০
ষাণ্মাসিক	—	১৯.৫০
ত্রৈমাসিক	—	১০.০০

দাম ৫০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাসুল ৭ পয়সা

DESH

Saturday, 14th Feb. 1970

শিক্ষায় রাজনীতি

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সম্প্রতি এই রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার ব্যাপার নিয়ে শিক্ষা দপ্তরের কার্যকলাপের সমালোচনা করা হয়েছে। বিধানসভায় প্রসঙ্গটি উঠেছে যে তাতে একরকম ভালই হয়েছে; না উঠলেও, আমরা জানি, ইদানীং শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেকেই বর্তমান শিক্ষা দপ্তরের মতিগতিতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। একটা মূল কথা সমালোচকরা সকলেই স্বীকার করেন এবং বলেন যে, দলীয় রাজনীতির প্রভাব-বৃদ্ধিই শিক্ষা দপ্তরের লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। এই অভিযোগ কতটা সত্য তা নিয়ে আমরা বিতর্কে নামতে চাই না, কিন্তু অভিযোগ যে মিথ্যা তাও আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

কোনো কোনো সত্য স্বীকার করে নেওয়া ভাল। একালের ছাত্রসমাজ তেমন নিশ্চয় নয়, যারা মনে করবে ছাত্রজীবনে অধ্যয়নই একমাত্র কর্ম। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ বলে নয়, ভারতের সর্বত্রই একই অবস্থা। আর ভারতই বা কেন, পৃথিবীর সকল দেশেই ছাত্রসমাজের চেহারা পালটে যাচ্ছে। কিন্তু ছাত্রসমাজের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকসমাজের চরিত্রও যে বদলে যাচ্ছে সেটাও চিন্তার কথা। আমাদের দেশে আবার দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রসমাজকে প্রত্যক্ষ রাজনীতির অংশীদার করে ফেলা হয়েছে। আর হালে এদেশীয় রাজনৈতিক দলগুলি ও নেতারা ক্রমশই ছাত্রসমাজকে যে যতটা পারছেন দলভুক্ত করার চেষ্টা করছেন। পরিণামে এই দাঁড়িয়েছে যে, সুস্থ রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা গড়ে তোলার বদলে ছাত্ররা কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ছে, আর দলীয় নেতার নির্দেশমতন কাজকর্ম করছে। রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া বা রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন হওয়া এক কথা আর দলীয় রাজনীতির শিকার হয়ে তরুণ বয়স থেকে সংকীর্ণ, একদেশদর্শী রাজনীতি করে বেড়ানো অন্য কথা। দুঃখের বিষয়, আমরা এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছি যে, আজ আর ছাত্রসমাজকে দলীয় রাজনীতির বাইরে টেনে আনার উপায় নেই।

ছাত্ররা রাজনীতির শিকার হয়ে পড়েছে বলেই আজ অন্য একটি প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়েছে। প্রশ্নটি হল, আমাদের শিক্ষা পরিচালনাতেও কি এই রাজনীতি থেকে যাবে? যদি তা থেকে যায়, বা থাকতে দেওয়া হয় তা হলে যখন যে দল ক্ষমতায় আসবেন, নিজের দলীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি ও বিস্তার করার জন্যে সেই দল শিক্ষা পরিচালনায় নিজের স্বার্থ সিদ্ধির সুযোগ খুঁজবেন। আমরা সবাই জানি, সরকারী ক্ষমতায় থাকলে স্বার্থসিদ্ধি কতটা সহজ।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসত্যপ্রিয় রায় মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য। এটা তাঁর রাজনৈতিক পরিচয়। অন্য একটি পরিচয়ও তাঁর আছে : তিনি দীর্ঘদিন শিক্ষকতার কাজ করেছেন, এবং শিক্ষা বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অল্প নয়। তা ছাড়া রায়-মশাই এ বি টি এ সংগঠনের মাথা ছিলেন। এ হেন শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে যদি অভিযোগ আসে যে, তিনি বা তাঁর দপ্তর শিক্ষাকে দলের কুক্ষিগত করার চেষ্টা করছেন তবে সে অভিযোগ বেদনাদায়ক। অভিযোগগুলিও খুব সাধারণ নয়, যেমন বলা হয়েছে যে, স্কুলে ম্যানেজিং কমিটি বাতিল করে অ্যাডমিনিস্ট্রেটার নিয়োগের বাড়াবাড়ি। এ-বাবৎ নাকি দু'শো আটত্রিশটি স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি বাতিল করে প্রশাসক নিয়োগ করা হয়েছে, এবং এই বাতিল কাজটি সারার সময় প্রচলিত আইন মানা হয় নি। উপরন্তু এমন অনেককে প্রশাসক পদে বসানো হয়েছে যাঁরা ওই পদের যোগ্যই নন এবং এক্ষেত্রে শিক্ষামন্ত্রী দলীয় স্বার্থের কথা বিবেচনা করেছেন। শ্রীযুক্ত রায় অবশ্য তাঁর জবাবে এ অভিযোগ স্বীকার করে নেন নি। নেবার কথাও নয়। মজার কথা, জনৈক কংগ্রেস সদস্য এমন দাবিও করেছেন যে, এই রাজ্যে কংগ্রেস যে চৌত্রিশ হাজার একশো পঞ্চাশটি স্কুল করে গিয়েছে—বর্তমান ফ্রন্ট সরকার তার বেশি একটিও স্কুল করতে পারেনি। এই দাবি যদি সত্য হয়, তবে বলতে হবে শিক্ষা দপ্তর গত ন' মাসে শুধু ম্যানেজিং কমিটি বাতিল করা ছাড়া অন্য দিকে চোখ ফেরাতেই সময় পেলেন না।

শোনা যাচ্ছে, আজকাল স্কুলে স্কুলে ম্যানেজিং কমিটি নির্বাচনের ব্যাপারে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট কর্মীরা খুবই তৎপর হয়ে উঠেছেন। তাঁদের নির্বাচিত অভিভাবককে তারা স্কুলের পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে পেতে চান। পাড়ার শিক্ষিত শিষ্ট, যোগ্য ব্যক্তি অপেক্ষা এঁদের ঝোঁক নাকি দলীয় সদস্য ও কর্মীদের ওপর। এর অর্থ কি এই যে, অতঃপর প্রত্যেকটি স্কুল মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির প্রত্যক্ষ পরিচালনায় চালানো হবে?

আজাদের প্রোগ্রেসিভ প্রধানমন্ত্রীর নেক নজরে পড়ার জন্য সি পি আই এবং সি পি এম-এর রেষারেষিটা সম্প্রতি কিঞ্চিৎ প্রকট হয়ে পড়েছে। কিছুদিন আগে সি পি এম নেতা কমরেড জ্যোতি বসু এবং কমরেড সুন্দরায়ার সঙ্গে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর নিভৃত আলাপন সি পি আই-এর মনে কিঞ্চিৎ মান সঞ্চার করেছে। এবং মানিনী তাঁর স্বভাবধর্ম অনুসারে কালান্তরে (২৯ জানুয়ারি, সম্পাদকীয় দ্রষ্টব্য) সি পি এম-এর এই বেহায়াপনার প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করেছেন। এটা আবার স্বাভাবিক কারণেই নব অনুরাগিণী সি পি এম-এর বিশেষ পছন্দ হয়নি। দেশ-হিতৈষী (৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০) পালটা জবাবে "বলিহারি কালান্তর" শীর্ষক প্রতিবেদনে সখেদে মন্তব্য করেছেন: ইন্দিরা গান্ধীকে যারা মোড়ল ঠাউরেছেন, স্বভাবতই তাঁরা ইন্দিরা সকাশে অপর কাউকে দেখলেই আঁতকে ওঠেন, ইন্দিরার কাছে যাবার উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন। সেই আঁতকে ওঠারই অভিব্যক্তি হল "কালান্তর"-এর ২৯শে জানুয়ারির সম্পাদকীয়—"বলিহারি"।

পাঠক, এখানে একটা বিষয় ভাল করে লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই যে "কালান্তর" এবং "দেশহিতৈষী" উভয়েই মারকসবাদে আদ্যন্ত নিমজ্জিত হওয়া সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রীর কাছে অভিসারের ঘটনা সম্পর্কে টিপ্পনী কাটতে গিয়ে বা তার প্রত্যুত্তরে কেউই কোনও প্রকার মারকসীয় লবজ্ ব্যবহার করেননি। শুধু বলেছেন, "বলিহারি"। এতদ্দ্বারা নিঃসন্দেহে এটা বোঝা যাচ্ছে, অভিসার, মান ইত্যাদি ক্রিয়াগুলি বা ভাবগুলি মারকসীয় দ্বন্দ্বমার্গের আওতা বহির্ভূত ব্যাপার। সর্বজ্বরহর গজসিংহ বটিকারূপে ডাইলেকটিকস সমাজদেহের যে ব্যাধিরই নিদান হোক না কেন, অনুরাগরূপে রগরগে ব্যাধিটির—তা সে ব্যক্তিরই হোক কি পারটিরই হোক—নিদান সে নয়। আর মান? কে না জানে তা অনুরাগেরই উপসর্গ। অহো। ভাবতেই শরীর রোমাঞ্চিত হয়। "মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্!" অহো জয়দেব! 'বচন অমিয় বিনে যে নাহি জীয়ে। মান-কুলিশ দরশায়সি কিয়ে॥" বলিহারি গোবিন্দ দাস! এই হচ্ছে "বলিহারি"র যথার্থ প্রয়োগ।

অতএব বোঝা গেল সি পি আই এবং সি পি এম অভিসারের যে পন্থা ধরেছেন তা আদৌ দ্বন্দ্বমার্গের নয়, নিছক ভক্তি-মার্গের। তাই "কালান্তর" আর "দেশহিতৈষী" "বলিহারি"—রসাশ্রিত এই শব্দটিই শুধু উদ্গার করেছেন। অর্থাৎ অনুরাগের রঙ লেগে ও'রা উভয়েই কিঞ্চিৎ রসস্থ হয়েছেন।

"বলিহারি" শব্দের অর্থ অভিধানকার হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় করেছেন, "প্রেম-ভক্তি প্রভৃতি হেতু আত্মোৎসর্গ।" প্রয়োগের উদাহরণটাও শুনুন, "যেতুল ব্রজবধূ-বৃন্দ বিমোহিত বোলত বলি বলিহারি।" আবার

সেই গোবিন্দদাস। এবং ঘুরে ফিরে সেই বৃন্দাবন লীলা। এবং পাত্র সেই কৃষ্ণ, পাত্রী রাধা এবং উভয়ের মিলনে সেই শাশ্বত বাধা, ননদিনী কুটিলা।

এইবার সুধী পাঠক ও রসময়ী পাঠিকে, ১৯৭০ সালে সংঘটিত এই রাজনৈতিক বৃন্দাবন লীলা প্রত্যক্ষ করে ধন্য হোন। কৃষ্ণ প্রধানমন্ত্রী, রাধা সি পি এম এবং ননদিনী সি পি আই। বোলত বলি বলিহারি।

অনুগ্রহ করে সকলে এবার আসুন, আমরা সকলে মিলে এই মান অভিমানের পালাটি একখানি সঙ্গীতসমৃদ্ধ টেকনি-কালার সিনেমা দেখার মন দিয়ে দেখি। দেখা যাক ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়ায়। ধরা যাক পালার নাম "প্রভাস মিলন"।

সি পি এম নেতা কমরেড জ্যোতি বসু পারটির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রভাস, এখানে দিল্লিতে, যাত্রা করেছেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের আশায়। সঙ্গে কমরেড সুন্দরায়া।

নেপথ্য সঙ্গীত

যজ্ঞ বার্তা পেয়ে যাত্রা করিলেন রাই।
সখীগণ সঙ্গে চলে সহিত বড়াই॥

যাত্রা বিবরণী

শ্রীমতী যাত্রা করতে উদ্যত। মনে মনে বললেন, এই তো যাত্রা করলাম আমি। হে গোবিন্দ, দাসীকে যেন দেখা দিও। গোবিন্দের দর্শন মানসে শ্রীমতী এই বলে যাত্রা করছেন, এমন সময় কুটিলা এসে বাধা দিতে "কোথা যাস" বলে।

নেপথ্য সঙ্গীত

কুটিলা কহে কুপিয়ে রাখালে মন সঁপিয়ে
চিরকাল কলঙ্ক গেল না।

রাধা : করজোড়ে (ক্রোড়)

ননদিনী, আমায় আর বাধা দিও না।
বাধা মানবে না গো
হা যা যা ননদী বাধা
মানবে না গো—

কুটিলা : কাঁদতে কাঁদতে (ক্রোড়)

একবার ফিরে দেখ গো দাদা
কুলে কলঙ্ক দিল যে রাধা
ওগো দাদা তোমার রাধা
আমার বাধা মানছে না গো-ও-ও-ও

নেপথ্য সঙ্গীত

ক্রোধেতে আয়ান হয়ে কম্পমান
কহে কমলিনী কাছে,
নাহি মেনে বাধা কোথা যাও রাধা
মনে কি বাসনা আছে?

[টীকা : এখানে আয়ান অর্থে মারকসবাদী জনগণ]

নিজ পতি ত্যজি পর পতি ভজি
মজিলি রাখাল সনে
এই ছিল রাধে মনে-এ-এ।

রাধা : করজোড়ে

সে যে তোমার পতি আমার পতি
পর পতি বোলো না হে—
জ্ঞান নয়ন নাহি দিলে
তোমার পাপ নয়নে চিনবে কেন?

দেশহিতৈষী : ৬ ফেব্রুয়ারি

..."সুন্দরায়া-জ্যোতি বসুর ইন্দিরা-সাক্ষাৎকে (জ্ঞান নয়ন নাহি দিলে) অন্য কোনো দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করাই সম্ভব নয়।"

“দেশে রাজনীতির মানের অবনতিতে ইন্দিরাজীর গভীর ক্ষোভ”—সাত সকালে কলকাতার একটা খবর কাগজে এই হেডিং দেখেই আমার হাসি পেল। শ্রীমতী গান্ধী নাকি আরামবাগের এক জনসভায় দুঃখ করে বলেছেন : আজকাল অনেক লোক রাজনীতির মানকে নীচে নামাবার চেষ্টা করছেন। ব্যক্তিগত গালি গালাজ, অন্যায় আক্রমণ রাজনীতিকে কলুষিত করছে। এটা অন্যায়।...

এই পর্যন্ত পড়েই আমি বিস্ময়ে হতবাক! হঠাৎ হল কী ভদ্রমহিলার? এমন আকস্মিকভাবে রাজনীতির মান রক্ষার জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন কেন? সাম্প্রতিক কালে ভারতের রাজনীতিতে পঙ্কিলতা আমদানীর জন্য যিনি সবচেয়ে বেশি দায়ী হঠাৎ তাঁর কণ্ঠে এত ক্ষোভ, এত ব্যথা কেন?

ভাবতে ভাবতে আমার মনে একটা প্রশ্ন দেখা দিল : এটা কি প্রধানমন্ত্রীর একটা নতুন টেকনিক? লোকে তাঁকে নীতিজ্ঞানহীন পঙ্কিল রাজনীতিবিদ বলছে বলেই কি তিনি উল্টো সুরে কথা বলতে শুরু করেছেন? তাঁর কি ধারণা যে এইভাবে বার বার আমাদের রাজনীতির মান অবনতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেই তিনি মানুষের ধারণা পাল্টে দিতে পারবেন? মানুষকে বোঝাতে পারবেন যে নিজে তো নীতিজ্ঞানহীন রাজনীতিবিদ ননই, বরং আমাদের রাজনীতির মান উন্নয়নের জন্য তিনি সচেষ্ট?

প্রধানমন্ত্রীর যাই অভিলাষ হোক, আমাদের দেশে এখনই এ জিনিস পুরোপুরি সম্ভব বলে আমার কিন্তু মনে হয় না। এখনও যেখানে অবাধ আলোচনার সুযোগ আছে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আছে, পার্লামেন্ট আছে সেখানে মানুষকে, দেশের সবাইকে এখনও এভাবে ভুল বোঝানো অসম্ভব।

তবে হ্যাঁ, এইভাবে প্রধানমন্ত্রী কিছুটা সাফল্য অর্জন করতে পারেন বৈকি। দীর্ঘমেয়াদী না হলেও অন্তত সাময়িক। তাঁর মুখে এই আক্ষেপ শুনতে শুনতে, তাঁর কমিউনিস্ট অকমিউনিস্ট সমর্থকদের দ্বারা সেগুলি প্রতিধ্বনিত হতে হতে, সরকারী রেডিও ও সরকারের ভয়ে ভীত বড় ব্যবসায়ীদের কতকগুলি কাগজপত্রে বারংবার তার পুনরুল্লেখ দেখতে দেখতে একদল সাধারণ মানুষের মনেও এ ধারণা জন্মাতে পারে যে প্রধানমন্ত্রী সত্যিই আমাদের রাজনীতির মান উন্নয়নের পক্ষপাতী, শ্রীমতী গান্ধী নিশ্চয়ই সে জন্য সচেষ্ট! যেমন, প্রচারে বিহ্বল একদল মানুষ সব কিছু দেখা শোনা সত্ত্বেও সত্যিই মনে করেন যে

শ্রীমতী গান্ধী সম্প্রতি দলের মধ্যে যে বিরাট লড়াইটা লড়লেন সেটা ছিল আদর্শের লড়াই, সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম; তেমনি বারংবার প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সমর্থকদের মুখে রাজনীতির মান অবনতির আক্ষেপ শুনতে শুনতে হয়ত সত্যিই একদল লোক অন্তত কিছুদিনের জন্য বিশ্বাস করবেন যে উনি এবং ওঁর রাজনীতির মান রক্ষার উদ্দেশ্যে, রাজনীতিতে পঙ্কিলতা না ঢুকতে দেওয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ!

❊

আমাদের দেশের রাজনীতির মান যে নেমে গিয়েছে সে সম্পর্কে অবশ্য আমার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কোনও মতভেদ নেই। প্রধানমন্ত্রী দুঃখ করেছেন : মান নেমে গিয়েছে। আমি মনে করি : মান অনেক নেমে গিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন : আজকাল অনেক লোক রাজনীতির মানকে নীচে নামাবার জন্য চেষ্টা করছেন। এই কথগুলি আর যাঁর মুখেই মানাক শ্রীমতী গান্ধীর মুখে মোটেই ভাল শোনায় না। কারণ, এ ব্যাপারে তাঁর চেয়ে বেশি দোষী খুব কম লোকই আছেন।

যখন কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন, বা যখন পরলোকগত পিতার প্রধান পরামর্শদাতা রূপে কাজ করেছেন তখন শ্রীমতী গান্ধী কী কী করেছিলেন সে প্রশ্ন তুলতে চাই না। হালফিল তিনি যেসব কাজ করেছেন সেগুলি বিচার করলেই পরিষ্কার বোঝা যায় বর্তমান রাজনীতিতে তাঁর চেয়ে নীতিজ্ঞানহীন লোক খুব কম আছেন। যেভাবে শ্রীমতী গান্ধী শ্রীসঞ্জীব রেড্ডির মনোনয়নপত্র দাখিল করে আবার তাঁকে হারাবার চেষ্টা করেছেন, যেভাবে তিনি কংগ্রেস দলের প্রধানমন্ত্রী হয়ে কংগ্রেস দলেরই প্রার্থীর বিরোধিতা করেছেন—পৃথিবীর সভ্য স্বাধীন রাজনীতির ইতিহাসে তার তুলনা মেলা কঠিন। এর চেয়ে বড় নীতিজ্ঞানহীনতার নজির আধুনিক ভারতের রাজনীতিতে আর নেই।

ব্যক্তিগত ক্ষমতার লড়াইয়ে যেভাবে প্রধানমন্ত্রী প্রশাসন যন্ত্রকে ব্যবহার করেছেন এবং করছেন তাও গণতান্ত্রিক রাজনীতির ইতিহাসে অভাবনীয়। উত্তর প্রদেশে প্রধানমন্ত্রী যেভাবে গুপ্ত সরকারকে উচ্ছেদের অভিযানে নেমেছেন সেটাও এক আজব জিনিস। ফেডারেল রাষ্ট্র কাঠামোতে প্রধানমন্ত্রীর এই ভূমিকা নীতিজ্ঞানহীন রাজনীতির চূড়ান্ত নিদর্শন।

প্রধানমন্ত্রী সবকিছুকে সমাজতন্ত্রের লড়াই বলে যেভাবে চালাতে চাইছেন সেটাও চরম নীতিজ্ঞানহীনতা। তিনি নিজেকে সমাজতন্ত্রী বলে দাবি করুন—আপত্তি নেই। তিনি বাবু জগজীবন রাম থেকে আরম্ভ করে বিজয় সিংহ নাহার পর্যন্ত সকলের বুকে ‘সোস্যালিস্ট’ বলে ছাপ মেরে দিন—তাতেও না হয় আপত্তি নাই করলাম। কিন্তু তাঁর সঙ্গে যাঁরা হাত মেলাবে না তারা সকলেই প্রতিক্রিয়াশীল—এই কথা বলা কি নীতিজ্ঞানহীনতা নয়? এটাও কি এক রকমের ‘মিথ্যাচার নয়? যদি প্রধানমন্ত্রীর রাজনীতি মানতে হয় তাহলে বলতে

হয় কামরাজের চেয়ে জগজীবনবাবু বড় সমাজতন্ত্রী এবং আকালি পার্টির চেয়ে এস এস পি প্রতিক্রিয়াশীল!

যাঁরা স্বতন্ত্র পার্টি এবং জনসংঘের সঙ্গে হাত মেলাবেন তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক হয়ে যাবেন! কিন্তু যাঁরা মুসলীম লীগ, ডি এম কে, ঝাড়খণ্ড পার্টি, আকালি দল প্রভৃতির সঙ্গে হাত মেলাবেন তাঁরা প্রগতিশীলই থাকবেন! এইটাই এখন প্রধানমন্ত্রীর রাজনীতি। এবং, এসব বলার পরও প্রধানমন্ত্রীকে পরম নীতিজ্ঞানসম্পন্ন রাজনীতিবিদ বলে মেনে নিতেই হবে!

*

তবে, ব্যক্তিগত নেতৃত্বের লড়াইয়ে সাফল্য ছাড়াও প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি আরও একটা বড় ব্যাপারে সফল হয়েছেন—নীতিজ্ঞানহীনতাকে তিনি ব্যাপকভাবে প্রায় সর্বদলে সংক্রামিত করতে পেরেছেন! স্বীকার করতেই হবে, এক্ষেত্রেও শ্রীমতী গান্ধীর সাফল্যের জুড়ি নেই!

আজ ভারতের প্রায় সব দলই চূড়ান্ত নীতিজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রায় সকলেরই কাজের সঙ্গে কথায় মিল নেই। প্রত্যেক দলই এমন সব প্রস্তাব দিয়েছেন যার দুই, তিন, এমনকি চার রকমের অর্থ করা যায়! সকলেই সুবিধাবাদের চরম দেখাচ্ছেন।

সি পি আই-র কথা এ আলোচনায় না আনাই ভালো। কারণ ওদের গোটা রাজনীতিটাই এখন কৌশল আর মারপ্যাঁচের রাজনীতিতে পর্যবসিত। যে দল বা যে ব্যক্তি ওদের সঙ্গে হাত মেলাবেন তাঁরাই ভাল। যে দল বা যে ব্যক্তি ওদের সঙ্গে হাত মেলাতে রাজি হবেন না তাঁরাই খারাপ। ওরা ইতিমধ্যে জনসংঘ থেকে আরম্ভ করে মুসলিম লীগ পর্যন্ত সকলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন! ওরা জগজীবন বাবুর ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার মধ্যেও প্রগতিশীলতা দেখেন; ওরা কে ডি মালব্যের দুর্নীতির মধ্যেও সমাজতন্ত্র আবিষ্কার করেন!

কিন্তু সি পি এম-এরই বা এখন কী দশা? যে পার্টি বাইরে এত বিপ্লবের হুঙ্কার দের, সেই পার্টিই কিনা আজ মন্ত্রিত্ব বজায় রাখার জন্য শ্রীমতী গান্ধীর কৃপাপ্রার্থনা করছে। আবার মুখে সেটা স্বীকার করতেও লজ্জা! আসলে যখন কৃপাভিক্ষা করতে যান বাইরে তখন বলেন, আমরা ওঁর ভুল ত্রুটি ধরিয়ে দিতে গিয়েছিলাম! আহা "বড় পুঁজিপতি এবং ভূস্বামীদের স্বার্থরক্ষাকারী প্রধানমন্ত্রীর" জন্য কী দরদ!

আবার দেখুন এস এস পির অবস্থা। যাঁরা মুখে বলেন আমরা সমাজতন্ত্রী তাঁরাই কিনা স্বতন্ত্র পার্টি, জনসংঘ এবং আদি কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কোয়ালিশন সরকার গঠনে উদ্‌গ্রীব! স্বতন্ত্র পার্টি, জনসংঘ এবং আদি কংগ্রেস প্রগতিশীলটা কোন্ বিচারে?

পি এস পির অবস্থাও তথৈবচ। তাঁরা এমন একটা প্রস্তাব তৈরী করেছেন যেটাকে ব্যাখ্যা করে দলের একজন নেতা বলছেন, আমরা নব কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাতে পারি, আর একজন বলছেন আমরা আদি কংগ্রেসের সঙ্গেও জোট বাঁধতে পারি!

একটু তলিয়ে বিচার করুন, দেখবেন সবকিছুর মূলেই প্রধানমন্ত্রীর রাজনীতি—তাঁরই লীলাখেলা। স্বীকার করতেই হবে, শ্রীমতী গান্ধীর ক্ষমতা আছে!

নবারুণ গুপ্ত

৭-২-৭০

দেবরাজ

শীতের পরশ

বসন্ত চেকোস্লোভাকিয়া থেকে কবে বিদেয় নিয়েছে, এখন সেখানে চলছে শীতের শাসন। যত দিন যাচ্ছে তার প্রকোপও ততই বাড়ছে। দু'চারটে ফুল এখানে-ওখানে যা ফুটে ছিল হাড়কাঁপানো শীতকে অগ্রাহ্য করে তাও আস্তে আস্তে ঝরে পড়ছে। চেকোস্লোভাকিয়ার কম্যুনিস্ট দলের কেন্দ্রীয় পরিষদের বৈঠক হয়ে গেছে তিন দিন ধরে জানুয়ারি মাসের আটাশে থেকে তিরিশে পর্যন্ত। ঠিক তার আগেই দেখা গেল ওলডরিচ চার্নিক প্রধানমন্ত্রীর পদে ইস্তফা দিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে সভাপতি-মণ্ডলী অর্থাৎ প্রেসিডিয়াম থেকেও। তাঁর জায়গায় এসেছেন লুবোমির স্ট্রুগাল নতুন প্রধানমন্ত্রী হয়ে। বোঝা গেল এ হলো রদবদলের মুখপাত। আরও বিস্তর হেরফের হবে সভাপতিমণ্ডলীতে, মন্ত্রিসভায়, দলের সংগঠনে। হলোও তাই। অনেক মন্ত্রীরই লেজ কাটা গেছে, সভাপতিমণ্ডলী থেকেও বিদেয় নিয়েছেন অনেকে, দলের কর্তৃত্বেরও রকমফের হয়েছে—যুক্তরাষ্ট্রে, আবার চেক আর স্লোভাক অঙ্গরাজ্যেও। লক্ষ্য সব ক্ষেত্রেই এক, মানবিক কম্যুনিজমের শেকড় পর্যন্ত উপড়ে ফেলা।

চোরা চার্নিক: গদি বজায় রাখবার জন্যে তিনি কম চেষ্টা তো করেন নি। যে ডুবচেক তাঁকে গদিতে বসিয়েছিলেন তাঁকে তিনি ত্যাগ তো করেছিলেনই, তাঁর নিন্দে করতেও কসুর করেন নি। দলের নতুন মতব্বর হুজাকের তাঁকে প্রধানমন্ত্রী রাখতে অনিচ্ছে ছিল না। কিন্তু চেকোস্লোভাকিয়াতে এখন কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম। সে কর্তা খোদ রুশীরা। তাদের ইচ্ছে নয় আটষট্টির বসন্তের আমেজ একটুও থাকে প্রাগে। তাই চার্নিকের প্রধানমন্ত্রীর চাকরি গেছে, সঙ্গে সঙ্গে গেছে প্রেসিডিয়ামের আসন। এখন তিনি নির্বিষ ঢোঁড়া সাপ। তাঁর গদি যিনি দখল করেছেন সেই স্ট্রুগাল হচ্ছেন মস্কোর পেয়ারের লোক। কেউ কেউ বলে তিনি নাকি মধ্যপন্থাই পছন্দ করেন; যদি তিনি কট্টর কম্যুনিস্টও হন, তা হলেও তিনি তেমন উগ্র নন। কিন্তু এ ধারণা ঠিক বলে মনে হয় না। রুশীরা চেকোস্লোভাকিয়াতে একবার ঠকেছে। বার বার ঠকবার পাত্র তারা নয়। স্ট্রুগাল নরমধাতের মানুষ এ ধারণা তাদের থাকলে কখনই তারা তাঁর হাতে রাজ্যপাট সঁপে দিত না।

রদবদলে যা হয়েছে তাতে বেশ বোঝা যাচ্ছে আর কোনও রকম ঝুঁকি নিতে রুশীরা রাজী নয়। যাঁরা এলেন তাঁরা সবাই নির্ভেজাল মস্কোভজা, যাঁদের সম্বন্ধে সামান্য একটু সন্দেহ আছে তাঁদের সকলকেই বিদেয় দেওয়া হয়েছে। স্টেফান সাদোভস্কি ছিলেন স্লোভাক কম্যুনিস্ট দলের পয়লা নম্বর সচিব। তিনি ছিলেন ডুবচেকের দলে। কিন্তু ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত দেশগুলি আটষট্টির আগস্টে চেকোস্লোভাকিয়ায় সেনা-সামন্ত পাঠাবার পরে তিনি হঠাৎ বদলে গেল মতটা করে নিজেকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর চতুরালি শেষ পর্যন্ত টিঁকলো না। তাঁকে যেতে হয়েছে জানুয়ারি মাসের কেন্দ্রীয় পরিষদের বৈঠকের পর। যেতে হয়েছে কারেল পোলাচেককে, যিনি গত আগস্টের অভিযানের পর ডুবচেকপন্থী ট্রেড ইউনিয়নদের শায়েস্তা করার ভার নিয়েছিলেন আর সে দায়িত্ব পালন করতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নি, মজুরেরা যে এখনও বেঁকে বসে আছে, ট্রেড ইউনিয়নগুলো আজও যে বাগ মানে নি সে দোষ তো আর তাঁর নয়। তবুও তাঁকে যেতে হয়েছে রুশীরা তাঁকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে না বলে।

ডুবচেকের ভক্তদের সভাপতিমণ্ডলী, মন্ত্রিসভা আর দলের সংগঠন থেকে প্রায় ঝেঁটিয়ে সাফ করে ফেলা হয়েছে। পুরোনোদের মধ্যে একমাত্র রয়ে গেছেন প্রেসিডেন্ট স্বভোবোদা। তিনিও কতদিন থাকবেন কে জানে। আর থাকলেই বা কী? তাঁকে ঘিরে যাঁরা রয়েছেন তাঁরা সবাই কট্টর কম্যুনিস্ট মানবিকতার ধার তাঁরা থোড়াই ধারেন। হয়তো বা তিতিবিরক্ত হয়ে স্বভোবোদাও নিজেই মানে মানে সরে পড়বেন। মার্চ মাসে কেন্দ্রীয় পরিষদের নতুন বৈঠক বসার কথা। শুদ্ধি যজ্ঞে শেষ আহুতি তখনই হয়তো দেওয়া হবে। জন বারো কুলীন কম্যুনিস্ট নেতাকে নিয়ে একটা স্ক্রীনিং কমিটী তৈরি করা হয়েছে। তাঁরা শুধু ওপরতলার নেতাদের নয়, প্রত্যেকটি পার্টি মেম্বারের কুষ্ঠি ঘেঁটে দেখবেন, কাকে দলে রাখা যায় আর কারই বা নাম কেটে দিতে হবে। দলের সদস্য হবার কার্ড অর্থাৎ ছাড়পত্র যারা পেয়েছে তাদের সংখ্যা চেকোস্লোভাকিয়াতে কম নয়। অন্তত বোলো লাখ লোক সেখানে কম্যুনিস্ট দলের সদস্য। এতগুলি লোকের রাজনৈতিক চরিত্র বিচার বড় সহজ কাজ নয়। কিন্তু মস্কোভজারা ঠিক করেছে আধাখেঁচড়া কাজ তারা করবে না, প্রত্যেকটি কম্যুনিস্টকে তারা যাচাই করে দেখবে কে খাঁটি, কে ঝুটো।

হুজাকের কী হবে? তিনি কী পার পেয়ে গিয়েছেন, না তাঁর ভাগ্যও অনিশ্চিত? নতুন প্রধানমন্ত্রী স্ট্রুগাল ছিলেন নোভোতনির আমলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, উগ্রপন্থী নোভোতনির তিনি ছিলেন একান্ত বশংবদ। সে আমলেই জেলে থাকতে হয়েছিল হুজাককে তাঁর নরমপন্থী মনোভাবের জন্যে। সে মনোভাব অবশ্য ডুবচেকের মত অতটা উদার ছিল না। তবুও তাঁকে কঠোর সাজা পেতে হয়েছিল। তাঁকে যিনি জেলে পাঠাবার মূলাধার ছিলেন সেই স্ট্রুগালকে প্রধানমন্ত্রী করতে হুজাকের বিপদ ঘনিয়ে এলো কি না কে জানে। তবে জেলে থাকার বেদনা হুজাক ভুলতে পারেন নি। তিনি জোর গলায় বলেছেন, নোভোতনির আমলের মত বিচারের ভান চেকোস্লোভাকিয়াতে আর হবে না, বানানো অভিযোগে সাজা দেওয়ার যুগ শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাই কী? অনেকের আশংকা হুজাককেও বিদেয় দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। ডুবচেকপন্থী তিনি আর নন বটে, কিন্তু দুরাত্মার কী আর ছলের অভাব হয়? আস্তে আস্তে ছোটখাটো কাঁটাগুলো সরিয়ে দিয়ে ডুবচেকের মতো বড় কাঁটায় হাত দেবে মস্কোভজারা। তারা নাকি খুঁজে দেখছে মহাযুদ্ধের সময় শত্রুদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার প্রমাণ পাওয়া মেলে কিনা।

তবে আজও যে উগ্রপন্থীদের সমঝে চলতে হচ্ছে তার কারণ হচ্ছে হাওয়াটা দেশে এখনও গোলমেলে। নইলে হুজাক সাজানো মামলার অভিযোগ তুলতে ভরসা পেতেন না, ডুবচেককেও আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় না করিয়ে আংকারাতে রাষ্ট্রদূত করে পাঠানো হতো না। ডুবচেক সব গঞ্জনা, লাঞ্ছনা, অপমান চুপ করে সহ্য করেছেন। কিন্তু স্বীকার করেন নি ১৯৬৮ সালে তিনি যা করেছিলেন, কী করতে চেয়েছিলেন সে সব ভুল। তাঁর মনের জোর আছে এই জন্যে দেশের লোক এখনও মনে মনে তাঁকে ভালবাসে, তাঁকে শ্রদ্ধা করে। তাদের গোপন আশা একদিন বুঝি তিনি ফিরে আসবেন, ফিরে আসবেন ডুবচেকের নতুন অর্থনীতি যিনি রচনা করেছিলেন সেই অধ্যাপক ওটা সিক সুইজারল্যাণ্ডে তাঁর নির্বাসন থেকে। এতদিন কেটে গেলেও তাই উৎপাদন বাড়ছে না, দেশে নানা জিনিসের অভাব দেখা দিচ্ছে, এমন কী খাবার জিনিসের পর্যন্ত। তাতে ভুগতে হচ্ছে নিজেদেরই। তবু মজুর আর কারিগররা পুরোনো কথা ভুলে গিয়ে নতুন উৎসাহ নিয়ে কাজে কর্মে হাত দিচ্ছে না। পরিকল্পনার মন্ত্রী হুলাকেও কবুল করতে হয়েছে আর্থিক অবস্থা শোচনীয় না হলেও গুরুতর। আন্তর্জাতিক লেনদেনে যেখানে কোটি কোটি ডলারের ফারাক, সেখানে অবস্থাটা ভাবিয়ে তোলবার মতো তো বটেই।

সহজ সুন্দরী

কবিতা সিংহ

চোখে যদি মন ফোটালে
মনে কেন চোখ দিলে না
বদলে তার বদলে
লজ্জায় ভুঁয়ে নোয়ালে।

লজ্জায় ভুঁয়ে নোয়ালে
তবু কেন ছেড়ে দিলে না
বদলে তার বদলে
দুনিয়ায় বেঁধে ঘোরালে।

দুনিয়ায় বেঁধে ঘোরালে
কালো মুখ ঢেকে দিলে না
বদলে তার বদলে
রক্তে প্রেমের বিষ মেশালে।

রক্তে প্রেমের বিষ মেশালে
বিষে কাল ঘুম দিলে না
বদলে তার বদলে
চোখে মন ফুটিয়ে দিয়ে
অঞ্জলায় যাচনা দিয়ে
বুকে কানা হৃদয় দিয়ে
দুনিয়ায় বেঁধে ঘোরালে
দুনিয়ায় বেঁধে ঘোরালে।

শরীর আমার শিখা নয় তুষের বস্তা

অরুন্ধতী রায়

শরীর আমার গুপ্ত ঘাতক
আমার সর্বনাশ
আমার বঙ্কিগতি ডানা দুটো
পুড়িয়ে দিল ডাইনী আমার শরীর
অথচ সব অ্যাপোলোদের অনেক আগেই
চাঁদ কিংবা মঙ্গল গ্রহে
কিংবা দূরতর ব্রহ্মাণ্ডে
—চিন্তা করি,
কোনো পদস্থ নাগরিক আমি
অন্তত এইরকম কথাই ছিল
শরীর আমার মীরজাফর
সিলিং ফ্যান আর পর্দাপাস্ত
তুলোর ঠাটের ষড়যন্ত্রে
আগুন খোঁজে
শরীর আমার তুষের বস্তা
দাহ্য শরীর
আগুন তবু নিম্নগামী পরিণতির
মাধ্যাকর্ষণ মেনে নিয়ে ছাইএর
পরে ছাইএর স্তূপ
কয়েক মুঠি মাটি বাঁধে

হারিয়ে যাচ্ছি

শিশিরকুমার দাশ

ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছি, ক্রমশই ভিড় বাড়ছে মেলায়
আমি এখন নদীর ধার ধরে ধরে চেষ্টা করছি ফিরে যেতে
কিন্তু নদী খুঁজে পাই না; সেই যে কখন বিকেলবেলায়
লোকের ভিড় জমার আগে এসেছিলাম, মাদুর পেতে

তখন যারা বসেছিল, তারা এখন কোথায় গেল, ক্রমশ ভয়
আমায় ঘিরছে, দিনের আলো আস্তে আস্তে নিভে আসে
জানি, সবাই বলেও ছিল, জীবনে সব খেলার নয়
তবুও আমি হারিয়ে যাচ্ছি, পরম করুণ অবিশ্বাসে

এখন শালবনের মাথায় সপ্ত ঋষি, কী বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে
ঘাসের ওপর জ্যোৎস্না জ্বলছে, সময় নেই সেসব দেখার
এখন কারো, ভিড় বাড়ছে, তার আগেই আমাকে হবে খুঁজে নিতে
ফেরার পথ, হারিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু কোথায় নদীর ধার!

জল্পনা

সুনীথ মজুমদার

ফিরিয়ে দিয়েছি, দেখি, তুমি নিজস্ব নিষ্ঠার কতদিন পর
ডাক দাও, সেই ডাক, যে ডাকে না-ফিরলে
মানুষ নিজেই নিজের হাত কামড়ায়, অশ্রু ফেলে
নরম বিছানা ভাসিয়ে দেয়—

মানুষ ফেরে তার নিজের অধিকারে, পুরোনো হাতের ছাপ পায়ের ছাপ
দেখবে বলে দাঁড়ায় সিঁদুরে আলতায়, নতুন খেলায়
তাকেও সবার জরুরী, এ কথা যখন বোঝে
বুক চুলে ঝড়ের আবেগ নিয়ে ধেয়ে আসে—

ফিরিয়ে দিয়েছি, দেখি তুমি কতদিন পর
আমাকে ভীষণ ছোট ক'রে দিয়ে ফিরে আসো দেবী চৌধুরানী!

'বার্ট্রাণ্ড রাসেল'

আর্থার উইলিয়াম বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মৃত্যু হল আটানব্বুই বছর বয়সে। আর দু বছর হলে তাঁর শত বর্ষ পূর্ণ হতে পারত।

সাম্প্রতিক কালের কাছে বার্ট্রাণ্ড রাসেল ছিলেন মানবতাবাদের অক্লান্ত শান্তির সৈনিক। যুদ্ধ, পারমাণবিক মারণ-যন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি নিরবচ্ছিন্ন অভিযান চালিয়ে গেছেন। অধ্যাপক রাসেলের কর্মক্ষেত্রে পদচ্যুতি ঘটেছে, কারাবরণ করেছেন, পৃথিবীর সমস্ত শান্তিকামী মানুষের কাছে উজ্জ্বল মহিমায় বিভাত হয়েছেন তিনি। এই শতকে পৃথিবীর অন্যতম প্রধান বুদ্ধিজীবী রাসেল প্রতিটি নতুন চিন্তাধারার শরিক হয়েছেন, তাঁর গাণিতিক বুদ্ধিতে বিশ্লেষণ করেছেন, দার্শনিক প্রজ্ঞায় ভাষ্য করেছেন। তাঁর বিচিত্র চিন্তার প্রকাশ রেখে গেছেন ছোট বড়ো অসংখ্য বইয়ের ভেতর। সমাজবাদের ব্যাখ্যা করেছেন, অঙ্ক শাস্ত্রের ওপর গ্রন্থ লিখেছেন, 'ম্যারেজ অ্যাণ্ড মরালস্' রচনা করে চাঞ্চল্য এনেছেন, পাশ্চাত্য-দর্শনের ওপর মূল্যবান বিশাল ইতিহাস রচনা করেছেন, আত্মজীবনী লিখেছেন, সাম্প্রতিক রাজনীতির বিশ্লেষণ করেছেন (একটি বই ভারতবর্ষে নিষিদ্ধ হয়েছিল, সে নিষেধ এখনো আছে কি না জানি না)। আর ধূসর জীবনের গোধূলিতে পেয়েছেন নোবেল পুরস্কার—সে পুরস্কার অঙ্কবিদকে নয়, দার্শনিককে নয়, সমাজতাত্ত্বিককেও নয়—যত দূর মনে পড়ছে—সাহিত্যিক বার্ট্রাণ্ড্ রাসেলকে।

আজ রাসেল শান্তি আর মানবতাবাদের প্রবক্তা। কিন্তু তা-ও হয়তো তাঁর সত্যিকারের পরিচয় নয়। সব মত, সব চিন্তা নিয়ে তিনি বিচার করেছেন—কোনো মতের অনুগত্য করেন নি। চিন্তার জগতে তাঁর মতো "ফ্রী-ল্যান্সার" আর জন্মেছেন কিনা জানি না।

বার্ট্রাণ্ড্ রাসেলকে বাংলা দেশের বুদ্ধিজীবীরা চিনেছিলেন অনেককাল আগেই। ভার্জিনিয়া উল্ফ—মিড্লটন ম্যারে—ডি-এইচ্ লরেন্স্-অলডাস্ হাক্সলির সঙ্গে উচ্চারিত হত তাঁর নাম— বয়োজ্যেষ্ঠ রাসেল নিরবচ্ছিন্ন প্রেরণা জোগাতেন তাঁদের, যেমন প্রি-র‍্যাফালাইটদের অনুপ্রাণিত করতেন রাস্কিন। দার্শনিকরা একভাবে রাসেলকে দেখবেন, গাণিতিকেরা আর এক দিক থেকে তাঁর পরিমাপ করবেন, আর এই শতাব্দীর অন্তত প্রথম তিন দশকের ইংরিজি সাহিত্য এবং সমালোচনা

অঙ্ক, বিদ্যা ও প্রেম—জীবনের তিনটি আকর্ষণ

নিয়ে যাঁরা একটু গভীরে যেতে চাইবেন, তাঁদের বার বার বার্ট্রাণ্ড রাসেলের প্রভাবের কথা ভাবতে হবে। আর এই কারণেই বাঙালী বুদ্ধিবাদীরা বোধ হয় এক সময়ে ইংল্যাণ্ডের দুই প্রধান ব্যক্তিত্বকে স্মরণ করতেন এক সঙ্গে—তাঁরা যথাক্রমে শ এবং রাসেল। 'ভ্রাম্যমাণ' দিলীপকুমার রায় আশ্চর্য সুন্দরভাবে বার্ট্রাণ্ড এবং তাঁর প্রথমা স্ত্রী ডোরার যে অন্তরঙ্গ ছবিটি এঁকেছিলেন, তাতে সমগ্রভাবে সেকালের বাঙালীর প্রীতি আর অনুরাগই নিবেদিত হয়েছিল।

কমনম্যান সুনন্দর পক্ষে এ সব তত্ত্ব জিজ্ঞাসা নিছক অনধিকার-চর্চা—পণ্ডিতেরা দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সমাজবিদ, রাসেলের ওপরে ভালো ভালো প্রবন্ধ লিখবেন। কিন্তু সুনন্দর মতো যাদের বয়েস, তাদের তারুণ্যে, ছাত্র-জীবনে কী আকর্ষণ ছিল রাসেলের লেখার ওপর। হাতে হাতে ঘুরত 'রোড্‌স্ টু ফ্রীডম', 'ম্যারেজ অ্যাণ্ড্ মরাল্‌স্', 'হোয়াই আয়্যাম নট্ এ ক্রিশ্চিয়ান', 'ইকারুস।' আমি দর্শনের কেউ নই—অতি সাধারণ সাহিত্যের ছাত্র, তবু সাহিত্যের স্বাদে ভরা এই বইগুলি মুগ্ধ হয়ে পড়তুম, দেখতুম খরশাণ যুক্তি, বিদ্রূপের উজ্জ্বলতা, সমস্ত সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। আঁরি বার্গস' আর ঐতিহাসিক মমসেন ছাড়া এমন স্বাদ যেন সাহিত্যের বাইরে আর কখনো পাইনি।

মনে পড়ে, কলেজে কোনো একটা জবরদস্ত ক্লাস চলছে প্রবাণ ইংরিজির, হয়তো ইতিহাসের। আর আমি পেছনের বেঞ্চিতে—আমার যথাস্থানে বসে, অখণ্ড মনোযোগে পড়ে চলেছি রাসেলের 'ইকারুস।' স্মৃতি আজ আবছা হয়ে এসেছে, বইটি যেন তত্ত্বের দিক থেকে শ-র 'ডক্‌টর্‌স্ ডিলেমা'র সগোত্রীয়—বিজ্ঞানের কোনো একটি দিক নিয়ে সমালোচনা করেছিলেন মনে হয়। কিন্তু তার ভরত-বাক্যটি ভুলি নি। গ্রীক পুরাণের সেই অবোধ বালক ইকারুসের মতো নবলব্ধ বিজ্ঞানের পাখায় মানুষ অনেকখানি উড়েছে, অনেক বেশি উড়েছে, কিন্তু আর বিলম্ব নেই—এইবার সূর্যের তাপে গলে যাবে তার পাখা, তারপরে মহা মৃত্যুর অতল-সমুদ্র।

এই দৃষ্টি সেদিনও আমার মনঃপূত ছিল না—সভ্যতার এই পরিণাম আমি কোনো-মতেই স্বীকার করতে প্রস্তুত নই। কিন্তু দার্শনিক রাসেল তো দর্শনের ইতিহাসে দুঃখবাদী বলেই চিহ্নিত থাকবেন। অঙ্কবিদের দৃষ্টিতে এই পৃথিবী চিরকালের নিয়মে নিয়ন্ত্রিত বিশাল শস্য-পেষাইয়ের যন্ত্র : মানুষ তার চক্রপাকে ক্ষণ-উত্থিত শস্য : চকিতের উল্লাসে তার ধারণা জন্মায় তার অসাধ্য কিছুই নেই—তারপরেই জাঁতা তাকে টেনে নিয়ে গুঁড়িয়ে-পিষে একাকার করে দেয়। এই দুর্নিবার জগৎ-যন্ত্রের কাছে সভ্যতা-বিজ্ঞান-মানুষের এই-ই নিশ্চিত পরিণতি।

আমি জানি না, উত্তর-জীবনে এই মৌল-চিন্তার কতখানি পরিবর্তন ঘটেছিল বার্ট্রাণ্ড্ রাসেলের। কিন্তু বিশুদ্ধ এবং বিশুষ্ক বুদ্ধি যা-ই বলুক রাসেল তো মানুষকে এই সিদ্ধান্তের হাতেই ছেড়ে দেননি। অন্ধ জগৎ-যন্ত্রের হাতে সে যদি নিতান্তই নিরুপায়—তা হলে কী ক্ষতি যুদ্ধে, ভিয়েতনামী পাশবিকতায়, দম্ভুর কু-ক্লাক্‌স্-ক্ল্যানে, পারমাণবিক বোমার প্রতি স্পর্ধায়? আসলে, যুক্তি-তর্ক যেখানেই টেনে নিয়ে যাক—সব কিছুর ঊর্ধ্বে মহৎ মানুষের একটি হৃদয় জেগে থাকেই, জীবনের প্রতি ভালোবাসায়, অন্যায়ের প্রতিবাদে, মানবতার সপক্ষে। চিরকালের সত্যসন্ধী বার্ট্রাণ্ড রাসেলেরও সেই হৃদয়ের উদ্বোধন ঘটেছিল, তাই শেষদিন পর্যন্ত সংগ্রাম করেছেন—সত্যের জন্যে দাঁড়িয়েছেন, দুঃখকে বরণ করেছেন। আত্মচরিতে যে বর্ণনা করেছেন মানবপ্রেম, জীবনপ্রেম আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা ঠিক এই ভাবেই তো আপাত নৈরাশ্যবাদী উইলিয়াম ফকনার তাঁর শেষ পর্বে শান্তি এবং মানবতার জয়গান গেয়েছিলেন।

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মৃত্যুর সঙ্গে ইতিহাসের একটা বিশাল যুগ শেষ হল। দুঃখবাদী দার্শনিককে জানি না, কিন্তু চিরকালের সত্যজিজ্ঞাসু এই মহান মনীষীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত রইল সুনন্দর প্রণাম।

কৃতজ্ঞতা

৩৭ বর্ষ, ১২ সংখ্যক 'দেশের জার্নালে' শিবরামের যে কবিতাটি স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত করেছি, তার শুদ্ধ পাঠটি কলকাতা-১২ থেকে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য পাঠিয়ে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন। সংশোধনের জন্য সেটি তুলে দিচ্ছি :

"লিখেছি কি আমি অনেক, বন্ধু ?
আমি তো সে সব লিখি নি।
ছিল যে লেখিকা অনেক বন্ধু
আমি ছিনু তার লেখনী॥"

মা ও ভ্রমরকে

বিজিতকুমার ভট্টাচার্য

তোমরা তো ডাকবে না কেউ, তবু যাব
এই অবেলায়

পায়ে চলা পথ, খামার গোয়াল
খড়ের ছাউনি দেয়া ঘর
বেরিয়ে আসার পথে বাতাবি নেবুর গাছ
সূর্যমুখী ফুল
আমি চিনি, তোমাদের সমস্ত শরীর।
বুকের ওপর মুখ
বলেছিলে
যাই……..

এই মাঠে, জোৎস্না ছিল
শিমুল গাছের থেকে লাল ফুল
ঝরে ঝরে পড়ে
[illegible] ফুল ঝরার সময়।

যাব, এই অবেলায়
ছড়িয়ে ছড়িয়ে ভেসে যাব তোমার শরীরে
আঠারো বছর পর, আরো একদিন অন্ধের মতন
আমি দু' হাতে হাতড়ে নেব
এই জোৎস্না, এই মাঠ …..
হারানো শরীর।

তুমি তো
[illegible] কাছে [illegible]
বুকের ওপর মুখ, বলেছিলে
যাই……

দৃশ্য, অদৃশ্য

শৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

সারাটা সময় যেন
হৃদয়ের তীর ছেড়ে দূরে………

তুমি যদি এমন বাগান না বানাতে
আমার তো ইচ্ছা ছিলো স্টীমারটা ধরিই……কিন্তু
জলে-ভেজা হরিণী চোখ দেখলে বড়ো বিষম লাগে যেন

হঠাৎ
তুমি আমাকে এমন অদ্ভুত বোকা বানালে,
ফুলের আড়ালে আড়ালে; রূপকথার পরী যেমন।

দৃশ্যটা অতুলনীয় : গোলাপী ডালিয়ার
নরম শরীরটা এখনও; মাথা নেড়ে কেমন দুলছে,
সেখানে

একটু আগে; অবিকল অজন্তার মডেলের মতো
তোমার কোমরের মুক্তাগুচ্ছ নজরে পড়ছিলো!

সত্যি,
স্টীমারটা ছেড়ে গেল……

পল্টনের বুট

গৌতম গুহ

পুরোনো পাপ পৃথিবীর নির্জনে ক্ষীণ হয়; যেন,
আমরা বন্ধু দূরে হেঁটে যাবো—সময়ের বৃত্তের বাইরে,
কোনো স্পষ্ট গম্ভীর কথা বলার জন্য
কোনো ভালবাসার মানুষের দরজায় প্রতিবাদ জানাতে
(বুকের ধ্বনির মতো আপন)।

সারা জীবন কিছুই করিনি,
গাছের ফুল আমার কথার অপেক্ষা না রেখেই সুন্দর ফুটেছে
গৃহ-অভ্যন্তরে
দুঃখের মাধুর্যও, পরামর্শ না করে এক সময় থেমে গেছে।

সর্বত্র আমি ক্রুদ্ধ পল্টনের মতো বুক থাবড়েছি—
যেন, এই সবের গোপন সূত্রটা আমি জানি
যেন, বিস্ফোরক অধিকারে [illegible] আমরা দেখিনি কোন দিনও
আমল দেবেও না কেউ
স্থির আক্রোশে তীক্ষ্ণ বর্শা যতই না কেন [illegible]

দুই ভাই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

ঘুড়ি ঠিক হোক বা না হোক, তোমার মন ঠিক হয়ে গেল। স্প্রীং কেটে যাওয়া অচল ঘড়ি হাতে রেখে অস্বস্তি পোহান, 'কি-করা-যায়' 'কি-করা-যায়' করে মনের অশান্তি বাড়ান—সব এখন পরিষ্কার। ঘড়ির দুর্ভাবনা আর তোমাকে পাচ্ছে না। কানা-ভাঁর বেয়াড়া ঘুড়ির বেআদবী সহ্য করতে না পেরে রাগী ছেলে সুতো ছিঁড়ে দিয়ে লাটাই গুটিয়ে নতুন ঘুড়ি কিনতে দোকানে চলল, অথবা ঘুড়ি উড়ান বন্ধ রেখে মাছ ধরতে ছুটল।

তার মানে তার মন ঠিক হয়ে গেল।

এই মন ঠিক করার ব্যাপারটা ঠিক করতেই সময় নেয়, তখনই যত গোলমাল। তারপর ঠিক হয়ে গেলে আর কিছু না, লম্বা পা ফেলে শুধু এগিয়ে যাওয়া। রাগী গিন্নী

ক করতে পারছিল না সে? এখন ঠিক হয়ে গেছে। দেয়ালে পেরেক ঠুকে তা ঠিক করে দিয়েছে, এখন আর নড়ছে দুলছে না। ঘুড়িটা বার বার গোত্তা য় মাটিতে পড়ছিল? কানাভাঁর হয়ে হয়ে হয়ে চরকির মতন আকাশে ছিল? সুতো ছিঁড়ে দিয়েছে সে। আপন া। এবার হাওয়ায় হাওয়ায় আকাশের যেখানে খুশি উড়ে যাক। আস্থারকে

পেরেক ঠুকে স্থির করে দেওয়ার মতন চঞ্চলকে বাধন ছিঁড়ে আলগা করে দেওয়াও এক ধরনের ঠিক করে দেওয়া।

হ্যাঁ, ঘড়ি দম নিচ্ছে না? স্প্রীং কেটে গেছে? ঘড়িওয়ালার কাছে গিয়ে সারিয়ে নাও। নয়তো জলে ফেলে দাও, বরং হামান-দিস্তার মধ্যে রেখে ওটাকে গুঁড়িয়ে ছাতু করে দিতে পার। এ-ও একরকম ঠিক করা। এ-ও মন্দ না।

পেরেক খুঁজে না পেয়ে নড়বড়ে ছবিটা দেওয়াল থেকে তুলে নিয়ে উনুনের দিকে ছুটে গেল, কানের কাছে অষ্টপ্রহর খসখস ঘসঘস সহ্য করবে কদিন? ছবি পুড়িয়ে শেষ করে দিল। যেমন রাগী পুরুষ বাড়ি ফেরে হাতের ঘড়ি গুঁড়িয়ে দিল। যেমন রাগী ছেলে মাছ ধরতে চলল।

চমৎকার চমৎকার উপমা তার মনে পড়তে লাগল। কদিন ধরেই মনে পড়ছিল। আজ

সেমিনারে সেই সেমিনারে তাদের আসন বাঁধা। কলকাতা শহর, বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই আছে। ট্রাম পোড়ানো, পটকা ফাটান, গ্যাস, গুলি, মিছিল এবং চূড়ান্ত বিক্ষোভের মধ্যেও শিল্পমেলা সাহিত্য-সভা সংস্কৃতি-অনুষ্ঠানে ভাটা পড়ে না। এই তো সেদিন কত জাঁক করে এত বড় একটা অল ইণ্ডিয়া রাইটার্স কনফারেন্স হয়ে গেল। উঁহু, রামানন্দদের ডাকা হয় নি। আর সুদূর বার্লিনে বসে পত্র-সাহিত্যিক শশাঙ্ক দত্তও নেমন্তন্ন পেল। শুভেন্দুর কাছে লেখা চিঠিতে তা-ও জানা গেছে।

না, রামানন্দদের ডাকবে কেন। তারা যে 'নিশ্চেতনা'র কবি, 'অবচেতনা'র অন্ধকারে হামাগুড়ি দিচ্ছে। এই বালখিল্য কবিদের, যদিও বয়সে অনেকে বুড়িয়ে গেছে, আজও 'পরীক্ষা-নিরীক্ষার' পর্ব শেষ হল না, এখনও 'আত্ম-অনুসন্ধান' নিয়ে মেতে আছে। তার মানে শিল্পসৃষ্টি করতে নেমে তারা নিজেদেরই আজ পর্যন্ত চিনে উঠতে পারল না, তারা কী তারা কে। যে কারণে তাদের কাব্য কবিতাও দুর্বোধ অস্পষ্ট থেকে গেল, নেবুলাস অবস্থা কাটিয়ে উঠে একটা নির্দিষ্ট আকার পেল না, অবয়ব পেল না। শিল্প-সাহিত্যের অঙ্গনে এই নীহারিকা পুঞ্জের জায়গা কোথায়।

আকাদমী বিজয়ী ঔপন্যাসিক প্রেম মজুমদার সম্প্রতি একটি সাহিত্য সভায় 'আধুনিক কবিদের' সম্পর্কে এই ধারার উক্তি করেছিল না?

কিন্তু রামানন্দ ও রামানন্দের অনুগামী কবিগোষ্ঠী এত বড় সত্যটা কি বুঝল? আজও বুঝতে পারে নি। তাই এই স্যাঁত-সেঁতে অন্ধকার চায়ের দোকানে বসে রামানন্দর কবিতার 'বিশুদ্ধ ইমেজ' দেখে শুভেন্দু হই-চই করে, শুভেন্দুর কবিতার 'মেজাজী ভাব' তার নিজস্ব 'অ্যাটিটিউড' 'স্মার্টনেস' লক্ষ্য করে বিকাশ আত্মহারা, আবার বিকাশের 'খাঁটি সুররিয়্যালিস্ট' কাব্য পড়ে তরুণ ভক্তের দল মুগ্ধ বিমোহিত।

হুঁ, তারা নিজেরাই নিজেদের দেখছে, একজন আর একজনের পিঠ চুলকোচ্ছে, পৃথিবীর কেউ তাদের কথা শুনছে না, তাদের কবিতা পড়ছে না, কবিতাই আর মানুষ পড়ছে না। পৃথিবী এখন রাজনীতি নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত, জনসংখ্যার চাপ নিয়ে অস্থির চঞ্চল, তার ওপর ক্ষণে ক্ষণে গ্রহান্তরে পাড়ি দেওয়ার রোমহর্ষক চমক—

আর এই অবস্থায় কিনা মূর্খের দল, রামানন্দ ও তার শিষ্যেরা কবিতা নিয়ে মুহুর্মুহু আস্ফালন করছে আন্দোলন করছে, গাঁটের পয়সা খরচ করে 'মিনিটের কবিতা' 'সেকেণ্ডের কবিতা' 'শুক্লপক্ষের কবিতা' 'কৃষ্ণপক্ষের কবিতা'—উদ্ভট আজগুবি সব নাম দিয়ে দিয়ে পত্র-পত্রিকা বার করছে, আর পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে।

রামানন্দ এক এক সময় চিন্তা করে, যেন তুমুল ঝড়জল আরম্ভ হয়েছে, বাগান জলে থই থই, আর সেই গলা-জলে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড ঝড় মাথায় করে কটি বোপাটি চারা, কটি আধুনিক কবি ফুল ফোটাবার অবোধ আনন্দ নিয়ে হি-হি করে হাসছে। শুভেন্দু বিকাশদের ডেকে এই কথাটাই জোর গলায় আজ তার বলতে ইচ্ছা করছিল।

হ্যাঁ, পড়ে পড়ে তারা মার খাচ্ছে তাদের হুঁস নেই, তা না থাক, কিন্তু বেচারা ঐ মোহনবাবু? রোজ দু'বেলা করে চার ঘণ্টা চার ঘণ্টা, আট ঘণ্টা, ছুটির দিন আরো বেশি, বারো ঘণ্টা—বারোটা চেয়ার দখল করে রেখে এক ডজন কবির অনর্গল কবিতা পাঠ আর টেবিল চাপড়ানো—[illegible]। একেবারে শেষ হয়ে গেল; মোহনবাবু মরে গেল!

তাই, আজ শেষ দিন এখানে চা খেতে বসে রামানন্দের বার বার মনে হচ্ছিল, কবিতার জন্য লড়াই করে তারা যদি শহীদ হতে চলল, কবিদের অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করে বেচারা মোহনবাবু শহীদের শহীদ হয়ে রইল। 'তোমাকে নমস্কার [illegible]।' বিড় বিড় করে বলল সে, তারপর শূন্য কাপটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল।

'চলি মোহনবাবু!'

'কোথায় চললেন?' মোহনবাবু, ক্যাশের খাতা থেকে চোখ তুলল।

তাই তো, এই প্রশ্নের সদুত্তর কেমন মোহনবাবুকে কি দেওয়া যায়। ক্যাশ বাক্সের সামনে চায়ের পয়সাটা রেখে দিয়ে মশলার থালা থেকে এক চিমটি মৌরী তুলে সে মুখে পুরল। তারপর মিষ্টি করে হাসল। মোহনবাবুর চোখ দেখে সে বুঝল তার প্রশ্নের উত্তর নিয়ে মোহনবাবু মোটেই মাথা ঘামাচ্ছে না, অন্য কিছু ভাবছে, ফ্যাকাশে চোখের তারা রীতিমত ধারালো করে ঘনঘন তাকে দেখছে।

স্বাভাবিক, চিন্তা ধরল সে, একদিন হয়তো কেউ তারা মোহনবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে না, তাঁর সঙ্গে এভাবে বিষণ্ণ গলায় কেউ কথাও বলে না, দলবদ্ধ হয়ে সব দোকানে ঢোকে, চা খায় আড্ডা দেয় হই-হই করে টেবিল-চেয়ার ভাঙে, তারপর দোকানের ছোকরা বয়ের হাতে পয়সা গুঁজে দিয়ে আবার দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ে।

না, মোহনবাবু কি করে ভাববে, এই শেষবারের মতন রামানন্দবাবু, তাঁর দোকানে বসে চা খেয়ে গেল, শেষ দিনের মতন তাঁর দেখে গেল, শেষবার মশলার থালা থেকে মৌরী তুলে মুখে ফেলে গেল। দু'চোখ ভরে দেখছে, এখন একা-একা চা খেয়ে গেলেও বিকেলে পড়াতে রামানন্দবাবু দলবল নিয়ে আবার এসে ঢুকবে।

উঁহু, মোহনবাবু কি করে জানবে, আর কোনদিন কবি দলের মধ্যমণি [illegible] রামানন্দের এখানে আসা হবে না, দল ছেড়ে সে খসে পড়েছে।

না, বেচারা মোহনবাবুর জানবার কথা না, রামানন্দ চিরদিনের মতন কেবল [illegible] গোষ্ঠী ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে না, [illegible] কালের মতন তার কবিতা লেখাও শেষ হয়ে গেছে।

'কি দেখছেন?' একটু [illegible] মোহনবাবু, তার দিকে ঝুঁকিয়ে [illegible], [illegible] একটু কৌতূহল নিয়ে সে হাসল।

[illegible] নিরীহ ঠাণ্ডা মানুষ, [illegible] গেল। [illegible] কিছু পারল না, [illegible] [illegible] হল না, [illegible] সাদা মুখে একটা [illegible] হাসি ফুটে উঠল।

'[illegible] হল আপনি [illegible] রামানন্দবাবু?'

'কেন? ঠিক ধরেছেন?' এবার [illegible] শব্দ করে হাসল, এত জোরে হাসল যে তার চোখে জল এসে গেল।

ক্যাশ মোহনবাবু, আর একবার [illegible] খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়েও ফ্যাকাশে মুখে লজ্জার একটা লাল আভা দেখা দিল। কেন না এমন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কেউ এত প্রাণ খুলে মোহনবাবুর সঙ্গে [illegible] দু' বেলা তাঁর দোকানে এসে অত্যাচার করে [illegible] ভদ্রলোকের সঙ্গে কেমন এক ধরনের ঠাণ্ডা দূরত্ব রেখে চলে কবিরা।

মোহনবাবু যাতে কাজটা তাড়াতাড়ি করে ফেলতে পারে এই জন্য তাঁর রোমশ বুকের খসখসে হাতটা মুঠো করে সে ধরে ফেলল। 'আমার বেশভূষা চেহারা দেখে দুষ্ট মনে হয়, আমি [illegible] হয়ে গেছি কেমন না?' মোহনবাবুর মুখের কাছে মুখ নিয়ে সে টেনে টেনে হাসল।

মোহনবাবুও এবার মিটিমিটি হাসছিল। কবিতা বোঝে না, কিন্তু কবিদের কথা তো বলতে গেলে চব্বিশ ঘণ্টাই কানে আসছে। তাই তাঁর মুখ থেকে হঠাৎ 'হাংরি' 'আংরি' ক 'বীট' বেরিয়ে পড়লেও রামানন্দদের অবাক হওয়া কি চটেমটে চোখ লাল করে কড়া করে দু-কথা শোনানো মোটেই বাঞ্ছনীয় না। বিশেষ করে রামানন্দ তো আজ কারো উপর রাগ করতেই পারে না। আজ একলাকেই তার ভালবাসার দিন। শেষ দিন। নাহলে মোহন পালের ঐ খোঁচা খোঁচা দাড়ি ভরতি গালে তার চুমো খাওয়াই উচিত ছিল। হাতটা ছেড়ে দিয়ে সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ঠিক।'

'বড় সকাল সকাল উঠে পড়লেন' [illegible] মতন চেহারা করল মোহন পাল। একটু পরেই [illegible]বাবু [illegible]।

[illegible]

'কেন, আমার কি রাতে আর কাজ থাকতে নেই' রামানন্দ উত্তেজিত হয়ে উঠল। 'আমি [illegible] না।'

[illegible]

'ছি ছি, আমি এমন কথা বলব কেন, [illegible] নিশ্চয় মানুষ, একেবারে মানুষ, [illegible] নিশ্চয়ই মানুষ কিন্তু [illegible] কবিদেরও সুখ-দুঃখ আছে ভাল-বাসাবাসি আছে, কাজকর্ম আছে [illegible] থাকতেই হবে—নিশ্চয়ই [illegible] সুখ পান না বলে, আর কোনো [illegible] চান না বলে, কারো [illegible] পারেন না বলে আপনারা [illegible] আসেন বসেন, চা খান, কবিতা চর্চা [illegible] দেখে আমি কত সুখ পাই, কত [illegible] লাগে মনে।'

আহা, মোহনবাবু কবিদের দেখে সুখ পায়, এক নাগাড়ে কুড়ি বছর দৌরাত্ম্য চালিয়ে এমন চমৎকার দোকানটা তারা প্রায় লাটে তুলে দিল, এতৎসত্ত্বেও বেচারা ভাল মানুষ মোহন পাল তার চোখে চোখ রেখে মোনালিসার মতন মধুর হাসি হাসছে।

রামানন্দর রাগ জল হয়ে গেল। আর ইতস্তত না করে ঝুঁকে পড়ে মোহন পালের খোঁচা খোঁচা গালে চুমু খেতে গেল।

মোহনবাবু মুখটা পিছনে সরিয়ে নিয়ে অল্প শব্দ করে হাসল। রামানন্দ বুঝতে পারে। তার মুখে গন্ধ পেয়ে মাথাটা

সরিয়ে ধরে মোহন লাজুক হাসি হাসছে।

'পেটে দু'এক পাত্তর পড়েছে বুঝি।'

রামানন্দ শব্দ করল না। এই অবস্থায় রাজা মহারাজ থেকে শুরু করে কীটানু কীট কাবিটি পর্যন্ত চুপ থেকে ঘাড় হেঁট করে স্থান ত্যাগ করে। লম্বা পা বাড়িয়ে রামানন্দ রাস্তায় নেমে এল।

কয়েক পা এগোবার পর সে ঘুরে দাঁড়াল। সত্যি তার বুকের ভিতর টন টন করছিল। চিরকালের মতন মোহন রেস্টুরেন্ট ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ঐ তো দোকানটা, ডাইনে জিলিপি গজার দোকান 'প্রসাদ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার', বাঁয়ে মনোহারী দোকান 'কালিমাতা স্টোর্স', মাঝখানে 'মোহন রেস্টুরেন্ট'। ত্রিশ বছরের পুরোনো রংচটা সাইন বোর্ড মাথায় ঝুলিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে। বড় নির্জন নিঃশব্দ। ভিতরটা শ্মশানের মতন খাঁ খাঁ করছে। এমন চমৎকার নিরিবিলি অন্ধকার একটা চায়ের দোকান রামানন্দ কবে আবিষ্কার করেছিল মনে করতে পারছে না, তবে এটা তার পরিষ্কার মনে আছে, ইউনিভার্সিটিতে পড়া ঝকঝকে একটি মেয়ে দুপুরবেলা চুপ করে ওখানে চলে আসত, তারপর রামানন্দর হাত থেকে কবিতার খাতাটা ছিনিয়ে নিয়ে এক নিশ্বাসে নতুন পুরোনো সব কবিতা পড়ে শেষ করত। হুঁ, বিয়ের আগে এক বছর এবং বিয়ের পরে দু' বছর, রামানন্দর লেখা হেন কবিতা ছিল না পুরবীর মুখস্ত ছিল না। তার পরেই কবিতার নাম শুনলে তার গা-বমি আরম্ভ হয়।

'চলি মোহনবাবু, চললাম।' মোহন রেস্টুরেন্টের ওপর শেষ দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে সে হাঁটতে আরম্ভ করল।

এক মাসের ওপর পুরবী আলাদা ফ্ল্যাট ভাড়া করে চলে গেছে। আপত্তি করে নি সে। কার ব্যক্তি স্বাধীনতায় কে হাত দেয়! তবে একদিন সে সাধতে গিয়েছিল। পুরবী তার মুখে থুথু ছিটোতে বাকি রেখেছিল। রাগ করেনি সে। কার রুচিতে কে বাধা দেয়। তবে কিনা আড়াই শ' টাকা বাড়ি-ভাড়া ঐ মহিলা তার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে গেল। তা-ও অবশ্য রামানন্দ গ্রাহ্য করছে না। এই গেল। তা-ও অবশ্য রামানন্দ গ্রাহ্য করছে না। এক চমৎকার আস্তানার সন্ধান পেয়ে গেছে। মন ঠিক করতে পারছিল না এই যা। এই জন্যই যত গোলমাল ছিল। তারপর মন ঠিক হয়ে যাবার পর এখন সব ঠিক হয়ে গেছে। মাত্র মাসের মাঝামাঝি। কিছু খুচরো নিয়ে আড়াই টাকা পকেটে ঝুলছিল। চা ও ট্রাম-বাসের পয়সা রেখে ওই থেকে দু' পাত্র দিশি গিলে আসার পর মাথাটা আরও সাফ হয়ে গেছে। হুঁ, দারুণ সুন্দর এক আস্তানার দিকে সে চলে যাচ্ছে।

এই জন্য তার এত ভাল লাগছিল। পৃথিবীর সব কিছু তার ভাল লাগছে, সকলকে ভালবাসতে ইচ্ছা করছে। রাগ, দ্বেষ, হিংসা, ঘৃণা কিছুই আজ মনে নেই। কেবল পুরবী না, কারো ওপরই সে রাগ করতে পারছে না। কাউকে ঘৃণা করতে ইচ্ছা করছে না, যে কারণে হোঁতকা বিদঘুটে চেহারার মোহন পালকেও রামানন্দ চুমু খেতে গেল। তখন মোহন রেস্টুরেন্টে ঢোকার সময় কী দেখল। রাস্তার ওপাশে ডাস্টবিন ঠুকরে ঠুকরে একটা মরা ইঁদুর ঠোঁটে তুলে নিয়ে কাকটা উড়ে গেল। প্রায় প্রেমিকের দৃষ্টি নিয়ে রামানন্দ পেট ফোলা পচা ইঁদুর ও কাকটাকে দেখল। দৃশ্যটা এমন মুগ্ধ করেছিল তাকে!

এখন আবার কী দেখছে! ফুটপাতের আধখানা রোদে পিঠ দিয়ে ঘেয়ো পা-টা ছড়িয়ে দিয়ে লোকটা ফুটপাতে শুয়ে আছে, কুকুরটা কাছে আসছে, আবার পিছিয়ে যাচ্ছে, আবার আসছে, তারপর আর ভাবনা চিন্তা না, চকচক শব্দ করে পায়ের ঘা চাটতে আরম্ভ করল।

উঁহু, রামানন্দ চোখ ফেরাল না। ঘেন্নায় শিউরে উঠল না। সে ভাল করে ছবিটা দেখল। হাসল মনে মনে। ইমেজ, নতুন 'ইমেজ' খুঁজে পেয়েছে সে! রামানন্দর কবিতায় এমন ছবি দেখতে পেলে শুভেন্দু, শুভেন্দু বিকাশরা কত খুশী হত!

হুঁ, এমন দিনে এই ফাল্গুনের দুপুরে রাস্তায় বেরোলে কোন্ গাছের গায়ে কচি-পাতা এসেছে সারাক্ষণ সেদিকে সে তাকিয়ে দেখত। হুঁ, এমন দিনে, এই ফাল্গুনের দুপুরে কোন্ ঋতুমতী বালিকার গালে বসন্তের রং লেগেছে অবাক হয়ে সে খুঁজত।

কিন্তু সব কবিতা সব ইমেজ শুভেন্দুদের দের হাতে তুলে দিয়ে সে অন্য জগতে চলে যাচ্ছে। শুভেন্দু, বিকাশ এবং তাদের ছোট ছোট শিষ্যরা গালে হাত দিয়ে ভাববে, তাই তো, রামানন্দ এমন করল কেন।

হুঁ, কেন। কেন আমরা কবিতা লিখি আর মোহন পাল কেবল চিনির বস্তা দেখে? মধুবাবু কেন রাতদিন ছবি আঁকে আর মধুবাবু কেবল কাগজের ঠোঙা? কেন মানুষ টাকে পাড়ি দেবে? একটা নিয়ে মারা কাটাকাটি করে কেন? শ্রীমতী কেনেডি কেন দ্বিতীয় ওনেসিসকে বিয়ে করে? পুরবী কেন স্বামীর ঘর ছেড়ে আলাদা ঘর ভাড়া করে? মধুসূদন দত্ত ... মধুসূদনবাবুই মহাকাব্য লেখে, ... পাঁচিশ পৃষ্ঠার চাউর উপন্যাস ... কেনই বা লিটল ম্যাগাজিনের কবিতার পৃষ্ঠা হিঁড়ে ফেরিওয়ালা ... ফেনা ও কটা দাড়ি মোছে।

শুভেন্দুদের বোঝা উচিত, পৃথিবীতে মুহূর্তে মুহূর্তে কোটি কোটি 'কেন' মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। একটা 'কেন'রও কোনো উত্তর হয় না।

— সিগারেটের দোকান সামনে পেয়ে রামানন্দ চট করে দাঁড়াল। 'সিগারেট খা... [illegible] চেয়ে দোকানের আরশিটা [illegible] বেশি টানল। এক প্যাকেট সিগারেট [illegible] আর ততক্ষণ দাঁড়িয়ে আরশির মধ্যে নিজের পুরো ছবিটা দেখল। দেখে হাসল। [illegible] [illegible] ভুল করেছে। [illegible] কেবল শব্দগুলি শিখে রেখেছে। [illegible] কোনটা প্রয়োগ করতে হয় জানে না। ভদ্রলোকের বলা উচিত ছিল, [illegible] 'হিপি' হয়ে গেছেন, রামানন্দবাবু [illegible] না, রামানন্দকে 'হিপি' দেখাচ্ছে। বড় বড় চুল কানের দু'পাশে ঝুলেছে, এক মুখ [illegible] চার আনা সাদা হয়ে গেছে, [illegible] পুরবীর চোখে তার বয়স এখন [illegible] সত্তর আশী হয়ে যাওয়াও বিচিত্র [illegible] অবশ্য পুরবীর সামনে গিয়ে সে [illegible] দাঁড়াচ্ছে না, যাচ্ছে অন্য জায়গায়। [illegible] চাদরটা গায়ে জড়াল, হলদে রঙের [illegible] পাঞ্জাবিটা কদিন থেকেই গায়ের [illegible] ঝুলছে, ওটা গায়ে চড়ালেই [illegible] [illegible] 'আলখাল্লা', [illegible] 'আলখাল্লা' [illegible] শোনায়। [illegible] টেরিউল ট্রাউজারের [illegible] কদিন থেকে সে খুঁজে পাচ্ছে না, ওই ভারি সোনালি ফ্রেমটা [illegible] চশমা পুরবী সহ্য করতে পারত না। [illegible] উঠলে রামানন্দকে আরও বেশি [illegible] লোকা দেখত, ঠিক স্কুলমাস্টার [illegible] গায়, বারো বছরের বেশি মাস্টার কাছে, [illegible] —কাজেই উজবুকের মত [illegible] কবিতা লেখা [illegible] মানুষের উপায় কি। [illegible] চশমা ও পাঞ্জাবি পরা ছেড়ে দিয়ে [illegible] পুরবীর হাজরা রোডের ফ্ল্যাটে গিয়ে সে উপস্থিত হয়েছিল, [illegible] [illegible] মুখে থুথু ছিটোতে বাকি [illegible] শ্রীমতী। রামানন্দ রাগ করেনি। [illegible] কারো ওপর তার রাগ নেই, বিরক্তি নেই, ঘৃণা নেই। আজ [illegible] [illegible] কাছে [illegible] একটা ছেঁড়া ময়লা [illegible] [illegible] দাঁড়িয়ে [illegible] তারপর বিছানায় শুয়ে থেকে [illegible] চুম্বন করে।

হুঁ, রাগ দ্বেষ হিংসা ঘৃণা সে [illegible] করেছে কেননা তার মন ঠিক হয়ে গেছে। মন ঠিক হয়ে যাবার পর পৃথিবীর সব কিছু ভাল, সুন্দর গ্রহণযোগ্য [illegible] কাকের ঠোঁটে পচা ইঁদুর, [illegible] কুকুর। সব কিছুই কবিতা, গান।

মন ঠিক হয়ে গেছে বলেই আকাশের ঘুড়ি আকাশে ছেড়ে দিয়ে সে মাঠ [illegible] যাচ্ছে, সুতো কেটে যাওয়া ঘুড়ি [illegible] ভেঙে ফেলতে চলেছে, দেওয়ালে ঘর

আকাশটা দেখল, তারপর ঘাড় সোজা করে দিয়ে ঝোপজঙ্গলের দিকে চোখ ফেরাল। তারপর ডাইনে তাকাল। এবড়ো-খেবড়ো জমি, মাঝে মাঝে শ্যাওলা আগাছা নিয়ে পুরোনো জীর্ণ ইটের পাঁজা দাঁড়িয়ে আছে। বোঝা যায়, এককালে এটা ইট-খোলা ছিল। পিছন দিয়ে গাঁয়ের কাঁচা রাস্তাটা চলে গেছে।

হঠাৎ রামানন্দর চোখে পড়ল একটা ইটের পাঁজার গা ঘেঁষে একটা মানুষ চুপ করে বসে আছে। রেললাইনের দিকে মুখ করে বসে আছে ঠিকই, কিন্তু এইমাত্র খুব মনোযোগ দিয়ে রামানন্দকে দেখছিল। কখন এসে লোকটা এমন চুপচাপ ওখানে বসে আছে! না কি আগেই ছিল, সে লক্ষ্য করেনি। সার্ট ট্রাউজার্স পরা, দেখলে ভদ্রলোকের ছেলেই মনে হয়। ঝোপজঙ্গলের মধ্যে হাওয়া খেতে এল, বেড়াতে এসেছে?

খাও বাবা, হাওয়া খাও। রামানন্দ এই নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাল না। রেললাইনের দিকে মুখটা ফিরিয়ে নিল। দূরের গুমগুম শব্দটা মিলিয়ে গেছে। গাড়ি না। অন্য কিছু। ডিসট্যান্ট সিগন্যালের আলোটা এখন গাঢ় সবুজ রং ধরে জ্বলজ্বল করছে। কিন্তু এতটা সময়ের মধ্যে একটা ট্রেন এসে পড়া উচিত ছিল যে, আপ ডাউন কোনো গাড়িই আসছে না। কোথাও গোলমাল-টোলমাল হচ্ছে? আজকাল তো এই লাইনে সেই লাইনে গণ্ডগোল লেগেই আছে, ভাবল সে। কি মনে হতে তৎক্ষণাৎ আবার ইটের পাঁজার দিকে সে চোখ ফেরাল।

যা ভেবেছিল, বেশ মনোযোগ দিয়ে লোকটা তাকে দেখছে। কিন্তু যেই রামানন্দ তাকিয়েছে, চট করে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে, যেন কত ভালমানুষ, রেললাইন দেখতে আরম্ভ করল।

কি ব্যাপার! রামানন্দ বিড়বিড় করে উঠল। আমাকে এত দেখবার কী আছে, আমি তো মেয়েছেলে নই রে বাবা।

জায়গাটা খারাপ। সেদিন সে যখন এখান থেকে ফিরছিল একটা গরুর গাড়ির গাড়োয়ানের সঙ্গে ওই রাস্তার বাঁকটার কাছে দেখা। গাড়োয়ান তাকে সাবধান করে দিয়েছিল, এভাবে লাইনের ধারে একলা ঘুরবেন না বাবু, খুব ছিনতাই-টিনতাই হয়, খুন জখমও হয়, পরশু ওই ইটের পাঁজাটার কাছে একটা লাস পড়ে থাকতে দেখা গেছে। রামানন্দ গ্রাহ্য করেনি, কথাটা সে ভুলেই গিয়েছিল।

এখন মনে পড়ল। কিন্তু মনে পড়ল বলে কি সে ঘাবড়ে গেল। ভুরু দুটো একবার কুঁচকাল মাত্র। একটু হাসল। আমি তো নিজের গরজেই মরতে এসেছি রে শালা, ট্রেনের চাকার নিচে গলা দিতে এসেছি, তোর আর কষ্ট করে খুন না করলেও চলবে, কিন্তু কি চাইছিস তুই আমার কাছে? টাকাকড়ি? পকেটে চার আনা পয়সা আছে, যদি বুঝি যে এদিক-ওদিক কোনো দিক থেকেই আজ আর ট্রেনফ্রেন আসবে না, কোথাও বড় রকম গোলমাল কি রেলওয়ে স্ট্রাইকই বেধে গেছে, হামেশা যা হচ্ছে, বাসে করে বাড়ি ফিরে যাব। এই জন্যই সিকিটা রেখেছি, এ ছাড়া আমার আর কিছু নেই। হাতের ঘড়িটা পরশু বেচে দিয়েছি, ঘড়ি ফাউন্টেন পেন ও আলমারীর কিছু বই। যে জিনিসগুলো আমার প্রিয় ছিল। আড়াই শ' টাকা বাড়ি ভাড়া একলা গুনতে হয়েছে, ইয়ার্কি। ইস্কুলের মাস্টার, ক' টাকা মাইনে পাই। কবি গাধা মাস্টার স্বামীকে বেশ ভালো মতন ডুবিয়ে দিয়ে গুণবতী গিন্নী আলাদা ঘর ভাড়া করে চলে গেছে। এই দ্যাখ, আমি হিপি হয়ে গেছি, ঢোলা পাঞ্জাবি ভারি সোলের চপ্পল পরলে শ্রীমতী মুখ বেঁকাত, 'উজবুক' 'অকর্মার ঢেঁকি' 'বাউণ্ডুলে' বলে গালাগাল করত, সেসব পোশাক পরাও ছেড়ে দিয়েছি, কাজেই বুকে ছোরা মেরে বা গলা টিপে ধরে ক'গাছা কাঁচাপাকা দাড়ি আর একমাথা জটধরা লাল চুল ছাড়া কিছুই পাবি না এখানে। নিজের মনে কথাগুলি বলে রামানন্দ ভিতরে ভিতরে বেশ একটু রসিকতাই অনুভব করল।

কিন্তু সে লক্ষ্য করছিল, ময়াপারেষটির মতলব সত্যি সুবিধের না। খুব ঘনঘন তাকে দেখছে। যেন একবার উঠে আসতেও চেষ্টা করল। ইচ্ছা করে রামানন্দ লাইনের দিকে মুখটা ফিরিয়ে রাখল, এবং সেই অবস্থায় ডান চোখের মণিটা আড় করে রেখে সবই সে দেখতে পাচ্ছিল। দাঁতে দাঁত ঘষল সে। তার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। দাঁড়াও শালা, তোমায় মজা দেখাচ্ছি, গুণ্ডা, কবিতা লিখি বলে দরকার হলে আমরাও যে গুণ্ডামী গুণ্ডামী করতে একেবারে না পারি তা ভেব না, সেবার সিনেমা দেখতে গিয়ে হাতিবাগানের মোড়ে ভিড়ের মধ্যে এক কুত্তার বাচ্চা কিনা বিকাশের হাতের ঘড়ির বেল্ট কাটতে চেয়েছিল, পেছন থেকে দেখতে পেয়ে এমন লাথি মেরেছিলাম শালার কোমরে, হুঁ এই শর্মা, কবি রামানন্দ সেন, সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে গিয়ে বাছাধন চোখ উল্টে দেয় আর তোমার ঐ তো ডিমপাড়া শালিকের মতন টিনটিনে শরীর, একটা ঘুষি মারলে আর একটা ঘুষি বসাবার জায়গা নেই—

একটা ক্রুদ্ধ উত্তেজনা হয়ে উঠল সে। চারদিকে প্রগাঢ় স্তব্ধতা, এমন গভীর সুন্দর সন্ধ্যা। আকাশের ওপারে সোনালি তারাটা ঝলমল করছে, এপারে আর একটা সবুজ তারা হয়ে ডিস্টান্ট সিগন্যালের বাতিটা জ্বলছে, এই মুহূর্তে সে কত কি ভাবছিল, জীবনের শেষ সময়, মৃত্যুর অন্ধকার দেশে সে চলে যাচ্ছে, এখনই হয়তো একটা ট্রেন ছুটে আসবে—হুঁ, কবিতা, মৃত্যুর ওপর ভয়ংকর সুন্দর একটা কবিতা, খাতার পাতায় লিখে রেখে গেলে জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হত, মগজের কোষে কোষে দু'-একটা চমৎকার শব্দও খেলা করে উঠছিল, আর ঠিক এই সময়টায় কিনা চোস্ত প্যান্ট হাওয়াই সার্ট চড়িয়ে ভদ্রলোক সেজে শুয়ারের বাচ্চা ওখানে ঘাপটি মেরে বসে চালাকি খেলছে, ভেবেছে কিছুই আমি টের পাচ্ছি না।

সঙ্গে ছোরাটোরা আছে? ধারেকাছে কোথাও পটকা-ফটকা লুকিয়ে রেখেছে। তা থাকলই বা ছোরা পটকা। আমি তো মরতেই এসেছি।

রামানন্দ অবশ্য সরাসরি সামনের দিকে এগিয়ে গেল না। ডাইনে মোড় নিয়ে কোণা-কোণি হেঁটে, যেন সে ফিরে যাচ্ছে, একটু একটু করে, ভাঙা ইট ও আগাছা পার হয়ে কাঁচা মাটির রাস্তা ঘেঁষে একটা গাছের আড়ালে এসে দাঁড়াল। মানে ইটের পাঁজাটার সম্পূর্ণ পিছন দিকে চলে এল। তিন চার সেকেন্ড সেখানে অপেক্ষা করল। লোকটা কিন্তু তখনি ঘাড় ঘুরিয়ে এদিকে তাকাচ্ছিল না, রামানন্দ সন্দেহ করতে পারে, তাই যেন সময় নিচ্ছিল, অর্থাৎ আর এক সেকেন্ড পরেই ওদিক থেকে ছুটে এসে রামানন্দর ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়বে, এই মতলব বা পিছন থেকে বোমাটোমা ছুঁড়ে মারত, কিন্তু রামানন্দ বাছাধনকে সেই সুযোগই দিল না, তৎক্ষণাৎ আবার বড় বড় পা ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে ইটের পাঁজাটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

'আহা—হা! করেন কি, করছেন কি মশাই, উঃ!'

'তুই কে, এখানে কি করছিস?'

'ছাড়ুন ছাড়ুন, লাগছে, ভীষণ লাগছে!' লোকটা হাঁসফাঁস করছিল, রামানন্দ শক্ত হাতে তার গলা চেপে ধরেছে।

'তুই কে, কোথা থেকে এসেছিস, এখানে এভাবে বসে কেন?'

'আমি আমি আর্টিস্ট, ছ—ছ—ছবি আঁকি।'

'অ্যাঁ!' রামানন্দ চমকে উঠল। তৎক্ষণাৎ মানুষটাকে ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। 'কিসের ছবি আঁকা হয়, মশায়ের নামটা জানতে পারি কি?'

'জগত মণ্ডল।'

রামানন্দ দস্তুরমত স্তম্ভিত, বিমূঢ় হয়ে গেল। জগৎ মণ্ডলকে সে কোনো দিন দেখেনি, মুখটা চিনত না, তরুণদের মুখে খুব নাম শোনে, গত পরশু মোহনবাবুর চায়ের দোকানে বসে শুভেন্দুরা মণ্ডলের ছবি নিয়ে ভীষণ আলোচনা করছিল। সম্প্রতি

তাঁর ছবির একক প্রদর্শনী হয়ে গেছে, একটু অদ্ভুত ধরনের প্রদর্শনী যদিও, হাজরার মোড়ে একটা পার্কের গাছের ডালে তাঁর আঁকা তৈলচিত্রগুলি টাঙিয়ে দেওয়া হয়। শুভেন্দু বিকাশ ওরা দল বেঁধে দেখতে গিয়েছিল।

'ও আপনি জগৎ মণ্ডল, নমস্কার।'

কিন্তু মণ্ডল তখনও স্বাভাবিক হতে পারছিল না, যেন ভয়ে কাঁপছে, না কি ভয়ের চেয়ে বিস্মিত হয়েছে বেশি, বড় বড় নিশ্বাস ফেলছিল। আবছা অন্ধকারে চোখ দুটো কত বড় দেখাচ্ছে।

'মশাই, আমি তো কারো অনিষ্ট কিংবা ক্ষতিও করিনি, পেছন থেকে ছুটে এসে যে-ভাবে অ্যাটাক করলেন—'

'না না, আমার ভুল হয়েছে, ক্ষমা চাইছি, এক্সকিউজ মী, আমি অন্য কিছু মনে করেছিলাম, সেদিন ঠিক এখানটায় একটা গুণ্ডা আমার মানিব্যাগ কেড়ে নিতে চেয়েছিল কিনা।'

জগৎ চুপ।

'হ্যাঁ আপনার প্রদর্শনী হয়ে গেল।' আত্মীয়ের মতন গলার সুরে করল রামানন্দ।

'হুঁ, ঐ আর কি।' আকাশের দিক

মুখ তুলে জগত মণ্ডল লম্বা নিশ্বাস ফেলল। তারপর চোখ নামিয়ে কেমন করে যেন হাসল। 'গাছতলার প্রদর্শনী। কোনো আর্ট গ্যালারী বা হলের ব্যবস্থা করা গেল না।'

'কেন!'

'বুঝতেই পাচ্ছেন,' আঙুলের টোকা দিয়ে জগত মণ্ডল টাকা পয়সার ইঙ্গিত করল। 'আমার ছবি লোকে একেবারে নিচ্ছে না, তাদের কাছে এই জিনিস একেবারে দুর্বোধ অস্পষ্ট, কারো কারো মতে এসব নাকি ছবি না, নিছক আবোলতাবোল আঁকিবুকি পাগলামী।'

রামানন্দ অল্প হাসল। 'হুঁ, আমার বন্ধুদের মুখে শুনেছি, আপনার আশ্চর্য কম্পোজিশন আপনার অ্যাটিচিউড, আপনার ঐ যাকে বলে বিমূর্ত অঙ্কনরীতি সাধারণ মানুষ এখনো ধরতে পারছে না, তাতে আর্টিস্টের কিছু যায় আসে না, লোকমনো-রঞ্জনের জন্য আপনি কিছু তুলি ধরছেন না, নগদ বিদায়ের আশায় কিছু করছেন না, শিল্পীর খেয়াল নিয়ে যা করার করে যাচ্ছেন, আমার বন্ধুরা তাই বলছিল, আপনি আজকের ছবি আঁকছেন না, যা দিয়ে যাচ্ছেন ভবিষ্যতের সম্পদ হয়ে থাকবে, আগামী কালের মানুষ আপনার ছবির সম্মান দেবে, মূল্য দেবে।'

'আর আগামী কাল!' জগত মণ্ডল কি [illegible] করছে, [illegible] [illegible] তাই সন্দেহ হল। ও কাজে [illegible] না তো আগামীকাল নিয়ে কথা [illegible] শেষ করে মণ্ডল অন্ধকার রেল লাইনটার দিকে কেমন ঘরে যেন তাকিয়ে রইল।

কাজেই রামানন্দর সন্দেহটা আরও ঘনীভূত হল। ভুরু কুঁচকাল সে। এ কথা কি সরাসরি জিজ্ঞেস করা যায়। ইতস্তত করছিল।

'যাই হোক,' রামানন্দ শেষটায় মাথা নাড়ল। 'আপনি আপনার সাধনা করে যান, একদিন ফল পাবেন ঠিকই—ঠিক, ভাল কথা,' রামানন্দ আর যেন লোভ সামলাতে পারল না। 'কিছু মনে করবেন না, আমাদের প্রত্যেকের একটা করে বাইরের জীবন যেমন আছে, তেমনি ঘরের জীবনও আছে, আপনি শিল্পী, তাই আরো বেশি জানতে ইচ্ছে করছে—আপনার এই শিল্প-চর্চা নিয়ে বাড়ির লোক কি বলছে?'

'কে? আমার ওয়াইফ?' যেন অনেক দুঃখে জগত মণ্ডল হাসল। 'ছবি এঁকে এক পয়সা আয় নেই, নিয়মমত রেশন তোলা হয় না, বাড়িভাড়া জমে গেছে—কাজেই বুঝতে পারেন ব্যাপারটা কী দাঁড়ায়।' একটু থেমে মণ্ডল আবার বলল, 'কেবল কি স্ত্রী, ছেলে মেয়ে দুটো পর্যন্ত খেপে গেছে, তিনজন মিলে প্রায় তেড়ে মারতে আসে, বাড়ি থেকে আমার পালিয়ে বেড়াবার অবস্থা।'

'তাই বুঝি এখানে চলে এসেছেন!' চোখ দুটো গোল করে ফেলল রামানন্দ।

জগত মণ্ডল হঠাৎ কথা বলল না।

কিন্তু রামানন্দ সেখানেই থেমে থাকল না।

'নিশ্চয় ট্রেনের অপেক্ষা করছেন, কখন একটা গাড়ি ছুটে আসবে, তাই না?'

'গাড়ি!' আকাশ থেকে পড়ার মতন সুর করল মণ্ডল। 'আমি তো গাড়ি চড়ে কোথাও যাচ্ছি না, তা ছাড়া এখান থেকে স্টেশনটা অনেক দূরে, মাঠের ওপর ট্রেন দাঁড়াবে কেন।'

'অ—অ—' অপ্রস্তুত হল রামানন্দ, লজ্জা ঢাকতে বড় করে একটা ঢোক গিলল। 'এমনি বেড়াতে এসেছিলেন?' কিন্তু কথাটা সে পুরে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

'হ্যাঁ,' জগত মণ্ডল অন্ধকারে মাথা নাড়ল। 'একটু আগে কেমন টকটকে রং ছড়িয়ে সূর্য অস্ত গেল, আবার দেখতে না দেখতে চারদিক অন্ধকার—'

'মানে লাল আর কালোর কম্পোজিশনটা কেমন দাঁড়ায় স্টাডি করছিলেন?' রামানন্দ ইচ্ছা করে কতকটা বেহায়ার মতন হাসল।

'কিন্তু মশায়ের এখনো পরিচয় পেলাম না।' জগতও অল্প শব্দ করে হাসল।

'আমার নাম রামানন্দ সেন।'

'কবি রামানন্দ সেন! মাই গড! নমস্কার নমস্কার, ছেলেছোকরারা, হ্যাঁ, তরুণীরাও শুনি আপনাকে মাথায় করে নাচে, দারুণ সব আধুনিক কবিতা বেরোচ্ছে আপনার হাত দিয়ে—হঠাৎ এদিকে?'

'এই একটু ঘুরতে ঘুরতে—' রামানন্দ ঘাড় চুলকাল। 'ভারি নিরিবিলি সুন্দর জায়গা।'

'হ্যাঁ, কবি শিল্পীদের বেড়াবার পক্ষে আদর্শ, আসুন সিগারেট খাওয়া যাক।' পকেট থেকে একটা দুমড়ান সিগারেট বের করে জগত মণ্ডল আধখানা নিজে রাখল, বাকি আধখানা ছিঁড়ে রামানন্দর হাতে তুলে দিল।

'তারপর?' আধখানা সিগারেট পেয়ে রামানন্দ মন খুশি হল না। 'এখন কোন্ দিকে যাওয়া হবে, না কি ফেরা বাড়ি?'

দেশলাইটা পকেটে ঢোকাল জগত, এক গাল ধোঁয়া ছাড়ল। 'আপনি?'

'আমি কিছু ঠিক করিনি।'

'চলুন তা হলে, ওদিকটা কেমন রোশনাই হয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছেন? একটু ঘুরে আসা যাক।' জগত মণ্ডল একদিকে আঙুল তুলে দেখাল।

রামানন্দ দেখল অন্ধকার গাছপালার ওপারে গাঁয়ের দিকে বেশ আলোটালো জ্বলছে।

'কি হচ্ছে ওখানে?'

'যাত্রা, ক'দিন ধরেই হচ্ছে, আজ শুনছি নবারুণ অপেরার সুসোভিনি পালা হবে।'

'বাঃ, চমৎকার, বেশ তো!' রামানন্দ খুশি হল। 'চলুন দেখে আসা যাক।'

'আর ঐ যে দূরে আর একটা আলো দেখতে পাচ্ছেন?' জগত আর একদিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল।

'হুঁ', রামানন্দ মাথা নাড়ল। 'ওখানে কি!'

'শতরূপা নাট্যগোষ্ঠীর মিনি নাটক থার্ড নাটিকা হচ্ছে।'

'সে আবার কি!' রামানন্দ বিড় বিড় করে উঠল।

'বা-রে, আপনাদের যেমন দিনের কবিতা ঘন্টার কবিতা মিনিটের কবিতা লেখা হয়, মিনি পত্রিকা মিনি উপন্যাস ছাপা হয়, তেমনি ওদেরও মিনি নাটক থার্ড নাটিকা, হ্যাঁ, এক মিনিটে একটা নাটক শেষ—একঘন্টা বসলে এক সঙ্গে ষাটটা অভিনয় দেখে আসবেন।'

'চমৎকার!' রামানন্দ গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। 'দেশে শিল্প সংস্কৃতির বান ডাকছে, আমাদের এখনো একেবারে নিরাশ হবার কিছু হয় নি।'

'তাই', রামানন্দর কাঁধে হাত রাখল জগত। 'চলুন, না হয় গাঁয়েই একটু করে টুকি দিয়ে দেখে তারপর ময়দানে সার্কাস দেখতে যাব, না কি রেশ দৌড়ে যাবেন? চলুন না হলে, দু ভাইয়ে মিলে আনন্দ করতে রেশ দৌড়ে চলে যাওয়া যাক।'

'রেস্ত?' রামানন্দ এবার হাসল। 'আমার পকেটে মাত্র একটা সিকি।'

'ঘাবড়াচ্ছেন কেন। আমার কাছে রেস্ত আছে। জগত মণ্ডলের ছবির ভবিষ্যৎ বুঝতে পেরে ভয় পেয়ে গিন্নী একটা কারখানায় ঢুকে পড়েছে, কাল গেল মাসের মাইনে নিয়ে ঘরে ফিরতে ওর ব্যাগ থেকে কুড়িটা টাকা চুরি করেছি।' অন্ধকারে দাঁত বার করে জগত হি-হি করে হাসল। 'তবে ওর টাকা আমি রাখব না, ফিরিয়ে দেব, এক কুড়ি এনেছি, পাঁচ কুড়ি ওর হাতে তুলে দেব এমন দিনের আশা রাখি, কি বলেন?'

রামানন্দ চুপ, কথা বলতে পারছিল না, তার মনে হল এই ব্যক্তি কোনোদিন লাইনের ধারে ছুটে যাবে না, ঘুড়ি ওড়ান বন্ধ রেখে কোনোদিনই মাছ ধরতে আসবে না, বরং যেন এক সঙ্গে তিনটে ঘুড়ি ওড়াবার ক্ষমতা রাখে সে। সেই মেজাজ সেই প্রফুল্লতা নিয়ে, সেই বিক্রম ও হিংস্রতা নিয়ে বড় বড় পা ফেলে জগত মণ্ডল হাঁটছিল, রোগা টিনটিনে শালিক না, রামানন্দর মনে হল বাঘের সঙ্গে চলেছে সে, এক খাঁটি শিল্পীর দেখা পেল। মণ্ডল গলা খুলে গান গাইছিল।

শেষ পর্যন্ত রেঙ্গুনে বেশ ধুমধাম করেই দুর্গাপুজো হয়ে গেল।

কিন্তু পুজো হবার আগে পুজোর আয়োজন বন্দোবস্ত নিয়ে যে মহাভারতের যুদ্ধ হয়ে গেল তার হিসেবনিকেশ পেলে আপনি তাজ্জব বনে যাবেন।

মহাদেবকে আপনি নিশ্চয় চেনেন। আজকাল রেঙ্গুন শহরে থাকলে মহাদেবকে চিনতেই হবে। মহাদেব হল রেঙ্গুনের নারদ মুনি। এই শহরে প্রতি বাড়ির হাঁড়ির খবর আপনি মহাদেবের কাছে পাবেন। আজকাল রেঙ্গুনের বাঙ্গালী সমাজের ভেতর যে এত ঝগড়া বিবাদ তার পেছনে রয়েছে মহাদেব। চণ্ডালিকা নাটক নিয়ে কলকাতার কাগজে এত লেখালেখি হল, বাকবিতণ্ডা হল—সব কিছুই নাকি মহাদেব করেছিল।

যাক, একদিন মহাদেব আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে আমাকে এসে বলল : দাদা, এবার রেঙ্গুনে আর মা দুর্গার পুজো হবে না। আজ সকালে মা দুর্গার নামে কোর্টে নালিশ ঠুকে দিলাম।

মহাদেবের কথা শুনে আমি বিস্মিত হলাম। কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলুম : সে কী হে, মা দুর্গার নামে নালিশ ঠুকে [illegible] ব্যাপারটা কী একটু খুলেই বলো না [illegible]।

[illegible] মহাদেব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সিগারেট [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] একটি সিগারেট [illegible] [illegible] এক লম্বা টান দিয়ে [illegible] [illegible] বললে : বলব না, বলব না। [illegible] [illegible]।

কিন্তু এমন মুখরোচক খবর শুনবার [illegible] আমার মন ব্যাকুল হল। আমি মহাদেবকে চেপে ধরলুম, বললুম : মহাদেব [illegible] তোমাকে বলতেই হবে।

মহাদেব সিগারেটে টান বন্ধ করল। তারপর [illegible]দিকে তাকিয়ে বলল : কাউকে বলবেন না।

: পাগল হয়েছ—আমি মহাদেবকে আশ্বাস দিলুম।

: আজকের সকালের কাগজ পড়েছেন? [illegible] আদালতের সমক্ষে প্রকাশিত হয়েছে দুর্গাপুজো কমিটির বিরুদ্ধে আমরা [illegible] কেস করেছি। আমরা পুজো কমিটিকে [illegible]। কমিটি বেআইনী। কিন্তু বাজারের [illegible] পুরো খবর এখনও জানতে পারিনি। [illegible] আবহাওয়া দেখে মনে হচ্ছে [illegible] রেঙ্গুনে আর দুর্গাপুজো হবে [illegible]। প্রতি বছর এই সময়ে যারা চাঁদা তোলে [illegible] রেস্তোরাঁয় চপ কাটলেট খেতে যায়। [illegible] এবার সবাই রেস্তোরাঁর সামনে ঘুর [illegible] করছে। পয়সার অভাবে ভেতরে ঢুকতে

পারছে না। কিন্তু [illegible] [illegible], এই খবর নিয়ে [illegible] [illegible] বলবেন না। ভারী ফুর্তি হবে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মহাদেব বলল : যাক, আগামী বছর রেঙ্গুনের দুর্গাপুজো নিয়ে আর চিন্তা করতে হবে না।

মহাদেবের [illegible] এবং কথা বলবার ভঙ্গী শুনে আমি প্রথমে খানিকটা আতঙ্কিত হয়েছিলুম। কিন্তু পুরো খবর শুনবার পর খানিকটা আশান্বিত হলুম।

যাক্ ব্যাপারটা বিশেষ গুরুতর নয়। কিন্তু আগামী বছরের দুর্গাপুজো নিয়ে কোন চিন্তা-ভাবনা করতে হবে না শুনে আমার মনে কৌতূহল জাগল। জিজ্ঞেস করলুম : আগামী বছর পুজোর কী বন্দোবস্ত করলে?

: আমাদের সি সি বোসকে চেনেন তো—মুখ থেকে সিগারেটের একরাশ ধোঁয়া বের করে মহাদেব বলল।

সি সি বোস। উনি আবার কে?

আমি বিস্ময় প্রকাশ করলুম।

: বুঝেছি দাদা, আপনি রেঙ্গুনে সদ্য এসেছেন। এখনকার আদব-কায়দায় এখনও রপ্ত হননি। আজকাল রেঙ্গুন শহরে এত ঘোষ, বোস, মিত্র হয়েছে যে কারো নাম ধরে ডাকবার যো নেই। পদবীর সঙ্গে আমরা কাজের পরিচয় জুড়ে দিই। যেমন ধরুন, ঐ যে ফুড ডিপার্টমেন্টে ঘোষ সাহেব কাজ করেন, আমরা ওঁকে ফুড ঘোষ বলে ডাকি। গোলাপ ফুলের চাষ করেন যে ভদ্রলোক, ওঁর নাম হল রোজ ঘোষ। আমাদের ইউনিভার্সিটি নিউক্লিয়ার ডিপার্টমেন্টে যে ঘোষ সাহেব কাজ করেন ওঁর নাম হল নিউ-ক্লিয়ার ঘোষ। নাম শুনলেই বুঝতে পারেন ভদ্রলোক কী কাজ করেন। যাক্ আজ যার কথা বললাম ওর নাম হল চাঁদিয়াৎ চন্দ্র বোস। আমরা সংক্ষেপে ওকে সি সি বোস বলে ডাকি। দুষ্টু লোকেরা ওকে গুলবাজ বোস বলে ডাকে। কিন্তু দিশী নাম সি সি বোসের একেবারেই পছন্দ নয়। যাক, সেদিন সি সি বোস আমাকে ডেকে বললেন :

মহাদেব, আগামী বছর আর তোদের দুর্গাপুজো নিয়ে কোর্টে যেতে হবে না। ভেবেছি আগামী বছর রেঙ্গুনের দুর্গাপুজো ইউনাইটেড নেশনসেই করবো। হাজার হোক ইউনাইটেড নেশনসের বড়ো কর্তা উ থান্ট তো বর্মা দেশেরই লোক। আর্জি করলেই ওইখানে পুজো করবার হুকুম মিলে যাবেই।

মহাদেব কথা শেষ করবার আগেই আমি চীৎকার করে উঠলুম। বললুমঃ তুমি কী বলছো মহাদেব। রেঙ্গুনের দুর্গা পুজো ইউনাইটেড নেশনসে হবে? তুমি কী পাগল হলে। আমার কণ্ঠস্বর শুনে মহাদেব একটুও ঘাবড়াল না। বেশ নির্লিপ্ত কণ্ঠেই জবাব দিলঃ রেঙ্গুনের দুর্গো পুজো ইউনাইটেড নেশনসে হবে না তো কোথায় হবে! রেঙ্গুনের দুর্গো পুজো নিয়ে কী কম ঝামেলা হচ্ছে। এর কাছে তো কাশ্মীরের সমস্যা একেবারে নস্যি। সি সি বোস আরো কী বললেন জানেন। বললেনঃ মহাদেব কোন চিন্তা করিস নে। আমি যখন তোদের পেছনে আছি তখন দেখবি কেমন জাঁকজমক করে পুজো হয়। আমি যখন লণ্ডনে ছিলুম তখন আমরা দুর্গো প্রতিমার বায়না দিতুম বিলেতে। অক্সফোর্ড থেকে মা সরস্বতীকে আনতুম, স্কটল্যাণ্ড থেকে লক্ষ্মীকে। অর পুরুত আমদানি করতুম কোত্থেকে জানিস মহাদেব?

—কোত্থেকে?

ম্যাকসমুলারের দেশ জর্মানী থেকে। বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ করতে পারে, এমনি পুরুত আনতুম। আর দুর্গো প্রতিমার সামনে 'নেটিভ ডান্স' হতো না।

ঃ নেটিভ ডান্স! এবার আমার বিস্ময়ের পালা। আমার প্রশ্নের ভঙ্গী শুনে মহাদেব একটু মৃদু হাসল। বললঃ আমিও নেটিভ ডান্সের কথা শুনে প্রথমে একটু ভড়কে গিয়েছিলুম। কিন্তু সি সি বোস বললেনঃ নেটিভ ডান্স মানে আরতি নৃত্য। ধুপ-ধুনো নিয়ে কি আজকাল কেউ নাচে। দেখবি আগামী বছর তোদের রেঙ্গুনের বাঙালীর ছেলেমেয়েরা মা দুর্গোর সামনে টুইস্ট নাচবে।

মহাদেবের কথা শুনে আমার চক্ষু চড়ক গাছ। বলুন, এ কথা শুনে আমি ভড়কে যাব না কেন? আগে এই রেঙ্গুনে দুর্গো পুজো কত জাঁকজমক করেই না হতো। বর্ষা শেষ হলো তো রেঙ্গুনে পুজোর বাজনা বেজে উঠত। অর পুজোর কটা দিন ঐ দুর্গাবাড়ির সামনে দিয়ে হাঁটাই ছিল এক দুরূহ কাজ। সেদিন রেঙ্গুনের রাস্তা দেখলে কে বলবে এ হল বর্মার রাজধানী রেঙ্গুন। মনে হতো এ হল কলকাতা। সবাই বাংলায় কথা বলছে, অঞ্জলি দিচ্ছে, আরতি হচ্ছে। আর রেঙ্গুনের বিজয়ার বর্ণনা নাই বা দিলুম। সাতদিন ধরে বিজয়ার কোলাকুলি আর মিষ্টিমুখ চলত। তখন পুজো কমিটির কর্মকর্তা ছিলেন পি কে বাসু, ময়না বাসু, শচী নিয়োগী, নির্মল সেন এমনি সব জাঁদরেল লোক। ওদের কাছে পুজোর চাঁদা চাইলেন, অমনি ঝনাৎ করে দশ হাজার টাকা ক্যাশ ফেলে দিল।

কিন্তু আজকাল আর পুজোর জৌলুস কোথায়? ঐ দুর্গাবাড়ির সামনে এখন প্রদীপ টিমটিম করে জ্বলছে। আগে এই রেঙ্গুন শহরে সবচাইতে বড় পুজো হতো দুর্গাবাড়িতে। শহরতলীর ছোট পুজোর কথা মিলিয়ে পুজো হতো তিনটে কি চারটে। কিন্তু আজকাল শহরের প্রায় অলিগলিতে দুর্গো পুজো হচ্ছে। চীনেদের মহল্লায়, মুঘলস স্ট্রীটে পুজোর মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে।

আমি আবার মহাদেবকে জিজ্ঞেস করলুম : মহাদেব, তুমি সি সি বোসের কথাগুলো বিশ্বাস করো? আমার প্রশ্ন শুনে মহাদেবের মুখে একটু চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। বলল : দাদা, সি সি বোস হলেন জনি ওয়াকারের বন্ধু। তাই কখন যে সত্যি কথা আর কখন যে গুল দেন বুঝতে পারিনে। কিন্তু দাদা, একবার যদি ওই ইউনাইটেড নেশনসে দুর্গো পুজো করতে পারি তখন সবাই এই বান্দাকে সেলাম ঠুকবে।

তারপর কণ্ঠস্বর আর একটু নীচু করে মহাদেব বলল : আর একটা মুখরোচক খবর শুনেছেন?

: কী? আমি এবার বেশ একটু উত্তেজিত হয়েই জিজ্ঞেস করলুম। বুঝতে পারলুম মহাদেবের গল্পের ভাণ্ডার উদ্বেলিত করছে। মনে আর কোন সন্দেহ রইল না যে, রেঙ্গুনের বাঙালী সমাজে গৃহযুদ্ধ আসন্ন। তাই আমার মহাদেবের মনের খবর জানবার আকাঙ্ক্ষা আরো তীব্র হল।

মহাদেব মৃদুস্বরে বলল : দাদা, পাড়ায় পাড়ায় সবাইকে উসকানি দিচ্ছি। কাউকে বলছি, তুমি পুজো কমিটির প্রেসিডেন্ট হও, কাউকে বলছি তুমি সেক্রেটারী না হলে পুজোর আসর জমবে না। আমি দাদা [illegible] চাঁদা কী করে হাত করা যায় [illegible] করছি। পুজোর পর যদি [illegible] না পারলাম, তিন দিন [illegible] আর এক সপ্তাহ [illegible] না পারলাম, তাহলে আর পুজো কমিটিতে রইলাম কেন? কিন্তু ওরা কী এক কাণ্ড জানেন? ওরা সংকল্প করেছে আমাকে পুজো কমিটি থেকে বাদ দেবে। তাই তো কোর্টে পুজো কমিটির বিরুদ্ধে নালিশ ঠুকে দিলাম। আমার বক্তব্য হল, নো মহাদেব, নো দুর্গো পুজো। কিন্তু আমি প্রতিবাদ করলুম : মহাদেব, তুমি আইন আদালতে কেস করে বাঙালী সমাজের মুখে চুনকালি দিলে। এর পর কী আর আমরা বিদেশীদের কাছে মুখ দেখাতে পারব।

: আপনি কী বলছেন দাদা? বাঙালী সমাজ? এই দুটি কথা বলেই মহাদেব মদন বোসের এক নৃত্যের ভঙ্গী করে বলল : বাঙালী সমাজ! ছিঃ ছিঃ এত্তো জঞ্জাল। শুনুন দাদা, বাঙালী সমাজের বক্তার কেত্তন যদি আপনার কাছে করি তা হলে আপনি চোখে কানে আঙুল দেবেন। অতীতের রেঙ্গুনের বাঙালী সমাজ কী আর বেঁচে আছে। আগের দিনের বাঙালীদের দেখলে চোখ জুড়িয়ে যেত। তখনকার বাঙালীদের দিল ছিল, ভালোবাসা ছিল। ক্লাবে বৈঠকী আড্ডা ও খোস গল্প হত। কেউ কারু গলা কাটত না। সবাই আমাকে বলে, মহাদেব, রেঙ্গুনের এই বাঙালী সমাজের ঝগড়া-বিবাদের মূলে হল তুমি। অর্থাৎ ওরা বলবে এই বাজারে আমি অধম্মো করছি আর ওঁরা পুণ্যি করছেন। ওদের কথা একেবারেই বিশ্বাস করবেন না। প্রতিদিন ওরা ঠাকুর দেবতার কাছে গিয়ে : ঠাকুর-ঠাকুর করছেন। ওঁদের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। তখন ওদের দেখলে মনে হবে যে ওঁদের ভক্তির সীমা নেই। কিন্তু আসলে ওঁরা ঠাকুরের নাম করছেন না ছাই। মনে মনে বলছেন : ঠাকুর, এবার চণ্ডালিকা নাটকে বংশলোচন আমাকে বড্ডো নাকানি চুবানি দিয়েছিল। ঠাকুর, তুমি শিগগির ওর একটা বাম্মো ধরিয়ে দাও। নিদেনপক্ষে ওলাওঠা।

একটানা কথা বলে মহাদেব ক্লান্ত বোধ করল। খানিকক্ষণ জিরিয়ে আবার বলতে লাগল : সেদিন শোয়ে ডাগন প্যাগোডাতে গিয়েছিলুম। সেইখানে গিয়ে দেখলুম আমাদের বকসীর মেয়ে নৃত্যকালী কী ভক্তিভরে পুজো করছে। ওর পুজোর বহর দেখে বকসীকর্তা আমাকে বললেন, 'মহাদেব দেখেছিস, মেয়েটার ভগবানের উপর কী ভক্তি।' কিন্তু দাদা আপনাকে আমি সত্যি করে বলছি, নৃত্যকালী আপনমনে ভগবানকে বলছিল : বাবা ঠাকুর, এম্ব্যাসীতে এক নতুন প্রেম [illegible] এসেছে। ঐ বউটা আমাদের কলেজের সেক্রেটারী। ঐ লোকটা [illegible] পর কলেজের আইনকানুন কড়া হয়েছে। এখন আর প্রেম করতে পারছিনে, পরীক্ষায় টোকাও বন্ধ হয়েছে। ঠাকুর, তুমি শিগগিরই ওকে বদলি করে দাও। আর ঐ চণ্ডালিকা নাটকের দিন রবীন্দ্রসংগীতের [illegible] কী প্রার্থনা করছিল জানেন? 'ঠাকুর, ওরা আমাকে গান গাইবার সুযোগ দেয়নি। ওদের গান করবার গলা যেন ভেঙে যায়, যারা নাচবে ওদের কোমরে যেন বাত হয়।'

এবার আমি হেসে বললুম : এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি দুর্গো পুজো কমিটির উপর তোমার এত রাগ কেন? কিন্তু মহাদেব এই ব্যাপারটির সমাধান তুমি কোর্টে নালিশ না ঠুকেও করতে পারতে। একটা পিসফুল সলুসোন করতে পারতে!

মহাদেব একটু হেসে বলল : সে চেষ্টা কি করিনি দাদা। পুজো কমিটিকে হটাবার জন্যে সব চেষ্টাই করেছিলুম। প্রতিবাদ, ইস্তাহার, মিছিল এমন কি অনশনের হুমকি দিয়েছিলুম। কিন্তু আমাদের পুজোর মাতব্বরেরা হলেন সিণ্ডিকেটের মেম্বার। নট নড়নচড়ন। তাই বাধ্য হয়ে ঠিক করলুম বিক্ষোভ মিছিল বের করব। কিন্তু জানেন তো, রেঙ্গুনে সরকারের বিনা অনুমতিতে কিছুই করবার জো নেই। সরকারের কাছে আমাদের নিবেদন জানালুম। কিন্তু আমাদের কথা শুনে ওরা বলল : রোলিজিয়নের বিরুদ্ধে ডেমোনো-স্ট্রেশন। অসম্ভব! এটা ভগবান বুদ্ধের দেশ। এখানে আমরা অধম্মো করতে দিতে পারিনে। ওদের নিষেধ শুনে বললুম : বেশ, তা হলে টেগোর কলেজের বিরুদ্ধে ডেমোনোস্ট্রেশন করতে দাও। মাস্টারেরা পড়ায় নি। ইউনিভার্সিটির পরীক্ষায় কলেজের রেজাল্ট খারাপ হয়েছে। হাণ্ড্রেড পার্সেণ্ট ফেল। কিন্তু পুলিসের কর্তারা আমাদের প্রস্তাবে গররাজি। খাতা খুলে বলল : এ বছর আমরা দুটো ছাত্র বিক্ষোভ হতে দিয়েছি। দুটোর বেশী স্টুডেন্টস প্রসেশন হতে দিতে পারিনে। কিন্তু একবার যখন গোঁ ধরেছি তখন মিছিল বের করতেই হবে। বললুম : সার, মিছিল আমাদের বের করতেই হবে। শুধু কী বিষয় এবং কার বিরুদ্ধে মিছিল করব এইটে বলে দিন।

সরকারী দাদা এবার খানিকক্ষণ চোখ বুজে চিন্তা করলেন। তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন : ভিয়েতনাম। আমি আঁতকে উঠলুম। বললুম : ভিয়েতনাম!

: হাঁ, এই একটা বিষয় নিয়ে তোমরা প্রতিবাদ জানাতে পার। কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। আমি এবার একটু অনুনয় বিনয় করে বললুম : কিন্তু ভিয়েতনাম কোথায় আমি জানিনে।

: জানবার দরকার নেই। মিছিল করো তো, স্লোগান দাও, 'রিমেমবার ভিয়েতনাম।' আমি কী ছাই জানি ভিয়েতনাম কোথায়? মহাদেব বলল।

সার, ভিয়েতনামের বিষয় নিয়ে মিছিল করার অনুমতি মিলল। কিন্তু আপনি ভাবছেন যে, ভিয়েতনামের সঙ্গে মা দুর্গোর সম্পর্ক কোথায়? কিন্তু মহাদেব শর্মাকে তো আপনি চেনেন না। সরকারী নির্দেশ শুনে আমি ঘাবড়ালুম না। একটা নতুন স্লোগান বের করলুম। সুকুমার রায়ের সেই কবিতা আপনার মনে আছে তো। 'আওয়াজখানা দিচ্ছে হানা দিল্লি থেকে বর্মা'। কিন্তু আজকাল রেঙ্গুনে বসে আমরা

আছে, আরো আছে

নালিশ জানিয়ে চিঠি লিখেছেন এক পাঠক : 'ফরাসিদের চোখে ভারত' সিরিজ বন্ধ হল কেন...রোলাঁ, মালরো, মিশো, কানোত্তি বাদ, আর কেউ নেই যিনি ভারতে এসে পড়বার মতো জানবার মতো কিছু লিখে গেছেন? স্টক ফতুর?

আমার কলম 'গুঞ্জরিয়া কহে, নহে নহে নহে...' আছে অপেক্ষমান দীর্ঘ তালিকা। শুধু ইতস্তত করি, কোনগুলোর দাবি বেশি : আধুনিকতর বর্ণনার না প্রাতিভু-ঐতিহাসিক বিবরণের?

লানজা দেল ভাস্তোর নাম ইতিমধ্যে অনেকেই জেনেছে। শুনেওছে কেউ কেউ, দক্ষিণ ফ্রান্সে L'arche (লার্শ) নামে এক উপনিবেশ চালান তিনি—গান্ধীনীতির আদর্শে। জন্ম ১৯০১, রাজবংশ; কবি, দার্শনিক, জহুরি; ভারতে এসেছিলেন ১৯৩৭-৩৮-এ। 'উৎস-সন্ধানে তীর্থপথিক' নামক চারশো-পাতার এক বইয়ে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন।

পক-প্রণালীর এপার-ওপার

প্রথম পদার্পণ সিংহলে। ভালো-খাবার উদ্ভিদ এখানে কম, কয়েকদিন থাকার পর মন্তব্য করেন : "য়ুরোপ এই দরিদ্র দেশটিকে শোষণ করে—খাঁটি কথা; কিন্তু সে জাতির উপর জাতির শোষণ, ব্যাপক, সার্বিক, নৈর্ব্যক্তিক; আর এরা আমাদের শোষণ করে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, জনে জনে : হোটেলের খাট বা খাটিয়া, ছারপোকার গুলজার, চার্জ গলা-কাটা; দোকানদারদের ঘ্যানঘ্যানে উপরোধ, গছিয়ে নেওয়ার জন্য ঝুলোঝুলি, ভিখিরিদের নাছোড়পনা...

"এরা এত আলাদা—জাতে, ধর্মে, ভাষায়। বসে না একত্রে, খায় না এক সঙ্গে, পান করে না এক কুয়োর জল। পরস্পরকে দেখবে শুনবে—এত ভালোবাসা নেই। হানাহানি, কাটাকাটি করবে—এত ঘৃণাও নেই। কেবল এক অন্যের প্রাঙ্গণে ঘোড়া আর ষাঁড়ের সহাবস্থান!"

লক্ষ্য করেন, "এখানে সবাই ছোটে—কিছু টানছে কি কিছু বইছে, হাঁটে না, ছোটে, ছায়া ও বিশ্রামের উদ্দেশে সকলে ধাবমান।"

এক জেলেকে—সে বৌদ্ধ শুনে—তাঁর প্রশ্ন : "মাছ ধরতে, মাছ খেতে মানা নেই তোমাদের?" জেলের উত্তর : "আমাদের ধর্ম মারতে নিষেধ করে, খেতে তো নয়! তা দেখুন, আমরা তো আর মারি না, শুধু বঁড়শি ডুবিয়ে দিই জলে—মাছ আপনি এসে বঁড়শি কামড়ে মারা পড়ে!"

...এবার এসে আরম্ভ হয় তাঁর 'ভোগ ধর্মের' পাঠ; তাঁর শার্ট, প্যান্ট, কোট তস্করের গায়ে ওঠে : "প্রবাদ আছে, আদুল-গায়ের লোকই সুখী। সে অর্থে বিপুল গৌরবে সুখের আঙিনায় আমার হল প্রবেশ লাভ।" কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বিতীয় অঙ্গরূপে মাথাটাও মুড়িয়ে ফেললেন, গায়ে চড়ালেন গৈরিক পরিচ্ছদ—আর সঙ্গে সঙ্গে কুড়ি থেকে তিন গুণ খরচ এক লাফে নেমে গেল তাঁর : "এখন আমি, এমন কি অনায়াসে, সেই বিলাসও করে নিতে পারি, য়ুরোপীয়েরা যার সুযোগ কখনো পায় না : দিতে পারি প্রার্থিত মূল্যের বেশি, যদি তা নিতান্তই 'সৎ ও ন্যায্য' ঠেকে।"

গায়ের চামড়া অবশ্য সাদাই রয়ে গেল—সেটা আর লুকোবেন কি করে? "ভারি লজ্জা করে আমার, ওই অনাবৃত কালো কালো চেহারাগুলোর উপর হিংসে হয়...!"

ভারতীয় খানার সঙ্গে তাঁর প্রথম অঙ্গুলি-মোকাবেলাও হল এখানে। 'হাতের তেলো পেরিয়ে কব্জি বেয়ে ঝোল গড়াল, গাল-চিবুক মাখামাখি হল বেজায়। শুধু কি তাই? মনের মতো পেট-জ্বালানো কি সব সবজি, আর ঐ পানীয়—গোলমরিচ-মেশানো জল। ঝালে ঝাঁ-ঝাঁ করা নাক-কান নিয়ে (সম্ভবত নাক-কান মলে) তিনি উঠে এসেছিলেন, হাত বাড়িয়ে জলের ঘটিটা নিতে নিতে ভেবেছিলেন, গোটা একটা বাথ-টাব হলে ভালো হত। ভোজের দাম, মাত্র তিন আনা। মাত্র নয়, উচিত দাম!

বিপুল উদ্যমে ভারতীয় বনে যাওয়ার চেষ্টা তিনি চালিয়ে যান; তাঁর স্থির বিশ্বাস, "ঔপনিবেশিক টুপি পরে য়ুরোপীয়ের পক্ষে ভারতীয়দের বুঝতে যাওয়া পণ্ডশ্রম। তিন বছর এদের উপর রাজত্ব করে যেতে পারে শ্বেতাঙ্গরা, ব্যবসাও চালাতে পারে, শেখাতে ও শিখতে পারে, কিন্তু তবু, তারা চলে যাবে এদের না জেনেই। কেন? স্রেফ চোখ মেলে দেখেনি বলে। বিদেশীরা এখানে অপরাপর বিদেশীর সান্নিধ্যেই দিন কাটায়, ভারতীয় সঙ্গ বলতে ঐ সংবেদন গৃহভৃত্য! এই বিপুল, বিশাল ও সুপ্রাচীন দেশের অবেক্ষণ-নিরীক্ষণ উক্ত ভৃত্যের চোখেই সারা হয় তাঁদের।"

কি কাণ্ড! এরা খালি-খালি তাঁকে মালা পরাতে চায় : "কেন? আমি কি শিবলিঙ্গ?" শিবের মন্দির দর্শন করেন মাদুরায় : "কি বিরাট, চারদিকে প্রাচীর, ঠিক যেন শহর; আর লাতিন মান ও খ্রীস্টীয় ধ্যানধারণায় অভ্যস্ত চোখে, অবিশ্বাস্য রকম বিচ্ছিরি!"

মাদুরা থেকে শ্রীরঙ্গম। সেখানে বিষ্ণু মন্দির : "এও প্রাচীরঘেরা, প্রাচীরের সংখ্যা সাত; কেননা, সপ্তসুর, রামধনুর বর্ণসপ্তক, চতুর্ভুজ (?) ও ত্রি-বিভূতি মিলে সাত।" দেবমূর্তিগুলির প্রসঙ্গে বলেন : "মূর্তিতে বিষ্ণুকে দয়ালু ও হাস্যোজ্জ্বল দেখায়, কিন্তু মাঝে মাঝে সিংহমুণ্ডে, তিন জোড়া হাত দিয়ে তিনি দেখা দেন, অরাতিকে বিনাশ করে তার নাড়িভুঁড়ি উৎপাটন করেন।" সেই সঙ্গে (মুরলীধারী কৃষ্ণ ও নটরাজ মহারুদ্রের সাক্ষ্যেই সম্ভবত) তাঁর নিজের মন্তব্য : "আসলে হিন্দুদের যে দেবতা নাচে না কখনো, কিংবা কাউকে সংহারও করে না, সে দেবতা কেমন যেন বিরসদর্শন হয়ে পড়েন : যেমন ব্রহ্মা—ভক্তানুসারে তিনি দেবাদিদেব, কিন্তু নৃত্যপর কিংবা বিনাশক নন বলে, সম্মান পান বটে, সানুরাগে তাঁর পূজা ও প্রশস্তি কেউ করে না।"

আর বুদ্ধ—দশাবতারে গৃহীত তিনি। ব্রাহ্মণ্য কিংবদন্তী অনুযায়ী বিষ্ণু মর্তের মানুষকে প্রতারণা করার জন্যই বুদ্ধরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন; সম্ভবত পাশ্চাত্ত্য প্রভাবেই বুদ্ধের মাহাত্ম্য ও পুণাত্মা হিন্দুরা এখন স্বীকার করে নেয়। কিন্তু অবতার তালিকায় তাঁর স্থানলাভ সন্দেহ নেই, নিছক

চাঁদের মাটি পৃথিবীর উদ্ভিদ

অ্যাপলো—১২র নভোচরেরা চাঁদ থেকে যে সমস্ত পাথর বা কাঁকরমাটি সংগ্রহ করে এনেছিলেন তাঁদের নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে ডঃ চার্লস এইচ ওয়াকিনস নামে জনৈক বিজ্ঞানী সম্প্রতি একটি চমকপ্রদ তথ্য পরিবেশন করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে দলটি দক্ষিণ-বনভূমি গবেষণা কেন্দ্রে পৃথিবীর উদ্ভিদের উপর চাঁদের মাটির প্রভাব অনুসন্ধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন ডঃ ওয়াকিনস তার নেতৃত্ব করেন। উদ্ভিদ-রোগ বিশেষজ্ঞ ডঃ ওয়াকিনস বিভিন্ন গাছ-গাছড়ার উপর গবেষণা চালিয়ে লক্ষ্য করেন, তাদের বেশির ভাগই চাঁদের মাটির স্পর্শে অনেক বেশী সজীব হয়ে উঠেছে। প্রথম দিকে এই দলের বেশির ভাগ বিজ্ঞানীই ভেবেছিলেন চন্দ্র-মৃত্তিকার সংস্পর্শে এসে কোন গাছপালাই হয়ত বেঁচে থাকতে পারবে না। কিন্তু রীতিমত অঘটন ঘটে গেল। এঁরা লক্ষ্য করলেন, উঁচু পর্যায়ের উদ্ভিদ, যেমন টমেটো, শীমজাতীয় গাছ, গম, পাইন—এদের বীজ বসালে ভবিষ্যতে অঙ্কুর সৃষ্টি করে বসল। শুধু বসল নয়, পৃথিবীর সাধারণ মাটিতে অঙ্কুরগুলি সাধারণত যতটা পুষ্ট হয়ে থাকে, এক্ষেত্রে তাদের পুষ্টি বা বৃদ্ধি যেন তার চেয়েও অনেক পরিমাণে বেশীই হল। বিশেষ করে পলাণ্ড জাতীয় এক ধরনের গাছের ব্যাপারে বৃদ্ধিটা চোখে পড়ার মত।

ওঁদের পরীক্ষার পদ্ধতিটি ছিল এই রকম: ওঁরা চার রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। কতকগুলি উদ্ভিদ বীজ বা চারাগাছকে স্বাভাবিক ভাবে অঙ্কুরোদ্গম বা বৃদ্ধি হতে সাহায্য করেন। কিছু উদ্ভিদ বীজ বা চারাগাছকে রাখলেন পৃথিবীর মাটির মধ্যে পুঁতে। তবে এই মাটি উত্তাপের সাহায্যে আগে থেকে রোগ-বীজাণু মুক্ত করে নেওয়া হয়। তিন নম্বর ব্যবস্থাপনায় চাঁদের মাটিকে নানা রকম ভাবে বিশোধিত করে নেওয়া হয়, যাতে করে যদি সেই মাটির মধ্যে কোন প্রকারের বীজাণু থেকেও থাকে তা যেন আর জীবিত থাকতে না পারে। পরে বিশোধিত এই চন্দ্র-মৃত্তিকা ছড়িয়ে দেওয়া হয় উদ্ভিদ-বীজ এবং চারাগাছের গোড়ায়। আর চার নম্বর ক্ষেত্রে বীজ এবং চারাগাছের গোড়ায় সরাসরি ছড়িয়ে দেওয়া হল চাঁদের অবিশোধিত মৃত্তিকা।

অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলেন ডঃ ওয়াকিনস। কিছু কিছু চারাগাছ বিশেষ করে টমেটো অবিশোধিত চাঁদের মাটির স্পর্শে সত্যিই বেশী বেড়ে উঠল। শুধু বৃদ্ধিই নয়, যথেষ্ট পুষ্টও। টমেটোর চারার পাতাগুলি হয়ে উঠল অনেক বেশী সবুজ, অনেক বেশী সতেজ। কিন্তু চাঁদের বিশোধিত মাটিতে বেড়ে ওঠা চারাগাছগুলি অতটা সতেজ হতে পারল না। ডঃ ওয়াকিনসের ধারণা, বিশোধনের ফলে চাঁদের পাথর বা ধুলো-মাটির মধ্যে এমন কোন প্রতিক্রিয়া ঘটে থাকবে যার ফলে উদ্ভিদের শারীরিক প্রয়োজনে ঐ মাটি তেমন আর কোন সাহায্য করতে পারে না।

ফার্ন-এর ক্ষেত্রে আরও একটি বিচিত্র ব্যাপার চোখে পড়ল। চাঁদের মাটির উপর তার অযৌন-জনন-শাখাগুলি খুব সুন্দরভাবে বেড়ে উঠল, যা শুধুমাত্র পৃথিবীর মাটির ব্যবহারে সম্ভব নয়। চাঁদের মাটির সংস্পর্শে এসে লেটুস গাছও কম সময়ের মধ্যেই লাবণ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ব্যতিক্রমও যে কিছু হল না, তা নয়। অলজী অর্থাৎ শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ প্রথম দিকটায় তেমন কোন সাড়া দেয়নি। বরং তাদের বৃদ্ধি ব্যাহতই হল। আবার অবাক বৈচিত্র্য দেখা গেল লম্বা পাতাওয়ালা পাইন চারার ক্ষেত্রে। এই গাছের যে সমস্ত দেহ-কোষ সরাসরি চাঁদের মাটির সংস্পর্শে ছিল তারা যেন সজোরে সাড়া বৃদ্ধির ব্যাপারটায় ছেদ টেনে দিল। আবার ঐ একই চারার যে সমস্ত কোষ সংস্পর্শে এল না তাদের বৃদ্ধি ব্যাহত হই নি। বরং স্বাভাবিক অবস্থায় যতটা বাড়ে তার চেয়ে বেশীই বেড়ে গেল।

অতএব উদ্ভিদ দেহের ব্যাপারে চাঁদের ধুলোমাটির প্রতিক্রিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে উজ্জ্বল যেমন দেখা গেল, আবার বেশ কিছু ক্ষেত্রে অস্পষ্টও হয়ে রইল। আপাতত নাসার উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা আরও নানা রকমের পরিকল্পনার কথা বিবেচনা করছেন। উদ্ভিদ-চারাকে বাড়িয়ে তোলার ব্যাপারে চাঁদের মাটি আরও কত বেশী সাহায্য করতে পারে এটা জানাই এখন তাঁদের মূল উদ্দেশ্য হবে। তবে ডঃ ওয়াকিনস মনে করেন, শুধুমাত্র চাঁদের ধুলো নিয়েই কিন্তু বীজের অঙ্কুরোদ্গম বা বৃদ্ধি লাভ করান সম্ভব নয়। কারণ ঐ ধুলোয় এমন কোন বস্তু চোখে পড়েনি যা উদ্ভিদের পুষ্টিসাধনের ক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারে। তবে হ্যাঁ, চাঁদের মাটির মধ্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর বস্তু মিশিয়ে ভাল ফল পাওয়া অসম্ভব হবে না। এ পর্যন্ত চাঁদের মাটির মধ্যে কোন জৈব-রাসায়নিক পদার্থের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। কোন বীজাণুও না। অতএব ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ বীজাণুমুক্ত ঐ মাটির সঙ্গে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য মিশিয়ে পুরোপুরি বীজাণুমুক্ত উদ্ভিদ চত্বর তৈরি করা সম্ভব হবে। তখন বিভিন্ন উদ্ভিদ-রোগের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান এবং উদ্ভিদের শারীর বিষয়ক মৌলিক গবেষণার ব্যাপারে আরও নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান সহজ হবে।

ফুসফুসের জমাট রক্ত

হ্যাঁ, ব্যাপারটা ভাবতে গেলে শুধু ফুসফুস নয়, সম্ভবত সারা শরীরের রক্তই জমাট বেঁধে যায়। ইদানিং এই রোগটির কথা কিন্তু প্রায়ই শোনা যাচ্ছে। তবে সব সময় যে হঠাৎ এই রোগ শরীরের উপর ভর করে মুহূর্তের মধ্যে একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটিয়ে দেবে, সে কথাও ভাবার কোন কারণ নেই। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে দেহের রক্তচাপ অথবা বিভিন্ন শারীরিক কারণে রক্ত তার স্বাভাবিক তারল্য হারিয়ে ফেলতে থাকে। হারিয়ে ফেলে কখনও কখনও জমাট বাঁধতে শুরু করে। প্রধানত ফুসফুসে। তখন স্বাভাবিক ভাবেই দেহের রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়। যার পরিণতি মৃত্যু!

তবে সময় মত রোগটি ধরা পড়লে কখনও কখনও নিরাশ হওয়ারও কারণ থাকে না। যদি জানা যায় ফুসফুসের মধ্যে কোথায় এবং কিভাবে রক্ত জমাট বাঁধতে শুরু করেছে, তখন রোগের নিরাময় ব্যবস্থা চিকিৎসকের হাতের বাইরে গিয়ে পড়ে না।

প্রচলিত যে সমস্ত পদ্ধতিতে ফুসফুসের রক্ত জমাটের ব্যাপারটা পরীক্ষা করা হয় তা শুধু ক্লেশকরই নয়, অনেক সময় তাতে

প্রকাশ পেয়েছিল তাদের ডিমের মধ্যেকার ভ্রূণগুলির জীবনে। ডিমের খোসার অতিরিক্ত স্তর তার প্রাথমিক স্তরের বায়ু চলাচলকারী ছিদ্রগুলি প্রায় বন্ধ করে দেবার মত অবস্থা করে তোলে। ফলে নিয়ম মত তারা শ্বাস-প্রশ্বাসও চালাতে পারেনি। তাছাড়া পরু সেই খোসার আস্তরণ ভেঙে ছানার মত তাদের বাচ্চাগুলি বাইরে বেরি- আসতে বাধাও পেয়েছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাই মৃত্যুবরণ করা ছাড়া তাদের আর কোন গতি ছিল না। হঠাৎ শেষের দিকে এমন কোন এক ধরনের রোগ নিশ্চয় তাদের মধ্যে সংক্রামিত হয়ে যায়, যার ফলে ডিমগুলির খোসা অমন পুরু হতে থাকে। প্রাকৃতিক ঘটনার ফলে তাদের পিটিউটারি গ্রন্থি [illegible] তাদের শারীরিক হ্রাস করে এমনটি করতে পারে। প্রজনন বিষয়ক গণ্ডগোল হয়ত ডিম তৈরির ব্যাপারটাকে অমন জটিল করে তুলেছিল। ডঃ এরবেনের মতে, নিম্ন মানের ডিমই ডাইনোসরদের ভবিষ্যৎ বংশ বিলুপ্তির অন্যতম কারণ।

সমরজিৎ কর

বাপ ছিল ভীষণ খাইয়ে লোক। দশ বিশ মণ আলু ম্যাচলায় খলিতে করে সেদ্ধ করে পিঁয়াজ নুন ছড়িয়ে দিয়ে চারটে গরু দিয়ে মাড়িয়ে এক কোদাল করে মেরে এক এক গালে খেয়ে নিত।'

সাধু পাগলাকে রাগাবার জন্যে এ গল্প বানানো হয়েছে বুঝলে সে হনহনিয়ে চলে যেত ঘরে—সেখান থেকে গাল পাড়তো বাবুজানের গুষ্টি তুলে—কিন্তু বাবুজানের নাম করে নয়।

আড়াই সের কই মাছের মাথা একদিন গিয়েছিল তার মেয়ের ননদের বিয়েতে খেতে কয়েকটি গ্রাম পার হয়ে। গ্রামের নাম রামদুপুর। বিয়ের উৎসব শেষ হয়ে গেল। কুটুম বিদায় হতে তিনদিন লাগলো। শেষ দিনে আর কিছু ছিল না। মানকচু আর মাগুর মাছের তরকারী। খেতে খেতে সাধু পাগলা বললে, 'এই তোমাদের মাগুর মাছ! আমি একটা মাগুর মাছ ধরেছিনু, ডেড় হাত হবে। শালার ল্যাজের দিকটা কেটে নিয়ে রান্না করে ছ্যালো মোর বউ—বাকিটা ম্যাচলায় জিয়োনো ছ্যালো—তা দশদিন বাদে দেখি তার বাচ্চা হয়ে ম্যাচলা বোঝাই হয়ে গ্যাছে!...সেই মাগুর মাছের যে রকম 'টেস' ছ্যালো, তোমাদের এই মাগুরের কি তা হবে?' একটি লোক বুড়োর কথা শুনে ক্ষেপে গেল। কিন্তু সেও গল্প জুড়লে পিঠোপিঠি। বললে, 'আর এই একটা কি তোমাদের মানকচু! আমাদের একটা মানকচু হয়েছিল, বারোটা জন লাগলো তাকে তুলতে। তিনদিন ধরে করাত করে কাটতে হলো। তারপর লরী বোঝাই দিয়ে শালেদার বাজারে নিয়ে যাবার সময় শালা পাকা রাস্তায় মানকচুর ভারনায় লরীর চাকা পুঁতে গেল! সে মানকচুর যে রকম 'টেস' ছ্যালো, বুঝলে চাচা, আড়াই সের কই মাছের মাথা...'

'তবে রে শালা, হারামজাদা, আমাকে ঠাট্টা...সাধু পাগলা মানকচুর তরকারী ডাল ভাত সব কলাপাত ধরে লোকটার মাথায় গায়ে ছুঁড়ে দিলে!

লোকটা তখন একটা দাওয়ার খুঁটি ছাড়িয়ে নিয়ে তাড়া করলে সাধু পাগলাকে। তেড়ে আনলে বড় কাছারীর মাঠ পার করে। সাধু পাগলা ন্যাংটো হয়ে গেল ছুটতে ছুটতে। ন্যাংটো অবস্থাতেই সে বাড়ি ফিরলো। গায়ে তার ধুলো' কাদা! রক্ত!

বজবজ থানার নোদাখালী গ্রামের সাধু পাগলা মরে গেছে, তার সঙ্গে সে যুগের সমাধি হয়ে গেছে সত্যি। কিন্তু তার গল্প আজো গাঁয়ের মানুষের মনে জ্যান্ত হয়ে আছে তার ম্যাচলায় বাচ্চা ছাড়া মাগুর মাছের মতোই।

মমরেজ পালোয়ানের কথা

সারা গাঁয়ে তখন দ্বিতীয় ভাগ পড়ার বিদ্যে ছিল একমাত্র বাগদীর ছেলে বিনয় সর্দারের। সে ছিল গাঁয়ের পাঠশালার গুরুমশায়। আর তবলাওয়ালা। রামায়ণ, মহাভারত, সত্যপীরের পুঁথি পড়ে সে শোনাতো। গাঁয়ে আর কোনো লেখাপড়ার চর্চা ছিল না। নোদাখালীতে বাড়ি জানলে অন্য গাঁয়ের লোক বসতে দিত না—তামাক খেতে হুঁকো দিলে কোল্কে খুলে নিত। খুন জখম রাহাজানি নোদাখালীতে লেগেই থাকতো। কাঘর কোরোঙ্গা, বাগদী, বোষ্টম আর মুসলমানের বাস এখানে। মোড়ের পাশিখানার নিচে নাকি কত লোকের মড়মুণ্ডু পোঁতা ছিল। গাঙ থেকে ইলিশের বাজরা এনে নামালে যে যার দুটো চারটে

শনিবারে স্কুল ছুটির দিনে খাওয়াদাওয়ার পর দুপুরে এই মাধব আনন্দের সুর করে রামায়ণ পড়ে শোনাত। সে যখন সুরে রামায়ণ পড়ত, তখন তার ঐ ন খটকা ছাড়া, সরল সোজা গানের ধরন আমাকে পাগল করে দিত। কোন ওস্তাদী নেই, কিন্তু কত অনায়াসে সে গেয়ে যেত। আমাদের বাড়িতে বাউল, ভাটিয়ালী গাইয়ে, গাজন-গান ও কালীনাচের গাইয়ে, ফকির বোষ্টম দূরের গ্রাম থেকে সর্বদাই আসত। তাদের গানে আমি অভিভূত হয়ে যেতাম। আমাদের বাড়িতে আনোয়ার নামে আরেক ভৃত্য ছিল। এই আনোয়ার ছিল আমার মাছ ধরা শেখানর গুরু। আমাদের বাগানের বাঁশ গাছের বাঁশ কেটে তাই দিয়ে নিজের হাতে ছিপ তৈরি করে, নিজে সুতো কেটে, তা ছিপে জুড়ে দিত। ওর নিজস্ব সম্পত্তির এক বাকস খুলে তা থেকে ওর নিজের মরচেপড়া বড়শী ছিপে লাগিয়ে আনোয়ার আমাকে মাছ ধরা শেখানতে হাতে খড়ি দিল। কুমিল্লায় আমাদের ষাট বিঘা জমির উপর বাড়ি, তাতে ফলের, তরকারির, ফুলের বাগান, বড় বড় পুরনো গাছ, আর তিনটে বড় পুকুরে ভর্তি মাছ ছিল। এসব বাবার শখের জিনিস। বাবা নিজের হাতে গাছ লাগাতেন। মালীর সঙ্গে বাবা নিজের হাতে মাটি কোপাতেন। গোমতী নদী থেকে নিজে মাছের পোনা সংগ্রহ করে প্রতি বছর পুকুরে ছাড়তেন। আনোয়ার ও আমি সুযোগ বুঝে ছিপ নিয়ে বসে যেতাম— আর দুজনে মাছ ধরতাম। তারপর গান গাইতে গাইতে পুকুরের ধারে ধারে ও বাগানে দুজনে বেড়িয়ে মনের কথা বলতাম। সেই দিনগুলি যে কি মধুর ছিল তা এখন বলে বোঝাতে পারব না।

আনোয়ার রাত্রে তার দোতারা বাজিয়ে যখন ভাটিয়ালী গান করত, তখন আমার ব্যাকরণ মুখস্থ করার দফারফা হয়ে যেত এবং পরদিন স্কুলে মাস্টারমশাই-এর কাছে বকুনিও খেতাম। কিন্তু রাত্রে আবার ব্যাকরণ মুখস্থ, অংক কষা ছেড়ে আনোয়ারের কোল ঘেঁষে বসে তার ভাটিয়ালীর সুরে ও কথায় নিজেকে হারিয়ে ফেলতাম। এরাই হল, লোক-সংগীতের আমার প্রথম দুই গুরু—মাধব ও আনোয়ার। ওস্তাদী গানেতে গলা সাধতে হয় দস্তুরমত, তাতে সরগম, তাল, লয় মীড় গমকের দরকার। কিন্তু আনোয়ারের গানে এসবের কোন বালাই ছিল না—সহজ সুরে, মিষ্টি করে গেয়ে সে প্রাণ মাতিয়ে দিত। আমি মার্গসংগীত যত পছন্দ করতাম, ঠিক ততখানি মাধব আনোয়ারের গানেও মুগ্ধ হতাম।

স্কুলের সংগেই লাগোয়া খেলার মাঠ ও তার পাশে বুড়ো বটগাছ। সেই গাছের নীচে আমাদের গানের নিয়মিত আসর জমত,

টিফিনের ছুটিতে। আমি আনোয়ারের গান-গুলি গাইতাম—খোলা মাঠে—পাশে ধর্মসাগর দীঘি। বড় বড় গাছের তলায় রোদে, বৃষ্টিতে, ঝড়ে-বাদলে, শীতে, কী আনন্দই না পেয়েছি প্রকৃতির কোলে মাটির গান গেয়ে দিন কাটিয়ে। সে আনন্দের আস্বাদন আজ আর পাওয়া যাবেনা। শহর-বাসীরা তার মূল্য বুঝবে না, সন্ধানও পাবে না। আনোয়ারের গানে সোজা সরল সুরে ও কথায় দেহতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, রাধা-কৃষ্ণের মিলন বিরহের বর্ণনা কি যে অপূর্ব আমেজ এনে দিত, তা বুঝিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এই গানগুলির সহায়তায় আমার ও আমার বন্ধুদের মহাবিপদের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার ঘটনা এবার বলছি।

আমি যখন নবম শ্রেণীতে পড়ি, কুমিল্লা থেকে দশ মাইল দূরে কমলাসাগরে পূজোর মেলা দেখতে যাচ্ছি বন্ধুবান্ধব ও সহপাঠীদের সঙ্গে। সেখানে কালীমন্দিরের চারিপাশ ঘিরে মেলা বসত। বহু দূর থেকে গ্রামবাসীরা মেলা দেখতে আসত। মেলা দেখা শেষ করে কমলাসাগর স্টেশনে এসে দেখি ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে। আমরা টিকিট না কেটেই দৌড়ে ট্রেনে উঠে পড়ি। পরে টিকিট চেকারের হাতে ধরা পড়ে যাই, বিনা টিকিটে ভ্রমণের অপরাধে। কুমিল্লার স্টেশন মাস্টার আমাদের সবাইকে স্টেশনের পাশে একটা গুদাম ঘরে বন্ধ করে দেন। বাড়ি থেকে বেরুনোর সময় বাবার অনুমতি নিইনি, ভেবেছিলাম সন্ধ্যার আগেই বাড়ি ফিরে যাব, কোন জবাবদিহি করতে হবে না। এখন স্টেশনে গুদামজাত হয়ে আমি ত কেঁদেই ফেলি। আমার সহপাঠী মোহিত এক বুদ্ধি যোগাল। সে বলল—"স্টেশন মাস্টারের মা খুব গান ভালবাসেন। কিছু আগে আমাদের বাড়িতে ঢপ কীর্তন শুনতে এসে আবেগে কাঁদছিলেন। শচীন, তুই [illegible] ভাটিয়ালী ও বাউল গানগুলি শুরু কর দেখি। এই গানগুলো গাইলে আমাদের মুক্তি পাবার একটা সুরাহা হবে।" আমি তখন মনে প্রাণে শুরু করে দিলাম। [illegible] প্রাণ ছিল না কারণ আমি [illegible] বাড়ি পৌঁছাতে পারলেই বাঁচি। কিন্তু গানের কি মহিমা আর মোহিতের বুদ্ধির কি বাহাদুরী—আমার গান পৌঁছল স্টেশন মাস্টারের মার কানে। দশ মিনিটের মধ্যে তাজ্জব ব্যাপার। গুদাম ঘরের দরজা খুলে গেল—দেখি, সশরীরে স্টেশন মাস্টারের মা উপস্থিত। গান শোনার পর ছেলের নিকট আমাদের কথা শুনে মুক্তি দিলেন আমাদের। এমনকি বাড়ি যাবার আগে সকলকে মিষ্টি-মুখও করিয়ে দিয়েছিলেন।

স্কুলের ছাত্রজীবন বড় আনন্দের ভিতর দিয়ে কেটে গেল। ব্যাকরণ ও অঙ্কের নামে আমার গায়ে জ্বর এসে যেত। তবুও কি করে জানিনা ১৯২০ সালে, ১৪ বছর বয়সে কুমিল্লা জিলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে ফেললাম। ১৯২১ সালে বাবা আমাকে কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তি করিয়ে দিলেন। আই এতে আর্টস-এর ছাত্র হলাম। পড়ায় তেমন মন ছিল না। পাশের নবাব-বাড়িতে প্রতি বছর বড় বড় গাইয়ে [illegible] ও বক্তৃতারা এসে গান বাজনা করতেন। পড়া ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে রাত জেগে সেই সব মজলিসে সময়মত উপস্থিত হতাম আর রাতের পর রাত তাঁদের গান বাজনা উপভোগ করতাম। তখন কুমিল্লার ও [illegible]

[illegible]

খেলার [illegible] কুমিল্লায় আমাদের বাড়িতে টেনিস লন ছিল, সেখানে সর্বদাই খেলতাম। সেখানে টেনিস চ্যাম্পিয়ান [illegible] পেয়ে গিয়েছিলাম। ম্যাট্রিক পর্যন্ত বাবা আমার বাইরে থাকার সময় [illegible] দিতেন। কিন্তু কলেজে ওঠার পর, [illegible] গাইয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতাম, তখন বাবা আর কোন [illegible] চাইতেন না। বরঞ্চ উৎসাহই দিতেন। শুধু একটি কথাই বলে দিতেন—"সময়মত খাওয়া দাওয়া করবে। আর পাশ করতেই হবে একবারে—কাজেই পড়াশোনা সম্বন্ধে ঠিক রেখো। তোমার গান শেখার বা শোনার ইচ্ছায় আমি কোন বাধা দেব না। কারণ নিজের ভালমন্দ বোঝার তোমার এখন বয়স হয়েছে।" পাস এর বাইরে আর কোন শাসন বা আদেশ আমার উপর ছিল না।

(ক্রমশ)

চোখের গর্ত, আর মাঠ খড়খড়ে, কারা সব ফসল নিংড়িয়ে নিয়ে গেছে, খালি পায়ে হাঁটলে পায়ে ফোটে। তবু একা একা ঘুরতাম, ফাঁকা মাঠে মরা পশুর হাড় মাঝে মাঝে চিকচিক করত, কী বীভৎস ধবধবে সাদা, এই কি মৃত্যুর চেহারা আমি কখনও কখনও কাঠ হয়ে ভেবেছি, না, না, মৃত্যু তো কালো, ফকিরের আলখাল্লার মতো কালো, বস্তুত অনেকদিন পর্যন্ত আমি বুঝতে পারিনি মৃত্যুর রঙ কালো, না সাদা।

আর তার গন্ধ? তাও একদিন টের পেয়েছি, মৃত্যুর গন্ধও আছে। সেবার খুব হিম পড়েছিল, হঠাৎ করে বুঝি সন্ধ্যার পর লণ্ঠনের তেল ফুরিয়ে গেল, মা বলল চট করে যা তো দোকানে, খানিকটা নারকেল তেলও আনিস, সারা রাস্তা ছমছম, সারা রাস্তা জুড়ে, কারা যেন আমার সঙ্গ নিয়েছে, কে যেন হাসছে হাওয়া-হাওয়া কণ্ঠস্বরে, আমি দৌড়লাম, এক ছুটে বাজার, কিন্তু ফেরার পথে এক ঝলক সেই গন্ধ। তেলের। দাদার একবার পা কাটে, মা তখন তার পায়ের আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে কর্পূর মিশিয়ে এই তেল মাখিয়ে দিয়েছিল, আমি ঝুঁকে পড়ে দাদার পায়ের ক্ষত দেখতে গিয়ে তার গন্ধ পেয়েছিলাম। সেই গন্ধ চেতনায় যে ছিটিয়ে গিয়েছিল তা জানতাম না তো, সেদিন সেই মুহূর্তে ফিরিয়ে আনল দাদাকে, তার মৃত্যুকে।

এক-একটা মৃত্যুর এক-একরকম গন্ধ। ইদানীং শহরের মড়ার চাদরে ফোটানো সেন্ট আতর, বেশির ভাগ দেখা মৃত্যুর গন্ধও তাই ওই আতরের। আতর আমি এই জন্যে আজো কখনও মাখিনি।

তাদের সেই আত্মীয়-স্বজনের [illegible] চিৎকার করা [illegible] কান্নার [illegible] এসেছে [illegible] কখনও কখনও কল্পনা করেছি [illegible] [illegible] [illegible] বিশ্বাস [illegible] [illegible] দাদাকে [illegible] দিয়ে কি দেখলাম! [illegible] আর মাটি তুমি দিয়েছ [illegible] করেছি কখন তুমি [illegible] মুঠি পাখিদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছি।

তুমি কিন্তু সহজেই একটা বিশ্বাসের মধ্যে প্রবেশ করেছিলে। তোমার [illegible] যে [illegible] গেল, তার [illegible] না, একটা মন্ত্রের বই কোথা থেকে জোগাড় করলে, ঘরের কোণে বসেছ আসন বিছিয়ে, মানে না জানা মন্ত্র একটার পর একটা পড়ে যাচ্ছ, এই ক্ষণে তোমার সেই [illegible] বিশ্বাসী, সমর্পিত রূপটি দেখতে পাচ্ছি।

সেই সময়ে সব, সকালটার অর্থই যেন [illegible] গিয়েছিল তোমার [illegible]। [illegible] আমারও মুখস্থ হয়ে যেত, আজও যত [illegible] যত মন্ত্র ভাঙাভাঙা ভাবে জানি, উচ্চারণ করি, সব তখনকার কানে-শোনার অবশিষ্ট অংশ। কিন্তু তোমার উদাসীনতার কোনো আমি পাইনি। দাদার অভাবের বোধটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল, কবে আমি প্রত্যাবৃত্ত হলাম আমার স্বভাবে, চাপল্য আর লোভে, কিন্তু তুমি যা ছাড়লে তা আর ধরলে না। একেবারে আলাদা। একটি মৃত্যু এল, কী নিয়ে গেল, বিনিময়ে

তোমাকে নিয়ে গেল সম্পূর্ণ একটি শৃঙ্খলা, যেন সেই শীত পড়ল অমনই তুমি পুরু একটা চাদরে নিজেকে জড়িয়ে নিলে। সেই চাদর সহজে আর খুলে পড়ল না।

[গ]

এই চিঠি লেখার একটা অসুবিধে এই [illegible]

[illegible]

আমাকে বদলে দিচ্ছিল, ফুসলিয়ে ফুসলিয়ে ক্রমশ দূরে ঠেলে দিতে চাইছিল।

যাক, সে-সব বৃত্তান্ত আরও পরের। তখন কিন্তু মা, আমরা এক থালায় খেতাম, ভাত মেখে মেখে তুমি এক-একটা গ্রাস ডেলা পাকিয়ে সাজিয়ে রাখতে, আমি কখনও টপাটপ মুখে তুলতাম, কখনও তুলে দিতে তুমি, গালে এঁটো লাগল তো হাতের পিঠ দিয়ে মুছিয়ে দিতে, আজ সেই সুখ-স্পর্শের কথা লিখে রাখতেও রোমাঞ্চ হচ্ছে। আর ছিল শেষ চাঁচিমুছি, ওটার সবস্বত্ব আমার তো ছিলই, এমন-কী তোমার মুখের চিবনো পানের দিকেও সতৃষ্ণ চেয়ে থেকেছি, কখন তুমি জিভের আগায় তুলে ধরে একটুখানি দেবে, সেই লোভে অধীর, ক্লাশে-শেখা সরল স্বাস্থ্যবিধিকে একটুও কেয়ার করিনি। খঞ্জনী বাজিয়ে বৈরাগী এলেই তোমার কাছ থেকে চাল চেয়ে নিয়ে দৌড়ে যাওয়া, তোমার পাশে বসে জোড়হাতে প্রতি বিষ্যুৎবারে লক্ষ্মীর পাঁচালি শোনা—পদ্মাসন করে বসা কাকে বলে তুমিই শিখিয়েছিলে, তোমার ঠাকুরের জন্যে অন্যের বাগানের ফুল চুরি, সজনে আর বকফুল পেড়ে আনা, আজও দেখছি স্মৃতির ঝুড়ি এমন অনেক কাঁড়াতেই ভর্তি। ছুটির দুপুরে তোমার চুলে বিলি কেটে দিয়েছি, এসব লেখার কোনও মানে নেই, কারও কাছে এর কোনও দাম নেই, আমার কাছেই বা কতটা আছে?

রাত্তিরে উঠে বাইরে যাবার দরকারে তোমাকে ডাকতাম যখন, ঘুমকাতুরে তুমি উঠে বসতে, কোনো দিন বা দেখতাম তোমার দুষ্টু, ভ্রূভঙ্গি, 'ভিতু ছেলে! এখন না হয় আমি দাঁড়াচ্ছি, এর পর দাঁড়াবে কে? তোর বউ এলে তাকেও দাঁড়াতে হবে। কেন, এত ভয়, এত ভয় কিসের।'

তোমাকে তখন কী-করে বোঝাব মা, ভয় কিসের। যাদের দেখা যায় না, কিন্তু যারা নিরন্তর নানা অবোধ্য শব্দ তুলে কথা বলে, রাত হলেই সার দিয়ে পাহারা দেয় বাইরে, একলা সেখানে গেলেই যে তাদের অধিকারে চলে যাব!

মধ্য রাত্রের আরও দু'একটি ছবি উঠে আসছে। গা থেকে লেপ কি কাঁথা সরিয়ে নিলে তুমি ঢেকে দিয়েছ, কিংবা জ্বরে যদি ছটফট করছি কপালে ঠাণ্ডা হাত, হাতটাই যেন জলপটি, বুলিয়ে দিচ্ছ, এসব তো মামুলি। কিন্তু এক-একদিন দেখেছি যে, মশারির মধ্যে তুমি ঠায় বসে, হাত দুটি জোড়া করা উপাসনার ধরনে, দৃষ্টি উপরে, সর্বাঙ্গ যেন কঠিন, আমার চেনা মা হঠাৎ যেন পাষাণ-মূর্তি; তুমি, স্তব্ধ, বিবিক্ত, নিস্পন্দ, মনে প্রশ্ন জাগত কাউকে কি ধ্যান করছ। তুমি যেখানে আছ, সেখানে নেই, স্পষ্ট বুঝতে পারতাম।

যদি টের পেলে আমি জেগে গেছি, চেয়ে আছি, অমনই তুমি ফিরে আসতে। তাড়াতাড়ি বলতে 'ঘুমো! বাইরে বোধহয় একটা সাপে ব্যাঙ ধরেছিল, কোঁ-কোঁ আওয়াজ শুনতে পেলাম, ঘুম ভেঙে গেল।'

একটা পাণ্ডুর মিথ্যা তোমার মুখে ছড়িয়ে পড়ত কিনা, কমিয়ে-রাখা লণ্ঠনের ম্রিয়মান ফিতেটাও সেটা ধরিয়ে দিত, আমি বুঝতে পারতাম। তুমি দাদার কথা ভাবছ তোমার বাকী সময়টার সমস্তটাই আমি আত্মসাৎ করে নিয়েছি, খালি এই নিস্তব্ধ-নীরব খানিকটা ক্ষণ আলাদা করে রাখা—বিনিদ্র এই সময়টুকু দাদার।

কখন আস্তে আস্তে তোমার বুকের মাথা তুলে দিতাম আমি, হাত বাড়িয়ে তোমার গলা জড়িয়ে ধরতাম।—'মা, বাবা আজও এল না?'

তুমি উত্তর দিতে না।

'এত বড় খবরটা পেয়েও, দাদা—দাদা নেই শুনেও এল না।'

'ও ওই রকম। কিংবা কী-জানি, হয়ত খবর পায়নি।'

'চিঠি তো দিয়েছ।'

'যে-কটা ঠিকানায় থাকতে পারে তার সব কটাতেই। লোকের মুখেও খবর পাঠিয়েছি।'

'তারা হয়ত খুঁজে পায়নি।'

'যাক। আমায় শুনেও আসেনি, হতে পারে। সংসার কি, ওর সংসার মন কি আছে? চিরকাল বাইরে বাইরে, দূরে দূরে, সংসার দেখল না। দেখবেই না যদি তবে সংসার করল কেন।'

সংসার করা কাকে বলে, তখন আমি মানে জানতাম না।

'বাবা কোথায় থাকে মা, কী করে?'

'ছি, থাকেন বলতে হয়। উনি দেশের কাজ করেন।'

দেশের কাজ কাকে বলে, ঠিক বুঝিনি। তবে জেলে যেতে হয়, জানতাম। বাবা মাঝে মাঝে গেছেন শুনেছি।

'শুধু দেশের কাজ?'

'ছাড়া পেলে, পাতা লেখেন। অনেক বই লেখা হয়ে আছে, বড় হলে পড়িস। পাতার পর পাতা লেখেনই। তা ছাড়া ওর মাথায় সব সময় কত যে টুকিটাকি [illegible] ফন্দী। ওই করেই তো সব গেল। [illegible] থেকে থাকতে বড় ঠকিয়েছেন, সুধীরদাও কতবার বলেছেন।'

সুধীরমামা, একটি [illegible] সুধীরমামা। আমাদের উঠোনের ভিতের ঘরটার পাশে একটা লম্বা নারকেল গাছ, ঠিক সেইরকম ঠায় দাঁড়িয়ে।

একদিন সকালে খুব শীত-শীত করছিল, হাফ-ইয়ার্লি আনুয়েল পরীক্ষা শেষ, ঘুম ভেঙেও লেপের তলায় চুপচাপ আছি। টের পাচ্ছি সুধীরমামা এসেছেন। যথারীতি চুমুক দিচ্ছেন নিমের রসে। রোদ্দুরের পিঠ দিয়ে মা বুঝি দিচ্ছিলেন বড়ি। বলতে শুনলাম সুধীরমামাকে—'তোমার বড়টা এভাবে না গেলে আনু, আর আট-দশটা বছর মাত্র, তুমি একটা নির্ভর পেয়ে যেতে।'

হঠাৎ ডাল-গোলা বাটিটা পড়ে গেল ঝনঝন করে। মা, তুমি জানো না, আমি হঠাৎ বিছানা থেকে টুপ করে লাফিয়ে পড়েছি। দাঁড়িয়েছি কবাটের ঠিক এপাশে, রোদ্দুর যেখানে একটি অবিরত তীর হয়ে ঠিকরে পড়েছে, ঠিক সেখানে। তোমার স্থির আয়ত দৃষ্টি দেখতে পেয়েছি, সেই দৃষ্টি কাঁপল না, কিন্তু কথা বলতে গিয়ে তোমার গলা কেঁপে গেল, 'কোন্ পাপে এমন হল, সুধীরদা, আজ আবার জিজ্ঞাসা করছি। ঈশ্বর জানেন কোনও পাপ তো আমরা করিনি।'

'পাপ? পাপ হয়ত অনেক রকমের হয়, আনু, সজ্ঞানে না হোক অজ্ঞানে। ঠিক জানিনে।'—এইরকমই কী একটা কথা বলতে চেয়েছিলেন সুধীরমামা, অস্পষ্ট স্বরে, অথবা সেই নিমের গেলাসেই মুখ রেখে আস্তে আস্তে উচ্চারণ করেছিলেন, বলে ঠিক শুনতে পাইনি।

কিন্তু বলতে বলতে থেমে গিয়েছিলেন সুধীরদা। মা, তুমি তাড়াতাড়ি উঠে [illegible] হাতে খাঁড়ির খোলা জেলে দেই, সেই হাতটা বুলিয়ে দিচ্ছিলে ওঁর পিঠে। সুধীরমামা একটু স্থির হতে তুমি বললে, 'এখনও সময় আছে সুধীরদা, তোমার এই শরীর কাউকে এনে তোমাকে দেখাশোনার ভার তুলে দাও।'

পলকে আরও যেন ফ্যাকাশে, [illegible] ভাঙা কাপড়ের মত দেখাল সুধীরমামার মুখ। কেমন অপরিচিত স্বরে তাঁকে বলতে শুনলাম, 'কেন, তোমরাই তো দেখা-শোনা করছ।'

'আমরা?' তোমার মুখে ফুটেছে দেখলাম যে হাসি হাসি নয়, সেই হাসি। 'আমরা? আমি তো নিজের শোকে, দুঃখে, নিজের মায়ার সংসারে জড়িয়ে আছি। বরং তুমিই আমাদের জন্যে—কেন, কেন, সুধীরদা, তোমাকে তো কিছু দিতে পারিনি। তুমি শুধু দিয়েই গেলে একটি কোটিও কখনও চাওনি।'

তখন কিসের যে-আভা ছড়িয়ে গেল সুধীরমামার মুখে, এখনও তা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।—'কী জানি আনু, পাইনি যে তাও জোর করে বলতে পারব না, ওই তো মুশকিল। পাওয়ার চেহারা বোধ হয় সব সময় ঠিক এক রকমের হয় না। না-পাওয়াটা কতকটা অভ্যাস হয়ে গেলে, তারও একটা নেশা লাগে, সেটাও তখন এক ধরনের পাওয়া হয়ে দাঁড়ায়।'

ঠিক এই কথাগুলোই কি বলেছিলেন সুধীরমামা, পাতার ফাঁকে ফাঁকে চলা বাতাসের মত স্বরে, আর আমি অবিকল তাই মনে রাখলাম? কী-জানি মা, মিথ্যে বলব না, হয়ত কথাগুলো অন্য ভাষায় ছিল, কিন্তু তার ভাবটা ছিল এইরকম, আমি আমার এই বয়সের আশা-হতাশার সমীকরণের দর্শন দিয়ে তাঁর নিস্পৃহ কথা-গুলো এইভাবে বসালাম। বানালাম।

[৭]

মাঝে মাঝে চিঠি আসত বাবার, কদাচিৎ টাকা। কিন্তু তিনি আসেন নি, অন্তত [illegible] পর্যন্ত না, দাদার মৃত্যুর অন্তত বছর দেড়েকের মধ্যে তাঁকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না, তার মানে দাদা গেল এক শীতে মাঝামাঝি আর একটা শীতে, বাবা সেদিন হঠাৎ উদয় হলেন, তখন চৌধুরীদের বড় বাগানে পাখিগুলো উড়ে গেছে, [illegible]

[illegible]

[illegible] আর তুমি [illegible] দেখা দিতাম।

দাদা চলে গেল, ফলে, বলেছি [illegible] জায়গায় হল দুই। [illegible] তোমার স্কুল, [illegible] ও আমার প্রগাঢ় আবরণ। প্রথম যেবার শীত ফিরে এল, কী-জানি কেন সেবার অকাল মেঘ চুইয়ে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিও পড়তে থাকল, কনকনে ঠাণ্ডা, বেরতে পারছি না, আমরা একটা চাদরে মুড়ি দিয়ে পড়ছিলাম, পড়ার বই থেকে বাংলা একটা পদ্য [illegible] দাও, ডেকে দাও দাদারে আমার/একা আমি পারি না খেলতে", পরে জেনেছি ওটা বিদেশী একটা কবিতার তর্জমা, পড়তে পড়তে হিহি করে কাঁপছিলাম, শীতে, নাকি ভিতরে ভিতরে কবিতার কথাটা কুয়াসার মত একাকার হয়ে হুহু করে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল? কখন তুমি যে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছ টের পাই নি। আড়চোখে চেয়ে দেখলাম, তুমি চলে যাচ্ছ।

ফিরে এলে একটু পরে, হাতে একটা কোট, আমার গায়ে ছুঁড়ে দিলে। মুখে বলো নি, কিন্তু বুঝতে পারছিলাম, পরতে বলছ।

পরলামও, আমাদের মধ্যে একটা নির্বাক ছায়াছবির অভিনয় চলছিল, বেশ আরাম লাগছিল কোটটায়, আমার কোট ছিল না, দাদা স্কুলের স্পোর্টস ক্লাব থেকে একটাই পেয়েছিল, পলকে চলে গেল শীত, তোমার মুখেও ফুটি-ফুটি হাসি, আমি দেখতে পাচ্ছিলাম।

এই কোটটা এতদিন তুমি দাও নি, তুলে রেখেছিলে, আজ দিলে, দিতে পারলে। বস্তুত দাদার ব্যবহার-করা সব জিনিসই যত্ন করে তুলে রেখেছিলে তুমি, রং-ওঠা [illegible] গায়ে [illegible] আমার শরীরে ছড়িয়ে যাচ্ছিল।

সাহস করে একদিন দাদার পড়ার বইও বের করলাম, এবার আমি নিজেই, কয়েকটা বই ওর প্রাইজেও-পাওয়া, যেমন রবিনহুড, পাতা উলটে পড়ছিলাম সেই গ্রীনউড-ডাকাতের গল্প, তুমি দেখে অবাক।—'ওর বই তুই পড়তে পারিস?' বললাম, 'পারি, একটু একটু', তুমি বললে 'পড়তো দেখি', আমি আস্তে আস্তে শুরু করলাম, তুমি তন্ময় শুনছিলে, কী বড়-বড় চোখ তোমার মা, কী ছোটো-ছোট বুকচাপা দীর্ঘশ্বাস! খানিক পরে তুমি বললে, 'ওর মতো হল না', সরে গেলে, আমি বইটা মুড়ে হিম হাওয়ার ঝাপটায় কয়েকটা কাকের কর্কশ কান্না শুনলাম, উঠোনে-লাগানো পেঁয়াজ কলিতে কলিতে ফোঁটা ফোঁটা জল জমেছিল, পিছনের পুকুরের শালুক ফুলগুলি মড়া-মড়া, ন্যাতানো।

স্বীকারোক্তি করব বলে কলম ধরেছি, অবশেষে আমি কি তবে প্রণামপূর্বক প্রচ্ছন্ন একটু অভিমানও পেশ করছি? জানি না। খানিক আগেই তো লিখেছি কত কাছাকাছি এসেছিলাম আমরা, তার মধ্যে হঠাৎ একটা! সেই সরল বাক্যেও শাখা-প্রশাখা লতায়-পাতায় জড়ানো কত যে জটিলতা, তার জট ছাড়াতে গেলে আজও চমকে যাই।

তুমি বলেছিলে, এবার আর পিঠে হবে না। তাতে আমার এমন কিছু এসে যেত না. কেননা পিঠে আমার কখনই প্রিয় নয়, তবু কী করে সে বছর তেতো হয়ে গেল, সেই কথা বলে খালাস হতে চাইছি। সুধীরমামা না-হয় এসে পিঁড়িতে চেপে বসে বললেন, 'করো পিঠে করো', আর ওঁর হাত থেকে খেজুর গুড়ের হাঁড়িটা নিয়ে বিনাবাক্যে উনুনে জেবলে বসলে তা-ও না-হয় বোঝা গেল, ওই বসার ভঙ্গিটাই একটা প্রতিবাদ. কিন্তু শুধু চন্দ্রপুলি কেন, পাটিসাপটা কেন নয়, পাতে বসেও আমার মনে মনে সেই যে আহত চিৎকার তুমি টের পেলে কি পেলে না জানিনা, কিন্তু আমাকে ভরপেট শুধু পুলিই খাওয়ালে। আমি লোভীর মত চেটেপুটে খাচ্ছিলাম, চুকচুক শব্দ করছিলাম, মুখে বলছিলাম, 'ভীষণ ভালো'. কিন্তু কেউ বুঝল না, না তুমি না সুধীরমামা, ওই উবুড় হয়ে খাওয়াটাই একটা হাহাকার, চন্দ্রপুলি দাদা ভালবাসত, তাই তুমি মাথা হেলিয়ে আমাকে দেখছিলে, সুধীরমামাকে বলছিলে আস্তে আস্তে 'সে-ও ঠিক এইভাবে খেত।' একটিও পাটিসাপটা পেলাম না।

তার মত, তার মত, সে আমাকে একলা পড়ার টেবিলে উদাস করে দিত, সেই আবার বিছে হয়ে কামড়াল, আশ্চর্য আমি কি নিজেই না-বুঝে একটা মরা মানুষকে হিংসে করছি!

ন্যাপথালিন খুলেছে, সেই কোটটা পরে যাচ্ছি. তুমি ঝেড়েঝুড়ে দিলে, না মরা পোকাগুলোর একটাও আর নেই, ন্যাপথালিনের একটা ঝিমঝিম নির্জীব গন্ধ শুধু লেগে আছে, দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলে, 'ঠিক ওর মত লাগছে' বললে থুতনি ছুঁয়ে, কী স্নেহ, কী স্নেহ, তখন পর্যন্ত ছবিতেই শুধু দেখা ঝরনার মত, কিন্তু আমার থুতনি পুড়েছিল। ওর চেয়ে আমি বুদ্ধিতে কম, গায়েও কালো, বরাবর এই শুনে আসছি, সেদিন হঠাৎ তারই মত দেখতে হয়েছি শুনে. কই, বুক ফুলে দশহাত হল না তো! তার মত, তার মত কেন, তার হয়ে তার প্রাপ্য স্নেহ আমি নেব কেন, নিলে হবে নাম ভাঁড়ানো, আমি আমার মতো। যে-যেমন, সে সেই মতো। অন্য কেউ হতে ভালো লাগে এক থিয়েটারে জমকালো পার্ট পেলে, কিন্তু জীবনে নয়, কক্ষনো না।

মরা মানুষকে হিংসে করছি, শুধু তাই নয়, ওই কোট পরে মনে হত আমি একটা মরা মানুষও হয়ে গেছি, [illegible]

[illegible] কোটটাকে, না আর কাউকে, অপ্রত্যক্ষ যে অকস্মাৎ সেখানে উপস্থিত হল, আমার মতো সে-ও চেয়ে চেয়ে দেখল, কেউ পাছে কোটটাকে তুমি ফের তিনের বড় বাক্সোয় ভাঁজ করে শুইয়ে দিচ্ছ।

কোটটা আবার মিশে গেল অন্ধকারে, কড়া ঝাঁঝাল ন্যাপথালিনের বিকট গন্ধে মাখা এক অবশ জগতে, কত কাল কে জানে, অথবা মরা কতিপয় সেই পোকারা প্রাণ ফিরে পেয়ে কি কোটটাকে ধীরে ধীরে খুঁটে খেয়েছিল?

জানি না। ওই কোট আমি আর পরিনি। পরের শীতে সুধীরমামা আমাকে আর-একটা কিনে দিয়েছিলেন, যদিও সেটা ছিটের।

(ক্রমশ)

সমালোচকের মনোভঙ্গী থাকা সত্ত্বেও পরিশেষে তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে যা বলেছেন সেটা এখানে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক : 'I am content with the artistic observation of a remarkable personality.'

রোলাঁ মুসোলিনি সম্বন্ধে ১৯২৬ সালেই যে পরিমাণে সচেতন, দেখা যায় ১৯৩৩ সালের নভেম্বরেও হিটলার সম্বন্ধে ঠিক সেই পরিমাণেই তিনি উদাসীন। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে ১৯৩৩-এর ২৫শে নভেম্বর, হিটলার সম্বন্ধে যে মন্তব্য তিনি করেন সেটা বিশেষ কারণে স্মরণীয়। মুসোলিনির উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং আত্মম্ভরিতার তুলনায় হিটলারকে তিনি বলেছিলেন 'বুদ্ধিতে খাটো কিন্তু অনেক বেশী সৎ এবং সরল' (plus sincere)। ১৯৩৩-এর জানুয়ারীতে হিটলার কর্তৃক জার্মানির চ্যান্সেলর-পদ গ্রহণ করবার এগারো মাস পরে তাঁর সম্বন্ধে রোলাঁর এই উক্তি। গদিতে বসবার পূর্বেকার কীর্তি-কলাপ না হয় ছেড়ে দিলাম, ঐ এগারো মাসের মধ্যেই জার্মানিতে যেসব ঘটনা ঘটেছে তার কয়েকটির উল্লেখ করছি। ২৭শে ফেব্রুয়ারি ঘটে সেই কুখ্যাত এবং সাজানো রাইখস্টাক-অগ্নিকাণ্ড যার ফলে ২০ হাজার নিরপরাধ কমিউনিস্টকে গেস্টাপো-কয়েদে বন্দী করা হয়, তাদের মধ্যে প্রাণ নিয়ে ফিরেছে মুষ্টিমেয়। ১০ই মে বের্লিনের পথে পথে হল সেই প্রতীক-প্রতিম গ্রন্থদাহ-উৎসব। ৪ঠা অক্টোবর পাশ হল রাইখ-প্রেস আইন, যার ফলে সারা জার্মানির কণ্ঠরোধ হল। ১৯৩৪-এর ৩০শে জুনের সেই ভয়াবহ blood purge আর মাত্র কয়েকমাস দূরবর্তী। ১৯২৫ সালে প্রকাশিত হিটলারের Mein Kampf যদি রোলাঁ পড়ে থাকেন, তাহলে পূর্বোক্ত ঘটনাগুলির তাৎপর্য সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকবার কথা নয়। তারপরেও কি হিটলারকে সৎ এবং সরল বলা চলে? যদি বলেন, এসব খবর তিনি না পড়েননি বা দেখেননি, তাহলেও কি সমকালীন রাজনীতি সম্বন্ধে অভ্রান্ত বিচারের দাবি তিনি করতে পারেন? অপরপক্ষে ১৯৩২ সালে লুডভিগের মতো ঐতিহাসিক যে মত প্রকাশ করেছেন সেই মত ১৯২৫ সালে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেছেন বলে এবং দশ বছর পরে মুসোলিনির রাজনৈতিক এবং সামরিক অপকীর্তিগুলি প্রত্যক্ষ অনুধাবন করে তাঁকে নিছক একটি Criminal বলে দিতে পারেননি বলেই কি তিনি মুসোলিনীর পাকাটিতে একেবারে নাবালক প্রতিপন্ন হয়ে গেলেন?

অবশ্য মুসোলিনির প্রতি রোলাঁর প্রতিক্রিয়ার মধ্যে অনেকখানিই ছিল রাজনৈতিক এবং সেইজন্যই তার মধ্যে কিঞ্চিৎ অসঙ্গতিও ছিল। ফলে মুসোলিনির ব্যাপারে তাঁকে পরেও ভুগতে হয়েছে, বিশেষ করে গান্ধীজিকে নিয়ে। সেই ব্যাপারটি সংক্ষেপে না বললে এই প্রসঙ্গটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ১৯৩১ সালে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক থেকে ফিরবার পথে গান্ধীজি রোলাঁর অতিথি হন ভিলনভে। ইতালি থেকে গান্ধীজির নিমন্ত্রণ এসেছে, তিনি যাবেন কিনা সে বিষয়ে রোলাঁর পরামর্শ চাইলেন। শুধু 'যাবেন না', এই কথাটাই মুখ ফুটে তিনি বললেন না, তাছাড়া সবই বললেন,

আমেন্দোলা ও মাত্তিয়োত্তি হত্যার কথা তো বিস্তৃতভাবেই বললেন, রবীন্দ্রনাথের ইতালি সফর সম্বন্ধে ফাসিস্ট প্রেসের মিথ্যা প্রচারও বাদ যায়নি। কিন্তু সব শুনে গান্ধীজি গম্ভীরভাবে বললেন যে এই ধরনের অপপ্রচার তাঁর বেলাতেও হ'তে পারে, তাতে সাময়িক ক্ষতি হলেও পরিণামে হয়তো সুফলই ফলাবে, অতএব তিনি যাওয়াই স্থির করলেন। সিদ্ধান্তটি যে রোলাঁর মনঃপুত হয়নি সে কথা বলাই বাহুল্য। কী আর করেন, রোলাঁ তখন গান্ধীজিকে কষে মহড়া দিলেন মুসোলিনির মিথ্যা প্রচার এবং শয়তানি চক্রান্ত কেমন ক'রে পণ্ড করতে হবে। কিন্তু অবশেষে গান্ধীজির ইতালি-সফর-কালে যা হবার তাই হ'ল। এবার শুধু উক্তিই বিকৃত হ'ল না, জাল ফটোগ্রাফও ছাপা হ'ল। ফিরবার পথে গান্ধীজি যথারীতি প্রতিবাদও পাঠালেন কিন্তু, বলা বাহুল্য সে প্রতিবাদ প্রচারিত হ'ল না। রোলাঁ খবর শুনে জানালেন সংবাদে লিখলেন : 'কৌতূহল' নামক যে ডিপার্টটা আছে আমার ডিপ্লোমের মধ্যে সেটাকে শান্ত হয়নি। এবং একটা কঠিন পরিস্থিতি ... ১৯৩০ সালের জুন মাসে বিশ্বকবি ... রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর য়ুরোপ সফরকালে রোলাঁর সঙ্গে দেখা করেন। ... কাছে রোলাঁ শুনলেন যে যাবার পূর্বে ... তাঁকে বারবার করে বলে দিয়ে-ছিলেন : য়ুরোপে দুইজন ব্যক্তি আছেন যাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা একান্ত আবশ্যক : তাঁরা হলেন মুসোলিনি এবং রোমাঁ রোলাঁ।' এর পরে অবশ্য রোলাঁ আর কোনো মন্তব্য করেন নি।

যাই হোক, রাজনীতিতে রবীন্দ্রনাথ আনাড়ি এ বিষয়ে রোলাঁর বিশ্বাস বদ্ধমূল। জার্নালে লিখলেন, কবি গানের উৎস, শান্তিনিকেতনের দিনরাত্রি তাঁর গানের সুরে ঝংকৃত। কিন্তু বিশ্ব ভ্রমণকালে 'তিনি বিশ্বকে দেখেন যেন একটা পর্দার ভিতর দিয়ে উর্ধ্বলোকসঞ্চারী ঈশ্বরের ভঙ্গিমায়।' ৩০শে সেপ্টেম্বর কালিদাস নাগের সঙ্গে আলাপসূত্রে তিনি স্পষ্ট করেই বললেন : 'আমার ইচ্ছা রবীন্দ্রনাথ যেন দৃঢ়ভাবেই নিজেকে রাজনীতির বাইরে রাখেন কেননা রাজনীতি জিনিসটা ঠিক তাঁর মনের অনুকূল নয় এবং এর মধ্যে তিনি যথার্থ রসও পান না।' শুধু ভ্রান্তিরই নয়, রোলাঁর আত্মবিস্মৃতিরও পরিচয় আছে এই উক্তিতে। এ যাবৎ ভারতবর্ষ অথবা বিশ্বের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন এবং যা করেছেন (এবং ভবিষ্যতেও রোলাঁর prompting ছাড়াই যা বলবেন এবং করবেন) তা যে পলিটিসিয়ানের পলিটিক্স নয়, তার চেয়ে গভীরতর, ব্যাপকতর কিছু, সে কথা রোলাঁ ভালোভাবেই জানতেন এবং তাঁর রচনা থেকে যে কয়েকটি উদ্ধৃতি পূর্বে যথাস্থানে দিয়েছি সেগুলির মধ্যেই তার স্পষ্ট নজির আছে। রোলাঁ নিজেও পলিটিশিয়ান ছিলেন না এবং রবীন্দ্রনাথও তাঁকে কোনোদিনই তা মনে করেননি। বিশ্বের অনেক পলিটিশিয়ানের সঙ্গেই কবির মোলাকাৎ হয়েছে, তাদের তিনি ভালো ক'রেই জানতেন। রোলাঁকে যদি পলিটিশিয়ান বলেই মনে করতেন তাহলে তাঁর দিকে ফিরেও চাইতেন না। হঠকারী চিন্তার ফলে, রোলাঁ কেমন করে নিজেকে বিভ্রান্ত করতেন, অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে এটা একটি। কিন্তু, এইখানেই এই বিভ্রান্তির শেষ হয়নি।

১৯৩০ সালে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নানা জটিল কারণে উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে। রবীন্দ্রনাথ এবার একেবারে নীরব না হলেও আন্দোলনের লক্ষ্য বা কর্মনীতি সম্বন্ধে প্রকাশ্য সমালোচনা থেকে বিরত আছেন। এই সময় রোলাঁ আঁদ্রে কার্পেলেকে একখানি বিস্ময়কর পত্র (১লা জুন, ১৯৩০) লেখেন। তিনি লিখলেন : 'আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ যদি আন্দোলনের নীতি বা লক্ষ্য সম্পর্কিত কোনো আলোচনায় না গিয়ে য়ুরোপের উদ্দেশে তাঁর উদাত্ত এবং সকরুণ কণ্ঠে ভারতবর্ষের পূত আদর্শের কথা, শৃঙ্খলমোচনরত ভারতবাসীদের অধিকার, নিগ্রহভোগ এবং বীরোচিত স্বার্থত্যাগের কথা বুঝিয়ে বলেন তাহলে এমন একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয় যা ভারতবর্ষের স্বার্থের অনুকূল।—যাই হোক, আজ যদি তিনি কথা বলার প্রয়োজন বোধ না করেন কাল হয়তো সেই প্রয়োজন অকস্মাৎ এসে হাজির হতে পারে। হয়তো স্বাধীনতা-সংগ্রামের সূত্রে শক্তির

একটা য়ুরোপীয় জাতির দর্পরোচিত অনমনীয়তা এবং অমানুষিকতার ফলে অনুষ্ঠিত ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের পরে সেই প্রয়োজন অনিবার্যভাবেই দেখা দেবে। পূর্বাহ্ণেই সেইরূপ ঘটনার জন্য প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন।' রবীন্দ্রনাথ কখনও তাঁর স্বদেশের রাজনীতি-মঞ্চ ত্যাগ করবেন, কখন আবার পুনঃপ্রবেশ করবেন, এবং প্রবেশ ক'রে কতটুকু কর্মসীমার মধ্যে নিজেকে সীমিত রাখবেন সে সম্বন্ধে সুইটজারল্যাণ্ড নিবাসী রোমাঁ রোলাঁর নির্দেশের অপেক্ষা থাকতে পারে, এই আত্মপ্রসাদমূলক চিন্তার মূঢ়তা আমাদের কাছে আজ অমার্জনীয় বলেই বোধ হতে পারতো যদি না আমরা রোলাঁর বুদ্ধিগত আবিলতা সত্ত্বেও তাঁর আন্তরিক মহত্ত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতাম। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে হয়তো তিনি তাই নিজেকে বিদেশী ব'লে মনে করতেন না, অন্তত রবীন্দ্রনাথকেই লিখিত এক পত্রে (২রা মার্চ, ১৯২৩) তিনি একবার ভারতবর্ষকে তাঁর 'বৃহত্তর মাতৃভূমি' ব'লেই বর্ণনা করেছিলেন। তবে একথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে গান্ধীজির উপর তাঁর পুস্তিকাটি আমাদের দেশে যে রকম বাহবা পেয়েছিল এবং সম্প্রতি গান্ধী-আশ্রম থেকে ভিলনভে যে রকম দলে দলে তীর্থযাত্রীর আমদানি হচ্ছিল তাতে তাঁর স্বভাবনিহিত smugness কিছুটা উত্তেজিত হয়ে থাকবে এবং ফলে হয়তো অজ্ঞাতসারেই নিজেকে তিনি ভারতবর্ষের অন্যতম অভিভাবকের আসনটি দিয়ে থাকবেন। সেই জন্য দেখা যায় ভারতবর্ষের সংকটকালে রবীন্দ্রনাথ যে বিদেশে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন (অক্সফোর্ডে Hibbert Lectures) এবং য়ুরোপের প্রধান শহরগুলিতে তাঁর ছবির প্রদর্শনী করে বেড়াচ্ছেন সেটাকে রোলাঁ একটা পলায়নী মনোবৃত্তির পরিচয় বলে মনে করলেন এবং যথারীতি ক্ষুব্ধ হলেন। এবং এই ক্ষোভের মধ্যে তিনি যে বিচারের ভ্রান্তি; রুচির স্থূলতা এবং হঠকারী মনোভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন, তাতে তাঁর মনের দীনতম অংশটিই অতিমাত্রায় প্রকট হয়ে উঠেছে।

২রা মে তারিখে প্যারিসের গ্যালেরি পিগালে ১২৫ খানি ছবি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধন হ'ল। তারপর কয়েকদিন প্যারিসে থেকে জন্মদিনের সম্বর্ধনা এবং বেতার-ভাষণ সেরে ৭ই কবি ফিরে গেলেন ইংলণ্ডে। রোলাঁ প্রদর্শনী দেখতে নিমন্ত্রিত হয়েও সময়াভাবে যেতে পারেননি একথা জর্নালে লিখেছেন। অতঃপর ২০শে জুন কালিদাস নাগের সঙ্গে সাক্ষাতে আলাপ প্রসঙ্গে রোলাঁ তাঁর ক্ষোভ আর চেপে রাখতে পারলেন না। রবীন্দ্র প্রতিভার অসংগতির এমন একটি শোকাবহ চিত্র আঁকলেন যার সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া কঠিন। প্রথমেই রাজনীতিক্ষেত্রের কথা তুললেন। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশেই প্রায় এক-ঘরে হয়ে গেছেন। বর্তমান ভারতবর্ষ আর ঘরে বাইরের মতো উপন্যাসের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পায় না, তার কারণ ঐ উপন্যাসে যে সামাজিক অবস্থা চিত্রিত তা এখন অতীতস্মৃতিমাত্র। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর মতামত বা দৃষ্টি-ভঙ্গী আর নতুন ক'রে যাচিয়ে নেননি ইত্যাদি। জর্নালটি খুললে দেখা যাবে ১৯২২ সালের ৮ই এপ্রিল এই কালিদাস নাগের সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে এই একই বিষয়ে রোলাঁ আলোচনা করেছিলেন। গান্ধীজির সঙ্গে মতবিরোধের দরুণ রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে দেশে যে বিরূপতা দেখা দিয়েছিল তার ব্যাখ্যাচ্ছলে ঘরে বাইরে এবং Nationalism এর উল্লেখ রোলাঁও করেন কিন্তু এই দুটির মধ্যে অন্ধ স্বাজাত্যের যে সমালোচনা ছিল সেটাই যে অনেকের বিরূপ মনোভাবের কারণ সে বিষয়ে স্পষ্ট মন্তব্য করেন। তারপর মাত্র আট বছরের মধ্যে কী এমন আমূল পরিবর্তন এসেছিল ভারতবর্ষে যার জন্য ঘরে বাইরে উপন্যাসে চিত্রিত 'সামাজিক অবস্থা' ১৯৩০ সালেই 'অতীত স্মৃতিমাত্রে' পর্যবসিত হ'ল তা বোঝা কঠিন। তারপর সাহিত্যক্ষেত্রেও যে রবীন্দ্রনাথ অস্তাচল-যাত্রী সে বিষয়েও বিস্ময়কর প্রত্যয়ের সঙ্গেই রোলাঁ আলাপ করলেন। বললেন: 'বলাকা নামক মহৎ কবিতাটি (একটি কবিতার কথাই বলছেন বলে মনে হয়) রচনা করবার পর উল্লেখযোগ্য কিছুই তিনি আর লিখতে পারেননি। তিনি এখন সব ছেড়ে কেবল ছবি আঁকেন নিজেকে ভুলিয়ে রাখবার জন্য।' অতঃপর রোলাঁ আসল কথায় এলেন: 'এখন তাঁর চিত্তবিক্ষেপের এবং বিস্মৃতির এত প্রয়োজন হয়েছে যে তার ফলে প্যারিসে এমন সব

snob-দের সংসর্গ তিনি স্বেচ্ছায় অনুসন্ধান করছেন অথবা গ্রহণ করছেন যাঁরা তাঁর মতো ব্যক্তির অযোগ্য। তার ফলে আমাদের ফরাসী বন্ধুদের সঙ্গত নিন্দাবাদের (vertueuses condamnations) লক্ষ্য তিনি হয়েছেন। কবির চিত্রের এই সুপ্রকট লঘুতার পশ্চাতে যে একটি ট্র্যাজেডি আছে সে বিষয়ে তাঁরা নিঃসন্দেহ।' মনে রাখতে হবে রোলাঁর এই মন্তব্যের লক্ষ্য হল প্যারিসে ১৯৩০-এ যে অনুষ্ঠিত কবির চিত্রপ্রদর্শনী এবং ওই যে তাঁর জন্মদিনে তাঁকে ঘিরে সম্বর্ধনা এবং উৎসব। রোলাঁর এই মন্তব্যগুলির যে জবাব শ্রীমতী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো দিয়েছেন (সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশিত রবীন্দ্র শতবার্ষিক স্মারকগ্রন্থ দ্রষ্টব্য) তার একটি অংশ তুলে দিচ্ছি। শ্রীমতী ওকাম্পো যে শুধু প্রত্যক্ষদর্শীই ছিলেন তাই নয়, কবির চিত্রপ্রদর্শনীর তিনি অন্যতম উদ্যোক্তাও ছিলেন। তিনি লিখেছেন :

'Romain Rolland also said that the end of the poet's life was sad and that he had taken to painting as a pastime; that for the same reason, he sought and accepted in Paris, invitations from certain society people 'so little worthy of him.' Such frivolity was censured by 'our French friends' (Swiss Romain Roland's earnest and virtuous friends, I imagine). The fact is I was with Tagore in Paris at the time to which Romain Rolland alludes . . . I therefore know whom Tagore did and whom he did not see in Paris in 1930. He met Gide, his translator, for the first time. I was present at this encounter to which Gide came alone. Tagore received also the visit of Paul Valery, Jean Casson and Georges Henri Riviere (of the Museum of Man) who, at my request, organized a show of the Poet's paintings. He had lunch with the abbe Bremond, the abbe Mugnier and Countess Mathieu de Noailles. These seven people, of whom four at least bear illustrious names in French letters, cannot be described as particularly worldly-minded. To be sure, Madame de Noailles was high-born and Paul Valery had friends in 'society.' I fail to see that there was anything in this 'unworthy' of Tagore.'

ব্যক্তিগত কারণে ক্ষুব্ধ হলে রোলাঁর বিচার কতখানি ভ্রান্ত এবং অসঙ্গত হয়ে উঠতে পারতো এখানে তারই দৃষ্টান্ত আমরা দেখছি। প্যারিসের বিদগ্ধ সমাজ রোলাঁকে কোনো কালেই বিশেষ পাত্তা দেয়নি, সেইজন্যই রোলাঁও চিরকাল তার প্রতি বিমুখ ছিলেন, এমন কি, জীদ, ভালেরি প্রভৃতি কবি, আর্টিস্টদের নাম পর্যন্ত মুখে আনতেন না, একথার উল্লেখ আগেই করেছি যেহেতু রবীন্দ্রনাথ সেই ফরাসী বিদগ্ধ সমাজের দ্বারা সম্বর্ধিত হয়েছেন অতএব তাঁদের সঙ্গে মিশে যেন তিনিও এক অমার্জনীয় চিত্তচাপল্যের পরিচয় দিয়েছেন। উপরন্তু ফরাসী চিন্তা, সাহিত্য এবং আর্টের যাঁরা যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করেন—ফরাসী সাংস্কৃতিক জীবনে যাঁদের প্রতিষ্ঠা রোলাঁর চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে অর্থাৎ সেই আঁদ্রে জীদ, পল ভালেরি প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিরা হয়ে গেলেন 'snob'। এখানে উল্লেখ প্রয়োজন, প্যারিসের জ্ঞানীগুণীদের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ বন্দিত হওয়ায় রোলাঁর যে মনোবিকার তা এই প্রথম নয়। পূর্বেও অনুরূপ ঘটনায় রোলাঁ কী ধরনের মন্তব্য করেছিলেন তা সহজেই অনুমান করা যায় ১৯২৮ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারী L' Information নামক পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যটি পাঠ করলে :

'Romain Rolland complains that France has not accepted Rabindranath Tagore wholeheartedly. And yet this poet whose works have been translated and published by eminent publishers is being offered in Paris a similar literary worship as was once offered to Claudel and Andre Gide, and duchesses have dedicated themselves to him. **Romain Rolland is wrong to find only snobbishness in this worship.** He himself brings to this worship **the faith of** his revolutionary **heart.'** (অ্যালেককস আরনসন কৃত Rabindranath Through Western Eyes গ্রন্থে উদ্ধৃত, italics আমার)

যাই হোক, এই রকম অবিচল মন নিয়ে ১৯৩০ সালে রোলাঁ জেনিভায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। কবি তখন মিস স্টোরি নামক ইংরেজ মহিলার অতিথি। দুজনের এই শেষ সাক্ষাৎ দীর্ঘকালস্থায়ী হয়নি। আলাপ হল নানা বিষয়ে, কিন্তু এই আলাপের যে প্রতিলিপি আছে **Rolland and Tagore** গ্রন্থে তার সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে দেখা যায় জর্নালে এর বিবরণটি রোলাঁ খুব সংক্ষেপেই সেরেছেন। কারণ খুবই সহজবোধ্য। এবারেও ভারতবর্ষের কথা উঠলো এবং রবীন্দ্রনাথ রামমোহন রায়ের উল্লেখ করে তাঁকে 'the first internationally-minded man of the 19th century' বলে বর্ণনা করলেন। এই প্রসঙ্গে ব্রাহ্ম আন্দোলনের পটভূমিকা ও তাৎপর্যের কথাও বললেন। এবারের মতো পূর্বেও দু-একবার কবি রোলাঁকে রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে কৌতূহলী করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু রোলাঁর কাছ থেকে কখনোই বিশেষ সাড়া পান নি, এবারেও পেলেন না। এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয়, কেন না রোলাঁ নিজেকে বরাবরই 'cives totius orbis' বা 'বিশ্বনাগরিকদের' একজন বলে বর্ণনা করতে অভ্যস্ত ছিলেন। যাই হোক, বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তাঁর মত জিজ্ঞাসা করায় কবি জানালেন যে, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও তাঁর নিজের সত্যান্বেষণের পথ ভিন্ন। এই প্রসঙ্গেই তিনি মন্তব্য করেন : 'Truth cannot afford to be tolerant where it faces positive evil.' অতঃপর অন্যান্য প্রসঙ্গের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ছবির প্রসঙ্গ উঠলো। ছবির ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ রীতিমত উত্তেজিত। বললেন, 'জীবনের প্রভাতে তিনি শুরু করেছিলেন গান এবং কবিতা দিয়ে, জীবনের সন্ধ্যায় তাঁর মন ছবির রঙে এবং রেখায় পরিপূর্ণ।' সেই সঙ্গে প্যারিস, বার্মিংহাম, বার্লিন, কোপেনহাগেন প্রভৃতি শহরে তাঁর ছবির সমাদরের উল্লেখ করলেন। সাক্ষাতে রোলাঁ এ বিষয়ে শিষ্টাচারসম্মত আলাপই করলেন, উল্লেখ করলেন জার্মান কবি হের্মান হেসের, তিনিও চল্লিশোর্ধ্বে চিত্রকলাকে আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু গোপনে এ বিষয়ে

চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ

শেষ পর্যন্ত চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে। সরকারী এবং বেসরকারী খাতে মোট বরাদ্দ ধরলে চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় মোট ২৪৮৫৫ কোটি টাকা ব্যয় হবে। খসড়া পরিকল্পনায় মোট বরাদ্দ ছিল ২৪৩৯৮ কোটি টাকা; অর্থাৎ মোট বরাদ্দের পরিমাণ ৪৫৭ কোটি টাকা বেড়েছে। যদিও মোট বরাদ্দের পরিমাণ বেড়েছে, তবুও বেসরকারী বরাদ্দ ১০,০০০ কোটি টাকা থেকে ৮৯৮৪ কোটি টাকা পর্যন্ত কমানো হয়েছে। অপরপক্ষে সরকারী খাতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ধরা হয়েছে ১৫৮৭১ কোটি টাকা। খসড়া পরিকল্পনায় সরকারী খাতে বরাদ্দের পরিমাণ প্রথমে ছিল ১৪,৩৯৮ কোটি টাকা এবং শেষ পর্যন্ত ১৪,৩৯০ কোটি টাকা। চূড়ান্ত চতুর্থ পরিকল্পনায় সরকারী খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ১৪৮১ কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে।

সরকারী খাতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ যা বাড়ানো হয়েছে, তার মধ্যে ৩৯৭ কোটি টাকা খরচ হবে রাজ্য সরকারের পরিকল্পনাগুলিতে। অপর অর্থাৎ ১১৪৪ কোটি টাকা খরচ হবে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনাগুলিতে। রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে বরাদ্দের পরিমাণ ৩৯৭ কোটি টাকা বেড়ে যাওয়ায় মোট বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়ালো ৬৬০৬ কোটি টাকা। চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় রাজ্যগুলিকে প্রদত্ত কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যের পরিমাণ ৩৫০০ কোটি টাকায় দাঁড়াবে। বাড়তি যে বরাদ্দ রাজ্যগুলির জন্য করা হয়েছে তার টাকার ব্যবস্থা রাজ্যগুলিকেই করতে হবে। তবে পঞ্চম [illegible] কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলির হাতে অতিরিক্ত ৪৫০ কোটি টাকা তুলে দেবেন। কৃষি পুনর্অর্থসংস্থান সংস্থা (Agricultural Refinance Corporation) এবং খাদ্য কর্পোরেশনের মজুদ ভাণ্ডার সম্পর্কীয় কাজকর্ম (Buffer stock operations) থেকে আরও ৩৯০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে বলে ধরা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশন আশা করছেন কেন্দ্রীয় সরকারের অতিরিক্ত [illegible]-এর একটি বড় অংশ পাওয়া যাবে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি থেকে। চতুর্থ পরিকল্পনায় যে অতিরিক্ত প্রকল্প গৃহীত হয়েছে তার মধ্যে আছে বোকারো ইস্পাত প্রকল্পের সম্প্রসারণ, আসামে দ্বিতীয় তৈল শোধনাগার স্থাপন, ইস্পাত কারখানাগুলির ইস্পাত উৎপাদনের ক্ষমতার সম্প্রসারণ, [illegible] প্রকল্প [illegible] কারখানা এবং কয়লা, অ্যালুমিনিয়াম, তামা,

নিকেল প্রভৃতি খনিজ সম্পদের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন। পশুপালন, ছোট খামার, গ্রামীণ উন্নতির জন্য বিভিন্ন প্রকল্প প্রভৃতির জন্যও অতিরিক্ত বরাদ্দ করা হয়েছে। বেসরকারী খাতে বিনিয়োগ বরাদ্দের পরিমাণ কমানোর অর্থ এই নয় যে কেন্দ্রীয় সরকার অথবা পরিকল্পনা কমিশন বেসরকারী উদ্যোগের উপর গুরুত্ব কম আরোপ করতে চান। তবে "উচ্চাকাঙ্ক্ষার সংকট" যাতে আবার দেখা না যায়, সেজন্যই এই ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় করের বোঝা আরও বাড়বে এবং ঘাটতি অর্থসংস্থানের দরুণও ৮৫০ কোটি টাকার বেশি হবে, এ ধারণা করা অযৌক্তিক নয়। তবে সামগ্রিক সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়বে বলে অনুমিত হয়েছে। ব্যাংক জাতীয়করণের ফলে কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতির জন্য অর্থসংস্থানের ব্যাপক সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে বলে [illegible] হয়। তাছাড়া গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থা সম্প্রসারণের ফলে সামগ্রিক [illegible] অনেক বাড়বে বলে আশা করা যায়। [illegible] বৈদেশিক সাহায্যের [illegible] ৫২ [illegible] পেয়ে [illegible] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র [illegible] বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়ায় সরকারী মহলে কিছুটা উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। তবুও পরিকল্পনা কমিশন আশা করেন, চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় মোট বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ২৬২২ কোটি টাকা হবে। 'রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া'র গভর্নর শ্রী এল কে ঝা সম্প্রতি এক [illegible] চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় ভারতের সম্ভাব্য [illegible] নিয়ে [illegible]। ১৯৭০ সালটি [illegible] কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের জন্য কৃষিক্ষেত্রে [illegible] আয়ের সদ্ব্যবহার করে অতিরিক্ত সম্পদ বাড়ানো উচিত বলে অনেকেই মনে করেন। একথা অস্বীকার করা যায় না যে গ্রামাঞ্চলে [illegible] আমরা [illegible] পারিনি। এ ব্যাপারে যদি সরকার আরও সচেষ্ট হন, তবে চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা হয়ত নির্বিঘ্নেই তার লক্ষ্যে যেতে পারবে। আমাদের দেশে কার্যরত কৃষি-জোতের সংখ্যা হচ্ছে প্রায় ৫১ মিলিয়ন। হিসেব করে দেখা গেছে যে তার শতকরা দুই ভাগের উপর কর ধার্য করলেও বছরে ১৫০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে। যে "সবুজ বিপ্লব" আমরা সম্প্রতি দেখতে পাচ্ছি তা টিঁকিয়ে রাখতে হলে চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় কৃষি-উৎপাদনের সম্প্রসারণ করতে হবে এবং সেজন্য যে আর্থিক সম্পদের প্রয়োজন তার ব্যবস্থা করতে হবে কৃষিক্ষেত্র থেকেই। তা যদি না করা হয় তবে চতুর্থ পরিকল্পনায় আর্থিক সংকট তীব্র রূপ ধারণ করা অসম্ভব নয়।

তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার পর অশোক মেহতার নেতৃত্বে চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার যে খসড়া তৈরী হয়েছিল তা সরকার শেষ পর্যন্ত পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। ১৯৬৬ সালের ৫ই জুন তারিখে টাকার মূল্য হ্রাস, ১৯৬৫-৬৬ ও ১৯৬৬-৬৭ সালে খাদ্য সংকট, মূল্যস্ফীতি এবং বৈদেশিক সাহায্যের অনিশ্চয়তার চাপে অবস্থার পরিবর্তন হয়। তিন বছর আমাদের শুধু বার্ষিক পরিকল্পনার উপর নির্ভর করে থাকতে হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনকেও ঢেলে নতুন করে সাজানো হয়েছে। শেষ পর্যন্ত চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার আরেকটি খসড়া তৈরী করা হয় ১৯৬৯ সালে অধ্যাপক ডি আর গাডগিলের নেতৃত্বে। বর্তমানে চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার যে চূড়ান্ত রূপ দেখতে পাচ্ছি তার ভিত্তি হচ্ছে অধ্যাপক গাডগিলের নেতৃত্বে তৈরী খসড়া।

ক্ষুদ্রশিল্পের অর্থসংস্থানের জন্য রিজার্ভ ব্যাংকের নতুন নির্দেশ

১৯৭০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া ক্ষুদ্রশিল্প-

গুলিকে ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে গ্যারান্টি প্রথা আরও শিথিল করেছে। বর্তমান নির্দেশ অনুযায়ী অনুমোদিত ঋণদানকারী সংস্থাগুলি ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়নের জন্য যে ঋণ দেবে, তা গ্যারান্টিকৃত করার জন্য ব্যক্তিগত আবেদনের প্রয়োজন হবে না। এই ব্যবস্থায় ক্ষুদ্রশিল্পগুলি বিভিন্ন ঋণদানকারী সংস্থা (বাণিজ্যমূলক ব্যাংকগুলি সহ) থেকে আরও সহজে ঋণ পাবে। অর্থ-সংস্থানের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি বর্তমানে বিশেষ তৎপর হয়েছে। এই তৎপরতা যাতে আরও জোরদার হয় তার জন্যই রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক এই নির্দেশ প্রদত্ত হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রের ন্যায় ক্ষুদ্রশিল্পক্ষেত্রেও ব্যাংকগুলি কর্তৃক ঋণ দেওয়ার প্রধান সমস্যা হল ক্ষুদ্রশিল্পগুলির মালিক বা উদ্যোক্তাদের ঋণ গ্রহণযোগ্যতার (Credit worthiness) অভাব। ঋণ গ্রহণকারীদের ঋণ গ্রহণযোগ্যতা কম বলেই ঋণের বিপক্ষে গ্যারান্টি দেওয়ার প্রশ্ন উঠে। ঋণদানের ক্ষেত্রে গ্যারান্টি প্রথা আরও শিথিল করার ব্যবস্থা সময়োপযোগী হয়েছে।

সুব্রত গুপ্ত

॥ ২৫ ॥

আচমকা হাত থেকে সিগারেটটা পড়ে গেল দীপুর। নিচু হয়ে সেটা কুড়িয়ে নিয়েও কি ভেবে আবার ফেলে দিল। এক-একদিন সিগারেট মাটিতে পড়ে গেলে কুড়িয়ে খায়। এক-একদিন খায় না। কোনো যুক্তি নেই। পাইকপাড়ায় বউদির কাছে যাবে না, আজ থাক, আজ তার শুভ্রার সঙ্গে দেখা করতে চায় না। শান্তার সঙ্গে চারদিন দেখা হয়নি, শান্তার বাড়িতে যাবার উপায় নেই। শান্তা বলে দিয়েছে, ওর বাড়িতে আর না যেতে, শান্তা নিজে থেকেই এসে দেখা করবে। কি করছে এখন শান্তা?

রেলিং ছেড়ে দীপু রাস্তায় নেমে পড়লো। বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই সে সামনের একটা লোককে জিজ্ঞেস করলো, কটা বাজে?

লোকটি খুব সাবধানে জামার হাতা সরালো, তারপর আগে দীপুর মুখের দিকে তাকিয়ে তারপর ঘড়ির দিকে তাকালো। দীর্ঘক্ষণ মনোযোগ দিয়ে ঘড়ি দেখে বললো, এখন ঠিক সাতটা বেজে দুই।

— ঠিক?

— হ্যাঁ, সাতটা বেজে দুই, কারেক্ট টাইম।

'কারেক্ট টাইম' কথাটার ওপর লোকটি এমন জোর দিল যে দীপুর একটু মজা লাগলো। লোকটি তো খুব সময়-সচেতন, একটা মিনিটও এদিক-ওদিক করতে চায় না! সময় সম্পর্কে লোকটির সততা কতটা খাঁটি এটা দেখার জন্যই আরেকজন লোককে আবার সময় জিজ্ঞেস করলো। এই লোকটি ঢিলে হাতার পাঞ্জাবি পরা, হাত উঁচু করে কোনো রকমে ঘড়ির দিকে এক নজর তাকিয়ে বললো, পৌনে সাতটা।

দীপু একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, ঠিক পৌনে সাতটা?

—এই, মিনিট দশেক বাকি আছে সাতটা বাজতে!

লোকটি হয় দীপুকে কোনো গুরুত্ব দিচ্ছে না, অথবা সময়ের ব্যাপারটাই তার কাছে গুরুত্বহীন। পৌনে সাতটা কিংবা সাতটা বাজতে দশ-এর মধ্যে সে কোনো তফাত দেখতে পায় না, কিংবা এখন সত্যি সত্যি সাতটা বেজে দুই কিনা এ সম্পর্কে তার কোনো মাথাব্যথাই নেই।

কিন্তু দীপু এই নিয়ে একটা খেলা পেয়ে গেল। একটু এগিয়ে সে আর একজন লোকের কাছে সময় জানতে চাইলো। এই লোকটি প্রৌঢ় এবং সুসজ্জিত। বলে উঠলো না, ট্যাক্সির জন্য ব্যস্ত। কিন্তু ব্যস্ততা সত্ত্বেও, আগে দীপুকে খুব ভালো ভাবে দেখে নিল, তারপর ঘড়ি দেখলো ধীরে সুস্থে। বললো, সাতটা একত্রিশ, উঁ আমার ঘড়ি আধ ঘণ্টা ফাস্ট, উঁ, তা হলে এখন সাতটা বেজে এক, উঁ, ধরুন সাতটা!

বিচিত্র মানুষ। ইচ্ছে করে নিজের ঘড়ি ফাস্ট করে রেখেছে, নিজেই সে হিসেব জানে। সময়কে এগিয়ে রেখেছে বলেই কি ব্যবহার অত ধীর স্থির? কিন্তু হিসেব অনুযায়ী সাতটা বেজে এক-ই যদি হয় তাহলে আবার 'ধরুন সাতটা' কেন? হিসেব সম্পর্কে নিশ্চিত নয়?

খেলাটায় বেশ মেতে উঠলো দীপু। নানা জনকে সময় জিজ্ঞেস করে সে ছোটখাটো অনেক মজা উপভোগ করতে লাগলো। এ পর্যন্ত মাত্র দু' জনের কাছ থেকে অবিকল এক সময় শুনেছে, বাকি সবাই আলাদা আলাদা নিজস্ব সময় নিয়ে বেঁচে আছে। কোনো একটি মেয়েকে জিজ্ঞেস করারও ইচ্ছে করছে দীপুর, কিন্তু সাহস সঞ্চয় করতে পারছে না। টপ করে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার অভ্যাস তার নেই। কিন্তু এখন একটি মেয়ের কাছ থেকে সময় না জানলে খেলা চলে না।

থানার সামনে বাস স্টপে একটি বেশ দয়ালু চেহারার মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। তিরিশের ওপর বয়েস, গোলগাল চেহারা, বুকটা বেশ ভালো ভাবে আঁচলে ঢাকা, দেখলে সম্ভ্রম হয়। আর যাই হোক, এই মহিলা নিশ্চয়ই ভাববেন না যে দীপু ওঁর সঙ্গে চ্যাংড়ামি করতে এসেছে। তবু দীপুর বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো। নিরীহ মুখে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা, এখন কটা বাজে?

কোথায় দয়াল? ভদ্রমহিলা এমনভাবে ভুরু কোঁচকালেন যেন দীপুকে তিনি সেই মুহূর্তে ভস্ম করে দেবেন! অঃ, মেয়েরা কেন বোঝে না যে ভুরু কোঁচকানো মুখে তাদের একদম মানায় না! তবু পথে ঘাটে মেয়েরা বেশীর ভাগ সময় ভুরু কুঁচকিয়ে আছে। ভুরু কোঁচকানো কি একটা অস্ত্র নাকি, শিশুদের কান্নার মতন? ভদ্রমহিলা ঘড়ি পরা হাতটা অন্য হাত দিয়ে চেপে ধরলেন, যেন এই প্রকাশ্য রাস্তায় এত লোকজনের মধ্যে পেছনেই থানা—তবু দীপু ওঁর ঘড়ি কেড়ে নেবে। দীপু তখন পালাতে পারলে বাঁচে, কিন্তু হঠাৎ পিছু ফিরে দৌড়ানো যায় না—মুখখানা এমন কাচুমাচু করে রইলো, যেন এই মুহূর্তে সময় জানার ওপর তার জীবন মরণ নির্ভর করছে।

দীপুর দিকে আর একবার ধিক্কার মিশ্রিত চোখে তাকিয়ে তিনি বললেন, সাড়ে কুড়ি!

—ধন্যবাদ। অত্যন্ত ধন্যবাদ।

চলতি বাসে ওঠার ভঙ্গি করে দীপু হন হন করে এগিয়ে গেল। ইনিও ভুল সময় নিয়ে বেঁচে আছেন।

আরেকজন লোকের কাছ থেকে দীপু চমকপ্রদ উত্তর পেল। নিখুঁত সুট-টাই পরা একজন ঠিক প্রৌঢ় নয়, ঠিক যুবক নয় লোকের কাছে দীপু জিজ্ঞেস করলো, এখন কটা বাজে বলতে পারেন?

লোকটির চুল ও জুতোর পালিশ সমান ঝকঝকে, কিন্তু দীপুকে হতভম্ব করে দিয়ে লোকটি সংক্ষিপ্ত ভাবে উত্তর দিল, ঘড়ি নেই।

সুট পরা কোনো লোকের হাতে ঘড়ি নেই, এ দীপু আগে কখনো দেখেনি। এ হতেই পারে না। ঘড়ি তো একটা অলংকার, পোশাকের একটা অংশ, এই লোকটির পোশাকে তা হলে ঘড়ি কেন? নিশ্চয়ই ঘড়িটা সরাতে দিয়েছে, এই ভেবে দীপু আশ্বস্ত হলো।

দীপু চলে যাচ্ছিল, লোকটি তবু অযাচিত ভাবে বললো, এখন এই পৌনে আটটা-টাটা হবে।

দীপু হেসে বললো, না, তাতে হবে না বোধহয়।

—এই পৌনে আটটার কাছাকাছি হবে।

দীপু এর পরে আরো লোককে জিজ্ঞেস করে দেখেছে, ঘড়ি নিয়ে বলেছে যে এখন সঠিক সময় সাতটা থেকে আট মিনিট থেকে দশ মিনিটের মধ্যে। এই সুট পরা লোকটির হাতে এখন ঘড়ি না থাকলেও, ঘড়ি পরা যে ওর অভ্যেস তাতে কোনো ভুল নেই। অথচ এক-আধদিন হাতে ঘড়ি না থাকলেই সময় সম্পর্কে ধারণা করতে পারে না! আধ ঘণ্টা ভুল!

এতদিন দীপুর ধারণা ছিল, কেবল ঘড়ির দোকানেই শুধু নানা রকম ভুল সময় দেখা যায়। এখন দেখছে, বেশীর ভাগ মানুষই ভুল সময়কে সঙ্গে নিয়ে আছে। অথচ সবাই নিজের ঘড়ি ঠিক রাখা চাই। অনেকে আবার ঘড়ি দেখে তারিখও মিলিয়ে নিতে চায়।

বাবার সোনার ঘড়িটা দীপু আগে মাঝে মাঝে পরতো। বাবা রাগ করতেন। একদিন বাবা বললেন, ঘড়িটা হারিয়ে গেছে। হারায়নি, দীপু জানে, বাবা সেটা বিক্রী করে দিয়েছেন। দীপুর নিজস্ব ঘড়ি কোনো দিন ছিল না।

শান্তা একটা ঘড়ি পরে। কাল শান্তার সঙ্গে দেখা হলেই দীপু ওর ঘড়িটা মিলিয়ে দেখবে। যদি একচুলও সময়ের এদিক-ওদিক থাকে, দীপু সেটা ফুটপাথের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দেবে। কোথায় প্রতিদিন, তার সঙ্গে সময়ের তাল কেলে ফেলো...। হঠাৎ দীপুর

একটা কথা মনে পড়ে গেল। মেজদির মেয়ে টুলটুল জন্মেছিল রাত্তিরবেলা। প্রথম ছ মাস টুলটুলকে নিয়ে বাড়ির সবাই ব্যতিব্যস্ত। ও সারা দিন ভরে ঘুমোতো, আর সারা রাত জেগে থাকতো। সবাই বলতো, রাত্তিরে জন্মেছে তো, তাই ও মেয়ে এখনও রাত্তিরটাকে দিন আর দিনটাকে রাত্তির মনে করছে।—রাত্তিরটাই ওর হাত পা ছোঁড়া খেলা, হাসি ও কান্নাকাটির সময়। তখন কথাটা শুনে দীপু খুব অবাক হয়েছিল। মানুষের দিন রাত্তির আর সময়ের বাঁধাধরা হিসেব কেউ যদি সারা জীবন উপেক্ষা করে থাকতে পারতো? তার লোভ, হিংসা, ভালোবাসা, দুঃখ এগুলোও কি অন্যরকম হতো?

হাঁটতে হাঁটতে দীপু একেবারে [illegible] কাছাকাছি চলে এসেছে। অনেকক্ষণ হাঁটছে বলেই হাঁটার ওর খারাপ লাগছে না। [illegible] থেকে নেমে হাঁটছে [illegible], [illegible] সম্পর্কে সচেতন নয়—কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তিবশেই [illegible] চাপা পড়ছে না।

রাস্তায় অনেক মানুষ, এদের মধ্যে দীপুর আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। সেজন্যই [illegible] [illegible] [illegible] চাপা, ভালো করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়—সে এখন মনে মনে কথা বলছে। অবশ্য ভালো করে লক্ষ্য করবার [illegible] নয়। রাস্তার সবাই যে-যার নিজের কাজে চলেছে, সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত।

রাস্তার পাশে [illegible] ঠিক [illegible] দাঁড়িয়ে দুটি মেয়ে, [illegible] বান্ধবী [illegible] [illegible] কি রকম যেন অদ্ভুত, [illegible] সব বই বিক্রী করে নাকি? [illegible] জিজ্ঞেস করলে, অনেক বই আছে [illegible] ওদের [illegible]?—কি জানি, কখনো পড়িনি।

দীপু ওদের দুজনকে দেখতে পায়নি, ওরাও দীপুকে ডাকলো না, দীপু দূরে চলে গেল।

বাড়ির প্রসঙ্গ ভুলে দীপু এখন সম্পূর্ণ অন্য কথা ভাবছে। আসলে দীপু এখন আর কলকাতায় নেই, ও পৌঁছে গেছে পশ্চিম জার্মানিতে। হামবুর্গ বিমান বন্দরে নেমে এদিক-ওদিক চাইছে। পোশাক এই রকমই, প্যান্ট সার্ট ও চটি, ডান হাতে একটা স্যুটকেস ও বাঁ হাতে পাস-পোর্ট, ঐ পাস-পোর্টখানা যেন হাজার হাজার লোককে দেখাতে হবে, এমনকি ট্যাক্সি ড্রাইভারকেও। কাস্টমস বেরিয়ার পার হয়ে বাইরে এসে দীপু খুব সপ্রতিভভাবে একজন ট্যাক্সি ড্রাইভারকে পাসপোর্ট দেখিয়ে, তারপর রণেনদার ঠিকানা বললো। ট্যাক্সি ড্রাইভার তো দীপুর ভাষা এক বর্ণও বুঝলো না, সে দীপুর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলো। দীপু কিন্তু তাতেও দমলো না, সে আপ্যায়িত করার মতন হেসে বললো, গুটেন মরগেন।

ঐ দুটি মাত্র জার্মান শব্দই দীপু জানে। কিন্তু তাতেই ম্যাজিকের মতন কাজ হলো, তারপর থেকে ট্যাক্সি ড্রাইভার দীপুর সব কথা বুঝতে পারলো—এক গাল হেসে সে-ও বললো, ও, তুমি ইণ্ডিয়া থেকে এসেছো? ইণ্ডিয়া খুব ভালো দেশ। আমি আর একজন ইণ্ডিয়ানকে চিনি। তার নাম রণেন গুহ, খুব অ্যামিয়েবল লোক—

দীপু বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলো, তুমি রণেন গুহকে চেনো? তিনিই তো আমার জামাই-বাবু, ব্রাদার ইন ল, আমি তো তাঁর ঠিকানাই—

—[illegible] [illegible] [illegible]? তাহলে তো তুমি আমারও বন্ধু, চলো, আমি তোমাকে [illegible] পৌঁছে দিচ্ছি—

রণেনদা ইলেকট্রিক শেভার-এ দাড়ি কামাচ্ছিলেন, চেহারা একই রকম আছে, একটুও বদলায়নি। দীপুকে দেখে দারুণ আনন্দে জড়িয়ে ধরলেন। আধখানা গালে দাড়ি কামানো অবস্থাতে বন্ধ রেখেই তিনি বললেন, কি আশ্চর্য ব্যাপার, আমি আজই তোমার কথা ভাবছিলুম, দীপু!

গীর্জার পাশে সাততলা বাড়ির একেবারে ওপর তলায় রণেনদা থাকেন। রণেনদার জানলা দিয়ে গীর্জার চূড়া দেখা যায়—তারও ওপাশে দেখা যায় হামবুর্গ পোর্ট আর [illegible] ভিড়। ঘন ঘন জাহাজের ভোঁপু শোনা যাচ্ছে। মাত্র ছোট ছোট দু'খানা ঘর নিয়ে রণেনদার ফ্ল্যাট, জিনিসপত্রে একেবারে ঠাসাঠাসি। এত ছোট ঘরে রণেনদা বোধহয় আগে কখনো থাকেননি, বাগবাজারে রণেনদাদের বিশাল বাড়ি প্রায় ফাঁকা পড়ে আছে। দুটি ঘরের মাঝখানের দরজায় রণেনদার জার্মান বউ দাঁড়িয়ে আছে, রীতিমতন মোটাসোটা জাঁদরেল চেহারা — মুখখানা গম্ভীর, তার পেছনে দুটি ফুটফুটে বাচ্চা। রণেনদা বউকে বললেন, দীপুর নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে, ওর জন্য হ্যাম-স্যাণ্ডউইচ বানাও, আর বিয়ার বার করো—

দীপু ম্লান গলায় বললো, অনেক কষ্ট করে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি রণেনদা, এমনি এমনি জার্মানিতে আসা কি চাট্টিখানি কথা! আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি, তার উত্তর শুনেই চলে যাবো।

রণেনদা হাসতে হাসতে বললেন, আরে, ওসব কথা-টথা পরে হবে। এসেছো যখন তোমাকে সহজে ছাড়ছি না। চলো, কাল সকালেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়বো, রাইন নদীর পারে কি সুন্দর জায়গা, রিলকে যেখানে থাকতেন, তারপর ব্ল্যাক ফরেস্ট—

—রণেনদা, আমি বেড়াবার জন্য আসিনি। আমাকে মাত্র তিন দিনের ভিসা দিয়েছে।

—ধ্যুৎ! তিন দিনের ভিসা আবার কি? তুমি কিছু জানো না—যতদিন খুশী থাকো—

—আমি বেড়াতে ভালোবাসি, কিন্তু এখন আমার থাকার উপায় নেই, পরের প্লেনেই আমাকে ফিরে যেতে হবে। আপনি মেজদিকে—

—চুপ!

—কেন, আমাকে চুপ করতে বলছেন কেন? আমি তো এই কথাই বলতে এসেছি।

—না, ওসব কথা এখন থাক। এখন বসো. জামাকাপড় ছাড়ো, কিছু খেয়ে নাও।

—না, রণেনদা, আমি আপনার কাছ থেকে আগে উত্তর না শুনে আপনার বাড়ির জলও স্পর্শ করবো না।

রণেনদা হা হা করে হাসলেন ঘরের দরজা-জানলা কাঁপিয়ে। ঠিক আগেকার মতন, আমহার্স্ট স্ট্রীটের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রণেনদা এত জোরে হাসতেন যে রাস্তার লোকজন চমকে যেত। হাসতে হাসতে রণেনদা বললেন, শোনো ইলসিগ্রিড, শোনো, আমার শালকটি একেবারে টিপিক্যাল হিন্দুর মতন কথা বলছে! 'জল স্পর্শ করবো না—' হাঃ হাঃ হাঃ! ঠিক আছে, বলো দীপু, তোমার প্রশ্নটা কি?

—আপনি মেজদির সঙ্গে ওরকম ব্যবহার করলেন কেন?

—কি রকম ব্যবহার?

—আপনি জানেন। আপনি ঠিকই জানেন। আপনি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছেন। আমি আসার পর আপনি আমাকে মেজদির কথা একবারও জিজ্ঞেস করেননি। এমনকি, আপনার মেয়ে টুলটুলের কথাও জানতে চাননি। রণেনদা, আপনি এরকম অমানুষ হলেন কি করে?

এর পর থেকে দীপুর কল্পনাটা দু' ভাগে ভাগ হয়ে গেল। প্রথমাংশে সে দেখলো, রণেনদা আবার প্রাণখোলা হেসে উঠে বললেন, তুমি ঠাট্টাও বোঝো না! তোমার দিদির সঙ্গে আমার কি হয়েছে কি, কিছু হয়নি! আমি একটা ট্রেনিং কমপ্লিট করার জন্য এখানে পড়ে আছি। সেটা শেষ হলেই দেশে ফিরে যাবো। আমার মেয়েকে দেখার

জন্য আমার প্রাণ সব সময় ছটফট করে। অপর্ণাকে ছেড়ে যে আমি কি কষ্টে আছি!

দীপু অবাক হয়ে বললো, আপনি এখানে বিয়ে করেননি?

—আমি অপর্ণাকে ছেড়ে আবার বিয়ে করবো? তুমি এ রকম কথা ভাবতে পারলে?

—তাহলে ঐ ভদ্রমহিলা?

—ঐ ইনগ্রিড? ও তো আমার ঝি! কিচেন রাঁধুনি। তুমি ওকে আমার বউ ভেবেছো? আরে রাম!

—তাহলে আপনি মেজদিকে চিঠি লেখেন না কেন?

—কে বলেছে চিঠি লিখি না? প্রত্যেক সপ্তাহে লিখি, আমার এক বন্ধুর ঠিকানায়—আমার বন্ধু অনিমেষকে আমি খামে চিঠি লিখি, সে অপর্ণাকে পৌঁছে দেয়—তোমাদের একটু চিন্তায় ফেলার জন্যই—অপর্ণা কি কোনোদিন তোমাদের কাছে আমার নামে কোনো অভিযোগ করেছে? বলো, করেছে?

—না, তা করেনি অবশ্য।

—তবে?

দীপু উঠে গিয়ে রণেনদাকে জড়িয়ে ধরলো। বিরাট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, উঃ, রণেনদা, এত ভালো লাগছে আজ! এতদিন একটা ভুল ধারণা ছিল—সত্যি, আপনার মতন মানুষকে সন্দেহ করা—

কিন্তু এই দৃশ্যটা বিশ্বাসযোগ্যভাবে দীর্ঘস্থায়ী হলো না। বদলে গেল। রণেনদা ডিভানের ওপর গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন, সিগারেট টানতে লাগলেন অনবরত। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে আস্তে আস্তে বললেন, তোমার মেজদির সঙ্গে আমার যা হয়েছে, সেটা একান্ত আমাদেরই ব্যাপার। তুমি এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছো কেন?

দীপু কাতরভাবে বললো, রণেনদা, আমি মেজদির সঙ্গে ভালো করে কথা বলতে পারি না। মুখোমুখি হলে এড়িয়ে যাই। মেজদির জন্য আমার খুব কষ্ট হয়। ন' বছর ধরে মেজদি যে-রকম চাপা দুঃখে জীবন কাটাচ্ছে! আপনি তো জানেন, ও কি রকম অভিমানী মেয়ে! তা ছাড়া টুলটুল, কি সুন্দর হয়েছে সে, আজও সে তার বাবাকে দেখেনি—আর সবার বাবা আছে, ওর নেই।

—ওকে বুঝিয়ো, ওর বাবা মরে গেছে!

—ছিঃ, আপনি এ রকম কথা বলছেন কেন? এখনো আপনি ফিরে আসতে পারেন না?

—না, তা সম্ভব নয়। আমি ইনগ্রিডকে বিয়ে করেছি, আমার এখানে দুটো বাচ্চা হয়েছে, সিটিজেনশীপ পেয়ে গেছি।

—রণেনদা, কেন আপনি এরকম করলেন? শুধু মেজদির জীবন নয়, টুলটুলেরই বা কি হবে? ও তো কোনো দোষ করেনি!

—কত মেয়েরই তো বাবা মরে যায়। তারা কি মানুষ হয় না।

দীপু এবার চটে উঠলো, চেঁচিয়ে বললো, আপনি ভেবেছেন কি? আপনি ভেবেছেন, পার পেয়ে যাবেন? আমি জার্মানিতে কেন এসেছি জানেন, সব্বাইকে বলে দেবো যে আপনার এখানকার বিয়েটা বে-আইনী। আগে আপনার বিয়ে আছে! এক সঙ্গে দুটো বিয়ে করলে পরেরটা ভেস্তে যায়। আমি জার্মান গভর্নমেন্টকে জানাবো, আমাদের এমব্যাসীতে জানাবো—আপনাকে ঘাড় ধরে এ দেশ থেকে বার করে দেবে—

রণেনদা বিচলিত হলেন না। ঠাট্টার ভঙ্গিতে হাসতে লাগলেন। বললেন, বাবাঃ, তুমি এত কিছু করবে? এখানে কারুকে চেনো না শোনো না, টাকা পয়সা বেশী নেই, তাও তুমি এত কাণ্ড করবে? যাক গে, ঠাট্টা নয়। দীপু, তোমাকে তো আমি এত অগভীর বলে কখনো মনে করিনি। সাধারণ লোকে যে-কথা বলে, তুমিও তাই বললো? ধরো, কথার কথা বলছি, আমার দ্বিতীয় বিয়েটা অসিদ্ধ হয়ে গেল, আমাকে এ দেশ থেকে তাড়িয়ে দিল, তা হলেই কি তোমার মেজদির সঙ্গে আমার আবার মিল হবে? এত কাণ্ডের পর? তা কি কখনো হয়!

—রণেনদা, আপনি তা হলে এরকম করলেন কেন? আপনি তো মেজদিকে ভালো বাসতেন, আমি জানি। তবু কেন বিদেশে এসে—

—দ্যাখো দীপু, সেটা সম্পূর্ণ অপর্ণা আর আমার নিজস্ব ব্যাপার। সেটা আর কেউ বুঝবে না। দুজন নারী পুরুষ কেন পরস্পরকে ভালোবাসে এবং কেনই বা ভালোবাসা নষ্ট হয়ে যায় সেটা একেবারেই তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার যে আর কারুর পক্ষে সেটা বোঝা সম্ভব নয়। আর কারুকে সেটা বলাও যায় না, মাকে না, বাবাকে না, শ্বশুর কিংবা শালা কিংবা কোনো বন্ধুকেও না—। আমি অপর্ণাকে আর ভালোবাসি না। বিদেশে আসার পর এটা হয়নি আগেই হয়েছিল, কোনো একটা ব্যাপারে—। কিন্তু নিজের স্ত্রীকে ভালো না বেসেও অনেক লোক পারিবারিক দায়িত্ব, সামাজিক দায়িত্ব মেনে চলে। তারা ভণ্ড। আমি সেই ভণ্ডামি করিনি।

—কিন্তু কি ব্যাপার হয়েছিল, আপনি এখানে আসবার আগে?

—তোমাকে সেটা বলা সম্ভব নয়।

—টুলটুল তো কোনো দোষ করেনি! ও তো আপনার মেয়ে—

—ওকে তো আমি কখনো চোখে দেখিনি, সেই জন্য ওর প্রতি আমার কোনো মায়া বসেনি।

—রণেনদা, আমি যে টুলটুলকে রোজ দেখি। এমন সুন্দর মেয়ে—স্কুলে যখন অন্য মেয়েরা তাদের বাবার গল্প বলে, ও তখন—আমার বড্ড কষ্ট হয় টুলটুলের জন্য, আপনার ওপর আমার তখন অসম্ভব রাগ হয়—ইচ্ছে হয়, জার্মানি থেকে আপনাকে জোর করে টেনে নিয়ে আসি—

দমকা হাওয়া দিচ্ছে ময়দানের দিক থেকে। পার্ক স্ট্রীটের কাছাকাছি এসে দীপুর স্বপ্ন ভেঙে গেল। মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল তাতে। প্রথম দৃশ্যটা যদি সত্যি হতো, যেটাতে রণেনদা হাসতে হাসতে বলছিলেন, এসবই তো ঠাট্টা করছিলাম—আসলে আমি চেষ্টা করছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে যেতে, টুলটুলের জন্য আমার মন কেমন করে, অপর্ণাকে আমি ভালোবাসি, আমি ফিরে যাবো—

বাড়ি ফিরবেই ঠিক করে দীপু পার্ক স্ট্রীটের কাছ থেকে বাসে উঠে পড়লো। মেজদির সঙ্গে বসে একটু কথা বলতে হবে। টুলটুল যদি ঘুমিয়ে না পড়ে এর মধ্যে—

কিন্তু দীপুর বাড়ি ফেরা হলো না। ট্রেনের কাছে বাস থেকে নেমেই দীপু পাড়ার সেই ছয় মস্তানের মুখোমুখি পড়ে গেল। দীপু মনে মনে যাদের নাম দিয়েছে ছয় রিপু। একজন বললো, এই যে দীপু, ভাগ্যিস তোমার সঙ্গে দেখা হলো। নইলে মাইরি মহা বিপদে পড়ে যেতাম। দশটা টাকা ধার দাও তো, কাল সকালেই দিয়ে দেবো। সত্যি বলছি, ফেরেব্বাজি নয়, কাল সকালেই—

দীপু বললো, আমার কাছে তো দশ টাকা নেই!

আরেকজন বললো, কোথা থেকে ফিরছো? গায়ে ভুরভুর গন্ধ! গার্ল ফ্রেণ্ডের সঙ্গে জড়াজড়ি হয়েছে বুঝি আজ?

যে বলছে, তার মুখেই স্পষ্ট অ্যালকোহলের গন্ধ। অথচ সে দীপুর গা থেকে কি করে গন্ধ পায় কে জানে। দীপু হেসে বললো, না ভাই, আজ ব্যাড লাক, আজ দেখা হয়নি।

—কেন ভাই ঢপাচ্ছো! বাঁশি বাজিয়ে? ছাড়ো দীপু মাস্টার, দশটা টাকা ছাড়ো!

দীপু আড়চোখে তাকিয়ে বুঝতে পারলো, ওরা তার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে বটে, কিন্তু আসলে ওরা তাকে ঘিরে আছে। হঠাৎ চলে যাবার কোনো উপায় নেই। তাদের ওপর একটু চোখ রাঙালেই ওরা আরও পেয়ে বসবে। ওরা তাই চাইছে।

(ক্রমশ)

বিয়োগান্ত সাধনা

কথা হচ্ছিল একজন প্রবীণ সঙ্গীত শিক্ষকের সঙ্গে। আজকালকার নানা প্রসঙ্গের সঙ্গে সঙ্গীত সাধনার কথা উঠল। কার কতখানি সাধনা এবং তাতে কতখানি সিদ্ধিলাভ হয়েছে তার একটা আলোচনা চলছিল। আরও দু'একজন ছিলেন এই চক্রে। তাঁরাও তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে দু-একটি কাহিনী বললেন। সাধনা সম্যক্ না হলে যে যথার্থ সার্থকতা লাভ করা যায় না—এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যটিই আমরা যখন নানা প্রমাণ সহযোগে মেনে নিতে যাচ্ছি তখন প্রবীণ সঙ্গীতজ্ঞ বললেন—"কিন্তু মশাই, [illegible] সাধনাতেও সফলকাম হলেন [illegible]"

[illegible] আমিও ছিলুম। [illegible] সঙ্গীত শিক্ষক [illegible] সহযোগীও ছিলেন। কিন্তু [illegible] তার সঙ্গে দেখা [illegible] তখন আমরা তাঁকে নিয়ে কিছু হাসাহাসিও করেছি—এখন তাঁকে ভাল বলছি। লোকটি সত্যিই ছিলেন সরল এবং সহজ। [illegible] তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখেছিলেন। [illegible] পরিশ্রম করে স্বরলিপি তুলতেন, কোনও ত্রুটি তার দৃষ্টি এড়াতো না। [illegible] কিন্তু সে গানে [illegible] তাঁর গান [illegible] পরিণত হত না, কিন্তু [illegible] পরিশ্রম [illegible] হত। [illegible] বয়সে তিনি রাগ-সঙ্গীত সাধনা [illegible]। সেখানেও রাগ, তালে ত্রুটি [illegible] তিনি আদৌ [illegible] পারতেন না। তাঁর রাগ-সঙ্গীতের [illegible] একদিন তাঁকে বললেন—'দেখো, আমার মনে হয় তুমি বাংলা গান শেখো। তাতে [illegible] ফল হবে। রাগ-সঙ্গীতের [illegible] তোমার গলা, তাতে তোমার ভাল বাংলা গান শিখতে অনেক সুবিধে হবে।" ভদ্রলোক বহু আসরে রাগসঙ্গীত গাইতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। অনেকবার রেডিওতে অডিশন দিয়েও উত্তীর্ণ হতে পারেননি। অতএব গুরুর কথাটা শুনলেন—এলেন রবীন্দ্র-সঙ্গীতে সিদ্ধিলাভ করবার জন্য। এই সময়েই তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ। তাঁর আগের ইতিহাসটা তিনিই আমাকে বলেছিলেন। তারপরে এক সময়ে স্বাভাবিক নিয়মেই—এইসব সঙ্গীত সংস্থার সঙ্গে আমার যোগসূত্র শিথিল হয়ে গেল এবং অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গেই বিচ্ছেদ ঘটল। তাঁর সঙ্গেও আমার আর কোনও সম্বন্ধ রইল না।

এরই পরের পর্যায় থেকে এই প্রবীণ সঙ্গীতজ্ঞের সঙ্গে, উক্ত ভদ্রলোকের আলাপ। পরের কাহিনী তাঁর কাছ থেকেই শুনলুম। অবশ্য এই উপলক্ষ্যে যে দু'জনের নাম করা হয়েছে তা কাল্পনিক। তিনি বললেন—"পূর্ণেন্দুবাবু যখন আমার কাছে এলেন তখন শিক্ষার্থীর পক্ষে তাঁর বয়স একটু বেশীই বলতে হবে। তিনিও সেটি উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি আমাকে বাড়িতেই অ্যাপয়েন্ট করেছিলেন। পয়সার তাঁর অভাব ছিল না—তাই তখনকার দিনে আমার চাহিদা মেটাতে তাঁর কষ্ট হত না। আমি সিনেমার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, আধুনিক গানই শেখাই—এই বয়সে তাঁকে হালকা আধুনিক গান শেখাতে আমার রীতিমত সংকোচ হত। কিন্তু তিনি অতি আগ্রহে সেই সব গানই শিখতেন, যদিচ তাও মোটেই রসোত্তীর্ণ হত না। ক্রমে আমার ক্লান্তি এসে যাচ্ছিল। যে ছাত্রের কোনও সম্ভাবনা নেই তাকে শেখানোর মত বিড়ম্বনা আর নেই। অথচ লোকটি এত ভাল যে তাঁর মনে আঘাত দিতে কষ্ট হচ্ছিল। এইরকম চলেছে এমন সময় একটা কাণ্ড ঘটল।

"একটা গানের কম্পিটিশন ছিল তাতে আমি বিচারক। দেখলাম রাগসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত, আধুনিক তিনটেতেই পূর্ণেন্দুবাবু প্রতিযোগী। অধিকাংশ ছেলে মেয়েদের সঙ্গে সামান্য কম্পিটিশনে তাঁর অংশগ্রহণটা খুবই বেমানান কিন্তু তাতে পূর্ণেন্দুবাবুকে বিচলিত দেখলুম না। শ্রোতাদের বিদ্রূপ, হাততালি অগ্রাহ্য করেই তিনি তাঁর কর্তব্য সমাপন করলেন। জানা গেল প্রায়ই তিনি এইসব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছেন এবং প্রতিবারই বিফলকাম হচ্ছেন। এবারও হলেন।

"খুব খারাপ লাগল। তাছাড়া তাঁর সঙ্গে আমার নামটা জড়িত থাকায় আমার সম্মানেরও হানি হচ্ছে বলে মনে হল। ঠিক করলুম, এবার আমি ইস্তফা দেব। মনস্থির করেই সেদিন গেছি। একথা সে-কথার পর শেষ কথাটা বলব ভাবছি, এমন সময় ঘরে ঢুকল রেখা। রেখা চ্যাটার্জিকে আপনাদের মনে আছে কিনা জানি না। এক সময় তার দুখানা রেকর্ড ছিল খুবই বিখ্যাত তার খ্যাতিও ছিল অসাধারণ। হঠাৎ সঙ্গীত জগৎ থেকে সে তিরোহিত হয়ে যায়। কি কারণে তার অপসারণ ঘটেছিল সেটাও পরক্ষণেই বুঝলুম। রেখা আমারই ছাত্রী ছিল এবং অসামান্য প্রতি-শ্রুতি সম্পন্না ছাত্রী।

"কোনরকম ভূমিকা না করেই রেখা বললে—'মাস্টার মশাই, আপনার পায়ে পড়ি, আপনি ওঁকে বলুন যে ওঁর কোনদিন গান-বাজনা হবে না, গাইয়ে হওয়া ওঁর ভাগ্যে নেই। এতদিন আমি কিছু বলিনি, আমি চাইনি ওঁকে আঘাত দিতে। কিন্তু আজ দেখছি ওঁর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে কম্পিটিশনে নামছেন—তারা ওঁকে নিয়ে হাসাহাসি করে। রেডিওতে যাচ্ছেন, গ্রামোফোন কোম্পানীতে যাচ্ছেন শুধু অপমানিত হবার জন্য। নিজেকে বিচার করবার শক্তি উনি হারিয়ে ফেলেছেন শুধু এই একটি জায়গায়।'

"রেখার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে ও বলতে লাগল—'আমার স্বামী আর কোন অংশে কারুর চেয়ে হীন নয়, তবু কেন আমি দেখব তাঁকে আমার শ্বশুর বাড়ির লোক থেকে সবাই উপহাস করছে?'

সংগীত সংহতি সম্মেলন

প্রসিদ্ধ [illegible]

[illegible] ... বাংলাদেশের এ-যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের সংসদের পক্ষ থেকে উদয়শংকরের সম্বর্ধনা দিয়ে সম্মেলনের সূত্রপাত। [illegible], ত্রিপুরা, বিহার, আসাম, মণিপুর, উড়িষ্যা, নাগাভূমি, দাক্ষিণাত্য এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গীতরূপের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ যোগসূত্র স্বরূপ ধ্রুপদী সংগীতের কিছু অনুষ্ঠান প্রতিদিনের কর্মসূচীর অন্তর্গত ছিল। ভারতবর্ষের জাতীয় সংহতি স্থাপনের বিভিন্ন প্রয়াসের মধ্যে এঁদের এই পরিকল্পনা শুধু অভিনব নয়, সর্বাপেক্ষা বাস্তব এবং ফলপ্রসূ বলে অনুকরণীয়ও।

উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে, ধ্রুপদী এবং লোকসংগীত উভয়কেই এই সম্মেলনে উপস্থিত করতে হয়েছে। প্রাধান্য পেয়েছে অবশ্য ধ্রুপদী সংগীত কিন্তু সেজন্য লোক-

বাঁকুড়ার বাউল সনাতন দাস

সংগীত বিষয়ে এক-একটি প্রদেশের বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ গানগুলিকে কখনোই বেমানান বলে মনে হয়নি, বরং তা বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। উদ্বোধনী অধিবেশনে আগরতলার পাপিয়া দেব বর্মনের আঞ্চলিক গানের সঙ্গে একটি ভাষান্তরিত রবীন্দ্রসংগীত এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ত্রিপুরা এবং বিহার শিল্পীদের নৃত্য-গীতও সেদিনকার অনুষ্ঠানসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঠিক এই ভাবেই বাংলাদেশের বাউল, রবীন্দ্রসংগীত, টপ্পা, কীর্তন, আসাম ও মণিপুর দিবসে মণিপুরী নৃত্য, উড়িষ্যা দিবসে দামোদর হোতার ওড়িশী, নাগাভূমি দিবসে ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দির পরিবেশিত নাগানৃত্য, দক্ষিণ-ভারতীয় দিবসে কথাকলি, চিত্রা পদ্মনাভনের ভরতনাট্যম্ আর শুভলক্ষ্মীর গান ভারতীয় সংস্কৃতির বিপুল বৈচিত্র্যের স্বাদ বহন করে এনে সংগীত-সাধনার প্রেরণাকে উদ্দীপিত করেছে। কিছু সংগীত-বিষয়ক গ্রন্থাদির প্রদর্শনীও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ধ্রুপদী সংগীতের আসরে যে সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ ছিল বীরজু মহারাজের কথক আর রবিশংকরের সেতার, শেষ দুদিনের প্রেক্ষাগৃহের দর্শক সংখ্যাই তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এঁরা দুজনেই সকলের প্রত্যাশাকে পূর্ণ করেছেন এঁদের অননুকরণীয় শিল্প-চাতুর্য দিয়ে। রবিশংকর প্রথমেই ঝিঁঝিট রাগে আলাপ, জোড় এবং ঝালার উপস্থাপনায় আশ্চর্য এক গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করেন। এমন সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত অথচ ভাবাবেগমণ্ডিত রাগ-পরিবেশনা, সুরের আর ছন্দের এমন কৌশলপূর্ণ [illegible] সহজ এবং সাবলীল ভঙ্গিতে সৃষ্টি খুব বেশি দেখা যায় না। রবিশংকরের সেতারে জোড় আর ঝালায় যেন একটা গদ্য কবিতার ছন্দ। আবার রাগান্তরে সংক্রমণ করে আস্থা রাখার সময়ে যখন ঝালার বিষম পদক্ষেপ শুরু হল তখন আর এক অনুভূতি। আর সবশেষে ধুনের মূর্ছনা। এক ঠাট থেকে অন্য ঠাটে, কখনও ঠুংরীর চাল আবার

ভরত নাট্যম শিল্পী চিত্রা পদ্মনাভন

স্বরের উদাত্ত গাম্ভীর্য আমাদের মুগ্ধ করেছে। সনাতন দাসের বাউল স্বরূপ-পরিসর স্থানে কিছুটা আড়ষ্ট বলে মনে হল। শেফালী ঘোষের প্রাচীন বাংলা গান চমৎকার রসসৃষ্টি করেছিল। অমর পালের ভাটিয়ালী খুবই মনোজ্ঞ তবে রাণী দাশগুপ্তের কীর্তন তেমন জমেনি।

সবশেষে সম্মেলনের অনুষ্ঠানসূচী সম্পর্কে দু'একটি কথা। প্রচলিত সংগীত সম্মেলনের গতানুগতিকতাকে এ'রা যে শুধু সংহতি-স্থাপনায় আদর্শ দিয়েই অতিক্রম করেছেন তা নয়, প্রত্যেক অনুষ্ঠানের জন্য সময় নির্ধারণ, ক্রিকেট মাঠের স্কোর-বোর্ডের ধরনের একটি বোর্ডে পরিচ্ছন্নভাবে লেখা অনুষ্ঠান নির্দেশিকার উপস্থাপনা, ধ্রুপদী সংগীতের পাশে অন্যান্য সংগীতের সুসমঞ্জস সন্নিবেশ—এই সব কিছুই তাঁদের সুচিন্তিত পরিকল্পনা শক্তির পরিচয়-দ্যোতক। কিন্তু বাংলা দেশের বিভিন্ন প্রকার গানের অনুষ্ঠান শুনতে শুনতে আর একটি প্রায়-বিস্মৃত প্রয়াসের কথা মনে হচ্ছিল, যার অন্তর্ভুক্তি হলে মনে হয় বাংলা দেশের কোনদিকই উপেক্ষিত থাকত না। তিমিরবরণকে সরোদশিল্পীর চেয়েও সুরস্রষ্টা এবং অর্কেস্ট্রার নির্দেশক রূপে উপস্থিত করলে সংগীত সংহতি সম্মেলনের উদ্দেশ্য সম্ভবত আরও সার্থকতা লাভ করত। কথাটা পরবর্তী সম্মেলনের জন্য কর্তৃপক্ষকে ভেবে দেখতে বলি।

—আনন্দবর্ধন

প্রার্থনার পরে

চণ্ডীগড় চঞ্চল

আরতি সেন

দিল্লি লাহোর, ঢাকার শহর—এককালে মানুষের কণ্ঠে গাথা ছিল তাদের ঐতিহ্য নিয়ে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের ফলে পাঞ্জাবের লাহোর শহর পাকিস্তানে চলে গেল, আর গেল আমাদের ঢাকার শহর। ঢাকা শহরের সব মানুষ ছড়িয়ে গেল কোথায় কে জানে। পাঞ্জাব লেগে গেল নূতন শহরের সন্ধানে। জওহরলাল নেহেরু বললেন নূতন করে গড়ে তোলো, "a new administrative city unfettered by the tradition of the past."

শিবালিক পাহাড়ের পাদদেশে নয় হাজার একর জমিতে প্রাকৃতিক ছড়ানো ১২টি গ্রাম। সিন্ধু থেকে [illegible] সামান্য উপরে। প্রথম চোখে পড়েছিল পাঞ্জাবের চীফ ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের। আকাশ থেকে জরিপ করছিলেন সারা পাঞ্জাব নূতন মুখ্য শহরের পত্তনের প্রয়াসে। দুটি নদীর মাঝে সমস্ত অঞ্চল। সমুদ্র সমতল থেকে উচ্চতা কমবেশী ১,০০০ ফুট। নদীর জলও বছরে দশমাস থাকে না। সবচেয়ে বড় কথা পরীক্ষায় পাওয়া গেল মাটির বুকে জলের উৎস বর্তমান অথচ জল নিষ্কাশনের সহজাত সম্ভাবনা রয়েছে। সামনে মহান হিমাচলের দৃশ্য আর সারা দিন মধুর বাতাস প্রাণ জুড়িয়ে দিচ্ছে।

কালকা যাবার পথে চণ্ডীমন্দির। দেবী চণ্ডিকার মহাপীঠস্থান। তাকে ঘিরে নূতন শক্তির সঞ্চার হলো। শহরের নামও হলো চণ্ডীগড়। প্রথম ধাক্কায় ১,৫০,০০০ মানুষ থাকবার মত ব্যবস্থাই হিসেবে ধরা হয়েছিল। পরে আরও বাড়বে। প্রথম পরিকল্পনা করেন আমেরিকান স্থপতি আলবার্ট মেয়ার। পরে স্বনামধন্য কর্বুসিয়েরের হাতে তৈরী হয়েছিল চণ্ডীগড়ের পরিপূর্ণ নূতন রূপ। আজ সারা দুনিয়া চণ্ডীগড়কে কর্বুসিয়েরের কীর্তি বলেই জানেন। ১৯৫০ সালের নভেম্বর মাসে যখন প্যারিসে কর্বুসিয়েরের সঙ্গে কথাবার্তা হয় তার আগেই লণ্ডনে ম্যাকসওয়েল ফ্রাই এবং তাঁর স্ত্রী জেন ড্রুকে শিমলা ও চণ্ডীগড়ের কাজের জন্য নিযুক্ত করা হয়ে গেছে। কর্বুসিয়েরের ইচ্ছায় পিয়ের জাঁনেরেতকে নিযুক্ত করা হলো। পিয়ের এর আগেই কর্বুসিয়েরের সহকারী হিসাবে কাজ করেছেন বহু বছর।

মূল পরিকল্পনা বা master plan কর্বুসিয়েরের। '৫১ সালে চণ্ডীগড়ে বসেই তিনি master planটি তৈরী করেন। পরিকল্পনার দুটি হলো, capitol আর sectors capitol-এ শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে মিউজিয়ামের বাড়ি, বাকি সব শহরের বিভিন্ন অংশ। মন্ত্রীদের আবাস থেকে নিয়ে ধাত্রী ঘর, স্কুল, হাসপাতাল সব ম্যাকসওয়েল ফ্রাই এবং জেন ড্রুর নকশা মাফিক হয়েছে। কাজেই কর্বুসিয়েরের কল্পনায় এঁদেরও অংশ আছে।

কর্বুসিয়েরের পরিকল্পনা নাকি মানুষকে ঘিরে। সাধারণ মানুষ যেন ইঁট কাঠে চাপা পড়ে না যায়। তার জন্য যেন প্রকৃতির অকৃপণ আনন্দ আপন হয়ে থাকতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গান্ধী ভবন
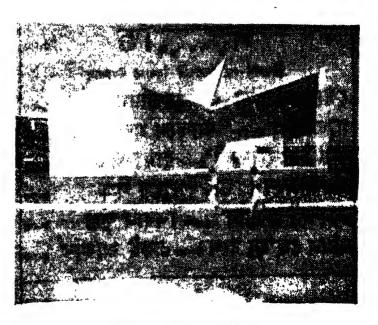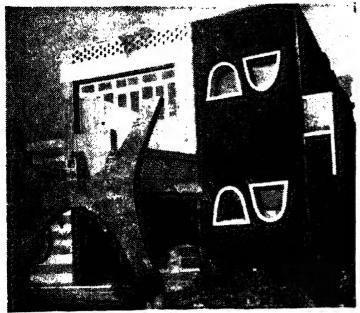
চণ্ডীগড়ের একটি বাড়ি

তিনি চেয়েছেন প্রত্যেক অমৃতের পাত্র যেন হয় "master of the sun, of space, of trees, of the earth"
ধরণী, গাছ, মহাকাশ যেন তার করায়ত্ত থাকে। শহর ভিত্তিক সভ্যতার মানুষ এখন "beaten, molested on all sides; exposed to noise, to danger, to decay, to enforced passivity."
—বিব্রত, উৎপীড়িত চারদিক থেকে। কোলাহল, বিপদ, ধ্বংস কিছু থেকেই বাঁচবার উপায় নেই। চণ্ডীগড়ে তাই তাঁর কল্পনাকে সার্থক করার প্রয়াস পেয়েছেন। কতটা হয়েছেন, কতটা হননি সে আর এক কাহিনী। চণ্ডীগড়ের নক্সা ইতোদি মানুষকে ঘিরে। একক নক্সা সেখানে একটি মানুষ কতটা চলতে পারে সেই হিসাব করে। মানুষের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনুকরণ করে শহরের অঙ্গ। capitol হচ্ছে মস্তিষ্ক, শহরের কেন্দ্র হচ্ছে হৃৎপিণ্ড, বিশ্ববিদ্যালয়, শিল্প এলাকা হচ্ছে হাত আর পা। lungs বা ফুসফুস তার পার্কগুলি।

চণ্ডীগড়ের বৈশিষ্ট্য তার অভিনবত্বে। চণ্ডীগড় গড়ে উঠবার পর এক মার্কিন পত্রিকা বর্ণনা করেছিল "বিশ্বজনীন" বলে। এখানে ভারতীয়তা কিছু নেই। এ শহর জগতের যে কোন জায়গায় শিল্প স্বাক্ষর হতে পারে। আর এক স্থপতি লিখেছিলেন, যত দিন যাবে তত চণ্ডীগড়ের রূপ মানুষ বুঝবে। যেভাবে মানুষ স্থপতির নিদর্শনের আকর্ষণে এদিকে-ওদিকে বেড়াতে যায় ঠিক সেইভাবে একদিন দেশ-বিদেশের পরিব্রাজক আসবে চণ্ডীগড় দেখতে।

ভারতীয়তা চণ্ডীগড়ের স্থাপত্যে নেই সত্য, কিন্তু চণ্ডীগড়ের আশে পাশে আছে পুরান ইতিহাসের কাহিনী জড়িত স্থান। পিঞ্জোর চণ্ডীগড় থেকে ১৩ মাইল দূরে। পিঞ্জোরের নাম এসেছে মহাভারতের পঞ্চপুর থেকে। দ্বাদশবর্ষ বনবাসকালে পাণ্ডবরা এসেছিলেন পঞ্চপুরে। পঞ্চপুর তাঁদের মুগ্ধ করেছিল বলে কিছু দিন সেখানে বাস করেছিলেন। সাম্রাজ্য ফিরে পেয়েও তাঁরা তাঁদের আশ্রয়দাতা পঞ্চপুরকে ভোলেননি। ৩৬ বছরের রাজত্বকালে বার বার পঞ্চপুরে দর্শনে গেছেন। মহাপ্রস্থানের প্রাক্কালেও পঞ্চপুরের শেষ দর্শন করে যান। সপ্তদশ শতাব্দীতে সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিশ্বস্ত সেনাপতি ফিদাই খাঁ পঞ্জাবের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। লাহোরের বাদশাহী মসজিদ ফিদাই খাঁর তৈরী। তিনি পঞ্চপুরের নির্জনতায় মুগ্ধ হয়ে সেখানে উদ্যানের পরিকল্পনা করলেন। মুঘল উদ্যানের প্রাচীনতম নিদর্শন এ বাগানের প্রত্যেক অংশ স্থপতির শিল্পচাতুর্যের স্বাক্ষর। [illegible] তার অলিন্দে, ধাপে ধাপে নেমে গেছে চত্বর, বাঁধানো জলাধারের সমান্তরাল আধারে বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গের মত ফোয়ারার জলে অপরূপ পিঞ্জোর। চণ্ডীগড় হয়ত [illegible] চেয়ে [illegible] কম নয়। কিছু দিন পিঞ্জোর অনাদৃত, উপেক্ষিত ছিল। [illegible] রাজার বাড়ি হয়েছিল পাঞ্জাবীর পঞ্চপুরে। পরে পাতিয়ালার মহারাজা পঞ্চপুরের সংস্কার করেন। আজ আবার পিঞ্জোরের পাশাপাশি এই নতুন চণ্ডীগড়ের স্থপতিকে নিয়েছে [illegible]। করবুসিয়ের কল্পনা আর ফিদাই খাঁর কল্পনা পাশাপাশি রয়েছে। মানুষ অঞ্জলি ভরে পান করতে পারে দুই যুগের শিল্পরূপ। পূর্ব আর পশ্চিম দুই সাগরের জল।

কিন্তু করবুসিয়ে বা ফিদাই খাঁ শিল্প দিয়ে মানুষের সেই আদিম কলহপ্রবৃত্তিকে শান্ত করতে পারেননি। পাঞ্জাব দু'ভাগ হল চণ্ডীগড়ের জন্য। তারপর নতুন বিভাগে চণ্ডীগড় চঞ্চল হয়ে উঠলো। চার বছর পরে এ চঞ্চলতা আকাশে বাতাসে চণ্ডীগড়ের

রাজধানী গড়বার জন্য অর্থসাহায্য ভিন্ন সহজ ঋণের ব্যবস্থা থাকবে।

পাঞ্জাবের বিজয় হলো বলে হরিয়ানার আগুন জ্বলে উঠলো। প্রথম ধাক্কায় পাঞ্জাব জয়কে উৎসবে পরিণত করে তুলতে চাওয়া সত্ত্বেও ক্রমশঃ সেখানেও অসন্তোষের আভাস স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সন্ত ফতে সিংকে লুধিয়ানার আকালীরা চুড়ি, দোপাট্টা, চিরুণী আর রিবনের পার্শেল পাঠিয়েছেন। শোণিতধারায় বিভক্ত পাঞ্জাবের রাজধানী সাধের শহর চণ্ডীগড় আবার কি নূতন সমস্যার সৃষ্টি করবে কে জানে।

সুন্দর শহর চণ্ডীগড়ে নাকি কর্বুসিয়ে প্রকৃতিকে মানুষের পাশে এনে দিয়েছেন। শিরীষে, পিপুলে, আম আর কদম্বে চণ্ডীগড়ের ইমারতকে শিশুর মত নরম কোমলতা দিয়েছে। উদ্যান-শহর চণ্ডীগড় নাকি মানুষের মনের তিক্ততা মুছে দেবে, কিন্তু পারলো কই? পঞ্চপুরের বনবাসী পাণ্ডব পারেননি মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব মুছতে। পিঞ্জোর উদ্যানের ফাদাই খাঁ পারেননি রূপরসে ভিজিয়ে শাহী কলহ বিরোধের সমাধান করতে, আজ কি করে স্থপতির শিল্পকলা মানুষকে বদলাবে বলুন।

হাসন রজার 'হাছন উদাস' গ্রন্থের একটি পৃষ্ঠা

রূপ দেখিলাম রে নয়নে আপনার রূপ দেখিলাম রে। আমার মাজত বাহির হইয়া দেখা দিল মরে॥ দেখা দিয়া প্রাণ লোয়া সামাইল ভিতরে। আদম ছুরত দেখা দিল ধরিয়া আমারে॥ আইনার মধ্যে যেমন মুখ দেখা জাএ। সেই মতে আমার রূপে দেখা দিল আমায়। নুরের বদন খানি জিনে কাঞ্চা সুনা। আপনার রূপ দেখিয়া আপনে হইলাম কানা॥ আপনার রূপ দেখিয়া আপনে পাগল। ত্রিভুবন জুড়িয়া রূপে করে ঝলমল। চন্দ্র সুর্য্য নাই হয়বে ঐ রূপের সমান। সে রূপ দেখিয়া আমার বাচে না প্রাণ॥ দিলের চইক্ষে দেখলাম রূপ নএয়ান ভরিয়া। কুলুবে বশিল আমায় দিলাসাও দিয়া। তুমি আমার আমি তুমার প্রাণ বন্ধে বলিয়া॥ রিদএ কমলে বন্ধু বসিল ও গিয়া। ভাবনা চিন্তা দুর হৌল বন্ধু কুলে লোয়া। নাচে হাছন রাজাএ বন্ধুয়ারে পাইয়া॥

রসিক—হাসন রাজা

দেশ পত্রিকার ৩৬ বর্ষ ৫২ সংখ্যায় সৈয়দ মুজতবা আলী হাসন রজার কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে লিখছেন "রবীন্দ্রনাথ হাসন রজার যে কবিতা উধৃত করেছেন, তাতে কিছু উনিশ-বিশ আছে বলে (রবীন্দ্রনাথ পাঠটি পেয়েছিলেন এক ভ্রাম্যমাণ লোকগীতি সংগ্রাহকের কাছ থেকে; তিনি শুনেছিলেন ভুল পাঠ লোকগীতির বেলা এটা আকছারই হয়।) মুর্তাজা সাহেব শুদ্ধ পাঠটি তুলে দিয়েছেন (এবং আমার কাছে যে পাঠটি আছে তার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়)। আমার বক্তব্য রবীন্দ্রনাথ ভুল পাঠ পান নাই।

হাসন রজার কবিতা রবীন্দ্রনাথের গোচরে আনবার দায়িত্ব আমি নিয়েছিলুম। ১৯২৪-২৬ ইংরেজীতে শিলেট মুরারিচাঁদ কলেজে পড়তুম। ১৯২৫ ইংরেজীতে গরমের ছুটিতে কয়েক দিনের জন্য শান্তি-নিকেতন গিয়েছিলুম। আমার সঙ্গে হাসন রজার আটটি কবিতা ছিল। সেগুলি রবীন্দ্রনাথের গোচরে আনবার সুযোগ হয়েছিল। কবিতাগুলি পড়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: "সে একটা কি বলতে চায়; ঠিক ধরতে পাচ্ছি না। এত কম কবিতায় ধরা যায় না।"

হাসন রজা জীবিতাবস্থায় তাঁর কবিতার বই "হাছন উদাস" ছাপিয়েছিলেন। একখানা অর্ধ-ছিন্ন "হাছন উদাস" পেয়েছিলুম। পূর্ণাঙ্গ বই যোগাড় করতে পারি নি। বইখানির অষ্টম পৃষ্ঠায় মুদ্রিত রয়েছে: "শ্রীহট্ট ইসলামিয়া প্রেসে, শ্রীমহাম্মদ আবদুল গণি দ্বারা মুদ্রিত। শ্রীযুক্ত জমিদার দেওয়ান হাছন রাজা কর্তৃক রচিত ও প্রকাশিত।" বাড়ি ফিরেই সেই বই থেকে পঁচাত্তরটি কবিতার অনুলিপি করে তাকে রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম। ১৯২৫

ইংরেজীর শেষাশেষি কলকাতায় ভারতবর্ষীয় দার্শনিক সঙ্ঘের সভাপতির অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ হাসন রজার কবিতা থেকে দুটি উধৃতি দিয়েছিলেন:

(১) "মম আঁখি হইতে পয়দা আসমান জমীন
শরীরে করিল পয়দা শক্ত আর নরম
আর পয়দা করিয়াছে ঠান্ডা আর গরম।
নাকে পয়দা করিয়াছে খুশবয় বদবয়।"

(২) "রূপ দেখিলাম রে নয়নে
আপনার রূপ দেখিলাম রে।
আমার মাঝত বাহির হইয়া
দেখা দিল আমারে॥"

(Modern Review, Jan. 1926
প্রবাসী, মাঘ ১৩৩২)

প্রথম উধৃতিটি হলো "হাছন উদাস" বইয়ের আটাশ পৃষ্ঠার একটি কবিতা থেকে রবীন্দ্রনাথের নিজের নির্বাচিত চারটি পংক্তি। এই কবিতার প্রথম চার পংক্তি নিম্নরূপঃ—

"বিচার করি চাইয়া দেখি সকলেই আমি।
সোনা মামি সোনা মামি গো
আমারে করি লায়ে বদনামি॥
আমি হইতে আল্লা রছুল আমি হইতে কুল।
পাগলা হাছন রাজা বলে তাতে নাই ভুল॥"

এই কবিতার প্রথম চার ছত্র বাদে সৈয়দ মুজতবা আলী যে উধৃতি দিয়েছেন তাতে উপরের উধৃতির প্রথম দুটি পংক্তি নেই, এটি লক্ষণীয় যে দ্বিতীয় পংক্তিতে হাসন রজা তাঁর উপলব্ধি ও দর্শনের দায়িত্ব, যিনি

বিচার করি চাইয়া দেখি সকলেই আমি। [illegible]

'হাছন উদাস' গ্রন্থের অপর একটি পৃষ্ঠা

জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, নিয়ন্ত্রণ করছেন, তাঁর উপর দিয়ে দিয়েছেন।

সৈয়দ মুজ্‌তবা আলী লিখেছেন: 'কী রবীন্দ্রনাথ কী শ্রীযুত সনাতন কী মুর্তাজা সাহেব একজন পল্লী কবিতে দার্শনিক প্লাতো প্রচারিত দর্শন পেয়ে উল্লসিত সম্মোহিত।" আমার বক্তব্য ভারতবর্ষের দর্শনের সঙ্গে হাসন রজার দার্শনিক কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে। হাসন রজার এই কবিতাতেও ভারতীয় আধ্যাত্মিক উপলব্ধির একটি স্তর দেখতে পাওয়া যায়। স্বামী বিবেকানন্দের নিম্নলিখিত দুটি উদ্ধৃতি থেকে তার পরিচয় পাই: "শাস্ত্র তো সব আমাদের মধ্যেই রয়েছে। মূর্খ, শুনতে পাচ্ছ না কি, তোমার নিজ হৃদয়ে দিবারাত্র সেই অনন্ত সঙ্গীত ধ্বনিত হচ্ছে—'সচ্চিদানন্দঃ সচ্চিদানন্দঃ, সোঽহং সোঽহম্'।"
(স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। চতুর্থ খণ্ড। ২২২ পৃষ্ঠা। দেববাণী)

"আমরা যখন সেই পূর্ণ সত্তা থেকে নিজেদের পৃথক করে তাতে কতকগুলি গুণের আরোপ করি, তখন তাঁকেই আমরা ঈশ্বর বলি। ঈশ্বর হচ্ছেন—আমাদের মনের দ্বারা দৃষ্ট এই জগৎপ্রপঞ্চের মূল সত্তা।"
(২৪১ পৃষ্ঠা। দেববাণী
স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। চতুর্থ খণ্ড।)

এই উন্নত দৃষ্টিভঙ্গী আমরা সকলে নিতে পারি না এটা বুঝেই হাসন রজা ঐ কবিতাতেই বলেছেন:

"মরব মরব দেশের লোক মর কথা জানে না রে।"

রবীন্দ্রনাথ একজন পল্লী কবিতে প্লাতোর প্রচারিত দর্শন পেয়ে 'উল্লসিত সম্মোহিত' হয়েছেন মনে করতে পারি না। ভারতবর্ষীয় দার্শনিক সঙ্ঘের সভাপতির অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথের একটি বক্তব্য ছিল যে, দেশের অজ্ঞাতনামা কবিদের রচিত কবিতার উচ্চ দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত রয়েছে মানবের চিরন্তন প্রশ্ন ও জীবনের চরম সার্থকতাই তাঁদের রচনার বিষয় সেগুলি জনসাধারণের প্রিয়, তাদের দ্বারা সমাদৃত: এর থেকে বোঝা যায় দর্শন কি গভীরভাবে জনসাধারণের জীবনে প্রবেশ করেছে ও সমস্ত জীবনকে পরিব্যাপ্ত করেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি গোটা দশ উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন, তার দুটি হাসন রজার; কবীরের গানের উদ্ধৃতিও ছিল। রবীন্দ্রনাথ নিরপেক্ষ সমালোচকের দৃষ্টিতেই দেখেছিলেন।

অপর উদ্ধৃতিটি "হাছন উদাস" বইয়ের চৌত্রিশ পৃষ্ঠার একটি কবিতার প্রথম দুটি পংক্তি। এই উদ্ধৃতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

"এই সাধক কবি দেখিতেছেন যে, শাশ্বত পুরুষ তাঁহারই ভিতর হইতে বাহির হইয়া তাঁহার নয়ন পথে আবির্ভূত হইলেন। বৈদিক ঋষিও এমনই ভাবে বলিয়াছেন যে, যে-পুরুষ তাঁহার মধ্যে তিনিই আদিত্য-মণ্ডলে অধিষ্ঠিত।"

স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি থেকে দেখতে পাই অনুরূপ চিন্তাধারা সুফী সমাজেও রয়েছে। স্বামীজী বলেছেন:

"সুফীরা জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত অভিন্ন জ্ঞান করে। আর তাদের মাধ্যমেই ঐ ভাব ইওরোপে এসেছে। তারা বলে, 'আন্ আল্ হক্' অর্থাৎ আমিই সেই সত্য-স্বরূপ।"
(২৪৬ পৃষ্ঠা। দেববাণী
স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। চতুর্থ খণ্ড।)

"হাছন উদাস" থেকে হাসন রজার দুটি কবিতার ফটো কপি দেওয়া হল। রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি "হাছন উদাস" এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যায় প্রথম উদ্ধৃতিতে "খবরের বদবয়" রয়েছে, কিন্তু "হাছন উদাস"-এ আছে "খবরের আর বদবয়"। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে আছে "দেখা দিল আমারে" কিন্তু "হাছন উদাস"-এ আছে "দেখা দিল মরে।" "হাছন উদাস" থেকে কবিতাগুলো লিখে রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠাবার আগে মিলিয়ে নিয়েছিলুম। তা সত্ত্বেও আমার কিছু ভুল থেকে যাওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু কবিতার ভাবের কোন হানি না করে, বাক্যের বিন্যাস না বদলিয়ে, হাসন রজার কবিতার ঐটুকু প্রসাধন করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অসম্ভব ছিল মনে হয় না।

শ্রীপ্রভাতকুমার শর্মা,
কলিকাতা-২৭

বাঙলার চালচিত্র

আপনার 'দেশ' পত্রিকায় জনাব আবদুল জব্বার লিখিত "বাংলার চালচিত্র" প্রবন্ধে ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেবের নামোল্লেখ করে যা লিখেছেন সে সম্বন্ধে দু' একটা কথা জানাতে চাই।

আমি ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেব কেবলা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ধর্মীয় মাসিক পত্রিকা "নেদায়ে ইসলাম" পত্রিকার খাদেম (সম্পাদক)। ইতিমধ্যে আমার পাঠক-বর্গের কেহ কেহ ঐ লেখার প্রতিবাদে আমাকে পত্র লিখেছেন। সুতরাং বিষয়টি আলোচিত হওয়া উচিত বলেই মনে করি।

'দেশ' পত্রিকার ২৬শে পৌষ ১৩৭৬, ১০ই জানুয়ারী, ১৯৭০ সংখ্যার ১০৮৫ পৃষ্ঠায় লেখক লিখেছেন: "ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেব বাবা সৈয়দ আবুবকর সিদ্দিকী..."। মুসলমানদের মধ্যে সৈয়দ তাঁরাই যাঁরা পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর কন্যা ফাতেমা ও জামাতা হজরত আলী (যিনি পয়গম্বরের নিজ বংশ—কোরেশ কুলজাত)-এর পুত্র ইমাম হোসেনের প্রত্যক্ষ বংশধর। কারবালার যুদ্ধে ইমাম হোসেন শহীদ হলে তাঁর একমাত্র বালকপুত্র জয়নাল আবেদীন কোনক্রমে রক্ষা পান। পরবর্তীকালে এঁরই বংশধরেরা সৈয়দ নামে অভিহিত হন।

আর "সিদ্দিকী" খেতাব পয়-গম্বর হজরতের প্রধানতম শিষ্য ইসলামের প্রথম খলিফা হজরত আবুবকরের। তাঁরই বংশধরদের পদবী 'সিদ্দিকী' নামে বিখ্যাত। ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেব এই 'সিদ্দিকী' বংশের সন্তান—তাঁরা আদৌ সৈয়দ নন।

সুতরাং সৈয়দ ও সিদ্দিকী এক পর্যায়ে বলা যায় না। অথচ লেখক যে সৈয়দ সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল নন তা তো মনে হয় না, কারণ ঐ পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় [illegible] পৃষ্ঠায় সৈয়দ মোতাহের হোসেন চৌধুরী সম্পর্কে তিনি যে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

দ্বিতীয়ত প্রশ্নে পীর সাহেবের যে বিবাহের বিবরণ লেখক দিয়েছেন তাতে আমার পত্রলেখক সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, আদৌ তিনি কাজেই সৈয়দদের বাড়িতে যেতে পেরেছেন কিনা। এ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য পরিবেশন ভালো হয়।

আমার মনে হয়, এ সম্বন্ধে জনাব আবদুল জব্বার সাহেব তুলনামূলক আলোচনায় যা বলেছেন শরিয়তের বিধানমতে [illegible] হিসাবে তাতে আপত্তি কি।

শেখ মোজাফ্‌ফর হোসেন
কলিকাতা-[illegible]

॥ ২ ॥

সাতুই জানুয়ারী সংখ্যায় 'দেশ' জনাব আবদুল জব্বার সাহেব লিখেছেন যে, তিনি সৈয়দ মোতাহের হোসেন চৌধুরীকে প্রশ্ন করেন, 'চৌধুরী হয়ে তিনি 'সৈয়দ' হন কেমন করে?' উত্তরে সৈয়দ সাহেব বলেন, "আমি বাঙ্গালী তাই চৌধুরী হওয়াই স্বাভাবিক। এবার থেকে আমি 'সৈয়দ' ত্যাগ করলাম।"

কিন্তু 'চৌধুরী' তো বাংলা পদবী নয়। ওটি মোগল যুগের উপাধী। উত্তর ভারতে কিছুর হিন্দু বা মুসলমান পাবেন যাঁরা এখনো নামের সঙ্গে "চৌধরী" উপাধি ব্যবহার করেন যেটি বাংলায় চৌধুরী হয়েছে। শ্রীমতী সরলাদেবী পাঞ্জাবী শ্রীরামভজ দত্তচৌধুরীকে বিবাহ করে "চৌধুরাণী" হন।

মজুমদার (মজমুয়াদার), হাওলাদার (হাবিলদার), ওয়াদ্দার (ওহদেদার), সরকার, খাঁ (খান), খাসনবীশ প্রভৃতি বহু মোগল উপাধি বাঙ্গালীরা ব্যবহার করছেন। 'মজুমদার' বা 'মজমুদার' গুজরাটে ও মহারাষ্ট্রে প্রচলিত।

বাংলা ভাষায় আমরা অনেক আরবী, ফার্সী, উর্দু, হিন্দী শব্দ আমাদের নিজস্ব উচ্চারণে রূপান্তরিত করে আত্মস্থ করেছি

যেমন 'ওয়াকিফহাল', 'নাজির', 'নজর', 'আয়না' প্রভৃতি। আবার অনেক শব্দের শুধু যে বানান বদলায়নি, অর্থই বদলে গেছে। যেমন "জাঁহাবাজ" হয়েছে "জাঁহানবাজ" থেকে যার আসল অর্থ সাহসী। 'বুজরুক' হল 'বুজর্গ' অর্থাৎ সম্মানীয় বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি। "কেচ্ছা" হল 'কিস্সা' অর্থাৎ কাহিনী। সম্পূর্ণ অর্থান্তর নিয়ে যেসব শব্দ এসেছে তার সংখ্যাও কম নয়।

বাঙালী কেমন করে 'সৈয়দ' হতে পারে এর উত্তর খোদকার কেবল সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেবই দিতে পারেন। যতদূর জানি যাঁদের পূর্বপুরুষ আরব বা পারস্য দেশ থেকে এসেছিলেন তাঁরাই 'সৈয়দ' উপাধি ব্যবহার করেন। ওই সব আরবী বা পারসিকরা না, সৈয়দ বংশ মুষ্টিমেয়। এখন যদিও তাঁরা বাঙালী বা অন্য প্রদেশের ভারতীয় হয়ে গেছেন। 'সৈয়দ' 'শেখ' প্রভৃতি উপাধি কেবলমাত্র একটি বিশিষ্ট গোষ্ঠীর নাগরিকরাই ব্যবহার করে থাকেন। তাঁদের বংশতালিকা অনুসরণ করলে দেখা যাবে যে তাঁদের পূর্বপুরুষেরা অভারতীয় ছিলেন।

শ্রীকমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায়,
আসানসোল-১

ছাত্র পরিষদের কর্মসূচী

দেশ পত্রিকার গত ২০শে ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে শ্রীবরুণ রায়ের লেখা পত্রের প্রত্যুত্তরে গত ১৫ই জানুয়ারী '৭০ তারিখে নিজস্ব ছাত্র পরিষদ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক প্রমুখের শ্রীসৌমিত্র রায়ের মন্তব্য সম্পর্কে বলতে চাই যে, শ্রীরায় আসল ঘটনার বিকৃত ব্যাখ্যা করেছেন। একথা ঠিক যে, ছাত্র পরিষদ ওয়ার্কিং কমিটিতে কেন্দ্রীয় সরকারের সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীর প্রতি সমর্থন জানানো হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণ হয় না যে, ছাত্র পরিষদ ইন্দিরা কংগ্রেসের লেজুড়ে পরিণত হয়েছে। যেমন যুক্তফ্রন্ট বাংলাদেশে ক্ষমতায় আসার সময় ছাত্র পরিষদ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রচনাত্মক কর্মসূচীর সমর্থন জানানোর প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সঙ্গে যুক্তফ্রন্টের লেজুড় সংগঠনে পরিণত হয়নি।

অস্বীকার করে কোনও লাভ নেই যে, সর্বভারতীয় রাজনৈতিক টানাপোড়েনে ছাত্র পরিষদ কর্মীরা দ্বিধা বিভক্ত। কোনও বিশেষ সংগঠনের প্রতি আনুগত্য সত্ত্বেও ছাত্র পরিষদের কর্মসূচী এবং রূপায়ণের ক্ষেত্রে কর্মীরা একতাবদ্ধ। ছাত্র পরিষদের এমন হাজার হাজার কর্মী আছেন, যাঁরা মনে করেন শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ক্ষমতালোলুপতার জন্য এবং নিজেকে কংগ্রেসের ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সরকারী ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেসকে দ্বিখণ্ডিত করেছেন। তবু সুস্থ গণতন্ত্রসম্মতভাবে পরিচালিত ছাত্র স্বার্থে ছাত্র-আন্দোলন পরিচালনার একমাত্র হাতিয়ার এই "ছাত্র পরিষদ"। জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন ছাত্রদের মিলিত প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি এই "ছাত্র পরিষদ"। এই সরল সহজ কথাটা না বুঝে ছাত্র-পরিষদের মধ্যে শ্রীরায়ের মতো কর্মীরা যারা এই সংগঠনকে সুবিধাবাদী রাজনীতির স্রষ্টা ইন্দিরা-কংগ্রেসের হাতে বন্ধক রাখতে চাইছেন, তারাই আসলে ছাত্র-পরিষদকে দ্বিখণ্ডিত করার ষড়যন্ত্র করছেন। সংগঠনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছেন। গোষ্ঠী রাজনীতির হাতে ছাত্র-পরিষদকে নীত করবার প্রচেষ্টাকে ছাত্র-পরিষদ কর্মীরা অবশ্যই রোখবার ক্ষমতা রাখে। রুখবেও! শ্রীরায়ের মত কিছু সংখ্যক কর্মীর ছাত্র-পরিষদ ভাঙবার নগ্ন ষড়যন্ত্র এবং বিভেদপন্থা সম্পর্কে পরিষদ কর্মীরা খুবই ওয়াকিবহাল। শুভদিবেশ চক্রবর্তী, (সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র পরিষদ); সুধীর চৌধুরী, (প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ পঃ বঃ ছাত্র-পরিষদ এবং সভাপতি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজ ছাত্র-পরিষদ); শংকরকুমার সান্যাল, (সাধারণ সম্পাদক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজ ছাত্র-পরিষদ); সমীর চট্টোপাধ্যায়, (সম্পাদক, পঃ বঃ ছাত্র-পরিষদ); সমীর বন্দ্যোপাধ্যায় (সভাপতি, উত্তর কলিকাতা জেলা ছাত্র-পরিষদ, সদস্য প্রদেশ ওয়ার্কিং কমিটি)।

গানের আসর

৩১শে জানুয়ারী তারিখের "দেশ" পত্রিকায় শ্রদ্ধেয় শার্ঙ্গদেবের "গানের আসর" পড়ে দু' একটি কথা নিবেদন করতে চাই।

সঙ্গীতের দুটি পর্যায় আছে, একটি ক্রিয়াসিদ্ধ অপরটি ঔপপত্তিক। ক্রিয়াসিদ্ধেরা রাগসঙ্গীত সাধনা পরিবেশন করেন ও সহৃদয় শ্রোতা তার রসোপলব্ধি করেন। রাগসঙ্গীতের চর্চা ও সাধনা যাঁরা করেন তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য রসোপলব্ধি মাত্র। তাঁদের পক্ষে স্বরগ্রাম, রাগরাগিণী, মাত্রা, লয়, ছন্দ ও তাল ছাড়া অন্য সব কিছুই অবান্তর এবং এইগুলিতেই তাঁরা সিদ্ধপুরুষ হন। শ্রোতার আনন্দ ছাড়াও রাগসঙ্গীত সাধককে পরমোচ্চ আনন্দে পৌঁছে দিতে পারে—সেখানেই ক্রিয়াসিদ্ধ সঙ্গীতের চরম সার্থকতা। এই সঙ্গীত-সাধকের কাছে সঙ্গীতের সামাজিক, ঐতিহাসিক এবং মানবিক প্রতিক্রিয়ার তত্ত্বান্বেষণ একেবারেই অবান্তর। ক্রিয়াসিদ্ধ সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী হবার জন্য তাঁদের রাগসঙ্গীতে প্রয়োগশিল্পের নিয়মাবলী জানতে হয় গুরুর কাছে অথবা গ্রন্থের মাধ্যমে। প্রচলিত ব্যবহারে এই নিয়মাবলীকেই আমরা সঙ্গীতের ঔপপত্তিক পর্যায় বলে থাকি। পৃথিবীর যে-কোনো দেশের সঙ্গীত একমাত্র প্রয়োগবিদ্যার উপরই নির্ভরশীল এবং একমাত্র প্রয়োগবিদ্যার দ্বারাই সঙ্গীতের পরিস্ফুটনা সম্ভব। সঙ্গীতসাধকেরা এই প্রয়োগবিদ্যারই সাধনা করেন।

ঐতিহাসিক গবেষকগণ সঙ্গীতের সামাজিক ঐতিহাসিক ও মানবিক তথ্যান্বেষণ করেন এবং তাঁদের নিজ নিজ উপলব্ধি অনুসারে সমাজের উপর তার প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণ করেন। এইরূপ সঙ্গীতচর্চার প্রকৃতি সম্পূর্ণই পৃথক এবং ক্রিয়াসিদ্ধ সঙ্গীতসেবীর দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য থাকবেই। একজনকে আমরা ঔপপত্তিক ও ক্রিয়াসিদ্ধ সঙ্গীতসাধক বলব এবং অপরজনকে সঙ্গীতের ইতিহাসতত্ত্বজ্ঞ বলব। ঋষি প্রণীত সঙ্গীতশাস্ত্রের ব্যাখ্যা নিয়েও উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য থাকবে। একজন প্রয়োগশিল্পের পরিপ্রেক্ষিতে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করবেন, অপরজন সামাজিক ঐতিহাসিক ও মানবিক প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করবেন। এই দুজনের দৃষ্টিভঙ্গী স্বতই পৃথক—সুতরাং তর্কের কারণও অবর্তমান। যাঁদের মন সঙ্গীতের রসে আকৃষ্ট হয় না তাঁরা সঙ্গীতের ঐতিহাসিক গবেষক হতে পারেন এবং হয়েও থাকেন, কিন্তু যাঁরা রাগরসে আপ্লুত হতে চান তাঁদের যদি সঙ্গীতের অপরাপর পর্যায়ে ঔৎসুক্য না থাকে তবে কি সেটা দোষনীয়? বর্তমান লেখক এবিষয়ে একমত নন। রসচর্চা যাঁরা করেন তাঁদের ঐতিহাসিক বা সমাজতত্ত্ববিদ হতেই হবে এর কোনো যুক্তি নেই।

ক্রিয়াসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞের পক্ষে শাস্ত্রালোচনা ততটুকুই দরকার যতটুকু তাঁর সঙ্গীতচর্চার সহায়ক হয়। সঙ্গীতচর্চাই তাঁর কাছে মুখ্য: সামাজিক মূল্যায়ন ততটুকুই সার্থক যেটুকু শ্রোতার মনের প্রতিক্রিয়া তাঁর উপলব্ধিগত হয়—এর বেশি কিছু নয়। সামাজিক ও মানবিকতার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যাঁরা শাস্ত্রালোচনা করেন তাঁদের কাজ সম্পূর্ণই স্বতন্ত্র, সঙ্গীতের সামাজিক মূল্যায়ন তাঁদেরই কাজ। তাঁরা মিউজিকোলজিস্ট, মিউজিশিয়ান নন। দু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া পৃথিবীর সব দেশেই তাঁরা বিভিন্ন ব্যক্তি, মিউজিশিয়ান তাঁরাই যাঁরা একমাত্র প্রয়োগশিল্পকুশলী।

ভরতের নাট্যশাস্ত্র সম্বন্ধে একটি নিবেদন করতে চাই। নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থটি সম্পূর্ণভাবেই নাটকের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। নাটকের কাজই হল দেশ, সমাজ ও মানবচরিত্রকে অখণ্ডভাবে তুলে ধরা। নাটকের প্রয়োজনেই সঙ্গীতের, বাদ্যের, নৃত্যের ও রসের অধ্যায় সেই গ্রন্থে সংযোজিত

হয়েছে। ভরতের পূর্ববর্তী কোনো সঙ্গীত শাস্ত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নি তাই বলে নাট্যশাস্ত্রকেই মুখ্যত সঙ্গীত-শাস্ত্র বলতে অসুবিধা হয়। সঙ্গীতরত্নাকর বহু পরবর্তী রচনা হলেও মুখ্যত সঙ্গীতশাস্ত্র এবং ভরত মতঙ্গাদির অনুসরণকারীও বটে, এবং ক্রিয়াসিদ্ধ সঙ্গীতের এত পরিপূর্ণতা অন্য কোনো শাস্ত্রেই নেই। রত্নাকরের সাতটি অধ্যায়ে গীত, বাদ্য ও নৃত্য সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য আলোচিত হয়েছে এবং এর সবটাই প্রয়োগবিদ্যার অন্তর্গত।

ভরতের "লোকরুচি" সম্পর্কের মন্তব্য নাটক সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, সঙ্গীত সম্বন্ধে নয়, কারণ নাটক সামাজিক চরিত্রেরই বিকাশ করে সুতরাং সামাজিক জনসাধারণের রুচির উপরই নির্ভরশীল। রাগসঙ্গীত শ্রোতার বিভিন্ন ও ব্যক্তিগত রুচি থাকতে পারে, সমাজ বা সমষ্টিগত অর্থে "লোকরুচি" এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

বর্তমান লেখকের শেষ নিবেদন এই যে, রাগসঙ্গীত নাটকেরই মাত্র অংশবিশেষ নয়, নিজ স্বতন্ত্র অধিকারেই সর্বশ্রেষ্ঠ কলাবিদ্যার অন্যতম। নাট্যকলা সঙ্গীতকলা থেকে তার প্রয়োজনীয় উপাদান গ্রহণ করেছে, যেমন করেছে ইতিহাস থেকে, সমাজ থেকে এবং বিভিন্ন মানুষের মনোবৃত্তি থেকে।

বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী,
কলকাতা-২৫।

সুনন্দর জার্নাল

সুনন্দ মহাশয়ের 'জার্নালে' "খাজুর গাড় কত কইরা?" (৩৭ বর্ষ, ১৪ সংখ্যা) বিষয়ক লেখাটি খাজুরাহের স্মৃতির ন্যায় গাঢ়। বলতে কি, বাঙালীরা অনেকেই ঐ "মেড ফর ইচ আদার"-এর মতো আদাব আদায়ে ব্যস্ত. তারা কোন মতেই স্বীকার করতে চায় না যে তারা বাঙালী। বরং তাদের আকর্ণ বিকৃত বে'কানো ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ঠিকরে বেরোয় 'ভেতো বাঙালী' কাঙালী। অতএব ওদের ক্যাঙলা ভাষা ব্যবহার না করে দাও ছেলেমেয়েকে হ্যাংলা (সাহেবী) স্কুলে ভর্তি করে। স্মর্তব্য, তারা সাহেবিয়ানা পুরোদস্তুর আদায় করে ঠিকই, কিন্তু সাহেব বনে না। এইখানেই বিরাট ফারাক। এই ফারাক বন্ধ করতে তারা ব্যস্ত। কিন্তু শশব্যস্তে "খাজুরগাড়" এসে সেই ফারাকে হুড়মুড় করে দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে "মাতৃভাষা বল মাতৃভাষা বল, মন ভরবে, পেট পুরবে—আনন্দ পাবে। বেশে যাই থাক না, ভেসে যেথাই যাও না, মনের আসল ভাষাটা প্রকাশ করতে দোষ কোথায়!" এই হল "খাজুর গাড়"-এর মাহাত্ম্য।

বড়ই পরিতাপের বিষয়, এই কলকাতাতেই অর্থ-স্বাচ্ছন্দ্যসম্পন্ন ও বাঙালীকে এক লহমায় বাঙালী বলে চিনতে হোঁচট খাই যতটা না বিব্রত হই বাংলার বাইরের বাঙালীদের দেখে। সুনন্দ মশাই বলেছেন, এদেশে "একটা স্তরের মেয়েরা" এমনভাবে "চিবিয়ে বাংলা বলেন" যে তাতে তাঁর সন্দেহ হয়েছে তাঁরা বোধ করি হামবূর্গ বা কানাডা থেকে এসে বাংলা শিখছেন। কিন্তু এমন বাঙালী পরিবারও আছে যারা—মেয়ে-পুরুষ সবাই—ইচ্ছা করেই 'কপকিয়ে' বাংলা বলে, তাও আবার হিন্দি-মিশ্রিত। কেন না দরওয়ান চাপরাশী রাখতে হয়েছে কিনা, তাই! কিন্তু এতে কি তাদের প্রাণ পূর্ণ হয়? তাই যদি হত তাহলে পূর্ব বাংলার তরুণ সরকারী কর্মচারীটি কলকাতার মাটিতে পা দিয়ে এমন করে বলতে পারত না "...বাংলাদেশে পা দিয়ে বাঁচলাম!" বাঁচার সুখ যে কথা বলায় আর ভোজনে আছে, সেটি সে এতদিন প্রাণ ভরে পায় নি রাওয়ালপিণ্ডিতে। সেই জন্যেই সুনন্দ মহাশয়ের বক্তব্য বেশেবাসে যাই হোক, হৃদয়ের ভাবপ্রকাশে যেন স্বধর্মটি প্রকাশ পায়। তাতে অপরে হাসুক, কিছুই এসে যায় না; কিন্তু আপনাকে তো আনন্দসাগরে ভাসানো যায়। সেটাই কি কম পাওনা! হিন্দুস্থানীদের সান্ধ্য গানের মজলিসে যখন ঢোল-করতালের শব্দ মচ্ছ জগঝম্পের মতো আকাশ-বাতাসকে বিদীর্ণ করে বাজে, তখন অবুঝেরা ঠাট্টা করলেও তাদের কিছু এসে যায় না। তারা দ্বিগুণ উৎসাহে খচমাচিয়ে কেন'য়' বলে চলে। তোমরা যে যাই বলো আমাদের হৃদয়ের আনন্দকে কেউ উপড়ে দিতে পারো না। কৃষক তার পুরানো কাস্তে দিয়েই ধান কাটে, তবে কি বছর শানিয়ে নেয়। তাতে কৃষকের মান যায় না। তেমনি স্ব-ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করতে মানও যায় না মনও ভাঙে না, আখেরে দুটোরই লাভ হয়। তাহলে "চিবিয়ে বাংলা" বলবো কেন, আর ধুতি পরতেই বা ভুলে যাবো কেন! বলা বাহুল্য, তথাকথিত বিদেশী ঢক্কানিনাদে আমাদের সবই ফক্কাবাজির কারসাজি হয়ে উঠছে—এই সমূহ দুঃখই লজ্জাকর।

শ্রীরজতকুমার পাণ্ডা
কলকাতা

রূপদর্শীর ভাষা

২৪শে জানুয়ারীর 'দেশ' পত্রিকার আলোচনা বিভাগে প্রকাশিত শ্রীমতী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের লেখা চিঠিখানি পড়লাম। তিনি 'রূপদর্শী'র ভাষার সমালোচনা করেছেন। রূপদর্শীর রচনা ক্রমশই রাজনৈতিক রূপ নিচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেছেন এবং তাঁর মতে রূপদর্শী বিশেষ একটি দলের প্রতিই তাঁর বাক্যবাণ নিক্ষেপ করে থাকেন। দেশের একজন নিয়মিত পাঠিকা হিসাবে আমার বক্তব্য এই যে, রূপদর্শীর ভাষা প্রধানত রাজনৈতিক ঘটনাশ্রয়ী হলেও তাঁর রচনা পক্ষপাতদুষ্ট মোটেই নয়। সবগুলি প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রতিই তাঁর সমান দৃষ্টি আছে। নিয়মিত পাঠিকা হিসাবে শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের একথাটা অস্বীকার করা উচিত হয়নি। রূপদর্শীর সংবাদ ভাষা যদি রাজনৈতিক কাঠামোর ওপরেই তৈরী হয়তো ক্ষতি কি? বাংলাদেশের খবর মানে সংবাদ মানেই তো আজকাল রাজনৈতিক খবর। মারামারি, কাটাকাটি, দলাদলি, খুনোখুনি এই হচ্ছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংবাদ। সংবাদপত্র পাঠ করা যার যাই হোক না কেন স্বাভাবিক সংবাদ পাওয়ার কোন উপায় নেই। সংবাদপত্র পড়ে সেই শিক্ষাই কি আমরা পাচ্ছি না? অতএব, রূপদর্শীর সংবাদভাষাও যদি রাজনৈতিক রূপ নেয় তা হলে আশ্চর্য হবার কিছু নাই।

পরিশেষে আর একটা কথা বলি—শ্রীমতী মুখার্জী সুদূর পুনায় থেকে বাংলাদেশের অবস্থা ঠিক বুঝতে পারছেন না। রাজনীতির ক্ষেত্রে কি তাণ্ডব লীলা চলছে তা যদি তিনি বাংলাদেশে বসে দেখতে পেতেন তাহলে তিনি এই চিঠি লিখতেন কিনা সন্দেহ। কোন দলের কি অপার মহিমা তা স্বচক্ষে দেখলে আর কারুর ভয়েই কোন কথা বলার প্রবৃত্তি থাকতো না।

মাধুরী চৌধুরী
কলিকাতা—৪০

'বিদায় বার্টি'

১৯৩৭ সালে বারট্রান্ড রাসেল রহস্যচ্ছলে নিজেই নিজের অবিচুয়ারি লিখেছিলেন এইরকম:

"By the death of the 3rd Earl of Russell (or Bertrand Russell as he preferred to call himself) at the age of ninety—a link with a very distant past is severed.... His life, for all its waywardness, had a certain anachronistic consistency, reminiscent of that of the aristocratic rebels of the early nineteenth century."

তখন, সেই উনিশ শো সাঁইত্রিশে তিনি নব্বই বছর বাঁচার আশা পোষণ করেছিলেন, বাঁচলেন প্রায় আটানব্বই বছর, তবু একশোটি শরৎকাল দেখে যেতে পারলেন না বলে ঈষৎ ক্ষোভ হয়।

প্রধানমন্ত্রীর বংশধর, রাসেলের তৃতীয় আর্ল, বারট্রান্ড আর্থার উইলিয়ম রাসেলকে মৃত্যুকালে শৈশবের ডাক-নাম ধরে ডাকতেই ইচ্ছে হলো। বছরখানেক আগে তাঁর আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ড পড়েছিলাম, কৈশোরের রাসেলের চেহারাটা এখনো চোখে ভাসে।

অঙ্কজ্ঞানী, দার্শনিক, সাহিত্যিক মানবতাবাদী—তাঁর কোন পরিচয়টা সবচেয়ে বড় তা নিয়ে আলোচনা করার সময় এখন নয়। ১৯০৩ সালে প্রকাশিত তাঁর 'দ্য প্রিন্সিপলস অফ ম্যাথমেটিক্স' এবং ১৯১০-১৩-তে ডঃ এ এন হোয়াইটহেডের সঙ্গে প্রকাশিত তিন খণ্ডে 'প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা'য় গণিতের মধ্যে যুক্তির যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার চেয়েও উন্নততর কাজ হয়তো হয়েছে; তাঁর দার্শনিকতত্ত্বের মতামতের মধ্যে অনেকে এখন অসঙ্গতি খুঁজে পেয়েছেন; কিন্তু এর বিরাটত্ব ও মহত্ত্ব কোনোদিন ক্ষুণ্ণ হবে না। ১৯৫০ সালে যখন তাঁকে সাহিত্যের জন্য নোবেল প্রাইজ দেওয়া হলো, তখন তার যৌক্তিকতা সম্পর্কে রাসেলের ঘোর বিরুদ্ধবাদীদেরও কোনো সন্দেহ জাগে নি। নোবেল প্রাইজের জন্য তাঁর কোনো বই আলাদা করে উল্লেখ করার দরকার হয় না। গণিত, দর্শন বা যে-কোনো কঠিন বিষয় সম্পর্কেই এমন স্বচ্ছ ও সরস, কখনো বিদ্রূপ ও শ্লেষ ঝলা-ভাষণের তুলনা কচিৎ পাওয়া যায়। এদিক থেকে কিছুটা মিল আছে ফ্রয়েডের সঙ্গে। সিগমুণ্ড ফ্রয়েডকে এখন যারা হাতুড়ে ডাক্তার আখ্যা দেয়, তারাও স্বীকার করে, ফ্রয়েডকে সাহিত্যের জন্য অনায়াসে নোবেল প্রাইজ দেওয়া যেতে পারতো। তা ছাড়াও রাসেলের 'ম্যারেজ অ্যানড মর্যালস', পোর্ট্রেট ফ্রম মেমরি এবং আত্মজীবনীর খণ্ডগুলি পৃথিবীর যে-কোনো সাহিত্যের মানে

মূল্যবান সম্পদ হিসেবে গণ্য হবার যোগ্য।

একথা ঠিক, রাসেলের চরিত্রে নানা অন্তর্বিরোধ ছিল। অনেকবার তিনি মত

বদলেছেন। তবে একটি অন্তর্বিরোধের জন্য এই বিশ্ব তাঁর কাছে ঋণী। আত্ম-জীবনীতে দেখা যায়, বারবার তিনি তীব্র নিঃসঙ্গতায় ভুগেছেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, নিঃসঙ্গতাবোধ মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে আমূল জড়িত। কিন্তু এই নিঃসঙ্গতা তাঁর মনে বৈরাগ্যভাব আনে নি, তিনি সমস্ত মানব জাতির দুঃখ চিন্তা থেকে কখনো বিরত হন নি, তিনি যোদ্ধার মতন একে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিলেন। একদিকে তিনি চেয়েছিলেন প্রতিটি মানুষের স্বাধীনতা—যে-জন্য সাম্যবাদীরা তাঁকে কখনো মেনে নিতে পারে নি, অন্যদিকে তিনি চেয়েছিলেন সাম্যবাদের বিনিময়েও সমস্ত মানব জাতির নিরাপত্তা।

ধর্মের বোঝা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে মুক্ত চিন্তার পালক হয়েছিলেন বাবা-মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকারী সূত্রে। প্রথম যৌবন থেকেই বিদ্রোহ করেন অনাচারের বিরুদ্ধে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জেলে যেতে হয় যুদ্ধের সমালোচনা করে। একজন শান্তি-বাদীর কারাদণ্ডের সমালোচনা করে প্যামফ্লেট লেখার জন্য তাঁর এক হাজার পাউণ্ড জরিমানা হয়, তিনি তা দিতে অস্বীকার করলে তাঁর লাইব্রেরী বিক্রী হয়ে যায়, ট্রিনিটি থেকে তাঁর অধ্যাপনার চাকরি খোয়া যায়। এর পরও, ইওরোপে অধিষ্ঠিত আমেরিকান সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে তিনি এই আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, যুদ্ধের পর এদের শ্রমিক ধর্মঘট ভেঙে দেবার জন্য কাজে লাগানো হবে—। এর ফলে, তাঁর জেল হয় ছ' মাস। জেলে বসেই তিনি 'ইনট্রোডাকশন টু ম্যাথমেটিক্যাল ফিলজফি'র অনেকটা লিখে ফেলেন। আমেরিকার সঙ্গে তাঁর ঝগড়া চলেছে বহু-দিন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে আমেরিকার সর্বসমেত চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে গিয়েছিলেন—এর মধ্যে দুটি জায়গা থেকে তাঁর চাকরি যায়—যৌন ব্যাপারে নীতিজ্ঞান-হীন, এই অভিযোগে। (আমেরিকায় তাঁর ক্লাসে অন্যতম ছাত্র ছিলেন টি এস এলিয়ট)।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে তিনি সঠিক যুদ্ধ

বলে মনে করতেন—কারণ তা স্বৈরাচারী হিটলারের বিরুদ্ধে, কিন্তু শেষের দিকে আণবিক বোমার দুর্ঘটনায় তিনি শিউরে ওঠেন এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কিংবা পৃথিবীর সভ্যতার বিনাশের ভয়াবহ সম্ভাবনার কথা তাঁর মন জুড়ে বসে। তারপর থেকে আণবিক অস্ত্র সংবরণের ব্যাপারে তাঁর অক্লান্ত চেষ্টার কথা অনেকেরই মনে আছে। ট্রাফালগার স্কোয়ারে সত্যাগ্রহ, কমিটি অব হাণ্ড্রেড, রাসেল পীস ফাউণ্ডেশন—এ সবের মধ্যেই ফুটে উঠেছে পৃথিবীর নিরাপত্তা সম্পর্কে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন একজন দুশ্চিন্তাকাতর মানুষের ছবি—যাঁর বয়েস নব্বই পেরিয়ে গেছে। হিরোসিমার ১৬ বছর স্মরণ দিনে হাইড পার্কে তিনি বক্তৃতা করার সময় পুলিশ তাঁর মাইক ছিনিয়ে নেয়। শান্তি বিঘ্নিত করার অভিযোগে এই নব্বই বছর বয়স্ক বিশ্ববন্দিত বৃদ্ধকে ব্রিটিশ সরকার দু' মাস কারাদণ্ড দেয়—অসুস্থতার কারণে অবশ্য তাঁকে সাতদিন জেলে থাকতে হয়েছিল। আণবিক যুদ্ধের আশংকা রাসেলের এত তীব্র ছিল যে, তিনি এক তরফা অস্ত্র সম্বরণেরও সমর্থক ছিলেন। কিউবা সংকটের সময় তিনি কেনেডিকে পরাজয় মেনে নেবার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লেখার ফলে অকম্যুনিস্ট দেশগুলি বেশ চটে যায়। আবার চীন-ভারত যুদ্ধের সময় তিনি চীনের সমর্থন করে ভারতকে নিজে থেকে সীমান্ত বিরোধ মিটিয়ে ফেলার জন্য নেহেরুকে চিঠি লিখেছিলেন বলে ভারতে অনেকের বিরাগভাজন হন। পরে অবশ্য, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বাড়াবাড়ির সময় মাও সে তুং-এর চীনের প্রতি তাঁর সমর্থন কমে যায়।

বার্ধক্য কখনো তাঁকে নিরস্ত করে নি। এই তো কয়েক বছর আগেও ভিয়েৎনাম যুদ্ধে বর্বরতার প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন, 'ভিয়েৎনাম যুদ্ধাপরাধীদের বিচার' এর তিনি ছিলেন মুখ্য উদ্যোক্তা। আমাদের জীবৎকালে, চোখের সামনে এসব ঘটনা ঘটেছে বলে হয়তো আমরা তেমন গুরুত্ব দিই না, কিন্তু, সার্থক হোক বা না হোক, একজন জরাজীর্ণ বৃদ্ধের এই প্রতিবাদের মহান্ মূল্য আছে মানবতার ইতিহাসে। মনে করা যাক, ট্রাফালগার স্কোয়ারে সেই ঘটনা ১৯৬১ সালে। ব্রিটেনে মার্কিন সমরঘাঁটি স্থাপনের প্রতিবাদে সেই মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন এই বৃদ্ধ, প্রতিরক্ষা দপ্তরের সামনে সত্যাগ্রহ করে মাটিতে শুয়ে ছিলেন—হিম, শনশনে হাওয়া অগ্রাহ্য করে—এই যে শরীরজয়ী প্রদীপ্ত মনোবল—দু' পাঁচশো বছর আগে এর জন্যই এরকম মানুষকে আমরা সন্ত আখ্যা দিতাম।

রাসেলের অভাবে পৃথিবী একটু দরিদ্র হয়ে গেল।
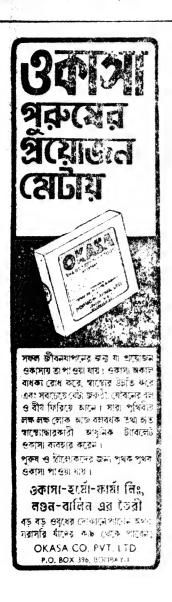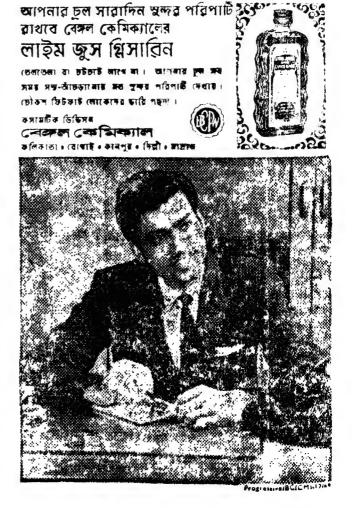
সনাতন পাঠক

ধর্ম

পবিত্র কোরআন (১ম ও ২য় ভাগ)— কাজী আবদুল ওদুদ অনূদিত। প্রথম সংস্করণ। মূল্য ৮·০০ ও ১২·০০ টাকা। প্রকাশক—ভারতী লাইব্রেরী, ৬ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা-১২।

কোরআন শরীফ গীতা ও বাইবেলের মত পৃথিবীর বহুপঠিত পুস্তক। নানা ভাষাতেই এর অনুবাদ হয়ে গেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় তেমন নির্ভরযোগ্য ও সুখপাঠ্য কোরআনের অনুবাদ এতদিন ছিল না বলেই শিক্ষিত সম্প্রদায় ইংরেজী ভাষায় অনূদিত গ্রন্থই পাঠ করে থাকেন। কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব ভূমিকায় বলেছেন, 'বাঙলায় অবশ্য কোরআনের অনেকগুলো অনুবাদ আছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেসব সহজবোধ্য নয়, ...ক করে কোরআনের যে দীপ্ত, মিত, ...ঞ্জল বাকভঙ্গি তার দিকে দৃষ্টি ...অনুবাদের চেষ্টা করা হয়নি, ফলে ...হয়ে পড়েছে ছড়িয়ে পড়া কাব্য, ...সংক্ষিপ্ত ভাবার্থ—কোরআনের প্রাণ-... যা থেকে বাদ পড়ে গেছে।' বাংলা ...ভাষায় যে প্রকাশ-সামর্থ্য কোরআন ...অনুবাদ করা সম্ভব জেনেই কাজী ... এই দুরূহ কাজে হাত দিতে ...ছেন। দীপ্ত, মিত, আবেগচঞ্চল এবং ...পূর্ণ ভাষায় কোরআনের বাকভঙ্গি ...ধারণ ঝঙ্কারে, গাম্ভীর্যে, ছন্দে, রসে, ...সাহিত্যে যেমন স্তরে স্তরে অপূর্ব ... উঠে গেছে উপরে, আবার স্তরে ...তেমনি নেমে এসেছে খাদে। আক্ষরিক ...বাদে এই কাব্য, নীতি, ন্যায়, তত্ত্বের ...কে ব্যক্ত করা অত্যন্ত দুরূহ। একটি ...দূরদৃষ্টিভঙ্গি কবি এবং দার্শনিক-মন ...ক ঠিক মত অনুসরণ করতে না পারলে ঠিক অনুবাদ সম্ভব নয়। কাজী আবদুল ...দ একাধারে উচ্চ শিক্ষিত, পণ্ডিত, ...রাজনৈতিক, সমালোচক, প্রাবন্ধিক, কবি ...বিদগ্ধ সাহিত্যরসিক বলেই তাঁর অনুবাদ ...উঠেছে প্রাঞ্জল, সহজবোধগম্য, ভাষার ছন্দে লালিত্যে রসোত্তীর্ণ। এবং বিদগ্ধ-ব্যক্তি মাত্রেই লক্ষ্য করবেন এই অনূদিত গ্রন্থ আর বিদেশী ভাষার নামগন্ধের মধ্যে ধরা ছোঁওয়া না রেখেই বাংলা ভাষার আপন সম্পদ হয়ে গেছে।

কোরআনের মোট ১১৪টি সুরার প্রথম ভাগে কাজী সাহেব নিয়েছেন ১৪ খণ্ড পর্যন্ত। দ্বিতীয় ভাগে ১৫ থেকে ৩০ খণ্ড পর্যন্ত। এতে আরবী ভাষার ব্যবহার করা হয়নি পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে। মূল আরবী কোরআন পাশে রেখে সুরার নাম আয়াতের নম্বর ধরে এই অনুবাদগ্রন্থ অনায়াসেই পড়া যাবে।

'কোরআনে বার বার ঘোষণা করা হয়েছে, কোরআন কোনো মানুষের বাণী নয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি অধীশ্বর তাঁর বাণী—তাঁর দূত জিব্রিল সেই বাণী অবতীর্ণ করেছিল হযরত মোহম্মদের অন্তরে। হযরতের বয়স যখন আনুমানিক চল্লিশ বৎসর তখন থেকে সেই বাণী তাঁর লাভ হতে থাকে আর আনুমানিক তেষট্টি বৎসর বয়সে তাঁর পরলোকগমনের অল্প কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত সেই বাণী তিনি লাভ করেন। সেই সব বাণী কোরআনের বিভিন্ন সুরায় স্থান পেয়েছে। অবশ্য অবতরণের ক্রম-অনুসারে আয়াত ও সুরাগুলো সাজানো হয়নি বরং সাজানো হয়েছে মুসলমান-মণ্ডলীর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে।'

যাঁরা নামাজে বা অন্য এবাদতে অথবা উপলক্ষে কোরআনের আবৃত্তি করে থাকেন তাঁরাই কোরআনের সাহিত্যের অর্থ অনুধাবন না করেও বুঝতে পারেন, এর আশ্চর্য সাহিত্য ও কাব্যগত মূল্য রয়েছে। আরবী ভাষায় অনধিকারী ব্যক্তিকেও কোরআনের ভাষার ধ্বনি, ছন্দ ও শৈলী মুগ্ধ এবং বিস্মিত না করে পারে না। এবং কোনো ভাষার শুধু অস্থিকে অবলম্বন করে তার ধ্বনি ছন্দ ও শৈলী গড়ে উঠতে পারে এ তত্ত্ব বিশ্বাসযোগ্য নয় অর্থাৎ কোনো সাহিত্যের আঙ্গিকগত সৌন্দর্য ও তার ভাব ও বক্তব্যকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। কোরআনের ভাবসম্পদের সঙ্গে তার সাহিত্য এমন কি ভাষার রস-সুষমা ও অঙ্গসৌন্দর্যের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করাতে যদি অনুবাদক সক্ষম না হন তাহলে অনুবাদের পূর্ণ উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হয় না তা বলা বাহুল্য। এক্ষেত্রে কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর পূর্বসূরীদের অনুসরণ না করে স্বকীয় মেধা, মরমী চেতনা, সাহিত্যবোধ এবং ভাষার মুন্সিয়ানায় যে আশ্চর্য দক্ষতা দেখিয়েছেন তা অত্যন্ত চমকপ্রদ।

'কোরআনে জোর দেওয়া হয়েছে সেই সব চিন্তার উপরে যা সহজবোধ্য—সব মানুষের প্রতিদিনের জীবনের ভালোর সঙ্গে যা মুখ্যভাবে জড়িত। মানুষের সুনিয়ন্ত্রিত ও শুচিতাপূর্ণ জীবনযাপনের কথা, তাদের প্রেমপ্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনের কথা, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার কথা, বঞ্চিতদের অধিকার দানের পথে অশ্রান্ত প্রযত্নের কথা, বার বার এতে ঘোষণা করা হয়েছে, আর বিশেষ করে বলা হয়েছে বিশ্বজগতের যিনি মঙ্গল-বিধাতা, যিনি সত্যস্বরূপ, তাঁর একান্ত আনুগত্য স্বীকারের কথা। কোরআনের মতে সেই আনুগত্য স্বীকারেই জীবন—সার্থক অনন্ত জীবন, আর সেই আনুগত্য স্বীকারের অভাবেই ধ্বংস—শোচনীয় ধ্বংস। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কালের মানবশ্রেষ্ঠদেরও এই-ই নির্দেশ। বর্তমান যুগকে বলা যায় নাস্তিক্য ও সংশয়বাদের যুগ—এর সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান সত্ত্বেও—আর সেই জন্য অন্ধ ভোগবাদের আর ব্যাপক হানাহানির যুগ। এই অনেক পরিমাণে দিশেহারা যুগে কোরআনের—এবং সর্বকালের মানবশ্রেষ্ঠদের—পরম সত্যের একান্ত আনুগত্য নতুন করে মানুষের অবলম্বন হোক'—কাজী সাহেবের এই আবেদন।

গ্রন্থ দুটির ছাপা, প্রচ্ছদ, অঙ্গসজ্জা অতি মনোরম। যে কোনো বাঙালী পাঠক এই গ্রন্থপাঠে কোরআনে কি আছে তা পরিষ্কার জানতে এবং বুঝতে সক্ষম হবেন। যারা আরবী ভাষায় ছাত্র তাদের অসাধারণ উপকারে লাগবে। মুসলমান বাঙালী পাঠকের জন্য এটি অপরিহার্য গ্রন্থ।

প্রবন্ধ

বিচিত্র এই দেশ—কালিদাস কাঞ্জিলাল। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা-৩৭। মূল্য ছয় টাকা।

ভারতবর্ষকে প্রায় হাজার বছর পদানত করে রেখেছিল পরদেশী মুসলমানেরা, তার জের টানতে হয়েছিল আমাদের দীর্ঘকাল ধরে। দীর্ঘকাল হিন্দু ধর্মান্তর, সংস্কৃতি, সভ্যতা হয়েছিল বিপর্যস্ত। তারপর ব্রিটিশ

শাসনে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে লর্ড মিণ্টোর আমল থেকে ভারতবর্ষে যে শাসন সংস্কারের সূত্রপাত হয়, তার যবনিকা টেনে দেওয়া হয় লর্ড মাউন্ট-ব্যাটেনের সময়কাল পর্যন্ত। আমরা যে স্বাধীনতা লাভ করেছি তা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা লাভ হলেও কোন কোন নিরপেক্ষ বিদেশী সমালোচক এ স্বাধীনতাকে শাসন-তান্ত্রিক সংস্কার ছাড়া আর কিছুই বলেননি।

পরবর্তী সময়ে নবলব্ধ দেশ এবং আমাদের নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গী, নবভারত গঠনের উদ্যোগ ও রাজনৈতিক উত্থান-পতনের ইতিহাস লেখক তথ্যবহুল প্রবন্ধের মাধ্যমে বলবার চেষ্টা করেছেন। নেতাদের চিন্তাধারা কর্ম-উদ্যোগ থেকে গান্ধীবাদের পথ ধরে লেখক ভারতের সমাজতন্ত্রবাদ, নেহরুবাদের ওপর সুচিন্তিত মতামত রেখেছেন। যদিও কালিদাসবাবুর এ আলোচনা তর্কসাপেক্ষ এবং কোন মতবাদ ও ইজম্ (বিশেষ করে গান্ধীবাদের ওপরে) খাড়া করতে আরও বেশী বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকা দরকার কিনা তাও বিচার্যের বিষয়। তবে প্রতিটি প্রবন্ধই যে তথ্য নির্ভর এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। বিশেষ করে উপর্যুক্ত রচনা ছাড়া, ভারতের শিক্ষা সমস্যা, প্রতিরক্ষা, স্বাধীন ভারতের পররাষ্ট্রনীতি, প্রাদেশিকতার প্রাদুর্ভাব ইত্যাদি আলোচনায় লেখকের পরিশ্রম, রাজনীতিজ্ঞান অনস্বীকার্য। লেখক মোট ১৯টি প্রবন্ধের মাধ্যমে বিচিত্র এই দেশ ভারতবর্ষের যেসব সমস্যার কথা মনোশি-য়ানার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন এবং যেসব প্রশ্নের অবতারণা করেছেন তা বিদগ্ধ সমাজের প্রশংসা অর্জন করবে বলে আশা করি।

১০৫।৬৯

কাব্যগ্রন্থ

সব প্রিয় ছায়া—অমিত বসু। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ৯। দাম দুই টাকা।

অমিত বসু লিখছেন খুব বেশীদিন নয় সুতরাং তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ হাতে পেয়ে স্বভাবতই নবা লেখকের উদ্দাম আবেগ, উচ্ছ্বাস এবং কাঁচা হাতের কিছু ছাপ থাকবে বলে আশা করেছিলাম। এটা দোষ নয়, স্বাভাবিক। কিছু মাত্রায় এ ত্রুটি থাকলেও অমিত বসু সাম্প্রতিক সমাজ পরিবেশ এবং মানুষের বিচিত্রতর সুখ দুঃখ হাসি কান্নার কথা পরিণত মনে স্বচ্ছন্দভাবে অঙ্কিত করেছেন—এটাই উল্লেখযোগ্য। তিনি যখন বলেন—'পোড়াই তেলের পুঁজি, ইঞ্জিনের মত জ্বালাই সময়/নতুন সকাল আসে ছিটিয়ে নতুন কুঁড়ি গাছে/চাঁদ আঁকে জলছবি জানলার কাঁচে' তখন আর তাঁর কবিপ্রাণ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

মৌসুমী—নিখিলরঞ্জন মাইতি। কলিকাতা পুস্তকালয়, ৩নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দাম দুই টাকা মাত্র।

নিখিলবাবু শুধু কবিতাই লেখেন না, বইয়ের পাতা উল্টে দেখা গেল তাঁর দুটো উপন্যাসও প্রেসে ছাপা হচ্ছে। তা যাই হোক, পরিবেশনভঙ্গীটা লেখার মতন যদি সেকেলে হয় তা হলে গ্রন্থকারকে আধুনিক বলি কি করে। তবু নিখিলবাবু যা বলতে চেয়েছেন তা সরল ভাষায় বলেছেন। সাম্প্রতিক অনেক তরুণ কবির মতন তাঁর কবিতায়ও সহজ একটি গ্রাম্য সুর ধরা পড়ে। কভার থেকে কবিতায় লেখা উৎসর্গ-পত্র পেরিয়ে মোট ছাব্বিশটি কবিতায় এ চিহ্ন বিদ্যমান।

বিবিধ

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অভিধান। রাজকুমার মুখোপাধ্যায়। দি ওয়ার্ল্ড প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা—১২: মূল্য সাত টাকা।

পাঠাগার বিজ্ঞানের পঠনপাঠন এ দেশে এখন সমাদৃত। কিন্তু দেশীয় ভাষায় রচিত পুস্তকের সংখ্যা নিতান্ত বিরল। সেদিক থেকে "গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অভিধান" বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রথম অভিধান, এ দাবি গ্রন্থকারের অযৌক্তিক নয়।

বইখানির বিশেষত্ব হল পাঠাগারের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত সমস্ত কথাগুলির অর্থ ও সংজ্ঞা নির্দেশ এবং ক্ষেত্রবিশেষে চিত্রমারফত অর্থের সংজ্ঞা প্রকাশ। দ্বিতীয়ত গ্রন্থাগারিকদের পুস্তক তালিকার ব্যাপারে কিছু সংক্ষিপ্ত শব্দ ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ইংরেজী ছাড়াও কিছু জার্মান ও ফরাসী শব্দ এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যদিও বইখানি L N Harrod-এর The Librarians glossary-র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, তথাপি বলতে হয় বাংলা ভাষায় রচিত এই অভিধানখানি পাঠাগার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখ্য সংযোজন। ২১১।৫৯

প্রাপ্তি স্বীকার

অখণ্ড ভারত। শ্রীসুহৃদগোপাল দত্ত। শ্রীমতী নমিতা দত্ত : ৩৬বি বসুপাড়া লেন, কলিকাতা।

পূর্ব-পশ্চিম। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। আনন্দধারা প্রকাশন : ৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৩·০০।

ভারতীয় দড়ির খেলা। যাদুকর বি হোড়। শ্রীমতী মঞ্জুল হোড় : রাণী সাগর, পূর্বপাড়, বর্ধমান। মূল্য ২·০০।

ভারতদর্পণ। শ্রীহৃদয়রঞ্জন ভট্টাচার্য। কুমারী অঞ্জলি ভট্টাচার্য : ৩০ই প্যারিক জঙ্গল রোড, পোঃ ভদ্রকালী, হুগলী। মূল্য ২·০০

শ্রীশ্রীগুরুগ্রন্থ সাহিবজী। আনন্দ সাহিব। অনুবাদ : শ্রীহারাণচন্দ্র দেবশর্মা চাকলাদার। ভৌতিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট : বেরহামপুর-১, গঞ্জাম, ওড়িশা। মূল্য ১·৫০।

হরিনামের মাহাত্ম্য। অনুবাদ : শ্রীহারাণ-চন্দ্র দেবশর্মা চাকলাদার। ভৌতিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট। বেরহামপুর-১, গঞ্জাম, ওড়িশা। মূল্য ০·৫০।

তুষের গান। সলিল মিত্র। ভক্তিরাণী মিত্র : পলাশী, হুগলী। মূল্য ০·২৫।

দেশবন্ধু। মণি বাগচি। মোহন লাইব্রেরী : ৩৫এ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য ১৫·০০।

পাতার নাম জমন। চোমং লামা। আলফা-বিটা পাবলিকেশনস : ৫৫/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৩·০০।

নতুন চীনের কবিতা। সম্পাদনা : মন্মথ বসু। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড : ১৪ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট কলিকাতা-১২। মূল্য ৩·০০।

কবিতার পুরুষ। সম্পাদনা : অমিতাভ দাশগুপ্ত। অধুনা : ১৭/১ডি সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-১। মূল্য ২·২৫।

বাদশাহী রসনরের তিন অধ্যায়। গুণেন রায়। রঞ্জন ব্রাদার্স : ১১/১ বৈষ্ণবপাড়া ফার্স্ট বাই লেন, হাওড়া-১। মূল্য ৪·০০।

বিস্ফোরিত বিষয়/আগন্তুক দিন। সিরাজ চৌধুরী। ঐতিহ্য প্রকাশনী : ২৭ হর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৫। মূল্য ২·০০।

শুক্তি-গাথা। শ্রীসুধীরকুমার দত্ত। শ্রীতন্ময়চিত্ত দত্ত : "শ্রীপঞ্চমী", প্রসাদপুর, বারাসত, ২৪ পরগণা। মূল্য ৩·০০।

জন্ম। সামসুল হক। স্বদেশরঞ্জন দত্ত : ১৮ পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা-২০। মূল্য ৩·০০।

Present Day India: by Probhat Kumar Sen. Gobinda Niketan, Jogen Sen Road, Chandannagar, Hooghly. Price 7·50.

Small Industries Seminar in the districts of West Bengal: Directorate of Cottage Industhies and Smayy Scale Industries, Govt. of West Bengal. 1 Kiran Shankar Roy Road Calcutta-1.

শৈলারোহণ শিক্ষা শিবির

প্রতিবারের মত এবারও বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ে কলকাতার হিমালয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় গত ২৩ থেকে ২৬ জানুয়ারি ষষ্ঠ বার্ষিক 'রক্ ক্লাইম্বিং ট্রেনিং কোর্স' বা শৈলারোহণ শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৯৬৫ সাল থেকে সমস্ত পূর্ব ভারতের মধ্যে একমাত্র হিমালয়ান অ্যাসো-সিয়েশনই এই ধরনের কোর্স পরিচালনা করে আসছে।

খুব উঁচু না হলেও শুশুনিয়া পাহাড় এই ধরনের শিক্ষাক্রমের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। চার দিনের এই কোর্সকে মোটামুটি দু' ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত পাহাড়ের উপরে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাইম্বিং, তার পরে নীচে নেমে এসে থিওরিটিক্যাল ক্লাস। ভোরের আলো ফোটবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েরা চলে যেত পাহাড়ের উপরে প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং-এর জন্য। দুপুর অবধি চলত প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং। পাহাড়ের উপরেই সারা হ'ত ব্রেকফাস্ট। নীচে নেমে এসে খাওয়া ও কিছুক্ষণ বিশ্রাম। তারপর আবার পর্বতারোহণ ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে থিওরিটিক্যাল ক্লাস। রাত্রিতে খাওয়া-দাওয়ার পর ক্যাম্প ফায়ার। প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে শেখান হ'ত প্রথমে সহজ শিলায় কিভাবে কোন কিছুর সাহায্য না নিয়ে উঠতে হয়। এর পরে অধিকতর কঠিন শিলায় কিভাবে বিভিন্ন উপায়ে ও নানারকম সাজসরঞ্জামের সাহায্যে উঠতে হয়, যাকে বলে আর্টিফিসিয়াল বা টেকনিক্যাল ক্লাইম্বিং। ওঠার পর নামার পালা। তাতে শেখান হ'ত শুধু দড়ির সাহায্যে ও অন্যান্য সাজসরঞ্জামের সাহায্যে খাড়া পাহাড় বেয়ে তাড়াতাড়ি নামা প্রভৃতি। এছাড়াও শেখান হ'ত চিমনি ক্লাইম্বিং, পাহাড়ের উপর থেকে আহত ব্যক্তিকে খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে নামিয়ে আনার কৌশল এবং এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থানান্তরিত করার পদ্ধতি প্রভৃতি। কেউ যদি বরফের ফাটলে পড়ে যায় তাকে কিভাবে উদ্ধার করতে হবে তাও শেখান হয়েছে। পর্বতারোহণে ও পর্বত অভিযানে যেসব সাজসরঞ্জাম দরকার হয় সে সবের প্রয়োজনীয়তা ও সেগুলি কিভাবে ব্যবহার করা হয় সে শিক্ষাও বাদ যায়নি। শিবির চলাকালীন এক সন্ধ্যায় রক্ ক্লাইম্বিং সম্বন্ধে দুটি শিক্ষামূলক চলচ্চিত্রও দেখান হয়েছে।

এই শিক্ষাক্রমে পর্বতারোহণের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় করান ছাড়াও শিবির তরুণ-তরুণীর মধ্যে শৃঙ্খলা, দলগত সংহতি ও একাগ্রতার প্রসার অন্যতম লক্ষ্য। অন্যান্য স্পোর্টসের মত শৈলারোহণকেও একটা স্পোর্টস হিসেবে জনপ্রিয় করাও এর উদ্দেশ্য।

বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ে হিমালয়ান অ্যাসোসিয়েশনের শৈলারোহণ শিক্ষাশিবিরে একজন শিক্ষার্থী পাহাড় থেকে নীচে নেমে আসার শিক্ষা নিচ্ছেন

এবারের শিক্ষাক্রমে শিক্ষক হিসেবে ছিলেন দার্জিলিং মাউন্টেনিয়ারিং ইন-স্টিটিউটের বিখ্যাত শেরপা শিক্ষক শ্রী এন তামী, শ্রী এন ফিঞ্জো ও বাঙলা দেশের অভিজ্ঞ পর্বতারোহী শ্রীশ্যামল চক্রবর্তী, শ্রীমানিক ব্যানার্জি ও শ্রীপ্রবীর লাহিড়ী।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এবারের শিবির চলাকালীন হিমালয়ান অ্যাসোসিয়েশনের নিজ 'ক্লাইম্বিং হাট' তৈরীর জন্য ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়েছে। ভাবতে ভাল লাগে যে অন্যান্য অনেক বিষয়ের মত বাঙলা দেশেরই সবচেয়ে পুরোন পর্বতা-রোহন সংস্থা হিমালয়ান অ্যাসোসিয়েশনই এ বিষয়ে পথিকৃত।

একলব্য

কৃতীর ক্রীড়া ভূমিকা

সুটারকিন স্ট্রীটে (এখন প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট) আই এফ এ অফিস ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। প্রথম যুক্ত ফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার অর্থমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু এসেছেন উদ্বোধন করতে। অ্যাডভোকেট জেনারেল এবং আই এফ এর সভাপতি শ্রীস্নেহাংশুকান্ত আচার্য শ্রী বসুকে স্বাগত জানিয়ে তাঁর ক্রীড়া-ভূমিকার উল্লেখ করলেন। বললেন, জীবনের অধিকাংশ সময় রাজনীতির খেলা নিয়ে মেতে থাকলেও শ্রীজ্যোতি বসু সত্যিকার খেলাধুলোও করেছেন এবং ফুটবলার হিসাবে রাইট হাফে বেশ ভালই খেলতেন—টুই প্লেড টুগেদার।

জ্যোতিবাবু একটু হেসে স্বাগত উক্তির মত ছোট্ট করে বললেন, 'এ আমার সম্বন্ধে একজ্যাজারেশন হচ্ছে।'

সেদিন রাইটার্স বিল্ডিংএ উপমুখ্যমন্ত্রীর ঘরে বসে যখন ও'রই মুখ থেকে কৈশোর ও যৌবনের খেলাধুলোর কথা শুনতে চাইলাম তখনো প্রায় এক সুর "না না, খেলাধুলো আমি কিছু করিনি।"

আমার মনে হল—যদিও জানি বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খেলাধুলোয় খ্যাতনামা নন—তবু বিনয় দেখাচ্ছেন। এটা বড় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। মনে পড়ল ডন ব্র্যাডম্যানের কথা, যিনি অত বড় ক্রিকেট খেলোয়াড় হয়েও 'ফেয়ারওয়েল টু ক্রিকেট' গ্রন্থে লিখেছেন, খেলোয়াড় জীবনে ক্রিকেট সম্বন্ধে যতটুকু শিখেছি তার চেয়ে বেশী শিখেছি খেলা থেকে অবসর নিয়ে। এখনো শিখছি, এখনো আমি শিক্ষার্থী। মনে পড়ল ক্রিকেটের রাজকুমার রণজিৎ সিংজীর কথা। স্যার জ্যাক হবস শততম সেঞ্চুরি করলে যিনি প্রেরিত উপহারের সঙ্গে একটুকরো কাগজ এঁটে তার উপর লিখে দিয়েছিলেন—'ফ্রম অ্যান আমবল স্টুডেণ্ট অব ক্রিকেট।' বড় চরিত্রের বিশ্বখ্যাত খেলোয়াড়রাই যখন নিজেদের ক্রীড়া-দক্ষতার কথা স্বীকার করতে চান না তখন একজন দেশবরেণ্য নেতা যাঁর বিরাট রাজনৈতিক পটভূমিকার পাশে ক্রীড়া ভূমিকা সিন্ধুতে বিন্দু সম, তিনি কিভাবে বলবেন, 'হ্যাঁ আমি খেলাধুলো করেছি কিংবা ভালই খেলতাম।'

পরে জ্যোতিবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা বলে বুঝলাম ঠিক বিনয় প্রকাশের জন্য নয়, খেলাধুলোয় ও'র ভূমিকা সম্বন্ধে কিছু বেশী লেখা হয়ে যায় সেই ভয়েই উনি মুখ খুলতে চাইছেন না। বললেন, 'মিছিমিছি রঙ ফলিয়ে কি হবে? মন্ত্রী হলেই তো অনেক গুণ বেড়ে যায়। কিছু বাড়িয়ে লিখবেন না। আমি খেলাধুলো বিশেষ করিনি।'

প্রতিবাদ করলেন পরিষদীয় মন্ত্রী শ্রীযতীন চক্রবর্তী। বললেন, 'কেন জেলে তো আমরা এক সংগে খেলাধুলো করেছি। ফুটবল খেলেছি, ক্রিকেট খেলেছি, ভলিবল খেলেছি।'

—'সে তো এমনি খেলা। খোলা মাঠে বন্দী জীবনের আনন্দ মেলা।'

—তবু মার দেখেই তো বোঝা যায় একদিন মারের হাত ছিল। শট দেখে বোঝা যায় পায়ে জোর ছিল। তাছাড়া বালীগঞ্জে কোন একটা ক্লাবেও তো আপনি খেলতেন শুনেছি'—বললেন যতীন চক্রবর্তী।

স্তূপীকৃত সরকারী ফাইলের মধ্যে ডুবে থাকা ভারাক্রান্ত মন বুঝি নিজের অজ্ঞাতে অল্প সময়ের মধ্যে চলে গেল ছোট বেলার সেই আনন্দময় সুখস্মৃতির মাঝে। বললেন, 'সেই ক্লাবের আমিই ছিলাম সেক্রেটারী।'

—'কোন্ ক্লাব?'—আমার প্রশ্ন।

—'কোনো নাম করা ক্লাব নয়।'

—'তবু'।

—'ছোট ক্লাব। এই পাড়ার ক্লাব আর কি।'

বুঝলাম নামকরা নয় বলেই উনি নাম করতে চান না। আমার পরের প্রশ্ন: ওখানে কি কি খেলতেন?

—ফুটবল, হকি, ব্যাডমিণ্টন এবং টেনিসও। ওখানে তো মাঠের অভাব ছিল না। রাত্রিতে আলো জ্বালিয়েও আমরা ব্যাডমিণ্টন খেলতাম। অনেক ফাঁকা জায়গা ছিল। খেলাধুলোর ছিল অঢেল সুযোগ। সেই সব ফাঁকা জায়গায় এখন বিরাট বিরাট বাড়ি উঠেছে। এখনকার ছেলেদের খেলাধুলো করার সে সুযোগ কোথায়?'

কথা প্রসঙ্গে আরও জানা গেল সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ও কলেজে পড়াশুনার সময় জ্যোতিবাবু সব রকমের খেলাধুলোই করেছেন। এমন কি, বক্সিং-এরও তালিম নিয়েছেন কিছুদিন বক্সার ফণী মিত্রের কাছ থেকে। সাংবাদিক বন্ধু শৈলেশ চৌধুরী যিনি কথাবার্তার সময় জ্যোতিবাবুর ঘরে ছিলেন, তিনি জানালেন বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়ার সময় ফাঁক পেলে ফুটবল মাঠে নেমে পড়েছেন জ্যোতিবাবু। স্নেহাংশু আচার্য জানিয়েছেন, বার লাইব্রেরী ক্লাবে ওঁরা এক-সংগে খেলাধুলো করেছেন।

ক্রীড়ানুরাগী পরিবার হিসাবেও ওঁদের পরিচয় আছে। জ্যোতিবাবুর দাদা ডাঃ কিরণ বসু টাউন ক্লাবের প্রতিনিধি হিসাবে আই এফ এ গভর্নিং বডির সদস্য ছিলেন। শিকারী হিসাবেও তাঁর সুনাম আছে। জ্যোতিবাবুর একমাত্র ছেলে চন্দনও খেলার ভক্ত, খেলাধুলো করেও।

ফুটবলের অতীত দিনের রাইট হাফ এবং বর্তমান লেফট সি পি এম 'টিমের' বড় স্তম্ভ জ্যোতি বসুর খেলাধুলো সম্পর্কে ধ্যানধারণা কি?

আগেই বলেছি, ওঁর দুঃখ ওঁরা যে সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন এখনকার ছেলে-মেয়েরা তা পায় না। স্টেডিয়াম অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল। ওটা প্রাইম নিড। ওই আলোচনার সময়ই পরিষদীয় মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তীর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁ, স্টেডিয়ামের রিপোর্টের কি হল? ১৫ দিনের মধ্যে তো দেবার কথা ছিল। যতীনবাবু জানালেন এখনো দেরী হয়নি। যেন একটু বিমর্ষ হলেন। বললেন, স্টেডিয়াম আমরা করবই। যত বাধাই আসুক আর আমাদের মধ্যে যত গোলমালই থাক স্টেডিয়ামের কাজ আটকে থাকবে না।

বিজ্ঞ পার্লামেণ্টেরিয়ান হিসাবে, বিরোধী দলনেতা হিসাবে জ্যোতিবাবুকে আমরা অব্যর্থ লক্ষ্যসন্ধানী বলেই জানি। বাক্যবাণ এবং যুক্তিবাণে যিনি জর্জরিত করেছেন শাসনক্ষমতাসীন কংগ্রেস দলকে সেদিন হুগলী জেলা রাইফেল শুটিংয়ের উদ্বোধন করতে গিয়ে তিনি লক্ষ্যসন্ধানী হিসাবে একেবারেই ব্যর্থ হলেন। পর পর চারটি গুলি ছুঁড়লেন। চারটিই মিস। একটিও টারগেটে বিদ্ধ হল না। স্কোর শূন্য অঙ্ক।

পরে বললেন, 'আমার ব্যর্থতা আগামী দিনের লক্ষ্যসন্ধানীদের পর্যায়ে নিয়ে সার্থক হয়ে উঠবে এই কামনা করি। সেই সঙ্গে কামনা করি সামাজিক ক্ষেত্রে অন্তর্ঘাতী লক্ষ্যসন্ধানীদের স্কোরকার্ড যেন একেবারে সাদাই থাকে। মারদাঙ্গা গোলমালে যেন আগ্নেয় অস্ত্রের অপব্যবহার না হয়।'

জ্যোতিবাবুকে প্রশ্ন করেছিলাম স্পোর্টসম্যান স্পিরিট নিয়ে যুক্তফ্রণ্টের শরিকী দল বিরোধ মিটমাট সম্ভব কি না!

উনি জানালেন, স্পোর্টস আর পলিটিকস দুটি পৃথক। পলিটিকসে নানা রকমের ইন্টারেস্ট। নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন স্পোর্টসম্যানস স্পিরিট নিয়ে পলিটিকসে সমস্যা মেটানো সম্ভব নয়।

ওঠার সময় জ্যোতিবাবু বললেন 'এনকারেজিং কিছু হল না, দুঃখিত'।

মুকুল

ামেরিকায় জাঁ-লুক গদার

আমেরিকার সঙ্গে জাঁ-লুকে গদারের যোগ অনেক দিনের। প্রায় চৌদ্দ র আগে হলিউডে তিনি ফিল্মের প্রেরণা ন। এবং তিনি তা স্বীকারও করেছেন না কথায় এবং তাঁর ছবিতে। ফ্রিৎজ ল্যাং, ওয়ার্ড হকস, ডন সিগেল প্রমুখ ছিলেন দারের বন্ধু। পরে বন্ধুত্ব হয়েছে অনেকের ঙ্গে। আমেরিকান উপন্যাস গদার পড়েছেন, মেরিকার জীবন সম্পর্কে খোঁজখবর য়েছেন প্রচুর।

কিন্তু সম্পর্ক দূরের হলে যেমন াসক্তি ধীরে ধীরে একদিন শিথিল য়, আমেরিকার প্রতি গদারের াকর্ষণও তেমনি একদিন কমে এল। mericanisation of the world লতে যা বোঝায়, গদার একদিন তার প্রতি রূপ হলেন।

গদারের পনেরোটি ছবি বিশ্লেষণ করলে মেরিকার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ক্রম-বর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রথমে আমেরিকার গ্যাংস্টার" ফিল্মের প্রতি গদারের আকর্ষণ ল গভীর। এর প্রমাণ: A Bout de ouffle। এ-ছবিতে তিনি "স্কারফেস"-এর নুকরণ করেছিলেন। গদারের মতে এই ছবি নেকটা "অ্যালিস ইন ওন্ডারল্যান্ড"-এর ত হয়েছিল। তারপর মিউজিক্যাল কমেডির তি গদারের ঝোঁক দেখা গেল। যেমন Une Femme est une Femme। আমেরিকার জীবনের কয়েকটি দিকের প্রতি গদারের ব্যঙ্গ প্রথম প্রকাশ পেল Le Mepris ছবিতে। Bande a Part সম্ভবত গদারের শেষ ছবি যাতে আমেরিকার

প্রতি তাঁর অনুরাগের নিদর্শন দেখা গিয়েছিল। "আমেরিকানাইজেশন"-এর প্রতি গদারের আক্রমণ বিশেষভাবে দেখা গেল ১৯৬৪ সনে, এবং Une Femme Mariee ছবিতে। Alphaville ছবিতে দেখা যায় "ডিহিউম্যানাইজেশন" এবং "কমপিউটারাইজেশন"-এর বিরুদ্ধে পরিষ্কার প্রতিবাদ।

রাজনীতির ব্যাপারে গদার Pierrot Le Fou ছবিতে খুব সচেতন। এই ছবিতে তিনি আমেরিকার ভিয়েতনাম নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। এবং বললেন, যতদিন যুদ্ধ চলবে তিনি এই নীতির বিরোধিতা করে যাবেন। এই প্রতিজ্ঞা তিনি রক্ষা করলেন Masculin Feminin ছবিতে। Made In USA ছবিতেও তার কিঞ্চিৎ প্রকাশ। তারপর থেকেই আমেরিকা হয়ে উঠল গদারের আক্রমণের লক্ষ্য। Deux ou Trois choses que Je Sais de Elle ছবিতে তা প্রমাণিত। "লাইফ" ম্যাগাজিনের ফটো নিয়ে গদারের রাগ তাতে প্রকাশ পেয়েছে। পরের ছবিতেই গদার "রিজেকটেড আউটসাইডার" হিসাবে নিজেকে আমেরিকার প্রভাব থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে নিলেন। শেষ পর্যন্ত, La Chinoise ছবিতে তিনি চীনের কমিউনিস্ট-দের দিকে ফিরে তাকালেন।

এই সময়ে La Chinoise ছবির প্রিন্ট নিয়ে তিনি বিশটি আমেরিকান ইউনিভার্সিটি ঘুরলেন। এই ছবিতে পাঁচ ফরাসী তরুণ-তরুণীই প্রধান—ছাত্রী, অভিনেতা, কৃষক মেয়ে, ইঞ্জিনিয়র ও শিল্পী। তারা এক সঙ্গে বাস করবে মনস্থ করল। তারা সেই

সংগীত পরিচালক পবিত্র চট্টোপাধ্যায় প্রযোজিত "মেঘ কালো" (পরিচালনাঃ সুশীল মুখোপাধ্যায়) ছবিতে সুচিত্রা সেন ও বিকাশ রায়

সংগে গড়ে তুলল "মাওইস্ট সেল"। মাওয়ের নীতি অনুসরণ করে তারা চলবে, বাঁচবে —এই তাদের সিদ্ধান্ত। হেনরিকে সেল থেকে বের করে দেওয়া হল, কারণ সে সোভিয়েট কম্যুনিস্ট নীতিতে বিশ্বাসী। তাকে বলা হল "রিভিশনিস্ট"। অশিক্ষিতা কৃষক মেয়েটিকে, যে হেনরিকে সাহায্য করার জন্য পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করেছিল, লেখাপড়া শেখানো হল। বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে আর্টের কোন মূল্য নেই বলে শিল্পী আত্মহত্যা করল। ছাত্রীটি এক সোভিয়েট মন্ত্রীকে হত্যা করে ইউনিভার্সিটিতে ফিরে যায়, এবং সক্রিয় সহিংস নীতি অনুসরণ করতে মনস্থ করে। লোকের দরজায় দরজায় "ডোর-টু-ডোর" থিয়েটারের ব্যবস্থা করে অভিনেতা মাওয়ের বাণী কার্যকর করে তুলতে চায়। গদারের মতে এই অভিনেতাই সব চাইতে উন্নত। তাঁর ভাষায়,

"Through studying Mao's thought, he has found his vocation; that is to say politics has made him discover his art".

লস এঞ্জেলস-এ ইউনিভার্সিটি অব সাদার্ণ ক্যালিফোর্ণিয়াতে গদার ছাত্রছাত্রীদের কাছে প্রচুর সমর্থন পেলেন। সিনেমার এসথেটিকস নিয়ে অনেক কথাই বললেন তিনি। লস এঞ্জেলস-এর একজন আন্ডারগ্রাউন্ড সাংবাদিক লিখলেন,

I am perfectly serious when I say that for me and for an increasing number of serious young people, Jean-Luc Godard is an important as Sartre, Hesse and Dostoievski".

হলিউডের উপর প্যানেল আলোচনাটি বেশ উত্তপ্ত হয়। সেখানে গদার বসলেন কিং ভিডর, রজার করম্যান, স্যামুয়েল ফুলার প্রভৃতির সংগে। গদার বুঝি সেদিন স্পষ্ট ভাষণের মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। বললেন,

"Mr. Vidor, I am really ashamed of what is happening to you, as I am ashamed of what happened to people like Joseph Von Sternberg or Fritz Lang".

আসরটি যে মোটেই জমেনি তা সহজেই অনুমেয়। "নিউজউইক"-এর প্রতিনিধিকে গদার এক সাক্ষাতকারে, "বনি অ্যান্ড ক্লাইড" ছবি সম্পর্কে বলেন,

It is a dead film. And why? Because it was made according to a structure that has seen its day.

গদার অবশ্য জানান, ম্যাক সেনেট, [illegible] ও চ্যাপলিন তার [illegible]। তা-ছাড়া, জেরি লুইয়ের খুব প্রশংসা করেন গদার। মুশকিল হল এই যে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গদার সিনেমাকে এড়িয়ে রাজনীতি নিয়েই বেশি কথা বলেছেন। বার্কলিতে ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ায় গদারকে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। একটি প্রশ্ন ছিল : সিনেমাকে কি আপনি বিপ্লবের যন্ত্র বলে ভাবেন? উত্তরে গদার বলেন,

I think that art is a special gun. Ideas are guns. A lot of people are dying from ideas and dying for ideas. A gun is a practical idea and an idea a theoretical gun. A film is a theoretical rifle and a rifle a practical [illegible]

"আবার আমি ফাটাব"

—[illegible]

"আবার আমি ফাটাব। যে [illegible] ভিতর দিয়ে আজকের সমাজ [illegible] চলছে তারই রূপ দেব ছবিতে। [illegible] মনে কার করব। তাতে যা হয় [illegible] —কথাগুলি চিত্রপরিচালক [illegible] ঘটকের। শ্রীঘটক এখন সম্পূ[illegible] আবার ছবির কাজে হাত দেবেন। [illegible] পদ্মশ্রীতে ভূষিত হয়েছেন বলে [illegible] সংবর্ধনা জানান নবগঠিত [illegible] অমৃত মহল। অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান হয়েছিল, গত ৩ ফেব্রুয়ারি, প্রেস ক্লাবে। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীপ্রমোদ লাহিড়ী। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন অনু[illegible] কুমার, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, জয়দেব [illegible] প্রভৃতি। রূপক মজুমদার মানপত্র [illegible] করেন। শঙ্খধ্বনির মধ্যে শ্রীঘটকের কপালে তিলক পরিয়ে দেন সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়। বক্তারা চলচ্চিত্রকার শ্রীঘটকের গুণাবলীর কথা বলেন এবং প্রায় সকলেই এই মত প্রকাশ করেন যে, পদ্মশ্রী উপাধি পেয়েছেন বলে তিনি বড় হননি। "ওটা—পদ্মশ্রী—[illegible] নয়। কিছু কথা বলার সুযোগ এলে [illegible] এই পর্যন্ত। এই সম্মান আসলে [illegible] চলচ্চিত্র শিল্পের। শিল্পীকে চটতে [illegible] রাগাতে হবে। না চটলে বড় কাজ হয় [illegible] বড় শিল্পসৃষ্টির মূলে এই রাগ [illegible] ঋত্বিকবাবু বলেন। অনুষ্ঠান-সভা[illegible] শ্রীপ্রমোদ লাহিড়ী বলেন—সুবাহকা [illegible] অগর শামকো ওয়াপস আয়ে তো উসে ভুলা নেহি সমঝা যাতা—সকালে [illegible] হারিয়ে গেছে সন্ধ্যায় সে ফিরে এলে [illegible] হারিয়েছি বলা যায় না। ঋত্বিকবাবু আবার ফিরে এসেছেন এটাই বড় কথা।

ঐদিনই সন্ধ্যায় সুমনা ফিল্মস [illegible] সাংবাদিক সভার আয়োজন করেন। [illegible] শ্রীঋত্বিক ঘটকের নতুন ছবির কথা [illegible] শ্রীসুশীল করণ। পুরুলিয়ার [illegible] সংস্কৃতির উপর একটি প্রামাণিক চিত্র [illegible]

অজয় করের পরিচালনায় নির্মীয়মাণ "মাল্যদান" ছবিতে নন্দিনী মালিয়া, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায় ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

ফটো—দেশ

করেছেন শ্রীঘটক। এই সভায় শ্রীঘটক সমসাময়িক বিশ্বচলচ্চিত্র সম্পর্কে আলোচনা করেন।

॥ চিত্র-সমালোচনা ॥

ধরতী

([illegible])

না! ভেবে কিছু "ধরতী"র মত অবাস্তব ছবি কেমন করে হয় ভেবে পাই না। এখন এটাই কি তা সম্ভব ছিল? ভারত কি কোন এক রাজ্যের অত্যাচারী দেওয়ান (প্রাণ) কথায় কথায় রিভলবার দিয়ে লোক খুন করছে? তার গুলিতে মরছে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, ও অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা, রাজপ্রাসাদে, মেরুদণ্ডহীন রাজার ([illegible] সান্যাল) সামনে। তার গুলিতে মরছে একের পর এক সাধারণ মানুষ। মানুষ মারাটা তার কাছে যেন একটা খেলা। সঙ্গে স্যুটেড হেলিকপ্টারের, রাজা কন্যাকে ট্রাঙ্ক কল করে রাজকুমারীর (ওয়াহিদা রেহমান) সঙ্গে কথাও বলেছেন। অথচ এই রাজ্যে আইন-আদালতও আছে। অথচ দেওয়ানের এই নারকীয় অত্যাচার ও বর্বরতা চলেছে অবাধে। এই অত্যাচার বন্ধ করতে পারতেন একমাত্র সেন্সর বোর্ড। সেন্সর নীতিতে অনেক কিছুই দোষের, দোষের নয় বুঝি শুধু অশ্লীল প্রকরণের নামে যথেচ্ছাচার ও অশালীনতা।

"ধরতী"তে আগাগোড়াই ফাঁকি, আগাগোড়াই প্রহসন। ছবির নামে দেশাত্মবোধের ইঙ্গিত, কাহিনীতেও দেশপ্রেমের বড় বড় কথা ও স্বাধীনতা সংগ্রাম আছে। কাহিনীতে, আগেই বলে নেওয়া ভাল, ইতিহাস-ভূগোলের তেমন বালাই নেই। এইটুকুই কাহিনীকার-পরিচালক শ্রীধর জানাতে চেয়েছেন যে, একটি রাজ্যের দেওয়ানের অত্যাচারে প্রজাকুল অতিষ্ঠ। প্রতিরোধ-সংগ্রামে এগিয়ে এসেছে আনন্দ নামে এক যুবক (শিবাজী গণেশন) এবং পরে তার বন্ধু ভারত (রাজেন্দ্রকুমার)। ভারত অক্সফোর্ডের সেরা ছাত্র, রাজকুমারীর সঙ্গে তার প্রেমের ব্যাপারে সন্দেহই নেই। পরিচালককে ধন্যবাদ, তিনি আনন্দকে অনেক আগেই সরিয়ে দিয়েছেন। এই ভূমিকায় শিবাজী গণেশনের যাত্রাভিনয় অসহ্য লাগছিল। শোভাযাত্রার পুরোভাগে থেকে পুলিসের গুলিতে আনন্দ প্রাণ দিয়েছে। তারপর ভারতের নেতৃত্বে সংগ্রাম চলে। ছদ্মবেশিনী রাজকুমারী তার প্রেমিক ভারতের দলে থেকেই সন্ত্রাসবাদের কাছে আত্মনিয়োগ করে।

হলিউডের চিত্রনাট্যে তৈরি এক ধরনের হিন্দী কস্টিউম থ্রিলার আছে। রাজা কাবু ও মন্ত্রী অথবা দেওয়ানের হাতের পুতুল, খলচরিত্র দেওয়ান রাজকুমারীর পাণিগ্রহণের জন্য সচেষ্ট, রবিনহুড-সদৃশ নায়ক শয়তানের বিনাশ করে রাজকুমারীকে লাভ করে। "ধরতী" এই ফরমুলার ছবি। তবে "সুরজ" যদিও বা সহ্য করা গিয়েছিল, "ধরতী" একেবারেই অসহ্য। ধরতী-র কাণ্ড-কারখানা মধ্যযুগীয়, সাজ-সরঞ্জাম আধুনিক সভ্যযুগের। তাছাড়া যখন-তখন শঙ্কর-জয়কিষণ সুরারোপিত গান ও ক্যাবারে নাচ সমেত আধুনিক হিন্দী চিত্রের আমোদ-উপকরণগুলিও এতে রাখা হয়েছে, নায়ক-নায়িকার রোমান্টিক প্লটের পটভূমি যথাবিহিত বিদেশে। জগাখিচুড়ি হিন্দী ছবির ক্ষেত্রে খুব দোষের নয়, সে তো থাকেই। পীড়াদায়ক এই ছবির "ধরতী" নাম এবং দেশাত্মবোধ-প্রচারের ভণিতা।

বালিকা বধূ'র 'রজনী' আজ আর বালিকা নেই। "পরিণীতা"র ললিতাও এখন রীতিমত গম্ভীর। চঞ্চলতাও আগের মত নেই। অনেক কম কথা বলেন। মৌসুমীর কথা বলছি।

সেদিন দেখা করতে গিয়েছিলাম ওঁর বেলেঘাটার বাড়িতে। গিয়ে দেখি রেকর্ড প্লেয়ারে ইংরেজী গান শুনছেন। আমি যেতেই রেকর্ড বন্ধ করলেন। ঘণ্টাখানেক ছিলাম। আমিই বেশী কথা বললাম। মৌসুমী যেন নীরব-সাক্ষী। বছর খানেক আগেও কিন্তু এমনটি দেখিনি। খুব কথা বলতেন আগে।

"পরিণীতা"র সেটে একদিন—

"জানেন, আমার এক বন্ধু না, আপনার লেখার খুব ভক্ত।" কোন দ্বিধা নেই, ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নেই, অকপটে বলে গেলেন মৌসুমী। আত্ম-প্রশস্তিতে গদগদ হয়ে আমিও প্রশ্ন করি, "বন্ধুটি কে?"

মৌসুমীর চটপট জবাব, "আসলে ঠিক আমার বন্ধু নয়, দিদির বন্ধু, আমি তো

খ্‌ব পাকা, তাই রীতা এখন আমারও বন্ধ্‌।"

আর না হেসে থাকতে পারি না।

"বালিকা বধ্‌"র শ্যটিংয়ের সময়, মনে আছে, তর্‌ণকুমার একবার ঠাট্টা করে বলেছিলেন, "কিরে, ইন্দ্‌ (মৌস্‌মীর ডাক-নাম), তুই আমার সঙ্গে পার্ট করবি?"

"হ্যাট্‌", ম্‌খ বিকৃত করেছিলেন মৌস্‌মী, জবাব দিয়েছিলেন, "তোমার সঙ্গে পার্ট করতে যাবো কেন? করলে তোমার দাদার সঙ্গে করব।"

ঘটনাচক্রে তর্‌ণকুমারের দাদার সঙ্গে একই সারির আসনে বসেছেন মৌস্‌মী। ১৯৬৮র ৬ মে, রবীন্দ্র সদনে মৌস্‌মী বছরের শ্রেষ্ঠ নায়িকা, উত্তমকুমার শ্রেষ্ঠ নায়ক (বি এফ জে-এর মতে)। সেদিনও ও'র চোখে ম্‌খে দেখেছি ব্‌বেনস-এর "পিপিং'"র সারল্য।

মনে পড়ে, সে বছর কী একটা পত্রিকায় মৌস্‌মী প্রসঙ্গে আমি লিখেছিলাম, "এই বয়সেই যেমনি চঞ্চল, তেমনি জেদী, আত্মাভিমানী ও স্পর্শকাতর।" "পরিণীতা"র শ্যটিংয়ের অবসরে মৌস্‌মী আমায় জিজ্ঞাসা করে বসলেন, "স্পর্শকাতর কথাটার মানে কি?"

এই ছিলেন মৌস্‌মী, বছর খানেক আগেও, ইদানীং দেখলাম খ্‌বই কম কথা বলছেন। নতুন ছবি বলতে মৌস্‌মীর হাতে এখন "প্রতিবাদ"। নায়ক বিশ্বজিৎ। এ ছবিতে মৌস্‌মীকে নাকি "স্কুল মিসট্রেস" র্‌পেও দেখা যাবে। "প্রতিবাদ" ছাড়া আরো একাধিক অফার আছে, জানালেন মৌস্‌মী, সামনেই পরীক্ষা আছে বলে নতুন অফার নিতে পারছেন না। প্রাইভেটে মৌস্‌মী এ বছর স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিচ্ছেন। টেস্টে ভালোই রেজাল্ট করেছেন। সে কথাও বললেন।

"নতুন অফার কি কি?" উনি জানালেন, "ছায়ালোকে"র সঙ্গেই তিনখানা ছবির কণ্ট্রাক্ট আছে। "মা ও মেয়ে"তে অভিনয় করাকালীন প্রযোজক নাকি মৌস্‌মীকে দিয়ে একসঙ্গে তিনখানা ছবির চুক্তি-পত্রে সই করিয়ে নিয়েছেন। গল্প নির্বাচনের পালা এখনো শেষ হয়নি। মৌস্‌মীকে ভেবেই নাকি গল্পের সন্ধান চলছে। সেকথাও শ্‌নলাম। ও'কে ভেবে আরেক-খানি গল্পের চিত্রস্বত্ব কিনেছেন পরিচালক অরবিন্দ ম্‌খোপাধ্যায়। গল্পের নাম "ধনি্য মেয়ে"। "নিশিপদ্ম"র পর অরবিন্দবাব্‌ সে ছবির কাজে হাত দেবেন। মৌস্‌মী-সংবাদ আরো আছে। বম্বের স্বনামখ্যাত পরিচালক হৃষীকেশ ম্‌খোপাধ্যায়ও নাকি বাংলাদেশে মৌস্‌মীকে নিয়ে একখানি ছবি করার কথা ভেবেছেন। মৌস্‌মীর আপত্তি নেই হৃষীবাব্‌র ছবিতে কাজ করতে। জানালেন সে কথা।

মৌস্‌মীর কাছে এখন রোজ অসংখ্য "ফ্যান লেটার" আসে। সে-সব চিঠির বয়ানও নাকি বিচিত্র ধরনের। কয়েকটি চিঠি মৌস্‌মী আমায় পড়তে দিলেন। সেগ্‌লি পড়লে মনে হয়, মৌস্‌মী আজ কারো কারো চোখে "স্বর্গের দেবী।" "মা ও মেয়ে"তে 'ডি-গ্ল্যামারাইজড' মৌস্‌মীকে

অগ্রগামী পরিচালিত "বিলম্বিত লগ্ন" এখন শেষ—ছবিতে উত্তমকুমার ও নবাগত দীপা চট্টোপাধ্যায়

সে মৌসুমী-ভক্তরা যেন খুশী নন। তে অনেকে আবার অভিযোগ রছেন, "এত দুঃখের বইয়েতে আপনি ই করলেন কেন?"

বাংলা ফিল্মে এখন "টিন-এজার"দের । কিশোর-কিশোরীর জয়জয়কার। লিকা বধূ" থেকেই এ ট্রেন্ড শুরু চ্ছে। "ছুটি", "আপনজন" ও তুন পাতা"র সাফল্য বুঝি আরো প্রেরণা দিয়েছে। মৌসুমী, জুঁই, পার্থ, করুণই ন্ত এখন কম নয়। জুঁইয়ের হাতে ক ছবি। [illegible], "এই করেছো লো", "কাচীমায়ের সংসার" ও "প্রতিবাদ" তে ওঁর সহ-নায়িকার ভূমিকা। পার্থ র্জির হাতেও নাকি খানতিনেক ছবি। লু চ্যাটার্জির "রাণুর প্রথম ভাগ", চ্যাটার্জির "উত্তরণ" ও দীনেন গুপ্তের ম প্রতিশ্রুতি।" "উত্তরণ" ছবিতে পার্থ বার গানও গেয়েছেন।

ইদানীং লক্ষ্য করা যাচ্ছে, বাংলা ছবির নর জগতেও "টিন-এজার" শিল্পীরা ক্রমে আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু রছেন। বাপি লাহিড়ীর বয়স সতেরোর শী নয়। বাপি এখন ছায়াছবির গীত-পরিচালক। মধুকর পরিচালিত হারার আদালত" ছবিতে তিনি সুর য়েছেন। বাপির সুরে এ-ছবিতে গান রছেন ওঁর মা-বাবা দুজনেই। বাঁশরী হিড়ী ও অপরেশ লাহিড়ী। তাছাড়া শা ভোঁসলে ও মুকেশকে দিয়েও নাকি রো দুখানা গান শীঘ্রই রেকর্ড করা চ্ছে। জানালেন বাপি।

আনন্দ-সংবাদ, বাংলা ছবির গীত নাতেও ইদানীং তরুণদের প্রবেশ লাভ চ্ছে। ফিল্মের এই একটি মাত্র বিভাগে কাল দেখেছি বরাবরের "নো ভ্যাকেন্সি"। সাকুল্যে ছজন গীতিকার ফিল্মের গোটা গানের জগৎটাকে আধিপত্য বিস্তার করে বসেছিলেন। তাও আবার সেই গৌরীপ্রসন্ন, প্রণব রায় ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া সংগীত-পরিচালকেরা যেন আর কারো কথা ভাবতেই পারতেন না। মাঝে মুকুল দত্ত এলেন ব্যতিক্রম হয়ে। মিন্টু ঘোষ, সুনীলবরণ, শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলকে বেশী দেখা যায় না। সম্প্রতি "নিশি-পদ্ম" ছবিতে একটি নতুন ছেলে গীত রচনার সুযোগ পেয়েছেন শুনলাম। নাম চন্দন সেন। তাঁর গানে সুর দিয়েছেন নচিকেতা ঘোষ। গেয়েছেন শ্যামল মিত্র।

—বিচক্ষ

সুরবাহারের অনুষ্ঠান

বিশিষ্ট সঙ্গীত শিক্ষায়তন সুরবাহার তৃতীয় ও চতুর্থ বার্ষিক মিলনোৎসব উপলক্ষে দুদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে নৃত্য, কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীতে আনন্দ দান করেন কসবা অঞ্চলের সঙ্গীতরসিকদের। শিশু শিল্পীদের গাওয়া সমবেত কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীতগুলি উপভোগ্য হয়। সুর-বাহার সঙ্গীতগোষ্ঠী পরিবেশিত নজরুলের 'জাগো অনশন বন্দী' ও সলিল চৌধুরীর 'নওজোয়ান' সঙ্গীতে সমবেত সংহতির স্বাক্ষর রাখে। একক সঙ্গীতে কিশোরী শিল্পী বাণী সমাদ্দার একাধারে রবীন্দ্র-সঙ্গীত, নজরুলগীতি, আধুনিক, ভজন এমনকি বিলম্বিত ও দ্রুতলয়ে খেয়াল গানেও কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। নন্দা মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা সরকার, সুগন্ধা মৈত্র ও ঊর্মিলা দত্তের কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত, অতুলপ্রসাদের গান, শ্যামাসংগীত, আধুনিক ও ভজন প্রশংসা লাভ করে। কথক ও রবীন্দ্র নৃত্যে যথাক্রমে নমিতা মল্লিক ও রূপালী ভট্টাচার্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেতারে বাগেশ্রী বাজিয়ে শিক্ষার্থী মঞ্জুলা মিত্র মুন্সীয়ানার পরিচয় দেয়। সংক্ষিপ্ত হলেও প্রশান্ত সমাদ্দারের তবলা লহরা তারিফ পাবার যোগ্য। ত্রিদিব বন্দ্যো-পাধ্যায়ের নির্দেশনায় গীটারে বিভিন্ন গানের সুর বাজিয়ে শোনায় শিক্ষার্থীবৃন্দ। এই দুদিনের অনুষ্ঠান শেষ হয় সুর-বাহারের শিক্ষকমণ্ডলীর অন্যতম সেতারী বলরাম পাঠকের বাগেশ্রী রাগ পরিবেশনার মধ্য দিয়ে। এঁর সঙ্গে তবলায় সঙ্গত করেন অনিল রায়চৌধুরী।

"আলেয়ার আলো" (পরিচালনা : মঙ্গল চক্রবর্তী) ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও জ্যোৎস্না বিশ্বাস

"দি ইলাসট্রেটেড ম্যান" ইংরেজি ছবিটা আসছে—এতে ক্লেয়ার ব্লুম ও রড স্টেইগার

নতুন নাট্যসংস্থা "অমৃত মহল"

উত্তমকুমারকে সভাপতি ক'রে একটি নতুন নাট্য সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নাম : অমৃত মহল। এ'রা অমৃতলালের "খাস দখল", ভারতচন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দর", শরৎ-চন্দ্রের "বিরাজ বৌ" এবং বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'দ্বিধা' নাটক মঞ্চস্থ করবেন। নাট্য-নির্দেশনার দায়িত্ব অভিনেতা তরুণকুমারের।

চেকোশ্লোভাক চিত্রপ্রদর্শনী

চেকোশ্লোভাক দূতাবাসের সহ-যোগিতায় সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা পঞ্চম চেকোশ্লোভাক চিত্র-উৎসবের ব্যবস্থা করেছেন। মোট সাতটি ছবি উৎসবে দেখানো হবে। ছবিগুলি হল : ডেইজিজ, স্কিড, দি বেস্ট এজ, দি ফানি ওল্ড ম্যান, আওয়ার ফানি ফ্যামিলি, লিটল্‌ভালি সিক্রেট ফাস্ট পারফরম্যান্স, দি এণ্ড অব দি প্রিস্ট।

গঠনপথে "কস্তুরীমৃগ"

কথা-চিত্রের প্রযোজিত হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে দিলীপ বসুর পরিচালনায় "কস্তুরীমৃগ"-এর চিত্রগ্রহণ এগিয়ে চলেছে। ছবির বিভিন্ন চরিত্রে আছেন—সাবিত্রী চ্যাটার্জি, অনিল চ্যাটার্জি, তরুণকুমার, গীতা দে, নিরঞ্জন রায়, মলিনা দেবী, বাণী গাঙ্গুলী, জহর রায়, সুব্রতা চ্যাটার্জি, পদ্মা দেবী প্রভৃতি।

"এই করেছো ভাল" সমাপ্ত

লাইট অ্যান্ড শেড প্রযোজিত "এই করেছো ভাল" ছবির চিত্রগ্রহণ সমাপ্ত হয়েছে। হাস্যরসের এই ছবিখানি পরিচালনা করেছেন অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, জহর গাঙ্গুলী, জহর রায়, অজয় গাঙ্গুলী, নবগত সরকার, অমরেশ মৌলিক, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, লিলি চক্রবর্তী, নমিতা বিশ্বাস ও মুক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়। কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। সুর সংযোজনায় রয়েছেন অধীর বাগচী।

সমতট-এর অনুষ্ঠান

সমতট সংস্থা গত ৩রা ফেব্রুয়ারি এক উপভোগ্য সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। রবীন্দ্রসংগীত, নজরুল-গীতি এবং গীত ও ভজনের সান্ধ্য অনুষ্ঠানে সব শিল্পীরাই সুন্দর মেজাজ ও দরদের সঙ্গে গান করেন। শিল্পীরা হলেন পূর্বা সিংহ ও শিপ্রা দত্তগুপ্ত (রবীন্দ্রসংগীত), কাবেরী ঘটক (নজরুলগীতি) এবং মন্দিরা রায়-চৌধুরী (গীত ও ভজন)। অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় ছিলেন নৃপেন সান্যাল।

পদ্মগোলাপ

দুই বিপরীতধর্মী চরিত্র নিয়ে "পদ্ম-গোলাপ" কাহিনীর সূত্রপাত। বড় ভাই উদার, কিন্তু ছোট ভাই মুনাফাখোর। ডঃ বিশ্বনাথ রায়ের কাহিনী অবলম্বনে এবং বারীন্দ্রনাথ দাস-এর চিত্রনাট্য অবলম্বনে পরিচালক অজিত লাহিড়ী যে ছবিটি সদ্য সমাপ্ত করেছেন সেটি হল "পদ্মগোলাপ"। এই চিত্রের সংগীত-পরিচালনা করেছেন শ্যামল মিত্র। ভূমিকা-লিপিতে রয়েছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন, অনুপকুমার, অনুভা ঘোষ, সত্য ব্যানার্জি, অজিতেশ, শৈলেন মুখার্জি (অতিথি) প্রভৃতি।

"দেবী" আগামী সপ্তাহে

ভারতীয় নারীর জীবন নিয়ে তৈরি ভেনাস পিকচার্সের হিন্দী চিত্র "দেবী"। মুখ্য চরিত্রের শিল্পী নূতন। বিভিন্ন চরিত্রে রয়েছেন সঞ্জীবকুমার, রেহমান, মেহমুদ, মুকরি, সুলোচনা প্রভৃতি। লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল সংগীত পরিচালক।

আর্ট সেণ্টার অব্ দি ওরিয়েণ্ট

আর্ট সেণ্টার অব দি ওরিয়েণ্ট সংস্থার একত্রিংশ বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ উৎসব সম্পন্ন হয়েছে ১লা ফেব্রুয়ারি, মহাজাতি সদনে। সেণ্টারের বেলবাটি, হাওড়া, কালী-ঘাট ও শিবপুর কেন্দ্রের প্রায় তিনশো জন ছাত্রী মোট আঠারোটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন। নৃত্য, গীত, সেতার ও গিটার বাজনার এই উপভোগ্য অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করেন রঞ্জিত গুহঠাকুরতা।

গৌরী

ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে সম্প্রতি অরবিন্দ ভট্টাচার্যের প্রযোজনায় এবং অরূপ চৌধুরীর পরিচালনায় আরম্ভ হয়েছে অরবিন্দ প্রোডাকসন্সের প্রথম ছবি 'গৌরী'র শুটিং। এ ছবির প্রথম পর্বের শুটিং-এর শিল্পীরা হলেন জীবেন ঘোষ, শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায়, মাস্টার মলয়, সৌরেন ব্যানার্জি এবং রাধা দেবী।

অরণ্যদেব লী ফক

NO SMOKING
এই প্লেন এখন আমাদের দখলে। কেউ বাধা দিলেই গুলি চালাব।
!?!

চটপট সবাই নেমে যান।
কী ভয়ঙ্কর!
PACIFICAN
আমাদের মালপত্রের কী হবে?

॥ বিশ্ব বার্তা ॥
আবার প্লেন লুঠ
এই নিয়ে মোট বারোখানা
পুলিশ হতভম্ব : ক্ষতির পরিমাণ ১০কোটি ডলার
কারা লুটেরা? তাদের উদ্দেশ্য কী?

রাজা চার্লের গুপ্ত বিমানঘাটিতে .....
প্লেন তো প্রচুর পাওয়া গেল। এবারে বাজে নামা যাক।
নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!

নিশ্চয়ই। কিন্তু কী তোমার চাই বলো তো?
৮/২২

লুণ্ঠিত প্লেনের মধ্যে ছ'খানা আপনাদের। শেষ রাডার-রিপোর্ট মোটামুটি এই এলাকা থেকে পাওয়া গিয়েছিল। এর হাজার মাইলের মধ্যে মাত্র একটাই বিমানঘাটি আছে। রাজা চার্ল তার মালিক।
প্রমাণ দিতে পারেন?

দূর দূর, এ একটা বাজে লোক!
কিন্তু শুধু অনুমানের ভিত্তিতে তো এগোনো যাবে না। পরে যদি দরকার বুঝি তো আপনাকে ডাকব।
PRESIDENT

লোকটা গেল কোথায়!!

PRESIDENT
!?

Waterbury's
Compound

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচিপত্র

সূচিপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীমানবেন্দ্র বড়ুয়া

১. নিপুণ এরিয়াল ব্যবস্থা : মিডিয়াম আর শর্ট ওয়েভের জন্যে ভেতরে বসানো দু-দুটো আলাদা এরিয়াল।

২. মাইক্রো-টিউনিং : স্বচ্ছন্দে নির্ভুলভাবে স্টেশন ধরবার দীর্ঘশক্তি ব্যাণ্ডস্প্রেড।

৩. মাত্র ৪টি অনায়াসলভ্য টর্চ সেলে চলে।

৪. হালক্যাশানের সুডৌল গড়ন।

মারফি
মিনি মাষ্টার

মনে ক'রে আজই যান—এই ২ ব্যাণ্ড মিনি মাস্টার দেখেশুনে মনের আনন্দে ঘরে আনুন!

এখনকার দাম মাত্র ২২০, টাকা *

* বিক্রয় কর আর স্থানীয় ট্যাক্স স্বতন্ত্র

মারফি

বাাঙ্ক, কারখানা আর গুদামে ব্যবহার হয়—কেন না এটি নির্ভরযোগ্য।

সূক্ষ্ম এর কারিগরী, প্রতিটি তালা'র জন্যে আলাদা আলাদা রকমের চাবী তৈরি হয়, তাছাড়া নব-তাল এমন ভাবে ডিজাইন করা—যাতে, খুলে বা ভেঙ্গে চুরি করা না যায়, তাই নব-তাল দেয় সবচেয়ে বেশী নিরাপত্তা। পেতল আর ইস্পাতের ডবল খাপ থাকে ব'লে এটি দারুণ মজবুত।

এটি তৈরি করছেন গোদরেজ—নিরাপত্তার সরঞ্জাম তৈরি করতে যাদের আছে ৭০ বছরেরও বেশী অভিজ্ঞতা।

নব-তাল

চার সাইজে পাবেন:
৪০ মিলিমিটার (৫ লিভার)
৫০ মিলিমিটার (৬ লিভার)
৬৭ মিঃ মিঃ (৭ লিভার)
৮৫ মিঃ মিঃ (৮ লিভার)

Godrej গোদরেজ সবসময় অ্যাঙ্কর ব্র্যাণ্ড চাইবেন

Bata
আসুন
বসন্ত মেলায়
পথ চলতে পায়ের আরাম, চমৎকার খোলামেলা গড়ন, ছিমছাম
মনোরম স্টাইল...বাটার এই সব স্যান্ডাল বা চপ্পলে নিজেকে
আপনি অনেক বেশি পরিচ্ছন্ন এবং স্বচ্ছন্দ বোধ করবেন।
সুঠাম, কোমল ওপর-চামড়া, তেমনি মোলায়েম আর মজবুত সোল—
প্রত্যেক পদক্ষেপে আশ্চর্য আরাম। স্টাইলের বহুমুখী
বৈচিত্র্য এদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। আজই এসে দেখে যান বাটার দোকানে
স্যান্ডাল ও চপ্পলের নানাবিধ সুদর্শন নকশা।
সাইজ ২—৭ ১৪.৯৫
সাইজ ৪—১০ ২৬.৯৫
সাইজ ৪—১০ ১৫.৯৫

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

৩৭ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১৭
শনিবার ৯ ফাল্গুন ১৩৭৬

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৪৩ ২৩-৪৫৪১

চাঁদার হার

কলকাতায়

বার্ষিক	— ২৫.০০
ষান্মাসিক	— ১২.৫০
ত্রৈমাসিক	— ৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	— ৩০.০০
ষান্মাসিক ,,	— ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক ,,	— ৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	— ৩০.০০
ষান্মাসিক ,,	— ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক ,,	— ৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	— ৫২.০০
ষান্মাসিক ,,	— ২৬.০০
ত্রৈমাসিক ,,	— ১৩.০০

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	— ৩৯.০০
ষান্মাসিক	— ১৯.৫০
ত্রৈমাসিক	— ১০.০০

দাম ৫০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাসুল ৭ পয়সা

DESH

Saturday, 21 Feb. 1970

জীবন্মৃত যুক্তফ্রণ্ট

পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রণ্ট সরকারের বর্তমান অবস্থাকে নাকি জীবন্মৃত অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তুলনা করেছেন স্বয়ং শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত মশাই। এ এক বড় রকমের রঙ্গ; যুক্তফ্রণ্ট যাঁরা গড়ে তুললেন, শরিকে শরিকে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হয়ে রাজ্যের শাসন ক্ষমতা নিলেন, মাত্র এগারো মাসের মধ্যেই তাঁদের দেখছি চৈতন্যোদয় হয়ে গেছে। কেউ বলছেন, এই সরকার বর্বর অসভ্য; কেউ বলছেন জীবন্মৃত, কারুর বা ধারণা—নিতান্ত খাতায় কলমে টিকে থাক। ছাড়া সরকারের আর কী-ই বা আছে। রক্ষে এই যে, কথাগুলো যুক্তফ্রণ্টের মাননীয় নেতা ও মন্ত্রীরাই বলছেন, অন্যে বললে সঙ্গে সঙ্গে তাদের 'দালাল' 'প্রতিক্রিয়াশীল' 'ষড়যন্ত্রকারী'—এইসব বাঁধা বিশেষণে ভূষিত করা হত। এখনও যে না হচ্ছে এমন নয়, যেমন বাংলা কংগ্রেস, সি পি আই—এদের বিরুদ্ধে সি পি এম-এর কুৎসা-প্রচার রাস্তাঘাটের দেওয়ালেও চোখে পড়ে। বস্তুত, সি পি এম দেখাতে চাইছে : যুক্তফ্রণ্টের এই ভগ্নপ্রায় অবস্থার জন্যে বাংলা কংগ্রেস, কম্যুনিস্ট পার্টি, ফরোয়ার্ড ব্লকের মতন দলগুলিই দায়ী; আবার অন্যরা দেখাতে চাইছেন মার্কসিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির জন্যেই ফ্রণ্ট সরকার ভেঙে যেতে বসেছে। দু'পক্ষেরই নিজস্ব যুক্তি আছে, দেখাবার মতন উদাহরণও হাতে আছে; কিন্তু মনে হয় না কোনো পক্ষই তাঁদের যুক্ত অবস্থাটা বিযুক্ত করতে সাহসী হচ্ছেন।

যুক্তফ্রণ্টের ভেতরের লড়াই নিয়ে মাথা ঘামাবার দায় আর যাদেরই হোক জনসাধারণের নিশ্চয় নয়। অথচ আজ যে অবস্থা করে ফেলা হয়েছে তাতে সবচেয়ে বেশী ভোগ ভুগতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। সারা পশ্চিমবঙ্গে এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে মানুষ আজ নিরুদ্বিগ্ন; সর্বত্র অশান্তি, মারপিট, খুনোখুনি। অন্ন সংগ্রহের দুশ্চিন্তার সঙ্গে এই আর-এক ভীষণ উদ্বেগ দেখা দিয়েছে : প্রাণ রক্ষা; কেউ বলতে পারে না কখন কি ভাবে হাঙ্গামা গণ্ডগোল লেগে যাবে। বলতে দ্বিধা নেই, জীবনের নিরাপত্তাই আপাতত বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে বড় প্রশ্ন। সে নিরাপত্তা কোথায়? শহরে নেই, গ্রামেও নেই।

কলকাতা শহরের সাম্প্রতিক হাঙ্গামার কথা ধরা যাক। বেলেঘাটা-নারকেলডাঙ্গা-মানিকতলা অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে যা চলছে এটা কী? খুনোখুনি তো এখানে কম হল না, তবু ওই অঞ্চলের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্যে কী করা হয়েছে! যে-কোনো জায়গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগার গুজব শুনলে মন্ত্রীরা তটস্থ হন, ছোটখাটো গোলমালেও মিলিটারির তলব হয়। আর এই নারকেলডাঙ্গায় অরাজকতা চলছে তো চলছেই, সরকারের তেমন কোনো গা নেই যেন। এই অভিযোগ আমাদের নয়, ফ্রণ্টের শরিক দলেরও। কৃষিমন্ত্রী ডঃ কানাই ভট্টাচার্য ব্যক্তিগত আলাপ এবং নোট দেওয়া সত্ত্বেও নাকি শ্রীজ্যোতি বসুকে এ-ব্যাপারে সচেতন করতে পারেননি। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভাতেও কলকাতার এই ঘটনা নিয়ে তুমুল বিতর্ক হয়ে গেছে। ফরোয়ার্ড ব্লক এবং সি পি আই স্পষ্টই অভিযোগ করেছেন যে, স্বরাষ্ট্র দপ্তর পুলিসকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে জনসাধারণের ওপর হামলাবাজি চালাচ্ছে। শ্রীমতী ইলা মিত্র বলেছেন, গুণ্ডাদের ধরা হচ্ছে না, সাধারণ লোকের আজ নিরাপত্তা নেই। প্রবীণ নেতা শ্রীহেমন্তকুমার বসু বলেছেন যে, গুণ্ডা ও সমাজ-বিরোধীদের একটি তালিকা তাঁরা শ্রীজ্যোতি বসুর দপ্তরে দিয়েছিলেন, অথচ জ্যোতিবাবু তা অস্বীকার করছেন। এই সব অভিযোগের পর স্বরাষ্ট্র দপ্তর কি বলবেন আমরা জানি না, তবে নিজের অক্ষমতা বা পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তাঁরা নিশ্চয় স্বীকার করবেন না। করবেই বা কেন?

যুক্তফ্রণ্টের এখন যা অবস্থা তাতে এই সরকারের স্থায়িত্ব সম্পর্কে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। এই সন্দেহ নেতাদেরও। কিন্তু মনে হয়, সকল পক্ষই নিজেদের তরফে একটা সুযোগের অপেক্ষায় বসে আছেন। রুগী যে মরণাপন্ন তাতে দ্বিমত হবার উপায় নেই, ক্ষণে ক্ষণে টাল আসছে, রাজনৈতিক বৈদ্যরা তা কোনো রকমে কাটিয়ে উঠছেন। কিন্তু এ-রুগী শেষাবধি বেঁচে যাবে এমন লক্ষণ তো দেখছি না। **যদি যায় সেটা ভোজবাজির সমতুল্য হবে। রাজনীতিতে** সাময়িকভাবে এটা সম্ভব। তবে আজ আর স্বীকার করতে দ্বিধা নেই—পশ্চিমবঙ্গ ভাগের মা হয়ে গেছে, তার বোধ হয় গঙ্গাপ্রাপ্তি হবে না।

অন্ধ গলি!

প্রধানমন্ত্রীর সংকট

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবার বেশ কিছুটা বিপদে পড়েছেন। উত্তর প্রদেশ এবং ব্যাংক জাতীয়করণ তাঁকে বেজায় অসুবিধায় ফেলেছে।

এই প্রবন্ধ যখন লিখছি তখনও এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী প্রাণপণে চেষ্টা করে চলেছেন। ব্যাংক জাতীয়করণের ব্যাপারে আর একটা অরডি-ন্যানস পাশের উদ্যোগ আয়োজন চলছে এবং শ্রীচরণ সিংকে যে কোনও উপায়ে শ্রী সি বি গুপ্তের খপ্পর থেকে বের করে আনার সর্বতোমুখী প্রচেষ্টা অব্যাহত।

হয়ত দুটি ক্ষেত্রেই এতদিনে অনেক কিছু ঘটেও গিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর এখন আর বসে ভাবার সময় খুব বেশি নেই। অবিলম্বে যে-কোনও মূল্যে দুই ক্ষেত্রেই সাফল্য অর্জনের চেষ্টা তাঁকে করতে হবে। কারণ, পারলামেন্ট খুলে যাচ্ছে। পারলামেন্ট খুললেই ধীরে বা দ্রুততালে নতুন ঘটনাপ্রবাহ শুরু হবে। তখন প্রধানমন্ত্রীকে সেই সব নতুন নতুন সমস্যা নিয়েই খুব বেশি ব্যস্ত থাকতে হবে। তাই এই দুই ক্ষেত্রেই যা কিছু করার তাড়াতাড়ি করে ফেলতে হবে।

❊

উত্তর প্রদেশ নিয়ে শ্রীমতী গান্ধী যা করেছেন তা অভাবনীয়। কোনও ফেডারেল সরকারের প্রধান এইভাবে একটি অন্য রাজ্যের সরকারকে খতম করার জন্য আদা-নুন খেয়ে লাগতে পারেন একথা কেউ কখনও ভাবে নি। আবার উত্তর প্রদেশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী যেভাবে থাপ্পড়টা খেলেন তাও অভূতপূর্ব। সি বি গুপ্ত এর আগেও অনেকের সঙ্গে লড়াই চালিয়েছেন, কিন্তু এর আগে কখনও কাউকে তিনি শেষ মুহূর্তে এইরকম একটা থাপ্পড় বোধ হয় মারতে পারেন নি।

চন্দ্রভান গুপ্ত এবং চরণ সিং শেষ মুহূর্তে যেভাবে আচমকা একটা "ভাই ভাই" চুক্তি করে ফেললেন সেটাও অদ্ভুত মিলন। আসলে এটা রাজনৈতিক সুবিধাবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়—বিশেষ করে চরণ সিংয়ের দিক থেকে। তিনি যেভাবে পক্ষ পরিবর্তন করলেন, যেভাবে মুখ্যমন্ত্রিত্বের লোভের জন্য উল্টো দিকে মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন তাকে চরম সুবিধাবাদ ছাড়া আর কি বলা যায়?

তবে, এজন্যও মূলত শ্রীমতী গান্ধী দায়ী। ভারতের রাজনীতিতে খুব দ্রুততালে চরম সুবিধাবাদ আমদানীর মূল দায়িত্ব তাঁর। তিনি রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী হয়ে উত্তর প্রদেশের গ্রামে গ্রামে ঘুরে যেভাবে বিভিন্ন দল থেকে এম-এল-এ ভাঙাবার চেষ্টা করেছেন তা কোনও ভদ্র রাজনীতিবিদের পক্ষে সম্ভব নয়। সেই রাজনীতিরই একটা স্বাভাবিক পরিণতি হলো চরণ সিং-এর ডিগবাজি।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এইখানেই থামছেন না। চরণ সিং-এর এই চরম সুবিধাবাদী ক্রিয়াকলাপের নিন্দা না করে উল্টো তিনি সেই চরণ সিং-এরই হাত পা ধরছেন। যাতে চরণ সিং আবার তাঁর পক্ষে ফিরে আসেন। যাতে চরণ সিং আবার ডিগবাজি খান!

প্রধানমন্ত্রীর এছাড়া কোনও উপায়ও নেই। কারণ তিনি সকলের চেয়ে ভাল করে জানেন যে, চরণ সিং-সি বি গুপ্ত জোট একবার উত্তর প্রদেশে সরকারী ক্ষমতা দখল করতে পারলে ওই রাজ্যের নব কংগ্রেসকে তো মৃতপ্রায় করে তুলবেই তাঁর নিজের সিংহাসন নিয়েও টানাটানি শুরু করবে। উত্তর প্রদেশের কিছু নব কংগ্রেসী এম পি-র আদি কংগ্রেসে ফিরে আসার আশংকা প্রবল হয়ে উঠবে, সি কে ডি এম পি-দের সমর্থনও প্রধানমন্ত্রী হারাবেন। শ্রীমতী গান্ধী আরও জানেন, উত্তর প্রদেশের ব্যবস্থাটা পাকা করে ফেলতে পারলেই সি বি গুপ্ত মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এবং হরিয়ানায় নবকংগ্রেসের তিন রাজ্য সরকারের পতন ঘটাবার জন্য উঠে পড়ে লাগবেন।

তাই, প্রধানমন্ত্রী যতটা নীচে নেমে সি বি গুপ্ত মন্ত্রিসভার পতন ঘটাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন এখন তার চেয়েও অনেক নীচে নেমে সি বি গুপ্ত-চরণ সিং জোট ভাঙাবার চেষ্টা করবেন। একবার নীচে নামা শুরু করলে সাধারণত যে নীচের দিকেই নেমে চলতে হয়—প্রধানমন্ত্রীর ক্রিয়াকলাপে এবার আরও পরিষ্কারভাবে তা ফুটে উঠবে।

❊

ব্যাংক জাতীয়করণের ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের রায় যে সমস্যাটা সৃষ্টি করেছে সেটা ভিন্ন ধরনের। প্রধানমন্ত্রী রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তাড়াহুড়া করে চোদ্দটা ব্যাংক সরকারী দখলে আনতে গিয়ে এখন এমন একটা সমস্যায় পড়েছেন যে, এগোতে গেলেও বিপদ, পিছু হটলেও সংকট।

সরকারী আইন পরামর্শদাতারা নাকি বলেছেন, সুপ্রীম কোর্টের রায় মানার জন্য ভারতের দেশী বিদেশী সব ব্যাংক জাতীয়করণের কোনও প্রয়োজন নেই। ওই

কেবলমাত্র ব্যাঙ্কে-ই রাষ্ট্রীয়করণ সীমাবদ্ধ রাখা যায়। প্রয়োজন শুধু আইনের কিছুটা সংশোধন এবং ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে আর একটু উদার নীতি অবলম্বন।

স্বাধীন আইনবিদরা কিন্তু মনে করেন, না, তা সম্ভব নয়। ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণ চাইলে সরকারকে এখন ভারতে কর্মরত দেশী বিদেশী সব ব্যাঙ্ককেই নিয়ে নিতে হবে এবং সুপ্রীম কোর্টের রায় অনুসারে ক্ষতিপূরণ দিতেই হবে। তা না করে সরকার যদি গোজামিল দিতে চান তাহলে আবার ঠকবেন। আদালতে আবার তা নাকচ হবে।

দেশী-বিদেশী সব ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের সাহস ও ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হবে কি? এত ক্ষতিপূরণ (তার একটা মোটা অংশ মেটাতে হবে বিদেশী মুদ্রায়) ভারত সরকার দিতে পারবেন কি?

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ প্রসঙ্গে সেই সম্পত্তির মৌলিক অধিকার হরণের প্রশ্নটা এবার আবার সজোরে উঠবেই। কমিউনিস্টরা এবং প্রধানমন্ত্রীর কংগ্রেসের একাংশ এজন্য সংবিধান সংশোধনের দাবি আরও দৃঢ়তার সঙ্গে তুলবেনই। আবার প্রধানমন্ত্রীর নিজ দলের একাংশ এর বিরোধিতা করবেনই। তাছাড়া পারলামেন্টে আকালি পারটি, মুসলিম লীগ প্রভৃতি যে সব দল (ও কিছু নির্দল এম পি) প্রধানমন্ত্রীকে সমর্থন করছেন তাঁরাও সম্পত্তির মৌলিক অধিকার হরণের প্রস্তাব মানতে পারবেন না। যাঁদের সমর্থনের উপর লোকসভায় প্রধানমন্ত্রীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা নির্ভরশীল এই প্রশ্নে তাঁরা দুভাগ হতে বাধ্য।

এই অবস্থাটাও প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে খুব বেশি অস্বস্তিকর হয়ে উঠবে। হয় তাঁকে রক্ষণশীলদের অভিযোগ শুনতে হবে, না হয় সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি রক্ষণশীলতার পরিচয় দিয়ে সংবিধান সংশোধনে অরাজি হলে হয়ত এখনই তাঁর দলে ভাঙন দেখা দেবে না। কিন্তু এগিয়ে যেতে চাইলে, সংবিধানের সম্পত্তির মৌলিক অধিকার হরণ করতে গেলে তাঁর দলে সংকট অনিবার্য। এবং এই সংকট মানে হয়ত তাঁর মন্ত্রিসভারই পতন।

প্রধানমন্ত্রী যখন ক্ষমতার লড়াইটা শুরু করেছিলেন, যখন ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের স্লোগানকে সেই লড়াইয়ে একটা হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন তখন হয়ত ভেবেছিলেন যে, ঘটনাপ্রবাহ তাঁর ইচ্ছামতই এগোবে।

কিন্তু তা এগোয় নি। কারণ একজনের ইচ্ছামত, সুবিধামত ইতিহাস কখনও এগোয় না।

১৩।২।৭০

নবারুণ গুপ্ত

বিজ্ঞপ্তি

দেশ পত্রিকায় যাঁরা রচনাদি পাঠান তাঁদের প্রতি নিবেদন, সমস্ত রচনার নকল রেখে লেখা পাঠাবেন। কবিতা বাদে অন্যান্য অমনোনীত রচনা আমরা ডাকে—বুক পোস্টে—ফেরত দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করে থাকি; তবু নানা গোলযোগে এবং ডাকেও লেখা খোয়া যাবার সম্ভাবনা থাকে। বলা বাহুল্য, ইচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের দপ্তরে পাঠানো লেখার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে আমরা অক্ষম।

—সম্পাদক

বালির বাঁধ

দেবরাজ

পীরিতি সব সময়েই বালির বাঁধ তা বড়রই হোক আর ছোটরই হোক! আর সে ভালবাসা যদি রাজনীতির হয় তা হলে তো কথাই নেই। সেখানে ক্ষণেকে যেমন চাঁদ তেমনি ক্ষণেকে হাতে দড়িও, কারুর কারুর ভগ্যে সে দড়ি ফাঁসির রশি হয়ে ওঠাও বিচিত্র নয়। ফিলিপাইন্‌সের প্রেসিডেণ্ট ফর্ডিনাণ্ড মার্কসের বরাত ভালো তাঁর বেলা শ্রাদ্ধটা বেশী দূর গড়ায়নি। তাঁর হাতেও দড়ি পড়েনি গলাতেও ফাঁসির রশি চেপে বসেনি। ফাঁড়া তাঁর এবার অল্পের ওপর কেটে গিয়েছে। কিন্তু যা ঘটছে ম্যানিলায় ৩০ জানুয়ারি তা তো সবে আদিপর্বের মুখ-বন্ধ। সে আঠারো পর্ব মহাভারত শেষ হলে কী যে হবে তা এখন থেকে আঁচ করা অসম্ভব। তবে এটুকু বোঝা যাচ্ছে প্রেসিডেণ্ট মার্কস যে চার বছর ধরে নির্বিঘ্ন আরামে গদিতে কাটিয়ে যাবেন তার সম্ভাবনা কম। তাঁকে বিস্তর শক্ত সমস্যার ফয়শালা করতে হবে, অনেক ঝামেলা হাঙ্গামার মোকাবিলা করতে হবে। হয়তো তাঁর গদি কেবল নয় ফিলিপাইন্‌সের শাসন ব্যবস্থা বজায় রাখাই দায় হয়ে উঠবে—যদি দেশের লোকের অসন্তোষ দূর তিনি করতে না পারেন।

পঞ্চাশ বছরের ওপর ফিলিপাইন্‌স্ ছিল আমেরিকার উপনিবেশ। দেশটা স্বাধীন হয়েছে ১৯৪৬ সনে। সেখানকার রাষ্ট্রপতির মেয়াদ চার বছরের। পর পর দুবারের বেশী কেউ রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন না এই হচ্ছে সংবিধানের নিয়ম। এতকাল একবারের বেশী দুবার রাষ্ট্রপতি হবার সৌভাগ্যও কারু হয়নি এক মার্কসের ছাড়া। গেল বছরের নির্বাচনে সাবেকি রেওয়াজ ভেঙে তিনি নতুন নজিরের সৃষ্টি করেছেন পর পর দুবার নির্বাচনে জিতে। তিনি যে একজন করিতকর্মা ব্যক্তি তাতে কোনও ভুল নেই। তাঁর যারা বিপক্ষে তারা বলে নির্বাচনে দুর্নীতি অল্পবিস্তর ফিলিপাইন্‌সে হয়েই থাকে, কিন্তু ১৯৬৯ সনের নভেম্বরে যা হয়েছে তা একেবারে পুকুর চুরি। সে অভিযোগ তাঁর দলের লোকেরা স্বীকার করে না। তারা বলে ভালবেসেই লোকে মার্কসকে ভোট দিয়েছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তাঁর অসাধারণ বীরত্বের কথা তারা ভুলে যায়নি। এক আধটা নয় ২৭টা পদক তিনি পেয়েছিলেন তাঁর সাহসের স্বীকৃতি হিসেবে। আর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে যিনি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তিনি তো ছিলেন জাপানীদের তাঁবেদার। কাজেই নির্বাচনে তিনি জিতবেন না তো কে জিতবে?

কথাটা সত্যি হলেও পুরোপুরি নয়। নির্বাচনে কারচুপি না করলেও জিততেন মার্কসই, তবে যত বেশী ভোট তিনি পেয়েছিলেন অত বেশী ভোট তিনি পেতেন না। তাঁর বিরাট জয় হয়েছিল নির্বাচনে তিনি জলের মত টাকা খরচ করেছিলেন বলে আর সে টাকা সব তাঁর গাঁটের কড়ি নয়। তার বেশীর ভাগই এসেছিল সরকারী তহবিল থেকে। তার ওপর ভোটারদের হাত করার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি তিনি করেননি। বাছা বাছা লোককে টাকা তো দিয়েছিলেনই যাতে লোককে খুশী করতে পারেন তার জন্যে দরাজ হাতে টাকা ঢেলেছেন সেই সব কাজের জন্যে যাতে তাঁর নামযশ বাড়ে। সব টাকাটাই যে তিনি জলে ফেলেছেন এমন দোষও দেওয়া যায় না। তাঁর প্রথম আমলের চার বছরে তিনি ৮০০০ মাইল রাস্তা বানিয়েছেন, ৪৩,০০০ স্কুল বাড়ি তৈরি করিয়েছেন, তিন লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করেছেন। এ সব যে সব কাজ তার দ্বারা দেশের উপকার যে যথেষ্ট হয়েছে সে কথা তাঁর অতি বড় শত্রুও অস্বীকার করতে পারে না। তবে তাদের অভিযোগ তিনি দেশসেবী তো বটেই, যা কিছু করেছেন না ভোট কুড়বার জন্যে।

প্রেসিডেণ্ট মার্কস পথঘাট ইস্কুল কলেজ কী সেচের খাল বানালে কী হয় দেশের আর্থিক বনিয়াদটা পাকা করার দিকে তেমন দৃষ্টি দেননি। টাকার টান পড়লে অভাব মেটাবার সোজা উপায় বেছে নিয়েছেন নতুন নোট ছাপিয়ে। তাতে ইচ্ছেমত চারদিকে টাকা ছড়াতে তিনি অবশ্য পেরেছেন প্রেসিডেণ্টের গদিতে বসে কিন্তু জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গিয়েছে তার ফলে। দরকারী জিনিস সবই অগ্নিমূল্য ফিলিপাইন্‌সে অগ্নিমূল্য। অথচ সেখানকার লোকেদের মাথা পিছু আয় খুবই কম। প্রাণ রাখতে লোকের তাই প্রাণান্ত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যারা সরকারের পেয়ারের লোক তাদের দিব্যি হচ্ছে বাড়বাড়ন্ত। তারা দিব্যি খাচ্ছে দাচ্ছে ফূর্তি করছে, তাদের ঐশ্বর্য দেখলে কোটিপতি আমেরিকানদেরও চোখ ঝলসে যায়। ম্যানিলাতে বড়লোকদের পাড়া ফর্বেস্ পার্কের জাঁকজমক নিউ ইয়র্কের অভিজাত পল্লীকেও ছাড়িয়ে যায়। আন্তর্জাতিক লেনদেনে দেশের বিরাট ঘাটতি। তার ফলে বাজেটে তাল রাখা সরকারের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠছে। হালে পানি না পেয়ে মার্কস সরকার করের বোঝা চতুর্গুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন।

লোকের দুর্দশা তাতে বেড়েছে বই কমেনি। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে মার্কস ভাবছিলেন কেমন করে তাঁর ক্ষমতা তাঁর চার বছরের মেয়াদ ফুরুলেও বজায় রাখা যায়। তা করতে গেলে সংবিধান সংশোধন করা দরকার। এর জন্যেই তিনি নাকি গোপনে তৈরি হচ্ছিলেন। কথাটা কেমন করে জানি ফাঁস হয়ে যায় আর তাতেই রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে ছাত্রের দল ৩০ জানুয়ারি চড়াও হয় তাঁর প্রাসাদের ওপর। রীতিমত খণ্ডযুদ্ধ বেধে যায় তাদের সঙ্গে সরকারী পুলিশের। অন্ততঃ চারজন ছাত্র সে লড়াইয়ে প্রাণ হারিয়েছে। ছাত্রেরাও কিছু কম যায়নি। তারা একটা রীতিমত তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছিল। প্রেসিডেণ্টের প্রাসাদ তারা কেবেবল অবরোধ করেছিল বললেই হয়। তাদের ঠাণ্ডা করার জন্যে শেষ পর্যন্ত ফৌজদের ডাকতে হয়েছিল। গোলা-বারুদ ছোঁড়া ও ম্যানিলার পথে পথে টহল দিয়েছে মিলিটারি, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি হয়ে ছিল পুলিশের দল ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে। গোলমেলে অশান্তি অনেকবার দেখা দিয়েছে ম্যানিলাতে কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পর এমনতর ঘটনা কখনও সেখানে ঘটেনি।

মার্কস বলছেন এ কাণ্ডটি ঘটিয়েছে নয়াচীনের চরেরা যারা চায় ফিলিপাইন্‌সে মাওপন্থীদের অভ্যুত্থান ঘটাতে। অল্প কয়েকজন ছাত্রকে হাত করে তারা ওরা করতে চেয়েছিল ৩০ জানুয়ারি, সে চেষ্টা তাদের তিনি ব্যর্থ করে দিয়েছেন এই তাঁর দাবি। তাঁর এ অভিযোগ কতটা সত্যি তা জানার কোনও উপায় নেই, কেন না কোনও প্রমাণ তিনি দাখিল করেননি। তবে এ কথা ঠিক যদি দেশের লোকের দুঃখ লাঘব তিনি করতে না পারেন তাহলে কম্যুনিস্টরা অচিরে হবে দেশে মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। মার্কস চতুর লোক। ছাত্রদের দাবি তিনি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেননি। তাদের সঙ্গে একটা আপোস করেছেন। ছাত্রদের জন্যে একটা সরকারী তহবিল খুলেছেন যাতে তাদের নানা দাবি দাওয়া মেটানো যায়। কেউ কেউ অবশ্য বলছেন এটা ঘুষ। তবে ছাত্ররা এ নিয়ে খুব অখুশী হয়নি। তার ওপর তাদের তিনি কথা দিয়েছেন আবার রাষ্ট্রপতি হবার চেষ্টা তিনি করবেন না, সংবিধান সংশোধনের জন্যে যে কমিটী হবে তাতেও তাঁর দলের কোনও লোককে পাঠাবেন না। শান্তি আপাততঃ ম্যানিলাতে ফিরে এসেছে। কিন্তু তা কতদিন থাকবে কে জানে।

'পুরুলিয়ার স্যার আশুতোষ

পুরুলিয়ার কোনো এক স্কুল-শিক্ষক স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মাইনে পাচ্ছেন না। যে নাইটহুড তিনি কদাপি পান নি—যার জন্যে তাঁর কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কেও ছিল বলে মনে হয় না, অকস্মাৎ

'আশুতোষের নিকট সুরেন্দ্রনাথের পরাজয়'
(সংবাদপত্রে খেলার পাতার হেড লাইন)

সেই মর্যাদা-প্রাপ্তিই তাঁর দুর্বিপাকের হেতু বলে জানাচ্ছে সংবাদ।

একটি পত্রিকা এ নিয়ে টিপ্পনী লিখতে গিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, যদি বঙ্গীয় ব্যাঘ্র স্যার আশুতোষের কালে এবংবিধ ব্যাপার ঘটত, তা হলে কী হত? কী যে হত! পরশুরামের 'কচি-সংসদে' এ সম্পর্কে প্রামাণ্য অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল 'পেলব'-প্রার্থী ন্যাপলারাম রায়—স্যার আশুতোষ এক ভল্যুম এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা নিয়ে তাকে তাড়া করেছিলেন। এখনকার সুলভ-সংস্করণ এনসাইক্লোপিডিয়া নয়—সে-কালের মোটা কাগজে, মোটা বোর্ডে বাঁধাই রাজ-সংস্করণ—এক-একখানাকে পাঁজাকোলা করে তুলতে হয় (সনন্দর সংগ্রহে তার একটি সেট আছে—বাহুবলের অভাবে ঘাঁটানো হয় না), তারই একটির আঘাতে আদি-অকৃত্রিম স্যার আশুতোষ শিক্ষা-বিভাগকে বিধ্বস্ত করতেন।

আপনাদের সকলের মতোই আমিও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, ডিকটেটরশিপের প্রতি কিছুমাত্র আসক্তি নেই আমার। কিন্তু কখনো কখনো বাজারের থলে, অফিসের ব্যাগ এবং জীবনযাত্রার ভারবাহী আমার মতো গড্ডলেরও কেমন যেন জিঘাংসা চেপে যায়। মনে হয়, ঘটে যাক একটা এসপার-ওসপার—গদা হাতে নেমে পড়ুন যে-কেউ, হবসের লিভায়াথান, নীট্শের স্যুপারম্যান, ভারতীয় বিখ্যাত 'কল্কি-অবতার'—যে খুশি। জাঁকিয়ে বসবার দরকার নেই, দিন-কয়েক সব ম্যানেজ করে দিয়ে আবার স্বস্থানে প্রস্থান করুন।

নাঃ, এ-সব কুচিন্তাকে প্রশ্রয় দেওয়াটা ঠিক হচ্ছে না। কোনো হিংস্র ব্যাপারে উৎসাহিত না হওয়াই ভালো। যতদূর বুঝতে পারছি বাংলা মতে ইংরিজিতে যে 'শ্রী' (SRI) লেখবার রেওয়াজ আছে, তারই 'R' এবং 'I' জায়গা বদল করে SHREE অথবা 'SRI' আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের এই বিপর্যয় ঘটিয়েছে।

যাঁরা তাঁর বেতন বন্ধ করে দিয়েছেন, তাঁদের অবস্থা বুঝতে পারছি। তাঁরা খুব বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন মনে হয়। তাঁদের হয়তো সংশয় জেগেছে: বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ কি এখনো জীবিত আছেন? কে জানে—জোর করে কিছুই বলা যায় না। হয়তো দুঁদে অ্যাডভোকেট, হাইকোর্টের চীফ জাস্টিস, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলোসাস ভাইস-চ্যান্সেলর — কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্যের স্বাদ পাওয়ার জন্যে এখন পুরুলিয়ায় শিক্ষকতা করছেন। সেই প্রচণ্ড পুরুষকে কি এই যৎসামান্য বেতন দেওয়া চলে, দেওয়া উচিত? স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের যোগ্য বেতন কী হতে পারে এই জটিল সমস্যাই এখনো সমাধান করতে পারেন নি তাঁরা।

আপনাকে শরৎ চাটুজ্জে হয়ে যেতে হবে সভায়। চেহারায় মিল আছে যথেষ্ট

বাস্তবিক, মহৎ ব্যক্তিদের নামধারণের অসুবিধে অনেক। এই নামসাম্যের ফলে জনৈক দীনহীন বাঙালী অধ্যাপককে জিজ্ঞাসু বালকদের বার-বার বোঝাতে হয়েছে যে, না—তিনি 'স্বর্ণলতা' নামে উৎকৃষ্ট উপন্যাসটি রচনা করেননি, তাঁকে অনেক পরে পৃথিবীতে আসতে হয়েছে। কোনো প্রাবন্ধিক-অধ্যাপককে ঘোষণা করতে হয়েছে যে তিনি এবং তাঁর নামীয় বিশ্রুত দার্শনিকটি সম্পূর্ণ আলাদা ব্যক্তি। একদা রোমাঞ্চিত চিত্তে কোনো দুর্ধর্ষ কথা-শিল্পীকে প্রশ্ন করলুম: 'আপনি বুঝি ম্যারেজ-রেজিস্ট্রার? শ্যামবাজার সাইডে আপনার নেম-প্লেট দেখলুম।' তিনি দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, 'তুমি তো আচ্ছা বেকুব!

আমি শ্যামবাজারে থাকি নাকি? তাছাড়া, ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারই বা হতে যাব কোন্ দুঃখে?'

তখনো নিঃসন্দেহ না হতে পেরে আমি বললুম, 'ম্যারেজ তো আপনি দিচ্ছেনই—সর্বদাই দিচ্ছেন। আপনার গল্পে উপন্যাসে নায়ক-নায়িকার হরদম তো বিয়ে হচ্ছে। না হয় কয়েকটা রেজিস্টার্ড ম্যারেজ দিলেনই।'

ধমকে বললেন, 'যাও-যাও, বেশি চালাকি কোরো না।'

লেখকমাত্রেই ম্যারেজ - রেজিস্ট্রার—ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, প্যাঁচ কষিয়ে, মিলনান্তক গল্পে বিয়ে তাঁরা দেবেনই। কিন্তু এ তথ্য আমাকে হৃদয়ঙ্গম করতে হল যে, শ্যামবাজারের নেম-প্লেটের সঙ্গে এঁর অন্তত কোনো সম্পর্ক নেই।

ছেলেবেলায় অসীম মূঢ়তার সঙ্গে আমি ভাবতুম, ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কী দারুণ ভার্সাটাইল! উপন্যাস লেখেন, আবার মঞ্চে, চলচ্চিত্রে অভিনয়ও করেন! কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি আমার লম্বা কানের সঙ্গে প্রাণিবিশেষের উক্ত শ্রুতিযন্ত্রের তুলনা করে বোঝালেন যে, আমি ভ্রান্ত। তুলনায় দুঃখিত হইনি, কিন্তু আমার বীর-পুজোয় একটু ঘাটতি পড়ল—তাতেই আমি সবিশেষ ব্যথিত হয়েছিলুম। মাঝারি মার্কিন ঔপন্যাসিক উইনস্টন চার্চিলকে ঘোরতর জন বুল উইনস্টন চার্চিলের সঙ্গেও প্রায় গুলিয়ে ফেলতে যাচ্ছিলুম এক সময়—দুজনেই তো প্রায় এক বয়সী।

অবশ্য যাঁরা বুদ্ধিমান, তাঁরা এ থেকেও কিছু মুনাফা কুড়িয়ে নিতে পারেন। আমার একজন বাংলার অধ্যাপককে মনে পড়ল।

খুব দশাসই চেহারা—প্রবল কণ্ঠস্বর, দেখলেই সন্দেহ হয়, ইনি কেষ্ট-বিষ্টু না হয়ে যান না। ছাত্রদের ভয়ে-ভক্তিতে সমারূঢ় হয়ে তিনি দূর গ্রামাঞ্চলে সাহিত্য-সভা করতে গেলেন। নামসাম্যে কজন প্রবীণ জানতে চাইলেন, তিনিই সেই আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান অর্থনীতিক কিনা। উত্তরে তিনি স্মিত হাস্যে জানালেন : 'আমি অত্যন্ত সামান্য ব্যক্তি—আমাকে লজ্জা দেবেন না।' তাঁরা বুঝলেন, ইনি বিনয়ের অবতার। পুজো তো চলছিলই, মহাপুজো আরম্ভ হল অতঃপর। সব অর্ঘ্য গ্রহণ করে ভদ্রলোক [illegible]চিত্তে ফিরে এলেন।

ইংরিজি কাগজে একটি খবরে চোখ পড়তে একবার চমকে উঠেছিলুম। 'গড পটেটো'—ঈশ্বর আলুর খোসা ছাড়াচ্ছেন একটি [illegible]! সে লোকটির তো আরো সব [illegible] কাজ আছে জানতুম, [illegible] জন্যে আলু ছাড়াতে গেলেন কেন! [illegible] মাংসও কাটছেন! পরে দেখা গেল, একটি নিতান্তই [illegible] তাঁর পদবী, [illegible] [illegible] এসেছে [illegible] ছাড়াতে তিনিই অদ্বিতীয়।

[illegible] পরমাণিক ঈশ্বরেরা। [illegible] কাটতে [illegible] নির্দিষ্ট দিনে [illegible] খিড়কি দিয়ে [illegible] চেষ্টা করতুম [illegible] করে টের পেতে [illegible] পালাই, ঠিক ধরে ফেলবে। [illegible] ঈশ্বরের মতো সর্বজ্ঞ এবং সর্বব্যাপী।

[illegible] গত ঐক্য কিঞ্চিৎ উপলব্ধির হওয়া উচিত। এনসাইক্লোপিডিয়া না থাক, স্কুলের লাইব্রেরিতে কি ওয়েবস্টারও নেই? তবেই একটা ব্যাপার—

নাঃ, আবার সেই হিংস্র প্ররোচনা! তা হলে এই পর্যন্তই থাক।

অনুসন্ধান

যোগব্রত চক্রবর্তী

মধ্যরাত্রে হেঁকে যায় ঘুমে স্বপ্নে নীল টেলিগ্রাম—
সুভাষ সরকার কার নাম।

অকস্মাৎ রক্তে বাজে অপরূপ দুরন্ত সিম্ফনি
অলৌকিক অন্ধকারে ডুবে যায় প্রমত্ত তরণী

অদৃশ্য পিয়ন হাঁকে দিক্‌বিদিকে:
সুভাষ সরকার,
জীবিত অথবা মৃত: আপনাকে ভীষণ দরকার—
চারিদিকে জমে ওঠে অসংখ্য ঠিকানা
এ পাড়ায় কে কে ছিল
—সুভাষ সরকার কার চেনা?

হয়তো অরণ্য ঘুরে পিয়নকে একা যেতে হবে
সুভাষ সরকার ছিল
এই রাতে কে কে সঙ্গে যাবে।

এখন প্রত্যেক ব্যক্তি

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

কার্পেট বিছোনো দিন পেতে দিয়ে
লাল শালুর 'স্বাগতম' আম্রপল্লবের ফাঁকে লিখে
মানপত্রে অভিষেক হবে বলে জানতাম……
দুই পাশে কাতারে কাতারে মস্ত বর্ষীয়ান
এখনই অর্কেস্ট্রা শুরু, গার্ড অব অনার…
যে-কোন ব্যক্তিই সম্মানিত হলে পরে
পাপাচরণ করতে পারে না কো
এখন প্রত্যেকটি লোক বৃক্ষের নৈঃসঙ্গ্য বুঝে নিয়ে
একা একা দাঁড়াবে, এখন তেলেজলে পা ধোয়াবে
সাঁওতাল রমণী
ভালবাসা এলে পরে সকলকেই নিজের নিজের মন
দেওয়া যায়
কেটে কেটে দেওয়া যায় তরমুজের লাল লাল ফালি,
কার্পেটের ওপর দিয়ে বয়ে যায় গাঢ় লাল মদ
চারপাশের সুগন্ধ এখন।

যা ছিল

সাঁজুতা দাশ

শব্দের মসনদে বসিয়ে রাখো অনুভূতি
আমরা এখনও অনেক দূরে আছি
সেরকম কোনো সক্ষমতার—

নয়তো বিনম্রভাবে অঙ্গীকার
করা যায়—
যেমন সমুদ্র আছে কি কোথাও
আর তারই থেকে সহস্র যোজন দূরে
এখনও;

আমাদের প্রত্যেকের চেতনার মধ্যে আর
সমুদ্র উত্তাল হয়ে বয় না কখনও—
সিংহাসন ক্রমশই সরে যায়।

প্রত্যেকের জন্যে যে একেকটা সিংহাসন ছিল।

ক্রমশ অন্যান্য দিকে

তুষার রায়

এক দিন থেকে ফের ক্রমশ অন্য দিনে
অন্য দিন থেকে ফের এভাবেই
দূরে যাওয়া, ফের ফিরে আসা
এভাবেই সব ভালোবাসা তুমি
নিয়েছো ফিরিয়ে
দিয়েছো যা সে সবাই তো নেওয়ারই জন্য
এই কথা ভেবে, দেখি উত্তরের থেকে
ফিরে যায় সব হাঁস সুদূর দক্ষিণে
এই দেখে আমারো ফেরার কথা
মনে পড়ে ফিরিয়ে নেওয়ার
আমি তো আমারি থাকব এই মনে হলে
দিতে দিতে নেওয়ার সমস্ত কথা ভুলে
অন্যান্য দৃশ্যের কথা ভাবি।

দেশীয়
সিগারেট শিল্প
পঙ্গু কেন?
স্বাধীন পৃথিবীতে তামাক
উৎপাদনকারী ও রপ্তানীকারী
বৃহৎ দেশগুলির মধ্যে ভারতের
স্থান দ্বিতীয়। ভারতে জনবল প্রচুর,
মূলধনেরও অভাব নেই। প্রয়োগকৌশলের
জ্ঞানেও ভারত যথেষ্ট অগ্রসর। তবুও স্বাধীন
ভারতের উন্নতিশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় দেশীয়
সিগারেট শিল্প তার যথাযোগ্য প্রসার ও স্থান লাভ
করতে পারে নি। এর কারণ অনুসন্ধান করা কিছু
কঠিন নয়। বহুকাল থেকে এক বিদেশী একচেটিয়া
প্রতিষ্ঠান দৃঢ় শেকড় গেড়ে রয়েছেন এবং আজও দেশীয়
শিল্পের স্বাভাবিক উন্নতিতে বাধা সৃষ্টি করে চলেছেন। এক-
চেটিয়া ব্যবসায়ের নানা পন্থা ও প্রক্রিয়া দেশীয় সিগারেট
গুলির সুষ্ঠু বন্টন ও বিচারমূলক মূল্য নির্দ্ধারণ অসম্ভব করে
তুলেছে। আর তাছাড়া, একচেটিয়া ব্যবসায়ী প্রায়ই যে
ধরণের প্রচারকার্য্য চালিয়ে থাকেন তাতে জনপ্রিয়
সিগারেটগুলিকে যেন মেরে ফেলবারই চেষ্টা বলে
মনে হয়। বাস্তবিক এইসব নির্মম কর্মপদ্ধতির
লক্ষ্যই হ'ল দেশীয় সিগারেট
শিল্পের উচ্ছেদ।
Panama
20
CIGARETTES
গোল্ডেন টোব্যাকো কোং প্রাইভেট লিঃ, বোম্বাই-৫৬
ভারতের এই ধরণের বৃহত্তম জাতীয় উদ্যম

GT 63BEN

বিকল্প

শিশির লাহিড়ী

হাত মুছতে মুছতে বিনোদ ঘরে ঢুকল। এই নিয়ে কবার হল দাদা?

ঘাড় ঘুরিয়ে ইতির কথার উত্তর দিতে গিয়ে বিনোদ শিখাকে দেখল। দেখে অপ্রস্তুত হল।

শিখা একবার বিনোদের মুখে চাইল, একবার ইতির দিকে। তারপরই ব্যাপারটা বুঝে হেসে উঠল শিখা—

ইতি হাসছিল। রোজ রোজ নেমন্তন্ন খাওয়া যেমন।

বিনোদ শিখার মাথায় হালকা একটা চাঁটি মারল। গলা মারিসনে ইতি।—রোজ রোজ খাচ্ছি?

ইতি কলকল করে উঠল। রোজ রোজ নয়! মিথ্যুক!—এই তো কালই খেয়ে এসেছ বাবা বিয়েবাড়িতে।

কালই তো খেলুম। আগের দিনের খাওয়াকে খাওয়া বলে নাকি? সে তো কাঁধকাঠের শুধু কাঠ চিবোনো।

মুখের গোড়ায় আঁচল এনে শিখা খুক-খুক করে কাশল। তা বলে একটু দেখে-শুনে খাবি না বিনু?

থুতনির গোড়াটা আঙুলে চুলকোতে চুলকোতে বিনোদ বলে উঠল, আরে দেখে-শুনেই খাই। তবে বুঝলে কিনা দশ-বারোদিন পরে মাছ খেলুম তো, তাই একটু বেশি খেয়ে ফেললুম।

ইতি উঠে দাঁড়াল। তুমি একটু বোস শিখাদি, আমি চা করে আনি।

ইতি চলে যেতে বিনোদ চৌকিতে এসে বসল। শিখা মুখের আঁচল কাঁধে বিছিয়ে দিল। আজ অনেকদিন পরে দেখছে বিনোদকে। কেমন যেন রোগা হয়ে গিয়েছে ছেলেটা, কণ্ঠার হাড় বেরিয়েছে, চোখের কোলে কালি, গালে ব্রণগুলো শক্ত হয়ে উঠেছে। পাঁজরার হাড় গেঞ্জির ওপর ফুটে উঠছে।

শিখা ভাল করে বিনোদকে দেখতে দেখতে অবাক গলায় বলে উঠল।—আরে এ কি চেহারা হয়েছে তোর? কি বিচ্ছিরি!

বিনোদ হলদে সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরাল। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, তা চেহারার আর দোষ কি বল?—খেতে পাই?

শিখা ঘাড় নাড়ল। একবার আলতো আঙুলে বিনোদের বুকে পিঠে হাত বুলিয়ে নিল। শুধু খাওয়া নয়, তোর অন্য কিছু হয়েছে বিনু। ডাক্তার দেখা।

কি আবার হবে? বিনোদ হাসল।

কিছু একটা হয়েছে। তুই চেপে যাচ্ছিস।

বিনোদ উঠে দাঁড়াল। জানালার চৌকাটে জ্বলন্ত সিগারেট রেখে পেরেকে ঝোলানো ময়লা জামাটা পেড়ে নিল। মাথা গলিয়ে জামাটা পরতে পরতে বিনোদ বলল, দূর! তুমি যে কি ছাই বল না—তোমার কাছে চেপে গিয়ে কি হবে?

শিখা চোখ বড় বড় করে তাকাল। সত্যি বলছিস। ডাক্তার দেখিয়েছিস?

ডাক্তার তোমার আমড়া করবে।

তবে কে করবে? আমি?

বিনোদ মুখ টিপে হাসল। তুমি করলেও করতে পার।

শিখা চোখ তুলে ধমক দিল। এত বয়স হল তবু তোর ছেলেমানুষি গেল না বিনু। সব তাতেই ইয়ার্কি। রোগ হলে ডাক্তার দেখাবি না?

বিনোদ হাসল। তবে লেডি ডাক্তার দেখাতে হয়।

চোখের কোণটা কুঁচকে গেল শিখার, সারা মুখে জিজ্ঞাসা ফুটল।—লেডি ডাক্তার কেন?

বিনোদ দোরের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলে উঠল।—এ বাবা শিবের অসাধ্য, ও লেডিফেডি ছাড়া কেউ সারাতে পারবে না।

চাপা গলায় হাসতে গিয়ে শিখা বিষম খেল। বাঁদর! মুখের আকডাক নেই কিছু।

তোমার কাছে আবার আকডাক কি। তোমার কাছে আমার সবই খোলা।

ইতি চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, কি খোলা রে দাদা?

কি আবার? এই কলমটা। পকেট থেকে আচমকা কলমটা তুলে নিয়ে হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেলল বিনোদ। কি মালই দিয়েছিল বাবা। তা টানা মাল আর কত ভাল হবে?

শিখা চোখ বড়বড় করল। টানা মাল?

টানা নয়! চুল বুলিয়ে টেনে আনা।

শিখা হেসে উঠল। ইতিও হাসল। ও খোলা চুলে বাঁধিয়ে আনার কথা বলছ তো। দিদিও সেদিন অমনি একটা কলম পেয়েছে।

বিনোদ বলল, কোথায় সেটা?

দিদির কাছে।

দিয়ে দিতে বলবি। ও চুরির জিনিস কাছে রাখতে নেই।

চা-টা শেষ করে বিনোদ বলল, তুমি বোস শিখাদি, আমি একটু আসি।

কোথায় যাবি এখন।

দাদার আবার রাত-পাহারা নয়।

রাত-পাহারা কি? বল রাত ডিউটি।

না গো। ইতি চেঁচিয়ে বলল, ওই যে দাদাদের স্ট্রাইক না ছাটাই কি হয়েছে যে, সেইজন্যে সব পালা করে করে দিনেরাতে কারখানা পাহারা দেয় যে।

সে কিরে! শিখা বলে উঠল, এত বড় একটা খবর আমাকে চেপে গিয়েছিস।

বিনোদ হাসছিল। তোমাকে বলে কি করবো বল। তুমি কি লেবার কমিশনার?

শিখা রেগে ঘাড় ঘুরিয়ে নিল। তুই তোর কমিশনার নিয়েই থাকগে যা। আর কোনদিন কোন কথা আমাকে বলতে আসিস।

মুখে আঙুল পুরে সিটি মারার শব্দ করলো বিনোদ। অ্যাই বাপ! হেভি চুপকি। তোমাকে বলব না তো কাকে বলব শুনি!

যারা তোর নিজের লোক তাদের বলিস।

বিনোদ হাসিমুখে কাছে সরে এল। লোক দেখানি রাগ দেখিয়ে বলল, দেখ আমাকে রাগিও না বলছি। তাহলে কিন্তু জরাসন্ধ বধ করে ফেলব।

হালকা হাতে একটা আলতো চড় মারল শিখা। দূর হ! বেরো। দেখতে তো ঐ খড়কে কাঠির মত, আবার বলে বধ করব।

বিনোদ চলে যেতেও ঘরে অনেকক্ষণ হাসির আওয়াজটা গমগম করল। বিছানার কুঁচকে যাওয়া ময়লা চাদরটা টেনে টেনে ঠিক করছিল ইতি। শিখা দাঁড়িয়ে দেখছিল। কি রকম যেন বদলে যাচ্ছে বিনোদটা। এত বড় একটা জরুরী খবর। এ খবরটা দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি বিনোদ। কোথাও কিছু একটা অনির্দেশ্য ঘটে যাচ্ছে অথচ সেটুকু ধরতে পারছে না শিখা। কি সেটা? কি? আজ দু'তিন মাসের ওপর দেখা করেনি বিনোদ। অথচ আগে হলে? আগে হলে অন্তত দিনের মধ্যে পাঁচবার যেত বিনোদ। কি করি বল তো? কি করি? জিজ্ঞাসা করত। মন ভাল থাকলে বকবক করত খানিক, হাসত। মন বেশি খারাপ হলে চুপ করে শুয়ে থাকত। শিখার কোলে মাথা, শিখা চুলে বিলি কাটতে কাটতে বলত, এই বিনু যা, রাত হল। বাড়ি যা।

দূর? বাড়িফাড়ি আর ভাল লাগে না শিখাদি। গেলেই তো সেই চারটে মুখ দেখতে হবে। হাঁ করে তাকিয়ে আছে, খাব খাব। কোথায় কি পাই, কি করি বলত?

স্ট্রাইক তো আর বেশিদিন থাকবে না। ভেঙ্গে যাবে। তখন তো সুদশুদ্ধ সব আদায় হয়ে যাবে। ভাবনা কিসের!

আরে যখন যাবে তখন যাবে, এখন কি করি? এখন তো আমার পাগড়ির প্যাঁচ ঢিলে হয়ে যাচ্ছে।

শিখা হাত বুলোতে বুলোতে হাসির গলায় বলত, দূরে বোকা ছেলে, আমি তো রয়েছি।

তোমার কাছে শেষে হাত পাততে হবে?

আমার কাছে তোর লজ্জা কি! তুই আমার করিসনি?

শিখা যেন দিবাস্বপ্ন দেখছিল। আচমকা ইতির কথায় ঘোর কেটে গেল শিখার। বুঝলে শিখাদি, দাদা কিন্তু একটু অন্য-রকমের হয়ে যাচ্ছে।

কেন রে! শিখা বলল, আমি তো বেশ হাসিখুশী দেখলাম।

কি জানি কেন। হয়তো তোমাকে দেখে একটু অন্যরকমের ব্যবহার করলে। নইলে আজকাল যা রেগে যায় সবতাতেই।

রেগে যায়!

যায় না। এই দেখনা সেদিন আজেবাজে একটা ঝুটঝামেলা নিয়ে দিদিকে যা ইচ্ছে তাই বলল। দিদি তো দু'দিন উপোস করে রইল।

বিনু!

হ্যাঁ গো! বিনু! কোন কাজই পছন্দ হয় না জানো। সব তাতেই খুঁতখুঁতে। পান থেকে চুন খসলেই ষোলআনা রাগ। আমাকেও তো যখন-তখন বলে, খেয়ে ঘুমিয়ে খোদার খাসি হচ্ছিস খালি, কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা। আচ্ছা তুমিই বলো, কাজ করি না আমি। না অন্য লোকে এসে করে দিয়ে যাচ্ছে।

শিখা কিছু বলল না, চুপ করে থাকল। খানিক পরে বলল, বাইরে থেকে তো কিছু বোঝবার উপায় নেই, কি বলি বল।

আরে তুমি বুঝবে কি? মাও বসে বুঝতে পারে না। এক এক সময় কাঁদে খালি।

মাকে কিছু বলে নাকি?

না। ইতি ঘাড় নাড়ল। মাকে আবার কি বলবে, তবে ঠেস দিয়ে বলতে ছাড়ে না। একদিন বুঝি বিয়ের কথা বলেছিল মা। তা দাদা কি বলল জানো? বলল, শোনো, বাবা যে দুটি স্যাম্পেল রেখে গেছে সে দুটি পার করি তবে তো বিয়ে। তারপর হাসল খানিক। হেসে বলল, বুঝলে মা, তুমি ভেব না, চিতার কাঠে শুয়ে শুয়ে আমার বিয়ে হবে।

সব কথা যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না শিখার, অথচ বিশ্বাস না করেও উপায় নেই। আজেবাজে কথা ইতি বলবে না। প্রীতি হলেও কথা ছিল। প্রীতির অনেক দোষ, এলোমেলো কথা বলে, তাছাড়া একটু বাইরে বাইরে টান আছে প্রীতির। নিজেকে সমঝে রাখতে পারে না, ফুটফাট ফষ্টিনষ্টি করে। তা আর কি করবে প্রীতি। বছর পঁচিশ বরস হল। আর দু'দিন পরে বয়সের সব ঝরে গিয়ে শিখার মত হয়ে আসবে, চামড়া কুঁচকে যাবে। প্রীতির কথা ভাবতে গিয়ে শিখা একবার নিজের কথা ভাবল, নিজের কথা থেকে বিনোদের কথায় এসে পড়ল।

ঘরের দোর টেনে দিয়ে শিকল তুলে দিতে দিতে ইতি বলল, কি রকম রোগা হয়ে গিয়েছে দেখেছ?

হ্যাঁ। তাই তো বলছিলুম বিনুকে। বলছিলুম ডাক্তার-ফাক্তার দেখা।

ডাক্তার দেখাবে! ইতি নাক কোঁচকালো। ঐ যে গো, কে এক বিমলবাবু, হম্‌ফ-হোমোপ্যাথ ডাক্তার আছে তাকেই দেখায়। সে নাকি কি সব বলেছে। এদিকে তো পেটের রোগে ভুগছে দু'তিন মাস। ভাল করে খেতে পারে না। আবার যখন খায়, লোভে খায়। রাত্তিরে ঘুমোয় না অর্দ্ধেক দিন। তার ওপর আজকাল আবার হিং খাওয়ার শখ হয়েছে।

হিং!

হিং খেলে নাকি শরীর ঠাণ্ডা থাকে।

শিখা হেসে ফেলল। হেসে বলল, পিণ্ডি হয়।

তাই না তাই! গন্ধে টেঁকা যায় না।

রান্নাঘর থেকে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে প্রীতি মুখ বাড়াল। এই শিখাদি এদিকেও মানুষজন আছে।

শিখা এগিয়ে এল। একটা পিঁড়ি টেনে নাও—প্রীতি বলল।

পিঁড়ি নিয়ে বসে শিখা বলল, তারপর তোর সেলাই-ফোঁড়াই কি রকম চলছে বল।

সেসব চুলোদোরে গিয়েছে। অরুণাদের বাড়ি যাওয়া বারণ হয়ে গিয়েছে না।

কেন, কি বৃত্তান্ত সে সব আর জিজ্ঞাসা করল না শিখা। —তোর হাতের কাজ কিন্তু ভাল ছিল।

হাতের কাজ ভাল সে সব কে আর দেখছে, সবাই কেবল মন্দটাই খুঁজে বেড়াচ্ছে, বুঝলে।

শিখা সহানুভূতির সুর টানল। দূর! আজেবাজে কথায় মন খারাপ করে।

আজেবাজে না শিখাদি। মন্দ বললেই বেশি বাজে। আমাদের যা বয়েস বুঝলে, তাতে সময়ে বিয়ে হলে দু'তিন ছেলের মা হয়ে গিন্নীবান্নী হয়ে যেতুম। এখন দেখছি না ঘরকা না ঘাটকা কুত্তা হয়েই রইলুম।

প্রীতির মনে গভীর করে ব্যথা বেজেছে। শিখা প্রীতির হাত ধরে টানল। কাছে বসিয়ে গায়ে গা লাগিয়ে বলল, আমাদের কি সব সময় দুঃখ করতে আছে। তা একটা কিছু করলেই তো পারিস।

কি আর করব বল। কিছু কি শিখেছি। দু'চার ক্লাস যা পড়েছি তা কবে গলে খেয়েছি। ইতিটা যা হোক এখান থেকে ওখান থেকে জোগাড়যন্তর করে শিখছে, তা ফি-এর টাকা জোগাড় হলে হয়।

সে হয়ে যাবে 'খন। তার জন্যে ভাবিস কেন?

হলেই ভাল। কিন্তু আমায় কিছু একটা

জোগাড়যন্ত্র করে দাও দিকিনি, করি। দু-বেলা হাঁড়ি ঠেলে আর এই পায়রার খুপরির মত দু'কামরা ঘরের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে আর ভাল লাগে না।

কি করবি?

তোমাদের কাজ-কারবার কি রকম?

শিখা হাসল। সে বড় শক্ত কাজ। তুই কি পারবি।

কি আর এমন শক্ত।

শক্ত নয়। সিঁড়ি হাঁটাহাটি করতেই জিব বেরিয়ে যায়।

চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি, আমার না হয় সিঁড়ি হাঁটাহাটিই সার হবে।

এবার যেতে হবে। শিখা উঠে দাঁড়াল। দাঁড়া দেখি কি করতে পারি। তা বিনুকে একটু বলতে হবে। বলে রাখিস।

সেসব আমি পারবো না। যা বলতে হয় তুমি বলো।

প্রীতির কাছ থেকে উঠে এসে শিখা সিঁড়ির নিচে একবার উঁকি মারল। এখানটায় এই ঘেরাটুকুনের মধ্যে মাসিমার আবাস। আগেকার করা তাই রক্ষে। নইলে মাথা গোঁজবার জায়গা কোথায় হত কে জানে। ছাতের ওপর ঘরটা হাত চারেক
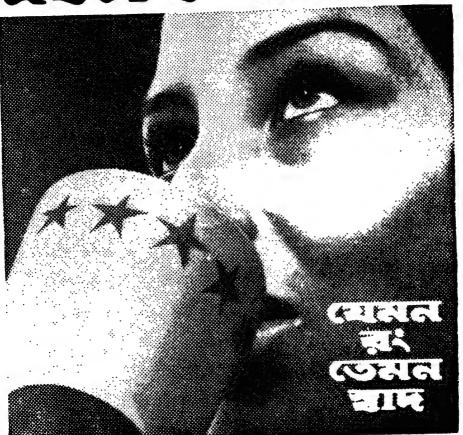
উঠে আছে, ওই অব্দিই, ও ঘর আর শেষ হয়নি। কোনদিন যে হবে কে বলতে পারে।

ইতি বালিসে বুক দিয়ে কিছু পড়ছিল। ইতি বলল, ও মা শিখাদি এসেছে।

হাতের ঝুলির মধ্যে তুলসী কাঠের মালা। মা মালা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিত্যানন্দ জপ করছেন। ঠোঁট নড়ছে, বিজবিজ একটা শব্দ উঠছে। হাতের মালা এগিয়ে ইঙ্গিতে শিখাকে বসতে বললেন। —শিখাদি একটু বোস। ইতি বলল।

চৌকাটের ওপর উবু হয়ে বসে পড়ল শিখা।

ইতি হেসে উঠল। এই, উঠে পড়। উঠে পড়। চৌকাটে বসলে কি হয় জানো তো!

শিখা হাসতে হাসতে হাতের তালুতে কাপড় ঝেড়ে নিয়ে বসল।

ইতি হাসছিল। মা হরিকে মন্ত্রে কি বলে জানো শিখাদি।

শিখা ঘাড় নাড়ল। বিনোদের কথা মনে পড়ে গেল শিখার। —জানো শিখাদি বাবার নাম তো করতে পারে না, মা তাই ফরি ফরি করে। বুঝলে নাবু কেমন বিকল্প ব্যবস্থা।

ফরি ফরি! শিখা হাসতে গিয়ে হাসতে পারলো না। সব কিছুতেই বিকল্প ব্যবস্থা। ঘিয়ের বদলে বিকল্প দিয়েই তো জীবন কাটছে।

গলির বাঁকটা পেরিয়ে বাস স্টান্ড অবধি যেতে না যেতেই বিনোদের সংগে দেখা। মুখটা থমথম করছে, বিনোদ হনহন করে হাঁটছিল।

কি ব্যাপার! শিখা বলে উঠল, অত হন্তদন্ত হয়ে ফিরে চললি কোথায়?

আচমকা সম্বোধনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল বিনোদ, দাঁড়িয়ে শিখাকে দেখল। —কোথায় আবার, ডেরায়। পাতলা একটু হাসি, বিনোদের মুখ ম্লান দেখাল। —অার হয়ে গেল বুঝলে!

কিসের কি হয়ে গেল?

ইউনিয়নে ইউনিয়নে কাজিয়া—আমাদের শালা প্রাণ যায়-যায়।

শিখা কাছে সরে এল। বিনোদের হাতের মধ্যে নিজের হাত গলিয়ে বলল, উলুখাগড়া হয়ে জন্মেছিস কেন, জন্মাবার সময় খেয়াল ছিল না? অল্প একটু থামল শিখা, দু' একটা বড় বড় নিশ্বাস নিল। —নে, আমাকে একটু পৌঁছে দে।

তুমি যাও না। আমার মেজাজ-ফেজাজ ভাল নেই।

শিখা চোখ বড় বড় করে তাকাল। ঠিক এই মুহূর্তেই বিনোদকে দরকার শিখার। এখন বাড়িতে গেলে, কিছু হয়তো করে বসবে বিনোদ, চিৎকার চেঁচামেচি। হয়তো খবেই না, অন্য লোককেও খেতে দেবে না। এখন একটু সান্ত্বনা দরকার, একটু ভুলিয়ে দেওয়ার। শিখা বলল, বাড়িতে গিয়ে কি তোর দশটা হাত পা বেরুবে? —চল, আমার সংগে চল।

ডান পা'টা একটু এগিয়ে আবার থমকে দাঁড়াল বিনোদ। —আরে আমাকে ছেড়ে দাও না তুমি।

শিখা চাপা গলায় ঝাঁঝিয়ে উঠল। —কেন? গেলে কি মান কমে যাবে নাকি?

আমি কি তাই বলেছি।

তবে?

চাকরি এখন সিকেয় ঝুলছে। মাথার ঠিক নেই, কি করতে কি করে ফেলব।

কি করবি? মারবি।

বিনোদ হেসে ফেলল। হেসে হাতটা

[illegible]ড়িয়ে নিয়ে পকেট থেকে সিগারেট দেশলাই বার করল। একটা সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল। —দূর! কি যে বলনা তুমি।

শিখা দেখছিল বিনোদ নরম হয়ে আসছে, মুখের থমথমে মেঘটা একটু একটু ফিকে হচ্ছে। এখন একটু হাসি ঠোঁটায় ছুঁইয়ে দিলে মেঘটা কেটে যেতে কতক্ষণ।

পাশ দিয়ে একটা রিকশা ঠুন ঠুন করে যাচ্ছে। ফাল্গুনের এই সময়ে শীত বলে কিছু নেই, কেবল একটু দখিনা বাতাস মাঝে মাঝে গাছপালার পাতা এলোমেলো করে দিয়ে যাচ্ছে। পথের কিনারায় সরে আসতে আসতে শিখা বলল—তোর অত ভাবনা কিসের? হাতের কাজ জানিস তুই। চাকরি একটা গেলে আর একটা মিলতে কতক্ষণ।

বিনোদ মুখ ফিরিয়ে চাইল। তারপর হেসে ফেলল। —কি যে বলো না মাইরি। তুমি দেখছি কিচ্ছু জানো না। এখন কি আর সে দিনকাল আছে। আমিই তো এর আগে তিনচারটে ছেড়ে এটায় এসেছি। —এখন আমারই ভয় ভয় করছে। —কত ভালো আচ্ছা আচ্ছা মিস্ত্রী রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করছে। —বেলিলিয়াস লেনের মতো লেনও কানা হয়ে গিয়েছে, জানো।

অতশত জানি না বাপু, তবে ভয় করলেই ভয়, নইলে অভয়। তোরই যদি ভয় হয়, তবে আমরা কোথায় যাই বল দিকি?

জোরে একটা টান দিয়ে বিনোদ সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলল। —চুলোয় যাক!

বাড়ি এসে শিখা আঁচলের চাবি দিয়ে তালা খুলল। বিনোদ চোখ তুলল,—বাড়িতে চাবি দেয়া দেখছি, মাসিমা কোথায়?

মা দু'একদিনের জন্যে দেশে গিয়েছে, কালই আসবে।

বাড়িতে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিল শিখা। সরু গলির মাথায় লম্বা ইলেকট্রিকের পোস্ট থেকে এক চিলতে আলো ঘোষদের আম বাগানের পাশ দিয়ে এসে উঠোনে পড়েছে। কাঠা দেড়েকের মত জমি, টালি ছাওয়া মাঠকোঠার মত ঘরদোর। সামান্য একটু উঠোন। উঠোন পেরিয়ে উঁচু রোয়াক। রোয়াকটায় এখনও সিমেন্ট হয়নি, কাঁচামাটির গোবর নিকানো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। —তুই একটু দাঁড়া। আমি আলোটা জ্বালি।

বিনোদ রোয়াকে বাঁশের খুঁটি ধরে দাঁড়াল। একেবারে সামনে দাঁড়াল না, আড়ার চাল যেখানে নেমে এসেছে, সেখানে মাথা ঠেকে যায়, বিনোদ একটু ভেতরে দাঁড়াল।

একবার উঁকি মারল বিনোদ। আকাশ ফাঁকা ফাঁকা। একটু দূরে নতুন একটা তেতলা বাড়ি এখনও রঙ হয়নি, আলো জ্বলছে।

ইলেকট্রিকটা নিয়ে নাও।

রান্নাঘরে হ্যারিকেন জ্বালাতে জ্বালাতে শিখা বলল,—আর দু'চারদিন যাক, নিয়ে নেব। নিতে গেলেই তো একক্ষাঁড়ি টাকা!

তা টাকা লাগবে বইকি! বিনোদ গলা নামিয়ে হাসল। —তুমি নিতে পার শিখাদি, তোমার টাকা আছে।

আলো নিয়ে আসতে আসতে শিখা বলল, হ্যাঁ! আছে কাঁড়ি কাঁড়ি! —তুই দেখেছিস!

এখন তো বাবা বেশ টু-পাইস হচ্ছে।

টু-পাইস হলে ক্ষতি কি ছিল। আমাদের ঐ হাঁটাহাঁটি, সিঁড়ি ভাঙাভাঙিই। —[illegible] [illegible] কোম্পানি মারছে।

তা বলে তাকে বকে কোপ মারলে না বুঝি।

মারি। —তা সে দু'চারটে। কোম্পানি সবাই আজকাল চালাকচতুর। কথা বলতে বলতে গলায় গলাজল ওঠে।

বিনোদ শব্দ করে হাসল। বেশ! তুমি গাব্বা মারছ।

বিনোদ সহজ হয়ে আসছিল। শিখা আলোটা হাতে ঝুলিয়ে রাখল। চৌকির বিছানা পেতে দিয়ে বলল,—একটু বোস। আজকাল তো আসাই ছেড়ে দিয়েছিস।—আমি একটু খাবার করি। —কি খাবি বল?

কিছু খাবো না।

বিনোদ চৌকির ওপর বসল। বসে বালিস টেনে নিয়ে আধশোওয়ার মত শুলো। তোমার তো আবার উনুনফুনুন ধরানোর হাঙ্গামা আছে।

না, শিখা ঘাড় নাড়ল, কেরোসিনের উনুনে রাঁধি।

ডিম আছে? বিনোদ মুখ নিচু করে হাসল। তা হলে একটু ঝালঝাল করে ডিমের ডালনা রাঁধো।

এই না পেট নিয়ে ভুগছিস। ডিমের ডালনা খাবি?

দূর! ও কি সে জিনিস। থাকলে করো, নইলে ছেড়ে দাও।

তুই পাঁচ মিনিট বসে থাক,—আমি এই এলুম বলে।

রান্নাঘরে গিয়ে কুকারটা জ্বালিয়ে নিল শিখা। জ্বালিয়ে জল চড়াল। একটু ফুটলেই ডিমটা ছেড়ে দেবে। তারপর সেদ্ধ হয়ে গেলে ছাড়িয়ে নিয়ে কড়ায় সাঁতলে নিতে আর কতক্ষণ। পেঁয়াজের ঝুড়ি থেকে দুটো পেঁয়াজ নিয়ে কুচিয়ে নেওয়া [illegible]।

বাইরে [illegible] শুনে অবধি মনটা খারাপ লাগছিল শিখার। অথচ বিনোদকে [illegible] বলা যাচ্ছে না। তবু, সত্যি, কোথাও একটা কিছু হয়েছে, বেশ বড় রকম কিছু [illegible] হাতে [illegible] ভাবতে ভাবতে [illegible] অতীতে ফিরে যাচ্ছিল। [illegible] বছর—[illegible] বছর [illegible] আলাপ। [illegible] সঙ্গে আসত বিনোদ। তাও দু'একদিন, তারপর এমনি এমনি। তখন [illegible] বিনোদের [illegible] পারেনি। [illegible] মেসোমশাই [illegible] একটা চাকরিও জুটিয়ে দিয়েছিলেন। —[illegible] শিখুকে, মেসোমশাই বলতেন। —[illegible] পারবে, বাবলো। আমার [illegible] তার [illegible] নয়।

বাবা বলে-কয়ে কারখানায় লাগিয়ে দিয়েছিলেন। চালাক চতুর ছেলে, অল্প দিনেই কাজকর্ম শিখে নিল। ব্যস, বয় থেকে হাফ-মিস্ত্রী, তারপর মিস্ত্রী হয়ে গেল পাঁচ ছ' বছরেই। সাড়ে চার টাকা পাঁচ টাকা রোজ পায়। বেশ বলত বিনোদ—আপনা হাত জগন্নাথ। বুঝলে শিখাদি, এই হাত গেলেই হল কম্ম কাবার।

খাঁড়ির ছেলের মত হয়ে গিয়েছিল বিনোদ। যখন-তখন আসত। ফুট ফাই-ফরমাশ খাটত। এটা এনে দে, ওটা এনে দে, লেগেই থাকত শিখার। মুখে আক্ষেপ নেই। করে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। তার ওপর হাসি-খুশী। ভারি ভালো লাগত বিনোদকে। ছেলো লাগত্য বখন যেন অন্তরোত্তার ঢালা যাচ্ছিল। খুটখাট হাসিঠাট্টা হত কি ছিলাকি হতো অনাদিকে বাপারটা [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

শিখা শুনে পড়েছিল—কি করে বিনোদ ... ... ঐ প্রতিভেন্ট ফান্ডের [illegible] টাকা—এটুকু তো সম্বল। ... ভেসে গেল, বাঁচবে! শিখার নিরুপায় [illegible] কালো হয়ে আসছিল। ... [illegible] [illegible]

এরকম রক্তকমলীর মতের পেটেন্ট নিয়ে যদি তুমি দিনরাত ঘুরে বেড়াও শিখাদি, বিনোদ একদিন বলেছিল, তা হলে আমিও কিন্তু ন্যাংটা শিবের পেটেন্ট নিয়ে নেব। পেটেন্ট নিয়ে পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ব।

শিখা হেসে ফেলেছিল। তা হলে মা-ও একটু ডেরা আছে এখনও, সেটুকু উঠে যাবে, পাড়ার লোকে পিটিয়ে তুলে দেবে।

কুছ পরোয়া নেই। বিনোদ হাসছিল। ন্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়। তোমার ভয় কিসের। তোমায় আমি মাথায় করে রাখব।

বিনোদ ঘরের ভেতর থেকে হাঁক পাড়ল। —হল?

—এই যাচ্ছি। আর একটু!

কাজের খবরটা ঐ বিনোদই এনেছিল। —যদি করতে পার, কাজ একটা আছে শিখাদি। তবে তার আগে পা দুটোকে তেল মাখিয়ে মাখিয়ে পাকা বাঁশের লাঠি করে নিতে হবে কিন্তু।

—কি কাজ?

—সেলস্ গার্ল!

—দোকানে-টোকানে?

বিনোদ হা হা করে হেসে উঠেছিল। বলি, আজকাল আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখা ছেড়ে দিয়েছ বুঝি! সেখানে যারা কাজ করে তারা তো সব বেবিডল। শো-কেসে সাজিয়ে রাখার জিনিস। কি সব চিজ। একবার দেখলেই জিব উল্টে আলজিব ছুঁতে আসে।

শিখা নিশ্বাস বন্ধ করে শুনেছিল। —তবে?

ও সব আজেবাজে ফাঁকো কোম্পানির মাল। সাবান-সেন্ট-স্নো থেকে ন্যাপথালিন-ধূপকাঠি-বদরু-হটাও হ রে ক র কমবা। অফিসে অফিসে ঘুরে ঘুরে বিক্রি। মাইনে দেবে একটা, আর বিক্রি করতে পারলে কমিশন।

—সত্যি বলছিস? হাঁ রে পারব?

অনেক মুহূর্ত আপাদমস্তক তাকিয়ে দেখেছিল বিনোদ, তারপর মস্তের ওজন নেবার মত করে দুই হাত বাড়িয়ে হাত নেড়েছিল। —পারবে। এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়, তবে একটু স্মার্ট হতে হবে বুঝলে—এসব একটু টাইট-ফাইটের ব্যাপার।

ভাতের বাটিতে ডিমের ডালনা, নিকেল-ওঠা চামচ। ও-বেলার হাতে গড়া রুটি ছিল কয়েকটা, তারই দু একটা ছোট্ট রেকাবিতে সাজিয়ে আনল শিখা। চায়ের জলটা স্টোভ নিয়ে আর একবার কেটলি সুদ্ধ গরম করে নিল, খেতে খেতে যাতে জুড়িয়ে না যায়।

বিনোদ উঠল না। —আমি কিন্তু শুয়ে শুয়েই খাব।

—বেশ, তাই খা। ছোট্ট চৌকিটার ওপর সাজিয়ে দিয়ে শিখা চৌকিতে বসল। —খাওয়া হলে চা ঢেলে দেব।

—তোমার কই?

—আমি এখন খাবো না।

—সে হয় না। এক যাত্রায় পৃথক ফল। তুমি আধখানা খাবে। বিনোদ চামচ দিয়ে ডিমটাকে আধাআধি কাটল।

শিখা হাঁ হাঁ করে উঠল। —খা না, বাবা।

—তুমি খাও।

—আচ্ছা, রেখে দে।

—রেখে দেওয়া-দেওয়ি নয়, আমার সঙ্গে সঙ্গেই খাও।

—কি জুলুম বাবা! শিখা বিনোদের ঘাড়ের ওপর ঝোঁকে আলগোছে একটু তুলে নিল।

—আর নাও।

—না, আর নয়।

বিনোদ তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছিল, শিখা আঙুল চুষে হাত ধুয়ে এল।

—বাঃ! বেড়ে রেঁধেছ মাইরি! খাওয়া শেষ করে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বিনোদ সিগরেট ধরাল।—দুজনে মিলে একটা রেস্তোরাঁ করতে পারলে মন্দ হয় না। বিনোদ হাসল,—এইখানে কম খরচে শিখা-কারি, শিখা-রোস্ট, শিখা-ফাউল পাওয়া যায়।

শিখা হাসল।—দোকান দে না।

দেবো ভাবছি। দিতেই হবে এবার। চাকরি গেলে কি করব? তুমি লোন দেবে টাকা। না-হয় তোমাকেই প্রোপ্রাইটার করে দেব।

—আমি বাবা মালিক-ফালিক হতে চাই না। যেমন আছি তেমনি থাকতে চাই।

—পেট ভরবে?

শিখা চোখ ঢেলিয়ে হাসল।—না—হয় নাই ভরল, আধপেটাই।

বিনোদ হাসল না, হাসির মত করল। —ওই করে করেই মরেছ। নইলে চিত্রগুপ্তকে কি বলবে তুমি?

—তুই ই বা কি বলবি!

—আমার কথা ছাড়ো।

—কেন, তোমার কথা ছাড়ব কেন? তুমি কি এমন মহাজন!

বিনোদ চোখ তুলল। বলল, পায়ের থেকে সরে বস শিখাদি? মুনিঋষিরা নাই বলেই তো জ্বালা যন্ত্রণা।

শিখা সরল না, আরও একটু ঘেঁষে বসল, তুই একেবারে বদলে যাচ্ছিস বিনু।

বিনোদ ঘুরে শুলো।—মানুষ বদলায় শিখাদি।

—তা বলে এতো বদলাবি? গায়ে হাত দিলে সরে বসতে হবে।

বিনোদ হাসল। হেসে নিজের হাতের মধ্যে একটা হাত তুলে নিল শিখার।—আমি আর সরল নই শিখাদি। আমার মনটা পাগে জটিল হয়ে যাচ্ছে।

—সেইজন্যেই বুঝি আসা বন্ধ করেছিস!

—হাঁ। বিনোদ গম্ভীর গলায় বলল, আগে কত সহজে ছিলাম বলো! যখন তখন আসতে পারতাম। হাসতে পারতাম। ইচ্ছে হলে তোমাকে জড়িয়ে দু'একটা চুমোটুমো খেতাম, ঘাড়ে গাল ঘষতাম। কিন্তু আমি বদলে যাচ্ছি শিখাদি, এসব আর ভালো লাগে না। খামা চাপা দিয়ে উপোস করতে কার মন চায় বলো। মনে হয় আরও ভেতরে যেতে চাই আমি—আরও আপন হতে চাই। বল তুমি আমাকে সে সব দিতে পারবে? বাঁচাতে পারবে আমাকে? পারবে?

অনেক কথা একসঙ্গে বলে বিনোদ হাঁপাচ্ছিল। শিখা বলল,—আমার আর কিছুই দেবার নেই রে, আমি তোর চেয়ে বয়সেও বড়ো।

—দেবার কিছু নেই তুমি বলতে পার না। অন্তত তুমি শান্তি দিতে পার, বাঁচাতে

পার।—অল্প বয়েস? বয়েস নিয়ে আমি কি করবো? ধুয়ে খাব?

শিখা বিনোদের হাত থেকে হাত তুলে নিয়ে মাথা নাড়ল।—তার চেয়ে তুই এক কাজ কর বরং। একটা ছোটখাট মেয়ে দেখে বিয়ে কর।

বিনোদ হাসতে চাইল। হাসতে গিয়ে লাথি খাওয়া কুকুরের মত ভাংগাচোরা মুখের চেহারা নিয়ে বলে উঠল,—বাঃ! বেশ বলেছ। আমার বিয়ে। এই নইলে তুমি আমার শুভাথী শিখাদি, ভাল চাও! ভাংগা দেড়-খানা ঘরের বাড়ি, মাথার ওপর দুদুটো বোন, মা। ভাইকে আনতে বায়ে কুলোয় না, তার ওপর চাকরি যাব-যাব। আমি বিয়ে করবো না তো কে করবে? তারপর যাকে বিয়ে করবো সে যখন টাকা চাইবে? সুখ চাইবে? শান্তি চাইবে? সিকিউরিটি চাইবে? তখন সে টাকা, সে সুখ, সে শান্তি, সে নিরাপত্তা আমি কোথায় পাব শিখাদি? এর চেয়ে তুমি বল, রেললাইনে মাথা দেওয়া অনেক সহজ কিনা।

শিখা খানিকক্ষণ চেয়ে থাকল। শেষে অন্তরঙ্গ গলায় বলল,—কিন্তু তুই তো [illegible] বিনু। নিজের দিকেও দেখতে হবে তো?

বিনোদ হাসল।—কি দেখব বল। দেখতে গেলে এদের ত্যাগ করে কোথাও পালিয়ে যেতে হয়। এক একসময় কি মনে হয় জানো, প্রীতিটাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দি, ইতিটার গলা টিপে শেষ করি। আমার মরে যাওয়াই ভালো শিখাদি। ভালো আমার কিছুই সয় না।

—তাহলে কি এমনি করেই চলবে?

—আমারও তো চলছে শিখাদি। এই এমনি করে মরে-মরে। না [illegible] না [illegible]। বিনোদ হা হা করে হেসে উঠল।

শিখা অনেকটা ঝুঁকে পড়ে বিনোদের মুখ দেখল। অসহায়, রুগ্ন, দুর্বল, [illegible] একটা শিশু। অসহায়। মমতায় শিখার সারা শরীর ভরে আসছিল। একটা দীর্ঘ-শ্বাস পড়ল শিখার। একবার উঠে দাঁড়াল। তারপর আলোর পলতেটা নিবিয়ে দিয়ে বলল, সর তো—আমিও একটু শোবো।

কিসে প্যারীওয়ারের বৈশিষ্ট্য ?

প্রধান স্থপতি, অভিজ্ঞ কনাস্ট্রাকশন ইঞ্জিনীয়ার্স ও নিয়মিত ব্যবহারকারী প্রত্যেকেই প্যারীওয়ারের সুখ্যাতি করেন। ভাল কাজ দেয় বলেই প্যারীওয়ার অসাধারণ ও প্রতি গৃহের এক অভিন্ন অংশ। একমাত্র প্যারীওয়ার ভিট্রিয়াস সৌন্দর্য্যে অভিজাত, গড়নে মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী। ফেঁকাশে হলদে, আশমানী, নীল, ফেঁকাশে লাল, সবুজ, মুক্তার মতো সাদা ইত্যাদি নানা চমৎকার রঙে পাওয়া যায়।

● ভিট্রিয়াস ● সম্পূর্ণরূপে স্বাস্থ্যবিধি সম্মত ● নিচ্ছিদ্র ● সরু-চিড় নিরোধক।

প্যারীওয়ার ভিট্রিয়াস আধুনিক বাসগৃহের এক পরিপূরক অঙ্গ।

Parryware
VITREOUS

(জি ডি, এস অ্যাণ্ড ডি-এর অনুমোদিত সরবরাহকারী)

জৌন্টন অ্যাণ্ড কোং লিঃ, ইংল্যাণ্ড-এর কারিগরি পরামর্শে বন্-ক্রেজ ভিট্রিয়াস চায়না থেকে তৈরী করেন

ই. আই. ডি.—প্যারী লিমিটেড (ইংল্যাণ্ডে সমবিভুক্ত। সভ্যদের দায় সীমাবদ্ধ)

ডেয়ার হাউস, মাদ্রাজ-১।

ব্যাংক জাতীয়করণ আইন বাতিল

ব্যাংক জাতীয়করণ আইনটি ভারতের সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক অবৈধ বলে ঘোষিত হয়েছে। এই আইনটি বাতিল করার কারণ এই নয় যে আইনটি শাসনতন্ত্রের নির্দেশাত্মক নীতির বিরোধী অথবা পার্লামেণ্টের এ-জাতীয় আইন প্রস্তুত করার ক্ষমতা নেই। আইনটি বাতিল করা হয়েছে এজন্য যে শুধু চৌদ্দটি ব্যাংকের ক্ষেত্রে এই আইনটি প্রযুক্ত হওয়ায় তাদের ক্ষেত্রে সরকারের একটি "বৈরীভাবাপন্ন তারতম্য" প্রতিভাত হয়েছে। অন্যান্য ব্যাংকের ক্ষেত্রে আইনটি প্রযুক্ত না হওয়ায় শাসনতন্ত্রে বর্ণিত "আইনের চোখে সমতা" ("equality before law") সম্পর্কিত মৌলিক অধিকারের ধারাটি অগ্রাহ্য করা হয়েছে। তাছাড়া এই আইনে নাগরিকদের সম্পত্তির অধিকারও যথাযথভাবে অনুসৃত হয়নি বলে সুপ্রীম কোর্টের দশজন বিচারপতি রায় দিয়েছেন। ব্যাংকগুলিকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা সম্পর্কে মন্তব্য করে সুপ্রীম কোর্টের দশজন বিচারপতির রায়ে বলা হয়েছে যে যেভাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে তা আদৌ ক্ষতিপূরণ প্রদানের পর্যায়ে পৌঁছায়নি। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির সম্পদের মূল্য কিভাবে নির্ধারিত হবে বণ্ডের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত হবে কিনা বণ্ডের উপর সুদের হার প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে সুপ্রীম কোর্ট ক্ষতিপূরণের প্রশ্নটি বিবেচনা করে বলেছেন যে ক্ষতিপূরণের বিধান যথোচিত নয়। কারণ, প্রচলিত সুদের হারের তুলনায় বণ্ডের মূল্য কম হওয়ার আশঙ্কা আছে। তাছাড়া শাসনতন্ত্রে ক্ষতিপূরণের যে বিধান আছে তাতে ক্ষতিপূরণের টাকা এমন কোন ঋণে রূপান্তরিত করা যায় না যার সুদ প্রচলিত হার অপেক্ষা কম। তাছাড়া ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণকালে সামগ্রিকভাবে কোন ব্যাংকের আর্থিক মূল্য নির্ধারিত হয়নি, ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে, মোট সম্পদ নির্ধারণে কয়েক শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ বাদ দেওয়া হয়েছে, জমি ও বাড়ির মূল্যায়ন সংক্রান্ত ব্যবস্থা যুক্তিযুক্ত হয়নি এবং সম্পত্তির সামগ্রিক মূল্য ও দায় নির্ধারণের ব্যাপারে নির্দিষ্ট নীতিও যথোচিত হয়নি, সুপ্রীম কোর্টের রায়ে এই অভিমত প্রকাশ পেয়েছে।

বিচারপতিগণ বলেন, বিদেশী ব্যাংকগুলি এবং পঞ্চাশ কোটি টাকার নীচে যাদের আমানত আছে এ-জাতীয় ব্যাংকগুলি দেশে ব্যাংকিং ব্যবসায় এবং অন্যান্য কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারবে অথচ পঞ্চাশ কোটি টাকার বেশী হলেই যে কোন ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত হবে এই বিধানটি যুক্তিযুক্ত হয়নি। দেশের, বিশেষ করে ভারতের মত উন্নতিকামী দেশের, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যতগুলি ব্যাংক আছে সেগুলির সামগ্রিক সম্পদও পর্যাপ্ত বলে যেখানে বিবেচিত হতে পারে না—সেক্ষেত্রে স্টেট ব্যাংক এবং চৌদ্দটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক নিয়ে দেশের মোট সম্পদের শতকরা ৮৩ ভাগের উপর যেখানে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেক্ষেত্রে শুধু চৌদ্দটি ব্যাংককে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় এনে এবং তাদের ব্যাংকিং-বহির্ভূত বিকল্প কোন ব্যবসায় করতে নিষেধ করে এবং ৮৯টি সিডিউল্ড ব্যাংকের মধ্যে ৩৫টি ব্যাংককে এই নিষেধাজ্ঞার আওতার বাইরে রেখে সরকার একদেশদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন বলে সুপ্রীম কোর্ট মনে করেন। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি মুনাফার দিকে না তাকিয়ে গ্রামাঞ্চলে সম্পদ আহরণ করবে এবং কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পকে উদার হস্তে অর্থ সাহায্য করবে, এ ধরনের যুক্তি আইনের বৈধিকতা বিচারের সময় বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত হয় না বলে সুপ্রীম কোর্ট মন্তব্য করেন।

সুপ্রীম কোর্টের মাত্র একজন বিচারপতি শ্রী এ এন রায় কিন্তু ব্যাংক জাতীয়করণের প্রশ্নে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তাঁর মতে ব্যাংক জাতীয়করণ আইনটি শাসনতন্ত্রসম্মত। তাঁর মতে ব্যাংক জাতীয়করণের উদ্দেশ্যও বিবেচনা করতে হবে। আমানতের ভিত্তিতে সবগুলি ব্যাংকের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ করা খুব দুরূহ। তাই ৪৫ কোটি টাকা থেকে ৫০ কোটি টাকার ভিতর আমানত আছে এ-জাতীয় ব্যাংকগুলিকেও রাষ্ট্রায়ত্ত করা উচিত ছিল একথা বলা যায় না। পঞ্চাশ কোটি টাকার উপর যে ব্যাংকগুলির আমানত আছে সেগুলির সঙ্গে ছোট ছোট ব্যাংকের পার্থক্য অনেক, তার উল্লেখ করে বিচারপতি শ্রীরায় বলেন, আইনটির উদ্দেশ্য নিয়েই এই শ্রেণীবিভাগ বিবেচনা করতে হবে। তাঁর মতে চৌদ্দটি ব্যাংকের সম্পদ, ব্যবস্থাপনা, সংগঠন এবং প্রশাসনিক পারদর্শিতা, সব বিবেচনা করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সেগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা অযৌক্তিক অথবা অবৈধ কাজ কিছু হয়নি। ক্ষতিপূরণের প্রশ্নে তিনি বলেন, কোন বিশেষ সম্পদের ভিত্তিতে যখন ক্ষতিপূরণ নির্ধারিত হচ্ছে না তখন ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে "just equivalent" তত্ত্বটি গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া শাসনতন্ত্রের চতুর্থ সংশোধনের পর কোনও কোম্পানীর সুনাম (goodwill) অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের পরিমাণ কত হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আদালতের এক্তিয়ার-বহির্ভূত। বলা বাহুল্য, মোট এগারোজন বিচারপতির মধ্যে দশজনই শ্রী এ এন রায়ের অভিমতকে সমর্থন করেননি।

সুপ্রীম কোর্টের এই রায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক তাৎপর্য আছে। এতদিন পর্যন্ত মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের বিবেচনায় আদালত শুধু একটি অধিকারের ভিত্তিতেই সবদিক বিবেচনা করতেন। কিন্তু এই সর্বপ্রথম একসঙ্গে অনেকগুলি মৌলিক অধিকার একসঙ্গে বিবেচিত হয়েছে। সুপ্রীম কোর্টের মতে শাসনতন্ত্রের ১৪, ১৯ এবং ৩১(২) নম্বর ধারা ব্যাংক জাতীয়করণ আইনে [The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1969] লঙ্ঘিত হয়েছে। শাসনতন্ত্রের ১৪ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, "The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of laws within the territory of India". অর্থাৎ, এই বিধানে "আইনের চোখে সমতা"-র উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সুপ্রীম কোর্ট মনে করেন, ব্যাংক জাতীয়করণের ফলে শুধু চৌদ্দটি ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ায় সবগুলি ব্যাংকের ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রের এই বিধানটি সমানভাবে প্রযুক্ত হয়নি। শাসনতন্ত্রের ১৯ নম্বর ধারায় নাগরিকদের সাতপ্রকার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে; তার মধ্যে ১৯(ক) ধারায় নাগরিকগণ সম্পত্তি অর্জন করতে, দখল করতে বা ভোগ করতে পারেন। শাসনতন্ত্রের ৩১(২) ধারায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার সংরক্ষিত হয়েছে। এই ধারা অনুযায়ী সরকার জনস্বার্থে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিকার করতে পারেন; কিন্তু সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা বা মূলনীতি থাকতে হবে। ব্যাংক জাতীয়করণ আইনে যে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা

হয়েছে, শাসনতন্ত্রের ৩১ (২) নম্বর ধারার পক্ষে তা পর্যাপ্ত নয় বলে সুপ্রীম কোর্ট মনে করেন। তবে ১৯৫৫ সালে শাসনতন্ত্রের চতুর্থ সংশোধনের ফলে স্থির হয় যে, সরকার জনস্বার্থে ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধিকারকালে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকলেও ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নিয়ে আদালতে কোন প্রশ্ন তোলা চলবে না এবং সংশ্লিষ্ট আইনে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ পর্যাপ্ত হয়নি বলে আদালত আইনটিকে বাতিল করতে পারবেন না। অন্তত শাসনতন্ত্রের ৩১(২) নম্বর ধারার ব্যাখ্যা প্রদানে বিচারপতি শ্রী এ এন রায় যে অভিমত দিয়েছেন তা গভীরভাবে প্রণিধানযোগ্য।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও New Deal প্রবর্তন করার ক্ষেত্রে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টকে আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের কাছ থেকে বাধা পেতে হয়েছিল। ব্যাংক জাতীয়করণ আইনটি বাতিল হয়ে গেলেও যে আগেকার ব্যাংক-ব্যবস্থা ফিরে আসবে বলে মনে হয় না। কারণ, এই ব্যাপারে আইন প্রণয়ন করার অধিকার যে পার্লামেণ্টের আছে একথা সুপ্রীম কোর্ট স্বীকার করেছেন।

সুব্রত গুপ্ত

নাস্তিকের প্রার্থনা

পেয়েছি দুই চিঠি—অপরিচিত হস্তাক্ষর, ঠিকানা অলিখিত, স্বাক্ষরকারীরা নাম-সাক্ষ্যে একজন পুরুষ, আর একটি মেয়ে। প্রথমটি একান্ত ব্যক্তিগত পত্র; প্রেরক বিপর্যস্ত এক প্রৌঢ়ত্বে-উপনীত জীবন যুদ্ধে বিপর্যস্ত, সাধারণ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক; কোনো এক অসুখী মুহূর্তে, অজানা এক বিদেশী যাজকের কাছে, নিজের হৃদয়-উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন—বলেছেন সংসারের নানা সমস্যার কথা, পিতামাতার মৃত্যুর কথা, আপন স্ত্রীর সীমাহীন ধৈর্যের কথা, আর নিজ অন্তরের অনির্বাণ অশান্তির কথা। পত্রান্তে বেজেছে যেন চ্যালেঞ্জের সুর : আমার স্ত্রী তো ঈশ্বরে বিশ্বাসী, সে তবু প্রার্থনায় শান্তি পায়, কিন্তু আমি যে নাস্তিক...। আপনি পাদ্রি, বলুন দেখি, ঈশ্বরে যার বিশ্বাস নেই, সে কি করে ডাকবে তাঁকে?

অচেনা বন্ধু, শোন তবে; এমনি ভাবে ডাকবে তাঁকে—

আমার স্ত্রীর ভগবান, আমি নাস্তিক, তোমার অস্তিত্ব বিশ্বাস করি না। পড়েছি ভূগোল, পড়েছি ইতিহাস, শিখেছি সন্দেহ করতে সব কিছু। সন্দেহ করেছি জ্ঞান, সন্দেহ করেছি বিজ্ঞান, সন্দেহ করি আজ আমার নিজের অবিশ্বাস।

হে প্রভু, কোনো যুগে কোনো জায়গায় তুমি যদি থেকে থাক, সহৃদয়ে ক্ষমা কর ইয়ারি আড্ডায় সাড়ম্বরে ঘোষিত আমার এই নাস্তিকতা। জীবনে ঠকেছি খুব, ঠকিয়েছিও কম নয়, কিন্তু ঠকতে চাই না আর, আর ঠকাতে চাই না, তোমায়, কল্পিত ভগবান—আমার জীবনের এই প্রথম প্রার্থনাতে।

আজ যদি, পরমেশ্বর, কর আমায় পরমদয়া, আমার আজকের সরল ও নম্র, কষ্টকর ও লজ্জাপূর্ণ, এতদিন অনুচ্চারিত স্বীকৃতির জন্য। অবিশ্বাস করি বটে, অবিশ্বাস করতে ভালোবাসি না, বিশ্বাস করতে ভালোবাসতাম।

বিশ্বাস করতে ভালোবাসতাম যে, আমার পরলোকগত [থাকে যদি পরলোক...] মাতাপিতার সঙ্গে একদিন স্বর্গে [যদি অলীক না হয়] আমার হবে পুনর্মিলন। বিশ্বাস করতে ভালোবাসতাম যে আমার দীর্ঘদিন-শয্যাশায়ী ষোড়শী কন্যার অরোগ্যাতীত রোগ অর্থহীন নয়। বিশ্বাস করতে ভালোবাসতাম যে আমার স্ত্রীর রাশিকৃত প্রার্থনা যথাস্থানে পৌঁছোয়; বিশ্বাস করতে ভালোবাসতাম তার নিত্য-স্মিতমুখের কারণ আর চিরসন্তোষের উৎস তার প্রকৃতিগত শান্ত স্বভাব নয়, কিন্তু সত্যি সত্যি তোমার অলৌকিক কৃপারই দান।

হয়তো আমার স্বর্গীয় মাতাপিতার প্রার্থনার দরুন, হয়তো আমার কন্যার এই তিন বৎসরব্যাপী স্তূপীকৃত 'পুণ্যযন্ত্রণার' জন্যই আমার স্ত্রীর সেই পরম শান্তি... আর আমার আজকের এই [বোধ হয়...] কি-যেন-কেমন ভাব।

অনুমানাত্মক ভগবান, আমার অবিশ্বাসকে অবিশ্বাস করতে আমাকে শেখাও। আমেন।

আমার জীবনের এই প্রথম প্রার্থনাতে

প্রথম রচনা

এক কৌতূহলী পাঠিকা [কৌতূহলী ছাড়া কি পাঠিকা হয়?]—যূথিকা তাঁর নাম—কৌতূহল প্রকাশ করেছেন আমার সর্বপ্রথম বাংলা রচনার বিষয়ে।

রচনা বলতে কি বোঝায়? আমার বাক্সে এক জাবদা খাতা আছে খসড়ার; তাতে পাবেন সাধু ভাষায় পুনর্লিখিত 'টুনটুনির বই', চলিত ভাষায় অনূদিত 'ছোটদের রামায়ণ' 'রাজর্ষি' উপন্যাসের স্বকৃত সংক্ষিপ্ত সার...আর প্রতি পাতায় অবশ্য দেখবেন মাস্টারের লাল কালির দাগ।

আসলে কিন্তু ঐ খাতায় রক্ষিত আমার প্রথম পাঠোপযোগী রচনা হল—কোনো এক পাড়ার কোন এক ক্লাবের ছেলেদের কি-যেন-এক হাতে-লেখা ম্যাগাজিনে 'প্রকাশিত' এক অতি প্রচলিত ফরাসী 'বড়দিনের গল্প'; রহস্যময় উপহার।

কৌতূহলী পাঠিকার উদ্দেশে টুকে দিলাম। বলা বাহুল্য, মাস্টারের সংশোধন অন্তর্গত হয়েছে; দোহাই আপনার, অসংশোধিত সংস্করণ ছাপতে বলে লজ্জা দেবেন না।

যীশুর গোশালা ত্যাগ করিয়া রাখালেরা মেষপালের কাছে ফিরিয়া গিয়াছে। মাতা মারীয়া খড়গুলো গুছাইতেছেন, শিশুটি নিশ্চিন্তে ঘুমাইতে পারিবেন...

কিন্তু আজ বড়দিন, এই কি ঘুমাইবার সময়?

...ধীরে ধীরে দরজাটা খুলিয়া গেল, চৌকাঠের কাছে এক বৃদ্ধাকে দেখা গেল। শুষ্ক ম্লান মুখ, কপোলে কুঞ্চিত জরাচিহ্ন চুলগুলি ধবধবে সাদা, পরনে তালি-মারা থান কাপড়।

গাধা ও গরুটা খড় চিবাইতে চিবাইতে আগন্তুকের প্রতি শান্ত দৃষ্টিতে চাহিতে ছিল; বৃদ্ধা যেন তাহাদের কতকালের চেনা। মারীয়া কিন্তু...

মারীয়া ভয়ার্ত নয়নে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন : কে এই সাক্ষাৎ যমদূতী? শিশুর কোনো অমঙ্গলসাধনই কি তাহার অভিপ্রায়?...প্রত্যেক মুহূর্তে মারীয়ার এক

শতাব্দী বলিয়া বোধ হইতেছিল। তিনি কিন্তু কোনো বাধাই দিতে পারিলেন না।

ধীর, ক্ষুদ্র পদক্ষেপে বৃদ্ধা আসিয়া পৌঁছাইল জাবপাত্রের কাছে। ভাগ্যবশত যীশু তখন ঘুমাইতেছিলেন। কিন্তু আজ বড়দিন, এই কি ঘুমাইবার সময়?

হঠাৎ শিশুর চোখের পাতা খুলিয়া গেল। মারীয়া বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, যীশু ও বৃদ্ধার চোখে এক গভীর সাদৃশ্য—একই আশার শিখা জ্বলিতেছে উভয়ের দৃষ্টিতে।

বৃদ্ধা যীশুর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। মারীয়া দেখিতে পাইলেন তাহার হাতে এক জীর্ণ থলি। থলির মধ্যে হাত ঢুকাইয়া হাতড়াইতে লাগিল বৃদ্ধা, অনেকক্ষণ বিস্মৃতির অতল হইতে স্মৃতির দুরেকটা মানিক খুঁজিয়া লইবার জন্য মানুষ যেমন হাতড়ায়। তাহার দিকে মারীয়া অপলক চাহিয়া রহিলেন। জন্তু দুইটিও চাহিতেছিল, কিন্তু তাহাদের চক্ষে কোনো বিস্ময়ের ভাব ছিল না, হয়তো তাহারা যাহা ঘটিবে সে সম্বন্ধে অনুমান করিতে পারিয়াছিল।

যেন বহু যুগ পরে বাঞ্ছিত বস্তুটি খুঁজিয়া পাইল বৃদ্ধা, গোপনে হাতের মধ্যে চাপিয়া উৎসর্গ করিল শিশুর কাছে।

রাখালদের স্তূপীকৃত উপহারগুলির উপরে এ নূতন উপহারটি আবার কি? মারীয়া যেখানে ছিলেন সেই স্থান হইতে স্পষ্ট করিয়া কিছুই দেখা সম্ভব না। বয়সের ভারে ভাঙিয়া-পড়া একটি পৃষ্ঠদেশ

থলির মধ্যে হাত ঢুকাইয়া হাতড়াইতে লাগিল...

জাবপাত্রটির উপরে নত হইয়া আছে ইহা ছাড়া তাহার চোখে আর কিছুই পড়িতেছে না। গাধা ও গরুটা দেখিতেছে সব, তবু তাহাদের দৃষ্টিতে বিস্ময়ের কোনো চিহ্ন নাই।

দীর্ঘকাল পরে বৃদ্ধাটি খাড়া হইয়া উঠিল, যে বোঝা তাহাকে মাটিতে আকর্ষণ করিতেছিল, সেই বোঝা যেন নামিয়া গিয়াছে। কোথায় এখন তাহার ধনুকের মতো বাঁকা কাঁধ?......তাহার মাথা এখন ঘরের চালটা স্পর্শ করিতেছে...তাহার মুখে পুনঃপ্রাপ্ত যৌবনের আভা।

জাবপাত্রটা ত্যাগ করিয়া সে যখন দরজার অভিমুখে অগ্রসর হইল। রাত্রির অন্ধকারে মিলাইয়া যায়, মারীয়া তখন দেখিতে পাইলেন, এই রহস্যজনক আগন্তুক উপহারটা কি।

ইভ্—হাঁ, আদি মাতা ইভ্‌ই—শিশুর হাতে রাখিয়া গেল একটি আপেল ফল, প্রথম পাপের আর পরবর্তী সমস্ত পাপের আপেল ফল। সদ্যোজাত শিশুর হাতে ছোট রাঙা আপেলটি আমাদের পৃথিবী গোলক বলিয়া মনে হইতেছিল।

বৃদ্ধা যেন যীশুর সঙ্গে বড়দিনের রাতে নবজন্ম লাভ করিয়াছে।

বিদায় সাধু

...এই আমার প্রথম পূর্ণাঙ্গ রচনা—এবং সাধু ভাষায় সর্বশেষ। আমার তৎকালীন গৃহশিক্ষক আমাকে বলেছিলেন, নব্য আর্টের ভিত্তি যেমন ক্লাসিক্যাল আর্ট, ফর্ম ভাঙতে গেলে ফর্মটাই যেমন আগে শিখতে হয়,—চলিতের জটিলতায় প্রবেশের পাসপোর্ট তেমনি সাধু ভাষায় প্রাঞ্জল পটভূমি। তা হবে। হয়, কেন যেন চলিতের দিকেই প্রবণতা ছিল বরাবর। নিজে নিজেই পত্রপত্রিকা, বই টই পড়ে চলিত চর্চা শুরু করে দিয়েছিলাম। ভালো লাগত তার গতি ও নমনীয়তা; বোকিয়ে-চুরিয়ে ইচ্ছেমতো লেখার স্বাধীনতায় উত্তেজনা জাগতো; আর সেই উত্তেজনার আধিক্য রচনাতেও দেখা দিত নানারকম বিপর্যস্ত বিন্যাসের আধিক্য। কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া নিয়ে ওলটপালট করার সে কি মজা!

এক গুরুস্থানীয় প্রাচীনপন্থী বন্ধু—পরেশবাবু তাঁর নাম—ঠাট্টা করে কাকে যেন বলেছিলেন, "কাদেরের লেখায় তো বড্ড বেশি ইনভার্সান্...'সে ভাত খেয়েছে' উনি লিখতে পারেন না, লেখেন, 'ভাত খেয়েছে সে।'" আমি পাল্টা ঠাট্টা ঠাটে কৌতুকপ্রদ এক তালিকা তৈরি করে বলেছিলাম সবগুলোই লিখব:

"ভাত খেয়েছে সে; এখন ঘুমোতে যাবে লেপ মুড়ি দিয়ে। সে খেয়েছে ভাত; ওরা খেয়েছে কোমা কালিয়া। খেয়েছে ভাত সে, কিন্তু খেয়েই বমি। ভাত সে খেয়েছে: খায় নি মিষ্টান্ন, ছোঁয় নি ব্যঞ্জন। খেয়েছে সে ভাত, বসে বেড়াচ্ছে পরমান্ন..."

—কৃত্রিম বই কি! এখন বুঝি, বাড়াবাড়ি। চুল পেকেছে আজ, দাঁতও নড়ো-নড়ো, শিখেছি সংযম। পরেশবাবু আর নেই... স্বর্গে যদি দেখা যায়, 'ছেঁড়া পাতা' পড়ে উনি হয়তো স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলেন, "শেষ পর্যন্ত আর পাঁচজনের মতো লিখতে শিখেছে।"

২০০০-এর পৃথিবী

আন্তর্জাতিক সংস্থার অতি সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, গত ১৯২০-র পর পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫০-এর পর লোক সংখ্যা বেড়েছে প্রায় একশ' কোটি। আর ১৯৬৮ সালেই বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ছয় কোটি তিরিশ লক্ষের মত। বর্তমানে পৃথিবীর জনসংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে তিনশ' পঞ্চান্ন কোটিতে। একটি হিসেবে বলা হয়েছে, যদি কোন দুর্বিপাক না ঘটে এবং নিয়মিত রীতিতে নতুন মুখের আবির্ভাব চলতে থাকে তাহলে ১৯৮০-র মধ্যে এই পৃথিবীর আকাশ বাতাস মানুষের কল-কোলাহলে আরও মুখরিত হয়ে উঠবে। কারণ তখন জন-সমুদ্রের পরিমাণ গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় সাত শ' কোটির মত। ২০০০-এর পৃথিবী আরও ভারাক্রান্ত।

অতএব?

ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে সমাজ বিজ্ঞানী থেকে শুরু করে মানুষের দৈনন্দিন সমস্যার সমাধানের জন্যে দিন রাত যাঁরা মাথা ঘামাচ্ছেন তাঁরাও রীতিমত চিন্তিত না হয়ে পারছেন না। নৃতত্ত্ববিদদের মতে, মানুষের সংখ্যা বাড়ার সংগে সংগে সব চাইতে ধাক্কাটা যার উপর বেশি এসে পড়ে সে হল আমাদের চারপাশের প্রাকৃতিক জগত। জীবন ধারনের ন্যূনতম প্রয়োজন, অর্থাৎ যা না হলে কোন প্রাণীর পক্ষেই তার অস্তিত্ব বজায় রাখা শক্ত, তা হল, খাদ্য এবং বাসস্থান। মানুষের ক্ষেত্রে এ দুটি মৌলিক প্রয়োজন ছাড়াও আছে আরও শতেক চাহিদা। আর সে চাহিদার মূলে উৎসও প্রকৃতি-জগত। প্রকৃতির সংগে দৈনন্দিন সংঘাতই মানুষকে ক্রমে কৃত্রিম করে তোলে। জীবন নামক সামগ্রীটির সহজ প্রকৃতি ক্রমে জটিল থেকে জটিলতর হয়। সংগে সংগে দেখা দেয় হাজারো সমস্যা। খাদ্য এবং বাসস্থান ছাড়াও তার আছে হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা—তার মানসিক বৃত্তিকে যথাযথ রূপদানের স্বাভাবিক চেষ্টা। সম্ভবত দ্বিতীয় এই চরিত্রটিই সমাজ-বিজ্ঞানীদের কাছে আজ সবচাইতে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ'রা মনে করেন, ২০০০-এর মানুষ হৃদয় এবং প্রবৃত্তির দিক দিয়ে বর্তমানের তুলনায় আরও জটিল হয়ে উঠবে। তারা বাঁচার তাগিদে জোরে জোরে ছুটবে, দ্রুত কথা বলবে এবং তাদের চাহিদা মেটাতে গিয়ে তখন যন্ত্র সভ্যতা যেহেতু আরও যান্ত্রিক হয়ে উঠবে, অতএব তখনকার লোকগুলিও হয়ে যাবে আরও অস্বাভাবিক। তখনকার সামাজিক চিত্রটি যদি এই মুহূর্তে আমরা বুঝে নিতে না পারি এবং সেইভাবে চলতে না শিখি তাহলে মানুষের মধ্যে অপরাধ-প্রবণতাও দারুণভাবে বেড়ে যাবে। জনৈক অপরাধ বিজ্ঞানীর মতে, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে যে সমস্ত হীনতম অপরাধের ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, সে তুলনায় আজকের দিনের অপরাধমূলক কার্যাবলীর যেন তুলনাই হয় না? শুধু মানুষ খুনের ব্যাপারেই না কত রকমের জটিল কৌশল আমরা লক্ষ করছি। শুধু খুনেই নয়, আরও নানা রকম অপরাধ প্রবণতায় যে সমস্ত উদ্ভাবনার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে বছর কুড়ি আগেও অনেকে তা কল্পনাও করতে পারেন নি।

সমস্যা আরও আছে। ২০০০-এর হাজারো সমস্যার কথা ভাবলে হয়ত বর্তমানের বেঁচে থাকাটাই বিস্বাদ হয়ে যাবে। তবে কিছু কিছু আশাবাদীর বক্তব্য,

যারা ২০০০-এর মানুষ তাদের বাসস্থান হবে হয়ত এমনই একটি অট্টালিকা। এটির উচ্চতা হবে ১২৫০ মিটার। অর্থাৎ প্যারীর ইফেল টাওয়ার (৯৮৫ ফুট)-এর চারগুণ। ৩৫৬ তলা এই বাড়িতে বাস করবে ২৫০০০ মানুষ

এখনই অতটা নাই বা ভাবলেন ? এ'রা করেন, যদি আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার ারে পারস্পরিক সহযোগিতা বজায় , তখনকার পৃথিবীর চেহারাটি হয়ত তরও হওয়া সম্ভব। সম্প্রতি ানিক'-এ অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে আশাবাদী বিজ্ঞানী ভবিষ্যতের বীকে স্বর্গের সঙ্গে তুলনা করতেও পিছ্পা হন নি। এ'রা বিভিন্ন রকমের সমস্যার কথা নিয়ে আলোচনা করেছেন। সেই সঙ্গে তাদের সমাধানের পথটিও নির্দেশ করেছেন।

খাদ্যের কথাই ধরা যাক। ইতিমধ্যে এই সমস্যাটির সমাধানের ব্যাপারে রসায়ন শাস্ত্র নানাভাবে আমাদের সাহায্য করেছে। যে সমস্ত দেশ যন্ত্রশিল্পে এগিয়ে রয়েছে সেই সব দেশের কৃষিজাত উৎপাদন গত একশ' বছরের তুলনায় প্রায় চার গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। শুধু সারের কথাই ধরুন। উদ্ভিদের পুষ্টির জন্যে চাই অতিরিক্ত পরিমাণ পটাস এবং ফসফেট। পৃথিবীর সঞ্চিত ভাণ্ডারে এদের পরিমাণ এত বেশী যে এদের যতটা ইচ্ছে ততটা নির্বিবাদে এবং সহজ পদ্ধতিতে আমরা

সংগ্রহ করে নিতে পারি। আর নাইট্রোজেন? অধ্যাপক বার্নহার্ড টিম মনে করেন, বর্তমানে সারা পৃথিবীতে ঠিক যেভাবে বছর প্রতি আমরা দু' কোটি সত্তর লক্ষ টন নাইট্রোজেন ঘটিত সার উৎপাদন করে থাকি, ২০০০ খৃষ্টাব্দে ঐ একইভাবে নয় থেকে সাড়ে নয় কোটি টন নাইট্রোজেন ঘটিত সার উৎপাদন করা সম্ভব হবে। তখনকার চাহিদা মেটানর ব্যাপারে এটাই যথেষ্ট। এই সঙ্গে কীট পতঙ্গের হাত থেকে ফসলকে যদি আমরা রক্ষা করতে পারি, শুধু এতে করেই আরও শতকরা তিরিশ ভাগ ফলন বাড়িয়ে তোলা যেতে পারে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অতিরিক্ত এই বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়াতে পারে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ। এ ব্যাপারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা প্রধানত দু রকমের পথ বেছে নিয়েছেন। এক. কৃত্রিম উপায়ে ফসল ধ্বংসকারী কীটদের মধ্যে বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি করা. দুই. ফসলের মধ্যেই এমন ক্ষমতা সৃষ্টি করা যাতে করে কোন কীটই তাদের সংস্পর্শে এসে কোন ক্ষতি না করতে পারে। এ ছাড়াও কৃত্রিম পদ্ধতিতে ফসলে অতিরিক্ত প্রোটিন এবং চিনি জাতীয় খাদ্য সৃষ্টির ক্ষমতা যাতে বৃদ্ধি পায় তারও চেষ্টা করা হচ্ছে। মাটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্যে ইউরিয়া-ফরমালডিহাইড ব্যবহার করে গাছপালার বৃদ্ধিকে সহজে ত্বরান্বিত করা যায়। অতএব এ ধরনের অভিজ্ঞতা তখনকার দিনে মূল্যবান বলেই বিবেচিত হবে। এ ছাড়াও বিভিন্ন খনিজ পদার্থ থেকে প্রোটিন জাতীয় পদার্থ তৈরি করাও তখন অসম্ভব হবে না। সম্প্রতি ভারত এবং পৃথিবীর আরও নানা দেশে পেট্রোলিয়াম থেকে প্রোটিন তৈরি করার কাজ শুরুও হয়ে গেছে। এই সঙ্গে আছে সমুদ্রজাত প্রোটিনের অফুরন্ত ভাণ্ডার।

জ্বালানির জন্যে তখন মানুষকে নির্ভর করতে হবে পারমাণবিক অথবা সৌর শক্তির উপর। এ দুটিও তখন কোন বড় রকমের সমস্যা হয়ে থাকবে না। তবে হ্যাঁ, যান-বাহন, ঘর-বাড়ি অগণিত মানুষের চাহিদা মেটানর জন্যে তাদের নানারকমের সংস্কার সাধন করার দরকার হবে। নগর পরি-কল্পনার ব্যাপারে স্থপতিদের হতে হবে অনেক বেশী তৎপর। তাঁদের এমন ধরনের বাড়ি তৈরি করতে হবে যার এক একটিতে কয়েক হাজার মানুষ সহজে বাস করতে পারে। প্রয়োজনে সেই বাড়ির মধ্যেই হয়ত থাকবে অফিস-কাছারি, গৃহস্থালী, বাজার, খেলার জায়গা, পার্ক, বাগান বা সাঁতার কাটার মত জলাশয়। দরকার হলে যান-বাহনের ব্যবস্থাও। ইতিমধ্যে সমাজ-বিজ্ঞানীরা গবেষণা শুরু করে দিয়েছেন ২০০০-এর পৃথিবীর সমাজ চিত্রটি আবিষ্কারের উদ্দেশে। এঁদের মতে সেই
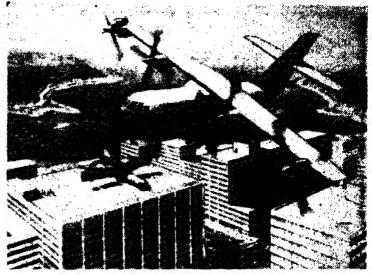
বি ও-১৪০। মিউনিকে তৈরি চার ইঞ্জিনের এই প্লেনটি আশী থেকে একশজন আরোহী বহন করে ঘণ্টায় ৭৮৮ কিলোমিটার বেগে উড়তে পারবে। এর পঁচিশ মিটার লম্বা ডানাটিকে ঘুরিয়ে ইঞ্জিনগুলিকে আকাশের দিকে মুখ করে রাখা যায়। ইঞ্জিনের পাখাগুলি তখন হেলিকপ্টরের পাখার মত প্লেনটির পিঠের উপর ঘুরতে থাকে। হেলিকপ্টরের মতই ছাদে এসে নামতে পারে। বাঁ পাশে ছাদের উপর দাঁড়ান প্লেনটি লক্ষ্য করুন

জনজগতি সময়ে মানুষের মন এবং মেজাজ কেমন অবস্থায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে যদি আগে থেকে জেনে নেওয়া সম্ভব হয় এবং এখন থেকেই তাদের মধ্যে সুসঙ্গতি রাখার মত পরিকল্পনা রচনা করে সেই মত কাজ করা হয়, তাহলে সেদিনের পৃথিবী অনাকাঙ্ক্ষিত নাও হতে পারে.

বিচিত্র হাত

ফিলাডেলফিয়া টেম্পল বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন বিজ্ঞানী একটি অভিনব যান্ত্রিক হাত তৈরি করেছেন। সাধারণ হাতের মতই এই হাতটি নিয়মিত কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারবে। এর জন্যে চাই সামান্য বিদ্যুৎ শক্তি। তাহলেই কাজ চুকে যাবে।

বিকলাঙ্গের কোমরের পেছনে এই যন্ত্রটি বেঁধে দেওয়া হয়। এতে আছে দশটি তড়িৎ-সংযোগ ব্যবস্থা। এর মধ্যে দিয়েই তার ইচ্ছে শক্তি বৈদ্যুতিক স্পন্দনরূপে প্রবেশ করে। যন্ত্রটি বৈদ্যুতিক ক্ষমতাকে প্রায় একশ গুণ বাড়িয়ে দেয় এবং তার বাহু সঞ্চালনে সাহায্য করে

বাইরে থেকে কোন রকম যান্ত্রিক কৌশলের সাহায্য না নিয়ে আমাদের মস্তিষ্কের উদ্দীপনাকে শরীরের স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে ইচ্ছেমত প্রবাহিত করে ঠিক যেভাবে আমরা দেহের পেশীগুলি সংকুচিত বা সম্প্রসারিত করে কাজ চালাই, এই হাতও ঠিক অনুরূপ পদ্ধতিতে কাজ করে যাবে। তিনজন বিকলাঙ্গের দেহে হাতটি জুড়ে দিয়ে আশানুরূপ ফলও পাওয়া গেছে।

বিকলাঙ্গদের দেহে কৃত্রিম হাত পা প্রভৃতি জুড়ে দিয়ে তাদের কর্মক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলার জন্যে ইতিমধ্যে নানারকমের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান হয়েছে। এই কৃত্রিম উপাঙ্গগুলির বেশির ভাগই তৈরি করা হয় সাধারণ যন্ত্র-বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে। কিছু ইস্পাতের তার, কপিকল অথবা কাঠ এবং লোহার সাহায্যে যথেষ্ট কৌশল অবলম্বন করে তাদের তৈরি করতে হয়। সেই সঙ্গে উপাঙ্গগুলিকে প্রয়োজন মত ব্যবহার করার জন্যে চাই প্রচুর অনুশীলন। আর এই অনুশীলন শুধু কষ্টসাধ্যই নয় অনেক সময় সতর্কতার সামান্যতম অভাবের দরুন বেশ কিছুটা ঝুঁকিও পোহাতে হয়। কারণ মগজের সঙ্গে সেই সমস্ত উপাঙ্গের প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক থাকে না। সে যেন বাঁধি ব্যবহার করে নেহাতই একটি যন্ত্র চালিয়ে যাওয়া।

কিন্তু ধরুন এমন যদি হয়, কারুর দেহের কোন স্থানে একটি মশা গিয়ে বসল এবং সেই মশা দেহে দংশনও করল, তখন? সেই দংশনের অনুভূতি সরাসরি আমাদের মস্তিষ্কে গিয়ে পৌঁছয় এবং মস্তিষ্কই স্নায়ু তন্ত্রের সাহায্যে উৎপাতটিকে তাড়িয়ে দেবার জন্যে এমনভাবে দেহের বিশেষ বিশেষ জায়গার পেশীগুলি সঞ্চালিত করতে থাকে যার ফলে তার কোন একটি হাত সচল হয়ে ওঠে এবং মশাটিকে লক্ষ্য করে চপেটাঘাত করে। ব্যাপারটা অত্যন্ত দ্রুত এবং এত সহজে ঘটে যায় যে অনেক

জর্জ বেনডার নতুন হাতটি দিয়ে নিজের নাম লিখছেন

সময় ঘটনার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কেউ কেউ বুঝতেই পারেন না, তিনি সত্যি তাঁর দেহের কোন স্থানে আঘাত করে বসলেন। প্রচলিত যান্ত্রিক উপাঙ্গদের দিয়ে এইভাবে কাজ করিয়ে নেয়া এতদিন সম্ভব ছিল না।

ফিলাডেলফিয়ার বিজ্ঞানীদের কৌশলটি অভিনবত্বের দিক দিয়ে খুবই চমকপ্রদ। এর জন্যে এই হাতটি যিনি ব্যবহার করেন প্রথমে তাঁর বুক, কাঁধ, বাহুর উপরের অংশ এবং পিঠের কয়েকটি বিশেষ স্থান চিহ্নিত করে নেয়া হয়। এই সমস্ত জায়গার পেশীই হাত বা বাহুর সঞ্চালনকে নিয়ন্ত্রিত করে। চিহ্নিত স্থানগুলিতে পরে কয়েকটি তড়িৎ-দ্বার বা ইলেকট্রোড জুড়ে দেওয়া হয়। বিকলাঙ্গ ব্যক্তি হাত দিয়ে যখন যা করতে চান তাঁর সেই ইচ্ছে বৈদ্যুতিক স্পন্দনরূপে স্বাভাবিক শারীরিক পদ্ধতিতে মস্তিষ্ক থেকে চলে আসে সুষুম্নাকাণ্ড বা 'স্পাইনাল কর্ড'-এ। এবং শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে পেশীর চিহ্নিত অঞ্চলে অবস্থিত স্নায়ুগুলির উপরে ঠিক যে যে জায়গায় তড়িৎ-দ্বারগুলি বসানো থাকে সেখানে। স্নায়ুর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত বৈদ্যুতিক সংকেতকে তড়িৎদ্বার মুহূর্তের মধ্যে মস্তিষ্কের ভাষায় রূপান্তরিত করে পাঠিয়ে দেয় চারটি ছোট ছোট মোটরে। মোটরগুলি সংগে সংগে সচল হয়ে ওঠে এবং মস্তিষ্কের নির্দেশমত কাজ শুরু করে দেয়। ঠিক যে শারীরিক পদ্ধতিতে মগজ দেহের অংগ-প্রত্যংগ সঞ্চালন করে এই হাতটিও ঠিক

দেহের যে পেশীগুলি বাহু সঞ্চালনে সাহায্য করে জনৈক বিশেষজ্ঞ তাদের চিহ্নিত করছেন

সেইভাবেই সঞ্চালিত হয়। এ পর্যন্ত এর দ্বারা থুতনি ঝাঁকিয়ে আপনাআপনি নড়াচড়া থেকে প্রায় আট রকমের অঙ্গ সঞ্চালন করা সম্ভব হয়েছে।

রক্তচাপ রোগের অভিনব চিকিৎসা

রক্ত-চাপ আধিক্য রোগে যাঁরা ভোগেন থাকেন তাঁদের উঁচু কোন জায়গায় গিয়ে বাস করা বারণ। প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতিতে সব সময় তাঁদের সাবধান করে দেওয়া হয় তাঁরা যেন কখনই কোন উঁচু পাহাড়ে জায়গায় গিয়ে চলাফেরা না করেন। এবার নতুন একদল চিকিৎসা বিজ্ঞানী কিন্তু উল্টো কথা বলতে শুরু করে দিয়েছেন। পশ্চিম জার্মানীর সালসবর্গ-এর স্বাস্থ্যরক্ষা গবেষণাগার কয়েকটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং চিকিৎসা ভবনের সঙ্গে সহযোগিতা করে কয়েকটি পাহাড় অঞ্চলে রক্ত-চাপের আধিক্যে ভুগছেন এমন কয়েকটি রোগীকে নিয়ে গবেষণা চালিয়ে অভূতপূর্ব সাফল্য পেয়েছেন বলে দাবি করছেন। রক্ত-চাপের মাত্রা অনুসারে তাঁরা বিভিন্ন রোগীকে ৫৫০০ থেকে ৭০০০ ফুট উঁচু অঞ্চলে নিয়ে যান। এখানে চার সপ্তাহের মত তাঁদের বসবাস করার ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণ ক্ষেত্রে এতটা উঁচু জায়গায় গিয়ে বাস করা কোন রোগীর পক্ষে কিন্তু নিরাপদ নয় বলেই বিবেচিত হয়ে থাকে।

প্রচলিত এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটালেন নতুন এই চিকিৎসক দল। যোলজন রোগীকে তাঁরা যে শুধু পাহাড়ের চূড়োর উপর তুললেন তাই নয়, তাঁদের নিয়মিত ব্যায়াম করতে বলা হল। চার সপ্তাহ ধরে ঐ উঁচু জায়গায় এক একজনকে গড়ে মোট নব্বই থেকে একশ কুড়ি মাইল পর্যন্ত হাঁটান হয়। সেই সঙ্গে রোজ সকালে উঠে আধ থেকে একঘণ্টা পর্যন্ত ব্যায়াম। তারপর জলের সাহায্যে অঙ্গসংবাহন বা ম্যাসেজ করা এবং গায়ের চামড়া ডলাই-মলাই। দৈনন্দিন নিয়মের মধ্যে যাতে বিঘ্ন না ঘটে অর্থাৎ সাধারণভাবে যিনি যেভাবে জীবন ধারণ করতে অভ্যস্থ, সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হয়। সাধারণভাবে তাঁরা যে ধরনের খাবার খান তাঁদের তাই দেওয়া হল। যাঁরা ধূমপান করেন তাঁদের ধূমপানে বাধা দেওয়া হয়নি। এমন কি পানীয়র ক্ষেত্রেও কোন বিধি-নিষেধ ছিল না। শুধুমাত্র যেটুকু ব্যতিক্রম তা হল এতদিন ধরে যে ওষুধটি খেয়ে নিয়মিত তাঁরা নিজেদের রক্ত-চাপকে স্বাভাবিক রাখতে চেষ্টা করে এসেছিলেন, সেটা বন্ধ করে দেওয়া হল। অতিরিক্ত শীত এবং অতিরিক্ত গরমের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে পরীক্ষাটি চালান হয় সেপ্টেম্বর মাসের মৃদু-নাতিশীতোষ্ণ পরিবেশে।

চার সপ্তাহ পর কিন্তু অদ্ভুত ফল পেলেন রোগীরা। উঁচু পাহাড় অঞ্চলে নিয়মিত ব্যায়াম এবং পরিশ্রম করে রোগ তো তাঁদের বাড়লই না, বরং তাঁদের স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি দেখা গেল।

এই চিকিৎসা পদ্ধতির উদ্ভাবক সালজবর্গ ইনসটিটিউটের অধ্যাপক কার্ল ইনামা।

সমরজিৎ কর

শ্রীচরণেষু—মাকে ॥ তিন ॥

[ক]

ওই শোক কখনও শান্ত-সংযত থাকত, কখনও-বা মাত্রা ছাড়াত, দিনের পর দিন এই দেখেছি। শীতের দিন তবু চট করে ফুরিয়ে যেত, কিন্তু গরমের লম্বা দিন আর কাটতে চাইত না। খুব ধুলো উড়িয়ে দোলের দিন এল গেল, কত রঙ মাখামাখি, কত ঢোলক, রাস্তায় কী উৎকট চিৎকার আর মাতামাতি, কিন্তু আমাদের বাড়িটা তার বিরস বিধবার চেহারা ধরেই রইল, একটু আবির কিনে এনে তোমাকে প্রণাম করব যে, আমার সেই সাহসও হল না। শেষে দুপুরের পরে, সবাই যখন ফিরে যাচ্ছে, তখন আমি আর থাকতে পারলাম না, বললাম, "মা, একটু রঙ কিনে আনি?" তুমি যেন ভয় পেলে।—"খেলবি?" —"না, তোমার পায়ে দেব শুধু।" আমি তাকিয়ে আছি, তুমিও কিছু বলছ না, অনেক পরে আস্তে আস্তে বললে, "যা।" টাকা হাতে দিয়ে বললে "ওই সঙ্গে বাজার থেকে ঘি রঙের কয়েক গাছি ডি এম সি সুতো কিনে আনিস।

তোমার হাতে বোনা চমৎকার কারুকার্য করা লেখাটা কত দিন আমাদের ঘরের দেয়ালে ঝোলানো ছিল বলো তো। ধবধবে এক খণ্ড লংক্লথ পাট পাট করা আমাদের বাড়িতেই ছিল, আমি রেশমী সুতো এনে দিলাম, তুমি সেদিনই বোধ হয় ছুঁচ নিয়ে বসলে। তোমার বয়স তখন কত আর— হিসাব করে দেখছি তিরিশ কি বত্রিশ। চশমা লাগত না।

চার পাশে লতা-পাতার নকশা হল, কোণে কোণে পাখি। বিকালে সুধীরমামা এলেন।

"ওটা কী করছ?"

একটু অপ্রতিভ হলে বোধ করি। নকশাটা টানটান করে ধরে বললে, "কেমন হয়েছে বলো না।"

লাঠির উপরে ভর দিয়ে একটু ঝুঁকে সুধীরমামা বললেন, "চমৎকার। কিন্তু কেন। কার জন্যে, তা-তো বললে না।"

"দিন যে কাটতে চায় না, সুধীরদা। তাই ভাবছিলাম, ওর জন্যে, ওর কথা ভেবে একটা কিছু করি।" (দাদার একটা নাম ছিল, কিন্তু সে চলে যাবার পর তার নামটা তুমি সহজে মুখে আনতে চাইতে না, হয়ত তোমার জিভের ডগা জ্বলত)।

সান্ত্বনার স্বরে, যেন সান্ত্বনা নয় একটা মলম, কথাগুলো আঙুল, সেইভাবে প্রলেপ দিতে দিতে সুধীরমামা বললেন, "ভুলতে পারছ না?"

মাথা নাড়ছিলে তুমি। মানে, বলা হয়ে গেল, একদম না। "ভোলা সম্ভব না। ভুলে থাকতে যদি পারি।"

তখনই বুঝি কী খেয়াল হল তোমার, গলায় আঁচল ফিরিয়ে প্রণাম করলে সুধীরমামাকে। ওঁর পায়ে বাজার থেকে যে-আবির কিনে এনেছিলাম, তার প্রায় সবটাই ঢেলে দিলে।

পরে নকশাকাটা কাপড়টার মাঝখানটা দেখিয়ে দিয়ে বললে, "এইখানে ওর উদ্দেশে কিছু লিখে দেওয়া যায় না? তুমি তো অনেক পড়েছ সুধীরদা, কয়েকটা লাইন বলে দাও না, কোনও কবিতার গোটা কয়েক উপযুক্ত লাইন?"

সুধীরমামা পরদিন এনে দিলেন একখানা বই। তারই একটা পাতা থেকে

হেথা হতে দূরে দূরে
স্বরগে, অমর পুরে
হৃদয়ের ধন মম কত দিন গিয়েছে।
না, না, না, যায়নি সে তো,
তারা ধরে নিয়েছে॥
সে-সব মরমে রোক
আমারি পরাণে শোক,
সে-আগুন এ-হৃদয়ে জ্বলিতেছে, জ্বলিবে
কাজ কি দেখায়ে পরে, কার বুকে বাজিবে॥

মনে আছে, বইটার নাম "কাব্যকুসুমাঞ্জলি।" স্বামীবিরহাতুরা নারীর বাণীকে পুত্রশোকাধীরা মাতার কথা করে তুলতে একটু বদলে নিতে হয়েছিল।

তারপর দাদার একটা ফটোও না খুব বড়ো করে বাঁধানোও হল! রোজ টাটকা ফুলের মালা দেওয়া হত তাতে. ফুল আমি আনতাম, তুমি গেঁথে তুলতে। সুধীরমামা আসতেন, দেখতেন। মাথা নাড়তেন, যেন তোমার বেদনা স্পর্শ করছে তাঁকে। বলতেন, "একটুও ভুলতে পারছ না?"

তুমি চমকে উঠে বলতে "না, না!" হিংসায় নয়, তখন সমব্যথায় আমিও আর্ত হয়ে পড়তাম। আজ কিন্তু একটু খটকা লাগছে মা। "না—না" বলে কী অস্বীকার করতে তুমি, ভুলতে না পারাটা, নাকি একটু-একটু করে যে ভুলতে শুরু করেছিলে, সেই কথাটা? শোকের গাঢ় রঙ কি একটু ফিকে হয়ে আসছিল, তাই কি স্মৃতি নিয়ে অত ঘাঁটাঘাঁটি, ফ্রেমে বাঁধিয়ে উঁচু করে ধরা, মন্ত্রজপের মাত্রা বাড়ানো দরকার হয়ে পড়ছিল?

তখন বুঝিনি তাই জিজ্ঞাসা করিনি। আজ ধারণাটা কেন্নোর মত নড়ছে, কিন্তু জেনে নেবার উপায় নেই, উপায় তুমি রাখোনি।

বাবাকে বোধহয় তার দিন কয়েক পরেই দেখা গেল।

সে-ও হঠাৎ। শীতকালে যেমন শরীরের চামড়া ফাটে, আর প্রখর জ্যৈষ্ঠে মাঠ, আমাদের সংসারেও তখন থেকেই তেমনই কেমন-কেমন সব ফাট ধরতে থাকল, অন্তত তুমি যেভাবেই দ্যাখো, আমি ওই ভাবেই দেখেছিলাম। ভালো হোক মন্দ হোক, এতদিন একভাবে চলছিল, সেই ধরনটাই জানতাম অভ্যাস, সেই ধরনটাই জানতাম নিয়ম, কিন্তু বাবা আসতে কী যেন বদলে গেল, একটু আলাদা রকম, আমি সবটাকে মেনে নিতে পারছিলাম না।

(মা, তুমি কি কিছু মনে করবে যদি

ঘরে ঢুকেছিলে, সেই জন্যেই বোধ হয় উঠতে হল সুধীরমামাকেই। আমিও তখন বিছানায় উঠে বসেছি, খিল খোলা হল, সঙ্গে সঙ্গে সুধীরমামার গলায়, "আরে আপনি! আসুন আসুন", যাকে বলা হল তিনি প্রত্যুত্তরে ঘড়ঘড়ে গলায় কী বললেন বোঝা গেল না, হয়ত বলেননি কিছুই, খালি একবার আড়চোখে চেয়েছেন, তারপর পাশ কাটিয়ে সোজা এসে উঠেছেন শোবার ঘরে, যেখানে আমি তখনও বিছানায়।

আমি চোখ বিস্ফারিত করে দেখছিলাম তাঁকে এমন-কী সুধীরমামার পাশ কাটিয়ে যখন এগিয়ে আসছিলেন, তখনই তাঁর চেহারাটা [illegible] হয়ে গিয়েছে। মাথায় খাটো, বোধ হয় সুধীরমামার কাঁধের চেয়ে উঁচু না, কিন্তু চলনেতে, ভারী ভারী পা ফেলার ধরন, এক পাশে লাঠিতে ঝুঁকে দাঁড়ানো কৃশ, দুর্বল, বেখাপ্পা লম্বা সুধীরমামার চেহারাটা এমন কুণ্ঠিত, বিসদৃশ ঠেকছিল।

চৌকাঠ পেরিয়ে তিনি এসে দাঁড়ালেন, বিছানার সামনে, ছড়ানো ছায়ায় আমাকে প্রায় অন্ধকার করে দিয়ে, খুব উৎসুকে, তাঁর স্থির দৃষ্টিতে আমাকে দেখছিলেন। আমি দেখলাম একটি মোটা কোর্তা, পাঞ্জাবি নয় ফতুয়া, চওড়া কাঁধ, রোমশ-বলিষ্ঠ দুটি হাত, যেন দুটি থাবা, ঘন ভুরুর মাঝখানে একটা প্রায় আধ-ইঞ্চির ক্ষতচিহ্ন।

বেশিক্ষণ তাকাতে পারিনি, চোখ নামিয়ে নিয়েছিলাম। তিনি হঠাৎ পিছন ফিরে [illegible], [illegible] বলে উঠেছিলেন, "এই এদিকে এসো। [illegible] ও জানে না যে আমি ওর [illegible] গুরুজনকে প্রণাম করতে হয়, [illegible]?"

[illegible] আড়ালে একটি ছায়া পড়েছিল— [illegible]। সেই ছায়াকে আগে ঘরে পাঠিয়ে পিছু-পিছু এলে তুমি। চাপা গলায় বললে, "[illegible], কী-করে জানবে, কথাটা গায়ে লেখা থাকে না তো।"

সেই গম্ভীর গলা হেসে উঠল, মজা [illegible], না বিদ্রূপ, বলা যায় না, [illegible] পর শোনা গেল, "ঠিক বলেছ, গায়ে লেখা থাকে না, পরিচয় থাকে রক্তে, শিরায় শিরায়, রাগে রাগে।"

ইতিমধ্যে আমি প্রণাম করেছি, তিনি আমাকে তুলে নিয়েছেন দু-হাতে সাপটে, টেনে নিয়েছেন আমাকে ওঁর বুকে, আমার মাথাটা ওঁর জামার যেখানে [illegible] বোতামটা, ঠিক সেইখানে, কপালে লাগছিল, গেঞ্জি—না জানি কতদিন না-কাচা ঘামে-ভেজা ফতুয়াটার গন্ধে গা গুলিয়ে উঠছিল, তবু একটি শিহরণ, একটি রোমাঞ্চ, একটি ভয়, দুর্বোধ্য সেই অনুভূতি আর আবেশটাকে, মা, এতদিন পরে কথায় কী করে ফোটাব।

একবার মনে হয়েছিল ছাড়লে বাঁচি, কিন্তু সাহস হচ্ছিল না, তা-ছাড়া উনি ধরে রেখেছিলেন কতক্ষণ আর। আসলে সেকেন্ড কয়েক তো মাত্র, তারপর মাথা তুলেই খড়খড়ে চিবুকটা এগিয়ে আড়চোখে তাকাতেই তোমাকে দেখলাম, মা!

অল্প একটু ঘোমটা তুলে তুমি পাশেই দাঁড়িয়েছিলে। মাথায় ঘোমটা-তোলা তোমাকে সেই প্রথম দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে এদিক-ওদিক একটু ত্রস্তে চেয়ে তুমিও গড় হয়ে প্রণাম করলে।

তিনি বললেন, "থাক, থাক", তুমি উঠে দাঁড়ালে যখন, দেখি তোমার মুখে হাসি-কান্নাতে ভেজা-ভেজা, আজ ভোরের ধোয়া চিকচিকে গাছের পাতার মতন। পুরনো কথাটার খেই ধরে ধরে তুমি বলছিলে, "কী করে চিনবে, সেই একেবারে যখন ছোট্টটি, তখন দেখেছে তো! বরং চিনতে যে পারত, সে তো—"

না, এতক্ষণ এই কথাটা বলার জন্যেই বুঝি তোমার মুখে টসটসে হয়ে ছিল, "যে চিনলেও চিনতে পারত, সে তো—" শেষ হতে না হতেই তোমার মুখে যেটুকু-বা রোদ ছিল, সব মুছে আষাঢ়ের বর্ষা নামল। দরজার কাঁপা-কাঁপা কবাটটা ছেড়ে তুমি দু হাতে মুখ ঢেকে বিছানায় অসহায় বসে পড়লে। আজও তোমার সেই ফোঁপানি শুনতে পাচ্ছি।

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ছিলেন তিনি, এই মাত্র জেনেছি যিনি আমার বাবা। ইতিমধ্যেই তিনি অসহিষ্ণু, অবাক্ কোনও অপরাধভারে অস্বস্তিগ্রস্ত, তোমার কথা শুনেছেন না, অথবা চাইছেন না শুনতে।

"তুমি খবর পাওনি? তুমি জানতে না?" নম্র অথচ অকম্পিত তোমার কণ্ঠ, বাবাকে স্থির থাকতে দিচ্ছিল না। ওই ভারী-ভারিক্কী মানুষটি কেমন যেন জেরার মুখে বিপাকে পড়ে অসংলগ্ন উত্তর দিচ্ছিলেন।—"জানতাম কিনা? না, জানলাম কই আর, যখন খবর পেলাম তখন তো চলে গিয়েছি অনেক দূরে, ছাড়া পেয়েই গিয়েছিলাম হরিদ্বার, কনখল, তারপর হৃষীকেশ, সেখান থেকে কোথায় কোথায়, রুদ্রপ্রয়াগ, চামোলি, তুমি নামও জানো না। নেপালের তরাই হয়ে নেমে এসেছি বিহারে, শোনপুরে হরিহরছত্রের মেলায়, সে যে কী বিরাট ব্যাপার, তুমি কল্পনাও করতে পারো না। সে-সব গল্প করব আর একদিন, হাতি ঘোড়া লক্ষ লক্ষ মানুষের পায়ের ছাপ, তার পরে আর একটু পশ্চিমে গিয়ে সরযূ নদীতে স্নান, ভরা অমাবস্যা, মাঘের শীত, কী কনকনে জল, টলটলে, কী জানো, এবার জেল থেকে বেরিয়ে কেমন বিবাগী-বিবাগী লাগছিল, মনে হল, দেশের কাজ করব যে, তার আগে দেশটাকে তো জানা চাই, দেখলাম এই দেশটা ছড়িয়ে আছে তার তীর্থে তীর্থে, কোটি কোটি মানুষের সহজ জীবনধারায়, সরল, বিশ্বাসী মুখের রেখায়, তাকে চিনতে চেষ্টা করলাম।"

"শুধু তোমার নিজের পরিবারকে জানতে চিনতে পারলে না" তুমি বললে মৃদু স্বরে। "দেখাশোনা করে কে, সংসার চলে কী করে—"

এইবার বাবা যেন রেগে উঠলেন, রাগটার মাথা থাবড়ে, গোঁ-গোঁ ডাকা কুকুরকে লোকে যেমন নিরস্ত করে, ফোটালেন একটা ঠাট্টার হাসি, "তোমরা স্ত্রীলোক, শুধু ঘরের কোণটুকুই বোঝো। দেখাশোনার কথা বলছ?" একটু বাঁকা ভঙ্গি দেখা গেল তাঁর ঠোঁটে, বাইরের দাওয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, "দেখাশোনার লোকের তো মার অভাব ছিল নাকি! মনে তো হয় না।"

তখনই কেমন একটা দম আটকানো আওয়াজ এলো বাইরের দাওয়া থেকে। বরাদ্দ নিমের গ্লাসটি সেদিনও বাদ পড়েনি, কিন্তু তেতো রসটা হঠাৎ বুঝি গলায় আটকে গেছে।

আমরা সকলেই এসে দাঁড়ালাম বাইরে, সুধীরমামা ততক্ষণে লাঠিটা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন, বাবার দিকে তাকিয়ে কেমন বোকার মত হাসলেন; হাসলেন তো মার দিকে চেয়েও, শেষে চোখ সরিয়ে বললেন, "আমি যাই আনু, বেলা হয়ে গেল, দেখি প্রণববাবুর জন্যে যদি মাছ-টাছ—"

অপসৃত দীর্ঘ দেহটা দেখতে পাচ্ছি, মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে-পড়া, সুধীরমামা চলে যাচ্ছেন।

মম শির/শির নেহারি আমার, নত ওই শিখর হিমাদ্রির!' শুনিসনি?"
াঠের পুতুলের মত মাথা নেড়ে বললাম া।"

-"ওই মধুর মুরতি কবিতাটা ক কে শিখিয়েছে? পড়ার বইয়ে ?"

লাম, "হ্যাঁ।"

—"কিন্তু এভাবে ঢঙ করে পড়তে শিখিয়েছে কে?"

—"সুধীরমামা।"

—"কে? ও। তোকে পড়ায় বুঝি?"

—"হ্যাঁ"

—"বলতে হয় 'আজ্ঞে হ্যাঁ'। রোজ পড়ায়?"

—"রোজই।"

—"তুই যাস?"

—"উনি আসেন।"

—"ও।"

কিছুক্ষণ বাবা আর-কিছু বললেন না, নিঝঝুম হয়ে থাকলেন। মনে হল ঘুমিয়ে পড়েছেন। সেটা যে ভুল, তা টের পেলাম পা-টিপে বেরিয়ে আসতে গিয়ে।

—"কোথায় যাচ্ছিস?" —"এই এমনি।

বেশি দূরে যাব না, স্কুলের মাঠ অবধি। বড়বৌদি সার ডেকেছেন।"

বলে একটু অপেক্ষা করলাম। অল্প পরেই ও'র নাক থেকে ফোঁস ফোঁস শব্দ বেরুতে থাকল. শোনার অভ্যাস নেই, কেমন অদ্ভুত, বিশ্রী লাগছিল। ও'র তলপেট তালে তালে উঠছে নামছে. প্রবল পরাক্রান্ত মানুষটা এখন অবসন্ন, দুর্বল—সেদিন এই দৃশ্যটাও ঠেকছিল হাস্যকর। (আজ তো জানি, আমারও নাক ডাকে, অনেক দিন থেকেই ডাকে)।

বেরিয়ে দেখলাম, মা তোমাকে। দাওয়ার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে পা ধুয়ে ঘরে উঠছ। থমকে দাঁড়ালাম, ভাবলাম বকবে। তুমি কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই খুব জোরে জোরে বলে উঠলাম, "স্কুলে যাচ্ছি। বড়বৌদি সার ডেকেছেন।"

"আজ না ছুটি?" এই প্রত্যাশিত প্রশ্নটা কিন্তু শুনতে হল না, যদিও ঠাঠা রোদ্দুরে ঝলসানো আকাশটার দিকে চেয়ে, উঠোনের কোণের নারকেল গাছটার মরা ডালে দুটো কাকের হাহাকার শুনতে শুনতে অপেক্ষা করে রইলাম। তারপর দৌড়ে সদর দরজা পর্যন্ত ছুটে গিয়ে বেপরোয়া খিল খুললাম, তখন বেশ চঞ্চল, সাহস বাড়ল। যেন দরজাটাকেই উদ্দেশ করে আরও চিৎকার করে বললাম, "যাচ্ছি। বিকেলের আগে ফিরব না।" কিন্তু পাল্টা কথা কেউ বলল না, পিছন থেকে কেউ ডাকল না।

সেরা দুপুর, তুমি জানো না, সেদিন প্রথমে সঙ্গী ছিল ভয়, পরে কখন দেখি সেই দীঘির জলে মুখ দেখলাম, দেখতে এল। ঝুঁকে হাত দিয়ে জল সরাতেই দেখি, সে নেই। জল থিতিয়ে যেতেই সে আবার এল। সে এল, গেল, এল, আমি জল নাড়ি আর থামি, তাকে অনেক কথা বললাম, বাবার আমার খবর, দাদার কিছুক্ষণ, আমার অভিমান। সে সব বুঝল, যেন ঘাড় নেড়ে সায় দিল, বিশেষ করে যখন বললাম "তুই যে চলে গিয়ে বেঁচেছিস", সে নিশ্চয়ই ভালকা হাসল, নইলে ঠিক তখনই কেন যে দীঘির পাড়ে যে গাছতলায় বসেছিলাম, তার ডাল থেকে টুপটাপ কয়েকটা পাতা আমার মাথায় খসে পড়বে কেন। একটা বক কেবলই উড়ে উড়ে দীঘির জলে ডুব দিচ্ছিল, কলমী দাম অল্প অল্প কাঁপছিল, একটা দুধধবল শঙ্খচিল যখন হা হা করে উড়ে গেল, তখনও আমি বসে, আমি কি আরও এই সব দেখব, কিংবা বকটা দীঘির জলের তলে কী খুঁজছে আমিও কি নেমে ওকে সাহায্য করব, করা উচিত হবে নাকি, এইসব ভাবছিলাম। ভয়? না, তখন আমি আছি আর দাদা আছে, দ্বিতীয় কিচ্ছু ছিল না।

প্রায়ই বেরুতে থাকলাম। যখনই একটা ফাঁক, তখনই, স্কুল ছুটির পর বিকেলেও। বকুনি খাব বলে তৈরি, জবাব কী দেব তাও ঠিকঠাক করে রেখেছি, কারণ ঢুকেই দেখেছি তুলসীতলায় পিদিম জ্বলছে, তার মানে সন্ধ্যা, তার মানে আকাশের এখানে-ওখানে তারার পাহারা, সব এড়িয়ে যখন ঘরে ঢুকতাম তখন পালা পড়া হচ্ছে। বাবা পড়ছেন, তুমি গালে হাত দিয়ে শুনছ। বাবার পড়ার ধরনটা অস্বাভাবিক, কোনও-খানটা পড়ছেন থিয়েটারি কায়দায়, হঠাৎ আবার গলা নামিয়ে আনছেন, আর ওই ভরাট গলায় মেয়েদের অংশ বলতে গিয়ে যখন স্বরটা সরু করতে চাইতেন, যেন ভোঁতা পেনসিলটা চেঁছে ছুঁচলো করা হচ্ছে, তখন কী-যে অদ্ভুত শোনাত! কখনও-বা একটু সুর দিয়ে গেয়ে উঠতেন, সে কী মজার গলা কাঁপানো, নিজের পায়ে হাত চাপড়ে চাপড়ে দিতেন তাল। বুঝতাম না কিছুই, হয়তো বুঝতাম না বলেই ভালোও লাগত না।

তবু শুনলে বাবা খুশী হতেন, তোমার তোমার মুখখানা এক ধরনের আহ্লাদে ঝিলিক দিত। তুমি উশখুশ করছ হয়ত, বলছ "যাই, রান্না চাপাই", বাবা হাত ধরে টেনে বসাতেন, "আহা শোন আর-একটু, শেষই না! এই জায়গাটা খুব মন দিয়ে লিখেছি।"

তোমার হাত যে ছাড়িয়ে আনব, তখন আমার অত জোর নেই না, আক্রোশ আর আতঙ্ক আমাকে কামড়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করত। যে অভিশাপ, তাকে জোর করে লেখা পড়ে শোনানো—জোর? কেন কিসের, এতো হ্যাংলামি (সেই হ্যাংলামি আমাকেও যে একদিন বন্ধুদের পাঠ করে শোনাতে তুলবে, তখন কি জানি!)

তুমি বলতে, "তুই পড়তে বোস গে।"

ভঙ্গির রাগে বলতাম "একটাই যে লণ্ঠন।"

পাতা থেকে চোখ তুলে বাবা বলতেন, "কোল থেকে ওকে আলাদা একটা লম্ফ জ্বালিয়ে দিও, ও ওই কোণে বসে পড়বে। আজ বরং এই পালাটাই শুনুক।" বাবা বলতেন অম্লান বদনে।

ফের শুরু হত পাঠ। এর না অনেকখানি পড়ে বাবা বললেন, "বুঝতে পেরেছ কী বলতে চাইছি। দেবযানীকে নিয়ে লেখা তো, তিনি হলেন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা। ভালোবাসলেন পিতৃশিষ্য দেবগুরু কচকে। ভালোবাসা পেলেন না, তখন অভিশাপ দিলেন যাকে চেয়েছিলেন তাকে। কিন্তু পরকে অভিশাপ দিলে নিজের দুঃখ কি যায়? যায় না। দেবযানীর বিয়ে হল, রাজা যযাতি স্বামী। মনে হল এইবার বুঝি দুঃখের শেষ, কিন্তু সেখানেও দ্বন্দ্ব। ঈর্ষায় কাতর দেবযানীর ইচ্ছায় নির্বাসিতা শর্মিষ্ঠা, কিন্তু তবু দেবযানী জয়ী হতে পারলেন কি? বিশেষ করে যখন জানলেন যে, স্বামী চলে যান সেই নির্বাসন-স্থানে, নির্বাসিতা পত্নীর সঙ্গে মিলিত হন গোপনে, তখন যে দাউ দাউ চিতা জ্বলে উঠল দেবযানীর মনে, সেই অসহ্য যন্ত্রণার কথা ভাবাও যায় না। আবার অভিশাপ, এবার স্বামীকে। কিন্তু সেই অভিশাপে কি নিজে যে অভিশপ্ত, তার জ্বালা ঘোচে? বারবার যে ভালবাসল, কিন্তু জীবনে সত্যকার ভালবাসা কারও কাছে পেল না, সেই নারীর বেদনা এই পালাটায় আমি বুঝতে, বোঝাতে চেয়েছি।"

মা, তখন তুমি আড়চোখে চেয়ে দেখছ, আমি শুনছি কিনা, বুঝছি কিনা। তখন অতটা বুঝিনি ঠিকই, কিন্তু শিখেছি, কথাগুলো সেই বয়সে কেমন অনায়াসে মনে গেঁথে যেত, তাই তাদের সারাংশটা আজ উপরে দেওয়া অসম্ভব হল না।

দেবযানীর বেদনা বুঝতে চেয়েছি, চেয়েছি বোঝাতেও—বাবা এই বলে যেই শেষ করলেন, তখনই দেখলাম, মা, তুমি আস্তে আস্তে উঠে পড়লে। রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছ, কিন্তু শুনতে পাচ্ছি যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে কেমন যেন বদলানো গলায় বলছ, "অন্য সব মেয়ের দুঃখই তুমি বোঝো। একটুও দেরী হয় না।"

ওই গ্রীবাভঙ্গি আর ওই উচ্চারণে কাকে দেখলাম মা, কাকে, তার নাম কী অভিশাপ দেয় যে, সেও কি সেই দেবযানী?

(ক্রমশ)

শীতের শুষ্কতায়ও...
নিভিয়া/আপনার ত্বকে সৌন্দর্য্য ফোটায়

কাঠ কাটে কাঠুরে
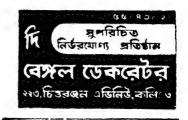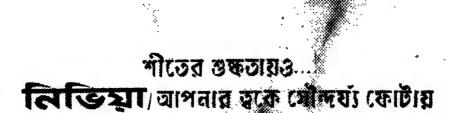
গাছপালা সব উজাড় হয়ে গেল দেশ-গাঁ থেকে। বড় বড় মোটা গাছ, যাদের মহীরূহ বলা হয়, যারা মেঘ থেকে নাবি বৃষ্টি নামায়। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতা প্রাকৃতিক সজীবতাকে গ্রাস করে—সবুজ মাটিকে মরুভূমিতে পরিণত না করলে বাঁচি! গ্রামের লোককে এখন রেশনের ব্যাগ হাতে নিয়ে বাজার করতে বেরুবার সময় একটা কয়লার থলেও সঙ্গে নিতে হয়—জ্বালানী কাঠের অভাব! কয়লা না আনলে উনোন জ্বলবে না। ঘুঁটেরও দাম বেশি। কেরোসিনের সেল ট্যাক্স! অথচ বজবজের কেরোসিন কোম্পানির ডিপোতে বছরে কয়েক লক্ষ কাহন খড়ের যোগান দিতে গিয়ে চাষীরা যখন ৪০ টাকা কাহন দরে খড় কিনে গরু পুষতে না পেরে কসাইখানায় বেচে দেয় তখন ঘরে ঘরে বাড়তি গরু না থাকলে গোবর পাবে কোথায় যে ঘুঁটে সস্তা হবে—জমিতে সার দেবে? তবু গাছপালা যখন শহরের চেয়ার টেবিল, শো-কেস, ফার্নিচার, চায়ের পেটি জুতোর হিল, চামড়া কাটার চকোর, মাংস কাটার চকোর, গাড়ির বডি পাটাতন, জেটির পাটাতন, রেলের পাড়ন, খেলনা, রেডিও ক্যাবিনেট ইত্যাদি তৈরির জন্যে প্লাইউড, স্লিপিং উড ফ্যাক্টরী, বাটানগর সু ফ্যাক্টরীতে প্রতিদিন হাজার হাজার গাছ টুকরো টুকরো হয়ে, চালান হয়ে চলে যাচ্ছে—দক্ষযজ্ঞের এ মহা-কাষ্ঠযাত্রা রোধিবে কে?

সরকার বছরে একটা পার্বণ করেন। বন-মহোৎসব বা বৃক্ষ রোপণ পার্বণ। গাণিতিক পরিসংখ্যান অনুসারে যত গাছ কাটা হয় তার চাইতে বেশি না হোক তত-গুলিও রোপণ করা হয় তো? নাকি এ শুধু মহাজনের সদিচ্ছা! একান্ত প্রকৃতি-নির্ভর এই সদিচ্ছায় যদি সজীবতা আর না বাঁচে তবে কি জনগণের অনিয়ন্ত্রিত স্বেচ্ছাধীন 'জঙ্গল আবাদ করো' নীতির প্রগতিশীল পাল্লাটার উপরেই পাথর চাপানো হবে? মুনি ঋষিরা মহীরূহের বীজ বা চারা রোপণ করতেন, মহীরূহ কাটতেন না, কেননা তাঁদের সেই আকাশ আচ্ছাদনকারী অরণ্য কাননেই আশ্রম বেঁধে থাকতে হত। বেল, বট, নিম, জগী ডুমুর (শমিধ), অশ্বত্থ, পাকুড়, কদম্ব, আমলকী, হরিতকী, আম, ঝাউ ইত্যাদি গাছ নাকি কাটতে নিষেধ ছিল। এসব কল্পবৃক্ষ। কাটলে পাপ হয়। পোড়াতে নেই। তাই আজো ধর্মে-মতি-হারায়-নি এমন কোনো কোনো হিন্দু পরিবার কখনো এ সব গাছের ডাল-পালা পর্যন্ত কাটে না। দেবজ্ঞানে এসব বৃক্ষকে পুজো করে। কিন্তু অর্থনৈতিক ভারসাম্য হারিয়ে যেতে এবং বৈজ্ঞানিক সভ্যতার কল্যাণে মন সংস্কার মুক্ত হতেই আমাদের সব বাঁধন আলগা হয়ে গেল। বেলের যে কি অসাধারণ উপকার তা ভুলে গিয়ে পুরনো মোটা গাছ, বেশি দাম দিচ্ছে ধনরন্দি সেখ, একটা তেঁতুল গাছের তিন শো টাকা দাম দিচ্ছে সাধু মল্লিক—অতএব দাও, বেচে ফেলো। করাত চলুক করর্‌র ক্যাস—করর্‌র ক্যাস শব্দে!

বড় বড় বেল, বট, অশথ, নিম, সবেদা, কাঁটাল, আম, জামরুল, লিচু, আঁসফল গাছের গোড়ায় যখন করাত টানা হয় তখন আমার যেন মনে হয় হিন্দু মুনি ঋষিদের হাড়ের উপর দিয়ে তা চলেছে নির্মমভাবে!

আমাদের আধুনিক লাট-বেলাট মন্ত্রী-অফিসার-প্রফেসার, এমন কি সাহিত্যিক কবিদেরও সিংহাসন দরকার! কিন্তু তাঁরা আধুনিক যান্ত্রিক যন্ত্রণার হাতের যতই শিকার হন তবু তাঁদের বাৎসরিক বৃক্ষ-

দেবজ্ঞানে এসব বৃক্ষকে পুজো কর

রোপণের বৈদিক ঐতিহ্যকে স্বীকৃতিদানের মাঙ্গলিক আচরণ দেখে ঋষিরা ঈষৎ খুশীও হতে পারেন এই কথা ভেবে যে ব্যাটারা একেবারে অকৃতজ্ঞ নয়! ছেদন 'রা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলেও রোপণের 'য়োজন দার্শনিক বা সাংস্কৃতিকভাবে 'ঝেন! ধর্মকৃত্য না করে ব্রাহ্মণ বা াহ্মাকে ভোজন করিয়ে কিছু দান দক্ষিণা 'র দিলেই মোক্ষ লাভের ব্যবস্থা তাঁরা 'রে দেবেন। এর পরে আর আধুনিক অর্থনৈতিক জটিলতার দিকে তোমরা অগ্রসর হয়ো না। বড়জোর না হয় যে বেল গাছটা বেচে দিয়েছ ছেলেমেয়ের কলেজের মাইনে দেবার জন্যে, ব্রাহ্মণ ডেকে তার গোড়ায় পুজো দিয়ে দাও!

কিন্তু সাধু মল্লিক বলে, হিন্দুরা গাছ পুজো করে কেন এবার বেশ বুঝতে পারছে! সব গাছ আমরা সাবাড় করে দিচ্ছি! ফলে জ্বালানী কাঠের দাম আক্রা হয়েছে। কর ব্যাটারা এবার কয়লাকে পুজো কর। ওটা খনির মধ্যে ছিল বলে পুজোর সন্ধান পায়নি। আগে নাকি হিন্দুদের বিয়ে করবার আগে গাছ বসিয়ে, মানে 'বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা' করে তাকে বিয়ে করতে হত, সেই গাছ আর কখনো কাটা হত না। গাছ ফল দিলে তবে তো তোমার সন্তান-বাল-বাচ্চা পালন হবে—তারপর বিয়ে কর। এখন ইটের পাঁজা পুজো করে! পাকা ঘর হবে, 'ইলেকট্রিক' আসবে, 'হিটারে' রান্না করবে! বেশি সভ্য হলে গাছ কয়লাও তখন বিদেয়! কিন্তু তেঁতুল গাছ আর পাই কোথা? মানুষ দিন দিন জুতোয় অভ্যস্থ হচ্ছে বেশি করে। একটা লোকের তিন জোড়া জুতো চাই। বাটানগর নতন নতন জুতো আবিষ্কার করছে। সভ্যতা যত বাড়বে জুতোর কদর তত বাড়বে। তাই জুতো তৈরি করতে গেলে তেঁতুল গাছ চাই। তেঁতুল কাঠের চকোর না পেলে কিসে চামড়া কাটবে? হিল তৈরি হবে মেয়েদের হাইহিল জুতোর? হাইহিল না পরলে মডার্ন লেডিজের কোমরের বাহার খুলবে কেন? তার জন্যে চাই তেঁতুল গাছ! ভাবনা নেই, তাদের পোয়াতিকালে তেঁতুল না হলেও আঙুর আনারস হলেও চলবে, কিন্তু সাধু মল্লিক এখন বিশেষভাবে ভাবিত বাটানগরের সাপ্তাহিক এক লরী ৩০০।৪০০ খানা তেঁতুলের চকোর কোথা পায়! ৪ টাকা ২০ পয়সা প্রতিটি চকোরের দাম। চাঁদি ১৪ ইঞ্চি, বেড ৩ ফুট ১১ ইঞ্চি। ফাটা কাটা বাদ। বাটার বাবুদের চোখে ময়ূরের তারা লাগানো আছে পাকা [illegible] সাঁইবাবলা, বাবলা [illegible] কাঁটাল [illegible] যাই হোক ঠিক ধরবে তারা। বলবে 'সাধু মল্লিক,

ধু কাজ তুমি করলে আমরা অন্য কে কনট্রাক্ট দিয়ে দেব! অতএব সাধু ান। বেটারা ঘুষও নেবে না! এখন ুল গাছ পাই কোথা? ওদিকে বেহালা পুকুর এদিকে ভাসা পৈলান আমতলা র হাট সরার হাট ফলতা রায়পুর পুর নিয়ে বিরাট এই কয়েকটি থানা কায় আমি আজতক বিশ বছরে আর নো তেঁতুল গাছ রাখিনি প্রায়। নাম- দু-একজনের আছে, যারা বেচতে চায় টাকার অভাব নেই। বাটার এই টাকসো' যখন ধরি তখন মোর কাছে কি ? কাবুলীর কাছে দেনা করনু। ৭০ করে করাত কিননু দু-খানা। সেহাই, লী, খানেবাটি গাঁয়ের মুসলমান ছোঁড়া ড়াদের কাঠুরের কাজে লাগানু। মুই এক কলম লেখাপড়া জানি নি হে—

বই একটা বি এ পাশ ছোকরাকে লেসকে তো দেখি মোর সাথে 'চোপরায়' পারে কেমন? ওদের তো বইপড়া বিদ্যে! আমি ঐসব বাবুদের সাথে মিলে মিশে কথা শিখিছি। আজ কংগ্রেসের দুর্দিন, না হলে কংগ্রেসের হেন মিটিং হত না যেখনে এই সাধু মল্লিককে এ অঞ্চলের এম এল এ-বাবু নেমতন্ন না করত। ভোটের সময় তিনটে গ্রাম আমার হাতে। অতএব টাকা দাও। এখনো দশটা হাই স্কুল, জুনিয়ার হাই স্কুল, মেয়েদের স্কুল, কত সমিতির আমি সেক্রেটারী, ভাইস প্রেসিডেন্ট 'মেম্বর' আছি। কেন? চাঁদা দিই। নতুন নতুন বুদ্ধি দিই। খাতা খুলে দেখ, হাউড়ী রানিয়া সেহাই খড়্গেবেড়িয়া দেসতিনা বারাতলা কত স্কুলের আমি 'মেম্বর'। সাধু মল্লিককে হিন্দু মুসলমান সবাই চেনে।

আমার 'উদভট চণ্ডী' শুনলে অনেক বড় বড় 'সংস্কারকাঁড়ি' পণ্ডিত ব্যাখ্যা করতে মুর্ছা যাবে। শোন তবে একটা শ্লোক: 'বর্দার কোটি মুল্যোঞ্চ লক্ষ মুল্যোঞ্চ দাড়িম্ব, শ্রীফল সহস্র মুল্যোঞ্চ লাউ মুল্যোঞ্চ কড়া কড়া!' এই শ্লোকের ব্যাখ্যা যিনি বুঝবে তার শত বছর পরমায়ু হবে।'

চা দোকানে বসে বসে কাপের পর কাপ চা আর বান্ডিলের পর বান্ডিল বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে বক্তৃতা করে সাধু মল্লিক। মাথায় কদমফুলি ছোট ছোট চুল। চাকা মতো মুখ। গোল গোল চোখ। চোখে বিড়ালের চাউনি। গালের গোঁফের কোণে সারা বছরই ফ্যাদফেদে সাদা ঘা। (সাধু মল্লিক বলে, শালাটাকে ভাল করা যায় না। পান তরকারি খেতে আমার বড্ড কষ্ট হয়।) তিনে ঘা। ময়লা ধুতি ময়লা সার্ট গায়ে।

গায়ে মুড়ি দেওয়া কম দামের রঙ-জ্বলে-যাওয়া চাদর। পায়ে কখনো বিবর্ণ ছেঁড়া জুতো থাকে, কখনো থাকে না। বাটা থেকে বিল ভাঙিয়ে সে হয়তো সেদিন ফিরেছে, গোছা গোছা নোটের তাড়া আছে তার পকেটে। জন খন, করাতি, কাঠুরেরা বসে আছে দাম কড়ির জন্যে তার পাশে। তাদের কার কত পাওনা সবই সাধু মল্লিকের মুখস্থ। তবু নেবু কচলায়। প্রাইমারী স্কুলে মাস্টারী পাবার জন্যে তার পিছনে পিছনে ঘোরা নিয়ামত ছোকরাকে সে হয়তো বলে, 'হিসেব করত বাপ, ৪০০ চাকোর। ৪·২০ পয়সা করে দাম হলে কত হয়?'

নিয়ামত কাঁপতে কাঁপতে হিসেব কষতে থাকে। বলে: 'এক হাজার ছ'শো আশী টাকা হয় চাচা।'

সাধু মল্লিকের ঐ পয়সার হিসেবটায় গোলমাল হয়। বসে আসতে আসতে অনেকবার হিসেব জুড়েছে সে। পাঁচ কুড়িং শ'। পাঁচটায় এক টাকা। তাহলে চারশোয় কত? হদিস পায়নি। কিন্তু নিয়ামত চট করে করলে কেমন করে? বিসে তো তাই আছে! তবু বলে, 'কি দিয়ে তোরা লেখাপড়া শিখছিস? ধান দিয়ে না চাল দিয়ে? ফের দেখ, পেন্সিলের মাথায় থুথু দে। ঘাড় চুলকে নে। মাথায় [illegible]!'

তাই আবার হিসেবটা দেখে নিয়ামত। ভালো দেখে, পুঁজি দিচ্ছে ঘামায় এই! ভুলে সাধু মল্লিক মারবে এক লাথি!'

আবার ঐ একই হিসেব দাখিল করে নিয়ামত। তখন ষোল সতের জন লোক—সবাইকে চা দিতে বলে সাধু মল্লিক। বলে, পঞ্চাশ টাকা লরীর বাদ দাও, চার শো টাকার গাছ, মজুরী ডোলাতে গাছ কাটাই, গরুর গাড়ি ভাড়াতে দুশো টাকা, চাকোর তৈরি করতে দুশো টাকা, আর পাঁউ বিড়িতে পঞ্চাশ টাকা—কত হল? নশো টাকা? আমার জনের দাম এক সপ্তাহে ধর একশো টাকা। আমারও তো পেট আছে? তাহলে হাজার টাকা হল। তবে ছশো আশী টাকা? পারবে কোনো লেখাপড়া জানা লোক এক সপ্তাহে এত টাকা কামাতে? কপাল চাই, ধক চাই। লেখাপড়া শিখে কেরানীগিরির জন্যে ধর্না না দিয়ে বুদ্ধিফিকির করে ব্যবসা করতে কি বাঙালী শিক্ষিত ছোঁড়াদের মাথা হয়? তা নয় শৌখিন হতে চায়, বাবু হতে চায়। সিনেমার নটনটীদের ফ্যাসানে চলতে চায়! রাস্তার কাজ, নৌকোর কাজ, কারখানার কাজ, মাঠের কাজ, খালাসির কাজ, ইট-তোলার কাজ—এসব কাজকে শিক্ষিত লোকেরা ঘৃণা করে—এসব কুলীর কাজ! কিন্তু কুলী খাটাতেও তো পার? পুঁজি

হঠাৎ মোড়ের মাথায় সাইকেলে চেপে কাবুলী গোলাম হোসেন এসে হাজির

নেই? পুঁজি কি ট্যাঁকে থাকে, না মাথায় থাকে?'

লোকেরা এবার টাকা চাইলে সাধু মল্লিক বক্তৃতা থামায়। চাদরের মধ্যে হাত গলিয়ে জামার পকেটের মধ্যে ইষ্টমন্ত্র জপ করার মতো আঙুলের মাথায় নোট গুণে নিয়ে টেনে বার করে দেয়: 'এই নে আলীবক্স মল্লিক কুড়ি টাকা!'

ঠিক কুড়ি টাকাই বার করে আনলে সাধু মল্লিক—চারখানা পাঁচ টাকার নোট। ইউনুস মল্লিক তিরিশ টাকা—এভাবেই টাকা বার করে আনে মল্লিক সাহেব। কেউ তাকে সব টাকা এক সাথে বার করতে দেখেনি কোনোদিন। অভাবে স্বভাব খারাপ হয়—ওদের নিয়েই অন্ধকার পথে যেতে হবে। তারপর একালের শ্রমিক মালিক সম্পর্ক। তার সব জনখেনোরাই এখন গোপনে লাল মার্কা। যাদের সে টাকা দেয় নিয়ামত নাম লিখতে থাকে। নূর ইসলাম মল্লিক, সাফি মল্লিক, মফিজউদ্দিন মল্লিক, রহুল মল্লিক, নকুল মান্না, শম্ভু প্রামাণিক, জয়দেব আদক, বিশ্বনাথ ভৌমিক, গিয়াসউদ্দিন মল্লিক, শুভো মিদ্দে, সেরাফাত সেখ, সায়েম আলি মল্লিক, আব্বাস মল্লিক।

তিন চারশো টাকা দেওয়া হয়ে যেতেই হঠাৎ মোড়ের মাথায় সাইকেলে চেপে কাবুলী গোলাম হোসেন এসে হাজির হল। সাধু মল্লিককে সালাম জানালে সে বেরিয়ে এসে হাঁটতে হাঁটতে মানুষ জনের চোখের আড়ালে সরিয়ে নিয়ে গেল। দিতে হল তাকে দুশো আড়াই শো টাকা। কাবুলী ঠিক খোঁজ রেখেছে সাধু মল্লিক আজ বিল ভাঙাবে। সে বাটানগরে গিয়েছিল কিন্তু সাধু কিভাবে অসাধুর মতো সটকা দিলে খোদা জানে।

ফিরে এসে সাধু মল্লিক আবার বসে। নিয়ামতকে খবরের কাগজটা পড়তে বলে। মন দিয়ে শোনে। কিন্তু যুক্ত ফ্রন্টের শরিকী কলহ তার ভাল লাগে না। কাগজ কেড়ে নিয়ে ফেলে দেয়। বলে, 'অনেক কাঠ বাদ গেল! চকোর কাটবার সময় তোরা এমন করলে আমি ব্যবসা তুলে দেব। শালা আজ হাজার দু' হাজার টাকা আনলু, কাল নেই। চারদিকে দেনা। গাছ-পালার দাম পাবে কত লোক? তবু খোরাকী কিনতে হয় না। পাকাবাড়িটা গাঁথতে যেয়েই ফেল হয়ে গেনু। তারপর কার কন্যাদায়, কার মামলা, কার স্কুল, কার ছেলের বই, কার মাইনে, পুজোর চাঁদা, মিলাদ মসজিদের চাঁদা—নানান দান খয়রাত লেগেই আছে। ভাবছি আমার নামে 'কনট্যাকসো' থাকবে, আমি মাল সাপ্লাই দেব—কিন্তু অ্যাসিসট্যান্ট 'কনট্যাকটার' নেব।'

সাধু মল্লিক এবার নাকি তাই করেছে। সে সাত গেরাম খুঁজে খুঁজে আর গাছ পায় না বলে তার ভাইদের উপ-ঠিকাদার তৈরি করেছে। কাবুলীকে বলে কয়ে তাদের ঋণের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সে-ই লরী ভাড়া দিয়ে শুধু তৈরি মাল সপ্তাহে একদিন বাটানগর জুতো কারখানায় চালান দেবে। তিন টাকা করে চকোর পিছু পাবে তার ভাইরা। উপ-ঠিকেদার আসফ মল্লিক, আত্তর মল্লিক অথবা রহুল মল্লিক, বাবুর

আলী মল্লিক। সাধু মল্লিক না গেলেও তারা মাল জমা দিয়ে আসতে পারে। মাল এনকোয়ারীর সময় সাধু থাকিবে, সে-ই বিল ভাঙাবে ধ্যাবড়া মোটা বুড়ো আঙুলের টিপ সই দিয়ে! কোনোকিছু ঝামেলা নেই আর। তিনশো খানা চকোর হলেই তার তিন শো ষাট টাকা। লরীভাড়া দেবে শুধু মানিক দাসকে পঞ্চাশ টাকা। তিন শো দশ টাকা সপ্তাহে উপায়।

আফস মল্লিক বলে, 'আমাদের কিছু থাকেনে বাবু। যে টাকা খাটাই সেটাই উঠে আসে। একটা তেঁতুল গাছ দশ হাত 'খাড়' (কাণ্ড) হলে চল্লিশটা চকোর বার হবে। একশো টাকা দাম। মজুরী যেটা লাগে ডালপালা বেচে হয়ে যায়। দু 'কল' (দল) করাতি আছে। ডেলিতে চারজনকে সতের টাকা দিতে হয়। আর চকোর কাটবার সময় প্রতিটায় আশী পয়সা ফুরোন। তার মানে একশোটা চকোরে আশী টাকা। তেঁতুল গাছ আর পাওয়া যায় না। তাই থ্রিপিস বা প্লাইউডের কাজও করছি।'

দাড়িওয়ালা ধনবদ্দি সেখ এল তার কাঠ কাটা কাঠুরেদের নিয়ে চা দোকানে। তাকে দেখলেই লোকজন খেপায়। বলে, 'কই গো চাচা, একটা গান কর তো!'

ধনবদ্দি অমনি চিৎকার করে গান ধরেঃ

আল্লা আল্লা কর বান্দা
নবী কর সার
নবীর কলেমা পড়ে
হয়ে যাবে পার।......'

তারপর সে 'হেই হেই' করে তার যেমন মুদ্রাদোষ উড়ো চিৎকার করে। চাদসে করে পান চিবোয়। বেশ মিষ্টি তার কথাবার্তা। খুব রসিক লোক। আদৌ লেখাপড়া জানে না। কিন্তু কথা-বার্তা চালচলন ভদ্র-বিনয়ী। ছেলেরা ধরে, 'চাচা আর একটা রসের গান গাও।' তখন ধনবদ্দি তার নিজের বানানো গান গায়ঃ

'মেয়েরা সব বুক ফুলিয়ে
কোট কাছারী যায়,
তাদের চাপে গাড়ি ঘোড়ায়
উঠতে পারা দায়!
মদ্দরা সব কচি খোকা
চুড়ু তামাক খায়
রাজনীতির লেকোলাজি
ফেলে দেশ পোড়ায়!'

সে বলে, 'আমরা নানা জাতের কাঠের চাকা দিয়ে টাকা রোজগার করবার ভাগ্য করি নি। তারা সাধুকে ছাড়া অসাধুকে 'কনটাকসো' দেয় না। তেঁতুল, নিম, বেল, কতবেল, করমচা, আম, জাম, জামরুল, সাঁইবাবলা, গুয়ে বাবলা, অশ্বথ, বট, পাকুড়, জিউলী, কদম, বাদাম, খিরিশ, চিরিশ, খেজুর কদম, মানারী বা ডাম্পার, চালতা, দেবদারু, শাওড়া, পেয়ারা, সবেদা আঁসফল, কাঁটাল, অর্জুন, শিমুল, বাটাং, বাবলা, লিচু, বকুল, জগী ডুমুর, ডুমুর, আমলকী, হরিতকী, মহুয়া, শিশু, গুলঞ্চ, মোহনচূড়া, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, সোনালী, কুলবাছাড়, গাব, প্রায় সব গাছ আমরা কাটি শুধু অশথ, বেল, সেগুন দামী গাছ কাটি না। ওসব গাছ এদিকে বেশি নেইও, শহর গাছ। সবকারের আছে, দরকার মতন কাটে। পবিত্র কাঠ হল অন্নদাতা তাই হিন্দু ভায়েরা পুজো করে। আমরা গাছ পুজো করি না। গাছ কেটে দেশ উজাড় করে দিচ্ছি। এখন আর দেশে শকুনে বাসা বাঁধবার মতন বড়গাছ আছে কি? আমাদের, প্লাইউডে আম কাঠেরই কদর বেশি। আম গাছের গুঁড়িতে যখন 'ইলেকট্রিক' করাত চলে ফরফর করে পাতলা কাগজের মতন আঁশ ওঠে। সেই পাতলো কাঠ জমিয়ে চায়ের পেটি—আরো কত কি সব হয়। থ্রিপিস কাঠ তৈরি হয়। আমাদের কাঠের মাপ হল চার ফুট বেড়, এক ফুট লম্বা—এর দাম আম কাঠ হলে সাড়ে সাত টাকা। অন্য বাজে কাঠ হলে দু' টাকা ষাট পয়সা ফুট। আমরা গ্রাম থেকে মজুর খাটিয়ে গাছ কেটে এনে মেপে মেপে লরিতে তুলে দিই যেখানে লরি না যায় ঐ দেদার বক্স গাড়োয়ান, কোবাদ, হানিফ আছে গরু ঠেঁঙিয়ে পাকা রাস্তায় এনে দেয়। মাল চলে যায় কলকাতায় মানিকতলায়। সেখানে ছটা আটটা কাঠ চেরাই কারখানা আছে। আছে বেহালায়। এদিকে মাল দিই আমতলা, বজবজ, পোকপাড়ি বা শ্যামপুরে, চটের কারখানার হাটে। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ গাছ কাটা হচ্ছে প্রতিদিন। অনেক ঠিকেদার আমাদের মাল জোগাচ্ছে। যেমন চকবাঁশবেড়িয়ার আনসার মল্লিক আমাদের মাল দেয় সে কলকাতায় নিয়ে যায় না। আমরা সব অনেকে আছি।'

দেদার বক্স গাড়োয়ানের কাঠ বোঝাই গরুর গাড়ি এল। তার ছেলে নবী কালো, লম্বা গাল, বেড়ে গাড়ির চাকা ঠেলে পাকা রাস্তায় গাড়ি তুললো কাঠ নামিয়ে লরী বোঝাই হতে থাকে। ... বেলা ভাঙাতে থাকে জাবর কাটতে কাটতে মুখ থেকে। দেদারের ছেলে কালোর পরনে চুস্ত প্যান্ট। তার হাতে একটা জাপানী অলওয়েভ সেট রেডিও! নির্বিঘ্ন ভারতীয় গান হচ্ছে।

কয়লার লরি এসে বাঁধল গ্রামের চা দোকানের মোড়ে। কয়লার ইমারত, বারিধা কোলিয়ারী থেকে মাল আসছে। প্রতিদিন নাকি এই অঞ্চ পাড়াগাঁয়ের চার পাঁচটি গ্রামে পাঁচ সাত টন করে কয়লা লাগে।

গ্রামে আর জ্বালানী কাঠ পাওয়া যাচ্ছে না। গ্রামের সবুজ সজীবতা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন। নাগরিক সভ্যতার চকচকে খোলসের মধ্যে আমাদের সমস্ত জীবনটা কাগজের ফুল না হয়ে যায় হারিয়ে না ফেলি প্রকৃতিকে এই ভয়। শহর স্বরূপ মূল্যে যেসব কাঁচা মাল নিচ্ছে রাহুর মতো তার বিনিময়ে শহর গ্রামকে দিচ্ছে নানা দ্রব্য; তার আর্থিক ভারসাম্য বহন করতে না পেরেও যে চুঁপসিয়ে গ্রাম শহর হতে চাচ্ছে সে কি অভিশাপ না উজ্জ্বল ভবিষ্যতের হাতছানি?

—আবদুল জব্বার

ভারতীয়তার ভিত

খবরটা মনে ধরেছিল বলেই বলছি। মজার খবর। বিলেতের এক প্রকাশক, নাম তাঁর ম্যাকায়। নিজের কাগজে এমন যাচ্ছেতাই, কদর্য সব কাহিনী লিখে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মুণ্ডু খাচ্ছিলেন যে অনেকেই অপছন্দ করতে আরম্ভ করে ছিলেন ব্যাপারটা। হঠাৎ ম্যাকায় মেমসাহেব গায়েব। কর্তার বয়স ষাট, গিন্নী কিছু ছোট। সাহেব নেশায় বুঁদ হয়ে থাকেন, ঘুমপাড়ানী সব কড়া কড়া মাদক যাকে drug বলা হয় তাতে তিনি ডুবে থেকে ভালবাসেন। আসলে আমরা যে কাগজপত্রে লেখা আর ছবি দেখে ভাবি drug বুঝি তরুণ তরুণীদের দখলে, [illegible] তার বেপরোয়া ছাপ বানিয়েছে তা সম্পূর্ণ ঠিক কথা নয়। বয়স্ক লোক, এমন কি বিদ্বান intellectual সবাই এইসব ভেষজের স্বাদ অল্পবিস্তর জানেন। যাই হোক, প্রকাশক ম্যাকায় জানেন ঠিকই। গিন্নী বেচারা কঠিন ব্যাধি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। কাজেই তাঁর ভেষজ প্রয়োগ বা ইনজেকশন সব দরকার [illegible] প্রয়োজন। [illegible] সবাই [illegible] এমন সময় [illegible] এক চিরকুট মিলল। [illegible] বলা হয়েছে। [illegible] নিকৃষ্ট রুচির [illegible] বিলেতে প্রকাশক প্রবর প্রকাশ করেছেন তারই [illegible] লিখিয়েছে কেউ। গিন্নী প্রবীণা, ভেষজের অভাবে [illegible] বেসামাল হয়ে উঠেছেন একেবারে এসেছে। তা হক। কচি কচি মনগুলিকে চিবিয়ে খাওয়ার চেয়ে কি আর এমন বড় অপরাধ?

ম্যাকায় কাহিনী কি [illegible] অভিভাবকদের [illegible] এক ম্যাকায়ই তো নেই। [illegible] তাদের সমাজে যে যৌন আবেদনশীল গল্প, ছবি [illegible] সবই কেমন [illegible] এক নতুন ধরনের বিপ্লব আনছে। তার অনুসরণে আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত যুবসমাজকেও চঞ্চল করেছে। [illegible] শাস্ত্রের শাসন বা অনুশাসন আঁকড়ে আজও চলতি হবে এমন কোন আজ্ঞাপত্র নেই। তবে যা ঘটছে বা ঘটতে পারে তার ফলাফল নিয়ে কি আমরা মাথা ঘামাই? দৈনন্দিন ঝামেলা কাটাতে পারলেই যেন মনে লক্ষ হয়েছে। যুবসমাজকে সুরক্ষিত করা আর এক নতুন [illegible] দাঁড়িয়েছে।

কদর্যতার টিকিট [illegible] বাড়াবার ব্যবস্থা বন্ধ দিন। যৌন জীবন সম্বন্ধে, প্রজনন সম্বন্ধে কতটুকু জানলে এবং কোন বয়সে জানলে সুস্থ মানসিক বিকাশের সহায় হবে তাও তো ভাববার কথা। অনেক দিন থেকেই সামান্য কিছু স্কুল ইত্যাদিতে শেখানো বা বোঝানো বিষয় ভাবা হয়েছে কিন্তু এখনও একটা নির্দিষ্ট স্তর বা বিচারের মাপকাঠি মিলছে কি? ঘরে বাবা মা কি খুঁজে পেয়েছেন অনুসন্ধিৎসু শিশুর জন্য প্রজনন সম্বন্ধে নানা প্রশ্নের সব সদুত্তর? এক সময় ব্যবস্থা ছিল বিশেষ কড়া। শিশু অল্প দিনেই জানতে পারতো প্রশ্ন করার ব্যাপারটা যেন কোন সংকোচের সঙ্গে জড়িত। সদুত্তর সম্ভব নয়। বহুরকমের আবোল তাবোল কাহিনী দিয়ে প্রজনন ব্যাপারটিকে চাপা দিয়ে শিশুকে অন্যদিকে আকৃষ্ট করার কত চেষ্টাই না হতো। শিশু যে সব সময় বুঝতে পারতো না তাও নয়। একটি গল্প শুনেছিলাম। পাশ্চাত্ত্য সমাজে প্রচলিত কাহিনী সারস পাখীর বাচ্চা আনা নিয়ে। একটি শিশু তার নবজাত ভাইকে দেখতে চলেছে হাসপাতালে। পথে মাঠের মাঝে এক পা গুটিয়ে সারস পাখী সুখে নিদ্রা যাচ্ছে। শিশু তার বাবাকে বললো, বাবা, দেখ ঐ সারসের একপা। অন্য পা বোধ হয় বাচ্চা আনতে আনতে ভেঙে গেছে। বাবাও বুঝলেন সারসের গল্পের সামান্য ফাঁকি শিশু বোঝে কিন্তু কি বললেন? বুঝিয়ে বলার সীমানা জানা নেই।

সীমানা জানার এখন এসেছে আর এক বিপর্যয়। আট নয় বছরের বাচ্চাদের ঘরে স্কুলের আর পাঁচটা শিক্ষার সঙ্গে বেশ ভাল করে প্রজনন কেমন করে হয় তার শিক্ষা চলেছে বিদেশে। কিন্তু সেখানেও সবাই একমত নয়। গত এক বছরে কোন কোন স্কুলে নাকি বিশদভাবে প্রজননের সকল পর্যায়ের মোটামুটি একটা ব্যাখ্যা বাচ্চাদের দেওয়া হয়েছিল মার্কিন দেশের উইসকনসিন প্রদেশে ছোট্ট এক শহরে। নাম সে শহরের সিডারবার্গ। উইসকনসিন মোটামুটি রক্ষণশীল প্রদেশ। শিক্ষাও যেমন একদল বেশ পছন্দ করলেন, আর একদল তেমনই ঘোরতর আপত্তি জানালেন। প্রথম প্রথম মায়েরা কেউ কেউ বোধ হয় পুরো ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনও নি। বড় বড় চাষী সংসারের মায়েরা ডিম উপহার দিয়েছিলেন স্কুলের শিশু বিভাগকে। সেই ডিম দিয়ে কিণ্ডারগার্টেনের বাচ্চাদের ডিম থেকে মুরগীর ছানা কি করে হয় তার শিক্ষা দেওয়া হলো। মায়েরা তো রেগে খুন। এমন জানলে কি আর ডিম দিতেন তাঁরা?

প্রাথমিক শিক্ষায় যৌনচর্চা আমেরিকার মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন প্রয়োজন মনে করেন। একথা এদেশের বেলায়ও সত্য যে বিকৃতভাবে প্রজনন সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু শিশুর খবর সংগ্রহ করার চেয়ে মাতাপিতা বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সুন্দরভাবে প্রয়োজন-মত ব্যাখ্যা করলে অনেক বেশী সহজে এত-বড় সত্য সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান হয়। এদেশে তথাকথিত স্বচ্ছল সমাজে দাসদাসীর আওতায় যে শিশু মানুষ হয় তার মানসিক বিকাশের প্রকৃত সংবাদ অনেক ক্ষেত্রে মা-বাবাও রাখেন না। দাসদাসী ভীতি প্রদর্শনেই হোক বা অন্য কোনভাবেই হোক মা-বাবার কাছ থেকে অনেক কিছু গোপন করতে শেখায়। অপরিণত মন ছোট ছোট ছেলেমেয়ের অবাধ গতিবিধি হয় ঐ দাসদাসী সমাজেই। বহুক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণের হিসাব হয়তো কোনও দিনও হয় না। গ্রামাঞ্চলের বালক-বালিকা জীবজন্তু ও প্রকৃতি থেকে

কিছু খবর সংগ্রহ করে। বাকী
মাতা পিতার। স্কুলেও শুনেছি
ন দেশে প্রশ্নের কিছু উত্তর
শিক্ষয়িত্রী দেন এবং কিছু প্রশ্নের
ার জন্য মা-বাবাকে অনুরোধ
দাস-দাসীবহুল ধনী সমাজই হক
র বাইরে প্রকৃতির পরিবেশ হক
জিজ্ঞাসার বহু কিছুর জবাব
মাতা-পিতা দেবেন। মাতা-পিতার কাছে সংকোচের আড়াল থাকার বিধি অন্তত আজকের সমাজে উচিত নয়। ছায়াছবি, কাগজপত্র, রঙ্গমঞ্চ এমনকি মানুষের জীবনেও একটা দুর্নিবার বন্ধনহীনতার বন্যা এসেছে। ভালমন্দ বিচারের ভাবনা ভাবাও কঠিন, কারণ বন্যার গতিরোধ হবার আশা নেই। কাজেই এককালে যাকে আমাদের সামাজিক আচরণের মানদণ্ডে নিন্দনীয় মনে করেছি, তার মাপকাঠির আমূল পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। যুগের পরিবর্তন দারুণ ক্ষিপ্রগতিতে চলেছে। একদিকে যেমন ম্যাকায় সাহেবের মত কদর্যতার কঠিন শাস্তি দরকার, অন্যদিকে অত্যন্ত বেশীরকম রক্ষণশীলতা বা গোঁড়ামি কোন কাজের কথা নয়।

মা বাবা বা অভিভাবকই পারেন উঠতি বয়সের বালক-বালিকা ও শিশুকে ভবিষ্যতের ভালমন্দ সম্বন্ধে মাপকাঠি গড়ে তুলতে। প্রাচীনপন্থী মনে যে চিরাচরিত প্রচলিত আদর্শের মানদণ্ড ছিল, অবক্ষীণ হয়ে সে মান যুগে যুগে অপরিবর্তিত পরবর্তীকালেও মানা হয়েছে। সে মানের দাম হঠাৎ ভেঙেছে। আমেরিকায় থাকতে নিগ্রোদেরকে দেখেছি যে ওরা প্রাচীন কালের 'টমকাকার কুটিরের' মানুষটি নেই। মাঝে মাঝে কাজের অবসরে পাশে বসে কত গল্পই না করতো। বলতো এ দুনিয়ায় সাদা মানুষ এক ভাগ, আর কালো মানুষ তিন। যেমন পৃথিবীতে তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল। তবু সাদা মানুষ সংস্কার দিয়ে কালোকে দাবিয়ে রাখে। [illegible] ধর্ম দিয়ে পাদ্রীর নিগ্রো কালোদের বলে ঈশ্বর তোমাদের পরজন্মে পরমানন্দ দেবেন। অবশ্য এ জন্মের ভোগ বিলাস সাদা মানুষের প্রাপ্য। মেনে নাও একথা। ঠিক ঐ নিগ্রো নারীর মতো নিগ্রোদের মত জগতে, সমাজে, রাষ্ট্রনীতিতে, মূল্যবোধে, আচারে, আচরণে বিদ্রোহের বন্যা এসেছে। চিরাচরিত ভাল মন্দের অনুশাসন ঢিলে হয়েছে। মানুষ সংস্কারের দোলায় বিশ্বাসের মূলকে নেড়ে চেড়ে দেখতে চায়।

কেউ কেউ দেখেন উদ্ভট শিশু ও অসংখ্য আপনার কৈশোরে কত মেলা আমাদের শিশু কত দৈর্ঘ্য বেশী থাকে। আমাদের বালক বা বালিকা কত বেশী আত্মপ্রত্যয়ী। যাদের শাসন আর সেইভাবে মান্য করা হতো তারা এখন নিজেদের মতামতের অধিকারী। বালক বালিকার পর কিশোর কিশোরী বা যুবক-যুবতীকে দেখুন। কি অবাধ তাদের গতি, কি সাবলীল তাদের চলাফেরা। দৃঢ় বিশ্বাসী, নিশ্চিত, সাহসী তারা। নিজের শক্তিতে পূর্ণ আস্থাবান। সংস্কার দিয়ে তাদের সামলাবেন আর কি করে? যুক্তি দিয়ে, ক্ষমা দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে আগামী দিনের ভারতবর্ষের মানুষকে ভারতীয়তার মর্যাদা রাখতে অনুপ্রাণিত করতে হবে।

তার জন্য দরকার সবার আগে আদর্শ। আমি যা করি না, তা করবার আদেশ করার অধিকার আমার নেই। রাজনৈতিক জগতে সার্বভৌমত্ব যদি ইতিহাসের কাহিনী হয়ে বসে থাকে, সমাজের না পাওয়ার দল যদি পরিবর্তন দাবি করেন, নিয়ন্ত্রণ আর শাসনের বাধা নিষেধ কেনই বা কোথাও থাকবে? বিশ বছর আগেও লজ্জা ছিল নারীর ভূষণ। ব্রীড়াবনতমুখী কন্যাই ছিল সমাজের আদর্শ। এখন দেখুন ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ-এর উত্তরাধিকারী বলে আমরা প্রকৃত গর্ব করতে পারি। দুটিই ভারতীয় আদর্শ, ভারতীয়তার আদর্শ, ভাবনা করবার কিছু নেই। সেই ভারতীয়তার ভিত যদি দৃঢ় হয়, উপরে যে হাওয়াই বয়ে যাক, স্থির থাকবে কৃষ্টির প্রধান লক্ষণগুলি। এমন বিপ্লব আগে আসেনি। পৃথিবীটা যে বড্ড ছোট হয়ে গেছে। চাঁদের নাগাল হাতের মুঠোয়। নৈতিকতার গণ্ডীও দেশের সীমায় আটকে থাকবে না। তাই বলি যে ঘরের বাঁধন শক্ত হবে যদি বাপ-মাকে শিশু ভালবাসে, কিশোর-কিশোরী শ্রদ্ধা করে। আমাদের দেশেও নাকার সাহেবের মত বিকৃত মানুষ নেই তা তো নয়। বিকার থেকে বাঁচতে হলে তাদের ঘরে কাছে লাগবে না, লাগবে ন্যায় অন্যায় সম্বন্ধে সহজ বিচারবুদ্ধি। প্রজননের মত সত্যকে লুকিয়ে দেবার চেয়ে পথও তাই বাপ-মায়েরই হাতে। যৌনজীবনকে বিকৃত-বুদ্ধি দিয়ে বুঝলে যে ক্ষতি হয় তার সম্বন্ধে সতর্কতার এই উপায়। বিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যমে বিশদ ব্যাখ্যার চেয়েও ভাল। পশ্চিমের প্রবল প্রভাবে যথেচ্ছাচারবাদী হবার বিরুদ্ধেও সাবধান হবার এই পথ। শিশু কিশোর সবদেশে এক নয়। ভাল মন্দ সর্বত্র সমান নয়। একদেশ তার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে হলে অপর দেশকে বাদ দিতে পারে না। বাদ দিতে পারে অন্ধ অনুকরণ। যে অনুকরণে বিচারশক্তি লোপ পায়। রুচিবহির্গত উদ্ভ্রান্ত ভাবের প্রভাবকে আধুনিকতা মনে করে। যৌন জীবনে অবাধ যথেচ্ছাচারের পশ্চিমী ধারা তার একদিক মাত্র।

শ্রীমতী

"দিলীপের মুখ থেকে খবরটা শুনে আমার যে কি আনন্দ হল! ওকে দুহাতে বুকে টেনে নিলাম। ও যথেষ্ট অনুশীলন করেছে, খেটেছে। তবুও বলবো এর জন্য যে-বাড়তি শক্তি-সামর্থ্যের প্রয়োজন তার সবটুকুই ও পেয়েছে বোর্নভিটা থেকে। দুধের সঙ্গে মিশিয়ে বোর্নভিটা খেতে ও বরাবরই বড্ড ভালোবাসে। শরীর সুস্থ-সবল রাখতে যে পুষ্টি, শক্তি ও সামর্থ্যের প্রয়োজন বোর্নভিটায় তা পুরোমাত্রায় রয়ে[illegible] ওকে আমি নিয়মিত বোর্ন[illegible] খাওয়াই। তাই [illegible]নায়, কি পড়াশুনায় সবদিকেই ছেলে আমার সমান চৌকশ।"

বোর্নভিটা পুষ্টিকর, শক্তিদায়ক সুষম পরিমাণে কোকো, দুধ চিনি ও মল্ট মিশিয়ে এটি তৈরি করেছেন ক্যাডবেরি— প্রাণোজ্জ্বল পানীয় প্রস্তুতে বিশেষজ্ঞ ব'লে যাঁদের খ্যাতি একশ বছরেরও বেশি। এর কোকো-সমৃদ্ধ স্বাদ ছেলেমেয়েদের ভারী পছন্দ !

[illegible] বোর্নভিটা খাবেন —

[illegible]

(৭)

১৯১৭ সাল থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের প্রতি এবং বিশেষ করে, গান্ধীজি এবং রবীন্দ্রনাথের পারস্পরিক সম্বন্ধটি সম্পর্কে রোলাঁর মনোভঙ্গী যাঁরা আনুপূর্বিক অনুসরণ করেছেন তাঁরা ১৯৩০ সালের সাক্ষাৎকারের যে বিবরণ রোলাঁ জর্নালে লিখেছেন তার মধ্যে কবির প্রতি যে বিরূপতার প্রকাশ লক্ষ্য করবেন, তার ফলে স্বভাবতই বিস্মিত হবেন। বিশেষ করে ঐ বিবরণের শেষে গান্ধীজির নামটি করেন নি বলেই গান্ধীজির পক্ষ অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে অনাবশ্যক কটু মন্তব্যগুলি রোলাঁ করেছেন সেগুলি দুর্বোধ্য বলেই মনে হবে। কিন্তু রোলাঁকে যাঁরা জানেন তাঁদের কাছে এটা খুব দুর্বোধ্য বলে মনে হবে না। বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে যে রোলাঁ চিরকালই দোলায়িত ছিলেন এবং তার ফলে বহুবার ডাইনে বাঁয়ে তিনি মোড় ফিরেছেন সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। প্রথম মহাযুদ্ধের পর সব ছেড়ে তিনি অন্ধ স্বাজাত্যের বিরুদ্ধে একটা সুস্থ, নিরপেক্ষ যুক্তি এবং বুদ্ধির দ্বারা সমর্থিত মুক্তমনের বা independence of the spirit-এর আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিলেন এবং এই আদর্শের সূত্রেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সহযোগিতা ছিল। কিন্তু ১৯২৬ এবং ১৯৩০ সালের মধ্যে কোনো এক সময় আবার তাঁর হৃদয় পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়ে থাকবে। এই মনোভাবটি যখন স্পষ্ট হয়ে উঠলো তখন দেখা যায় তিনি যুক্তি-মার্গ ছেড়ে ভক্তিমার্গে উন্নীত হয়েছেন, মুক্ত-মনকে ছেড়ে আশ্রয় করেছেন অন্ধ বিশ্বাসকে। 'We die, Christophe, to be born again!'

গান্ধীজি সম্বন্ধে তিনি এমন একটা প্রত্যাশা মনে মনে পোষণ করেছেন যার সঙ্গে যুক্তি-তর্ক বা বুদ্ধি-বিচারের সম্ভব নেই। রোলাঁর প্রত্যাশা, গান্ধীজি এমন একটা miracle দেখাবেন যার ফলে টলস্টয়ের non-resistance to evil এবং সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্যে যে বিরোধ ছেলেবেলা থেকেই তাঁর মনকে উদ্‌ভ্রান্ত করেছে, তার অতি সহজ একটি মীমাংসা হয়ে যাবে। সেই জন্যই দেখা যায়, যদিও একদা রোলাঁ বিশ্বভারতীর একটি 'য়ুরোপীয় শাখা' সংগঠনের কথা ভেবেছিলেন, এখন তাঁর গৃহটিই প্রায় সাবরমতী আশ্রমের 'য়ুরোপীয় শাখায়' পরিণত হয়েছে এবং অচিরেই, ১৯৩৫ সালের পরে, বিশেষ করে—অনিবার্য কারণেই—সেটি রামকৃষ্ণ মিশনের বে-সরকারী 'য়ুরোপীয় শাখায়' পরিণত হবে। যাই হোক, ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির সঙ্গে যথোচিত সহযোগিতা করছেন না এই সন্দেহমাত্রেই তাঁর এই অধৈর্য। গান্ধীজির সম্বন্ধে রোলাঁর প্রত্যাশাটা ঠিক কী ছিল সেটা স্পষ্ট জানা যায় কিছু পরে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত এক পত্রে (১৬ই নভেম্বর, ১৯৩৩)। রোলাঁ লিখেছেন: 'আজকের সংগ্রামে আমি যে ভূমিকাটি নিয়েছি এবং যা আপনি আপনার যৌবন-সুলভ অনমনীয়তার দরুণ ঠিক বুঝতে পারছেন না, তা হ'ল দুটি বিপ্লবের মধ্যে যোগসূত্রের কাজ করা: গান্ধীর (অহিংস) বিপ্লব এবং লেনিনের (সশস্ত্র) বিপ্লব।' অর্থাৎ প্রত্যাশিত miracleটি হ'ল এই যে, কোনো এক সময় গান্ধীজির অহিংস পন্থাতেই লেনিনের সশস্ত্র বিপ্লবের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে এবং তার ফলে বর্তমান বিশ্ব তার মহত্তম সিদ্ধি তো লাভ করবেই, উপরন্তু সেই সূত্রে রোলাঁর নিজের বহু পুরাতন অন্তর্দ্বন্দ্বেরও নিরসন হয়ে যাবে। ১৯৩১ সালে যখন গান্ধীজি ভিল্‌ন্যুভে রোলাঁর অতিথি হন, তখন শ্রমিক স্বার্থ, শ্রমিক আন্দোলন প্রভৃতি বিষয়ে রোলাঁ তাঁকে কতকগুলি প্রশ্ন করেন, তার যে উত্তর শুনেছিলেন তার ফলেই যে উপরোক্ত ধারণাটি বদ্ধমূল হয়েছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু রোলাঁর এই সমস্ত লালিত মোহাবিষ্ট স্বপ্নটি একটি নিদারুণ লগুড়াঘাত খায় সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই হাতে। ইতিপূর্বে ১৯২৪ সালেই লালা লাজপৎ রায়ের মুখে গান্ধীজির নেতৃত্বের কঠোর সমালোচনা তিনি শুনেছেন, কিন্তু

খন গায় মাখেন নি, পরেও জওহরলাল নেহরুর কথাতেও গান্ধীজির প্রতি ঈষৎ সহিষ্ণু মনোভাবের পরিচয় পেয়েছেন কিন্তু কখনোই তর্ক করবার প্রয়োজন বোধ করেন নি, কেননা গান্ধীবাদ সম্বন্ধে তখনও পর্যন্ত তাঁর কোনো দায়িত্ববোধ জন্মায় নি। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে তাঁর তদানীন্তন বিশ্বাসে যে আঘাতটি তিনি পেলেন তার একটু বিশেষত্ব আছে। যে কোনো কারণেই হোক রোলাঁ এবার সৌম্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে রীতিমত তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। ভিলন্যোভে রোলাঁর গৃহেই ১৯৩৩-এর ২৪শে এবং ২৫শে নভেম্বর এই দুইদিন ধরে এই তর্ক চললো। সৌম্যেন্দ্রনাথ-লিখিত এবং রোলাঁ কর্তৃক সংশোধিত এই বিতর্কের অনুলিপিটি ফরাসী তর্জমায় রোলাঁর জার্নালে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত আছে। বিতর্কের এই অনুলিপিটি পড়লে দেখা যায় তরুণ সৌম্যেন্দ্রনাথ যে ভাবে তথ্যের বিশ্লেষণ ও বিন্যাস করেছেন, শাণিত যুক্তির সুনিপুণ প্রয়োগ করেছেন, তার সামনে রোলাঁ প্রায় দাঁড়াতেই পারেন নি। সৌম্যেন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত অস্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন একটি লক্ষ্যের দিকেই—অর্থাৎ রোলাঁর সেই প্রত্যাশাটি যে কোনো একটা সময়ে গান্ধী বিপ্লব অহিংসপন্থাতেই লেনিন-বিপ্লবে পরিণত হয়ে যাবে। রোলাঁ স্বভাবতই কোনো সদুত্তর দিতে পারেন নি, তার কারণ এটাতে তাঁর একটা মত নয়, একটা বিশ্বাস [illegible] কিন্তু মুখে স্বীকার না করলেও এমন কি [illegible] সৌম্যেন্দ্রনাথের উক্তিগুলিকে [illegible] উপহাস করলেও, ভিতরে ভিতরে যে তিনি খুব বড় রকমের একটা নাড়া খেয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সৌম্যেন্দ্রনাথ যে ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে অচিরেই গান্ধীজির অহিংস বিপ্লব সম্বন্ধে রোলাঁর এই মোহ কেটে যাবে এবং সোস্যালিস্টদের সঙ্গেই তাঁকে হাত মেলাতে হবে সেটা সত্যে পরিণত হতে বিলম্ব হ'ল না। অবশেষে ১৯৩৪-এর সেপ্টেম্বরে বোম্বাই কংগ্রেসে সোস্যালিজম্ সম্বন্ধে গান্ধীজির সুস্পষ্ট বক্তব্য শুনে রোলাঁর স্বপ্নভঙ্গ হ'ল। 'গান্ধীজি যে শুধু সোস্যালিজম্ গ্রহণ করবেন না তাই নয়, সোস্যালিজম্ বস্তুটি কী তা তিনি বুঝে দেখতেও রাজি নন' এই কথা শুনে রোলাঁ তাঁর যে বইখানি তখন যন্ত্রস্থ ছিল (Par La Revolution, La Paix) তার সঙ্গে একটি অংশ যোগ করে গান্ধীজির রাজনীতির সঙ্গে নিজের বিচ্ছেদ ঘোষণা করলেন। সেই অংশটিতে তিনি লিখলেনঃ 'সমাজ সংস্কারের পথ চির-উন্মুক্ত, তার [illegible] সব সময়েই এগিয়ে চলবে। এই অগ্রগতি [illegible] বা রীতির দ্বারা অথবা কোনো অভ্রপ্রতিষ্ঠ credo-র দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে না। অতীতের যে প্রভাব এই অগ্রগতির বাধাস্বরূপ, গান্ধীজি যদি নিজেকে তার থেকে মুক্ত করতে না পারেন, তাহলে ভারতবর্ষের এই মহৎ আন্দোলনের নেতৃত্ব তিনি অনিবার্যভাবেই হারাবেন। এই আন্দোলন ইতিমধ্যেই তাঁকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে শুরু করেছে।' অতঃপর ১৯৩৫-এর এপ্রিলে রোলাঁ যখন [illegible] সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করছেন [illegible] গান্ধীজি সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ মোহমুক্ত। [illegible] গান্ধীজি সম্বন্ধে তাঁর [illegible] অর্থাৎ [illegible] ফিরে রোলাঁ আবার ফিরে দাঁড়ালেন রবীন্দ্রনাথেরই পাশে।

এই রকম রাজনৈতিক ভাবাবেগের জন্য রোলাঁ রবীন্দ্রনাথকে দু একবার ভুল বুঝেছেন এবং সাময়িকভাবে তার প্রতি একটু বিরূপ হয়েছেন। রাজনীতি ছাড়াও নিছক সাহিত্যিক কারণেও অনেক সময় কবির প্রতি তিনি অবিচার করেছেন বা সংকীর্ণ মনোভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষত [illegible] দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রোলাঁর যথার্থ জ্ঞানের অভাবেই এর মূল কারণ। [illegible] কবিকে বুঝবার চেষ্টা করেছেন, রোলাঁর পক্ষে সে পথ এক রকম বন্ধই ছিল। তার কারণ তিনি ইংরেজি ভালো জানতেন না এবং [illegible] ইংরেজিতে কবির যত বই প্রকাশিত হয়েছিল, ফরাসী তর্জমা তার তুলনায় ছিল নগণ্য। অবশ্য ইংরেজির মাধ্যমেও কবি সম্বন্ধে [illegible] জ্ঞানের বেশী প্রত্যাশা ছিল না, কিন্তু রোলাঁর পক্ষে সেটুকুও [illegible] ছিল। [illegible] কৌতূহল নিয়ে এমন সব সংবাদদাতার শরণাপন্ন তিনি হয়েছিলেন, যাঁদের অনেকেই ছিলেন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, একদেশদর্শী অথবা ব্যক্তিগত কারণে অপযশবিলাসী অর্থাৎ সত্য প্রকাশে সম্পূর্ণ অনধিকারী। এঁরাই যে অনেক সময় রোলাঁকে বিভ্রান্ত

করেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যেমন অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে একটির উল্লেখ করছি। ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপসূত্রে, মনে হয় তাঁর কাছে শুনেই, রোলাঁ মন্তব্য করছেন যে ওকাকুরার সঙ্গে সাক্ষাতের ফলে, তারই প্রভাবে, নাকি মহত্তর রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। কালিদাস নাগের মতো ব্যক্তিও যে সব সময় কবিকে বোঝার ব্যাপারে রোলাঁকে সাহায্য করেন নি তার নজির আছে। তাঁর সঙ্গে আলাপসূত্রেই রোলাঁ সেই বিস্ময়কর এবং ভ্রান্ত উক্তিটি করেন যে বলাকা রচনার পর উল্লেখযোগ্য আর কিছুই রবীন্দ্রনাথ লিখতে পারেন নি। কালিদাস নাগ কোনো প্রতিবাদ করেন নি, করলে অবশ্যই রোলাঁ জর্নালে তার উল্লেখ করতেন। কালিদাস নাগ কি জানতেন না বলাকার পর কবি কী কী রচনা করেছেন? তাঁর নীরবতার একটা কারণ অবশ্য সহজবোধ্য। রোলাঁর উদ্যোগেই বলাকার যে ফরাসী তর্জমাটি Cygne নামে প্রকাশিত হয় সেটি রচনা করেন পিয়ের জাঁ জুভ্ নামক এক তৃতীয় শ্রেণীর কবি কালিদাস নাগেরই সহযোগিতায়। উল্লেখ প্রয়োজন যে, বলাকার তর্জমা হিসেবে এটি নিতান্তই নিষ্প্রভ। কিন্তু এ ছাড়া বিভ্রান্তির অপেক্ষাকৃত মারাত্মক কারণ রোলাঁর নিজের স্বভাবের মধ্যেই ছিল। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ [illegible]। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক সেটি সংগীতের নয় কিন্তু রোলাঁর মনের একটা বিশেষ দিকে এটি আলোকসম্পাত করবে। ১৯২৬ সালে একদিন কবির সঙ্গে সংগীত সম্বন্ধে আলোচনার পরে রোলাঁ জর্নালে লিখলেন যে রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপীয় সংগীত সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, তিনি বাখ-এর নাম পর্যন্ত শোনেননি। সবিস্ময়ে রোলাঁ মন্তব্য করলেন যে কবি এতবার য়ুরোপে এসেছেন, এর মধ্যে কোনো য়ুরোপীয় বন্ধুই যে তাঁকে য়ুরোপীয় সংগীত ভালোভাবে শিখে নিতে সাহায্য করেননি সেটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। জর্নালে রোলাঁর এই মন্তব্যটিই শুধু বিচ্ছিন্নভাবে পড়লে এমন একটা ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে য়ুরোপীয় সংগীত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিশেষজ্ঞতার পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলেন, পরীক্ষক রোলাঁ তাঁকে পাস মার্কা দেননি। সকলেই জানেন, কোনো বিষয়েই—এমন কি বাংলা ভাষা সম্বন্ধেও বিশেষজ্ঞতার দাবী করা কবির প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। তাছাড়া সংগীত সম্বন্ধে ঐ বিশেষ দিনের আলোচনার অনুলিপি বর্তমান, Rolland and Tagore গ্রন্থে। সেটি পড়লে পাঠক মাত্রেই বুঝবেন যে আলোচনার বিষয়টা ছিল আর্ট সম্বন্ধে একটি সাধারণ তত্ত্ব, য়ুরোপীয় সংগীত প্রসঙ্গত উল্লিখিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বাখ ও বেটোভেনের উল্লেখ করেছিলেন যেহেতু তিনি তাঁদের সংগীত ভালোবাসতেন। গ্লুকের নাম না শুনলে বাখ বেটোভেনের সংগীত সম্ভোগ করা যাবে না এমন দাবী গ্রহণযোগ্য নয়। আসলে একজন আর্টিস্টের ভিন্ন ঐতিহ্যাশ্রিত আর্ট সম্বন্ধে যে কৌতূহল অথবা উৎসাহ তা মূলত সৃজনমূলক, অনেক সময় আর্টিস্টের ভুল বোঝাটাও নূতন সৃষ্টির উৎস হতে পারে। বলা বাহুল্য এই সৃজনমূলক কৌতূহল বা ঐতিহাসিকের অথবা বৈয়াকরণিকের নয়। সংগীত-ইতিহাসের প্রাক্তন অধ্যাপক রোলাঁ এই সত্যটি বুঝতে পারেননি তাঁর গুরুমশাই-সুলভ মনোভঙ্গীর জন্যই। এর মধ্যে একটু আত্মপ্রসাদের ভাবও হয়তো ছিল। অপরপক্ষে স্মরণ করা যেতে পারে ১৯২১ সালের দ্বিতীয় সাক্ষাতে কবি গীতাঞ্জলির দুটি গান গেয়ে শোনালে রোলাঁ মন্তব্য করেছিলেন : 'রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যে অভিনবত্ব তেমন কিছু নেই, তুলনায় গত বৎসর দিলীপ রায়ের কণ্ঠে যে মার্গ-সংগীতের নমুনা শুনেছিলাম, তার মূল্য অনেক বেশী।' রোলাঁ ভারতীয় সংগীত সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না, দিলীপ রায়ের কণ্ঠে শোনা দু একটি রাগ-রাগিণী ছাড়া। উপরন্তু তিনি রবীন্দ্রসংগীতের বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন মাত্র দুটি গান শুনে, তাও ষাট বৎসরের বৃদ্ধ কবির জীর্ণ কণ্ঠে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত স্বভাব-সিদ্ধ ঈষৎ হঠকারিতার সঙ্গে রাজনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক ইত্যাদি নানা জটিলতাও বর্তমান দেখা যায়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপরিক্রমা সম্বন্ধে রোলাঁর জল্পনা কল্পনা, এর শুরু প্রায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রোলাঁর প্রথম সাক্ষাতের পর থেকেই এবং চলে প্রায় শেষ পর্যন্ত। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য নিজেও চিঠিপত্রে এবং আলাপ প্রসঙ্গে অনেক সময় এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং সেই ছিন্নপত্রের যুগ থেকেই যে তিনি নিজের মধ্যে ঘরের টান এবং পথের আকর্ষণ দুইই সমভাবে অনুভব করেছেন তাও আমাদের অবিদিত নয়। আকাশ কবির 'সাকী', তাই সমুদ্রের পিয়াসায় তো মাঝে-মাঝেই ঘর ছেড়ে তিনি পথে বেরিয়ে পড়বেন! কিন্তু পরিণত বয়সে কবি যে বারবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছেন সে শুধু বৈচিত্র্যের ক্ষুধায় নয়। আরো একটা ক্ষুধা ছিল, সেটা হল মানুষকে দেখার ক্ষুধা। কবিমাত্রেই যে এই ক্ষুধা বোধ করেন তা নয়, তবে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট কবিসত্তার এটি একটি অন্যতম লক্ষণ। ১৯৩০ সালে দিলীপ রায়কে লিখিত একটি চিঠিতে কবি লিখেছেন : 'আমার সব অনুভূতি এবং বেদনার ধারা এসে ঠেকেছে মানবের মধ্যে। বারবার ডেকেছি দেবতাকে, বারবার সাড়া দিয়েছেন মানুষ, রূপে এবং অরূপে, ভোগে এবং ত্যাগে। সেই মানুষ ব্যক্তিতে এবং সেই মানুষ অব্যক্তে।...যে মানব একই কালে 'সনাতন' এবং 'পুনর্ণব' আমি তাঁরই কাছে কবিত্বের বায়না নিয়েছি।' এই মানুষকে প্রতিদিন ঘরের কোণে প্রাত্যহিক ক্ষুদ্রতার এবং তুচ্ছতার আড়ালে দেখলে তাঁর গৌরব হারায়, তাঁর মূর্তি বিকৃত হয়। তাই মাঝে মাঝে বাইরে বিশ্বজগতের বৃহৎ রঙ্গশালায় কবি তাঁকে নানা মূর্তিতে দেখতে চেয়েছেন,—দেখতে চেয়েছেন বিচিত্র কর্মের প্রয়াসে, নব নব চিন্তার এবং ধ্যানের ঐশ্বর্যের মধ্যে। কবি তাঁর বিশ্বভ্রমণকে বলেছেন তীর্থযাত্রা। সেই জন্য, বিদেশে যে তাঁর অভূতপূর্ব সমাদর হয়েছে, তাঁর কথা শুনে, এমন কি ভাষা না বুঝে, তাঁর শান্ত কণ্ঠস্বরেই যে অগণিত নরনারী শক্তি, শান্তি এবং সান্ত্বনা লাভ করেছে এবং তাঁকে

মতো ভক্তি-অর্ঘ নিবেদন করেছে
তিনি কোনোদিনই বড় করে
। এণ্ডরুজকে লিখিত
পত্রে কবি লিখেছিলেন :
praying to be lighted from
and not simply to hold a
n my hand.'
থেকে যা মনকে আলোকিত করে তা
, সম্মান নয়। এই প্রেমের গভীর
যথোপযুক্ত পরিচয় কবি তাঁর বিশ্ব-
ভ্রমণে বারবারই পেয়েছেন এবং
চিত্তে গ্রহণ করেছেন। এরই জন্য
মনে ছিল অন্তহীন ক্ষুধা, কেননা
ধ্য ছিল ছিন্নপত্রে যাকে তিনি
ন সেই 'দাহহীন চির অগ্নি' যা
সত্তাকে ফুলফলের সার্থকতায়
ভূষিত করেছে।

বিশ্বভ্রমণ সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা-
যা যায় রোলাঁ বিভিন্ন সময়ে
বুঝবার চেষ্টা কখনো করেননি।

তাছাড়া রাজনৈতিক মতামত এবং কখনো কখনো অনতিগোচর মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাও এর মধ্যে কাজ করেছে বলে মনে হয়। একটা জিনিস লক্ষ্য না করে উপায় নেই যে য়ুরোপ ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ যে রাজোচিত সম্মান ও সমাদর পেয়েছিলেন এবং তৎকালীন সংবাদপত্রগুলি সে বিষয়ে যথোচিত মুখর ছিল, রোলাঁর জর্নালে তার কোনো পরোক্ষ উল্লেখও পাওয়া যায় না। ১৯২৩ সালে রোলাঁর সিদ্ধান্ত হল এই যে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রদক্ষিণের প্রকৃত অর্থ হল বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ-সংগ্রহ-প্রচেষ্টা। এই বৎসরই ডিসেম্বরে আঁদ্রে কার্পেলেকে লিখিত এক পত্রে রোলাঁ প্রচুর সমবেদনা এবং উদ্বেগ প্রকাশ করলেন এবং সেই সঙ্গে এও বললেন যে, তাঁর নিজের যথেষ্ট সংগতি থাকলে তিনি কবিকে সাহায্য করতে পারতেন। ১৯২৪ সালে কবির দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রার ব্যাপারে রোলাঁর মন যখন ক্ষুব্ধ তখন দেখা যায় কবির এই ভ্রমণস্পৃহাকে একটা মানসিক অস্থিরতার বাহ্যলক্ষণ বলেই স্থির করেছেন। জর্নালে রোলাঁ প্রশ্ন করছেন: 'এই যে সময়ের অপব্যয় করে, স্বাস্থ্যকে বিপন্ন করে, কবি ঘুরে বেড়ালেন, তাতে লাভটা কী হল? প্যারিসে কী দেখবার ছিল? বুয়েনস এয়ারিসেই বা কী দেখবার ছিল?' আর্টিস্ট কোথায় কখন কী দেখেন সঠিক বলা কঠিন, তবে কবির দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রাটা রোলাঁ যতটা সময়ের অপব্যয় মনে করেছেন ততটা অবশ্যই ছিল না, কেননা অন্তত পূরবীর মতো একখানি কাব্যগ্রন্থ এবং পশ্চিমযাত্রীর ডায়েরীর মতো একখানি গদ্যগ্রন্থ এই যাত্রার ফলশ্রুতি! ১৯২৬ সালে কবি যে মুসোলিনির ইতালি এবং হর্টির হাঙ্গেরি সফর করেছেন সেটা ফ্যাসিবিরোধী রোলাঁর কাছে রাজনৈতিক কারণেই অত্যন্ত অরুচিকর ঠেকেছে। সেই সঙ্গে দেখা যায় কবির বিশ্বভ্রমণ সম্বন্ধেও তাঁর বিরূপতা সেই কারণেই বৃদ্ধি পেয়েছে। এবার রোলাঁ মন্তব্য করলেন: নিজেকে নিরন্তর উত্তেজিত রাখবার, ভ্রমণ করবার, দেখবার (নাকি, দৃশ্যমান হবার?) এই যে একটা অপরিহার্য প্রয়োজন দেখি কবির মধ্যে, এটা একটা ব্যাধিবিশেষ, মনে হয় এটা তাঁর স্বভাবের দুর্বলতারই লক্ষণ। [illegible] লক্ষ্য করবার বিষয়। কোনো এক সময়, অন্তত সাময়িকভাবেও, রোলাঁর মনে হয়েছিল যে কবির এই নিরন্তর বিশ্বভ্রমণের পিছনে আছে আত্ম-বিজ্ঞাপনের স্পৃহা, হাজার হাজার নরনারীর মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে নিজেকে নাচিয়ে বেড়াবার আকাঙ্ক্ষা। এইরকম ধারণার কোনো সংগত কারণ চোখে পড়ে না—একমাত্র মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ছাড়া। স্বভাবতই রোলাঁর প্রতিকৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন মনে উদিত হয়: তাঁর চেহারাটা ছিল একেবারেই বৈশিষ্ট্যবর্জিত, বক্তৃতা শক্তি তাঁর ভালো ছিল না, জনতার সামনে তিনি কোনো দিনই দাঁড়ান নি (তাঁর কারবার ছিল বরাবরই নিভৃতে সেই little [illegible] নিয়ে) এবং তাঁর বাণীও নিয়ে কোনো দেশের সাধারণ মানুষই কোনোকালে কৌতূহল বা আগ্রহ প্রকাশ করে নি। যাই হোক, এই জাতীয় উক্তি তিনি আর দ্বিতীয়বার জর্নালে করেন নি। তবে ভ্রমণের উত্তেজনা যে কবির স্বাস্থ্যনাশে এক ব্যাধিবিশেষ সে কথা কয়েকবারই লিখেছেন।

যে দৃষ্টান্তগুলির বিস্তৃত আলোচনা করলাম সেগুলি একটা জিনিসই সপ্রমাণ করে—তা হল এই যে, ব্যক্তিগত ব্যাপারে রোলাঁ অনেক কারণে কবি সম্বন্ধে অনেক

ভুল করেছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে একজন বিদেশী এবং জটিল ব্যক্তিত্বশালী আর্টিস্টকে সম্পূর্ণ বোঝা অতীব কঠিন। কিন্তু বই পড়েই হোক বা ব্যক্তিগত সাহচর্যের ফলেই হোক, এই দুঃসাধ্য কাজ কেউ কেউ করেছেন। আঁদ্রে জীদ ডস্টয়েভ্‌স্কিকে বুঝেছিলেন, রিল্‌কে বুঝেছিলেন রোদাঁকে। রোলাঁর পক্ষে তা সম্ভব হয়নি, তার কারণ ওঁদের মতো ধৈর্য, কল্পনাশক্তি, সূক্ষ্ম অনুভূতি, আত্ম-নিরপেক্ষতা এবং সর্বোপরি, মানস-সম্বল তাঁর ছিল না। বাহিক বাধাও ছিল প্রবল। কবির ব্যক্তিত্বের বহুমুখী জটিলতাও একটা কারণ। এবিষয়ে রোলাঁ নিজেও সচেতন ছিলেন। কবিকেই একখানা চিঠিতে তিনি লেখেন : যাঁরা আপনার নিকটতম তাঁদের মধ্যেও কজনই বা সত্যি সত্যি আপনাকে জানেন? কিন্তু ব্যক্তিগত স্তরে পারিপার্শ্বিক যাবতীয় ভুলভ্রান্তি করলেও রোলাঁ মূলে ভুল করেন নি, যাঁকে ১৯১৩ সালেই মহাকবি বলে চিনেছিলেন এবং ১৯১৬ সালের পর থেকেই যাঁর কবি-দৃষ্টি এবং আদর্শ তাঁকে আকর্ষণ করেছে, সেই কবির প্রতি অনুরাগ, শ্রদ্ধা এবং আনুগত্যের ত্রুটি কখনো হয়নি, ব্যক্তিগত ব্যাপারে অনেক স্খলন প্রমাদ সত্ত্বেও। রোলাঁ ভুল করেছেন ছোটখাটো ব্যাপারে, ব্যক্তিগত বা সাময়িক ব্যাপারে কিন্তু সেগুলির সংশোধন তিনি করেন নানা কারণে। [illegible] কবির ব্যক্তিত্বটি যতই [illegible] তিনি দেখতে পেয়েছেন, ততই তাঁর দৃষ্টির সাময়িক কুয়াশা কেটে গেছে এবং ততই কবির মধ্যে যা বরণীয়, বন্দনীয় এবং অবিস্মরণীয়, তিনি তার সংকীর্তন করেছেন গভীর অনুরাগের এবং শ্রদ্ধার ভাষায়। এটাই মূল এবং এর নিদর্শন আমরা পূর্বেও দেখেছি, পরেও দেখাবো। একদা কবিকে লিখিত এক পত্রে রোলাঁ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যা বলেছিলেন কবির সম্বন্ধেও তিনি সে-কথা বলতে পারতেন, এবং তাঁর মনোভাবের সেটাই হত নির্ভুল বর্ণনা। তিনি লিখেছেন : 'আমি যদি সব সময় নির্ভুলভাবে সব কিছু না বুঝে থাকি, তথাপি আশা করি, আমার সহানুভূতিতে কোনো ভুল নেই। কেননা আমি ভালোবেসেছি।'

(৪)

১৯৩০ সালের বিবরণে ফেরা যাক। ইতিপূর্বে রোলাঁর বিভিন্ন মন্তব্য বিশ্লেষণের সূত্রে দেখেছি, এবার কবির প্রতি তিনি যে ঘোরতর অবিচার করেছেন তার অনেক কারণের মধ্যে একটা হল এই যে, সে সময় বিদেশে থেকেও কবি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে কী ভেবেছেন, কী করেছেন সে বিষয়ে তাঁর সম্পূর্ণ অজ্ঞতা। অন্যান্য বারের মতো এই ভুল কি তাঁর ভেঙেছিল? সেটা অবশ্য খুব কঠিন ছিল না, কেননা অন্তত ১৬ই মে তারিখের ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানটি এবং ৭ই জুন তারিখের স্পেকটেটরখানা দেখলেই রোলাঁ বুঝতে পারতেন, যে বিদেশে থাকলেও স্বদেশ সম্বন্ধে কবি নির্বিকার ছিলেন না এবং গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর মৌলিক মতবিরোধ সত্ত্বেও ভারতবর্ষের মহান নেতা হিসেবে গান্ধীজির যেটা প্রাপ্য তা তিনি রবীন্দ্রনাথের নিকট সব সময়েই পূর্ণমাত্রাতেই পেয়েছেন। তবে রোলাঁ যে এইসব পত্রিকা নিজে দেখেছেন বা অপরের কাছেও কিছু শুনেছেন এমন লিখিত কোনো নজির পাওয়া যায় না। তার একটা কারণ এবারের বিরূপ মন্তব্যগুলি শুধুমাত্র তাঁর জার্নালেই লিখে রেখেছিলেন, এবং একমাত্র আঁদ্রে কার্পেলেকে লিখিত যে চিঠিখানির উল্লেখ পূর্বে করেছি, সেটি ছাড়া চিঠিপত্রে বা অন্যান্য কোনো প্রকাশ্য রচনায় এবিষয়ে কোনো আভাস পাওয়া যায় না। তবে সেই সাময়িক বিরূপতা যে অচিরেই অন্তর্হিত হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। জেনিভায় ২৮শে আগস্ট রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পূর্ব-বর্ণিত সাক্ষাৎকারের এক মাসের মধ্যেই [illegible] The Golden Book of Tagore-এর জন্য রচনা আহ্বান করে যে প্রচারপত্রটি রোলাঁ রচনা করেন তার একটি অংশ মনোযোগ দিয়ে পড়লে কবির প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছাড়াও একটা [illegible] হয়েছিল যে বিষয়ে [illegible] স্বীকার করেছিলেন, অনুরূপ স্বীকারোক্তির মতো [illegible] সংশোধনের একটা চেষ্টা আছে এর মধ্যে। সম্পূর্ণ প্রচারপত্রটিই জার্নালে উদ্ধৃত আছে, তার থেকে উল্লিখিত অংশটি তুলে দিচ্ছি :

'রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে ছন্দোময় এবং জ্যোতিষ্মান মননের জীবন্ত প্রতীক-স্বরূপ। এরিয়েল তার স্বর্ণবীণায় যে আলোকের সুর বাজিয়েছিল, এই বিরাট যুক্তে [illegible] ঝঞ্ঝার মাঝখানে শৃঙ্খলাচ্ছিন্ন উন্মত্ত হিংসার সমুদ্র পার হয়ে সেই সঙ্গীতকে উঁচুতে ধরে রেখেছেন। কিন্তু মানুষের দুঃখের প্রতি, স্বাধীনতার জন্য জনগণের বীরোচিত সংগ্রামের প্রতি তাঁর মহিমান্বিত আত্মা কোনোদিনই নির্বিকার থাকেনি। কেননা, আমরা যা কিছু হয়েছি, যা কিছু সৃষ্টি করেছি তার মূলে অথবা তার শাখাপ্রশাখা অভিষিক্ত হয়েছে প্রেমের এবং কালের এই [illegible]।'

স্মারক গ্রন্থটি রোলাঁ নিজে [illegible] হিসেবে Niobe নামে যে বাণী রচনাটি নিবেদন করেন তার ক্ষুদ্র ভূমিকাটিতেও এ একই সুর শুনি :

'[illegible] যে ছোট শ্যামা পাখীটি তার কুলায় ছেড়ে উড়ে যাবার জন্য তার ক্ষুদ্র ডানাদুটি শক্তি পরীক্ষা শুরু করেছিল, তারই এই শৈশব কাকলি ভারতবর্ষের সেই মায়াবিহঙ্গকে নিবেদন করি।'

১৯৩০-এর পর থেকেই রবীন্দ্রনাথ এবং রোলাঁর মধ্যে অনিবার্য কারণবশতই একটা ব্যবধানের সূচনা হল। এর পরে ইরান, ইরাক, সিংহল প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করলেও, কবির পক্ষে য়ুরোপযাত্রা আর সম্ভব নয়। রোলাঁও তাঁর ভারতযাত্রার স্বপ্ন নানা কারণেই বহু পূর্বেই ত্যাগ করেছেন। কাজেই আর দেখা হবে না। পত্রযোগে এখনও রোলাঁ কবিকে শোকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, নাতনীর বিবাহ সংবাদে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। ভারী একটা সকরুণ সতর্কতার ভাব আছে এই কয়েকটি চিঠিতে। ইতিমধ্যে নানা ফাসি-বিরোধী অথবা যুদ্ধবিরোধী সংস্থার সভাপতি অথবা প্রোৎসাহক হিসেবে কবি যে যথা-স্থানে যথারীতি অতন্দ্র প্রহরীর কাজ করে চলেছেন, দূরে থেকে রোলাঁ সবই লক্ষ্য করছেন। এখন কবিকে দেখছেন দূর থেকে, কাছের কোনো কুয়াশা আর সেই জ্যোতির্ময় মূর্তিকে আচ্ছন্ন করতে পারবে না। অবশেষে ১৯৩৭-এর শেষে কলকাতা কংগ্রেসের সময় গান্ধীজি অসুস্থ হয়ে পড়লে, রোগজীর্ণ শরীরে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দেখতে যান, হরিজন কাগজে তার বিবরণ পড়ে রোলাঁ অভিভূত। জার্নালে এই দুই বরেণ্য ব্যক্তিত্বের কথা সশ্রদ্ধ ভাষায় যেভাবে লিখেছেন তাতে বুঝতে বাকি থাকে না যে অবশেষে তাঁদের দুজনকেই, তিনি যথার্থ চিনতে পেরেছেন।

ইতিমধ্যে যে সর্বনাশের বিভীষিকা রোলাঁ দশ বৎসর পূর্ব থেকেই কল্পনায় দেখে এসেছেন তা প্রায় য়ুরোপের দ্বারে এসে হানা দিয়েছে। স্পেনের গৃহযুদ্ধটিই যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের নান্দীপর্ব সে বিষয়ে রোলাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ১৯৩৮ সালে রোলাঁ সুইটজারল্যাণ্ড ছেড়ে ফ্রান্সে ফিরলেন। একাধিক অর্থেই এটা তাঁর ঘরে ফেরার পালা। গান্ধীজির অহিংস বিপ্লবে তাঁর কোনো সমস্যার সমাধান হয়নি, যুদ্ধের যে অগ্রদূতকে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখা যাচ্ছে তাকে তা দিয়ে ঠেকানো যাবে না। বিবেকানন্দ-রামকৃষ্ণের বিশেষ আধ্যাত্মিক জগতে তাঁর যে মানস-বিহার শুরু হয়েছিল তারও শেষ হল, সেখানে তাঁর স্থায়ী আশ্রয় নেই। এখন তিনি আর above the battle নন। এখন তিনি সৈনিক, ফ্রান্সের সাধারণ মানুষের পাশেই তাঁর স্থান। ১৯৩৭-এর ৫ই ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথকে যে চিঠিখানি রোলাঁ লেখেন তাতে তাঁর এই শেষ বেলাকার অপরাজিত বিশ্বাসের পরিচয় আছে। তিনি লিখেছেন : 'ইণ্ডিয়ান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়নের বুলেটিন আমি মাঝে মাঝে

পাই। তাতে ন্যায়ধর্ম ও স্বাধীনতা রক্ষার যে সংগ্রামের বিবরণ পাই তার পুরোভাগেই দেখি আপনার গৌরবদৃপ্ত নামটি। আপনি জানেন য়ুরোপে সেই একই সংগ্রামে আমিও নিযুক্ত আছি। এখানে এই সংগ্রাম আরো বেশী ভয়ানক রূপ ধারণ করেছে। শত্রুচক্র দিন-দিন এখানে হিংস্র হয়ে উঠছে এবং ক্রমশই নিকটে ঘনিয়ে আসছে। কিন্তু ফ্রান্সের মজুর এবং চাষীদের মধ্যে যে জাগরণ এসেছে (সামাজিক, মানসিক এবং নৈতিক) সেটাই এখন আমার পরম আনন্দের এবং আশার কারণ। বিশেষ করে গত দুই তিন বৎসরের মধ্যে তারা নিজেদের শক্তি এবং ঐক্যের মূল্য বুঝতে শিখেছে, সেই সঙ্গে বিশ্বের প্রতি তাদের কর্তব্য সম্বন্ধেও তারা সচেতন। আমার প্রার্থনা, তাঁরা যেন জাঁ জোরে-র মত রাজনৈতিক নেতাকে এবং ভিক্তর য়্যুগোর মতো অথবা আপনার মতো একজন কবিকে লাভ করতে পারে। এটা তাদের প্রাপ্য।'

প্রলয় রাত্রি যখন য়ুরোপের উপর ঘনিয়ে আসছে তখন রোলাঁর শেষ আশ্রয়-স্থল কোথায়? অহিংস বিপ্লব নয়, ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ নয়,—সোস্যালিজম এবং কবিতা। জাঁ জোরে, ভিক্তর য়্যুগো এবং রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথকে রোলাঁ লিখলেন তাঁর শেষ চিঠি ১৯৪০-এর ২৭শে ফেব্রুয়ারি, অর্থাৎ ফ্রান্সের পতনের মাত্র সাড়ে তিন মাস পূর্বে। রোলাঁ লিখলেন : 'অন্ধ হিংস্রতা আজ জগৎকে গ্রাস করেছে। এখন আমাদের অন্তরের মধ্যে সত্যকে এবং শান্তিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।' সেই সঙ্গে জানালেন : 'এখন লিখছি এবং কাজ করে চলেছি ভবিষ্যতের সুদিনের জন্য।' উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছিলেন আজ তা মনে হয় যেন বয়ঃকনিষ্ঠের প্রতি তাঁর শেষ আশীর্বাদ :

'please accept...my hopes and prayers that your work for better times may prosper and that those times may soon be known'.

রবীন্দ্রনাথের এই শেষ চিঠিখানি রোলাঁর হস্তগত হয়নি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জগৎজোড়া দুঃস্বপ্নের যখন অবসান হল তখন রবীন্দ্রনাথও নেই, রোলাঁও নেই। আজ আমরা সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চেয়েও ভয়ানক বিভীষিকার সামনে দাঁড়িয়েছি। আজ কোথায় রবীন্দ্রনাথের মতো কবি, কোথায় রোলাঁর মতো মানবপ্রেমিক যাঁরা সমগ্র মানবসমাজকে ডাক দেবেন শুভবুদ্ধির পথে? আজ কি এ'দেরই বিশেষ করে স্মরণ করবার দিন আসে নি? কিন্তু স্মরণ কেমন করে করবো? কোন জিনিসটা স্মরণীয়? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'যা ভোলবার সামগ্রী তা ভুলে না গেলে যা না-ভোলবার তা বড়ো হয়ে সম্পূর্ণ হয়ে দেখা দেয় না।' মানুষের মধ্যে যাঁরা স্মরণীয় তাঁদের সম্বন্ধেই কথাটা বলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রোলাঁর যে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের বিবৃতি দেওয়া হল তার মধ্যে কোন জিনিসটা স্মরণীয়? যথোচিত জ্ঞানের অভাবে, বুদ্ধির দোষে অথবা স্বভাবের কোনো বিশেষ ত্রুটির দরুণ রোলাঁ যেখানে সাময়িকভাবে ভুল বুঝেছেন, অবিচার করেছেন, অথবা ক্ষুব্ধ হয়েছেন, সেটা স্মরণীয় নয়। যেখানে রোলাঁর সত্যপরিচয়, স্থায়ী পরিচয় আছে, অর্থাৎ পরম শ্রদ্ধায় এবং গভীর অনুরাগে যেখানে তিনি হাত মিলিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মানবের কল্যাণব্রতের অংশীদার হয়ে—সেটাই আজ বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁরা স্থায়ী ফললাভ করেন নি, ধ্বংসের হাত থেকে তাঁরা পৃথিবীকে বাঁচাতে পারেন নি। কিন্তু তাঁরা সবাইকে ডাক দিয়েছিলেন—কল্যাণের পথে, শুভ বুদ্ধির পথে। আশা করবার এবং আশা জাগাবার শক্তি অদ্ভুত তাঁদের ছিল, সেই জন্য বর্তমানের হতাশা পেরিয়ে ভবিষ্যতের দিকে তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। রোলাঁ রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে লেখেন :

'Our home is the future'

রবীন্দ্রনাথও রোলাঁকে লেখেন :

'The truths that save us have always been uttered by the few and rejected by the many and triumph through their failures'.

দুটি কণ্ঠস্বরের মধ্যে এখানে যে মিল দেখছি, সমস্ত পার্থক্যের চেয়ে, বিভেদের চেয়ে, এর মূল্য অনেক বেশী। শ্রদ্ধার সঙ্গে এই মিলটিই আজ আমরা স্মরণ করবো।

সমাপ্ত

কসঙ্গীতে আমার আত্মা যেন প্রাণ পায়। ম যে মাটির মানুষের সঙ্গে তাদের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছি, তাই তাদের সহজ ল গ্রাম্য সুর আমার গলায় সহজে ফুটে য়। সে সুরই আমার কল্পনার রাজ্য, পনা থেকেই তা জাগে, গলায় আপনা কই তা বেজে ওঠে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা ার এসে যায়। এর জন্য কোন রেওয়াজ-এর প্রয়োজন হয় না—এ সুর নিজের জীবনের সঙ্গে মিশে গেছে। আমার মধ্যে রাজবাড়ির নিয়ম-কানুন আদব-কায়দা বা ফরমদারিটিজ কেউ খুঁজে পেত না। যে গ্রামের খোলা মাঠের সবুজ আমেজ পেয়েছে, যাকে বড় বড় প্রাচীন গাছগুলি ছায়ার আড়াল করে প্রকৃতির মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে, যে না জানি কিসের আকর্ষণে রাত্রেও গ্রামে গ্রামে কাটিয়েছে যেখানে দু-একটা কেরাসিনের পিদিম টিম্‌টিম্‌ করে—সেই পরিবেশে যে নীল আকাশকে ভালবেসেছে—যে গ্রামের সরল লোকেদের সঙ্গ মাটিতে বসে মশগুল হয়ে গেছে—তাকে রাজবাড়ির আবহাওয়া বাঁধবে কি করে?

হিন্দীতে এক প্রবন্ধ আছে 'রাগ, রসুই পাগড়ী—কভি কভি বন্ যায়"। (মানে

গান-বাজনা, ভাল রান্না ও মাথায় ভাল পাগড়ী বাঁধা সব সময় সম্ভব নয়, কখনো সখনো তা হয়)। লোকসংগীতে এই প্রবাদ কিন্তু অচল। গ্রামের পরিবেশে বাউল বা ভাটিয়ালী সব সময়েই জমে যায়।

কলেজ-জীবনে প্রতি বছরই আমাদের নাটক প্রযোজনা হত। এই সব নাট্যাভিনয়ে আমি হতাম সংগীত পরিচালক। যতদূর মনে পড়ে আমাদের ইতিহাসের অধ্যাপক হতেন নাট্য পরিচালক। তিনি নিজে গান লিখতেন আমি সঙ্গে সঙ্গে সুর বসিয়ে দিতাম। কলেজে ছাত্রমহলে আমার তখন খুব কদর।

১৯২৪ সালে বি-এ পাশ করলাম। বাবা আমাকে কলকাতাতে নিয়ে এসে ১৯২৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দিলেন এম-এ পড়ার জন্য। আমি কলকাতার [illegible] সার্কুলার রোডে [illegible] [illegible]-এ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী বিষয়ে এম-এ পড়তে শুরু করলাম। আমার পল্লীজীবনের পরিবেশের পরিবর্তনে প্রথম দিকে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছিলাম না। ইট-কাঠ-পাথরের [illegible] কলকাতা [illegible] আমার চোখে [illegible]। [illegible] নিজেকে [illegible] মনে হল এই শহরে এসে। মানুষের হাতের তৈরী সব কিছু আমার কাছে অস্বাভাবিক লাগত। সিমেন্ট ও পাথরের তৈরী কলকাতা [illegible] [illegible] হয়ে [illegible] [illegible]। এইসব দেখে যেমন [illegible] হয়েছিল [illegible], [illegible]। [illegible] হয়েছিলাম এই দেখে যে কলকাতায় মাটি বিক্রী হয়। আমি যে মাটির মানুষ—সেই মাটি কলকাতা শহরে বিক্রী করা হয়—এবং তা লোকেও কেনে—এসব দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। সমস্ত দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে কেটে যেত। [illegible] ফিরেই আকাশ দেখতে ইচ্ছা হতো। এত বাড়ির আড়ালে আকাশ যেন ম্লান হয়ে [illegible] যেত। জ্যোৎস্না বা পূর্ণিমা, কোনটাই [illegible] বিজলী বাতির ঔজ্জ্বল্যে তা ধরতে পারতুম না।

কলকাতার এই পরিবেশে, সব সময় মনে পড়ত দেশের পুরোনো দিনগুলি। আমাদের [illegible] তিন দিকেই [illegible] [illegible] গান [illegible] [illegible] আর বাঁশী বাজান। ত্রিপুরাতে সবাই বাঁশী বাজাতে পারে—এটাও একটা প্রবাদ। আমাদের দেশের বিশিষ্ট পরিবারেই বাঁশী [illegible] জ্ঞান হওয়া অবধি বাজাতাম। শেষের দিকে এইসব স্মৃতিগুলি আমার মনে ব্যথা জাগাত। এই সব স্মৃতি নিয়েই ঘুমিয়ে পড়তাম। সকালে আবার যন্ত্র-চালিতের মত যন্ত্রের মানুষ হয়ে শহর কলকাতায় দিনের কাজকর্ম আরম্ভ করতাম।

কুমিল্লাতে কলেজে পাঠ্যাবস্থাতেই কলকাতা এসে হিন্দুস্থানী সংগীতের বড় বড় ওস্তাদের কাছে গান শোনা, তাঁদের কাছে গান শেখা আমার মনে প্রবলভাবে জেগেছিল। এম-এ পড়তে আর ভাল লাগে না। এক বছর বাদে ছেড়েই দিলাম পড়াশোনা। ১৯২৫ সালে আমি অন্ধ গায়ক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে-র নিকট হিন্দুস্থানী উচ্চ-সংগীত শেখা আরম্ভ করলাম। বাবার অনুমতি ছিল। কেষ্টবাবু আমাকে তাঁর প্রিয় শিষ্য করে নিলেন ও খুব যত্ন করে শেখাতে লাগলেন। কুমিল্লার টেনিস খেলার নেশাও ছাড়লাম না। চৌরঙ্গী ওয়াই এম সি এ-র সভ্য হয়ে নিয়মিত টেনিস খেলতাম। তখন ওয়াই এম সি এ-তে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের প্রাধান্য লক্ষ্য করেছিলাম। গোড়ার দিকে আমাকে খেলোয়াড় হিসেবে পাত্তাই দিত না। একদিন সেখানে এক দক্ষিণ ভারতীয় '[illegible]'-এর সঙ্গে পরিচয় হল। তারই পরামর্শে প্রত্যেকদিন দুপুরে [illegible] সময় [illegible] এসে তার সঙ্গে নিয়মিত অভ্যাস শুরু করলাম। তাকে রোজ [illegible] আনা করে দিতে হত এবং সে আমাকে একঘণ্টা অভ্যাস করার সুযোগ দিত। এতে আমার খেলার খুব উন্নতি হল ফলে সব সভ্যরাই পরে আমার সাথে খেলতে চাইত। এর পরে আমি সাউথ ক্লাবের সভ্য হলাম। এত বেশী টেনিস যে খেলার পরে আমার গলা বসে যেত গলা কর্কশ হয়ে যেত। সন্ধ্যার পরে গানের রেওয়াজ করতে গিয়ে দেখতাম আমার গলা বেশ ধরে গেছে। আমার গলার যেন কোন ক্ষতি না হয় সেদিকে কেষ্টবাবুর খুব লক্ষ্য ছিল। তিনি আমার গলা ধরার কারণ ধরে ফেললেন, বললেন, টেনিস খেলা বন্ধ করতে। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী সঙ্গে সঙ্গে টেনিস খেলা ছেড়ে দিলাম। তারপর প্রায় দু সপ্তাহের মধ্যেই আমি আমার স্বাভাবিক স্বর ফিরে পেলাম। কেষ্টবাবু আমার গলার স্বর বাঁচিয়ে রাখলেন। কেষ্ট-বাবুর গান শেখানোর পদ্ধতি ছিল অতি সুন্দর। তিনি তাঁর বন্ধুদের কাছে বলতেন যে ভবিষ্যতে আমার গানের উন্নতি অনিবার্য। রেওয়াজ ছিল অবশ্য কঠোর, কিন্তু কখনও অত্যধিক কিছু করা কেষ্টবাবু অপছন্দ করতেন এবং আমাকেও তা করতে মানা করতেন।

বাবা দুঃখ পেয়েছিলেন এম-এ পড়া ছেড়ে দিলাম বলে। এরপর বাবা একবার কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি তখন আমাকে জোর করে ল কলেজে ভর্তি করিয়ে দিয়ে আগরতলায় ফিরে গেলেন। আইনের মার-প্যাঁচ আমি কি পড়ব, ওইসব বই দেখলেই আমার মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করত। মাথায় আইনের কিছুই ঢুকত না। অল্প কয়েক মাস পর আইন অধ্যয়ন ত্যাগ করলাম। এবার বাবা আমাকে বিলেতে পাঠিয়ে স্টেট-এর কাজকর্ম প্রশাসন শেখাবার জন্য তৈরী করতে চাইলেন। বাবা তখন ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রী। আমার জন্য রাজ্য সরকারের বড় পদ তিনি ঠিক করে রাখলেন। তখন আমার মনে কি প্রচণ্ড দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল তা বলা যায় না। বাবাকে ভালবাসি শ্রদ্ধা করি। একদিকে তাঁর ইচ্ছাপূরণ—অন্যদিকে যা আমার দ্বারা কখনও সম্ভব নয়। কিন্তু যাই হোক, বাবা শেষ পর্যন্ত আমার ইচ্ছাই মেনে নিলেন। বিলেতেও গেলাম না রাজ্য সরকারে চাকরীও নিলাম না। কলকাতায় কেষ্টবাবুর কাছে এবং পরে তাঁর অনুমতি নিয়ে তাঁর গুরু ওস্তাদ বাদল খাঁ সাহেবের কাছে গান শিখতে লাগলাম। ওস্তাদ বাদল খাঁর বয়স তখন প্রায় ৯০ বছর। ওই বয়সে প্রিয় ছাত্রদের গৃহে তাঁকে হেঁটে আসতে দেখেছি। ছিপছিপে অথচ লোহার মত ঋজু, শক্ত শরীর ছিল তাঁর। এই সময় বলতে গেলে কলকাতার প্রায় সব গায়কেরাই বাদল খাঁর শিষ্য ছিলেন যেমন কৃষ্ণচন্দ্র দে, গিরিজাশংকর চক্রবর্তী, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। কেষ্টবাবুর সব জলসাতেই আমি উপস্থিত থাকতাম তাঁর সঙ্গে। এছাড়া তিনি যখন বড় বড় উচ্চসঙ্গীতের গায়ক বাদক ও বাইজীদের গান শুনতে যেতেন, তাঁর সঙ্গে সেই সব আসরে মাইফেলে আমাকেও নিয়ে যেতেন।

কলকাতায় তখন ছিলেন শ্রীশ্যামলাল ক্ষেত্রী, বিখ্যাত হারমোনিয়ম বাদক ও ঠুংরীর বিশেষজ্ঞ। আমি তাঁর কাছে বেনারসী ঠুংরী শেখার ও ঠুংরীর বোল বানাবার পদ্ধতি শিখেছিলাম। তখন আমার ক্লাসিক্যাল গান শেখার ইচ্ছা প্রবল। গান-বাজনার প্রতি আমার এত শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা দেখে আমি শ্যামলালজীর স্নেহের পাত্র হলাম। কলকাতার বাইরের শ্রেষ্ঠ সব সঙ্গীত শিল্পীরা শ্যামলালজীকে এত শ্রদ্ধা করতেন যে শ্যামলালজী যদি কখনও তাঁদের কোন জলসাতে আহ্বান করতেন তবে তাঁরা সবাই তাতে যোগ দিতেন। তাঁর নিজের গৃহেও এই সব ওস্তাদ সংগীত শিল্পীদের গানের আসর লেগেই থাকত। আমার সৌভাগ্য যে শ্যামলালজীর গৃহে গানের সব আসরে আমি সর্বদাই উপস্থিত

থেকে শ্রেষ্ঠ সব কণ্ঠশিল্পী, যন্ত্রশিল্পী বাঈজীদের গান বহুবার শুনেছি। সেখানেই কোন এক গানের আসরে সঙ্গীত-জ্ঞানী শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় হয়। ব্যস, ধূর্জটিবাবু সেই যে আমাকে ভালবেসে ফেললেন, তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর সেই ভালবাসা আমাকে ধন্য করেছে। তিনি ছিলেন লক্ষ্ণৌতে অধ্যাপক। ভারতীয় সঙ্গীতের বিদগ্ধ রসিক ও সমঝদার। তিনি যখনই কলকাতায় আসতেন, আমাদের দেখা হতো, আমাকে সঙ্গীত সাধনায় উৎসাহ দিতেন। ধূর্জটিদা ছিলেন আমার জীবনে সঙ্গীত সাধনায় উৎসাহদাতাদের অন্যতম। ১৯৩৭ সালে কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা। তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের গান শুনেছেন, তবুও জানি না কেন আমার মত এই ক্ষুদ্র শিল্পীর গান শুনতে তিনি খুব ভালবাসতেন। আমিও তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতাম। তিনিই আমাকে শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন-এর কাছে নিয়ে যান। আমার গান শুনে অতুলপ্রসাদও খুশী হয়ে নানান উৎসাহ দেন।

গিরিজাবাবুর সঙ্গেও শ্যামলালজীর বাড়িতেই আমার প্রথম পরিচয়। তিনি তখন কলকাতার স্থানীয় গায়কদের মধ্যে সবচাইতে খ্যাত। তাঁর গানও আমি বহুবার শুনেছি।

এই সময়ে চলচ্চিত্র প্রচার-বিদ শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যালের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় যা পরে বন্ধুত্বে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে সুধীরেন্দ্র নিউ থিয়েটারস-এ প্রচার-সচিবরূপে যোগ দেন। তিনিও লেখক, সঙ্গীতপ্রেমী, সুরসিক ছিলেন। আমি এই সময় নিজে গানের সুর রচনা আরম্ভ করি এবং সুধীরেন্দ্র সেইসব কয়েকটি গান সে সময় লিখে দেন। তাঁর বাড়ির বৈঠকী আড্ডায় আমি সর্বদাই উপস্থিত থাকতাম। তিনিও আমার কাছে সদাসর্বদা আসতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার গান শুনতেন। কলকাতায় থাকাকালীন তাঁর সঙ্গে আমার এইভাবে যোগাযোগ ছিল। আমি বম্বে চলে আসার পর, এখানে ১৯৫০ সালে আমার সঙ্গে তাঁর শেষ দেখা। তিনি আমার অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। আমাদের দুজনের মধ্যে অত্যন্ত মধুর সম্পর্ক ছিল। আমার গানেরও তিনি ছিলেন একজন দরদী। কখনও তাঁকে ভুলতে পারব না।

আরেকজন সাহিত্যিক, গীতিকার, সঙ্গীত রসিক 'নাচঘর' সাপ্তাহিকের সম্পাদক শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়-এর সঙ্গেও এই সময় আমার পরিচয় হয়। ১৯২৫ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে, হেমেন রায়, সুধীরেন্দ্র ও ধূর্জটিদার নিকট সঙ্গীত সাধনায় যে উৎসাহ পেয়েছি তা বলে বোঝান মুশকিল। তাঁদের এই উৎসাহ ও সমর্থন না পেলে হয়ত আমি আর এগোতে পারতাম না। তাঁদের প্রেরণায় আমি পুরো-পুরিভাবে সঙ্গীত সাধনায় নিজেকে উৎসর্গ করলাম।

কলকাতায় যে যুগে এমন কোন গানের জলসা বা সঙ্গীত আসর ছিল না যাতে আমি অনুপস্থিত ছিলাম। ভারতের সেরা সেরা সব সঙ্গীত শিল্পীদেরই কলানৈপুণ্য আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে। মন্ত্রমুগ্ধের মত সারারাত জেগে এই সব আসরে গান শুনেছি। সে এক বিরাট শিক্ষা। সঙ্গীত শিক্ষায় উপযুক্ত গুরু ও অভ্যাসের যেমন প্রয়োজন তেমনি সঙ্গীত শোনা কান তৈরী করাও আরেক প্রয়োজন। এভাবে অবিশ্রান্ত সঙ্গীতের আসরে গান শুনে আমার যে কান তৈরী হল, তার গুরুত্বও প্রচুর। এই জন্যই বোধ হয় এখন আমি আমার নিজস্ব গায়কী সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছি। শিক্ষা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে, এইভাবে ভাল সঙ্গীত শুনে, আমার সেই শিক্ষা পাকা হয়েছিল সঙ্গেই আমার ধারণা ও আমার জীবনের অভিজ্ঞতা। এইভাবে ক্রমশ কলকাতার বাঙ্গবৈশমী জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম সঙ্গীত কলার প্রেমিক হয়।

কলকাতায় Indian State Broadcasting Coy তখন নতুন। এরপর All India Radio-র সৃষ্টি। এই ব্রডকাস্টিং কোং ডেকে পাঠাল আমাকে গান গাইতে। আমার গান বেতারে প্রচারিত হবে—সে কি কম কথা। খুব উত্তেজনা মনে। প্রথম যেদিন গান করলাম সেদিনের সে যে কি আনন্দ

তা আজও ভুলিনি। শ্রীনৃপেন মজুমদার, শ্রীরাইচাঁদ বড়াল, এঁরা সব তখন বেতার কোং-এর কর্তা। আমাকে ১৫ মিনিট গাইবার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। আমার নিজের সুর সংযোজনায় দুখানা গান গাইলাম। পারিশ্রমিক পেলাম দশ টাকা। এই আমার জীবনের প্রথম উপার্জন। এই দশ টাকা পারিশ্রমিক পাবার তখনকার সেই আনন্দও জীবনে ভোলার নয়। এ আমার কাছে লক্ষ টাকার থেকেও বেশী মনে হয়েছিল। জীবনে প্রথম আমার নিজের সুর রচনায় গান বেতারে প্রচারিত হল—পারিশ্রমিক পেলাম দশ টাকা—আমার প্রথম উপার্জন—আমার মনে বিরাট একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তখন। নৃপেনবাবু আমার গানের প্রশংসা করেছিলেন খুব।

১৯২৫ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত কলকাতাতে আমি বসবাস করলেও বছরে তিন-চার বার আমি দেশের টানে কুমিল্লা ও আগরতলাতে গিয়ে বাবা-মা ভাই-বোনদের, প্রিয়জনদের সঙ্গে কাটিয়ে আসতাম। কি যে ভাল লাগত কলকাতা থেকে এভাবে দেশে যেতে। এ সময় আমি গ্রামে গ্রামে ঘুরে গান সংগ্রহ করতাম, সেখানেই সুর রচনাও করতাম। শিকার করাও ছিল আমার এক নেশা—ছেলেবেলা থেকেই। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কোন কোন সময় শিকারেও যেতাম।

কুমিল্লাতে যখন যেতাম, তখন আমার পুরনো পরিচিত সুরসাগর হিমাংশু দত্ত, অজয় ভট্টাচার্য ও সুবোধ পুরকায়স্থ এদের সঙ্গেও আনন্দে দিন কাটিয়ে আসতাম। এঁরাও আমাদের কুমিল্লার বাড়িতে সর্বদা আসতেন, বসে যেত গান-বাজনার বৈঠক। এভাবে কুমিল্লা, আগরতলা ও আশেপাশের গ্রামগুলের আবেশ নিয়ে আবার যখন ফিরে আসতাম কলকাতার পরিবেশে মন তখন সুরের আবেশে মগ্ন।

১৯৩০ সালে বাবা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন চিরকালের জন্য। অত্যন্ত নিঃসহায় মনে হয়েছিল নিজেকে। এই নিদারুণ দুঃখকে সহ্য করে নিতে বেশ কিছুদিন সময় লেগে গেল। ১৯২৫ সাল থেকে কলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করার সময় বাবা কুমিল্লা বা আগরতলা থেকে নিয়মিত আমাকে চিঠি লিখে উপদেশ দিতেন, উৎসাহ দিতেন। কলকাতায় থাকার ও সঙ্গীত শেখার সমস্ত খরচ তিনি আমাকে নিয়মিত পাঠাতেন। এতদিন কোন দায়িত্ব ছিল না আমার এবং অর্থের চিন্তাভাবনাও ছিল না। এখন আমি যেন অগাধ জলে পড়ে গেলাম। এই অবস্থায় আমি আগরতলায় বা কুমিল্লায় গিয়ে থাকলে রাজকীয় আরামে ও নিশ্চিন্তে নিজেদের বাড়িতে বাস করতে পারতাম এবং রাজ্য সরকারে কোন উচ্চপদে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতাম। আমার বড় ভাইরা আমাকে তাই করতে বললেন। তাঁরাও সবাই রাজ্য প্রশাসনে বিভিন্ন প্রতিপত্তিশীল পদে নিয়োজিত। আমার কিন্তু এ ব্যবস্থা মনঃপূত হল না।

নিজে একলা সংগ্রাম করে, নিজে উপার্জন করে সঙ্গীত সাধনায় জীবন কাটিয়ে দেব, মনের মধ্যে একমাত্র এই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কলকাতার ত্রিপুরা প্রাসাদ-এ আমার বাসস্থান ছেড়ে, ভাড়া করা সামান্য একখানা ঘরে আমার আস্তানা বাঁধলাম। আত্মীয়-স্বজন এবং রাজপরিবারের সকলেই আমার এই সংকল্প একেবারেই সমর্থন করলেন না। তুমুল প্রতিবাদ উঠল, রাজপরিবারের ছেলের এই সাধারণভাবে জীবনযাপনে। আমি কিন্তু কোন কিছুর পরোয়া না করে, বাড়ি থেকে কোন অর্থসাহায্য না নিয়ে কলকাতার সেই একখানা ঘরে সঙ্গীত সাধনা বজায় রাখলাম। খুব রেওয়াজ করতাম তখন, বড় বড় ওস্তাদদের সঙ্গ করতাম, গানবাজনা শুনতাম। শুধু এই সঙ্গীতের পরিবেশেই দিন কাটাতাম। এসময় আমি গান শেখানোর কয়েকটি টিউশনিও নিলাম এবং এই উপার্জন থেকেই আমার কলকাতার খরচ বহন করতাম।

এই সময় থেকে আমি নিজে গানের সুর রচনা করতাম এবং নিজেই গাইতাম। গানগুলি বেশীর ভাগ সময় লিখতেন 'নাচঘর' সাপ্তাহিকের সম্পাদক শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়। হিন্দুস্থান রেকর্ডে আমার প্রথম গান 'ডাকলে কোকিল রোজ বিহানে' তাঁর লেখা, অপরটি 'এ পথে আজ এসো প্রিয়' শৈলেন রায় রচিত। এখন থেকেই নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করা, নিজের স্বতন্ত্র স্টাইলে সুর রচনা করা আরম্ভ হল। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত এই পাঁচ-ছ বছরে লোকসঙ্গীত ও ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের সংমিশ্রণে নিজস্ব ধরনে সুর রচনা করলাম—যা অন্য কারো সঙ্গে মিলল না। এইভাবে আমি আমার নিজস্ব গায়কী সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলাম। এতে আমাকে অনেকেই অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেছেন এবং এঁদের মধ্যে আমি একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই। তিনি হলেন সঙ্গীতরসিক ও পণ্ডিত নাটোরের মহারাজা। এ ছাড়া শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল, শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ, শ্রীখগেন মিত্র, শ্রীহেমেন রায় এঁরা তো আছেনই। এঁদের উৎসাহে ও আশীর্বাদে আমি আমার এক নিজস্ব শৈলী সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলাম এবং জনসাধারণের নিকট থেকে সমর্থনও পেয়েছিলাম আমার এই প্রচেষ্টায়, তাঁদের নিকট জনপ্রিয়তা ও সুনাম অর্জন করে।

নাটোরের মহারাজার সঙ্গে ১৯৩৫ সালে কলকাতার এক সঙ্গীত সম্মেলনে আমার প্রথম পরিচয় হয়। আমি ওই সম্মেলনে গান গেয়েছিলাম। আমার গান তাঁর ভাল লেগেছিল এবং আমাকে তারপর থেকে তিনি সদাসর্বদা উৎসাহ প্রদান করেছেন। আমার গায়কীর উচ্চপ্রশংসা করতেন সর্বত্র এবং আমাকে তাঁর গৃহে আমন্ত্রণ করে প্রায়শই আমার গান শুনতেন। সে সময় নাটোরের মহারাজার বাড়ি ছিল ভারতের সব সঙ্গীতশিল্পী ও গুণীদের সমাবেশের স্থান। কত জলসা হত তার ইয়ত্তা নেই। সেখানে নানা জলসাতে আমি শুধু যে অন্যদের গান শুনেছি তা নয়, নিজেও গেয়েছি।

শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল আরেক সুরের রসিক। তাঁর কাছে শুদ্ধ পদ্ধতি অনুযায়ী ঠুমরীর বোল বানানো আমি শিক্ষা করেছি। ভারতীয় উচ্চ সঙ্গীতের এই পণ্ডিত ভারতের প্রথম শ্রেণীর গুণী শিল্পীদের শুধু যে গান শুনেছেন তা নয়, তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধও স্থাপনা করেছেন। আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করেন আমার নানা রকম সঙ্গীত প্রচেষ্টায়। এই প্রসঙ্গে 'দেশ' পত্রিকাতে শ্রীসান্যালের "স্মৃতির অতলে" পর্যায়ে লেখাগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই লেখাতে ভারতীয় উচ্চ সঙ্গীতের যে মেজাজ ও বৈঠকী আবহাওয়া তিনি পাঠকদের সম্মুখে তুলে ধরেছিলেন তা অতুলনীয়।

শ্রীখগেন মিত্র ও ধূর্জটিদার সমর্থনও আমাকে সর্বদা সাহস জুগিয়েছে।

এই সব প্রখ্যাত গুণীজ্ঞানীরা ছাড়াও, আরেক খাঁটি সঙ্গীত রসিক আমার সঙ্গীতজীবনে যে সাহায্য করেছেন তা ভোলার নয়। সঙ্গীতে মশগুল এরকম আপনভোলা ব্যক্তি আমি আর দেখিনি। এর নাম হল শ্রীভবসিন্ধু মুখোপাধ্যায়। তিনি উঁচুদরের সঙ্গীতশিল্পী হলেও, বাইরে কখনও কোন গানবাজনা করতেন না। অথচ গলায় তাঁর সুর ছিল অপূর্ব, সেতার ও এস্রাজ বাদনে সুদক্ষ। এই সুরের মাধ্যমে ভবসিন্ধু আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গেল, আমাকে একেবারে আপন করে নিয়েছিল। আমার প্রায় সব জলসায়, সে নিজের আহ্লাদে ও আনন্দে সাধ করে তার সাজ নিয়ে আমার সঙ্গে যেত ও সুরের আনন্দে বিভোর হয়ে কখনও তার সেতার, কখনও এস্রাজ বাজিয়ে আমার গানের সুরে সুরে এক হয়ে যেত। আমার বাড়িতে প্রায়ই চলে আসত তার যন্ত্র সাজসরঞ্জাম নিয়ে, আপনভোলা মনে বাজিয়ে যেত আমার গানের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তার কোন হুঁশই থাকত না। আবার এমনও হয়েছে, আমার একটা কোন গলার কাজ শুনে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে চলে গেছে। পরে বলেছে, আমি ওই কাজের পর অন্য কিছু শুনতে চাইনি কারণ তার আমেজ যদি নষ্ট হয়ে যায়। এই রকমই সঙ্গীতরসিক ছিল ভবসিন্ধু। আমার ওই যুগের সঙ্গীত সাধনাকে সে সত্যিই উদ্দীপিত করেছিল।

(ক্রমশ)

ল্যাকমে ক্লেনজিং মিল্ক
বেশী শক্তিশালী বেশী গাঢ়ো
পরিষ্কার করে বেশী গভীরে

॥ ২৬ ॥

ছয় রিপু ঘিরে আছে দীপুকে। [illegible] ওরা [illegible] দাঁড়িয়েছে, [illegible] দীপু ছাড় পাবে না। ওদের ছাড়ানো [illegible] পোশাক, নিখুঁত দাড়ি কামানো, ওরা সবাই বেকার। কিন্তু [illegible] নয়, ওরা আজ ছুটি নিয়ে [illegible] এসেছে।

সুকুমার দীপুর একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে, দীপু একটু [illegible] বললেই সে ঝট করে একটা [illegible] করার জন্য তৈরী, যদিও সুকুমারের মুখে হাসি। কি নিষ্ঠুরের মতন হাসতে পারে [illegible] সুকুমার। কলেজে দীপুর সঙ্গে থার্ড ইয়ার পর্যন্ত পড়েছিল, তখন সে সুকুমার এরকম ছিল না। শ্যামবাজারে একটা ভালো চাকরি পেয়ে পড়া ছেড়ে চলে গেল, তারপর চাকরি হারিয়ে মুখখানা [illegible] খাওয়া কুকুরের মতন বীভৎস করে ফিরে এসেছে। ধনঞ্জয় একটু দূরে, তার কব্জিতে দুটো লোহার বালা, সহজে হাসে না সে—পুরোনো বাড়ির দেয়ালের মতন তার মুখের চেহারা। ধনঞ্জয় সব সময় পকেটে ছুরি রাখে, দীপু জানে। পাড়ার সবাই জানে। বিশ্বনাথ, ভুপে, রঞ্জিৎ আর হিমুও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে পাশে, ওদের সবারই চোখ একটু লাল, মুখে ঘাম, আজ রাত্তিরবেলা ওরা কিছু একটা করতে চায়।

ওরাও বেকার, দীপুও বেকার এবং এক পাড়ার ছেলে, সুতরাং ওরা মনে করে দীপুকে দলে টানার একটা অধিকার আছে ওদের। দীপু এমনিতে ওদের খুব অপছন্দ করে না। সে জানে, ওদের ক্ষোভ, অভিমানের কারণ আছে। ওদের যুক্তিসংগত দাবি আছে একটা চাকরি পাওয়ার, নইলে ওরা সব কিছু ভেঙে-চুড়ে আগুন জ্বালাবে। এই সবই দীপু মানে, কিন্তু তবুও সে ওদের সঙ্গে মিশে যেতে পারে না। তারও চাকরি নেই, কিন্তু সে চাকরি চায়ও না—এ কথাটা ওদের বোঝাতে পারে না।

দীপুর এড়িয়ে এড়িয়ে পা বাঁচিয়ে চলাটা ওরা অপমান মনে করে। দীপু একটা মেয়ের সঙ্গে ঘোরে, এটাই বা ওরা কতদিন সহ্য করবে! ওদের সঙ্গে কোনো মেয়ের ভাব নেই, মেয়েরা ওদের দেখলেই অন্য ফুটপাথে চলে যায়—আর দীপু একা, একা—

দীপু ধনঞ্জয়ের দিকে তাকিয়ে হেসে বললো, আমার কাছে বেশী পয়সা নেই রে আজ দু' তিন টাকা আছে—

ভুপে বললো, সব টাকা মাগীর পেছনে খরচ করে এসেছিস? আমরা কি কেউ নই ভাই, বানের জলে ভেসে এসেছি?

—আজ কোনো মেয়ের সঙ্গে আমার দেখাই হয় নি, বিশ্বাস কর।

—কাকে কথা কাকে শোনাচ্ছো ভাই। তোমার সারা গা থেকে ভুরভুর করে মেয়েছেলের গন্ধ বেরুচ্ছে! খুব জাপটা জাপটি হয়েছে, অ্যাঁ?

—তুই মেয়েছেলের সঙ্গে ঘুরবি, আমাদের একটা ট্যাক্স দে!

—তোর মালকে আমরা আওয়াজ দিই না, ডিসটার্ব করি না—

ওরা রীতিমত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে রাস্তার লোককে শুনিয়ে কথা বলছে। খারাপ কথা উচ্চারণ করছে বেশী রসিয়ে। দু' চারজন লোক একটু অবাক হয়ে ওদের দিকে তাকিয়েই দ্রুত সরে পড়লো। এসব কথা বলাতে ওদের লজ্জা নেই, অন্যদের লজ্জা পেতে দেখলেই ওদের আনন্দ হয়।

দীপু অন্যদের কথায় কান না দিয়ে ধনঞ্জয়কেই আবার বললো, আজ আমার কাছে বেশী টাকা নেই, সত্যি বলছি! এমনি চা-টা যদি খেতে চাস, খাওয়াতে পারি।

দেখি কত আছে, এই বলে ভুপে তার পকেটে হাত দিতে আসতেই দীপু হঠাৎ ধৈর্য হারিয়ে ফেললো। ঝট করে ভুপের হাত ঠেলে দিয়ে দীপু চেঁচিয়ে উঠলো, এই, যখন তখন পকেটে হাত দিবি না বলে দিচ্ছি!

—আরেঃ বাস, ফোঁস করছে যে রে! তোর পকেট যা, আমার পকেটও তা, হাত দিলে কি হয়েছে?

—না, হাত দিবি না! আমি পছন্দ করি না!

—মাইরি মাইরি, তোমার পছন্দে কি আসে যায়! সার্চ না করে আমি তোমার কথা বিশ্বাস করছি না! দে দে, হাত সরা—

—খবরদার বলে দিচ্ছি ভুপে—

আচমকা সুকুমার তার পেটে একটা ঘুষি মারলো। সুকুমারের দিকে তাকায় নি, সুতরাং অপ্রত্যাশিত আঘাতটা সামলাতে পারলো না, দীপু নিচু হয়ে বসে পড়ছিল, সুকুমারই তার দু' হাত ধরে দাঁড় করালো। নিষ্ঠুর মুখে হাসতে হাসতে বললো, এ কি রে মাইরি, তোর লাগলো নাকি? আমি ঠাট্টা করছিলুম!

আঘাতটা সহ্য করে কথা বলার জন্য দীপু দম নিচ্ছিল, সুকুমার তার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বললো, এইটুকুতেই তোর এত লাগলো? মাইরি, ঠাট্টাও বুঝিস না?

দীপু বুক ভরে ভালো করে নিশ্বাস নিল, ভুলে গেল যে এই ছজনের সঙ্গে সে গায়ের জোরে পারবে না। কিংবা এখনকার মত কোনোরকমে পালালেও ওরা আবার তাকে ধরবে, ওদের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। সে শুধু ধনঞ্জয়ের দিকে চেয়ে রইলো, ধনঞ্জয়ের অভিব্যক্তিহীন মুখটা দেখে কিছু বোঝার চেষ্টা করলো, তারপরই ঘুরে সুকুমারের থুতনিতে প্রাণপণে একটা ঘুষি মেরে বললো, দ্যাখ, এই ঠাট্টাটা কেমন লাগে!

ব্যথা পাবার চেয়ে সুকুমার অবাকই হয়েছে বেশী। সে খানিকটা টলে গিয়ে চোখ বড় বড় করে দাঁড়িয়ে রইলো, নাটকের ছককাটা অভিনয়ের মতন আর তিনজন সট করে চলে এলো দীপুর পাশে, এই মুহূর্তে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে দীপুর ওপর। কিন্তু দীপু বুঝলো, এখানে কাপুরুষতা দেখিয়ে তার বেশী লাভ নেই,

সে এক পা পিছিয়ে গিয়ে চোখ রাখলো ধনঞ্জয়ের দিকে। অন্য পাঁচটা ছেলের তুলনায় দীপুর গায়ে জোর কম নয়, কিন্তু কোনোদিন সে মারামারির কথা ভাবেনি। কারুকে মারার কথা মনে করলেই তার গা শিরশির করে। কিন্তু আজ একটা অযৌক্তিক রাগে তার শরীর ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগলো। সে ঠিক করলো, ছুরি চালাতে এলে সে ধনঞ্জয়ের ছুরি সুদ্ধ হাত মুচড়ে ভেঙে দেবে।

ধনঞ্জয় বললো, না, দীপুরে পকেট সার্চ করার দরকার নেই। আমরা ওকে বিশ্বাস করি। ঠিক আছে দীপু, তোর কাছে টাকা নেই বুঝলুম, কিন্তু কিছু টাকা রেইজ কর।

দীপু রুক্ষ ভাবে বললো, না, এখন কোনো জায়গা থেকে টাকা জোগাড় করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

—সম্ভব নয়?

—না।

—ঠিক?

—বলছি তো টাকা জোগাড় করতে পারবো না এখন।

—ঠিক আছে, তুই আমাদের সংগে চল্।

—কোথায়?

—আমরা ইন্দ্রজিতের কাছে গিয়ে আজ পঞ্চাশটা টাকা চাইবো।

—আমি ইন্দ্রজিতের কাছে টাকা চাইতে পারবো না। আমার যাওয়ার দরকার কি, তোদের যদি ইচ্ছে হয় তো যা না।

—তোকে চাইতে হবে না, তুই আমাদের সংগে যাবি শুধু। ঐ শালা বো—কে আজ ঝাড়বো। এমন ঝাড়বো যে অন্তত টেংরি খুলে নেবো একখানা।

দীপু ধনঞ্জয়ের স্বভাব জানে। অযথা তড়পায় না সে। ইন্দ্রজিতকে মারার কথা বলার একটা উদ্দেশ্য আছে তার। দীপুকে দেখাতে চায়, ইন্দ্রজিৎকে আজ কি রকম-ভাবে মারা হবে। অর্থাৎ দীপুকেও ওরা ইচ্ছে হলেই ওরকম মারবে। দীপুর এক আধটা ঘুঁষি চালানোকে ধনঞ্জয় গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলো না। ধনঞ্জয় একটা হাত সব সময় পকেটে ভরে রাখে, বোধ হয় মুঠো করে ধরে থাকে ছুরিটা, তাই ওর অত মনের জোর।

ইন্দ্রজিতের সংগে ছেলেবেলায় অনেক ব্যাডমিন্টন খেলেছে দীপু। ধনঞ্জয়, সুকুমাররাও খেলতো। ইন্দ্রজিতদের বাড়ির উঠোনটা বেশ বড়, ওখানেই ওরা বিকেলবেলা খেলতে যেত। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় একবার ফেল করে ইন্দ্রজিৎ কিছুদিনের জন্য বখে যায়। অবস্থাপন্ন বাড়ির ছেলে হয়েও রোজ লাইন দিয়ে সিনেমা দেখতো, সিগারেট টানতো গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে, খিস্তিটিস্তিতেও বেশ রপ্ত হয়ে উঠেছিল। ধনঞ্জয় সুকুমারদের সংগেই সে বেশী

মিশতো. এই ষড় রিপু তাকে রীতিমতন পেয়ে বসেছিল। কিন্তু কয়েক বছর পর কোনোক্রমে বি কম পাশ করতেই ইন্দ্রজিতের জামাইবাবু ওকে কোন একটা মারোয়াড়ী কম্পানিতে চাকরিতে ঢুকিয়ে দিল। তারপরই ইন্দ্রজিতের ভোল বদলে গেল একেবারে. সে এখন রোজ সুট-টাই পরে অফিস যায়. কম্পানির গাড়ি আসে তাকে নেবার জন্য। ইন্দ্রজিতের মুখের চেহারাটাই এখন অন্যরকম। এখন আর সে ধনঞ্জয়-সুকুমারদের সঙ্গে মেশে না. এটাই ওদের রাগ। একবার দলের সদস্য হলে আর দল থেকে বেরিয়ে যাওয়া ওরা ক্ষমা করে না।

দীপু জিজ্ঞেস করলো. ইন্দ্রজিতকে মারবি কেন? কি করেছে?

ধনঞ্জয় সংক্ষিপ্তভাবে বললো, ওর বড় ফাট বেড়েছে।

—আমি ওসবের মধ্যে নেই! মারামারি করতে চাস তোরা করতে পারিস. আমি তার মধ্যে থাকবো কেন?

—আরে, ইন্দ্রজিৎ তোকেও তো অপমান করেছে, তুই থাকবি না?

—আমাকে অপমান করেছে? কেন?

—ও আজ ভূপেকে বলেছে ছোটলোক। ও বলেছে, এ পাড়ার ছোটলোকদের সঙ্গে ও আর মিশতে চায় না। এ পাড়ার ছেলেদের ছোটলোক বলা হলে, তোকেও বলা হলো না? বল? তুই-ও তো এ পাড়ার ছেলে।

দীপু চেষ্টা করে একটু হাসলো। বললো, আমাকে কেউ ছোটলোক বললেও আমার গায়ে লাগে না, আমার কিছু যায় আসে না ওতে।

—যায় আসে না মানে? তোর না যায়, আমাদের যায় আসে। চল, দেখবো ও শালার কত রং বেড়েছে। শালা মারোয়াড়ীর দালাল, নিমকহারাম, শালা হারামী......

দীপু আবার জেদের সঙ্গে বললো, না, আমি যাবো না!

এতক্ষণ বাদে ধনঞ্জয়ের চোখে একটা ঝিলিক দেখা গেল। এত বেশী কথা বলা সে পছন্দ করে না। পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে সে, পকেটে হাত, দীপুর মুখোমুখি। ঘোড়ার ক্ষুরের আকারে আর পাঁচজন ঘিরে আছে দীপুকে। বড় রাস্তার পাশেই, অনেক লোকজন যাচ্ছে, তবু দীপু জানে, কেউ তাকে সাহায্য করবে না। দীপুর খুব ক্লান্ত লাগতে লাগলো, আজ তার মনটা ভালো নেই, আজই এই উৎপাত। দীপুর বিবেচনা শক্তি ক্রমশ ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। সে বুঝতে পারছে না, এখন তার কি করা উচিত। কিন্তু মনে মনে এটুকু অন্তত জানে, ওদের সঙ্গে বেশী হঠকারীতা করতে গেলে, প্রাণটাও চলে যেতে পারে। আজ ওরা যে-রকম উত্তেজিত, হয়তো দু'তিন-জনের পকেটেই ছুরি আছে। পেটে ছুরি বসিয়ে দেওয়া তো কিছুই ব্যাপার নয় এখন। তবে প্রাণ হারাতে কে চায়?

ধনঞ্জয় আলতোভাবে বললো, কেন বেগড়বাই করছিস দীপু? তোকে বলছি, আমাদের সঙ্গে যেতে, চল না!

দীপু চেঁচিয়ে উঠলো, না, যাবো না! কি করবি কি?

—কিছু করবো না! লে লে কথা বাড়াস নি

দু'খানা শক্ত হাত দীপুর কাঁধ চেপে ধরলো. তারপর জোর করেই ওকে ঠেলে নিয়ে যেতে লাগলো। নিষ্ফল জেনে, দীপু আর নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করলো না। সুকুমার একগাল হেসে বললো, তুই মাইরি, আমার থুঁতনির সঙ্গে বড্ড জোর ঠাট্টা করেছিস! আর একটু ঠাট্টা-ইয়ার্কি হবে নাকি?

ইন্দ্রজিৎদের বাড়ির বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে। একটু দূরে ওরা থেমে পড়লো। ধনঞ্জয় ঠাণ্ডাভাবে হুকুম দিল, যা দীপু, তুই গিয়ে ইন্দ্রজিতকে বাইরে ডেকে নিয়ে আয়। একথাও বলে দিচ্ছি, ফর ইওর ওউন সেক, কেটে পড়ার চেষ্টা করিস না!

ওরা কেউ ডাকলে ইন্দ্রজিৎ হয়তো বাইরে আসবে না, তাই দীপুকে পাঠাচ্ছে। ধনঞ্জয়ের বুদ্ধির সূক্ষ্মতায় দীপু অবাক হয়ে গেল। এমনিতে হয়তো দীপুর পকেট থেকে পাঁচ দশ টাকা কেড়ে নিয়েই নিষ্কৃতি দিত, যেমন অন্যদিন করে, কিন্তু আজ ও রাগের মাথায় সুকুমারকে ঘুষি মেরেছে বলেই ওরা এই প্রতিশোধের উপায়টা নিয়েছে। দীপুকে ওরা মার্কা-মারা করে দিতে চায়।

দীপু ধনঞ্জয়কে একটু অনুনয় করে বললো, আমাকে এর মধ্যে কেন জড়াচ্ছিস ভাই? আমি কারুর সাতে পাঁচে থাকি না—

ধনঞ্জয় রূক্ষভাবে বললো, যা না! মেয়েছেলের মতন নাকে কান্না কাঁদছিস কেন? পুরুষ মানুষ না তুই!

—আমি মারামারি করে পুরুষ মানুষের প্রমাণ দিতে চাই না।

—তুই আজ বড্ড এ'ড়ে তর্ক করছিস! তোকে যা বলছি, তাই কর, আর পাঁচ মিনিট টাইম দিলুম—তারপর যদি আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়—

ইন্দ্রজিতদের বসবার ঘরে জ্বলজ্বল করছে ফ্লুরোসেণ্ট আলো, আর পার্কের অন্ধকার কোণে ও'রা দাঁড়িয়ে আছে। ধনঞ্জয় খস করে দেশলাই জেলে সিগারেট ধরিয়ে কাঠিটা নিবে যাবার আগে সেই আলোতে ঘড়ি দেখলো।

দীপু জিজ্ঞেস করলো, কি বলবো কি আমি ইন্দ্রজিতকে? টাকা চাইবো?

—ইন্দ্রজিৎকে ডেকে আনবি কোনো ছুতোয়।

—কি ছুতোয়?

—একটু ব্রেনটা খেলা! নাকি সব ভোঁতা মেরে গেছে!

—এই যে খানিকটা আগে বললি, পঞ্চাশটা টাকা চাইবি

—না, বাইরে ডেকে নিয়ে আয়। ও কত বড় ভদ্দর লোকের গাঁ—সেটা দেখতে হবে তো! যাঃ—

ধনঞ্জয় একটা ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে দিল দীপুকে। দীপু এক পা এক পা করে এগুতে লাগলো। এখনো সে এক ছুটে পালিয়ে যেতে পারে। ওরা কেউ তার সঙ্গে দৌড়ে পারবে না। তাড়া করলেও দীপু এক আধজনকে লাথি ঘুষি মেরে ফেলে দিতে পারে, কিন্তু সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু এর পর যে আবার যে কোনোদিন ওরা তাকে ধরবে। পেছন থেকে কাপুরুষের মতন বোমা ছুঁড়বে কিংবা ছুরি মারবে। তাছাড়াও দীপুর মেজাজ যে এখন রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করতে পারে—সে অধিকার হারাবে—সমস্ত গোপন খুঁটিনাটি জেনে কুৎসা ছড়াবে, অশ্লীল গালাগাল দেবে।

দরজার সামনে গিয়ে দীপু ডাকলো, ইন্দ্রজিৎ!

ইন্দ্রজিতের দাদা এবং তাঁর এক বন্ধু বসে গল্প করছিলেন। ইন্দ্রজিতের দাদা বাসুদেব চেনেন দীপুকে, বললেন, এসো, ভেতরে বসো, দেখি ও আছে কিনা। দাদার বন্ধু এই সময় বিদায় নিয়ে চলে গেল, বাসুদেব বললেন, কি খবর, দীপু? নীলাঞ্জনের আর দেখা পাই না, ও কোথায় বাড়ি নিয়েছে যেন?'

ধনঞ্জয় মাত্র পাঁচ মিনিট সময় দিয়েছে, দীপু বললো, ইন্দ্রজিতের সঙ্গে আমার একটু বিশেষ দরকার ছিল।

—বসো, ডেকে দিচ্ছি।

বাসুদেবদা ওপরে উঠে গেলেন, তারপর আর অনেকক্ষণ সাড়া শব্দ নেই। দীপুর কাছে ঘড়ি নেই, পাঁচ মিনিট কেটে গেছে কিনা ও জানে না। সময়ের গতি এক এক সময় এক এক রকম হয়ে যায়। দীপু উঁকি দিয়ে দেখলো ধনঞ্জয়দের দেখা যাচ্ছে কি না, কিন্তু পার্কের ওদিকটায় অন্ধকার। ওরা নিশ্চয়ই দীপুকে লক্ষ্য করছে।

কিছুক্ষণ বাদে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। কে আসছে, ইন্দ্রজিৎ না বাসুদেবদা? প্রতিবার সিঁড়িতে পায়ের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে দীপুর বুকের মধ্যে দুমদুম করতে লাগলো।

[ক্রমশ]

হ্যাঁ, 'এভারেডী'
হলেই নিশ্চিন্ত

SPECIAL
EVEREADY
TRADE MARKS
LEAKPROOF
TRANSISTOR BATTERY
UNION CARBIDE

১ টাকা ১০ পঃ
কর আলাদা

এভারেডী
নং ১050

ট্র্যানজিস্টারকে ক্ষয়ক্ষতি থেকে
বাঁচিয়ে শক্তি যোগানোর জন্যে
বিশেষভাবে তৈরী রাউণ্ড ব্যাটারী

* বহুক্ষণ ধরে চালু রাখার একটানা শক্তি যোগায়।
* বিদ্যুতের অপচয় এবং যন্ত্রপাতির ক্ষতি নিরোধ করাই এর বিশেষত্ব।
* এই ব্যাটারী লাগিয়ে বরাবর পরিষ্কার ও নিখুঁত আওয়াজ পাবেন।
* যেমন এর কর্মকুশলতা তেমনি দীর্ঘ এর স্থায়িত্ব।

**এভারেডী নং ১০৫০ লাগিয়ে
আপনার ট্র্যানজিস্টার থেকে সবচেয়ে
সুন্দর কাজ পাবেন।**

সমস্ত রকম ট্র্যানজিস্টারের জন্যই
'এভারেডী' ব্যাটারী পাবেন।

UG.3771

শিল্পী শ্রীমতী কমল দাশগুপ্ত সম্প্রতি অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে তাঁর প্রথম একক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। প্যাস্টেল ও তেলরঙে আঁকা ২১টি রচনানিদর্শন প্রদর্শনীতে দেখা যায়।

শ্রীমতী কমল দাশগুপ্তের পেশা কিন্তু শিল্পকর্ম নয়। তিনি শিক্ষয়িত্রী, কার্সিয়ঙ শহরের একটি সুপরিচিত বালিকা বিদ্যালয়ে তিনি ইংরাজী শিক্ষা দেন। সরকারী আর্ট কলেজে শিক্ষার্থিনী হিসাবে তিন বছর তিনি পড়েও ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ইংরাজী সাহিত্যে স্নাতোকত্তর ডিগ্রী লাভ করে শিক্ষয়িত্রীর পেশা অবলম্বন করেন ও বর্তমানে কার্সিয়ঙেই বাস করেন। তবে শিল্পের প্রতি তাঁর সহজাত মমতা তিনি ত্যাগ করতে পারেন নি। দৈনন্দিন পড়াশোনা ও পড়াবার কাজ শেষ করার পরে হাতে যে অবসরটুকু থাকে সেই সময়ে তিনি আপনার মনে ছবি এঁকে অবসর সময়টুকু সুন্দর ও সার্থক করে তোলেন। শিল্পীর রচনা তিন শ্রেণীর—নিসর্গ দৃশ্য, প্রতিকৃতি, বিশেষ করে কয়েকটি মুখের স্টাডি ও স্টিল লাইফ। কার্সিয়ঙের চারিপাশের নানা মনোরম দৃশ্য, পাহাড়ী ছেলেমেয়েদের পুতুল, গোলগাল মুখমণ্ডল ও কয়েকটি ইংরাজ রমণীর পরলোকগত স্কেচ প্রদর্শনীতে চোখে পড়ে। শিল্পী পেশাদার নন সুতরাং তাঁর কাছে অসাধারণ কিছু আশা করা সমীচীন হবে না। তবে এই শিল্পীর রচনায় নারীসুলভ একটি স্নিগ্ধ কোমলতার পরিচয় পাওয়া যায়—বিশেষ করে ২০ ও ২১ নং হেড স্টাডিতে। প্রায় সব ছবিই রিয়্যালিস্টিক রীতিতে আঁকা, এক রেড ইন ব্ল্যাক ছবিটিতে আধুনিকতার আভাস মেলে। এই প্রসঙ্গে ক্রাসান্থেমামের নাম করা যায়। স্টিল লাইফ-এর মধ্যে সানফ্লাওয়ার উল্লেখযোগ্য। কয়েকটি নিসর্গ দৃশ্যে শিল্পীর আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠেছে—বিশেষত দীর্ঘ পাইন শ্রেণীর পরিপ্রেক্ষিতে দূরস্থিত কুটীর ও আবেষ্টনী (অলটারস থ্রু মিস্ট) থেকে শিল্পীর নিসর্গ দৃশ্য রচনা করার বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। অপরাপর ছবির মধ্যে সি স্কেপ ও হার্ভেস্টিং-এর নাম করা চলে।

*

বিড়লা অ্যাকাডেমিতে ক্যানভাস আর্টিস্টস সার্কল-এর শিল্পীসভাগণ তাঁদের পঞ্চম প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন। প্রদর্শনীতে ১১ জন সভ্যের ২১টি রচনা ও দুজন ভাস্কর-শিল্পীর আটটি ভাস্কর্য নিদর্শন দেখা যায়। এই গোষ্ঠীর কয়েকজন তরুণ শিল্পীমহলে পরিচিতি লাভ করেছেন। সকলেই কমবেশী প্রগতিবাদী,

ও অঙ্কনরীতির দিক থেকে আধুনিক, বিমূর্ত ও সমবিমূর্ত নানা রচনা চোখে পড়ে। তবে ভাস্কর্যে সমসাময়িক চিন্তাধারা বা গঠনকৌশলের বিশেষ পরিচয় পাইনি। মাধ্যমও চিরাচরিত প্লাস্টার সিমেন্ট ইত্যাদি। শিল্পীসভ্যদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেই আপন আপন চিন্তাধারা অনুযায়ী কাজ করে গেছেন, ফলে ভাল হোক বা মন্দ হোক,

র‍্যালি —শিপ্রা আদিত্য

অধিকাংশ স্থলে একটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়েছে। তবে একথা সত্যি যে প্রদর্শনীর মান সাধারণ। স্বপ্নেশ চৌধুরী উদীয়মান, তরুণ শিল্পী, প্রদর্শনীতে তাঁর নতুনতম দুএকটি কাজ দেখার আশা করেছিলাম। বলাই কর্মকার ও বরেন বসু উভয়েই বালি, সিমেন্ট, কাঠের গুঁড়ো জাতীয় উপাদান সহকারে রচনা সৃষ্টি করেছেন। প্রথম জনের ফর্ম নং ১ উল্লেখ্য। দ্বিতীয় জনের মিথ অনেকের ভাল লাগে। নানা প্রতীক ব্যবহার ও সিঁদুর রঙের ওপর প্রাধান্য দান করার ফলে এটির একটি বিশেষ আবেদন ফুটে উঠেছে—যাতে সকলকেই সাড়া দিতে হয়। অশোক বিশ্বাস সমবিমূর্ত রচনার মধ্যেও রীতিমুখরতার অবতারণা করেছেন—এই প্রসঙ্গে পেন্টিং ১-এর নাম করা যায়।

রিয়্যালিস্টিক হলেও আলোক ভট্টাচার্যের উইন্টার-এর শীতকাতর কয়েকজন লোকের —বিশেষ করে একজনের ঈষৎ বর্ধিত অঙ্গ সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে তাঁর বক্তব্যটুকু প্রকাশিত হয়েছে। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে নারায়ণ চক্রবর্তীর অ্যাকোয়েরিয়াম অনেকেরই ভাল লাগে। পরিমল দত্তরায়ের রচনায় স্থিরচিত্রসুলভ বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে, যেমন আন্ডার দি স্কাই। শান্তি চক্রবর্তী তাঁর রচনায় ভাস্কর্যসুলভ আয়তনিক গভীরতার সৃষ্টি করেছেন (ডিলাপিডেটেড বিউটি—২)। সুখেন্দু রায়ের রচনা সাধারণ—তবে একটি আতঙ্কগ্রস্ত পরিবারের মনোভাব ব্যক্ত করাই যদি তাঁর উদ্দেশ্য হয় তাহলে টু সারভাইভ-এর নাম করা উচিত। ত্রিদিব চন্দ্রের কাজ অনেকেরই নজরে পড়ে তাঁর তাদের গ্রাফিক তথা অলংকার জাতীয় গুণের জন্য। যেমন, নীলপৃষ্ঠভূমির পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাফিকসুলভ লাল ও কালো রেখাপ্রধান রচনা—দি ক্লুড। বিষ্ণু দাসের রচনানিদর্শনও সাধারণ শ্রেণীর—অ্যাসটনিশড্-এ গগনেন্দ্রনাথের অনুকরণ প্রচেষ্টা চোখে পড়ে। ভাস্কর্য বিভাগে মানিক তালুকদার ও সুধীর ধরের কাজে কোনও নতুনত্ব দেখিনি, যদিও মানিক তালুকদারের কাছ থেকে সমকালীন বিশেষ করে নেগেটিভ ফর্মের কোনও নিদর্শন আশা করেছিলাম। দুটি ভাস্কর্য নিদর্শন চোখে পড়ে—ফিশ (মানিক তালুকদার) ও কমপোজিশন-৪ (সুধীর ধর)-এর নাম করা যায়।

*

দর্শক শিল্পীগোষ্ঠীর উদ্যোগে কনক বিল্ডিং-এ (চৌরঙ্গী রোড) একটি সমকালীন চিত্রকলা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে মাত্র পাঁচজন শিল্পীর ২৬টি রচনা নিদর্শন দেখা যায়। অধিকাংশই জলরঙে আঁকা স্কেচ, নিসর্গ ও নানা বহির্দৃশ্য ও স্টাডি। দুঃখের বিষয় প্রদর্শনী দেখে মনে হয়, কর্তৃপক্ষ এটির

প্রতি গভীর মনোযোগ দেন নি—বিশেষ করে কয়েকটি রচনা শিক্ষার্থীসুলভ ও প্রদর্শনীভুক্ত করার যোগ্য নয়। পরিচিত শিল্পী দেবব্রত মুখার্জীর কয়েকটি নিসর্গ দৃশ্য মন্দ লাগে না। সুন্দরবন অনেকেরই চোখে পড়ে। চারু খাঁ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ায় সুকৌশল রঙ ব্যবহারের জন্য প্রশংসা দাবী করতে পারেন। উডকাট ও একটি স্কেচের মধ্য দিয়ে দীপালি পাল প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। আরও দুটি রচনার নাম করা উচিত—শিপ্রা আদিত্যর গসিপ ও র‍্যালি। প্রথমটি রীতিমুখর, দ্বিতীয়টি ইম্প্রেশানিস্টিক রচনা হিসাবে উল্লেখযোগ্য। ক্যাটালগের প্রথম ও প্রধান আকর্ষণ ছিল শ্রদ্ধেয় প্রবীণ শিল্পী ভোলা চট্টোপাধ্যায়ের নতুন রচনা—নিউ জেনারেশন—দেখা। আত্মীয়বিয়োগের জন্য তিনি প্রদর্শনীতে যোগদান করতে পারেননি জেনে দুঃখিত হলাম। পরের প্রদর্শনীতে ভোলা চট্টোপাধ্যায়ের রচনা নিদর্শন দেখাবার ব্যবস্থা করলে দর্শক শিল্পীগোষ্ঠী সকলের ধন্যবাদভাজন হবেন।

চিত্রপ্রিয়

বিমানবিহারী মজুমদার

গত ৩রা জানুয়ারী, ১০ম সংখ্যা দেশ-এ প্রকাশিত ভবতোষ দত্ত লিখিত 'বিমানবিহারী মজুমদার' রচনাটির জন্যে লেখক ও আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বিমানবিহারী পাটনায় জীবনের সিংহভাগ কাটিয়েছেন। পাটনাবাসী হিসেবে তাঁকে অনেক কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। নানা পরিবেশে, বিভিন্ন সময়ে দীর্ঘদিন যাবৎ বিমান-বিহারীকে দেখার ফলে যা আমাদের কাছে এই কর্মকাণ্ড ও বিদ্যাভাণ্ডারের সঙ্গে সমান্তরালভাবে প্রতিভাত তা হচ্ছে "মানুষ বিমানবিহারী"র 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা' ভাব। আলোচ্য লেখায় এ দিকটির পরিচয় কিছু দুর্বল বলেই মনে হয়েছে।

আরায় হরপ্রসাদ জৈন কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে যখন তিনি ১৯৪৫ সালে যোগদান করেন তখন কলেজের অবস্থা ছিল শোচনীয়। জনবসতির বিরলতার ফলে ছাত্ররা সন্ধ্যার পর থেকেই হাঁপিয়ে উঠত। শোনা যায় তারা সন্ধ্যেবেলা আরা স্টেশনে চলে আসত ট্রেন দেখে একটু বৈচিত্রের স্বাদ পেতে। সে সময়ে অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্যে কোনরকম বিল্ডিং ছিল না। বিমানবিহারী তাঁর অদম্য কর্মশক্তি ও অটুট সংগঠন শক্তির মিতালি ঘটিয়ে কলেজের বিল্ডিং থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু সংগ্রহ করে কলেজটিকে বিহারের অন্যতম বড় কলেজরূপে গড়ে তুলেছিলেন। তখন এমন দিনও গেছে যখন তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বাড়ি তৈরীর কাজ পর্যবেক্ষণ করেছেন। এতে তাঁর অফুরন্ত প্রাণশক্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শক হিসেবে যে আদর্শ তিনি স্থাপন করে গেছেন আজও তা অম্লান এবং অনুকরণীয়।

বিহারের বর্তমান শিক্ষাজগতের অন্যতম গৌরব ও প্রথম অন্ধ 'ডক্টরেট' ডঃ ভবত মিশ্রের সাফল্যের পশ্চাতেও বিমানবিহারীর দান অতুলনীয়। ডঃ মিশ্র তাঁর থিসিস্ Civil Liberty and the Indian National Congress 'ব্রেইলী' নিয়ে শেষ করেন বিমানবিহারীর তত্ত্বাবধানে। একজন অন্ধকে এরকম একটি বিষয়ে 'গাইড' করার মধ্যে যে কি অসাধারণ পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও ধৈর্যের সঙ্গে স্নেহ-প্রীতি জড়ান ছিল তার তুলনা ছিলেন একমাত্র তিনিই। সম্প্রতি তাঁরই সাহায্যে ও চেষ্টায় এই থিসিস্‌টি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়ে প্রশংসিত হয়েছে।

পরম ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন বিমানবিহারী। কি বাড়ির সীমানায়, কি বাইরে সর্বদাই তাঁর আচারে ব্যবহারে সে ভাবটি ফুটে উঠত। সেই সঙ্গে ছিল প্রখর সময়জ্ঞান ও নিয়মানুবর্তিতা। পাটনার প্রায় প্রতিটি ছোট বড় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি আত্মগতভাবে জড়িত ছিলেন। কোনদিন কোন উৎসবে বা সভায় সময়ের ব্যতিক্রম তাঁর বড় একটা হয়নি। অপার রসজ্ঞান ছিল বিমান-বিহারীর। উচিত বক্তা হিসেবেও তিনি ছিলেন সুনামের অধিকারী। জীবনের সর্বক্ষেত্রে সরলতা ও আড়ম্বরহীনতা ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম উজ্জ্বল দিক। অন্যায়ের সঙ্গে কখনও রফা তিনি করেননি। এজন্য সময় সময় তাঁকে কটুভাষী বলে মনে হলেও তাঁর মন ছিল অসম্ভব রকমের নরম ও সংবেদনশীল। তাঁর ছাত্ররা (দেশী ও বিদেশী) সকলেই তার নিভৃত পরিচয় পেয়েছেন। তাঁর স্নেহ ও মমতার কথা সর্বজনবিদিত। পৃথিবীর তাবৎ সৃষ্টিশীলতার প্রতি তাঁর বিশাল মনোভাব, প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী ও উদারতা দেখে মনে হয় ইংরেজীর catholicity of taste কথাটি ও'র ক্ষেত্রে সুপ্রযোজ্য। ভবতোষবাবু তাঁর লেখার শেষে ঠিকই মন্তব্য করেছেন যে, তিনি তাঁর বহু পরিকল্পনাই সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে "রবীন্দ্রনাথের সেরা" নামে একটি সংকলন। স্থানীয় রবীন্দ্র পরিষদ রবীন্দ্রনাথের সেরা নামে একটি বক্তৃতামালার ব্যবস্থা করে-ছিলেন। তাতে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ এই পর্যায়ে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথ-নাথ বিশী, ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, ডঃ অমলেন্দু বোস, শ্রীমতী মৃণালিনী ঘোষ, সিস্টার পুষ্প এবং আরও অনেকে বক্তৃতা করেছিলেন। বিমানবিহারী এই সংকলনটির সম্পাদনা কার্যে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু আরও অনেক পরিকল্পনার মতো এটিও অসমাপ্তই রয়ে গেল।

একজন পাটনাবাসী গুণগ্রাহী হিসেবে ভবতোষবাবুর লেখার পরিপ্রেক্ষিতে বিমান-বিহারীর প্রতি আমার এই শ্রদ্ধাঞ্জলি পত্রটি প্রকাশ করলে বাধিত হব।

শ্রীজীবনময় দত্ত,
পাটনা-১

মহাভারতের অনুবাদ

গত সপ্তাহের (৩১।১।১৯৭০) দেশ পত্রিকার সাহিত্য সংবাদে (৮১ পৃঃ) মহা-ভারতের ইংরাজী অনুবাদ সংক্রান্ত যে তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সহিত আরও কিছু যোগ করা প্রয়োজন মনে করিতেছি। আমি প্রায় ২০।২২ বৎসর পূর্বে দার্জিলিং শহরে N N P Hall সংলগ্ন Public Libraryতে কয়েক খণ্ড ইংরাজীতে Sir P C Roy C I E কর্তৃক অনূদিত মহাভারত পাঠের সুযোগ পাইয়াছিলাম। ইনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র নহেন—এ'র নাম যতদূর স্মরণ হয়—Sir Pratul বা Sir Pratap ch. Roy। বইগুলোর বাঁধাই বেশ উঁচুদরের এবং ইংরেজী অনুবাদ খুবই উৎকৃষ্ট। ইঁহার সম্বন্ধে আর কোনও সংবাদ পাইবার সুযোগ হয় নাই। বোধ হয় ইনি পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয় বা বঙ্কিম-চন্দ্র-সমসাময়িক ছিলেন। C I E খেতাব ঐ অনুবাদের জন্য তাঁকে দেওয়া হইয়াছিল—ইহাই আমার বিশ্বাস।

জিতেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার
কলকাতা-১৯

কীটস-এর উদ্ধৃতি

'দেশ' সাহিত্য সাপ্তাহিকের গত ৩৭ বর্ষ ১৪শ সংখ্যায় তাঁর 'শান্তিনিকেতন/সেকাল একাল' আলোচনার এক জায়গায় শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার ইংরেজ কবি কীটস-এর কবিতা থেকে উল্লেখ করতে গিয়ে স্মৃতি-বিভ্রমে লিখেছেন,

"Truth is beauty, beauty is truth
That is all ye know and need
to know."

আসলে ছত্রটি হবে,

'Beauty is truth, truth beauty,'
—that is all
Ye know on earth, and all ye
need to know.

আমার মনে হয়, সঠিক না জানা থাকলে উদ্ধৃতি দেওয়ার লোভ সংবরণ করাই শ্রেয়, কেননা বিকৃত উদ্ধৃতি পরোক্ষভাবে লেখকের অজ্ঞতারই পরিচায়ক।

বিশ্বনাথ ভৌমিক,
মেদিনীপুর

সরকারী উকীল

গত ৩১।১।৭০ তারিখের "দেশ পত্রিকার ২৮।২৯ পৃষ্ঠায় আমার রচিত যে "সরকারী উকীল/সেকাল ও একাল" শীর্ষক নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে কয়েকজনের নাম উল্লিখিত থাকায় অপর কোনো কোনো লোকের মনে কিছু কিছু ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হওয়া সম্ভব। ঐরূপ অভিযোগ কেহ কেহ আমার নিকট করায় তাঁহাদের ইচ্ছানুযায়ী এই পত্রে অনুরোধ জানাইতেছি যে, উক্ত আলোচ্য নিবন্ধ সম্পর্কে আমার নিম্নলিখিত মন্তব্য অনুগ্রহ করিয়া আপনার 'দেশ' পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করুন। কোনো ব্যক্তি-বিশেষকে লক্ষ করিয়া উহা রচিত হয় নাই। 'সরকারী উকীল' পর্যায়ে পদোন্নতিভুক্ত সকলকেই বুঝায়। [illegible] আমার নিবন্ধে [illegible] অভিযোগ [illegible] ছিল [illegible] অবশ্য আছেন। ঐরূপে অভিযোগ [illegible] উত্থিত হইতে না পারে [illegible] আমার উক্ত রচনা।

সুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়
[illegible]

বাংলার চালচিত্র

শ্রীআবদুল [illegible] চালচিত্র (১৭-১-৭০) প্রসঙ্গে ৭ই ফেব্রুয়ারী শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র রায়-এর চিঠি সম্পর্কে [illegible] মতামত জানাচ্ছি।

প্রথমেই বলি, আমি শ্রীরায়ের সঙ্গে একমত হতে পারছি না। [illegible] ও [illegible] চ্যালেঞ্জ আমার মনে হয় রাজনৈতিক স্টান্ট ছাড়া আর কিছুই নয় এবং সেই কারণেই [illegible] এক বিশেষ দল নির্বাচনের আগে এই ব্যাপারে তৎপর ছিল এবং চ্যালেঞ্জটা ছিল তাদেরই। প্রায় দেড় শ' বছর আগে [illegible] এ বিষয়ে আলোকপাত [illegible] আজও সত্য, তাই তার আর উল্লেখ করছি না, যা শ্রীরায়ের মন্তব্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

শ্রীরায়ের মন্তব্য, "...যদি গো-মাংস খান তবে বলতে হবে হিন্দু সভ্যতা তাদের মধ্যে তেমন গভীরভাবে প্রবেশ করে নি।" —আপত্তিকর। গো-মাংস না খাওয়াই কি হিন্দু সভ্যতা? তা আদৌ নয়, সেটা হিন্দু কুসংস্কার।

শ্রীকুম্ভারের লেখা ও শ্রীরায়ের ব্যাখ্যা (interpretation) অনুযায়ী মনে হতে পারে যে, "কলকাতা-প্রবাসী গ্রামের" হিন্দু ছেলেরাই গো-মাংস খায়। সেটা ঠিক নয়। বলা যায়, বিশেষ করে হিন্দু যুবক-ছাত্র-মধ্যবয়সী, তারা কোনো বিশেষ (বাংলা দেশ) জায়গার লোক নয়—তারা সমগ্র (বাংলা) দেশেরই অধিবাসী, এবং কমিউনিস্ট-অকমিউনিস্ট, বলেও তাদের আলাদা করা যায় না—তারা যে-কোনো কুসংস্কারবর্জিত লোক। আমি যত দূর জানি, সে সংখ্যা নেহাত কম নয় এবং সে বিষয়ে হয়তো শ্রীরায় অবহিত নন।

সব্যসাচী ঘোষদস্তিদার
কলকাতা-১৯

॥ ২ ॥

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭০, দেশ পত্রিকায় আবদুল জব্বার সাহেবের ফিচার সম্পর্কে জিতেন্দ্রচন্দ্র রায়ের বক্তব্য পড়ে সাধারণ পাঠক হিসেবে দু'একটা কথা বলতে চাই।

উনি কি করে স্থিরনিশ্চিত হলেন যে, 'কম্যুনিস্ট হিন্দু বন্ধুরা এবং আধুনিকরাও ....' গো-মাংস খাচ্ছেন না। আবদুল জব্বার সাহেব একজন বিচক্ষণ লেখক হয়ে কি এমন 'ডাহা অসত্য ও বানানো' কথা-গুলি সত্য বলে চালিয়ে দিতে পারেন? আমি এমন কয়েকজন তরুণ হিন্দু কম্যুনিস্টদের জানি, যারা গো-মাংস খাওয়াকে বিন্দুমাত্র গর্হিত কাজ বলে মনে করে না, বরং তারা সবার সামনে সেটা প্রকাশ করতে তেমন দ্বিধাবোধ করে না। কিছু কিছু তরুণ কমরেডদের মধ্যে এ ধরনের উক্তিও চালু আছে—'কি রে চল্, বড় মাংস খেয়ে আসি।' অবশ্য সব কম্যুনিস্টদের কথা [illegible] বলছি না।

বাদলকুমার চৌধুরী
কাঁচরাপাড়া

॥ ৩ ॥

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী '৭০ "দেশ" পত্রিকায় 'বাংলার চালচিত্র' সম্পর্কে মতামত জানাতে গিয়ে শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র রায় যে কয়েকটি উক্তি করেছেন, আমি তার প্রতিবাদ করছি।

প্রথমেই তিনি লিখেছেন, "বৈদিক যুগে গো-মাংস খাওয়া হত এ ধারণা ভুল।" জানি না কোন্ তথ্যের উপর ভিত্তি করে তিনি এমন দুঃসাহসিক মন্তব্য করেছেন।

শ্রীজগজীবন রাম যদি পার্লামেন্টে চ্যালেঞ্জের উত্তরে নীরব হয়ে গিয়ে থাকেন তা হলে তিনি ঠিকই করেছেন। কারণ, তিনি রাজনীতিবিদ, ঐতিহাসিক নন। শ্রীরায়ের নিরুত্তর থাকা নিয়েই যদি আমাদের বুঝতে হয় যে, বৈদিক যুগে গো-মাংস ভক্ষণ করা হতো না, তা হলে সত্যই আমাদের দুর্ভাগ্য।

বৈদিক যুগে গো-মাংস ভক্ষণ করা হতো কিনা তা নিয়ে আমার মত সাধারণ পাঠকের বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়া মোটেই উচিত নয়। তবে, এ বিষয়ে বিশ্ববিশ্রুত কয়েকজন ঐতিহাসিক কি বলেন তা দেখা যাক্ঃ

"When the serious business of the assembly was over, the sabha or assembly-hall was converted into a club house, where the people ate and drank, talking merrily all the while. Both animal and vegetable foods were taken by the Aryans. Not only fish, birds, goats, and rams, but horses, buffaloes and even bulls were slaughtered for their food."

Ancient India
R. C. Majumdar
pp. 46.

"....The use of animal food was common, especially at the great feasts and family gatherings. The slaying of the cow was, however, gradually looked upon with disfavour as is apparent from the name aghnya (not to be killed) applied in several passages."

An Advanced History of India
R. C. Majumdar,
H. C. Ray Chowdhury,
Kalikinkar Datta
ch. III. pp. 32.

"....But the vedic Indians were a nation of meat-eaters, nor need we believe that they merely ate meat on occasions of sacrifices. Rather, as in the Homeric age, the slaughter of oxen was always in some degree a sacrificial act, and one specially appropriate for the entertainment of guests, as the sacred name of the heroic Divodasa Atithigva, 'the slayer of oxen for guests' and as the practice of slaying oxen at the wedding festival abundantly show. The ox, the sheep, and the goat were normal food eaten by men and offered to their gods......"

A. Berriedale Keith
The Cambridge History of India
Vol. I. edited by E. J. Rapson.

অতএব দেখা যাচ্ছে, বৈদিক যুগে গো-মাংস ভক্ষণ করা হতো। পুরীর জগদ্গুরুর কথা এবং শ্রীরায়ের মন্তব্য মেনে নিতে গেলে বিদগ্ধ এইসব পণ্ডিত ব্যক্তি মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করেছেন বলেই ধরে নিতে হয়। [illegible] কালস্রোতে নিমজ্জমান পথিক ছাড়া কিছুই নন, তাঁর যুক্তি ভ্রান্ত ছাড়া কিছুই নয়।

'হিন্দু সভ্যতা' [illegible] বলে [illegible] যে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা হিন্দু সমাজের [illegible] সমাজের [illegible] [illegible] ? [illegible]

কলকাতা-প্রবাসী [illegible]

প্রতি শ্রীরামের অতিরিক্ত সহানুভূতি বিস্ময়ের উদ্রেক করে। জব্বার সাহেবের কয়েকটি পংক্তি তুলে তিনি সে সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "ঐসব উক্তিগুলি ডাহা অসত্য ও বানানো।" জব্বার সাহেবকে ধন্যবাদ যে, তিনি তাঁর লেখায় সত্য ছবি এঁকেছেন ; কারণ তাঁর মন্তব্য মোটেই মিথ্যা নয়, ডাহা তো দূরের কথা। কলকাতায় বহু ছাত্রবন্ধুদের দেখেছি তাঁরা বিনা দ্বিধায় গো-মাংস খান ; কারণ ধর্মের সেই অকারণ আর ঘৃণ্য বাধাগুলো তাঁরা অনায়াসেই উপেক্ষা করতে পারেন।

আদিনাথ বৈদ্য
কলিকাতা-৭

॥ ৪ ॥

৭ই ফেব্রুয়ারী, দেশ পত্রিকায় শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র রায় লিখেছেন যে বৈদিক যুগে গো-মাংস খাওয়া হত এ ধারণা ভুল এবং হিন্দুর ছেলেরা 'মুসলমান হোটেলে' সস্তায় আহার সমাধা করেন তাকেও কুৎসা বলে গণ্য করেছেন।

কেবলমাত্র সেণ্টিমেণ্ট এবং দেশাচারের উপর নির্ভর করে হিন্দুধর্ম বা যে কোনো ধর্ম এবং ধার্মিক আচার ব্যবহারের সম্বন্ধে চূড়ান্ত মতামত কেউই দিতে পারেন না। ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রদেশে দেশাচার, লোকাচারে প্রভেদ আছে, যদিও প্রত্যেকে নিজেদের বর্ণহিন্দু বলে দাবি করেন। নিরামিষাশীরা আমিষভক্ষকদের ধর্মভ্রষ্ট বলেন, এবং আমিষাশীরা স্বপক্ষে শাস্ত্র থেকে ভূরি ভূরি উদ্ধৃতি দিতে পারেন। 'সররাইট' বিবাহ পদ্ধতি এখনো দক্ষিণ ভারতে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের ভিতরে প্রচলিত, যাকে মুসলমানী বলে বাংলার ও উত্তর ভারতের লোকেরা হয়তো মূর্ছা যাবেন। মুচী মেথর, চামাররাও হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বহু যুগ ধরে এবং ন্যায়শাস্ত্রের দিক দিয়ে তাঁদের আচার-ব্যবহার, খাদ্য প্রভৃতিও হিন্দু সামাজিক। অব্রাহ্মণোচিত হয়তো বলা চলতে পারে কিন্তু অহিন্দু বলা যায় না।

মানব সমাজের গোড়ার দিকে আমরা নিরামিষাশী ছিলাম না এ কথা লেখা বাহুল্য এবং তখন ভক্ষণীয় প্রাণীমাত্রকেই আমরা নির্বিচারে খেয়েছি। কৃষিযুগে আমরা আংশিকত নিরামিষাশী হয়েছি এবং লাঙ্গল চালাবার জন্য বলদ, দুধের জন্য গরু ; গোময় সার দেবার কাজে আসে বলে গোহত্যা ধার্মিক অনুশাসনের দ্বারা বন্ধ করা হয়। অহিংসার উপর জোর দেওয়া হয় বুদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রবর্তনের পর। শ্রীজগজ্জীবন রাম যদি লোকসভায় নিরুত্তর থাকেন তা নিছক রাজনৈতিক কারণে। ইতিহাসের প্রমাণের অভাবের দরুন নয়। আমাদের 'সেণ্টিমেণ্ট' এখনো এত প্রবল যে মুসলমান, খৃষ্টান বা হরিজন যদি হিন্দু শাস্ত্রের উচিত সমালোচনা করেন তা হলেও আমরা খড়্গহস্ত হয়ে উঠি। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় যে অনেক বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ শাস্ত্রজ্ঞ ঐতিহাসিকরাও বৈদিক যুগে গো-মাংস ভক্ষণের প্রমাণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

গরু, শূয়োর, এবং বিভিন্ন সরীসৃপ, পোকা মাকড়দের শরীরে পাঁঠার চেয়ে বেশী প্রোটিন অবশ্যই আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, এমন কী ভারতের আদিবাসীরাও, সাপ থেকে এমন এমন প্রাণী বা পোকামাকড় সাগ্রহে আহার করে থাকেন যা শুনলে অনভ্যস্তদের অন্নপ্রাশনের ভাতও বেরিয়ে আসবে। এক শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা যদি অনবধানতা বা সংস্কারবশত কিছু খান না বলে অপর শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা খাবেন না এমন কোনো অনুশাসন নেই।

কলিকাতায় যে কেবল মেধাবী ছাত্র ও ধনীর দুলালেরা পড়তে আসেন এমন কথাও হলফ করে বলা চলে না। স্থানীয় ও প্রবাসী অধিকাংশ ছাত্র ও কর্মীরা সচ্ছল নন। অর্থাভাবের জন্য শুধু বর্তমানে নয়, পূর্বে পাইস হোটেলের যুগেও অনেকে মুসলমান হোটেলে সমানে সস্তায় খেতেন। এখানে, অর্থাৎ আহমেদাবাদে এক প্রকারের কাবাব বা সিংগাড়া স্থানীয় হিন্দু মুসলমানরা প্রকাশ্যে ও নির্বিবাদে খান যা কোনো মতেই পাঁঠার মাংস দিয়ে তৈরী নয়। শুধু গরীব নয়, ধনীরাও খান এবং সুস্বাদের জন্য।

ভারতবর্ষে বর্তমানে সবপ্রকার আমিষ আহারের বিরুদ্ধে একটিই কারণ দেখান চলতে পারে। আমাদের দেশের গরু, শূয়োর, পাঁঠা, ভেড়া সবই অধিকাংশ রুগ্ন ও ব্যাধিদুষ্ট। তাই তাদের মাংস কেন, দুধ খেলেও স্বাস্থ্যের বদলে অসুস্থ হবার আশঙ্কাই বেশী। কিন্তু এহ বাহ্য।

মোট কথা, ভারতবর্ষে আর্যরা গো-মাংস খেতেন অথবা এখনো কিছুর হিন্দু খান এ কথা কেউ বললে সেটি ভুল নয় এবং তাতে আমাদের ক্রুদ্ধ হবার কোনো কারণ নেই।

কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায়
আমেদাবাদ-১

গোবিন্দমাণিক্য দেব ও তাঁহার মুদ্রা

'ইতিহাসের আলোতে : ত্রিপুরেরাজ গোবিন্দমাণিক্য দেব ও তাঁহার মুদ্রা' শীর্ষক একটি মনোরম প্রবন্ধ ১৭ মাঘ, ১৩৭৬ সালের 'দেশে' পড়িলাম। লেখকদ্বয় শ্রীবসন্ত চৌধুরী ও শ্রীপরিমল রায়কে ধন্যবাদ। পরিপূরক হিসাবে কয়েকটি মন্তব্য করিবার অনুমতি চাহিতেছি।

"রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা ১৩৬৮" (শত-বার্ষিকী সংস্করণ, রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী—পুলিনবিহারী সেন, কালি ও কলম, পৌষ ১৩৭৫), "রাজরত্নাকর" বা ত্রিপুরা বুরঞ্জী (Published by the Government of Assam in the Department of Historical and Antiquarian studies, 1938.) প্রভৃতি পুস্তকেও এই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কিছু কিছু পরিচয় আছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে 'রাজর্ষি' গল্পের প্রেরণা যে একটি স্বপ্ন হইতে উদ্ভূত তাহার উল্লেখ আছে—লেখকদ্বয় সে কথা বলিয়াছেন এবং তৎকালীন ত্রিপুরারাজের একটি চিঠির অংশও উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং গ্রন্থপঞ্জীতে 'রাজমালার' বিভিন্ন প্রকাশের কথাও বলিয়াছেন। কবিই প্রথম স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মহারাজ বীরচন্দ্রকে পত্র দেন। পত্র-খানিতে তারিখ না থাকিলেও খুব সম্ভব ২৩শে বৈশাখ, ১২৯৩ সালে লেখা। কবির সপ্ততিতম জন্মজয়ন্তীতে কলিকাতা টাউন হলের সম্বর্ধনা সভায় আয়োজিত প্রদর্শনীতে ঐ পত্রখানি দর্শিত হয়। পত্রটি এইরূপ—মহারাজ বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন যে, আমি ত্রিপুরা রাজবংশের ইতিহাস অবলম্বন করিয়া 'রাজর্ষি' নামে একটি উপন্যাস লিখিতেছি। কিন্তু তাহাতে ইতিহাস রক্ষা করিতে পারি নাই। তাহার কারণ ইতিহাস পাই নাই। এজন্য আপনাদের কাছে মার্জনা প্রার্থনা করিতে নিবেদন করিতেছি। এখন যদিও অনেক বিলম্ব হইয়াছে তথাপি মহারাজ যদি গোবিন্দ-মাণিক্য ও তাঁহার ভ্রাতার রাজত্বের সময়ের সবিশেষ ইতিহাস আমাকে প্রেরণ করিতে অনুমতি করেন, তবে আমি যথাসাধ্য পরিবর্তন করিতে চেষ্টা করিব. ...। 'রাজর্ষি'র প্রথম সংস্করণে মহারাজ কর্তৃক প্রেরিত রাজরত্নাকর (রাজমালা নয়) নামে ত্রিপুরারাজবংশের একটি সংস্কৃত কাহিনী লিপিবদ্ধ ছিল। তাহার নাম "মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য চরিতম্"। তাহার কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি—"কল্যাণ মাণিক্যস্য মরণাৎ ষোড়শ দিনে রাজ্যাসনে শুভ তিথ্যাদ্যাদ্যন্তে যুবরাজ গোবিন্দ নারায়ণো নানাবিধ মহোৎসবৈঃ স্বকুলাচার বিধিনা সিংহাসনমারুহ্য পট্টমহিষ্যৈক পৃষ্ঠে শিব-লিঙ্গাকৃতি খচিতা পরপৃষ্ঠে স্বমহিষী গুণবতী নামাঙ্কিতাং সুবর্ণময়ীং রজতময়ীং মুদ্রাং প্রথমেব প্রচারয়ামাস"......রাজ্যাভি-ষেকের পর বৈমাত্রেয় "নক্ষত্রঠাকুরো মুর্শি-দাবাদাধিপতে নবাবান্তিকং গত্বা স্বপরিচয়ং বিজ্ঞাপয়ামাসে। নক্ষত্রঠাকুরস্তু প্রত্যহং নানাবিধ কৌতুককথাকোন নবাবং পরিতোষ-বান্। ততঃ ক্রমেনাভয়ো সৌহৃদো সঞ্জাতে কদাচিৎ নক্ষত্রঠাকুরো নবাবং স্বাভিপ্রায়ং বিজ্ঞাপ্য"......অর্থাৎ মুঘল সাহায্য গ্রহণ করিব ইত্যাদি বলায় নবাব সৈন্যসামন্ত দিয়া

টাটা-এগ্রিকো যন্ত্রপাতির মধ্যে আছে ঃ

বেলচা ঃ চৌকো মাথা, গোল মাথা, ফায়ারিং (লম্বা ফলা) ফায়ারিং (খাটো ফলা)

কোদাল ঃ বোম্বাই, ওয়েস্ট ইণ্ডিয়া, ঈস্ট ইণ্ডিয়া, এগ্রি, সোয়ান নেক, মাইশোর, ট্যাঙ্গড় (মামুটি)

শাবল ঃ আট-কোনা

গাঁইতি ঃ বাটালি মুখ (চওড়া) ও সরু মুখ, বাটালি মুখ (সরু) এবং সরু মুখ, দুদিকে সরু মুখ

বাটার ঃ সরু ও চৌকো মুখ

হাতুড়ী ঃ দুমুখো ভারী হাতুড়ী, পাথর ভাঙ্গা হাতুড়ী

কয়লা কাটা গাঁইতি (মেশিনের জন্য)

টাটা-এগ্রিকো
দি টাটা আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানী লিমিটেডের একটি বিভাগ
হেড সেল্‌স অফিস ঃ ৪৩ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৬
ব্রাঞ্চ সেল্‌স অফিসসমূহ ঃ আমেদাবাদ . বাঙ্গালোর . বোম্বাই . কোচিন . দিল্লী . ধানবাদ . জলন্ধর সিটি . কানপুর . মাদ্রাজ . নাগপুর . সেকেন্দ্রাবাদ . বিজয়ওয়াদা

TN-5545A

কয়েকটি নতুন ধরনের পত্র-পত্রিকা

সমতট একই সঙ্গে ইংরেজী-বাংলা দু'ভাষার পত্রিকা। একই লেখার বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদ নয়, দুই ভাষায় আলাদা রচনা। এই ধরনের পত্রিকার উদ্দেশ্য একটা আছে নিশ্চয়ই, তবে তা সহজে বুঝে ওঠা মুশকিল। পিছনের মলাটে অবশ্য Raison d'etre এ জানানো হয়েছে যে, বিভিন্ন স্তরের এবং বিভিন্ন পেশার মানুষকে সমতটে আনার চেষ্টার জন্যই এই পত্রিকা এবং সমাজে টুকরো টুকরো পরিমণ্ডল তৈরী হয়ে যাওয়ার প্রবৃত্তি রোধ করে ঐক্য আনার্ট এর সাধনা। সাময়িক পত্রিকার পক্ষে উদ্দেশ্যটা একটু বেশী ভারী এবং দুর্বোধ্য, তবু এর দুঃসাহসিকতা এবং অভিনবত্ব অভিনন্দন যোগ্য।

আলোচ্য সংখ্যাটিতে কয়েকটি অভি-নিবেশ যোগ্য আলোচনা আছে, যেমন আরব ইজরায়েল দ্বন্দ্ব সম্পর্কে চারজনের সেমিনার (ইংরেজী), ভারতীয় ভাষাগুলি সম্পর্কে একটি সার্বজনীন বর্ণমালা (ইংরেজী) এবং বাংলায় আছে অতীন্দ্র-মোহন গুণের 'সিদ্ধান্ত তত্ত্বের গোড়ার কথা', পরলোকগত ডঃ বিনয় সরকারের 'বঙ্গ সংস্কৃতির লেন দেন'-এর পুনর্মুদ্রণ প্রভৃতি। প্রধান সম্পাদক, অর্ঘ্যকুমার দত্ত।

গবেষণা বিজ্ঞানের সমস্ত শাখার টেকনিক্যাল মাসিক পত্রিকা। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার প্রসারের জন্য এর আগেও অনেক চেষ্টা ও ব্যর্থতার দৃষ্টান্ত দেখা গেছে, তবুও নতুন প্রচেষ্টার মূল্য কমে যায়নি। জগদীশ বসু কিংবা সত্যেন বোসের মত বিজ্ঞানীরা যেমন স্বচ্ছন্দ-সুন্দর বাংলায় নানা রচনা লিখেছেন, তেমনি আবার অনেক বিজ্ঞানের অধ্যাপক বা গবেষক বাংলায় দু'চার লাইন লিখতে গেলে কলম ভেঙে ফেলেন। অথচ আমরা জানি মাতৃভাষায় যিনি স্বীয় বক্তব্য গুছিয়ে লিখতে পারেন না, তার জ্ঞান সম্পূর্ণ নয়। এই পত্রিকাটির রচনার মান ও পরিচ্ছন্নতা আকর্ষণীয়। সম্পাদক আশিস সিংহ।

নিম-সাহিত্য একটি পাক্ষিক পত্রিকা, বেরুচ্ছে দুর্গাপুর থেকে। এঁদের মটো, 'না সাহিত্য অল্প সাহিত্য তিক্ত বিরক্ত সাহিত্য'। প্রথম সংখ্যায় আছে একটি 'গররাজী গল্প' 'হরাইজন্টাল কবিতা', (ক্ষিপ্ত টালমাটাল যুক্তিহীন শান্ত উদার বিভ্রান্ত যুবক যুবতীদের নিয়ে 'নিম উপন্যাস' 'তিক্ত বিরক্ত গল্প' 'না-গল্প, 'আল্প-গল্প' না প্রবন্ধ 'না-আলোচনা'। সাহিত্যে কোনো কিছুই চূড়ান্ত নয়, যে-কোনো নতুন রূপ প্রয়াসই দেখতে ভালো লাগে। রচনাগুলি বেশ তেজী ও ঝকঝকে। এঁদের কয়েকটি স্লোগান এইরকম : "জীবনের কোনো ধর্ম নেই, যা কিছু স্রেফ ধাঁ ধাঁ"। "মস্তিষ্ক ও হৃদয় বিসর্জন দিন এবং নারী ফুল চাঁদ ইত্যাদি—" এবং "লেখক হওয়ার বাসনা জাগা মাত্রই আত্মহত্যা করুন।" বাঃ চমৎকার! সম্পাদক সুধাংশু সেন ও বিমান চট্টোপাধ্যায়।

কলিকাতার বাইরে, বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে কবিতার পত্রিকা প্রকাশের বিরাম নেই। এবং সুখের বিষয়, ক্রমেই এই সব পত্রিকার রুচি ও মানের উন্নতি হচ্ছে। আশা করি, সাহিত্যে কলকাতার মাথাভারী কেন্দ্র অচিরে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে যাবে, এবং বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দেখা দেবে সাহিত্যের নতুন ঐশ্বর্য।

জব্বলপুরে বাংলা ছাপার কোনো প্রেস নেই, সেখান থেকেও বেরিয়েছে পত্রিকা 'সাতপুরা'—এলাহাবাদ থেকে ছাপানো—এতেই জব্বলপুরের বাঙালীদের সাহিত্য-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম সংখ্যায় মুখবন্ধ হিসেবে এঁরা লিখেছেন "আমরা তৃষ্ণার্ত। কিন্তু চাতক হয়ে আছি সেই চেরাপুঞ্জির দিকে চক্ষুপাত করে। এ আর সহ্য হচ্ছে না। জল চাই—এক্ষুনি। চেরাপুঞ্জি অনেক দূরে। কাজেই এ পার্বত্য প্রদেশেও খুঁড়তে হবে জলাধার। প্রয়োজনে সব হয়। আমাদের প্রয়োজনের গভীরতাই মেটাবে আমাদের তৃষ্ণা।" সম্পাদক, শ্যামল মুখোপাধ্যায়।

কৃষ্ণনগর থেকে বেরিয়েছে **অনিকেত**। বিভিন্ন সংখ্যায় বিভিন্ন জন সম্পাদনার ভার নিয়েছে, প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক শিবাজী রায়। এঁরা বলছেন, "কবিতার প্রচলিত ব্যবস্থাপনার বিভ্রম থেকে দৃষ্টি ফেরান। কবিতা পড়ুন আরও কবিতা। কালো কবিতা নয়, সগর্বে বেঁচে থাকার কবিতা।"

চিত্তরঞ্জন, বর্ধমান থেকে বেরিয়েছে **পরবাস**। সম্পাদক অরুণকুমার চট্টো-পাধ্যায়। সুমুদ্রিত, সুদৃশ্য পত্রিকা, কবিতা ও গল্প ছাড়াও স্থান পেয়েছে কলকাতার বাইরে যে-সব এলাকায় নাট্য আন্দোলন হচ্ছে সেই সম্পর্কে আলোচনা। এঁদের সম্পাদকীয় বক্তব্য : দেবতা ভেবে যাকে মাথায় করে উদ্বাহু হই, ইতিহাস তাকে ধুলোয় ছুঁড়ে দিতেও পারে। অবজ্ঞায় আজ যাকে দূরে ঠেলে দিই, ভবিষ্যৎ তারই গলায় দিগ্বিজয়ী তাজ পরিয়ে দিতেও পারে। তবে ভুল করা কেন, আর বিভ্রম কিসের?"

পুরুলিয়া থেকে বেরিয়েছে **কেতকী**, সম্পাদক মোহিনীমোহন গাঙ্গুলি। উৎসাহের অভাবে গ্রামের যে-সমস্ত প্রতিভা অকালে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এরা সেই সম্পর্কে সচেতন।

কবিতার দৈনিক সাপ্তাহিকের পর, এবার আমাদের হাতে এসেছে 'মাসিক বাংলা কবিতা' ও 'দ্বিমাসিক বাংলা কবিতা'। **'মাসিক বাংলা কবিতা'** বেরুচ্ছে কলকাতা থেকে, সম্পাদক সুব্রত রুদ্র ও অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের দ্বিতীয় সংখ্যায় কোনো সম্পাদকীয় বক্তব্য দেখতে পেলাম না, তবে কয়েকটি কবিতা চমৎকার।

"দ্বিমাসিক বাংলা কবিতা" বেরুচ্ছে ভাটপাড়া থেকে, সম্পাদক উমাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁরা বলছেন, "এটাই সবচেয়ে দুঃখের যে খুশী মনে নতুনকে যৎসামান্য স্বাগত জানাতেও অনেকের অনীহা; বা চাপে পড়ে মৌখিক স্বীকৃতি দান করেই ক্ষান্ত হন।...বাধাকে খুব একটা গুরুত্ব না দিয়ে স্বীয় কার্যক্ষমতা ও পরিমিত আত্মবিশ্বাসে আস্থাশীল হয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।"

'কবিতাবিত্ত' একটি খুব লম্বা কাগজে ছাপানো, জাপানী পাখার মতন খুলে যায়। সম্পাদক কল্যাণশঙ্কর সেনগুপ্ত। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য : 'তবে দুঃখের কথা, এই সোরগোলের মওকায় কবিতা নিয়ে নোংরামির বীজও ধীরে ধীরে কবিতার জগতে অঙ্কুরিত হতে চলেছে। বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর সঙ্কীর্ণতা বাংলা কবিতায় সুরুচি ও মৌলিকতার পরিপন্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে।......কবিতাবিত্ত এগিয়ে এসেছে নতুন সংকল্প নিয়ে।"

ধান সিঁড়িও কবিতা গল্পের লিটল ম্যাগাজিন। সম্পাদক সুভাষরঞ্জন বসু। এই সংখ্যায় পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

রাজকীয় আকারে বেরিয়েছে আর একটি নতুন কবিতার পত্রিকা **রাজধানী**, সম্পাদক নিশিনাথ সেন। কবিদের নামের তালিকায় চেনা অল্প-চেনা প্রায় সবাইকেই খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। মুদ্রণ ও সাজ-সজ্জা যথেষ্ট রুচিশীল, কিন্তু কোনো সম্পাদকীয় বক্তব্য নেই। অনেকগুলো পূর্ব-বঙ্গের কবিতা স্থান পেয়েছে, যা অত্যন্ত টাটকা স্বাদের।

সনাতন পাঠক

গিরিশচন্দ্র : নাটক ও আলোচনা

গিরিশ রচনাবলী। প্রথম খণ্ড। ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় ও ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য। সাহিত্য সংসদ। ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলি-৯। কুড়ি টাকা।

মূল্যবান বাংলা গ্রন্থ প্রকাশনায় সাহিত্য সংসদ একটি স্বতন্ত্র ঐতিহ্যের অধিকারী। আমাদের সাহিত্যে যে রচনাগুলি ক্লাসিক পর্যায়ের মর্যাদা লাভ করেছে বা ঐতিহাসিক কারণে যে লেখকবৃন্দ বিশেষ সম্মানের অধিকারী তার সঙ্গে বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেরই পরিচয় আছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই পরিচয় আংশিক; নির্দিষ্ট তথ্যের অভাবে কিছুটা-বা অস্পষ্ট। স্বাভাবিক কারণেই জনপ্রিয় রচনাগুলির সঙ্গে পাঠকের পরিচয় অব্যাহত থাকে। অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত গ্রন্থগুলি কালক্রমে লুপ্ত হয়ে যায়। সব ক্ষেত্রেই যে এই অপ্রচলিত লেখাগুলির রচনামূল্য খুব উচ্চাঙ্গের তা নয়। কতকগুলি হয়ত স্পষ্টতই শিল্পীর আত্মপ্রকাশের নেপথ্যচর্চামাত্র। কিন্তু যদি ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে কোন লেখকের সার্বিক মূল্যায়নের প্রয়োজন হয় তাহলে নিশ্চয়ই আপাতমূল্যহীন এই সমস্ত অল্প পরিচিত গ্রন্থগুলি এবং খণ্ড, বিক্ষিপ্ত বহু রচনারও ভূমিকা অবহেলা করা চলে না।

প্রকাশককে ধন্যবাদ, যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়েও তাঁরা সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটি পালন করেছেন। ইতিমধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, রমেশচন্দ্র বা দ্বিজেন্দ্রলালের দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য রচনাবলী-সহ সমগ্র সাহিত্যকর্মের প্রকাশ ও সম্পাদনায় তাঁরা যে সুনাম অর্জন করেছেন অধুনা গিরিশ রচনাবলীর প্রকাশ তাকে নিঃসন্দেহে আরও বাড়িয়ে তুলবে। প্রকাশক একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন যে নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের সমগ্র রচনা—নাটক, উপন্যাস, গল্প, কবিতা, গান, স্বরলিপি, প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে যা কিছু পাওয়া সম্ভব সমস্তই সংগৃহীত হয়ে মোট চার খণ্ডে প্রকাশিত হবে। সমালোচ্য প্রথম খণ্ডটি সেই বৃহৎ পরিকল্পনার একটি অংশ মাত্র।

বর্তমান গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে গিরিশচন্দ্রের একুশটি নাটক ও সাতটি গদ্য রচনা। মঞ্চসাফল্যে বিখ্যাত নাটকগুলির মধ্যে এখানে স্থান পেয়েছে সীতার বনবাস, নিমাই সন্ন্যাস, জনা, পাণ্ডব গৌরব, সিরাজদ্দৌলা, বলিদান প্রভৃতি। গ্রন্থশেষে মুদ্রিত গদ্য-রচনাগুলি সাধারণ পাঠকের কাছে অপরিচিত। অথচ এই দুষ্প্রাপ্য লেখাগুলি পড়লে যে কোন পাঠক উপলব্ধি করবেন নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের মানসিকতা বিচারে এগুলির মূল্য কতখানি। বাংলাদেশের দর্শক, মঞ্চ, নট ও নাট্যকার এবং সর্বোপরি লেখক হিসাবে গিরিশচন্দ্রের স্বপ্ন, সীমাবদ্ধতা ও অতৃপ্তির অন্তরঙ্গ পরিচয় বিধৃত এই পর্যায়ের 'নটের আবেদন', 'বর্তমান রংগভূমি' বা 'কাব্য ও দৃশ্য' প্রভৃতি রচনাগুলির মধ্যে।

এ ছাড়াও গিরিশচর্চার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অথচ এ পর্যন্ত সমগ্রভাবে অপ্রকাশিত দুটি মূল্যবান তালিকা সন্নিবেশ এ গ্রন্থের অন্যতম আকর্ষণ। একটি তালিকায় নির্দেশিত ইংরাজী ও বাংলা তারিখ সহ গিরিশচন্দ্রের প্রতিটি নাটকের প্রথম অভিনয়ের দিন, স্থান এবং প্রকাশের সময়। অপর তালিকায় সূচিত বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের যোগাযোগের কালানুক্রমিক বিবরণ। গিরিশচন্দ্র, দানিবাবু, অর্ধেন্দুশেখর ও বিনোদিনী দাসীর কয়েকখানি দুর্লভ আলোকচিত্রের জন্যও সংকলনটির মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ্রন্থটি সম্পাদনার দায়িত্ব প্রধানত পালন করেছেন অধ্যাপক ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য। প্রথম সম্পাদক অধ্যাপক ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায়ের অকাল-মৃত্যুর পর সংসদ এই দায়িত্ব-পূর্ণ পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য অধ্যাপক ভট্টাচার্যকে আহ্বান করেন। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, ডঃ ভট্টাচার্য সেই দুরূহ দায়িত্ব পালনে সফলকাম হয়েছেন। উপরন্তু তিনি এই জাতীয় সংকলনের জন্য প্রয়োজনীয় নিষ্ঠা, শ্রম ও ইতিহাস চেতনার প্রশংসনীয় পরিচয় দিয়েছেন। গিরিশচন্দ্রের জীবন-কাহিনী ও সাহিত্য-সাধনার সুদীর্ঘ আলোচনায় তিনি প্রাসঙ্গিক তথ্যের যে বিপুল সমাবেশ ঘটিয়েছেন তাও বিস্ময়কর। সম্পাদক তাঁর আলোচনায় তৎকালীন অভিনেতা, অভিনেত্রী, মঞ্চ ও নাট্যাভিনয়ের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে উদ্ধার করেছেন একাল ও সেকালের সম্পাদক, সাহিত্যিক, নট ও নাট্যকারদের অজস্র মন্তব্য। লক্ষণীয় এই সম্পূর্ণ তথ্য-ভিত্তিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি গিরিশচন্দ্রের একটি সামগ্রিক মূল্যায়নে ব্রতী। বস্তুত বহু আলোচিত নাট্যকার হওয়া সত্ত্বেও গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে এখনো সমালোচক মহলে পরস্পরবিরোধী মতের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। একদলের দৃষ্টিতে তিনি বাংলা মঞ্চ ও নাটকলার বিবর্ধনে শেকসপীয়র ও গ্যারিকের সমতুল। আবার কারো বিচারে তিনি নিতান্তই জনরুচির সেবক, ভক্তি, রস ও মেলোড্রামার প্লাবনে নিমজ্জিত নাট্যকার। তাঁর অজস্র রচনা প্রকৃতপক্ষে বাংলা মঞ্চের অগ্রগতি না অধোগতির কারণ—এমন একটি প্রশ্নও প্রশ্রয় পেয়ে থাকে কারো কারো কাছে। এই প্রান্তিক ধারণাগুলির মধ্যবর্তী অপর একটি মতের বিচারে গিরিশচন্দ্রের নাটক উনিশ শতকের শেষ পর্বের 'হিন্দু পুনরভ্যুত্থান' এবং বিশ শতকের প্রথম পর্বের জ্বলন্ত দেশ প্রেমের ঐতিহাসিক আলেখ্য। সম্পাদক পূর্বসূরীদের প্রায় প্রতিটি উল্লেখযোগ্য মতামতকে উদ্ধার করে তার সারবত্তা বিচার করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি নিজে গিরিশচন্দ্রকে বিচার করেছেন প্রধানত একজন সফল প্লে-রাইট হিসাবে। এই দৃষ্টিভঙ্গির সূত্রেই তিনি গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে অনেক ভুল বোঝাবুঝির সমাধান করতে পেরেছেন। বার্নার্ড শ'র একটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য উদ্ধার করে তিনি

প্লে-রাইট ও ড্রামাটিস্ট-এর মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্যটিও খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন। আসলে নিছক উৎকর্ষের চিন্তাকে প্রাধান্য না দিয়ে দর্শক, নটনটী ও মালিকের স্বার্থকে মনে রেখে গিরিশচন্দ্রকে নাটক লিখতে হয়েছে। অধ্যাপক ভট্টাচার্যের বিচারে তাই 'গিরিশচন্দ্র যদি প্লে-রাইটরূপে জীবন অতিবাহিত না করতেন তাহলে হয়ত তাঁর নাট্যরচনার সংখ্যা কমত কিন্তু নাটকের গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেত।'

কিন্তু সত্যিই কোন উপায় ছিল না। নবীন পেশাদারী বাংলা মঞ্চের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা মেটাবার জন্য গিরিশচন্দ্রের একক প্রতিভা মুহূর্তের জন্যও স্ব-স্থ হবার অবকাশ পায়নি। সম্পাদক সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে গিরিশচন্দ্রের এই ঐতিহাসিক ভূমিকাটিকে বিশ্বস্তভাবে চিত্রিত করেছেন। স্ব-মত প্রতিষ্ঠায় আবেগ ও অসহিষ্ণুতা বর্জন করে গিরিশ-চন্দ্রের যথাযোগ্য স্থান নির্দেশকল্পে তিনি এই সমীচীন সিদ্ধান্তে উপনীত : গিরিশ-চন্দ্র অলোকসামান্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না, সে দাবি তিনি নিজেও কখনো করেননি। তাঁর আকাঙ্ক্ষা অতি বিনীত—রঙ্গভূমি ভালোবাসি/হৃদে সাধ রাশি রাশি/আশার নেশায় করি জীবন যাপন॥ সেই নেশায় তিনি জীবন যাপন করেছেন, সেখানে কোন ফাঁকি নেই, আন্তরিকতার অভাব নেই। তাই যতদিন বাংলা নাটক ও নাট্যজগৎ থাকবে ততদিন তাঁর নাম বেঁচে থাকবে এ ঘোষণা স্বার্থহীন কণ্ঠে উচ্চারণ-যোগ্য। [২৮৫/৬৯]

বিবিধ

প্রতিবর্ণীকরণে নূতন পদ্ধতি। সৈয়দ আনিসুল ইসলাম। ১ মার্কুইস লেন, কলকাতা-১৬। মূল্য ৬২ পয়সা।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার উদ্দেশ্য শুদ্ধভাবে ফারসী ও আরবী শব্দের উচ্চারণ বাংলা ভাষার বর্ণমালা সাহায্যে প্রকাশ করা। প্রতিবর্ণীকরণে উৎসাহীর পক্ষে পুস্তিকাটি প্রয়োজনীয়। সাধারণভাবে এ জাতীয় পুস্তকের কিঞ্চিৎ মূল্যও আছে। লেখক যথেষ্ট পরিশ্রম সহকারে তাঁর কর্ম সম্পাদন করেছেন। আশা করি, উৎসাহীরা পুস্তিকাটি সংগ্রহ করতে বিলম্ব করবেন না।

প্রাপ্তি স্বীকার

উপনিবেশবাদ থেকে সাম্যবাদ। হোয়াং ভ্যান চি। অনুবাদ : কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। এশিয়া পাবলিশিং, কলকাতা-বারো। দাম : পাঁচ টাকা।

আজিকার উত্তর ভিয়েতনাম। সম্পাদনা : পি জে হনি। অনুবাদ : দীপক চৌধুরী। এশিয়া পাবলিশিং, কলকাতা-বারো। দাম : পাঁচ টাকা।

আনন্দ ও পঁচিশতলা বাড়ি। কল্লোল মজুমদার। কবিতা প্রকাশ ভবন : ৭ নন্দী স্ট্রীট, কলিকাতা-২৯। মূল্য ২·০০।

হোমিওপ্যাথিক রন্ধনকণা। ডাঃ খগেন্দ্রনাথ বসু। সুন্দর হোমিও সদন : ১১৩ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১। মূল্য ৩·২৫।

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন। ভ্লাদিমির মায়াকোভস্কি। অনুবাদ : সিদ্ধেশ্বর সেন। দিলীপ মজুমদার : ডি-১, ১৫ বেচু-লাল রোড, কলিকাতা-১৪।

ভালবাসার দান। নির্মল আচার্য। সুরেশ প্রকাশনী : ৫৭ দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ৩·০০।

গণেশ সেনের কবিতা। বিশ্ববাণীর প্রকাশনী : ৪৪এ ক্লাইভ কলোনী, কলিকাতা-২৮। মূল্য ৩·০০।

দয়িতা। নরেন্দ্রনাথ মিত্র। কথা ও কাহিনী : ১৩ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৬·০০।

নীল সাগরের তীরে। এস এম সিররাজুল ইসলাম। বুল-বুল প্রকাশনী : ১৩/৩ কবিন লেন, কলিকাতা-১৬। মূল্য ২·০০।

সরল সত্য। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড : ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য ৫·০০।

গান্ধীজির শিক্ষা। শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য। গান্ধী শতাব্দী প্রকাশন : ১৬৬ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-৭। মূল্য ০·৫০।

খাদি ও চরখার কথা। শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত। গান্ধী শতাব্দী প্রকাশন : ১৬৬ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-৭। মূল্য ০·৫০।

শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা। শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী। চিন্ময়ী স্মৃতি : ২২ এম আই জি, সোদপুর, ২৪ পরগণা। মূল্য ২·০০।

বেদস্তুতি। শ্রীকালীপদ চক্রবর্তী। শ্রীসাবিত্রী দেবী : ৫সি কাটুয়াঘাটি লেন, কলিকাতা-২৫। মূল্য ৩·০০।

একটি শিশির বিন্দু। সত্যব্রত রায়। কণ্ঠস্বর : ১৩/২ বিধান সরণি, কলিকাতা-৪। মূল্য ৩·০০।

হাওয়া দেয়। অরুণ ভট্টাচার্য/বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বাঙলা কবিতা প্রকাশনী : ১৮ পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা-২০। মূল্য ১·০০।

বুকের কাছে কৈফিয়ৎ। তরুণ সেন। বিচিত্রা প্রকাশনী : ৭ নবীন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য ২·০০।

অগ্নিকণা। শ্রীস্বরাজবন্ধু চক্রবর্তী। এস বি প্রকাশনী : রবীন্দ্র পল্লী, কৃষ্ণপুর, ২৪ পরগণা। মূল্য ২·০০।

নীল আকাশের নীচে। জগদীশ দাশ। সাহিত্যব্রতী : ১১ই সিমলাইপাড়া লেন, কলিকাতা-২। মূল্য ২·০০।

রিপু। সঞ্জয় ভট্টাচার্য। চতুষ্পর্ণী প্রকাশনী : ৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য ৪·০০।

প্রতিবিম্ব। আশীষ বসু। বিবেক ভারতী : ৫৭ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য ২·৫০।

Patraput : Rabindranath Tagore. Translated by Sisir Chattopadhayaya. Pathikrit Prakashani: 11A Navaratna Lane, Calcutta-4. Price Rs. 6.00.

কলকাতার যীশু। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। অরুণা প্রকাশনী : ৭ যুগলকিশোর দাস লেন, কলিকাতা-৬। মূল্য ৩·৫০।

প্রবন্ধ সঞ্চয়ন। বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়। আলফা পাবলিশিং কনসার্ন : ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য ১০·০০।

রূপনারাণের কূলে। গোপাল হালদার। মনীষা গ্রন্থালয় : বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৬·০০।

Studies in Western Influence on 19th Century Bengali Poetry by Harendra Mohon Das Gupta. Semushi : 42-1A Sarat Bose Road, Calcutta-20 : Price Rs. 15.00.

দুই কবি। প্রমথনাথ সেন। ইউনিভার্সাল বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স : ৮/২ কিরণশঙ্কর রায় রোড, কলিকাতা-১। মূল্য ১০·০০।

মালয়েশিয়া। চুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায়। মুখোসাহিত্য মন্দির : গ্রাম, চকদহ; পোঃ পূর্ব পাটুলিয়ারী, ২৪ পরগণা। মূল্য ১·০০।

আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। মুজফ্‌ফর আহমদ। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিমিটেড : ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ১৬·০০।

নতুন ক্রাইম ছবি "কুহেলী" (পরিচালনাঃ অভিমন্যু) তৈরি হচ্ছে—ছবিতে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায় ও বিশ্বজিৎ

ফটো—দেশ

॥ চিত্র-সমালোচনা ॥

মন কী আঁখে

(পুষ্পা পিকচার্স)

হিন্দী চিত্রের পরিচালকদের ক্ষমতাই আলাদা। তাঁরা যখন মানুষের মহত্ত্ব দেখাবেন তখন তা দেবমাহাত্ম্যকেও ছাড়িয়ে যাবে। মানুষের নীচতা যখন তাঁরা দেখাতে শুরু করবেন তখন দর্শকের মন শিউরে উঠবে। "মন কী আঁখে" ছবিতে দেখানো হয়েছে পয়সার 'লালচ' মানুষকে কত নীচে নামাতে পারে। যাকে উপলক্ষ করে দেখানো তিনি এক শিক্ষিত, অভিজাত ঘরের বিধবা মহিলা, তাঁর দুই ছেলে। ছেলেদের বিয়ের ব্যাপারেই জননীর (ললিতা পাওয়ার) অর্থলালসার প্রকাশ। বড় ছেলের (সুজিতকুমার) বিয়ে তিনি মনের মত পাত্রীর (ফরিয়াল) সঙ্গেই দিয়েছেন। বউয়ের বড়লোক পিতার সম্পত্তির উপরই শাশুড়ীর শ্যেনদৃষ্টি।

নাট্যকাহিনীর সূত্রপাত ছোট ছেলের (ধর্মেন্দ্র) প্রেম করে গরীবের মেয়েকে (ওয়াহীদা রেহমান) বিয়ে করা নিয়ে। পেটের ছেলের প্রতি মায়ের নির্দয়তা কী পরিমাণ প্রকাশ পেতে পারে, পরিচালক রঘুনাথ ঝালানি সাধ্যমত তা দেখিয়েছেন। ললিতা পাওয়ার একাধিকবার পুত্রবধূ ওয়াহীদা রেহমানকে মেরেছেন। আরও যে-সব অত্যাচার করেছেন তার ফিরিস্তি দিয়ে লাভ নেই। এক কথায়, মায়ের চরিত্রটি রীতিমত ভিলেনের মত। "মন কী আঁখে" তথা মনের দৃষ্টি খোলার আগে তাঁকেও শাস্তি পেতে হয়েছে। বড় ছেলেই পরে মাকে অপমান করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এর আগে ছোট ছেলে ও তার বউকে মা বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলেন।

ছবিটিতে হরেক রকম ব্যাপার আছে। ক্রাইমও বাদ যায়নি। নাইট ক্লাবও না। এইসব দেখানো হয়েছে বড় বউ অর্থাৎ ফরিয়ালকে কেন্দ্র করে। ফরিয়ালের "মন কী আঁখে" খুলেছে অনেক পরে, বদমাশদের পাল্লায় পড়ে। ধর্মেন্দ্র যথাসময়ে শয়তানদের শায়েস্তা করেছে, তার আগে ললিতা পাওয়ারেরও চোখ খুলেছে। ছবির শেষে পারিবারিক মিলন-উৎসব। ওয়াহীদা রেহমানের বাবা-মায়ের (মনোমোহন কৃষ্ণ ও লীলা চিৎনিস) দুঃখও দূর হয়েছে। লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলালের সুরারোপে শেষ মুহূর্তে ব্যাণ্ড বেজেছে। তাঁদের সুরে কিছু গান সারা ছবিতেই ছড়ানো।

টলি-টিপ্পনী

ছবি তৈরির ক্ষেত্র এই টালিগঞ্জ আজও অন্ধ বিশ্বাস ও সংস্কারের লীলাক্ষেত্র। অন্ধ সংস্কার এখানে আলোর নির্দেশ দেয়। সেই সঙ্গে নিয়মের রাজত্ব। অত অক্ষরে ছবির নাম হবে, কাহিনীতে শাখা-সিঁদুরের মহিমার কথা উচ্চগ্রামে উচ্চারিত হবে, অমুকের একটা গান থাকবে, ভূমিকালিপিতে অমুককে নিতেই হবে, ব্যস, তবেই নাকি চতুর্বর্গ লাভ। অর্থাৎ ছবি 'হিট'। ফরমুলোর ছবি 'হিট' করে না, এমন কথা একবারও বলছি না আমি। সময়ে 'হিট' করে, কখনো আবার 'ফ্লপ'ও করে। ফরমুলোর বাইরের ছবি যে আরো বেশী 'হিট' করে তার হাজার প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও কেন নিয়মের প্রতি এই আনুগত্য, কেন এত গোঁড়ামি, তার অর্থ বুঝি না। 'লাকি'-'আনলাকি' ব্যাপারটা এই শিল্পে যত, অন্যত্র বুঝি তত নয়। 'হিট' যখন করে কোন ছবি, সেই ছবির শিল্পী ও কলাকুশলী সবাই তখন 'লাকি'। 'ফ্লপ' করলেই 'আনলাকি' হয়ে গেল। একাধিক 'ফ্লপ' ছবির শিল্পীর ট্র্যাজেডি বড় মর্মান্তিক। ছবিতে কাজ পাওয়া দূরে থাক, তখন তাঁর উপস্থিতি পর্যন্ত অনেকে সহ্য করতে পারেন না।—'এই রে এলো, আজ দিনটাই খারাপ যাবে।' এমনিতর মন্তব্যও নাকি হয়ে থাকে। মর্মান্তিক হলেও সত্যি, এ হেন মন্তব্য উত্তমকুমারের মত শিল্পীরও একদা শুনতে হয়েছিল।

১৯৫০-'৫১ সাল। নতুন নায়ক উত্তমকুমারের প্রতি ভাগ্যবিধাতা তখন অপ্রসন্ন। 'কামনা', 'মর্যাদা', 'ওরে যাত্রী' পর পর 'ফ্লপ' করল। উত্তমকুমার তখন 'আনলাকি' আর্টিস্ট। আজ ভাবতেও অবাক লাগে, এমন দিনও গেছে, কোন কোন প্রযোজক নাকি ওঁর মুখের ওপর বলে দিয়েছেন, 'তুমি আবার কেন এলে জ্বালাতে, এ লাইন তোমার জন্যে নয়, মানে মানে বিদেয় হও দিকি।' ট্র্যাজেডির এখানেই শেষ নয়। কোন একটা ছবিতে সই

'দেবী'তে অরুণা ইরানি

করতে যাবেন উত্তমকুমার ঠিক সেই সময়ে প্রযোজক এসে হাত থেকে কলম কেড়ে নিয়েছেন। পরিচালককে বলে দিয়েছেন, 'না, না একে চলবে না, 'আনলাকি' আর্টিস্ট।' ভাবুন অবস্থাটা, আজ এই উত্তমকুমারই নাকি বাংলা ছবির সবচেয়ে 'লাকি' আর্টিস্ট।

এ তো গেল 'লাকি'-'আনলাকি' শিল্পীর কথা। ছবির নামকরণে 'লাকি'-'আনলাকি' ব্যাপারটা আরো মজার। কোন ছবি 'ফ্লপ' করলে সেই ছবির নামের আদ্যক্ষরটা পর্যন্ত অনেক প্রযোজক নিজের ছবির নামে ব্যবহার করতে চান না। ইতিপূর্বে এই পত্রিকার কোন এক সংখ্যায় এই নিয়ে আলোচনাও করেছি। অনেক প্রযোজক আবার 'হিট' ছবির শুরুর দিনটাকে পর্যন্ত 'লাকি ডেট' মনে করেন। যথাঃ 'মণিহার' বলে একটা ছবি খুব 'হিট' হয়েছিল। ১২ ফেব্রুয়ারি শুরু হয়েছিল ছবিটির শুটিং। অতএব ১২ ফেব্রুয়ারি নাকি এখন নতুন ছবির শুটিং শুরু করার পক্ষে শুভ দিন। বিশ্বাস করুন, আর নাই করুন, শুধুমাত্র এই সংস্কারের ওপর ভিত্তি করেই গত ১২ ফেব্রুয়ারি শুরু হয়েছে সুচিত্রা সেনের নতুন ছবি 'নবরাগ'-এর শুটিং।

—বিচক্ষ

বিশ্বরূপায় 'বেগম মেরী বিশ্বাস'-এ সবিতাব্রত দত্ত, কণিকা মজুমদার ও সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ফটো—দেশ

নাট্য-সমালোচনা

বেগম মেরী বিশ্বাস

(বিশ্বরূপা)

বিশ্বরূপার নতুন নাটক কেমন হয়েছে সেটা পরের কথা, বড় কথা এই যে বিমল মিত্রের ঐতিহাসিক রসের বৃহৎ উপন্যাস "বেগম মেরী বিশ্বাস"-এর নাট্যরূপ মঞ্চস্থ হল। এই কাহিনীর ভিত্তিতে নাটক প্রযোজনায় যে সাহস ও সুপরিকল্পনার প্রয়োজন নাট্যকার-পরিচালক রাসবিহারী সরকার তার প্রমাণ দিয়েছেন। তাই শুরুতেই শ্রীসরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে রাখি।

"বেগম মেরী বিশ্বাস"-এর নাট্যরূপ দেওয়া খুব সহজ কাজ ছিল না। কাহিনীতে অনেক ঘটনা, অনেক চরিত্র। একদিকে ইতিহাসের পটভূমি, অপরদিকে 'প্যাসোনাল ড্রামা'। তিন ঘণ্টার নাটকে এই দুটিই কিন্তু মোটামুটি একটা সংহত রূপ পেয়েছে। সিরাজের করুণ কাহিনী—বিশ্বাসঘাতক-বেষ্টিত সিরাজের মর্মযাতনা, পলাশিতে পরাজয়, মহম্মদী বেগের ছোরায় সিরাজ-নিধন প্রভৃতি অনেক ঘটনাই নাট্য-সংবেদনের ভিতর দিয়ে উপস্থিত করা হয়েছে। সিরাজের পাশে মরালী ওরফে মরিয়মকে কোন কোন সময়ে বিখ্যাত নাটকের বিখ্যাত চরিত্র আলেয়ার মত মনে হলেও ওই চরিত্রে কিছু বৈশিষ্ট্যও আছে। মরিয়ম বাংলাদেশকে ভালবেসে বাংলার নবাবকে ভালবেসে ফেললেও তার প্রেমাস্পদ অন্য আর একজন—যার নাম কান্ত সরকার। কান্ত সরকার উত্তরীয়ের মত নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে মরিয়ম বা মরালীকে প্রাণদণ্ড থেকে বাঁচিয়েছে। এই আত্মদানের মধ্যেই কান্তর প্রেম সার্থক। কান্ত জাগতিক অর্থে মরালীকে পায়নি। মরালীকেই তার বিয়ে করবার কথা ছিল। কিন্তু বিয়ের আসরে বরের বেশে কান্তের আসতে দেরি হওয়ায় মরালীর যখন লগ্নভ্রষ্টা হবার উপক্রম, তখন বাউণ্ডুলে, আপনভোলা, উদ্ধবদাসকে বর হিসাবে ধরে নিয়ে আসা হয়।

ব্যক্তিগত নাটক এবং ইতিহাসের রস তো নাটকে আছেই। উপরি পাওনা হিসাবে রয়েছে অনেক গান। মিউজিক্যাল ড্রামার মতই এই নাটক। গান নাটকের পরিপূরক। উদ্ধবদাস গান গেয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। দাশু রায়ের পাঁচালি এবং পুরনো আমলের আরও কিছু সুন্দর সুন্দর গান উদ্ধবদাসের কণ্ঠে শুনতে পাবেন দর্শকরা। গানগুলির সুরও চমৎকার দিয়েছেন অনিল বাগচি। এবং গানগুলি দরাজ গলায় গেয়েছেন সবিতাব্রত দত্ত। গানের গুণে "বেগম মেরী বিশ্বাস"-এর আকর্ষণ মঞ্চে যে আরও অনেক বেড়েছে তা বলাই বাহুল্য।

আবার নাটকের কথায় আসি। উদ্ধবদাসও মরালীকে পায়নি। মরালী মনের মত নয় বলে বিয়ের রাত্রেই মরালী পালিয়েছে। উদ্ধবের অন্তরে ভাবের আলোড়ন জাগিয়ে দিয়ে গেছে মরালী। মরালী চলে যাবার পর উদ্ধবের মুখে ভক্তিভাবের গান (গানগুলি যদিও নির্দিষ্ট হয়ে শোনার মত), কথায় সহজিয়া মধুর রসের সুর। অর্থাৎ গানের বিচারে তাকে শুধুই সর্বত্যাগী ঈশ্বরসাধক মনে হয়, আবার কথা বলার সময় তার সহজ, রসিক রূপ। এই সামান্য অসঙ্গতি সত্ত্বেও উদ্ধব মোটামুটি একটা মিস্টিক চরিত্র বা সহজিয়া প্রেমের সাধক হয়ে উঠতে পেরেছে। সে-ই মরালীর নাম দিয়েছে "বেগম মেরী বিশ্বাস"। মরালী ভালবেসেছে পর-পুরুষকে, কান্তকে। কান্তর আত্মদানে প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেয়েছে মরালী। সেটা সইতে না পেরে মরালী নাটকের শেষে অপ্রকৃতিস্থ। প্রসঙ্গত বলি, নাটকের শেষ দৃশ্যটি অসামান্য রসব্যঞ্জনায় এবং দৃশ্যগঠনে।

মরালীর ট্র্যাজেডি আরও গভীরভাবে দর্শকের মনকে আলোড়িত করতে পারত। গভীর প্রেমের সার্থকতার জন্য কান্তর যে এত বড় একটা আত্মত্যাগ তার প্রস্তুতি নাটকে অল্প। বড় প্রেম দেখবার সুযোগ হয়নি বলে তার ট্র্যাজেডি যত বড়ই হোক সেটা দর্শকের মনকে তেমন নাড়া দিতে পারেনি। আসলে কাহিনীর পটভূমি বিরাট, ঘটনা ও চরিত্র অনেক। তাই এই কাহিনীর নাট্যরূপে স্বভাবতই কিছু কিছু ঘটনা ও চরিত্র উপেক্ষিত রয়ে গেছে। আবার অনাবশ্যক বস্তুও (ক্লাইভের মুন্সির ভাঁড়ামি) বেশি পরিমাণে দর্শককে সহ্য করতে হয়েছে। দ্বিতীয় অঙ্কের শুরুতে ভাঁড়ামি কাণ্ড রীতিমত দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর। অন্যদিকে ছোটমশাইয়ের বাড়িতে যে নাটকের সম্ভাবনা ছিল তাও ভগ্নাংশে পরিণত। তবুও একটি সুগ্রথিত নাটক আমরা পেয়েছি, তাতে কোন চরিত্রে

'বেগম মেরী বিশ্বাস' : শেখর চট্টোপাধ্যায়, জয়শ্রী সেন ও নিমু ভৌমিক ফটো—দেশ

উপাখ্যান অসম্পূর্ণ থাকলেও তা সামগ্রিক নাট্যরসবন্ধনে অত্যাবশ্যক এবং নাট্য-পরিণতি সাধনে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

নাট্যপরিচালনার গুণের কথা আগেও কিছু বলেছি, আরও কিছু বলবার আছে। নাট্যপরিচালক শ্রীসরকার বিশেষ কল্পনার সঙ্গে কাহিনীর পিরিয়ড-এর ছাপটি নাটকে নিয়ে এসেছেন। সেটা বেশভূষায় তো দেখা গেছেই, তার চেয়েও বেশি পরিস্ফুট পরিবেশীয় ঘটনা উপস্থাপনে। সিরাজের শিবিরে সাধক রামপ্রসাদের গান ভেসে আসার ঘটনাটি চমৎকার। রামপ্রসাদকে ডাকিয়ে আনলেন সিরাজ, তাঁর গান শুনলেন। এই গানের প্রভাব, গানের

কথা সিরাজের মানসিকতা ও অন্তরভাবনাকে পরেও আমাদের কাছে উজ্জ্বল করে তুলেছে। পরিচালকের এই কল্পনাশক্তির বলে রস যেমন জমেছে তেমনি একটি যুগের পরিচয়ও প্রকাশ পেয়েছে। তাছাড়া, প্রয়োগকলার ক্ষেত্রেও পরিচালকের নৈপুণ্যের পরিচয় মেলে। ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ, নদীতে বজরা চলার আওয়াজ প্রভৃতির মাধ্যমে নাটকে 'অ্যাকশন' এবং বিশ্বাসযোগ্য পরিবেশ রচনার কৃতিত্ব দেখা গেছে।

এই নাটকের মঞ্চসজ্জাও অকুণ্ঠ প্রশংসার যোগ্য। সুরেশ দত্ত নিখুঁতভাবে সিরাজের আমলের প্রাচীন বাংলার চেহারাটি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর মঞ্চস্থাপত্যে। নবাবের দরবার ও প্রাসাদের মণ্ডপ সত্যিই দেখবার মত। বিশেষ গবেষণার মধ্য দিয়ে যে শ্রীদত্ত তা সম্পাদন করেছেন তা বোঝা যায়। এই মঞ্চসজ্জা কাহিনীকালের পরিবেশ মূর্ত করে তুলেছে। সেই সঙ্গে সমান দক্ষতার আলোর কাজ দেখিয়েছেন তাপস সেন। নদীর উপর বজরা চলার চমৎকার দৃশ্যটি উল্লেখ করা যেতে পারে। এই দৃশ্যে আলোক-সম্পাতের অসাধারণত্ব লক্ষণীয়। দৃষ্টিবাহিত সৌন্দর্য এবং সার্বিক রস-নিষ্পত্তি—এই দুইয়ের যোগাযোগে [illegible] নিবেদন" একটি স্মরণীয় নাট্যসৃষ্টি।

শিল্পীদের সম্মিলিত সুঅভিনয় নাটকটিতে বিশেষভাবে প্রশংসার দাবি রাখে। একথা সত্য, ছোট বড় ও চরিত্রবহুল এই নাটকে কোন কোন বিশিষ্ট শিল্পী বিশেষ অভিনয়ের সুযোগ পাননি। কিন্তু যেটুকু সুযোগ তাঁরা পেয়েছেন তাতেই তাঁরা নিজেদের দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। অন্যদিকে অভিনয়-নৈপুণ্য দেখাবার সুযোগ যাঁদের তাঁরা চরিত্রচিত্রণের বিরল ক্ষমতা দেখিয়েছেন। প্রথমেই শেখর চট্টোপাধ্যায়ের নাম (ক্লাইভ) করতে হয়। তাঁর উঁচুদরের অভিনয় তাঁর, যেমন তাঁর অভিব্যক্তি তেমনি তাঁর বাচনভঙ্গী, নাটকীয় মুহূর্তে তিনি যেমন স্বচ্ছন্দ তেমনি হাল্কা মুহূর্তে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাঁর ইংরেজী বলার ধরন ও উচ্চারণ। সবিতাব্রত দত্তের উদ্ধবদাস শিল্পীর আর একটি স্মরণীয় চরিত্রসৃষ্টি। তাঁর গানের কথা আগেই বলেছি। অভিনয়েও তিনি আবেগ সঞ্চার করেছেন। সিরাজের রূপসজ্জায় সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত চরিত্রে বাঞ্ছিত ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছেন। সিরাজের মর্মজ্বালা ও ট্র্যাজেডি তাঁর অভিনয়ে সুন্দর ফুটে উঠেছে। অনুপকুমার হয়েছেন ক্লাইভের মুনশি, দর্শককে কমিক অভিনয়ে তিনি প্রচুর হাসিয়েছেন। কান্ত সরকারের রূপসজ্জায় তরুণকুমার চরিত্রটির অস্ফুট প্রেম চমৎকার প্রকাশ করেছেন।

অলিম্পিক পিকচার্স-এর হিন্দী ছবি 'দেবী' এ-সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে—ছবিতে নূতন ও সঞ্জীবকুমার

জয়শ্রী সেনের মরালীকে দর্শকরা অনেকদিন মনে রাখবেন। জয়শ্রীর মরালী অসহায়, পরে তেজস্বিনী, শেষে প্রেমিকা। সব স্তরের চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছেন শিল্পী। মহিলা শিল্পীদের সকলের অভিনয়ই ভাল, বিশেষ করে কণিকা মজুমদারের। তাঁর অভিনয়ের গুণে ছোট বউর চরিত্রের প্রতি দর্শকের মমতা ও সহানুভূতি জাগে। লীলাবতীর (করালী) দুর্গা একটি অসাধারণ চরিত্ররূপায়ণ। গীতা নাগও বড় বউয়ের ভূমিকায় ব্যক্তিত্বপূর্ণ অভিনয় করেছেন। সংগীতা কর হয়েছেন লুৎফা, তাঁর অভিনয়ও ভাল।

আগেই বলেছি, নাটকে চরিত্র অনেক। একটি বিশিষ্ট চরিত্রে (ওয়াটস) নিমু ভৌমিক বেশ সপ্রতিভ, বচনে ও ভাবপ্রকাশে। তাঁর অভিনয়ে একটি ইংরেজ চরিত্রকে খুঁজে পাওয়া যায়। গোবিন্দ গাঙ্গুলি দুটি চরিত্রে (শোভারাম ও মিরজাফর) অভিনয়-দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। একটি দৃশ্যের অভিনয়ে নির্মল ঘোষের (কাজী) টাইপ-অভিনয় দেখবার মত। অন্যান্য চরিত্রে অনুকূল দত্ত, রঞ্জন শেঠ, গোবিন্দ মুখার্জি, সমরেশ ব্যানার্জি প্রমুখ সুঅভিনয় করেছেন।

"নবরাগ" শুরু

বিজয় বসুর পরিচালনায় 'নবরাগ' ছবির শুটিং আরম্ভ হয়েছে গত সপ্তাহে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য রচিত। উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন নায়ক-নায়িকা, বিকাশ রায়, বিজন ভট্টাচার্য ও বাসবী নন্দী ছবির তিনটি বিশিষ্ট চরিত্রের শিল্পী। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

"শাস্তি"-র মুক্তি

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের চিত্ররূপ 'শাস্তি' (পরিচালনা: স্বদেশ সরকার) এ-সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, গীতা দে, দিলীপ রায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় এবং স্বর্গত প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছবির প্রধান শিল্পী। সংগীত-পরিচালনা করেছেন পবিত্র চট্টোপাধ্যায়।

সোনা বৌদি

দীনেশ চিত্রমের দ্বিতীয় ছবি 'সোনা বউদি'। গল্প অভিনেতা সুখেন দাসের। গত সপ্তাহে পীযূষ গাঙ্গুলীর পরিচালনায় ছবির চার দিনের শুটিং হয়েছে। এর পর হবে গান রেকর্ডিং। 'পান্না-হীরে-চুনী'-খ্যাত অজয় দাস ছবির সংগীতপরিচালক।

অপরাজিতা

রূপ ও বাণী-র দ্বিতীয় প্রয়াস 'অপরাজিতা' ছবির শুটিং চলছে। চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় আছেন অজিত গাঙ্গুলী। ভূমিকায় রয়েছেন শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, অনুভা ঘোষ, জহর রায়, নবাগতা মিঠু মুখার্জি ও 'নতুন পাতা' খ্যাত আরতি গাঙ্গুলী। 'গুপী গায়েন'..... খ্যাত তপেন চট্টোপাধ্যায়কেও এই ছবিতে দেখা যাবে। সঙ্গীত পরিচালক সুকুমার মিত্র।

বোম্বাই বিচিত্রা

কোন কোন ছবি প্রচণ্ড জাঁকজমকের সঙ্গে রিলিজ্ড হয়, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস জাঁকিয়ে চলে, নতুন বক্স-অফিস রেকর্ড সৃষ্টি করে, তারপর বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়। এই ধরনের অধিকাংশ ছবিই বহু লোকে দেখে, কিন্তু আলোচনা করে খুবই কম লোকে। আর এক ধরনের ছবি হয়, যে ছবিগুলি দেখে খুব কম লোকে, কিন্তু সে ছবিগুলি নিয়ে আলোচনা করে বহু লোকে। সিনেমা হাউসে সামান্য কয়েকদিনের উপস্থিতিতেই এই ধরনের ছবিগুলি দর্শকমণ্ডলে বিতর্কের সৃষ্টি করে। ছবি উঠে যায়, কিন্তু তর্ক-বিতর্ক উঠে যায় না। এইসব ছবি নিয়ে যারা দিনের পর দিন কফিহাউস গরম করে তাদের অধিকাংশই হয়ত আলোচ্য ছবি দেখেনি, তবু তারা গলার শিরা ফুলিয়ে আলোচনা-সমালোচনায় জুটে যায়।

কয়েকদিন আগে দিল্লীর কনওয়েট প্লেসের কফি হাউসে এক শীতের সন্ধ্যা গরম হচ্ছিল এমন এক আলোচনায়। আলোচনার বিষয়বস্তু যদিও সাধারণ কোন ছবি ছিল না, ছিল এক পরিচালক, তবু ছবি বাদ দিয়ে পরিচালক সম্বন্ধে আলোচনা করা যায় না বলেই হয়ত শেষ পর্যন্ত আলোচনার জালে আলোচ্য পরিচালকের ছবিগুলিও এসে পড়েছিল। আলোচনা কিছুক্ষণ চলার পরই বোঝা গেল যে, এ আলোচনা-সভার অধিকাংশ আলোচকই আলোচ্য পরিচালকের অধিকাংশ ছবিই দেখেন নি। তবু আলোচনা চলছিল। আলোচনা শুরু হয়েছে পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের 'পদ্মশ্রী' খেতাব প্রাপ্তিকে কেন্দ্র করে। "ঋত্বিক ঘটক ভায়োলেন্ট নন-ভায়োলেন্স-এর জনক মহাত্মা গান্ধীর প্রতি তাঁর কোনরকম শ্রদ্ধা নেই,—জওহরলাল নেহরুর প্রতি তাঁর কোন আস্থা নেই, তবু তাঁকে 'পদ্মশ্রী' খেতাব দেওয়া হল—তাও আবার গান্ধী শতাব্দীর বছরে!" উদ্ধত বক্তার বক্তব্যে ঝোপঝাড় হতে হল কিছুক্ষণের মধ্যেই। কয়েকজন সমবেত কণ্ঠে ঘোষণা করল যে, আলোচ্য বক্তা "সি আই এ উচ্ছিষ্ট লালিত কিলিং-ক্যাপিটালিস্ট-পার্টির কংগ্রেসের দালাল।" "ঋত্বিক ঘটক শিল্পী, ঋত্বিক ঘটক বর্তমান যুগের গণ-সংগ্রামের প্রতিনিধি। ঋত্বিক ঘটক হিপো-ক্রিট নয়।" "কিন্তু যাই বলো, ঋত্বিক ঘটক যদি সত্যি শিল্পী হন তা হলে 'পদ্মশ্রী' খেতাব প্রত্যাখ্যান করা তাঁর একান্ত কর্তব্য।" "কেন?" "কারণ, যে খেতাব স্টার সিস্টেমের পোষা—যে খেতাব রাজেন্দ্র-

'অপরাজিতা' ছবির গান রেকর্ডিংয়ে পরিচালক অজিত গাঙ্গুলি, সংগীত পরিচালক সুকুমার মিত্র ও সন্ধ্যা মুখার্জি

কুমারের মত অভিনেতাকেও দেওয়া হয়, ঋত্বিক ঘটকের মত শিল্পীর সে খেতাব গ্রহণ করা উচিত নয়।" "ব্যুরোক্রসীতে এ ধরনের ঘটনা ঘটবেই! ভুলটি ফেলে দিয়ে কালটি তুলে নাও। চোরের ওপর গোঁসা করে মাটিতে ভাত খাওয়ার কোন মানে হয় না।" "ঋত্বিক ঘটকের চেয়ে রাজেন্দ্রকুমার যে গাতর ব্যক্তি পদ্মশ্রী খেতাবের জন্য। গণতন্ত্রের যুগে যারাই পপুলার তারাই যোগ্য। তোমাদের ঋত্বিক ঘটককে ক'জন চেনে হে? কিন্তু রাজেন্দ্রকুমার? ভারতের যে-কোন প্রান্তে চলে যাও, রাজেন্দ্রকুমার, রাজ কাপুর, দিলীপকুমারকে দেশের শতকরা নব্বই জন লোক চেনে।" "পপুলারিটিই যদি যোগ্যতার একমাত্র মান হয়...." এমন সময় একজন বিনয়ের সঙ্গে বললেন, "কিছু মনে করবেন না, তখন থেকে আপনারা ঋত্বিক ঘটকের 'পদ্মশ্রী' খেতাব পাওয়ার যোগ্যতা নিয়ে আলোচনা করছেন, কেউ ঋত্বিক ঘটককে শিল্পী বলছেন, কেউ তাঁকে "ভায়োলেণ্ট", কেউ বলছেন পাগল। আপনাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনারা সবাই ঋত্বিকবাবুকে ব্যক্তিগতভাবে চেনেন, এবং তাঁর ব্যক্তিসত্তা এবং শিল্পসত্তার সমস্ত দিকের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় আছে। আমি ঋত্বিক ঘটককে চিনি না, এবং তাঁর একটিমাত্র ছবি কয়েক বছর আগে দেখেছি। অথচ আমি আপনাদের চিনি, বছরের পর বছর আপনাদের দেখছি—"। বিনয়ী ভদ্রলোককে শেষ করতে দিলেন না একজন উত্তেজিত যুবক, "আপনি ঋত্বিক ঘটকের একটা ছবি অন্তত দেখেছেন, সুতরাং আপনিই বলুন, ঋত্বিকবাবু কি পদ্মশ্রী পাবার যোগ্য ব্যক্তি?" আরেকজন, "উত্তর দেবার আগে মনে রাখবেন ঋত্বিক ঘটক মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত নেহরুর মত লোককে গালিগালাজ করে। নিজ কানে না শুনলেও আমরা জানি যে এ-কথা সত্য।" বিনয়ী ভদ্রলোক—"হয়ত আপনারা যা বলছেন তার সবই সত্য, এ কথা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয় যে, ঋত্বিকবাবু পদ্মশ্রী খেতাব পাবার যোগ্য কিনা! কারণ, পদ্মশ্রী খেতাব দেবার সময় কিভাবে, এবং কোন্ পদ্ধতিতে ব্যক্তি নির্বাচন করা হয় সেটা আমার জানা নেই। আমার কেবল মনে হয় ফিল্ম লাইনের কাউকেই এ ধরনের খেতাব দেওয়া উচিত নয়, কারণ সেখানে সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কার আছে।" "তা হলে কাদের দেওয়া হবে এসব পুরস্কার?" "আপনার আমার মত লোকেদের, যাদের পরচর্চা ছাড়া অন্য কোন কাজ নেই।" আলোচনা যখন এই খাতে বইছে তখন দিল্লীর ঐ প্রচণ্ড শীতকে অগ্রাহ্য করে এক বিদেশী হিপি কন্যার আবির্ভাব হল কফি হাউসে। সব গুঞ্জন বন্ধ হল নিমেষে, সব দৃষ্টি নিবদ্ধ হল বিদেশিনীর অপাঙ্গে।

সরল শর্মা

ভারতীয় নাট্য সংঘের বার্ষিক সম্মেলন

থিয়েটার সেণ্টারের উদ্যোগে কলকাতার ইনফরমেশন সেণ্টার হলে ভারতীয় নাট্য সংঘের বার্ষিক সম্মেলন শুরু হয় গত ১৩ ফেবরুয়ারি থেকে। এই সম্মেলন তিন-দিন ধরে চলে। উদ্বোধন করেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীদীপ-নারায়ণ সিংহ। পৌরোহিত্য করেন পালান-পুরের নবাব বাহাদুর।

প্রথম দিনের আলোচনা-চক্রে যোগ দেন দিল্লির নাট্যকার ও প্রযোজক শ্রীসেন সেনগুপ্ত এবং কলকাতার প্রযোজক ও অভিনেতা শ্রীশম্ভু মিত্র। বর্তমান সমাজ-জীবন এবং তার সমস্যাগুলি আমাদের নাটকে প্রতিফলিত হওয়া উচিত কি না এবং সে সম্পর্কে প্রযোজক ও শিল্পীদের সচেতন থাকা প্রয়োজন কিনা—এই প্রশ্নটিই ছিল প্রথম দিনের মূল আলোচ্য বিষয়।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীতরুণ রায়, শ্রী বি এম সিংঘী, শ্রী এ আর কৃষ্ণ, শ্রীমতী সংযুক্তা গুজরাল ও শ্রীমতী দীপান্বিতা রায়।

১৪ ফেবরুয়ারি শ্রীবিজয় টেণ্ডুলকারকে কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় পুরস্কার দেওয়া হয়। মহারাষ্ট্রের শ্রীটেণ্ডুলকার ১৯৭০ সনের শ্রেষ্ঠ নাটকের রচয়িতা হিসাবে অভিহিত।

অরণ্যদেব লী ফক

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্লেন-কোম্পানির কর্তারা এক অদ্ভুত চিঠি পেলেন ...
'অজ্ঞাতনামা কিছু লোক আপনার কোম্পানির ক'টি প্লেন অন্যের বিমানঘাঁটিতে নামিয়ে রেখে গেছে। এ নিয়ে আলোচনা করবার জন্য লোক পাঠান। কথাটা যেন পাঁচ-কান না হয়।
প্রিন্স চার্ল—

এতক্ষণে তারা নিশ্চয়ই চিঠি পেয়েছে। শিগগিরই লোক পাঠাবে।

রাজা চার্ল
কারা নামিয়ে রেখে গেছে জানি না, তবে প্লেনগুলো ভালই আছে। আমি সেগুলি ফেরত দিতে চাই।
এ তো খুবই ভাল কথা।

তবে কিনা বিমান-ঘাঁটির ভাড়া বাবদে অল্প-কিছু টাকা চাই। এই ধরুন এক-একটা প্লেনের জন্যে মাস-পিছু দশ লক্ষ ডলার।

স্রেফ পার্কিং-চার্জ বাবদে দশ লাখ ডলার?
অবিশ্বাস্য ব্যাপার!
না, আমি ঠাট্টা করছি না - ....
6/25

প্লেনগুলোর এক-একটার দাম হবে প্রায় এক কোটি ডলার। আপনারা সেক্ষেত্রে এক-একটার জন্যে মাসে দশ লাখ ডলার দেবেন। না-দিলে, যেমন দিন যাচ্ছে, তেমনি ভাড়ার অঙ্কও বাড়বে।

পার্কিং চার্জ মাস-পিছু দশ লাখ? লোকটা কি পাগল?
না, রাষ্ট্রসঙ্ঘেরও এ-ব্যাপারে কিছু করবার উপায় নেই।
প্লেন-গুলোকে নিজের মুঠোয় পেয়ে লোকটা আমাদের প্যাঁচে ফেলেছে!

না, তোমরা ফিরে এসো। আমি মিঃ ওয়াকার নামে এক ভদ্রলোককে পাঠাচ্ছি। তিনিই আমাদের প্রতিনিধি হিসেবে কথা বলবেন।
টাকা দেবেন না। টাকা পেলে ওর লালসা আরও বেড়ে যাবে।
* অরণ্যদেবের নাম : ওয়াকার

মিঃ ওয়াকার নামে একজনকে ওরা প্রতিনিধি হিসেবে পাঠাচ্ছে!
টাকা ওরা দেবেই!
না-দিলে আমরা ছাড়ব কেন?

ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত করা সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের রায় এই সপ্তাহের প্রধান আলোচ্য বিষয়। গত ১০ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট ভারতের চোদ্দটি বড় বড় ব্যাংক রাষ্ট্রীয়করণ আইন পুরোপুরি অবৈধ বলে ঘোষণা করেছেন। এগারোজন সদস্য নিয়ে গঠিত স্পেশ্যাল বেঞ্চের দশজন সদস্য ওই আইন বিধিসম্মত নয় বলে অভিমত দেন। একজন সদস্য ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। রায়-দান প্রসঙ্গে বিচারপতি শ্রীশাহ বলেন, ঐ আইনে এই চোদ্দটি ব্যাংক সম্পর্কে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। পক্ষান্তরে অন্যান্য ভারতীয় ও বিদেশী ব্যাংকগুলি সম্পর্কে ব্যাংকিং ব্যবসা চালানোর ব্যাপারে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করা হয়নি। এ প্রসঙ্গে বিচারপতি শাহ আরও বলেছেন যে, সংবিধানে ক্ষতিপূরণের যে গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে ওই আইন তাও লঙ্ঘন করেছে এবং আইনে যে অর্থ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে তাকে ন্যায্য বলা চলে না। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ওই চোদ্দটি ব্যাংক বাতিল হয়ে যাওয়ায় আবার ১৯৬৯ সালের ১৯ জুলাই থেকে ওই ব্যাংকগুলি রাষ্ট্রীকরণ করে রাষ্ট্রপতি ১৪ জুলাই এক অর্ডিন্যান্স জারি করেন। প্রতিটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক কি পরিমাণ ক্ষতিপূরণ পাবে নতুন অর্ডিন্যান্সে তা সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় এবং আইনের ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করা হয়। রাষ্ট্রীকরণ আইনে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির শেয়ার হোলডারদের ব্যাংক ব্যবসা চালাতে নিষেধ করা হয়েছিল। বর্তমান অর্ডিন্যান্সে তাঁদের ওপর ওই-রকম কোন বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়নি।

দেশী সংবাদ

৯ ফেব্রুয়ারি—মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় স্বরাষ্ট্র দফতরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, 'সমস্ত ব্যাপারটা' তিনি নিজে তদন্ত করে দেখার আগ পর্যন্ত যেন কলকাতা পুলিসে সেই তিরিশজন সাব্-ইনসপেকটর ও ২৭ জন সারজেনটকে নিয়োগ না করা হয়। অজয়বাবু এই নিয়োগের ব্যাপারে সমস্ত কাগজপত্রও তাঁর কাছে পেশ করতে বলেছেন।

কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে এক তারবার্তা পাঠিয়ে পশ্চিমবঙ্গে কূটনীতিকদের ওপর আক্রমণের ঘটনাগুলিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কলকাতার বিভিন্ন বিদেশী কূটনীতিক মিশনের প্রতিনিধিদের বাসভবনের সামনে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পুলিস-কুকুর বাঙ্গুর হাসপাতালে সেই আহত যুবককে আজ দেখিয়ে দিয়েছে।

১০ ফেব্রুয়ারি—উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সি বি গুপ্ত আজ পদত্যাগ করেছেন। পদত্যাগপত্রে তিনি বি কে ডি নেতা শ্রীচরণ সিংকে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে রাজ্যপালকে অনুরোধ জানিয়েছেন। রাজ্যপাল গুপ্তজীর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন। তাঁর অনুরোধও সম্ভবত রাখবেন। কেননা আদি কংগ্রেস তো বটেই, জনসঙ্ঘ ও এস এস পি-ও ভাবি কোয়ালিশনে সামিল হতে রাজি হয়েছে। শ্রীচরণ সিং বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রীত্বের দায়িত্ব বহনে তিনি প্রস্তুত।

ভবিষ্যতে সি পি এম-এর নেতৃত্বে গঠিত কোন সরকারে যোগ না দেওয়ার জন্য ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি সি পি আই-এর পশ্চিমবঙ্গ শাখাকে অনুরোধ জানিয়েছেন।

১১ ফেব্রুয়ারি—শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মীকে জানিয়েছেন যে, কোন মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর কোনও বিশেষ বা সাধারণ নির্দেশের বিরোধিতা করে কোনও সরকারী নির্দেশ দিলে তিনি সেই মন্ত্রীর বিরুদ্ধে "চরম ব্যবস্থা" নেবেন। মুখ্যমন্ত্রীর দৃঢ় বিশ্বাস, সরকারী বিধিমত জনস্বার্থে ও বিশেষ প্রয়োজনে যে কোন মন্ত্রীর নির্দেশ বাতিল করে তিনি বিশেষ নির্দেশ দিতে পারেন।

১২ ফেব্রুয়ারি—বাংলা কংগ্রেসের কর্মপরিষদ এবং এম এল এ-দের যৌথ সভায় আজ সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়

ছাড়া দলের আর তিনজন মন্ত্রী ২০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে "মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁদের নিজ নিজ পদত্যাগপত্র দাখিল করবেন।" এই তিনজন মন্ত্রী হলেন সর্বশ্রী সুশীল ধাড়া, চারুমিহির সরকার এবং ভবতোষ সরেন।

আজ বেলেঘাটা-নারকেলডাঙ্গা-মানিকতলা অঞ্চলে সংঘর্ষ প্রচণ্ড আকার নেয়। ওই সব অঞ্চলে ক-দিন ধরেই হাঙ্গামা চলছিল কম বেশী। গুলি, কাঁদানে গ্যাস নিত্যকার ব্যাপার। বিরোধ মোটামুটি সি পি এম ও ফরওয়ারড ব্লক সমর্থকদের মধ্যে। এদিনের সংঘর্ষে গুলি ইত্যাদিতে ২ জন নিহত হয়। বিকালের দিকে বেলেঘাটা-মানিকতলা থানা এলাকার অধিকাংশ অঞ্চলে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। বেলেঘাটা থানার ভার নেন একজন ডি সি ও দুজন এ সি।

১০ ফেব্রুয়ারি—আজ সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত যুক্ত ফ্রনট নেতাদের দফায় দফায় বৈঠকে আরও কিছুদিন ফ্রনটকে বাঁচিয়ে রেখে শেষ 'ট্রায়াল' দেওয়ার কথা ওঠে। এই কিছুদিন—ঠিক কতদিন তা পরিষ্কার না হলেও কোন কোন মুখে অন্তত এক মাস অবস্থা দেখে চলার প্রসঙ্গ শোনা যায়।

১৪ ফেব্রুয়ারি—উত্তরপ্রদেশে নব কংগ্রেস ও বি কে ডি-র মধ্যে আজ পূর্ণ মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর ফলে সেখানে নব কংগ্রেসের মন্ত্রিসভা গঠনের প্রয়াস সফল হল। মনে হচ্ছে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হবে বি কে ডি-র চেয়ারম্যান শ্রীচরণ সিংয়ের নেতৃত্বে।

উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু আজ শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীসুশীল ধাড়াকে লিখিত এক পত্রে এই অভিযোগ করেছেন যে, চিনি শিল্পের জন্য কনট্রোলার নিয়োগের সমস্ত ব্যাপারটা 'খুবই সন্দেহজনক' এবং অন্যায় ও কলঙ্ককর।

১৫ ফেব্রুয়ারি—বিহারে খুব শীঘ্রই রাষ্ট্রপতি শাসনের অবসান ঘটবে বলে আশা করা যাচ্ছে। নব কংগ্রেস আইনসভা দলের নেতা শ্রীদারোগা রাই রাজ্যে কোয়ালিশন সরকার গঠন করবেন। আগামীকাল বিহারে শ্রী রাই-এর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভা শপথ নিতে পারেন।

আজ সন্ধ্যায় হায়দরাবাদে এক সভাস্থলে আদি কংগ্রেস নেতা শ্রীমোরারজী দেশাই উপস্থিত হলে বিক্ষোভকারীরা তাঁকে কালো পতাকা প্রদর্শন করে এবং বিভিন্ন ধ্বনি করে ও ধাক্কা দেয়। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে একজন তাঁর গলায় একটি কালো পতাকা বেঁধে দেয়। অন্য একজন তাঁর গান্ধী-টুপি নিয়ে দূরে নিক্ষেপ করে।

বিদেশী সংবাদ

৯ ফেব্রুয়ারি—পাকিস্তানের এক সংবাদে প্রকাশ : প্রাক্তন পাক রাষ্ট্রপতি আয়ুব খান যিনি ক্ষমতায় এসে চোরাই চালানের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছিলেন, ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার সময় তিনিই চোরাই চালানের কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন। পাকিস্তানের গবর্নর থেকে শুরু করে করাচীর চীফ কমিশনার পর্যন্ত সমস্ত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাই চোরাই চালানের রাজা শ্রী কাশেমের কাছ থেকে কমিশন পেয়ে থাকেন।

১০ ফেব্রুয়ারি—গতকাল প্রেসিডেনট নাসেরের সভাপতিত্বে আরবের প্রধান প্রধান রাষ্ট্রের এক বৈঠকে পুনরায় দৃঢ়তার সঙ্গে এই কথা ঘোষণা করা হয় যে, তাঁরা ইজরায়েল অধিকৃত আরব এলাকাগুলি পুনরুদ্ধারে কৃতসঙ্কল্প হয়েছেন। এই বিষয়ে তাঁদের [illegible] অবশ্যম্ভাবী সে কথাও তাঁরা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন। পাঁচটি আরব রাষ্ট্রের নেতারা তিনদিনব্যাপী বৈঠকের পর এই ঘোষণা করেন।

১১ ফেব্রুয়ারি—জাপান আজ মনুষ্যহীন একটি উপগ্রহ ছেড়েছে এবং উপগ্রহটি এখন পৃথিবীর কক্ষপথ পরিক্রমা করছে বলে বেসরকারী জাপানী সংবাদে বলা হয়। মার্কিন জাতীয় এরোনটিকস ও স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত সংবাদে এই খবরটি সমর্থন করা হয়। এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে জাপানই সর্বপ্রথম মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠালো।

১২ ফেব্রুয়ারি—মার্কিন প্রভাবিত আন্তর্জাতিক ফিনান্স করপোরেশন ওয়াশিংটনে ঘোষণা করেছে যে, পশ্চিম মালয়েশিয়াতে একটা সুসংহত বয়নশিল্পের মিল স্থাপনের ব্যাপারে তারা মালয়েশিয়া ও ভারতের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। বিড়লা কটন স্পিনিং অ্যানড উইভিং মিলস লিমিটেড এ উদ্যোগের প্রবর্তক। মিলটি তৈরি ও পরিকল্পনা করবে তারাই।

১৩ ফেব্রুয়ারি—চীন দাবী করছে যে, হাইনান দ্বীপের আকাশে চীনা নৌবাহিনীর বিমানবহর আরোহীশূন্য একখানি মার্কিন পর্যবেক্ষক তথা গোয়েন্দা বিমানকে আক্রমণ করে ভূপাতিত করেছে। মার্কিন বিমানখানা খুব উঁচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল।

১৪ ফেব্রুয়ারি—গতকাল রাতে ইতালীর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয় যে, শ্রীভ্লাদিমির আলেকজানড্রোভ নামক সোভিয়েট দূতাবাসের জনৈক সামরিক কর্মচারীকে 'অবাঞ্ছিত' ব্যক্তি বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং তাঁকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ইতালী থেকে চলে যেতে বলা হয়েছে।

১৫ ফেব্রুয়ারি—পশ্চিম পাকিস্তানে সোয়াত রাজ্যে পান্নার খনি থেকে মূল্যবান স্তূপ সরাবার চেষ্টা করলে পুলিস জনতার উপর গুলি বর্ষণ করে। ফলে একজন মহিলা ও শিশুসহ তিনজন নিহত ও ১৭ জন আহত হয়। ওই স্তূপের মধ্যে বহু মূল্যবান পাথর পাওয়া যায়।

আমরা চাই ওয়েকফিল্ডের কাস্টার্ড

বাচ্চারা (আর সেই সঙ্গে বড়রাও) ওয়েকফিল্ড কাস্টার্ড ভালোবাসে— আপনারও ভালো লাগবে!

আরেকটি নতুন ওয়েকফিল্ড খাবার
কাস্টার্ড পাউডার কুকীজ

- ৮ বড় চামচ ওয়েকফিল্ড কাস্টার্ড পাউডার
- ১ চায়ের চামচ ওয়েকফিল্ড বেকিং পাউডার ভ্যানিলা এসেন্স
- ½ কাপ সাদা চিনি
- ১ কাপ যবের ছাতু
- ১ কাপ ময়দা
- ১ ডিম ½ কাপ মাখন
- এক চিমটি নুন
- দুধ দরকার মত

প্রণালী: মাখন ও চিনি একসঙ্গে মেশাবার পর তাতে ডিম ও এসেন্স দিন। শুকনো সবকটি উপকরণকে একসঙ্গে চালুনিতে ছেঁকে মিশ্রণের সঙ্গে যোগ করুন। মেখে নরম তাল তৈরি করার জন্যে ওতে একটু দুধ দেবেন। টিনের ট্রেতে তেল লাগিয়ে মাখা তাল থেকে চামচে ভর্তি নিয়ে নিয়ে ট্রের ওপর আলাদা আলাদা ফেলবেন। ফর্ক (কাঁটা) দিয়ে চেপে ধরবেন। হাল্কা বাদামী রঙ না হওয়া পর্যন্ত উনুনে ট্রে চাপিয়ে ২০০° সি. তাপে সেঁকবেন। ফর্ক ঢুকিয়ে পরীক্ষা করবেন। ফর্ক পরিষ্কার বেরিয়ে আসলে আঁচ থেকে নামিয়ে ঠাণ্ডা হতে দেবেন।

আজই বিনামূল্যে পাকপ্রণালীর বই চেয়ে পাঠান। এখানে লিখুন:
ওয়েকফিল্ড প্রোডাক্টস্ কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) সি.এম.ও.
৪৫, সেসুন রোড, পুণা-১.

আর ওয়েকফিল্ডের রকমারি রসালো ফলের জেলী খেয়ে দেখো। সেগুলো সবই এমন মনেরমত যে খেলে বলে উঠবে। "ওয়েকফিল্ডের জয়জয়কার!"

ওয়েকফিল্ড— যায়না খাওয়া কম কম, খেতে এতো মনোরম!

WP.O-1 BN

সূচিপত্র

বিষয় লেখক	পৃষ্ঠা

বিষয় লেখক		পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাণে ভরপুর তাজা কফি—নেস্‌কাফে!

ভারতে সবচেয়ে বেশী যে আসবাবের আবরণীর কাপড় ব্যবহৃত হয় তা তৈরী করে ডিসিএম :

অনেক বেশী লোক ওর ওপর আরাম করে, অনেক বেশী ছেলেমেয়েরা ওর ওপর লম্ফঝম্প করে, অনেক বেশী বেড়াল ওর ওপর গুঁটি'সুঁটি মেরে ব'সে থাকে···বাস্তবিক, অনেক বেশী লোক অন্য কিছুর চাইতে **ডি সি এম** এর তৈরী আসবাবের আবরণীর কাপড়ই পছন্দ করেন। কারণগুলি সোজা নয় : ঘর সাজাবার জন্য **ডি সি এম**-এর তৈরী অতি চমৎকার চমৎকার ও উজ্জ্বল রকমারি জ্যাকার্ড ও ডবি প্যাটানে আসবাবের আবরণীর কাপড় এবং ছাপানো ও রঙীন পর্দার কাপড় অতি সুবিধেমত দামে পাওয়া যায়। আজ দেখে আসুন। কালই নিজের ঘরে ওর ওপর ব'সে আরাম করতে পারবেন।

ডি সি এম স্টোরে যখনই যাবেন নতুন কিছু না কিছু অবশ্য পাবেন।

(Bensons 1456)

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৭ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১৮
শনিবার, ১৬ ফাল্গুন, ১৩৭৬

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ
*
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
*
টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৫৪১
*
চাঁদার হার
কলিকাতায়

বার্ষিক	—	২৫.০০
ষান্মাসিক	—	১২.৫০
ত্রৈমাসিক	—	৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	—	৩০.০০
ষান্মাসিক „	—	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক „	—	৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	—	৩০.০০
ষান্মাসিক „	—	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক „	—	৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	—	৫২.০০
ষান্মাসিক „	—	২৬.০০
ত্রৈমাসিক „	—	১৩.০০

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	—	৩৯.০০
ষান্মাসিক	—	১৯.৫০
ত্রৈমাসিক	—	১০.০০

*
দাম ৫০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাসুল ৭ পয়সা
*
DESH

Saturday 28 Feb. 1970

বৈদ্যুতিক তার চুরি

কিছুদিন ধরে কলকাতা এবং কলকাতার আশেপাশে এক ধরনের চুরির হিড়িক পড়েছে। প্রধানত এটা রাস্তাঘাটের ইলেকট্রিক তার চুরি। শহর কলকাতার অর্ধেক রাস্তা এখন অন্ধকারে ডুবে থাকে, কারণটা এই যে, পাড়ায় পাড়ায় রাত্রের অন্ধকারে কারা যেন এসে ইলেকট্রিক তার কেটে নিয়ে চলে যায়। যত দূর মনে পড়ছে, কলকাতা পৌরসভা ইদানীং এক হিসেব দাখিল করে বলেছিলেন, গত বছর এপ্রিল মাস থেকে নাকি প্রতি মাসে চল্লিশ হাজার টাকা মূল্যের তার চুরি হয়ে যাচ্ছে। এই হিসেবে যদি ভুল না থাকে তবে আজ দশ এগারো মাসে কী পরিমাণ মূল্যের তার চুরি হয়েছে তা একবার ভেবে দেখা দরকার। পৌরসভা চোরেদের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ইদানীং তামার তারের বদলে অন্য ধরনের তার দিতে শুরু করেছেন বলে শুনেছি। এতে কতটুকু লাভ হবে তা অবশ্য এখন বলা যায় না। খাস কলকাতার অনেক গলির মধ্যে ঢুকলে চোখে পড়বে ভূগর্ভস্থ নালার ওপরকার বড় বড়, ভারী লোহার ঢাকনাগুলো কারা তুলে নিয়ে চলে গেছে। যে কোনো অন্যমনস্ক পথ-চলিয়ের পক্ষে এগুলি বিপজ্জনক, মেয়ে কিংবা বাচ্চাকাচ্চা-দের পক্ষে তো আরও সাংঘাতিক। অর্থাৎ লোহা, তামা ইত্যাদি ধাতব পদার্থ চুরি করা এবং সেই চুরির মাল বিক্রী করার একটা গোপন ব্যবসা চমৎকারভাবে চালু হয়ে গেছে। আর এমন দুর্দিনে পুঁজিপাটা না থাকলে এমন ব্যবসা যে বেশ লাভজনক তাও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কাজেই পৌরসভা রাস্তার আলোর জন্যে তামার তারের বিকল্প যে-তার ব্যবহার করতে শুরু করেছেন—এর বাজার দর এবং চাহিদার খোঁজ খবর নেবার পর চোরেরা নিশ্চয় চুপ করে বসে থাকবে না।

ইলেকট্রিক ট্রেনের তার-চুরির প্রসঙ্গটাও এই সঙ্গে এসে পড়ে। বিস্তর অর্থ ব্যয় করে, দীর্ঘদিন কাজ করার পর আমাদের এখানে ইলেকট্রিক ট্রেন চালু করা হয়েছে। অথচ সেই রেলপথের তার-চুরি দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে হালে যা হচ্ছে এমন আর দেখা যায় নি; প্রায় প্রত্যহই কোথাও না কোথাও তার কেটে নেওয়ার খবর শোনা যায়। পরিণামে ট্রেন চলায় বিঘ্ন ঘটে, ফলে যাত্রীদের একাংশ স্টেশনে হামলা চালিয়ে সব তছনছ করে, গার্ডবাবুকে পিটিয়ে ঠাণ্ডা করে, ড্রাইভারকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয়। খুব সম্প্রতি এই রকম একটি ঘটনায় শিয়ালদা রেল কর্মচারীরা এতই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে, তাঁরা ট্রেন চালানো বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না, নিত্য যদি স্টেশনের ওপর, গার্ড ও ড্রাইভারের ওপর, কেবিনম্যানের ওপর উত্তেজিত জনতার হামলা হয় তবে তাঁরা কোন্ ভরসায় গাড়ি চালাবেন। আবার এটাও ঠিক, হাজার হাজার মফস্বল-বাসী কলকাতায় আসেন অফিস কাছারী করতে, ছাত্রছাত্রী আসে পড়তে, ব্যবসা-পত্রে কাজেকর্মে তো হামেশাই মানুষকে কলকাতায় আসতে হয়। ট্রেন না চললে অসুবিধে শহরতলির মানুষের। হাঙ্গামা করে বাস-চলাচল বন্ধ করলেও এঁদেরই অসুবিধে। তবু হাঙ্গামা হয়, হচ্ছে। এটা কেন, কোন যুক্তিতে হয়, আমরা বুঝি না। স্টেশন মাস্টার, গার্ড, ড্রাইভার এঁরা কোন্ দোষে দোষী হল? আর যারা তার কাটে, রেল লাইন আটকে রাখে, হামলা করে—তারা কোন যুক্তিতে নির্দোষ হল? ট্রেনের কোন কোন রসিক যাত্রীর মুখে শোনা যায়, জনতার ইলেকট্রিক তার জনতা কেটেছে মশাই, কার কি বলার আছে!

যাঁরা ইলেকট্রিক ট্রেনের যাত্রী তাঁরা জানেন, এই ধরনের গাড়ি যখন প্রথম চালু হল তখন গাড়ির ভেতরের অবস্থা কী ছিমছাম ছিল, এখনই বা কোন হাল হয়েছে! শুধু চুরি, না হয় নষ্ট করা—এতেই এই হাল। আমরা কলকাতায় চক্রবেড় রেল নিয়ে হইচই করি। কেউ অস্বীকার করবে না, চক্রবেড়ের প্রয়োজন কতখানি। কিন্তু চক্রবেড়, তা যতটুকুই হোক, হবার পর দেখা যাবে চোরেদের আর কিছু সুযোগ বেড়ে গিয়েছে। যাত্রীদের যত না—তার বেশি লাভ হবে চোরেদের। মাঝে মাঝে ভয় হয়, যে ধরনের ব্যাপার চলছে, এর পর রেলের লাইন, গাড়ির কামরা, মায় এঞ্জিন পর্যন্ত না লুঠ হয়ে যায়। হলেও আশ্চর্য হবার থাকবে না, কেননা এখন আর বলার কিছু নেই, সমস্ত রকম অসামাজিক ক্রিয়া-কলাপই কোনো না কোনো অছিলায় হজম করে নেওয়া হচ্ছে। না হলে আজ সমাজবিরোধীর এত দৌরাত্ম্য কেন? কেন মানুষের জীবন যাপনে এত উদ্বিগ্নতা? অন্যায়ের শাস্তি নেই—এই বোধ যদি সমাজবিরোধীদের মনে জন্মে গিয়ে থাকে তবে তো তাদের পোয়া বারো, ভোগ শুধু আমাদের।

বিহার ও
উত্তর প্রদেশ সুন্দরী

[ফরওয়ারড ব্লকবাদী মারকসিসট মহাসম্মেলনে আগামী দিনের চিত্ত চমৎকার৷ এক উদ্‌বোধনী ভাষণ]

কমরেডগণ, ভারতে আমরা আজ যে রাজনৈতিক ভাবাদর্শ প্রচারে উদ্যোগী হয়েছি, সে সম্পর্কে আমি আপনাদের এই গ্যারানটি দিতে পারি যে, এই ভাবাদর্শ সম্পূর্ণ ভারতে প্রস্তুত। দীর্ঘদিন ধরে আমরা এইরূপ একটি ভাবাদর্শের জন্য তৃষিত চাতকের মত অপেক্ষা করে ছিলাম। আজ সেই অরূপরতন হাতে এসে গিয়েছে। এই ১৯৭০ সাল রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাচিহ্নিত হয়ে বিরাজ করবে। কারণ এই সালটিই ভারতীয় ভাবসাধনার জমিতে পাশ্চাত্য সমাজ-বিপ্লবের চারা পুঁতে সুরসাল উচ্চ ফলনশীল "মালেতাজী" উৎপন্ন করতে সমর্থ হয়েছে। এ কাজ আর-কারুর পক্ষে সম্ভব হত না। এই সমন্বয়, এবং এ নিয়ে কোনোই সন্দেহ নেই যে এ এক দারুণ সমন্বয়, খাঁটি ভারতীয় সাধনারই ফলশ্রুতি। এই হচ্ছে ভারতের "স্পেশাল জিনিয়াস"।

এই ভারতের কল্পনায়, ধারণা যেমন এক সময় ব্রহ্ম ও আত্মা—ব্রহ্মরূপ বা হংস ও হংসী, — ইত্যাদি, প্রভৃতি নানা প্রকার সমন্বয়ে উদ্ভাসিত সৃষ্টি হয়েছিল, ঠিক তেমনি আমাদের "মালেতাজী"। অর্থাৎ মারকস—লেনিন নেতাজী এ এক [illegible] উপাদেয় সমন্বয়, সুস্বাদু, এবং বলবর্ধক (বলবর্ধকও বটে)।

দেখুন কমরেডগণ, আমরা ফরওয়ারড ব্লকবাদীরা চিরদিনই কিছুটা ফরওয়ারড। তদুপরি তার উপর আবার মারকসিসট। সুতরাং ঠেকায় কে? শোনা যায়, কোন সুদূর অতীতে নেতাজী সুভাষ নামক এক ব্যক্তি এই দলের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শোনা যায়, তিনি একটি পতাকাও দলকে দিয়েছিলেন। ওই দেখুন, আমাদের "মালেতাজী" সংগ্রহশালার বাজে জিনিসের গাদায় ওটা ফেলে রেখে দিয়েছি। কারণ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওটা হচ্ছে একটা বিরাট ধাপ্পা, আমাদের দলকে জনগণের কাছ থেকে সরিয়ে দেবার জন্য শত্রুপক্ষের সুপরিকল্পিত চক্রান্ত। দুঃখের বিষয়, আমার আগের আমলের কিছু রক্ষণশীল নেতা, এই চক্রান্তের শিকার হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের এ কথাটা বোঝাতে পারা যায়নি যে, প্রাক্তন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট সুভাষচন্দ্র বসু, তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য যদি ফরওয়ারড ব্লকের ঝাণ্ডা ত্রিবর্ণরঞ্জিত রেখে থাকেন, তবে তার দায় সুভাষ বোসেরই, জনগণপ্রিয় নেতাজীর নয়।

কমরেডগণ, আশা করি, আপনারা ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করবেন। আমরা ফরওয়ারড ব্লকবাদী মারকসিসটরা বা "মালেতাজী"পন্থীরা যেন কখনোই সুভাষ বোস আর নেতাজীকে এক করে গুলিয়ে না ফেলি। মারকসিসট ফরওয়ারড ব্লকবাদীরা যেমন ফরওয়ারড ব্লকবাদী মারকসিসট নয়, তেমনি সুভাষ বোসও নেতাজী নন। আপাতদৃষ্টিতে দেখতে গেলে প্রভেদটা সূক্ষ্ম বলে ভ্রম হতে পারে বটে, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই ধরা পড়বে তফাৎটা একেবারে ফানডামেনটাল। দলের নাম বা কথাবার্তায় প্রভেদটা তেমন হয়ত ধরা পড়ে না, তাই সেদিক দিয়ে বিচার করা পণ্ডশ্রম হবে জেনে, আমি আপনাদের নেতাদের মুখপানে চেয়ে দেখবার অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনারা একবার কমরেড চিত্ত বসু, কি অশোক ঘোষের দিকে তাকান, আর তারপর দেখুন, হেম চ্যাটার্জির দিকে। এঁদের পার্থক্য এতই ফানডামেনটাল যে চাইবামাত্রই আর বুঝতে অসুবিধা হয় না।

এইভাবে চাইতে চাইতে আপনাদের একদিন ভেদাভেদজ্ঞান তীক্ষ্ণ হয়ে উঠবে এবং হংস যেমন "ক্ষীরমম্বুমধ্যাৎ" ক্ষীরটুকু শুষে নিয়ে জলটুকু আলাদা করতে সমর্থ হয়, আপনারাও তেমনি সেদিন নেতাজীটুকুকে শুষে নিয়ে সুভাষটুকুকে ফেলে দেবার ক্ষমতা আয়ত্ত করতে সমর্থ হবেন।

দলীয় পতাকার সম্বন্ধে বলছিলাম। সুভাষ ত্রিবর্ণ ঝাণ্ডার উপর বাঘ ছাপ লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এখন আপনারাই দেখুন, ত্রিবর্ণ ঝাণ্ডা জনবিরোধী কংগ্রেসের প্রতীক। সুভাষ আর নো সুভাষ, আমরা এ যুগের তরুণ নেতৃত্ব, যারা অল-ওয়েজ ফরওয়ারড, আমাদের পতাকায় এই ত্রিবর্ণ রাখতে পারি না। তা ছাড়া মানায়ও না। বাঘ বিনা কারণে লাফ মারে না, মারে কি? বাঘ যখন লাফ মারে, তখন সে কারও ঘাড় মটকাবার উদ্দেশ্যেই লাফ মারে। আর ঘাড় মটকালেই গ্রাউনডে রক্ত ঝরবেই। তাই, রিয়ালিটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখবার জন্যও বটে, আবার পতাকা থেকে প্রতিক্রিয়াশীলতার রঙ মুছে ফেলার জন্যও বটে আমরা কিছু দিন আগেই পতাকার গ্রাউনড লাল করে দিয়েছিলাম। আর আজ, আরও এক ধাপ এগিয়ে, সধবার কপালে যেমন সিঁদুরের টিপ ছাড়া মানায় না, তদ্রূপ লাল ঝাণ্ডাতেও কাস্তে হাতুড়ি ছাড়া মানায় না, এই আমলে কাস্তে হাতুড়ি বসিয়ে দিয়েছি। এবং মতবাদের নাম রেখেছি "মালেতাজী"।

"মালেতাজী" কথাটার মধ্যে অপূর্ব সব ব্যঞ্জনা লুকিয়ে আছে। প্রথমে তো "মা"তে মারকস, "লে"তে লেনিন এবং "তাজী"তে নেতাজী। আমাদের ফরওয়ারড ব্লকবাদী মারকসিসটদের আদি, মধ্য এবং অন্তে এই তিন মোহান্ত বা ট্রিনিটি। মারকস-লেনিনকে আগে ঝুলিয়ে দিয়ে নেতাজীকে যে আমরা ল্যাজে খেলাচ্ছি, এতেই বুঝবেন যে, আমাদের দলীয় চিত্ত ভারতীয় সমন্বয় সাধনার কোন্ তুরীয় মার্গে বিচরণ করছে। তাই আমরা মারকস, লেনিন আর নেতাজীতে কোথাও কোনও অসঙ্গতি দেখছিনে। যেমন শক হূন দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন, ঠিক তেমনি মারকস লেনিন আর নেতাজী।

আবার দেখুন, এই মা-লে-তাজী কথাটার মধ্যে কত বড় একটা ভাব লুকিয়ে আছে। মা অর্থে জননী (প্রয়োগঃ ওগো মা—) লে অর্থে লহ (প্রয়োগঃ লে হালুয়া) এবং তাজী অর্থে আরবি ঘোড়া (এখানে দুরন্ত গতি সর্বহারা বিপ্লবের প্রতীক)। তা হলে সব মিলিয়ে অর্থটা দাঁড়াল, "হে ভারত মাতঃ, সর্বহারা বিপ্লব দুরন্ত বেগে ছুটে আসছে, তাকে কোলে তুলে নাও।"

কমরেডগণ, আশা করি এবার বুঝতে পেরেছেন "মালেতাজী" মালখানা কতটা তাজা এবং কতটা তেজী। অতএব মালেতাজীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নেতাজীর অতীত কায়া অর্থাৎ সুভাষচন্দ্রকে মেরামত করাই হবে ফরওয়ারড ব্লকবাদী মারকসিসটদের ভবিষ্যতের সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান কাজ। শত্রুপক্ষ বলছে, নেতাজী নাকি বলেছেন :

"Considering everything, one is inclined to hold that the next phase in world-history will produce a synthesis between Communism and Fascism. And will it be a surprise if that synthesis is produced in India?"

কমরেডস্, মনে রাখবেন, এই ধরনের কথা নেতাজী কখনোই বলেন নি। বলেছেন, সুভাষ বোস তাঁর দি ইনডিয়ান স্ট্রাগল বইতে। তাই তো ভারতের সর্বহারা বিপ্লবের খাতিরে, এই কারণেই সুভাষকে মেরামত করা দরকার।

অমরত্ব

"সর্বশেষ ডেবরা-গোপীবল্লভপুরে কৃষক-হত্যার জন্য মিলিটারি পাঠিয়ে জ্যোতি বোস প্রমাণ করেছে বিধান রায় মরেনি জ্যোতি বোসের মধ্যে সে বেঁচে আছে. "

—দেশব্রতী, ১৯।২।৭০

সুভাষবাদই ভারতীয় মারকসবাদ!

ফরওয়ারড ব্লকের সর্বভারতীয় সম্মেলনে এবার একটা মৌলিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। সেই তত্ত্বটা হলো : ভারতীয় পরিস্থিতিতে সুভাষবাদই হলো মারকসবাদ।

এই তত্ত্বটার প্রকৃত অর্থ বুঝতে না পেরে কয়েকজন ফরওয়ারড ব্লক নেতার কাছে ব্যাখ্যা শুনতে চেয়েছিলাম। তাঁরা যা বললেন তাতে ব্যাপারটা আরো ঘোলাটে মনে হলো। তাঁদের ব্যাখ্যাটা মোটামুটি এইরকম : ফরওয়ারড ব্লক মারকসবাদী সুভাষবাদী দল। ফরওয়ারড ব্লক ভারতীয় বিচার ধারা অনুসারে ভারতীয় পরিস্থিতিতে মারকসবাদ প্রয়োগ করতে চায়। মারকসবাদের সেই ভারতীয় প্রয়োগই হলো সুভাষবাদ।

এই মৌলিক তত্ত্বটি এখন ফরওয়ারড ব্লকের "মূল রাজনৈতিক থিসিসের" অঙ্গীভূত। নেতাজীর ছবির নীচে বসে নেতাজী জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে ফরওয়ারড ব্লকের আড়াই হাজার প্রতিনিধি এই মৌলিক তত্ত্বটিকে চূড়ান্ত স্বীকৃতি দিয়েছেন।

কিভাবে এই মূল তত্ত্বটি ফরওয়ারড ব্লকের সর্বভারতীয় সম্মেলনে এলো বিস্তারিত আলোচনার আগে সেটা একটু সংক্ষেপে বলে নেওয়া ভালো। ব্যাপারটা এইরকম : দলের নেতারা সম্মেলনের প্রতিনিধিদের সামনে যে খসড়া "রাজনৈতিক থিসিসটা" আনলেন তার একটা অংশে ছিল যে, ফরওয়ারড ব্লক বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী মারকসবাদীদল। একজন প্রতিনিধি এই অংশ সম্পর্কে একটা সংশোধনী প্রস্তাব আনলেন। তিনি বললেন, মারকসবাদ চাইই, আর একদল সুভাষবাদ না হলে ফরওয়ারড ব্লক বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী সুভাষবাদী দল। সম্মেলনে এই সংশোধনীটা পাশ হয়ে গেল। নেতারা ভীষণ বিপদে পড়লেন। তাঁরা দেখলেন, দল দু-টুকরো হয় হয়। একদলের মারকসবাদ চাইই আর একদল সুভাষবাদ না হলে কিছুতেই রাজি নন। তাঁরা তাই অনেক ভেবে চিন্তে একটা রফার প্রস্তাব আনলেন। সেই প্রস্তাবেরই মূল কথা, ফরওয়ারড ব্লক ভারতীয় চিন্তাধারা অনুসারে ভারতীয় পরিস্থিতিতে মারকসবাদ প্রয়োগ করতে চায়—মারকসবাদের সেই ভারতীয় প্রয়োগই হলো সুভাষবাদ। তারপর সাধারণত এই ধরনের রাজনৈতিক দলে যা হয়ে থাকে তাই হলো। আগের সংশোধন প্রস্তাবটাকে বাতিল বলে ঘোষণা করে এই নতুন সংশোধনী গৃহীত হল! দাদারা ভাইদের উপর প্রচন্ড চাপ দিলেন। ভাইরা নানা আপত্তি সত্ত্বেও এই সংশোধনী মেনে নিতে বাধ্য হলেন। ঘোষিত হল : ফরওয়ারড ব্লকের মতে ভারতে সুভাষবাদই মারকসবাদ।

*

রাজনীতির যে কোনও ছাত্রের কাছে ফরওয়ারড ব্লকের এই "মৌলিক" তত্ত্বটা অদ্ভুত মনে হবে। মারকসবাদ যাঁরা কিছুটাও জানেন, সুভাষচন্দ্রের চিন্তাধারার সঙ্গে যাঁরা সামান্যও পরিচিত তাঁরা সুস্থ মস্তিষ্কে থাকলে কিছুতেই এই তত্ত্বটাকে মেনে নিতে পারবেন না।

গোটা বিশ্বে এখন মারকসবাদের হাজারো ভাষ্য হচ্ছে। এই ছোট্ট পশ্চিমবঙ্গেই আট দশটা মারকসবাদী দল আছে। সি পি এম, সি পি আই, সি পি (এম এল), নকশালপন্থী (অসিত সেন, পরিমল দাশগুপ্ত প্রভৃতি গ্রুপ), এস ইউ সি, আর এস পি, বলশেভিক পার্টি আর সি পি আই প্রভৃতি নানা মারকসবাদী দল রয়েছে এই পশ্চিমবঙ্গে। সকলেই মারকসবাদের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করেন। সবাই বলেন, আমরাই বিশুদ্ধ মারকসবাদ মতো চলছি।

কিন্তু বিভিন্ন প্রশ্নে মারকসবাদের প্রয়োগ নিয়ে বিভিন্ন দলে, বিভিন্ন ব্যক্তিতে যতই মতভেদ থাকুক মারকসবাদের মূল তিনটি ভিত্তি নিয়ে সকলেই একমত। সেই তিনটা ভিত্তি হলো : মারকসীয় দর্শন, মারকসীয় অর্থনীতি এবং মারকসীয় রাষ্ট্র চিন্তা।

মারকসীয় দর্শনের ভিত্তি হলো দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। মারকসীয় অর্থনীতির

চূড়ান্ত লক্ষ্য সাম্যবাদ—যেখানে উৎপাদন ব্যবস্থাগুলি পুরোপুরি সমাজের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে এবং প্রত্যেকে তার প্রয়োজন মত নেবে ও সাধ্যমত দেবে। মারকসীয় রাষ্ট্র চিন্তার মূল কথা—রাষ্ট্র হলো শ্রেণী শাসন ও শোষণের যন্ত্র। তাই, সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বে শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হলে আস্তে আস্তে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তাই ফুরিয়ে যাবে।

সুভাষচন্দ্র পরিষ্কার বলে গিয়েছেন : আমি মারকসীয় দর্শন ও রাষ্ট্র চিন্তা সমর্থন করি না। তবে, মারকসীয় অর্থনীতির কতকগুলি বক্তব্যকে সত্য বলে স্বীকার করি। বিশেষ করে, ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা শোষণের রূপ ও ধারা সম্পর্কে মারকস যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন আমি তার সঙ্গে বহুলাংশে একমত।

নেতাজীকে কেউই বিরাট তাত্ত্বিক নেতা বলবেন না। তিনি যে তত্ত্ব নিয়ে খুব বেশি একটা মাথা ঘামিয়েছেন তাও নয়। সে সুযোগও তাঁর ছিল না। তাঁর কাছে সব চেয়ে বড় প্রশ্ন ছিল ভারতের স্বাধীনতা অর্জন—ইংরেজ শাসনের অবসান।

নেতাজী সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করেছিলেন। তাঁর বিভিন্ন লেখা থেকে এটা স্পষ্ট যে তিনি এমন এক শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে মানুষে মানুষে বিরাট অর্থনৈতিক বৈষম্য থাকবে না। নেতাজী ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা বহু দিন থেকেই চিন্তা করেছিলেন। সেইজন্য তিনি কংগ্রেস সভাপতিরূপে প্রথম পরিকল্পনা কমিশন গঠন করেছিলেন। কিন্তু তা বলে তিনি কখনও বলেন নি যে মারকসীয় অর্থনৈতিক নির্দেশ অনুসারেই ভারতকে সমাজতন্ত্রের পথে এগোতে হবে।

সুভাষচন্দ্র দেশনায়ক ছিলেন। তিনি চিন্তানায়ক ছিলেন না। চিন্তানায়ক হওয়ার চেষ্টাও তিনি কোনও দিন করেন নি। তাই সুভাষচন্দ্র কী কী সমর্থন করতেন, কী কী চাইতেন তা মোটামুটি বলা গেলেও তাঁর বক্তৃতাবলী বা বিভিন্ন প্রবন্ধ থেকে কোনও বিশিষ্ট ইজম বা 'বাদ' দাঁড় করানো কঠিন।

তা সত্ত্বেও কেউ যদি 'সুভাষবাদ' বলে কোনও ইজম দাঁড় করাতে চান আত্ম-সন্তুষ্টির জন্য তা করতে পারেন। কিন্তু যদি সঙ্গে সঙ্গে আবার বলেন যে, সেই সুভাষবাদই হলো ভারতীয় মারকসবাদ তাহলে সেটা 'হাঁসজারু' গোছের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, সুভাষচন্দ্র স্পষ্ট বলে গিয়েছেন যে, মারকসবাদের দুটো বড় জিনিস তিনি মোটেই মানেন না।

একজন ফরওয়ারড ব্লক নেতা সেদিন বলছিলেন : কেন, সুভাষবাদই ভারতের মারকসবাদ বলায় তোমার এত আপত্তি কিসে। মারকসবাদই লেনিনবাদ, মারকসবাদই মাও বাদ—এগুলি তো বেশ মানতে পারছ।

বিস্তারিত বিতর্কে না গিয়ে শুধু বলেছিলাম : লেনিনবাদ বা মাও বাদের সব কিছু নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে আপনি শুধু দয়া করে দেখান, লেনিন বা মাও সে তুং কোথাও বলেছেন যে আমরা মারকসবাদের এই এই মূল বক্তব্য মানি না। নেতাজী কিন্তু তা বলেছেন। তবু আপনারা বলবেন সুভাষবাদই মারকসবাদ!

*

পৃথিবীর এত দলই যখন মারকসবাদ গ্রহণ করেছে তখন ফরওয়ারড ব্লকও না হয় মারকসবাদ গ্রহণ করল। তাতে দলের ক্ষতি হবে না, লাভ হবে—সেটা ফরওয়ারড ব্লকের সদস্যদের বিচার্য বিষয়। বাইরের লোকের তা নিয়ে আপত্তি করার তেমন কিছু থাকতে পারে না। মারকসবাদ ভুল না ঠিক সে বিতর্কের অবতারণাও এখানে নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু তা বলে নিশ্চয়ই ফরওয়ারড ব্লকের বর্তমান সদস্যদের সুভাষচন্দ্রকে মারকসবাদী বলার অধিকার কেউ লিখে দেন নি! সুভাষচন্দ্র ফরওয়ারড ব্লক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাই ফরওয়ারড ব্লকের বর্তমান নেতাদের সুভাষচন্দ্রের নামে সব কিছু চালাবার অধিকার আছে—এ যুক্তিও কোনও সুস্থ মস্তিষ্কের লোক কিছুতেই মানতে পারবেন না।

ফরওয়ারড ব্লকের নেতাদের কাছে আমার আবেদন : নেতাজীর নামে আপনারা তো অনেক দিন অনেক কিছু চালালেন, এবার তাঁকে রেহাই দিন। আপনারা না মাথা ঘামালেও সুভাষচন্দ্র নেতাজীরূপেই ভারতবাসীর কাছে বেঁচে থাকবেন।

নবারুণ গুপ্ত

দেবরাজ

ভূতের বেগার?

১৯২০ সনের ১৭ ফেব্রুয়ারি। প্রচণ্ড শীত পড়েছে বার্লিনে। হঠাৎ কার যেন নজরে পড়লো একটা খালের জলে একটি মেয়ে বুঝি জলকেলি করছে। কিন্তু ওই নিদারুণ ঠান্ডার জলে মাতামাতি করবে এমন মাথা খারাপ কার হয়েছে? সন্দেহ হলো হয়তো বা মেয়েটি পা পিছলে জলে পড়ে গিয়েছে কিংবা হয়তো সে আত্মহত্যা করতে খালের জলে ঝাঁপ দিয়েছে। চারদিকে শোরগোল পড়ে গেল, দু' চারজন লোক লাফ দিয়ে জলে নেমে সাঁতার কেটে মেয়েটিকে ডাঙায় তুললো। সে তখন অচৈতন্য। দেখা গেল ভদ্রঘরের একটি অল্পবয়সী মেয়ে। তার শরীরের অনেক জায়গাতেই পুরোনো ক্ষত-চিহ্ন যেন সেসব জায়গায় ঘা হয়েছিল কিংবা কেটেকুটে গিয়েছিল, ক্ষত শুকিয়ে গেছে কিন্তু দাগ মিলোয়নি। বয়স তার উনিশ কুড়ি হবে। দেখতে শুনতেও ভাল। তা হলে কী মনে কোনও আঘাত পেয়ে সে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল খালের জলে ডুবে? খানিকক্ষণ তার শুশ্রূষা করার পর তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ালো, জ্ঞানও ফিরে এলো। জেরায় সে স্বীকার করলো আত্মঘাতী হতেই সে চেয়েছিল।

কিন্তু কিসের দুঃখে গোড়ায় সে তা ভাঙতে চায়নি। শুধু বলেছিল তার নাম মিসেস চেকোভ্স্কি। জীবনে এর মধ্যেই সে অনেক দাগা পেয়েছে। এমন তো আখছার হচ্ছে। কাজেই জলেডোবা মেয়েটির কাহিনী নিয়ে কেউ বিশেষ মাথা ঘামায়নি। কিন্তু সুস্থ হয়ে ওঠবার পর সে যা বললে তাতে সকলের চোখ কপালে উঠলো। সে নাকি মিসেস চেকোভ্স্কি নয়, তার চোদ্দ পুরুষের কারুর সঙ্গে কোনো চেকোভ্স্কির সম্পর্ক নেই। ওটা তার ছদ্মনাম। নিজেকে বাঁচাবার জন্যেই তাকে নাকি নাম ভাঁড়াতে হয়েছে। সে আর কেউ নয়, রুশিয়ার শেষ জার দ্বিতীয় নিকোলাসের সে নাকি ছোট মেয়ে অ্যানাস্টেসিয়া নিকোলায়েভনা। কম্যুনিস্ট রুশিয়া থেকে ফেরার হয়েছে বলে সোভিয়েট চরেদের কাছ থেকে বাঁচবার জন্যে নাম নিয়েছে মিসেস চেকোভ্স্কি। একবার সে সাক্ষাৎ যমের হাত থেকে বেঁচে পালিয়ে এসেছে, আবার ধরা পড়লে আর রক্ষে নেই।

যারা শুনলো তাদের তো আক্কেল গুড়ুম। মেয়েটি বলে কী? অ্যানাস্টেসিয়া সত্যিই দ্বিতীয় নিকোলাসের ছোট মেয়ের নাম। মিসেস চেকোভ্স্কি বলে যিনি পরিচয় দিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে রুশ রাজকুমারীর চেহারারও আদল আছে। বয়সও একই রকম। কিন্তু ১৯১৮ সনের ১৮ জুলাই যখন জার নিকোলাস আর তাঁর পরিবারের সকলকে ইয়েকাটেরিনবুর্গে গুলি করে মেরে ফেলা হয় তখন তাঁর মেয়েদের একজনও তো বাদ যাননি—ওলগা, তাতিয়ানা, মারিয়া, আর অ্যানাস্টেসিয়া সকলেই তো একসঙ্গে বিদ্রোহী বলশেভিকদের বন্দুকের শিকার হয়েছিলেন। তা হলে কেমন করে মিসেস চেকোভ্স্কির দাবি মেনে নেওয়া যায়? উত্তরে তিনি যে কাহিনী সকলকে বলেছিলেন তা গল্প কথাকেও হার মানায়। বলশেভিক ফৌজের গুলিতে তিনি নাকি আহত হয়েছিলেন মাত্র, মারা যাননি। জ্ঞান ফিরে এলে তিনি দেখেন তাঁর মা, বাপ, ভাই, বোন সকলেই প্রাণ হারিয়েছেন, এক তিনি ছাড়া। তারপর দুজন সেপাইয়ের সাহায্যে কেমন করে তিনি পালিয়ে আসেন সাইবেরিয়ার বন্দীশালা থেকে, কেমন করে একজন পোলিশ সেনা তাঁকে রুমানিয়াতে নিয়ে আসে সে এক রীতিমত রোমাঞ্চকর গল্প।

সে গল্প কেউ বিশ্বাস করলে, কেউ করলে না। যারা করলে না তারা বললে ওসব স্রেফ বানানো, কস্মিনকালে মিসেস চেকোভ্স্কি জারের প্রাসাদের চৌহদ্দি মাড়াননি, তাঁর সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক থাকা তো দূরের কথা। খোঁজখবর নিয়ে কেউ কেউ বললে মেয়েটা জোচ্চর, আসলে ও হচ্ছে পোল্যান্ডের মেয়ে, আদৌ রুশী নয়, ওর বাপ ছিল খেতমজুর। আসল নাম ওর হচ্ছে ফ্রানজিস্কা শান্‌ৎস্কোস্কি। যেসব কাটা পোড়ার দাগ ওর গায়ে রয়েছে তার সঙ্গে বলশেভিকদের অত্যাচারের কোনও সম্পর্ক নেই, সে দাগ হয়েছে একটা বারুদের কারখানার বিস্ফোরণে ঝলসে যাওয়ার ফলে। এসব কথা কিন্তু যারা মিসেস চেকোভ্স্কিকেই আসল অ্যানাস্টেসিয়া বলে মনে করে তারা কানে তোলেনি। তাদের সপক্ষেও প্রমাণ বেশ জোরালো। জেরা করে দেখা গেছে জারের রাজপ্রাসাদের হালচাল আদব-কায়দা সে দিব্যি জানে। রাজপরিবারের অনেক গোপন খবরই তার জানা। একজন খেতমজুরের মেয়ে কেমন করে সেসব খবর পাবে? তার ওপর আসল অ্যানাস্টেসিয়ার কান আর তার কান নাকি অবিকল এক, হাতের লেখাতেও নাকি আশ্চর্য মিল। জারের অন্দরমহলে যে ভণ্ড সন্ন্যাসী রাসপুটিনের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল তার মেয়ে মারিয়াও বলেছেন এই তো অ্যানাস্টেসিয়া।

কিন্তু অ্যানাস্টেসিয়া বলে যিনি নিজেকে জাহির করছেন তিনি ঠেকে গেছেন আইনের বেড়ায়। তাঁর দাবি প্রমাণ করার জন্যে তিনি মামলা রুজু করেন ৩৬ বছর আগে হামবুর্গে। ইতিমধ্যে তিনি তাঁর ছদ্মনাম মিসেস চেকোভ্স্কি ছেড়ে নতুন নাম নিয়েছেন অ্যানা অ্যান্ডারসন। এখন সে নামই চালু, যদিও এক মার্কিন ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ জন মানাহানকে বিয়ে করে শ্রীমতী মানাহান হয়েছেন ১৯৬৮ সনে। তাঁর মামলায় আগের বছর বার্লিন কোর্ট রায় দেয় জারের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের মধ্যে নিকটতম হচ্ছেন ডাচেস অব মেকলেনবুর্গ। সে রায় রদ করানোর জন্যেই অ্যানা অ্যান্ডারসনের মামলা। সে মামলায় তিনি হেরে যান ১৯৬১ সনে। তাতেও তিনি হাল না ছেড়ে দিয়ে সে রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করেন। সে আপীলও নামঞ্জুর হয় ১৯৬৮ সনের ২৮ ফেব্রুয়ারি। কিন্তু মিস অ্যান্ডারসন তাতেও ভেঙে পড়েননি, বিচার প্রার্থী হলেন কার্লসরুহের ফেডারেল কোর্ট অব অ্যাপীলের কাছে। সে কোর্টের রায় বেরিয়েছে ১৭ ফেব্রুয়ারি। এবারেও তাঁর হার। কোর্টের প্রশ্ন: ১৯২০ সনে যখন প্রমাণপত্র পাওয়া অনেক সোজা হতো তখন কেন তিনি তাঁর দাবি তোলেননি?

এ জিজ্ঞাসার জবাব নেই—আবার আছেও। ১৯২০ সনে তো ডামাডোল চলছে ইউরোপের দেশে দেশে। রুশিয়াতে কম্যুনিস্ট সরকার তখন জাঁকিয়ে বসেছেন। মামলা লড়তে গেলে তাঁরা কোনও সাহায্য তো করতেনই না, উলটে হয়তো কেউ লাগিয়ে দিতেন রাজবংশের শেষ সন্তানের পেছনে। আবার এ প্রশ্নও তোলা যায়, ১৯২০ সনে যখন তিনি নিজের পরিচয় লোককে জানিয়েই দিলেন তখন আর আইনের শরণ নিয়ে নিজের দাবিটা পাকা করিয়ে নিতেই বা কি বাধা ছিল? নিলে তো হাঙ্গামা তখনই চুকে যেত। ব্যাপারটা আরও ঘোরালো হয়ে দাঁড়িয়েছে এই জন্যে যে এ মামলায় জিতলে জারের লুকোনো সম্পত্তির তিনিই হবেন মালিকানী। লোকের ধারণা রুশিয়ার বাইরে ইউরোপের কোনও ব্যাংকে জারের লক্ষ লক্ষ টাকা পচছে—যে প্রমাণ করতে পারবে রোমানফ বংশের সে শেষ সন্তান, টাকাটা তারই ভাগ্যে নাচছে। অ্যানা অ্যান্ডারসনের নজর আসলে নাকি সেই টাকার দিকে। কিন্তু সে টাকা কোথায় তার হদিস কেউ জানে না। ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের তরফ থেকে অস্বীকার করা হয়েছে যে জার নিকোলাসের কিংবা তাঁর আমলের সরকারের কোনও টাকা গচ্ছিত আছে তাঁদের কাছে। বেয়ারিং ব্রাদার্স যাঁদের কাছে জারেরা টাকা জমা রাখতেন তাঁরাও বলেছেন এসবের কিছুই জানেন না। তবে কী এ মামলা কেবল ভূতের বেগার?

অফিস যাবার মুখে দাম্পত্য কলহ   ট্রেনে ড্রাইভারের ওপর ঝাল মেটালেন   শেয়ালদায় ট্রেন চললো না। ফলে অন্তত একজনের বিয়ে পণ্ড হল

‘কার্য’-কারণ’

ছেলেবেলায় নটে-গাছ মুড়োনোর সেই নিবিড় ছড়াটি সকলেই শুনে থাকবেন। কারো মেটে-দাওয়ার পাশে একটি কাঁটা-নটে বা চাঁপা-নটে বিকশিত হয়েছিল। কোনো ক্ষুধিত ছাগল (অথবা ছাগল মাত্রেই সর্বদা ক্ষুধিত—কিছুই চিবুচ্ছে না এ অবস্থায় কোনো ছাগলকে কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না) সেটি মুড়িয়ে খেয়েছিল। অতঃপর শুরু হল ছাগলের এই অন্যায়ের উৎস-সন্ধান। কারণ-সূত্র অনুসরণ করতে করতে অবশেষে পৌঁছোনো গেল পিঁপড়ের কাছে। পিঁপড়ে সরু গলায় জানিয়ে দিলে, তার খাবার জিনিস সে খাবেই এবং ‘গুড়-গুড়িতে’ও সে অবশ্য অবশ্য যাবে। ‘গুড়-গুড়িতে’ যাওয়া যে কী বস্তু, সেটা অবশ্য আমি এখনো অবধারণ করতে পারিনি।

মনে পড়ছে স্কুলের নীচু ক্লাসে সহ-পাঠী পিলুয়াকে। ‘পিলুয়া’ অবশ্যই তার ভালো নাম নয়—শিবতোষ-দেবতোষ গোছের কী যেন একটা ছিল। এটি তার ডাক নাম কিনা তাতেও সন্দেহ আছে, খুব সম্ভব উত্তর বাংলার ম্যালেরিয়ায় তার প্লীহাগত কিঞ্চিৎ সমৃদ্ধি ঘটেছিল বলেই বন্ধুদের কাছ থেকে নামটি সে অর্জন করে থাকবে।

পিলুয়া একবার ভূগোলের পরীক্ষায় পাঁচ কিংবা সাত—এই রকম নম্বর পেয়েছিল। স্বভাবতই ভূগোলের মাস্টারমশাই তার এই কৃতিত্বের নেপথ্য-রহস্য জানবার জন্যে কৌতূহলী হলেন। নিপাট ভালোমানুষ পিলুয়া—প্লীহা-জর্জরিত শরীরে অতি কষ্টে দণ্ডায়মান হল।

: কিরে, কী ব্যাপার?—মাস্টারমশাই প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করলেন।

বার কয়েক পিলুয়ার ঠোঁট কাঁপল। তারপর হঠাৎ বলে ফেলল : কাঁটাল, স্যার।

: কাঁটাল।

উত্তরটা এমন অভাবিত যে স্যার একটা খাবি খেলেন। ভূগোল-স্যার পারতপক্ষে কাউকে মারতেন না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসশুদ্ধ আমাদের সকলের চোখ চলে গেল টেবিলের ওপর রাখা চকচকে লম্বা ম্যাপ-পয়েন্টারের দিকে।

: কাঁটাল কি রকম?

একটা ঢোঁক গিলে পিলুয়া বললে, আমাদের বাগানে যে দুটো বড়ো বড়ো কাঁটাল পেকেছিল, স্যার।

মাস্টার মশাই রসিক মানুষ ছিলেন। হাসলেন না, কেবল ঠোঁটের কোণায় একটু বাঁক নিলে, রোল্ড-গোল্ড্ ফ্রেমের চশমার নীচে চোখ দুটো চকচকে করে উঠল।

: হুঁ, বলে যা।

: মা সেই কাঁটাল দিয়ে অনেক বড়া—

কিন্তু প্রশ্নোত্তরের এর বেশি বিবরণ অনাবশ্যক। আসল ব্যাপার হল, পিলুয়াকে সেই কাঁটালের বড়া—খুব সম্ভব অনিচ্ছায় নয়—একটু বেশি পরিমাণেই আত্মসাৎ করতে হয়েছিল। এবং তাতে করে ম্যালেরিয়া-কাতর শরীরে অবধারিত পৈটিক বিপর্যয়। এমন অবস্থায় ভূগোলে মনোনিবেশ করা কার পক্ষে সম্ভব? ফল—

ফল, ভূগোলে পাঁচ অথবা পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি।

না, পিলুয়াকে দোষ দেওয়া যায় না। বাগানে দুটো বড়ো বড়ো কাঁটাল পাকলে কী-ই বা করতে পারে সে? এবং তা দিয়ে মা যদি বড়া ভাজেন, তা হলে সে তো আরো নিরুপায়।

সুতরাং আমার পরিচিত কোনো ভদ্রলোকের একটি চার বছরের ছেলে যে জলে ডুবে মারা গেল, তাতে আমি কিছুমাত্র

বিস্মিত হইনি। ইংরিজিতে একটি বচন আছে : 'দেয়ারস্ নাথিং নিউ আন্ডার দ্য সান'—সূর্যের তলদেশে অভিনব কিছুই নেই। সুতরাং নটে গাছ এবং ভূগোলের কাজ আর এফেক্টের অনুসরণ করলে এই শিশুটির অপঘাতের পূর্বভূমিকা এই :

(ক) কিছু কর্মবীরের মনে হল, বিনা মূলধনে অতীব লাভজনক এমন কোনো ব্যবসা করা যায় কিনা যাতে নির্ভাবনায় প্রচুর অর্থাগম হতে পারে। চুরি-ডাকাতি অবশ্যই করা যায়, কিন্তু তাতে কিছু রিস্ক রয়েছে। তার চাইতে—

(খ) অদূরেই বসন্তের চঞ্চল হাওয়ায় এবং স্নিগ্ধ কিরণে শিহরিত আর চিক্চিকিত হচ্ছে রেলওয়ের ইলেক্ট্রিক ট্র্যাক্শনের তামার তার। সঙ্গে সঙ্গেই সব ক'টি দৃষ্টি নিবদ্ধ হল তার দিকে। ওই তো রয়েছে—একেবারে 'দুয়ার হইতে অদূরে'। তামার এখন নিদারুণ কৌলীন্য—বিচক্ষণ ব্যবসায়ীরা কেনার জন্যে মুখিয়ে রয়েছেন—কোথা থেকে এল এ-সব অসঙ্গত প্রশ্ন তাঁরা কদাপি করেন না। অর—

(গ) আর কে না জানে, রেলের জিনিসপত্র তো সর্বজনীন সম্পত্তি। রেলের কামরাতেও তা লিপিবদ্ধ আছে। রেলের একটা রক্ষিবাহিনী বোধ হয় আছে, কিন্তু তারা তো প্রায়শঃ ঈশ্বরের মতো দুর্দর্শন—খুব সম্ভব 'স্বাধীন ব্যবসায়ের' পৃষ্ঠপোষকও তাদের মধ্যে আছে—আর সারা ভারতের রেললাইন পাহারা দিতে গেলে সর্ব-ভারতীয় সৈন্যদলেও কুলোবে না। অতএব—

(ঘ) কয়েকটি ছেদন-যন্ত্র সংগ্রহ, একটু ঊর্ধ্বারোহণ—কাজ কম্প্লীট।

(ঙ) পরদিন স্বাভাবিক নিয়মেই ট্রেন বন্ধ। কোনো ব্যবস্থা চালু হওয়ার আগেই যাত্রীদের অবধারিত বিক্ষোভ—তারপর নিদারুণ ক্রোধ, আর ক্রোধ হলেই সামনে যাকে পাওয়া যাবে, তাকেই ঠ্যাঙানো আমাদের একটি আত্মিক কর্তব্য। তাই পত্রপাঠ স্টেশন তছনছ কাগজপত্র ছাই, টেলিফোন বিচূর্ণ, স্টেশন মাস্টার এবং তাঁর সহযোগিবৃন্দ প্রহৃত, আহত, পলাতক (অবশ্য পলাবার মতো শরীরের অবস্থা তাঁদের থাকলে)।

(চ) ক্রুদ্ধেরা ছাড়াও আরো হাজার-হাজার যাত্রী নিরুপায়—অন্তত বাসের বিকল্প যাঁদের নেই। তাঁরা স্টেশনে বসে কপাল চাপড়ে 'হাপু'-সঙ্গীতে রত।

(ছ) কোনো রেলস্টেশন থেকে সাত মাইল দূরের একটি গৃহিণী ভেবে কূল-কিনারা পাচ্ছেন না। ভোরের ট্রেনে যে মানুষটির আসবার কথা—বেলা একটাতেও তাঁর দেখা নেই। স্বভাবতই দুর্ঘটনার আতঙ্ক। তারপর যখন মাথা খারাপ হওয়ার অবস্থা—তখন ছুটে বেরুনো, যদি গ্রামের কারো কাছে কোনো সন্ধান মেলে।

(ঝ) মা-র সেই উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় চার বছরের ছেলেটি সম্পূর্ণ মুক্ত পুরুষ। নিরিবিলি পায়ে নির্জন দুপুরে তার পুকুরঘাটে যাত্রা। তারপর—

তারপর অনাবশ্যক।

'নাথিং নিউ আন্ডার দ্য সান'—বাস্তবিক। পিঁপড়ে কামড়াবে, কাঁটাল পাকবে, রেলের তারও কাটা হবে। কোনো প্রতীকার নেই—কারণ, বিশ্বনীতির মতোই এ অমোঘ।

আমরা কী করতে পারি? কেবল কার্য-কারণসূত্রই অনুধাবন করতে পারি। আর কিছুই নয়।

বিলাপ

তবে কি তুমিও সেই ভাগ্যহীন বংশের সন্তান,
স্বাভাবিকভাবে বৃত, পরিচয়ে পান্ডুর প্রান্তিক,
সতর্কীকরণে সিদ্ধ রোমাঞ্চক দৃষ্টান্তস্বরূপ—
বিখ্যাত ঘোড়ার পিঠে বৈদ্যুতিক কিছু পথ চ'লে
হঠাৎ খুরের তলে প'ড়ে যায় যারা,
সম্ভাব্য সারথি, হয় নিজেরাই চাকার ঘূর্ণনে
পিষ্টতর, অভিলাষ অতিরিক্ত ব'লে,
কিংবা যেন উল্কা, যার গতিবেগ পতনে উজ্জ্বল?
আমি, মুগ্ধ, তাকাই তোমার দিকে, নিজে নিরাপদ।
মনে হয়, তুমি দিলে সেই মূল্য
যার জন্য অন্যদের চালে খড়, জোটে ডাল-ভাত,
কখনো বা হৈমন্তিক আঙিনায়
বিশীর্ণ ডালেও ধরে সপ্রতিভ দু-একটি ফল।
মনে হয়, যেহেতু তোমার
ঐশ্বর্য সহজ ছিলো, তাই প্রতিনিধিত্বের আঁধার গৌরবে
অন্যদের সব ঋণ শোধ ক'রে নিজে নিঃস্ব হ'লে।
কিন্তু আমাদের
যা ছিলো গভীরতর কাঙ্ক্ষণীয় তা নয় তোমার আত্মবলি,
নয় বিবেচনাহীন পরার্থপরতা,
তা তোমারই সুপক্ক, প্রচুরতর স্বকীয় ফসল।

ভেবো না, বুঝিনি আমি তোমার হৃদয়লব্ধ অভিসন্ধি:
বিচ্ছেদের আর্তির উত্তরে
প্রতিহিংসাপরায়ণ তাৎক্ষণিক উদ্যমে অধীর—
কিছু অস্তরাগ, কিছু বিতর্ক, বেদনা,
আরো বেশি কুটিল উদ্‌ভাবন প্রয়োজনমতো,
কিছু বা বাস্তব তথ্য, ইন্দ্রিয়ের সূক্ষ্ম সমাচার:
এই সব উপাদানে কুটনো কেটে, উগ্রকাম চুল্লিতে চাপিয়ে
প্রতিটি বুদ্বুদে তুমি দেখেছিলে অনিবার্য মিলনসংকেত—
না, শুধু সংকেত নয়, আরো তীব্র উৎসাহ তোমার,
আরো বড়ো দুঃসাহস: যেন সেই ঈপ্সিতা ও অনুপস্থিতা
রয়েছে বিলীন হ'য়ে রন্ধনীয় দ্রব্যসামগ্রীতে,
রয়েছে শাশ্বতভাবে নানাবিধ মিশ্রণে ও রূপান্তরণে
(যেমন জলের মধ্যে স্বাদময় অদৃশ্য লবণ,
অথবা সামুদ্রিক বাতাসে সুবিস্তীর্ণ অস্বাদ লবণ)—
এই ধারণায় তুমি শিল্পী ও শিল্পের ভেদ ভুলে গিয়ে
চেয়েছিলে প্রবিষ্ট ও সংরক্ষিত হ'তে
প্রেমিকার গূঢ়তম অন্তঃপুরে — যেমন ডিমের মধ্যে পাখি,
অথবা গর্ভের জলে ভাসমান ভ্রূণ।
কিংবা যেন তপ্ত রসায়নে
জ্বালিয়ে, গালিয়ে তাকে সঞ্চালিত ক'রে দিয়েছিলে
তোমার রক্তের স্রোতে, যাতে সে কখনো
পালাতে না পারে আর। কিন্তু সেই বিরাট চেষ্টার চাপে
টুকরো হ'য়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেলো তোমার জীবন,
তাতে আর জোড়া দিতে পারলে না। কেন পারলে না?

অথচ, তুমিও জানো, বায়ুশূন্য কৌটোর ভিতরে
ঘনিষ্ঠ চিংড়ির মতো আমাদের অস্তিত্ব সরল নয়।
জরায়ু, ডিমের খোলা, মৃত্তিকার অভ্যন্তরফুঁড়ে
জন্ম নিতে হয় ব'লে আমাদের জন্মান্তরলিপ্সু চেতনায়
সেই আদি বিচ্ছেদের অনুভূতি ফিরে আসে বার-বার, দুর্নিবারভাবে।
প্রেম, গান, স্বজ্ঞায় সৌন্দর্যবোধ, সৃষ্টির প্রেরণা —
কিছু নেই যা নয় বিচ্ছেদে বদ্ধমূল, নয় দুই বিপরীত টানে
বিকীর্ণ জ্যোতির বিন্দু — হাতুড়ি ও প্রস্তরের মধ্যবর্তী।
আর তাই
আমরা অনবরত হ'তে চাই
অনিশ্চিত দূর দেশে ভ্রাম্যমাণ,
মাতার আশ্রয়চ্যুত বিপন্ন সন্তান,
যেন এক নামহীন সন্ধানে আহত,
চাই সেই মোহিনীকে, দ্যুতিময় যার ব্যবধান
জাগায় দূরভিলাষ, অতিক্রান্ত হয় না কখনো।
এই দ্বৈত আমাদের মূলধন, মৌলিক বিধান,
দ্বন্দ্বেই জীবন চলমান,
প্রাপ্তি নয়, বাসনাই সব। তোমার বাসনা ছিলো,
আগ্নেয়, দারুণ ছিলো বাসনা তোমার।
তবু কেন, কেন পারলে না
উড্ডীন পাখির মতো স্বাধীন ও সঙ্গহীন হ'তে,
জ্যামুক্ত বাণের মতো স্পন্দমান,
বাড়ন্ত গাছের মতো বন্ধনেও উত্থানসক্ষম,
যাতে তুমি বাসনাকে ক্ষমতায় পরিণত ক'রে
হ'তে পারো ঋদ্ধতর, স্বাবলম্বী, অনাক্রমণীয়?
যে-ফাঁদ অন্যের জন্য পেতেছিলে, তাতে নিজে ধরা দিলে কেন?

শোনো, ছেলে, আমি জানি অন্ধকার কেমন সুস্বাদু হ'তে পারে,
আপাতত কেমন স্বয়ংপূর্ণ, যেন প্রায় দৈবের অতীত।
কিন্তু অন্ধকার,
তাও নয় নিথর একস্বময়, নিরঞ্জন — স্তব্ধ নয়, স্বরগ্রামে
পরিবর্তমান।
তাকে নিয়ে কিছু কাজ করা যায়, গ'ড়ে তোলা যায়,
তা পারে জীবনব্যাপী শ্রম হ'তে, দায়িত্বে ও অনুবন্ধে অফুরান,
রূপ দিতে পারে সব অনাগত ঋতু, জ্ঞান, অভিজ্ঞতাকে।
আছে স্মৃতি — অন্তঃসার — অন্ধকার তাই আশান্বিত।
স্মৃতি জ্ব'লে ওঠে রশ্মি, ব'য়ে যায় বিপুল বাতাস ছ'য়ে দিকে-দিকে,
গহ্বরে ছড়িয়ে পড়ে আলকাৎরায় বিচ্ছুরিত বর্ণাবলি,
ফুটে ওঠে দৃশ্য, ভাষা — চিন্তনীয়, অস্থির, স্বপ্নিল —
ল্যাম্পোস্টের বিভায় পিঙ্গল হ'য়ে, কিংবা গ্রাম্য কুয়াশায়
আনীল-ধবল,
কখনো বা নক্ষত্রপুঞ্জের ফাঁকে জ্বলন্ত, গভীরতর নীল,—
সবই অতি অশান্তিজনকভাবে অর্থবহ :
যেন কোনো আহ্বান, জাগাতে চায় তোমাকে আবার,
দাবি করে উত্তর তোমার কাছে।
রাত্রির চলন্ত ট্রেনে — মনে পড়ে — তুমি একবার
ঝাপসা ঘুমে, ভুলে গিয়ে ভূগোল, তারিখ,
অনুভব করেছিলে জীবন ও যৌবনের অমেয় বিস্ময়
ভারাক্রান্ত, সম্ভাবনাময়,
যেন তারই উদ্দেশে তোমার সব ভ্রমণ, সময়
এ-মুহূর্তে নতুন আরম্ভ হ'লো। এও সেইমতো।
কথা ছিলো, তুমি হবে দর্শক এবং লিপিকার,
যুগপৎ ভুক্তভোগী, বৈজ্ঞানিক;
আলিঙ্গনে লিপ্ত, তবু নির্ভুল গণক —
কেমন রক্তের চাপ বেড়ে যায় প্রণয়সংগমে,

কত দ্রুত হয় নাড়ি, কতটুকু স্ফীতি পায় শিরা,
এবং চুম্বন কোন তৃপ্তিহীন লালসায় তরঙ্গিত হ'য়ে
অধরসান্নিধ্য ছেড়ে চ'লে যায় দূরে,
আরো দূরে — এখনো-দৃশ্যাতীত সৈকতের দিকে।
কথা ছিলো, খুঁজে নেবে নম্র কোনো বহিরাশ্রয়,
যার মধ্যে তোমার ভঙ্গুর সত্তা ফলের ঘনত্ব পাবে ধীরে-ধীরে,
এদিকে রাস্তায় তুমি যে-কোনো অন্যের মতো সাবলীলভাবে
পরোটা ও মাংস খেয়ে, মুখে পুরে এলাচের দানা,
বাস্-এর এঁটেল ভিড়ে ঈষৎ আরামে দাঁড়াবার
স্থানটুকু জুটে গেলে প্রীত হবে প্রতিবেশিতায়।
কেননা জগৎ আছে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী,
দুর্জয়, অনতিক্রম্য, ক্ষমাহীন। কোনোমতে তাকে ফাঁকি দেয়া চাই।
মাটিতে পা রাখা চাই, সেটা প্রাথমিক —
অন্তত ঝুলে থাকা, শূন্যে খসে না-প'ড়ে, নিরভিমান
কোনো ছুতো, সূত্র ধ'রে ঝুলে থাকা — সংগোপন পরিকল্পনায়।
— কিন্তু তুমি ভয়াবহভাবে
যখন কোমল রৌদ্রে তারুণ্যকুসুমে সব পাপড়িও খোলোনি,
বালকের হাতে ছেঁড়া অসম্পূর্ণ মঞ্জরীর মতো
উদ্ঘাটিত হ'য়ে গেলে হৃদয়ের একটি ঝঙ্কার।
যাত্রাপথে, কোনো ভুল ইস্টেশনে ফেলে-আসা তোরঙ্গের মতো
নিজেকে হারিয়ে ফেলে, রুদ্ধ ক'রে দিলে সব দ্বার।
আমার বিলাপ তাই। অন্য প্রান্তে ঘন হ'য়ে নেমে আসে শীত।

একটি কবিতা খুঁজে

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

কবিতার সুতো ঐ নাগরিক পলাশের পাংশু জিভ রক্তের মতন
    কোজাপূর্ণিমার ছাদ ছুঁয়ে দেখে চাঁদ বহু দূরে
এবং যা রীতি, ছন্দ, প্রতিমার নিজস্ব গঠন
    তাকে ক'রে কাচচূর্ণ, ঘুড়ির প্রকৃতপক্ষ যারা
এবং কেবলই তার পিছু নেয়, যে নয় ভাগ্যের
    আমাদের রেষারেষি বন্ধ ক'রে অন্তত বসেছে
আপন দুয়ার জুড়ে—শান্তি, সাতমহল, কবুতর
লক্ষ্মীর স্বচ্ছন্দ পেঁচা বেঁচে থাকে রাতের মন্থর
    সংসারে ধ্বংসের সুতো অথবা ধনের—মনে ক'রে।

কোনো কবিতা
    এর সুতো ছাড়ে প্রাজ্ঞ যে-সভায়
তারই কাছাকাছি কোনো চারুবাক্ ঈশ্বরে আঘাত
                করে কাঠুরের অস্ত্র

খরশান্, সমস্ত পৃথিবী
দুঃখের মতন ন্যাংটো নেড়িকুত্তো যেন শীতকাতর
পায়ে পায়ে ঘোরে আধা কবিতার কাদার কাঠামো—
সুতো ছেঁড়ে, ছুতোর পেরেকে লেগে, পলাশের মতো
একটি কবিতা খুঁজে মরে কবি শান্ত, মুখ বুজে।

কদ্দূর দাঁড়াবে জানি না

সুধেন্দু মল্লিক

টুকরো কাচটা কুড়িয়ে রাখি, অস্তাচলের
সূর্য জানে শূন্য আকাশ পরিভ্রমণ ব্যর্থ হয় না।
    টুকরো কাচটা কুড়িয়ে রাখি। স্ফটিকমালা
দিচ্ছেটা কে? সেটা আমার দৃষ্টিভঙ্গী যেমন আমার মায়ের কাছে
দুনিয়ার সব ক'টা পাজী, কেবল তাঁর ছেলেটিই ভালো।
সে কথা অগ্রাহ্য হয় যেখানে লোক উল্টো গাইছে!
    আমাদের সব গোত্রদাতা মানে সেই মুনিঋষিরা
ভরা কলির ব্যাপার দেখলে চোখ তুলে মূর্চ্ছো যেতেন।
সে যাক যা বলছিলাম আমার একটা নতুন কাগজ আছে
        তাতেই নৌকো ছোট্ট নৌকো
বুকটা উঁচু মনটা দরাজ। আজ একটা নীল জাহাজের
সঙ্গে একটু ভাব করেছি, নৌকো যখন
ছাড়বো তখন ও তার বাঁশী বাজাবে।
    এই মতো চুক্তি হয়েছে কদ্দূর দাঁড়াবে জানি না।

কতোদিন তো যাই না কোথাও। কখন গাছের
হৃদয় খুলে বেরিয়ে আসে বাউণ্ডুলে
কে বলতে পারে আমি নিজেই তো ঠিক জানি না।
টুকরো কাচটা কুড়িয়ে রাখি। মোহরকে মোহর অথবা
টাকাকে টাকাই হলো। সেই কি এমন ক্যালনা নাকি—
বিদেশে কে দেখবে আমাকে! অবশ্য সঞ্চয়ী নই
চাইলে কেউ দিয়েই ফেলবো। (দেব না, তেমন পাষাণ?)
        কিংবা অন্ততপক্ষে
বুকে তো বেঁধাতে পারবো সাপ যেমন ছোবলে খুশী।
আত্মহত্যা? দূর বাপু সে কিছু ভালো কথা নয়।
টুকরো কাচটা কুড়িয়ে রাখি—একেবারে ভিখিরি নই তো।

দেশীয়
সিগারেট শিল্প
পঙ্গু কেন?
স্বাধীন পৃথিবীতে তামাক
উৎপাদনকারী ও রপ্তানীকারী
বৃহৎ দেশগুলির মধ্যে ভারতের
স্থান দ্বিতীয়। ভারতে জনবল প্রচুর,
মূলধনেরও অভাব নেই। প্রয়োগকৌশলের
জ্ঞানেও ভারত যথেষ্ট অগ্রসর। তবুও স্বাধীন
ভারতের উন্নতিশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় দেশীয়
সিগারেট শিল্প তার যথাযোগ্য প্রসার ও স্থান লাভ
করতে পারে নি। এর কারণ অনুসন্ধান করা কিছু
কঠিন নয়। বহুকাল থেকে এক বিদেশী একচেটিয়া
প্রতিষ্ঠান শিকড় গেড়ে রয়েছেন এবং আজও দেশীয়
শিল্পের স্বাভাবিক উন্নতিতে বাধা সৃষ্টি করে চলেছেন। এক-
চেটিয়া ব্যবসায়ের নানা পন্থা ও প্রক্রিয়া দেশীয় সিগারেট-
গুলির সুষ্ঠু বন্টন ও বিচারমূলক মূল্য নির্দ্ধারণ অসম্ভব করে
তুলেছে। আর তাছাড়া, একচেটিয়া ব্যবসায়ী প্রায়ই যে
ধরণের প্রচারকার্য্য চালিয়ে থাকেন তাতে জনপ্রিয়
সিগারেটগুলিকে যেন মেরে ফেলবারই চেষ্টা বলে
মনে হয়। বাস্তবিক এইসব নির্মম কর্মপদ্ধতির
লক্ষ্যই হ'ল দেশীয় সিগারেট
শিল্পের উচ্ছেদ।
Panama
20
CIGARETTES
গোল্ডেন টোব্যাকো কোং প্রাইভেট লিঃ, বোম্বাই-৫৬
ভারতের এই ধরণের বৃহত্তম জাতীয় উদ্যম

GT. 63 BEN

আনন্দের সন্ধানে রাসেল

অম্লান দত্ত

সংশয় থেকে যাত্রা ক'রে সত্য জ্ঞানে পৌঁছানো যায় কি না, এই ছিল ফরাসী দার্শনিক দেকার্তের সমস্যা। আর অবিশ্বাস থেকে শুরু ক'রে আনন্দে পৌঁছবার পথ খুঁজেছেন সারাজীবন, এ যুগের মহান চিন্তাবিদ রাসেল।

রাসেলের এই দীর্ঘ অন্বেষণের মূলে শুধু দার্শনিক কৌতূহল নয়, বরং তাঁর জীবনের একটি অতি ঘনিষ্ঠ সমস্যা জড়িত ছিল। শৈশব থেকে তিনি ছিলেন অসুখী। যৌবনে বহুবার আত্মহত্যার চিন্তা তাঁর মনে উঁকি দিয়েছে। এমন কি তিনি যখন বিবাহিত, সন্তানের পিতা, এবং ব্যক্তিগত জীবনে বাহ্যত সুখী, তখনও তাঁর মনের গভীরে একটা বিপুল নৈর্ব্যক্তিক নৈরাশ্য অনড় বোঝার মতো চেপে বসে ছিল। তাঁর বয়স যখন প্রায় ষাট তখন তিনি লিখছেন: "I have derived from my children at least as much instinctive satisfaction as I anticipated . . . . But while my personal life has been satisfying, my impersonal outlook has become increasingly sombre . . My activities continue from force of habit, and in the company of others I forget the despair which underlines my daily pursuits and pleasures. But when I am alone and idle, I cannot conceal for myself that my life had no purpose. . . I find myself involved in a vast mist of solitude." (June 11, 1931). ১৯৩১ সালে তাঁর অসুখের অন্যতম কারণ ছিল পৃথিবী সম্বন্ধে, গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে, হতাশা। কিন্তু এর অতিরিক্ত, আরও গভীর, কিছু কি ছিল না?

প্রথম যৌবনের সংশয় ও বেদনা থেকে রাসেল আত্মরক্ষা করেছিলেন গণিত শাস্ত্রকে আঁকড়ে ধরে। কিন্তু ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধ আবারও তাঁর মনে একটা প্রচণ্ড তোলপাড় সৃষ্টি করল। সমাজ ও সভ্যতার সমস্যা তাঁকে অত্যন্ত গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলল।

বিপর্যয়ের শুরুতেই মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ভয়ানকভাবে পালটে গেল। তিনি লিখেছেন: "I had supposed that most people liked money better than anything else, but I discovered that they liked destruction even better."* অর্থাৎ অধিকাংশ ইংরেজ যুক্তিবাদীর মতো রাসেলও পূর্বে বিশ্বাস করতেন যে, সাধারণ মানুষ সবচেয়ে ভালোবাসে টাকা অথবা সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্য; কিন্তু স্তম্ভিত হ'য়ে তিনি আবিষ্কার করলেন যে, টাকার চেয়েও মানুষকে বেশী টানে বিশুদ্ধ ধ্বংসের উন্মাদনা। কেন এমন হয়, কি ক'রে মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা যায়, এটাই হ'য়ে উঠল রাসেলের প্রধান চিন্তা।

গভীর চিন্তার পর রাসেল কয়েকটি সরল প্রত্যয়ে এসে পৌঁছলেন। তিনি লিখলেন: "I became for the first time deeply convinced that Puritanism does not make for human happiness. Through the spectacle of death I acquired a new love for what is living. I became convinced that most human beings are possessed by a profound unhappiness venting itself in destructive rages, and that only through a diffusion of instinctive joy can a good world be brought into being." রাসেল এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, প্রবৃত্তিকে পীড়ন ক'রে মানুষকে সমাজে বাঁচতে হয়; প্রবৃত্তির এই পীড়নের ফলে মানুষ অসুখী; আর এই অসুখই মানুষকে হন্যে ক'রে তোলে, অপরকে পীড়নের ভিতর মানুষ সুখ খোঁজে। এই সময় তিনি Principles of Social Reconstruction নামে একটি বই লেখেন। মানুষের মনের ঝোঁকগুলিকে এখানে সৃজনধর্মী (creative) ও সংরক্ষণধর্মী (possessive) এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। মানুষ যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভালোবাসে, শিল্পে নিজেকে প্রকাশ করে, অথবা কৌতূহলের বশবর্তী হ'য়ে জ্ঞানের অন্বেষণ করে, তখন তার ভিতর সৃজনধর্মিতার প্রাধান্য। আবার মানুষ যখন স্বধন রক্ষায় চিন্তিত কিংবা নিজের অথবা অপরের নিগ্রহে নিযুক্ত, তখন তার মন সংরক্ষণধর্মী। সেই সমাজই ভালো যেখানে মানুষের মন স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে নিজেকে প্রকাশ করবার স্বাধীনতা

* এই উদ্ধৃতিটি ও পরবর্তী অধিকাংশ উদ্ধৃতি রাসেলের আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ড থেকে গৃহীত।

থেকে বঞ্চিত নয়, যেখানে জ্ঞান মুক্ত, আর প্রেম মানুষে-মানুষে নির্ভয় বন্ধনের সেতু।

মানুষের প্রকৃতির উপর যখনই জোর করে কিছু চাপিয়ে দেবার চেষ্টা হয় তখনই দেখা দেয় তার বিকৃতির সম্ভাবনা। অতএব প্রবৃত্তির উপর জোরজবরদস্তি যতো কম করা যায় ততই ভালো। কথাটা আরও একটু তলিয়ে দেখা দরকার। রাসেল জন স্টুয়ার্ট মিলের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। মিল কিন্তু জানতেন যে, একেবারে স্বতঃস্ফূর্ত হতে গেলে বন্য থেকে যাবার ভয় আছে। মিল বুঝেছিলেন যে, অনুশীলনের ভিতর দিয়েই চরিত্র গঠন হয়; অতএব তিনি লিখেছিলেন: "Nearly every respectable attribute of humanity is result, not of instinct, but of victory over instinct." এ সব কথা নিশ্চয়ই রাসেলের অজানা ছিল না। কিন্তু সত্যের এপিঠ ওপিঠ আছে। রাসেল সত্যের অন্যপিঠটা জোর দিয়ে বলা প্রয়োজন বোধ করেছিলেন।

তিনি একথা বলা প্রয়োজন মনে করেছেন যে, প্রচলিত সমাজ ও সংস্কার মানুষকে আষ্টে-পৃষ্ঠে এমনভাবে বেঁধেছে, যেটা মানুষের সুখ অথবা সমাজের ভবিষ্যৎ কোনো দিক থেকেই বাঞ্ছনীয় নয়। এইসব অনাবশ্যক বন্ধনের ভিতর কিছু হল বাহ্য, আবার কিছু অন্তরের। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে যান্ত্রিকতার অত্যাচার, আর দ্বিতীয় শ্রেণীতে অতীন্দ্রিয় শংকা, রাসেল যাকে বলেছেন "metaphysical fears"। এইসব বাধা-নিষেধ থেকে রাসেল মানুষকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন।

আধুনিক সমাজে যান্ত্রিকতার আধিপত্য। মানুষকে এখানে বাঁধা হয়েছে যন্ত্রের ছাঁচের সঙ্গে। রাসেল মনে প্রাণে বৈজ্ঞানিক; অথচ যন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি এমন বাক্যও উচ্চারণ করেছেন যা গান্ধীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আধুনিক যান্ত্রিকতার কারণ যুক্ত হয়েছে সমাজের একটা চিরকালের ঝোঁক: ক্ষমতার বিশেষ কেন্দ্রে সংহত হবার প্রবণতা। এই অতিকেন্দ্রিকতার বিপদ রাসেলকে ভাবিয়ে তুলেছিল। *Power: A New Social Analysis* নামক গ্রন্থে রাসেল বিষয়টি বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। এই বইটি সম্বন্ধে রাসেল তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন: "এই পুস্তকের বক্তব্য আমার গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়; আমি আশা করেছিলাম যে, বইটি আরও বেশী লোকে পড়বে।" এই পুস্তকের মূল কথাটি রাসেলের ভাষাতেই তুলে দিচ্ছি: "I argued that power, rather than wealth, should be the basic concept of social theory, and that social justice should consist in equalization of power to the greatest practicable degree." ধনতান্ত্রিক সমাজে ধন অল্পসংখ্যক মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে; সাম্যবাদী সমাজে রাজনৈতিক ক্ষমতা, অর্থাৎ রাষ্ট্রের শক্তি, একটি দল অথবা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর হাতে সংহত হয়েছে। দুই-ই ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের প্রকারভেদ। ক্ষমতার অতিকেন্দ্রিকতার ফলে স্বাধীনতার সংকট ও নানারকম নিষ্ঠুরতাও অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে।

রাজনৈতিক মহলে বিভিন্ন দল বিভিন্ন সময় রাসেলের প্রতি প্রসন্ন অথবা ক্রুদ্ধ হয়েছে। এর কারণ বোঝা কঠিন নয়। রাসেলের যা মনে হয়েছে, জনপ্রিয়তার কথা চিন্তা না করেই তিনি তা অকপটে বলেছেন। তাঁর যে চিন্তাকে ভালো লেগেছে: [illegible] ভালো লাগেনি। [illegible] সম্বন্ধে তাঁর সমালোচনা [illegible] তাঁকে সাম্যবাদী বলা যেতে পারে; কিন্তু [illegible] অর্থেই তিনি সাম্যবাদী ছিলেন। [illegible] প্রচলিত [illegible] তিনি অকুণ্ঠ [illegible] তিনি ছিলেন [illegible] কিন্তু রাসেলের মন [illegible] তাঁর [illegible] তিনি নিজেই লিখেছেন:

"I have imagined myself in turn a liberal, a socialist, or a pacifist, but I have never been any of these [illegible]" [illegible] তাঁর মনের [illegible] কোনো [illegible] করেই [illegible] অন্বেষণ [illegible] পারে তার [illegible] ভিতর দিয়ে মানুষের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।

[illegible] মানুষের মুক্তির পথ [illegible] অন্য সংস্কারের [illegible] ধর্মবিশ্বাস। [illegible] রাসেল তার [illegible] বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে [illegible] মানুষের মনের প্রাচীন [illegible] কুসংস্কারের [illegible] আরও শক্তিশালী করে তুলেছে। এ যুগের কোনো কোনো আন্দোলনে আবার [illegible] বিধাতার পরিবর্তে কল্পনা করা হয়েছে ইতিহাসের বিধান; এবং তারই নামে নিষ্ঠুরতার এক নতুন অধ্যায় অনেকের কাছে প্রশ্রয় পেয়েছে।

শিক্ষানীতিতেও রাসেল একটা অহেতুক কঠোরতার প্রাধান্য লক্ষ্য করেছিলেন। তা ছাড়া নারী পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে পাপবোধ প্রেমের আনন্দকে তিক্ত করে তুলেছে। এসব বিষয়ে রাসেলের ধারণা

ছিল প্রচলিত ধারণা থেকে একেবারেই পৃথক।

শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনায় রাসেল লিখেছেন : "It is reverence towards others that is lacking in those who ad- vocate machine-made cast-iron systems." ব্যক্তিত্বের প্রতি যাঁদের শ্রদ্ধা নেই তাঁরাই ছাঁচে-ঢালা মানুষ তৈরী করতে চান। খানিকটা বাধ্যবাধকতা ও নিয়মকানুন ছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হতে পারে না, একথা রাসেল জানতেন।। কিন্তু একথাটার ওপর তিনি জোর দিতে চাননি। Principles of Social Reconstruc- tion নামে বইটিতে পাই তাঁর অনবদ্য গদ্যের আরও একটি উদাহরণ : "The man who has reverence will not think it his duty to "mould" the young. He feels in all that lives, but especially in human beings, and most of all in children, something sacred, in- definable, unlimited, something individual and strangely precious, the growing principle of life, an embodied fragment of the dumb striving of the world." মানুষের, বিশেষত শিশুর, বিকাশোন্মুখ মনের প্রতি শ্রদ্ধাকে রাসেল শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাধান্য দিতে চেয়েছিলেন।

মার্কিন দেশে যৌনচিন্তার আতিশয্যে রাসেল বিরক্ত বোধ করেন। ধর্মীয় গোঁড়ামি ও তজ্জনিত প্রবৃত্তির অবদমনকেই তিনি এর জন্য দায়ী মনে করেন। পাশ্চাত্ত্য জগতে এই গোঁড়ামির বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে এবং সেই প্রতিক্রিয়ার প্রথম যুগে আতিশয্য অবশ্যম্ভাবী, একথাও রাসেল বলে যান। তবু নৈতিক গোঁড়ামি থেকে যৌনচিন্তাকে মুক্ত করা প্রয়োজন ব'লে তাঁর মনে হয়। এ বিষয়ে রাসেলের মতামত এক সময়ে শুধু বিতর্কই নয়, প্রচণ্ড বিক্ষোভেরও সৃষ্টি করে- ছিল। বিবাহিত জীবনের বাইরে পারস্পরিক সম্মতি সহ যৌন সম্পর্ক স্থাপন রাসেল সব সময় গুরুতর অপরাধ মনে করতেন না। কিন্তু যৌনচিন্তা আমাদের মনকে অধিকার ক'রে থাকবে এটাও তিনি কখনও চাননি, কারণ যৌন আকাঙ্ক্ষার প্রাধান্য মনের একটা বন্ধনবিশেষ। Marriage and Morals পুস্তকে তিনি একদিকে যেমন লিখেছেন, "Joy of life depends upon a certain sponta- neity in regard to sex", অন্যদিকে তেমনই স্বার্থহীন ভাষায় যোগ করেছেন "I wish to repeat, as emphati- cally as I can, that I regard an undue preoccupation with this as an evil." রাসেলের সিদ্ধান্ত ছিল এই যে, শুধু নিষেধের দ্বারা নয় বরং যৌন আকাঙ্ক্ষার পাশে লোকহিতচিন্তা ও জ্ঞানচর্চার মতো সদর্থক প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত ক'রেই জীবনে সাম্য আনা সম্ভব।

রাসেল শুধু প্রচলিত আচারবিচারের বিরোধী একজন সমাজ সংস্কারকই ছিলেন না। তিনি ছিলেন দার্শনিক। সমাজের বহিরঙ্গে কিছু পরিবর্তন ঘটাতে পারলেই মানুষ দুঃখ থেকে মুক্তি পাবে, মানুষ সম্বন্ধে এমন অগভীর ধারণা রাসেলের নিশ্চয়ই ছিল না। তাঁর ব্যক্তিগত হতাশা ও বেদনার ভিত্তি ছিল অস্তিত্বের আরও গভীরে। সমাজকে ছেড়ে মানুষের চলে না; কিন্তু মানুষের একটা দিক আছে যেখানে সে নিঃসঙ্গ। মানুষ সামাজিক হ'য়েও সমাজসর্বস্ব নয়। অন্তত রাসেল ছিলেন না।

জীবনে বহুবার রাসেল নিজেকে অনেক মানুষের ভিতর একাকার ক'রে দেবার আগ্রহ বোধ করেছেন; কিন্তু তাঁর সংশয়ধর্মী বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব- সচেতন মন তাঁকে ঐ মাতলামিতে ডুবতে দেয় নি। রাসেল লিখেছেন : "Throughout my life I have longed to feel that oneness with large bodies of human beings that is experienced by the mem- bers of enthusiastic crowds.... Always the sceptical intellect, when I have most wished it silent, has whispered doubts to me, has cut me off from the facile enthusiasms of others, and has transported me into a desolate solitude." যে মধ্যযুগীয় মন সমবেতভাবে হাঁটু গেড়ে ব'সে মুক্তির তাৎক্ষণিক স্বাদ অনুভব করে, অথবা যূথবদ্ধ হ'য়ে বিধর্মীর বিরুদ্ধে ক্রোধে ফেটে পড়ে তার সঙ্গে রাসেলের নাড়ির সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছিল। ক্রুশের পরিবর্তে ঝাণ্ডাকেও তিনি গ্রহণ করতে পারেননি।

একক সাধক হিসাবেও ভগবানকে মেনে নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ কথাটা তিনি কখনও যুক্তির ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন, আবার কখনও অত্যন্ত করুণ এবং বেদনার্ত স্বরে বলেছেন। যুক্তির দিক থেকে ভগবানের অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ তিনি খুঁজে পাননি। ভগবানে বিশ্বাসের আশ্রয় হারাতে তাঁকে অসহনীয় যন্ত্রণাবোধ করতে হয়েছে; তবু যুক্তিকেই তিনি গ্রহণ করেছেন। প্রিয়াকে লিখিত একটি পত্রে তিনি বলছেন : "The centre of me is always and eternally a terrible pain— a searching for something be- yond what the world contains, something transfigured and in- finite—the beatific vision—God— I do not find it, I do not think it is to be found."

যে বিশ্বাস তাঁর তাপিত জীবনে শীতল করুণাধারার মতো বর্ষিত হ'তে পারত, তার আশ্রয় থেকে তিনি নিজেকে স্বেচ্ছায় নির্বাসিত করেছেন। অথবা বলা ভালো যে, এ বিষয়ে তাঁর যুক্তিবাদী মনের কাছে কোনো গত্যন্তর ছিল না। তাঁর যুক্তি এ প্রশ্নে নিরপেক্ষতার ভূমিকা গ্রহণ করেনি, এবং ভগবানের অস্তিত্বের বিপক্ষেই স্পষ্ট-ভাবে রায় দিয়েছে। ভগবানের অস্তিত্বের সংগে রাসেল পৃথিবীতে অসংখ্য অন্যায়কে মেলাতে পারেন নি; আর বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তও ধর্মবিশ্বাসের সংগে অসংগতিপূর্ণ ব'লে তাঁর মনে হয়েছে। অতএব রাসেলকে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয়েছে যে, মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি বিশ্ব-জগতের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই; জগৎ আছে, কিন্তু কোনো জগদীশ্বর নেই।

মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার সংগে জগতের কোনো নিগূঢ় আত্মিক সম্পর্ক নেই জেনেও স্পিনোজা নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে এমন একটি বিশ্বজোড়া সমন্বয়ের সন্ধান পেয়েছিলেন যে তাতেই তাঁর বুদ্ধি ও আত্মা তৃপ্ত হয়েছিল। কিন্তু যে সমন্বয়দৃষ্টি স্পিনোজাকে শান্তি দিয়েছিল তাও রাসেলের কাছে গ্রহণীয় হল না। তিনি লিখেছেন : "What Spinoza calls "the intellectual love of God" has seemed to me the best thing to live by, but I have not had even the somewhat abstract God that Spinoza allowed himself to whom to attach my intellectual love." এ বিষয়ে রাসেলের দ্বিধার কারণ তিনি স্পষ্টভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস বিষয়ে তাঁর বৃহৎ গ্রন্থে তিনি লিখেছেন :

"Spinoza thinks that if you see your misfortunes as they are in reality, as part of the concatenation of causes stretching from the beginning of time to the end, you will see that they are only misfortunes to you, not to the universe, to which they are merely passing discords heightening an ultimate harmony. I cannot accept this; I think that particular events are what they are, and do not become different by absorption into a whole. Each act of cruelty is eternally a part of the universe; nothing that happens later .... can confer perfection on the whole of which it is a part." নিজের দুঃখকে যদি-বা উপেক্ষা করা যায়, অন্যের প্রতি অন্যায় কোনো বিশ্বদৃষ্টিতেই মেনে নেওয়া যায় না। এই মুহূর্তের একটি অমার্জনীয় অবিচার অনাগত ভবিষ্যতের কোনো সুবিচারের ফলে তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারায় না। প্রতিটি অন্যায় নিষ্ঠুরতা ইতিহাসের বুকে কাঁটার মতো জেগে থাকে। বিশ্বজগতে এমন কোনো সমন্বয় নেই যাতে হৃদয় মুগ্ধ হয়। স্পিনোজার বিরুদ্ধে রাসেলের সমালোচনার বাগানুবাদ না-হলেও এটাই মর্মার্থ।

রাসেলের সমস্যা তা হ'লে এই। আনন্দ তাঁর জীবনের লক্ষ্য, তিনি সুখের হতেই ব্যাকুল। অথচ তিনি অবিশ্বাসী, তাঁর যুক্তি তাঁকে সংশয়বাদী করেছে। অবিশ্বাস থেকে শুরু ক'রে কি আনন্দে পৌঁছানোর কোনো পথ আছে? জনতার ভিতর তিনি নিজেকে হারাতে পারলেন না; ভগবানে তিনি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলেন না; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তিনি কোনো পরম সুন্দরের মহিমা খুঁজে পেলেন না। তবে তিনি কি নিয়ে বাঁচবেন?

রাসেলের জীবনদর্শন কি আত্মবিরোধী নয়? স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের ভিত্তিতে তিনি জীবনকে স্থাপন করতে চেয়েছেন। কিন্তু এই বিশাল বিশ্ব মানুষের মহত্তম আদর্শ এবং আশাআকাঙ্ক্ষার প্রতি নিষ্করুণ একথা জানবার পর কি জীবনকে কোনো সরল, সহজ আনন্দের সুরে বাঁধা যায়? সহজ আনন্দের দু'টি স্তর আছে : এক, শিশুর মন আর দ্বিতীয়, সাধকের দৃষ্টি। যে-বিশ্লেষণী বুদ্ধি জগতে অসংগতি খুঁজে পায়, যে-ন্যায় অন্যায় চেতনা এই অসংগতিতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, তা তো আমাদের শিশুর জগৎ থেকে নির্বাসিত করে, আবার সাধকের জগতেও প্রবেশাধিকার দেয় না। এই সংশয় বুদ্ধির প্রতি যদি আমাদের বিশ্বস্ত থাকতে হয় তো তার মূল্য

হিসাবে অশান্তিকে মেনে নেওয়াই কি সঙ্গত নয়? আর এই যুক্তিকে যদি আমরা উত্তীর্ণ হই, তারপরও কি কাল-হীন বিশ্বে কোনো বিকট অসামঞ্জস্য রাসেলের অভ্রান্ত বেদনার্ত অট্টহাস্যের মতো অনন্ত শূন্যকে ব্যাপ্ত করে ধ্বনিত হতে থাকে? রাসেল যুক্তিবাদী; এই দুই বিকল্পের কোনো একটিকে বেছে নেওয়াই কি যুক্তির কথা নয়?

কিন্তু রাসেল একটি তৃতীয় পথ অনুসরণ করলেন। সেটি করুণার পথ।

পৃথিবীতে ন্যায় নেই; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মানুষের প্রতি করুণা নেই; মানুষের মহত্তম সাধনায় সাফল্যের কোনো নির্ভর-যোগ্য প্রতিশ্রুতি নেই। ব্রহ্মাণ্ডের এই নির্মমতার বিরুদ্ধে মানুষের দৃপ্ত বিদ্রোহের পতাকা হবে, মানুষের প্রতি মানুষের করুণা। A Free Man's Worship শীর্ষক তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধে রাসেল লিখেছেন : "United with his fellow men by the strongest of all ties, the tie of a common doom, the free man finds that a new vision is with him always, shedding over every daily task the light of love ...... One by one as they march, our comrades vanish from our sight, seized by the silent orders of omnipotent Death .... Be it ours to feel that, where they suffered, where they failed, no deed of ours was the cause." রাসেল জানতেন যে, মৃত্যু যতদিন আছে দুঃখ ততদিন অনিবার্য। জগতের নিয়মে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কাজেই অমরতা তিনিও দাবি করেননি। তিনি চেয়েছিলেন দুঃখে ক্লিষ্ট মানুষের দুঃখ লাঘব করতে।

'ভগবান' বুদ্ধ ভগবান সম্বন্ধে মৌন ছিলেন। রাসেলও করুণাকে তাঁর পথ এবং পাথের বলে গ্রহণ করলেন।

এ পথের শেষে কি তিনি আনন্দে পৌঁছেছিলেন? জানি না: শুধু জানি যে, জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে তিনি এমন কয়েকটি বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন, অপার্থিব আনন্দ ও করুণতম বেদনার সংমিশ্রণে যা অবিস্মরণীয়। চুরানব্বুই বছরের বৃদ্ধ রাসেল তাঁর আত্মজীবনীর মুখবন্ধে লিখেছেন : "Three passions, simple but overwhelmingly strong, have governed my life: the longing for love, the search for knowledge, and unbearable pity for the suffering of mankind.... I have sought (love) because in the union of love I have seen, in a mystic miniature, the prefiguring vision of the heaven that saints and poets have imagined. This is what I sought,

and this is what—at last—I have found.... With equal passion I have sought knowledge.... A little of this, but not much, I have achieved.... Love and knowledge, so far as they were possible, led upward toward the heavens. But always pity brought me back to earth. Echoes of cries of pain reverberate in my heart.... I long to alleviate the evil, but I cannot, and I too suffer." কথা শুনে চমকে উঠতে হয়। রাসেল বলছেন যে, জীবনের শেষপ্রান্তে এসে তিনি অবশেষে সেই অলৌকিককে লাভ করেছেন যে-অধরা শুধু কবি ও সাধকের কল্পনায় ধরা দেয়। প্রেম ও জ্ঞানের হাত ধরে তিনি স্বর্গের দিকে এগিয়ে গেছেন। কিন্তু পৃথিবীতে মানুষের আর্তনাদ তাঁকে সেই স্বর্গে স্থির থাকতে দেয়নি। বেদনায় বিদ্ধ হয়ে তিনি সংসারে ফিরে এসেছেন।

রাসেল—যুক্তিবাদী রাসেল—আনন্দের স্বর্গে পৌঁছেছিলেন, একথা কি সত্য? অবিশ্বাস্য। কিন্তু রাসেল মিথ্যা বলেছেন, এও তো বিশ্বাস করা যায় না।

এখন হৃষিকেশ

অভ্র রায়

একটা কুকুর, কতকগুলো পাখি আর হরেকরকম গাছগাছালি ও ফলের বাগান এই নিয়ে এখন হৃষিকেশের সংসার। (হৃষীকেশ নিজেকে অবশ্য 'হৃষিকেশ' করে রেখেছে) কুকুরটার নাম টমি। সেটা জাতে অ্যালসেশিয়ান হলেও ইদানীং অনেকটা দো-আঁশলা মত হয়ে গেছে। হৃষিকেশ বলে, সঙ্গদোষ—সঙ্গগুণেই ও ব্যাটার স্বভাব চরিত্তির পাল্টে গেছে। খাবার সময় হৃষিকেশের পাশে বসেই ও দিব্যি মাছ ভাত, তরি-তরকারী মায় আলুসেদ্ধ পর্যন্ত বেশ পরিপাটি করে খায়। খাবার পর ওর ভাত-ঘুম আসে; খাটের ওপরে হৃষিকেশ আর তলায় টমি, দুজনেই ঘণ্টা আড়াই ঝিমিয়ে নেয়। বিকেলে ঘুম ভাঙলে টমি হাই তুলে মানুষের মতই আলসেমি ছাড়াবার চেষ্টা করে। সামনের পা দুটো টান টান করে ছড়িয়ে দিয়ে দু-তিনবার ডন দেবার ভঙ্গি করে। হৃষিকেশ হাসে, কি ব্যবর ঘুম ভাঙলো? কাঁচা ঘুম নাকি? টমি দেয় একটা কুঁইকুঁই শব্দ, লম্বা ছুঁচালো মুখটার প্রান্তে এক ফালি লালচে জিভ, আর বাদামী চোখ দুটো নিয়ে প্রভুর দিকে তাকায়। হৃষিকেশ আদর করে ওর মাথা চাপড়ে দেয়। তারপর দুজনেই চা মুড়ি, বিস্কুট বা পাউরুটির টুকরো একটা কিছু মুখে দিয়ে বৈকালিক ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে।

অবশ্য রোজই যে একই নিয়মে হৃষিকেশের দিন চলে, তা নয়। কোনদিন ঘুম থেকে উঠে ফলের বাগান আর গাছ-গাছালির তদারকিতেই তার সন্ধে পর্যন্ত কেটে যায়। আবার, এক একদিন কিছুই ভাল লাগে না যখন, তখন সে তার প্রাচীন ইজিচেয়ারটায় হেলান দিয়ে চুপচাপ বাগানের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। বস্তুত এ সময় ওরা দুজনেই খুব গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবে।

অথচ এই হৃষিকেশ রঙ্গরসিকতা বা হই হুল্লোড়েও কিছু কম যায় না। বাগানের মধ্যে পাড়ার বাচ্চাদের নিয়ে বেশ জমাট গল্পেরও আসর বসে যায় কোন কোনদিন।

বেশির ভাগ সময়ে হৃষিকেশ আর তারা শ্রোতা। নানারকম মানুষ আর দেশ-বিদেশের মজার গল্প বলতে পারে হৃষিকেশ। যৌবনে রেলের চাকরি করেছে সে। বাঙলা বিহার উত্তরপ্রদেশের বিচিত্র সব জায়গায় জীবনের কতদিন কেটেছে। কত বিচিত্র দৃশ্য আর মজার মজার মানুষ সারা দেশে ছড়িয়ে আছে। সেই সব গল্প বলতে বলতে সে কখনো কখনো ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়ে। কখনো বা বিষন্নতায় মুষড়ে যায়। আবার পরক্ষণেই হয়ত কোন কৌতুকের স্মৃতিতে ভরাট গলায় হো হো করে হেসে ওঠে। সম্পর্কটা বিশেষভাবে কল্পনার জগতের সঙ্গে যুক্ত ছিল বলেই হয়ত এইসব অপরিণত বয়স্কদের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ছিল অবিচ্ছেদ্য।

পাখিগুলোর সঙ্গে তার সম্পর্কটা আবার একটু অন্যরকমের। অবশ্য পোষা পাখি বলতে তিনটে—একটা বুড়ো কাকাতুয়া, দুটো মুনিয়া। এ ছাড়া আছে কয়েকটা চেনা শালিখ আর এক দঙ্গল চড়ুই। যারা প্রায় রোজই ঘরে বা বারান্দায় বসে তার দেওয়া দানা খায় এবং নিতান্ত অকারণে ঝগড়া পাকায়। কাকাতুয়াটার বয়স হয়েছে, চলতে পারে না; সারাদিন বসে বসে ঝিমোয় আর কখনো কখনো অদ্ভুত একটা স্বর বার করে হৃষিকেশকে ডাকে। আর মুনিয়া দুটো শুধু খাঁচায় বসে কী এক অকারণ আশঙ্কায় সারা দিনমান থরথর করে কাঁপে। হৃষিকেশের কাছে এদের সবারই কাম্য আহার, আশ্রয় আর অভয়।

এ ছাড়া ছিল একটি সুন্দর ফুলের বাগান। অজস্র শৌখিন মরসুমী ফুল, গোলাপ, গাঁদা, ডালিয়া, জিনিয়া, চন্দ্রমল্লিকা আর রজনীগন্ধার ঝাড়। পূর্বদিকে গেটের পাশে বোগেনভেলিয়া লতা, আর সারি সারি বেল, জুঁই এবং করবী। পশ্চিম সীমানা জুড়ে কৃষ্ণচূড়া, নিম, দেবদারু, সজনে প্রভৃতি ঝাঁকড়া বড় গাছের সারি—যেগুলো দুপুর শেষ হতে না হতেই বাগানের মধ্যে লম্বা ছায়ার ফালি বিছিয়ে দেয়। দিনের প্রথম রোদটা বাগানের পক্ষে খুব জরুরী, তাই পূর্বদিকে কোন ঘন ছায়াঅলা গাছ সে রাখেনি। পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে আপনা থেকেই একটা অশত্থ গাছ বেড়ে উঠেছে আজ ক'বছর হলো। ইতিমধ্যেই তার ডালপালা বিস্তৃত হয়ে ওদিকে অনেকটা আকাশ আর আলো আড়াল করতে শুরু করেছে। কিন্তু কাটবো কাটবো করেও শেষ পর্যন্ত ওটাকে কাটতে পারেনি হৃষিকেশ। অশত্থ গাছের ছায়া বড় মিঠে, বাতাসে ওর অজস্র শিরঅলা সবুজ পাতার নৃত্য, আর তার সিরসিরে শব্দটাও বড় মিষ্টি। তাছাড়া অনেক পাখি পাখালির ঘর-সংসার ওই ডালগুলোর ওপর কেমন একটা মায়াও বসে গেছে তার।

এমনিতে অবশ্য সদা মাথা তোলা কচি কচি ফুল গাছগুলোর মাথা কুটকুট করে কেটে দেয় সে। গাঁদা, ডালিয়া, জিনিয়া, চন্দ্রমল্লিকা সবারই প্রায় এক সমস্যা। বড় অহংকারে, বড় অভিমানে লক লক করে মাথা তুলতে চায় ওরা। মাটির অন্ধকার থেকে বেরিয়েই যেন রাতারাতি আকাশ ছুঁতে চায়। কী অদ্ভুত রহস্যময় আর স্পর্ধিত এই বেড়ে ওঠার ভঙ্গি। কিন্তু এভাবে সত্যিই বেড়ে ওঠা যায় না। হৃষিকেশ বোঝে এই বাড়ের মুখেই ওদের কাটিং করে দিতে হয়, না হলে ডালপালা ছড়িয়ে ওরা নিজেদের ঠিকমত মেলে ধরতে পারে না।

এক এক সময় হৃষিকেশের মনে হয় মানুষের প্রথম যৌবনের বেড়ে ওঠার দিনগুলোও বুঝি এই রকম। অন্তত তার পুরোনো দিনগুলোর কথা মনে করতে গেলে এই রকমই একটা ছবি ভাসে। হঠাৎ কখন মঞ্জরীর মুখটা জেগে ওঠে। সকালের ঝলমলে রোদ্দুরে একটি শিশুর হাত ধরে প্রায় লাল হয়ে রাস্তা পেরিয়ে যায় মঞ্জরী। বাবার কথাও মনে আসে কখনো কখনো। আর তখনই একটা দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে সব স্মৃতিগুলোকে উড়িয়ে দিয়ে হৃষিকেশ তার প্রিয় গানের লাইনটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গুনগুন করে : আমার কী বা পাওনা, কী বা দেনা...। সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে মাথা দোলায়, চেয়ারের হাতলে তাল ঠোকে। ভাল না লাগলে ঘর বারান্দাময় খানিকক্ষণ পায়চারি করে, তারপর টমিকে লক্ষ করে, আও বেটা—বলে বাগানের দিকে বেরিয়ে পড়ে।

আজকাল ঘরের মধ্যে থাকতে কেমন হাঁপিয়ে পড়ে সে। ঘরটাও কেমন যেন ছোট হয়ে আসছে দিনে দিনে। বাড়িটায় যখন প্রথম এসেছিল তখন ঘর ছিল দুটো। রান্নাঘর, স্টোরও ছিল লাগোয়া। কিন্তু এখন বড় ঘরটাতেই শুধু হৃষিকেশের সংসার। সেখানেও খুব অল্প জায়গা জুড়ে আছে দু তিনটে কেরোসিনের স্টোভ, মিটসেফ, কিছু টুকিটাকি। আর একটু এ পাশে তক্তপোশ, ঝোলানো জামা কাপড়, দেয়াল-আলমারির একটিমাত্র ব্যবহার্য তাকে কিছু পুরোনো আমলের পত্রিকা, একখানা ছেঁড়া জ্যামিতি বই, বাঁধানো সঞ্চয়িতা একখানা। বই দুখানা নিয়ে মাঝে মাঝে বেশ সময় কেটে যায়। বারান্দার মেঝেতে চক দিয়ে এক একদিন জ্যামিতির প্রবলেম্ সল্ভ করে সে। যে শক্ত একস্ট্রাগুলো আগে কিছুতেই মিলত না, এখন সেগুলো কত সহজে সমাধান হয়ে যায় দেখে অবাক লাগে তার।

সঞ্চয়িতাখানাও হৃষিকেশের বেশ প্রিয় এবং এর প্রতি তার আকর্ষণের কারণ আরও গভীর। বইটার প্রথমেই বাবার হাতের লেখা। কোন এক বিবাহ বার্ষিকীতে মাকে দেওয়া বাবার উপহার। কবিতা আবৃত্তিতে ছিল বাবার বরাবরের শখ। মন মেজাজ খুশি থাকলে দরাজ গলায় পর পর কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়ে যেতেন মাকে। কখনো কখনো আবার মার নিতান্ত সাংসারিক প্রশ্নের উত্তরে বাবা কবিতার ভাষায় উত্তর দিয়ে মাকে ক্ষেপিয়ে তুলতেন। মা যতই রেগে যেতেন, বাবা যেন ততই মজা পেয়ে আরও আবেগ দিয়ে উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি শুরু করতেন। ঠিক একেবারে ছেলেমানুষের মত মজা করতে ভালবাসতেন তিনি। কী হাসিখুশি মানুষ, অথচ...।

পুরোনো দিনগুলো এখন যেন নেশার মত পেয়ে বসে। চোখ বুজে বসে ভাবতে ভাবতে কেমন ঝিমুনি লাগে। চোখ খুলে দূরের দিকে তাকিয়ে থাকলেও খানিকক্ষণ পরে সব কেমন ঝাপসা লাগে। নিতান্ত বাস্তব দৃশ্যগুলোও তখন অবাস্তব মনে হতে থাকে। আসলে চোখের তেজটাই কমে আসছে। মাঝে মাঝে চোখের কোণের দিকে কেমন আঠা আঠা লাগে। হঠাৎ হঠাৎ জল পড়ে। ঘুম থেকে ওঠার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত দৃষ্টির ঘোরই কাটতে চায় না। ফলে স্বপ্নের মধ্যে দেখা দৃশ্যগুলো জেগে ওঠার পরও যেন চোখে জড়িয়ে থাকতে চায়।

মাঝে-মধ্যে আসে ছেলেবেলার বন্ধু বলরাম। সে এসে পুরোনো দিনকালের কথা আরও বেশি করে মনে করিয়ে দিয়ে যায়। বলরাম অবশ্য এখনও মস্তবড় করিৎকর্মা মানুষ। সল্টলেকে কো-অপারেটিভ হাউসিং স্কীমের কর্মকর্তা। এই বাড়িটা সেই সস্তায় কিনিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, বেশ দাঁও মারলে হে। কিন্তু এটার ভাড়া বসাও। এ অঞ্চলটা আমাদের স্কীমের বাইরে পড়েছে। থাকতে হলে, এস আমাদের কোঅপারেটিভের মধ্যে, একটা ভাল প্লট দেখেশুনে বাড়ি তুলে দি।

নরেশ, মৃণাল, অরবিন্দ চেনাজানা অনেক মানুষের নাম করেছিল বলরাম। জানিয়েছিল তারা সবাই কী আগ্রহী হয়ে এই স্কীমে বাড়ি করছে, এবং আরও কত লোক ঘুরছে তার পেছনে একটা প্লটের জন্যে।

—তুমি বাড়িটা রাখছ রাখ, কিন্তু বাস করতে হলে প্ল্যানিং-এর মধ্যে থাকাই ভাল।

হৃষিকেশের সেই একই উত্তর, না ভাই, এই ত' বেশ। একটু পুরোনো পুরোনো ইতিহাসের মত। জঙ্গল ডোবা থাকলেও বেশ খোলামেলা, একটু বাগান-টাগান

করব। তাছাড়া তোমরা ত কাছেপিঠেই রইলে।

—তোমার যেমন ইচ্ছে ব্রাদার। হ্যাঁ, ভাল কথা—সেই যে তোমার মঞ্জরী, তার ত এখন বিস্তর পয়সা; স্বামী, ইনসিওরেন্সের বড় অফিসার, পেল্লায় বাড়ি তুলছে এখানে। মনে আছে ত সেই প্রাতঃদর্শনীয়া শ্রীমতীকে?

বলরামের মুখটা এখন রোদে পুড়ে পুড়ে তামাটে, চোখের সেই ধারালো উজ্জ্বলতাও আর নেই। তবু তার চোখের ইঙ্গিতে সেই কাঁচা বয়সের রঙ্গরস যেন অনেকটাই চলকে উঠল।

—কি যাবে নাকি একদিন? চল, আলাপ করিয়ে দি তোমার সঙ্গে।

—থাক না, ব্যস্ত কি? এসেছি যখন ফিরে সবার সঙ্গেই দেখা হবে একদিন। হৃষিকেশ সতর্ক হয়ে দ্রুত প্রসঙ্গ পাল্টাতে চায়। বলরামের মুখ বরাবরই একটু পাতলা, কে জানে ফস করে কি রসিকতা করে বসবে?

তারপর আরও কয়েকবার এসেছে বলরাম। ঠাট্টা রসিকতা আর পুরোনো আমলের গল্পগুজবের সময় কাটিয়ে গেছে। মঞ্জরীর কথা তুলেও বেশ হাসি-ঠাট্টা করতে চেয়েছে কয়েকবার। কিন্তু হৃষিকেশের এক অদ্ভুত থমথমে নীরবতায় শেষ পর্যন্ত কোন উৎসাহই পায়নি সে। হালে তার যাতায়াত একেবারেই কমে গেছে।

এখন অবশ্য হৃষিকেশের বয়স আন্দাজ করা শক্ত। পরিচর্যাহীন শরীরটা বয়সের তুলনায় কিছু বেশি প্রাচীন মনে হয়। নির্ধারিত সময়ের প্রায় আট-ন' বছর আগে সে চাকরি থেকে অবসর নিয়েছিল। তার পরও প্রায় দশ বছর কেটে গেল। বাড়িটা যখন সে কিনেছিল তখন এদিকটা প্রায় জনবসতিশূন্য ছিল। তারপর কত বাড়িঘর উঠল, রাস্তা-ঘাট, দোকান-পাট জিনিসপত্রের দাম কেমন হুহু করে বেড়ে গেল। সব মিলিয়ে আর পাঁচটা জায়গার মত এ জায়গাটাও বেশ জমজমাট হয়ে উঠল দিনে দিনে। নবাগত পড়শীর দল এল হৃষিকেশের সঙ্গে আলাপ করতে। কিন্তু হৃষিকেশের নিস্পৃহ ঔদাসীন্য, অভিযোগহীন এক নির্বিকার ভালমানুষী সবাইকে হতাশ করেছে। তারা এখন বুঝে নিয়েছে বাগান কুকুর নিয়ে ক্ষ্যাপা-লোকটার সঙ্গে বিষয় আশয় নিয়ে দুটো মনের কথা বলা সময়ের অপব্যবহার মাত্র। আসলে সংসারধর্ম না করলে এই বয়সে লোকের মতিগতি যা হয় আর কি। গাছ গাছালি, কুকুর, আর এক দঙ্গল ছেলে-মেয়ে নিয়ে হইহই করে না হলে এই বুড়ো বয়সে কারো দিন কাটে? হৃষিকেশ বোঝে, সবই বোঝে তবু তার স্বভাবের কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। বাগানের পরিচর্যা করতে করতে এক এক সময় সে নিজের সঙ্গেই কথা কয়, হাসে, গান গায়। সজনে গাছ থেকে কাঠবেড়ালির ওঠানামা দেখে টমি হঠাৎ লাফিয়ে উঠলে ধমকায়, কি রে ধরবি ওটাকে? তারপর কি করবি? আঁচড়াবি, কামড়াবি, দুপায় পিষে মারবি এই ত? ব্যাটা কুকুর কোথাকার! টমি যেন কথার মানে বোঝে। কনকতে মনিবের পাশে সে আবার পরক্ষণেই মাথা নামিয়ে শুয়ে থাকে।

অথচ একদিন ছিল, যখন হৃষিকেশ শুধু নিজের কথাই ভাবত। কত সম্ভব-অসম্ভব কল্পনায় তরতাজা দিনগুলো কেমন স্বপ্নের মত কেটে যেত। নিজের মুখটিতেই যেন তখন কত বিস্ময় আর রহস্য জড়ানো ছিল। ফিরে ফিরে দেখতে ইচ্ছে করত বারবার। তার অবকাশ, সবার থেকে আলাদা হয়ে কোন নির্জন জায়গায় দাঁড়িয়ে বিরাট আকাশটার দিকে তাকিয়ে থাকতে ভাল লাগত।

মঞ্জরী ঘোষদস্তিদারকে এমনি সময়েই একদিন প্রথম দেখেছিল হৃষিকেশ। কলেজে যাবার পথে ছিল মঞ্জরীদের লাল ইটরঙের লম্বা ঝুল বারান্দাওলা প্রকাণ্ড বাড়িটা। একটু আগেই ছিল একটা পুরোনো মন্দির, মোটরের গ্যারাজ, উল্টোদিকের ফুটপাতে পানবিড়ি সিগারেটের দোকান। তখন সিগারেট খেত হৃষিকেশ। প্রথমদিন ওই সিগারেটের দোকানে দাঁড়িয়েই সে উল্টো-দিকের বারান্দায় মঞ্জরীকে দেখেছিল। আশ্চর্য রূপ ছিল মঞ্জরীর। দেখবার মত এক জোড়া ঈষৎ লম্বাটে চোখ, শ্যামলা মাজা

গায়ের রঙ, পাতলা দুটো ঠোঁটের নীচে টানা চিবুক। লম্বা ছাঁদের মুখটার রূপের সঙ্গে যেন জড়িয়ে ছিল এক দুঃসহ অহঙ্কারের জলুস। চমকে উঠেছিল হৃষিকেশ। ধ্বক করে বুকের মধ্যে কোথাও একটা প্রচণ্ড আঘাত লেগেছিল বুঝি। কী এক অদ্ভুত আকর্ষণে সমস্ত কিছু যেন ওলটপালট হয়ে যেতে লাগল তার মনের মধ্যে। এই প্রথম সে আর একজন মানুষের ভাবনায় মশগুল হতে শিখল।

তারপর থেকে প্রায় প্রতিদিনই হৃষিকেশ মঞ্জরীদের রেলিঙঘেরা বারান্দাটা দেখতে দেখতে পথ চলত। নানারকম কল্পনায় তখন মাথাটা ঝিমঝিম করত, বুকের মধ্যে বয়ে যেত এক প্রবল উত্তেজনার স্রোত। কিন্তু মঞ্জরী আর একদিনও তার দিকে তাকিয়ে দেখল না। কতদিন তাকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। কখনো ভিজে জামা কাপড় মেলে দিতে এসে এলোচুলে খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে সে চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে, কখনো বা রেলিঙে লতানো ওপাশের গাছটাকে আলতো হাতে দোলাতে দোলাতে হঠাৎ পাখির মতই অদৃশ্য হয়ে গেছে।

অহঙ্কার, অহঙ্কার। অহঙ্কারের মিনারে বসেই মঞ্জরী তাকে উপেক্ষা করল। ক্ষুব্ধ আক্রোশে আর অভিমানে এক এক সময় গর্জে উঠত তার মন। পরে ভেবেচিন্তে বিশ্লেষণ করেও সে সঠিক সমাধান করতে পারেনি আসলে অহঙ্কারটা কিসের? মঞ্জরীর রূপের না আভিজাত্যের? নাকি তার বয়সের? মনে মনে অনেক সম্ভাবনা আর সংশয় নিজেকেই শানিয়েছে সে। অভিমানের আড়ালে নিজেকেই অন্ধ করে রাখল মঞ্জরী। এই মাটির দিকে অনেক কিছু দেখবার ছিল, তুমি দেখলে না। আকাশ তো শুধু শূন্য। তার চেয়ে মাটি কিন্তু অনেক বিশ্বাসী অনেক জীবন্ত। অথচ তুমি তা দেখলে না।

মঞ্জরীর প্রতি তার এই দুর্নিবার আকর্ষণের নামই কি প্রেম? জীবনে অনেকদিন এই রকম একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে হৃষিকেশ। প্রেম সম্পর্কে তার জীবনে এই একটিই অভিজ্ঞতা। ফলে বহুবার বিচার বিশ্লেষণ করে তার তরুণ বয়সের এই স্মৃতিটাকে উল্টেপাল্টে দেখতে ইচ্ছে হয়েছে। এমনও মনে হয়েছে এক এক সময় হয়তো তার তরুণ বয়সের নিছক একটা আবেগেই এভাবে উপেক্ষার আঘাতে ফেনিয়ে উঠেছিল। হয়তো নিজের অভিমানে আঘাত লেগেছিল বলেই মঞ্জরীকে সেদিন বড় বেশি নিষ্ঠুর মনে হয়েছিল। হয়তো এটা কিছুই নয়। একটা নিছক আত্মাভিমানিকতা, নিজেরই তারুণ্যের অহঙ্কার। কারণ এরপর অনেকদিন বাদে মঞ্জরীকে দেখে যে অনুভূতিটা হয়েছিল সেটা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা।

অবশ্য হৃষিকেশ নিজেও ইতিমধ্যে কম বদলায়নি। পরিবারের অনেক ভাঙচুর তাকে পোড় খাইয়ে অনেক পরিমাণে অভিজ্ঞ আর সহিষ্ণু করে দিয়ে গেছে। প্রথম একদিন বাবা নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। সত্যি সত্যিই ব্যাপারটার সঠিক গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়নি অবশ্য। কিন্তু মা যখন বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টায় ছটফট করতে লাগলেন তখন এর নিদারুণ কারণটা জেনে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল হৃষিকেশ। মার মুখেই নামটা বারবার উচ্চারিত হতে শুনে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করেছিলেন—উনি কে? হৃষিকেশ তৎক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা আন্দাজ করে লজ্জার অপমানে মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। তবু খুব সহজভাবে বলেছিল, আমার রাঙামাসি।

শেষ পর্যন্ত মা বেঁচে গেলেন কিন্তু মাথার গোলমাল হয়ে গেল। তারপর থেকে বাড়িতে রাঙামাসির দেওয়া একটা কলম, মাসির সঙ্গে পিকনিকে তোলা তাদের একটা গ্রুপ ফটো, তাঁর হাতের কাজ, একটা টেবিল ঢাকনা—সব একদিন মা টান মেরে একে একে উনুনে জ্বালিয়ে দিলেন। উজ্জ্বল নিশ্চিন্ত জীবন রাতারাতি দারিদ্র্য আর দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ল যেন। স্বপ্ন দেখার পাট জীবনে তখনই চুকিয়ে দিয়ে মাকে নিয়ে কলকাতা ছাড়ল হৃষিকেশ। তারপর থেকে শুরু রেলের চাকরি আর তার জীবনের ভ্রাম্যমাণ অধ্যায়।

ভরা জোয়ারের মুখে নদীগর্ভে পাহাড় ভেঙে পড়লে কি হয় কে জানে? হয়ত একটা স্রোত সহস্রধারা হয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলে। অন্তত হৃষিকেশের জীবনে এরকম ঘটেছিল। একটা স্বপ্ন গড়ে উঠবার মুখে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলেও স্বপ্নের জগৎ থেকে সত্যিই পরিত্রাণ পেল না সে। দুঃখ কষ্ট সহিষ্ণুতা আর মমতার বিচিত্র অনুভূতির মধ্যে দিয়ে জীবনকে আর একভাবে চিনতে শিখল হৃষিকেশ। মায়ের শান্ত সন্ন্যাস মূর্তি দিনে দিনে উগ্রতর হল, শেষ কটা মাস তো পুরোপুরি উন্মাদ অবস্থা। একটা কোন উন্মাদ আশ্রমে পাঠাবার জন্যে তখন অনেকেই পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু তার আর দরকার হল না। কোথাও পাঠাবার আগেই একদিন মা তার কাছ থেকে চিরদিনের মত বিদায় নিলেন। তারপর কয়েকদিন এক বিচিত্র মুক্তি আর শূন্যতার মধ্যে নিঃসঙ্গ দিনগুলো কাটতে লাগল। অবশেষে ছুটি নিয়ে বহুদিন পরে কলকাতায় ফিরল হৃষিকেশ।

কয়েকটা দিন এলোমেলো ঘুরে ঘুরেই কাটল। পুরোনো দিনের আত্মীয় বন্ধু চেনাজানা দুএকজনের কথা মনে এলেও কোথাও গেল না সে। বেশির ভাগ সময়ই উদ্দেশ্যহীনভাবে পথে পথে ঘুরে মনের ভারটা কমাবার চেষ্টা করেছিল। এমনি সময় একদিন কলেজে যাবার সেই প্রিয় পরিচিত রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ মঞ্জরীদের বাড়ির সামনে এসে থামল।

তেমনি দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা। আশেপাশের অনেকগুলো বাড়ির চেহারা অনেকটাই পাল্টে গেছে যদিও। সিগারেটের সেই দোকানটা এখনো আছে। পুরোনো অভ্যাসে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে আয়নায় নিজের মুখটা দেখল। দোকানটায় বেশ ভীড়, আয়নার পাশে একটা সবুজ নিয়ন টিউব, পাশে হাল ফ্যাশানের রেডিও। বেশ পরিবর্তিত চেহারা চারদিকে। শুধু মঞ্জরীদের বারান্দাটা সেই আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ সেদিকে চেয়ে রইল হৃষিকেশ। কে জানে মঞ্জরী এখন কোথায়। এখনো কি সে এ বাড়িতে আছে? খুব দেখতে ইচ্ছে হল তাকে একবার। কিন্তু না, কোথাও তাকে দেখা গেল না। তারপর আরও দুতিন দিন ধরে ওপথে ঘুরল হৃষিকেশ। এবং শেষ দিনই হঠাৎ মঞ্জরীর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। কিন্তু এ কোন মঞ্জরী?

একটা ছোট ছেলের হাত ধরে পার্কের দিক থেকে হেঁটে আসছিল সে। আগের চেয়ে বেশ ভারী চেহারা এখন, মিশকালো একরাশ চুলের মাঝ বরাবর টকটকে লাল সিঁথি। মুখটা ভরাট, লাবণ্যময় চোখের দৃষ্টিতে এক নম্র স্নিগ্ধতা। চোখাচোখি হতেই সে যেন একটু হাসল। একরাশ লজ্জায় যেন রাঙা তার মুখটা। তবে কি সে এতদিন পর তাকে চিনতে পারল? কিন্তু দৃষ্টি বিনিময়ের আকস্মিকতায় এখানেই ছেদ পড়ল। তার হাত ধরা দুষ্টুমতো বাচ্চাটা ইতিমধ্যে কখন হাত ছাড়িয়ে টলতে টলতে ছুটতে আরম্ভ করেছে। দামাল ছেলেটাকে সামলাতেই মঞ্জরী বিব্রত এখন। ছুটোছুটি—মঞ্জরীও ছুটল তার পিছন পিছন। পাখি নয়, এবার রাজহংসী ছুটে যাওয়া দেখল হৃষিকেশ। অহঙ্কারের খোলস ভেঙে তখন এক দ্বিতীয় মঞ্জরীর জন্ম হয়ে গেছে।

হৃষিকেশের এখন মাঝে মাঝে মনে হয় সে বোধ হয় ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। সব কিছুই যেন দিনে দিনে কেমন পাল্টে যায়। শুধু বাইরেটা নয়, স্বভাব, দৃষ্টি, অনুভূতি সবেরই বুঝি নতুন নতুন জন্ম হয়। এবং এই রূপান্তরই আসলে আমাদের পৃথিবী চেনায়, অন্যের কাছাকাছি নিয়ে আসে, ভালবাসার নতুন রাস্তা দেখায়। কেমন এক অদ্ভুত আত্মত্যাগ, ক্ষমা, স্নেহ-প্রীতির অনুভূতিতে ভরে উঠতে চায় এখন হৃষিকেশের মন।

এমন কি তার পিতার বিরুদ্ধে নালিশ

তার এতদিনকার ঘৃণা, ক্রোধ, অভিমান তাও যেন ক্রমশ দ্রবীভূত হয়ে এক গোপন মমতার জন্ম দেয়। পাখি দুটো যখন চোখের সামনে থর থর করে কাঁপে, কুকুরটা সজল চোখে তার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, বাগানে সর সর করে গাছগাছালির পাতাগুলো কেমন এক স্বপ্নে শোনা সঙ্গীতের মত বাজতে থাকে, তখন সে এক একদিন তার বাবাকে দেখতে পায়। কখনো রাঙামাসি অথবা তার হিংস্র উন্মাদ মাকেও যেন বাবার পিছন পিছন ছায়ার মত উঠে আসতে দেখে। বাবার মুখে এখন যেন আর অপরাধবোধ নেই। ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে সেই মুখটা তার চার পাশে ঘুরে বেড়ায়, কোথাও যেন একটু আশ্রয় প্রার্থনা করে। রাঙামাসির মুখ থেকেও যেন আত্মগ্লানির কালো ছায়াটা করে যায়। শিশির ভেজা সজনে ফুলের মত ক্রমশ স্নিগ্ধ আর শুভ্র হয়ে রাঙামাসি আবার তার কাছে ফিরে আসে। আর মার মুখটা সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে উত্তর দিকের দগ্ধ তালগাছটার দিকে তাকিয়ে। বাজ পড়ে ঝলসে থেঁতলে গাছটার কিম্ভূতকিমাকার চেহারা দিনের আলোতেও বীভৎস হয়েছিল এতদিন। কিন্তু বেঁচে উঠবার লড়াই মানুষের চেয়েও দুর্দমনীয় প্রকৃতির। একদিন তাই কালো অন্ধকারের পাঁজর ফাটিয়ে আবার সবুজ পাতা মেলে দিল গাছটা। যেন একখানা ঠাণ্ডা সবুজ হাতপাখা কেউ তার বাগানের দিকে আস্তে আস্তে মেলে ধরল। এমনি ভাবেই স্নেহ মমতা আর ক্ষমার এক অপূর্ব জোতির্ময়ী মূর্তিতে তার মাকেও আবার নতুন করে বেঁচে উঠতে দেখছিল হৃষিকেশ।

মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সংসারের কোথাও একটা গভীর মিল আছে। নিজের বাগানের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কথাটা গভীরভাবে উপলব্ধি করে হৃষিকেশ। খুরপি দিয়ে জিনিয়া, ক্যালেণ্ডুলা, নাসটার্সিয়াম গাছের গোড়াগুলো সামান্য খুবলে দিতে দিতে মনে হয় এরা সবাই যেন মানুষের মতই অনেক ঝড়ঝাপ্টা সয়ে বাঁচার অভিজ্ঞতা অর্জন করে। যত বড় হয়, ডালপালা ছড়িয়ে ততই তারা প্রসারিত হয়। হাজার লতাপাতা ফুল কীটপতঙ্গের মধ্যে মানুষের মত সংসার পাতে। ভালবাসার শিকড় ছড়ায়। হৃষিকেশের খুবই ইচ্ছে করে মঞ্জরীকে ডেকে একদিন ভালবাসার এই রূপটা দেখাতে। হয়তো তা সম্ভব হয়ে ওঠে না বলেই সে মনে মনে মঞ্জরীকে সৃষ্টি করে কোথাও সাজিয়ে রাখতে চায়।

অবশ্য মঞ্জরী এখন কাছে, থাকে। সরকারী নতুন রাস্তাটা ধরে দক্ষিণ দিকে সোজা এগিয়ে গেলে মোড়ের মাথায় তার বাড়িটা। প্রথম দিন আচমকা দূরে থেকে ওকে দেখেই খুব অবাক হয়েছিল হৃষিকেশ। তারপর থেকেই মাঝে মাঝে সকালে বা বিকেলে তাকে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের নিয়ে রাস্তায় বেড়াতে দেখা যায়। কালো ফ্রেমের চশমাপরা শক্ত মজবুত চেহারার এক ভদ্রলোক কখনো কখনো তার সঙ্গী। অনুমান করা যায়, ওই ভদ্রলোকই হয়ত তার স্বামী।

কতদিন ভেবেছে হৃষিকেশ, একদিন আত্মপরিচয় দিয়ে তার সামনা-সামনি গিয়ে দাঁড়াবে। বলবে, আমি আপনাকে কিন্তু চিনি, অনেকদিন থেকেই চিনি। তারপর ডেকে এনে তার বাগান দেখিয়ে বলবে, দেখুন কী সুন্দর আমার এই ভালবাসার বাগান। কতদিন ধরে আমি একে সাজিয়েছি। পাখিগুলোকে দেখুন, কি খুশি। কুকুরটার দিকে তাকান, কোন অভিযোগ নেই—বড় সরল, আর বিশ্বাসী। আমার এই গাছগুলোর মতই ওরা সহিষ্ণু। নিজের মনে বিড় বিড় করতে করতেই এক সময় অবশেষে হেসে ফেলে সে।

অবশেষে সত্যিই একদিন মঞ্জরীর মুখোমুখি দাঁড়াল। হৃষিকেশ। হালকা শীতের ছোঁয়া সেদিন সকালে। কুয়াশায় ভিজে মাঠের মধ্যে ধীরে ধীরে পায়চারি করছিল মঞ্জরী। আট ন' বছরের একটি মেয়ে তার পাশে, একটু দূরে আরও দুটো বাচ্চা ছুটে ছুটে মাঠময় চক্কর কাটছে। হঠাৎ কমফর্টার জড়ানো হৃষিকেশ আর তার বুড়ো কুকুরটাকে দেখে বাচ্চা দুটো সেদিকেই ছুটে এল। মঞ্জরী ব্যস্ত হয়ে চীৎকার করল, মিলি—, ঝুলি—চলে এস এদিকে। কিন্তু মিলি, ঝুলি নড়বার খুব লক্ষণ দেখাল না। হৃষিকেশ ততক্ষণে মাফলারের ঘোমটা খুলে ওদের দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসছে। তারপর বেতের ছড়িটা কুকুরের মুখে ধরিয়ে মাফলারটা লাগামের মত করে বেঁধে ওদের মজা দেখাতে লাগল।

মঞ্জরী পায়ে পায়ে এগিয়ে এল এবার। কী আশ্চর্য সুন্দর লাগছিল তাকে এই ভোরের আলোয়। বয়সে কি সৌন্দর্য বাড়ে? অন্তত মঞ্জরীর বেড়েছে। সেই লম্বাটে টান টান মুখটা এখন প্রায় গোলাকৃতি। কিন্তু টলটলে স্নেহের লাবণ্যে তার সেই মেদস্ফীতি মানিয়েছে। টানা টানা রক্তিম চোখ দুটো এখন যেন কত শান্ত, স্থির। অহঙ্কারী কোন কটাক্ষের বদলে এখন সেখানে জলা সরোবরের প্রশান্তি।

হৃষিকেশ হাত তুলে নমস্কার করল, —আমায় চিনতে পারেন?

প্রতি নমস্কারে হাত তুলে একটু ভাল করে দেখবার চেষ্টা করল মঞ্জরী, হয়ত মনে করারও। তারপর বেশ অবাক হয়েই বলল—চেনা চেনা লাগছে, কিন্তু...ঠিক...।

হৃষিকেশ খুব বিনীতভাবে হাসল,—আমি কিন্তু আপনাকে অনেকদিন থেকেই চিনি। আপনাদের বাড়ির সামনে দিয়ে রোজ কলেজে যেতাম। কতদিন আপনাকে সেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। আমি ওই দিকেই থাকতাম কি না।

মঞ্জরী অবাক হয়ে তাকে দেখছিল। একটু যেন লজ্জিত হয়েই হৃষিকেশ থেমে গেল। বাচ্চা দুটো কুকুরের গায়ে হাত রাখছিল। তাদের সরিয়ে দিয়ে দুজনের মাথায় আলতো করে একটু হাত বোলাল। তারপর স্বগতোক্তির মতই বলতে লাগল—কতদিন আগের কথা, তবু মনে হয় যেন এই ত সেদিন। আপনি অবশ্য অনেক বদলে গেছেন, তবু চেনা যায়।

মঞ্জরীর চোখে তখনো বিস্ময়ের ঘোর। শেষ কথাটায় বোধ হয় মুখে লজ্জার আভা

পড়ল। সকালের রোদ্দুরেট ক্রমশ গাছ গাছালির মাথা থেকে মাঠের মধ্যে নেমে আসছিল। অসংখ্য পাখি পাখালির ডাক ছাপিয়ে সিমেণ্ট ফ্যাক্টরির প্রথম ভোঁ পড়ল। রোদ্দুর পিঠে করে ওরা, সবাই পায়ে পায়ে মাঠ ছাড়িয়ে এবার রাস্তায় নামল। সৌজন্যমূলক টুকরো টুকরো দু' একটা কথা আর সাধারণ প্রশ্ন বিনিময়ের সূত্র ধরে তারা পথ হাঁটছিল। হৃষিকেশ চলতে চলতে হাত তুলে দেখাল, ওই ত ওইখানটায় আমার বাড়ি আসুন না দেখবেন বেড়াতে বেড়াতে।

আপত্তি এবং সম্মতির মাঝামাঝি একটা দ্বিধায় মঞ্জরী একবার চোখ তুলল। তারপর হৃষিকেশের বাড়ির অন্য লোকজনদের কথা জানতে চাইল। হৃষিকেশ কুকুরটাকে দেখাল, পাখিদের পরিচয় দিল, বাগানের কথা বলল, অবশেষে খুব মৃদুভাবে হাসল—বেশ আছি কিন্তু। লোকে অবশ্য একটু পাগল টাগল ভাবে, তা আর কি করা যাবে? পাড়ার বাচ্চারাই হচ্ছে এখন আমার বন্ধু, ওরাই আমাকে সবচেয়ে ভালবাসে। বলে কিশোরী —মেয়েটির দিকে তাকিয়ে চোখ পিঠ পিঠ করে বেশ কৌতুকের ভঙ্গিতে হাসল হৃষিকেশ।

মঞ্জরী বলল.—রুনকি, আমার ছোট মেয়ে। আর ও দুটি—মিলি, ঝুলি আমার যায়ের—ওরা এখানে বেড়াতে এসেছে।

বাড়ির কাছে আসতেই টমি হঠাৎ কাঠ-বেড়ালির গন্ধ দেখে ছুটে বাগানের মধ্যে ঢুকল। এতক্ষণ ও আগে আগে সবাইকে রাস্তা দেখিয়ে আনছিল। মিলি, ঝুলি ওর পিছন পিছন, তারপর হৃষিকেশ, মঞ্জরীর আর রুনকির পাশাপাশি।

সকালের টকটকে রোদ মেখে মরসুমী ফুলগুলো রঙের ফোয়ারার মত দুলছিল। অশ্বত্থ ডালে শালিখ, ফিঙে, দোয়েলের প্রভাতী মজলিস শুরু হয়ে গেছে। একরাশ প্রজাপতি সার বেঁধে বাগানে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে ওরা ঝাঁক বেঁধে উড়তে উড়তে একবার ডালিয়া এক-বার গোলাপ গাছগুলোর তলায় মাটির গন্ধ শুঁকছিল যেন। মিলি, ঝুলি প্রজাপতি ধরতে ডালিয়া গাছগুলোর দিকে এগিয়ে গেল। মঞ্জরী ওদের ডাকল। একটা ধাতব আওয়াজে তার চড়া গলাটা যেন রিনরিন করে উঠল। রুনকিকে ডেকে বলল শেষে—যাও ওদের নিয়ে এস। মঞ্জরীর আদেশটা বড় কঠিন। ওদের হয়ে একটু দরবার করতে ইচ্ছে হল হৃষিকেশের, থাক না, খেলুক একটু। এত ফুল প্রজাপতি দেখে বাচ্চারা যদি একটু হুটোপাটি না করে ত আর কে করবে?

—বলবেন না, ওরা যা দুরন্ত না, খানিক থাকলেই আপনার বাগান ফরসা হয়ে যাবে।

মঞ্জরীর মুখে আবার স্মিত হাসি। রুনকি বাগানের মধ্যে। সেও এখন অবাক হয়ে প্রজাপতির খেলা দেখছিল। মিলি, ঝুলি গাঁদা ঝোপের আড়ালে কাঠবেড়ালি খুঁজছে। মঞ্জরী দেখতে দেখতে এক সময় বলে উঠল, বাঃ, খুব সুন্দর বাগানটা ত আপনার। হৃষিকেশ সঙ্কুচিত হয়ে একটু হাসল। তারপর বলল, আসুন না দয়া করে একবার ভেতরে ভাল করে দেখবেন।

ধোয়া মোছা নীল আকাশটা হঠাৎ কখন কুচি কুচি মেঘে ভরে উঠল। এতক্ষণ আকাশ উপচে রোদ ঝরছিল, এবার যেন একটু মিইয়ে গেল আলোটা। জুঁই, মল্লিকা, গোলাপের গন্ধে ভারী বাতাসটা একটু ঠান্ডা ঠান্ডা এখন। পাশাপাশি দুটো কাঠের ফোল্ডিং চেয়ার পেতে বসেছিল ওরা। রুনকি, মিলি, ঝুলি প্রজাপতির মতই ঘুরছিল ওদের ঘিরে ঘিরে। ওদের আনন্দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কুকুরটাও লাফাচ্ছিল কুঁই কুঁই শব্দ করে। অশথ পাতার সেই সিরসিরে শব্দটাও এখন নেশার মত ছড়িয়ে পড়ছে।

মঞ্জরী মুগ্ধ চোখে চারদিক চেয়ে দেখছিল। তার পায়ের কাছে ক্রিসেনু-থিমাম-এর ঝাড়, ডান দিকে জিনিয়া-ডালিয়ার সারি, বাঁ দিকে হৃষিকেশ। হৃষিকেশ কিছু বলবে বলবে করেও চুপ করে রইল। মঞ্জরীর চোখ দুটোকে এখন পদ্মফুলের মত লাগছিল দেখতে। মাটির গভীর থেকে রস নিয়ে ফুটে ওঠা এক জোড়া তাজা স্থলপদ্ম। চেয়ারের এক দিকে বেঁকে শরীরটা কেমন আলতো করে ভেঙে বসেছিল মঞ্জরী। হালকা হাতে জুঁই লতা দোলাতে দোলাতে সে আকাশ দেখত এক-দিন, এখন সে নিজেই জুঁই লতা হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে।

মিলি একটা প্রজাপতি ধরে চীৎকার করতে করতে বিজয়োল্লাসে এগিয়ে এল। ঝুলি, রুনকি পিছন পিছন। মঞ্জরীর মুখেও যেন ওদের আনন্দের উদ্ভাস। মিলি আনন্দের উচ্ছ্বাসে কোলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওর চুলের মুঠি ধরে আলগোছে টেনে তুলল মঞ্জরী। তারপর খুব আস্তে করে মোলায়েম হাতে প্রজাপতিটা ধরল। সবুজ, হলুদ আর খয়েরিতে চিত্র বিচিত্র অপূর্ব দুখানা ডানা। হৃষিকেশকে ওটা দেখিয়ে একবার মৃদু হাসল সে। তার বগলের দুপাশে ঘিরে এখন রুপোলী চুলের সারি, ছোট্ট টুকরো কপালটা চুল উঠে উঠে কত প্রশস্ত; তবু যেন তার হাসিতে এক উচ্ছল কিশোরীর কৌতুক দেখতে পেল হৃষিকেশ।

প্রজাপতিটা আস্তে করে উড়িয়ে দিল মঞ্জরী। মিলি হঠাৎ দু ঠোঁটে অভিমান জড়ো করে বসে পড়ল। ঝুলি, রুনকি চেঁচিয়ে উঠে আবার প্রজাপতিটার পিছন পিছন ছুটল। হৃষিকেশ উড়ন্ত ভীতু সেই প্রজাপতিটাকে দেখতে দেখতে হাসল। মিলিকে কোলের মধ্যে চেপে ধরে তার অভিমান ভাঙানোর চেষ্টা করল মঞ্জরী। তার ফুলো ফুলো গাল দুটোয় দীর্ঘ চুম্বনের মুদ্রায় মুখটা চেপে রইল অনেকক্ষণ। কী অদ্ভুত সেই দৃশ্যটা! তার বাগানে যেন এক নতুন সংসার বসে গেছে। রুনকি এবার গাঁদা ঝোপের মাথা থেকে আর-একটা প্রজাপতি ধরল। ঝুলি আর রুনকি প্রায় হুমড়ি খেয়ে তখন গাঁদা ডালগুলোকে জড়িয়ে। মিলিকে নিয়ে মঞ্জরী নিজেই এবার ওদের কাছে এগিয়ে গেল।

মেঘ কেটে আকাশটা আবার নীল হয়ে উঠছে আস্তে আস্তে। ফুলের ভারে নুয়ে পড়া গাছগুলোর রক্ত রোদ পেয়ে আবার জ্বলে উঠল। সজনে, নিম, অশথ ডালের পাখিগুলো আর একবার নতুন উদ্যমে চেঁচিয়ে উঠল। হৃষিকেশ ভাবছিল আজ এতদিন পরে সে আর মঞ্জরী কি অপ্রত্যা-শিতভাবে কত কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। অজস্র ডালপালা আর শিকড় ছড়ানো কোন গাছের মত সে স্নেহ, প্রেম, ভালবাসার ভারে যেন মাটির ওপর নুয়ে পড়তে চায় আজ।

অন্য সবার সঙ্গে মঞ্জরীও যেন এখানে তার কাছাকাছি কোথাও অদৃশ্য হয়েছিল এতদিন। আজ তাকে নতুন করে আবিষ্কার করতে পেয়ে এক অপূর্ব পরিতৃপ্তি আর আনন্দে ভরে উঠছিল মন।

কিম্পুরুষবর্ষের দলাই লামা ছিলেন তিব্বতের ধর্মগুরু; এখন আছেন ভারতবর্ষে ধর্মশালা নামে পার্বত্য গ্রামে। আলবার্ট শোয়াইৎজার জন্মেছিলেন ফ্রান্স ও জার্মানীর সীমান্তে সার অঞ্চলে; জীবনের শেষ অর্ধশতাব্দী কাটিয়েছিলেন আফ্রিকার গাবোঁ দেশে একটা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে দুঃস্থ নিগ্রো রোগীদের নিরাময়ের চেষ্টায়। প্রেসিডেণ্ট নক্রুমা ঘানার স্বাধীনতার অগ্রদূত, পরে স্বাধীন ঘানার প্রেসিডেণ্ট ছিলেন; কয়েক বছর হল ক্ষমতাচ্যুত ও নির্বাসিত। "সুয়োমির চিঠি"তে ফিনল্যাণ্ড থেকে বহু দূরস্থ এই তিন দেশের সর্বজনবিদিত এই তিন নেতার নাম করছি দেখে আশ্চর্য লাগতে পারে। কিন্তু হেলসিংকি থেকে ৩৪০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে ও উত্তর রাশিয়ার সীমান্তের ১৬০ কিলোমিটার পশ্চিমে এই ছোট্ট ডার্কাউস শহরে এসে এমন এক ভদ্রলোকের বাড়িতে অতিথি হয়ে আছি যিনি এই তিনজনকেই ব্যক্তিগতভাবে চেনেন। এঁর নাম মাইস্তেরি (মাস্টার অফ আর্টস) ভাইনো তুওমিসারি ডার্কাউস কান্সানাইস ওপিস্তোর যোহ্তেয়া বা অধ্যক্ষ। ইনি গত গ্রীষ্মে মাস তিনেক ভারতবর্ষে ছুটি কাটিয়ে আগস্ট মাসে ফিরেছেন দেশে ও আমাকে তাঁর শিক্ষালয়ে যোগ শেখাবার জন্য ভীভ্রাকিভ ইণ্টারন্যাশনাল কলেজ থেকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছেন। ছয় সপ্তাহ প্রতি শুক্র ও শনিবারে আমায় এঁর অতিথি হয়ে এখানে যোগ শেখাতে আসতে হবে। তার মধ্যে আর চার সপ্তাহ বাকী আছে।

ভাপা-ওপিস্তো ও কান্সানাইস-ওপিস্তো হচ্ছে বয়স্ক-শিক্ষার নৈশবিদ্যালয়। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ার থেকে কাপড়ের কারখানার নীচু দর্জার (গ্রেডের) মজুরনী পর্যন্ত নানা শ্রেণীর প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও মেয়ে এই বিদ্যালয়ের ছাত্র। ২৫০০০ লোকের বাস এই শহরে, তার মধ্যে ১০০০এর বেশী এই বিদ্যালয়ের ছাত্র। এখানে শেখানো হয় ফিল্ম ও ফটোগ্রাফী, বিদেশী একাধিক ভাষা (তার মধ্যে ইংরিজি ক্লাসেই ছাত্র বেশী), রান্না ও গার্হস্থ্যশিল্প, সেলাই আর্ট ও ও ক্রাফট্‌স্, টাইপরাইটিং, কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত ইত্যাদি। আমায় এনে যোগের ক্লাসও খুলেছেন অক্টোবরের শুরুতে। প্রভু ভৃত্য, শিক্ষক-ছাত্র, ইঞ্জিনিয়ার-শ্রমিক পাশাপাশি বসে কোথাও ইংরিজি, কোথাও গান, কোথাও পটারি, কোথাও বা যোগ শিখছে। প্রতিটি শহরেই এরকম নৈশ বিদ্যালয় আছে। এক এক সময়ে ভাবি—আমার দেশেও কবে এমনটি হবে। অধ্যক্ষ তুওমিসারি বললেন ৪৫ লক্ষ লোকের বাসস্থান এই সুয়োমি দেশে ২৫০০-এর বেশী রকম বিদ্যালয় আছে; বড় বড় গ্রামেও তার শাখা বিস্তারিত হয়েছে ও এদেশের শহরেরা প্রশংসার এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারে। শ্রীনিকেতনের পল্লীসংগঠন বিভাগ ৩১টা গ্রামে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র চালাচ্ছে—কোথাও বা গাছের তলায়, কোথাও বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘরে, কোথাও বা অবস্থাপন্ন গৃহীর চণ্ডীমণ্ডপে। ৩১ জন আক্ষরিক শিক্ষক ও ৩১ জন সামাজিক শিক্ষক শেখান—তাঁদের বিদ্যা বড়জোর স্কুল ফাইনাল পর্যন্ত। এদেশে নৈশ বিদ্যালয়ে আক্ষরিক শিক্ষা দেবার দরকারই নেই কারণ জড়বুদ্ধি ও সর্বদা শয্যাগত রোগী, বালকবালিকা ছাড়া সকলেরই আট বছর প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক এরা ১৯১৭তে স্বাধীনতা পাবার পর থেকেই। ফলে শতকরা ৯৯ জনেরও বেশী সাক্ষর।

প্রকাণ্ড চারতলা বাড়ি এই ওপিস্তোর নিজস্ব। একতলার এক অংশে শহরের সাধারণ পাঠাগার। চারতলায় চারকামরা জুড়ে অধ্যক্ষের বাসস্থান; তারই একটা ঘরে দুই দিন রাত আমি থাকি। অধ্যক্ষ গিন্নীও এই বিদ্যালয়েরই শিক্ষিকা, জার্মান মহিলা। স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই দ্বিতীয় পক্ষ, এঁদের ছয় বছরের একটি মেয়ে আছে। তাছাড়া দুজনেরই প্রথম পক্ষের তিনটি করে ছেলে-মেয়ে আছে। তারা বড় হয়ে স্বাবলম্বী হয়েছে ও নিজ নিজ সংসার পেতেছে। গিন্নীর থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড আণ্ডার-অ্যাকটিভ, তার ওপর অহরহ মিগ্রেন নামক যন্ত্রণাদায়ক শিরঃপীড়ায় ভোগেন বলে ছুটি নিয়ে ভূমধ্যসাগরের বালিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জের ইবিৎসা দ্বীপে নিজেদের বাড়িতে বাস করছেন এখন, ছয় বছরের মেয়েটিকে নিয়ে। "লক্ষ্মীহীন এ শূন্যপুরী"তে ৬১ বছর বয়স্ক অধ্যক্ষ একা রয়েছেন এখন। দুদিন সপ্তাহে আমিও এঁদের একটা ঘরে থাকি। সকালে বিকেলে চা, কফি অধ্যক্ষ রান্নাঘরে বানিয়ে নেন। দুপুরে ও রাত্রে কাছের কোন গ্রীল বা হোটেলে লাঞ্চ ও ডিনার খেতে যান। আমার ৩৩টি ছাত্রছাত্রী হয়েছে। দুটো গ্রুপ, শুক্রবার সন্ধ্যায় দু ঘণ্টা ও শনিবার সন্ধ্যায় দু ঘণ্টাতে দুটো গ্রুপকে আসন প্রাণায়াম শেখাই। অধ্যক্ষও আমার যোগ-ক্লাসের ছাত্র। আগেই আমার প্রাক্তন ছাত্রী, ভীভ্রাকিভর অধ্যক্ষা শ্রীমতী

হিমাচল প্রদেশে ধরমশালার কাছে চা বাগানে শ্রীতুওমিসারি চা-পাতা তুলছেন—জুন ১৯৬৯

এল্‌ডি সাহিব কাছে শীর্ষাসন শিখেছিল। এঁর স্ত্রীর অসুখের উপযোগী কোন আসন আছে কিনা জিজ্ঞেস করায় শশঙ্গাসন, সর্বাঙ্গাসন, মৎস্যাসন ও বজ্রাসনে বসে শীতলী প্রাণায়াম তাঁকে করতে শিখতে বলেছি। আসন প্রাণায়াম করে কিছু লোকের দেহের ও স্নায়ুর রোগের উপশম হওয়ার যোগ সম্বন্ধে আগ্রহ সুয়োমিতে দিন দিন বাড়ছে। আমার শিক্ষকতার যত চাহিদা তত সময় বা শক্তি আমার নেই। সোম থেকে শনিবার প্রতিটি সন্ধ্যায় বিভিন্ন শহরে গিয়ে ২৩ ঘণ্টা করে আসন শেখাতে হয়। যারা আমায় নিয়োগ করে তারা হয় নৈশবিদ্যালয় নয়ত ব্যালে-স্কুল। সময়াভাবে বহু আহ্বান প্রত্যাখ্যান করতে হচ্ছে।

শ্রীতুওমিসারি মাতৃভাষা ফিনিশ ছাড়া, ইংরিজি, জার্মান, সুইডিশ ভাল করে জানেন। কাজ চালাবার মত করে জানেন ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ ও ইটালিয়ান। ঘুরেছেন রাশ্যা সহ ইওরোপের প্রায় সবদেশে, ইউ এস এ-তে, ভারতে ও আফ্রিকার নাইজেরিয়া, ঘানা ও গাম্বো দেশে। এঁর মতে নক্রুমা হচ্ছেন আফ্রিকার কালো লোকদের স্বাধীনতার দাবীর প্রথম বজ্রনির্ঘোষক। নক্রুমা,

"প্রথমে স্বাধীনতা অর্জন কর, তার পেছনে পেছনে সব আসবে—শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ঐশ্বর্য" বলে নিগ্রো জাতিকে জাগাবার চেষ্টা শুরু করেছিলেন। কিন্তু আজ তিনি স্বদেশ থেকে নির্বাসিত। কঙ্গোর লুমুম্বাও নিহত, অ্যালজেরিয়ার বেন বেলা কারারুদ্ধ—স্বাধীনতার অগ্রদূতেরা কদাচিৎ তার সুখ সুবিধা উপভোগ করতে পান অধিকাংশ-ক্ষেত্রেই। আমাদের দেশেও ত তাই হয়েছে—গান্ধীজীও ভারতের স্বাধীনতা লাভের ছ মাসের মধ্যে আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছিলেন।

আফ্রিকায়-প্রবাসী আলবার্ট শোয়াইৎজারের মত জিজ্ঞেস করেছিলেন তুওমিসারি—"নিগ্রোদের স্বাধীনতা পাওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন কি?" শোয়াইৎজার নাকি স্পষ্ট বলেছিলেন, "কক্ষনো না। আগে তারা স্বাধীনতা লাভের যোগ্যতা অর্জন করুক; তারপরে স্বাধীনতা পাবে।" তিনি মানব-ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস করতেন, সেই সঙ্গে বলতেন "শ্বেতকায়রা বড় ভাই, কৃষ্ণকায়রা ছোট ভাই।" ভাবতে আশ্চর্য লাগছে যে, তাঁর মত মানবদরদী কাছেই সাউথ আফ্রিকা ও রোডেশিয়ার দৃষ্টান্ত দেখেও ভাবতেন যে শাদা বড় ভাই কালো ছোট ভাইকে স্বাধীন হয়ে ওঠার জন্য শিক্ষা বা সহায়তা দেবে। তুওমিসারি আমার এই বিস্ময় বোধে সুর মেলালেন। আরো বললেন, তিনি যে কদিন শোয়াইৎজারের কাছে ছিলেন, খাবার টেবিলে প্রায় জনাত্রিশেক খেতে বসত, সেই দলে একদিনও কোন কালো লোককে টেবিলে খেতে বসতে দেখেন নি। শাদা ডাক্তার ও নার্সদের জন্মদিনে নিগ্রোরা তাদের জানলার বাইরে গান গেয়ে শুভেচ্ছা জানাত; ভিতরে আসত না। আর একটা গল্প বললেন, শোয়াইৎজারের রান্নাঘরে একদিন একটা কুমীর মেরে আনা হয়েছে এবং শোয়াইৎজার সেটা দেখতে গিয়েছেন এমন সময়ে তুওমিসারি ফোটো তোলার জন্য যেই ক্যামেরা তুলেছেন অমনি শোয়াইৎজার ফোকাস থেকে পালিয়ে গেলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মচরিতে পড়েছিলাম তিনি রেঙ্গুনের বাজারে কুমীরের মাংস বিক্রী হচ্ছে দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। আমিও ল্যম্বারেনে হাসপাতালের ডাক্তার নার্সদের কুমীর খাওয়ার কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে বললাম, "কুমীরের মাংস কি সুস্বাদু?" তুওমিসারি বললেন, "খেতে মন্দ নয়, বিশেষত ল্যাজের মাংস বেশ উপাদেয়।" শান্তিনিকেতনের সুধাকান্ত রায় চৌধুরী বলেছিলেন যে তিনি বাঘের মাংস খেয়েছেন; খেতে ভাল নয়। কুমীরের মাংস খেয়েছেন কিনা জিজ্ঞেস করিনি তাঁকে।

তুওমিসারি যখন যে দেশে বেড়াতে যান সেখানকার স্থানীয় অধিবাসী কারোর বাড়িতে অতিথি হন। এবারে ভারতে গিয়েও চণ্ডীগড়ের কাছে বায়রনপুর গ্রামে এক শিখ পরিবারের অতিথি হয়েছিলেন। ঘানাতে গিয়েও এক নিগ্রো পরিবারের অতিথি হয়েছিলেন। কৃষ্ণকায়ের বাড়িতে শ্বেতকায় অতিথি হয়ে আছেন শুনেই নাকি প্রেসিডেন্ট নক্রুমা অগ্রণী হয়ে তুওমিসারির সঙ্গে আলাপ করেন। একাধিক ফোটো দেখালেন, তিনি ও নক্রুমা, তিনি ও শোয়াইৎজার পাশাপাশি বসে বা দাঁড়িয়ে আছেন। আর বললেন "আগে মনে হত ঘানায় ও আমি কত পৃথক—রং তুলনা করে ত অন্য রকম বটেই। ধর্ম, ঐতিহ্য, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সংস্কারও কত দিক থেকে আমাদের মধ্যে। তাদের সঙ্গে বাস করে দেখলাম, পার্থক্য এমন কিছু নয়। সংস্কারবশেও, দেশপ্রেম ইত্যাদি আমারও যেমন নিগ্রোদেরও ঠিক তেমনই আছে। একদিন নিগ্রো গৃহকর্ত্রীর মেয়েটিকে ডেকে দুজনে আয়নার সামনে জিভ বের করে দাঁড়ালাম। দেখলাম ওর জিভের ও মাড়ির যে রং আমারও ঠিক সেই রং। আর জান কি, আমরাও সম্পূর্ণ শাদা কেউ নয়; ২৫/৩০% ডার্ক পিগমেন্ট আমার চামড়াতেও আছে। নিগ্রোদের চামড়ায় ডার্ক পিগমেন্ট হচ্ছে ৭০/৭৫%।" আমি বললাম, ২৬ বছর আগে প্রথম যখন ইউরোপে আসি, আমারও এই পার্থক্য খুব বড় বলে মনে হত। এদের কাছে এসে ও একসঙ্গে বাস করে এখন দেখছি পার্থক্য কম, সাদৃশ্যই বেশী। তুওমিসারির সঙ্গে নানা প্রসঙ্গে আলাপ হচ্ছে। ভারতে ধর্ম, সমাজ ও রাজনৈতিক সমস্যা, বর্তমান ছাত্র বিক্ষোভ সম্বন্ধে আমার মত কি জিজ্ঞেস করছেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। Erich Fromm এর লেখা Art of Loving Revolution of Hope এবং Dr Frankl-এর Man's Search for Meaning সম্প্রতি পড়েছি ও Frankl-এর The Doctor and Soul বইটাও সদ্য কিনেছি। সাইকোলজি আগে কখনও পড়িনি। তুওমিসারি পলিটিক্স ও সাইকোলজিতে এম-এ। তাই তাঁর সঙ্গে কথা বলে যা ঠিকমত বুঝতে পারিনি তা বোঝবার চেষ্টা করছি।

তুওমিসারির নানা বিষয়ে ইন্টারেস্ট। চা, কফি খাচ্ছি এঁর নিজ হাতে গড়া পেয়ালা পিরিচে। শ্রীনিকেতনের পটারির মত মাটি দিয়ে তৈরী, চায়না-ক্লের নয়। ফোটোগ্রাফি খুবই ভাল জানেন। আগের পৃষ্ঠাটা যখন লিখছি তখন আমার কয়েকটা স্ন্যাপ নিয়ে নীচে লাবরোরেটারীতে তা ডেভেলপ করতে গিয়েছিলেন। এই মাত্র এসে বললেন যে হয়ে গেছে, আজ রাতেই প্রোজেক্টারে তা দেখাবেন। এখন গেলেন তাঁর গানের ক্লাসে। পাপেট থিয়েটারও তাঁর হবি। যে ঘরে শুতে দিয়েছেন তার দেয়াল-আলমারিতে রাশি রাশি পাপেট ঝুলছে। এঁর স্ত্রীও পাপেট-থিয়েটার করেন। তিনি ছবিও আঁকেন—মডার্ন ও অ্যাবস্ট্রাক্ট, তার রস আমি বুঝতে পারি না।

ধর্মশালায় দলাই-লামার ব্যক্তিগত চিকিৎসকের সঙ্গে এঁর বেশ ভাব হয়। তিনি অ্যালোপাথ নন, তিব্বতী চিকিৎসা-শাস্ত্র অনুসারে চিকিৎসা করেন। জানি না আমাদের চরক, শুশ্রুতের চিকিৎসা-শাস্ত্র থেকে তিব্বতীরা কিছু নিয়েছিল কিনা। দিন কয়েক আগে প্রথম ক্রুজেডের সমকালীন মোজেস বেন সাইমন (ইনি মাইমনিডেস নামেই খ্যাত) এঁর জীবনী অবলম্বনে রচিত ইহুদী চিকিৎসক ও জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধীয় বই Trial and Triumph পড়লাম। ইনি মুসলমান বীর

শ্রীতুওমিসারী ও প্রেসিডেন্ট নক্রুমা—ঘানার আক্রাতে তোলা জুলাই ১৯৫৬

বৃহস্পতির রক্ত কলঙ্ক

বিগত প্রায় তিন শতাব্দী ধরে বৃহস্পতির উপরকার যে বিস্তৃত লোহিত অঞ্চলটি পৃথিবীর সমস্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানীর মনে রহস্যের মায়াজাল সৃষ্টি করে রেখেছে, এবার সেই রহস্যের হয়ত একটা সমাধান পাওয়া যাবে। সম্প্রতি মার্কিন মহাকাশ গবেষণা

বৃহস্পতির এই ছবিটি তোলা হয় ডিসেম্বর ১২, ১৯৬৬। উপবৃত্তীয় কালো অঞ্চলটিই সেই রক্ত-কলঙ্ক

সংস্থার একজন-বাইওলজি বা জীববিজ্ঞানী শাখার দু'জন বিজ্ঞানী, ডঃ ক্লিফোর্ড উয়েলার এবং ডঃ সাইরিল পোন্নামপেরুমা ধারাবাহিকভাবে কতকগুলি পরীক্ষা চালিয়ে সিদ্ধান্ত করেছেন ঐ রক্তিম অঞ্চলটির বেশির ভাগ অংশেরই মূল উপাদান হাইড্রোজেন সায়ানাইডের যুগ্ম যৌগ। অর্থাৎ, একাধিক হাইড্রোজেন সায়ানাইড পরমাণু মিলিত অবস্থায় সেখানে বিচরণ করছে।

অনেকের ধারণা বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলে মিথেন এবং অ্যামোনিয়া গ্যাসের পরিমাণই সবচাইতে বেশী। সেই সঙ্গে নিরন্তর সেখানকার আকাশ চিরে ছড়িয়ে পড়ছে বিদ্যুতের চকমকি। ফলে সেখানকার বায়ুমণ্ডলে নানা রকম রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে থাকে। এই পরিবর্তনের ফলে কি ধরনের বস্তু তৈরি হতে পারে সেটা জানার জন্যে ডঃ উয়েলার এবং ডঃ পোন্নামপেরুমা ক্যালিফোর্নিয়ার রোকেট ফিল্ড গবেষণা কেন্দ্রে একটি আবদ্ধ পাত্রের মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে বৃহস্পতির অনুরূপ বায়ুমণ্ডল তৈরি করে নেন। তারপর পাত্রটির মধ্যে পাঠান হয় মুহুর্মুহু বৈদ্যুতিক স্পার্ক বা স্ফুলিঙ্গ। বৃহস্পতি থেকে ঠিকরে আসা আলোর বর্ণালী পরীক্ষা করে এ পর্যন্ত যে সমস্ত বস্তুর সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল, ওঁরা দেখলেন ঐ পাত্রটির মধ্যে তাদের অনেকেই তৈরি হয়ে গেছে। তৈরি হয়েছে নানা রকম জৈব-রাসায়নিক যৌগ। যাদের কোন কোনটি জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি করতে পারে। আর সবচাইতে আশ্চর্যের ব্যাপার, প্রচণ্ড বিদ্যুৎ ক্ষরণের ফলে আরও এক ধরনের বস্তু সৃষ্টি হয়েছে। যার রঙ লাল এবং যে মোটেই ভোলাটাইল বা উদ্বায়ী নয়। নাম, হাইড্রোজেন সায়ানাইডের যুগ্ম যৌগ। ওঁরা অনুমান করছেন, এই হাইড্রোজেন সায়ানাইডের যুগ্ম যৌগই সম্ভবতঃ বৃহস্পতির বুকে লোহিত কলঙ্ক সৃষ্টির অন্যতম কারণ। অনুমানের স্বপক্ষে ওঁদের বক্তব্য, বৃহস্পতির বর্ণালী বিশ্লেষণ করে এ পর্যন্ত সেখানকার বায়ুমণ্ডলের আর কোথাও হাইড্রোজেন সায়ানাইড অণুকে মুক্তভাবে বিচরণ করতে দেখা যায়নি। অতএব সত্যিই এই বস্তুটিকে যদি সেখানে খুঁজে পেতে হয় তাহলে একমাত্র ঐ রক্ত তিলকের মধ্যেই তাকে পাওয়া যাবে।

বস্তুত মঙ্গল গ্রহের বুকের সেই তথাকথিত খালকে নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জ্যোতির্বিজ্ঞানী যেমন হাজারো কল্পনার জাল রচনা করেছিলেন, উজ্জ্বল বৃহস্পতির দক্ষিণ প্রান্ত বরাবর ফিকে লাল রঙের চিহ্নটিও তেমনি তাঁদের মনে নানান প্রশ্নের জটিলতা সৃষ্টি করেছে। এক সময়ে বিরাট এই রক্ত তিলক কারুর কারুর কাছে নেহাত দৃষ্টি ভ্রম বলে মনে হলেও গত এক শ' তিরিশ বছর ধরে বিজ্ঞানীরা এর উপর শ্যেনচক্ষু মেলে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছেন। দীর্ঘ এই সময়ে কখনও বা তার লাল রঙ ফিকে হয়ে এসেছে। কখনও ধূসর হয়ে গেছে। কিন্তু একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায়নি। তবে একটা ব্যাপার কারুর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। সেটা হল, বৃহস্পতির ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ একে ঘিরে থাকলেও, মাঝে মাঝে এ যেন স্থান পরিবর্তন করে। অর্থাৎ নিজের অক্ষের চারপাশে আবর্তন করার সময় বৃহস্পতি গ্রহের অন্যান্য অঞ্চল ঠিক যেভাবে আমাদের চোখে এক পাশ থেকে আর এক পাশে সরে যায় বলে মনে হয়, এই লাল অঞ্চলটি কিন্তু সেভাবে সরে না। কতকটা পৃথিবীর বুকে ভাসমান মেঘের মত। পৃথিবী তার অক্ষের চারপাশে ঘুরছে। এর সঙ্গে সমান তাল রেখে তার সমুদ্র, পাহাড় পর্বত, অরণ্য এ পাশ থেকে ও পাশে সরে

মার্চ ২, ১৯৬৭ তারিখে তোলা বৃহস্পতির ছবি। বাঁ থেকে ডান দিক বরাবর বিষুব রেখার দুধারে সাদা কালো অঞ্চল জুড়ে রয়েছে মেঘ এবং অন্ধকার। মাঝখানে কালো বিন্দুটি বৃহস্পতির তৃতীয় বৃহত্তম উপগ্রহ আইও

যায়। কারণ এরা সকলেই পৃথিবীর কঠিন ভূ-স্তরের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে। শুধু ব্যতিক্রম ঐ মেঘের স্তূপগুলি। অকঠিন বায়ুস্তরে সব সময় ভেসে থাকায় এবং সেই সঙ্গে বাতাসের নিজস্ব গতিবেগের প্রভাবে সমুদ্র, পাহাড় পর্বতের মত তাল রেখে তারা ছুটতে পারে না। খানিকটা এদিক সেদিক যেমন ছিটকে পড়ে, বৃহস্পতির রক্তাভ অঞ্চলটিও ঠিক ঐ একইভাবে তার চারপাশের তুলনায় স্থান পরিবর্তন করে। এ থেকে কোন কোন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর ধারণা হয়েছে, বৃহস্পতির ঐ রক্তিম অঞ্চল এমন

কোন বস্তু দিয়ে তৈরি তার সঙ্গে মূল গ্রহটির কঠিন ভূ-স্তরের কোন প্রত্যক্ষ সংযোগ থাকা সম্ভব নয়। অবশ্য যদি সেখানে কোন কঠিন ভূ-স্তর থাকে। কেউ কেউ মনে করেন, হয়ত ওটি ভাসমান কোন বায়বীয় বস্তুসামগ্রীও নয়। বরং কোন কঠিন পদার্থ দিয়ে তৈরি।

তবে ভিন্নতর মতেরও অভাব নেই। ব্রিটিশ আবহাওয়া কেন্দ্রের অধ্যক্ষ এবং অন্যতম ভূ-পদার্থ বিজ্ঞানী ডঃ রেমণ্ড হাইড ১৯৬১ সালে প্রকাশিত তাঁর একটি প্রবন্ধে মন্তব্য করেন : আমার ধারণা, বৃহস্পতির বুকে যে রক্তিম অঞ্চলটি আমরা দেখে থাকি হয়ত সেটা কোন অকঠিন পদার্থের ঘূর্ণী স্তম্ভ। যার কায়দা কানুন 'টেইলর স্তম্ভের' অনুরূপ। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, সঞ্চরণশীল তরল বা বায়বীয় স্তরের নিচের অংশ যদি কোথাও বাধার সম্মুখে পড়ে উপর দিকে ঠেলে ওঠে অথবা গর্তের মধ্যে পড়ে কোথাও নিচের দিকে বসে যায় তখন ঐ ঠেলে ওঠা বা বসে যাওয়া অঞ্চলে একটি আবর্তন বেগ দানা বেঁধে ওঠে। ফলে ঐ অঞ্চলে একটি ঘূর্ণায়মান তরল বা বায়বীয় স্তম্ভের সৃষ্টি হয়। স্তম্ভটি চোঙের মত। একটি নির্দিষ্ট অক্ষের চারপাশে সমান্তরালভাবে ঘুরতে থাকে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার জিওফ্রে টেইলরের নাম অনুসারে এ ধরনের স্তম্ভের নামকরণ হয়েছে 'টেইলর স্তম্ভ'। ডঃ রেমণ্ড হাইডের মতে, বৃহস্পতির বুকের উপর সামান্যতম অঞ্চল যদি উঁচু হয়ে থাকে তাহলে তার সঙ্গে বাধা পেয়ে সেখানকার আবহাওয়া মণ্ডলের মধ্যে প্রচণ্ড ঘূর্ণি সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়। বিশেষ করে ঐ গ্রহটি তার অক্ষের চারপাশে যে রকম প্রচণ্ড গতি নিয়ে ঘুরছে, তাতে এইটিই স্বাভাবিক। ঐ ঘূর্ণিই একটি বিরাট স্তম্ভ সৃষ্টি করে গ্রহটির বায়ুস্তরের বাইরে মাথা বের করে থাকে, সম্ভবতঃ সেটি আমাদের চোখে পড়ে। পৃথিবী থেকে তার সেই ওপরের তলটি কতকটা লোহিত কলঙ্কের মত মনে হয়।

হ্যাঁ, রীতিমত বিস্ময়ের ব্যাপার। সৌরজগতের একমাত্র এই গ্রহটির কপালেই বা ঐ রক্ততিলক কেন এবং কিভাবে তা গড়ে উঠল এ নিয়ে এ পর্যন্ত হাজারো কল্পনা মাকড়সার জাল সৃষ্টি করেছে। বৃহস্পতি! সূর্য থেকে দূরত্বে বৃহত্তম এই গ্রহটির স্থান পঞ্চম। ব্যাস প্রায় ছিয়াশি হাজার মাইল। অর্থাৎ পৃথিবীর প্রায় এগার গুণ। প্রতি এগার দশমিক আট বছরে একবার করে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। পরিক্রমণ কালে এই গ্রহটি যখন পৃথিবীর নিকটতম স্থানে এসে উপস্থিত হয় তখন সে উজ্জ্বলতায় [illegible] পড়ে 'সাইরিয়াস' বা লুব্ধক নক্ষত্রের মত। বিভিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে মনে হয়েছে, বৃহস্পতির দৃশ্যমান অঞ্চলটি সম্ভবত অ্যামোনিয়া গ্যাস এবং জমাট অ্যামোনিয়ার বরফ কুচি দিয়ে তৈরি মেঘের আবরণে ঢাকা। সেই মেঘ এমন এক ধরনের বায়ু-মণ্ডলে ভেসে রয়েছে যার মূল উপাদান হাইড্রোজেন, কিছুটা জলীয় বাষ্প। হয়ত বা তার সঙ্গে মিশে আছে মিথেন এবং হিলিয়াম গ্যাস। বলা হয়েছে, পৃথিবীর তুলনায় বৃহস্পতির ঘনত্ব অনেক কম। জলের ঘনত্বের ১·৩ গুণ মাত্র। এ থেকে কেউ কেউ অনুমান করেন, হয়ত শুধু হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম দিয়েই ঐ গ্রহটি তৈরি হয়েছে। এক সময়ে এ কথাও বলা হয়েছিল, পৃথিবীর মত বৃহস্পতিরও ভূ-গর্ভ অঞ্চল বিভিন্ন ধাতুর মিশ্রণে তৈরি। তবে ভূ-ত্বকের বাইরের অংশ পুরু এবং কঠিন বরফের আবরণে ঢাকা।

নভেম্বর ৮ এবং ৯, ১৯৬৫ তিরিশ ঘণ্টার ব্যবধানে বৃহস্পতির এই দুটি ছবি তোলা হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে গ্রহটির বুকে মেঘ সদৃশ অঞ্চলগুলি কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, বাঁ এবং ডান পাশের ছবিতে লক্ষ করুন

কিন্তু এ ধারণাটিও পাল্টে নিতে হল। ১৯৫১ সালে ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উইলিয়াম এইচ র‍্যামজে নতুন একটি তত্ত্ব উপস্থাপিত করে বললেন, ঐ গ্রহটির গভীরতম অঞ্চলের চাপ অত্যন্ত বেশী। এত বেশী যে, সেই চাপের মধ্যে পড়ে সাধারণ তরল এবং কঠিন হাইড্রোজেন পরিবর্তিত হয়ে একটি ধাতব অবস্থা পেয়ে যেতে পারে। পরিবর্তিত এই হাইড্রোজেন সাধারণ ধাতুর মতই বিদ্যুৎশক্তি পরিবহণ করতে পারবে। র‍্যামজের পরিকল্পনা উত্তরকালে ঐ গ্রহটির আভ্যন্তরীণ চাপ এবং ঘনত্ব সম্পর্কে একটি পুরোপুরি বর্ণনা দিতে সক্ষম হয়। কিন্তু তার তাপ এবং বিদ্যুৎ পরিবাহিতা, তাপমাত্রা অথবা তার ভূ-ত্বক কতটা কঠিন সে সম্পর্কে কোন গ্রহণযোগ্য তথ্য যোগাতে সমর্থ হয়নি। এমন কি, এ কথাও নিশ্চিত করে জানা সম্ভব হয়নি সেখানকার বায়ুমণ্ডলের নিচে কোন তরল বা কঠিন পদার্থ আদৌ বিরাজ করছে কি না।

১৬১০ খৃস্টাব্দে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বৃহস্পতির তেরোটি উপগ্রহের মোট চারটি বৃহত্তম উপগ্রহ আবিষ্কার করেন গ্যালিলিও। এর কুড়ি বছর পর নিকোলাস জুখি এবং দানিয়েল বারটোলি সর্বপ্রথম ঐ গ্রহটির দৃশ্যমান অঞ্চলের কতকগুলি সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেন। ওঁরা বৃহস্পতির বিষুব রেখার সমান্তরাল বরাবর একটানা পর পর সাজানো কতকগুলি সাদা এবং কালো অঞ্চল দেখতে পান। মাঝে মাঝে কালো অঞ্চলগুলি অদৃশ্য হয়ে গিয়ে সেখানে সাদা অংশ ছড়িয়ে পড়ে। কখনও বা একই অঞ্চলের সাদা অংশ অদৃশ্য হয়ে গিয়ে বেশ কয়েক সপ্তাহ এক টানা কালো অঞ্চল বিরাজ করে। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা হয়, হয়ত ঐ সাদা-কালো শুধু মেঘ এবং অন্ধকারের খেলা। বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলে যখন একটানা মেঘ জমে ওঠে তখন তার বিষুব অঞ্চল বরাবর একটানা সাদা আবরণীতে ছেয়ে যায়। মেঘ অদৃশ্য হলেই আবার ফুটে ওঠে ঘনকৃষ্ণ অন্ধকার।

কিন্তু সেই রহস্যময় রক্ত কলঙ্ক? না, গ্যালিলিও তাঁর খেলার দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে বৃহস্পতির রক্তিম অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছতে পারেননি। এটি প্রথম ধরা পড়ল ১৬৬৪ খৃস্টাব্দে। প্রথম দর্শক রবার্ট হুক। ঐ বছরই গিওভান্নি কাসসিনি রক্তিম অঞ্চলটির একটি ছক তৈরি করে ফেললেন এবং গ্রহটির অক্ষের চারপাশে একবার করে ঘুরে আসতে কতটা সময় লাগে তা নথীভুক্ত করতে থাকেন। উদ্দেশ্য, নিজের অক্ষের চারপাশে একবার ঘুরতে বৃহস্পতি কতটা সময় নেয় সেটা জানা। লাল অঞ্চলটিকে একটা সংকেত হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এর অর্থ হল, যদি গ্রহটির গায়ে লাল দাগটা লেগে থাকে তাহলে কোন নির্দিষ্ট স্থান থেকে সেটি যাত্রা করে আবার আগের জায়গায় ফিরে আসতে যে সময় লাগবে ঐ সময়ে গ্রহটির তার অক্ষের চারপাশে একবার পাক খাওয়ার কথা। কিন্তু হিসেবে পাঁচ সেকেণ্ডের মত গরমিল চোখে পড়ল। ১৬৬৪-তে একবার ঘুরে আসতে যেখানে সময় লাগে নয় ঘণ্টা পঞ্চান্ন মিনিট ছাপ্পান্ন সেকেণ্ড, ১৬৭২-এ তিনি লক্ষ্য করলেন এক পাক ঘুরতে সে সময় নিল আরও পাঁচ সেকেণ্ড বেশী। অতএব সেই প্রথম প্রশ্ন : তাহলে ঐ রক্তিম অঞ্চলটি মূল গ্রহের গায়ের সঙ্গে কি জুড়ে নেই? যদি থাকত তাহলে গ্রহটির সঙ্গেই তো সে পাক খেত? সে ক্ষেত্রে গ্রহ এবং ঐ লাল জায়গাটির আবর্তনকাল তো একই হোত? প্রথম আবিষ্কারক হুকের নাম অনুসারে জায়গাটির নাম রাখা হল 'হুকের কলঙ্ক'।

পরবর্তীকালে এই কলঙ্কটি সম্পর্কে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় ১৮৩১ খৃস্টাব্দে। বিবরণ দিলেন জার্মান ভেষজ বিজ্ঞানী হাইনরিখ সামুয়েল সওবে। উল্লেখ্য, ইনিই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেছিলেন, প্রতি এগার বৎসর অন্তর সূর্যের কলঙ্কের সবচাইতে বেশি হ্রাস বা বৃদ্ধি হয়ে থাকে। বৃহস্পতির আর একটি ছক পাওয়া যায় ১৮৫৭-তে। এটি এঁকেছিলেন উইলিয়াম রুটার ডাওয়েস নামে একজন ইংরেজ ধর্ম যাজক। এঁর ছবিতে রক্ত-কলঙ্কটিকে স্পষ্ট করে দেখান হয়েছিল। পরবর্তী বর্ণনা পাওয়া যায় লেহাই বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানী আলফ্রেড এম মায়ার-এর কাছ থেকে। ১৮৭০ খৃস্টাব্দে পনের সেণ্টিমিটার ব্যাসের একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে মায়ার মন্তব্য করেন : 'বৃহস্পতির স্থির, উজ্জ্বল এবং নিখুঁত থালাটি দেখে আমি রীতিমত বিস্মিত না হয়ে পারিনি। আর সবচাইতে বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলাম, তার নিরক্ষীয় অঞ্চলের দক্ষিণ বরাবর একটু নিচের দিকে অবস্থিত লালচে রঙের ডিম্বাকৃতি একফালি রেখাকে লক্ষ্য করে। প্রথমে ভেবেছিলাম, হয়ত এ আমার দৃষ্টি ভ্রম।...কিন্তু না। আমি পরিষ্কার দেখতে পেলাম, ঐ উপবৃত্তীয় অঞ্চলটি যতই বৃহস্পতির থালার কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে আসছে ততই স্পষ্টতর হয়ে উঠছে।' মায়ার মনে করেছিলেন, হয়ত তিনিই প্রথম ঐ রক্তিম কলঙ্ক আবিষ্কার করেছেন।

১৮৭৯ খৃস্টাব্দে রক্ত কলঙ্কটি এত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল যে, সাধারণ মানুষও এ ব্যাপারে তখন আগ্রহী হয়ে ওঠে। ১৮৮২-তে কলঙ্কটি ফিকে হতে শুরু করে। এবং এমন নির্দিষ্টভাবে ফিকে হতে থাকে, যা পরীক্ষা করে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ধরে নিয়েছিলেন, হয়ত ১৮৯০-এর মধ্যেই সেটি পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর হল না। বরং ১৮৯১-এ দেখা গেল ফিকে হয়ে যাওয়াটা যেন বন্ধ হয়ে গেল এবং ক্রমেই সেটা স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল। এরপর থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নিয়মিত এই রক্ত-কলঙ্কটিকে নিরীক্ষণ করে আসছেন। দীর্ঘ এক শতাব্দীরও বেশী সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেল। এর মধ্যে কখনও এটি অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। কখনও বা অতি স্পষ্ট। কিন্তু কখনই অদৃশ্য হয়ে থাকেনি।

ইতিমধ্যে এই কলঙ্কটি সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা গেছে তা হল : এক, কলঙ্কটির আকার, আয়তন এবং অবস্থান অত্যন্ত নির্দিষ্ট। উপবৃত্তীয় এই কলঙ্ক লম্বায় চল্লিশ হাজার কিলোমিটার। চওড়ায় তেরো হাজার কিলোমিটার। অবস্থান গ্রহটির নিরক্ষ রেখা থেকে প্রায় বাইশ ডিগ্রী দক্ষিণে। মোটামুটিভাবে এর বাইরের তলের ক্ষেত্রফল পৃথিবীর মোট তলের ক্ষেত্রফলের সমান। দুই, বৃহস্পতির অক্ষের চারপাশে আবর্তন করার সময় এর আবর্তন-কাল দশ

সেকেণ্ডেরও বেশী সময় এদিক-সেদিক হয়ে থাকে। এর অর্থ হল, একবার পাক খেতে যতটা সময় লাগে, পরের বারে পাক খাওয়ার সময়, সেই সময় দশ সেকেণ্ডের মত হের-ফের হয়ে যায়। তিন, অক্ষাংশ থেকে এটি একপ্রকার স্থির দূরত্ব বজায় রেখেই অবস্থান করে। চার, কলংকটির দক্ষিণ প্রান্ত বরাবর একটি গর্তের মত স্থান দেখা যায়। এই গর্তটিকে কখনই অদৃশ্য হতে দেখা যায়নি। পাঁচ, কলংকটির বর্ণের মধ্যেও নিয়ত একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করার মত। তবে এই পরিবর্তন এতই সূক্ষ্ম যে, তাকে যথাযথ মেপে বের করা খুবই কঠিন। যখন অত্যন্ত ফিকে হয়ে আসে তখন এর রঙ দাঁড়ায় ধূসর বা অত্যন্ত ফ্যাকাশে লাল। আর যখন অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে তখন এর রঙ হয় ইটের মত লালচে অথবা গোলাপী-লাল। ছয়, বৃহস্পতির বুকে এটি ছাড়া আর কোন বড় কলংক চোখে পড়ে না। অতএব মনে হয় এই কলংকটি এমন একটি বৈশিষ্ট্য, যা হাজার, লক্ষ বা কোটি কোটি বছর ধরে স্থায়ীভাবে সেখানে বাস করছে।

শুধু রহস্যই নয়, জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই এমন এক অস্বাভাবিক এবং ভুতুড়ে কাণ্ড বলে মনে হয়েছিল যে, দীর্ঘকাল এ নিয়ে মাথা ঘামানর কোন চেষ্টাই তাঁরা করেননি। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ডিয়ারবর্ন মানমন্দিরের বাৎসরিক প্রতিবেদনে অধ্যাপক জি ডব্লু হউঘ এই কলংকটি সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলে ভাসমান রত এটি কোন বস্তু সামগ্রী। এর কিছু দিন পর প্রকাশিত হয় পীর প্যানেট জুপিটার' নামক গ্রন্থ। রচয়িতা একজন সৌখিন জ্যোতির্বিদ। নাম বার্ট্রান্ড এম পিক। পিক এই গ্রন্থে বৃহস্পতি সংক্রান্ত তাঁর নিজস্ব পর্যবেক্ষণের নানা রকম তথ্য পরিবেশন করেন। সেই সঙ্গে অধ্যাপক হাউঘকে সমর্থন করে মন্তব্য করেন, ঐ ভাসমান বস্তুস্তূপ আসলে কঠিন বরফের কুচি ছাড়া কিছু নয়। আর সে বরফের মূল উপাদান জল। জলের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে ঐ ধরনের বরফ পৃথিবীর গবেষণাগারেও তৈরি করা সম্ভব। পিকের বক্তব্য, বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডল হয়ত সব সময় সমানভাবে গভীরতা নিয়ে অবস্থান করে না। কখনও তার গভীরতা কমে। কখনও-বা তুলনামূলক ভাবে বেড়ে যায়। অনেকটা ঢেউ-এর উপর ওঠা নামা করার মত। ঐ অসম বায়ুস্তরের উপর ভেসে থাকায়, বৃহস্পতির অক্ষের চারপাশে ঘোরার সময় তার আবর্তন বেগে কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটে। এই সঙ্গে তিনি একথাও যোগ করে দেন, বায়ুস্তরের উপর ওঠা নামা করার ফলে পর্যায়ক্রমে ঐ বরফের গুণাগুণ পরিবর্তিত হয় এবং সেই সঙ্গে বেশ কিছুটা উত্তাপ শক্তি হয় চারপাশ থেকে শোষণ করে অথবা চারপাশে পরিত্যাগ করে। সম্ভবত এই কারণেই ঐ বস্তুস্তূপের রঙ পাল্টায়। অতি সম্প্রতি এ সম্পর্কে আরও কিছুটা মন্তব্য করেছেন কেনটাকি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডাঃ ওয়েনডেল সি দামারেকাস এবং ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ রুপার্ট ওয়াইলডট। এঁদের বক্তব্য, হাইড্রোজেন গ্যাসের মত হালকা আবহাওয়া মণ্ডলে কি করে এই স্তূপটির ভেসে থাকা সম্ভব সেটা নিতান্তই কষ্ট কল্পনা। তবে এমনও হতে পারে, ঐ রক্ত-কলংক এমন কোন কঠিন বস্তু দিয়ে তৈরি যার উপাদান এবং ঘনত্ব তার চারপাশে বিচরণ রত বায়বীয় পরিমণ্ডলের অনুরূপ। সে ক্ষেত্রে তার ভেসে থাকাটা অসম্ভব নয়। ইতিমধ্যে প্রিন্সটোন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রবার্ট এইচ ডিকে আর একটি মতবাদ ব্যক্ত করেছেন। তিনি মনে করেন, বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডল সম্ভবত তার বিষুব রেখার সঙ্গে সমান্তরাল পথে বিচরণ করে। এবং এই কারণেই ঐ বায়ুস্তরে ভাসমান রত রক্ত-কলংকটি কখনও অক্ষাংশ থেকে দূরে সরে যায় না। যদি সত্যিই এমনটি ঘটে থাকে তাহলে আরও একটি প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেল। কেন রক্ত-কলংকটি অক্ষাংশে থেকে দূরে সরে যায় না, এটাই তার একমাত্র কারণ। তবে এই সঙ্গে আরও একটি বড় প্রশ্ন অসমাধিত অবস্থায় থেকে যাচ্ছে। সেটা হল, সেখানকার সমস্ত বায়ুমণ্ডলের মাঝখানে এ ধরনের একটি মাত্র বস্তুই বা তৈরি হল কেন? এ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর আজও কেউ দিয়ে উঠতে পারেননি। যদি 'টেইলর স্তম্ভ' মত-বাদকেও স্বীকার করে নেওয়া হয়, তাহলে প্রশ্ন দাঁড়াবে, যেখানে ঐ লাল মুখো স্তম্ভটি তৈরি হয়েছে একমাত্র সেখানকার অকঠিন বায়ুস্তরের নীচেই কি শুধু কোন উঁচু বাধা বা গভীর গর্ত পড়েআছে, যা ঐ স্তম্ভটিকে তৈরি করতে সাহায্য করেছে, অন্যত্র তেমন কোন বাধা বা গর্ত আর নেই? এটাও একটা বড় রকমের রহস্য!

আরও একটি প্রশ্ন থেকে যায়। সম্প্রতি 'নাসার যে দুজন বিজ্ঞানী ঐ রক্ত তিলকের মধ্যে হাইড্রোজেন সায়ানাইডের যুগ্ম যৌগ থাকতে পারে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন, সেটাই বা শুধুমাত্র ঐ অঞ্চলেই থাকার কারণ কী হতে পারে? আগেই বলেছি, বৃহস্পতির বিস্তৃত বায়ুমণ্ডলে কিন্তু এ ধরনের সামগ্রী এখনও পর্যন্ত তেমন খুঁজে পাওয়া যায়নি। বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলে আছে অ্যামোনিয়া এবং মিথেন। পৃথিবীর আকাশের মত সেখানকারও আকাশ ঘিরে অবস্থান করছে ভ্যান-অ্যালেন বেল্টের মত পরিবেষ্টনী। কোন ওজন-গ্যাসের স্তর সেখানে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এর অর্থ বৃহস্পতির বুকে সূর্য থেকে বিকীরিত অতি-বেগুনী রশ্মি অবারিতভাবে বর্ষিত হয়ে চলেছে। এই সঙ্গে আছে নিয়ত বিদ্যুতের চমক। এমন পরিবেশে মিথেন এবং অ্যামোনিয়া মিলিত হয়ে তো সেখানকার আবহাওয়া মণ্ডলে প্রচুর পরিমাণ হাইড্রোজেন সায়ানাইড তৈরি করতে পারত? তবে এমনও হতে পারে, হাইড্রোজেন সাইয়ানাইড তৈরি হওয়ার জন্য যতটা চাপ এবং উত্তাপের দরকার ততটা চাপ এবং উত্তাপ তার আবহাওয়া মণ্ডলে নেই। কিন্তু লাল মুখো ঐ স্তম্ভটি প্রচণ্ড বেগে নিজের অক্ষের চারপাশে আবর্তন করার ফলে তার মধ্যে প্রয়োজনীয় চাপ এবং উত্তাপ তৈরি হয়ে গেছে। এবং তার ফলেই একমাত্র ঐ স্তম্ভের ভেতরকার মিথেন এবং অ্যামোনিয়া মিলিত হয়ে হাইড্রোজেন সায়ানাইডের যুগ্ম যৌগ তৈরি করতে পারে। সম্ভবত সেই যুগ্মযৌগ থেকে নির্গত রক্তাভ বিকিরণ আমাদের চোখে পড়ায় জায়গাটিকে আমাদের কাছে রক্তাভ বলে মনে হয়। মনে হয় বৃহস্পতির বুকে কে যেন একটি সুস্পষ্ট লাল রঙের টিপ পরিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু এও এখনও জল্পনা! ব্যাখ্যা যাই হোক, সঠিক সিদ্ধান্ত এখনও দূর অস্ত! অতি নিকট ভবিষ্যতে বিরাট ঐ গ্রহটির পাশ বরাবর একটি স্বনিয়ন্ত্রিত মহাকাশযান পাঠানর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঐ মহাকাশ-যান অনেক কাছে থেকে রাসায়নিকবীক্ষণ চালিয়ে হয়ত আমাদের বলতে পারবে রহস্যময় ঐ গ্রহটির বায়ুমণ্ডলের আসল পরিচয় কি? তখন ঐ রক্ত-তিলক সম্পর্কে হয়ত আমরা নতুন কোন বার্তাও পেয়ে যেতে পারি।

সমরজিৎ কর

'বিদ্যাকল্পদ্রুম'

বীণা দেবী জানালেন "আপনার গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলো ভালো লাগে পড়তে, কিন্তু দোহাই আপনার বাচ্চাদের কথা আর লিখবেন না; আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের আপনার চেয়ে অনেক বেশি ভালো করে চিনি...!" কথাটা বলে তিনি এক পেয়ালা চা, এক বাটি পায়েস আর পণ্ডিচেরীর আশ্রমের অগাধ সুধা ও তত্ত্ব পরিবেশন করতে লাগলেন।

বীণা দেবীর এই অর্ধ প্রশংসা বাণীর আনন্দে পুনরুজ্জীবিত উৎসাহ, পায়েস-জনিত সন্তোষ আর পণ্ডিচেরীর এক গাদা পত্রিকা নিয়ে গ্রন্থাগারের অভিমুখে পা বাড়ালাম প্রাচীন গ্রন্থের বিভাগে তীর্থযাত্রী হয়ে। ইচ্ছা ছিল—আমার বন্ধু রণজয়ের প্রপিতামহ রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদিত 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' নাড়াচাড়া করব।

এই দ্বিভাষিক Encyclopaedia Bengalensis-এর প্রথম উপাদান রোম রাজ্যের পুরাবৃত্ত [১৮৪৬]। "পূর্বকার ইউট্রোপিয়স ও লাটিন গ্রন্থকারদের ব্যাখ্যা—মধ্যে মধ্যে হুক, আর্নল্ড, নিবর, গিবন এবং অন্যান্য বক্তাদিগের গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত বৃত্তান্ত সম্বলিত..." আর এর থেকেই পাঠক মহলে আলোড়ন; গ্রন্থটি যথার্থ অনুবাদ নয়, প্রাচীন লাতিন লেখকের রচনা কোথাও সংকুচিত কোথাও প্রসারিত হয়েছে, তার ওপর জায়গায় জায়গায় আধুনিক ঐতিহাসিকদের প্রক্ষেপ।

কামেরন্‌ সাহেবের কাছে প্রেরিত এক পত্রে কে এম বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযুক্ত প্রণালীর সপক্ষে জানিয়েছেন, পাঠকদের চিত্তাকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য তিনি যা করেছেন, তার কৈফিয়ৎ এই যে তাঁর বর্ণিত বিষয় রোমের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস—লেখক বিশেষের চরিত্র চিত্র নয়। একে তো ঐতিহাসিক হিসেবে ইউট্রোপিয়সের কোনো উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যই নেই; তাতে আবার বাঙ্গালী পাঠক সমাজ ঐ রকম ব্যক্তিকেন্দ্রিক ইতিহাস বুঝতে এখনও প্রস্তুত নয়।

প্রত্যুত্তরে কামেরন্‌ সাহেব লেখককে সমর্থন করেও এই আশা প্রকাশ করলেন যে থুসিদিদেস্‌, প্লুতার্ক কিংবা লিবি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকের গ্রন্থাবলী বাংলা ভাষায় যদি কোনোদিন অনূদিত হয়, পাদটীকার বাইরে মূল রচনার মধ্যে কোনো সংযোজন প্রক্ষিপ্ত হবে না; "ঐ ধরনের প্রক্ষেপ মনে হয় ফিদিয়াসের খোদিত কিংবা রাফায়েলের চিত্রিত কোনো দর্শাচিত্রে আর এক মূর্তি সংযোজনের সামিল!"

অনুবাদ সাহিত্য

প্রক্ষেপের দুঃসাহসিক সংযোজন একমাত্র কে এম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈশিষ্ট্য নয়। রামলাল মিত্রের 'সুললিত ইতিহাস'-ও [শকুন্তলার উপাখ্যান, ১৮৫৪] কালিদাসের নাটকের অবিকল অনুবাদ নয়: "যে সকল অংশ দুরূহ ও অসংলগ্ন তৎসমুদয় পরিত্যাগ করা গিয়াছে এবং কোন২ স্থানে পাঠকবর্গের মনোরঞ্জনার্থ বিস্তর বাহুল্য করা গিয়াছে।"

মথুরানাথ তর্করত্নের মতে "বাঙ্গালায় ইংরেজির অবিকল অনুবাদ করা অত্যন্ত দুরূহ কর্ম, অনুবাদক অত্যন্ত সাবধান হইলেও রীতি বৈলক্ষণ্য ও মূলার্থের বৈকল্য ঘটিয়া থাকে" [জীবন বৃত্তান্ত ১৮৫৯]। ঐ ধরনের 'মূলার্থের বৈকল্য' দেখেছি রামমোহন রায়ের সংগৃহীত, রাখালদাস হালদারের অনূদিত 'সুখশান্তির উপায় স্বরূপ যিশু প্রণীত হিতোপদেশ'-এ [১৮৫৯]: "ধন্য সেই ব্যক্তি সকল, যাঁহারা আপনাদের আত্মার অভাব উপলব্ধি করিতে পারেন, কারণ তাঁহারা সুখ রাজ্যের অধিকারী হইবেন"; মূলে আছে: "ধন্য—অন্তরে যারা দীন; স্বর্গরাজ্য তাদেরই।"

প্রাচীন গদ্যানুবাদের মূল্যায়ন করতে

লেলে অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করবে—বাইবেলের তর্জমার পরে—Pilgrim's Progress-এর অনুবাদগুলি : যাত্রাগুসর [ফেলিকস কেরী, ১৮২১; পীয়াস্ ও পীয়ার্সন্, ১৮৩৪; ওয়েংগার, ১৮৫২], যাত্রিকের গতি, যাত্রিকের যাত্রার বিবরণ স্বর্গীয় যাত্রীর বিবরণ...। আর পদ্যানুবাদেই যাঁদের অনুরাগ তাঁরা অবশ্য পড়বেন পয়ারছন্দে রচিত 'ইলিয়াড' [১৮৬৩]।

তখনকার দিনের অনুবাদকদের সমস্যা ব্যাখ্যাত হয়েছে রোএর সাহেবের সেক্স্পীর প্রণীত নাটকের মর্মানুরূপ লেম্বসাহেব [Lambs Tales] নামক ইংরেজি গ্রন্থের কতিপয় আখ্যায়িকার অনুবাদে [১৮৫৩] : "বিজাতীয় ভাষা রচিত কোন গ্রন্থ ভাষান্তর করিলেই বৈলক্ষণ্য হয়, বিশেষতঃ গৌড়ীয় ভাষায় তাহার রস অবিকল রাখা বড় কঠিন হয়। এই ভাষার বর্তমান চলন দর্শনে বোধ হইতেছে যে ইহার ব্যাকরণশুদ্ধি বিলক্ষণ কিন্তু লিপিচাতুরীর পারিপাট্য অদ্যাপিও হইয়া উঠে নাই, সুতরাং এখন পর্যন্ত এতদ্ভাষায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থেরও বাহুল্যাভিরহ

আছে। সে যাহা হউক, এতাদৃশ ভাষাতে কোন গ্রন্থ লেখায় উভয় সংকট, কারণ সংস্কৃতবহুল সাধু ভাষায় লিখিলে আর সাধারণের সুগম হয় না, আর ইতর ভাষায় লিখিলে অতি হেয় ও গ্রাম্য বোধে সাধুগণের অগ্রাহ্য হয়।" রোএর সাহেবের মতে "বঙ্গ ভাষার বর্তমানাবস্থায় মূলগ্রন্থ অবিকল অনুবাদ করিলে তাহা অকাল-পরিণতবৎ ভাসমান হইবেক।"

'ভারতবর্ষের ইতিহাস'

'রোম রাজ্যের পুরাবৃত্ত' প্রথম আলোড়ন-কারী ইতিহাস-গ্রন্থ নয়। মার্শম্যান-লিখিত 'ভারতবর্ষের ইতিহাস'-এর অনুবাদক গোপালচন্দ্র মিত্র পুস্তকান্তে এক বিজ্ঞাপনে জানান [১৮৫০]। "ঐ মহাশয় খ্রীষ্টধর্মের অত্যন্ত পক্ষপাতী। আমি বঙ্গ ভাষায় ঐ গ্রন্থের অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া পরিবর্ত করিতে পারিলাম না, সুতরাং তাঁহার মতানুসারে অনুবাদ করিতে হইল।" মার্শম্যান লিখেছিলেন, "হিন্দুদের [illegible] ধর্ম পুস্তকে লিখিত ইতিহাস ব্যতীত ইংলণ্ডীয় বর্তমান শকের দুই সহস্র বৎসরের অধিক পূর্বে কোনো প্রাচীন জাতিদিগের মধ্যে ইতিহাস নাই। [illegible] অনেক স্বাভাবিক দৃষ্ট হয় যে মনুষ্যের পরমায়ু একশত বৎসরের অধিক [illegible] না [illegible] দশ পুরুষের অধিক [illegible]" পুরাণ [illegible] আনুকূল্য এবং [illegible] উৎপত্তির উল্লেখ আছে। [illegible] এই সব [illegible] উক্তি [illegible] হন।

'[illegible]' [১৮৫৮] ভূমিকায় [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] শ্রীযুত মার্শম্যান [illegible] যে এক পুস্তক রচনা করিয়াছেন তদ্দৃষ্টে বোধ হইল যে তিনি হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি ছলক্রমে স্বকপোল কল্পিত [illegible] দোষ দর্শাইয়া হিন্দু বালকদিগকে ভুলাইয়া খ্রীষ্টিয়ান করিবার মানসে লিখিয়াছেন ঃ যেমন আধুনিক ব্রাহ্মণেরা [illegible] দেশ হইতে আনিয়া এদেশে প্রকাশ করিয়াছেন; ব্রাহ্মণেরা [illegible] হিন্দুরা [illegible] এবং অতি নীচ জাতি; পূর্বে পাহাড়িয়া [illegible] ন্যায় ছিলেন; হিন্দুরা কস্মিনকালে স্বাধীন ও পরাক্রান্ত একচ্ছত্রী রাজা ছিলেন না; অতএব [illegible] স্থানের অধিপতি চিরকাল; খ্রীষ্টধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ, খ্রীষ্টিয়ান এবং যবন জাতির চিরকাল প্রাধান্য—এইরূপে কৌশলক্রমে পক্ষপাতাধীন যথেচ্ছা বর্ণনা করিয়াছেন।"

লেখক অন্যথা মার্শম্যানকে আক্রমণ করে নিরস্ত হন না, তাঁর নিজস্ব ধর্মমতও তিনি প্রচার না করে ছাড়েন না ঃ "ধর্ম-বিষয়ক অনুমান সিদ্ধ এই হয় যে সনাতন হিন্দুধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাগ্রিম, প্রাচীন কালের সভ্য জাতি মত্রেই বেদের আলোচনা এবং বেদ মতে উপাসনা করিতেন।" মোট কথা, "সাধারণ সমীপে এ অকিঞ্চনের নিবেদন এই যে আমারদিগের উচিত শাস্ত্রার্থে দৃঢ় বিশ্বাস অর্থাৎ পুরাণে যে শব্দটি আছে তৎসমুদয় বাক্য যথার্থ বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবেক।"

এদিকে কেদারনাথ দত্ত তাঁর স্বরচিত 'ভারতবর্ষের ইতিহাস'-কে [১৮৬০] লং সাহেবের নামে উৎসর্গ করে এক ইংরেজি ভূমিকায় লেখেন ঃ "পৃথিবীর এই সহজতম ভাষাটির [অর্থাৎ ইংরেজির] অর্ধ-শতাব্দীব্যাপী চর্চা নিম্নমানের কিছু নাটা প্রয়াস ব্যতীত, মূলত অনুবাদের বীজ বপন করেছে। ভারতের বর্তমান ইতিহাসটি এক্ষেত্রে প্রথম মৌলিক এক প্রচেষ্টা। মিল, ওআর্ড, মার্শম্যান ইত্যাদির কিম্ভূত ধারণা-বলী, হিন্দুচরিত্র বিষয়ে তাঁদের অপব্যাখ্যা-সমূহ যত্নসহকারে এই গ্রন্থে খণ্ডন করা হয়েছে।"

ঐ জাতীয় বাগবিতণ্ডা শুধু খ্রীষ্টধর্ম কেন্দ্রিক নয়। 'পাষণ্ড দলনের' [১৮৬২] ভূমিকায় রামলাল মুখোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ "এক্ষণে এদেশে বৈষ্ণব ধর্ম দ্বারা যে কত প্রকার অনিষ্ট ঘটিতেছে বোধ হয় তাহা সকলেই অবগত আছেন। (...) ইহার যত শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে ততই দেশের অনিষ্ট ঘটিতেছে; তাহার কারণ এই অধিকাংশ ইন্দ্রিয়পরায়ণ অলস ও সমজদুষ্ট ব্যক্তিরাই আপন আপন বাসনা চরিতার্থের নিমিত্ত ইহার আশ্রয় লইতে অগ্রসর হয়। তাহারা 'পরিশ্রম করা বৈষ্ণব ধর্মের বিরুদ্ধ কর্ম' এই বলিয়া তাহাতে পরাঙ্মুখ হয় এবং ভিক্ষার দ্বারা জীবনী নির্বাহ করে।"

আর আছে 'কায়স্থ দীপিকা' [১৮৫২] ঃ "কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব স্থাপন ও তন্মত খণ্ডন বিষয়ক বিচার—তৎসংক্রান্ত উভয় পক্ষীয় প্রস্তাবসমূহ বা লিপিচয় যাহাতে কায়স্থোৎপত্তি ও তজ্জাতীয় আদি পুরুষ বংশানুচরিত এবং আদ্যন্ত বিবরণ প্রকাশ আছে—বহুল প্রমাণ এবং

বন্দ্যের সহিত শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চৌধুরির কর্তৃক প্রকাশিত"।

'অজ্ঞানতিমির নাশক'
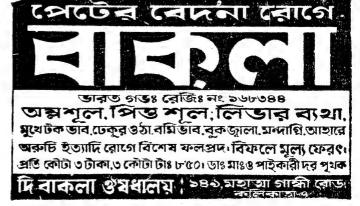
এই জাতের সবচেয়ে কৌতূহলপ্রদ মন্তব্য মিলবে 'অজ্ঞানতিমির নাশক—প্রশ্নোত্তর দ্বারা গ্রন্থ'-এ [১৮৩৮]। এই পাঠ্য পুস্তকে লেখক বৈদ্যনাথ আচার্য কাঁচড়াপাড়ার এক পাঠশালার ছাত্রদের "প্রয়োজনীয় তাবৎ বিষয়" সংগৃহীত করেছেন : "ধর্ম, বিদ্যা,

কথোপকথনে বস্ত্রাঞ্চল ধারণ বা অঙ্গস্পর্শ কি দোষ?

সভ্যতা, জ্যোতিষঃ, পদার্থবিদ্যা, ভূগোল, বঙ্গদেশের প্রাচীনেতিহাস" ইত্যাদি সব কথা।

অজ্ঞানতিমির নাশ করতে গিয়ে লেখক প্রথমে প্রশ্ন করেন : "তোমার নাম কি? তোমার পিতার, পিতামহের, প্রপিতামহের; মাতামহের, প্রমাতামহের বৃদ্ধ প্রমাতামহের [বৃদ্ধ প্রপিতামহের উল্লেখ নেই] নাম কি?" তারপর "তুমি কোন জাতি? তোমাদিগের গোত্র কি? তোমার কয় প্রবর এবং কি কি? তোমরা কোন শ্রেণী? তোমরা কোন বংশী? কান্যকুব্জে তোমার পূর্ব পুরুষের কি উপাধি ছিল?..." পাঠশালার যে ছেলেটি এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, তার অজ্ঞানতিমির অনেকটা নষ্ট হয়েছে বলে মানতে হবে!

যে-সব ছেলের পূর্বপুরুষ কান্যকুব্জ থেকে নয়, পিঁপড়েখালি কিংবা হিংগলগঞ্জ থেকেই সেই স্বনামধন্য কাঁচড়াপাড়ায় আগত, তারা যে পুস্তকের কোনো উত্তর দিতে পারবে না এমন নয়। ধরুন "কথোপকথনে বস্ত্রাঞ্চল ধারণ বা অঙ্গস্পর্শ কি দোষ?" কিংবা "কথনের প্রতি মনোযোগ ভাব কেমন?" প্রশ্নটা। উত্তর : "যখন এক ব্যক্তি কোন বিষয় নিবেদন করিতেছে তখন যে শ্রোতা অন্যমনস্ক হয়, যথা গবাক্ষ দ্বারা অন্যদিগে দৃষ্টি করে, অঙ্গুলী দ্বারা নাসিকা খোটে, কেহ নস্যাধার ঘূরায়, অথবা তৃতীয় ব্যক্তিতে এক কথা কহিয়া উঠে..."

ভূমিকায় সরলভাবে—কিন্তু সরল ভাষায় নয়—লেখক স্বীকার করেন যে "অধুনা সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাস বহু কষ্টে এবং বিদ্যা জন্মিলেও লাভ অল্প জন্য এই ক্ষণে অর্থকারী বিদ্যা ইংরেজী; লোকের তাহাতেই অনুরাগ, তদ্বিদ্যাতেও বিদ্যা জন্মিলে লোক সভ্য হইতে পারে।" তাতে অবশ্য একটি অসুবিধা আছে : "সর্বদা যুবারা কহেন, সংস্কৃত শাস্ত্রে কিছুই নাই, কেবল গোলযোগ মাত্র এবং ইহাই কহিয়া ক্ষান্ত থাকেন এমত নহে, বরং দেখা যাইতেছে অনেক যুবা অবজ্ঞা পুরঃসর সনাতন ধর্ম পর্যন্ত ত্যাগ করিতেছেন।"

দেশীয় ভাষায় লিখিত কোনো পাঠ্য পুস্তক যে একেবারে নেই এমন নয় : "মিসনরিরা মধ্যে২ ক্ষুদ্র২ পুস্তক বাঙ্গালা পাঠশালাতে এবং ইতস্তত বিতরণ করিয়া থাকেন, কিন্তু সে তাবৎ গ্রন্থের রচনা এমনি ভঙ্গিক্রমে আছে, যাহাতে বালক সকল মুগ্ধ হইয়া পিতামাতার নিকট হইতে আসিয়া খ্রীষ্টিয়ান ধর্মাবলম্বন করে, অর্থাৎ সে সমস্ত পুস্তকের মর্ম প্রায় এই যে হিন্দুমত অতি কদর্য এবং নীচ, হিন্দুশাস্ত্র সমস্ত মিথ্যা এবং অমূলক, হিন্দুরা চিরকাল বন্যপশুর ন্যায় ভ্রমণ করিতেছিল, ইতিমধ্যে ইংলণ্ডীয়েরা আসিয়া সভ্য করিতেছেন।"

লেখকের মত সম্পূর্ণ বিপরীত : "পূর্বকালে এই ভারতবর্ষের ন্যায় অন্যান্য বর্ষমধ্যে লোক সমস্ত সনাতন ধর্মানুগামী [ছিল], কিন্তু কালক্রমে ভারতবর্ষস্থ ভিন্ন ইদানীং প্রায় তাবদ্দেশস্থই হিন্দু ধর্ম

গবাক্ষ দ্বারা অন্যদিগে দৃষ্টি করে

কঠিন যবনাক্রম (!) হইয়া নানা দেশে নানা অবতার কল্পনা এবং পৃথক২ ধর্মস্থিরকরত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অথবা একজাতি অর্থাৎ ম্লেচ্ছ মধ্যেই প্রবিষ্ট হইয়া, তন্মধ্যে এক্ষণে তিন—যথা খ্রিষ্টিয়ান, য়িহুদি এবং যবন; ক্রাইস্ট হইতে খ্রিষ্টিয়ান, মুসা হইতে য়িহুদি, মহম্মদ হইতে যবন।" গ্রন্থকারের ভাষা সহজবোধ্য না হলেও সুধী পাঠক বুঝবেন : উল্লিখিত ধর্মত্রয় হিন্দু ধর্মের বিকৃত রূপবিশেষ।

লেখক আরও বলেন, ইংলণ্ডের "স্থানে স্থানে দেবমূর্তি অদ্যাপিও পাওয়া যায়, ভাষা সংস্কৃত-মিশ্রিত", চীন দেশেও "চীনেশ্বরী প্রতিমা অদ্যাপি আছে", এমন কি "মক্কায় মক্কেশ্বর শিব আছে।"

কালক্রমে "যবনেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া এ দেশের ধন ধর্ম এবং বিদ্যা এই তিন সম্পূর্ণ রূপে নাশ করিবার চেষ্টায় স্বর্ণ রৌপ্য মণি মুক্তাদি যাহা পাইত তাহা সমস্ত হরণ এবং উৎপাত করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করত, ধর্ম এবং বিদ্যা লোপের মানসে ক্রমে২ অন্বেষণকরত পণ্ডিতসমূহের স্থান হইতে বলপূর্বক গৃহীত পুস্তকাদি মাঠে পর্বতাকার করিয়া অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিত।"

"ফলকথা সনাতন ধর্মে কোন দোষ বা নিন্দা নাই, সে অতি যথার্থ এবং সকলের আদি যবনাদি তাবদ্ধর্ম আধুনিক এবং ইহকালে সুখভোগের নিমিত্তে রচনা হইয়াছিল।"

'কৃশ্চান' ভারতীয়দের অবশ্য উদ্ধারোপায় আছে—বর্ণিত হয়েছে "পতিতোদ্ধার সম্বন্ধে সভ্য মহাশয়দিগের অনুমত্যনুসারে' প্রকাশিত 'পতিতোদ্ধার বিষয়ক ভূমিকা ও ব্যবস্থা পত্রিকা' গ্রন্থে [১৮৫৩]। নবদ্বীপ, শান্তিপুর, ত্রিবেণী, কাশীপুর প্রভৃতি নানা-বাসী ৫৫ জন পণ্ডিত দেখা যায় এই ব্যবস্থাপত্রিকার স্বাক্ষরকারী।

অনেক দিন পরে অন্য সুর শোনা গেল জয়গোপাল বসুর 'ধর্মসংবাদে' [১৮৫৮]: "যে স্থলে এই তিন ধর্মেই একই প্রকার অভেদ সকল মূল ধর্মোপদেশ আছে যে, আপনার সকলকে প্রেম ও প্রীতি করিবে, তখন তিন ধর্মের সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্যের সহিত পরস্পর ঐক্য হইতেছে বলিতে হইবেক।"

ছেলেবেলায়, ছুটির দিনে, মাঠে মাঠে ঘুরতাম পুরনো ছাপার সন্ধানে। এক-একবার অপ্রত্যাশিতভাবে ধরা পড়ত নতুন আকারের, নতুন গড়নের, নতুন স্বাদের এক নমুনা। পুরনো ছাপা শিকারের অভিজ্ঞতা যাদের আছে, তাঁরাই বুঝবেন 'অজ্ঞান তিমির নাশক, প্রশ্নোত্তর দ্বারা গ্রন্থের' আবিষ্কারে আমার উৎসাহ।

আমার ভয় ছিল না। [illegible] সঙ্গী আছে, যাকে এতকাল সমীহ করতাম কিন্তু এখন যার সঙ্গে আমি স্বচ্ছন্দ, এই হেতু যে উভয়ের মধ্যে একটা সাঁকো তৈরী হয়ে গেছে। তাই বলতে পেরেছিলাম, "আসুন না, সুধীরমামা, আসবেন না?"

উনি ইতস্তত করলেন, এক লহমা, তার পর বললেন "না, থাক। আনু বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে।" আমি জোর দিয়ে বলেছিলাম, "আমার মা এত তাড়াতাড়ি কখনও ঘুমোয় না।"

কিন্তু তুমি তো ঘুমিয়েছিলে। চাপা গলায় কতবার ডাকলাম, "মা, মা, মা," তবে তো শুনতে পেলে। যেন নিশির ডাক ডাকছি, সাড়া দিতে নেই, তুমি সাড়া দেবে না। একটি ছায়ামূর্তি জোলো জ্যোৎস্নায় ভাসতে ভাসতে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে, আমার পা ক্রমশ অবশ, "মা—মা" ডাকতে গিয়ে গলা কাঁপছে।

আমার মা এত তাড়াতাড়ি ঘুমোয় না। বলেছিলাম। কিন্তু তুমি তো ঘুমিয়ে ছিলে! একটা লম্ফ হাতে খিল খুলে দিতে এলে, তার কালো-লালে মেশা পিঙ্গল আলোয় দেখলাম তোমার ফোলা ফোলা চোখ, সারা কপালে সিঁদুর—খুব বড় করে টিপ পরো কিনা ইদানীং, তাই বেশি করে ছড়ানো—আলগা কাপড়টা তোমাকে জড়িয়ে কোনমতে। দেখেই বুঝলাম ঘুমিয়েছিলে। তোমার কোল ঘেঁষে, বুকের গন্ধে ভোর তাই চিরকাল ঘুমিয়েছি, তোমার ওই চেহারা আমি চিনি না?

সোজা নিয়ে গেলে রান্নাঘরে। খাবার ঢাকা ছিল, বেড়ে দিলে। হাই তুলছিলে লুকিয়ে টের পাচ্ছিলাম, তোমার যাতে বেশি কষ্ট না-হয় তাই তাড়াতাড়ি খেলাম। একটু নতুন ধরন বৈকি, পিঁড়িতে বসে আমি চুলতে থাকব আর তুমি মুখে জোর করে গ্রাস ঢুকিয়ে দেবে বরং এই তো ছিল নিয়ম, সেই নিয়মটা আজ কি হঠাৎ উলটে গেছে?

খেয়ে উঠেই এক দৌড়ে বিছানা, যে-বিছানা তোমার-আমার, টান টান করে পাতা চাদর, মনে মনে ঠিক যেন মিলছে না, বালিশে মাথামাখি তোমার মাথার তেলের গন্ধ ছাপ কিছু নেই, তাতে তেমন-কিছু বিস্ময় নেই, কারণ তোমার রুক্ষ চুল, সবটাই খোলা, সেদিন বোধ হয় তেল মাখোনি, কিন্তু বালিশটাই যে নেই, বিস্ময় সেইটেই।

বাবার ওদিকটা আসছ্যা-আসবাস, কিন্তু ওঁর নাক ডাকছিল না, তবে ঘুমোননি? তা নিয়ে বিশেষ ভাবছিলাম না, তুমি ঘুমিয়েছিলে কি ছিলে না, এই ভাবতে ভাবতে আমি নিজেই কখন ঘুমিয়ে পড়লাম।

একটু একটু করে সব যে বদলাচ্ছে, বাইরের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছিলাম। [illegible] দেখতে দেখতে রাগী হয়ে যায়, সমস্ত দুপুরটা তামাটে। এক-একটা বিকেল আবার ঘোলাটে হয়ে যায়, যখন হা-হা করতে করতে এক-একটা ঝড় রাক্ষসের মত ছুটে আসে, কাঁপায় কাঁপায় সব কাঁপায়, আমাদের ঘরের চাল আর খুঁটিসুদ্ধ থরথরিয়ে দেয়। রাত্রে ছটফট সাপ গর্ত করে বেরিয়ে, দাওয়ায় কি উঠোনে এসে কুণ্ডলী পাকায়, অন্ধকারে সরসর করে রাস্তার এপার-ওপার হাঁটে।

এক-একটা ঋতু তখন এক-একটা ছাপ ফেলত, যেমন গ্রীষ্ম, তেমনই বর্ষাও, তার বড় বড় ফোঁটা মনের মাটিতে গেঁথে যেত।

বর্ষার একটু আগেই বোধ হয় বাবার বড় রকমের অসুখটা হল। কাশি তো ছিলই সেই সঙ্গে বুকের ব্যথাটা। জ্বরটা কিছুতেই যাচ্ছিল না, চোখ সারা দিন লাল, বাবাকে কেমন অন্য রকম লাগত। যখন চোখ বোজা থাকত বাবার, তখন ঠোঁট, দেখতাম, নড়ছে। কণ্ঠস্বরও চিরে গিয়ে চিকণ, বিড়বিড় কথাগুলো সব বোঝা যায় না, কখনও শুনতাম "এখানে থাকব না, আমি এর পর ছত্তিশগড় যাবো ঠিক ছিল যে। সেখান থেকে আরও দূরে, পশ্চিমে, একেবারে দ্বারকা, এই বলো না, আমি সেরে উঠব তো। উঠব না?"

কাছে ডেকে কখনও আমার মাথায় হাত রাখছেন, কড়া-পড়া হাত, কিন্তু শিথিল দুর্বল, তবু তাতেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। কখনও দৌড়ে ওষুধ আনতে ছুটেছি, কখনও-বা দেখছি চৌকাঠে দাঁড়িয়ে, তুমি নিশ্চল একটি মূর্তি বাবার শিয়রে। তাপ নিচ্ছ বুকে হাত রেখে, কপালে ঠাণ্ডা জলপটি, বাবা যদি উপুড় হয়ে শুয়ে, তবে ঘরেই বালতি বালতি জল এনে, ওঁর মাথায় ঢালছ, মুছিয়ে দিচ্ছ গামছায় আলগোছে, মাথাটা বালিশে তুলে দিলে সন্তর্পণে, আস্তে আস্তে যখন হাত পাখা নাড়ছ তখন যেন একটি মেঘের মত মমতা তুমি। অপলক, ঘন-নিশ্বসিত তোমাকে কখনও ক্লান্ত, ওখানেই এক পাশে এলিয়ে পড়তে দেখতাম।

কিন্তু, আশ্চর্য, লাগত না। নতুন বর্ষা আমাকেও নরম করে ফেলছিল।

আশ্চর্য, সুধীরমামাও ঠিক ওই সময়েই কাবু হয়ে পড়লেন। ওঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে ছিপ হাতে বেরিয়ে পড়তাম আমি, আগেই বলেছি ইতিমধ্যে দুজনের মধ্যে একটা সহধর্মী সখ্য হয়ে গেছে যদিও আমরা অসম-বয়সী, তাই যখন ক্লাস [illegible] জলের কোমল [illegible] পাশাপাশি একটানা অনেকক্ষণ। [illegible] ভাসছে, উঠছে, কিন্তু আড়চোখে চেয়ে টের পেতাম, সুধীরমামার লক্ষ নেই, আসলে মনই নেই ওখানে, মাছধরা-টরা তো সুধীরমামার নেশা নয়, কোনও দিন ছিল না, বুঝতে পারতাম উনি নতুন একটা অভ্যাসে প্রবেশ করতে চাইছেন।

দু-একটা কথা হত মাত্র। কথার কোনও দরকার ছিল না। আমরা দুজন দুজনকে বুঝতে পারতাম। যেদিন হয়ত একটাও মাছ উঠল না, সেদিন শেষবেলায় সুতোটুতো সব গুটিয়ে সুধীরমামা ওঁর নড়বড়ে শরীরটা নিয়ে উঠছেন, হাড়েহাড়ে-লাগা ঠোকাঠুকিরও যেন আওয়াজ পাচ্ছি, বলছেন, "আসলে কেন আসি জানিস? মাছ ধরাটা হল ধৈর্যের পরীক্ষা। এখানে বসে বসে সহিষ্ণুতা শিখি।"

কেন যে আসতেন, আমি জানতাম।

একদিন কিন্তু আসতে পারলেন না। ওঁর বাসায় গিয়ে দেখি, শুয়ে আছেন, আগাগোড়া চাদরমুড়ি, জানালা বন্ধ, ঘর অন্ধকার। পায়ের শব্দ পেতে মুড়ি সরিয়ে বললেন, "খুব মাথা ধরেছে রে, ছিঁড়ে যাচ্ছে, কম্প দিচ্ছে, আমাকে চেপে ধরবি? একবারটি চেপে ধর।"

চেপে ধরলাম, উনি যেন তৃষ্ণার্তের মত আমার মাথার ঘ্রাণ পান করলেন, যেন শুষে নিতে চাইছিলেন আমাকে, আমার সত্তাকে।

আঁকড়ে-ধরা হাত দুটো আপনা থেকেই এক সময়ে শিথিল হয়ে এল, আমি মাথা তুললাম, উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন কিন্তু তপ্ত শ্বাস তখনও গালে লাগছিল, পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলাম।

তোমাকে বললাম, "সুধীরমামারও অসুখ। খুব জ্বর, দেখে এসেছি।"

তুমি চেয়ে রইলে, যেন চোখ দিয়ে শুনলে, তোমার মুখে ভাবলেশ ছিল না, তখনই কিছু বললে না।

বললে, পরদিন দুপুরে, পুকুরঘাটে।

—"কেমন আছে রে?"

—"আজ তো যাইনি!"

—"যাবি না?"

—"যাবো তো বটে!"—বলো তো কথাটা একটু ঝোঁক দিয়ে বললাম। সঙ্গে সঙ্গে শুনলাম তুমি বলছ "আমাকে নিয়ে যাবি?"

"বাড়ি ছেড়ে? ঘরে বাবা একা—"

"উনি তো এখন একটু ভালোর দিকে। পথ্য দিয়ে এসেছি। তা-ছাড়া এখন তো আমার চান করার সময়—যাবো আর আসব, বেশি দেরি হবে না।"

[গ]

সেই জানালা-বন্ধ ঘর, এবার আমি সাক্ষী। সুধীরমামা ঘুমোচ্ছিলেন, গলা অবধি ঢাকা, বিছানার সঙ্গে রোগা মানুষটি আরো যেন লেপ্টে।

আমি শুধু দেখছি। তোমাকে এগিয়ে যেতে দেখলাম, আঁচল থেকে বের করলে একটি শাখা-করুণ হাত, খুব আলগোছে সেই হাতের পিঠ ওঁর কপালে একবার না-ছোঁয়ার মত ছোঁয়ালে। ব্যস, আর কিছু না। আমার দিকে ফিরে বললে, "এখনও তো বেশ জ্বর।" ব্যস আর কিছু না। জলপটি না, হাতপাখা না, শুধু কলসী থেকে গড়িয়ে ওঁর শিয়রের কাছে রেখে দিলে এক গ্লাস জল। বললে "এবার চল্।" যেমন চুপিচুপি এসেছিলে তেমনই চুপিচুপি বেরিয়ে এলে।

আর কিছু না কেন, বাবার শিয়রেও তো মূর্তিমতী শুশ্রূষা, সেবা, উৎকণ্ঠা আর মায়া তোমাকে দেখেছি, এখানে এই কৃপণ-কৃচ্ছ্র, নীরব নিস্পৃহতা, এই বৈপরীত্য ভালো লাগছিল না। সারা রাস্তা তোমার সঙ্গে একটা কথা বলিনি।

সেদিন যাকে ভেবেছি অমানুষী নির্মমতা, পরে তার মানে জেনেছি। একই জিনিসের দুপিঠ কোথাও সব ঢেলে দিয়েও মনে হয় আরও দিই, কোথাও হাত থাকে শামুকের মুখের মত গুটিয়ে, কিছু না-দেওয়া, দিতে না-চাওয়া বা না-পারাটাও সব দেওয়া।

বাবা জেগে গিয়েছিলেন। উঠে এসে বসেছিলেন দাওয়ায়. তুমি আঁতকে উঠেছ, "অসুখ-শরীর নিয়ে এ কী" প্রায় টিংকারের মত শুনিয়েছে তোমার গলা, কিন্তু বাবার চোখ তখন একেবারে ঠাণ্ডা, ভীষণ মসৃণ-সমতল কণ্ঠে বলেছেন, "কোথায় গিয়েছিলে?"

পুকুরঘাটে যে নয়, তোমাকে দেখে সেটা বোঝাই যাচ্ছিল, পেয়ারা গাছ থেকে উপরে নেমে এসে দুটো কাঠবিড়ালি উঠোনে কী খুঁটে খুঁটে খাচ্ছিল। ওরা দৌড়ে পালাল। একটু থমকে দাঁড়ালে এক মুহূর্ত। তারপর যেন বাবারই নিস্তরঙ্গ সমতল কণ্ঠস্বর নকল করে বললে, "সুধীরদার ওখানে।"

বাঁচালে তুমি, মা, একটা কিছু যে বানিয়ে বলোনি তখনই, তাতে সেই দিন আমার কাছে তুমি বেঁচে গেলে। আমি দম ধরে দাঁড়িয়েছিলাম। সেই ছোট্ট উত্তরটা শোনা গেল, অমনই একটা নেড়ী খিড়কির দিক থেকে খালি কুতকুতে চোখে উঁকি দিচ্ছিল, একটা লাঠি নিয়ে সেটাকে তাড়া করে গেলাম।

"ওখানে কেন?"

"সুধীরদার জ্বর।"

"খবর আনল কে?"

হাত দিয়ে আমাকে দেখিয়ে দিলে তুমি। সত্য অস্বস্তির, কিন্তু তার রঙ যে কী-সাদা, এই উঠোনের উপরকার খোলা আকাশটার মত, তখনই টের পেলাম।

দেখলাম, বাবা উঠছেন কাঁপতে কাঁপতে, খুঁটিটা ধরে দাঁড়ালেন। টলতে টলতে ঢুকলেন ঘরে, ফের সেই অসুখের বিছানায়।

সেদিন বিকালেই বাবার বোধহয় আবার জ্বর এল।

আর সেদিন রাত্রে? হঠাৎ ঘুম ভেঙে ভয় পেয়েছিলাম, মুখের উপর গরম বাতাস, কার তপ্ত শ্বাস। একটা নিবু-নিবু আলো জ্বলছিল, বাবার অসুখের সময় থেকে রোজই জ্বালা থাকত, বুঝতে দেরি হল না সেই শ্বাস কার। অনেক দিনের না-কামানো দাড়িগোঁফ, ঘন ভ্রূ, বাবাকে চেনা গেল সহজেই। সেই দাড়ি-ভুরুর জঙ্গলে বাঘের মত জ্বলছিল এক জোড়া চোখ- বাঘ, না, সে-দৃষ্টি পাগলের— আমাকে খড়খড়ে জিহ্বা দিয়ে লেহন করছে। মা, ও মা, তুমি এখনও কেন খাটের একপাশে যেন লুটানো লতা, তোমার ঘুম ভাঙে না কেন।

আমি সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে ফেলেছি, যেন দেখিনি এই ভান, ঘুমের ভানের চেয়ে ঘুমিয়ে-পড়া কত সহজ, কিন্তু আমি তো ঘুমোব না, জেগে থাকব, সব নড়া-চড়া নিশ্বাস বন্ধ করে দিয়ে, সেকেন্ড কাটছে, এক, দুই, তিন, কত সেকেন্ডে এক মিনিট, কত মিনিটে, হে ভগবান, একটা গোটা রাত? তারপর চোখ বুজেই টের পেয়েছি, শিকারী বড় একাগ্র চাউনিটা সরে গেছে, যেতে যেতে একটা পা লণ্ঠনটা দিয়েছে উলটিয়ে। তেল গড়াচ্ছে নিশ্চয়ই, কাল সকালে নিশ্চয়ই মেঝের উপরে কালো একটা দাগ দেখতে পাব, ফিতের মত, ফিতে কিংবা অজগরের একটা বেণী, ঘামে ভেজে উঠতে উঠতে আমি এইসব কল্পনা করলাম। ঘামের কুলকুল ধারাও কখনও কখনও শোনা যায়।

আকাশ পাতাল অনেক কিছু ভাবতে থাকলাম, খাঁজ ভেবে পেলাম না, ঝুঁকে পড়ে বাবা কী দেখছিলেন আমার মুখে, অত ঘন ঘন ওঁর শ্বাস পড়ছিল কেন।

পরদিন সকালে উঠে শুনতে পেলাম বাবা বলছেন তোমাকে, "আমি এবার যাব।"

দুজনেই বারান্দায়, বাবার গলা মৃদু, যেন আলাদা মানুষ, একবার হঠাৎ ঘরে ঢুকলেন, বোধহয় একটা গামছা নিতে, আমার দিকে তাকালেন, তবু দেখতে পেলাম, এরই মধ্যে বাবা কখন দাড়িটাড়ি কামিয়ে দিব্যি।

আসলে, শেষ রাত্রে ঘুম তো, আমিই বোধহয় বেলা করে উঠেছিলাম।

আবার বাবা বেরিয়ে গেলেন বারান্দায়, তোমাকে বললেন, "যাব, কাল কি পরশু।" তুমি বললে শুনলাম "সে কী, শরীর এখনও সারেনি", বাবা তৎক্ষণাৎ "আমার অসুখ কি সারবার, তুমি কী বলো?" গলা থেকে বোঝা যাচ্ছে বাবা হাসছেন মিটি-মিটি, চমৎকার, কী মধুর, কিন্তু মা তুমি ছাড়ছো না, গলা আরও নামিয়ে বলছ "কিন্তু আমার এই অবস্থায়—"

"ভয় পাচ্ছ?"

"পাচ্ছি।"

"ঠিক জেনেছ একেবারে?"

"একেবারে ঠিক কী করে বলি আর। তবে আর-আর বারের মতই সব কিছু— এক-একবার তুমি আসো, আর এই হয়। তোমরা কী দয়াহীন, দয়াহীন একটা দস্যু—" মা তুমি যেন আর কথা খুঁজে পাচ্ছিলে না।

হো-হো করে নির্মল হাসতে শুনতে পেলাম বাবাকে, যেন নিজের মজা-পাওয়া গলায় নিজেই মজে গেছেন, "ভালোই তো হল, তুমি ভাবছ কেন, এবারে তো দেশের ভাবী সংগ্রামের এক একজন সৈনিক—"

"তা হয় না। হবে না।" মা, তুমি কাঁপছ, কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে যে দাঁতে দাঁত গেছে চেপে, "হবে না, হবে না।"

"হবে না কেন।"

"কে টানবে এর, কে মানুষ করবে?"

হা-হা হা-হা, অন্যদিন অনেক হাসি বাবার, কিন্তু বলছেন আস্তে আস্তে, "কেন, টানবার লোক তো আছে, মানুষ করা? সেটা ঠিক জানি না।"

"মানে?"

"না যদি জানো তো বলব না। কিন্তু দ্যাখো, যেটা আছে, সেটা ঠিক মানুষ হচ্ছে না।" এইবার বাবা সেই সাংঘাতিক কথা বললেন, "ভাবছি ওকে আমি নিয়ে যাব। এখানে রাখব না। এখানে ও বরং খারাপ প্রভাবে অমানুষ হচ্ছে। ওকে আমার কাছে রেখে মানুষ করে গড়ে তুলব।"

ওকে, মানে আমাকে। কাঠ হয়ে শুনেছিলাম। মা, রুদ্ধশ্বাসে তোমাকে বলতে শুনলাম, "বলছ কী?"

"ভেবে-চিন্তেই বলছি।"

"তুমি রাক্ষস, তুমিই বলতে পারো এ-কথা।"

"একেবারে ঘাবড়ে যেও না।" দরজার ফাঁক দিয়ে দেখছি, বাবা চোখ টিপছেন— "ওকে আবার ফেরত পাঠাতেও পারি।"

"মানে?"

"বলছি। তার আগে তুমি হিসেবটা আর-একবার ভালো করে বলো তো? আমি সেই একবার এলাম, কোন্ সালে যেন, বছরটা মনে করিয়ে দাও। তারপরে এলাম যেবার, সে ক'বছর পরে? বোধহয় দুই-কি-তিন। ওকে দেখলাম, তুমি বললে ওরও ঠিক দু'বছর পূর্ণ হয়েছে। সত্যি বলো তো, ও কি তখন দু'বছরেরই ছিল, তার চেয়ে কমটম নয় তো?"

তোমার মুখে কথা ছিল না। কান্না, রাগ, ঘেন্না সব মিশিয়ে যেন মিলিয়ে যাচ্ছিল, "নির্লজ্জ, বদমাস, ইতর?" খুঁটি ধরে সামলে এই তিনটি শব্দই খালি বলতে পেরেছিলে।

"আ-হা-হা গালাগাল পরে, আগে শোনোই না। কথাগুলো চটপট বলে ফেললেই তো খটকা মিটে যায়। সোনামণি, আমার দিকটা তুমি কেন দেখছ না। জানো, আমি মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে নিজের মুখটা মিলিয়ে দেখি? তারপর নিজেকে দেখি আয়নায়। কোনো-কোনো রাতে, ও যখন ঘুমিয়ে, দেখি, দেখতেই থাকি আমার যন্ত্রণাটা তুমি বুঝছ না?"

তোমার মুখে কথা ছিল না, চোখের মণি ঠিকরে বাইরে আসতে চাইছিল, কিন্তু সারা মুখ ছিল অসম্ভব সাদা। কোনমতে টেনে টেনে, কিন্তু তীব্রস্বরে, তুমি বললে— "তুমি—চলে—যাও।"

"যাবোই তো। বলো তো আজই। তবে একেবারে এইভাবে বিদায় দেবে? পাঁজি খুলে যাত্রা শুভ-টুভো কিনা একবার দেখে দেবে না?"

উত্তর নেই।

"বলেছি তো, ওকেও নিয়ে যাব। কলকাতায় আজকাল অনেক রকম পরীক্ষা হয়েছে, ব্লাড টেস্ট, কখনও শুনেছ? রক্তের সঙ্গে রক্ত মেলানো। কথাটা যখন উঠেছে, তখন যাকে নিজ হাতে মানুষ করব, তার সম্পর্কে একেবারে নিঃসংশয় হওয়াই তো ভালো।"

হাতের কাছে কী-একটা পেয়ে তুমি ছুঁড়ে মেরেছিলে বাবাকে। সমস্ত দৃশ্যটা চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। খালি আমার কান দুটোয় প্রতিটি শব্দ ঢুকছিল। সেই ভয়ংকর সকালটাকে আজও ভুলিনি। অনেক কথা, অনেক ইঙ্গিত সেদিন ছিল অস্বচ্ছ, কিন্তু কথাগুলো যে ভয়ানক, সেটা সেই অবোধ বয়সের সহজাত বোধেও গেঁথে গিয়েছিল।

[ক্রমশ]

॥ ৩ ॥

শ্রী হেমেন রায়ই আমাকে প্রথম কলকাতার পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন। আগেই বলেছি, তাঁর রচিত গানেই আমি প্রথম নিয়মিত সুর সংযোজনা আরম্ভ করি। তাঁরই উদ্যোগে নাট্যনিকেতনে "সতীতীর্থ" ও "জননী" এই দুটি নাটকের আমি সঙ্গীত রচনা করি। সে সময় রঙ্গমঞ্চের জন্য আমার এই সঙ্গীত রচনা শ্রোতাদের প্রশংসা পেয়েছিল। পত্র পত্রিকাতে উচ্চপ্রশংসিত হয়েছিল আমার সুর-যোজনা। কলকাতার রঙ্গমঞ্চে তখন শ্রীমতী নীহারবালা ছিলেন গানের জন্য বিখ্যাত। তাঁকে আমি গান শেখাই এবং নাটকে শ্রীমতী নীহারবালা আমার রচিত সুরে গান করেন।

"সতীতীর্থে" ছিল নয়টি গান, সবকয়টির সুরই আমার দেওয়া। নাটকের তখনকার দিনের এই জনপ্রিয় গানগুলি অনেকেরই মনে থাকবে। যেমন 'চোখের জলে ভিজিয়ে দিলাম গলার বেলীর মালা', 'চল রাধে তুই বরনপুরে' বা 'যৌবন আজ দুলিয়ে দিলে' ইত্যাদি।

কলকাতার রঙ্গমঞ্চের সংযোগযুক্ত থাকাকালে আরও অনেক গুণী শিল্পী সাহিত্যিকদের সান্নিধ্যে এসেছিলাম এবং এঁরা সবাই আমার গান ও সুরারোপ শুনতে ভালবাসতেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গাঙ্গুলী, যোগেশ চৌধুরী, নরেশ মিত্র, অহীন্দ্র চৌধুরী এবং সর্বোপরি শিশির ভাদুড়ী। এঁদের সবাইকে আমি বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখতাম। এঁরাও সকলে আমার গান শুনতে খুব ভালবাসতেন। এই একই সময়ে আমি রঙ্গমঞ্চের প্রতিও খুবই আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। কলকাতার রঙ্গমঞ্চে এমন কোন নতুন প্রযোজনা ছিল না যা আমি না দেখতাম। রবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী পরে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হন। জহর গাঙ্গুলী ও আমি দুজনেই ছিলাম ফুটবল খেলার ভক্ত। কিন্তু সে ছিল মোহনবাগানের সমর্থক, আমি ইস্টবেঙ্গলের। যেদিন মোহনবাগান খেলায় হেরে যেত, সেদিন আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিত বা যে সময় ইস্টবেঙ্গল হেরে গেলে আমাদের মধ্যে রীতিমত মনকষাকষি হয়ে যেত।

আজ জীবনের সায়াহ্নে যখন উপরোক্ত সব গুণী শিল্পী, সাহিত্যিক, পণ্ডিত ব্যক্তিদের কথা মনে পড়ে তখন মন বড় নিঃসঙ্গ হয়ে যায়। এঁদের অনেকেই আজ আর নেই। কিন্তু সে ছিল এক সৃষ্টির যুগ, এঁদের সকলের মধ্যেই ছিল সৃষ্টির আবেগ। কঠোর সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তখন সংসার চালাতে হলেও তার মধ্যে ছিল অনাবিল আনন্দ। আবার যদি সেসব দিনগুলি ফিরে পেতাম।

একই সময়ে চলচ্চিত্রের বিখ্যাত প্রযোজক ও পরিচালক শ্রীমধু বসুর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটে। তাঁর নির্দেশনায় যখনই কোন মঞ্চাভিনয় বা চলচ্চিত্র হয়েছে, আমি তা দেখতে গিয়েছি। তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী সাধনাও আমার কাছে গান শিখেছিলেন। আগেই বলেছি, মধু বসুর "সেলিমা" নামে একটি ছবিতে আমি গান গেয়েছিলাম, একটি ভিখারীর ভূমিকায়। মধুবাবুর তাঁর আত্মজীবনী "আমার জীবন" পুস্তকে এ বিষয়ে যা লিখেছেন, তা এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না—

"চৌরঙ্গী প্লেসে বর্তমান রকসী সিনেমার পাশেই একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিলাম। নতুন করে আবার সংসার পাতলাম সেখানে, ১৯৩৩ সালের গোড়ায়।........ সাধনা ঐ সঙ্গে আবার নতুন করে গান শিখতেও লাগল। সে সময়ে আমাদের ফ্ল্যাটে প্রায়ই গান-বাজনার আসর বসত; এই আসরে প্রায় নিয়মিতভাবে যারা আসত তাঁদের মধ্যে মিহিরবাবু (তিমিরবরণের দাদা মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য), শচীন (দেববর্মণ) ও হিমুর (হিমাংশু দত্ত সুরসাগর) নাম বেশি করে মনে পড়ছে। আমি শচীনকে সাধনার গান শেখার আগ্রহের কথা বলতে সে অত্যন্ত খুশি মনে তাকে শেখাতে চাইল এবং বলা বাহুল্য, এর জন্য কোনরকম পারিশ্রমিক নিতে সে রাজি হল না।......

২৭শে এপ্রিল, ১৯২৪. ভোরবেলায় বাবা পরলোকের দিকে যাত্রা করলেন। 'সেলিমার' স্যুটিং অবিলম্বে করবার তাগিদ আসায় আমাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কলকাতায় চলে আসতে হল। ......সেলিমার একটি ছোট্ট ভূমিকায় অভিনয় করেছিল, আজকের দিনের বিখ্যাত এক সঙ্গীত পরিচালক। এই ভূমিকাটি ছিল এক ভিখারীর। এই সঙ্গীত পরিচালক তখন গাইয়ে হিসাবে সবে নাম করেছে এবং সাধনাকে গান শেখাত। তাকে একদিন কথায় কথায় বললাম একটি ছোট্ট ভিখারীর ভূমিকা আছে— কাজ বিশেষ কিছুই নেই— শুধু বসে বসে একটি গান করতে হবে আর

কিছু নয়। শুনে প্রথমে সে চমকে উঠল, বলল—বলেন কি মিঃ বোস? আমি ফিল্মে নামব কি? জানেন তো আমার পরিবারকে। আমি যদি ফিল্মে নামি, তাহলে তাঁরা নির্ঘাত আমায় একঘরে করবেন। আমি গান করি, রেকর্ড করি, তাইতেই কত লোক কত কথা বলে। আমি বললাম, তোমায় এমন করে মেকআপ করে দেব, দাড়ি গোঁফ লাগিয়ে, যে কেউ চিনতেই পারবে না। তারপর অনেক করে বোঝাতে শেষটায় সে রাজি হল। গানটি সে খুবই ভালো গেয়েছিল। এই বালকটি হলো আজকের বিখ্যাত সংগীত পরিচালক কুমার শচীন দেববর্মণ।"

(আমার জীবন—মধু বসু, পৃষ্ঠা ১৮৩, ১৮৬, ১৯৬, ১৯৮)

কাজী নজরুল ইসলামের সংগেও দীর্ঘকাল ধরে আমার ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি আমাকে যথেষ্ট ভালবাসতেন এবং আমি তাঁর স্নেহধন্য শিল্পী। তাঁর রচনা, গান, কবিতা, আবৃত্তি আমি বহু শুনেছি। তিনিও আমার গান ও সুর খুবই পছন্দ করতেন। আমার বাড়িতে আসতেন, মুগ্ধ করতেন কবিতা ও গানে। আমার নিজস্ব ধরনে গানে সুর দিয়ে তাঁকে যখনই শুনিয়েছি, উৎসাহিত করেছেন আমাকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায়। তাঁর রচিত গান রেকর্ড করতে আমাকে আদেশও দিয়েছিলেন। আমার জন্যই বিশেষভাবে সেগুলি রচনা করেছিলেন তিনি। আমি তা রেকর্ডও করেছিলাম এবং সবকটি গানই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল কাজীদার রচনার গুণে। অনেকেই আমার গাওয়া "চোখ গেল, চোখ গেল কেন ডাকিস রে—চোখ গেল পাখিরে" গানটি শুনেছেন। এটি কাজীদার রচিত। প্রায় চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যে লিখেছিলেন আমার জন্য, সুর দিয়ে। আমি কাজীদাকে বলেছিলাম—"ঝুমুরের ধরনে একটু "টিকলিশ" সুরের গান দিন আমাকে।" কাজীদা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দিলেন ওই গানটি উপহার। কাজীদার সঙ্গলাভ আমার জীবনের অন্যতম প্রধান ঘটনা।

হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্টস-এ আমি প্রথম আমার গান রেকর্ড করা শুরু করি এ সময়ে। আগেই বলেছি, আমার নিজের সুরে যে দুখানা বাংলা গান সর্বপ্রথম রেকর্ড করেছিলাম, তার একটির প্রথম লাইন ছিল—"ডাকলে কোকিল রোজ বিহানে মাঠের বাটে যাই"—গানটির লেখক শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়। অপর গানটির প্রথম লাইন ছিল—"এই পথে আজ এসো প্রিয় কোরো না আর ভুল"—এই গানটি লিখেছিলেন শ্রীশৈলেন রায়। নিজের গলা, নিজে শুনেছি। প্রথম প্রথম সে ছিল এক থ্রিলিং ব্যাপার আমার কাছে। এরপর থেকে আমার গাওয়া আরও বহু গান রেকর্ড করেছেন হিন্দুস্থান কোম্পানি, যার বেশী ভাগই বাংলা গান। কয়েকটি হিন্দী গানও আছে তার মধ্যে। খুব সম্ভব ১৯৪৭ সাল থেকে হিজ মাস্টারস ভয়েস-এ গান রেকর্ড করা শুরু হয়। প্রথমদিকে হেমেন্দ্র রায় আমার গান লিখতেন, পরে সুধীরেন্দ্র সান্যাল এবং শৈলেন রায়ও লিখেছেন আমার জন্য বহু গান।

এই সময়ে আমি শ্রীঅজয় ভট্টাচার্যকে লিখলাম কলকাতা চলে আসতে এবং আমার জন্য গান লিখতে। অজয় তখন চলে এল কলকাতাতে সঙ্গে সঙ্গে। সে আসার পর আমার সব গান অজয়ই লিখত। তারপর অসময়ে অজয় যখন আমাদের ছেড়ে চলে গেল, তখন আমার জন্য গান লিখল শ্রীগৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও শ্রীরবি মজুমদার। এদের লেখা বহু গান আমি রেকর্ড করেছি।

সর্বপ্রকার কলাবিদ্যাই আমাকে চিরকাল আকৃষ্ট করেছে। চিত্রকলা, নৃত্য, মঞ্চাভিনয় ইত্যাদি কত কি। ১৯৩৫ সালে শ্রীমতী বালা সরস্বতীর ভারতনাট্যম নৃত্য প্রথম দেখি কলকাতায়। মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম এই শিল্পীর নৃত্য ও অভিনয়ে। উদয়শংকর ছিলেন আমার প্রিয় নৃত্যশিল্পী। তাঁর কোন অনুষ্ঠান কলকাতায় যখনই হত আমি তা দেখতাম। উদয়শঙ্করের পরে শ্রীরামগোপালের নাচ দেখে অভিভূত হয়েছিলাম। কলকাতাতে কোন ভাল অনুষ্ঠানই বাদ দিতাম না। শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের নাচগুলি [illegible] কলকাতাতে [illegible] দেখেছি। এ ছাড়া সেরাইকেলার ছৌ নাচ, লক্ষ্ণৌর শ্রীঅচ্চন মহারাজ, শ্রীশম্ভু মহারাজের নাচ। শম্ভু মহারাজের ঠুংরী গান এবং সেসব গানের ভাব সব সময় আমাকে আকৃষ্ট করেছে। আমাদের [illegible] মণিপুরী [illegible] ভক্ত ছিলাম। শ্রেষ্ঠ বহু মণিপুরী নৃত্য-শিল্পীদের নাচ দেখারও সৌভাগ্য হয়েছে আমার। কলকাতাতে পাশ্চাত্যের [illegible] পাভলোভার নাচও দেখেছিলাম। পরবর্তী-কালে বিদেশে মস্কো, লেনিনগ্রাদ, হেলসিঙ্কি, লন্ডন, প্যারিস প্রভৃতি বিভিন্ন শহরে নানা প্রকার ব্যালে, অপেরা, [illegible], আধুনিক গান ও নাচের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছি। হেলসিঙ্কিতে [illegible] উৎসবে [illegible] নানা দেশের সংগীত, লোকসংগীত ও উচ্চাঙ্গ সংগীত শোনার সৌভাগ্য হয়েছে। সংগীত ছাড়া প্রথম আকর্ষণ [illegible], চিত্রকলা, ভাস্কর্যও আমাকে একইভাবে আকৃষ্ট করেছে। ভাস্কর্যের কথায় প্রথমেই উল্লেখ শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর কথা বলতে হয়। তাঁর ভগিনী আমার বন্ধু ছিলেন। সেই সূত্রে দেবীপ্রসাদের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ প্রীতি ও আত্মীয়তার সম্পর্ক। তিনি আমার গানের খাতার উপরের মলাটে "সুরের পরশ" আর্টিস্টিকভাবে এক অপূর্ব ছবি এঁকে দিয়েছিলেন যা এখনও আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছি। দেবীপ্রসাদবাবু মাদ্রাজ সরকারী আর্ট কলেজে যোগ দিয়ে সেখানে বসবাস করতে লাগলেন আর আমিও ১৯৪৪ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘোরের মধ্যে বম্বে চলে এলাম। শুরু হল আমার জীবনের তৃতীয় পর্বের মহাযুদ্ধ।

(ক্রমশ)

যুধিষ্ঠিরের নন্দন কানন

দু'খানা থালা বন্ধক রেখে পাঁচ সের চাল দেবেন সাহা মশায়, বড্ড টানাটানি, ক'দিন জ্বর গায়ে জনখাটতে বেরুতে পারিনি; তিনটে মেয়ে, চারটে ছেলে, একটা বিধবা বোন, তারপর আমরা দুই মেয়েমর্দ—এই দশজনের, প্রতি বেলায় পাঁচ সের চাল লাগে—পাব কোথায়? চার বিঘে পৈতৃক বাস্তুভিটেও বন্ধক পড়ল। ঘরের ছাউনী গলে গেছে—প্রাণের ভয়ে কাক বসে না! আড়াই টাকা ধানের বস্তা (দেড় মণ), আমার চার আনা করে রোজের দাম, অন্যলোকের তিন আনা, দু আনা—তা ক'দিন খাটলে তবে আড়াই টাকা হবে! ছ'পয়সা চালের সের—পাঁচ সের চালের দাম পাঁচ ছ' [illegible] পয়সা, আর কিছু, চাল [illegible] পয়সাও চাই। না হয় সাহা মশায় আট আনাই দাও।'

থালা বন্ধক দিয়ে [illegible] ঘেঁষে নিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে বলে নিমাই। [illegible] বড় ছেলে যুধিষ্ঠিরটাকে পেটের দায়ে মুদিখানায় কাজে পাঠালুম পাঠশালার পড়া ছাড়িয়ে। তা সে ছেলে ভাল। নিজের চেষ্টায় মুদিখানার হিসেবপত্র করতে হয় বলে পড়াশোনা করে শিখে নিয়েছে। এখন রামায়ণ মহাভারত পড়তে পারে। খাতা লেখে। দশ বচ্ছর মুদিখানা চালিয়ে এসে এখন বলছে সে ছোট ভাইদের নিয়ে শাকসব্জির ব্যবসা করবে। তা সে যা টাকা এনেছে, একটা পাইও দিতে চায় না—বলছে বন্ধকী অন্ততঃ দু বিঘে জায়গা ছাড়িয়ে নেবে। সেই জমিতে গায়ে গতরে খেটে মুলো-পালং-লাউ-বেগুন চাষ করবে।'

সাহা মশায় বলেন, 'খুব ভাল কথা। তোমার ছেলে যুধিষ্ঠির ভাল মানুষ হবে বলে মনে হয়।'

মাত্র বছর দুই গেল আর টানাপোড়েনে। যুধিষ্ঠির তার ভাই ভীম অর্জুন আদি চতুষ্পাণ্ডব আর বোনেদের নিয়ে খানাডোবা থেকে জল ছেঁচে সার দিয়ে সব্জি চাষ করে তাদের দু'বিঘে জমিকে সবুজ কাননে পরিণত করলে। কলা, কপি, বেগুন, টম্যাটো আলু, পালং, কুমড়ো, লাউ, সিম, বরবটি, মটরশুঁটি, গাজর, মূলো ইত্যাদি সে এমন ফলাতে শুরু করলে যে সবাই বাহবা দিলে। হাটের সেরা মাল তার।

আরো দু বিঘে জমিও ছাড়ানো হল। ঘরের চালে উঠল টালি খোলা। বোনেদের বিয়ে দিতে হবে। কোনোক্রমে এখন পেটের ভাতের জোগাড় হয়েছে। বাবার গতর পড়ে গেছে। দাওয়ায় বসে বসে মাছ ঘাস নিড়োয় আর হুঁকো টানে নিমাই

গায়েন। মেজো ছেলে ভীম বেশ কাজের লোক। ঘাম ঝরা সব সময় তার শরীরে [illegible]।

দু বোনের বিয়ে দিলেন যুধিষ্ঠির। তারপর ভীমকে নিয়ে একটি আড্ডায় বসে গবেষণা শুরু করলেন :

দু'খানা থালা বন্ধক রেখে পাঁচ সের চাল দেবেন সাহা মশায়,...

'আচ্ছা ভীম, সারাদিন-রাত কাজ করতে পারব আমরা, অথচ লাভ বেশি হবে এমন কি কাজ করা যায়?'

ভীম বললে, 'শাকসব্জির দাম হালকা, লাভ কম, খাটুনি বেশি। আর অনেক সময় জায়গা পড়েও থাকে। মরশুমে মরশুমে এসব চাষ করতে হয়। এখন তবে কি করবে ভাবছ?

'ধর, যদি নার্শারী করি। তবে আস্তে আস্তে, আমাদের টাকা পয়সার সামর্থ্য অনুসারে। দিন দিন বাজার-দর বেড়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে শীগগিরই দেশের স্বাধীনতা আসবে। তখন কি হবে? স্বাধীনতা এলে এই যারা স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করছে তারাই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হবে। তারা নিজেদের আখের গুছোবার জন্যে ব্যস্ত হবে। দেশ যদি ভাল করে শাসন করতে না পারে বাজারে আগুন ধরে যাবে। যারা ব্যবসাদার চোরাকারবারি তারাও ফোঁটাচন্দনের তিলক কেটে সমাজসেবক হবে। বাজারে দিন দিন আগুন জ্বলে উঠবে। তখন আমাদের মতন গরিবদের কি হবে?'

ভীম অতশত তলিয়ে বোঝে না। সে বলে, 'দেশ স্বাধীন হলে তো আরো ভাল।'

'তুই ওসব বুঝবি পরে। শোন, নার্শারী করব আমরা। কলকাতায় একটা দোকানও নেব পরে। গাছপালা আনবার কথাও বলে ফেলেছি। তুই মাটি কুপিয়ে জায়গা ঠিক কর যেমন যেমন বলি।'

তারপর নার্শারী চাষ আরম্ভ হয়ে গেল। বিয়েও করে ফেললে যুধিষ্ঠির গায়েন। সে আজ থেকে ২৫।২৬ বছর আগের কথা। ১৩৫১ সাল তখন। সবে পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ বাংলাদেশের মাংস চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে হাড়গোড়গুলো ফেলে রেখে গেছে। দূর্বা গাছের খাড়া পড়ে থাকলে আবার যেমন বর্ষায় তার গায়ে পাতা ঘাস গজায় তেমনি প্রাণসম্পদ সজীবতা ফিরে এল ধীরে ধীরে।

যুধিষ্ঠিরের বাবা মারা গেল। পৈতৃক চার বিঘে জায়গা যুধিষ্ঠিরের নামে সে দলিল করে লিখে দিয়ে গেছে। তার অর্থ পরিষ্কার। তোমার হাতেই আমার সংসারের যাবতীয় ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গেলাম বাবা!'

বাগান সাইজ হয়ে পুরোদমে যখন মাল বিক্রি শুরু হল তখন যুধিষ্ঠির বেলেঘাটায় দোকান নিলে। দোকানের নাম দিলে পরমানন্দ নার্শারী।

দুই বোনের বিয়ে দেবার পর নার্শারীর আসল প্রাণ ভাই ভীম গায়েনেরও বিয়ে দিয়ে দিলে। তারা স্বামী স্ত্রী দুইজনেই ফল বাগানে কাজ করতে লাগল। আর যুধিষ্ঠিরের স্ত্রী পরিবালা সংসারের রান্না, জনেদের মুড়িভাজা, গরুবাছুর দেখতে লাগল।

বেলেঘাটার দোকানের আয় থেকে ছ-বিঘে জমি কেনা হল। তখন সংসারে সুদিন এসেছে। দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। বাজার চড়ছে দিন দিন। কিন্তু হঠাৎ ভীম মারা গেল দুটি ছেলেমেয়ে রেখে গোকুল অন্ধকার করে। যুধিষ্ঠির চোখের জলে সারা সংসার—সারা দুনিয়া অন্ধকার দেখলে। এবার কি হবে? কে দোকান

দেখবে, কে দেখবে এই নার্শারী আর বাগান ভরা ফুলে 'ফুলময় এই নন্দন কানন? আর কাঁটা বন্ধুদের বিরহ, দীর্ঘশ্বাসে ছাদ্রবধূ পান্নাবালার মতো তাদের বাগানও শুকিয়ে যাবে না তো?

'কিন্তু না, ভগবান পথ করে দেন। তিনি বলেন, 'ধৈর্য ধর, মৃত্যু, শোক, রোগ, বিপর্যয়, বিপদ, বিভীষিকায় বিচলিত হয়ো না, আমাতে আত্মসমর্পণ কর, শান্তি পাবে, নচেৎ আমি আছি কেন?'

বিধবা পান্নাবালা তার স্বামীকে হারিয়ে তার হাতে গড়া ফুল বাগানের পরিচর্যা করেই নিজের মনকে সান্ত্বনা দিলে। ফুল বাগানের সেবাই যেন তার স্বামীর সেবা। সারা দিন ঐ সাদা থান কাপড় পরে রজনীগন্ধার ডাঁটার মতো সতেজ যে মেয়েটি খুরপি হাতে, নিড়েনি হাতে নিয়ে বাগানের ফুলময় পরিবেশে অক্লান্ত শ্রম করে রোদ বৃষ্টি উপেক্ষা করে চলেছে তারই এই বাগান—এই নার্শারী।

*

মুচিশার উমেদপুর গ্রামের বিখ্যাত নার্শারী যুধিষ্ঠির গায়েন মশায়ের। ৭৫ নং বাস থেকে মুচিশায় এসে নামুন। দক্ষিণ দিকের চওড়া মাটির রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকুন। মোড়ে চা দোকান, মুদিখানা, ডাক্তারখানা, লন্ড্রী, বৈরাগী বাবাজীদের গাঁজার আড্ডায় খোল করতালের বাজনার তালে তালে 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম' গান হচ্ছে, বড় বড় কাঠের গুঁড়ি কাটা পড়ে আছে, লরী গরুর গাড়ি বোঝাই হচ্ছে, ট্রিপিস কারখানায় যাবে এসব—একটু এলেই হরিদাস বিদ্যাপীঠ—হাইস্কুল, টিউবওয়েল—বউ ঝিউড়িরা চলেছে জলের জন্যে—সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মশায়ের স্নেহভাজন প্রিয়পাত্র চৈতন্যবাবাজী মাথায় বাজরায় করে ফুল বা ফলের গাছ নিয়ে চলেছেন শহরের উদ্দেশে—পথে মেলা শহরযাত্রী চাকুরে-বাবুরা আসছে বেলা আটটার বাস ধরবার জন্যে—তাদের পরনে চোস্ত শহুরে পোশাক, হাতে ব্যাগ, বস্তিহীন বইচি, নাটা কাঁটা, হোগলা, বাঁশ, উলু মাঠ, নোনাভাগাড়, গোলঞ্চ দোলা, গুয়ে বাবলার ঢিবি-গাই পালা ঝোপঝাড়। বাঁদিকে একটু বিঘে দুই ফুল গাছের নার্শারী। ঝাউয়ের সারি দেখা যাচ্ছে। ভিতরে নানা বর্ণের ফুল ফুটে আছে। নারকোল পাতায় ছাওয়া মাচার নিচে কোনো চারা গাছের আওতা দেওয়া। এটিও যুধিষ্ঠির গায়েনের একটি ছোট বাগান। আরো একটু যেতে হবে। একটা পথ চলে গেছে পশ্চিমে পোস্ট অফিস কামরা গ্রামের দিকে। উমেদপুরের পথের এক বাঁকে চেলা গ্রাম। ছোবড়া পিষছে মেয়েরা। ডান পাশে সেখ আবদুল, সেখ জিয়ার ছোট মতো গোলাপের একটা বাগান। আর কিছুটা গেলেই যুধিষ্ঠিরবাবুর বাড়ি এবং নার্শারী।

তার স্বামীকে হারিয়ে তার হাতে গড়া ফুলবাগানের পরিচর্যা করেই নিজের মনকে সান্ত্বনা দিলে

সামনের দুটি তরুণ পাম গাছের মাঝখানে বড় একটা সাইনবোর্ড আদিনাথ আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসালয়। দু' কামরা মাটির ঘর। খোলার ছাউনী। একটা ঘরে বৈঠকখানা। অন্যকটা নারকোল পাতা ঘেরা যুধিষ্ঠিরবাবুর সংসার। তাঁর স্ত্রীর খোনতা নাড়া কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। কাছেই মুসলমান পাড়া। তাদের ছেলে মেয়েরা এসে বাড়িতে ঢুকে খেলা করছে, কথা বলছে।

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক যুধিষ্ঠিরবাবু বেরিয়ে এলেন আমাদের ডাক শুনে। খাটো সাধারণ চেহারা। কালো রোদপোড়া তামাটে রং। মুখে কাঁচা পাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কয়েক দিন চাঁছা হয়ে ওঠেনি। চেয়ার বার করে দিলেন। নিজে মোড়াতে বসলেন। চাদর মুড়ি দিয়ে আছেন। পরনে খাটো ময়লা ধুতি। পায়ে চটিজুতো। পরিচয় পেয়ে 'রূপলোক' নামে একখানি পত্রিকা বার করে এনে দেখালেন। পত্রিকাটি তিনি পরিচালনা করেন। মূলত সাহিত্যসেবী। পাড়াগাঁয়ের অনেক কাঁচা হাতের প্রাথমিক লিপিচাতুরী। 'লিপিমাধুরী' বলাই ভাল। যুধিষ্ঠিরবাবুর নিজের লেখা দেখে বিস্মিত হলাম। ভাষায় তাঁর যথেষ্ট দখল। সংস্কৃত পর্যন্ত উদ্ধৃতি—আলোচনা। প্রেসে কাগজ ছাপাতে দিলে যে কত ঝঞ্ঝাট সেসব কথাও বললেন। ধোপা, নাপিত আর প্রেস বা পাবলিশার- এরা নাকি কথা ঠিক রাখে না। পত্রিকার তিনটি সংকলনই নাকি আমাকে পাঠানো হয়েছিল কিন্তু মাসখানেক পরে ফেরত আসে। ডিক্লিয়ারেশন পাওয়া যাচ্ছে না পেলে মাসিক বার করার ইচ্ছে। পত্রিকার সম্পাদক: সুবল রায়; সহ-সম্পাদক: মোহম্মদ গোলাম মোস্তাফা মল্লিক। একটি উদ্ধৃতি: 'যাহারা জীবনের প্রতি দয়া করে, তাহাদের প্রতি আল্লাহ্ স্বয়ং দয়া করেন, অতঃপর তোমরা জগৎবাসীর উপর দয়া কর, তোমাদের প্রতি আকাশবাসী দয়া বিস্তার করিবেন।' এটি হজরত মোহম্মদের বাণী। কিন্তু 'আকাশ-বাসী' বলতে কে? আল্লাহ? জর্জ বার্নার্ড শ' বলেছেন: 'বিওআর অব দি ম্যান, হুজ গড ইজ ইন দি স্কাই!' সেই মানুষের সম্বন্ধে সাবধান, আল্লাহ যার আকাশে!'

সামনে আমাদের চোখ জুড়নো ফুলের বাগান। বাগান তো নয়—স্বর্গোদ্যান। নার্শারী সম্বন্ধে কথা বলতে লাগলেন যুধিষ্ঠিরবাবু:

'এই যে সব টবে গাছ বসানো আছে সারি দিয়ে, এইসব টবের কি দাম?' 'এগুলো ৪ ইঞ্চি মুখ ৬ টাকা ১০০টা। ৬ ইঞ্চি থেকে ১২ ইঞ্চি পর্যন্ত আমরা ব্যবহার করি। ৬ ইঞ্চি ৩০ টাকা ১০০টা। ২৪ ইঞ্চি ১১০ টাকা ১০০টা। ৬ থেকে ৮ ইঞ্চি বেশি প্রয়োজন হয়।'

দুজন পাইকার এসে তাদের পছন্দ মতো নানা ফুল গাছের টব বয়ে আনতে লাগল। তারা দাম দিয়ে গেল ২৬টা গোলাপ নিয়ে ২৬ টাকা। আর দুজন হিন্দুস্থানী মুসলমান এল—তারা কাল এনেছে অন্য বাগান থেকে, এখান থেকে নিলে গোলাপ আর বুগেনভিলা। একে একে প্রতি ঘণ্টা ছাড়াই নতুন নতুন পাইকার আসছে। বেশি হিন্দুস্থানী। ওরা কলকাতার নানা নার্শারীতে মাল যোগান দেয়। [illegible] কথা চলছিল [illegible]।

যুধিষ্ঠিরবাবুর শরীর তেমন ভাল নেই। টাইফয়েড হয়েছে। দাঁতের মাড়ি ফুলেছে। একটু ইনফেকশন আছে মনে হলো। তাঁর বাগানে কেমন গাছপালা আছে সে সম্বন্ধে বলতে লাগলেন:

গোলাপ

'গোলাপ সাধারণত চার জাতীয়।

(১) হাইব্রীড (উচ্চ জাতীয়); (২) হাই-ব্রীড পারপিচুয়েল; (৩) টি-রোজ [সেন্টেড ছোট রঙ্গ জাতীয়, সংকর—হাইব্রীড + বোরবো একটু সদৃশ্য]; (৪) বোরবো [টি জাতীয় প্রচুর ফুল হয়]।

হাইব্রীড পারপিচুয়ালের লতানে গাছ আছে। তাতে সাদা, লাল, হলদে ফুল হয়। এসব এনেছি মধুপুর, কারমাটার, চিত্তরঞ্জন (মিহিজাম পুরনো নাম) থেকে। চিত্তরঞ্জনের রেলওয়ে গার্ডেনেই সবচাইতে ভাল গোলাপ পাওয়া যায়। সেখানে প্রায় সব রকমের গোলাপ আছে। গোলাপ প্রায় ২০০ রকমের। আমার কাছে ৬০।৭০ রকমের আছে।'

'এই যে এরা গোলাপ নিচ্ছে, এরা কেমন করে গাছ চিনছে?'

'লাল গোলাপের কাঁটা কম। গোলাপীর কাঁটা ঘন। পাতা গাছ ওদের চেনা আছে।

তবে ভাল জাতীয় গোলাপের গাছ এখানের মাটি বা আবহাওয়ায় বাঁচানো কঠিন। শীত-প্রধান দেশেই গোলাপ ভাল জন্মায়। দোয়াশ মাটিই এর জীবিকা। এ'টেল বেলেতে হয় না। আমাদের এখানে নোনা বেলে। এখন এই মাঘ মাসে শীতের বেলায়ই গোলাপ বসানোর সময়। তাই এখন গোলাপ আর বগেনভিলার বেশি খদ্দের।'

'ভাল গোলাপের নাম, হাইব্রীড জাতীয় : মিরান্ডি; সুপারস্টার; হেলেন ট্রাউবেল; ফার্টিনাইন; মেডাম কুরি; বেলবন্ডি; পিস; সুলেখানী; পলিনিরন; আন্তেন; হিজ ম্যাজেস্টি; গ্লোরি দি ডাচার; পিয়ার নাটি ইত্যাদি।'

'হাইব্রীড পারপিচুয়াল : ইজাহিল, বার্সিলোনা; পিকচার; টলিসমান; উইলিয়ম কাপ, উইলিয়ম সিল, সামারেল, প্রিন্স সোজেনিয়া, সেতেলিটি; মাদামাসন; ব্লাক প্রিন্স; মিসেস রইসেনার; পিঙ্ক পার্ফেট; এক্সেট; ডক্টর চুলি; মিসেস বিয়ার কান্ট; ভর্কেনিয়া; গোল্ডেন ওফেলিয়া; হারিকাবা; ইটেল ডি লিয়ন; পারলে ডি অল; মিরেটি; ইটেল ডি ফ্রান্স; ইটেল ডি হল্যান্ড; ভাইটাল হোয়াইট; লেডি হিলিংডন; মবক্যা ডিকসন; ক্যামিল; কোরেও; মিসেস ময়রে হেকিং ইত্যাদি।'

'ক্লাইম্বিং বা লতানে : মার্সেলিন হোয়াইট, ইয়োলো, রেড, মার্সেলিন ফিল্ড; ক্লাইম্বিং পিস ইত্যাদি।'

'ফ্লোরিবান্ডা : পলি অ্যাপল; ব্রিটেনিয়া; এল সি পলসন; রেড রোজ; রোজমেরি টিউ মন্টোভিলা; রেড রোজ রুজ, জোসেফ রোজ, ব্লানশ, রোয়াইট ইন্ডিয়া, প্রফেসর কাসির, মাইকেল ইত্যাদি।'

'পলিয়ান্থা : চীনা জাতীয় ছোট ছোট ফুল প্রচুর হয়। নানারকম আছে। যেমন পিঙ্ক লেডি, চাইনিজ রোজ, মুন লাইট, মিডিটি মাও সে তুং, কিউ শান চি, চু এন লাই, লিউ চাও, মিঃ লাওয়েস ইত্যাদি।'

বগেন ভিলা

'গোড়াই সবুজ বা বিচিত্র পাতা। ফুলের পাপড়িই মতো নানা বর্ণের ফুল হয়ে থাকে। দেখতে খুব বাহার। নাম হল :

'মোরিপাসালাল, সাদা; পার্পল (গোলাপী); কারলেস ডুইন (নীলাভ); মহাত্মা; পার্বতী; গ্লাডরা; পারপেটেস, বিফলাজেন্স; ফর্মোজা; লুসে ওয়েস্ট্যাস, এডিন ল্যাঙ্কেস্টার, লেডি মেরী বিয়ারি (হলদে); থিমা (লাল সাদা ফুল, পাতা হলদে); মাহারা (লাল ডবল গাছ) ইত্যাদি।'

'এর ধাপা কলম কাটতে হয়। ডাল চেঁছে দিয়ে মাটিতে বসিয়ে দিলে শিকড় হয়। মাহারা বগেনভিলা একটা ১০ টাকা দাম। এর বাংলা নাম 'লাল ঝান্ডা'।'

চাঁপা

'ম্যাগনোলিয়া, ম্যাগনোলিয়া গ্রান্ডি ফ্লোরা (সাদা); মিউটাবিলিস (হলদে); কাঠ্যুরী চাঁপা (কড়া গন্ধ); ফস্কেটা; স্বর্ণচাঁপা; শ্বেত চাঁপা; কাঁটালী চাঁপা; নাগেশ্বর চাঁপা; ল্যাভেন্ডার চাঁপা; কাঠ-চাঁপা (গোলাপী); মুচুকুন্দ চাঁপা (সাদা); কনক চাঁপা ইত্যাদি। চাঁপার গুলে কলম বাঁধতে হয়। মাটির বুক ফেড়ে এক রকমের ফুল ফোটে তার নাম ভুঁইচাঁপা! ভুঁইচাঁপাকে আমি ভালবাসি। আমার জীবনের প্রতীক। রবীন্দ্রনাথের ভুঁইচাঁপা সম্বন্ধে লাইন মনে পড়ে : 'তুলোট পুঁথির মলাট খুলে বেরিয়ে এলো শকুন্তলা।'

সিঁথিতে সিঁদুর দেওয়া একটি বছর কুড়ি বয়েসের মেয়ে, ফর্সা রঙ—এল আমাদের সামনে—বাটিতে করে কি যেন যুধিষ্ঠির বাবুকে দিয়ে গেল। মনে হয় কবিরাজী ওষুধ। মেয়েটি ভাইঝি। নাম নাকি জয়ন্তী। টি পি পাশ করার পর বিয়ে হয়ে গেছে।

আর দুটি বছর ১২ বয়েসের ফ্রকপরা মেয়ে এল স্কুল থেকে বেলা ১০টার সময়। তাদের মধ্যে বড় মেটা মতো চেহারার কালো মেয়েটি মেজ ভাই স্থধীরের। নাম শকুন্তলা। ছোটো ফরসা টি যুধিষ্ঠির বাবার। নাম পদ্ম। দুজনেই ৮ম শ্রেণীর ছাত্রী।

অবনবাবুর সঙ্গে যুধিষ্ঠির বাবু পান খেতে খেতে কথা বলছেন। ঘন ঘন বিড়ি খাচ্ছেন। কাশছেন। শ্বাস কষ্ট হচ্ছে। দাঁতে চেপে চেপে আস্তে কথা বলছেন। ইতিমধ্যে ফাঁকে মধ্যে দেখা পাওয়া একটা দেওয়াল আলমারী তাতে বড় বড় শিশিতে আয়ুর্বেদীয় ঔষধ। একপাশে তক্তাপোষে বিছানা পাতা। তাঁর স্ত্রীর সাংসারিক কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। কবিরাজ মশায় আবার খুলতে লাগলেন ■

বেল

'রাইবেল; জাপানী রাই; খই বেল; মতিয়া বেল; মদিনা বেল; মোটু বেল ইত্যাদি।'

যুঁই

'ডবল যুঁই; সিঙ্গল যুঁই; চীনে যুঁই; লতানে যুঁই বা জেসমিন; ৫।৭ রকমের জাপানী যুঁই আছে।'

চন্দ্রমল্লিকা

'দেশী ক্রিসেনথিমাম, চীনা; জাপানী ইত্যাদি।'

জবা

'ডবল সাইজ : ড্যাফোডিল (হলদে); গোল্ডেন স্পুর; বিশ্বরূপ; মহারাজা ত্রিবাঙ্কুর; মহাত্মা। দেশীয় : হলদে; ডবল জবা; পাটকিলে; হরগৌরী; পঞ্চমুখী (লাল); সপ্তমুখী; শ্বেতজবা; নীলজবা। সিঙ্গল সাইজ : হাওয়াই হোয়াইট; নেতাজী হোয়াইট; প্রেসিডেন্ট জবা; কালী ঘাট বিউটি; কৃষ্ণা; ওয়ারিনা; নিউ অরেঞ্জ ভেরাই কাটা; বিচিত্রা; লক্ষ্মী; জাইসমন, সুইট হার্ট।'

রঙ্গন

'সিঙ্গাপুরী রঙ্গন; পিঙ্ক রঙ্গন, জাপানী রঙ্গন; অরেঞ্জ রঙ্গন; চাইনিজ লাল এবং সাদা রঙ্গন।'

গন্ধরাজ

'দেশী; চাইনিজ; জাপানী।'

কামিনী

'দেশী সাদা। এর আর কোনো অন্য জাত নেই।'

রজনীগন্ধা

'ইন্ডিয়া পাইপরোজ; জাপানী; চীনা; বার্মিজ।'

টগর

'সিঙ্গল টগর, ডবল টগর।'

ফুরুস

'ফর শো—অপভ্রংশ কথা। সাদা, বেগুনী, লাল, গোলাপী।'

করবী

'শ্বেত করবী; লাল, গোলাপী, (ডবল সিঙ্গল); কোকিলাক্ষ অথবা রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত রক্তকরবী।'

হেনা

'দেশী সাদা হাস্নাহেনা। লাল হেনা।'

পাতাবাহার

'ক্রোটন; রাজা মহীন্দ্র; মহাত্মা; জোসনা; কালিয়াস; পানসেটিয়া; ড্রাকেনা বেগিনা; কাট্টু পাতা বিচিত্র ইত্যাদি—২০/২৫ রকম।'

লতা

'বিগনোনিয়া ক্রিপার; আইভি; শাঁখ; ঝুমকোলতা; অপরাজিতা; মাধবীলতা; নীলমণি-লতা; মাধবীলতা; মালতী, মাধবী ক্লেরোডেনড্রন; মাধবীডেনড্রন; আইপোমিয়া; বেলাতো; ভেরেন্ডা; স্বর্ণলতা। ইত্যাদি।'

গাঁদা

'দেশী অরেঞ্জ, ইয়েলো; চীনে লাল; আফ্রিকান জায়েন্ট; জাপানী মেরিগোল্ড ইত্যাদি।'

[illegible]

'[illegible], মাস্টার পিস; ব্ল্যাক আউট; নির্মলচন্দ্র; রেড ক্যাকটাস; স্নো হোয়াইট; বিধানচন্দ্র; পরাগ সংযোগের দ্বারা এর বহু রকম বৈচিত্র্য তৈরি করা হচ্ছে প্রতি মরশুমে।'

মৌসুমী

'অ্যাস্টার; ক্যালেনডুলা; ডায়েনথাস; ফ্লক্স; পপি; হলিহক; সালভিয়া; ন্যাস্টার্শিয়াম ইত্যাদি।'

[illegible]

'প্যুলেনার; ক্যালিয়াণ্ডা ইত্যাদি।'

ঝাউ

'জুনীপ্রাস; থুজা; কাসুয়ারিনা (দেশী); অরকেরিয়া কুকী (এক ফুট একটা গাছ ১০ টাকা। আট ফুট গাছ ১০০ টাকা দাম)।'

লিলি

'অ্যামারিলিস; গ্যাডিওলাস; হাইমেনথ্যাস; সুদর্শন প্রভৃতি।'

ক্যাকটাস

'ফণী মনসা জাতীয়, মনসা জাতীয়, লঙ্কাশিরা, বাজবরণ, পাহাড়ী গাছ এসব—বহু রকমের। কালিম্পঙ থেকে আনা হয়।'

[illegible]

'পাম্বপাদপ, ইয়ুকা, খেজুর; শুকনো ফার্ন জাতীয়, যা জল পেলে জীবন্ত হয় — ইত্যাদি।'

পাম

'বটল পাম; এরিকা পাম; চাইনিজ পাম; জামু পাম; পিচালিয়া পাম ইত্যাদি।'

অর্কিড

'পাহাড়ী অর্কিড শত রকমের হয়। ২ টাকা থেকে ৫০ টাকা ১০০ টাকা পর্যন্ত দাম আছে। অর্কিডের ফুল অনেক দিন টাটকা থাকে। খুব সুগন্ধ। পরগাছা জাতীয়। হাড়ভাঙা ফুল, যা সাদা মোচার মতো হয়, অর্কিড জাতীয়—এর গন্ধ কিন্তু অসহনীয়—উৎকট। যে গাছে উঠবে সে গাছের হাড়গোড় ভেঙে ফেলবে। যত বড় মহীরুহই হোক না কেন।' এর নাম দিয়েছি অতুল্য ঘোষ।'

কথা বলতে বলতে এবার আমরা বাগানের মধ্যে এলাম। চারদিকে বিচিত্র ফুল ফুটে আছে। প্রজাপতি নেচে বেড়াচ্ছে। জনেরা কাজ করছে। দুটি বিধবা মেয়ে কাজ করছে পুকুরের দিকে। জয়ন্তী থালা বাসন মাজছে ঘাটের উপরে অবাক চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে। সবুজ পরিবেশে লাল শাড়িপরা জয়ন্তীকে যেন বৃহৎ একটা রক্তজবার মতো দেখাচ্ছে। ওদিকে ফলের গাছ। মাঝে মাঝে বেগুন কুমড়ো পালং ধনে।

কদম, কৃষ্ণচূড়া, গুলমোহর, রাধাচূড়া, বকুল, অশোক, পলাশ ওক, ফার, ইউক্যালিপটাস, শাল, সেগুন, শিশু, মেহগনি, মহুয়া, হরিতকী, আমলকী, চীনা বাদাম (মাটিকলাই নয়), রবার, কদম্ব, ঢোল সমুদ্র, ওলট কম্বল, সুপারি, বহু রকমের নারকোল, আম, কলা, সবেদা, আসফল, লিচু, জামরুল, কামরাঙা, কাবাবচীনি, লবঙ্গ, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাচ, বহেড়া, বচ, কুচ, জয়িত্রী, জায়ফল নোড়, কাঁটাল, আনারস, বিলিতি কুল, বিলিতি আমড়া, চালতা, পেঁপে বহু রকমের গাছে বাগান ঠাসা।

এটা কি? ম্যাগনোলিয়া। ওটা ওলিওফেগাস। স্থলপদ্ম এলামণ্ডা। গুলমোহর হলদে নয়—ওটা ভুল। কৃষ্ণচূড়ার যেগুলো ছোট জাতীয় ঐগুলি গুলমোহর। বিহারের দিকে কেষ্টচূড়াকেই গুলমোহর বলে। রাধাচূড়া হলদে।'

ফিরে এসে আমরা আবার বসলাম। পাঁচ ছ-জন কারিগর কাজ করছে বাগানে। তাদের একজন একগোছা গোলাপের অস্ফুট কোরক এনে আমার হাতে দিলে।

'এসব গাছ কত দূরে যায়?'

'দিল্লী, পাঞ্জাব, বিহার, দার্জিলিং, শিলং।'

'দক্ষিণ ভারতে যায় না?'

'না। ওদিকে সবেদা বা ফলের গাছের টান বেশি?'

'দিনে কত বিক্রি হয়?'

'পঞ্চাশ, একশো, দুশো, ঠিক নেই। তবে এই শীতকালে গোলাপটাই টানে। বর্ষায় বেশি বিক্রি ফলের কলম বা গুলে কলমের গাছ যা মাটিতে পোঁতা হয় ও-সময় বিক্রি হয় বেশি।

জাদুবধূ পান্নাবালা শুধোলে, 'ও বাগানে কি এদের পাঠাব—না আমি নিজে যাব?

নিজেই চলে গেল সে। যৌবন গড়িয়ে গেছে। বিকালের ম্লান রশ্মি তার মুখে।

'মাসে আপনার কত সংসার খরচা লাগে?'

'সাড়ে চার শো থেকে পাঁচ শো। দশটা পেট। বাগানের পেছনে খরচ হয় পাঁচ শোর মতো প্রতি মাসে। ৬ জন কারিগরদের রোজ ৫ টাকা। গোলা জন তিন টাকা। ধান জমি এক কাঠাও নেই। আমার নামেই সব জায়গার দলিল ছিল। দু ভাই আলাদা। তাদের একজন বেলেঘাটার দোকান চালায়। তাদের ৭ বিঘে জায়গা দানপত্র করে লিখে দিয়েছি! তাদের এখনো বিয়ে হয়নি। মেজ ভাইয়ের স্ত্রী-পুত্র আমার কাছেই আছে।'

লোকটিকে দেখলাম। অত্যন্ত সাধারণ। কিন্তু নিজের নামে থাকা সম্পত্তির হারানো ইতিহাসকে যিনি নিজের টাকায় ফিরিয়ে এনে সবজি চাষ করে সবাইকে দাঁড় করিয়ে পরমানন্দ নাশারীর উপায়ে ৬ বিঘে জায়গা করেছিলেন তিনি অনায়াসে সব ফাঁকি দিতে পারতেন। আর পাকাবাড়িও করতে পারতেন মেজ ভাইয়ের সংসার না টানলে। সাধারণ খোবড়া বাড়িতে এই লোকটি অসাধারণ একটি মন একটি হৃদয় লুকিয়ে রেখেছেন —যার নাম মনুষ্যত্ব। সে মনুষ্যত্বের জন্ম, প্রাণটা পাঠশালার প্রথম শ্রেণী থেকে বুক ধরফড়াতে ধরফড়াতে মুদিখানা, সবজি চাষ, পরমানন্দ নার্শারী পার হয়ে আয়ুর্বেদীয় ঔষুধের মধ্যে দিয়ে আয়ুষ্মান হয়ে এখন সাহিত্য সমাজ কর্মেও দীক্ষা নিতে চায়।

কে আছে পুরোহিত যাঁকে দীক্ষা দেবার?

যুধিষ্ঠির বাবু, সারা পৃথিবীর সব সাহিত্য সমাজকর্মেও দীক্ষা নিতে চায়।

[illegible] রাজের চরিত্রকেই আমি শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি—তাঁর জীবনের দুঃখের চিত্র স্মরণ করে নিজের চোখের জলেই দীক্ষা আপনাকে নিতে বলি। যাঁরা জগতের শিক্ষা নেন না অথচ জগতকে শিক্ষা দেন তাঁদের মধ্যে আপনিও একজন। ক্ষুদ্র একটু আলো, তবু শত যোজন অন্ধকার আপনাদের লুকিয়ে রাখতে পারে না।

—আবদুল জব্বার

নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্ রচিত কিতাবে দুলহন্

সম্প্রতি "দুলহন্" নামক নবাব ওয়াজেদ আলী শা'র একটি সংগীত সংগ্রহ আমার হাতে এসেছিল। গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য। এই রকম আরও অনেক গ্রন্থ তাঁর ছিল এবং সেগুলিও এটিরই মত দুষ্প্রাপ্য। "দুলহন্" শব্দের অর্থ কনে। নববিবাহিত দম্পতি এই গ্রন্থের বহু গান গাইবে এবং উপভোগ

নবাব ওয়াজেদ আলি শাহর মোহরাঙ্কিত প্রথম অলংকৃত পৃষ্ঠা

করবে—এটাই বোধ হয় ছিল উদ্দেশ্য। চমৎকার নাস্তালিকে গ্রন্থটি লেখা। গ্রন্থটিতে ওয়াজেদ আলীর বহু গান স্থান পেয়েছে এবং এটি একটি উত্তম সংগ্রহ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে বর্তমানে ওয়াজেদ আলী শা'র নামে প্রচলিত বহু গান আবার এই সংগ্রহে নেই; "বাব ছোড়ি লখনউ নগরী", "বাবুল মোরা নৈহর ছুটো যায়" বা "ফুলবালে কন্থ" প্রভৃতি গান এই পুস্তকে পাওয়া গেল না। এই গ্রন্থে কিছু ধ্রুপদ, সাদরা, চতুরঙ্গ, তেলেনা, ত্রিবট প্রভৃতি রয়েছে। এ ছাড়া আছে হোরী, চাঁচর, খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরী, দাদরা পোস্তা প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর গান। ঠুমরীর সংখ্যা পঞ্চাশেরও বেশী, দাদরাও আছে সত্তরের কাছাকাছি। টপ্পার সংখ্যাও এগার, বার এবং খেয়াল প্রায় সতেরো আঠারোটি। বারোটি শ্রেণীতে এই পর্যায়গুলি ভাগ করা আছে। ওয়াজেদ আলী কূট রাগ বা তালের পক্ষপাতী ছিলেন না। অধিকাংশ রচনা পরিচিত রাগে বিন্যস্ত। তালের দিক থেকেও তিনি প্রচলিত তালই অবলম্বন করেছিলেন। ধ্রুপদে চৌতাল, সুরফাখতা, ঝাঁপতাল; খেয়ালে তিমে এবং জলদ তেতালা, টপ্পাতেও তাই; ঠুমরীতে অধিকাংশই জলদ তেতালা। তবে সেতারখানি এবং কাওয়ালীও আছে। তিনি কিন্তু "সেতারখানি" না বলে বলেছেন "সাত্তারখানী"। মনে হয় ওই নামটিই যথার্থ। সেতারখানী নামের কোনও তাৎপর্য পাওয়া যায় না। বরঞ্চ সত্তার খাঁ নামক কোন বাদক হয়ত এই পদ্ধতির উদ্ভাবন করে থাকবেন। পরে সাত্তারখানী সেতারখানীতে পর্যবসিত হয়েছে। গ্রন্থটিতে শিল্পী সম্পর্কীয় কোনও আলোচনা নেই। অবশ্য গ্রন্থশেষে যেসব প্রশংসাপত্র যুক্ত হয়েছে তাতে কিছু কিছু সাংগীতিক তথ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে তাকে ঔপপত্তিক আলোচনা বলা যায় না।

গ্রন্থের মুখবন্ধ ফার্সীতে লেখা। "সুলতানে আলম" নামে তিনি সাধারণভাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর তখল্লুস (ছদ্মনাম) হচ্ছে আখতর। গানে তিনি "আখতর পিয়া" এই নামটি ব্যবহার করতেন। পরবর্তীকালে আরও অনেকেই বিভিন্ন পিয়া নামে ঠুমরীতে জনপ্রিয় হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে কদর পিয়া (১৮৩৬-১৯০২?) সনদ পিয়া, মঞ্জর পিয়া, সুঘর পিয়া, লাল্লন পিয়া তো বিশেষ বিখ্যাত। এ ছাড়া বর্তমানেও কোনও কোনও খ্যাতনামা গায়ক এইরকম এক একটি পিয়া নাম গ্রহণ করেছেন।

গ্রন্থে সামান্য ফার্সী বিবরণী থাকলেও গানগুলি কিন্তু নিছক দেশী ভাষায় রচিত। তিনি উত্তম উর্দু জানতেন কিন্তু গানে দু একটি উর্দু শব্দ ছাড়া আর কিছু প্রয়োগ করেননি। গানগুলি থেকে বোঝা যায় লখনউ অঞ্চলের কথ্য ভাষা এবং উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের "বোলী"ই তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। মূলত ব্রজভাষাকে অবলম্বন করে তাতে নানারকম প্রাদেশিক ভাষার মিশ্রণ এনে তিনি গানগুলি রচনা করেন। এ ছাড়া পাঞ্জাবে প্রচলিত যে ভাষা টপ্পার প্রচলন হয় তাও তিনি জানতেন। এই ধরনের টপ্পাও তাঁর এ গ্রন্থে রয়েছে। প্রায় সব গানের আগেই তিনি "মন আলম" বা "মন মুসান্নিফ" লিখেছেন। এতে মনে হয় এগুলি তাঁরই রচনা। তবে সংগ্রহ যে কিছু ছিল না সে কথা জোর করে বলা যাবে না। গ্রন্থটি ১২৯০ হিজরীতে কলকাতায় তাঁর নিজস্ব প্রেসে ছাপা হয়েছিল। ছাপার তদারক করেছিলেন জনৈক রাইসুদ্দৌলাহ্। গ্রন্থের নামকরণ সম্বন্ধে তিনি বলছেন—"নামে নামিশ, দুলহন কে বফার্সী ওরুস্ অস্ত নেহাদম্" (এর নাম দুলহন যা ফার্সীতে কনে বোঝায়, তাই রাখলাম)।

লখনউ-এর নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ

নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ্

জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮২২ সালে। নবাবীতে অধিষ্ঠিত হন ১৮৪৭ সালে এবং ১৮৫৬ সালে তাঁকে পদচ্যুত করে কলকাতার মেটেবুরুজে স্থানান্তরিত করা হয়। দীর্ঘ একত্রিশ বৎসর এইখানে কাটিয়ে তিনি ১৮৮৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

ওয়াজেদ আলী শার গানগুলি পড়লে মনে হয় তিনি ছিলেন অতিশয় ভাবুক এবং মরমী ব্যক্তি। দুলহনে বিধৃত গান-গুলির কিছু যদি রচয়িতার নাম উল্লেখ না করে শোনানো যায় তাহলে মনে হবে তিনি একজন রসিক ও প্রেমিক বৈষ্ণব কবি। বস্তুত একটি গানে তিনি নিজেকে "আখতর গোঁসাই" বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর বহু গানে যেন বৈষ্ণব পদাবলীর আবেদন পাওয়া যায়। রাধাকৃষ্ণের লীলা অবলম্বনে তিনি "রহস" (রস) নামক একটি সংগীতালেখ্য রচনা করেছিলেন বলে

শুনেছি এবং দেখেনও। কখনও তাতে তিনি নিজে নাকি তাঁর মহামূল্যবান মুকুট পরে কৃষ্ণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। কলকাতায় বন্দী অবস্থায় থাকার কালেও তাঁর নিজের পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং চিত্তবিনোদনের জন্য যথাসম্ভব আয়োজন রেখেছিলেন। তাঁর এই গোষ্ঠীর মধ্যে প্রয়োগকুশল ব্যক্তি থেকে নট, নটী, গায়ক গায়িকার সংখ্যা সব মিলে নাকি তিনশোরও বেশী ছিল। লখনউ-র তাঁর পরীসভার কথা এবং ইন্দ্রসভা নাট্য-প্রচেষ্টার বৃত্তান্তও অনেকে জানেন। এই নাট্যানুষ্ঠানেও তিনি শখ করে ইন্দ্র সাজতেন।

তাঁর একজন প্রধান গুরু ছিলেন কথক সম্প্রদায়ের ঠাকুরপ্রসাদজী। এঁরা নাকি ভাববণ্টনে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ঠুমরীতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন ঠুমরী দুই প্রকার—একটি বোল বাট কি ঠুমরী, অপরটি বোল বনাও কি ঠুমরী। দুটির সঙ্গেই নৃত্য এবং ভাবাভিনয় থাকত। নবাব এই অভিনয় এবং ভাবের অভিব্যক্তি খুব পছন্দ করতেন।

ডিমাই সাইজের এই গ্রন্থটির পত্রসংখ্যা ১৩৮। এর মধ্যে সঙ্গীত সংগ্রহ ৮১

পড়ছে। আমার চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন। আমার চাইতে শরম লাগছে—বড় লজ্জায় আমার গলা তোমার দেহের সঙ্গে সংলগ্ন হচ্ছে।

দোহাই তোমার, আমার কথাটা রাখ।

খাম্বাজ-জলদ তেতালা
স্থায়ী

মিল গাওরে সন্দেশরা
আবকি ফাগমত্মে লালন আরে।

অন্তরা

গহ। পুকারত গহ। ছোড়ত
গহ। মুরত নাকাসেরা।

সবাই মিলে গেয়ে প্রচার কর এই সংবাদ যে এই ফাল্গুনে প্রিয়তম এসেছে। কখনোবা (কোনও গোপী) ধ্বনি করে উঠছে, কখনো বা সব কাজ ভুলে যাচ্ছে, আবার কখনোবা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বক্ষের আবরণী স্খলিত হয়ে পড়েছে।

আলহাইয়া-জলদ তেতালা
স্থায়ী

ইত্তনি আরজ মোরী মান লে সেইয়াঁ
মিনতি করহুঁ পড়হুঁ পাইয়াঁ

অন্তরা

হা হা করত হুঁ কর জোড়ত হুঁ
অব না বিসারো আখতর গোঁসাইয়া

টীকা নিষ্প্রয়োজন। এ গানের আবেদন শ্রোতার মর্মে পৌঁছোয়। ভণিতায় নবাব নিজেকে বৈষ্ণব কবিদের মত গোঁসাই বলে প্রচার করেছেন। এ গান যেন তাঁর অন্তর থেকে স্বতঃ উৎসারিত হয়েছে এক সুগভীর আকুতি নিয়ে।

এরপর ঠুমরী। ঠুমরীতেও তিনি স্থায়ী, অন্তরা ভিন্নভাবে নির্দেশ করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে রাগেরও নির্দেশ আছে।

জলদ তেতালা
স্থায়ী

আরে সেইয়াঁ অব বিদেশবা
চৈৎকা সগ খেলুঁ

অম্বুয়া কি ডালে কোয়েল কু কি কুকিরে
আয় পাপিহারা।

বন্ধু বিদেশে। কার সঙ্গে আর হবে বসন্তের (চৈত্রের) খেলা। আমগাছের ডালে কোকিল কুকু করে ডাকছে। হায়রে পাপিয়া

জলদ তেতালা
স্থায়ী

ননদিয়ারে রাত মালা লে গয়ে

অন্তরা

শুতিথি ম্যায় আপনি মন্দিলমে
সিমননে কুছ কহা গয়ে

ননদী, রাতে কখন এসে মালা নিয়ে গেছে। আপনার মন্দিরে শুয়েছিলাম। চুপিসাড়ে (অথবা স্বপ্নে) সে হয়ত কিছু বলে গেছে।

জলদ তেতালা
স্থায়ী

কাহেকো জাগায়ী সারী রাত
(রসিয়া)

অন্তরা

সগরী রয়েন মোরে জুড়পাত নিত
মানোজী মানোজী মোরি বাত।

রসিয়া, আমাকে কেন সারা রাত জাগিয়ে রেখেছিলে। সারাটা রাত্তির আমার শঙ্কায় কেটেছে। আমার অনুরোধ রাখ, কথা শোন।

জলদ তেতালা
স্থায়ী

ইস বংশীওয়ালে সাঁওরিয়ানে
মোরে মন মোহে লিয়া

অন্তরা

চৌনক আঁগনসে ঘরসে নিকসি দেখ পড়ী
সুরত মোহন কি
সুধ না রহে কছু আপন তন কি।

এই বাঁশিওয়ালা বন্ধু আমার মনকে মোহগ্রস্ত করেছে। হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে সেই মোহন আকৃতি আমার চোখে পড়ল আর নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও চেতনা রইল না।

ঝিঁঝোটি-জলদ তেতালা
স্থায়ী

[illegible]

রাধা শ্যাম সে আর আনন্দে [illegible] রইল না। বন্ধু যেন আর, মেতে নিয়েছে। এক জন এসেছে শ্যাম, তুমি আর নন্দের আর এক জন বালিকার নবীন বয়সের।

পিলু-আড়াঠেকা
স্থায়ী

[illegible]

অন্তরা (১)

[illegible]

অন্তরা (২)

[illegible]
হম তোমকা পতছানী
সদা জগত জানী
হম পাপো নাহো মাহমুদ সুলতান।

পশ্চিম জার্মেনীর কলোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান করেন এবং বন্, ডুসেলডার্ফ, লণ্ডন প্যারিস প্রভৃতি স্থানেও বক্তৃতা সহ অনুষ্ঠানাদি করেন। বর্তমানে তিনি কলকাতার বিড়লা একাডেমী অফ্ আর্ট এণ্ড কালচারের সংগীত বিভাগে সেতার এবং সুরবাহারের অধ্যাপক।

রায়চৌধুরী মহাশয় প্রখরভাবে গুরুবাদী। গত ১৪ ফেব্রুয়ারীর সংখ্যার আলোচনা বিভাগে প্রকাশিত তাঁর পত্র থেকে সংগীত সম্বন্ধে তাঁর মতবাদের পরিচয় পাওয়া যাবে। যদিচ প্রয়োগ শিল্পের ওপর তিনি সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব আরোপ করেন তথাপি তত্ত্ব এবং তথ্যের দিকে তাঁর উৎসাহ কম নয়। লেখকের সঙ্গে তাঁর কোনও কোনও বিষয়ে এবং চিন্তাধারায় মতানৈক্য বর্তমান কিন্তু তাতে সহৃদয় সম্পর্কের কিছুমাত্র ক্ষতি হয়নি। তাঁর আর একটি গুণের কথা বলতে উৎসুক হচ্ছি, কিন্তু তাহলে অনেকেই তাঁকে বিপন্ন করে তুলতে পারেন। তথাপি বলেই ফেলি, তিনি একজন অভিজ্ঞ জ্যোতিষীও বটেন।

শার্ঙ্গদেব

ব্যাংক জাতীয়করণের নতুন অর্ডিন্যান্স

সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক ১৯৬৯ সালের ব্যাংক জাতীয়করণ আইনটি বাতিল হয়ে যাবার পর রাষ্ট্রপতি আবার একটি নতুন অর্ডিন্যান্স করে চৌদ্দটি ব্যাংককে রাষ্ট্রয়ত্ত করেছেন। এবারকার নতুন অর্ডিন্যান্সের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, কোন ব্যাংককে কত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সুপ্রীম কোর্টের নাকচ করা ব্যাংক রাষ্ট্রীয়করণ আইনটিতে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্দিষ্ট ছিল না। নতুন অর্ডিন্যান্সে আগেকার রাষ্ট্রীয়করণ আইনটির ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করা হয়েছে। নতুন অর্ডিন্যান্সে ব্যাংকগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে ১৯৬৯ সালের ১৯শে জুলাই থেকে। আগেকার রাষ্ট্রীয়করণ আইনে ব্যাংকগুলিকে দেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ছিল ৬৫ কোটি টাকা; নতুন অর্ডিন্যান্সে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৮৭.৪০ কোটি টাকা। এখন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির ইচ্ছানুসারে ক্ষতিপূরণের টাকা নগদে বা কেন্দ্রীয় সরকারের সিকিউরিটিতে দেওয়া হবে। যাদের নগদ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে তারা ওই টাকা তিনটি বার্ষিক কিস্তিতে পাবেন। প্রত্যেক কিস্তির টাকার উপর ১৯৬৯ সালের ১৯শে জুলাই থেকে ৪ শতাংশ সুদ দেওয়া হবে। যদি কোন কোম্পানী সিকিউরিটিতে ক্ষতিপূরণ চায়, তাহলে ওই কোম্পানী শতকরা বার্ষিক সাড়ে চার টাকা সুদের ১০ বছর মেয়াদী সিকিউরিটি বা শতকরা বার্ষিক সাড়ে পাঁচ টাকা সুদের ৩০ বছর মেয়াদী সিকিউরিটি নিতে পারেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ১৯৬৯ সালের ১৯শে জুলাই থেকে সুদ দেওয়া হবে। কোন কোম্পানী ইচ্ছা করলে আংশিক নগদে ও আংশিক সিকিউরিটিতে ক্ষতিপূরণ নিতে পারেন। অর্ডিন্যান্স জারির তিন মাসের মধ্যে কোম্পানীগুলিকে জানাতে হবে কিভাবে তারা ক্ষতিপূরণ চায়। সরকার ইচ্ছা করলে আরও তিন মাস সময় দিতে পারেন। কোম্পানীগুলির অভিমত জানার ৬০ দিনের মধ্যে সরকার নগদ টাকার প্রথম কিস্তি দিয়ে দেবেন। কোন কোম্পানী যদি ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে অভিমত না জানায় তবে ধরে নেওয়া হবে যে কোম্পানী ১০ বছরের মেয়াদী সিকিউরিটিতে ক্ষতিপূরণ পাবার পক্ষপাতী।

নতুন অর্ডিন্যান্সের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, রাষ্ট্রায়ত্ত হয়ে যাবার পর আগেকার ব্যাংকগুলিকে ক্ষতিপূরণের যে টাকা দেওয়া হবে তার সাহায্যে যদি ওই ব্যাংকগুলি আবার ব্যাংকিং ব্যবসা শুরু করতে চায় তবে তারা তা করতে পারে।

সুপ্রীম কোর্টের রায় প্রকাশ পাবার পর অনেকেই ভেবেছিলেন যে এবার হয়তো সরকার সবগুলি ব্যাংককে (বিদেশী ব্যাংকগুলি সহ) রাষ্ট্রায়ত্ত করবেন। বিদেশী ব্যাংকগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার অসুবিধা থাকলেও অন্তত সবগুলি ভারতীয় ব্যাংককে সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত করতে পারতেন। সরকার কেন তা করেন নি বোঝা মুশকিল।

সাধারণ বীমা রাষ্ট্রায়ত্ত করা হবে কি?

ব্যাংক জাতীয়করণের পর সাধারণ বীমার কোম্পানীগুলিকে জাতীয়করণের দাবি অনেক মহলে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। জীবন বীমা কোম্পানীগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করার পর সাধারণ বীমা কোম্পানীগুলিকেও রাষ্ট্রায়ত্ত করার দাবি খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু যে কোন ব্যবসায় রাষ্ট্রায়ত্ত করার ক্ষেত্রেই সরকারকে শাসনতন্ত্রের ১৪ নম্বর এবং ১৯ নম্বর ধারার কথা গভীরভাবে বিবেচনা করতে হবে। উত্তর প্রদেশের চিনিকলগুলি রাষ্ট্রায়ত্তকরণের যে দাবি উঠেছে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেও অনুরূপ বিবেচনার প্রয়োজন। সাধারণ বীমার ক্ষেত্রে আগুন, চুরি, রাহাজানি, মোটর প্রভৃতি ক্ষেত্রে যদি দুর্ঘটনা হয় তার বিপক্ষে বীমার ব্যবস্থা আছে। সরকার যদি এগুলি গ্রহণ করেন তবে বীমাকারীদের মনে যে নিরাপত্তা বোধ বাড়বে সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সাধারণ বীমা কোম্পানীগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার আগে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ এবং ক্ষতিপূরণের পদ্ধতি সম্পর্কে যদি চিন্তা-প্রসূত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয় তবে তারও ব্যাংক রাষ্ট্রীয়করণ আইনের অবস্থা হবে।

সম্পত্তির উর্ধ্বতম সীমা আরোপিত হবে কি?

প্রধানমন্ত্রীর মহল থেকে কিছুকাল ধরে শোনা যাচ্ছিল যে নাগরিকদের সম্পত্তির একটি উর্ধ্বতম সীমা ধার্য করা হবে। কিন্তু শাসনতন্ত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত "সম্পত্তির অধিকার" মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সম্পত্তির উপর উর্ধ্বতম সীমা আরোপ করা কতটা সম্ভব হবে সে সম্পর্কে চিন্তার অবকাশ রয়েছে। অনেকে বলেছেন, শাসনতন্ত্র থেকে "সম্পত্তির অধিকার" সংক্রান্ত মৌলিক অধিকারটি বাতিল করা হোক। কিন্তু ১৯৬৭ সালের "গোলকনাথ বনাম পাঞ্জাব সরকার" মামলার রায় প্রদানকালে সুপ্রীম কোর্ট ঘোষণা করেছেন যে শাসনতন্ত্রের ৩৬৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী শাসনতন্ত্র সংশোধন করা চলে বটে, কিন্তু শাসনতন্ত্রের তৃতীয় অংশে বর্ণিত মৌলিক অধিকার সমূহের সংশোধন করা অথবা সেইগুলিতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার পার্লামেন্টের নেই। আবার অনেকে ভাবছেন, সম্পত্তির উপর উর্ধ্বতম সীমা আরোপ না করে অন্যান্যভাবে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা যায় কি না। কিন্তু, কৃষি-জোতের উপর যখন সর্বোচ্চ সীমা ধার্য করা সম্ভব হয়েছে, তখন শহরাঞ্চলের সম্পত্তির উপর উর্ধ্বতম সীমা ধার্য করা হয়তো অসুবিধা হবে না। কিন্তু সবই নির্ভর করে প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর অনুগামীদের ইচ্ছা ও নীতির উপর।

সুব্রত গুপ্ত

গালার চুড়ি

কাঁকন কাহিনী

আমাদের ছোটবেলায় চুড়ি বিক্রী করতে আসতো মকবুল ওসমানি। কি সুন্দর কথা বলতো সে। বলতো চুড়ি তো 'জেবর' নয়, চুড়ি "সোহাগ"। চুড়ি আয়োতি লক্ষণ। গহনামাত্র হলে কি আর তার এত কদর হতো? এতো বড় দেশ! তার কোণায় কোণায় এমন সুন্দর সোহাগচিহ্ন হিসাবে আর কোন অলংকার অহংকার করতে পারে? ওসমানির উদ্দেশ্য অবশ্য মেয়েদের মন ভুলিয়ে, মিষ্টি কথার মুগ্ধ করে চুড়ির চুপড়ি হালকা করা। কিন্তু সত্যিই চুড়ি যেমন নারীজীবনের মধুরে এক সংস্কারে বাঁধা আর কোনও গহনা বা ভূষণে তা নেই।

ওসমানির আদিবাস উত্তর প্রদেশের ফিরোজাবাদ শহরে। দোকান করেছে বাংলা-দেশের এই কলকাতা শহরের এক কোণায়। তখনকার কলকাতা "কলকাত্তা" বলতে সারা ভারতের সব মানুষের মন নেচে উঠতো। আজকের ক্লিষ্ট, বিপন্ন শহর নয়। সেই ফিরোজাবাদ থেকে ওসমানির বাপ দাদা এসেছিল। বাংলাদেশেই তো ব্যাপার বাধবে। রূপরসের সোনার বাংলা। যাক, অবান্তর কথা বলে লাভ নেই। ওসমানির পসরার কথা বলি। তার মস্ত বড় ঝুড়িতে থাকতো বেলোয়ারি চুড়ি। সাদা, রঙীন, সরু, মোটা ঝলমলে আর ঝকঝকে। বড়রা যখন পরতেন তার মাপের হিসাব ছিল ইঞ্চির হিসাব। দুই, সওয়া দুই এইসব। ছোট কচি হাতের হিসাব হতো বারো আনা, চোদ্দ আনা। পাঁচ রকমের বড়দের মাপ আর পাঁচ রকমের ছোটদের মাপ এই ছিল ওসমানি সাহেবের মাল। কেমন অবলীলা-ক্রমে শক্ত নরম নানারকম হাতে ভঙ্গুর কাচের চুড়ি পরিয়ে দিতেন, যেন কোন যাদুস্পর্শে হাতের বাঁধন চুড়ির ফাঁদে ধরা দিত।

বেলোয়ারি চুড়ি আমরা পরতাম শখ করে। স্কুলে কলেজে যাদের একটু সাজের সাধ ছিল তারা পরতো রং মিলিয়ে। কিন্তু উত্তর ভারতে কাচের চুড়ি এয়োস্ত্রীর থাকা চাইই। থাক হীরে মুক্তো, থাক যত সোনা হোক না বয়স বেশী, ধরুক চুলে পাক, স্বামী বর্তমানে কাচের চুড়ি যে তাঁর মঙ্গলের পরিচায়ক। এমনি করেই বাংলার মেয়েও শংখবলয়কে ঘিরে স্বপ্ন রচনা করতো। দরিদ্রের পর্ণ কুটিরেও শাঁখাপরা দুটি হাত যে ছিল সম্রাজ্ঞী! শাঁখার লোভে দেবী পার্বতী কতবার শাঁখারীকে ভুলিয়ে দিয়েছেন। অন্ততঃ কত কাহিনী ঘিরে এই শাঁখার মোহকে মহীয়ান করা হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। ঢাকা শহরের শঙ্খবণিক সেকালে কি অপূর্ব সৃষ্টি করতো তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। তাও শিল্প হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল ঐতিহ্যের জোরে। আজও শাঁখা না হলে হিন্দু মেয়ের বিয়ে হয় না। সিন্দুরের সমান তার সম্মান। শাঁখা ভেঙ্গে গেল অতি বড় আধুনিকারও অমঙ্গল আশংকায় বুক কেঁপে ওঠে।

শাঁখার মত মাঙ্গলিক সোহাগ লক্ষণ পাঞ্জাবের হাতির দাঁতের চুড়ি। এ চুড়িকে ওঁরা বলেন চুড়া। লাল রং-এর চুড় গোছা গোছা হাতে পরে বিয়ের কনে। চুড়া খুলে রাখতেও মহা ধুমধাম গান বাজনা হয়। বিয়ের শাঁখা যেমন সাবধানে খুলে তুলে রাখা হয়, চুড়াও সযত্নে রেখে দেওয়া হয়। আমাদের সধবার লক্ষণ 'নোয়া'র মত বর বয় হাতে রাখার প্রশ্ন ওঠে না।

রাজস্থানে চলন কাঁচের চুড়ির সঙ্গে সঙ্গে গালার চুড়ি। গালার চুড়ি হায়দ্রাবাদের বিখ্যাত। গালার উপর কাচের কুচি বসিয়ে এমন সুন্দর হয় যে হীরে মুক্তো

হাতির দাঁতের চুড়ি

কাচের বেলোয়ারী চুড়ি

ফেলে বরবর্ণিনী গালার চুড়ি হাতে পরেন। গালায় নরম আধারে গরম থাকতে নানা রঙের নকল পাথরও বসানো হয়। এক একটি বিশেষ ধরনের চুড়ি বেশ বেশী দাম দিয়ে মেয়েরা কেনেন। নবাবী অভিজাত হায়দ্রাবাদে এমন কদর গালার। তা থেকে বোঝা যায় ভারতীয় নারী বহুমূল্য রত্নে-ভূষণে সেজেছেন বটে চিরকাল, কিন্তু সাধারণ অল্প মূল্যের জিনিসেই জড়িত ছিল তার সুখ সৌভাগ্যের সব সংস্কার। আজকের বোম্বাই প্লাস্টিক চুড়িতে স্বল্প-মূল্যতা বজায় আছে কিন্তু সংস্কারের মোহিনী মায়া নেই তাতে। নেই শাঁখার মত অসামান্যতা। সাজসজ্জা আর ভূষণে কোথায় যেন এক অজানা ইঙ্গিত আছে মানুষকে নিয়মে বাঁধার। পশ্চিমে বিয়ের অংটি বিবাহিত মহিলা অতিশয় আদরে সর্বদা ধারণ করেন, গলার হার সম্বন্ধে বাঙালী সমাজে প্রচলিত আছে যে সন্তানের জননী সন্তানের মঙ্গলের জন্য গলায় হার পরবেন। চুণি পান্না হবার দরকার নেই। সাধারণ সোনারূপো যথেষ্ট। এত সব সত্ত্বেও ভারতীয় সমাজে চুড়ির স্থান কোন গহনা নিতে পারেনি।

বিবাহিত মহিলার 'সোহাগ' হিসাবে চুড়ির মান, আবার উৎসবের আনন্দ হিসাবেও চুড়ি এক বিশেষ স্থানে থাকে। বাংলাদেশে তত নয়, কিন্তু উত্তর ভারতে উৎসবের নূতন কাপড় জামার সঙ্গে মেয়েরা কেনেন চুড়ি। গোছা গোছা গুছিয়ে রেখেও মন ভরে না। নূতন চাই। শাড়ি যেমন যতই আসুক উৎসব সম্পূর্ণ হবে না নূতন চুড়ি ভিন্ন। তাই তো আজকে ওসমানিরাও ব্যাপার চালান জোরকদমে। সারি সারি দোকান, তার উপর বাড়ি বাড়ি ফিরি ব্যবসায়ে মন্দা নেই। সোনা নয় তো, কাজেই শাসন নেই। জহরৎ যাচাই করার ভাবনা নেই। ছন্দে ছন্দে বেজে চলে মেয়েদের হাতে হাতে। হিন্দু হোক মুসলমান হোক, চুড়ি সবার সোহাগের স্বরূপ। 'ভাগ্যবতীর আভরণ।

নরম হাতে চুড়ি পরাচ্ছেন

মোকারি মাক্কা ?

জাপানী কবিতা। যা শুনেছিলাম তাও স্পষ্ট মনে নেই। শুনেওছিলাম তো আমার ভারতীয় কানে। জাপানী ভাষার কোন ঠিকঠিকানা তাতে ছিল কিনা হলপ করে বলতে পারি না। কবিতা হচ্ছে তিন লাইনের

"শিবুকারো কা
শিরানেদো কাকিনো
হাত্সু চিগিরি—" অনুবাদ বরং স্পষ্ট মনে আছে। ফলটি কি তেতো, ফলটি কি মিষ্টি, জানতে বেশী সময় লাগে না। প্রথম আস্বাদেই তার পরিচয়। কাজেই ওসাকার যে দারুণ দুর্নাম, আমি কিন্তু তার সঙ্গে একমত হ'তে পারিনি। জাপানী মানুষ বলে ওসাকার মানে কঠিন হৃদয় ব্যবসায়ী। লক্ষ লক্ষ "ইয়েনের" লেনদেন তারা বোঝে কিন্তু বলে দেখো বন্ধুত্বের কথা, হৃদয়ের লেনদেনের দুটো আলাপের আভাস দিয়ে দেখো, মনে হবে মানুষগুলি কাঠের তৈরী, যেমন ওদের কঠিন কাঠের পুতুল। বন্ধু-বান্ধবের দেখাশুনো হলে ওরা নাকি কুশল প্রশ্ন করে না। বলে "মোকারি মাক্কা?" মোকারি মাক্কা মানে "তোমার ব্যবসায় চলছে কেমন?" হয়তো এটা নিছক ঠাট্টার কথা। আমরাও তো আমাদের দেশের ধনী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে এরকম ঠাট্টা করে থাকি। মনে করি ওরা কুশল মানেই অর্থাগম ভাবে।

ওসাকা দেখে আমার কিন্তু একেবারেই তা মনে হয়নি। ফলের প্রথম স্বাদের মত আমারও ওসাকার সঙ্গে সামান্য পরিচয়। জাপান যাবার আগেই আমাকে জাপানী বন্ধু প্রশ্ন করেছিলেন কি দেখতে চাই। কিছু না ভেবেই বলেছিলাম আর কিছু দেখি আর না দেখি, তোমাদের সেই বিশ্ববিখ্যাত সুপার এক্সপ্রেসে যেতে চাই ওসাকা। তথাস্তু। জাপান পৌঁছে দেখি আমার টিকিট কাটা রয়েছে। নিউ টকাইডো লাইনের ভোর বেলার গাড়ি ধরে প্রথমে কিয়োটো, তারপর নারা, আর নারা থেকে ওসাকা। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দ্রুতগতি

বেলা। টোকিও থেকে তিন ঘণ্টা সময় লাগে ওসাকা পৌঁছোতে। বিমানে লাগে মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট। তবু সেই সুপার এক্সপ্রেসে যাত্রী ঠাসাঠাসি। কোথাও ফাঁকা থাকে না। আধ ঘণ্টা অন্তর টোকিও থেকে যাচ্ছে দ্রুতগামী গাড়ি। সব সময় সে গাড়ি লোকে ভরা। অথচ চেঁচামেচি নেই, হট্টগোল নেই। কফি চান, প্রাতরাশ চান, আইসক্রীম বা আর কিছু চান ফুটফুটে জাপানী মেয়ে আপনার হাতে এসে দিয়ে যাবে। মূল্য অতি সামান্য। অত জোরে গাড়ি ছুটছে, ভিতরে বসে বুঝতেও পারবেন না। আপনার কফি বা চায়ের পেয়ালার একটুকুও চলকে পড়বে না।

ওসাকা জাপানের দ্বিতীয় বড় শহর। লোকসংখ্যা ৩,০১০,০০০। পশ্চিম জাপান সমস্ত ব্যবসা প্রায় ওসাকায় কেন্দ্রীভূত করেছে। [illegible] ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। হিদেওশি তোয়োতোমির রাজত্বকালে [illegible] সাল থেকে ওসাকা রাজধানী। আজও জাপানের রাজধানীর অনেক আসে ওসাকার ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে।

কিন্তু ওসাকা জাপানের [illegible] কীর্তি বর্জিত নয়। ওসাকার প্রাচীন দুর্গ আছে, জাপানী চা পানের আসর [illegible] আছে, কাবুকী আর [illegible] থিয়েটার আছে। ওসাকার [illegible] টাকারাজুকা। টাকারাজুকা বিখ্যাত অপেরা। [illegible] পুরুষের স্থান নেই। কাবুকী থিয়েটারে যেমন মেয়ে নেই, টাকারাজুকাতে তেমন ছেলে নেই। কাবুকীতে নাকি এক সময় মেয়ে [illegible] হতো। কিন্তু [illegible] মেয়েদের [illegible] করা হয়েছে না। [illegible] সেখানে আসলে দেখা যেত কাবুকী অভিনেত্রীরা [illegible] হতেন। বন্ধ করে দেওয়া হলো মেয়েদের অংশ গ্রহণ। কাবুকীর রঙ্গমঞ্চে কোমল, সরলা ললনার কামিনী সুলভ অভিনয় পুরুষেরাই করেন, যেমন সেদিন পর্যন্ত আমাদের যাত্রায় ছিল।

টাকারাজুকার এলাকায় অপেরা হাউস আছে, থিয়েটার আছে, চিড়িয়াখানা আছে, বোটানিক্যাল গার্ডেন আছে। সবই টাকারাজুকার রাজত্ব। অপেরা হাউসে কেবলমাত্র মেয়েদের অপেরার প্রদর্শনী হয়। পুরুষের ভূমিকা নেন দীর্ঘাঙ্গী তরুণী জাপানী সুন্দরী। প্রাচ্যে এত বড় অপেরা হাউস আর কোথাও নেই। পাশ্চাত্ত্য জগত পাগল হয়ে যায় এই মেয়ে অপেরার নামে।

এই ওসাকার উপকণ্ঠে ১৯৭০ সালের এক্সপোর প্রস্তুতি চলেছে। EXPO'70 হবে সেন্‌রি হিলস নামক শহরতলিতে।

গাইড মেয়েরা পাঠ বুঝে নিচ্ছেন

আগামী ১৫ই মার্চ এক্সপোর উদ্বোধন। ছয় মাসের মেলা [illegible]। ৮১৫ একর জমি নিয়ে এক্সপো নগরী গড়ে উঠেছে। কত না দেশের কত না বাহারের বাড়ি উঠেছে। হিসেব করা হয়েছে যে, ১৮৩ দিনে অন্তত ৪৮,০০০,০০০ দর্শক আসবে। সোভিয়েট দেশ আর আমেরিকা, পোর্টুগাল আর ভারতবর্ষ একই ক্ষেত্রে নিজের দেশের [illegible]। কার দেশের কি কল্পনা, আগামী দিনের কি ভাবনা তার এক [illegible] সুযোগ এনে দেবে এক্সপো সত্তর।

সেন্‌রি হিল এক সময় অজানা বাঁশের জঙ্গল ছিল। আজ সেখানে হাজার হাজার লোক কাজ করছে যাতে ভবিষ্যতে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম সহজ হয়। বুল-ডোজার আর ট্রাক চলছে চারদিকে। আমাদের প্যাভিলিয়ন বা কারুকার্যময় চত্বরের কাজও এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের চত্বরে যাঁরা গাইডের কাজ করবেন তাঁদের শিক্ষার মহড়াও চলছে চারমাস ধরে। অবশ্য সেটা সেন্‌রি হিলে নয়। নতুন দিল্লির ইন্সটিটিউট অফ ম্যাস কমিউ-নিকেশনসে। এবারে ব্যবস্থা পাকা। আগে আগে দেখা গেছে যথোপযুক্ত শিক্ষা-গ্রহণ না করে মেয়েরা বিদেশে প্রদর্শনীর পরিদর্শিকা করতে গিয়ে ভুল-চুক করেছেন কিছু কিছু। গাইড মেয়েরা প্রদর্শনীর দর্শনীয় যা কিছু তা তো দেখাবেনই, উপরন্তু তাঁরা দেশের মুখপাত্র হিসাবে বিদেশের মানুষকে ভারতীয় [illegible] জানাবেন। কৃষ্টির বিনিময় করতে হলে তাঁরা সবার আগে নিজেদের কৃষ্টির খবর রাখবেন।

এই উদ্দেশ্যে চারমাসের শিক্ষার আয়োজন। ভারতীয় কৃষ্টি ও প্রগতি ভিন্ন [illegible] সম্বন্ধে জানাও তাঁদের দরকার। মোটামুটি জাপানী ভাষার একটা শিক্ষাও দরকার। [illegible] বলতে পারা প্রয়োজন।

মিনিস্ট্রি অফ ফরেন ট্রেড-এর তরফ থেকে দরখাস্ত চাওয়া হয়েছিল। আপাতত ৩১টি শিক্ষার্থী আছেন। তার মধ্যে দুটি বিবাহিত মেয়েও আছেন। দরখাস্ত-

কারিণীদের বয়স ২০ থেকে ২৮-এর মধ্যে চাওয়া হয়। মোটামুটি একুশ বাইশ বছরের মেয়েই বেশী। বি-এ পাশ তো আছেনই, কেউ বা আরও বেশীদূর পড়াশুনো করেছেন।

•

মেয়েদের ক্লাশে গিয়ে দেখেছিলাম উৎসাহে ঝলমল করছে তরুণীর দল। পাঠের বোঝা বেশ। দশটা পাঁচটা ক্লাশ, তারপর ঘরের পাঠ তো আছে। চার মাসে এতটা শিখতে পরিশ্রম কম নয়। ৩২ জনের সবাই যাবেন এক্সপোতে এমন নয়। পাঠের যোগ্যতা যাচাই করে তবে পাঠানো হবে বেছে বেছে। বাঙালী মেয়ের নামও দু'একটি দেখলাম। নীলাক্ষী বন্দ্যোপাধ্যায়, অদিতি খান। কিন্তু রাজধানীর সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সংযোগ না থাকলে মেয়েরা এসব সুযোগ সহজে পান না বলে আমার অন্ততঃ ধারণা হয়েছে। অথচ যাঁরা রাজধানীর রাজমহলে ঘোরাফেরা করেন তাঁদের চেয়েও যাঁরা দূরে থাকেন তাঁদের সুযোগের প্রয়োজন বেশী। নির্বাচনেই তাঁরা পিছিয়ে থাকেন, না নির্বাচনের আহ্বান তাঁদের কাছে পৌঁছোয় না, আমরা জানি না।

খবরের টুকরো

বিমানবিনোদিনীদের কাজটা প্রায় চিত্রতারকাদের মত। কাজের গুরু দায়িত্ব সামনাসামনি বোঝা যায় না, মনে হয় জীবন তাদের রোমাঞ্চে ভরা। সাজে পোশাকে, নিত্য নূতন দেশে আনাগোনায় বুঝি বা তারা আমেজে মশগুল থাকে। সম্প্রতি বিদেশী এক চিকিৎসা পত্রিকায় বলা হয়েছে যে অতি কঠিন কাজ এ'দের—"This is no job for softies. Intelligence tact and a knowledge of languages, physical stamina are prerequisites."

"কোন ক্রমেই এ কাজ অবলা কোমলা কামিনীর নয়। বুদ্ধি চাই, পরের মন বুঝে চলার ক্ষমতা চাই, নানা ভাষা জানতে হবে, দেহবল চাই কষ্ট সহ্য করার।" ডাক্তাররাও বলেন বিমানে এক ঘণ্টা কাজ করা, অন্য কাজের আড়াই ঘণ্টার সমান। যে বিমান পুরো অতলান্তিক মহাসাগর পাড়ি দেয়, অর্থাৎ ইউরোপ থেকে আমেরিকা যায়, তার বিনোদিনী সফরে হাঁটেনই পাঁচ মাইল!

*

ক্যানাডার প্রধানমন্ত্রী এবার ভিন্ন রকমের মানুষ। বিদেশীর মুখে তিনি most eligible bachelor। বরের আসনে মনোনীত হবার জন্য সেরা মানুষ। রাজনীতি আর রোম্যান্স একাধারে। তবে এ তো সেকালের স্বয়ম্বর সভার দিন নয়! স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী উড়ে গেলেন নিউইয়র্কে। গায়িকা অভিনেত্রী বারবারা স্ট্রেস্যান্ড নায়িকা। তাঁকে "date" করতে এ অভিযান। রসিক নাগর লীলায় পাগল হয়েও তাঁর রাজনৈতিক সত্তা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। বেচারা সাংবাদিক দল রসের সংবাদ পরিবেশনের আশায় ঘুর ঘুর করছে সব। একজন সাহস করে প্রশ্ন করলেন, "ব্যাপারটা কতটা এগিয়েছে?" রস পেলে উবে। মন্ত্রী মশায় হেঁকে বললেন "বন্ধ কর বেয়াদবকে!"

*

তারকা জগতেও কত হেরফের সহ্য করতে হয়। মহেশ যোগী যখন দেশে ফিরলেন তাঁকে নিয়ে কৌতূহল কম বেশী যাই হ'ক, তাঁর চেলার দল ভারতীয় মনকে নাচিয়ে তুলেছিল। তার মধ্যে সুন্দরী মিয়া ফারো তো কলকাতার পথেঘাটে ঘোরাও হচ্ছিলেন। এতটুকু দর্শনের জন্য দলে দলে মানুষের ঠেলাঠেলি। সেই মিয়ার ছোট বোন টিসা। হোমার ছবির হিরোইন হয়েছেন। ছবির প্রযোজক নাকি রাগের মাথায় টিসাকে পদাঘাত করেছেন। টিসা তাতে বিন্দুমাত্র কাবু নয়। অভিনেত্রী হয়ে লাথি খাওয়ার চেয়ে ফিরে যাবে সে তার পুরোনো কাজে। হোটেলে মদ্য পরিবেশনের পরিচারিকার কাজ করতো টিসা। সেই বরং ভাল।

টুকিটাকি

বাসি পাঁউরুটি একেবারে খারাপ না হ'য়ে থাকলে, সামান্য দুধ মেখে 'তেজালে' কিছুক্ষণ রেখে দিন। দেখবেন কি চমৎকার স্বাদ হবে। রুটির উপরটা হবে মচমচে আর ভিতর হবে আরও মোলায়েম।

পুদিনার চলন বাংলাদেশে কম। পুদিনা কেবলমাত্র সুগন্ধি নয়, পুদিনা উপকারী। হজমের পক্ষে বিশেষ ভাল। আজকাল বাজারে সাধারণ যা চা পাওয়া যায় তাতে স্বাদগন্ধ সবেরই অভাব। টি-পটে দুচারটে পুদিনা পাতা ফেলে চা ভিজিয়ে দেখবেন। বেশ নূতন এক গন্ধের সন্ধান মিলবে।

আলু, গাজর ইত্যাদি যেসব সব্জী মাটির নীচে হয়, কাটবার সময় বেশীক্ষণ জলে ভেজাবেন না। যেসব খনিজ পদার্থ ওই সবজীতে থাকে, তা নষ্ট হয়ে যাবে। বহু খনিজ পদার্থ স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ প্রয়োজন এবং শাকসব্জী থেকেই গ্রহণ করা সবচেয়ে ভাল উপায়।

ডিমের যেদিকটা সরু সেদিকটা নীচে রেখে সোজাভাবে রাখতে পারলে ডিম বেশীদিন তাজা থাকে। এভাবে রাখতে হ'লে বাজারে যে ডিম রাখার পাত্র বিক্রী হয় তাতে রাখা সুবিধা। ডিমের আকারে খাঁজ থাকে তাতে ডিম সুরক্ষিত থাকে। আমার মনে হয় প্লাস্টিকের চেয়েও জমানো কাগজে যে আধার তৈরি হয় তাতে ডিম আরও ভাল থাকবে।

মাংস রান্নায় নুন একেবারে শেষে দিলে স্বাদ ভাল হয়। সে স্বাদের পরীক্ষা করে না দেখলে বোঝানো কঠিন। লবণ ও অন্যান্য মশলা মেখে অনেকে মাংসের ঝোল রান্না করেন, তাঁরাও একটু পরে লবণ দিলে স্বাদ রক্ষা করবেন বেশী।

আলু ছাড়িয়ে সিদ্ধ করবেন না। তাতে ভিটামিন ফেলা যায় আর স্বাদও নষ্ট হয়। যাঁরা 'তেজাল' ব্যবহার করেন তাঁরা আলু সিদ্ধ না করে পোড়া করে মুখ বদলাবেন। তাতে খাদ্যগুণ বেশী বজায় থাকবে।

আলুর মধ্যে মাংস ভরে যে "চপ" করা হয় তাতে সামান্য কিছু কাঁচকলা মিশিয়ে দিতে পারেন। কাঁচকলা অতি পুষ্টিকর জিনিস। এতে কার্বোহাইড্রেট বাদেও বহু গুণ আছে। আপেল আঙ্গুর ও কমলা লেবুতে যে প্রোটিন নেই, তা কাঁচকলায় পাবেন। এতে প্রচুর ফস্ফোরাস আছে, বহু তথাকথিত উপকারী ফলে তা নেই। এজনাই বোধ হয় নিরামিষাশীদের জন্য কাঁচকলার তুল্য পবিত্র কোন খাদ্যকেই জ্ঞান করা হ'তো না। কলায় ভিটামিন 'বি'এর প্রাচুর্যও আছে। পাকা কলাও সস্তা আটপৌরে ফল বলে অবজ্ঞা করার মত নয়। পরম পুষ্টিকর পাকা কলা দৈনন্দিন আহারে সংযোগ করলে মূল্যবান সব ফলের অভাবের জন্য আফশোস করবার কিছু থাকবে না।

শ্রীমতী

আর্ট ফেয়ার—'৭০

নানা রঙ ও রেখার মায়াজাল, ভেসে-আসা সঙ্গীতের রেশ, নরনারীর কলগুঞ্জন, আলোকমালায় উদ্ভাসিত পরিবেশ ও সেই সঙ্গে পরিচিত তরুণ শিল্পীবৃন্দের উৎসাহ ও উদ্দীপনা। রূপে, রঙে ও আকারে এবারের শিল্পমেলার মুক্ত অঙ্গন যেন উৎসবের আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠেছিল। দড়িতে ঝোলান ছোট বড় নানা আকারের ছবি, স্ক্রীনের ওপরে রাখা অপেক্ষাকৃত বড় তেলরঙের নানা রচনা, কোনও ধারে কয়েকটি স্কেচ, অন্য কোনও কোণে হয়ত কয়েকটি বাটিক নিদর্শন—তারই সঙ্গে ইতস্তত স্থাপিত কয়েকটি ভাস্কর্য-শিল্পের নমুনা ও অঙ্গনের একাংশে শিল্প ও সাহিত্য পত্র-পত্রিকা। একবার নয়, দু'বার নয়, যতবারই মার্কেট স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত এবারের শিল্পমেলায় গিয়েছি, ততবারই দেখেছি কেবল রঙ ও রেখার খেলা ও মেলার চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বিভিন্ন জাতির দর্শকবৃন্দ। কেউ আগ্রহ সহকারে ছবি দেখছেন, কেউ বা কোনও ছবি পছন্দ করে কেনার জন্য দরদস্তুর করছেন। আবার কয়েকজন বসে ছাত্র শিল্পীদের কাছ থেকে তাঁদের প্রতিকৃতি আঁকিয়ে নিচ্ছেন।

কলকাতার তরুণ শিল্পীদল পরিচালিত এই শিল্পমেলার এটি দ্বিতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান। উদ্দেশ্য : সঙ্গীত ও সাহিত্যের মত জনসাধারণের মনে শিল্পবোধটুকু জাগরিত করা। এবারের শিল্পমেলা দেখে আশ্বস্ত হলাম। কারণ, তাঁদের প্রচেষ্টা অনেকাংশে সার্থক হয়েছে। প্রবেশ মূল্য থাকা সত্ত্বেও গড়ে প্রতিদিন ৬০০/৭০০ (ছুটির দিন ও রবিবারে প্রায় ১০০০) নরনারী মেলায় পদার্পণ করেছেন ও একান্ত আন্তরিকতার সঙ্গে ছবি দেখেছেন, বোঝার চেষ্টা করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত অনেকে ছবি কিনেছেনও। শিল্পী উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাই, প্রাচীরপত্র ও মাইকে প্রসারিত আবেদন মাধ্যমে তাঁরা দর্শক সাধারণকে ছবি কেনার প্রয়োজনীয়তা তথা গুরুত্ব প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ও শিল্পীর হাতে-আঁকা মৌলিক ছবি বা শিল্পকর্ম যে সাহিত্য তথা সঙ্গীতের রস-ধারার মতই সভ্য জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ তা বিশেষভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মাঝেও মধ্যবিত্ত পরিবারের সাধারণ লোক যাতে স্বল্পমূল্যে ছবি কিনতে পারেন সেজন্য তাঁরা ছবির মূল্যও সাধ্যায়ত্ত রেখেছিলেন।

ছবি কিরকম বিক্রী হচ্ছে? শিল্পী গোপাল সান্যাল বললেন : 'ভালই। গত কয়েকদিন গড়ে ৫০০/৬০০ টাকার ছবি বিক্রী হয়েছে। তাছাড়া মাত্র ৫৲ টাকা দিয়ে প্রতিদিন বহু লোক প্রতিকৃতি আঁকিয়ে নিচ্ছেন।' সত্যি কথা। প্রতিদিনই ছাত্র শিল্পীদের কাগজ পেনসিল হাতে আঁকতে দেখেছি। সেদিন দেখলাম রবীন হালদার (ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজ) একজন বিদেশী যুবকের প্রতিকৃতি আঁকছেন। ছবি কিনছেন কোন্ শ্রেণীর লোক? শুনলাম, অধিকাংশ ক্রেতাই বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, যদিও বিদেশী ও অবাঙালী ক্রেতাও ছিলেন। যাঁরা কিনেছেন তাঁদের রুচির প্রশংসা করি, কারণ তাঁরা গোপাল সান্যাল, রবীন মণ্ডল, বিকাশ ভট্টাচার্য, প্রকাশ কর্মকার, শ্যামল দত্ত রায়, সুহাস রায়, অমরেন্দ্র চৌধুরী, কার্তিক পাইন প্রভৃতি পরিচিত শিল্পীদের রচনাই কিনেছেন। ব্রজগোপালের আঁকা কার্ল মার্কস-এর প্রতিকৃতিটিও রুশ কনসাল মহোদয় কিনেছেন। আরও আশার কথা এই যে, মানিক তালুকদার, ফুলচাঁদ পাইন ও দেবব্রত চক্রবর্তীর কয়েকটি ভাস্কর্য কাজও বিক্রী হয়েছে।

গতবারে শুনেছিলাম প্রতি বছর কলকাতার বিভিন্ন অংশে শিল্পমেলার আয়োজন করা হবে ও পরে বাংলাদেশের এক একটি জেলা শহরেও এর অনুষ্ঠান করা হবে। এবারে জানলাম উদ্যোক্তাদের সে উদ্দেশ্য নেই। তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য হল জনমানসে শিল্পবোধ জাগিয়ে তোলা। এবারে তাঁরা জনসাধারণের কাছে অপ্রত্যাশিত সাড়া পেয়েছেন, সুতরাং প্রতি বছরই তাঁরা মার্কেট স্কোয়ারেই শিল্পমেলার আয়োজন করে আরও ব্যাপকভাবে জনসাধারণের মনে শিল্পবোধ জাগাবার চেষ্টা করবেন।

শিল্পমেলা ত্যাগ করার পূর্বে একজন তরুণ শিল্পী বললেন : 'জানেন, অধিকাংশ লোকই রিয়ালিস্টিক ছবি কিনছেন।' বললাম : 'ক্ষতি কি? তবু ত কিনেছেন। সেটাই বড় কথা।' তাছাড়া রিয়ালিস্টিক ছবিরই বা কি অপরাধ? আমাদের দেশেও লোকে লঘু ও শাস্ত্রীয়—দু শ্রেণীর গানই শুনে থাকেন—তবে?

*

বালক শিল্পী সুনির্মল ব্যানার্জি অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে তাঁর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। জলরঙে প্যাস্টেলে আঁকা ২০টি ছবি প্রদর্শনীতে দেখা যায়।

সুনির্মল ব্যানার্জি জন্মবধির। বয়স মাত্র ১৬। ১৯৫৯ সালে তিনি মূক ও বধির বিদ্যালয়ে ভর্তি হন ও তাঁর অঙ্কন প্রতিভার পরিচয় পেয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে কলা বিভাগের ছাত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। গত ছয় বছর যাবৎ তিনি কেবল আপনার মনে ছবির পর ছবি এঁকে গেছেন এবং শুধু তাই নয়, দেশে ও বিদেশের বহু প্রদর্শনী থেকে পুরস্কারও লাভ করেছেন।

সম্ভবত শ্রবণেন্দ্রিয় থেকে বঞ্চিত হয়েছেন বলেই তাঁর দুটি চোখের দৃষ্টি সজাগ, সচেতন ও শিল্পীসুলভ অনুসন্ধিৎসু। সঙ্গীতের মৃদু ও মিষ্ট ঝংকার তাঁর কানে যায় না, সেজন্য তিনি দুঃখিত নন। তাই বহির্জগতের প্রত্যেকটি দর্শনীয় জিনিস তিনি যত্নসহকারে দেখেছেন

ও যে যে বস্তু তাঁর চোখে ভাল লেগেছে তাই তিনি এ'কে গেছেন। তাঁর বিভিন্ন ছবি লক্ষ্য করলে শিশুসুলভ দৃষ্টিভঙ্গী ও সরলতা বিশেষভাবে চোখে পড়ে। দু' এক স্থলে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির আভাস পাওয়া যায়। বলতে দ্বিধা নেই যে, সেই ক্ষেত্রেই শিল্পী সুফল লাভ করেছেন। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই দি ডেফ ছবিখানি সকলের চোখে পড়ে যায়। মাত্র একটি মুখমণ্ডল, জলরঙে আঁকা, অথচ মুখ, চোখ ও বিশেষ করে চোখের চাহনী দেখেই মনে হয় যেন ভগবানদত্ত স্বাভাবিক কোনও গুণ থেকে সে বঞ্চিত। প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ এই ছবিটি দেখে অনেকেই অভিভূত হন ও সেই সঙ্গে বালক শিল্পীর রঙ ও রেখার মধ্য দিয়ে মনোভাব প্রকাশ করার ক্ষমতার পরিচয় পান। কয়েকটি নিসর্গ দৃশ্য ভাল লাগে। ওয়াশ পদ্ধতিতে আঁকা ছবিগুলি রঙ নির্বাচন ও পরিপ্রেক্ষিতবোধের দিক থেকে উল্লেখ্য। এই প্রসঙ্গে আফটার দি রেন, মর্নিং মিস্ট ও ল্যাণ্ডস্কেপ-২-এর নাম করা যায়। পল্লীদৃশ্য হিসাবে হোলি প্লেস ও রিভারসাইড প্রশংসা দাবী করে। ফেস্টিভ ডে-তে নানা রঙ ও রেখার মধ্য দিয়ে তিনি যে উচ্ছল আনন্দের রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন তাতে যেন তাঁর বালক শিল্পী সত্তাটিই প্রতিভাত হয়েছে। আরও একটি ছবি নজরে পড়ে—থ্রু মাই উইণ্ডো। আপনার ঘরের জানালার মধ্য দিয়ে দেখা দূরস্থিত কয়েকটি বাড়ি ও পরিবেশের রূপ শিল্পী নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন।

*

বধির —সুনির্মল ব্যানার্জি

পৃথিবীর সর্বদেশে ও সর্বকালে সমগ্র মানবজাতি যে একই সূত্রে বাঁধা আছে তার শ্রেষ্ঠ পরিচয় পাওয়া গেল ম্যাক্সমুলের ভবন আয়োজিত, অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে অনুষ্ঠিত এক বিরাট স্থিরচিত্র প্রদর্শনী দেখে। প্রদর্শনীর নাম 'হোয়াট ইজ ম্যান'। জার্মানীর জনপ্রিয় সচিত্র স্টার্ন (Stern) পত্রিকা ও মিউজিয়ম ও গ্যালারীর একটি অন্তর্জাতিক সংস্থা এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। বিভিন্ন দেশ থেকে প্রেরিত মোট ২২,০০০ স্থিরচিত্রের মধ্য থেকে মাত্র ৫৫৫টি নিদর্শন আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে—তার মধ্যে স্থানাভাবের জন্য অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে মাত্র ২৫৫টি স্থির-চিত্র রাখা হয়। ৩০টি বিভিন্ন দেশ থেকে নেওয়া এই স্থিরচিত্রগুলি ইতিমধ্যে পৃথিবীর নানা দেশে প্রদর্শিত হয়েছে ও ভারতেও বিভিন্ন শহরে প্রদর্শিত হচ্ছে। প্রদর্শনীর বৈশিষ্ট্য এই যে সভ্য ও অসভ্য, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, ধনী ও দরিদ্র, জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জীবনের বিশিষ্ট কোনও ক্ষণমুহূর্তটুকু গুণী স্থিরচিত্র-শিল্পীর চোখ ও ক্যামেরায় পড়ে অপরূপ রসসৃষ্টি করেছে। বলা বাহুল্য, বিপরীত-ধর্মী নিদর্শনগুলি অধিক উপভোগ্য।

দর্শকদের সুবিধার জন্য বিরাট প্রদর্শনীটিকে ৪২টি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে এক একটি বিশেষ বিষয়বস্তু বা ভাবধারার কয়েকখানি চিত্র একত্রে রাখা হয়েছে। ফলে, একই বিষয়বস্তু বিভিন্ন স্থিরচিত্রশিল্পী আপন আপন দৃষ্টিভঙ্গী-অনুযায়ী নানাভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রদর্শনীর আর একটি বিশেষত্ব এই যে, বিভিন্ন প্রয়োগ ও কলাকৌশলের ওপর আদৌ প্রাধান্য না দিয়ে ক্যামেরা-শিল্পীগণ মানুষের চরিত্র, অনুভূতি ও বিভিন্ন বৃত্তির স্বাভাবিক রূপেরই ব্যাখ্যা করেছেন। প্রদর্শনীটি এত বড় ও প্রত্যেক নিদর্শন এত সুনির্বাচিত যে সব কয়টির বিষয় বলা সম্ভব নয়। প্যারিস শহরের রাস্তার ধারে এক বৃদ্ধা রমণী পরম স্নেহে জীর্ণ মালার মত জীর্ণ ও শীর্ণ হাতে এক লোলচর্ম বৃদ্ধকে পরম আদরে আলিঙ্গনে বেঁধে রেখেছেন ও তারই অদূরে সাথীহারা সর্বস্বান্ত আর এক বৃদ্ধ করুণ, অসহায় চোখে চেয়ে আছেন, অশিক্ষিতা, বহু সন্তান-জননী অনাহুত আর একটি সন্তানের আগমন প্রতীক্ষায় করুণভাবে নিজ স্ফীত উদরের দিকে দৃষ্টিপাত করছেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ক্রিমিয়ায় ধ্বংসলীলা সম্পন্ন করে জার্মান সৈন্যদল চলে যাবার পর আত্মীয়স্বজন শত শত খণ্ডিত, বীভৎস মৃতদেহের মধ্যে প্রিয়জনের সন্ধান করে চলেছেন বা নিউ ইয়র্কের বিশেষ কোন স্থানে অর্ধনগ্ন যুবতীর দল লাস্য নৃত্যের ছলে আসর জমিয়েছেন, অথবা কোথাও কোনও জার্মান শিশু নিগ্রো শিক্ষককে আদর করছে—এক কথায় নানা দেশের নরনারীর জীবনযাত্রা ও নানা স্মরণীয় মুহূর্তগুলির রূপ দর্শকের মনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। বলা বাহুল্য, প্রদর্শনীতে কলকাতার পথের ভিখারী বা নেপালী রমণীর ছবিও দেখা যায়। স্থির-চিত্রশিল্পীদের মধ্যে বিশেষ করে রিচার্ড পিটারসেন, ক্লডিয়া আন্দ্রেয়ার, ফ্র্যাঙ্ক হোভার্ট, উইলিয়ম ক্লীন, ফ্রেডারিকো প্যাতিলেনি, ফ্রাঙ্ক হুবম্যান, ওয়ার্নার বিশফ ও রবার্ট ক্যাপার নাম উল্লেখযোগ্য। এই উপভোগ্য প্রদর্শনীটির আয়োজন করে ম্যাক্সমুলের ভবন কর্তৃপক্ষ সকলের ধন্যবাদ-ভাজন হলেন।

*

কোনও শিল্পরসিক দেশী বা বিদেশী ভদ্রলোক তথা মহিলা কলকাতায় এসে যদি সমকালীন কোন ছবি কিনতে চান তাহলে প্রায়ই তাঁকে বিব্রত হতে হয়। কারণ ঠিক এই উদ্দেশ্যে গঠিত কোনও আর্ট গ্যালারি কলকাতায় নেই বললেই চলে। সুখের বিষয়, পরিচিত শিল্পী শ্রীমতী সন্তোষ রোহাতগী সম্প্রতি এই অসুবিধা দূর করেছেন। চৌরঙ্গী ও সুরেন ব্যানার্জি রোডের সংযোগস্থলে স্থাপিত তাঁর অঙ্কন বিদ্যালয়েই তিনি সম্প্রতি একটি চিত্র গ্যালারী স্থাপন করেন—উদ্বোধন করেন আমেরিকার কনসাল পত্নী, শ্রীমতী গর্ডন। গ্যালারীতে যে সকল তরুণ শিল্পীদের রচনা দেখা যায় তাঁদের মধ্যে অমিতাভ ব্যানার্জি, শ্যামল বোস, মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী, সন্তোষ রোহাতগী, শঙ্কর ঘোষ ও বারিদ গোস্বামীর নাম উল্লেখযোগ্য।

—চিত্রপ্রিয়

॥ ২৭ ॥

ইন্দ্রজিৎ দীপুকে দেখে বিশেষ অবাক হলো না, বাঁ হাতের তালু দিয়ে থুতনি ঘষতে ঘষতে বললো, কি রে কি ব্যাপার? বোস্।

দীপু অন্তত দু-এক বছরের মধ্যে ইন্দ্রজিতের সঙ্গে আড্ডা মারার জন্য তার বাড়িতে আসে নি, কিন্তু ইন্দ্রজিৎ আজকাল নিজেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ লোক মনে করে এবং ধরেই নিয়েছে যে এখন প্রায়ই লোকজন তার কাছে আসবে। মেজাজ ভালো থাকলেই হাতের তালুতে সে থুতনি ঘোরায়, দাড়ির খরখরানি অনুভব করতে ভালোবাসে।

আরেকবার 'বোস্' বলে ইন্দ্রজিৎ বেরিয়ে গেল রাস্তার দিকে বারান্দায়—দীপুর শরীরে একটা শিহরণ খেলে গেল। রাস্তা থেকে ওরা ছ'জন নিশ্চয়ই ইন্দ্রজিৎকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে এখন, দীপুর আর মিথ্যে কথা বলার কোনো সুযোগ রইলো না।

ইন্দ্রজিৎ চিঠির বাক্সটা খুললো, ফাঁকা, লক্ষ করলো। কেন রাত ন'টায় পিওন এসে চিঠি দিয়ে যাবে, সে আশা করেছিল। প্রতিদিন বারবার চিঠির বাক্স নিয়ে ঘাঁটা-ঘাঁটি করা অনেকের অভ্যেস। বিশেষ কোনো চিঠির প্রত্যাশা যে করে, তাও নয়।

আবার ঘরে এসে বললো, কি রে, দাঁড়িয়ে রইলি যে?

দীপু শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখখানা বিবর্ণ। আস্তে আস্তে বললো। ইন্দ্রজিৎ, আমাকে পঞ্চাশটা টাকা দিতে পারিস? আমি তোকে শোধ দিয়ে দেবো, এক মাসের মধ্যে—

—পঞ্চাশ টাকা? উঁ: কবে চাই?

—আজই। এক্ষুনি।

এক্ষুনি! কি দরকার? বাড়িতে কিছু হয়েছে?

—না, বাড়িতে কিছু নয়। আমার নিজের।

—কি ব্যাপার কি? তুই ওরকম ভেঙে সীরিয়াস কেন? বোস্ একটু!

দীপু রাস্তায় নানা লোকের ঘড়ি দেখে সময় নিয়ে খেলা করছিল। এখন পাঁচ মিনিট সময়ের দামই তার কাছে সাংঘাতিক। সে জানে না, পাঁচ মিনিট এরই মধ্যে পেরিয়ে গেছে কি না।

—না, বসবো না। টাকাটা যদি এক্ষুনি দিতে পারিস ভালো হয়।

—এখন তো ক্যাশ পঞ্চাশ টাকা দেওয়া আমার পক্ষে একদম পসিবল্ নয়। অফিসের কো-অপারেটিভ থেকে লোন নিয়ে দিতে পারি—তাও পরশুর আগে হবে না। আর তোর যদি সত্যিই বিশেষ দরকার হয়—তা হলে কাল ব্যাংক থেকে তুলে দিতে পারি—অবশ্য হুটহাট করে ব্যাংক থেকে টাকা তোলাটা আমার ঠিক পছন্দ নয়।

—ইন্দ্রজিৎ, টাকাটা এক্ষুনি পেলেই সবচেয়ে ভালো হয়।

ইন্দ্রজিতের গলায় খানিকটা অভিমান ফুটে উঠলো। বললো, তুই আমাকে বিশ্বাস করছিস না, দীপু? আমার টাকা থাকলে তোকে দিতাম না? টাকার আর কি ভ্যালু আছে! তার চেয়ে ফ্রেণ্ডশীপকে বেশী ভ্যালু দিই!

কথাটা বেশ ভালো ভাবে বলতে পেরে ইন্দ্রজিৎ খুশী হয়ে তালু দিয়ে থুতনি ঘষতে লাগলো। দীপুকে অস্বস্তিতে ফেলতে পেরে সার্থক হয়ে ইন্দ্রজিৎ আবার বললো, তবে আমি কোনো বন্ধুর কাছে বিপদে পড়ে টাকা চাইতে গেলে, শুধু টাকাই চাইতাম না—তার কাছে বিপদের কথাটাও খুলে বলতাম। শুধু টাকা দিয়েই তো আর সাহায্য হয় না, আরও কত রকম ভাবে—তুই কি কোনো মেয়ে-টেয়েকে নিয়ে ট্রাবলে পড়েছিস নাকি?

দীপু অস্থির ভাবে এদিক ওদিক চাইছে। সে কি করবে, কিছুই ঠিক করতে পারছে না—এই রকম অবস্থা তার জীবনে খুব বেশী আসে না, কিন্তু যখন আসে সে খুব অসহায় হয়ে পড়ে। দুঃখ-কষ্ট নিয়েও সে হাসি-ঠাট্টায় থাকতে চায়—কিন্তু এ তো অন্যরকম!

দীপু বললো, ইন্দ্রজিৎ তুই ধনঞ্জয়দের সঙ্গে ঝগড়া করেছিস?

এই অপ্রত্যাশিত কথায় ইন্দ্রজিৎ চোখ সরু করে তাকালো। বললো, ধনঞ্জয়দের সঙ্গে? তুই হঠাৎ একথা জিজ্ঞেস করছিস?

—আমাকে ওরা বললো।

—তোকে? তুই আজকাল ঐ লোফার-দের সঙ্গে মিশছিস নাকি? তোকে তো জানতুম—

—আমাকে ওরা বললো। তুই ভূপেকে ছোটলোক বলেছিস!

—ছোটলোককে ছোটলোক বলবো না তো কি বলবো? কুকুরকে কেউ ছাগল বলে?

জানলার পাশে ওরা কেউ কান পেতে নেই তো? দীপু জানলার দিকে তাকালো। রাস্তা দিয়ে লোক চলাচল বিরল হয়ে এসেছে। পার্কের কোণে অন্ধকারে দু' তিনটে সিগারেটের আগুন জ্বলতে দেখা যায়।

ইন্দ্রজিৎ ফের বললো, ভূপে আর সুকুমার আমার সঙ্গে বেশী মস্তানি দেখাতে এসেছিল। দো দিন কা যোগী, ইয়েতে জট্। ভেবেছে শিকাগোর গুণ্ডা হয়েছে। প্রোটেকশান মানি চায়। যখন তখন টাকা চাইলেই আমি দেবো! ওসব মাজাকি আমার সঙ্গে—

সিগারেট ধরিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ও খিস্তি আড়াল করার জন্য ইন্দ্রজিৎ উঠে গিয়ে বাড়ির দিকের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে এলো। দীপুকে একটা সিগারেট দিতে এলে দীপু নিল না। ভালো চাকরি পেলেও ইন্দ্রজিৎ মুখ খারাপ করার অভ্যেস ছাড়ে নি।

দীপু বললো, ইন্দ্রজিৎ আমি এখন কি করি বল তো? ধনঞ্জয়েরা তোর ওপর খুব রেগে গেছে। আমাকে পাঠিয়েছে কোনো ছুতোয় তোকে ডেকে আনতে।

—তোকে পাঠিয়েছে? তুইও তাহলে শেষ পর্যন্ত ওদের দলে ভিড়লি! এক

সময় তো খুব ফাট দেখাতিস! আমি ওদের সঙ্গে মিশতাম বলে খুব বাণী দিতিস আমাকে!

—না না, আমি ওদের দলে মিশিনি। ওরা আমাকে আজ রাস্তায় ধরেছে, দারুণ ক্ষেপে আছে ওরা—

—বুঝেছি বুঝেছি, চাকরি না পেয়ে সবাই আজকাল মাস্তান হয়! কিন্তু তোর বাবার এত কানেকশান, তোকে কোনো অফিসে চাকরিতে দিতে পারলো না?

—ইন্দ্রজিৎ, তুই বুঝতে পারছিস না। তোর আজ কোনোক্রমেই রাস্তায় বেরুনো উচিত না। ওরা আমাকে পাঠিয়েছে, আমি যদি তোকে ডেকে নিয়ে না-যাই, তা হলে আমাকে মারবে বোধহয়। সেইজন্যই আমি ভেবেছিলাম—

ইন্দ্রজিৎ তড়াক্‌ উঠে বললো, মারবে? মাইরি আর কি! চল তো দেখি, কত ওদের বুকের পাটা!

—ওরা ছয়জন আছে। ধনঞ্জয়ের কাছে বোধহয় ছুরি আছে।

তড়পানি সত্ত্বেও ইন্দ্রজিৎ কিন্তু চেয়ার ছেড়ে উঠলো না। জিজ্ঞেস করলো, মাল টেনেছে? মাল টানলেই রুস্তমিটা বেশী বাড়ে।

আমিই তোকে শোধ করে দিতাম!

—ঠিক আছে, থানায় ফোন করে দিচ্ছি। থানায় নিয়ে গিয়ে শালাদের আচ্ছা করে প্যাদানি দিলেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে! তুই বোস, আমি ব্যবস্থা করছি!

দীপু বিমর্ষভাবে বললো, থানায় খবর দিলে কি কোনো সুরাহা হবে? থানায় খবর দিলেও হয়তো আসবে না। যদি আসেও, বড় জোর একজন দুজনকে ধরবে। ধনঞ্জয় কি টাইপের ছেলে, তা সবাই জানে, পুলিশও জানে—তবু তো ধরে না। থানায় ধরে নিয়ে গেলেও দুচারদিন বাদে ছেড়ে দেবে—তখন প্রতিশোধ নেবে না? ওরা ডেসপারেট! কিংবা যারা [illegible] চেষ্টা করবে—আমি তোকে বলছি ইন্দ্রজিৎ, ওরা ডেসপারেট—ওদের সঙ্গে একদিন মারামারি করেও হয়তো কোনো লাভ—কিন্তু মারামারিই ওদের পেশা, আমরা তো আর প্রত্যেকদিন এই নিয়ে থাকতে পারি না! সেইজন্যই আমি ভেবেছিলাম—ওরা প্রথমে বলেছিল, তোর কাছে পঞ্চাশ টাকা চাইবে—যদি টাকাটা পায় তাহলে হয়তো—

চোখের সামনে কোনো দারুণ একটা নোংরা জিনিস দেখছে এই ভাবে মুখ বিকৃত করে ইন্দ্রজিৎ বললো, এইজন্য তুই টাকা চাইছিলি? বলছিলি যে তোর খুব দরকার! মাইরি, কাউকে আজকাল বিশ্বাস নেই!

দীপু আরক্ত মুখে বললো, টাকাটা আমিই তোকে শোধ করে দিতাম!

—তুই ওদের টাকা দিবি? টাকা দিয়ে ওদের কাছ থেকে নিস্তার পাওয়া যায়? আজ দিলেই আবার কাল চাইবে। একবার মধুর সন্ধান পেলেই শালা বারবার একেবারে [illegible] ছেড়ে দেবে!

—আমি তো জানি। টাকা দিয়ে নিস্তার পাওয়া যাবে না, জানি। কিন্তু আমি কি করবো, বলে দে তো! আমার ভালো লাগছে না, একটুও ভালো লাগছে না। ধনঞ্জয় আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিয়েছিল।

—আমাকে সত্যি করে বল্‌ তো, তুই ওদের সাইড নিয়েছিস কিনা! আমি দু' একদিন তোকে ওদের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি। তুই আমার কাছে ভাঁওতা মারছিস না তো?

দীপু আর কোনো কথা বললো না, গাঢ় ভাবে তাকালো ইন্দ্রজিতের দিকে। তার অসম্ভব ক্লান্ত লাগছে। যা হয় হোক, তাকে এখন এখান থেকে বেরুতেই হবে।

ইন্দ্রজিৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, শালারা এখনও বাইরে দাঁড়িয়ে আছে? দাঁড়া, ওদের কি রকম টাইট দিতে হয় দেখিয়ে দিচ্ছি। আমার মেসোমশাই অ্যান্টি-করাপশানের ডেপুটি কমিশনার, ফোন করে দিলেই ভ্যান নিয়ে এসে পেছন থেকে সব কটাকে জাপটে ধরবে। আমি বললে, ধোলাই দিয়ে হাত পা ভেঙে দেবে। ঠুঁটো হয়ে কি রকম মাস্তানি করে দেখবো। তুই বোস, আমি আসছি।

ধনঞ্জয় সুকুমারদের ধরে নিয়ে গিয়ে হাত পা ভেঙে দেওয়া হোক, এটাও দীপু মনে মনে চায় না। স্বাস্থ্যবান তেজী কয়েকটি ছোকরা সারা জীবনের মতন অক্ষম হয়ে যাবে—এ হতেই পারে না। কিন্তু কি করেই বা ওদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে? আঃ, সে আর ভাবতে পারে না! ওরা যদি শুধু তাকে এর মধ্যে না জড়াতো! দীপু তো ওদের কোনোদিন কোনো ক্ষতি করেনি!

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেছে, ইন্দ্রজিৎ তবু এলো না। পাঁচ মিনিটের বদলে হয়তো আধ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। টেলিফোন করতে এত সময় লাগে? ইন্দ্রজিৎ ওপরে গিয়ে তার কথা ভুলে যায়নি তো? ধনঞ্জয়েরা বোধহয় অধৈর্য হয়ে ক্ষেপে আরও আগুন হয়ে আছে। কিংবা এমনও তো হতে পারে, ওরা হয়তো আজকের মতন হাল ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। ইস, তাই যদি হয়!

ইন্দ্রজিৎ শেষ পর্যন্ত এলো, মুখ গম্ভীর। হাতে কয়েকখানা দশ টাকার নোট। বললো, পঞ্চাশ টাকা হলো না, এই তিরিশ টাকা নে। দাদার কাছে চাইতে হলো। ওদের সঙ্গে আর মিশিস না।

—তুই ভুল করছিস, আমি ওদের সঙ্গে মিশি না।

—ঠিক আছে। বুঝলি না, ওরা ঠিক আমাদের র‍্যাংকের নয়।

ইন্দ্রজিৎ টেলিফোন করার ব্যাপারে কোনো উচ্চবাচ্য করলো না। দীপুই জিজ্ঞেস করলো, তুই টেলিফোন করেছিস?

ইন্দ্রজিৎ উদাসীন ভাবে বললো, টেলিফোন? নাঃ, পরে এক সময় করলেই হবে। মেসোমশাই বোধহয় এখন কলকাতায় নেই! আচ্ছা—

টাকাগুলো হাতের মুঠোয় নিয়ে দীপু আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলো। তার কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। ইন্দ্রজিৎ তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে নি, ভেবেছে যে দীপুও পাড়ার গুণ্ডাদের দলে ভিড়েছে, যে-দলে ইন্দ্রজিৎ নিজে একসময় ছিল।

আচ্ছা, দীপু যত শিগগির পারে ইন্দ্রজিতের টাকা শোধ করে দেবে।

পার্কের কোণটায় এসে দেখলো, সেখানে কেউ নেই। রাস্তা অনেক ফাঁকা। মানিকতলার কাছাকাছি লোহার দোকান-গুলোর পাশে বিহারীদের গান শোনা যাচ্ছে। তাহলে ওরা সত্যি চলে গেছে? দেরী দেখে ওরা নিশ্চয়ই সন্দেহ করেছিল, ইন্দ্রজিৎ থানায় খবর দিতে পারে। টাকা-গুলো নিয়ে সে কি করবে? ইন্দ্রজিৎকে গিয়ে আবার ফেরৎ দিয়ে আসবে? ইন্দ্রজিৎদের বসবার ঘরের আলো নিবে গেছে।

টাকাগুলো হাতে নিয়ে দীপু ইতস্তত করছে, ঠিক এই সময় যেন মাটি ফুঁড়ে সুকুমার তার পাশে এসে দাঁড়ালো। যেন এই প্রথম দীপুর সঙ্গে তার দেখা হচ্ছে এই ভঙ্গিতে সুকুমার তাকে জিজ্ঞেস করলো, কি রে?

দীপু খানিকটা হালকা ভঙ্গি করার চেষ্টা করে বললো, আমি ভাবলাম, তোরা বুঝি চলেই গেছিস! ইন্দ্রজিতের কাছ থেকে টাকা পেতে এত দেরী হলো!

কি দ্রুত সুকুমাররা মুখের ভাব পাল্টাতে পারে! দীপুর কথা শুনে সুকুমার খুব মজা পাবার ভাব দেখিয়ে অনাবিল ভাবে হাসলো। সঙ্গে সঙ্গে হিংস্র নেকড়ের মতন মুখের ভঙ্গি করে বললো, শালা—। এক থাবা দিয়ে দীপুর হাতের টাকাগুলো কেড়ে নিয়ে আর এক হাতে একটা প্রচণ্ড ঘুষি মারলো দীপুর কানের নিচে। দীপু আঘাত সামলাতে পারলো না, ঘুরে একেবারে রাস্তায় পড়ে গেল। আবার উঠে দাঁড়াতেই তাকে কোনো রকম সুযোগ না দিয়ে সুকুমার আবার পর পর দুটো ঘুষি মেরে দীপুকে ফেলে দিল।

এবার উঠে দাঁড়াতে দীপুর একটু সময় লাগলো। হাত দিয়ে বুঝলো, তার কষ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। অনেক—অনেকদিন বাদে দীপু নিজের শরীরের রক্ত দেখলো। রক্ত দেখেই তার শরীরে যেন অমিত শক্তি এসে গেল, সে এখন ইচ্ছে করলেই এই পৃথিবীটা টুকরো টুকরো করে দিতে পারে।

আস্তে আস্তে উঠে পড়ে দেখলো, আর পাঁচজন ইতিমধ্যে হাজির হয়ে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। রাস্তা দিয়ে এখনও লোক যাচ্ছে দু' একজন, ওদের দলটার দিকে তাকিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে দ্রুত। এখান থেকে মাত্র কয়েক শো গজ দূরে থানা—কিন্তু চেঁচিয়েও কোনো লাভ নেই।

পকেটে হাত দিয়ে রুমাল খুঁজে পেল না দীপু। হাতের ধুলো ঝেড়ে, বাঁ হাতের উলটো দিক দিয়ে রক্ত মুছলো। অন্যদের গ্রাহ্যও করলো না, সুকুমারের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে অত্যন্ত ঠান্ডা ভাবে বললো, আমার গায়ে আর হাত দিস না। আর কোনোদিন হাত দিস না। মারামারি করতে আমার ঘেন্না হয়, কিন্তু তোর হাত দুটো আমি ভেঙে দিতে পারি। এক্ষুনি ভেঙে দিতে পারি।

সুকুমার কিছু বলার জন্য মুখ খুলতেই দীপু প্রচণ্ড জোরে চেঁচিয়ে উঠলো, চুপ! কোনো কথা শুনতে চাই না আর।

ভুপে এগিয়ে এসে বললো, কি রে শালা বো......, অত তড়পাচ্ছিস কাকে?

দীপু তাকেও ধমক দিয়ে বললো, চুপ!

দীপু তৈরী ছিল, ভুপে ঘুষি চালাবার আগেই দীপু অন্ধ ক্রোধে তাকে এত জোরে মারলো যে ভুপে ছিটকে পড়ে গেল সুকুমারের ঘাড়ে। দীপু সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালো ধনঞ্জয়ের দিকে।

দলপতির ভঙ্গিতে ধনঞ্জয় কোমরে হাত দিয়ে গম্ভীর ভাবে সব দেখছিল। চোখের পলকে তার হাতে ঝলসে উঠলো ছুরি। যেন ছোট ভাইকে উপদেশ দিচ্ছে, এইরকম ভাবে বললো, তুই বড্ড টেঁটিয়া হয়েছিস দীপু!

দীপুর আর ভয় নেই, তার শরীরটা

প্রথম শক্ত। ঠিক রাগ নয়, এক ধরনের প্রচণ্ড ঘৃণায় সে কাঁপছে। পর্যায়ক্রমে সে ধনঞ্জয়ের চোখ আর হাতের ছুরির ওপর দৃষ্টি রেখেছে, এক পা এক পা করে পেছোতে পেছোতে বললো, তোরা কাপুরুষ, তোরা পুরুষ মানুষ নামেরও যোগ্য নস। তোরা পাঁচ ছ'জন মিলে একজনকে মারিস। তাও ছুরি বার করতে লজ্জা হয় না! সাহস থাকে তো একা একা আয় আমার সঙ্গে। দেখি তোর কত গায়ের জোর!

—ইন্দ্রজিতের সঙ্গে এতক্ষণ তোর কি কথা হচ্ছিল?

কিছু কথা হয় নি!

—বেশী চেল্লাস নি। তোকে মারতে চাইলে এতক্ষণ তোর রক্ত ফুটপাথে গড়াতো। তোর সঙ্গে তো মারামারি করতে চাইনি, তুই-ই তো ঝামেলা পাকাচ্ছিস! ইন্দ্রজিতের সঙ্গে তোর কি কথা হলো?

—কিছু কথা হয় নি!

—আর একবার জিজ্ঞেস করবো! ইন্দ্রজিৎ কাকে খবর পাঠিয়েছে? কার নাম বলেছে?

দীপু আর পিছুতে পারলো না। পেছন থেকে আর দুজন এসে তার দু' হাত চেপে ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে ধনঞ্জয় ছুরিটা একেবারে তার মুখের কাছে এনে বললো, শখ মিটিয়ে দেবো? তোর জন্য আজ অনেকক্ষণ মেজাজ খারাপ করিনি। ধনঞ্জয় হাঁটু দিয়ে ইন্দ্রজিতের পেটে এক ধাক্কা মেরে বললো, বল শালা—

পেটের আঘাতটা সামলাবার জন্য দীপু অনেকক্ষণ দম বন্ধ করে রইলো। তারপর বললো, কি, আমাকে মারবি? মার না। তোরা আমাকে খুন করতে পারিস, তা বলে কি আমি তোদের ভয় করবো নাকি? আমি কিছু বলবো না।

ধনঞ্জয় এবার দাঁতের ঝলক দেখিয়ে সঙ্গীদের বললো, চল, শালাকে আখড়ায় নিয়ে চল্। আজ যদি ও মুখ না খোলে, আমি ওর মুখে জুতো ভরে দেবো।

তিনচারজন মিলে দীপুকে টেনে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে নিয়ে যেতে লাগলো রাজাবাজারের বস্তির দিকে। দীপুর

একবার মনে হলো, আজই তার শেষ দিন, আজ ওরা কোনো কারণে দারুণ ক্ষেপে আছে—আজ আর উদ্ধার নেই। জোর করে দীপু নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করেও পারলো না, তার একখানা হাত পিঠের দিকে মুচড়ে ধরেছে, পিঠের কাছেই ধনঞ্জয়। আজই তাকে মরতে হবে? দীপু চোখ বুজে নিজের ভবিষ্যৎটা দেখার চেষ্টা করলো, প্রথমে কিছুই দেখতে পেলে না, তারপর শান্তার মুখ। জলের মধ্যে যেন ভাসছে শান্তার মুখের ছবি। দীপু চিৎকার করার চেষ্টা করতেই ভূপে চেপে ধরলো তার মুখ। নাঃ, এর থেকে মরে যাওয়াই ভালো! বস্তির একটা ঘরের মধ্যে ওরা তাকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিল।

ঘরটা বেশ বড়। মেঝের সমস্তটা জুড়ে চাটাই পাতা, এক কোণে একটা ছোট খাট পাতা, সেখানে চারজন লোক বসে নিবিষ্ট হয়ে তাস খেলছে। তাদের পাশে পাশে গেলাসে দিশি মদ। একটা আধা-চিনে আধা-অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সোডা ঢেলে দিচ্ছে তাদের গেলাসে। ছোট আলমারির মাথায় রেডিওতে বিবিধ ভারতীর গান বেজেই চলেছে।

তাস খেলার লোকগুলোর মধ্যে একজন এদিকে তাকিয়ে বললো, আরে, এ কাকে এনেছে রে? এ কি করেছে?

কেউ কোনো উত্তর দিল না। লোকটি খাট থেকে নেমে এসে বললো, ঠিক ঐ জায়গাটায় একদিন জগন্নাথ... দেখি, ওর মুখটা ফেরা তো!

খানিকটা মজা করার জন্যই ভূপে জোর করে দীপুর মুখটা ঘুরিয়ে দিল লোকটির দিকে। লোকটির গায়ে একটা চাদর কোনোরকমে জড়ানো, তার একটি হাত শক্তিহীন, শুকনো নড়বড়ে ভাবে ঝুলছে। অন্য হাতটি অত্যন্ত সবল, সাধারণ মানুষের উরুর মতন মোটা। এই লোকটির নাম নিতাই। সে অস্ফুট ভাবে বললো, এ কি, এ তো দীপু, রাসুদার ছেলে। এখানে একে এনেছো কেন? ছেড়ে দাও!

ধনঞ্জয় রুক্ষভাবে বললো, আপনি নিজের চরকায় তেল দিন! এখানে নাক গলাবেন না!

এক মুহূর্তও সময় না দিয়ে নিতাই তার একটি মাত্র শক্তিমান হাতে ঠাস করে এক চড় মারলো ধনঞ্জয়কে। ধনঞ্জয়ের মুখটা এপাশ থেকে ওপাশে ঘুরে গেল। নিতাই বললো, ক'বচ্ছর কলকাতায় ছিলাম না, তা বলে এ পাড়ায় আমার মুখের ওপর কেউ কথা বলবে? ফুটো পয়সার মাস্তান সব—

তাস খেলার দল থেকে আরেকজন তড়াক করে নেমে এসে ধনঞ্জয় আর নিতাইয়ের মাঝখানে দাঁড়ালো। বললো, আরে, আরে, নিজেদের মধ্যে এসব কি! এই ধনা, তুই নিতাইদাকে চিনিস না! নিতাইদা একটা কথা জিজ্ঞেস করেছে—

ধনঞ্জয় বললো, ওসব নিতাইদা ফিতাইদা কারুকে চিনি না আমি!

লোকটি ধনঞ্জয়ের কাঁধে হাত দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে বললো, আরে, চল চল, মাথা গরম করিস নি। বাইরে চল, তোর সঙ্গে একটা কথা আছে। নিতাইদা আমাদের অনেকদিনকার দাদা—।

লোকটি ধনঞ্জয়কে বাইরে উঠোনে নিয়ে গেল। নিতাইয়ের হাতের দুর্দান্ত চড়-খানা দেখে আর পাঁচজন থ মেরে দাঁড়িয়ে আছে। প্রবল শক্তির প্রকাশ দেখলে ওদের মনে ভক্তির ভাব এসে যায়।

দীপু আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো। নিতাই তার কাঁধে হাত রেখে সস্নেহে বললো, দীপু, তোমাকে এখানে দেখবো ভাবতেই পারিনি। ওরা বুঝি তোমার সঙ্গে ঝামেলা করছিল? আমি বারণ করে দেবো, আর কোনোদিন কিছু করবে না! তোমার বাবার কাছে আমি কত ঋণী!

দীপু নিতাইকে কোনো ধন্যবাদ কিংবা কৃতজ্ঞতা জানালো না। ক্লান্ত ভাবে শুধু বললো, আমি এবার বাড়ি যাবো!

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, দাঁড়াও, আমি তোমাকে নিজে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবো। ধুলো টুলো ঝেড়ে নাও। ঠোঁটের পাশটায় একটু কেটে গেছে, এখানে ডেটল আছে, আমি লাগিয়ে দিচ্ছি।

[ক্রমশ]

"সত্যং শিবং সুন্দরম্"

"দেশ" পত্রিকায় শ্রদ্ধেয়া মীরা দেবীর স্মৃতিকথা প্রকাশিত হবার পর ঐ বিষয়ে "আলোচনা" বিভাগে শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মজুমদার গত ৩৭ বর্ষ ১৪ সংখ্যায় (৩১-১-৭০) তাঁর শ্রদ্ধাপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি লিখেছেন "সত্যং শিবং সুন্দরম্ Keats-এর বহু বহু পূর্বে আমাদের প্রাচীন ঋষিদের আশ্রমে রচিত হইয়াছিল।"

এই সম্পর্কে আমার সবিনীত বক্তব্য এই যে, চতুর্বেদ ও তদন্তর্গত উপনিষদাবলীর কোনো স্থানেই "সত্যং শিবং সুন্দরম্" মন্ত্রটি পাওয়া যায় না। কেন পাওয়া যায় না তার সহজ কারণ এই যে, শ্লোকটির উৎপত্তিস্থান আমাদের "প্রাচীন ঋষিদের আশ্রমে" নয়, তার উৎপত্তি ফরাসী দেশে, দার্শনিক Cousin-এর রচনাবলীতে। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ তা জানতেন এবং সেই জন্যই তিনি [illegible] ফরাসী দার্শনিক [illegible] : the true, the good, the beautiful [illegible] সত্যং শিবং সুন্দরম্। এমন কি, অনেকে মনে করেন, এটি উপনিষদের বাণী। [illegible] (১০ম খণ্ড—পৃঃ ৬০১)

রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত মন্তব্যের পর এই বিষয়ে আশা করি অন্য কোনো তর্ক উত্থাপিত হবে না।

সুবোধ মৈত্র
পাটনা-১।

মিনি-পত্রিকা

॥ ১ ॥

১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, [illegible] মাসের [illegible] [illegible] "মিনি পত্রিকা" [illegible] সরকারে পড়লাম। পড়ে কিছু না লেখার লোভ সামলাতে পারলাম না।

প্রথমে উক্ত পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই তাঁদের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার জন্যে। আজ এই অ্যাপোলো-১১ ও ১২-এর যুগে সাহিত্যও থেমে নেই। সব কিছু নিয়ে যখন চরম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, ঠিক তেমনি এক আনন্দঘন মুহূর্তে সম্পাদকমণ্ডলী সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হয়ে আমাদের চমকে দিলেন তাঁদের নবতম উপহার "মিনি-পত্রিকা" দিয়ে। এতে সাহিত্যানুরাগীরা খুশী হয়েছেন।

একথা ঠিক, ১০ কেজি ওজনের বিশাল উপন্যাসের চাপে আমরা আমাদের মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলি। দু' লাইন পড়ে বিমুগ্ধ হয়ে তার সূক্ষ্ম অণুরণন যদি পাঁচ মিনিট ধরে আমাদের মনকে গভীরভাবে দোলা দেয়, তার মূল্য কিসের সঙ্গে তুলনা করবো? এ হিসেবে "পত্রপুট" অতুলনীয়।

"পত্রপুট" নবজাতক। একে বাঁচাবার দায়িত্ব সাহিত্যিকদের। তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত আঁতুড় ঘরে যেন এর অকাল-মৃত্যু না হয় তার প্রতি দৃষ্টি রাখা। (অবশ্য এ রকম চিন্তা করা আমার উচিত হয়নি, সে জন্য ক্ষমাপ্রার্থী)। সাহিত্যিকরা এগিয়ে আসুন একে রক্ষা করতে। সাধারণ একজন পাঠক হিসেবে এটা আমার আন্তরিক আবেদন তাঁদের কাছে।

"পত্রপুট"-এর সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রতিযোগী এই আসরে এসে ভীড় করবে। সেই ভীড়ে "পত্রপুট" হয়তো হারিয়ে যাবে। কিন্তু শত ভীড়েও পত্রপুটকে খুঁজে বার করতে আমাদের অসুবিধা হবে না। কারণ, পত্রপুট আমাদের মানসকন্যা, চোখের মণি।

"পত্রপুট" দীর্ঘজীবি হোক্।

বিনয়কুমার বসু
ধূপগুড়ি জলপাইগুড়ি।

বিজ্ঞপ্তি

দেশ পত্রিকায় যাঁরা রচনাদি পাঠান তাঁদের প্রতি নিবেদন, সমস্ত রচনার নকল রেখে লেখা পাঠাবেন। কবিতা বাদে অন্যান্য অমনোনীত রচনা আমরা ডাকে—বুক পোস্টে—ফেরত দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করে থাকি; তবু নানা গোলযোগে এবং ডাকেও লেখা খোয়া যাবার সম্ভাবনা থাকে। বলা বাহুল্য, ইচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের দপ্তরে পাঠানো লেখার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে আমরা অক্ষম।

—সম্পাদক

॥ ২ ॥

বর্তমানে বোধ হয়, আমরা একটা মিনি-যুগের মধ্যে বাস করছি। তাই একাধারে রাজনীতিতে মিনি-ফ্রন্ট, আর সাহিত্যে মিনি-পত্রিকা। রাজনীতির মিনি-ফ্রন্টের কথা থাক; মিনি-পত্রিকার ব্যাপারটা কি? এর পূর্বে 'কবিতা ঘণ্টিকী', 'কবিতা দৈনিকী' প্রভৃতির আবির্ভাব হয়েছিল ওষধি-জাতীয় উদ্ভিদরূপে। বর্তমানে আমরা পাচ্ছি—মিনি-বুক ও মিনি-পত্রিকা।

রসিক মাত্রই স্বীকার করবেন—সাহিত্যে দৈর্ঘ-প্রস্থের বিষয়টা ঠিক জমির অনুরূপ নয়। মার্কিন স্থাপত্যের যে আশ্চর্য সংযম ও সংক্ষিপ্ততা—অল্প স্থানে অধিক মানুষের স্থান-সংকুলানের আবাস-নির্মাণ তা কি অন্তরীতি হিসেবে সাহিত্যেও প্রয়োগ করা হবে? আমরা ছোট গল্পের দৃষ্টান্ত টানতে

পারি। আধুনিক জীবনযাত্রার সংক্ষিপ্ততা ও দ্রুততার প্রতীকী উদাহরণ ছোট গল্প। জীবনের অন্বেষণই ছোট গল্পকে সার্থক শিল্পসুষমা দান করেছে। মিনি-সাহিত্যের পেছনে জীবনের কোন তাগিদ আছে? মনে করুন, একটি মিনি-পত্রিকায় 'গম্বুজ হাতের স্পর্শ' (লেখক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়—পত্রিকা 'অনুত্তম') গল্পটি। এটির মধ্যে এমন কি বিশেষত্ব আছে যাতে একে মিনি-গল্প বলব! বরং, মনে হয়—লেখককে আর একটু পরিসর দিলে তিনি 'সুধা'র ওপর সুবিচার করতে পারতেন।

আর, কবিতার স্বল্প আয়তনের কথা যদি ধরেন—তার জন্যে মিনি-পত্রিকার দ্বারস্থ হতে হবে না। আশ্চর্য সুন্দর সংক্ষিপ্ত জাপানী কবিতার সঙ্গে আমরা পরিচিত। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের 'লেখন' অপেক্ষা মহত্তর 'মিনি-কবিতা' কি হতে পারে।

অবশ্য যদি বলেন—সাহিত্যকে সব সময় পকেটে নিয়ে ঘুরতে হবে—তাহলে আলাদা কথা! তাহলে মিনি-সাহিত্যের সার্থকতা pocket book dictionary-এর উপযোগিতার সমান। শ্রীসন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের 'মিনি-বুকের' শক্তিমত্তার উদাহরণ মনে রেখেই বলছি।

অবশ্য, যদি মিনি-সাহিত্যের মধ্যে কোন রসবস্তু থাকে—তা টিকবে। কিন্তু, তার জন্য মিনি-সাহিত্যের বিশেষ ঢংয়ের ঢক্কানিনাদ না করলে চলবে। একঘেয়েমি কাটানোর জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা ভাল। কিন্তু, সাহিত্য সরস্বতীকে হুজুগের হুকুম না মানালেই মঙ্গল।

রেণুকণা পণ্ডিত
সালকিয়া, হাওড়া

বাংলার চালচিত্র

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭০, দেশ পত্রিকায় ১৭ জানুয়ারীর 'বাংলার চালচিত্র'-এর প্রতিবাদে শ্রীজিতেন্দ্রলাল রায় মহাশয় যে পত্র লিখেছেন তা পড়ে মোটামুটি এ ধারণা করা যাচ্ছে যে, শ্রীরায় হিন্দুদের গো-মাংস ভক্ষণ কোনো প্রকারেই বরদাস্ত করতে পারবেন না। এমন কি মুচি মেথর সম্প্রদায়ের হিন্দুদের মধ্যে হিন্দুধর্ম যথেষ্ট বিস্তার লাভ করেনি বলেই সে সমাজে গো-মাংস ভক্ষণ প্রচলিত—এ মন্তব্যও তিনি করে ফেলেছেন। শ্রীরায়ের পুরো চিঠিতেই কেমন এক অন্ধ গোঁড়ামীর আভাস পাওয়া যায়। গো-মাংসে প্রোটিন আছে কথাটা আদৌ ডাহা মিথ্যা নয়। ছারপোকায় প্রোটিন (!) থাকা সত্ত্বেও লোকে ছারপোকা খায় না, তার কারণ আর কিছু নয়, ছারপোকার দুর্গন্ধ। এমন দিন হয়ত দূরে নেই যখন আমরা (শ্রীরায় মশাই-র সঙ্গে) দুর্গন্ধবিমুক্ত ছারপোকার প্রোটিন বটিকা সেবন করব। এবং আশা করতে পারি তাতে আমাদের শাস্ত্রজ্ঞ সম্প্রদায় আমাদের ধর্মচ্যুত করার ফতোয়া দেবেন না। তাছাড়া ছারপোকা ও গো-মাংসে তুলনা করার আগে, গোঁড়া হিন্দু শ্রীরায় ছাগ মাংসের সঙ্গেও ঐ প্রাণীটির তুলনা করতে পারতেন। তাতে খুব তফাত দাঁড়াত না, যুক্তির দিক থেকে।

তারপর প্রত্যয় সহকারে শ্রীরায় কোলকাতার ছাত্র সমাজের যে চিত্র দিয়েছেন সে ভয়ানক হাস্যকর। কোলকাতার ছাত্ররা (বহিরাগত ছাত্ররা) শ্রীরায়ের মতে হয় ধনীর দুলাল নয়ত জলপানি পাওয়া মেধাবী ছেলে। শ্রীরায়ের বাসস্থল মেদিনীপুর থেকে কোলকাতার দূরত্ব পৃথিবী ও চন্দ্রের দূরত্ব নয় যে, উনি সজ্ঞানে এমন উদ্ভট প্রচার চালাতে পারেন। আমার দু বৎসর আগেকার অভিজ্ঞতা (এবং সে অভিজ্ঞতা একজন 'জলপানি পাওয়া' ছাত্রেরই) থেকে শ্রীরায়কে আমি না জানিয়ে পারছি না যে আমার অনেক বন্ধুবান্ধবই এমন কি শ্রীআব্দুল জব্বার মশাই-এর দেওয়া হিসেবকেও রীতিমত বিলাসিতা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারতেন না। আমি নিজেও না। কিন্তু সে বিলাসিতা মধ্যে মধ্যে যে করিনি তা নয়। অর্থাৎ এককথায় আমার বহু বন্ধুর সঙ্গে আমি নিজে ধর্মচ্যুত হয়েছি।

গোমাংস ভক্ষণে হিন্দুধর্ম যদি অপবিত্র হয়ে যেতে পারে তবে ধরে নিতে হবে তা যুগোপযোগী ধর্ম নয়। অন্ধভাবে তা আঁকড়ে ধরে থেকে শাস্ত্রের দোহাই পাড়া রীতিমত ভণ্ডামী।

বিশু ভট্টাচার্য
ডিগবয়

॥ ২ ॥

গত ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭০ দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র রায়ের পত্রখানিতে 'পরের মুখে ঝাল খাওয়া' প্রবাদ-বাক্যটির সার্থক প্রয়োগ দেখে পুলকিত হলাম।

শ্রীযুক্ত রায়কে অনুরোধ তিনি যেন অন্তত শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্রের Indo-Aryans (volume 1) বইটির ষষ্ঠ অনুচ্ছেদটি পড়ে দেখেন। সম্প্রতি এই অংশটি "Beef in Ancient India" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য
কলিকাতা-১২।

বাংলা দেশে বাংলা ভাষা

'বাংলা প্রবর্তন সমিতি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষাকে সরকারী বে-সরকারী সমস্ত রকম কাজে লাগাবার জন্য, সর্বস্তরে শিক্ষার বাহন করবার জন্য এবং সাইনবোর্ড বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি যাবতীয় গণ সংযোগের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকে প্রাধান্য দেবার দাবি জানিয়ে ২১শে থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি 'বাংলা প্রবর্তন সপ্তাহ' হিসেবে পালন করেছেন। এই উপলক্ষে জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন বোস স্বাক্ষরিত যে আবেদনটি প্রচারিত হয়েছে, সেটি উদ্ধৃত হলো।

"আগামী ২১-এ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৭-এ ফেব্রুয়ারী বাংলা প্রবর্তন সপ্তাহ পালনের জন্য 'বাংলা প্রবর্তন সমিতি' পশ্চিম বাংলার জনসাধারণের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। আমি একান্তভাবে কামনা করি—পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ব্যবসায় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সাধারণভাবে পশ্চিম বাংলার অধিবাসী মাত্রই তাঁদের আবেদনে সাড়া দিয়ে বাংলা ভাষাকে নিত্যকার কাজের ভাষা হিসেবে ব্যবহার করতে সচেষ্ট হবেন।

শুনলাম, বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার সরকারি মহলে বাংলা প্রচলনের জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। এরই মধ্যে সমস্ত দপ্তরকে বাংলা টাইপ কেনবার ও ব্যবহারের যে নির্দেশ তাঁরা দিয়েছেন তাতে তাঁদের এ বিষয়ে ঐকান্তিকতা প্রকাশ পেয়েছে। আমার একান্ত বিশ্বাস ও কামনা—সরকারী দপ্তর ও আইন আদালতের সব কাজ বাংলায় চালিয়ে বর্তমান সরকার জনসাধারণের কাছে তাঁদের প্রতিশ্রুতি পালন করতে দ্বিধা করবেন না। তাঁদের চেষ্টায় বাংলা ভাষা যদি এই মর্যাদা পায়, সারা দেশ তাঁদের সাধুবাদ জানাবে।

এই প্রসঙ্গে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের কথা মনে আসে। সেখানে শোনা যায় মাতৃভাষা চালানোর প্রচেষ্টায় তারা আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে গেছে। অথচ নিজেদের ভাষা নিয়ে আমাদের গর্ব কম নয়। কিন্তু গর্ব যতটা, ততটা নিষ্ঠা ও ঐকান্তিক চেষ্টা নেই। আমরা ধরে নিয়েছি, বাংলায় কাব্য সাহিত্য চলতে পারে—মনের কথা বলা যেতে পারে—কিন্তু কাজের কথা ও-ভাষায় চলবে না। যে কাজ ভিন্ন ভাষায় করতে হয়, সে-কাজে কখনও মন থাকতে পারে না। সেই-জন্যে দু'শ বছর ধরে ঐ ভাষাতে সব কাজ শিখেও তেমন কিছু গড়ে তুলতে পারিনি। আমাদের মনের ভাষা বাংলা ভাষাকে কাজের ভাষা করে তুলতে হলে, তার উপর কাজের দায়িত্ব দিতে হবে। সেই ভাষায় কাজের চিন্তা করতে হবে। তবেই এ ভাষা কাজের ভাষা হয়ে বলিষ্ঠ হয়ে উঠবে। এইভাবে আমাদের বিদ্বান, পণ্ডিত ডাক্তার, উকীল, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, কারিগর, কারবারী, সরকারী-আমলা যখন এই বাংলা ভাষাকে তাঁদের মুখের, মনের ও কাজের ভাষা করে দাঁড় করাতে পারবেন, তখনই বাংলা দেশের অসংখ্য সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁরা তাঁদের নাড়ীর যোগ ফিরে পাবেন, বাংলা ভাষাকে ভালোবেসে কাজকেও ভালোবাসবেন। সাধারণ মানুষও উপরতলার জ্ঞান-ভাণ্ডারের শরিক হয়ে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে।

বাংলা প্রবর্তন সমিতি চাইছেন, আর আর দেশের লোকেদের মত, আমরাও মাতৃভাষায় চিন্তা করি, মাতৃভাষা বলি, মাতৃভাষায় কাজ করি। এক সপ্তাহ ধরে তাঁরা দেশবাসীর কাছে বাংলা ভাষায় এই দাবি পৌঁছিয়ে দেবেন। দেশের উপরতলায় যাঁরা আছেন যদি তাঁদের মধ্যে মাতৃভাষা সম্পর্কে একটুও দরদ তাঁরা জাগিয়ে তুলতে পারেন, তবেই তাঁদের সপ্তাহব্যাপী এই প্রয়াস সার্থক হবে। বাংলা প্রবর্তনের এই দাবি আমি মনেপ্রাণে সমর্থন করে দেশবাসীর কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি, তাঁরা যেন না ভোলেন বাংলা তাঁদের মাতৃভাষা বলেই তাঁরা বাঙালী।"

সত্যেন বোস

১৩।২।৭০

পরলোকে অ্যাগনন

ইজরায়েলের প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক স্যামুয়েল যোসেফ অ্যাগনন গত ১৭ই ফেব্রুয়ারি জেরুজালেমে মারা গেছেন বয়েস যথেষ্ট হয়েছিল, অ্যাগননের জন্ম ১৮৮৮ সালে। পোল্যাণ্ডে। ১৯০৮ সালে তিনি প্যালেস্টাইনে এসে বসবাস শুরু করেন। ১৯৬৬ সালে তিনি কবি নেলি শাখ্স-এর সঙ্গে এক সঙ্গে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান।

তাঁর আসল নাম অন্য, অ্যাগনন এঁর

ছদ্মনামটি তিনি গ্রহণ করেন ১৯০৯ সালে —এই সময় তিনি হিব্রু এবং ইডিস—দু' ভাষাতেই কবিতা লিখতেন। কবিতা ও ছোট গল্প লিখে তিনি প্যালেসটাইনে যৌবনেই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, কিন্তু ১৯৩১ সালে তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস 'দা ব্রাইডাল ক্যানোপি' ইংরেজীতে অনূদিত হবার পরই বিশ্বে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর আর দুটি বিখ্যাত উপন্যাস "রাত্রির অতিথি" এবং "গতকাল ও তার আগের দিন"।

জীবনানন্দ স্মৃতি

৬ই ফাল্গুন জীবনানন্দ দাশের জন্মদিন এসে চলে গেল। এই উপলক্ষটি স্মরণ করার জন্য 'খোয়াই' নামে একটি কবিতা পত্রিকা তাঁদের বিচারে বছরের শ্রেষ্ঠ কবিকে সম্বর্ধনা জানাবার আয়োজন করেছিলেন। তাঁরা সম্বর্ধনা জানিয়েছেন সুখেন্দু মল্লিককে। সুখেন্দু মল্লিক বাংলা দেশের প্রায় সমস্ত পত্র-পত্রিকায় বহু কবিতা প্রকাশ করেছেন, তাঁর কবিতার বইয়ের নাম "বৃষ্টিকে করেছো সৃষ্টি"।

"বিভিন্ন কোরাস" নামে একটি পত্রিকা "জীবনানন্দ দাশ সংখ্যা" প্রকাশ করেছেন।। এঁরাও একটি প্রতিযোগিতা আহ্বান করে "শ্রেষ্ঠ তরুণতম পদ্যকারকে" জীবনানন্দ পুরস্কার দেবার কথা ঘোষণা করেছেন।

"কৌরব" নামে জামসেদপুরের একটি তরুণ লেখকগোষ্ঠী ২১শে ফেব্রুয়ারি একই সঙ্গে দুটি স্মৃতিপালন করেছেন। ১৯৫২ সালে পূর্ব পাকিস্তানের যেসব তরুণেরা বাংলা ভাষার সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে মৌন মিছিল এবং পরে জীবনানন্দের ৭২তম জন্মতিথি পালন।

কথ্য ভাষার অভিধান

বাংলায় কথ্য ভাষার অভিধানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমরা অনেক হা-হুতাশ করেছি। সম্প্রতি এই রকম অভিধান আমাদের হাতে এসেছে। কুমারেশ ঘোষ সংকলিত "আড্ডার অভিধান"। খুব বেশী বড় নয়, ৮৪ পাতা, নরম মলাট। আমাদের আশা সম্পূর্ণ মেটেনি বটে, তবু এই অভিধানটি নিশ্চয়ই উৎসাহী পাঠকদের এবং গবেষকদের কাজে লাগবে।

বেলা-অবেলা

আর একটি নতুন কবিতার পত্রিকা, সম্পাদক শৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। সুন্দর ছাপা এবং সম্পাদনায় মুন্শীয়ানার পরিচয় আছে। বিশেষ আকর্ষণ, কবিদের আত্মপরিচিতি। এ সংখ্যায় লিখেছেন কৃষ্ণ ধর ও কবিতা সিংহ। দীপ্তি ত্রিপাঠীর প্রবন্ধটিও মূল্যবান। এ ছাড়া কবিতা লিখেছেন গোপাল ভৌমিক, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখ।

সনাতন পাঠক

ধর্ম ও রাজনীতি

Islam in Indias Transition to Modernity. by Dr. M. A. Karandikar. Orient Longmans. **Bombay-1.** Price Rs. 20/-.

১৯৬৭ সনের পর থেকে ভারতের **বিভিন্ন স্থানে** বেশ কয়েকটি সাম্প্রদায়িক **হাঙ্গামা সৃষ্টি** হওয়ায় হিন্দু ও মুসল**মানের সমস্যাকে** নূতনভাবে দেখার চেষ্টা **হচ্ছে। অবশ্য সম্প্রতি** দাঙ্গা আর হিন্দু-**মুসলমানের মধ্যে** সীমাবদ্ধ নেই, কেরলে **মুসলমানের** সঙ্গে খৃস্টানের, মুসলমানদের **সঙ্গে মহারাষ্ট্রের** বৌদ্ধদের এবং রাঁচীতে **মুসলমান** ও আদিবাসীর মধ্যে দাঙ্গা **ঘটতে** দেখা গেছে। কিন্তু মুসলমানেরা **যেহেতু** সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির মধ্যে **সংখ্যায় সবচেয়ে** বেশী এবং হিন্দু-**মুসলমান দাঙ্গার** জন্য ভারত ও পাকিস্তান **সৃষ্টি হয়েছিল** সেহেতু হিন্দু-মুসলমান **সমস্যা সম্পর্কে** বর্তমান ভারতে অনেক **বেশী লোক** ভাবছেন, এই একটিমাত্র বিষয়ে **সম্প্রতি প্রকাশিত** বইয়ের সংখ্যাও কম নয়।

লেখক ভারতীয় মুসলমানদের ধর্ম ও **সংস্কৃতিকে** ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম **বৈশিষ্ট্য** হিসাবে মনে করেন। কিন্তু এই **মুসলিম মানসিকতার** বিভিন্ন দিকগুলি **সম্পর্কে** হিন্দু বা অন্য অমুসলিম **ভারতীয়দের** কোন ধারণা নেই। কোরাণ, **হাদিস,** আরবের খলিফাদের শাসনকাল, **মুসলমান** সমাজে বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলন এবং তাঁর প্রতিক্রিয়া হিসাবে গোঁড়া মুসলমানদের আন্দোলন—এ সবই ভারতীয় মুসলমান সমাজের মানসিকতার অঙ্গ। লেখক আলোচ্য গ্রন্থে তাই ইসলামের আবির্ভাব, ইসলামের সৃষ্টিশীল ও সম্প্রসারণশীল যুগ, শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে পার্থক্য, উলেমাগণ কর্তৃক কোরাণের ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে ইবন তাইমিয়ার বিদ্রোহের কথা বর্ণনা করে ভারতীয় ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মুসলমান সম্প্রদায়ের ভূমিকার কথা আলোচনা করেছেন। এই পটভূমিকার জন্যই ভারতের খিলাফৎ আন্দোলন কত প্রতিক্রিয়াশীল ছিল, তা বুঝতে পাঠকের কোন অসুবিধা হয় না। তুরস্কের দুর্নীতিগ্রস্ত যে সুলতানকে কামাল পাশা তুরস্ক থেকে বিদায় দিয়েছিলেন, সেই সুলতানের সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ভারতে কংগ্রেস ও খিলাফত কমিটী আন্দোলন করেছিল। আর এজনাই এশিয়ায় সর্বপ্রথম ধর্ম-নিরপেক্ষ বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাকারী, তুরস্কের সেই কামাল পাশা ভারতে বহুআলোচিত ও বহুপঠিত ব্যক্তি হতে পারেননি।

লেখক ভারতে বিভিন্ন মুসলমান সাম্রাজ্য, ইংরেজ আমলে মুসলিম আন্দোলন, ভারতের বিভিন্ন স্থানে খলিফার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা এবং স্বাধীন ভারতে মুসলিম আন্দোলনের দুটি ভাবধারা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ইসলাম কেবল আরবে নয়, ভারতেও ছোট ছোট রাজ্যের বদলে বৃহৎ রাষ্ট্র গঠনে সাহায্য করেছিল। ফরাসী বিপ্লবের ক্ষেত্রে ফরাসী ব্যবসায়ীদের মত ভারতীয় ব্যবসায়ীরাও ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্য স্থাপনকে তাই স্বাগত জানিয়েছিল। লেখক দেখিয়েছেন, যখনই মুসলমান সমাজের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোন অনিশ্চয়তা দেখা দেয়, তখনই মুসলমান সমাজের গোঁড়ামি নতুন করে মাথা চাড়া দেয়। মুসলমান সমাজ ও ইসলামিক ভাবধারাকে আধুনিক করার জন্য বার বার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু প্রতিবারই উলেমারা তাঁদের অমুসলমান বলে ফতোয়া দিয়ে মুসলমান সমাজ থেকে বের করে দিয়েছেন। ভারতে আহমেদিয়াদের নৃশংসভাবে হত্যা করার ঘটনাও এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। তবে স্বাধীন ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক সংবিধানের জন্য বর্তমান সংস্কারবাদীরা ইসলামিক আইনকে সংশোধনের সঙ্গে ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার হিসাবে গণ্য করারও আন্দোলন করছেন। ইসলাম বিশ্ব-

ভ্রাতৃত্বের ও সাম্যের কথা বললেও, আরব ও এদেশে বিভিন্ন সময়ে আরবে ও অ-আরব মুসলমান, তুর্কী ও ভারতীয় মুসলমান-দের মধ্যে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পার্থক্য বজায় রাখা হত, লেখক তাও বর্ণনা করেছেন। যে-সব ঐতিহাসিক ভারতীয় ইতিহাসকে নতুন করে লেখার কথা ভাবেন; এ-বইটি তাঁদের কাজে সহায়ক হবে। বইটি লেখার জন্য মারাঠী ও সংস্কৃত ভাষার ডক্টরেট হয়েও লেখক আলিগড়ে গিয়ে মধ্যযুগের ইতিহাস নিয়ে এম এ পড়েছেন।

পাকিস্তানের স্রষ্টা শ্রীজিন্না প্রথম দিকে যে কত অসাম্প্রদায়িক ছিলেন এবং মুসলীম লীগে যোগদান করেও হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির জন্য চেষ্টা করেছেন, বর্তমান গ্রন্থে তার পরিচয় মিলবে। অবশ্য জিন্নাকে পাকিস্তান প্রস্তাবের উত্থাপক বলে বর্ণনা করা হয়েছে, এটা ঠিক নয়। আবার হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দেয় ১৯০৫ সালে পূর্ববঙ্গে, খিলাফৎ আন্দোলনের পর মালাবারে নয়। কয়েকটি ছোটখাট ত্রুটি সত্ত্বেও সম্প্রতিকালে ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে এত ভাল বই বের হয়নি।

শ্রীঅচ্যুৎ পট্টবর্ধনের ভূমিকা বইটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ত্রিরিশ দশকে শ্রীপট্টবর্ধন ও তাঁর স্যোশালিস্ট বন্ধুরা মার্কস-লেনিনের পথে অর্থাৎ শ্রেণী আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলমান সমাজ থেকে প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বকে বিদায় দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন। তাঁদের সে চিন্তাধারা যে কত ভুল ছিল, শ্রীপট্টবর্ধন সে-কথা স্বীকার করে নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যা বিশ্লেষণের আবেদন জানিয়েছেন। (৩৩৯/৬৯

বেদ গ্রন্থমালা—১ম খণ্ড। সম্পাদক—পরিতোষ ঠাকুর ও শ্রীঅমরকুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক—পরিতোষ ঠাকুর, ২৯, সদানন্দ রোড, কলিকাতা-২৬। মূল্য—তিন টাকা।

"বেদার্থমঞ্জুষা"—এই নামে বেদ গ্রন্থমালার ১ম খণ্ডে সম্পাদকদ্বয় ঋগ্বেদ-সংহিতার অনুবাদ-কার্যে ব্রতী হয়েছেন। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ৮ম মন্ত্র পর্যন্ত আলোচ্য পুস্তকে সন্নিবেশিত। প্রথমে ঋক্-মন্ত্র, পরে মন্ত্রের পদবিভাগ, অন্বয়, অনুবাদ এবং শব্দার্থ ব্যাখ্যা করে দেওয়ার ফলে সাধারণ পাঠকের কাছেও ঋগ্বেদের এই অংশটি সহজবোধ্য হবে। বস্তুত, বেদপাঠে অভিলাষী হওয়া সত্ত্বেও উপযুক্ত পুস্তকের অভাবে অনেক পাঠকই এতাবৎ তা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। আলোচ্য পুস্তকটি সেই অভাব অনেক পরিমাণে দূর করবে। মূল পুস্তকের সঙ্গে পরিতোষ ঠাকুরের সম্পাদনায় "বৈদিক শব্দকোষ" সংযোজিত থাকার ফলে পাঠক-দের অনেক বেশি সুবিধা হয়েছে। মূল পুস্তকের মুখবন্ধে চারটি বেদেরই অনুবাদ একে একে প্রকাশ করা হবে—এ-কথা জানানো হয়েছে। উৎসাহী পাঠক-গণ সুতরাং পরবর্তী খণ্ডগুলির জন্য উদ্‌গ্রীব থাকবেন বলা যেতে পারে।
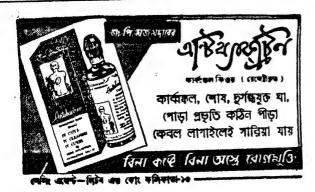
পত্রিকা

সমীক্ষা। সম্পাদক: রমেন আচার্য। জিওলজিক্যাল সার্ভে রিক্রিয়েশন ক্লাব: কলিকাতা-১৩।

জিওলজিক্যাল সার্ভে রিক্রিয়েশন ক্লাবের রজত-জয়ন্তী পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত এই স্মারক পত্রিকাটি রচনা ও আঙ্গিক সৌষ্ঠবে উল্লেখযোগ্য। লেখকসূচীতে অধিকাংশই অপরিচিত নাম থাকলেও গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, ভ্রমণ-কাহিনী বা রম্য রচনাদি বেশ একটা মান রক্ষা করেছে। সংখ্যাটি পাঠকসাধারণকে তুষ্ট করবে।

প্রাপ্তি স্বীকার

দুই নিশ্বাসের মোহনায়। সুধাংশু গুপ্ত। ভাবীকাল পাবলিশার্স: ১৬/সি বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা-১০। মূল্য ২·০০।

সাধারণভাবেই বিদেশ সফররত খেলোয়াড়রা শান্তি ও সখ্যতার বাণী বহন করে বেড়ান বলে তাদের বলা হয় অ্যাম্বাসাডার বা দেশদূত। খেলোয়াড় জীবনের গৌরবোজ্জ্বল লগ্নে যিনি ভারত সফর করার সুযোগ পাননি—ইংলণ্ডের সেই কীর্তিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় লেন হাটন ব্যবসা সম্পর্কীয় কাজে ভারতে এসে আমাদের অনেক ভাল কথা শুনিয়েছেন।

মাদ্রাজে ভারতের পরলোকগত ফাস্ট বোলার অমর সিং সম্বন্ধে বলেছেন, অমর সিং সর্বকালের মধ্যে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফাস্ট বোলার। মহম্মদ নিসার সম্পর্কেও হাটনের একই অভিমত। এবং বলেছেন, তখনকার দিনে ফাস্ট বোলিংয়ে অমর সিং নিসারের মত জুড়ি অন্য কোন দেশেই ছিল না। ভারতের বিনু মানকড়কে হাটন পৃথিবীর সেরা ৬ জন চৌকস খেলোয়াড়ের একজন বলে অভিহিত করেছেন। তার মতে অপর পাঁচজন হচ্ছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের গ্যারি সোবার্স, অস্ট্রেলিয়ার কিথ মিলার এবং ইংলণ্ডের ওয়াল্টার হ্যামণ্ড, উইলফ্রেড রোডস এবং ফ্র্যাঙ্ক উলি। হাটন ভারতের বিজয় মার্চেন্ট, বিজয় হাজারে, পতৌদি এবং ফারুক ইঞ্জিনিয়ারেরও প্রশংসা করেছেন। কলকাতায় এসে ইডেনের ক্রিকেট মাঠে দেখে বলেছেন, 'এই স্বর্গোদ্যান সম্পর্কে আমার যে কল্পনা ছিল বাস্তবের সঙ্গে সেই কল্পনার ছবি মিলে যাচ্ছে। লর্ডস প্রভৃতি পৃথিবীর যে কোন শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট মাঠের সঙ্গে ইডেনের তুলনা করা যেতে পারে।'

তবু হাটন ইডেনের যৌবন সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করেন নি। যখন ইডেন ছিল শ্যামলে সবুজ, সারি সারি বৃক্ষরাজির আড়ালে ছায়া সুনিবিড় আর কেয়ারি করা পুষ্পবক্ষে সুসজ্জিত।

সি এ বি'র রজতজয়ন্তী উপলক্ষে ইডেনে খেলার জন্য দেশবিদেশের জ্ঞানী-গুণী খেলোয়াড়দের সঙ্গে হাটনকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু পারি-বারিক অসুবিধার জন্য হাটন সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারেন নি। পারলে তখন হয়তো তাঁর মুখ থেকে আরও কিছু ভাল কথা শুনতে পেতাম।

কলকাতায় ক্রীড়া সাংবাদিকদের সঙ্গে হাটন ক্রিকেটের নানা বিষয় আলোচনা করেছেন। নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। ইংলণ্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক লেন হাটন এক সময় ব্যক্তিগত টেস্ট রানে (৩৬৪ নট আউট) বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী ছিলেন। তাঁর অধিনায়কত্বেই প্রায় দুই দশক পরে অস্ট্রেলিয়ার কাছ থেকে ইংলণ্ড 'অ্যাশেস' পুনরুদ্ধার করেছিল। ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসাবে এবং বিশ্বের অন্যতম কৃতী খেলোয়াড় হিসাবে যিনি ১৯টি সেঞ্চুরি সমেত টেস্ট খেলায় ৬৯৭১ রান করেছেন তাঁর ক্রিকেট প্রজ্ঞা সম্পর্কে সকলেই শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু দুঃখের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে, ক্রিকেট সম্পর্কে ধুরন্ধর খেলোয়াড় হাটনের দু'টি মন্তব্যের সঙ্গে আমরা একমত হতে পারছি না।

প্রথম, চিত্তাকর্ষক এবং প্রাণবন্ত খেলা সম্পর্কে। চিত্তাকর্ষক এবং প্রাণবন্ত ক্রিকেট থেকে সরে গিয়ে সব দেশের খেলোয়াড়রা আস্তে আস্তে নেতিমূলক ক্রিকেট খেলছেন, কেন এই প্রশ্নের উত্তরে হাটন বলেছেন, এখন ফলাফলের দিকে বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে, কিছুতেই হার স্বীকার করবো না এই মনোভাবই নেতিমূলক ক্রিকেটের জন্য দায়ী।

যদিও প্রশ্ন উঠতে পারে ফলাফলের জন্য কবে না গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তবু স্বীকার করি নেতিমূলক খেলার মূলে এই মনোভাবকে আংশিক দায়ী করা যেতে পারে। কিন্তু জয়পরাজয় মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত খেলা চললে নেতিমূলক খেলার অবসান ঘটবে বলে হাটন যে মন্তব্য করেছেন সেটা মেনে নিতে পারছি না। যদি পাঁচ দিন বা ছয় দিনের পরেও টেস্ট খেলাকে টেনে নিয়ে যেতে হয়—তবে ক্রিকেট কি আরও মন্থর হয়ে পড়বে না? অতীতে ইংলণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকায় যে টেস্ট খেলা ১০ দিন ধরে চলেছিল তাতে প্রাণবন্ত ক্রিকেটের পরিচয় মিলেছিল? না খেলার ফলাফল মীমাংসিত হয়েছিল? তা ছাড়া নেগেটিভ বোলিং নেতিমূলক ক্রিকেটের অন্যতম কারণ বলে হাটন যে মন্তব্য করেছেন, সে সম্পর্কেও আমরা সম্পূর্ণ একমত নই। শুধু বোলারের উপর দোষ চাপিয়ে লাভ নেই। নেতিমূলক ক্রিকেটের মূলে ব্যাটসম্যানের ক্রীড়াপদ্ধতিই বিশেষ-ভাবে দায়ী।

দ্বিতীয়, বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে খেলা সম্পর্কে হাটনের অভিমতের সঙ্গেও আমরা একমত হতে পারি নি। ক্রিকেট খেলার দৌলতে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে স্যার খেতাব প্রাপ্ত লিওনার্ড হাটন বলেছেন, ইংলণ্ডে বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকার সফর তিনি সমর্থন করেন। তাঁর মতে রাজনীতির প্রশ্ন ছেড়ে দিয়ে যদি শুধু ক্রিকেটের ভালর কথা চিন্তা করা যায়, তবে শক্তিশালী দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে খেলার ব্যবস্থা ক্রিকেটের উন্নতির সহায়ক।

প্রশ্ন করি, খেলার মধ্যে যারা রাজনীতিকে টেনে এনেছে, উৎকট বর্ণ-বিদ্বেষের বিষ মিশিয়ে খেলাধুলার আবহাওয়া যারা কলুষিত করেছে—কৃষ্ণকায় খেলোয়াড়দের ক্রীড়াঙ্গণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য যাদের সরকারী আইন তাদের ক্রীড়ানীতি কি রাজনীতি বিযুক্ত? রাজ-নৈতিক প্রশ্ন এড়ানো যাবে কিভাবে? আর ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ক্রিকেট খেললে ক্রিকেটের ভাল হবে বলে স্যার লেন হাটন যে মন্তব্য করেছেন, জিজ্ঞাসা করি, সে ভাল কাদের জন্য? শুধু কি শ্বেত সম্প্রদায়ের জন্য?

স্যার লিওনার্ডের স্মরণ রাখা উচিত উৎকট বর্ণবিদ্বেষের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকাকে বিশ্ব ক্রীড়ামঞ্চ থেকে বাদ দেবার জন্য বহু দেশে আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। এমন দিন বেশী দূরে নয় যেদিন কৃষ্ণকায় খেলোয়াড়দের পক্ষ থেকেও দাবী উঠবে, বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে যে সব শ্বেত দেশ খেলাধুলার সম্পর্ক বজায় রাখবে তাদের সঙ্গেও আমরা খেলাধুলা করব না।

একলব্য

ইডেনে ব্যাডমিনটনের জাতীয় আসর সম্পর্কে

এক কবিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ভাষার মধ্যে সুন্দরতম শব্দ কোনটি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কবি উত্তর দিয়েছিলেন 'স্মৃতি'। সত্যি, এত আনন্দ, এত বেদনা, একথায় এত গভীরতায় আধার অন্য দ্বিতীয় কোনও শব্দ ভাষায় আছে কি না বলা কঠিন। সেই স্মৃতির জগতকে আশ্চর্য-ভাবে নাড়া দিয়ে গেল—এবারের জাতীয় ব্যাডমিন্টনের শেষ দিনের শেষ অনুষ্ঠানটি। প্রবীণদের ডবলস্ ফাইনালে অংশগ্রহণ করার জন্য মাঠে এসে দাঁড়ালেন সুনীল বসু, গজানন হেমাড়ী, হরিপদ গুহ পঙ্কজ গুহ। মনে হ'ল ফিরে এলাম প্রায় পঁচিশ বছর আগে, বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় সেই বাংলা দেশ, সেই কলকাতা, সেই ১৯৪০

আর ১৯৫০ সালের মাঝামাঝি দিনগুলো। সুনীল বসু-হেমাডী তখন খ্যাতির শীর্ষে—হরিপদ, পঙ্কজ সবে উঠছেন। কলকাতার যে কোনও বড় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার শেষের দিকে দেখা যেত এ'দেরই। আরও ভাল লাগল একটি জিনিস। কে একজন আম্পায়ারিং করতে যাচ্ছিলেন তাঁকে সরিয়ে দিয়ে আম্পায়ারের আসনে ধীরে ধীরে এসে বসলেন—এ খেলার আম্পায়ার হিসাবে একমাত্র যাকেই মানায়—সেই মনোজ গুহ। খেলোয়াড় হিসাবে মনোজ গুহ চিরকালই শ্রদ্ধেয়—নতুন করে পরিচয় পেলাম তাঁর শিল্পবোধের—যেন একটি মাত্র তুলির আঁচড়ে তিনি ছবিটিতে পূর্ণতার পরশ এনে দিলেন। সত্যিই, সুনীল বসু আছেন, হেমাডী আছেন আর সেখানে মনোজ গুহ নেই, এ কথা যেন ভাবাই যায় না। অস্বীকার করব না, আমার ভাল করে খেলা দেখা হয় নি—বার বার চোখের সামনে পুরনো দিনের ছবিই ভেসে উঠেছে।

বাংলাদেশের দর্শকরাও আর একবার প্রমাণ করলেন—খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব, পরিহাসপ্রিয়তা ও রসবোধে তাঁদের আসন কত উঁচুতে। তারা বাংলার খেলোয়াড়দের সব রকমে অনুপ্রাণিত করার চেণ্টা করেছেন—দীপু-রমেনের জন্যে স্বাভাবিকভাবেই আনন্দে আত্মহারা হয়েছেন—কিন্তু সেই সঙ্গে এও প্রমাণ করেছেন যে বহিরাগত খেলোয়াড়দের উৎসাহদানে, সত্যিকারের কুশলতার সমঝদারিতায়, তাঁদের কোনও কার্পণ্য নেই। এমন কি রমেন ও সুরেশ গোয়েলের খেলার সময় মনে হল অধিকাংশ দর্শক সুরেশেরই জয়লাভ চাইছেন—কারণ, একটি ঘটনায় তাদের মনে হয়েছে সুরেশের ওপর অবিচার হয়েছে কিংবা খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তির মাপকাঠিতে রমেন যেন যথেণ্ট নন। ডবলস্ ফাইনালে রমেন ৩।৪ বার র‍্যাকেট পরিবর্তন করেন। একজন পরিহাস করে বললেন—"এতক্ষণ দীপুর বল বদল ছিল, তার ওপর আবার রমেনের ব্যাট বদল শুরু হল—আর পারা যায় না।" আর একজন যোগ করলেন—"পারলে বোধ হয় ওরা প্লেয়ারও বদল করে আনে—ওদের সব ভাইরাই প্রায় সমান ভাল খেলে শুনেছি।"

নাটকের ছোঁওয়া লেগেছিল মহিলাদের সিংগলস ফাইনালে। উত্তর প্রদেশের দময়ন্তীর খেলার দাপট চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। শান্ত, নম্র, কমনীয়, মধুরভাষিণী—অন্য সব দিকে মেয়ে—এই মেয়েটিরই হাতে ব্যাডমিণ্টন ব্যাট পড়লে যেন সম্পূর্ণ অন্য একজন। হলফ করে বলতে পারি—তাঁর বিরুদ্ধে খেলতে বললে অনেক খ্যাতিমান পুরুষ খেলোয়াড়েরও হয়তো নানা অজুহাতে খেলা সম্ভব হয়ে উঠবে না। তিনি এ প্রতিযোগিতায় শ্রেণ্ঠ মহিলা খেলোয়াড় ছিলেন—এ সম্বন্ধে বোধ হয় তর্কের অবকাশ নেই। কিন্তু ফাইনালে তার বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্রের শোভা প্রাণপণ লড়েছিলেন। শেষ মুহূর্তে মনে হল দময়ন্তীকে তিনি যেন কিছুতেই জিততে দেবেন না। ইংরাজীতে যাকে বলা হয় "over my deadbody or never" এমন সময় একটি বিতর্কিত ঘটনায় খেলা শেষ হল—আম্পায়ার দময়ন্তীকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করলেন লাইনজজের পরামর্শে। আপাত দৃণ্টিতে সকলেরই মনে হ'ল শোভার ওপর অবিচার হ'ল। চোখ মুছতে মুছতে শোভা কোর্ট থেকে বেরিয়ে গেলেন। দময়ন্তী শেষ পয়েণ্টটি আবার খেলতে চাইলেন—কিন্তু রোরুদ্যমানা শোভা ততক্ষণ ড্রেসিং রুমে। দর্শকরা প্রথমে আম্পায়ার ও লাইনজজকে তাদের নিজস্ব ধরনে "শিরোপা" দিলেন। তারপর একটু করে যখন মহিলাদের ডবল্‌স্ ফাইনাল আরম্ভ হ'ল তখন দেখা গেল সকলেই শোভা ও মরিনের পক্ষে। দময়ন্তী ও কিলিনের সমর্থক খুঁজে পাওয়াই ভার। একজনকে জিগ্যেস করলাম—"এতক্ষণ তো আপনি দময়ন্তীর সাপোর্টার ছিলেন—কি হ'ল এখন?" বললেন—"তা ছিলাম, কিন্তু বাংলাদেশের মাটি থেকে তো কোনও মেয়েকে চোখের জল ফেলতে ফেলতে যেতে দেওয়া যায় না। শোভাকে আমরা হাসাবই।" শেষ পর্যন্ত সকলেরই মানরক্ষা হ'ল। ডাবল্‌স্ ফাইনালে জিতে শোভা হাসিমুখেই কোর্ট থেকে বিদায় নিলেন।

এ প্রতিযোগিতায় কেউ যদি জয়ী না হয়েও জয়ীর সম্মান লাভ করে থাকে সে হল বালকদের বিভাগে ফাইনালে পরাজিত মহীশূরের প্রকাশ। প্রতিপক্ষ দিল্লীর ধীলনের ক্রীড়াকুশলতা অনস্বীকার্য—কিন্তু দর্শকদের আপত্তি অন্যত্র—বালক বিভাগে তার খেলার অধিকার নিয়ে—আপাতদৃষ্টিতে সে অভিযোগ যুক্তিহীন নয় বলেই মনে হয়। তরুণ প্রকাশের খেলাও নিঃসন্দেহে পরম সম্ভাবনাপূর্ণ—অসম এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজয়ের পর দর্শকরা তাকেই নিয়ে গেলেন গ্যালারির কাছে—দাঁড়িয়ে উঠে দিলেন বীরের অভিনন্দন। আর যে জিতল তাকেই মনে হ'ল পরাজিতের মত—অনভিনন্দিত, অবহেলিত সে হারিয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে।

রেলওয়ে ও সার্ভিসেস দলের বিভিন্ন আন্ত-রাজ্য প্রতিযোগিতায় যোগদানের যৌক্তিকতা অনেকের কাছেই বোঝা কঠিন। যে প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের দলগত উৎকর্য বিচার করা—সেখানে রেলওয়ে বা সার্ভিসেস দলের জয় লাভের কি অর্থ করা হয় জানি না। ফাইনালে রেলওয়ে ও বাংলার খেলার দিন এক ভদ্রলোক অতি সংক্ষেপে এই কথাটাই বুঝিয়ে দিলেন। বাংলা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হল। চুপ করে বসে আছেন দেখে পরিহাস করে বললাম—"মন খারাপ করে কি করবেন? ওরা অনেক ভাল খেলে"। বললেন—"তা নয়। ভাবছি অন্য কথা। রেলওয়ের 'দীপু ঘোষ' এসে 'বাংলার যোল্পিকে' হারিয়ে দিয়ে গেল।"

সর্বজনপ্রিয় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের ব্যাডমিণ্টনে অনুরাগ সর্বজনবিদিত। প্রতিযোগিতার প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ দিনেই তাঁকে সস্ত্রীক সারাক্ষণ দেখা গেছে খেলার আঙিনায়। একবার দেখা গেল গতবারের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন সতীশ ভাটিয়া তাঁর পাশে বসে গভীর আলোচনায় মগ্ন। একজন বললেন "কি কথা হচ্ছে জানি না। সৌমিত্র ব্যাডমিণ্টনে নামলে সতীশের অসুবিধা হবে কি বলতে পারি না, তবে সতীশ সিনেমায় নামলে অন্যান্য নায়কেরা প্রমাদ গনতে পারেন।" প্রসংগত উল্লেখযোগ্য সতীশ ভাটিয়ার মত সুদর্শন, সুপুরুষ সত্যিই বিরল।

কলকাতায় ব্যাডমিণ্টনের এতবড় আসর বসল। তার মধ্যে মনে হল, সবই আছে, নেই শুধু একজন। সেই সুন্দর, সদাহাসামর উজ্জ্বল মুখ, সেই আশ্চর্য মধুর প্রাণ-খোলা কিংবা প্রাণছোঁয়া ব্যবহার, সেই সবকাজে সবআগে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে আসা ক্লান্তিহীন মানুষটিকে আর ব্যাডমিণ্টনের আসরে কোনওদিন দেখা যাবে না এ কথা বিশ্বাস করা সত্যিই কঠিন। উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ, তাঁরা ফাইনালের দিন রজনীগন্ধায় সৌরভমণ্ডিত করে একটিমাত্র ছবিই সকলের সম্মুখে রেখেছিলেন—সে ছবি গান্ধীজী, জওহরলাল বা বিধানচন্দ্রের নয়—নয় ইন্দিরা, অজয় মুখার্জি কিংবা ব্যাডমিণ্টন অ্যাসোসিয়েশনের কোনও প্রাক্তন বা বর্তমান সভাপতিরও। সে ছবি অতীতের ৪ বছরের বেংগল চ্যাম্পিয়ন এবং এক সময়ে ভারতের ৪ নম্বর খেলোয়াড়—প্রণব বসুর। তাঁর সতীর্থরা, তাঁর বন্ধুরা, তাঁর কথা বার বার করে স্মরণ করবেন—এর মধ্যে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই—কিন্তু অবাক হলাম সাধারণ দর্শকের গ্যালারিতে কতবার কত লোক শ্রদ্ধায়, স্নেহে তাঁর নাম করলেন। জানি না এত লোক কি ভাবে প্রণব বসুর সংস্পর্শে এসেছিলেন—কিংবা হৃদয়ের সৌরভ বোধ হয় ফুলের সৌরভের মত আপনিই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের অবিশ্বাসী মনে মৃত্যুর পরপারে আর কিছু আছে বলে কিছুতেই নিঃসংশয় হতে পারি না—তবু এক-একসময় কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় যেন কিছু থাকে। তাহলে প্রণব বসু নিশ্চয় জানতে পারবেন—ভালবাসার আসনে তাঁর চিরদিনের প্রতিষ্ঠা রইল, অন্তত বাংলাদেশের ব্যাডমিণ্টনের জগত তাঁকে কোনওদিনও ভুলে যাবে না।

প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়

কৃতীর ক্রীড়া ভূমিকা

রাজা মহারাজা নবাব বাদশাহের দানে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রিটিশ ভারতে যেমন শিক্ষাদীক্ষা, সাহিত্য, কৃষ্টি এবং ললিতকলার প্রসার প্রচার হয়েছে, তেমন খেলাধূলোরও প্রসার প্রচারে ও'দের অবদান অনস্বীকার্য।

বরোদা, বিকানীর, বিজয়নগর, জয়পুর, জামনগর, ইন্দোর, পাতিয়ালা পতাউদি, ভূপাল, কুচবিহার প্রভৃতি দেশীয় রাজ্য এ ব্যাপারে যেমন অগ্রণী, তেমন অগ্রণী নাটোর সন্তোষ ময়মনসিংহের রাজপরিবার। তবে ঘরোয়ানা আলাদা। পাতিয়ালা, নাটোর, কুচবিহার প্রভৃতি যদি ক্রিকেটের ঘরোয়ানা হয়, জয়পুর ঘরোয়ানা পোলোর, বিকানীর বর্তমানে রাইফেল সুটিংয়ের। ফুটবলে তাজহাটের অতীত ঐতিহ্য আজ বিস্মৃতির কোলে। কিন্তু ফুটবল ও ক্রিকেটের দ্বৈত অবদানে ময়মনসিংহ ও কুচবিহারের স্মৃতি আজো উজ্জ্বল।

ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্যের পৌত্র এবং মহারাজা শশীকান্ত আচার্যের পুত্র অ্যাডভোকেট জেনারেল স্নেহাংশুকান্ত আচার্য নিজের খেলাধূলোর কথার সঙ্গে সেই স্মৃতিকথাও সেদিন বলছিলেন ও'র চেম্বারে বসে। বলছিলেন ও'র ঠাকুরদার নামাঙ্কিত সূর্যকান্ত শীল্ডের কথা, যার নামে উৎসর্গ ছোটদের ফুটবল প্রতিযোগিতা মহারাণী লীলা দেবী শীল্ড খেলার কথা। আরও কত স্মৃতি। রামজী, জগন্নাথ মেটা, ডাঃ গুহ্ঠাকুরতা, কোলা, ফ্রাঙ্ক টেরান্ট, হারান ভট্টাচার্য, অজিতবাব ঘোষ, হেমাঙ্গ বসু প্রভৃতির ক্রিকেট ও ফুটবল খেলার সে সব কাহিনী ভারতীয় ক্রীড়া ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়।

সূর্যকান্ত শীল্ড আকারে যেমন ভারতের সর্ববৃহৎ ট্রফি তেমন আভিজাত্যে ও প্রতিযোগিতার আয়োজনে ছিল রাজকীয় সমারোহ। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, এরিয়ান প্রভৃতি যেসব নামকরা এবং নাম-না-করা দল খেলতে যেত তাদের খেলোয়াড়রা রাজার গেস্ট-এর মর্যাদা পেতেন। বিজয়ীর পুরস্কারের সঙ্গে দেওয়া হত ১১টি স্বর্ণপদক, বিজিতের পুরস্কারের সঙ্গে ১১টি রৌপ্য পদক। এখনকার মত গিল্টি করা সোনা রুপো নয়, সত্যিকারের সোনা রুপোর মেডেল। মহারাণী লীলা দেবী শীল্ডেও একই ব্যবস্থা।

শুধু দেশের নামডাকের দল বা নামকরা খেলোয়াড়দের সমাবেশ কিংবা খেলাধূলোর আয়োজনের জাঁকজমকই নয়—আচার্য পরিবারের ভূমিকা ছিল 'আপনি আচারি ধর্ম পরেরে শেখাও'-এর মত। মহারাজা এবং রাজকুমাররাও মাঠে নেমেছেন। খেলাধূলোয় কৃতী হয়েছেন।

ময়মনসিংহের পাণ্ডিতপাড়া ক্লাবে স্নেহাংশুকান্ত আচার্যের খেলাধূলোর সূচনা হলেও রাজায় রাজায় যুদ্ধের মত যখন খেলা হয়েছে নাটোর কুচবিহার বা সন্তোষের সঙ্গে তখন খেলেছেন মহারাজা শশীকান্ত আচার্যের নিজস্ব টিম এশিয়াটিক ইউনাইটেডে। কিন্তু সর্ববিদ্যাবিশারদ ক্রীড়াবিদ হিসাবে ও'র প্রতিষ্ঠা প্রথমে স্কটিশ চার্চ কলেজে, পরে টাউন ক্লাবে।

অ্যাডভোকেট জেনারেল স্নেহাংশুকান্ত আচার্যের ক্রীড়াজীবনের ছবি

কনস্টিটিউশন, কোম্পানী অ্যাক্ট, সেবার কোড, লেটার্স অন ডিভোর্স প্রভৃতি রাশি রাশি মোটা আইনের বইয়ের মধ্যে অ্যাডভোকেট-জেনারেল শ্রীআচার্যের অতীত জীবনের অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে। জনহিতকর কাজে রাজপরিবারের দান-ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ক্রীড়াঙ্গন থেকে আহরিত চার-পাঁচ শ'র মত পুরস্কারও দান করে দিয়েছেন ছোট ছোট ক্লাবে। ক্রীড়াজীবনের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে আছে কিছু প্রশংসাপত্র। অপরের কাছে যার মূল্য নেই।

একখানা প্রশংসাপত্রে দেখছি স্কটিশ চার্চ কলেজের খেলাধূলোর ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক মার্কাস ডিগ্রের স্বাক্ষর। তারিখ ৪-৭-৩৬। কেম্ব্রিজ ব্লু মার্কাস ডিগ্রে লিখছেন : গত ৪ বছর ধরে আমি স্নেহাংশুকান্ত আচার্যকে জানি, সে ৪ বছর ধরেই কলেজের খেলাধূলোয় উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের অধিকারী, চার বছরই ক্রিকেট খেলেছে। ১৯৩৪-৩৫ সালে হয়েছে ক্রিকেট ক্যাপ্টেন। কলেজে টেনিস খেলেছে দু'বছর। ১৯৩৪-৩৫-এ সিঙ্গলস ও ডাবলস জয়ের সুবাদে টেনিসের শিরমুকুট পেয়েছে। পরের বছর পেয়েছে শুধু ডাবলসে জয়ের সম্মান।' ওই বছর তাকে অধিনায়কের দায়িত্বও বহন করতে হয়েছে। ১৯৩৪-৩৫ এবং ৩৫-৩৬-এ স্নেহাংশুকান্ত অ্যাথলেটিক সোসাইটির সেক্রেটারী ছিল। সে ফুটবল খেলেছে, হকি খেলেছে, অ্যাথলেটিকসে কৃতিত্ব দেখিয়েছে। কলেজের বেস্ট অলরাউনডার হিসাবে ১৯৩৫-এ পেয়েছে হেক্টর মেমোরিয়াল শীল্ড।

মার্কাস ডিগ্রের প্রশংসাপত্র থেকেই বোঝা যায় কলেজ জীবনে স্নেহাংশুকান্ত খেলাধূলোয় কতখানি দক্ষ ছিলেন। পরে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়ে বিলেতেও টেনিস খেলেছেন, ফুটবল খেলেছেন। ফুটবলে প্রতিনিধিত্ব করেছেন ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের। ওখানে বক্সিংও করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় চ্যাম্পিয়নশিপে। যার ফলে মুখ ও'র ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। ক্ষতস্থান জুড়তে হয়েছিল ২২টি স্টিচ করে। শ্রীআচার্য গলফ্ খেলাতেও বেশ কিছুটা সুনাম কিনেছিলেন। অ্যাথলেটিকসে ইভেন্ট ছিল : সট পাট, ডিসকাস, জ্যাভলিন আর ৮৮০ গজ দৌড়।

তবে টাউন ক্লাবেই ও'র খেলোয়াড়-জীবনে মধ্যগগনের দীপ্তি, যেখানে মহারাজা শশীকান্ত অধিনায়ক, স্নেহাংশুকান্ত চৌকস খেলোয়াড়। পুরনো স্কোর বইয়ে ও'র নামের পাশে অনেক সেঞ্চুরি আছে। এমন কি ইডেন গার্ডেনে দুর্ধর্ষ ক্যালকাটার সঙ্গে খেলাতেও একাধিক। বোলিংয়ে আছে কোন কোন ইনিংসে ৬।৭টি উইকেট দখলের কৃতিত্ব।

রাজার ছেলে স্নেহাংশুকান্তর নীতি চিরদিনই বাম ঘেঁষা। ফুটবলে লেফট্-ব্যাকে খেলতেন। ক্রিকেটে বেশী বল মারতেন বাঁদিকে। এই বামঘেঁষা নীতি রূপায়িত করতে চেয়েছেন আই এফ এ-র সিংহাসনে বসেও। ঐতিহ্য ভেঙ্গে ইডেনে ফুটবলের আসর বসিয়েছেন। চিরবঞ্চিতদের সুযোগ সুবিধা দিতে চেয়েছেন। দিতে পারেননি বলেই সরে দাঁড়িয়েছেন। কিংবা বলা যায় তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু খেলাধূলোর সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হয়নি। খেলার ডাকে সদাই তাঁর সাড়া মেলে। এখন স্পোর্টস কাউন্সিল এবং স্টেডিয়াম কমিটির সদস্য অতীত দিনের খেলোয়াড় এবং পরম ক্রীড়ানুরাগী অ্যাডভোকেট জেনারেল স্নেহাংশুকান্ত আচার্য।

মুকুল

॥ চিত্র-সমালোচনা ॥

শাস্তি

(ছায়ালিপি ফিল্মস)

শাস্তি : গীতা দে/সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ফিল্ম তৈরি করতে গিয়ে পরিচালকরা সাধারণত কী অসুবিধা বোধ করেন তা বোঝা যায়। ছোট গল্পকে বড় করাটাই হয়ে ওঠে আসল সমস্যা। যদিও রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের সুন্দর বাংলা ছবি এর আগে হয়েছে, তবু অনেকের ক্ষেত্রে বুঝি একটি গল্পের একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি তৈরির ফ্যাসাদ থেকেই যায়। "শাস্তি"র কথাই ধরা যাক। কঠোর নিয়তির অমোঘ ক্রিয়ার পটভূমিতে লেখা এই পারিবারিক গল্প। এতে ভয়ানক রসের ছায়া আছে, নাট্যগুণও এর প্রচণ্ড। ছোট বউ চন্দরার ফাঁসি হয় খুনের দায়ে। যেচে খুনের দায় নিয়েছে চন্দরা, শাস্তি পেয়ে শাস্তি দিয়ে গেছে স্বামী ছিদামকে ও ভাসুর দুঃখীরামকে। বড় বউ রাধা খুন হয়েছিল তার স্বামীরই হাতে সারা দিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর বাড়িতে এসে ভাত চেয়ে যখন বউয়ের গঞ্জনা সইতে হল দুঃখীরামকে, তখন খুন চেপে গিয়েছিল তার মাথায়, ধারালো দা হাতে নিয়ে সেটা বসিয়ে দিল স্ত্রীর মাথায়।

নিরন্ন কৃষক পরিবারের নিদারুণ ট্র্যাজেডির গল্প "শাস্তি", আবার জটিল মনস্তত্ত্বেরও বটে। সাঙ্ঘাতিক বিপদের মুহূর্তে অস্থির ছিদামের মুখ থেকে ফসকে বেরিয়ে যায় ওই যে কথা—বউ গেলে বউ পাওয়া যায়, ভাই গেলে ভাই পাওয়া যায় না—তাই বুঝি তীব্রভাবে বেজেছিল চন্দরার বুকে। সর্বনাশা অভিমানেই বুঝি চন্দরা অনবরত বলে, আমিই খুন করেছি। ফাঁসির আগে স্বামী দেখা করতে চাইলে চন্দরা শুধু বলে, 'মরণ'। ছবিতে গল্পের শেষ কিন্তু অন্যরকম। নাটকের রস ঢালা হয়েছে একটু বেশী। ভাসুরের কান্নায় এবং চন্দরা ও ছিদামের শেষ দেখায়। দুঃখীরামই যে শাস্তি পেল তাও সে জানিয়ে দিয়েছে। চন্দরা ও ছিদামের কথাবার্তায় অন্তরের হাহাকার ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে। অর্থাৎ যা মূল গল্পে অস্পষ্ট, ছবিতে তা বেশ স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। সিনেমায় এই নাটক সৃষ্টির স্বাধীনতা মোটেই দোষের নয়। বরঞ্চ পরিচালক স্বদেশ সরকারকে সাধুবাদ দেব এই কারণে যে, নাট্যরস তিনি খুব পরিচ্ছন্ন-ভাবেই ছবিতে পরিবেশন করেছেন। দর্শক ওই নাটকীয় মুহূর্তে স্তব্ধ।

গল্পটি, বলা বাহুল্য, ছবিতে বাড়ানো হয়েছে। গ্রামের পরিবেশ এবং ছবির নানা ঘটনা-বিন্যাসে লিরিক্যাল মেজাজ ফোটাবার চেষ্টা, এসথেটিক রসের কথাও পরিচালক বিস্মৃত হননি—টপের আসর এবং মধুর রসের টুকরো টুকরো গানেই তার প্রমাণ! আসল গল্পের মেজাজ কিন্তু কঠিন বাস্তব ও মনস্তত্ত্বের এবং এইখানেই আসল গল্পের মূল রসের সঙ্গে বিরোধ। ছবির স্বাদও তাই দুই পর্বে ভিন্ন, তবে শেষের সেই ভয়ঙ্করের নাটকের প্রস্তুতি চিত্রনাট্যে বিশ্বাসযোগ্যভাবেই দেখানো হয়েছে। ছবিতে ঘটনা বাড়াবার তাগিদে পরিচালক জমিদারের বিলাসভোগ এবং গরীবের দুঃখ-বরণের বিপরীত চিত্রগুলি বিশেষরূপে এবং বেশি পরিমাণে দেখাতে চেয়েছেন। ক্ষুধার্ত ছিদামের চোখে জমিদারের ঘরে ভূরিভোজনও দেখানো হয়েছে। যে বর্ষা নি। কৃষককুলে আতঙ্ক, সেই বর্ষা নিয়ে জমিদারের সামনে বাঈজির রসের গান গাওয়ার ব্যঞ্জনাটি পর পর দৃশ্যে সুপরি-কল্পনার সঙ্গে দেখানো হয়েছে। তবে জমিদারের ব্যাপারগুলি গল্পে পাশাপাশি রেখে চিত্রনাট্য বিস্তারের সুযোগ হয়েছে সত্য, কিন্তু ধনী-নির্ধনের ভিন্নমুখী জীবনধারা-আশ্রিত সামাজিক বক্তব্য একালে বাহবা পেলেও রবীন্দ্রনাথের "শাস্তি" গল্পে যেন তার অনধিকার প্রবেশ।

সে যাই হোক, তথাকথিত তারকা-বর্জিত "শাস্তি" চিত্রটি একটি দুঃসাহসিক প্রয়াস, এই সৎ প্রচেষ্টার জন্য প্রযোজক ও পরিচালক ধন্যবাদ নিশ্চয়ই পাবেন। তাছাড়া, গ্রামের সুন্দর পটভূমিতে একটি নতুন স্বাদের ছবি এই "শাস্তি"। আউট-ডোর দৃশ্যগুলি চমৎকার, ভিস্যুয়াল সৌন্দর্য এ ছবিতে প্রচুর। এবং তা দেখানো বিশেষ করে সম্ভব হয়েছে মণীশ দাশগুপ্তের প্রশংসনীয় ক্যামেরার কাজের জন্য। বৃষ্টির দৃশ্যগুলি তোলার কাজে তিনি খুবই দক্ষতা দেখিয়েছেন।

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় হয়েছেন চন্দরা। কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও দিলীপ রায় যথা-ক্রমে বড় ভাই ও ছোট ভাই। অতএব অভিনয় যে ছবির বিশেষ সম্পদ তা বলাই বাহুল্য। চন্দরাকে অবশ্য পরিচালক রবীন্দ্রনাথের মৃন্ময়ীর মত উপস্থিত করেছেন। গল্পের চন্দরা অন্যরকম। সে যাই হোক, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় এতে অভিনয়ের সুযোগও পেয়েছেন, অভিনয়ের নৈপুণ্যও দেখিয়েছেন। ছবিতে কোন কোন মুহূর্তে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের অভিব্যক্তি ভোলা যায় না। কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ও অসামান্য। চরিত্র-চিত্রণে ও কথাবার্তায় সফিসটি-কেশনের বিন্দুমাত্র লক্ষণ নেই। চরিত্রটি যেমন, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ও তেমন। দিলীপ রায়ের অভিনয়ও তেমনি উঁচু-দরের, আগাগোড়াই স্বচ্ছন্দ ও উঁচুদরের।

হিন্দীচিত্র "প্রেম পূজারী"/ওয়াহীদা রেহমান, দেব আনন্দ

অবস্থা তেমন কিছু সচ্ছল নয়। ছবির এই ভিলেনটি পরে হাত মিলিয়েছে শেখরের দাদার (রহমান) শাশুড়ীর (ললিতা পাওয়ার) সঙ্গে। শাশুড়ী দামাদজীর বাড়িতেই ছোট মেয়েকে নিয়ে থাকেন। শেখরের সঙ্গে মেয়েকে বিয়ে দেবার জন্যই তাঁর যত ভিলেনি। এই শয়তানিও মাত্রাহীন।

অবাস্তব অনেক ঘটনারই সমাবেশ ছবিতে। মিথ্যার ভিত্তিতেও কেমন জমানো চলে, এমন কী কখনও-সখনও দর্শকের চোখও ভিজিয়ে দেওয়া যায় তারই সফল প্রমাণ দেখিয়েছেন পরিচালক ভি মধুসূদন রাও। লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলালের দেওয়া সুন্দর সুরের গান সমেত এই ছবিতে সাধারণ হিন্দী চিত্রের প্রায় সব আমোদ-উপকরণই আছে। নূতন, সঞ্জীবকুমার এবং রেহমানের অভিনয়ও ভাল।

অন্যান্য ভূমিকার মধ্যে তেমন অভিনয়-কুশলতার পরিচয় না থাকলেও গীতা দে-র রাধা মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য। চরিত্রটির দজ্জাল রূপে তিনি ভালই দেখিয়েছেন। অন্য কয়েকটি ভূমিকায় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, রসরাজ চক্রবর্তী সুঅভিনয় করেছেন।

গান ছবির একটি বড় আকর্ষণ। সংগীত-পরিচালক পবিত্র চট্টোপাধ্যায় গানের সুররচনায় রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। গ্রামীন সংস্কৃতির পরিচয় গানের সুরে প্রকাশ পেয়েছে, গান শুনতেও ভাল লেগেছে খুব। বাঈজির মুখের গানগুলি (সিপ্রা বসুর কণ্ঠে) তো চমৎকার। আবহসংগীত ও বিভিন্ন ঘটনার মর্মানুসারী।

দেবী

(ভেনাস পিকচার্স)

নায়িকার নাম দেবী খুব ভেবেচিন্তেই রাখা হয়েছে। দেবী (নূতন) ভারতীয় নারীর আদর্শ। দেবীপুত্রের দীপক নামও নিরর্থক নয়। ডাঃ শেখরের জীবনের (সঞ্জীবকুমার) আঁধেরা দূর করে দিয়েছে দীপক। ছেলেটিকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রতি অদ্ভুত মায়া পড়ে যায় শেখরের। শেখর জানে না, দীপক তারই ছেলে। সীতা নির্বাসন কিংবা লব অথবা কুশের কথা স্মরণ করুন। দক্ষিণ ভারতের সামাজিক হিন্দী চিত্রে রামায়ণী কথার ছাঁচটি হামেশাই মেলে। নূতন অর্থাৎ দেবী মিথ্যা কলঙ্কের ভাগী হয়ে স্বামিগৃহ থেকে নির্বাসিতা। বলা বাহুল্য, নির্বাসনের পরেই সে জননী হয়েছে। সম্ভবত ইতিমধ্যে পাঁচ-ছয় বছর কেটে গিয়েছে—দীপকের বয়স পাঁচ-ছয় মনে হয়। স্বামিত্যক্তা দেবীর বাস যেখানে ওই অঞ্চলেই তার ডাক্তার স্বামী চেম্বার খুলেছে; কিন্তু তাদের কেউ জানে না যে, ওরা এত কাছাকাছি। দীপকের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও (যে সারাক্ষণ ডাক্তারের বাড়িতেই থাকে এবং ডাক্তারের পয়সাতেই স্কুলে পড়ে) ডাক্তার জানে না, সে দেবীরই ছেলে। দেবীকে যে সে ভুল বুঝেছিল সেটা জানবার পর শেখর তাকে তন্নতন্ন করে খুঁজেছে। পরে জেনেছে, দেবী ও তার ছেলে বেঁচে নেই। শেখর জেনেছে, মেটারনিটি হাউস পুড়ে ছাই হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দেবী ও তার ছেলে আগুনে পুড়ে মারা গেছে। আগুন লাগার পর দেবী কী করে ছেলেকে নিয়ে বাঁচল, দেবীকে বাঁচাতে গিয়ে আর একজন কী করে মরল ইত্যাদি ঘটনা মেটারনিটি হাউসের আর কেউ দেখেনি।

আসলে যুক্তি দিয়ে মেনে নেওয়া যায় না কোন ঘটনাই। যে ভিলেনটি দিনের পর দিন দেবীর মাকে ব্ল্যাকমেল করেছে ("উত্তরফাল্গুনী" বা "মমতা" হিন্দী ছবির খলচরিত্রের মত) সে-ই বা এমন নির্বিঘ্নে কীভাবে শয়তানি করে গেল তাও তাজ্জব ব্যাপার। যাকে ব্ল্যাকমেল করা হয় তার অতীতের কোন ভুল বা বোকামির জের থাকে, এ ক্ষেত্রে তার কিছুই নেই, শুধুই ফটোগ্রাফির কারসাজি। তা ছাড়া ভিলেনরা এমন ব্যক্তিকেই ব্ল্যাকমেল করে যার টাকা-পয়সা আছে। দেবীর বাড়ির

টীকা-টিপ্পনী

চলচ্চিত্রের জাতীয় পুরস্কার প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পীর স্বীকৃতি পেয়েছেন মান্না দে, এ খবর আজ আর কারো অজানা নেই। অজানা আছে যে কথা তা রীতিমত বিস্ময়কর। শুনে অবাক হলাম, মান্না দে-র এই সর্বভারতীয় স্বীকৃতিতে কেউ কেউ নাকি অখুশী হয়েছেন। কারণ? অবশ্যই 'জেলাসি' বা ঈর্ষা। গুজবে প্রকাশ, বম্বের একাধিক জনপ্রিয় গায়ক নাকি এই পুরস্কারটি পাওয়ার জন্যে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করেছেন। দিল্লিতে লবিইং হয়েছে খুব। জাতীয় পুরস্কার কমিটিকে ধন্যবাদ, এ সবে কোন ফল হয়নি। এ বছর যোগ্য ব্যক্তিকেই ও'রা শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিয়েছেন।

মান্না দে-র সংগীত সাধনার বয়স আজ আঠাশ বছর। ১৯৪২ সালে উনি ও'র কাকা 'কৃষ্ণচন্দ্র দে-র হাত ধরে বোম্বাইয়ে পাড়ি দেন। তখন থেকেই কাকার সহকারীরূপে ছায়াছবির সংগীত পরিচালনার সঙ্গে সংশিল্পষ্ট। মান্নাবাবুর প্রথম সংগীত-শিক্ষাগুরু ও'র এই কাকাই। তাঁরই প্রেরণাতে শেষ পর্যন্ত স্কটিশ চার্চ কলেজের গ্র্যাজুয়েট মান্না দে ল' পড়তে বিলেত না গিয়ে গান করতে বম্বে চলে আসেন। ও'র প্লে-ব্যাক করা প্রথম বাংলা ছবি ভি শান্তারামের "অমর ভূপালী" (১৯৫২)। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বম্বেতে গৃহীত এই ছবিতেই লতা মুঙ্গেশকারও জীবনে প্রথম বাংলা গান করেন। একই বছরে হিন্দী "মশাল" (পরিচালনাঃ

নীতীন বসু) ছবিতে মান্না দে-র গাওয়া দুটি গান "উপর গগন বিশাল" ও "দুনিয়াকে লোগো" লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। তখন থেকেই উনি জনপ্রিয়।

দিল্লি থেকে অ্যাওয়ার্ড নিয়ে গত সপ্তাহে মান্নাবাবু কলকাতায় এসেছেন। ও'র মদন ঘোষ লেনের বাড়িতে দেখা করতে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি, ভরদুপুরে বাড়িতে বসে গানের রিহার্সেল করছেন। কী একটা বাংলা ছবির গানের টেকিং আছে কালই, বললেন সে কথা আমি পুরস্কারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম। স্মিত হেসে মান্নাবাবু বললেন, "মন্দ কি, বেশ এনকারেজিং।"
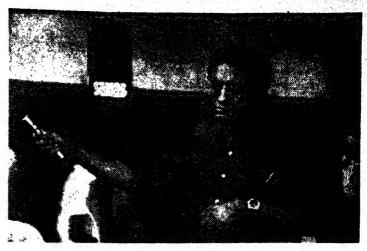
মদন ঘোষ লেনের অনেক স্মৃতি বিজড়িত পুরনো বাড়িটাতে বসে আমাদের মধ্যে অনেক কথা হল। কথায় কথায় মান্নাবাবু সেই পুরনো দিনে ফিরে গেলেন। বললেন, "এই ঘরটাতেই তানপুরা নিয়ে বসতেন কাকা। আসতেন আলাউদ্দিন খাঁ, কেরামতুল্লা খাঁ, বাদল খাঁ, জমিরুদ্দিন খাঁ, আবদুল হুসেন খাঁ, বিলায়েত খাঁ, দাবির খাঁ প্রমুখ সঙ্গীত দিশারীর দল। খেয়াল, ঠুংরী, ভজন, কীর্তন আর ধ্রুপদের তালে তালে মুখর হয়ে উঠত এ ঘরের চার দেয়াল। অবাক হয়ে শুনতাম। আমার গানের প্রেরণা আসতো এখান থেকেই।" মান্নাবাবু বলছিলেন, আর বার বার আমার মনে হচ্ছিল,

কলকাতার পথে, রেস্তোরাঁয়, সিনেমা হাউসে ও নানা জায়গায় সত্যজিৎ রায়ের নতুন ছবি "প্রতিদ্বন্দ্বী"-র শুটিং গত সপ্তাহে আরম্ভ হয়েছে—উপরে দেখা যাচ্ছে শ্রীরায় কাঁধে টেপরেকর্ডার ঝুলিয়ে "ডায়ালগ" রেকর্ড করছেন। ফটো-দেশ

(বাঁয়ে) প্রতিদ্বন্দ্বী-তে এই হিপিকে দেখা যাবে—দৃশ্যগুলি তোলা হয় নিউ মার্কেটে (ডাইনে) ফুটপাথে বসে শ্রীরায় শট নিচ্ছেন।
ফটো-দেশ

এক অবিস্মরণীয় সঙ্গীতসাধনা, আর আনন্দবেদনার নানা স্মৃতিরাশি বুঝি স্তব্ধ হয়ে আছে মদন ঘোষ লেনের এই পুরনো বাড়িটার মধ্যে। আজ আর অন্ধ সঙ্গীত-সাধক কৃষ্ণচন্দ্র দে বেঁচে নেই। ঘরটি অবশ্য তেমনি আছে। দেয়ালে ঝুলছে তাঁর দশ-বারো সাইজের ফ্রেমে-আঁটা পুরনো ছবি। তানপুরোটার তারগুলোতে ধুলো পড়েছে কিনা লক্ষ্য করিনি, তবে হারমোনিয়াম ও খোলটি বেশ ঝকঝকেই আছে।

—বিচক্ষ

"রাজযোটক" নাটকাভিনয়

গত ৭ ফেব্রুয়ারি কোম্পানি ল অ্যা ড মি নি স্ট্রে শ ন অ্যাসোসিয়েশন-এর বাৎসরিক উৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীপ্রশান্তকুমার মল্লিক এবং প্রধান অতিথি ছিলেন হাই-কোর্টের অফিসিয়াল লিক্যুইডেটর শ্রীজ্যোতিপ্রকাশ মুখোপাধ্যায়। এই উপলক্ষে অ্যাসোসিয়েশনের স ভ্য বৃ ন্দ কর্তৃক "রাজযোটক" নাটকটি অভিনীত হয়। অভিনয়ে প্রজ্ঞানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় (সদানন্দ) ও শ্রীমতী কনক রায় (বিন্দু) বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। সংগীতানুষ্ঠানে যোগ দেন গৌর ঘোষাল, প্রভাময় মুখোপাধ্যায়, নিশীথ সাধু, অনুপ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

বোম্বাই বিচিত্রা

'ফিল্ম কি?' এই প্রশ্নের উত্তর ভিন্ন থেকে ভিন্নতর হয় পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে। ফিল্ম শিল্প, না ফিল্ম বাণিজ্য, বা ফিল্ম 'বাণিজ্য-শিল্প', অথবা 'শিল্প-বাণিজ্য' এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর এখনো পর্যন্ত কার্যক্ষেত্রে পাওয়া যায় নি। আলোচনার ক্ষেত্র বিস্তারিত করে লাভ নেই, তাই দেশী ফিল্ম নির্মাণের কষ্টিপাথরে ফিল্মের সংজ্ঞা নির্ধারণের চেষ্টা করা যাক। পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন যে, হঠাৎ এ প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন কী? উত্তরে নিশ্চয়ই বলব যে, 'প্রয়োজন আছে'; নইলে আলোচনার মূলেই অবান্তর হয়ে যাবে। আমাদের দেশে 'শিল্প' এবং 'বাণিজ্য' ছাড়াও ফিল্মের অন্য সংজ্ঞা আছে। ফিল্ম নির্মাণের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ফিল্ম বানানোর সময় নির্মাতারা যে দৃষ্টিকোণ থেকে চিত্রনির্মাণ করেন, হিন্দীচিত্র নির্মাণের সময় তাঁদের সে দৃষ্টিকোণ থাকে না। অজুহাত দর্শক। বাংলা ফিল্ম, মারাঠী ফিল্ম, তামিল ফিল্ম অহরহ হিন্দী চিত্রে রূপান্তরিত হচ্ছে। এবং এইসব আঞ্চলিক চিত্র হিন্দী চিত্রে রূপায়িত হবার সময় তার কলেবর পরিবর্তিত হচ্ছে বিশদভাবে। অর্থাৎ বাংলা ফিল্ম-এর সংজ্ঞা এক, হিন্দী ফিল্ম-এর অন্য। বাংলা ফিল্ম-এর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন গল্প, অভিনয় এবং নির্মাণ-সারল্য; আর হিন্দী ফিল্মের বেলায় সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন গ্ল্যামার, তারপর হিন্দী ফিল্মের পর্দা যথেষ্ট পরিমাণে তারকা-খচিত হওয়া দরকার, সঙ্গে থাকা দরকার যথেষ্ট পরিমাণ নৃত্যগীত। গল্প যেমন-তেমন হলেও কোন আপত্তি নেই, সিচুয়েশন-এ নতুনত্ব অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, নায়ক/নায়িকার প্রথম সাক্ষাৎ হিন্দী চিত্রের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তারপর যা কিছু সেটা পুরোনো মদ, নতুন বোতলের গল্প। সংবাদ অর্থাৎ 'ডায়লগ', হিন্দী চলচ্চিত্রের অভিধানে হাজারখানেক কথা আছে তারই হেরফেরে (পারমুটেশন / কমবিনেশন) হিন্দী চিত্রের কথোপকথন। আঞ্চলিক চিত্রে গল্পের গতি নির্ধারিত হয় যুক্তি এবং বাস্তবতার ভিত্তিতে, হিন্দী চিত্রে গল্পের গতি নির্ধারণ করে 'চমক এবং ঝলক'। আঞ্চলিক চিত্রে সাহিত্য বা নাটকের কমা, ছেদ থাকে, থাকে প্যারাগ্রাফ, পরিচ্ছেদ। কিন্তু হিন্দী ফিল্মের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী ব্যবহার হয় হাইফেন। কখনো তা নৃত্যগীতের মাধ্যমে, কখনো হাস্যকৌতুকের সাহায্যে, আবার কখনো খলনায়কের সৌজন্যে।

"গুপী গাইন বাঘা বাইন" ছবির প্রযোজক অসীম দত্ত দিল্লিতে জাতীয় পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরির হাত থেকে বছরের শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চিত্রের পুরস্কার নিচ্ছেন

বর্তমানে হিন্দী ফিল্ম তিন চিত্রজগৎ দ্বারা প্রভাবিত। কেবলমাত্র গ্ল্যামার ফিল্মকে প্রভাবিত করেছে হলিউড। সেখানে শোম্যানশিপ, জাঁকজমক, দ্রুতগতি এবং মূল্যবান নামের সমাবেশ। দ্বিতীয় প্রভাব হল মাদ্রাজের। অধিকাংশ মাদ্রাজী-হিন্দী চিত্র প্রথম বাংলা গল্প থেকে তামিল-তেলেগুর রাজ্য জয় করে তারপর বঙ্গ-মাদ্রাজী ঢঙের এক বিচিত্র সমন্বয়ে হিন্দী চিত্র হয়ে দর্শক সমাজে উপস্থিত হয়। তৃতীয়টি আসে সোজা বাংলা দেশ থেকে। বাংলা ছবির সরাসরি হিন্দীকরণ। যেসব নির্মাতারা বাংলা ছবির হিন্দী করেন তাঁদের মুখে মাঝে মাঝে এমন সব পরস্পরবিরোধী কথাবার্তা শুনি যে, প্রায় ব্যাকুল হয়ে চলচ্চিত্রের সংজ্ঞার শরণাপন্ন হতে হয়। গত কয়েক বছরের মধ্যে বেশ কয়েকটি বাংলা চিত্র হিন্দী চিত্রে রূপায়িত হয়েছে এবং আপাতত বেশ কয়েকটি হচ্ছে। বলাই বাহুল্য যে, ব্যবসায়িক অর্থে সফল বাংলা চিত্রই হিন্দীতে রূপান্তরিত হবার যোগ্যতা রাখে। যখন কোন হিন্দী চিত্রনির্মাতা ঐ সকল বাংলা চিত্রের হিন্দী রূপান্তর করবার কথা ভাবেন তখনই ঐ ছবির একটি প্রিন্ট আলোচ্য নির্মাণ সংস্থার কলাকুশলীরা বার-বার দেখেন। এবং বহুবার দেখে তাঁরা উক্ত ছবির ত্রুটিগুলি খুঁজে বার করার চেষ্টা করেন, তারপর যে চেষ্টা হয় সেটা ছবির আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক চরিত্রটিকে সর্বভারতীয় দর্শকগ্রাহ্য কোন এক চরিত্রে রূপান্তরের প্রয়াস। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই প্রয়াসের প্রযত্নই যত নষ্টের মূল হয়। সাদাসিধে বাংলা ছবিকে গ্ল্যামারাস স্মার্ট প্রমোদোপম হিন্দী ছবি বানাতে গিয়ে বেশির ভাগ নির্মাতাই এমন এক খিচুড়ি প্রস্তুত করেন যে, দর্শকরা যা হজম করতে পারে না।

সরল শর্মা

টেলিভিসনে "যাদু-প্রেয়সী"

মহিলা-যাদুকর কুমারী ডি-পুষ্পা একটি নতুন সম্মান পেলেন। কলকাতার ময়দানে নিখিল ভারত শিল্প ও সাংস্কৃতিক প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ গত ৭ ফেবরুয়ারি তাঁদের টেলিভিসন-মঞ্চে তাঁকে 'যাদু-প্রেয়সী' উপাধিতে সম্মানিত করেন। এই উপলক্ষে কুমারী পুষ্পা টেলিভিসনে কিছু যাদুর খেলা দেখান। পরদিন ওই প্রদর্শনীর সাংস্কৃতিক মঞ্চে কুমারী পুষ্পা অনেকগুলি যাদু খেলা দেখিয়ে দর্শকদের আনন্দ দেন। বিশেষ করে ডলস্ হাউস, শূন্যে ভাসমান বালিকা, বেনারসের মন্দির, ভারত-মাতা, বাক্সবন্দীর খেলা ইত্যাদি দেখে দর্শকরা উল্লসিত হয়ে ওঠেন।

পার্ক সার্কাস সংগীত সম্মেলন

পার্ক ইউনিয়ন ক্লাব কর্তৃক আয়োজিত পঞ্চদশ বার্ষিক সম্মেলন গত ১২ই ফেব্রুয়ারী থেকে কলামন্দিরে অনুষ্ঠিত হল। দুটি সান্ধ্য এবং একটি রাত্রিব্যাপী অধিবেশনে সম্পন্ন এই সম্মেলনের প্রায় প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানই মনোগ্রাহী হয়েছে। এঁরা সম্ভবত প্রত্যেক শিল্পীর সময় বেঁধে দেননি। তার পরিবর্তে শিল্পীর সংখ্যা সীমায়িত রেখেছিলেন। ফলে প্রত্যেকেই পর্যাপ্ত সময় নিয়ে অনুষ্ঠান পরিবেশন করেছেন।

সুমিত্রা মিত্রের কথক নৃত্য ছিল এবারকার সম্মেলনের প্রথম সংগীতানুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি উপভোগ্য হয়েছে। মণিলাল নাগ সেতারে 'জয়জয়ন্তী' রাগের ভাবরসটি আলাপ, জোড় ও ঝালায় সুন্দর ফুটিয়েছেন। 'গাম্মা'র গতেও মণিলাল নাগ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। তবে সওয়াল-জবাবের অংশটি তেমন জমেনি। সুনন্দা পট্টনায়ক মালকোষের যে রূপ দিয়েছেন, তা প্রচলিত রূপ থেকে যেন কিছুটা পৃথক। অবশ্য সে পার্থক্য স্বরগ্রামের পর্দায় নয়। মালকোষে মধ্যমের যে প্রাধান্য সচরাচর দেখা যায়, সুনন্দার গানে তা ছিল না বলেই সম্ভবত এই পার্থক্য অনুভূত হয়েছিল। তবে তাঁর গানে মেজাজটি সুন্দর ছিল। দ্বিতীয় অধিবেশনটি অবশ্য তুলনামূলক বিচারে অন্যান্য দিনের চেয়ে কিছুটা নিষ্প্রভ ছিল। মায়া চট্টোপাধ্যায়ের কথক বেশ ভাল হয়েছে। শিপ্রা বসুও কলাবতী রাগের একটি পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দর খেয়াল উপহার দিয়েছেন। কিন্তু ভি জি যোগের বেহালার 'যোগ' রাগের রূপায়ণ খুবই নৈরাশ্যজনক। 'যোগ' রাগের সেই অতল গভীর ভাব-গাম্ভীর্য তাঁর উজ্জ্বল বাজনায় কখনই প্রকাশ পায় নি। তিনি সেদিন অপেক্ষাকৃত লঘু রাগ নির্বাচন করলে সুবিবেচনার পরিচয় দিতেন। ওস্তাদ আমীর খাঁর কৌশিক কানাড়ারও যেন ঠিক রসস্ফূর্তি ঘটল না। বিশেষত, বিলম্বিত অংশে আমীর খাঁকে তাঁর অন্যান্য অনুষ্ঠানের মতন স্বচ্ছন্দ বলে মনে হল না।

সম্মেলনের শেষে অধিবেশনটি সর্বাপেক্ষা উপভোগ্য হয়েছিল। সেদিনের প্রথম শিল্পী ইউসুফ বেশ ভালই গেয়েছেন, তবে তাঁর তান-প্রকরণে কিছু পুনরাবৃত্তি না ঘটলে অনুষ্ঠানটি আরও সংক্ষিপ্ত এবং রসঘন হতে পারত। ওড়িশী নৃত্যের অনুষ্ঠানে সংযুক্তা পাণিগ্রাহী অনবদ্য। তাঁর অনুষ্ঠানের উপান্ত অংশটুকু, যেখানে দ্রুত লয়ে চকিতে ছন্দ থেকে ছন্দান্তরে নৃত্যের বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তুলেছেন, তাঁর উন্নত কলানৈপুণ্যের পরিচয় বহন করে। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের 'গাওতিতে খেয়াল, এবং রামকেলি ও তোড়ি রাগে এ কাননের গান ভালই হয়েছে। তবে সেদিন যন্ত্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠান অপেক্ষাকৃত চিত্তাকর্ষক ছিল। আমজাদ আলি অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে বাজিয়েছেন দরবারী কানাড়া। আলাপের মধ্যে এই রাগটির গভীরতা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন, গমকের অনায়াস অথচ পরিমিত ব্যবহার, জমজমা ও সূতের নিখুঁত প্রয়োগে তাঁর সেদিনকার অনুষ্ঠানে যে রমণীয়তা প্রদান করেছিলেন তা অনেক দিন মনে থাকবে। আর ভাল হয়েছে সম্মেলনের শেষ অনুষ্ঠান আশাবরী রাগে নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেতার শিল্পীর এ বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান বলে কখনও কখনও মনে হয়েছে। যেমন আলাপে, জোড়ে, ঝালায়, তেমনই ত্রিতালে নব নব সুরে ও ছন্দে, তানে ও তেহাই-এ এমন এক রসঘন অনুষ্ঠান সেদিন উপহার দিলেন যে, দুটি ঘণ্টা কীভাবে কেটে গেল বোঝা গেল না। পরে 'ধুন' জাতীয় আর কিছু তিনি বাজান নি। না বাজিয়ে বোধ হয় ভালই করেছেন। আশাবরীর এমন সুন্দর রেশটুকু নিয়ে তা হলে আর ফেরা হত না।
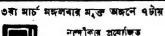
—আনন্দবর্ধন

উত্তর কলিকাতার মডার্ন সঙ্গীত শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালিত সঙ্গীত সম্মেলন সম্প্রতি কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী স্ট্রীটস্থ স্কুল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। অংশ গ্রহণ করেন লক্ষ্মণ হাজরা, অনিল দত্ত, পরেশ চ্যাটার্জি, মালা রায়, সাগরিকা নাগ, গোপাল মুখার্জি, রাধারানী দে, বেণু সেনগুপ্ত, সুমিতা ঘোষ, সমর মুখার্জি, বিশ্বনাথ মল্লিক ও রূপক চ্যাটার্জি। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পরেশ চ্যাটার্জি ও বাদল বিশ্বাস।
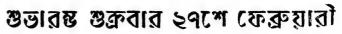
অরণ্যদেব লী ফক

গত চার দিনের মধ্যে আর নতুন কোনও প্লেন লুট হয়নি।
যাক বাবা!
এখুনি অত নিশ্চিন্ত হয়ো না হে!

শুনতে পাচ্ছি, প্লেনগুলোর সন্ধান আপনারা পেয়েছেন, এখন সেগুলোকে ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা চলছে। কথাটা কি ঠিক?
ধুৎ, এসব গাঁজাখুরি খবর আপনারা পান কোথায়?

সত্যি খবরটা পৃথিবীতে মাত্র দশ-জন মানুষ জানে, এবং খবরটাকে গোপন রাখতে তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। রিপোর্টাররা তবু যে কীভাবে সব টের পেয়ে যায়, কে জানে!

প্রিন্স চার্ল অস্থির হয়ে উঠছেন -----
যে লোকটা আসবে, তার নাম যেন কী?
মিঃ ওয়াকার*
* মিঃ অরণ্যদেবের অন্য নাম মিঃ ওয়াকার

অরণ্যদেব অরণ্যের প্রান্তবর্তী শহরে এসে নেমেছেন -----
কুকুরটাকে প্লেনে নিয়ে এল কীভাবে? আইনবিরুদ্ধ ব্যাপার!
লোকটার নিশ্চয়ই খুঁটির জোর আছে।

বিমানঘাটির কাছে জঙ্গলের এক গোপন ঘাটিতে -----
টোমা, হেলিকপ্টারটা দিয়ে গেছে তো?
কালই দিয়েছে। তেরপল দিয়ে ঢেকে রেখেছি।

হীরো আর ডেভিলকে নিয়ে অরণ্যদেব হেলিকপ্টারে উঠলেন -----
চলো, একটু বেড়িয়ে আসা যাক।

ওই সেই প্লেনগুলো। ওই প্রিন্স চার্লের প্রাসাদ··· টাকার জন্যে লোকটা অপেক্ষা করছে।

আর কতক্ষণ লোকটার জন্যে বসে থাকব? কী যেন নাম?
মিঃ ওয়াকার

!?
প্রিন্স চার্ল, আশা করি আমার জন্যেই আপনি অপেক্ষা করছেন?

পশ্চিমবঙ্গের বাজেট পেশ এই সপ্তাহের উল্লেখযোগ্য আলোচ্য বিষয়। অর্থমন্ত্রীরূপে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ২০ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার বিধানসভায় রাজ্য সরকারের ১৯৭০—৭১ সালের বাজেট পেশ করেন। তিনি পঞ্চম অর্থ কমিশনের সুপারিশে অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং স্থায়ী অর্থ কমিশন গঠনের দাবি জানান। তিনি তাঁর বাজেট বক্তৃতায় পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বিশেষ অর্থনৈতিক সুবিধার প্রয়োজনীয়তার কথাও দৃঢ়তার সঙ্গে তুলে ধরেন। এই বাজেটে রাজস্ব এবং অন্যান্য খাতে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ১৫ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা। এর সঙ্গে বর্ষারম্ভের ঘাটতি প্রারম্ভিক তহবিলের ২৫ কোটি ৬ লক্ষ টাকা যোগ করে বর্ষশেষের ঘাটতি তহবিল দাঁড়াবে ৪০ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা বলে অনুমিত হয়েছে। অর্থমন্ত্রী ঐ ঘাটতি পূরণের জন্য আগামী বছরে সুনির্দিষ্ট কোন কর ধার্যের প্রস্তাব তার বাজেট বক্তৃতায় করেন নি।

দেশী সংবাদ

১৬ ফেব্রুয়ারি—দীর্ঘ আট মাস পর বিহারে আজ রাষ্ট্রপতি শাসনের অবসান ঘটলো। রাজ্যের শাসক কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা শ্রীদারোগাপ্রসাদ রাই'র নেতৃত্বে নতুন কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করেছেন।

সারা ভারত ফরওয়ারড ব্লকের সাধারণ সম্পাদক শ্রীহালদুলকার আজ প্রতিনিধি সম্মেলনে যে রিপোরট পেশ করেছেন তাতে বলা হয়েছে যে, সি পি এম যদি তাঁদের আচরণ অবিলম্বে না বদলায় তবে পশ্চিম বাংলার যুক্তফ্রনটের সংকট আরও ঘনীভূত হবে।

১৭ ফেব্রুয়ারি—আজ সকালে উত্তরপ্রদেশে নব কংগ্রেসের সহায়তায় বি কে ডি চেয়ারম্যান শ্রীচরণ সিং-এর নেতৃত্বে দশজন সদস্য নিয়ে ভারতীয় ক্রান্তিদল মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে। মন্ত্রগুপ্তির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে নব কংগ্রেস নেতা শ্রীত্রিপাঠী ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীগুলজারিলাল নন্দ ও শ্রী ডি সঞ্জীবায়াকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় নেওয়া হয়েছে। ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দলে ভাঙ্গনের ফলে কয়েকজন মন্ত্রী পদত্যাগ করায় মন্ত্রি-পরিষদে কিছু আসন শূন্য হয়। এদের দুজনকে নিয়ে তার কিছুটা পূরণ করা হলো।

১৮ ফেব্রুয়ারি—শিয়ালদহ দক্ষিণ সেকশনের সুভাষ স্টেশনে একদল বিক্ষুব্ধ-যাত্রী বিলম্বে ট্রেন চলাচলের প্রতিবাদে লোক্যাল ট্রেনের ড্রাইভারকে মারধর করার ফলে পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশনের সমস্ত সেকশনে আজ সকাল থেকে লোক্যাল ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। তবে বিকাল পর্যন্ত দূরপাল্লার ট্রেন চলেছে।

আজ কেন্দ্রীয় সরকার যে নতুন শিল্প-লাইসেনসিং নীতি ঘোষণা করেছেন, তাতে এক কোটি টাকা পর্যন্ত মূলধনের শিল্পসংস্থা-গুলিকে লাইসেন্স মুক্ত করা হয়েছে। এক থেকে পাঁচ কোটি টাকার মূলধনের নতুন শিল্প-সংস্থাগুলির ব্যাপারে লাইসেনসিং থাকবে।

১৯ ফেব্রুয়ারি—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ কংগ্রেস সংসদীয় দলের কর্ম সমিতির সভায় বলেন : সংবিধানে বর্ণিত মৌল অধিকার সম্পর্কে শ্রীনাথ পাই যে বিলটি পেশ করেছেন সেটি বিবেচিত হওয়া উচিত।

প্রগতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যই এটা প্রয়োজন।

সংসদের বাজেট অধিবেশনে অধিকাংশ অকমিউনিসট বিরোধী দলই এই অধিবেশনে কী ভূমিকা গ্রহণ করবেন তা স্থির করে ফেলেছেন। 'আদি কংগ্রেস, জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্র ইন্দিরা সরকারের "অগণতান্ত্রিক মনোভাবের" বিরুদ্ধে চালাবেন তীব্র আক্রমণ। পি এস পি অবশ্য ঢাআও বিরোধিতার বদলে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবেন।

২০ ফেব্রুয়ারি—রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি আজ সংসদের বাজেট অধিবেশনের উদ্বোধনী ভাষণে ঘোষণা করেন : সরকার রাজন্যবর্গের ভাতা ও বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বিলোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এজন্য আইন প্রণয়ন করা হবে। রাষ্ট্রপতি বলেন—সামাজিক ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দ্রুত এগিয়ে যেতে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এক গণতান্ত্রিক সমাজবাদী ব্যবস্থা গড়ে তোলাই সরকারের কাম্য।

কলকাতায় পানীয় জলের যোগান অর্ধেকের মত কমে গিয়েছে বলে অভিযোগ করে শ্রীবিমান মিত্র আজ পৌর অধিবেশনে বলেন : অকর্মণ্য, অযোগ্য এবং দুর্নীতিপরায়ণ কিছু অফিসারের কাছে আমরা আত্মসমর্পণ করে বসে আছি বলেই এই সংকট।

২১ ফেব্রুয়ারি—ওড়িশার স্বতন্ত্র জন-কংগ্রেস কোয়ালিশনে গুরুতর সংকট দেখা দিয়েছে। দুই দলের একদল সদস্য মন্ত্রিসভা থেকে তাঁদের সমর্থন তুলে নেবার পক্ষপাতী। জন-কংগ্রেসের সাতজন এম এল এ স্বতন্ত্র দলের সঙ্গে 'অশুভ জোট' ভেঙে ফেলার দাবি করেছেন। দুই দলেরই বেশ কয়েকজন এম এল এ এরই মনোভাব মন্ত্রিসভার স্থায়িত্বের পক্ষে বিপদ দেখা দিয়েছে।

২২ ফেব্রুয়ারি—ভারত তার দীর্ঘ (উ রেখা) বরাবর সমুদ্র গর্ভে তেলের স অবতীর্ণ হচ্ছে। আগামী মাসের মাঝ ভারতবর্ষ প্রথম সমুদ্রগর্ভ খনন করে ে খোঁজ করবে। চেষ্টাটি সফল হলে ভা প্রযুক্তি বিদ্যায় ইতিহাসে তা স্মরণীয় থাকবে।

বিদেশী সংবাদ

৬১ ফেব্রুয়ারি—ডোমিনকান সাধ তন্ত্রের নৌ-বাহিনীর জনৈক মুখপাত্র বলে যে, একটি দুই ইঞ্জিন বিশিষ্ট ডোমিন জঙ্গী বিমান বিমানঘাঁটি ত্যাগের • ক্যারেবিয়ান সাগরে পড়ে ডুবে যায়। দুর্ঘটনার ফলে বিমানের মোট ১০২ আরোহীই নিহত হয়েছেন।

১৭ ফেব্রুয়ারি—ইজরায়েলের প্রধানম শ্রীমতী গোলডা মেয়ার আজ আরব দেশগু কাছে পারস্পরিক সার্বভৌমত্বের প্রতি প শ্রদ্ধা নিয়ে আলাপ আলোচনার আবে জানিয়েছেন। তিনি বলেন : শান্তির ■ আকুলতা থেকেই এই আবেদন।

১৮ ফেব্রুয়ারি—মারকিন প্রেসিডেন রিচারড নিকসন আজ কংগ্রেসে বলেন এশিয়ার বিপজ্জনক সংঘর্ষ এড়ানোর জন ভারত ও পাকিস্তান এবং তাদের বন্ধু রাষ্ট্র গুলিকে একযোগে কাজ করতে হবে। তিনি তাঁর প্রথম বার্ষিক পররাষ্ট্র নীতি সংক্রান্ত প্রতিবেদনে বলেন : মারকিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানের অগ্রগতিতে সাহায্য করতে প্রস্তুত।

১৯ ফেব্রুয়ারি—১৯৭০ সালে ইউরোপীয় প্রতিরক্ষার ব্যাপারে বৃটেন যে সামরিক দায়িত্ব গ্রহণ করছে সে জন্য তাকে প্রতিরক্ষা খাতে ভারি বরাদ্দ করতে হয়েছে। ১৯৭০-৭১ সালে প্রতিরক্ষা খাতে ২২৪ কোটি স্টার্লিং ব্যয়বরাদ্দ স্থির করা হয়েছে। গত বছর এই বরাদ্দ ছিল ২২৬ কোটি ৬০ লক্ষ স্টার্লিং।

২০ ফেব্রুয়ারি—পাকিস্তানের সভা-সমিতি ও পত্রপত্রিকাগুলিতে পাকিস্তানে চীনা তৎপরতা সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে। ফলে চীন খুব চটেছে এবং পাকিস্তান-স্থিত চীনা রাষ্ট্রদূত 'চীন বিরোধী অপপ্রচারের কড়া প্রতিবাদ' জানিয়েছে।

২১ ফেব্রুয়ারি—আজ একখানি সুইস বিমান বাডেনের কাছাকাছি একটি জায়গায় ভেঙ্গে পড়ে। বিমানে বৈমানিক সহ ৪৭ জন আরোহী ছিলেন। মনে হচ্ছে বিমানে একটি বিস্ফোরণ ঘটে এই দুর্ঘটনা হয়। কেউ বেঁচে নেই বলে মনে হয়।

২২ ফেব্রুয়ারি—নিউ ইয়রক শহরে কবর খনকেরা বেতন বৃদ্ধির দাবিতে যে ধর্মঘট শুরু করেছে আজ সে ধর্মঘটের ষষ্ঠ সপ্তাহ শুরু হল। ইতিমধ্যে প্রায় ১৩ হাজার মৃতদেহ সমাধিবদ্ধ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে।

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীঅলোক ধর

শিক্ষিত বেকারদের জন্য এক নতুন পেশা!

॥ ওরিয়েণ্টের স্থায়ী সাহিত্য-সম্পদ ॥

• সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমালোচনাবিষয়ক •

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের **বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা** [পূর্ণাঙ্গ] ২০·০০, **বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা** [আধুনিক যুগ] ৭·৫০, **বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা** [আদি ও মধ্যযুগ] ১৫·০০, **ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস** ৯·০০। কবিশেখর কালিদাস রায়ের **বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়** ১৫·০০। অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর **ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি** ৬·০০। অধ্যাপক গোপাল হালদারের **সংস্কৃতির রূপান্তর** ১২·০০। নন্দগোপাল সেনগুপ্তের **বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা** ৫·০০। শিবানন্দের **বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস** [সমালোচনা] ৬·০০। ডক্টর সুরেশচন্দ্র মৈত্রের **বাংলা কবিতার নবজন্ম** ১৫·০০। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর **নানা-রকম** ৬·০০। রতনমণি চট্টোপাধ্যায়ের **আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের চিন্তাধারা** ৮·০০। হুমায়ুন কবিরের **ইমানুয়েল কাণ্ট** ৫·০০। ডক্টর অরুণকুমার বসুর **শক্তিগীতি পদাবলী** ৮·০০। অনন্তকুমার ন্যায়তর্কতীর্থের **বৈজ্ঞানিক দর্পণ** ২০·০০।

• রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র-সাহিত্যবিষয়ক •

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের **রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা**, ২য় খণ্ড ২০·০০। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর **রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ** [পূর্ণাঙ্গ] ২৫·০০, **রবীন্দ্র-সাহিত্য-বিচিত্রা** ১৮·০০, **রবীন্দ্র-বিচিত্রা** ৫·৫০, **রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ**, ১ম খণ্ড ৫·০০। ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের **রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা** ২০·০০। ডক্টর অর্চনা মজুমদারের **রবীন্দ্র-উপন্যাস-পরিক্রমা** ১২·০০। ডক্টর অরুণকুমার বসুর **রবীন্দ্র-বিচিন্তা** ১০·০০। ডক্টর প্রণয়কুমার কুণ্ডুর **রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য** ১২·৫০। রেণু মিত্রের **রবীন্দ্র-জন্ম** ৫·০০। সমীরণ চট্টোপাধ্যায়ের **পূর্বপক্ষের কবি রবীন্দ্রনাথ** ৬·০০, **আন্দোলন-দর্শন** ২·০০, **গুরুদর্শন** ২·৫০। সুধীরচন্দ্র করের **জনগণের রবীন্দ্রনাথ** ১০·০০, **কবি-কথা** ৩·৫০, **শান্তিনিকেতন-প্রসঙ্গ** ১৫·০০, **শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা** ১০·০০। নন্দগোপাল সেনগুপ্তের **কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ** ৫·০০। গৌরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের **কাছেদূরে রবীন্দ্রনাথ** ৫·০০। ডক্টর তারকনাথ ঘোষের **রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা** ৫·০০। প্রতিভা গুপ্তের **শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ** ৬·০০।

• শিক্ষা বিষয়ক •

মহাত্মা গান্ধীর **শিক্ষা** ১৫·০০। অধ্যক্ষ নিখিলরঞ্জন রায়ের **সমাজ শিক্ষা** ১০·০০, **জনশিক্ষার কথা** ৫·০০, **শিক্ষা-বিচিত্রা** ৪·৫০, **সমাজ শিক্ষার ভূমিকা** ৫·০০। অধ্যাপিকা প্রতিভা গুপ্তের **সমাজ ও শিশু শিক্ষা** ৮·০০, **সমাজ ও শিশু সমীক্ষা** ৮·০০, **শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ** ৬·০০। হুমায়ুন কবিরের **নয়া ভারতের শিক্ষা** ৮·০০। ফণিভূষণ বিশ্বাসের **নয়াশিক্ষা** ৬·০০। সুধীরচন্দ্র করের **সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা** ৫·০০, **শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা** ১০·০০। সমীরণ চট্টোপাধ্যায়ের **শিশু পরিবেশ** ৭·০০। বিজয়কুমার ভট্টাচার্যের **বুনিয়াদী শিক্ষা** ২·৫০, **বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি** ৪·০০। অনিলমোহন গুপ্তের **বুনিয়াদী শিক্ষার কথা**, ১ম খণ্ড ৪·৫০, **বুনিয়াদী শিক্ষার কথা** ২য় খণ্ড ৪·৫০, **বুনিয়াদী শিক্ষার সংগঠন** ৪·৫০। অনাথনাথ বসুর **প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শ** ২·০০। প্রদ্যোৎকুমার প্রামাণিকের **নূতন শিক্ষা** ৩·০০। ধীরেন্দ্র মজুমদারের **নঈ তালিম** ৩·০০। শান্তিময় চক্রবর্তীর **শিক্ষার নূতন পথে** ২·০০। বিমলচন্দ্র দাশগুপ্তের **শিক্ষক শিক্ষণ প্রকাশিকা** ২·৫০। রেণু মিত্রের **প্রাথমিক শিক্ষা** ৪·০০।

• গ্রন্থাগার বিষয়ক •

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের **বাংলা গ্রন্থ বর্গীকরণ** ১০·০০। রাজকুমার মুখোপাধ্যায়ের **গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক** ১০·০০, **জনসাধারণের গ্রন্থাগারে পুস্তক নির্বাচন** ২·৫০।

• ভ্রমণ বিষয়ক •

মায়ালতা দেবীর **যাত্রী** ৫·০০। জ্যোতিষচন্দ্র রায়ের **কেদার বদরী** ৫·০০। কল্যাণী প্রামাণিকের **দুনিয়া দেখেছি** ৫·০০। শান্তিকুমার মিত্রের **আজকের জার্মানী** ৫·০০। প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের **হিমালয় পারে কৈলাস ও মানস সরোবর** ৮·০০। ধীরেন্দ্রলাল ধরের **মন্দিরে মন্দিরে** ৬·০০। স্বপনবুড়োর **সাতসমুদ্দুর তের নদী পারে** ৪·০০।

[পূর্ণাঙ্গ পুস্তক তালিকার জন্য পত্র লিখুন]

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি

• কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। দোতলা। কলিকাতা-১২। ফোনঃ ৩৪-৩৬৫৪ •

(সি-৭১৫৮)

উঁচুদরের
টাটা কারবন স্টীল থেকে
জোড়াতাড়া না দিয়ে তৈরী
টাটা-এগ্রিকো
যন্ত্রপাতি
ভারি মজবুত • অনেক বেশী টেকে
খরচ ঢের কম পড়ে

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৭ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১৯
শনিবার ২৩ ফাল্গুন ১৩৭৬

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীসীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৫৫১

চাঁদার হার
কলিকাতায়
বার্ষিক — ২৫.০০
ষান্মাসিক — ১২.৫০
ত্রৈমাসিক — ৬.২৫

ভারতে
বার্ষিক সডাক — ৩০.০০
ষান্মাসিক " — ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক " — ৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)
বার্ষিক সডাক — ৩০.০০
ষান্মাসিক " — ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক " — ৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)
বার্ষিক সডাক — ৫২.০০
ষান্মাসিক " — ২৬.০০
ত্রৈমাসিক " — ১৩.০০

অন্যান্য অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক — ৩৯.০০
ষান্মাসিক — ১৯.৫০
ত্রৈমাসিক — ১০.০০

দাম ৫০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৫ পয়সা

DESH
Saturday 7 March 1970

বিশ্ববিদ্যালয়ের রণাঙ্গন

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূব দিকের কিছুটা অংশ—আমরা যাকে কলেজ স্ট্রীট পাড়া বলি, এই শহরের ছাত্রসমাজের দীর্ঘকালের রণভূমি। অর্ধ-শতাব্দী না হোক আজ প্রায় পঁচিশ ছিরিশ বছর এই এলাকায় বহু যুদ্ধ ঘটে গেছে, ট্রাম-বাস পুড়েছে, ভাঙা ইটের টুকরোয় রাস্তা ভরে গেছে, সোডার বোতল আর কাচের গুঁড়োয় পথঘাট বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। অতীতে এখানে বয়াল্লিশের আন্দোলনের কিংবা রশিদ আলি দিবসের যে সব ঘটনা ঘটেছে তার সঙ্গে আজকের দিনের ঘটনার তুলনা নাই বা করলাম, তবু অস্বীকার করা যাবে না, বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের এই এলাকা—একদিকে যার হ্যারিসন রোড অন্যদিকে মেডিকেল কলেজ তার একটি বৈপ্লবিক ঐতিহ্য আছে যা পুরোনোদিনের ছাত্রদের দ্বারা সৃষ্ট। বোধ হয় সেই ঐতিহ্য এখন পায়ে পায়ে এগিয়ে বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রাঙ্গণেও ঢুকে পড়েছে। রাস্তার যুদ্ধ ইদানীং প্রাঙ্গণের মধ্যে প্রসারিত হয়ে পড়ায় আমরা মাঝে মাঝে হতচকিত হয়ে যাই। কিন্তু আমাদের বিমূঢ়তার জন্যে ছাত্ররা কি রণভঙ্গ দেবে, নাকি সেই পুরোনো রাস্তায় মুখে ফিরে যাবে? নিশ্চয় নয়।

সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে একটি বড় রকম যুদ্ধ হয়ে গেছে। ইতিপূর্বের হালের যুদ্ধগুলির তুলনায় সাম্প্রতিক যুদ্ধের প্রকৃতি কিছু আলাদা। বর্তমান যুদ্ধে যুযুধান ছাত্রদল খোলা তলোয়ার এবং পিস্তল ব্যবহার করেছিল। নিতান্ত দরজা জানলার কাচ ভাঙা, বোমা ফাটানো, টেবিল চেয়ার নষ্ট করা, ছোটখাটো অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদিতে নতুনত্বের স্বাদ না থাকাতেই বোধ হয় পিস্তল, তলোয়ার আমদানি করা হয়েছিল। আধুনিক বিপ্লব তো রাইফেলের নলের মুখে, ইটপাটকেলে নয়। অবশ্য এই দুটি বাড়তি উপসর্গ যোগ করার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তো বটেই অন্যরাও রীতিমত ভীত ও উদ্বিগ্ন। নানা মুখেই প্রশ্ন উঠেছে—এই যদি অবস্থা হয় তাহলে ভবিষ্যতে কী হবে? ছাত্ররা কি স্টেনগান, রাইফেল, প্লাস্টিক বোমা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যুদ্ধ করবে?

আমরা ভবিষ্যতের কথা জানি না। কয়েক বছর ধরে যা ঘটে চলেছে তার দিকে তাকালে দেখতে পাব—প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এলাকা আমরা ছাত্রদের হাতে তুলে দিয়েছি। ওই এলাকাটা তাদের দখলে এটা বেসরকারীভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, ফলে গণ্ডগোলের সময় পুলিস তাদের ভ্যান নিয়ে নিরাপদ দূরে অবস্থান করা ছাড়া কিছুই করে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পবিত্র জায়গা, পুলিস ভেতরে ঢোকে না, যদিও ছাত্ররা সেই পবিত্র জায়গায় ছোরাছুরি, বোমা, লাঠির সদ্ব্যবহার করে। জানি না, এই রকম কোনো আইন আছে কিনা যাতে ছাত্ররা কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মধ্যে তাণ্ডব করতে পারবে, পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা দিতে দেবে না, মেয়েরা ভয়ে কাঁপবে, কাঁদবে—অথচ পুলিস তার ঢাল তলোয়ার নিয়ে বাইরে বসে নিধিরাম সর্দারের পার্ট করে যাবে! আর বলতে দোষ কি, পুলিস এর আগে যখনই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঢুকতে গিয়েছে—আমরা সমস্বরে হই হই করে উঠেছি; গেল গেল রব তুলেছি। কাজেই পুলিসেরই বা কি দায় হাঙ্গামায় জড়িয়ে।

কলকাতা পুলিসের ওপর মহল সম্প্রতি স্পষ্টই বলেছেন যে, তাঁদের কোনো একটি কলেজের মধ্যে ঢুকতে দিলে গণ্ডগোলের অনেকটা সুরাহা তাঁরা করতে পারেন। কিন্তু একটি কলেজের মধ্যে ঢুকে কতটা সুরাহা হতে পারে! অন্যান্য কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে নিত্য হাঙ্গামার কি হবে?

এই প্রসঙ্গে আমরা ছাত্রদের দ্বারা অধ্যাপক নিগ্রহের কথাটি তুলতে চাই। প্রকৃতপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক হাঙ্গামার পিছনে জনৈক অধ্যাপকের নিগৃহীত হওয়ার ব্যাপার রয়েছে। ইদানীং দেখা যাচ্ছে, ছাত্রদের একাংশ অধ্যাপকদের নিগ্রহ করা বৈপ্লবিক কর্ম বলে মনে করেন। শুধু একটি কলেজ নয়, কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের বহু কলেজে অধ্যাপক-নিগ্রহ নৈমিত্তিক হয়ে উঠেছে। ছাত্ররা যে অধ্যাপক ও অধ্যক্ষকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিতে পারে তার দৃষ্টান্তও তো রয়েছে। জানি না আমরা কাদের প্ররোচনায়, কোন্ আদর্শে, কী মানবিক যুক্তিতে অধ্যাপক-নিগ্রহের পথ বেছে নিয়েছি। এই যদি আমাদের ছাত্রসমাজের মতি হয় তবে বলা ভাল এমন দুর্মতি আগে দেখিনি।

না এলে না-ই বা এলে

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

না এলে না-ই বা এলে, তাই বলে কি এ-জন্মে আমার
পরিত্রাণ নেই?
তুমি যত ধোঁকা দাও, তুমি যত
চালাক মাছের মত দূরে-দূরে ঘোরাফেরা করো,
আমারও ততই
জেদ বেড়ে যায়, আমি
শব্দনির্বাচনে তত সতর্ক হবার চেষ্টা করি।
ডাইনে-বাঁয়ে জমে আছে শব্দের পাহাড়। আমি
একদিক থেকে একটি ইচ্ছুক পাথর তুলে এনে—
যে-রকম জুতো জামা ইত্যাদির মিলন ঘটানো হয়,
সেইরকম—
অন্য পাথরের সঙ্গে তার
জোড় মেলাবার চেষ্টা করি,
ক্রমাগত ক্রমাগত চেষ্টা করি,
কিন্তু জোড় কিছুতে মেলে না।

তুমি একবার মাত্র হাতের মুঠোয় এসেছিলে
সুদূর শৈশবে;
তারপর একবারও এলে না।
যেমন আকাশ থেকে কবুতর মাটিতে, অথবা
দূর অরণ্যের ফুল বারান্দার টবের চারায়
দৈব নিয়মের মত প্রতিদিন
নির্দিষ্ট সময়ে ফিরে আসে, সেইরকম আর
একবারও এলে না তুমি।

না এলে না-ই বা এলে, তাই বলে কি বিকল্পে আমার
পরিত্রাণ নেই?
সম্প্রতি দুবার আমি দূর থেকে তোমাকে দেখলুম:
একবার আগ্রার এক ভগ্ন মিনারের শীর্ষে সন্ধ্যার আগুনে,—
একবার পুরীর
দীপ্র মরকতকান্তি তরঙ্গমালায়।
দেখলুম, এখনও তুমি একাধারে
হরিচন্দনের মত জ্বলন্ত এবং
জলজ পুষ্পের মত কমনীয় রয়ে গেছ। সেই
মুখশ্রীকে আমি
শব্দের ভিতরে ধরে রাখতে চাই, আমি
শব্দে-শব্দে তাই জোড় বাঁধতে চাই, তবু
বাঁধতে পারি না।
অথচ নিশ্চিত জানি, রক্ত ও মাংসের সেই মূর্তিকে যদি না
হাতে পাই, তবে তাকে শব্দের ভিতরে
সমূহ ফোটাতে হবে, না-ফোটালে এ-জন্মে আমার
পরিত্রাণ নেই।

[বিপ্লবী বাংলার বীর বাঙ্গালীদের উদ্দেশে খোলা চিঠি]

হে বীরশ্রেষ্ঠ বঙ্গসন্তানগণ, হে ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল চাকী-কানাইলাল-সূর্য সেন-বাঘা যতীনের বাঘা বাঘা বংশধরগণ। এ সপ্তাহে সংবাদ-ভাষ্য রচনা করে আপনাদের সাপ্তাহিক আমোদ পরিবেশন করতে পারলাম না, সে কারণে দুঃখিত। তৎপরিবর্তে আপনাদের সকাশে প্রেরণের জন্য এই খোলা চিঠি লিখছি। আশা করছি, এই চিঠি যখন পৌঁছাবে, তখন আপনারা দিব্যি বহাল তবিয়তেই থাকবেন। আপনাদের জীবন বিপন্ন হতে পারে, এমন অণুমাত্রও ঝুঁকি নেবেন না। আপনাদের জননী যদি দুর্বৃত্তদের দ্বারা লাঞ্ছিতা হন, আপনার স্ত্রীকে যদি গুন্ডারা আপনার কাছ থেকে ধর্ষণের জন্য ছিনিয়ে নিয়ে যায়, নীরবে দাঁড়িয়ে থাকবেন। খবরদার, এমন কিছু করবেন না, যাতে গুন্ডারা ভুলেও ভাবতে পারে যে আপনি তাদের বাধা দিতে যাচ্ছেন, গুন্ডাদের তো বিশ্বাস নেই, হয়ত তারা আপনার অহিত একটা কিছু করে ফেলতে পারে। তখনই যে বাধা দেবেন না, শুধু তাই নয়, গুন্ডারা যদি আপনাকে এ কথা বলে যায় যে "চুপচাপ কেটে পড়ুন, এ নিয়ে উচ্চবাচ্য করবেন না, পুলিসে খবর দেবেন না, অমুক দিন অমুক জায়গা থেকে আপনার বউকে নিয়ে যাবেন", তবে অক্ষরে অক্ষরে সে কথা পালন করবেন। তা হলেই দেখবেন, হে বিপ্লবী বাংলার বাঘা বংশধরগণ, আপনাদের গায়ে আঁচড়টি লাগবে না।

এ বিষয়ে আদর্শ একজন পুরুষের কথা এখানে উল্লেখ করি। ২৭ ফেব্রুয়ারির (১৯৭০) শেষ শহর সংস্করণ স্টেটসম্যান পত্রিকায় সংবাদটি বেরিয়েছিল। তার হুবহু অনুবাদ এখানে দেওয়া হল : **যে সব ঘটনার কথা আমরা জানতে পেরেছি, তার মধ্যে সব থেকে সাংঘাতিক হচ্ছে এক স্বামী-স্ত্রীর কথা, যারা চৌরঙ্গীর এক সিনেমায় নাইট শোতে সিনেমা দেখতে এসেছিলেন। মধ্যরাত্রির পরে সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে এসে তাঁদের গাড়ীটি যেখানে পারক করে রেখেছিলেন, সেখানে তাঁরা আর সেই গাড়িটি দেখতে পেলেন না। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর, কিছুটা দূরে, একটা সরু গলির ভিতরে গাড়িটি পাওয়া গেল। ওরা দুজন যখন গাড়িতে ঢুকতে যাবেন, হঠাৎ তিনজন লোক ছোরা হাতে তাঁদের ঘিরে ধরল। তারা স্বামীটিকে বলল, চুপচাপ কেটে পড়। "আর বউকে যদি ফিরে পেতে চাও, দুদিন পরে এখান থেকে নিয়ে যেও।" দুদিন পরে বউটিকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ওই গলি থেকেই**

পাওয়া গেল। এবং কয়েকদিন পরে এক নারসিং হোমে বউটি মারা গেল। এই ঘটনা পুলিসে জানানো হয় নি।

আজকের পশ্চিমবঙ্গে এ কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। হামেশাই ঘটছে। ঘটছে যে মুখ্যমন্ত্রীর বয়ানেও তার সমর্থন মিলেছে। স্টেটসম্যানে প্রকাশিত ঘটনা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এ ঘটনার সত্যাসত্য আমি জানিনে, তবে এই রকম আরও একটি ঘটনার কথা আমার এবং উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর গোচরে আনা হয়েছিল।... এ তো কলকাতার অবস্থা। গ্রামের অবস্থা সর্বত্র না হলেও বহু স্থানে আরও খারাপ। —(দৈনিক বসুমতী ২৮-২-৭০)

মুখ্যমন্ত্রী উপমুখ্যমন্ত্রী পুলিস কমিশনার প্রভৃতি প্রভুজাতীয় তাঁদেরা এ বিষয়ে কিছু করছেন কি করছেন না, সেটা আলোচনার মত পণ্ডশ্রম করার জন্য এই খোলা চিঠির অবতারণা নয়।

আমার স্ত্রীকে গুন্ডারা আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, এবং আমি চাচা আপন প্রাণ বাঁচা নীতি অবলম্বন করে অক্ষত অবস্থায় বেঁচে থাকব, এই অবস্থাকে বাঁচা বলে কি না, এই খোলা চিঠির মাধ্যমে আপনাদের কাছে আমার জিজ্ঞাসা তাই। কতদিন এভাবে বেঁচে থাকা যায়? এই আমার প্রশ্ন।

প্রত্যেক মানুষেরই সমাজে বাস করার কতকগুলো অধিকার আছে। সেই অধিকার রক্ষা করার দায়িত্ব সামাজিক মানুষেরই। আমরা, বিপ্লবী বাংলার বাঘা বংশধরেরা সেই দায়িত্ব দীর্ঘকাল ধরেই পালন করছি না। আমাদের চারপাশে সামাজিক অন্যায় ঘটে যাচ্ছে, সমাজবিরোধীরা বীরবিক্রমে আস্ফালন করে বেড়াচ্ছে, আমরা বিপ্লবী বাংলার বাঘা বংশধরেরা দেঁতো হাসি হেসে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছি, অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য ক্রুদ্ধ গর্জনে অপরাধীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছি না। অথচ সমাজবিরোধীদের সংখ্যা সব সমাজেই সব সময়েই নগণ্য। ট্রেনে ট্রামে বাসে মেয়েরা লাঞ্ছিতা হচ্ছেন, আমরা চুপ, আমাদের আজকের জীবনে সব থেকে প্রয়োজনীয় পরিবহণ ব্যবস্থা ট্রেন, ট্রাম, বাস মুষ্টিমেয় কিছু লোকের জন্য বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, পুড়ছে, আমরা চুপ।

ছাত্রদের জীবনমরণ স্বরূপে পড়া বন্ধ হচ্ছে, পরীক্ষা ভণ্ডুল হচ্ছে, আমরা জেনে শুনে চুপ, গুন্ডারা চাঁদার ছলনায় জবরদস্তি করে কর আদায় করছে, আমরা চুপ। পাড়ায় পাড়ায় লুঠ হচ্ছে, রাহাজানি হচ্ছে, খুন হচ্ছে, বোমা পড়ছে, অষ্টপ্রহর মাইকের বিকট আওয়াজে মরণাপন্ন রোগী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে, সদ্যোজাত শিশু শ্রবণশক্তি হারাচ্ছে, আমরা চুপ। অ্যামবুলেনস আক্রান্ত হচ্ছে, রোগীকে হাসপাতালে নিতে পারা যাচ্ছে না, ফায়ারব্রিগেডকে আগুন নেবাতে যেতে দেওয়া হচ্ছে না, আমরা চুপ। কোথাও প্রতিবাদে ফেটে পড়ছি না। সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলছি না। প্রত্যেকেই চামড়া বাঁচানোর ফিকিরে আছি।

আমরা সবাই একা বেঁচে থাকতে চাইছি। চাইছি কি না বলুন? আর দেখুন, এই-ভাবে বাঁচার ভান করতে করতে নিজেদের অস্তিত্বকে কোন্ আবর্জনার আস্তাকুঁড়ে নামিয়ে এনেছেন!

অনুগ্রহ করে চুপ করুন, প্রত্যেকটি নপুংসক আচরণের পিছনে লক্ষ কোটি সাফাই জড়ো করা যায়, আমি জানি। কিন্তু তাতে এ প্রশ্নটার জবাব মেলে না—যে-কোনও মূল্যে বেঁচে থাকার নামই কি বাঁচা? সকল রকম অপমান, নির্যাতন মুখ বুজে সহ্য করে শুধুমাত্র হৃদপিণ্ডের যন্ত্রটিকে ধুকধুক করে টিঁকিয়ে রাখার নামই কি বাঁচা? বলুন? নিজের কাছেই প্রশ্ন করুন।

এই প্রশ্নের মুখে আপনাদের দাঁড় করাব বলেই, হে কেউ-ক্ষুদিরাম- কেউ-কানাই-লাল, কেউ-সূর্য সেন, কেউ-বাঘা যতীন, কেউ-বিনয়-বাদল-দীনেশ, কেউ-বা-বীর সুভাষের বংশধরগণ, আপনাদের উদ্দেশে আমার এই খোলা চিঠি প্রেরিত হল।

পশ্চিমবঙ্গের অনিশ্চয়তা

আমার কয়েকজন বন্ধু অভিযোগ তুলেছেন : তুমি আর পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে লিখছ না, ব্যাপারটা কী?

অভিযোগটা সত্য। কয়েক সপ্তাহ ধরে আমি পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে লিখিনি। 'লিখিনি' না বলে বরং বলা ভাল, লিখতে পারিনি। কারণ পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এখন এত দ্রুত পালটাচ্ছে যে সে সম্পর্কে সাপ্তাহিক পত্রিকায় কোন সামগ্রিক আলোচনা প্রায় অসম্ভব।

ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার। ধরুন, আজ ২৮ ফেবরুয়ারি আমি এই লেখা লিখছি। আজ লেখাটা প্রেসে দিতেই হবে। ছাপা হয়ে তা বের হবে কিন্তু সেই ৭ মারচ। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি অনেক দূরে এগিয়ে যেতে পারে। ৪ মারচ যুক্তফ্রন্টের বৈঠক আছে। সেই বৈঠকে কী হবে কেউই তা জানেন না। যদি মিটিং-এ আলোচনা ভালোর দিকে এগোয় তা হলে রাজ্যের রাজনীতি একভাবে এগোবে। আর যদি সুষ্ঠু আলোচনার পরিবর্তে তিক্ত বিরোধ হয় তাহলে তা অন্য পথ নেবে।

ফ্রন্টের আগামী বৈঠকে কী হবে ফ্রন্টের নেতারা তা জানেন না। যুক্তফ্রন্টের ২৩ ফেবরুয়ারির বৈঠকের পর আমি বহু নেতাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম : তা হলে ব্যাপারটা এখন কী দাঁড়াল? কেউ পরিষ্কার জবাব দিতে পারেননি। সকলেরই এক কথা : বুঝতে পারছি না ঠিক। দেখুন না ৪ তারিখ কী হয়।

২৭ ফেবরুয়ারি শ্রীজ্যোতি বসু শ্রী বি এম বিড়লার সঙ্গে বিড়লা ব্রাদার্সের গণ্ডগোল নিয়ে আলোচনা করতে বসেছিলেন। আলোচনা অনেকক্ষণ চলার পর ঠিক হলো মারচ মাসে আবার তাঁরা এই প্রসঙ্গ আলোচনা করবেন। প্রশ্ন উঠল, মারচের কবে আলোচনায় বসা যায়। জ্যোতি বাবু নিজেই বললেন, ৪ মারচের পর বসা যাবে। আগে দেখা যাক ৪ তারিখের ফ্রন্ট মিটিং-এ কী দাঁড়ায়। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কতকগুলি জরুরী বিষয় জমে আছে। রাজনৈতিক বিচারেও এইসব বিষয়ের যথেষ্ট গুরুত্ব। মুখ্যমন্ত্রী অফিসারদের জানিয়েছেন, ৪ মারচের পর তিনি এইসব বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত জানাবেন। ৪ মারচ কী হয় মুখ্যমন্ত্রীও তা দেখে নিতে চান।

বেশ কিছুদিন যাবতই পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এই অনিশ্চিত অবস্থা চলছে। যে কোনও সময় যে কোনও জিনিস ঘটে যেতে পারে। আবার নাও ঘটতে পারে। প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্যাবিনেট মিটিং বা ফ্রন্ট বৈঠকের আগে তো একেবারে চরম অনিশ্চিত অবস্থা দেখা দেয়।

তাই যেখানে যে কোনও মুহূর্তে পরিস্থিতি একেবারে পালটে যেতে পারে, সেখানে সাতদিন আগে কিছু লিখে রাখা কঠিন। যখন সেই লেখা বের হবে তখন হয়ত পরিস্থিতি একেবারে পালটে গিয়েছে। যেমন এবার এই লেখা যখন বের হবে তখন হয়ত দেখবেন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অন্যরকম।

*

যুক্তফ্রন্ট রাজনীতি কত দ্রুত পরিবর্তনশীল আমি তার একটা মজার নিদর্শন দেব।

১৮।১৯ ফেবরুয়ারি একটা খবরের কথা আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে। খবরটা রাজ্যের বাজেট নিয়ে। খবর বের হল, মুখ্যমন্ত্রী পাঁচ মাসের জন্য ভোট অন অ্যাকাউন্ট আনতে চান। প্রথমে এ সম্পর্কে সামান্য একটু উল্লেখ ছিল একটি ইংরাজি সংবাদপত্রে। ১০।১১ ফেবরুয়ারি নাগাদ। আনন্দবাজারে স্পষ্ট খবর বের হল ১৮ ফেবরুয়ারি—মুখ্যমন্ত্রী পাঁচ মাসের ভোট অন অ্যাকাউন্ট আনছেন। খবরটা বের হবার সঙ্গে সঙ্গে রাইটারস বিলডিংসে একেবারে হইহই পড়ে গেল। সি পি এম সমর্থক মন্ত্রীরা বললেন : এটা গভীর ষড়যন্ত্র। পাঁচ মাসের খরচা অনুমোদন করে নিয়ে চার পাঁচদিনের মধ্যে বিধানসভার অধিবেশন বন্ধ করে দেওয়ার জন্যই এইটা করা হচ্ছে। তারপরই অজয়বাবু মন্ত্রিসভা থেকে সি পি এমকে বাদ দিয়ে দেবেন।

ওইদিন সকালেই জ্যোতিবাবুর ঘরে সি পি এম ও সি পি এম সমর্থক কয়েকজন মন্ত্রীর একটা গোপন বৈঠক বসল। সবাই রায় দিলেন : মারাত্মক ষড়যন্ত্র! তবে সঙ্গে সঙ্গে সকলেই বললেন, কিছু করার আগে খবরটা পুরোপুরি সত্য কিনা তাও একবার যাচাই করে নেওয়া ভাল। কী করে যাচাই করা? স্থির হল শ্রীযতীন চক্রবর্তী মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে গিয়ে কথা বলবেন। সেইমত যতীনবাবু অজয়বাবুর ঘরে গেলেন।

একথা সে কথার পর অজয়বাবুই কথাটা তুললেন : শুনছি, ভোট অন অ্যাকাউন্টের প্রস্তাব নিয়ে খুব রাজনীতি হচ্ছে? যতীনবাবু জবাব দিলেন : সকলেই এই খবর শুনে আশ্চর্য। আপনি তো কাউকেই বলেননি যে ভোট অন অ্যাকাউন্ট আনছেন। ক্যাবিনেটে তো ঠিক হয়েছিল পুরো বাজেটই আসবে। সেইমত আমি বিধানসভায় আলোচনার ব্যবস্থাও করেছি। এখন যদি হঠাৎ বলেন ভোট অন অ্যাকাউন্ট হচ্ছে তা হলে ভুল বোঝাবুঝি হবেই।... তাছাড়া, এসব জিনিস আমাদের মন্ত্রিদেরও কি এখন থেকে কাগজ দেখেই জানতে হবে? এটা তো অদ্ভুত রীতি! আপনি যদি ভোট অন অ্যাকাউনট আনেনই আমরা আর এস পির মন্ত্রিরা তা সমর্থন করতে পারব না। আমাদের তার বিরোধিতা করতেই হবে।

মুখ্যমন্ত্রীও নাকি তখন বেশ কিছুটা চটে ওঠেন। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলেন : আমি বলে রাখছি আপনাকে, ক্যাবিনেটে ভোট অন অ্যাকাউনট আনবই। আমার প্রস্তাব যদি হেরে যায় আমি তাকে অনাস্থা প্রস্তাব হিসাবে গ্রহণ করব এবং আপনাদের তার ফল ভুগতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর কথা শুনে যতীনবাবুর তো চক্ষুস্থির। তিনি ফিরে এলেন জ্যোতিবাবুর ঘরে। যতীনবাবুর মুখে অজয়বাবুর বক্তব্য জেনে তাঁরাও একেবারে বোবা। তাহলে কালকেই কি শো ডাউন? কালকেই কি মন্ত্রিসভার পতন? শলাপরামর্শ চলল। স্থির হল, যাই হোক, ভোট অন অ্যাকাউন্টের বিরোধিতা করা হবেই। সকলকে বলে দেওয়া হল, তাঁদের পক্ষের সব মন্ত্রী যেন কাল মন্ত্রিসভার বৈঠকে অতি অবশ্য হাজির হন। গোলাম ইয়াজদানি উত্তরবঙ্গ গিয়েছিলেন। তাঁকে পুলিস মারফৎ বেতারে খবর দেওয়া হল যেন যে কোনওভাবে চলে আসেন। হিসাব করে তাঁরা দেখলেন এস ইউ সি, ফরওয়ারড ব্লক অজয়বাবুকে সমর্থন করলেও মন্ত্রিসভায় ১৩—১৩ হয়ে যাবে। যদি দেওপ্রকাশ রাইকে কোনওভাবে ম্যানেজ করা যায়, অন্তত ক্যাবিনেটে অনুপস্থিত করিয়ে দেওয়া যায়, তাহলেই মুখ্যমন্ত্রীকে হারিয়ে দেওয়া যাবে। উপকরণসহ কার উপর দেওপ্রকাশ রাইয়ের দায়িত্ব দেওয়া হবে তাও একটু পরেই স্থির হয়ে গেল।

মুখ্যমন্ত্রী যতীনবাবুর সঙ্গে কথা বলার পরই বসিরহাটে চলে গেলেন। নির্বাচনী জনসভা ছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গোটা রাইটারস বিলডিংসে রটে গেল, কাল ভোট অন অ্যাকাউনট নিয়ে শো ডাউন হচ্ছে। কালই বোধ হয় শেষ রজনী। আমরা রিপোরটারেরাও ছোটাছুটি শুরু করলাম। মুখ্যমন্ত্রী রাইটারস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময়ও তাঁকে একবারে ধরা হল : তাহলে কি ভোট অন অ্যাকাউনটই আসছে? অজয়বাবু সাংবাদিকদের জবাব দিলেন : আপনারা খবর স্কুপ করতে গিয়ে সব গণ্ডগোল করে দেন। কী হবে সেটা স্থির

করবে ক্যাবিনেট। আমি আগাম কিছু বলতে পারব না।

রাত বারটা একটা পর্যন্ত বিভিন্ন শিবিরে শলাপরামর্শ চলল। রাতে আর এস পি তো এক বিবৃতিই দিয়ে বসলেন: আমরা ভোট অন অ্যাকাউনটের বিরোধিতা করছি। এটা মুখ্যমন্ত্রী অন্যায় কাজ করছেন। গভীর রাতে মুখ্যমন্ত্রী নিজেও বসিরহাট থেকে ফিরে এসে ফোনে দু একজনার কাছে খবরাখবর জিজ্ঞেস করলেন।

পরদিন রাইটারস বিলডিংসে এসেই মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পারটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের সঙ্গে কথা বললেন। তারপর ডেকে পাঠালেন সি পি আইর শ্রীসোমনাথ লাহিড়ি, ফরওয়ারড ব্লকের ডঃ কানাই ভট্টাচার্য এবং এস ইউ সির শ্রীসুবোধ ব্যানারজিকে। তাঁদের বললেন: কেন্দ্র থেকে বহু টাকার ব্যাপারে পাকা কথা পাওয়া যায়নি বলে এখন পুরো বাজেট না করে আধা বাজেট করব ভেবেছিলাম। তাই পাঁচ মাসের ভোট অন অ্যাকাউনট তৈরী করেছিলাম। এখন দেখছি ওরা এ নিয়ে রাজনীতি করছেন। ক্যাবিনেটে ভোটাভুটি করতে চাইছেন। আমিও বলেছি তবে তাই হোক।

ওরা বললেন: আপনি যে কারণে ভোট অন অ্যাকাউনট করতে চেয়েছেন সেটা পুরোপুরি যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু ওরা যখন ভাবছে এটা ওদের পাশ দিয়ে সরকার চালানোর জন্যই আনা হচ্ছে তখন থাক না ব্যাপারটা। কী দরকার এ নিয়ে গণ্ডগোল করে। সোমনাথবাবু ব্যাপারটা গোড়া থেকেই জানতেন।

মুখ্যমন্ত্রী বললেন: আচ্ছা, তবে তাই হোক।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মন্ত্রিসভার বৈঠক শুরু হল। সব হাজির। সি পি এম পক্ষ একেবারে প্রস্তুত। চটপট অন্যান্য সব বিষয় পাশ হয়ে গেল। অন্যান্য বিষয়ে কারো যেন কোনও আগ্রহই নেই। সকলেই আসল ব্যাপারটার জন্য অপেক্ষা করছেন। কিন্তু ও হরি, আসল ব্যাপারটাই যে এল না। মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেটের কথাই তুললেন না। সি পি এম পক্ষ একেবারে আশ্চর্য। সবাই চুপচাপ বসে। ক্যাবিনেটের কাজ শেষ। তবু কেউ উঠতে ভরসা পাচ্ছেন না। ভয়, কেউ উঠে যাওয়ার পর যদি মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টা তোলেন।

শেষ পর্যন্ত যতীনবাবুই বেশ কিছুটা ঘুরিয়ে বাজেট প্রসঙ্গ আনলেন: তা হলে কোনদিন বাজেটের কোন্ দফা নিয়ে আলোচনা হবে তা ঠিক হোক। (ভোট অন অ্যাকাউনট হলে আর দফাওয়ারি আলোচনার প্রয়োজন হয় না।) অজয়বাবু বললেন; তা তো ঠিকই আছে। আপনি সব মন্ত্রীকে আবার একবার জিজ্ঞেস করে নিতে পারেন।

ব্যাস এই পর্যন্ত। মন্ত্রিসভার বৈঠক ভেঙ্গে গেল। সি পি এম সমর্থক কয়েকজন মন্ত্রী আবার জ্যোতিবাবুর ঘরে মিলিত হলেন। সকলেরই মুখে এক প্রশ্ন: তা হলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল? অজয়বাবু কি ক্যাবিনেটের অনুমোদন ছাড়াই কাল বিধানসভায় ভোট অন অ্যাকাউনট আনবেন?

আবার যতীনবাবুর উপর দায়িত্ব পড়ল খোঁজ খবর নেওয়ার। আর তাঁকে বলা হল, সব মন্ত্রীকে দিয়ে সই করিয়ে নিন কবে কার দফতরের আলোচনা হবে।

যতীনবাবু মন্ত্রীদের ঘরে ঘরে ছুটলেন। সই করিয়ে নিলেন অনেককে দিয়ে। শ্রীসুশীল ধাড়া এবং শ্রীচারুমিহির সরকারও বাদ গেলেন না। তারপর শুরু হলো আসল খবর জানার চেষ্টা—মুখ্যমন্ত্রী তা সত্ত্বেও কাল বিধানসভায় ভোট অন অ্যাকাউনট আনছেন কিনা। যতীনবাবু সেজন্য ফাইনান্স কমিশনার শ্রী জে এন তালুকদারকে ফোন করলেন। কিন্তু ফাইনান্স কমিশনারের টেলিফোনটা খারাপ। কি আর করেন, বাধ্য হয়ে মন্ত্রী যতীনবাবু অফিসার কমিশনারের ঘরে গিয়ে হাজির হলেন: ভোট অন অ্যাকাউনট হচ্ছে না তো? ফাইনান্স কমিশনার আশ্বস্ত করলেন পরিষদীয় মন্ত্রীকে, না, না, তা হচ্ছে না। তা হতে পারে না। কারণ তার প্রস্তুতি হয়নি। সেজন্য সময় দরকার।

বিকেলে জ্যোতিবাবুর ঘরে আবার বৈঠক বসল। যতীনবাবু সব রিপোর্ট দিলেন। কিন্তু তবু সবাই আশ্বস্ত হতে পারছেন না। স্থির হলো, যদি দেখা যায় কাল বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী ভোট অন অ্যাকাউনট তুলছেন তা হলে বিরোধী মন্ত্রীরা সকলে একযোগে দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে বাধা দেবেন। বলবেন, তিনি বে-আইনী কাজ করছেন।

ওরা জানতেন না, ততক্ষণে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বাজেট ভাষণ থেকে ভোট অন অ্যাকাউনটের প্রসঙ্গটাই কেটে বাদ দিয়েছেন। ততক্ষণে সেই ভোট অন অ্যাকাউনট বর্জিত বাজেট ভাষণ ছাপাও শুরু হয়ে গিয়েছে।

পরদিন বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর বাজেট ভাষণ শুরু হলো। সি পি এম সমর্থক মন্ত্রীদের উত্তেজনা আস্তে আস্তে কমে এলো। তাঁরা বুঝলেন, না, মুখ্যমন্ত্রী শেষ পর্যন্ত পুরো বাজেটই পেশ করলেন।

কিন্তু শ্রীদেওপ্রকাশ রাইয়ের তখন সেটা বোঝারও ক্ষমতা নেই! তিনি আগে থেকেই বুঝে এসেছেন, মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রিসভার অনুমতি না নিয়েই বিধানসভায় ভোট অন অ্যাকাউনট তুলবেন এবং দাঁড়িয়ে উঠে তার প্রতিবাদ করতে হবে। সেইমত তিনি বারবার চেষ্টা করলেন, দাঁড়িয়ে উঠে প্রতিবাদ করার। আর পাশ থেকে দুজন মন্ত্রী তাঁকে বারবারই চেপে বসিয়ে দিলেন। তাঁরা বারংবার উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রীকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন: না, না অজয়বাবু পুরো বাজেটই পেশ করছেন। ভোট অন অ্যাকাউনট নয়। দেওপ্রকাশ ততই বলে চললেন: নো, নো, হি ইজ প্রেজেনটিং ভোট অন অ্যাকাউনট। আই মাসট প্রোটেসট!

*

আপনিই বলুন, অবস্থাটা যেখানে এতই অনিশ্চিত সেখানে সাতদিন আগে কিছু লিখে রাখা যায়?

২৮-২-৭০

নবারুণ গুপ্ত

পুবালী বায়ু

দু নিয়াদ্দুত লোক জানে জার্মানি দু টুকরো হয়ে গিয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর। সব দেশের সরকারী মহল কিন্তু ব্যাপারটা মেনে নিতে রাজী নন। জার্মানির দু মুলুককে এখন দুই সরকার, দু মুলুকেরই রয়েছে আলাদা শাসনতন্ত্র, আলাদা শাসনব্যবস্থা। পুব জার্মানি হচ্ছে ম্যুনিস্ট, তাকে আদর করে দলে টেনে নয়েছে রুশিয়া থেকে শুরু করে সমস্ত ম্যুনিস্ট দেশ। পশ্চিম জার্মানিতে রয়েছে ংসদীয় গণতন্ত্র। তার খাতির পশ্চিমী ষ্ট্রদের দরবারে। কম্যুনিস্ট দেশগুলোর ঙ্গে তার মাখামাখি তো নেই-ই, নেই াক দেখানো কূটনৈতিক সম্পর্কও— নটি দেশ ছাড়া। সে তিনটি হলো াভিয়েট ইউনিয়ন, যুগোস্লাভিয়া আর মানিয়া। কম্যুনিস্ট দেশগুলোকে পশ্চিম র্মানি যে অচ্ছুৎ মনে করে তা নয়। তা লে কোনও কম্যুনিস্ট দেশের সঙ্গেই সে পর্ক পাতাতো না। কম্যুনিস্ট দেশলোও যে সমাজতন্ত্রী সমাজে পশ্চিম র্মানিকে একঘরে করে রাখতে চায় এমন । তবুও যে বেশীর ভাগ কম্যুনিস্ট শের সঙ্গে তার কোনও সম্বন্ধ নেই তার ন্য দায়ী পশ্চিম জার্মান সরকারের এক ভূত নিয়ম।

সে নিয়মটা হচ্ছে যে দেশ পুব র্মানির সঙ্গে মিতালি পাতাবে, তাকে টনৈতিক স্বীকৃতি দেবে তার সঙ্গে নও সম্বন্ধ রাখবে না পশ্চিম জার্মানি। র নেবে সে দেশ তার পরম শত্রু। পশ্চিম র্মানির সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক আছে ন কোনও দেশ যদি পুব জার্মানিকে ীকৃতি দেয় তাহলে কোনও তর্কাবিতর্কের ধ্য না গিয়ে তখুনি তার সঙ্গে সম্পর্ক দ করবে পশ্চিম জার্মানি। অকম্যুনিস্ট শগুলি তার এ বিধি-নিষেধ মেনে লেও কম্যুনিস্ট দেশগুলি তা মানতে জী নয়। কম্যুনিস্ট পুব জার্মানি বর্জন র তারা পশ্চিম জার্মানির সঙ্গে ভাব বে এমন তো আর হতে পারে না। তাই ধিকাংশ কম্যুনিস্ট দেশের সঙ্গে তার জ-কারবার নেই—হবার সম্ভাবনাও শেষ এতদিন ছিল না। যে তিনটে ম্যুনিস্ট দেশের সঙ্গে তার কূটনৈতিক পর্ক আছে তাদের মধ্যে প্রধান হলো শিয়া। তার সঙ্গে পশ্চিম জার্মানি পর্ক রেখেছে পুব জার্মানির সঙ্গে নষ্ঠতা সত্ত্বেও এই জন্যে যে ও-দেশটা শেবর অতিশক্তিধর রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একটি া বটেই, কম্যুনিস্টকুলের সে তো প্রধান। ব রুমানিয়া ও যুগোস্লাভিয়া হচ্ছে ম্যুনিস্ট হলেও কেমন যেন দলছাড়া।

প্রশ্ন উঠতে পারে, পুব জার্মানিকে

দেবরাজ

পশ্চিম যদি ঘোর শত্রু বলে মনে করে তাহলে তার সঙ্গে সে কোনও সম্পর্ক না হয় নাই রাখলে কিন্তু অপরকে সে পুব জার্মানির সঙ্গে মিতালি পাতাতে বাধা দেয় কোন যুক্তিতে? এর যে জবাব পশ্চিম জার্মানির পক্ষ থেকে দেওয়া হয় তা হচ্ছে, জার্মানি যে দু-ভাগ হয়েছে সে ব্যাপারটাই পশ্চিম মুলুক স্বীকার করে না। তাদের মতে পুব এলাকাকে দখল করে নিয়েছে গায়ের জোরে রুশীরা। যে সরকার ও এলাকায় আছে তা হলো সোভিয়েট ইউনিয়নের তাঁবেদার, নিজস্ব ক্ষমতা বলতে তার কিছু নেই, মস্কো থেকে যেমন বাঁশী বাজানো হয় তারা তেমনই নাচে। এ যুক্তিতে সার থাকুক আর নাই থাকুক, মেনে নিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর তারই পিছু পিছু ব্রিটেন আর ফ্রান্স সমেত বিস্তর দেশ। তাদের অধিকাংশই পশ্চিমী জোট-ঘেঁষা। তবে গোষ্ঠীছাড়া দেশও বেশ কিছু আছে। পশ্চিম জার্মানিকেই শুধু যারা মেনে নিয়েছে দলে তারাই ভারী।

পুবকে পশ্চিম যেমন বলছে রুশীদের তাঁবেদার, পশ্চিমকেও পুব তেমনি পালটা গাল দিচ্ছে মার্কিনী গোলাম বলে। আমেরিকা যা হুকুম দিচ্ছে পশ্চিম তাই নির্বিচারে তামিল করছে এই হচ্ছে পুবের অভিযোগ। দু তরফে তরজার লড়াই চলছে যেদিন থেকে দু মুলুককে স্বাধীনতা দিয়েছে চার দিকপাল রাষ্ট্র আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স আর রুশিয়া। পশ্চিম জার্মান দেশ ভাগাভাগি মানেনি এই বলে যে, তাদের ধারণা সমস্ত জার্মানিতে একটি মত শাসনতন্ত্র আর সরকার একদিন না একদিন চালু হবে। বনকে তারা স্থায়ী রাজধানী বলে স্বীকার করতে রাজী নয়। তারা বলছে, বার্লিন ছাড়া আবার কোন শহর জার্মানির রাজধানী হবার যোগ্য? আপাতত সে শহরের খানিকটা বেদখল বলে ছোট শহর বনকে দিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে—যেদিন জার্মানি তার হারানো ঐক্য ফিরে পাবে সেদিন বার্লিন আবার হবে নতুন জার্মানির রাজধানী। যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন তারা ভাঙা জার্মানিকে জোড়া রাখার জন্যে চেষ্টা করে যাবে।

পুব জার্মানির ধারণা পশ্চিম হাওয়ায় কেল্লা বানাচ্ছে—ভাঙা জার্মানি আর জোড়া লাগবে না, যদি লাগেও তা ঘটবে অনেক কাল পরে। ইতিমধ্যে তারা দিব্যি আছে, স্বাধীনভাবে নিজেদের ভাগ্য গড়ে তুলছে। পশ্চিমের সঙ্গে এক হয়ে যেতে তারা চায় না—চায় তার সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক, যেমন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে থাকে। কীভাবে আলাদা থেকেও দু' জার্মানির মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে তার জন্যে অনেক পরিকল্পনা তারা তৈরী করেছে। তার কোনওটিই পশ্চিম জার্মান সরকারের পছন্দ হয়নি। তাঁরা পুবের সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেই নারাজ ছিলেন এতকাল। হাওয়াটা বদলেছে গেল নির্বাচনের পর থেকে। পুরোনো দল সে নির্বাচনে ক্ষমতা হারিয়েছে, তা দখল করেছে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা। সে দলের নেতা ব্রাণ্ডট এখন চ্যান্সেলার অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী, আগের চ্যান্সেলরদের যেমন পুব জার্মানির নেতাদের সঙ্গে কথা বলতেও প্রবল আপত্তি ছিল তাঁর তা নেই। পুব ইউরোপের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে আনার আগ্রহ তাঁর খুবই। কেবল পুব ইউরোপের মোড়ল রুশিয়ার সঙ্গে নয়, প্রতিবেশী পুব জার্মানির সঙ্গেও।

ঠিক হয়েছে এই মাসেই বার্লিনের যে এলাকাটা পুব জার্মানির ভাগে সেখানেই তাঁর সঙ্গে বৈঠক হবে পুব জার্মানির প্রধানমন্ত্রী উইলি স্টোফের। যাতে সে বৈঠকে সব কাজ সুশৃঙ্খলায় হয় তার জন্যে দু' রাজ্যের সরকারী আমলাদের বৈঠক হয়ে গিয়েছে মার্চ মাসের গোড়ার দিকে। বার্লিনের বৈঠকে ব্রাণ্ডট নিয়ে আসবেন তাঁর আন্তজার্মান সম্পর্কের মন্ত্রী ইগোন ফ্রাংকেকে, আর স্টোফের সঙ্গী হবেন তাঁর বৈদেশিক মন্ত্রী উইনৎসের। দু' দেশের দৃষ্টিভঙ্গীর তফাৎ এই সঙ্গী বাছাই পর্ব থেকেই বোঝা যাচ্ছে। পশ্চিম জার্মানির কাছে পুব জার্মানির সঙ্গে তার অবনিবনা নেহাত ঘরোয়া ঝগড়া। তাই সে ঘরোয়া মামলা মেটাবার দায়িত্ব যাঁর ওপর তাঁকেই তিনি বেছে নিয়েছেন দোসর হিসেবে। আর পুব জার্মানির কাছে পশ্চিম জার্মানি বিদেশ। তাই বৈদেশিক মন্ত্রীকে পাশে নিয়ে বৈঠকে বসবেন স্টোফ। তাঁদের মতের অমিলটা স্পষ্ট। তবুও বৈঠকটা একেবারে নেহাতই নিষ্ফল এমন কথা হলফ করে বলা যায় না। পুব জার্মানিকে আলাদা রাষ্ট্র বলে মেনে নিতে সম্ভবত ব্রাণ্ডট রাজী হবেন না। আর স্টোফ যদি ধনুক ভাঙা পণ ধরেন সমঝোতার তাঁর ওই একমাত্র শর্ত, তাহলে বৈঠক ভেঙে যাবে। তবে একটা রফায় যদি তিনি রাজী হন তাহলে হয়তো বন-বার্লিনের সম্পর্ক অনেক স্বাভাবিক হয়ে আসবে।

হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়ন পিটজিলিস্টেরও চোয়াল উড়ে যাবে। মহামান্য পোপের যে অশ্বতরটি প্রতিহিংসার এক লাথিতে একটি অর্বাচীনকে স্রেফ ধুলো করে দিয়েছিল, তার গল্প ইয়োরোপে অমর হয়ে আছে। সম্ভবতঃ স্কিনহেডে'রা সেই দৃষ্টান্তেই অনুপ্রাণিত। কালো-চামড়ার পোশাকপরা মোটর-সাইকেলবাহী 'রকার'দের মতো কথায় কথায় এরা ছোরা বের করে না—বোতল, ইট, বোমায়ও এদের বিশ্বাস নেই—লোহা-লাগানো দুর্জয় বুটের আঘাতেই এরা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে। পিকাডিলীর সেই দুর্গ থেকে হিপিদের উৎখাত করায় এরাই এসেছিল স্বেচ্ছাবাহিনী হয়ে—আর রণজয়ের প্রধান অস্ত্রই ছিল পায়ের বুট!

"হিপিদের পেটাতে বেশ লাগে। বন্ধুদের সঙ্গে হ্যাম্পস্টেড হীথে হিপিদের আড্ডায় যাই আমরা। গিয়ে বলি, আমাদের কিছু খাওয়া। যদি খাওয়াতে রাজী না হয়, একটু লড়ে নিই ওদের সঙ্গে। ও: সেটা বেশ মজার ব্যাপার। তাড়াবার সময় ওদের মুখের চেহারা যা হয়, সে দেখবার মতো!"

স্কিনহেডের দলকে নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা এখন। ওরাই কি উদীয়মান ফ্যাসিস্ট—আগামীকালের নাৎসী চমু? এ সব কটি প্রশ্নের উত্তর পরে পাওয়া যাবে। কিন্তু আপাততঃ—এদের ভাষায় : "নোংরা হিপিদে"র এরা প্রচণ্ড শত্রু।

আমার বেদনা এইখানেই। যে 'হিপিরা' ভারতীয় 'অধ্যাত্ম ভাবনা' আর 'প্রেমমন্ত্র'কে বিশ্বময় ব্যাপ্ত করতে নেমে পড়েছে, তাদের ওপর এই ফ্যাসিস্ট সুলভ আক্রমণ অতীব আপত্তিকর। ভারতীয় দূতাবাস এ ব্যাপারে যাতে তৎপর হন, সেজন্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে আমার অবিলম্বে দিল্লী যাওয়া দরকার।

কিন্তু মুশকিল এই, তা হলে ট্রেনে চাপতে হয়। এবং সে পথ বন্ধ।

তা হলে হিপিরাই জেগে উঠুন। শিবের শৃঙ্গিকার সঙ্গে ত্রিশূলও স্মরণ করুন তাঁরা (স্মরণীয়—বাহুবলীন্দ্র 'রকার'দের দেখলেই উর্ধ্বশ্বাসে স্কিনহেডে'র দল ছুটে পালায়)। আর হিপিকারাই বা নীরব থাকবেন কেন? যোগশাস্ত্রে বলেছে শিবশক্তি অচ্ছেদ্য—তাঁরা রাজাবাজারের টেকলুঙ্গি ছেড়ে বাঘ-ছাল-টাল পরুন এবং খাঁড়া ধরুন। তারপর নেমে পড়ুন অসুর-সংহারে।

জেম আপনার নিজের হ'লে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বেড়ে চলে

বিক্রয় ব্যবস্থাপক:

জেনারেল ইকুইপমেন্ট মার্চেন্টস্ লিঃ

মানুষ রতন

সমরেশ বসু

॥ ১ ॥

কথা চোখে চোখে। ত্যাবড়া চোখের তারা উলটে, খানিকটা শিবনেত্র ভঙ্গি করল। মনা ওর দিকে চেয়ে, নিচের ঠোঁট দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে, প'ক প'ক করে হর্ন বাজিয়ে দিল। যেন একটা জন্তুর খুশীর ডাক। পুনিয়া তখন ওর সামনে দাঁড়িয়ে, তলপেটের নিচে রঙ ওঠা ময়লা চাপা প্যাণ্ট, পা দুটো অনেকখানি ফাঁক করা। হাত দুটোও ওপর দিকে তুলে দু'দিকে ছড়ানো। সরু গলার ওপরে রুক্ষ্ম ঝাঁকড়াচুলো মাথাটা না থাকলে, রোগা শরীরটা পুরো ইংরেজী এক্স অক্ষর। শরীরটাকে দুলিয়ে, মনাকে চোখ টিপল। সোতে, ওদের তিন জনের দিকেই তাকিয়ে, চোখের কোণে বাঁ দিকে ইশারা করল। তারপরে লাফ দিয়ে রিকশার সীটের ওপর উঠে, উলটো দিকে প্যাডেল ঘুরিয়ে দিল বনবনিয়ে। পথ চলতি এক মহিলাকে ডেকে, চেঁচিয়ে বলল, 'রিকশা নিয়ে আসব দিদিমণি?'

> 'মানুষ রতন' গল্পটি সুদীর্ঘ। পরবর্তী আরও দুটি সংখ্যায় রচনাটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হবে।

দিদিমণি ওর দিকে চেয়ে, হেসে বললেন, 'এখন না।'

সোতে মুখের ভাব করল, যেন হতাশ হয়েছে। মাথাটা নিচু করে হাত ঝুলিয়ে দিল। তারপরেই আবার চারজনে, চারজনের দিকে তাকাল। আবার কথা চোখে চোখে। ত্যাবড়া এমন ভাবে ঘাড় কাত করে, জিভটা এক পাশে বের করে ঝুলিয়ে দিলে, মরা মানুষের মুখের কথা মনে হয়। সেই সঙ্গে আবার চোখ ওলটানো, আর ঘাড়ের একটা ইশারা। মনা মাথা নেড়ে কয়েকবার খাবি খাওয়ার ভঙ্গি করল। পুনিয়া ঠোঁট টিপে, ভুরু কুঁচকে, ঘাড় নেড়ে মনাকে সায় দিল। সোতে এমন মুখ-চোখ করল, আর শক্ত হাতে হর্ন টিপল, যেন কারোর গলা টিপছে। ত্যাবড়া ঠোঁটের কোণে হেসে বলল, 'ভাগ শালা।'

সোতে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'আমার শালা আর দেরি সইছে না।'

এই সময়ে গণেশ এসে ওদের সামনে দাঁড়াল। পরনে লুঙ্গির মত করে ময়লা কাপড় দু' ভাঁজ দিয়ে পরা। গায়ে একটা সাবানের কোম্পানীর ছাপ মারা, বিনা পয়সায় পাওয়া ধবধবে সাদা গেঞ্জি।

মফস্বলের রিকশা-ওয়ালাদের গেঞ্জি দান করে কোম্পানীগুলো এভাবে বিজ্ঞাপন করে। ওর চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, সন্দেহে ভরা। চারজনের দিকেই তাকিয়ে, রাস্তার আশেপাশে একবার দেখে নিল। ইস্টিশনের দিকেও একবার দেখল। তারপরে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার রে তোদের?'

ত্যাবড়া সমস্ত দাঁতগুলো বের করে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ক্যানারে গণিশ?'

বলে, চারজনে আবার চারজনের দিকে তাকাল। চারজনেই হাসল। মনা আর সোতে জোরে জোরে হর্ন বাজাতে লাগল। সেপাই লাঠি তুলে ছুটে এসে বলল, 'এই শালারা, শুধু শুধু হল্লা করছিস কেন?'

ঠিক এ সময়েই, কুড়ি হাত দূরে স্ট্রিট-কর্নার মিটিং শুরু হয়ে গেল, 'বন্ধুগণ, মহকুমার আসন্ন ছাত্র ও যুবকদের যে সম্মেলন হতে যাচ্ছে, সেখানে বিপ্লবী মোর্চায় দীক্ষিত...।'

ওরা চারজন বা গণেশ সেদিকে ফিরে তাকাল না। কানও নেই। গণেশের সন্দিগ্ধ চোখ দুটো যেন দপ দপ করে জ্বলে উঠল। নাকের পাটা ফুলে উঠল। সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'ফটকে, অ্যাই ফটকে।'

যার নাম ফটকে সে একটা হুডতোলা রিকশার মধ্যে ঠ্যাঙ ছড়িয়ে আয়েস করে বসেছিল। গণেশের ডাক শুনে লাফ দিয়ে নেমে এসে বলল, 'কী বলছ গুরু।'

গণেশ আবার ওদের চারজনের দিকে চোখ ঘুরিয়ে নিল। বলল, 'এরা একটা মতলবে আছে মনে হচ্ছে। আমি যেন কীরকম একটা গন্ধ পাচ্ছি। দ্যাখ্ তো, ইস্টিশনে একটা পাক মেরে আয়। সব ভাল করে দেখে আসবি।'

ফটকেও গণেশের মতই সন্দিগ্ধ চোখে চারজনের দিকে একবার দেখে, দৌড় দিল বলে গেল, 'এখুনি দেখে আসছি গুরু।'

মনা ঘাড় কাত করে গণেশের দিকে তাকাল। চোখ আধবোজা করে জিজ্ঞেস করল, 'কী হল রে গণিশ?'

গণেশ একটা বিড়ি কামড়ে ধরে চোয়াল শক্ত করে বলল, 'তোদের পোল খুলব।'

ওরা চারজনেই আবার হেসে উঠল। কেউ খ্যালখেলিয়ে, কেউ কিতকিতিয়ে। আর ঢলে ঢলে পড়তে লাগল। পানিয়া বলল, 'খাঁটি পোল্ কেন রে, বল্, আমাদের সব খুলে নিবি।'

ত্যাবড়া ওর কোমরের প্যান্টটা টেনে দেখিয়ে বলল 'ইস্তক এটা।'

সোতে তাড়াতাড়ি ওর প্যান্টে হাত চেপে ভয়ে ভয়ে বলল, 'উ রে শালা ফাদুরফাঁই করে দেবে, গণিশ মরদ বটে কথা!'

বলেই, আবার একটি সাড়াগোছ করে কালো ঠুলি পরা যুবতীকে ডেকে চেঁচিয়ে উঠল, 'রিকশা নিয়ে আসব দিদিমণি?'

মেয়েটি ফিরে তাকাল না। মনা বলল 'শালার খালি দিদিমণি দেখলেই ডাকা, মা-ঠাকরুণ বাবুদের ডাকতে পারিস্ না?'

সোতে হাত নেড়ে বলল, 'ওসব তুই বুঝবি না। প্যাসেঞ্জার হালকা হবে, বালান্দাল চালাব, পয়সাও বেশী, ওদিকে নজরেও মেজাজ।'

'...সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের মুখোশ আমরা টেনে ছিঁড়ে ফেলব...।'

মাইকে গলা শোনা যাচ্ছে। এ সময়েই একটা ট্রেন এল। রাস্তার ওপারে জলের স্রোতের মত প্যাসেঞ্জার নেমে এল। এর সঙ্গে বোধ হয় পঞ্চাশটা রিকশাওয়ালা হর্ন বাজিয়ে প্যাসেঞ্জার ডাকতে লাগল। মাইকের শব্দ একটু সময়ের জন্য চাপা পড়ল। ফাঁক হতেও সময় লাগল না।

ওরা চারজন তেমনি দাঁড়িয়ে। গণেশ প্যাসেঞ্জার ধরবার জন্য যেতে গিয়েও থমকে গেল। ওর চোখের পাতা কুঁচকে উঠল নাকের পাটা আবার ফুলল, সন্দেহের সঙ্গে উত্তেজনার চোখ ঝকঝকিয়ে উঠল। বলল 'উ রে শালা, প্যাসেঞ্জার ধরার তাল নেই তোদের?'

মনা বললে, 'সালা এমন লক্ষ্মী গাড়ি না দেখলি প্যাসেঞ্জার নিজেই এসে গেছে।'

গণেশের উত্তেজনা আর দুশ্চিন্তা বেড়ে উঠল। বলল, 'নিশ্চিত তোরা কিছু পেয়েছিস, না হলে—।'

ফটুকে ফিরে এসে বলল, 'না গুরু, ইস্টিশনে প্যাসেঞ্জারদের কোথাও কিছু দেখতে পেলাম না।'

'ঝাড়ুদারনিটাকে জিজ্ঞেস করেছিলি ?'

'হ্যাঁ, বললে কিছু দেখতে পায় নি।'

এই সময়েই পুনিয়ার রিকশায় গাদাখানেক কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে একটি গরীব বউ উঠে পড়ল।

পুনিয়া খেঁকিয়ে উঠল, 'আরে আরে কোথায় যাবে ?'

বউটি ব্যস্ত। কোলে একটি, কোলের নীচে একটি, কোল ধরে, পাশে দুটি। বলল, 'জোড়া তালাও।'

পুনিয়ার মুখ বিকৃত। বলল, 'বার আনা লাগবে।'

বউটি প্রতিবাদ করে বলল, 'কেন? ছ' আনা ভাড়া তো।'

পুনিয়া ঘাড় নেড়ে বলল, 'হবে না, অন্য রিকশা দেখ।'

গণেশ ইতিমধ্যে ওদের আরো কয়েকবার দেখে সরে গেল। যাবার আগে বলে গেল, 'আচ্ছা, আমিও দেখছি।'

ডাবড়া বলল, 'দ্যাখ দ্যাখ, দেখে নে গণেশ।'

ওরা চারজনেই আবার হেসে উঠল। হাসির মধ্যেই মনা, পুনিয়ার রিকশার যাত্রী বউটিকে জিজ্ঞেস করল, 'দশ আনা দেবেন দিদি ?'

বউটি বলল, 'না ভাই, আট আনা দিতে পারি।'

'পাঁচজন যাবেন তো।'

'সব তো ছেলেমানুষ বাপু।'

মনা রাজী হয়ে গেল, 'আসুন, দিনের বেলাটা চালাতে হবে তো।'

বউটি বাচ্চাদের নিয়ে হুড়মুড় করে পুনিয়ার রিকশা থেকে নেমে মনার রিকশায় এসে উঠল।

পুনিয়া বলল, 'যা রে শালা।'

মনা বলল, 'তোমার শালা এখন গরম বেশী। সকালেই লম্বা টিরিপ মেরেছ, পেট টাকা করকর করছে।'

ওরা চারজনে আবার চোখাচোখি করল। আবার ইশারা, চোখে চোখে কথা। বোঝা যায় তার সংগে ভাড়ার কোন ব্যাপার নেই। ডাবড়া বলল মনাকে, 'যাচ্ছিস, একটা টাকা ছেড়ে যা, জিনিস কিনতে হবে না ?'

'ঘুরে আসি।'

ডাবড়া ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, 'না না, ঘুরে এলে হবে না। রেডি করতে হবে।'

মনা মুখ বিকৃত করে প্যান্টের পকেট হাতড়াল। একটা আধুলি বের করে দিয়ে বলল, 'এখন এটা রাখ, ফিরে এসে বাকীটা দিচ্ছি।'

ডাবড়া আধুলিটা নিয়ে বলল, 'থাকলেও দিবি না, খচ্চর! আচ্ছা শোন্—।'

ও রিকশা-সারির সকলের মুখের দিকে একবার দেখে নিল। গণেশ ওর দিকেই তাকিয়েছিল। মনার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে, বলল, 'ওদিকে যাচ্ছিস, একবার দেখে আসিস।'

মনা জিজ্ঞেস করল, 'পটল তোলা হয়ে গেলে নিয়ে আসব ?'

ডাবড়া নেতার মত মুখ করে বলল, 'না, একলা আনিস না। আমাদের কাউকে ডেকে নিয়ে যাস। আমার শালা খুব ভয় লাগছে।'

'কেন ?'

'গণেশ ফটুকেরা না টের পেয়ে যায়।'

মনা একবার গণেশের দিকে দেখল, বলল, 'শালা খটাসের মতন চেয়ে রয়েছে। তবে কিছু আনজাদ করতে পারছে না। আচ্ছা আমি ঘুরে আসি।'

ওরা চারজনেই মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল।

যাঁরা যাত্রী নিয়ে চলে গেল। আর দুটি কলেজের মেয়ে সোতের রিকশার কাছে এসে বলল, 'ভাড়া যাবে?'

সোতে তড়াক করে রিকশার কাছ ঘেঁষে বলল, 'কোথায় যাবেন?'

'লক্ষ্মীপুর।'

'বসুন।'

'ভাড়া কত?'

'আপনাদের আবার ভাড়া বলব কি, উঠুন না। যা ভাড়া তা-ই দেবেন।'

মেয়ে দুটি ওঠবার সময়েই ত্যাবড়া ডেকে উঠল, 'সোতে—।'

সোতে হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল। প্যান্টের হিপ পকেট থেকে একটা টাকা বের করে ত্যাবড়ার হাতে দিয়ে বলল, 'সুসতীশ দাস, ওসব ভোলে না।'

বলেই রিকশাটাকে নিয়ে দৌড়ে ছুটে গেল রাস্তার ওপর। লাফ দিয়ে সিটের ওপর উঠতে উঠতে কপালে পড়া চুলে একটা ঝাপটা মারল, হর্ন বাজাল।

পানিয়া বলল, 'শালার কপাল দেখলি। ঠিক নিদিরাম মিলে গেল।'

ত্যাবড়াও সেই দিকে চেয়ে কবুল করল, 'হ্যাঁ, ওর কপালে নিদিরাম আছে।'

কথা বলতে বলতেই ত্যাবড়া আর পানিয়া আবার চোখে চোখে তাকায়।

'...আজকের যুবক আর ছাত্রেরা সংগ্রামী জনতার এক বিরাট অংশ, তারা অতন্দ্র প্রহরীর মত...।'

'ওই দ্যাখ্, গণশা শালা ফটকের কানে কানে কী বলছে।' পানিয়া বলল।

ত্যাবড়া বলল, 'দেখছি। শালারা খেকতুরে শকুন হয়ে আছে। এর আগেরটাও ওদের হাত ফসকেছিল। এটাও—।'

'ভাড়া যাবে?'

ত্যাবড়ার বদলে পানিয়া যাত্রীর দিকে দেখল। লোকটা মোটা, প্যান্টালুনে কোট পরা, হাতে ব্যাগ। জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাবেন?'

'রেজিস্ট্রি অফিস।'

'আট আনা।'

'চার আনা।'

পানিয়া গণেশকে দেখিয়ে বলল, 'ওই রিকশায় যান।'

লোকটা একটু অবাক হয়ে গণেশের দিকে এগিয়ে গেল। কী দু'একটা কথা হল। গণেশ চেঁচিয়ে খিস্তি করে উঠল, 'শালা ইয়ে মস্করা হচ্ছে আমার সংগে, আঁ? প্যাসেঞ্জার নিয়ে ইয়ারকি। খপরি খুলে নেব।'

পানিয়া ত্যাবড়ার দিকে চেয়ে ওর পাকানো শরীর কাঁপিয়ে নিঃশব্দে হাসতে লাগল। ত্যাবড়া বলল, 'পেছনে লাগিস না, বুড়ো এমনিতেই বাঘের আছে।'

গণেশের সংগে লোকটার ভাড়ার রফা হয়ে গিয়েছে। যাত্রী তুলে নিয়ে যাবার আগেও সে কপট চোখে পানিয়ার দিকে চেয়ে খেউড় করে গেল। ত্যাবড়া বলল, 'দে, তোর টাকাটা ছাড়।'

পানিয়া বলল, 'এখনই?'

'হ্যাঁ, দে, মালপাত্তর রেডি রাখি।'

পানিয়া টাকাটা বের করে দিতে একটু দেরি করল। তার আগে বলল, 'আগে গিয়ে একবার দেখে আসব, মাল মজুদ আছে, না হাপিস হয়ে গেল।'

ত্যাবড়া ধমকে উঠল, 'যাও শালা, বলছি টাকাটা দে। হাপিস হবে কেন?'

পানিয়া একটা টাকা দিল ত্যাবড়াকে। ত্যাবড়া বলল, 'তুই থাক আমি আসছি।'

পানিয়া হবু বলল, 'আমি একবার দেখে আসি না।'

'ফটকেরা টের পেয়ে যাবে।'

'বাজারের পেছনকার গলি দিয়ে ঘুরে যাব। বুঝতে পারবে না।'

ত্যাবড়া একটু ভেবে বলল, 'যা তবে।'

পানিয়া চলে গেল। ত্যাবড়া দাঁড়িয়ে রইল। আড়চোখে ফটকেকে দেখল। তারপরেই হঠাৎ মেয়ে গলার খলখলে হাসি শুনে পিছন ফিরে তাকাল। রিকশা সারির পিছনে দেখল দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে জগা ঠ্যাঙ ছড়িয়ে বসে আছে। পান-খাওয়া

মনা বলল, 'আমাদেরও পুণ্যি হল।'

ত্যাবড়া ঘাড় ঝাঁকাল। মরা মুখের দিকে চোখ রেখে বলল, 'লোকটা ভাল মানুষ ছিল মনে হয়, না?'

পুনিয়া বলে উঠল, 'হ্যাঁ, আমার তাই মনে হচ্ছিল। কোথা থেকে এসেছিল লোকটা?'

ত্যাবড়া বলল, 'মানুষ আবার কোথা থেকে আসে। সবাই যেখান থেকে আসে, সেখান থেকেই এসেছে।'

পুনিয়া অবাক হয় মনার দিকে তাকাল। মনা বলল, 'বাঃ, তা বলে একটা জায়গা, ঘর বাড়ি—।'

ত্যাবড়া ভুরু তুলে, ঠোঁট বেঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুই কোথায় থাকিস, তোর বাড়ি ঘর কোথায়?'

মনা বোকার মত শব্দ করল, 'অ্যাঁ?'

'বল্ না।'

মনা বলল, 'আমি তো ইস্টিশনের এই দিকে—।'

ত্যাবড়া বলে উঠল, 'অই রকম, সব অই রকম। এক জায়গা থেকে এলেই হল। তুই মরে যাবার পরে যখন কেউ খোঁজ নেবে—'

মনা খেঁকিয়ে উঠল, 'খচ্চর, শালা, তোর খোঁজ নেবে লোকে।'

ত্যাবড়া শেলষ্মা জড়ানো গলায় হেসে উঠল। বলল, 'নে, বুড়োর হাঁ মুখটা বুজিয়ে দে তো।'

কিন্তু মনার কানে কথাটা সেই মুহূর্তেই গেল বলে মনে হল না। মরা মুখটার দিকে চেয়ে, ও কেমন যেন অনমনা। এ সময়ে শেষ মাঘের দক্ষিণা বাতাস বইছিল। হঠাৎ একটা ছোট ঝাপটা মত এল, ধুলো আর পাতা উড়ে, একটা ঘূর্ণীর মত হল। দুটো ছায়া, মরা শরীরের ওপর দিয়ে সাঁ করে চলে গেল। তিনজনেই দেখল, কয়েকটা শকুন, উড়তে উড়তে আরো নিচে নেমে এসেছে। ওপারে লাইনের ধারে, আরো দুটো নেমে বসেছে।

ত্যাবড়া নিচু হয়ে, মরা মানুষটির হাঁ মুখ বন্ধ করে দিল। কিন্তু পুরো বন্ধ হল না। আস্তে আস্তে খুলে, অল্প একটু ফাঁক হয়ে রইল। ওইটুকু আর বন্ধ করার চেষ্টা না করে ত্যাবড়া পুঁটলিটা খুলল। একটু আধটু ছেঁড়া থাকলেও, প্রায় ফরসা একটা জামা। একটা চশমা, একদিকে কাচ নেই। একটা চিরুনি। কয়েক মুঠো শুকনো মুড়ি একটা ঠোঙায় দলা পাকানো। কিছু শুকিয়ে যাওয়া ফুল বেলপাতা। ছোট রুদ্রাক্ষের একটা মালা। পুঁটলিতে আর কিছু নেই।

তিনজনেই মুখ চাওয়াচায়ি করল। ত্যাবড়া মরা মানুষটির কোমরের কাছ থেকে জামা তুলে, হাত দিয়ে টিপে টিপে দেখল। ছেঁড়া-খোড়া জামার বুকের কাছে, পিঠের নিচে, সব জায়গায় হাতড়াল। ঠোঁট

উল্টে বলল, 'শালা, একটা ঘষা লোহাও নেই।'

মনা বলল, 'এরকম হয় না। ইস্টিশনের কাছে সেই যে পাগলিটা পচে গলে মরেছিল, তার পুঁটলিতেও কিছু পয়সা ছিল।'

পুনিয়া কিছু বলতে যাচ্ছিল, এ সময়ে পিছন থেকে মোটা আর ভরাট গলা শোনা গেল, 'কে রে তোরা, কী করছিস?'

ওরা তিনজনেই ফিরে দেখল। চিনতে পারল, বড় রাস্তার ধারে বাবুর বাড়ি। ত্যাবড়া বলল, 'দেখুন না বাবু, বুড়ো মরে গেছে, ভাবছি পুড়িয়ে দেব।'

ভদ্রলোক মৃতদেহ দেখলেন। নাকে কাপড় চাপা দিলেন। চোখে খুশির ভাব ফুটে উঠল। ঘাড় নেড়ে বললেন, 'খুব ভাল, খুব ভাল। তোদের চেনাশোনা ছিল বুঝি?'

ত্যাবড়া বলল, 'না না, কে কার চেনা-শোনা। দেখলাম মরে পড়ে আছে, আপনাদের ঘর-দোরের সামনে, ভাবলাম দিই গে পুড়িয়ে।'

ভদ্রলোক ঘাড় নেড়ে বললেন, 'বাহবা বাহবা, এই তো চাই, এই তো—।'

ত্যাবড়া ফিসফিসিয়ে বলল, 'শালা দায়ে পড়ে বলছে।' গলা তুলে বলল, 'কিছু সাহায্য করুন বাবু। খরচ-টরচ আছে তো।'

ভদ্রলোক ভাবতে পারেন নি, কথা কত দিকে গড়াতে পারে। বললেন, 'তা?' তারপরে ঘাড় নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তা বটে তা বটে।'

পকেট থেকে গোটা একটি টাকার নোট তুলে ধরলেন। মনা এগিয়ে হাত বাড়িয়ে নিল। ভদ্রলোক যেন পালক ঝাড়া দিয়ে চলে যেতে যেতে বললেন, 'তা হলে, নিয়ে যাস বাবা।'

ত্যাবড়া শ্লেষ্মা জড়ানো গলায় হাসল। বলল, 'শালা বাঁশ কেন ঝাড়ে...খবরদারি করতে এসে একটা টাকা দণ্ড। বউনিটা ভাল, কী বলিস?'

পুনিয়া বলল, 'মাইরি মাইরি।'

'লে ধর, তুলে নিয়ে যাই। দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে, আর দেরি করব না।'

ত্যাবড়া ধরল দুটো হাত। মনা ধরল দুটো পা। চ্যাংদোলা করে তুলে ধরতে, মাথাটা পড়ল ঝুলে। ত্যাবড়া পুনিয়াকে হুকুম করল, 'পুঁটলিটা নে, আর এক হাতে মাথাটা তুলে ধর।'

পুনিয়া হুকুম পালন করল। তিনজনে মিলে, মড়া শরীর নিয়ে রাস্তায় এসে উঠল। ত্যাবড়া মনার রিকশার ওপরে তুলতে যেতে, মনা খেঁকিয়ে বলল, 'না, তোর গাড়িতে নে।'

ত্যাবড়া মড়াটাকে ঝাঁকানি দিয়ে বলল, 'আরে ধ্যাৎ, তোল না।'

ও মনার রিকশায় অর্ধেকটা শরীর তুলে দিল। দিয়ে, আরো খানিকটা টেনে সীটের গায়ে ঠেকনো দিল। মনার চোখ দপদপিয়ে উঠল। 'শালা, নিজের বেলায় আঁটিসুঁটি—।'

ত্যাবড়া বলল, 'লে লে, হাঁটু দুটো একটু ভেঙে তুলে দে। আরে বাবা, একটু গঙ্গা জল ছিটিয়ে দিলেই হবে।'

'সে তো তোর গাড়িতেও দেওয়া যেত।'

ত্যাবড়া সে কথার কোন জবাব না দিয়ে, মড়ার পা দুটোকে একটু ভেঙে, যতটা সম্ভব, রিকশার পা রাখবার জায়গায় তুলে দিল। আবার ছায়া উড়ে গেল মরা শরীরের ওপর দিয়ে। তিনজনেই আকাশের দিকে তাকাল। শকুনগুলো এখনো উড়ছে; পুনিয়া কাঁচকলা দেখিয়ে বলল, 'এই পাচ্ছ।'

ত্যাবড়া মরা লোকটির দিকে তাকিয়ে-ছিল। ও যেন হঠাৎ খুব অবাক হয়েছে, চোখের পলক পড়ছে না। মনা বিরক্ত হয়ে বলল, 'কী হল কী। যেন বাপের মুখ দেখছিস শালা।'

ত্যাবড়া ঘাড় নেড়ে বলল, 'আমার বাপ? এরকম ভাল মানুষ হতে হলে আমার বাপকে আবার জন্মাতে হবে। সে শালার কথা ছেড়ে দে, কিন্তু মাইরি আমি এই লোকটার কথা ভাবছি। এ নিগঘাত খুব পুণ্যি করেছে, চেহারা দেখেছিস। তাই তো বলি।'

বলে ঘাড় নাড়তে লাগল। মনা পুনিয়া চোখাচোখি করল। ত্যাবড়া ওদের দিকে চেয়ে বলল, 'ভেবে দ্যাখ, মাসের এখন পয়লা হপ্তা যাচ্ছে, অ্যাঁ? কাল চটকলে হপ্তা হয়ে গেছে, কেমন? আর আজ শনিবার —শনিবারের দুপুরে লোকটা মরল। উঃ রে শালা, কপাল কাকে বলে। এ নিশ্চয় কোন সাধক টাধক হবে। এর আগের দুটোর একটাও এ রকম হয়নি।'

মনা পুনিয়াও এবার অবাক হয়। মনা বলল, 'ঠিক বলেছিস তো।'

ত্যাবড়া আদরের ভঙ্গিতে, চুমকুড়ি শব্দ করে, মড়ার মরা চিবুকে হাত বুলিয়ে দিল। বলল, 'বাবা, বরাবর যেন তোমার মত পাই।'

বলে ত্যাবড়া সীটের ওপর উঠে বসতে বসতে পুনিয়াকে বলল, 'তুই আমার গাড়িটা চালিয়ে চল্। পুঁটলিটা বুড়োর কোলে রেখে দে।'

এ সময়ে মনা গাড়িতে উঠতে গিয়ে টের পেল, পিছনের চাকায় হাওয়া নেই। ও চিৎকার করে উঠল, 'এ শালা নিগঘাত গণশা আর ফটকের কাণ্ড।'

ত্যাবড়া বলল, 'তা ছাড়া? কিন্তু আগে চল্। গাড়ি হাঁটিয়ে নিয়ে চলে যাই, দু মিনিট লাগবে। ওরা স্বীকার যাবে না, তুই সবাইকে শুনিয়ে, আচ্ছা করে খিস্তি দিবি।'

দেবে না, দেওয়া শুরু হয়ে গেল।

(ক্রমশ)
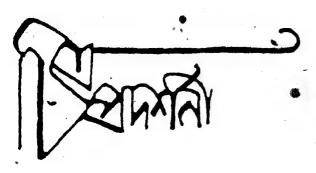
অনেক সময়ে দেখা যায় যে অপরিচিত হলেও দু' একজন শিল্পী প্রথম প্রদর্শনীতেই শিল্পরসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মৃণাল ঘোষ তাঁদের মধ্যে একজন। অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে আয়োজিত তাঁর প্রদর্শনীতে ছবি, কাঠখোদাই তথা ভাস্কর্য
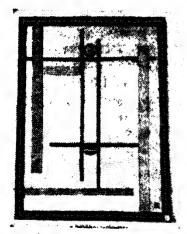
কম্পোজিশন —মৃণাল ঘোষ

ও হাতে-তৈরী বিভিন্ন শিল্পকর্মের ৩১টি নিদর্শন দেখা যায়।

মৃণাল ঘোষ আনুষ্ঠানিকভাবে কোথাও শিল্পবিদ্যা শেখেননি। বাল্যকাল থেকেই ছবি আঁকার প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল ও নিজ হাতে ছোটখাটো নানা জিনিস তিনি তৈরী করতেন। পরে তিনি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনস্টিটিউট থেকে কারিগরী শিল্পে ডিপ্লোমা লাভ করেন। বর্তমানে তিনি নরেন্দ্রপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যায়তনে শিক্ষক হিসাবে কাজ করছেন।

শিল্পীর বিভিন্ন কাজ দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, প্রধানত তিনি কারিগর শিল্পী। সাধারণ শিল্পীর মত তিনি কাগজ বা ক্যানভাসের ওপরে রঙ ব্যবহার করেননি। বালি, সিমেন্ট, মোম, কাচ, কয়লার গুঁড়া, নারিকেলের মালার উপরাংশ, চট প্রভৃতি উপাদান ব্যবহার করে রূপনাক্ষেত্র তৈরী করেছেন ও তার ওপরেই তেলরঙ সহকারে প্রয়োজনমত নানা আকার ও রূপের সৃষ্টি করেছেন। বিভিন্ন প্রয়োগরীতি দেখে মনে হয় তিনি কেবল পরীক্ষা করে গেছেন—তাই কি কম্পোজিশন বা কি কাঠখোদাই নিদর্শন দেখে তাঁকে শ্রেণীভুক্ত করা চলে না। তবে কাজ দেখে বিশ্বাস হয় যে কারিকর-শিল্পীর প্রতিভা আছে ও তিনি রসোত্তীর্ণ বস্তু সৃষ্টি করতে পারেন। কম্পোজিশনগুলির মধ্যে কয়েকটি বিমূর্ত জাতীয়। লম্বমান রেখাদ্বারা তিনি রচনাক্ষেত্র বিভক্ত করেছেন ও সামান্য লাল রঙের বিন্দুর মধ্য দিয়ে তিনি নারীর মুখের সংকেতিত প্রতীকের অবতারণা করেছেন, যেমন কম্পোজিশন ৪। দু' একটির মধ্যে যেন একটি স্থাপত্যরূপ ফুটে উঠেছে সিঁড়ি। কয়েকস্থলে তিনি কালো জমিয়ে ফেলেছেন ও পরে তার ওপর লাল, কালো, সাদা ও বেগুনী রঙ বুলিয়ে বিচিত্র আকারের সৃষ্টি করেছেন, যথা কম্পোজিশন ১৫। সব কাজটি রসোত্তীর্ণ হয়নি, তবে পরীক্ষা প্রচেষ্টা হিসাবে নজরে পড়ে। হস্তশিল্পের বিষয়েও এই কথা বলা চলে। এখানেও তিনি কাঠ, সিমেন্ট, নারকোলের আবরণ প্রভৃতি ব্যবহার করেছেন। ঢালাই অপেক্ষা খোদাইয়ের সংখ্যাই অধিক, সেই সঙ্গে নতুনতম কোনও বস্তু তৈরী করার প্রয়াসও বোঝা যায়। এখানেও গঠনরীতি বিমূর্ত, সমধিমূর্ত যা সরল। ভাস্কর্য নিদর্শন হিসাবে দুটি কাজ অনেকের ভাল লাগে—সি ও লাভ। প্রথমটিতে শিল্পী উপবিষ্ট কোনও নারীর সমগ্র সংশ্লিষ্ট আকারটিকে তিন ভাগে বিভক্ত করে পৃথক পৃথক তিনটি অংশের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয়টিতে একই কাঠখণ্ড খোদাই করে আলিঙ্গনরত নরনারীর রূপ ফুটিয়েছেন—যদিও নিম্নভাগ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হলে এটির আয়তনিক সমতা নির্ভুল হত। ১৩ নং-এ প্রাচীন লোকচিত্রের আভাস পাওয়া যায়। আরও একটি কাজ চোখে পড়ে—নেগেটিভ ফর্ম-প্রধান গার্ল। মৃণাল ঘোষ তরুণ, তাঁর কাজে অন্য শিল্পীর প্রভাবও দেখা যায়, তবে পরীক্ষা তথা সৃষ্টি করার উৎসাহ তাঁর অদম্য। নিয়মিতভাবে চর্চা করলে ভাস্কর্য শিল্পে তিনি প্রতিভার পরিচয় দিতে পারবেন বলে মনে করি।

*

কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়ম সম্প্রতি বাংলা দেশের প্রাচীন ভাস্কর্য সম্ভারের একটি ছোট প্রদর্শনীর আয়োজন করেন—উদ্বোধন করেন শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। পুরাতত্ত্ব তথা প্রাচীন ইতিহাস ও ভাস্কর্যশিল্পের বিশিষ্ট গবেষণাকেন্দ্র হিসাবে আশুতোষ মিউজিয়ম সুধীসমাজে সুপরিচিত। মাত্র পাঁচটি ভাস্কর্য নিদর্শন সংগ্রহ করে সুদীর্ঘ তেত্রিশ বছর পূর্বে স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই মিউজিয়ম স্থাপনা করেন- উদ্দেশ্য ছিল এটিকে দেশের অন্যতম পুরাতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করা। পাঁচটির স্থলে এই মিউজিয়মে প্রাচীন ভাস্কর্য, লোক, পঙ্খের ঝুরো ও প্রাচীরচিত্রের সংখ্যা আজ ৩৭,০০০। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরানো সেনেট

হলের স্থলে নির্মিত নতুন শতবার্ষিকী সৌধের প্রথম ও দ্বিতলে অনেকগুলি কক্ষে দেশের বহু পুরানো নিদর্শন সুন্দরভাবে রক্ষিত আছে। বর্তমান প্রদর্শনী উপলক্ষে কয়েক বার মিউজিয়মে গিয়েছিলাম ও অনুসন্ধিৎসু ছাত্রছাত্রীদের প্রদর্শনীকক্ষে দেখেছিলাম। প্রদর্শনীতে পূর্বাঞ্চল ও বিশেষ করে বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত ৩৬টি পুরানো ভাস্কর্য নিদর্শন দেখা যায়।

নদীমাতৃক বাংলা দেশের মাটির একটি বিশেষ গুণ ও নমনীয়তা আছে। প্রাচীন কাল থেকেই লোকে মাটির নানা পুতুল, খেলনা, দেবদেবী, জন্তু-জানোয়ারের মূর্তি তৈরী করত। সুতরাং পুরাকালে তৈরী ছোট বড় নানা মূর্তি ও নিদর্শন দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিল—এবং হয়ত এখনও আছে। অনুসন্ধান ও গবেষণা প্রসঙ্গে এ জাতীয় বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় ও পরে এই মিউজিয়মে সেগুলি সযত্নে রক্ষিত হয়। পাথরে খোদাই করা নানা মূর্তির নিদর্শনও বাংলা দেশে পাওয়া যায়, এগুলির অধিকাংশই ১০ম ও ১১শ শতকে রচিত। রাজমহল ও গয়া থেকে আনীত কালো পাথরের ব্যবহারও তখন প্রচলিত ছিল। যেসব অজ্ঞাতনামা ভাস্কর কারিকর মাটির নানা মূর্তি খোদাই করতেন তাঁরা বা তাঁদের বংশধরগণ পরে পাথর কাটার বা খোদাই করার কৌশল আয়ত্ত করেন। প্রদর্শনীতে অতি প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতকে রচিত নানা ভাস্কর্য নিদর্শন তথা মূর্তি দেখা যায়। নিদর্শনগুলির অধিকাংশই সম্পূর্ণ নয়, অনেক ক্ষেত্রে অঙ্গ বিশেষ ভগ্ন দেখা যায়। তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে সেগুলি মৌলিক। প্রথমেই মুদ্রার মত ছোট্ট একটি সীল (কাদা)-এর ওপর খোদিত সূক্ষ্ম লড়াইরত দুটি মূর্তি অনেকের কৌতূহল জাগায়। মূর্তিগঠনে যে প্রাচীনকালের ভাস্কর শিল্পিগণ পটু ছিলেন তা চন্দ্রকেতুগড়ের (২৪ পরগণা) টর্সো, (মৌর্য সাম্রাজ্যকাল), বনগড়ের (পশ্চিম দিনাজপুরে) প্রথম শতকে গঠিত নারীমূর্তি, পান্না র (মেদিনীপুরে), নারীর মুখমণ্ডল (৫ম শতক), গঙ্গারামপুরের (পঃ দিনাজপুরে), গজলক্ষ্মী (পাথর)র (৯ম শতক), মূর্তি দেখে বোঝা যায়। উত্তরকালে ভাস্কর শিল্পিগণ গঠন ও কারুকার্যে যে ব্যুৎপত্তি-লাভ করেছিলেন তার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়-সরস্বতী (সুন্দরবন, ১০ম শতক), কার্তিক (কালিগ্রাম, রাজশাহী, ১১ শ' শতক), গোপাল (কাঠ, কামসাট, মালদহ, ১৬ শ' শতক) ও বিশেষ করে বিষ্ণু জটারদেউল, ২৪ পরগণা, ১০ম শতক) ও নারীর মুখমণ্ডলের (কালো পাথর, অগ্রাদিগুণ, পঃ দিনাজপুরে, ৯-১০ম' শতক) অপরূপ গঠনশৈলী ও খোদাই কাজ

নারীর মুখমণ্ডল (কালো পাথর—অগ্রাদিগুণ, পশ্চিম দিনাজপুর, ৯ম-১০ম শতক
[আশুতোষ মিউজিয়মের সৌজন্যে]

দেখে। তা ছাড়া প্রদর্শনীতে অষ্টধাতুর নানা নিদর্শন দেখা গেল—যেমন আদিনাথ (পুরুলিয়া, ১০ম শতক), বিষ্ণু (সাগরদিঘি, মুর্শিদাবাদ, ১১ শ' শতক) ও হাতীর রথের ওপর স্থাপিত লক্ষ্মী-সরস্বতীর যুগলমূর্তি (মুর্শিদাবাদ, ১৮ শ' শতক)। সমকালীন পোড়ামাটির নমুনার মধ্যে পাঁচকুড়ার (বাঁকুড়া) মনসামেধ অনেকেরই চোখে পড়ে। ছাত্র ও জনসাধারণের আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা লক্ষ্য করে মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষ প্রদর্শনীর মেয়াদ বাড়িয়ে দিয়ে সকলের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

*

সরকারী আর্ট কলেজ কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি কলেজের স্থায়ী গ্যালারীতে চতুর্থ ও পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের আঁকা বিভিন্ন স্কেচের একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। সমকালীন চিত্রকলার বিভিন্ন অঙ্কন রীতির চাপে স্টাডি বা স্কেচের অল্প নিদর্শন আজকাল প্রদর্শনীতে দেখা যায়। কলেজ কর্তৃপক্ষ এ জাতীয় প্রদর্শনীর প্রথম অনুষ্ঠান করে একত্রে কয়েকটি স্কেচ উপভোগ করার সুযোগ দিলেন।

স্কেচগুলি জলরঙ ও কালিকলমে আঁকা এবং অধিকাংশই ইমপ্রেশানিস্টিক, যদিও দু-একটি রিয়ালিস্টিক স্টাডিও দেখা গেল। বিষয়বস্তু শহর ও পল্লীর বিভিন্ন অংশ বা বিশেষ কোনও দৃশ্য। ছবিগুলি দেখে বোঝা যায় যে, ছাত্রছাত্রিগণ নানা স্থানে গিয়ে আপন আপন রুচিমত স্কেচ করে থাকেন এবং কাজের নমুনা দেখে জানা যায় যে, শিল্পী অধ্যাপকগণও এ বিষয়ে উৎসাহ দেন। নিদর্শনগুলির মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের অঙ্কন পদ্ধতি, তুলি চালনা ও পরিপ্রেক্ষিত-বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। যাঁদের স্কেচ বা স্টাডি প্রশংসাযোগ্য, তাঁদের মধ্যে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর আনন্দ গোপাল রায়, অনুপ মুখার্জী, সুভাষ বসু ও পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর বিশ্বপতি মাইতি, অমল বৈরা, দীপ্তি পাল, অনুকর্ণা বোস ও নীলিমা মুখার্জীর নাম উল্লেখযোগ্য।

*

শ্রীমতী নোবুকো সফ্‌ট পরিচালিত ইকেবানা (ইকেনোবো) ফ্লোর‍্যাল স্কুলের তৃতীয় বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও ন্যাশনাল টোব্যাকো কোম্পনীর উদ্যোগে অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে তৃতীয় ফুলসজ্জা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। জাপানী প্রথায় ফুলসজ্জা আজ এদেশে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে ও দেশের নানা স্থানে রুচিশীলা মহিলাগণ যত্নসহকারে এই সজ্জাবিন্যাস বিদ্যা শিক্ষা করছেন। প্রদর্শনীতে স্কুলের ছাত্রী ও শিক্ষাপ্রাপ্তা

স্কেচ —বিশ্বপতি মাইতি

HAZELINE
BEAUTY TALC
এখন পাবেন
দুই সাইজে
HAZELINE
BEAUTY TALC

যে", বাবা বললেন, "না, বাদ্যিগিরির দরকার নেই, চটিটাই দিব্যি আছে,' তারপর তোমার দিকে তাকিয়ে "তুমি বুঝতে পারোনি যে, ও তোমার কথা-মত আর চলবে না, তোমার হুকুম খাটবে না?"

তুমি শুনলে। আমি শুনলাম। যে-ক্ষণগুলো কাকে যেন ছিঁড়তে চায়, কিন্তু পারে না, না পারুক, কিন্তু সমস্ত জীবন ভেবেছি, তারা তখন নিজেরই ভিতরটাকে হিংস্রভাবে আঁচড়াতে থাকে কেন।

[খ]

দাদাকে মনে মনে বললাম, যাচ্ছি। তোমাকে প্রণাম করছি। কোথায় যাচ্ছি, কত দিনের জন্যে, জানি না। প্রণাম করছি। তুমি হাত বাড়িয়ে ছুঁলে, সেই স্পর্শে সাড়া ছিল না। বাইরে অন্ধকার, দূরে দূরে দু' একটা আলো। ওরা জেগে আছে, কিন্তু জানছে না কে চলে যাচ্ছে, তবু আশ্চর্য, শোক নেই, অন্তত বাইরে তার কোনও চিহ্ন নেই। এই পাড়াটা আমার যেন আর-এক মা, সে-ও সেদিন যেন, মা, তোমার মতই হঠাৎ-পাথর, স্তব্ধ। সোজাসুজিই বলে দিই,

আমার বুক ঠেলে কান্না, ভয় উঠে আসছিল। অন্ধকার হলেও আমার চেনা রাস্তা, এর প্রত্যেকটা ভাঙা-চোরা-গর্ত আমি জানি, তবু হোঁচট খাচ্ছি, আর আগে-আগে হেঁটে বাবা তাড়া দিচ্ছেন, তাড়াতাড়ি চল্, তাড়াতাড়ি।

যাচ্ছি তো, কিন্তু এ ভাবে কেউ যায়, এই রকম চোরের মতো? কালও সকাল হবে, পাড়াটা কি তখন টের পাবে, কে ছিল, কে কে নেই, তাকে আর এখানে দেখা যাবে না? আমার পকেটটা একবার ছেঁড়া ছিল, তখন টের পাইনি, দুটো পয়সা পড়ে যায়। তবু তো আমি সেদিনই একটু পরে টের পাই, হারানো পয়সা দুটো আঁতি-পাঁতি করে খুঁজি! এই পাড়াটায় কি ততটুকু সাড়াও পড়বে না, এদিক-ওদিক চোখ মেলে আমাকে সে খুঁজবে না! আমার কি দুটো পয়সার মত দামও না? কান্না পাচ্ছিল।

পাড়া ছেড়ে তাকালাম আকাশে, না, ওখানে ওরা আছে, হাজার-হাজার জ্বলজ্বলে চোখে একজনের চলে-যাওয়া দেখছে। সাহস পেলাম, ভরসা এল। যেখানেই যাই, ভয় কী। যেখানেই যাই না কেন, চোখ বুজে অবাক আকাশটাক বললাম, সেখানে তোমরা থেকো।

তুমি হয়ত বিছানায় লুটিয়ে ছিলে, অথবা গেঁথেই গিয়েছিলে দরজাটার, কবাটের মত, তুমি জানতে পারোনি, কত জনের কাছে সেদিন মনে মনে বিদায় নিতে নিতে যাচ্ছিলাম। এক-একবার এক-একজনকে বলি, আর সকলকে সরিয়ে দিয়ে বারবারই ভেসে ওঠো তুমি। তোমাকে কী বলব, তোমাকে কিন্তু কিছুই বলা হয় না।

সেই মজা কুয়োটা, রাস্তা যেখানে বাঁক নিতে গিয়ে পা পিছলে মাঠে পড়ল, মেঠো-রাস্তার মোড়ের পাহারা সেই ইঁদারায় ঝুঁকে পড়ে কথা বলা ছিল একটা মজা। ইঁদারায় কিছু ফেলে দিলে, টুপ করে ডুবে যায়, আর ওঠে না, অথচ তার বুকে মুখ রেখে যা-খুশি বলো, প্রত্যেকটা শব্দ সে দশগুণ ছড়িয়ে বাড়িয়ে উপরে ছুঁড়ে দেবে। চমৎকার সেই খেলাটা, হারানো কথা ফিরে পাওয়া, শেষ বারের মত খেলতে ইচ্ছা হল। ভাবলাম ওর বুকে মুখ ডোবাই, ডোবাই, ডুবিয়ে অনেকক্ষণ থাকি, শেষে হঠাৎ বলে ফেলি, 'আমি যাচ্ছি কিন্তু, আর আসব না।'

'আর আসব না,' মেঠো রাস্তাটা শর্টকাট, ওপারে স্টেশনের রাস্তার মুখেই যে অশত্থ গাছ, অন্ধকারে দূর থেকে যাকে বাবরি-চুল ডাকাত ভেবে [illegible] আর বিশ্বস্ত-পরিচিতের [illegible] সেই কথা বললাম।

কয়েকটা লাইন কেবলই মনে পড়ছিল, সেই সীতাহরণের জায়গাটা, সুর করে পড়তে পড়তে যেখানটায় গলা ধরে যেত, তোমার, আমার। এইখানেই সেই দীঘিটা, যার ওপারে সেই বাসাটা। আজ দুপুরেও গিয়েছি। মাথার কাছে রাখা গ্লাসটা থেকে এতক্ষণে তিনি নিশ্চয়ই জল খেয়েছেন? তিনিও কিছু জানেন না। তাঁর জ্বর কি এখনও আছে, না ছেড়ে গেছে? আমি ছেলে, তবু নিজেকে ভাবছিলাম ওই জানকী। সীতা তো যেতে যেতে, কত-কী ছড়িয়ে ফেলে-ছিল, যাতে চিহ্ন থাকে, যাতে রাম-লক্ষ্মণ জানতে পারে, চিনতে পায়, কিন্তু, হায়, কাঁকন-কেয়ূর কিছুই তো আমার নেই, আমি কোন্ চিহ্ন রেখে যাব?

বাবা একটু এগিয়ে, আমি একটু পিছিয়ে, এক সেকেন্ড দাঁড়ালাম। পকেটে ক্লিপ-লাগানো স্টাইলো-কলম, সুধীরমামা দিয়েছিলেন, টুপ করে সেটাকে ফেলে দিলাম। রাস্তার ধারে। বাবা ধমক দিলেন, "কী হল, পা চালিয়ে আয়," ফের তাড়াতাড়ি চলতে থাকলাম। খুব আস্তে আস্তে কাকে যেন বলছিলাম, "ওঁর যেন জ্বর সেরে গিয়ে থাকে, রোজ 'মর্নিং ওয়াক' করা তো ওঁর অভ্যাস, কালও খুব সকালে যেন বেরিয়ে পড়েন। যেন দেখতে পান। ওঁরই দেওয়া জিনিস তো, নিশ্চয়ই চিনতে পারবেন কলমটাকে, কুড়িয়ে নেবেন। কলমটা সব বলে দেবে, সুধীরমামা জানবেন।

[গ]

চারপাশে সব চুপচাপ, নিথর, কিন্তু স্টেশনটা সরগরম। আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে কারা সব শুয়ে আছে, গোটা দুই ছ্যাকরা গাড়ি, আর-একটা সেই কাপড়ের ঘোমটা-দেওয়া ট্যাক্সি, যেটা গাড়ি এলেই যত পারে প্যাসেঞ্জার লুঠ করে আমাদের এই মফস্বলের শহর থেকে জেলাসদরের দিকে ধোঁয়া ধুলোর গা-ঢাকা দিয়ে ছুটতে থাকে। জেলা-সদরে রেল নেই।

তখনও গাড়ি আসেনি, আমরা গেলাম, আর ঢং ঢং করে প্রথম ঘণ্টা পড়ল। তার মানে গাড়ি আসতে এখনও মিনিট পনেরো দেরি। গ্যাসের আলো জেলে বুড়ো পানওয়ালা পান সেজে চলেছে, গাড়ি এলেই ছুটবে প্ল্যাটফরমে—পান-বিড়ি-সিগ্রেইট—আমি ওর গলা ফার্স্ট-ক্লাস নকল করতে পারি—বাবা টিকিট ঘরের সামনে দাঁড়ালেন, ভিতরে ঘটাং ঘটাং শব্দ, ঝোলানো টেলিফোনের একটা দিক কানে তুলে চোঙে মুখ রেখে স্টেশনবাবু দূরের কাকে বলছেন "হ্যালো হ্যালো", মাঝে মাঝে খটখট টরেটক্কা, নিস্তুপ চারধারের নদীতে এই স্টেশনটা ভার গম্‌গম, আলো, চাঞ্চল্য আর ব্যস্ততা নিয়ে চরের মতো জেগে আছে।

বাইরে প্লাটফরমটা অনেকটা ঠান্ডা, পড়ে-থাকা পাথরে বাঁধানো, উপর দিয়ে কালো একটা ওভার-ব্রিজ, ওই ভারী জিনিসটা বুকে নিয়েও সে নির্বিকার, সারকাসে পালোয়ানের বুকে অনায়াসে নেওয়া যেন প্রকাণ্ড এক হাতি। প্ল্যাট-ফরমের সীমানার ঠিক শেষে সিগন্যালের খুঁটি, টিমটিমে আলো, অন্ধকারে হঠাৎ-উঁচু, যেন ফশ্ করে তারা হয়ে উঠে যেতে চাইছে আকাশে, কার্তিক মাসের আকাশ-প্রদীপও যেমন চায়, কিন্তু পারে না, এই সিগন্যালের আলোগুলোও পারছে না, ইচ্ছেটা সামলে চকচকে চোখে চেয়ে আছে।

যে-ল্যাম্পপোস্টগুলোর কাছে স্টেশনের নাম লেখা তারই একটার নিচে দাঁড়ালাম, পাশে একটা করবী গাছের ঝাড়, খুব নিচু

হয়ে মুরে আস্তে আস্তে নিশ্বাস ফেলছে, সেই হাওয়ায় হালকা একটা গন্ধও বেশ টের পেলাম।

বাবার মুখটা ঠিক দেখতে পাচ্ছি না, যদিও তিনিও পাশেই দাঁড়িয়ে, কিন্তু মুখ অন্য দিকে ঘোরানো, ওই দিক থেকেই মুকি গাড়ি আসবে, তাই মুখটা দেখতে পাচ্ছি না, অস্পষ্ট, অন্ধকার, সেই ফেরানো মুখ থেকে, সহসা টের পেলাম, কী আওয়াজ। কান পাততেই বোঝা গেল, একটা জিজ্ঞাসা, আমাকেই।—"আমাকে তোর কী মনে হচ্ছে রে? বদরাগী, খেয়ালী, তাই না? তোকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছি।"

হঠাৎ মুরে দাঁড়িয়ে বাবা চেপে ধরেছেন আমার মুঠি, ওঁর হাত কাঁপা কাঁপা, আমারও শরীর কাঁপছে। এ আলাদা একটি মানুষ, একেবারে আলাদা গলা। আমি চিনি না। ওই মায়াবী মনোরম আলোর অভিসারী সিগন্যালটা সাক্ষী রেখে তিনি কি বদলে গেলেন। এখনও ঠিক বুঝি না সেই মুহূর্তে ওঁর ভিতরে ভিতরে কী ঘটছিল, কেন হাত কাঁপছিল শক্ত সমর্থ মানুষটার, আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন জেনেও কেন, আমরা দুজনে যেই একলা অমনই অন্য লোক হয়ে যেতে চাইছিলেন

"আমাকে তুই চিনিস না। আগে দেখিসনি, দেখলেও মনে রাখিসনি। বল্ তো আমি কে?"

"বাবা তো।" পুতুলের মত বললাম।

"কিন্তু কী করি, আমি কে?"

কী করেন, তার স্পষ্ট ধারণা ছিল না, তাই যা মনে এল তাই বলে ফেললাম, "আপনি পালা লেখেন, না?"

"পালাগান?" করবীর ঝাড়ের নিশ্বাসের সঙ্গে মিশে আর-একটি নিশ্বাস নিঃশব্দ হল।—"লিখি। কিন্তু সে-কথা ক'জন আর জানে। কে পড়ে? দু'একজনকে ডেকে শোনাই, এই যা। নইলে সব তো বাক্স-বন্দী হয়েই রইল। অনেকগুলোর পাতা হলদে। ছিঁড়ে আসছে।"

"প্লে হয় না?" বলে ফেললাম।

"কারা করবে। দল চাই, টাকা চাই।"

হঠাৎ যেন মাথায় বুদ্ধি এল, বললাম, "বাবা, বই ছাপালে তো অনেক টাকা হয়, এই পালাগুলোকে বই করা যায় না?"

"বই, মানে ছাপানো বই?"

আমার কাছে তখন বই মানেই তাই। বাবা বললেন, "দূর। ছাপাতেও অনেক টাকা চাই। টাকা কোথায় আমার? টো-টো করে ঘুরি, কোথাও বাঁধা পড়ি না, হাতে যা আসে সব খরচ হয়ে যায়, সারা জীবনে কিছু কি আর জমাতে পারলাম!" বাবা টেনে টেনে বলছিলেন, বলার সময় কোথায় যেন ওঁর লাগছে, সেই কষ্টটা আমার গায়েও হাওয়ার ঝাপটার মত লাগছিল।—"জমা কিছু নেই নেই। কেউ চেনে না, নিজে থেকে অন্য কে এ সব আগ্রহ করে ছাপবে? এ-সব ব্যাপার তুই জানিস না। আমি—আমি শুধু লিখব, লিখে যাব। ছাপা হবে না।"

আমারই মুখে চোখ রেখে কথা বলছেন, বাবার মুখ এখন আর ঘোরানো নেই, সবটা দেখা যাচ্ছে, ভারী গাল, গলা, ভাঁজ ভাঁজ চিবুক, জোড়া ভুরুর মাঝখানে হঠাৎ-প্রদীপ্ত দুটি চোখ, তিনি যা বলছিলেন, এখনও শুনতে পাচ্ছি।

—"ছাপা হবে না, কিন্তু থাকবে, রেখে তো যাব। তুই বড়ো হয়ে পড়ে দেখিস। আর—আর" ওঁর স্বর শুকোতে দেওয়া কাপড়ের মতো তারে কাঁপছিল, "আর—আর, তোকে যদি মানুষের মতো মানুষ করতে পারি, যদি কোনোদিন টাকা হয়, তবে তুই ছাপা দিস।"

খুব ক্লান্ত, তাই বাবা থেমে বুক ভরে বাতাস নিলেন।—" স্মৃতি, কী রকম জানিস, তুই কি বুঝবি? পড়ে থাকা এক টুকরো কাগজ কিংবা ছেঁড়া তবু হঠাৎ কখনও কাজে লাগে। এই পালাগুলোও তোমেছ। আজ কোনও দরকার নেই, তাই কেউ

দেখছে না, কিন্তু, বলা তো যায়, অনেক, অনেক দিন পরে কারও হয়ত নজর পড়ল, আজ যা খারিজ করছে, হঠাৎ কখনও পৃথিবীর কাছে তাই দরকারী হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু তোলা থাকবে, তবে তো?"

তখন দ্বিতীয় ঘণ্টাটা বাজছে, তাড়াতাড়ি খুব তাড়াতাড়ি, গাড়ি এসে পড়ল বলে, বাবার মূর্তি অসহায়, কিন্তু চোখ ধক্-ধক্ জ্বলছে, ইনজিনের গমগমে আগুনকে ওইভাবে জ্বলতে দেখেছি, খুব তাড়াতাড়ি, লোহার যে-প্রকাণ্ড ডাণ্ডাটা সামনের চাকাগুলোকে ঠেলে, সেইভাবে, অস্থির অথচ সহসা শক্তিমান বাবা ব্যাকুল কণ্ঠে বলছেন, "কথা দে, যে-দিন পারবি, সে-দিন তুই লেখাগুলো ছাপবি?"

'কথা দে, কথা দে'—ওঁর মা-কাটা নখগুলো আমার হাতে ফুটছে, সেই যন্ত্রণায় নয়, এমনিই কেন জানি আমি চিৎকার করে উঠতে চাইছি, ধস ধস, ধস ধস, কয়লার ধুলোর মিটমিটে আলোগুলো চোখ বুজে ফেলল, গাড়ি এসে পড়েছে। ঠেলাঠেলি, কামরায় কামরায় বন্ধ দরজায় ধাক্কা, একটা দরজা বুঝি খোলা পাওয়া গেল হুড়মুড় হুড়্‌হুড়্, সবাই ঢুকতে চাইছে, আমার হাত বাবার মুঠিতে, সবার শেষে উঠে তিনি দরজার হাতল ধরে হাঁপাচ্ছেন, আমিও উঠতে যাব, তখনই শুনলাম বাবা বলছেন, "থাক।"

থাক, মানে উঠব না? ওঁর হাত আলগা হয়ে গেছে, জানালা দিয়ে আমার বাক্‌সটা ফের আমার হাতে তুলে দিলেন। স্তম্ভিত আমি কী শুনছি?—"তুই থাক।" গলা বাড়িয়ে বাবা যেন আমার কানে কানে বলছেন, "আমি একটা ভুল করতে যাচ্ছিলাম। আমি বাউণ্ডুলে, মুসাফির, ঘুরে ঘুরে বেড়াই, তোকেও তাই করতে চাইছিলাম। তুইও আমার মতো হলে—কী করে ওগুলো ছাপবি?"

যেন আমি চলে গেলে ওই বইগুলো ছাপবে কে, সেইজন্যেই বাবা আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে যেতে চাইছেন। আর কোনও কারণ নেই।

ইনজিন জল নিচ্ছিল, গাড়ি ছাড়তে দেরি হচ্ছিল, কখন দেখি উনি টুপ করে নেমে এসেছেন নিচে। আমার কাঁধে হাত রেখে বলছেন, "জীবনে কাউকে সুখী করতে পারিনি, তোর মাকেও না। তোকেও কেড়ে নিলে ওর থাকবে কী। দিতে না-ই পারি, কিন্তু নেব না। তুই থাক, তুই ফিরে যা।"

কী-রকম করুণ একটা হাসি ওঁর মুখে জড়িয়ে যাচ্ছিল, সিগন্যালের রক্তচক্ষু তখনই নরম হয়ে গেল, উনি আস্তে আস্তে আবার পা-দানিতে উঠলেন। ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, "মাকে বলিস—কী বলবি? তোর খাম-খেয়ালী বাবার আর-একটা কাণ্ড, না? না-হয় তুই বলে দিস। কিন্তু এত রাতে তোর এক-একা ফিরতে ভয় করবে না?"

ভাঙা গলার একটা বাঁশি ওঁর কথাগুলোর উপরে জোয়ারের মত আছড়ে পড়ল, সব ডুবে যাচ্ছে, এই লোকজন, ওই ওভারব্রিজ, ধোঁয়ার কুয়াশায় ঢেকে সব পলকে ঝাপসা। বিরাটকায় একটা অজগর ফোঁস ফোঁস করতে করতে চলেছে, বাবা তখনও দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন কি না জানি না, চোখে কয়লার গুঁড়ো লাগছে দেখব কী করে, ওঁকে দেখতে পাচ্ছি না। টিনের বাক্‌সটা হাঁটুতে লাগছে ঠকঠক করে, আমি গেটের দিকে এগোতে থাকলাম।

ভয়, দূর, ভয় কোথায়! কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম, জীবনে সেই বোধ হয় আমি নির্ভয়ে প্রথম একা এতটা পথ পাড়ি দিলাম, এত দীর্ঘ পথ পার হলাম এত তাড়াতাড়ি।

একটা গোটা দিন আমাকে একটা বলের মত লোফালুফি করে ছেড়ে দিল। ভয় ছিল না।
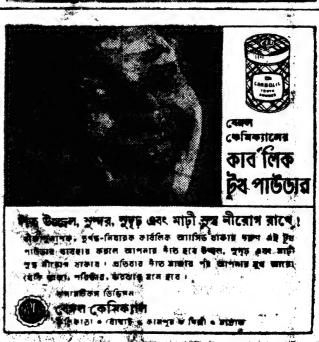
[ক্রমশ]

ক্রাকাতোয়া কি সুপ্ত?

এক পাশে জাভা, আর এক পাশে সুমাত্রা। তাদের যোগ করে রেখেছিল সুন্দ প্রণালী। তারই মাঝখানে দাঁড়িয়ে ক্রাকাতোয়া। ক্রাকাতোয়া এক সময়ে ছিল একটি সম্পূর্ণ দ্বীপ। যার সবটাই আগ্নেয় পর্বতে তৈরি। সমুদ্রের তলা থেকে কখন এবং কি ভাবে সেই বিস্তীর্ণ পর্বতশ্রেণী মাথা উঁচু করে উপরে উঠে এসেছিল তার হিসেব হয়ত ভূ-তত্ত্ববিদদের জানা। তবে পরবর্তীকালে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে সেই একক দ্বীপ খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রচুর ভাঙা-গড়ার পর ১৮৮৩ নাগাদ সেখানে সমুদ্রের বুকের অনেক উপরে তিনটি সূচলো পাহাড়ের চূড়া চোখে পড়েছিল। পৃথকভাবে দাঁড়িয়ে থাকলেও এদের পরস্পরের মধ্যে একটা সংযোগও ছিল। এদের নাম রাখা হয় রাকাতা, দানান এবং পেরবেওয়াতন। অবশ্য এর সঙ্গে আরও ছোট বড় অনেকগুলি চূড়া সাগরের বুকে ভেসে ক্রাকাতোয়ার সীমান্ত রেখা তৈরী করেছিল। এই নিয়েই দ্বীপটি কতকাল নিশ্চুপ ঘুমিয়ে ছিল, কে জানে?

এল আগস্ট ২৬, ১৮৮৩-এর অপরাহ্ণ। হঠাৎ চারদিক প্রকম্পিত করে ক্রাকাতোয়ার বুকে শুরু হল একের পর এক বিস্ফোরণ গর্জন। পরদিন সকাল দশটা বেজে কুড়ি মিনিটের সময় সেই বিস্ফোরণ সপ্তমে গিয়ে উঠল। আর সেটাই মোক্ষম মার। পৃথিবীতে এত প্রচণ্ড বিস্ফোরণের নজির বড় একটা নেই। মুহূর্তে দানান এবং পেরবেওয়াতান-এর সূচলো ডগা দুটি অদৃশ্য হয়ে গেল। পরিবর্তে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল ছোট বড় অজস্র পাথরের টুকরো। দ্বীপটির কোন কোন অংশ যেখানে জলের উপর চাল্লিশ শ' ফুটের মত মাথা বের করে ছিল সেই অঞ্চলগুলি তখন ন শ' ফুট সমুদ্রের নীচে চলে গেছে। সুদূরে তিন হাজার মাইল দূরে ভারত মহাসাগরে অবস্থিত রডরিগেউয়েস দ্বীপ থেকে এই বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছিল। এবং এর ফলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যে চাপের পরিবর্তন ঘটে তা সর্বত্র ব্যারোমিটারে ধরা পড়েছিল। এই সঙ্গে দারুণ জলোচ্ছ্বাস দেখা দেয়। একটা হিসেবে বলা হয়েছে, পশ্চিম জাভা এবং দক্ষিণ সুমাত্রার নিম্নভূমি অঞ্চলে এর ফলে প্রায় ৩৬,৫০০ জন লোক প্রাণ হারায়।

বিস্ফোরণের সময় ছাই এবং ছোট-বড় পাথরের টুকরো মাইলের পর মাইল ছড়িয়ে পড়ে এবং সেই সঙ্গে পৃথিবীর সর্বত্র বায়ুমণ্ডলে সূক্ষ্ম ভস্ম কণাও। ভাসমান অবস্থা থেকে মাটির বুকে নেমে আসতে এই ভস্মের প্রায় দুই বছরের মত সময় লেগেছিল। আর এই সময়ে সকলেই লক্ষ করেছেন সূর্যাস্তের মুহূর্তে প্রতিদিন আকাশ কেমন যেন বিচিত্র বর্ণে রঙিন হয়ে উঠেছে। সূর্যের চার পাশে তখন ঘিরে থাকতো লালচে-বাদামী রঙের একটা চক্র, ঠিক সৌর সভার মত। এর নাম বিশপ-চক্র। এই চক্র বায়ুমণ্ডলে ভাসমান ভস্ম-কণার অস্তিত্ব সম্পর্কেই যে শুধু বিজ্ঞানীদের একটা ধারণা দিয়েছিল তা নয়, সেই কণার আয়তন সম্পর্কেও বেশ কিছু তথ্য জুগিয়েছিল। জানা গেছে, এই আয়তন এক ইঞ্চির দশ হাজার ভাগের এক ভাগ। ভূবিজ্ঞানীরা দেখেছেন, ১৮৮৩-র পর থেকে ক্রাকাতোয়া আবার নতুন করে নিজেকে তৈরি করে নিচ্ছে। বসে যাওয়া এবং ভেঙে যাওয়া অঞ্চল আবার নতুন করে পুনর্গঠিত হচ্ছে। তার নীচে সমানে চলেছে আগ্নেয়গিরির কার্যাবলী। আশ-পাশের ছোটখাটো জ্বালামুখ থেকে মাঝে মাঝে ছাই-এর স্তূপ বেরিয়ে এসে চার-পাশটা গড়ে নেওয়ার কাজের শেষ নেই।

বস্তুতঃ, শুধু ক্রাকাতোয়াই নয়। ক্রাকাতোয়ার মত বহু নিমজ্জিত দ্বীপ এর আগে প্রশান্ত মহাসাগরের বহু অঞ্চলে মাঝে মাঝেই মাথা চাড়া দিয়ে ভেসে উঠেছে, বিস্ফোরণের ফলে অদৃশ্য হয়েছে, আবার নতুন করে ভেসে উঠেছে। যেমন ধরুন, [illegible] দ্বীপ। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর অবস্থিত ২০·৪ ডিগ্রী দক্ষিণ এবং ১৭৫·৬ ডিগ্রী পশ্চিমে অবস্থিত এই দ্বীপটি হঠাৎ এক বিস্ফোরণের ফলে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ১৯২৭-এর ৪ অক্টোবর পর পর কতকগুলি বিস্ফোরণের পর চকিতে দ্বীপটি আবার ভেসে উঠল সমুদ্রের উপর। অ্যালেউটিয়ানের বোগোস্লোফ দ্বীপ, (৫৬ ডিগ্রী উত্তর এবং ১৬৮ ডিগ্রী পশ্চিমে) এর কথা সর্বপ্রথম শোনা যায় নাবিকদের মুখে, ১৮২৬-এ। তারপর কখনও এটি অদৃশ্য হয়েছে, আবার কখনও বা সাগরের বুকে ফুটে উঠেছে। আর সেই থেকেই সমানে চলেছে এই লুকোচুরি খেলা। ফলে বিপদ হয়েছে যাঁরা মানচিত্র তৈরি করেন, তাঁদের।

বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভূ-বিজ্ঞানীরা সর্বত্র আগ্নেয়গিরির উপর নজর রেখে চলেছেন। বিশেষ করে ক্রাকাতোয়ার মত আগ্নেয়গিরি, যারা সমুদ্রের নীচে থেকে মাথা বাড়িয়ে উপরে উঠে আসে, অবশেষে বিস্ফোরণের ফলে অদৃশ্য হয়। তাদের মতে আগ্নেয়গিরি বা আগ্নেয় দ্বীপই বিশেষজ্ঞদের চোখে একটা ভূ-তাত্ত্বিক বিবর্তনের স্পষ্ট ছবি তুলে ধরতে

ক্রাকাতোয়া নতুন করে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিজেকে আবার তৈরি করে নিচ্ছে। ১০০০ ফুট দূরে থেকে এই ছবিটি তোলা হয় জানুয়ারি ১২, ১৯৬০

সাহায্য করে। মৌলিক গবেষণা ছাড়াও আরও দুটি দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। এক, কখন, কোথায় এবং কিভাবে আগ্নেয়গিরি সক্রিয় হয়ে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে আগে থেকে সেটা নির্ণয় করা। এতে করে বহু জীবন এবং প্রচুর সম্পত্তি অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে। দুই, আগ্নেয়গিরির প্রাকৃতিক শক্তিকে বশ করে মানব কল্যাণে কাজে লাগান। যে সমস্ত আগ্নেয়গিরির বিভিন্ন রন্ধ্রপথ ধরে প্রচণ্ড চাপ এবং উষ্ণতা নিয়ে জলীয় বাষ্প নির্গত হয়, কোন কোন দেশ সেই চাপ বা উষ্ণতার সাহায্যে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের কিছু কিছু কাজ এরই মধ্যে শুরু করে দিয়েছে। দেখা গেছে, আগ্নেয়গিরির গলিত লাভা থেকে যে সমস্ত গ্যাসীয় পদার্থ পাওয়া যায় তার আয়তনের প্রায় শতকরা নব্বই ভাগই জলীয় বাষ্প। তারপরেই কার্বন ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন, গন্ধকের বাষ্প এবং কিছু পরিমাণ কার্বন মনোক্সাইড, হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিনের সন্ধান। এছাড়াও আরও কিছু কিছু বায়বীয় পদার্থ পাওয়া যায় যা অনুপাতে খুবই নগণ্য। তবে সংগ্রহ করতে পারলে কখনও কখনও পরিমাণ বড় একটা কম হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে, ১৯১২ সালে আলাস্কার কাতমাই আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের ফলে যে সমস্ত পদার্থ নির্গত হয়েছিল তার মধ্যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডই পাওয়া যায় ১২৫০০০০ টন এবং হাইড্রো ফ্লোরিক অ্যাসিড ২০০০০০ টন। এছাড়াও আরও যে সমস্ত পদার্থ পাওয়া যায় তাদের কাজে লাগান যেতে পারে।

ভূতত্ত্বের দিক থেকে, কাকাতোয়া মোটেই সুপ্ত ছিল না। সম্ভবতঃ ভারত এবং প্রশান্ত মহাসাগরের বেশির ভাগ আগ্নেয়গিরি বড়ো দ্বীপপুঞ্জেই আছে। এরা নিয়ত ভূপৃষ্ঠে অনেক পরিবর্তন চালিয়ে যাচ্ছে। তা যাক। কারণ এদের সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করা প্রায় দুঃসাধ্যই বলা চলে। তবে হঠাৎ বিস্ফোরণ দিয়ে এই সমস্ত দ্বীপ যাতে কোন ক্ষতি করতে না পারে ওঁরা সেই চেষ্টাই করছেন। ওঁরা চেষ্টা করছেন এমন কোন পথ বের করতে যাতে করে ভবিষ্যতে এই ধরনের আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ বন্ধ করা যায়, অথবা পুরোপুরি না গেলেও কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করা যায়।

রাসায়নিক নির্বীজকরণ, ভারতীয় প্রচেষ্টা

তুলো এবং ঢেঁড়স গাছের শত্রু লাল রঙের এক ধরনের কীট দমন করার একটি চমৎকার পদ্ধতি বের করেছেন হাইদ্রাবাদের আঞ্চলিক গবেষণাগারের বিজ্ঞানী মোহম্মদ আলী খাঁ। জীব-বিজ্ঞানীদের ভাষায় এই কীটটির নাম ডাইসডেরকাস সিনগুলেটাস। এই পদ্ধতিতে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে পুরুষ কীটদের এমন ভাবে নির্বীজকরণ করা হয়, যাতে করে তার ফলে তাদের স্ত্রী-কীটদের সঙ্গে মিলন আকাঙ্ক্ষা মোটেই কমে না যায় অথবা তাদের নিজেদের আয়ুও না কমে যায়। এর জন্য যে রাসায়নিক বস্তুটি ব্যবহার করা হয়েছে তার নাম 'অ্যাফোলেট'। বয়স্ক পুরুষ কীটকে আটচল্লিশ ঘণ্টার মত এই বিশেষ ধরনের রাসায়নিক যৌগটির সংস্পর্শে রেখে দিলেই তারা পুরোপুরি নির্বীজ হয়ে পড়ে। এইবার সাধারণ বয়স্ক স্ত্রী-কীটদের এই নির্বীজকৃত পুরুষগুলোর সঙ্গে কোন আবদ্ধ পাত্রে কিছুক্ষণ আটকে রাখলে দেখা যায়, স্ত্রী-কীটরা যে ডিম পাড়ে তার সবগুলিই বন্ধ্যা।

আরও একটি অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেন মোহম্মদ আলী খাঁ। কিছু নির্বীজ এবং কিছু স্বাভাবিক বয়স্ক পুরুষ কীটদেরও যদি এক সঙ্গে সাধারণ স্ত্রী-কীটদের সঙ্গে সহবাস করতে দেওয়া হয় তা হলেও প্রায় সব ক্ষেত্রেই দেখা যায়, স্ত্রীরা যে সমস্ত ডিম পেড়েছে তার বেশির ভাগই নিষ্ফলা বা বন্ধ্যা। পরে দেখা গেছে, কৃত্রিম উপায়ে নির্বীজকৃত কীটগুলি স্ত্রীদের সঙ্গে মিলনের সময় অনেক বেশী তৎপর হয়ে ওঠে। এবং তাদের সঙ্গে লড়াই-এ অনির্বীজ পুরুষগুলি পেরে ওঠে না। অধিক সংখ্যক নিষ্ফলা ডিম পাড়ার এটাই অন্যতম কারণ। গবেষণাগারে পর পর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, কিছু সংখ্যক নির্বীজ পুরুষ যদি স্ত্রীদের সঙ্গে মিশতে দেওয়া যায় তাহলে অল্পদিনের মধ্যেই ভবিষ্যৎ বংশধরদের সংখ্যা দারুণ ভাবে কমে যায়। উন্মুক্ত স্থানে এবং বহিরাঙ্গনেও পরীক্ষাটি করা হয়েছিল। ফল একই পাওয়া গেছে। মোহম্মদ আলী খাঁর এই

গবেষণা পরিচালনায় সাহায্য করেন, ডঃ এন বি নাইডু এবং এর জন্যে ১৯৬৯ সালে তাঁকে পি এইচ ডি সম্মানে ভূষিত করা হয়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও নির্বীজিকরণ পদ্ধতিতে কীট দমনের ব্যাপারে চেষ্টা চলছে। প্রচলিত নিয়মে ডি ডি টি বা অনুরূপ কোন রাসায়নিক পদার্থ ছড়িয়ে কীটনাশের কাজ চালান হয়ে থাকে। এর ক্ষেত্রে তার অসুবিধেও ধরা পড়েছে অনেক। এক, অসাবধান হলে ঐ সমস্ত পদার্থ অন্যান্য প্রাণীরও ক্ষতি করে থাকে। দুই, বহু কীট এরই মধ্যে ঐ সমস্ত পদার্থের বিষক্রিয়া প্রতিহত করার ক্ষমতা অর্জন করে ফেলেছে। ফলে তারা ওদের বিশেষ কোন ক্ষতি করতে পারে না। তিন, কোন কোন রাসায়নিক পদার্থ কীটের ক্ষতি করলেও সেই সঙ্গে ফসলের উৎকর্ষ নষ্ট করে দেয়। কিন্তু নির্বীজিকরণ পদ্ধতিতে এ ধরনের কোন আশঙ্কা নেই। বরং এর দ্বারা কতকটা স্বাভাবিক নিয়মের মতই কয়েক পুরুষ ধরে ক্ষতিকর কীটগুলিকে নিষ্ফল করে দিয়ে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করা না গেলেও, সংখ্যায় অনেক কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

বিষ-বিজ্ঞান

হ্যাঁ, এ ব্যাপারগুলি নিয়ে এবার আর না মাথা ঘামিয়ে উপায় নেই। বিজ্ঞান আমাদের অনেক কিছুই দিয়েছে, সেই সঙ্গে হরণ করেছেও বেশ কিছু। বিজ্ঞান তথা যান্ত্রিক সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি জগতের উপর মানুষের আধিপত্য কতই না বেড়ে গেছে। মানব কল্যাণে তার অবদান কতটা, এ কথারই হয়ত হাজার-খানেক জবাব আজকের দিনে একজন স্কুলের ছাত্রের পক্ষেও গড় গড় করে বলে যাওয়া তেমন কোন শক্ত ব্যাপার নয়। কিন্তু ঠিক তারই পাশাপাশি অদৃশ্য দানবের মত অথবা রূপকথার গল্পের পরাক্রান্ত ভূত-এর মত যারা আজ মানব সভ্যতার প্রচণ্ড ধ্বংসকারী শক্তিরূপে অগ্রগামী বাহু মেলে ক্রমেই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে, একবার তাদের কথা ভাবুন? একবার ভেবে দেখুন, প্রচণ্ড বেগে ধাবমান জলরাশির সম্মুখে বাঁধ বাঁধিয়ে আমরা তার ধ্বংসাত্মক ক্ষমতাকে যেমন বাধা দিয়েছি, সেই সঙ্গে বেশ কিছু পরিমাণ প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎশক্তিও সংগ্রহ করছি। বিজ্ঞানের এই কল্যাণকারী অবদান নিঃসন্দেহে মানুষের কাছে এক পরম আশীর্বাদ। কিন্তু আর একটি দিকও দেখুন। সেই বাঁধ এক দিকে যেমন অফুরন্ত শক্তি যোগানে সমর্থ হয়েছে,

অধ্যাপক মরিস উইলকিনস। ১৯৬২-তে ...জ বিজ্ঞানের উপর মৌলিক গবেষণা... ইনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন

আর এক দিকে হাজার হাজার মাইল জুড়ে সৃষ্টি করেছে জলহীন শুষ্ক প্রান্তর। তার জল নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে অহেতুক অপ্রত্যাশিত অঞ্চলে বন্যার সৃষ্টি; সেই ফলে ফসলের ক্ষতি, লোকালয়ের যেমন ক্ষতি সেই সঙ্গে বাঁধ-ভাঙা ঐ উদ্বৃত্ত জল যত্রতত্র ছড়িয়ে পড়ে নিকাশের রাস্তা না পেয়ে এখানে সেখানে জমতে থাকে। আর হঠাৎ আবদ্ধ হয়ে পড়া সেই জলে ঝাঁকে ঝাঁকে বংশ বৃদ্ধি করে ফসল ক্ষতি-কারী কীট-পতঙ্গ।

এ তো গেল একটি মাত্র উদাহরণ।

সাম্প্রতিক কালে কিছু সংখ্যক চিন্তা-শীল ব্যক্তি বিজ্ঞান-অগ্রগতির বিভিন্ন ভয়াবহ দিক নিয়ে বেশ খানিকটা সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। এঁরা মনে করেন, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিদ্যা এখন যে হারে মানুষের কল্যাণ করে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে, তার চাইতে বরং ক্ষতিই বেশী করে চলেছে। শহরীয় সভ্যতাকে মোটরগাড়ি যেমন সচল করে রেখেছে, সেই সঙ্গে প্রচুর ধুলো, রাশি রাশি বিষাক্ত ধোঁয়া কোটি কোটি মানুষের ফুসফুস আজ ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। কীট নাশক ওষুধের কথাই ধরা যাক। এরা যেন ঠিক শাঁখের করাত। এরা কীট ধ্বংস করে, আবার অপ্রত্যক্ষভাবে খাদ্য-বস্তুকে বিষাক্তও করে। সেই সঙ্গে জলের যোয়ানির সঙ্গে সেই কীটনাশক রাসায়নিক পদার্থগুলি বড় বড় নদী এবং সমুদ্রের জলে মিশে গিয়ে জলজ প্রাণীরও ক্ষতি করতে শুরু করেছে। জৈব-রসায়ন-বিদদের মতে, ডি ডি টি বা অনুরূপ বস্তু যখন আবিষ্কৃত হয়েছিল তখন তার প্রত্যক্ষ ফলাফল অবশ্য খুবই ভাল লেগেছিল। কিন্তু ধীরগতি বিষাক্ত পদার্থের মত তাদের সুদূরপরাহত ফলগুলি খুবই ভয়াবহ। এরা ভবিষ্যতের খাদ্যশস্যকে বিষাক্ত করে তুলতে পারে, মাছ বা অনুরূপ জলজ প্রাণীদের ক্ষতি করতে পারে, এমন কি মাটির মধ্যেকার বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়ার

ক্ষতিসাধন করে 'আবহাওয়া মণ্ডলেরও পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

অধুনা প্রজনন এবং মনোবিজ্ঞানে যে সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা প্রয়োগগত ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞানের আধুনিকতার চরম মাপ কাঠি বলে পৃথিবীর হাটে দারুন মর্যাদা পেয়ে যাচ্ছে, তাদের পরিণতির কথা ভাবলে তো শিউরে উঠতে হয়? একজনের দেহ কোষ আর একজনের দেহে জুড়ে দেওয়া, একের হৃৎপিণ্ড অপরের দেহে, অথবা একজনের মস্তিষ্কের কোন বিশেষ মূল্যবান অংশটি আর একজনের মস্তিষ্কে প্রতিস্থাপন—প্রযুক্তির দিক দিয়ে এ সমস্ত ব্যাপার খুবই দুঃসাহসিক সন্দেহ নেই। কিন্তু তার পরবর্তী ফলাফলের কথা একবার অনুমান করুন। এ সমস্ত করতে গিয়ে তার কোষের সূক্ষ্মতম অংশ 'জিন'-এর যে স্বাভাবিক ধর্ম, তাও ব্যাহত, হতে পারে? স্ত্রী এবং পুরুষের জৈবিক মিলনের শেষ পরিণতি শুক্রকোষ এবং ডিম্বকোষের একত্রীকরণ হলেও, সেই বিশেষ মুহূর্তে একটি পুরুষ এবং নারীর মধ্যে যে অপরাপর দৈহিক এবং মানসিক অনুভূতি সক্রিয় হয়ে ওঠে তার সঙ্গে নতুন প্রাণী সৃষ্টির যে যথেষ্ট সম্পর্ক রয়েছে সে কথা মনোবিজ্ঞানীরা ,কন্তু অস্বীকার করেন না। কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি নিয়ে বর্তমানে যে তোড়জোড় চলেছে, তাতেও এই স্বাভাবিকতা কি বজায় রাখা যাবে? জনৈক বিজ্ঞানীর মন্তব্যঃ কে জানে, এ সব করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত আমরা না সরীসৃপের মত হয়ে পড়ি। বিশেষ করে জীব-রসায়ন

কলকাতার ইউনিভার্সিটি কলেজের কেলাসবীক্ষণ বিভাগের প্রাক্তন প্রধান ডঃ জেম কার্থেলিন লনসডেল। ২৮৫ বছরের প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত রয়্যাল সোসাইটির ১৯৪৫ সালে সর্বপ্রথম যে দুজন মহিলা রয়্যাল সোসাইটির ফেলো রূপে নির্বাচিতা হন, ডেম ক্যাথেলিন তাঁদের একজন।

বিজ্ঞান যে সমস্ত আশ্চর্যজনক গবেষণায় মানুষ হাত দিয়েছে, তাতে শংকিত না হয়ে পারা যায় না। জীবনের মৌল উপাদান ডি এন এ এবং আর এন এ-র রহস্য এখন তার কাছে অনেক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কৃত্রিম উপায়ে এদের তৈরি করাও সম্ভব হয়েছে। কে জানে, আগামী কয়েক দশকের মধ্যে কৃত্রিম জীবন সৃষ্টিও হয়ত সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। তখন? মানুষের হাতে সেই জীবন যে কোন নতুন ফ্র্যাংকেস্টাইন তৈরি করে বসবে না সে গ্যারান্টি এখন থেকেই কেউ কি দিতে পারেন?

প্রশ্ন উঠেছে, তথাকথিত মানবিক ধর্মের মূল্যায়ন. আজকের এই বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির সাম্রাজ্য কি সেইজন্যই এক পুরোহিতের মত শোনায় না? কারণ আজকের মানুষ বিজ্ঞানের দাস। বিভিন্ন যন্ত্রের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে তার হাবভাব পরিবর্তিত হচ্ছে, তার মননশীলতা ভিন্নতর হয়ে যাচ্ছে। বৃহৎ-যন্ত্রের সে অংশ হয়ে যাচ্ছে। আমরা মহাকাশ জয় করেছি, চাঁদে পদার্পণ করেছি। কিন্তু একবার ভেবে দেখুন, এই মহাকাশ বিজ্ঞানকে সাফল্যমণ্ডিত করতে গিয়ে কি বিরাট মূল্য দিতে হচ্ছে একজন মানুষকে। কত কোটি ডলারের জলাঞ্জলি পড়ল, কত কোটি ডলার ব্যয় হল, প্রশ্নটা এ নিয়ে নয়। অথবা, চাঁদকে পৃথিবীর প্রয়োজনে কতটা কাজে লাগান যেতে পারে, সেটাও নয়। শুধু ভাবুন, সেই মানুষটির কথা, পার্থিব জগতের হয়েও যার মধ্যে অপার্থিবের আকর বর্তমান। নভোচর হিসেবে যে প্রচণ্ড কৃত্রিমতার মধ্যে তাকে বেঁচে থাকতে হয়েছে তার কোন তুলনাই হয় না। যেন জড়পদার্থের সহনশীলতা নিয়েই তার জন্ম হয়েছিল। সেই সহনশীলতা নিয়েই সে কাজ করে গেছে। এক কথায়, কৃত্রিমতার চরমতম নিদর্শন যেন একখানি মহাকাশযানের ক্যাবিন। কৃত্রিম জীবনের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ সেই যানের আরোহী। সে জীবনের মধ্যে প্রচলিত মানবিক ভাবনা বা অনুভূতির বস্তুতঃ কোন স্থান নেই। হৃদয়ের আবেগ সেখানে পাগলামী, উচ্ছ্বাস-কতকটা উন্মাদের ব্যবহারের মত, ভাবপ্রবৃত্তি জীবনের উপর ঝাঁক ছাড়া কিছুই নয়। জড় পদার্থের মত কাজ আর কাজ। রঙিন আলোর সংকেত, যন্ত্রগণকের নির্দেশে অনুগত অনুশীলন—ব্যস! সেখানে জীবন ধর্মের এই হল সার কথা।

অতএব!

অতএব আজকের চিন্তাবিদদের জিজ্ঞাসা : বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার এই অভূতপূর্ব অগ্রগতির শেষ কোথায়? আর সবচাইতে বিস্ময়ের ব্যাপার, যাঁদের মনে এই প্রশ্ন দানা বেঁধে উঠেছে, তাঁরা সকলেই বিজ্ঞানী। পুরোপুরি না হলেও অংশতঃ। তাঁরাই বিজ্ঞানের আবিষ্কর্তা এবং তাঁরাই নিজেদের আবিষ্কার সম্পর্কে বেশি চিন্তিত। তার ভয়াবহ পরিণতির কথা ভেবে তাঁরাই নিজেদের আজ সবচাইতে বেশি অসহায় মনে করছেন। সম্প্রতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই সমস্যা নিয়ে পর্যালোচনা করার ব্যাপারে কিছু কিছু সমিতি বা গোষ্ঠীও তৈরি হয়ে গেছে। এঁরা চেষ্টা করছেন, মানুষের তথা প্রকৃতির সহক্রিয়াকে বিজ্ঞান প্রগতির সঙ্গে সমন্বয় করাতে। চেষ্টা করছেন, বিজ্ঞানের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিণতির সূত্রগুলির সন্ধানে এবং সেই সঙ্গে এমন কোন উপায় আবিষ্কারের, যাতে করে ভবিষ্যতের মানুষ এর সাহায্যে না ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে বৃটেনে স্থাপিত হয়েছে 'বৃটিশ সোসাইটি ফর সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি ইন সায়েন্স'। গত বছর এপ্রিল মাসে তার প্রথম অধিবেশন হয়ে গেছে। যাঁরা সেই অধিবেশনে বক্তৃতা করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন, নোবেল বিজ্ঞানী মরিস উইলকিনস, যিনি ডি এন এ-র রহস্য উদ্ঘাটনে কাজ করেছেন, অধ্যাপক সি এফ পাওয়েল, জেনারী মিলার প্রভৃতি। আর তার পৃষ্ঠপোষণায় রয়েছেন, ডেম কেথলিন লনসডেল, স্যার বার্ট্রান্ড রাসেল, স্যার জুলিয়ান হাক্সলি, অধ্যাপক আবদাস সালাম, অধ্যাপক সি এইচ ওয়েডিংটন, স্যার হারমান বেন্ডি প্রমুখ প্রখ্যাত বিজ্ঞানীবৃন্দ।

সমরজিৎ কর

॥ ৪ ॥

১৯৩৪ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় 'অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্স'-এ আমি প্রথম নিমন্ত্রিত হলাম। বাংলাদেশের বাইরে অত বড় ও বিখ্যাত সঙ্গীত সম্মেলনে আমন্ত্রণ আমার কাছে শুধু যে বিশেষ সম্মান বলে মনে হয়েছিল তা নয়; একেবারে বিরাট চ্যালেঞ্জ বলেও মনে হল। ভগবানের ইচ্ছায় ওই সম্মেলনে আমি ঠুমরী ও নিজস্ব সুরে ও স্টাইলে বাংলা গান গেয়ে খুব সুনাম অর্জন করেছিলাম সে বছর আমার সঙ্গীত আমি ভালভাবেই রসিক ও সমঝদারদের সম্মুখে পেশ করতে পেরেছিলাম বলে আনন্দে ভরে উঠেছিল মন। এই সম্মেলনে প্রথম পরিচয় হল খাঁ সাহেব ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁর সঙ্গে। তিনি আমাকে আশীর্বাদ করলেন গান শুনে। এরপর যতবার তিনি কলকাতায় এসেছেন আমি তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছি ও প্রাণ ভরে তাঁর গান শুনেছি।

এই সম্মেলনেই জীবনে সর্বপ্রথমে অটোগ্রাফ্ সই দিয়েছিলাম ব'লে মনে পড়ছে। সে কী যে আত্মপ্রসাদ মনে এসেছিল সেদিন ওই সামান্য অটোগ্রাফ সইয়ে, তা বোঝান মুশকিল। এই সম্মেলনে শ্রোতারূপে উপস্থিত ছিলেন, আমার গানের —স্যার তেজবাহাদুর সপরু, ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু, শ্রীমতী বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিত প্রভৃতি। ডাঃ কাটজু আমাকে মেডেল উপহার দিয়েছিলেন।

এই সম্মেলনের পরবর্তী তিন বছরেও আমি আমন্ত্রিত হয়েছিলাম এবং গেয়েছিলাম। কলকাতার সঙ্গীত সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করলাম পরের বছর ১৯৩৫ সালে, এইরকম কলকাতার এক সম্মেলনে যাতে ১৯৩৫ সালে আমিও গান করেছিলাম, ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। পরে তিনি যখনই কলকাতায় আসতেন আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতাম এবং সময় কাটাতাম। তাঁর সব সঙ্গীত অনুষ্ঠানে আমিও হাজির হতাম ও'র সঙ্গে। খাঁ সাহেবও আমাকে বেশ স্নেহের চক্ষে দেখতেন।

একইভাবে খাঁ সাহেব ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর সঙ্গেও আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয় এবং তাঁর স্নেহ অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করি।

এইসব সঙ্গীত সম্মেলনের স্মৃতি ও সেই সঙ্গে নানান রসিক, সুধী ও গুণীজনের সান্নিধ্য লাভ আমার জীবনের সব উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সে সময় বাংলা দেশের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী। তাঁর গানের এক অপূর্ব নিজস্ব স্টাইল আমাকে মুগ্ধ করেছিল। কিছুকাল আমি তাঁর কাছে সঙ্গীত শিক্ষালাভ করি।

এছাড়া এলাহাবাদের প্রখ্যাত সঙ্গীতপ্রেমী, সমঝদার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীদক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য, বিখ্যাত আইনজ্ঞ শ্রীমল্লিক, শ্রীগিরিজাশঙ্কর বাজপাই প্রভৃতি গুণী ব্যক্তিরাও আমার গান শুনে আমাকে আপন করে নিয়েছিলেন। আমি এলাহাবাদে গেলে, এ'রা আমাকে সর্বদাই নিজগৃহে আমন্ত্রণ জানাতেন এবং বসত গানের আসর। সব সঙ্গীত শিল্পীরাই শ্রীভট্টাচার্য ও শ্রীমল্লিককে খুবই শ্রদ্ধা করতেন।

শিশুকাল থেকেই বাংলা দেশের পল্লীসঙ্গীতের সঙ্গে আমি বেশী পরিচিত। যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে লোকসঙ্গীতের সম্পর্কে ১৯৩৪ সাল থেকে, সম্মেলনের সূত্রে নানাস্থানে ঘুরে, পরিচয় গ্রহণ করলাম। এই দুটি প্রদেশের গ্রামাঞ্চলের নানান দেহাতী গানের আসরে যোগ দিয়ে সেইসব গ্রাম্য সঙ্গীত সংগ্রহ করে আমার পুঁজি বৃদ্ধি করলাম।

১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত আমি I. P. T. A.-এর সঙ্গীত বিভাগের সঙ্গে জড়িত ছিলাম। এই Indian Peoples Theatres Association আমাকে ও'দের বাংলা লোক সঙ্গীত শাখার সভাপতি করেছিল। এই সমিতিতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রখ্যাত গায়কদের সমাবেশ ঘটেছিল এবং আমিও নানান রাজ্যের প্রতিনিধিদের সংস্পর্শে এসে তাদের গান শুনে নিজের জ্ঞান ও সংগ্রহ আরও বাড়ালাম। আমি ১৯৪৪ সালে প্রথম যখন বম্বে গেলাম, তখন এই সমিতির বম্বে শাখার বিভিন্ন সঙ্গীতানুষ্ঠানে, বিশেষ করে স্বর্গত শ্রীশান্তি বর্ধনের নৃত্যানুষ্ঠানে নিয়মিত-

ভাবে যোগ দিতাম। শান্তি বর্ধন ছিলেন অত্যন্ত গুণী, নতুন সৃজনকারী শিল্পী। তার নানা রকমের পরীক্ষা নিরীক্ষা আমাকে খুব মুগ্ধ করত। বন্ধুবর আম্বেরী অপনাকে শ্রীমর্যাদার সেই কেন্দ্রটির স্মৃতি সর্বদাই মনে পড়ে। এই গুণী শিল্পীর অকালমৃত্যু খুবই ক্ষতিকর হয়েছে।

আই পি টি এর সঙ্গে জড়িত থাকা-কালে বুঝতে পারলাম ভারতবর্ষের লোক-সঙ্গীত কত বিচিত্র ও বৃহৎ সংগীত সম্পদে পুষ্ট।

১৯৩৩ সালে পিতৃদেবের মৃত্যুর পর, নিজের চেষ্টায়, নিজস্ব এক গায়কী সৃষ্টি করে সঙ্গীতশিল্পীরূপে কিছুটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলাম। তখন ইন্ডিয়া রেডিও থেকে আমার গান নিয়মিত প্রচারিত হতে লাগল প্রতি মাসে। এছাড়া নিজের গানের রেকর্ড করতে লাগলাম। কলকাতা ও এলাহাবাদের সঙ্গীত সম্মেলনে যোগদান এবং নানান জলসাতে গান গাইবার আমন্ত্রণ পেতে লাগলাম। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আমার কিছুটা জনপ্রিয়তা থাকায় তারাও আমাকে সদাসর্বদা আমন্ত্রণ জানাত তাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান করার। দুর্গাপূজো

[illegible] মিউজিক রেকর্ডিং নিয়ে ব্যস্ত শচীন দেববর্মন

সরস্বতী পূজাতে টানাটানি পড়ে যেত। এইভাবে আর্থিক ক্ষেত্রেও আমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হলাম।

এবার আমি দুটি ঘরের একটি ফ্ল্যাট ভাড়া করলাম। একটি ঘর আমার থাকার ব্যবস্থা, অন্য ঘরে আমার গান শেখানোর স্কুল—নাম দিলাম—"সুরমন্দির"। খুব সামান্য ফি নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের গান শেখাতাম, আমার গায়কীতে। দুঃস্থ ছাত্র, সঙ্গীতে প্রতিশ্রুতি থাকলে, তাদের কাছ থেকে আমি কোন ফি নিতাম না। আমার এই স্কুল ও তার ছাত্র-ছাত্রীরা কিছুদিনের মধ্যেই বেশ সুনাম অর্জন করল। ছাত্রদের নিয়ে বেশ আনন্দে গান বাজনায় আমার দিন কেটে যেতে লাগল। সরস্বতী পূজার সময় ছাত্ররাই উৎসাহ নিয়ে "সুরমন্দির-এ" সরস্বতী পূজা করত এবং সারারাত ধরে গান বাজনা চলত। এভাবে হোলির সময়েও আমার ফ্ল্যাট দিনরাত মুখরিত হয়ে থাকত গান বাজনায়। বহু গুণী জ্ঞানী আমার এই ক্ষুদ্র সঙ্গীত বিদ্যালয়ে পদধূলি দিয়েছেন।

বঙ্গাব্দ ১৩৪৫ সালের বৈশাখ মাসে (ইং ১৯৩৯ সাল) আমি "সুরের লিখন" নামে একটি সঙ্গীত পুস্তিকা প্রকাশিত করি। এতে আমার পঁচিশটি গান স্বরলিপিসহ ছাপাই। প্রকাশক ছিল ডি এম লাইব্রেরী। বইটি উৎসর্গ করেছিলাম স্বর্গত পিতা মহারাজ কুমার শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দেব বর্মনের নামে।

বাংলা চলচ্চিত্রে সঙ্গীত পরিচালনা করার আকাঙ্ক্ষা ছিল খুব। কিন্তু কোন সুযোগই পাচ্ছিলাম না। আমি নিউ থিয়েটারস-এ ঘোরাফেরা করেছিলাম অনেক; আশাও পেয়েছিলাম কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট থেকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আশা আর সফল হল না। তখনকার দিনে নিউ থিয়েটারস-এর খ্যাতনামা বহু পরিচালক-এর নিকট আমি অপরিচিত ছিলাম না, যেমন শ্রীনীতিন বসু, আমার বন্ধু শ্রীহেমচন্দ্র ও শ্রীদেবকী বসু। এঁরা সবাই আমার গান, সুর সংযোজনার প্রশংসা করতেন। স্বনামধন্য শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া ও আমি ত একসঙ্গে টেনিস খেলতাম। এসব সত্ত্বেও কোন তরফ থেকে সাড়া না পাওয়াতে আমার মনে কিছু অভিমানও জেগেছিল। মাঝে মাঝে আমার মনে হত, হয়ত আমার সুর জনসাধারণের আনন্দদানে কোন কাজের নয়।

রায়চাঁদ বড়াল, পাহাড়ী সান্যাল এঁরাও আমার বিশেষ বন্ধু। রায়চাঁদের সঙ্গে কলকাতার বাইরে—যেমন রাঁচিতে অনেকবার গান গাইতে গিয়েছি। নিউ থিয়েটারস-এর কর্ণধার শ্রী বি এন সরকারও আমার সুর সংযোজনা সম্বন্ধে জানতেন, পরিচয়ও হয়েছিল। এসব সত্ত্বেও কোথাও কোন চলচ্চিত্র সংস্থা আমাকে সঙ্গীত পরিচালনা করার সুযোগ না দেওয়াতে মনে খুবই দুঃখ হয়েছিল। অথচ বাংলা ছবিতে আমি সুর যে দিইনি তা নয়—দুটো ছবির কথা মনে পড়ছে—যেমন "রাজগী" ও "রাজকুমারের নির্বাসন।" (ক্রমশ)

রমনাথ বিশ্বাসকে আপনারা অনেকেই হয়ত ভুলে গেছেন। কিন্তু তিনি আমার প্রাতঃস্মরণীয়। মাণিকতলার একটা বাজার বাড়ির এক ছোট্ট কামরায় বসে তাঁর কাছে আমি ভবঘুরেবৃত্তিতে দীক্ষা নিয়েছিলুম। সেই হিসেবে দেশ-বিদেশের বাউণ্ডুলে সমাজে আমার ঘরানা খুব উঁচু। রমনাথদাদু বিকেল তিনটে বেজে পনের মিনিটে চায়ের জন্যে হাঁক পাড়তেন। একটা ছোট্ট খুকী এসে এক পেয়ালা চা দিয়ে যেত। তারই আদ্ধেকটা পিরিচে ঢালা হতো আমার জন্যে। দাদু বলতেন : পৃথিবী ঘুরবে বইকি, নিশ্চয় ঘুরবে। তবে আমার মতন নয়। আমি তো ঘুরেছি "—"র মতন (শব্দটা দুরুচ্চায্য; আমি কাঠগড়ায় দাঁড়াতে রাজি নই)।

আমাদের শৈশবে রমনাথ বিশ্বাসই ছিলেন আমাদের লিভিংস্টোন, স্বেন হেডিন। তিনি যত ঘুরেছেন তার শতাংশের এক ভাগও আমি ঘুরিনি। ভারতে অনেক জায়গায় 'টুরের' মতন ঘুরলেও, বিদেশে ঘোরাঘেরার ছাড়পত্র ছিল। তবে এই নিঃস্ব পরিব্রাজকের আশীর্বাদে আমার দেখা-শোনার ইন্দ্রিয়গুলো মোটামুটি বেশ তৎপরতা পেয়েছে বলতে পারি।

আমেরিকায় যেখানে যখন গেছি, অল্প দিনের ভেতরেই সেই অঞ্চলের লোকেদের সঙ্গে সহজ মেলামেশার অবাধ সুযোগ ঘটে গেছে। একেবারে অভাবনীয় ঘটনা ঘটেছে, যাতে মানুষের মনের নানা দিকের পরিচয় পেয়েছি। সে পরিচয় কখনো মিষ্টি, কখনো তেতো, কখনো টকঝাল রসালো। আজ যাবার সময়ে (আমার গত তিনখানি চিঠিতে আমি 'যাই-যাই' করেছি। আমার চিঠির যদি কোনও নিয়মিত পাঠক থাকেন, দয়া করে ভ্রূকুটি করবেন না। এবার আমি বাস্তবিকই যাচ্ছি। রিজার্ভেশন হয়ে গেছে) যদিও বলতে পারছি না যে যা দেখেছি তার তুলনা নেই, বলতে পারি তুলনা বিরল।

এখানে কী আছে, যার স্বাদ দেশে বসে পাইনি? কী নেই এ দেশে, যার অভিকা আমাদের দেশকে উজ্জ্বল দিতে পারছে? মাঝে মাঝে এই ধরনের প্রশ্ন আমি পাই, নিজের মন থেকে, আবার বন্ধুবান্ধব জানাশোনা লোকের চিঠিতেও থাকে। যা আছে এদের তার ফর্দ তো খুব লম্বা-চওড়া হতে পারে। কিন্তু সেটা কি ঠিক জবাব হবে? ধরুন, এদের হাইওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং, পরিবহণ ব্যবস্থার কথা। শতমুখে বলেও ফুরোনো যায় না। পর্বতের বুকের মধ্যে সুড়ঙ্গ কেটে, নদীর নিচ দিয়ে, উপসাগরের ওপরে দোতলা সেতু বেঁধে, মরুভূমির ওপর দিয়ে হাজার হাজার মাইল মোটর পথ আর রেল পথ চলে গেছে। পথের পাশে পাশে মোটেল আর গ্যাস স্টেশন। অবিশ্বাস্য সুখভোগের বন্দোবস্ত। ধরুন ডাকব্যবস্থা কিংবা যোগাযোগ ব্যবস্থা। আপনি ওয়াশিংটন থেকে পেনসিলভানিয়ার কোনো শহরে এলেন, গেলেন মিউইয়র্ক-শিকাগো কি লস এঞ্জেলেস। আপনার যে কোন বসবাসের শহরে, সেখানকার পোস্ট অফিসে গিয়ে একখানা গোলাপী রঙের কার্ড নিন। কার্ডে সব ছাপানো নির্দেশ রয়েছে। আপনি পুরোনো ঠিকানা এবং নতুন ঠিকানার কলামগুলো ভরে দিন। কবে থেকে নতুন ঠিকানায় আপনার ডাক বিলি হবে, সেই তারিখটা আর কদিন পর্যন্ত ওই নির্দেশ বহাল থাকবে সব নির্দিষ্ট কলামে লিখে দিন। ব্যস, নিশ্চিন্ত হয়ে যেখানে খুশী চলে যান। আপনি পরবর্তী শহরে পা দেবার আগে-ভাগেই সেখানকার ডাকঘরে আপনার সমস্ত চিঠি-পত্র, টেলিফোনকোম্পানীর তাগাদা, ম্যাগাজিনের বান্ডিল, পত্রিকার বিজ্ঞাপন, সবকিছু পৌঁছে গেছে। বেড়াতে গেছেন, এসব ডাকঘরের ঝিক্কামেলা এড়াতে চান, সেই মর্মে নির্দেশ রাখুন, আপনার চলাফেরাতেই সব জমা থাকবে, ঘুরে এসে পাবেন। একখণ্ড কাগজও আপনার খোয়া যাবে না। এখানে সচরাচর মাসে দুবার করে মাইনে হয়। শুনতে বেশ মজাই। তবে খতিয়ে দেখলে অত আহামরি লোভনীয় লাগে না। বছরে ছাব্বিশখানা পে চেক। জুন আর ডিসেম্বরে তিনটে, আর বাকি সব মাসে দুটো করে পে চেক। সমস্ত ব্যবস্থাটাই কম্পিউটারাইজড। হপ্তায় পাঁচ দিন কাজ, দিনে আট ঘণ্টা হিসেবে চল্লিশ ঘণ্টা। প্রতিদিন লানচ বা কফিব্রেক বাবদ আরো তিন কোয়ার্টার সময় বাড়তি কাটা হয়। অর বেতন ঐ চল্লিশ ঘণ্টারই। বাকি দুই দিন শূন্য। ছুটির দিনে, বা বাড়তি সময়ের জন্যে কাজ করলে নগদ বিদায় ওভারটাইম, কিংবা কমপেনসেটরী টাইম। ছুটিছাটা, কামাই অসুখ ইত্যাদির সমস্ত হিসেব, তাছাড়া আয়কর-কর্তন এসব কিছুই কম্পিউটার হিসেব করছে। তারপর ঠিক পনের দিনের মাথায় আপনার নাম-ঠিকানা সামাজিক নিরাপত্তা সংখ্যা অংকিত ফুটো করা কার্ডে ট্রেজারীর চেক চলে আসছে আপনার নামে। এখন মাইনের আগেই হয়ত আপনি হঠাৎ কোনো কাজে, কিংবা নিছক অবসর বিনোদনের তাগিদে বাইরে চলে গেলেন। হয়ত সময়মত সেক্রেটারীকে ঠিকানা দিতে গেছেন ভুলে গেছেন। পরোয়া নেই। মিসিগানের আন আরবার থেকে ওয়াশিংটনে আপিসের সেক্রেটারীকে ফোন করলেন। সেই বর্ষীয়সী মহিলা আপন স্টাইলে আপনাকে আশ্বস্ত করলেন : 'ডোনট ওরী। টেক ইট ইজি। হ্যাভ ফান। আল রাইট।' এর পরেই দায়িত্ববোধের পরীক্ষা ডাক বিভাগের একটা খাকি খামের গড়ে নীলাভ সবুজ প্রিয়দর্শন যে চেকখানি আপনার নামে ডাকে গেল, সেটা মামুলী ডাকেই যাচ্ছে। কোনো রেজেস্ট্রি বা ইনসিওরকৃত সাবধানতা নয়। রসিদ দেবার ব্যবস্থা নেই। এমনও হতে পারে যে দুর্ঘটনা ক্রমে সেটা অন্য কোনো কবজায় উপনীত হল। ভুয়া আইডেনটিটি দেখিয়ে আর কেউ সেটা ভাঙিয়ে নিল, ভাঙিয়ে দিল। কিন্তু তা হয় না। অন্তত সহজে নজীর মেলে না। কারণ স্যালারি চেক ক্যাশ করার জন্যে আপনাকে নির্ভরযোগ্য পরিচিতিপত্রক দরকার হয়। সে যাক। যদি ডাক বিভাগের অনবধানতার আপনার চেক হারিয়ে যায়, আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। বড় জোর কিছুটা সময় নষ্ট হবে। সরকারী অর্থদপ্তর হারানো পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট ক্ষতিপূরণ করে। অবশ্য বড় খাটুনি মামলা মোটেই নয়। কিংবা একবার পোস্ট অফিসে যাওয়া মাত্র, চক্ষুজ্যে ঢোকাও নয়। 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' বলে ককিয়ে ওঠার কারণ কখনো ঘটে না। আমাদের দেশের সরকারী কর্মচারীদের মতন ঘোর-সময়নিষ্ঠ নয় এরা। যদি ঘোরে দুটো মিনিট দেরি করে আসার জন্যে মানুষটা কিঞ্চিৎ হয়রানি হতে থাকে তখন কখনো কখনো নিজের কাঁধে-দায়িত্ব নিয়ে, মহাভারত অশুদ্ধ করে ফেলে, সূর্যচন্দ্রকে ওলট-পালট করে দেয়—অর্থাৎ ডাকঘরের বন্ধ কাউন্টারটা আরো একবার সেই অভাগার জন্যে খুলে দেয় (হাসিমুখেই), কিংবা সীলকরার আগে পর্যন্ত একবার বাঁধা বস্তার মুখটা আরো একবার খোলে (হয়ত গজগজ একটু করে)।

ট্যাক্সির দুর্দিনের ব্যাপারে অনেক দিন আগে একবার যে খবর দিয়েছিলুম, তাতে আমি বহু স্বদেশবাসীর ঈর্ষাভাজন হই। এবারে টেলিফোন সম্পর্কিত সৌভাগ্য নিয়ে কিছু লিখতে গিয়ে তাই দোনামোনা করছি। শিগগীরই দেশে ফিরছি। দেশে পরশ্রীকাতর লোকের তো আর অভাব নেই। আর হিংসের মানুষ কী না করতে পারে। তা সে আমার ভাগ্যে যা আছে কে আর খণ্ডাবে। এখানে টেলিফোনের জন্যে ধরোস্কোপ কষাতে হবে না। ...

ক্যামেরাস্কোপের নায়ক হতে হয় না। এমন কি কোনো আমানত দেখাতে বা জামানত দাখিল করতেও হয় না। এবেলা খবর দিলে ওবেলা আপনার বাড়িতে টেলিফোন বসিয়ে দিয়ে যাবে। যে ঘরে যতগুলো আপনার খুশী, যে রঙের, যে মডেলের আপনার মরজি। শুধু তাই নয়, রাত্তিবেলাতে টেলিফোনের কর্কশ ঘণ্টিতে আপনার পাছে ঘুমের ব্যাঘাত হয়, তার জন্যে আছে সুমধুর টাইমের আয়োজন; আপনি গোলাপী তন্দ্রার আমেজে ডুবে থেকেই টেলিফোনে রসালাপ করতে পারবেন। মাস গেলে থোউক একটা পেমেন্ট। লোকাল কলের জন্যে আর কোন রকম চার্জ নেই। যতক্ষণ ইচ্ছে, যত কল ইচ্ছে আপনি করতে পারেন। লং-ডিসটেন্স কলের জন্যে চার্জ যেমন আছে, সুবিধেও তেমনি কল্পনাতীত। এক সেকেণ্ড সময়ও অপচয় না করে, একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তের কয়েক হাজার মাইলের ব্যবধান পেরিয়ে সরাসরি ডায়েল করে কথাবার্তা বলুন। ভোরে ঘুম ভাঙে না? ওয়েক আপ সার্ভিস জাগিয়ে দেবে। রাতে ঘুম আসে না? ঘুমপাড়ানি গান শোনাবে একটা বিশেষ নাম্বার। আবহাওয়ার খবর পাবেন চব্বিশ ঘণ্টার যে-

কোনো সময়। আরো অনেক কিছু আছে। কিন্তু থাক, আর বলব না। শুধু এক মনীষী ইংরেজের উক্তি মনে পড়ছে, সেটার উদ্ধৃতি দিই। একে মনীষী তায় ইংরেজ, তার মন্তব্য করছেন আমেরিকার ওপর—কাজেই নাকের ডগা যে কতটা উঁচু তা বোধগম্য। আমেরিকায় কী কী ভাল লাগল এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন : তিনটে জিনিস। তোমাদের হাইওয়ে; তোমাদের জোয়ান মেজ; আর তোমাদের টেলিফোন।

*

সাত সকালেই মেজাজটা দারুণ খিঁচড়ে গেল। সামান্য কয়েক মিনিটের হেরফেরে অনেকগুলো ডলার গচ্চা চলে যাবে। শুধু কি তাই? অনেক পেড়াপিড়ির ভোগও ভুগতে হবে। বাড়ির সামনের ওই সদর রাস্তায় গাড়িগুলো সারা রাত পড়ে থাকতে পারে। নেহাত needy চোর ছাড়া কেউ ছোঁবে না। কিন্তু চোরে যা ছোঁয় না, পুলিসেও তা ছোঁয়। আর পুলিস ছুঁলে ছত্রিশ ঘা। এসব সদর রাস্তায় গাড়ি রাখার একটা বাঁধা সময় আছে। সকাল সাতটা থেকে সাড়ে ন'টা; আবার বিকেল চারটে থেকে সাড়ে ছটা—নো-পার্কিং আওয়ার্স। তখন এ রাস্তা heavy traffic zone। বিশেষ ঐ রাস্তার অনেক অনেকগুলো বড় বড় রাস্তাকেই one way করে দেওয়া হয়। ওসব রাস্তার [illegible] এক মাথে, গাড়ি ছোটে। যদি বাড়ির ঐ রাস্তায় গাড়ি পার্ক করে থাকেন, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কে জানে? প্রায় নাকের ওপর দিয়ে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Tow-Away-Zone-এ [illegible] [illegible] পুলিস [illegible] [illegible] [illegible] আপনার গাড়ির ঠিকুজী কোষ্ঠী জানাতে হবে। অপরপক্ষ একেবারে বকচ্ছন্দ। বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাবে। যেন আপনার করুণা-ভিক্ষা করছে এমন করে আপনার নাম ধাম জিজ্ঞেস করবে। তারপর নেমন্তন্ন করবে—প্রায় দেড় মাইল দূরের Vehicle department-এ। সেখানে গিয়ে লাইন দিন। মনটা সান্ত্বনায় ভরে যাবে। আপনি একাই অ-চাক্ষুক নন। এস কাটিকো বিয়েলের টেকো হিপিযুগল, ক্যাপেলাডিব্বনে চীনা ইঞ্জিনিয়ার, পোশাকাভিজ্ঞ তরুণ কাহিম-

নরনা নিগ্রোনী, বঙ্গললনা সরলরেখাবৎ কাঁপসরণী হাউসওয়াইফ—সবাই এসে দাঁড়িয়েছে কাতারে। এবং এখানে অর্থনৈতিক সাম্যবাদের চূড়ান্ত। ১৯৬৭ সালের ভোকসওয়াগেন থেকে ১৯৯১ সালের স্টুডিবেকার; টু-সীটার থেকে স্টেশন ওয়াগন সকলেরই এক দর। From each according to his purse নয়, from each according to the regulation —সকলেরই দেয় দন্ড তের ডলার—অভাগা তের। আমার কপালে সত্যিই সেদিন মাসের তের তারিখ।

তা দেখুন গাড়ি নইলে এদেশে যেমন অচলাবস্থা, তেমনি আবার এর ল্যাঠা-ঝিক্কিও কম নয়। আর গাড়ি কেনার পর থেকে আপনাকে পাকা অটো-মেকানিক হতে হবে। নইলে ব্যাংকের খাতা থেকে এক এক দফায় মোটা মোটা অঙ্ক নেমে যাবে। আর, আপনাকে হতভম্ব হতে দেখলেও কারও মায়া হবে না। একটা ছোট্ট নমুনা শুনুন। রেডিয়েটারটায় একবার লিক দেখা গেল। এর আগেও একবার হোসটা বদলাতে হয়েছিল। সে সময়ে ঘোর অনাড়ি ছিলুম। দরদী মেকানিক প্রায় হাসিয়ে এনে ছিল। কী ভাগ্য এক [illegible] চোখে পড়ে গেল ব্যাপারটা। [illegible] [illegible] [illegible] সার্ভিস স্টেশনে গেলুম, [illegible] কয়ে জলটল ভরে দিলে, স্টপলীক বলে একটা নীলচে সলিউশন জলের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে, দিয়ে বললে এটা তোমার রেডিয়েটর শপের কাজ। ওরা বদলি কিংবা মেরামত করবে। এই সুযোগে চাকার হাওয়া দেখার ছল করে কিন্তু অন্য বাণিজ্য করে নিলে। বললে : এ কী করেছ তুমি! পেছনের টায়ারটাকে এরকম নেগলেকট করলে চলবে কি করে?

আমি (আধখানা হাঁ করা মুখে) : টায়ারটা কি খারাপ।

মেকানিক : খারাপ নয়, বিপজ্জনক।

আমি (ঢোক গিলে) : বদলানো দরকার?

মেক : ওয়েল, দ্যাটস আপটু য়ু...তবে আমি যদি তুমি হতুম তাহলে বরং ফুটো রেডিয়েটর সারাতে যেতুম না, কিন্তু টায়ার ...কাজেই টায়ার বদলানোই সমীচীন মনে করেছিলুম। কিন্তু ইতিমধ্যে একদিন আর এক জায়গায় গ্যাস ভরাতে গিয়ে কী মনে হল গাড়ির দু-একটা পার্টস চেক করালুম। মিস্তিরী আঁতকে উঠে চোখ কপালে তুলে বলল : 'কী ভয়ানক, পেছনের শক্-এবসরবার যে এক্ষুনি নতুন লাগানোর দরকার।' আঠারো ডলার গচ্চা দিয়ে ফেরবার সময় জিজ্ঞেস করলুম—টাকাটা কেমন বুঝেছ? এ মাসটা চলে যাবে? মিস্তিরী অভয় দিলে। তবে সাজেশন ঝাড়লো—বড় শীগ্গির সম্ভব

বদলে নিও। সেই টায়ার আমি আদৌ বদলাইনি। ওয়াশিংটন থেকে প্রায় সাত শ' মাইল দূরে শিকাগো শহরে এসেছি। সেখানে তিন সপ্তাহ থেকেছি। সেখান থেকে রওনা হবার আগে আমেরিকান অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েশনের দাগলাগা দোকানে গাড়ির সেই নির্দেশিকা অনুযায়ী গিয়ে টায়ার দেখালুম। ওরা বললে এই টায়ারে তিন চার হাজার মাইল অনায়াসে যাওয়া যাবে। আমার মতে তোমার ব্রেকটা কিন্তু অবহেলা কোরো না। টেক্সাসের গ্যালপ শহরে ব্রেকটা সারাতে নিয়ে গিয়ে দেখলুম, কিছুটা ব্রেক-ফ্লুইডেই কাজটা হয়ে গেল। সে কিন্তু একটা নতুন ব্যাটারী গছাবার জন্যে ছোঁকছোঁক করতে লাগল। শেষকালে ব্যাটারীর ব্যাপারে আমাকে খুব কট্টর সংরক্ষণপন্থী দেখে অন্য চাল চাললো। প্রায় পঁয়তাল্লিশ ডলার খসিয়ে একটা রিবিল্ট জেনারেটর কনভার্টারই চাপিয়ে দিলে। ঐ গ্যাড়াকলটা আমি আদৌ বুঝতুম না। সামনে তখনো হাজার মাইল বিস্তৃত মরু-আকীর্ণ পথ। সঙ্গে বাচ্চা-কাচ্চা। গোঁয়ার্তুমি করতে সাহস পেলুম না। তাই বলছিলুম, গাড়ির মেকানিজম না শিখে গাড়ি কেনা আর সেক্সোলজির পাঠ না নিয়ে বিয়ে করা একই রকম মূর্খতা। কিন্তু আসল কথাটা যা বলতে চাইছি, তা হল এদেশ ওদেশ হুবহু এক। মানুষজনের স্বভাবজাত দুর্বলতা, সরলতা ভালমানসী-বজ্জাতি এক-আধটুক রকমফেরে সবই সমান। তা হলে চার বছরে তফাতটা কী দেখলুম। জানি দেশের মাটিতে পা দিতে না দিতেই এই প্রশ্ন আমায় শুনতে হবে। 'কী দেখলে? কেমন লাগল' এসব প্রশ্নের দায়সারা জবাবে বাইরের লোককে ঠেকান যায়, কিংবা মুচকি হেসে কুটুম-স্বজনকে এড়ানো যায়—কিন্তু বন্ধু-বান্ধব? তারা তো পুরনো মনিবের মতন ব্যবহার করে। 'কী রে বেটাচ্ছেলে। এনতার শোর গরু মুরগী স্কচ বেয়ার বেকন মারটিনি তো গিলে এলি। তা দেখেশুনে কিছু শিখে এলি, না যেমন হাবলা ছিলি তেমনই রয়ে গেলি।' এদের ঠেকানো যাবে না। জবাব দিতে হবে: 'সব এক রে দাদা, সব এক। চামড়াটা সাদা (কালো-হলদে-বাদামীর কথা কি ভুলে যাব?), শরীর গতর একটু বাড়াবাড়ি রকম ভালো। পকেটগুলো একটু বেশি ফাঁপা। আর রেস্তরাঁয়-বারে পর্বত ও জলস্রোত লভ্য। ডলার আর ফ্লোরেন্সেরা লোভনীয় রকম দৃশ্যমান। দূরদৃষ্টি না থাকলে (আমার যেমন আছে), ছিদ্রান্বেষী মানুষে দুটোই সংগ্রহ করতে পারে। এই আর সবই সমান। বাড়িগুলো একটু বেশি উঁচু। কিন্তু তাতে যারা বাস করে, তাদের পোশাক-আশাক চালচলন কলকাতার ফোতো-নবাবদের তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট। মেয়েদের মাথায় পরচুলো, ভুরুতে কাজল, ঠোঁটের পালিশ লিপস্টিক..."

কিন্তু যে জবাবটা দিতে মন চাইছে, সেটা সহজে বলা যাবে না। সেটা বলতে গেলে আড্ডার মুড নষ্ট হবে। বন্ধুরা এক লহমায় দেশের প্রতিনিধি হয়ে উঠবে, তাদের জাতে ঘা লাগবে। ভুলে যাবে, আমিও তাদেরই লোক। আমি বিদেশী নই। [illegible] আমি দঙ্গলে, কিংবা আড্ডাখানে কিংবা অর্গানাইজেশনে ঘুরেছি। আমি কি বলতে পারি যে আসলে সব মানুষই এক। কিন্তু তফাত তার আচরণে? বলা কি আমার উচিত হবে যে আসলে তোমরা সব এক-একটি বুড়োখোকা। মেচিওরিটির নামমাত্র নেই তোমাদের মধ্যে? এনতার খাল কেটে ঘরের ভেতর বেনোজল ঢোকাচ্ছ। হলিউডের বস্তাপচা ছবি দেখে, দেড় শো বছর আগের টেক্সান কাউবয়ের অনুকরণে চোঙা প্যান্ট পরছ আর ভাবছ প্রগতি করলুম। বিশ বছর ধরে কেবল ঝান্ডাবাহির রাজনীতি আর হাওয়ায় ঘুঁষি মেরে 'মানতে হবে' 'মানব না' করছ। কিন্তু যারা বানাবার, তারা তোমাদের ভেড়া বানিয়ে ঠিক 'মানিয়ে' নিচ্ছে, তোমাদের কোনো দাবিই যে আদতে 'মানতে হবে না' তারা সেটা ঠিক বুঝে নিয়েছে। তোমরা কাউকে কান ধরে, গলায় কলার চেপে কিছু করাতে পারো না (একমাত্র সমধর্মী কিছু নিরীহ মেষশাবক ছাড়া)। তোমরা বলবে: 'দেশের সব কিছুই রসাতলে যেতে বসেছে। তাই আমরা সংগঠিত হব, বিপ্লব করব।' তারপর সংগঠনের আপিস বসাতে গিয়েই মতান্তর, ঝগড়া, দুটো দলের পাঁচটা উপদল। রবি ঠাকুরের ভাষায়, হুইসল দিতেই সব স্টীম খতম। এসব কথা আমি বলব কোন মুখে? আমি নিজেও তো এ দলের বাইরে নই।

এসব ব্যাপারে এরা একেবারে আলাদা ধাঁচের। বেশীর ভাগ ছেলেমেয়েই বড়জোর হাইস্কুল পাশ। বিশ্বরাজনীতির কোনো খবর রাখে না। আমার মনে হয়, সেটাই একটা মস্ত কারণ যে এতদিন যাবৎ এরা ভিয়েৎনাম নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় নি। হালে ক্ষেপে উঠেছে। দেখবেন, আমার জোরাল বিশ্বাস, রুশ-চীন নয়, সার্ত্র-রাসেল (তাঁর স্মৃতি অমর হোক) নন, আমেরিকার জাগ্রত যুবমানসই আমেরিকাকে ভিয়েৎনামের মাটিছাড়া করবে। যা বলছিলুম। অনুচ্চশিক্ষিত এই তরুণেরা হাতে-কলমে কাজ শেখে। হাড়ভাঙা খাটুনি আর পকেটভরা মজুরি। পেটভরা খাবার আর মনভরা রঙ্গ-সঙ্গ। এই নিয়েই এদের অধিকাংশ লোকের জীবন। খুবই নিচু স্তরের, খুবই প্রিমিটিভ ধরনের জীবনধারা। এই স্ট্যানডার্ড অব লিভিংকে হাই বলা যায় কী করে আমি জানি না। মোটাই তো, ঘরে ঘরে টিভি-ফ্রিজ-রেফ্রিজারেটর-গাড়ি থাকলেই কি উন্নত [illegible]? এরা নিজেরাও [illegible] আমাদের মতন প্রাচ্যের মননশীল ঋষিরা এসে এদের যদি ওসব না ভাবাতে। আসলে আমরা কোনটা চাই বলুন তো? এ দেশের মতন লৌকিক সম্পদের প্রাচুর্য। তা হলে, পৃথিবীর ভালমন্দ, হিংসা অহিংসা, গান্ধী-গণতন্ত্র, আরব-ইসরায়েল সব শিকেয় তুলে কিছুদিন কোমর বেঁধে কাজে নামতে হবে। বলতে পারবেন না 'শোষণ হচ্ছে'। শোষণ যে হচ্ছে, সে তো আজকের কথা নয়। শোষকরা তো আমাদের রক্তে প্রতিপালিত হচ্ছে প্রপিতামহদের আমল থেকে। বুকনি দিয়ে থামান গেছে? আসুন হাল চষি, কিচেন গার্ডেন করি, মুরগি পুষি, মুদির দোকান দিই, আলুবেগুন বেচি, ধোপার পাট খুলি। ভাববেন না আমি বিপ্লব-বিরোধী বুলি আওড়াচ্ছি। আমি প্রতিক্রিয়াশীল নই। বিপ্লব যারা করবে, মাপ করবেন মশায়রা, আপনি আমি সে চরিত্র নই। যদি কেউ করে, যারা করবে, তারা গোকুলে বাড়ছে। আপনি আমি দুবেলা দুমুঠোর সংস্থান করতে পারলে (ইনডিভিজুয়ালি বা কলেকটিভলি), বিপ্লব ভেস্তে যাবে না। সে প্লাবন যখন আসবে, তখন সকলের সব তুচ্ছ পুঁটুলি ভেসে যাবে। হ্যাঁ মশায়, ঐ যে দেশের কাগজে পড়ি চাষায় চাষার বউকে বিধবা করছে, মজুর তার কারখানার বেরাদরের পেট ফাঁসিয়ে দিচ্ছে—এটাও কি বিপ্লব? একবার এক উদ্বাস্তু কলোনীর কিছু বি এ, এম এ বন্ধুদের বলছিলুম: পোলট্রি করিস না কেন? (ওরা সবাই বেকার এবং পার্টি কমিউনিস্ট)। জবাব পেলুম: 'কেউ কো-অপারেশন করবে না।' ওরা বিপ্লব করবে। অনুযোগ করছে: 'এখানে কোনো ইনডাস্ট্রি নেই।' তাকিয়ে আছে ভবিষ্যতে সরকার (তখনও কংগ্রেস আমল) কারখানা বসাবে, তখন ওরা সেখানে (না চাকরি নেবে না) ইউনিয়ন করবে। বিপ্লব হবে। সেই শহরের চৌহদ্দির মধ্যে সাতখানা গ্রাম। এরা তার বাসিন্দাদের চেনে না। চাষীদের সমস্যার সঙ্গে পরিচিত নয়। চায়ের দোকানে আড্ডা দেয়, সার্থক কবিতা লেখে, ইঁদুরের ছবি আঁকে, কামু-কাফকা-জীবনানন্দ পড়ে, টোপর পরে যৌতুক নিয়ে বিয়ে করে......।

এ দেশের যুবকদের যখন দেখি, তখন মনে হয়, আমাদের দেশের (বিশেষ করে বাংলার) ইউথের সিকি ভাগ ইনটেলেকচুও এদের নেই; নেই তাদের শতাংশ ভাগ বিশ্ব-জিজ্ঞাসা। সেই কলম্বাসের আমলের ভুল এখনো করে চলেছে। আদিবাসীদের আজও বলে ইনডিয়ান। প্রকৃত ইনডিয়ার কতটুকু পরিচয় জানে, কতটুকু খবর রাখে! পার্থিব সম্পদের ক্ষেত্রে আমাদের দেশের সঙ্গে এ দেশের কোনো তুলনাই হয় না। অথচ এরা কিসে বড়। ভারতীয়েরা বলে থাকেন: 'তা তো হবেই, ওদের টাকার অভাব নেই।

নে কি [illegible]। আমাদেরই [illegible] কোথায়। বিদেশের [illegible] কোনো [illegible] দেশে [illegible] আমরা [illegible] কোটি [illegible] টাকা [illegible] করি না? জাতীয় আয়, পারক্যাপিটা-ইনকাম—এই সব অর্থবিজ্ঞানের আর মধ্যবিত্তের পাঁশতাড়ী কচকচি বাদ দিন। সাধারণ লোক ওসব বোঝে না। গান্ধী লোকটার শত দোষ থাকতে পারে, কিন্তু নিঃসন্দেহে কিছু কথা বলত। তার মানে বোঝা যায়। যে দেশের মাথাপিছু আয় এক আনা না তিন আনা, (তাই নিয়ে পারলামেনটে তর্ক হয়ে গেছে) তাদের আবার এত বাবুয়ানাই কেন? গান্ধী নাকি বলতেন, দেশের প্রেসিডেন্ট মাটির ঝোপড়িতে থাকবেন; বিদেশের দূতাবাস হবে অনাড়ম্বর, তার চালচলন হবে মিতব্যয়ী। দেশ-বিদেশের কাছে দেনায় চুল পর্যন্ত বিকিয়ে আছে, ভিক্ষেও করছি। অথচ বিবিধ রকম ফুটানির অন্ত নেই। ওয়াশিংটনে অনেক দেশেরই দূতাবাস দেখলুম। আমাদের অত বড় বাড়ি হাঁকড়ে বসার দরকারটা কী। জানি, এ সব কথার কেউ প্রতিবাদ করতে চাইলে, বিপরীত যুক্তির অভাব হবে না। আমাদের জ্ঞানগরিমা শানশওকতের কথা শত-মুখে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে খুব বলা যায়। এখানকার লোকের কাছে আমি নিজেও ঐরকম বলে থাকি। আমরা দারুণ প্রগতিশীল নেশন। আমাদের প্রধানমন্ত্রী মেয়েমানুষ, তা ছাড়াও কত নাম করা পারলামেণ্টারিয়ান, মায় লাটসাহেব পর্যন্ত হয়েছেন আমাদের মেয়েরা। এতই যখন প্রগতি, তখন জন্মনিয়ন্ত্রণের মতন একটা অতিবাস্তব সমস্যা সামলাতে হিমসিম খাচ্ছি কেন? ইন্দিরা গান্ধী যদি ভারতীয়া মহিলাদের প্রতিনিধি হন, তা হলে অশিক্ষাটা কোথায়! এসব কথা বিদেশীদের বোঝাই কেমন করে বলুন তো। তারাও তো আজকাল আকছার ইনডিয়ায় যাচ্ছে। নিজের চোখে দেখছে সব। পাঁচসালা পুতুল খেলার (কথাটা আমার নয়, একজন সহৃদয়, সহানুভূতিশীল মারকিনের) ছবি দেখিয়ে দেশের আপামর মানুষকে সাময়িকভাবে হয়তো ভোলানো যায়। বিদেশীরা অনেক সীরিয়স। জানতে চায়, ওয়াগন-ভরা গম কেন ইঁদুরের পেটে যায়। দানের দুধ কেন বাজারে বিক্রি হয়।

কী মন্তরে এরা এত ধনসম্পদের মালিক হল, আর কোন্ অভিশাপে আমরা দিন দিন শুকিয়ে গেলুম, সেটা ভাবতে গিয়ে আমার কেবলই জনসংখ্যাবৃদ্ধি আর ব্রিটিশ শাসনের জবাবটা মনে আসে না। আরো কিছু আছে, গুরুতর কিছু। আর সেটাকেই বোধ হয় জাতীয় চরিত্র বলা যায়। আমরা কেন এদের মতন একটু matter of fact ভাবতে শিখলুম না। আর একটু কম

প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী

emotional, less intellectual হলুম না। যাক। এ সব কথা এখানেই বন্ধ করি। দেখছেন তো এ সব বলতে গেলেই আমার খেই হারিয়ে যায়। তা ছাড়া এটা আমার অনধিকারচর্চা। আন্তরিক লজ্জা ও অকৃত্রিম বিনয়ের সঙ্গে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

*

সান ফ্রানসিসকো শহরে সবে পা দিয়েছি, কয়েক জায়গা থেকে গানবাজনা শোনার নেমন্তন্ন এল। গোলডেন গেট ন্যাশনাল পারক প্রশান্ত মহাসাগরের পাড়ের ওপর যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে রয়েছে বিরাট জায়গা জুড়ে রঙ্গভূমি : প্লেল্যান্ড। বাচ্চাদের আমোদ-প্রমোদের অনেক ব্যবস্থা আছে। আছে যে-কোনো বয়সের সর্ববিধ আনন্দ ও মনোরঞ্জনের আয়োজন। এই প্লেল্যান্ডের কনসার্ট হলে এক সন্ধ্যায় হিন্দু লোক-সংগীতের অনুষ্ঠানে হাজির হলুম। সেদিন ওখানেই রক মিউজিক এবং নানারকম আনকনভেনশনাল নাচগানেরও বন্দোবস্ত ছিল। হলের ভেতর খুব ভিড়। গাঁজার ধোঁয়া, চরসের সুগন্ধ এসবেরও প্রাবল্য ছিল। প্রমত্ত যুগলনৃত্য, একক আন্দোলন তৎসহ সুরের সংস্পর্শশূন্য বিচিত্র চড়া পর্দার আওয়াজ ও ড্রামের 'গুরু গুরু [illegible] [illegible] [illegible] অনুষ্ঠানের [illegible] বাইরে [illegible]। অনেকে [illegible] বসার ব্যবস্থা ঘাসের ওপরে। এই সবার বাইরে থেকে আসা হিন্দু লোক, হাবভাবে সীরিয়স [illegible] প্রতীতি হল, হলের ভেতর এসে বসলেন। গান আরম্ভ হল : 'দ্বেরি মুখ[illegible], ঠেকিয়াছি ফান্দে...সজনী গো কী হেরিলাম জলের ঘাটে গিয়া...' ধমকের মচমচ, আর ঘুঙুরের রুনঝুন সব মিলে গোটা আসরের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে একটা নিবিড় পল্লীজন-পরিবেশের আনন্দ ঘন হয়ে উঠল। আনন্দ-লহরী বাজিয়ে, হেলে দুলে, ঝাঁকড়া চুল নাচিয়ে বাংলার যে সুদর্শন তরুণ বাউল সেদিন মঞ্চ মাতিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর নাম প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী। ক'দিন আগেই এঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। এঁর মত মিষ্টি স্বভাবের মিশুক ছেলে বেশী দেখিনি। সান ফ্রানসিসকোতে থাকতে থাকতেই ব্রহ্মচারীর সঙ্গে আমার ও আমার পরিবারের সকলের এমন একটা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠল, যেটা কোন দিনই ভোলবার নয়। প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারীর নাম হয়ত আপনাদের অনেকেরই পরিচিত। যুগোস্লাভিয়ায় অনুষ্ঠিত যুব সম্মেলনে বিশ্ব লোকগীতি প্রতিযোগিতায় ইনি শীর্ষস্থান লাভ করে-ছিলেন। প্রহ্লাদ এখানে আরো অনেক প্রোগ্রাম করেছে। তার গান না তার সুন্দর স্বভাব, কোনটা যে আমায় বেশী মুগ্ধ করেছে, বলা শক্ত।

আরো একজন গুণীর সঙ্গে এখানে আমার পরিচয় হল। তাঁর নাম গোপাল চট্টোপাধ্যায়। রসিকসমাজে 'খোলো গোপাল' হিসেবে তাঁর সমধিক খ্যাতি। খোল এঁর হাতে কথা বলে। গানবাজনার যৎসামান্য যা বুঝি, তাতে মনে হয়েছে গোপালবাবু

আলী আকবরের বাড়িতে ঘরোয়া পরিবেশে আমরা

অত্যন্ত কৃতী বাজিয়ে। এখানে তাঁর অনেক ভক্ত জুটেছিল। কিছু কিছু শিষ্যও। সবাই এ-দেশীয়। শ্রীচট্টোপাধ্যায় এখন দেশে ফিরে এসেছেন।

সসোলিটো, সান র‍্যাফেল আর টেম্যালিনডা কয়েকটি ছোট্ট শহর সান ফ্রানসিসকো থেকে পনের মাইলের মধ্যেই ছড়িয়ে রয়েছে। ফ্রিসকোর শহরতলিও বলতে পারেন। একদিন দুপুরবেলায় সসোলিটোর হেয়ারপিন-বেন্ড-ঘূর্ণিপথের মায়াময় সাগরতলি (ব্যাকরণ মানি না) আর উপত্যকার পাশ কাটিয়ে অনেকগুলো পাহাড় ভেঙে আমরা সান র‍্যাফেলে গেলুম। মধ্যাহ্নভোজের নেমন্তন্ন ছিল। কিন্তু রাস্তা ভুল করে বেশ খানিকটা দেরি হয়ে গেল। বি স্ট্রীট আর সি স্ট্রীটের মধ্যে থার্ড স্ট্রীটের ওপর একটি ছবির মতন দোতলা বাড়ির সামনে গাড়ি পার্ক করার সঙ্গে সঙ্গে ওপর থেকে গৃহস্বামী নেমে এলেন। গায়ে পাতলা স্পোর্টশার্ট পরনে হালকা ট্রাউজার্স, মসৃণ টাক আর শান্ত-সরল হাসি-ভরা একটি অতিপরিচিত মুখ, সে মুখে ঈষৎ উৎকণ্ঠা : 'পথে কোনো গোলমাল হয়নি তো? দেরি দেখে চিন্তা হচ্ছিল। সঙ্গে বাচ্চারা রয়েছে...।' আমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ভারতের গৌরবদৃপ্ত শিল্পী পদ্মভূষণ আলি আকবর খান। খোলা উঠোন, মাথার ওপর জুলাই মাসের রোদ, বেলা প্রায় দুটো, এখনো অভুক্ত। কেবল আমন্ত্রিত অতিথির জন্যে প্রতীক্ষারত কর্তব্যপর গৃহস্বামী নন, এ আলি আকবর এক স্নেহময় মানুষ। দাদা যেমন তাঁর ছোট ভাইয়ের জন্যে অপেক্ষা করেন। আমি না হয়ে আমজাদ-খ্যাদেশ আসার কথা থাকলে যেমন না খেয়ে বসে থাকতেন।

আমাদের অনেকেরই শ্রদ্ধার পাত্র এই গুণী-শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে কাছাকাছি দেখবার সৌভাগ্য আমার অনেকবার হয়েছে। দেশে এবং বিদেশে। এঁর কাছে অনেক শুনেছি, অনেক জেনেছি। এখানে সম্ভব নয়, ভবিষ্যতে সময় ও সুযোগ হলে সেসব কথা লিখব। আমি কিশোর বয়েস থেকেই রবিশংকর-আলি আকবরের ভক্ত। আর কি জানি কেন, আমার ধ্যানলোকে শিল্পী আর তাঁর সৃষ্টিকে কিছুতেই আমি আলাদা করে দেখতে পারি না। এই করে করে একটা বিশ্বাস দাঁড়িয়ে গেছে যে, যে-কোনও মহৎ শিল্পীই তাঁর ব্যক্তিসত্তার মধ্যেও কোথাও একটা যাদুকাঠি, একটা ছোটখাট চুম্বক লুকিয়ে রাখেন, যা দিয়ে, তিনি গান না গেয়েও, বাজনা না বাজিয়েও কাব্য বা স্থাপত্য সম্পর্কে লেকচার না দিয়েও লোককে কাছে টানতে পারেন, লোকের মন জয় করতে পারেন। আর আপনাদের অনুমতি পেলে বলব, এই ধারণা, এই বিশ্বাস আমার কোথাও betrayed হয়নি। আমার এই অকিঞ্চিৎকর জীবনে, যে কটি মহৎ শিল্পীর কাছে যাবার ভাগ্য আমার হয়েছে, মানুষ হিসেবেই তাঁরা আমায় বেশী করে টেনেছেন।

টেরালিনডার হিলটপে 'য়ুনিটারিয়ান চার্চের যে বাড়িটিতে আলি আকবর খান মিউজিক কলেজ, সেটিকে বাড়ি না বলে আধুনিক তপোবন বলুন, ঠিক হবে। এখানের বাতাসে যেন এক রত্তি ধুলো নেই (কথাটা বৈজ্ঞানিক সত্য নয়), তত উঁচু। আমার গাড়িটার কি ভাগ্যি আমার মতন ল্যারিংসের দোষ নেই, নইলে এত উঁচু উঠতে হাঁপিয়ে পড়ত। কলেজ-বাড়ির সামনে প্রশস্ত লনের ওপর প্রায় সুইমিং পুলের মতন বড় একটা বাঁধানো চৌবাচ্চায় টলটলে নীলচে জল, তার ওপর পশ্চিমের রোদ ঝলকে পড়েছে। আমার মেয়ে আর শংকরবাবুর ছেলে (শ্রীশংকর ঘোষ) খেলা করছে ছুটতে একবার ঝপ করে তার ভেতর পড়ল। এখনো ক্লাসের সময় হয়নি। ছাত্রছাত্রীরা ভিড় করেছে লনে, ঘাসে-ঘাসে, লাউঞ্জে, কিচেনে, অডিটোরিয়াম হলে। একটু পরেই চা এলো। আমরা এক-সঙ্গে চা খেলুম। খালি কাপগুলো আমাদের কিছুতেই কিচেনে নিতে দিল না। একটি মেয়ে জোর করে কেড়েকুড়ে নিয়ে গেল। আমরা যে অতিথি, এখানে একটা কথা বলি। সহজ মিষ্টি আতিথেয়তা, সব রকমের সৌজন্য আপনি আমেরিকানদের কাছে সব সময়েই পাবেন, কারোর বাড়িতে গেলে তো বটেই। কিন্তু দোকানে, স্কুল-কলেজে বা পাঁচজনের মেলামেশার জায়গায়, কেউ কারও সেবা করবার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে না, যে যারটা করে নেয়, সেটাই নিয়ম। তবে বুড়োমানুষ, বাচ্চা বা মেয়েরা কখনো কখনো অযাচিত সার্ভিস নিশ্চয় পায়। কিন্তু এই যে ছোট্ট ব্যাপারটি ঘটল, এটা চরিত্রে ভারতীয়। এটা এই কলেজের লিখিত অনুশাসন নয়, অলিখিত উপদেশও নয়। কেবলমাত্র আচরণের দ্বারা, ভারতীয় জীবনচর্যার যে দার্শনিক প্রতিফলন, সংগীতের সঙ্গে যা এক অভিন্ন আত্মিকতায় সম্পৃক্ত, তার মাধুর্যটুকুকে আয়ত্ত করে নেবার স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়াস। এইটুকুই আচার্য এদের কাছে দাবি করেছেন। ভারতীয় সংগীত শিখতে হলে, এর মানসিকতাকে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। ঔদ্ধত্য, অবিনয়, অধৈর্য, হামবড়াই সবজান্তা ভাব—এসব থাকলে চলবে না। তার মানে এ নয় যে, কর্তৃপক্ষ বা আচার্য এসব বরদাস্ত করবেন না। কিন্তু এই inner discipline-এর অভাব থাকলে, শিল্পের কারিগরি শিখে লাভ হবে না। এর পেছনে ইষ্টনিষ্ঠা ও ভক্তিমাধুর্য যুক্ত না হলে শিল্পের রসস্রাব ঘটা সম্ভব হবে না। অর্থাৎ ultimately এতে শিক্ষার্থীর স্বার্থই বিঘ্নিত হবে। আমার মনে হল, এই ethics-এর মর্ম এরা বুঝতে পেরেছে। ক্লাসে ক্লাসে ছাত্রছাত্রীরা পাঞ্জাবি-পাজামা-সালোয়ার-কামিজ-শাড়ি পরে বসেছে, স্কার্ট-ব্লাউজ শার্ট-প্যান্টও নেই তা নয়। সবাই পা মুড়ে বসছে অর্ধবৃত্তাকারে। অদূরে বসেছেন শিক্ষক। সেতারের ক্লাস নিচ্ছেন ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য। তবলার ক্লাস—শংকর ঘোষ। কণ্ঠসংগীত শেখাচ্ছেন শংকরজায়া সংযুক্তা দেবী। পশ্চিমের কোণের ঘরে বিরাট কাচের জানলার ওপর গাছের ছায়া বাতাসে কাঁপছে। কাচের ফাঁক দিয়ে ঈষৎ কমলা রঙের রোদ্দুর ঘরের গালচের ওপর গড়িয়ে পড়েছে। নিবিষ্ট নিবিষ্ট হয়ে একদল নবীন যন্ত্রী তাঁদের আচার্যকে ঘিরে বসে আছেন। এঁরা অ্যাডভান্সড স্টুডেন্ট। খাঁ সাহেব নিজে এঁদের

ক্লাস নেন। রাগ মধুবন্তী শেখান হচ্ছিল। ঝাঁপতালের গৎ। পুরো গৎটি খাঁ সাহেব বাজিয়ে শোনালেন, ছাত্রেরা তন্ময় হ'য়ে শুনল। তারপর একে একে তাদের মধ্যে তুলে নিতে চেষ্টা করল। সেসব চর্চা কালে তাদের বাজনায় যা নমুনা শুনলুম, সেটা দেশের অনেক মাঝারি শ্রেণীর বাজিয়ের সঙ্গে অনায়াসেই তুলনীয়। তখন মনে পড়ল, আমি কার ক্লাসে বসে আছি। বুঝলুম, যাঁরা মনে করেন, বিদেশে আলি আকবর-রবিশংকর পণ্ডশ্রম করছেন, তাঁরা হয় misinformed নইলে অন্য motive আছে। এই ছেলেমেয়েরা কেউ আচার্যকে বা অন্য শিক্ষকদের পা ছুঁয়ে প্রণাম করছে কিনা আমি দেখিনি, কিন্তু ওদের ভঙ্গিতে প্রণিপাত ছিল। ক্লাসে বসে প্রশ্ন করা নিষেধ, কিন্তু তাদের সব জিজ্ঞাসারই যথাযথ জবাব দেওয়া হয়। আর সেবার যথা অর্থে ওরা নিপুণ। শংকরবাবু আর আমি বাইরে দাঁড়িয়ে সিগ্রেট টানছিলুম, ও'র ক্লাসের পরে। দু' একজন ছাত্র এসে কী সব জানতে চাইল। উনি বুঝিয়ে দিলেন। ইন্দ্রনীলবাবু বললেন : 'এরা এত সিনসিয়ারলি খাটে যে, ছাত্র বলতে গর্ব হয়।' ভারতীয় সংগীতের একটা অত্যন্ত সীরিয়স খাটুনির দিক আছে, ফিজিকাল অনুশীলনের দিক। এ কথাটা অনেকে ভুলে যান। নিছক প্রতিভার অংকুর থাকলেই চলে না। বহু যন্ত্রণার রক্তক্ষরণের পথ তাকে অতিক্রম করতে হয়। নইলে পরিণতি আসে না। বাংলা দেশের গান-বাজনার সমাজে বোধ হয় এখন এই ধারণার কোনো কাঞ্চনমূল্য নেই। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেছি : ছ' মাসে হারমোনিয়াম বাজাতে এবং ন' মাসে রেডিও-রেকর্ডের উপযোগী গাইতে শেখানো হয়। এককালে বেশ কিছু অভিভাবক অংকুরিত প্রতিভাদের আমার কাছে পাঠাতেন। এই প্রত্যাশায় যে, আমার পরিচিত জনপ্রিয় শিল্পীদের কাছে তারা কিছু দিন ছাত্রছাত্রী হয়ে থাকবে, তারপর আমি তাদের রেডিও অডিশনে পাস করিয়ে দেব (মোটেই সেটা আমার হাতে ছিল না) এবং রেকর্ড কোম্পানিতে সুপারিশ করব। রেডিওতে কখনো আমি কারুর জন্যে চেষ্টা সুপারিশ করিনি এমন নয়। তাতে ক্ষেত্রবিশেষে কাজ হয়নি, এমন নয়। কিন্তু আমার বিচারে তাঁরা উপযুক্ত শিল্পী হিসেবে উৎরেছিলেন। হাতেখড়ি হয়নি, কবিতার বই বার করবে! সাতটা সুরের নাম জানে না, গলায় তোলা তো দূরে অস্তু —তারা রেডিয়োয় রেকর্ডে গাইবে! অবিশ্যি এখন তারাই সংখ্যায় বেশী গাইছে বাজাচ্ছে। যাক গে ওসব কথা।

তাই বলছিলুম, টেঙ্গালিনডায় এই কলেজকে আপনি তপোবন বলতে পারেন। এখানে এলে মনে খুব ফূর্তি হয়। বাচ্চারা এখানে বোরড্ হয় না। খুব হুটোপাটি করে। অথচ ক্লাসের ভেতর যে গাম্ভীর্যের আবহ, সেটা ভাবের, ধ্যানের। তাই রসের। এ মৌনতা আমার অবসাদের নয়, পাছে এতটুকু [illegible] কোথাও চিড় ধরে, তাই প্রার্থনা-এ উদ্বেগ। আলি আকবর কলেজ এক মিউজিক আয়ামা [illegible] হল এখানে [illegible] করেছে। এর মধ্যেই এর প্রসার ও বিস্তার প্রতিশ্রুতিময় হ'য়ে উঠেছে। কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে নামমাত্র দক্ষিণা নেওয়া হয়। সম্ভাবনা আছে এমন বিত্তহীন শিক্ষার্থী বিনা দক্ষিণাও শিখছে। সেদিক দিয়ে খুব কড়াকড়ি [illegible] এখনো প্রায় চার শ' ছাত্র [illegible]। স্থানা-ভাব [illegible] অসুবিধের দরুন এদের [illegible] না, পরে পরে, আরও এবং সিনসিয়ারিটি অনুসারে এদের ডাকা হবে। এটা একটা সাধনার জায়গা, কমার্শিয়াল প্রতিষ্ঠান নয়। আলি আকবর চান, ক্রমে এটা একটা ভারতীয় সংস্কৃতির পীঠভূমি হয়ে উঠবে। শুধু গানবাজনাই নয়, ভাস্কর্য, দর্শন, অন্যান্য কলাশাস্ত্রের চর্চাও এই কেন্দ্রে হবে। তাঁর দৃষ্টি ছাড়িয়ে পড়ার দিকে অতটা নয়, যতটা intensive study আর রিসার্চের দিকে। তিনি বলেন : আমার বাবার আদর্শ এই। তাঁর পতাকাবহনই আমার ধর্ম।

আলিদার বাড়ির বৈঠকখানায় বসে কথা হচ্ছিল। এ ঘরটাও ধ্যানের ঘর। এ ধ্যানের নায়ক—আনন্দ ব্রিস্। বেদীর মতন একটি সাইডটেবলের ওপর কলাগুরু আলাউদ্দিন খাঁর আবক্ষ ছবি। আমার মেয়েরা সারা বাড়ি চষে বেড়াচ্ছে। তাদের শাসন করতে গিয়ে তাদের মা-ই উলটে বকুনি খেল। তারা কেউ জ্যেঠুর কোলে চাপছে, কেউ সিগারেট-লাইটার নিয়ে টানাটানি করছে, সযত্নে কারুর ড্রেসের বেলটে গেঁথে বেঁধে দিচ্ছেন। আমার সঙ্গী জিজ্ঞেস করলেন : দাদা, দেশে কি আর ফিরবেন না? দাদা মৃদু হাসলেন : ফিরব না কেন। এই শীতকালেই তো যাচ্ছি। তারপর বললেন : দেশের সেবা তো বিশ পঁচিশ বছর করলুম, বিদেশের সেবা ক'দিন করি। আমরা চোখ বুজোলে যাতে কাজটা চলতে থাকে... । মনে হল—শিল্পীর কথার গভীরে কোথাও একটু ক্ষোভের আভাস আছে। আমার ভুল হতে পারে। কিন্তু যদি সত্যিই ক্ষোভ থাকে, তার কারণ কী? ভারতের সংগীত-প্রিয় মানুষ, দেশের সরকার, দেশ-বিদেশের কলারসিক বিদগ্ধজন তাঁকে স্বতঃস্ফূর্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা অর্পণে কার্পণ্য করেনি। প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন আলি আকবর। গল্প শুনেছি : যোধপুর মহারাজের দরবারে থাকার সময়ে দশ পনের হাজার টাকার তোড়া তো প্রায় রোজ [illegible] সাহেব [illegible] বার্ষিক [illegible] হয়েছিল [illegible] অধিকারী। [illegible] থেকে [illegible] নিজের [illegible] কাছ [illegible] ধরে [illegible] কোথাও [illegible] বড়ো [illegible] শিল্পীরা [illegible] যাতে [illegible] পরে [illegible] পাঠায় [illegible] আমার [illegible] থেকে [illegible] সেই খাজাগুরুদের [illegible] রবীন্দ্রশংকর [illegible] রেশমী পোশাক বিক্রিয়ে দিয়ে চটের বস্তা পরে, মুটি আর শাক খেয়ে দিন কাটিয়েছে। আলিদা বলেন : ছেলেবেলায় বাবাকে দেখেছি, ভক্তিতার সময় মাথার চুল বেঁধে রেখেছেন, পাছে ঘুমে ঢুলুনি আসে; চেয়ারের সঙ্গে গামছা দিয়ে নিজেকে শক্ত ক'রে বেঁধে রেখেছেন: শুধু হাত দুটো খোলা। হাতের কাছে একটা টেবিলে ভিজে ছোলা আর জল। দিনরাত্তির রেওয়াজ চলেছে। পারব ও-রকম আমরা?'...যদি সত্যিই তাঁর ক্ষোভ থাকে, আমি সে ক্ষোভের মর্ম বুঝতে পারি।

রাত হয়েছিল। আমরা সবাই ডিনারে বসলুম। ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্যকে আপনারা নিপুণ সেতারশিল্পী হিসেবেই চেনেন। কিন্তু লুচি বেলায় যে ও'র কী পরিমাণ কৃতিত্ব, তার তো খবর রাখেন না। আমার সে ভাগ্য হয়েছে। আর স্বয়ং আলি আকবর খাঁ যখন নিজে পাচকের ভূমিকায় ফুলকো লুচি ভেজে তুলতে লাগলেন,

তখন অকৃত্রিম বিস্ময় ও অমিমিশ্র আন-ন্দানিতে আমার মুখ আপনা থেকেই এমন হাঁ হয়ে রইল যে, যতক্ষণ না তাতে সেই ঐতিহাসিক তোরণে খচিত কয়েকটি মাছি পড়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বন্ধ হয়নি। রাত প্রায় বারোটায় আমরা বিদায় নিলুম। বাইরে তখন [illegible] জাগিয়ে চাঁদনী [illegible]। [illegible] [illegible] তখন স্বর্ণ-আনন্দের লঘু প্রভাব। এতটুকুতে স্টিয়ারিং ধরতে অসুবিধে হবে। এমন কাঁচা অভ্যেস করিনি। অপূর্ব যে সন্ধ্যাটি আমরা হাসি-গল্প-গান আর পান দিয়ে ভরিয়ে নিয়েছি, আমাদের অগোচরে এতক্ষণে তার প্রগল্ভ যৌবন গাঢ় হতে হতে সীমান্তে পৌঁছে গেছে। এখনো তার অকৃপণ দান, আমার চোখে কিন্তু সমীহের কুণ্ঠা। আলি আকবর খাঁ এখনো হয়ত শুয়ে পড়েননি। তাঁরা যদি এই রাতকে দেখেন, তিনি চিনতে পারবেন। হয়ত এই রাতেরই নাম—[illegible]।

✻

এইটি আমার শেষ চিঠি। আপনাদের বিদায় নমস্কার জানাচ্ছি।

জহুরী [illegible]

বুভুক্ষা

রঙ ধরিয়ে দেয় নি তখনো ভস্মমাখা ভোরের আকাশে। অন্ধকার গলি থেকে ময়লার স্তূপ ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে এসে এইমাত্র চৌপট্টির মোড় ঘেঁষে বসল খয়রন।

মাথায় শনশনুড়ি চুল। উকুন বিজবিজ করছে। পরনে জড়ানো ফালিখানেক হাড়ি-কালি ন্যাকড়া। ছেঁড়া ঝুলি ঝুলি। পায়ের ওপরে পা জড়ানো, অদ্ভুত-কালো একটি মাংসপিণ্ড কেলে। কঁকিয়ে কঁকিয়ে মাথা কুটছে—মুখ ঘষড়াচ্ছে মায়ের বুকেতে।

পুড়ে পুড়ে পোড়ামাটি যেনো সে-বুক —সাহারা!

কোনো আশ্বাসই নেই এক ফোঁটা অমৃতের।

কনুই পর্যন্ত গড়িয়ে বেড়ানো কাচের লাল চুড়ি দু'খানা দু'টি শীর্ণ-কঙ্কাল-হাতে। গিঁটে আঙুলের মুঠি পাকিয়ে বাঁদরের মতো দাঁত খিঁচিয়ে উঠে ধাঁই ধাঁই করে খানকয়েক পেঁদিয়ে দেয় খয়রন তার বাচ্চাটাকে। বাচ্চা তো নয়—রক্তচোষা হাড়গিলের পাখি!

আঁকাবাঁকা হাতখানা শূন্যে চালিয়ে দেখে এক ঝোঁকে বেশ খানিকক্ষণ সুর ধরলে সে:

'আল্লা তুম-কো রুজি দে গা
দে খোদা-কী রাহা মে'—

কিনকিনে গলায় শানেতে বেশ! গানের মধ্যে। ছন্দ কাটা। তাল মাপা।

ভোরের চাকর ঝাঁটা হাতে আবর্জনা ঠেলে এনে চোখ কোঁচকে—গোলক-ধাঁধা আটপৌরে হাতের আঙুলে 'জলকেয়ারী' গোঁফে মোচড় দিয়ে ভরদুনিয়ার স্বরে দাঁত খিঁচিয়ে বলে—'আরে শিয়াড় জানানা! উঠো গা—ক্যা? মারে গা ঝাড়ু? হাট ভাগ যা'.........

পাতাল-কালো চোখের কোটর থেকে দপ্ করে আগুন ঝলকালো এক ঝলকি। উকুন-ভরা মাথা নেড়ে নেড়ে ঘাড় কাঁকিয়ে কোলের বাচ্চাটাকে একটা ঝাঁকি মেরে বলে খয়রন, 'উঃ! মিনসের কথার ছিরি-দ্যাখো-না! আমি জানানা—তোর বাবা জানানা! মাথায় মারি মুড়ো-ঝাঁটা! মেড়ুয়া মেথর কোথাকার!'

বসে বসেই নিজেকে খানিকটা টেনে নিয়ে গেল খয়রন। পায়ের চৌত্রিশ কাটিয়ে মেথরটা ঘষঘষ করে ঝাঁটা চেলে জঞ্জাল ঠেলে চলে যায় চৌপট্টির ডানহাতি মাথাঘষা এক চিলতে ফন্দে গলিটার ভেতরে।

কাঁচা আনাজের ঝাজরা মাথায় নিয়ে গাঁও-গ্রামান্তের আঁকাবাঁকা অসমতল পথ ভেঙে আসছে কালঘামে ভেজা শিরদাঁড়া খাড়া চাষীরা। আটটার বাঁশিকে ওরা

বজবজের চার নম্বর ফটকের নাগাল ধরবে।

বাবুদের আয়না-চকচকে ট্যাক্সিগুলো বুলবুল করে এক মুঠো নীলচে ধোঁয়া ছেড়ে সাঁ করে উড়ে যায়। তারপর চৌরঙ্গীর মোড় থেকে গাদাগাদি করে মানুষ-বোঝাই শিখ-ড্রাইভারী বাসগুলো গড়াতে গড়াতে যায় কলকাতার দিকে। পাটের গাঁট বোঝাই ছ'খানা চাকাওলা বিরাট জুট মিলের 'বেরঙ্গো-বেরঙ্গো লরী' একটার পর একটা।

ডাগর মেয়ের দল বই বুকে নিয়ে বেণী দুলিয়ে চলেছে বালীপুর হাইস্কুলে। একটু পরেই মাঠ জুড়ে ছুটবে ন্যাংটো কলোনি ছেলের দঙ্গল। মেয়েমদ্দ ডাগর-কাঁচা আপামর। সামনেই রেজিস্ট্রারী অফিসের বাঁ-পাশ ঘেঁষে গোটা দশেক আসমান জোড়া বার্মা শেল, স্ট্যান্ডার্ড ভ্যাকুয়াম, ক্যালটেক্স আর ইন্ডিয়ান অয়েলের বিরাট বিরাট কেরোসিন ট্যাঙ্ক, পেট্রোলের ডিপো।

ডাঙা দিয়ে দাঁড়িয়েছে দোকানগুলো রেশনিং অফিসের সামনে। চৌমাথার একচেটের দোতলায় একটি মেয়ে—আধখানি নাইসমেত পেট আর বুক, পিঠ খোলা, বগল ফাঁকা, একজী ব্লাউজ পরা—তুলিটানা ভুরু নাচিয়ে রঙিন ঠোঁটে হাসি ছড়িয়ে রসালাপ করছে, চুস্ত প্যান্ট পরা কপালে সিঙাড়ার মতো চুল পাকানো একটি ছোকরার সঙ্গে।

'হায় হায়...এ্যা, লজ্জা!' রেডিওর দোকানটা থেকে আধুনিক গান হচ্ছে। কোনো নারী যেন প্রথম যৌবনের বাসর-শয্যায় প্রণয়ীর নিপীড়নে শরম-জড়ানো কণ্ঠলীলায় ব্যক্ত করছে।

এপাশে 'জেবুন্নিসা' হোটেলে মশলা মাখানো গোশতে কষার ছ্যাঁক-ছোঁক শব্দ আর বাতাস মাতানো গন্ধ।

আর একদল ছাতাভাঙা থুরথুরে বুড়ো-বুড়ী এল লাঠি ঠকঠক করতে করতে মাকনহাড়িয়া দিকে; হালদার পাড়ার হিন্দুস্থানটা ফুঁড়ে 'কুইন সিনেমা'র সামনের 'গোনটা' ধরে।

অন্যমনস্ক হয়ে গেছল এতক্ষণ খয়রন। আচমকা গানের সুর ভাঁজলে সে। 'আল্লা তুম-কো রুজি দেগা—দে খোদাকী রাহা মে'.....

ঠক করে একটা তামার কোনাচে পাঁচ পয়সা পড়ল খয়রনের সামনে। মুখখানা চিকচিক করে উঠল অকস্মাৎ এক ঝলক

সেখানদনের সেবকবাহিনী সব। অফিসার, মহাজন, আড়তদার মহাশয়দের তেজারতীর ভবিষ্যত অংশীদার। আবদুজেল আজ না হয় ভিখিরী বলে কেউ তাকে দয়া করে চেনে না। কিন্তু সে তো চেনে এখানের সকলকে।

খদ্দরের একটা হাত ধরে টাগিয়ে তুলে দাড়ি-গোঁফ ভর্তি মুখটা রাগে আর বিরক্তিতে জাঁহুর করে বলে আবজেল, দুইনার এত জায়গা থাকতে তুই এখেনে কেন পড়ে মত্তে এলি র‍্যা শালী? চ'—উ-দিক পানে চ'। যেমনি কুকুর তেমনি মুগুর। ঠিক হয়েছে। তাদের কাছে গ্যাছে হাত পাততে। তের গালে'...

বিষম ক্ষুব্ধ আবজেল। খিড়কির কপাট খুলে গেছে তার মুখের। চার খুঁটে বাঁধা একটা ঝুলির মালিক বটে সে, কিন্তু তার হাড়-পাঁজরের গতরে মানুষ চেনার (সহস্রাধিক কশাঘাত) অভিজ্ঞতা আছে বিলক্ষণ। গরিব আর বড়লোক। সীমা ছাড়ায় কেন খয়রান? ঠেকে না শিখলে 'এদ' (ইয়াদ) হবে না তো। আবজেল মনে করে, সীমা যদি ছাড়াতেই হয় তবে তার তেল-পাকানো এই কাঁধে লাঠিটাই একান্তভাবে কাজ দেবে।

কিন্তু ভারি অসহায় মনে হয় কেবলই।

ছাদহীন উন্মুক্ত আকাশের তলায় যে সংসার তাদের যাযাবর, তার অভিযোগ আর দুরন্ত ফরিয়াদ শুধু মাথা কুটে কুটে মরে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে এগিয়ে চলে খয়রন। পঙ্গু আবজেলের চোখের পাতা দুটো কেমন যেন ভিজে ভিজে! পচা ফেলে-দেওয়া একটা আম কুড়িয়ে এনেছিল আবজেল। সেইটাকে চোবলাতে চোবলাতে শান্ত হয়েছে ছেলেটা।

—'বস এখেনে।' বলে আবজেল : 'এট্‌টুস ছাচ্‌তেল চেয়ে 'লোসি' (লিয়ে + এসি) ঐ মুদিখানাটা থেকেন। পিঠে-পাছায় দিবে দোবখনে। ফোস্কা পড়ে যাবে তোর গোটা 'শরীলে'!' আবজেল এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ হেঁট হয়ে কয়েকটা আধপোড়া বিড়ি কুড়িয়ে নেয়। ধরায় একটা, পান-দোকানের খোলেন থেকে। দুটো টান মেরেই ফেলে দেয়। বিরক্ত হয়ে বিড় বিড় করে বলে, শালারা কি সেই লোক, যে এট্‌টুস রেখে-থুয়ে ফেলবে!'

ভরসা করে পান-দোকানে একটা বিড়ি চাইলে আবজেল।

'ভাগ শালা কাঁহা-কো!' বাপরে! একটা বিড়ির জন্যে যে খ্যাংরা তুলে বসে লোক! কি দেশ হল! নাঃ! বাঁচবার মতো আর কোনো সুরাহাই নেই আবজেলের।

তেল নিয়ে এল আবজেল। বাঁ-হাত বুলিয়ে রগড়ে দিলে খয়রনের মেরুদণ্ড-খাড়া পিঠখানায়। সামনের দিকটায় তেমন বেশী পোড়েনি চট করে ঘুরে পড়ার জন্যে। ছেলেটার কচি চামড়ায় এরই মধ্যে কয়েক জায়গায় ঢোলা ঢোলা ফোস্কা পড়ে গেছে। চড়িয়ালের মোড় থেকে বিদায় নিলে ভিখারী-দম্পতি।

সাড়ে দশটার ভোঁ হল চারদিক থেকে সব ক'টা চটকলে।

ভিড়ভিড় করে মিলের গহবর থেকে ফেঁসোমাখা মজুরেরা তেলকালি-জমা গামছায় গা ঝাড়তে ঝাড়তে ছুটে এসে পড়ল কতক চার নম্বর ফটকের বাজারে। এরা সব বাসাড়ে। খরচামত কাঁচা আনাজ কেনে রোজের। দু ঘণ্টা ছুটির মধ্যে রান্না, চান, খাওয়া, একগোড় গড়ানো। তারপর সাড়ে বারোটার ভোঁ ধরা। সপ্তার ছ' দিন ছক-বাঁধা কাজে জীবন নিঙড়ে রুদ্ধশ্বাসে ছুটে যার যে যার বাড়ি-ঘরে। মাগ-ছেলে, জন-ধন, গরু-বাছুর, লাঙল-জমি, খাজনা-খেসারত, মামলা-মোকদ্দমা—হাজারো কাজ সেখানে। আর একদল—যাদের বাড়ি তিন মাইলের মধ্যে, তারা ছুটেছে নাভিশ্বাস বইয়ে বাড়িতে খেতে। রেল লাইন টপ্‌কানো পথটার দু' পাশে দুজনে একফালি করে ন্যাকড়া বিছিয়ে বসেছে—আবজেল আর খয়রন। দুজনেরই দু-সুর। দেহের দোলনও দু-ভঙ্গির। কিন্তু উদ্দেশ্য একই।

পাঁচটা মিনিটের মধ্যেই বিলকুল সাফ হয়ে যায় কলের লোকের ভীড়। খালা বাড়িয়ে আশেপাশে দু-একটি আবর্জনাসংকুল পাতা-পচা রঙীন শ্যাওলাজমা এঁদো ডোবার যোয়েমর্দোর ডোল-ডোবাডুবি চলে কয়েক মিনিট। কাঁচা কয়লা বোঝাই ওয়াগন টেনে হুস হুস করে ফুঁসতে ফুঁসতে ওরিয়্যান্ট মিলের দিকে চলে যায় মন্থরগতি বাষ্প-শকট।

পয়সা ক'টা খুঁটে নিয়ে গণ্ডা গণ্ডা করে গুনে হিসেব করে নাই-কোঁচড়ের খুঁটে বাঁধে খয়রন। আবজেল পেয়েছে বেশ পয়সা আর খয়রন বুঝি পঁচিশ পয়সা। এবারে বাড়তি কাঁচা আনাজের যোগাড়ে দুজন হাত পাতে এসে চাষী আর বাজারের স্থায়ী ব্যাপারীদের কাছে। ঝিঙে, উচ্ছে, পটল, লাল আলু, বেগুন, পিঁয়াজ। কেউ বিমুখ করে না। যা হোক দুটো একটা দান করে।

আবজেল বলে, 'ও মুসার মা, আজকে জুম্মাবার! তোর 'এদ' আছে?'

খয়রন হাসলে। তার মনেই ছিল যে আজ শুক্‌কুরবার।

মুসার হাতে চার পয়সার মুড়ি কিনে দিয়ে আবজেলের কাছে তাকে বসিয়ে রেখে বাড়িতে চলে যায় খয়রন। ভগ্ন আগড়টা খুলে কোঁচড়ের আনাজ ক'টা মেঝের স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার এক কোণে ঢেলে রেখে মাটির শানকি দুখানা নিয়ে আসবার সময় গেঁটের পাঁচটা পয়সা বার করে ওড়িয়ার দোকান থেকে এক খিলি গুণ্ডি পান কিনে খেলে খয়রন। নভচারী মিনারওয়ালা চড়িয়ালের বড় মসজিদ। বাঁ পাশে ব্যঞ্জন-হাড়িয়ার ঘোষের হাটেরে রাস্তা। ডানপাশে কসাইখানা। হাড়গোড় নিয়ে ঘেয়ো-ভাজা কুকুরের শ্মশান-কীর্তন। ওপাশে মজা খালটার ধারে—করোমচা, পিটুলি আর ভেলকো বাঁশ ঝাড়টার তলায় শকুনের সঙ্গে আড়ি-করে-আনা কালখানার হড়মা-সার, আধমরা গরুর দল বাঁধা।

খোঁকামেকি বেধে গেছে ভিখারীদের মধ্যে। আঁচড়াআঁচড়ি-কামড়াকামড়ি। চুল ছেঁড়াছিঁড়ি। শানকি হাতে সবাই চায় পয়লা একটু বেশী 'হাজুত ভাত' নিতে। খোদার নামে মানসিক করা খাসী কিংবা মোরগের মাংস রান্না আর ভাত দেওয়া হয় ফি জুম্মাবারে। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের নর-নারায়ণ সেবা—এতিম মিস্‌কিনের প্রতি পরহেজ-গারদারী।

আবজেলের লক্ষ পড়ল, পেছন থেকে দুজন বিদেশী সাহেব তাদের ফটো তুলছে!

অনেক কষ্টে কালঘাম ছুটিয়ে দুজনে দু মুঠো অন্ন সংগ্রহ করেছে আবজেলরা। হাঁক হাঁক করে গোগ্রাসে খেতে লেগে গেছে। আবজেল খেতে খেতে হঠাৎ একটু অন্য-মনস্ক হয়েছে পেছনে লোমওঠা পচা ঘা-ওয়ালা পাগলা কুকুরটার গর্জনে, অমনি তার পাত থেকে খপ্‌ করে টুকরো দুই

এর জেবায় ময়লাকাটা আড়ুক জেলে দেখা হবে। অবশ্য তারা যদি মাসে পঞ্চাশ টাকা করে ভাড়া দিতে পারে।

বরফগলা শীতের রাতে পথের পাশে—পাতাঝরা গাছের তলায় পড়ে প্রথম দিন ধরে কাঁদলে ভিখারী-দম্পতি। অসহায়ের সহায় নিরাকার আল্লার দরবারে অভিযোগ না করে নিজেদের কপালের লিখন পালটাবার জন্যে করুণাভিক্ষা করলে।

আবার সেই ভিক্ষাবৃত্তিতে নেমে এল দু-জনে। পচা নোংরা গলির আস্তাকুড় ঘেঁটে সারাদিন জীবিকার আহরণ ঃ পড়ে থাকে যেকোনো জায়গায় আন্ত বাসি মড়ার মতো। মাছি ভন ভন করে গায়ে মাথায়। তিনটে মানুষের কাঁচা জীবন ধুঁকিয়ে ধুঁকিয়ে জ্বলে চাঁদে, চারদিকে পাকানো শিটে তিনটে শরীরে।

ধীরে ধীরে বয়স বাড়ে মুসার। পথ-চলতি পাড়া-গাঁয়ের জমানো ভিক্ষের চাল-আটা নিয়ে গাছের তলায় তিনটি ইটের ঠিকে উনুনে কাঁধে-করে-বয়ে-বেড়ানো মাটির ছোব ভাঁড়ে রান্না বসায় খয়রন। ছুটে ছুটে জ্বালানি-কাঠ কুড়িয়ে আনে বাচ্চাটা। একরাশি ন্যাকড়া জড়িয়ে শনুড়ি চুল আর খোস-ওঠা গা নুচতে নুচতে গৃহিণীর মতো রান্নার কাজে ব্যস্ত খয়রন। ফেন জড়ানো চাল-আলু কিম্বা খুদের খিচুড়ি-ভাতটুকু তিন ভাগ করে সপাসপ কয়েক মুহূর্তেই মেরে দেয় তিনজনে।

যাযাবর জীবনকে টেনে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে যায় শহরের পথে। একদিন দেখা যায় নভচারী প্রাসাদের সুনীল থেকে ছিটকে পড়া এক [illegible] পার্কের এককোণে [illegible] খোঁড়া আবজেল একটুকরো ইট মেরে মেরে ভাঙবার চেষ্টা করছে ভদ্রলোকে-খেয়ে-ফেলে-দেওয়া একটা ডাবের খোলাকে। অদম্য চেষ্টা—প্রাণপণ। সে যেন লড়াই করছে। ভাঙতে না পেরে আঙুল গলিয়ে কুরে কুরে শাঁসটুকু খাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু পাকা শাঁস ওঠার নামই করে না। শুধু আঙুলটা চাটছে তো চাটছেই!

লোভাতুর ড্যাবডেবে আর জ্বলজ্বলে চোখ মেলে চেয়ে থাকে খয়রন। শুকনো ঠোঁট দুটো তার লালায় ভিজে যায় ঠোঁট নাড়ার অনুকরণ করে। শেষে ইটটা নিয়ে বলে, 'কই দাও দিকিনি—ভেঙে দিচ্ছি!'

'তুই যা কচ্ছিস কন্না।' না, কিছুতেই দেবে না আবজেল। খেয়ে নেবার মতলব। হাঁইফাই করতে করতে ছুটে ছুটে আর একটা খোলা নিয়ে এল মুসা। রেলিংয়ের ওপারে নাকি খাচ্ছে দুটো বাবু। মেয়েরা সাথে আছে এক দঙ্গল। আরো খাবে। অনেকগুলো জুটে গেছে এরই মধ্যে ভিখিরী ছোঁড়া-ছুঁড়ির দল।

মায়ের কাছে খোলাটা জিম্মা রেখে মাথা গুঁজে চিলের মতো ছুটে গেল মুসা। কিন্তু মাড়োয়ারী বাবুরা এবং বিবিরা বুঝি আর ডাব খাবে না।

দইবড়া আর ফুচকাওয়ালাদের কাছে ভীড় জমিয়ে ঘাঘরা ছড়িয়ে বসেছে বিবি-গুলো। পায়ে পায়ে কাছে ঘেঁষে গিয়ে মুসা শীর্ণ একখানা হাত বাড়িয়ে বলে—'মা!'...

ক্ষুধার্ত শকুন-শিশুর মতো তার কণ্ঠস্বর।

তাড়া খেয়ে সরে এল মুসা। মেয়েগুলোর গায়ে হাজার হাজার টাকার সোনার গয়না! মাড়োয়ারী বাবুটি রঙিন পাথর বসানো আংটিপরা আঙুলের টুসকিতে পোড়া সিগারেট খণ্ডটি ছুঁড়ে ফেলে দিতেই চোখ কান বন্ধ করে দম মারে মুসা।—'আঃ!'... এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে দেয় আকাশে; কিলবিল করে ছড়িয়ে যায় বাউরী বাতাসে।

একজন বাঙালীবাবু ওখানে দাঁড়িয়ে। হাতে অ্যাটাচিব্যাগ। সাদা খদ্দরের পোশাক। উদাস চাউনি।

—'বাবু!'

—'কিরে? ওঃ! পয়সা চাইছিস? দু'-দিন খাওয়া হয়নি?'

ভদ্রলোক কবিসুলভ করুণ দৃষ্টি মেলে তাকে কিছুক্ষণ দেখলেন। মুসার শুকনো ঠোঁট দুটো নিসপিস করতে লাগল। এক পায়ে দাঁড়িয়ে এক পা ঘষতে লাগল, হাত দুটো পিছনের বাড়ের দিকে করে বেঁধে। বললে, 'আমরা দু' দিন খাইনি বললে তো কেউ কিছু দেয় না বাবু; কাল, আরে! দু' দিন করে তো আমরা সব্বাই শুকিয়ে আছি। সব্বাই—সব বাংলার সব্বাই! খালি

লাট, মন্ত্রী, বড় বড় কোম্পানির মালিক আর অফিসাররা ভাল ভাল খেতে পায়—যাকে 'খাওয়া' বলে! দুধ-ঘি-ফল-মুরগি-মাংস-পোলাও-কোর্মা এই সব! আমরা সেসব দেখিনি—নামও জানিনি।'...

ভদ্রলোকটি দুর্বল-হৃদয়। তাঁর চোখ ছলছল করে উঠল। পকেট থেকে একটা কি যেন বার করে ওর হাতে দিয়ে হনহন করে সোজা চলতে লাগলেন।

কিন্তু...মুসার চোখে ধাঁধা লেগে গেল। ছুটল পিছনে পিছনে।—'বাবু—ও বাবু'—ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে গেছেন তখন বাবুটি।

এক দৌড়ে পার্কের কোণে এসে দাঁড়াল সে বাবা-মা'র কাছে। গালের ভেতর থেকে একটা চকচকে আধুলি বার করে দেখালে তাদের দু' জনকে। ছোঁ মেরে—খাঁ করে—ছিনিয়ে নিলে খয়রন।

আবজেল বলে, 'তুই কোথায় পেলি?'

মুসা বলে, 'তুই শালা চুম্মার! আহ্! কপরে দালালী মারাচ্ছে! ভাবটা লোসে দিতেই কেড়ে দিয়ে বসে আছে! মা, দে মোর পয়সা, চাল কিনে লোস!'

'তা দে! তা দে!' বলে আবজেল খাঁকড়া চুলদাড়ি বোঝাই মাথাটা নেড়ে নেড়ে। কিন্তু খয়রন ছেলেকে বিশ্বাস করতে পারে না। যায় তার সঙ্গে সঙ্গে। পথে বলে, 'ছ' পয়সার একটা 'আস-কিম' কেনতো বাবা।'

মুসা রাজি নয়। চাল কিনে ফিরতি পথে গলির অন্ধকার থেকে কুড়িয়ে আনলে একটা মরা মুরগি। খয়রনের মতে সেটা টাটকা—হয়তো এখনি কেউ ফেলে দিয়েছে। গায়ের উষ্ণতা পর্যন্ত বর্তমান।

মাংস চাপালো তিনে উনুনে।

মাঠভরা সবুজ ঘাসের আস্তরণ আলোর আলো। আবজেলার হাত থেকে মুরগির ছাড়ানো ধবধবে পালকগুলো নিয়ে মুসা খেলায় মত্ত। ফিরফিরে বাতাসে পেঁজা তুলোর মতো রঙিন আলো ভরা সারা মাঠে ছড়িয়ে গেছে পালকগুলো।

খাওয়া শেষ হবার অপেক্ষায় নুয়ে অকিড ঝাড়টার কোল ঘেঁষে দাঁড়ায় মুসা। চোখ পড়ে তার সামনের প্রাসাদের দোতলার বারান্দায় দাঁড়ানো তারই বয়সি চকচকে একটা ছেলের দিকে। উৎসুক দুটো ভোমরা কালো চোখে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। মজা দেখছে যেন।

কি খেয়াল গেল মুসা মুখ ভেংচে কাঁচকলা দেখিয়ে বাগিয়ে দেখাতে লাগল ছেলেটাকে। হঠাৎ ঝকমল-করা ঝুলন্ত পর্দাটার ভেতরে গপ্ করে সেঁধিয়ে গেল ছেলেটা।

কিছুক্ষণ পরে উৎকট চিৎকার আর অশ্রাব্য গালাগালিতে মৌনতা ভেঙে গেল চারদিকটার। উচ্চকিত হয়ে পার্কের কোণটার তাকালে সকলে।

—'কেন তুই জিনিস শালা! ক্যাসবার গতর নেই ফিরে মোর কেড়ে খাওয়া!'

মুসাকে বুকে তুলে চিৎকার করতে করতে পংগু স্বামীর কাছে ছুটে এল

—হাঁ রা শালার শালা পাজী—মুই লিইচি? না, উ-মাগী!'

'কেন মুই এট্টুস বেশি লাবুনি? মুই তো 'পাইড়' আননু।' অতএব মাংসের বাড়তি অংশটুকু তো খয়রনেরই পাওনা। যা হোক, সন্ধি হয়ে গেল একটু পরেই। অন্য আর একদিন—যেদিন মাংসের যোগাড় হবে দেবে মুসাকে বেশি করে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে পথের-কুড়িয়ে-আনা আধ পোড়া সিগারেট-বিড়িগুলো বের করে উনুনের আগুনে ধরিয়ে ধরিয়ে তিনজনে বসে বসে বেশ কিছুক্ষণ ধূমপান করলে।

হাড় কনকনে শীত। গুটিসুটি মেরে কাঁটালী চাঁপা আর অর্কিড ঝোপটার তলায় শুলো তিনজনে ছেঁড়া খোঁকড়া ময়লা গুদোড়ি মুড়ি দিয়ে। উচ্ছ্বসিত সারেঙ্গের সুরে আলাপ ভেসে আসছে পার্কের কোণের বাড়িটা থেকে। কানে এসে বাজে হরেক রকমের শব্দ :

'রাজকুমারীরা— ইলকুত পাউডার!'... 'কুলপী মালাই বরফ!'...'চানাচুর!'...

পথ থেকে পথে। আশাহীন আকাঙ্ক্ষাহীন জীবন। বৈচিত্র্যহীন।

আর একদিন :

ভিখারী বধূর আর্তচিৎকারে ছিঁড়ে-খুঁড়ে গেল মধ্যাহ্নের নীরবতা।

এইমাত্র পরনের আটপৌরে কাপড়খানা মাঠের ঘাসে মেলে দিয়ে হাত দেড়েক ফালি একটা ন্যাকড়া কোমরে জড়িয়ে এলো বুকে পড়েছিল খয়রন ওই শাখাপ্রশাখা বিস্তারিত ঘন শিরীষ গাছটার তলায়। বসে বসে তার মাথার শনুনোড়ি চুল হাঁটকে উকুন বাছছিল আবজেল। হঠাৎ—হঠাৎ এমন করে আকাশ-ফাটা চিৎকার করে উঠল কেন খয়রন? পাগলের মতো চিৎকার করে ছুটে চলেছে সার্কাস এভিনিউটার দিকে!...

কালো পীচ-মোড়া চওড়া রাজপথের বুক থেকে রক্তাক্ত দেহ মুসাকে বুকে তুলে চিৎকার করতে করতে পংগু স্বামীর কাছে ছুটে এল খয়রন।

বাবুদের উল্কাবেগ ট্যাক্সির তলায় চাপা পড়ে নাকি মারা গেছে তার বাচ্চাটা! খয়রন শুয়ে শুয়েই দেখতে পাচ্ছিল, রাস্তার ওপারের বাড়িটার তেতলা থেকে একটা মেয়ে খান দুই বাসি রুটি ছুঁড়ে দিচ্ছে মুসাকে দেখিয়ে। ওপারে অনেক ভিখারীর ভীড়। হঠাৎ ছুটে রাজপথটা পাড়ি দিতে গিয়ে—'মোর বুকের মাণিক, ওই বাবুদের গাড়ি চাপা পড়ে মরে গেল বাবারে'... অসহায় আর্তনাদে খয়রন বুক চাপড়াতে লাগল তার রক্তমাখা বাচ্চার লাসটা কোলে চেপে। গণ্ডউঁচু তোবড়ানো গালের রোদ-পোড়া চাপ-দাড়ি বেয়ে ঝরঝর করে অশ্রু ঝরে পড়ছে পংগু আবজেলের। তার যদি মিলের-সেপটে র-জড়িয়ে-সিলিন্ডার-ঘুরিয়ে-আছাড়-খাওয়া এই ঠ্যাং-ঠোকলা-ভাঙা-'অবস্থা' না হত—তাহলে তার মাণিককে আজ এমন করে...

খয়রন ভিখারী মেয়ে হলেও সে মা! বুকে তার দুরন্ত হাহাকার!

পথের মানুষ হঠাৎ একটু দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে চলে যায় যে যার কাজে।

রক্ত উগরে শ্রান্ত সূর্য নামছে পাটে।

কান্না থামিয়ে খয়রন এক সময় কাঁচা কংকাল শরীরে ছিন্নমলিন আটপৌরে কাপড়খানা জড়ালে। কাঁধে তুলে নিলে তার শুকনো কাঠের রক্তমাখা মরা বাচ্চার লাসটা।

অশ্রুক্লান্ত চোখ দুটোর তারায় তারায় তারা এক ঝলক নতুন আশার আগুন। খয়রন পা বাড়ালো পথে। কান্না-মাখা সারা মুখে তার চিকচিক করছে অনেক বুভুক্ষা!

—আবদুল জব্বার

খেটে খেটে সারা!
সংসারের যাবতীয় কাজে গৃহিণীর শরীরের
গ্লুকোজ প্রতিমুহূর্তে ক্ষয় হচ্ছে
ক্লান্তির মানে হ'ল, শরীরে
গ্লুকোজের প্রয়োজন। আর
গ্ল্যাক্সোজ-ডি হল এমন বিশুদ্ধ
গ্লুকোজ পাউডার, যা খেলে মুহূর্তে
দেহের শক্তি ফিরে আসে।
আপনার শরীরের গ্লুকোজ অনবরত ক্ষয় হ'য়ে যাচ্ছে। আর সেই গ্লুকোজ
যখন একেবারে কমে যায় তখন আপনার ক্লান্তি আসে। সেই সময়ে আপনার
একটু গ্লুকোজ খাওয়া বিশেষ দরকার। মনে রাখবেন যাঁরা গ্লুকোজ ব্যবহার
করেন তাঁদের প্রায় সবারই পছন্দ মিষ্টি স্বাদের গ্ল্যাক্সোজ-ডি। এতে মুহূর্তে
আপনার শরীরে শক্তি ফিরে আসে। আপনি একে জলে, দুধে, ফলের
রসে কিম্বা সোজাসুজি প্যাকেট থেকে খেতে পারেন।
নিমেষে শক্তি অথচ কত কম দাম
GLAXOSE-D
গ্ল্যাক্সোজ-ডি
গ্ল্যাক্সোর তৈরী গ্লুকোজ পাউডার

তোলা হয়েছে: তরুরা তবে কি ইংলণ্ডে প্রবাসী প্রথম বাঙালী মহিলা? ফ্রান্সে পদার্পণকারী প্রথম ভারতীয় নারী?

কেমব্রিজে এক পাদ্রির কন্যা মেরী মার্টিনের সঙ্গে তরুর ভাব হয়। দেশে ফিরে তাঁর কাছে ঘন ঘন। এমন কি হপ্তায় হপ্তায় চিঠি লেখেন। এই ৫৩টি চিঠি তরুকে চেনার পক্ষে এক অমূল্য সম্পদ।

পত্রের দর্পণে

বন্ধুর কাছে তরু লেখেন বিলেত-থেকে-নিয়ে-আসা গাছ, পাখি ও গিনিপিগের কথা, ঝিলের ধারে বৃদ্ধ বিড়ালের সমাধিদানের কথা, বর্ষাকালে রুমাল দিয়ে ক্ষেতে মাঠে মাছ ধরার মজার কথা...। আর লেখেন কানা পের, বনা বাঘের আর 'অসমাপ্ত গণ্ডার'-প্রাপ্তির মোহ, হাওড়ার নতুন নৌকার সেতু, কলকাতার নতুন চিড়িয়াখানা, ভারতের নতুন বড়লাট ও নতুন মেট্রোপলিটন বিশপের কথা।

তরুর চিঠিগুলি বাগমারির কোকিল ও পাপিয়ার গানে মুখরিত, চম্পা ও গন্ধরাজে সুরভিত। উচ্ছ্বসিত চিত্তে বন্ধুকে তিনি জানান, লিচু আর আম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফল, ভারতের কমলালেবু ইয়োরোপের

কমলালেবুর চেয়ে ঢের বেশি মিষ্টি, বাংলা দেশের কয়লা ইংলণ্ডের কয়লার চেয়ে ঢের বেশি বড়। আর বাগান-বাড়ির 'হোমৃ-মিল্কের' কথা কি বলব? তবুর রসনা ভাষণে বিদেশী হলে কি হয়...আস্বাদনে সে বাঙ্গালী : ইংলণ্ডে থেকেও তিনি "kuchooree, churchuree, ambole" খেতে ভালোবাসতেন। মেরীকে জ্ঞানদানার্থে তিনি বোঝান মামা-কাকা-জেঠা নামের পার্থক্য—আর তাঁর হিন্দু মামার বহু-বিবাহের তাৎপর্য।

তরুর দিন কাটে পঠনে অধ্যয়নে : I was always a bookworm। গোবিন বাবুর তত্ত্বাবধানে তিনি শেখেন অঙ্ক এবং [জার্মান শিক্ষকের অভাবে] সংস্কৃত; ওঁর কাছে কিন্তু দেবভাষা—আর পঠনীয় অভিজ্ঞান-শকুন্তলং-ও—অতিশয় কঠিন ঠেকে : the grammatical rules are legion and so minute.

তাঁর হবি ছিল : ঘোড়া! তাঁদের গাড়ির দুটি ঘোড়াকে তিনি খেতে দিতেন [ঘোড়া নাকি গাজর ও আখ খেতে ভালোবাসে!] শুশ্রূষা করতেন, অশ্বপালন ও অশ্বচিকিৎসা সম্বন্ধে গাদা গাদা বইও পড়তেন। দুঃখের বিষয়, গোবিনবাবু তাঁর জন্য একটা রাইডিং হর্স কিনতে রাজি হন নি।

পদে পদে কিশোরসুলভ অতিশয়োক্তি : immensely, exceedingly, dreadfully, sublime ...পড়তে পড়তে পাঠক শুনতে পান আজকের বাঙ্গালী কিশোরীর বিস্ময়চিহ্নসম্বলিত উচ্চ ধ্বনি : ভীষণ ভালো, দারুণ মিষ্টি, অপূর্ব...

কলকাতা তাঁর ভালো লাগে না : "কলকাতা এক জঘন্য জায়গা—সামাজিক ও আত্মিক অর্থে very sink of iniquity. ইংলণ্ডের স্বাস্থ্যকর জলবায়ু ও স্বাধীন জীবনযাত্রার জন্য তাঁর মন ব্যাকুলিত : "ভারতীয় নারীরা গাড়িতে কিংবা পাল্কিতে ছাড়া কোথাও বেরুতে পারে না, রাস্তায় পদভ্রমণ তাদের নিষেধ : unladylike, indecent (...) এখানকার সামাজিক সম্মিলন শুধু পুরুষদের জন্য; পত্নী কন্যারা, সারা নারী সমাজ চাবি-দেওয়া অলা-আঁটা ঘরে আবদ্ধ থাকে!... বিলেত থেকে ফেরার পর থেকে কোনো ডিনার-পার্টিতে, এমন কি কোনো পার্টিতেই আমি যাই নি।"

স্বদেশ-বিদেশ

ভারত থেকে প্রেরিত তাঁর সর্বপ্রথম চিঠিতে—এবং তার পরবর্তী বহু চিঠিতেই —তরু প্রকাশ করেছেন ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন ও স্থায়ী বসবাসের ইচ্ছা : বাগান-বাড়ি বিক্রী করতে পারলেই হল। "আমরা প্রায়ই আলোচনা করি, ইংলণ্ডে গিয়ে কোথায় কোথায় ঘুরব, কি কি দেখব শুনব, কি ফল খাব, কি মাছ চাখব..." তাঁর জীবনের শেষ কয়েক মাসে কিন্তু বিলেত-যাওয়ার আনন্দের সঙ্গে মিশেছে বিষাদের সুর : "বাড়ি ছেড়ে চলে যাব?... যে-বাড়িতে কেটেছে কত সুখের ও দুঃখের দিন!...যা বলি না কেন, ভারত তো আমার মাতৃভূমি।"

কোনো কোনো সমালোচকের মতে দেশের অধিবাসী ও সাংস্কৃতির জীবনের প্রতি তরুর সহানুভূতি ছিল অল্প। তাঁর লেখনীতে 'ভারতীয়' অর্থে বারবার নেটিভ্ শব্দটা আসে; শেষ পর্যন্ত তাঁর ইংরেজ বন্ধুর আর সহ্য হল না, তিনিই আপত্তি জানালেন। ওলাউঠার মহামারী আর দেশ-ময় অনটনের কথা তরু লিখেছেন অত্যন্ত নিরাসক্তভাবে। তাঁর চিঠিগুলিতে যত বাঙ্গালীর উল্লেখ আছে, প্রায় সবই উল্লিখিত হয়েছে তাঁর বিদেশী পত্রদাত্রীর উল্লেখের উত্তরে। বঙ্কিমের কিংবা কপাল-কুণ্ডলা-বিষবৃক্ষ-চন্দ্রশেখরের কথা কোথাও নেই; মধুসূদনের বিষয়ে তাঁর একমাত্র মন্তব্য : তিনি আমাদের বংশের কেউ নন। যে-পত্রিকায় তরুর বহু কবিতা বেরিয়েছে, সেই 'বেঙ্গল রিভিউ'-র সম্পাদক রেভেরেণ্ড বিহারীলাল দে-র প্রসিদ্ধ ইংরেজি রচনা 'গোবিন্দ সামন্ত' পর্যন্ত তিনি পড়েন না...। পরেশনাথের শোভাযাত্রার এবং দুর্গাপুজার বিসর্জনের বাদ্যযন্ত্রের [an exquisite discordance] তিনি নির্লিপ্ত বিচার করেন। কালীর মূর্তি হল the most hideous thing you can imagine.
বিলাত-ফেরৎ হিন্দুরা একাধিকবার গঙ্গায় স্নান করে এবং আরও এমন কিছু করে "আমি যার উল্লেখ করব না and which must be dreadfully disagreeable."

আসলে, যে-পরিবেশে তরু মানুষ হয়েছেন সেই পরিবেশ হিন্দু ধর্মের যথার্থ মূল্যায়নের অনুকূল ছিল না। এদিকে, খ্রীষ্টান হিসেবে, নিজ দেশবাসী-দের প্রতি প্রকৃত ভালোবাসায় অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি লেখেন : "প্রার্থনা করি, সারা ভারত যেন একদিন সেই সত্য ও প্রেমময় ঈশ্বরের চরণে আত্মোৎসর্গ করতে পারে, একমাত্র যিনি আমাদের পরিত্রাণ করতে এবং নিজেদের পাপ থেকে শুচিধৌত করে তুলতে সক্ষম!"

আরো বলার আছে : ইংরেজ বিচারকের অবিচারের বিরুদ্ধে, ঔপনিবেশিকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে তিনি কোনো দিন ভোলেন নি : "এখানে সত্যকার ভদ্র ইংরেজ পুরুষ নারীর সংখ্যা অতি অল্প।" বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর পর্যাপ্ত শ্রদ্ধার পরিচয় নেই : অনভ্যাসের জন্য তাঁর হাতের লেখা খুবই কাঁচা; বাক্যশেষে দাঁড়ি না দিয়ে তিনি দেন ফুলস্টপ্; নিজের নাম সই করতে বানান ভুল করেন—তোরু দত্ত। আর তবু প্রাচীন ভারতের মহাকাব্যদ্বয় মূল ভাষায় পড়ার আকাঙ্ক্ষা তাঁর অকৃত্রিম, প্রাচীন ভারতের সীতা প্রভৃতি আদর্শ নারী চরিত্রের প্রতি তাঁর সম্ভ্রম অকপট।

নিজে তিনি স্বীকার করেন : "আমার চিঠি বড় আত্মকেন্দ্রিক, কিন্তু কি করি বল, মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ পাই কোথায়? (...) এখানে কাউকে জানি না—আমার আত্মীয়দের ছাড়া...আর তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে চিনি না।" তাঁর মায়ের এক আত্মীয়ার বিবাহের কথা তুলে তিনি লেখেন : "মেয়েটি ও তার স্বামীর পরিবার হিন্দু, তাই আমরা নিমন্ত্রণ পাই নি।"

তাঁর কবিতায় উল্লিখিত
sweet companies, loved with love intense; for your sakes shall the tree be ever dear, সেই সব খেলার সাথি হবে কি কাশ্মীরের?

[ক্রমশ]

১৯৭০-৭১ সালের রেল বাজেট

১৯৭০-৭১ সালের রেল বাজেট সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করেছে। যদিও বাজেটে ২২ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকবে বলে অনুমান করা হয়েছে, সাধারণ মানুষের উপর ভাড়া-বৃদ্ধির বোঝা চাপিয়ে ৩৯ কোটি টাকা আয়ের সংস্থান করা হয়েছে এবং তা থেকেই উদ্বৃত্তের সৃষ্টি। যাত্রী-ভাড়া ও মালের মাশুল বাড়িয়ে দেওয়ার কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে, চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহের জন্যই এ-ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। রেলে মাল পরিবহনের জন্য মূল মাশুল কাঠামো সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলার জন্য যদিও বা কিছু যুক্তি আছে, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের উপর ভাড়া-বৃদ্ধির বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার কোন যুক্তি আছে কি? রেল যাত্রীদের মধ্যে যাঁরা মাসিক টিকিট ব্যবহার করেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও ভাড়া বাড়ানো হয়েছে। ট্রেনের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সব শ্রেণীরই ভাড়া বেড়েছে; প্রথম শ্রেণীর ভাড়াও বেড়েছে। যাঁরা বড়লোক তাঁদের উপরেই যদি ভাড়া-বৃদ্ধির বোঝা চাপানো হত তবে বলার কিছু থাকত না। কিন্তু যে সরকার সাধারণ মানুষের জন্য ভাবেন বলে দাবি করেন, সেই সরকার কেন সাধারণ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের উপর আরও বোঝা চাপিয়ে দিলেন তা বোঝা গেল না।

১৯৭০-৭১ সালে কার্যসূচী ব্যয়ের জন্য ২৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এ বছরের সংশোধিত হিসাবের চেয়ে এটা ৩৭ কোটি টাকা বেশি। রোলিং স্টকের জন্য ধরা হয়েছে ১২৪ কোটি টাকা। ১৯৭০-৭১ সালের কর্মসূচীর জন্য আরও ১৫০০০ ওয়াগনের অর্ডার দেওয়া হয়েছে। চতুর্থ যোজনায় ৪৩০টি ব্রডগেজ এবং ২২৮টি মিটার গেজ মেন লাইন ডিজেল ইঞ্জিন, ১০০টি ডিজেল শান্টার, ৩৪০টি ব্রডগেজ ইলেকট্রিক ইঞ্জিন, প্রায় ১ লক্ষ ওয়াগন, ৬৪০টি স্ট্যান্ডার্ড কোচ, ৭৬৮টি বৈদ্যুতিক মালটিপল কোচ (Multiple coach) এবং ৫০টি রেলগাড়ী নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এজন্য ১৭০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হবে বলে রেলমন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দ জানিয়েছেন। রেলমন্ত্রীর মতে গত বছর থেকে কর্মী ও রেল কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক অনেক উন্নত হয়েছে। তিনি বলেন, ১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করার জন্য যাঁদের সাময়িক বা পূর্ণভাবে বরখাস্ত করা হয়েছিল আদালতের রায় সাপেক্ষে তাঁদের সকলকেই পুনর্নিয়োগ করা হয়েছে।

যে সব কর্মী গত দুই বছর বা তার বেশি সময় যাবৎ তাঁদের বেতনের সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে গেছেন তাঁদের উল্লেখ করে রেলমন্ত্রী জানিয়েছেন যে, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর এই সব কর্মীদের ক্ষেত্রে তাঁদের সর্বশেষ বেতন বৃদ্ধির সমপরিমাণে একটা ব্যক্তিগত বেতন দানের অর্ডার দেওয়া হচ্ছে। রেলমন্ত্রীর এই ঘোষণাটি নিঃসন্দেহে অভিনন্দযোগ্য।

চতুর্থ যোজনায় রেলের মোট ব্যয়-বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১৫২৫ কোটি টাকা; তার মধ্যে ৯৪০ কোটি টাকা রেলওয়ের নিজস্ব আয় থেকে সংগ্রহ করতে হবে। বাকী ৫৮৫ কোটি টাকা পাওয়া যাবে সাধারণ সম্পদ থেকে।

নতুন শিল্প লাইসেন্স নীতি

ভারত সরকার নতুন শিল্প লাইসেন্স নীতি ঘোষণা করেছেন। শিল্প লাইসেন্স নীতি নিয়ে ইতিপূর্বে হাজারি কমিশন, দত্ত কমিটি এবং পরিকল্পনা কমিশন বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। হাজারি কমিশন বিনা লাইসেন্সে কারখানা স্থাপনের পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা করার সুপারিশ করেছিলেন। দত্ত কমিটি ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ লাইসেন্স-মুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সরকার ঘোষণা করেছেন, ১০ লক্ষ টাকা বা মোট বিনিয়োগের ১০ শতাংশ বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন না হলে ১ কোটি টাকা বিনিয়োগের জন্য সব শিল্পই লাইসেন্স-মুক্ত থাকবে। সরকার এক্ষেত্রে হাজারি কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ১ কোটি থেকে ৫ কোটি টাকা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার দুই ধরনের নীতি অনুসরণ করবেন। প্রথমটি হচ্ছে, নতুন কোন কারখানা স্থাপন করতে হলে ওই পরিমাণ টাকা বিনিয়োগের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স নিতে হবে। দ্বিতীয় নীতিটি হচ্ছে চালু প্রতিষ্ঠানগুলির সম্প্রসারণ করতে হলে যদি ওই পরিমাণ টাকার প্রয়োজন হয় তবে সেজন্য কোন লাইসেন্সের প্রয়োজন হবে না। তবে এই প্রতিষ্ঠানগুলির মালিকানা ভারতে বৃহৎ কুড়িটি শিল্প সংস্থার হাতে থাকলে, মোট বিনিয়োগের শতকরা দশ ভাগ বা দশ লক্ষ টাকার বেশি বৈদেশিক মুদ্রা লাগলে, এবং প্রতিষ্ঠানটি মনোপলি কমিশনের অভিমত অনুযায়ী প্রধান প্রধান শিল্প-সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হলে কারখানা সম্প্রসারণের জন্য লাইসেন্সের দরকার হবে।

ক্ষুদ্র শিল্প সম্পর্কে যে সংজ্ঞা প্রচলিত অর্থাৎ এমন শিল্প যার বিনিয়োগের পরিমাণ সাড়ে সাত লক্ষ টাকা থেকে দশ লক্ষ টাকার ভিতর, সরকার সে-ই সংজ্ঞাই বহাল রেখেছেন। নতুন শিল্প স্থাপনের জন্য ১ কোটি থেকে ৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করলে সংশ্লিষ্ট শিল্প "Middle Sector"-এর অন্তর্ভুক্ত হবে। যদি কোন নতুন শিল্প সংস্থায় পাঁচ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ হয় তবে সংশ্লিষ্ট শিল্পটি "Heavy Investment Sector"-এর অন্তর্ভুক্ত হবে। মূল শিল্প, প্রতিরক্ষা শিল্প এবং বেশি মূলধন-বিনিয়োগকারী গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলি গঠন করবে "Core Sector". ১৯৫৬ সালে ঘোষিত শিল্প-নীতিতে প্রথম শ্রেণীর যে ১৭টি মূল ও ভারী শিল্প আছে সেগুলিকে "Core Sector"-এর অন্তর্ভুক্ত করা হবে। সেই সঙ্গে আরও নয়টি শিল্পকে এই শ্রেণীতে আনা হয়েছে:—এই নয়টি শিল্প হচ্ছে, সার, ট্র্যাক্টর, জীবাণুনাশক সমেত কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় শিল্প, লোহা ও ইস্পাত, লৌহেতর ধাতু, পেট্রোলিয়াম, পোড়া কয়লা, নিউজপ্রিণ্ট, ইলেকট্রনিকস্, জাহাজ নির্মাণ ও ড্রেজিং। আবার এই শ্রেণীভুক্ত শিল্পগুলি "Heavy Investment Sector"-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দত্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী "Heavy Investment Sector"-কে আবার "Joint Sector" হিসাবেও গণ্য করা হয়েছে। এখন থেকে এই শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠানে দেশী ও বিদেশী মূলধনের সুযোগ মিলবে।

নতুন শিল্প লাইসেন্স নীতিতে একদিকে যেমন বড় বড় ব্যবসায়ী সংস্থা এবং পুঁজিবাদীদের হাতেই সব বিনিয়োগ লাইসেন্স-মুক্ত হিসাবে ছেড়ে দেওয়া বন্ধ করা হয়েছে, অপরদিকে তেমনি ক্ষুদ্র শিল্পগুলি কতটা বৈদেশিক মুদ্রার সুবিধা পাবে তা বলা হয়নি। নতুন শিল্পনীতিতে বণিক সংস্থা মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। নতুন শিল্পনীতিতে বলা হয়েছে যে ঋণদান সংস্থাগুলি বেসরকারী ক্ষেত্রে যে ঋণ দিয়ে থাকে সেগুলিকে ইকুইটিতে (equities) পরিণত করা যাবে; অনেকে মনে করেন যে তা বেসরকারী উদ্যোগের পরিপন্থী হবে। ক্ষুদ্র শিল্পগুলি কতকগুলিকে (যেমন, সাইকেল, টায়ার, টিউব, প্রভৃতি) সংরক্ষণ দেওয়া যেমন একদিকে ভাল হয়েছে অপরদিকে এই ব্যবস্থার ফলে নীচু মানের জিনিস উৎপাদনের সম্ভাবনা আছে বলেও অনেকে মনে করেন। তাছাড়া, বিদেশী মুদ্রা ছাড় দেওয়ার ব্যাপারে এই সব সংস্থাকে অসুবিধায় পড়তে হতে পারে।

সুব্রত গুপ্ত

॥ ২৮ ॥

দীপু নিতাইয়ের দিকে না তাকিয়ে মৃদু গলায় আবার বললো, আমি বাড়ি যাবো।

নিতাই ছোট ছেলেকে বোঝাবার ভঙ্গিতে বললো, বলছি তো, আমি নিজে তোমায় বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবো। তোমার কোনো ভয় নেই। এ সব ছেলে ছোকরাদের সঙ্গে তুমি মিশো না! এরা সব লোফার, গুণ্ডা—

—আমাকে পৌঁছে দেবার দরকার নেই। আমি নিজেই যেতে পারবো!

—দাঁড়াও, এখনো বৃষ্টি পড়ছে, এখন, ঠাণ্ডা লাগিয়ে না! এই অবস্থায় বাড়ি ফিরলে তোমার বাবা কি ভাববেন!

—সে কথা আপনাকে ভাবতে হবে না, আমি নিজেই সব ব্যবস্থা করতে পারবো!

নিতাই তার একটি মাত্র হাত দীপুর কাঁধে রেখে আন্তরিক ভাবে বললো, তুমি আমায় বিশ্বাস করছো না? তোমার বাবার সঙ্গে আমার অনেক দিনের চেনা, আমি তোমার বাবার নুন খেয়েছি।

সুকুমার, ভুপে ওরা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করছিল। খাটের ওপর ছড়ানো তাসের সামনে দুটি লোক তখনো চুপ করে বসে আছে, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, জেলের কয়েদীদের মতন মুখের ভাব, তাদের সামনে জড়ো করা নোট আর পয়সা। তাদের একজন, যার শরীরের গড়ন কুস্তিগীরের মতন, বিরক্ত ভাবে বললো, কি নেতাই, আর খেলা হবে? এই সব বাচ্চা ঝামেলা হটাও না!

ধনঞ্জয় আবার ফিরে এলো দরজার কাছে, নিতাইয়ের সঙ্গী তাকে ধরে রাখার চেষ্টা করেও পারেনি, ধনঞ্জয়ের চোখ এখন আরও বেশী লাল! ধনঞ্জয় ঘরের মধ্যে ঢুকলো না, দরজার কাছে গাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে বললো এই দীপু, বেরিয়ে আয়! যদি প্রাণে বাঁচতে চাস তো বেরিয়ে আয়!

দীপু বেরুতে যাচ্ছিল, প্রাণে বাঁচার জন্যে নয়, শুধু এই ঘর থেকে বেরুবার জন্যই। নিতাই শক্ত করে তার কাঁধ চেপে ধরলো। তারপর অসম্ভব নিষ্ঠুর মুখ করে ধনঞ্জয়ের দিকে চেয়ে বললো, আরে, এই ছোঁড়াটা কে রে? আমার মুখের ওপর কথা বলে! এই হারামির বাচ্চা, তোর তেল বেড়েছে না? ঘাড় ভাঙার শখ হয়েছে?

দীপু অবাক হয়ে দেখলো, ধনঞ্জয় নিতাইয়ের কথা শুনেও পকেট থেকে ছুরি বার করলো না। ধনঞ্জয়ের বেপরোয়া স্বভাবের কথা সবাই জানে। সেই তুলনায় নিতাইকে এ পাড়ায় চেনে ক'জন! তা ছাড়া নিতাইয়ের একটা মাত্র হাত। তবু নিতাই দীপুকে আড়াল করে দরজার দিকে এগিয়ে গেল সুকুমার ভুপেরাও এখন ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে ধনঞ্জয়ের পাশে দাঁড়িয়েছে।

নিতাই ফের একটা চড় মারতে যাচ্ছিল ধনঞ্জয়কে, ধনঞ্জয় পিছিয়ে গেল, এবারও ছুরি বার করলো না, পকেটে যদিও হাত।

দীপু বুঝতে পারলো, গুণ্ডা ধরনের ছেলেরা পথে ঘাটে যে-রকম কথায় কথায় ছুরি বার করে, নিজেদের মধ্যে ঝগড়ার সময় সে-রকম নয়। নিরীহ লোকদের ভয় দেখাবার সময় ওরা আর অন্য কিছু ভাবে না, কিন্তু নিজেদের মধ্যে পরস্পরের গুরুত্ব না বুঝে কিছু করে না। নিতাই ধুতি আর শার্ট পরে চাদর জড়িয়ে আছে, তার কাছে ছুরি থাকলেও এক হাতে সব দিক ম্যানেজ করতে নিশ্চয়ই অসুবিধে হবে, তবু তার মুখে চোখে ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই!

ধনঞ্জয় দাঁতে দাঁত চেপে বললো, আপনি আমাদের ব্যাপারে কেন ফোপর দালালি করছেন? ইন্দ্রজিতের কাছে ও শালা কি চুকলি কেটেছে আমাদের জানা দরকার!

তাস খেলার আর দুটি লোক এই ফাঁকে নেমে এসেছে। তাদের মধ্যে কুস্তিগিরের মতন চেহারা যার, সে ধনঞ্জয়কে মশা-মাছির মতন অগ্রাহ্য করে বললো, এই যা, ভাগ্, ভাগ্। যত সব এঁড়ে গরুর পাল, এখানে কি চাই?

লোকটা এলোপাথাড়ি হাত চালিয়ে ধনঞ্জয়কে নাগাল পেল না, কিন্তু সুকুমারের চুলের মুঠি ধরে ফেললো, তারপরই এক বিচিত্র কায়দায় হাত ঘুরিয়ে চুল সুদ্ধ সুকুমারের মুখটা ঘাড়ের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে বললো, এঃ, এখনো মুখে দুধের গন্ধ, মাস্তানি মারতে এসেছে! নিতাই এই সময় এগিয়ে গেল ধনঞ্জয়কে ধরতে—ধনঞ্জয়ের দলবল এবার পিছিয়ে গেল, দুদ্দাড় করে দৌড়ে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

নিতাইরা ঘরে ঢুকে দরজাটায় এবার ছিটকিনি লাগালো, পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মুখ কুঁচকে নাক দিয়ে বেশী নিশ্বাস বার করে এক ধরনের হাসলো। অন্যান্য আর পাঁচজন সামাজিক ভদ্রলোকের মতন তাদের

মুখের ভাবখানাও যেন এই, ইস, আজকালকার ছেলেগুলো একেবারে বখে গেছে! এরা সবাই ধনঞ্জয়দের চেয়ে দশ-বারো বছরের বড়, অভিজ্ঞ, পোড় খাওয়া চেহারা। নিতাই ছাড়া বাকি তিনজন খাটে উঠে তাস নিয়ে বসার আগে এক চুমুকে যে-যার গেলাসের দিশি মদ শেষ করে ফেললো। চীনে-অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান চেহারা মেলানো যে-লোকটা মদ ঢালছিল, সে নিশ্চয়ই বোবা, কারণ সে এতক্ষণ একটাও কথা বলেনি, দু' দলের ঝগড়ার সময় সে মন দিয়ে শুধু রেডিওর চাবি ঘোরাচ্ছিল।

নিতাই বললো, বসো, দীপু।

দীপু একগুঁয়ে ছেলের মতন আবার বললো, আমি এখানে আর একটুও থাকতে চাই না। বাড়ি যাবো।

—দাঁড়াও, ওদের গরম একটু কমুক। তারপর আমি তোমাকে পৌঁছে দেবো। কি হয়েছিল ওদের সঙ্গে?

—কিছু না।'

—কিছু না?

—না!

একথা দীপু শুধু অভিমানের ঝোঁকে বলছে না। সত্যিই তো, ধনঞ্জয়দের সঙ্গে তার কিছুই হয়নি। সে ওদের কোনোই ক্ষতি করে নি। ওদের কখনো ঠকায় নি, গালাগালি দেয়নি—কিছু না! শুধু ওদের কথা মতন সে ইন্দ্রজিতকে বাইরে ডেকে এনে মার খাওয়াতে রাজী হয় নি। তার থেকেই ছুরি-ছোরা কত কি হয়ে গেল! ধনঞ্জয়রাও কি দীপুর বিরুদ্ধে সত্যিই কোনো অভিযোগ করতে পারবে? অভিযোগের দরকার নেই, কারণের দরকার নেই, ওরা এমনিই গোলমাল পাকাতে [illegible] একটা সন্ধ্যেবেলা ওরা এমনি [illegible] ভেতরে ক্ষেপে ওঠে, আগ্নেয়গিরির মতন টগবগ করে, তারপর [illegible] করে যখন [illegible] বাষ্প বেরিয়ে পড়ে, তখন সামনে যাকেই পায় তাকেই খুনমার করে দিতে চায়!

নিতাই [illegible] সাইরই খানিকটা ডেটল আর তুলো জোগাড় করে ফেলেছে। প্রথমে সে নিজেই [illegible] দীপুর কপালের [illegible] রক্ত মুছে দিতে এলো। কিন্তু তার মুখ দেখে বোঝা যায়, সে ডেটলের গন্ধ একেবারে সহ্য করতে পারে না। গন্ধ এড়াবার জন্য সে দম বন্ধ করে আছে। তাও বেশীক্ষণ পারলো না, অনুনয় করে দীপুর হাতে তুলোটা দিয়ে বললো, তুমি [illegible] একটু লাগিয়ে নাও, ডেটলের গন্ধেই আমার বমি আসে।

তাড়াতাড়ি বমি চাপবার জন্য নিতাই [illegible] এক চুমুকে অনেকটা মদ খেয়ে নিল। নিতাইয়ের কথাবার্তা কিংবা চলার মধ্যে মাতালের কোনো লক্ষণ নেই, কিন্তু তার মুখের চামড়া দেখলেই বোঝা যায় যে আজ সারাদিন ধরে মদ খাচ্ছে। মুখের চামড়া ফেটে যেন রক্ত বেরিয়ে আসবে, নাকটা চকচক করছে, চুলগুলো খাড়াখাড়া।

এক হাতেই নিজস্ব কায়দায় দেশলাই জ্বালিয়ে সিগারেট ধরিয়ে নিতাই বললো, আমার সঙ্গে তোমার যে দেখা হয়েছে, তোমার বাবাকে এ কথা বলো না।

হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিক ভাবে এ কথা শুনে দীপু একটু চমকে নিতাইয়ের দিকে তাকালো কিন্তু কোনো কথা বললো না।

নিতাই একটু অদ্ভুতভাবে হেসে বললো, তোমার বাবাকে আমি কথা দিয়েছিলাম কলকাতা ছেড়ে চলে যাবো। কিন্তু বুঝলে না, পুরোনো নেশা, হাতে একটু টাকা এলেই মনটা ছটফট করে, পুরোনো অভ্যাসগুলো চাগা দেয়—এদের সঙ্গে ক'হাত তাস খেলতে গিয়ে সব টাকা হাওয়া হয়ে গেল!

খাটের ওপর তিনটে লোক নিতাইকে বাদ দিয়েই নিঃশব্দে তাস খেলায় মগ্ন হয়ে

গেছে, ঠুনঠান খসখস্ শব্দ হচ্ছে পয়সা ও নোট বিনিময়ের। একটু আগের ঘটনা তাদের ব্যবহারে কোনো ছাপ ফেলেনি, যেন তারা এ রকমভাবেই নির্বিঘ্নে তাশ খেলছে বহুক্ষণ ধরে।

দীপু নিতাইয়ের কথা শুনে কোনো মন্তব্য করলো না। নিতাই আবার বললো, তোমার বাবার কাছে আবার কিছু টাকা চাইতে হবে। ইচ্ছে করে না চাইতে, বুড়ো মানুষ, কিন্তু শালা উপায় নেই আমার।

এ ব্যাপারটা দীপু কিছু কিছু জানে। তবু চুপ করে রইলো।

নিতাই উদাসভাবে বললো, আর ভালো লাগে না, জানলে, কুকুরের মতন পালিয়ে পালিয়ে থাকা—কলকাতার বাইরে আমাকে কেউ চেনে না, কত লোক তড়পায়, রোয়াব দেখায়—আমি কিছু বলতে পারি না—আমার এই যে হাতটা দেখছো—একবার তো হাওয়াবাগে একদল ছেলে আমাকে ঘিরে নুলো নুলো বলে চেঁচাতে লাগলো—আরে শালা, আমি কি ভিখারি নাকি!

দীপু চুপ।

—ইচ্ছে করে কলকাতাতেই থেকে যাই, যা হয় হোক! শুধু রাসুদার জন্যই—একটা নামী লোক, লোকে যদি তার নামে কিছু বলে—কিন্তু আমার আর এ রকমভাবে বাঁচতে ইচ্ছে করে না। মাইরি বলছি, বিশ্বাস করো, আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না! তুমি যেখানে বসে আছো, ঠিক ঐ জায়গাটায়—

দীপু বসে আছে ঘরের ঠিক মাঝখানে, একটা টুলে। মেঝেটা এবড়ো খেবড়ো, টুলটা একদিকে বেঁকে আছে।

—আমার এই হাতটা, দেখো, কি অবস্থা সেটার এখন—

নিতাই তার বিকৃত ভয়ংকর বাঁ হাতখানা এগিয়ে দিল দীপুর দিকে। সে হাতের পাঞ্জাখানা নেই, কব্জির কাছে এখনো একটু একটু ঘা, গোটা হাতটাই খুব শুকনো গাছের মরা ডালের মতন। দীপু সেদিকে এক পলক তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল।

—মানুষের দাঁতের বিষ যে অত সাংঘাতিক কে জানতো। বোধ হয় মরার সময় ঐ রকম বিষ আসে—তোমার বাবাও তো গায়ের জোর কম নয়—কিছুতেই টেনে ছাড়াতে পারেন নি জগন্নাথকে—একেবারে কচ্ছপের কামড় দিয়েছিল, তখন আমি ডান হাতে ওর গলাটা ঠুসে ধরলাম—আমি ওকে খুন করতে চাই নি, কিন্তু শালা হঠাৎ ফেঁসে গেল। আমার হাতে যে এই ব্যাপার হয়েছে, তখন সে রকম বুঝতে পারি নি—জগন্নাথ ফেঁসে যাবার পরও কামড়ে ধরেছিল, ওর দাঁতের মধ্যে ছুরি ঢুকিয়ে চাড় দিয়ে আমার হাত বার করেছিলাম। তারপর আর বেশী জ্বালা করে নি, একটু টেটান লাগিয়েছিলাম—সেই অবস্থায় জগন্নাথের লাশ নিয়ে গিয়ে আমি উল্টো গঙ্গায় ফেলে এসেছিলাম। পুলিস কিছু টের পায় নি। তোমার বাবা শুধুমুদু ভয় পেয়েছিলেন—জগন্নাথের সঙ্গে ওঁর নামেই তো কন্ট্রাক্ট লেখা ছিল—

দীপু মাটির দিকে চোখ রেখে শুনছিল, সেই দিকে তাকিয়েই বললো, আমার বাবা এখানে এসেছিলেন কেন?

—মাত্র একবার, সেই একবারই এসেছিলেন। তোমার বাবা এসব জায়গায় আসবার লোকই না। অত বড় একটা মানী লোক, একবারই শুধু এসেছিলেন প্রাণের দায়ে—আজ তুমি যেমন এসেছো।

—আমাকে জোর করে এনেছে।

—রাসুদাও প্রায় তাই, অতগুলো টাকা—

খাটের ওপর থেকে তাশ খেলার লোকদের একজন ধমক দিয়ে বললো, এই নেতাই, তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? ছেলেটাকে যেতে দে না!

নিতাই ক্যাকাসে ভাবে হেসে বললো, আমার সত্যিই মাথা খারাপ হয়ে গেছে, শালা! আমার আর বাঁচার আশা নেই। বুঝলে দীপু, তোমাকে যে এ সব বললাম, এর মধ্যে আমার কোনো মতলোব নেই।

সিলিং ফ্যান
জগতে
বৈশিষ্ট্য হ'ল
G.E.C.
জি ই সি-র গর্বের
সীমা নেই—
এভারেষ্ট
এক নতুন ধারা
গড়ে তুলছে
বৈদ্যুতিক পাখায়।
G.E.C.
"এভারেষ্ট"
ডি. জি. এস এ্যাণ্ড ডি. রেট কণ্ট্র্যাক্টেও পাওয়া যায়।
দি জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড
কলিকাতা • গৌহাটি • ভুবনেশ্বর • পাটনা • কানপুর • নিউ দিল্লী • চণ্ডীগড়
জয়পুর • বোম্বাই • আমেদাবাদ • নাগপুর • জব্বলপুর • মাদ্রাজ • কোয়েম্বাটোর
বাঙ্গালোর • সেকেন্দ্রাবাদ • এর্ণাকুলাম
সবচেয়ে আকর্ষণীয় কিস্তিবন্দী হারে সবচাইতে সুন্দর বৈদ্যুতিক পাখা
Kalpana-GEC-532 B

"আজকাল প্রাণ
রাখতেই প্রাণান্ত।"
Cadbury's
Bournvita
the ideal food drink
for strength and vigour
450g

মহাভারতের অনুবাদ

সনাতন পাঠক 'সাহিত্য সংবাদে' (৩০-১-৭০) মহাভারতের ইংরেজী অনুবাদ প্রসঙ্গে স্বর্গত কিশোরীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় কৃত অনুবাদের উল্লেখ করেছেন। আর 'আলোচনা' বিভাগে শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মজুমদারের চিঠিতে দেখলাম তিনি Sir P. C. Roy C I E অনুদিত মহাভারতের কথা লিখেছেন। আসলে ওঁরা দুজনেই কিন্তু একই অনুবাদের কথা বলেছেন। এটি প্রতাপচন্দ্র রায়ের মহাভারত হিসেবেই চলে আসছে, ঠিক কালীপ্রসন্ন সিংহের বাংলা মহাভারতের মতই। অর্থাৎ এঁদের দুজনের মহাভারতেরই প্রকৃত অনুবাদক এঁরা নন। প্রতাপচন্দ্র 'স্যার' ছিলেন না, তবে সি আই ই উপাধি পেয়েছিলেন। জন্ম ১৮৪২, মৃত্যু ১৮৯৫। ১৯০৫ সালে প্রকাশিত তাঁর একটি ১৮০ পৃষ্ঠার ইংরেজী জীবনীগ্রন্থ আমার কাছে আছে। অষ্টাদশ পর্ব মহাভারতের ১,১০,০০০ শ্লোক ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়ে প্রকাশ করতে মোট এক লক্ষ টাকা লেগেছিল। আঠারো খণ্ডের এই ইংরেজী মহাভারত দশ বছর আগেও জাতীয় গ্রন্থাগারে এবং অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থাগারে দেখেছি। এখনো আছে কিনা জানি না। আঠারো খণ্ডে ছিল মোট ছ হাজার পৃষ্ঠা, ওজন ছিল আধ মণ। ব্যাসকূটের অর্থ উদ্ধারের জন্যে তিনি যে পরিশ্রম স্বীকার করেছিলেন তাও একালে ভাবা যায় না। কালীপ্রসন্ন সিংহ যখন বাংলা মহাভারত বের করার কথা ভাবছেন, প্রতাপচন্দ্র রায় তখন তাঁর কাছেই সাত টাকা মাসিক বেতনের চাকুরে। পরে তিনি নিজেই 'দাতব্য ভারত কার্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেন, ছাপখানা করেন, পণ্ডিতদের নিযুক্ত করেন প্রথমে বাংলা অনুবাদের জন্যে, সেটি প্রকাশের পর মহাভারতের পূর্ণাঙ্গ ইংরেজী অনুবাদ শুরু করেন। ষোলটি খণ্ড প্রকাশের পর তাঁর মৃত্যু হয়, কিন্তু বাকী দু খণ্ড তাঁর স্ত্রী প্রকাশ করেন। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার ও ডক্টর রস্ট ছাড়াও ইউরোপ আমেরিকার বহু পণ্ডিত তাঁকে বছরের পর বছর উৎসাহ দিয়েছেন এবং তাঁর প্রভূত প্রশংসা করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী সুন্দরী যখন মহাভারত প্রকাশ সমাপ্ত করেছিলেন তখন স্যার এডউইন আর্নল্ড লণ্ডনের ডেলী টেলিগ্রাফে 'দি ডেড ম্যানস্ ভিকটরী' নামে একটি রচনা লেখেন। কাজ শুরু হওয়ার আগেই অনুবাদের একটি সংক্ষিপ্ত নমুনা পাঠিয়েছিলেন ম্যাক্সমুলার স্বয়ং। এই বৃহৎ কর্মকাণ্ডের সংগঠক হিসেবেই প্রতাপচন্দ্র কিশোরীমোহনকে অনুবাদক নিয়োগ (?) করেন। স্বর্গত কিশোরীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় অনুবাদের কাজে হাত দেন বটে, কিন্তু নামপ্রকাশে তাঁর আপত্তি ছিল। তাঁকে সাহায্য করেছিলেন পণ্ডিত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মহাভারতের সামান্য কিছু প্রক্ষিপ্ত অংশ ছাড়া আর কিছুই অনুবাদে বাদ দেওয়া হয়নি বলেই মনে হয়। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান পত্রিকায় বিস্তৃত আলোচনা হয়েছিল এই অনুবাদের।

প্রতাপচন্দ্র রায়ের যে জীবনীগ্রন্থটি আমার কাছে আছে তার কোন কপি বহু গ্রন্থাগারে খোঁজ করেও পাইনি। অথচ জীর্ণাবস্থার এ বইটিকে রক্ষা করার কি উপায় তাও বুঝতে পারছি না। এতে শুধু এই অনুবাদ প্রকাশের তথ্যই নয়, অন্যান্য বহু প্রয়োজনীয় খবরও আছে।

রমাপদ চৌধুরী
কলকাতা ২৬।

খাদ্য ও অখাদ্য

'দেশ' পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় (৯ ফাল্গুন, ১৩৭৬) গোমাংসভোজন বিষয়ে পত্র ক'খানা পড়ে আমার দু-একটি কথা মনে হলো; এখানে তা সংক্ষেপে উপস্থিত করছি।

মানুষ নামক জীব পৃথিবীর সর্বত্রই পশুমাংসভোজী, যাঁরা নামত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী তাঁরাও, আমিষ ও নিরামিষে বিভক্ত শুধু ভারতবর্ষীয় হিন্দু। এতে হিন্দুজাতির অধিকতর আধ্যাত্মিকতা সূচিত হচ্ছে কিনা, আমি তা বলতে পারবো না, তবে খাদ্যসম্পৃক্ত নিষেধের চাপে বর্ণহিন্দুর মতো নিপীড়িত মানুষ ভূমণ্ডলে আর নেই, এ-কথা সর্বজনবিদিত। এবং এর ফলে আমাদের বর্তমান খাদ্য-সমস্যার সমাধান আরো দুরূহ হ'য়ে উঠছে, এও নিঃসন্দেহ।

কোনো কূট ব্যক্তি তর্ক করতে পারেন আমিষ ও নিরামিষে প্রভেদ কাল্পনিক মাত্র, কেননা দুধও পশুজাত খাদ্য, এবং ফলমূল শস্যাদিও সপ্রাণ। এ-সব কথা ব্যবহারিক জীবনে অচল হ'লেও, ভারতীয় নিরামিষভোজীদের মধ্যে, অন্তত আজকের দিনে, সব সময় যে সংগতি দেখা যায় তা নয়। তাঁদের মধ্যে অনেকে আছেন ডিম্বাশী; অনেক দক্ষিণ-ভারতীয়কে দেখেছি, যাঁরা বাড়িতে বিশুদ্ধ নিরামিষাশী হ'লেও, বন্ধুগৃহে বা রেস্তোরাঁয় মাংস খেতে দ্বিধা করেন না। তেমনি, অনেক নাগরিক বাঙালি—আর তাঁরা শুধু 'কলকাতাপ্রবাসী' ('প্রবাসী' অর্থে?) ছাত্র বা যুবক নন—বাড়ির বাইরে সানন্দে গোমাংস উপভোগ ক'রে থাকেন, কিন্তু বাড়িতে ঐ বস্তুর আমদানি এখনো তাঁদের পক্ষে কল্পনাতীত। অর্থাৎ আমাদের সংস্কারের বাঁধন ঈষৎ শিথিল হয়েছে মাত্র, তা থেকে মুক্তি এখনো সুদূরে।

যাঁরা বংশানুক্রমিক বা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে নিরামিষাশী, তাঁদের সঙ্গে কারোরই কোনো তর্ক থাকতে পারে না। এবং খাদ্য বিষয়ে ব্যক্তিগত রুচি ও স্বাস্থ্যের দাবিও অবশ্যমান্য। কিন্তু যাঁরা অভ্যস্তভাবে মাংসভোজী (বলা বাহুল্য, মাছও এক-

প্রকার মাংস), অথচ ভক্ষ্য হিশেবে শুধু দু-একটি প্রাণীকে 'বিশুদ্ধ' জ্ঞান ক'রে থাকেন, তাঁদের মনোভাব বর্তমান সময়ের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। গোমাংস দুষ্পাচ্য, গ্রীষ্মমণ্ডলের অনুপযোগী, বা তা খেলে কুষ্ঠ হয়—এ-সব কথা, আমরা যা আবাল্য শুনে আসছি—এতই পরীক্ষিত-ভাবে ভ্রান্ত যে আজকের দিনে প্রতিবাদ করতেও ইচ্ছে করে না। কিন্তু আমরা যে শুধু পুরোনো সংস্কার আঁকড়ে আছি তা নয়, কোনো শাস্ত্র-সম্পর্কহীন নতুনকে গ্রহণ করতেও আমরা পরাঙ্মুখ। সেদিন এক বিদুষী মহিলা আমাকে এই আশ্চর্য খবরটি জানালেন যে তিলাপিয়া মাছ খেলে ধবল রোগে আক্রান্ত হ'তে হয়। আমি জিগেস করলাম, 'এর প্রমাণ কী? কোনো বৈজ্ঞানিক কি গবেষণা করেছেন এ নিয়ে?' উত্তর: 'আমি তা জানি না, তবে অমুকের মুখে তা-ই শুনেছি।' আমি বুঝলাম, ঐ সারবান মৎস্য নবাগত ব'লেই অপরাধী; যেহেতু আমাদের পূর্বপুরুষ ওটা খাননি, তাই আমরাও বর্জন ক'রে চলতে চাই—শুধু এই কারণেই এই যুক্তিহীন, প্রমাণ-হীন রটনা। আমরা কতদূর পর্যন্ত অনড়, পরীক্ষাবিমুখ ও গতানুগতিক, খাদ্য বিষয়ে এই শুচিবায়ুতেও তা প্রতিফলিত হচ্ছে।

প্রাচীন ভারতে খাদ্য ও অখাদ্য বিষয়ে কী ধারণা ছিল, এ-প্রসঙ্গে তার উল্লেখ অবান্তর হবে না। গোমাংসের প্রচলন বিষয়ে আধুনিক বিশেষজ্ঞেরা একমত, তাই সে-বিষয়ে কিছু না-বললেও চলে; কিন্তু প্রাচীনেরা সাধারণভাবে মাংসভোজনের কতদূর পক্ষপাতী ছিলেন, তা হয়তো এখনো সাধারণ জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। মহাভারতের অনুশাসনপর্বে যুধিষ্ঠির মাংসাহার বিষয়ে জ্ঞান প্রার্থনা করলে ভীষ্ম নির্দেশ দিলেন প্রাণীহত্যা পাপ, অহিংসাই পরম ধর্ম। সব শুনে যুধিষ্ঠির বললেন তাঁর নিজের ধারণায় মাংসের তুল্য সরস খাদ্য কিছুই নেই (রাজশেখর বসু)।' ভীষ্মের উত্তর: 'তোমার কথা সত্য, মাংস অপেক্ষা সুস্বাদু কিছু নেই। কৃশ দুর্বল ইন্দ্রিয়সেবী ও পথশ্রান্ত লোকের পক্ষে মাংসই শ্রেষ্ঠ খাদ্য, তাতে সদ্য বলবৃদ্ধি ও পুষ্টি হয়।' এর পরে আবার অহিংসার প্রশস্তি, আবার পরমুহূর্তেই যজ্ঞে ও মৃগয়ায় পশুবধের সমর্থন। বোঝা যায়, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্ম ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণধর্মে দ্বন্দ্ব চলছে এখানে; কিন্তু ভীষ্মাদি বীর ও মহাত্মারা যে সকলেই মাংসাশী ছিলেন, এই তথ্যটি নির্ভুলভাবে বেরিয়ে আসছে। এবং সেই মাংস এক নয়, দুই নয়—বহু ও বিচিত্র। বনবাসকালে রামলক্ষ্মণের খাদ্য জোগাতো মৃগয়ালব্ধ বরাহ, নানা প্রকার হরিণ ও গোধা (গোসাপ), এবং সীতাও যে সেই খাদ্যে বিমুখ ছিলেন না, তার প্রমাণ পাই যখন রাম চিত্রকূটে বিশ্রামকালে নানাবিধ সুস্বাদু ও অগ্নিপক্ব মাংস দেখিয়ে সীতার প্রীতি উৎপাদন করছেন (বাল্মীকি: অযোধ্যা-কাণ্ড: সর্গ ৯৬, শ্লোক ১-২)। সেনা-সমেত ভরতের আপ্যায়নের জন্য (অযোধ্যা-কাণ্ড) ভরদ্বাজ মুনি যে-ভোজের আয়োজন করেন, তাতে মাংস ছিল পাঁচ প্রকার: ছাগ বরাহ মৃগ ময়ূর কুক্কুট। মহাভারতের শান্তিপর্বে ব্যাসদেব ব্রাহ্মণের পক্ষে যে-সব মাংস নিষিদ্ধ ব'লে ঘোষণা করছেন, তার মধ্যে আছে বৃষ, পিপীলিকা, শঙ্করজাত মৎস্য, মণ্ডূক, হংসাদি জলচর পক্ষী, মেষ, ঘোটকী, গর্দভী, উষ্ট্রী (কালী-প্রসন্ন সিংহ)।' যে-কাজ সাধারণত কেউ করে না, তাকে নিষিদ্ধ করা অর্থহীন; অতএব ধ'রে নেয়া যায়, ও-সব খাদ্যের প্রচলন ছিলো—সম্ভবত ব্রাহ্মণের মধ্যেও, ক্ষত্রিয় ও অন্য দুই বর্ণের কথা ছেড়েই দিচ্ছি। শান্তিপর্বেই অন্যত্র আছে পঞ্চনখ প্রাণীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ভক্ষ্য শুধু শশক, শজারু, গোধা, গণ্ডার ও কচ্ছপ। এই বৃহৎ খাদ্যতালিকা থেকে কবি-কল্পনা হিশেবে কিছু অংশ যদি ছেঁটেও ফেলি, তবু এটি আমাদের পক্ষে চমকপ্রদ, কেননা এর অধিকাংশই বর্ণহিন্দুসমাজে অপ্রচলিত

হ'য়ে গেছে; কোনো-কোনোটি দুর্লভ (যেমন হরিণ, খরগোশ); কোনো-কোনোটি অংশত বা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ (মুর্গি, শূকর); কোনো-কোনোটি ঘৃণ্য (ব্যাং, গোসাপ), এবং কোনো-কোনোটি কল্পনাতীত (পিঁপড়ে, শজারু)। মহাজনদের অনুসরণ ক'রে আজকের দিনে এ-সব মাংস আহার করে শুধু আদিবাসীরা, আর যারা তথাকথিত অন্ত্যজ, তথাকথিত হিন্দুসমাজের প্রান্তিক অধিবাসী।

অবশ্য ব্যাসদেবের পূর্বোক্ত বিধানেই ভারতীয় খাদ্যতালিকার সংকোচনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়; হয়তো খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে আমাদের দম-আটকানো বিধিনিষেধের সেখানেই আরম্ভ। নিষেধ শুধু আমিষে নয়, নিরামিষেও। আমি ছেলেবেলায় দেখেছি, হিন্দু বিধবারা শাদা চিনি খান না, যেহেতু, 'লোকে বলে', সেটা গোরক্তমিশ্রণে পরিষ্কৃত; টমাটো খান না, কেননা সেটা 'বিলিতি' বেগুন—এখনকার টিলাপিয়ার মতো নবাগত বলেই সন্দেহভাজন। চলতি বাংলায় যাকে ব্যাঙের ছাতা বলে (অপমানজনক শব্দ!) তা মাংসের তুল্য উচ্চপ্রোটিনযুক্ত একটি সুস্বাদু উদ্ভিদ; আমাদের দেশে বর্ষা অবস্থায় তা জন্মায় প্রচুর, অথচ খাদ্য হিসেবে (চীনে রেস্তোরাঁর বাইরে) তার প্রচলন নেই বললেই চলে। এখন প্রশ্ন এই: এখনো কি, এত দুর্ভোগের পরেও আমরা মনকে মুক্ত করতে পারবো না, এখনো কি অনাবশ্যক ও অযৌক্তিক সংস্কারে আবদ্ধ হ'য়ে থাকবো? বিশেষত এই মুহূর্তে যখন খাদ্যসংকটের দিক থেকে ভারতের মতো বিপন্ন দেশ পৃথিবীতে আর নেই, তখন প্রয়োজন নতুন ও [illegible] খাদ্যের উৎপাদন ও প্রচলন, এবং এ-যাবৎ নিষিদ্ধ বা অস্বাদিত খাদ্যের সামাজিক স্বীকরণ। যদি তা কারো মনঃপূত না হয়, তিনি নিজের রুচি অনুসরণ করুন, কিন্তু এই অর্ধাশনক্লিষ্ট দেশকে, দোহাই ঈশ্বরের কেউ যেন অধিকতর উপবাসের পরামর্শ না দেন।

বুদ্ধদেব বসু
কলকাতা-৪৭

॥ ২ ॥

গত ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৭০ 'দেশ' পত্রিকায় আবদুল জব্বার সাহেব লিখিত "বাংলার চালচিত্র"র কয়েকটি অংশ সম্বন্ধে ৭ই ফেব্রুয়ারী "দেশ"-এ সাধারণ পাঠক হিসাবে শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র রায় যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না।

একথা সকলেরই জানা আছে যে, বৈদিক-যুগে কচি গো-বৎসের মাংস ও সোমরস দিয়ে যজ্ঞ ও অতিথি সৎকার করা হতো—একথা পঞ্চম বেদ মহাভারতেও উল্লেখ আছে। পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন তাঁর 'ভল্গা থেকে গঙ্গা' বইয়ে লিখেছেন "রাজা রন্তিদেব সত্যযুগে ষোলজন মহান রাজাদের মধ্যে একজন। তিনি অতিথি সেবার জন্য খুবই প্রসিদ্ধ ছিলেন। রন্তিদেবের ভোজনশালার জন্য প্রতিদিন দু' হাজার করে গরু মারা হতো। তাদের চামড়া রসুইখানায় রাখা হতো। তা থেকে যে রস গড়িয়ে পড়তো তাতেই এক নদীর সৃষ্টি হয়ে গেলো। চর্ম থেকে উৎপত্তি বলে তার নাম হলো চর্মনবতী।"

'মহানদী চর্মরাশেরুৎক্লেদাৎ সংসৃজে যতঃ।
ততশ্চর্মণ্বতীত্যেবং বিখ্যাতা সা মহানদী॥'
শান্তিপর্ব ২৯—২৩।

"রন্তিদেবের ওখানে অতিথিদের খাওয়ার জন্য এই গো-মাংস রন্ধনের কাজে দু' হাজার পাচক নিযুক্ত ছিল। আর এই সংগে ব্রাহ্মণ অতিথিদের সংখ্যাও এতো বেড়ে উঠতো যে, মাংস কম পড়ে যাওয়ার ভয়ে পাচকদের, মাংসের বদলে সূপ বেশী করে নেবার অনুরোধ জানাতে হতো।"

রাজ্ঞো মহানসে পূর্বং রন্তিদেবস্য বৈদ্বিজ।
অহন্যহনি বধ্যেতে দ্বে সহস্রেগবাং তথা।
সমাংসং দদতো হ্যন্নং রন্তিদেবস্য নিত্যশঃ।
অতুলা কীর্তিরভবন্নৃপস্য দ্বিজসত্তম।

বনপর্ব ২০৮।৮-১০।

অজয়কুমার বড়ুয়া
কলিকাতা-২৮।

"কাপুনিজাত রোগ"

গত ৭ ফেব্রুয়ারী তারিখের "দেশ" পত্রিকায় "বিশ্ব বিজ্ঞানে" আপনার লেখা "কাপুনিজাত রোগের" বিষয় পড়িয়া মনে একটু ভরসা পাইলাম এই কারণে যে, এ রোগও ভাল হয় এবং হইতেছে। কারণ বিগত ১০।১২ বৎসর হইয়া গেল সবসময় আমার হাত দুটি মৃদু কম্পমান। তাই লেখা পড়ার প্রতি গভীর অনুরাগ সত্ত্বেও B Sc পাশের পর মনের ধিক্কারে সব কিছু শিকেয় তুলিয়া চুপ-চাপ বসিয়া আছি। কারণ আমার হাত যেভাবে কম্পমান ইহাতে কোন চাকরি মাস্টারি কোন কিছু করাই সম্ভব নয়। এক লাইন লিখিতে গিয়া দশ বার কলম কাঁপিলে কে আমায় চাকরি দিবে। আর কাজই বা করিব কেমন করিয়া? তাই কবিরাজী, অ্যালোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক প্রভৃতি বহু রকম চিকিৎসা করাইয়া হতাশ হইয়া আমার এই যৌবন বয়সে বৃদ্ধের মত জীবনযাপন করিতেছি।

ঠিক এইরূপে এক পরিস্থিতির মধ্যে জীবন দুর্বিসহ হইয়া উঠিয়াছে। রাত্রির নির্জনে কাঁপুনি একটু কম হয় তাই আপনাকে লিখিতেছি দিবালোকে বা কাহারও সম্মুখে এক লাইনও লিখিতে পারি না—তাই মনে মনে মর্মজ্বালা অনুভব করিতেছি। কিন্তু আপনার লেখা পড়িয়া মনে একটু বল পাইতেছি এবার বুঝি এ রোগের উপশমের একটা পথ খুঁজিয়া পাইব।

বিশ্বনাথ পাল
বারাণসী।

বিশ্বভারতী পত্রিকা

৯ ফাল্গুন, ১৩৭৬ সংখ্যায় শ্রীমিত্র পাল লিখিত পত্রের উত্তরে জানাই যে, বিশ্বভারতী পত্রিকায় পঁচিশ বছরের বিষয়সূচী প্রকাশের পরিকল্পনা আমাদের আছে।

রণজিৎ রায়
অধ্যক্ষ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ

বাঙলার চালচিত্র

বাংলার চালচিত্রের শিল্পীদের [illegible] ধন্যবাদ। বিশেষত, তাঁর [illegible] (৭০) তারিখের 'মাংস এবং কসাই' লেখাটির জন্য। মুসলমানরা ধর্মের [illegible] নিয়ে গোমাংস খেয়ে থাকেন। এবং এর জন্য প্রগতিশীল কোন কোন হিন্দু, সমাজে মনে যে ক্ষোভ নেই, তা নয়। [illegible] সাম্প্রদায়িক বিরোধ এর থেকেই কখনও কখনও লেগে থাকে।

কেবল ধর্মগত কারণেই যে [illegible] হয়, তা নয়। মানবতা ও [illegible] দিক থেকেও একে [illegible] আবদুল জব্বার মশাই। তিনি [illegible] তুলেছেন মানবতার প্রশ্ন। [illegible] স্বাস্থ্যের উপর এর প্রতিক্রিয়া [illegible] তিনি যে ছবি এঁকেছেন, তা [illegible] আমাদের অনেকেরই অভিজ্ঞতা না থাকায় এ বিষয়ে নির্বিকার।

অথচ, আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় নির্বিকার থাকবার কারুরই উপায় নেই। মানবতা ও জনস্বাস্থ্য বিরোধী ঐ কাজে [illegible] পরিবার সমাজের দুর্দশাকে আরও [illegible] করে তুলছে। এর জন্য সরকার হয়ত [illegible] করতে পারেন, কিন্তু তাতে রাজনৈতিক জটিলতা আসতে পারে। বোধ করি, [illegible] জব্বার মশাইর মত চিন্তাশীল [illegible] অনুরাগী ব্যক্তিরা যদি সচেতন হন, [illegible] তাঁদের আচরণে এবং প্রচারে গ্রামে গ্রামে এই বার্তা রটে যাবে ক্রমে। তাঁরা জানবেন সাম্প্রদায়িক চাপে নয়, নিজেদের সুস্থভাবে বাঁচবার প্রয়োজনেই গো-বধ বর্জন করতে হবে।

মন্মথ দাস
মেদিনীপুর

সরগমের নিখাদ

॥ ১ ॥

আমাদের অন্যতম প্রিয় সুরকার ও গীতিশিল্পী কুমার শচীন দেববর্মণের আত্ম-জীবনীমূলক স্মৃতিচারণ অতি আনন্দের সঙ্গে পড়ছি। এই প্রসঙ্গে ২১ ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় শ্রীদেবাশিস দাস ছায়াচিত্রে গীত শ্রীদেববর্মণের গানগুলি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন বাংলা ছবিতে গীত তাঁর নয়খানি গানের মধ্যে সাতখানির হিসাব পাওয়া যাচ্ছে—যে দুটি বাকি থাকছে সে দুটি কি?

আমার যতদূর মনে পড়ছে, সে দুটি গান হচ্ছে—"মরণ তোদের ডাকে আজ" ও "সাজে নওলকিশোর চাঁদের তিলকে আজ"। তবে যে ছবি দুটি শ্রীদেববর্মণ এই গান দুখানি গেয়েছিলেন সে দুটির নাম এতদিন পরে কিছুতেই মনে আনতে পারছি না। স্মৃতির উপর নির্ভর করে এইটুকু বললাম। হয়তো গানের পঙক্তিগুলির উদ্ধৃতিতে ত্রুটি থাকতে পারে। যদি থাকে, কোনও সহৃদয় পাঠক সংশোধন করে দিলে কৃতজ্ঞ হব।

দিলীপকুমার বিশ্বাস
কলকাতা-৩৭

॥ ২ ॥

'সরগমের নিখাদ'—শ্রীশচীন দেববর্মণের আত্মকথার ভূমিকায় বলা হয়েছে, বাংলা ফিল্মে তাঁর গাওয়া গানের সংখ্যা মোট নয়টি। প্রসঙ্গক্রমে চারখানি বাংলা ছবির নামও উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী ৯ই ফাল্গুনের দেশ পত্রিকায় পত্রলেখক দেবাশিস দাশগুপ্ত শ্রীদেববর্মণের গাওয়া আরও তিনখানি চিত্রগীতির উল্লেখ ক'রে ('জনমদুখিনী সীতা' গানটি "জীবন সঙ্গিনী" ছবিতে ছিল) তালিকাটিকে অধিকতর সম্পূর্ণ করেছেন। শিল্পীর কথামত বাকি থাকে আরও দুটি গান। সম্ভবত সে দুটি গান হল, ১। অবোধ নেয়ে উজান বেয়ে যাও (প্রতিশোধ) এবং ২। বাংলার মেয়ে বাংলার তুমি (জীবন সঙ্গিনী? নারী?)

শচীন কর্তা একখানি ছবিতে রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়েছিলেন সে কথা তাঁর অনুরাগীদের নিশ্চয় স্মরণে আছে। গানটি হল "মিলন রাতি পোহাল"। ছবির নামটি ঠিক মনে পড়ছে না, তবে সেই ছবিতেই প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত সেই বিখ্যাত গানটিও ছিল যার প্রথম লাইন, 'যদিও পরীরা ভুলেও কখনো এখানে আসে না নামি'।

গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা-১৪

সাহিত্য সংবাদ

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনাবসান

বয়স হয়েছিল ৭৮, শনিবার ২৮শে ফেবরুয়ারি ভোরবেলা কলকাতার সাদার্ন এভিনিউয়ের বাড়িতে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ইংরেজি সাহিত্যের পণ্ডিত, বাংলা সাহিত্যের সঙ্গেও যাঁর নিরবচ্ছিন্ন যোগা-

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

যোগ ছিল—এমন একজন প্রাচীন মানুষ চলে গেলেন।

কিছুদিন আগেও তাঁকে দেখেছি নানা সভা-সমিতিতে—সব সময়ে বক্তা হিসেবে নয়, শ্রোতা হিসেবেও। এরকম বর্ষীয়ান জ্ঞানী ব্যক্তিদের আজকাল সচরাচর শ্রোতার আসনে দেখা যায় না। বছরখানেক আগে, আধুনিক সাহিত্যের একটি বিতর্কমূলক সভায় আমি বসেছিলাম একেবারে শেষের সারিতে এবং আমারই পাশে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে অত্যন্ত চমকে গিয়েছিলাম। উদ্যোক্তাদের অনেক পেড়াপীড়িতেও তিনি মঞ্চে ওঠেন নি। সভার শেষে ওঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কিছু বললেন না? ছড়ি হাতে খর্বকায় বৃদ্ধ গোঁফের ফাঁকে হেসে বলেছিলেন, না, এসব শুনে আমি কিছু শিখতে এসেছি।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৯২ সালের ২৩ মারচ বীরভূমের হাতিয়া গ্রামে। স্কটিশ চারচ কলেজ থেকে তিনি ইংরেজীতে ঈশান স্কলার হয়ে বি-এ পাশ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনিই প্রথম ইংরেজীর ঈশান স্কলার। এম-এ পরীক্ষাতেও তিনি ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। ১৯২৭ সালে তাঁর পি-এইচ-ডি'র থিসিস ছিল, রোমানটিক থিওরি—ওয়ার্ডসওয়ার্থ আনড কোলরিজ।

কিছুদিন রিপন কলেজে, কিছুদিন প্রেসিডেন্সি কলেজে ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে অধ্যাপনা করার পর তিনি রাজসাহী কলেজে উপাধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে আবার ফিরে আসার পর তিনি সরকারী চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

এরপর দেখা যায়, তাঁর অন্য একটি পরিচয়। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। এখানে তিনি অধ্যাপক হিসেবে ছিলেন ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত। এর আগেই প্রকাশিত হয়, তাঁর বিশাল গ্রন্থ "বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা"। বাংলা উপন্যাস নিয়ে এমন ব্যাপক কাজ আগে আর হয় নি। এই বইয়ের কিছু কিছু অংশ সম্পর্কে এখনকার অনেক পাঠকের মতের মিল না হতে পারে, কিন্তু বেশ কয়েকটি জায়গায় বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর গভীর নিষ্ঠা এবং সমদর্শিতা দেখে বিস্মিত হতে হয়। যেমন, প্রাচীনপন্থী হিসেবে পরিচিত হলেও তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতন লেখকের প্রতিভা সমর্থন করতে পেরেছিলেন।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন দু'একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েছিলেন। যাক্, সেটা আমাদের বিষয় নয়। এ ছাড়াও তিনি সামাজিক বহু প্রতিষ্ঠানের সদস্য বা সভাপতি ছিলেন।

আকাদেমি পুরস্কার

সাহিত্য আকাদেমির পুরস্কার এবার বাংলা দেশ থেকে দুজন পেয়েছেন, ডঃ নীহাররঞ্জন রায় এবং কবি মণীন্দ্র রায়।

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় পেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর ইংরেজি বই, "আন আরটিস্ট ইন লাইফ"-এর জন্য। বাংলা দেশে ঐতিহাসিক এবং সাহিত্য সমালোচক হিসেবে তিনি সুবিদিত। বাংলায় তাঁর "বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)" এবং "রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা" বহুপঠিত।

কবি মণীন্দ্র রায় পেয়েছেন তাঁর "মোহিনী আড়াল" নামে কাব্যগ্রন্থটির জন্য। সম্পূর্ণ বইটি একটিই দীর্ঘ কবিতা। এ পর্যন্ত তাঁর অনেকগুলি কবিতার বই বেরিয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, "এই জন্ম, জন্মভূমি", "মানুষের মুখ", "নদী ঢেউ ঝিলিমিলি নয়" প্রভৃতি।

অন্যান্য ভাষায় পুরস্কার পেয়েছে, অসমীয়া : অতুলচন্দ্র হাজারিকার মঞ্চলেখা; গুজরাটী : স্বামী আনন্দের কুলকথাও; কানাড়া : ডঃ ইউ টিপ্পেরুদ্রস্বামীর কর্ণাটক সংস্কৃতি সমীক্ষে; কাশ্মীরী : অবদুল

ডঃ নীহাররঞ্জন রায়

মণীন্দ্র রায়

মালেক-এর তাকজৈনাগিরিকা; মৈথিলী : উপেন্দ্র ঝা-এর দুপত্র; মালয়ালম : এডাসিরি গোবিন্দন নায়ারের কবিলে পাটু; মারাঠী : এস এন বনহাট্টির নাট্যাচার্য দেবল; ওড়িয়া : সুরেন্দ্র মহান্তির নীল শৈল; পাঞ্জাবী : ডঃ হরভজন সিং-এর নাগ্লেপনা; উর্দু : পরলোকগত মখদুম মহীউদ্দীনের বিসাৎ-ই-রকস; হিন্দী : শ্রীলাল শুক্লের রাগ দরবারী; তামিল : পরলোকগত ভারতীদাসনের পিচি লাণ্ডিয়ার; তেলেগু : তুমুলা সীতারামমূর্তির মহাত্মা কথা; সিন্ধি : এস ইউ মালকানির সিন্ধনামারজি।

মিনির পর মিনি

উঃ, এত মিনি পত্রিকা বেরুচ্ছে যে চোখে অন্ধকার দেখছি। আমাদের টেবিলে এসে জমছে হরেক রকমের হরেক আকারের মিনি পত্রিকা। সবই কোনো-না-কোনো উপায়ে "বিশ্বের প্রথম"। এর মধ্যে নতুনত্বে যারা অন্যদের এ পর্যন্ত টেক্কা দিয়েছে, সেই দুটির নাম উল্লেখ করছি। "স্রোতস্বিনী"র দাবি "বিশ্বের প্রথম দৈনিক পত্রিকা"! সত্যি দৈনিক, পরপর দু'দিন পেয়েছি, সম্পাদক লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আর 'মিনি'র দাবি, 'শিশু সাহিত্যে বিশ্বের প্রথম মিনি'—এর সম্পাদক বরুণ মজুমদার ও কুমারেশ চক্রবর্তী।

সনাতন পাঠক

লোক শিল্প

Stone Wares. Edited by Sukumar Sinha, Govt. of India Publications. Price 8.50

মানুষের ইতিহাসে এমন একটা সময় গেছে যখন পাথর ছিল তার নিত্যসংগী, বন্ধু; পাথরের ওপর সে ছিল নির্ভরশীল। আত্মরক্ষায় পাথরের যতটা প্রয়োজন ছিল ততটাই ছিল ধর্মেকর্মে, শিল্পে। সে যুগ কবে শেষ হয়ে গেছে, এখন তা বিস্মৃতির পর্যায়ে, তবু লক্ষ করলে দেখা যাবে সমাজের কোথাও তার একটি ক্ষীণ ধারা যেন থেকে গেছে। আজও পাথরের থালা বাটি দেবমূর্তি ইত্যাদি হিন্দু সমাজের এক অংশের কাছে পবিত্র বলে বিবেচিত হয়। বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষে অতীতকাল থেকেই পাথরের জিনিসপত্র তৈরীর কাজের রেওয়াজ ছিল, এবং এই বিশেষ শিল্পটি দক্ষ কারিগরদের হাতে পড়ে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। বৃত্তি বা পেশা হিসেবেও এর বহুল প্রচলন দেখা যায়। অন্যান্য অনেক বৃত্তির মতন পাথরের পণ্যদ্রব্য প্রস্তুতের যে বৃত্তি তার সঙ্গেও সমাজের একটি গোষ্ঠী সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে, এই বিশেষ শিল্পই ছিল তাদের জীবিকা। আজ নানা কারণে আমাদের, এখানে পশ্চিমবঙ্গের, নানা গ্রাম্য শিল্প হয় মৃতপ্রায়, না হয় লুপ্ত হতে চলেছে। দুঃখের বিষয়, বংশপরম্পরায় যাঁরা এই ধরনের শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন আমরা তাঁদের কোনো খোঁজ খবর রাখি না, তাঁদের সুখদুঃখ, অভাব অভিযোগের বিষয়ও কিছু জানি না। আলোচ্য গ্রন্থটি, নামেই বোঝা যায়, পাথরের জিনিসপত্র সম্পর্কে ও যাঁরা এই কর্মে নিযুক্ত তাঁদের বিষয়ে রচিত। মেদিনীপুর জেলার শিমুলপাল গ্রামটি পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে কতটা পরিচিত জানি না, কিন্তু এই গ্রন্থটি শিমুলপালকে শুধু নয়, এই গ্রামে দীর্ঘকাল ধরে বংশপরম্পরায় যাঁরা পাথরের জিনিসপত্র তৈরি করে আসছেন তাঁদের সর্বাঙ্গ পরিচয় আমাদের গোচরে আনতে কার্পণ্য করে নি। বলতে আপত্তি নেই, প্রায় দুশো পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে (যাতে তথ্য, বিবরণ, ছবি, নকশা অসংখ্য) আমরা প্রধানত এই অঞ্চলের পাথরের কাজের সর্বপ্রকার বিবরণ ও তথ্য পরিপূর্ণভাবে দেখতে পাই; সেই সঙ্গে এখানকার মানুষের, কারিগরদের, তাদের রীতিনীতি, সমাজ জীবন যাপন এবং আরও অনেক কিছুর বিবরণ। শ্রীসুকুমার সিংহ ইতিপূর্বে কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বর্তমান গ্রন্থ তাঁরই সম্পাদিত। তাঁকে সাহায্য করেছেন শ্রীদীপঙ্কর সেন। উভয়ে এক দুরূহ কর্ম যে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছেন তাতে সন্দেহ নেই।

উপন্যাস

বাদশাহী মসনদের তিন অধ্যায়। যোগেশ রায়। বঙ্গন ব্রাদার্স, ১৯/১, বৈষ্ণব

পাড়া ফার্স্ট বাই লেন, হাওড়া-১। মূল্য ঃ চার টাকা পঞ্চাশ।

লালকেল্লার অতীত ঐশ্বর্য, জাঁকজমক, ঘাতপ্রতিঘাতে ঘেরা ইতিহাস এ গ্রন্থে বৈচিত্র্যপূর্ণভাবে পরিবেশিত হয়েছে। মোগল সম্রাটদের ভোগ, বিলাস তাঁদের হারেমের কাহিনী অবলম্বনে ইতিপূর্বে প্রকাশিত অনেক গ্রন্থের মত বাদশাহী মসনদ এই পটভূমিকাশ্রয়ী হয়েছে। দিল্লীশ্বর মহম্মদ শাহের সাম্রাজ্যের কূটনীতি, বিলাসব্যসন, প্রেমকাহিনী এ উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয়। লেখক খ্যাতনামা ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকারের 'Fall of Mughal Empire' গ্রন্থ অবলম্বনে তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং তা কল্পনাশ্রয়ী হওয়াতে বিভিন্ন চরিত্রগুলির সঙ্গে পাঠক একাত্ম হতে পারবেন বলে আশা করা যায়। নতুন লেখক হিসেবে এ কৃতিত্বটুকুও কম নয়। রচনা ও গ্রন্থ পরিবেশনে লেখকের একটু মনোযোগী হওয়া উচিত ছিল।

মেম বাইজী। এককড়ি ভট্টাচার্য। সুবর্ণরেখা, ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য ঃ তিন টাকা।

মেম বাইজী উপন্যাসের কাহিনী, পার্ক স্ট্রীট এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অবস্থিত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের সংসার, ভালোবাসা, ব্যথা, বেদনার রোজনামচা। কলকাতার বিভিন্ন অফিসে কর্মরতা যে সব মেয়ে জীবন সংগ্রামে ব্যস্ত, তারাই আবার রাত্রে আলোয় হোটেলে, বারে, বয়ফ্রেণ্ডদের সঙ্গে বিয়ারের গেলাসে চুমুক দিয়ে উচ্ছল হয়। বাজনার তালে তালে নাচে কুইক স্টেপ, রাম্বা, কিংবা স্লো ফক্সট্রট।

লেখক ব্যক্তিগত জীবনে এদের সংস্পর্শে এসেছেন, তাদের ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন, তাদের কথা সহজ সরল ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। এ উপন্যাসে অজস্র চরিত্র আঁকা হয়েছে, তাদের কারো সঙ্গে কারো মিল নেই, মিল থাকার কথাও নয়, তবে সব মিলিয়ে যে ছবিটি আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হল অর্থনৈতিক চাপে বিপর্যস্ত হওয়া একটা সমাজ, তার মধ্যে কিন্তু সমর উজ্জ্বল হয়ে থাকে ম্যাক্সিম, ডায়না, জেনিফার।

প্রাপ্তি স্বীকার

অবিস্মরণীয় (১ম খণ্ড)। শ্রীগঙ্গানারায়ণ চন্দ্র। ৫৯ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ১০·০০।

প্রেম অপ্রেম। সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। বসন্ত সাহিত্য মন্দির ঃ ১৭ ধ্রুবকুমার পাল লেন, হাওড়া-২। মূল্য ৫·০০।

আধুনিক একাংক সংকলন। সম্পাদনা ঃ সজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। অপেরা ঃ ২৭/৬ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ১০·০০।

Women In Indian Folklore. Edited by Sankar Sen Gupta. Indian Publications, 3 British Indian Street, Calcutta-1 Price Rs 45.00.

The Man Who Never Died by Dr. Gopal Singh. Macmillan & Co., Calcutta. Price Rs 6.00.

শিবচন্দ্র দেব ও বাংলার উনবিংশ শতাব্দী। ত্রিপুরাশংকর সেন শাস্ত্রী। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ঃ ২১১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। মূল্য ঃ ০·৭৫।

গত সপ্তাহে দিল্লিতে লালকেল্লার পাশে হর্স-শো জাম্পিং-এ কুমারী কমল ধীমান হার্ডল রেস অতিক্রম করছেন

অতীত দিনের কীর্তিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় স্যার লিওনার্ড হাটন কলকাতায় এসে উজ্জ্বল ক্রিকেট এবং বর্ণ-বিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে খেলা-ধুলোর সম্পর্ক রাখা সম্বন্ধে যেসব মন্তব্য করেছিলেন তার সঙ্গে আমরা একমত হতে না পেরে গত সপ্তাহে 'দেশ'-এর পাতায় কিছু সমালোচনা করেছি। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার সফরকে কেন্দ্র করে ইংলণ্ডে বিক্ষোভ সম্পর্কে হাটনের মন্তব্যের সমালোচনা করিনি। এখন করতে হচ্ছে ওই সম্পর্কে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারোল্ড উইলসনের বিবৃতির পরিপ্রেক্ষিতে।

দক্ষিণ আফ্রিকার সফর ও বিক্ষোভ

যদি আমার স্মরণশক্তি ঠিক থেকে থাকে তবে বলতে পারি সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনার সময় স্যার লিওনার্ড বলেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার সফরের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে যারা বিক্ষোভ আন্দোলনকে দানা বেঁধে তুলছেন তাঁরা তিন চারজন কম্যুনিস্ট ছাড়া আর কেউ নন।

মাত্র তিন চারজন কম্যুনিস্ট? সে কি কথা! তবে স্বয়ং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারোল্ড উইলসনও কি কম্যুনিস্ট বনে গিয়েছেন? নাকি ইংলণ্ডের লেবার পার্টিও আজ কম্যুনিস্ট পার্টিতে পরিণত?

ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন দক্ষিণ আফ্রিকার বিতর্কিত ইংলণ্ড সফর সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর মতামত জানতে চাইলে প্রধান-মন্ত্রী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, কৃষ্ণকায় খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলতে অস্বীকার করে দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেটের শালীনতা ও শিষ্টাচার বিরোধী কাজ করেছে।

শুধু তাই নয়, হ্যারোল্ড উইলসন বলেছেন, তিনি ইংলণ্ডে দক্ষিণ আফ্রিকার কোন খেলাও দেখবেন না।

দক্ষিণ আফ্রিকায় জন্ম কৃষ্ণকায় ক্রিকেট খেলোয়াড় বেসিল ডলিভেরাকে কেন্দ্র করেই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ওই মন্তব্য। ডলিভেরা এখন ব্রিটিশ নাগরিক। ১৯৬৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের জন্য এম সি সি দলে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু ডলিভেরার গায়ের রং কালো সেহেতু দক্ষিণ আফ্রিকা তাকে গ্রহণীয় বলে মনে করেন নি। ফলে সফরও বাতিল হয়ে গিয়েছিল। উৎকট বর্ণ বিদ্বেষী সেই দক্ষিণ আফ্রিকা আসছে ইংলণ্ড সফরে। সুতরাং ইংলণ্ডের বহু নাগরিকই সেটা সমর্থন করতে পারছেন না। শ্রমিক পার্টির বৃহত্তর লণ্ডন কাউন্সিল তাদের ১০ লক্ষ সমর্থকের কাছে ওই মর্মে আবেদন করেছেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকা দল যখন ইংলণ্ডে এসে পৌঁছবে তখন তাঁরা যেন শান্তিপূর্ণভাবে বর্ণ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তবে আশ্চর্য হচ্ছি স্যার লিওনার্ড হাটন কিভাবে বললেন, বিক্ষোভ আন্দোলনের পেছনে রয়েছে মাত্র তিন চারজন কম্যুনিস্টের হাত?

জলন্ধরে জাতীয় হকি

ভারতের ৩৫তম জাতীয় হকির আসর বসেছে এখন জলন্ধরে। ভারতের ২১টি রাজ্য দল এবং সার্ভিসেস রেলওয়ে ও ইউনিভার্সিটিকে নিয়ে মোট ২৪টি দল ওখানে খেলছে। বলা বাহুল্য, সব রাজ্যের প্রথম সারির খেলোয়াড়দের নিয়েই এক একটি দল গঠিত এবং শক্তিশালীর সঙ্গে শক্তিশালীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যোগ্যতা পরিমাপের সুযোগ ব্যক্তিগত গুণাগুণ বিচারের আসর। এই আসরের খেলার পটভূমিকায় গড়া হবে ব্যাংকক এশিয়ান গেমে ভারতের হকি দল। তারপর ১৯৭২-এর মিউনিক অলিম্পিক। তার জন্য অবশ্য

প্রয়োজন সময় পাওয়া যাবে। এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন ভারতের সামনে এখন এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের সম্মান বজায় রাখার প্রশ্নই মুখ্য। বিশেষ করে রোম্বাইয়ের আন্তর্জাতিক হকিতে ভারতের ব্যর্থতার পর।

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় বাংলার ভূমিকা কি? চারবারের বিজয়ী, দুইবারের রানার্স। কিন্তু ১৯৫২ সালের পর গত ১৭ বছরের মধ্যে বাংলা কোনবার ফাইনালে উঠতে পারেনি। তবে গতবার এর্নাকুলামের জাতীয় আসরে বাংলার ভূমিকা প্রশংসার দাবি করে। এবারের মত গতবারও হকি মরসুম আরম্ভ হতে না হতে অপ্রস্তুত অবস্থায় বাংলাকে জাতীয় প্রতিযোগিতায় খেলতে যেতে হয়েছিল। তবু নিজ গ্রুপে বাংলা পরাজিত করেছিল কেরালাকে ৫—০ গোলে, মধ্য প্রদেশকে ২—০ গোলে এবং পাঞ্জাবকে ২—১ গোলে। প্রথম খেলায় গোয়ার বিরুদ্ধে ওয়াক ওভার পাবার ফলে একটি পয়েন্টও না হারিয়ে গ্রুপে প্রথম স্থান পেয়েছিল। কোয়ার্টার ফাইনালে পরাজিত করেছিল মহীশূরকে ১—০ গোলে। সেমি-ফাইনালে ডাবল লেগের খেলায় বাংলাকে রেলওয়ের কাছে ০—৩ ও ১—৬ গোলে হার স্বীকার করতে হয়েছিল। তবে সেমি ফাইনালে পরাজিত দুই দলের খেলায় বোম্বাইয়ের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে যুগ্মভাবে লাভ করেছিল হার্ড লাইন ট্রফি।

জাতীয় হকির গতবারের বিজয়ী পাঞ্জাবকে গ্রুপের খেলায় পরাজিত করা বাংলার পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নয়। গতবার ওই খেলাটাই ছিল প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ খেলা। রেলওয়ের কাছে বাংলার পরাজয়ের মূলে দুই নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় ইনাম-উর-রহমান এবং যোগীন্দার সিং-এর অনুপস্থিতি। জরুরী প্রয়োজনে দুজনকেই সেমি ফাইনাল খেলার আগে এর্নাকুলাম থেকে চলে আসতে হয়।

দেখা যাক এ বছরের জাতীয় হকিতে বাংলা কেমন খেলে।

বেটন কাপের আসাম আসর

এই লেখার সময় পর্যন্তও কলকাতার হকি লীগ আরম্ভ সম্বন্ধে বি এইচ এ-র সিদ্ধান্ত জানা যায়নি। ইতিমধ্যে বি এইচ এ বেটন কাপ আরম্ভের এক পরিকল্পনা তৈরী করেছেন।

কলকাতার হকি মরসুমের আয়ু মাত্র ৩ মাস। তার মধ্যে এক মাস অতিক্রান্ত। প্রতি বছর লীগের শেষ মুখে থেকে বা লীগ খেলা শেষ হলে বেটনের খেলা আরম্ভ হয়। তখন অন্যান্য রাজ্যেও হকি প্রতিযোগিতা চলার ফলে অনেক দলের পক্ষে বেটনে যোগ দেবার অসুবিধা সৃষ্টি করে। খেলার আকর্ষণও কমে যায়। তাই এবার মার্চের শেষ সপ্তাহ থেকে বেটন আরম্ভের পরিকল্পনা।

সন্দেহ নেই বাস্তবানুগ পরিকল্পনা। কিন্তু মাঠ পাওয়া যাবে কি? পরিকল্পনা আছে ইডেনে দুটি হকি মাঠের ব্যবস্থা করে লীগের সঙ্গে সঙ্গে বেটনের খেলা শেষ করা হবে। ইডেনের মাঠ এখন সরকারের সম্পত্তি। যদিও অন্যান্য মাঠের মালিকও সরকার ছাড়া আর কেউ নন। তবু ইডেনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একচেটিয়া কর্তৃত্ব। সরকার আবার এখন টাকা ছাড়া কথা কন না। চেকোস্লোভাকিয়ার ইন্টার ব্রাতিস্লাভার সঙ্গে আই এফ এ-র প্রদর্শনী ফুটবল খেলাতেও টাকা দাবী করেছিলেন। বেটনের জন্যও হয়তো হাঁ করে বসে আছেন।

কিন্তু হকি সত্যিই গরীব সংস্থা। টাকা নেই। তারপর এক সময়ে ভারতের নামডাকের হকি প্রতিযোগিতা বেটনের আকর্ষণ দিন দিন কমে আসছে। এবার আবার বেটন কাপের প্লাটিনাম জয়ন্তী বছর। তাই আশা করব পশ্চিমবঙ্গ সরকার বেঙ্গল হকি অ্যাসোসিয়েশনকে বেটন কাপের জন্য ইডেন মাঠ ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে শৃঙ্খলার সঙ্গে বেটন কাপ পরিচালনার সুযোগ দেবেন।

ফুটবল সংস্থারও অর্থাভাব

শুধু রাজ্যের হকি সংস্থারই অর্থাভাব নয়, ফুটবল সংস্থারও অর্থাভাব।

খবরে প্রকাশ, অর্থ সংগ্রহের জন্য রাজ্য সরকার দুটি চ্যারিটি খেলার অনুমতি না দিলে আই এফ এ দল তেহেরানে এশীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবে না।

আই এফ এ দল না বলে বাংলা দল বলাই ভাল। ভারতের জাতীয় ফুটবলে বিজয়ী দলকেই তেহরানের এশীয় ফুটবলে আমন্ত্রণ জানানো হয়। মহীশূরে দুবার খেলে এসেছে। গতবারের সন্তোষ ট্রফি বিজয়ী বাংলা দলের এবার সর্বপ্রথম যাবার সুযোগ।

তেহরান যাবার জন্য ৫৬ হাজার টাকার দরকার। আই এফ এ-র কোষাগারে টাকা নেই। সুতরাং সরকারের কাছে তারা চ্যারিটি ম্যাচ অনুমোদনের আর্জি পেশ করেছেন। চ্যারিটি ম্যাচ খেলানো হবে অবশ্য ফুটবল মরসুমে। ইতিমধ্যে সেই ম্যাচ খেলাবার অনুমতি মিললে টাকার ব্যবস্থা করে ফেলা যাবে বলে আই এফ এ প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছেন। দল গড়ার জন্য ফোর্ট উইলিয়মে কোচিং ক্যাম্পও খোলা হচ্ছে।

যদিও এশীয় ফুটবলে ভারতের স্থান অনেক নীচে এবং তেহরান থেকে বাংলা দল হেরে এলে ভারতীয় ফুটবলের সম্মান বাড়বে না, তবু আন্তর্জাতিক খেলায় অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য বাংলা দলকে তেহরানে যাবার সুযোগ দেওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি। আন্তর্জাতিক খেলায় অভিজ্ঞতার অভাব আমাদের খেলার মান উন্নত না হবার এক বড় কারণ।

আবার দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, বিদেশ সফরের প্রলোভনে আমাদের খেলোয়াড়রা নীতিভ্রষ্ট না হয়ে পড়েন, সেদিকেও যেন সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে শুল্ক আইন ফাঁকি দিয়ে বিলাসদ্রব্য পাচারের অভিযোগ আছে। অলিম্পিক আসরে গিয়ে পানভোজনে নিয়ম শৃঙ্খলার বাইরে চলে যাবার অভিযোগ আছে। সেদিন রাজ্যসভায় প্রশ্নোত্তরের সময় শিক্ষা বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীভক্ত দর্শনই স্বীকার করেছেন, মেক্সিকো অলিম্পিকে কোন কোন খেলোয়াড়ের পানভোজনের মাত্রা নিয়ম শৃঙ্খলার বাইরে চলে গিয়েছিল।

একলব্য

কৃতীর ক্রীড়া ভূমিকা

বিধানসভায় বিরোধী দলের নেতা সিদ্ধার্থশংকর রায়-এর নাম এখন যেমন খবরের কাগজে প্রায় নিত্যদিনের খবর, তেমন এমন একসময় ছিল যখন ক্রিকেট মরসুমে খবরের কাগজের খেলার পাতায় প্রায়ই দেখা যেত এস এস রায়-এর নাম। প্রায়ই সেঞ্চুরি করতেন। উনিশ শো চল্লিশ, একচল্লিশ, বিয়াল্লিশ—তিন বছরই হাজার রান পূর্ণ করেছিলেন। ডাবল সেঞ্চুরিও করেছিলেন বার চারেক।

বেরীদা বলতেন, 'মানু' ক্রিকেট ভালই খেলে। যদি সব খেলায় পারদর্শী হবার চেষ্টা না করে 'মানু' শুধু ক্রিকেটই খেলত তবে সত্যিই উঁচু দরের ক্রিকেটার হতে পারত।

হ্যাঁ, বেরী সর্বাধিকারীই ছিলেন তখন কালীঘাট ক্লাবের ক্রিকেট ক্যাপ্টেন। আর কালীঘাটের সেই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ে তাঁর পাশে ছিলেন ধ্রুব দাস, কল্যাণ বসু, পি ডি দত্ত, পি বি দত্ত, দেবরাজ পুরী, পিয়ার্সন সুরিটা, এস দত্ত, এস এস রায় প্রভৃতি সব নাম-করা ক্রিকেট খেলোয়াড়। কুচবিহারের মহারাজাও মধ্যে মধ্যে খেলতেন কালীঘাট ক্লাবে।

শুধু কি ক্রিকেট? ফুটবলেও তখন কালীঘাট ক্লাবের বেশ সুনাম। এবং এস এস রায় ফুটবলের রাইট ব্যাক হিসাবেও ছিলেন রীতিমত নির্ভরযোগ্য। অ্যাথলেটিক স্পোর্টস করতেন। হকি এবং টেনিসেও ছিল বেশ ভাল হাত।

কলেজে এবং কালীঘাট ক্লাবে ওঁর খেলাধুলোর ভূমিকা সত্যিই উল্লেখ করবার মত। প্রেসিডেন্সী কলেজ, ল কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি—তিন জায়গা থেকে 'ব্লু' পেয়েছেন ৮ বার। প্রেসিডেন্সী কলেজে ক্রিকেট এবং ফুটবল দুটি খেলায় অধিনায়ক তো ছিলেনই, ইনডোর গেমসেও অধিনায়কত্ব করেছেন। উনিশ শো একচল্লিশ থেকে তেতাল্লিশ পর্যন্ত ল কলেজের প্রতিনিধিত্ব করেছেন ক্রিকেট, ফুটবল, হকি এবং টেনিস খেলায়। অ্যাথলেটিকসে দু' বছর পেয়েছেন ইনডিভিজুয়াল চ্যাম্পিয়নশিপ। আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল এবং আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেটে প্রতিনিধিত্ব করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের। ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়ে বিলেতে ইণ্ডিয়া জিমখানাতেও ক্রিকেট খেলেছেন।

সব রকমের খেলাধুলোয় দক্ষতা সইবার মত ভগবৎদত্ত স্বাস্থ্যও ছিল সিদ্ধার্থ রায়ের। সত্যিই সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী দোহারা চেহারার দীর্ঘদেহী যুবক। খেলোয়াড়-জীবনে হাত-গুটানো সাদা শার্ট ছাড়া অন্য কোন পোশাক পরতে দেখিনি কোনদিন সিদ্ধার্থ রায়কে। সেদিন ২ নম্বর বেলতলা রোডে ওঁর বাড়িতে বসে পঁচিশ তিরিশ বছর আগের সেই চেহারার সঙ্গে ওঁর বর্তমান চেহারার মিল খুঁজছিলাম। একটু মোটা হয়ে পড়েছেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে একটু ভারিক্কি ভাবও এসেছে। কিন্তু খেলার মাঠের সেই সদাহাস্যময় প্রাণচঞ্চল

সিদ্ধার্থশংকর রায়

'মানু' এখনো প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। খেলে মাঠসুলভ কর্মপ্রেরণা।

প্রশ্ন করেছিলাম—'আপনার স্বাস্থ্য কেমন যাচ্ছে?'

বললেন, সেটা আপনারাই বলুন। খেটে তো যাচ্ছি। এই কাল অ্যাসেম্বলি সেরে বসিরহাটে গিয়েছি ইলেকশনের মিটিং করতে। ফিরেছি রাত ১২টায়। আজ অল্প সময়ের মধ্যে সব কাজ সেরে বিকেলের প্লেনে যাব দিল্লি। প্রধানমন্ত্রীর জরুরী তার।

মিলিয়ে দেখছিলাম পাশাপাশি আর দুটি ছবি। একটি ১৯০৪ সালের আর একটি ১৯৩৯-এর। একটি ছবিতে ইলিয়ট শীল্ড বিজয়ী প্রেসিডেন্সী কলেজ টিমের অধিনায়ক হিসাবে শীল্ডের পাশে বসে আছেন সিদ্ধার্থবাবুর বাবা সুধীর রায়। আর একটি ছবিতে ইলিয়ট শীল্ডের পাশে প্রেসিডেন্সীর অধিনায়ক হিসাবে সিদ্ধার্থ রায়। কলেজ-জীবনের ফুটবলে পিতা-পুত্রের দ্বৈত কীর্তির ছবি। তবে পুত্রের কীর্তি কিছু বেশী। ইলিয়ট শীল্ডের সঙ্গে ১৯৩৯-এ হার্ডিঞ্জ বার্থডে শীল্ডও পেয়েছিল প্রেসিডেন্সী কলেজ। সেই শেষবার প্রেসিডেন্সীর ইলিয়ট জয়। তখন প্রেসিডেন্সীর টিমও ছিল দুর্ধর্ষ। গোলে রমু ভট্টাচার্য, ব্যাকে সিদ্ধার্থ রায়, হাফে দশু মিত্র, নাসিম, ফরোয়ার্ডে নির্মল চ্যাটার্জি, আব্বাস—পরবর্তী কালের সব নামকরা খেলোয়াড়ের তখন উঠতি ফর্ম।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দৌহিত্র সিদ্ধার্থশংকর রায়ের রাজনীতিতে দীক্ষা গ্রহণের মূলে যেমন আছে মাতামহের বিরাট অবদানের পরোক্ষ প্রভাব তেমন খেলাধুলার ক্ষেত্রেও তাঁদের পারিবারিক ভূমিকা নগণ্য নয়। টেনিস খেলোয়াড় জয়দীপ মুখার্জি দেশবন্ধুরই পৌত্রীর পুত্র। অর্থাৎ চিত্তরঞ্জন দাসের মেয়ের ছেলে।

—জানেন, দাদু টেনিস বেশ ভালই খেলতেন। বাড়িতেই কোর্ট ছিল। ক্রিকেটও খেলতেন মাঝে-মধ্যে। মমাও (চিত্তরঞ্জন) ভাল টেনিস খেলতেন। তবে আমার খেলাধুলোয় হাতেখড়ি এই বাড়িতে বাবার কাছে—বললেন সিদ্ধার্থবাবু।

সিদ্ধার্থবাবুর বাবা লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিস্টার সুধীর রায় ক্রিকেট খেলতেন স্পোর্টিং ইউনিয়নে। ফুটবলের সেন্টার ফরোয়ার্ড হিসাবে বহরমপুরে সুনাম ছিল। সিদ্ধার্থবাবুর মেজো ভাই ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোম্পানীর ডিরেক্টর শান্তনু রায় একসময় বাংলার ৩ নম্বর টেনিস খেলোয়াড় ছিলেন। পরের ভাই বিনাগুড়ি টি এস্টেটের ম্যানেজার সঞ্জয় রায়ও ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ক্রিকেট ব্লু। স্পোর্টিং ইউনিয়নে খেলতেন।

সিদ্ধার্থশংকর রায়ের কাছে আমার শেষ প্রশ্ন ছিল, 'এখনো কি খেলাধুলো করার শখ জাগে'? বললেন, এখন তো মেতে আছি অন্য খেলায়।

প্রগতিপন্থীদের মতে পলিটিক্সেও উনি ক্রিকেট খেলছেন। অ্যান্ড উইথ স্ট্রেট ব্যাট।

মুকুল

॥ চিত্র-সমালোচনা ॥

সম্প্রতি সত্যজিৎ রায় কলকাতার পথে, সিনেমা হাউসের সামনে ও নানা জায়গায় নতুন শিল্পীদের নিয়ে "প্রতিদ্বন্দ্বী"-র (কাহিনী : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়) আউটডোর দৃশ্য তোলেন—উপরে শ্রীরায়ের সঙ্গে যে হিপিকে দেখা যাচ্ছে তাঁকেও ছবিতে দেখা যাবে—নিউ মার্কেট অঞ্চলে এই দৃশ্য তোলা হয় ফটো—দেশ

গো-দান

(জেটলী ফিল্মস)

হিন্দী সাহিত্যের সঙ্গে হিন্দী ফিল্মের যোগ সামান্য। তাই যখন কোন সাহিত্য-রচনার ভিত্তিতে হিন্দী ছবি হয়, তখন শিক্ষিত ও বোদ্ধা দর্শকেরা স্বভাবতই আশান্বিত হন। তবে ছবি দেখার পর, কোন কোন ক্ষেত্রে, তাঁদের আশাভঙ্গের কারণও ঘটে। প্রেমচাঁদের কাহিনী অবলম্বনে তৈরি "গো-দান" এর একটি সাম্প্রতিক নজির।

"গো-দান" রঙিন নয়, তারকাখচিত নয়, জনের পটভূমিতে তোলা কৃষিজীবকদের সঙ্গে সম্বন্ধ। হিন্দীছবিতে এই বাস্তবতা ও বৈশিষ্ট্যের কথা আজকাল ভাবা যায় না। সেদিক থেকে ছবিটি অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু গল্পটি পরিচালক-প্রযোজক ত্রিলোক জেটলি যে-ভাবে ছবিতে বিন্যস্ত করেছেন তাতে আর যাই হোক "গো-দান" কিন্তু হয়নি।

গ্রাম্য পরিবেশে কিছু কিছু ঘটনা সত্যিই সুন্দর, যাতে গ্রামীণ এবং কৃষকদের জীবনযাত্রার পরিচয় মেলে। এ ক্ষেত্রে সংগীতের দান অপরিসীম। গল্প এক কৃষক-পরিবার, তথা এক কৃষক-দম্পতিকে কেন্দ্র করে রচিত। তাদের জীবনের ট্র্যাজেডি কাহিনীর বিষয়বস্তু। দুরবস্থার সঙ্গে অবিশ্রান্ত সংগ্রামের পর প্রধান চরিত্র হরির (রাজকুমার) মৃত্যু এবং পারলৌকিক কাজের সময় তার গো-দান (গরু নেই, তার বিনিময়ে সামান্য মুদ্রা) দর্শকের মনে ট্র্যাজেডির সুর বাজাতে পারে না। কারণ হয়ত এই যে, পরিচালক ছবিতে নাটক তৈরি করতে চান নি। কিন্তু ঘটনাগুলি যে নাট্যরসাশ্রিত। দুই বিপরীতধর্মী মূল্য-বোধের অনিবার্য সংঘর্ষ, হরির ছেলে (মেহমুদ) আত্মকেন্দ্রিক হবার পর, যেমন ছবিতে বিশ্লেষিত নয়, তেমনি স্বার্থপর জগতে হরি ও তার স্ত্রীর (কামিনী কৌশল) সৎজীবন যাপনের চেষ্টার মধ্যে যে একটা করুণ সুর রয়েছে তাও পরিচালক দর্শকের অন্তরে তেমন করে পৌঁছিয়ে দিতে পারলেন না।

আসলে চিত্রনাট্যটি কেমন যেন খাপছাড়া—কখন কোন্ ঘটনা কেন ঘটছে, কে বা কারা কেন আসছে যাচ্ছে, তার কোন সূত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন। বি-নাটকীকরণের শর্ত এটা নয়। কয়েকবারই দেখা গেল 'সফিসটিকেটেড' শশিকলাকে (এখানে খারাপ মেয়ে নয়), যে ভালবাসাতে চায় এক ব্যক্তিকে। এই ব্যক্তি সেজেছেন পরিচালক নিজেই (তাঁর নামবার কি দরকার ছিল?)। তাদের উপস্থিতি নিয়ে কোন উপকাহিনী নেই, গ্রামের জমিদারকে (বিপিন গুপ্ত) কেন মাঝে মাঝে দেখা যায় তাও স্পষ্ট নয়।

সাহস ও ক্ষমতা যদিও এক নয়, তবু বলব, পরিচালক-প্রযোজক শ্রীজেটলি

'গো-দান'-চিত্রে রাজকুমার, কামিনী কৌশল ও মেহমুদ

অজয় চক্রবর্তী পরিচালিত নতুন বাংলা ছবি "আলেয়ার আলো" এ-সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে—ছবিতে সৌমিত্র চ্যাটার্জি ও কালী ব্যানার্জি

দুঃসাহসী। এমন একটি গ্রাম্যমেজাজের ছবি তৈরি করতেই যে তিনি শুধু সাহস দেখিয়েছেন তা নয়, সংগীতপরিচালক হিসাবে রবিশঙ্করকেও নিয়েছেন। এর ফলে ছবিটি, আগেই বলেছি, সাঙ্গীতিক আবেদনে অদ্ভুতভাবে মনোগ্রাহী হয়ে উঠেছে। গানগুলিও বার বার শুনতে ইচ্ছা করে। গানই ছবির প্রধান আকর্ষণ।

রাজকুমার ও কামিনী কৌশল বড়ই স্বাভাবিক ভাল অভিনয় করেন, এহেন ছবিতে তা মনে দাগ কাটে না। মেহমুদ ছবিতে 'সীরিয়স' চরিত্রের শিল্পী। এটা পরিচালকের আর এক দুঃসাহস।

টলি-টিপ্পনী

কাজ, কাজ আর লোক। একঘেয়ে কর্মব্যস্ততার হাত থেকে রেহাই পেতে শিল্পীকে কখনো কখনো অজ্ঞাতবাসের কথা ভাবতে হয়। আপন কর্মস্থল ছেড়ে ও'রা তখন পাড়ি দেন দূরে, অনেক দূরে। লোকচক্ষুর আড়ালে। ব্যস্ত শিল্পীর জীবনেই এই জাতীয় ঘটনা বিশেষ করে ঘটে। অনেকে আবার হয়তো তেমন ব্যস্ত নন, কিন্তু প্রাত্যহিক রুটিনের হুকুমে হাঁপিয়ে উঠে শেষ পর্যন্ত কিছুকাল অন্যত্র গা-ঢাকা দেবার কথা চিন্তা করেন। কেরানীর জীবনেও এই ঘটনা ঘটতে পারে। তবে শিল্পীজীবনে বিশেষ করে ঘটে, কারণ, ও'রা বৈচিত্র্যের সন্ধানী। মন ও'দের সদাই অন্য কোথা, অন্য কোনখানে উড়ে বেড়াতে চায়।

বম্বের বিখ্যাত সংগীত-শিল্পী শ্রীশচীনদেব বর্মণ সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন নিছক গা-ঢাকা দিতে। এখানে অবশ্য তাঁর নিজের বাড়িও আছে। কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ তিনি কলকাতায় চলে এসেছিলেন, এবং নিজের বাড়িতে দিব্যি দিনচারেক লুকিয়েছিলেন। একদিন কে একজন তাঁকে দেখে ফেললেন রঙমহল থিয়েটারে। আর যান কোথায়, এই বার্তা রটে গেল ক্রমে সারা টালিগঞ্জে। খবর পেয়ে আমিও সেদিন হাজির হলাম ও'র সাউথ এণ্ড পার্কের বাড়িতে। আমাকে দেখেই শচীন কর্তা অবাক। পূর্ববঙ্গের ভাষায় জানতে চাইলেন, খবর পেলাম কোত্থেকে! সবিনয়ে জানালাম, "এ খবর এখন আর কারুরই অজানা নেই।" সোফায় বসতে বসতে শ্রীদেববর্মণ বললেন, "কেউ জানুক সেটা কিন্তু আমি সত্যি চাই নি। কয়েকটা দিন এখানে অজ্ঞাতবাস করব ভেবেছিলাম। বম্বেতে লোকের ভিড়ে ভিড়ে একরকম হাঁপিয়ে উঠেছি।" জিজ্ঞাসা করলাম, "বম্বেতে নতুন ছবি কি কি করছেন?" আমার এ প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে যেতে চাইলেন শ্রীদেববর্মণ। বললেন, "ওসব কথা এখন থাক।" স্বভাবতই প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "চারদিন হল কলকাতায় এসেছেন, কি করছেন সারাদিন বাড়িতে বসে।" উনি জানালেন, নতুন কয়েকটা সুরের পরিকল্পনা এখন তাঁর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। এখানে যাচ্ছেন, ওখানে যাচ্ছেন, কিছুতেই নাকি "ভিস্যুয়েল" সেই সুরের স্পর্শ রপ্ত করতে পারছেন না। আমি অবাক হলাম। শচীন কর্তাই হঠাৎ বললেন, "এবার কলকাতায় এসে দেখলাম অনেক কিছু বদলে গেছে।" জিজ্ঞাসা করলাম, "কিরকম?" তিনি জানালেন, "ঐ রেল লাইনের ওপারের বস্তিটা এখন শহর হয়ে গেছে।" বলেই আত্মভোলা মানুষটি আমাকে একটা গল্প শোনালেন। বললেন, "সেবার বম্বে থেকে কলকাতায় এসেছিলাম কয়েকটা দিন বিশ্রাম নিতে। একদিন সন্ধ্যার পর বাড়িতে শুয়ে শুয়ে কি একটা বই পড়ছি, হঠাৎ রেললাইনের ওপারের বস্তি অঞ্চল থেকে আমার কানে এলো কীর্তনের সোরগোল। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি একদল লোক ঢোল বাজিয়ে মনের আনন্দে কীর্তন করছে। মুহূর্তে আমার মনে পড়ে গেল পাকিস্তানের সেই নানা রংয়ের দিনগুলির কথা, মনে হল, যারা গাইছে তারা রিফিউজি। পাকিস্তানে তাদের সব কিছু ফেলে রেখে সহায়সম্বলহীন হয়ে এখানে চলে এসেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য, ঢোলটি আর নিজেদের গানের মনটা সঙ্গে আনতে ভোলে নি। নিজের মনের এই ছবি থেকে হঠাৎ একটা আবছা সুরের সন্ধান পেয়ে গেলাম।

আজ মনে পড়ে যায় ভাটিয়ালী দিনগুলি। বাউলের দিনগুলি।

—"শুনি টাকু ডুম টাকু ডুম বাজে
বাজে ভাংগা ঢোল
ও মন যা ভুলে যা, যা আছে তোর
ভোল রে কাথা ভোল।"

—বিচক্ষ

নাট্য-সমালোচনা

মুখোশের আড়ালে

(কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ)

বম্বে ফিল্মের মত, রঙ্গমঞ্চেও এক শ্রেণীর ক্রাইম-নাটকের সূচনা হয়েছে কি? প্রেমেন্দ্র মিত্র ও ধনঞ্জয় বৈরাগীর যুগ্ম রচনা "আগন্তুক" দেখার পর কিন্তু এই প্রশ্ন মনে জাগে নি। জাগছে এখন, ওঁদের দুজনের 'আগন্তুক'-জাতীয় "মুখোশের আড়ালে" দেখে। এই জাতের নাটক এক নতুন ধরনের "এনটারটেনমেনট" সন্দেহ নেই; বম্বে ফিল্মের কিংবা হিন্দী ক্রাইম-চিত্রের গুণগ্রাহীর যদি অন্ত না থাকে, তবে ইলপ করে বলা যায়, "মুখোশের আড়ালে"র মত নাটকের দর্শকও হবেন অসংখ্য। তবে ক্রাইম ফিল্মের মত এই রীতির নাটক দীর্ঘায়ু হবে কিনা তা এখনই বলা যায় না।

"মুখোশের আড়ালে"-ও সেই "স্মাগলারস ডেন", চোরাকারবারীদের আস্তানা। অবশ্য এবারের চোরাকারবারীদের দেশদ্রোহী বলে অভিযুক্ত করা যায় না, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গেও তাঁদের যোগসাজস নেই। তবে দুর্বৃত্তদের সেই গ্যাজেট ও নানাবিধ যান্ত্রিক

কৌশল, তাদের কবলিত বার-হোটেল ইত্যাদি রয়েছে। নতুনের মধ্যে রয়েছে একটি টুটেন-খামেনের মমি, তার দুটি চোখ জ্বলে, ভিতরে মরণ-ফাঁদ। এয়ারপোর্টে প্লেন ওঠা-নামার দৃশ্য বিস্মিত হয়ে দেখার মত। এক কথায়, প্রযোজনার পারিপাট্য ও চমৎকৃতি দেখবার মত। তার চেয়েও বড় কথা, পরিচালক তরুণ রায় নাটকটিকে এমন গতিসম্পন্ন করেছেন যে, তাতে ফিল্মের ডাইমেনশান এসে গেছে। মঞ্চ "রিভলভিং" নয়, কিন্তু ঘূর্ণায়মান মঞ্চেও বুঝি নাটকের এমন প্রচণ্ড গতি ও অ্যাকশন সম্ভব নয়। এর জন্য পরিচালককে মঞ্চের দুই কোণায় 'মিনি স্টেজ' তৈরি করে নিতে হয়েছে, কুশীলবদের পর্দার বাইরে ও পর্দা তুলে অনবরত মুভমেন্ট-এ রাখতে হয়েছে। এক কথায় আঙ্গিকের দিক থেকে একটি উঁচু দরের নাট্যপ্রযোজনা "মুখোশের আড়ালে"। এবং যে উদ্দেশ্যে এই নাটক দর্শককে সাড়ে তিন ঘণ্টার জন্য রোমাঞ্চ, সাসপেনস, উৎকণ্ঠা ও কৌতূহলে নিমজ্জিত রাখা তাও চমৎকারভাবে সিদ্ধ। দর্শক ক্রাইম-নাটকটি দেখার কালে এক মুহূর্তের জন্যও অন্যমনস্ক হতে পারবেন না।

নাটকের ঘটনাস্থল তথা চোরাকারবারীদের গোপন আস্তানা বিত্তবান সুরথ চৌধুরীর গৃহে। গৃহস্বামী তা জানতে পারেন অনেক পরে। যখন জানেন তখন তিনি ও তাঁর কন্যা শয়তানদের শিকার। যুবতী কন্যাকে, প্রণয়সিক্তরূপে, বাঁচাবার জন্য উঠে পড়ে লেগে যান তরুণ ডিটেকটিভ ইনসপেকটর। ওই বাড়িতে সাসপেনস-এর উপাদান তৈরি করা হয়েছে সুন্দরভাবে। গৃহস্বামীর পরলোকগত স্ত্রীর গান কেমন করে বাজে, কে-ই বা দুর্বৃত্তদলের হয়ে সেখানে কাজ করছে ইত্যাদি রহস্য সযত্নে সাজানো।

বিজয় বসুর পরিচালনায় নির্মীয়মাণ ফিল্ম জেমের "নবরাগ" ছবিতে সুচিত্রা সেন ও বাসবী নন্দী

রহস্যের উন্মোচন যখন, তখন নাটক রীতিমত রোমাঞ্চকর।

নাটকের পরিণতিতে, বলা বাহুল্য, পুলিসের হাতে দুর্বৃত্তদের পতন দেখানো হয়েছে, এবং সেই পুরনো কথাও উচ্চারিত—ক্রাইম ডাজ নট পে। তবে বক্স-অফিসে এই নাটকের ক্রাইম এবং পাপকাণ্ডের যে মার নেই তা নিশ্চিন্তে বলা যায়। ক্রাইম-গল্পে কৌতুক থাকে স্বাদান্তরের জন্য, এখানেও আছে। আর রয়েছে, যেমন থাকে, হোটেলের নাচ। নাচের দৃশ্যের জন্য দু-একজন সুন্দরীকেও রাখা হয়েছে।

উপভোগ্য এই নাটকের বড় আকর্ষণ অভিনয়। নাট্যপরিচালক তরুণ রায় এই নাটকে দুই রূপসজ্জায় অভিনয় করেছেন। এক রূপে তিনি দুর্বৃত্তদলের নায়ক, অপর রূপ ছদ্মবেশের। ছদ্মবেশী শয়তানরূপেও (নাম তখন নিবারণ) তিনি উঁচু-দরের কমেডি-অভিনয়ের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। দুই বেশেই তাঁর অভিনয় নাটকের একটি সম্পদ। প্রধান চরিত্রে প্রত্যেকের চরিত্রচিত্রণই দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা পাবার যোগ্য। অজিত মিত্র (সুরথ চৌধুরী), দীপান্বিতা রায় (মালতী), পান্নালাল চট্টোপাধ্যায় (কমিক চরিত্র) ও সমরেশ চক্রবর্তী (ডিটেকটিভ ইনসপেকটর) চমৎকার অভিনয় করেছেন। বাণী হাজরা (বেণু) এ নাটকে একটি চরিত্রে সুন্দর রূপ দিয়েছেন। রবীন মজুমদারের অভিনয় (কলকাতা পুলিসে সুপারিনটেনডেন্ট থাকে কি?) বেশ সংযত ও স্বচ্ছন্দ। কয়েকটি বিশেষ ভূমিকায় রিটা পলিন, দেবব্রত রায়,

'মুখোশের আড়ালে' নাটকের একটি দৃশ্য—নীচে রবীন মজুমদার ও দেবরাজ রায়

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় দক্ষিণ ভারতের শিল্পী নাগেশ্বর রাওয়ের হাতে স্মারক উপহার দিচ্ছেন

সংযুক্তা গুঞ্জিরাল, দেবরাজ রায়, বিভাস মুখার্জি ও প্রণত ঘোষ সুঅভিনয়ের জন্য বিশেষ প্রশংসা

ন্তি বালসারার সংগীতপরিচালনাও কৃতিত্বপূর্ণ। বিশেষ প্রশংসনীয় মঞ্চসজ্জা (গণেশ দাস) এবং আলোর কাজ (সুরেশ ভিয়াস)।

কলকাতায় দক্ষিণ ভারতের শিল্পী

বিশাল কলকাতা অন্ধ্র সমিতির আমন্ত্রণে দুজন কৃতী শিল্পী সম্প্রতি দক্ষিণ ভারত থেকে এই শহরে এসেছিলেন। বিখ্যাত চিত্রপ্রযোজক ও অভিনেতা শ্রীআকিনেনি নাগেশ্বর রাও এবং সংগীতজ্ঞ শ্রীঘণ্টাশালা ভেংকটেশ্বর রাও—দুজনেই ভারত সরকারের কাছ থেকে 'পদ্মশ্রী' খেতাব পেয়েছেন, দুজনেরই শিল্পীজীবনের রজতজয়ন্তীবর্ষ সদ্য পূর্ণ হয়েছে। এই উপলক্ষেই সমিতি রবীন্দ্রসদনে দুদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে দুই শিল্পীকে সম্বর্ধনা জানালেন। শ্রীঘণ্টাশালা-র সম্মানার্থ উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীসঞ্জীবায়া। আর অপর অনুষ্ঠানে সভাপতিরূপে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথি হিসাবে চলচ্চিত্র পরিচালক শ্রীতপন সিংহ।

মূল অনুষ্ঠানে এবং ঘরোয়াভাবে চলচ্চিত্র সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে শ্রীনাগেশ্বর রাও বাংলা ফিল্ম সম্পর্কে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। তামিল ও তেলেগু ছবির নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি জানান যে তিনি অপর এক প্রযোজক বন্ধুর সহযোগিতায় বছরে অন্তত একটি পরীক্ষা তথা শিক্ষামূলক ছবি তুলবেন। এজন্য প্রতি বছর দু-লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্ষতি স্বীকার করতে তাঁরা প্রস্তুত। এধরণের গোটাদুই ছবি তাঁরা এরমধ্যে বাজারে ছেড়েছেন। (প্রশ্ন—"লাভ হয়েছে না লোকসান"? উত্তর—"অবশ্যই লাভ নয়!")

দু-দিনে অনুষ্ঠানেই শ্রীঘণ্টাশালা তাঁর দলবলসহ অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক সংগীত পরিবেষণ করেন। অধিকাংশই রাগাশ্রয়ী সংগীত ও কীর্তন এবং স্বরচিত জনপ্রিয় ফিল্মী গান—তেলেগু ভাষায়। এছাড়া দু-একটি করে হিন্দী, তামিল এবং কানাড়ী গানও তিনি গেয়েছিলেন।

কে শংকর পরিচালিত "সাচ্চাই" হিন্দীচিত্রে শাম্মি কাপুর

বোম্বাই বিচিত্রা

আটষট্টি সাল থেকে ভারতীয় চিত্র প্রযোজক সংস্থার সভাপতিত্ব করছেন শ্রী আই এস জোহর। এই পদে থাকাকালীন শ্রীজোহরের স্বভাবসুলভ কাঁচা মিঠে মন্তব্য চলচ্চিত্র জগতের বিভিন্ন বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের চঞ্চলতা সৃষ্টি করেছে। সরকারী মহলে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মচারীরা ছাড়াও কয়েকজন মন্ত্রীও শ্রী জোহরের মন্তব্যে কখনো কখনো উষ্মা প্রকাশ করেছেন। কিছুদিন আগে রাজভবনের এক পার্টিতে শ্রী জোহরের মন্তব্য শুনে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধীও চিত্রজগতের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়েছেন। শ্রী আই এস জোহর সাধারণত যা করেন তার জন্য মনস্তাপ করবার লোক নন। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী চটেছেন শুনে, শ্রী জোহর কিছুটা বিচলিত হয়েছেন। এমন গুজবও শোনা যাচ্ছে যে শ্রী জোহরের কটু মন্তব্যের জন্যই শ্রীমতী গান্ধী নাকি আগামী বাজেট অধিবেশনে চিত্রজগতের প্রতি সহানুভূতির দৃষ্টি রাখবেন না। এমন গুজব গুজব হলেও বিচলিত হবারই কথা। সুতরাং শ্রী জোহর একেবারে কালক্ষয় না করে শ্রীমতী গান্ধীকে এই মর্মে পত্র লিখেছেন যে শ্রী জোহরের প্রতি চটে গিয়ে তিনি যেন চিত্র জগতের প্রতি কোন অবিচার না করেন।

ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রযোজক সংস্থা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। সুতরাং তার সভাপতি যে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি হবেন এতে আর সন্দেহ কী! এ সংস্থার সভাপতি চলচ্চিত্র সম্বন্ধীয় সমস্ত সভা-সমিতিতেই আপ্যায়িত হয়ে থাকেন এবং সর্বত্রই তাঁর বক্তব্য পেশ করার অধিকার থাকে। শ্রী আই এস জোহর এই সম্মানিত সময়েই এ অধিকারের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছেন এবং হাসি ঠাট্টার ছলে অত্যন্ত গম্ভীর পরিবেশেও চিত্র জগতের সমস্যার কথা পেশ করেছেন শ্রোতা সমক্ষে। যদিও আমরা আদিকাল থেকে জানি যে, সরকার সাধারণত রুগীর আসল অবস্থা না জেনেই পথ্য এবং ঔষধের নির্ণয় করে থাকেন, তব, মুখ ফুটে সে কথা আমরা সরকার সমক্ষে প্রকাশ করি না। সরকার আইন রচনা করে, আমরা আইনের ফাঁক খুঁজি। সরকার ট্যাক্স জারি করে, আমরা ট্যাক্স ফাঁকি দেবার জন্য মোটা টাকায় পরামর্শদাতা জোগাড় করি। কিন্তু আই এস জোহর এ প্রথার ব্যতিক্রম। উনি বিনা দ্বিধায় রুই-কাৎলা প্রযোজকদের বিরুদ্ধাচরণ করতে পিছপা হননি, মন্ত্রীদের সঙ্গে হাসিমুখে ফটো তোলার জন্য আগ্রহী না হয়ে, চলচ্চিত্রের সমস্যা তাঁদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন এবং সময় ও সুযোগ এলেই সরকারকে মনে করিয়ে দিয়েছেন, চলচ্চিত্রের প্রতি তার কর্তব্যের কথা। ছোটখাটো সাদা/কালো ছবির প্রযোজকরা এবং আঞ্চলিক চিত্রনির্মাতারা নানা কারণে শ্রী জোহরের গুণগ্রাহী।

সরল শর্মা

রেকর্ড সমালোচনা

বসন্ত-বন্দনা

"বসন্ত-বন্দনা" ঋতু-বন্দনা নয়। গ্রামোফোন কোম্পানি বসন্তে এমন কোন গান বা গীতিনাট্য বের করেন নি যাকে বসন্তের আবাহন বা অভিষেক বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। "বসন্ত-বন্দনা" আসলে নানারকম গানের রেকর্ডগুচ্ছ, যাতে রাগ-প্রধান গান, রবীন্দ্রসংগীত, শ্যামাসংগীত, কীর্তন ইত্যাদি সবই আছে। অতএব বসন্তের এই রেকর্ড-প্রযোজনার নাম হতে পারত "বসন্ত-বিচিত্রা"। যদিও এ ক্ষেত্রে নামে কিছু আসে যায় না। শ্রোতার এই সময়কার বিশেষ পাওনা বহাল থাকলেই হল। এবং তা ভালভাবেই আছে, আগেরবারের তুলনায় "বসন্ত-বন্দনা"র রেকর্ড এবার হয়ত রেকর্ড-ক্রেতাদের বেশী প্রলুব্ধ করবে।

চারটি ঈ-পি রেকর্ডের শিল্পী এবার উমা বসু (আধুনিক), কনক দাস (রবীন্দ্র-সংগীত), দীপালি নাগ (রাগপ্রধান) ও ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য (শ্যামাসংগীত)। রসিক শ্রোতার উপরিপাওনা যে যথেষ্ট তা বলাই বাহুল্য। অতীতের তীর হতে কোন কোন কণ্ঠ আজকের শ্রোতার মনেও দোলা দিয়ে যায়। সেদিক থেকে হিমাংশু দত্তের সুরে গাওয়া উমা বসুর গান (অজ ফাগুনের প্রথম দিনে/আকাশের চাঁদ মাটির ফুলেতে/চাঁদ কহে চামেলী গো/ঝরনো পাতার পথে) কিংবা কনক বিশ্বাসের রবীন্দ্র সংগীতের (সেদিন দুজনে/আসা-যাওয়ার পথের ধারে/জীবনে পরম লগন/ডেকো না আমারে) মূল্য কম নয়। দীপালি নাগের বেহাগ, বাগেশ্রী, রামসখ ও গৌরী শুনে অল্পে সুখমিশ্র বলে অবসরবিনোদন করা যায়। পুরানা অমলের কিংবা আগের গাওয়া গানে সব শ্রোতার মন না ভরলেও বৈচিত্র্যের দিক থেকে এই ঈ-পি রেকর্ডের

লী ফক

পছন্দ করি না, তবে বাধ্য হলে তাও করব!
রিভলবার উঁচিয়ে বলছে মারপিট পছন্দ করে না, লোকটা কে রে বাবা!
???

প্রিন্স চার্লস, তুমি তো
অপেক্ষা করছিলে, তাই না?

?!

রাজা চার্লসের প্রাসাদে -----
তুমিই বুঝি ওয়াকার? তা এই প্রাসাদের মধ্যে তুমি ঢুকলে কী করে?

কী করে ঢুকেছে বুঝতে পারছি!

ঢুকেছ বটে, কিন্তু তোমাকে আর বেরুতে দিচ্ছি নে---এঃ!
7/13

কী নিশানা রে বাবা!
তোমার গুলির শব্দ শুনে পাহারাদারা ছুটে এসেছে। আর তোমার নিস্তার নেই।

তুমিই ওয়াকার, সে কথা জানছি। কিন্তু বুঝতে পারছি না যে, প্লেন-কোম্পানির ব্যাপারে কীভাবে···
মুখোশ-পরা একটা লোককে আমার সঙ্গে কথা বলতে পাঠাল! হাঃ হাঃ!

শোনো চার্লস, প্লেনগুলো যদি বিনাবাক্যে ফেরত দাও, তাহলে এ-যাত্রা তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি।
টাকা না-পেলে প্লেন আমি ফেরত দেব না।

তাহলে তোমাকে ফাটকে আটক করব।
হো হো, হা হা! চারদিকে আমার সেপাই-সান্ত্রী, অথচ আমাকেই কিনা ফাটকে আটক করতে চায়!

ভারত সরকারের ১৯৭০—৭১ সালের বাজেট বর্তমান সপ্তাহের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। ২৮ ফেব্রুয়ারি ভারতের প্রধানমন্ত্রী লোকসভায় এই বাজেট পেশ করে আগামী আর্থিক বৎসরের জন্য ১৭০ কোটি টাকার অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহের জন্য প্রস্তাব দিয়েছেন। এই বাজেটের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ঃ—কর বৃদ্ধির ব্যাপারে চিনি, চা, মদ, স্টেইনলেস স্টীলের ব্লেড, সিগারেট, সাদা কেরোসিন, মোটর স্পিরিট, ফারনেসের তেল, এয়ার কন্ডিশনার, রেফরিজারেটার, টেলিভিশন সেট ও কৃত্রিম রেশমের কাপড় ইত্যাদি বিলাসবস্তুর উপর শুল্ক বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। যাঁদের ব্যক্তিগত আয় বছরে ২ লাখ টাকার উপর তাঁদের আয়কর ধার্য হয়েছে ৯৩·৫ শতাংশ। ডাক ও তার বিভাগে পারসেল, রেজেস্ট্রি-ফি, ভি পি বার, মনিঅরডার, তারে অভিনন্দন বার্তা ও টেলিফোন ইত্যাদির জন্য দেয় ফি বাড়িয়েছেন। এইভাবে অতিরিক্ত যে রাজস্ব সংগ্রহ হবে তাতে আগামী বছরের ঘাটতি চলতি বছরের ঘাটতির পরিমাণ ২৯০ কোটি টাকা থেকে কমে ২২৫ কোটি টাকায় নেমে আসবে।

দেশী সংবাদ

২৩ ফেব্রুয়ারি—মেদিনীপুর কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনে সি পি আই নেতা শ্রীবিশ্বনাথ মুখারজি প্রায় সতের হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। শ্রীমুখারজি পেয়েছেন ৩২১৭২ ভোট এবং তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নব-কংগ্রেস প্রার্থী পেয়েছেন ১৫৩২৪ ভোট। আদি কংগ্রেস প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়ে গিয়েছে।

আজ যুক্তফ্রন্ট কমিটির বৈঠকে এস ইউ সি-র খসড়া নিয়ে দীর্ঘ চার ঘণ্টা আলোচনার পরও ফ্রন্টের বৈঠকে সংখ্যাধিক্যের ভোটে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রস্তাবে প্রচণ্ড মতভেদ থেকে যায়। ফ্রন্টের শান্তি বৈঠক আবার বসছে আগামী ৪ মারচ বুধবার।

২৪ ফেব্রুয়ারি—আজ দুপুরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুদল ছাত্রের মধ্যে কলেজ প্রাঙ্গণে প্রচণ্ড সশস্ত্র সংঘর্ষে কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলে ত্রাসের সৃষ্টি হয়। মুহুর্মুহু বোমা ফাটে। দুপক্ষের মধ্যে খোলা তরোয়াল ও পিস্তলের লড়াইও চলে। আশুতোষ ভবনের কয়েকটি দরজা এবং বহু জানালার কাচ ভেঙে তছনছ। ওই ভবনের একতলায় ছাত্র ইউনিয়নের অফিস-ঘরে আগুনও লাগে।

ন' দিন যেতে না যেতেই বিহারে দারোগা রাই মন্ত্রিসভা সংকটের মুখে পড়েছে। শ্রীরাম-লক্ষ্মণ সিং যাদব বিহার নব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের পদে ইসতফা দেওয়াতেই এই সংকট।

২৫ ফেব্রুয়ারি—আজ আসানসোলের কাছেই বেনাচি ও শ্রীপুরে কয়লাখনিতে দুটি দলের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষের পরিণামে চারজন প্রাণ হারান। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও পাঁচ-জন। বেনাচিতে সংঘর্ষ হয় দুটি কম্যুনিস্ট দলের সমর্থকদের মধ্যে। বিকালে শ্রীপুরে এস এস পি ও সি পি এম-এর সমর্থকদের মধ্যে বেশ কয়েকবার সংঘর্ষ বাধে। ওই অঞ্চলে সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত কারফিউ জারি হয়েছে।

রেল বাজেটে প্রস্তাবিত তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের ভাড়ার হার সরকার বেশ ভাল-রকম সংশোধন করতে হয়ত রাজি হবেন। কারণ প্রায় সকল দল থেকেই এর বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ উঠেছে।

২৬ ফেব্রুয়ারি—মারকিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়াকে ভারত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে তাদের দেওয়া অস্ত্রশস্ত্রে বলীয়ান পাকিস্তান এখন ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। আজ রাজ্যসভায় সদস্যদের কয়েকটি প্রশ্নের জবাবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীস্বরণ সিং এ কথা বলেন।

আজ নয়াদিল্লিতে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সংসদীয় দলের কার্যনির্বাহক পরিষদের বৈঠকে এই অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, তৃতীয় শ্রেণীর এবং শহরতলীর স্বল্প-দূরত্বের গাড়িভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে হবে। সেই সঙ্গে খাদ্যশস্য, দুধ ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির যে হারে মাশুল বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে তাও কমাতে হবে।

২৭ ফেব্রুয়ারি—আজ জনসংঘ সদস্য শ্রীশংকরপ্রসাদ জয়সওয়াল নব কংগ্রেস সদস্যদের আসনে উপবিষ্ট শ্রীকানাইয়ালাল সোনকারের দিকে এক জোড়া চপ্পল ছুড়লে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় প্রচণ্ড হট্টগোল শুরু হয়। ফলে নির্ধারিত সময়ের পনের মিনিট আগেই উত্তর-প্রদেশ বিধানসভা মুলতুবি হয়ে যায়।

গত পাঁচ বছরের মধ্যে অভাবে পড়ে যাঁরা জমি বিক্রি করেছেন, তাঁরা চাইলেই সে জমি ফিরে পাবেন—এই মর্মে রাজ্য বিধানসভায় বর্তমান অধিবেশনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিল আনা হচ্ছে। বিলটির নাম হবে রেস্টোরেশন অব অ্যালিনিয়েটেড ল্যানড বিল।

২৮ ফেব্রুয়ারি—খারাপভাবে মজুত করার জন্য হাওড়ার নন্দীবাড়ি সরকারী গুদামে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা মূল্যের চাল অখাদ্য হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। এর মধ্যে ১৩০০ কুইনটাল মিহি চাল ধুলোবালি-কাঁকর ইত্যাদি দ্বারা নষ্ট হয়েছে।

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও সাহিত্য সমালোচক ডঃ শ্রীকুমার ব্যানারজি আজ ভোরে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তাঁর স্ত্রী কয়েক বছর আগেই পরলোক-গমন করেন। তিনি দুই পুত্র রেখে গিয়েছেন।

১ মারচ—কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা বহুদিন আগেই সংবিধান সংশোধন বিলে অনুমোদন করেছেন যে, রাজন্যদের ব্যক্তিগত ভাতা এবং অধিকার-সমূহ বিলোপ করা হবে এবং রাজন্য প্রথা আর থাকবে না। কিন্তু তাঁদের কি ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে এ সম্পর্কে মন্ত্রিসভায় দারুণ মতদ্বৈধতা দেখা দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

বিদেশী সংবাদ

২৩ ফেব্রুয়ারি—আগামী বুধবার ফরাসী রাষ্ট্রপতি জর্জেস পমপিদু যখন মারকিন কংগ্রেসের দুই সভার মিলিত অধিবেশনে ভাষণ দেবেন তখন কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ প্রতিনিধি তা বয়কট করবেন বলে এ পি-র সংবাদে জানানো হয়েছে।

২৪ ফেব্রুয়ারি—সারা পূর্ব পাকিস্তান সংবাদপত্র শ্রমিক ফেডারেশন এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় আজ ঢাকায় ইত্তেফাক, দৈনিক পাকিস্তান, আজাদ এবং সংগ্রাম এই চারটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছে।

২৫ ফেব্রুয়ারি—নেপালের যুবরাজের বিবাহোৎসবে যোগদানের জন্য জাপানের যুবরাজ হিরোহিতো ও তাঁর পত্নী জাপানের সম্রাট হিরো-হিতোর প্রতিভূরূপে কাঠমাণ্ডুতে গিয়েছেন।

বিজ্ঞপ্তি

দেশ পত্রিকায় যাঁরা রচনাদি পাঠান তাঁদের প্রতি নিবেদন, সমস্ত রচনার নকল রেখে লেখা পাঠাবেন। কবিতা বাদে অন্যান্য অমনোনীত রচনা আমরা ডাকে—বুক পোস্টে—ফেরত দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করে থাকি; তবু নানা গোলযোগে এবং ডাকেও লেখা খোয়া যাবার সম্ভাবনা থাকে। বলা বাহুল্য, ইচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের দপ্তরে পাঠানো লেখার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে আমরা অক্ষম।

—সম্পাদক

২৬ ফেব্রুয়ারি—রাজকুমার বীরেন্দ্রের বিবাহ উৎসবে যোগদানের জন্য রাজা মহেন্দ্রের আমন্ত্রণে ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি চারদিন-ব্যাপী নেপাল পরিদর্শনে আসেন। কাঠমাণ্ডুতে পৌঁছলে তাঁকে আড়ম্বরপূর্ণভাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

২৭ ফেব্রুয়ারি—নেপালের যুবরাজের আজ বিয়ে। যুবরাজ স্বর্ণখচিত জাতীয় পোশাক পরে সোনার সিংহাসনে চড়ে রাজপ্রাসাদ থেকে পাঁচ মাইল দূরে সিংহদরবার-এ কনের বাড়ি গিয়েছেন। বরযাত্রীদের মধ্যে রয়েছেন রাজা, রাণী, প্রধানমন্ত্রী, প্রধান বিচারপতি প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি।

২৮ ফেব্রুয়ারি—গতকাল মধ্যপূর্ব নেপালের জুমসন বিমানঘাটি থেকে রয়েল নেপাল বিমান-পথের একখানি টুইন অটার বিমান ওড়ার সময়ই দুর্ঘটনায় পড়ে। এর ফলে একজন নিহত ও কয়েকজন আহত হয়।

১ মারচ—একটি বিশিষ্ট রুশ গ্রন্থ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ৪০ খণ্ডের একটি বিশ্ব ইতিহাস প্রকাশ করছেন। এর দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচ্য বিষয় হবে প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি। প্রথম খণ্ডে থাকবে প্রাচীন জাপান নিয়ে আলোচনা।

Kirloskar

(সি ৭৬৭১)

454 Gm.
FERRADOL
A VITAMIN NUTRITIVE TONIC
STANDARDIZED
PARKE-DAVIS

লেখক		পৃষ্ঠা

বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীপান্নালাল মল্লিক

খেয়েটে খাই—
ষোল-আনা তৃপ্তি চাই !

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৭ বর্ষ ॥ সংখ্যা ২০
শনিবার ৩০ ফাল্গুন ১৩৭৬

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

*

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

*

টেলিফোন
২৩-২২৪৩ ২৩-৪৫৪১

*

চাঁদার হার
কলিকাতায়

বার্ষিক	২৫.০০
ষাণ্মাসিক	১২.৫০
ত্রৈমাসিক	৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	৩০.০০
ষাণ্মাসিক "	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক "	৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	৩০.০০
ষাণ্মাসিক "	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক "	৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	৫২.০০
ষাণ্মাসিক "	২৬.০০
ত্রৈমাসিক "	১৩.০০

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	৩৯.০০
ষাণ্মাসিক	১৯.৫০
ত্রৈমাসিক	১০.০০

*

দাম ৫০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাসুল ৭ পয়সা

*

DESH

Saturday 14 March, 1970

ফ্রণ্টে নতুন ফাটল

বসিরহাট উপনির্বাচনে যুক্তফ্রণ্ট প্রার্থী জয়ী হয়েছেন যদিও তবু এই উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অবস্থা আবার ঘোরালো হয়ে উঠল। এই উপনির্বাচনে—যেটি লোকসভার আসন—যুক্তফ্রণ্টের মনোনীত প্রার্থী ছিলেন বাংলা কংগ্রেসের সদস্য। যে ধরনের মোটা ভোটের ব্যবধানে এঁর জয়ী হবার কথা, সে রকমটি অবশ্য ঘটেনি, অন্যদিকে বাংলার রাজনীতিতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ কেরল-রাজ্যের বাসিন্দা প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগের জনৈক প্রার্থী অপ্রত্যাশিত বিপুল ভোট পেয়ে অনেকের চলতি ধ্যান ধারণা একেবারে পালটে দিয়েছেন। বাংলা কংগ্রেস নির্বাচনের আগে, নির্বাচনের সময় এবং তাঁদের প্রার্থীর জয়লাভের পর প্রকাশ্যে অভিযোগ করেছেন : বসিরহাট উপনির্বাচনে সি পি এম দল তাঁদের বিরোধিতা করেছেন, অর্থাৎ প্রকারান্তরে প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগ প্রার্থীকেই সাহায্য করেছেন। এই অভিযোগের প্রত্যুত্তরে সি পি এম জানিয়েছেন, এমন হীন কাজ তাঁরা কখনোই করেননি। বাংলা কংগ্রেস স্বভাবতই এ ধরনের আপত্তিতে সন্তুষ্ট নন, তাঁরা অতিমাত্রায় ক্ষুব্ধ ও ক্ষুণ্ণ হয়ে প্রথমে ফ্রণ্ট বৈঠক বর্জন করেছেন। অতঃপর মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন যে, তিনি সাত দিনের মধ্যে পদত্যাগ করছেন। অর্থাৎ বাংলা কংগ্রেস এখন আর সি পি এম-এর সহ-শরিক হতে রাজী না।

লক্ষ করলে দেখা যাবে, ইদানীং দুই নেতা—ফ্রণ্ট সরকারের দুই মাথা—মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রী প্রায় কোনো বিষয়েই একমত ছিলেন না, বা খুব সামান্য বিষয়েই একমত ছিলেন। শান্তিশৃঙ্খলার ব্যাপারে, নিজেদের ক্ষমতার এক্তিয়ার সম্পর্কে, সরকারের মামলা প্রত্যাহারের বিষয়ে, নানা অত্যাচারমূলক ঘটনা নিয়ে, শিল্পে অশান্তি ও কলকারখানার স্থানান্তর বিষয়ে এবং আরও নানা ব্যাপারে দুই প্রধানের মতামত দু রকমের। তাও আবার এই মতামত সম্পূর্ণ বিপরীত। একজন যাকে সম্পূর্ণ কালো বলছেন, অন্যজন তাকেই পরিষ্কার সাদা বলছেন। অবস্থা যখন এই রকম, তখন শরিকী বিবাদের নিষ্পত্তি আশা করা কষ্টকর ছিল।

আমরা দেখেছি, অন্যান্য শরিক, যাঁরা বাংলা কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিশীল—অথচ ঠিক এই মুহূর্তে চূড়ান্ত কোনো ব্যবস্থার পক্ষপাতী নন—তাঁরা অন্যান্য বারের মতন এবারও বাংলা কংগ্রেসের ক্ষোভ কিছুটা প্রশমিত করে একটা কাজ-চালানো মিটমাট করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাংলা কংগ্রেস আর ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে রাজী না। তাঁরা শেষ পথ বেছে নিয়েছেন। এখন কোন্ পথে রাজনীতি মোড় নেবে তা আগে থেকে আন্দাজ করা সম্ভব নয়।

তবে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির ঘোরালো চেহারা কেন্দ্রকেও খানিকটা সচকিত করেছে। বরং বলা ভাল, মাত্র সপ্তাহ কয়েক আগেও কেন্দ্র যতটা নীরব ছিলেন ঠিক ততটা নীরব আর নন। সংসদের অধিবেশন চলছে বলেই যে আমরা কেন্দ্রের কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছি তাও হয়ত নয়, কেন্দ্রও কোনো কোনো ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা ও শান্তির ব্যাপারে কথা বলেছেন, শ্রীচবন স্পষ্টই স্বীকার করেছেন, ওই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটেছে। অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের বিষয়েও তাঁরা ওয়াকি-বহাল। এমন কি শান্তি ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে কেন্দ্র যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে সর্বপ্রকার সাহায্য করতে প্রস্তুত তাও তাঁরা জানিয়েছেন। চারপাশের এই সব লক্ষণ থেকে মনে হয়, যুক্তফ্রণ্টের চারপাশে যে আঁধার ঘনিয়ে এসেছে তা কেটে গিয়ে আলো ফোটা খুব সহজ নয়। আবার এও ঠিক যে, এই মেঘলা কতদিন চলবে তাও নির্দিষ্ট করে বলা যায় না।

প্রসঙ্গত একটা কথা বলা দরকার। বসিরহাট উপনির্বাচনে দুটি সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রথমটি হল, মুসলমান-প্রধান অঞ্চলে প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা। কোনো কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিই অস্বীকার করতে পারবেন না—যা ঘটেছে সেটা অবিশ্বাস্য ঘটনা ! কী করে এটা হল ? তবে কি আবার এখানে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বীজ পুঁতে দেওয়া হয়েছে ? কে দিয়েছে ? দ্বিতীয় হল, আদি কংগ্রেসের নাজেহাল অবস্থা। ক'দিন আগে মেদিনীপুরের এবং সম্প্রতি বসিরহাটের নির্বাচনে দেখা যাচ্ছে আদি কংগ্রেস শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন, তুলনায় নব কংগ্রেস অনেক জনপ্রিয়।

প্রতিবিম্বিত মহিমা

মেদিনীপুর

বসিরহাট

প্রধানমন্ত্রী

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কে আমি যেসব কথা লিখেছি তাতে কিছু পাঠক ক্ষুব্ধ। কয়েকজন লিখেছেন : আপনি অন্ধ প্রধানমন্ত্রী বিদ্বেষী; উনি যা বলেন যা করেন আপনি তারই বিরোধিতা করেন।

বিনীতভাবে বলতে চাই, আমি কারু সম্পর্কেই অন্ধ বিদ্বেষ পোষণ করি না। প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কেও নয়। শ্রীমতী গান্ধী যাই করেন বা বলেন আমি তারই বিরোধিতা করি, একথাও সত্য নয়। আমি শুধু নীতিগতভাবে প্রধানমন্ত্রীর কতকগুলি কাজের সমালোচনা করেছি। কারণ সেগুলি অন্যায় বলে মনে হয়েছে।

ধরুন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রশ্নটা। এই ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী যা করেছেন তাকে কেউ নীতিগতভাবে সমর্থন করতে পারেন? কংগ্রেস পারলামেনটারি বোরড একজনার নাম স্থির করলেন। প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর মনোনয়নপত্রে প্রস্তাবক হিসাবে সইও দিলেন। তারপর সেই প্রার্থীকে হারাবার জন্য তিনিই আদাজল খেয়ে লেগে পড়লেন। এটা কেমন ধরনের রাজনীতি? কেউ একে সমর্থন করবেন?

কংগ্রেস পারলামেনটারি বোরড শ্রীসঞ্জীব রেড্ডিকে প্রার্থী করেছেন বলেই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকেও তাঁকেই সমর্থন করতে হবে, একথা আমি মনে করি না। তিনি বোরডের বৈঠকে রেড্ডির নামে বিরোধিতা করেছিলেন। বাইরেও সে কাজ করার অধিকার নিশ্চয়ই তাঁর ছিল। তিনি পারলামেনটারি বোরডের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে দল থেকে বেরিয়ে আসতে পারতেন অথবা পারলামেনটারি বোরডের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ওয়ারকিং কমিটি এবং

এ আই সি সি-র কাছে আবেদন জানাতে পারতেন। যদি তাঁর সে দাবিমত নিজলিঙ্গাপ্পা ওয়ারকিং কমিটি বা এ আই সি সি ডাকতে রাজি না হতেন তাহলে তখন প্রধানমন্ত্রী দলের কর্মীদের প্রকাশ্যে বলতে পারতেন : দেখ, ওঁরা আমার দাবি মানতে রাজি নন, তাই আমি পারলামেনটারি বোরডের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গিয়ে গিরিকে সমর্থন করছি।

প্রধানমন্ত্রী কিন্তু তা করলেন না। তিনি প্রকাশ্যে বললেন, রেড্ডিই আমাদের প্রার্থী, রেড্ডির মনোনয়নপত্রেও প্রস্তাবক হিসাবে নাম সই করলেন। আবার গোপনে গোপনে গিরির জন্য প্রস্তুতি গড়লেন। যখন দেখলেন সমস্ত প্রস্তুতি সম্পূর্ণ, যখন পাঠকের মনোনয়নও পারটিকে দিয়ে পাশ করানো হয়ে গেল তখন জনসংঘ এবং স্বতন্ত্র পারটির প্রশ্ন তুললেন। শ্রীজগজীবন রামের নাম প্রস্তাব করা, জনাব ফকরুদ্দিন আলিকে দিয়ে চিঠি লেখানো, জনসংঘের সঙ্গে নিজলিঙ্গাপ্পার গোপন ষড়যন্ত্রের প্রশ্ন তোলা—প্রধানমন্ত্রীর এসব কাজের মধ্যেই একটি মাত্র লক্ষ ছিল। সে লক্ষ রেড্ডিকে হারানো। তিনি সুকৌশলে মুসলমান ও হরিজন সেনটিমেনটেও সুড়সুড়ি দিলেন। গোপনে গোপনে বহু অ-কংগ্রেস। দলের সঙ্গে কথা বললেন। এটা কি সং রাজনীতি? এর সমালোচনা করা অন্যায়? দলে থাকবও, দলের সব সুযোগ সুবিধাও নেব এবং সেই দলেরই প্রার্থীকে হারাবো—এই কাজ কেউ সমর্থন করতে পারেন?

প্রধানমন্ত্রী উত্তর প্রদেশে যা করেছেন তার সমালোচনা করেছি। অনেকে তাতে বেজায় চটেছেন। কিন্তু কোনও রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারী ক্ষমতা ব্যবহার করে দিনের পর দিন একটি অঙ্গরাজ্যের সরকারকে উৎখাত করার চেষ্টা করেছেন এর কোনও তুলনা কেউ দিতে পারবেন? শ্রীচন্দ্রভান গুপ্তকে আমি মোটেই আদর্শ রাজনীতিবিদ বা মুখ্যমন্ত্রী মনে করি না। কিন্তু তাঁকে সমর্থন করি না বলেই প্রধানমন্ত্রী সরকারী ক্ষমতা অপব্যবহার করে তাঁর মন্ত্রিসভার পতন ঘটাবার চেষ্টা করলে তারও প্রতিবাদ করব না? লড়াইয়ে শ্রীচন্দ্রভান গুপ্ত হেরে গিয়েছেন এবং প্রধানমন্ত্রীই জিতেছেন। শ্রীচন্দ্রভান গুপ্তও ন্যায়ের পথে থেকে লড়াই চালান নি। কিন্তু তাই বলে কি প্রধানমন্ত্রী যেসব কাজ করেছেন সেগুলিকেও সং কাজ বলে জাহির করতে হবে?

বাঙ্গালোরের পর থেকে প্রধানমন্ত্রী রাজনৈতিক লড়াইয়ে যে প্রচন্ড সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা নেই। এত সাহস তাঁর পিতৃদেবও কোনওদিন দেখাতে পারেন নি। ইন্দিরা আজ যাঁদের বিরুদ্ধে লড়লেন নেহরুও এঁদের অনেককেই পছন্দ করতেন না। কিন্তু তিনিও সব সময় এঁদের চটাতে সাহস পান নি। এঁদের সবাইকে একযোগে খতম করতে উদ্যত হতে ভরসা পাননি। তাঁর মেয়ে কিন্তু সেই কাজ করলেন এবং আপাতত বেশ সাফল্যের সঙ্গেই করলেন।

এর প্রধান কারণ, ইন্দিরার চেয়ে নেহরুর সাহস কম ছিল (অন্তত শেষ দিকে)। এসব কাজে ইন্দিরার দক্ষতাও অনেক বেশি। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী যে প্রচন্ড দক্ষতার সঙ্গে শত্রুদের সঙ্গে লড়াই চালিয়েছেন তা তাঁর অতি বড় সমালোচকও স্বীকার করেন।

ঝুঁকি নেওয়ারও একটা অসাধারণ ক্ষমতা আছে শ্রীমতী গান্ধীর। তাঁর চেয়ে ভাল আর কে জানেন যে এই লড়াইয়ের কোথাও যদি তিনি হেরে যেতেন বা হেরে যান তাহলে পরিণতি কী হবে। জয় সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়েই যে তিনি লড়াইয়ে নেমেছিলেন তেমনও নয়। তিনি হেরেও যেতে পারতেন যে কোনও ধাপে। এবং হেরে গেলেই তাঁকে সব হারাতে হত। কিন্তু তবু তিনি ঝুঁকি নিয়েছিলেন। এবং

এই ঝুঁকি নেওয়ার অভাবনীয় ক্ষমতাই তাঁর জয়ের একটা বড় কারণ।

কিন্তু তাঁর এই বিরাট সাফল্যের আর একটা বড় দিকও আছে। সেটা হলো নীতিজ্ঞানহীনতা। বিবেককে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে তিনি যেভাবে ক্ষমতার লড়াই চালিয়েছেন তারও তুলনা নেই। প্রধানমন্ত্রী এই লড়াইয়ে সাফল্যের জন্য যেসব কাজ করেছেন তার সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ইতিহাস যদি কোনও দিন প্রকাশিত হয় তাহলে তাঁর অতি বড় সমর্থকও লজ্জায় মাথা হেঁট করতে বাধ্য হবেন।

*

প্রধানমন্ত্রী বাইরে মুখে যা বলেন ভেতরে বহু ক্ষেত্রেই তার ঠিক উল্টো কাজটি করেন। যেমন, আমাদের অনেকেরই ধারণা যে দেশের পুঁজিপতিদের সঙ্গে গোপন আঁতাতে চলেন শুধু সিন্ডিকেটের নেতারাই; প্রধানমন্ত্রী এসব ব্যাপারে অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। অন্ততঃ প্রধানমন্ত্রীর কথাবার্তায় তাই মনে হয়। আসল ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই তা নয়। প্রধানমন্ত্রীও কারুর চেয়ে এ ব্যাপারে কম যান না। তিনি কোন্ পুঁজিপতি গোষ্ঠীর সাহায্য কখন কীভাবে কতটা নিয়েছেন দিল্লি, বোম্বাই এবং কলকাতার ব্যবসায়ী মহলে তার অসংখ্য কাহিনী শোনা যায়।

প্রধানমন্ত্রী মুখে বলবেন, আমি গণতন্ত্রের পূজারী। কিন্তু তিনি কেমন গণতন্ত্রের পূজারী আমি তার একটা উদাহরণ দেব।

আমেদাবাদ এবং বোম্বাইয়ে দুই কংগ্রেসের অধিবেশন হল। দুই কংগ্রেসের অধিবেশন হয়ে যাওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী একদিন সকালে বোম্বাইয়ে কয়েকজন সাংবাদিককে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা নব কংগ্রেস অধিবেশন রিপোর্ট করতে বোম্বাই এসেছিলেন। এবং কয়েকজন আমেদাবাদেও গিয়েছিলেন। বৈঠকে বসেই প্রধানমন্ত্রী তাঁদের 'ফায়ার' করতে শুরু করলেন ঃ ভেবেছেন কি আপনারা? আপনারা অনেকে লিখেছেন আমেদাবাদ অধিবেশনে বোম্বাই অধিবেশনের চেয়ে বেশি লোক হয়েছিল। মিথ্যা কথা লেখার একটা সীমা থাকা উচিত! বোম্বাইর তুলনায় আমেদাবাদে অনেক কম লোক হয়েছিল; কিন্তু আপনারা কেউ তা লেখেন নি। আপনারা সব মিথ্যে কথা লিখেছেন।

একজন সাংবাদিক প্রতিবাদ করলেন। বললেন ঃ আপনি যা বলছেন তা ঠিক নয়। আমি দুটো অধিবেশনই দেখেছি। মোটামুটি সব বড় কাগজেই সঠিক বিবরণ বেরিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বাধা দিলেন; আমি ছোটবেলা থেকে মিটিং দেখছি। বোম্বাইর মিটিং-এ আমেদাবাদের মিটিং-এর চেয়ে অনেক বেশি লোক হয়েছিল।

সাংবাদিক বললেন ঃ কিন্তু আপনি যে আমেদাবাদের মিটিং দেখেন নি। আমরা যে দুটোই দেখেছি।

প্রধানমন্ত্রী আরও চটে গেলেন ঃ আমি জানি আপনারা কাদের স্বার্থে রিপোর্ট লেখেন, কার স্বার্থে আমাদের দলকে ছোট করে দেখান। আমি আপনাদের চিনি।...

সকলে থ। আর একজন সাংবাদিক বাধা দিলেন ঃ আপনি কী আমাদের ভয় দেখাতে ডেকেছেন?

প্রধানমন্ত্রী গলার স্বর আরও উচ্চগ্রামে তুলে বললেন ঃ আপনাদের ভয় দেখানোর প্রয়োজন আছে মনে করি না। আমি ডেকে পাঠালে পাঁচ মিনিটের মধ্যে আপনাদের মালিকরা এখানে এসে করজোড়ে দাঁড়াবে। কিন্তু আমি তা করতে চাই না। কারণ আমি একজন গণতন্ত্রী। আমি শুধু আপনাদের সতর্ক করে দিতে চাই। আপনারা মিথ্যা রিপোর্ট দেন।

প্রধানমন্ত্রী কেমন গণতন্ত্রের পূজারী সেইটা বোঝাবার জন্যই এই উদাহরণটা দিলাম। ওই বৈঠকে উপস্থিত তিনজন সাংবাদিকের কাছ থেকে আমি আলাদা আলাদাভাবে এই বিবরণ সংগ্রহ করেছি।

তবে বলে রাখা ভাল প্রধানমন্ত্রীর পার্টিজান নিরপেক্ষতার ও গণতন্ত্রে পূজার যেসব নমুনা, কাহিনী শোনা যায় এটা সে-সব তুলনায় নেহাতই সামান্য!

*

কিন্তু আমরা যে যাই মনে করি প্রধানমন্ত্রী ঠিকই এগিয়ে চলেছেন। অনেকেরই আশংকা ছিল সংসদের বাজেট অধিবেশনে হঠাৎ একটা কিছু ঘটনা ঘটবে। তার আশংকা যে প্রায় নেই ইতিমধ্যেই অনেকে তা বুঝে নিয়েছেন। মন্ত্রীর চাকুরী দেওয়ার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী এমনভাবে এগিয়েছেন যে তাঁর দলের ও নিজে বিক্ষোভদেরও কোনও ভয় আর আপাতত নেই। সরকার রাখার বিচারে বলতে গেলে তিনি চরম সুবিধাবাদী সহযোগী হয়েছেন। কেরলে কম্যুনিস্ট বামপন্থী দলের এখনও তাঁকে সমর্থন করা ছাড়া গতি নেই। এস এস পির মত যাঁরা তাঁকে সমর্থন করতে বাকি না সে দলগুলিও প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সুবিধাজনকভাবেই দ্বিধাবিভক্ত।

শ্রীমতী গান্ধী তাই ধীর পায়ে পদক্ষেপে নিশ্চিত সাফল্যের দিকে এগিয়ে চলেছেন। হঠাৎ কোনও অঘটন না ঘটলে তিনি যে অন্তত ৭২ সন পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবেন সেটা এখন মোটামুটি নিশ্চিত। তারপর ৭২ সনের নির্বাচনের মুখে তাঁকে আবার নতুন করে ভাবতে হবে।

নবারুণ গুপ্ত

প্রধানমন্ত্রী

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কে আমি যেসব কথা লিখেছি তাতে কিছু পাঠক ক্ষুব্ধ। কয়েকজন লিখেছেন : আপনি অন্ধ প্রধানমন্ত্রী বিদ্বেষী; উনি যা বলেন যা করেন আপনি তারই বিরোধিতা করেন।

বিনীতভাবে বলতে চাই, আমি কারু সম্পর্কেই অন্ধ বিদ্বেষ পোষণ করি না। প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কেও নয়। শ্রীমতী গান্ধী যাই করেন বা বলেন আমি তারই বিরোধিতা করি, একথাও সত্য নয়। আমি শুধু নীতিগতভাবে প্রধানমন্ত্রীর কতকগুলি কাজের সমালোচনা করেছি। কারণ সেগুলি অন্যায় বলে মনে হয়েছে।

ধরুন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রশ্নটা। এই ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী যা করেছেন তাকে কেউ নীতিগতভাবে সমর্থন করতে পারেন? কংগ্রেস পারলামেনটারি বোরড একজনার নাম স্থির করলেন। প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর মনোনয়নপত্রে প্রস্তাবক হিসাবে সইও দিলেন। তারপর সেই প্রার্থীকে হারাবার জন্য তিনিই আদানুন খেয়ে লেগে পড়লেন। এটা কেমন ধরনের রাজনীতি? কেউ একে সমর্থন করবেন?

কংগ্রেস পারলামেনটারি বোরড শ্রীসঞ্জীব রেড্ডিকে প্রার্থী করেছেন বলেই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকেও তাঁকেই সমর্থন করতে হবে, একথা আমি মনে করি না। তিনি বোরডের বৈঠকে রেড্ডির নামে বিরোধিতা করেছিলেন। বাইরেও সে কাজ করার অধিকার নিশ্চয়ই তাঁর ছিল। তিনি পারলামেনটারি বোরডের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে দল থেকে বেরিয়ে আসতে পারতেন অথবা পারলামেনটারি বোরডের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ওয়ারকিং কমিটি এবং এ আই সি সি-র কাছে আবেদন জানাতে পারতেন। যদি তাঁর সে দাবিমত নিজলিঙ্গাপ্পা ওয়ারকিং কমিটি বা এ আই সি সি ডাকতে রাজি না হতেন তাহলে তখন প্রধানমন্ত্রী দলের কর্মীদের প্রকাশ্যে বলতে পারতেন : দেখ, ওঁরা আমার দাবি মানতে রাজি নন, তাই আমি পারলামেনটারি বোরডের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গিয়ে গিরিকে সমর্থন করছি।

প্রধানমন্ত্রী কিন্তু তা করলেন না। তিনি প্রকাশ্যে বললেন, রেড্ডিই আমাদের প্রার্থী, রেড্ডির মনোনয়নপত্রেও প্রস্তাবক হিসাবে নাম সই করলেন। আবার গোপনে গোপনে গিরির জন্য প্রস্তুতি গড়লেন। যখন দেখলেন সমস্ত প্রস্তুতি সম্পূর্ণ, যখন পাঠকের মনোনয়নও পারটিকে দিয়ে পাশ করানো হয়ে গেল তখন জনসংঘ এবং স্বতন্ত্র পারটির প্রশ্ন তুললেন। শ্রীজগজীবন রামের নাম প্রস্তাব করা, জনাব ফকরুদ্দিন আলিকে দিয়ে চিঠি লেখানো, জনসংঘের সঙ্গে নিজলিঙ্গাপ্পার গোপন ষড়যন্ত্রের প্রশ্ন তোলা—প্রধানমন্ত্রীর এসব কাজের মধ্যেই একটি মাত্র লক্ষ ছিল। সে লক্ষ রেড্ডিকে হারানো। তিনি সুকৌশলে মুসলমান ও হরিজন সেনটিমেনটেও সুড়সুড়ি দিলেন। গোপনে গোপনে বহু অ-কংগ্রেস দলের সঙ্গে কথা বললেন। এটা কি সৎ রাজনীতি? এর সমালোচনা করা অন্যায়? দলে থাকবও, দলের সব সুযোগ সুবিধাও নেব এবং সেই দলেরই প্রার্থীকে হারাবো—এই কাজ কেউ সমর্থন করতে পারেন?

প্রধানমন্ত্রী উত্তর প্রদেশে যা করেছেন তার সমালোচনা করেছি। অনেকে তাতে বেজায় চটেছেন। কিন্তু কোনও রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারী ক্ষমতা ব্যবহার করে দিনের পর দিন একটি অঙ্গরাজ্যের সরকারকে উৎখাত করার চেষ্টা করেছেন এর কোনও তুলনা কেউ দিতে পারবেন? শ্রীচন্দ্রভান গুপ্তকে আমি মোটেই আদর্শ রাজনীতিবিদ বা মুখ্যমন্ত্রী মনে করি না। কিন্তু তাঁকে সমর্থন করি না বলেই প্রধানমন্ত্রী সরকারী ক্ষমতা অপব্যবহার করে তাঁর মন্ত্রিসভার পতন ঘটাবার চেষ্টা করলে তারও প্রতিবাদ করব না? লড়াইয়ে শ্রীচন্দ্রভান গুপ্ত হেরে গিয়েছেন এবং প্রধানমন্ত্রীই জিতেছেন। শ্রীচন্দ্রভান গুপ্তও ন্যায়ের পথে থেকে লড়াই চালান নি। কিন্তু তাই বলে কি প্রধানমন্ত্রী যেসব কাজ করেছেন সেগুলিকেও সৎ কাজ বলে জাহির করতে হবে?

বাঙ্গালোরের পর থেকে প্রধানমন্ত্রী রাজনৈতিক লড়াইয়ে যে প্রচণ্ড সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা নেই। এত সাহস তাঁর পিতৃদেবও কোনওদিন দেখাতে পারেন নি। ইন্দিরা আজ যাঁদের বিরুদ্ধে লড়লেন নেহরুও এঁদের অনেককেই পছন্দ করতেন না। কিন্তু তিনিও সব সময় এঁদের চটাতে সাহস পান নি। এঁদের সবাইকে একযোগে খতম করতে উদ্যত হতে ভরসা পাননি। তাঁর মেয়ে কিন্তু সেই কাজ করলেন এবং আপাতত বেশ সাফল্যের সঙ্গেই করলেন।

এর প্রধান কারণ, ইন্দিরার চেয়ে নেহরুর সাহস কম ছিল (অন্তত শেষ দিকে)। এসব কাজে ইন্দিরার দক্ষতাও অনেক বেশি। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী যে প্রচণ্ড দক্ষতার সঙ্গে শত্রুদের সঙ্গে লড়াই চালিয়েছেন তা তাঁর অতি বড় সমালোচকও স্বীকার করেন।

ঝুঁকি নেওয়ারও একটা অসাধারণ ক্ষমতা আছে শ্রীমতী গান্ধীর। তাঁর চেয়ে ভাল আর কে জানেন যে এই লড়াইয়ের কোথাও যদি তিনি হেরে যেতেন বা হেরে যান তাহলে পরিণতি কী হবে। জয় সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়েই যে তিনি লড়াইয়ে নেমেছিলেন তেমনও নয়। তিনি হেরেও যেতে পারতেন যে কোনও ধাপে। এবং হেরে গেলেই তাঁকে সব হারাতে হত। কিন্তু তবু তিনি ঝুঁকি নিয়েছিলেন। এবং

এই ঝুঁকি নেওয়ার অভাবনীয় ক্ষমতাই তাঁর জয়ের একটা বড় কারণ।

কিন্তু তাঁর এই বিরাট সাফল্যের আর একটা বড় দিকও আছে। সেটা হলো নীতিজ্ঞানহীনতা। বিবেককে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে তিনি যেভাবে ক্ষমতার লড়াই চালিয়েছেন তারও তুলনা নেই। প্রধানমন্ত্রী এই লড়াইয়ে সাফল্যের জন্য যেসব কাজ করেছেন তার সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ইতিহাস যদি কোনও দিন প্রকাশিত হয় তাহলে তাঁর অতি বড় সমর্থকও লজ্জায় মাথা হেঁট করতে বাধ্য হবেন।

✻

প্রধানমন্ত্রী বাইরে মুখে যা বলেন ভেতরে বহু ক্ষেত্রেই তার ঠিক উল্টো কাজটি করেন। যেমন, আমাদের অনেকেরই ধারণা যে দেশের পুঁজিপতিদের সঙ্গে গোপন আঁতাতে চলেন শুধু সিন্ডিকেটের নেতারাই; প্রধানমন্ত্রী এসব ব্যাপারে অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। অন্তত প্রধানমন্ত্রীর কথাবার্তায় তাই মনে হয়। আসল ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই তা নয়। প্রধানমন্ত্রীও কারুর চেয়ে এ ব্যাপারে কম যান না। তিনি কোন্ পুঁজিপতি গোষ্ঠীর সাহায্য কখন কীভাবে কতটা নিয়েছেন দিল্লী, বোম্বাই এবং কলকাতার ব্যবসায়ী মহলে তার অসংখ্য কাহিনী শোনা যায়।

প্রধানমন্ত্রী মুখে বলবেন, আমি গণতন্ত্রের পূজারী। কিন্তু তিনি কেমন গণতন্ত্রের পূজারী আমি তার একটা উদাহরণ দেব।

আমেদাবাদ এবং বোম্বাইয়ে দুই কংগ্রেসের অধিবেশন হল। দুই কংগ্রেসের অধিবেশন হয়ে যাওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী একদিন সকালে বোম্বাইয়ে কয়েকজন সাংবাদিককে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা নব কংগ্রেস অধিবেশন রিপোর্ট করতে বোম্বাই এসেছিলেন। এরা কয়েকজন আমেদাবাদেও গিয়েছিলেন। বৈঠকে বসেই প্রধানমন্ত্রী তাঁদের 'ফায়ার' করতে শুরু করলেন : ভেবেছেন কি আপনারা? আপনারা অনেকে লিখেছেন আমেদাবাদ অধিবেশনে বোম্বাই অধিবেশনের চেয়ে বেশি লোক হয়েছিল। মিথ্যা কথা লেখার একটা সীমা থাকা উচিত! বোম্বাইর তুলনায় আমেদাবাদে অনেক কম লোক হয়েছিল; কিন্তু আপনারা কেউ তা লেখেন নি। আপনারা সব মিথ্যে কথা লিখেছেন।

একজন সাংবাদিক প্রতিবাদ করলেন। বললেন : আপনি যা বলছেন তা ঠিক নয়। আমি দুটো অধিবেশনই দেখেছি। মোটামুটি সব বড় কাগজেই সঠিক বিবরণ বেরিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বাধা দিলেন : আমি ছোটবেলা থেকে মিটিং দেখছি। বোম্বাইর মিটিং-এ আমেদাবাদের মিটিং-এর চেয়ে অনেক বেশি লোক হয়েছিল।

সাংবাদিক বললেন : কিন্তু আপনি যে আমেদাবাদের মিটিং দেখেন নি। আমরা যে দুটোই দেখেছি।

প্রধানমন্ত্রী আরও চটে গেলেন : আমি জানি আপনারা কাদের স্বার্থে রিপোর্ট লেখেন, কার স্বার্থে আমাদের দলকে ছোট করে দেখান। আমি আপনাদের চিনি।...

সকলে থ। আর একজন সাংবাদিক বাধা দিলেন : আপনি কী আমাদের ভয় দেখাতে ডেকেছেন?

প্রধানমন্ত্রী গলার স্বর আরও উচ্চগ্রামে তুলে বললেন : আপনাদের ভয় দেখানোর প্রয়োজন আছে মনে করি না। আমি ডেকে পাঠালে পাঁচ মিনিটের মধ্যে আপনাদের মালিকরা এখানে এসে করজোড়ে দাঁড়াবে। কিন্তু আমি তা করতে চাই না। কারণ আমি একজন গণতন্ত্রী। আমি শুধু আপনাদের সতর্ক করে দিতে চাই। আপনারা মিথ্যা রিপোর্ট দেন।

প্রধানমন্ত্রী কেমন গণতন্ত্রের পূজারী সেইটা বোঝাবার জন্যই এই উদাহরণটা দিলাম। ওই বৈঠকে উপস্থিত তিনজন সাংবাদিকের কাছ থেকে আমি আলাদা আলাদাভাবে এই বিবরণ সংগ্রহ করেছি।

তবে বলে রাখা ভাল প্রধানমন্ত্রীর পুঁজিবাদ বিরোধিতার বা গণতন্ত্র পূজার যেসব নেপথ্য কাহিনী শোনা যায় এটা সেগুলির তুলনায় নেহাতই সামান্য!

✻

কিন্তু আমরা যে যাই মনে করি প্রধানমন্ত্রী ঠিকই এগিয়ে চলেছেন। অনেকেরই আশংকা ছিল সংসদের বাজেট অধিবেশনে হয়ত একটা কিছু ঘটনা ঘটবে। তার আশংকা যে প্রায় নেই ইতিমধ্যেই অনেকে তা বুঝে গিয়েছেন। মন্ত্রীর চাকুরী দেওয়ার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী এমনভাবে এগিয়েছেন যে তাঁর দলে এ নিয়ে বিস্ফোরণের কোনও ভয় আর আপাতত নেই। সরকার রাখার বিচারে বাজেটটাও তিনি চরম সাফল্যের সঙ্গেই তৈরী করেছেন। কেন্দ্রে কমিউনিস্ট ও বামপন্থী দলের এখনও তাঁকে সমর্থন করা ছাড়া গতি নেই। এস এস পির মত যারা তাঁকে সমর্থন করতে রাজি নন সে দলগুলিও প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সুবিধাজনকভাবেই দ্বিধাবিভক্ত।

শ্রীমতী গান্ধী তাই বীর দর্পে পদক্ষেপে নিশ্চিত সাফল্যের দিকে এগিয়ে চলেছেন। হঠাৎ কোনও দুর্ঘটনা না ঘটলে তিনি যে অন্তত ৭২ সন পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পারবেন সেটা এখন মোটামুটি নিশ্চিত। তারপর ৭২ সনের নির্বাচনের মুখে তাঁকে আবার নতুন করে ভাবতে হবে।

নবারুণ গুপ্ত

দেবরাজ

মন পাবার পণ

দেশবিদেশ ঘুরে বেড়ানো ইদানীং প্রধানমন্ত্রী-রাষ্ট্রপতিদের একটা রেওয়াজ হয়ে উঠেছে। সময়সুবিধে পেলে তাঁরা প্রায়ই বিদেশে একটা চক্কর দিয়ে আসেন—তাঁদের মধ্যে যাঁরা ছোট তাঁরা তো বটেই, যাঁরা বড় তাঁরাও বাদ যান না। ওঁদের বিদেশ সফর নিয়ে কেউ আর মাথা ঘামায় না তাঁদের নিজেদের দেশের লোকেরা ছাড়া। আর তারাও মাথা যে ঠিক ঘামায় তাও বলা চলে না। খবরের কাগজে, বেতারে, টেলিভিসনে ব্যাপারটা পড়ে, শোনে, দেখে, দু'চারটে টিপ্পনীও হয়তো চায়ের টেবিলে কাটে। তার বেশী কদাচিৎ কেউ এগোয়, বিদেশে তো নয়ই, দেশেও। ফরাসী রাষ্ট্রপতির মার্কিন দেশ সফর কিন্তু ছিল এ নিয়মের ব্যতিক্রম। ২৪ ফেব্রুয়ারি তাঁর সফরের প্রথম দিন থেকেই ৩ মার্চ সে সফরের শেষদিন পর্যন্ত কেমন যেন একটা "কী-হয়-কী-হয়"-ভাব ছিল দু দেশেই। তেসরা মার্চ যখন সফর সেরে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরলেন নির্বিঘ্নে পঁপিদু, দু দেশের লোক যেন তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

এত উৎকণ্ঠা কিসের জন্যে? মার্কিন দেশ তো আর দক্ষিণ আমেরিকার কোনও রাষ্ট্র নয় যে গেরিলারা পঁপিদুকে গায়েব করে ফেলবে কিংবা রাষ্ট্রপতিও দক্ষিণ আফ্রিকার নেতাদের মত এমন কালা-বিদ্বেষী নন যে তাঁকে মার্কিনী নিগ্রোরা মেরে বসবে! পঁপিদু কেতাদুরস্ত ভদ্রলোক। তাঁর ওপর চটবার সাধারণ আমেরিকান নাগরিকের কিছু ছিল না, তারা চটেওনি, তাঁর বিরুদ্ধে কালো পতাকা উড়িয়ে, শ্লোগান হেঁকে বিক্ষোভও দেখায়নি। তবুও কিন্তু দুর্ভাবনার কারণ কিছু ছিল বইকি। আর দুর্ভাবনা যে মিথ্যে নয় তাও প্রমাণ হয়েছে। মার্কিন সরকারের ভয় ছিল ইহুদিদের আর ইহুদি সমর্থক রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে। ফরাসীদের ওপর ইহুদিদের এখন বেজায় রাগ। সে রাগ তাদের হয়েছিল দ্য গলের আমলেই। ফ্রান্স থেকে যুদ্ধের সামগ্রী ইস্রায়েলে রপ্তানি করা নিষিদ্ধ করে হুকুম জারি তিনিই করেছিলেন। পঁপিদু সে হুকুম বাতিল তো করেনই, নতুন করে তা জারি করেছেন হালে। তার ফলে ফ্রান্স থেকে মিরাজ বিমান কেনার যে ব্যবস্থা ইস্রায়েল করেছিল তা নাকচ হয়ে গেছে। অথচ ওই ধরনের বিমান তাদের বড্ড দরকার।

পঁপিদু অবশ্য ঠিক দ্য গলের মত ইস্রায়েলের ওপর চটা নন। দ্য গলের আমলে যে সব কড়াকড়ি ছিল ইহুদিদের দেশে অস্ত্রশস্ত্র পাঠাবার সে সব তুলে দেওয়ারই পক্ষপাতী তিনি ছিলেন। আর দিতেনও হয়তো যদি না ইস্রায়েল তাঁকে বোকা বানিয়ে ফ্রান্সের শেরবুর্গ বন্দর থেকে গোটা পাঁচেক গানবোট অর্থাৎ জঙ্গী জাহাজ নিয়ে সরে না পড়তো। কাজটা চুরিও নয়, বাটপাড়িও নয়। জাহাজগুলো ইহুদিরাই বরাত দিয়ে তৈরি করিয়েছিল, দামও দিয়েছিল আগাম। দুদিন সবুর করলে তারা হয়তো ওগুলো দেশে নিয়ে যাবার পরোয়ানা সরকারী দপ্তর থেকেই পেতো। গোল বাধালো তারা খামখা তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে। দুনিয়াতে তারা খুব বাহবা পেলে বটে, চটলো ফ্রান্স। পঁপিদু তখ্খুনি হুকুম দিলেন জঙ্গী বিমান একটাও আর ইস্রায়েলকে দেওয়া চলবে না—আগে থেকে বরাত দেওয়া থাকলেও নয়। ফরাসী মিরাজ বিমানগুলো ইহুদিদের মুঠোর মধ্যে থেকে ফস্কে তো গেলোই উপরন্তু একটা আরব দেশ—লিবিয়া—এক আধটা নয় একশো আটটা সে বিমান পেলো।

ইহুদিরা ঠিক করলে পঁপিদু আমেরিকা সফরে এলে তারা মনের ঝাল মিটিয়ে নেবে। টাকার অভাব তাদের নেই, সংগঠনও তাদের পোক্ত। এমনও শোনা যাচ্ছে বিক্ষোভের পুরো ছকটাই নাকি তৈরি হয়েছিল খাস তেল আভিভে। তবে ছক যেখানেই তৈরি হোক ব্যাপারটা ঠিক হেসে উড়িয়ে দেওয়ার মত হয়নি। পঁপিদু আমেরিকায় পা দেওয়ার পর থেকেই তাঁর পেছনে ধাওয়া করেছে কালো পতাকা আর শ্লোগান-লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে ইহুদিরা। হোয়াইট হাউসের সামনে তারা হই হল্লা করেছে, সাড়ে তিন হাজার লোক ওয়াশিংটন মনুমেণ্টের তলায় জমায়েত হয়ে "পঁপিদু ফিরে যাও" বলে চেঁচিয়েছে। অবস্থা চরমে উঠেছিল চিকাগোতে। সেখানে রীতিমত অপমান সইতে হয়েছে পঁপিদুকে ইহুদিদের হাতে। আমেরিকার যারা আরব-বিদ্বেষী আর ইহুদিভক্ত তাঁরাও রাগ দেখাতে কসুর করেননি। চিকাগোর মেয়র ডালি আর নিউ ইয়র্কের মেয়র লিণ্ডসে দুজনেই ফরাসী রাষ্ট্রপতিকে এড়িয়ে চলেছেন। কংগ্রেসের সদস্যরাও কম যাননি। কংগ্রেসের যে যুক্ত অধিবেশনে পঁপিদু বক্তৃতা করেন তাতে ইচ্ছে করে গরহাজির ছিলেন শখানেক সদস্য।

এতে মুশকিলে পড়েছিলেন সব চেয়ে বেশী প্রেসিডেণ্ট নিক্সন। দ্য গলের সময় ফ্রান্সের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্কটা যেরকম আদায়-কাঁচকলায়-গোছের দাঁড়িয়েছিল তা আর যেন না থাকে এই তিনি চান। নইলে ইউরোপে কল্কে পাওয়া আমেরিকার পক্ষে অসম্ভব হবে। দ্য গল তো মার্কিন দেশকে ইউরোপে একরকম একঘরে করে ফেলেছিলেন—কেবল আমেরিকাকে নয়, ব্রিটেনকেও। তার জন্যেই কমন মার্কেটে নাক গলাতে পারেনি ব্রিটেন, এখনও পারছে না ফরাসীদের আপত্তির জন্যেই। নাটো থেকেও দ্য গল সরে এসেছিলেন, তার সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ রাখেননি। সাবেক চালই এখনও পর্যন্ত বজায় রেখেছেন পঁপিদু। নিক্সন চেয়েছিলেন ফরাসী রাষ্ট্রপতিকে আদর যত্ন করে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাঁর মনটাকে নরম করতে যাতে আমেরিকার সঙ্গে ফ্রান্সের সম্পর্কটা সহজ হয়ে আসে, নাটোতে ফরাসীরা আবার যোগ দেয়, ব্রিটেন ইউরোপের বাজারে ঢুকতে পারে। জনকয়েক মাথা-গরম ইহুদি আর তাদের মুরুব্বিদের গোঁয়ারতুমির জন্যে ফ্রান্সের সঙ্গে আর একটা ঝগড়া পাকাতে তিনি রাজী নন।

নিক্সনের চেষ্টা সফল হয়েছে কি না তার কোনও প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। তবে মার্কিন রাষ্ট্রপতি জানেন সবুরে মেওয়া নাও ফলতে পারে, কিন্তু তাড়াতাড়ি করলে তার ফলার সম্ভাবনা একেবারেই চলে যাবে। চেষ্টার ত্রুটি তিনি তাই করেননি। পঁপিদু পৌঁছতে না পৌঁছতে তাঁর আরামের ব্যবস্থা করেছেন মেরিল্যাণ্ডে প্রেসিডেণ্টের খাস বাগানবাড়ি ছেড়ে দিয়ে তাঁর আর তাঁর দলবলের জন্যে। ফরাসী দূতাবাসে গিয়ে তাঁর সঙ্গে খানাপিনা করেছেন যা মার্কিন রাষ্ট্রপতি কদাচিৎ করেন। নিউ ইয়র্কে ভোজসভায় মেয়র লিণ্ডসে গরহাজির হওয়াতে সেখানে পাঠিয়েছেন খোদ ভাইস প্রেসিডেণ্ট অ্যাগ্নিউকে। চিকাগোর কেলেঙ্কারির পর তিনি প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়েছেন অতিথি রাষ্ট্রপতির কাছে। এতেও যদি পঁপিদুর মন না ভেজে তো তিনি নাচার। বারবার তিনি পঁপিদুকে মনে করে দিয়েছেন ফ্রান্স আমেরিকার সবচেয়ে পুরোনো বন্ধু, সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্র। ফ্রান্স সাহায্য না করলে আমেরিকা স্বাধীনই হয়তো হতে পারতো না। আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলনের ফরাসী সুহৃদ লাফায়েতের আর আমেরিকার আদি যুগের নেতা জেফারসন আর বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের দোহাই দিয়ে তিনি ফ্রান্সের সঙ্গে পুরোনো বন্ধুত্ব ঝালিয়ে নিতে চেয়েছেন। দু একটা মামুলি কথা ছাড়া দেশে ফিরে পঁপিদুও কিছু বলেননি। তবে রাগও তো তিনি করেননি—এটাই তো আশার কথা।

এখন চারদিকে শুভ-বিবাহের পরিস্থিতি। শানাই-টানাই বাজছে, আলো-টালো জ্বলছে, খোঁপায় মালাপরা রঙিন পাখির ঝাঁকের মতো খুশিতে ছলোছল মেয়েদের মন্দ লাগছে না, মোটর থেকে রাজবেশ পরে যে নামল, তাকে দেখে স্মৃতির একটা সুখাবেশও জাগছে কখনো কখনো। কিন্তু ওই পর্যন্তই। বিরস প্রতিক্রিয়াটা টের পাওয়া যাচ্ছে বাজার করতে গিয়ে, দু-একখানা আমন্ত্রণ-পত্র
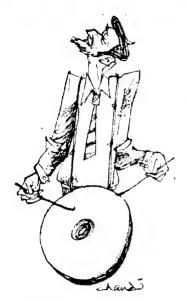
প্রোলেটারিয়েট বিয়ের বাজনা ব্রাস পার্টি

পাওয়ার এবং আনুষঙ্গিক সামাজিকতার দুর্ভাবনায়।

তা হোক, তবু শানাই বাজুক। একদিনের জন্যেও জীবনটা রূপকথা হয়ে উঠুক। তারপরে ক্ষমাহীন রিয়্যালিটি তো আছেই। কলাপাতাগুলো শুকিয়ে হলদে হওয়ার আগেই রাজপুত্রের ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে হবে অফিসের বাস ধরতে; রাজকন্যার চাকরি থাকে ভালোই, নইলে তাকে খাতা-কলম নিয়ে সংসারের বাজেট মেলাতে বসে যেতে হবে।

বিয়ের শানাই বাজতে থাকুক, আমি চোখ বুজে না হয় কিছুক্ষণ আবিষ্ট হতে পারি। অনেক সময় সুরে গুণীর নিপুণ ছোঁয়া লাগে, চমকে ভাবি, রেডিয়োতে বিসমিল্লা খাঁর বাজনা শুনছি না তো? স্মৃতিরা আসে, টুকরো টুকরো ছবি ফোটে, যেসব মুখেরা চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে—তারা চকিতের জন্যে মধুর বেদনা জাগিয়ে দেয়—রবীন্দ্রনাথের 'সানাই' কবিতাটি মনে পড়ে। বাজার থেকে যে

আজ মাছ আনা যায়নি, সে ক্ষোভটাকেও খুব বড়ো … বোধ হয় না আর।

কিন্তু আমার বাড়ির প্রায় পাশেই, একটি দরিদ্র সংসারের বিয়েতে, বস্তির একটি ঘর থেকে—সভ্যতার সব চেয়ে মর্মঘাতী অবদান অ্যামপ্লিফায়ার প্রমুখাৎ যে সুরধ্বনি আমার বন্ধ দরজা-জানলায় এসে আঘাত করছে, তাতে আমার প্রভাতী প্রশান্তি সান্ধ্য-বিশ্রাম আর রাত্রির নিদ্রা বিপর্যস্ত। না—শানাই নয়। কয়েকটি হিন্দী গানের রেকর্ড।

গরিব নিম্নবিত্তের পক্ষে শানাইয়ের বিলাসিতা সম্ভব নয়, তা জানি। কিন্তু আয়োজন যত সামান্যই হোক, বিয়ের একটা ধ্বনিময় পরিবেশ তো তৈরী করতে হবে। কাজেই অল্প খরচে রেকর্ড আর অ্যামপ্লিফায়ারের ব্যবস্থা।

প্রথমেই মনে জিজ্ঞাসা জাগল, দু-চারটে ভালো উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বাজালে কী ক্ষতি হত, আমিও কান পেতে শুনতে পারতুম। কিন্তু না—তা হলে লোকে ভাবত, ওটা গানের জলসা, বিয়ে বাড়ি নয়। কীর্তন কিংবা ভক্তিমূলক গান-টান? সর্বনাশ—ওতো শ্রাদ্ধ-বাসর নয়। রবীন্দ্রসঙ্গীত? নাঃ, ওটা বাড়াবাড়ি—'ওগো বধূ সুন্দরী' পর্যন্ত চলতে পারে বড়জোর। আধুনিক বাংলা গান? কী লাভ, ওগুলির বাংলা গানের যেসব নমুনা মধ্যে মধ্যে কানে আসে, সেগুলো তো হিন্দী গানেরই মনোরম

বুর্জোয়া বিয়ের বাজনা

রূপান্তর ছাড়া কিছুই নয়। সুতরাং নকলের চাইতে ওরিজিন্যালই ভালো।

এই সুরের ধারা যখন আমার বন্ধ দরজা-জানলা দিয়ে ক্রমাগত আমাকে বিচলিত করতে লাগল, তখন আমি নিরুপায় হয়ে গানগুলো বোঝবার প্রয়াসী হলুম। দু-তিনটে গানই ঘুরে-ফিরে বাজছিল। হিন্দী এবং উর্দু সামান্য কিছু জানা আছে, এইরকম একটা কিম্ভুত আত্ম-প্রত্যয় আমার বহুকাল ধরে জাগ্রত ছিল। কিন্তু প্রভূত অভিনিবেশেও গানগুলোর মর্ম বিশেষ হৃদয়ঙ্গম করা গেল না।

ক্যাপিটালিস্ট বিয়ের বাজনা ব্যান্ড পার্টি

একটি নারী এক আধ কলি গেয়ে উঠতে গিয়েই যেন আচমকা কলিক-পেনের ঘা খেয়ে থমকে যাচ্ছেন, তারপরে হাঁপাচ্ছেন। অবিলম্বে কিঞ্চিৎ অদ্ভুত বাজনা বাজছে, কোনো পুরুষ মোটা গলায় কিছু গাইছেন—হয়তো বলছেন, ডাক্তার ডাকব নাকি? এবং তারও পরে 'প্যানডিমোনিয়াম লেট লুজ'—মানে, খুব সম্ভব কোনো চিড়িয়াখানার দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। যাবতীয় জীবজন্তুর ডাক বাজনার তালে তালে (কে জানে, কোন তালে!) ধ্বনিত হচ্ছে, মহিলাটি আবার হাঁপিয়ে উঠে থেমে যাচ্ছেন—বোধ হয় মারাই গেলেন তিনি।

কিংবা এমনও হতে পারে, ইনি ছুটির দিনে পুরুষটির সঙ্গে চিড়িয়াখানা দেখতে গিয়েছিলেন। তারপর গ্যাসট্রিকের যন্ত্রণা—ব্যথায় অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন, আর তাঁর

দশা দেখে চিড়িয়াখানার জীববৃন্দ সমবেদনায় হাহাকার করে উঠেছে।

কিংবা—

কিংবা অনেক কিছুই হতে পারে। যদি ছায়া-ছবির গান হয়, তাহলে এই গানের সঙ্গে ঘটনা-চক্র কোন দিকে যে আবর্তিত হয়েছে, তা জেমস বণ্ডের পক্ষেও আঁচ করা শক্ত। আমি খানিক চেষ্টা করে হাল ছাড়লুম।

তারপরে আমার মনে দার্শনিক নানা ভাবনার উদয় হতে থাকল। সকালের ভাঁয়রো-ভৈরবী-আলাহিয়া বিলাওল, দুপুরের সারং, বিকেলের ম্লান আলোয় মুলতান-বারোয়াঁ, সন্ধ্যার পূরবী, রাত্রির বেহাগ-কানাড়া-মালকোষ, বর্ষার মল্লার, বসন্তের হিন্দোল; অথবা যে-কোনো শুদ্ধ রাগ-রাগিণী আমাদের অনুভূতিতে এক একটি প্রভাব ছড়ায়। শুধু আমরা নই, অনেক বিদেশী সঙ্গীত-পিপাসু—যাঁরা আমাদের এসব সুর প্রথম শোনেন, তাঁরাও এদের মধ্যেকার ভাবটি আশ্চর্যভাবে অনুভব করেন। অর্থাৎ মানবিক-চেতনার কিছু মৌলিক স্পন্দন রয়ে গেছে এইসব সুরের ভেতরে—এরা সর্বজনীন, সর্বদেশীয়।

পূর্ব বাংলার নদীতে শুনেছি ভাটিয়ালী, উত্তর বাংলার ধু-ধু মাঠে রাখালী গান। বিশাল অন্ধকার আড়িয়াল খাঁর বুকে সে সুর মিশেছে এক হয়ে—দিগন্ত হারানো ঢেউ খেলানো। মাঠে সে গান কাঁপতে কাঁপতে চলে গেছে ধানক্ষেত-বেণুবন-পদ্মদীঘি-আদিকালের বটের ওপর দিয়ে। প্রকৃতি আর জীবনের মধ্য থেকে সে গান আপনিই জন্ম নিয়েছে।

আজ ইংলণ্ড থেকে বিট্‌লদের গানে এক মনের চেহারা: পপুলারের অপভ্রংশ 'পপ' গানের অন্তরের রূপ। আমি মিথ্যেই বলে পাচ্ছি। এই নিষ্কাশিতের উৎসবে আর কী সুর আজকে বাজবে এইসব রেকর্ড ছাড়া?

দুদিন পরেই দুঃখ-যন্ত্রণায় মেয়েটির মনের সব সুর হাঁপিয়ে পড়বে; নিরুপায় পৃথিবীর কোথাও ছন্দ থাকবে না। আর কিশোর আসবে। কোন শিশুরা? আমার দরজার সামনে উলঙ্গ-অর্ধউলঙ্গ যারা খেলে বেড়ায়, কোনো ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি যাদের সামনে নেই—কিছু কিছু বয়স্কের প্ররোচনায় যারা অন্ধকারের সৈনিক হতে চলেছে? তারপর তাদের কোলাহল ছাড়া আর কী আছে?

আপাতত এই রেকর্ডটাই বাজবে। কিন্তু ওদেরও কি সানাই বাজাবার দিন আসবে না? সে প্রতিশ্রুতি কি আমরা দিইনি?

প্রতিশ্রুতি বারবার

শিবশম্ভু পাল

বারোয়ারিতলা থেকে সরে যাব। হে আমার বিজন প্রবাস,
অমোঘ দক্ষিণ পাণি বাড়াও এবার দীর্ঘ বিরহের পর
রথের মেলায় গিয়ে কিনে আনব নির্বাচিত তোমার উল্লাস
চারাগাছ, পুঁতে দেব দেশের বাড়িতে, কিছু স্নিগ্ধ অবসর
প্রসারিত কৃষিক্ষেত্র, অনুকূল রোদে-জলে খালি গায়ে যাই
অপ্রাকৃত চাষে, ভাঙা দগ্ধমাটি, অগভীর কুয়োতলা, দাও
তোমার প্রসন্ন স্পর্শ, ভোজনবিলাসে মেতে যথেচ্ছ বেড়াই;
নদীর স্রোতের মধ্যে বহে যায় শ্রেণীহীন মাছের উৎসাহ।

বারবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল নানা ছলে গোপন ঈশ্বর
অথচ কোথাও নেই নির্ভরতা সহযোগ আকাঙ্ক্ষিত হাত
বিনামেঘে অবিরল আদিগন্ত রাজনীতি গ্রাম্য বৃষ্টিপাত,
আমার সন্ধ্যার শেষে গতিবেগ জরাগ্রস্ত তেমনই মন্থর...
বাসস্টপ থেকে নেমে আঁকাবাঁকা অন্ধকার গলি দিয়ে চলা,
আপস প্রস্তাব নিয়ে দু হাত বাড়িয়ে সামনে বারোয়ারিতলা॥

যাও বললেই

তুলসী মুখোপাধ্যায়

যাও বললেই এখন চলে যাওয়া যায়?
স্পষ্টতই সদরে দাঁড়িয়ে ডেকেছিলে
স্পষ্টতই হৃদ্‌পিণ্ডের ছাপ মেরে
বদলাবদলি হল পরস্পরের ছবি
যাও বললেই এখন চলে যাওয়া যায়!

যাও বললেই—
দেয়ালে মারাত্মক পোস্টার পড়ে যাবে
পথে পথে বিক্ষোভ মিছিল, পিকেটিং, হরতালের ডাক
যাও বললেই তোমাকে ঘেরাও করে
কয়েক হাজার ঘুঘু ছুঁড়ে দেব তোমার বাগানে
তোমার দু চোখ থেকে কেড়ে নেব সূর্যের ঘোষণা—
কেননা, ভালোবাসা কি দুদিনের সৌখিন ভ্রমণ?
হৃদ্‌পিণ্ড বদল তো আর গাড়ি বদল নয়!

যাও বললেই এখন আর চলে যাওয়া যায়?

অভিমান / রাগ

তুষার রায়

আমাকে কি এখনো চিনলে না
ভীষণ খাদের বাঁকে আমিই তো বেঁকে
আমিই তো রোদ্দুর শীতের বিকেলে
যদ্দুরেই যাও দেখবে আমি ধ্রুবতারা।

না চিনে অথচ তোমরা ঠাঠা করে হাসো
ভালোবাসো উল্লুকের পঞ্চম পাঠাকে
অভিমানে ছিঁড়ে ফেলি কাঁচা ব্যান্ডেজ
তবুও পাতাল ভেঙে উঠে আসি তেড়ে
ভালোবাসি তোমাদের বড়ো ভালোবাসি।

অথচ হতেল ঘুঘু ঠাঠা করে হাসে
রাজনীতি গুণ্ডার ছুরি হয়ে ওঠে
হুক্কাহুয়া বলে আমি পরাক্রান্ত বাঘ
তাই এই রাগ আমি লুকোইনি খাপে।

এই রাগ নিয়ে আমি এবার লাফাবো
গ্যামাক্সিন দিয়ে মারবো সব ছারপোকা
সব গ্যাস তেজস্ক্রিয়া গিলে নেব, যাতে
এই প্রিয় দেশ যেন পুনর্বার বাসযোগ্য হয়।

জানালা দরোজা বন্ধ তবু

রবীন সুর.

জানালা দরোজা বন্ধ তবু কেউ নাছোড়বান্দা,
দৃশ্যাতীত অস্তিত্বের করাঘাতে কেন প্রতিদিন
অন্ধকার চৈতন্যের হলঘরে ধ্বনি প্রতিধ্বনি,
তিলার্ধ নিস্তার নেই :
এ দেয়াল ও দেয়াল রুদ্ধ কপাটের
সমস্ত ছিটকিনি নড়ে নৈঃশব্দের বিরোধী প্রস্তাবে।

নাড়ি নেই জানালেও বাহিরের ধ্বনিত জিজ্ঞাসা
রেহাই দেবে না
অথচ আশকারা নেই তবুও ভিতর ঘরে যে-কোনো পিপাসা
অতীন্দ্রিয় শব্দ ও সঙ্গীতে
প্রতিমা গড়ার স্বপ্নে ক্রমশই ঘনীভূত স্বেদ আর শ্রম।

বন্ধ দরজায় কেউ কড়া নাড়ে,
অন্তর্গত শব্দগুলি ক্রমান্বয়ে ওলটপালট·
বিলম্বিত প্রসবের অস্থির কুহক
হলঘরের শূন্যতায় আরও বাড়ে, দেয়ালের বদ্ধ চতুষ্কোণে
শ্লোকগুলি অসম্পূর্ণ, অলৌকিক সম্ভাবনা সমুদ্রে শঙ্কায়।

মানুষ রতন

সমরেশ বসু

॥ ২ ॥
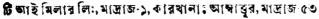
ওরা যখন মড়া নিয়ে ইস্টিশনে এল, সোতে আর জগা বাকী ব্যবস্থা করে রেখেছে। বাকী ব্যবস্থা আর কী, নতুন কোরা কাপড়টা দু-ফালি করে কেটে রেখেছে। ওরা আসতেই, সোতে ইস্টিশনের রোয়াকে ওঠবার সিঁড়ির এক ধারে, এক টুকরো কাপড় পেতে দিল। ত্যাবড়া আগে পুঁটলিটা খুলে রুদ্রাক্ষের মালাটা বুড়োর গলায় পরিয়ে দিল। পুঁটলিটা রাখল শিয়রের দিকে, বালিশের মত করে। তারপরে সবাই মিলে যখন মরা মানুষটাকে শুইয়ে দিল, চারপাশে তখন লোকের ভিড়।

সোতে বলে উঠল, 'ভিড় হটাও ভাই, ভিড় হটাও, মড়া কথা বলে না।'

জগা ওর জায়গায় বসেই ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দিল। ত্যাবড়া আর এক টুকরো নতুন কাপড় দিয়ে বুড়োর শরীর বুক অবধি ঢেকে দিল। পাঁচ-পাপড়ির টগরের মালাটা বুকের ওপর ছড়িয়ে দিল। শুকনো জবা ফুলটা একদলা বাসি রক্তের মত দেখাচ্ছে। মনা ততক্ষণে চিৎকার করে খিস্তি শুরু করে দিয়েছে। যে ওর চাকার হাওয়া খুলেছে, তার মা বোন কারোর বিষয়েই, ওর কোন বাছ বিচার নেই, এই কথাটাই, রাগে আর অনেক কথায় বলে চলেছে। আশেপাশের দোকানদারেরা ব্যাপার দেখে হাসাহাসি রাগারাগি করছে। 'সালারা যমের অরুচি।' 'এদের কি মশাই ধম্মো-জ্ঞান নেই?' 'দেশটা রসাতলে গেল।' 'কীরকম মজার ব্যবসা দেখেছেন।' 'আজ শালাদের ফলার হবে।' কিন্তু পথচারী বা রেলের যাত্রীরা, রাস্তার ধারের দোকানদার না। তাদের কাছে, সব মিলিয়ে এটা একটা নিখুঁত দৃশ্য। একটি মৃতদেহ, নতুন কাপড়ে ঢাকা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, বুকে ফুল, ধূপকাটি জ্বলছে।

পুনিয়া বলে উঠল, 'মড়া পোড়ানোর জন্য কিছু দিয়ে যাবেন দাদারা।'

সোতে ধমক দিয়ে উঠল, 'চুপ কর শালা। সুসমরদা কী বলে দিয়েছিল মনে নেই? "সৎকারের জন্য কিছু সাহায্য করুন দাদা" একথা বলতে হবে।'

ত্যাবড়া পুনিয়াকে খিঁচিয়ে বলল, 'তা না সালা, মড়া পোড়াবার জন্য বলছে।'

মনা তখনো চাকার হাওয়া খুলে

দেওয়ার রাগ সামলাতে পারে নি। নাগাড়ে খিস্তি করে যাচ্ছিল। গণেশ ফটকেরা প্রথম প্রথম হাসছিল। খিস্তিগুলো শুনতে শুনতে ক্রমে ওদের মুখ শক্ত হয়ে উঠছিল। মনা তা-ই চাইছিল। এই সময়ে ত্যাবড়া ধমকে বলল, 'এই মনা, এবার থাম, কুত্তা-দের কামড়াতে যাসনে। সালারা কী জ্বালায় জ্বলছে, জানিস না? যা, চাকার হাওয়া দিয়ে নিয়ে আয়।'

ইতিমধ্যে জগাও চটের থলি ছেড়ে উঠে এল। ত্যাবড়া একটা টাকা আর কিছু খুচরো পয়সা মড়ার বুকের ওপরে রাখল। তাছাড়া পাঁচ দশ কুড়ির মুদ্রা দু চারটে পড়তে আরম্ভ করেছে। এই সময়ে সেপাই এসে দাঁড়াল। মড়ার দিকে তাকাল না, ত্যাবড়াদের দিকে তার নজর। বলল, 'কী হচ্ছে এসব?'

জগা বলল, 'ওই হচ্ছে, মড়ার ওপরে তো কথা নেই।'

সেপাই ভুরু কোঁচকাল, চোখ ছোট করল। বলল, 'খুব বেড়েছিস। যা খুশি তা ই? মড়া পোড়াবার নামে টাকা তুলে মদ মাগীবাজী আর মাংস—?'

সোতে ওর কালো ঠোঁটের ফাঁকে সমস্ত শাদা দাঁতগুলো দেখিয়ে বলল, 'ওটি বলবেন না সেপাই দাদা। নাম করে না, যা করি পুড়িয়ে করি।'

গণেশ কখন এসে দাঁড়িয়েছিল কারোর খেয়াল হয় নি। সে বলে উঠল, 'মিছে কথা বাবু, সালারা মিছে কথা বলছে।'

ওরা শক্ত মুখে ঝটিতি ফিরতে সেপাই নিজেই হাতের ডান্ডা তুলে খেঁকিয়ে উঠল, 'সালা, তোকে মোড়লি মারতে কে বলেছে। তুই যখন এর আগে—।'

পিঠে এক ঘা পড়ার আগেই, গণেশ হাত তুলে চাটুকারের মত হাসল। হাসতে হাসতে দৌড়ে চলে গেল।

ত্যাবড়া সেপাইকে বলল, 'যান না, যান না, নিজের কাজ করুনগে দাদা, দেবতার পুজো হবে।'

সেপাইটা এক গাল হাসল। জগার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'একটা সিগারেট দে।'

সোতে একটা সিগারেট দিল। সেপাই অন্যদিকে গেল। তিনজনেই মুখ বিকৃত করে বলল, 'সালা মড়া দেখলেই সব্বার নোলায় জল।'

ঠিক এ সময়েই শোনা গেল, 'হুঁ হুঁ হুঁ, হেঁ হেঁ হেঁ, কী রে ত্যাবরা, র‍্যালের জায়গায় হালায় মরা শোয়াইছস?'

দেখা গেল, মড়ার মাথার কাছে, রোয়াকের ওপরে জি আর পি-এর সেপাই দাঁড়িয়ে। মুখের হাসিতে রোখশাক নেই, বরং বেশ অমায়িক। সোতে বলে উঠল, 'আবার আর এক সালা।'

ত্যাবড়া বলল, 'আমরা নিমিত্ত দাদা, সব পাবলিকের ব্যাপার। ফেলে দিন, পাবলিককে বলুন।'

সেপাই হ্যা হ্যা করে হেসে বলল, 'আইচ্ছা আইচ্ছা, আইজকাল পাবলিক দেখাইতে শিখছ হালা তোমরা, আঁ।'

জগা যেন বিরক্ত অথচ মেজাজের মাথায় জঘন্য একরকম হাসি হেসে চোখ মারল, বলল, 'কেন দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করছেন, অন্যদিকে যান না।'

সেপাই এবার হি হি করে হাসল। অশক্ত হয়ে চলে যেতে যেতে অনেকটা আদরের স্বরে বলল, 'খুব পাজী হইছস তোরা।'

পুনিয়া রেগে উঠে বলল, 'সালা মড়া-খেকো সব।'

ভর দুপুরে রাস্তাটা একটু ফাঁকা হয়ে আসে। এ সময়ে ট্রেন কম, যাত্রীর আনা-গোনা তেমন নেই। রিকশাচালকেরা কেউ কেউ খেতে গিয়েছে, যাচ্ছেও। মাঘের শেষের দুপুরটা অকালের উত্তাপে ঝাঁঝালো। রোদে বেশ তেজ। থেকে থেকে দক্ষিণা বাতাস দিচ্ছে। এ সময়েই মাছি ওড়ে, ভানে ভান করে, আর দুর্গন্ধ ছড়ায় সবখান থেকে। খোলা নর্দমাগুলো থেকে, আর প্রস্রাবের গন্ধ যেখানে সেখানে। বাতাসে গন্ধ ছড়ায়, ধুলো ওড়ে, আর কুকুরগুলো হঠাৎ হঠাৎ বাতাসে নাক তুলে শুঁকতে শুঁকতে যেন কোন মরার খবর পায়। শোকে মড়াকান্না জুড়ে দেয়।

ত্যাবড়া সোতে জগা আর পুনিয়া, মরা শরীরটার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে। মনা গিয়েছে চাকায় হাওয়া ভরতে। খাওয়ার কথা ওদের মনে নেই। ভাড়া খাটবার চিন্তাও মাথায় নেই। একটা মরা মানুষের শরীর ওদের চোখে মুখে নতুন ঝলক এনে দিয়েছে। থেকে থেকে ওদের চোখ পড়ছে মরা শরীরটার দিকে। আর চারজনেই কী করবে এখন, ঠিক করতে পারছে না। অথচ কেউ কারের দিকে তাকাচ্ছে না। কেউ দু পা হেঁটে চলে যাচ্ছে। রিকশা হাতড়াচ্ছে, না হয় তো হর্নটাই টিপে দিচ্ছে। পুনিয়া একবার বলেই উঠল, 'আজ সালা—!'

কথা শেষ হল না। বাকী তিনজনে ওর দিকে ফিরে তাকাল। পুনিয়া বোতল টানার শব্দ করল। সোতের আবার ডান হাতে ঘড়ি। সেই হাতটা তুলে ও বলল, 'অনেক দিন শরীরের জাম ছাড়ে নি। আজ একটু জাম ছাড়াতে হবে।'

জগা জিজ্ঞেস করল, 'ক বোতল টানবি?'

'তা জানি না। যতক্ষণ হুঁস থাকবে।'

ত্যাবড়া বলল, 'খাওয়ার সালা। তার-পরে তিন দিন গাড়ি চালাতে পারবে না, তখন আমার কাছে খালি টাকার হিসাব চাইবে।'

'সে তো আগেই ভাগাভাগি হয়ে যাবে ওস্তাদ।'

'হলেও, সালা তোমাদের চিনি না? পরে বলবে, ত্যাবড়া সালা বেশি মেরে দিয়েছে।'

এই সময়ে মনা চাকায় হাওয়া দিয়ে ফিরে এল। আর সোতের নজর খাড়া হয়ে উঠল। ইস্টিশনের রোয়াক থেকে নেমে এল সাজগোজ করা তিন যুবতী। সোতে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'গাড়ি নিয়ে আসব দিদিমণি?'

পুনিয়া চিৎকার করে বলল, 'আমি আনছি দিদিমণি।'

দিদিমণিদের একজন সোতেকে বলল, 'তিনজনকে নিতে পারবে?'

সোতে বলল, 'চারজন হলেও পারব দিদিমণি। কোথায় যাবেন?'

'রূবি সিনেমা।'

কোন জবাব না দিয়ে, সোতে রিকশাটা তিনজনের সামনে নিয়ে এল। ইতিমধ্যে এক দিদিমণি প্রায় আঁতকে উঠে বলল, 'ওমা, এটা কী?'

ত্যাবড়া বলল, 'মৃতদেহ দিদিমণি।'

সোতে বলল, 'সৎকারের জন্য কিছু সাহায্য করে যান দিদিমণি।'

তিনজনেই খানিকটা সরে গেল। দুই দিদিমণি ব্যাগ খুলে পয়সা ফেলল। একজন বলল, 'মড়া দেখলে যাত্রা শুভ।' তারপরে রিকশায় কে কার কোলে বসবে, তাই নিয়ে কথা আর হাসির মধ্যে, কোলে বসতে হল সব থেকে ছোটদিদিমণিকে, যার পরনে আঁট পায়জামা আর পাঞ্জাবী। রিকশা চালাবার আগে, সোতে একবার সঙ্গীদের দিকে আড়চোখে তাকাল। হাত তুলে নমস্কার করল মরা মানুষের দিকে চেয়ে। দৌড় দিল রিকশা নিয়ে। পিছন থেকে ত্যাবড়া বলল, 'দুপুরের খাওয়া মিটিয়ে আসিস।'

এই মুহূর্তে সবাই সোতের চলে যাওয়া রিকশার দিকেই তাকিয়েছিল। মনা বলল, 'শালার কপালটা সাঁতা দিদিমণি ছাপা।'

পুনিয়া বলল, 'তাও এই ভর দুপুরে। এখনো ম্যাটিনি শোর কত দেরি।'

ত্যাবড়া বলল, 'কেন বল তো?'

'কেন?' সবাই ওর দিকে তাকাল।

ত্যাবড়া মরা মানুষটাকে দেখিয়ে বলল, 'এর জন্য। মুখখানা দেখেছিস। সেই যাদের ফটো দেখে লোকে পুজো করে, সেইরকম দেখাচ্ছে, তাই না?'

সবাই মরা মুখের দিকে তাকাল। সকলেই যেন অবাক, আবিষ্ট হয়ে কয়েক মুহূর্ত সেই মুখের দিকে চেয়ে রইল। কালো চোখ বোজা শান্ত লম্বাটে একটা মুখ। অল্প অল্প ধূসর গোঁফ দাড়ি। হাঁ মুখটা সামান্য একটু ফাঁক। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা।

জগা বলে উঠল, 'সত্যি! লোকটার কী নাম ছিল কে জানে?'

ত্যাবড়া বলল, 'নাম ছিল জগার বাপ।'

জগা ত্যাবড়ার দিকে তাকাল। মনা আর পুনিয়া হেসে উঠল। মনা বলল, 'ত্যাবড়ার বাপ।'

ত্যাবড়া বলল, 'মনার বাপ।'

জগা বলল, 'পুনিয়ার বাপটা আর বাদ যায় কেন?'

পুনিয়া বলল, 'তা হলে সোতের বাপও নাম হতে পারে।'

ত্যাবড়া বলল, 'হ্যাঁ, আমাদের সকলের বাপ, বাপ চোদ্দপুরুষ। এখন সব তো এখান থেকে, একটু ফারাকে থাক। লোকজন যাবে, দেখবে, তবে তো পয়সা দেবে।'

পয়সা ইতিমধ্যেই কিছু পড়েছে। পড়ছেও। ওরা সবাই একটু সরে গেল। জগা বলল, 'তোর চোখ বটে ত্যাবড়া। পুলের ওপর থেকে দেখতে পেয়েছিলি।'

ত্যাবড়া বলল, 'দেখেই আমার কেমন খটকা লাগল। তখখুনি নেমে কাছে গেলাম। যা ভেবেছি, সনসারের মায়া কাটাবার তালে আছে। তবে এমন জায়গা, যদি রাত্তিরে পটল তুলত তা হলে আর খুঁজে পাওয়া যেত না। শেয়ালকুকুরে খেয়ে ফেলত।'

মনা বলল, 'আর ভাব, কাল থেকে হাবি খেতে খেতে মরল আজ দুপুরে। শালা টাইম জ্ঞান দেখেছিস, রেলগাড়ির মতন।'

'রেলগাড়ি?' বিটকেল মুখ করে জগা বলল, 'রেলগাড়ির মতন টাইমে মরলে তাকে দেখতে হত না। কোন গাড়িটা সালা টাইমে চলে রে?'

ত্যাবড়া বলল, 'যা বলেছিস! আমাদের বাবার টাইম অন্য জিনিস। মুখ দেখেছিস না?'

আবার সবাই মরা মুখটার দিকে ফিরে তাকাল। খানিকক্ষণ পরে সেই দিকে চোখ রেখেই জগা বলল, 'এর আগেরটা প্রায় চার মাস হয়ে গেল, না?'

ত্যাবড়া বলল, 'তা হবে।'

'চার মাস পরে, আবার আজ!'

পুনিয়া গান গেয়ে উঠল, 'কহাঁ গয়ে হো—।'

ত্যাবড়া খেঁকিয়ে উঠল, 'চুপ কর, গিলে আয় না। মনাও খেয়ে আয়। তোরা এলে আমি আর জগা খেতে যাব।'

পুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'চল্ দোস্ত!'

ও আর মনা চলে গেল। জগা তখনো মরা মুখের দিকে চেয়ে। ডাকল, 'ত্যাবড়া শোন্!'

'কী।'

'আট আনা পয়সা দে তো, ও মুখটার ওপরে একবার ঝেঁকে আসি।'

ত্যাবড়া একটা খিস্তি করে বলল, 'এই দেব! খাটবার নাম নেই, তুমি এখন জুয়া মারতে যাবে।'

জগা বলল, 'দে না, দে না। ওবেলা খাটব। এ মুখে আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, তুই আট আনা দে, আধঘণ্টা বাদে তোকে ফেরত দেব।'

মুখের কথায় ত্যাবড়া একটু দুর্বল হল। তবু বলল, 'কেন, তোর সেই ছুঁড়ি কোথায় গেল।'

'সে এখন কোথায় জোড় হয়ে বসে আছে কে জানে। তুই দে না।'

ত্যাবড়া প্যান্টের পাছার পকেট থেকে একটা আধুলি বের করে দিয়ে বলল, 'আধ ঘণ্টা বাদে ফেরত না দিলে কিন্তু দোস্তি থাকবে না বলে দিলাম।'

জগা কথা না বলে আধুলিটা নিয়ে ইস্টিশনের রোয়াকের ওপর উঠে গেল। রোয়াকের এক শেষ প্রান্তে পান বিড়ি সিগারেটের গুমটি ঘরের পিছনে গেল। সেখানে তখন জমজমাট আসর। সামনের দিক থেকে কিছুই দেখা যায় না। পুলিসের সঙ্গে ব্যবস্থা আছে। রিকশাচালকদের খেলার জায়গা এটা। এখন দুটো দলে খেলা হচ্ছে। একদল খেলা দেখছে। জগা দেখল, যমুনা এক পাশে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। হীরা তার ঘাড়ের ওপর একটা পা তুলে দিয়ে খেলা দেখছে।

জগা মনে মনে বলল, 'তা-ই। না হলে এতক্ষণ যমুনার দেখা পাওয়া যেত।' ও গিয়ে হীরার পাশে বসল।

এক পাত্র, দু পাত্র, তিন পাত্র। তারপরে মাতাল যেমন তার নিজস্ব মূর্তি পায়, ছোট মফস্বল শহরটা তেমনি পেতে আরম্ভ করে। বিশেষ করে ইস্টিশনের সামনে শহরের এই সদর অংশে। যতই বেলা গড়িয়ে যায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, ভিড় ততই বাড়তে আরম্ভ করে। ট্রেন মোটরবাসের যাত্রী ছাড়াও কলকারখানার ছুটির ভিড়। সন্ধ্যার ঝোঁকে পতাকা ফেস্টুন সহ মিছিলটা চলে যাবার পরে ভিড়টা যেন নতুন করে বেড়ে উঠল। বাতিগুলোও জ্বলতে আরম্ভ করল।

সোতে ইতিমধ্যে দুটো দিদিমণি টিপ দিয়েছে। পুনিয়া একটা টিপ দিয়েছে। মনা যাত্রী পায় নি।

জগা ত্যাবড়াকে আট আনা পয়সা ফেরত দিয়ে আবার সেখানেই ফিরে গিয়েছে। ত্যাবড়ার নড়াচড়া নেই। ওর লক্ষ, মরা মানুষ। মরা মানুষ শোয়ানো, নতুন কাপড়ের আর মরা শরীরের দিকে। অজস্র পয়সা পড়েছে। ত্যাবড়া কয়েকবার কাপড় তুলে তুলে পয়সাগুলো এক জায়গায় জড়ো করে দিয়েছে। কিছু কিছু তুলে টাকার নোট করে নিয়েছে। চোখে দেখা গুনতিতে যদি ঠিক থেকে থাকে, তবে প্রায় সত্তর টাকার মত উঠেছে। রাত্রি দশটার আগে মড়া গেটানো হবে না। শনিবারের বাজার, মাসের প্রথম সপ্তাহ। ত্যাবড়া মরা মুখের দিকে চেয়ে মনে মনে বলল, 'বাবা, আজ তোমার দিন, আমাদেরও দিন।'

এ সময়েই ঘটনাটা ঘটল। গণেশের দল অনেকক্ষণ থেকেই অনেক রকম টিকাটিপ্পনি কাটছিল। এরা বিশেষ কিছু জবাব দেয় নি। এ বেলার দিকে প্রথম মনার গাড়িতে প্যাসেঞ্জার জুটল, স্বামী-স্ত্রী। দুজনে উঠতে যাবে, গণেশ চেঁচিয়ে বলল, 'ও গাড়িতে উঠবেন না বাবু, ওই মড়াটা ওতে বই করেছে।'

স্বামী-স্ত্রী একবার মড়ার দিকে তাকিয়ে তৎক্ষণাৎ পেছিয়ে গেল। মনার গলায় একটা গর্জন শোনা গেল, 'তবে রে শুয়োরের বাচ্চা!'

তারপরেই ও একটা উড়ন তুবড়ির মত ঝাঁপ দিয়ে পড়ল গণেশের ওপর। গণেশকে নিয়ে একেবারে মাটির ওপরে আছাড়, আর একটি বিরাশি সিক্কা ওজনের ঘুঁষি চোয়ালে, 'সালা, সেই থেকে পেছুতে লেগে আছ, এখন প্যাসেঞ্জার ভাগাচ্ছ?'

গণেশও সমানে খিস্তি চালাচ্ছে আর ওঠবার চেষ্টা করছে। একটা দল হাত দিয়ে সবাইকে আগলে রাখছে আর চেঁচাচ্ছে, 'চালাও হারকিলিস্, এস্‌পার কি উস্‌পার।'

হাততালি আর কান-ফাটানো শিস্ বাজল। গণেশ কায়দা করে মনাকে কাত করে পেটে একটা ঘুঁষি কষাল। মনা গণেশের চুলের মুঠি ধরে মাটিতে ঠুকে চেপে ধরল।

ত্যাবড়া মরা মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'মনাকে অসুরের শক্তি দাও বাবা।'

ঠিক এ সময়েই ফটকে আর নিজেকে সামলাতে পারল না। ও ঝাঁপিয়ে পড়ল গিয়ে মনার ঘাড়ের ওপর। দেখেই পুনিয়া গিয়ে পড়ল ফটকের ওপর। জগারা গুমটির পেছন থেকে খেলা ছেড়ে এসে পড়ল। চারটে মানুষ দলা পাকিয়ে আছাড়িপিছাড়ি মারামারি করছে। হার জিত বোঝার উপায়
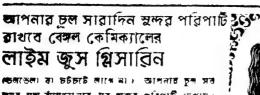
নেই। আর ওদের ঘিরে এক দলের চিৎকার শিস হাসি।

জগা বলল, 'তাবড়া, হুঁশিয়ার, ভাল বুঝে সব এখানে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।'
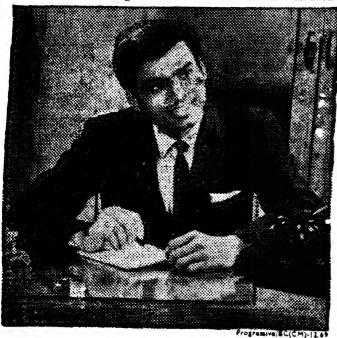
'জানি, সে মতলবও কয়েকজনের আছে। এদিকে দঙ্গল এলেই সব গাড়িটিয়ে ফেলব।'

তারপরেই রিকশার ওপরে ঝপাঝপ লাঠি পেটাবার শব্দ শোনা গেল। চিৎকার শোনা গেল, 'ছটাও সালা, ভাগো হিঁয়াসে।'

সেপাই ছুটে এসে চারজনের ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ল। লাঠি চালাল অন্ধের মত, বাছবিচার না করে। নিজেদের মারামারি একরকম, রাগে আর জেদে সেটা চালিয়ে যাওয়া যায়। বাইরের থেকে লাঠি পড়লেই মুশকিল। প্রথমে দু দিকে ছিটকে গেল পুনিয়া আর ফটকে। তারপরে মুখোমুখি দাঁড়াল গণেশ আর মনা। দুজনেরই গাল কপাল ফোলা, ঠোঁটের কষে রক্ত। দুজনে দুটো মোষের মত রক্ত চোখে দুজনের দিকে তাকিয়ে হাঁপাচ্ছে।

তাবড়ার পাশে জগা বলল, 'গণেশটা ছুবে ঘাড়িয়ে তুলেছে।'

তাবড়া বলল, 'জল্লাদ। এখন কিছু বলিস না। দেখিস, সোতেটা না ক্ষেপে যায়। তুই পুনিয়ার গাড়িতে প্যাসেঞ্জার দুটোকে নিয়ে এই তালে কেটে পড়।'

জগা তা-ই করল। পুনিয়ার গাড়িটা এগিয়ে নিয়ে এসে দুজনের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'চলুন বাবু, আপনাদের আমি পৌঁছে দিচ্ছি। ও শালারা ছোটলোক।'

ভদ্রলোক খুশি হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ চল, সব ডাকাত আর গুণ্ডা।'

স্ত্রীকে নিয়ে ভদ্রলোক উঠে পড়লেন।

সেপাই প্রথমেই গণেশকে ধাক্কা মারল, 'যা শালা ভাগ, এই তল্লাটে থাকবি না।'

গণেশ বলল, 'আমি কি মিছে বলেছি, ওর গাড়িতে—।'

সেপাই ওকে জোরে ধাক্কা মারল, 'চুপ, বাত নেই মাংতা, তুই যা এখান থেকে।'

বলেই পাশে ফটকেকে দেখে ওকেও ধাক্কা মারল। দুজনকেই ধাক্কাতে ধাক্কাতে দূরে নিয়ে গেল। ফিরে এসে মনাকেও ধাক্কা মারল, 'যা, সরে যা এখান থেকে।'

মনা ঠোঁটের কষ থেকে রক্ত মুছতে মুছতে বলল, 'আপনি জানেন না সেপাইদা—।'

'আমি জানতে চাই না। বড়বাবু দেখতে পেলে সব কটাকে হাজতে পুরে দেবে।'

পুনিয়া আগেই সরে গিয়েছে। মনা ওর রিকশার গদীতে উঠে বসল। সোতে এসে ওর মুখের দিকে দেখল। বলল, 'মুখটা জল দিয়ে ধুয়ে আয়। কপালটায় লাগল কী করে।'

মনা কপালে হাত দিয়ে বলল, 'কী জানি, সেপাইটার লাঠি হবে বোধ হয়। একটু মাল টানতে হবে।'

সোতে বলল, 'হবে। আজ অর আমরা কেউ গাড়ি চালাব না। যা, মুখ ধুয়ে আয়।'

মনা ইস্টিশনের দিকে চলে গেল। সোতে তাবড়ার কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, 'কাল আমি গণশা শালাকে একবার দেখব।'

তাবড়া বলল, 'ওর প্যাসেঞ্জার জগাকে দিয়ে পুনিয়ার গাড়িতে তুলে দিয়েছি।'

সোতে হেসে বলল, 'ফার্সকিলাস। তবে গণেশ শালাই বেশী প্যাদানি খেয়েছে। ঠোঁট কপাল দু জায়গায় ফেটে রক্ত বেরিয়ে গেছে। মাথার সামনের দিকে সব চুল তুলে নিয়েছে।'

'সালা।'

দুজনেই হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে মরা মনুষের দিকে তাকাল। মুখ থেকে, কাপড়ে আর সারা শরীরে ছড়ানো পয়সা-

মুখের দিকে। ভ্যাবড়া বলল, 'সব এর জন্য। মড়া হলেই হয় না, এ শালা মড়া দেখেছিস। এখনো মনে হচ্ছে বেঁচে থেকে ঘুমোচ্ছে। আমার মনে হয় লোকটা বোধ হয় সব জানত।'

'কী?'

'ওকে দিয়ে আমাদের একদিন হবে।'

'কী করে বুঝলি?'

'মুখের দিকে চেয়ে দ্যাখ্ না।'

সোতে মরা মুখের দিকে আবার তাকাল। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পরে ও হঠাৎ সরে গেল। বলল, 'দূর, ওসব কথা আমার ভাল লাগছে না। টাকা দে, একটা পাঁট নিয়ে আসি, মনা খাবে।'

ভ্যাবড়া ঘাড় নেড়ে বলল, 'এখন যে যার পকেট থেকে নিয়ে আয়, পরে শোধ হবে।'

সোতে চলে যাচ্ছিল। ভ্যাবড়া ডাকল, 'শোন্, কমল। কেবিনের ব্যাচাদাকে বলবি আড়াই কেজি মাংস রান্না করে দিতে হবে, আর ভাত।'

'আগাম টাকা দিতে হবে না?'

'তুই আমার নাম করে বলবি। আর বলবি নাড়িভুঁড়ি যেন না দেয়।'

'আর মিষ্টি?'

'রাজভোগ কেনা হবে।'

'আর মাল?'

'সে হবে এখন।'

সোতে মুখ শক্ত করে বলল, 'অই সালা তোর দোষ, সব তাতে কত্তামো করবি।'

ভ্যাবড়া ওর লাল দাঁত বের করে হাসল, বলল, 'সালা, যত খুশি টেনো, টেনে পড়ে থেকো, চিতেয় তুলে দিয়ে আসব। আগে সব টাকাটার হিসাব হোক না।'

সোতে আর কথা না বাড়িয়ে চলে গেল। ভ্যাবড়া মরা মুখের দিকে ফিরে তাকাল। পয়সা না গুনেও আধুলি, সিকি, কুড়ি, দশ, পাঁচ, তিন, দুই-এর রেজকি, পায়ের ওপরে, গায়ে ছড়ানো চেহারা দেখেই ও অনুমান করতে পারে, আশির ওপরে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে হিসাবে তিনটে দশ আর একটা পাঁচ টাকার নোট, ওর নিজের পকেটেই আছে। এখন প্রায় সাতটা বাজে। আরো ঘণ্টা তিনেক কম করে সময় হাতে আছে। এখনো লাইনের প্যাসেঞ্জার বিস্তর। দুটো সিনেমা হলে দুটো শো ভাঙবে, আবার শুরু হবে। শনিবার মাসের প্রথম। আর এ যা মুখ, এমন নিপাট ভাল অঘোর ঘুমে নিরীহ মানুষের মত, এ আর দেখতে হবে না। একশো ছাড়িয়ে কুড়ি পঁচিশে নির্ঘাৎ দাঁড়াবে। ভ্যাবড়ার বিশ্বাস, লোকটা ওকে ডেকেছিল। না হলে পোলের ওপর দিয়ে যেতে যেতে নিচে পিছনের দিকে ঝোপের পাশে লাইনের ধারে হঠাৎ কারোর নজর টানে। 'অনেক দিন তো আধপেটা ছাড়া ভাল-মন্দ খাস নি, প্রাণভরে মাল টানিস নি। আমাকে দিয়ে খাস, জানিয়ে দিয়ে গেলাম।' প্রথম দেখে এ কথাই ওর মনে হয়েছিল। গোটা শীতকাল ধরে প্রতিটা ছুটির দিনে গাড়িতে গাড়িতে কত ভদ্রলোকের ছেলেমেয়েরা ফিস্‌টি করতে যায়। গান করতে করতে যায়, টুইস্ট নাচতে নাচতে যায়, মাইকে গান বাজাতে বাজাতে যায়, রাস্তায় মেয়ে দেখলে শিস দেয়, ইশারা করে। এই শহরের ছেলেমেয়েরাই কতরকম করে। কী ফুর্তি!

ভ্যাবড়া ভাবে, তা এও একরকমের ফিস্‌টি। এও একরকমের চাঁদা। সব জাতের মানুষদের তো আর একরকমের হয় না। খাওয়া ফুর্তি হলেই হল, ওটা সবাই বোঝে।

এই সময়ে পুনিয়া এল একদিক থেকে। আর এক দিক থেকে যমুনা। পুনিয়ার মুখটা একদিকে খামচানো। ভ্যাবড়া ওর মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'ওখানে কী হয়েছে?'

পুনিয়ার মুখে এখনো খামচানোর আর

রাগের জ্বালা। বলল, 'ফটকে শালা খ'মচে দিয়েছে। শুয়োরের বাচ্চাকে কাল আমি দেখাব।'

যমুনা মরা মানুষের ধার ঘেঁষে ত্যাবড়ার প্রায় গায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ত্যাবড়া রুক্ষ মুখে ভুরু কুঁচকে তাকাল। যমুনা দেখছে মরা মুখ আর একটু একটু কোমর দুলিয়ে মিটি মিটি হাসছে। কোমর নাচানো মেয়েটার একটা অভ্যাস। মরা মুখের দিকে চোখ রেখেই বলল, 'আগেই বলেছিলাম তোমাদের মতলব ঠিক জানতে পারব। রতন আমাকে দুক্কুরেই বলেছে।'

ত্যাবড়া মুখ খিঁচিয়ে বলল, 'বেশ করেছে। কোথা থেকে তেতে এলি?'

'তেতে আবার আসব কোত্থেকে? আমি তো গুমটির পেছনে সারা দিন শুয়ে কাটালাম গো।'

'কেন, পেট বাঁধিয়েছিস নাকি?'

যমুনা সারা গায়ে ঢেউ দিয়ে খিলখিল করে হাসল। অন্যান্য রিকশাচালকদের শিস আর গলার রকমারি আওয়াজ শোনা গেল। কে যেন ডাকল, 'এই যমুনা, ইদিকে আয়।'

যমুনা সেদিকে তাকাল না। হাসতে হাসতে প্রায় ত্যাবড়ার গায়ে ঢলে পড়ার যোগাড় করল। মরা মানুষের আরো কাছে সরে গেল। ত্যাবড়া খেঁকিয়ে উঠল, 'আরে, আরে, তুই ও মড়া ছুঁস্‌নি, কাট এখান থেকে।'

যমুনা হাসি থামিয়ে ঘাড় কাত করে ত্যাবড়ার দিকে তাকাল। জিজ্ঞেস করল, 'কেন, আমি এ-মড়া ছুঁলে মড়ার জাত যাবে?'

'তা যাবে না? কোত্থেকে কী করে এসেছিস, যা এখান থেকে।'

এবার পুনিয়া হেসে উঠল। ও সরে এসে যমুনার কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে। যমুনাও হাসল। বলল, 'ত্যাওড়াদাদার যে কথা। মাইরি বলছি, কিছু করে আসি নি, পেটও বাঁধে নি। আমার সালা বাঁজা পেট। দেখলে না, ইসটিশনের খুড়িটা, পেট বাঁধিয়ে মরে গেল, আমার কিছু হল না আদ্দিনে। বেঁচেছি বাবা। রতনটা কোথা গেল?'

ত্যাবড়া বলল, 'সেই খোঁজেই এসেছিস। সেজন্যই তো বলছিলাম, কোথা থেকে তেতে এলি।'

এই সময়ে যমুনা পুনিয়ার দিকে ফিরল। পুনিয়ার থামচানো মুখে হাসি। নজর যমুনার জামার বোতামছাড়া অনেকখানি খোলা বুকের দিকে। অন্যদিকে যমুনার দিকে কথা ছোঁড়াছুড়ি শিস চলছিল। যমুনা পুনিয়াকে বলল, 'কী রে মড়া, তুই কী দেখছিস?'

পুনিয়া হেসে বলল, 'মড়া।'

যমুনা বলল, 'সালা, শকুন কোনেকার।'

ও ত্যাবড়ার দিকে ফিরে বলল, 'একটা টাকা দিয়েছি—।'

কথা শেষ করবার আগেই, ত্যাবড়া বলে উঠল, 'রতনের কাছ থেকে রাত্রেই নিয়ে নিস।'

যমুনা মাথা নেড়ে বলল, 'টাকা আমি নেব না, তোমাদের দলে থাকব।'

'ভাগ্‌, মেয়েমানুষটানুষ আমাদের দলে নিই না।'

'আমি ঠিক থাকব।'

বলেই যমুনা মরা মানুষের মাথার কাছে বসে পড়ল। বলল, 'ই কী গো, ধুপকাটি নিবে গেছে কখন, দ্যাখ নি। দাও, সালাইটা দাও।'

বলে, ধুপকাটির বাকসোটা হাতে তুলে নিল। ত্যাবড়া হুমকে উঠল, 'অ্যাই অ্যাই, মড়া ছুঁস নে বলছি।'

যমুনা বলল, 'মড়া ছুঁচ্ছি না বাবা,

সালাইটা দাও না, ধ্পকাটি জেবলে দিচ্ছি।'

ত্যাবড়া দেশলাইটা ছ'ুড়ে দিয়ে বলল, 'সালা, আচ্ছা আপদ জ্টেছে তো।'

রম্না হাসতে হাসতে দেশলাই জনালিয়ে জোড়া কাটি ধরাল। কাদা মাটির ডালায় প'্তে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ত্যাবড়াকে দেশলাই ফিরিয়ে দিয়ে আশে-পাশে তাকিয়ে গলা নামিয়ে বলল, 'যে কথা বলতে এয়েছিলাম, শোন। তোমরা যখন মড়া নিয়ে বেরোবে তখন রাস্তায় তোমাদের আটকাবে।'

'কারা?'

'গণশা ফটকেরা তো থাকবেই, শিবে লাট্রাও ওদের সঙ্গে থাকবে, ছিনতাই করবে টাকা।'

ত্যাবড়ার ম্খ শক্ত হয়ে উঠল। প্নিয়ার সংগে ওর চোখাচোখি হল। প্নিয়ার চোখ ছোট হল, রাগ ফ্টে উঠল। ত্যাবড়া মরা ম্খের দিকে তাকাল, তারপরে হিপ পকেট থেকে টেনে বের করল একটা ছ্রি। ছ্রির ফলাটা খ্লে বোতাম টিপে আটকে যেন মরা মান্ষটাকে দেখাল। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'তোমার জন্য আজ জ্যান্ত

খাব, কিন্তু তোমার দিন, আমাদের দিন পাকা. পাই পয়সা কাউকে ভাগ দেব না।'

পনিয়া বলল, 'সালাদের ঘাড়ে কটা মাথা আছে দেখব।'

যমুনা বলল, 'আমি বলেছি ওদের, তোরা যখন মড়ার পয়সায় খেয়েছিলি রতনদের ভাগ দিয়েছিলি। আমাকে গণশা সালা বললে, "চোপড়া ভেঙে দেব।" আমি বলেছি, "তোর ইয়ে মচড়ে দেব।"'

এই সময়ে মনা আর সোতে এক সঙ্গে এল। সোতের প্যান্টের পকেট দেখেই বোঝা যায়, একটা পাঁট নিয়ে এসেছে। দুজনেই ওদের পাশ ঘেঁষে যাবার সময় সোতে যমুনার পাছায় একটা চাঁটি মারল। যমুনা প্রতিবাদে কোমরটা দুলিয়ে দিল। ওরা দুজনে রিকশা সারির পিছনে নর্দমার ধারে দেওয়াল ঘেঁষে চটের ওপর গিয়ে বসল।

যমুনা আবার ত্যাবড়াকে বলল, 'আমি কিন্তু দলে রইলাম।'

ত্যাবড়া ধমক দিল, 'ভাগ।'

যমুনা হাসতে হাসতে ইস্টিশনের দিকে চলে গেল। সোতে মনার দিকে একবার তাকিয়ে পনিয়াকে বলল, 'শোন পনিয়া, একবার গয়ের ডিপোর কাছে যাস। একটু এগিয়ে গেলে দেখবি, রেললাইনে ঢোকবার গলির মধ্যে একটা বাঁশ পড়ে আছে। ওটা নিয়ে চলে আয়।'

পনিয়ার চোখে মুখে অনিচ্ছা। বলল, 'ওই সালা কার বাঁশ, দেখবে তারপরে তাড়া করবে।'

'আরে কেউ দেখবে না, তুই যা না।'

'আমার সঙ্গে কেউ চলুক।'

'সঙ্গে আবার যাবে কি, তুই দ্যাখ না যেয়ে।'

পনিয়া যাবার আগে বলল, 'তুমি সালা আমাকে দিয়ে বেশি খাটাচ্ছ।'

ত্যাবড়া হেসে বলল, 'দু টুকরো মাংস বেশি খাস।'

পনিয়া হাসল না, চলে গেল।

রাত যত বাড়তে লাগল, ইস্টিশনের সামনেটা একটু ফাঁকা হতে লাগল। তবে শনিবারের রাত। অন্যান্য দিনের তুলনায় এখনো ভিড় কম না। আইন আছে, রাত আটটার পরে দোকান বন্ধ। এ শহরে আইন নেই। দশটা বাজছে, দোকান সবই হাট করে খোলা, আলোয় ফটফট করছে। পকেট যাদের ভরবার তাদের ভরছে।

মাঘের শেষ, কিন্তু দিনের বেলার মতই এখনো দক্ষিণা বাতাস ছাড়ছে। শীত তেমন নেই, বসন্তকালের মত আবহাওয়া। পনিয়া বাঁশটা ঠিক আনতে পেরেছে। সেটাকে দু টুকরো করে কেটে মোটামুটি একটা চালি বানানো হয়েছে। সোতে মনা আর জগাই করেছে। তবে ইতিমধ্যে পাঁচজনে দু পাঁট খেয়েছে। কিন্তু যে কারণে ওরা খায়, খেয়ে বলে, 'শরীরের জাম ছাড়াচ্ছি, এখন সে অবস্থা নয়। যমুনার সংবাদের পরে ভিতরে ভিতরে ওদের এখন লড়াইয়ের প্রস্তুতি। সকলেরই শক্ত মুখ, চোখে চোখে নজর হানা। গণশাদের দলটাকে কাছে পিঠে দেখা যাচ্ছে না। তবে মদ খাওয়ার পরে সবাই একবার মরা মানুষের গায়ে হাত বুলিয়েছে। ত্যাবড়া মরার ঠান্ডা কনকনে চিবুকে হাত দিয়ে চুমকুড়ি শব্দ করে বলেছে, 'আসিরবাদ কর, নিজের বাপকে যেন তোমার মতন এখানে এনে শোয়াতে পারি।'

জগা বলেছে, 'নিজের বাপকে শোয়াবি?'

'শোয়াব না? ওটাই তো একমাত্তর হকের ধন। বাপ পুড়িয়ে আবার একদিন আশ পুরে খাব।'

সোতে বলেছে, 'আর সেইসব ছেরাদ্দ-টেরাদ্দ কী সব বলে, সেসব করবি না?'

'ধু-সালা, ছেরাদ্দ আবার কী। চিতেয় গঙ্গাজল ঢেলে দেব, ওতেই ছেরাদ্দ হয়ে যাবে।' বাকী চারজন চুপ করেছিল খানিকক্ষণ। তারপরে জগা বলেছে, 'আমার তো বাপই মরে গেছে।'

মনা সোতেও তাই বলেছে, ওদের বাপও মরে গেছে। পনিয়া বলেছে, 'আমাকে

সেই বাচ্চা বয়সে ছেড়ে দিয়ে বাপটা যে কোথায় ভেগে গেল, কোনদিন জানতে পারলাম না।'

ত্যাবড়া বলেছে, 'কোথায় যেয়ে মরে গেছে, কারা হয়তো পুড়িয়ে আমাদের মতন খেয়েছে।'

পুনিয়া সামনের মরা মানুষের মুখের দিকে ফিরে তাকিয়েছে। ওর আনমনা চোখে বাবার ঝাপসা মুখটা ভেসে উঠছিল। গালের থামচানো ক্ষতের জায়গাটা কেমন যেন কুঁচকে উঠেছিল।

দু পাঁট মদ খাবার পরে এইসব কথা ওরা বলাবলি করেছে। তারপরে কারখানায় রাত্রি দশটার ভোঁ বেজে যাবার পরে ত্যাবড়া মরা মানুষের শরীর আর কাপড় থেকে সব পয়সা তুলে নিয়ে গুনেল। যা ভেবেছিল তা-ই, প্রায় একশো পনর টাকা উঠেছে। সোতে আর মনাকে ডেকে বলল, 'ভাত আর মাংসের আগাম টাকা দিয়ে আয়। রান্ন-ভোগের হাঁড়িটা ওখানেই জমা করে দিস। মালের বোতলের কথা বলে রেখেছিস?'

সোতে বলল, 'পাঁচ বোতল পুরো।'

ত্যাবড়া বলল, 'খেয়ে যদি পড়ে থাকিস কোন সালাকে টেনে তোলা হবে না।'

মনা বলল, 'তোকেও সালা তুলব না।'

ত্যাবড়া টাকা দিয়ে বলল, 'যা, মিটিয়ে আয়, এবার বেরুব। আমরা মড়াটা বেঁধে ফেলছি।'

জগা বলল, 'সাড়ে দশটার মধ্যে। আরো দুটো গাড়ি দেখে নে।'

ত্যাবড়া বলল, 'যোগাড় যন্তর করতে করতে হয়ে যাবে।'

সোতে মনা চলে গেল। ত্যাবড়া মড়ার কাছে উপড়ে হয়ে খাঁজে ভাঁজে অগলে বগলে হাতকে দেখল, পয়সা আরো পড়ে আছে কী না। তিনটে দশ পয়সা পাওয়া গেল আরো। এ সময়েই একটা হাসির রোল আর মার মার শব্দ শোনা গেল। কোথায় কী ঘটছে বোঝবার আগেই নর্দমায় বড় বড় ইঁট পড়তে লাগল। সেই সঙ্গে একটা জন্তুর গলা ফাটানো চিৎকার। তারপরেই নর্দমার থেকে লাফ দিয়ে উঠল নোংরা মাখা একটা শুয়োর। মরা মানুষটার ওপর দিয়ে মাড়িয়ে চলে গেল। ত্যাবড়া ছিটকে সরে যাবার আগেই ওর গায়েও নর্দমার দুর্গন্ধ ময়লা লেগে গেল।

কয়েকজনের একটা দল, খ্যাল খ্যাল করে হাসতে লাগল।

ত্যাবড়া চিৎকার করে উঠল, 'জগা, মড়াটা আগলে দাঁড়া তো। একটা কুত্তার বাচ্চা এদিকে এলে মাথা দু ফাঁক করে দিব।'

হাসিটা আরো জোর হল। জগা চেঁচিয়ে বলল, 'কুত্তার বাচ্চা দেখছিস কোথায়, সব তো শোরের বাচ্চা। সালাদের [illegible] ঠিক [illegible] সামনে আসুক।'

[illegible] ওর রিকশায় [illegible] সঁটা তুলে [illegible] থেকে একটা [illegible] বের করে [illegible] ধরে চিৎকার করল, 'সব [illegible] চামড়া খুলে নেব।'

এ সময় যমুনা এসে দাঁড়াল। আবার হাততালি হাসির রোল, শিস বেজে উঠল। সেই সঙ্গে টিটকিরি। যমুনাও [illegible] দুলিয়ে শরীর কাঁপিয়ে হাততালি দিয়ে উঠল। চেঁচিয়ে বলল 'কীরে মড়ার দল [illegible] চামড়া উঠিয়ে নেবি?'

ফটিকের গলা শোনা গেল, 'না, তোর ওপরে।'

যমুনা বলল, 'মুরোদ জানা আছে রে। রিকশা চালিয়ে চালিয়ে তো সালা তোদের মাজা ভেঙে গেছে।'

সেপাইটা আবার এগিয়ে এল। এতক্ষণ ছিল না। ডিউটি শেষ করে চলে গিয়েছিল। আবার ফিরে এসেছে। এসেই হাঁক দিল, 'আই, গোলমাল কিসের, ঝামেলা হটাও।'

বলতে বলতে সে মারমুখী হয়ে লাঠি উঁচিয়ে দলবলের দিকে এগিয়ে গেল। ওরা সব এদিক ওদিক দৌড় দিল। ত্যাবড়া নিজের গায়ের ময়লা মোছার আগে, ন্যাকড়া দিয়ে মড়ার শরীর পরিষ্কার করতে লাগল। মরা মানুষটার মুখের ওপরে ময়লার

ধ্যাবড়া, শুয়োরের পায়ের আঁচড়ে গালের খানিকটা চামড়া খসে গিয়েছে।

সেপাইটা ওদের দিকে এগিয়ে এসে সিঁড়ির ধারে যমুনাকে দেখল। দেখলেই বোঝা যায়, নজরের ঠেক কোথায়। দাঁত-চাপা স্বরে বলল, 'তুই এখন এখানে কেন, তোর জায়গায় যা।'

যমুনা হেসে বলল, 'আমার আবার জায়গা কোথায় গো সেপাইদা?'

সেপাই আবার লাঠি তুলে এগোল, 'তোমার জায়গা চেন না হারামজাদি।'

যমুনা 'বাবা গো' বলে ঢঙ করে হেসে দৌড় দিল। আর তখুনি ওর ডানা মুচড়ে ধরল রেলের সেই সেপাই, 'গায়ের উপরে পড়স ক্যান ছেমরি, গতরে পোকা পড়ছে নাকি?'

যমুনা ব্যথার শব্দ করল, 'উঃ উঃ লাগে।'

রিকশাচালক ভিখিরি আর একশ্রেণীর যাত্রীরা হেসে উঠল। ধ্যাবড়ার সামনে শহর থানার সেপাই নিচু হয়ে বলল, 'অনেক রাত হল রে ধ্যাবড়া, এবার বাড়ি যাব।

ধ্যাবড়া তখন মড়ার গালের উঠে যাওয়া চামড়াটা লেপটে দেবার চেষ্টায় ছিল। পকেট থেকে তিনটে টাকা বের করে, সেপাইয়ের হাতে গুঁজে দিল। সেপাই খেঁকিয়ে বলল, 'ভাগ হারামজাদা, আর পাঁচ টাকা দে। দেড় শো টাকা তো তুলেছিস।'

'মাইরি না সেপাইদা, একশোও পুরো হয়নি।'

'ভাগ, পাঁচটা টাকা ছাড়।'

ধ্যাবড়া মনে মনে বলল, 'শুয়োরের বাচ্চা!'

আরো দুটো টাকা দিয়ে দিল। জগা বলল, 'আর এক সালা তাকিয়ে আছে রে।'

ধ্যাবড়া বলল, 'হ্যাঁ, জলের কুমিরটা গেল, এখন ডাঙার বাঘ। রেল সেপাই দেখতে পেয়েছে কত দিলাম?'

'সালা যমুনার গায়ে খামচে ধরে থাপিসের মত এদিকে নজর রেখেছিল। ওকে যা দিয়েছিস, একেও তাই দিতে হবে। বুড়ো মানুষটার দেনা মিটছে।'

ধ্যাবড়া মাথা ঝাঁকিয়ে পকেটে হাত দিল। বলল, 'আমাদের দেনা বল। মানুষটাকে দিয়ে নিজেদের দেনা মেটাচ্ছি।'

ভুরু আর ঠোঁট ফোলা মনা বলল, 'হ্যাঁ, রিকশাওয়ালা হলেই পুলিসের কাছে চোদ্দ পুরুষের দেনা থাকে। আর ইস্টিশনের ধারে হলে রেল পুলিসের কাছেও। মিটিয়ে দে শালা।'

ধ্যাবড়া রতনের হাতে পাঁচটা টাকা দিয়ে দিল। রতন ইস্টিশনের রোয়াকে উঠে রেল সেপাইয়ের হাতে গুঁজে দিল। সেপাই প্যান্টের পকেটে হাত গুঁজে তৃপ্ত হেসে বলল, 'এইবার মরা লইয়া যা গিয়া, গন্ধ ছাড়ব।'

'সোতে ফিসফিসিয়ে বলল, 'এখন যা, পাঁচ টাকা নিয়ে বুড়ি মাগের কাছে যা সালা।'

যমুনা ছাড়া পেয়ে একদিকে পালিয়েছে। বাতাসটা কমের দিকে না, রাতের সংগে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে যেন। কয়েকটা কুকুর দৌড়াদৌড়ি কামড়াকামড়ি খেলা জুড়ে দিয়েছে, আর এখন ফ্যাস ফ্যাস শব্দ করছে, যেন চুপিচুপি কিছু কথা বলছে। পুনিয়া ইঁট নিয়ে তৈরি, মড়ার ঘাড়ের ওপর এসে পড়তে পারে। বলল, 'সালারা হঠাৎ খেলা জুড়ে দিল কেন বল তো?'

সোতে বলল, 'কুত্তার মর্জি, কে বুঝবে।'

যে দুটো গাড়ির অপেক্ষা ছিল, তাও এসে গেল। মড়ার চাদরে আরো কিছু পয়সা পড়ল। দোকানপাটও কয়েকটা বন্ধ হতে আরম্ভ করল। দু একটা আপ ডাউন গাড়ি আছে। তার অনেক দেরি। ত্যাবড়া বলল, 'নে, এবার চালিটা আন, বেঁধে ফেলা যাক।'

সোতে মনা পিছনের দেওয়ালের কাছ থেকে চালিটা নিয়ে এল। সবাই মিলে মরা মানুষটাকে চালিতে তুলল। মুখটা বের করে রেখে, জড়িয়ে বাঁধবার সময় গণেশরা চিৎকার করে 'হরিবোল' দিল, তারপরে লাটুর গলা শোনা গেল, 'পাঁচ ব্যাটার বাপ মরেছে।'

ওরা কেউ সে সবে কান দিল না। ত্যাবড়া বলল, 'পুনিয়া, তোর গাড়িটা নিয়ে চল্। সীটের নিচে, মালের বোতলগুলোন নে। আড়াই শো চানাচুর নিয়ে নে, খালি মুখে চলবে না।'

সোতে বলল, 'তোকে বলতে হবে না, নেওয়া হয়েছে।'

পুনিয়া বলল, 'গাড়ি চালাবে কে?'

'তুই।'

'না, আমি মড়া বইব।'

'আচ্ছা চল্, গাড়ি আমি চালিয়ে যাব।'

গলা শুনে সবাই ফিরে তাকাল। যমুনা কোমর দুলিয়ে হাসছে। ত্যাবড়া জগার মুখের দিকে তাকাল। শক্ত মুখে খেঁকিয়ে উঠল, 'না, মেয়েমানুষ-টানুষ যাবে না।'

জগা সোতে আর মনার দিকে তাকাল। সোতে বলে উঠল, 'যেতে চায়, চলুক না।'

মনা বলল, 'চলুক। একটা টাকা দিয়েছিস তো?'

ও যমুনার দিকে তাকাল। ত্যাবড়া খিঁচিয়ে উঠল, 'অ সালা, তোমরা মাল খেয়ে মেয়ে নিয়ে র‍্যালা করতে যাচ্ছ? আমি ওসবের মধ্যে নেই।'

জগা বলল, 'আরে, র‍্যালা করবার কী আছে! আমরা থাকব আমাদের মনে, ও থাকবে ওর মনে।'

ত্যাবড়া মুখ বিকৃত করে বলল, 'যা খুশি করগে সালা। একটা ভাল মানুষের মড়া, তার সঙ্গে দিন ভর কী না কী করছে ছুঁড়ি।'

যমুনা ঘাড় দুলিয়ে বলল, 'মাইরি আজ সারাদিন কিছু—।'

'চোপ, আমার সামনে থেকে যা।'

যমুনা যেন ভয় পেয়েই একটু সরে গেল। আর পুনিয়া যমুনার দিকে চেয়ে, হেসে বলে উঠল, 'তা হলে আমিই গাড়ি চালাব।'

কথাটা শেষ হবার আগেই ত্যাবড়া ওর কোমরে একটা লাথি কষিয়ে দিল, 'সালা।'

পুনিয়া হেসে, লাফ দিয়ে সরে গেল। নাণ্টা এসে দাঁড়াল ওদের সামনে। নাণ্টাকে দেখেই, ওরা পাঁচজনে নাণ্টার দিকে ফিরে তাকাল। নাণ্টা একবার চালির দিকে দেখল, আর একবার ওদের দিকে।

সোতে জিজ্ঞেস করল, 'কী হল রে নাণ্টা, তুই আবার কেন এখানে?'

নাণ্টা বলল, 'তখন থেকে দেখছি, কেউ কিছু বলছিস না। এখন কেটে পড়বার তালে আছিস। এ কি সেপাইয়ের পাওয়ানা? খেচে দিতে পারিস না?'

ওরা পাঁচজনে চোখাচোখি করল। মনা বলল, 'ইউনিয়নের চাঁদা চাইছিস?'

নাণ্টা বলল, 'তবে কি মাল খাব বলে?'

নাণ্টা ইউনিয়নের লিডার। ত্যাবড়া
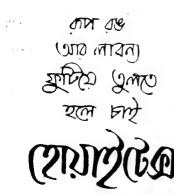
বলল, 'এর আগে তো মড়ার টাকা থেকে চাঁদা নেওয়া হয় নি।'

নান্টা বলল, 'সে হয় নি, হয় নি। ফোকটে পেয়েছ, ইউনিয়নকেও দিতে হবে।'

ত্যাবড়া বলল, 'ফোকটে বলিস না। চাঁদা দিতে বলেছিস দিচ্ছি। কিন্তু কার নামে বিল লিখবি? পাঁচজনের নামে?'

নান্টা ভুরু কুঁচকে বলল, 'তোদের নামে লিখব কেন? মড়ার চাঁদা বলে লিখব।'

ত্যাবড়া বলল, 'সেই ভাল।'

ও পাঁচটা টাকা এগিয়ে দিল। নান্টা খেঁকিয়ে উঠল, 'ভাগ সালা, সেপাইদের পাঁচ টাকা করে ঘুষ দিতে পার, ইউনিয়নকে দশটা টাকা দিতে পার না? নিজেরা তো সালা ডেঁড়েমুষে মাল আর মাংস মারবে।'

মনা হাত তুলে বলল, 'একটা তো দিন, ওসব খোঁটা দিস্ না নান্টা। ত্যাবড়া, কথা বাড়াস নি, মিটিয়ে দে।'

ত্যাবড়া দশটা টাকা নান্টার হাতে তুলে দিল। আর তখনই দক্ষিণ দিকে, একটু দূরে রাস্তার ওপরে দুম্ করে একটা শব্দ হল। আগুন ঝলকে উঠল। তারপরেই একসঙ্গে কতগুলো গলার চিৎকার। নান্টা ছুটে গেল। ওরা পাঁচজন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। জগা বলে উঠল, 'বেজাদের ছিনতাই পার্টির মধ্যে লাগল বোধহয়।'

ওর কথা শেষ হবার আগেই, আবার দুটো পর পর বোম ফাটল। একদল ভয় পাওয়া লোক ইস্টিশনের দিকে ছুটে এল। দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হতে লাগল। দক্ষিণ-দিকের রাস্তাটা হঠাৎ একেবারে অন্ধকারে ডুবে গেল। রাস্তার আলোগুলো নিবে গেল। জগা বলে উঠল, 'যা বলেছিলাম, তা-ই।'

একটু দূরেই অন্ধকারের মধ্যে, কিছু লোকের ছোটাছুটি মারামারি দাঙ্গা হচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে। ব্যাপারটা এদিকে এগিয়ে আসবে কী না, বোঝা যাচ্ছে না। দোকান-ঘরগুলো দু' মিনিটের মধ্যেই বন্ধ হয়ে গেল। ফলে, ইস্টিশনের সামনেটাও অন্ধকার হয়ে এল। ইস্টিশনের রোয়াকের ওপর লোকের ভিড় বাড়তে লাগল। বাজার রাস্তা আর সমস্ত পট্টি থেকে লোকজন এখানেই জড়ো হল। এখন ইস্টিশনই তাদের কাছে একমাত্র নিরাপদ জায়গা।

ত্যাবড়া ভয়ে আর উত্তেজনায় বলে উঠল, 'আমাদের এখুনি কেটে পড়া দরকার।'

সোতে বলল, 'কিন্তু যাবি কোন রাস্তা দিয়ে। আমাদের যাবার রাস্তার ওপরে তো লেগেছে। টাকা আর মড়া, সব ছিনতাই হয়ে যাবে।'

পুনিয়া বলে উঠল, 'চল্, মড়া নিয়ে রেল লাইন দিয়ে কেটে পড়ি।'

জগা ভেংচি কেটে বলল, 'হ্যাঁ, আর পোটেক্‌শন পুলিসে সব কেড়ে নিক।'

ওর কথা শেষ হবার আগেই, আবার কয়েকটা বোম ফাটল। একটা বোম ইস্টিশনের কাছাকাছি। তৎক্ষণাৎ একদল খালি রিকশা নিয়ে, উলটো দিকে ছুটল। ইস্টিশনের রোয়াকের ভিড় ওভারব্রিজের দিকে ছুটল। ত্যাবড়া চিৎকার করে বলল 'ওরা মারামারি করতে করতে এদিকে আসছে, শীগগির চালি ঘাড়ে কর।'

মনা বলে উঠল, 'ওস্তাদ এক কাজ কর। চল মড়া নিয়ে বাজারের পেছু দিয়ে গঙ্গার ধারে চলে যাই। গঙ্গার ধার দিয়ে দিয়ে শ্মশানে যাব।'

... একদম বড় নর্দমার খালটা পে... ... করে। গঙ্গায় জোয়ার থাকলে বুক সমান জল হবে।'

ত্যাবড়া বলে উঠল, 'সে তখন দেখা যাবে। তোল তাড়াতাড়ি।'

এ সময়েই দক্ষিণের অন্ধকার থেকে একটা প্রচণ্ড চিৎকার শোনা গেল। তার-পরেই একজনের গলা শোনা গেল, 'ওরা হেবোকে পেট ফাঁসিয়ে দিয়েছে।'

তারপরেই অনেকগুলো গলার চিৎকার। পরপর কয়েকটা বোম ফাটাতে ফাটাতে ইস্টিশনের দিকে একটা দল আর একটা দলকে হটিয়ে নিয়ে এল। ইস্টিশনের সামনে রাস্তা রোয়াক সব ফাঁকা।

ত্যাবড়া চিৎকার করে বলল, 'সালারা তোল না মড়াটা।'

সোতে মনা জগা ত্যাবড়া মড়া তুলে ঘাড়ে ফেলে উল্টো দিকে দৌড় দিল। যমুনা পুনিয়ার রিকশায় লাফ দিয়ে উঠল। পুনিয়া রিকশা চালিয়ে দিল। এ সময়ে একটা পুলিসের জীপ আর ভ্যান আলো জ্বালিয়ে, উত্তর দিক থেকে ছুটে এল। পুনিয়া বলল, 'যাক, এসে গেছে।'

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

সেদিন কথায় কথায় অপর্ণা দেবী বলছিলেন -
"বাড়ীর গিন্নির সবদিকে নজর রাখতে হয়, তাই নিজের শরীরটা আগে ঠিক রাখা দরকার।"
Cadbury's
Bournvita
the ideal food drink for strength and vigour
450g

কান চেপে ধরি, তবু এক অট্টহাস্য শুনি, প্রশ্নকর্তার সঙ্গে সময়ের স্বর মিশে গেছে। সময় বাবার পাশে একটানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে আমাকে, তাঁর পুঁথির পাশে আমার সৃষ্টিকেও কুঁকড়ে উড়ে যেতে দেখে শিউরে উঠি। এক হাতে মাপা বিচার—সেদিন কি জানতাম আমিও একদিন হব পরিত্যক্ত, জীর্ণ, পুরনো? অমোঘ দৈব—সময় মানে হল মৃত্যু-মৃত্যুতে ভরে-ওঠা এক ভাগাড়।

[খ]

সেই রাত্রে দরজায় ঘন ঘন ঘা দেওয়ার পরে অবাক তোমাকে কী বলেছিলাম? হাঁপাতে হাঁপাতে একটি কথা কি শুধু—"ফিরে এলাম।" তুমি কি বিশ্বাসে অবিশ্বাসে চোখ কচলে কচলে দেখছিলে, নিজেকে চিমটি কেটে পরখ করছিলে, সত্য কিনা? চাপা স্বরে একবার বলেছ বুঝি "উনি কোথায়", উঁকিও দিয়েছ।

"বাবা আসেননি, আমি একা।"

আর তখনই সেই বিস্ফোরণ ঘটল! ঠায় দাঁড়ানো তুমি হঠাৎ এগিয়ে আমাকে ঠাস ঠাস করে কয়েকটা চড় মারলে। "একা এসেছিস, ফিরে এসেছিস, তুই একা—একা!" বলে উঠলে অপ্রীতির কণ্ঠে, তারপর, একী, তোমাকে দেখছি দু হাতে মুখ চেপে পাগলের মত ফুঁপিয়ে উঠতে।

চড়ের দাগ গালে বসে যাচ্ছিল, আমার লাগছিল। মিথ্যে কথা, লাগছিল না। তুমি কাঁদছিলে আমি কাঁদিনি। সহর্ষ সর্বাঙ্গ দিয়ে বরং জানতে পেরেছি সেদিন আমি আমিই, আমি দাদা বা অন্য কারও ডুপ্লিকেট না।

পরদিন সকালে এক ছুটে সেইখানে, যেখানে কলমটাকে ফেলে এসেছিলাম, সেখান থেকে সুধীরমামার ওখানে। না, সেরে ওঠেননি, বিছানায় উঠে বসেছেন শুধু, তবু মুখে কথা নেই একরকম টানতে টানতে তাঁকে নিয়ে এলাম আমাদের বাড়ি।

উঠোনে দাঁড়িয়ে কাঁপছেন সুধীরমামা, আমি মহোৎসাহে নিমপাতা পাড়ছি, সব ঠিক আগের মতন লাগছে, সব ঠিক আগের মত হয়ে যাবে, মাঝের এই কটা দিন যে কিছু না আর মিছে সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছি।

কিন্তু ঠিক আগের মত হল না তো। মা, তুমি কথা বলতে পারছিলে না, সুধীরমামাও না। উনি ফিরে গেলেন, পরদিন আবার অবশ্য এলেন, গেলেন, এলেন। এলেন গেলেন। যাওয়া-আসাটা আগের মত কথায় কথায় ভরে উঠেছিল না।

সে-ও তবু ভালো ছিল। কথা না-বলা। কিন্তু একদিন, বোধ হয় মাসখানেক পরে, কেননা তখন দিনমান জুড়ে আকাশ মেঘে ছেয়ে থাকত, সন্ধ্যায় বিদ্যুৎ অকস্মাৎ হয়ে উঠত, তুমি কী বললে সুধীরমামাকে যে, ও'র মুখটা ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল, কেমন যেন অপ্রস্তুত, আহত, আচমকা কিছুর সঙ্গে যেন ঠোক্কর খেলেন? তুমি বললে, না ও'র চোখে নিজে থেকেই কিছু ধরা পড়ে গেল?

দেখতে পাচ্ছি শুধু ও'র মুখ নয়, স্বরও কখনও বিবর্ণ হয়ে যায়, তখন তো হয়ে গেল, উনি বলছেন, "কী বলছ তুমি আনু?" "এবারও? আবার?" দুর্বোধ্য, সংক্ষিপ্ত, সাংকেতিক কোনও ভাষা।

তুমি দাওয়ায় বসে, দু'হাঁটুর মাঝখানে তোমার মুখ একেবারে ডুবে গেছে, সেই মুখ আস্তে আস্তে তুললে। কেমন অস্থির সুধীরমামা, ছটফট করছেন, ও'র জ্বর ফিরে এল নাকি, তীব্র, ও'র পক্ষে অস্বাভাবিক, স্বরে বলে উঠলেন, "এ আমি ভাবতেও পারি না, ছি-ছি-ছি!"

এই বিনম্র তুমি, হঠাৎ জ্বলে উঠলে কেন, দেখতে পাচ্ছি তোমার দু'টি চোখ তখন আর চোখ না, তেল-ফুরনো কোনও প্রদীপ, দপদপ জ্বলছে, সব জোর দিয়ে মরীয়া হয়ে সব সংকোচ ঝেড়ে ফেলে তুমি সহসা একটা চিৎকার হয়ে গেলে—"তোমার—তোমার কী?"

"আমার?" মাথা নীচু সুধীরমামার, থরথর হাত-পা নাড়ছেন, যেন লজ্জা এক-টুকরো কাপড়, তুমি এইমাত্র তোমারটা

জড়িয়ে দিলে ও'র গায়ে, সেই কাপড় জড়িয়ে গেল ও'র মুখে, চোখ নাক থেকে সেটা সরাতে সরাতে বললেন "আমার? না, আমার কী আর। কিছু না। কিন্তু ভেবে দেখো এটা তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা কিনা—" সুধীরমামা এখানে দাদার নাম করলেন, রোগা মানুষটা এখন হাঁপাচ্ছেন, ও'কে এত রেগে যেতে কখনও দেখিনি, সতত শান্ত চোখ দুটো যেন ছোট্ট হয়ে গেছে, রাগলে লোকে দেখতে হঠাৎ বিশ্রী, রাগ বড়ো বিশ্রী, মা, তুমিও এক্ষুনি রেগে উঠবে নাকি, পায়ে পড়ি, না, তোমার চোখ দুটো দপ করে উঠেই মরা-মরা ছাই হয়ে উড়ছে কেন, দুটো বিড়াল কি সময় বুঝে ঠিক এখনই বাড়ির পিছনে ঝগড়া করছে—আঃ। এই তো একটু আগে কেমন অপরাধী, লাজুক-লাজুক দেখাচ্ছিলাম তোমায়, সেই লজ্জাই কি বেপরোয়া ভঙ্গি হয়ে গেল নাকি, এত চট করে যায়?

"বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা উঠছে কী-করে, বলেছি তো, একটা ভুল, একটা জবরদস্তি—"

"শুধু জবরদস্তি?" সুধীরমামা কেমন-

গলায় বলছেন, রোগা, রোগা, আর রাগী, ও'র হাতের লাঠিটার মতই শুকনো যেন একটা মরা ডাল, সুধীরমামা দেখতে এত খারাপ যেন সেদিনই প্রথম বুঝলাম।

—"তোমাকে একটু আলাদা ভেবেছিলাম আনু।" গলায় যখন রাগ-রাগ ভাব, চোখ দুটো তখনই দ্যাখ, কী করুণ, পৃথিবীর মত দুঃখী, মেঘ যেন ওখানে জমছে। ও'র রাগটা কেড়ে নিয়ে তুমি বললে, "আমি যা আমি তা-ই।"

সুধীরমামা আর দাঁড়ালেন না।

কিছু বুঝলাম না। কিছু বুঝলাম না তাই দুজনের কারও দিকেই যেতে পারছিলাম না, আমার হয়েছিল সেই মুশকিল। আমি কার দিকে?

[গ]

কুয়োতলায় গিয়ে চোখে-মুখে জল ঢেলে এসে, এখন অনেক শান্ত, কিন্তু সেদিনই তোমাকে খুব শুকনো দেখলাম মা, চোখে কালি। কী রোগা হয়ে গেছ, গালের হাড় তোমার এত উঁচু কখনও ছিল না তো।

একটু টলছিলে। দাওয়ায় ঠেস দিয়ে রাখা ছিল একটা গোটানো মাদুরে, সেটা সেটা দাওয়াতেই বিছিয়ে শুয়ে পড়লে, মুখ অল্প একটু 'হাঁ', এইটুকুতেই হাঁপাচ্ছ যেন, তোমার চোখের কোণে রক্তের একটু ছিটে নেই, আমি ছুটে এসে ধপ করে তোমার পাশে বসলাম। সেঁতিয়ে রয়েছে, তবু সে কৌতূহলটা কুরে কুরে খাচ্ছে, তাকে ধরে রাখতে পারছিলাম না।

"তুই আজ চাল ধুয়ে আনতে পারবি?" তুমি আস্তে আস্তে বললে।

"পারব, মা।"

"আমিই ফুটিয়ে দেব। একটু ঘুমিয়ে নিয়ে উঠে, তারপর। আলুভাতে, কুমড়ো ভাতে, আর বেগুন-পোড়া। খেতে পারবি না?"

বললাম, "খু-উ-ব।"

"লক্ষ্মী ছেলে। না-হয় ডাল ভাতেও দিয়ে দেব।" তুমি হাত বাড়িয়ে আমার কপাল ছুঁলে, ঠান্ডা, কিন্তু সেই নরম, স্নিগ্ধ হাত—ঝুঁকে পড়ে বললাম, "সুধীরমামা কী বলছিলেন মা? কী যেন বিশ্বাস-টিশ্বাস—"

"তুই শুনেছিস?"

"এখানেই তো ছিলাম।"

একটু কি কেঁপে উঠলো, তুমি, না তোমার ঠোঁট দুটি? কী যেন বলতে পারছ না? না, বলছ। চোখ বুজে আমাকে বলছ, "আমার অসুখ কিনা, তাই বলছিল।"

অসুখ ঠিক, কিন্তু কারও অসুখ করার সঙ্গে বিশ্বাস ভাঙার-টাঙার সম্পর্ক কী, তাই ভাবছিলাম।

"আমার খুব অসুখ, জানিস," আরও বড় অসুখ হবে। সারাদিন গলা জ্বলে, অম্বল, গা গুলোয়, মাথা ঘোরে—"

"তুমি একটু ঘুমোও মা। আমি এক্ষুনি চাল ধুয়ে আনছি।"

"দাঁড়া, বেছে দিই।" তুমি উঠে বসলে, তখনও শ্বাস টানছ, চোখ নামিয়ে থামানো কথাটার খেই টেনে বলছ, "বিশ্বাস! বিশ্বাস ভাঙা-টাঙার কথা ওঠে কী করে? ও ওইরকম বলে, তোর সুধীরমামা। বরাবর মুখচোরা, কিছু কোনও দিন বলল না, করল না, আজ এখন মুখ ফুটেছে।"

কাকে শোনাচ্ছ তুমি, আমাকে না নিজেকে?

"মানে হয় না, মানে হয় না" (মা, এ-সব কথার অর্থ কী) "ওরা সবাই এমনি অবুঝ, হিংসুক—যেমন তোর বাবা, তেমনি ওই সুধীরমামা।"

তুমি বলছ কিনা, তাই আমারও সাহস বাড়ছে, জিজ্ঞাসা করতে ভরসা পাচ্ছি। "কিন্তু সুধীরমামা হঠাৎ যেন কেমন হয়ে গেলেন, চট করে চলে গেলেন, নিমের রস-টসও কিছু খাননি।"

"একটু জল এনে দে।" আনলাম। খেয়ে ঠোঁট মুছলে। দেখলাম। তারপরই হঠাৎ—"জানিস তোর দাদা ফিরে আসছে।"

কী—কী—কী, আমার কান, আমার না অন্য কারও, তোমার গলাই তো, না অন্য কারও—কী শুনছি, কী শুনছি আমি। অসম্ভব একটা ঘোষণা করছ, কিন্তু করছই যদি, মা, তোমার চোখ হাতের ডালায় নামানো কেন।

"আসছে।" তুমি বললে আর-একবার। এবার বিশ্বাসের সুরে।

"আর যাবে না?"

"তাই যেন হয়, প্রার্থনা কর।" উপরের দিকে চেয়ে তুমিই যেন একটিবার প্রার্থনা করে নিলে, "যেন আর না যায়। যেন ভালোভাবে আসতে পারে।"

আর কিছু শোনার দরকার নেই তো, আমি একটা লাফ দিয়ে এক ছুটে ঘরে, দাঁড়ালাম দাদার ফটোটা যেখানে। খুব মজা পেয়ে হাসছিল সে, যেন ওই ফ্রেমটার মধ্যে আটকে থাকতে চাইছে না, পারলে এখুনি নেমে আসে। এসে আমি কী করব ঠিক করতে পারছি না, গলা জড়িয়ে ধরব, যেমন ধরতাম, পায়ে ভর দিয়ে একটু উঁচু হয়ে ওর কানে মুখ রেখে এ-কথাও কি বলব যে, "তবে ওরা যে বলত তুই স্বর্গে আছিস, দেবতাদের সঙ্গে, তুইও নাকি দেবতা হয়ে গেছিস?"

"কে বলত, মা, আর সুধীরমামা?" দাদার ঠোঁট-নড়ার যেন শুনতে পাচ্ছি "ওরা ভুল বলত।"

"বলকু গো।" রুদ্ধশ্বাসে, চাপা খুশিতে, ওকে ভরসা দিতে, বলেই ফেললাম কথাটা "দাদা, তুই দেবতা ছিলি, আবার মানুষ হবি।"

আর, সারাদিন উন্মনা কেটে যাওয়ার পর সেদিন রাত্রে? তুমি একটু আগেই শুয়ে পড়েছ, আমি বিছানায় লাফ দিয়ে প্রথমেই কী করব কী বলব ভেবে পাচ্ছি না, হঠাৎ মুখ গুঁজে দিলাম তোমার বুকে, কেন না তোমার শরীর খারাপ, এখন আর কোনও কথা না, দাদা-বাবা-মামা, কারও বিষয়ে কোনও আলোচনা না, তোমাকে জড়িয়ে শুধু, তোমাকে জড়িয়ে তবু, একটাই প্রশ্ন করতে পারলাম, অদ্ভুত সেই প্রশ্ন—"মা, দাদা এলে তোমার কোন্ দিকটাতে শোবে?"

[৬]

বাবার চিঠি এল, হঠাৎ একদিন একটা পোসটকার্ড—এবার আমার নামে। আমার নাম-লেখা, আমাকে লেখা সেই প্রথম চিঠি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এপিঠ-ওপিঠ, কতবার যে পড়লাম। তোমাকেও দিয়েছিলাম, তুমি চোখ বুলিয়ে একবার দেখলে শুধু, পাশে রেখে দিলে। তারিখের উপরে ছিল "জব্বলপুর"—সে কতদূর, ম্যাপে মিলিয়ে নিলাম, আঙুল দেখিয়ে তোমাকে বুঝিয়ে দিলাম, "দ্যাখো, এইখানে।" চিঠিতে বিশেষ কিছু ছিল না, নতুন কোনও পালা-টালা লিখছেন কিনা সে-সব কথা একদম না, কেবল কেমন আছি, তোমার শরীর কেমন, ভালো হয়ে থেকো, মানুষ হতে হবে, এই-সব। নর্মদা নদী, মার্বেল রক নিয়েও একটা লাইন ছিল বোধহয়, কিংবা আমি ভূগোলের বইয়ে যা পড়েছিলাম তখন-তখন, তার সঙ্গেও মিলিয়ে ফেলতে পারি। স্মৃতি যেন আলাদা-আলাদা বাটিতে অনেক কিছু রাখে, অনেক-কিছু আবার সিরাপ-বরফ-জলের মত একই গেলাসে ঢেলে মেলায় কখন-কখনও।

চিঠিতে কিন্তু ঠিকানা ছিল না, চিঠি দিতে হলে কোথায় দেব, তার কোনও উল্লেখ না। ওইটাতেই একটু খচখচ করছিল, প্রথম চিঠি পেলাম অথচ তার উত্তর দেবার উপায় নেই, বাবা যেন কেমন! আবার একটু দূরে-দূরে পর-পর লাগছিল ওঁকে, নিজের খবর পাঠিয়েই খুশি, আমরা কী-রকম আছি সে-সব যেন জানবার দরকার নেই, ধরো যদি মরে যাই, দাদা যেমন গিয়েছিল, ওঁকে জানানো যাবে না, জানার জন্যে উনিও এমন-কিছু উতলা থাকছেন না—নিশ্চিন্ত, নির্বিকার। মনে মনে সাব্যস্ত করলাম, তুমিই ঠিক, ওঁর সম্পর্কে যা বলতে তা একেবারে খাঁটি—বাবা নিষ্ঠুর, ভীষণ নিষ্ঠুর, আর স্বার্থপর।

এরই মধ্যে বুড়ো ডাক্তার একদিন দেখে গেল, তোমার বুক-পেট ঠোকা-ঠোকা দিয়ে বলল, "এখনও অনেক দেরি আছে।" ওই বুকে মাথা পেতে, ওই পেটে কান পেতে, যখনই তুমি মেঝেয়-শোওয়া, কাঁথ-টিল শিথিল, তখনই ওই পেটে কান পেতে আমি কী-জানি কী শুনতে চাই। শুনি। দাদা আর ফটোতে নেই তো, ওইখানে আছে।

ও-পাড়ার বুড়ি দাই একদিন খবর নিয়ে গেল। কোমরে হাত রেখে, একটু বাঁকা হয়ে, সে তেরছা চোখে তোমাকে দেখল। মিশি-মেশানো থুথু ফেলে বলল, "দূ-উ-র! এ-তো মোটে দু'-আড়াই মাস দেখছি। এতেই এত কাবু, বাছা, তুমি বিয়োবে কী করে?"

আমি ওর পিছু নিলাম। পুকুর পাড়ে ধরে ফেলে বললাম, "কত দেরি?"

ভুরু কুঁচকে সে বলল, "কিসের?"

"মানে, মানে" ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছিলাম না, হাঁপাচ্ছিলাম।

"তোর মা কবে বিয়োবে, তাই জানতে চাইছিস?" কী বিশ্রী কথার ধাঁচ বুড়িটার. শব্দটা ওর মুখের থিশি-মেশানো থুথুর মতো, সেই দিনই দুদুবার শুনলাম। বুড়ি বলল, "তা বাকী আছে অন্তত পাক্কা সাত মাস, কি সাড়ে ছয় মাস তো বটেই।"

"তুমি যেন হাত গুনতে জানো।"

"পেত্যয় হচ্ছে না? আমি জানি না? কত বউঝি এই হাতে পার করলাম, তোকেও খালাস করেছিল কে রে? আমি।" নিজের বুকে বুড়ি আঙুল দিয়ে দেখাল। "মাগীরা তো পেটে ধরেই খালাস, তোদের খালাস করি আমি।"

রাগে অন্ধ হয়ে যাচ্ছিলাম আমি, খারাপ সব গালাগালি শুনে, যা, মা, তোমাকেও স্পর্শ করছে। বললাম, জোরে মাথা নাড়িয়ে, "না অত্তো দেরি নেই, কক্ষনো নেই।"

"তর সইছে না বুঝি! দেখি দেখি, ব্যাটার মুখখানা দেখি!" বুড়ি যেন ঠেকার দিয়ে বলল, "খাটা, হেদিয়ে মরছিস কেন, সে-শত্তুরটা আসছে, এলে যে সে তোরটাতে ভাগ বসাবে!"

ওকে মনে মনে তখন আমিও একটা খারাপ গালাগালি দিলাম। ও জানে না যে দাদা আসছে। মারব, মারব ওকে আমি। একটা ঢিল তুললাম।

হাত তুলে বুড়ি মাথা বাঁচাল, যেতে যেতে মুখ ঘুরিয়ে বলে গেল, "তোর মা কাঁচা-পেয়ারাটি, রোজ-রোজ পাতাতা-পাতি তুলে এনে খেতে দিবি, বুঝলি? থু-থু।"

[৬]

পাকা সাত মাস কি সাড়ে ছয়, তার মানে পুজো-টুজো পেরিয়ে সেই শীতকাল? একটু ছমছম করে উঠল গা-টা, দাদা যে গিয়েছিল, সে-ও তো সেই শীতকালেই? শীতে গিয়েছিল, শীতেই আসছে। দাদা-ই যে ফিরছে, আমি তখন একেবারে নিঃসংশয় হলাম।

ডাক্তারখানা থেকে মাঝে মাঝে মিকশ্চার আনি, যে-দিন তুমি একটু বেশি কাবু হয়ে পড়ো, সেদিন। গাঙ্গুলীবাড়ির পিসীমা সেদিন এসে রান্না করে দিয়ে যান। আঁচলে ঢেকে নিয়ে আসেন আচার। তুমি খাও, আমি খাই, তুমিই বারে বারে, বেশি-বেশি। সবাই আসছেন, কিন্তু সুধীরমামা কোথায়, তিনি আসা বন্ধ করেছেন কেন।

বাবা গেলেন, তবু, কই, সব ঠিক আগের মত হল না?

একটু ভালো থাকলেই কাঁথা নিয়ে বসতে তুমি, আমার জন্যে নয়, সে-আমি বুঝেছিলাম, আমাকে অতটুকুতে ধরবে কেন। কথা নেই, তবু তোমার পাশে বসতাম। ফিরে ফিরে সেই একই কথা, তাই বারে বারে, "দাদা আসছে মা?"

ঘাড় হেলিয়ে 'হাঁ' বলতে তুমি।

"তার মানে আমরা আবার তিনজন?"

"তিনজন।" সায় দিয়েই বলেছ, "কিন্তু সে আসছে ছোট্টটি হয়ে"—কাঁথাটা দেখিয়ে—"এইটাতে সে শোবে।"

"ছোট্টটি হয়ে?"

"ছোট্টটি।"

আর চেপে রাখতে পারছিলাম না নিজেকে, মনে যে আন্দাজটা এসেছিল, সেইটাই যাচাই করে নিতে চাইলাম তোমার মুখ থেকে। —"ছোট্টটি, মানে আমি হব—"

"দাদা।" আমার গালে আলতো একটু টোকা দিয়ে বলেছ "আর এবার সে হবে তোর ছোট্ট ভাইটি।"

একেবারে উল্টে যাবে, বুঝেছি, তবু যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না, যা ছিল তাই, তবু একটু অন্যরকম, কী মজা, মনের সুখে শোধ আগের বারের শোধ তোলা যাবে। ভালবাসব, ঠিকই, কিন্তু ধরো, যখন দুষ্টুমি করছে কি পড়তে চাইছে না, তখন—তখন কি ওকে আমি বকব? কিংবা সুযোগ পেলেই ফস করে একটু কানমলা—কী?—ভ্যা করে কাঁদবে? তো বয়েই গেল। কিন্তু যদি সে-ও ফিরে তেড়ে আসে, চোখ পাকিয়ে, কি ছলছল করে, বলে "অ্যাই! আমি আর জন্মে তোর দাদা ছিলাম না!" মা, ও মা, তোমাকে বলতাম, কী হলে কী হবে তুমি একটু বুঝিয়ে দাও না।

কিন্তু সুধীরমামা আসা বন্ধ করেছেন কেন। দাদা-ই যে আসছে তা হয়ত উনি বোঝেননি, জানেন না। মনে হল ওঁকে জানানো দরকার, খুবই দরকার, তাই, তা-ছাড়া রথেরও মেলা এসে পড়েছে, একা যাব কী-করে, সে-জন্যেও, এক দিন—কত দিন কত দিন পরে—দৌড়ে, পার হলাম সেই মাঠটা, দৌড়ে।

(ক্রমশ)

cali–tut
special
ক্যালি-কট স্পেশাল
ক্যালি-কট শাড়ী
ক্যালি-ক্রয়ের সব
খুচরো দোকানেই
পাওয়া যায়।

ছত্রাক এবং মানুষ,

দয়া করে চমকে উঠবেন না। জীববিজ্ঞানের কোন জটিল উপাত্ত ঘাঁটিয়ে ছত্রাক এবং মানুষের পারস্পরিক জটিল সম্পর্কটা কী, সেটা আবিষ্কার করার দুঃসাহস (?) আমার নেই। আপাতত দুটি তথ্য আপনাদের অবগতির জন্য পরিবেশন করছি। এক, অতিরিক্ত চিনি বা চিনি জাতীয় দ্রব্য খেয়ে এই মুহূর্তে কারুর দেহ-সৌষ্ঠব যদি কিছুটা অপ্রীতিকর হয়ে থাকে, অর্থাৎ সাদা কথায় যদি তিনি বেশ কিছুটা স্থূল হয়ে উঠেছেন বলে নিজেকে মনে করেন, তাহলে যে কোন খাদ্য-বিশেষজ্ঞ তাঁকে অবশ্যই কম-ক্যালোরিযুক্ত খাবার খেতে উপদেশ দেবেন। সেই সঙ্গে কোন কোন খাদ্যবস্তুর মধ্যে কম ক্যালোরি থাকে তার একটা তালিকাও হয়ত তৈরি করে দেবেন। আধুনিক খাদ্য বিশেষজ্ঞরা ঐ তালিকা তৈরি করতে গিয়ে একটি বিশেষ বস্তু মোটেই বাদ দেবেন না। তার নাম ছত্রাক। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, অধিক ক্যালোরি বিশিষ্ট খাদ্য বলতে সাধারণত ভাত, আলু, চিনি প্রভৃতিকে বোঝায়। দুই, বিশেষজ্ঞদের মতে ছত্রাক একটি উপাদেয় খাদ্য-বস্তু। এর মধ্যে আছে বিভিন্ন রকমের ভিটামিন যেমন, থায়ামিন, নিয়াসিন এবং রিবোফ্লাভিন। তার সাথে যথেষ্ট পরিমাণ প্রোটিন। এই প্রোটিন উচ্চ পর্যায়েরও বটে। তাদের মধ্যে থাকে বেশ কিছু পরিমাণ লাইসিন অ্যামিনো অ্যাসিড, যাদের হজম করতে শরীরের দিক থেকে কোন বেগ পেতে হয় না। জীববিজ্ঞানের দিক দিয়ে খাদ্য হিসেবে এই প্রোটিনের গুণাগুণ উদ্ভিজ্জ এবং প্রাণিজ প্রোটিনের ঠিক মাঝামাঝি। সম্ভবত এ দুটি কথা ভেবেই বিশ্বের খাদ্য-বিজ্ঞানীরা মনে করেন, জনবহুল পৃথিবীতে বিশেষ করে উন্নয়নশীল মানুষদের পক্ষে প্রকৃতির দান বিতর্কিত, বহু আলোচিত এবং বিভিন্ন সংস্কারে আচ্ছন্ন এই বস্তুটিকে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য রূপে গ্রহণ করা উচিত। এতে করে প্রোটিন জনিত অপুষ্টির হাত থেকে হয়ত অনেকে রেহাই পাবেন।

বস্তুত, ইংরেজীতে যার নাম মাশরুম, তারই বাংলা নাম ছত্রাক বা ব্যাঙের ছাতা। প্রথম বর্ষার স্পর্শে নরম মাটির বুক থেকে যখন একটা ভ্যাপসা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে, ঠিক তখন, লক্ষ্য করলেই দেখা যায় বাঁশ ঝাড়, কলা বা কচুর মোচার কাছাকাছি, যেখানে প্রচুর পাতা পচা বা অপচা অবস্থায় পড়ে রয়েছে সেখানে, অথবা এঁদো ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে যেন ভুঁই-ফোঁড়ের মত হঠাৎ গজিয়ে উঠে চারদিকে ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাদা, সাদাটে ধূসর, হলদেটে, সাদা প্রভৃতি বর্ণের ব্যাঙের ছাতা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই বস্তুটিকে নিয়ে রূপকথা উপকথার অন্ত নেই। কোন কোন ছত্রাকের মধ্যে বিষাক্ত পদার্থ থাকায় সম্ভবত সেই সব বিদঘুটে গল্প তৈরি হয়ে থাকবে। তবু প্রকৃতির এই বিশেষ উদ্ভিজ্জ পদার্থটি সহজ প্রবচনে গণ্য হয়ে পৃথিবীর মানুষের খাদ্য বস্তুর তালিকায় একটি বিশিষ্ট আসন লাভ করতে কখনো পারে নি। খাদ্য হিসেবে বিভিন্ন দেশে যে ধরনের ছত্রাকের চাষ সব চেয়ে বেশী করা হয়ে থাকে তাদের মধ্যে অন্যতম **অ্যাগারিকাস বিসপোরাস।** গত এক দশকে এর চাষ দ্রুতভাবে বাড়ানো হয়েছে এবং ভবিষ্যতে এর উৎপাদন যাতে আরও বৃদ্ধি করা যায় তার উপরও নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। মুখ্যত এর চাষ সবচাইতে বেশি করা হয় ফ্রান্স, মার্কিন দেশ এবং বৃটেনে। এ ছাড়াও আরও যে সমস্ত দেশ সম্প্রতি এ ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহী হয়ে উঠেছেন তাদের মধ্যে আছে তাইওয়ান, অস্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ড, ইটালি প্রভৃতি।

অ্যাগারিকাস
বিসপোরাস

বলা হয়েছে, বর্তমানে সারা পৃথিবীতে এই বিশেষ ধরনের ছত্রাকটির মোট উৎপাদনের পরিমাণ ২৫০,০০০ মেট্রিক টন। বায়ুহীন কৌটোয় পুরে এবং কাঁচা অবস্থাতে সহজেই সর্বত্র পাঠান সম্ভব হয় বলে একে কোন শৌখিন খাদ্য বস্তু বলে মনে করার আজ আর কোন কারণ নেই।

গবেষকরা লক্ষ্য করেছেন, কয়েকটি বিশেষ ধরনের এক-কোষী প্রাণী অ্যাগারিকাস বিসপোরাস-এর বংশ বৃদ্ধি এবং তার পুষ্টিসাধন করে যথাযথ বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে থাকে। অতএব ঐ বিশেষ বিশেষ এক-কোষী প্রাণীদের যদি আমরা সুসংহতভাবে কাজে লাগাতে পারি, তাহলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অন্যান্য ফসলের মত এই ছত্রাকের উৎপাদন সহজেই বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

সত্যি কথা বলতে কি, শারীর-বিজ্ঞানের দিক দিয়ে ছত্রাকের দেহকে আমরা প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করে থাকি। এক, ভেজিটেটিভ মাইসেলিয়াম অর্থাৎ ক্রমবর্ধনশীল ছত্রাক দেহ। সুতোর মত লম্বাটে ধরনের এই দেহ কেশ শাখা প্রশাখা বিস্তার করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ঠিক কতকটা সাধারণ গাছপালার শেকড়ের মত। দুই, ফ্রুট বডিস। অর্থাৎ ছত্রাকের যে মাংসল অংশটি খাদ্যরূপে আমরা গ্রহণ করি, তাই। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন করতে হলে প্রথমেই লক্ষ্য রাখতে হয়, যাতে ছত্রাকের সুতোর মত ঐ ক্রমবর্ধনশীল অংশগুলি খুব তাড়াতাড়ি প্রচুর শাখা প্রশাখা বিস্তার করতে পারে। এরই উপর নির্ভর করে ছত্রাকের ফলনের পরিমাণ। মাইসেলিয়ামের দ্রুত বৃদ্ধির জন্যে চাষীরা সাধারণত ঘোড়ার মলের সার এবং গমের খড়কুটো ব্যবহার করে থাকেন। দেখা গেছে

এ ধরনের সার ছত্রাক দেহের পুষ্টি সাধনের কাজও যেমন করে থাকে, সেই সঙ্গে এমন কয়েক ধরনের এক-কোষী প্রাণীদের জীবন ধারণ করতে সাহায্য করে যারা পরোক্ষভাবে ঐ ছত্রাকের দেহের পুষ্টি সাধনের জন্যেই কাজ করে যায়। এ ব্যাপারে তিন প্রকারের জীবাণুর বা এক-কোষী প্রাণীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এরা হল, ব্যাকটেরিয়া, ফাঙ্গি এবং অ্যাকটিনোমাইসেটেস। রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, গমের খড় কুটোর মধ্যেকার সেলুলোজ, হেমি-সেলুলোজ এবং লিগনিন থেকেই ছত্রাক তার পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করে থাকে এবং সেই খাবার তৈরি করতে সাহায্য করে ঐ বীজাণুর দল। উল্লেখ্য, ভিটামিন এবং অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরির ব্যাপারে ব্যাকটেরিয়া প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে থাকে। এদেরই সাহায্যে প্রথমে পর্যাপ্ত পরিমাণ মাইসেলিয়াম উৎপাদিত করে নেওয়া হয়। পরে প্রয়োজন মত মাটির মধ্যে এই
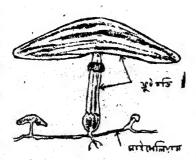
মাইসেলিয়াম ছড়িয়ে দিলেই তার মধ্যে থেকে গজিয়ে ওঠে ছত্রাকের শাঁসাল অংশ। এর জন্যে আগেরই মত মাটির সঙ্গে কিছুটা সার মিলিয়ে নেওয়া হয়। মাটিকে এমনভাবে প্রস্তুত করতে হয় যাতে করে তার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ জলীয় বাষ্প থাকতে পারে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এই মাটির মধ্যে মাইসেলিয়াম থেকে নির্গত উদ্বায়ী পদার্থ অথবা ইথেনল, ইথাইল অ্যাসিটেট, অ্যাসিটোন এবং অ্যাসিটেলডেহাইড বাষ্পের মিশ্রণ মিশিয়ে দিলে 'সিউডোমোনাস পুটিডা' নামে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার আবির্ভাব ঘটে। এই ব্যাকটেরিয়াই পরে সার থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর পদার্থ তৈরি করে ছত্রাকের ডাঁটার মত অংশ এবং শাঁসাল 'ছাতা'টিকে পুষ্ট করে তুলতে সাহায্য করে। ঐ ডাঁটা বা শাঁসাল অংশের মধ্যেই থাকে মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রোটিন এবং খাদ্য-প্রাণ বা ভিটামিন।

তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ছত্রাকের উৎপাদন লাভজনক করে তুলতে হলে আরও গবেষণার প্রয়োজন আছে। আর সেই গবেষণার মূল লক্ষ্য হবেঃ এক, আরও নতুন নতুন ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কার করা যারা ছত্রাকের দেহ বৃদ্ধির ব্যাপারটাকে প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর পদার্থ জুগিয়ে আরও ত্বরান্বিত করতে সক্ষম হবে। দুই, প্রচুর পরিমাণ মাইসেলিয়াম উৎপাদন করে দেশ বিদেশে চালান দেবার ব্যবস্থাদির উন্নতি সাধন। সেই সঙ্গে আদর্শ ফলন ব্যবস্থা আবিষ্কার। বস্তুত ছত্রাকের উপর এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে গবেষণার কাজ মাত্র কয়েক বছর হল শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে লাভজনক ফলও পাওয়া গেছে। যদি এইভাবে কাজ চলতে থাকে তাহলে প্রোটিন এবং মূল্যবান ভিটামিনের বিকল্প-ভাণ্ডার রূপে অদূর ভবিষ্যতে ছত্রাক যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে সমর্থ হবে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

পৃথিবীর প্রাচীনতম ঘড়ি

পশ্চিম জার্মানির বুপেরটাল-এর ঘড়ির যাদুঘরটি সারা ইউরোপের এক বিরাট বিস্ময়। এখানকার ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় স্থান পেয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন সময়ের নানা রকমের ঘড়ি। এরা প্রত্যেকেই বর্ণে এবং বৈচিত্র্যে এক একটি যেন অভিনব সামগ্রী। সাধারণভাবে ঘণ্টা এবং মিনিটের হিসেব ছাড়াও তাদের কোন কোনটি নিয়মিত সপ্তাহ, মাস এবং সালের গণনা ঠিক ঠিক অঙ্ক জানিয়ে চলেছে। এখানকার সংগ্রহশালায় স্থান পেয়েছে প্রাচীন মিশরীয় যুগের ঘড়িও। এই ঘড়ির সাহায্যে তৃতীয় আমেনোফিস-এর সময় (অর্থাৎ ১৪১১—১৩৭৫ খৃষ্ট-পূর্বাব্দ) সময় গণনা করা হত। ঘড়িটি জলের সংকেতের সাহায্যে সময় জানাত।

'আবেলার ঘড়ির যাদুঘর' নামে এই সংগ্রহশালার একটি বিশেষ আকর্ষণ হল, আনতোনি শেথস-এর তৈরি জ্যোতির্বিজ্ঞানের-ঘড়িটি। এই ঘড়ির একটি গোপন দেরাজের মধ্যে জার্মান ভাষায় রচিত একটি বিবরণ রাখা আছে। বিবরণটি লেখা হয়েছিল ১৭৫৪-এ। অত্যন্ত জটিল যন্ত্র-

পাতি দিয়ে তৈরি এই ঘড়ির সাহায্যে বিভিন্ন বর্ণের সংকেতের সাহায্যে দিন এবং রাত্রির সময় সংকেত জানান হয়। বিভিন্ন মাসে, ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে। স্থানীয় সৌর-কাল ধরে সমানে সে এই গণনা করে চলেছে। এর সঙ্গে আছে বিশেষ ধরনের একটি ক্যালেন্ডার যা অতীত, বর্তমান এবং চির-ভবিষ্যতের দিন-ক্ষণ সমানে জানিয়ে দিতে পারে। এতে আছে সেকেন্ডের কাঁটা, তারিখের কাঁটা এবং সেই সঙ্গে রাশিচক্রের মধ্যে সূর্যের অবস্থান কোথায় থাকে তার সংকেত। ১৯৫৫ সাল থেকে সংগ্রহশালাটির বেশির ভাগ মূল্যবান ঘড়িই সংগ্রহ করে আসছেন নির্মাতাদের পরিবারবর্গ।
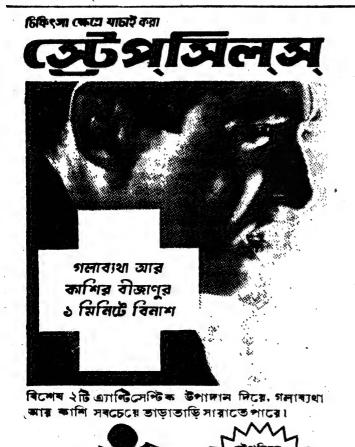
মিশরের ঘড়ি

আনতোনি শেষস-এর ঘড়ি

সম্মোহন ক্ষমতা
বাহ্যিক নয়, ব্যক্তিগত

বা. হিপনোসিস বা সম্মোহিত অবস্থা কোন অলৌকিক ব্যাপার নয়। কোন ব্যক্তির উপর আরোপিত কোন ভৌতিক শক্তিও নয়। এর সঙ্গে কোন আধিভৌতিক সম্পর্কও জড়িয়ে নেই। সম্প্রতি ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন বিখ্যাত গবেষক রীতিমত পরীক্ষার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত করেছেন, সম্মোহিত অবস্থা কোন ব্যক্তি বিশেষের পুরোপুরি ব্যক্তিগত ক্ষমতারই পরিবর্তিত রূপ। সম্মোহনের ফলে যে সমস্ত আচরণ বা অভিনবত্ব তার মধ্যে প্রকাশ পায় তার সমস্তটারই মূল উৎস সে নিজে। অর্থাৎ তার ব্যক্তিগত ক্ষমতার প্রভাবেই সব কিছু ঘটে থাকে। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের মনবিদ্যা এবং মনরোগবিদ্যার অধ্যাপক ফিলিপ জি জিমবারদো একটি প্রতিবেদনে কয়েকটি পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের কথাও উল্লেখ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, সম্মোহনের দ্বারা তিনি এবং তাঁর দুই সহকর্মী একই সময়ে তাঁদের বাঁ এবং ডান হাতের তাপমাত্রার মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন। এবং এই তাপমাত্রার পার্থক্য ছিল প্রায় সাত ডিগ্রি ফারেনহাইটের মত।

পরীক্ষাটি চালান হয় বিশেষ ধরনের একটি ঘরের মধ্যে। ঘরটি সম্পূর্ণভাবে শীত-তাপ নিয়ন্ত্রিত ছিল। তাপমাত্রা ছিয়াশি ডিগ্রি ফারেনহাইট। ও'দের একজনকে প্রথমে ঐ ঘরের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসতে বলা হয়। তাঁর দুই হাতে জুড়ে দেওয়া হয় দুটি থার্মোকাপল। উদ্দেশ্য, যদি তাঁর হাতের তাপমাত্রার একটুকু পরিবর্তন হয়, ঐ থার্মোকাপল সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিবর্তনের কথাটা গবেষকদের জানিয়ে দেবে। সমস্ত ঠিকঠাক করার পর ঘরটির বাইরে থেকে অধ্যাপক জিমবারদো নির্দেশ দিলেন, ভাল. এবার তুমি নিজেকে পুরোপুরি আলগা করে দাও। সমস্ত মানসিক এবং দৈহিক চেতনার কথা ভুলে গিয়ে যেন বিশ্রাম করছ, ঠিক এমনিভাবে বসে থাক। তাঁর সহকর্মীটি তাই করলেন।
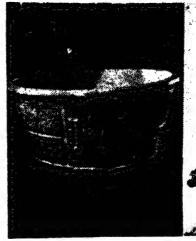
কিছুক্ষণ পর আবার নির্দেশ দিলেন অধ্যাপক জিমবারদো : এবার দুই হাতের উপর তোমার চিন্তা শক্তি আরোপ কর। মনে কর, একটি হাতের তাপমাত্রা অপর হাতের চেয়ে বেড়ে যাচ্ছে।

সহকর্মীটি সেইভাবে চিন্তা করতে শুরু করলেন।

দেখা গেল অল্প সময়ের মধ্যে সত্যিই তাঁর একটি হাত আর একটি হাতের চেয়ে বেশ কিছুটা গরম হয়ে উঠেছে। উভয় হাতের তাপমাত্রার পার্থক্য শেষ পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়াল প্রায় সাত ডিগ্রি ফারেনহাইটের মত।

অধ্যাপক নিজের উপরও এই পরীক্ষাটি চালান। সে ক্ষেত্রে তিনি স্বয়ং নিজেকে নির্দেশ দেন এবং একই ফলাফল লক্ষ্য করেন। তিনি বলেন মানুষের স্বনিয়ন্ত্রিত স্নায়ুতন্ত্রের উপর এ ধরনের অভিজ্ঞতার উদাহরণ খুবই নতুন। তিনি আশা করেন, অদূর ভবিষ্যতে শারীরিক কার্যাবলীর অনেক কিছুই হয়ত শুধুমাত্র মানসিক প্রভাবের দ্বারা এইভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। এতে করে কিছু কিছু কষ্টকর রোগের উপসম ঘটানও সহজতর হবে। পোর্টল্যান্ডের জনৈক দাঁতের ডাক্তার এরই মধ্যে সম্মোহন করে বহু দাঁতের রোগীর চিকিৎসা করে সাফল্যও অর্জন করেছেন। দাঁতের মাড়ি ফোলা, দাঁতের ব্যথা এবং দাঁত থেকে রক্ত-পড়া—এর সমস্তই তিনি অদ্ভুতভাবে সারিয়ে তুলেছেন শুধুমাত্র সম্মোহনের সাহায্যে। ভদ্রলোকের নাম আইরল ক্লারি। তিনি বলেন, ব্যাপারটা না দেখলে সত্যিই বিশ্বাস করা যায় না। এর আগে হার্ভার্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়েও এ নিয়ে গবেষণা করা হয়। সম্মোহনের সাহায্যে সেখানকার বিশেষজ্ঞরা কয়েকজন লোকের দেহের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম হন। কিন্তু আসলে কি ধরনের দৈহিক ক্রিয়াকলাপের ফলে এমনটি হল সে কথা অবশ্য তাঁরা বুঝে উঠতে পারেন নি।

তবে একটা ব্যাপারে বিশেষজ্ঞরা এক-মত। তাঁদের সকলেরই ধারণা হয়েছে, 'সম্মোহন' ব্যাপারটা রোগীর নিজেস্ব চেষ্টারই ফল। বাইরে থেকে তাঁরা শুধু তাঁহাদের কিছুটা উদ্বুদ্ধ করে থাকেন এই যা। 'ও'রা লক্ষ্য করেছেন, শিশুরা সহজেই সম্মোহিত হয়। কিন্তু বড়দের ক্ষেত্রে সময় লাগে ঢের বেশী। সম্ভবত তাদের মানসিক কাঠামোটা কিছুটা স্থায়ী। এর দরুন নিজেদের খুশীমত নিজেদের মতকে তারা কোন বিশেষ ফলাফল বা কার্যের উপর নিবদ্ধ করতে পারে না। ও'দের মতে সম্মোহন কতকটা যোগ-সাধনারই অনুরূপ। নিজস্ব ইচ্ছে শক্তির প্রভাবে দৈহিক কার্য-কারণ নিয়ন্ত্রণ করা এর দ্বারা সম্ভব। কিন্তু কি ভাবে যে সেটা ঘটে থাকে, আপাতত সেটাই তাঁরা পরীক্ষা করে দেখছেন।

সমরজিৎ কর

সিলিং ফ্যান
জগতে
বৈশিষ্ট্য হ'ল
G.E.C.
জি ই সি-র গর্বের
সীমা নেই—
এভারেষ্ট
এক নতুন ধারা
গড়ে তুলছে
বৈদ্যুতিক পাখায়।
G.E.C.
"এভারেষ্ট"

॥ ৫ ॥

১৯৩৮ সালে ১০ই ফেব্রুয়ারি স্বর্গত জজ রায়বাহাদুর শ্রীকমলনাথ দাশগুপ্তের দৌহিত্রী শ্রীমতী মীরার সঙ্গে কলকাতায় আমার বিবাহ হয়। আমার বিবাহ উপলক্ষে আগরতলা থেকে আমার মা, বড় ভাই, বউদিরা এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন কলকাতায় এসেছিলেন। মীরা ১৯৩৭ সাল থেকে আমার কাছে গান শিখত। আমার ট্রেনিং-এ কয়েকটি গান রেকর্ডও করেছিল। ১৯৩৭ সালে এলাহাবাদ সংগীত সম্মেলনে মীরাও গান করার সুযোগ পেয়েছিল, আমারই মত। সে সময় মীরা ভীষ্মদেবের কাছে উচ্চাঙ্গ সংগীত ও শান্তিনিকেতনের শ্রীমতী অমিতা সেনের (পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের কনিষ্ঠা কন্যা) কাছে নাচ শিখত। পরে মীরা শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের কাছে ঠুংরী ও কীর্তন এবং শ্রীঅনাদি দস্তিদারের কাছে রবীন্দ্রসংগীতও শিখেছিল। আমার সঙ্গে ১৯৪৪ সালে বম্বে আসার পর, মীরা বম্বেতে কিরাণা ঘরাণার ওস্তাদ ফৈয়াজ মহম্মদ খানের কাছে উচ্চাংগ সংগীত শেখে। মীরা রেডিওতে গান গাওয়া ছাড়াও, আমার তত্ত্বাবধানে এইচ-এম-ভি'তে কয়েকটি হিন্দী গানও রেকর্ড করে।

মীরা নিজে শুধু যে গান লেখে তা নয়, সুর সংযোজনাতেও পারদর্শিনী। ওর সাহায্যে ও সাহচর্যে আমি আমার অনেক সফল ও জনপ্রিয় গানের সুর দিয়েছি। আমার সুর রচনায় অনেকগুলি জনপ্রিয় গানের মুখড়ার সুর মীরার। বহু সময় এ রকমও হয়েছে আমি সুর রচনা করেছি, তার উপর ভিত্তি করে মীরা বাংলাতে গান লিখেছে সুরের মিটার ও ছন্দ অনুযায়ী, হিন্দী গান রচয়িতাকে তা বোঝাবার জন্য। পরে সেই সুরে হিন্দী গান রচনা হয়েছে। মীরার লেখা ছয়খানা বাংলা গান আমি এইচ-এম-ভিতে রেকর্ডও করেছি, নিজের গলায়। কেবল সহধর্মিনীরূপে নয়, আমার সংগীত জীবনের সাফল্যের পিছনে মীরার সহযোগিতা, সাহায্য, প্রেরণা, উৎসাহ ও আত্মত্যাগ প্রচ্ছন্নভাবে সর্বদাই বর্তমান রয়েছে ও থাকবে। আমি মীরার মত সহধর্মিনী লাভ করে নিজেকে সর্বদাই অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে করেছি।

আমাদের একমাত্র সন্তান শ্রীমান রাহুল-এর জন্ম হয় ১৯৩৯ সালের ২৭শে জুন। শিশুকাল থেকেই গানের জগতের উপর রাহুলের অসাধারণ ঝোঁক দেখে ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ সাহেবের কাছে ওর স্বরোদ শেখার ব্যবস্থা করে দিলাম, কলকাতাতে। পরে যখন চলচ্চিত্রের সুর সংযোজনায় ওর ইচ্ছা লক্ষ করলাম, তখন ওকে নিয়ে এলাম বম্বেতে ১৯৫৯ সালে। আমার সহকারীরূপে হিন্দী চলচ্চিত্রের সংগীত রচনায় ওকে তৈরী করতে লাগলাম। এখন রাহুল বম্বেতে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে সংগীত পরিচালকরূপে, সুনামও অর্জন করেছে। তরুণদের কাছে তার সংগীত রচনা খুবই জনপ্রিয়। এখন সে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজেই সংগীত পরিচালনা করছে।

বম্বেতে সংগীত পরিচালনা করবার প্রথম আহ্বান আমি পাই ১৯৪২ সালে, সর্দার শ্রীচন্দুলাল শার কাছ থেকে। তিনি তখন বম্বের বিখ্যাত রঞ্জিত স্টুডিও-র মালিক। কিন্তু কেন জানি না ১৯৪২ সালে কলকাতা ছেড়ে বম্বে আসতে মন চাইল না। তখনও আশা যে কলকাতাতে বাংলা চলচ্চিত্রে কাজ পাব। তখন এলাম না বলে চন্দুলাল দুঃখিত হয়েছিলেন। বম্বেতে পরে যখন দেখা হয়, উনি অনুযোগ করেছিলেন, তখন না আসাতে।

"ফিল্মিস্তান" চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের মালিক রায় বাহাদুর শ্রীচুনীলাল ও শ্রীশশধর মুখার্জি ১৯৪৪ সালে আমাকে তাঁদের একটি ছবিতে সংগীত রচনা করতে আমন্ত্রণ জানান। তখনও আমি দোলামনা করছিলাম। সেই সময় বন্ধুবর শ্রীসুশীল মজুমদার "ফিল্মিস্তানে" কাজ করতেন। তিনি বার বার আমাকে বম্বে চলে আসবার জন্য লেখেন এবং এই সুযোগ অবহেলা না করে "ফিল্মিস্তানে" কাজ নিতে বলেন।

কলকাতার চলচ্চিত্র-জগৎ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে, মনের মধ্যে কিছু ক্ষোভ ও অভিমান নিয়ে আমি "ফিল্মিস্তানের" আহ্বানে ১৯৪৪ সালে বম্বে চলে এলাম সপরিবারে। ওই বছরের অক্টোবর মাসে স্ত্রী-পুত্র সহ বম্বেতে এসে "ফিল্মিস্তানে" যোগ দিলাম সংগীত পরিচালকরূপে।

দেখলাম বম্বে বেশ মাজাঘষা শহর।

"দুধ আর চিনি দিই ?"
"তা কেন ? মিল্কমেড দিলেই তো হয় !"

সেখানে সব সময় কর্মব্যস্ততা এবং কলকাতার চাইতে অনেক বেশী কসমোপলিটান। বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী শ্রীপান্নালাল ঘোষ, সঙ্গীত পরিচালক শ্রীঅনিল বিশ্বাস, অভিনেতা শ্রীপাহাড়ী সান্যাল, শব্দযন্ত্রী শ্রীরবীন চাটার্জি—এ'দের সঙ্গে দেখা হল আমার বম্বেতে। কিন্তু প্রথম প্রথম কেমন যেন মনে হল, যে দেশে গঙ্গা নেই সে দেশের মাটি রুক্ষ, যে দেশে আলসেমী নেই সে দেশে প্রথমটায় কোন প্রাণের সাড়াই যেন পেলাম না। প্রথমটায় বড় নিঃসঙ্গ বোধ করতাম নিজেকে। কলকাতার আমার সব গুণী বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত পরিবেশ থেকে বম্বে কেমন যেন আমাকে মনমরা করে দিয়েছিল প্রথমে।

বম্বেতে আমার প্রথম সঙ্গীত পরিচালনা, ফিল্মিস্তানের ছবি "শিকারী"। ছবির নায়ক শ্রীঅশোককুমার। আমার সুরে তিনি গান করেছিলেন। আমরা সবাই তাঁকে "দাদামণি" বলে ডাকি। বিখ্যাত গীতিকার শ্রীপ্রদীপ ছবির গান রচয়িতা। সঙ্গীত পরিচালকরূপে এই ছবিতেই প্রথম নাম বেরোল আমার। প্রথম ছবির সুর রচনা, সঙ্গীত পরিচালনা প্রশংসা পেল পত্র-পত্রিকায়। এর পরে ফিল্মিস্তানে আরও পাঁচটি ছবির আমি সঙ্গীত পরিচালনা করি। সেগুলির নাম—"এইট ডেজ" দো ভাই, শবনম্, পেয়িং গেস্ট ও মুনীমজী। শবনম-এর সব গানগুলিই হিট হয়ে গেল। প্রথম ছবি 'শিকারী'-র সুর রচনার সময় স্টুডিওর সবাই খুব প্রশংসা করেছিল আমার সঙ্গীতের, কিন্তু কেন জানি না আমি খুশী হতে পারিনি। স্টুডিওর বাইরে, জনসাধারণের তেমন কোন সাড়া পেলুম না, আমার সুরে, যাকে বলে Public Pulse-এ কোন ভালমন্দ বোঝা গেল না। শিকারী মুক্তি পাবার কিছুদিন পর, শ্রীযামিনী দেওয়ানের "রতন" ছবি মুক্তি পেল। সমস্ত বম্বে শহর "রতন" ছবির গানে ছেয়ে গেল, জনসাধারণের মুখে মুখে গানগুলি প্রচারিত হল। ফিল্মিস্তানে আমার ঘরে বসে আমি একদিন হারমোনিয়াম নিয়ে সুর রচনায় ব্যস্ত। হঠাৎ কানে এল আমার বেয়ারা ছোকরাটির গলায় গান, চা তৈরী করতে করতে সে গাইছিল—"যব তুমহি চলে পরদেশ, লাগাকর ঠেস্ ও-পীতম পেয়ারা—দুনিয়া মে কৌন হামারা।"—রতন ছবির গান। তখন এই গানটি বম্বের রাস্তাঘাটে সর্বত্র শুনতে পাওয়া যেত। সেদিন আর কাজ করলাম না। এই 'রুম্-বয়' এতদিন আমার সঙ্গে কাজ করছে, রাতদিন আমার গানের রচনা শুনছে, কিন্তু কই কোনদিন আমার গানের রচনা তাকে তো গুণ-গুণ করতে শুনিনি? কিছুদিন পর আমার চোখ খুলে গেল। 'ইউরেকা'! কয়েকদিন বাদে 'দো-ভাই' ছবির

অভিনেত্রী সুরাইয়া শচীন কর্তার সুরে গান করছেন।

একটা দুঃখের গানের সুর দেওয়াতে ব্যস্ত, যার প্রথম লাইন "মেরা সুন্দর স্বপ্না বীত গয়া"। পাশের ঘর থেকে আমার সেই 'রুম-বয়'-কে ওই গানখানা মশগুল হয়ে গাইতে শুনলাম। আমার কাছে, আমার চলচ্চিত্র-জীবনের সবচাইতে বড় অভিজ্ঞতার উন্মোচন হল এতে। তখনই বুঝতে পারলাম ফিল্মের 'হিট' গান মানে হল, অতি সোজা সুর, যত কম অলংকার থাকে ততই ভাল। কারণ তাহলে সাধারণ লোকেও সে গানের সুর নিজের গলায় তুলতে পারে। চলচ্চিত্রে সঙ্গীত পরিচালক রূপে আমার প্রথম গুরু হল, স্টুডিওর ওই 'রুম-বয়'। এরপর "শবনম" ছবির গানের সুর দেবার সময় লুকিয়ে লুকিয়ে খেয়াল করার চেষ্টা করেছি 'রুম-বয়' আমার সুরে কোন সাড়া দেয় কিনা। শবনম্ ছবির যে সব গানগুলো ওই রুম-বয় গুণ গুণ করত, সেগুলোই হিট্ হয়েছিল।

(ক্রমশ)

ব্রিটিশ মহিলা মন্ত্রী জুডিথ হার্ট

দিন কয়েক আগে ব্রিটিশ মহিলা মন্ত্রী জুডিথ হার্ট কলকাতা এসেছিলেন। যে কোন কারণেই হোক, আজকাল সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত বিদেশীরা অনেকেই কলকাতা কেটে ভারত ঘুরে যান। শ্রীমতী হার্ট কিন্তু সবার আগে মাদ্রাজ আর কলকাতা হয়ে গেলেন। শ্রীমতী হার্ট ব্রিটেনের মহিলা কল্যাণের সঙ্গে বহুদিন

মিসেস জুডিথ হার্ট

থেকে জড়িত। অবশ্য ভারত সফর সেজন্য নয়। Overseas development সংক্রান্ত ব্যাপারে ব্রিটেনের সহায়তার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসাবে এসেছিলেন এবার।

মাদ্রাজ-এর কোন এক কাগজ শ্রীমতী হার্ট-এর বর্ণনায় হাতে গলায় হীরের হারের উল্লেখ করেছিল। আমার সঙ্গে যেদিন দেখা হলো আমি আবার জিজ্ঞাসা করে বসলাম, তোমার গলার মালায় কি নীলকান্ত মণি? শ্রীমতী বললেন, মাদ্রাজে আমার সস্তা আংটির পাথরকে বলেছে হীরে, এখন তুমি বলছ গলায় আমার নীলকান্তমণি। কোনটাই মহামূল্য নয় আমার অলঙ্কারে। সিংহলে কিনেছি সামান্য দামে স্বল্পমূল্য পাথর। কোনকালেই শ্রীমতী হার্ট ধনীসমাজের অঙ্গ হতে চাননি।

ধনীসমাজের একজন হতে চাননি জুডিথ হার্ট কিন্তু বিদুষী তিনি। লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিকস্-এর সমাজ-বিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেয়েছিলেন। ছাত্রাবস্থাতেই রাজনৈতিক বিষয়ে আগ্রহ ছিল। লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স মহাযুদ্ধের সময় কেম্ব্রিজে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। তখন তিনি Cambridge University Labour Club-এর সেক্রেটারী হয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি লেবার পার্টির ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ কমিটির মেম্বর। সব সত্ত্বেও সংসারের গৃহিণী তিনি। স্বামী আন্টনী হার্ট-এর সঙ্গে ১৯৪৬ সালে তাঁর বিবাহ হয় এবং দুই পুত্রের জননী তিনি।

কলকাতায় কেমন লাগলো জিজ্ঞাসা করাতে শ্রীমতী হার্ট একটু হেসে বললেন, কলকাতা দেখে এক মিশ্র অনুভূতি হয়। দুটি বস্তি এলাকা তাঁকে C M P O থেকে দেখাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বস্তির মানুষ তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করেছে, বস্তির বাচ্চারা আপনজনের মত আশেপাশে ঘুরেছে কিন্তু জীবনযাত্রার এত দৈনন্দিন দুঃখের ছাপ তাঁর দেখে খারাপ লেগেছে। আসবারই কথা। ভারতবর্ষেও বোম্বাই কোথাও বস্তির মত দুর্দশা অন্যত্র দেখা যায় না। এঁরা তো বিদেশের মানুষ। রাজনৈতিক বিবাদ-বিসম্বাদে সর্বত্র যেন একটা দুর্যোগ আছে।

উপায় যে নেই তাও নয়। শ্রীমতী হার্ট দুর্গাপুর দেখে খুব খুশী। ভারতের বিভিন্ন স্থানে ইস্পাত কারখানায় বিভিন্ন দেশের সহায়তা আছে। দুর্গাপুরে আছে ব্রিটিশ সহায়তা। সেজন্য বিশেষ করে শ্রীমতী হার্ট দুর্গাপুরে দেখতে গিয়েছিলেন।

শ্রীমতী হার্ট ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে ওঁর দেশে ন্যাশনাল কমিশন অন উইমেনের সভাপতি হয়েছেন। ন্যাশনাল কমিশন অন উইমেন, উইমেন্স কনসালটেটিভ কাউন্সিলেরই নূতন নাম। মহিলা কল্যাণের সঙ্গে শিশুমঙ্গলেও তাঁর আগ্রহ প্রচুর। জড়বুদ্ধি শিশুর সম্বন্ধে তাঁর ব্যাপক অনুসন্ধান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রূপসী কিশোরী

সেদিন ফিরপো হোটেলে যে রূপসী নির্বাচন মজলিস বসেছিল সে আসরের বৈশিষ্ট্য ছিল বই কি। এমন বৈঠক আগে অনেক আমরা দেখেছি। এবারে প্রভেদ নম্বর ঠেকলো দু-তিনটে। রূপের হাট বসেছিল কিশোরীদের নিয়ে। যাদের পশ্চিমের আখ্যা হলো Teenager। বরণ উৎসবের চয়নের নামও তাই Miss Young India চয়ন। গুচ্ছে গুচ্ছে ফুলের মত কাঁচা-কাঁচা কিশোরী রূপসীদের মেলায় সুন্দরী সেরা কে? বিচারকদের কাজ কঠিন ছিল। আমার তো মনে হয়েছিল ওরা সবাই সুন্দরী।

Miss Young India বরণের প্রথম পর্ব চলেছে। সবার আগে বাংলার রূপসী

কিশোরী সাজের ফ্যাশন—পূর্ব ও পশ্চিমের সমন্বয়

নির্বাচন হলো। তারপর বিভিন্ন শহরের উৎসবের শেষে ভারতের রূপসী-শ্রেষ্ঠ নির্বাচন হবে বোম্বাইতে। যে কিশোরী ভারত সুন্দরী হবেন তিনি যাবেন জাপানের ওসাকা শহরে। যে বিশ্ব-প্রদর্শনীর আয়োজন হচ্ছে জগৎজোড়া সেই expo '70-র অংশ হিসাবে হবে উৎসব Young International বরণ। Miss Young International অনুষ্ঠান জাপানে হওয়াও এক নতুনত্ব। এতদিন রূপসীর যাচাই করা মার্কিন দেশের একচেটিয়া ছিল, এবার চেরীর দেশে চলবে মহফিল। জাপানী মেয়েরা কুসুমকোমল রূপের অধিকারিণী।

দেখা যাক কে আনে বিজয়মালা। কলকাতার রূপসী কুমারী চৌধুরীকে আপাতত অভিনন্দন জানাচ্ছি। সামনেই ভারতের সুন্দরী প্রধানা বরণ আছে। তবে তো ওসাকা।

কিশোরী বরণের ব্যাপারটা বিশ্বময় প্রবণতার এক প্রকাশ মাত্র। যে কিশোর-কিশোরীকে সমাজ সংসার শাসনে রেখেছে এতদিন, তাদের জন্য আছে ভবিষ্যৎ, বর্তমান বড়রা সামলাবে এমন ছিল ধারণা, তারা এখন হঠাৎ প্রাধান্যে পাগল হয়ে উঠেছে। ভালমন্দের কথা বলছি না, বলছি এ এক ঝোঁক। সমাজের ইতিহাসে প্রতি বাঁক, প্রতি মোড় সর্বদাই নূতন ঠেকেছে। কেউ মেনে নিয়েছে, কেউ মানে নি। বল্গা-হীন বাঁকের সবটাই যে সুন্দর তাও নয়, আবার পরিবর্তনের সবটাই মন্দ তাই বা বলি কি করে? তবে ভারতবর্ষের সমস্যা এত যে তার পরিবর্তন সম্বন্ধে দেশের অনুকরণ না হলে আর্থিক স্তরের বিভিন্ন পর্যায়ে ঝড় উঠতো না।

বরণ উৎসবের আর এক নূতনত্ব দেখলাম সাজ্জিদ খাঁ আর তার দল। বাজিয়ে দলের নাম Savagos। এ'রা Pop সঙ্গীত-

বিশারদ্। পশ্চিমে এই পপ নিয়ে কি মাতামাতিই না চলেছে। মত্ত নর্তক, গানে আর পায়ের তালে যেন দর্শকদের তলিয়ে দিলেন। হাতের তালি ফটফট বেজে চললো সমানে। চশমাপরা হলদে শার্ট গায়ে রোগা ছোট্ট ছেলেটা মায়ের পাশে বসেছিল, সেও তালি বাজাতে লাগলো। আধুনিকা তরুণী সেই নূতন ফ্যাশনের "সারং কাবায়া" অর্থাৎ লুঙ্গি আর কুর্তা পরে ঘননীল নয়নরঞ্জনী আর কফি রং-এর ওষ্ঠ বানিয়েছে—সেও তালে তালে তালি তুলে হেলেদুলে মেতে উঠলো। হায় হায়!

ঘরোয়া ওজনের মোটামুটি হিসাব

এক চায়ের চামচ	৪ মিলিগ্রাম
১ বড় চামচ	১৫ মিলিগ্রাম
এক কাপ	১৮০ মিলিগ্রাম
২½ কাপ দুধ	৪৫০ মিলিগ্রাম
২½ কাপ চিনি	৪৫৩ গ্রাম
২½ কাপ চাল	৪৫৩ গ্রাম
৪½ কাপ ময়দা	৪৫৩ গ্রাম
২½ কাপ গুঁড়োদুধ	৪৫৩ গ্রাম
দুই পেয়ালা তেল বা ঘি	৪৫৩ গ্রাম

তাকিয়ে দেখি আমার সামনে সবাই তালি দিচ্ছে, পিছনে, পাশে। বলতে গেলে কেউ বাকি নেই। সাজিদ ঘেমে নেয়ে উঠছে। তার বড় বড় বাবরি চুল ঝাঁকিতে ঝাঁকিতে এলোমেলো তবু ক্লান্তি নেই। তালের চোটে মঞ্চ কাঁপছে, বাজিয়ের দল মশগুল। কত গান। কি তার মানে বুঝলাম না। একমাত্র east goes west-এ আছে "হরে কৃষ্ণ হরে রাম"। ভাল লাগলো। আমারও মাথা নাড়তে ইচ্ছা হলো। বুঝলাম এই দশা বা ভাবাবেগ-এর জন্যই pop সঙ্গীতের এত কদর। পশ্চিমের মানুষ খুঁজে বেড়ায় একটু মানসিক নিশ্চিন্ততা। পথের সন্ধানে তারা হারিয়ে ফেলে নিজেদের। কখনও বা মাদক, কখনও বা হরিনাম হয় তার পরিণাম। নিউ ইয়র্কের হরেকৃষ্ণ মন্দিরে গিয়েছিলাম। সেখানেও ঐ এক প্রশ্ন। স্থূলে, বস্তুগত জিনিসের অভাব নেই প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ সকলে। অথচ সেই নিউ ইয়র্কের অপেক্ষাকৃত অপরিষ্কার অংশ East Village-এর সরু গলির স্বল্প পরিসর সোপান বেয়ে ছেলেমেয়েরা আসে মন্দিরে। খঞ্জনী বাজিয়ে গায় হরে কৃষ্ণ হরে রাম। পরণে গেরুয়া, মাথায় টিকি, আগুনের শিষ-এর মত দেহবর্ণ অল্পবয়সী ছেলেরা খালি পায়ে কৃষ্ণ মন্দিরে বিভোর হয়ে নাম গানে ভুলেছে সব। সুন্দরী কিশোরীরা গেরুয়া শাড়ি পরে দুহাত তুলে নাচছে।

সাজাদ খাঁর তাল

খোল বাজাচ্ছে কেউ, কেউ গাঁথছে মালা;

সাজিদ খাঁ বোম্বাই-এর চিত্র জগতে বিখ্যাত মেহবুব খাঁর পুত্র। হলিউড থেকে নিয়ে ইনল্যান্ড পর্যন্ত কিশোরদুনিয়া তার পরমভক্ত। ফিরপোতে যা দেখলাম, আমাদের কিশোরজগৎও কম যায় না। চুপি চুপি বলছি, বহু বয়স্কও তালের টাল সামলাতে বেসামাল হচ্ছিলেন। আশ্চর্য কিন্তু। একথা সত্যি এঁরা সমাজের সামান্য অংশ মাত্র। যাঁদের খাওয়াপরার ভাবনায় দিন গুজরতে হয় না। যাদের হয়, সে সমাজের ছেলে-মেয়ে কি করবে? তারা কি পুরোনো সেই "আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ" এ নিবদ্ধ থাকবে? ভাবনার বিষয় বটে।

কলকাতায় অবশ্য কিশোরীবরণে কিশোরী ফ্যাশন প্রদর্শনী ছিল না। অন্যত্র কোথাও কোথাও তাও সংযোগ করা হয়েছে। ফ্যাশনগুলি ভাল কিন্তু কিশোরীরা ফ্যাশনে এমন মজলে অভি-ভাবকদের বিপত্তি। বেশ ভারী পকেটের বাব-মা দরকার এত জরি-কিংখাব-সাটিন সম্বলিত সাজের যোগান দিতে। কিশোরী-দের ফ্যাশনে এটুকু লক্ষ করলাম যে, বেশবাসের সংক্ষিপ্ততা ছিল না। ভারতীয় ঘাগরা, ঘারেরা, ল্যাহঙ্গা ইত্যাদি দিয়েই বেশীর ভাগ নূতনত্ব হয়েছে। প্যান্টস্যুটও আছে, কিন্তু মিনির বাড়াবাড়ি নেই। পোশাক রচয়িত্রী কুমারী অনিতা দেব বললেন, পোশাকের শালীনতায় তিনি বিশ্বাস করেন।

Miss Young India বরণ উৎসবের আয়োজন করেছেন বোম্বাই-এর মহিলা পত্রিকা Eves weekly আর প্রসাধনী প্রতিষ্ঠান আ্যান ফ্রেঞ্চ। আরও সহযোগিতা এসেছে বহু প্রতিষ্ঠান থেকে। নির্বাচিত রূপসীদের অঞ্জলি ভরে উঠেছে উপহারে। কিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য সহযোগও পুরস্কারের সঙ্গে আছে।

শ্রীমতী

আপনার...
আমেজভরা আনন্দে
আপনার!
ভার্জিনিয়া তামাকের অপরূপ মিশ্রণ,
কী মোলায়েম, কী আরামের।
এসকোয়ার
ফিলটার সিগারেট
এসকোয়ার সিগারেট খান, তাতে
বিদেশী মুদ্রা বেঁচে যাবে।
বিদেশী মুদ্রা বাঁচান মানে
বিদেশী মুদ্রা অর্জন
Esquire
Esquire
Filter Tipped
CIGARETTES
MADE IN INDIA
গোল্ডেন টোব্যাকো কোং
প্রাইভেট লিঃ, বোম্বাই-৫৬
ভারতের এই ধরণের বৃহত্তম
জাতীয় উদ্যম

ফ্রান্স-অনুরাগিনী

কে যেন লিখেছে, "ফরাসিরা তরু দত্তকে ফরাসি ব'লে দাবি করে, ইংরেজরা তাঁকে বলে ইংরেজ...।" ফ্রান্সে অবশ্য তরুকে কেউ জানে না, তাঁর নাম কোনো স্থান পায় নি ফরাসি সাহিত্যেতিহাসে।

তরু নিজেই এদিকে ফ্রান্সের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। ফরাসি এক প্রবাদ আছে: "মানুষমাত্রের আছে মাতৃভূমি দুটি: স্বদেশ আর ফ্রান্স!" তরুর বেলায় কথাটা খাটে। ১৮৭১ সালে জার্মানির হাতে ফ্রান্সের পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে তিনি তাঁর দিনলেখে লেখেন: "যুদ্ধের শুরু থেকেই আমি সর্বান্তঃকরণে ফরাসিদের পক্ষ নিয়েছিলাম—যদিও জানতাম ওদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী; (...) আমি অবিচলিতভাবে ফরাসি। চঞ্চলমতি হব না: পরাজিত ফরাসিদের প্রতিই আমার সহানুভূতি, আমার অনুরাগ।"

তাঁর লিখিত চিঠিগুলিতেও পরিস্ফুট হয়েছে সেই পক্ষপাত: অম্লান বদনে তিনি ঘোষণা করেন, ফরাসিদের রেজিমেণ্টদের তুলনায় কলকাতার ইংরেজি তথা ভারতীয় রেজিমেন্টদের তাঁর poor affairs মনে হয়! বাড়িতে তিনি যেন ফরাসি আবহাওয়ার মধ্যে বাস করেন: বিদেশ থেকে ঘন ঘন ফরাসি বই আনেন, দিন কাটান লিত্রে-র অভিধান ও 'র‍্যভ্যু দ্যা দ মোঁদ'-পত্রিকার পঠন-অধ্যয়নে; তাঁর প্রিয় বিড়ালের নাম তিনি রেখেছেন Baguette আর ঘোটকীদ্বয়কে Jeunette ও Gentille।

ফরাসি ভাষায় তরুর হাতে-খড়ি হয় ফ্রান্সে—প্রথমে বিদ্যালয়ে, পরে এক গৃহ-শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে। লণ্ডনে তিনি ফরাসিতে কথা বলেন তাঁদের ইতালীয় চাকরের সংগে; কেম্‌ব্রিজে 'মহিলাদের জন্য উচ্চতর পর্যায়ের বক্তৃতামালা' তিনি শুনতে যান, বাড়িতেও টাটোর রাখেন।

'প্রাচীন ভারতে নারী' নামক ফরাসি পুস্তকের লেখিকা মিস্ ক্লারিস্ বাদের্-এর কাছে তরু ফরাসি ভাষায় চারটে চিঠি লেখেন; তাঁর ইচ্ছা ছিল ঐ পুস্তকটির তিনি এক অনুবাদ করবেন। তাঁর ফরাসী ভাষাবিদ্ ইংরেজ বন্ধুর কাছে প্রেরিত পত্রেও প্রায়ই দেখা যায় ফরাসী বাক্যাংশ। Cousin না লিখে তিনি cousine লেখেন, বিদেশী বন্ধু যাতে সংগে সংগে বুঝতে পারেন—মামাতো, মাসতুতো, খুড়তুতো, জাঠতুতো, পিসতুতো যা-ই হোক, বোনেরই কথা হচ্ছে বটে। Khupper-dah [খবরদার] কথাটা উল্লেখ করে তিনি তার এক সুন্দর ফরাসী অনুবাদ দেন: gare!

ফরাসী ফসল

তরুর জীবৎকালে একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ ['মুদ্রিত গ্রন্থ' বরং বলা ভালো—কোনো প্রকাশক বইটিকে নেন নি] ১৬৫টি ফরাসী কবিতার এক সংকলন: A Sheaf gleaned in French Fields, ফরাসী ক্ষেতে কুড়ানো এক আঁটি' পুস্তকটি ১৮৭৬ সালে ভবানীপুরস্থ 'সাপ্তাহিক সংবাদ' মুদ্রালয়ে মুদ্রিত। তরুর মৃত্যুর পরে ১৮৭০ সালে একই ছাপাখানায় মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণে, আরো কবিতা ত্রিশেক সংযোজিত হয়েছে। তৃতীয় সংস্করণ ১৮৮০ সালে লণ্ডনে প্রকাশিত।

ফরাসী ক্ষেতের ফসল তরু শৃংখলা-সম্মতভাবে কুড়োন নি; উনিশ শতাব্দীর বেড়া ডিংগোতে তিনি যেন ভয় পেয়েছেন, ফলে তাঁর সংকলনকে সমগ্র ফরাসী সাহিত্যের প্রতিচ্ছু বলা যায় না। তাঁর প্রায় সমস্ত অনুবাদ [তখনকার দিনের]-আধুনিক লেখকদের কবিতার; ব্যতিক্রম মাত্র ছটা [কবি তথা কবিতা]: দ্যু-বেলে, মারোস [ষোড়শ শতাব্দী], কর্নায়্, স্কারোঁ [সপ্তদশ শতাব্দী], ফ্লরিয়াঁ, শেনিয়ে [অষ্টাদশ শতাব্দী]।

এদিকে পাঠক যে সমকালীন সাহিত্যের যথার্থ ধারণা পাবেন তা-ও নয়: রোমাণ্টিক 'বিগ্ ফোর্'-এর ৩৭টি কবিতার মধ্যে তিনি পাবেন লামার্তিন্-এর দুটি, ভিন্যিয়-র দুটি, মুসে-র তিনটি অথ য়ুগো-র ত্রিশটি কবিতা—যে-কোনো মাপ-কাঠিতে অনুপাতটা অদ্ভুত ঠেকবে! আর সেই ত্রিশটি কবিতার অর্ধেকটা আবার এক বিশেষ গ্রন্থ [লা শাতিমাঁ] থেকে গৃহীত: সে গ্রন্থ য়ুগোর সর্বশ্রেষ্ঠ কিংবা সর্বজনপ্রিয় নয়। ফরাসি সাহিত্যে অপরিচিত গ্রামোঁ-র [যাঁকে তিনি বলেছেন ফ্রান্সের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আধুনিক কবি] সাতেরোটি, এবং অর্ধ-পরিচিত সুলারি-র [যাঁর সনেটগুচ্ছের তিনি উচ্চতম প্রশংসা করেছেন] তেরোটি কবিতা তরু অনুবাদ করেছেন। এদিকে যাঁকে তিনি বলেছেন

"ফ্রান্সের অন্যতম মহৎ কবি, এমন কি এ-যুগের মহত্তম কবি একজন" ফরাসি সাহিত্যে সেই লাপ্রাদ-এর স্থান কোথায়?

তরুর এক চিঠিতে প্রদর্শিত কবি-বিন্যাস [ভিরিয়ো, লাকোঁৎ দ্য লিল্, বোদল্যার] আজকালকার দিনে সমালোচক মাত্রই উল্টিয়ে লিখবেন; বোদল্যার, ল্যকোঁৎ দ্য লিল্। আর ভিরিয়ো? তিনি তো পাদটীকায় নির্বাসিত হবেন; সেখানে স্থান পাবেন বটে, তবে তাঁর পদ্যের জন্য নয়, উপন্যাসের জন্য। কিন্তু তরুর জীবৎকালে ফ্রান্সে সবাই কি তা বুঝেছিলেন? গতকাল কি আজকের বিচার বোঝে? আগামীকাল কি আজকের বিচার মানবে?

অনামী লেখক ছাড়া ৭৪ জন কবির কবিতা অন্তর্গত হয়েছে তরুর সঙ্কলনে; তার মধ্যে পাঁচজন লেখিকার ন'টি কবিতা আর একজন জার্মান কবির [হাইনে] পাঁচটি কাব্যের ফরাসি অনুবাদের ইংরেজি তর্জমা।

আসলে তরুর কাব্য-নির্বাচনের সম্ভাবনা সীমিত ছিল। তাঁর উল্লেখিত এমন অনেক কবি আছেন যাঁদের কোনো গ্রন্থ তিনি কোনো দিন দেখেন নি; তাঁদের কবিতা তিনি পড়েছেন গুস্তাভ্ মাসোঁ-র 'লালীর্ ফ্রাঁসেস' নামক এক সঙ্কলনে।

সমালোচক তরু

শীফ্এর প্রায় প্রতিটি কবিতা সটীক। কর্কশমনা এক সমালোচক বলেছেন, "ঐ টীকাবলী তুষের স্তূপ...।" স্তূপের মধ্যে কিন্তু দৈবাৎ মেলে সোনার কণা।

কোন এক কবির কথা বলতে তরু আমাদের এই জ্ঞানদান করেন যে "গণতান্ত্রিক ফ্রান্সের বর্তমান রাষ্ট্রপতির পূর্বপুরুষ ব্রিটিশ জ্যাকোবাইট ছিলেন........." কিংবা "লামার্তিন্-এর পত্নী ছিলেন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের সূচনায় সিরাজ-উদ্-দৌলা কর্তৃক ব্ল্যাক্ হোলে অবরুদ্ধ গভর্নর হলওয়েলের এক নাতনী।"

দেবভাষার শিক্ষানবিশ তরু সংস্কৃত জ্ঞান-প্রদর্শনের প্রলোভন সামলাতে পারেন না: 'কন্যার মৃত্যুতে' রচিত য়ুগোর এক কবিতা অনুবাদ করে তিনি রামায়ণের এক উদ্ধৃতি পরিবেশন করেন: "তিষ্ঠেন্মৎস্যো বিনা সূর্যং শস্যং বা সলিলং বিনা, ন তু রামং বিনা দেহে তিষ্ঠেত্তু মম জীবিতম্।"

পাঠককে তিনি পরামর্শ দিতে ভোলেন না: "ঐ লাইনগুলি মুখস্থ করার যোগ্য..." কিংবা "এই লেখকের আত্মজীবনী ও ভ্রমণ-কাহিনী পড়ুন, সুধী পাঠক [মানে, আপনি যদি না পড়ে থাকেন আর কি] এবং আমার এই পরামর্শের জন্য আমাকে ধন্যবাদ দিন।"

সমালোচকদের তথা কবিদের সাহিত্যিক ও নৈতিক সার্টিফিকেট বিতরণ করতে তরু পিছপা নন: "স্যাঁৎবভ্-এর সমালোচনা যথার্থ: মিল্ভোয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি..." কিংবা "য়ুগো-র রচনাদির মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যা কিশোর-কিশোরীদের হাতে দেওয়া নিরাপদ নয়।" আর অন্যত্র: "ভিরিয়ো-র উপন্যাসগুলি অধিকাংশ ফরাসী উপন্যাসের মতো, [are] of doubtful taste, if not of doubtful morality." শুধু ভাবি, এই দুঃসাহসিক সাধারণীকরণে উপনীত হবার জন্য তরু কতগুলি ফরাসী উপন্যাস পড়েছেন? 'ল্যা মিজেরাব্ল্' শেষ করতে তাঁর পুরো পাঁচ মাস লেগেছিল!

টীকাবলীতে সন-তারিখের বড় একটা বালাই নেই। বেরাঁজে-র তিনটি কবিতা

অনুবাদ করেও তরু বেরাঁজে-র জীবনী, জন্মকাল, মৃত্যুকালের কোনো উল্লেখই প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন না। এদিকে ১৮৬৭ সালে পরলোকগত বোদল্যায়ারকে তিনি ১৮৭৬ সালে "জীবিত কবি" বলেন।

মা, কবুল করতে দ্বিধা করব না : তরুর 'আঁটির' মধ্যে তুষ যে আছে-ই তা অবশ্যম্বীকার্য : তাঁর পিতার কাছে তিনি সাহিত্যের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে ভালোই শিখেছিলেন ["বাবা আমাকে না শেখালে good poetry কাকে বলে আমি কোনো দিনই বুঝতাম না"], 'স্কলারশিপের' অর্থ শিখেছিলেন কম। আর তবু তুষের মধ্যে এমন সোনার কণা নিশ্চয়ই আছে যার সাক্ষ্যে ই টি টমসন লিখেছেন : "অন্তত টীকা-বলীর জন্যও শীফ্ পুনঃপ্রকাশের যোগ্য।"

এমন এক সোনার কণা আমিও উদ্ধার করেছি। বোদ্‌ল্যার-এর বিষয়ে তরু লিখেছেন :

he borrows, without acknowledgment, too much from English and German sources জার্মান ঋণের কোনো নমুনা তিনি দেননি, দিয়েছেন ইংরাজি ঋণের এক উজ্জ্বল উদাহরণ। Le Guignon নামক কবিতাটির চতুর্দশ পঙ্‌ক্তি আছে : তার এগারো লাইনের জন্য বোদ্‌ল্যার বিদেশী সাহিত্যের কাছে ঋণী : শেষ ছয়টি লাইন ইংরেজ কবি গ্রে-র, পূর্ববর্তী পাঁচ লাইন ইংরেজ কবি লংফেলো-র। এই দুটি ইংরেজি উদ্ধৃতি বোদ্‌ল্যার-এর স্বহস্তে লিখিত এক চিরকুটে পাওয়া গিয়েছে—আর তবু ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে লংফেলো-র কাছে সেই ধারের কথা ফ্রান্সের কোনো সমালোচক উল্লেখ করেন নি।

সাহিত্য ক্ষেত্রে তরুর স্থান নেই, স্থান অর্জন করার সময় পান নি [একুশ বছর বয়সে যক্ষ্মা রোগে মারা না গেলে তিনি কত নাম করতেন কে জানে!], তবে 'ল্যা ফ্লার দ্যু মাল্'-এর প্রামাণিক সংস্করণে তাঁর নাম দিলে এক অভাব পূরণ হবে——ফরাসী সাহিত্যে বাংলা দেশের অস্তিত্বের প্রথম স্বীকৃতি।

কবি তরু

বিদেশে শীফ-এর মাত্র দুটি সমালোচনা বেরিয়েছিল : লিখেছিলেন ইংলণ্ডের 'এক্সামিনার'-এ ই ডবল্যু গস্, আর ছ' মাস পরে ফ্রান্সের 'রভ্যু দ্যা মোঁদ্'-এ এ তরিয়ো।

গ্রন্থটির যথার্থ মূল্য নির্ণয় করে গস্ লিখেছেন : "শীফ্‌টা যদি সত্যকার ভারতীয় অবদান হয়, তাহলে বলতে হবে সংস্কৃতি-প্রগতির ইতিহাসে বইটা এক যুগান্তকারী ঘটনা।" 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'—নেতিবাচকভাবে অবশ্য একই কথা বলে : "শীফ্‌টা ইংরেজ লেখিকার রচনা হলে আমরা, অধিক কিছু না বলে, ডিসমিস

করে দিতে পারতাম।" নিরপেক্ষ বিচারে গস্ শীঘ-এ লক্ষ্য করেছেন "শক্তি ও দুর্বলতার—তথা মহাবিঘ্ন-অতিক্রমকারী প্রতিভা এবং অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতার হাতে পরাজিত মণীষার—এক অদ্ভুত মিশ্রণ।" তাঁর মতে তরুর অনুবাদের প্রধান আকর্ষণীয়তা : কাব্যগুণ-হ্রাসের ঝুঁকি নিয়েও, তাঁর সংযোজনহীন, সংক্ষিপ্তি-রহিত "পরম আর অকৃত্রিম আক্ষরিকতা"।

তরুর আটির মধ্যে তাঁর দিদি অরুর যে আটটি শীষ রয়েছে, তার মধ্যে হুগোর 'মর্নিং সেরেনাড' কবিতাটির অনুবাদের উচ্চ প্রশংসা করেছেন গস্ : "জাত-ইংরেজ কোনো শীলিত কবি শ্রেষ্ঠতর অনুবাদ করতে পারতেন কিনা, সন্দেহ।"

শীঘ-এর যে কোনো দোষ নেই এমন নয় : "অশুদ্ধ ব্যাকরণ, আজব কিংবা নিস্তেজ বাক্যবিন্যাস" [ইংলিশম্যান]। এবং, প্রধানত, ছন্দের দুর্বলতা : "তরু-ব্যবহৃত ছন্দগুলি প্রায়শই অতি সরলতায় আক্রান্ত; ছন্দোরচনাও নিতান্ত অপরিণত" [টম্সন্]; "কখনো-সখনো অনবদ্য তাঁর ইংরেজি ছন্দোলিপি: অন্যত্র ছন্দের নিয়ম সম্পূর্ণ লঙ্ঘিত—স্পষ্টত এই হিন্দু মহিলা-কবি

দানসাদ মিস্ত্রির কথা

দানসাদ মিস্ত্রির মতো লোক সংসারে বড় দুর্লভ। সে জানে না এমন বেশি কাজ নেই। রেডিও সারা, গ্রামোফোন সারা—সাইকেল, মোটর মিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, ঘরামি-গীরি, কাঠে বা কাপড়ে নকশা আঁকা, দেওয়ালে চিত্র আঁকা, জাল বোনা, ঘড়ি সারা, দর্জির কাজ, ছুতোরের কাজ সব তার ভাল জানা আছে।

পান-খাওয়া রাঙা ঠোঁটে তার মিষ্টি হাসিটি লেগে আছে সব সময়। সে নামাজ পড়ে পাঁচওয়াক্ত। মুখে পাতলা হালকা দাড়ি। মাথায় কিস্তির জালিদার টুপি—কখনো থাকে, কখনো আবার থাকে না। সিঙ্গাপুরী চেক লুঙ্গি আর ফতুয়া পরনে। পাতলা গড়ন। পাকা গৌর বর্ণ। বয়স গোটা পঞ্চাশ। বাড়ি চক কাশীপুরে।

মাটির বা ইটের দেওয়াল হয়ে গেলে ডেকে আনো দানসাদ মিস্ত্রিকে। দেওয়ালও সে গেঁথে দিত আগে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাটির 'চাপ' মেরে দিত—কোণ কান একেবারে সোজা—পাকা ঘরের দেওয়ালের মতন। এখন তার দশ টাকা রোজ, আর তাকে সহজে পাওয়াও যায় না—তাই ছোটখাটো পাঁচ টাকা রোজের ঘরামি, বাউরি ঘরামি অথবা পূর্ণ সরদার 'দেলী'কে দিয়ে দেওয়াল গাঁথিয়ে নিতে হয় মাটির হলে। দানসাদ এসে তার ছোট হাত-করাত দিয়ে নিচে বসে বসে সমস্ত বাঁশ, গরান বা শালের খুঁটি, তালের 'আদনা' ডাঁসা, 'প্যাড' 'সরদাল'—সমস্ত কুঁচিয়ে নিয়ে উপরে তুলে কাঠামো খাটিয়ে দেবে। বাঁশের মুখে মুখে ডাঁসাগুলো এমন খিলিয়ে দেবে যে বাঁখারীর 'বাটাং' মারার পর দু-কুটরী ঘরে সাড়ে বারো শো টালি খোলা তুলে দিলেও 'তীর' না লাগিয়েই সমস্ত চাল বা ছাউনী শূন্যে শুধু 'আদনো' বা 'দাঁতনে'র মুখে ভর রেখে দাঁড়িয়ে থাকবে। আড়াই কেজি করে প্রত্যেক খোলাটার ওজন হলে সাড়ে বারো শো খোলার ওজন কত? একত্রিশ কুইণ্টল পঁচিশ কেজি হয় কি? তারপর বাঁশ কাঠ কাঠামোর ওজন আছে। কাজটায় এখন নোদাখালীর বাগদির ছেলে পূর্ণ সরদারও হাতপাকা হয়ে গেছে।

দানসাদের হাতের ঘর আছে এ অঞ্চলে শত শত। তার মতো ফুল-বাঁখারী চাঁছতে পারবে না কেউ। বহু বায়ে শৌখিন বাংলো বাড়ি বাঁধতে হলে দানসাদ মিস্ত্রিকে চাইই। মোড়ল বাবুরা যখন ছবির মতন দোতলা পাকা বাড়িটা বাঁধেন তাঁদের সঙ্গে দানসাদের মতের মিল না হওয়াতে—মুলেত তাঁদের সঙ্গে নয়—কলকাতার একজন হিন্দু রাজমিস্ত্রির সঙ্গে—সে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে আসে। সপ্তাহ দুই পরে মোটর সাই-কেল চেপে অমিয়বাবু স্বয়ং এসে হাজির, 'দানসাদ, তোমাকে যেতে হবে, ইন্দু মিস্ত্রি টেরা-বাঁকা করে ফেলছে দেওয়াল গেঁথে তুলতে। বলছে সিমেণ্ট মশলা দিয়ে ভরাট করে দেবে। মা তাকে, তাড়িয়ে দিয়েছেন। তোমাকে ভাই যেতেই হবে।' দানসাদ চোখে কাঁচ লাগিয়ে ঘড়ি সারছিল তার দলিজে বসে। ছোট্ট দলিজ। বিচিত্র ছবি আঁকা দেওয়ালে। মাটির দেওয়াল 'উলুটি' করা। আয়নার মতন চকচক করছে যেন। গিরি-মাটির রঙে চিত্রিত ছবিগুলি। এই 'উলুটি' করতে গেলে অনেক পরিশ্রম, অনেক খরচ। দানসাদের ঘরের দেওয়াল আরো আশ্চর্য রকমের সুন্দর মসৃন। প্রথমে উলু কুঁচিয়ে কাদায় ছোপ মারতে হয়। পরে পাট কুঁচিয়ে। তারপর তুষ। কুঁড়ো। তারপর দুধেমাটি। শেষ কালে কুসুম বাদ দিয়ে ডিমের লালা দিয়ে সমস্ত দেওয়াল মাজতে হবে। পাকা বাড়ির চাইতেও অনেক খরচ। এ একেবারে প্লাসটিক পেইণ্টের মতো চক-চকে। দানসাদ ঘরামি বটে কিন্তু 'ঘরামির ঘর ফাঁকা' অভিশাপ থেকে মুক্ত।

হঠাৎ কালো রঙের কাপড় পরা দীপ-শিখার মতন অপরূপা এক সুন্দরী যুবতী মাথা এলো করে এসেই জিব কেটে আবার অন্দরে পালিয়ে গেল। অমিয়বাবু আশ্চর্য, দানসাদের বউ নাকি—এত সুন্দরী! এযে একেবারে কাশ্মীরী গোলাপ।

দানসাদ বললে, 'বাবু যাই কি করে বলুন দেখি! অনেক কাজ হাতে। এ-ক'টা মাস চাষীবাসীদের ঘর হচ্ছে। কাঠামোর কাজ হাতে নিয়েছি। অনেকেই গরিব লোক। অনেক কষ্টে দেওয়াল তুলেছে। চোত, বোশেখ, জষ্টি মাসের মধ্যে ঘর শেষ না হলে বিষ্টি নাবলে মাটির দেওয়াল ধুয়ে যাবে। এখন আমাকে মাফ করুন। অন্য রাজমিস্ত্রি কত আছে, তারা কাজ পাচ্ছে না, তাদের ডেকে নিন।'

'না, তা হয় না, তোমাকে যেতেই হবে।' শেষকালে হাতে ধরেন অমিয়বাবু। বি-এ পাশ, সম্ভ্রান্ত লোক, কলকাতায় চা দোকান, মনিহারী দোকান চলে, আগের পুরনো জমিদার। দানসাদ উঠে পড়ে।

'একি করেন বাবু...ঠিক আছে, আমি যাব একদিন...'

'না, এখনি একবার দেখে আসবে চল।'

মোটর সাইকেলে করে অমিয়বাবু তাকে নিয়ে এলেন। এসে সব দেখে সে বড়বাক হয়ে গেল। এক মানুষ উঁচু গাঁথা হয়ে গেছে। এ যেন পার্মানিক অ্যাবসেসের রোগীর সাইটিকা বলে ডাক্তার খুব জাঁকিয়ে চিকিৎসা করে গেছে।

দানসাদ বললে, 'সব ফেলে দিতে হবে। নিচের বনেদ বার করে রাখুন, পরে আমি আসব। এর উপর ঘর গেঁথে তুললে অসমান হবে। অল্পদিন পরে দেওয়ালে ছাদে ক্র্যাক হবে।'

অগত্যা। অনেক টাকা লোকসান। আবার টাকা খরচা করে ভাঙো। দানসাদের নির্দেশ মতো শিরাকোল-বঙ্গ নগর-কাশীরামপুরের ইউসুফ মিস্ত্রি, খোদাবক্স মিস্ত্রিকে ডেকে আনতে হল। অমিয়বাবুর মা দানসাদকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গিয়ে বেশ খাতির করে চা মিষ্টি লুচি খাওয়ালেন—পাছে লোকটা তার পুরনো অপমান মনে পুষে রাখে। বনেদ গাথা, মানে, ভিত্তি পত্তনের সময় ঈশান কোণে কিছু সোনা রুপো দিতে হয় দানসাদ জানাতে বৃদ্ধা মা তাঁর কপালের টিকুলি খুলে দিয়েছিলেন। আর একটা রুপোর ছোট্ট বাটি। গৃহ যে লক্ষ্মী। বসুমাতাকে সন্তুষ্ট করতে হয়। তাঁর যেন অভিশাপ না লাগে।

ইনজিনিয়ারের নকশা দেখে নতুন প্যাটার্নের ঘর গাঁথা হতে লাগল। দানসাদ ছোট মিস্ত্রিদের শুধু ফরমাস দেয়। মাপ জোক করে। 'ওলোন' ধরে। 'কর্নিক' চালায়। 'পাস', 'মাটাম', 'উসো', 'পাটা', 'দস্তি' 'সুরেমি', 'আতান' 'ডউস' ধরে কাজ দেখায় —কাজ শেখায়। ইউসুফ মিস্ত্রি পাকা লোক। খোদাবক্সর রাগ একটু বেশি। খুজি পাতলা—রগচটা লোক! তার বাবরি চুল, মাথায় পাগড়ি, পরনে পাজামা, পাঞ্জাবি ওয়েস্ট কোট। মুখে কাঁচা কালো দাড়ি। রঙ খুব কালো। সারা গায়ে বসন্তর দাগ। ইউসুফ মিস্ত্রি লুঙ্গি শার্ট পরে। ওদের রোজ সাত টাকা করে। অনেক জোগাড়ে লেগেছে। ইট ভাঙছে, সুরকি কুটছে, মশলা মাখাচ্ছে, বালতি করে ভারা বেয়ে বেয়ে মাল তুলছে। মাঝে মাঝে দানসাদ গান করে।

তার গান শুনতে আসে ছেলেমেয়েরা। সামনে বিরাট পুষ্করিণী। ফল ফুলের বাগান। পুরনো আমলের বাড়ি জঙ্গ থেকে গাঁথা হয়ে উঠেছে। মাথায় সিংহ থাব। অমিয়বাবুর ঠাকুর দাদা ওই বাড়ি তৈরি করেন। তখন বিখ্যাত রাজমিস্ত্রি ছিল খোদাবক্সীর জয়নাদ্দি সেখ। বাগানে অর্ধ-নগ্না নারীদের মূর্তি। পাম, ঝাউ, ইউক্কা, ক্যাকটাস গাছ।

অমিয়বাবুর ঠাকুরদাদা রায় সাহেব ঈশান মণ্ডলের নাম শুনলে নাকি যমেও ভয় পেত। গল্প আছে: তিনি একবার শালতি করে ধানবনের মধ্যে দিয়ে আসছিলেন। কে যেন হেঁকে বলে, 'কে যায় হে? ধানের ক্ষতি করলে ঈশান মোড়লের কাছে ধরে নিয়ে যাব। শংকর মাছের ছাঁড় দিয়ে ছাল ছাড়িয়ে নেবে।'

শালতিওয়ালা বলে, 'ঈশান মোড়ল আমার বাপ হয়, তুই কি তার শালা?'

তখন জমিদার ঈশান মণ্ডল করজ চোখ তুলে বিরাট গোঁফ জোড়া নাচিয়ে কৌতুক ভরে শালতিওয়ালাকে শুধোন, 'তুমি জমিদার ঈশান মণ্ডলকে চেনো?'

শালতিওয়ালা বলে, 'না বাবু!'

সেই বাড়িতে কাজ করতে এসেছে দানসাদ।

দানসাদ গাইছিল :

: 'নিশ্চিন্ত একটা গান করো'

'আজ বুঝি তোরে যাবে লইয়া
গো বদরুজান,
আজ বুঝি তোরে যাবে লইয়া॥
বিহান থেকে ঝুঁটি কেন তার
কথা কেন সরে না মুখে আর
চোখের পানি চলে দুখান বইয়া।
গো বদরুজান
আজ বুঝি তোরে যাবে লইয়া॥
টিপির টিপির পানি হয়
বাইয়ে চলে লইয়া।
এতই সাধের আশা পরা
উড়ে গেল দইয়া—
গো বদরুজান
আজ বুঝি তোরে যাবে লইয়া॥'

আমিরবাবুর মেয়ে তিনটি গান শুনে খিল খিল করে হাসে। গলার চলাটি সরেস, দানসাদের বড় মিষ্টি। একেবারে মেঠো দরদের। কলেজে পড়া মেয়েটি, নাম সুনন্দা—সে বলে, 'নিশ্চিন্ত আর একটা গান করো।'

দানসাদ আরম্ভ করে :
'...চাঁদা মাছ উঠিয়া বলে

আর কেঁদো না ভেইয়া
তোমার বিয়েতে যাব
কানের পাশা হইয়া॥
চুনো মাছ উঠিয়া বলে
আর কেঁদো না ভেইয়া
তোমার বিয়েতে যাব
নাকের 'নোলক' হইয়া॥
পালকী চলে হুম হুম
হুম হুম হুম হুম
হুঁস করে ভাই বইয়ো॥
জোরসে হাঁকে হেঁইয়ো
শালী বড় ভারী রে
হুঁস করে ভাই বইয়ো॥'

মেয়েরা আবার হাসতে থাকে। সবাই টিফিন করতে চলে গেলে দানসাদ যখন একা এক কোণের দিকে নকশার কাজ করে, বই কোলে নিয়ে একটা টুলের উপরে বসে থাকে সুনন্দা। গল্প করে ওর সঙ্গে। ওর সংসারের গল্প। বউয়ের নাম নাকি পরী। পরীর মতন ফরসা। তন্বী চেহারা। তার কখনো ছেলেপুলে হয়নি। একেবারে জোয়ান যুবতী। সে কালো রঙের শাড়ি পরে সর্বদা। সুন্দর কাঁথা সেলাই করতে পারে। তার ঘুমের খুব বেশি। দানসাদের একটা মাসি থাকে সংসারে। সেই সব দেখে। মাসির নানান অভিযোগ। সে নাকি রুটি গড়ার সময় 'জিনিস' বা লেচি তৈরি করে কুলোর রেখে দেয় আর বউকে বলে দেখিস যা, ভেড়াটা যেন খেয়ে না নেয়। কিন্তু বউ তার এক গেলাস গরম চা খেয়ে নেবার পরই পিঁড়েয় বসে দেওয়ালে হেলান দিয়ে দিব্যি ঘুমোতে থাকে! আর ভেড়াটা আস্তে আস্তে এসে সব লেচিগুলো খেয়ে নেয় কখন!

সুনন্দা খুব হাসে। বলে, 'তুমি বেশ গল্প বলতে পার।'

দানসাদ মিষ্টি নিচের ঠোঁট মিস্ত্রিদের একবার দেখে কাজের কথা বলে দেয়। তারপরে বলে, 'চোদ্দ' অক্ষরে পয়ার ছন্দে আমি একটা পুঁথি লিখেছি। তার কাহিনী শুনবে নন্দা?'

সুনন্দা মিষ্টি হাসি মাখিয়ে বলে, 'বল।'

'কাহিনীটা আমি একটা উর্দু বইয়ে পেয়েছিলাম। উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দ শহরে যে জগৎ বিখ্যাত মসজিদটি রয়েছে তারই কাহিনী। এটি তৈরি করে চেঙ্গিস খাঁর প্রথম রানী। চেঙ্গিস সৈন্য-সামন্ত নিয়ে দূরে কারাকোরাম পার হয়ে সোনার রাজ্য হিন্দুস্তানের দিকে চলে গেছে। বীর চেঙ্গিস। দুর্দান্ত কষ্টের জীবন তার। বাপের রাজ্য হারিয়ে সে বন্দী হল। ঘাড়ে কাঠের কাঙ। উৎসব রাতে মাতোয়ারা শত্রু শিবির। প্রহরীকে কাঁধে বাঁধা চৌকির মতন ক্যাঙের গুঁতো মেরে ফেলে দিলে তার রানীকে মুক্ত হতে পারলে দেবার লোভ দেখিয়ে শিকল খুলে দেবার পরেই। তারপর দৌড়। পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। জল খাবার জন্যে নদীর তীরে নামল। খাড়া তীর। মুখ বাড়াল ক্যাঙ ঘাড়ে নিয়ে। না পারছে না। পড়ে যাবে। হঠাৎ এক দল ঘোড়সওয়ার এল। তাকে খুঁজছে। শরঝাড়ের ঝোপে সে লুকিয়ে আছে। একটি সৈনিকের চোখে চোখ পড়ল। সে কিছু বলল না।

রাতে কনকনে ঠাণ্ডায় মরুভূমি পেরিয়ে একটা আলো দেখে এসে এক বাড়ির দরজায় আঘাত করতে বেরিয়ে এল সেই সৈনিকটি। সে দলপতি। বললে, 'চেঙ্গিস তুমি!' সে তাড়াতাড়ি ভিতরে এনে ক্যাঙ কেটে ফেলে চেঙ্গিসকে মুক্ত করে গরম দুধ খেতে দিলে। তার বউ তাকে কম্বল চাপা দিয়ে দিলে। কিন্তু খানিকটা পরেই সন্দেহপরায়ণ আর একদল সৈনিক এল। বাঁশের চোঙার দূরবীনে তারা নাকি দূর মরুভূমির আকাশ পটে চেঙ্গিসকে ক্যাঙ ঘাড়ে নিয়ে এদিকে আসতে দেখেছে। মরুভূমির বালিতে স্পষ্ট পায়ের দাগ। সৈনিকদের হাতে বর্শা আর জ্বলন্ত মশাল। তারা বাইরে থেকে ডাকতেই বউটি চেঙ্গিসকে খিড়কি দিয়ে বার করে এনে পশমের গাড়ির মধ্যে গুঁজে দিলে। দলপতির বাড়ি খানাতল্লাসী হল। ক্যাঙটা আগেই পুড়তে ফেলা হয়েছিল। সৈনিকরা পরে এসে বর্শা চালাতে লাগল গাড়ি ভর্তি পশমের মধ্যে। চেঙ্গিসের দেহে তাদের বর্শা গাঁথতে লাগল। রক্ত মুছে গেল পশমে। তারা টের পেলে না। সবাই চলে গেলে দলপতি তাকে টেনে বার করলে। শত ক্ষতের রক্ত ঝরছে চেঙ্গিসের দেহ থেকে। দলপতি একটা

ঘোড়া দিয়ে বললে, এ রাজ্য ছেড়ে পালাও বন্ধু—নিস্তার নেই। বাঁচলে পরে দেখা হবে।"

চেঙ্গিস সেই আহত অবস্থায় ঘোড়া ছুটিয়ে বহু মাইল পার হয়ে এসে এক সময় অজ্ঞান হয়ে এক মরুদ্যানের মাঝখানে পড়ে গেল। তার জ্বর হয়েছে। ঘোড়াটা সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। পরে একদল বেদুইন এসে চেঙ্গিসকে তুলে নিয়ে যায়। এবং চেঙ্গিস পরে তাদের দলপতি হয়ে হৃত রাজ্য আর রানীকে উদ্ধার করে।

এটি হল চেঙ্গিসের দুঃখময় জীবনের ভূমিকা। মসজিদ তৈরির কাহিনী এরপর। চেঙ্গিস এক বৎসর পরে দেশে ফেরার কথা বলে রাজ্য জয় করতে বেরিয়ে গেলে রানী রাজ্যে ঘোষণা করে দেয় যে সে একটি জগৎ বিখ্যাত মসজিদ করাতে চায়। তার নকশা তৈরি করে আনুক শিল্পীরা। অনেক শিল্পী তাদের নকশা নিয়ে এল। কোনোটাই পছন্দ নয়। নতুন কিছু চায় সে। শেষে একটি নকশা এল। রানীর খুব পছন্দ হল। রানী তাকে দেখেই তো অবাক। অপরূপ সুন্দর এক যুবক। এমন রূপ যে মানুষের থাকতে পারে রানী তা কল্পনাও করে নি। স্বর্ণাভ ঢেউ খেলানো চুল, নীল চোখ দুটি যেন মায়াময় ঝিলকে। নাকের গড়ন কি অপূর্ব! শিল্পীকে রানী বললে, এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পাবে কিন্তু যদি এক বছরের মধ্যে মসজিদ তৈরি না করতে পার তাহলে তোমার গর্দান যাবে। কেন না আমি চাই জগৎ-জয়ী বীর চেঙ্গিসকে জিততে। তিনি এসে এই মসজিদ দেখে যেন স্তব্ধ হয়ে যান। যেন মনে করেন যাদুমন্ত্র বলে কোনো যাদুকর স্বর্গ থেকে এই সাদা রূপোর প্রাসাদ তুলে এনে তাসখন্দের বাগিচায় বসিয়ে দিয়ে গেছে।"

শিল্পী রাজি হল। রানীর রূপে সেও মোহিত হয়ে গেছে।

মসজিদের ভিত্তি স্থাপিত হল। শত শত উট মাল বইছে। দামী পাথর আসছে। হাজার হাজার লোক কাজ করছে।

মানুষ-সমান গাঁথা হবার পরে একদিন রানী তার সহচরীকে সঙ্গে নিয়ে কাজ দেখতে এল। সূর্য তখন অস্তাচলে। শিল্পী মিনহাজ বেগ দাঁড়িয়ে আছে ভিত্তির উপরে। বোরখার নেকাব তুলতেই তার সঙ্গে চোখো-চোখি হল রানীর। অস্ত সূর্যের রাঙা রশ্মি পড়েছে রানীর গোলাপ-কোমল মুখে। সেই অপরূপ দৃশ্যে শিল্পী মুগ্ধ হল।

সহচরী তাকে ইঙ্গিতে ডাক দিলে।

সন্ধ্যার পাতলা অন্ধকার। চেনার গাছের নিচে এসে দাঁড়াল রানী। তার সামনে শিল্পী মিনহাজ বেগ। রানী হাত ধরলে শিল্পীর। দুজনে নির্বাক। কাঁপতে লাগল শুধু। দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। মশালের আলো এসে পড়ছে দূরে থেকে মাঝে মাঝে। চলন্ত উটের ছায়া চলেছে দীর্ঘ হয়ে দিগন্তের কোল পর্যন্ত। আখরোট, খেজুর, খুবানি, চেরী, পাইন, কার গাছের মধ্যে কুয়াশা—বরফের হালকা পেঁজা তুলো ভাসতে ভাসতে পাতায় পাতায় ঘসে ঘসে জমছে আলতো পায়ে পায়ে। অনেক রাতে জমা বরফগুলো ছুঁচলো পাইন পাতা থেকে খসে পড়বে কাঁচের মতন ঝনাৎ করে।

তারপর হঠাৎ যদি ভয়ংকর তুষার-ঝড় ওঠে, তার গাছগুলো ফেড়ে চৌচির হয়ে যাবে। তাঁবু লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে শিল্পীর।

সহচরী সামনে এল। হাত ছেড়ে গেল। চেঙ্গিসের চর আছে। জানতে পারলে শিল্পীর প্রাণ যাবে।

তাঁবুতে ফিরে এল শিল্পী।

রাজমিস্ত্রিরা পরদিনের কাজ বুঝে নিয়ে চলে গেল। শিল্পীর চোখে ঘুম নেই। সে চেয়ে থাকে মসজিদের দিকে। তারপর ছয় মাস কেটে গেল বহু আয়াস-কষ্ট, স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে।

রানীকে দেখতে না পেয়ে শিল্পীর মন শ্রান্ত হল। মসজিদের প্রাথমিক কাজ সব শেষ। এবার বাইরের গাঁথুনি। নকশার কাজ। শিল্পীর নিজের কাজ। কিন্তু রাত জাগার জন্যে তার হঠাৎ খুব ঠাণ্ডা লেগে জ্বর এসে গেল। জ্ঞান হারালে শিল্পী। রানী হেকিম পাঠালো নিজে এল একদিন তার তাঁবুতে। কাজকাম সব বন্ধ। চিকিৎসার পর শিল্পীর জ্ঞান ফিরতে সে দেখলে তার স্বপ্নের দেবী তার মাথাটা কোলে নিয়ে বসে আছে যেন রোগগ্রস্ত সন্তানকে নিয়ে মায়ের মতন। শিল্পীর আবার জ্ঞান হারাল।

দীর্ঘ পনরো দিন পরে যেদিন সে আরোগ্যলাভ করে কাজে হাত দিলে কোনো কাজই করতে পারলে না সে। উদাস মনে শুধু বসে রইল। রানী এল আবার বাগানে।

শিল্পী সেই চেনায় বৃক্ষের তলায় এসে রানীর সামনে নতজানু হয়ে ক্ষমা চাইলে।

'রানী, আমাকে মুক্তি দিন। না হয় গর্দান নিন। আমি আর পারছি না।'

রানী তাকে তুলে দুহাতে তার মুখটা ধরলে।

শুধোলে, 'মনে হচ্ছে তুমি ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত। কি তোমার অভাব, অভিযোগ? টাকা চাও, সোনা চাও?'

'না। তা যা দিচ্ছেন অনেক। কেবল ভাবছি চেঙ্গিসের কথা। রক্ত মাংসের নিষ্ঠুর এক পাষণ্ড কিনা আপনার মতন গোলাপকে পুরে রেখেছে হারেমে। আপনি কি সুখী? আপনার বুক কি ভরেছে তাকে পেয়ে?'

রানী হাসলে। বললে, 'সবাই সব কি পায়? তুমি কি পেয়েছ?'

'যা সুন্দর, যা মহৎ, যা ঐশ্বরিক তাকে আমি উপলব্ধি করি। সেটা শিল্পীর [illegible] জীবনে এক অভিশাপ। [illegible] তার কাছে, কিন্তু [illegible] ওঠে, তাকে বন্ধু আমাদের পাওয়া যায় না।'

'কি চাও তুমি?'

'মুক্তি।'

'পাবে না। [illegible] আমি দেব। আমি চাই তুমি অনুপ্রেরণা পাও। [illegible] শক্তি পাও। [illegible] ফিরে পাও আবার। কি চাও তুমি শিল্পী?'

শিল্পী কম্পিত। বিস্ময়ে। সে রানীকে বলতে চাইলে, চাই তোমাকে কিন্তু বলতে পারলে না। কোথায় যেন পাষাণ-চেতনা সেখানে। রানী হয়তো উত্তর দেবে, সুন্দরী রানী, সোনা রুপো, হীরে মণি মুক্তো বন্দী থাকে পাষণ্ড [illegible] মানুষদের [illegible]। চেঙ্গিস তার মূর্ত প্রতীক। সে তোমাকে পেতে [illegible] টুকরো করে [illegible] ফেলবে,

ঃ আমি চাই বহু মূল্যের অমূল্য জিনিস। তা কি দিতে পারবেন রানী?

[illegible] খুঁজে পাবে। অতএব যা [illegible] তাই চাও শিল্পী।

শিল্পী [illegible] বললে, 'আমি চাই বহু মূল্যের অমূল্য জিনিস। তা কি দিতে পারবেন রানী? আমি চাই শুধু মাত্র একটি চুম্বন। আর কিছু নয়।'

রানী হাসলে। শিল্পীর কাছে [illegible] মুখখানা তুলে ধরলে। শিল্পী চুম্বন করলে।

বললে, 'একটি চুম্বনের [illegible] এই সৌধপুরী তোমাকে [illegible] দিয়ে গেলাম রাজেন্দ্রাণী! শুধু, আমার [illegible] কাছে [illegible] রেখো।'

[illegible] সৌধপুরী তৈরি হয়ে গেল।

[illegible] সাদা [illegible]

মাঠের উপরে দাঁড়াল সৌধপুরী।

সহসা সংবাদ এল চেঙ্গিস খাঁ ফিরে এসেছে শহরে বিপুল বাহিনী নিয়ে।

চেঙ্গিস এসে সৌধপুরী দেখেই তো হতবাক। এ আবার কোথায় থেকে এল। রানী হেসে বললে, 'এক যাদুকর এনে দিয়েছে স্বর্গ থেকে।'

'তাই তো দেখছি। কোথায় সেই যাদুকর? আজ তাকে আমি পুরস্কৃত করতে চাই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা।'

দরবার বসলে শিল্পীর ডাক পড়ল।

কিন্তু শিল্পী কোথায়? তাকে নাকি কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! তার সহকারী শিষ্য এসে বললে, 'ওই সৌধপুরীর শেষ শিখর [illegible] যখন গাঁথা হয়, [illegible] অবাক কাণ্ড, [illegible] ঐ নীল আকাশে সোনার আলো ছড়িয়ে চলে গেলেন দু'বাহু মেলে। এই সৌধ তৈরি করবার জন্যে তিনি এসেছিলেন — আর কোনোদিন ফিরবেন না।'

রানীর দু'গাল বেয়ে [illegible] চোখের জল ঝরে পড়তে লাগল নীরবে।'

কাহিনী শুনে সুনন্দা নির্বাক হয়ে গেল। একজন রাজমিস্ত্রি বলে কি? কোথাকার কি মানুষ? যে তাজমহল তৈরি করেছিল সেও তো ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে নি! বৈজ্ঞানিক ইঞ্জিনিয়াররা ছাঁচে গড়া জিনিসকে রূপ দেন। তাঁরা স্বপ্নকে [illegible] রূপ দিতে পারেন না। কাজের [illegible] অশিক্ষিত এই [illegible] মানুষ। বাইরে থেকে মনে হয় এরা অশিক্ষিত, অভদ্র, দরিদ্র, [illegible]। কিন্তু ভিতরে যে শিল্পী। তার তুলনা নেই।

[illegible] এবং সুনন্দা অনেকক্ষণ কথা বললে না। পরে [illegible] বললে, [illegible] লেখার জন্যে [illegible] লাখ টাকার সোনার [illegible] কথা ছিল। কিন্তু [illegible] কিছু কম নিতে চাইলে কবি বললেন, রাজার কথার যদি খেলাপ হয় তবে সাধারণ মানুষ কি করবে? অতএব তিনি নিলেন না।'

আবার অনেকক্ষণ চুপচাপ।

[illegible]দের হাত চলছে ঠিকই। কোন তৈরি করছে সে মন দিয়ে। সুনন্দ এক সময় চা এনে দিতে সে খুশী হয়। বলে, 'মা তোমার মনটা ভাল। ভাল মানুষ হওয়াও সংসারে বড় লাভ। নাই বা জগৎ বিখ্যাত হলে। তবু সৎ হাত বাঁধা কিসের। তার দামও অনেক। জানো মা, কলকাতায় একবার এক পণ্ডিত গুণী লোকের বাড়ি তৈরি করতে যাই আমি। এক মিস্ত্রি আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। লেখক মশায় মুসলমান, অগাধ পাণ্ডিত্য। আমার সঙ্গে গল্প করতেন। একদিন তাঁর ঘাড় মেরে দিলাম, রোজও মেরে দিলাম। বেতের চেয়ার বুনে দিলাম। তিনি একদিন কোরআন শরীফের একটি

আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা শোনাতে আমি খুব বিনয়ের সঙ্গে আপত্তি করলাম এবং আমার বক্তব্য শোনালাম। তিনি তো অবাক! একজন রাজমিস্ত্রি বলে কি? কিন্তু আমি যে ভাল আরবী, উর্দু, ফারসি জানি। শুধু ইংরিজি জানি না, পড়তে পারি—ভাল মনে বুঝি না।'

মিস্ত্রির কথায় সুনন্দা প্রতি মিনিটে যেন অবাক হয়। তার বাপকে সে সব কথা বলে। ঠাকুরমা শুনে বলেন, 'ওরাই তো মানুষ! ওরা তো আধুনিক ঢ্যাড়োস নয়?'

বেলা শেষে কাজকাম ছেড়ে তিনজন রাজমিস্ত্রি যখন মগরেবের নামাজ পড়ে বাগানের ঝাউ গাছটার তলায়, অমিয় বাবুর মা স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকেন।

চলে যাবার সময় দানসাদকে তিনি ডাকেন। বলেন, 'হাঁ বাবা দানসাদ, তোর ছেলেমেয়েদের আন না একদিন।'

'না মা, তারা ভীষণ দুষ্টু। একেবারে চেঙ্গিস খাঁ নাদির শাহ্। তারা সব আপনাদের বাগান-টাগান তছরূপ করে দেবে। একেবারে খাঁটি মুসলমানের বাচ্চা!' কথা বলে হাহা করে হাসে দানসাদ।

মাও হাসেন।

সুনন্দা বলে, 'কিন্তু আপনি যে দানসাদ-কাকা বললেন, আমার ছেলেপুলে নেই?'

'হে হে মা, তা কি এই মায়ের সামনে বলতে আছে? মা যে মনে কষ্ট পাবেন! ঐ দেখ দেখ, মায়ের চোখ কাঁপছে বেচারা নিঃসন্তান রাজমিস্ত্রির কথা ভেবে।'

মা হাসলেন। কিন্তু সত্যিই তাঁর চোখ দুটোতে সহানুভূতির কুয়াশা ঝাপসা করে এসেছিল।

রাজমিস্ত্রিরা চলে গেল রোজ যেমন সন্ধ্যার সময় যায়।

পরদিন আবার গল্প শুনতে এল সুনন্দা।

'কাকা গল্প বলুন।'

দানসাদ বললে আমাকে 'তুমি' বলবে। আমরা সাধারণ লোক। শ্রমিক মজুর। আর তা ছাড়া যারা বাবা মা কাকা মামা আত্মীয়স্বজনকে 'আপনি' বলে তারা যেন বড্ড বেশি শৌখিন—মাটি ছাড়া। 'তুমি'র ভিতরে আত্মিক রস আছে।'

'বেশ, তুমি গল্প বল।'

'এই তো মায়ের মতন কথা! তুই বেটি যদি আমার মেয়ে হতিস! শালা, এমন কপাল আমার, একটা মেয়ে পর্যন্ত হল না। আর ঐ খোদাবক্স মিস্ত্রির খালি ন-টা ছেলেমেয়ে!'

'আমি তোমার মেয়ে হলে কি করতে।'

'তোর বিয়ে দিতুম।'

'যাও!'

খোদাবক্স হাহা করে হাসতে থাকে। সে তখন দানসাদের কাছে কাজ করছিল।

হঠাৎ দানসাদ মহারোগে যায় খোদাবক্সর উপরে—বলে, 'এই কি তোর কাজ হল? এই কোণটা থাকবে কেন? ঝুরো মশলা। কেন সিমেণ্ট কি কম পড়েছে ওদের? এই ছোঁড়ারা—কি কাজ হচ্ছে—না। গল্প মারছিস? ক'বার 'জিরেন' দিস বা! বাবুদের কাজ না? 'উষোঢিলে' মেরে গেছ সব। যতসব ওলাউঠো জুটেছে এখানে।

দানসাদ ভীষণ পান খায়। সুনন্দা এক ডিবে পান এনে দেয়। মাঝে মাঝে সেও তার পাঠ্যপুস্তকের গল্প বলে শোনায়। তাজমহলের কথা উঠতে দানসাদ ইরানী শিল্পীদের কথা বলে। সে নাকি তাজমহল দেখে এসেছে আজমীর শরীফ থেকে তীর্থ করে ফেরার পথে। বলে, 'বড় আশ্চর্য সৌধ মা। যারা গরিব মানুষ—এর পাথরের কি দাম, নকশার কাজের কত পরিশ্রম, কত অর্থ ব্যয়—ধারণা করতে পারবে না। আর মহাআশ্চর্য যে, সেকালেও মোজাইক হত। তাজমহল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমি দেখেছি। জ্যামিতির মাপ জোক দেখেছি। সব ঠিক আছে। শুধু ইনজিনিয়াররা এটা তৈরি করতে পারবে না। একই সঙ্গে শিল্পকলাও জানা চাই। যেমন কবি যদি গান লিখে নিজেই সুর দেয়, নিজেই গান গায়, তার মূল্য অন্য। এখন একজন লেখে, অন্যজন সুর দেয়, আর একজন গায়। কাজেই বেশির ভাগ ফালতু। তবে তাজমহলের মধ্যে একটা দৃষ্টিকটু ব্যাপার চোখে পড়েছে আমার। সেটা হল, মাঝখানে বেগমের কবর, তার এক পাশে বাদশার যে কবরটি। অন্যপাশে জায়গার ফাঁকটা একটু বেশি। চট করে অবশ্য চোখে পড়বে না। অনেকেই কবর, আলো, ফুল, দৃশ্য—এইসবেই মোহিত হয়; আমরা তো রাজমিস্ত্রি, ওসব না দেখে নিখুঁত মাপ-জোক দেখি। যেমন মুচিরা গোটা মানুষটাকে না দেখে, দেখে তার জুতো! স্বপ্নরসিক বাদশাহ শাহজাহান এর জন্য দায়ী নন, দোষী তাঁর পুত্র আওরঙ্গজেব! যিনি স্বদেশ-উদ্ধারকামী শিবাজীর শত্রুতায় তাঁর নাবালক নিরপরাধ কিশোর পুত্র শাহুজীর জিব টেনে ছিঁড়ে ফেলেছিলেন, যিনি দারা সিকোর মতো মহানুভব মানুষের গর্দান নিয়ে ছিলেন নাকি ধর্মের কথা ভেবে! আহা কি ধর্মের চাঁই তিনি! হতে পারেন তিনি জগতের একজন শ্রেষ্ঠ কূটনীতিক, গোঁড়া ধর্মপ্রেমী, কিন্তু তার ফলাফল কী? মোগল-রাজ্য তাঁর জন্যই তো হারাল। যেই তাঁর হাত থেকে তলোয়ার খসে পড়ল অমনি চারদিক থেকে বিদ্রোহ, আর বিভীষিকা জাগল। তাজের মতন একটা সুন্দর জিনিসকে তিনি বুঝতে পারলেন না, মায়ের পাশে বাবাকে শুইয়ে দিলেন—খরচ বাঁচালেন, কিন্তু নাকি বিসদৃশ ফাঁকটাকে তিনি নিজে শুয়ে ভরাট করলেন না কেন? খরচ আরো বাঁচত।'

'চেঙ্গিস তুমি বুঝবে কি রাণীর চোখে জল কেন?'

দানসাদ হা হা করে হাসে। অদ্ভুত তো লোকটা!

—আবদুল জব্বার

॥ ২৯ ॥

টুলটুল কিছুতেই ঘুমোবে না, একগাদা খেলনা ছড়িয়ে সে বসেছিল। বাড়িতে আর ছোট কেউ নেই, পাশের বাড়ির দু' একটা ছেলেমেয়ে মাঝে মাঝে খেলতে আসে বটে, কিন্তু টুলটুলের বিশেষ কোনো বন্ধু হয় নি। অধিকাংশ সময়েই সে একা একা খেলে, পুতুলদের সঙ্গে একা একা কথা বলে। পুতুলগুলোকে সে সাজায়, জামা-কাপড় পরায়, চুল আঁচড়ে দেয়, যে পুতুলটা দুষ্টু, তাকে বকুনি দেয়।

টুলটুলের পুতুলের সংসারটি বেশ বড়, সব শুদ্ধ নটি ছেলে ও মেয়ে, একটা ভাল্লুক, দুটো কুকুর তারা বিয়ে থা করে নিশ্চিন্তে ঘর সংসার করছে। টুলটুলের পুতুল খেলার জগতে কোনো অশান্তি নেই।

অপর্ণা সাধ্যমতন টুলটুলকে প্রায়ই নতুন পুতুল কিনে দেয়। পাশের বাড়ির মেয়ে বাবলির মামা জার্মানি থেকে বাবলির জন্য একটা চমৎকার পুতুল এনেছে, ফ্রক পরা মেমসাহেব—চাবি দিলেই ঘুরে ঘুরে নাচে, আর নাচের তালে তালে টুং টাং শব্দ হয়। টুলটুল ঐ রকম একটা পুতুল কেনার জন্য খুব কান্নাকাটি করেছিল। অপর্ণা অনেক খুঁজেও ঠিক ঐ রকম পুতুল পায় নি কলকাতার কোনো দোকানে। টুলটুলের বাবা সাত বছর জার্মানিতে আছে, কোনো-দিন একটা খেলনা পাঠায়নি মেয়ের জন্য।

একটা দুষ্টু পুতুল কিছুতেই ঘুমোবে না, টুলটুল তাকে জোর করে শুইয়ে চাপড়ে চাপড়ে ঘুম পাড়াচ্ছিল আর বলছিল, শিগগির ঘুমিয়ে পড়ো, নইলে সন্ধেবেলা পড়তে বসলেই ঘুম পাবে! পড়াশুনো না করলে সবাই নিন্দে করবে। ঘুমোও বলছি! —এই সময় অপর্ণা এসে টুলটুলকে প্রায় ঠিক একই রকম কথা বললো, আয়, এবার ঘুমোবি আয়! পুতুল রেখে দে! নইলে সন্ধেবেলা মাস্টারমশাই এলেই তো ঘুমোবি।

টুলটুল কিছুতেই ঘুমোতে যাবে না—বিশেষত পুতুলের সামনেই তাকে ও-কথা বলায় তার মনে খুব লেগেছে। অপর্ণা জোর করে তুলে নিয়ে গেল তাকে। এমনিতে শান্ত স্বভাবের, কিন্তু আজ একেবারে হাত পা ছুঁড়ে কাঁদতে লাগলো। অপর্ণা তাকে কোলের ওপর ঠেসে শুইয়ে দু' হাতে চাপড়াতে চাপড়াতে বললো, ঘুমোও শিগগির! ইস্কুল ছুটি থাকলেই আজকাল তুমি একদম পড়াশুনো করো না! এরকম করলে আর ফার্স্ট তো হবেই না, ফেল করবে।

অপর্ণা মেয়েকে কাঁদায় না সাধারণত। কখনো টুলটুল একটু বেশী বায়নাক্কা করলেও নানা রকম গল্প বলে ভোলায়। টুলটুল ঘুমোতে না চাইলেও খুব বেশী জোর করে না, পাশে শুইয়ে রাখে। আজ সে বড্ড বেশী অধৈর্য হয়ে পড়ছে। ঝাঁঝালো গলায় বললো, তুই বড্ড জ্বালাচ্ছিস আমাকে! একটা কথা শুনতে পারিস্ না! বলছি ঘুমোতে—

রাগের মাথায় অপর্ণা টুলটুলকে বেশ জোরেই একটা চড় মেরে বসলো। মায়ের কাছ থেকে কোনোদিন মার খায় না, আজ মায়ের হাতের চড় খেয়ে ব্যথার চেয়েও অভিমানে একেবারে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো টুলটুল। অপর্ণার রাগ কমলো না, বললো, আবার কান্না? আবার মারবো কিন্তু! চোখ বোজো! চোখ বোজো বলছি!

আর মারার দরকার হলো না, কাঁদতে কাঁদতেই একসময় ঘুমিয়ে পড়লো, অপর্ণা তাকে আস্তে আস্তে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে, একটা পাতলা চাদর টেনে দিল গায়ে, মাথার কাছের জানলা বন্ধ করে দিল, যাতে রোদ না লাগে চোখে। তারপর অপর্ণা আয়নার সামনে দাঁড়ালো চুল বাঁধতে।

মিনিট পনেরোর মধ্যে সেজেগুজে তৈরী হয়ে নিল অপর্ণা। অনেকদিন বাদে আজ সে বেশ যত্ন করে সেজেছে। উগ্র কিছু করেনি, কালো পেন্সিলে চোখ আঁকেনি, তবু তার মুখে এসেছে মসৃণ লাবণ্য। আকাশী নীল রঙের শাড়ির সঙ্গে মিলিয়ে পরেছে ব্লাউজ ও চটি, আপন মনেই একটা মুচকি হেসে কপালে একটা নীল টিপ পরলো। কানের পেছনে, ঘাড়ে ও বুকে ছিটিয়ে দিল ওডিকোলন, দু' হাতের কনুইতে লাগালো একটু ক্রিম। এক সময় অপর্ণা সাজতে খুব ভালোবাসতো; অনেকদিন মাঝখানে তার

সাজের সব জিনিস আলমারিতে তোলা ছিল, কিন্তু তোলেনি কিছুই।

শব্দে যাতে টুলটুলের ঘুম না ভাঙে, এইজন্য খুব সাবধানে ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার খুলে বার করলো তার হাত ব্যাগ আর একটা চামড়ায় বাঁধানো খাতা। তারপর টুলটুলের দিকে আর একবার তাকাতেই তার খুব মন খারাপ হয়ে গেল—নিজের সন্তানকে চড় চাপড় মারার পর পৃথিবীর সব মায়েদেরই যেমন মন খারাপ হয়! মেঝেতে ছড়িয়ে আছে টুলটুলের পুতুলগুলো, বিছানায় সে কাৎ হয়ে শুয়ে আছে, মুখে এখন কান্নার ভাব নেই, কিন্তু চোখের নিচে শুকনো জলের রেখা। আঁচল দিয়ে আলতো করে চোখের জলের দাগ মুছে দিয়ে অপর্ণা টুলটুলের কপালে একবার ঠোঁট ছোঁয়ালো। মনে মনে বললো, কি করবো, যতক্ষণ জেগে থাকবে, কিছুতেই তো আমাকে বাড়ি থেকে বেরুতে দেবে না!

অপর্ণা বাবার ঘরে গিয়ে দেখলো, বাবা চোখ বুজে শুয়ে আছেন। ঘুমিয়ে আছেন কিংবা চিন্তামগ্ন, বোঝা যায় না। অপর্ণা নিচু গলায় দুবার ডাকলো, বাবা, বাবা! কোনো উত্তর নেই। তৃতীয়বার ডাকতেই কিন্তু রাসমোহন সাড়া দিলেন, চোখ না খুলেই বললেন, কি?

—বাবা, আমি একটু বেরুচ্ছি। টুলটুল ঘুমিয়ে রইলো, যদি উঠে পড়ে...

—আচ্ছা। ওর খাবার তৈরী আছে?

—হ্যাঁ। পানুর মা বিকেলে এসে ওকে খাইয়ে দেবে।

—আচ্ছা।

একবারও চোখ খুললেন না রাসমোহন, একবারও মেয়ের দিকে তাকালেন না। যেমন শুয়ে ছিলেন, তেমনি রইলেন, ঘুমোচ্ছেন না বোঝা যায়। গত দুদিন ধরেই রাসমোহন অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর হয়ে গেছেন, সব সময় কি যেন চিন্তা করছেন।

অপর্ণা দীপুর ঘরের দিকে একবার তাকালো। দীপু যে এসময় বাড়ি থাকবে না, তা তো জানাই কথা। বাড়ি থেকে বেরিয়ে অপর্ণা একটু দ্রুত ট্রাম রাস্তার দিকে হাঁটতে লাগলো।

—কি, এত দেরী?

—কই, খুব দেরী হয়েছে কি? মাত্র সাত মিনিট।

ছিপছিপে লম্বা চেহারা, তীক্ষ্ণ নাক, ওল্টানো ঘন চুল, চোখে মোটা কালো চশমা—অনিমেষ চক্রবর্তীকে মেয়েদের চোখে নিশ্চয়ই খুব সুন্দর মনে হবে। বাংলার অধ্যাপক হয়েও অনিমেষ সাধারণত প্যান্ট-সার্ট পরে, আজ ধুতি ও পাঞ্জাবি পরেছে, এই পোশাকেও তাকে ভালো মানায়।

অনিমেষ হাত তুলে ট্যাক্সি থামাবার চেষ্টা করতে করতে বললো, কলেজে চাকরি করার কি ঝঞ্ঝাট, তা তো জানেন না! কোথাও একটু দাঁড়িয়ে থাকলেই প্রতি মিনিটে দুজন করে অন্তত ছাত্র ছাত্রীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়!

অপর্ণা জিজ্ঞেস করলো, আমরা কত-দূরে যাবো?

—আপনি গীতা ভবন চেনেন না? এই তো দেশপ্রিয় পার্কের কাছে।

—ট্যাক্সিতে যেতে হবে? বাসে গেলে হয় না?

অনিমেষের ঝকঝকে মুখে হাসি খেলে গেল, জিজ্ঞেস করলো, কেন, আপত্তি আছে?

অপর্ণা লজ্জিতভাবে বললো, না, তবে বাসে গেলে যদি চলে, তাহলে শুধু শুধু ট্যাক্সিতে—

অনিমেষ ঘড়ি দেখলো, বললো, একটু দেরী হলেও অবশ্য কিছু ক্ষতি নেই। তবে, ঐ যে বললুম, অধ্যাপক হয়ে যদি আপনার মতন একজন অসামান্য সুন্দরী যুবতীকে নিয়ে বাসে উঠি, কোনো না কোনো ছাত্র বা ছাত্রী দেখে ফেলবেই। অবশ্য দেখে ফেললেও, আই ডোন্ট মাইন্ড—

—আপনার সৌন্দর্যবোধের খুব প্রশংসা করা যায় না।

—কেন?

—আমাকে যদি অসামান্য সুন্দরী বলেন, তাহলে ঐ মেয়েটিকে কি বলবেন?

বিপরীত ফুটপাথে আর একটি মেয়ে হেঁটে যাচ্ছে, সত্যিই অপর্ণার চেয়ে অনেক বেশী সুন্দরী এবং তার রূপের ঔজ্জ্বল্য সে ঠিকমতন ছড়াতে জানে। অনিমেষ কিন্তু খুব সপ্রতিভভাবে বললো, ঐ মেয়েটি এমন কিছু নয়। বিউটি ইজ অ্যান এক্সপীরিয়েন্স। আমার চোখে এই মুহূর্তে আপনিই—

শেষ পর্যন্ত বাসেই এলো। দেশপ্রিয় পার্কের ভেতর দিয়ে ঘুরে যখন ওরা গীতা ভবনে পৌঁছলো, তখন অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়ে গেছে, বেশ ভিড়, মাইকে ঘোষণা হলো, এবার কবিতা পড়বেন, তারাপদ রায়—

তারাপদ রায় গমগমে গলায় কবিতা পড়ছেন, ওরা ভিড় ঠেলে এসে বসলো একেবারে সামনের দিকে। অপর্ণার এখন একটু নার্ভাস লাগছে, এসব অনুষ্ঠানে সে আগে কখনো আসে নি, ভেতরে ভেতরে তার বুক কাঁপছে এবং ক্ষীণভাবে মনে হচ্ছে, না এলেই ভালো হতো!

অনিমেষ ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো, আপনার লেখা এনেছেন তো?

অপর্ণা উত্তর দিল না, লাজুকভাবে মাথা নিচু করে রইলো। অনিমেষ বুঝতে পারলো ওর অবস্থা। কথা বলে বলে ওর লজ্জা ভাঙাবার জন্যই বললো, আপনি এখানে কাকে কাকে চেনেন?

—কারুকে না।

—এখানে অনেকে উপস্থিত আছেন। ঠিক আছে, শেষ হয়ে যাক আপনার সঙ্গে সবার আলাপ করিয়ে দেবো।

অপর্ণা তাড়াতাড়ি বললো, না, না, আমার সঙ্গে আলাপ করাতে হবে না। আমি একটা কি, অতি সাধারণ; কিছুই লিখতে পারি না, আমার সঙ্গে আলাপ করে ওঁরা সময় নষ্ট করবেন কেন?

অনিমেষ মুচকি হেসে বললো, মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করলে সময় নষ্ট হয় নাকি? আপনার সঙ্গে আলাপ হবার পরই তো আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়—

কথাটা চাপা দেবার জন্য অপর্ণা অন্যদিকে মুখ ফেরালো। যে-দিকে অপর্ণার চোখ, সেদিকে চোখ রেখে অনিমেষ বললো, একেবারে প্রথম সারির কোণের দিকে যাঁকে দেখছেন, ওঁর নাম নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। ঐ যে, খুব লম্বা—উনি কথা বলছেন সন্তোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। ওঁদের ঠিক পেছনেই বসে আছেন শঙ্খ ঘোষ—ঐ যে মুখ নিচু করে আছেন, তাঁর পাশে বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত—দেখতে পেয়েছেন তো, গেরুয়া পাঞ্জাবি।

অপর্ণা বললো, আপনি এখানে ওঁদের সঙ্গে বসবেন না?

—না, আমি এখানেই বেশ ভালো আছি। আপনার ডান দিকে দেখুন, ফোর্থ না ফিফথ্ লাইনে—একটা ছেলের হাতে একটা কাগজ দিচ্ছেন, উনি শক্তি চট্টোপাধ্যায়। দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে আছেন শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, প্যান্ট পরা, তাঁর পাশে সুনীল গাঙ্গুলি—অমু তাঁর পাশে—

অনিমেষ বলে যাচ্ছে ফিসফিস করে, কিন্তু অপর্ণা তেমন উৎসুকভাবে দেখছে না। তার বুকের মধ্যে এখনো কাঁপছে একটু একটু। এখনো চলে যাওয়া যায় না? এতগুলো লোকের সামনে সে নিজের লেখা পড়ে শোনাবে কি করে?

এর পরেই অনিমেষের ডাক পড়লো। অনিমেষ নিজে শুরু করার আগে উদ্যোক্তাদের ফিসফিস করে কি যেন বললো, তারপর পকেট থেকে কাগজ বার করে পড়তে শুরু করলো। অনিমেষ খুব ভালো পড়তে পারে প্রতিটি উচ্চারণ স্পষ্ট, গলার আওয়াজও বেশ জোরালো। অনিমেষ বেশ জনপ্রিয়, দুটি কবিতা পড়ার পরও কেউ

কেউ অনুরোধ করলো তাকে আর একটি পড়তে।

জায়গায় ফিরে এসে অনিমেষ নিজেই জিজ্ঞেস করলো, কি রকম লাগলো? সত্যিই মন্দ ভালো লেগেছে, একথাটা জানাতেও লজ্জা করলো অপর্ণার। সে শুধু লাজুক-ভাবে হাসলো। অনিমেষ হেসে বললো, বুঝেছি, তার মানে ভালো লাগে নি!

একথার প্রতিবাদ করার আগেই অপর্ণার ডাক পড়লো। শেষ মুহূর্তে একেবারে কেঁপে উঠলো অপর্ণা। বিহ্বলভাবে তাকালো অনিমেষের দিকে। অনিমেষ তার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বললো, যান, নার্ভাস হবার কিছু নেই—একটু থেমে থেমে পড়বেন, দুটো—

ধীর পায়ে উঠে গিয়ে মাইকের সামনে বসলো অপর্ণা। হঠাৎ যেন তার বুকের দুপদুপ একেবারে থেমে গেছে, সব কিছু ভারী শান্ত, আর একটুও অস্বস্তি লাগছে না। অপর্ণা শ্রোতাদের মুখের দিকে একবারও তাকালো না, অনিমেষকেও দেখলো না, তার খাতার পাতা ওল্টাতে লাগলো। মাঝ রাত্তিরে উঠে আয়নাকে ছাড়া আর কারুকে আগে তার কবিতা নিজে পড়ে শোনায় নি অপর্ণা। কিন্তু এখন তার একটুও ভয় করছে না। খুব ধীর গলায় সে পড়তে লাগলো,

একটি স্বপ্নের কাছে চিরদিন রয়ে যাবো ঋণী
ঘুমন্ত বা জাগরুকে, সে আমার শান্ত
নির্ঝরিণী।
থিরথিরে জলের মতো কাঁপে দুঃখ
ছায়ার গহনে সুপ্ত মুখ
কখনো সুখেরও কাছে পেয়েছি রৌদ্রের মতো
ক্ষণিক কৌতুক
ভুলে থাকি, ভুলে যাই
অনেক হারাই, ফিরে পাই
একটি স্বপ্নের কাছে তবু আমি রয়ে যাবো
ঋণী।...

পাশ থেকে কে একজন অনিমেষকে জিজ্ঞেস করলো, এই মেয়েটি নতুন লিখছে বুঝি? অনিমেষ বললো, হ্যাঁ। কেমন লাগছে, ওর কবিতা?

—মন্দ না, ভালোই, তবে ছন্দের হাতটা একটু ঠিকঠাক করলে—

একটি কবিতা পড়ার পর সবাই খুব জোরে হাততালি দিল, কিন্তু আর একটি কবিতা পড়ার জন্য কেউ অনুরোধ করলো না। খাতা মুড়ে সে উঠে এলো। বসার সঙ্গে সঙ্গে অনিমেষ অতি উৎসাহের সঙ্গে বললো, দারুণ পড়া হয়েছে, দুর্দান্ত! কবিতাটা দারুণ, নতুন লিখেছেন এটা? আগে পড়িনি তো!

অপর্ণার আবার যত রাজ্যের ভয় ও নার্ভাসনেশ ফিরে এসেছে, এখন আবার হাত পা কাঁপছে থরথর করে, ঝাঁ ঝাঁ করছে শরীর। কারুর মুখের দিকে তাকাতে পারছে না, অনিমেষের কথাও শুনতে পাচ্ছে না। অনিমেষ কি বলে যাচ্ছে, কোনো উত্তর না দিয়ে অপর্ণা শুধু নোখ দিয়ে দাগ কাটছে খাতার ওপরে।

অনুষ্ঠানের মাঝখানেই শরৎ মুখার্জি আর সুনীল গাঙ্গুলি বেরিয়ে যাচ্ছিল, অনিমেষ তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকলো। ওরা কাছে আসতেই অনিমেষ বললো, কোথায় যাচ্ছেন? বসুন না।

—আমাদের একটু কাজ আছে।

—একটু বসুন। নিজেদের কবিতা পড়া হয়ে গেলেই অমনি, 'কাজ আছে', না? এটা কিন্তু ঠিক নয়। অন্যদের কবিতাও শোনা উচিত।

শরৎ কাঁচুমাচু মুখ করে বললো, না ভাই, সত্যিই আজ কাজ আছে আমাদের।

অনিমেষ বললো, এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, অপর্ণা সরকার—

—সরকার? তখন যে অ্যানাউন্স করলো অপর্ণা গুহ?

অনিমেষ একটু বিরত হয়ে বললো, তাই বলেছে বুঝি? ও যাকগে, ইয়ে, একটু বসুন, আমরাও বেরুবো, একসঙ্গে যাওয়া যাবে—

শরৎ অপর্ণার দিকে তাকিয়ে বললো, খুব ভালো লাগলো আপনার কবিতা। ফার্স্ট ক্লাস। এতদিন লেখেন নি কেন?

অপর্ণা লাজুকতা কাটিয়ে কোনোক্রমে বললো, এই তো মোটে দু'একটা লিখেছি। এখনও কিছুই লিখতে পারি না।

—যাই লিখুন, বেশী দুঃখের কবিতা লিখবেন না।

সুনীল দু'এক পলক বেশী তাকিয়ে রইলো অপর্ণার দিকে। তারপর বললো, আপনাকে আমি আগে দেখেছি। অনেকদিন আগে। আপনি নীলাঞ্জনের বোন তো?

—হ্যাঁ।

—নীলাঞ্জনের সঙ্গে আমি কলেজে পড়তুম। তখন দু'একবার গিয়েছিলাম আপনাদের বাড়িতে। আপনার ছোট ভাই দীপাঞ্জনের সঙ্গেও আমার দেখা হয় মাঝে মাঝে। নীলাঞ্জন তো এখন পাইকপাড়ার ওদিকে কোথায় থাকে, না? ওকে বলবেন, একদিন আমার বাড়িতে আসতে!

অপর্ণা অপরাধীর মতন মুখ করে বললো, আচ্ছা, বলবো।

দাদার সঙ্গে তার যে আজকাল আর দেখা হয় না, কথা হয় না, সে কথা সে জানাতে পারলো না। সে খুব আড়ষ্ট বোধ করলো।

শরৎ বললো, এবার যাওয়া যাক্।

অনিমেষ বললো, আর একটু বাদেই তো শেষ হবে—তখন একসঙ্গেই বেরুবো—

—না, আমাদের সত্যিই কাজ আছে।

—বুঝেছি, বুঝেছি কি কাজ! আচ্ছা!

খানিক বাদে অনিমেষও অপর্ণাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। হাঁটতে হাঁটতে চলে এলো বাস স্টপের কাছে। প্রায় সন্ধে হয়ে এসেছে। বেশ সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে আজ। অনিমেষ খুব খুশী মেজাজে রয়েছে। বললো, ফেরার সময় যদি ট্যাক্সিতে ফিরি, সেটাও কি দোষের হবে?

অপর্ণা নম্রভাবে বললো, কেন, বাসেও তো ফেরা যায়। তা ছাড়া, আপনি তো অন্যদিকে যাবেন!

—অন্যদিকে গেলেই বা, আপনাকে নামিয়ে দিয়ে আসতে পারি না।

—না, না, তার দরকার নেই।

—ঠিক আছে, বাসেই যদি উঠতে হয়, চলুন, এক স্টপ হেঁটে এগিয়ে যাই। এখানে দাঁড়ালে চেনাশুনো অনেকের সঙ্গে দেখা হবে, দেরী হয়ে যাবে কথা বলতে বলতে—

দুজনে খানিকটা রাস্তা সবে হেঁটেছে, অনিমেষ আচমকা একটা চলন্ত ট্যাক্সিকে দাঁড় করালো। অপর্ণাকে বললো, উঠুন।

অপর্ণা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, একি, শুধু শুধু ট্যাক্সি ডাকলেন কেন?

অনিমেষ সারা মুখ হাসিতে ভরিয়ে বললো, আমার খুশী। আপনি উঠবেন কি না বলুন!

অপর্ণা আর আপত্তি করলো না, ট্যাক্সিতে উঠে বসলো। অনিমেষ আবার জিজ্ঞেস করলো, এক্ষুণি বাড়ি ফিরতে হবে? একটু কোথাও বসে চা খেলে হয় না?

অপর্ণার মনটা এখন বেশ হালকা লাগছে। ঐ অনুষ্ঠানে বসে কবিতা পড়ার পর, তার মনটা হঠাৎ কি রকম যেন দুঃখে ভরে গিয়েছিল, এখন সেই দুঃখটাই আনন্দে উত্তীর্ণ হয়েছে। অনেকদিন পর সে আজ এক ধরনের তৃপ্তির স্বাদ পেয়েছে। তবু, চকিতে বাড়ির কথা মনে পড়লো। ঘুম থেকে ওঠার পর টুলটুল কিছুক্ষণ দাদুর কাছে থাকবে। বাবা হয়তো টুলটুলকে নিয়ে বেড়াতে বেরুবেন একবার। সন্ধের পর বাড়ি ফিরে টুলটুল মায়ের খোঁজ করবেই। মাকে না দেখলে তার পড়ায় মন বসবে না, খেলায় মন বসবে না—। এখনও হয়তো বেড়িয়ে ফেরেনি, সাতটাও বাজেনি—

অপর্ণা বললো, না, আজ থাক—

অনিমেষ অসহিষ্ণুভাবে বললো, যেদিনই বলি, সেদিনই শুনি, আজ থাক। কেন, আজ একটুখানি যদি কোথাও বসি—অবশ্য, আমার সঙ্গে চা খেতে যেতে যদি আপত্তি থাকে সেটা আলাদা কথা!

—না, না, আপত্তির কথা নয়। দেরী হয়ে গেলে—

—দেরী হবে কেন? কতক্ষণ আর লাগবে!

—কোথায় চা খাবো?

—রাজী? তা হলে রাজী তো? একবার রাজী হলে, কোথায় বসে চা খাবো, সেটা কোনো বড় কথা নয়। চলুন গঙ্গার ধারে যাই, ওখানে খুব সুন্দর—

—না, গঙ্গার ধারে গেলে, সত্যিই অনেক দেরী হয়ে যাবে!

—কিচ্ছু দেরী হবে না। বাড়িতে কি এমন জরুরি কাজ আছে?

বাড়িতে তার মেয়ে বেশীক্ষণ তাকে না দেখলে অস্থির হয়ে উঠবে, অপর্ণা সে কথাটা কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারলো না। অনিমেষ গঙ্গার দিকে ট্যাক্সি ফেরাতে বললো।

(ক্রমশ)

চিত্র, সঙ্গীত, সাহিত্য

দিনসপ্তাহেক আগে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ছবিমেলায় চিত্রশিল্পীরা সাহিত্য এবং সঙ্গীতজ্ঞদের সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সেখানে একটি ছোট্ট অথচ হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনাও হয়েছিল। এটা অনুভব করা গেল যে, চিত্রশিল্প, সাহিত্য এবং সংগীত—এই তিনটি বিষয়ে এমন কিছু যোগসূত্র আছে যা তিনটি সম্প্রদায়কেই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করছে। ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি, আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে সাহিত্যিক এবং চিত্রশিল্পী যত আছেন গায়ক বা সংগীতজ্ঞ তত নেই। কি করে এই পরিচয় ঘটেছে এবং বন্ধুত্বসূত্র গভীর হয়েছে তা হয়ত ভেবে বলতে হবে কিন্তু আমরা যখন মিলিত হই তখন যে বিশেষ আনন্দিত হই এবং এ সম্পর্ক যে ছিন্ন হবার নয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই সুনিবিড় এবং মঙ্গলদায়ক সম্পর্কটি কত মূল্যবান এই ছবিমেলায় এসে তা আবার উপলব্ধি করা গেল।

সাহিত্য এবং সংগীতের মধ্যে যে একটা স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে—সেটা আমরা সহজেই বুঝি। উত্তম সংগীত মানেই উত্তম কবিতা তথা উত্তম সাহিত্য। কবি সর্বদাই সুরকারকে খুঁজেছেন তাঁর কবিতায় সুর দেবার জন্য, আর সুরকার খুঁজেছেন কবিকে তাঁর সুরকে যথার্থভাবে আরোপ করবার জন্য। আমাদের দেশে তো কবিই গায়ক আর গায়কই কবি। কিন্তু এ ছাড়াও এই নিকট সম্বন্ধের কারণ আছে, সে হচ্ছে ইনটেলেকটের আকর্ষণ। যিনি দর্শনশাস্ত্র বা অন্যান্য তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন তিনিও কবিবন্ধুর সাহচর্য কামনা করেন তার কারণ বুদ্ধিবৃত্তির আর একটি উত্তম প্রকাশকে তিনি গভীর আগ্রহের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেন। সঙ্গীতকে সকলেই ভালবাসেন অতএব সাহিত্যিকেরাও ভালবাসেন কিন্তু সংগীতজ্ঞের সঙ্গে সাহিত্যিকের যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, সখ্যতা গড়ে ওঠে সে কি কেবল গান বাজনা ভাল লাগে বলে? তা নয়। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সৃষ্টির যে চাতুর্য একজন সাহিত্যিক তাঁর নিজের মধ্যে উপলব্ধি করেন সেই চাতুর্যের আর একটি ধারার বিকাশ দেখেন একজন গায়ক বা বাদকের মধ্যে। সৃষ্টির এই ভিন্ন পর্যায়ের সার্থকতাই একজন সাহিত্যিককে একজন সংগীতজ্ঞের প্রতি আকৃষ্ট করে। কিন্তু একজন সাহিত্যিক যে পরিমাণ ইনটেলেকচুয়েল, একজন সংগীতশিল্পী সাধারণতঃ সেই পরিমাণ ইনটেলেকচুয়েল নাও হতে পারেন। তাই অনেক ক্ষেত্রে বন্ধুত্ব গড়ে উঠলেও তা হয়ত তেমন নিবিড় হয়ে ওঠে না, কারণ সেখানে কিছু অভাব থেকে যায়। যদি উভয়েরই বুদ্ধিমত্তা সমান স্তরের হয় তা হলে এই বন্ধুত্ব একটা অপূর্ব সখ্যতায় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এবং সমাজ তাতে উপকৃত হয়। যেমন ধরুন, দিলীপকুমার রায় বা ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। দিলীপকুমারকে গায়ক বললে কম বলা হয়; আসলে তিনি একজন ইনটেলেকচুয়েল। ধূর্জটিপ্রসাদকেও তেমনি শুধু সঙ্গীতসমালোচক বললে খাটো করা হয়; কারণ, তিনিও একজন প্রখর ইনটেলেকচুয়েল। আর একজনের কথাও মনে আসছে, তিনি অমিয়নাথ সান্যাল। প্রখর বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল তাঁর সঙ্গীতচিন্তা যা উত্তম সাহিত্যের আকারে প্রকাশ পেয়েছে। এঁরা সবাই চিন্তাজগতের অধিবাসী যেখানে সাহিত্যিক, দার্শনিক এবং বিবিধ তাত্ত্বিকগণ স্থান করে নিয়েছেন। তাই এঁদের পরিচিতের সংখ্যা কেবলমাত্র একটি সম্প্রদায়েই সীমাবদ্ধ নেই—এঁদের সম্পর্ক বুদ্ধিজগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে, যদিচ এঁরা এক একটি বিশেষ আর্টের সঙ্গেই জড়িত।

চিত্রশিল্প কিন্তু আর একটু ভিন্ন প্রকৃতির। সাহিত্য এবং সঙ্গীতের সম্পর্ক যতটা নিবিড় চিত্রশিল্প ততটা নিবিড় সম্বন্ধযুক্ত নয়। তথাপি চিত্রশিল্পও উভয়কে আকর্ষণ করেছে এবং চিত্রশিল্পীরাও উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যকীর্তি এবং সঙ্গীতসাধনার সঙ্গে চিত্রশিল্পকেও বরণ করে নিয়েছিলেন। এরকম আরও বহু মনীষী আছেন যাঁরা ভিন্ন তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও চিত্রশিল্পের অনুরাগী এবং চিত্রকরদের সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ। এখানেও বিকাশের আর একটি ধারা তাঁদের এদিকে আকর্ষণ করে আনছে। সাহিত্য একটি মহান ইনটেলেকচুয়েল আর্ট, আর সঙ্গীত ও চিত্রশিল্প ফাইন আর্ট। এই যে কমনীয় দুটি কলা এই দুটি সাধারণভাবেই দেশিকতার (কালচার) সঙ্গে যুক্ত সুতরাং বৃত্তির পটভূমি থেকে পর্যবেক্ষণ করলে তিনটি সম্প্রদায়ই প্রকাশের বিভিন্ন মাধ্যমে সেই একই মানসলোকে পরিভ্রমণ করে চলেছেন। পরস্পরের প্রতি সখ্যতা এক্ষেত্রে স্বাভাবিক।

আমাদের এস্থেটিক্সে কয়েকটি বৃত্তি আছে। বৃত্তি বলতে আমরা সাধারণভাবে কালচারকেই বুঝতে পারি। প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, কৈশিকীবৃত্তির প্রয়োগ না হলে চারুকলার কোনও অনুষ্ঠানই সার্থক হতে পারে না। এই কৈশিকী বৃত্তিই হচ্ছে ফাইন আর্ট যার মধ্যে প্রতিটি মনোহর প্রকাশধারা, নৃত্য, গীত প্রভৃতি আর্ট রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে নাটকের সাজ, সজ্জা, বেশভূষা—এগুলি সবই এই কৈশিকীবৃত্তির পর্যায়ভুক্ত। এই "মেকআপ"-এর আর্টকে বলা হত নেপথ্যবিধি। নেপথ্য শব্দের মানে কিন্তু মঞ্চের আড়াল থেকে বলা বা প্রয়োগ নয়। এই অর্থ কোনও কোনও ব্যবহারবিধি থেকে দাঁড়িয়ে গেছে; কিন্তু আসলে নেপথ্য শব্দের অর্থই হল "মেকআপ"। সংস্কৃত নাটকের যুগে এই নেপথ্যবিদগণ বিশেষ সম্মানিত ছিলেন এবং চিত্রবিদ্যায় তাঁরাও বিশেষ অভিজ্ঞ হতেন। নাট্যাচার্য, নাট্যকার এবং নেপথ্যশিল্পী, এঁদের মধ্যে যোগসূত্র ছিল সুনিবিড় কারণ এঁরা সবাই কৈশিকী বৃত্তিরই বিভিন্ন কলার চর্চায় নিযুক্ত।

সংগীতের দিক থেকেই দেখা যাক। এক সময় দেখা গেল রাগ-রাগিণীর নানারকম চিত্র পরিকল্পিত হচ্ছে। কোনও কোনও শাস্ত্রে একে দেবময় মূর্তি

আখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং দাবী করা হয়েছে যে এটি সঙ্গীতশিল্পীদেরই মনন-শীলতা। আমার মন এতে সায় দেয় না। আমার মনে হয় এ মননশীলতা চিত্র-শিল্পীরই উপযুক্ত। রাগরাগিণীর অভি-ব্যক্তি থেকে কোনও মুহূর্তে বা সর্বাঙ্গীণ শ্রবণ থেকে কোনও চিত্রশিল্পীর মানস-লোকে একটি বিচিত্ররূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল যাকে তিনি চিত্রে রঙ তুলি দিয়ে ধরে রেখেছিলেন। এই থেকেই গড়ে উঠেছিল প্রসিদ্ধ রাগমালা পেন্টিঙের ট্রাডিশন। সঙ্গীতশিল্পী বা সঙ্গীত-শাস্ত্রীরা একে নিজস্ব চিন্তা বলে দাবী করলেন, কেননা মূলে সঙ্গীতটি তাঁদেরই বস্তু। এ নিয়ে আমাদের এই পত্রিকায় একদা যথেষ্ট বাদানুবাদ হয়েছে। এ প্রসঙ্গ তুলে আবার সেই বিতর্কের অভ্যুত্থান ঘটাতে চাই না; কিন্তু এই প্রকাশে সঙ্গীত-শিল্পী এবং চিত্রশিল্পীর মধ্যে যে ভাব-ধারার আদান-প্রদান দেখা যাচ্ছে সেটা অস্বীকার করবার নয়। আজকের যুগে বিমূর্তশিল্প নিয়ে চিত্রশিল্পীরা একটা প্রবল বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হয়ে-ছেন, কিন্তু রাগমালা চিত্র আবার বিমূর্তেরই মূর্তপ্রতীক। যারা বিমূর্ত-শিল্পে একটা চিন্তাকে ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ তাঁরা যে বিমূর্ত চিন্তাকেও মূর্ত শিল্পে পরিণত করতে সক্ষম রাগমালা-চিত্র তাই প্রমাণ করে থাকে। রাগরাগিণীর আলাপ যখন তাঁরা শুনেছেন তখন তাঁরা তো একটা বিমূর্ত রসলোকেই অবস্থিত ছিলেন; কিন্তু যখন ছবি আঁকলেন তখনই তা মূর্তি পরিগ্রহ করল।

বর্তমানে কি সঙ্গীত, কি সাহিত্য, কি চিত্রশিল্প—এইসব ক্ষেত্রেই একটা বিরাট আলোড়ন দেখা দিয়েছে। চিত্র শিল্পের নবতর রূপকল্পে অনেকে যেমন বিভ্রান্ত তেমনি সঙ্গীতের নবতর পরিকল্পনাতেও অনেকে বিপর্যস্ত। নতুন যুগের চিত্রজগতে প্রবেশ করবার জন্য যেমন একটা মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে বলে শিল্পীরা মনে করেন তেমনি সঙ্গীতশিল্পীরাও মনে করছেন, শ্রোতারা—"ফেস দি মিউজিক", কথাটির সার্থকতা উপলব্ধি করবেন। অপরপক্ষে সাহিত্য জগতের যে বিপুল আলোড়ন আমাদের গোটা সমাজেই বিপ্লব এনেছে সে সম্বন্ধে বলাই বাহুল্য। তাই এস্থেটিকসের জগতে এই তিনটি শরিকই যে এক সঙ্গে চলবেন, পরস্পরকে বুঝতে চাইবেন এবং পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হবেন—এটি তো অমোঘ নিয়ম বলেই ধরে নিতে পারি।

চিত্র শব্দের আসল অর্থ হচ্ছে যাকে বলে ভ্যারাইটি। সংস্কৃতে এই অর্থেই এই শব্দটির বহুল প্রয়োগ হয়েছে। বিবিধ বর্ণ, বিবিধ রূপকল্প, বিবিধ বিন্যাস একমাত্র ছবিতে ঘটে বলেই—এর পারিভাষিক আখ্যা হয়েছে চিত্র। যুগে যুগে নানা অভ্যুদয়ে এই অর্থটিকেই আমাদের স্মরণ করা উচিত শুধু ছবি ব্যাপারেই নয়, সাহিত্য এবং সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও।

শার্ঙ্গদেব

রবীন্দ্র সংগীতের অনুষ্ঠান

গত ২২শে ফেবরুয়ারি আকাদমি অব ফাইন আর্টস প্রেক্ষাগৃহে 'কৌশিকী'র উদ্যোগে অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানের অনুষ্ঠানটি কিছুটা অভিনবত্বের দাবী করতে পারে। ঘরোয়া আসরে একক শিল্পীর পরি-বেশিত রবীন্দ্র সংগীত প্রায়ই শোনা যায়। কিন্তু একজন শিল্পীকে দিয়ে বড়ো রকমের উদ্যোগ বিশেষ দেখা যায় নি। 'কৌশিকী'র সৎসাহস এদিক থেকে প্রশংসনীয়। সংগীত রসিকরাও যে এই প্রয়াসকে সাধুবাদ জানিয়েছেন পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহই তার প্রমাণ। অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ও গভীর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা-সহ তাঁর দরাজ কণ্ঠের গান শুনিয়ে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে পরিতৃপ্ত করেছেন।

রবীন্দ্র সংগীতের আপাত-সহজ রূপের অন্তরালে যে প্রগাঢ় উপলব্ধি আছে, কথা ও সুরের যে অনুপম ঐশ্বর্য আছে, তার সম্যক আস্বাদন বেশ কিছুটা নির্জনতা দাবী করে, আর কিছুটা অবকাশ। রবীন্দ্র-নাথ নিজেও দু এক জায়গায় লিখেছেন,, স্রষ্টা কর্তৃক সুনিবদ্ধ সংগীতে নতুন সুর-রচনার স্বাধীনতা যদিও গায়কের নেই, কিন্তু বিভিন্ন গায়কের মধ্যে ভাব-ব্যাখ্যানের পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী এবং তারই উপর রসসৃষ্টির তারতম্য নির্ভরশীল। বিভিন্ন শিল্পীর সমাবেশে আয়োজিত রবীন্দ্র-সংগীতের অনুষ্ঠানে তাই সেই অখণ্ড রসপরিমণ্ডলটি গড়ে উঠতে পারে না, যা পরিপূর্ণরূপে অনুভব করা যায় এই জাতীয় একক সংগীতানুষ্ঠানে। অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব এই যে, এমনই একটি রসঘন পরিবেশ গড়ে তুলতে সেদিন তিনি সক্ষম হয়েছিলেন।

গানের নির্বাচন, প্রত্যেকটি গানের পরি-চিতি সম্বলিত অনুষ্ঠানপত্র, পরিচ্ছন্ন ও শোভন অঙ্গসজ্জা—এই সবকিছুই উদ্যোক্তা-দের সুচিন্তিত পরিকল্পনার সাক্ষ্যবহ। নির্বাচিত পনেরোটি গানের মধ্যে বেশ কয়েকটি কীর্তনের প্রভাবযুক্ত। এ-ধরনের গানে অশোকতরুও যেন অপেক্ষাকৃত স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন। তবে হিন্দুস্থানী ধ্রুপদের আদর্শে দরবারীতে রচিত 'জগতে তুমি রাজা, অসীম প্রতাপ'—অনুষ্ঠানের এই প্রারম্ভিক গানটির পরিবেশনাও সুন্দর। রসাভিব্যক্তির দিকে

লক্ষ্য রেখে শিল্পী কণ্ঠস্বরের নিয়ন্ত্রণ করেছেন, পুনরাবৃত্তি বর্জন করেছেন। কাব্যাংশের ভাবরসের সম্বন্ধে তিনি যে সর্বদা সচেতন, তাও প্রতি মুহূর্তেই বোঝা গেছে। কিন্তু কোথাও কোথাও এমন কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণ-প্রবণতার বেশ খানিকটা আতিশয্যও ঘটেছে যা প্রায় একটা মুদ্রাদোষের মতন মনে হয়েছে। প্রধানত ভাবগম্ভীর বিলম্বিত লয়াবিশিষ্ট অথবা রাগাশ্রয়ী গানের ফাঁকে 'ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে ওরে পাখি' অথবা চিরকুমার সভার অক্ষয়ের গান 'কী জানি কী ভেবেছ মনে' উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্য সম্পাদন করেছে। অন্যান্য গানগুলির মধ্যে 'আজি যে রজনী যায়', 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না' ও 'সুখহীন নিশিদিন' এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সুরারোপিত 'হল না লো, হল না সই' উল্লেখযোগ্য। সহযোগী যন্ত্রগুলির মধ্যে বাঁশির প্রাধান্য ছিল। সেতার এবং দিলরুবাকে সম্ভবত আরও ভাল কাজে লাগানো যেত। তবলা-সহযোগিতাও ভাল, তবে যষ্ঠীতালের ছন্দে ত্রিমাত্রিক চলন অস্বস্তিকর লেগেছে।

—আনন্দবর্ধন

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বাজেট-প্রস্তাব

- "বাজেটটি সমৃদ্ধি ও কল্যাণের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন মেটাবে"।
- বাড়তি কর থেকে রাজস্ব পাওয়া যাবে ১৭০ কোটি টাকা।
- বড়লোকদের জন্য আরও বেশি কর।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭০-৭১ সালের জন্য যে বাজেট প্রস্তুত করেছেন, সাধারণভাবে জনসাধারণের কাছে তা

> **বিজ্ঞপ্তি**
>
> **দেশ পত্রিকায় যাঁরা রচনাদি পাঠান তাঁদের প্রতি নিবেদন, সমস্ত রচনার নকল রেখে লেখা পাঠাবেন। কবিতা বাদে অন্যান্য অমনোনীত রচনা আমরা ডাকে—বুক পোস্টে—ফেরত দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করে থাকি; তবু নানা গোলযোগে এবং ডাকেও লেখা খোয়া যাবার সম্ভাবনা থাকে। বলা বাহুল্য, ইচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের দপ্তরে পাঠানো লেখার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে আমরা অক্ষম।**
>
> —সম্পাদক

গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। বিশেষ করে লোকসভায় শ্রীমতী গান্ধীর সরকারের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকা সত্ত্বেও বাজেটটি যথেষ্ট বলিষ্ঠ ও সাহসিক হয়েছে, সেজন্য প্রধানমন্ত্রী অভিনন্দন দাবি করতে পারেন। বাজেটটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল: (১) ৫০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের ক্ষেত্রে আয়কর দিতে হবে না। (২) ৪০,০০০ টাকার ঊর্ধ্বে ব্যক্তিগত আয়ের উপর আয়করের হার ক্রমপর্যায়ে বাড়ানো হয়েছে; দু' লক্ষ টাকার উপর সর্বোচ্চ স্তরে আয়করের হার হবে শতকরা ৮৫ টাকা এবং সর্বোচ্চ স্তরে সারচার্জ সহ আয়করের সর্বোচ্চ হার হবে শতকরা ৯৩·৫ ভাগ। (৩) সাধারণ সম্পদ করের হার বর্তমানে হচ্ছে শতকরা ০·৫ থেকে ৩ ভাগ; এটা বাড়িয়ে শতকরা ১ ভাগ থেকে ৫ ভাগ পর্যন্ত করা হবে। (৪) শহরাঞ্চলের যেসব জমি ও বাড়ির মূল্য ৫ লক্ষ টাকার বেশি তার উপর অতিরিক্ত সম্পদ করের হার বাড়িয়ে শতকরা ৫ ভাগ এবং ১০ লক্ষ টাকার বেশি মূল্যের সম্পত্তির উপর শতকরা ৭ ভাগ ধার্য করা হয়েছে। এক লক্ষ লোকের বেশি জনসংখ্যা যে শহরে আছে, সেখানে ৪ লক্ষ টাকা থেকে ৭ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত মূল্যের জমি ও বাড়ির জন্য অতিরিক্ত সম্পদ করের ব্যবস্থা হয়েছে শতকরা ১ ভাগ থেকে ৪ ভাগ পর্যন্ত। যেসব মিউনিসিপ্যালিটির লোকসংখ্যা ১০ হাজারের বেশি সেখানেও এই কর বসাবার প্রস্তাব করা হয়েছে। (৫) দানকরের হারও বাড়ানো হয়েছে। বর্তমান হার যেখানে শতকরা ৫ ভাগ থেকে ৫০ ভাগ, নতুন হার সেখানে দাঁড়াবে শতকরা ৫ ভাগ থেকে ৭৫ ভাগ। দানকরের ক্ষেত্রে রেহাইয়ের মাত্রা ১০ হাজার টাকা থেকে কমিয়ে ৫ হাজার টাকা করা হচ্ছে।

প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত পাঁচটি প্রস্তাব বড়লোকদের উপর বোঝার সৃষ্টি করবে, গরীবদের উপর নয়। বরং পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত আয়করের রেহাই স্থির করে দেওয়ায় পাঁচ লক্ষ লোককে আর আয়কর দিতে হবে না। আয় ও সম্পদের বৈষম্য কমিয়ে কল্যাণধর্মী অর্থনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করার ক্ষেত্রে শ্রীমতী গান্ধীর এই প্রস্তাবগুলি বলিষ্ঠ পদক্ষেপের পরিচায়ক। ব্যবসায় বাণিজ্যের সম্প্রসারণের জন্য লগ্নী বাবদ কিছু সুবিধার কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে ইউনিট ট্রাস্টে লগ্নী বাবদ ১,০০০ টাকা পর্যন্ত এবং ভারতীয় কোম্পানির শেয়ারে লগ্নী বাবদ ১০০০ টাকা পর্যন্ত আয় আয়কর থেকে রেহাই দেওয়া হয়। শ্রীমতী গান্ধীর বাজেটে ৩০০০ টাকা পর্যন্ত এই ধরনের আয় করমুক্ত করা হয়েছে। বেতনভোগী আয়করদাতারা কর্মস্থলে বাসে অথবা সাইকেলে যাওয়ার জন্য মাসে ২০ টাকা হিসাবে ছাড় পাবেন। যাঁদের বার্ষিক আয় ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত তাঁদের মোটর গাড়ি বাবদ এখন থেকে মাসিক ২০০ টাকা ছাড় দেওয়া হবে; আগে এই ছাড়ের মাত্রা ছিল ২৫০ টাকা।

শ্রীমতী গান্ধীর বাজেটে পরোক্ষ করের বোঝাও বেড়েছে। চা, চিনি, সিগারেট, কেরোসিন, সোডা অ্যাশ, কসটিক সোডা, পেট্রল, মদ, স্টেনলেস ব্লেড, অ্যালুমিনিয়াম, নকল রেশম, বিস্কুট, মাখন, চীজ, লেমনেড, টেলিভিসন সেট, রেফ্রিজারেটার, কতিপয় যন্ত্রপাতি, মোটর গাড়ির যন্ত্রাংশ প্রভৃতি

সামগ্রীর উপর করের হার বেড়েছে। চায়ের উপর থেকে রপ্তানি শুল্ক তুলে নেওয়া হয়েছে এবং পাটজাত জিনিসের উপর উৎপাদন শুল্ক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

নতুন কর ব্যবস্থায় ১৭০ কোটি টাকা রাজস্ব বাড়বে বলে ধরা হয়েছে। অপর দিকে, চায়ের উপর রপ্তানি শুল্ক না থাকায় এবং পাটজাত জিনিসের উপর উৎপাদন শুল্ক কমিয়ে দেওয়ায় রপ্তানির পরিমাণ বাড়বে। শ্রীমতী গান্ধী বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন নতুন কর ধার্যের ফলে যে ১৭০ কোটি টাকা রাজস্ব বাড়বে তা সমাজের সমৃদ্ধি ও কল্যাণের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন মেটাবার কাজে ব্যবহৃত হবে।

১৯৬৯-৭০ সালে সংশোধিত বাজেট এবং ১৯৭০-৭১ সালের প্রস্তাবিত বাজেটের মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য দেখা যায়। ১৯৬৯-৭০ সালের সংশোধিত বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ২৯০ কোটি টাকা (যদিও ঘাটতির পরিমাণ ২৫৪ কোটি টাকা ধরা হয়েছিল); ১৯৭০-৭১ সালে ঘাটতি অর্থসংস্থানের পরিমাণ ধরা হয়েছে ২২৫ কোটি টাকা। ১৯৬৯-৭০ সালে পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দ ছিল ১২৯৩ কোটি টাকা; ১৯৭০-৭১ সালে পরিকল্পনাখাতে বরাদ্দ করা হয়েছে ১৪১১ কোটি টাকা। ১৯৬৯-৭০ সালে বিনিয়োগ ধরা হয়েছিল ২২৩৯ কোটি টাকা ১৯৭০-৭১ সালে বিনিয়োগ ধরা হয়েছে ২৬৩৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ বিনিয়োগের হার শতকরা ১৫ ভাগ বেড়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৬৯-৭০ সালে জাতীয় আয় বেড়েছে শতকরা সাড়ে পাঁচ ভাগ এবং শিল্পোৎপাদন বেড়েছে শতকরা সাড়ে সাত ভাগ। ১৯৭০-৭১ সালের বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের সর্বনিম্ন পারিবারিক পেন্সনের পরিমাণ মাসিক ৪০ টাকা করা হয়েছে; প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের ক্ষেত্রেও কিছু সুবিধা দেওয়া হয়েছে। রাজ্যগুলিকে পরিকল্পনার খরচ বাবদ সাহায্যের পরিমাণ কিছু বাড়ানো হয়েছে; ১৯৬৯-৭০ সালে এই সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৬১৫ কোটি টাকা; ১৯৭০-৭১ সালে তা বাড়িয়ে করা হয়েছে ৬৩৫ কোটি টাকা।

১৯৭০-৭১ সালের বাজেটে রাজস্ব হিসাবে (Revenue Account) ১৪·৭৫ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত এবং মূলধনী হিসাবে (Capital Account) ৩৬৪·৭৫ কোটি টাকা ঘাটতি ধরা হয়েছে; সুতরাং মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ৩৫০ কোটি টাকা। নতুন কর ব্যবস্থার ফলে যে ১৭০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে, তার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য হবে ১২৫ কোটি টাকা এবং রাজ্য সরকারগুলির প্রাপ্য হবে ৪৫ কোটি টাকা। তাই কেন্দ্রীয় বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ২২৫ কোটি টাকা। দেশে যখন উৎপাদন ধারার বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হচ্ছে তখন এই ঘাটতি মুদ্রাস্ফীতি তীব্রতর করবে বলে মনে হয় না। তবে যে নতুন পরোক্ষ করগুলি চাপানো হয়েছে তার ফলে জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি হতে পারে। শ্রীমতী গান্ধী মনে করেন না যে এ ব্যবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি বাড়বে। ১৯৭০-৭১ সালের বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতে ৪৭ কোটি টাকা খরচ বাড়ছে।

প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত বাজেট প্রস্তাবের মূল্যায়ন করলে এটাই পরিষ্কার হয় যে, করের চাপ বেশি পড়েছে অপেক্ষাকৃত ধনী ব্যক্তিদের উপর, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে সম্পদ কর বৃদ্ধির প্রস্তাবটি আয় ও ধনের বৈষম্য কমাবার পক্ষে সমর্থনযোগ্য। কিন্তু একটি জিনিস শ্রীমতী গান্ধী উপেক্ষা করেছেন, আমাদের জাতীয় আয়ের শতকরা ৫০ ভাগই এখন আসছে কৃষিক্ষেত্র থেকে। যে হারে শহরাঞ্চলে করের হার বাড়ানো হয়েছে সে অনুপাতে আমাদের কৃষিক্ষেত্র এখনও ততটা করের আওতায় আসেনি। তা ছাড়া, কর ফাঁকি দেওয়া বন্ধ করার ব্যবস্থা এবং বকেয়া কর আদায় করার ব্যবস্থা আরও জোরদার করা দরকার। ১৯৬৯ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনাদায়ী আয়করের পরিমাণ ছিল ৫৫৫·৯৯ কোটি টাকা। সরকারী ঋণের পরিমাণও ক্রমেই বেড়ে চলেছে।
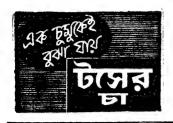
সুব্রত গুপ্ত

রাসেল প্রসঙ্গে

"আনন্দের সন্ধানে রাসেল" প্রবন্ধটিতে (১৬ই ফাল্গুন) অম্লান দত্ত রাসেলের জীবনবোধ ও ব্যক্তিত্বের একটি বিশেষ দিক বা মূল্যবোধের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। রাসেলের মনন বহুমুখী, তাঁর চিন্তায় ও কর্মে পালাবদল ঘটেছে বিস্তর। সবই হয়তো প্রশংসনীয় নয়। আত্মজীবনীতে বিবৃত একাধিক ঘটনা বা পত্রলেখা অ-পিউরিটানকেও বিব্রত করবে। কিন্তু সমস্ত কিছুর কেন্দ্রে ছিল এক আশ্চর্য বেদনা ও রহস্যবোধ, এমনকি প্রেম ও করুণার প্রতি অদম্য আকর্ষণ, যা প্রবন্ধ লেখক সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। এ যুগের অধিকাংশ চিন্তা ও রাজনীতিবিদদের যদি তার কণাটুকুও থাকতো! এই প্রসঙ্গে রাসেলের রচনা থেকে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। উদ্ধৃতিটি প্রবন্ধ লেখকের অজানা থাকার কথা নয়, অপরের কাজে লাগতে পারে। শ্রদ্ধা পুরানো।

"The root of the matter is a very simple and old-fashioned thing, a thing so simple that I am almost ashamed to mention it, for fear of the derisive smile which cynics will greet my words. The thing I mean—please forgive me for mentioning it—is love, Christian love, or compassion. If you feel this, you have a motive for existence, a guide to action, a reason for courage, an imperative necessity for intellectual honesty. If you feel this you have all that anybody should need by way of religion. Although you may not find happiness, you will never know the deep despair of those whose life is aimless and void of purpose; for there is always something that you can do to diminish the awful sum of human misery."

শিশিরকুমার ঘোষ
শান্তিনিকেতন

সরগমের নিখাদ

॥ ১ ॥

'সরগমের নিখাদ' নিঃসন্দেহে দেশ পত্রিকায় একটি মূল্যবান সংযোজন। আত্মজীবনী মূলক রচনা—যা অনেকদিন থেকেই দেশ-এ অনুপস্থিত ছিল, বিশেষ করে শ্রীশচীন দেববর্মণের মতো একজন মরমী শিল্পীকে কাছে পাওয়ায় একজন পাঠক হিসেবে সত্যি আমি আনন্দিত।

এই প্রসঙ্গে সবিনয়ে একটি কথা জানাতে চাই। গত ১৭ সংখ্যা দেশে প্রকাশিত—"১৯২৩ সালে বি এ ভর্তি হলাম...১৯২৪ সালে বি এ পাশ করলাম ..." শ্রীদেববর্মণের এই উক্তিতে আমাদের কিঞ্চিৎ বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। আমরা যতদূর জানি, তখনকার দিনে আই এ পাশ করে বি এ ডিগ্রীর জন্যে কমপক্ষে দু' বছর পড়তে হতো। এটা কী তাহলে 'ছাপাখানার ভূতের কারসাজি'?

মন্মথ সাহা
গৌহাটী-১৬

॥ ২ ॥

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী 'দেশ' পত্রিকার আলোচনা-বিভাগে প্রকাশিত শ্রীদেবাশিস দাশগুপ্তের চিঠিখানি পড়লাম। 'সরগমের নিখাদ'-শীর্ষক শ্রীশচীন দেববর্মণের স্মৃতিকথায় উল্লেখিত প্রসঙ্গে বাংলা ছায়াছবিতে শ্রীবর্মণের স্বকণ্ঠে গীত গানের সংখ্যা নিরূপণে শ্রীদাশগুপ্ত দুটি গানের মীমাংসা করতে পারেননি বলে জানিয়েছেন। এর মধ্যে একটি গানের সূত্র তিনি আমার এই চিঠি মারফৎ পেতে পারেন আশা করি।

যতদূর মনে পড়ছে, [illegible] 'জহুরী' [illegible] প্রযোজিত [illegible] টকীজের "সমর" কথাচিত্রে শ্রীদেববর্মণের স্বকণ্ঠে গীত একটি গান ছিল, যার প্রথম কটি কথা ছিল এই রকম :

"সুন্দরী গো সুন্দরী,
দল বেঁধে আয় গান করি,
আজ বাদল বেলা যদি নাচি
আর না লাগে দিশে,
টুসুনি, টুসুনি"।

কৈশোরও নয়, নিতান্ত বাল্য বয়সে দেখা উক্ত বাণীচিত্রের এই গানখানির সুর ও কথা স্মৃতিতে আজও অম্লান। স্মৃতি যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করে, গানটি শ্রীদেববর্মণেরই স্বকণ্ঠে গীত বলে আমার বিশ্বাস।

মিহিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
কলি-৩১

॥ ৩ ॥

শ্রীশচীনদেব বর্মণের চলচ্চিত্রে গান করা সম্বন্ধে শ্রীদেবাশিস দাশগুপ্তের চিঠি (দেশ—২১।২।৭০) পড়লাম। শচীন কর্তার জীবন সম্বন্ধে সঙ্গীত-রসিক পাঠক ও তাঁর অনুরাগীরা এর মধ্যেই আমার নিকট নানা তথ্য পাঠিয়েছেন এবং প্রচুর কৌতূহল প্রকাশ করেছেন—যাতে খুবই আনন্দ বোধ করছি। বিভিন্ন তথ্যদানকালে শ্রীদেব বর্মণের স্মৃতি বিভ্রম ঘটা অসম্ভব নয়। এ সম্পর্কে শান্তিনিকেতন থেকে বন্ধুবর শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় যে সব তথ্য পাঠিয়েছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে শচীনদা শুধু ৯টি কেন, ১৩টি গান গেয়েছিলেন ১০টি বাংলা চলচ্চিত্রে। সেগুলি হল : ১৯৩৫ সনে মধু বসু পরিচালিত "সেলিমা" চিত্রে ভিখারীর কণ্ঠে, ভিখারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ১টি গান গেয়েছিলেন; ১৯৪০ সনে সুকুমার দাশগুপ্ত পরিচালিত "রাজকুমারের নির্বাসন" চিত্রে ১টি গান

শিুরিয়া রে কেথায় শিখেছ বাঁশি জান্‌); ১৯৪১ সনে সুশীল মজুমদার রচালিত "প্রতিশোধ" চিত্রে ২টি গান ক মায়া লাগল চোখে এবং অবোধ নেয়ে গান বাইয়া যাও) সুকুমার দশগুপ্ত পরি-লিত "এপার ওপার" চিত্রে ১টি গান দাসী রে বিদেশী রে ফিরে তুমি যাও), বং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ন্দিনী" চিত্রে ১টি গান (চোখ গেল চোখ ল কেন ডাকিস রে); ১৯৪২ সনে প্রফুল্ল র পরিচালিত "নারী" চিত্রে ১টি গান (কে ন কাঁদিছে আকাশ ভুবনময়), গুণময় ন্দ্যাপাধ্যায় পরিচালিত "জীবনসঙ্গিনী" ত্রে ২টি গান ('বাংলার মেয়ে বাংলার ভূমি' 'জনমদুখিনী সীতা') এবং সুশীল জুমদার পরিচালিত "অভয়ের বিয়ে" চিত্রে কিরের কণ্ঠে, ফকিরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ১টি উর্দু গান (আয়ে দিল বেতর উঁস ইয়াদ কিয়ে যা); ১৯৪৪ সনে হরি ভঞ্জ পরিচালিত "মাটির ঘর" চিত্রে ২টি গান ('শ্যামরূপ ধরিয়া এসেছে মরণ' ও 'কাল সাগরের মরণ দোলায়) এবং অজয় ভট্টাচার্য পরিচালিত "ছদ্মবেশী" চিত্রে ১টি গান (বন্দর ছাড় যাত্রীরা সবে)।

উপর্যুক্ত হিসাব অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে, শচীনদা ১০টি বাংলা চলচ্চিত্রে ১৩টি গান গেয়েছিলেন।

এছাড়া সুখময়বাবু আরও জানিয়েছেন যে, শচীনদা ৫টি বাংলা ছবিতে সুরারোপ করেছিলেন (যদিও তিনি—সে যুগে বাংলা ছবিতে তাঁকে কেউ সংগীত পরিচালনার ভার দেয়নি বলে আমার নিকট আগে অভি-মান প্রকাশ করেছিলেন)। সেই ছবিগুলি হল: 'প্রতিশোধ', 'অভয়ের বিয়ে,' 'ছদ্ম-বেশী,' 'মাটির ঘর' ও 'প্রতিকার' (পরি-চালক ছবি বিশ্বাস)। কারো কারো মতে 'রাজকুমারের নির্বাসন' ছবিরও সংগীত পরিচালনা করেন শচীনদা। এটা অনু-সন্ধান করা প্রয়োজন।

এছাড়া শচীনদেব বর্মণ বলেছেন, "নন্দিনী" চিত্রে কাজী নজরুলের সুরে 'চোখ গেল চোখ গেল' গানটি ছাড়া অন্য কারো সুরে তিনি কখনো চলচ্চিত্রে গান করেননি। কিন্তু 'জীবনসঙ্গিনী' চিত্রে দুটি গান তিনি গেয়েছিলেন (বাংলার মেয়ে ও জনমদুখিনী সীতা) তার সংগীত পরিচালক ছিলেন শ্রীহিমাংশু দত্ত সুরসাগর' ওই গান দুটির সুর বোধ হয় তাঁরই দেওয়া। শচীন কর্তা হিমাংশু দত্তর সুরে অনেক গানই গেয়েছেন, চলচ্চিত্রের বাইরে।

আরও একটা কথা, শচীন কর্তা বলেছেন, তাঁর কোন গান অন্য অভিনেতার মুখে প্লে-ব্যাক হয়নি। কিন্তু "রাজকুমারের নির্বাসন" ছবির 'বাঁশুরিয়া রে' ও "জীবন-সঙ্গিনী"-র 'জনমদুখিনী সীতা' প্লে-ব্যাক হয়েছিল। কলকাতায় শচীনদেব বর্মণ সুর-সংযোজিত শেষ ছবি "প্রতিকার" (১৯৪৪)। বোম্বাইয়ে তাঁর সুর-সংযোজিত প্রথম ছবি "বেগম" (পরিচালনা সুশীল মজুমদার)। শচীনদার মতে, ফিল্মিস্তানের হিন্দী ছবি "শিকারী"-তেই বম্বেতে তাঁর প্রথম সংগীত পরিচালনা।

হিন্দী ছবিতে শচীনদা স্বকণ্ঠে যে গান-গুলি গেয়েছেন, সেগুলি হল: ১৯৪৬ সনে ফিল্মিস্তানের "আটদিন" (Eight Days) ছবিতে 'উমীদ ভরা পঞ্ছি থা খোজ রহা সজনী'; বিমল রায়ের "সুজাতা" (১৯৫৬) ছবিতে 'সুনো মেরে বন্ধু রে' ও "বন্দিনী" (১৯৬০) ছবিতে 'মেরে সজন হ্যায় উস্‌পার'; নবকেতনের "গাইড" (১৯৬৩) ছবিতে 'ওহাঁ কৌন হ্যায় তেরা মুসাফির'; শক্তি ফিল্মসের "আরাধনা" (১৯৬৯) ছবিতে 'কাহেকো রোয়ে—সফল হোগি তেরা আরাধনা'; রালহান প্রোডাক-শনের "তালাশ" (১৯৬৯) ছবিতে 'মেরী দুনিয়া হ্যায় মা তেরী আঁচলমে' এবং নবকেতনের "প্রেম পুজারী" (১৯৭০) ছবিতে 'প্রেম কে পুজারী হ্যায় মায় রস কে ভিখারী।'।

এ বিষয়ে পাঠকরা আরও সব তথ্য জানালে বাধিত হব।

সলিল ঘোষ
বোম্বাই-১৪

দৃশ্যপট

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ দেশ পত্রিকার প্রকাশিত শ্রদ্ধেয় নবারুণ গুপ্ত লিখিত "দৃশ্যপট" পড়ে আমরা কিছুটা চিন্তা লাঘব করতে পেরেছি। তাঁর লেখার জন্য আমরা তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আমার একটু বক্তব্য না রেখে পারছি না। সদ্য সমাপ্ত "সারা ভারত ফরোয়ার্ড ব্লক"-এর নবম জাতীয় সম্মেলনে গৃহীত আদর্শ নৈতিক প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে মার্কস-বাদ-ই সুভাষবাদ রূপে পরিগণিত হবে। অর্থাৎ সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন দর্শন হলো মার্কসবাদ—এই কথাই তাঁরা বলেছেন। "ফরোয়ার্ড ব্লকের" এই ঘোষণা কোন বিশেষ দৃষ্টিকোণ হতে বৈপ্লবিক হতে পারে, কিন্তু সুভাষ জীবন দর্শন সম্পর্কে এই ভ্রান্ত মতবাদ বর্জনীয়। সুভাষচন্দ্রকে ইতিপূর্বে অনেকে অনেক-বাদী বলে বর্ণনা করেছেন। কেউ তাঁকে ফ্যাসিস্ট, শভিনিস্ট, ডিক্টেটর, এনারকিস্ট, অথবা মার্কসিস্ট ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করেছেন। কিন্তু সে অনুপাতে "সুভাষ দর্শনে"র মর্মবাণী অনুশীলন প্রয়াস খুবই কম হয়েছে, ইতিহাস পুরুষ সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে "ফরোয়ার্ড ব্লক" নামটি ঐতিহাসিক সূত্রে গ্রথিত সেই সুবিধাটুকু নিয়ে শ্রীঅশোক ঘোষ ও শ্রীচিত্ত বোসের "ফরোয়ার্ড ব্লক" সুভাষ-দর্শনের ভ্রান্ত দিক্‌দর্শন দিতে শুরু করেছেন।

সুভাষকে মার্কসিস্ট বানানোর চেষ্টা অনেক কাল থেকেই দেখা গেছে।

কিন্তু সুভাষ মার্কসবাদেরই উপাসক এবং তিনি সেই দর্শনের ভারতীয় প্রবক্তা, সুভাষচন্দ্রের সম্পর্কে এমন অবমাননাকর উক্তির গৌরবের দাবী বোধ হয় একমাত্র "ছয় সাত" দশকের ফরোয়ার্ড ব্লক করতে পারেন।

রাষ্ট্র, রাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্য ও দর্শন, সমাজ ও মানব প্রগতির বিকাশ ও বিস্তার, সমাজনীতি ও অর্থনীতি, বিপ্লব ও বিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ের মৌলিক মতাদর্শে সুভাষ-মার্কসের ভেতর মাটি আকাশ ব্যবধান।

ভারতীয় পদ্ধতিতে মার্কসবাদের

প্রয়োগকে নেতাজী স্বীকার করেননি। তিনি বার বার বলেছেন, মার্কসবাদ থেকে এগিয়ে যেতে; হেগল, বার্গসঁ, মার্কস, গান্ধী প্রমুখ থেকে সুভাষ স্বতন্ত্র। সুভাষের জীবন দর্শন "সমন্বয়বাদ"। মার্কসের জড়বাদকে যেমনি সুভাষ প্রত্যাখ্যান করেছেন, তেমনি গান্ধীর অতি-ইন্দ্রিয়বাদকেও অস্বীকার করেছেন।

মার্কসবাদের কোন একটি বিশেষ দিককেও নেতাজী ভারতীয় ক্ষেত্রে স্বীকার করেননি। উপরন্তু বলেছেন যে "ভারতীয় সমাজবাদ মার্কসবাদের পুঁথির পাতায় জন্মগ্রহণ করেনি।" সুতরাং "ফরোয়ার্ড ব্লক" যে বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে এই ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেছেন তা সুভাষ-বাদীদের বুঝতে কষ্ট হয় না।

বর্তমানে সিন্ডিকেট-ইন্ডিকেট কোন কংগ্রেসকেই যেমন আর সুরেন-গান্ধীর কংগ্রেস বলা যায় না, তেমনি "ফরোয়ার্ড ব্লক"কেও আর নেতাজীর ফরোয়ার্ড ব্লক বলা যায় না।

হরেন পয়রা
সাধারণ সম্পাদক
সোস্যালিস্ট স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন,
পশ্চিম বাংলা

গোবিন্দমাণিক্যের মুদ্রা

৯ই ফাল্গুন ১৩৭৬ সংখ্যায় প্রকাশিত আমার পত্রের জন্য ধন্যবাদ জানাই। শ্রীযুক্ত বসন্ত চৌধুরীকে ধন্যবাদ জানাই যে এই প্রসঙ্গে আমার পত্রটির শেষ পঙ্ক্তিতে একটি কথা অনবধানতাবশতঃ মূল লিপি হইতে বাদ পড়িয়া গিয়াছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন টেলিফোনে। সেইটি এইরূপ—"১৭২৪ খৃঃ অব্দে রত্নকন্দলী শর্মা ও অর্জুনদাস বৈরাগী নামে দুইজন দূত (যাঁরা) স্বর্গদেব রুদ্রসিংহের শাসনকালে ত্রিপুরা রাজ রত্নমাণিক্যদেবের কাছে প্রেরিত হইয়াছিল তাহারই আখ্যান আছে এই বুরুঞ্জীতে।" "যাঁরা" কথাটি লিপিবদ্ধ না হওয়ায় বক্তব্য অস্পষ্ট থাকিয়া যাইতেছে; কারণ এ রকম মনে হওয়া স্বাভাবিক যে ১৭২৪ খৃঃ অব্দে আসমরাজ রুদ্র সিংহ রাজত্ব করিতেছিলেন। তাহা নয়, আখ্যানটি রচিত হয় ১৭২৪ খৃঃ অব্দে। রুদ্র সিংহ মারা যান ১৭১৪ খৃঃ অব্দে। মূল বুরুঞ্জীর ভাষা

(Government of Assam in the Department of Historical and Antiquarian studies 1938)—

"মহারাজ রুদ্র সিংহ স্বর্গদেবে ত্রিপুরা দেশলৈ পাঠায়। কটকী রত্ন কন্দলী শর্মা আরু অর্জুনদাস বৈরাগীর দ্বারা ১৬৪৬ শকত রচিত। লণ্ডনর বৃটিচ মিউজিয়েমত পুথির পরা পঠ সংগৃহীত" ইতি।

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
কলকাতা-২৯

যুধিষ্ঠিরের নন্দনকানন

যুধিষ্ঠিরের নন্দনকাননের গাছপালার নাম, নামের বানান, গাছের বর্ণনা এবং অন্যান্য যে তথ্য শ্রীজব্বার দিয়েছেন তা আগাগোড়া ভুলে ভর্তি। ফলফুলের সম্পর্কে লেখা অতি সাধারণ বইও এ কথার সাক্ষ্য দেবে।

নতুন গাছের (প্রজাতির) নামকরণের দায়িত্ব যিনি সেই গাছ আবিষ্কার অথবা পরাগ মিলিয়ে সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছেন তাঁর। এ নাম খুশীমত পাল্টানো চলে না। গাছের নাম পাল্টে 'বাংলা নাম' দেওয়া এই কারণে রীতিবিরুদ্ধ।

পরাগ সংগমের দ্বারা এর (ডালিয়ার) নতুন রকম বৈচিত্র্য তৈরী করা হচ্ছে প্রতি মরসুমে। এতে নিশ্চয়ই আমাদের দেশের কথাই বলা হয়েছে। ডালিয়ার সংকর জাতির সৃষ্টির পদ্ধতি জানার আকাঙ্ক্ষা আমার অনেক দিনের। গত দু বছর ধরে যথেষ্ট চেষ্টা করেও কোন ভারতীয়ের খবর পাইনি, যাঁর এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে। শেষ পর্যন্ত পত্রের মাধ্যমে বিদেশের অভিজ্ঞ এবং সহৃদয় ব্যক্তিদের কাছ থেকে কি করে ডালিয়ার সংকর জাতির সৃষ্টি করেন তা জেনেছি। এদেশে যে দু' চারটি সংকর জাতির সৃষ্টি হয়েছে তা একান্তই প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে। লেখকের বক্তব্য ভুল নয় এ কথা প্রমাণ করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করব কোথায় এবং কে ডালিয়ার সংকর জাতি সৃষ্টি করেছেন তা জানাতে।

ব্রহ্মচারী অবারচৈতন্য
নরেন্দ্রপুর

খাজুর গুড় কত কইব্যা

দেশ ১৪শ সংখ্যায় সুনন্দর জার্নালে 'খাজুর গুড় কত কইব্যা' পড়ে খুবই আনন্দলাভ করলাম। বাংলা দেশের বাইরে থেকে এরূপ লেখার মাধ্যমেই শুধু পূর্ববঙ্গের ভাষার আস্বাদ পাওয়া যায়। কলকাতা বা তার আশেপাশে চলাফেরা করতে মনেই হয় না যে, আমরা পশ্চিমবঙ্গে আছি। সেখানে তো পূর্ববঙ্গের ভাষার বিগলিত ধারা প্রবহমান। আমাদের মত দেশছাড়া চাতকদের জন্যই এরূপ লেখার বিশেষ প্রয়োজন আছে। বেশভূষা, চালচলন ইত্যাদি উপর থেকে পরিবর্তিত হলেও ভেতরে ভেতরে যে ভাষার ফল্গুধারা বইছে তা কী করে অস্বীকার করা যাবে? গত ১০ম সংখ্যায়ও জার্নালে 'অতিথেয়তা' লিখে সুনন্দ মনের ভেতর ঢেউ খেলিয়ে দিয়েছেন। এ জন্য তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এখানে নিজের ব্যক্তিগত অনুভবের কথা একটু না উল্লেখ করে পারলাম না। পাকিস্তান হবার পর 'একবার মাত্র দেশে গিয়েছিলাম। সুরমা মেলে যাচ্ছিলাম ময়মনসিং থেকে জগন্নাথগঞ্জ ঘাটের দিকে। একটু তন্দ্রার মত এসেছিল, বোধ হয় ভাদ্র কি আশ্বিন মাস। রেললাইনের দু ধারে ডোবার মধ্যে স্তূপাকারে পাট ভেজানো ছিল। ঐ পাটপচা দুর্গন্ধ যে কী সেটা পূর্ববংগবাসীমাত্রই জানেন। কিন্তু সেদিন ঐ গন্ধ নাকে প্রবেশ করা মাত্র আমার সুখের তন্দ্রা ছুটে গিয়েছিল! আমি তড়াক করে উঠে বসে বুকভরে নিঃশ্বাস নিয়েছিলাম যদিও অনেকের নাকে ছিল রুমালচাপা। ঐ গন্ধ সেদিন আমার কাছে আতরের গন্ধের চেয়েও প্রিয় মনে হয়েছিল। কিন্তু দেশ বিভাগের আগে নিজেই ঐ দুর্গন্ধ সহ্য করতে পারতাম না। দেশকে হারিয়েছিলাম বলেই সেদিন সে দুর্গন্ধ আমার কাছে প্রিয় মনে হয়েছিল। তাই আজ যার মুখে পূর্ব-বংগের ভাষা শুনি তাকেই বেশী করে আপন মনে হয়। সুনন্দের কাছে অনুরোধ তিনি যেন আমাদের মত কাঙ্গালদের মাঝে মাঝে পূর্ববঙ্গের ভাষার রচনা পড়বার সুযোগ দেন। বর্তমানে দেশহারাদের নির্জীব প্রাণে ঐ ভাষাই তাদের পক্ষে "মৃতসঞ্জীবনী সুধা"!

ভূপেন্দ্রচন্দ্র সরকার
লক্ষ্ণৌ—৫

একটি অসাধারণ কবিতার বই

বিনয় মজুমদারের "ফিরে এসো, চাকা" কবিতার বইটি চোখে দেখা মাত্রই হাতে তুলে নিতে ইচ্ছে হয়। প্রথমত বিনয় মজুমদারের কবিতা পড়াই একটা বিশেষ ধরনের অভিজ্ঞতা, তা ছাড়া এই বইটির আকৃতিও ভারী প্রীতিপ্রদ, অনেকটা বিলিতি বইয়ের মতন, উগ্রতাবিহীন। পেপারব্যাকের মতন নরম মলাট, পুরো প্রচ্ছদপট জুড়ে বিনয় মজুমদারের মুখের খানিকটা অংশের

আলোকচিত্র—এতে তাঁর চোখ দুটিই প্রধান, না, ঠিক বলা হলো না। অনেকটা প্রথাগত, তাঁর ঠোঁটের ভঙ্গিটিই বেশী চোখে পড়ে। বইটি প্রকাশ করেছেন মীনাক্ষী দত্ত।

বিনয় মজুমদারের মতন কবি পৃথিবীর যে-কোনো দেশেই দুর্লভ। বাংলা দেশ কবিতার দেশ—এটা নিতান্তই ছেঁদো কথা, যদি সত্যিই তাই হতো, তা হলে বিনয় মজুমদারকে বাংলা দেশের মাথায় করে রাখা উচিত ছিল। অবশ্য, মাথায় করে রাখলেই যে বিনয় মজুমদার সেখানে থাকতেন, তা মনে হয় না, ও রকম কুস্থান তিনি অচিরে পরিহার করতেন, কিন্তু সেটা অন্য কথা।

কলেজ স্ট্রীট কফি হাউসে বিনয় মজুমদারকে বিকেলের দিকে প্রায়ই দেখা যায়। এই বইয়ের কবি পরিচিতিতে তাঁর ঠিকানা হিসেবে ঐ স্থানই উল্লেখ করা হয়েছে। আমি বিনয় মজুমদারকে বেশ কয়েক বছর ধরে ওখানে দেখছি। এখন বেশ রোগা হয়ে গেছেন। সাধারণত কোট ও প্যাণ্ট পরে থাকেন—বেশ কয়েক বছর সেগুলো কাচা হয়নি, চোখে মোটা কাচের

চশমা, মাঝে মাঝেই গালে দাড়ি থাকে। পরিচিত লোকদের দেখলে বিনয় সেই টেবিলে এসে বসেন, প্রায়ই তিনি অন্যদের সঙ্গে কথা না বলে নিজের মনে একা একা কথা বলেন। দু'একদিন কোনো মেয়েকে দেখা মাত্রই ওঁকে খুব চটে উঠতে লক্ষ করেছি। তবে, দৈবাৎ দু'চারদিন বিনয় যখন হাসিখুশী ভাবে সবার সঙ্গে গল্প করেন, তখন ওঁকে বড্ড ভালোবাসতে ইচ্ছে করে।

বিনয়কে কিছুতেই সুস্থিরমস্তিষ্ক বলা যায় না। তবে বিশ্ব সংসারে উনি কারুর কোনো ক্ষতি করছেন না, নিজের ছাড়া। ক্ষতি করছেন কিংবা নিজেকে নিগ্রহের এমন একটা স্তরে নিয়ে গেছেন, যেখানে মানুষ হয়তো অনেকটা মোহমুক্ত হতে পারে।

বিনয় মজুমদারের জন্ম ১৯৩৪এ। যুদ্ধের সময় তিনি বাবা মায়ের সঙ্গে পায়ে হেঁটে বর্মা থেকে ভারতবর্ষে আসেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই এস সি পাশ করে শিবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়েন। ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বিনয়ের প্রথম শ্রেণীর ডিগ্রি আছে। দুর্গাপুরে দু বছর চাকরিও করেছিলেন, কিন্তু চাকরি করা বিনয় মজুমদারকে মানায় না। রুশ ভাষা শিখে এক সময় ঐ ভাষা থেকে অনুবাদ করে জীবিকা অর্জন করতেন। পাঁচটি অনুবাদের বইও প্রকাশ করেছেন। এখন বিনয় জীবিকা কিংবা গ্রাসাচ্ছাদনের তোয়াক্কা করেন না।

পায়ে হেঁটে দেশান্তর গমন বিনয়ের শুধু বাল্যকালেই ঘটেনি। এই তো কিছুদিন আগে, বিনয় হাঁটতে হাঁটতে পূর্ব পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন। উভয় পক্ষের

নজরুল : স্মৃতি সংকলন

নজরুল স্মৃতি। সম্পাদনা : বিশ্বনাথ দে। সাহিত্যম্‌, ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট; কলকাতা-১২। দাম : ৬·০০ টাকা।

বাঙালী-জীবনে কাজী নজরুল ইসলাম এক পরম গৌরব ও চরম বেদনার সমন্বয়। রবীন্দ্রনাথের পর এমন বহুমুখী প্রতিভার আবির্ভাব আর ঘটেছে কিনা তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে হয়তো, কিন্তু পুরোপুরি অস্বীকার করার মত যুক্তিও বোধ হয় খুঁজে পাওয়া যাবে না। নজরুলকে পরিপূর্ণ রূপে জানার জন্য আলোচ্য গ্রন্থটি বিশেষভাবে সহায়তা করবে।

নজরুল সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে যা যা লিখেছেন সেগুলি সযত্নে সংকলিত হয়েছে গ্রন্থটিতে। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, কুমুদরঞ্জন, হেমেন্দ্রকুমার রায়, শৈলজানন্দ, তারাশংকর, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, জসীমউদ্দীন, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, পরিমল গোস্বামী, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, মোহিতলাল মজুমদার, কাজী আবদুল ওদুদ, সৈয়দ মুজতবা আলী, গুরুদাস ভট্টাচার্য, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ কবি সাহিত্যিক ও সমালোচক; বিপিনচন্দ্র পাল, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, সুভাষচন্দ্র বসু, নলিনীকান্ত সরকার, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় প্রমুখ বিপ্লবী ও রাজনীতিক; শচীনদেব বর্মণ, ইন্দুবালা, আব্বাসউদ্দীন, আঙুরবালা, যূথিকা রায়, সলিল চৌধুরী প্রমুখ সঙ্গীতবিদ; মন্মথ রায়, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, সরযূবালা, দেবনারায়ণ গুপ্ত প্রমুখ নাট্যসেবী এবং আরও অনেক বিশিষ্ট লেখকের প্রাণবন্ত রচনার সংকলনটির মধ্য দিয়ে নজরুলের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রকাশ পেয়েছে। যদিও কিশোরদের উপযোগী করে রচনাগুলি সম্পাদিত, তথাপি সব বয়সের পাঠকরাই বইটি থেকে রস সংগ্রহ করতে পারবেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কল্প-কথাটি তো শেষ পর্যন্ত চোখ ভিজিয়ে দেয়। সম্পাদক ও প্রকাশককে ধন্যবাদ, তাঁরা এই গ্রন্থটি প্রকাশ করে একটি জাতীয় কর্তব্য পালন করেছেন।

(৬৩।৭০)

বিবিধ

ছিন্ন চিন্তা। ১ম ও ২য় পর্ব। শ্রীঅচৈতন্য। প্রকাশক—ডাঃ নস্কর, ভট্টাচার্য-পাড়া, বারুইপুর, ২৪ পরগণা। দাম: প্রতি পর্ব ২·২৫ পয়সা।

আলোচ্য গ্রন্থটি লেখকের স্মৃতিচারণা। বাইরের নানা বৈচিত্র্য অন্তরে যে অনুভূতির সৃষ্টি করে তা ডায়েরীর পৃষ্ঠা থেকে সরাসরি পুস্তকের পৃষ্ঠায় উপস্থিত। লেখকের ভাষা সাবলীল, সুতরাং সুখপাঠ্য। লেখকের বোধ ও বিশ্বাসের সঙ্গে সকলে একমত হয়তো নাও হতে পারেন, কিন্তু তাঁর আন্তরিকতা উপেক্ষণীয় নয়। সমব্যথী ও সহানুভূতিশীল পাঠকের কাছে বই দুখানি উপযুক্ত মর্যাদা পাবে বলে আশা করা যায়।

পত্রিকা

সমতট প্রকাশন (এ বাইলিংগুয়াল কোয়ার্টারলি)। অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৬৯। সম্পাদনা—অর্ঘ্যকুসুম দত্ত। ৫/১/বি, দেশপ্রিয় পার্ক রোড। কলকাতা-২৯। দাম প্রতি সংখ্যা দু টাকা।

বাংলা ও ইংরেজী প্রবন্ধ মিলিয়ে এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাটির এটি দ্বিতীয় সংখ্যা। বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ ছাড়া আরব-ইজরাইল বিরোধ নিয়ে চারজনের আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন ইজরাইলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বা ইবন, কায়রোর আল আহরম পত্রিকার সম্পাদক ক্লোভিস মকসুদ, জয়প্রকাশ নারায়ণ ও অভিনব গুপ্ত। বঙ্গ সংস্কৃতির লেন-দেন সম্পর্কে অধ্যাপক বিনয় সরকারের একটি পুস্তিকা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। বর্তমান সংখ্যায় ওড়িয়া কবি রামামোহানের সাক্ষাৎকার বেরিয়েছে, গত সংখ্যায় বেরিয়েছিল একজন অসমিয়া কবির, সামনের সংখ্যায় থাকবে উর্দু-কবি মখদুম মহীউদ্দীনের কবিতা সম্পর্কে আলোচনা। পাঠকদের চিঠিপত্রের বিভাগটিও আকর্ষণীয়। লিটল ম্যাগাজিনগুলি কীভাবে বিজ্ঞাপন ও ডাক টিকিটের সমস্যা অতিক্রম করতে পারে, একটি চিঠিতে সে-বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে। সামনের সংখ্যার প্রধান আলোচনার বিষয়—"কম্যুনিজম ও ভারতবর্ষ" এবং এই বিতর্কে ৬ জন মার্কসবাদী ও অ-মার্কসবাদী পণ্ডিত অংশ গ্রহণ করছেন বলে জানানো হয়েছে।

গবেষণা : জানুয়ারি। সম্পাদক—আশিস সিংহ। প্রকাশক-বিজ্ঞান সংস্থা, ২৭ জাস্টিস মন্মথ মুখার্জী রো, কলকাতা-৯। দাম এক টাকা।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার জন্যই এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি বের করা হয়েছে।

এটি পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা। শুশুনিয়া পাহাড়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সম্পর্কে তিনটি আলোচনা আছে। শুশুনিয়াতে অ-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধানের কাজ চালানোর বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। সূচীপত্রে তিনটি গবেষণা-পত্র প্রকাশের কথা থাকলেও গোটা পত্রিকাটাই গবেষণামূলক আলোচনায় ভর্তি। বিভিন্ন বাংলা বৈজ্ঞানিক পরিভাষার একটি তালিকাও প্রকাশিত হয়েছে।

প্রাপ্তি স্বীকার

সুরের খেয়া (১ম পর্ব)। নির্মলেন্দু ঘোষ। শ্রীশিবদাস ঘোষ ঃ নবপল্লী, বারাসাত, ২৪ পরগণা। মূল্য ঃ ১·০০।

উপনিষদ। রামমোহন রায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ঃ ২১১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। মূল্য ঃ ২·০০।

ময়ূর-মাধুরী। শ্রীপ্রশান্তকুমার মুখোপাধ্যায়। নব পুস্তক বিপণি ঃ ১২-১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ঃ ১·০০।

হেনরী ডিরোজিও ঃ কবি ও প্রাবন্ধিক। পল্লব সেনগুপ্ত। সারস্বত লাইব্রেরী ঃ ২০৬, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। মূল্য ঃ ১·৫০।

নজরুল স্মৃতি। সম্পাদনা ঃ বিশ্বনাথ দে। সাহিত্যম্ ঃ ১৮-বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ঃ ৬·০০।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্য সংগ্রহ। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ ঃ ৫, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭। মূল্য ঃ ১৪·০০।

প্রভু শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা। শ্রীরমণীমোহন রায়। বিষ্ণুপ্রসাদ রায় ঃ ১২/১, ইসমাইল স্ট্রীট, কলিকাতা-১৪। মূল্য ঃ ৩·০০।

বি-এফ-জে-এ'র নির্বাচনে

১৯৬৯-এর শ্রেষ্ঠ

বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের ব্যালট ভোটে ১৯৬৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির শ্রেষ্ঠত্ব নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী (শনিবার ৭ মার্চ সন্ধ্যায় ভোট গণনা হয়) সত্যজিৎ রায় একাই ৫টি বিভাগে (পরিচালনা, চিত্রনাট্য, সংগীত পরিচালনা, গীত-রচনা ও সংলাপ রচনা) শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান পেয়েছেন। একই বছরে একসঙ্গে এতগুলি সম্মান বি-এফ-জে-এ-র সদস্যদের নিকট থেকে ইতিপূর্বে আর কেউই পান নি। এই সম্মান তিনি পেয়েছেন নেপাল দত্ত ও অসীম দত্ত প্রযোজিত 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবির জন্য। এছাড়া অভিনয়, চিত্রগ্রহণ, শিল্প-নির্দেশনা, সম্পাদনা ও শব্দগ্রহণ—এই ৫টি বিভাগেও ওই ছবির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিল্পী ও কলাকুশলীরা শ্রেষ্ঠত্বের সম্মানে সম্মানিত। 'গুপী গাইন' কিন্তু শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চিত্রের সম্মান লাভে বঞ্চিত হয়েছে। সে সম্মান পেয়েছে মৃণাল সেন কৃত 'ভুবন সোম'। 'গুপী গাইন'-এর স্থান ওই পর্যায়ে দ্বিতীয়। সম্পূর্ণ ফলাফল নিম্নরূপ :

বছরের শ্রেষ্ঠ দশটি ভারতীয় ছবি (গুণানুক্রমে)—ভুবন সোম, গুপী গাইন বাঘা বাইন, আশীর্বাদ, সরস্বতীচন্দ্র, অনোখী রাত, আরোগ্য-নিকেতন, নতুন পাতা, রাহ্‌গীর, নান্‌হা ফরিশ্‌তা, পরিণীতা। **শ্রেষ্ঠ অভিনেতা** (বাংলা)—তপেন চট্টোপাধ্যায় (গুপী গাইন...); হিন্দী : অশোককুমার (আশীর্বাদ)। **শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী** (বাংলা)—অপর্ণা সেন (অপরিচিত); হিন্দী : সুহাসিনী মুলে (ভুবন সোম)। **শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা** (বাংলা)—নির্মলকুমার (কমললতা); হিন্দী : অজয় সাহানি (অনোখী রাত)। **শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রী** (বাংলা)—রমা চৌধুরী (মন নিয়ে); হিন্দী : শশিকলা (রাহ্‌গীর)।

অন্যান্য বিভাগে শ্রেষ্ঠত্বের গৌরবে সম্মানিত : **চিত্রনাট্য ও পরিচালনা** (বাংলা)—সত্যজিৎ রায় (গুপী গাইন); হিন্দী : মৃণাল সেন (ভুবন সোম)। **সংলাপ** (বাংলা)—সত্যজিৎ রায় (গুপী গাইন); হিন্দী : পণ্ডিত আনন্দকুমার (অনোখী রাত)। **সংগীত** (বাংলা)—সত্যজিৎ রায় (গুপী গাইন); হিন্দী : কল্যাণজী আনন্দজী (সরস্বতীচন্দ্র); **চিত্রগ্রহণ** (বাংলা)—সৌমেন্দু রায় (গুপী গাইন); হিন্দী : কে কে মহাজন ভুবন সোম)। **কালার ফোটোগ্রাফি** (হিন্দী) —কানাই দে (রাহ্‌গীর)। **শিল্প-নির্দেশনা** (বাংলা)—বংশী চন্দ্রগুপ্ত (গুপী গাইন); হিন্দী : রবি চট্টোপাধ্যায় (রাহ্‌গীর)। **সম্পাদনা** (বাংলা)—দুলাল দত্ত (গুপী গাইন); হিন্দী : গঙ্গাধর নস্কর (ভুবন সোম)। **গীত-রচনা** (বাংলা)—সত্যজিৎ রায় (গুপী গাইন); হিন্দী : ইন্দিবর (সরস্বতীচন্দ্র)। **নেপথ্যসংগীত** (বাংলা)—মান্না দে (চিরদিনের), প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় (পরিণীতা); হিন্দী : মুকেশ ও লতা মঙ্গেশকর (সরস্বতীচন্দ্র)। **শব্দগ্রহণ** (বাংলা)—অতুল চ্যাটার্জী, সুজিত সরকার ও নৃপেন পাল (গুপী গাইন); হিন্দী : ডি সি মেনন (নান্‌হা ফরিশতা)। এ ছাড়া একটি বিশেষ পুরস্কারের অধিকারী : বেবি রানী (নান্‌হা ফরিশতা)।

বছরের শ্রেষ্ঠ তিনটি **বিদেশী চিত্র** (গুণানুক্রমে) : এ স্পেস ওডিসি, রোজমেরিজ বেবি, বনি অ্যানড ক্লাইড। এই বিভাগে শ্রেষ্ঠ পরিচালক, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রী যথাক্রমে : স্ট্যানলি কুব্রিক (এ স্পেস ওডিসি), সিডনে পয়টিয়ের (টু স্যর, উইথ লাভ), অড্রে হেপবার্ন (ওয়েট আনটিল ডার্ক।)

পীনেন গুপ্তর পরিচালনায় তৈরি হচ্ছে "প্রথম প্রতিশ্রুতি" ছবির বিশিষ্ট চরিত্রের শিল্পী শ্রীগুপ্তর কন্যা সোনালি গুপ্ত ফটো—দেশ

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের (ডাইনে) সংগীত পরিচালনায় গত সপ্তাহে "আজব শহর" ছবির গান রেকর্ড করা হয়—ছবিতে দুই কণ্ঠশিল্পী বনশ্রী সেনগুপ্ত ও সন্ধ্যা মুখার্জী। রবীন বসু ছবিটি পরিচালনা করছেন ফটো—দেশ

নাচের সেটে এমন কি বিরাট এক মদের গ্লাসের ভিতর হেলেনকে দেখা যায়। আবেগের ব্যাপার নিয়েও বাড়াবাড়ি, আদর্শ বা বক্তব্য বিষয়েও তাই, ক্লাইমের কথা আর বলে লাভ নেই। অভিনয় সকলেরই চরিত্রানুগ। তবে সঞ্জীবকুমার যে বড় অভিনেতা সে প্রমাণ ছবিতে আছে।

বক্তব্যপ্রধান গানও (সুর : শঙ্কর-জয়কিষণ) ছবিতে আছে। একটি গানে... ময় নে দুনিয়া দেখী হৈ—হালের দুনিয়া দেখার কথা রয়েছে। আমরা দেখলাম, হালের একটি হিন্দী ছবি যাতে সাচ্চাই হল স্থূল আমোদ।

॥ চিত্র-সমালোচনা ॥

সাচ্চাই

মূলত দুই বন্ধুর কাহিনী "সাচ্চাই"। কিশোর (সঞ্জীবকুমার) সাচ্চাই কা পুজারী অর্থাৎ সত্যের পুজারী, অশোক (শাম্মি কাপুর) বিপথগামী। ওরা তিন বছরের সময় চেয়ে নিল পরস্পরের কাছে—কিশোর প্রমাণ করবে সত্যের জয় অশোক দেখাবে এ-যুগে সত্য নিহত, জয় অন্যায়ের। এই সংকল্প তারা নিয়েছে মহাত্মাজীর মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে। একাধিকবার দেখা গেছে, কিশোর কোন বড় আদর্শের কথা যখন বলতে যাচ্ছে তখন পরিচালক তাকে মহাত্মাজীর প্রতিমূর্তির সামনে এনে দাঁড় করিয়েছেন। সে যাক কলিকালেও যে (এক পাগলের মুখে কলির ধর্ম বিবৃত) সত্যের জয় হয় তা দেখানোই চিত্রকাহিনীর লক্ষ্য। না কি উপলক্ষ? মনে তো হয় চিত্রনাট্যের তথা চিত্রপরিচালক কে শঙ্করের আসল উদ্দেশ্য সাচ্চাইয়ের জয় দেখানো নয়, সাচ্চাইয়ের আদর্শকে সামনে রেখে নোংরা নাচ-গান, কমেডি, অ্যাকশন, ক্রাইম এবং স্থূল ভাবাবেগের নেশায় দর্শককে মজিয়ে রাখা।

তিন বছরের মধ্যে অশোক সৎজীবনে ফিরে এসেছে, কিশোর হয়েছে বড় জাতের ডাকু—ছদ্মনাম তখন তার বাগী সিতারা। সত্যের জয় হয়েছে ঠিকই, তবে যার যা হবার কথা সে তা হয়নি। অবশ্য এতে পরিচালকের কোন অসুবিধা হয়েছে মনে হয় না। একজন তো পাপের পথে থেকেই গেছে এবং এই সুযোগে ছবিতে ক্রাইমের অঢেল উপকরণও রাখা হয়েছে। অভিনেতা প্রাণও ছবিতে আছেন। তিনিই কিশোরকে পাপের পথে টেনে এনেছেন।

তিন বছর পর যখন আবার দুই বন্ধু মহাত্মাজীর মূর্তির পদতলে তখন অশোক জাঁদরেল পুলিস ইনসপেক্টার, কিশোর বাগী সিতারা। ইনসপেকটর অশোক জানত না, যে বাগী সিতারাকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় ধরবার জন্য সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সে তারই প্রাণের বন্ধু কিশোর। আশ্চর্য, এত নামকরা যে ডাকাতকে ধরতে হবে তার কোন ছবি কি পুলিসের কাছে ছিল না? এদিকে কিশোর জানত না, যে ইনসপেকটারকে সে নিধন করতে চায় সে অন্য কোন অশোক নয়, তারই বন্ধু অশোক। কিশোরের অধঃপতন তার বোন শোভাও (সাধনা) জানতে পারেনি। কিশোর বাড়ি ছেড়ে এসেছিল অনেকদিন আগেই। সে অন্য কাহিনী। অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব নানা উপায়ে কাহিনীটি গাঁথা হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত অশোকের গুলিতেই কিশোর অর্থাৎ বাগী সিতারা গুলিবিদ্ধ হয়ে মরেছে। অশোক তাকে শেষ সময়ে বলেছে, বন্ধুর হাতে নয় কানুনের হাতে তুমি নিহত। এই ধরনের মামুলি নাট্যদ্বন্দ্ব, পুলিসের জীবনে কর্তব্য ও প্রেমের সংঘাত হিন্দীচিত্রে প্রায়শই দেখতে হয়। মরবার আগে কিশোর জেনে গেছে তার বোন শোভা অশোকেরই প্রণয়িনী।

দর্শকরা হিন্দী ছবিতে সাধারণত যা চান তা সবই এ-ছবিতে আছে। "সাচ্চাই"-এর অতিরিক্ত আকর্ষণ জাঁকজমকপূর্ণ সেট, রঙের বাহার। মাদ্রাজের এই হিন্দী ছবি দেখে মনে হয়, পরিচালক অল্পে তুষ্ট নন।

বিজ্ঞাপনে তনুজার নামের পাশে এখন আর ব্র্যাকেটে "বম্বে" লেখা হয় না। "বম্বে" কথাটির উচ্ছেদ বোধ হয় "দুষ্টু প্রজাপতি"র পর থেকে। "অ্যান্টনী ফিরিঙ্গি" থেকে লক্ষ করছি তনুজাকে আর বোম্বের শিল্পী বলে পরিচিত করাবার প্রয়োজন হচ্ছে না। তনুজা এখন বাংলা দেশেরই নায়িকা। এখানে ওঁর ডিমাণ্ডও খুব। বিশেষ করে পরিবেশক মহলে। ব্যক্তিগতভাবে আমি একজন পরিবেশকের কথা জানি, প্রযোজকের ইচ্ছা ছিল অন্য কোন নায়িকাকে নিয়ে নতুন ছবি শুরু করার, কিন্তু পরিবেশক নাকি তাঁকে সাফ জবাব দিয়েছেন, তনুজাকে না নিলে চলবে না। একজিবিটারের কাছ থেকে তনুজার নামের বিনিময়ে পরিবেশক মহোদয় নাকি মোটা অঙ্ক অ্যাডভান্স নিতে পারবে। এখন মুশকিলে পড়েছেন উক্ত ছবির পরিচালক। অন্য নায়িকার সঙ্গে তিনি কথা বলে রেখেছিলেন, শুধু তাই নয়, "ভিসুয়েলি"ও কিছুতেই তিনি তনুজাকে ঐ গল্পের নায়িকারূপে ভাবতে পারছেন না। শেষ-সংবাদ, শেষ পর্যন্ত তনুজাকেই নায়িকা করে ছবিটির শুটিং শুরু হচ্ছে।

তনুজার হাতে এখন বাংলা ছবি কী কী? "চৈতালি" ও "প্রথম কদম ফুল" প্রায় শেষ, নতুন ছবি বলতে একমাত্র "রাজকুমারী"। রোল সম্পর্কে তনুজা এখন খুবই "সিলেকটিভ"। সংখ্যায় বেশি ছবি করার ইচ্ছে ওঁর নেই। বেছে বেছে ছবি নিচ্ছেন। এক সাক্ষাৎকারে তনুজা আমায় বলেছেন, "কোন রকমের রিস্ক" নিতে আমি রাজী নই। নতুন ছবিতে সই করার আগে প্রথমেই আমি দেখে নিই সেই ছবির নায়ক কে? "বাংলা দেশে আপনার প্রিয় নায়ক কে?"

বিপন্ন মানুষের বুকে তীব্রভাবে বেজেছে।

আসল গল্প, আগেই বলেছি, দস্যু-সর্দারকে নিয়ে। নাম তার রঙ্গন। শিরোমণির মেয়ে সুলভাই দস্যু রঙ্গনের মনে নতুন জীবনের বীজ রোপণ করেছে। রত্নাকরের মতই রঙ্গনের নবজীবন লাভ, যার সূত্রপাত রঙ্গন ও সুলভার প্রথম সাক্ষাতে। রঙ্গন ও সুলভার প্রেমের জটিলতা, পারস্পরিক মূল্যবোধের প্রারম্ভিক সংঘর্ষ, একটি পরীক্ষাকে (রঙ্গনের রূপান্তর) সফল করে তোলার জন্য সুলভার তপস্যা এবং রঙ্গনের উত্তরণ নাটকে সুন্দরভাবে বিশ্লেষিত। রঙ্গন-সুলভার কাহিনীকে এক পাশে রেখে নাট্যকার কুমার রায় পরিবেশীয় সমস্যাগুলিকে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু নাটকে একটি অপরটির পরিপূরক মনে হয়েছে। নাটকের শুরু চমৎকার, বনের মধ্যে দেবী চামুণ্ডার সামনে ডাকাত দল শপথ নিচ্ছে। ভয়ংকর অথচ স্বাভাবিক ওই দৃশ্যগঠনে নাট্য-পরিচালিকা তৃপ্তি মিত্রর কল্পনাশক্তির প্রশংসা করতে হয়। "কিংবদন্তী" নাটক কিয়দংশে "বাল্মীকি প্রতিভা"-প্রভাবিত কিনা সে ভিন্ন কথা। কিন্তু মঞ্চে "বাল্মীকি প্রতিভা"-র ডাকাত দল-সমন্বিত বনদৃশ্যে এমন ভয়াল পরিবেশ ও "অ্যাটমসফিয়ার" এর আগে নজরে পড়েনি। বেদীতে মূর্তি স্থাপন, ডাকাতদের দাঁড়ানো ও ওঠা-বসার মধ্যে এমন জ্যামিতিক আঙ্গিক-পরিকল্পনার পরিচয় দিয়েছেন পরিচালিকা যার ফলে ওই দৃশ্যের ভাব-ব্যঞ্জনা সহজেই মূর্ত হয়ে উঠেছে। এর জন্য মাঞ্চিক দৃশ্যসম্ভারের প্রয়োজন হয়নি। প্রয়োগের যে বৈশিষ্ট্য বহুরূপীর প্রায় সব নাট্যপ্রযোজনাতেই দেখা যায় এই নাটকেও তা রয়েছে—অনাড়ম্বর মঞ্চসজ্জায় পরিবেশের রূপ এবং অ্যাকশনের ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তোলা, যার জন্য ধ্বনি বা আলোকের অতিরিক্ত ব্যবহারের কোন দরকার পড়ে না। নাট্যপরিচালিকা হিসাবে তৃপ্তি মিত্রর আর একটি অভাবনীয় কৃতিত্ব হল নাটকটিতে স্বচ্ছন্দ গতিবেগ সঞ্চার করা। ঘূর্ণায়মান মঞ্চ ছাড়াই এই গতিবেগ দেখা গেছে নাটকে।

নাটকের শেষভাগ আরও রসোত্তীর্ণ হতে পারত কিনা সে প্রশ্ন উঠতেই পারে। সুলভা ও রঙ্গনের ব্রত উদযাপন সবে শেষ হতে চলেছে। সুলভা অপেক্ষা করে আছে

"সিম্থল কুইন" প্রতিযোগিতায় "মিস ক্যালকাটা" নির্বাচিত হয়েছেন কুমারী শমিতা মুখার্জি। গত ৪ মার্চ গোদরেজ সাবান প্রস্তুতকারক এবং "ইভস উইকলি"-র যুগ্ম উদ্যোগে এই আঞ্চলিক সুন্দরী প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়—বিভিন্ন অঞ্চলের সুন্দরীরা ২০ মার্চ বোম্বাইয়ে মিস ইণ্ডিয়া প্রতিযোগিতায় যোগ দেবেন। মিস ইণ্ডিয়া-কে এবার আন্তর্জাতিক সুন্দরী প্রতিযোগিতা ছাড়াও জাপানের "একসপো—৭০" প্রদর্শনীতে পাঠানো হবে।

ফটো—দেশ

কবে শুকনো কাঠে কাঁচ পাতা গজাবে, রঞ্জনের তখন পরিপূর্ণ অহিংসার ব্রত। ওই মুহূর্তে এক অসহায় নারীর জীবন বাঁচাতে গিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও রঞ্জনের হাতে তখনকার ডাকাত-সর্দার বিষাণ নিহত। রঞ্জন কি তবে পদস্খলিত? রঞ্জনের মনে ওই রকমেরই একটা দ্বন্দ্ব। এই অন্তর্দ্বন্দ্বকে তীব্র করে তুলে অধিকতর নাট্যক্রিয়া সৃষ্টির অবকাশ পাননি নাট্যকার। সুলভা-রঞ্জনের মিলন ঘটানোর ব্যস্ততা তখন নাটকে আচমকা ছেদ টেনে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে প্রথম থেকেই নাটকে রসের যে প্রস্তুতি ছিল তা নানা ঘটনার ভিতর দিয়ে রসোত্তীর্ণতার পথ ধরে অনেক দূর এসেও পরিণতির মুখে কেমন যেন বানচাল হয়ে গেল। নাটকটি পরিণামরমণীয় হতে নয়, কিন্তু ক্লাইম্যাক্সের অল্প আগে পর্যন্ত ওই নাটক দর্শককে অভিভূত করে রাখে। নাটকের আবেদন হঠাৎ কেন থেমে গেল, সুলভা-রঞ্জনের কাহিনীতে নতুন কোন ডাইমেনশন দেওয়া কেন সম্ভব হল না, বক্তব্য কেন শেষের দিকে স্তব্ধ হল—এ-নিয়ে আক্ষেপের মনোবৃত্তি দর্শকের বিশেষ থাকে না। কী হলে কী ভাল হত, শিরো-মণির নেতৃত্বে প্রতিরোধ সংগ্রামে যোগ দিলে রঞ্জনের শান্তিমন্ত্রের সার্থকতা ও স্বাভাবিক পরিণতি মিলত কিনা, রঞ্জনের রূপান্তর যদিও কাম্য কিন্তু সুলভার সঙ্গে তার মিলন অপরিহার্য ছিল কি?—ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাবার সুযোগ দেয়নি "কিংবদন্তী"। নাম যখন "কিংবদন্তী", তখন এই চুলচেরা সূক্ষ্ম বিচারের প্রয়োজন কী? নাটকের অনিবার্য আকর্ষণ বেড়েছে সুন্দর কয়েকটি ঘটনায়, রসমুহূর্তে—যে-প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাসী ও সুলভার মধুর সম্পর্ক উল্লেখযোগ্য। পরিচালিকা এদের উপস্থিতিতে নাটকে সহজিয়া প্রেমের মিষ্টিক রস নিয়ে এসেছেন। টুকরো টুকরো কীর্তন গানে এই রস পরিস্ফুট।

পরিচালিকার আরও বড় কৃতিত্ব, কোন্ নাটকে কী ধরনের অভিনয় সার্থক তা তিনি শিল্পীদের বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন। পূর্ব বাংলার ভাষায় শিল্পীদের দিয়ে স্বাভাবিক অভিনয় করাতে সক্ষম হয়েছেন। প্রায় সকল শিল্পীর অভিনয়ই উঁচুদরের। শাঁওলী মিত্র হয়েছেন সুলভা। শ্রীমতী মিত্রর অসামান্য চরিত্রচিত্রণ, চরিত্রের যন্ত্রণা ও সমস্যার গভীরে যাওয়ার অনায়াস ক্ষমতা এবং বাচনভঙ্গি বিস্মিত করেছে। ইনি শিল্পী-দম্পতি শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্রর কন্যা, পিতা-মাতার কাছে শাঁওলীর অভিনয়-দীক্ষা সার্থক। রঞ্জন হয়েছেন অশোক চট্টোপাধ্যায়। প্রথমে শান্ত এবং পরে দ্বিধা-জড়িত প্রেম ও আত্মত্যাগের প্রতিমূর্তি রঞ্জন। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের চরিত্রবিশ্লেষণ চমৎকার। অসাধারণ অভিনয়

অমল দত্ত পরিচালিত "আবার রাঙালো" ছবিতে অনিল ও সুচন্দ্রা।

গঙ্গাপার বন্দরে শিরোমণি। গঙ্গাপার বন্দর শিরোমণি সরল ব্রাহ্মণ, কখনও বা প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞায় দীপ্ত। ভোলা সম্ভব নয় আরতি মৈত্রের কৃষ্ণদাসীকে, গ্রাম্য বৈষ্ণবী কৃষ্ণদাসী, আরতি মৈত্রর অভিনয়ে চরিত্রটির কথা বলা, গান গাওয়া এত স্বাভাবিক হয়েছে যে মনেই হয় না কেউ ওই চরিত্রে অভিনয় করছেন।

নিমাই গুপ্ত, উদয় সিংহ, কালীপ্রসাদ ঘোষ, উৎপল ভট্টাচার্য প্রমুখ শিল্পীরাও তাঁদের অভিনয়ের জন্য অকুণ্ঠ প্রশংসা পাবেন। কৌতুক-অভিনয়ে দর্শকদের হাসিয়েছেন তারাপদ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়।

খালেদ চৌধুরীর মঞ্চসজ্জা শিল্প-সম্মত।

কলকাতায় জি-ডি-আর চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদল

ভারতের নানা শহরে এ-মাসে পূর্ব জার্মানীর চলচ্চিত্রের উৎসব হচ্ছে। কল-কাতায় সাতদিনব্যাপী উৎসব শুরু হচ্ছে ১৩ মার্চ। এই উপলক্ষে ওই দেশের এক চলচ্চিত্র প্রতিনিধি দল ভারতে এসেছেন। গত সপ্তাহে (৪ মার্চ) তাঁরা বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশন-এর সভ্যদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। তার আগের দিন ফেডারেশন অব দি ফিল্ম সোসাইটিজ অব ইণ্ডিয়া তাঁদের স্বাগত জানান।

প্রতিনিধিদলে ছিলেন "টাইম টু লিভ" (উৎসবে দেখানো হবে) ছবির পরিচালক হর্স্ট সীম্যান এবং ওই ছবির অভিনেত্রী ট্রউল কুলিকাওয়াস্কি। সাংবাদিকদের সঙ্গে তাঁরা নানা বিষয়ে কথা বলেন—তাঁদের দেশের ছবির কথা, দেশ-বিদেশের চল-চ্চিত্রের কথা। শ্রীমতী কুলিকাওয়াস্কি জানান, বিদেশের অভিনেতাদের মধ্যে মার্চেলো মাস্ত্রোয়ানিকে তাঁর খুব পছন্দ। পরিচালক শ্রীসীম্যান বলেন, ফরাসী নুভেল ভাগ সম্বন্ধে তিনি অবহিত। তবে গদার, ত্রুফো প্রমুখ পরিচালকরা "ফর্ম" নিয়ে যত মাথা ঘামান "কনটেণ্ট" নিয়ে ততটা নয়। "হিরোশিমা মনামুর" ছবিটি শ্রীসীম্যানের খুব ভাল লেগেছে। আমেরিকার পরি-চালকদের মধ্যে স্ট্যানলি ক্রেমারের প্রশংসা করেন পূর্ব জার্মানীর চলচ্চিত্রকার। ইঙ্গ-মার বার্গম্যানের প্রসঙ্গ উঠলে তিনি বলেন মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী হিসাবে আমি তাঁকে গ্রহণ করতে পারি না।

প্রতিনিধিরা বলেন, তাঁদের দেশে সরকারী সংস্থায় বছরে প্রায় ২০টি ফিচার ছবি তৈরি হয়। রোমাণ্টিক ছবিও তাঁরা তৈরি করেন। তবে সমসাময়িক জীবনযাত্রার উপর ছবিই বেশি তৈরি হয়। অন্তত তরুণ দর্শকদের তাই পছন্দ।

ব্যস্ত। কাজ না থাকলে কাজের সন্ধানে ব্যস্ত। ফিল্মী আদমী মানেই সন্ধানী লোক। চলচ্চিত্র-সান্নিধ্যে থাকলেই

"নল দময়ন্তী" ছবিতে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়
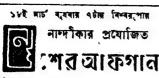
সন্ধানী হতে হয়। এখানে কখন যে কে কার সন্ধানে ঘুরবে তা স্বয়ং ভাগ্য বিধাতাও 'ফোরকাস্ট' করতে পারেন না।

এতদিন ফিল্ম লাইনে আছি প্রায় গর্ব-ভরে 'এ লাইনের সবকিছু জানি বলে বড়াই করে থাকি।' কিন্তু এ গর্ব খর্ব করতে মাঝে মাঝেই এক আধটা ঘটনা ঘটে, যেগুলোকে একটু বাড়িয়ে বললেই দুর্ঘটনা বলা চলে। দুপুরে ভোজন পর্ব শেষ করে একটু দিবানিদ্রার 'আরাধনা' করব ভাবছি এমন সময় এক সাহিত্যিক বন্ধুর সুপারিশপত্র নিয়ে এক উঠতি লেখক-কাম চিত্রসংবাদিক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। ভদ্রলোক নেহাৎ-ই সিরিয়াস যুবাপুরুষ, আদর্শবাদী, উচ্চাভিলাষী, সততা এবং কর্ম-কুশলতায় আস্থাবান। বছর খানেক হোল মধ্য প্রদেশের 'জব্বলপুর' অঞ্চল থেকে বম্বেতে এসেছেন ভাগ্যলক্ষ্মীর খোঁজে। অর্থাৎ এখনো এ শহরের শহুরে জীবন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ।

অনেক ধানাই পানাই হল। এবার আসল কথায় আসা যাক। আলোচ্য জব্বলপুরী ছেলেটি উদীয়মান লেখক (হিন্দী)। অধুনা মানে বম্বে আসার পর (মানে মাস কয়েক আগে) এক পার্শ্ব-অভিনেত্রী কাম লেখিকার প্রেমে পড়েছে। প্রেমে পড়া মানেই সমস্যা। কিন্তু সেটা সমস্যা নয়। এই যুবকের অভিনেত্রী-লেখিকা প্রেয়সী এক জটিল এবং রহস্যময়ী নারী। সমস্যা সেইখানে। না আসলে সমস্যাটা সেখানেও নয়। যুবকটি আমাকে এসে জিগ্যেস করলেন যে অমুক বিখ্যাত চিত্রনির্মাতাকে আমি চিনি কিনা। যখন জানলেন যে আমি তাকে চিনি তখন বললেন যে তিনি ঐ বিখ্যাত প্রবীণ চিত্র-নির্মাতার জীবন-চরিত লিখতে চান। আমি অবাক হলাম. "ওর জীবন-চরিত লিখতে চান তো আমার কাছে আসা কেন?" "পরামর্শ নিতে" সোজা উত্তর দিলেন যুবক। প্রশ্ন করলাম "কি ধরনের পরামর্শ।" প্রশ্নের উত্তরে আবার প্রশ্ন করলেন যুবকটি "ধরুন আমি যদি ও'র জীবনের সমস্ত সত্য কথা তাঁর প্রপার পারস্পেকটিভে লিখতে চাই তাহলে কি উনি তা লেখার অনুমতি আমাকে দেবেন?" "আপনি কি ভদ্রলোকের জীবনের সমস্ত সত্য কথা তার প্রপার পারসপেকটিভে জানেন।" "হ্যাঁ জানি" সপ্রতিভ উত্তর দিলেন যুবক। "কি করে জানলেন?" প্রশ্ন করলাম। সরল উত্তর : "ঐ ভদ্রলোকের গার্ল ফ্রেন্ড আমার প্রেয়সী"। আমি বললাম, "আমার ধারণা যে ভদ্রলোকের বয়স অন্তত ষাটেরকোঠায়, আর আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে যে আপনার প্রেয়সীর বয়স বছর পঁচিশেকের বেশী হবে না।" "আপনার অনুমান প্রায় সত্য।" বলল যুবক। "তার মানে ভদ্রলোকের পুরো জীবন আপনার প্রেয়সীর পক্ষেও জানা সম্ভব নয়, উনি নিজে যা জানেন সেটা ছাড়া যা জানেন তা শোনা কথা, সুতরাং আপনার হাতে যা মেটিরিয়াল আছে তাতে কাল্পনিক রঙীন জীবন-চরিত হতে পারে কিন্তু আসল জীবন-চরিত তো হবে না।" আমার কথা শুনে একটু ভাবলেন তিনি। তারপর বললেন "ওঁর জীবন-চরিত না লিখতে পারলে তো ওঁর মুখোশ ছিঁড়ে ফেলা যাবে না।" আমি বললাম, "এত লোক থাকতে আপনি ঐ বৃদ্ধ ভদ্র-লোকের মুখোশ নিয়ে টানাটানি করছেন কেন?" "কারণ ওঁর সম্বন্ধে আমি জানতে পেরেছি।" সোজা উত্তর দিলেন যুবক। "আপনি যে 'জেনেছেন' সেটা জানলেন কি করে?" আমার প্রশ্ন। ছেলেটির উত্তর "আমার প্রেমিকা আমাকে বলেছে।" "সে যে আপনাকে সত্য কথা বলেছে তা আপনি ভাবছেন কেন?" আমি জিগ্যেস করলাম। তাতে ছেলেটি পাল্টা প্রশ্ন করল, "সে আমাকে মিথ্যে কথা বলেছে এ কথা আমি ভাবব কেন?" একটু বিব্রত হলাম। তারপর বললাম, "যাচাই করবার জন্য।" চটে গেলেন ভদ্রলোক, বললেন, "এই জন্যেই তো এ-দেশের কিছু হচ্ছে না, কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না, সবাই সবাইকে সন্দেহ করে, সাহায্য চাইলে উপদেশ দেয়, ভালবাসলে বোকা ভাবে, শ্রদ্ধা করলে এক্সপ্লয়েট করে, সম্পাদকের বাড়ির বাজার করে দিলে তবে কাগজে লেখা ছাপে—কি হবে বলুন, এদেশের আর কী হবে। বৃথা এদেশে কারুর আসল জীবন-চরিত লিখতে চাওয়া। এখানে অচল জিনিস ছাড়া কিছু চলে না—চলি।"

সরল শর্মা

অরণ্যদেব লী ফক

এখনো আমি ভেবেই পাচ্ছি না যে, প্লেন-কোম্পানির কর্তারা কীভাবে মুখোশ-পরা একটা বদমাসকে আমার সঙ্গে কথা বলতে পাঠাল?
প্রিন্স চার্লস, মুখোশ-পরা মানুষমাত্রেই বদমাস নয়, আবার বদমাস মাত্রেই যে মুখোশ পরে তাও নয়!

মনে হচ্ছে, লোকটা আমাদেরই বদমাস বলছে, তাই না?
@✱■!!

প্রিন্স চার্লসের প্রাসাদে.....
প্লেনগুলো যদি বিনাবাক্যে ফেরত না দিই, তাহলে তুমি আমাকে নিয়ে যাবে আটকে রাখবে, কেমন?
নিশ্চয়ই!

তাহলে শুনে রাখো, প্রতিটি প্লেনের বাবদে আমি দশ লাখ ডলার চাই। তা না পাওয়া পর্যন্ত প্লেনের সঙ্গে তোমাকেও আমি আটকে রাখব।

একে নিয়ে অন্ধকূপে আটকে রাখ!
7/20

কে আটকাবে? অরণ্যদেবের মুহুর্মুহু ঘুসির ঘায়ে প্রহরীদের বন্দুক খসে পড়ছে!
!
!
!

তারপরেই চতুর্দিকে চলতে লাগল তাঁর ঘুষি.....
উঃ!
আঃ!
ওঃ!

বাঁচাও!

সবাইকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে বলো। নয়তো তোমার খুলি উড়িয়ে দেব।
?!
!

মুখ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগের নির্দেশ দান বর্তমান সপ্তাহের প্রধান আলোচনার বিষয়। বাংলা কংগ্রেসের রাজ্য পরিষদ ও পরিষদীয় দল আজ দলের সভাপতি মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখারজিকে আগামী ১৬ মারচের মধ্যে পদত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমুখারজিও বলেন—তিনি দলের নির্দেশমত কাজ করবেন। ৭ ও ৮ মারচের বৈঠকের পর বাংলা কংগ্রেসের রাজ্য কর্মপরিষদ ও পরিষদীয় দল এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মুখ্যমন্ত্রী এবং দলের সভাপতি শ্রী অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ই বৈঠকে পৌরোহিত্য করেন। বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়, যুক্তফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে সেবা করতে ব্যর্থ হয়েছে। সি পি এম ভিতর ও বাহির থেকে ফ্রন্টকে ধ্বংস করতে বদ্ধ পরিকর। এই বৈঠক দলের নেতা এবং মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছেন : দলের তিনজন মন্ত্রী—শ্রীসুশীলকুমার ধাড়া, শ্রীচারুমিহির সরকার এবং শ্রীভবতোষ সোরেন-এর পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করুন এবং আগামী ১৬ মারচের মধ্যে আপনি সরকার থেকে বেরিয়ে আসুন।

দেশী সংবাদ

২ মারচ—কেন্দ্রীয় শিল্পোন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীফকরুদ্দিন আলি আমেদ রাজ্যসভায় আজ বলেন যে, শিল্প সরিয়ে নেবার ঘটনা শুধু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। মহারাষ্ট্রেরও কয়েকটি শিল্প-সংস্থা অন্যত্র শিল্প স্থানান্তরের আবেদন করেছেন। তবে পশ্চিমবঙ্গের শ্রম পরিস্থিতি যে শিল্প বিকাশের পক্ষে প্রতিকূল তা তিনি স্বীকার করেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ রাজ্যসভায় বলেন : পশ্চিমবঙ্গের ক্রমবর্ধমান হিংসাত্মক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ও জনমত গড়ে তোলার দায়িত্ব সেখানকার সরকারের। আর যেসব দল নিয়ে সেই সরকার গঠিত সেই সব দলের।

৩ মারচ—কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী ওয়াই বি চবন আজ এক দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের জবাবে বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অতি দ্রুত অবনতি ঘটছে এবং উহা এখন 'জাতীয় উদ্বেগের কারণ' হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন দলের মধ্যে সংঘর্ষে অবাধে যে সব অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করা হয় তা স্থানীয়ভাবেই প্রস্তুত বলে তিনি সংবাদ পেয়েছেন।

একটি হিন্দী ছবি প্রদর্শনের বিরুদ্ধে আজ কলকাতা ও আশপাশের কয়েকটি সিনেমা হলে বিক্ষোভ দেখানো হয়। কাল অন্তত দুটি হলে আগুন লাগে, দুম দুম বোমা ফাটে, ইটপাটকেল পড়ে এবং পুলিস কাঁদানে গ্যাস ছাড়ে। ছবিটির নাম প্রেম পূজারী।

৪ মারচ—রেলমন্ত্রী শ্রীরামসুভগ সিংহ আজ লোকসভায় ঘোষণা করেন যে মেল বা এক্সপ্রেস কোন ট্রেনেই তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া বাড়বে না। তৃতীয় শ্রেণীর স্লিপার ও প্লাটফর্ম টিকিটের বর্তমান হারই বহাল থাকবে। [illegible] ও ডাল-কড়াই এর উপর থেকেও বর্ধিত মাশুল হার প্রত্যাহার করা হল। ফলে আগামী বছরের রেলের বর্ধিত আয় থেকে ১৩ কোটি টাকার মত হ্রাস পেল।

লোকসভার নতুন অধিবেশনে ইন্দিরা সরকার এই প্রথম আজ বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন। রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবটি ২৭০—৬০ ভোটে গৃহীত হয়েছে। আদি কংগ্রেস, স্বতন্ত্র, জনসঙ্ঘ ও এস এস পি-র একাংশ প্রস্তাবটির বিপক্ষে ভোট দেন। সি পি আই, সি পি এম, পি এস পি ডি এম কে সদস্যরা ভোটদানে বিরত থাকেন।

৫ মারচ—বন্ধ অফিস-কলকারখানা খোলা, ছাঁটাই-লে-অফ-লক আউট প্রত্যাহার, [illegible] আইনী করার দাবি এবং বিড়লা কোম্পানীর সকল দফতর অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার প্রতিবাদে আজ কলকাতায় বিভিন্ন সওদাগরি অফিসের কর্মচারীরা একদিনের প্রতীক ধর্মঘট পালন করেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী ওয়াই বি চবন আজ রাজ্যসভাকে জানান যে, বৈরী নাগাদের কাছ থেকে আসামের উগ্রপন্থীরা সামান্য চীনা অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ পেয়েছে এবং আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের উগ্রপন্থীদের মধ্যে যোগাযোগ রয়েছে এমন কেন্দ্রের কাছে এই তথ্য আছে।

৬ মারচ—মামলা তুলে নেওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন জেলা কর্তৃপক্ষের কাছে স্বরাষ্ট্র পুলিস দফতর যে হুকুমনামা পাঠিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বিশেষ ক্ষমতাবলে তা বাতিল করে দিয়েছেন। পুলিস দফতরের এই হুকুমনামায় বলা হয়েছিল, আমাদের অনুমতি ছাড়া অন্য কোনও দফতরের কথায় কেউ কোনও মামলা তুলে নেবেন না। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বিশেষ আদেশে বলেছেন, নিম্নতর আদালতে যে ব্যবস্থা ছিল তাই থাকবে। আইন দফতর এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। তাঁদের নির্দেশমত পাবলিক প্রসিকিউটররা মামলা তুলবেন। পুলিস দফতরের আদেশটি বেআইনী।

৭ মারচ—মুখ্যমন্ত্রী শ্রী অ জ য় কু মা র মুখারজিকে পদত্যাগ না করার জন্য আজ যুক্তফ্রন্টের বহু নেতা অনুরোধ জানালেন। তাঁরা বললেন—আপনি পদত্যাগ করলে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন ছাড়া কোনও পথ থাকবে না। —আমরা এখন আপনার সঙ্গে যোগ দিতে পারছি না। মুখ্যমন্ত্রী বলেন—আপনারা না আসুন আমি একাই যাব, আমি আর এ জিনিস সহ্য করতে পারছি না।

আজ দুপুরের পর চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ এবং কলুটোলা স্ট্রীটের সংযোগস্থলে কয়েকজন অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্তের বেপরোয়া বোমাবর্ষণের ফলে দুজন নিহত এবং ছ' জন আহত হন। নিহতদের মধ্যে একজনকে তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত বলে সনাক্ত করেন। তাঁর মাথা চুরমার হয়ে যায়। দ্বিতীয় ব্যক্তি বধুলাল(৩০) হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর মারা যান। এঁরা দুজনই পথচারী।

৮ মারচ—মুখ্যমন্ত্রী শ্রী অ জ য় কু মা র মুখারজির পদত্যাগ প্রসঙ্গে উপমুখ্যমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু আজ বলেন, কারও অধিকার নেই এ সরকার ভেঙে ফেলার। তা হলে আবার জনগণের রায় নিতে হবে—ছ' সপ্তাহের মধ্যে নির্বাচনও করা যায়।

সি পি আই মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানিয়েছেন এবং রাষ্ট্রপতির শাসন এড়ানোর জন্য সি পি এম-কে তাঁদের মনোভাব সংশোধন করতে বলেছেন। না হলে তাঁরাও চান নতুন নির্বাচন। ফরওয়ার্ড ব্লক বলেছেন, সি পি এম-এর মাতব্বরি করা এবং জনস্বার্থবিরোধী মনোভাবই এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী।

বিদেশী সংবাদ

২ মারচ—গত ১০ ফেব্রুয়ারি লণ্ডনের হ্যাম্পস্টেড টাউন হলে মহা সমারোহে সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজা কমিটির সভাপতি ছিলেন শ্রীনারায়ণ চক্রবর্তী ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন শ্রী[illegible]কুমার মজুমদার। পূজান্তে ব্রিটেনের বিভিন্ন স্থান থেকে উপস্থিত প্রায় দু' হাজার লোককে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

৩ মারচ—ফরাসী প্রেসিডেন্ট শ্রীপম্পিদুর সাম্প্রতিক আমেরিকা সফরের সময় তাঁর প্রতি যে অসৌজন্যমূলক আচরণ করা হয়েছে, সেজন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট শ্রীনিকসন তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

৪ মারচ—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোন অবস্থাতেই রোডেশিয়ার আয়ান স্মিথের নেতৃত্বে সংখ্যালঘু সরকারকে স্বীকৃতি দেবে না। মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের জনৈক পদস্থ অফিসার এক বিবৃতিতে এ-কথা বলেন।

৫ মারচ—মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিকসন ঘোষণা করেন যে, পরমাণু অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তি আজ থেকে কার্যকর হল। তিনি সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী অ্যালেক্সি কোসিগিনের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে এ আশাও প্রকাশ করেন যে, নিরস্ত্রীকরণের জন্য আরও উল্লেখযোগ্য চুক্তি সম্ভব হবে।

৬ মারচ—রাওয়ালপিণ্ডির এক সংবাদে প্রকাশ : প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান গতকাল বলেছেন যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যদি চান তা হলে তিনি বকেয়া বিরোধগুলি নিয়ে আলোচনার জন্য শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে প্রস্তুত। গঙ্গার জলের ভাগ ও কাশ্মীর প্রসঙ্গ তাঁর মতে বকেয়া বিরোধ।

৭ মারচ—জাতিসংঘ নিরাপত্তা বৈঠকে রোডেশিয়া সম্পর্কে ব্রিটেন যে প্রস্তাব পেশ করবে বলে স্থির করেছে, আফ্রিকান দেশগুলি তাতে সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করবে বলেই মনে হয়। তারা অবৈধ স্মিথ প্রশাসনের অবসান ঘটাবার জন্য কড়া ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবি জানাবে।

৮ মারচ—চীন সরকার নেপালের জন্য অর্থনৈতিক সাহায্য অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। চীনের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে নেপাল সরকারের আলোচনার সমাপ্তিতে উপরোক্ত তথ্যটি ঘোষণা করা হয়।

সূচিপত্র

সূচিপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীসুব্রত ত্রিপাঠী

টাটা-এগ্রিকো যন্ত্রপাতির মধ্যে আছে ঃ

বেলচা ঃ চৌকো মাথা, গোল মাথা, ফায়ারিং (লম্বা ফলা) ফায়ারিং (খাটো ফলা)

কোদাল ঃ বোম্বাই, ওয়েস্ট ইণ্ডিয়া, ঈস্ট ইণ্ডিয়া, এগ্রি, সোয়ান নেক, মাইশোর, ট্যাঙ্গড্ (মামুটি)

শাবল ঃ আট-কোনা

গাঁইতি ঃ বাটালি মুখ (চওড়া) ও সরু মুখ, বাটালি মুখ (সরু) এবং সরু মুখ, দুদিকে সরু মুখ

বাটার ঃ সরু ও চৌকো মুখ

হাতুড়ী ঃ দুমুখো ভারী হাতুড়ী, পাথর ভাঙ্গা হাতুড়ী

কয়লা কাটা গাঁইতি (মেশিনের জন্য)

টাটা-এগ্রিকো

দি টাটা আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানী লিমিটেডের একটি বিভাগ

হেড সেলস অফিস : ৪৩ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৬

ব্রাঞ্চ সেলস অফিসসমূহ : আমেদাবাদ . ব্যাঙ্গালোর . বোম্বাই . কোচিন . দিল্লী . ধানবাদ . জলন্ধর সিটি কানপুর . মাদ্রাজ . নাগপুর . সেকেন্দ্রাবাদ . বিজয়ওয়াদা

TN-5545A

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৭ বর্ষ ॥ সংখ্যা ২১
শনিবার ৭ চৈত্র ১৩৭৬

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
কলিকাতায়

বার্ষিক	২৫.০০
ষান্মাসিক	১২.৫০
ত্রৈমাসিক	৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	৩০.০০
ষান্মাসিক	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক	৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	৩০.০০
ষান্মাসিক	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক	৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	৫২.০০
ষান্মাসিক	২৬.০০
ত্রৈমাসিক	১৩.০০

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	৩৯.০০
ষান্মাসিক	১৯.৫০
ত্রৈমাসিক	১০.০০

দাম ৫০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাসুল ৭ পয়সা

DESH

Saturday, March 21, 1970

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় আজ, ষোলোই মার্চ, পদত্যাগ করছেন। তাঁর পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট যুক্ত থাকছে অথবা বিযুক্ত হয়ে যাচ্ছে কিনা সেটা নেহাতই তর্কের ব্যাপার, কেননা ফ্রন্ট গড়ার সময় চোদ্দটি দলের একটি দুটি বা ঠিক কটি দল বাদ গেলে ফ্রন্ট থাকবে বা থাকবে না, তেমন কোনো নিয়ম বোধহয় করা হয় নি। কাজেই সেই যুক্তিতে একটি দল বাদ গেলে ফ্রন্ট থাকে। আবার যদি এমন হয় চোদ্দ শরিকের এক শরিক বাদ গেলে তা ভেঙে যাওয়া বলে ধরে নেওয়া হয় তবে বাংলা কংগ্রেস চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ফ্রন্ট ভেঙে যাচ্ছে; সেই সঙ্গে আরও দু'চারটি দল বাংলা কংগ্রেসের সহযাত্রী হলে তো কথাই নেই। ফ্রন্ট থাকুক বা না থাকুক অজয়বাবুর পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান ফ্রন্ট সরকার ভেঙে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে যাই হোক, সেই সরকারকে আর পুরোনো ফ্রন্ট সরকার বলা যাবে না, তার চেহারা দাঁড়াবে নতুন ফ্রন্টেরই। অবশ্য আবার যদি সরকার গড়া হয়।

নতুন একটি সরকার গড়ে তোলার কথাও এখন শোনা যাচ্ছে। এ বিষয়ে সি পি এম দলের আগ্রহ এবং চেষ্টা স্পষ্ট। সপ্তাহ খানেক আগেও এ'দের মনোভাব কাগজে-কলমে, স্লোগানে যেভাবে ব্যক্ত করা হয়েছিল তাতে মনে হত, বর্তমান সরকার ভাঙলেই তাঁরা নতুন নির্বাচনের দাবি তুলবেন। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে তাঁদের সে মনোভাব পালটে গেছে; জ্যোতিবাবুরা তাঁদের নেতৃত্বে নতুন সরকার গড়ার দাবি তুলেছেন। সাধারণ বুদ্ধিতে তো মনে হয়, বর্তমান ফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটলে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সর্ববৃহৎ এই দলটিকে সরকার গড়তে আমন্ত্রণ জানানোই সঙ্গত। তবে আমন্ত্রণ জানানো আর সরকার গঠন করা এক জিনিস নয়। জ্যোতিবাবু সঙ্গত কারণেই আমন্ত্রণ পেতে পারেন যেমন, তেমনই আবার তাঁকে প্রমাণ করতে হবে যে, তাঁরা সরকার গঠনের সামর্থ্য রাখেন। শোনা যাচ্ছে শ্রীবসু তাঁর সামর্থ্যের প্রমাণ দিতে তৎপর হয়ে উঠেছেন। এমনকি, এ ব্যাপারে তাঁরা উভয় কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সাহায্য নিতেও প্রস্তুত। মন্দ লোকের মন্দ কথা বলে এহেন ব্যাপারটাকে অপপ্রচার বলা যেতে পারত, কিন্তু স্বয়ং শ্রীমতী গান্ধীও বলেছেন, আদি কংগ্রেস ও মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান ফ্রন্টের বিরুদ্ধে একযোগে কাজ করছেন। কাগজে খবর বেরিয়েছে জ্যোতিবাবুর দূত নব কংগ্রেসের সিদ্ধার্থবাবুর সঙ্গেও কথা বলছেন। আমরা, বলা বাহুল্য, রাজনীতির এই চমকপ্রদ খেলায় বিমূঢ় বোধ করছি।

অজয়বাবুর পদত্যাগের সিদ্ধান্তের পর পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির ঘোলা জল আরও ঘোলা হয়ে গেছে। বাইরে থেকে যা দেখায় ভেতরে তার চেয়েও ঘোলাটে অবস্থা। বাংলা কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েও ডান কম্যুনিস্ট দল, ফরোয়ার্ড ব্লক, এস ইউ সি—এ'রা অজয়বাবুর এই সিদ্ধান্ত প্রসন্ন মনে মেনে নিতে পারেন নি। এখনও তাঁরা খুশী নন; কেননা অজয়বাবুর পদত্যাগের ফলে তাঁদের ক্ষতির আশঙ্কাই বেশি। সি পি এম-এর নেতৃত্ব এ'রা নিশ্চয় পছন্দ করেন না, অথচ সেই নেতৃত্বেই যদি সরকার গঠিত হয় তবে এই দলগুলি কি করবে? সহযোগিতা অথবা অসহযোগিতা? সহযোগিতা করা সম্ভব নয়, আবার অসহযোগিতা করতে কিঞ্চিৎ উদ্বেগও হয়। গত এক সপ্তাহ এ'রা নানাভাবে, বিভিন্ন প্রস্তাব নিয়ে, অনুরোধ নিয়ে অজয়বাবুকে পদত্যাগ থেকে নিরস্ত করতে চেষ্টাও করেছেন। ফলে কিছু হয়নি। দিল্লি থেকে শ্রীমতী গান্ধী চেষ্টা করেছেন অজয়বাবু যাতে পদত্যাগ না করেন, ত্রিগুণা সেন মশাই কলকাতায় ছুটে এসে শেষ চেষ্টা করেছেন, কিন্তু অজয়বাবুকে নরম করা গেল না। আপাতত সমস্ত ব্যাপারটাই অনিশ্চিত হয়ে রয়েছে। জ্যোতিবাবুরা সরকার গড়তে পারবেন কি না? গড়লেও তার আয়ু কতদিন? বিধানসভায় বাজেট পাশ হবে কি হবে না? নিতান্ত দায়ে পড়ে রাষ্ট্রপতি শাসন কিছুদিনের মতন চালু করতে হবে কি না ইত্যাদি প্রশ্ন আজ সকলের। আমাদের দেশে রাজনীতির গতি আগে থেকে বোঝার মতন বিচক্ষণ বড় দেখি না। ক্ষমতা অধিকার এবং তা রক্ষার জন্যে এখানে সবই হয়, নীতির বাধা গ্রাহ্য করা হয় না। পশ্চিমবঙ্গে কী ঘটবে আজ নিশ্চিত করে তা বলা যায় না। তবে আশা করা যাচ্ছে মার্চ মাসের মধ্যেই কিছুটা বোঝা যাবে। কেননা তার মধ্যে হয় রাজ্য বিধানসভায় না হয় সংসদে বাজেট অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। কোথায় সেটা অনুমোদিত হয় তা দেখার বিষয়।

বাংলার আকাশে
রাজনৈতিক কালবৈশাখী

চার রাজ্যের ঘটনা

শনি ও মঙ্গলের অশুভ যোগাযোগের ফলে কিনা জানি না, ভারতের চার-চারটি রাজ্যে একসঙ্গে রাজনৈতিক ডামাডোল শুরু হয়ে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ, কাশ্মীর, গুজরাট এবং উড়িষ্যা এখন চরম রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। আগামী সাত দিনের মধ্যে কোন্ রাজ্যের অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে কেউ তা জানেন না।

শেষ পর্যন্ত এই চার রাজ্যের রাজনীতি যেখানেই গিয়ে দাঁড়াক ইতিমধ্যেই এই সব ঘটনার মধ্য থেকে নতুন করে যেসব সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, শিক্ষা নেওয়ার পক্ষে সাধারণ মানুষের কাছে তাই যথেষ্ট।

প্রথমেই আসা যাক পশ্চিমবঙ্গ প্রসঙ্গে। এখনও অজানা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই সি পি এম নামক বিপ্লবী দলটির মুখোস অনেকটা খুলে পড়েছে। যে সি পি এম এতদিন বলছিলেন, "এই সরকার ভেঙ্গে গেলেই আমরা অন্তর্বর্তী নির্বাচন দাবি করব তাঁরাই বিকল্প সরকার গঠনের জন্য গোপনে এবং প্রকাশ্যে সব রকমের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রোগ্রেসিভ মুসলিম লীগের মত পারটির এম এল এ-দের সঙ্গে নেপথ্যে আলোচনা করছেন। প্রত্যেকটি দল থেকে এম এল এ ভাঙ্গানোর কাজে উঠেপড়ে লেগেছেন। এমনকি যাঁকে তাঁরা একদিন শুধু "কেন্দ্রীয় বুর্জোয়া সরকারের এজেণ্ট" বলে চিহ্নিত করতেন সেই রাজ্যপালের সঙ্গেও মধুর সম্পর্ক রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

এত করেও শেষ পর্যন্ত দিল্লির লাড্ডু মিলবে কিনা সন্দেহ। মিললে ভাল দেখাতো পারে কেমন করে সেই লাড্ডু তাঁরা নিজেরা খাচ্ছেন এবং জনগণকে খাওয়াচ্ছেন।

বাংলা কংগ্রেস, সি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি দল, যাঁরা সত্যিই এতদিন গোপনে গোপনে সি পি এমকে বাদ দিয়ে বিকল্প সরকারের চেষ্টা চালাচ্ছিলেন সি পি এম নেতৃত্ব তাঁদের আত্মরক্ষার সুবর্ণ সুযোগ করে দিলেন। ওরা যে এখনও বিকল্প সরকারের গোপন প্রচেষ্টা ছেড়েছেন তেমন কথা আমি বলছি না। কিন্তু ওরা সুকৌশলে সি পি এম নেতৃত্বকে "মিনি ফ্রন্ট" সরকারের গদিতে ঠেলে দিতে পেরেছেন।

সি পি এম নেতৃত্ব বলছেন, বাংলা কংগ্রেস ফ্রন্ট ছেড়ে গেলেই ফ্রন্ট ভাঙ্গবে কেন, অন্যরা ফ্রন্ট ও ফ্রন্ট সরকার চালাক।

কিন্তু একদিন কি সি পি এম নেতৃত্ব জনগণকে ঠিক উল্টো ধারণাই দিয়ে আসেন নি? বলে আসেন নি, এই ফ্রন্ট ভাঙ্গলেই নির্বাচন? সি পি এম বলছেন, আমরা অন্যান্য দলকে 'এক্সপোজ' করতে চাই—তাই বিকল্প সরকার গঠনে এগোচ্ছি। সি পি আই, ফরওয়ারড ব্লক, এস ইউ সি প্রভৃতি দল তো প্রকাশ্যে বলেই দিয়েছেন তাঁরা সি পি এম-এর নেতৃত্বে বিকল্প সরকার করবেন না। এর পরও কি এদের মুখোস খোলার জন্য দলছুট এম এল এ-দের জোগাড় করে, প্রোগ্রেসিভ মুসলিম লীগের সাহায্য নিয়ে, রাজ্যপালকে খুশী রেখে সরকার গঠনের জন্য এগিয়ে যাওয়া প্রয়োজন?

তলিয়ে যাবার আগে

এ কাহিনী আজকের কলকাতার অন্তঃসারশূন্য মধ্যবিত্ত সমাজের। যে সমাজ সতত ভয়ে পঙ্গু, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে রুখে ওঠে না, শুধু আত্মসমর্পণ করে, শুধু পিছু হটে বাঁচতে চায়—গৌরকিশোর ঘোষ লিখিত "তলিয়ে যাবার আগে" সেই সমাজেরই পুংখানুপুংখরূপে আত্মসমীক্ষা। এই সুবৃহৎ গল্পটি পরের সংখ্যা থেকে চার কিস্তিতে প্রকাশিত হবে।

ছলে বলে কৌশলে সরকারী ক্ষমতা দখলে রাখাই যে এদেরও লক্ষ্য সি পি আই কেরলে তা প্রমাণ করেছেন। সি পি এম পশ্চিমবঙ্গে তা প্রমাণ করলেন।

এত করেও সি পি এম দিল্লির লাড্ডু পেলেন কিনা এতদিনে আপনারা তা নিশ্চয়ই জেনে গিয়েছেন।

✻

গুজরাট, কাশ্মীর এবং উড়িষ্যার ঘটনাবলী ঠিক এইভাবে খুলে দিয়েছে নব ও ইন্দিরা কংগ্রেসের মুখোস।

কাশ্মীরের ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে ইন্দিরা কংগ্রেসের নেতারাও ক্ষমতার লোভে কতটা পাগল, নিজেদের মধ্যে গদি নিয়ে কিভাবে ঝগড়া করতে পারেন। শ্রীমতী গান্ধী যখন নব কংগ্রেস গঠন করেছিলেন তখন বলেছিলেন : সাচ্চা আদর্শবান কংগ্রেসীরা এদিকে এসেছেন, ক্ষমতালোভী আদর্শভ্রষ্টরা ওদিকে চলে গিয়েছেন। কাশ্মীরের দু পক্ষই তো নব কংগ্রেসের। তাঁরা গদি নিয়ে এত মারামারি করছেন কেন?

উড়িষ্যার ঘটনা এখনও পর্যন্ত সব কিছু প্রকাশ করেনি। কিন্তু এই লেখা প্রকাশের মধ্যে হয়ত অনেক কিছু বেরিয়েও পড়বে। এখানেও মূলে প্রচেষ্টা নব কংগ্রেসের। তাঁরা চাইছেন যে কোনও ভাবে উড়িষ্যার বর্তমান সরকারের পতন ঘটিয়ে অপ্রত্যক্ষভাবে নিজেরা ক্ষমতায় আসতে। উড়িষ্যার বর্তমান কোয়ালিশন সরকার আদর্শ সরকার একথা আমি একবারও বলব না। কিন্তু নব কংগ্রেস নেতৃত্ব যেভাবে এই সরকারের পতন ঘটাবার চেষ্টা করছেন সেটাও কি সমর্থনযোগ্য?

গুজরাটে স্বতন্ত্র পারটি এবং নব কংগ্রেস দু দলেরই মুখোস খুলেছে। নব কংগ্রেসের আসল চেহারা কী, স্বয়ং সভাপতি জগজীবন রামই তা প্রকাশ করে দিয়েছেন। জগজীবন বাবু বলেছেন : আমরা স্বতন্ত্র পারটির সরকার গঠনের প্রচেষ্টায় সাহায্য করব। তাঁদের সঙ্গে সরকারে যোগ দেব না, তবে বাইরে থেকে তাঁদের সমর্থন করব। হায় ইন্দিরা গান্ধী, শেষ পর্যন্ত আপনার দল স্বতন্ত্র পারটিকেও সমর্থন করতে রাজি!

✻

কয়েক দিন আগে গোটা দেশে জেনারেল কারিয়াপ্পার মন্তব্য নিয়ে হৈচৈ হয়ে গিয়েছে। কারিয়াপ্পা সামরিক শাসনের কথা বলেছিলেন। লোকসভার সদস্যরা তো একেবারে অগ্নিশর্মা : লোকটা গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে চায়, এত বড় স্পর্ধা!

কিন্তু আমার মনে হয় কারিয়াপ্পার উক্তি গণতন্ত্রের যত না ক্ষতি করেছে কারিয়াপ্পার সমালোচক দলগুলি এই গণতন্ত্রের তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি করছেন।

গণতন্ত্রের নামে এত খোলাখুলি আদর্শহীনতা, ভণ্ডামী, ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থসিদ্ধি চললে মানুষ কত দিন অন্ধকারে সেই গণতন্ত্রের পূজো করবে?

১১-৩-৭০

নবারুণ গুপ্ত

গেরিলা শিকারী

দেবরাজ

আমেরিকার কী যে হয়েছে কে জানে, কূটনীতির দাবা খেলায় চালে তার কেবলই ভুল হচ্ছে। ভিয়েতনাম, লাওস কী কাম্বোডিয়া তো অনেক দূরে, ঘরের পাশে গুয়াটেমালাতেও তো সে সুবিধে করে উঠতে পারছে না। মধ্য আমেরিকার ওই ছোট দেশটিতে আমেরিকার প্রতিপত্তি খুব। লোকে বলে সেখানকার সরকার নামেই দেশশাসন করেন, আসলে দেশটা চালায় সি আই এ আর ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানি। গুয়াটেমালায় ওই মার্কিন কোম্পানির বিরাট জমিদারী তার আয়তন হবে দু' লাখ চৌত্রিশ হাজার একর। বিস্তর বাগিচার তারা মালিক। তাতে ফলে কফি, কলা, তুলো। ও-সব রপ্তানি হয় বিদেশে, বিশেষ করে আমেরিকায়। আর রপ্তানি হয় চিকল গাম যা চিউয়িং গাম তৈরি করতে লাগে। ১৯৫৩ সনে প্রেসিডেন্ট জ্যাকোবো আরবেনজের আমলে সরকার চেয়েছিলেন ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানির জমিজমা বাগিচা খাস করে নিতে। কিন্তু আমেরিকার ধমকানি খেয়ে তাঁরা চুপ করে যান। পর বছর বিদ্রোহ দেখা দিল দেশে। গণতন্ত্রের পতন ঘটলো, ক্ষমতা দখল করলো সেনাবাহিনী। লোকের ধারণা সে বিদ্রোহও নাকি মার্কিন গোয়েন্দা আর ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানির কারসাজি।

গণতন্ত্র অবশ্য তার পরে গুয়াটেমালাতে ফিরে এসেছে। ফৌজী শাসন কিংবা একনায়ক সরকার সেখানে আজ আর নেই। বিস্তর টালমাটালের পর নতুন শাসনতন্ত্র সে দেশে চালু হয়েছে চার বছর আগে। দেশ-জোড়া নির্বাচনে জিতে রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন জুলিও সীজার মেন্ডেজ মন্টিনিগ্রো। মেয়াদ তাঁর ফুরিয়েছে এ বছর। পরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পালাও সাঙ্গ হয়ে গিয়েছে ১ মার্চ। সে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন তিন জন। এখনকার প্রেসিডেন্ট মেন্ডেজের দলের লোক মারিও ফুয়েন্টেস পিয়েরুচ্চিনি, কর্নেল কার্লস আরানা ওসোরিও আর জোর্গে কাবালেরস। এঁদের মধ্যে কাবালেরস ছিলেন খানিকটা বামপন্থীঘেঁষা, পিয়েরুচ্চিনি মধ্যপন্থী আর আরানা শুধু দক্ষিণপন্থী নন উগ্র দক্ষিণপন্থী। আমেরিকার ইচ্ছে ছিল নির্বাচনে জেতেন মধ্যপন্থী পিয়েরুচ্চিনি। তাঁর দল নামে রেভলুশিনারি পার্টি অর্থাৎ বিপ্লবী দল হলে কী হয় সশস্ত্র বিপ্লব তাঁরা চান না। আমেরিকার সঙ্গে তাঁদেরই খাতির। কিন্তু সি আই-এর সব ফন্দি ভেস্তে দিয়ে সবচেয়ে বেশী ভোট পেলেন কর্নেল কার্লস আরানা ওসোরিও।

আরানা জিতেছেন, আবার জেতেনও নি। গুয়াটেমালার সংবিধানের নিয়ম হচ্ছে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জিততে গেলে অপরদের চেয়ে বেশী ভোট পেলেই হবে না মোট ভোট যা পড়েছে তার অর্ধেকেরও বেশী ভোট পাওয়া চাই। কোনও প্রার্থীই যদি তা না পান তা হলে জাতীয় সংসদ অর্থাৎ কংগ্রেসে ভোটাভুটি হয়ে ঠিক হবে প্রেসিডেন্টের গদিতে কে বসবেন। আরানা নির্বাচনে সবচেয়ে বেশী ভোট পেয়েছেন তিন জন প্রার্থীর মধ্যে, তা কিন্তু মোট ভোটের অর্ধেকের কম। কাজেই তাঁর প্রেসিডেন্ট হওয়া-না-হওয়া নির্ভর করছে কংগ্রেসের সদস্যদের মর্জির ওপর। তাঁদের যে আরানাকেই পছন্দ করতে হবে এমন কোনও নির্দেশ সংবিধানে নেই। সে সংবিধান আবার নতুন। নজিরের জোরও তেমন বেশী নয়। খুঁতখুঁতুনি বড় একটা থেকে যেতো না যদি কংগ্রেসের নির্বাচনেও জিততো আরানারই দল ন্যাশনাল লিবারেশন মুভমেণ্ট অর্থাৎ জাতীয় মুক্তি আন্দোলন। কংগ্রেসে নির্বাচনের পরও বিদায়ী প্রেসিডেন্ট মেন্ডেজের পার্টিই দলে ভারী।

কর্নেল আরানাকে আমেরিকা ভালো চোখে না দেখলেও তিনি একজন রীতিমত জবরদস্ত জেনারেল। কম্যুনিস্টদের ধার তো তিনি ধারেনই না কম্যুনিস্টরা তাঁর দু' চোখের বিষ। কিউবাতে কাস্ত্রো ক্ষমতা দখল করার পর মধ্য আর দক্ষিণ আমেরিকার দেশে দেশে গেরিলা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। গুয়াটেমালাতে বছর চার ধরে গেরিলাদের তৎপরতা বেশ বেড়ে চলেছে, গ্রাম অঞ্চলেও শহরেও। তবে তাদের কাবু করেছেন পল্লী এলাকাতে কর্নেল আরানাই। তিনি বলেন আমি হচ্ছি শান্তিদাতা আর লোকে বলে তিনি হচ্ছেন খুনী কর্নেল। গাঁয়ের গেরিলাদের শায়েস্তা করতে গিয়ে তিনি যে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা খুব বেশী নেই। তাঁর জাকাপা ব্রিগেডের হাতে মরেছে অন্তত হাজার তিনেক লোক। তাদের মধ্যে মাত্র ৮০ জন নাকি ছিল গেরিলা, শ' পাঁচেক তাদের শুভানুধ্যায়ী আর চব্বিশ শ' নিরীহ লোক। এতটা বাড়াবাড়ি গুয়াটেমালার সরকারও বরদাস্ত করতে পারেন নি। তাঁরা তাঁকে এক রকম নির্বাসনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন নিকারাগুয়াতে সেখানকার রাষ্ট্রদূত হিসেবে।

এ হেন দুঁদে কম্যুনিস্ট-বিরোধী লোককেও যে আমেরিকার মনে ধরেনি তার কারণ হচ্ছে গেরিলাদের শায়েস্তা করতে গিয়ে যে রকম নির্মম অত্যাচার তিনি করেছেন তা মার্কিন সরকারের পছন্দ নয়। তাঁদের ভয় সরকার চরম পন্থা নিলে গেরিলারাও বেপরোয়া হয়ে উঠবে, হয়তো বা লোকের সহানুভূতি তাদের দিকেই যাবে। তখন শেষ রক্ষা করা শক্ত হবে, গোটা দেশটাই হয়তো কাস্ত্রো ভক্ত হয়ে উঠবে। গেরিলাদের দমন করতে আমেরিকার আপত্তি নেই, আপত্তি উগ্র কিছু করতে। প্রেসিডেন্ট মেন্ডেজের নরম গরম নীতি তাই তার পছন্দ। কিন্তু আমেরিকার পছন্দ মাফিক তো গুয়াটেমালার লোকেদের চালানো সম্ভব নয়। তা সম্ভব হয়ও নি। নির্বাচনের আগে আরানা যে জোর গলায় বলেছিলেন তিনি আর কিছু না পারেন দেশে আইন আর শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবেন তা ভোটারদের অনেকের মনে ধরেছে বলে মনে হচ্ছে। অশান্তি ডেকে আনতে সাধ করে কে চায়? লোকে জিইয়ে রাখারই বা সাধ কার হয়? আরানাকে ভোট দিয়েছে তিনি দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনবেন এই আশায়।

আরানার দাপটে গাঁ থেকে গেরিলারা উজাড় হয়তো হয়ে গিয়েছে কিন্তু হালে তারা ছড়িয়ে পড়েছে শহরে শহরে। দু' বছর আগে গুয়াটেমালার সেনাবাহিনীতে গেরিলাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কায়দা শেখাবার জন্যে যে দুজন মার্কিন অফিসার এসেছিলেন তাঁদের গুলি করে মারে শহুরে গেরিলারা। তাদের হাতে প্রাণ দিয়েছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত জন মাইন ১৯৬৮ সনে। তারপর থেকে গেরিলাদের অভিযান শহর অঞ্চলে সমানে চলেছে। নির্বাচনের দুদিন আগে তারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল খোদ বৈদেশিক মন্ত্রী আলবার্টো ফুয়েন্টেস মোহরকে। তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয় বদলি হিসেবে একজন বন্দী গেরিলাকে মুক্তি দিলে। নির্বাচনের পরও ঠিক অমনি আরও ব্যাপার ঘটছে। ৫ মার্চ সীন হলি বলে একজন মার্কিন কূটনীতিককে ধরে নিয়ে যায় গেরিলারা গুয়াটেমালা শহর থেকে দিন দুপুরে পুলিশের নাকের ডগার সামনে থেকে, তারপর ছেড়ে দেয় দিন দুই পরে সরকারের কাছ থেকে দুজন বন্দী গেরিলার মুক্তি আদায় করে। ছাড়া-পাওয়া গেরিলা নেতা জোসে মানুয়েল আগুইরে মনজন শাসিয়েছেন আরানা গদিতে বসলে তাঁদের আন্দোলন আরও জোরদার হয়ে উঠবে, আরও লোক তাঁরা গায়েব করবেন। দেখা যাক গেরিলাশিকারী আরানা ক্ষমতা হাতে নিয়ে কি করে তাদের মোকাবিলা করেন।

'থার্ড ক্লাসে শ্রীনন্দা'

রেলমন্ত্রী শ্রীনন্দার একটি অভীপ্সা জাগ্রত হয়েছে। রেলগাড়ির তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের অবস্থা কী, কোন্ কোন্ সুখ তারা লাভ করে থাকে, কিভাবে 'তিসরী ডিব্বায়' তারা কালাতিপাত করে, তাদের আরাম-বিরামের যে-সব সুব্যবস্থার কথা বারবার ঘোষিত হয়েছে সেগুলি কী পরিমাণে কার্যকর, এইসব জানবার জন্য তিনি স্বয়ং তৃতীয় শ্রেণীতে কিছু পরিভ্রমণ করবেন।

লোকাল ট্রেনের গার্ড হবার রোমাঞ্চ মন্ত্রী-মশাই অনুভব করতে পারেন

কি রকম খটকা লাগল প্রথমটায়। জাতির জনকের অন্যতম একনিষ্ঠ শিষ্য কখনো কি থার্ড ক্লাস কামরায় আরোহণ করেননি ইতিপূর্বে? নাকি সেই বৃদ্ধের ওপর ভার দিয়েই নিশ্চিন্ত ছিলেন সবাই, সকলের হয়ে একাই অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তিনি? অথবা সেই অনেককাল আগে গুরুদেবের উদ্দীপনায় থার্ড ক্লাসে দু-একবার চেপে থাকবেন রেলমন্ত্রী, তারপরে তো অনেক জল গড়িয়ে গেছে পাঞ্জাবের নদ-নদী আর দিল্লীর ক্লান্ত যমুনায়। কে আর মনে রাখে সে-সব?

এবার তিনি সেই অভিজ্ঞতা অর্জন, অথবা পুনরর্জন করতে চাইছেন। কিন্তু 'রাজসমারোহে' নয়। তাঁর অভিলাষ থেকে জানা গেল, পরিক্রমাকালে সঙ্গে তাঁর অনুচরবৃন্দ থাকবেন না—রক্ষীরা দরজায় দাঁড়িয়ে 'গাঁওয়ার' লোকদের বিতাড়ন করবে না এই বলে : 'হটো হটো—ইয়ে মন্ত্রীজীকে ডিব্বা হ্যায়।' তিনি একাই চলবেন। অর্থাৎ মিশে যাবেন জনগণের সঙ্গে।

এই ভ্রমণটি আরব্য উপন্যাসের 'হারুণ-অল-রশীদে'র মতো ছদ্মবেশে হবে কিনা বুঝতে পারছি না। শ্রীযুক্ত নন্দা তাঁর বিখ্যাত গোঁফ এবং চোস্ত্ ইত্যাদির মায়া কাটাতে পারবেন তো? কিংবা গোঁফ কামাবার কী দরকার, ও তো ভারতীয় ঐতিহ্য, বলা হয়ে থাকে : 'জিস্‌কা মোচ্ নেহি হ্যায়, উ তো মর্দানা নহি হ্যায়!' আর চোস্ত তো আজকাল জাতীয় পোশাক।

তা হলে শ্রীনন্দা তাঁর চোস্ত গোঁফ এবং চোস্ত্ নিয়েই তৃতীয় শ্রেণীতে আরোহণ করুন। আর দিল্লী থেকে মাত্র গুটি দুই স্টেশনের মধ্যেই যেন অভিজ্ঞতা তাঁর সীমাবদ্ধ না থাকে। একটু কষ্ট করে কলকাতা পর্যন্তই আসুন না। না—স্লীপারে নয়, থ্রী-টায়ারে নয়, তাপ-নিয়ন্ত্রিত 'জনতা'য় নয়—আদি এবং বনেদী থার্ড ক্লাসে চেপেই তাঁর শুভাগমন ঘটুক। তারপর একবার অনুগ্রহ করে অফিস-টাইমের লোকাল ট্রেনেও তাঁকে উঠতে হবে।

রেলমন্ত্রী শ্রীনন্দার সেই ঐতিহাসিক যাত্রা—সেই রৈলিক (রেল+ষ্ণিক্ প্রত্যয়) জয়দর্শন এই জার্নাল ছাপা হওয়ার আগেই আরম্ভ হবে কিনা জানি না; আরম্ভ না হলেও এই জার্নাল যে তিনি কদাপি পাঠ করবেন, এ বড়ো দুরাশা আমি রাখি না। কিন্তু, তা হোক, আমি মনশ্চক্ষে তাঁর এই জয়যাত্রা একটু অনুধাবনের চেষ্টা করি।

কুলিকে পয়সা দিয়ে জানলা টপকে থার্ড ক্লাসে চড়ে বসার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন

দিল্লী থেকে না উঠে—একটু এগিয়েই উঠতে চেষ্টা করুন—যথা এটাওয়া। মিডওয়ে থেকে ট্রেন ধরলেই আনন্দটা একটু বেশি। দেখতে পাচ্ছি, থার্ড ক্লাস বুকিং কাউণ্টারের 'কো' (যাকে আমরা 'কিউ' বলে জানি)-তে অথবা পুচ্ছে

চা-পান না বিষপান—কথাটি পি সি রায় কেন বলেছিলেন সেটাও সহজে বুঝতে পারবেন ট্রেনে চড়লে

তিনিও দেহাতীজনের সঙ্গে দণ্ডায়মান। আশা করি তাঁর পকেট কাটা যায়নি, কারণ 'কো'তে টিকেটের জন্যে দাঁড়াবেন অথচ পকেট (কিংবা কোমরের গেঁজে) সামলাবেন না, এমন কাঁচা পলিটিশান্ তিনি নিশ্চয়ই নন। ঘণ্টা বেজেছে, ট্রেন ইন করেছে, এই অবস্থায় ধনুস্তাধ্বনিত করে টিকেট পেয়ে হয়তো চেঞ্জের আশা ছেড়েই তিনি ট্রেন ধরতে দৌড়োবেন।

থার্ড ক্লাসে যাচ্ছেন জনগণের সঙ্গে, হাতে একটা পুঁটুলি নেবেন নিশ্চয়।

তারপর এ কামরা সে কামরা—পা-দানিতেও (ইলেকট্রিক কোচ হলে তো কথাই নেই) গোঁফ গলাতে পারবেন না। পুরোনো অভ্যাসে আত্ম-বিস্মৃত হয়ে কোনো এ-সি কোচেই হয়তো উঠতে চাইবেন, খাবেন গার্ডের ঘাড়ধাক্কা, ছিটকে পড়তে পড়তে

সামলে যাবেন। তারপর যখন ট্রেন ছাড়ে-ছাড়ে, তখন কোনো এক কামরার সামনে পড়বেন দেহাতীদের মারামারির ভেতরে, আর সেই ধাক্কাধাক্কিতে শীর্ণকায় শ্রীনন্দা গাড়ির ভেতরে ছিটকে চলে যাবেন। একটু হুঁশিয়ার না হলে এই সময় হাতের পাটুলিটা বেহাত হয়ে যেতে পারে তাঁর।

অতঃএব শ্রীনন্দা আরূঢ় হবেন। ওঠবার সময় একটা হাত মচকে যেতে পারে, গা ছড়ে যেতে পারে, কিন্তু আশা করা যায় ওটা তিনি মাইণ্ড করবেন না। ভেতরে ঢুকে জনতার পিশে তিনি কিছুক্ষণ লিপ্ত হয়ে থাকবেন, তারপর হয়তো কোথাও নিজের পাটুলি পেতে বসেও পড়তে পারেন। বেঞ্চে বসবেন—এমন কল্পনাই করা চলে না।

শ্রীনন্দার বরাত আরো খুলে যাবে যদি ওই সময়টায় মেলা-টেলা কিছু থাকে। তা হলে—এই বার্ধক্যেও যদি তাঁর যথোচিত উদ্দীপনা থাকে—সেক্ষেত্রে আরো আরামে পরিভ্রমণ করবেন ভদ্রলোক। অর্থাৎ তাঁকে গাড়ির ছাদে উঠতে হবে। সেই মুক্তাঙ্গন-বিহারে আকাশের রোদ-বৃষ্টি-জ্যোৎস্না অকৃপণভাবেই পাবেন তিনি। অবশ্যই একটু ব্যালান্স রেখে বসতে হবে, নীচু ব্রীজ দেখলে যথাকালে মাথা নামাতে হবে, বটের ডাল-টাল সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকতে হবে। এ আমাদের সম্মিলিত আবেদন—কারণ ভারতের রেলমন্ত্রীকে আমরা অপঘাতে খোয়াতে চাই না।

আর যদি তিসরী ডিব্বার ভেতরেই তিনি বিরাজ করেন, তা হলেও তাঁর আনন্দে যে কিছু ঘাটতি পড়বে তা নয়। যদি তাঁকে সো-কল্ড্ বাথরুমে যেতে হয়, তা হলে কিছু লম্ফঝম্পদির চর্চা করতে হবে—অনেক পোঁটলা-পাটুলি-বস্তা-বিছানার ওপর দিয়ে হার্ডলস্ পেরুবার কৃতিত্ব দেখাতে হবে। আশা করা যায়, তাঁর গায়ে মধ্যে মধ্যে ভাঁড়ের চা ছলকে পড়বে, লোকের ওঠানামার সময় যথানিয়মে গাঁতো-গাঁতি খাবেন, বাইরে থেকে ছুঁড়ে-দেওয়া একটা ট্রাঙ্ক যদি হঠাৎ তাঁর ঘাড়ে চড়াও হয়—তিনি খুব বেশি আর্তনাদ করবেন না, দেহাতী লাঠির দু-একটা খোঁচা-খোঁচা খেলেও সেসব স্পোর্টসম্যান স্পিরিটেই নেবেন।

থার্ড ক্লাসে পাখা থাকবে, অবশ্যই তার ব্লেড থাকবে না, সুতরাং শ্রীনন্দা ঘামে সেদ্ধ হবেন; যদি বালবগুলো চুরি হয়ে গিয়ে থাকে, অন্ধকারেই বা মন্দ লাগবে কেন?

তেষ্টা পেলে শ্রীনন্দা লোটা নিয়ে (তাঁর পাটুলিতে নিশ্চয়ই লোটা থাকবে) অবশ্যই স্টেশনের কলে জল আনতে যাবেন; সেখানেও ঠেলা পড়বে—শ্রীনন্দা যখন জল পাবেন, তখন ট্রেন হুইসল দিয়েছে। অগত্যা তিনি লোটা নিয়ে ছুটবেন, আছাড় খাবার উপক্রম করবেন, লোকে তাঁকে টেনে তুলবে, সেই সময় গগনভেদী আর্তনাদ করবেন তিনি: 'এ ভইয়া, লোটা গিরু গিয়া!' পুরী-কচোরী কেনবার লোভে যদি অবতরণ করেন, তা হলে—

নাঃ, আর চলল না। এটাওয়া টু হাওড়া যাত্রার সম্পূর্ণ বিবরণ দিতে হলে ধারাবাহিক রচনা লিখতে হয় দেখছি। অতএব এখানেই থামতে হচ্ছে। শ্রীনন্দাকে কলকাতার লোকাল ট্রেনে চাপানো গেল না, এ দুঃখও ভুলতে পারছি না।

কিন্তু এই ঐতিহাসিক যাত্রার পর হারুণ-অল-রশীদ কী করবেন? থার্ড ক্লাসটাই তুলে দেবেন কি?

উচ্চ শিক্ষার সমস্যা

সমীরকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলা দেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় যে বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখা দিয়েছে, তাকে অনেকেই সামাজিক জীবনের বিশৃঙ্খলার প্রতিফলন বলে ব্যাখ্যা করেন। আবার অনেকে এর বিপরীতকে সত্য বলে মনে করেন। কিন্তু কোনটা কারণ এবং কোনটা ফল, এই নিয়ে বিতর্ক থাকলেও শিক্ষার প্রসার এবং উন্নতি না হলে যে সামাজিক জীবনের উন্নতি বাধা পায়, সে সম্পর্কে সকলেই একমত।

বস্তুত, বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনে অনেক পরিবর্তন হয়েছে এবং হচ্ছে। তার একটা বড় উদাহরণ এই যে পারিবারিক প্রথা শিথিল হতে চলেছে। যে সব দৃঢ় পারিবারিক শৃঙ্খলার মধ্যে আগে সন্তান-সন্ততি মানুষ হত, অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই শৃঙ্খলা কিছুটা শিথিল হয়ে গেছে। এখন পরিবারে স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই অনেক ক্ষেত্রে অর্থ উপার্জনের জন্য বেরুতে হয়, ফলে সন্তান-সন্ততি বাড়ির লোকের সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হয়। এটা ভাল কি মন্দ তা নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে, তবে এটাই ইতিহাসের ধারা এবং এই ধারাকে বাধা দেওয়া হয়তো কারুর পক্ষেই আর সম্ভব নয়।

সে কথা যাক। প্রশ্ন এই যে, অভিভাবকদের পূর্ণ সাহচর্য বা শিক্ষা থেকে অনেক ক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়ে ছাত্রছাত্রীরা যায় স্কুল-কলেজে অর্থাৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে। সেখানে যে শিক্ষা তারা পায় সেটাই আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয়। বস্তুত এই শিক্ষা ব্যবস্থায় যত গলদ আজ দেখা যাচ্ছে তার তালিকা সম্পূর্ণ করা বোধ হয় সম্ভব নয়। তবুও, দুঃখের বিষয় এই যে, শিক্ষাব্যবস্থার গলদগুলির প্রতিকারের জন্য এখনও কোনও সুদৃঢ় জনমত গড়ে উঠলো না। সকলেই স্বীকার করেন যে খাদ্য দূষিত হলে যেমন শরীরের ক্ষতি হয়, তেমনি শিক্ষার ত্রুটি থাকলে মানুষের চিন্তার মানের অধঃপতন ঘটে এবং জাতির সংস্কৃতি ক্রমশ অবলুপ্তির পথে চলে যায়।

এই নিবন্ধে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আলোচনা সম্ভব নয়, তবে যেসব গলদগুলি সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মান নির্ণয়ে খুব বেশী চোখে পড়ে, সেগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

প্রথমত, আজকালকার ছাত্রছাত্রীরা ভাষার ওপর দখল হারিয়েছে। 'ইংরাজী হটাও' বলে যেসব রাজনীতিবিদ আন্দোলন করেন, তাঁরা সম্ভবত ভুলে যান যে ভাষা-ভিত্তিতেও পৃথিবীর সমস্ত ভাষার মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে। যে ছাত্র সংস্কৃতে ভাল, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে ইংরাজীতেও ভাল। 'ইংরাজী হটাও' আন্দোলনকারীরা নিজেদের গুরুত্ব জাহির করতে গিয়ে কখনও ছাত্রদের বাংলা শেখার উন্নতি সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন বলে মনে হয় না, নইলে বাঙ্গালী ছাত্র-ছাত্রীরা বাংলা ভাষার এত অপটু হত না। বর্তমান ব্যবস্থায় উচ্চ-মাধ্যমিক-এর ছাত্র ছাত্রীরা বাংলা ভাষায় দক্ষতা লাভ করেন না, এটা অনেকেই স্বীকার করেন; কিন্তু সেটা অন্য বিষয়গুলির তুলনায় বাংলাকে কম প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বলে, না শিক্ষকদের যোগ্যতার অভাবে—তা বিচার্য। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ইংরাজীর ওপর গুরুত্ব কমিয়ে ছাত্রছাত্রীদের কিছু মঙ্গল হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষার শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণীতে ইংরাজী শুরু করা হয়। ফলে উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষার বাকি ছয় বছরের মধ্যে ইংরাজী শেখার যথেষ্ট অবকাশ বা সুযোগ ছাত্রছাত্রীরা পান না। তার বিষময় ফল তাঁরা ভোগ করেন উচ্চ-শিক্ষার পর্যায়ে পৌঁছে।

আজও পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের সঞ্চয়কে জানতে গেলে একটি বিদেশী ভাষার ওপর দখল অপরিহার্য। ইংরাজী ভাষাই সকল বিদেশী ভাষার মধ্যে অগ্রণী এবং তা শেখবার সুযোগ এখনও যথেষ্ট আছে। এই সুযোগ নষ্ট করে ইংরাজী ভাষার মান নামিয়ে দিলেই জাতীয়তাবাদের পরিচয় দেওয়া হবে—এ কথা বাতুলতা মাত্র। পৃথিবী আজ যেভাবে এগিয়ে চলেছে, তাতে যেমন দেশে দেশে জ্ঞানের বিনিময় বাড়ছে, তেমনি প্রতিযোগিতাও বাড়ছে। আজ যে বাঙ্গালী ছাত্রছাত্রীরা প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে যাচ্ছেন এবং গবেষণার কাজ প্রায় বন্ধ হতে চলেছে—তার একটা বড় কারণ ইংরাজী ভাষার প্রতি অবহেলা। রাজা রামমোহন বা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেউই কম জাতীয়তাবাদী ছিলেন না, কিন্তু ইংরাজী ভাষার যথেষ্ট সমাদর তাঁরা নিজেদের জীবদ্দশায় করে গেছেন। উপরন্তু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের হাতিয়ার হিসাবে তাঁরা ইংরাজী শিক্ষা-ধারাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় গলদ যেটা চোখে পড়ে তা হচ্ছে, বই পড়া আজকাল প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে এবং পাঠ্য পুস্তকের স্থান দখল করেছে নোটবই অথবা suggestion ও তার উত্তর। বই পড়ার অভ্যাস নষ্ট হওয়ার অনেকগুলি কারণের একটা বড় কারণ ভাষার ওপর দখলের অভাব। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এসে কলেজের ছাত্রছাত্রীরা অনেকেই অভিযোগ করেন যে তাঁরা বই পড়ে মানে বুঝতে পারছেন না। বাঙ্গালী ছাত্রছাত্রীদের যে উচ্চশিক্ষার পরও বাক্তিত্বের বিকাশ হয় না এবং সাধারণ জ্ঞানের অভাব দেখা যায় তার কারণ, একটি পুরো পাঠ্য পুস্তক পড়বার মত ধৈর্য অথবা ক্ষমতা আজ তাঁদের নেই, দুঃখের বিষয়, শিক্ষকরাও এর জন্য অনুপ্রেরণা দেন না, কারণ তাতে তাঁদের নিজেদের অধিকতর পরিশ্রম করতে হয়।

যে কোনো শিক্ষা ব্যবস্থাতেই শিক্ষকদের এবং কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট দায়িত্ব আছে। অভিভাবকরা যদি কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে না পারেন, তাহলে শিক্ষকদের ওপর সামাজিক দায়িত্ব বেশী এসে পড়ে। কিন্তু কোনও পক্ষই যদি দায়িত্ব পালন না করেন তাহলে শিক্ষার অধঃপতনের জন্য ছাত্রছাত্রীদের দোষ দিয়ে কোনও লাভ নেই। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ বলতে বোঝায় কলেজ কর্তৃপক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকার; অছি অথবা Trust কলেজগুলিতে কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কলেজ পরিচালনা করেন। Trust আইন অনুসারে Trust কলেজগুলিতে বাইরের কোনো লোক হস্তক্ষেপ করতে

বিজ্ঞপ্তি

দেশ পত্রিকায় যাঁরা রচনাদি পাঠান তাঁদের প্রতি নিবেদন, সমস্ত রচনার নকল রেখে লেখা পাঠাবেন। কবিতা বাদে অন্যান্য অমনোনীত রচনা আমরা ডাকে—বুক পোস্টে—ফেরত দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করে থাকি; তবু নানা গোলযোগে এবং ডাকেও লেখা খোয়া যাবার সম্ভাবনা থাকে। বলা বাহুল্য, ইচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের দপ্তরে পাঠানো লেখার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে আমরা অক্ষম।

—সম্পাদক

পারেন না। সুতরাং এইসব কলেজগুলি প্রায় জমিদারী প্রথায় চলে। এখানে কলেজের মঙ্গলের প্রতি নজর দেবার অথবা প্রশাসনিক ব্যবস্থা সুশৃঙ্খলে চলছে কি না দেখবার মত সময় কর্তৃপক্ষের প্রায়ই থাকে না। এই কলেজগুলির পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে কর্তৃপক্ষের প্রীতিভাজন কোনও অধ্যক্ষের উপর। এই অধ্যক্ষ পদের জন্য সাধারণত বিজ্ঞাপন দেওয়া বা যোগ্যতা বিচার করা হয় না। সুতরাং কর্তৃপক্ষের বংশবদ অধ্যক্ষরা কলেজ পরিচালনায় যোগ্য না অযোগ্য সে প্রশ্ন এ ক্ষেত্রে তুচ্ছ। নির্বাচন এবং বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই খাম-খেয়ালীতা ও পক্ষপাতিত্ব শুধুমাত্র অধ্যক্ষের ক্ষেত্রেই সীমিত নয়—বহু অধ্যাপকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এর ফলে কলেজ প্রশাসনে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রায় অচল হয়ে পড়ে। এছাড়াও ছাত্র রাজনীতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষক রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়, যার ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিপর্যয় দেখা দেয়। পরিণামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মসূচী ব্যাহত হয় এবং নির্দিষ্ট ক্লাসগুলির অধিকাংশই হয় না।

সরকারী কলেজগুলিরও অনুরূপ অবস্থা, কিন্তু তার কারণ অন্য। এই সব কলেজের অধ্যক্ষেরা সরকারী কর্মচারী হ'লেও ক্ষমতা তাঁদের সীমাবদ্ধ। নির্দেশের অপেক্ষায় তাঁদের তাকিয়ে থাকতে হয় 'Writers Buildings'-এর দিকে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সরকারী নির্দেশ আসতে দু'চার মাস সময় লেগে যায়। কোনও অধ্যাপক স্থানান্তরিত হ'লে তাঁর জায়গায় নূতন অধ্যাপক আসতে সময় লাগে এবং ততদিন ক্লাসগুলি শূন্য যায়।

গ্রীষ্মের ছুটি, অন্যান্য ছুটি, স্ট্রাইক, হরতাল, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি বাদ দিলে দেখা যায় কোনও কলেজই বছরে চার-পাঁচ মাসের বেশী খোলা থাকে না। এর মধ্যেও যদি নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্লাসের সবগুলি না হয় তাহলে যথার্থ কাজ কতটুকু হয় তা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং পাঠ্য তালিকা যে বহুলাংশে অসম্পূর্ণ থেকে যায়, এ অভিযোগ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সত্য।

বাংলাদেশের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সবচেয়ে প্রাচীন ও বৃহৎ। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দ আছে, কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় এগুলির ছাত্র সংখ্যা নগণ্য। শুধুমাত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনেই তিন চার লক্ষ ছাত্রছাত্রী আছেন। শিক্ষা কমিশন দুঃখ প্রকাশ ক'রে তাঁদের রিপোর্টে বলেছেন যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান ক্রমশ নিম্নগামী হচ্ছে এবং বিকল্প হিসাবে তাঁরা একে ভাগ ক'রে দুটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছেন। বস্তুত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এখন পরীক্ষার দিন-স্থির ও পরিবর্তন করা এবং পরীক্ষাগুলিকে কোনোক্রমে পরিচালিত করা ছাড়া অন্য কিছু কাজ নেই, পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে যে সব লজ্জাকর ঘটনা ঘটছে, তার জন্য কর্তৃপক্ষকে সম্পূর্ণ দায়ী না ক'রেও বলা যেতে পারে যে, অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ কলেজগুলির পরিচালনা সম্বন্ধে তাঁরা বিন্দুমাত্র সজাগ নন, এই বর্তমান প্রক্রিয়ার বিভক্ত ক'রে যদি অধীনস্থ শাখাগুলির ওপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করা যায়, তবে সে ব্যবস্থা সম্ভবত ভালই হবে। বাংলাদেশে বর্তমানে যে কয়টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, তাদের মধ্যে জেলা ভিত্তিতে উচ্চ শিক্ষার দায়িত্ব পুনর্বণ্টন ক'রে দিলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বোঝা কমবে, অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গুরুত্ব বাড়বে এবং উচ্চ শিক্ষার মানও উন্নত হবে ব'লে আশা করা যায়। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্তকেও এইভাবে আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিকেন্দ্রীভূত করলে মাধ্যমিক শিক্ষারও মান উন্নত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থার সাফল্যের চাবিকাঠি শিক্ষকদের হাতে। শিক্ষকবৃত্তি যে অন্যান্য বৃত্তি অপেক্ষা ভিন্ন, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা ভুলে যাই। শত বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে কাজ করলেও শিক্ষকরা যদি ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে তাঁদের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হন, তাহলে কাজে তাঁরা অনুপ্রেরণা পাবেন। আজ বাংলাদেশের অন্যূন দেড় লক্ষ আত্মাভিমানী প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষক যদি ছাত্রদের প্রতি তাঁদের বিরাট দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ হ'য়ে ওঠেন, তাহলে এদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে যে প্রাচীন গৌরব ছিল, তা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে এবং আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে নূতন প্রাণসঞ্চার হবে।

যূঁথি ও তার প্রেমিকেরা

পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী

আকাশে বাতাসে তুমুল দ্বন্দ্ব
কে আগে কাড়বে যূঁথির গন্ধ
কার হাতে বড় নখ।
স্বর্গে মর্ত্যে যে যার গর্তে
যূঁথিকে গলার মালায় পরতে
ভীষণ উত্তেজক।।

মেঘের ভগ্নী গোঁয়ার মহিষ
রোদ রাগী ঘোড়া, সূর্য সহিস,
বজ্র বানায় বোমা।
বিদ্যুৎ চায় বিদীর্ণ মাটি
গাছে গাছে খাড়া সড়কি ও লাঠি
নদী গিরি বন ভয়ে অচেতন
[illegible] বোমা।

আকাশে বাতাসে তুমুল দ্বন্দ্ব
যে যার গর্তে ভীষণ [illegible]
নখে দাঁত, মুখে [illegible]।
কেবল যূঁথিই জানে না সঠিক
সে তার পরমাশ্চর্য প্রেমিক
চোখে জল, বুকে ত্রাস।

একুশতলা বাড়ির কার্নিশে

তারাপদ রায়

বেলজিয়াম আয়নার মত ঝকঝকে মেঘ
তারই দিকে মুখ রেখে
একটা একুশতলা বাড়ির কার্নিশে
রাত বারোটার জ্যোৎস্নার ক্রিম মেখে
একজন ভালোমতন ভদ্রলোক
হাওয়ায় চুল আঁচড়াচ্ছেন।

চুলের ভিতরে হাওয়ার অটোমেটিক চিরুনি,
চোখের সামনেই চকচক করছে আয়না
শেষবারের মত একবার
নিজের বাউণ্ডুলে মুখের ছায়া দেখতে গিয়ে
হঠাৎ থমকিয়ে গেলেন তিনি
নিজের এমন প্রসাধন দেখে।

নিজের দিকে আর তাকিয়ে পড়া হলো না,
সেই থেকে তিনি কার্নিশে দাঁড়িয়ে
দিনরাত, রাতদিন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঘুরিয়ে
স্নান নেই, খাওয়া নেই
শুধুই নিজের মুখ দেখছেন আয়নায়।

ছেঁড়া চিঠির কাতরানি

জগন্নাথ লাহা

চিঠি লিখতে গেলে শুধু কাগজ ছেঁড়ার খচাৎ খচাৎ শব্দ
ছেঁড়া কাগজ দেখে বুকের ভিতর আফসোস মোচড়ায়
অন্তত আট শো দলামোচা করা শব্দের মুখে গাঁজলা ওঠে
বিকট না-ভালোলাগায় সমস্ত দেহটা বোবা বোবা লাগে

চিঠি লিখছি তো লিখছি লিখছি তো লিখছি লিখছি তো অসমাপ্ত থেকে যায়
কখনো কখনো নিজেকে টাটকা খুনীর মতো অসহায় মনে হয়
কাগজ ফেলে লম্বা পেরেক দিয়ে সাদা দেয়াল
ফুটো ক'রে অয়্যারলেস্ বানাই এবং
আমার মতো ঘোঁট ফুলোনো খাঁটি শুয়োরের বাচ্চাদের
উদ্দেশ্যে অনেকক্ষণ ধরে চিঠির এলোমেলো বয়ান আওড়ে যাই

চিঠি লিখছি তো ছিঁড়ছি লিখছি আর ছিঁড়ছি কিছুতেই লেখা হয় না
কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ঘামের ভিতর
ছেঁড়া চিঠির আট শো ক্লান্ত মুখ জ্বলজ্বল করে
অর্থাৎ আমার বিবর্ণ শরীর মেঝের টুকরো টুকরো
কাগজের ভিতর বিকৃতভাবে চিত হয়ে কাতরায়।

স্বজন ও সজ্জন

অম্লান দত্ত

স্বজনপোষণ আজ এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। চারদিকে এর বিরুদ্ধে আক্ষেপ শোনা যাচ্ছে। সেই সঙ্গে সবাই যে যার স্বজনপোষণ করেও চলেছেন। স্বজন বলতে কেউ বোঝেন নিজের পরিবার, কেউ বা নিজের দল, অথবা স্বজাতি।

আক্ষেপ ও আচরণের এই বিরোধ থেকে একটা কথা সহজেই অনুমান করা যায়। অন্যের অপরের স্বজনপোষণে বিরক্তি, কারণ নিজের দলীয় স্বার্থে তাতে আঘাত লাগে। কিন্তু নীতিগতভাবে আমরা স্বজনপোষণের বিরোধী নই। অন্তত ঐরকম কোনো নীতিবোধ আমাদের মনের গভীরে স্থান পায়নি। সেখানে স্বজাতিপ্রীতির একমাত্র বিরোধী শক্তি স্বার্থপরতা। অতএব স্বজনপোষণকে আমরা একরকম কর্তব্যই মনে করি। যিনি স্বজনপোষণ করেন না, তিনি স্বার্থপর। এর চেয়ে বড় কোনো নীতি অথবা বিচারের কথা যদি-বা আমাদের ভাবার স্থান পেয়েছে, আমাদের বিবেক তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় এবং আচরণেও তার প্রকাশ নেই।

১৮৬১ সালে কলকাতা "হাই কোর্ট" স্থাপিত হয়। পাশ্চাত্ত্য বিচারধারার সঙ্গে দেশের পরিচয় শুরু হয়েছে আরও আগে। কিন্তু যে-ধ্যানধারণার ওপর পাশ্চাত্ত্য বিচারনীতি প্রতিষ্ঠিত তার সঙ্গে আমাদের ঐতিহ্যের একটা বিরাট অসামঞ্জস্য থেকেই গেছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সংখ্যা ছোট ছোট ঘটনায় এই অসামঞ্জস্য প্রকট। কেউ অধিকার হিসাবে কিছু দাবি করলে আমরা অসন্তুষ্ট হই। স্বজাতি হিসাবে অথবা স্নেহাকাঙ্ক্ষীরূপে চাইলে সে কথাটা বুঝি। আর বুঝি মায়ের ভয়। কিন্তু অধিকারের প্রশ্ন উঠলে আমাদের বুকের ভিতর কঠিন হয়ে যায়। তখন স্বভাবতই আমাদের মনে হয় 'তর্ক'। তর্ক জিনিসটা যে আমরা কোনো ক্ষেত্রেই পছন্দ করি না এমন নয়। দার্শনিক তর্কে আমাদের কিঞ্চিৎ রুচি আছে। কিন্তু অধিকার নিয়ে তর্ক জিনিসটা আমাদের বড়ই অভদ্রতা ঠেকে।

গোড়ার কথাটা এবার অন্যভাবে বলা যাক। কিছুটা স্বজনপোষণ সবদেশেই আছে, অর্থাৎ অপরিহার্য। আসল সমস্যা এই যে, আমাদের সমাজে পারিবারিক কর্তব্য ও 'পাব্লিক ডিউটি'র ভিতর সীমারেখা অস্পষ্ট। ঐ ইংরেজি শব্দটির কোনো বাংলা প্রতিশব্দ মনে পড়ছে না। সামাজিক কর্তব্য বলতে তো আমরা সাধারণত পারিবারিক কর্তব্যই বুঝি। যৌথ পরিবার যদিও আজ অটুট নেই তবুও আমাদের মনের গভীরে যে-নীতিগুলি আমরা চিনি, যৌথ পরিবারের অতি প্রাচীন আধারেই তাদের সৃষ্টি। এসব নীতি আজ সর্বক্ষেত্রে পালিত না হলেও এরা সর্বজনপরিচিত। যৌথ-পরিবারের নীতির সঙ্গে স্বজনপোষণের কোনো বিরোধ নেই। যে-নীতির ওপর দাঁড়িয়ে স্বজনপোষণের সমালোচনা সম্ভব আমাদের কাছে সেটাই বিজাতীয়। আমরা যখন পরিবার ভেঙে বেরিয়ে আসি তখনও প্রায়শ কোনো দল অথবা সমিতি আমাদের চিত্তে যৌথপরিবারের স্থান গ্রহণ করে। উপরন্তু দলীয় আনুগত্যের একটা বিশেষ সুবিধা আছে। যে-হেতু যথার্থ সমাজ-বোধ আমাদের চিন্তায় অনুপস্থিত অতএব দলীয় স্বার্থকে সামাজিক হিতের সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা করা কঠিন হয় না; এবং পারিবারিক স্বার্থের পিছনে ধাবিত হলে বিবেকজনিত যতটুকু অস্বস্তি বোধ করার সম্ভাবনা থাকে দলীয় ব্যাপারে ততটুকুও থাকে না। দলীয়তার ঊর্ধ্বে স্বাধীন বিচার অথবা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলে কোনো বস্তুর সঙ্গে আমাদের অধিকাংশেরই পরিচয় নেই।

মানুষকে বুঝতে হলে তার সমাজকে বুঝতে হয়। আগেই দেখেছি যে, আমাদের সনাতন সমাজের একটা বড় ভিত্তি ছিল যৌথ পরিবার। স্নেহ, শ্রদ্ধা, আনুগত্য, আত্মত্যাগ প্রভৃতি গুণ এই প্রতিষ্ঠানকে আশ্রয় করে বিকশিত হয়েছে। প্রাচীন সমাজসংহতির ভিত্তি এবং ধর্মের অঙ্গ হিসাবে আচারেরও একটা বিশিষ্ট স্থান অস্বীকার করা যায় না। তা ছাড়া পরিবার ও সমাজকে অতিক্রম করে হিন্দুধর্মে ব্যক্তির এমন একটি নিঃসঙ্গ আত্মাকে

স্বীকার করা হয়েছে যার মুক্তি সম্ভব ব্রহ্মের সঙ্গে যোগস্থাপনে।

হিন্দুর ধর্মে যেখানে মোক্ষের কথা বলা হয়েছে সেখানে সমাজসংসার গৌণ, জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে সেখানে সাক্ষাৎ সম্পর্ক। এটা আমাদের বৈশিষ্ট্য। ইহুদী ধর্মে ভগবান চুক্তি স্থাপন করেছেন একটা গোটা জাতি অথবা সমাজের সঙ্গে। ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্মে বহুলোকের মিলিত উপাসনার যেমন রীতি আছে, হিন্দুধর্মে তেমন নেই। হিন্দুর ভজন নিঃসঙ্গ সাধকের গান। খৃষ্টানের জন্য আছে সম্মিলিত ধর্মসঙ্গীত। ব্যতিক্রম দেখানো কঠিন নয়; যেমন, কীর্তন। কিন্তু মোটের ওপর একটা পার্থক্য অস্বীকার করা যায় না।

সত্য সম্বন্ধে ধারণাতেও একই প্রকার সূক্ষ্ম পার্থক্য লক্ষ করা যায়। সব ধর্মেই সত্যকে বড় স্থান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সত্য শ্রদ্ধেয় কেন? যদি বলা হয় যে, সাধক ও ভগবানের ভিতর সত্যই যোগসূত্র তা হলে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের কাছে সত্য থাকবে এটাই প্রধান কথা হয়ে দাঁড়ায়। ব্যক্তি যদি নিজের কাছে সত্য না থাকে তো আত্মবিরোধ দেখা দেয়; সেই অবস্থায় তার মুক্তি সম্ভব নয়। হিন্দুর কাছে এটাই প্রধান কথা। কিন্তু সত্যের আরও একটি গুণ আছে। সত্য এক ব্যক্তিকে অন্যের সঙ্গে আবদ্ধ করে; সত্য সমাজসংহতির ভিত্তি। সত্যকে বিসর্জন দিলে মানুষে মানুষে পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত্তি থাকে না, অতএব সমাজ উৎসন্নে যায়। বাইবেলে যে-ধর্মের ব্যাখ্যা আছে তাতে এদিকটাকে বড় করা হয়েছে। ভগবানের দশটি প্রধান আজ্ঞার ভিতর একটি হল এই যে, প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে কখনও মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না!

হিন্দুর কাছে এটা অপেক্ষাকৃত সামান্য কথা মনে হবে। তার চেয়ে বড় অহিংসা, সংযম প্রভৃতি গুণের ব্যাখ্যা। এই সব গুণ আয়ত্ত করতে পারলে মিথ্যা সাক্ষ্যের মতো সামান্য ব্যাপার উল্লেখেরই প্রয়োজন হবে না। এই ধরনের কিছু চিন্তা আমাদের মনে আসা স্বাভাবিক। কিন্তু বিষয়টি এইভাবে দেখা ঠিক নয়। হিন্দুর কাছে অহিংসা, সংযম ইত্যাদি হল মুক্ত জিতেন্দ্রিয় হয়ে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, মোক্ষলাভের উপায়। বাইবেলের ধর্মে প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্যকে এমনই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে যে, ভগবানের প্রধান আজ্ঞায় বার বারই এ বিষয়ে ইঙ্গিত লক্ষ করা যায়। পার্থক্যটা যদিও আপেক্ষিক তবুও এর গুরুত্ব আছে। প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে বাইবেলে যে-কথা আছে তার সঙ্গে তুলনীয় বাক্য মহাভারতেও পাওয়া যায়। কিন্তু এই সব বাক্য যে আমাদের ঐতিহ্যে তেমন কেন্দ্রীয় স্থান লাভ করে নি যেমন করেছে খ্রিস্টধর্মের আদর্শ, তার কারণ আমাদের মূল সুরটি অন্তর্মুখী। হিন্দু মনে মনে নিঃসঙ্গ।

এই বৈরাগ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রাচীন ভারতীয় সমাজকে ধারণ ক'রে ছিল প্রধানত আচার ও পারিবারিক বন্ধন। আমাদের প্রাচীনেরা মহানুভবতার মুহূর্তে বসুধাকে কুটুম্ব চিন্তা করেছেন। এটা আত্মীয়তাবোধের বিস্তৃতি হিসাবে শ্রদ্ধেয়। কিন্তু অপরের প্রতি আমাদের কর্তব্য শুধু কুটুম্বিতাবোধ দ্বারা নির্ণয় করা নিরাপদ নয়। কুটুম্বচিন্তায় ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও অধিকারের প্রশ্নটা নগণ্য। মা সন্তানকে ভালোবাসেন সেটা মায়ের ধর্ম বলে, সন্তানের অধিকার বলে নয়। স্বাভাবিক স্নেহ-ভালবাসাকে বাদ দিয়ে কোনো সমাজই চলে না। কিন্তু আধুনিক সমাজের পক্ষে এটা যথেষ্ট নয়। নাগরিক জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে এমন বহু মানুষের সঙ্গে যুক্ত হতে হয় যাদের সঙ্গে তার কোনো আত্মীয়তার বন্ধন নেই। আধুনিক জীবনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনশীলতা। এই দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে অনাত্মীয় ও ভিন্নরুচির মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে-নীতিবোধ প্রয়োজন, প্রাচীন নীতিবোধের সঙ্গে তার মৌলিক পার্থক্য আছে।

আত্মীয় শব্দেরও অর্থে স্তরভেদ আছে। অনাত্মীয়ের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েই আত্মীয়তার উচ্চতর স্তরে ওঠা যায়। কথাটা তত্ত্বের আকারে বলা থাক। যেমন ব্যক্তির চেতনায় তেমনই সমাজজীবনের বিকাশে প্রেম ও যুক্তির একটা দ্বান্দ্বিক বিবর্তন লক্ষণীয়। প্রেমের দৃষ্টিতে সাধারণও বিশেষ হয়ে ওঠে। আমরা প্রত্যেকেই নিজের কাছে 'বিশেষ'; প্রেম অপরকে নিজের অংশ করে তাকে বৈশিষ্ট্য দান করে। আর যুক্তির স্বভাব হল বিশেষকে একটি সাধারণ তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত করে দেখা। যাকে আমরা অক্লেশে আত্মীয় বলে চিনি তার প্রতি সদ্ভাবের জন্য যুক্তির প্রয়োজন হয় না। কিন্তু প্রতিবেশীর কাছে তুমি যে-আচরণ আশা কর তার প্রতি তোমার আচরণও সেই রকম হওয়া উচিত, এই চিন্তায় মানুষ আদিম আত্মীয়তাবোধকে অতিক্রম করে প্রেম ও যুক্তির একটি নতুন সমন্বয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। মনে রাখা আবশ্যক যে, এই চিন্তারই একটি ধাপে যীশুখৃষ্ট 'প্রতিবেশী' শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করে অপরিচিতকেও তার অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। বৃহত্তর সমাজে পারস্পরিক কর্তব্য ও অধিকারের একটি নতুন ভিত্তি এইভাবে স্থাপিত হল।

আধুনিক জীবনের সাধারণ কাজেকর্মে যে-নীতিবোধ প্রয়োজন হয় তাতে অনেক

সময় প্রেমের অংশটা প্রধান নয়, তাকে প্রাধান্য দেওয়া বিপজ্জনক। পরীক্ষার খাতা দেখার সময় পরীক্ষক যে-নীতিবোধ থেকে নিরপেক্ষতা রক্ষা করেন তাতে সাধারণ অর্থে প্রেম অনুপস্থিত; তার পরিবর্তে আছে ন্যায় ও মঙ্গলবোধ। অধিক গুণসম্পন্ন অপরিচিত ব্যক্তিকে চাকুরীতে অগ্রাধিকার দেবার জন্য যে-ন্যায়দৃষ্টি আবশ্যক, তাতে অপরিচিতের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলেও প্রেম-দৃষ্টির সঙ্গে সেটা অভিন্ন নয়।

প্রশ্নের আরও গভীরে যাওয়া যাক। আত্মীয় ও প্রতিবেশীর ভিতর একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। আত্মীয় আমাদের "অহং" থেকে পৃথক নয়। স্ত্রী যেমন স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী, পুত্র যেমন পিতার প্রলম্বন, পরিবারও তেমনই আমাদের পরিবর্ধিত সংস্করণ। আত্মীয় সম্প্রসারিত অহং-এর অংশবিশেষ। প্রতিবেশী স্বতন্ত্র ব্যক্তি; তাকে স্বতন্ত্র জেনেও তার সঙ্গে আমরা কল্যাণের বন্ধনে আবদ্ধ হই। আধুনিক সমাজে মানুষে মানুষে এটাই প্রত্যাশিত সম্পর্ক। অতএব এ যুগে সজ্জন হতে হলে স্বজনচিন্তার অধিক কিছু প্রয়োজন। "তুমিই সে" এই শিক্ষার ভিতর দিয়ে হিন্দুধর্ম বিশ্বকে ব্যক্তির অন্তরাত্মায় স্থাপন করেছে। কিন্তু যাকে আমরা সম্পূর্ণ আপন করতে পারিনি সেই অপর মানুষের প্রতিও আমাদের কর্তব্য আছে। এ বিষয়ে হিন্দুধর্মে আচার ভিন্ন কোনো কার্যকর নির্দেশের অভাব। প্রাচীন আচারে আমরা আজ শ্রদ্ধা হারিয়েছি। অথচ ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও অধিকারবোধে চিহ্নিত আধুনিক জীবনদর্শন এখনও আমাদের ধ্যানধারণায় প্রবেশ করেনি।

বলে রাখা ভালো যে, বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্বের আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব সমস্যা আছে। কিন্তু সেটা এখানে আলোচ্য নয়। আমাদের সমস্যা নিয়েই এই প্রবন্ধের ভাবনা। যেহেতু আধুনিক যুগের উপযোগী নীতিবোধ আমাদের ভিতর বিস্তার লাভ করেনি, অতএব প্রাচীন আত্মীয়চিন্তার দুই বিপরীত মেরুর ভিতর আমরা আজও দোদুল্যমান। আমরা একদিকে সমাজকে ডিঙিয়ে ভগবানের কাছে হাজির হই। যখন সংসারে ফিরে আসি তখন হয় স্বার্থবুদ্ধি, নয়তো স্বজনপোষণ নীতি দিয়ে চালিত হই। যে বৃহৎ সমাজবোধ অথবা বিবেক এ দুয়ের ভিতর সেতু রচনা করতে পারতো আমাদের সংস্কৃতিতে আজ তার অস্তিত্ব প্রায় চোখে পড়ে না। এ ব্যাপারটা আমাদের মধ্যে এতোই ব্যাপক যে, এর ব্যতিক্রম আমরা কদাচিৎ কল্পনা করি। কারও কাজ যদি আপাতদৃষ্টিতে নিঃস্বার্থ হয় তো অনেক গোপন উদ্দেশ্য কল্পনা করে তাঁর সম্বন্ধে

আমাদের সন্দেহ আরও গভীর হয়। নয়তো তাঁকে আমরা সাধুসন্ত বানাই। মোট কথা, কোনো ব্যক্তি সংসারে থেকেও ব্যক্তিগত, পারিবারিক অথবা দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে ন্যায়বুদ্ধি দ্বারা চালিত হতে পারেন, এটা সচরাচর আমাদের গণনার মধ্যে আসে না। কারণ নিজের চেতনার ভিতর এটা আমরা সহজে খুঁজে পাই না। অপরের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আত্মজ্ঞানেরই প্রতিফলন।

যেমন প্রাচীন আত্মীয়তাবোধে ভাঙন ধরলেও নতুন ন্যায়বোধ আমাদের ধ্যানধারণায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তেমনই পুরাতন আচারের ধ্বংসাবশেষের ওপর নতুন আচার আমাদের সমাজে এখনও গড়ে ওঠেনি। ইতিহাসের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনাত্মীয়ের প্রতি আমাদের কর্তব্য পরিবর্তিত হয় এবং এই পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে নতুন আচারের প্রয়োজন হয়। আচার বস্তুটির প্রতি আধুনিক মনে একটা বিরূপতা আছে। এর কারণ বোঝা কঠিন নয়। আচার সংস্কৃতিকে একটা বিশেষ ছাঁচে ঢালে; ফলে পরিবর্তন কঠিন হয়। তবু ব্যক্তিগত জীবনে অভ্যাসের মতোই সমাজজীবনে আচারের একটা স্থান আছে। অভ্যাসের জোরে যেমন আমরা কিছু প্রয়োজনীয় কাজ অক্লেশে করি, আচারের গুণে তেমনই কতগুলি দায়িত্ব সহজে পালন করা যায়। দায়িত্ব পালনের সময় যদি প্রতিবার চিন্তা করতে হয় যে এবার ওটা না করলেই নয় কিনা, তা হলে কর্তব্যে অবহেলা করার পক্ষে কারণ খুঁজে পাওয়া কঠিন হয় না।

এই অবহেলা আমাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরে। চাঞ্চল্যকর দুর্নীতির কথা বলছি না। সেই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনাচারের কথা বলছি যার যোগফল বৃহৎ। আমাদের অনেকেই বাড়ীতে আচার অনুষ্ঠান পালন করেন, কিন্তু অফিসে আড্ডা দেন। পুরোনোর পরিবর্তে নতুন আচার সৃষ্টি না হবার ফল এই। বাড়ীতে যাঁরা এসব কিছুতে বিশ্বাস করেন না, তাঁরাও অপরের অনুষ্ঠানে বাধা দেন না; চক্ষুলজ্জাটা সঙ্গতভাবেই অবিশ্বাসীর। অফিসে যিনি কাজে বিশ্বাসী তিনি মনে মনে উত্ত্যক্ত বোধ করলেও আড্ডায় বাধা দেন না; চক্ষুলজ্জাটা বিশ্বাসীর। আর একটি উদাহরণ দিই। সম্প্রতি আনন্দবাজার পত্রিকায় (জানুয়ারী ১০, ১৯৭০) জনৈক পত্রলেখক অভিযোগ করেছেন :

"কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যাঁরা পত্রালাপের চেষ্টা করেছেন তাঁরা জানেন যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণত চিঠির উত্তর দেন না, এমন কি পত্রের প্রাপ্তি স্বীকারও করেন না।

"এর কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করলে সেই সংক্রান্ত ব্যাপারে তারপর একটা বাধ্যবাধকতা এসে যায়, দায়িত্ব অস্বীকার করা কঠিন হয়।"

আসলে এ ব্যাপারে আমাদের সমাজে প্রয়োজনীয় "আচার" প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তি হিসাবে চিঠি লিখলেও অনেক সময় উত্তর পাওয়া যায়, কারণ এটা ওদের অভ্যস্ত প্রতিক্রিয়া। বলা বাহুল্য যে, বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে যে কথা প্রযোজ্য আমাদের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধেও সেটা সমভাবে সত্য। মোট কথা, ঘরের স্বজনের চেয়েও অপরজনের প্রতি দায়িত্বজ্ঞানকে শুধু স্বাভাবিক ঔদার্যবোধের হাতে ছেড়ে দেওয়া ভুল; তাকে অভ্যাসের ছাঁচে ঢালতে হয়। নতুন যুগের দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অভ্যাস ও ধ্যানধারণার পুনর্গঠন আজও আমাদের অন্যতম প্রধান অসমাপ্ত কাজ।

স্বজনপোষণের কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম। তারপর বলেছি ব্যক্তির অধিকারের কথা। সেটা আরও গোড়ার প্রশ্ন। তাই দিয়ে শেষ করছি। ব্যক্তির অধিকার আমরা বুঝি না, গ্রাহ্য করি না। পরিণামে অধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নের মীমাংসায় প্রাধান্য লাভ করে যুক্তির চেয়ে আদিম দুটি প্রবৃত্তি। আমরা দয়া বুঝি, আর বুঝি ভয়। যখন কিছু পেতে চাই, হাতজোড় করি—নয় তো মারমুখো হই। যখন কিছু দেবার প্রশ্ন ওঠে, কৃপা করি—অথবা গোলমাল এড়াবার জন্য দিয়ে দিই। ভয়ে আত্মসমর্পণ করি, তাকে বলি প্রেম। যে বস্তুটি আজ আমাদের নেই তা হল মেরুদণ্ড। মেরুদণ্ড নেই কারণ যে নীতি আমরা বুঝি সেটা এ যুগের যোগ্য নয়; যে নীতি এ যুগে প্রযোজ্য তা আমরা বুঝি না। আমাদের একটা বড় পটুত্ব আছে, সেটা হল কোনো প্রকারে বাঁচা। কোনো প্রকারে আমরা বাঁচবো; তবে সেটা বাঁচার মতো বাঁচা হবে না। কথাটা নৈরাশ্যবাদের মতো শোনাচ্ছে। তা হলে অন্যভাবে বলা যাক। আধুনিকতার একটা সদর্থ আছে; সেই অর্থটি যখন আমরা আবিষ্কার করতে পারব, সেটাই হবে এ যুগে আমাদের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার। কারণ রাজা উজীর কে এলেন গেলেন তাতে খুব যায় আসে না; দেশের সংস্কারেরও পরিবর্তন চাই।

মানুষ রতন

সমরেশ বসু

॥ ৩ ॥

মড়া নিয়ে, প্রায় দশ মিনিটের মধ্যেই, ওরা গঙ্গার ধারে এসে পড়ল। পিছনে পিছনে, যমুনাকে নিয়ে পুনিয়া, রিকশা চালিয়ে। কিন্তু গঙ্গার ধারে এসেও ওরা থমকে দাঁড়াল। রাস্তায় আলো নেই, অন্ধকার। এমন থাকবার কথা নয়। গঙ্গার বুকে, স্রোতের বাঁকা ঘূর্ণিতে কয়েকটা লম্বা ঝিলিক মাত্র। ছোট ছোট ঢেউয়ের মাথায়, হঠাৎ যেন এক আধটা জোনাকির জ্বলে ওঠা। আর সবই অন্ধকার, উঁচু রাস্তা, নিচের পাড়, নদী। দক্ষিণের দূর বাঁক পর্যন্ত অন্ধকার। ওপারের আলো কিছু দেখা যায়। সব যেন কেমন থমথম করছে।

ত্যাবড়া নিচু স্বরে বলল, 'রাস্তায় একটাও বাতি নেই কেন?'

মনা বলল, 'কেমন যেন লাগছে। এখানে কিছু হয়েছে নাকি?'

খানিকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। ইস্টিশনের ওদিক থেকে আর একবার একটা বোমা ফাটার শব্দ শোনা গেল। দু'-একটা গাড়ির গর্জন, একটা ট্রেন আসার শব্দ। তা ছাড়া শহরটা নিঝুম, যেন নিশ্বাস বন্ধ, চুপ করে এক কোণে লুকিয়ে আছে।

সোতে বলল, 'আমরা তো মড়া নিয়ে বেরিয়েছি। চল না, হরিবোল দিতে দিতে চলে যাই।'

ত্যাবড়া বলল, 'হ্যাঁ, তারপরে [illegible] চিনতে পারবে, মড়াশুদ্ধ সব ছিনিয়ে নেবে।'

জগা বলে উঠল, 'তা'লে এক কাজ কর।'

'কী?'

'ঝামেলায় যেয়ে দরকার কী, চল গঙ্গায় ভাসিয়ে দিই।'

ত্যাবড়া নিচু স্বরে গর্জে উঠল, 'শালা বেইমান! তারপরে তুমি মদ মাংস খেয়ে, ছুঁড়িটাকে নিয়ে কোথাও পড়ে থাকবে।'

মনাও অনেকটা গর্জনের স্বরে বলল, 'সালা। খালি আমাদের কিসটি গেলাবার জন্য লোকটা মরেছে, না?'

সোতে বলল, 'হ্যাঁ, না পোড়ালে মাইরি শাপ লাগবে।'

জগা বলল, 'যা বাবা, আমি ভালর জন্য বললাম, আর—।'

যমুনা রিকশা থেকে বলে উঠল, 'সব ভাল ভাল না জগা। তোমার মনে অধম্মো আছে। লোকটা চিতেয় পুড়বে বলেই না ত্যাওড়াদার নজর টেনেছিল।'

কয়েক মুহূর্ত কেউ কোন কথা বলল না। মনে হল, মড়া মানুষটার মুখটা ওদের সকলের চোখের সামনে জেগে উঠল।

পানিরা পিছন ফিরে যমনোকে একবার দেখতে চেষ্টা করল। সোতের গলা শোনা গেল, 'হ্যাঁ, পুড়িয়ে যাব, ভাসিয়ে দেব না। পানিরা একটা কাজ কর তো। একটা বোতল বের কর, এক ঢোক ক'রে মাল টেনে নিই।'

মনার গলা, 'মাইরি।'

পানিরা রিকশা থেকে নামল। যমুনার গায়ে হাত দিয়ে বলল, 'থাম।'

যমুনা ওকে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'তুই যা, আমি দিচ্ছি।'

যমুনা নিজেই, সীটের তলা থেকে একটা দেশী মদের বোতল বের করল। গালার সীল ভেঙে ছিপি খুলে, আগে ন্যাবড়ার হাতে দিল। ন্যাবড়া প্রথমটা একটু থমকে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে, মরা মুখটা একবার দেখবার চেষ্টা করল। তারপরে বোতল উপুড় করে গলায় ঢালল। দমবন্ধ গলায় বলল, 'তাড়াতাড়ি কর, বেরিয়ে যাই।'

যমুনা তারপরে সোতেকে বোতল দিল। যমুনার গলা শোনা গেল, 'আঃ, ছাড়।'

গলায় মদ ঢালার শব্দ হল। মনা বলল, 'সোতেটা শালা মড়া কাঁধেও খচড়ামি করছে।'

সোতে মদ গিলে নিয়ে বলল, 'একটা কথা হঠাৎ মনে হল মাইরি। আমরা পাঁচ জন পাণ্ডব, আর যমুনো দ্রৌপদী।'

পানিয়ার হাসি শোনা গেল। যমুনো বলল, 'ঠাকুর দেবতা নিয়ে ইয়ারকি ভাল না।'

ন্যাবড়া হঠাৎ অনেকটা চিন্তিত সুরে বলল, 'হুঁ, এবার বুঝেছি, গঙ্গার ধারটা কেন অন্ধকার করে রেখেছে। শালারা লড়াইয়ের ময়দান সাজিয়ে রেখে গেছে, বুঝলি? বড় রাস্তায় ফয়সালা না হলে, এখানে আসবে।'

সোতে বলল, 'তা হলে তাড়াতাড়ি চল।'

জগা বলল, 'দাঁড়া বাবা, ঢোকটা মেরে নিই।'

সাহকদের পরে, যমুনো পানিরাকে বলল, 'হাঁ কর, তোর গলায় ঢেলে দিচ্ছি।'

পানিরা বলল, 'তুই খাবি না?'

'না।'

'কেন, খাস না নাকি?'

'তা বলে, ভোলের মতন মড়া নিয়ে যেতে যেতে খাব? নে নে, হাঁ কর।'

পানিরা হাঁ করল। যমুনা মদ ঢেলে দিল। আর পানিরার হাতটা উঠে এল যমুনার কাঁধে। যমুনা বলল, 'নে হয়েছে, চল।'

ওরা চারজন আগে আগে মড়া নিয়ে, নিঃশব্দে চলেছে। হরিধ্বনি উচ্চারণ করতে পারছে না। পিছনে পিছনে, রিকশার ঝন্-ঝন্ শব্দটা সকলেরই খারাপ লাগছে, ভয় পাচ্ছে। গাঢ় অন্ধকার, একটা লোক নেই। গাছের ঘন ঝোপ থেকে ভয় পাওয়া পাখি, হঠাৎ এক-আধবার ডেকে উঠছে। থমথমে অন্ধকারের মধ্যে, প্রতি মুহূর্তেই যেন একটা কিছু ঘটবার আশঙ্কা। একটা বোমা ঝটিতি এসে ফাটা, বা একটা দল এসে ঝাঁপিয়ে পড়া।

হলও তাই। দূর থেকে, ওদের ওপরে একটা চড়া আলো এসে পড়ল। আলোটা ছুটে ওদের দিকে আসতে লাগল।

ন্যাবড়া উত্তেজিত হয়ে, হিপ পকেট থেকে ছোরাটা বের করে খুলে ফেলল, 'যা থাকে বরাতে, লড়ে যাব।'

মনাও ছোরা বের করে বলল, 'আমারও আছে।'

পানিরা বলল, 'যমুনা, শীগগির সীটের নিচে থেকে সাইকেলের চেনটা দে।'

আলোর পিছনে কী আছে, কে আসে, প্রথমে বোঝা গেল না। আরো খানিকটা কাছে আসতেই বোঝা গেল, প্রাণপণে কেউ সাইকেল চালিয়ে আসছে। সামনে ডায়নামোর আলো। কাছাকাছি আসতেও যখন সাইকেলের গতি কমল না, তখন ওরা একটু নিশ্চিন্ত হল। কাছাকাছি হতে, ওরা দেখল, সামনের রডের ওপর আর একজন ঝুঁকে বসে আছে। তার মাথা মুখ বেয়ে রক্ত পড়ছে। ওদের গা ঘেঁষে, সাইকেলটা সাঁ করে বেরিয়ে গেল।

ন্যাবড়া বলে উঠল, 'যা বলেছিলাম, এবার সব এদিকে আসবে। দৌড়ো।'

ওরা মড়া কাঁধে দৌড়তে লাগল। সোতে বলল, 'কোন রকমে একবার খাল নর্দমার ধারে পৌঁছুতে পারলে হয়, তারপরে সব ঠাণ্ডা।'

পৌঁছলও তা-ই, ধুক ধুক প্রাণে, কিন্তু নিরাপদেই। কেবল অন্ধকারটা আরো ঘন হয়ে উঠল। খাল নর্দমা মানে, শহরের একমাত্র আউট-লেট। গঙ্গায় এসে মিশেছে। আশপাশগুড়া আর কালকাসুন্দের জঙ্গল পায়ের নিচে। খালের দিকে ঢালু জমি নেমে গিয়েছে।

পানিয়া বলল, 'রিকশা পার করব কী করে?'

ত্যাবড়া বলল, 'রিকশা পার করা যাবে না। মালপত্তর সব বের করে ঝোলায় নে, গাড়ি জঙ্গলের মধ্যে ঢ়ুকিয়ে দে, কেউ দেখতে পাবে না।'

প্যানিয়া বলল, 'হ্যাঁ, কেউ দেখতে পাবে না! যদি কেউ দেখতে পায়, আর মেরে নিয়ে যায়, গাড়ির মালিক শালা আমাকে ফাটকে পাঠিয়ে দেবে।'

মনা বলল, 'তুই আমার ওপর ছেড়ে দে। এমন জায়গায় ঢোকাব, কাকপক্ষীও দেখতে পাবে না।'

মড়াটা ওরা আর একবার নামাল। যমুনা সীটের তলা থেকে মদের বোতলগুলো, চানাচুরের ঠোঙা নামিয়ে নিল। মনা ঢালু জমির ঘন জঙ্গলের একদিকে তিন চাকার গাড়িটা নামিয়ে নিয়ে গেল। মড়মড় করে কয়েকটা আসশ্যাওড়া গাছ ভেঙে গাড়িটাকে ঢেকে দিল। ত্যাবড়া নর্দমার ধার থেকে উঠে এসে বলল, 'জোয়ারটা নেমে গেছে, কিন্তু হাঁটু ডোবা পাঁক জমেছে। সাবধানে যেতে হবে। চল বেরিয়ে যাই।'

চারজনেই আবার মড়া কাঁধে তুলে নিল। প্যানিয়া বোতলের ঝোলা কাঁধে নিল। যমুনা ওর পাশে পাশে। নর্দমার ময়লার ওপরে, পলিমাটির আস্তরণের ওপর দিয়ে সবাই সাবধানে পা টিপে টিপে নামতে লাগল। ময়লায় পা পড়তেই, এমন দুর্গন্ধ বেরোল নাড়িভুঁড়ি উঠে আসবার যোগাড়। যমুনাই প্রথম শব্দ করে নাকে আঁচল চাপা দিল। নর্দমার মাঝামাঝি আসতে, হাঁটুর বেশি ডুবে গেল।

ত্যাবড়ার গলা শোনা গেল, 'হুঁশিয়ার।'

যমুনা প্যানিয়ার ঘাড়ে হাত রাখল। প্যানিয়ার এখন মজা নেই। পাঁকের মধ্যে ডুবে যাওয়ার ভয় করছে। তথাপি যমুনার ছোঁয়া পেয়ে, একটু যেন ভরসাও পেল। কিন্তু ওর গায়ে হাত দেবার সাহস পেল না। একটা ঝুঁকে পড়া গাছের ডালের সঙ্গে, মড়ার ধাক্কা লাগল। ওরা খুব আস্তে আস্তে পার হল। নর্দমার পাঁক ওদের উরত ছাড়িয়ে উঠতে লাগল। যমুনার গলা শোনা গেল, 'আমার কোমর ধরেছে।'

সোতে শব্দ করল, 'সস্‌স্, উঁম্!'

সকলেই প্রায় কোমর অবধি ময়লা আর দুর্গন্ধ মাখামাখি করে পার হয়ে এল। ওপারে উঠে বাঁ দিকে ফিরে খানিকটা যাবার পরে গঙ্গার ধারের রাস্তা পেল। আলোও পাওয়া গেল। নিজেদের দিকে সবাই তাকিয়ে দেখল। কোমর অবধি রঙ বদলে গিয়েছে।

জগা এতক্ষণে কথা বলল, 'একেবারে গঙ্গায় চান করব।'

এক দিকে গঙ্গা, আর এক দিকে চটকলের লম্বা পাঁচিল। তারপরে একটা গরীবদের পাড়া। সেই পাড়াটা পেরিয়ে গেলেই শ্মশান। মনা বলল, 'হরিবোল দেব?'

ত্যাবড়া বলল, 'থাক, শালা যা দিন আজ, বলা যায় না। চুপচাপ চলে যাই।'

সোতে বলল, 'লোকটা বোধহয় চুপচাপ থাকতে ভালবাসত।'

অর্থাৎ মরা মানুষটি। প্যানিয়া বলল, 'আস্তে আস্তে একটা গান গাইব?'

কেউ জবাব দিল না। প্যানিয়া সকলের সম্মতি আছে ভেবে, নিচু গলায় গান ধরল, 'আমরা রিকশা চালাই, আমরা রিকশা...।'

সোতে বলল, 'ভাগ্ সালা, আর গান খুঁজে পেলে না। শুনলে সালা আমার চিত্তির জ্বলে যায়।'

মনা বলল, 'আমারও মাইরি। গাড়ি চালাই আমরা, আর সালা ওরা গান করে, তাল মারে।'

সোতে বলল, 'সালা মাক্কীচুষ জাত। সবখানে চুষে খায়।'

প্যানিয়ার আর গান গাওয়া হল না। মুখ ফিরিয়ে যমুনার দিকে তাকাল। যমুনা এসব কথা শুনছিল না। ও গঙ্গার দিকে তাকিয়ে হাঁটছে। বাতাসে ওর চুল উড়ছে। পা থেকে কোমর পর্যন্ত মাটি দিয়ে গড়া প্রতিমার মত দেখাচ্ছে। কালো ময়লা আর পলিমাটির জন্য ওদের সবাইকেই একরকম দেখাচ্ছে। যমুনা মেয়ে বলে অন্য রকম।

ত্যাবড়া হঠাৎ মোটা গলায়, নিচু সুরে গেয়ে উঠল, 'মরিব মরিব সখী, নিশ্চয় মরিব...।'

সোতে হেসে উঠল, তারপরে সবাই হেসে উঠল। সোতে বলল, 'সালা আর গান খুঁজে পেল না। মড়া বইছে কী না!'

যমুনা বলল, 'তোমার আবার সখী কে গো ত্যাওড়া দা!'

ত্যাবড়া ধমক দিয়ে বলল, 'তুই চুপ কর।'

বোঝা গেল, ত্যাবড়ার মনটা এখন বেশ খুশী আর নিশ্চিন্ত এবং সকলেরই।

৪

গরীবপাড়ার পরে, ছোট একটা মাঠ। তারপরে শ্মশান। শ্মশানে ঢোকবার আগে, ওরা এবার গলা ফাটিয়ে হরিধ্বনি দিল। যমুনার গলাটা ওদের সঙ্গে মিশে, হরিবোল ধ্বনিটা কেমন একটা নতুন সুরে বাজল।

শ্মশানটা ফাঁকা, একটাও চিতা জ্বলছে না। মনা বলল, 'সত্যি, লোকটা ঝামেলা পছন্দ করত না। আজ মড়ার ভিড় নেই।'

কাঠের চালাটার পাশে টিমটিমে বিজলি আলোর নিচে চণ্ডী এসে খালি গায়ে দাঁড়াল। পাশেই তার নিজের থাকবার ঘর। সেখানে তার বউ ছেলেমেয়েরা আছে। চণ্ডী শ্মশানের ডোম। সে এসে দাঁড়াতে, গঙ্গার ধারের ছাইগাদা থেকে তিনটে কুকুরও তার পাশে এসে দাঁড়াল। কান খাড়া, ল্যাজ ঝোলা, লাল ঢুলঢুলু চোখ কুকুরগুলো যেন বিশেষভাবে লক্ষ করে, কাঁধের মড়াটা দেখল। ওরা চারজন শ্মশানের কাঁচা উঠোনে মড়া নামাল।

উঠোনের এক পাশে কয়েকটা দরজা বিহীন চালা ঘর। একটাতে টিমটিম করে কুপি জ্বলছে। গায়ে গেরুয়া জামা পরে, চুল দাড়িওয়ালা এক বুড়ো গালে হাত দিয়ে বসে রয়েছে। আর একটা ঘরে অস্পষ্টভাবে দেখা যায়, দু' তিনজন ঢাকাঢুকি দিয়ে শুয়ে আছে।

চণ্ডী এসে মড়ার সামনে দাঁড়াল, দেখল, তারপরে সকলের দিকে ফিরে তাকাল। রোগা লম্বা কালো চণ্ডী কলসীতে জল ভরার মত বগ বগ করে হেসে উঠল। বলল, 'কার মড়া? নিজেদের কারোর? নাকি জুটল?'

ত্যাবড়া বলল, 'জুটল।'

চণ্ডী বলল, 'বাহ্, তোমাদের কপালটা বেশ ভাল। তা কেমন পেলে?'

'মন্দ না, মাখো মাখো করে, ভালই।'

'মাখো মাখো? গড়িয়ে পড়বে না?'

চণ্ডী বগ্ বগ্ করে হাসল। যমুনার দিকে তাকাল, জিজ্ঞেস করল, 'আর ইটি?'

সোতে বলল, 'জুটে গেল।'

চণ্ডী আবার হাসল। ত্যাবড়া বলল, 'দাও দাদা, সাজিয়ে ফেল, জিনিস তৈরি।' বলে পকেট থেকে টাকা বের করে গুণে দিল। চণ্ডী বলল, 'চার মাস আগের হিসাবে দিলে। আরো দেড় টাকা দাও, লকড়ির দাম বেড়েছে।'

ত্যাবড়া মুখটা বিকৃত করল। মনা বলল, 'কমছেটা কী, তা তো বুঝি না।'

চণ্ডী বলল, 'মড়া। মাইরি, বড্ড কমে গেছে।'

ত্যাবড়া আরো দেড় টাকা দিল। চণ্ডী এবার পুনিয়ার হাতের ঝোলার দিকে তাকাল। বলল, 'চিতের কাছে নিয়ে যেয়ে মড়ার দরাচুড়া খোল। আমি সাজিয়ে ফেলছি।'

চারটি চিতা, পাঁচিল ঘেরা। চিতার ঘেরাও থেকে জমি ঢালুতে নেমে গঙ্গায় গিয়েছে। ওরা একটা চিতার সামনে মড়াটা নামাল। ত্যাবড়া বলল, 'এখন দরাচুড়া খোলার দরকার নেই। আগে কাঠ কেলাক।'

জগা বলল, 'তা হলে গলাটা একটু ভিজিয়ে নিই। টাড় লাগছে।'

সোতে মনাও সায় দিল। জগা বলল, 'যমুনা, তুই মড়ার কাছে থাক, আমরা ঢালুতে নেমে যাচ্ছি।'

যমুনা বলে উঠল, 'না না, আমি একলা মড়া আগলাতে পারব না।'

জগা হঠাৎ ধমকে উঠল, 'পারবি। আমরা তো পাঁচ হাত দূরেই থাকছি। ন্যাকামো হচ্ছে।'

যমুনার ভুরু কুঁচকে উঠল। হঠাৎ ওর শরীরটা বেঁকে যেন ধারালো হয়ে উঠল। বলল, 'বড় যে মেজাজ দেখাচ্ছ?'

জগা হাত তুলে, খেঁকিয়ে উঠল, 'এক থাপ্পড় মারব বেশি কথা বললে, খালি কচর কচর।'

জগার ব্যবহারে সবাই অবাক হল। যমুনাও। কিন্তু যমুনার চোখ ধক ধক করে উঠল। ও কিছু বলবার আগেই ত্যাবড়া বলে উঠল, 'সালা মাগ-ভাতারি ঝগড়া।'

জগা তেমনি গর্জে বলল, 'মুখ সামলে কথা বলবি ত্যাবড়া।'

ত্যাবড়াও একইভাবে বলল, 'এক ঝাপড়ে দাঁত তুলে নেব।'

দুজনেই মারমুখী হয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল। বাকীরা ওদের ঘিরে। মনা বলল, 'আ রে, আপসে লড়ছে দেখ। কী হল রে জগা?'

জগা চেঁচিয়ে বলল, 'ত্যাবড়া কেন সব সময়ে লিডারি মারবে? তখন দেখতুম, গঙ্গার ধারে বোমবাজী হলে, মড়া গঙ্গায় না ফেলে কী উপায় ছিল? তা সালা আমাকে শোনালে, আমি মদ খেয়ে মাগীবাজী করতে যাব। আর এই মাগী—।'

যমুনার দিকে তাকাল ও, 'বলে কী না, আমার মনে অধম্মো। শালী আমার ধম্মের বজ্জা গাই।'

বলেই ও গঙ্গার ধারে নেমে গেল। বাকীরা সব মুখ চাওয়াচাওয়ি করল, যমুনা ছাড়া। যমুনা ঠোঁট বাঁকিয়ে জ্বলন্ত চোখে জগাকে দেখছিল। সোতে হেসে বলল, 'সেই থেকে সালা মনে মনে ফুঁসছে। ত্যাবড়া তুইও খচ্চর আছিস। খালি খোঁচা দিয়ে কথা বলিস কেন?'

যমুনা বলল, 'না না, তোমাদের ওপর চটেনি, আমার ওপর গরম হয়েছে। অই যে, ত্যাওড়ালাকে সাপোর্ট দিয়ে, অধম্মো বলেছি।'

বলেই, ও গঙ্গার ধারের দিকে চেয়ে, কোমরে একটা ঝটকা দোলা দিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'ইস্টিশনে ভিক্ষে করে খাই, যমুনা কারোর তোয়াক্কা করে না।'

সোতে বলল, 'দে লে, তুই আর শুরু করিস না।'

এই সময়ে চণ্ডী কাঠের বোঝা এনে চিতার পাশে ফেলল। জিজ্ঞেস করল, 'কী হল?'

ত্যাবড়া বলল, 'কিছু না। চণ্ডী তো এখন কাঠ সাজাবে, যমুনাকে একলা থাকতে হবে না।'

চণ্ডী বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি আছি, তোমরা চালাও গে।'

ওরা সবাই নেমে গেল। গঙ্গার ধারে ছাইয়ে ভরতি। ছাইগাদার পরে, পলি পড়া ভিজে পাড়। ছাইয়ের ওপরেই ওরা চেপে বসল। বাতাসে ছাই উড়ল। চুপচাপ সবাই, খোলা বোতলটা হাতে হাতে নিয়ে শেষ করে দিল। তারপরে চানাচুর চিবোতে লাগল।

পাঁনিয়া হঠাৎ বলল, 'আমি চিতা সাজানো দেখিগে।'

মনা বলল, 'হ্যাঁ, পোড় গে সালা।'

পুনিয়া চলে গেল। সোতে বলল, 'মনার কাছ থেকে নড়াতে চাইছে না।'

ভাবড়া হাসল। আর একটা নতুন বোতল বের করে ছিপি খুলে গলায় ঢালল। একে একে সবাই ঢালল। ভাবড়ার গোঙানো স্বর শোনা গেল, 'লোকটার মুখটা আমার মনে পড়ছে।'

মনা বলল, 'আমার মাংস দিয়ে ভাত খেতে ইচ্ছা করছে।'

সোতে বলল, 'ধু—। দে মাল খাই। আমার বাবা এই ভাল।'

জগা হেসে বলল, 'হ্যাঁ, দিদিমণি তো আর কোনদিন জুটবে না, খালি বয়েই বেড়াতে হবে।'

সোতে বলল, 'দিদিমণি জুটে আমার দরকার নেই। মেয়েমানুষ সব এক, কোন সুখ নেই।'

জগা বলল, 'সুখ নেই?'

'না। আমার সালা, কেন কিছুতে সুখ নেই, আমি বুঝতে পারি না মাইরি।'

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। কেবল মনার চানাচুর চিবোবার মচ্ মচ্ শব্দ শোনা গেল।
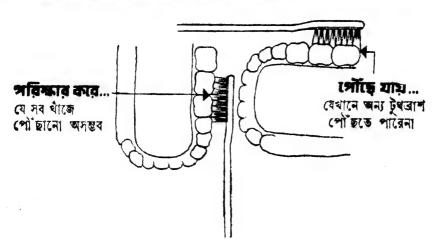
জগা বলল, 'মাল খেলে আমারও এরকম মনে হয়।'

সোতে বলল, 'তুই তো যমুনাকে নিয়ে বেশ আছিস।'

'যমুনা কি আমার একলার?'

'একলা হলে খুশি হতিস?'

জগা জবাব দিল না। মনা বলল, 'রিকশাওয়ালার আবার খুশি। খেটে খেয়ে মরে যাব, ফিনিস্।'

ত্যাবড়ার গোঙানো স্বর আবার শোনা গেল, 'এই দ্যাখ্, আমি মরলে তোরা ফিস্টি করবি তো?'

সবাই ওর দিকে ফিরে তাকাল। ত্যাবড়া আবার বলল, 'আমি নিশ্চয়ই ইস্টিশনেই মরব।'

জগা বলল, 'আমরা সবাই ইস্টিশনে মরব। আমাদের কার ঘর আছে?'

ত্যাবড়া বলল, কিন্তু দেখিস, আমাদের মড়া নিয়ে যেন গণেশ ফটকেরা না যায়।'

মনা বলে উঠল, 'তা হলে সালাদের কাঁচা খেয়ে ফেলব।'

এই সময়ে চণ্ডীর গলা শোনা গেল, 'কই গো, এস সব, চাপাতে হবে।'

বোতলের ঝোলা রেখেই ওরা সবাই উঠে গেল। ত্যাবড়া নিজের হাতে মড়ার গায়ের কাপড় খুলতে গিয়ে দেখল নতুন কাপড়ের টুকরো দুটো নেই। জিজ্ঞেস করল, 'নতুন কাপড় কোথায় গেল?'

চণ্ডী বগ্‌বগ্ করে হাসল। যমুনা বলল, 'এক টুকরো এ নিয়েছে। আর এক টুকরো ওই সাধু নিয়েছে।'

সবাই তাকিয়ে দেখল, গেরুয়া জামা গায়ে, চুল দাড়িওয়ালা সাধু একটু দূরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘাড় নেড়ে হেসে বলল, 'এমন একটা লোক মরল, সবায়েরই তো কিছু পাওয়া চাই।'

চণ্ডী সায় দিয়ে বলল, 'সত্যি কথা। নাও, বাকী জামা কাপড়গুলো খুলে দাও। ঘি এনেছ?'

ত্যাবড়া বলল, 'কী হবে?'

'মড়ার গায়ে মাখাতে হয়।'

'ওসব ছাড়।'

'নিদেন একটু দালদা আনলেও পারতে। যাক গে, আন নি যখন...।'

ত্যাবড়া মরা মানুষটির গা থেকে জামা কাপড় খুলতে খুলতে বলল, 'সব খুলে নেব?'

'না, কোমরের কানিটুক রাখ, বাকী খুলে দাও।'

তা-ই করা হল। তারপরে চারজনে ধরে চিতার কাঠের ওপরে মড়া শুইয়ে দিল। হাত দুটো গুটিয়ে দিতে গিয়ে দেখা গেল, ভীষণ শক্ত হয়ে গিয়েছে। শরীরের একটা জায়গাও বাঁকাবার উপায় নেই। চণ্ডী বলল, 'ছেড়ে দাও, এমনি থাকুক।'

সে মড়ার ওপরে কাঠ সাজিয়ে দিতে লাগল। ওরা সবাই ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল। ত্যাবড়া মড়ার মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'দেখো বাবা, কোন দোষ নিও না। এই চেয়েছিলে তো?'

বুড়ো সাধুটা ঘড়ঘড়ে স্বরে বলল, 'আর আবার কী চাইবে। মরার পরে চিতায় উঠে পুড়তে যাচ্ছে, মানুষের আর কী চাইবার আছে।'

কথাটা সবাই শুনল, কেউ ফিরে তাকাল না। কাঠ সাজাবার পরে চণ্ডী নিজের হাতে কয়েকটা প্যাকাটি জ্বালিয়ে বলল, 'নাও, কে মুখে আগুন দেবে, দাও।'

ত্যাবড়া বলল, 'আমিই দেব।'

জগা বলল, 'তোর না বাপ বেঁচে আছে, তুই মুখে আগুন দিবি কি?'

ত্যাবড়া বলল 'এ বাপ বাপের থেকে বেশি।'

জগা বলল, 'তবে আমিও দেব।'

সোতে মনা পুনিয়া, সবাই বলল দেবে। সবাই একসঙ্গে বুড়ো মানুষটার মুখে আগুন ঠেকিয়ে দিল। যমুনা পলকহীন চোখে দেখছিল। চণ্ডী হেসে বলল, 'মন্দ না, নতুন এক রকম হল।'

সে চিতায় আগুন ধরিয়ে দিল। বাতাস থাকায়, একটু পরেই ভালভাবে আগুন জ্বলে উঠল। সোতে বলল, 'যাই, ছাইগাদায় বসি গে।'

জগা যমুনার দিকে ফিরে ডাকল, 'আয়, ওখানে যেয়ে বসি।'

যমুনা আগুনের দিকে চোখ রেখে বলল, 'যাও, যাচ্ছি।'

ওরা সবাই গিয়ে আবার ছাইগাদায় বসল। যমুনাও আস্তে আস্তে এসে বসল। চণ্ডীও এল। বগ্‌বগ্ করে হেসে,

স্যাবড়ার পাশ ঘেঁষে বসল। বোতল হাতে হাতে ঘুরতে লাগল, গলায় ঢালা চলল। চণ্ডীও হাতে বোতল তুলে নিয়ে বলল, 'মাগীটা ঘুমোচ্ছে।'

অর্থাৎ তার বউ। না ঘুমোলে, মদ খেতে পারত। সোতে বলল, 'যমুনা একটু খা না।'

যমুনা বলল, 'না, ভাল লাগছে না।'

যমুনার একদিকে জগা আর একদিকে পুনিয়া। হাঁটুর কাছে সোতে, একটা পা ঢুকিয়ে দিয়েছে যমুনার ঠ্যাঙের তলায়। পুনিয়া বলল, 'তোর কোলে একটু মাথা রাখতে দিবি যমুনা?'

যমুনা বলল, 'রাখ, তোমার মরণ ধরেছে জানি।'

চণ্ডী খগ্‌খগ্ করে হাসল, বলল, 'সেই কথা, মরণ না ধরলে চলবে কেন?'

পুনিয়া যমুনার কোলে মাথা রাখল। যমুনা পুনিয়ার মাথার চুলে হাত দিল। সোতে একবার যমুনার ঘাড়ে আস্তে টিপে দিয়ে, পুনিয়াকে চোখের ইশারায় দেখাল। মনা এগিয়ে এসে যমুনার পিঠে আস্তে হেলান দিয়ে বসল।

নতুন বোতল খোলা হল। এমন সময়,

সেই দাড়িওয়ালা বুড়ো এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল, 'কী, কারণ পান হচ্ছে? এ তো বড় ভাল জিনিস।'

তাবড়া বলল, 'চলবে?'

বুড়ো বলল 'তা আর না চলবে কেন। অমন মানুষের মড়া। লোকটা পুনিয়ামন্ত ছিল।'

সে কাছে এসে বসল। তাবড়া বলল, 'কিন্তু খাবে কিসে বাবা? আমাদের পাত্তর টাত্তর নেই, বোতল থেকে চুমুক মারতে হবে।'

বুড়ো হে হে করে হেসে বলল, 'এখানে আবার এ'টোকাটা কী আছে। বোতল ধরেই খাব।'

বুড়ো গাঁজার কলকেটিও এনেছে। সেটা বাঁ হাতে নিয়ে, ডান হাতে বোতল ধরে চুমুক দিল। দাড়ি বেয়ে কয়েক ফোঁটা পড়ল। তারপরে কলকের ভিতরে আঙুল টিপতে লাগল। এখন সকলেই চুপচাপ। কেউ কারোর দিকে তাকিয়ে নেই। সকলেরই চেহারাগুলো যেন কেমন বদলে গিয়েছে। সেই দুপুরের মানুষগুলোকে আর চেনা যায় না। পুনিয়ার একটা হাত মায়ের কোলে শিশুর মত, যমুনার বুকের কাছে নড়ছে। যমুনা নির্বিকার, গঙ্গার দিকে তাকিয়ে আছে। বাতাস বইছে। কয়েকটা কুকুর ওদের আশেপাশে এসে শুয়ে আছে।

তাবড়া হঠাৎ বলে উঠল, 'মানুষ যে কী, তা বুঝলাম না।'

কেন কথাটা বলল, বোঝা গেল না। কেবল সোতে সায় দিতে গিয়ে, শুধু উচ্চারণ করল, 'হাঁ সালা মানুষ—।'

দাড়িওয়ালা সাধু বুড়ো, গাঁজার কলকে টিপতে টিপতে, ঘাড় নেড়ে হাসল। তারপরে কেশো ঘড়ঘড়ে গলায় সুর করে গাইল,

'মানুষ মানুষে করলি—মানুষ
রতন চিনলি না।'

তারপরে বলল, 'মান চাই, হুঁস চাই, মানে হুঁশে মানুষ।'

তার এসব কথার কেউ কোন জবাব দিল না।

আবার নতুন বোতল খোলা হল। তার থেকে দু ঢোক খেয়ে, চণ্ডী উঠে বলল, 'যাই, একটু খুঁচিয়ে দিয়ে আসি।'

তাবড়া বলল, 'চল, আমিও যাই।'

সবাই উঠল। সবাই গেল। মড়া পুড়ছে, মুখটা পুড়ছে, আর ঠোঁট পুড়ে গিয়ে, দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ছে। মাথার চুল পুড়ে, চামড়া উঠে, শাদা খুলি দেখা যাচ্ছে।

তাবড়া বলল, 'আমার মনে হচ্ছে, হাসছে।'

চণ্ডী বলল, 'হাঁ, এখনই তো যত রঙ্গ।'

বলে বগ্‌বগ্ করে হাসল। মনা বলল, 'ধু— ছাইগাদাতে যেয়ে বাঁস।'

সোতেও সায় দিল। সবাই সায় দিল। আবার সবাই ছাইগাদায় গেল। বুড়ো সাধুও গেল। গিয়ে কলকেয় আগুন দিল।

জগা বলল, 'সব হল, কিন্তু মানুষটার জন্য কাঁদা হল না।'

সোতে হেসে বলল, 'ঠিক বলেছিস। এর আগেরবার বেগা শালা কী রকম কেঁদেছিল, মড়াটার জন্য?'

মনা বলল, 'যমুনা তুই মেয়েমানুষ, তুই কাঁদ।'

যমুনা ঝংকার দিল, 'আমার বয়ে গেছে।'

সোতেও বলল, 'কাঁদ না যমুনা, তুই একটু কাঁদ।'

যমুনা গায়ে মোচড় দিয়ে বলল, 'ভাগ্, কাঁদবে না হাতি।'

সবাই এক সঙ্গে বলে উঠল, 'কাঁদ না যমুনা, কাঁদ কাঁদ, তুই কাঁদ।'

ওরা যেন যমুনাকে সবাই পাগল পেল। যমুনা হাসতে লাগল। কিন্তু ওরা যেন কেমন ক্ষেপে উঠতে লাগল, জেদ করতে লাগল, 'কাঁদ না, কাঁদ যমুনা, তুই কাঁদ।'

ওরা যমুনাকে ধাক্কা মারতে লাগল, আর ওদের কেমন ক্ষ্যাপা দেখাতে লাগল। যমুনা ছিটকে উঠে দাঁড়াল, চেঁচিয়ে উঠল, 'না না না।'

বলে ও গঙ্গাধারের দিকে চলে গেল। খানিকটা গিয়ে হঠাৎ দাঁড়াল, তারপরেই হঠাৎ সবাই শুনতে পেল, যমুনা হা হা করে কাঁদছে, আর বলছে, 'ও গো বাবা গো, বাবা গো...বাবা, আমার বাবা—বাবা, সেই রাস্তার ধারে তুমি মরে পড়ে রইলে গো, বাবা গো! তোমার টেঁপিকে দেখলে না—আঁ আঁ আঁ......।'

ওরা সবাই শুনল, আর সকলেরই যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু ওরা নিজেদের দিকে কেউ তাকাল না। তারপরেই হঠাৎ তাবড়া ফুঁপিয়ে উঠল। মুহূর্তের ওরা এ ওর দিকে একবার তাকাল, এবং সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নিল। যেন ওরা কেউ কারোকে আর চিনতে পারছে না। তারপরে পুনিয়াও তেমনি হঠাৎ ছেলেমানুষের মত কেঁদে উঠল।

মনা বলল, 'ধ্যাত্, ভাল লাগে না। খাটব খাব......।'

ওর কথা শেষ হল না, গলার কাছে শব্দটা আটকে গেল, যেন স্বরটা ভেঙে গেল। সোতে দাঁতে দাঁত টিপে, চোখের জল মুছতে লাগল। ওর নিচু চাপা স্বর শোনা গেল, 'সুখ নেই সালা—।'

যেন পাথর সরে গেল, বানের জল ভাসল কলকলিয়ে।

চণ্ডী বোতল তুলে চুমুক দিল। যমুনা তখনো কাঁদছে। চণ্ডী বলল, 'কাঁদ, সবাই কাঁদ। কাঁদলে জ্বালা জুড়োয়। যাই, আবার একটুক খুঁচিয়ে দিয়ে আসি।'

চণ্ডী চিতার দিকে এগিয়ে গেল।

সমাপ্ত

অ্যান ফ্রেঞ্চ ডীপ ক্লেনজিং মিল্ক দিয়ে
আপনার রূপের আড়াল সরিয়ে দিন
এই পরীক্ষা প্রমাণ করে ঃ
ক্লেনজিং মিল্ক যত তরল হয় তত ভেতর পর্যন্ত পরিষ্কার করতে পারে
Anne French
DEEP CLEANSING MILK

শ্রীচরণেষু — মাকে ॥ সাত ॥

[ক]

চেনা সিঁড়ি, চেনা ঘর, কিন্তু কী দেখলাম সেদিন? তখনকার ভাষা দিয়ে তা ফোটানো কঠিন, যা বুঝেছিলেম তখনকার বোধ দিয়ে তা বোঝানো সে তো আরও অসম্ভব। কিন্তু একটা কিছু বুঝে ছিলাম। সেদিন ফিরে এসে তোমাকে বলিনি, বলিনি বোধ হয় কোনোদিনই।

সুধীরমামা শুয়ে নেই, বসে আছেন একটা হেলানো চেয়ারে, একটু দূর থেকেই দেখতে পেয়েছিলাম, আর বুক থেকে একটা ভার নেমে গিয়েছিল। কারণ সারা রাস্তা যদিও তাড়াতাড়ি পা চালিয়েই এসেছি তবু অনেকদিন পরে তো, একটু বাধো-বাধোও লাগছিল। কী দেখব গিয়ে, ওঁর আবার অসুখ? শুয়ে আছেন, এক হাতে মাথা টিপে? ওঁর মাথার কাছে কেউ জল রেখে যায়নি? কিংবা, হে ভগবান, যদি ভালো থাকেন, কী বলবেন আমাকে দেখে, খুশিতে মুখ ভেসে যাবে? হাত বাড়িয়ে বলবেন, "আয় এত দিন আসিসনি যে" আমি তখন যা বলব তা-ও মনে মনে ঠিক, বলব যে "আপনিও তো যাননি," তার পরে? কাছে টেনে নিয়ে যদি ঘ্রাণ নিতে শুরু করেন, তা হলে কিন্তু কেমন করবে যেন, আমার ওতে সুড়সুড়ি লাগে, যদি পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করেন—ভাবতে ভাবতেই আমি সেখানে।

হেলানো চেয়ারে সুধীরমামা, পায়ের শব্দ পেয়ে ঘাড় ফেরালেন, আলগা একবার হাসলেন শুধু, কিন্তু বললেন না তো "আয়?" আমি পাপোষে পা ঘষছি, না একেবারেও একটু একটু এগোচ্ছি, কারণ নেই, তবু একটু অচেনা লাগছে, সুধীরমামা, সুধীরমামাই তো? ফিনফিনে একটা লুঙ্গি, গায়ে জালিকাটা গেঞ্জি আগে কখনও ওঁর এই বেশ দেখিনি। হাতে একটা আয়না, আর-একটা ছোট্ট কাঁচি দেখলাম সুধীরমামা এ কয় দিনে একটু গোঁফও রেখেছেন, সেটাই কি ছাঁটছেন যত্ন করে? ওঁর পাতলা চুল, তবু ঢেউ, নিজের ঘরে সর্বদা বইয়ে যে মুখ ডুবিয়ে থাকত, সেই মানুষটি কোথায় গেল? একটু [illegible] গন্ধ পাচ্ছি। একবার ভাবলাম তা নয়, আসলে সুধীরমামা তেমন হাসছেন না, বিশেষ কথা বলছেন না, সেই জন্যেই হয়তো ঠেকছে আলাদা-রকম, নতুন-নতুন, আমি আরও উদাস, এলোমেলো চুল, আরও রোগা হয়ে যাওয়া সুধীরমামাকে দেখতে চেয়েছিলাম। পাশে অবশ্যই রাখা ছিল একটা বই, বাঁধানো, মোটা, কিন্তু আমি কাছাকাছি যেতেই তিনি চমকে উঠে সেটাকে চাপা দিলেন কেন, কী আছে ওই বইয়ে, জানবার জন্যে আমি মরে যেতে থাকলাম।

আর-একটু অবাক হতে বাকী ছিল, ওদিকে ঘুরে গিয়ে যখন দেখি, সুধীরমামার বাঁ-দিকের চুলগুলো, কানের পাশে যা কাঁচা পাকা ছিল, এখন একদম কালো। আর, চুল বেশ ছাঁটা, ঘাড় কামানো। সব বিশ্রী, সব অন্য রকম। উনি নিশ্চয় চুল ছাঁটিয়েছেন, বাবুইপাখিরা উড়ে গেছে, আগে তো তুমি কতদিন হেসে বলেছ তাদের বাসা ছিল ওই মাথায় ('ওরা খুঁটে খুঁটে কী খায়, সুধীরদা, তোমার ঘিলু? মাথা তো বিদ্যে-বুদ্ধিতে ঠাসা একেবারে'), তাই কি আলাদা? পাকা চুলগুলো কালো হল কী করে, একটা শিশি দেখতে পাচ্ছি, তার পাশেই একটা তুলি, তুলিটার মুখে কালো রঙ মাখা। কাঁচা চুলের রহস্য ওরই মধ্যে আছে কিনা জানব বলে যেই ঝুঁকে পড়েছি, সুধীরমামা অমনই সেটাকে তাড়াতাড়ি তুলে নিলেন। তাড়াতাড়ি, আজ ওঁর সবতাতেই তাড়াতাড়ি, খালি পিছন-ফেরা, খালি লুকোনো, নিজেকেও। পিছন ফিরে আমিও একটা চিরুনি আমার চুলে বসিয়ে জোরে জোরে টানছি, মাথা বেশি আঁচড়ালে উনি বকতেন, সেদিন বেশ বুঝতেই পেরেছিলাম—বকবেন না, তাই জোরে জোরে চিরুনি চালাচ্ছি। লাগছিল। বকলেন না বলে ব্যথা পাচ্ছিলাম।

তাক-রাখা বইগুলোর পাশে একটা কৌটো, পাউডারের, একটা লাল রঙের তেলের শিশি। না-চেনা গন্ধ, চেনা শুধু বিস্কুটের সেই টিনটাই, খুলে নিয়ে পুরলাম, ফড়মড় শব্দ হল, উনি ফিরে তাকালেন, কিছু বললেন না। বলেছেন কি, "খাচ্ছিস, আর-একটা খা?" তা-ও না।

বলছেন না, কিছু বলছেন না, অথচ এমনিতে বেশ স্বাভাবিক, কেমন আছি, কেমন ছিলাম, কে কেমন, কিচ্ছু না, যেন রোজই আসি আজও এসেছি, মাঝখানে কিছু নেই কিছু হয়নি, বাইরে একটু শব্দ হলেই কিন্তু চমকে উঠছেন, একবার তো ভিতরের বারান্দায় বেরিয়ে উঁকি দিয়েও এলেন, কিছু বলছেন না, তার মানে উনি কি আর কারও অপেক্ষা করছেন, কে আসবে, আসতে পারে কে, ওঁর তো তেমন কেউ বন্ধু নেই, কিছু বলছেন না, খাটে ছড়ানো তাস, ওগুলো কার, সেই তুলি আর শিশিটা লুকিয়ে ফেলেছেন এখন কোথায়, ওটায় কী আছে আমি দেখব

বলছেন না একেবারে কিছু না, আমি আর-একটা বিসকুট খাব, আমি—আমি চলে যাব।

দাদাই যে আসছে, সুধীরমামাকে বলা হল না।

[খ]

আমি তোমাকে বলিনি, বলতে চাইনি, কেন না বলার মতো কিছু তো ছিলও না। তবু, মা, ধরা পড়ে গেলাম, কী-করে তার কোনও বিশ্বাস্য ব্যাখ্যা আজও দিতে পারব না। মুখের কথা ছাড়াও আমাদের দুজনের মধ্যে কি একটা সাংকেতিক, কুট-গূঢ় কোনও ভাব-চালাচালির আলাদা ভাষা ছিল, চোখে-চোখেও হত বলাবলি? লুকোনো যেত না কিছুই, লুকোনো থাকত না, যেমন আমার মুখ দেখেই তুমি বলে দিতে পারতে কী হয়েছে সেদিন ইস্কুলে, বকুনি খেলাম কি খাইনি, এমন-কী একদিন তো বাইরে মশলা-সুপুরি খেয়ে এসেও তোমার নজর এড়াতে পারলাম না। অনেক দিন পর্যন্ত, আমার অনেক বয়স পর্যন্ত এই অলৌকিক শক্তি ছিল তোমার, যেন মন্ত্রবল, আজ আমি যেমন যে-কোনও শক্ত বই অন্তত পড়ে ফেলতে পারি, তখন ছেলের মুখ দেখামাত্র পড়ে ফেলা অসাধ্য ছিল না তোমার। মনে মনে গর্ব অনুভব করতাম গর্বের সঙ্গে ভয়ও ছিল যেন একটু—আমার মা জাদু জানে; এমন-কী কবে কোন্ মাঠ থেকে ঘুরে এসেছি, ঠিকঠিক বলে দিতে পারে পায়ের ধুলো থেকে।' পাঠোদ্ধার করার সেই ক্ষমতা তোমার কবে লুপ্ত হয়ে গেল, তোমার বেশি- বয়স কেড়ে নিল তা কি, নাকি সেটা কেড়ে নিয়েছিল আমারই বয়স, বড় হয়ে নিজেই চালাকি করে আস্তে আস্তে নতুন, তোমার অজানা, এক লিপিতে লিখে নিলাম আমার চোখের চাউনি আর মুখের রেখাগুলিকে, যখন উপরের ঠোঁট অল্প-অল্প গোঁফ, থুতনিতে দু'এক গাছি সদ্য-দাড়ি, চোখ বসা, চোয়াল শক্ত আর উঁচু, আর গাল-ভরতি দগদগে ব্রণ। প্রথম দিকে নতুন পাঠ তৈরী হবার সূত্রপাতে, নিজেই কিন্তু ভয় পেয়েছিলাম, যেদিন গলার স্বর হঠাৎ কেমন ভাঙা কিন্তু ভরা-ভরা অন্যরকম হয়ে গেল। ওটাও যেন একটা অপরাধ, আমারই অপরাধ, ভেবে-ছিলাম, আদা-নুন গরম জল দিয়ে-গলা-খাকারি দিলে বুঝি সারবে। দূরে, কিছু হল না, তুমি বললে, ওতে কিন্তু ভয় নেই, বড় হলে সকলেরই হয়। বড় হওয়ার প্রথম দাম বুঝি কণ্ঠস্বর, যা নিয়ে জন্মেছি তার অনেক কিছুই যেমন একে একে খোয়া যায়, ক্রমশ থাকে না, যেমন গোড়াকার দাঁত, তেমনই স্বর, আকৃতির সঙ্গে প্রকৃতি, প্রকৃতির সঙ্গে নানা বিশ্বাস, ভরসা, ভাল-বাসা ইত্যাদি।

যাক এসব কথা আসবে অনেক স্টেশনে অনেক ভাটা খেলে যাওয়ার পরে, সেদিন কিন্তু তুমি ধরে ফেলেছিলে।

"কী বলল রে?"

"কে?"

"তোর সুধীরমামা।"

"কিছু না।"

"কথাই বলল না?"

একেবারে কিছু না বললে তো কথা ছিল না, কিন্তু সুধীরমামা কথা বলেছিলও যে, ওই তো গোলমাল, কিন্তু কথার মত কথা কিছু না, যেমন এক দিন আসিনি কেন, উনিই-বা কেন আসেননি, আগের মত করে একটা কথাও যদি বলতেন, আগের মত একটা কিছুও যদি দেখতে পেতাম, তবে সেদিন আমার ভিতরে ভিতরে বিনা ভাষায় যে-সব জিনিস উথলে উঠছিল, তার কিছুই দেখা যেত না। নিজেই যা বুঝিনি, তা কী করে বোঝাব।

তুমি কিন্তু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব বের করে নিচ্ছিলে।

"কিছু খেয়ে এসেছিস ওখানে?"

বললাম, "বিসকুট।" মুখের কোণে গুঁড়ো লেগেও ছিল।

"নিজে খেয়েছিস?"

উত্তর দিলাম না। তুমি তখন ছুঁচ-

সুতো কাঁথার কাপড় সরিয়ে রাখলে।—"কী করছিল?"

"কী আবার করবেন। বই পড়ছিলেন।"

সুধীরমামার ব্যাপারে চেনা ওই একটা ব্যাপার শুনে তুমি যেন একটু হাঁপ ছেড়ে সহজ হয়ে বসলে।—"ওই তো স্বভাব ওর। বইয়ের পোকা। তোকে কিছু পড়ে শোনাল? মানে বুঝিয়ে দিল?"

"না তো।"

একটু অবাক, বাজারের হিসেব না মিললে তুমি যেমন উশখুশ কর, তুমি নড়াচড়া করলে। ছুঁচটা ফের তুলে নিয়ে বললে "বোধ হয় খুব শক্ত বই, তোকে শোনাবার মতো না।"

মা, তোমাকে সেদিন বলিনি বইটার ব্যাপারে পুরো ব্যাপারটা। সুধীরমামা একটুখানির জন্যে বাইরে গিয়েছিলেন তো, ঠিক তক্ষুনি যে ঝুঁকে পড়ে পাতা উলটে ফেলেছিলাম বইটার। শক্ত কিনা জানি না, কিন্তু ওই ছবি, ছবির পর ছবি! মা, তখন আমি চান করার সময়েও যে গামছা পরে নিই, তুমি হঠাৎ সেখানে কিছু ধরতে এসে পড়েছ কি অমনই চলে গেছি কুয়োর আড়ালে, হাত নেড়ে নেড়ে অস্থির বলছি "চলে যাও সরে যাও তুমি", কিংবা পুকুরঘাটে তোমাকে দেখে, মা, তোমাকে দেখেও, তাড়াতাড়ি চোখ ঘুরিয়ে নিচ্ছি ভিতরে ভিতরে তখনই কী-একটা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে এই সব ঘটছে, ওই ছবি, ছবির পর ছবি, অবাক কী যে, আমার চোখের পাতা পুড়িয়ে ক্রিভসুদ্ধ শুকনো করে দেবে! তোমার পেটের চেনা আড়াআড়ি দাগগুলো পর্যন্ত তখন চোখ মেলে দেখতে পারি না, আর না-চেনা ওই সব লাজলজ্জাহীন চেহারা আর ভঙ্গি, সহজাত যে ভাষাহীন, ব্যাখ্যাহীন, বোধশক্তি অবোলা প্রাণীরও থাকে, আমিও সেই বয়সে তো প্রাণীই, তবু টের পেয়েছি ওই ভঙ্গিগুলো বিশ্রী, ওদের চাউনি অন্তত তোমার মতো নয় কখনও, কানে হাত দিয়ে দেখি গরম গরম, কী ঘন থুথু, ছিঃ। আমার জ্বর হল নাকি! ভাগ্যিস সেকেন্ড কয়েকই মোটে, সুধীরমামা ফিরে এসেছিলেন, তার আগেই আমি মুড়ে ফেলেছি বইটা, অবিকল যেমন ছিল তেমনই, অবিকল ছিলাম না একমাত্র আমি।

সুধীরমামা তবে একা-একা এই বই পড়েন পড়েন তো না দেখেন, দেখেন মানে আগে দেখতেন না, দেখছেন; এই বইটা আগে কখনও দেখিনি।

সেদিন তুমি যদি অত কথার পর কথার জোড় না দিয়ে শুধু হাত বাড়িয়ে একবারটি আমার কপাল ছুঁতে, দেখতে তখনও ছাক-ছাক, ঘোলাটে জ্বর-জ্বর ভাব, তা-ছাড়া ওই চুলের রঙ ফেরানোর শিশি, তুলিটার মুখে কালি, কালি সুধীরমামার সারা মুখে, তাকে ছড়ানো পাউডার, গন্ধ তেল, মা, আমার গা কেমন-কেমন করছিল, বমি, বমি করব নাকি আমি, ঠেকিয়ে রাখতে কষ্ট হচ্ছিল।

তোমাকে বলতে পারিনি। কারণ, ওই যে বলেছি, টনটনে অবোধ একটা বোধ, বলে দিচ্ছিল, তোমাকে কেন জানি না, ও-সব বলা যায় না, উচিত হবে না, তুমি কষ্ট পাবে, কষ্টটাকে আমি একাই বরং মেখে থাকি। কোনও ছেলে কোনও বয়সে আমাদের কালে মুখে ও-সব কথা বলতে পারে না তো, এমন-কী বলা যায় না বড় হয়েও, অথচ পটপট করে তোমাকে যে খোলাখুলি লিখে দেওয়া গেল, সেই জিনিসটার কথা, যেটা শক্ত, শুকনো, শির-শিরে, যার নাম পরে জেনেছি যৌনবোধ, সজ্ঞানে আমার প্রথম যৌন বোধ, তার কারণ, লিখে দেওয়া সহজ, পাকা হয়ে আমরা কম বয়সের বন্ধুরা, অনেক খারাপ কথা যেমন প্রকাশ্যেই বলাবলি করেছি সাটে, কিংবা মজা করে বানান করে করে, অথবা অশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দে বা ইংরাজীতে। এই লেখা তুমি পড়লেও শরীর দিয়ে পড়ছ না, আজ আমার সেটাও একটা সুবিধে।

(স্তব, স্তব করা তোমার বন্ধ থাকেনি, বোনা আসনটি পেতে বসা ছিল নিত্য। আমি মানে বুঝতাম না, শরীর যখন খারাপ, তখনও কেন রোজ ভোর বেলাতেই স্নান করে ঠান্ডা লাগানো, তা-ছাড়া দাদা যাবার পরেই তো এর আরম্ভ, সেই দাদাই যখন ফিরে আসছে, তখন আর এ-সব কেন। অথবা, আমার পরের বয়সের একটা কঠিন সন্দেহের কথা বলি, তুমি জানতে দাদা সত্যি-সত্যিই তো কিছু আসছে না, খালি আমাকে ছেলে-ভুলিয়েছিলে, তাই দাদার কল্যাণে মন্ত্রপাঠ কাঁথা বোনার পাশা-পাশি চলেছিল। এ-সব, বলেছি তো, পর-বর্তী সময়ের হিসাবী গদ্য, তখন অবশ্য সবই ভাবে-বিশ্বাসে টলটল পদ্য)।

[গ]

আমি বললাম না, কিন্তু কানায় কানায় চাপাই কি কিছু রইল! আমি না-হয় নির্বোধ সহানুভূতিতে ঠিক করেছিলাম, কষ্টটা কোনও ভাগ না দিয়ে একাই সহ্য করব, একা কষ্ট পাওয়া, কিংবা কষ্টে একা হয়ে যাওয়ার অভ্যাসটা তখন থেকেই শিকড় গাঁথছিল, অনেক বেদনা আছে যা কাউকে বলা যায় না, বললেও লাভ হয় না কোনও। তাই বিচার করে দেখেছি, আমার চরিত্রের একটা দিক মেলে-দেওয়া, বহির্মুখী, উচ্ছল, চপল, আর-একটা দিক গুটিয়ে-নেওয়া, অন্তর্মুখী, যেমন আয়না—একটা দিকে ঝকঝকে কাচ কিন্তু পিছন দিকটা পারা দিয়ে লেপা, অবাক। হয়ত অনেকেরই।

আমি সুধীরমামার ওখানে যেতাম, যেতে থাকলাম, কী-একটা অন্ধ টান থেকে থেকেই আমাকে ওখানে ছুটিয়ে নিয়ে যেত। না, ওই ঘরের ভিতরে নয়, বাইরে রাস্তায়, কাছাকাছি কোথাও। দাঁড়াতাম, দেখতাম, যেটুকু-বা দেখা যায়, একটি মানুষ কী-করে আলাদা হয়ে গেল, আমাকে, আমাদের বাড়িটা ছেড়ে, আর কী পেল, অথবা সে কি আলাদাই ছিল, এখন যে-রকম? যে-মানুষটা লুঙ্গি পরে, ওইসব ছবির বই রাখে, ছাঁটা চুল, চুলে টেড়ি, চুলের রঙ ফেরানো, ও কি চৈত্র মাসের সঙ, ও কি বহুরূপী? গুনগুন

যে বন্ধু হতে পারে, সঙ্গী হতে পারে, ছেলেদের যে সেই রকম অন্তত একজন ছেলেও চাই।

ওই যে মানুষটাকে দেখছি, যে সুধীরমামা, কিন্তু সুধীরমামা তো না! এতদিন অন্যরূপে ছিল কোথায় চাপা ছিল এই রূপ, ওকে আর তেমন স্থির স্থিত দুঃখী মনে হয় না তো, বেশ তো ফূর্তিবাজ, তেমন রোগাও আর ঠেকে না, আর অসহায় নয়, দিব্যি শক্ত মজবুত একটি মানুষ। প্রমাণ নেই, তবু ওই ধারণাটা গড়ে তুলছিলাম, আমি তখনই যেন পোটোপাড়ার সেই বুড়ো কুমোর, যে কাদা দিয়ে মূর্তি গড়ে, মনোমত না হলে ভাঙে, আমিও তেমনই একটি মূর্তি ভেঙে একেবারে কাদার তাল করে, আর-একটা তৈরি করে নিচ্ছিলাম, তার মূর্তি, যে আসলে আলাদা, কিন্তু সেটা লুকিয়ে রেখেছিল। সে আমাকে ঠকিয়েছিল, সেই বহুরূপীটা।

কিন্তু বলেছি তো, কিছুই লুকোনো থাকে না তোমার চোখে। তুমি কি গল্পের সেই জাদুকরী, যে হাতের স্ফটিকে নজর রেখে সব বলে দিতে পারে? ঠিক তৃতীয় একটা চোখ দিয়ে তুমি টের পেতে, কোথায় আমি ফাঁক পেলেই ছুটে যাই, গায়ে ঘাম, পায়ে ধুলো, এইমাত্র ছুটে ফিরে আসছি কোথা থেকে।

কিন্তু সেদিন মা, তুমি ছি ছি ছি আমার চুলের মুঠি ধরলে, তোমার না শরীর খারাপ! হাই তুলছ আর গড়াচ্ছ, কুয়োতলায় যখন গিয়ে চোখে দিচ্ছ জলের ঝাপটা, হঠাৎ এত রেগে যাওয়া তোমার উচিত হয়নি। ভাবাই যায় না, আমার গায়ে হাত তুলছ তুমি। অবাক হয়ে চেয়ে ছিলাম, তাই হয়তো মাথাটা সরাতে পারিনি। মুঠি করে ধরেছ, ঝাঁকানি দিচ্ছ বারে বারে, কুল পাড়তে আমরা যেমন ডালে নাড়া দিই, যন্ত্রণায় আমি বোবা, শরীরের যন্ত্রণা তো বটেই, একটা অসম্ভব ঘটনা বলে মনেও। কোলে নিয়ে ঝিনুকে দুধ খাওয়াতে যখন মারতে —মারোনি কি আর—কিংবা না-ঘুমোলে ঘুম থামিয়ে রেগে চড় মারতে—মেরেছ নিশ্চয়ই—সে-সব তো আমার মনে নেই, সে-সব ঘটে থাকে মানুষের চিরতরে জন্মের স্মৃতি তলিয়ে যাওয়া বয়সে, কিন্তু জ্ঞান হয়ে কোনদিন তোমার হাতের আলতো চাপড়ি খেয়েছি বলে মনে পড়ে না। স্টেশন থেকে হঠাৎ ফিরে যে-রাত্রে আসি, সেই রাত্রির কথাটা অবশ্য স্বতন্ত্র। সে-তো মার নয়, জ্বরের অবিশ্বাস্য আহ্লাদে ফুলঝুরি হয়ে ওঠা! (নিজেই যে পড়ে পড়ে মার খায় অন্যের হাতে, সে তো নিয়ত মিশে আছে মাটিতে অথবা উঠে গেছে উপাসনায়, সে আর অন্যকে মারবে কী!)

তাই সেদিন বেজেছিল। চেয়ে ছিলাম। সুধীরমামার মতো তুমিও আলাদা হয়ে গেলে নাকি, যে-মাকে জানি তুমি কি সেই মা নও! সবই কি বদলে যাচ্ছে, সকলে?

—"কেন যাস, কেন যাস ওখানে তুই, সে-কি তোকেও জাদু করেছে?" দাঁত দিয়ে ঠোঁট চাপা, ঠোঁটের কোণে ফেনা, যেন অনেকগুলো মারবেল তোমার মুখে, একটার পর একটা ঠিকরে আমার চোখে মুখে লাগছে।

"যাই না তো, দাঁড়িয়ে থাকি। রাস্তায়।"

"যাস না? দাঁড়িয়ে থাকিস? তা-হলেও তো সে তোকে তুক করেছে।" চুলের মুঠি ছেড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে।

"কে? সুধীরমামা?"

তুমি অপলক তাকিয়ে ছিলে। ক্লান্ত, একটু একটু নেতিয়ে পড়ছ।—"না। সেই—সেই খারাপ মেয়েটা। তুই তাকে নিশ্চয় দেখেছিস?"

বলে উঠলাম, "আমি কাউকে দেখিনি মা।"

কানাঘুষো তোমার কানেও এসেছিল। ক্লাসে এই সব নিয়ে বলাবলি হত, সব কথা তখন আমি বুঝতাম না। আমাদের মধ্যে মাথায় বড় যে-মানিক, সে একদিন কেমন রসিয়ে রসিয়ে বলছিল, শুনছিল ওর ওদের বন্ধুরা, কেউ কেউ আড়চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছিল। একজন আমাকে ঠেলা দিয়ে বলল, "কী রে, তোর সুধীরমামা তোদের বাড়ি আসছেন তো, রোজ? আসছেন না?" বলেছি, "না"। সে বলল, "একদম বন্ধ?" মাথা নাড়লাম। তখন "হি-হি, আসবে কী করে, শামুকে পা কেটেছে যে!" শামুকটা কী, বুঝিনি, বোকার মত আমি ভেবেছিলাম, সুধীরমামার পায়ে, কই, শামুক-টামুকের কোনও দাগ তো দেখিনি!

কানে কানে ফিরে কথাটা তোমার কানেও এসেছিল।—"দেখিসনি, তুই তাকে দেখিসনি?"

"কই না তো", বলে দিলাম এক নিশ্বাসে।

কিন্তু মা, তোমাকে আমি মিথ্যে কথা বলেছিলাম, তাকে আমি দেখেছি।

মুখে মিথ্যে, চোখে তখন এক ঝোপ থেকে আর-এক ঝোপে এক-একটা খরগোস যেমন তরতর ছুটে যায়, তেমনই পর-পর এক-একটা ছবি: সুধীরমামা বের হচ্ছেন, আমি একটা গাছের আড়ালে চট করে চলে গেছি। খিল খোলার পর দু' পা বেরিয়ে এসেই হঠাৎ পিছিয়ে গেল কে, একে তো আমি আগে দেখিনি। যে-বুড়ি ও'র জল তুলে দেয়, উনুনে সাজায়, জল তুলে আনে, তাকে তো আমি চিনি, কালিদাসী। আবছা যাকে দেখা গেল সে অন্য, মার চেয়ে ময়লা

কিন্তু বয়সে মারই মতো বরং একটু ছোট, সবাই এখন বদলাচ্ছে জানি, তবু এতটা ভোল পালটানো বুড়ি কালিদাসীর পক্ষে কি সম্ভব? বোধ হয় না।

"বাজে মেয়ে, খারাপ মেয়ে", উঠোনেই বসে পড়ে মুখ ঢেকে তুমি বলছ, "লোকের কথায় আর কান পাতা যায় না।"

আমি গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আমি কখন রাস্তায় গুটি গুটি এগিয়ে একটা খোলা জানালার সামনে। শিকে মুখ মুখ রেখে—এই তো সে। খিল খুলে যে বেরিয়ে এসেছিল সেই না? মস্ত কালো পেড়ে একটা শাড়ি, ভরা ভরা-গাল একটা মুখ, চোখ ফোলাফোলা, কিন্তু চোখ কি কারও অত কালো হয়, তাই বলো, কাজল-টানা, কাজল তো পরে বাচ্চারা, আমার চেয়েও যারা বাচ্চা, তারা, বড় মেয়েরা অবার কাজল পরে নাকি, আমি তখনও অন্তত দেখিনি। কিন্তু ময়লা, মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, আমারই তো, গোলগাল মুখটা নীচের দিকে ক্রমশ-সরু, কেমন ওই মুখটা, কেমন যেন?—ঠিক, ঠিক, মনে পড়েছে, তাসে-দেখা ইসকাবনের মতো। "শুনেছি তো দেখতে একটা কোলা ব্যাঙ, একটা বাচ্চা হাতি", মা, কে বলছে কথাগুলো, তুমি? তুমি যদি, তবে কোথায় আমি, আমি এখন কোথায়, কার গলা শুনেছি, কিন্তু, ওই, ওইযে, দ্যাখো, এক্ষুনি আমায় ডাকছে। দাঁত দিয়ে কালো ফিতে চেপে, এক হাতে কেমন দু' আঙুলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বুকের সামনে এনে পাকাচ্ছে বেণী, অন্য হাতটা হাতছানি দিয়ে আমায় ডাকছে। আমি যাচ্ছি। ডাকলেন কেন। তুই কে। কেন ওখানে দাঁড়িয়েছিস। সুধীরমামা বাড়ি নেই? উনি আমার মামা। তোর মামা? তার মানে তোর

মা, ওর বোন, বোন না দিদি, হয় রে। তাতো জানি না, মামা, সুধীরমামা, আপনাকে দেখিনি। আমি? আমি এসে থাকি, থাকছি। কিন্তু কালিদাসী করে দিয়েছি কবে, দু' জন মানুষ, এমন আর কাজ কী, আমি পারি, ফুঃ, আমার কবজি, হাত দেখেছিস, তোর সুধীরমামাও পারে না, বরং ওর হাতই একদিন মচকে গিয়েছিল, কিন্তু এত কথা জিজ্ঞাসা করছিস, দেখতে তো মেনি কিন্তু তুই ছোঁড়া তো খুব পাকা রে, পেটে ফন্দী, আমার পেট থেকে কথা বের করতে চাইছিস। যাঃ, এবার না দাঁড়া, ছুটে ওই দোকান থেকে জন্যে দোক্তা এনে দে, এই নে, দু' হাত পাত, আমি ছুঁড়ে দিচ্ছি, হাতে না! "সব সময়েই মুখে নাকি খিল, এ দিকে তো শুনি বিধবা।" একটু থামো, থামো না, দু' রকম আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে, দেখছ দোক্তা পাতা নিয়ে দৌড়ে এসে আমি হাঁপাচ্ছি?—জানালাটা উঁচু, ওখানে দিবি কী করে, এই ছোঁড়া, ওরে আঙুল, তার চেয়ে ভেতরে আয়, আর খিল খুলে দিচ্ছি, ও মা, মোটে এই বোকা পেয়ে তোকে ঠকিয়েছে, তোকে ভেবেছিলুম তুই তা-তো না—এক সেয়ানা না, দোকানদারটা ঠগ, ও আসু ওকে বলব। "ও- ওকে" বললেন কথা শোনো, কী বলব তবে। কেন, সুধীর দাদাঃ? দা-টা ও আমার হল ও আমার দাদা-টাদা কিচ্ছু না। তবে বললে কি তুই বুঝবি, ওর মামাতো ভাই, লতায়-পাতায় কেমন ভাই কে রে বাবা, ওর এক মামাতো না কী-তুতো ভাই হল গিয়ে আমার ভাসুর। "আপনা বিয়ে হয়েছে?" কপালটা সাদা দেখে ছিস, এই বয়সে তুই তো দেখছি সব কি জেনে বসে আছিস, বিয়ে? তা হয়েছে, হয়েছিল, আমি বিধবা।—"ছি, ছি, বয়সে, যাকে ভাবতুম গোবরগণেশ ঠাকুরটি, গণেশ তো নয় ইঁদুর, গণেশে বাহন ইঁদুর, তা-ও খড়ে তৈরী"—কে বল আমি বুঝছি না, শুনতে চাইছি না, দেখ না উনি আমার গাল দুটো এইমাত্র টিপে দিলেন, নাকের ডগাও।—ইস, টিপলে এখনও দুধ গলে, দোক্তা এনে দিলি, তো কী দিই বল্ তো, বাতাসা খাবি, বাতাসা আর তার সঙ্গে, নেয়ে উঠেছিস যে, ঠান্ডা জল, নাকি লেবু-মেশানো চিনির সরবৎ কী ঠান্ডা, কী ঠান্ডা, তোমরা কেউ এখন কথা বোলো না, ঠান্ডা! কুলকুল, যাচ্ছে, বুকের তলা দিয়ে। "কী বলে ডাকব আপনাকে?" মামী, মামী বলতে পারি

না, মামী না, কে আবার কী বলবে, বরং বলিস, মাসী, আর দোক্তা পাতা আমার যখন-তখন ফুরিয়ে যায়, এনে দিবি বুঝলি, আর রোজ আসিস।

[খ]

তোমাকে এ-সব কিচ্ছু বলিনি, মা, সেদিন মুখ ফসকে মিথ্যে কথাটা বেরিয়ে গেল কেন যে! বলিনি, আবার বলেছি-ও। রাত্রে, শুতে গিয়ে, মনে মনে, হয়ত বা ঘুমের ঘোরে, স্বপ্নে। তাকে আমি দেখেছি, দেখেছি, দেখেছি। তার হাতের সরবৎ খেয়েছি। এর পর আরও দু' দিন ফাই-ফরমাস, একদিন সেই দোক্তা, আর-একটি চুলের ফিতে। সব তোমাকে ওইভাবে বলে ফেলে হালকা হয়ে গিয়েছি। তুমি শুনতে না-ই বা পেলে, না বলে দিলে আমি সেদিন ঘুমোতাম কী-করে!

আর তুমি? প্রথমে চুলের মুঠি ধরেছ, ঠাসঠাস করে মারলে। কিন্তু আমি কাঁদিনি তো, তুমি নিজেই বরং কড়া করে জবানবন্দী নিতে নিতে, ঝাঁঝ আর ঝাল মিশিয়ে কত কী বলতে বলতে, হঠাৎ চোখ ভাসিয়ে ফেললে। হুহু, হুহু, থামেই না, এ-যেন নদীর পাড়ের হিমেল হাওয়া শুধু, কী আশ্চর্য, মা, আমার কান্নাটা আমার হয়ে তুমিই কাঁদলে?

আর মাঝে মাঝে এক-একটা ওই কথা, ছপছপ জলে পা ফেলার মতো। তুমি ভাবছিলে ওগুলো স্বগত, কেউ শুনছে না, কিন্তু শুনেছে। সেদিন বোঝেনি, পরে, একদিন সবখানি মানের ডালা তার কাছে খুলে গেছে।

"এই ভাবে শোধ নিচ্ছে ও, এইভাবে," মাথা নিচু, স্বর আরও নীচু, তুমি বলছিলে। "না-হয় পাড়ার বাইরে, তবু এই সাহস, এই সাহস, শরীর খারাপের ছুতো করে কাকে আনল, আর তাকে রেখে দিল?" তুমি ফুঁসছিলে, "রেখে" কথাটাকে অত বিশ্রীভাবে ঝোঁক দিয়ে বলারই বা কী মানে ছিল?

"হেরে গেছি", একেবারে শেষে তুমি বলেছ আস্তে আস্তে, "আমি হেরে গেছি, ও সইতে পারল না, তাই শোধ নিল, আমাকে হারিয়ে দিল।"

সেদিন পারিনি, এখন "কর-খল-জল"-এর মতো সোজা বাক্যগুলো পড়ছি। সেদিন পড়তে পারতাম যদি, তবে তক্ষুনি তোমাকে বলে দিতাম, মা—জানি না, উনি কী সইতে পারেননি, কিন্তু শোধ, কোথায় শোধ? তুমি হারোনি, একেবারে হেরে গেছেন সুধীরমামা। দোক্তায় আসক্ত এক-জনকে যে আনতে হল—ষোল-আনা জিত তো তোমারই। [ক্রমশ]

'তামিল বার্জিল'

"আপনারা জেসুইট-ফাদার, না? ভারতে আপনাদের কত কলেজ, কত স্কুল। কিন্তু বলুন দেখি, ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আপনাদের কোনো অবদান আছে কি? আপনাদের কেরী, ডাফ্, [illegible] কোথায়?"

আক্রমণকারী আগন্তুককে নম্রভাবে স্মরণ করালাম, অবাঙালী ভারতবাসীদেরও ভাষা ও সংস্কৃতিকে তিনি যদি 'ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির' মর্যাদা দিতে পশ্চাৎপদ না হন, তাহলে আমার কিছু বলার আছে। এমন এক ইতালীয় জেসুইটের কথা বলার আছে যিনি কেরী-র আগেই শ্রীরামপুরের [illegible]। নাম তাঁর কোন্‌স্তান্তিনো বেস্কি, ওরফে বীরমামুনি।

লাতিন কবি বার্জিলের জন্মভূমি মান্তুয়া নগরে তাঁর জন্ম [যার জন্য য়ুরোপে তিনি 'তামিল বার্জিল' নামে আখ্যাত]; ১৭১০ সালে তাঁর ভারতযাত্রা; ১৭৪৭ সালে, ৬৭ বছরের বয়সে, মালাবার-অন্তর্গত আম্বালাকাড়ে তাঁর মৃত্যু।

বেস্কি ছিলেন বহুভাষাবিদ: দেশে থাকতে তিনি শিখেছিলেন মাতৃভাষা ছাড়া পর্তুগীজ, স্প্যানিশ ও ফরাসি, তার ওপর গ্রীক ও লাতিন-ও বটে। ভারতে এসে সংস্কৃত, তামিল ও তেলেগু ছাড়া তিনি শিখেছিলেন আর্কটের নবাব চাঁদা সাহেবের সভায় প্রচলিত ভাষা: ফার্সি ও হিন্দুস্থানি।

বেস্কি দু-দুটো তামিল ব্যাকরণ রচনা করেছেন: চলিত ভাষার [১৭২৮ সালে লিখিত, ১৭৩৮ সালে মুদ্রিত] আর সাধু ভাষার [১৭৩০ সালে লিখিত, ইংরেজী ভাষায় বহুবার পুনর্মুদ্রিত]। আজ পর্যন্ত তামিলভাষী লেখকেরা বেস্কির ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেন।

১৭৪২ সালে লাতিন ভাষায় রচিত [১৮৮২ সালে মুদ্রিত] তামিল অভিধান ছাড়া, বেস্কি 'চতুরাকরাদি' নামে এক চতুর্বিধ অভিধান সংকলন করেন: শব্দার্থের অভিধান, প্রতিশব্দের অভিধান, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক শ্রেণীভুক্ত শব্দের অভিধান, আর এক অন্ত্যমিলের শব্দকোষ।

গদ্যে-পদ্যে সব্যসাচী

পদ্য-রচনায় হাত পাকাতে গিয়ে বেস্কি তিরুবল্লুভারের 'কুরাল' কাব্য-গ্রন্থের লাতিন অনুবাদ করেন, প্রাচীন তামিল কবিদের কাব্য সংকলন করেন। তিনি ভ্রাম্যমান মিশনারী ছিলেন: পাল্কিতে ঘুরতে ঘুরতে কাব্য রচনা করতেন, রাত্রে তাঁর মুখস্থ-করা চতুষ্পদী চারজন কেরানীকে শোনাতেন, একেক জন একেক পদ তাল-পাতায় টুকে নিত, পঞ্চম একজন পাতাগুলো সাজাত।

'তেম্বাওয়ানি' [অবিনশ্বর মুকুট] বেস্কির সবচেয়ে বিখ্যাত কাব্য। এই মহাকাব্যের ৩৬টি সর্গ [৩৬১৫ চতুষ্পদী] ১৭২৬ সালে সমাপ্ত হয়; তার প্রথম মুদ্রণ ১৮৫১ সালে, পণ্ডিচেরীতে। তেম্বাওয়ানি-তে লেখক ৮৭ রকম ছন্দ ব্যবহার করেছেন। কাব্যের বিষয়বস্তু যীশুর পালক পিতা যোসেফের জীবনী; তাতে অন্তর্গত হয়েছে বাইবেলের আদি [Old] ও নব বিধানের [New Testament] বহু কাহিনী। প্রাচীন কবিদের প্রচলন-অনুযায়ী বেস্কি নিজেই তাঁর মহাকাব্যের এক আক্ষরিক 'পদানুবাদ' —আর এক ব্যাখ্যাও—রচনা করেছেন।

বেস্কি তামিল গদ্যের পিতা। তাঁর আগমনের পূর্বে গদ্য ব্যবহৃত হত শুধু দুটি কাব্যের যোগসূত্র-রূপে কিংবা কাব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে। তামিল গদ্যের স্বাধীন ব্যবহার সর্বপ্রথম মেলে তাঁরই লেখনীতে।

বেস্কির প্রথম গদ্য রচনা তর্কমূলক: ট্রাঙ্কবার্-এর দানিশ লুথেরান মিশন-প্রচারিত ধর্মতত্ত্বের আক্রমণ। পরে অবশ্য, পরিস্থিতি পরিবর্তিত হওয়াতে, তামিল ব্যাকরণ [বেস্কির জীবৎকালে তাঁর একমাত্র মুদ্রিত গ্রন্থ] লুথেরান মুদ্রালয়েই মুদ্রিত হয়। শুধু তাই নয়, তাঁর ধর্ম বিষয়ক শ্রেষ্ঠ রচনা 'বেদিয়ার ওলুক্কম' প্রোটেস্টান্টদের প্রযত্নেই পুনঃ প্রকাশিত হয়েছে।

বেস্কির সবচেয়ে জনপ্রিয় গদ্য রচনা হল বিদেশী শিক্ষানবীশ মিশনারীদের উদ্দেশে লিখিত 'পরমার্থ গুরুর কথা' নামে এক গল্পমালা। এই গল্পমালায় তিনি সঙ্কলিত

এক ব্যক্তি অশ্বপৃষ্ঠে দিব্য নদী পার হইয়া গেল

করেছেন দৈনন্দিন জীবনের শব্দাবলী ও বাক্ পদ্ধতি। গ্রন্থটি শুধু ভারতীয় ভাষায় নয়, ইংরেজী, ফরাসি ও জার্মান ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে। কাহিনী "মজারু" খুব—যদিও সর্বত্র স্থূলতাবর্জিত নয়। অধিকাংশ গল্প যে ভারতীয়, সে-কথা অবশ্যস্বীকার্য—যদিও য়ুরোপীয় পল্লী সাহিত্যেও পাওয়া যায়।

গল্পগুলির সারাংশ ভাষান্তরে দেওয়া হল। লিখতে গিয়ে মনে পড়ল বিদ্যাসাগরের কথামালার কথা। এ-সব কাহিনী, অন্তত বঙ্গ সাহিত্যানুরাগীদের মনে, বিদ্যাসাগরীয় আবহে এখনো এতটাই আচ্ছন্ন যে চলিতে লিখতে সাহস হল না। আড়ি-করে-দেওয়া সাধু ভাষার সঙ্গেই উপস্থিত বনিবনা করে নিলাম—ঢোক গিলে। মানে ঢেঁাক গিলে।

প্রশ্ন রইল, বৈস্কির মৌলিকতা কতখানি?

আক্কেল গুড়ুম গুরু

পরমশরণ্য মহামহোপাধ্যায় গুরু আক্কেল গুড়ুম পঞ্চ প্রদীপসম্নিভ তাঁহার পঞ্চশিষ্য—সর্বশ্রী গাড়ল, গবেট, গর্দভানন্দ, গোমূর্খ ও গোবর গণেশ—সমভিব্যা পথ চলিতে চলিতে অকস্মাৎ এক ন মুখে পড়িয়া কিঞ্চিৎ বেআক্কেল হইলে নদীটি তাহাদের অতিক্রম করিতে হইবে

গুরু নির্দেশে এক যথাযোগ্য মশাল হাতে নদীর জলে ঝুঁকিয়া পর করিয়া আসিতে গেল, নদী ঘুমাই কিনা। জ্বলন্ত মশালে জলসংযোগ ঘ যে শীৎকার ধ্বনি উত্থিত হইল তাহ তাহারা কৃত নিশ্চয় হইল—নদীবাব ঘুমায় নাই।

গুরু কহিলেন, "জানিতাম, বেটা ক্রুর। সেদিন গর্দভপৃষ্ঠে লবণের বে চাপাইয়া একজন নদী পার হই গিয়াছিল, নদী অবলীলাক্রমে সমুদয় ল আত্মসাৎ করিল, বোঝাগুলি খুলিবা পর্যন্ত প্রয়োজন হইল না। ভা লোকটিকে সুদ্ধ হাতাইয়া লয় নাই।—ে বেচারা বড় বাঁচা বাঁচিয়া গিয়াছে।"

এদিকে তাহাদের চক্ষের উপর দিয়া এ ব্যক্তি অশ্বপৃষ্ঠে দিব্য নদী পার হই গেল। গুরু শিষ্যে মিলিয়া ঘাড় নাড়ি একবাক্যে স্বীকার করিল : তাহা হই আসল কথাটা হইতেছে—ঘোড়া। ঘোড় কাছে নদীর জারিজুরি খাটিবে না।

মশাল দিয়া পুনরায় পরীক্ষা করা হইল কিন্তু সিক্ত মশাল ইতিমধ্যে নির্বাপিত, আ শব্দোৎসার ঘটিল না। নদীকে এক্ষণে সুপ্তমগ্ন ঠাহর করিয়া সকলে পায়ে পায় পার হইয়া গেল—ধীরে ধীরে, অতি সাবধানে, পাছে গোলযোগে কাঁচা ঘু চটিয়া যায় নদীর, আড়মোড়া ভাঙিয়া সে জাগিয়া উঠে।

ওপারে আসিয়া আরেক বিপদ। এক গুরু, পঞ্চ শিষ্য, মোট ছয়; অথচ প্রত্যেকে গনিয়া দেখে, রহিয়াছে মাত্র পাঁচ। কি সর্বনাশ, তবে কি একজন নদী গর্ভেই . ভাবিতেও তাহারা শিহরিয়া উঠে।

অবশেষে দয়াবান এক ব্যক্তি তাহাদের দুর্দশাদর্শনে যৎপরোনাস্তি কৃপাপরবশ হইয়া, অর্থের বিনিময়ে, হৃত ব্যক্তির পুনরুদ্ধারে সম্মত হইল। একটি যষ্টি তুলিয়া দেখাইয়া সকলের উদ্দেশে সে বলিল, "এই দেখিতেছ লাঠিগাছ। ইহা দ্বারা প্রত্যেককে আমি আঘাত করিব। যখনই যাহার পৃষ্ঠে যষ্টিঘাত পড়িবে, তৎক্ষণাৎ সে তাহার নিজ নাম হাঁকিবে।"

লাঠির বাড়ি পড়িল পিঠে, প্রত্যেকে ককাইয়া উঠিয়া নিজ নাম বলিল, দেখা গেল ষট্ অটুট আছে। বিপদ উত্তীর্ণ।

পরবর্তী সাক্ষাৎকার এক স্ত্রীলোকের সঙ্গে। সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া সে মাথা নাড়িয়া বলে, "বাপু হে, তোমাদের গণনা পদ্ধতি তো ঠিক হয় নাই। শাস্ত্র সম্মত সঠিক প্রণালীটি এই : একতাল গোবর লইয়া প্রত্যেকে তাহাতে পৃথক

পৃথকভাবে নাসিকাগ্র চাপিয়া ধরিবে। অতঃপর এই নাসিকার ছাপগুলি গণিয়া লইবে—বুঝিলে?"

"বুঝিলাম," তাহারা কবুল করে।

কিন্তু তাহাদের এখন ঘোড়ায় পাইয়াছে। "আসল কথাটা হইল ঘোড়া—ঘোড়া না থাকাটাই যত নষ্টের গোড়া।" কিন্তু ঘোড়া কিনিতে বিস্তর টাকা লাগে। তবে তাহারা শুনিল, অল্প কিছু অর্থের বিনিময়ে তাহারা ঘোড়ার ডিম কিনিতে পারে বটে। ডিম কিনিতে যায় শিষ্যেরা। গুরুদেব মনে মনে স্থির করেন, নানাবিধ মর্দন-পেষণ-রন্ধনকার্যে নিযুক্ত শিষ্যদের ব্যতিব্যস্ত না করিয়া নিজেই তা দিয়া ডিম ফুটাইবেন।

বিধি বাম। শিষ্যেরা ঘোড়ার ডিম অর্থাৎ এক কুষ্মাণ্ড কিনিয়া যখন ফিরিয়া আসিতেছিল, পথে তাহাদের হাত হইতে পড়িয়া কুমড়াটি ফাটিয়া যায়। নিকটেই ধাবমান এক শশক শশব্যস্তে পলায়ন করিতেছিল, উহাকে সদ্যোজাত অশ্বশাবক ভাবিয়া চেলার দল পিছু পিছু ছুটিল। কিন্তু হায়, উদ্দেশ মিলিল না।

গুরু ভগ্নমনোরথ শিষ্যদের সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "ভালো-ই হইল; ডিমেরই যাহার এত তেজ, বয়সকালে সে একটি কেলেঙ্কারি না বাধাইয়া ছাড়িত কি?"

ঘোড়ার আশা টুটিল, তবে এক ভাড়াটে বলদ জুটিল। কিন্তু পোড়া কপাল, এখানেও বিধি। শ্রান্ত আক্কেল গুড়ুম বলদের ছায়ায় বসিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম লইয়াছেন, এই অজুহাতে বলদের মালিক আসিয়া অতিরিক্ত অর্থ দাবী করিল: "বলদ ভাড়া দিয়াছি, ছায়া তো মাগনা দিই নাই!" শেষটায় এক প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মধ্যস্থতায় মুশকিল আসান হয়। সব শুনিয়া তিনি রায় দেন, "বলদের ছায়ার ভাড়া—বটেই তো, দিতে হইবে বই কি। তবে দিতে হইবে টাকার ছায়া দিয়া।"

পরবর্তী অকুস্থল এক মন্দির। মন্দিরের সম্মুখে এক পুষ্করিণীর পার্শ্বে খাড়া এক অশ্বমূর্তি, জলে তাহার ছায়া পড়িয়াছে। মৃদুমন্দসমীরণজনিত তরঙ্গ সঞ্চারে সেই ছায়া কাঁপিতেছে—দেখিয়া সকলে ভাবিল, আসল জীবন্ত ঘোড়াটি ঐ জলগর্ভে রহিয়াছে, বঁড়শিতে গাঁথিয়া উহাকে পাড়ে তুলিতে হইবে। মাথার পাগড়ির এক কোণায় একটি কাস্তে বাঁধিয়া তাহারা জলে ফেলিল, পাগড়ির আরেক প্রান্ত রাখিল হাতে ধরিয়া—সঙ্গে টোপ লাগানো হইল এক থলি চাউল।

আলোড়িত জলে অশ্বমূর্তির প্রতিবিম্ব যতই ভঙ্গিল হয়, তাহারা আশান্বিত হয় তত: ঐ তো ঘোড়া লাফাইতেছে, এই পা ছুঁড়িল, ঐ ঢুঁ মারিল...। পাগড়ি ধরিয়া তাহারা টান মারে এবার। ধরা পড়িয়াছে বাছাধন, কাস্তে কামড়াইয়া ধরিয়া আছে।...আসলে অবশ্য আগাছা-গুল্মে জড়াইয়া গিয়াছে। "মারো টান হেঁইয়ো..." একসঙ্গে সকলে মিলিয়া চিৎপাত।

এ-দুরবস্থা দেখিয়া অবশেষে একজন আগাইয়া আসিয়া তাহাদের একটি খঞ্জ অশ্ব উপহার দিল।

এতক্ষণের শ্রম উশুল হইল, কিন্তু পথিমধ্যে মাশুল লাগিল ঘোড়ার জন্য। তদুপরি, ঘোড়াটি খোঁড়া হইলেও আত্মপর-ভেদের গোঁড়ামি তাহার বিন্দুমাত্র নাই; খঞ্জপদ হইলেও ঝঞ্ঝাট বাধাইতে সে পশ্চাৎপদ নহে। কোন্ এক গৃহস্থের বেষ্টিত প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া সমুদয় তৃণ সে সাবাড় করিয়া ফেলিল। পুনরায় অর্থদণ্ড।

আরেকজন আসিয়া বুঝাইল, আসলে ঘোড়াটি পাপী, তাহার দোষ লাগিয়াছে, তাই এত শাস্তি। গুরু শিষ্যের অনুরোধে সে ঝাড়ফুঁক দিয়া ঘোড়াটিকে দোষমুক্ত করিতে স্বীকৃত হইল। জন্তুটির একটি কান কাটিয়া লইয়া সে বলিল, "এইবার আর ভয় নাই, ঘোড়ার পাপমুক্তি ঘটিয়াছে।"

পাপমুক্তি ঘটিল কি না কে বুঝিবে, তবে ওঝার যে কিঞ্চিৎ অর্থপ্রাপ্তি ঘটিল, তাহা বলা বাহুল্য।

অবশেষে পঞ্চ শিষ্যের সহিত গুরু তাঁহার গন্তব্য স্থলে—আশ্রমে — আসিয়া পৌঁছিলেন। ঘোড়ার উৎপাতে উত্যক্ত হইয়া তিনি ঘোড়াটিকে বিদায় দিতে মনস্থ করিয়াছেন। কিন্তু শিষ্যেরা বুঝাইল, তাহা করিবার প্রয়োজন কি, ঘোড়াকে একটি বেড়া-দেওয়া জায়গায় রাখিয়া দিন; তাহা হইলেই সে আর বিপত্তি ঘটাইতে পারিবে না।

বেড়া বানাইবার কাঠ কাটিতে গেল একজন, গাছের এক ডালে বসিয়া সেই ডালটিই কোপাইতে লাগিল। তলা দিয়া এক ব্রাহ্মণ যাইতেছিলেন, কহিলেন, "বৎস, ওরূপ করিও না, পড়িয়া মরিবে।" ব্রাহ্মণের বাক্যে সে কর্ণপাত করিল না। ফল হইল এই, ডালসুদ্ধ সে মাটিতে পড়িল।

তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া সে ব্রাহ্মণকে ধরিয়া বলিল, "প্রভু, আপনি সিদ্ধবাক। আমাদের গুরুকে বিপন্মুক্ত রাখিবার উপায় আমাদের বাৎলাইয়া দিন।" ব্রাহ্মণ, লোকটিকে নাছোড়বান্দা দেখিয়া, উহার হাত হইতে কোনোক্রমে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য এক মন্ত্র উদ্ভাবন করিলেন: আসনং শীতং জীবননাশম্।

শিষ্য বুঝিল, এ-মন্ত্রের অর্থ—গুরুর নিতম্বদেশ যখনই শীতল হইবে, বুঝা যাইবে, তাঁহার অন্তিম ক্ষণ আসন্ন।

গুরুর শিরস্ত্রাণ ভূপাতিত হয়। শিষ্যেরা

তাহা তুলিয়া না দেওয়ায় গুরু তাঁর ভর্ৎসনা করিয়া নির্দেশ দেন : "এখন হইতে যাহা পড়িবে, তাহা-ই তুলিয়া দিবে।"

শিষ্যেরা দেখিল, ঘোড়ার নাদি মাটিতে পড়িতেছে। তাহারা হাঁ হাঁ করিয়া আসিয়া নাদি তুলিয়া দিতে যায়—পুনর্বার লাঞ্ছনা জোটে। গুরুর কাছে সকলে মিনতি জানায়, "তাহা হইলে, গুরুদেব, আমাদের এক তালিকা করিয়া দিন, কি কি তুলিব, এবং কি কি তুলিব না।" গুরু লেখেন : "তুলিবে নিরস্ত্রাণ, তুলিবে পায়জামা, তুলিবে পিরান, তুলিবে কোর্তা..."।

এবার গুরু নিজেই ভূলুণ্ঠিত হন। শিষ্যেরা সযত্নে সশ্রমে শিরস্ত্রাণ, পায়জামা, পিরান, কোর্তা—সব তোলে, বিবসন গুরুকে ফেলিয়া রাখে।

গুরুকে শেষ পর্যন্ত পুনশ্চ জুড়িতে হয় : "...আর আমি যদি পড়ি, আমাকেও তুলিবে।"

গুরু কাদায় পড়িয়াছিলেন; উঠিবার পর দেখা গেল তাঁহার নিতম্বপ্রদেশ আর্দ্র ও হিমশীতল। গুরু শিষ্যদের চিতা সাজাইতে নির্দেশ দিলেন। সৌভাগ্যক্রমে এক ব্যক্তি ঘটনাস্থলে আসিয়া পড়ে। সে বলে, "নিতম্বের শীতলতা মৃত্যু নির্দেশক ঠিকই; তবে তাহা কোনো বাহ্যবস্তুর প্রভাবে ঘটিলে চলিবে না, কারণটা অন্তর্লীন হওয়া চাই।"

সেদিন রাত্রে, নিদ্রিত গুরুর—ও শিষ্যদের—অজ্ঞাতে, বৃষ্টিপাত হয়। জাগিয়া উঠিলে দেখা যায় নিতম্ব পুনরায় শীতল, কিন্তু বাহ্য কারণ কেহ খুঁজিয়া পায় না।

মৃত্যু আসন্ন বুঝিয়া গুরু মূর্ছা যান। মূর্ছিত গুরুকে মৃতজ্ঞানে শিষ্যেরা অন্ত্যেষ্টির জন্য প্রস্তুত করে, আনু[...] অবগাহনের জন্য জলে লইয়া ডোবা[...]

জলের ভিতর গুরুর সম্বিৎ [...] আসে, তবে নিমজ্জনেই তাঁহার [...] ঘটে...।

ধন্য সেই বিদেশী মিশন[...] 'পরমার্থ গুরুর কথা-মালার সূত্রে [...] ভাষার সঙ্গে যাঁদের প্রথম মোলাকাৎ।

ব্যাকরণবিদ, ছান্দসিক, কোষ[...] অভিধানকার, কবি ও গদ্য রচয়িতা [...] নিজেকে 'রঙ-চূর্ণক' বলে অ[...] করতেন : রঙ চূর্ণ করা-ই তাঁর কাজ[...] চূর্ণিত রঙ দিয়েই অন্যেরা যাতে অ[...] শেখে। সেই রঙ-চূর্ণককে তামিল ভ[...] ভোলেন নি : বেস্কির মূর্তি স্থান পে[...] তামিল ভূমির সেরা সারস্বত সন্ত[...] পাশে, মাদ্রাজের সমুদ্র তীরে।

জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত পৃথিবীতে প্রথম পদার্পণ করছে নবলব্ধ জ্ঞানের আলোকের রূপ শিল্পী নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। শিল্পীর কয়েকটি রচনার মধ্যে যেন আশাবাদের বাণী শোনা যায়। এই প্রসঙ্গে অনফোল্ডিং বিম-এর নাম করা যায়। পুরোভাগে দুটি পৃষ্ঠভূমিতে স্থাপিত একটি মূর্তিকে কেন্দ্র করে শিল্পী হলুদ ও সবুজ রঙের স্তর ভেদের মধ্য দিয়ে যেন আশার বাণীই শোনাতে চেয়েছেন। কমপোজিশন হিসাবে আরও দুটির উল্লেখ করা যায়—প্রতীকমূলক, বৃত্তাধার রচনা লাল ও হলুদ রঙ প্রধান স্ফটিকস্বচ্ছ বিকনিং লাইট। প্রাচীর চিত্রের দুটি নিদর্শনের মধ্যে নতুনত্ব বা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাইনি, যদিও অঙ্কন পদ্ধতির দিক থেকে স্ট্রাগল অ্যান্ড এগজিসটেন্স মন্দ লাগে নি।

বস্তী —স্বাধীন দত্ত

টু সোলস অরুন্ধতী রায়চৌধুরী

শিল্পী ওয়াশিম রাজ কাপুর, মৃন্ময় মুখার্জি ও স্বাধীন দত্ত অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে তাঁদের যৌথ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। তিনজনই প্রধানত ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের ছাত্র। তিনজনেই প্রধানত স্কেচ, স্টাডি ও নিসর্গ তথা বহির্দৃশ্যের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। রচনাবলী দেখে বোঝা যায় যে সকলেই যত্নসহকারে নিয়মিতভাবে স্কেচ-ড্রয়িং করেন। তবে এ জাতীয় প্রদর্শনীতে উচ্চাঙ্গের কোনও কাজ চোখে না পড়াই স্বাভাবিক। কাপুর তেল ও জল রঙ দুইই ব্যবহার করেছেন—তাঁর স্টিল লাইফ ও স্ট্রীট সিন মন্দ লাগে নি। শিক্ষার্থীর রচনা হিসাবে মৃন্ময় মুখার্জির দু একটি নিসর্গ দৃশ্য চোখে পড়ে, যেমন হিল সাইড ও ভিলেজ সাইড। তবে তুলনামূলকভাবে দেখলে স্বাধীন দত্তের হাত অপেক্ষাকৃত তৈরী। রঙ ব্যবহার ও বিশেষ করে রঙের স্তর ভেদ সৃষ্টি করার ফলে তাঁর কয়েকটি ছবি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই প্রসঙ্গে মার্কেট কর্নার বা ফ্যাক্টরীর নাম করা চলে। বস্তীর দুটি স্কেচের মধ্যে ৩০নং মন্দ লাগে না।

*

শিল্পী জশপাল অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে তাঁর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। জশপাল আনুষ্ঠানিকভাবে শিল্পবিদ্যা শেখেন নি। তিনি দুর্গাপুর স্টীল ওয়ার্কসে কাজ করেন ও অবসরকালে খুশিমত ছবি আঁকেন। প্রদর্শনীতে তেল ও জলরঙে আঁকা ৪১টি নিদর্শন দেখা যায়। অধিকাংশই স্কেচ বা নিসর্গ দৃশ্য, সেই সঙ্গে দু একটি প্রতিকৃতিও চোখে পড়ে। প্রায় সবগুলিই রিয়ালিস্টিক রীতিতে আঁকা।

শিল্পী নির্বাচন ব্যাপারে অধিকতর সচেতন হলে প্রদর্শনীর মান হয়ত কিছু উন্নত হত। ছবিগুলি সাধারণ, অ্যামেচার শিল্পীর রচনা হিসাবে কয়েকটি চলসনই—যেমন হিলপাশ ডোয়েলারস অব বুরকেলা, ভিলেজ কর্নার, ডিপ পাফ্। একটি উল্লেখযোগ্য রচনা ছিল—জাপানী প্রথায় রচিত শেল্টার ফ্রম দি রেন।

—চিত্রপ্রিয়

শ্রীমন মহাপ্রভু সপার্ষদ কীর্তন করছেন। এই ছবিটি প্রায় তিনশত বছরের হাতে আঁকা ছবি থেকে তোলা। নবদ্বীপে সোনার গৌরাঙ্গ বাড়িতে এই প্রাচীন ছবিটি সংরক্ষিত আছে (সংগ্রাহক : সমরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়)

দেখায়। কিন্তু জীবন আলোর উৎপত্তির কারণ ভিন্নতর। সমুদ্র বিজ্ঞানীরা জলের নীচে কখনও কখনও এক কিলোমিটারের মত গভীরেও যন্ত্রপাতি নামিয়ে অনুসন্ধান করে দেখেছেন, সেখানেও কিছু কিছু মশাল মাছ অর্থাৎ দেহজ আলো বিকিরণ-কারী মাছ বিচরণ করে। এ'দের ধারণা, সমুদ্রের ঢেউ অথবা শক্ত কোন কিছুর আঘাতে ঐ সমস্ত মাছের দেহে হয়ত কোন বিশেষ ধরনের জৈবিক প্রতিক্রিয়া ঘটে থাকে। যার জন্যে তাদের গা থেকে অমন আলোর দীপ্তি বের হয়। জানা গেছে, যে সমস্ত প্রাণীর দেহে এই আলো দেখা যায় তাদের মধ্যে বিশেষ এক প্রকারের উৎসের সন্ধান পাওয়া গেছে যার মধ্যে থাকে লুসিফারিন এবং লুসিফারেজ। এই পদার্থ দুটি যেন দিয়েশলাই-এর কাঠির ডগায় লাগান বা এবং দিয়েশলাই বাক্সের গায়ে লাগ রাসায়নিক প্রলেপের মত। প্রলেপের স ঘর্ষণের ফলে কাঠির বারুদ জ্বলে উ যেমন আলো এবং তাপ তৈরি করে, তেমনি অক্সিজেন ঐ লুসিফারেজ- সাহায্যে লুসিফারিনকে জারিত করে। ফ প্রচুর আলো এবং যৎসামান্য উত্তা

সৃষ্টি। বিজ্ঞানীদের কাছে এটাই আজ বড় রকমের একটি ধাঁধা। সাধারণত দেখা যায়, অতিরিক্ত উত্তাপ সৃষ্টি না করে কখনই আমরা উজ্জ্বলতর আলো জ্বালাতে পারি না। অথচ অতি সামান্য তাপ উৎপন্ন করে অত বেশী উজ্জ্বল আলোর মশাল জ্বালান কি করে সম্ভব হয়? মশাল মাছের দেহে এমন কী বৈচিত্র্যপূর্ণ রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে থাকে যার ফলে এমন শীতল-আলো জ্বালান সম্ভব হয়? জীব-রসায়ন বিজ্ঞানীদের কাছে এটা আজ একটি মস্ত বড় প্রশ্ন।

প্রশ্ন : জীবদেহের এই স্বতঃদীপ্তির প্রয়োজনই বা কী? প্রকৃতি-বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে কিছু কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেছেন। অনুসন্ধান চালিয়ে ওঁরা দেখেছেন, কোন কোন প্রাণী নিজেদের দেহ নিঃসৃত স্বতঃদীপ্তির আড়ালে আত্মগোপন করে শত্রুর হাত থেকে গা বাঁচিয়ে চলে। কেউ কেউ ঐ আলোর হাতছানি দিয়ে প্রলুব্ধ করে তাদের অন্যান্য প্রাণীদের সাবাড় করার জন্যে কাছে ডেকে আনে। এমনও দেখা গেছে, শামুক জাতীয় এক ধরনের সামুদ্রিক প্রাণী ঐ আলোর সাহায্যে মাছের সঙ্গে সংকেত বার্তা বিনিময় করে। তবে এর সব কিছুই প্রায় অনুমান। গবেষকরা এ নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন।

সবচাইতে মজার ব্যাপার, ইতর প্রাণীদের দেহ নিঃসৃত এই আলো কখনও কখনও মানুষেরও কম উপকারে আসে না। যেমন ধরুন, সমুদ্রে ভাসমান কোন জাহাজের ক্যাপ্টেনের কাছে এই আলো কতকটা মুশকিল আসান-এর মতই কাজ করে। জাহাজের কাছাকাছি কোন দ্বীপ অথবা অগভীর অঞ্চল থাকলে সেখানে প্রায় সব সময়েই ঢেউ-এর নাচন লেগে থাকে। অতএব যদি সেখানে 'জীয়ন-আলো'ওয়ালা কোন মাছের ঝাঁক এসে পড়ে, সেই ঢেউ-এর আঘাতে তখন তাদের মধ্যে খানিকটা জৈবিক তাড়ন সৃষ্টি হয়। সঙ্গে সঙ্গে লুসিফারিনে আগুন ধরে যায়। আর মনে হয় এক ঝাঁক আলোর সারি যেন নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। এই আলো নাবিকের কাছে বিপদ-সংকেতের মতই কাজ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই সংকেত অনেক সময় শত্রুপক্ষের জাহাজেরও সন্ধান জোগাতে সমর্থ হয়েছিল। রাতের দিকে শত্রুর কাছ থেকে গা ঢাকা দেবার জন্যে ঐ সমস্ত জাহাজদের প্রায় নিষ্প্রদীপ করে রেখে দেওয়া হত। কিন্তু মুশকিল হল, জাহাজের গায়ে জলের ধাক্কার মধ্যে যে সমস্ত মশাল মাছ হঠাৎ এসে আছড়ে পড়ত, তাদের গা থেকে বেরুত আলোর রোশনাই। সেই রোশনাই দেখে ব্যাপারটা বুঝে নেওয়া শক্ত হত না। এ ছাড়া এমন খবরও পাওয়া গেছে, ঐ একই

স্ফুটন্ত ধাতুর একস-রে ছবি তুলছেন বোরিস আজকনেমস্কি
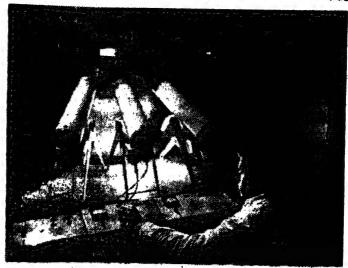
সময়ে শুধুমাত্র ঐ মশাল মাছের কৃপায় বেশ কয়েকটি জাহাজ টরপেডোর হাতে অনিবার্য ধ্বংস পেতে পেতে বেঁচে গিয়েছিল। কারণ জলের মধ্যে দিয়ে যে রাস্তা ধরে টরপেডোগুলি জাহাজ ধ্বংসের জন্যে ছুটে আসে, তার সমস্তটা জুড়ে তখন কয়েক ঝাঁক মশাল-মাছের আবির্ভাব ঘটেছিল। প্রবল বেগে এগিয়ে আসার সময় টরপেডোগুলি জলের মধ্যে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করে। আর সেই সঙ্গে মশাল মাছের গাগুলিও ওঠে জ্বলে। ফলে মনে হচ্ছিল একটা জ্বলন্ত শিখা যেন তীব্র বেগে সাগরের বুকের উপর দিয়ে জাহাজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অভিজ্ঞ নাবিকদের কাছে এর অর্থ পরিষ্কার। তাঁরা চট করে জাহাজগুলি টরপেডোর নিশানার বাইরে সরিয়ে নিয়ে যায়।

যাই হোক। আপাতত দুটি বিষয় নিয়ে বিজ্ঞানীরা মাথা ঘামাচ্ছেন। এক, আলোর সঙ্গে মাছের সত্যিকারের কি সম্পর্ক সেটা তাঁরা খুঁটিয়ে দেখছেন। কোন মাছ কেন এবং কিভাবে কি ধরনের আলোর সম্মুখে সাড়া দেয় সেটা ভাল ভাবে জানতে পারলে ভবিষ্যতে ব্যাপকভাবে মাছ শিকারের ব্যাপারে বেশ খানিকটা সুরাহা করা যাবে। দুই, এঁরা জৈবিক স্বতঃদীপ্তির সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কটি কী তা খুঁটিয়ে দেখে নিতে চান। এতে করে জীবকোষের কার্যাবলী সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য সংগ্রহ করা হয়ত সম্ভব হবে। এবং সেক্ষেত্রে অনেক দুরারোগ্য ব্যাধির পথও হয়ত খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

গলিত পদার্থের এক্স-রে ছবি

সাইবেরিয়ার পদার্থবিদরা একটি নতুন ধরনের এক্স-রে ব্যবস্থা তৈরি করেছেন। এর জন্যে যে যন্ত্রটি তাঁরা কাজে লাগাচ্ছেন তা দিয়ে এবার তাঁরা গলিত তপ্ত পদার্থের এক্স-রে ছবি তুলতে পারবেন এবং দরকার হলে সেই ছবির ফিল্মও। পরে পর্দার উপর এই ফিল্মের ছবি ফেলে বিভিন্ন ধাতু, গ্যাস এবং রাসায়নিক পদার্থ প্রচণ্ড উত্তপ্ত হওয়ার ফলে যে সমস্ত আচরণ দেখিয়ে থাকে তা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা যাবে। পৃথিবীর ভূগর্ভস্থ উত্তাপ থেকে বিদ্যুৎশক্তি সংগ্রহের জন্যে সে দেশে যে সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান হচ্ছে তার উপর বিশদ তথ্যাবলী সংগ্রহ করাই হবে নতুন এই যন্ত্রটির উদ্দেশ্য। ইতিমধ্যে কামাসকাটকা অঞ্চলে আগ্নেয়গিরি থেকে সংগৃহীত উত্তাপ শক্তি দিয়ে তাঁরা উচ্চ চাপের জলীয় বাষ্প তৈরি করতে সমর্থ হয়েছেন এবং ঐ বাষ্পের সাহায্যে টারবাইন ঘুরিয়ে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বেশ কিছু পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তিও উৎপাদন করছেন। এটাই এখন সারা পৃথিবীর একমাত্র উল্লেখযোগ্য ভূ-তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র। উত্তপ্ত বাতাস কিভাবে টারবাইনের ব্লেডে ধাক্কা মেরে টারবাইনটিকে সবচাইতে বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন করে তুলতে পারে, সেটা জানার জন্যে তপ্ত গ্যাসের প্রবাহ রীতি সম্পর্কে নিখুঁত জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। দেখা গেছে, কোন গ্যাসকে ৭০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মত উষ্ণ করলে তার গতিবেগ গিয়ে দাঁড়ায় ঘণ্টায় প্রায় নয় হাজার মাইলের মত। এত দ্রুতগতিসম্পন্ন কোন তপ্ত বস্তুর ছবি তোলা কুশলীদের কাছে আজও পর্যন্ত একটি সমস্যাই থেকে গেছে। এ ছাড়া ধাতু বিজ্ঞান গবেষণা ক্ষেত্রেও একটি বড় সমস্যা হল, বিগলিত কোন ধাতুর আভ্যন্তরীণ কার্যাবলীর উপর অনুসন্ধান চালান। তাপের ফলে গলে

গিয়ে তাদের অণুপরমাণুরা কিভাবে চলাফেরা করে বা পরস্পর বিনাস্ত হয়, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এটা জানা খুবই দরকার। কিন্তু সাধারণ আলোর কাছে সমস্ত গলিত ধাতুই অস্বচ্ছ। অতএব তা দিয়ে ছবি তোলার প্রশ্নই ওঠে না। এবার নতুন এই এক্স-রে যন্ত্রটি সেই সমস্যারও সমাধান করে দিল।

এবার চা এবং পিল

আজ্ঞে হ্যাঁ, এবার পরিবার-পরিকল্পনার ব্যাপারে একটা নতুন সংবাদ পাওয়া গেল। পৃথিবীর কয়েকটি বিখ্যাত ওষুধ কোম্পানি এবার নতুন এক ধরনের জন্ম-নিরোধ বড়ি তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছেন যা বর্তমানে বহুল-প্রচলিত প্রায় সমস্ত রকম বড়ির চেয়ে নাকি অনেক কম ক্ষতিকর হবে। যিনি জন্মনিরোধ ক্ষমতা সন্ধ্যা বা রাতের দিকে সবচাইতে বেশি কার্যকর করে তুলতে চান, তাঁর বিকেলের দিকে ঠিক চা-পানের সময়েই এ ধরনের একটি পিল অর্থাৎ বটিকা খেয়ে নিলেই চলবে। বটিকা সেবনের চারঘণ্টা পরই এর গুণাগুণ সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং তা বজায় থাকে চব্বিশ ঘণ্টার মত।

বস্তুত গত দু এক বছর ধরে বিভিন্ন ধরনের জন্ম-নিরোধ বড়ি সম্পর্কে নানা রকমের অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। সাফল্যের দিক দিয়ে এদের প্রত্যেকটিই শতকরা প্রায় একশ ভাগই নির্ভরযোগ্য। কিন্তু নিয়মিত ব্যবহারের ফলে এদের দ্বারা যে সমস্ত শারীরিক অসুবিধে একে একে চোখে পড়ছে তাদের ঠিক উপেক্ষা করা চলে না। ক্ষতিকর ফলাফলের মধ্যে এক নম্বর হল, এই পিল সেবন করার কয়েকমাস পর থেকেই কারুর কারুর শরীরের রক্ত কেমন যেন জমাট বাঁধতে থাকে। কখনও বা এই পিল মেটাবলিজম বা বিপাক ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে শরীরের মধ্যে চিনি জাতীয় বস্তুর মাত্রা বাড়িয়ে দেয় এবং সেই সঙ্গে রক্তে কোলেস্টারল এবং ট্রাইগ্লিসারাইড যৌগের পরিমাণও। অবশ্য এ পর্যন্ত এমন কোন নির্ভরযোগ্য সংবাদ পাওয়া যায়নি যাতে করে বলা চলে এ ধরনের শারীরিক পরিবর্তন এখনই দেহের কোন ক্ষতি ঘটাচ্ছে। তবে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা মনে করেন, যদি এই ব্যাপারটি দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে তাহলে শেষ পর্যন্ত তা রীতিমত ভয়াবহ রকমের আশঙ্কারও কারণ হতে পারে।

আপাতত পরীক্ষা করে দেখা গেছে, নতুন এই বড়ি রক্তকে জমাট বাঁধিয়ে তোলে না এবং বিপাকীয় ব্যবস্থাকেও ব্যাহত করে না। এ ছাড়া মূল ওষুধের মাত্রা এই পিলে কম থাকায় শরীর সহজেই এটিকে বরদাস্ত করতে পারে। বিশেষ করে যাঁরা পুরোপুরিভাবে জন্ম-নিরোধ না করে সাময়িক সন্তানধারণ ক্ষমতা স্থগিত রাখতে চান অথবা যাঁরা প্রচলিত বড়িগুলি ঠিক সহ্য করতে পারেন না বিশেষজ্ঞদের মতে নতুন এই বড়ি তাঁদের ক্ষেত্রে খুবই প্রসু হবে। ইতিমধ্যে বৃটেনের কয় প্রতিষ্ঠান নতুন এই পিলের উপর বা পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। শতকরা আ ভাগ ক্ষেত্রে ফল খুবই আশাপ্রদ হয়ে তবে অবশিষ্ট কুড়ি শতাংশ মহিলা ক্ষেত্রে 'মাসিক কাল'-এর সময় বেশ কিছু ব্যাহত হয়। ব্যাপারটা ওঁরা খু দেখছেন।

নতুন উদ্ভাবিত এই জন্ম-নিরোধ পি স্ত্রী দেহজাত হরমোন ওয়েসট্রোজেনস- কোনটিই থাকে না। অথচ প্রচলিত পি গুলির এরাই প্রধান উপাদান। ওয়েসট্রোজেনরাই বিপাক-ব্যবস্থায় গো যোগ সৃষ্টি করে। তা ছাড়া শারীরিক ব্যাপারের উপরেও এদের প্রভ অত্যন্ত বেশী। কিন্তু নতুন পিলটি যে ধরনের হরমোন ব্যবহার করা হচ্ছে প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত মৃদু এবং শরীরের ঠি যে অংশে তার কাজ করার কথা মু সেখানেই সক্রিয় হয়। কাজ করার সম এরা সরাসরি চলে আসে আঠার মত জরায়ুর সমগ্রীর কাছে। জরায়ুর মুখে কাছে সোজা নলের মধ্যে এই বস্তুটি নিঃস হয়। যদি কেউ পিল ব্যবহার না করে তাহলে প্রতিবার মাসিকের পূর্বে এব পরে আঠার মত এই সামগ্রীটি কম ঘন হয়ে শুক্রকীট পুরু বা থকথকে হয়ে ওঠে। কিন্তু পরস্পর দুইটি মাসিক-কালে মধ্যবর্তী সময়ে যখন ডিম্বকোষগুলি উপযুক্ত হতে শুরু করে তখন ঐ পদার্থটি যথেষ্ট তরল হয়ে পড়ে। ফলে ঐ হাল্কা তরলের মধ্যে সাঁতার কেটে সহজেই শুক্র-কোষ গিয়ে ডিম্বকোষের সঙ্গে মিলিত হতে পারে। কিন্তু নতুন এই পিল সব সময় ঐ আঠার মত পদার্থটিকে হাল্কা তরল অবস্থা পেতে বাধা দেয়। ফলে এই পিল নিয়মিত যাঁরা ব্যবহার করবেন তাঁদের জরায়ু নলের মধ্যবর্তী আঠার মত ঐ তরল সব সময় জমাট বেঁধে থাকবে। শুক্র-কোষ আর এগিয়ে গিয়ে ডিম্বকোষের সঙ্গে মিলিত হতে পারবে না। অতএব গর্ভসঞ্চারও হবে না।

নতুন এই পিলটি সম্পর্কে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা দুটি কারণে যথেষ্ট আশাবাদী। এক, শরীরের অন্যান্য ব্যাপারে এর প্রতিক্রিয়া নেই বললেই চলে। না থাকারও কথা। কারণ ঠিক যেখানটিতে এর কাজ করার কথা সেখানেই শুধু তার উপস্থিতি ঘটে। দুই, নিয়মিতভাবে প্রত্যেক দিনই এই পিলটি সেবন করতে হয় বলে অবশেষে একটা স্থায়ী অভ্যাস কিছুদিনের মধ্যেই লাভ করা যায়। তাই হঠাৎ ভুলে গিয়ে কোন বিপত্তির সম্মুখীন হওয়ার কোন আশঙ্কা থাকে না।

সমরজিৎ কর

॥ ৬ ॥

১৯৪৪ সাল থেকে ১৯৪৯ সালের মধ্যে বম্বের বহু খ্যাতনামা প্রযোজক ও পরিচালকদের সঙ্গে আমার আলাপ হল। শবনম ছবির সাফল্যে আমারও খুব নাম হওয়াতে খুশীই হয়েছিলাম। কিন্তু মনে মনে একটি দুঃখ রয়ে গেল। আমার নিজস্ব স্টাইল বা গায়কী হিন্দী পাবলিক ই এখনও নিল না। অর্থকষ্ট হয়ত আমার আর হবে না, কিন্তু আমার মনকষ্ট যাবে না, যতক্ষণ না আমার নিজস্ব ধরনের সুর রচনা সাধারণ হিন্দী শ্রোতারা আদরের সঙ্গে না গ্রহণ করবে। এখানেও যেন বঙ্গালের গোঁ আমাকে পেয়ে বসল, আমি সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে তবে ছাড়ব।

দেব আনন্দের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৪৮ সালে। তখন সে সবেমাত্র তরুণ হিরো হয়েছে। দেব আনন্দ ছিল আমার গানে পাগল। বম্বের পালি হিলে থাকত দেব, তার বড় ভাই চেতন, ছোট ভাই বিজয় (গোল্ডি) আর বোনেরা থাকত। সন্ধ্যার পর ওদের বাড়িতে আমাদের আড্ডা বসত—সেখানে আমাদের বন্ধু গুরু দত্তও আসত। গুরু দত্ত ছিল আমার গানের অনেক ভক্ত। দেব ও গুরুর মত আমার গানের অনুরাগী ভক্ত বম্বেতে আর কেউ ছিল না। ওরা দুজনে প্রায়ই শায়ন-এ আমার ফ্ল্যাটে চলে আসত গান শুনতে। আলাপ-আলোচনার মধ্যে আমরা সবাই মিলে একটি নতুন চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলি এসব ইচ্ছাও দানা বাঁধল। কোন প্রকার ফরমুলার মধ্যে না গিয়ে আমাদের এই প্রতিষ্ঠান নতুন পথে যাবে এমন কথাও হত। দেব, চেতন, বিজয়, গুরু, সবাই আমাকে কোনপ্রকার আপোস না করে আমার নিজস্ব ধরনে সঙ্গীত রচনায় উৎসাহ দিত। তখন আমার মনে আত্ম-বিশ্বাস জাগল যে একদিন না একদিন আমার সুর হিন্দী ছবির মাধ্যমে সারা ভারতবর্ষে চাঞ্চল্য করে তুলবে। যে সুযোগের অপেক্ষা করছিলাম, তা এসে গেল। দেব নতুন প্রতিষ্ঠান করল—"নব কেতন" (নতুন পতাকা)—নাম দিয়ে। প্রথম ছবি স্থির হল "অফিসার"। পরিচালক চেতন। দেব হিরো, নায়িকা সুরাইয়া। আমি সঙ্গীত পরিচালক। ১৯৪৯ সাল। ছবিটি ভাল চলেনি। কিন্তু সুরাইয়ার গলায় আমার একটি সুর "মন মেরা হুয়া মাতোয়ালা" গানের, খুবই জনপ্রিয় হল।

শ্রীশচীনদেব বর্মন ও শ্রীমতী গীতা রায়

নবকেতনের হয়ে আমার দ্বিতীয় ছবি করলাম ১৯৫০ সালে—ছবির নাম "বাজী", পরিচালক ছিলেন গুরু দত্ত। দেব আনন্দ ও গীতাবলী প্রধান চরিত্রে। এ ছবি তোলার সময় আমি এবং গুরু সদাসর্বদা সঙ্গীত সম্পর্কে আলাপ-আলোচনায় ডুবে থাকতাম। সে তার ছবির পরিচালনার নতুন আইডিয়া আমাকে শোনাত, আমিও গানের সঙ্গীত রচনার বিষয় তার সঙ্গে আলোচনা করতাম। আমাদের দুজনের এই সহযোগিতা ছবিটির সাফল্যে সাহায্য করে। এখনকার হিন্দী চলচ্চিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকার শাহির লুধিয়ানভীকে আমিই প্রথম গান রচনার জন্য আহ্বান করি। "বাজী" ছবির গান-গুলি তাঁরই লেখা। যদিও লুধিয়ানভী তখন নতুন, তবুও নবকেতনের কর্তৃপক্ষ আমার এই নির্বাচনে কোন আপত্তি করেননি। প্রথম থেকেই গতানুগতিক ছন্দের আমি বিপক্ষে। যেসব গীতিকারের সঙ্গে আমাকে কাজ করতে হয় তাদেরকে

সহধর্মিণী মীরা দেবীর সঙ্গে সুর সাধনায় শচীন দেববর্মন

আমি আমার সুরের ছন্দ অনুযায়ী লিখিয়ে নিতে চেষ্টা করি। আমি শাহিরকে দিয়েও এইভাবে গান লেখানোর চেষ্টা করলাম। দুজনকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছিল, বহু সময় ব্যয় করে। কিন্তু আমাদের এই যুক্ত প্রচেষ্টা খুবই সাফল্যমণ্ডিত হল। এই ধরনের বহু পরীক্ষা আমি করেছি আমার সংগীত রচনায়। কোন কোন সময় তা খুবই সফল হয়েছে, কোন সময় আমি অকৃতকার্যও হয়েছি। আমার সংগীত পরিচালনায় নবকেতনের আরেকটি ছবি "কালাপানি"তে একটা গানের মুখড়াতে গজলের ছন্দ রেখে অন্তরা একেবারে গীতে সুর সংযোজনা করেছিলাম। গানটির প্রথম লাইন ছিল "হাম বেখুশিমে তুমকো পুকারে চলে গায়ে।" রফিকে দিয়ে গাইয়েছিলাম ওই গান। রফি আমার পরিকল্পনায় সুন্দর আমেজ দিয়ে গেয়েছিল গানটি, ঠিক যেমনটি চেয়েছিলাম।

নবকেতনে আমরা সবাই যেন একসূত্রে বাঁধা হয়ে গিয়েছিলাম। "বাজী" ছবিতে পরীক্ষা শুরু করলাম, শাহীরকে দিয়ে একখানা গজল লেখালাম। এই গজল সুরের সঙ্গে পাশ্চাত্য সুর মিশ্রণ করলাম। পরিচালক গুরু বা নবকেতনের কেউ এতে আপত্তি করল না। বরং নতুন ধরনের এই রচনার তারিফই করল। গানটির প্রথম লাইন "তদবীরসে বিগড়ী হুই তগদীর বনা লে।" গীতা রায় এই গানটি করেছিল। ছবি প্রদর্শিত হবার সঙ্গে সঙ্গে গানটি হিট হয়ে গেল। এই গানই প্রথম আমাকে সুর সংযোজনায় এক বলিষ্ঠতা এনে দেয়। 'বাজী'-র প্রায় সব কয়টি গানই খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। গীতা রায় এই ছবিতে গান করে খুব নাম করেছিল। অবশ্য ফিল্মিস্তানের "দো ভাই" ছবিতে এর আগে "মেরে সুন্দর স্বপনা বীত গয়া" গানটিও গীতার কণ্ঠস্বরে হিট হয়েছিল, যা থেকে তাঁর জনপ্রিয়তার সূত্রপাত। গীতা এর আগে কোরাসে গাইত।

আমিই প্রথম একক গাইবার সুযোগ দিয়েছিলাম। বাকী ছবিতে নায়িকার সব গানগুলি গীতার গাওয়া।

এরপরে "ফিল্ম আর্টস" নামে আরেকটি চলচ্চিত্র কোম্পানীর হয়ে আমি সঙ্গীত পরিচালনা করি ১৯৫১ সালে—ছবিটির নাম "জাল", পরিচালক গুরু দত্ত। এখানেও দেব নায়ক। এই ছবিতেও একেবারে আমার পছন্দ মত একটি গান রচনা করেছিলাম, নায়কের জন্য। কাকে দিয়ে এই গানখানা গাওয়াব সে কথা ভাবছিলাম, তখন প্রধান সব গাইয়ে রফি, তালাত, মুকেশ। কিন্তু ঠিক একই সময় হেমন্তকুমার বোম্বেতে এসেছিলেন, ফিল্মিস্তানে চাকরী নিয়ে, কিন্তু তখনও চলচ্চিত্রের প্লে ব্যাক করার কোন সুযোগ পাননি। স্থির করলাম এই গানটি হেমন্তকে দিয়েই গাওয়াব। হিন্দী উচ্চারণ স্পষ্ট করার জন্য হেমন্তকে খুব খাটতে বলেছিলাম তখন এবং অনেক অভ্যাসের পর হেমন্ত গানটি গাইল। এই একটি গানেই হেমন্ত হিন্দী ছবির জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হল। হিন্দী ছবিতে একটি নতুন গলা শুনে জনসাধারণও খুব খুশী হল। এই গানটির প্রথম লাইন ছিল "ইয়ে রাত ইয়ে চাঁদনী, ফির কাঁহা, শুন যা দিল কী দাস্তাঁ"। গীতাকে সামনে বসিয়ে অনেক খেটে আমার সুর ও আইডিয়া অনুযায়ী এই গানটি লিখিয়েছিলাম। গীতা ও হেমন্তকে এইভাবে আমি হিন্দী চলচ্চিত্র সঙ্গীতে এনে জনপ্রিয় শিল্পী করতে পেরেছিলাম। আমারও নিজের ক্ষমতার উপর তখন কিছুটা আত্মবিশ্বাস এসে গেল। যখনই কোন গানের সুর দিতাম, তখন সঙ্গে সঙ্গে এটা ও স্থির করতাম কার গলায় এই গান ভাল পরিবেশিত হবে।

নবকেতনের হয়ে "ট্যাক্সী ড্রাইভার" ছবির সঙ্গীত রচনা করলাম, (১৯৫৩), পরিচালক চেতন আনন্দ, নায়ক দেব। এই ছবিতে তালাত মহম্মদকে দিয়ে আমার একটি প্রিয় গান গাইয়েছিলাম। রফি, মুকেশ, হেমন্ত তখন আমার সুর সংযোজনায় গান করতে উৎসুক ছিল। কিন্তু এই বিশেষ গানটি তালাতের কণ্ঠে ভাল হবে বলে মনে ছিল আমার দৃঢ় ধারণা। কারণ গানের সুরে ছিল ছোট ছোট হালকা মুড়কী। তালাতের গলার বিশেষত্ব ছিল হালকা খটকা, লক্ষ্ণৌ ঢঙ এ মাজিত। তালাতকে দিয়ে গানটি গাওয়ালাম। সেই ছবির ওটাই হল সবচাইতে জনপ্রিয় গান। প্রথম লাইন—"যায়ে তো যায়ে কাঁহা।" এই ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করে সে বছর আমি বম্বের চলচ্চিত্র পত্রিকার "ফিল্মফেয়ার"-এর শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালক পুরস্কারটি পাই। (ক্রমশ)

বিজয় আনন্দ, শচীনদেব বর্মন ও দেব আনন্দ

করে সে সুর ভাঙ্গে, কীর্তন তো নয়, অন্য গান, এ-সব গান কি ওর আগে থেকেই জানা ছিল?

ঘরেও যেতে পারতাম, যাইনি। সেদিন উনি তো আমায় বকেননি, কিন্তু সেই না-বকাটাই ভাবলেশহীন নির্বিকার যেন কিছুই হয়নি সেই মুখ, একদম কিছু লেখা-পাত হয়নি এমনই একটা সাদা কাগজ, বাধা হয়ে দাঁড়াল। ভালবাসেন না, আমাকে আর ভালবাসেন না, বাসেন না যে তার কোনও স্পষ্ট প্রমাণ নেই, কিন্তু প্রমাণ না থাকাটাও যেন ও'র অন্যায়, আমার ভিতরটাকে দোলাতে থাকত। যেন আমাদের খেলার টীম থেকে একজন অন্য টীমে চলে গেছে। বিশ্বাস ভাঙা-টাঙা না কী যেন সেইদিন বলেছিলেন সুধীরমামা? ও'র এই বদলে যাওয়াটা তো একরকম বিশ্বাস ভাঙা, এই তো ক'দিন আগে, বাবা যখন এখানে, না বলে ক'রে, মা, তুমি আর বাবা এক দলে হয়ে গেলে, আমি আর সুধীরমামা আর এক দলে, যেন মুখোমুখি দুটো টীম, কিন্তু এখন কী হল, আমার দলে কেউ রইল না, কী করব, আমি একা, নাকি মনে মনে চলে যাচ্ছি বাবার দলে তুমিও আছ অবশ্য, কিন্তু তুমি তো মো

মনের ছবি : গ্রিগরের ঘোড়া

যে মার্কিন রকেট চাঁদে গিয়েছিল মহা-জাগতিক রশ্মি ভেদ করে, তার গতি ছিল অসাধারণ, কিন্তু অঙ্কে বাঁধা; মানুষের মনের রকেট তার চাইতে অনেক দ্রুতগামী এবং তা বিষয় থেকে কেমন করে বিষয়ান্তরে যায় তা লক্ষ করলে অবাক হবেন। অনিয়ন্ত্রিত মনের ছবি এত টেরা-বাঁকা উল্টোপাল্টা রেখায় ছোটে যে তা অনুধাবন করা কঠিন।

যেমন ভোর বেলায় আমার ঘুম ভেঙে গেছে আর ভেবে চলেছি :

মছলন্দপুরে — দক্ষিণ চাতরা-রায়পুরের সেই ছুঁচলো দাড়িওলা মুসলমান লোকটি, পুকুরে ডুব দিয়ে উঠল, তার দাড়ি থেকে বাঁকা স্রোতে হুড়হুড় করে জল নামছে, আমি গলা-জলে দাঁড়িয়ে আছি, পায়ের তলায় একটা গলদা চিংড়িমাছ চেপে ধরে, পাশেই ঘাস-ফোটা শুকনো ইছামতী নদী, বাঁশ জঙলাই থেকে একটা পেটসাদা ছোট-মতো মাছরাঙা পড়ল জলে, মাছ নিয়ে গিয়ে গাছের ডালে বসে গা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে গিলতে লাগল, লোকটা বললে, 'আপনা তোম্পার বাড় কমনে?' বুঝতে পারছিলাম না ভাষাটা। বন্ধু সহজ বাংলা করে দিলে, 'হাঁ গা, তোমার বাড়ি কোথা?'

মেটিয়াবুরুজের দর্জি হাসমত বলে-ছিল, 'বর্মা মুল্লুকের রাজধানী রেঙ্গুনে ছিলাম বিশ বছর, বর্মী মেয়ে বিয়ে করে-ছিলুম চারটে তার ছেলেমেয়ে হয়েছিল, প্লেগে দেখা দিতে সব ফেলে রেখে পালিয়ে এলুম। তা ওরা রেগে গেলে বলে, 'ফু আনে তুরা মে।' জুতো মেরে মুখ ছিঁড়ে দেব।'

আর বিড়লাপুরের রাজ্জাক ডাক্তারের কাছে কালো পাথর চেহারা, গলায় তক্তি বাঁধা, তাতে আরবী লেখা, লোকটাকে কোথায় কি কাজ করে শুধোতে বলেছিল : 'হুড্ গরে হানি মাফি!'

আমি তো বক দেখলাম।

লোকটি 'নোয়াখালির। পোর্ট কমি-শনের জাহাজে কাজ করে। তার কাজ নাকি নদীর জল মাপা। 'হুড্ গরে হানি মাফি' হল — ফড ঘরে পানি মাপি!

নোয়াখালির ম্যালেরিয়া ডিপার্টমেন্টের ফালতু কাজ নেই, কম্ম নেই, শুধু খাতা সারা, ব্যানার্জিবাবু, পদ্মাপার বরিশালের লোক। তিনি বলেন, 'তোমার কতা হুঁইনা, গোরাও হাসবো।' তোমার কথা শুনে, ঘোড়াও হাসবে। এটা হল ঢাকাই কুট্টিদের ভাষা!

আমাদের মুসলমান পরিবারের মধ্যে যে

কথাবার্তা চলে, বাইরে এক পা বাড়ালেই তার গতি চেহারা পাল্টে যায়।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় বল-ছিলেন, যেসব নতুন শব্দ পান তা অর্থসহ সংগ্রহ করলে কিন্তু বাংলা ভাষার উন্নতির জন্যে অনেক কাজ করা হয়। যেমন, গরুর গাড়ির নানান পার্টস আছে, সে সবের নাম কি?'

মনে মনে বলে গেলাম : প্যাঁপ, চাপা, ঠেকো, ধুরো, পাকি, হাল, বংকিল, চিমাল, তুকাঠ, কড়, জোল, হাঁড়ি, এক্সেল ইত্যাদি।

চিত্তবাবু বলছিলেন, 'ভারের হাত থেকে বাঁচিয়ে মুক্ত হবার পর রাজধানীকেন্দ্রিক বা নগরকেন্দ্রিক সাহিত্য না হয়ে যাতে দেশের সার্বিক লোকাল ছবি প্রকাশ পায় তার জন্য প্রদেশে প্রদেশে প্রেস পাব্লিকে-শন করা হল। সেখানে লোকাল পিকচার ফুটল। মানুষের চিন্তাভাবনা অভাব-অভিযোগ ধরা পড়তে লাগল। এতে কেন্দ্র থেকে সারা দেশকে বুঝতে সুবিধা হল। আর আমাদের দেশে প্রায় সম্পাদকমশায়রা চাকরি করেন। নিজের কাগজে নিজে সম্পাদক হলে নতুন লেখক তৈরি করা সহজ। কিন্তু চাকরিজীবী সম্পাদক চাইবেন, নামী লেখক। যাঁর লেখা নিয়ে গোল বাধলে লেখক দায়ী হবেন, কৈফিয়ত দেবেন। কিন্তু নতুন লেখক হলে, তাঁর লেখা এডিট করতে হয়, অত কষ্ট কে করবে, যদি শেষ পর্যন্ত লেখাটা না দাঁড়ায়, বাজে পরি-শ্রম, অতএব......আজকাল নগরসাহিত্যে সবাই এক কথাই যেন নানা রঙে-ঢঙে লিখ-ছেন, তাতে সারা দেশের ছবি ফুটছে না। আর এটা সত্যি যে, বিদেশের অর্থাৎ য়ুরোপের যে-কোনো একটা নাম-না-জানা লেখকেরও একটা বই পড়ুন, দেখবেন, তিনি যে বিষয়ে লিখেছেন, কত খোঁজ নিয়েছেন!'......

ছোট মেয়ে অনিমা জিনাত ঘুমোতে ঘুমোতে হঠাৎ হেসে উঠল। তারপর আবার কান্নার শব্দ। ওর পেটটা গরম হয়েছে। তাই ওষুধের এ্যাবজর্ব করতে পারছে না। ঠাণ্ডা লেগেছে।

মহা আতঙ্কে আছি। একটু দূরের গ্রামে দারুণ বসন্তের মহামারি দেখা দিয়েছে। কারো একটু জ্বর হলেই ভয় লাগে। এই বুঝি বসন্ত হল।

সোজনে ফুল কুড়িয়ে এনে সিম দিয়ে রান্না করে, ভাজা করে খেতে বলেছি। লাউ-টাও নাকি ভাল। বসন্তের প্রতিষেধক। করলা উচ্ছেটা সব চাইতে বেশি ভাল। বসন্তের দাগে ভরা বিশাল দেহী লাউ হাতে বাঙাল বন্ধু সুধাকর বাবু বললেন, লাউ দিয়ে ল্যাঠা মাছ রান্না ভাল লাগে!

ল্যাঠা দেখুনে, বললাম, খাবেন না। ল্যাঠা, কই, মাগুর, সিঙ্গি জাতীয় কালো মাছে নাকি বসন্তের জীবাণু থাকে। আমি শীতকালে কই মাছ ধরে দেখেছি তার গায়ে বসন্ত ফুটেছে। মনে হয়েছে, এটা বোধ হয়—মাছগুলো শীতে জড়সড় হয়ে বসে থাকে, অল্প জলে পোকা জন্মায়, বিশেষ করে কেউট জাতীয় এক রকম পোকা—সেগুলো মাছের গায়ে বসে রক্ত খায়—ঘা করে দেয়। শ্রীমতী বললে, 'না, এই তো বসন্ত ফুটেছে—ফেলে দাও ড্রেনে—সাবান দিয়ে গরম পানিতে হাত ধুয়ে এস।' বললাম, 'দেখ, পিত্ত ফোটেনি তো? শীত-কালে আমরা লেপ কাঁথার তলায় শুই, পেট গরম হয়, পিত্ত বেশি পড়ে, সেইটা ফুটে বের হয় বোধ হয়। শীতে গাছের পাতা ঝরে যায়। বাকল ওঠে। সাপের খোলস ছাড়ে। এ ঋতুতে বার্ষিক পরিবর্তন আসে। নব জীবন আসে।'

শ্রীমতী মানে আমার সহধর্মিণী, সর্বদা যদিও একমত নয়—সে অবশ্য অন্য কথা ভাবে, সে বলে, 'তাহলে কি মানুষও চামড়া ছাড়তে চায়?'

'হয় তো চায়, পারে না, মরে যায়।'

'তা তোমাদের জনস্বাস্থ্য বিভাগ প্রতি জনের টিকে দিতে আসে না কেন?

লাউ দিয়ে ল্যাঠা মাছ রান্না ভাল লাগে

তাদের ডাকলেও আসে না। তাছাড়া ডাকতেই বা হবে কেন? বি-ডি-ও অর্ডার দেবেন পৌষ মাসের মধ্যেই সমস্ত গ্রামের প্রত্যেকটি মানুষকে টিকে দেবার। বজ্র পাখির মতন কখন ছুঁয়ে ছুঁয়ে এসে দু' চারজনকে টিকে দিয়ে চলে যায়। ম্যালেরিয়া ডিপার্টমেন্টের লোকগুলো কি এখনো কোটি কোটি লোক ঘেঁটে ম্যালেরিয়ার বিষ খুঁজে বেড়াচ্ছেন? দেশে বসন্ত কলেরার মড়কে মানুষ শেষ হয়ে যাচ্ছে আর তাঁরা ভারতবর্ষকে 'ম্যালেরিয়া শূন্য' দেশ বলে ঘোষণা করবার জন্যে হাজার হাজার মানুষকে চাকরি দিয়ে যেন অনাথ পুষছেন। লোকগুলোও অকম্মা হয়ে যাচ্ছে। জন-সাধারণ তাঁদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। সেই হোমিওপ্যাথির গবেষক ডক্তার যেমন আপনার নাকের ডগায় বিষাক্ত একটা ফোড়া হলে আপনার সাতপুরুষ আগে থেকে হদ্দহদিস নিতে থাকেন এবং ছমাস হদিস নেবার পর একটা অদ্ভুত হদিস তৈরি হতে হতে রোগী টেঁসে যায় এও তেমনি!'...

চালচিত্রের পড়ে পণ্ডিত চূড়ামণি ডঃ চট্টোপাধ্যায় মশায়ও নাকি খুশী। জরুরী তলব পাঠিয়েছেন ঐ 'মাংস এবং কসাইটা নাকি তাঁর ভাল লেগেছে খুব।'

কিন্তু চাটার্জিবাবু, সব কথা কি লেখা যায়?

ধরুন, যে গাড়োয়ানটা তার গরুকে হরদম চাবুক দিয়ে পিটছে তাকে নির্মম বলে হয়তো চড় বাগিয়ে এলেন কেউ কিন্তু একটু ভেবে দেখেছেন কি, মায়ের চাইতে মাসির দরদ বেশি হতে পারে না। আমি নবাহার গাড়োয়ানকে তো দেখেছি এক হাঁটু কাদা রাস্তায় যখন সে বাঁশের বোঝাই গাড়ি নিয়ে যায় কাদা দেখে ভূত হয়ে আর গরু দুটোকে চামড়ার চাবুক দিয়ে পেটে মরিয়া হয়ে—একদিন সে নিজেই অজ্ঞান হয়ে কাদার ওপরে পড়েছিল—পেটে অম্বলের ব্যথা উঠলে ট্যাঁকে খোঁসা শিশি বার করে সোডা খায় ঢকঢক করে—সে যখন মাল খালাস করে গাড়ি নিয়ে বাড়িতে ফিরে গরুর যত্ন করে সেটা দেখলে খুশী হবেন। যদি খড়ভুষি দিতে তার স্ত্রী দেরি করে তবে তারও পিঠে পড়ে চামড়ার চাবুক। এসব জীবনের প্রকৃত কথা লেখা হয় নি। কে তা লিখবে? যাঁরা স্মরণীয় বরণীয়, রোজ সকালে বিকালে সন্তুষ্ট মনে তাঁদের গোলাপ দিয়ে পুজো করেই কাজ সাঙ্গ! আমি তো সামান্য নগন্য এক ফিচার লিখিয়ে, যাঁরা গণ্যমান্য সাহিত্যিক আছেন তাঁদের...

সেই বুড়ী পীরিনী মা বলেছে কাউকে আঘাত দেবে না। স্টপ। কানমলা!...

আমার ভায়ের ছোট ছোট ছেলে দুটো কানমলা খেতে, ওঠ-বস দিতে খুবই খুশী। তারা মনে করে ওটা এক রকমের আমোদ!

আমার ছেলে অশোক ফেরদৌসী ছ' বছর—নট নড়ন-চড়ন! শয়তান! ছোটর ছেলে বলে, 'বড়বাবু তুই কানমলা খা! ওঠ বস কর!'

আমি তাই করতে থাকলে মা, বউমা (ভাদ্রবধূ), স্ত্রী সবাই হাসতে থাকে। কেন, হাসে কেন?

হাসিটা কোথা থেকে আসে?

অশোক হঠাৎ আকাশে দেখায় 'ঐ দেখ, শকুনি নামছে। শোঁ শোঁ শব্দ। তীর বেগে

নেমে গেল। জানো বাপী, শ্মশানে রোজ গরু পড়ছে। একটা লোক সাইকেলের পেছনের সিটে করে বেঁধে এনে একটু আগে একটা বাছুর ফেলে দিয়ে গেল!'...

ভীষণ গরু মরছে।

'কি করে আকাশ থেকে শকুনিরা দেখতে পায় বাপী?'

খুব বসন্ত হচ্ছে।

'ওদের চোখে কি দূরবীন আছে?'

গরুদেরও বসন্ত হচ্ছে। অথচ হোটেল-খানায় কসাইখানা উজাড় করে মাল যাচ্ছে।

'শকুনদের বসন্ত হয় না কেন?' আট বছরের মেয়ে মনিরা জিনাত শুধোলে।

অশোক বলে, 'হলে ওদের ডাক্তার ডাকবে, না হলে ৫০০ বছর বাঁচে কি করে?'

'৫০০ বছর না হাতি! কেউ ধরে তার বাপ ঠাকুর দাদার আমল থেকে সাতপুরুষ পরীক্ষা করে দেখেছে?

বিদিরা রামচন্দ্রপুরে গিয়েছিলাম গত-কাল। প্রতি বাড়িতে বাড়িতে গেলাম রাইটার্স বিলডিং থেকে বসন্তের মড়ক প্রতিরোধ করার জন্যে যে বাবুবাহিনী যাচ্ছেন প্রায়ই, তাঁদের সঙ্গে। বাবুরা সবাই সাহেব। সুট পরা। অনেকেই পূর্ববঙ্গীয়, পূর্ববঙ্গীয় ভাষা আমার খুব ভাল লাগে। তার টান টোন—রসিকতা।

ঘরে ঘরে রোগী। কী বীভৎস!

কলা পাতায় সরষের তেল মাখিয়ে শোয়ানো আছে দু' বছরের বাচ্চা মেয়েটা? বসন্তর গুটি ছেয়ে গেছে সর্বত্র। কাপড়ে শোয়ালে জড়িয়ে ধরে। ছাড়াবার সময় চিৎকার করে। একটা বুড়ো লোক—বাড়ির কর্তা, মরে পড়ে আছে দাওয়ায়। কাঁদবার লোক নেই। বুড়োর মেয়ে আছে শ্বশুর বাড়ি। খবর দেবার পরও তাকে আসতে দেওয়া হয়নি। দুটো জোয়ান ছেলে শয্যা-শায়ী। দুটি বউ। চারটি ছেলে। সবাই পড়ে আছে কে কার মুখে জল দেয়!

পঞ্চাশজন মারা গেছে। রোজ দুটো চারটে করে মরছে। গ্রামে আতঙ্ক। পাশের গ্রামে লাল নিশান পোঁতা। শীতলা পুজো হচ্ছে। আর একটি বাড়ি থেকে মড়া বেরুল। বলো হরি হরি বোল।...

অন্য একটি বাড়ি। মা ভাল আছে। চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে এলো বুকে। স্তন থেকে দুধ ঝরে পড়ছে। তার বাচ্চা আর টানতে পারছে না। কোলে ধরা আছে বসন্তর গুটি পাকা বাচ্চা! নাভিশ্বাস টানছে!

এদিকে পাশাপাশি কবর। বাপ মা ছেলে-মেয়ে শুয়ে আছে।

সৎকার করার লোকের অভাব।

পথ নেই সরকারী গাড়ি যাবার।

বাবুরা হেঁটে আসেন তিন চার মাইল বাস রাস্তা থেকে। ঠিকে হাসপাতাল খোলা হয়েছে। কিন্তু শেষ দশায়। না না আর

কোনো বাড়ি যায় না। এসব দেখা যায় না।

ভগবান যদি থাকেন আপাতত তিনি নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে এখান থেকে পালিয়েছেন।

আল্লাও কি দেখতে পাচ্ছেন না কবর-গুলো?

ঐ সব নিষ্পাপ শিশুদের কিসের অপরাধ? কার পাপে কার দণ্ড?

কিন্তু পৃথিবীর ভার তো কমানো চাই। তাহলে যুদ্ধ বন্ধ কেন?

কি খাচ্ছেন?

'মাংসের ঘুগনী।'

খাবেন না।

'কেন?'

মাংস ওতে নেই, পাঁটা খাসী ছাগলের বাসি মাছিধরা আধপচা নাড়ীভুঁড়ি কুঁচোনো ওতে আছে—মাংস নেই। ব্যাধি হবে। বসন্ত, কলেরা, আমাশা।'

কি খাচ্ছেন?

'আইসক্রীম।'

খাবেন না।

'কেন?'

'বরফকলের কাটা আইসক্রীম তৈরির কার-

থানায় গেলে দেখবেন চৌবাচ্চার মধ্যে যে জল এনে রেখে জমানো হচ্ছে তা কত দূষিত। ঐ যে প্রেস কোয়ার্টার্সের গায়ে পথের ধারে, সবুজ বর্ণের শ্যাওলা জমা এঁদো ডোবা, ওর জলে প্রেসেরা নোংরা কাপড় চোপড় ধোয়। চৌবাচ্চার জলে বড় বড় পোকা। এ সব খেলে কলেরা হতে পারে।'

স্কুলের ছেলেগুলো তো খুবই খায়।

ভারত আমার সোনার ভারত, এর বাতাসে প্রতি ধূলিকণায় বিষ কিন্তু রৌদ্ররশ্মি যদি না সেই সব বিষ মেরে ফেলত অরক্ষিত অনিয়ন্ত্রিত, আমাদের কোটি কোটি জীবন বাঁচত না। কিন্তু বেঁচে আছি কি?

কজন বেঁচে আছি?

আমরা তো আধ মরা। যাদের হাতে কাস্তে হাতুড়ি তারা আধমরা। শুধু শিল্পীদের ডাক দিয়ে এদের বীর্যবন্ত প্রতীকী মূর্তি করা হয় শিল্পীদের দিয়ে। শিল্পীর করেও সুখ, আমাদের দেখেও সুখ। এর নাম আর্ট!

কিন্তু কেন বসন্ত হল বিমিদা রাম-চন্দ্রপুরে?

শীতলা মায়ের মন্দিরের একটা পাঁঠা নাকি চুরি করে খেয়েছিল কজন লোক। তা সব কজনের বসন্ত হল।

যাতা সব!

কুসংস্কার। বাজে গল্প।

কিন্তু দুর্দিনে বুড়ো পাড়ুতলা পাঁঠার মাংসে এ সময় শীতকালে বসন্তের বিষ থাকা কি খুব আশ্চর্য? আর সেই পাঁঠাটা যদি বৈশাখেও খাওয়া হয়ে থাকে?

রক্ষা করো মা শীতলা দেবী! সবই তোমারই মহিমা।

একটি সুন্দরী তেড়ুকী তাকে আমি চিনি না, বলছিল, 'আপনার চালচিত্তির পড়লে পরাচিত্তির করতে হয়। ওটা কি সাহিত্য?'

বললাম, না। আত্মারহ্যাফি অব আওয়ার ভিলেজেস। কে ভাল বলল কে মন্দ বলল আমার আসে যায় না। আমি মিথ্যা লিখি না। যেটুকু বানাই সে শুধু ভাষার বা সামাজিক ভদ্রতার শালীনতার জন্য। লোকে যে ভাষায় কথা বলে তা যদি সত্যিই লেখা যেত তাহলে 'পরাচিত্তির' কেন ধিক্কারে লজ্জায় ঘৃণায় গায়ে কেরোসিন মেখে, খাঁড়ি অমন শ্রীঅঙ্গে দুর্গন্ধ কোনদিন না মেখে (আর্ট ফর আর্টসেক) পেট্রল বা গ্যাসোলিন মেখে আগুনে ধরিয়ে দিতেন।

মাইরও ডাকছে। সকাল হয়ে গেছে। ছোট মেয়েটা বলছে, 'বাবার কাছে যাব।' 'না, এখন লিখছে। বকবে।'

আমি বকি?

লোকে বলে খবে ঠাণ্ডা লোক?

সে তো বাইরে। স্ত্রীর কাছে?

ওটা কি সাহিত্য?

বিমলা-দা বলেন, স্ত্রীর কাছে একটু রাগ দেখাবে, নইলে পুরুষ বলে মানবে না।'

পুরুষ!

নারী!

পুরুষ-নারী—ছেলেমেয়ে:

ছেলেমেয়ে আমার এবং সবার। সবায়ের ছেলেমেয়েরা আইসক্রীম খাচ্ছে, ঘুগনি খাচ্ছে। অথচ টিকা দেওয়া হচ্ছে না, ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে না।

বউ বলে, 'আর দিয়েও তো হচ্ছে! রাজার হল। মায়ের হল। তাঁর তো দুবার বসন্ত হল? কোনো পুরনো থিসিস চলছে না। আজকের বৈজ্ঞানিক তথ্য কালকে অচল। মশা রয়েছে, ম্যালেরিয়া গেল কেন? ম্যানিয়া আবার ভাল নয়। সাহিত্যিকদের যেমন ম্যানিয়া কিসে সাহিত্য হল কিসে হল না সর্বদা সেই লক্ষ্য। তোমরা জীবনের সুরুচির সাধক। সেই সাধনাকেই তো সাহিত্য বল? তাহলে সাহিত্যে নোংরামি ঢোকাচ্ছ কেন? আল্লা যদি মনুষ্য হয়, নররূপে তা হলে শয়তান। নিরীশ্বরবাদী মানুষ তাহলে শয়তান। রবীন্দ্রনাথ গেটে ফেরদৌসী সাদী লিও টলস্টয় সেক্সপীয়ার এঁরা ঈশ্বর মেনেছেন—এঁরা কি বোকা ছিলেন? দুঃখে ধান্ধায় দারিদ্র্যে কষ্টে অত্যাচারিত নিপীড়িত মানুষ তার মনের সুকুমার বৃত্তি হারিয়ে ফেলে যদি স্রষ্টার ভূমিকায় নামে তার সৃষ্টি কি হবে? গান্ধীজী কি বলেন নি 'ক্ষুধিতের সামনে ভগবান আসেন খাদ্য রূপে।'

'ভগবান বেচারাকে মুক্তি দাও, বড় বুড়ো হয়ে গেছে। বড় ব্যবহৃত হয়ে গেছে। বুড়োর ন'কোটি নিরেনব্বই লক্ষ কোটি বছর বয়েস। পায়ে গোদ, চোখের পাতা দেড় হাত ঝুলে পড়েছে। বিরাট ভুঁড়ি—ধর্মের ইঁদুররা তার মধ্যে বাস করে, নড়ে

বসতে পারেন না—তিনি ছেলেমেয়েদের কার মশারী নেই, কার শাড়ি নেই, কার কলেজের মাইনে বাকি, কে কার জমি কেড়ে নিয়েছে, কার রাজ্য কেড়ে নিয়েছে, কার স্বরাষ্ট্র দপ্তর কেড়ে নেবার জন্যে নেড়া ওল গরম হয়েছে—সবই তিনি দেখেন জানেন বোঝেন অনুভব করেন কিন্তু তাঁর করার শক্তি নেই কিছু। তিনি যে নড়তে পারেন না, শিব—পাথর!'

তবু সেই শিবের মধ্যে সুন্দরের সাধনা করেন কারা? সাহিত্যিক শিল্পীরা না? বৈজ্ঞানিকরা?

তাঁরা পথ করে দেন? কিন্তু সৌন্দর্যের সংজ্ঞাটি কী দেবেন তাঁরা?

ফুল ফোটা কি মিথ্যা?

সেই জন্যই তো বসন্ত কাল আসে।

আবার বসন্ত?

হাঁ, ফাগ ছড়াবার দিন আসছে। কৃষ্ণ-চূড়া জ্বলছে গাছের ডালে। শীতে তার মজ্জায় সৃষ্টির গোপন ক্রিয়া চলে। তারপর ফাগুনে আকাশ লাল করে দেবে। রাধাদের গায়ে ফাগ দিও তখন। বসন্তের বিষ নাশ হবে। নিজেও ফাগ মেখো। কোরো কোলা-কুলি, ঢলাঢলি। শালী শেলেজ নিয়ে কিন্তু সাবধান।

উদ্দাম বেলাচারের নেশা দিন দিন সাহিত্যে সিনেমায় পোশাকে—অফিসে কলেজে হোটেলে—রাস্তায় ঘাটে বাড়ছে।

বিপ্লব তাহলে আসায়? তাই মাক্সের হ্যাটের পদুলের নিচে ঃ চেয়ারম্যানের চীন আক্রান্ত হতে পারে, বিপ্লব প্রস্তুততর করুন।

কাস্তে কুড়ুল ফেলে ছুটে এলুম। ওমা, দেখি মাঠ ফাঁকা। আমি বলি ওরা পান্তা ভাত। একেবারে 'দোয়ানি'! তাই বা খাবে কি দিয়ে? পিঁয়াজ লঙ্কা যে চাষীর বাড়ির ছেলের হাতে। তার হাতে এমিল জোলা, ডস্টয়েভস্কি, গোর্কি, রোলাঁ, লিও টলস্টয়, হেমিংওয়ে, মিখাইল শলোখভের নিরেট হেঁতালের ডাণ্ডা! বীরভূঁইয়ের তলতা বাঁশের ডগলাই নয়।

'অ্যাণ্ড কোয়াইট ফ্লোজ দি ডন' কোনো এক বাঙালী কৃষক জোয়ানের মধ্যে এই শীতের দিনে তাপ সংগ্রহ করছে, ধীরে বঁধু ধীরে।

বসন্ত আসুক। রক্তপরাগ ঢালা। রূপময়, গন্ধময়, মধুময়।

আকাসিয়ানা সূর্যমুখীর বনে তোমার মাথার রুমাল উড়ছে। তোমার দুরন্ত যৌবনের ডাক শুনে ঃ

আসছে, ঘোড়সওয়ার কসাক গ্রিগরি আসছে। পথ ছেড়ে দাও।

—আবদুল জব্বার

ললিত কলা অ্যাকাডেমি ও অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর উদ্যোগে অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে জার্মান শিল্পী কার্ল এরিখ মুলার-এর একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে শিল্পীর ভারতবর্ষে ও অন্যান্য দেশে আঁকা কালি-কলম, চারকোল জল ও তেলরঙের ৭৩ খানি ছবি দেখা যায়।

মুলার হেল শহরে ১৯১৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতাও ছিলেন শিল্পী—সুতরাং বংশানুক্রমেই তিনি শিল্পপ্রতিভার অধিকারী হন এবং গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রুশ বন্দীশিবিরে থাকাকালীনই তিনি স্বাধীন শিল্পচিন্তা শুরু করেন ও পরে হেল শহরের আর্ট কলেজের স্নাতক হন। মুলার অল্পকালের জন্য দুবার ভারতবর্ষে আসেন। প্রথম আসেন দিল্লিতে ১৯৬৬ সালে ললিত কলা অ্যাকাডেমির আমন্ত্রণে। সেবার তিনি কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ শহর ঘুরে যান। দ্বিতীয়বার আসেন ১৯৬৮ সালে, দিল্লিতে ত্রিবার্ষিকীর (Triennale) অনুষ্ঠান উপলক্ষে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে তিনি অনেকগুলি ছবি আঁকেন—বলা বাহুল্য সেইগুলিই প্রধানত এই প্রদর্শনীভুক্ত।

মুলার প্রধানত গ্রাফিক শিল্পী এবং গ্রাফিক শিল্পী হিসাবেই তিনি অধিক পরিচিত। এমন কি পঞ্চাশ দশকের মধ্যকাল পর্যন্ত গ্রাফিক শিল্পের মধ্য দিয়েই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। শিল্পীর অঙ্কনরীতি রিয়ালিস্টিক ও ক্ষেত্রবিশেষে যেন মনুমেন্টাল—অনেক স্থলে রীতির দিক থেকে কেথে কোলভিৎসের রচনার কথা মনে করিয়ে দেয়। বিভিন্ন দেশের তথা ভারতের নরনারী, প্রাচীন মন্দির, মসজিদ, রাস্তা বা স্মরণীয় কোনও দৃশ্য, যা তাঁর চোখে ভাল লেগেছে তাই তিনি এঁকে গেছেন। শিল্পীর রেখা তথা তুলির টান বলিষ্ঠ ও স্থলবিশেষে গ্রাফিক শিল্পের মত সূক্ষ্ম—ফলে প্রত্যেকটির মধ্যেই বিষয়বস্তুটি যথার্থভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রদর্শনীতে কয়েকটি ইমপ্রেসানিস্টিক স্কেচও দেখা যায়। কলম তথা তুলির নির্ভুল টান দেখে বোঝা যায় যে, সেগুলি শিল্পীর হাত থেকে অক্লেশে ও অবলীলাক্রমে বেরিয়ে এসেছে। তবে এ স্কেচ ভিন্ন শ্রেণীর, টপলাস্কির রেখাজাল এখানে দেখা যায় না। কয়েক স্থলে আবার তিনি আকারকে নানাভাবে বিভক্ত করে বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করেছেন, যেমন সিকান্দ্রা। নীলরঙপ্রধান বম্বে অন নাইট ইমপ্রেসানিস্টিক রচনা হিসাবে উল্লেখযোগ্য। আকাশের বুকে চাঁদ, পাশে শায়িতা নীলবসনা সমুদ্র ও পুরোভাগে বিচিত্র আলোকমালায় সজ্জিত উচ্চ সৌধশ্রেণীর সম্মুখে সচল ছায়ার মত নরনারীর ভিড়। তবে প্রকৃতপক্ষে মুলারের গ্রাফিক জাতীয় ছবিগুলিই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রেখা ও অভিব্যক্তি, বিশেষ করে অঙ্কন পদ্ধতির বলিষ্ঠতাই এগুলির প্রধান সম্পদ। এই প্রসঙ্গে উইদাউট শেলটার, রিলিজো শ্রেণীর ইন্ডিয়ান কাপল, টেম্পল অ্যাট দি গ্যাঞ্জেস-এর নাম করা চলে। শিল্পীর কয়েকটি প্রতিকৃতি জাতীয় রচনাও অনেকের ভাল লাগে, যেমন উওম্যান ফ্রম ক্যালকাটা, ভিখারী, যার দুটি চোখের করুণ চাহনীর মধ্য দিয়েই দৈন্য ও অভাবের ভাষা ফুটে উঠেছে ও বৃদ্ধা রমণীর রেখাজালে ক্ষতবিক্ষত মুখমণ্ডল বা পরলোকগত শিল্পী নিখিল বিশ্বাসের প্রতিকৃতি। শিল্পীর কয়েকটি স্কেচ উপভোগ্য। দুটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হল-সাইকেল রিকশা মাদ্রাজ ও অন দি ক্যালকাটা এয়ার পোর্ট। দুটিই ইমপ্রেসানিস্টিক। অপরাপর ছবির মধ্যে মাদার ইন্ডিয়া, মুন ওভার বম্বে ও বিশেষ করে সমসাময়িক রীতিতে আঁকা মেডিটেটিং পিলগ্রিম উল্লেখযোগ্য।

সাইকেল রিকশা (মাদ্রাজ) —কার্ল এরিখ মুলার

বিভিন্ন শিল্পীর প্রদর্শনীতে নানা ছবি দেখা যায়, কয়েকটির মধ্যে হয়ত প্রতিভার স্বাক্ষরও থাকে। কিন্তু কমক্ষেত্রেই কোনও রচনা দেখা মাত্রই বলা যায় যে এটি বিশেষ কোনও শিল্পীর সৃষ্টি। অর্থাৎ শিল্পীর নিজস্ব স্বাক্ষর তথা ব্যক্তিত্বের পরিচয় অতি অল্প ক্ষেত্রেই চোখে পড়ে। শিল্পী শ্রীমতী অরুন্ধতী রায়-চৌধুরী সেই হিসাবে ব্যতিক্রম। অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে তাঁর সাম্প্রতিকতম কাজ দেখে সেই কথাই মনে হল।

শিল্পী হিসাবে শ্রীমতী অরুন্ধতী পরিচিত এবং অল্প কয়েকজন মহিলা শিল্পীদের মধ্যে তিনি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। প্রদর্শনীতে তেলরঙে আঁকা ১৪টি রচনা দেখা যায়।

✻

শিল্পীর অধিকাংশ ক্যানভাসই বড়, এবং সমগ্র রচনা ক্ষেত্রটিকে তিনি বিভিন্ন কোণ থেকে বিভক্ত করে পৃথক পৃথক ক্ষেত্রগুলি নানা রঙে ভরিয়ে ফেলেছেন ও সেই সংগে তার ওপর নানা কারুকার্যের সৃষ্টি করেছেন। শিল্পী উজ্জ্বল বা সোচ্চার রঙের পরিবর্তে অধিকাংশ স্থলে কোমল রঙ ব্যবহারের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন, বিশেষ করে লাল ও কমলা রঙের স্থলে নীল সবুজ ও বেগুনী জাতীয় মৃদু ও কোমল রঙ ব্যবহার করেছেন। এই বিভিন্ন রঙের নানা স্তর ভেদের মধ্য দিয়ে অধিক রচনাতেই একটি হালকা, স্ফটিক জাতীয় স্বচ্ছতা ও কারুকার্য ফুটে উঠেছে। তাই মূলত শ্রীমতী অরুন্ধতীর রচনা কল্পনা-ধর্মী। শিল্পী হিসাবে রঙের ছন্দ সৃষ্টি করাই তাঁর বৈশিষ্ট্য এবং এর মধ্য দিয়েই তাঁর শিল্পীসত্তা আত্মপ্রকাশ করেছে। শিল্পীর রচনাবলী এক শ্রেণীর নয়। কয়েকটি বিষয়বস্তুমূলক, যার ভেতর দিয়ে তিনি নিজস্ব কোনও বক্তব্য প্রকাশ করতে চান, যেমন ভিশন। অজন্তা ও অবিশ্বসের অন্ধকার গুহার মধ্য থেকে যেন চেতনালাভ করে কেউ নবজীবনের অধিকারী হয়ে
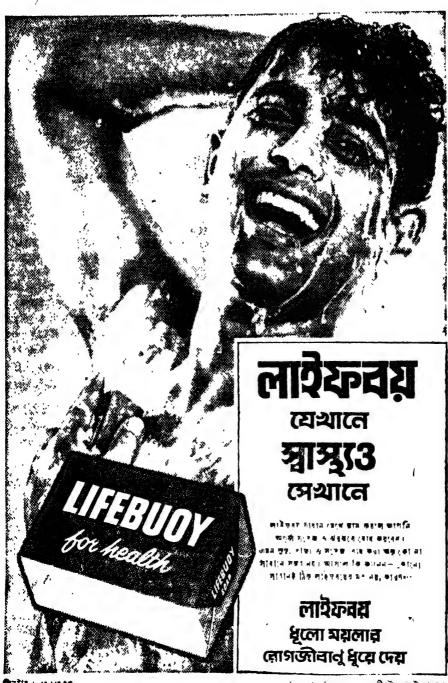
আলো চিনুন / মাছ ধরুন

আলোর সঙ্গে মাছের কি কোন সম্পর্ক আছে? পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে মাছ শিকারীরা মাছ ধরার জন্যে কৃত্রিম আলোর সাহায্য নিয়ে থাকেন। এর জন্য এ'রা বিভিন্ন বর্ণ এবং ঔজ্জ্বল্যের আলো সমুদ্রে জলের নিচে নামিয়ে দেন। অবশ্য সবই বিদ্যুতের আলো। রাতের অন্ধকারে সেই আলোকচ্ছটাকে ঘিরে তখন ছুটে আসে নানারকমের মাছ। অতএব তোফা হাত চালিয়ে গেলেই কাজ শেষ। এ'রা এও লক্ষ্য করেছেন, কি ধরনের মাছ ছুটে এসে ভীড় জমাবে সেটা নির্ভর করে কিছুটা সেই আলোর বর্ণ এবং কিছুটা তার ঔজ্জ্বল্যের উপর। কতকটা সিগন্যালের মত আলোর সংকেত দেখিয়ে মনোমত মৎস-শাবকটিকে আহ্বান জানান আর কি। হ্যাঁ, তাজ্জব কাণ্ডই বটে! এ'দের ব্যাপার স্যাপার দেখে মনে হয়, কেউ যদি খাবার টেবিলের মেনু নিয়মিত পালটে নিতে চান, তাহলে তাঁর পক্ষে কতকগুলি আলোর সংকেত জেনে নিলেই হল। সেই সঙ্গে কিনি কোন সংকেতে ধরা দেন সেটাও। বাস। কাজ শেষ। এবার রাতের অন্ধকারে জলের নিচে এক একটি আলোর সংকেত জানিয়ে 'আ যাও' বলে শুধু ডাক দিয়ে যাওয়া। মনের ভাবটা কিছুটা এমন ধারাই যেন। তারপরই দেখা যাবে, তাঁর রসনাতৃপ্তির বস্তুগুলি কখন নাগালের মধ্যে এসে ঘুর ঘুর শুরু করে দিয়েছে। মিশন সাকসেসফুল।

কিন্তু কেন?

সোভাস্তোপোল গবেষণাগারের জীবন-বিজ্ঞানী ডঃ এড়ুয়ার্ড বিটিয়েউকভ এই প্রশ্নটির মীমাংসার ব্যাপারে একটি সুন্দর মতবাদ খাড়া করেছেন। তিনি মনে করেন, সমুদ্রের অনেক প্রাণী বা উদ্ভিদই তাদের নিজেদের দেহ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আলো বিকিরণ করে। এর নাম 'বাইওলুমিনিসেন্স' বা 'জীবন-আলো'। সম্ভবত আদিকাল থেকে ঐ আলোর সংকেত দেখতে দেখতে কোন কোন মাছের মধ্যে এমন একটি সহজাতপ্রবণতা তৈরি হয়ে গেছে, যার ফলে যখন ঐ আলো তারা দেখতে পায়, তখনই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। তখন হয় তারা আলোর দিকে ছুটে যায়, অথবা আলো থেকে দূরে সরে যেতে চেষ্টা করে। প্রথম কাজটির উদ্দেশ্য আক্রমণাত্মক। দ্বিতীয়টি সম্ভবত আত্মরক্ষা। জৈবিক কারণেই এই গুণটি তারা অর্জন করেছে। ফলে ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছে, কেউ যদি এখন কৃত্রিম উপায়েও জীবন আলোর মত কোন আলো তাদের সামনে তুলে ধরেন কোন রকম দ্বিধা না করে তারা সেই আলোর দিকে এগিয়ে যায়। সেই কারণেই কৃত্রিম আলোর

আলোর সংকেত জানিয়ে 'আ যাও' বলে ডাক দিয়ে যাওয়া

সংকেত দেখিয়ে মাছ শিকার করা সম্ভব হয়েছে।

বস্তুত কোন কোন উদ্ভিদ এবং প্রাণী-দেহ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আলোর বিকিরণ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের মনে দারুন কৌতুহল সৃষ্টি করে এসেছে। নিকষকালো অন্ধকারে মাটির বুকে অথবা সাগরের ঢেউএর উপর তাদের সেই আলোর মালা দেখে কখনও তাঁরা ভয় পেয়েছেন, কখনও বা বিস্মিত হয়েছেন। আর সেই বিস্ময় এবং ভীতির সঙ্গে কখনও কখনও দানা বাঁধত অলৌকিকত্বের অনুভূতি। তবে আধুনিক জীব-রসায়নবিদদের মতে নিতান্ত জৈবিক কারণেই প্রাণী এবং উদ্ভিদের মধ্যে এমন কিছু কিছু ভৌতিক বা রাসায়নিক ব্যাপার ঘটে থাকে যার ফলে তাদের দেহ থেকে আলোকরশ্মির বিকিরণ বের হয়। এ বিকিরণ সব রকমের জীবদেহ থেকেই নির্গত হতে পারে। মাত্রার কমবেশির দরুণ সকলের দেহ নিঃসৃত সেই আলোর দীপ্তি সাধারণ চোখে দেখা সম্ভব হয় না।

রাতের অন্ধকারে কেঁচো বা শামুকের গা থেকে আলো বের হওয়ার ব্যাপারটা অনেকেই হয়ত লক্ষ্য করেছেন। কোন কোন কীট, শামুক জাতীয় সামুদ্রিক প্রাণী, এক-কোষী শৈবাল এবং মাছের গা থেকেও বিভিন্ন বর্ণ এবং ঔজ্জ্বল্যের আলো বের হতে দেখা যায়। কারুর কারুর আলো এতই উজ্জ্বল যে তা দিয়ে পথ চিনে চলা সম্ভব। যেমন ধরুন এউফাউসাইডা গোষ্ঠীর এক ধরনের বাগদা চিংড়ি। এরা লম্বায় প্রায় সাতাশ মিলিমিটারের মত হয়ে থাকে। এদের গোটা পাঁচ ছয়েক পাকড়ে একটি কাচের পাত্রের মধ্যে রেখে দিলে এদের গা থেকে যতটা আলো পাওয়া যায় তার সাহায্যে অনায়াসে খবরের কাগজ পড়া যেতে পারে। অনেক সময় অন্য কোন উৎস থেকে আলো এসে গায়ে পড়লেও প্রাণী বা উদ্ভিদের গা চকচকে

ক্লারা জেটকিন

বিপ্লবী সূর্য সেনের সম্বন্ধে গল্প শুনেছিলাম, তিনি নাকি পুলিসের নাকের উপর বসে থেকে তাদের বোকা বানাতেন। একবার পুলিস তাঁকে তাড়া করেছে, ছুটতে ছুটতে মাস্টারদা এসে দাঁড়ালেন পুকুরের ধারে। পাড়ার বর্ষীয়সী মহিলা বসে বাসন মাজছেন একমনে। মাস্টারদা কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, 'মা আমার যে বড় বিপদ'। মা মুখ তুলেও দেখলেন না। ও গলার স্বর সবার জানা যে। আস্তে মলিন শতছিন্ন শাড়িখানা অবলীলাক্রমে পাড়ে রেখে মা জলে নামলেন অবগাহনে। আকণ্ঠ জলে আর ভাবনা কি? এদিকে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা সূর্য সেন সেই শাড়িখানা সম্বল করে অবগুণ্ঠনের আড়ালে আত্মগোপন করলেন। মেজে চললেন ঘড়া, ঘটি, থালাবাটি। পুলিস পাশ দিয়ে পাতিপাতি করে খুঁজেও তাঁকে ধরতে পারেনি। পথের দাবির সব্যসাচীর চেয়েও অনেক বেশি অবাক কাণ্ড তিনি করতেন। সূর্য সেনের তুলনা মনে হলো পূর্ব জার্মানির বিপ্লবী মহিলা ক্লারা জেটকিনের কথায়।

আমরা যেমন আমাদের মহিলা প্রগতির স্মারক হিসাবে সরোজিনী নাইডুর জন্মদিন ১৩ই ফেব্রুয়ারীকে মহিলা দিবস মানি, পূর্ব জার্মানির মহিলারা ৮ই মার্চকে মহিলা দিবস মানেন। পূর্ব জার্মানির বাইরেও ক্লারা জেটকিনের স্মারক উৎসব হয় সোস্যালিস্ট মহিলা সমাজে। ৮ই মার্চ তাঁর জন্মদিন নয়। কোপেনহাগেনে এক সোস্যালিস্ট কনফারেন্সে তিনি এক "মহিলা দিবস"-এর পত্তন করলেন নারীর আপন অধিকার জয় করার এক স্মারকদিন হিসাবে।

ক্লারা জেটকিন সারা জীবন ধরে সংগ্রাম করেছেন এবং পুলিস তো ছোট কথা, হিটলার, গোয়েরিং, গোয়েবল্‌স সবার চোখে ধুলো দিয়ে ফিরেছেন। একবার ফ্রান্সের এক শহরে তিনি সকলের অজ্ঞাতসারে কর্মী দলের ছোট সভায় হঠাৎ পৌঁছলেন। বামপন্থী দলের অনেকেই ক্লারা জেটকিনকে জানতেন। ক্লারার উপস্থিতিতে হইচই পড়ে গেল। তিনিও আবেগে ভরা এক বক্তৃতা দিলেন। হাততালির হল্লা তখনও বন্ধ হয়নি। সবাই তাকিয়ে দেখলো শ্রীমতী জেটকিন উধাও। শ্রীমতী কিন্তু তখন ঠিক কাচ মেজেছি নন। এদিকে ফরাসী সরকার সংবাদ পেয়ে দেশের পুলিসকে একযোগে লাগিয়ে দিলেন। খুঁজে পেতেই হবে তাঁকে। তারা ছেঁকে ফেললো সব সীমান্তগামী যানবাহন। ক্লারা জেটকিন তখন ট্রেনের এক কামরায় বসে পশম আর কাঠি হাতে জামা বুনে যাচ্ছেন। সঙ্গে নাতিনাতনী ভীড় করে বসে গল্প শুনছে। এমন এক ঠাকুমাকে কে সন্দেহ করবে বলুন?

আর একবার ক্লারা জেটকিন তখন রাশিয়াতে। হিটলার, গোয়েরিং, গোয়েবল্‌স তাঁকে হত্যা করার ভয়ও দেখিয়েছেন। জার্মান ডায়েট-এর প্রাচীনতম সদস্য হিসাবে সেবার ক্লারার সেসনের প্রথম দিন উদ্বোধন করার কথা। ক্লারা জেটকিন যাতে বার্লিন না পৌঁছোতে পারেন, সেজন্য রেল স্টেশন আর এয়ারপোর্টে সৈন্য মোতায়েন করা হলো। ক্লারা জেটকিন ট্রেনেই রওনা হয়েছিলেন, কিন্তু পথের মাঝে বদল করে মোটরে উঠলেন। ট্রেনের পথে পাহারা বসেই থাকলো।

শ্রীমতী ক্লারা পৌঁছোলেন বার্লিনে। পরদিন সকালে জার্মান ডায়েটের প্রত্যেকটি মানুষ হতবাক! অসুস্থ বৃদ্ধার পক্ষে এমন কি করে সম্ভব হলো?

ক্লারা জেটকিন সোস্যালিস্ট পার্টির কর্মী ছিলেন, কিন্তু সবার উপরে তিনি ছিলেন মেয়েদের অধিকার আন্দোলনের নেত্রী। সামান্য সাধারণ ঘরের ঘরণী, খেটে খাওয়া মেয়ে সবার সঙ্গে সমান অধিকারে বসবে না কেন? সোস্যালিস্ট হয়ে তবে লাভ কি? তাই দলের কাছেও তিনি বলতেন 'মেয়েদের অধিকার উপেক্ষা করো না। মা আর তার সন্তান সমাজের সকল দাবির আগে আসে। মেয়েরা যেন কাজ করবার স্বত্ব থেকে বঞ্চিত না হয়। ক্লারার নিজের জীবনও কঠিন দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছে। লাইপজিগ ও জুরিখে রাজনৈতিক কার্যকলাপে দেশ থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন। প্যারিসে প্রবাসও কষ্টকর কম ছিল না। স্বামী অসিপ অল্প বয়সে মারা যান। দুটি ছোট ছোট ছেলে ম্যাক্সিম এবং কোস্টিয়াকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করতে হয়েছিল। তাই বোধ হয় মহিলা সমাজের জন্য ক্লারার এত বেশী ভাবনা ছিল। ফরাসী বিপ্লবের স্মরণে যখন বিপ্লবী দল একত্র হতেন, তখন কতই বা হতো মেয়ের সংখ্যা? মেয়েরা কমই আসতেন রাজনীতির রাজ্যে। তখনও অতি সাধারণ বেশভূষায়, ততোধিক সাধারণ কেশসজ্জায় এই মেয়েটি আসতো। মুখে গভীর চিন্তা ও কায়িক পরিশ্রমের স্পষ্ট ছাপ কারও নজর এড়াতো না। কিন্তু তিনি চাইতেন যেন তাঁর মত আরও অনেক কর্মী মেয়ে এগিয়ে আসে

রাজবধূ রাজ্যলক্ষ্মী দেবী

রাজনীতির সংগ্রামে।

প্রায় পঁচিশ বছর ক্লারা জেটকিন এক মহিলা পত্রিকার সম্পাদনা করেন, নাম তার Equality। অর্থাৎ নারীর জন্য সাম্য চাই। বৃদ্ধ বয়সে, অসুস্থ শরীরেও এই এক মূল লক্ষ্য নিয়ে তিনি কাজ করেছেন। লেনিন এবং তাঁর পত্নী নাদেস্কা ক্রুপসকায়া ক্লারা জেটকিনের অন্তরঙ্গ ছিলেন। সোভিয়েট দেশ প্রায় তাঁর নিজের ঘরের মতই হয়েছিল।

ক্লারা জেটকিন ১৯৩৩ সালে ২২শে জুন মারা যান। মহিলাদের দুঃখদুর্দশার দরদী বন্ধুর দলের একজন বলে ইতিহাস তাঁকে স্মরণে রাখবে। উত্তরকালে সমস্ত দুনিয়ার মেয়েরা আর বঞ্চিত উপেক্ষিত রইল না, তবে নিজ নিজ এলাকায় এমন করে কাজ কেউ কেউ করেছিলেন বলেই সে পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে।

রাজবধূ

নেপালের যুবরাজের বিয়ে। মাসের পর মাস, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে সারা দুনিয়ায় সাড়া পড়ে গিয়েছিল। পর্যটক থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন দেশের সেরা মানুষ, ব্যস্ত মানুষ, কাজের মানুষ, গণ্যমান্য সবাই একত্র হলেন। ২৭শে ফেব্রুয়ারী বিয়ে। হিন্দু বিয়ে। আচার নিয়ম, জাঁকজমক সবই অসাধারণ। নেপাল আমাদের পাশের দেশ এবং নেপালের মানুষ প্রায় আপনজন। বিয়ের এমন দারুণ ঘটার মধ্যেও তাই মনে হচ্ছিল আত্মীয়তার কথা। রাজবধূ শ্রীমতী রাজ্যলক্ষ্মী দেবী রাণার শৈশব কেটেছে কার্শিয়াং-এর সেন্ট হেলেনস কনভেন্টে। যুবরাজ বীরবিক্রম শার শিক্ষাও হয়েছে দার্জিলিং-এর সেন্ট জোসেফস কলেজে। ছয় বছর বয়সে বীরেন্দ্র সেন্ট জোসেফে পড়তে যান এবং সেখানে থাকাকালীন ১৯৫৫ সালের ১৫ই মার্চ নেপালের রাজা মহেন্দ্র তাঁকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসাবে ঘোষণা করেন।

কার্শিয়াং আর দার্জিলিং বেশী দূরের পথ নয়। ছোট্ট কুমার আর শিশু রাজকুমারী পথেঘাটে দৃষ্টি বিনিময় করেছিলেন কিনা জানা নেই, তবে ১৯৬৫ সালে তরুণ রাজকুমার ও রাজকুমারীর পরিচয় হয়। পরিচয়ই পরে পরিণয়সূত্রের সূচনা করে। ১৯৬৯ সালের ২রা মে বাগদানের পর রাজসংসারের এ উৎসবের জন্য দেশ-বিদেশে আগ্রহের অন্ত ছিল না।

রাজবধূটি প্রায় কিশোরী। ১৯৪৯ সালের শেষে নভেম্বর মাসের সাত তারিখে তাঁর জন্ম। কেন্দ্র সামশেরজং বাহাদুর রানার কন্যা তিনি। কার্শিয়াংএর সেন্ট হেলেনের পর নেপালের সেন্ট মেরী স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন। ১৯৬৫ সালে পদ্মকন্যা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট ও প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে, পরে ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হন। রাজবধূটি নাকি সাহিত্যানুরাগী। ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁকে আকর্ষণ করে কারণ তাঁর প্রকৃতির বর্ণনায় যেন কোথায় নেপালের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মিল আছে। রাজ্যলক্ষ্মী সংগীতে পারদর্শিনী। বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজবধূর দায়িত্ব কম নয়। নেপাল এখন পৃথিবীর সকল দেশের আগ্রহের স্থান। সবার মিলনের এমন তীর্থ যেন রাজবধূর মঙ্গল স্পর্শে সার্থক হয়। আগামী দিনের আশাভরা ভবিষ্যতে সব বিশ্বাস যেন ঠাঁই পায়। নূতন দম্পতির যাত্রাপথে সকলের এই শুভ কামনা।

শ্রীমতী

॥ ৩০ ॥

দোতলা রেস্তোরাঁটায় দারুণ ভিড়, টেবিল তো খালি নেই-ই, বাইরে অনেক নারী-পুরুষ খালি হবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। অনিমেষ খুব নিরাশ হয়ে গেল। দোতলায় কাচের জানলার পাশে বসে গঙ্গার শোভা দেখতে দেখতে অপর্ণার সঙ্গে কফি খাবার কথা অনিমেষ অনেক আগেই ভেবে রেখেছিল। বিরক্ত মুখে সে বললো, দূর ছাই! কলকাতাটা আর ভদ্রলোকদের রইলো না! সব জায়গায় এই এরা টাকার গরম দেখিয়ে—

অপর্ণা চারদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। মুগ্ধভাবে বললো, এই জায়গাটা ভারী সুন্দর করেছে তো! আগে কি গঙ্গার পাড় এরকম বাঁধানো—রেলিং দেওয়া ছিল?

—না, এই তো কয়েক বছর!

—চলুন না, আরও তো কত দোকান হয়েছে দেখছি রাস্তার ধারে! এক জায়গা থেকে চা খেয়ে নিলেই তো হলো।

—যাঃ, দাঁড়িয়ে কি চা খাবো? একটা কোথাও না বসলে—

—আমার অবশ্য তেমন চায়ের নেশা নেই। না খেলেও চলে।

—না, না, কফি খেতেই হবে। কফি খাওয়ার জন্যই এখানে আসা—

—তা বলে এখানে এই দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবেন? অন্তত একটু ঘুরে আসি—

মূল রাস্তার একদিকে অন্ধকার, সেই অন্ধকারের মধ্যে কেল্লার এলাকা। অন্ধকারের মধ্যে মাঝে মাঝে দু' একটা সাদা সাদা ছোপ চোখে পড়ে, বোঝা যায়, ওখানে জোড়ায় জোড়ায় অনেক বসে নির্জনতার সুযোগ নিচ্ছে। রাস্তার এ পাশে রীতিমতন আলো, অনেক ফেরিওয়ালা ও মোটর গাড়ি, অনেক কলরব। তাদের পেছনে মেহেদীর বেড়া, তারপর পায়ে চলা পথ, রেলিং এবং গঙ্গা। গঙ্গায় দু'টি তিনটি গম্ভীর জাহাজ, গঙ্গার ওপারে বিজ্ঞাপনের আলো—কয়েকটি লেখা এপার থেকেও পড়া যায়।

এখানে অনেক মানুষ, বুড়ো-বুড়ি প্রায় চোখে পড়ে না, অধিকাংশই যুবক-যুবতী, অনেকে বাচ্চাদের নিয়ে সপরিবারেও এসেছে। মাঝে মাঝে গোড়া বাঁধানো গাছের নিচে বেঞ্চ পাতা, একটা বেঞ্চও খালি নেই, দেখলে মনে হয় অনেকে বোধহয় গতকাল থেকে ঐ সব বেঞ্চ অধিকার করে আছে। নরম মখমলের মতন হাওয়া আসছে গঙ্গা থেকে, হঠাৎ বিশ্বাসই হতে চায় না—এমন চমৎকার একটা উপভোগের জিনিস কলকাতায় এখনো বিনা পয়সায় পাওয়া যায়!

অনিমেষ আর অপর্ণা বেশ কিছুক্ষণ হাঁটলো নিঃশব্দে। ঠিক নিঃশব্দে নয়, অনিমেষ কি যেন বলছিল, অপর্ণা মন দিয়ে শোনেনি। গত কয়েকটা বছর ধরে কি বিষম নিঃসঙ্গ জীবন ছিল অপর্ণার, কোথাও বেড়াতে যায়নি, কোনো আনন্দ উৎসবে যোগ দেয়নি। মেয়েকে ইস্কুলে পৌঁছে দেওয়া—নিয়ে আসা ছাড়া প্রায় সারাক্ষণই বাড়িতে থেকেছে। আজ এখানে এই অস্পষ্ট আলোছায়ার মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শরীরটা খুব হাল্কা লাগছে তার, মনের মধ্যে সমস্ত গুমোট ভাব কেটে গিয়ে ফুরফুরে টাটকা হাওয়া খেলে বেড়াচ্ছে যেন। হঠাৎ অপর্ণার মনে হলো, পৃথিবীতে সত্যি বেঁচে থাকার একটা মানে আছে। শুধু বেঁচে থাকাটাই ভারী আনন্দের।

বাঁদিকে তাকিয়ে অপর্ণা বললো, ইস, দেখুন, দেখুন, গাড়ি থেকে নেমে সব বড় বড় ছেলেমেয়েরা কি রকম ফুচকা খাচ্ছে।

অনিমেষ জিজ্ঞেস করলো, আপনার লোভ হচ্ছে বুঝি?

—এক সময় খুব খেতুম। এত ভালোবাসতুম যে স্কুলে গিয়ে রোজ না খেলে মনটা উসখুস করতো। তখন আমরা বলতুম জলকচুরি, এখন সবাই বলে ফুচকা! আপনি ভালোবাসেন না?

—মন্দ লাগে না। তবে ঐ নোংরা হাত দিয়ে তেঁতুলের জলটা যখন গোলে আর আলু চটকায়—

—ধ্যাৎ, ওসব ভাবলে কিছুই খাওয়া যায় না! চলুন না, আজ একটু খেয়ে দেখি, অনেকদিন পর কেমন লাগে—

—ভালো লাগবে না।

—চলুন, তবে দু'একটা খেয়ে দেখি। অনেকদিন পর সত্যি ইচ্ছে হচ্ছে।

অনিমেষ তার কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বললো, যাঃ, ছেলেমানুষের মতন এখন ফুচকা খাবেন কি?

অপর্ণা অনিমেষের মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আপনার বুঝি কখনো ছেলেমানুষী করতে ইচ্ছে করে না?

—ইচ্ছে তো করে, কিন্তু উপায় তো থাকে না সব সময়। এখন যদি আমি আপনার সঙ্গে দাঁড়িয়ে ফুচকা খাই, তাহলে আর দেখতে হবে না! নির্ঘাৎ কোনো ছাত্রছাত্রী দেখে ফেলবেই—তাহলেই কালকে ক্লাসে গিয়ে যখন বলাকা কবিতার সঙ্গে গীতি-কাব্যের আলোচনা শুরু করবো অমনি একজন নিরীহ মুখে জিজ্ঞেস করবে, স্যার, বলাকার সঙ্গে ফুচকার কোনো সম্পর্ক নেই? তখন সারা ক্লাস—

অনিমেষ আশা করেছিল, অপর্ণা হাসবে। কিন্তু অপর্ণা হাসলো না। জিজ্ঞেস করলো, অধ্যাপক হলে বুঝি সব সময় গম্ভীর থাকতেই হবে? অন্যরা যা করে, তা করা চলবে না?

—তাই তো সবাই আশা করে। আমাদের কাজ তো শুধু লেখাপড়া শেখানো নয়, একটা আদর্শ স্থাপন করা।

—তাহলে গঙ্গার পারে এই রকম বেড়ানো, এটা দোষের নয়?

অনিমেষ প্রথমে বললো, আশা করি কেউ দেখবে না।

সঙ্গে সঙ্গে আবার বললো, দেখলেই বা কি, আমার কি নিজস্ব চলা ফেরারও স্বাধীনতা থাকবে না? আমি তো কোনো অন্যায় করছি না।

আর একটু ভেবে অনিমেষ ফের যোগ করলো, তাছাড়া আমাদের ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়েরা বেশ ভদ্র। অন্য জায়গার মতন নয়।

অপর্ণা জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা, রবীন্দ্র ভারতীতে আমি যদি এখন ভর্তি হতে চাই, আমাকে নেবে? এতদিন বাদে? আমার অবশ্য অনার্স ছিল! আমি বেশ ছাত্রী হয়ে আপনার ক্লাসে বসে আপনার পড়ানো শুনবো!

—খবর্দার ও কাজ করবেন না। এখন আবার ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবেন কেন? আপনি আমার ক্লাসে বসলে আমি একদম পড়াতে পারবো না।

—কেন?

—আপনাকে দেখলেই আমার বুকের মধ্যে কাঁপবে!

অপর্ণা একটু হেসে জিজ্ঞেস করলো, বাঃ, বুক কাঁপবে কেন? এত ছেলে-মেয়েকে পড়াচ্ছেন, শুধু আমাকে দেখলে বুক কাঁপবে কেন?

অনিমেষ অপর্ণার চোখে চোখ রেখে গাঢ় স্বরে বললো, আপনি জানেন না?

—কি জানবো? এই তো এখন আমি আপনার পাশে হাঁটছি, এখন কি কিছু হচ্ছে? আর ক্লাসের মধ্যে—

—এখনও আমার বুক কাঁপছে!

—যাঃ! আপনি ইয়ার্কি করছেন।

—না, বিশ্বাস করুন, মোটেই ইয়ার্কি করছি না। কথাটা অত্যন্ত সত্যি, আমাদের বেঁচে থাকার মতন সত্যি।

—কেন? বুক কাঁপবে কেন?

অনিমেষ আবার অপর্ণার দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি বেঁধে জিজ্ঞেস করলো, আপনি সত্যিই জানেন না?

অপর্ণা শিশুর সরলতায় বললো, না সত্যি জানি না। কখনো এরকম শুনিনি।

অনিমেষ থমকে দাঁড়িয়ে জন্মদুঃখীর মতন কাতর গলায় বললো, কেউ যখন

কারুকে সত্যিকারের ভালোবাসে, তখন যতবারই তার সঙ্গে দেখা হয়, বুক কাঁপে।

অপর্ণাও দাঁড়িয়েছে, মুখ নিচু করলো, তার বুকেও এবার কেঁপে উঠেছে। খুব আস্তে আস্তে বললো, সাড়ে সাতটা বেজে গেছে, এবার আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে অপর্ণার মনে পড়ে গেল, টুলটুল এতক্ষণ মাকে না দেখে নিশ্চয়ই ছটফট করছে। বাবা ঘন ঘন এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছেন অপর্ণা ফিরলো কি না। অপর্ণা সাধারণত এত দেরী করে কোনোদিন ফেরে না। দীপু যদি বাড়িতে থাকে, তাহলে বাবা নিশ্চয়ই ব্যস্ত হয়ে দীপুকে তার খোঁজ নিতে পাঠাবেন। অবশ্য দীপুর এ সময় বাড়িতে থাকার কথা নয়।

অনিমেষ বললো, দাঁড়ান, এখনো তো কফি খাওয়াই হলো না। আপনি ফুচকা খেতে চাইলেন, তাও খাওয়ালাম না!

—থাক, আজ আর কিছু খাবো না।

—আরে, একটু কফি খেতে আর কতক্ষণ লাগবে?

—না, আজ থাক।

—চলুন, চলুন!

এবার রেস্তোরাঁটায় জায়গা পাওয়া গেল, দোতলায়, জানলার ধারেই। জানলার কাচে নাক ঠেকালেই দেখা যায় নিচে গঙ্গার প্রবাহ। একেবারে মুখোমুখি একটা জাহাজ, সেটার এখানে ওখানে আলো জ্বলছে। অপর্ণা জাহাজটার নাম পড়ার চেষ্টা করলো। জাহাজটার নাম এস এস স্লেজউইগ। নাম দেখেই বোঝা যায়, জার্মান জাহাজ—অপর্ণা জানে স্লেজউইগ জার্মানির একটা বন্দর। অপর্ণা মনে মনে ভাবলো, স্লেজউইগ হামবুর্গ থেকে কত দূরে? জাহাজটা নিশ্চয়ই হামবুর্গ ছুঁয়ে এসেছে? অপর্ণা একটা দীর্ঘনিশ্বাস লুকিয়ে ফেললো, একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

স্যান্ডউইচ আর কফির অর্ডার দিয়ে অনিমেষ একটা সিগারেট ধরালো। তারপর বললো, এমন কিছু দেরী হয়নি। আপনি মুখটা অমন শুকনো করে বসে আছেন কেন?

—কই, না তো!

—একটাও কথা বলছেন না। অন্যদিকে চেয়ে আছেন—

উত্তর না দিয়ে অপর্ণা শুধু হ্ঃ বললো। কফি না-আসা পর্যন্ত অনিমেষ চুপ করে রইলো। তারপর কফিতে প্রথম চুমুক দিয়ে মুখটা কাপের কাছেই রেখে ফিসফিস করে বললো, আপনি আমার ওপর রাগ করেছেন?

—কেন, রাগ করবো কেন?

—তখন ঐ কথাটা বললাম বলে?

—কোন্ কথাটা?

প্রাণে ভরপুর তাজা কফি—নেস্‌কাফে!
সান্ধ্য
মজলিশ
জমিয়ে তুলবে!
খুশির আমেজ
ছড়িয়ে দেবে
নেস্‌কাফে!
(মাত্র পাঁচ সেকেণ্ডে তৈরী!)
দক্ষিণ
ভারতের
কফিদানা থেকে
তৈরী ১০০% খাঁটি
কফি
NESCAFE
instant
coffee
নেস্‌কাফে খেয়ে দেখুন—
উৎকৃষ্ট কফির স্বাদে-গন্ধে
মন ভরবে, মনমেজাজ
চাঙ্গা হবে।
নেস্‌লের তৈরী
NCE 5753

—আপনি ঠিকই বুঝেছেন, আপনি এড়িয়ে যাচ্ছেন!

অপর্ণা আঙুল দিয়ে টেবিলের কাচের ওপর একটা দুর্বোধ্য ছবি আঁকতে আঁকতে বললো, জানেন, নিজেকে আমার খুব অপরাধী মনে হচ্ছে।

—কেন?

—কি জানি, তা বুঝতে পারছি না।

—আপনাকে যদি আমি এখানে জোর করে এনে থাকি, তা হলে আমার অন্যায় হয়েছে। আমি দুঃখিত।

—না, না, তা নয়। এসে বেশ ভালোই লাগছে। বিশ্বাস করুন, অনেক দিন তো এরকম ভাবে বেড়াইনি—সত্যি খুব ভালো লাগছে। তবু—

—তবু কি?

—হয়তো, মানে, আমার মেয়ে রয়েছে বাড়িতে—আমাকে ছেড়ে বেশীক্ষণ থাকতে পারে না—যদি কান্নাকাটি করে... আমি এখানে—

—আপনার মেয়ে তো বেশ বড়, আট বছর বা ন' বছর—সে একটা সন্ধ্যে একটু একা থাকতে পারবে না? খুব পারবে! আপনি শুধু শুধু ভাবছেন। সব মায়েদেরই ওরকম চিন্তা করা স্বভাব।

—হয়তো তাই। তবু মনের মধ্যে সব সময়—

—টুলটুল ভারী ভালো মেয়ে। আমার এত ভালো লাগে ওকে। দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে।

অপর্ণা আর একবার আলো ঝলমল জার্মান জাহাজটির দিকে তাকালো। এবার বোঝা যায়, টেবিলের ওপর আঙুল দিয়ে এতক্ষণ সে একটা জাহাজই আঁকছিল।

অনিমেষ বললো, একি, আপনি স্যান্ড-উইচ খাচ্ছেন না?

—হ্যাঁ, এই তো—

—তখন কিন্তু কথাটা আপনাকে একটুও বানিয়ে বলিনি। আপনাকে দেখলেই আমার বুক কাঁপে।

অপর্ণা মুখ তুললো না, ভারী অদ্ভুত-ভাবে একটু হাসলো। হেসে বললো, শুধু আমাকে দেখলেই কাঁপে? আগে আর কখনো কাঁপে নি?

—আর একবার কেঁপেছিল, তখন আঠেরো-উনিশ বছর বয়েস, কলেজে পড়ি—সেই মেয়েটি মারা গেছে। তারপর এত-দিনে আরও তো কত মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, কিন্তু আর কখনো—

—আপনার এখন কত বয়েস?

—বত্রিশ।

—আপনি আমার সমান!

—মোটেই না, আপনার চেয়ে আমি তিন বছরের বড়। আজকাল তো মেয়েদের বয়েস বাড়িয়ে বলাই ফ্যাসান।

—তাই বুঝি?

—আমার ক্লাসের মেয়েদের তো দেখি—

হঠাৎ দুজনেই কি কারণে যেন স্যান্ড-উইচ খাওয়ায় খুব মনোযোগী হয়ে পড়লো। প্রায় এক মিনিট দুজনে আর একটাও কথা বললো না। অনিমেষই প্রথম নীরবতা ভেঙে বললো, আপনি যে কবিতাটা লিখেছেন, 'একটি স্বপ্নের কাছে চিরদিন ঋণী'—সেটা কি স্বপ্ন?

—জানি না।

—বলুন না। কবিতাটা খুব সুন্দর। কি ভেবে লিখেছেন?

—ওসব কথা থাক। নিজের কবিতা নিয়ে আলোচনা করতে আমার লজ্জা করে। ভারী তো ছাই লিখি! চলুন, এবার ওঠা যাক।

—দাঁড়ান, আগে বিল দিক। এত তাড়া কিসের? আচ্ছা, আপনি আমার কথা একটুও ভাবেন না, না?

—উঁ?

—আপনি আমার কথা...সেদিন যা বলেছিলাম?

—আপনি কখনো জাহাজে চেপেছেন? দেখুন, ঐ জাহাজটা কি রকম সুন্দর দেখাচ্ছে!

—আপনি কথা ঘুরিয়ে নিচ্ছেন। আপনি বুঝতে পারেন না, আপনার জন্য আমার কষ্ট হয়? আমি আর কিছু ভাবতে পারি না এখন, আমার আর লেখায় কিংবা পড়াশুনোয় মন নেই—

—এসব কথা আজ নয়।

—কেন? আপনি ভুল করছেন। আপনি কি সারাজীবন এইরকম থাকবেন ভেবেছেন? এই রকম রিক্ত, শূন্য—আপনার মুখটা বেশীর ভাগ সময়েই ম্লান থাকে—আপনার জন্য একজন কেউ ব্যাকুল হয়ে আছে, আপনার কথা ভেবে কষ্ট পাচ্ছে, তার জন্যেও আপনি...

—এসব কথা শুনলে আমার ভয় করে।

—ভয় করে?

—বিশ্বাস করুন, আগে ভয় পেতুম না, একটুও না। আজকাল আমার প্রায়ই ভয় করে।

—মানুষ কখনো একা থাকতে পারে না, শূন্যতাই ভয়ের। আমাদের দুজনেরই অনেক দুঃখ আছে।

—আপনার কি দুঃখ?

—আছে, আছে। সব মানুষেরই দুঃখ থাকে—বাইরে থেকে বোঝা যায় না। সেই গোপন দুঃখের সান্ত্বনা পাওয়া যায়—যদি কেউ তাকে ভালোবাসে, কেউ তার জন্য—

অপর্ণা সোজা হয়ে বসে হাসি হাসি মুখে বললো, দেখুন, আপনি আপনার ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার ভয় করছিলেন, এখন আমারই চেনা লোকের সঙ্গে এখানে দেখা হয়ে গেল!

—কোথায়? কোথায়?

—ঘাড় ঘোরাবেন না এক্ষুনি! আপনার ডানদিকে, রাস্তার দিকে টেবিলে—

কখন ঐ দলটি এসে বসেছে, ওরা টের পায়নি। বড় টেবিলের চার পাশে চেয়ার টেনে বসেছে সাত আটজন। দুজন পুরুষ, একজন বর্ষিয়সী মহিলা, কয়েকটি মেয়ে। টেবিলের ধার ঘেঁষে একটি মেয়ে বসে আছে, মুখটা গোঁজ করা, যেন কোনো কিছুই তার পছন্দ নয়।

এক নজর দেখে নিয়ে অনিমেষ জিজ্ঞেস করলো, ওদের মধ্যে কোন্ জন আপনার চেনা?

—সবাই।

মুখে একটু চিন্তার ভাব ফুটিয়ে অনিমেষ জিজ্ঞেস করলো, কি, দেখা হয়ে গেলে মুশকিল আছে? আত্মীয়-টাত্মীয়?

—আত্মীয়-টাত্মীয় হলেও আমার কোনো মুশকিল নেই। আপনিই তো তখন বললেন, আমরা কোনো অন্যায় করছি না! ঐ পাশের এই মেয়েটিকে দেখুন, ওর নাম শান্তা, আমার ছোটভাই দীপুর সঙ্গে ওর খুব ভাব।

আবার ওদিকে একবার মুখ ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে অনিমেষ বললো, বাঃ, মেয়েটি বেশ অন্য ধরনের সুন্দর তো। আপনার ছোট ভাই খুব লাকি। আচ্ছা, দীপু এখনো কোনো চাকরি-টাকরি তো করছে না, না?

—না।

—একটা কিছু করলে পারে। সবাই বলে চাকরি পাওয়া যায় না, আমি বিশ্বাস করি না। চেষ্টা করলে অন্তত ফ্যাক্টরি-ট্যাক্টরিতে ঠিকই জুটে যায়। একেবারে বসে থাকার বদলে কিছু একটা করা ভালো।

অপর্ণা কিছু বললো না। অনিমেষ আবার বললো, মাঝে মাঝে ওকে পাড়ার মোড়ে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিতে দেখি। অলস থাকলেই শয়তানের কারখানা সক্রিয় হয়ে ওঠে। আপনারা কিছু বলেন না?

—কি বলবো?

—নিজে রোজগার করার আগেই প্রেম-ট্রেম করা—এখনকার ছেলেদের লজ্জাও করে না?

অপর্ণা অনেক সময় দীপুর ওপর রাগ করে, কিন্তু অন্য লোকের মুখ থেকে দীপুর নিন্দে শুনতে তার ভালো লাগলো না। প্রসঙ্গটা এড়াবার জন্য বললো, দীপু অন্য কারুর কথা শোনে না, ও নিজে যা ভালো বোঝে তাই করে!

—নিজে বোঝার যদি ক্ষমতা থাকতো—

—তা ওর আছে।

এই সময় শান্তার সঙ্গে অপর্ণার চোখা-চোখি হলো। সঙ্গে সঙ্গে শান্তা উঠে এলো এই টেবিলের দিকে। শান্তাদের টেবিলে অন্যরা অপর্ণাকে দেখে অমনি তাকে নিয়েই কথা শুরু করে দিয়েছে, বোঝা যায়।

—একি বৌদি! আপনি? কতদিন পর দেখলাম আপনাকে!

রণেনদের সঙ্গে শান্তাদের কি যেন একটা দূর সম্পর্ক আছে। সেই সূত্রে রণেনকে সে দাদা বলতো। অপর্ণা অনিমেষের সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিয়ে বললো, এসো, বসো এখানে। আমরা অবশ্য এক্ষুনি চলে যাবো। ভাগ্যিস আগে যাইনি, তাই তোমার সঙ্গে দেখা হলো। তুমি বাড়ির সবার সঙ্গে এসেছো?

—হ্যাঁ, মা-ও এসেছেন। দেখা করবেন মায়ের সঙ্গে?

—না।

—ঠিক আছে, সেই ভালো, দেখা করার দরকার নেই! টুলটুল কেমন আছে? একদিন এসেছিল আমাদের বাড়িতে—এত সুন্দর—

—তুমি আসো না কেন আমাদের বাড়িতে?

—আসবো?

—বাঃ, আমার অনুমতি চাইতে হবে বুঝি?

—হবে না? আমরা তো আপনার শত্রু-পক্ষ। আপনার শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়—

—তুমি বুঝি শুধু আমার শত্রুপক্ষ? আর কেউ না?

অনিমেষের এইসব কথাবার্তা একটুও পছন্দ হচ্ছে না। প্রথমত তার সংগে আলাপ হবার পরও শান্তা, 'ও, আপনিই কবি অনিমেষ চক্রবর্তী'—এই বলে বিস্ময় প্রকাশ করে নি। দ্বিতীয়ত অপর্ণাকে বৌদি বলে ডাকাটা তার মোটেই ভালো লাগে না। সে চেয়ার সরিয়ে বললো, তাহলে যাওয়া যাক, আপনার তাড়াতাড়ি আছে বলছিলেন।

অপর্ণা উঠে দাঁড়িয়ে শান্তাকে বললো, এসো একদিন বাড়িতে। অনেক গল্প করা যাবে।

অনিমেষ খানিকটা মুষড়ে পড়েছে মনে হয়। কিছু একটা সে বলতে গিয়েও বারবার বাধা পাচ্ছে। রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে সে খানিকক্ষণ চুপ।

এখান থেকে সুবিধাজনক বাস পাওয়া যায় না, অনিমেষ ট্যাক্সি ধরতে চায়, অপর্ণা রাজী নয়। অনিমেষ বললো, চলুন তা হলে হাঁটা যাক, এসপ্লানেড পর্যন্ত।

—উরে ব্বাবা, তাহলে অনেক দেরী হয়ে যাবে না?

—কি আর এমন দেরী হবে! মাত্র পৌনে আটটা বাজে।

—মাত্র! অনেক দেরী হয়ে গেছে।

—শুনুন, শুনুন, এখন ফেরাও যা, নটার পরে ফেরাও তা। বাড়ি গিয়ে বলবেন সিনেমা দেখে এলাম কোনো বন্ধুর সঙ্গে।

—কাকে বলবো? কেউ তো আমার কৈফিয়ৎ নেবে না। বাবা আমার ওপরে রাগ করলেও কিছু বলবেন না।

—তাহলে তো চুকেই গেল!

অপর্ণার মনটা অস্থির হয়ে উঠেছে, তবু সে বুঝতে পারলো, বেশী জোর করলে অনিমেষের সঙ্গে অভদ্রতা করা হবে। পুরুষরা তো আর এসব বোঝে না। দেরী যখন হয়েছেই, তখন সে আজকের বেড়াবার আনন্দটা আর নষ্ট করতে চায় না। সে বললো, এত দেরী করা উচিত হয়নি আমার, তবে একথাও ঠিক, খুব ভালো লাগছে আজ! এত ভালো লাগছে হাঁটতে!

—আমার সংগে এসে সত্যি ভালো লাগছে?

'আমার সংগে'—এইটুকুর ওপর অনিমেষ অযথা জোর দিল। অপর্ণা শুধু বললো, হাঁ! সংগে সংগে অনিমেষ অপর্ণার একটা হাত আলতো করে ধরলো। অপর্ণা আপত্তি করলো না। তার নরম ছিপছিপে হাতটা অনিমেষের হাতের মুঠোয় বন্দী।

সর্টকাট করার জন্য রাস্তা ছেড়ে মাঠের দিকে চলে এলো ওরা। মেঘের আড়ালে কোথাও আছে চাঁদ, খুবই অস্পষ্ট জ্যোৎস্না। একটুও গরম নেই, হাওয়া দিচ্ছে বিশবস্ত-

[illegible] [illegible] [illegible] জল একটু ভিজেছে অপর্ণা একমাত্র চটি খুলে ঘাসে পা ফেললো। বিয়ের পর দেড় বছরে স্বপনের সঙ্গে অনেকবার সে বেড়াতে গেছে, কিন্তু স্বপন বাড়িতে থাকতে ভালোবাসতো। এরকম অন্ধকার মাঠে কখনো সে পায়ে হেঁটে যায়নি।

একটু যেতেই মাঠের মধ্যে বেশ ঘন অন্ধকারে এসে পড়লো তারা। অনিমেষ শুধু তার হাতটা মুঠোয় ধরে আছে, তাছাড়া রেখেছে সম্মানজনক দূরত্ব। সে বললো, মনে হচ্ছে না, আমরা অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেছি?

—হুঁ।

—এরকমভাবে যদি অনন্তকাল পাশাপাশি—

—আপনি বড্ড কবিত্ব করছেন। সত্যিই হারিয়ে যাইনি তো? এদিকে না এলেই ভালো হতো, বরং রাস্তা দিয়েই—

—চলুন না, আমি তো আছি। আমার সঙ্গে অন্ধকারে হাটতে ভয় করছে না তো?

—না।

—যাক্, তবু নিশ্চিন্ত হলুম। নইলে কিন্তু খুবে অপমানিত বোধ করতুম। আমি আর যাই হই, অভদ্র নই!

—অভদ্র হবেনই বা কেন?

—অবশ্য, এখন মনে হচ্ছে, একটু অভদ্র কিংবা দুঃসাহসী হলেই বোধ হয় ভালোই হতো। আপনাকে মুখের ভাষায় যা বোঝাতে পারিনি, যদি—

—বোঝাতে পারবেন না কেন? আমি তো বুঝেছি।

—বুঝেছেন?

হঠাৎ একটা হইচই হুড়োহুড়ির শব্দ শোনা গেল। এই মাঠের মধ্যে যে এত লোক বসে আছে, ওরা খেয়ালই করেনি। একদল নারী পুরুষ ছোটাছুটি শুরু করেছে। অপর্ণা ভয় পেয়ে অনিমেষের হাতখানা শক্ত করে চেপে দাঁড়িয়ে পড়লো। আর তক্ষুনি যেন মাটি ফুঁড়ে দুজন পুলিশ ওদের সামনে উঠে এলো। মুখের ওপর টর্চের আলো ফেলে বললো, এই যে একটা পেয়ার!

অনিমেষ অপর্ণাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে বললো, কি ব্যাপার? কি হয়েছে?

একজন পুলিশ অত্যন্ত কর্কশভাবে বললো, এখানে কি হচ্ছে, অ্যাঁ?

—আমরা এসপ্লানেডে যাচ্ছি।

—মাঠের মধ্যে দিয়ে ছাড়া আর যাবার রাস্তা নেই? এই অন্ধকারে? খুব, অ্যাঁ?

—ভদ্রভাবে কথা বলুন!

—আবার তেজ! চলো, দুটোকেই থানায় নিয়ে চলো—

অপর্ণা এমন বিবর্ণ হয়ে গেছে, যেন এক্ষুনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে। এরা কি বলছে এসব? কি দোষ করেছে তারা? থানায় যেতে হবে? কি সর্বনাশের কথা। টুলটুলের মুখখানা ভেসে উঠলো, মাথা ঝিমঝিম করতে লাগলো।

আর একজন পুলিশ একটু ভদ্রভাবে বললো, আপনাদের দেখে তো ভদ্রলোকই মনে হচ্ছে। এখানে বসেছিলেন কেন? এই অন্ধকারের মধ্যে?

অনিমেষ বললো, আমরা এখানে বসিনি। হেঁটে যাচ্ছিলাম। কেন, এখানে বসা কিংবা হেঁটে যাওয়া কি অন্যায়?

তারপর সে বাংলা ছেড়ে ইংরেজি শুরু করলো, ইস দিস এ প্রহিবিটেড এরিয়া? উই ডিড নট ফাইন্ড এনি নোটিশ এনি হোয়ার!

পুলিশটি আরও ভদ্রভাবে বললো, দেখুন, আপনাদের ভালোর জন্যই আমরা এখানে এসেছি। এখানে অনেক ইমমরাল কাজ হয়, তাছাড়া গুণ্ডা ছিনতাইবাজের অভাব নেই। আপনারা যদি জেনুইন প্যাসেঞ্জার বাই হন, আপনাদের আইডেন্টিটি ক্লিয়ার করে চলে যাবেন, এখন একবার থানায় চলুন।

—কেন, থানায় যেতে হবে কেন?

—আপনারা কি স্বামী-স্ত্রী?

—নো। সো হোয়াট?

আবার ঝোঁকের মাথায় অনিমেষ বললো, বাট উই আর গোয়িং টু ম্যারি ভেরি সুন!

—বেশ তো। আপনারা দুজনেই অ্যাডাল্ট। আপনাদের ভয়ের তো কিছু নেই। আইডেন্টিটিটা ক্লিয়ার করেই... বেশীক্ষণ লাগবে না।

অপর্ণা এবার কোনোক্রমে বললো, না, না, আমাদের ছেড়ে দিন! আমরা জানতাম না।

পুলিশটা এবার অপর্ণার দিকে টর্চটা একবার ঘুরিয়েই নামিয়ে নিল। তারপর নীরস গলায় বললো, আপনারা যদি জেনুইন হন, আপনাদের তো থানায় যেতে ভয় পাওয়া উচিত নয়! ক্রিমিনালরাই থানার নামে ভয় পায়। আমাদের তো জানা দরকার, কে জেনুইন, কে জেনুইন নয়।

—সে কথা নয়। আপনি বুঝতে পারছেন না। আমার বাড়ি ফিরতে দেরী হলে—

—চলুন, বেশীক্ষণ লাগবে না।

(ক্রমশঃ)

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পব্যবস্থা কোন্ পথে ?

অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে জড়িত। রাজনৈতিক অস্থিরতা পশ্চিমবঙ্গের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রাকে যেমন বিপর্যস্ত করেছে, শিল্প-ব্যবস্থাকেও তেমনি মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করেছে। একদা যে রাজ্য ভারতে উন্নতিশীল রাজ্যগুলির মধ্যে অগ্রণী ছিল, তার এমন বিপর্যয় কেন? ৬ই মার্চ তারিখে রাজ্য বিধানসভায় সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ১২৭টি কল-কারখানা বন্ধ আছে এবং তার দরুন ২৭,৭৭১ জন শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। রাজ্য সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী কোম্পানিগুলির আর্থিক অনটন এবং শ্রমিক-মালিক বিরোধই কল-কারখানাগুলি বন্ধ হয়ে যাবার কারণ। একথা এখন অস্বীকার করা যায় না যে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পব্যবস্থা চরম দুর্দিনের সম্মুখীন হয়েছে। শুধু যে ১২৭টি কল-কারখানা বন্ধ হয়েছে তা-ই নয়; কোন কোন শিল্পপতি পশ্চিমবঙ্গ থেকে তাঁদের প্রধান অফিস অথবা কারখানা তুলে নিয়ে যেতে চান। নতুন বিনিয়োগও বিশেষ হচ্ছে না। কেন এ অবস্থার সৃষ্টি হল? চা-বাগিচা এবং চটকল শ্রমিকদের ধর্মঘট বহু দিন চলার পর মিটে গেছে। কয়েকটি কাপড়ের মিল এবং দেশী ও বিদেশী বাণিজ্য সংস্থারও বিরোধ শেষ পর্যন্ত মিটে গেছে। আবার নতুন নতুন সংস্থায় সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছে। বহু ক্ষেত্রে শ্রমিকদের ক্ষেত্রে অবিচার করা হয়েছে অথবা শ্রমিক-স্বার্থ উপেক্ষিত হয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু একথাও স্বীকার্য, পশ্চিমবঙ্গে যে এত কল-কারখানা স্থাপিত হয়েছে তার কারণ হল, পূর্বতন বিনিয়োগকারীরা মনে করতেন এই রাজ্যে বিনিয়োগ থেকে লাভের পরিমাণ বেশি হবে। কলকাতা শহর ভারতের শিল্পব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র; বর্তমানে এই প্রাণের স্পন্দন স্তিমিত হয়ে এসেছে বলা চলে। যে কল-কারখানাগুলি বন্ধ আছে সেগুলি খুলুক সবাই তা চান। বিড়লা গোষ্ঠী যেন তাঁদের কোম্পানীর প্রধান অফিসগুলি কলকাতা থেকে সরিয়ে না নেন, তাও সকলেরই কাম্য। ট্রেড ইউনিয়নের নির্দেশে যে হাজার হাজার শ্রমিক নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য, মজুরী বাড়াবার জন্য এবং সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য আন্দোলন করছেন, তাঁদের প্রতিও সহানুভূতি থাকা সকলের পক্ষেই স্বাভাবিক। কিন্তু শ্রমিক-মালিক বিরোধের নিষ্পত্তি না হলে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে না, বেকার সমস্যার তীব্রতাও প্রশমিত হবে না এবং

বিনিয়োগও বাড়বে না। নতুন রাজনৈতিক অবস্থায় শ্রমিকদের নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষিত রাখার জন্য নতুন চেতনায় উন্মেষ হয়েছে, একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু এই চেতনাকে যদি ঠিকভাবে পরিচালিত করা না যায় এবং মালিকপক্ষও যদি পরিবর্তিত অবস্থাকে গ্রহণ করার জন্য আগ্রহী না হন, তবে এই বিরোধের শেষ কোথায়? পশ্চিম-বঙ্গ থেকে কোনও শিল্প সরানো চলবে না এবং দ্বি-পাক্ষিক বা ত্রি-পাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সব বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে হবে, —এই দৃঢ় সংকল্প নিয়ে জনমত গঠন না করতে পারলে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-জীবনে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা কঠিন হবে।

"সবুজ বিপ্লব" প্রসঙ্গে

ভারতের একজন প্রথম শ্রেণীর অর্থ-নীতিবিদ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক কে এন রাজ "সবুজ বিপ্লবের" ভিত্তি সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। রাষ্ট্রসংঘের উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে একজন পরামর্শদাতা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন কমিটির সদস্য ডক্টর রাজ সম্প্রতি একটি মননশীল প্রবন্ধে ভারতের "সবুজ বিপ্লব" কি কি ধারণার উপর ভিত্তিশীল, তা আলোচনা করেছেন। ভারতে পাঞ্জাব, গুজরাট এবং তামিলনাড়ুতে পর পর তিন বছর যাবৎ ভাল কৃষি-উৎপাদন হওয়ায় "সবুজ বিপ্লব" (Green Revolution) কথাটি প্রবর্তিত হয়েছে। ডক্টর রাজ মেক্সিকো এবং তাইওয়ানের অভিজ্ঞতাও বিবেচনা করেছেন। ডক্টর রাজের প্রধান যুক্তি হল, কৃষি উৎপাদনের সু-উচ্চ হার সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতাই একথা প্রমাণ করে না যে, এ ধরনের উৎপাদন বৃদ্ধির হার বার বার দেখা যাবে। ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে উৎপাদনের কলাকৌশল যতটা উন্নত হয়েছে তাতে উৎপাদনের হার যে আরও বাড়বে তা আশা করা যায় না। যদি উৎপাদনের হার আরও বাড়াতে হয় তবে আমাদের কৃষি-কাঠামোর কিছু সংস্কার প্রয়োজন। মেক্সিকোতে যে বর্ধিত উৎপাদন হার দেখা যায়, তার প্রধান কারণ হল জলসেচ খাতে বিনিয়োগ হার বৃদ্ধি, চাষবাসের জন্য নতুন জমি উদ্ধার, কতিপয় অর্থনৈতিক কারণ (যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য ও সান্নিধ্য) প্রভৃতি। অনগ্রসর কাঠামো থেকে কৃষিব্যবস্থার রূপান্তর মেক্সিকো থেকে তাই-ওয়ানে আরও বেশি উল্লেখযোগ্য। তাইওয়ানে কৃষি-উৎপাদন যে আশাতীতভাবে বেড়েছে তার প্রধান কারণ দেশের গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামোর রূপান্তর, জনসাধারণের আয় বেড়ে যাওয়ায় কৃষিগত সামগ্রীর জন্য চাহিদা বৃদ্ধি এবং ভূমি সংস্কারের ফলে কৃষকদের উৎপাদন বাড়াবার জন্য নতুন অনুপ্রেরণা। পাঞ্জাব, গুজরাট, তামিলনাড়ু প্রভৃতি রাজ্যে কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির যে অপ্রতিহত ধারা দেখা যাচ্ছে, ডক্টর রাজ তার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। পাঞ্জাবে উৎপাদন বেড়ে যাওয়ার প্রধান কারণ নতুন নতুন জমিতে চাষ; গুজ-রাটে উৎপাদন বেড়ে যাওয়ার কারণ হল ফসলের পরিবর্তনশীল রূপ এবং তামিল-নাড়ুতে উৎপাদন বেড়ে যাওয়ার কারণ হল একরপিছু জমির উৎপাদনী শক্তি বৃদ্ধি। এই মুহূর্তে চাষের জন্য নতুন জমি উদ্ধার করার সম্ভাবনা খুবই সীমিত। ভারতে যদি উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অপ্রতিহত রাখতে হয়, তবে তিনটি জিনিসের প্রয়োজন খুব বেশি—(১) পর্যাপ্ত জলসেচের ব্যবস্থা, (২) প্রয়োজনীয় পরিমাণে জমিতে সার প্রয়োগ এবং (৩) ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে কৃষকদের মধ্যে উৎপাদন বাড়াবার প্রচেষ্টা আরও সক্রিয় করা।

তারপর তিন বছর ভাল উৎপাদন হলেই যে "বিপ্লবের" সূচনা হল তা নয়। যদি নিয়মিত এবং পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত না হওয়া সত্ত্বেও উৎপাদন বৃদ্ধির হার অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়, তবেই "সবুজ বিপ্লব" সার্থক হবে।

সুব্রত গুপ্ত

"খাদ্য ও অখাদ্য"

॥ ১ ॥

২৩শে ফাল্গুন, ১৩৭৬ সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকার 'আলোচনা' বিভাগে শ্রদ্ধেয় বুদ্ধদেব বসুর 'খাদ্য ও অখাদ্য' শীর্ষক আলোচনাটি পড়ে আমার মনে যে দু'একটি প্রশ্নের উদয় হয়েছে, তা এখানে নিবেদন করছি।

শ্রীযুক্ত বসুর মতে "খাদ্য সম্পর্কে নিষেধের চাপে বর্ণহিন্দুর মতো নিপীড়িত মানুষ ভূমণ্ডলে আর নেই" এবং এই সব বিধিনিষেধ অধিকাংশই যেহেতু অবৈজ্ঞানিক সে কারণে মেনে চলার যুক্তি তো নাই-ই, উপরন্তু তাতে এদেশের খাদ্য সমস্যাও আরো সংকটপূর্ণ হয়েছে।

বাঙালী বর্ণহিন্দুরা গোমাংস খেতে শুরু করলেই যে বাংলাদেশের খাদ্য সমস্যার নিরসন সহজতর হবে, কিম্বা অন্যান্য ভারতীয় বর্ণহিন্দুগণ মাছ মাংস ভক্ষণের বিরুদ্ধে সংস্কার বর্জন করলেই ভারতের খাদ্য সমস্যা আর থাকবে না, এরকম ধারণা, আমার মনে হয়, সমস্যার অতিসরলীকরণ (over simplification)। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে শস্যহানি ঘটলে দুর্ভিক্ষ বা খাদ্যের অনটন ঘটা বিচিত্র নয়। সর্ব মাংসভুক দেশেও—যথা ইওরোপে ও চীনেও—অতীতে এরূপ দুর্ভিক্ষ ও বিপর্যয় ঘটেছে। এর সমাধান খাদ্যাখাদ্যের ভেদ লোপ করাতে নয়—দুর্ভিক্ষের সময় আপনিই তা ঘুচে যায়—খাদ্য আমদানী ও বণ্টনের সুষ্ঠু ব্যবস্থায় এবং কৃষিব্যবস্থাকে যথাসম্ভব কম প্রকৃতিনির্ভর করে তোলায়।

বর্ণহিন্দুরা যে খাদ্যসম্পর্কে নিষেধের চাপে অত্যন্ত 'নিপীড়িত' মৎস্যাশী বাংলা দেশে তো সেরূপ কিছু কখনো বোধ করিনি। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ বর্ণহিন্দুরা যে মাছ মাংস ডিম কিছুই খান না, তাঁরাও যে এইসব বিধিনিষেধের চাপে খুব নিপীড়িত বোধ করে থাকেন, তাও অনুভব করিনি। বরং এই আত্মশাসন ও আমিষ বর্জনের সামর্থ্যের জন্য কিঞ্চিৎ গর্বই বোধ করে থাকেন দেখেছি।

যে কারণেই হোক ঐতিহাসিক যুগ থেকে ভারতীয় বর্ণহিন্দুগণ আমিষাহার বর্জনকেই শ্রেয়তর জ্ঞান করেছেন। ক্রমে এই শ্রেয়বোধ জাতিমানসে দৃঢ় সংস্কারে পরিণত হয়েছে। হিংসা যে অন্যায় এবং অহিংসা যে শ্রেয়তর একথা যখন সব ধর্মেই স্বীকৃত, তখন মানবসীমা অতিক্রম করে সকল প্রাণীর প্রতিই যদি আমাদের অহিংসা বিস্তৃত হয়ে থাকে এবং আহারের ক্ষেত্রে ভোজনলোলুপতার যূপে যদি তাবৎ প্রাণীকুলকে বলিদান রূপ হিংস্রতা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ আমরা মেনে চলাকেই মনুষ্যত্ব জ্ঞান করি, সেটা খুব নিন্দনীয় নিশ্চয়ই নয়।

মাংস খাওয়ার সঙ্গে নীতির প্রশ্ন সর্বদাই জড়িত। অর্থনৈতিক কারণ দিয়েই অনেকে সব কিছু ব্যাখ্যা করতে ভালবাসেন। যেমন কৃষিকার্যের জন্য গোধন অতিশয় মূল্যবান সম্পদ এবং গো সংরক্ষণের অভাবে এদেশের কৃষিব্যবস্থা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এ উপলব্ধি থেকেই গো-হত্যা ও গো মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ হয়েছিল, একথা অনেকে বলে থাকেন। কিন্তু এ যুক্তি আংশিক সত্য হলেও পূর্ণ সত্য নয়। নতুবা উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের উচ্চবর্ণের হিন্দুদের পক্ষে আমিষাহার মাত্রই নিন্দিত হবে কেন? নিজের ভোজনবিলাসের জন্য প্রাণী হত্যার মধ্যে যে কুৎসিত ক্রূরতা আছে, বিশেষ গৃহপালিত উপকারী জীব হত্যার মধ্যে যে নির্মম রাক্ষসসুলভ মনোবৃত্তি সূচিত ও প্রশ্রয়প্রাপ্ত হয়, তা প্রণিধান করেই সমাজ নেতৃগণ গোহত্যা বিশেষরূপে নিষিদ্ধ করেছিলেন। অন্যান্য গৃহপালিত জীবজন্তু হত্যাও এই কারণেই নিষিদ্ধ এবং প্রাণীদেহকে ভক্ষ্যরূপে ব্যবহারও এই কারণেই নিন্দিত।

আমিষ যে সুস্বাদু এবং তার প্রতি মানব রসনার যে স্বাভাবিক প্রবণতা আছে, তা সমাজ নায়কেরা জানতেন নিশ্চয়ই। কিন্তু আমিষাহার ছাড়া জীবনধারণ অসম্ভব বা অত্যন্ত কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য তাও তাঁরা স্বীকার করতেন না। বরং যার প্রতি মানবমনের স্বাভাবিক প্রবণতা তাকে জয় করাতেই যথার্থ মানবধর্ম, বীরধর্ম এইটেই বিশ্বাস করতেন। গীতায় যে বারে বারে ইন্দ্রিয় জয় ও নিরাসক্তির কথা বলা হয়েছে তাও এই জন্যই। পূর্ণ আত্মশাসন ছাড়া শ্রেয় নাই, আনন্দও নাই। রসনার দাবির কাছে সহজেই হার মানা ও সব প্রবৃত্তিকেই যথেচ্ছ প্রশ্রয়দানের অতিলালিত মনোভাবটি আধুনিক। এতে আর যাই থাক, গৌরবের কিছু নেই।

গো মাংস খেলে কোনো ক্ষতি হয় না, কাজেই গো মাংস না খাওয়া অবৈজ্ঞানিক, এবং এ-কুসংস্কার অবিলম্বে বর্জনীয়, এ যুক্তিও খুব গ্রাহ্য মনে হয় না। কারণ, মানব-ব্যবহারের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকতাই একমাত্র নিয়ামক নয়, উচ্চতর আজ্ঞাপকও (higher imperatives) আছে। ইওরোপে হিটলারীয় তাণ্ডবের সময় নাৎসীদের তথাকথিত অতি-বৈজ্ঞানিক মানববুদ্ধি নিহত ইহুদীদের মৃতদেহ থেকে সাবান কম্বল প্রভৃতি ভোগ্যবস্তু উৎপাদনে তাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল, এই আতঙ্কজনক সত্যও আমাদের মনে রাখা উচিত।

অবশ্য গোমাংস খেলে যে কুষ্ঠ ইত্যাদি হয় ইত্যাদি কথা বালসুলভ। যে-সংস্কার প্রায় মজ্জার মধ্যে সঞ্চারিত তাকে স্বল্পবুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করার এগুলি হাস্যকর প্রচেষ্টা। কিন্তু যে-সংস্কার মুক্তির উদ্দেশ্য রসনার তৃপ্তিসাধনে আরো নিষ্ঠুর কঠোর, আরো হিংসক বৃত্তির আয়োজন তাতে গৌরবের কী থাকতে পারে?

বাঙালী মাছ ও পাঁঠার মাংস ছাড়ুক একথা আমি বলছি না, বললেও কেউ শুনবে না। কিন্তু উদর পূরণার্থে যে-প্রাণী হিংসায় তারা এখনো বিরত, তাতে তাদের নিরস্ত

করার জন্য বৈজ্ঞানিক যুক্তির দোহাই মানাও সমর্থন করি না। অবাঙ্গালী বর্ণহিন্দুরা যাঁরা নিরামিষাশী, তাঁদেরও আমিষাহারে যুক্তি দেবার পক্ষপাতী আমি নই।

তিলাপিয়া মাছ মাঝে মাঝে খায় না এমন বাঙ্গালী পরিবার আমার চোখে পড়েনি। ও মাছ খেলে শ্বেতী হয় একথাও কখনো শুনিনি। আর মাছের যা আকাল তাতে ডাক্তারেও যদি ও মাছ খেতে নিষেধ করে, তা হলেও বেশি লোক শুনবে কিনা আমার সন্দেহ আছে—সিগারেট খেলে ফুস-ফুসের ক্যানসার হয় শুনেও যেমন অনেকেই এখনো সিগারেট খেয়ে থাকেন, তেমনি। নতুন ধরনের মাছ বলে তিলাপিয়ার প্রতি বাঙ্গালী সাধারণের কোনো অনীহা আমি তো দেখিনি। মাছটা খুব সুস্বাদু নয়, এই কারণেই কিঞ্চিৎ আগ্রহের অভাব দেখেছি মাত্র।

সে যুগের বাঙ্গালী বর্ণহিন্দু বিধবাদের টোমাটো ও সাগচিনি খেতে অনিচ্ছার কথাও শ্রীযুক্ত বসু উল্লেখ করেছেন। নতুন জিনিস বলেই খেতে অকুণ্ঠ হওয়া বিধবা-সুলভ মনোবৃত্তি নয়। তাঁদের পক্ষে শাস্ত্র নির্দেশ দিয়েছেন ত্যাগের, নিবৃত্তির ও

কৃচ্ছ্রসাধনের। এই নির্দেশ ভালো কি মন্দ সে তর্ক এখানে তুলবো না। কিন্তু যদি ঐ নির্দেশ কেউ গ্রহণ করেন, তবে অপরিচিত আহার্যবস্তু গ্রহণে অনিচ্ছাও তাঁর সহজে আসতে পারে। আর সাদাচিনি যে হাড়ের কয়লা (bone charcoal) দিয়ে পরিশোধিত এবং সে হাড়ের মধ্যে গরুর হাড় তথা গোরক্ত লাঞ্ছিত হাড়ও থাকা সম্ভব, এরূপ কিছু শুনে তাঁরা যদি ঐ চিনির প্রতি তাঁদের রসনাকে সংযত করে থাকেন, তাতে দোষের কী আসতে পারে? তবে পূর্বেই বলেছি, বৈধব্য সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় অনুশাসন ও তার মর্ম মানলেই এরূপ মনোবৃত্তি সম্ভব। কিন্তু ঐ অনুশাসনের পক্ষে বা বিপক্ষে আমি এখানে কিছুই বলছি না।

নিষিদ্ধ মাংসাদি না খাওয়ায় বর্ণহিন্দুদের স্বাস্থ্যের অবনতি হয়েছে একথাও মাঝে মাঝে শুনি তবে গ্রাহ্য মনে করি না। মৎস্যাশী বাঙালীদের চেয়ে উত্তর ভারতের উচ্চবর্ণের নিরামিষাশী হিন্দুদের দেখলেই তা বোঝা যাবে। দেহের গঠনে, দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে শক্তি ও সাহসে তাঁরা আমিষাশীদের চেয়ে অন্তত হীন নয় একথা সকলেই স্বীকার করবেন। আমাদের এই উষ্ণ দেশে আমিষজাত প্রোটিনের প্রয়োজন ততো তীব্র নয়—শীতপ্রধান বৃটেনেও যে অপরিহার্য নয় তা শেলী ও বার্নার্ড শ আমিষাহার বর্জন করে প্রমাণ করে গিয়েছেন—তাই শুধু রসনার তাগিদে মাংসাহাররূপে হিংসা কর্মের প্রতি বিরুদ্ধ সংস্কার বর্জনের পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে মনে হয় না।

ক্ষিতীন ঘোষাল
কলকাতা—৩২

॥ ২ ॥

দেশ পত্রিকার ২৩শে ফাল্গুনের সংখ্যায় বুদ্ধদেব বসু তাঁর পত্রের শেষে যে মনোভাব এবং আবেদন জানিয়েছেন, তার সঙ্গে আমার ক্ষীণ কণ্ঠও যোগ করতে চাই।

এই প্রসঙ্গে বাংলার একজন সদাশয় ও মহাপ্রাণ মুসলমানের কথা মনে পড়ছে। তিনি স্বনামধন্য দন্ত চিকিৎসক ডাঃ রফিউদ্দিন আমেদ। প্রায় ১০-১২ বৎসর আগের কথা। তিনি তখন পশ্চিম বংলার কৃষিমন্ত্রী। কোন এক প্রদর্শনীর উদ্বোধনী সভায় তাঁকে নিয়ে যাবার সময় তাঁর সঙ্গে খাদ্য সংকট ও সেই সঙ্গে আমাদের খাদ্যের উপর বিপুল সংখ্যক গবাদি পশুর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের চাপ কমানোর বিষয়ে আমার আলোচনা হয়।

আমি কথা প্রসঙ্গে বলি যে, পুরান বিমানবাহী জাহাজকে যেমন হাসপাতাল করা হয় তেমন যদি কোন জাহাজকে Floating Meat Packing Factory—অর্থাৎ ভাসমান মাংস প্যাক করার কারখানা করে আমাদের দেশের চাষের বা দুধ উৎপাদনের পক্ষে লাভজনক নয় এমন অবাঞ্ছিত গবাদিকে আন্দামানের নিকটবর্তী সমুদ্রে তাদের বাক্সবন্দী মাংসে রূপান্তরিত করে বিদেশে চালান দেওয়া হয়, তাহলে একই সঙ্গে দুটি সমস্যার সমাধান হতে পারে—গবাদির সংখ্যা হ্রাস এবং কাজেই আমাদের খাদ্যের উপর চাপ কমান—যে চাপ পৃথিবীতে ভারতেই সবচেয়ে বেশি। বর্তমানে ভারতে গৃহপালিত পশুর সংখ্যা প্রায় ৩৪ কোটি যার অর্ধেকই গরু এবং জনসংখ্যা প্রায় ৫৫ কোটি। এবিষয়ে সেই সময় বাংলা দেশে যে আমেরিকার কৃষি উপদেষ্টা ছিলেন, তাঁর অনুকূল মতামতও তাঁকে জানাই। এর জবাবে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হৃদয়ে তিনি জানান, গরুর প্ল্যান্ড থেকে ওষুধ তৈরির জন্য হুগলী জেলায় গ্রান্ড-ট্রাংক রোডের উপর একটা কারখানা তৈরির ব্যাপারে ডাঃ রায়ের কাছে তিনি সুপারিশ করেছিলেন, যাতে বিদেশী দুর্মূল্য ওষুধের পরিবর্তে বাংলা তথা ভারতের জনগণ স্বল্প ব্যয়ে দেশী ওষুধ পেতে পারেন। কিন্তু তার সেই প্রচেষ্টা শুধু যে ব্যর্থই হয় তাই নয়, তার কোন সহকর্মী পরোক্ষে বলেছিলেন—তাঁর কথায়, "আমি মোছলমান তাই আমি গরু মারার ব্যবস্থা করেছি।" এই সংকীর্ণ মনোভাব থেকে আমরা কবে উদ্ধার পাবো আমার জানা নেই, তবে ভারতের অগণিত অবাঞ্ছিত গবাদি পশুর হাত থেকে যদি আমরা উদ্ধার না পাই, তাহলে খাদ্য সমস্যা সমাধান কখনও হবে না। কেননা, জনসংখ্যা

এবং পশুসংখ্যা পরস্পর পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি শুধুমাত্র দু বেলা দু মুঠো খাওয়ার মত হলেই সমস্যার সমাধান হবে না—স্বচ্ছলতার জন্য উদ্বৃত্তও চাই।

শ্রীমুরারিপ্রসাদ গুহ
নয়াদিল্লী—৫

রূপদর্শীর সংবাদ-ভাষ্য

॥ ১ ॥

দেশ পত্রিকায় (৭ই মার্চ) রূপদর্শীর সংবাদভাষ্যের জন্য অগণিত পাঠকপাঠিকার তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাই।

সময়োপযোগী এই লেখায় কলকাতার অসংখ্য নাগরিকের মনের কথা রূপদর্শীর লেখনীতে ব্যক্ত হয়েছে, এজন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। বর্তমান কলকাতার একটি জীবন্ত ছবি তাঁর লেখায় পরিস্ফুট। ক্ষুদি-রাম, সূর্য সেন, বাঘা যতীনের যুগ বোধ হয় সত্যই হারিয়ে গেল!

তিলোত্তমা মুখোপাধ্যায়
কলকাতা

॥ ২ ॥

২৩শে ফাল্গুন সংখ্যার 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত "খোলা চিঠি"র জন্য রূপদর্শীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। যে সব 'উলুখড়ের' দল "প্রভুজাতীয় জীবদের" (কি অতুলনীয় শব্দ নির্বাচন!) ভাষা সম্যক উপলব্ধি করে উঠতে পারেন না, তাদের চোখের সামনে স্রেফ রাতারাতিই প্রায় শহর কলকাতাটা কেমন করে যেন একটা অজ-পাড়া-গাঁ হয়ে দাঁড়ালো হঠাৎ! শহরের সাধারণ সুযোগ-সুবিধার দুর্দশার কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া হলো, পথেঘাটে টিমটিমে আলো (কোথাও বা সম্পূর্ণই অন্ধকার।) ইস্কুল-কলেজ যেতে হয় প্রাণ হাতে করে, সিনেমা দেখার কথায় বুক কাঁপে, সন্ধ্যা-রাত্তিরে মেয়েদের পথে বেরোনো নাকি বিপজ্জনক, রাত ন'টার পরে সুদৃশ্য জন-পথ ছিমছাম ফাঁকা—এটা একদিন বিংশ শতাব্দীর কলকাতার বর্ণনা হয়ে দাঁড়াবে, স্বপ্নেও কি কেউ ভাবতে পেরেছিলো?

তবু সৌভাগ্যের কথা বলতে হবে যে, 'এতদ্দেশ বঙ্গদেশ'এ রূপদর্শীর নিরপেক্ষ রসটুকু অন্ততঃ এখনও টিঁকে রয়েছে। "সংবাদ-ভাষ্য" জিন্দাবাদ!

এষা মুখোপাধ্যায়
কলকাতা—১৯

॥ ৩ ॥

দেশ পত্রিকার ৩৭ বর্ষ, ১৯ সংখ্যায় রূপদর্শীর সংবাদভাষ্যে বিপ্লবী বাংলার বীর বাঙ্গালীদের উদ্দেশ্যে খোলা চিঠি পাঠ করলাম। পশ্চিম বাংলার বর্তমান অসহায় অবস্থা পরিষ্কার ফুটে উঠেছে ঐ চিঠিতে। সত্যিই আজ আমরা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে ভুলে গেছি বললে ঠিক বলা হবে না—সাহস পাচ্ছি না। কেন আজ বাংলার ঘরে সম্প্রদায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জে না উঠে এই স্বপ্নংসক মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছে এটা বোঝা যাচ্ছে না। অবশ্য রূপদর্শী লিখেছেন, "হে বীর-শ্রেষ্ঠগণ, হে ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, কানাইলাল, সূর্য সেন, বাঘা যতীনের বাঘা বাঘা বংশধরগণ..." কিন্তু আমার বক্তব্য যে, রূপদর্শী সবই ঠিক লিখেছেন, তবে একটা কথা হয়ত ভুলে গেছেন যে, বাংলার তদানীন্তন বীরশ্রেষ্ঠগণ—ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, কানাইলাল, সূর্য সেন প্রভৃতি সকলেই অবিবাহিত। কাজেই তাঁদের বংশধর কি থাকা সম্ভব? সত্যই যদি তাঁদের বংশধর থাকত, তাহলে বাংলা দেশের সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে রাজনীতির বেড়াজালে ফেলে দেশের উন্নতির নামে এক চরম অসহায় অবস্থার সৃষ্টি করতে কেউ সাহসী হতো না। ভগবান বলে যদি কেউ থাকেন, তবে তাঁর কাছে প্রার্থনা, বাংলা দেশে আবার যেন ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, কানাইলাল, সূর্য সেন, বাঘা যতীনের জন্মগ্রহণের ব্যবস্থা করে বাংলা দেশকে রক্ষা করুন—না হলে এদেশের ধ্বংস অনিবার্য।

শ্রীমধুসূদন চৌধুরী
নদীয়া

গোবিন্দমাণিক্যের মুদ্রা

সম্প্রতি 'দেশ' পত্রিকায় "ইতিহাসের আলোতে ত্রিপুররাজ গোবিন্দমাণিক্য দেব ও তাঁহার মুদ্রা" শিরোনামাঙ্কিত একটি নাতিদীর্ঘ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। লেখাটি নিঃসন্দেহে মূল্যবান কিন্তু গোবিন্দমাণিক্যের তাম্রশাসন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক বিবরণের প্রতি যথোচিত দৃষ্টি না দেওয়ার ফলে গোবিন্দ-মাণিক্যের রাজত্বকাল সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিতর্কিত বিষয়গুলির সুমীমাংসা সম্ভব হয়নি। যেমন, গোবিন্দমাণিক্যের মুদ্রায় শিবলিঙ্গ উৎকীর্ণ দেখে "সম্ভবত ত্রিপুরার মুদ্রায় এই প্রথম শিবলিঙ্গ চিহ্ন উৎকীর্ণ করা হল"—এই অনুমান। এই অনুমান যে যথার্থ নয় তার প্রমাণ পাওয়া যায় গোবিন্দের পিতা কল্যাণমাণিক্যের শিবলিঙ্গযুক্ত মুদ্রা থেকে। 'রাজরত্নাকরের' ভাষায় গোবিন্দমাণিক্য 'পূর্বরীতিমতে' শিবলিঙ্গযুক্ত মুদ্রা প্রচার করেন। 'রাজ-মালার' বিভিন্ন সংস্করণেও এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যায়। যথা,

"শিবলিঙ্গ লিখিলেক মোহর পৃষ্ঠেতে।
আর পৃষ্ঠে নিজ নাম রাজার এ হাতে॥"
(কালীপ্রসন্ন সেন সম্পাদিত)

অথবা,
"শিবলিঙ্গ লিখীল মোহর এক পাশে।
অন্যদিগে রাজা নাম লিখীল বিশেষে॥"
(সা প পুঁথির পাঠ)

'রাজমালা'র উক্তি ছাড়াও ১৫৮৩ শকে প্রচারিত কল্যাণমাণিক্যের শিবলিঙ্গ ও সিংহমূর্তিযুক্ত মুদ্রার উল্লেখ পাওয়া যায় কালীপ্রসন্ন সেন সম্পাদিত 'রাজমালা'র তৃতীয় লহরের ২৮৩ পৃষ্ঠায়। প্রসঙ্গক্রমে গোবিন্দমাণিক্য কর্তৃক স্বর্ণমুদ্রা প্রচারের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। এরকম কোন মুদ্রা বর্তমানে সুলভ না হলেও মুদ্রা-প্রচার সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় কর্নেল ঠাকুর মহিমচন্দ্র দেববর্মার "দেশীয় রাজ্য" গ্রন্থের ২২৯ পৃষ্ঠায়। নক্ষত্ররায়ও সেই কথা বলে।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ হল : নক্ষত্রমাণিক্য কর্তৃক মোগল সহায়তায় সিংহাসন অধিকার। এই প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত নিবন্ধে বলা হয়েছে, "নক্ষত্রমাণিক্য যে মোগল-শক্তির আনুকূল্য পেয়েছিলেন সেটা নিশ্চিত।" কোন্ তথ্যের ভিত্তিতে যে এরকম নিশ্চিত হওয়া গেছে তা বোঝা যায় না। তৎকালীন মোগল ইতিহাসে এরকম নিশ্চয়তার আদৌ কোন সূত্র মেলে না। বরং যে কৈলাসচন্দ্র সিংহের উক্তি লেখক-দ্বয়ের বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়নি—ইতিহাসে সেই উক্তির সমর্থন পাওয়া যায়। বাংলা দেশের তৎকালীন ইতিহাসের কোন প্রামাণিক গ্রন্থ পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, নক্ষত্রমাণিক্যের পক্ষে গোবিন্দ-মাণিক্যকে সিংহাসনচ্যুত করার উদ্দেশ্যে মোগল সহায়তা অর্থাৎ শাহ সুজার কাছ থেকে সৈন্য সাহায্য লাভ কোনরূপেই সম্ভব ছিল না; কারণ, গোবিন্দমাণিক্যের সিংহাসনারোহণের কিছুকাল আগেই সুজা অওরঙ্গজেবের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েন এবং গোবিন্দমাণিক্যের প্রথম স্বল্প-কালীন রাজত্বকালে আত্মরক্ষায় এমনই বিব্রত হয়ে পড়েন যে, তাঁর নক্ষত্রমাণিক্যকে সৈন্য প্রদানের কাহিনী আদৌ বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না। শুধু সুজা কেন, বাংলার পরবর্তী সুবেদার মীরজুমলার পক্ষেও এরকম কোন সাহায্য প্রদানের সুযোগ ছিল বলে মনে হয় না। তৎকালীন ত্রিপুরার অবস্থা পর্যালোচনায় বরং এই কথাই মনে হয় যে, গোবিন্দমাণিক্যকে সিংহাসনচ্যুত করার ব্যাপারে নক্ষত্রমাণিক্য যদি কারও কাছ থেকে কোনও সাহায্য পেয়ে থাকেন তবে সে সাহায্য এসেছে রাজ্যের চতুর্দশ দেবতার প্রধান পূজারী এবং ধর্মাচরণ সংক্রান্ত ক্ষেত্রে অসীম প্রভাবসম্পন্ন 'চন্তাই' এবং ঐ চন্তাই-প্ররোচিত, বিক্ষুব্ধ প্রজা-বর্গের কাছ থেকে। গোবিন্দমাণিক্যের পশুবলি প্রথা রহিত করার আদেশই ছিল তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের প্রধান অস্ত্র। নক্ষত্রমাণিক্য নিঃসন্দেহে এই অস্ত্র কাজে লাগিয়েছিলেন।

তৃতীয় প্রসঙ্গ হল : ছত্রমাণিক্যের রাজত্বকাল ও গোবিন্দমাণিক্যের দ্বিতীয়-বার সিংহাসনারোহণ। ছত্রমাণিক্যের রাজত্ব-কালের সময় এবং গোবিন্দমাণিক্যের দ্বিতীয়বার রাজ্যলাভ সম্বন্ধে যথোপযুক্ত তথ্যের অভাবেই বোধ করি ছত্রমাণিক্যের রাজত্বকাল "ঐতিহাসিকদের মতে দুই থেকে ছয় বছর" বলেই লেখকদ্বয় নিজে-দের বক্তব্য শেষ করেছেন। গোবিন্দ-মাণিক্যের ১৫৮২ শকের এবং ছত্রমাণিক্যের ১৫৮৩ শকের মুদ্রা ছাড়া তারিখযুক্ত আর কোন মুদ্রা বর্তমানে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু গোবিন্দমাণিক্য যে ১৫৮৩ শকের অন্তত কার্তিক মাস পর্যন্ত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন তার সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় গোবিন্দমাণিক্যের একটি শিলালিপি থেকে। ঐ শিলালিপিতে গোবিন্দমাণিক্য কর্তৃক মাতার স্বর্গকামনায় ১৫৮৩ শকের কার্তিক পূর্ণিমায় বিষ্ণুর উদ্দেশে 'প্রাসাদ' দানের কথা আছে। তিনি যে দ্বিতীয়বার ১৫৮৯ শকের কার্তিক মাসের পূর্বে অথবা কার্তিক মাসেই সিংহাসনে আরোহণ করেন তারও প্রমাণ পাওয়া যায় গোবিন্দমাণিক্যের একটি তাম্র-শাসন থেকে। সুতরাং ছত্রমাণিক্যের রাজত্ব-কাল মোটামুটি হিসাবে ১৫৮৩ শকের শেষার্ধ থেকে ১৫৮৯ শকের প্রথমার্ধের

মধ্যবর্তী বলে ধরে নেওয়া যায়।

চতুর্থ প্রসঙ্গ হল : গোবিন্দ-তনয় রামদেবমাণিক্যের সিংহাসনারোহণের তারিখ। রামদেবমাণিক্যের ১৫৯৮ শকের মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে সত্য, কিন্তু ঐ মুদ্রাই যে তার অভিষেককালীন মুদ্রা সে সম্বন্ধে বোধ হয় এখনও নিঃসংশয় হওয়া যাচ্ছে না। এ ব্যাপারে সংশয়ের কারণ দুটি। প্রথম কারণ, গোবিন্দমাণিক্যের মৃত্যুর সঠিক তারিখ এখনও নির্ণীত হয়নি এবং ১৫৯৫ শকের পরে তাঁর কোন তাম্রশাসনও পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয় কারণ, ১৫৯৫ শকে নির্মিত একটি বিষ্ণুমন্দিরের শিলা-লিপিতে 'কল্যাণদেব', 'গোবিন্দ' ও 'রাম' এই তিন রাজার একত্রে নামোল্লেখ। অবশ্য এই শিলালিপির সম্পূর্ণ পাঠ উদ্ধার করা যায়নি এবং সেজন্যেই রামদেবমাণিক্য ঐ শকে রাজা ছিলেন একথা নিশ্চিত বলা যাচ্ছে না, তবে তার ১৫৯৮ শকে সিংহাসনে আরোহণ সংক্রান্ত আরও প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত একটা সংশয় থেকেই যায়।

সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

আগরতলা।

রবীন্দ্র পুরস্কার : আবু সয়ীদ আইয়ুব

আবু সয়ীদ আইয়ুব এ বছর রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন শুনে যথার্থ আনন্দ হলো। এই পুরস্কারে আইয়ুবের মর্যাদা বৃদ্ধি হবে না, কিন্তু পুরস্কার-দাতারা যে দৈবাৎ একবার একটি উপযুক্ত গ্রন্থকে চিনতে পেরেছেন, সেটাই বড় কথা। এতে পুরস্কারটিরই মর্যাদা বৃদ্ধি পেল।

আইয়ুবের বই, "আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ" এই পুরস্কারের উপলক্ষ। এই বইয়ের

আবু সয়ীদ আইয়ুব

অধিকাংশ রচনা "দেশ" পত্রিকাতেই ছাপা হয়েছে এবং বইখানি নিয়ে আমরা এই বিভাগে কিছুকাল আগে আলোচনা করেছিলাম—সুতরাং আমাদের পাঠকদের কাছে অধিক বর্ণনা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

আইয়ুবের জন্ম পশ্চিমী মুসলমান পরিবারে, মাতৃভাষা উর্দু। এই বইতেই তিনি তাঁর বাংলা ভাষা শিক্ষার ইতিহাস বলে দিয়েছেন। ইংরেজীতে রবীন্দ্রনাথের "গীতাঞ্জলি" পড়ে মুগ্ধ হয়ে মূলভাষায় সেটি পড়ার জন্য আকৃষ্ট হন, এবং বাংলা শিখতে শুরু করেন। এখন তিনি বাংলা ভাষার প্রধান লেখক।

তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন কিন্তু দার্শনিক হিসেবেই তাঁর প্রথম পরিচিতি। "প্রাচ্য ও পশ্চাত্ত্যের দর্শন" নামে বহুখণ্ড সংকলনটির তিনি অন্যতম লেখক। উর্দু, ইংরেজী, সংস্কৃত, বাংলা ও ফরাসী ভাষা তিনি সাবলীলভাবে ব্যবহার করেন। বাংলা কবিতা বিষয়ে মর্মস্পর্শী ও আধুনিক লেখা আমরা এখন প্রধানত আইয়ুবের কাছ থেকেই আশা করি। শুধু লেখা নয়, আইয়ুবের মতন এমন পরিশীলিত অথচ সপ্রাণ ও সরস বাংলা বলতেও শুনেছি খুব কম লোকের কাছে।

অনেক দিন আগে, "আধুনিক বাংলা কবিতা" নামে একটি সংকলনের তিনি ছিলেন অন্যতম সম্পাদক। তাঁর সহযোগী ছিলেন হীরেন মুখার্জি (এখন এম পি)। এর পর তিনি একা সম্পাদনা করেন পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা।

আইয়ুব এখন সিমলার ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজের ফেলো, এবং ধর্মনিরপেক্ষ সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী এবং মওলানা আবুল কালাম আজাদের ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে তুলনামূলক গবেষণা করছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, "আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থের এক জায়গায় আইয়ুব বলেছেন, তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না—কিন্তু জগৎ সংসারের সর্বাত্মক মঙ্গল ও শুভবোধে বিশ্বাসী।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের জীবনাবসান

রবীন্দ্র সাহিত্যের বিশিষ্ট সমালোচক ও প্রখ্যাত অধ্যাপক ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ৯ই মার্চ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন, ৭১ বছর বয়েসে।

মুনসীগঞ্জ কলেজে তাঁর অধ্যাপক জীবনের শুরু, তারপর তিনি কলকাতায় সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, জয়পুরিয়া কলেজ, উইমেনস কলেজ ও রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। রবীন্দ্র কাব্য পরিক্রমা, রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও পত্র সাহিত্যের ওপর তিনি গবেষণা করেন।

তাঁর একটি বিশেষ কীর্তি বাউল গানের সংগ্রহ। গ্রামে গ্রামে ঘুরে তিনি প্রায় দেড় হাজার বাউল গান সংগ্রহ করেছিলেন—তার একটি নির্বাচিত গুচ্ছ স্থান পেয়েছে তাঁর "বাংলার বাউল" গ্রন্থে।

১৯৫৮ সালে তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছিলেন।

হাঁটুতে হাঁটুতে নহবৎ

লোকনাথ ভট্টাচার্যের এই নামের বইটি বাংলায় একটি নতুন পরীক্ষামূলক কাব্যগ্রন্থ। আগাগোড়া টানা গদ্যে খণ্ড খণ্ড কবিতা, ছন্দ ও মিলের প্রথাগত সাহচর্য পরিত্যাগ করে তিনি শুধু শব্দ নির্বাচনে কবিতাকে ধরতে চেয়েছেন। এক যুগ আগে লোকনাথ ভট্টাচার্য র‍্যাঁবোর কবিতা "নরকে এক ঋতু" বাংলায় প্রকাশ করে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি বেশ কিছু কবিতা ও কয়েকটি গদ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন, কিন্তু এই কবিতার বইটির জাত আলাদা।

"মহড়া", "পথ" ও "গ্রাম"—এই তিনটি ভাগ। তিনটি অংশ থেকে কিছু কিছু লাইন উদ্ধার করছি। "দেহটা হয়েছে যেন ভূতের বাড়ি, তার অন্ধকার বাদুড় আর চামচিকের বিষ্ঠা সস্নেহে লুকোয়। তবু একদিন বাড়িটায় মানুষ ছিল, প্রেয়সী হেসেছে, ঝাড়লণ্ঠন জ্বলতো।

আজ যখন নব বসন্তে পাতা ঝরানোর ডাক—এবং তুমি ডেকেছো, তোমরাও ডেকেছো আমায় মানুষের মিলিত উৎসবে, সদা মুকুলিত আম্রকুঞ্জে—এ কথার নির্মোক আমি খসাতে পারিনি।"

"একটা যুদ্ধ শেষ হল, আরো অনেক আছে—আরো পথ, মরু, হোঁচট খাওয়া, রক্ত ঝরা, আর কাঁধে বোঝা, আর তৃষা—নাগিনীর নিশ্বাস তো আছেই।

ভেবে সংকিত নই—আমার গানও অফুরন্ত, অনন্ত পান্থশালার জন্য।"

"আমার কথা সম্পূর্ণ নয়, এ রাত্রি সম্পূর্ণ নয়, একমাত্র ভোরই সম্পূর্ণ" বাংলা কবিতার ঝোঁক স্বভাবতই নরম ও সংগীতময় হওয়ার দিকে—সেই তুলনায় লোকনাথ ভট্টাচার্যের এই সব কবিতা নিশ্চিত নতুন ও বিশেষত্বমণ্ডিত। তবে, কবিতার ভাষার তুলনায় বাংলা গদ্যরীতিতে এ পর্যন্ত পরীক্ষা অনেক কম হয়েছে। একটু সুললিত হবার চেষ্টা করলেই অনেকে রবীন্দ্রনাথের কব্জায় পড়ে যান। লোকনাথ ভট্টাচার্যও তা সম্পূর্ণ এড়াতে পারেন নি।

নহবৎ

ফণিভূষণ আচার্য সম্পাদিত এই পত্রিকাটিতে আধুনিক কবিতা ও ছোট গল্পের একটি বিশিষ্ট ফসল পাওয়া যায়। প্রতিষ্ঠিত লেখকদের পাশাপাশি এতে স্থান পায় শক্তিমান তরুণ লেখকরা। এ পত্রিকার মলাট থেকেই রচনা শুরু এবং প্রতি সংখ্যায় একজন লেখকের ছবি থাকে। এ সংখ্যায় আছে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ছবি ও কবিতা। এ ছাড়া, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখের কবিতা, সুশীল রায়, অলোক সরকার, সত্যেন্দ্র আচার্য প্রমুখের গল্প আর অরুণকুমার সরকারের একটি প্রবন্ধ। সম্পাদক স্বয়ং লিখেছেন পঞ্চাশের কবিদের অন্তরঙ্গ কথা।

সনাতন পাঠক

পশ্চিমবঙ্গ সমীক্ষা
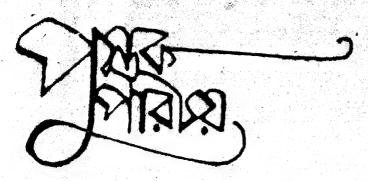
Occupational Mobility and Caste Structure in Bengal—Dr. P. K. Bhowmick. Indian Publications, 3, British Indian Street, Calcutta-1. Price Rs. 15.00,

মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমায় সিলদা বাজার ও ঐ একই মহকুমায় বেলপাহাড়ী বাজারকে কেন্দ্র করে দুটি সমীক্ষা হয়। নিজেদের জাতিগত পেশা বা ব্যবসা ছেড়ে স্থানীয়রা ভিন্ন পেশার কাজ কী পরিমাণে করছে, সেটা দেখাই সমীক্ষা দুটির উদ্দেশ্য ছিল। সিলদার সঙ্গে ঝাড়গ্রাম ও গিদনি রেল স্টেশনের যোগাযোগের একটা পাকা সড়ক আছে এবং একটি বাসও ঐ সড়ক দিয়ে যাতায়াত করে। বেলপাহাড়ী থেকেও ঝাড়গ্রাম এবং গিদনিতে বাসে করে চলাফেরা করা যায়। কোন এলাকার সঙ্গে বাইরের জগতের ট্রেনে বা বাসে যোগাযোগের সুযোগ থাকলে জাতিভেদপ্রথা বা অস্পৃশ্যতার প্রাচীর আপনা থেকেই আস্তে আস্তে ধ্বসে পড়ে। বাইরের এই প্রভাবের ফলে স্থানীয় লোকদের পক্ষেও নতুন নতুন পেশা গ্রহণ করা সহজ হয়, গ্রাম্য-সমাজে পরস্পরনির্ভরশীলতাও হ্রাস পায়।

সিলদা বাজারের দোকানদারদের সকলেই হিন্দু। এখানে স্বর্ণকারেরা অলংকার-শিল্পে নিযুক্ত না থেকে সাইকেল মেরামত করছে, তরিতরকারি ও পানের দোকান চালাচ্ছে এবং মহুয়া ফুল কেনাবেচার ব্যবসা করছে। তেমনি কর্মকারেরা কৃষিকাজ বা লোহার জিনিস তৈরির কাজে নিযুক্ত না থেকে সাইকেল মেরামত ও পানের দোকান খুলে বসেছে। ধোপাদের একজন বাজারে কাপড় এবং একজন কাঁসার বাসন বিক্রি করে। তবে হাটবার ছাড়া অন্য দিন এদের একজন চাষবাস করে এবং অপরজন কাপড় কাচার কাজ করে। যোগীরা আগে ভিক্ষে করত, এখন ভিক্ষে করা অপমানজনক মনে করে। ঐ বর্ণের দুজনের দুটি স্টেশনারী দোকান আছে। কিন্তু সমাজের যারা সবচেয়ে নীচে, সেই মুচিরা আজও অস্পৃশ্য রয়ে গিয়েছে এবং চামড়ার কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজ করে না। শিক্ষার সুযোগ পেলে এরা হয়তো ভবিষ্যতে অন্য পেশা নিতে পারবে এবং তখনই অস্পৃশ্যতা দূর করা সম্ভব হবে।

বেলপাহাড়ী বাজারের চারিদিকে বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন বর্ণের হিন্দুরা ছাড়া সাঁওতাল, মুসলমান এবং খৃষ্টানরাও বসবাস করে। বেলপাহাড়ী বাজারে ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা কাজের বদলে টেলারিং, মুদিখানা, চায়ের দোকান ও সাইকেল মেরামতের দোকান ও কাঠগোলা খুলে বসেছে। তবে চায়ের দোকানে নিজেরাই কাপ-প্লেট ও গ্লাস ধোয় কিনা তা অবশ্য সমীক্ষা থেকে জানবার উপায় নেই। বৈষ্ণবেরা আগে চাষবাস বা ব্যবসা করত না। কিন্তু বাজারে ২৬টি দোকানের মধ্যে ৮টির মালিক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত এবং তাদের মধ্যে একজনের কিছুটা জমি আছে। এই বাজারেও দুই মুচির চামড়ার দোকান আছে, তাদের বাপ-ঠাকুরদাও ঐ একই কাজ করত। হাতে পয়সা এলে চামড়ার কাজ ছেড়ে দিয়ে পান-বিড়ি বা চায়ের দোকান দেবে বলে একজন ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। মাহাতো সম্প্রদায়ের দুটি লোক চামড়ার কাজ করে।

আবার, সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের কাজ আরম্ভ হওয়ায় নারায়ণগড়ের নিকট ডুহির-পুর এলাকায় একজন বাগদি স্কুল-শিক্ষক ও একজন লোধা সমবায়-সমিতি ও ধান-গোলার ম্যানেজার হয়েছে। এখানে মুণ্ডা, লোধা ও বাগদিরা উন্নত পদ্ধতিতে কৃষি-কাজ এবং সার ও পাম্পসেট ব্যবহার করছে। কিন্তু সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনায় সুযোগ বেলপাহাড়ীর মাহাতো ও রুইদাস এবং সিলদার মুচিদের অবস্থার কোন পরিবর্তন আনেনি। সরকারী প্রচেষ্টায় যে সামাজিক সিঁড়ির উপরের ধাপে ওঠা যায়, ডুহিরপুরের ঘটনাই তার প্রমাণ।

শ্রীশংকর সেনগুপ্তের দীর্ঘ ভূমিকায় ডঃ ভৌমিকের সমীক্ষা দুটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে। আয়তনের তুলনায় বইটির দাম সত্যিই বেশী। (২৫২।৬৯)

প্রবন্ধ

ভিয়েতনামের যুদ্ধ কেন? এম শিবরাম। অনুবাদ—মণি গঙ্গোপাধ্যায়। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি। এ/১৩২-১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-১২। দাম দু' টাকা।

ভিয়েতনামের যুদ্ধ থেমেও থামে না। ভিয়েতনামে বর্তমান অবস্থার কীভাবে উদ্ভব হল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে হো চি মিন কীভাবে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন, ফরাসীদের পরাজিত করলেন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন সাংবাদিক শ্রী এম শিবরাম তা বর্ণনা করেছেন। চীন ও কম্বোডিয়ার সঙ্গে ভিয়েতনাম ও ভিয়েতনামীদের সম্পর্ক, অতীত ভিয়েতনাম

দখল করল, ভিয়েতনামীদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে গেলে তা জানা দরকার। শ্রীশিবরামও তা জানাতে ভোলেননি।

দক্ষিণ ভিয়েতনামে দিয়েমের ডিক্টেটরি শাসনের অবসানে পর পর সামরিক নায়কদের রাজত্বকাল, ব্যাপক দুর্নীতি, নাইট ক্লাব• বৌদ্ধদের বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করেছে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের কম্যুনিস্ট বিরোধীরাও কেন সায়গনের সরকারকে সমর্থন করতে পারেন না, ভিয়েতকংদের শক্তির উৎস কোথায়, এ সবই অত্যন্ত দক্ষতা ও আশ্চর্য সরলতার সঙ্গে লিখিত হয়েছে। অনুবাদ ভালই। (৪৩৩/৬৭)

রাক্ষসী তিস্তা। অরুণ নিয়োগী। রায়কতপাড়া, জলপাইগুড়ি। দাম ৩ টাকা ৫০ পয়সা।

১৯৬৮ সালে জলপাইগুড়ির ভয়ংকর বন্যার কাহিনী। 'রাক্ষসী তিস্তা' মুষলধারায় যে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছিল, সেই বৃষ্টির জল করলা তিস্তায় জলস্ফীতি সৃষ্টি করেছিল, রাত্রে আচমকা সেই জল বাঁধ ভেঙে কত গ্রাম, শহর, বাড়ি, গাছপালা বন্যার জলে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তার কোন ইয়ত্তা নেই। শিশু, বৃদ্ধ, জোয়ান, গরু-বাছুর নির্বিশেষে কীভাবে তিস্তার জলে ভেসে গিয়েছিল, শ্রীমৈত্র তারই এক করুণ কাহিনী এখানে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিস্তার প্রলয়-নৃত্যের কাহিনী পড়বার সময় আতঙ্কে শিউরে উঠতে হয়। সমসাময়িককালের সবচেয়ে মারাত্মক বন্যার কাহিনী লিপিবদ্ধ করার জন্য শ্রীমৈত্রকে ধন্যবাদ। (৭৯।৬৯)

জীবনী

শ্যামাপ্রসাদ। বীরেশ মজুমদার। জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট। কলকাতা-১৩। পাঁচ টাকা।

বর্তমান শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করে নিজ কৃতিত্বে সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা অর্জন করেছেন এমন বাঙালী কৃতী পুরুষ আজ অবধি একজনই জন্মেছেন—তিনি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, যদিও তাঁর জীবনকাল খুব একটা দীর্ঘ ছিল না। তবু এই অনতিদীর্ঘ কালের মধ্যেই শিক্ষাব্রতী এবং রাজনীতিজ্ঞ হিসেবে তিনি যে খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন, তার তুলনা মেলা ভার।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এমন একজন মহান বাঙালীর একটিও পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ আজ পর্যন্ত রচিত বা প্রকাশিত হয়নি; যদিও তিনি মারা গেছেন সেও আজ কম দিন হল না—প্রায় সতেরো বছর। আত্মবিস্মৃত জাতি হিসেবে বাঙালীর 'সুনাম' বহুদিনের। আজ হঠাৎ সেই বহুদিন অর্জিত 'সুনাম' একদিনে লুপ্ত হবে এমন আশা করা যায় না। তবু দুঃখ হয়, যখন দেখি, মাত্র সতেরো বছরের ব্যবধানে সেই হিমালয়সদৃশ বিরাট তেজস্বী পুরুষ প্রায় সম্পূর্ণ বিস্মৃত বাঙালী মানস থেকে। যে মানুষটি তাঁর সারাটি জীবন শিক্ষার প্রসারের জন্যে নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও বিদেশী শাসকদের সঙ্গে একক সংগ্রাম করে গেছেন, দেশবাসীর স্বাধিকার ও সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার জন্যে পরাধীন ও স্বাধীন উভয় ভারতেই সিংহবিক্রমে লড়াই করে গেছেন, দক্ষ পার্লামেণ্টারিয়ান হিসেবে ভারতের গণতন্ত্রের শৈশবাবস্থায় বিরোধী নেতার কর্তব্যের সুস্থ ঐতিহ্য স্থাপন করে গেছেন, আজ তিনি তাঁর নিজ প্রদেশেই বিস্মৃতির গর্ভে বিলীয়মান—এর চেয়ে লজ্জার বুঝি আর কিছু হতে পারে না।

বর্তমান বইটি সমগ্র বাঙালী জাতির সেই অনপনেয় লজ্জা কিঞ্চিৎ পরিমাণে হলেও, দূর করবে। কেননা, দীর্ঘকাল পরে হলেও এখনও পর্যন্ত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত স্বর্গত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এটিই একমাত্র জীবনচরিত।

এ বইটিতে প্রধানত তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্বের কথা আলোচিত হয়েছে—সম্পূর্ণ জীবনের কথা নয়। ফলে, এ বইটি থেকে মানুষ শ্যামাপ্রসাদের সম্পূর্ণ পরিচয়টি পাওয়া যাবে না সত্যি, কিন্তু বিদ্যোৎসাহী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অকুতোভয় একজন দেশপ্রেমিককে অনায়াসেই খুঁজে পাওয়া যাবে। উপরন্তু, শ্যামাপ্রসাদের জনপ্রিয়তা খর্ব করার জন্যে তাঁর সম্বন্ধে যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচার তাঁর বিরোধী বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলি থেকে অবিরাম ঢক্কানিনাদ সহকারে করা হত যে, তিনি নাকি অতি বড় সাম্প্রদায়িকতাবাদী ছিলেন, তা যে কত বড় মিথ্যে, তা-ও এই গ্রন্থে উদ্ধৃত শ্যামাপ্রসাদের বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত বক্তৃতামালা থেকে সপ্রমাণ হবে। রাজনীতির ক্ষেত্রেও তিনি কত বড় দূরদর্শী, বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন ও অভ্রান্ত ছিলেন, কাশ্মীরের ব্যাপারে তা পরবর্তী কালে প্রমাণিত হয়েছে; পাকিস্তান সম্পর্কেও তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী যতই দিন যাচ্ছে ততই সত্য হয়ে উঠছে। যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে এমন একজন মহান মানুষের জীবনের পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা এবং তাঁর কৃতিত্বের পূর্ণ ও উচিত মূল্যায়ন যে-কোনও স্বাধীন দেশেরই জাতীয় কর্তব্য। সুখের বিষয়, বীরেশ মজুমদার মহাশয়, সম্পূর্ণভাবে না হলেও, আংশিকভাবেও সেই জাতীয় কর্তব্য এই গ্রন্থের মাধ্যমে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। (১৮১।৬৯)
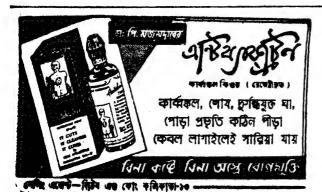
প্রাপ্তি স্বীকার

ব্যাপার গুরুতর। ওঙ্কার গুপ্ত। বাকসাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড : ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯। মূল্য : ৫·০০।

চিত্রগন্ধা। শ্রীবিমলচন্দ্র বেদজ্ঞ। শ্রীমতী লীলা দেবী : ১৯/৩৯, মল রোড, কলিকাতা-২৮। মূল্য : ৩·০০।

মানব দৃষ্টি। চারুবাক্। সঞ্জয়কুমার দাস : কাজলদিঘী, পানবাড়ি, জলপাইগুড়ি। মূল্য : ৩·৫০।

জাতীয় হকির গতবারের বিজয়ী পাঞ্জাব এবং রানার্স রেলওয়ে দলের মধ্যে এবারকার প্রথম দিনের ফাইনাল খেলা জলন্ধরে গোলশূন্যভাবে শেষ হবার পর কলম নিয়ে বসেছি। এ লেখা পাঠকদের হাতে পড়বার আগে হয় পাঞ্জাব না হয় রেল দল হকির জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হবে। সে সম্পর্কে আলোচনা আপাতত মুলতুবী রেখে বাংলার খেলা সম্পর্কে খতিয়ে দেখা যাক।

জাতীয় হকিতে বাংলার ভাগ্য বিড়ম্বনা

গ্রুপ লীগে বাংলা ২—০ গোলে ভুপালকে, ২—১ গোলে বিদর্ভকে, ৪—০ গোলে গুজরাটকে এবং ৪—০ গোলে কেরলকে পরাজিত করেছে। গ্রুপ লীগে বাংলাকে হার স্বীকার করতে হয়েছে শক্তিশালী সার্ভিসেস দলের কাছে ১—৪ গোলে। তবে এ পরাজয় বাংলার কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠায় বাধার সৃষ্টি করেনি। গ্রুপ রানার্স হিসাবে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে বাংলাকে জাতীয় হকি থেকে বিদায় নিতে হয়েছে রেলওয়ের কাছে ১—০ গোলে পরাজয় স্বীকার করে।

এখানে বলা দরকার সার্ভিসেস দল সেমিফাইনালে অপ্রত্যাশিতভাবে উত্তর-প্রদেশের কাছে হার স্বীকার করলেও এবারকার জাতীয় হকিতে ওরাই ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী দল। সুতরাং সার্ভিসেস দলের কাছে গ্রুপ লীগে বাংলার পরাজয় অপ্রত্যাশিত ছিল না। কোয়ার্টার ফাইনালে রেল দলের কাছে বাংলার পরাজয়কেও অপ্রত্যাশিত বলব না। কেননা, তুলনামূলক বিচারে রেল অনেক শক্তিশালী দল। তবু বাংলার পরাজয়ের ক্ষেত্রে কিছুটা ভাগ্য বিড়ম্বনা আছে এ কথা স্বীকার করতেই হবে। ঠিক গতবারের মতই ভাগ্য বিড়ম্বনা।

গতবারও বাংলাকে রেল দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছিল সেমিফাইনালে ইনাম-উর-রহমান এবং যোগীন্দার সিং-এর মত দুইজন নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়ের সাহায্য ব্যতিরেকে। এক আত্মীয়ের অসুস্থ সংবাদ পেয়ে যোগীন্দার সিংকে জাতীয় হকি আসর এর্নাকুলাম থেকে চলে আসতে হয়েছিল। এয়ার লাইনসের ট্রেনিং ক্যাম্প যোগ দেবার জন্য এর্নাকুলাম ছেড়ে ইনামুরকে যেতে হয়েছিল দিল্লিতে।

এবারও রেল দলের সঙ্গে কোয়ার্টার ফাইনালের আগেই ইনাম-উর ও ইক্রামুরকে জলন্ধর ছেড়ে আসতে হয়েছে মায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে।

ইনাম-উর শুধু সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়ই নন। এবার তার উপরই পড়েছিল বাংলা দলের অধিনায়কের দায়িত্ব। গ্রুপ লীগের পাঁচটি খেলায় বাংলার ১৩টি গোলের মধ্যে কেরলের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করার কৃতিত্ব সমেত ইনাম-উরই করেছিলেন ৬টি গোল। সুতরাং তাঁর অনুপস্থিতিতে বাংলা যেমন তার সবচেয়ে ভাল খেলোয়াড়ের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে তেমন বঞ্চিত হয়েছে যোগ্য নেতৃত্ব থেকে। তবু শক্তিশালী রেল দলের কাছে দ্বিতীয়ার্ধের একটি গোলে বাংলার পরাজয় অগৌরবের নয়।

দল বদলের আইন বদল দরকার

কলম নিয়ে বসেছি কলকাতার ফুটবল খেলোয়াড়দের দল বদলের শেষ দিনেও। কলকাতার খেলোয়াড় বলতে সেই সব ফুটবল খেলোয়াড়কেও বোঝায় যাঁরা ভিন রাজ্যবাসী হলেও কলকাতার কোন-না-কোন ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত। ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ মার্চ পর্যন্ত এঁরা এক মাস ধরে দল বদলের সুযোগ পান। এ বছর ১৫ মার্চ রবিবার পড়ায় ১৬ মার্চ পর্যন্ত সুযোগ পেয়েছেন।

এই এক মাস সময়ের মধ্যে অনেকে দল বদল করেছেন। অনেকে একবার দল বদল করে আবার পুরনো ক্লাবেই ফিরে এসেছেন। ওটা আইনের ফাঁক। কারণ অন্য ক্লাবে নাম লিখিয়ে পুরনো ক্লাবে ফিরে এলে খেলোয়াড়ের হাত-পা বাঁধা হয়ে যায়। আর কোনো ক্লাবে যাবার উপায় থাকে না। যে সব খেলোয়াড়কে কর্তৃপক্ষ সন্দেহের চোখে দেখেন বা যে সব খেলোয়াড়ের অন্য ক্লাবের কর্মকর্তাদের খপ্পরে পড়বার সম্ভাবনা থাকে সেই সব খেলোয়াড়কেই এইভাবে অন্য ক্লাবে নাম সই করিয়ে আবার ক্লাবে ফিরিয়ে আনা হয়।

বলা বাহুল্য, দল বদলের আইনে খেলোয়াড়কে সশরীরে আই এফ এ অফিসে উপস্থিত হয়ে ছাড়পত্রে নাম স্বাক্ষর করতে হয়। এ জন্য খেলোয়াড়দের লাঞ্ছনাও কম ভোগ করতে হয় না। যে ক্লাব ছেড়ে আসছেন সেই ক্লাবের উগ্র সমর্থকদের কটূক্তি, ভ্রূকুটি, গালিগালাজ তো আছে। তার সঙ্গে আছে শারীরিক নিগ্রহও।

প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিটে আমাদের দপ্তর থেকে আই এফ এ অফিস মাত্র একশো গজের মধ্যে। দপ্তরে বসে দল বদলের শেষ দিনে আই এফ এ অফিসের সামনে ক্লাব সমর্থকদের যে কাণ্ডকারখানা দেখতে পাচ্ছি তাকে চরম উচ্ছৃঙ্খলতা বললে অল্প বলা হয়। ইঁটপাটকেল, লাঠিসোটা, কাচের বোতল অবাধে ব্যবহার করা হচ্ছে। শ্লোগানে কান ঝালাপালা। খেলোয়াড়দের নিয়ে টানা-হ্যাচড়া চলছে।

আনন্দবাজার পত্রিকার চিঠিপত্র স্তম্ভে এক ফুটবল ক্রীড়ামোদি দল বদলের এই পদ্ধতির নিন্দা করে বলেছেন, 'দল-বদল খেলোয়াড়দের নিজের ব্যাপার। ওই ব্যাপারে তাদের বাধা পাওয়া উচিত নয়, এবং তাদের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তার বন্দোবস্ত থাকা উচিত।

খুবই সত্যি কথা। এ বছর তো কেটেই গেল। আশা করি আই এফ এ কর্তৃপক্ষ আগামী বছর থেকে দল-বদল পদ্ধতিকে সহজ করার চেষ্টা করবেন যাতে খেলোয়াড়দের অযথা লাঞ্ছনা ভোগ করতে না হয়।

একলব্য

ভারত-সিংহল ভলিবল সম্পর্কে

[১৯৫২ সালে মস্কোতে বিশ্ব ভলিবল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারিণী উত্তরপ্রদেশের বাঙালী মেয়ে মীনাক্ষী চৌধুরীর (এখন মীনাক্ষী গোস্বামী) সব রকমের খেলাধুলোয় কৃতিত্বের কথা এর আগে 'দেশ' পত্রিকায় আলোচিত হয়। কলকাতায় ভারত-সিংহল ভলিবল টেস্ট খেলা সম্বন্ধে শ্রীমতী গোস্বামীর মতামত নিচে ছাপা হচ্ছে।]

শুরুতেই 'দেশ' পত্রিকার পাঠক-পাঠিকাকে জানিয়ে রাখি যে, আমি ছিলাম খেলোয়াড়, লেখনীর জোর আমার ছিল না। সেই কারণে যখন আমায় মুকুলবাবু ভারতের মাটিতে সর্বপ্রথম মহিলা ভলিবল টেস্টের বিষয়ে কিছু লিখতে বললেন, আমি রীতিমত চিন্তায় পড়লাম যে, লিখব কি করে। শেষ পর্যন্ত মনস্থির করে ফেললাম, একবার না-হয় লেখবার চেষ্টাই করা যাক।

আন্তর্জাতিক স্পোর্টস-এ ভারতের মহিলাদের স্থান খুবই পিছনে। হয়তো মান নীচু হওয়ার দরুন অংশগ্রহণও খুব কম। ১৯৫৩ সালে ম্যানিলার দ্বিতীয় এশিয়ান গেমস-এ "রীলে রেসের" স্বর্ণ-পদকই বোধ হয় শ্রেষ্ঠ সার্থকতা। তা ছাড়া হকি, টেবিল টেনিস ও ব্যাডমিন্টনে ভারতীয় মহিলাদের স্থান আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী মন্দ নয়। কিন্তু বাস্কেটবল বা ভলিবলে ভারতের মেয়েদের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা নেই বললেই চলে। কেবে সেই ১৯৫২ সালে মস্কোতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ভলিবল প্রতিযোগিতায় ভারতীয় মহিলা দল যোগদান করেছিল। বাস, ওই পর্যন্তই শেষ। সেবার জাতীয় ভলিবল বিজয়ী উত্তরপ্রদেশের মহিলা দলকেই

পাঠানো হয় মস্কোতে। ওই দলের প্রায় বেশির ভাগই মেয়ে ছিল এলাহাবাদের এবং তাতে বাঙালী ছিল ৭ জন। অধিনায়কাও ছিলেন বাঙালী। মস্কোয় আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছিল দারুণ সব শক্তিশালী দলের সঙ্গে। রাশিয়া, বুলগেরিয়া, ফ্রান্স, চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, আরো কয়েকটি দল ছিল, যাঁদের খেলোয়াড়রা ছিল সত্যিই দুর্ধর্ষ। তাঁদের দেহগঠন বিশাল, প্রবল শক্তির অধিকারিণী সব, যেমন তাঁদের স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্য, তেমনই তাঁদের খেলার কৌশল ও নিপুণতা। ওইসব মেয়েদের খেলা দেখলে আশ্চর্য হতে হয় যে, মেয়েরাও কত উঁচু মানে পৌঁছতে পারে। আমাদের সময় সময় মনে হত যে, ছেলেদের খেলার টেকনিকের সঙ্গে এদের প্রভেদ নেই। এদের সার্ভিস যেমন ডিসেপটিভ এবং জোরালো, স্ম্যাশ তেমনই সাংঘাতিক। আবার তেমনই ভাল প্রতিরোধ-ক্ষমতা। ভলিবল খেলার প্রতিটি টেকনিক ওঁদের করায়ত্ত। দলগত সংহতিও চমৎকার। বিদেশী মেয়েরা বলতো, খেলাধুলো আমাদের ধর্মের মত। তুলনায় আমরা ভারতীয়রা ছিলাম দুর্বল, ছোটখাটো এবং খেলাতেও অতি নিম্নমানের। বলতে কুণ্ঠা নেই যে, আমরা শোচনীয় পরাজয় স্বীকার করে দেশে ফিরেছিলাম। অবশ্য যথেষ্ট অভিজ্ঞতা নিয়ে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সদ্ব্যবহার করতে পারলাম না।

কলকাতায় ভলিবলের প্রচলন এবং আগ্রহ যথেষ্ট। তবে মেয়েরা এতে অংশ গ্রহণ ইদানীংই অল্পস্বল্প করছে। যত দূর মনে পড়ে, গত বৎসরই প্রথম জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতায় বাংলার মহিলা দল প্রথম যোগদান করে। মেয়ে ভলিবল খেলোয়াড়ের সংখ্যা বাংলা দেশে খুবই কম। ইতিমধ্যে কয়েক বৎসর ভলিবল খেলা কিংবা অন্য খেলাগুলির সঙ্গে আমার সরাসরি যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয়নি। সংবাদপত্র মারফত জাতীয় প্রতিযোগিতা এবং অন্যান্য খেলাধুলো সম্বন্ধে একটু-আধটু খবরাখবর রাখতাম। একদিন হঠাৎ সংবাদপত্রে দেখলাম যে, ভারতের মাটিতে সর্বপ্রথম মহিলা ভলিবল টেস্ট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সংবাদ পড়ে খুব আনন্দ হল যে, অনেক দিন পর মেয়েদের ভালো ভলিবল খেলা দেখতে পাবো। খুব আগ্রহ নিয়ে ৯ মার্চ আমি খেলাটি দেখতে যাই। সিংহলের খেলার মান সম্বন্ধে আমার কোনই জ্ঞান ছিল না। তবে এটা ধারণা করেছিলাম যে, ১ কোটি মানুষের দেশ সিংহলের চাইতে ৬০ কোটি মানুষের দেশ ভারতের খেলা নিশ্চয়ই উচ্চমানের হবে এবং আমরা জিতবই। কিন্তু বড়ই দুঃখের সঙ্গে লিখছি যে, সে আশা আমার ভেঙ্গে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। সিংহলের চাইতে ভারতের মান উঁচু ছিল না, প্রায় সমান ছিল। তারও পর স্বদেশের মাটিতে খেলার সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও ভারত পর জিত হল।

সিংহল খুবই ভাল খেলেছিল। তাঁদের জয়ের প্রধান কৃতিত্ব অধিনায়িকা নন্দা গানেগোদার। অত্যন্ত সুকৌশলী খেলোয়াড়। শুধু গায়ের জোরেই খেলেনি, খুব বুদ্ধি খাটিয়ে খেলেছে। অনেক সময়ে খেলোয়াড়রা ভুলে যায় যে, ভলিবল খেলা শুধু গায়ের জোরের খেলা নয়। এ খেলায় টেকনিক এবং ক্রাফটেরও দরকার। আমার মনে হয়, স্ম্যাশ-এর সঙ্গে বুদ্ধি প্রয়োগ করলে খেলাটি যেমন উচ্চ মানের হয়, তেমনই দর্শকদের পক্ষে উপভোগ্য হয়ে ওঠে। নন্দা গানেগোদার নেটের কাছে লাফিয়ে উঠে স্ম্যাশ করার দক্ষতা প্রচুর প্রশংসার দাবি রাখে। স্ম্যাশ-এর তীব্রতা যেমন মাঝে মাঝে দেখা গিয়েছিল, তেমনই প্লেসিং এত সুচতুর ছিল যে, ভারতের মেয়েরা প্রায়ই নাগাল পাচ্ছিল না। সিংহল-এর দলগত সংহতি ছিল ভাল। প্রত্যেকটি খেলোয়াড় খুব উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে খেলেছিল। সিংহলী দলের খেলায় ছিল অনুপ্রেরণা এবং তৎপরতা। যেগুলি খেলায় খুবই প্রয়োজনীয়। কোর্টের যথাস্থানে তাঁদের দাঁড়ানো যাকে পজিশন প্লে বলে তারও আমি প্রশংসা করব।

সেই তুলনায় ভারতীয় দলের পজিশনিং ছিল ত্রুটিপূর্ণ। নেটের ধারে লাইন করে দাঁড়িয়ে ডিফেন্স ব্লক তৈরির কথা কেন যে তাঁদের মনে হয়নি, এমন কি টাইম আউট-এর সময় কোচ কেন যে তাঁদের নানাবিধ উপদেশের মধ্যে এই বিষয়ে কিছু বলেননি —আমার বারবার সে কথা মনে হয়েছে এবং বিস্ময়ও লেগেছে। কোর্টের নেটের কাছের অংশ ভারতীয় খেলোয়াড়রা ফাঁক রাখার ফলে সিংহলী খেলোয়াড়দের স্ম্যাশগুলি কার্যকরী হয়েছিল। এদিকে আমাদের মেয়েদের বেশির ভাগ স্ম্যাশ হয় আউট হয়েছে, না-হয় নেটে লেগে ব্যর্থ হয়েছে। কমলেশ নামক খেলোয়াড়টির স্ম্যাশগুলি যথেষ্ট জোরালো ছিল। কিন্তু বেশির ভাগই সোজা কোর্টের বাইরে গিয়ে পড়ে। বার বার স্ম্যাশের ব্যর্থতা দেখেও আমাদের মেয়েরা স্ম্যাশ করার লোভ সামলাতে পারেনি। আমার অনেকবার মনে হয়েছে, গিয়ে বলি স্ম্যাশের চেয়ে বুদ্ধি প্রয়োগ করে সহজভাবে খেলো, ভালো ডিফেন্স কর এবং কোর্টের পিছন দিকে খেলবার চেষ্টা কর। দু' গেম জেতার পর সিংহলী দল বিশেষ করে অধিনায়িকা খুব পরিশ্রম করার ফলে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অবশ্য দম হিসেব না করেও খেলা ভুল।

ভারতীয় দল এই ত্রুটির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে পর পর দুটি গেমই জিতে নেয়। এই সময় ভারতের অধিনায়িকা সুরজিৎ, কমলেশ, গীতাবাঈ ও বিজিতা ভালো এবং জোরালো সার্ভিস করেছে। আমাদের অধিনায়িকা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বেশ স্টেডি গেম খেলেছিল। আর আলিয়ামা সব দিক থেকে ভালো খেলেছে। আমার মতে, ভারতীয় দলের ওই ছিল সব থেকে ভালো খেলোয়াড়। ওর স্ম্যাশ ছিল ভাল, কয়েকটি চমৎকার প্লেসিং প্রশংসনীয়। ভারত দুটি গেম জেতার ফলে, শেষ পর্যন্ত জয়ের আশা জাগিয়েছিল দর্শকদের মনে।

জানা কথা, পঞ্চম গেম হবে নার্ভের প্রতিযোগিতা, শেষ পর্যন্ত নার্ভই প্রভাবিত করবে এবং হলও তাই। গানেগোদা নেটের কাছে দাঁড়িয়ে ভারতীয় মেয়েদের স্ম্যাশগুলি সুন্দর ব্লক করছিল। যার ফলে অনেকগুলি স্ম্যাশ ব্যর্থ হল। আমাদের মেয়েদের মনোবলও সঙ্গে সঙ্গে ধাক্কা খেল। তাঁদের সার্ভিসে ভুল হতে লাগল। যে একরোখা মনোভাব নিয়ে বল বারবার ফেরাবার চেষ্টা করা উচিত তা দেখা গেল না। এপার থেকে যে খেলোয়াড় বল ওপারে পাঠালো সে কিন্তু তারই কাছে তৎক্ষণাৎ ফেরত আসা বল মিস করতে লাগল। সিংহল দল গোড়া থেকে এগিয়ে থাকবার পর ভারতীয় দল একবার পয়েন্ট সমান সমান করল, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারল না। ১৫—১১ পয়েন্টে শেষ গেমে এবং প্রথম টেস্টে ভারত সিংহলের কাছে পরাজিত হল। আমরা দর্শকরা সেদিন বড়ই মনমরা হয়ে বাড়ি ফিরলাম।

তবে এ কথা আমি বলবই যে, দু' দলেরই মান প্রায় সমান সমান ছিল। ভারতীয় দল যদি নিজেদের ত্রুটিগুলি সংশোধন করে ফেলে তা হলে পরবর্তী টেস্টগুলিতে ভারতের জিতবার সম্ভাবনাই বেশী। প্রথম টেস্টের অভিজ্ঞতা থেকে ভারতীয় খেলোয়াড়রা নিশ্চয়ই অনেক কিছু শেখবার সুযোগ পেয়েছে।

আমরা যে সময়ে খেলতাম সেই সময় থেকে এখনকার খেলার মান প্রায় সমান হলেও কিছু এগিয়েছে। আমাদের যুগে আঙুলের জোর বেশী খাটাতে হয়েছে, থার্ড কোর্ট পর্যন্ত বল গিয়েছে—এবার যা যায়নি। এখনকার স্ম্যাশ ত্রুটিপূর্ণ হলেও আমাদের সময় স্ম্যাশ করার প্রচেষ্টা ছিল না বললেই চলে। তবু ১৪ বৎসর দীর্ঘ সময়। খেলার মান অনেকখানি বাড়া উচিত ছিল, তা বাড়েনি। তারই জন্য খেলার শেষে আমি বেশী নিরাশ হয়েছি, ভারতীয় দল হেরেছে বলে ততটা নয়।

—মীনাক্ষী গোস্বামী

খেলাধুলোয় কৃতিত্ব অর্জন করলে এখন ভিক্টরী স্ট্যান্ডের উপর তুলে গলায় মালা পরিয়ে দেওয়া হয়। আর এমন এক সময় ছিল যখন খেলাধুলো করলে ভিক্টরী স্ট্যান্ডের উপর তোলার বদলে মাস্টারমশাইরা 'স্ট্যান্ড আপ অন দি বেঞ্চ'-এর শাস্তি দিতেন ছাত্রদের।

এখন সাঁতারে কৃতিত্ব দেখালে হয়তো পুলিস মন্ত্রী বা পুলিস কমিশনার গলায় পদক পরিয়ে দিতে এগিয়ে আসেন। আর এই কলকাতা শহরেই এমন সময় গিয়েছে যখন পুকুরের জলে সাঁতার কাটতে গেলে খেতে হয়েছে পুলিসের গলাধাক্কা।

গলাধাক্কা না খেলেও পুলিসের তাড়া খেয়ে যাঁদের সাঁতার শিখতে হয়েছে শিক্ষকের কাছ থেকে শাস্তি পেয়ে যাঁদের খেলাধুলো শিখতে হয়েছে তাঁদের মধ্যে একজন সর্ববিদ্যাবিশারদ ক্রীড়াবিদ হচ্ছেন শ্রীঅশোক চ্যাটার্জি।

সেদিন মার্টিন কোম্পানীর হেড অফিসে ওঁর চেম্বারে বসে সেইসব অভিজ্ঞতার কথাই বলছিলেন অশোক চ্যাটার্জি।

ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুলে পড়ার সময় ক্রিকেট খেলার জন্য ওঁকে একদিন শাস্তি পেতে হয়েছিল। আবার উনিশ শো তেইশ কি চব্বিশে যখন কেম্ব্রিজ থেকে ফিরে এলেন তখন ওই স্কুলের স্পোর্টসে পুরস্কার বিতরণের জন্য ওঁর ডাক পড়ল স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র এবং কৃতী ছাত্র হিসাবে।

স্পোর্টসের অঙ্গ হিসাবে দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝি সময়ে যে চার-পাঁচটি ছেলে শহরের পুকুরে প্রথম সাঁতার আরম্ভ করেছিল অশোক চ্যাটার্জি তাদের অন্যতম। প্রথম কয়েকদিন পুলিসের তাড়া খেতে হয়েছিল। তারপর কর্পোরেশনের ডিস্ট্রিক্ট হেলথ অফিসারের কাছে দরবার করে সাঁতারের অনুমতি পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু শর্ত ছিল প্যান্ট ও শার্ট পরে সাঁতার কাটতে হবে। তখন খালি গায়ে সাঁতার কাটা অসভ্যতা বলে বিবেচিত হত। সুইমিং কস্টিউমের তখন প্রচলনই হয়নি।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক, 'প্রবাসী' ও মডার্ন রিভিউ-এর সম্পাদক, ঋষিতুল্য পুরুষ স্বর্গীয় রামানন্দ চ্যাটার্জির পুত্র এবং ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকারের জামাতা শ্রীঅশোক চ্যাটার্জি পাণ্ডিত্যে, কৃষ্টিতে এবং বৃহত্তর সামাজিক পরিমণ্ডলে ওঁর ভূমিকার তুলনায় খেলাধুলার ভূমিকা অবশ্যই গৌণ। তবু নিঃসন্দেহে অশোক চ্যাটার্জিকে সর্ববিদ্যাবিশারদ স্পোর্টসম্যান হিসাবে অভিহিত করা যায়।—যিনি ফুটবল খেলেছেন, ক্রিকেট খেলেছেন, হকি খেলেছেন, সাঁতার কেটেছেন, অ্যাথ-

কৃতীর ক্রীড়া ভূমিকা

লেটিক স্পোর্টস করেছেন, রাগবী, পোলো এবং ওয়াটারপোলো, বিলিয়ার্ডও খেলেছেন। আবার রাইডিং করেছেন, কুস্তি ও বক্সিং লড়েছেন, মুষ্টিযুদ্ধের পাঁচপয়জারও আরম্ভ করেছেন। এবং বলা বাহুল্য, অনেক কিছু শিখতে হয়েছে প্রতিকূল পরিবেশে। অনুকূল পরিবেশ এসেছিল বিদেশে। কেম্ব্রিজে অর্থনীতির জাঁদরেল পণ্ডিত কেন্স ও পিগুর কাছে যেমন অর্থনীতির উঁচু পাঠ নেবার সুযোগ ঘটেছে তেমন সুযোগ পেয়েছেন খেলাধুলো করার।

অশোক চ্যাটার্জি

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মুষ্টিযুদ্ধে বেশ সুনাম পেয়েছিলেন। ও ব্যাপারে ভাগ্য গুরুও জুটে গিয়েছিল। ইউরোপের মিডলওয়েট চ্যাম্পিয়ন বক্সার বিল চাইল্ড ছিলেন ওঁর মুষ্টিযুদ্ধের শিক্ষাগুরু। বিশ্ববিদ্যালয় দলেই হকি খেলেছেন। তা ছাড়া খেলাধুলোর বেশী সুযোগ পেয়েছেন কেম্ব্রিজের কোকোডাইলস ক্লাবে। সেটা এশিয়ার ছাত্র খেলোয়াড়দের ক্লাব।

মল্লযুদ্ধ, টেন্ট পেগিং, রাইডিং প্রভৃতির চর্চা ক্যাভালরি রেজিমেন্টে। কলকাতার ছাত্র আন্দোলনের নেতা ছিলেন। কিছুদিন ট্রেড ইউনিয়ন করেছেন। তা ছাড়া ভূপতি মজুমদার, অমর ঘোষ প্রভৃতির সঙ্গে এক সময় যাদুগোপাল মুখার্জির সন্ত্রাসবাদী দলে ঢুকে পড়েছিলেন। পুলিশের নজর পড়তেই ঢুকে পড়েছিলেন ক্যাভালরি রেজিমেন্টে। মোহনবাগানের ১৯১১-র স্বনামধন্য খেলোয়াড় বিজয়দাস ভাদুড়ীও ছিলেন ওই রেজিমেন্টে। বিজয়দাসই ওঁকে ফুটবল খেলার জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন মোহনবাগান ক্লাবে।

"কিন্তু সে খেলা আমার ফুটবল-নৈপুণ্যের জন্য নয়। খেলিওনি বেশী"—বললেন অশোক চ্যাটার্জি।

বুট পরে খেলতেন। দেহের ছিল মজবুত বাঁধুনি। সে বাঁধুনি আজ ৭৩ বছর বয়সেও বর্তমান। শরীরে শক্তি ছিল। মারামারি করতে ওস্তাদ ছিলেন। সাহেব গোরাদের সঙ্গে খেলবার সময় বিজয়দাস লোক দেখিয়ে দিয়ে বলতেন, ওকে আটকে রাখবে, কিছুতেই বল নিয়ে বেরিয়ে আসতে দেবে না। হয় বল আটকাবে, না-হয় মানুষ আটকাবে।

বিজয়দাসের বাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করতেন। খেলার নীতি ছিল 'তুমি ভি মিলিটারী তো হাম ভি মিলিটারী'। তার জন্য রেফারির কাছ থেকে শাস্তিও পেতে হয়েছে।

পারিবারিক ঐতিহ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির পূজারী অশোক চ্যাটার্জি একদিকে যেমন সদালাপী, সপ্রতিভ এবং গভীর রসবোধের অধিকারী, অপর দিকে তেমন ছোটবেলা থেকে দারুণ ডানপিটে আর খেলাধুলোর অনুরাগী। বাবা রামানন্দ চ্যাটার্জি ছিলেন শান্ত ও সুন্দর পুরুষ। জ্ঞানের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখে সব সময়ই প্রশান্তির হাসি লেগে থাকত। তিনিও ছিলেন অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী, খেলাধুলায় ছেলেদের যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন।

—"আর মা" বললেন অশোক চ্যাটার্জি—"সত্যিই তেজস্বিনী ছিলেন। ১৯০৫ সালে মিসেস বেলকার নাম্নী এক বান্ধবীর সঙ্গে গাড়ীতে করে বেনারস কংগ্রেস অধিবেশনে যাবার সময় এক গুণ্ডার দ্বারা আক্রান্ত হন। কিন্তু দুজনে বেঁটে ছাতা দিয়ে গুণ্ডাটাকে এমনভাবে পিটিয়েছিলেন যে, মিসেস বেলকার ও মার সেই গুণ্ডা মারার কাহিনী উপকথায় পরিণত হয়েছিল।"

মা ও বাবার কাছ থেকে খেলাধুলোয় উৎসাহ পেয়ে খেলাধুলোকে যিনি জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন, খেলাধুলোর প্রচার-প্রসারেও তাঁর অবদান কম নয়। বিলেত থেকে ফিরে এসে ওয়াই এম সি এ এবং যাদবপুর কলেজে বক্সিং শেখাবার ভার নিয়েছিলেন। আজও খেলাধুলোর কয়েকটি বড় সংস্থার হাল ধরে রয়েছেন অশোক চ্যাটার্জি। ভারতীয় অ্যামেচার বক্সিং ফেডারেশন, বেঙ্গল অ্যামেচার বক্সিং ফেডারেশন, স্কুল অব ফিজিক্যাল কালচার এবং বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি।

মুকুল

অরণ্যদেব ✡ লী ফক

প্রিন্স চার্লস, ওদেরকে বন্দুক নামিয়ে রাখতে বলো।
বলছি, বলছি, আমার হাতটাকে এভাবে মোচড়াচ্ছ কেন?

বন্দুক নামাও!

প্রিন্স চার্লসের প্রাসাদে——
হাজার প্রহরী আমাকে রক্ষা করতে পারল না; উঃ, কী অপমান!
অসম্মানিত হবার বদলে মারা পড়লেই কি ভাল হত?

ঠিক আছে, তুমিই জিতেছ। প্লেনগুলো আমি ফেরত দেব।
তা হলে আমাদের টাকা দেবে কে?

প্রিন্স, এই বদমাসগুলোকে বেঁধে ফেলবার জন্যে তোমার রক্ষীদের হুকুম দাও।
ওদের বেঁধে ফ্যাল!
!!
7/27

এবার আমাকে ছেড়ে দাও।
না প্রিন্স, তোমাকে আমার সঙ্গে আসতে হবে।

তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না। তুমি অতি পাজী লোক!
ওদেরকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

!
১৪

সত্যজিৎ রায় এবং তাঁর নতুন ছবি "প্রতিদ্বন্দ্বী"র নায়িকা জয়শ্রী রায় / ফটো—[illegible]

ষাট দশকের ব্রিটিশ চিত্র

ষাট দশকের ব্রিটিশ চিত্রের কথা বললেন চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ ও সমালোচক ডঃ রজার ম্যানভেল। গত সপ্তাহে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন, এবং দি ব্রিটিশ কাউন্সিল ও ফেডারেশন অব দি ফিল্ম সোসায়েটিজ-এর ব্যবস্থাপনায় অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস প্রেক্ষাগৃহে দুই দিন "সমসাময়িক ব্রিটিশ চিত্র" এবং "চলচ্চিত্রে শেকসপীয়র" সম্পর্কে ভাষণ দেন। ভাষণের সঙ্গে কয়েকটি চলচ্চিত্রের অংশবিশেষ দেখানো হয়।

ডঃ ম্যানভেল এর আগেও দুবার কলকাতায় এসেছিলেন। দ্বিতীয় বার, সম্ভবত বছর তিন-চার আগে, তিনি এই একই পন্থায় ব্রিটিশ ফিল্ম সম্পর্কে "সচিত্র"-আলোচনা করেছিলেন। তখন তিনি কয়েকটি ছবির যেসব রীল নিয়ে এসেছিলেন সেগুলি দর্শকের কৌতূহলকে বেশ নাড়া দিয়েছিল। ইতিমধ্যে কলকাতায় ফিল্ম সোসায়েটি আন্দোলন প্রবল হয়েছে, অনেক ক্লাব গড়ে উঠেছে এবং য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের আধুনিকতম ছবি দেখবার সুযোগ আমরা পেয়েছি। অর্থাৎ ফিল্ম সোসায়েটি আন্দোলনের ফলে সমসাময়িক য়ুরোপের চিত্র সম্পর্কে আমরা অভিজ্ঞ বলা যেতে পারে। অতএব যে 'রীল'-গুলি ডঃ ম্যানভেল দেখালেন, যদি তা থেকে সমগ্রের মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়, সেসব ফিল্ম অংশ যদি আমাদের বুদ্ধিকে অথবা "ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন"-কে সচকিত করে না থাকে তবে এর কারণ, আমরা ফিল্মে আরও বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রগতি ইতিমধ্যেই দেখে ফেলেছি। যেসব চিত্রাংশ ডঃ ম্যানভেল দেখিয়েছেন তার মধ্যে "মরগ্যান" কিছুটা উল্লেখযোগ্য। অলীক ও বাস্তবের সীমারেখায় "হ্যালুসিনেশন" ও "রিয়ালিটি" মিশ্রিত এই ছবিতে রাজনীতিক চেতনা-প্রসূত যন্ত্রণার পরিচয় আছে। ছবির শেষে বাগানটি, ফুলগাছ দিয়ে তৈরি বিরাট কাস্তে হাতুড়ি বা কম্যুনিস্ট সিমবল, চমৎকার। নায়কের মনের সংকট বা দ্বন্দ্ব অর্থাৎ তার চেতনায় এসথেটিক বা রোমান্টিক ভাবনার সঙ্গে নির্মম বাস্তব প্রত্যয়ের সংঘর্ষ দেখাবার জন্য এই ফুলে ফুলে তৈরি কম্যুনিস্ট সিমবল-এর প্রয়োজন অপরিণত সূক্ষ্ম বুদ্ধি বা কল্পনার পরিচায়ক।

যাই হোক, ষাট দশকের তরুণ ব্রিটিশ চলচ্চিত্রকারদের ছবির পরিচয় পাওয়া গেল। নতুন অভিজ্ঞতা হিসাবে এর মূল্য আছে। ডঃ ম্যানভেল আমাদের জানিয়েছেন, ব্রিটেনের তরুণ চিত্রপরিচালকদের মেজাজ ও মর্জি এখন কীরূপ, কীভাবে তাঁরা কনভেনশন ভাঙতে চান, সেন্সরশিপের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ (যদিও সচিত্র উদাহরণে তা বোঝা গেল না), কী দুঃসাহসে তাঁরা অল্প বাজেটের ছবি তৈরি করছেন এবং টেলিভিশন কীভাবে সমসাময়িক ব্রিটিশ চিত্রকে প্রভাবিত করেছে। তিনি আর একটি সুখবর দিলেন, নতুন ধরনের পরীক্ষামূলক ছবি "মরগ্যান" জনপ্রিয় হয়েছে।

বিএফ জে এ সদস্যদের ব্যালট ভোটে ১৯৬৯-এর শ্রেষ্ঠ নায়িকা হয়েছেন অপর্ণা সেন। অপর্ণা অনুরাগীদের কাছে সংবাদটি নিঃসন্দেহে আনন্দের। "অপরিচিত"-র এই নায়িকাকে ভালো লেগে গিয়েছিল অনেকেরই। এই ছবি দেখে অনেকে মন্তব্য করেছেন অপর্ণা নাকি বাংলা চলচ্চিত্রের নতুন সুচিত্রা সেন। কথা প্রসঙ্গে একদিন আমি অপর্ণাকে শুনিয়েও দিয়েছিলাম কথাটা। মাপা হাসি হেসে উনি জবাব দিয়েছিলেন, লোকে প্রশংসা করলে কি হবে, সমালোচকদের তো এ ছবিতে আমার অভিনয় তেমন ভালো লাগেনি। উদাহরণ স্বরূপে কয়েকটা নামী কাগজের মন্তব্যের কথাও উল্লেখ করেছিলেন উনি। মজার কথা, সাংবাদিকদের ভোটেই এবার উনি বছরের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর স্বীকৃতি পেলেন। সেদিন আমি অপর্ণাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "অপরিচিত"-র অভিনয়ে আপনি নিজে কি খুব 'সন্তুষ্ট'?" উনি জবাব দিয়েছিলেন, "একটা দুটো জায়গা ছাড়া আমার অভিনয় খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছে বলে ভাবতে পারছি না।" বাংলা ফিল্মে অনেক নায়ক-নায়িকা আছেন সিনেমা রিপোর্টারদের সামনে আড়ষ্ট হয়ে পড়েন। গুছিয়ে সব কথা ঠিক মত বলতে পারেন না। কিংবা হুট করে এমন কোন কথা বলে ফেলেন যা হুবহু ছাপা হলে "ফ্যান"দের আশাভঙ্গের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শিল্পীর কল্পিত "ইমেজ" ব্যাহত হয়ে পড়ে। সেদিক থেকে অপর্ণা এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। মাপা হাসেন, মাপা কথা বলেন।

অপর্ণা সেন যখন সবে ক্লাস নাইনে উঠেছেন, তখনই প্রথম ফিল্মে অভিনয় করবার ডাক আসে সত্যজিৎ রায়ের "তিন কন্যা"র "সমাপ্তি" ছবিতে। তারও আগে নাকি অপর্ণাকে সিনেমায় নামাতে চেয়েছিলেন সত্যজিৎবাবু। সত্যজিৎ-পরিবারের সঙ্গে অপর্ণাদের পারিবারিক প্রীতি অনেক কালের। অপর্ণার বাবা চিদানন্দ দাশগুপ্ত সত্যজিৎবাবুর অনেক দিনের বন্ধু। "পথের পাঁচালী"র অনেক আগে দুজনে মিলে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি। "অপুর সংসার" ছবির প্রস্তুতি লগ্নেই অপর্ণাকে প্রথম সিনেমায় নামানোর কথা ওঠে। কিন্তু পড়াশুনোর ক্ষতি হবে আশংকায় বাবা তখন মত দেননি।

প্রথম ছবি "সমাপ্তি"-তেই অপর্ণা সেন অনেকের মন জয় করে নিয়েছিলেন। "সমাপ্তি"র সাফল্যের পর অনেক অফার এসেছিল ও'র কাছে। কিন্তু হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষা পাশ করার আগে অপর্ণা আর কোন ছবি হাতে নেননি। "বাক্স বদল" ও'র দ্বিতীয় ছবি। তারপর "আকাশ কুসুম" ও "হংস মিথুন"। হঠাৎ বম্বে থেকে ডাক এল। হিন্দী "বিশ্বাস" ছবিতে অভিনয় করা কালীনই উনি সই করলেন ইংরেজী "দি গুরু" ছবিতে। তখনই বাংলা দেশে ও'র হাতে "অপরিচিত"। একই সঙ্গে হিন্দী, ইংরেজী ও বাংলা, এই তিন ভাষায় ছবিতে অভিনয়

শুভেন্দু পিকচার্স-এর 'শেষ পর্ব' (পরিচালনা : চিত্ত বসু) ছবিতে সমিত ভঞ্জ

করার গৌরব খুব বেশী নায়িকার ভাগ্যে জোটেনি। যদিও বিগত দিনের সাধনা বসু এই তিন ভাষার ছবিতে অভিনয় করেছেন, যতদূর মনে পড়ে, তাঁর তিনটি ছবিই তোলা হয়েছিল কলকাতায়, এবং তাঁর পরিণত বয়সে।

অপর্ণার হাতে এখন নতুন ছবি কী কী? "কলঙ্কিত নায়ক" শেষ, "এখানে পিঞ্জর" আর "পদ্মগোলাপ"ও সমাপ্ত প্রায়। নতুন ছবি সই করেছেন "জয় জয়ন্তী"। একমাত্র "পদ্মগোলাপ" ছাড়া বাকী সবগুলি ছবিতেই ও'র নায়ক হলেন উত্তমকুমার।

—বিচক্ষ

সত্যজিৎ রায়ের "প্রতিদ্বন্দ্বী" ছবির নায়ক-নায়িকা : ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায় ও জয়শ্রী রায়

ফটো—দেশ

বিদেশী সমালোচকের চোখে "দিবারাত্রির কাব্য"

ডঃ রজার ম্যানভেল গত সপ্তাহে কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি এখানে একাধিক বাংলা ছবি দেখেন। তার মধ্যে নারায়ণ চক্রবর্তী ও বিমল ভৌমিক পরিচালিত "দিবারাত্রির কাব্য" একটি। ব্রিটিশ চিত্রসমালোচক ডঃ ম্যানভেল "দিবারাত্রির কাব্য" দেখে বলেছেন এমন আন-কনভেনশানাল ছবি এ দেশে হয়েছে বলে আমার ধারণা নেই। ছবির শিল্পমান উচ্চাঙ্গের ও পরিণত। ছবিতে মাধবী মুখোপাধ্যায় ও কানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে ডঃ ম্যানভেল চিনতে পেরেছেন। সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে তিনি তাঁদের দেখেছেন। তিনি ছবির ফটোগ্রাফি ও ব্যঞ্জনাত্মক ট্রিটমেন্ট-এর বিশেষ প্রশংসা করেন।

॥ চিত্র-সমালোচনা ॥

মেঘ ও রৌদ্র : হাসু বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বরূপ দত্ত

মেঘ ও রৌদ্র

(কে এল কাপুর প্রোডাকশনস)

প্রথম ছবি "ছুটি", দ্বিতীয় "মেঘ ও রৌদ্র"—ভিন্ন কাহিনী, আলাদা রস, পৃথক পরিবেশ কিন্তু একই মেজাজ, কোমল পর্দায় কী যেন এক সুরসংগতি। পর পর দুটি ছবি দেখে চিত্রপরিচালিকা হিসাবে অরুন্ধতী দেবীর যে স্টাইল ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া গেল তা স্পর্শকাতর, অন্তত কঠোরের স্পর্শে ম্রিয়মাণ; মেঘের ছায়ায় যার প্রকাশ বেশি, রৌদ্রতাপে শুষ্ক।

তাঁর "মেঘ ও রৌদ্র" এই কোমল মনোভঙ্গির ছবি। কাব্যিক মেজাজের ছবি, যা দেখে দর্শক হয়ত খুবই খুশি হবেন। তার সব সাধারণ বাংলা ছবির তুলনায় "মেঘ ও রৌদ্র"কে উঁচুমানের তাও এই সঙ্গে বলে রাখছি। মহিলা শিল্পীর মনের কোমলতা কোন কোন অংশে চমৎকার রসসঞ্চার করেছে, কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে রৌদ্রকণার মত ক্ষণে ক্ষণে বিচ্ছুরিত শশিভূষণের পৌরুষ ও তেজস্বিতা বিশ্লেষণে। শশিভূষণকে এক তেজস্বী পুরুষরূপে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই আঁকেননি। কিন্তু প্রতিকারহীন অন্যায়ের বিরুদ্ধে তার ব্যর্থ বিদ্রোহের মধ্যেও যে রোষবহ্নি দেখা গেছে পরিচালিকা তার আঁচটুকু তেমনভাবে ছবিতে লাগতে দেননি। নদীর বুকে আক্রমণ দেখানো হয়ত সম্ভব হয়নি, কিন্তু শশিভূষণ যে সাহেবদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই প্রতিরোধের প্রস্তুতি কোথায়? অর্থাৎ ছবিতে শশিভূষণের চরিত্রের একটি দিক, যেখানে সে ভাবুক, এবং গিরিবালার সঙ্গে তার সকাল-বিকালের খেলা, আমরা বিশেষভাবে দেখেছি; আর একটি দিক, যেখানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে কিছু করতে না পেরে সে যন্ত্রণায় পুড়ছে এবং কখনও বা ফুঁসে উঠছে, ছবিতে উপেক্ষিত। ফিল্মে গল্প একটু বাড়াতে হয়, অরুন্ধতী দেবীও বাড়িয়েছেন, পিতা-পুত্রের নাটকও কিছু পরিমাণে রেখেছেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে শশিভূষণের একক যুদ্ধকে নিয়ে তিনি আর একটু রৌদ্ররসের বিস্তার কেন করলেন না, (সেটা সময়োপযোগীও হত হয়ত) তা অবশ্য ভিন্ন প্রশ্ন।

প্রকৃতপক্ষে শুরু থেকেই পরিচালিকা দর্শককে একটা স্নিগ্ধ ও সংবেদী ভাবরাজ্যে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। সে-কারণে প্রথমেই বাউল সমাবেশ, এই সব শুভ্রধারী বাউলের দোলা-দোলা গান গাওয়া দেখতে খুব ভাল লেগেছে তা নয়। বাউল প্রথমেই যে বার্তা জানিয়ে দিয়ে গেল—সোনার মানুষ ভাসছে রসে—লালন ফকিরের গানটি শুনতে অবশ্যই ভাল—তার সঙ্গে শশিভূষণ-গিরিবালার কাহিনীর যোগসূত্র স্থাপন যদিও কঠিন তবুও একটা এসথেটিক মাধুর্য এতে ফুটেছে অস্বীকার করি না। যোগসূত্রের কথা উঠছে এই কারণে যে পরিচালিকা ছবির বিভিন্ন মুহূর্তের রস অনুযায়ী এক একটি গান শুনিয়ে দিয়েছেন। গানের কথা অনুযায়ী যাতে আমরা রস গ্রহণ করতে পারি সে বিষয়ে পরিচালিকার তৎপরতা লক্ষণীয়। যাত্রা-পালার এই ঐতিহ্য ফিল্মে আজও চলছে। অতএব এই প্রয়োগ দোষের নয়। তবে পরিচালিকা কণ্ঠস্বরের উৎস না দেখালেই ভাল করতেন। বিবেকের মত যারা বিভিন্ন নাটকে গান গেয়ে ঘুরছে তাদের এই বেশভূষা বা চেহারায় রবীন্দ্রসংগীতের পরিশীলিত উচ্চারণ বেমানান।

এই অভিযোগ বাদে। আমরা আকাশের মেঘরৌদ্রের সমারোহ ও ক্ষণকালীন খেলার মত সংসারপ্রান্তে দুটি মনে যে ক্ষণিক খেলা এবং যা প্রবল জীবননাট্যের বড় বড় ঘটনার পাশে অতি তুচ্ছ অথচ যা সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করার বস্তু, তার প্রতিটি রসভঙ্গ পরিচালিকা যদি গানের অতিরিক্ত কথা দিয়ে আরও বেশি স্পষ্ট করে বোঝাতে চেষ্টা না করতেন তবে সম্ভবত দর্শকের নীরব উপলব্ধি আরও নিবিড় হতে পারত। দর্শকের কথাই ধরা যাক। পরিচালিকা কাহিনীর ছেদ টেনেছেন চমৎকার, দর্শককে সাসপেন্সএ রেখে দিয়ে। গিরিবালাকে, বইয়ে যেমন আছে, শশিভূষণের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। কারো মুখে কোন কথা নয়, শুধু দুজনের নিঃশব্দে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকা। এই মুহূর্তে দর্শকের রসোপলব্ধি আরও কত গভীর হতে পারত এবং রিক্ত শশিভূষণ ও রিক্তা গিরিবালার অন্তর উপচে-পড়া পাওনা আমরা আরও কত সুন্দরভাবে বুঝতে পারতাম যদি না ওই সময়ে চাওয়া-পাওয়ার তত্ত্বটি গানের ভিতর দিয়ে অত সোচ্চার ভাবে আমাদের জানানো না হত। মূল রচনার প্রতি যেখানে এত বিশ্বস্ততা, সেখানে পরিচালিকা ওই মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের দেওয়া গানটি—এসো এসো ফিরে এসো—কেন ব্যবহার করলেন না জানি না। রসনিষ্পত্তি যে শেষের গানটিতে আরও সুন্দর হত তা বলাই বাহুল্য। তা-ছাড়া মান্না দের গাওয়া সুন্দর গানটিও নষ্ট হল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পে বৈষ্ণব ভিক্ষুকের মুখে গান রাখলেও আমাদের 'এতকালের অভিজ্ঞতার পথচারী বৈষ্ণব দলের মুখে খোল-করতাল বাজনা সমেত "না চাহিলে যারে পাওয়া যায়" রবীন্দ্রসংগীত (এমন দিন এলে অবশ্য আপত্তি নেই) একেবারেই হাস্যকর, এবং দৃশ্যটি যেভাবে গৃহীত তাতে তা বেশ দৃষ্টিকটু। একই জিনিস বইয়ে পড়া আর ফিল্মে দেখা এক নয়। তা বাদে, যে রস সহৃদয়হৃদয়সংবাদী তার সংবাদ বিশেষভাবে দর্শকের মনে পৌঁছিয়ে দেবার চেষ্টাতেই রসহানি। অবশ্য ধ্বনি, দৃশ্য ও সংগীতের মাধ্যমে পাঠ্য গল্পের রূপান্তর ফিল্মে ঘটবেই। রস দৃশ্যরূপ পরিগ্রহ করলে এর ব্যঞ্জনা কিছুটা বাড়তেই পারে। কিন্তু ফিল্মেরও একটা ভাষা আছে, শিল্পরক্ষার জন্য যেখানে কিছুটা অস্পষ্টতা কিছুটা সংযমের দরকার। এই গল্পের রসপ্রতিষ্ঠায় শিল্পের এই শর্ত সর্বত্র যথাযথ পালিত না হলেও ছবিতে এমন

কিছু মুহূর্ত আছে যা মনকে রসগুণে আবিষ্ট করে। শশিভূষণের কাছে গিরিবালার পড়াশোনার সময় বালিকামনের অহৈতুকী আনন্দ ও অভিমান এবং দুরন্ত কৌতূহলের রূপটি অরুন্ধতী দেবী সুন্দর দেখিয়েছেন। তবে দৃশ্য কাট করে সঙ্গে সঙ্গে পাঠশালার দৃশ্য দেখাবার কী প্রয়োজন ছিল? তা-ছাড়া, পাঠশালার ওই মামুলি দৃশ্য, পণ্ডিত মশাইয়ের নিদ্রাযোগ ও ছাত্রদের দুষ্টুমি, ওই কৌতুক তো কতবার বাংলা ছবিতে দেখেছি। তবে একটি ছেলের প্রকৃতির বেগ সামলাতে না পারার ব্যাপারটি নতুন, খুবই কৌতুকপ্রদ।

রাধারানী পিকচার্স-এর 'মুক্তি স্নান' (পরিচালনা : অজিত গাঙ্গুলি) ছবিতে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

ছবিতে অবান্তর দৃশ্যও কিছু আছে, এবং এমন বিষয়ও আছে—যেমন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মত শশিভূষণের বাবার মেক-আপ—যা কৃত্রিম মনে হয়। তুচ্ছ ত্রুটির দিকে নজর না দিয়েও (যেমন, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের কবিতা গিরিবালাকে দিয়ে ভুল করিয়ে কেন ঈশ্বর গুপ্তের বলানো হল তার কারণ দেখানো হয়নি) বলতে পারি, একটি সুরুচিপূর্ণ লিরিক্যাল আমেজের ছবি তৈরির ক্ষমতা অরুন্ধতী দেবী আবার দেখালেন। শশিভূষণ ও গিরিবালার সম্পর্ক তিনি যেভাবে দেখিয়েছেন মূল গল্পের মতই তা সুখভোগ্য ও প্রসাদগুণমণ্ডিত। বাদ সেধেছে, যা আগে বলেছি, রস বিশ্লেষণের অত্যধিক ব্যগ্রতা। তা ছাড়া, ট্রিটমেন্ট বা প্রয়োগ-কর্ম সাধারণভাবে কনভেনশ্যানাল। ছবিতে ফিল্মের গুণ কম থাকলেও বাহ্যিক সৌন্দর্য যথেষ্ট। এই ক্ষেত্রে বিমল মুখোপাধ্যায়ের ক্যামেরার কাজ অসাধারণ। ঝড়-বৃষ্টির দৃশ্যটি চমৎকার। কিছু কিছু শট অদ্ভুত সুন্দর। কাহিনী রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ-রচনার দিকেও —কী গ্রাম্য পথে-ঘাটে, কী গৃহস্থের অন্দরে—পরিচালিকার তীক্ষ্ণ নজর। গ্রামীণ প্রকৃতি ও সংস্কৃতির পরিচয়টিও ছবিতে লভ্য। নায়েবের ঘটনাও সুন্দরভাবে বিশ্লেষিত।

অভিনয় ছবিতে কোন বিশেষ ডাইমেনশন এনে দিতে না পারলেও প্রধান চরিত্রে সকলের চরিত্রচিত্রণই প্রশংসনীয়। স্বরূপ দত্তকে রবীন্দ্রনাথের শশিভূষণ হিসাবে সহজেই গ্রহণ করা যায়। তাঁর বাচনভঙ্গি নম্র, অভিব্যক্তি শান্ত। তবে চরিত্রে তেজস্বিতার দিক আর একটু ফুটলে ভাল হত। হাসু বন্দ্যোপাধ্যায় হয়েছেন গিরিবালা। তাঁর কথা বলার ধরনটি স্মার্ট, এ জনাই তাকে ভাল লাগে। তাঁর চোখেও মনের ভাষা সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে। তবে কান্নাটা তাঁর কৃত্রিম লেগেছে। উঁচুদরের অভিনয় নায়েববেশী স্বর্গত প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের। একটি দৃশ্যে অপমানের জ্বালা তিনি চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শুচিতা রায় (স্বর্ণ), মঞ্জু ভট্টাচার্য, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীদের চরিত্রচিত্রণ যথাযথ।

ছবির গানের কথা আগেই বলা হয়েছে। আবহসংগীতে অরুন্ধতী দেবী বিশেষ ভাবমুহূর্তে রবীন্দ্র সংগীতের সুর ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গানের কথা যাঁর জানা নেই তাঁর কাছে ওই সুর শুনতে ভাল লাগলেও অর্থবহ নয়।

কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ সন্তোষজনক। ক্যামেরার কাজের কথা আগেই বলেছি। এর পরেই প্রশংসনীয় সুবোধ রায়ের চিত্রসম্পাদনা ও সুনীতি মিত্রর শিল্পনির্দেশনা।

আলেয়ার আলো

(ইউনিট প্রোডাকসন্স অব ইণ্ডিয়া)

কাহিনী যা তাতে স্পষ্টতই বোঝা যায়, দর্শককে কিছুক্ষণের জন্য উত্তেজনা, উৎকণ্ঠা ও সাসপেন্স-এ মজিয়ে রাখার জন্যই "আলেয়ার আলো"। ক্রাইমের মাত্রা যথাসাধ্য চড়িয়ে দেওয়া হয়েছে—ছোট ভাই (শেখর চট্টোপাধ্যায়) সম্পত্তি আত্মসাতের জন্য বড় ভাইকে (অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়) কৌশলে খুন করেও নিরস্ত নয়, বড় ভাইয়ের অনাগত সন্তানের ভূমিষ্ট হবার পথও রোধ করা যায় কিনা সেই হীনকার্যেও সে তৎপর। যাই হোক, এস্টেটের ম্যানেজারের (রাধামোহন ভট্টাচার্য) চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত দুর্বৃত্তের সব মতলবই ব্যর্থ হয়। শয়তানের শাস্তি পেতেও বিলম্ব হয় না—পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে সে শয্যাশায়ী।

পরের অধ্যায়ে রয়েছে কিছু পারিবারিক নাট্যোপকরণ। তাছাড়া আছে সাসপেন্স, বড় ভাই দীপনারায়ণের পুত্র প্রদীপ (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়) এবং তার প্রেয়সী শিখাকে (সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়) কেন্দ্র করে। সৌমিত্রর বড় ভাই (কাকার ছেলে) হয়েছেন অনুপকুমার; অনুপকুমারের প্রেমিকা আবার সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের ছোট বোন জ্যোৎস্না বিশ্বাস। অনুপকুমারকে বড় ভাই ভাবতে যেমন

অসুবিধা হয়, তেমনি অস্বাভাবিক লাগে তাকে ছোট ভাইয়ের প্রেমিকার ছোট বোনের প্রেমে পড়তে দেখে। তবে এই প্রেমকাণ্ডে অবশ্য অনুপকুমারের কৌতুকোজ্জ্বল অভিনয় এবং জ্যোৎস্না বিশ্বাসের রোমান্টিক আচরণ ভাল লেগেছে। রোমান্টিক জুটি হিসাবে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় নিষ্প্রভ। আরও খারাপ লেগেছে শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়ের মেক-আপ।

রোমান্টিক বিষয়ে "আলেয়ার আলো"-র কিছুই দেবার নেই। বরঞ্চ পরিচালক মঙ্গল চক্রবর্তী অ্যাকশন, ক্রাইম, ষড়যন্ত্র, কয়লা-খনির কাজকর্ম ইত্যাদি ছবিতে সুবিন্যস্ত করেছেন। ছবিটিও গতিসম্পন্ন। যদিও শেষার্ধে, যখন কাহিনীর জাল গুটনোর পালা, ছবিটি দর্শকের আগ্রহ তেমন ধরে রাখতে পারে না। অর্থাৎ গোড়ায় যে আমোদের আশা জাগে শেষের দিকে তা আলেয়ার আলোর মতই দর্শককে নিরাশ করে।

অভিনয়ে রাধামোহন ভট্টাচার্য (এস্টেটের ম্যানেজার), সন্ধ্যারাণী (বড় বউ) এবং সন্ধ্যা চৌধুরীর (ছোট বউ) নামই আগে করতে হয়। এঁরা সুন্দর অভিনয় করেছেন। রাধামোহন ভট্টাচার্যের চরিত্র-চিত্রণ বলিষ্ঠপূর্ণ। কুচক্রী উকিলের ছোট একটি ভূমিকায় তরুণ মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ও ভাল লাগে।

সংগীত পরিচালনা করেছেন গোপেন মল্লিক। গানটি মন্দ নয়।

বোম্বাই বিচিত্রা

শিবসেনার সৈনিকরা এতদিনে চলচ্চিত্র জগতেও হামলা এনেছেন। কিছুদিন আগে শিবসেনার নেতা শ্রীবাল ঠাকরে স্থানীয় রণজিৎ স্টুডিওতে একটি সভার আহ্বান করেন এবং সেই সভাতেই শিবসেনার চলচ্চিত্র শাখার জন্ম হয়। শ্রীবাল ঠাকরে উক্ত সভায় ঘোষণা করেছেন যে, এখানে অর্থাৎ বোম্বাইয়ে যাঁরা হিন্দী ছবি করেন তাঁরা বাধ্যতামূলকভাবে দুটি হিন্দী ছবি করার পর একটি করে মারাঠি ছবি করবেন, নইলে...। শিবসেনা নেতার এ ঘোষণাকে সবাই কামানি ভাবতে শুরু করেছেন। ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা সংস্থার সভাপতি শ্রী আই এস জোহর শিবসেনা নেতার এ ঘোষণার নিন্দা করে বিবৃতি দিয়েছেন নয়াভাষার। এ প্রসঙ্গে নানান ধরনের বিবৃতির আদান-প্রদান হবে এখন কিছুদিন ধরে। চলচ্চিত্র জগতে শিবসেনার আগমনকে স্বাগত জানাবেন মারাঠি চিত্রের নির্মাতারা। কারণ মারাঠি চিত্রের প্রতি

এ-আর-সি প্রোডাকশনস-এর "রূপসী" (পরিচালনা : অজিত গাঙ্গুলি) ছবিতে সন্ধ্যা রায়

সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা থাকলেও তা তেমন উদ্দীপনার সৃষ্টি করেনি মারাঠি চিত্র নির্মাতাদের মধ্যে। মারাঠি চিত্র ব্যবসা এখনো প্রায় যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই আছে। চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করেই শিবসেনা ঘোষণা করেছেন যে, যদি কোন মারাঠি চিত্রনির্মাতা ছবির মুক্তির জন্য সিনেমা হাউস না পান বা পেলেও অত্যন্ত বেশী ভাড়ার জন্য ছবি রিলিজ করতে অসমর্থ হন তাহলে উক্ত চিত্রনির্মাতা যেন শিবসেনার শরণাপন্ন হন। মারাঠি চিত্র-নির্মাতারা এতে অভয় লাভ করেছেন। কিন্তু যাঁরা ভয়ে কাঁপতে শুরু করেছেন তাঁরা হলেন সিনেমা হাউসের মালিকরা। আমি বাঙালী হলেও (সম্ভবত বাঙালী বলেই) মারাঠি ছবির সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি। বাংলা দেশে যেমন হিন্দী ছবি এবং মুনাফা মনোবৃত্তির চাপে বাংলা চিত্রজগতকে রুদ্ধশ্বাস দেখে আমার মনে আক্রোশের জ্বালা ওঠে তেমনি একই পরিবেশ এবং পারিপার্শ্বিকের কল্যাণে মারাঠি ছবির মৃত্যুপ্রায় অবস্থা দেখে আমার অনুতাপের অন্ত থাকে না। তাই যখন তার প্রতিকার এবং কোন রকম সম্ভাবনা নজরে আসে তখন আমি তাকে বিনা দ্বিধায় স্বাগত জানাই। শিবসেনার চলচ্চিত্র শাখার একটি প্রস্তাবকে সমর্থন জানানোর সঙ্গে সঙ্গে একই নিঃশ্বাসে অন্য প্রস্তাবটির অসমর্থন করছি দৃঢ়ভাবে। সে প্রস্তাবটি হল ঐ হিন্দী চিত্রনির্মাতাদের দুটি হিন্দী ছবি বানানোর পর বাধ্যতামূলকভাবে একটি মারাঠি ছবি বানানোর প্রস্তাব। এ প্রস্তাবের প্রতিবাদও করছি মারাঠি ছবি ভালবাসি বলে। অমারাঠি চিত্র-বণিকদের হাতে কোনক্রমে যদি একবার মারাঠি ছবির ভবিষ্যৎ সঁপে দেওয়া হয় তাহলে ভবিষ্যতের কোন শিবসেনাই মারাঠি ছবির মারাঠিত্বকে বাঁচাতে পারবে না। মারাঠি ছবি শুদ্ধ

তাঁরাই করবেন যাঁরা মনেপ্রাণে মারাঠি ভাষা, মারাঠি জীবন এবং মারাঠি সংস্কৃতিকে ভালবাসেন, শ্রদ্ধা করেন। হিন্দী ছবির বর্তমান দুরবস্থার অন্যতম কারণ হল যে, হিন্দী ছবির নির্মাণ ব্যবসা মুখ্যত অহিন্দী ব্যবসায়ীর হাতে। হিন্দী ছবির বর্তমান চেহারার জন্যও মুখ্যত দায়ী ঐ একই কারণ। সেই জন্যেই বলছি শ্রীবাল ঠাকরের যদি কোন রকম শ্রদ্ধা থাকে মারাঠি চিত্র ব্যবসায়ের প্রতি তাহলে যেন উনি মারাঠি চিত্র ব্যবসায়ের রক্ষাকর্তা হতে গিয়ে তার সর্বনাশ না করেন।

*

সেদিন দুপুরে শর্মিলার বাড়িতে আড্ডা হচ্ছিল, তনুজা ছিল, আর একজন মহিলা। এমন সময় একটি টেলিগ্রাম এলো। শর্মিলা পড়ল, তারপর তনুজা, আবার শর্মিলার হাত হয়ে সেটা আমার হাতে এলো। শর্মিলার ফিল্ম ফেয়ার অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তির খবর এসেছে খাস দপ্তর থেকে। উৎফুল্ল হলাম। শর্মিলা বলল, 'নিশ্চয়ই বাজে খবর, কেউ ঠাট্টা করেছে বোধ হয়।' 'কেন সেরূপ ভাবছেন?' বললাম। হাসলো শর্মিলা 'আমি তো কোন চেষ্টা করিনি।' সবাই হাসলো। একটু পরে জানলাম তনুজাও পেয়েছে একটা পুরস্কার।

'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন' (পরিচালনা : অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়) ছবিতে দেশবন্ধুর ভূমিকায় অনিল চট্টোপাধ্যায় এবং বাসন্তী দেবীর চরিত্রে লিলি চক্রবর্তী ফটো—দেশ

*

সেদিন পরিচালক অসিত সেনের সংগে কথা হচ্ছিল। অসিতবাবু হিন্দী চিত্র-জগতে প্রবেশ করেছেন উত্তরফাল্গুনীর হিন্দী রূপ 'মমতা'র পর। বেশ কয়েকটি বড় ছবি মানে বড় বড় নাম-করা তারকা-খচিত এবং মিউজিক ডাইরেক্টর শোভিত ছবির পরিচালক অসিত সেন। 'মমতা'র পর ও'র নির্দেশনায় একটি ছবি মুক্তি লাভ করেছে, সে ছবির নাম "আনোখী রাত"। এ ছবির ফলাফলের কথা আপনারা জানেন। আপাতত অসিতবাবুর একটি ছবি মুক্তি প্রতীক্ষায়, নাম 'খামোশী'। এটি 'দীপ জেবলে যাই'-এর হিন্দী রূপ। মুক্তি লাভ করলে তখন অন্তত বাঙ্গালী দর্শকেরা এ ছবির তুলনামূলক আলোচনা করতে পারবেন। অন্য একটি ছবি, যে ছবির জন্যই অসিত সেন অসিত সেন, সেটি হল ও'র প্রথম চিত্র 'চলাচল'। এখন অসিত-বাবু 'চলাচলে'র হিন্দীরূপ দিচ্ছেন। চলাচলের নাম হয়েছে 'সফর'। চলাচলের চলচ্চিত্র-চরিত্র হিন্দীতেও অক্ষুণ্ণ থাকবে [illegible] আশ্বাস দিচ্ছেন অসিতবাবু। যদি সত্যি সত্যি "সফর" দেখে এ আশ্বাসের সত্যতা দেখতে পান দর্শকসমাজ তা হলে অসিতবাবু জয়ধ্বনি লাভের যোগ্যতা অর্জন করবেন।

*

আগামী তিরিশে এপ্রিল থেকে এক সপ্তাহ বম্বেতে দাদাভাই ফালকে শত-বার্ষিকী পালিত হবে। প্রথামত একটি উৎসব কমিটি স্থাপিত হয়েছে, যার কর্ণধার হয়েছেন রাজ্য সরকারের শিক্ষা এবং সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রী এস ডি চৌধুরী। অনেকের মতে দাদাভাই ফালকেই ভারতীয় চলচ্চিত্রের জনক (অনেকের মতে হীরালাল সেন)। দাদাভাই ফালকে শতবার্ষিকী উৎসব কমিটি শ্রী ফালকের একটি স্ট্যাচু প্রতিষ্ঠা করতে চান, দাদাভাই ফালকে রোডের সন্ধিস্থলে। এছাড়া প্রভাত চিত্র মণ্ডলের সৌজন্যে এক সপ্তাহব্যাপী শ্রী ফালকের বিভিন্ন ছবি দেখানো হবে। এই কমিটি চলচ্চিত্র জগতের প্রত্যেক সংস্থার সভা-পতিকে এই উৎসবে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে দাদাভাই ফালকে শতবার্ষিকী যেমন একটা সর্বভারতীয় রঙে এবং ঢঙে হওয়া উচিত তার কোন আভাষ এখনো পাওয়া যাচ্ছে না।

সরল শর্মা

হেমন্তিকার ঋতুরঙ্গ

কবিতীর্থের শিশু সংস্থা হেমন্তিকার দ্বিতীয় বার্ষিক নিবেদন নৃত্যনাট্য ও ঋতুরঙ্গ অনুষ্ঠানটি "শরৎচন্দ্র পাল বালিকা বিদ্যালয়" প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়।

'মেলোডিকা'র সংগীতানুষ্ঠান

সম্প্রতি 'মেলোডিকা'র প্রযোজনায় একটি মনোরম সন্ধ্যা অতিবাহিত হল মহাজাতি সদনে। অধিকাংশ শিল্পীই শিক্ষার্থী। কিন্তু আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা দিয়ে ওঁরা সুর আর ছন্দের যে বিচিত্র রসমাধুর্য সৃষ্টি করেছিলেন, উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে তা খুবই উপভোগ্য হয়ে ওঠে। সেদিন শিল্পীরা অধিকাংশই গেয়েছেন হিমাংশু বিশ্বাসের সুরারোপিত গান। এ ছাড়া গীটারের ঐকতানে তাঁরই পরিচালনায় উচ্ছ্বসিত কিছু পরিচিত ও জনপ্রিয় সুরের সুন্দর ঝংকার। বিচিত্রানুষ্ঠানের শেষে 'রঙ-বেরঙ'এর শিল্পীরা রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'র অন্তর্গত 'তোতাকাহিনী' অবলম্বনে একটি নাটক মঞ্চস্থ করেন। কাহিনীটির নাট্যরূপারোপ এবং কয়েকটি চরিত্রের অভিনয়ে রঙ্গরসের কিছু আতিশয্য না থাকলে এই নিগূঢ় সংকেতধর্মী কাহিনীর মেজাজটি সার্থকতর ব্যঞ্জনায় ফুটে উঠতে পারত। তবে [illegible] অভিনয় এবং সেই সঙ্গে হিমাংশু বিশ্বাস রচিত আবহসংগীত বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

চতুর্মুখের উত্তর ভারত সফর

পশ্চিমবাংলার খ্যাতনামা অপেশাদার সংস্থা চতুর্মুখ কেন্দ্রীয় সংগীত-নাটক আকাদেমীর বিশেষ আমন্ত্রণে দিল্লীতে অভিনয়ের জন্য ২৮শে মার্চ নিউ দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করছেন।

দিল্লীতে কলকাতায় আলোড়ন সৃষ্টিকারী নাটক 'কুইনের মৃত্যু' ও মন্মথ রায়ের 'দম্পতি' নাটকের কয়েকটি অভিনয়ের পর চতুর্মুখ ফিরতি পথে লক্ষ্ণৌ ও পাটনায় আরো কয়েকটি অভিনয় করবেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' প্রযোজনার চতুর্মুখ হাত দিয়েছেন। নাট্যরূপের দায়িত্ব নিয়েছেন শ্যামলেন্দু পত্রী। নায়িকার চরিত্রে মঞ্জু ও চিত্রকূপাতের অভিনেত্রী প্রতিষ্ঠিত অভিনেত্রীকে দেখা যাবে। চতুর্মুখের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাটকের নির্দেশনার দায়িত্বে থাকছেন মঞ্চ ও চিত্রাভিনেতা অসীম চক্রবর্তী।

বৈতানিকের রবীন্দ্র নাট্যোৎসব

রবীন্দ্রনাথ জীবন-সায়াহ্নে একটি আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিলেন, যেটি চরিতার্থ করবার ক্ষমতা এক তাঁরই হাতে ছিল। কালিদাসের শকুন্তলা অবলম্বনে একটি নৃত্যনাট্য-রচনা। এই কাজটি তিনি সম্পন্ন করে যেতে পারেন নি। যদি পারতেন, তা হলে 'শ্যামা'র পরে আর একটি অসাধারণ সৃষ্টি তাঁর স্বর্ণভাণ্ডারে সংযোজিত হত নিশ্চয়ই। কথাটা মনে হচ্ছিল গত ১৬ই ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্র সদনে বৈতানিকের উৎসবে

"শপথ" (পরিচালনা : অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়) ছবিতে প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ● সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

উপস্থিত হয়ে। রবীন্দ্রনাথের সংগীত এবং রচনার সঙ্গে মূল শকুন্তলার অংশবিশেষের সংযোগে কালিদাসের ওই অমর কীর্তিটির নূতনতর উপস্থাপনা সেদিনকার অনুষ্ঠান সূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ কাজে সম্পাদনার দায়িত্বটি কিন্তু অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু রবীন্দ্রনাথের গানের ভাণ্ডারে দেখা যায় যে, মানুষের এমন অনুভূতি নেই, যা তাঁর গানে ভাষা পায় নি, অতএব যে-কোনো পরিস্থিতির যে-কোনো আবেগব্যাকুল মুহূর্তের উপযোগী গানই সেখান থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে, এমন একটা ধারণা অনেকের আছে। এরই ফলে রবীন্দ্ররচিত নৃত্যনাট্য ছাড়াও রবীন্দ্রসংগীত এবং রবীন্দ্র রচনা সম্বলিত অধুনারচিত বেশ কিছু নতুন নতুন নৃত্যনাট্য-প্রযোজনার খবর মেলে। এগুলির মধ্যে 'শকুন্তলা'র পরিকল্পনাটি বৈশিষ্ট্যের দাবি করতে পারে। কালিদাস আর রবীন্দ্রনাথের মানস-সান্নিধ্য যে কত নিবিড়, তা আমাদের অজানা নেই। বিশেষত, 'মেঘদূত' আর 'শকুন্তলা' রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে কিভাবে অধিকার করেছিল, তার বিভিন্ন রচনায় তার প্রমাণ আছে। এই জাতীয় ভাবনাই হয়তো বৈতানিকের 'শকুন্তলা' নৃত্যনাট্য গ্রন্থনার প্রেরণা দিয়েছে। তাঁদের প্রযোজনায় মূল রচনাটির প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্যটুকু বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মতন। কখনও কখনও সংস্কৃত শ্লোকের আবৃত্তি-সহ রবীন্দ্রসংগীত সহযোগে 'শকুন্তলা'র সমগ্র কাহিনীটির অবিকল উপস্থাপনায় তাঁদের আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠার পরিচয় ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও রসের বিচারে অনুষ্ঠানটিকে খুব সার্থক বলা চলে কি? মূল রচনার যেন এদিক-ওদিক না হয়, এ বিষয়ে তাঁরা সচেতন ছিলেন কিন্তু গানের সুর ও ছন্দের এমন দুর্বল, প্রমাদযুক্ত পরিবেশনা অন্তত বৈতানিকের কাছ থেকে প্রত্যাশিত নয়। আর শুধু আখ্যানের দিক থেকে মিলিয়ে দিলেই তো হল না, ভাবের দিক থেকে, রসের দিক থেকে কালিদাসের শকুন্তলার সঙ্গে নির্বাচিত রবীন্দ্রগীতিগুলি ঠিক সঙ্গতিপূর্ণ হল কিনা, সেটুকুও তো দেখতে হবে। কয়েকটি মুহূর্ত অবশ্য সার্থক পরিবেশ রচনা করেছে, যার মধ্যে 'সকল দুঃখের প্রদীপ জ্বেলে'—এই গানটির উপস্থাপনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নৃত্যাংশে অলকানন্দা চাকলাদার প্রশংসনীয়, তবে দুষ্মন্তের ভূমিকায় সাধন গুহকে ঠিক মানায় নি। 'শকুন্তলা' নৃত্যনাট্যটি যদি সেদিন খুব সফল হয়ে না থাকে তবে তার জন্য পরিকল্পনাহীন দুর্বল আবহসংগীতও অবশ্য অনেকখানি দায়ী।

বৈতানিকের নাট্যোৎসবের অন্যান্য প্রযোজনাগুলি হল 'বাল্মীকি-প্রতিভা' 'ক্ষুধিত পাষাণ' এবং 'সামান্য ক্ষতি'। 'ক্ষুধিত পাষাণ'এর অতিলৌকিক পরিবেশ-সৃজনে এবং প্রয়োগ-পারিপাট্যে উল্লেখযোগ্য কল্পনাশক্তির পরিচয় ছিল। আবহসংগীত এই নাট্য-পরিবেশনায় বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। 'সামান্য ক্ষতি' কিছুকাল আগে আর একবার মঞ্চস্থ হয়েছিল; এ সম্পর্কে আলোচনাও হয়েছে। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র পরিবেশনাতেও গীতি-নাট্যটির অন্তর্নিহিত ভাবরসের সার্থক ব্যঞ্জনা ঘটেছে।

আনন্দবর্ধন

সোমবার ১৬ মারচ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখারজির পদত্যাগের সিদ্ধান্ত পাকাপাকিভাবে গৃহীত হওয়ার পরে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এই সপ্তাহের প্রধান আলোচ্য বিষয়। শ্রীমুখারজি যাতে পদত্যাগ না করেন সেজন্য ১৫ মারচ রবিবার যুক্তফ্রনটের সি পি আই, ফরওয়ারড ব্লক, পি এস পি এবং এস ইউ সি দলের নেতৃবৃন্দ সারাদিন ধরে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাদের চেষ্টা সফল হয়নি। এই চার দলের অনুরোধে বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদকমণ্ডলী এদিন বিকালেও রাত্রে দুবার বৈঠকে বসেন। তার পরও মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত থাকে। যুক্তফ্রনটের আটটি শরিক দল একটি বৈঠকে বসে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এই আটটি শরিক দল রাজ্যপালকে জানিয়ে দেবেন:—তাঁরা কোন বিকল্প সরকার গঠনের বিরোধী এবং শুধু তাই নয়, তাঁরা জনস্বার্থ এবং শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী হরতালেরও বিরুদ্ধে। বৈঠক শেষ হলেও আজ সোমবারও যুক্তফ্রনটের বিভিন্ন দল মুখ্যমন্ত্রী যাতে পদত্যাগ না করেন সেজন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবেন বলে জানতে পারা যায়।

দেশী সংবাদ

৯ মারচ—আজ রাতে খোড়াবাজার অঞ্চলে দোকানপাট লুঠ করবার সময় দুর্বৃত্তদের লক্ষ্য করে পুলিস ৪ রাউনড গুলি ছোড়ে। পুলিসের গুলিতে শ্রীমতী শকুন্তলা দত্ত (৫৮) নামে এক মহিলা গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। তাছাড়া একজন ছুরিকাহত হয়েছে। দুটি গাড়িও খুব ক্ষতি করা হয়েছে। কয়েকটি দোকান লুণ্ঠিত হয়েছে। পুলিস ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জি আজ বিধানসভার অধিবেশনের প্রারম্ভেই ঘোষণা করেন যে, আগামী ১৬ মারচ বা তার আগেই তিনি পদত্যাগ করতে চান। এখন কিছু করণীয় থাকলে তা যেন করা হয়। মোট দশ মিনিটেই আজ বিধানসভার অধিবেশন শেষ হয়।

১০ মারচ—পরিষদীয় মন্ত্রী শ্রীসতীন চক্রবর্তী আজ রাতে জানান, রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান তাঁর কাছে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করলে বৃহত্তম দলের নেতা হিসাবে তিনি শ্রীজ্যোতি বসুকে ডাকবেন এবং শ্রীবসু সরকার গঠন করতে পারেন কিনা জানতে চাইবেন।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমুখার্জির কাছে যুক্তফ্রনটের পক্ষে নতুন প্রস্তাব দেবার তোড়জোড় চলছে। আজ রাতে আর এস পি নেতা শ্রীত্রিদিব চৌধুরী এবং ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা শ্রী... ভট্টাচার্য মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এই ব্যাপারে কথা বলেছেন। ১৩ মারচ সকাল সাতটার মধ্যে এই নতুন প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেবেন বলে তাঁরা কথা দিয়ে এসেছেন।

১২ মারচ—তেলেঙ্গানার আন্দোলন সম্পর্কে নতুন করে একটি তদন্ত কমিশন গঠনে ভারত সরকার শেষ পর্যন্ত রাজী হয়েছেন। আজ রাজ্যসভায় শ্রীচিত্ত বসুর এক প্রশ্নের যে জবাব স্বরাষ্ট্র দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীবিদ্যাচরণ শুক্ল দেন তা থেকে এ খবর জানা যায়।

প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জি এবং শ্রীসুশীল ধাড়া আজ সকালে দিল্লী যাচ্ছেন। রাজধানীতে পৌঁছেই মুখ্যমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবন এবং নব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীজগজীবন রামের সঙ্গে কথা বলবেন। বিকালে তাঁরা দুজনে বা আলাদাভাবে, একা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন। সি পি আই-এর কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতারও দিল্লীতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার কথা আছে।

১২ মারচ—পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক সংকট সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতার সঙ্গে শ্রীঅজয় মুখার্জির আলোচনা শেষ হয়েছে। সারাদিন আলাপ-আলোচনার পর মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমুখার্জি জানান যে, ১৬ মারচের মধ্যে তাঁর পদত্যাগের সিদ্ধান্তে তিনি অবিচলিত রয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী টেলিফোনে কথা বলার সময় আজ শ্রীজ্যোতি বসুকে জানিয়েছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে যদি এখন রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হয় তা হলে ১৯৭২ সালের আগে এখানে নির্বাচন হতে পারবে না।

১৩ মারচ—উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর এবং গুজরাটে সরকার পক্ষ এবং বিরোধীদের মধ্যে পাল্লার লড়াই স্পষ্ট। উড়িষ্যার আটজন এম এল এ সরকারের প্রতি তাঁদের সমর্থন তুলে নিয়েছেন, কিন্তু তিন বছরের পুরানো স্বতন্ত্র জনকংগ্রেস কোয়ালিশন যে এখন টিকছে সরকারের পরিণতি এটা সুস্পষ্ট।

আজ রাত্রে যুক্তফ্রনটের আটটি দল এস ইউ সি-র অফিসে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত করেছেন "আমরা সি পি এম-এর মিনি-ফ্রনট সরকার গঠনের প্রচেষ্টা আটকাবই।" এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সি পি আই, এস ইউ সি, ফরওয়ারড ব্লক, পি এস পি, এস এস পি-র দুই গোষ্ঠী, বলশেভিক পার্টি, গোর্খা লীগ এবং আর সি পি আই-র শ্রীঅনাদি দাস।

১৪ মারচ—পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান কেন্দ্রকে জানিয়েছেন : শ্রীঅজয় মুখার্জি পদত্যাগ করলে এবং যুক্তফ্রনট সরকারের পতন ঘটলে তিনি নতুন সরকার গঠনে চেষ্টা করতে শ্রীজ্যোতি বসুকে আমন্ত্রণ জানাবেন। শ্রীধাওয়ানের অভিমত : সংবিধানের দিক দিয়ে তিনি বিকল্প সরকার গঠনের সম্ভাবনা খুঁজে দেখতে বাধ্য। তাই বর্তমান সরকারের অবসান ঘটামাত্র তিনি রাষ্ট্রপতি শাসনের সুপারিশ করতে পারেন না। রাজ্যপাল বলেছেন ঃ বিধানসভায় সি পি এম একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। সুতরাং তিনি প্রথমেই শ্রীবসুকে আমন্ত্রণ জানাবেন এবং সরকার গঠনের জন্য সময় দেবেন।

১৫ মারচ—আজ ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউনডের বিশাল সমাবেশে সি পি আই এম নেতৃবৃন্দ ফ্রনট ভাঙার চক্রান্তের প্রতি তীব্র ধিক্কার জানান ও কেন্দ্রের চক্রান্ত রোখবার জন্য জোরদার আহ্বান জানান। সি পি আই এম-এর রাজ্য কমিটির সম্পাদক শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত ঘোষণা করেন : তিনি শুনেছেন, দিল্লী থেকে নাকি সর্বশেষ নির্দেশ এসেছে, রাজ্যপাল জ্যোতিবাবুকে সরকার গঠন করতে দেওয়ার আগে সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখাতে চাইবেন। তিনি বলেন, এ চক্রান্ত রুখতেই হবে। উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুও মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের পরদিনই হরতাল পালন এবং পরবর্তীকালে বৃহত্তর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেন।

বিদেশী সংবাদ

৯ মারচ—চীন থেকে যে শুভেচ্ছা সফরকারী দলটি কাঠমান্ডুতে এসেছে গতকাল চীনা রাষ্ট্রদূত তাদের অভ্যর্থনা জানান। এই অনুষ্ঠানে নেপালে ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রীরাজবাহাদুরও উপস্থিত ছিলেন। শ্রীরাজবাহাদুরকে চীনা রাষ্ট্রদূত ও শ্রীকুও মো জো সাদর অভ্যর্থনা জানান।

১০ মারচ—লাওসের উপর ক্রমবর্ধমান মারকিন বোমাবর্ষণ মস্কোতে সরকারী উদ্বেগের সঞ্চার করেছে। কখনও কখনও মারকিন বিমান-বাহিনী লাওসের উপর দৈনিক চারশোবার করেও হানা দিচ্ছে বলে মস্কোর সংবাদপত্রে খবর বেরিয়েছে।

১১ মারচ—পাকিস্তান এই প্রথম স্থলপথে আফগানিস্থানের মধ্য দিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নে অনেক মালপত্র পাঠিয়েছে। মস্কো রেডিও এই খবর দিয়ে বলেছে যে, এই রাস্তা দিয়েই ইতিপূর্বে সোভিয়েত পণ্য পাকিস্তানে এসেছিল।

১২ মারচ—লনডনের দুইজন ছাত্রছাত্রী একাদিক্রমে ছয় ঘন্টা চুম্বনাবদ্ধ থেকে পৃথিবীর চুম্বনের রেকরড ভঙ্গ করেছে। গত সপ্তাহে নিউজিল্যান্ডের দুইজন ছাত্রছাত্রী ১০১ মিনিট চুম্বনাবদ্ধ থেকে রেকরড সৃষ্টি করেছিল।

১৩ মারচ—গতকাল নিরাপত্তা পরিষদের সভায় সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত ঘোষণা করেছেন, রোডেশিয়াতে সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গদের বিদ্রোহ দমনে এবং সেখানকার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন দানে বৃটেনের বরাবর অনিচ্ছা প্রকাশকে নিন্দা করে পরিষদে যে প্রস্তাব এসেছে সোভিয়েট ইউনিয়ন তা সমর্থন করবে।

১৪ মারচ—দক্ষিণ ইরানের সিরাজ থেকে পাওয়া সংবাদে জানা গিয়েছে, মক্কার তীর্থযাত্রীদের নিয়ে ফিরে আসার সময় একখানি লঞ্চ আবুধাবির কাছে ডুবে যায়। তার ফলে ১০৫ জন জলমগ্ন হয়ে মারা যায়।

১৫ মারচ—বুভুক্ষা, রোগব্যাধি জর্জর পৃথিবীতে ১৯৬৯ সালে সামরিক খাতে রেকরড পরিমাণ ব্যয় হয়েছে। ব্যয়ের পরিমাণ ২০ লক্ষ মিলিয়ন ডলার। তবে ১৯৬৭ সাল থেকে সামরিক খাতে বার্ষিক ব্যয়বৃদ্ধির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

সূচিপত্র

সূচিপত্র

ভোরবেলার মতই
দিনভোর
স্নিগ্ধ সতেজ
রাখবে
স্নান সারা হবার পর ভোরের সতেজ
অনুভূতি অনেকক্ষণ ধরে বজায়
রাখতে চান তো পণ্ড্স ড্রীমফ্লাওয়ার
ট্যাল্ক পাউডার মাখুন। ভারতে
এই ট্যাল্কাম পাউডারই কাটতিতে
সবার ওপরে।
পণ্ড্স ড্রীমফ্লাওয়ার ট্যাল্কের হাল্কা
মিষ্টি গন্ধ বহুক্ষণ শরীরে জড়িয়ে
থাকে...
পণ্ড্স ড্রীমফ্লাওয়ার ট্যাল্ক মাখতে-
না-মাখতেই ঘাম টেনে নেয়।
গুমোট গরমের দিনেও স্নিগ্ধ-সতেজ
ও সুগন্ধে ভরে রাখে—
আপনার সান্নিধ্য
সবার ভালো লাগে। বছরের
যে-কোন সময়েই এই
ট্যাল্কাম পাউডার
ব্যবহার করতে পারেন।
৩ রকম সাইজে
পাওয়া যায়:
ফ্যামিলি—বড়—মাঝারি
Pond's
Dreamflower talc
TRADE MARKS REGD. MADE IN INDIA
Dreamflower talc
পণ্ড্স
ড্রীমফ্লাওয়ার ট্যাল্ক
এর চেয়ে মোলায়েম সৌখীন ট্যাল্কাম আর হয় না।
চীজব্রো-পণ্ড্স-ইনকরপোরেটেড
(সীমিত দায়ে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)
P-5482A

প্রচ্ছদ : শ্রীদিলীপকুমার দাশ

● ওরিয়েন্টের গবেষণামূলক স্থায়ী সাহিত্য-সম্পদ ●

অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী

রবীন্দ্র-সাহিত্য-বিচিত্রা

রবীন্দ্র-সাহিত্য গবেষণার ক্ষেত্রে প্রমথনাথ বিশীর নিরলস অনুশীলন বাংলার প্রবন্ধ-সাহিত্যকে প্রতিনিয়তই সমৃদ্ধ করে চলছে। রবীন্দ্র-সাহিত্য-বিষয়ে তাঁর এই সর্বাধুনিক বইটি কিন্তু একেবারে অভিনব। কবির বহুমুখী প্রতিভা সম্বন্ধে একটি সর্বাঙ্গীণ ধারণা সৃষ্টির সহায়ক হিসাবেই বইটির পরিকল্পনা। একাধিক গবেষণামূলক প্রামাণ্য নিবন্ধে তত্ত্ব ও তথ্যের সুনিপুণ বিন্যাসে আমরা যেন খুঁজে পাই সমগ্র কবিকে দেখার নতুন চোখ, নতুন দৃষ্টি। ডিমাই সাইজ। প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠা। দাম ১৮৲

● অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর অন্যান্য সাহিত্য কীর্তি ●

রবীন্দ্র-নাট্য-প্রবাহ (পূর্ণাঙ্গ)	২০৲	রবীন্দ্র-বিচিত্রা	৫৷৷৹
রবীন্দ্র-নাট্য-প্রবাহ, ১ম খণ্ড	৫৲	নানা-রকম	৬৲
প্রনাবির নীরস গল্প-সঞ্চয়ন	৩৷৷৹		
জোড়াদীঘির উদয়াস্ত (২য় মুদ্রণ) (উপন্যাস)			২০৲
প্রমথনাথ বিশীর শ্রেষ্ঠ কবিতা			৬৲

অধ্যাপক অরুণকুমার বসু এম-এ, পি. আর. এস, ডি-ফিল.

রবীন্দ্র-বিচিন্তা

মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, কল্পনা, আকাশ প্রদীপ, আরোগ্য প্রভৃতি রবীন্দ্র কাব্যের প্রথম ও শেষ পর্যায়ের বিস্তারিত আলোচনা, রবীন্দ্রকাব্যে প্রেম, রাজানাটক, রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা বিষয়ে মননশীল নূতন আলোক সম্পাত। দাম ১০৲

.... ডক্টর অরুণকুমার বসুর অন্যান্য রচনা ....

শক্তি-গীতি পদাবলী

পুস্তকখানির বৈশিষ্ট্য রচনাশৈলী ও গবেষণাপূর্ণ আলোচনা স্বীকৃত হয়েছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. আর. এস. প্রদান করে। ডিমাই সাইজ। দাম ৮৲

ডক্টর অরুণকুমার বসু সম্পাদিত

মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্য	৩৲	বিল্বমঙ্গলঠাকুর	৪৲
বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা	৩৲	কৃষ্ণকান্তের উইল	৩৷৷৹

শিক্ষা
মহাত্মা গান্ধী

মহান শিক্ষাবিদ গান্ধীজীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষার সম্পর্কে যাবতীয় রচনার ভারতীয় ভাষায় একমাত্র প্রথম সংকলন। ১৭টি অধ্যায়ে ৫০০ পৃষ্ঠায় ডিমাই সাইজের বৃহৎ বই। দাম ১৫৲

.... শিক্ষা বিষয়ে অন্যান্য বই ....

অধ্যক্ষ নিখিলরঞ্জন রায়ের **সমাজ শিক্ষা** ১০·০০, **জনশিক্ষার কথা** ৫·০০, **শিক্ষা-বিচিন্তা** ৪·৫০, **সমাজ শিক্ষার ভূমিকা** ৫·০০। অধ্যাপিকা প্রতিভা গুপ্তের **সমাজ ও শিশু সমীক্ষা** ৮·০০, **শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ** ৬·০০। হুমায়ুন কবিরের **নয়া ভারতের শিক্ষা** ৮·০০। সুধীরচন্দ্র করের **সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা** ৫·০০, **শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা** ১০·০০। সমীরণ চট্টোপাধ্যায়ের **শিশু পরিবেশ** ৭·০০। বিজয়কুমার ভট্টাচার্যের **বুনিয়াদী শিক্ষা** ২·৫০ **বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি** ৪·০০। অনিলমোহন গুপ্তের **বুনিয়াদী শিক্ষার কথা**, ১ম খণ্ড ৪·৫০, **বুনিয়াদী শিক্ষার কথা** ২য় খণ্ড ৪·৫০, **বুনিয়াদী শিক্ষায় সংগঠন** ৪·৫০। প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিকের **নূতন শিক্ষা** ৩·০০।

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি। কলেজ স্ট্রীট মার্কেট দোতলা। কলিকাতা ১২। ফোন ৩৪-৩৬৫৪

(সি ৪২৩৯)

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৭ বর্ষ ॥ সংখ্যা ২২
শনিবার ১৪ চৈত্র ১৩৭৬

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

*

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

*

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৫৪১

*

চাঁদার হার
কলিকাতায়

বার্ষিক	— ২৫.০০
ষান্মাসিক	— ১২.৫০
ত্রৈমাসিক	— ৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	— ৩০.০০
ষান্মাসিক "	— ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক "	— ৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	— ৩০.০০
ষান্মাসিক "	— ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক "	— ৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	— ৫২.০০
ষান্মাসিক "	— ২৬.০০
ত্রৈমাসিক "	— ১৩.০০

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	— ৩৯.০০
ষান্মাসিক	— ১৯.৫০
ত্রৈমাসিক	— ১০.০০

দাম ৫০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাসুল ৭ পয়সা

DESH

Saturday, Mar. 28, 1970

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি-শাসন

অনেক আশা আশংকার পর পশ্চিমবঙ্গের সেই জীবন্মৃত যুক্তফ্রন্টের মৃত্যুই ঘটেছে। মৃত্যু সংবাদ মাত্রই বেদনাদায়ক, এক্ষেত্রে কার বেদনা কোথায় তা বোঝা মুশকিল। যে বেদনায় অজয়বাবু মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছাড়লেন, আর নতুন একটি ফ্রণ্ট গড়তে না পেরে জ্যোতিবাবু যে বেদনা পেলেন, তা বোধ হয় এক নয়। কিংবা রাষ্ট্রপতি-শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর কার নয়নে কতটা কুম্ভীরাশ্রুর পতন ঘটছে তাও আজ মাপা মুশকিল। জনসাধারণের জন্য দেওয়া বিবৃতি যদি সত্যিই নেতাদের আন্তরিক কথা হত, সত্য হত—তবে আর গোলমাল থাকত না। দুঃখের বিষয়, রাজনীতিতে অন্তর-বাহির এক নয়।

সাতষট্টি সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় থেকে এই সত্তর সালের মার্চ পর্যন্ত—অর্থাৎ তিন বছরে দু' বার নির্বাচন হল, দু' বার যুক্তফ্রণ্ট গড়ে উঠল, সরকারী ক্ষমতা হাতে পেল, দু' বারই ফ্রণ্ট ভাঙল, আর দু' বারই চালু হল রাষ্ট্রপতি শাসন। সামনে আরও একটি নির্বাচনের আশা করা হচ্ছে, এবং আবার কোনো যুক্তফ্রণ্টের। তবে এখানে একটি 'যদি' থেকে গেছে। এবারে রাষ্ট্রপতি শাসন চালু হলেও বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হয়নি। আশা করা যাচ্ছে, হালের ডামাডোল কেটে গেলে খানিকটা সুস্থির, শান্ত পরিবেশে হয়ত আবার নতুন করে এক ফ্রণ্ট গড়ে তুলে শাসনক্ষমতা হাতে নেওয়ার সুযোগ হবে। রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান তো বলেছেনই, রাম বনবাসে চলে গেলে ভরত যেভাবে তাঁর পাদুকা ভিক্ষা করে নিয়ে রাজ্য চালিয়ে ছিলেন তিনি অনেকটা সেইভাবেই এই সরকারের তত্ত্বাবধান করবেন। আমরা বোধ হয় রামের প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারি।

একথা বলা বাহুল্য যে, গত তেরো মাসে যুক্তফ্রণ্টের দ্বিতীয় দফার শাসনকালে এই রাজ্যের সর্বত্র অশান্তি প্রকট হয়ে উঠেছিল। জমি, ধান, ভেড়ি—এই সব লুঠ হবার পর সেই লুঠের হাওয়া শহরের গায়ে লেগেছিল। গ্রামে গ্রামে যে অশান্তি জেগেছিল সেই অশান্তি শেষের দিকে তীব্র ও বীভৎস হয়ে এই কলকাতা নগরীতেও দেখা দেয়। বিশেষ করে গত মাস দুই আমাদের না ছিল স্বস্তি, না নিরাপত্তা। কলকাতা শহরের মতন বেজায় হুজুগে শহরেও সন্ধ্যের পর রাস্তাঘাটে লোক চলাচল এমনই কমে যেত যে মনে হত, এ যেন অন্য কোন শহর। বিশ্রী একটা আতঙ্কের ভাব জেগে গিয়েছিল : খুনোখুনি, ছিনতাই, লুঠ, বোমাবাজি—এ একেবারে নিত্যদিনের বিষয় হয়ে উঠেছিল। সমাজদ্রোহী ও দুর্বৃত্তদল মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে স্তব্ধ করে দিতে পেরেছিল—এটাই আশ্চর্যের। যাঁরা রক্ষক ছিলেন তাঁরা দর্শক হয়ে পড়েছিলেন। বস্তুত সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষের মনোবল যেমন ভেঙে পড়ছিল, অন্যদিকে দুর্বৃত্ত শ্রেণীর লোকের মনোবল পরোক্ষ প্রশ্রয়ে বেড়ে যাচ্ছিল। এ থেকে মুক্তি বোধ হয় ছিল না।

রাষ্ট্রপতি শাসনের প্রথম কথা, আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করতে দেওয়া হবে না। রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে স্পষ্টই বলেছেন, রাজ্যের জনমনকে যে ভয় ও আতঙ্ক পঙ্গু করে ফেলেছিল তা দূর করাই এখন প্রথম প্রয়োজন। সাধারণের মনে এই আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে যে রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার সামর্থ্য সরকারের আছে। আমরাও মনে করি, আজ সর্বাগ্রে মানুষের মনে এই নিরাপত্তার ভাব ফিরিয়ে আনা দরকার।

শাসন ক্ষমতার পালা বদলের সঙ্গে সঙ্গে আমরা কয়েকটি জিনিস লক্ষ করছি। যেমন শয়ে শয়ে বোমা উদ্ধার: বোমা, বোমা তৈরীর মালমশলা, অস্ত্র-শস্ত্র—এসব উদ্ধার হতে শুরু হয়েছে। পুলিসই উদ্ধার করছেন। আরও হয়ত করবেন। প্রশ্ন হল, রাষ্ট্রপতি শাসন বলবৎ হবার দু তিনটি দিন যেতে না যেতেই যদি এসব উদ্ধার করা পুলিসের পক্ষে সম্ভব হয়ে থাকে তবে গত এক বছরে কেন তা হয়নি? এমন কোনো নির্দেশ কি তাঁদের ওপর ছিল যাতে এসব উদ্ধার করা না হয়। যদি থেকে থাকে তবে সে নির্দেশ কার? কেন? কী উদ্দেশ্যে? স্বরাষ্ট্র দপ্তর কি জেগেও ঘুমিয়ে ছিলেন? বোমা, অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজদ্রোহীদের গ্রেফতারও করা হচ্ছে। এদের আটক রাখার আইন নাকি এখন নেই, সাময়িকভাবে অবশ্য রাখা যাবে। জানি না, কোনো বিশেষ আইনের প্রয়োজন এক্ষেত্রে হবে কিনা। যদি হয় আপত্তি কি!

দুঃস্বপ্ন
রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা
পশ্চিম বঙ্গ

যুক্তফ্রন্টের পতন

অবশেষে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটল। তেরো মাস আগে লক্ষ লক্ষ মানুষের শুভাকাঙ্ক্ষা নিয়ে যে সরকারের যাত্রা শুরু হয়েছিল, ১৯ মার্চ রাত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে সেই সরকারের ভবলীলা সাঙ্গ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। জয়ধ্বনির মধ্যে যাঁরা যাত্রা শুরু করেছিলেন, ধিক্কারধ্বনির বোঝা পিঠে চাপিয়ে তাঁরা বিদায় নিলেন।

দেশের সাধারণ মানুষ যুক্তফ্রন্টের কাছে আশা করেছিলেন একটি সৎ, পরিচ্ছন্ন কর্মদক্ষ সরকার। আশা করেছিলেন দেশের এবং দশের হিত। এঁরা তার পরিবর্তে মানুষের সামনে হাজির করলেন একটি কলহ-পঙ্গু অথর্ব কিম্ভুত সরকার। দেশ ও দশের হিতের পরিবর্তে এঁরা মত্ত হয়ে উঠলেন দলগত স্বার্থসিদ্ধির অত্যুগ্র বাসনায়।

যুক্তফ্রন্ট সরকার ভাল কিছুই করেন নি, এমন কথা বলব না। তাঁরা বেনামী বহু জমি উদ্ধার করেছেন; বহু ভূমিহীনকে জমি দিয়েছেন। শ্রমিকদের মজুরী বাড়ানোর ব্যাপারে সাহায্য করেছেন। কর্মীদের বেতন বাড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এইসব ভাল কাজের পাশাপাশি তাঁরা এত খারাপ কাজ করেছেন যে ভাল কাজগুলিকে খারাপ কাজ ডুবিয়ে দিয়েছে।

হামলাবাজীর পথে জমি উদ্ধারের কাজে নেমে তাঁরা গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে অরাজকতা আমদানী করেছেন। যে লুণ্ঠনের বাসনা শেষদিকে আর শুধু জমিতে সীমাবদ্ধ থাকেনি, যে অরাজকতা গ্রামাঞ্চলের দরিদ্রতম মানুষকে পর্যন্ত বিপর্যস্ত করেছে, যে অরাজকতা ধনী জোতদারের বাড়ির সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্রতম কৃষকের কুটিরকে পর্যন্ত পুড়িয়ে ছাই করেছে।

শ্রমিক আন্দোলনে শৃংখলা ও নিষ্ঠা না রক্ষা করে ইউনিয়ন দখলের উদ্দাম প্রতিযোগিতায় এঁরা রাজ্যের পরিস্থিতিটা এমন করে তুলেছেন যে এখানে দিন দিন কর্মসংস্থানের সুযোগ কমেছে। বেকারী বেড়েছে। দুয়ারে দুয়ারে বেকার বাঙ্গালী যুবকের লাইন বড় হয়েছে।

সরকারী কর্মীদের বেতন ও ভাতা বেড়েছে। ভালই হয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সরকারী দফতরগুলিতে বিশৃংখলাও বেড়েছে। কাজের পরিমাণ কমেছে। এবং ফলে সাধারণ মানুষের দুর্গতি বেড়েছে।

সবচেয়ে বড় বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছিল অরাজকতা। প্রথমে এই অরাজকতা শুধু গ্রামের বিত্তবানদের স্পর্শ করেছিল। তারপর সেটা গ্রামের গরীব মানুষকেও ছুঁল। প্রথমে শুধু শহরের খুব বড়লোকেরা

কলকারখানার মালিকরা আতংকিত হয়েছিলেন। পরে খাস কলকাতার সাধারণ মানুষকেও অরাজকতা আতংকিত করে তুলল। গরীব মানুষও রাত্রে পথে বেরুতে ভয় পেলেন।

যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনকে গ্রামের মানুষ কীভাবে নিয়েছেন আমি দেখি নি। কিন্তু শহরের সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া দেখেছি। প্রায় সকলের মুখেই এক কথা : বাঁচা গেল। দলীয় অন্ধ ভক্তরা ছাড়া আর সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন।

১৯৬৭ সনে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস যখন নির্বাচনে বিপর্যস্ত হল তখন এই কলকাতা শহরে লক্ষ লক্ষ মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড বিজয়োল্লাস দেখেছি। সেদিনের মূল সুর ছিল : পাপকে খতম করা গিয়েছে—অপরাজেয় পাপীকে পরাজিত করা সম্ভব হয়েছে। এবার যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পরও সেই কলকাতাকে দেখলাম। লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ চাপা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ছেন। এবারের মূল সুর : আপদ বিদায় হয়েছে! দুষ্ট গ্রহ ঘাড় থেকে নেমেছে!

✼

মাত্র তেরো মাসের মধ্যে যুক্তফ্রন্টের এই দশা হল কেন?

এর সবচেয়ে বড় কারণ, সাধারণ মানুষ এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই বুঝে গিয়েছিল, এই সরকার দেশের হিতের চেয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতে বেশি উৎসাহী। এই তেরো মাসেই মানুষ পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিল, এ রাজ্যে দেশ সেবার চেয়ে দল সেবা বেশি হচ্ছে।

প্রায় প্রতিটি পার্টির দলগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দাম প্রচেষ্টার ফলে যুক্তফ্রন্টের সংঘাত ক্রমেই বেড়ে চলল। যদি শুধু বক্তব্যের জোরে বা সাংগঠনিক শক্তির ভিত্তিতে দল বাড়াবার চেষ্টা চলত তাহলে ফ্রন্টের সংকট এভাবে এগিয়ে আসত না। পার্টিগুলি এই দল বৃদ্ধির চেষ্টার সঙ্গে ডাণ্ডা এবং প্রশাসন যন্ত্রকে জড়িয়ে ফেলার ফলেই সংকট এতটা ভয়াবহ আকার ধারণ করল।

প্রায় শুরু থেকেই এ ব্যাপারে তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় ফ্রন্টের বড় বড় শরিক দলগুলির মধ্যে। প্রত্যেকেই সংগঠন বাড়াতে উৎসাহী। প্রায় প্রত্যেকেই সেজন্য ডাণ্ডা ও প্রশাসনযন্ত্র ব্যবহারে ব্যগ্র। এবং প্রত্যেকেই সেই উদ্দেশ্যে সমাজের ঘৃণ্যতম জীবদের পঙ্কপুটে আশ্রয় দিতেও আগ্রহী। প্রায় প্রতিটি দলের পাশে সরকারী আনুকূল্য প্রার্থী প্রাক্তন কংগ্রেসীরা এবং সর্বপ্রকারের সমাজবিরোধীরা ভিড় জমালো। সকলেই মনে করলেন দল বাড়ছে। সকলেই আরো আরো দল বাড়াতে লেগে গেলেন। সকলেই বেশি বেশি করে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের দলে ঠাঁই দিতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে দলগুলির ভিতরে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের প্রাধান্য বেড়ে চলল। এই অবস্থা প্রতিরোধ করা দূরে থাকুক নেতারা বরং দল বাড়াবার লোভে এমন লোকদের বেশি করে প্রশ্রয় দেওয়া শুরু করলেন।

দলগত স্বার্থে প্রশাসন যন্ত্র কংগ্রেস আমলেও ব্যবহৃত হত। কিন্তু এ ব্যাপারে যুক্তফ্রন্টের দলগুলি কংগ্রেসকে একেবারে হারিয়ে দিয়েছেন। এবার দলবাজি যা হয়েছে তার তুলনা নেই। কোনও বিস্তারিত তদন্ত কমিশন বসানো হলে এর কিছুটা বেরিয়ে আসবে এবং হলফ করে বলতে পারি সেই কিছুটা দেখেই মানুষ চমকে উঠবেন।

দলবাজি হয়েছে সর্বত্র। কিন্তু বাহ্যত সর্বত্র এ জিনিস সমানভাবে ধরা পড়েনি। সেচ দফতরে, বিচার বিভাগ, বা স্বাস্থ্য দফতরে যেসব দলবাজি হয়েছে সেগুলি মানুষের চোখের সামনে খুব বড় করে ফুটে ওঠেনি। কারণ একটা টিউবওয়েল বসানো বা একজন পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগ অথবা একজন ডাক্তারের নিয়োগ বা বদলি নিয়ে যে দলবাজি হয়েছে সেগুলি সাধারণ মানুষকে তেমন স্পর্শ করেনি। কিন্তু দলবাজি যখন হয়েছে পুলিস পরিচালনায় তখন সেটা সামগ্রিকভাবে প্রত্যেকটি নাগরিকের জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছে।

নেতারা প্রথমে যখন শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দল বাড়ানো শুরু করলেন, বা যখন সংঘবদ্ধ হামলাবাজির পথে জমি দখলের কাজে এগোলেন অথবা যখন দলগত স্বার্থে পুলিস ব্যবহার শুরু করলেন, তখন তাঁরা একবারও বুঝতে পারেননি বা বোঝার চেষ্টা করেননি এর পরিণতি কী হতে পারে। ধীরে ধীরে সর্বত্র হামলাবাজি বেড়েছে। লুণ্ঠনের প্রবৃত্তিও আর শুধু জমিতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে আচ্ছন্ন করে শুধু হামলাবাজি এবং লুণ্ঠনই ক্রমে ক্রমে বড় হয়ে উঠেছে।

প্রথমে অরাজকতাটা আসে গ্রামাঞ্চলে। আমরা শহরের মানুষেরা অনেকেই মনে

করেছিলাম, শুধু গ্রামের জোতদাররাই চিৎকার করছেন। কিন্তু ধীরে ধীরে অরাজকতা যখন শহরকেও স্পর্শ করল, যখন রাতে কলকাতার পথঘাটে বের হতে সাধারণ মানুষও ভয় পেলেন তখন সকলেই আতংকিত হয়ে উঠলাম। শহুরে মানুষও তখন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল।

প্রথমে যখন পুলিসকে দলগত স্বার্থে পরিচালনা করা শুরু হল তখন নেতারা নিজেরাও বোঝেননি এর পরিণতি কী হতে পারে। যেখানে ওপর মহল থেকে কোনও নির্দেশ গেল না সেখানেও পুলিস অফিসাররা সি পি এম-এর স্বার্থরক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। যেখানে সংঘাতটা যুক্তফ্রন্টের শরিক দলের ভেতরে নয়, বিবাদমান দুপক্ষের একপক্ষে ফ্রনটের কোনও এক দল এবং অন্যদিকে সাধারণ নাগরিক—পুলিস সেখানে ফ্রনটের শরিকের স্বার্থে চলল। এটা অবশ্য প্রথম অবস্থা। ধীরে ধীরে পুলিস কাজ করাই ছেড়ে দিল। সবাই অবাধ ক্রিয়াকলাপের সুযোগ পেয়ে গেল। এমন কি চোর গুণ্ডা বদমাইসরাও। ফলে গ্রাম ও শহর সর্বত্রই মগের মুল্লুকের এক বিচিত্র পরিবেশ সৃষ্টি হল। সর্বপ্রকারের কুকর্ম বেড়ে গেল। সমাজবিরোধীরা লাল রুমাল ও লাল পতাকার ছত্রছায়ায় বুক ফুলিয়ে চলা শুরু করল।

পুলিস যে এইভাবে সর্বক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় হয়ে উঠবে এটা নেতারা গোড়ায় একবারও আশংকা করেন নি। তাঁরা ভেবেছিলেন পুলিস শুধু 'আমার' দলের লোকজনকে স্পর্শ করবে না। কার্যক্ষেত্রে ধীরে ধীরে তাঁরা দেখলেন, পুলিস কাউকেও কিছু করছে না। এই অবস্থা যখন এল তখন নেতারা সবাই দেখলেন শত চেঁচিয়েও পুলিসকে আর সক্রিয় করা যাচ্ছে না। পুলিস তাঁদের সবাইকে বৃদ্ধাংগুষ্ঠ প্রদর্শন শুরু করল। অরাজকতা বেড়েই চলল। সাধারণ মানুষ ভীত, আতংকিত হয়ে উঠলেন।

*

যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের আর একটা বড় কারণ শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়। অজয়বাবু না হয়ে জ্যোতিবাবু, সোমনাথ-বাবু বা কানাইবাবু মুখ্যমন্ত্রী হলে এত অরাজকতা সত্ত্বেও এত শীঘ্র ফ্রনট সরকারের পতন ঘটত না।

অজয়বাবু গান্ধীবাদী এবং অজয়বাবু ঘোরতর কমিউনিসট বিরোধী। ঘটনাচক্রে অজয়বাবুকে কমিউনিসটদের সঙ্গে হাত মেলাতে হয়েছে। যতক্ষণ এই ঐক্যটা শুধু বিরোধী দলের ঐক্য ছিল, কংগ্রেসকে পরাজিত করার সংগ্রাম ছিল ততদিন অজয়বাবুর তেমন অসুবিধা হয় নি। কিন্তু যখন তাঁদের সঙ্গে রাজত্ব চালাতে হল তখন তিনি বুঝলেন ব্যাপারটা কী। ১৯৬৭ সনেও তিনি এই সংকটে পড়েছিলেন। ১৯৬৯এও সেই সংকট দেখা দিল।

এবারের সংকটটা অবশ্য সেবারের সংকটের চেয়ে অনেক বেশি। এবার একটি কমিউনিসট পারটির হাতে স্বরাষ্ট্র দফতর। এবার কংগ্রেস প্রায় অথর্ব। এবার ফ্রনটের সকলেরই বদ্ধমূল ধারণা, দল বাড়াবার এমন সুযোগ আর মিলবে না। ফলে, ১৯৬৭-র তুলনায় ১৯৬৯-এ কমিউনিসট শাসনের কতকগুলি দিক একটু বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠল। অজয়বাবু সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠলেন।

প্রতিদিন তাঁর কাছে অসংখ্য মানুষ আসতে আরম্ভ করল নানা করুণ কাহিনী নিয়ে। অজয়বাবু প্রতিকারের কিছুটা চেষ্টা শুরু করলেন। কিন্তু বেশি কিছু করতে পারলেন না। এর পর তিনি শুরু করলেন অনশন-সত্যাগ্রহ। তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থীদের আগমনের সংখ্যা আরও বেড়ে গেল। প্রায় প্রতিদিন দশ পনেরোজন করে মানুষ আসতেন মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্য চাইতে। অত্যাচারের নানা কাহিনী বলতেন এঁরা। মুখ্যমন্ত্রী আবার কিছু করার চেষ্টা শুরু করলেন। কিন্তু পারলেন না। এর পর এক-একদিন দেখেছি, ঘটনার বিবরণ শুনতে শুনতে মুখ্যমন্ত্রী প্রায় পাগলের মত চীৎকার করে উঠছেন: আমাকে বলে লাভ নেই। আমি কিছু করতে পারব না। নিজেরা যা পারেন করুন। দেখেছি এর পর এক-একজন সাহায্যপ্রার্থী তাঁর পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে পড়েছেন: আপনি মুখ্যমন্ত্রী, আপনার কাছে না এসে কার কাছে যাব, আপনি না দেখলে কে দেখবে আমাদের!

এইসব ঘটনা যত বেড়েছে মুখ্যমন্ত্রীর আন্তরতাও ততই বেড়েছে। এবং, বাড়তে বাড়তে এমন একটা সময় এল যখন মুখ্য-মন্ত্রী সিদ্ধান্ত করলেন: হয় সি পি এমকে সরকার থেকে বাদ দিতে হবে, না হয় তিনি সরকার ছেড়ে দেবেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর এই মনোভাব গোপন রাখেন নি। তিনি দলের লোকদের বার বার এই কথা জানিয়েছেন। বিভিন্ন শরিক দলকেও তা বলেছেন। দলের লোকরা তাঁকে বারণ করেন নি। বরং, উৎসাহিত করেছেন। কারণ, তাঁদেরও প্রতিদিন একই রকম ঘটনার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল, তাঁদের অনেকের আপন স্বার্থেও ঘা পড়ছিল।

অন্যান্য 'বন্ধু' দল কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়েও তাঁর সঙ্গে পুরোপুরি একমত হতে পারলেন না। তাঁরা বললেন: এখনই নয়। তাঁরা যুক্তি দিলেন, সি পি এমকে আরও বিচ্ছিন্ন করা দরকার। তাঁরা বোঝাবার চেষ্টা করলেন, বিকল্প ব্যবস্থার প্রস্তুতি পূর্ণ হওয়ার আগে মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে পদত্যাগ করাও উচিত হবে না।

মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। বহু আলোচনা হল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। 'বন্ধু' দল-গুলি মনে করলেন, অজয়বাবু মুখে যাই বলুন বিকল্প সরকার গঠনের ব্যবস্থা পাকা না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই পদত্যাগ করবেন না।

সন্দেহ নেই, অজয়বাবুও প্রথমে বিকল্প সরকারই চেয়েছিলেন। কিন্তু যখন দেখলেন, তা হবার নয় তখন শুধু একটা জিনিস বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করলেন: তিনি পদত্যাগ করলে কী সি পি এম-এর নেতৃত্বে সরকার গঠন সম্ভব? যখন এই প্রশ্নের চূড়ান্ত জবাব পেলেন, তখন তিনি পদ-ত্যাগের সংকল্প ঘোষণা করলেন। তারপরও 'ম্যানুভারের' জন্য হাতে কয়েকদিন সময় রেখেছিলেন। কিন্তু তাতেও বিকল্প সরকারের কোনও ব্যবস্থা হল না। অন্যান্য 'বন্ধু' দল তখনও রাজি হলেন না। অজয়-বাবু শেষ পর্যন্ত পদত্যাগই করলেন। সরকার ভেঙে গেল।

সি পি এম অভিযোগ তুলেছেন, অজয়-বাবু বড়লোকদের স্বার্থে, জোতদার-মিলমালিকদের উস্কানিতেই পদত্যাগ করেছেন—সরকার ভেঙে দিয়েছেন। অজয়বাবুর কাছে যাঁরা প্রতিকারের জন্য আবেদন নিবেদন জানিয়েছেন তাঁদের মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু বড়লোকও ছিলেন। কিন্তু অজয়বাবু শুধু বড়লোকদের কথায়, তাঁদের স্বার্থরক্ষার জন্যই পদত্যাগ করেছেন একথা আমি অন্তত বিশ্বাস করতে রাজি নই।

অজয়বাবু যে মতবাদের যে ধরনের মানুষ তাতে ওঁর পক্ষে এই পরিস্থিতিতে পদত্যাগ করা ছাড়া কোনও উপায়ই ছিল না। অজয়বাবু শ্রেণী সংগ্রামে বিশ্বাস করেন না। শ্রেণী সংগ্রামের নামে সব জুলুম সব পাপ তাঁর কাছে পবিত্র নয়। যে সরকার তেরো মাস ধরে পশ্চিমবঙ্গে চলেছে তেমন কোনও সরকারে মুখ্যমন্ত্রিত্ব করা অজয়বাবুর পক্ষে বেশিদিন সম্ভব নয়।

মবারক গুপ্ত

দেবরাজ

রাজপুত্রের নির্বাসন

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে ফরাসীদের যে বিশাল সাম্রাজ্য ছিল তা ভেঙে এখন তিনটে আলাদা দেশের সৃষ্টি হয়েছে—ভিয়েতনাম, লাওস আর কাম্বোডিয়া। এদের মধ্যে ভিয়েতনাম আপাতত দু-টুকরো হয়ে আছে। উত্তরে দক্ষিণে সেখানে চলছে প্রচণ্ড লড়াই। উত্তরের সহায় দুই কমুনিস্ট কুলপতি—রাশিয়া আর চীন, তবে তারা পেছন থেকে মদত দিচ্ছে। দক্ষিণের সহায় আমেরিকা আর আমেরিকা আড়ালে আবডালে থেকে নয় সরাসরি লড়াইয়ে নেমে দক্ষিণকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আগুন যেমন এক জায়গায় লাগলে আশে-পাশে ছড়িয়ে পড়ে লড়াইও তাই। যারা লড়ছে তারা প্রায়ই বিপক্ষকে কাবু করতে কিংবা নিজেদের বাঁচাতে কাছাকাছি ভিন দেশে হানা দেয় কী ঘাঁটি গাড়ে। অমনই করেই ভিয়েতনামের লড়াই ছড়িয়ে পড়েছে লাওসে। উত্তর ভিয়েতনামের সেনাসামন্তও সেখানে আছে, আমেরিকার বিমানবহরও।

লড়াইয়ের আঁচ তেমন গায়ে লাগেনি কাম্বোডিয়ার। তাই বলে ভিয়েতনাম যুদ্ধের ঢেউ সেখানে আদৌ গিয়ে পৌঁছয়নি একথা ঠিক নয়। উত্তরের সেনাসামন্ত আর দক্ষিণের ভিয়েতকং গেরিলারা সেখানে দিব্যি ঘাঁটি বানিয়েছে। তাদের সঙ্গে একটা ভদ্রলোকের চুক্তি হয়েছিল রাজকুমার নরোত্তম সিহানুকের, যিনি হপ্তা দুই আগেও ছিলেন কাম্বোডিয়ার কেবল রাষ্ট্রপ্রধান নয় সে দেশের হর্তাকর্তাবিধাতা। সিহানুক তাদের কাম্বোডিয়া দিয়ে যাতায়াত আর মাল চালান করতে তো দিয়েইছিলেন তার ওপর ঘাঁটি তৈরি করতেও অনুমতি দিয়েছিলেন। তবে তাঁর শর্ত ছিল যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভিয়েতনামীদের চাটিবাটি তুলে দেশে ফিরে যেতে হবে। কাম্বোডিয়ায় ভিয়েতনামী সেনা আর গেরিলা দু পাঁচ জন মাত্র নেই। সংখ্যায় তারা অন্তত হাজার পঞ্চাশ হবে। এদিকে কাম্বোডিয়ার সেনা তো কুল্লে হাজার পাঁচেক। সিহানুক বলতেন লড়াই আগে থামুক তারপর কী হয় দেখা যাবে—এখন তো বাঘের গায়ে হাত বুলোনোই ভাল।

সিহানুক কেবল খাস ভিয়েতনামীদেরই তোয়াজ করেননি, তোয়াজ করেছেন কমুনিস্ট কুলপতিদেরও মস্কোতে আর পিকিঙে। সঙ্গে সঙ্গে চোখ রাঙিয়েছেন মার্কিন দেশের ওপর। জোট-ছাড়া নীতিতে ছিল তাঁর অটুট বিশ্বাস। তবে কুলোকে বলে তাঁর জোট-ছাড়া নীতি ছিল বেশ খানিকটা কমুনিস্ট ঘেঁষা। মস্কো-পিকিং তিনি চষে বেড়িয়েছেন, কিন্তু ওয়াশিংটনের সঙ্গে সব সম্বন্ধই তিনি তুলে দিয়েছিলেন পাঁচ বছর আগে। গেল বছর নতুন করে তার সঙ্গে সম্পর্ক ফাঁদলেও দহরম মহরম বিশেষ তিনি আমেরিকার সঙ্গে করতে চাননি। পাশ্চমী দেশগুলির মধ্যে ফ্রান্সের সঙ্গে ছিল সিহানুকের মাখামাখি। তার অবশ্য অনেক কারণ। রাজকুমারের শিক্ষাদীক্ষা তো প্যারিসে। আর ফ্রান্স ইন্দোচীনে তার রাজত্ব গেলেও এখনও মনে করে ও অঞ্চলের সেই অছি।

সব মিলিয়ে তাই সিহানুকের মার্কিন-বিদ্বেষ, ফরাসী-প্রীতি আর রুশ-চীন তোয়াজ বিশেষ বেমানান হয়নি। দেশটাকে লাল রঙে রাঙিয়ে দেবার কোনও ফন্দি তাঁর ছিল না। তাঁর ভয় ভিয়েতনামীদের। পাছে তাদের বাধা দিলে তারা রেগে গিয়ে কাম্বোডিয়া দখলের লড়াই শুরু করে দেয় তাই তিনি তারা যা করতে চেয়েছে তাই করতে দিয়েছেন, আমেরিকার সঙ্গে ভাব না করে করেছেন রাশিয়া আর চীনের সঙ্গে তাদেরই মন রাখার জন্যে; সঙ্গে সঙ্গে দেশকে গড়তে চেষ্টা করেছেন আধুনিক ঢঙে। ও দেশে রাজতন্ত্র এখনও চালু আছে যদিও রাজারাণীর বাইরের আড়ম্বরই সার, সত্যিকারের ক্ষমতা বলতে কিছু নেই। ১৯৪১ সনে ঠিক হয়েছিল তাঁর দাদামশাই মারা গেলে সিংহাসনে বসবেন তিনি, তাঁর বাবা নরোদম সুরামারিত নয়। দেশ তখন ছিল পরাধীন। স্বাধীন হবার পর তিনি স্বেচ্ছায় সিংহাসনের দাবি ছেড়ে দিয়ে তাতে বসালেন বাবাকে ১৯৫৬ সনে। ১৯৬০ সনে বাবা মারা যাওয়ার পর তিনি নিজে হলেন রাষ্ট্রপ্রধান, মা কোসসামাক হলেন দেশের রানী। এখনও রানীগিরি তিনিই করছেন, ছেলে কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধান নেই।

কাম্বোডিয়াতে রাজপুত্র নির্বাসন পালার প্রথম অংক শুরু হয় ১১ মার্চ। সেদিন সকালে হঠাৎ রাজধানী নম পেন্‌তে হাজার দশেক লোক ঝাণ্ডা ওড়াতে ওড়াতে হাজির হলো গিয়ে দক্ষিণ ভিয়েতনামের অস্থায়ী বৈপ্লবিক সরকারের দূতাবাসের সামনে। "এখান থেকে চলে যাও" বলে তারা খুব খানিক চেঁচালো। তারপর শুরু হলো রীতিমত দক্ষযজ্ঞ। দেখতে দেখতে সব কিছু তছনছ হয়ে গেলো। এবার উত্তর ভিয়েতনাম দূতাবাসের পালা। সেখানেও ঘটলো ওই একই কাণ্ড। শুধু তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে দু দূতাবাসের ওপর সরকারী হুকুম জারি হলো ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে দেশ ছেড়ে যেতে। অথচ উত্তর ভিয়েতনামের সঙ্গে কাম্বোডিয়ার খুবই দহরম মহরম আর দক্ষিণ ভিয়েতনাম অস্থায়ী সরকার খাড়া হতে না হতেই তাকে কিউবার পরই স্বীকৃতি দিয়েছিল কাম্বোডিয়া। প্যারিসে সব খবর শুনে রাজকুমার সিহানুক তো চটেই লাল। তিনি বললেন দক্ষিণপন্থীরা দেশটাকে সঁপে দিচ্ছে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের হাতে। নাম কারুর না করলেও ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। সিহানুকের ধারণা কাণ্ডটা সি আই-এর চক্রান্তেই বাধিয়েছে তাঁরই সরকার যাঁদের ওপর দেশের ভার তিনি দিয়ে এসেছিলেন। সরাসরি প্যারিস থেকে দেশে না ফিরে তিনি চললেন মস্কো, তারপর পিকিং হয়ে ফিরবেন নম পেন। ঘরে ফেরা কিন্তু তাঁর হলো না। জাতীয় পর্ষদ আর জাতীয় সংসদ তাঁকে বরখাস্ত করলো ১৮ মার্চ। দেশে ফেরাও তাঁর মানা।

যাঁরা সিহানুককে সরিয়েছেন তাঁদের তিনিও বলেছেন প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণ-পন্থী, সি আই এর হুকুমেই তারা এ কাজ করেছে। ওরকম কথা মস্কো আর পিকিং থেকেও বলা হয়েছে। কিন্তু রুশী আর চীনারা যে রাজপুত্রকে রণসাজে সাজিয়ে সেনাসামন্ত দিয়ে দেশে ফিরে পাঠাবে তার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। যে ত্রিমূর্তি এখন দেশটা শাসন করছেন তাঁরা হলেন জাতীয় সংসদের অধ্যক্ষ চেং হেং (তিনিই এখন অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান), প্রধান মন্ত্রী জেনারেল লোন নোল আর উপ-প্রধানমন্ত্রী রাজকুমার শিশোওয়াথ সিরিক মাতাক। তাঁরা দক্ষিণপন্থীই হোন আর প্রতিক্রিয়াশীলই হোন এ'দের লোকের ওপর প্রভাব খুব বেশী, নইলে যেসব উঁচু পদ তাঁরা পেয়েছেন সেসব তাঁরা পেতেন না, সিহানুকও তাদের ওপর দেশের ভার ছেড়ে দিয়ে প্যারিসে যেতে পারতেন না। যেভাবে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন সিহানুক ভিয়েতনামীদের সেটা দেশের লোকদের পছন্দ নয়। ঝোপ বুঝে তাই কোপ মেরেছেন ত্রিমূর্তি। তাঁরা ক্ষমতা হাতে নিয়ে দক্ষিণপন্থী কোনও কথাই বলেননি। আশ্বাস দিয়েছেন অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কে পুরোনো চাল তাঁরা ছাড়বেন না, তবে কী আমেরিকা, কী চীন, কী রাশিয়া, কী ভিয়েতনাম কারুর কাছেই দেশটা বিকিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে তাঁদের নেই।

যৌবন

মনুজেশ মিত্র

তোমার বাড়ীর
দরজা-জানলা সব সকালে-বিকালে
বন্ধ থাকে।
শুধু ওই সাজানো বাগানে ডালে ডালে
পাখীর কূজনই সব নয়,
কিম্বা রিমঝিম কোনো বৃষ্টির সময়।
বাগানে সাজানো স্তূপে হতে পারে
প্রচুর পোকার লাফালাফি,
প্রচ্ছদের হেরফের ঢাকে তবু
ও কিসের ঝাঁপি?
যদিও নিশ্চিন্ত হাওয়া বয়,
নির্জন রোয়াকে-বসে-জানলায়-রমণী-দেখা
ফাজিল ছোকরার মত
চোখ টিপছে চতুর সময়......
দরজা খোলা হলে—
খোলা হাট—
দেখা যাবে মরচে-ধরা তোবড়ানো তোরঙ্গ, আর
নড়বড়ে খাট!

বাঁচি

রত্নেশ্বর হাজরা

ছায়ার জন্য গাছকে গাছ বলেছি গাছের জন্য ছায়াকে ছায়া
আমি ছায়ার মধ্যে খুন করেছিলাম প্রেমিক হবার জন্য —
দুঃখের দিকে হাত শুকে উড়লো এলোমেলো হাওয়ায়
ছায়ার মধ্যে গাছ গাছের মধ্যে ছায়া
খুন করেছিলাম বলেই প্রেমিক অথবা
প্রেমিক বলেই খুন করেছিলাম —

এবং কোনো পাওয়াই তো নিছক পাওয়া নয়
কোনোকিছুর বিনিময়ে কিছু
আমি সাত লক্ষ বার অসুস্থ হয়েছি একটু স্বাস্থ্যের জন্য
দিনের জন্য রাত্রি বিলিয়ে দিয়েছিলাম রাত্রির জন্য দিন
ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছি ঘুমের নামে —
স্রোতের জন্য জল এবং জলের জন্য স্রোত
বাঁচার নামে উৎসর্গ করলাম আয়ু
আমি আমার জন্য আমাকে রোজ
বিলিয়ে দিই -

তোমাকে মৈত্রেয়ী ভাবতে পারিনি

পলাশ মিত্র

তোমাকে মৈত্রেয়ী ভাবতে পারি নি। তাই এই
দুঃসহ বোঝা : তাই এই
বুকের ভিতর
অহরহ যেন এক
শয়তান হাসে। তাই
এই বিভীষিকা,
রুদ্রের অসীম শাসন
ভয়ানক ভার
মনে হয়। তাই এই
শরীরের প্রতি লোমকূপে
পাপ আর পাপ :
দুঃসহ বোঝা।

তোমাকে মৈত্রেয়ী ভাবতে পারি নি। তাই দেখি
চারিদিকে এতো বিষণ্নতা : তাই
দেখি চারিদিকে
ভয়ের আঁধার।

'শিশুরা'

অজয়বাবু বসে বসে আলুর চপ জাতীয় একটা কিছু খাচ্ছিলেন; জ্যোতিবাবু হ্যাফ-প্যান্টের পকেটে হাত পুরে দিয়ে সি-এল-টিতে শোনা 'জিজো'র গান গলা খুলে গাইছিলেন: 'চাই টুপি—চাই টুপি!' যতীন চক্রবর্তী মশাই সামনের খোয়ার রাস্তা থেকে অনেকগুলো নুড়ি কুড়িয়ে এনে জড়ো করছিলেন, কী উদ্দেশ্যে ঠিক জানি না। আশেপাশে একদল এম-এল-এ
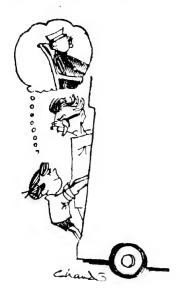
যে দেশে দশ বছর আয়কর ফাঁকি দিতে পারলে মন্ত্রী হওয়া যায় সেদেশে ছাত্ররা বাসে টিকিট কিনবে কেন?

দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁদের ভেতরে দু-চারজন সচিব-টচিবও ছিলেন মনে হয়।

সকালটি মনোহরণ। অশথ গাছটির সতেজ-সবুজ শাখায় বসে একটা কাক উদাস গলায় কা-কা করছে। মাদার গাছটার মগডালে চেপে বসেছে লাল-শাদা একটি ল্যাজমোটা কিশোর বেড়াল, তলায় থাপ পেতে আছে তেঠেঙে একটা শাদা কুকুর—বেড়ালটা নেমে এলে তাকে ধরবার একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করছে সে। একটি টুনটুনি এসে বেড়ালটাকে পর্যবেক্ষণ করে গেল।

নিবিড় শান্তিময় পরিবেশ। বঙ্গ দেশ শান্তি মগ্ন। অতি সুশৃঙ্খল-ভাবে মন্ত্রিসভার অধিবেশন চলছিল। হঠাৎ কোত্থেকে অ্যাপ্‌ল্‌ অভ ডিস্‌কর্ড নেমে এল জানি না। কোনো মহিলা এম-এল-এ পেছন থেকে ধাক্কা খেয়ে যতীনবাবুর নুড়িগুলোর ওপর পড়লেন—ছিটকে গেল সেগুলো; চটে যতীনবাবু তার বিনুনি ধরে টেনে দিলেন। তারপর কী হল বোঝা গেল না—মানে গুরুতর সংকট উপস্থিত হল একটা—দারুণ চ্যাঁচামেচি শুরু হয়ে গেল।

'মেরে সবগুলোর গাল উড়িয়ে দেব—' অতি গুরু গভীর এক গর্জন। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ শীর্ণকায় এক ব্যক্তি, মাথায় কাঁচাপাকা ঝাঁকড়া চুল, পরনে হাঁটু পর্যন্ত একটি ঠেঁটি, চোখ দুটি রক্তবর্ণ। আবার গর্জন করে সে জানালো: 'ভাগ্‌—ভাগ্‌ এখান থেকে সব। লেখাপড়া নেই—কিস্‌সু নেই—সকালবেলাতেই—'

আলুর চপ গালে পুরে অজয়দা দৌড় মারলেন সর্বাগ্রে, পেছনে পেছনে যতীনদা—জ্যোতিদা—এম-এল-এরা এবং সচিবরাও দিগ্‌বিদিকে ছুটলেন। ফালি জমিটায় রাখা যে ভাঙা তক্তপোশের ওপর মন্ত্রিসভার অধিবেশন চলছিল, উক্ত কৃষ্ণকায় ব্যক্তিটি সবেগে তাতে বসে পড়ে মালিকানা সপ্রমাণ করলেন।

অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হল। আমার মস্তিষ্ক সম্পর্কে অনুগ্রহ করে

যে দেশে চেয়ার ভাঙলে মেয়র হওয়া যায় সে দেশে স্কুলের আসবাব ছাত্ররা ধ্বংস করবে না কেন?

সন্দেহ করবেন না—না, বাংলা দেশের এই-সব বিপর্যয়ে আমি এখনো উন্মাদ হয়ে যাই নি। আমি নিতান্তই জানলা দিয়ে বস্তির ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খেলা দেখছিলুম। কাল বদলেছে, খেলাও বদলেছে। রাজনীতি বোঝবার বয়েস ওদের কারুরই হয় নি এখনো। বড়োদের আলোচনা শুনছে, উত্তেজনা দেখতে পাচ্ছে, মন্ত্রীদের নামগুলো বার বার কানে আসছে। তাই এক-একজন এক-একটা নাম সংগ্রহ

যে দেশে ভাগ্নীকে ফার্স্ট ক্লাশ দেবার জন্য আরও দশজনকে দিতে হয় সে দেশে ছাত্ররা পড়বে কেন?

করে নিয়ে নতুন খেলার চেষ্টা করছিল। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা যদি মানহানির মামলা করতে চান—তা হলে সেই সব শিশুদের বিরুদ্ধেই করুন—যাদের সব চাইতে বড়োটির বয়েস এখনো আট পেরোয় নি।

বাংলা দেশের আরো সব মানুষের মতো কমনম্যান সুনন্দরও রাজনীতির একটা ভাবনা আছে। কিন্তু সে ব্যক্তিগত ভাবনা থাক। খেলা ছোটদের যেমন ভাঙে, তেমনি বড়োরাও যে ভাঙতে জানেন সে দৃষ্টান্তেরও তো অভাব নেই। ছোটরা তারই রিহার্সাল দিচ্ছিল কিনা কে জানে!

রাজনীতির যা হয় হোক, কিন্তু আমি এইসব শিশুদের কথাই ভাবছি। এরা কারা? দরিদ্র আর নিম্নবিত্তের সন্তান সব। সরকারী 'লাল ত্রিকোণে'র রক্তিম বার্তা এখানে পৌঁছোয় না—আমার অদূরেই জবর-দখল জমিতে একটি কুঁড়েয় যে দম্পতি বাস করে, তাদের আটটি সন্তান—অথচ এরা এখনো প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছোয় নি। সব

চেয়ে ছোট শিশুটি সেদিন বিনা-চিকিৎসায় মারা গেল, তার মা কাঁদতে কাঁদতে দরজায় ঘুরতে লাগল সৎকারের খরচের জন্যে। সে ঝিয়ের কাজ করে, গোবর কুড়িয়ে ঘুঁটে দেয়, স্বামীটি বোধ করি সেই ঘুঁটে বিক্রী করে বেড়ায়। আটটি সন্তান এবং স্বামি-স্ত্রীর খাদ্যের সংস্থান কি ভাবে হয়—কোন্ মন্ত্র বলে, আমি তা জানি না।

বস্তিতে এক-একটি ঘরভাড়া নিয়ে যারা থাকে, অবশ্যই নিম্নবিত্ত—মা ষষ্ঠী তাদের ওপরেও কৃপণতা করেন নি। সেইসব দম-আটকানো ছোট ছোট ঘরে রাতটা সবাই মিলে কুণ্ডলী পাকিয়ে কাটিয়ে দেয়, তার-পর ভোর না হতেই বাপ-মা শিশুদের ঠেলে বার করে দেয় রাস্তায়। রাত ন'টা পর্যন্ত পথই তাদের একমাত্র জায়গা, সারা-দিন তাদের কলধ্বনি শুনি, আমার খোলা জানলা দিয়ে তাদের খেলাধুলোর এক-আধটা ইঁট-পাথরের টুকরো প্রায়ই আমাকে অভ্যর্থনা জানায়।

মাত্র দু-একজনকে স্কুল-ইউনিফর্ম-পরে বিদ্যালয়ে যেতে দেখি, বাকী সকলের জ্ঞানলাভ কোথায়—কি ভাবে হচ্ছে, আমার ঠিক বোধগম্য হয় না। কাছাকাছি বোধ-হয় কোনো স্কুল নেই কর্পোরেশনের।

লেখাপড়া করে যেই গাড়ী চাপা পড়ে সেই

আমাদের পাড়ায় একটি ধনবান পরিবারে একজন সহৃদয়া বিদুষী মহিলা আছেন, তিনি কিছু কিছু বাচ্চাকে ডেকে নিয়ে অবৈতনিক প্রাথমিক পাঠ দেন। আর তাছাড়া—

তাছাড়া অন্ধকার।

এই শিশুদের সব দাবিই তো আছে—খাদ্যের, শিক্ষার, চিকিৎসার—মানুষ হয়ে বাঁচবার। কিন্তু কোনো পথ তো দেখছি না। যে-কোনো রাষ্ট্র—যে-কোনো গণতন্ত্রই এই দাবি মেটাতে বাধ্য। অথচ বছরের পর বছর—রাজনীতির ইতিহাসে নতুন পাতা খোলে, এদের ভাগ্য বদলায় না। তারপর এরা বড়ো হয়ে কী দাঁড়ায়, তা-ও দেখতে পাচ্ছি। ন্যূনতম প্রয়োজনীয় শিক্ষার অভাবে কোনো স্বাভাবিক জীবিকা এরা খুঁজে পায় না (টেক্‌নিশ্যানরাই তো এখন নৈরাশ্যের মহাতামসে ডুবছেন), ফলে ওয়াগন-ব্রেকার, ছিনতাইকারী, মস্তান, ছোরা এবং বোমাবাজের সংখ্যা বাড়তে থাকে, তৈরী হতে থাকে অন্ধকারের বাহিনী।

হয়তো তেমন যদি কোনো প্রাণের দুর্দান্ত জোয়ার আসে, তা হলে এরাও সেই স্রোতকে শক্তি দেবে। কিন্তু কতখানি? যে-গাছে পোকা ধরে আছে, তা কটি ফুল ফোটাতে পারে? এমনও তো হতে পারে যে কিছু মারাত্মক বীজাণু সব কিছুই বিষিয়ে দিতে পারে?

'যে হোক রাজা, যে হোক মন্ত্রী, কেউ রবে না তারা'—রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। কিন্তু কী থাকবে? চিরকালের স্বদেশ। এই উদীয়মান মানবতার মধ্যেই সেই স্বদেশের অমৃত অথবা মৃত্যুবাণ। আজ মন্ত্রী-মন্ত্রী খেলা—কিন্তু নৈরাশ্যের খেলায় যখন নেমে পড়বে, তখন কে মেটাবে সেই অপরাধের ঋণ?

রাজনীতিতে সব দলই নির্ভুল, তাই অন্য দলের ভুল-ভ্রান্তিতে তাঁদের গর্জিত এবং কখনো-কখনো সহিংস প্রতিবাদ। কিন্তু এই শিশুরা কোন্ দলের—আমার তাই জানতে ইচ্ছে করে।

জগদীশ্বর, রসলোক, আল্লাহ্, লর্ড অব দি য়ুনিভার্স—শব্দগুলি আমার মনে কোনো স্পষ্ট বোধ বা আবেগ জাগায় না। এই ভাবচ্ছবি এবং তৎসংশ্লিষ্ট প্রত্যয় মানুষের মনে কেমন করে জন্মগ্রহণ করল, ক্রমে পরিপুষ্ট ও পরিশুদ্ধ হল, সে বিষয়ে কিছু জ্ঞান থাকলেও প্রত্যয়টির সার্থকতা মেনে নিতে পারি না। কিন্তু এই বিশ্বজগৎটা তো রয়েছে আমাদের চোখের, বুদ্ধির ও অনুভূতির সম্মুখেই। একে কেউ সম্পূর্ণ বুঝে উঠতে পারেনি, এর রহস্যের অন্ত নেই, জানা যতটা তার চেয়ে অজানা ঢের বেশি, তবু তাকে অস্বীকার বা সন্দেহ করা যায় না; যারা বলে মায়া তাদেরও তো তার সঙ্গে প্রয়োজনের ও ভোগের কারবার বন্ধ করা সম্ভব নয়; সন্দেহবাদী যদি কবি, শুধু বলে যদি তার দিকে পিঠ ফেরাই, তবে তো বিশ্ব সম্পর্কে চেতনা আরো প্রখর হয়ে ওঠে। বস্তুতপক্ষে যাকে মন বলি তা তো একটি অধর শূন্যতাই, যদি না ভরে ওঠে মানবিক ও প্রাকৃতিক জগতের প্রতিফলনে, আত্মীকরণে, প্রতিকরণে (reaction)। মন নিস্তুক অব্যক্ততা (potentiality) থেকে রূপান্তরিত হয় বাস্তবিক ধনাত্মক সত্তায় জগতের সঙ্গে নানা জাতীয় ব্যবসায়ে, লেন-দেনে, নৈবেদ্যদানে ও প্রসাদ গ্রহণে। তিন দিনের শিশুর মন বলে কি কিছু আছে, তার জগতই বা কতটুকু? প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে যেমন, মনুষ্যজাতির পক্ষেও তেমনি, মন এবং জগতের বিস্তার, বৃদ্ধি ও বাস্তবীকরণ সমান্তরালে পরস্পরের সঙ্গে তাল রেখে ঘটে।

মোটের উপর জীবন-ধারণের প্রয়োজনাতীত জগৎ সম্পর্কে আমাদের প্রতিক্রিয়া (অর্থাৎ আধ্যাত্মিক প্রতিক্রিয়া) তিন প্রকারের: জ্ঞানী রূপে, রসবোদ্ধা রূপে ও হিতকর্মীরূপে। আমার পূর্বে প্রকাশিত প্রবন্ধে ('রোগশয্যায়', দেশ, ২৪ জানুয়ারি) তুলনা ছিল রসবোদ্ধার সঙ্গে কর্মীর, অর্থাৎ নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে শ্রেয়োনীতিক দৃষ্টিভঙ্গির। সমালোচনা থেকে জানা গেল যে কেউ কেউ খানিকটা ভুল বুঝেছেন।* রসবোদ্ধার সঙ্গে জ্ঞানীর দূরত্ব আমার মতে খুব বেশি নয়। দুজনই ধ্যানী পুরুষ। এই অনেকান্ত জগতের দুই ভিন্ন রূপ তাঁরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অবলোকন করছেন, চিত্তের ঈষদ্-বক্রিত মুকুরে প্রতিবিম্বিত করছেন। একজন বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে চান তার যতটা বোধগম্য, যতটা সুসমঞ্জস ও নিয়মানুগ। সে-বোধগম্য রূপটাকে আমরা বলি সত্য। অন্য জন হৃদয় দিয়ে অনুভবের মধ্যে তাকে পেতে চান, ধরতে চান। এই অনুভূত রূপটাকে আমরা বলি সুন্দর। সুন্দর কথাটা এখানে খুব বড়ো অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে, তার মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অনেক সীমিত কুৎসিতের স্থান আছে। সব খণ্ড খণ্ড সুন্দরের মধ্যে এই পরম সুন্দরের ইঙ্গিত থাকে, সব খণ্ড সত্যের মধ্যে এই পরম সত্যের আভাস। প্রথমটা প্রতিফলিত হয় আমাদের শিল্প-সাহিত্যে, দ্বিতীয়টা দর্শনে-বিজ্ঞানে।

বরঞ্চ আত্মীয়তা আরো নিকট। একথা কি অস্বীকার করা যায় যে আইনস্টাইনের বিশেষ ও সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ, এমিবার মতো এককোষী জীব কিংবা আরো পেছিয়ে গেলে ভাইরাস-কণা (যাকে জীব-পদার্থ বলব কি জড়পদার্থ, ঠাহর করা শক্ত) থেকে মানুষ পর্যন্ত প্রাণ-ধারার ক্রমবিবর্তন-বাদ, পরমাণুতত্ত্ব—এসবও 'মোনা-লীসা' কিংবা 'শ্যামা' থেকে ঈষৎ ভিন্ন অর্থে কিন্তু সদর্থে সুন্দর, বোধগম্যতার স্বাদে মেশায় অগম্যের মাধুরি, পরিতৃপ্ত করে শুধু বুদ্ধিকে নয়, রহস্যবোধকেও, একটু ব্যাপক ভাবে বলতে গেলে, রসবোধকেও? আবার কোনো সাহিত্যসৃষ্টিতে যদি সত্যের কতকটা তির্যক কিন্তু অন্তর্গূঢ় উদ্ভাস না থাকে তবে তা মহৎ সাহিত্যের মর্যাদা পায় না, সৌখিন বা ডেকরেটিভ শিল্পের কোঠায় পড়ে, জড়োয়া গয়নার মতন নয়নাভিরাম হয়েও জড়োয়া গয়নার মতনই অকিঞ্চিৎকর থেকে যায়। উদাহরণত, সত্যেন দত্তের কিছু কবিতার উল্লেখ করা যায় এখানে। ছন্দের টুং টাং শুনতে বেশ লাগে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি কিছু অনুভূতি জাগায় না; সকল হুতাশ জ্বলে ওঠে না, সকল বাতাস গর্জে ওঠে না। "জাগারে দিয়ে সকল আকাশ পূর্ণতা বিস্তারো"—রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন তাঁর হৃদয়েশ্বরকে সম্বোধন করে; তাঁরই হৃদয়ের প্রকাশ যে কাব্যে ও গানে তাকে সম্বোধন করেও বলতে পারতেন। বললে আমাদের মনের কথাটা বলতেন। কিন্তু "ইলশে গুঁড়ি! ইলশে গুঁড়ি! ইলিশ মাছের ডিম"-এর লেখককে সম্বোধন করে আমরা সেকথা বলতে পারি না, ভাবতেও পারি না।

* দেশ—আলোচনা বিভাগ, ৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০।

আগেই বলেছি যে জগতের সৌন্দর্য আমরা সম্ভোগ করি তার কুশ্রীতা-কদর্যতাকে বাদ দিয়ে নয়। এফ আর লীভিস যদি বলে থাকেন যে কীট্‌স্‌-এর সুন্দরের ধ্যান ছিল disagreeable-কে বর্জন করে তবে তিনি কীট্‌স্‌-কে ছোট করে দেখেছেন। আমার বিচারে এই ভাগ্যহত ক্ষয়রোগগ্রস্ত যুবা আরো উঁচু স্তরের কবি। তিনি জীবনের the weariness, the fever, and the fret" মর্মে মর্মে বোধ করেছিলেন, চোখের সামনে দেখেছিলেন নিজের ছোটো ভাইকে অসহায় যন্ত্রণায় তিলে তিলে ক্ষয় হতে—"where youth grows pale and spectre-thin and dies." তাঁর কবিতায় অমঙ্গলবোধ তীব্র, সমগ্র মানবজাতির যন্ত্রণায় তাঁর হৃদয় ছিল অনুকম্পিত। আমি ভাবতেই পারি না যে এই রোমান্টিক কবির জীবনে সুন্দরের সাধনা ছিল কুৎসিতকে বর্জন করে। রবীন্দ্রনাথের, বিশেষত শেষ পর্বের রবীন্দ্রনাথের, বেলা তো এমনতর ভাবনা একেবারেই অসম্ভব। আলোচ্য কবিতাটির (রোগশয্যায়, ২১) মর্মার্থ সংহত হয়েছে দুটি পংক্তিতে :

> লক্ষ কোটি গ্রহতারা আকাশে আকাশে
> বহন করিয়া চলে প্রকাণ্ড সুষমা।

"প্রকাণ্ড সুষমা" ইংরেজি সাবলিমিটির অনুরণন জাগায় মনে—যার উপাদানে awe এবং majesty দুই-ই বিধৃত। সব কিছুকে স্বীকার করে, এক প্রকার বৈরাগ্যময় অনুরাগে রঞ্জিত করে রবীন্দ্রনাথ পৌঁছেছিলেন তাঁর কাব্য-সাধনার শেষ পর্যায়ে।

জ্ঞানী ও শিল্পীকে পরস্পর-আত্মীয় এবং কর্মীকে উভয়ের অনাত্মীয় মনে করি কেন সেটা বোধ হয় আরো একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। সম্প্রতি একজন তরুণ সমালোচক প্রশ্ন তুলেছেন : "শ্রীআইয়ুব এই কথাই কি স্বীকার করে নিচ্ছেন না যে যা নান্দনিক তাই সত্য? না হলে যে বোদলেয়র খুব কাছ থেকে জীবনকে দেখেছিলেন তাঁর দেখাকে তিনি অসৎ (অসত্য?) কীভাবে বলতে পারেন?"* উত্তর হয়ত একটু দর্শনঘেঁষা হবে, কিন্তু সেটা অনিবার্য। আমি বিশ্বাস করি যে সত্যান্বেষী এবং কবি উভয়ের লক্ষ্য জীবনকে এবং সব কিছুকে তার সমগ্র স্বরূপে দেখা। সমগ্রকে দেখতে হলে একটু দূরে থেকেই দেখতে হয়, খুব কাছ থেকে খণ্ডবিশেষকেই দেখা যায় এবং বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায়।

গাছ থেকে আপেল ফল পড়ল মাটিতে এটা সত্য কথা কিন্তু তুচ্ছ সত্য। শুধু একটি আপেল নয়, সব কিছুই মাটির দিকে পতনশীল। চন্দ্রও পৃথিবীর দিকে পড়ছে এবং পৃথিবী সূর্যের দিকে। সূর্যের দিকে এই টান এবং একটি প্রাথমিক ট্যানজেনশাল গতিবেগের যোগফল হচ্ছে সৌরমণ্ডলে চন্দ্র ও গ্রহগুলির উপবৃত্তাকার প্রদক্ষিণ-পথ। গাছ থেকে একটি পাকা ফল পড়ে যাওয়াকে মহাজাগতিক মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের প্রেক্ষিতে দেখা হচ্ছে আরো বড় সত্য, এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে দেখা। বিজ্ঞানীর নিরন্তর চেষ্টা এমনি বড়ো করে দেখা, প্রত্যেকটি ঘটনাকে একটি বৃহৎ নিয়মের দৃষ্টান্তরূপে দেখা, এবং সেই নিয়মকে আরো বৃহত্তর নিয়ম বা তত্ত্বের অঙ্গীভূত করা। এমনি করে তিনি যখন যে-কোনো বিচ্ছিন্ন তথ্য বা ঘটনাকে সমগ্র জগতের সঙ্গে সামঞ্জস্যযুক্ত করে এবং তার সীমিত রূপরেখার মধ্যে যেন সমগ্র বিশ্বজগতের স্বরূপটিকে প্রতিফলিত করে দেখেন তখনই তাঁর দেখা সার্থক, তিনি সত্যদ্রষ্টা। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অবশ্য সমন্বয়ের উপলব্ধি বুদ্ধি-নির্ভর।

কবির দৃষ্টি বিশেষকে নিয়েই অনির্দিষ্ট বা বেদনার্ত। তিনি বিশেষের মধ্যে তার অন্তর্নিহিত সত্যের সন্ধানী; সাধারণ নিয়ম বা তত্ত্বের খোঁজ করেন না। কিন্তু বিশেষ—হোক তা কোনো-এক বিকেলের শরৎ-আকাশে দেখা রামধনু, কোনো বিজন সন্ধ্যায় শোনা বুলবুলির গান, বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল কিংবা গভীর রাতে রোগীর শয্যাপাশে একজন স্নেহব্যাকুলা শুশ্রূষাকারিণীর জাগ্রত আবির্ভাব—তার বিশেষত্ব ক্ষুদ্র চতুঃসীমানার মধ্যে আবদ্ধ নয়। তা কালিক বিশেষ, অর্থাৎ তা স্বভাবতঃ ইঙ্গিতময়, ব্যঞ্জনাময়। কিসের ব্যঞ্জনা? প্রথম স্তরে অবশ্য কবির সুক্ষ্ম ও গভীর আবেগপুঞ্জেরই ব্যঞ্জনা, কিন্তু আবেগ অন্তরে অবস্থান করলেও বহির্মুখী ব্যাপার। এবং তার আশ্রয় কাব্যোল্লেখ্য ঐ ছোটো সীমিত ঘটনামাত্র নয়। কী তবে? এইটুকু বলা সহজ যে ঐ বর্ণিত নির্দিষ্ট বিশেষকে ছাড়িয়ে সে ইঙ্গিত বহু দূরে প্রসারিত, বহু দূরের সংবাদবহ। ভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডকে দেখা বলে একটা কথা আছে। হোক তা উদ্ধৃতিজীর্ণ, তবু তা শিল্পসৃষ্টিরই পরিপ্রেক্ষণিকায় বিবেচ্য। "The poet speaks to us of one thing, but in this one thing there seems to lurk the secret of all." কবিও চান জাগতিক সমন্বয় উপলব্ধি করতে, কিন্তু হৃদয় দিয়ে, কল্পনা দিয়ে।

> দূরে কোথায় দূরে দূরে
> মন বেড়ায় গো ঘুরে ঘুরে

শুধু কবির মন নয়, জ্ঞানান্বেষীর মনও।

---

* কালাচাঁদ চৌধুরী—আধুনিকতা ও আবু সয়ীদ আইয়ুব (নান্দীমুখ, জানুয়ারি, ১৯৭০)।

এইখানে আমি সত্যের সঙ্গে সৌন্দর্যের সাধর্ম্য লক্ষ্য করি।

ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য নিয়ে কর্মী—রাষ্ট্র-বিপ্লবী, সমাজহিতব্রতী বা কুষ্ঠরোগীর শুশ্রূষাকারী—ব্যতিব্যস্ত নন। তাঁর কাজের জন্য, উপস্থিত প্রয়োজন সাধনের জন্য, যতটুকু দেখা দরকার তার বাইরে তিনি তাকাতে নারাজ। মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরলে তাঁর কাজ চলে না অবশ্য। কিন্তু ছোটো সত্যকে নিয়ে তাঁর কাজ চলে, তাতেই কাজ বেশ ভালো চলে। বড়ো সত্যের কথা ভাবা তাঁর পক্ষে সময় ও শক্তির অপব্যয়। হয় সত্য নয় মিথ্যা বা ভ্রান্তি—এই চূড়ান্ত বিশ্লেষণটা অতি-সরল। আসলে সত্যের মাত্রাভেদ বা পর্যায়ভেদ (ডিগ্রীজ অব ট্রুথ) আছে—শূন্য থেকে (যাকে মিথ্যা বলা যেতে পারে) মহাসত্য বা অনন্ত সত্য পর্যন্ত, যা জ্ঞানী ও কবির অন্বিষ্ট। সত্য ও সুন্দরের কথা যখন ভাবি তখন এই মহাসত্যের কথা ভাবি। মঙ্গল-সাধনা যাঁর ব্রত তিনি মিথ্যাশ্রয়ী নন, তবে ছোট সত্যের ক্ষুদ্র আয়তনের উপরই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ। তাঁর পক্ষে দৃষ্টির সংকোচটাই প্রয়োজনীয়; খুব বেশি প্রসার কর্মজীবনে বিঘ্ন ঘটাবে। কর্মীর মনও যদি দূরে দূরে সকল দেশ কালকে ঘুরে বেড়াতে, আকাশ পাতাল হাতড়াতে শুরু করে, তবে কাজ এগোয় না। ধ্যানী থাকুন আপন খেয়াল ধরে। এমন "ধ্যানীর" সংখ্যা অল্পই হবে সব সমাজে।

বোদলেয়ারের জীবন-দর্শনকে আমি অসত্য বলেছিলাম, অসৎ বলিনি। অর্থাৎ কবির পক্ষে অসত্য। কর্মীর পক্ষে সে-দৃষ্টি সৎ এবং সত্য—অমঙ্গলের অতিশয় চেতনা—তাই নিয়ে বোদলেয়ার হলেন কবি, "কবিদের রাজা"। প্রতিবিধানের কথা অবশ্য তিনি ভাবেননি না, কবির কাছে সে ভাবনা আমরা প্রত্যাশা করি না। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি রইল কেবল কালো দাগগুলির উপর ফোকাস-করা। এই ছিল আমার নালিশের ভিত্তি। সমসাময়িক সমাজরক্ষীরা তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি প্রচারের অভিযোগ এনেছিলেন। আমার অভিযোগ ঠিক উল্টো। বোদলেয়ারের নীতিজ্ঞান ছিল প্রখর (ব্যক্তি-গত পদস্খলন এখানে ধর্তব্য নয়) —কবির পক্ষে অত্যন্ত প্রখর। অর্থাৎ তাঁর দৃষ্টি এবং দর্শন যথেষ্ট সম্প্রসারিত ছিল না। তিনি পাইথেকাস অ্যানথ্রোপাস থেকে সক্রেটিস, গৌতম বুদ্ধ, দা ভিন্চি ও নিউটন পর্যন্ত মহামানবের জয়যাত্রা দেখতে পাননি, এবং সে যাত্রায় সম্মুখে প্রসারিত অনন্ত পথ; দেখতে পান নি যে এ যাত্রা প্রাকৃতিক নিয়মের আওতারই সম্ভবপর হয়েছে, "ঘৃণ্য" প্রকৃতি থেকে দূরে সরে গিয়ে নয়। দেখতে পান নি যে এ পথে আমরা এগুব কি হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকব সেটা আমাদেরই জাগ্রত বিবেক ও বুদ্ধির উপর নির্ভর করছে, কোনো আসুরিক কিংবা দৈব শক্তির হস্তক্ষেপের উপর নয়। বোদলেয়রের দৃষ্টির সংকোচ ও সমবেদনার অতিপ্রখরতা হিতকর্মীকে মানাত, কিন্তু অকর্মণ্য কবিকে মানায় না—সে কবি যত বড় রূপদক্ষ শব্দ-শিল্পী বা বাক্‌মূর্তিকার হোন না কেন। কবি প্রথমত শব্দের কারিগর, কিন্তু শেষত দ্রষ্টাও তাঁকে হতে হয়। দুইয়ের মণিকাঞ্চন যোগ না হলে মহৎ কবি হওয়া যায় না।

সত্য ও সুন্দরের সঙ্গে শিবের নাম্টি যুক্ত, কিন্তু শিব ভিন্ন মন্দিরের দেবতা, ভিন্ন উপাচার দিয়ে তাঁর পূজা সম্পন্ন হয়। সত্য এবং সুন্দরের সাধক, অর্থাৎ জ্ঞানী এবং শিল্পী, উভয়ই ধ্যানী (contemplative) মানুষ; শিবের পূজারী কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ, মঙ্গলকর্মই তাঁর ব্রত, কর্মমার্গই তাঁর পন্থা। বলাবাহুল্য, এই অনুচ্ছেদে শিবকে আমি কেবলমাত্র মঙ্গলের দেবতা রূপেই কল্পনা করছি। বিরোধ বললে অতিশয়োক্তি হবে, কিন্তু বিভেদটা মৌলিক। মার্ক্সের ক্লাসিক ভাষাতেই তা ব্যক্ত করি—দার্শনিকেরা এ যাবৎ জগৎকে বুঝতেই চেয়েছেন, আসল কথাটা হচ্ছে তাকে ঢেলে সাজানো (the point is to change it)।" দার্শনিকরা যেমন, কবিরাও তেমনি; তবে "বুঝতে চেয়েছেন" না বলে বলব "সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন"। ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, দল-ভুক্ত ও দলবহির্ভূত নির্বিশেষে সকল মানুষের স্থায়ী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এই পোড়া জগৎটাকে, অন্তত তার সমাজ ব্যবস্থাটাকে, ভেঙে নতুন করে গড়ার অত্যন্ত প্রয়োজন আছে এ কথা কে অস্বীকার করবে। এই প্রয়োজনের ডাক আমাদের অন্তর্নিহিত কর্মী সত্তাকে উদ্বুদ্ধ করে। বাইরের জীবনে যদি তার প্রকাশ না ঘটে তবে আমরা অসম্পূর্ণ থেকে যাই এবং অসম্পূর্ণতা-বোধে কষ্ট পাই—যেমন পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, কীট্‌স, য়েট্‌স্।

কিন্তু আমাদের অন্তঃকরণে অন্য একটি মৌল সত্তা রয়েছে, তাকে বলব ধ্যানীসত্তা। আমার এই ধ্যানী ব্যক্তি-স্বরূপের সাধনা ও সার্থকতা ঐ পোড়া জগৎকে বুদ্ধির দ্বারা বা অনুভবের দ্বারা (কল্পনার যথোপযুক্ত ব্যবহার উভয় ক্ষেত্রেই) সম্যকরূপে উপলব্ধি করাতেই। এবং ধ্যানের সুদূরপ্রসারী সর্বগ্রাহী ও সর্বংসহ দৃষ্টি দিয়ে দেখলে দেখব, এই অনন্ত জগত্যাং জগৎ সত্যি-সত্যি আদ্যোপান্ত পোড়া নয়; ঈশাবাস্যম্ কি না সে তর্ক না তুলেও বলা যায় তা একটি বিরাট গোলাপের মতো সুন্দর—শতশত পোকা-

মাকড়, ঝরা পাতা, ঝরা পাপড়ি সত্ত্বেও। বহু পূর্বে 'রাজা' নাটকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা/দেখিস নি কি শুকনো পাতা ঝরা ফুলের খেলা।" এ দেখা নান্দনিক, দার্শনিকের সঙ্গে তার গরমিল নেই; কিন্তু প্রয়োজনীতিক বিচারে বালক অমলের মতো আধফোটা ফুলের শুকিয়ে ঝরে যাওয়াকে "খেলা" বলে অত সহজে মেনে নেওয়া যায় না।

জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় (য়ুনিটি অফ থিয়োরী এ্যান্ড্ প্র্যাক্‌টিস) ভালো কথা; আরো ভালো কথা জ্ঞান ও কর্মের সমতা, সমমূল্যতা। কিন্তু কর্মের জন্যই জ্ঞান, প্র্যাক্‌টিসের জন্যই থিয়োরী একথা কারো কারো কাছে প্রামাণিক ঠেকলেও স্বতঃ-প্রামাণ্য নয়। উল্টোটাও তো হতে পারে—থিয়োরীর জন্য প্র্যাকটিস, জ্ঞান ও ললিত কলার অপ্রতিহত চর্চাতেই কর্মজীবনের, সুস্থ সমাজ-গঠনের সার্থকতা? ধনের ধনের মূল্য তো উপকরণ-মূল্য নয়, অন্য কোনো মাপকাঠিতে তাকে মাপা যায় না। শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে কী হবে যদি মন উপবাসী থাকে, যদি আমাদের কবিরা

র্শনিকেরা মনে প্রাণে রাজনীতিক হয়ে
পড়েন, অথবা রাজনীতিকের আজ্ঞাবহ?
াঁদের দৃষ্টি যেন কেবল উপস্থিত
য়োজন এবং স্বল্পকালীন দাবীদাওয়ার
পর নিবদ্ধ না হয়; যেন থাকে মহাকালে ও
শ্বলোকে সম্প্রসারিত।

শ্রেয়োনীতিক দৃষ্টি তৎসাময়িক এবং
বশেষরূপে অমঙ্গলের উপর সংহত,
মঙ্গলের পরিব্যাপ্তিতে নিরতিশয়
পীড়িত ও বিক্ষুব্ধ, ন্যায়বিচারোদ্যত উত্মায়
স্থির, ঈশ্বরকে পর্যন্ত ক্ষমা করতে
নিচ্ছুক। প্রতিতুলনায় নান্দনিক তথা
র্শনিক দৃষ্টি দেশকালের কোনো ক্ষুদ্র
ীমায় আবদ্ধ নয়, বিরাট পটভূমিকায়
াদা ও কালোর বর্ণযোজনা যে-সুষমা
ুটিয়ে তোলে তা আবিষ্কার করে আনন্দ-
স্ময়ে, হয়তো বা বিষাদেও, স্নিগ্ধ,
র্বদাই উষ্মা ও বিক্ষোভ রহিত।
মেতাঃ রমাত্মা, অর্থাৎ কবির আত্মা:
মীর আত্মা অশান্ত থাকাই ভালো। এটাই
বির স্থায়ী দৃষ্টিভঙ্গি, ডমিনেন্ট মুড।
তবু শ্রেয়োনীতিক দৃষ্টি দিয়ে জগৎকে
খেও যে উত্তম কাব্য রচনা করা যায় না
নয়, এক ধরণের সংরাগরক্তিমা তাকে
সমুত্তীর্ণ করে তোলে। মার্কসবাদী
হিত্যবিচারে এই পর্যায়ের সাহিত্যই
শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, কারো কারো মতে একমাত্র
হিত্য। সেটা বাড়াবাড়ি। শ্রেয়োনীতি-
মূলক সাহিত্যের প্রতি (সমাজবাদী
হিত্যও তারই অন্তর্ভুক্ত) প্রীতি
ভাবিক, একান্ত পক্ষপাত অসঙ্গত।
নাগশয্যায়' থেকে এমন কয়েকটি কবিতার
াখ্যাসহ উল্লেখ করেছিলাম আলোচ্য
বন্ধে। পরিশেষ-এর 'প্রশ্ন' এক সময়ে
িতি, সঙ্গত খ্যাতি, অর্জন করেছিল।
কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যদি শুধু এই সব
বতা লিখেই ক্ষান্ত হতেন তবে তিনি
ত্তম কবি হতে পারতেন কিন্তু মহৎ কবি
তেন না।

সামঞ্জস্য কথাটা নন্দনতত্ত্বে এবং দর্শন-
স্ত্রে যত বড়ো, শ্রেয়োনীতির বিচারে
ত বড়ো নয়, ততটা ঐকান্তিক তো
ই। সামঞ্জস্য সর্বদাই সৌন্দর্যের জনক,
কিঞ্চিৎ শর্তাধীনে সত্যেরও। কিন্তু
সামঞ্জস্য মঙ্গলের যেমন পরিপোষক,
অমঙ্গলেরও তেমনি। গান্ধীর জীবনে
যেটা সামঞ্জস্য ছিল, নেহরুর জীবনে
সেটা ছিল না। ফলে গান্ধী মহাত্মা
হন, নেহরুকে বড়ো জোর মহাপুরুষ
া যায়। পক্ষান্তরে, ইয়াগোর চরিত্রে
টা সামঞ্জস্য পাই অথেলোর চরিত্রে
টা নয়। কিন্তু তার ফলে ইয়াগো
থেলোর চেয়ে শ্রেয়তর মানুষ হল না,
। তাঁমিষ্ঠ শয়তান।
নান্দনিক দৃষ্টি যতদূরে পর্যন্ত
মাশীল, যত বিচিত্র বিসদৃশ উপাদান
গ্রহণে ও আত্মীকরণে সক্ষম, শ্রেয়োনীতিক
দৃষ্টি ততটা নয়। "বিকৃতি না ঘটায়
স্বভাব"—বিচারটা নান্দনিক, শ্রেয়োনীতিক
নয়। 'প্রশ্ন' কবিতাটি শ্রেয়োনীতিমূলক
বলেই ক্ষমাহীন:

> যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু,
> নিভাইছে তব আলো,
> তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ,
> তুমি কি বেসেছে ভালো?

'শ্যামা' নাটকটি নান্দনিক পরিপ্রেক্ষিতে
রচিত, তাই ক্ষমায় এমন ভরপুর, ক্ষমাই
তার আদি এবং অন্ত সুর:

> জানি তুমি ক্ষমিবে তারে
> যে অভাগিনী পাপের ভারে
> চরণে তব বিনতা।
> ক্ষমিবে না ক্ষমিবে না
> আমার ক্ষমাহীনতা।

রাসেলের 'পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস'
নামক গ্রন্থ থেকে অম্লান দত্ত তাঁর সদ্য
প্রকাশিত প্রবন্ধে (দেশ-২৮ ফেব্রুয়ারী)
এমন একটি উদ্ধৃতি তুলে দিয়েছেন যা
আমার আলোচনায় এই স্থলে খুবই
প্রাসঙ্গিক। রাসেল লিখছেন: "স্পিনোজা
মনে করেন তুমি যদি তোমার বিপদ-
আপদগুলিকে তাদের সত্য স্বরূপে দেখো,
অর্থাৎ এই মহাবিশ্বের অনন্তকালব্যাপী
কার্যকারণ-শৃঙ্খলার অংশরূপে দেখো,
তবে বুঝতে পারবে যে সেগুলি কেবলমাত্র
তোমারই দুর্বিপাক, বিশ্ব জগতের দুর্বি-
পাক নয়; অনন্ত জগতের মধ্যে তারা
দ্রুতবিলীয়মান বিবাদী সুর মাত্র যা তার
অন্তর্গূঢ় সঙ্গীতকে আরও পূর্ণতা দান
করে। আমি অবশ্য এ কথা মানতে পারি
না। আমি বিশ্বাস করি যে বিশেষ কোনো
ঘটনা যেমনটি ঘটে আসলেও তা তাই;
এই সব ঘটনা সমগ্রের অঙ্গ হিসাবে নতুন
কোনো রূপ ধারণ করে না। প্রত্যেকটি
নিষ্ঠুর অপকর্ম চিরকালের মতো জগতের
কলঙ্ক হয়ে থাকে। পরে যাই ঘটুক না
কেন, সে-দুষ্কৃতি যে-সমগ্রের অংশবিশেষ,
পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ তাকে পরিপূর্ণ

সম্পত্তি দান করতে পারে না।" এ বিশ্বাস এবং যে-দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ বিশ্বাস জন্মলাভ করেছে তা শ্রেয়োনীতিমূলক। প্রতিতুলনায় স্পিনোজার দৃষ্টি ছিল নান্দনিক (ইস্থেটিক)। রাসেল কবুল করেছেন তিনি স্পিনোজার জ্ঞানাশ্রয়ী ঈশ্বরপ্রেম বা বিশ্বপ্রেম (স্পিনোজার দর্শনে ঈশ্বর এবং বিশ্বজগৎ বিকল্প শব্দ-রূপে ব্যবহৃত হয়) দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন, এমন কি মনে করতেন যে যেসব মৌল প্রত্যয় জীবনের ভিত্তি হতে পারে সেগুলির মধ্যে এটিই সর্বোৎকৃষ্ট (has seemed to me the best thing to live by); তবু তিনি কখনও স্পিনোজার নান্দনিক দৃষ্টি লাভ করেন নি। তাঁর অতি-বিশ্লেষণী অতি ক্ষুরধার বুদ্ধিই ছিল মস্ত অন্তরায়। রাসেলের জীবনে আপাত বিরাট সাফল্যের আবরণেও গভীর দুরপনেয় বিষণ্ণতার কারণ আমার মতে তাঁর অন্তরের ধ্যানী-সত্তা ও কর্মী-সত্তার মধ্যে অশেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তাঁর মনের মূল তন্ত্রীটি ছিল শ্রেয়োনীতিক, তাঁর হওয়া উচিত ছিল লেনিনের মতো অথবা গান্ধীর মতো কর্মী। অথচ তাঁর ইণ্টেলেক্টের অসাধারণ শক্তি তাঁকে নিয়ে গেল দর্শনের পথে, ধ্যানের পথে। দ্বন্দ্ব হল অনিবার্য, এবং গ্লানি অপ্রতিকার্য।

সমগ্র স্বরূপের কথাটাকেই বড়ো করে দেখাকে বলেছি নান্দনিক দৃষ্টি। যেসব কুশ্রীতা ও বিকৃতি এই মুহূর্তে আমাদের আশেপাশে থেবড়ে রয়েছে, শ্রেয়োনীতিক দৃষ্টিতে সেগুলিই খুব বড়ো আকারে ম্যাগনিফাইড হয়ে দেখা দেয়। তাই সঙ্গত। নইলে এ সবের প্রতিবিধান হবে কেমন করে, আমরা সংগ্রামের শক্তি ও প্রেরণা পাব কোথা থেকে? বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থাটাকে ঢেলে সাজাবার কাজে যিনি আপন সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছেন, তাঁর সময় কোথায় এ বিশ্বকে তার সমগ্র স্বরূপে দেখবার? সে প্রবৃত্তিও তাঁর নেই। স্বক্ষেত্রে তিনি যে মহৎ লোক তাতে সন্দেহ নেই। পক্ষান্তরে যিনি কর্মব্রতী নন, ধ্যাননিমগ্ন,—স্পিনোজার মতো, রবীন্দ্রনাথের মতো, আইনস্টাইনের মতো—তিনিও মহৎ লোক হতে পারেন স্বকীয় সাধনার ক্ষেত্রে।

ধ্যানী-সত্তা ও কর্মী-সত্তা সব মানুষের মধ্যেই আছে, তবে শুধু প্রবণতা রূপে, অংকুর রূপে। উভয় পথে কিছু দূর এগুনো অনেকের পক্ষে অসাধ্য নয়। কিছু দূর এগুনো সকলের উচিতও বটে। গান্ধী কর্মীশ্রেষ্ঠ হয়েও ধ্যানস্নিগ্ধ রেখেছিলেন নিজের ব্যক্তিত্বকে। রবীন্দ্রনাথ অতি বড় ধ্যানী হয়েও অনেক শুভকর্মের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু একই ব্যক্তির পক্ষে যদি একাধারে ধ্যানে ও কর্মে নিজেকে পূর্ণ বিকশিত করা সম্ভব হতো তবে তিনি হতেন পূর্ণ মানুষ, নরোত্তম। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে এমন মানুষের অস্তিত্ব অত্যন্ত বিরল, এতই বিরল যে তাঁকে মনুষ্যত্বের আদর্শ ভাবা শক্ত। লেনিন ও বিবেকানন্দের কথা সহজেই মনে আসে। কর্মীরূপে লেনিনের ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ, অতুলনীয় প্রতিভাসম্পন্ন। কিন্তু তাঁর দার্শনিক চিন্তা তুলনমূল্যে নয়। মৌলিকতার অভাব তো ছিলই, তা ছাড়া তিনি নিজে তাঁর দার্শনিক রচনাকে রাজনৈতিক সংগ্রামের অর্থাৎ কর্মের, অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেছেন; একটি সর্বাঙ্গসুন্দর পূর্ণাঙ্গ বিশ্বনিরীক্ষা গড়ে তোলাকে (সেটাই প্রকৃত দর্শন) চরম মূল্য দেন নি। বিবেকানন্দকে যোগী হিসাবে হয়ত মহাধ্যানী মনে করা যায়, কিন্তু যোগ বিষয়ে কোনো ধারণা আমার মনে নেই। দার্শনিক

পর্যায়ে তাঁর স্থান উত্তুঙ্গ নয় বলে আমার বিশ্বাস। বলা বাহুল্য এ'রা কেউ কবি বা শিল্পী ছিলেন না। আসল কথা, ব্যক্তিত্বের স্বরূপবৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কেউ বরণ করেন ধ্যানের পথ, কেউ কর্মমার্গ। আবার ধ্যানীর মধ্যে কেউ বেছে নেন চিন্তার কাজ, কেউ সৃষ্টির।

স্থিতি ও গতির মধ্যে, ধ্যান ও কর্মের মধ্যে, সামঞ্জস্য কোথাও আছে নিশ্চয়ই। সে সামঞ্জস্য সম্ভবত জটিল এবং তার অনেকখানি আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। এক দিক দিয়ে সামঞ্জস্য কি এই যে কর্মী চান সামাজিক অবস্থার এমন পরিবর্তন যাতে সব মানুষের শুধু জৈব স্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নতি নয়, তাদের ধ্যানী সত্তারও পূর্ণ বিকাশ সম্ভবপর হতে পারে? কিন্তু তার জন্য উচিত যে বাইরের অবস্থাকে কখনোই সম্পূর্ণ মনের মতোটি করে তোলা যাবে না, একটা coefficient of resistance থাকবেই, তার সঙ্গে চিরসংগ্রামের মধ্যেই আমরা পূর্ণ হব, জৈব থেকে আধ্যাত্মিক [illegible] নীড্হাম যাকে বলেছেন আমাদের ক্রিয়েটিভনেস তার দুরপনেয় বাধা মানবিক পরিস্থিতির অবশ্যম্ভাবী উপাদান। তাকে মেনে নিতেই হবে। অর্থাৎ বাইরের পরিবর্তনের যেমন দরকার আছে, অন্তরেরও পরিবর্তন তেমনি অত্যাবশ্যক। ধর্মের পরিভাষায় সে পরিবর্তনকে বলে আত্মশুদ্ধি, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভাষায় rectification of human emotions, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দে রে,
খসে যাবার, ভেসে যাবার
ভাঙবারই আনন্দে রে।

বাইরের জগৎকে মনের মতন করে গড়ে তোলা এবং অন্তর্লোককে বহির্জগতের [illegible] সাজিয়ে নেওয়া—এই দুটো বিপরীত প্রেরণাই মানবজীবনের মৌল প্রেরণা।

সামঞ্জস্য যদি বা কোথাও থাকে, তবু ধ্যানী এবং কর্মী চলেন ভিন্ন পথে, ভাবেন [illegible] ভাবনা; তাঁদের চোখের সামনে [illegible]-সদৃশ দৃশ্যপট। তাঁরা পরস্পরকে নমস্কার করে চলবেন, এইটুকু কি আশা [illegible] যায় না? ধ্যানব্রতী যাঁরা তাঁরা [illegible]তকর্মীর প্রতি অশ্রদ্ধাবান নন, এবং নিজের কর্মশক্তির অভাবে কিঞ্চিৎ বিবেক-পীড়িত। বলা বাহুল্য আমি দার্শনিক ও [illegible]বির কথাই ভাবছি: সাধু-সন্ন্যাসীদের [illegible]থা নয়, তাঁরা আমার কাছে অজ্ঞেয়। দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে তেমন নয়, তবে শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে অবশ্য এমন [illegible] কারো কথা আমার জানা আছে [illegible]দের আত্মম্ভরিতা গগনচুম্বী এবং অন্য [illegible]দের প্রতি অবজ্ঞা অপরিসীম। এটাকে [illegible] ধরনের নিরীহ খ্যাপামি ছাড়া আর [illegible]ছুই মনে করা যায় না। মনোবিজ্ঞানে বোধ করি এর নাম নার্সিসিজ্‌ম্‌। বর্তমান শতাব্দীতে আমাদের দেশ দুইজন মহামানবকে পেয়েছে—রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধী। এ'দের মধ্যে কে মহত্তর সে বিচার যেমন অসম্ভব তেমনি নিরর্থক। এমনতর বিচারের কোনো মাপকাঠিই নেই আমাদের হাতে। তেমনি একজন মাঝারি সাহিত্যিককে একজন মাঝারি দার্শনিক বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক বা সমাজ-কর্মীর চেয়ে বড়ো বা ছোটো বলার কোনো মানে হয় না। জ্ঞানপীঠ প্রতিষ্ঠান শুধু ঔপন্যাসিক ও কবির জন্য লাখ টকার বাৎসরিক পুরস্কার ঘোষণা করে একটি ভ্রান্ত ধারণার পরিপোষণ বা অনুসরণ করছেন—যেন এ'রাই সমাজের সর্বাগ্রগণ্য মানুষ। নোবেল কমিটি বহু সাহিত্যিক-লেবেলধারী পুরস্কার ঐতিহাসিক ও দার্শনিককেও দান করেছেন এবং বৈজ্ঞানিক ও সমাজ-কর্মীর জন্য স্বতন্ত্র পুরস্কার রেখেছেন। সাহিত্যিকরা পুরস্কৃত ও সম্মানিত হন, সেটা সকলের পক্ষেই অতীব আনন্দের কথা। কিন্তু এমন ভুল শিক্ষার প্রতিষ্ঠা যেন না হয় যে কাব্য-উপন্যাস জাতীয় সাহিত্যই অধ্যাত্মসাধনার প্রশস্ততম বা শ্রেয়স্তম মার্গ।

শিল্পী সাহিত্যিকদের দর্প থাকতে পারে, কিন্তু দাপট নেই। তাঁরা [illegible] অহিংস মানুষ। ফিলিস্টাইন, [illegible] বেরসিক, মূঢ় ইত্যাদি কয়েকটি [illegible] চেয়ে ক্ষুরধার বা বিষধর কোনো বাণ তাঁরা হানতে পারেন না। ভয় হয় যখন দেখি একনিষ্ঠ সমাজ-কর্মীদের মধ্যে বিশুদ্ধ জ্ঞানব্রতী ও শিল্পসাহিত্যসাধকদের প্রতি শুধু শ্রদ্ধার অভাব নয়, রীতিমত অসহিষ্ণুতার প্রকোপ—যদি তাঁরা সমাজোন্নয়নের অস্ত্ররূপে নিজের প্রতিভাকে ব্যবহার করতে গররাজি থাকেন। সত্য-সুন্দরের যেরূপটি তাঁরা যেমন বুঝেছেন বা অনুভব করেছেন তার অনুজ্ঞাই তাঁদের পক্ষে চূড়ান্ত অনুজ্ঞা, আর কোনো অনুজ্ঞা মেনে চললে তাঁরা অধর্ম চারণ করবেন।

কর্মমার্গীরা ক্ষমতাশালী মানুষ। এ'রা

যদি ভাবেন—কর্মের পথই একমাত্র পথ; আর অন্য পন্থা বিপদের আয়নায় শুধু নয়, অন্য কূল পথ বিধর্মীর পথ, বিনাশের পথ, সুতরাং অন্য সব পথের পথিকরা নিপাত যাক—তবে ভয় হবারই কথা। পূর্ণতার পথ কোনোটাই নয়, কিন্তু দুটি পথ স্বতন্ত্র (আক্ষরিক অর্থে স্ব-তন্ত্র) হয়েও পরস্পরের সম্পূরক এই ভাবচ্ছবিটি মনশ্চক্ষের সামনে রাখলেই সমাজের সর্বাঙ্গীন কুশল নয় কি? কবির আবেদন অবিস্মরণীয়:

এই কথাটি মনে রেখো,
তোমাদের এই হাসিখেলায়,
আমি যে গান গেয়েছিলাম
জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়।

সংস্কার নয়, সর্বোদয় নয়, বিপ্লব নয়, সমাজ গঠন নয়, শুধু গান গেয়েই কি কেউ সমাজের মহত্তম উত্তমর্ণদের মধ্যে গণ্য হতে পারেন না?

পরবর্তী প্রবন্ধ—'রাজা' নাটকের দীর্ঘ আলোচনা—শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। বর্তমান প্রবন্ধটি তার ভূমিকা স্বরূপ। সমালোচকদের অনুরোধ জানাই সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে।

॥ এক ॥

অসিত তখন ব্যস্ত, খুবই ব্যস্ত, স্টেনোগ্রাফারকে একটা জরুরী চিঠির যা এসেছে দিল্লীর আমদানি রপ্তানি দফতর থেকে, টপ প্রায়োরিটি রেফারেন্সে অ্যাপ্লিকেশন ফর একসপোর্ট অব ম্যাগনেটিক ওর টু সফট কারেন্সি কান্ট্রিজ, যা এসেছে দেরিতে অথচ নির্দিষ্ট তারিখের আগে যার জবাব সংশ্লিষ্ট দফতরে না পৌঁছলে তাকে অত টাকা মাইনে এত অজস্র সুবিধা দিয়ে পোষা কোমপানির কাছে নিরর্থক হয়ে উঠবে এবং দু দিন মাত্র দু দিন আর বাকি সেই সময়সীমা পেরুতে, জবাব ঝড়ের গতিতে ডিকটেট করছিল একগাদা ফাইলের পাতা ওলটাতে ওলটাতে, চোখ দুটো প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নিপুণে বকআর খুটে খুটে আহরণ করছিল, ফোন এল।

—হ্যালো। অনিচ্ছাকৃত বিরক্তির তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল তার কণ্ঠ থেকে তারে।

—লিলি বলছি, খুব শান্ত কোমল স্বর, আমি লিলি, আমি এসে গিয়েছি।

অসিত কিছু না ভেবেই চেঁচিয়ে উঠল, লিলি! এসে গেছ! গুড্, গুড্!

অসিতের হৃদয়যন্ত্রের মধ্যে একটা টাইম বোমা এ ক'দিন, আজ পাঁচ দিন, টিক টিক করে চলছিল, এই মুহূর্তে সেটা ফেটে পড়ল। অসিতের দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সে চোখ বুজল। অন্ধকার। তিনটি পৈশাচিক মুখ হাসছে। বিকট হাসির শব্দে তার কানের পর্দা ফেটে যাচ্ছে। কিছু না ভেবেই গভীর রাতের এক নির্জন রাস্তা ধরে প্রাণপণে সে ছুটে চলেছে। অসিত চোখ খুলল। দেখল স্টেনোগ্রাফারের এনামেল করা মুখমণ্ডলে অবস্থিত এক জোড়া চোখ তার দিকে সকৌতূহল বিস্ময়ে চেয়ে আছে।

ফিরিয়ে তার গলায় উত্তেজনা ঝরছে। মেকেঞ্জি দিল। কাউথাপিসটা চেপে ধরে অসিত যথাসম্ভব মর্যাদা সহকারে স্টেনোগ্রাফারকে নির্দেশ দিল, মিস নন্দী, যতটুকু হয়েছে টাইপ করুন। ডাকলে আসবেন।

তার প্রচণ্ড জল-তেষ্টা পেয়েছিল। টেবিলের তলায় আঙুল ঢুকিয়ে কলিং বেল বাজাবামাত্র চাপরাসী এসে দাঁড়াল। গেলাসে তাকে জল আনতে বলল অসিত। ঢক-ঢক—ঢকঢক করে গেলাসটা নিঃশেষ করে দিল। সব কাজ শেষ। লিলি ফোনের ওদিকে দাঁড়িয়ে। লিলি ফোন করেছে। লিলি ফিরে এসেছে। এতক্ষণে ঘামতে শুরু করল অসিত। এই ঠাণ্ডা-করা ঘরে বসেও।

—লিলি? এখনও তার গলা কাঁপছে। হঠাৎ যেন তাতে প্রাণ ফিরে এল, যেন অত্যন্ত জরুরী কথাটাই জানতে চাইল, লিলি, তুমি কোথায়? কোথেকে বলছ? তুমি তুমি তোমার তোমার—হঠাৎ কথা ফুরিয়ে গেল অসিতের। একটা দারুণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছিল, ঠোঁটের ডগায় এসেছিল তা, কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে সাহস হল না।

লিলি বলল, তেমনি নরম, তেমনি কোমল, আমি বাড়িতে অসিত, বাড়ি থেকেই বলছি।

—বাড়ি থেকে! গুড্, গড্! আবার একটা আবেগের ঢেউ অসিতকে কিছুটা দুলিয়ে দিল। একটু দম নিয়ে প্রায় স্বাভাবিকভাবেই সে জিজ্ঞাসা করল, কি করে বাড়ি পৌঁছলে লিলি? কে পৌঁছে দিয়ে গেল?

লিলি বলল, আমি নিজে নিজেই পৌঁছে গেলাম। আমাদের গাড়িটা ড্রাইভ করেই এসেছি।

অসিত বিশ্বাস করতে পারছিল না। ... ফোনে কথা বলছে। উঃ, এ পাঁচটা দিন যেভাবে অসিতের কেটেছে কোনওভাবেই তা প্রকাশ করা যায় না।

লিলি বলল, তুমি তো এখন ব্যস্ত।

—না না, একটা চিঠি ডিকটেট করছিলাম। ওটা ... পোস্টেই পাঠালে ভাল হত। ... পাঠাব। আমি এখনই চলে আসছি।

—কি দরকার! লিলি বলল। এখন একটু আগে বা পরে এলে যখন কিছুই যাচ্ছে আসছে না, তখন না-হয় জরুরী কাজটা সেরেই এসো।

—না, আমার মন মানছে না, তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করছে, এক্ষুনি।

অসিত সবিস্ময়ে লক্ষ করল তার গলায় কলেজী জীবনের সেই ছেলেমানুষী অস্থির আকাঙ্ক্ষাটা ভর করেছে।

—না, কাজ সেরেই এস। আমাকে হারাবার ভয় আপাতত এখন আর যখন নেই, তখন আর এত তাড়া কিসের?

—লিলি, এ পাঁচ দিন আমার যে কী যন্ত্রণার মধ্যে কেটেছে, তা তোমাকে বোঝাতে পারব না। লিলি, তুমি ঠিক বলছ, তুমি আমাদের বাড়ি থেকে টেলিফোন করছ? তুমি মুক্ত, স্বাধীন। কেউ ছোরা উঁচিয়ে তোমার পিছনে দাঁড়িয়ে নেই। রিভলবার উঁচিয়ে কেউ তোমাকে ফোর্স্ করছে না আমাকে টেলিফোন করতে?

ওপাশ থেকে জবাব এল না। ভয়ে ঢোল হয়ে এল অসিতের শরীর। সে চেঁচিয়ে উঠল ফোনে, লিলি, লিলি!

—লিলি, এই তো আমাদের গাড়ি! উফ্। মস্তানদের নিয়ে আর পারা যায় না। আজকাল কোন সিকিউরিটি নেই ড্যাম্ড্ কলকাতায়। চাবিটা দাও।

লিলি বলল, তুমি বড্ড টায়ার্ড। আমিই চালাচ্ছি। তুমি বরং চাকাগুলো দেখে নাও হাওয়া ঠিক আছে কিনা। সেই ছেলেটা যদি না বলে দিত তো আমরা খুঁজেই পেতাম না গাড়িটা। ওকে একটা টাকা দিলাম, তুমি খাপ্পা হয়ে উঠলে।

—বাস্টারড্! ওরা সব এক গ্যাং বুঝলে। নো মারসি। ওদের দ্যাখ, আর গুলি করে মার। আমার হাতে গভর্মেন্ট থাকলে আমি তাই করতাম।

—উঃ, গলিটা কি অন্ধকার!

লিলি অভ্যস্ত হাতে দরজা খুলে স্টিয়ারিং-এ বসল। সঙ্গে সঙ্গে কে তাকে এক ঝটকায় চিত করে ফেলে দিয়ে তার কণ্ঠায় একটা ছুরির ডগা ছুঁইয়ে রেখে বলল, একটি আওয়াজ ছেড়েছ কি গলা দু ফাঁক হয়ে যাবে। কোনও বাবা বাঁচাতে আসবে না। চুপ করে থাক, যদি বাঁচতে চাও।

বুঝি মূর্ছাই যায়।

—এই, ও শালাকে ধরেছিস? অন্ধকারে কে বলল।

অন্ধকারে কে জবাব দিল, ধরেছি।

—শালা, খুব তড়পাচ্ছিল। এক লাথি ঝেড়ে শালার বিচি দুটো ফাটিয়ে দে। শালা গরমেনট দেখাচ্ছে। মার লাথি।

অসিত সঙ্গে সঙ্গে টেরিলিনের প্যানটের ফাঁকে দু হাত দিয়ে অণ্ডকোষ দুটো চেপে ধরে চাপা স্বরে কাতরে উঠল, না, প্লিজ্। কি চাও বল, সব দিয়ে দিচ্ছি। মেরো না।

—ব্যস্! গরমেনটের বাচ্চা যে ছুঁতে না ছুঁতেই কেঁদিয়ে গেল রে! অন্ধকারে তিন প্রস্থ হাসি বেজে উঠল। আচ্ছা, ঠিক আছে, ছুঁচো মেরে আর হাতে গন্ধ করছি নি। দাও, দেখি কি আছে?

একে একে সব দিল অসিত। ওরা সব নিল। একেবারে নীরবে সমাধা হল লেন-দেন।

—এইবার শোন, খুব শান্ত আর ধীর স্বরটা বেজে উঠল, যেই আমি বলব ডবল মারচ, আর তুমি সঙ্গে সঙ্গে জোর পায়ে হাঁটা দেবে, পিছনে তাকাবে না, দৌড়বে না। তোমার গাড়ি আর এই মাল, কে এটা, বউ, না কি অন্যের ঝোপে কোপ মারছ, আমরা নিয়ে যাচ্ছি, পাঁচ দিন পরে এখানে এরকম সময়ে আবার এসে নিয়ে যাবে। খবরদার শালা, এই পাঁচ দিন টুঁ শব্দটি করবে না। যদি পুলিসে কেস লিখিয়েছ কি কাউকে বলেছ, কিছু আর অস্ত পাবে না।

অসিত কাকুতি মিনতি করে কি বলতে যাচ্ছিল। সেই আওয়াজটা ধমক দিল, চোপ শালা, আবার কথা! মুখ খুলেচ কি বস বিয়ারিং ছটকে যাবে। তারপর মিলিটারি কায়দায় হুকুম দিল, মুখ ঘোরাও। অসিত গলির দিকে মুখ ফেরাল। ডবল মারচ। আর সঙ্গে সঙ্গে অসিত হাঁটা দিল এবং বেশ দ্রুত।

গাড়ি স্টারট দিতে দিতে একজন বলল, ওটাকে অলিমপিকে পাঠালে হয়। নির্ঘাত শালা দ্রুত হণ্টনে সোনার মেডেল নিয়ে আসবে। শালা কালটু সাহেবের আনটো যা ভিজেচে না, বাড়ি গিয়েই ধুতে বসবে। তারপর অন্য কাজ।

—হ্যালো হ্যালো, সাহেব, আমি রিয়াজুদ্দীন বলছি।

—রিয়াজুদ্দীন? কোত্থেকে বলছ? অসিত দেখল তার হাতের তালুটা এত ঘেমে গিয়েছে যে, রিসিভারটা পিছলে পড়ার জো হয়েছে।

রিয়াজুদ্দীন জবাব দিল, ঘর থিকে বলছি হুজুর।

মেম সাহেব কোথায়?

—এই তো হুজুর, পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে হুকুম করলেন কি, সাহেবের সঙ্গে বাত কর।

জিজি ফোনটা টেনে নিয়ে একটু হাসল। তারপর আস্তে বলল, কি, এবার ফোন করছি, আমার পিছনে গোয়েন্দা লাগিয়ে যা রিভলবার নিয়ে ক্রাইম-ফিকশনের মত কোনও গুণ্ডা বা গুণ্ডোরা দাঁড়িয়ে নেই?

—ওঃ তাই। অসিত বুকে খালি করে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল এবং সঙ্গে

কোটাও শাড়ি অবশিষ্ট নেই।

সে কাতরস্বরে স্বীকার করল, আমি বড় ভীতু লিলি। আমি বেজায় ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

॥ দুই ॥

এখন শাওয়ারে অনেকক্ষণ ধরে চান করে এবং যে-সব বিলিতী সাবান দুর্লভ, আমদানি বন্ধ, চোরা পথে বাজারে এসে চড়া দামে প্রকাশ্যেই সাহেবপাড়ার শৌখিন কেমিসটস অ্যানড ড্রাগিসটস দোকানগুলি থেকে লিলির ভাঁড়ারে এসে জমা হয়, যা কোমল ত্বককে রোমকূপের ময়লা নিষ্কাশন করে দিয়ে তাজা রাখতে সাহায্য করে এবং যার রুচিসম্মত সুবাস দীর্ঘ সময়-ব্যাপী তাকে এবং তার সমীপবর্তী বায়ু-মণ্ডলকে সুরভিত করে রাখে তারই একটা ধীরে খরচ করে সে পুরাতন আরামকে যাতে সে অভ্যস্ত ছিল এই পাঁচ দিন আগে পর্যন্তও ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করল। গত পাঁচ দিন তাকে একটি মাত্র শাড়ি, একটি পেটিকোট, একটি প্যানটি, একটি চোলি এবং একটি ব্রা সম্বল করেই কাটাতে হয়েছে। এখন তার মনে হল তার সব থেকে বেশী ক্লেশের কারণ ছিল এইটেই। সাবানের ফেনায় আর শাওয়ারের শীতল ধারায় তার শারীরিক আরাম কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠলে সে ঠাণ্ডা এবং মসৃণ এবং নীলাভ টালির উপর পা ফেলে ফেলে পূর্ণাবয়ব আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল এবং নিজের নিরাবরণ শরীরটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিল। কপালটা এখনও ফুলে আছে, এবং ব্যথা। স্তনে এবং তলপেটের নিচে কালসিটে।

নষ্ট হয়েছে, এমন কোনও চিহ্ন সে দেখতে পেল না। শাওয়ারটা বন্ধ করে বাথ টাওয়ালটা দিয়ে চেপে চেপে সে শরীরটা শুকিয়ে নিতে লাগল।

যোপদুরস্ত পোশাক পরার সঙ্গে সঙ্গেই শরীরটা বেশ ঝরঝরে বোধ করছিল। বেতের চেয়ারটা সরিয়ে নিয়ে ব্যালকনির এমন জায়গায় বসল, অসিত এলে যেখান থেকে সহজে দেখা যায়। লিলি এইজন্যই দোতলায় এই অ্যাপারট-মেনটা বেছে নিয়েছিল। অসিতের গলার স্বরে তার আবেগ ও উদ্বেগ যদি সৎভাবে ফুটে থাকে তবে যে-কোনও মুহূর্তে সে এসে পড়বে। কিভাবে এসে আমার সামনে দাঁড়াবে অসিত? ঠিক আন্দাজ করতে পারল না।

—মেম সাব্, চা আনব? রিয়াজুদ্দিন এসে দাঁড়াল।

—একটু পরে। লিলি বলল, সাহেব এলেই দিও।

ও যখন বাড়িতে এসে ঢুকল কেউ কোনও বিস্ময় প্রকাশ করেনি। যেন মারকেটিং থেকে, কি পারটি থেকে, কি বাপের বাড়ি থেকে ফেরে, ঠিক তেমনি ঘটনা যেন। অথবা বাড়িতেই ছিল সে অসিত কিছুই বলেনি বোঝা গেল। অসিতকে ফোন করার পর হঠাৎ খুব ক্লান্ত বোধ করছিল। চান করে সে ভাবটা তার গিয়েছে এখন সে বেশ তাজা। র‍্যাক থেকে পুরনো কাগজগুলো এনে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে লাগল লিলি। না, কোথাও এ খবরটা নেই। অসিত দেখছি ওদের কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। লিলি হাসল। অসিতের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কি? সাত বছর আগে আমরা ছিলাম লাভার পাঁচ বছর আগে আমরা হলাম স্বামী স্ত্রী পাঁচ দিন আগে আমরা কি তাই ছিলাম? তাই যদি থাকব তবে গত পাঁচ দিনে কোথাও তার কোনও চিহ্ন নেই কেন? ক্রমশ বিভ্রান্ত হয়ে উঠছে লিলি? কেননা, এটা ঠিক যে, অঙ্কের উত্তর মিলছে না। কিন্তু অঙ্কটাই বা কি আর তার উত্তরই বা কি সেই ব্যাপারটাই লিলির কাছে ধোঁয়াটে হয়ে পড়েছে। এই বাড়ির কথাই ধরা যাক। তার এখানে কোন্ ভূমিকা? তার অভাবে কোনও কিছু তো অচল হয়ে পড়েনি। সম্ভবত তার বিছানাটি, তার ওয়ারড্রোব, তার প্রসাধনসামগ্রীগুলিই হস্তস্পর্শ পায়নি, কারণ সে অনুপস্থিত ছিল, হ্যাঁ শুধুই অনুপস্থিত। এ বাড়িতে এই কয়দিন তার অভাব ঘটেনি, ঘটেছিল অনুপস্থিতি। তাই এ নিয়ে কোনও শোরগোল হয়নি, তাকে উদ্ধারের জন্য কোনও তোলপাড় হয়নি। অথচ সে কিন্তু ভেবেছিল অসিত তার উদ্ধারের জন্য হুলুস্থুল কাণ্ড

সম্ভাবনা রয়েছে একটা বিরাট বাহিনী ঘিরে ফেলবে সেই পরিত্যক্ত বাগানবাড়িটা, যার মধ্যে ওরা তাকে আটকে রেখেছিল। পুলিস কুকুর শুঁকতে শুঁকতে চিনিয়ে দেবে বাড়িটা, যে জন্যে সে কায়দা করে তার পারস, তার রুমাল পথে ফেলে দিয়েছিল। বন্দুক, রিভলবারে সজ্জিত পুলিস বাহিনী নিয়ে হাজির হবে অসিত উস্কখুস্ক চুল, চোখের কোলে কালি। তাকে দেখে উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠবে অসিত 'লিলি তুমি বেঁচে আছ' বলে।

চিন্তাটা তার কাছে, এখন, এই বাড়ির নিশ্চিন্ত পরিবেশে এতই উদ্ভট মনে হল যে, লিলি নিজেই হেসে উঠল। অথচ ওই পাঁচটি দিনের অন্তত পনেরো দুটো দিন সে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেছিল যে, অসিত সহজে ছাড়বে না। তাকে উদ্ধারের জন্য সে এই ধরনের কোনও একটা ব্যবস্থাই নেবে। আসলে এসব দিবাস্বপ্ন অত্যধিক সিনেমা দেখারই ফল। জীবনে যা ঘটে তা আলাদা।

অসিত এল। অফিস-ফেরত যেমন বরাবর আসে, হাতে দামী অ্যাটাচি, একটু ক্লান্ত ক্লান্ত কিন্তু ফিটফাট, ঠিক তেমনি। অ্যাটাচিটা পাশের টিপয়ে রেখে, টাইটা ঢিলে করে মাথা ঝুঁকিয়ে কি একটা বলতে যাচ্ছিল, রিয়াজুদ্দীন চা-এর ট্রে নিয়ে হাজির হতে চুপ করে গেল। রিয়াজুদ্দীন চলে যেতেই গলা নামিয়ে বলল, ওরা কিছু জানে না।

লিলি এখন দারুণ শান্ত। গোপালপুরে হনিমুনে করতে গিয়ে যেমন সারাক্ষণ নিরুদ্বেগ আরামে শরীরটাকে শিথিল করে রেখেছিল, আজ যেন তার সেই ভাব। একবার অসিতের দিকে চেয়ে সে নীরবে পট থেকে কাপে চা ঢালতে লাগল।

অসিত যথেষ্ট সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করে কথায় বেশ একটু জোর দিয়ে বলল, উঃ হরিবল্! কথাটা কাউকে বলতে পারছি না, একবার ভাবলাম পুলিসে যাই—

লিলি চায়ের কাপ অসিতের দিকে এগিয়ে দিল।

অসিত চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, সেকেনড খটে ভাবলাম সেটা হয়ত ওয়াইজ হবে না। দিজ্ বাসটারডস্ ডোনট ডু দেয়ার ডিউটিজ্ নাউ এ ডেজ অ্যানড উই পে ট্যাকসেস।

অসিত উত্তেজিতভাবে এক হাতে টানা-টানি করে টাইটা খুলতে লাগল। বলল, তা ছাড়া কে জানে পুলিসের ভিতরেও গুণ্ডাদের লোক আছে কিনা? নিশ্চয়ই আছে। না হলে ওদের এত সাহস কোত্থেকে হয়। আমি পুলিসে ডায়েরি করলাম, তারা গাঁট হয়ে বসে রইল, মাঝখান থেকে গুণ্ডারা খবর পেয়ে গেল যে, আমি তাদের কথা অমান্য করেছি, কিংবা খবরের কাগজেই করত, উঃ, ভাবতেই পারছি নে।

লিলি শান্তভাবে বলল, ওরা রোজ খবরের কাগজ পড়ত।

পড়ত। উত্তেজনায় অসিত সোজা হয়ে বসল, আমি তবে ঠিকই ভেবেছিলাম লিলি। আই ওয়াজ কারেকট। আমি জানতাম, ওরা কাগজ পড়বে, পুলিস সোরস থেকে খবর নেবে—

লিলি নির্বিকারভাবে চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগল। সে অবাক হয়ে দেখল, অসিতের উত্তেজনা তাকে অণুমাত্রও স্পর্শ করছে না।

—এমন কি, অসিত এক নিশ্বাসে বলে যেতে লাগল, আমার প্রতিটি মুভমেনট ওরা ক্লোজলি ওয়াচ্ করবে। সর্বত্র ওদের জাল পাতা। তাই আমি অনেক ভেবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, ওরা যা বলল তাই বরং করি। ইটু ওয়াজ এ গ্যামবল্, কিন্তু এ ছাড়া আমার আর কী-ই বা করার ছিল।

বিশ্বাস কর লিলি, অসিত আন্তরিক-ভাবে আবেদন করল, এই সিদ্ধান্তটা নিয়ে আমি স্বস্তি পাইনি। নরকযন্ত্রণা যে কী, এই পাঁচ দিনে আমি টের পেয়েছি। আমি একটা কিছু করতে চাইছিলাম, সামথিং পজিটিভ। কিন্তু একা আমি কী করব, ওয়ান এগেনস্ট সো মেনি, কি করতে পারি? ইটস্ এ বিগ্ র‍্যাকেট।

লিলি তেমনি শান্ত এবং কোমল স্বরে তিনজন ছিল।

—হোয়াট! তি—ন—জ—ন!

বিস্ময়ের প্রচণ্ড ধাক্কায় অসিত একে-বারে হতবাক হয়ে গেল। অস্ফুট স্বরে আবৃত্তি করতে লাগল, তিনজন, মাত্র তিনজন!

লিলি বলল, তেইশ বছরের বেশী কারও বয়েস ছিল না। সব থেকে যে ছোট সে একেবারে দুধের বাচ্চা, বছর উনিশ। সবাই মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, অসিত। পেশাদার গুণ্ডা কেউই নয়।

একটু থেমে লিলি বলল, আমি খাবার রেডি করছি। যাও, অফিসের জামা-কাপড় ছেড়ে এস। ওসব কথা পরে হবে।

॥ তিন ॥

ওরা যে পেশাদার গুণ্ডা নয়, লিলি নিজেও তা প্রথমটায় বুঝতে পারেনি। সেও ভয়ে কুঁকড়ে গিয়েছিল। আকস্মিক আক্রমণে তার আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গিয়েছিল, আর শরীর অবশ, স্নায়ু বিধ্বস্ত। ও যে অসিতের সঙ্গে বেরিয়ে-ছিল, অসিত যে ওর সঙ্গেই ছিল, অসিত যে গুণ্ডাদের সঙ্গে সামান্যমাত্রও ফাইট করেনি, বাধ্য ছেলের মত গুণ্ডাদের হুকুম অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে, ওরা বলল 'ডবল মারচ' তো অসিতও ডবল মারচ করে দিব্যি চলে গেল, তাকে, অসিতের স্ত্রী লিলিকে, গুণ্ডাদের হাতে সমর্পণ করে, সেদিন কিন্তু সেই তখন এত কিছু তার

মনেই হয় নি। ভয়ে সে চোখ বুজেই ছিল সারাক্ষণ।

গাড়িটায় স্টার্ট দিয়ে দুজন ওকে সামনের সিট থেকে শূন্যে তুলে বাণ্ডিলের মত পিছনের সিটে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর দুজন সেই সিটে তাকে ঠেসে ধরে বসে থাকল। ওরা যে দারুণ উত্তেজিত সেটা ওরা প্রাণপণে চেপে রাখবার চেষ্টা করছিল।

সেই আবছা অন্ধকারে গাড়িটা যেই চলতে আরম্ভ করেছে, একখানা মুখ তার মুখের উপর নেমে আসছে লিলি চোখ বুজে থেকেও তা টের পেল। সে শিউরে উঠল। শরীর গলগল করে ঘামতে লাগল। পিঠ, কোমর, তলপেটে খিচুনি শুরু হল। মাসিক হবার অব্যবহিত আগে যেরকম অব্যক্ত অস্বস্তি তাকে পীড়িত করে তোলে, তেমনি এক পীড়া তাকে কাবু করে ফেলতে লাগল।

আততায়ী মুখটা মন্দ্রস্বরে লিলিকে বলল, পারতপক্ষে খুনখারাপির ঝামেলায় আমরা জড়িয়ে পড়তে চাইনে। কোনও-রকম আওয়াজ দিও না। যা বলব করে যাবে। তা হলে তোমার ড্যামেজ কম হবে।

—কেন গুরু, দিদিমণিকে ফল্‌স্ দিচ্ছ? লিলির পায়ের কাছ থেকে একটা চড়া আওয়াজ ভেসে এল।

ড্রাইভারের সিট থেকে আওয়াজ এল, থাপরি মাল হাতে পেয়েছে তো, গুরু তাই একটু সফ্‌ট্ দিচ্ছে।

চড়া আওয়াজ বলল, ফুল ফিটিংস্-এ যদি বাড়ি পৌঁছুতে চাও দিদিমণি, একদম আওয়াজ দেবে না। আওয়াজ দিয়েছ কি, তোমার বডিটা আর এক কিস্তিতে বাড়ি পৌঁছুবে না। ওই চামরি বডির ফিটিংস খুলে খুলে পারসেলে করে বাড়ি পাঠিয়ে দেব। মেল মেমবার এতক্ষণে ট্যাকসি করে বাড়ি পৌঁছে কফি খাচ্ছে বোধ হয়। কি বলিস?

—ধুস্, মাল চিনলি নি, ড্রাইভার বলল, ও শালা মিলিটারির বাচ্চা। ডবল মারচের হুকুম পেয়েছে তো, ডবল মারচ করেই বাড়ি ফিরবে। বেট্?

—শালা যে চুব্য নয়, কি গ্যারানটি? ডলি করে দিলেই কিচিং চুকে যেত। তা নয় শালাকে থামকা ছেড়ে দিলি। শালা কেবলু সেজে চুক্কি দিয়ে কেটে গেল, হয়ত বেটনবাবুর কাছে গিয়ে ডায়েরি লেখাচ্ছে এতক্ষণ।

ড্রাইভার বলল, এ জ্যানের গুঁজিয়াটাকে এই লাইনে কেন টেনে আনলে গুরু? করছিলি তো ভাতিবাজি, তাই নিয়ে পড়ে থাকলেই পারতিস। এই লাইনে আসার শখ গেল কেন? যত্তো বাজে ডম্পর।

—আমি ভাতিবাজি করি আর তুমি সাধু গদাধর, কেমন? তোমার সেই শুঁক্কিটাকে তুমি লিমপু দাও না? বাতেলা ছোড়ো ইয়ার। কি গুরু, আওয়াজ ছাড়ছ না যে।

গুরু মন্দ্রস্বরে বলে উঠল, নে শালারা, দোগলাবাজি রাখ।

ড্রাইভার জিভ দিয়ে জোরে চ্যাক্ করে এক আওয়াজ ছেড়ে বলল, কোথায় থাপ খুলেছ শিবাজী, এ যে পলাশীর প্রান্তর।

তারপর অ্যাকসিলেটারে চাপ দিয়ে তীব্র গতিতে গাড়ি ছুটিয়ে বলল, তেল ফুল ট্যাংকি গুরু, কোথায় যাব বল?

—রেড রোড।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঝড়ের বেগে গাড়িটা লোয়ার সারকুলার রোড দিয়ে রেড রোডে এসে পড়ল।

—রেড রোড, গুরু?

—সিধা। টপ স্পিড।

—সত্তর চলছে গুরু?

—বাড়িয়ে যা।

—আশি গুরু?

—বাড়িয়ে যা।

—নব্বই গুরু?

—ঠেকিয়ে দে।

—চল রে ময়ূরপঙ্খি, উড়ান দিয়ে চল।

অ্যাকসিলেটারে পুরো চাপ পড়তেই গাড়ি যেন শূন্যে উড়ে চলল।

গাড়ির স্পিড বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লিলি লক্ষ করল, ওদের তিনজনের উত্তেজনা চরমে উঠছে। লিলির ভয় করতে লাগল। গলা শুকিয়ে আসতে লাগল। একটা অ্যাকসিডেনট হলে কাউকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এরা শুধু খুনে নয়, উন্মাদ, বদ্ধ উন্মাদ।

পারক স্ট্রিটের আইল্যানডটা যেভাবে এড়িয়ে গেল, গাড়িটা যেভাবে টাল খেয়ে ছুটল তাতে এখনও যে বেঁচে আছে লিলি, সেটাই তার কাছে আশ্চর্য বোধ হতে লাগল। আরও আশ্চর্য, ওরা তিনজন শিস দিয়ে সুর ভাঁজতে লেগেছে।

একটা শিস থামল।

—রেড রোড খতম, গুরু।

শিস শুরু হল।

আরেকটা শিস থামল।

—বাঁয়ে চল।
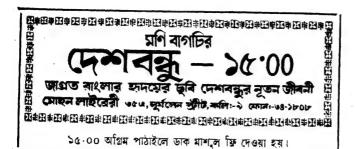
শিস শুরু হল। গাড়ি বাঁয়ে চলল উড়ে।

আবার একটা শিস থামল।

—স্ট্র্যানড রোড, গুরু।

শিস আবার কোরাসে মিশল।

কিছুক্ষণ পরে আবার আরেকটা শিস থামল।

—বাঁয়ে।

আবার শিসটা কোরাসে মিশল।

গাড়ির সেই ক্ষ্যাপার মত গতি, তিনটি শিসের সেই ঐকতান সংগীত, অপরিসীম ভয়, দারুণ শ্রান্তি লিলির সময়জ্ঞানকে ধীরে ধীরে চেতনা থেকে মুছে দিল। ওরা যেন অনন্তকাল ধরে এইভাবে উন্মাদের মত পাক খেতে লাগল; লোয়ার সারকুলার রোড, রেড রোড, স্ট্র্যানড, হেস্টিংস, লোয়ার সারকুলার রোড, রেড রোড, স্ট্র্যানড, হেস্টিংস, লোয়ার সারকুলার রোড, বাঁয়ে চল, রেড রোড, বাঁয়ে চল, স্ট্র্যানড, বাঁয়ে চল, হেস্টিংস, সোজা চল, লোয়ার সারকুলার রোড, বাঁয়ে চল, শিসের ঐকতান, রেড রোড, শিসের ঐকতান, বাঁয়ে চল, শিসের ঐকতান, স্ট্র্যানড, শিসের ঐকতান, বাঁয়ে চল, শিসের ঐকতান, হেস্টিংস, শিসের ঐকতান, সোজা চল, শিসের ঐকতান, লোয়ার সারকুলার রোড, শিসের ঐকতান, আলো, শিসের ঐকতান, অন্ধকার, শিসের ঐকতান, আলো, বাঁয়ে চল, শিসের ঐকতান, আলো, শিসের ঐকতান, আলো, শিসের ঐকতান, আলো, শিসের ঐকতান, বাঁয়ে চল, শিসের ঐকতান, অন্ধকার, শিসের ঐকতান, অন্ধকার, শিসের ঐকতান, অন্ধকার, শিসের ঐকতান, অন্ধকার, শিসের ঐকতান, আলো শিসের ঐকতান আলো শিসের ঐকতান আলো আলো আলো শিসের ঐকতান অন্ধকার আলো আলো বাঁয়ে চল আলো আলো শিসের ঐকতান বাঁয়ে চল অন্ধকার অন্ধকার আলো আলো বাঁয়ে চল আলো অন্ধকার অন্ধকার আলো শিসের ঐকতান অন্ধকার আলো অন্ধকা—

—এই এই ব্রেক ব্রেক!

ক্যা-অ্যা-অ্যা-চ্! আকস্মিক ব্রেকের প্রচণ্ড ধাক্কায় গাড়িটা বোঁ বোঁ করে রাস্তার উপর চরকির মত ঘুরপাক খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। হুমড়ি খেয়ে এ ওর গায়ের উপর ছিটকে পড়ল। লিলি ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল। তার বুক ফেটে যাবে, এমনভাবে ধুকপুক করছে। কোমর পেটে শিরদাঁড়ায় অসহ্য খিঁচুনি। ভয়ে ওর পেচ্ছাবের বেগ বার-বার ঠেলা দিয়ে উঠতে লাগল। গলা শুকিয়ে কাঠ। সর্বশরীরে ঘামের বন্যা বইছে। ওদের সামনে দিয়ে বাঁশ বোঝাই একটা গরুর গাড়ি খিদিরপুরের দিক থেকে ট্রাম লাইনের সমান্তরাল রাস্তা ধরে মন্থর গতিতে এসপ্লানেডের দিকে চলে গেল। ওরা চট করে সামলে নিল নিজেদের।

গুরু বলল, সাব্বাস! দিদিমণি একটু ভেবড়ে গেছে। কি ভয় বাব্বা!

খিদিরপুরের দিক থেকে একটা পুলিশ ভ্যান আসছে দেখা গেল। চট করে গাড়িটায় স্টারট দিয়ে ওরা টপ স্পিডে লোয়ার সারকুলার রোডে ঢুকে পড়ল।

ড্রাইভার বলল, মামুর গাড়ি! ফলো করছে মনে হচ্ছে।

—দিক যত খুশি। তুই কাটিয়ে চল। কত আর ঘুরাবি। এবার সিধা প্যালেস।

ওদের মধ্যে আবার একটা চাপা উত্তেজনার ভাব দেখা গেল। মনে হল, ওদের ফুর্তি আবার উথলে উঠল। আবার শুরু হল শিসের ঐকতান।

মন্দস্বরে গুরু গেয়ে উঠল, ও জান না কি, পিছনে তোমার রয়েছে রাজার চর?

ড্রাইভার জবাব দিল, জানি জানি, তাই তো আমি চলেছি দেশান্তর।

এবং ওরা ভুল গায়, এ-কথা সেই বিপন্ন অবস্থাতেও লিলির মনে হল। মাঝে মাঝে সে সত্যিই গুণ্ডার পাল্লায় পড়েছে কিনা, নাকি কোনও সিনেমা দেখছে, নাকি নিজের ঘরের নিরাপদ বিছানাতেই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এই ধরনের বিকট এক দুঃস্বপ্ন দেখছে, এমন একটা ভ্রম তার হতে লাগল।

ওরা পেশাদার গুণ্ডা হোক বা না হোক, হিংস্রতায় বা নৃশংসতায় ওরাও যে কিছু কম ছিল না, লিলি তার লাঞ্ছনার অভিজ্ঞতা থেকেই সে কথা বুঝে গিয়েছিল।

অসিত যখন ফিটফাট হয়ে খাবার টেবিলে এসে বসল, তাকে দেখে লিলির মনে হল, সত্যিই সে মানসিক যন্ত্রণার হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছে। সে এরই মধ্যে আবার একবার কামিয়ে চান করে নিয়েছে। বিলিতী আফটার-শেভ লোশনের সুন্দর গন্ধটা ওর গাল থেকে ঘরময় কেমন ছড়িয়ে পড়ছে। ওর চোখে মুখে একটা আত্মতৃপ্তিজনিত সুখ-সুখ ভাব উঁকি মারছে।

লিলির হঠাৎ ইচ্ছা হল ওকে জিজ্ঞাসা করে, অসিত সেদিন সত্যিই হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরেছিল, নাকি পার্কটা পার হয়েই দৌড় মেরেছিল? নাকি ট্যাক্সি চেপেই এসেছিল?

[ক্রমশ]

শ্রীচরণেষু—মাকে ॥ আট ॥

[ক]

কিছু তুমি ক্রমে ক্রমে আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছিলে। আজ মনে হয়, দিচ্ছিলে ইচ্ছা করে। এক-একটা সময় আসে যখন বেঁচে থাকাটাকে মনে হয় একটা বুদ্বুদ, ফুঁ দিলেই ফটাস। তাতে কিছু যায় আসে না, কারও না, যে যায় তারও না, কারণ বুদ্বুদটার মানে নেই, বরং ওই অর্থহীনতাকে টিঁকিয়ে রাখাটাই যন্ত্রণা। যেন অনেক কষ্ট করে কষা অংকটার পাশে মাস্টারমশাই ঢ্যাড়া এঁকে দিলেন, বসিয়ে দিলেন একটা গোল্লা।

তোমার মুখেও ফিকফিকে সাদা একটা ছায়া পড়তে দেখছি, শুকনো ঘায়ের উপরে নতুন চামড়ার আস্তর পড়লে দেখায় যেমন। লক্ষ করেছি ভালো করে খাচ্ছ না, গাঙ্গুলিবাড়ির পিসীমা বলতেন, ‘তোমার এত অরুচি! ওষুধ আনিয়ে খাও।’ ওষুধ আনা হত, তুমি খেতে না; দু’চার গ্রাস মুখে যা তুলেছ সে শুধু আমার খাতিরে।

ও-বাড়ির পিসীমার মত মত্যো সত্যি-সত্যি আমি বিশ্বাস করিনি যে, তোমাকে কিছুতে ভর করেছে, ওঝা-টোঝা ডাকা এক-দম বাড়াবাড়ি, তা-ছাড়া ঝাড়াঝাড়ির গল্প-টল্প যা শুনেছি, এই শরীরে তোমার সহ্য হবে না। তবু জল-পড়া এনে দিলাম, পিসীমার কথামত একদিন বড়বাড়ির মন্দিরের পিছনে গিয়ে এক টুকরো নুড়ি বেঁধে দিয়ে এলাম। ওদিকটায় ঝোপঝাড় ফণিমনসা, সাপখোপ শেয়াল, যাদের কটা চোখ জ্বলজ্বল করে, ধূর্ত-ধূসর নেউল, তা-ছাড়া এখানে ওখানে লুকোনো বিছুটি, গাছি পায়ে গেলে চুলকোয়, জ্বালা করে, তবু তোমার জন্যে কোথায় না যেতে পারি, পাশের বাড়ির পিসীমা শিখিয়ে দিয়েছিল মানত করতে, কী-ভাবে তা করে আমি কি জানতাম, মাথায় হাত ঠেকিয়ে ঠাকুরকে বলা ‘মাকে সারিয়ে দাও’, এই তো! শুধুমাত্র বলা না হলে কি পাপ হবে, হয় হোক গে, হলে তো আমার হবে, কিন্তু মা যেন যা ছিল আবার তা-ই হয়ে যায়।

মানত করে ফিরছি, সন্ধ্যা লেগেছে কি লাগেনি, ঘরে ঢুকতে যেতেই এ কী, খোলা চুল একেবারে ছড়ানো, চৌকাঠের ঠিক ওপাশে তুমি চিত হয়ে পড়ে, কাপড়চোপড় এলোমেলো, মা, তোমার বুকটাও যে ওঠা-পড়া করছে না!

ভীষণ চিৎকার করে আমিও উবুড় হয়ে পড়েছি তোমার বুকের উপরে, ফুঁ দিচ্ছি, জলের গ্লাস কাত করে তোমার চোখে ঝাপটা। এ-সব করতে কে বলে দিল জানিনে, হয়ত ফিটের ব্যাপারে সাড় ফেরাতে এইসব করে কোথাও দেখে থাকব, সেই জ্ঞান উপরে ছিল না, হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে তলা থেকে মাথা ঠেলে উঠে এল। ভর করেছে? সেইটেই তবে বোধহয় ঠিক, নইলে সর্‌সর্‌ সর্‌সর্‌ চার পাশে শুনছি কেন, ঝিঁঝি পোকারা একসঙ্গে ডেকে উঠেছে, বাইরে নয়, আমার মাথার মধ্যে, নারকেল গাছটার ছায়া প্রকাণ্ড কচ্ছপের মত মুখ নেড়ে এগিয়ে আসছে, তোমাকে ঢেকে দেবে, ওঠো, বলছি এক্ষুনি উঠে পড়ো! নইলে আমিও ঠিক তোমার পাশে ফিট হয়ে পড়ে যাব।

কত পরে, কত পরে দেখলাম যে, তুমি চোখ মেলছ? একটা হাত কাত হয়ে পড়ল আমার কপালে, চোখের ইসারায় তুমি আমাকে উঠে বসতে বলছ। চোখেরই ইসারা বুঝে গ্লাসে নতুন করে জল ভরে তোমাকে দিলাম, তোমার হাত কাঁপছে কিন্তু ঢক্‌ঢক্‌ করে এক চুমুকে সবটা শেষ করে দিলে।

“ওখানে স্বর্ণসিন্দুর আছে, খলটাও আছে, মেড়ে এনে দিতে পারবি?” জেগে উঠে সেই তোমার প্রথম কণ্ঠস্বর। পারব না! তুমি ফিরে এলে, কোথায় না কোথায় তলিয়ে গিয়েছিলে, পুকুরঘাটে মাঝে মাঝে যেমন ডুব দাও, অনেকক্ষণ আর মাথা তোলো না, জলের নীচে আমি তোমার গোল হয়ে ফুলে-ফেঁপে ওঠা কাপড়ের আভাস দেখি, উঠছ না এখনও উঠছ না কেন, ডুব দিয়ে তুমি কি তুলে আনতে চাও তলাকার মাটি, কিন্তু তলায় যে অনেক শ্যাওলা, ওর মধ্যে জড়িয়ে গেলে তুমি আর উঠবে না। হাতে তোমারই শুকনো একটা কাপড়, বদলে যেটা পরার কথা, সেই পাকিছত কাপড়টা হাতে নিয়ে আমি কাঁপতে থাকি।

সেই ডুব দিয়ে ভয় পাওয়ানোর মজার খেলাটাই অন্যভাবে আজ তুমি খেললে নাকি, খেলেছ বেশ করেছ, এখন তুমি ক্লান্ত, তোমার মুখে গাঁজলা, হাপরের মত শ্বাস

নিচ্ছ, কিন্তু ফিরে তো এসেছ! তুমি পেরেছ ফিরে আসতে, আর আমি সামান্য একটু স্বর্ণসিন্দুর খলে করে মেড়ে আনা, এটুকুও পারব না? ঘরের কাজে আমি আনাড়ি, ঠিক, কিন্তু এক-একটা বিপাক আমাকে কাজ শিখিয়ে দিচ্ছে, এক-একটা ঘটনা ধাক্কা দিয়ে দিয়ে আমাকে দিচ্ছে বড় করে। ইস্কুলে একবার এক ভেলকিওয়ালার হাতের ঢেউয়ের মত ওঠানামায় যেমন একটা টবের চারাগাছকে তরতর করে বেড়ে উঠতে দেখেছি।

আমি বড় হচ্ছি। এবার রথের মেলায় একদিনও যাইনি, না-গিয়ে থাকতে পারলাম, দেখলে না?

বড় হয়েও হঠাৎ-হঠাৎ বোকা-বোকা এক-একটা কথা বলে ফেলার স্বভাবটা কিন্তু আমার গেল না। এই সেদিনই তো তুমি খল থেকে স্বর্ণসিন্দুরটা চেটে চেটে খাবার পরে আমি ওরা যেন শুনতে না পায় এমনি গলায় বললাম, "মা, ওরা জ্বর করল কেন। দাদা আসছে বলে ছিলে? সইতে পারছে না?"

তুমি হেসেছ; মনে পড়ছে সে-হাসি পাণ্ডুর, মধুর, মৃত্যুরই মতো। খলটা নামিয়ে রেখে বলেছ, "আমি বোধহয় এবার আর বাঁচব না রে। সে আসবে না, আমাকেই বুঝি নিয়ে যাবে।"

তোমার মুখে হাত-চাপা দিয়ে বলেছি, "চুপ, চুপ বলছি। চুপ করো", আর হাত সরিয়ে তুমি, "কিন্তু আমার মন যে কেবলই তাই বলছে। নইলে কোনও বার তো এরকম হয় না! শরীর একেবারে ভাঙা, এই মূর্ছা যাওয়া, ভয়ভয় রোগ!"

"চুপ করলে না তুমি? এক্ষুনি যদি যদি না থামো, ওসব বাজে অলক্ষুণে কথা বলে চল, তবে আমি খাবো না, শোবো না, এই রাত্তিরে শ্যাওড়া গাছটার নীচে গিয়ে দাঁড়াব, তারপর ভূত-পেত্নী সব নেমে আসুক, আসুক না, আমি কেয়ার করি না। তুমি তো তা-ই চাইছ?"

বসে বসেই, হাতে ভর দিয়ে, আরও কাছে এসেছ তুমি।—"সত্যি বলছি, সত্যি, ওই দ্যাখ টিকটিকিটা ডেকে উঠল। বল্ না, কী হবে যদি মরে যাই!"

তার মানে দাদার কাছেই যেতে চাও, আমি তোমার কেউ না, অভিমানে ফোলা ঠোঁট, টসটসে চোখে এইসব কথা, শব্দ করে নয়, যেন লেখা হয়ে যাচ্ছিল। আমার পিঠে হাত রেখেছ তুমি, চাই না, চাই না ওই আদর, সরিয়ে নাও, সরে যাও—যাও এক্ষুনি।

হাত বুলিয়ে তবু বলছিলে, সে কি আমাকে আরও কষ্ট দিতে, না নিজের কষ্ট ঢাকতে? বলছিলে "মরে যাই-ই যদি, ভগবান যদি টেনেই নেন, তবে তোর আর কী (না আমার কিছু না), তোর বাবা এসে তোকে নিয়ে যাবে, লেখাপড়া শিখবি, বড় হবি, তোর টুকটুকে একটা বউ হবে (বউ, বউ, তোমাকে বাদ দিয়ে; কিন্তু তোমারই মত মিষ্টি আর-একজনের ছবি তুমি তখন থেকেই তৈরী করে দিচ্ছিলে, দ্বিতীয় একটি অনুভূতি; তখনও কামনা না, শুধু সুন্দর একটি কল্পনা), তখন, তখন আমাকে ভুলে যাবি তো?

"গেলি তো গেলি", তখন তুমি সামলে উঠে হালকা গলায় হাসতেও পারছ, ঠাট্টা দিয়ে শরীর-মনের ব্যথার উপরে চাদর টেনে দেওয়া—"গেলি তো গেলি, আমি তখন কোথায়, দেখতে তো আসব না! দেখি, মুখখানা দেখি। উহুঁ, একটু-একটু মনে পড়বে, না রে? মাঝে মাঝে। কী মনে

পড়বে, একটা মা ছিল, সেই তোর গল্পের বইয়ের দরোয়ানী, ঘুটেকুড়ুনি যে খালি সকলকে দুঃখই দিয়ে গেল, জ্বালাল সব্বাইকে, তোকে, তোর বাবাকে—সুধীর মামাকে, জ্বালালো, নিজেও জ্বলে-পুড়ে শেষ হল (মিথ্যে, মিথ্যে, আমার কিছু মনে পড়বে না)।

"মনে পড়বে রে, পড়বে। যে তোকে ভালো করে খেতে দিত না, কেমন? তোকে চুলের মুঠি ধরে মারত, কেমন? শীতের দিনেও জোর করে ধরে নাওয়াত, মাছের কাঁটা ঠিকমত বেছে দিত না বলে গলায় কাঁটা ফুটত, আর কী-কী, সব এই বেলাবেলিই বলে দে, জেনে যাই, তখন তো আর জানব না! এই! চোখ মোছ বলছি, দেখিসনি তোর বাবা কেমন চলে-ফেরে গটগট করে, তার ছেলে হয়ে তুই ছিচকাঁদুনি, ছি, তোকেই দেখছি বউ সাজিয়ে বিয়ে দিতে হবে, নাকে নোলক, মাথায় ঘোমটা, দেখি দেখি কেমন মানাবে" (খবরদার বলছি, তোমার আঁচল আমার মাথায় ফেলতে দিয়ে ঘোমটা বানাতে এসো না)।

লাফ দিয়ে সরে গেছি, দরজায় পিঠ দিয়ে আঙুল তুলে তোমাকে শাসাচ্ছি, কাঁদছি কোথায়, এই মিথ্যেবাদী, তোমার চোখের দুষ্টুমির খানিকটা আমার চোখে ভর নিয়ে এই তো আমিও হেসে উঠেছি, দেখছ না?

[খ]

দোক্তা পাতাগুলো হাতে নিয়ে সে বলল, "এই শেষ, তোকে আর বোধ হয় আমার জন্যে দোকানে ছুটোছুটি করতে হবে না।"

"ছেড়ে দেবেন?"

খিলখিল হেসে সে বলল, "এই জায়গাটাই ছেড়ে যাব। এখানে আর টেঁকা যাচ্ছে না।"

তার মানে বলছে, ও চলে যাবে, তার মানে কি যা ছিল ফের ঠিক তেমনই হবে? আমার ভিতরটা লাফাচ্ছিল, তার কতটা সত্যি-সত্যি আহ্লাদে, কতটা একটু মুষড়ে পড়ে, তোমাকে বোঝাতে পারব না। এখন কিন্তু বেশ বুঝি, আমার একটা ভাগ খুশী হয়েছিল নিশ্চয়, যে মনে মনে চাইত কিনা যে 'চলে যাক, ও চলে যাক', তোমার সেই কাটাকাটা কথার ছিটে আমার সেই ভাগটার গায়েও লেগেছিল, তাই "ও চলে গেলেই সুধীরমামা আবার আমাদের হবে" এই আশাটার উপরে মন উড়ে উড়ে গিয়ে পড়ছিল, পায়রা পাখি বারে বারে এই চালে এই খোপে ঢুকে ডিমের উপর পাখা ছড়িয়ে যেমন বসে। (এটাও সেই বয়সের আর-একটা বোকামি, প্রকৃতিতে যা দেখি, জীবনেও তাই প্রার্থনা করা; কুয়াশা কাটলে যেমন গাছপালা আবার স্পষ্ট, ঢল নেমে গেলে মাঠ-ক্ষেত-দাওয়া যে-কে-সেই, বৃষ্টি থামল তো আকাশ আবার রোদ্দুরে পৈঠে হল, তেমনই, সব তেমনই। একটা কিছু ঘটে কিছু-কিছু অন্য রকম করে দেয়, সে সরে যাক, অমনই দেখবে চেনা ব্যাপারগুলো তাদের পুরনো চেহারা ফিরে পাবে। পরে দেখে দেখে বুঝেছি, জীবনে তা হয় না, অনেক জিনিস আছে যা যায় তা চলেই যায়, জোড়া আর লাগে না একবার যদি ভেঙে যায়। ধাক্কা খেয়ে যে-স্রোত নেমে গেছে নীচের দিকে সে আর কখনো পিছনের পাড়ে ফিরে আসবে না। একটা ভাগ তবু চাইছিল ও চলে যাক, এত কিছু পাবার আছে মন তখন জানত না তো, জানত না, পেতে পেতে আর হারাতে হারাতে জীবনে চলতে হয়; তাই যা ছিল তার সবটুকুকে সেদিন সে আঁকড়ে রাখতে চাইত, যা ভাঙছে তাকে জোড়া দেবে কী করে ভেবে ভেবে ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে পড়ত)।

আর-একটা ভাগ, যা তোমাকে বলিনি, আমারই মনের আর একটা ভাগ, অন্য একটা মজা পেয়েছিল যে, সে বলছিল, থাকুক না ও, কী আসে যায়, ওই যে দোক্তাপাতা আনা, চুলের ফিতে কেনা, লেবু-চিনির সরবত, মুখের সামনে ঝুলিয়ে দেওয়া নিমুনি, এ-সব কিছুরই একটা আলাদা স্বাদ, বড় হলে এরই নাম দেওয়া যেত নেশা, অবচেতন একটা আসক্তি। অবচেতন, কারণ শরীরের আঁটসাট গড়নে তোমার সঙ্গে তার যে-তফাত, সেটা ওই বয়সে সজ্ঞানে সে ধরতে পারে নি। আহা, সেই ভাগ, যে চপল, যে লোভী, সে জানে না কেন যে, অন্য রকম লাগে কেন। উচিত, অনুচিত? ভালো, মন্দ? এ-সব বাছবিচার টনটনে বয়সেই হয় না, আর তখন তো চোখ না ফোটা পাখির বাচ্চা, অন্ধ। (অন্ধ অনায়াসে প্রবেশ করে অন্ধকারে, মানুষের গভীর দার্শনিক উপলব্ধিও এই কথা বলেছে, পরে পড়েছি। আলোকের সীমা ছেড়ে সে যে তমসায় চলে গেল তা কি অনুভব করে?) পায়েসের পাত্রটি আছেই, থাক, তবু ঝোঁক যায় আচারের বয়মের দিকেও। তোমার সঙ্গে আমার এই দ্বিতীয় অংশের একটা আলো-আঁধারি লুকোচুরি চলছিল।

দ্যাখো মা, ধারাবিবরণীকে খানিকক্ষণ "তিষ্ঠ" বলে তোমাকে অকপটে সাফসাফ কয়েকটা কথা এখনই বলে ফেলি, পরে, যখন জীবনের জটিলতর অধ্যায়ে প্রবেশ করব, তখন কাজটা সহজ হবে। হাঁ, যে লুকোচুরিটার কথা বলছিলাম, ওটা সকলেরই থাকে, গোচরে বা অগোচরে, প্রীতি-অপ্রীতি,

অনুভূতির নানা স্তরে। সবচেয়ে বড়ো একটিমাত্র মনোহারী দোকান থেকেও তো সব জিনিস কেনা যায় না, সর্বোত্তম বা সর্বোত্তমাকে দিয়েও সব চাহিদা চিরতরে মেটে না। প্রত্যেক মানুষ, নর কিংবা নারী, এর খানিকটা গ্রহণ করে, ওর খানিকটা, ভিতরের-বাইরের, স্থূল-সূক্ষ্ম বিবিধ প্রয়োজন পূরণের জন্য, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, অসংখ্য ব্যক্তির জন্য স্থান আছে। তা ছাড়া কেউ গতকালের, কেউ আজকের, কেউ আগামীকালের। প্রিয়তমাকে পাশে বসিয়েও পটপটিয়সীর অভিনয়-নৈপুণ্যের, এমন-কী শারীর রেখা-টেখারও তারিফ করাতে কারও বাধে না; অতি বিশ্বস্ত কুলবতীও তুখোড় খেলোয়াড়ের চাতুর্যে, পটু নটের মাধুর্যে, অস্ফুট হর্ষধ্বনি করে ওঠেন, জননায়কের নিমেষ-দর্শনের আশায় কুতূহলী বাতায়নে দাঁড়ান। মনের মৌচাকে আলাদা আলাদা সব খোপ আছে, নির্জ্ঞানে যাই থাক, সজ্ঞানে কোনোটার সঙ্গে কোনোটার বিরোধ নেই, অদ্ভুত এক সন্ধি আর সমন্বয়, রক্তপাত নেই, অশ্রুও না, দিব্য এক শান্তি; কিন্তু খোপে খোপে যদি কখনও একাকার সেই অঘটনও ঘটে, প্রায়ই ঘটতে চায়, তখনই

বিপত্তি, তাতে সেই চমৎকার সামঞ্জস্য, তখনই অশ্রু, রক্ত, এমন-কী প্রাণপাত। তার চেয়ে অগোচর মন যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দেয়, তার কোনও লেখাপড়া থাকে না বটে, কিন্তু সেটাই নির্ঝঞ্ঝাট, কেন না তার অনেকটাই যে মা-জেনে। মা, তুমিও তো মা জেনেই এমনই কয়েকটা খোপ তৈরী করে নিয়েছিলে?—কোনোটা আমার, কোনোটা বাবার, কোনোটা সুধীর মামার। সুধীর মামার—তাঁর পূর্ব-পর্বের কথা বলছি—নীরক্ত-নিরাসক্ত নিষ্পত্র মা-ফলেষু ঋজুতাকে শ্রদ্ধা করেছ, তাই বলে বাবার প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বকেও প্রতিহত করার বেড়াও তোমার শক্ত ছিল না, তদুপরি ভগবানেও ভক্তি ছিল খাঁটি আর অচলা, দ্যাখো, মন কেমন ভার-সাম্যের বাঁধা তার, একের পর এক ভর সয়েও টানটান থাকে, কেউ হেলে যায়, কেউ টলে পড়ে, কিন্তু পড়বেই যে এমন কোনও কথা নেই। মা, এতদিন পরে আমার সেদিনকার দ্বিমুখী টানের এই সাফাই; আমার, অর্থাৎ আমার একাংশের। অন্য ভাগের কথা আগেই বলেছি।

এইবার খেই ধরে যা বলছিলাম, সেই বিবরণে ফিরে আসি।

[গ]

সে বলছিল, "এখানে আর থাকা যাবে না, ছেড়ে যাব। রোজ ঢিল পড়ছে, উঠোনে, টিনের ছাদে। সাঁঝের আঁধারে টিউ-কলের পাশের গাছটায় কারা চড়ে বসে।"

"ভূত?"

সে হাসল। "ভূত ঠিকই তবে মানুষ-ভূত।" বলতে বলতে সে কৌটো খুলে টপ্ করে একটা লেবেঞ্চুস গালে ফেলল, একটা আমার মুখে গুঁজে দিল, একটু টক, একটু মিষ্টি, একই সঙ্গে দুরকম। তা-ছাড়া সে আঁচলটার খানিক খুলে উড়িয়ে উড়িয়ে নিজেকে বাতাস করছিল। আমাকে অবাক দেখে তাকাল যেন কেমন একটু করে, রেগে গেলে তুমি যেমন চোখ সরু আর ছুঁচলো করো, কতকটা তেমনই, তবে সে করছিল কৌতুকে। বলল, "থাকিই না একটুখানি এমনি, যা গরম! তোর সুধীর-মামা তো আর দেখছে না।"

তা ঠিক। সুধীরমামা যখন নেই, তখনই যাওয়াটা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল আমার অভ্যাসে। দেখা না হতে হতে ক্রমে এসে গেল একটা আড়ষ্টতা, মনে হত মুখোমুখি হলেই সর্বনাশ, কী বলব, কোথা দিয়ে পালাব? সুধীরমামাও নিশ্চয় জানতেন আমি যাই-আসি। উনিও কি চাইতেন আমাকে এড়াতে?

সে বলছিল "ওই গাছটায় ওরা চড়ে বসে, কলতলায় উঁকি মারে ভেবে দ্যাখ তখন হয়ত আমার গায়ে কাপড় নেই। পরশু যাত্রা শুনতে গিয়েছিলাম, ও একটু এগিয়ে পড়েছিল, কারা আমার পিছু নিল। ধপ্ ধপ্, ধপ্ ধপ্ পায়ের শব্দ, বাপ্ রে ভাবলেও এখন বুক ধপধপ করে। শুনিয়ে শুনিয়ে কী শিস্ আর কত বাহারের গান! বাড়ির কাছাকাছি আসতে একেবারে যা-হয়-তা-হবে বলে তো একটা দৌড় দিলাম। খিল তুলে দিয়েছি, তবু কাঁপছি। ওরা জানালার বাইরে দিয়ে যেতে যেতে, হাড়-হাভাতের দল, জোরে জোরে বলে গেল, 'তুমি ওকে গুণ করেছ, তোমার ভাগ আমরা চাই'—তুই এ-সব সাটমারা কথার মানে বুঝিস?"

আলগোছ খোঁপাটাকে হঠাৎ সে খুলে দিল, ঘামাচি নেই তবু যে যেন কণ্ঠার হাড়ের ঠিক নীচটা চুলকোচ্ছিল!—"তোর সুধীরমামাকে বললাম সব। ও কেমন মেনিমুখো জানিস তো, একদিন মজা করে কলপের শিশিটা লুকিয়ে রেখেছিলাম, কী দুর্দশা বেচারার! পরদিন চুলগুলো সব নতুন-ওঠা আমের-পাতার মতো তামাটে, সে যা ছিরি হল, যদি একবার দেখতিস্! ঘুরে ঘুরে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে, 'দাও দাও' বলে আমাকে সাধাসাধি আর-কী, ওই যাত্রায় কেষ্ট রাধার কাছে হাঁটু মুড়ে যেমন করছিল। যাক, এমন যে মেনিমুখো, ও-ও কিন্তু সব শুনে বলল, 'ভামতী, আমরা এখানে থাকব না।'"

ভামতী, ওর নাম ভামতী। আমাকে ভামী-মাসি বলে ডাকতে বলত।

ছোট্ট ছোট্ট হাই তুলে সে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাওয়া নাড়ছিল, ঘাটে বসে হাত দিয়ে ছোট ছোট ঢেউ তুলে জল নাড়ার মতো। বলছিল, "এখানে কাচারির কাজটা অবিশ্যি ভালোই ছিল, ছুটিই তো দেখি বেশি, তা-ছাড়া আগে নাকি ডেকে ডেকে ছেলে পড়াত, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর পাগলামিটা ঘুচেছে ভালোই হয়েছে। যাক গে, ব্যাটা ছেলে, লেখাপড়াও শিখেছে, অন্য জায়গায় গিয়েও চালিয়ে নিতে পারবে, দুটো তো পেট মোটে! না পারে তো আমার কী, আগে যেখানে ছিলাম সেখানেই ফিরে যাব।"

"ফিরে যাবেন, সুধীরমামার কাছে থাকবেন না?"

"না রাখতে পারে যদি, কী করা। এখানে পাজী লোকেরা পিছু নিয়েছে, শিস দিচ্ছে ঢিল ছুঁড়ছে, হ্যাঁরে, ও যে বলে ঢিল যারা ছোড়ে তাদের মধ্যে ইসকুলেরও গোটা কয়েক ছেলেও আছে?"

"হবে।" আমি বললাম।

"একদিন হেডমাসটারকে বলবে বলে বেরোলো। কিন্তু ফিরে এল মুখ চুন করে। বল্ তো কেন? আগে খেয়াল করে নি, খানিকটা যেতে টের পেল, বলবে কী, তা হলে আমি যে কে, তা-ও তো বলতে হয়, তা-হলে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে আসে যে!" সে, যার নাম ভামতী, একটু আগে যে-আঁচল হয়েছিল তার হাতপাখা, সেটাই মুখে পুরে হাসি সামলে নিচ্ছিল। —"কেঁচো খুঁড়তে তা-হলে সাপ বেরোবে, হি-হি", হাসিটাকে কমা-সেমিকোলনের মতো ব্যবহার করছিল সে, কিন্তু তার চোখ

চকচকে হয়ে উঠেছিল। হাসি থামাতে গেলে চোখ এ-রকম চকচকে হয়ে যায়, বিশেষ করে পেট থেকে হাওয়া বেরিয়ে যায় কিনা তাই কষ্ট হয়, আমাদের সকলেরই হয়, চোখের তারা তখন যেন ঠিকরে আসে, যেন ভাসতে চায়, অল্প জলে চকচকে পুঁটিমাছ যেমন, ভামতীর চোখের মণিও ভাসছিল।

"বুঝেছিস, তোর সুধীরমামা তাই ফিরে এসে মাথা নেড়ে নেড়ে বলল, "উপায় নেই, আমাদের চোরের মার খেতেই হবে, উপায় নেই! নইলে আমরা শেষ পর্যন্ত না-হয় চলেই যাব।"

'চোরের মার' কথাটা বলতে বলতে তার মুখটা হঠাৎ কেমন করুণ হয়ে গেল, গলাটাও ধরা-ধরা, যদিও তখনও সে হাসছিল, কিন্তু সেই মুহূর্তে তার চোখে-চোখে তাকিয়ে আমি ধরতে পারছিলাম না, চকচক্ করছে কেন: এর সবটাই কি ফাজলেমোর ফূর্তি, নাকি পেটে খিল ধরেছিল বলে কষ্ট, অথবা এই কষ্টটা ফুটেছিল শরীরের আর-একটা অংশে, যেটা পেটের বেশ খানিকটা উপরে, যেখানটা দেখতে এমনি অন্যান্য ভাবে শুধু একটু, আড়াল হয়েছে? আর তাই ওর গলায় হঠাৎ অন্য সুর লেগে গেল।

এ-সব আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না, মা, তাই আমারও কেমন কষ্ট হচ্ছিল। ওই হাসিখুশী ভামতী, চাল-চলন তোমার বিপরীত বলেই যার ছিল আলাদা-অদ্ভুত একটা আকর্ষণ, পলকে যেন তাকে তুমি হয়ে যেতে দেখলাম, তোমার মতন। তার মুখে তোমার ছায়া পড়েছিল, কোথা থেকে এসে তুমি তাকে ঢেকে দিচ্ছিলে, ফুটফুটে চাঁদের উপরে পাতলা একটা মেঘের আবরণ, ওরও তবে চোখ ছলছল করে, কী-আশ্চর্য, ভামতীরও?

সারা জীবন, পরে এরকম কত ধূপ-ছায়া ব্যাপার দেখেছি মানুষের পর মানুষে, কাউকে সব সময় একটা ধারণার পাটে বসিয়ে রাখতে পারি নি। শ্রদ্ধার লোকটির আকস্মিক একটা অন্ধকার দিক দেখতে পেয়ে শিউরে উঠি, যাকে ঘৃণা করি, হঠাৎ কোনও কোনও ক্ষণে, তার কোমল মায়াবী অন্য একটা পিঠ দেখে চমকে উঠি; আরে, এ-তো ঘৃণা না! তার সেইটুকুকে তখন বুঝতে ভালবাসতে চেষ্টা করি, যতক্ষণ-না সে আবার ছকের দানের মত উলটো পিঠে ঘুরে যায়, এইভাবে ক্রমাগত লেপা-পোছা আবার লেখা চলে, প্রথমবার পার্বত্য উপত্যকায় গিয়ে যথা সবিস্ময় দেখি এই রৌদ্র এই ছায়া, এই বুঝি কুয়াসা কিংবা ঝিরঝিরে বৃষ্টি প্রত্যেক মানুষও তেমনই বুঝি বহুরূপী না না, বহুরূপী কেউ না, আমরা তাদের বহুরূপে দেখি। সম্পর্কের লড়াই শুধু বাইরের দিকটা, স্থায়ী; ভিতরের

সম্পর্কে কোনও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নেই। ভাঁটা, জোয়ার, আবার ভাঁটা।

এই দর্শনের সূচনা বয়সের সকালেই ঘটে, শুধু তখন এ-ভাবে চিরে দেখার চোখ থাকে না, আমারও ঘটছিল, কত ফকির তাদের ছাইরঙা জামার তলা থেকে হাতের মুঠো খুলে দেখিয়ে দিল ঝিকমিকে এক ফটিক, কত কুহকিনীর অন্তর্বাসের দুর্গন্ধ ভক্ করে নাকে লেগে মুখ ফেরাতে হল। বাইবেলের সেই গল্পটা তুমি জানো না, ছিল সোল, হল পোল, সেই গল্প। আসলে সোল যে, সে হয়ত-বা সোল-ই থাকে, তাকে "পোল" বলে দ্যাখে অন্য লোকে।

এইভাবেই, বাবা একদিন ইস্টিশানের ছায়া ছায়া আলোয় কাছের মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন, খানিকক্ষণের জন্যে, কত চঙ্, কত রঙ্গ-জানা থপ্‌থপে ভামতীও কৃশ-করুণ হয়ে, তোমারই আদল নকল করে আমাকে হঠাৎ ছলাৎ করে দিল—সে-ও হয়ত খানিকক্ষণের জন্যে। মনটা যেন বরফ-ভরা কাচের গ্লাস, ঠাণ্ডা হাওয়ার একটু ছোঁয়া পেলেই তার গায়ে ফোঁটা ফোঁটা জল জমে ওঠে, সে-জল আবার শুকিয়েও যায়।

তবু, ওই যে বাবাকে, যাঁর সঙ্গে তোমার আড়াআড়ি ভাবে, সহসা আর্দ্র চোখে দেখা, ভামতীর কষ্টে ভিতরটা একটু কেঁপে যাওয়া, এর মধ্যে, স্পষ্ট টের না পেলেও প্রচ্ছন্ন ছিল কি কোনও অন্যায়-বোধ, তোমার প্রতি এক ধরনের বিশ্বাসভঙ্গ করে ফেলেছি? বলা মুশকিল। ইচ্ছা করে ভাঙি না। বিশ্বাস যত্রতত্র ছড়ানো থাকে, খোলামকুচির মতো, সারাক্ষণ না-জেনে অহরহ মাড়াই, পায়ের চাপে মুচমুচ করে ভাঙে, মানুষ তার কী করবে বলো, মানুষ নাচার।

[ঘ]

সুধীরমামার জন্যেও সেদিন একটু কষ্ট হচ্ছিল বৈকি, ভামতীর মুখে শুনে। হেডমাস্টারকে বলতে গিয়ে মুখ লুকিয়ে ফিরে এসেছেন। যিনি ছেড়ে যাবেন, ছেড়ে যাচ্ছেন, তুলে দিচ্ছেন এখানকার পাট, সেই সুধীরমামা! মাথায় কমফরটার, নিমের গেলাস, লাঠিতে ঝুঁকে ঝুঁকে হাঁটা, সুপুরিগাছের মতো রোগা কিন্তু সোজা, এখন না-হয় কী-কারণে কে জানে, অন্তরিত অন্য জীবনে। কিন্তু ওঁর সেই আগের ছবিটাই তো বেছে রেখেছি। চোখ বুজলে আজও সেইটাই দেখি। তিনি চলে যাবেন, আর কাছে পাব না, কত পড়ানো, মেলায় মেলায় ঘোরানো, ম্যাজিক লনঠনের সেই আসর, ঝিলে-বিলে মাছধরার চুপচাপ কয়েকটি দুপুর, সব শেষ, উপড়ে যাবে, বাবা যেমন একদিন উপড়ে ফেলেছিলেন উঠোনের গাঁদা ফুলের গাছ। সুধীরমামা। ওঁর বাবা আর তোমার বাবা, মানে আমার দাদু, সেই কত বচ্ছর আগে এখানে আসেন এক সঙ্গে, ছোট্ট কী সম্পর্ক ছিল জানি না, তখনকার দিনে ঘনিষ্ঠতার জন্যে রক্ত-সম্পর্কের বিশেষ দরকারও হত না—এখন তো রক্ত-সম্পর্কের মানুষেও তো একসঙ্গে কিংবা কাছাকাছি থাকে না, রক্ত বুঝি আর ঘন নেই জলের চেয়ে—তখন কিন্তু একটু লতায়-পাতায় আত্মীয়তা থাকলেই যথেষ্ট হত। ওঁরা এসেছিলেন, সত্তর আশি কি তারও বেশি বছর আগে, তখন এখানে শুনেছি রেল ছিল না, বড় গাঙ থেকে যে-খালটা বেরিয়ে এসেছে তার ঘাটে নৌকো ভিড়ত, একজন কাজ নিয়ে এলেন সেরেস্তায়, মানে আমার দাদু, আর সুধীর-মামার বাবা নাকি চাঁদসির চিকিৎসা করতেন, মলম-টলম এইসব আর কী। দুজনেই তখন নবযুবা, অবিবাহিত, সুতরাং চোখে স্বপ্ন, চোখে আশা, সেই চোখ, উপনিবেশে বসতি করতে-আসা প্রথম মানুষদের দৃষ্টিতে যে-ঔজ্জ্বল্য থাকে। একটু-একটু করে ডালপালা দেখা দিল, শিকড় ছড়ালো, নরম মাটি, তার পরতের পর পরতের মায়ায়, প্রাণের গভীরে।

সব উপড়ে যাবে। ভিতরটা হু-হু হয়ে যাচ্ছিল, ভামতীর চোখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না। তখন ও-তো ভামতী নয়, সুধীরমামার প্রতিনিধি। তোমাকে একটু আগে ভুল বলেছি মা, ওই যে ভামতীর অনাস্বাদের আকর্ষণ-টানের কথা যখন বললাম। শুধু তার জন্যে তো নয়, সুধীর-মামার টানেও যে এখানে আসি, এই ঘরে তাঁর উপস্থিতি, এই ঘরে তাঁর স্মৃতি ছড়ানো, আজকের সুবাসের পিছনে ধুলো-মলিন সেই পুরু চাদরটা, চাদর মুড়ি, নয় তো লেপমুড়ি, রবিবার দুপুরে আমাকে নিয়ে, সেই সঙ্গে আরও কয়েকটি ছেলে জুটিয়ে ক্লাস—গ্রিমের গল্প, আসছে বছর শ্যাম্‌ নামে কার লেখা থেকে বিলিতি নাটকেরও গল্প পড়ে শোনানোর কথা ছিল। সব মুছে যাচ্ছে।

সব মুছে যাচ্ছে, ওঁর জ্বর, মাথার কাছে জলের গেলাস, সব। বারান্দায় টাঙানো দড়িটা ছিঁড়ে গেলে যেমন ঝুলতে থাকে, রাতে ভয়-দেখানো হয়ে যায়। শুধু ভামতীর টানে আসি না তো, আমার শুধু

ইচ্ছা করে, আমাকে—আমাদের নিয়ে উনি কী বলেন, এখনও সে-সব মনে রেখেছেন কিনা, সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিই। জিজ্ঞাসা করা হয় না, ঠোঁটে কী-যেন আটকে যায়, তাই জেনে নেব প্রতিজ্ঞা করে আবার আসি।

জয়ন্তী এখন খাওয়া লজেন্স্‌টার অবশিষ্ট ঠোঁট দিয়ে চাটছে, চোখে সেই দুষ্টু-দুষ্টু হাসি।—"চলে যাব ঠিকই। তবে ওকেও ছেড়ে যেতে পারি তোকে একটু আগে বলেছিলাম না! সব ঠাট্টা। রোগা জিরজিরে, একদম দুর্বল যে, আমাকে বলেছে কোনোদিন কারু কাছে কিচ্ছু পায়নি, বাচ্চার মত এখন আঁকড়ে আছে আমাকে। আমিও গেলে ওর থাকবে কী?"

এতদিন বুঝিনি, তখনই যেন বোঝা হয়ে গেল জয়ন্তী ওর কে। মনে মনে বলতে থাকলাম, "না, না, তুমি যেও না।"

'খুব দুর্বল, ও খুব দুর্বল', জয়ন্তী বারবারই বলছিল বটে, কিন্তু ওর অত বেশি-বেশি করে বলায় চোখের সামনে দেখছিলাম যে, দুর্বল কি একা সুধীর-মামাই?—না।

(ক্রমশ)

ভিষরূচিহ্ন লোকাঃ

—ধরুন, আপনি যদি দ্বীপান্তরে যান...

—উহুঁ, যাবই না।

—না, মানে, যদি যানই, তাহলে...

—দেখ বাপু, দেশান্তরে ভালো, বেপান্তরে ভালো, এমন কি লোকান্তরেও যেতে রাজি আছি। কিন্তু দ্বীপান্তরে? কভি নেহি।

—মানারের খালি মস্করা। বলছিলাম কি, দ্বীপান্তরে যাওয়া হল একটা খেলা। আমাদের আসরের ছেলেদের সঙ্গে আপনাকে খেলতেই হবে। দারুণ ইন্টারেস্টিং। প্রশ্নটা এই : আপনি যদি দ্বীপান্তরে যান [এবার, আশা করি, আমাকে শেষ করতে দেবেন], কোন্ একশ'টা বই সঙ্গে নেবেন সময় কাটাতে? আর ধরুন, যাবার পথে টাইফুন উঠল, জাহাজের ভার হালকা করার জন্য কি কি বই সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলবেন?

মজার খেলা। কেউ কেউ এমন সব বইয়ের নাম করল, এতদিন যাদের পড়ার সুযোগ হয়নি। অনেকে আবার বেছে নিল পুনঃপাঠ্য গ্রন্থসঞ্চয়। আর একটি ছেলে দ্বীপান্তরে নিয়ে যাবে এক তুর্কী ব্যাকরণ, এক তুর্কী অভিধান আর আটানব্বই তুর্কী উপন্যাস...দ্বীপান্তরে সময় কাটবে বেশ।

বছর কুড়ি আগে ঐ ধরনের খেলা খেলেছিল ফ্রান্সের এক সাহিত্য পত্রিকার পাঠকসমাজ। প্রত্যেকে পাঠিয়েছিল এক-শ'টা করে নাম। সব মিলিয়ে সাড়ে তিন হাজার গ্রন্থের নাম উল্লিখিত হয়েছিল, পাঁচমিশেলি সেই তালিকা, আর বিচিত্রও বটে। এর মধ্যে স্থান পেয়েছে গীতাঞ্জলি (একবার), ঘরে বাইরে (একবার), শ্রীঅরবিন্দর রচনাবলী (একবার)।

বিজয়ী একশ' বইয়ের আদর্শ গ্রন্থাগারে ফরাসি বইয়ের সংখ্যা একষট্টি অ-ফরাসির উনচল্লিশ। অবিসংবাদিত উইনার : শেকস-পীয়রের নাট্যাবলী; অবিসংবাদিত রানার আপ : বাইবেল। তারপর যথাক্রমে প্রুস্তে, মোতেঞ্ঞ, রাব্লে, বোদ্‌ল্যার, পাস্কাল ('পাঁসেয়'), মলিয়ের, রুশো, স্তাঁদাল ('লা রুজ এ লা নেয়ার'), প্লেটো, স্তাঁদাল ('লা শার্ত্রজ্ দ্য পার্ম'), ভিয়োঁ, র‍্যাঁবো...

অ-ফরাসি উনচল্লিশে ইংরেজি বইয়ের আসন নটি : শেক্‌স্‌পীয়রের নাট্যাবলীর পর যথাক্রমে য়ুলিসিস (জয়েস), গালি-ভারের ভ্রমণ কাহিনী, রবিনসন ক্রুশো, আজব দেশে এলিস, ওয়াদারিং হাইট্‌স্, ব্লেকের কবিতাবলী, লর্ড জিম, দি সেভেন পিলার্স অব উইজ্‌ডম্। ইতালীয় ও স্প্যানিশ সাহিত্যের প্রতিনিধি হিসেবে স্থান পেয়েছেন দান্তে ও কাসানোভা, সের্ভান্তেস ও সেণ্ট জন অব দি ক্রশ। আরও আছেন ত্রয়ী রুশ : তলস্তয় (যুদ্ধ ও শান্তি), দস্তয়েভ্‌স্কি (চারটি উপন্যাস) ও গোগোল (মৃত আত্মা)। আর ছজন জার্মানভাষী লেখক : যথাক্রমে গোটে, হেল্ডার্লিন, মার্ক্‌স্, কাফ্‌কা, নোভালিস, নীট্‌শে। লাতিন : তাসিতুস্, প্লুতার্ক, ভার্জিল আর...স্পিনোজা; গ্রীক : প্লেটো ও হেরাক্লিতেস, ইস্কিলেস, সফোক্লেস ও আরিস্তফানেস এবং হোমের বাকি দুটি মহাকাব্যই গ্রন্থতালিকার অন্তর্ভুক্ত। ওদিকে আছে 'হাজার-এক রাত্রি', আছে আন্দার্সেনের গল্পগুচ্ছ।

আর ফরাসি লেখক? আছে, অবশ্যই আছে, মস্ত মস্ত সব নাম : রাসিন ও লাফোঁতেন, রোঁসার ও ভলত্যার, ভের্লেন ও র‍্যাঁবো, ভালেরি ও ক্লোদেল। হুগোর ভাগে তিন-তিনটি বই [হ্যাঁ, ল্যা মিজেরাব্ল্ আছে বটে] আর বালজাকের আছে 'লা কমেদিয় য়ুমেন' [অর্থাৎ কিনা ৯৩টি উপন্যাসের সমাহার!]। সেরা একশ'-র তালিকায় জীবিত ফরাসি লেখক মাত্রই একজন : মালরো; নোবেল-পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকও একজন : জীদ্। নেই লামার্তিন, আর—বাঙালী পাঠক শুনে মর্মাহত হবেন—নেই মোপাসাঁ। সত্য সেলুকস, বিচিত্র এই জনরুচি!...

...আদর্শ গ্রন্থাগার ওরফে দ্বীপান্তর-সিরিজ নামক এই খেলাটিতে আমাদের মধ্যেও সেদিন, ফরাসি খেলুড়েদের মতোই প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিত গ্রন্থসম্ভারের পঞ্চব্যঞ্জন পরিবেশিত হয়েছিল তালিকায়। প্রায় সবাই লিখেছিল রামায়ণ ও ভগবদ্-গীতা, গল্পগুচ্ছ ও পথের পাঁচালি... মিলি কিন্তু দ্বীপান্তরে পড়বে 'কঙ্কাবতী', সন্তোষ পড়বে 'ওয়েস্ট ল্যান্ড', বাবুসোনা 'পাপুর বই' আর আমি খলিল্ জিব্রানের 'দি প্রফেট'।

খলিলের ঝুলি

ছেলেবেলায়, আধুনিক প্রাচ্যসাহিত্য বলতে—গীতাঞ্জলি ছাড়া—আমরা শুধু জানতাম ঐ 'দি প্রফেট' গদ্যকাব্য। অর্ফালীজ্ নগরে বহুকাল প্রবাসের পর আলমুস্তাফা ফিরে যাবেন নৌকোযোগে

নিজের দেশে। বিদায়কালে আল মিত্রা প্রভৃতি নগরবাসী নারী পুরুষ ভিড় করে এল আলমুস্তাফার বিদায়-বাণী শোনার জন্য। বিভিন্ন শ্রোতাদের অনুরোধে তাই আলমুস্তাফা সুখদুঃখ, শুভাশুভ, বন্ধুত্ব, আত্মজ্ঞান, বিবাহ, মৃত্যু, প্রার্থনা, সৌন্দর্যাদি বিষয়ে অনবদ্য গদ্যছন্দে উপদেশ দেন।

খলিল্ জিব্রানের জন্ম উত্তর লেবানন্-এর এক গ্রামে, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে। দেশ ছাড়েন এগারো বছর বয়সে; তারপর থেকে আমৃত্যু [১৯৩১ সালে] তিনি যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ছিলেন। জিব্রানের প্রথম কয়েকটি গ্রন্থ আরাবীতে লেখা হলেও, তাঁর শ্রেষ্ঠ উপাদান বোধ হয়—তাঁর জীবনের শেষ দশকে—ইংরেজিতেই রচিত : 'দি প্রফেট' (১৯২৩), 'বালি ও ফেনা' (১৯২৬), 'মানবপুত্র যীশু' (১৯২৮)। তাঁর গ্রন্থগুলিকে তিনি নিজেই চিত্রিত করতেন।

'মানবপুত্র যীশু' এক আশ্চর্য গ্রন্থ : তাতে যীশুর জীবনের সত্তর-জন চাক্ষুষ-সাক্ষী তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দান করেন। অনেক সাক্ষী কাল্পনিক : এক গ্রীক ভিষক, তীরবাসী এক ব্যবসায়ী, নাজারেথের এক বৃদ্ধ...। এক সংসারী সূত্রধর-যীশুর তৈরি মজবুত দরজা ও জানালার প্রশংসা করেন। এক ইহুদী যাজক তাঁকে প্রবঞ্চক ও যাদুকর আখ্যা দেন। এক বিধবা তীব্র অভিযোগ করেন, যীশু তাঁর একমাত্র সন্তানকে মাতৃকোল থেকে কেড়ে নিয়ে শিষ্য ক'রে নিয়ে চলে গিয়েছেন। আর আছে বিশ্বাসঘাতক যীশুশিষ্য জুডাস্-এর মায়ের উক্তি : "ছেলেটা আমার ভালো-ই ছিল—মাতৃভক্ত আর দেশপ্রেমিক। একদিন যীশুর ডাকে সাড়া দিয়ে ও আমাকে ত্যাগ করল। আমি জানতাম, ও ভুল করছে...; ওকে তা বলেও ছিলাম। ও কিন্তু শুনল না। জানি, ও আজ আর নেই; জানি, নিজের হাতেই ও নিজের প্রাণ বিনাশ করেছে...। আমাকে আর কিছু বলতে বলবেন না, আমি আর কিছু বলতে পারব না। যীশুর মায়ের কাছে যান, তিনিও পুত্রশোক বোঝেন, তিনি আপনাদের বলবেন আমার সব কথা—তাহলেই বুঝবেন।"

পুরুষদের চোখে

বাগ্মী আসাফ্ যীশুর বলার ভঙ্গির বর্ণনা দেন :

যৌবনে অনেক ভাষণ শুনেছি—রোম, আথেনস, আলেকজান্দ্রিয়ায় বাগ্মীদের মুখে। শিল্পিত ছিল তাদের বাক্যবিন্যাস, শ্রবণে আসত মুগ্ধতা; যীশুর কথা শুনলে কিন্তু শুধু শ্রুতিই কেন, হৃদয় উধাও হয়ে যেত সে কোন্ অচেনা লোকে। ওরা—ঐ সব বক্তারা—জীবনকে দেখত তোমার

আমার চেয়ে আরেকটুমাত্র স্বচ্ছ দুটি চোখে। আর তিনি তো জীবনকে অবলোকন করতেন স্বয়ং ঈশ্বরেরই অমল বিভায়।

গল্প তিনি শুরু করতেন এভাবে : "চাষী গেল মাঠে বীজ বুনবে বলে..." বা "এক ছিল বড়লোক, অনেকগুলি আঙুর ক্ষেত ছিল তার..." বা "সন্ধেবেলায় রাখাল তার মেষগুলি গুণে দেখে, একটি গেছে হারিয়ে..."

এই ধরনের কথাগুলি শ্রোতাদের ফিরিয়ে আনত তাদেরই সরল সত্য সত্তায়, তাদের অতীত দিনগুলিতে। আমরা—আমরাও তো চাষী সকলেই, দ্রাক্ষাকুঞ্জ সবারই প্রিয়, আর আমাদের সকলেরই স্মৃতির চারণক্ষেত্রে রয়েছে এক রাখাল, এক মেষপাল আর হারিয়ে-যাওয়া সেই ভেড়াটি।

হারানো ভেড়ার উপকথাটি খলিল্ জিব্রান্ বসিয়েছেন লেবানন্-এর এক রাখালের মুখে :

বসন্ত যখন এল, যীশু আরেকবার সেই চারণক্ষেত্র অতিক্রম করলেন।

সেদিন বেণু আমার গীতহারা, আমার পালের এক ভেড়া নিরুদ্দেশ—তাই বিয়োগবেদনা বুকে, হৃদয়ে পাষাণভার।

আমি তাঁর কাছে হেঁটে গেলাম, নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়ালাম তাঁর সামনে—তাপিত প্রাণ আমার, সান্ত্বনার আকাঙ্ক্ষায়। আমার চোখে চোখ রেখে তিনি বললেন, "তোমার বেণু আজ স্তব্ধ। তোমার দু-চোখে কিসের বিষাদ?

আমি বললাম, "আমার ভেড়ার পাল থেকে একটি গেছে হারিয়ে।"

এক মুহূর্ত তিনি নীরব হয়ে রইলেন। তারপর তাঁর মুখে ফুটল হাসি, আমার উদ্দেশে বললেন, "আমি তাকে খুঁজে দেব...।" ধীর পায়ে হেঁটে মিলিয়ে গেলেন শৈলশ্রেণীর ওপারে।

অর্ধ প্রহর পরে তিনি ফিরে এলেন, সঙ্গে ফিরে এল হারানো মেষ। আমার কাঁধে হাত রেখে তিনি বললেন, "আজ থেকে তুমি এই মেষটিকেই অন্য সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসবে—ও যে হারিয়ে গিয়েছিল, আবার তোমার কাছে ফিরে এসেছে।"

আনন্দে ভেড়াটিকে জড়িয়ে ধরলাম... আর যীশুকে ধন্যবাদ দিতে যখন মাথা তুললাম, ততক্ষণে দেখি, তিনি অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছেন, তাঁকে আর অনুসরণ করার সাহস হল না।

যীশুর মৃত্যুর পূর্ব রাত্রের কথা বিবৃত করেছেন এক রোমীয় সেনাপতি :

হুকুম এল, পরদিন সকাল পর্যন্ত তাকে যেন রাখা হয় আমার হেফাজতে। আমার সৈন্যরা তাঁকে বন্দী করে নিয়ে গেল।

মধ্য রাত্রে আমি আমার স্ত্রী ও শিশুদের ছেড়ে অস্ত্রাগার পরিদর্শন করতে বেরোলাম। দেখলাম, আমার সৈন্যরা মস্করা করছে তাঁর সঙ্গে। খুলে নিয়েছে তাঁর গাত্রবাস, মাথায় পরিয়েছে গত বছরের কাঁটা দিয়ে গাঁথা এক মুকুট।

তাঁকে বসিয়েছে এক স্তম্ভের গায়ে হেলান দিয়ে, তাঁর সামনে নৃত্য ও কোলাহলে মত্ত হয়ে উঠেছে।

আর তাঁর হাতে ধরিয়ে দিয়েছে এক খাগড়ার নল।

আমি ঢুকতেই কে একজন চিৎকার করে উঠল : "দেখুন, হে সেনাধ্যক্ষ, ইহুদীদের রাজাকে দেখে যান।"

তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আমি তাকালাম তাঁর দিকে, লজ্জাহত হয়ে...।

গালিয়া আর স্পেনে আমি যুদ্ধ করেছি, আমার বাহিনী নিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি। তবু আতঙ্কিত হই নি কখনো, ভীরুতার অপবাদ নিই নি কাঁধে। কিন্তু যখন এই মানুষটির সামনে দাঁড়ালাম আর তিনি দৃষ্টিপাত করলেন আমার দিকে, সাহস আমার তলিয়ে গেল কোথায়... একটি কথাও উচ্চারণ করতে পারলাম না।

সোজা আমি পালিয়ে এলাম অস্ত্রাগার ছেড়ে।

এ ঘটনা ঘটেছিল ত্রিশ বৎসর পূর্বে। আমার পুত্রেরা—তারা তখন শিশু মাত্র—এখন সাবালক হয়েছে, সিজার্ আর রোম্-এর সেবা করছে।

কিন্তু কখনো কখনো উপদেশ প্রসঙ্গে আমি তাদের কাছে বলেছি তাঁর কথা—যিনি মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছিলেন ওষ্ঠে প্রাণের অমৃতরস নিয়ে, দুটি চোখে নিয়ে তাঁর ঘাতকদের জন্য অপার করুণা।

এখন আমি বৃদ্ধ। পরিপূর্ণভাবে বেঁচেছি আমার জীবনের প্রতিটি বৎসর। আর আমি সত্যিই ভাবি, গালিলি-র সেই মানুষটির মতো তেমন মহান নায়ক আর কেউ নন—না পম্পে, না সিজার্।

নারীদের চোখে

অনুতপ্ত পাপিনী মারিয়া মাগ্দালেনা বলেন :

...পুনরায় যখন তাঁকে দেখলাম, আমার গবাক্ষ পথে, তখন অগস্ট মাস। আমার উদ্যানের অপর প্রান্তে সাইপ্রেস্ গাছের ছায়ায় তিনি উপবিষ্ট, নিশ্চল—যেন পাথর কুঁদে তৈরি, আন্তিয়োক্ কিংবা উত্তরদেশের নগরীর মূর্তির মতো।

আমার মিশরী বাঁদী আমাকে এসে বলল, "ওই লোকটি আবার এসেছে। আপনার বাগানের ওপারে সে বসে আছে।"

আমি তাঁর দিকে তাকালাম, আমার প্রাণ কেঁপে উঠল বুকের ভিতর। তিনি রূপবান...দেহ তাঁর অন্বয়, অঙ্গে-অঙ্গে যেন সংরাগের মিলন, সামঞ্জস্যে-সুষমায় অপরূপ।

দামাস্কাসের বসনে সজ্জিত হয়ে আমি গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলাম, অগ্রসর হলাম তাঁর দিকে।

কিসে আমাকে টেনে আনল তাঁর কাছে—আমার [illegible] না কি তাঁর সৌরভ? [illegible] ফুল আমার [illegible] [illegible] না কি আমার চোখের আলো [illegible] তাঁর সৌন্দর্য?

[illegible] তা জানি না।

[illegible] আমি তাঁর কাছে [illegible] আমার সোনালী চপ্পল—[illegible] যে চপ্পল আমাকে উপহার দিয়েছিলেন, হ্যাঁ, সেই চপ্পলের জোড়াটি। তাঁর সমীপবর্তী হয়ে আমি বললাম, "দিন তোমার শুভ হোক।"

তিনি বললেন, "তোমার দিন শুভ হোক, মারিয়া।"

আমি বললাম, "এখানে কেন? দয়া করে আমার ঘরে আসুন।"

তিনি নেত্রপাত করলেন আমার দিকে আমার উপর ব্যাপ্ত হল তাঁর নয়নের জ্যোতি—যেন দ্বিপ্রহরের তাম্বর মহিমায় বললেন, "তুমি বহুবল্লভা, আর তবু একমাত্র আমিই ভালোবাসি তোমাকে। অন্য পুরুষের তোমার সান্নিধ্যে নিজেদেরই ভালোবাসে, আর আমি তোমাকে ভালো-বাসি তুমি তুমি ব'লেই...তোমারই জন্য তোমাকে ভালোবাসি। অন্য পুরুষেরা তোমার মধ্যে যে-সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করে, তাদের নিজেদের আয়ুর চেয়েও তা দ্রুত ম্লান হবে। কিন্তু আমি তোমার মধ্যে যে-সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করি, তা অম্লান,...একমাত্র আমিই তোমার অন্তর্নিহিত অগোচরকে ভালোবাসি।"

তারপর অনুচ্চ স্বরে তিনি বললেন "এবার যাও।"

শিষ্য রাফায়েল খলিল জিব্রানের কল্পনার সৃষ্টি :

মাঝে মাঝে মনে হয়, তিনি হয়তো অগণিত নরনারীর স্বপ্নের ধন; মাঝে মাঝে মনে হয়, আমরা বোধ হয় আমাদের খণ্ড খণ্ড স্বপ্নাংশগুলিকে পরস্পরসংবদ্ধ করতে করতে শেষে তাকেই সত্য জ্ঞান করেছি...

কিন্তু আসলে তো তিনি স্বপ্ন ছিলেন না। তিন বছর ধরে আমরা তাঁকে জেনেছি দ্বিপ্রহরের উজ্জ্বল দিবালোকে, উন্মীলিত নয়নে তাঁকে দর্শন করেছি।

স্পর্শ করেছি তাঁর করতল; অনুসরণ করেছি তাঁর, স্থান থেকে স্থানান্তরে; শ্রবণ করেছি তাঁর উপদেশ, প্রত্যক্ষ করেছি তাঁর কর্মলীলা।...নাকি আমরা নিজেরাও [illegible] রক্তে সঞ্চারমাণ কোনো [illegible]?

নাজারেথের যীশু [illegible] এক মহৎ ঘটনা। সেই যাদুকরী, [illegible] ও মাতা ও ভ্রাতাদের [illegible] তিনি, [illegible] ছিলেন বন্ধুদেরায় সংঘটিত এক আশ্চর্য অলৌকিকতা? হ্যাঁ, তাঁর [illegible] সমস্ত অলৌকিক ঘটনাগুলিকে যদি তাঁর পদতলে স্তূপীকৃত করা হয়, তবু তা কতটুকু, তাঁর গুলফ-ও ছোঁয় সাধ্য কি?

আগে প্রতি বছর আমি অপেক্ষা করে থাকতুম, এই উপত্যকায় কবে শোনা যাবে বসন্তের পদপাত। প্রতীক্ষা করতাম লিলি-ফুলের জন্য আর দোপাটির জন্য, কিন্তু প্রতি বছরই অন্তরে আমার বেদনা বাজত ভিতরে ভিতরে; চিরকালই আমি চাইতাম বসন্তের সঙ্গে সঙ্গে উৎফুল্ল হয়ে উঠতে, কিন্তু তা পারতাম কই?

কিন্তু যেদিন যীশু এসে আবির্ভূত হলেন আমার ঋতুপরম্পরায়, সেদিনই তাঁকে আমি চিনলাম আমার বসন্ত ব'লে। তাঁর মধ্যে ছিল অনাগত কত ঋতুর অঙ্গীকার! আনন্দের স্ফুধায় আমার হৃদয় তিনি ভরিয়ে তুললেন।

না, যীশু কোনো মুগ্ধ মনের বিভ্রম নন, কবিকল্পনার সৃষ্টি নন। তিনি ছিলেন তোমার আমার মতোই মানুষ—কিন্তু সে তো শুধু আমাদের দৃষ্টি, স্পর্শন শ্রবণের কাছে, আর-সব দিক দিয়েই তিনি ছিলেন আমাদের থেকে স্বতন্ত্র।

তিনি এমন সব দৃশ্য দেখতেন যা আমরা দেখতাম না, শুনতেন এমন কণ্ঠস্বর যা থাকত আমাদের অশ্রুত; তিনি কথা বলতেন যেন অদৃশ্য অগণিত জনতার সঙ্গে, আর প্রায়শই আমাদের মধ্য দিয়ে সম্বোধন করতেন মানবজাতির অজাত উত্তরাধিকারীদের।

আর মাঝে মাঝে যীশু একা হয়ে যেতেন—আমাদেরই মধ্যে, তবু যেন আমাদের কেউ নন। এই পৃথিবীতেই বিরাজ করতেন তিনি, অথচ যেন দূরে আকাশলোকের রহস্যময় মানুষটি। তার সেই নিঃসঙ্গতার রাজ্যে আমরা উত্তীর্ণ হতে পারি কেবলমাত্র আমাদেরই নৈঃসঙ্গের নির্জনে।

শ্রোতাদের সঙ্গে তিনি ফুর্তি করতেন, হাসাতেন, কথা নিয়ে খেলা করতেন, তবু এই সারাক্ষণই তাঁর দুটি চোখে মাখা থাকত এক আশ্চর্য দূরত্ব, কণ্ঠস্বরে জেগে থাকত এক অনির্দেশ্য বিষাদ...

বুঝলাম ঐ রহস্যের অর্থ, তমসাবৃত সেই শুক্রবার...

...বছরে বছরে—এমন কি আজকেই—বিস্ময়ে পালিত সেই গুড্ ফ্রাইডে, আর পুনরুত্থানের ইস্টার-রোববার।

॥ ৭ ॥

শ্রী অশোককুমারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, খ্যাতনামা অভিনেতা কিশোরকুমারকেও আমিই প্রথম সংগীতশিল্পী রূপে আবিষ্কার করি এবং হিন্দী চলচ্চিত্রে গান করার সুযোগ দিই। আমি তখন ফিল্মিস্তানে কাজ করছি দাদামণি অশোককুমারের নিজস্ব প্রোডাকশনে "এইট ডেজ" (১৯৪৬)। কিশোর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার পর, তার দাদার সংগে স্টুডিওতে বেড়াতে আসত। একদিন দাদামণি আমাকে কিশোরের গান শুনতে বললেন। কিশোর কোনদিনও তেমন ভাবে গান অভ্যাস করেনি, রেওয়াজ করেনি—একেবারে স্বাভাবিক ভগবানদত্ত গলায় ওর গান শুনে আমি মুগ্ধ। তখনই আমি ওই ছবির একটি গান কিশোরকে দিয়ে গাওয়ালাম। প্রথম "টেক"-এই একেবারে "ও কে" করতে হল। আমি তখন দাদামণিকে বলেছিলাম, কিশোরকে আর কলেজে পড়িয়ে কোন দরকার নেই, এই গানের লাইনেই যেন সে চলে আসে। তারপর কিশোর নিজেকে হিন্দী ছবির প্লে-ব্যাক শিল্পীরূপে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করল। আমার এখনকার নতুন ছবি "আরাধনা"-র (১৯৬৯) বহু গান কিশোরের কণ্ঠে একেবারে এমন হিট হয়েছে যে বলার নয়।

কিশোরকে দিয়ে আমি কখনও গজল গাওয়াইনি। কারণ গজল ওর গলায় মানাবে না। ওর গলার উপযোগী হল, Smart ও rhythmic সুর। কিশোরকে দিয়ে আমি যে সব গান করিয়েছি, প্রত্যেকটিই খুব সাফল্য লাভ করেছে।

হিন্দী ছবিতে ব্যাকগ্রাউন্ড সংগীতের চাইতেও গানের সুরের উপর বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়, কারণ সাধারণ দর্শক ও শ্রোতারা গান বলতে অজ্ঞান। কোন ছবিতে যদি কোন গান ওদের পছন্দমত হয়ে যায়, তবে সেই ছবির সাফল্য নিশ্চিত। প্রযোজকরা যখন ছবির পরিবেশকদের নিকট ছবি বিক্রী করতে যায়, তখন বহু ক্ষেত্রে তারা প্রথমেই ছবির গান শুনতে চায়। গান পছন্দ হলে বেশী দামে বিক্রীও হয়ে যায়। ছবির দামে এই বেচা কেনার তারতম্য বহু ক্ষেত্রে গানের জন্য ঘটে। আমি নিজে ব্যাকগ্রাউন্ড সংগীতের গুরুত্ব

শচীন দেববর্মন ও কিশোরকুমার

লতা ও শচীন দেববর্মন

দিলেও এবং তার প্রাধান্য সর্বাগ্রে মনে করলেও, সাধারণ শ্রোতাদের ত আমি অবজ্ঞা করতে পারি না। আমাদের সুনাম বা বদনাম সর্বদাই এই গানের সুরের উপর নির্ভর করে। সুতরাং গান ও তার সুর যাতে সাধারণ শ্রোতারা নেয় সে প্রচেষ্টা আমাদের সকলকেই করতে হয়।

আমার গানের সুর নিজের পছন্দ মত হলেও, তার সাফল্য নির্ভর করে গানের গায়িকার উপর। ১৯৪৪ সাল থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত আমার সুরে যারা গান গেয়েছেন তাদের মধ্যে আছেন এই সব জনপ্রিয় শিল্পীরা—আমিরবাই কর্ণাটকী, সামসাদ বেগম, রাজকুমারী, লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, গীতা (রায়) দত্ত, সুরাইয়া, পারুল বিশ্বাস (পান্নালাল ঘোষ-এর স্ত্রী), সুমন কল্যাণপুরে, পারো (অভিনেত্রী), মুবারক বেগম, হেমলতা, সন্ধ্যা মুখার্জি ইত্যাদি। সন্ধ্যাকে আমিই কলকাতা থেকে বম্বে এনেছিলাম একটি ছবিতে প্লে-ব্যাক করার জন্য। গায়কদের মধ্যে আমার ছবিতে গেয়েছেন—মহম্মদ রফি, মুকেশ, মান্না দে, হেমন্তকুমার, কিশোরকুমার, অশোককুমার, সুরেন্দ্র ও বাতিস। বাতিস এক কালে সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন এবং ভাল উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গলা ছিল তাঁর। ক্লাসিক্যাল ধরণের গান আমি বাতিসকে দিয়ে করিয়েছি আমার ছবিতে। সুরেন্দ্র হিন্দী ছবির নায়ক ছিলেন এবং নিজে গাইতেও পারতেন।

প্লে-ব্যাক শিল্পীদের মধ্যে লতা মঙ্গেশকর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মাইকের এত উপযোগী গলা বোধ হয় আর কারও নেই, এমনকি অতীতেও ছিল না। ভবিষ্যতেও তা হবে কিনা সন্দেহ। সব রকম গান, নানান সুরের, নানান ধরনের মুডের, লতার গলায় খাপ খেয়ে যায়। অত্যন্ত অনায়াসে লতা সব গান ও সুর তুলে নিতে পারে। এখনকার প্রাদেশিক মনোভাব ও ভেদাভেদের দিনেও, ভারতের সব অঞ্চলে লতার জনপ্রিয়তা, বিভিন্ন ভাষায় তার গান সকলের হৃদয় জয় করেছে। আমার হিন্দী বহু গানের সাফল্যের মূলে লতার গলা।

লতার বোন আশাও খুব উচ্চ শ্রেণীর শিল্পী। ওর গলার মধ্যে বেশ একটা Youthful vigour-এর মেজাজ আছে। এই দুই বোন, সুর নিয়ে কোন প্রকার

আশা ভোঁসলে ও শচীন দেববর্মন

পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ওদের বুঝিয়ে দিলে অনায়াসে তা গলায় তুলে নিতে পারে।

চলচ্চিত্রের সংগীত-রচনার সাফল্যের মূলে হ'ল অত্যন্ত সহজ ও সরল সুর দেওয়া। সাধারণ শ্রোতারা যাতে সহজে গানটি নিজের গলায় তুলতে পারে। ছবিতে হিট গান মানেই সোজা গান। আমার মতে নানারকম রং ফলিয়ে কেরামতী দেখিয়ে সুর-যোজনা করা অতি সহজ। কিন্তু অত্যন্ত সোজা সরল সুর যা সকলের প্রাণ স্পর্শ করবে, এমনকি শিশুও গাইতে পারবে, তা রচনা করাই সবচাইতে দুরূহ।

শচীন দেববর্মন ও মহম্মদ রফি

তাই বলে আমি যে কঠিন ও জটিল সুর বা উচ্চাঙ্গ সংগীতের ভিত্তিতে, প্রয়োজনমত সুরারোপ করিনি তা নয়। এবং এই সব গানের জন্য আমার সব চাইতে প্রিয় শিল্পী হল অনুজপ্রতিম শ্রীমান্না দে। কলকাতায় আমার গান শেখার সর্ব-প্রথম গুরু স্বর্গত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দের ভ্রাতুষ্পুত্র। মান্না বহুদিন বম্বেতে আছে। আমি ১৯৪৮ সালে বম্বে টকীজ-এর দ্বারা প্রযোজিত বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়ের "রজনী" অবলম্বনে, বাংলা ও হিন্দী দুটি ছবির সংগীত পরিচালক ছিলাম। "রজনী"-র বাংলা ছবির নাম রাখা হয়েছিল — "সমর" ও হিন্দী ছবির "মশাল"। এই দুটি ছবির পরিচালক ছিলেন নীতিনদা। দুটোরই নায়ক অশোককুমার। সংগীত পরিচালকরূপে মান্না ছিল আমার সহকারী। বড় অমায়িক নিরহংকার ও মিষ্টভাষী এই মান্না। বম্বের হিন্দী ছবির গান আজকাল অনেকটা মেকানিকাল হয়ে গেছে, শিল্পীরা রোজই রেকর্ডিং-এ ব্যস্ত, অভ্যাস বা রেওয়াজ করার সময় কোথায়। মান্না কিন্তু এর একমাত্র ব্যতিক্রম। জনপ্রিয়তা ও খ্যাতির শীর্ষে এখনও এই শিল্পী রোজ সকালে প্রিয় তানপুরা নিয়ে রেওয়াজ করে, পারতপক্ষে কখনও বাদ পড়ে না এই অভ্যাস। সংগীতের উপর ওর এই নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা আমাকে মুগ্ধ করেছে। এইজন্য সে আমার অত্যন্ত স্নেহের পাত্র। মান্না আমার ছবিতে বহু গান করেছে ও এখনও করছে। সব গানেই সে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

উচ্চাঙ্গ সংগীতের ভিত্তিতে কোন গানের যখন সুর রচনা করি, তখন আমি তা মান্নার গলাতে গাওয়ান পছন্দ করি। যখনই ছবির গল্পের সিচুয়েশন অনুযায়ী উচ্চাঙ্গ সংগীতের সুর রচনা করার সুযোগ পেয়েছি তখনই আমি তা গ্রহণ করেছি। ১৯৬১ সালে "মেরী সুরৎ, তেরী আখেঁ" ছবির এইরকম এক ঘটনার দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। বাংলা ছবি "রিক্তা"-র উপর ভিত্তি করে এই ছবি নির্মিত হয়েছিল ১৯৬১ সালে। জি পি ফিল্মস্ এর প্রযোজক, পুরানো দিনের অভিজ্ঞ পরিচালক শ্রীরাখান্, আর নায়ক শ্রীঅশোককুমার। অশোককুমার নিজে আমাকে অনুরোধ করেন ছবির সংগীত পরিচালনার ভার নিতে। ছবিতে ছিল এক ক্লাসিকাল সংগীতশিল্পী ওস্তাদের চরিত্র। ওস্তাদ তাঁর ছেলেকে একটি গানের তালিম দেয় বাল্যকালে। বড় হয়ে সেই ছেলে (অশোককুমার) বাবার তালিমের সেই গান গায়। সময় ছিল ভোর রাত্রি। আমি সময়োপযোগী আহিরী ভৈরব রাগে একটি গান রচনা করলাম, শৈলেন্দ্র গীতিকার। গানটি হল—"পুছোনা কায়সে মায়নে রয়ন বিতাই।" গানটি ছবিতে গেয়েছিল মান্না দে। মান্নার গলায় গানটি যে কি প্রাণবন্ত হয়েছিল, যারা তা শুনেছেন তারাই উপলব্ধি করেছেন। গানটি মোটেই চটুল নয়, টিমালয়ে গম্ভীর প্রকৃতির। এখনও গানটির জনপ্রিয়তা বর্তমান, এমনই আমেজ ও শিল্পী-জনোচিত মেজাজে মান্না গেয়েছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আরও বহুকাল এই গানটি সমাদৃত হবে রসিকদের নিকট।
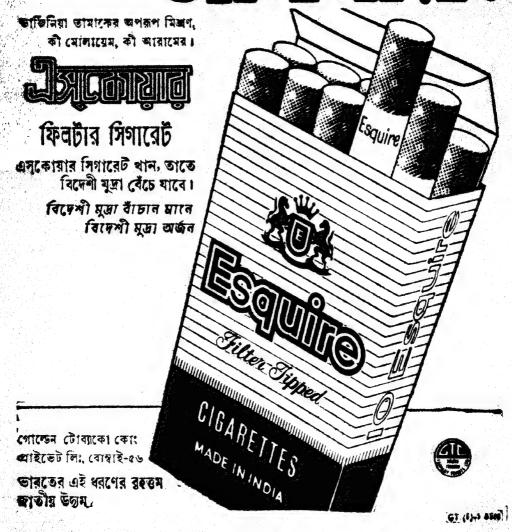
[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

ভার্জিনিয়া তামাকের অপরূপ মিশ্রণ,
কী মোলায়েম, কী আরামের।
এসকোয়ার
ফিলটার সিগারেট
এসকোয়ার সিগারেট খান, তাতে
বিদেশী মুদ্রা বেঁচে যাবে।
বিদেশী মুদ্রা বাঁচান মানে
বিদেশী মুদ্রা অর্জন
Esquire
Esquire
Filter-Tipped
CIGARETTES
MADE IN INDIA
10 Esquire
গোল্ডেন টোব্যাকো কোং
প্রাইভেট লিঃ, বোম্বাই-৫৬
ভারতের এই ধরণের বৃহত্তম
জাতীয় উদ্যম

ইউনাইটেড স্টেট্‌স্‌ ইনফরমেশন সার্ভিস-এর উদ্যোগে অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে শিল্পী পলিন ডাভ-এর এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। পলিন ডাভ মনরোর (নর্থ ক্যারোলিনা) অধিবাসী। ভার্জিনিয়ার মেরী বলডুইন কলেজ থেকে শিল্প ইতিহাসে স্নাতক হবার পরে তিনি ফ্রান্স ও ওয়াশিংটনের আর্ট স্কুল এবং শেষে করকোরান আর্ট স্কুলে শিল্পবিদ্যা

লাফিং অ্যালিগেটর —পলিন ডাভ

শিক্ষা করেন ও ১৯৬৯ সালে জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিল্পকলায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রীলাভ করেন। ইতিপূর্বে তিনি ওয়াশিংটন এবং বোম্বাই ও কাঠমাণ্ডু শহরে প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন। প্রদর্শনীতে তেল ও অ্যাক্রিলিক রঙে আঁকা ১৫টি, একটি কোলাজ, দুটি চারকোল ড্রয়িং ও ২৬টি সেরিগ্রাফ-এর নিদর্শন দেখা যায়।

অ্যাক্রিলিকের সুবিধা এই যে, এটি জল ও তেল উভয় রঙ হিসাবেই ব্যবহার করা চলে, অর্থাৎ তেল রঙের স্বাভাবিক গুণ থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনমত টার্পিনের পরিবর্তে জল মিশিয়ে এই রঙ ব্যবহার করে সুফল লাভ করা যায়। পলিন ডাভ হলুদ, লাল ও নীল, প্রাথমিক এই তিনটি রঙকে আশ্রয় করে বিভিন্ন স্তরভেদ, রঙ ও আকারের সৃষ্টি করেছেন। প্রধানত জ্যামিতিক ক্ষেত্র, বিশেষ করে বৃত্ত, অর্ধবৃত্ত বা অন-কে কেন্দ্র করে তাঁর রচনা গড়ে উঠেছে। রচনাক্ষেত্রের এক স্থানে তিনি একটি বৃত্ত এঁকে সেটিকে লাল রঙে ভরে ফেলেছেন, পরে তারই পাশে আর একটি বৃত্ত এঁকেছেন, যার কিয়দংশ প্রথম বৃত্তের অংশবিশেষ ভেদ করে গেছে। দ্বিতীয় বৃত্তটি হয়ত তিনি হলুদ রঙে ভরে দিয়েছেন, ফলে সুপারইমপোজিশনের অর্থাৎ লাল রঙের ওপর হলুদ রঙ লাগাবার ফলে স্থানটি কমলা রঙে ভরে উঠেছে। অ্যাক্রিলিক রঙের জন্য এক রঙের ওপর অন্য রঙ ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে, অথচ সেই সংগে জল রঙের স্বাভাবিক স্বচ্ছতাটুকুও ফুটে উঠেছে। বিভিন্ন নিদর্শনেই প্রাথমিক রঙ থেকে নানা নতুন রঙের সৃষ্টি, স্তরভেদ ও একটি সাবলীল ছন্দ যেন আত্মপ্রকাশ করেছে। আকার থাকলেও শিল্পীর এজাতীয় রচনাগুলি একান্তভাবেই রঙের স্বপ্নালোক বিশেষ। রঙ ও স্তরভেদ বিষয়ে শিল্পীর দূরদৃষ্টি লক্ষণীয়। দুই বা তিনটি প্রাথমিক রঙকে অবলম্বন করে তিনি ক্ষেত্রবিশেষে সাত আটটি ছন্দোবদ্ধ আকার তথা স্তরভেদের অবতারণা করেছেন। এই প্রসঙ্গে লাল রঙ কেন্দ্রিক ডায়মণ্ড রেড, রামধনুর সপ্তরঙ প্রধান আলোছায়ার মায়ালোক বিশেষ থ্রু লেজেস-২ ও বিশেষভাবে সবুজ বেগুনী ও নীলরঙ প্রধান আবরণ আচ্ছাদিত নারীমুখের রহস্য ইঙ্গিতময় স্মাইলস অলরাউণ্ড-এর নাম করা যায়। চারকোলের দুটি নিভুল স্টাডি দেখে শিল্পীর শারীরবিদ্যাজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

শিল্পীর সেরিগ্রাফ-এর কাজ অন্য শ্রেণীর। সেরিগ্রাফ বা সিল্ক স্ক্রীন প্রিণ্টিং অনেকটা স্টেনসিল ছাপের মত। সূক্ষ্ম কোনও রেশমখণ্ডের ওপর রঙ লাগান হয় যেটি অনাচ্ছাদিত অংশের ওপর ছড়িয়ে পড়ে সূক্ষ্ম দানার সৃষ্টি করে। সাধারণত আচ্ছাদন হিসাবে পাতলা কাগজ বা ল্যাকার ব্যবহৃত হয়। একই স্ক্রীনকে বিভিন্ন ভাবে আচ্ছাদিত করে বিভিন্ন রঙে তার নানা প্রিন্ট নেওয়া যায়। সেরিগ্রাফ আমেরিকায় যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সেরিগ্রাফে শিল্পী মূলত বহিঃরেখা ও আকারের ওপর প্রাধান্য দান করেছেন, যদিও কয়েক স্থলে তিনি সমস্ত আকারটিই আবার খণ্ড খণ্ড করে বিভক্ত করেছেন, যেমন লাল ও হলুদ রঙ প্রধান লাভ অ্যাপল, নীলরঙের পৃষ্ঠভূমিতে আঁকা এলিফ্যাণ্ট উইথ বার্ডস বা লাফিং অ্যালিগেটর, তবে নানা রেখার মধ্য দিয়ে যার গতিশীলতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। দু' একটিতে শিল্পী কারুকার্যের অবতারণা করেছেন—এই প্রসঙ্গে ম্যাজেণ্টা নোয়েল, বা লাল, বেগুনী ও নীলরঙ বিচ্ছুরিত উইচেস ওয়াল্‌জ্‌-এর নাম করা

মিস্টিক ওয়ার্লড-৩
—রামমোহন সরকার

চলে। অপরাপর নিদর্শনের মধ্যে ভৈরব (কোলাজ) ও ভৈরব (সেরিগ্রাফ) উল্লেখযোগ্য। সমসাময়িক চিন্তাধারা, রঙের স্বপ্নালোক সৃষ্টি ও পরিচ্ছন্নতার জন্য পলিন ডাভ-এর কাজ অনেকের মনে থাকবে।

*

শিল্পী রামমোহন সরকার অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। শিল্পী ইতিপূর্বে এখানে ও অন্যান্য স্থানে প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেছেন সুতরাং শিল্পী হিসাবে তিনি অপরিচিত নন।

রাখাল দাসের সাম্প্রতিক রচনা নিদর্শন
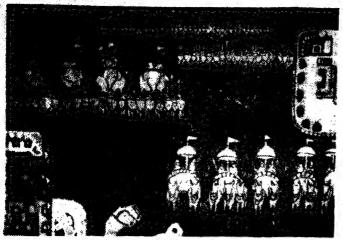
বর্তমানে তিনি শ্রীনগরের জম্মু ও কাশ্মীর ইনস্টিটিউট অব মিউজিক অ্যান্ড ফাইন আর্টের কলাবিভাগের প্রধান হিসাবে নিযুক্ত আছেন। প্রদর্শনীতে তেলরঙে আঁকা শিল্পীর ১৫টি রচনা দেখা যায়।

আপন আপন কর্মফল অনুযায়ী মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। মাতৃক্রোড়ে লালিত-পালিত হয়ে শৈশব কাটিয়ে বাল্যকালে উপনীত হয় এবং পরে যৌবনে পদার্পণ করে পৃথিবীর বুকে নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন কাজ করে অবশেষে একদিন পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়, আর তার অবিনশ্বর আত্মা এ দেহ ত্যাগ করে আবার অন্য দেহে আশ্রয় গ্রহণ করে। অভাব-অভিযোগ, দুঃখ দারিদ্র্য, সুখ ও দুঃখ থাকা সত্ত্বেও মানুষ সৃষ্টিকর্তার কথা নানাভাবে স্মরণ করে থাকে। ভারতীয় ধর্ম তথা দর্শনশাস্ত্রের এই মূল কথাটি শিল্পীর প্রধান বিষয়বস্তু এবং এই ভাবধারাই তিনি বিভিন্ন রচনার মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। শিল্পীর অংকন-রীতি প্রাচীন লোক ও দেওয়ালচিত্র জাতীয়। রেখাভিত্তিক মূর্তিগুলি ঠিক রিয়ালিস্টিক নয়—বিমূর্তও নয়। বহিরা-বয়বগুলি তিনি মোটা রেখাদ্বারা ফুটিয়ে পৃষ্ঠভূমিতে প্রয়োজনমত হাল্কা রঙ ব্যবহার করে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। কোনও প্রকার অংকনচাতুর্য অপেক্ষা শিল্পীর কাজে সরলতাই লক্ষণীয়। কমপোজিশন হিসাবে চাপা সবুজ রঙপ্রধান মিস্টিক ওয়ার্লড-১৩ উল্লেখযোগ্য। কয়েক-ক্ষেত্রে শিল্পী বৃত্ত বা অর্ধবৃত্ত সহকারে পৃষ্ঠভূমি ভরে ফেলে তাদের ওপর ছোট ছোট নানা মূর্তির অবতারণা করেছেন। এই প্রসঙ্গে মিস্টিক ওয়ার্লড-২৫-র নাম করা যায়। প্রাচীর চিত্র জাতীয় একটি প্যানেলও অনেকের চোখে পড়ে, যেমন মিস্টিক ওয়ার্লড-২০। বিষয়বস্তু হিসাবে রচনাগুলি একটু দুর্বোধ্য মনে হয় তবে রচনার সরলতার জন্য কয়েকটির রস গ্রহণ করতে অসুবিধা হয় না।

✻

অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে শ্রীমতী মিউসি ঘোষের প্রদর্শনী দেখে প্রথমেই দর্শকের মনে প্রশ্ন জাগে : এই শিল্পী এতদিন কোথায় আত্মগোপন করেছিলেন? শিল্পীর জলরঙ রচনাবলী ভারতীয় ধারায় আঁকা। তা হোক, ক্ষতি নেই, কিন্তু তাঁর নিপুণ ও নিভুর্ল অংকণরীতি, রঙ ব্যবহার তথা ওয়াশ পদ্ধতি ও বিশেষ করে পরি-প্রেক্ষিতবোধ দেখে বোঝা যায় যে, শিল্পী অতীব যত্নসহকারে এককালে ছবি আঁকতেন এবং প্রত্যেকটি রচনার মধ্য দিয়েই আত্ম-বিশ্বাস ও শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কয়েকটি কপিও সুন্দর ভাবে আঁকা। শিল্পীর সাঁওতাল নৃত্য, গুহক বিদায় ও রেশমের ওপরে আঁকা গোপা দেবী উইথ হার কনসর্ট ও মায়া দেবীর ড্রিম উল্লেখযোগ্য। শিল্পীর তেলরঙের কাজ অবশ্য অতি সাধারণ। সাম্প্রতিক নিদর্শন দেখেও মনে হয় তেলরঙ ব্যবহারে শিল্পীর হাত এখনও কাঁচা। অধিকাংশ রচনাই প্রতিকৃতিজাতীয়, তবে কয়েকটি মন্দ লাগেনা, যেমন এ লেডি, দাদিমা, প্রসাধন ও স্কেরমেট। প্রদর্শনীর অন্যান্য ছবির মধ্যে রেওয়াজ-এর নাম করা উচিত।

✻

শিল্পী রাখাল দাস অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে যে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন তার অধিকাংশ ছবিই ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত পথপ্রদর্শনীতে দেখা গেছে। সুতরাং এ বিষয়ে নতুন করে বলার কিছুই নেই। তবে প্রদর্শনীতে কয়েকটি সাম্প্রতিক রচনা দেখা যায়, সেগুলি মহাভারতের বিভিন্ন পর্ব অবলম্বনে রচিত। অবশ্য এর ব্যত্যয় আছে। শিল্পীর পূর্ববর্তী প্রদর্শনীতে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার অনিশ্চয়তাই মুখ্য বিষয়বস্তু হিসাবে প্রতি-ফলিত হয়েছিল। সাম্প্রতিক পরিস্থিতির সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ পরিণতি ও তার সমাধান-কল্পেই হয়ত শিল্পী মহাভারতের বিশেষ পর্বগুলির শরণ নিয়েছেন। তবে এটি নিতান্তই শিল্পীর ব্যক্তিগত চিন্তাধারা ও সেটিকেই তিনি রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। শিল্পীর এ রচনাগুলি আলংকারিক। লাল রঙের কাগজের ওপর তিনি ক্ষুদ্রাকারে বিভিন্ন পর্বলিখিত মূল বিষয়গুলি এঁকেছেন ও সবুজ প্যাস্টেলে বিরাট রচনা ক্ষেত্রটি ভরে ফেলেছেন—ফলে লাল কাগজের ছোট ছোট মূর্তিগুলি রিলিফের মত আত্মপ্রকাশ করেছে। কয়েক স্থলে রচনাক্ষেত্রের নিম্নভাগেও তিনি ছবি এঁকেছেন। সবুজ রঙের পরিপ্রেক্ষিতে রাজস্থানী মিনিয়েচার জাতীয় রচনাগুলি একটি বিশেষ রূপ গ্রহণ করেছে। বর্তমান প্রদর্শনীর এটিই বৈশিষ্ট্য। এই প্রসঙ্গে কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের রথস্থাপনা ও একান্ত বিষণ্ণ ও ভগ্ন-মনোরথ অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণের উৎসাহদান উল্লেখযোগ্য।

—চিত্রপ্রিয়

হগ সাহেবের বাজার

মার্কেটের মাঝে রয়েছে পুরোনো কামান

নূতন বাজার নূতন হবে
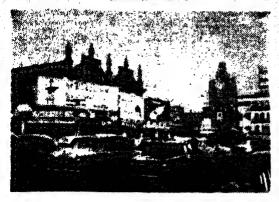
আমাদের কলকাতা, আমাদের সাধের শহর। তাই নিয়ে কত শত মন্তব্যই না শুনি। হয়তো অনেকটা সত্যি। তবু ভাল লাগে না। সম্প্রতি সাময়িক সংবাদে কলকাতা যেন শখের খেলনা। ছোট ছেলের মত তার হাত পা ভেঙ্গে অস্থি কুড়ে ফেলতে বাধছে না কারও মনে। আবার এদিক ওদিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যেখানটা ভেঙ্গেছে, যতটুকু রং চটেছে তাই নিয়ে তাড়িয়ে তাড়িয়ে বচসা আর রসরচনাও চলছে। সংবাদপত্রের একটিতে তো আবার Oh Calcutta বলে সেদিন এক প্রবন্ধ পড়লাম। Oh Calcutta এক মার্কিন ছবির নাম। ছবিটির সঙ্গে এই শহরের সম্বন্ধ নেই। তবু বোধ হয় লোকের মনে ধরেছে। কালকুত্তেকে কলকাত্তা বানিয়ে নিয়েছে। আমরা কিন্তু এখনও স্বপ্ন দেখি কলকাতা আবার ভারতবর্ষের সেরা শহর হবে। তাই কিছুদিন আগে যখন খবর শুনলাম নূতন বাজারের নূতন রূপ হবে, মনটা আনন্দে নেচে উঠলো। কর্পোরেশন পরিকল্পনা করছেন নূতন বাজার সাজ বদলাবে, কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য মিলবে মেওয়া পট্টির উপরে রণ-পার মত করে Stilts এর উপরে হবে মস্ত হোটেল। হোটেলে আসবে আগন্তুক। বাজার তাদের হাতের কাছে, এমন বাজার যেখানে আলপিন থেকে বাঘের বাচ্চা মেলে। সমস্ত এলাকা হবে পরিচ্ছন্ন এক আধুনিক বাজারের হাল ফ্যাশানী সংস্করণ। ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান পরিকল্পনায় নানা ভাবে গবেষণা হয়েছে মার্কেটের কি ভাবে উন্নতি হ'তে পারে। গবেষণার রিপোর্টের সাহায্য নিয়ে এবার বুঝিবা সত্যিই কিছু হবে। ইতিহাসের কেতাবে বাজার আর পসরায় মেয়েদের অংশ গ্রহণ যাই থাকুক, আজকের পরিপ্রেক্ষিতে বাজারের বারো আনাই মেয়েদের কেনাকাটা এবং সর্বাধুনিক ভূমিকায় তারা বেচার ব্যাপারেও কম নন। কাজেই নূতন বাজারের নূতন ভবিষ্যতে বাঙ্গালী হিসাবে ও কলকাতাবাসী হিসাবে আমাদের সম্মর্যাদা বাড়বে তো বটেই, তার উপর মহিলা হিসাবে বাজারের নূতন রূপ দেখবার জন্য আমরা আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করবো। এখন পরিকল্পনা অন্যান্য বহু পরিকল্পনার মত না ফসকালেই হয়।

কলকাতা শহরে নগর পালিকার অধিকারে যতগুলি বাজার আছে তার মধ্যে নূতন বাজার, নিউ মার্কেট অর্থাৎ Sir Stuart Hogg Market সবচেয়ে পুরোনো। তারপর এসেছে ল্যান্সডাউন রোড বাজার, লেক বাজার, কলেজ স্ট্রীট বাজার, গড়িয়াহাট, এন্টালী, চিৎপুরের Sir Charles Allen market, পার্ক সার্কাসে মাধববাবুর বাজারও কর্পোরেশন নিয়েছে, সর্বাধুনিক নিউ আলিপুরের বাজার নিউ আলিপুরের নূতন বড়লোকদের এলাকায় নূতনত্ব নিয়ে এসেছে তবু সেই হগ সাহেবের বাজারকে হারাতে পারেনি। হগ সাহেবের বাজারের নামও New Market রয়ে গেছে!

হগ সাহেব ছিলেন তখন কলকাতার পুলিস কমিশনার। পুলিস কমিশনাররাই তখন পৌরশাসনের কর্তাও হতেন। ১৮৭৪ সালের জানুয়ারী মাসে হগ মার্কেট খোলা হ'লো। হইহই ব্যাপার। মার্কেট সুপার মতলবে মুর্শেদ সাহেবের বই থেকে যা টুকেছি সে হিসাবে স্যার স্টুয়ার্ট হগ সাহেব ছিলেন Chairman of the peace of the Justices। জাস্টিসেস অফ দি পিসরা উদ্বোধন করলেন বিকিকিনির এই নূতন বাজার, নাম তার তাই হগ সাহেবের নামে দিলেন। হয়তো হগ সাহেব অনেক কিছুই ছিলেন একাধারে।

হগ সাহেবের বাজারের স্থপতি ছিলেন R R Bayne। ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলের তিনি কর্মচারী ছিলেন। রেল তো আর তখন সরকারী হয়নি। কোম্পানীর আর্কিটেক্ট নকশা পেশ করেছিলেন আরও পাঁচজনের সঙ্গে। তাঁরটা শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়। শ্রেষ্ঠত্বের কদর হিসাবে ১০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। দারুণ সম্মান হিসাবে বেনসাহেব তা গ্রহণ করেছিলেন। ভেবে দেখুন হগসাহেবের বাজারের শতাব্দী উৎসব করার দিন এসে গেছে। 'একশ' বছর আগে হাজার টাকার কত মূল্য ছিল! ঠিকাদার ছিলেন বার্ন কোম্পানী। জমি-সংগ্রহ করা থেকে ইমারত শেষ করা পর্যন্ত খরচা পড়েছিল ৬৫৫,২৭৭ টাকা। মাত্র সাড়ে ছয় লাখ টাকার মত। ঐ এলাকায় একখানা বাড়িও এ টাকায় আজ হয় কিনা সন্দেহ। ইমারতের মধ্যে ৮৬,০০০ বর্গফুটের বেশী ভাড়া দেবার মত দোকান ঘর সব ছিল।

১৮৭১ সাল থেকেই খাদ্যদ্রব্য, শাক-সবজী বিক্রির মত ব্যবস্থা হগবাজার এলাকায় আরম্ভ হয়েছিল। তখন ধর্মতলা বাজার ছিল ঐ সীমানার সবচেয়ে বড় বাজার। চৌরঙ্গী আর ধর্মতলার মোড়টা জুড়ে এই বিরাট বাজারের স্বত্বাধিকারী ছিলেন হীরালাল শীল। সারা কলকাতাতেই সম্ভবত এর চেয়ে বড় বাজার ছিল না। হীরালাল বাবুর বাজার বজায় থাকতে হগসাহেবের বাজার সুবিধা তেমন করতে পারছিল না বলেই হোক বা তেমন একটা আশংকা থেকেই হোক, ১৮৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেই এ বাজার পৌরশাসন নিয়ে নিয়েছিল। কিছুদিন বাজার হিসাবে রেখে ১৮৮৭—১৮৯১ সালের মধ্যে বাজার ভেঙ্গে ২২ টুকরো জমি নীলাম বিক্রি করে দেওয়া হয়। হীরালালবাবু বহু দরদাম

করে সাত লাখের বেশী পাননি। জমি বিক্রি করে কত উঠেছিল নীলামে জানা যায়নি কিন্তু হগ সাহেবের বাজার সবমিলে হয়ে গেল সেরা বাজার সেদিন, বোধ হয় আজও ভারতের সবচেয়ে বড়বাজার ও একত্র এত জিনিস মনে হয় সমগ্র এশিয়াতে আর কোথাও পাওয়া যায় না। একত্র তো বটেই তার উপর কত ভিন্ন ভিন্ন ধরনের পণ্য তার ঠিকানা নেই।

এরপর ১৯০৭ সালে পূব দিকটা জুড়ে যে মাংস, মাছ আর মুরগী ইত্যাদির দোকান সব আছে তা তৈরি হয়। সঙ্গে সঙ্গে কর্মচারীদের জন্য ঘরবাড়িও হয়। এখনও সেই বাড়িতে থাকেন বহু কর্মচারী, এমন কি ঐ কোয়ার্টারে বাস করে অন্য বাজার তদারক করেন কেউ কেউ। এ সুযোগে বাজারের বিভাগ হলো নূতন করে। এক এক ধরনের পসরা এক এক দিকে রইল। অবশ্য দোকানঘরের ভাড়া গেল বেড়ে।

পাখির জন্য যে বিরাট অংশ রয়েছে যাতে ময়না মুনিয়া ময়ূর থেকে বড়দিনের টার্কি, গিনি ফাউল সব মেলে তা তৈরি হয়েছিল '১৫ সালে। শাক-সবজীর মেলা ছিল উত্তর দিকে। বি ব্লক বা মেওয়াপট্টি যার উপর হোটেলের পরিকল্পনা তা একবার আগুনে পুড়ে যাওয়াতে নূতন করে বানানো হয়। ১৯১৫ সালে হগবাজারের মূল্য দাঁড়ায় ২৫ লাখ টাকা। আরও ক্রমশ বেড়ে উঠে ঝলসিয়ে দিয়েছিল কলকাতার রূপকে। আজ আবার অর্থনৈতিক অবসাদে আক্রান্ত কলকাতা, রাস্তাঘাট আবর্জনাময়, হগবাজারেও তার রেশ প্রতিফলিত। তবু আয়তনে, আয়-ব্যয়ে শহরে অদ্বিতীয়। ৩০টি বিভাগ ২২০০ দোকান, তার মধ্যে ১৪০০ স্থায়ী ও বাকী অস্থায়ী, কর্পোরেশন ভাড়া পান ১৪৩,০০০ টাকা মাসে, ৫,০০০ কর্মচারী কাজ করেন, তার মধ্যে কর্পোরেশন কর্মচারী ২৬৪ জন, এবং ৩৫০টি লাইসেন্সপ্রাপ্ত মুটে আর কোন বাজারে বা ভারতবর্ষে আছে?

এককালে বাজার বলতে জমিদার বা অধিকারীর বাজার বোঝাতো। সামন্ততন্ত্রের যুগে প্রায় সর্বত্রই সেকালে এমনই প্রথা ছিল। ল্যাটিন শব্দ Mercatus থেকে মার্কেট কথাটির জন্ম। প্রায় সমস্ত ইউরোপীয়ান ভাষায় বেচাকেনার স্থানকেই Mercatus শব্দের থেকে নেওয়া শব্দে বর্ণনা করা হয়। ইংলণ্ডেও জমিদারের অধিকারেই বাজার ছিল। কখনও বা জমিদারিত্ব গীর্জার অধিকারী মশায়ের ভাগ্যে জুটতো। উর্সস্টার শহরের বাজারে ১৮৭৩ সালে আর্ল অর্ধেক আয় নিতেন আর ধর্মযাজককে দিতেন অর্ধেক। পরে পৌরশাসনের বাজারের জন্ম কোথাও কোথাও হয়ে যায়। ফরাসী বিপ্লবের পর ফ্রান্সে বাজার আর জমিদারীর রয়নি। আমেরিকার বাজার মেলে প্রতিযোগীতার ভিত্তিতে। আইন, কানুন বা অধিকার নয়। কড়া প্রতিযোগিতায় কে কাকে টেক্কা দেবে এই ভাবনা। আমাদেরও তো বেশীর ভাগ বাজার জমিদারী কানুনে চলতো। এখন ক্রমশ নিয়ম পালটাচ্ছে এবং সময়োপযোগী আধুনিকতার সংযোগ হচ্ছে। বিদেশের বাজার ভেঙ্গেগড়ে ঘরণী ও তাদের সঙ্গের শিশুদের অনায়াসে চলাফেরার চমৎকার ব্যবস্থা হচ্ছে। গাড়ি পার্কিং-এর ব্যবস্থা এমন যে গাড়ি চাপা পড়ার ভয় নেই। হগবাজারে অসুবিধা এই যে আশেপাশে বাড়বার স্থান নেই। যদি কিছু উপরের দিকে বাড়ানো চলে তবে হয়তো নিঃশ্বাস নেবার মত স্থান হতে পারে। যথেষ্ট শৌচাগার, পাবলিক টেলিফোন ইত্যাদির ব্যবস্থা তো বোধ হয় এখনই হতে পারে। মেয়েরা যাতে অনায়াসে বিনা আশংকায় বাজার হাট করে ঘরে ফিরতে পারেন এমন সুরক্ষিত বাজার করা কঠিন নয়। যানবাহনের উন্নতি দরকার। অন্যবাজারে দরকার নেই তা নয়, তবে হগসাহেবের বাজার যে আমাদের মস্ত গর্বের জিনিস। যদি কেউ বলে দিনদুপুরে সেখানে ছিনতাই হয় তবে কি আমাদের ভাল লাগে?

শ্রীমতী

জাতের মেলা এবং শাঁখারী সম্প্রদায়

দক্ষিণ রায়পুরের 'জাতের মেলা'। জাতের মেলা মানে বিভিন্ন জাতির লোকদের মেলা। মেলা শব্দের অর্থ মেলমেশা। মেশামিশি। হরেক জাত গোত্র বর্ণ সম্প্রদায়ের লোকজন আসে এখানে। একশো বছরের উপরে এই মেলার প্রতিষ্ঠা—কাজেই তখনকার দিনে মুচি মেথর চাঁড়াল খাদাল—হিন্দু মুসলমান একাকার হয়ে মিশে যাওয়া—আনন্দ-উৎসব করার নাম 'জাতের মেলা' হলে অর্থহীন হবে কেন? আসলে মাঘ-উৎসবের মেলা। সারা মাঘ মাস ধরে চলে। পৌষ-সংক্রান্তির দিনে আরম্ভ হয়। প্রতিষ্ঠাতা নাকি নিমাই চাঁদ দাস নামের এক মাথায়-পাগলাটে ছিট-থাকা কোনো এক নমঃশূদ্র লোক। রায়পুরের হুগলী নদীর চরে সে একা একা ঘুরে বেড়াত। বিরাট চর ছিল তখন। বন-ঝামা, হরকোচ, ফণী মনসা আর গেঁয়ো গাছের ঝোপজঙ্গল ছিল ওখানে। নিমাই চাঁদ গঙ্গাঠাকুর এনে পৌষ সংক্রান্তির দিনে পুজো করে। সে মারা গেলে রায়পুরের হাটের লোকরা মিলে ওই ঠাকুর তোলে। জেলেরা আর পালেরা যোগ দেয় তাতে। রক্ষাকালী ঠাকুরও তোলা হয় তার সঙ্গে। বিরাট জেঁকে যায় মেলা। আগে রায়পুরের এক ফটকে পোলের কাছ থেকে গদাখালির কোল পর্যন্ত বিরাট জায়গায় মেলা বসত। এখন চর ভেঙে চলে গেছে নদীগর্ভে। মেলাটিও যায় যায়। গ্রাম জীবনে মেলার উপকারিতা অনেক। কিন্তু মেলাকে সকলে মিলে চালাতে পারা এখন কঠিন। ধনী নির্ধনের লড়াইয়ে সমাজদেহ ছিন্নভিন্ন। যোগ্যতাসম্পন্ন উচ্চমানের ব্যক্তিরা আজ হতমান। বুদ্ধিহীন দরিদ্র ব্যক্তিরা পেটের জ্বালায় বিপ্লব চেয়ে বুক চাপড়াচ্ছে। মাঝখানে কালের কালো ঘোড়ায় সমাজ-জীবনের সবুজ ঘাস ফসল খেয়ে যাচ্ছে।

মনে পড়ে ছেলেবেলার কথা। পাড়ার ছেলেমেয়েরা জুটে গা-ঢাকা অন্ধকার নামলেই আমরা প্রায়ই পালিয়ে যেতাম রায়পুরের মেলায়। বিরাট তাম্বু গেড়েছে সারকাসের। সামনে হাতী উট বাঁধা। ম্যাজিকের তাঁবুর সামনে একটা লোক হরদম নীল লাল কাগজ গিলে চলেছে। পুতুল নাচ হচ্ছে। নদীতে বিরাট গর্জন তুলে আলোর মালা সাজিয়ে জাহাজ চলে যাচ্ছে। বাঁধের উপরে উঠে দেখো চরের তলায় শুধু হোগলায় ছাউনি দেওয়া দোকানপসারীর সারি। নাগরদোলা ঘুরছে ক্রমাগত ওঁ-ওঁ-ওঁ শব্দ তুলে।

কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে নাচছে পুতুল নাচের সখি দুটো। গাঁয়ের বউমেয়েরা তার সামনে ভীড় করে অবাক চোখে দেখছে। কেমন করে কাঠের পুতুল নাচে দেখার জন্যে আমি নাচঘরের ভিতরে গেছি, আমাদের নোদাখালী গাঁয়ের হৃষিকেশ অধিকারী পায়ে ঘুঙুর বেঁধে পুতুল নাচাচ্ছে। তালে তালে তবলা হারমোনিয়াম বাজছে। হৃষি মামার কোমরে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা বাঁশের চোঙা। তাতে এক মানুষ উঁচু হোগলার বেড়ার উপরে নাচানো পুতুলের শাড়ি-সায়ার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে সে দড়ি টেনে টেনে হাত নাড়াচ্ছে মাথা ঘোরাচ্ছে। পুতুলকে শোয়াচ্ছে, তুলছে—তার সঙ্গে নিজে ঘুর-পাক খাচ্ছে। পুতুলগুলো মাত্র বুক পর্যন্ত তৈরি। মনসা কাঠ কুঁদে তৈরি করা হয়। 'বেরসো' কাঠ যেমন হয়। সারি সারি ভীম, দুর্যোধন, রাবণ রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, হনুমান, কত কি পুতুল দাঁড় করানো আছে। হৃষি মামার 'হরিশ-চন্দ্র', 'মনসার ভাসান', 'রাম-রাবণের যুদ্ধ', 'সোহরাব রুস্তম'—কত সব পালা মুখস্থ। সে চিৎকার করে পালা বলত—সং দিত। হৃষি মামা বিচিত্র লোক। সে ভাল মন্তর-তন্তর জানে। সারকাস জানে। যাদুমন্ত্র বলে মানুষকে রাক্ষসে পরিণত করে তার সামনে হাঁস দিলে সে কাঁচাই ছিঁড়ে-খুঁড়ে খেয়ে ফেলত! মানুষের জিব কেটে নিয়ে জোড়া দিত—ভাল লাঠি খেলা, তলোয়ার খেলা জানে। এখন দেখি সেই হৃষি মামা সাধু হয়েছে। পরনে গেরুয়া কাপড় চোপড়। শিষ্যবাড়ি থেকে একটা রেডিও সেট এনেছে—সেইটা বগলদাবায় নিয়ে খড়ম পায়ে দিয়ে চওড়া মতো একটা ঘড়ি হাতে বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার শিষ্যরা কেউ আছে লন্ডনে কেউ নিউইয়র্কে। চিঠি আসে, আমাকে পড়ে দিতে হয়! মুড়ির দোকান করেছে। রোজ এক 'ঠেক' মুড়ি বিক্রি হয় নাকি তার।

পুতুল নাচের ঘরের মধ্যে আমি, আর আমার মামাতো বোন জোবেদা খাতুনের কাণ্ড শোন—সে কাঁদতে কাঁদতে মেলা কমিটির লোককে বলে দিয়েছে, আমি নাকি হারিয়ে গেছি মশায়! তারা চিৎকার করে আমার নাম ধরে ডাকছে! মামাতো বোনের আক্কেল বলিহারী! তাকে খুঁজে বার করতে সে চোখ মুছে ফেলে হেসে হাত

ধরলে। তার মুখ লাল হয়ে গেছে। বয়স তার চৌদ্দ হলে কি হবে, গাঁয়ের মেয়ে, ভীষণ ভয়তরাসে, দু মাইল দূরের এত বড় মেলায় এসে সে বোকা বনে গেছে!

নহবতখানায় শানাই বাজছে। ভীষণ দর্শন তাড়কা রাক্ষসী। দ্বারপাল দুইজন গদা ঘাড়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিশাল বিস্ফারিত চোখ। আর ঝাঁটার মতো গোঁফ। যাত্রার সাজঘরে উঁকিঝুঁকি মারছে ছোঁড়ারা। নটরাজ ফণীবাবুকে সবাই দেখতে চায়। দোকানে দোকানে পরোটা ভাজা হচ্ছে—চাপড়ানো হচ্ছে তাওয়ার উপরে। ঘিয়ের গন্ধ। আলুর দম কড়ায় জবা ফুলের মতন লাল টকটক করছে। সারি সারি ডিম ভাজা গোটা গোটা! গোটা গোটা বড়-চিংড়ি ভাজা। সমুদ্রে-কাঁকড়া ভাজা। মাংসের তরকারী। লোকজন খাচ্ছে সব। সারি সারি মাট-কলাইয়ের দোকান।

ঠাকুর দর্শন করুন এবার। জুতো খুলে 'পেন্নাম' করুন। দক্ষিণমুখী বাঁয়ে গঙ্গা দেবী। ডাইনে রক্ষাকালী।

গঙ্গাদেবীর রঙ পাটকিলে বাসন্তী। সাদা শাড়ি পরনে। সুন্দর মনোহর আয়ত চক্ষু। তাঁর চার হাতে শঙ্খ পদ্ম চক্র ধনুর্বাণ। দেবীর দক্ষিণে ঘন শ্যামবর্ণ বিষ্ণু। তাঁরও চার হাত—হাতে হাতে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম। বাঁয়ে চতুর্মুখ ব্রহ্মা। গৌরবর্ণ। হাতে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম। দক্ষিণে নিচে মহাদেব। ডম্বরু হাতে। মহাদেবের চোখ আর ভুঁড়ি দেখবার মতো। বাঁয়ে অনন্ত মুনি। গঙ্গার বেণধারী। সবার নিচে মকর মাছের বাহনে চড়ে মাথে শাঁখ বাজিয়ে চলেছেন ভগীরথ।

রক্ষাকালীর রঙ ভীষণ কালো। দু পাশে জয়া বিজয়া। নিচে মানসিকের ঠাকুর দান করে গেছে ভক্তরা।

পৌষ সংক্রান্তির দিনে গঙ্গাপুজো হয়। মাঘ মাসের প্রথম সপ্তাহে হয় কালী পুজো। কালী পুজোয় বলি দেওয়া হয় ছাঁচি কুমড়ো, আখ আর পাঁঠা। মহাদেবের হয় চতুর্থ প্রহরে। এখন পূজারী আছেন ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। মেলার এবং বছরের সেক্রেটারী ছিলেন রায়পুর অঞ্চলের বিত্তবান ব্যক্তি শেখরাম জানা মশাই। তাঁর ছেলেরা কেউ বা এম-এ পাশ করে মাস্টারী করছেন, কেউ পাশ করেছেন এক আধ বি এ। তাই মশায় এখন বড় বড় নানান কাজ নিয়ে জড়িয়ে পড়েছেন—মেলা দেখবার তাঁর সময় নেই। আর ঠিক মাইল চারেক এক মাইল জমি নেই। জমি কি আর আছে যে দেখবেন। চারদিকে নদী গ্রাস করে নিয়েছে। তবু প্রতি বছরেই উৎসব হচ্ছে। এ বছর সেক্রেটারী ছিলেন তারাপদ মালিক।

পাঁচ রাত যাত্রা হয়ে গেল। রায়পুরের দল বই করলে 'তৃষ্ণা', জোগাড়িয়ার দল 'রণভেরী', উত্তর রায়পুর নাটক করলে 'ফেরিওয়ালা', মনসাড়ির দল গান করলে 'সূর্যতোরণ', সোনিয়া গ্রামের দল করলে 'চণ্ডীতলার মন্দির'। একজন মুসলমান ছোকরা বললে, 'বা এই কম-লাইট' (লাইট) হয়েছে। মন্দ কথা মন্দ করে নিকো।'

আমি খোঁজ খবর নিচ্ছি আর মেলা-দেখতে আসা আমার সঙ্গের একাদশী-খালিকাটি বিরক্ত হচ্ছে। সে ফড়ফড় করে হলদে প্রজাপতির মতন উড়ে বেড়াতে চায়। হাত ধরে টানছে কুসুম-কোরকিনী। তাকে বাড়িতে পৌঁছে দেবার কথা। শ্রীমতী গিন্নীর হুকুম ঃ সন্ধ্যার পর যেন নদীর ধার দিয়ে বিরলাপুরের আস্তানাটার উপর দিয়ে তাকে একা না ছাড়া হয়। তার

হাতে ছিল একটা ব্যাগ ভর্তি আণ্ডালে আণ্ডালে দানাভরা সিম। তার দিদি তুলে দিয়েছে আমাদের ঝাঁদলা থেকে। মেজ বোন শ্বশুর বাড়ি থেকে বাপের বাড়ি এসে আছে এখন। তার নাম খরিশ কেউটে। সে নাকি খুব 'সিমদানা' খেতে ভালবাসে। পায়ের উপর পা ছড়িয়ে বসে খুব খাবে আর বরের কথা ভাববে! সিমের ব্যাগটা একটা দোকানে রেখে দিলাম।

একটি পাথর বাটির দোকানে এলাম। দোকানদার ওড়িয়া। নাম নবকৃষ্ণ মাইতি। বাড়ি বালেশ্বর। আর একজন বুড়ো দাদা বসে আছে সঙ্গে। বড় পাথর বাটির দাম পাঁচ টাকা, সাত টাকা। একটা খদ্দের গৃহিণী তার বউমাকে বললে, 'পান্তাপান্তি খেতে কী যে ভাল এই পাথরে। সহজে ভাঙে না। একটায় এক যুগ চলে। ছোট বাটিগুলোর দাম কত গো? আট আনা দশ আনা!'

'এ সব কোথায় তৈরি হয় মাইতি মশায়?'

'আমাদের উড়িষ্যায় 'বৌলপোড়ি'তে পাথরের কারখানা 'ফ্যাক্টরী' আছে।' [illegible] দাদা ভাইয়ের সংলাপ : [illegible] [illegible] কাটিবে? [illegible] কাটি [illegible] আমার সঙ্গে আবার বাংলা কথা : [illegible] থেকে পাথর এনে সমারী ফ্যাক্টরীতে তৈরি হয়। তারা সেখান থেকে পাইকারী কিনে এনে বেচে। দেশের মেলায় মেলায় ঘুরে বেড়াই। এখান থেকে যাব শ্রীরাম-পুরের [illegible] মেলায়। এসব জিনিস [illegible]। হিন্দুর বাড়ীদের [illegible]। কিন্তু হিন্দুরা আধুনিক হচ্ছে বলে সেখানে পাথর বাদ দিয়ে কাচ, চীনামাটি, কলাই করা টিনের ডিস-কাপগ্লাস সৌখিন জিনিস আমদানি হচ্ছে। ভাল বিক্রি নেই [illegible]। [illegible] টাকায় এই মেলায় মাটি ভাড়া নিয়ে বসেছি। দশ দিনের বাড়ি টাকা ভাড়া দিতে হবে। রোজ কুড়ি পঁচিশ টাকাও বিক্রি হয় না।'

'ঐ সব অত হরিতকী কি হবে? খাও নাকি?'

'না। ওতে রঙ হয়। হরিতকী ভিজিয়ে জ্বাল দিয়ে তাতে হিরাকস মিশিয়ে আলকাতরার মতন কালো রঙ তৈরি করি। ঐ রঙ দিই নতুন সানাতে এইসব পাথরের পাত্তরে। কালো কুচকুচ করে। এর একটু বেশি দাম।'

শ্যামলিকা বিরক্ত। হিন্দুদের ঐ পাথর দেখলে তার নাকি ঘেন্না করে। ঘেন্না করে শাঁখা দেখলে। এই বিদ্বেষ কোথা থেকে এল অতটুকুন মুসলমানীটার মধ্যে? সে বললে, 'আমি বাড়ি যাই।'

বললাম, যা তবে শালী, কেটে পড়, আমার কাজ আছে, দেরি হবে। আর রাত হয়ে গেলে তোকে একা নির্জন পথে নিয়ে যাবার সময় আমার এই ভদ্রলোক চেহারাটা হঠাৎ বন-মানুষ হয়ে উঠতেও পারে।'

ছোট বাটিগুলো দাম কত গো

সে ঠিক বুঝল। 'ঈ-ঈ-ঈঃ!' বলে জিব বার করে ভেংচি কাটল। বললে, 'তবে কাচের শখ কিনে দাও, আর কাঁচের চুড়ি, দুটো বালা। একটা মোটর গাড়ি!'

দুটো টাকার মধ্যে তার জিনিসগুলো কিনে দিতে অনেক বেলা থাকতেই সে সিমের ব্যাগটা হাতে নিয়ে চলে গেল। একটু এগিয়েও দিলাম। বলে গেল, রবিবার আসব আলো চাল নিয়ে। এখন দিয়ে 'আলো' ধান ভানাতে যেতে হবে পাড়ার কলে।' নবান্নের দিনে পিঠে-পানি হবে তার যোগাড় হচ্ছে তাহলে। শালীটি পিছু ফিরে একবারও তাকালে না। মেলার দিকে আবার ফিরছি। ডান পাশে হুগলী নদী। নদীতে এখন ভাটা। থাক থাক নরম চিকচিকে পলিমাটির স্তর দেখতে আমার বড় ভাল লাগে। হঠাৎ চোখ পড়ল বাঁ পাশে জয়দেব পালের পাকা দেওয়ালটার গায়ে ছোটবড় ট্যারা বাঁকা বাংলা হরফে সাদা চুন দিয়ে লেখা বিখ্যাত নির্বাচনী পোস্টার :

পুঁজিপতির দালাল কংগ্রেস
শ্রমিক ও কৃষক রাজকে কবর দিন
কায়েম কর।
শিক্ষিত বর্মনকে
এই চিহ্নে ভোট (কাস্তে হাতুড়ি তারা)
দিন।

দেওয়ালের গায়ে জায়গা হয়নি মশায়! সে তো জয়দেব পালেরই দোষ! দেওয়ালটা বড় করেনি কেন? কৃষক শ্রমিকদের ছেলেরা যতটুকু লেখাপড়া জানে তাই দিয়েই তাদের বাপদাদাদের কবর তো দিয়েছে। ওরাই আবার একদিন 'বিপ্লব' আনবে দেখবেন। কার মুণ্ডু তখন কে নেবে তার ঐ রকম ঠিক থাকবে না!...

মেলায় ঢুকবার মুখেই প্রথম দোকানটা দিয়েছে চকমানিক গ্রামের বলাইচাঁদ দাস। পরোটা ভাজছে তার ছোকরা ছেলেটা। ডিম ভাজা, কপির তরকারী, মাংসের তরকারী। তেমন বিক্রি নেই। আগে কালাজ্বরে দু'বছর পড়েছিল বলাই। তখন মেয়ে-ঝি-চাকরানীরা দোকান ডাকে তুলে দিলে। ৯ জন প্রাণী সংসারে। একেবারে আধপেটা। সংসার চলে না। জনখাটতে হয়।

নাগর দোলা!

এই নাগরদোলা দেখলেই আমার পূর্ব স্মৃতিটা মনে পড়ে। তিন ফটকে বাজারের পতিতারা মেলা দেখতে আসত রংচং করে। কেউ উঠেছিল নাগর দোলায়। নাগরদোলা বনবন করে ঘুরছে। আর একটা ভীতু মেয়ে...অরে রাম রাম! সকালের গায়ে মাথায় যেন বমন হয়ে গেল!...

এখনকার নাগরদোলাটির মালিক হল ঝাউড়িয়া অধিবাসী মুসলমান গোবর্ধন মল্লিক। বিশ মণ করে ভারী পোঁতা খুঁটি দুটো শাল কাঠের। আয়রন কাঠের হলেই নাকি ভাল হয়। শালের মোটা তক্তায় পদ্মের চিহ্নের মতো নাগর দোলার পাকি। চেয়ারগুলো সেগুনের। সব নিয়ে ভারী ৫০।৬০ মণ হবে। রোজ কত টাকা উপায় হয়? ২০।২৫ টাকা। যারা ঘোরাচ্ছে তাদের রোজ তিন টাকা। নাম ইউনুস, ফরহাদ, জামাল, রহিম বক্স। ভাড়া দিতে হয়েছে মেলা কর্তৃপক্ষকে ৩৫ টাকা। এই নাগরদোলাটা তৈরি হয়েছে গত বড় পুজোর সময়। টেঁকে বছর কুড়ি-বাইশ।

দমদম থেকে হরিপদ বিশ্বাস এসেছে কাঁচের বক, বাঁশি, বল, মুখোশ, খেলনা ইত্যাদি নিয়ে। এসেছে সোডাজলের কল নিয়ে ডায়মণ্ডহারবার থেকে দুলাল মণ্ডল। শাকালু, বিলিতি কুল, কাঁপ আলু আনাজ বিক্রি হচ্ছে। মণিহারী দোকান বসেছে সারি সারি। রাজ্যের মেয়েদের ভীড়। ঠেলে ঢোকা যায় না। এর মধ্যে প্রেমিক-প্রেমিকারাও এসে মিলিত হয়েছে মেলার অবাধ মেলামেশার অভীষ্ট স্থানে।

গাঁ-ঘরের মেয়েরা স্বভাবতই আলু-থালু। পরিবেশ অসচেতন। তাদের গায়ে গা ঘেঁষে ধাক্কা দিয়ে রোমান্টিক মন নিয়ে চোরের মতন ঘুরছে কিছু কিছু রঙিন চশমা আর চোঙা প্যাণ্ট পরা মস্তান ছেলেরা। কলেজে পড়া ছেলেমেয়েরাও আছে। স্কুলে-পড়া পাঁচ ছটি মেয়ে মণিহারী দোকান থেকে কি একটা নিয়ে দাম না দিয়ে চলে যাচ্ছিল, দোকানদার ডাকলে ছোঁড়ারা হই হই করে দুয়ো দিতে থাকে। একটি ডাগর মেয়ে নাক চুলকোতে চুলকোতে আড়চোখে একটি তরুণকে প্রলুব্ধ করতে দেখা যায়।

কাঠের গামলা বারকোষ বিক্রি করছেন পূর্ববাংলার লোক—অনিলকুমার দে। বিক্রমপুর-ঢাকার লোক তিনি। একটা ১৯½ ইঞ্চি বেড় গামলার দাম ৩৫ টাকা। ১৮ ইঞ্চি বেড় ১৪ টাকা। বারকোষ ২৮ ইঞ্চি বেড় ১৮ টাকা। ১০ ইঞ্চি বেড় ৩ টাকা। সব আম কাঠ থেকে তৈরি। কলকাতার মানিকতলায় গ্রেট ইণ্ডিয়া স (মিল) মিলে তৈরি হয়। মিলের মেশিনে অথবা বাটালিতে বেড় মাল তৈরি করা হয়। কর্মীরা সবাই পূর্ববঙ্গের লোক। পিঁড়ে, বেলুনী, সন্দেশ তৈরির ছাপা ও ডাইস বিক্রি হচ্ছে।

আজ বিজয়া, তাই ভীড় একটু বেশি। মুচিপাড়ার দুর্যোধন সরদার তার ঢোল কাঁসি নিয়ে এসে হরদম বাজাচ্ছে ঠাকুরদালান সামনে। ঢোলের বুলি সব অশ্লীল পাঁচালীতে ভরা অশ্লীল ছড়া বা কাব্য আর কিছু নেই। শুনবেন? না, লেখা যাবে না। জনগণের লোককথা কি সব লেখা যায়? তাহলে জেল জরিমানা দুই হতে পারে অশ্লীলতার দায়ে। ইংরিজি বা ফরাসী সাহিত্য হলে খানিকটা চেষ্টা করা যেত। বাংলা সাহিত্যের বাজারে শালীনতার প্রাচীন প্রাচীর এখনও বাধা আছে। কিন্তু জীবনে নেই। আমার মনে হয় সেখানের মুখোশ সাহিত্য সোনা চকচকে তার নিচেই গ্রাম্য বাঙালির মন আছে আমি জীবন-চিত্রের কারিগর। তাই সদাই বুক চিপ চিপ করে কখন সেই চোরাদহে হঠাৎ গলা পর্যন্ত এক কোমর ডুবে যাব! অতএব ঢোলের বুলি বলে দরকার নেই। ওই গাদুম গাদুম শব্দ করে বললেই বাবুরা বুঝে যাবেন। [কিন্তু সুনীতিবাবু (ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়) বোধহয় এমন নীতি মানেন না। বলেন: কাজের ভাষা, গালাগালি, কবিগান, তরজা, ভাটিয়ে নাচের গান, ঢোলের বুলি, মন্ত্র, গ্রাম্য ছড়া, পাঁচালী সব লিখে দিন। 'দেশ' পত্রিকা ছাপতে না পারলে বইয়ের মধ্যে দিয়ে দেবেন।' কিন্তু অশ্লীলতার দায়ে কেসে পড়লে আমি বিচারককে সুনীতিবাবু উপদেষ্টা বলে জানাব কিনা এখনো জানা হয় নাই।] যা হোক, দুর্যোধন সরদার আমার অনেক কালের চেনা ঢুলী। আমি ভূমিষ্ঠ হতে সে নাকি আমাদের বাড়িতে এসে [ইমাম বাবাজীর অনুপস্থিতিতে] দু'হাত বাজিয়ে গিয়েছিল ঐ খারাপ খারাপ বুলির শব্দ তুলে! বেটা বুড়ো জাহান্নামে যাক! জীবনের ভিত্তিটাই ঢোলের অশ্লীল বুলিতে ভরিয়ে দিয়েছে। বুড়োর কিন্তু বেশ পাকা হাড়! আজো দু'পাঁট ধেনো মাল টেনে আনন্দে ডগমগ। নেচে নেচে ঢোল বাজাচ্ছে। শানাই কাঁসি চড়চড়ি বাজাচ্ছে তার ছেলে আর নাতিরা। কাঁসি হল ঢোলের সাক্ষী গোপাল। তারও সায় দেওয়ার বুলি আছে। দুর্যোধনের ৩০ টাকা ফুরোন, গঙ্গা পুজো, কালী পুজো আর বিজয়ায় বাজিয়ে যেতে হবে।

মেলার অফিসের সামনে নিশিকান্ত ভৌমিকের দোকানে এলাম তার ডাক শুনে। সে দুধের পাউডার গুলে চা দিলে। তার দোকানে বিচিত্র ছবির বাহার। একটি উলঙ্গ নারী কোলের কাছে তোয়ালে সম্বল করে বিশেষ ভঙ্গিমায় বসে আছে। আর একটি ছবিতে নারীর মুখ, পাখির ডানা, ঘোড়ার দেহ, ময়ূরের ল্যাজ, 'পারমান' থেকে দুধ ঝরে পড়ছে শিবলিঙ্গের উপরে। অলক্ষ্যে হরপার্বতী।

চীনা মাটির পাত্র বিক্রি করতে এসেছেন ৬৫নং পাটবাড়ি লেন, বরানগর কলকাতা-৩৫ থেকে কমরেড জ্যোতি বসুর এলাকার লোক শম্ভুনাথ মান্না। চায়ের কাপ সসার কিনছে হরদম মেয়েরা। বেলঘরিয়া ইণ্ডিয়া পটারীতে তৈরি হয় এগুলো। মহাদেবের ধ্যান মূর্তি, রবীন্দ্রনাথ, নেহরু, গান্ধীজী, রামকৃষ্ণ, সরস্বতী ঠাকুর, রামমোহন, তাজমহল, বিধানবাবু, নেতাজী, সি আর দাশ— এমন কি বাবরি চুলওয়ালা সুদর্শন নজরুল পর্যন্ত— অপূর্ব সুন্দর সমস্ত। এক একটার দাম ১০।১২ টাকা। বেলঘরিয়ার ইণ্ডিয়া পটারী বাঙালী প্রতিষ্ঠান।

মেলার একটি মাত্র মুদি দোকান বাসুদেব মান্নার।

মনসুরের সেখ আবদুল কাশেম বিরাট দোকান ফেঁদেছে ফ্রক, বোঁসয়ার, পেনি, শার্ট, গেঞ্জি, সায়া, ব্লাউসের।

তেলে ভাজার দোকান সারি সারি। নেড়ি কুকুরগুলো নেং নেং করে ঘুরে বেড়াচ্ছে মানুষের পায়ের তলা গলে তাড়া খেয়ে খেয়ে।

ব্রজমোহন অধিকারী, গলায় তুলসীর মালা, পাঁপর ভাজছেন বসে বসে। মটর-কলাই, ঘুঘনি ডাল, বাদাম ভাজা, আলুর চপ, বোমা খুব বিক্রি করছে তার ছেলেরা। ব্রজবাবু খুবই পরিচিত লোক। ৩০ বছর ধরে এই মেলায় দোকান দিচ্ছেন। কখনো নাকি 'লোকসান' যায় নি নিতাইগৌরের কৃপায়। এখনো প্রতিদিন ৭০।৮০ টাকার

বিক্রি হয়। তিনি শুদ্ধচারী একজন বৈষ্ণব। অনেক সময় তাঁকে দেখি হোমিওপ্যাথ ডাক্তার সুধাংশুশেখর মাঝির ডিসপেনসারিতে বসে তাঁর 'অনির্বাণ'জী গুরুর 'বেদ মীমাংসা' গ্রন্থপাঠ শুনতে। আমার মাথায় অত ঘি নেই যে সেই জটিল দর্শনতত্ত্ব বুঝতে পারি। ব্রজবাবুর খাটের তলায় রসুনের একটি মালসা! বললাম, 'এটার কথা। লিখব তো?' তিনি হেসে বললেন, 'না। ওটা এক জাতীয় মশলা!'

'বৈষ্ণবের ঝোলায় কাছিম!'

তিনি জিব কাটলেন!

'রসুনটা বোধহয় হিন্দুমতে সিদ্ধ, পিঁয়াজটা নয়—এই রকম যেন শুনেছিলাম!'

'হিন্দুধর্মে' কোনটা বাদ আর কোনটা সচল তার বিধান দেওয়া কঠিন। চার বেদ, আঠারো পুরাণ, তেত্রিশ কোটি দেবদেবী, বহু উপনিষদ, মহাভারত, রামায়ণ, চণ্ডী, বহু হাজার মুনি ঋষি—কার কথা শুনবেন আর কার কথা বাদ দেবেন? কাজেই কেউ যদি বলে 'মাংস নিরামিষ কেন না গরু খাসী উট মহিষ এরা ঘাস খায়—অতএব ঘাসের সমষ্টি, তবে নিরামিষ। আর মাছ আমিষ কেন না সে মাছ খায়, শিকার করে। এ যুক্তি দিলে হঠায় কে? এই যুক্তি দাঁড় করিয়ে কিছু শিষ্য করতে পারলেই তো আমিও একজন মুনি-ঋষি!'

'তার চাইতে বলুন—তেত্রিশ কোটি দেবদেবী হলে—প্রত্যেক হিন্দু নারী-পুরুষই একজন করে দেবদেবী!'

'বটেই তো। 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই!'

'মুসলমানরা কিন্তু মানবে না। তারা বলবে, সবার উপরে 'মনুষ্যত্ব' সত্য তাহার উপরে নাই। মনুষ্যত্ব হল আল্লা। মানুষ হল তাঁর সৃষ্টি অর্থাৎ অন্তজ। হিন্দু দর্শনে স্রষ্টা আর সৃষ্টি এক হয়ে যায়, কিন্তু ইসলামে এক করার ব্যাপারে কড়া নিষেধ। আল্লার ৯৯ নাম অর্থাৎ গুণবাচক বিশেষণ। সে-সব গুণ কোনো মানুষ একাধারে লাভ করতে পারে না। তাই মানুষ পূর্ণ নয়। যদিও কোরআন শরীফে বলা হয়েছে : 'আল্লার গুণাবলীতে ভূষিত হও।' যেমন ধরুন, লেখকের জীবন এক রকম, তাঁর সাহিত্য হয়তো অন্য রকম। অবশ্য সাহিত্যে জীবনের ছাপ পড়বেই—তবুও তফাৎ থাকে। এ ভেদ বুঝতে পারলে সূক্ষ্মদর্শক হওয়া যায়। নইলে 'জড়িয়ে গেছে সরু মোটা দুইটি তারে/জীবনবীণা ঠিক সুরে তাই বাজে নারে—এই রকম একটা কিছু বোধহয় ঘটে যায়।'...

পড়পড় করে কাপড় ফাড়ার মতন শব্দ করে নাসিকাবীর্য বার করলে একটা বুড়ো লোক।

ধুচুনী, কুলো, চ্যাঙারী, চুবড়ি, ঝোড়া, চালুনী নিয়ে বসেছে মোহনপুরের ডোমেরা কয়েকজন। একটি কালো মোটা মেয়ে সিঁথিতে কেন্নোর মতন সিঁদুর রেখা—গোল গোল সাদা চোখ-পা ফেরকে বসে চুবড়ি বুনতে বুনতে ছেলেকে মাই দিচ্ছে।

মাটির ঘোড়া, পুতুল, পালকি, কুঁজো বিক্রি করছে পালেরা। বিষ্ণুপুর থানার গোতলাহাটের মনসা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার মহালক্ষ্মী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার দোকান বসিয়ে হরদম বাসি মিষ্টি বিক্রি করছে ঘনশ্যাম মান্না, বিশ্বনাথ মান্না। টাটকা মিষ্টি বলছে নাসিকে আড়াই টাকা কেজি জিলিপি। রসগোল্লা পানতুয়া চার টাকা। তিন হাজার টাকা বিক্রি হবে ৩০ দিনে।

জুতো দোকান দিয়েছেন পোয়ারা গ্রামের আবদুল খালেক। দোকানে বসলে বড় বড় কেডস হেঁটে হয়ে যান, মাথায় লাগাতে পারে। খালেক সাহেবের বড় মেয়ে আনোয়ারা খাতুন বসে আছে তক্তাপোষের এক কোণে। সে ক্লাস নাইনে পড়ে। দু'বছরের রাবেয়া খাতুন—ছোট্ট মেয়েটা কাচ কাচ করে শাঁকালু চিবুচ্ছে আর গালের কোণ বেয়ে তার সাদা দুধের মতো রস গড়িয়ে পড়ছে। প্লাসটিকের অধিকাংশ জুতো। স্যাণ্ডেলই বেশি।

আলমপুরের আচার্যিদের বাড়ির দুটি ডাগর মেয়ে কাপ হাতে নিয়ে মণিহারী দোকানে রিবন না কি যেন দর করছে। পাতলা ফরসা মেয়েটি সুন্দরী। তাকে সবাই লক্ষ্য করছে। চেহারা আদলা দেখে মনে হয় মেয়েটি পড়াশোনা করছে। তাদের মুখের ডৌল দেখলেই যে কেউ বলে দিতে পারে আচার্যিদের মেয়ে—কেন না তারা বাপমুখো মেয়ে।

এবার আমরা একটি বিস্ময়কর অজানা জগতে নেমে যাব।

শাঁখ বা শাঁখার জগৎ।

একটি তির্যক ডাণ্ডায় ত্রেকোণা কাঠের

ফ্রেম বসিয়ে ভাণ্ডার মুখে শাঁখা বসিয়ে উখো দিয়ে ঘষে ঘষে নকশা কাটছে একটি হাবাভোলা ১২ বছরের ছেলে। ছেলেটি গোপাল অধিকারীর। অধিকারী তার স্যুটকেশ থেকে সারি সারি শাঁখা পেতে নিয়ে বসে আছে। পাড়ায় পাড়ায় ফেরি করে সে। এখন মেলায় বসেছে। এদিককের সব গ্রামের সমস্ত হিন্দু বউ গিন্নি মেয়েগুলোই নাকি তার চেনা। একজোড়া শাঁখার দাম দেড় টাকা-দু' টাকা-তিন টাকা।

'শাঁখা তৈরির ইতিহাস জানতে চান তো ঐ বিরাট মণিহারীটিতে যান। উলুবেড়ের সুবল দত্তর দোকানে। ওরা শাঁখারী।'

কিন্তু সেখানে এখন মেয়েদের ভীষণ ভীড়। সাত-আটটা কারিগর চুড়ি শাঁখা পরাচ্ছে। একটি বছর কুড়ি বয়েসের মেয়ে চোখে ভারী পাওয়ারের চশমা, কাঁধের উপর [illegible] বেণিয়ারের দড়ি! গ্রামের মেয়েদের ব্লাউজের কাঁধ ঢেকে থাকে না। মেয়েটির হাত কেটে গেছে—চিৎকার করছে —চুড়ি ঢুকাতে গিয়ে। জল দিয়ে হাত ভিজাচ্ছে। অন্যান্য মেয়েরা হাত সমর্পণ করে [illegible] বসে সর্বসহা মূর্তি ধরে শাঁখা-চুড়ি পরে নিচ্ছে।

[illegible] পাড়াও পাড়াও—আমরা বেশ মনে পড়ে।

একটু ভীড় কমতে শাঁখারী সুবল দত্তর সঙ্গে আলাপ হ'লো। তাঁর দোকানে [illegible] দেওয়ালে [illegible] ছবি [illegible]। এক গোছা পাকা চুল [illegible]।

সুবলবাবু বললেন : আমাদের দোকান আছে [illegible]—উলুবেড়িয়াতে। তিন ভাই দোকান দেখি। এক ভাই মেশিন চালায়। সংসারে আটাশজন লোক। [illegible] তিন হাজার টাকা লাগে সংসার খরচে। শাঁখার কারবার এখন [illegible]। জাতীয় ব্যবসা বজায় রেখে আছি। ছাড়তেও পারছি না। তবে এ ব্যবসা আমাদের মারে না। কেন না যতদিন হিন্দু আছে ততদিন শাঁখাও থাকবে। বিয়ের সময় শাঁখা দরকার হবেই। শাঁখ বাজবেই প্রতিদিন সন্ধ্যায় প্রতি হিন্দুর বাড়িতে। তারপর পুজোআচ্চা আছে। বাগবাজার, নতুন বাজার, বাগনান, বাঁটুল, বেহালা, উলুবেড়িয়াতে শাঁখারীর কাজ হয়। আধখানা চাঁদের মতন এক রকম করাত আছে, সেটা তোলা-নামা করে ঘুরিয়ে

শাঁখারীর দোকান—শাঁখা পরছে মেয়েরা

ঘুরিয়ে আসতে-যেতে শাঁখা কাটা হয়। এখন মেশিনে কাটা হচ্ছে।'

'শাঁখ আসে কোথা থেকে?'

'সিংহল, মাদ্রাজ উপকূলের ডুবুরিরা [illegible] সমুদ্র থেকে জ্যান্ত শাঁখ তোলে। অগভীর জলে শাঁখ থাকে না। ছোট বড় বহু রকমের বহু জাতের শাঁখ আছে। শাঁখ শিকারের পর সেগুলোকে ডাঙায় এনে মাটিতে অনেকদিন পুঁতে রাখা হয়। সমুদ্র থেকে তোলা জ্যান্ত শাঁখের গায়ে কালো শ্যাওলার মতন এক রকম চামড়া থাকে। মাটির মধ্যে থেকে [illegible] পচাতে হয়। আবার চামড়াটা [illegible] যায়। মাস [illegible] পর [illegible] অল্পদিন পরে তুললে বড্ড দুর্গন্ধ থাকে।'

'অনেককাল [illegible] প্রবাল পাওয়া [illegible] শাঁখের মাথা থাকে। [illegible] সাদা পাইপের মতন হয়ে যায়।'

প্রবালের চামড়া থাকে না। থাকে শ্যাওলা। পুকুরের জলে [illegible] যেমন চিংড়ি মাছের গা [illegible] —প্রবাল হল [illegible] এক জাতীয় কীটের বাসা। জমে পাথর হয়ে যায়। মাদ্রাজের শাঁখ জাহাজে করে এনে খিদিরপুরে বা বাবুঘাটে তোলা হয়। সেখান থেকে হয় কলকাতায়। শুনলে আশ্চর্য হবেন, বাংলা দেশে একমাত্র শাঁখের মহাজন বা আড়তদার হলেন একজন মুসলমান। তিনি মাদ্রাজী। নাম হাবিব মহম্মদ। আর কেউ আড়তদার নেই। একাই [illegible] বাজার দর ক্রমাগতই চড়াচ্ছেন। এক বস্তা শাঁখ কিনলে তাতে ছোট বড় [illegible] সব মিলিয়ে থাকবে ১৫০টা। দাম ৫০০ টাকা। দোকানে এনে ছাড়া দিয়ে এনে ৫০টা ফেলে দিতে হবে। শাঁখারীদের কোনো কাজে লাগবে না। সেগুলো চুন হয়। সোনার দরে কিনে পেতলের দরে বিক্রি করতে হয়। এই শাঁখের চুন বীরভূমের সরাউরা, চাকুলিয়ায় যায়। সেখানের মানুষেরা ঘরে দেয়। শাঁখের চুন ঠাণ্ডা। ঐ সব গরম রাঢ় অঞ্চলের মানুষেরা তাই পছন্দ করে। বাকি ১০০টা শাঁখের দাম পড়ে ৫০০ টাকা। একটা শাঁখ পাঁচ টাকা। কোনোটা দু'টাকা, দেড়টাকা, কোনোটা আবার দশ টাকা বারো টাকায় বিক্রি করি। পঞ্চমুখী বড় শাঁখ পনেরো টাকাতেও বিক্রি হয়। শাঁখ মেশিনে কেটে শাঁখা তৈরি করে আমরা দোকানে বসে বিক্রি করি। সুতোর মতন সরু শাঁখা কাটা হয় মেশিনে। আমরা পাইকারী বেচি। শাঁখা-চুড়িওয়ালারা হাটেবাজারে গাঁয়ে গঞ্জে ফেরি করে। ঐ একমাত্র মহাজনের হাতেই সব কারবারির নস্
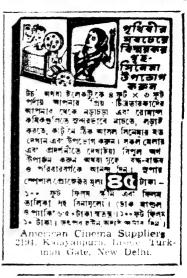
খেয়ে কারবার তাকে তুলে দিচ্ছে। সরকার যদি এটা কয়েকটা হাতে দেন এবং যাতে দরটা বেশি না ওঠে দেখেন, তাহলে শাঁখারী সম্প্রদায় বাঁচতে পারে। শাঁখারী সম্প্রদায় জাত শিল্পী—কিন্তু নির্বাক। এরা মারা যাচ্ছে অথচ হিন্দুত্বের আদি এবং অকৃত্রিম ঐতিহ্য লোকচক্ষুর অন্তরালে একজন মুসলমানের হাতে—তিনি কি বুঝবেন শাঁখারী হিন্দু সম্প্রদায়ের দুঃখ সুখের, উত্থান-পতনের ব্যথা! ডাল আলু চাল ছোলা কাপড় তেল লঙ্কা পাঁপড় গম ভুষি —সংসারের সব কিছুই এখন বাঙালীদের হাতছাড়া। হয় মাড়োয়ারী, নয় পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, দিল্লীওলাদের হাতে। বাঙালীরা তাদের মুঠোর মধ্যে। তাদের শুধু বাইরে চিৎকার। তাদের রবীন্দ্রনাথ আছেন, বিবেকানন্দ আছেন, আরও কত আছেন! কিন্তু পাঞ্চজন্য শাঁখটাই যে মাদ্রাজী ...কুরের হাবিব মহম্মদের হাতে!'...

'শাঁখের করাত দুদিকের শাঁখ না কেটে এখন শাঁখারীদের বুকের হাড় কেটে চলেছে!'

—আবদুল জব্বার

আমীর খস্রু ও ভারতীয় সঙ্গীত

আমীর খস্রু সম্বন্ধে আমাদের কতকগুলি বদ্ধমূল ধারণা আছে। এ শুধু ওস্তাদদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, ঐতিহাসিক বা তাঁর জীবনীলেখকদের মধ্যেও বর্তমান। কিন্তু এই বদ্ধমূল ধারণার মূল যে কোথায় সেটা অনুসন্ধান করেও জানতে পারেননি অথচ বহু কালের কিম্বদন্তীকে তাঁরা অগ্রাহ্যও করতে পারেননি। অনেক দিন থেকেই লেখকের মনে এ বিষয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে এবং আরও অনেকের মনেও উঠেছে নিশ্চয়ই কিন্তু বিদগ্ধসমাজে প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটনের জন্যে প্রশ্নগুলি কেউ এ পর্যন্ত তুলালেনও না। যেসব কৃতিত্ব আমীর খস্রুর ওপর আরোপ করা হয়ে থাকে সেগুলি সম্বন্ধে যদি কিঞ্চিৎ খোলাখুলি আলোচনা করি তাহলে কিন্তু এটা ভাববেন না যে আমার অনুসন্ধিৎসার মূলে কিছুমাত্র বিদ্বেষের মনোভাব আছে। আসলে সত্যটা নিরূপণ করা দরকার এবং তার জন্য আলোচনটা যথাসম্ভব নিরপেক্ষ হওয়াই প্রয়োজন।

আমীর খস্রুর জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তিনি প্রকৃত ভারতীয় সমাজে প্রায় প্রবেশই করেননি। শাসক সম্প্রদায়ের উচ্চতম মহলে তিনি আজীবন পরিবর্ধিত। সেখানে ভারতীয় কোনও বস্তুই যে তেমন শ্রদ্ধার চোখে দেখা হত এমন নয়। খস্রু নিজেকেও ভারতীয় তুর্কী বলে প্রচারিত করতেন, সম্পূর্ণ ভারতীয় বলতে তাঁর দ্বিধা হত। সেটা হবারই কথা। কারণ তাঁর বাবা ছিলেন খাঁটি তুর্কী এবং ভারতে তিনি মোগলদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যই চলে এসেছিলেন। অবশ্য তাঁর মা ছিলেন ভারতীয় মহিলা কিন্তু পিতৃপরিচয়টাই তো বড় পরিচয়। তিনি যে ভারতীয় সাহিত্য, শাস্ত্র এবং সুকুমার কলাগুলি খুব যত্নসহকারে ভারতীয় শিক্ষকদের কাছ থেকে শিখেছিলেন এমন প্রমাণ নেই। তাহলে এটাই ধারণা করতে হয় যে, তিনি তাঁর অসাধারণ প্রতিভায় এখানে ওখানে যা শুনেছিলেন, দেখেছিলেন তাই নিয়েই তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা গঠন করেছিলেন। অপরপক্ষে পারসিক সংগীত বা সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর যে ধারণা তাও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে লাভ করা নয়। তিনি কখনো ইরানে যাননি। তখনকার দিনে ইরানের প্রথম শ্রেণীর গুণী ব্যক্তি ভারতে কমই আসতেন। যাঁরা আসতেন তাঁদের গুণপনার বিচার কতখানি হত তাও সন্দেহের বিষয়। তাহলে এইটাও অনুমান করতে হয় যে, পারসিক সংগীত সম্বন্ধে তাঁর যে ধারণা তাও যেটুকু এধারে ওধারে শুনতেন তা থেকেই লব্ধ। এ বিষয়ে তাঁর বিশেষ শিক্ষালাভের কোনও তথ্য তাঁর জীবনীকারেরা দিতে পারেননি। এমতাবস্থায় তিনি উভয় দেশের সংগীতের সংমিশ্রণে যে বারটি তথাকথিত সুর সৃষ্টি করেছিলেন তাকে কি বিশেষজ্ঞের সৃষ্টি বলা যায় এই ধরনের সৃষ্টি আরও অনেকেই করতে সক্ষম ছিলেন কিন্তু আমীর খস্রুর খ্যাতি এবং প্রভাবপ্রতিপত্তির দরুণই এগুলি অসামান্য স্বীকৃতিলাভ করে।

তার একটি প্রশ্ন আমার মনে উদিত হয়—সত্যিই কি তিনি ভারতীয় সংগীতের উৎকর্ষ সাধনের জন্য এই মিশ্ররাগগুলির উদ্ভাবন করেছিলেন? এও তো হতে পারে যে, ভারতীয় সংগীতকে তিনি উচ্চ মানের আর্ট বলে মনে করতেন না এবং তাঁর ধারণা ছিল ফার্সী বা বিদেশী সংগীতের মিশ্রণেই তা উন্নত হতে পারে। এটাও দ্রুষ্টব্য যে, তিনি এই মিশ্রসুরগুলির একটারও ভারতীয় নাম দিতে চাননি, বিদেশী নাম আরোপ করবার দিকেই তাঁর সম্পূর্ণ আগ্রহ ছিল। এরই বা কারণ কি? প্রকৃত ভারতীয় আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলে এমনটা হওয়া তো উচিত ছিল না। কয়েক শতাব্দী পরে মোগল গৌরব আকবর বাদশা "কুড়ায়ী" নামক ভারতীয় রাগকেই "সুঘ্রায়ী" নাম দিয়েছেন, দরবারী কানাড়াও তাঁর মত অনুসারেই হয়েছে। তিনি তো এগুলির ফার্সী নাম দিতে পারতেন কিন্তু তিনি তা করেননি। কেননা, তিনি মনেপ্রাণে ভারতীয়ই ছিলেন। এ ছাড়া এই সব সুরই যে আমীর খস্রু রচনা করেছিলেন এমন প্রমাণ নেই। যদি অপরাপর সংগীতজ্ঞ এই রকম কোনও কোনও সুর সৃষ্টি করে প্রচারের জন্য আমীর খস্রুর নামের সংগে যুক্ত করেন তাহলেও তাকে অগ্রাহ্য করা যাবে না। আসলে ইমন, সরপর্দা এবং জীলফ্ অনেক পরবর্তীকালে পরিমার্জিত হয়ে প্রচলিত হয়।

গোপালনায়ককে পরাজিত করার আখ্যায়িকাটি "রাগদর্পণ" নামক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। গ্রন্থকার কোথা থেকে এটি সংগ্রহ করেছিলেন জানা যায় না তবে আমীর খস্রুর নিজের লেখায় বা সমসাময়িক কোনও গ্রন্থে এরকম কোনও বিবরণ নেই। কাহিনীটি হচ্ছে এই যে, থানেশ্বরে তীর্থযাত্রায় এসে গোপালনায়ক সুলতান আলাউদ্দীন খিলজির দরবারে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে চান। খস্রু অসুখের ভাণ করে সিংহাসনের তলায় লুকিয়ে থেকে প্রথমে নায়কের হরগীত এবং স্বরবর্তনী অনুষ্ঠান শ্রবণ করেন। পরে যখন তাঁর পালা এল তখন তিনি প্রমাণ করলেন যে উক্ত সংগীত তিনি তো জানতেনই উপরন্তু কওল কাঁসিং তরানা, খেয়াল, নক্শ, নিসার এবং সোহেলা গেয়ে দেখিয়ে দিলেন যে তিনি কত নতুন বস্তু সৃষ্টি করেছেন। নায়ক নাকি একেবারে হতভম্ব হয়ে পরাজয় স্বীকার করে নিলেন।

প্রথমত এই কাহিনীটি কতখানি সত্যি বা আদৌ সত্যি কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ

বর্তমান, কারণ সমসাময়িক কোনও প্রামাণিক গ্রন্থে এই বিবরণ নেই। আলাউদ্দীন খিলজির মত দুর্ধর্ষ সুলতানের কাছে গিয়ে চ্যালেঞ্জ করবার মত সাহস তৎকালে একজন গায়কের পক্ষে সম্ভবপর হওয়া খুবই কঠিন ছিল। দ্বিতীয়ত, গোপাল গাইলেন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, আর জবাবে খস্রু গাইলেন কতকগুলি ভিন্ন স্তরের কাব্যগীতি। তারানা আর খেয়াল আজকাল যেভাবে গাওয়া হয় খস্রু নিশ্চয়ই সেভাবে গাননি। দুটি বিভিন্ন ধরনের মধ্যে আদৌ তুলনা চলে না। কাওয়ালী রচনা করা খস্রুর পক্ষে সম্ভব ছিল। খেয়ালও হয়ত তিনি রচনা করেছিলেন, কারণ তিনি উক্ত নামের একটি গদ্যরীতি আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু এগুলি ভারতীয় সঙ্গীতের উন্নতিবিধানের উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়নি, করা হয়েছিল নিছক একটা নতুন কিছু করবার উদ্দেশ্যে। তারানা যে আমীর খস্রুর সৃষ্টি এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ বর্তমান। এই ধরনের অর্থহীন শব্দ নিয়ে সঙ্গীত পরিকল্পনার ট্র্যাডিশন বহু পূর্বকাল থেকে ভারতেও প্রচলিত ছিল। প্রাচীনকালে একে বলা হত "শুষ্কাক্ষরগীতি"। যদি ঘটনাটি সত্যও হয় তা হলেও এটিই প্রমাণিত হয় যে, আমীর খস্রু দরবারের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন বলেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয়েছিল এবং গোপাল সেইহেতু ভয়েই পরাজয় স্বীকার করেছিলেন। এটা তো সর্বকালের স্বাভাবিক ঘটনা। গোপাল যে অনেক বড় গায়ক ছিলেন সেটা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, খস্রু নিজেও সেটা জানতেন, নইলে প্রথমটা লুকিয়ে পড়তেন না।

সেতার তৈরি সম্পর্কেও খস্রু নিজে নীরব। অপরাপর গ্রন্থেও এই ধরনের কিছু বলা হয়নি। খস্রু তৎকালীন বহু বাদ্যযন্ত্রের নাম উল্লেখ করেছেন কিন্তু প্রায় সবই বিদেশী যেমন—পাইকন, আজব রুদ, নূহ্লা, চাঙ্গ, রবাব, ডফ, নায়ী, তাম্বুর, দুহুক, দহতাল, শানাই, বাবুলিক প্রভৃতি। তিনি এক রকম যন্ত্র ব্যবহার করতেন বলে জানা যায় যাকে তিনি বলতেন ডাণ্ডা। কিন্তু তা সেতার নয়।

যেখানে খস্রু যথার্থ গুণপনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠতেন সে হচ্ছে গজলের আবৃত্তি। তিনি চমৎকার সুরেলা গলায় গজল পাঠ করতেন। বরনী তাঁর তারিখে ফিরোজশাহীতে বার বার খস্রুর গজল গাওয়ার উল্লেখ করেছেন। তিনি যখন সুর সহযোগে গজল গাইতেন তখন সঙ্গে কিঙ্গার, চাঙ্গ রবাব, নায়ী প্রভৃতি বাজনা বাজত। খস্রু সম্বন্ধে সমসাময়িক জীবনীকারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী তথ্য পাওয়া যায় এই গ্রন্থটিতে এবং এর উক্তিগুলিও নির্ভরযোগ্য। বরনী এ কথাও বলেছেন যে, তখনকার অনেক ওস্তাদ পারসিক এবং হিন্দী কায়দায় গান করতেন। এই হিন্দী শব্দে কিন্তু ঠিক ভারতীয় হিন্দুস্তানী সঙ্গীত বোঝাচ্ছে না, বরঞ্চ আফগান এবং তুর্কীরা ভারতে এসে যেভাবে কিছু কিছু মিশ্ররীতিতে তাদের গান গাইতেন সেটাই বোঝাচ্ছে। খস্রুর জীবিতকালে খোরাসানের কিছু গায়ক ভারতে এসে যখন ভারতীয় গায়কদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন তখনও এই ভারতীয়েরা এই ধরনের গানই গেয়েছিলেন। এটা বিশ্বাস করবার কোনও কারণ নেই যে, তাঁরা তখনকার প্রবন্ধগীতিগুলি গাইতেন। কারণ, খস্রুর মতই তাঁদের পূর্ব পুরুষেরাও বাইরে থেকে ভারতে এসে বসবাস আরম্ভ করেছিলেন। তাঁরা তাঁদের সঙ্গীতকেই এখানকার মত করে নিয়ে-

ছিলেন। তফাৎ ছিল এইটুকু। তার খোরাসানের পার্টি যে প্রথম শ্রেণীর সংগীতজ্ঞ নিয়ে গঠিত ছিল তারও প্রমাণ অভাব।

মোট কথা, তখনকার লেখকগণ খস্রুকে সুরেলা কাব্যপাঠের জন্যই সাধুবাদ প্রদান করেছেন, তাঁকে ওস্তাদ পর্যায়ের সংগীতজ্ঞ বলতে চাননি। অতএব, বর্তমান ওস্তাদগণ যখন আমাদের সংগীতের বহু উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবনার কৃতিত্ব আমীর খস্রুর ওপর আরোপ করেন তখন সেটা বিশ্বাস করা শক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে প্রমাণের যেমন অভাব অপরদিকে সম্ভাবনাও তেমনি অল্প। সেই কারণেই এখন আবার নতুন করে গবেষণা করা দরকার এইটা জানবার জন্য যে ভারতীয় সংগীতে তাঁর প্রকৃত দান কতখানি। এর জন্য ওরিজিন্যাল সূত্রগুলি আমাদের নিজেদের পরীক্ষা করে দেখতে হবে। আমরা জর্মান, ফরাসী, স্প্যানিশ প্রভৃতি বহু সাহিত্যের অনুবাদ করি কিন্তু আশ্চর্য লাগে আমাদের সঙ্গে বহু কালের সম্পর্কিত ফারসী সাহিত্যের অনুবাদে কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করি না। অন্তত আমীর খস্রুর মত বিরাট প্রতিভাসম্পন্ন কবির বিচিত্র কবিতাবলীর সঙ্গে পরিচিত হওয়াও তো আমাদের দরকার।

শার্ঙ্গদেব

রবীন্দ্র সংগীত ও লোকসংগীতের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরূপতা

ভারতের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রণালয় থেকে প্রতি বছর ভারতীয় তরুণ ও তরুণীদের সংগীত, নৃত্য, অভিনয়, চিত্র ও মূর্তিকলার পারদর্শিতা বিচার করে যাতে তারা দেশে বা বিদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উন্নততর শিক্ষার সুযোগের জন্যে ২৫০, টাকার মত মাসিক বৃত্তি দু'বছরের জন্যে দেবার ব্যবস্থা আছে। ভাল শিক্ষার্থীদের জন্যে এর পরে আরো এক বছরের মত বৃত্তির মেয়াদ বাড়ানো হয়।

সংগীতের বৃত্তিতে কতগুলি ভাগ আছে, যেমন উচ্চাঙ্গের হিন্দুস্থানী, কর্ণাটী কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীত, বিভিন্ন প্রদেশের লোক-সংগীত এবং রবীন্দ্র সংগীত। নৃত্যে আছে উচ্চাঙ্গের কথাকলি, ভারত নাট্যম, কুচিপুড়ি, ওড়িশী, মণিপুরী, আসামীয়া সত্রের নাচ, কথক নাচ এবং ভারতের নানা প্রদেশের লোকনৃত্য। চিত্র ও মূর্তিকলার বেলায় কেবল মাত্র আধুনিক বা যাকে আজকাল বলা হয় 'মডার্ন' আর্ট', তার শিল্পীরাই বৃত্তি পাচ্ছে। পূর্ব যুগের ভারতীয় শৈলীতে আঁকা বা রচিত ভারতীয় চিত্রকলা বা মূর্তিকলার জন্যে বৃত্তি একেবারেই দেওয়া হয় না।

আবেদনকারী তরুণ-তরুণীদের গুণা-

বিশ্ব বিজ্ঞান

এক প্রাগৈতিহাসিক পাখির কাহিনী

ওদের চোয়াল ছিল ধনেশ পাখির মত। শিরদাঁড়া সরীসৃপের মত। বাজপাখির মত ওদের দুটি পা-ও ছিল। সেই পায়ের নখগুলি ছিল ইস্পাতের মত শক্ত। আর ছিল বিরাট দুটি ডানা। কতকটা বাদুড়ের মত পাতলা চামড়ার আস্তরণ দিয়ে তৈরি। ডানার মাঝ বরাবর জোড়া ছিল দুটি উপাঙ্গ। বাইরে থেকে দেখলে মনে হত যেন খুদে খুদে দুটি হাত। সেই হাতের সাহায্যে গাছের ডাল বা কাণ্ড বেয়ে গিরগিটির মত অনায়াসে তারা চলাফেরা করতে পারত। যখন মাটির উপর বসে থাকত তখন মনে হত যেন একটা অদ্ভুত জানোয়ার। আকাশে উঠলেই বলে যেত একটা রাক্ষুসে পাখি। ওদের শরীরের মধ্যে উষ্ণ রক্ত প্রবাহিত হত। এবং উন্নত শ্রেণীর প্রাণীর মতই ওরা দলবদ্ধভাবে একটা সামাজিক জীবন যাপন করত।

সংক্ষেপে এই হল ওদের পরিচয়। প্রত্নতাত্ত্বিকদের সংজ্ঞায় এদের ফেলা হয় টেরোসর বা টেরোডাকটাইলস গোষ্ঠীর প্রাণী। আজ থেকে প্রায় দশ কোটি বছর আগে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই এরা বিচরণ করত। সম্ভবতঃ সাত কোটি বছর আগে যখন পৃথিবীর ভূ-স্তরে খড়িমাটি তৈরির কাজ প্রায় শেষ হতে শুরু করে সেই সময় প্রকৃতির এই বিচিত্র প্রাণী গোষ্ঠি বিলুপ্তির পথে চলে পড়ে। খড়িমাটির স্তরের মধ্যে সংরক্ষিত থাকে তাদের দেহাবশেষ শতাব্দীর পর শতাব্দী, শত শত শতাব্দী। অবশেষে পাথরের স্তূপ ভেঙে আঠারো শতকে যখন প্রথম তাদের আবিষ্কার করা গেল, পৃথিবীর মানুষ বিস্মিত, স্তম্ভিত। সরীসৃপ এবং পদচারী জন্তুর মাঝামাঝি পর্যায়ের এই উড়ন্ত প্রাণীটি জীববিজ্ঞানীদের কাছে যেন প্রহেলিকার মত মনে হয়েছিল, তাঁদের যথেষ্ট বিমূঢ় করে তুলেছিল। সেই থেকে বিবর্তনবাদীরা সমানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। হাজারো প্রশ্নের তাঁরা সম্মুখীন হয়েছেন। সেই হাজারের এক একটি প্রশ্ন আবার লক্ষ প্রশ্নের জাল সৃষ্টি করছে। তবু আজও কেউ সংশয়মুক্ত হতে পারেন নি। অদ্ভুত

শিল্পীর চোখে টেরোনডন তাদের বাচ্চাদের খেতে দিচ্ছে। ছবি : স্পেকট্রাম

এই প্রাণীটির পরিচয় আজও ওঁদের কাছে দূর অস্ত্!

জানা গেছে এই প্রাণীর সকলেই বিরাট কেউ কেটার মত ছিল না। চেহারায় সাদৃশ্য থাকলেও ওদের মধ্যে ক্ষুদ্রতম শ্রেণীর প্রাণীটির আয়তন ছিল কতকটা চড়ুই পাখির মত। এদের বলা হয় টেরোড্যাকটিল। আর যারা চিলের মত চলাফেরা করত, আয়তনে তারাই ছিল সব চাইতে বড়। তাদের পাখা দুটি এক সঙ্গে মেললে লম্বায় দাঁড়াত সাতাশ ফুটেরও বেশী। অর্থাৎ অ্যালবাট্রস পাখির দুটি পাখার মিলিত দৈর্ঘ্যের প্রায় তিনগুণ। উল্লেখ্য, অ্যালবাট্রসই বর্তমান পৃথিবীর দীর্ঘতম পাখা বিশিষ্ট পাখি। এদের দুটি পাখা সম্পূর্ণভাবে মেলে ধরলে দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় বারো ফুটের মত। জীবাশ্ম পরীক্ষা করে জীববিজ্ঞানীদের ধারণা হয়েছে, টেরোসরসরা সমসাময়িক প্রাণীদের মধ্যে খুবই উন্নত ধরনের ছিল। এরা বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার নানা রকম কৌশল অর্জন করে, সেই সঙ্গে পাখা দুলিয়ে ওড়ার সময় অদ্ভুত কতকগুলি পদ্ধতিও।

বস্তুত, ওড়ার দিকটা খুঁটিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, এই কাজটি পাখিরা দুই-ভাবে সম্পন্ন করে থাকে। এক, প্রত্যক্ষ ওড়া। এক্ষেত্রে নিজের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তারা ঝাপটা মেরে পাখা দুলিয়ে বাতাস কাটার চেষ্টা করে। দুই, গা ভাসিয়ে ওড়া। ইংরেজীতে যার নাম গ্লাইডিং ফ্লাইট। এক্ষেত্রে তারা ডানা দুটি বিস্তৃত করে বাতাসের বুকে গা ভাসিয়ে রেখে দেয়। অর্থাৎ স্থির করে ডানা দুটি শুধু মেলে থাকা। নিজের শক্তি ব্যবহার করে তখন তারা বিশেষ কায়দায় বায়ুস্তরের মধ্যে দিয়ে ভেসে চলে। অনেক পাখি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবেই উড়ে থাকে। যেমন চড়ুই। আবার অ্যালবাট্রসের মত পাখিরা বেশ কিছুক্ষণ ধরে ডানায় কোন রকম কসরৎ না করে মাইলের পর মাইল উড়ে যেতে পারে। তবে একথাও ঠিক পুরোপুরিভাবে শুধু ডানা ঝাপটিয়ে বা গা ভাসিয়ে কেউই ওড়ে না। কোন কোন পাখি ডানা ঝাপটায় বেশি, কেউ কম। এই ওড়ার ব্যাপারটা পরীক্ষা করতে গিয়ে পাখি-বিজ্ঞানীরা একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন। এঁদের মনে হয়েছে, জৈবিক বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে একদল পাখি শুধু

'র‍্যামফোরাইনকাস তার ডানার সঙ্গে লাগান ধারাল আঙ্গুলের সাহায্যে গাছে চড়ছে। এরা সরীসৃপ, অথচ এদের দেহে পাখির মত ডানা। অধুনা বিরল এই প্রাণীটির মধ্যে প্রাচীন টেরোনডনের কিছুটা চিহ্ন পাওয়া যায়। ছবি : স্পেকট্রাম

ডানা ঝাপটিয়ে ওড়াটাই রপ্ত করেছিল রপ্ত করে নেয়ার চেষ্টা করেছে। আর একদল চেষ্টা করেছে হাওয়ার উপর ভর দিয়ে কি ভাবে গা ভাসিয়ে ওড়া যায় সেটা আয়ত্ব করতে। জীবাশ্ম থেকে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকে দেখা যায় সুপ্রাচীন জুরাসিক যুগের টেরোসরসরা ডানা ঝাপটিয়ে ওড়াটাই রপ্ত করেছিল বেশী। জুরাসিক যুগ বলতে, পৃথিবীর বুকে যে সময়ে ভঙ্গিল পর্বত শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছিল সেই সময়টাকেই বোঝায়। আন্দেজ, হিমালয়, আলপস, জুরাস এবং কারপাথিয়ানস পর্বতমালা এই সময়ে তৈরি হয়েছিল এবং ভূতাত্ত্বিক হিসেবে এরাই ভঙ্গিল শ্রেণীর পর্বতের মধ্যে পড়ে। যাই হোক, এরও পরবর্তীকালে যখন পৃথিবীর ভূস্তরে খড়িমাটির স্তর গড়ে উঠতে শুরু করে ঠিক সেই সময় থেকেই টেরোসরসদের মধ্যে বাতাসে গা ভাসিয়ে ওড়ার ভঙ্গীটি ধরা পড়ে। জুরাসিক যুগের ওড়ার ব্যাপারে তারা যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করলেও, এই নতুন পদ্ধতিতে ওড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল জৈব-বিবর্তনের দিক থেকেও পরবর্তীকালের ঐ জন্তু-পাখিরা যেন অনেক নতুন গুণের অধিকারী হয়ে গেছে। ওদের সমাজ ব্যবস্থা, চাল-চলন, এমন কি নিজেদের বাচ্চাদের অতি নিপুণভাবে লালন-পালন, সব কিছুর মধ্যেই বেশ কিছুটা অভিনবত্ব ধরা পড়ে। এদের মধ্যে টেরানোডন নামে রাক্ষুসে পাখিরা ভেসে চলার ব্যাপারে যে নিপুণতা দেখিয়েছে পরবর্তী সময়ে তার আর কোন নজির কারুর চোখে পড়েনি। সুখের কথা তাদের সেই কলা-কৌশল পুরাতত্ত্ববিদদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। কৃত্রিম পদ্ধতিতে আকাশে ওড়ার ব্যাপারে মানুষও তাদের সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছে।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ভারসাম্য বজায় রেখে বাতাসের বুকে দীর্ঘপথ গা ভাসিয়ে বিচরণ করতে হলে দুটি দিকের প্রতি লক্ষ্য দেওয়া দরকার। এক, যে ভাসবে তার ওজনটি যতটা সম্ভব কম হওয়া চাই। দুই, যে ডানা দুটির উপর ভর করে ভাসতে হবে সেই ডানা দুটিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে বিস্তৃত হয়ে থাকতে হবে। সম্প্রতি হিসেব করে জানা গেছে, টেরানোডন-এর দেহের তুলনায় পাখা দুটি ছিল অত্যন্ত বড়। এত বড় যে, সেই পাখার প্রতি বর্গ-ফুট জায়গার উপর ভার পড়ত মাত্র এক পাউণ্ডের মত। এই ভারটা অবশ্য পড়ত যখন সে উড়ত তখন। কোনরকম যন্ত্রের সাহায্য না নিয়ে কৃত্রিম উপায়ে বাতাসে ভেসে চলার জন্যে মানুষ এ পর্যন্ত যে সমস্ত 'গ্লাইডার' তৈরি করেছে তার ডানার আয়তন সে তুলনায় যথেষ্ট কম। আর সেই ডানার প্রতি বর্গফুটের ওপর ভার পড়ে চার পাউণ্ডের মত।

অতএব প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে, টেরানোডন-এর পক্ষে এতটা হাল্কা হওয়ার ক্ষমতা কোথা থেকে এল? একটা কথা ঠিক, তাদের দুটি পাখার মিলিত দৈর্ঘ্য ছিল সাতাশ ফুট। সেই পাখা তৈরি হয়েছিল বাদুড়ের পাতলা চামড়ার মত আস্তরণ দিয়ে। বিস্তৃত হয়ে থাকত ডানার এক প্রান্ত থেকে দুটি পায়ের গোড়ালি, কাঁধ এমন কি পা দুটির পেছন দিকে ফাঁক পর্যন্ত। ফলে পাখা দুটির মোট তলের ক্ষেত্রফল গিয়ে দাঁড়াত হাজার বর্গফুটেরও উপরে। এই জন্যেই উড়ে চলার সময় প্রতি বর্গফুটে চাপ পড়ত যথেষ্ট কম। এ ছাড়াও বিবর্তনের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে গিয়ে যত রকমে সম্ভব প্রকৃতির এই বিশেষ প্রাণীটি নিজের দৈহিক ওজনকে কমিয়ে এনেছিল। সম্ভবত বাঁচার তাগিদে যত্রতত্র যখন তখন তাদের ছোটাছুটি করতে হত বলেই এমনটি হয়েছে। তাই দেখা যায়, বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যখন তারা চরমতম দৈহিক অবস্থা লাভ করেছিল তখন ঐ দৈহিক ভারটুকুই শুধু কমানোর জন্যে তাদের দেহের হাড়গুলি হয়ে পড়েছিল যথেষ্ট হাল্কা। সেই সঙ্গে ফাঁপাও। এদের ডানার কিছু কিছু হাড় ড্রইং কাগজের মত পাতলা ছিল। এত পাতলা এবং হাল্কা হাড় পরবর্তীকালে তেমন আর চোখে পড়ে নি।

দেহের হাড়গুলি হাল্কা করার সঙ্গে সঙ্গে টেরানোডনরা তাদের দাঁতগুলিও হারাতে শুরু করে। এক সময়ে যে দাঁত ছিল ভারী এবং যথেষ্ট মজবুত, একে একে তারা কেমন যেন পাল্টে গেল। তার বদলে গজিয়ে উঠল পাখীর মত ঠোঁট। ওজনে হাল্কা, কিন্তু বেজায় বড়। এমনকি এদের পূর্বপুরুষদের দেহে পুচ্ছ নামক যে বস্তুটি লাগান ছিল সেটাও খাটো হতে হতে এক সময়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। পা দুটি হয়ে

পড়ল বেঁটে। এ ছাড়াও বাতাসের বুকে ভর দিয়ে ভেসে চলার জন্যে ডানা ঝাপটানর তেমন দরকার হত না বলে, ডানার মাংসল পেশীরও পরিমাণ গেল কমে। একবার ভেবে দেখুন কি কাণ্ড। স্লিম হওয়ার এমন নজির সত্যিই খুব কম। কায়দাটা এ যুগে জানা থাকলে হয়ত কেউ কেউ খুবই লাভবান হতে পারতেন।

শুধু হাল্কাই নয়, আঘাত অথবা কোন রকম বাইরের চাপে যাতে দেহটি না দুমড়ে যায় তার জন্যে পুরো শরীরের কাঠামোটাই হয়ে পড়েছিল বড় অদ্ভুত ধরনের। বুকের ফালি ফালি হাড়গুলি গিয়েছিল জুড়ে। এবং আর সমস্ত অংশ একত্রিত হয়ে মূলে দেহটি হয়ে পড়েছিল একটা বাক্সের মত। আর সেই বাক্সের দুপাশে লাগান মস্ত পাখা, খুদে খুদে দুটি পা, বিদঘুটে বিরাট একটি মাথা। শরীরটাকে অত হাল্কা করে ফেলার দরুন বাতাসে ভর দিয়ে ওড়ার সময় টেরানোডনরা তাদের গতিবেগ অস্বাভাবিকভাবে কমিয়ে আনতে পারত। সম্প্রতি হিসেব করে দেখা গেছে এই গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় প্রায় পনের মাইল। এবং ঐ গতি নিয়ে ভাসার সময় তাদের দেহটি নিচের দিকে নেমে আসত না বললেই চলে। তবে হ্যাঁ, যাকে বলে টেক অফ অর্থাৎ মাটি ছেড়ে ওড়া শুরু করা—সেটা করতে গিয়ে ওদের বেশ কিছুটা ঝক্কি নিতে হত। কারণ অতবড় দেহটি নিয়ে ঐ কাজটি করতে গেলে প্রথমেই যতটা গতিবেগের প্রয়োজন হয় অমন হাল্কা শরীরের পক্ষে সেটা জোগান কিছুটা শক্তই বলা চলে। আবার উড়তে উড়তে মাটিতে নামাটাও বেশ ঝক্কির কাজ বলেই মনে হয়। কারণ সেক্ষেত্রেও একটা বিশেষ গতিবেগ নিয়ে নামতে না পারলে ঝুপ করে পড়ে গিয়ে গুঁড়িয়ে যাবার সম্ভাবনাটাই থাকে বেশী। তবে মনে হয়, এ ধরনের বাধা অতিক্রম করার ক্ষমতা তাদের ছিল। অনেকে মনে করেন, বিশেষ করে বাতাসের গতিবেগ যখন ঘণ্টায় পনের মাইলের উপরে গিয়ে দাঁড়াত তখন কোন সমস্যাই দেখা দিত না। টেরানোডনরা তখন পাখা দুটি যত বেশী সম্ভব বিস্তৃত করে বাতাসের সম্মুখে মেলে ধরত। সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের ধাক্কায় এমনিতেই অর্থাৎ নিজের কোন চেষ্টা ছাড়াই নীল আকাশের বুকে ভেসে পড়ত। আকাশে উঠেই এরা চেষ্টা করত যতদূর সম্ভব ওপরের দিকে উঠে যেতে এবং সেই সঙ্গে গতিশীল বাতাসকে আঁকড়ে ধরে থাকতে। মাঝে মাঝে খাদ্যের অন্বেষণে অবশ্য সমুদ্রের বুকে নেমে আসতে হত। কারণ মাছই ছিল তাদের প্রধান খাদ্য। কিন্তু জলের কাছে নেমে এলেও তারা নিজস্ব গতিবেগটি হারানর তেমন ভয় ছিল না। সমুদ্রের ঢেউ-এর প্রবল ধাক্কায় এমনিতেই সেখানকার বাতাসের গতিবেগ পনের মাইলের বেশীই থাকত। সেখান থেকে মাছ ধরে আবার তারা উঠে যেত ঊর্ধ্বাকাশে। তারপর বাতাসের গতির সঙ্গে গা ভাসিয়ে এসে নামত কোন পাহাড়ের চূড়ায়, তার নিজের আবাসে। মাটি থেকে ঐ সমস্ত পাহাড়ের চূড়া অনেকটা উপরে থাকায় গতিশীল বাতাসের সাহায্যটি তারা পেয়ে যেত। অতএব হঠাৎ ঝুপ করে পড়ে গুঁড়িয়ে যাবার তেমন সম্ভাবনা ছিল না। আরও একটা গুণ ছিল এই পাখিদের। এরা ইচ্ছে মত চট করে নিজেদের ডানা দুটি বিচিত্র ভঙ্গীতে বেঁকিয়ে দিতে পারত, কখনও সরাসরি ভাঁজ করে খাড়া উপরের দিকে মুখ করে রাখতে পারত অথবা ওড়ার সময় গতিবেগ কমিয়ে আনার জন্যে ঠিক প্লেনের মত ডানার খানিকটা অংশ নব্বই ডিগ্রি কোণ করে বাঁকিয়ে দিয়ে গতিকে মন্থর করতে সক্ষম হত। তবে মাটিতে অবতরণ করার সময় যে যথেষ্ট সাবধান হয়ে

তাদের চলতে হত, সেটা বেশ অনুমান করা যায়।

পুরাতত্ত্ববিদরা আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে এই প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীটি সম্পর্কে আরও কিছু কিছু তথ্য জানতে পেরেছেন। দেখা গেছে এদের মস্তিষ্কের গঠন এবং এখনকার পাখিদের মস্তিষ্কের গঠনের মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে। বিশেষ করে মস্তিষ্কের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ 'সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার'-এর গঠনটি তো বটেই। এগুলি দেখে মনে হয়েছে প্রাণী হিসেবে টেরানোডনরা যথেষ্ট চতুর ছিল।

তবু প্রশ্ন থেকে যায়, টেরানোডনরা কি সত্যিই সরীসৃপ শ্রেণীর প্রাণী? তাদের জীবাশ্ম পরীক্ষা করে তো তাই মনে হয়? অন্ততঃ বেশীর ভাগ গবেষকদের এটাই সিদ্ধান্ত। তবে সরীসৃপ শ্রেণীর হয়েও এরা ছিল উষ্ণ-শোণিত প্রাণী। পাখি বা দুগ্ধপায়ীরা যেমন, ঠিক তেমনই। বাঁচার তাগিদে এদের উড়তে হত মাইলের পর মাইল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। দৈহিক প্রক্রিয়ায় এদের দেহ থেকে যে উত্তাপ বেরিয়ে আসত সেই উত্তাপকে তারা জমিয়ে রাখত পশমের পুরু আস্তরণের মধ্যে। সম্প্রতি হাল্কা-পাথরে তৈরী একটি জীবাশ্মের মধ্যে টেরানোডন-এর পশমের কিছু কিছু অংশ পাওয়া গেছে।

কিন্তু ডানার সামনে ছোট ছোট আঙুলের মত যে উপাঙ্গ দেখা যায়, তারাই বা কি কাজে লাগত? হয়ত কোন কিছু আঁকড়ে ধরে চলাফেরার জন্যে এই উপাঙ্গ দুটি তারা ব্যবহার করে থাকবে। অনেক পুরাতত্ত্ববিদদের বক্তব্য, হাতের মত ঐ উপাঙ্গ দুটি স্ত্রী-পুরুষের মিলনের সময় আলিঙ্গনের জন্যে হয়ত ব্যবহৃত হত। এমনও হতে পারে, আসলে ঐ উপাঙ্গ দুটি তারা চিরুনির মত ব্যবহার করত নিজেদের পশমী দেহটাকে পরিষ্কার করে নিতে। পশমী শরীর হলে তার মধ্যে কিছুটা ধুলো-মাটি বা উকুন বা ঐ ধরনের কিছু পরজীবি জমে উঠবেই। কুকুর, বেড়াল, হনুমান প্রভৃতির ক্ষেত্রে এতো আমরা দেখেই থাকি। টেরানোডনরা ঐ চিরুনি দিয়ে গাটা বেশ পরিপাটি করে হয়ত পরিষ্কার করে নিত। এতে করে দেহটিও মসৃণ হয়ে উঠত। ফলে ওড়ার সময় বাতাস কাটিয়ে চলতে তেমন অসুবিধে হত না। অর্থাৎ বিচিত্র এই প্রাণীটি সর্বদিক দিয়েই যে যথেষ্ট উন্নত ছিল সে কথা বলাই বাহুল্য।

তবু কালের বিবর্তনে একদিন তারাও সমাপ্তির প্রান্তে এসে উপনীত হয়। অবশেষে বিলুপ্ত।

কিন্তু কেন? এত যে উন্নত প্রাণী, পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রামে সে কেন জয়ী হতে পারল না? এ জিজ্ঞাসার সঠিক উত্তর অবশ্য জোগান কঠিন। একটি মতবাদে বলা হয়েছে, এই রাক্ষুসে পাখিগুলি বাস্তু-জীবনে বড় বেশি এক পেশে হয়ে উঠেছিল। শেষের দিকে তাদের চাল-চলন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য পেয়ে যায়, এত বেশি স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে, যার ফলে তারা শুধু একটি নির্দিষ্ট পরিবেশের মধ্যেই বেঁচে থাকার ক্ষমতা অর্জন করেছিল। কিন্তু প্রকৃতির কোন অবস্থাই চিরস্থায়ী হয়ে থাকে না। যখন সেখানে পরিবর্তন এল, নিজেদের বৈশিষ্ট্যগুলিকে তখনও তারা আঁকড়ে ধরে রইল। নতুনের সঙ্গে চলতে গেলে যতটা খাপ খাইয়ে নিতে হয়, তারা তা পারে নি। অতএব এবার পেছনে হাটার পালা। অবশেষে পরাজিত সম্রাটের মৃত্যু! কেউ কেউ আবার বলেন, পরবর্তী-কালে অন্যান্য পাখিদের সঙ্গে দলে তারা এঁটে উঠতে পারে নি বলেই এমন হয়েছে। নতুন আগন্তুক এই পাখিরা ছিল অত্যন্ত তৎপর। এদের মধ্যে কোন কোন গোষ্ঠী যে ধরনের মাছ শিকার করে নিজেদের আহার্য সংগ্রহ করত, টেরানোডনদেরও হয়ত সেই মাছের উপর নির্ভর করতে হয়। এক সঙ্গে অজস্র ঐ পাখি দলবদ্ধ ভাবে একত্রিত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত সমুদ্রের বুকে। তাদের ভীড় ঠেলে এগোনো টেরানোডনদের পক্ষে খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়াত। অতএব পরাজয়।! হয়ত বা নতুন ঐ পাখিরা দল বেঁধে জুলুম করে তাদের পাহাড়ের চূড়া থেকে বাস্তুত্যাগীও করে থাকতে পারে।

তবে সবই অনুমান। সত্য যা, তা হল, আধুনিক বিমান-বিজ্ঞানে যত রকমের অভিজ্ঞতাই আমরা কাজে লাগানর চেষ্টা করি না কেন, তার সব কিছুই রপ্ত করে নিয়েছিল প্রাগৈতিহাসিক সেই জীব—টেরানোডন। হয়ত আরও বেশী। তারা এখন বিলুপ্ত। তাদের জীবাশ্মও এত পুরনো এবং জীর্ণ পাতা যে, এখন তার পাঠোদ্ধার করাও প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

সমরজিৎ কর

জীবন যে-রকম

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ৩১ ॥

অন্ধকার থেকে ওরা আবার এলো রাস্তার আলোর দিকে। এইটুকু সময়ের মধ্যেই জায়গাটা অনেক ফাঁকা হয়ে গেছে, দু'চারটে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে শুধু, বেঞ্চগুলো প্রায় ফাঁকা, কিছু লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক-ওদিক। অথচ এ জায়গাটাকে এখন পৃথিবীর যে-কোনো বিখ্যাত সুন্দর জায়গার সঙ্গে তুলনা করা যায়। সামনে এই স্রোতস্বতী নদী, একসঙ্গে অনেকখানি সচল জল দেখলেই মানুষের ভালো লাগে—আবছা অন্ধকারে নদীটি এখন রহস্যময়, মনে হয় নিঃশব্দ, কিন্তু কান পেতে শুনলে ছলছল শব্দ শোনা যায়। জোনাকির মতন এখানে ওখানে নৌকোর আলোর বিন্দু, মায়াপুরীর মতন ঝলমলে জাহাজ। কি নরম হাওয়া দিচ্ছে! এখানে সারা রাত বসে থাকলেও কারুর ভালো লাগতে পারে। কিন্তু তার উপায় নেই। কেউ না কেউ এসে সেই সুখ তছনছ করে দেবে। মানুষ শুধু এখন অন্যের ধন সম্পদের ওপরেই লোভ করে নি, অন্যের অমূর্ত ভালো-লাগাও নষ্ট করে দিতে চায়।

অপর্ণা হঠাৎ একেবারে চুপ করে গেছে। সে বুঝেছে, আর কিছু বলে এখন লাভ নেই। তা ছাড়া তার আত্ম-সম্মানবোধ এত প্রবল যে মরে গেলেও সে কোনো লোককে একবারের বেশী দু'বার কোনো কিছুর জন্য অনুরোধ করবে না। ভেতরে ভেতরে তার এখন কি হচ্ছে তা শুধু সে-ই জানে।

অনিমেষ প্রকাশ্যেই বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছে। ঘন ঘন সিগারেট টানছে, রাগে কিংবা আশঙ্কায় আঙুল কাঁপছে তার। অপর্ণার মুখের দিকে পর্যন্ত সে তাকাতে পারছে না।

অনিমেষ বললো, না, আমরা গাড়িতে উঠবো না।

—তা হলে, সবার সামনে দিয়ে হেঁটে হেঁটে গেলে ভালো লাগবে আপনাদের? গাড়িতে উঠতে কি হয়েছে?

—না, আমরা গাড়িতে উঠবো না।

—কেন ইয়ে করছেন! বললাম তো বেশীক্ষণ লাগবে না!

সিগারেটটা আধেক শেষ হবার আগেই ফেলে দিয়ে অনিমেষ আবার একটা সিগারেট ধরাতে গেল, ধরালো না। একটা বাদামওয়ালা অপর্ণাকে জ্বালাতন করতে এসে পুলিশ দেখেই তাড়াতাড়ি সরে পড়লো।

ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে যতটা কাতর ভাবে মিনতি করা যায়, সেইরকম ভাবে অনিমেষ বললো, কেন আপনারা শুধু শুধু হ্যারাস করছেন? আপনারা জোর করে আমাদের ধরে নিয়ে যেতে চাইছেন, একটু বাদেই আপনাদের ভুল বুঝতে পারবেন—কিন্তু এর জন্য আমাদের এত ক্ষতি হয়ে যাবে! এই ভদ্রমহিলার এক্ষুনি বাড়ি ফেরা দরকার—

পুলিশ দু'জনের মধ্যে একজনের ব্যবহার বেশ রুক্ষ ও অসহিষ্ণু। অন্যজনের কথার মধ্যে বেশ কিছুটা মোলায়েম ভদ্রতার ভাব আছে। প্রথম জন বললো, আপনারাই তো শুধুমুদু দেরী করাচ্ছেন। এখানে দাঁড়িয়ে তর্কাতর্কি করলেই কি রাত কাবার করতে হবে না কি? ঐ যে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, উঠুন!

দ্বিতীয় পুলিশটি বললো, রেস-পেকটেবল্ লোক হয়েও ঐ অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে বসে ছিলেন কেন? এখানে এত বসার জায়গা থাকতে—

—বসিনি, হেঁটে যাচ্ছিলাম।

—একই কথা! পরশুদিনও ওখানে এক ভদ্রমহিলার গলার হার ছেনতাই হয়েছিল। কাগজেও বেরিয়েছিল, পড়েন নি?

—না লক্ষ্য করিনি!

এরপর অনিমেষ খানিকটা রেগে গিয়ে বললো, ওয়েল, ডু উই লুক লাইক পেটি স্ন্যাচারাস্?

রুক্ষ পুলিশটি আর একটু রুক্ষ ভাবে বললো, চেহারা দেখেই যদি ভদ্দরলোক চেনা যেত—কত ভদ্দরলোক দেখলাম—

অন্য পুলিশটি বললো, তা ছাড়া আর একটা ব্যাপার আছে। এখানে অনেক ইম্মরাল কাজ হয়। আনলাইসেনড স্ট্রিট ওয়াকার মেয়েদের সঙ্গে...আমরা যদি সেগুলো চেক না করি—

—আপনি কি সব আজেবাজে কথা বলছেন? সত্যিই যদি সে-রকম কিছু হয়, তা হলে তাদের কারুকে না ধরে গোটা ময়দান থেকে শুধু আমাদের দু'জনকে ধরলেন? চমৎকার মানুষ চেনার ক্ষমতা দেখছি আপনাদের!

অপর্ণা মুখ নিচু করে মাটির দিকে চেয়ে আছে। সে কিছু দেখবে না, কিছু

অনুমান না ঠিক করেছিল। তবু একবার রাস্তার ওদিকে তার চোখ চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে একটা শিহরন খেলে যায় তার সারা শরীরে। এই মুহূর্তে তার মরে যাবার কোনো উপায় নেই? অপর্ণা আর একটুও বাঁচতে চায় না।

রাস্তার ওপাশে খানিকটা দূরের সেই রেস্তোরাঁ থেকে শান্তা আর তার বাড়ির লোকেরা নেমে আসছে। ওরা কি আর বেড়াতে বেড়াতে এদিকে আসবে না? দুজন পুলিশের পাশে একজন নারী ও পুরুষ দাঁড়িয়ে—সেদিকে তো ওদের চোখ পড়বেই! এরপর আর অপর্ণার বেঁচে থাকার মানে কি? টুলটুল বড় ভাগ্যহীন মেয়ে, তার বাবাকে সে কখনো দেখলো না, তার মা-ও তার জন্য...।

শান্তারা সবাই মিলে একটা স্টেশন ওয়াগনে উঠলো। একজন অতি উৎসাহী পুরুষ ওদের দলটার তত্ত্বাবধান করছে। তাকে অপর্ণা ঠিক চিনতে পারলো না, সে ওদের বাড়ির রমেনদা। শান্তার মুখ এখনো গম্ভীর। গাড়িটা এদিক দিয়েই চলে গেল। চলতি গাড়ি থেকে কি ওদের চোখ পড়বে না এদিকে? শান্তা যদি আবার 'বৌদি' বলে চেঁচিয়ে ওঠে? যদি গাড়ি থামাতে বলে? আশঙ্কায়, লজ্জায়, অনুশোচনায় অপর্ণা চোখ বুজে ফেললো!

ভদ্র পুলিশটি শুকনো হেসে বললো, মানুষ চেনাই তো মুশকিল! আমাদের লাইনে থাকলে বুঝতেন, চেহারা দেখলে একদম মানুষ চেনা যায় না!

যেন পুলিশ দুজনের আর কোনো কাজ নেই, ওরাও বেড়াতে এসেছে—বেড়াতে এসে এই খেলাটায় খুব মজা পাচ্ছে। এক জোড়া যুবক-যুবতীকে ভয় দেখানোর খেলা।

একজন অনিমেষকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কোনো চাকরি-টাকরি করেন? কোথায় চাকরি করেন?

—আমি একজন অধ্যাপক।

—আপনার সঙ্গে আইডেনটিটি কার্ড আছে কিছু?

—অধ্যাপকরা আবার কবে থেকে আইডেনটিটি কার্ড নিয়ে ঘোরে?

—আপনার কাছে এমন কিছু আছে কি, যা দিয়ে আপনি আপনার পরিচয়টা প্রমাণ করতে পারেন? তা হলে এক্ষুনি ছেড়ে দিতে পারি!

—যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে মানুষ নিজের পরিচয় কি করে প্রমাণ করতে পারে? এ তো অদ্ভুত কথা বলছেন। আমার মুখের কথাই আপনার বিশ্বাস করা উচিত! পৃথিবীর অন্য যে-কোনো দেশে একজন অধ্যাপকের কথার গুরুত্ব দেওয়া হয়।

—পকেটে কোনো কাগজপত্রও নেই? কোনো চিঠি টিঠি—

—সব সময় পকেটে ওসব থাকবে, তারও কোনো মানে নেই। পকেটে আছে কয়েকটা টাকা, একটা কলম—ও, এই তো, আমার সঙ্গে এই বইটা রয়েছে, এই কবিতার বইটা আমার লেখা—

মজার খেলাটার মাঝখানে পুলিশটি হো-হো করে হাসলো। তারপর মৃদু ভর্ৎসনা করে বললো, এটা আপনি কি বললেন প্রফেসার? এটা তো প্রফেসারের মতন কথা হলো না! যে-কোনো লোকই হাতে একখানা বই দেখিয়ে বলতে পারে, এটা আমার লেখা! তাতে কি প্রমাণ হয়? ঠিক আছে বলছি তো থানায় চলুন, আপনার চেনা কোনো লোকের টেলিফোন আছে কি? তাকে টেলিফোন করে আপনার আইডেনটিটি ক্লিয়ার করে নিলেই ছেড়ে দেবো! কতক্ষণ আর লাগবে?

বৃদ্ধ পুলিশটি বললো, ওর থেকেও এই মেয়েছেলেটির আইডেনটিটি ক্লিয়ার করা বেশী দরকার!

অনিমেষ কটমট করে তার দিকে তাকালো। এখন সে দারুণ রেগে গেছে, রাগের চোটে এখন আর লজ্জা কিংবা নিরাপত্তার কথা তার মনে নেই। সে প্রায় ধমক দিয়েই বললো, ঠিক আছে, চলুন থানায়! আমি এমন লোককে টেলিফোন করবো, যিনি আমাদের দুজনকেই চিনতে পারবেন। কোনো অধ্যাপককে টেলিফোন করলে হবে? না কি, অধ্যাপকের কথায়

পারবে দেবেন না? ঠিক আছে, কোনো এম এল এ কে টেলিফোন করলে চলবে তো? তাও দু'একজন চেনা আছে—

এম এল এ-র কথা শুনেও পুলিশ দুজন তেমন বিচলিত হলো না। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো, সেই মাতালটার কথা মনে আছে? ধরা পড়লেই বলতো, সে অতুল্য ঘোষের আত্মীয়! এক টেলিফোনে সে আমাদের সব্বাইকে মফঃস্বলে বদলি করে দেবে! হাঃ-হা-হা, এখন আবার সে জ্যোতি বোসের নাম বলে......

অনিমেষ ওদের গাড়িতে কিছুতেই উঠতে রাজী হলো না, একটা ট্যাক্সি ডাকলো, একজন পুলিশ তাদের সঙ্গে এলো। ট্যাক্সিতে ওঠার সময়েও অপর্ণা একটাও কথা বললো না। তার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু ও সান্ত্বনার কথা বলার ভরসা পেল না অনিমেষ। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে অপর্ণার হাতটা খোঁজার চেষ্টা করলো, পেয়েও গেল। ঘাম নেই, অথচ ভিজে ভিজে হাত- যেন সেই হাতের কোনো ভাষা আছে, অনিমেষ সে ভাষা বুঝতে পারছে না। অনিমেষ একটু চাপ দিল অপর্ণার হাতে—যেন তার হাতও কোনো ভাষা বোঝাতে চাইছে অপর্ণাকে। অপর্ণা সে ভাষা বুঝতে পারবে কি না জানে না।

থানার ভেতরে বেশ ভিড়, কয়েকটা চেয়ার ও তিনটি বেঞ্চি ভরা নারী পুরুষ, নানা বয়েসের নানান রকমের সামাজিক স্তরের। দুটি কচি চেহারার স্ত্রীলোক মাটিতেই বসে আছে উবু হয়ে। একজন পুলিশ বেমালুম আর দু'জন লোককে ধমক দিয়ে চেয়ার থেকে উঠিয়ে দিল, ওদের জন্য। তারপর বললো, একটু বসুন, আসছি। তারা ভেতরের দিকে চলে গেল।

টেবিলে একজন ইন্সপেক্টর ডায়েরি লিখতে অত্যন্ত ব্যস্ত। একজন মাঝ-বয়েসী স্ত্রীলোককে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করছেন, তোমার বাড়ি থেকে দশ গজ দূরে? দশ গজ না, দশ হাত? বেশ, দশ হাত দূরে—বিল্টুকে যখন ধনিয়া লাঠি দিয়ে মারে, তখন তোমার ছেলে—কোথায় ছিল? অ্যাঁ? গরুকে খাবার দিচ্ছিল? এত রাত্তিরে? বয়েস কত? না, না, গরুর না, তোমার ছেলের—। মাঝে মাঝে প্রশ্নোত্তর থামিয়ে ইন্সপেক্টরটি চেঁচিয়ে উঠছেন, এই দরোয়াজা, একটা পান আনালে না? কখন থেকে একটা পান চাইছি।......আরে, এ কি, এ তো জর্দা পান, বললুম সাদা পান আনতে—কতবার বলবো এক কথা! হ্যাঁ, বয়েস কত তোমার ছেলের? তিরিশ? জেল খেটেছে একবারও? খাটেনি? ঠিক করে বলো—এইটুকু পান? এর দাম পাঁচ নয়া? দুটো আনতে পারলে না?

অনিমেষদের দিকে ইন্সপেক্টরটি একবার ভ্রূক্ষেপও করলেন না। হঠাৎ মনে হলো, ওরা যদি এখন উঠে বেরিয়ে চলে যায়, কেউ তাদের বাধা দেবে না। কিন্তু সে-রকম করতে ভরসা পেল না। অথচ কেউ কোনো কথাও বললে না ওদের সঙ্গে। সেই পুলিশ দুটি অদৃশ্য। এরকম অস্বাভাবিক অবস্থায় অনিমেষ জীবনে কখনো পড়েনি—বুঝতেই পারছে না এখন তার কি করা উচিত।

মাঝে মাঝে সে আড়চোখে অপর্ণার দিকে চেয়ে দেখছে। অপর্ণা কোনোদিকে তাকিয়ে নেই, তার দৃষ্টি শূন্যাশ্রয়ী। তবে, এখন তাকে দেখে মনে হয়, তার মুখে আর ভয় কিংবা উৎকণ্ঠার ছাপ নেই। হয় সে সম্পূর্ণ অন্য কিছু ভাবছে, অথবা এখানকার ব্যাপারটা বেশ উপভোগই করছে। থানার ভেতরের দৃশ্য তো ওরা দুজনেই আগে কখনো দেখে নি!

ওদের মুখোমুখি দেয়ালে একটা বেশ

বড় গোল ঘড়ি। অসম্ভব দ্রুত সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। সওয়া নটা...সাড়ে নটা... পৌনে দশটা...। অনিমেষ দু' একবার উঠে দাঁড়িয়ে ইন্সপেক্টরটির দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলো—কিন্তু তিনি ওকে পাত্তাই দিলেন না। একটা বেশ রোমহর্ষক দাঙ্গার ব্যাপারে জেরা করা নিয়ে তিনি খুব ব্যস্ত।

সেই পুলিশ দুজন আবার এ ঘরে ঢুকলো, দু' জনেরই মুখের সামনে চায়ের কাপ। ওদের দেখে যেন ভারী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, একি আপনারা এখনো বসে আছেন? বাড়ি যান নি? চা খাবেন?

অনিমেষ উষ্ণ ভাবে বললো, না। আমাকে টেলিফোন করতে দেবেন?

—দাঁড়ান, ওঁর এই কেসটা হয়ে যাক।

—কেসের সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক? আমি তো শুধু একটা টেলিফোন করবো—

—বাঃ, ব্যাপারটা ওনাকে বলতে হবে না? উনি পারমিশান না দিলে—

—আর কতক্ষণ এ ভাবে বসে থাকবো বলতে পারেন? আপনাদের অত্যাচারেরও তো একটা সীমা আছে!

বুকে পুলিশটি বললো, আমরা গিয়ে ধরলে এখনো তো ঐ মাঠেই বসে থাকতেন!

—আপনাকে কতবার বলবো যে আমরা ওখানে বসিনি?

—অত জোরে কথা বলবেন না, একটু আস্তে কথা বলুন। অন্যদের ডিসটার্ব হচ্ছে!

অনিমেষ আসলে নিজের ভেতরের ভয়টা ভাঙাবার জনাই তেজের সঙ্গে কথা বলছিল। এতক্ষণ ধরে মনের মধ্যে আঁতি-পাঁতি করে খুঁজেও সে একটা নাম ঠিক করতে পারে নি—যাকে টেলিফোন করে সাহায্য চাইবে। এই অদ্ভুত পরিস্থিতির কথা বলবে কাকে? কেউ কি বিশ্বাস করবে? কেউ কি বুঝবে যে, সত্যি ওরা কোনো দোষ করে নি, ওরা কিছু না জেনে, নিজেদের মধ্যে বিভোর হয়ে অন্ধকার মাঠ দিয়ে হাঁটছিল। গোটা ব্যাপারটাই যে একটা দারুণ ভুল—এটা কে মানবে? তার একার ব্যাপার হলে কিছু ভয় ছিল না—কিন্তু অপর্ণার কথা কি করে বলবে? কে স্ক্যাণ্ডল রটাবে না? কে সত্যিকারের শুভার্থী? একজনকেও বিশ্বাস করতে সাহস হয় না!

হঠাৎ অপর্ণার দিকে ফিরে অত্যন্ত অসহায় ভাবে বললো, অপর্ণা, আমি কি করবো বলো তো? সব আমারই দোষ—

অপর্ণা অত্যন্ত শান্ত ভাবে বললো, আপনি আর কি করবেন!

এই সঙ্কটের সময়ে ওরা দুজনে যেন খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে। অনিমেষ বিনা দ্বিধায় তুমি বলছে তাকে।

অবশ্য অনিমেষকে শেষ পর্যন্ত টেলিফোন করতে হলো না। সওয়া দশটা বেজে যাবার একটু পরেই দরজার কাছের সিপাহী জুতোয় খটাখট শব্দ তুলে সেলাম করলো। রাশভারী চেহারার একজন ঢুকলেন, তিনি এ থানার ও-সি। ঘরে ঢুকেই তিনি অনিমেষ আর অপর্ণার দিকে তাকালেন, ভুরু কুঞ্চিত হলো, কাছাকাছি পুলিশটিকে জিজ্ঞেস করলেন, এঁদের কি ব্যাপার?

পুলিশটি বললো, স্যার ময়দানে... অন্ধকারে...কোরেস্পেনেবল অবস্থায় ঘোরা-ঘুরি...ঠিক পরিচয় দিতে পারছেন না—

পুরোটা শুনলেন না তিনি, মৃদু ধমকানি দিয়ে বললেন, ধ্যাৎ! যাকে-তাকে ধরে আনবেন তাই বলে? অ্যাদ্দিনেও কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান হলো না! বদমাইসরা উৎপাত করে বলে ভালো লোকেরাও বেড়াতে পারবে না? সেখানেও যদি আপনারা উৎপাত করেন—

অনিমেষদের দিকে ফিরে অত্যন্ত বিনীত ভাবে বললেন, আপনাদের শুধু

অনর্থক হয়রান করা হলো, খুব রেগে গেছেন নিশ্চয়ই?

অনিমেষ এতক্ষণ মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল, একবার এখান থেকে ছাড়া পেলে—এই থানার বিরুদ্ধে সে একটা তুমুল কাণ্ড করবে। কি করে কি করবে, তা জানে না অবশ্য, কিন্তু কিছু করবেই প্রতিজ্ঞা করেছিল। কিন্তু একটা সহানু-ভূতিপূর্ণ ভদ্র কথা শুনেই অনেকটা গলে জল হয়ে গেল। আস্তে অনুযোগের সুরে বললো দেখুন তো, প্রায় দু' ঘণ্টা ধরে আমাদের বিনা কারণে ডিটেন করে রাখা হয়েছে।

—আসুন, একটু আমার ঘরে আসুন।

এত ভদ্র ব্যবহার পাবার পর আর বলা যায় না যে, না, আমাদের আর এক মুহূর্ত বসার উপায় নেই! —একটু বসতেই হলো। প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও তিনি ওদের জন্য এত রাত্তিরে চা আনালেন। অপণা অবশ্য সে চা ছুঁলো না।

ও-সি মধ্যবয়সী পুরুষ, মুখখানা বেশ প্রসন্ন ধরনের, মাথাজোড়া টাক। সস্নেহে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কলেজে একসঙ্গে পড়েন বুঝি?

ও-সি ভদ্রলোকের মানুষ চেনার ক্ষমতা থাকতে পারে, কিন্তু বয়েস বোঝার ক্ষমতা নেই। অনিমেষ সামান্য গর্বের ভাব লুকোতে পারলো না. মৃদু হেসে বললো, না, আমি কলেজে পড়ি না, কলেজে পড়াই! এঁরও পড়া শেষ হয়ে গেছে! আচ্ছা, মাঠের মধ্যে দিয়ে হাঁটা কি বে-আইনি কাজ?

—না, না, বে-আইনি কেন হবে? তবে বুঝলেন না, চোর ছ্যাঁচোড় লুচ্চোর তো অভাব নেই! এরাও ভুল করে যাকে তাকে ধরে আনে—

—এদের ভুলের জন্য যে কত লোকের কত ক্ষতি হয়ে যেতে পারে—

—তা তো পারেই! তা তো পারেই! জেনুইন স্বামী-স্ত্রীকেও যদি ধরে আনে—কই সিঁদুর দেখছি না তো! খৃষ্টান?

—না, আমরা বিবাহিত নই। তবে—

—শিগগিরই বিয়ে হবে? হ্যাঁ, মেয়েটির মুখ দেখেই বুঝতে পারছি—কবে হচ্ছে? শিগগিরই নিশ্চয়ই! নেমন্তন্ন করবেন আমাকে? আমি মশাই বামুনের ছেলে, বিয়ের নেমন্তন্ন পেলেই ছুটে যাই। যাই হোক, নেমন্তন্ন করুন আর না করুন, এখনই আশীর্বাদ করছি! ভালো মিল হবে দুজনের। নাম কি? আপনার নাম আর ওনার নাম?

নাম বলার পর অনিমেষ উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, আমরা তা হলে এবার উঠি?

—হ্যাঁ, উঠবেন বৈকি। কোথায় থাকেন? কত দূরে?

—বাগবাজার।

—বাগবাজার? রাস্তার নাম কি, কত নম্বর? আরে, এ তো বাগবাজার থানার কাছেই! কলেজে পড়ান তো, পাড়ার লোক নিশ্চয়ই খুব মান্য করে? দাঁড়ান, এক মিনিট!

ও-সি টেলিফোন তুলে ডায়াল ঘোরালেন। ও পাশ থেকে সাড়া পাবার পর জিজ্ঞেস করলেন, হ্যালো, বাগবাজার? ও মশাই, আপনাদের এরিয়ায় অনিমেষ চক্রবর্তি বলে কারুকে চেনেন? না, না, কোনো কেস-টেস নয়, এমনিই বিয়ের সম্বন্ধ করবো—ভালো পাত্র শুনেছি.... চেনেন? অ্যাঁ? ব্যাচিলার তো! বাঃ। আচ্ছা, হ্যাঁ, লালবাজারে ও ব্যাপারটা কথা বলেছিলাম। ডি আই জি বললেন......

টেলিফোন নামিয়ে রেখে ও-সি একগাল হেসে বললেন, শুনলেন তো, আপনার এরিয়ার থানার ও-সিও রেকমেণ্ড করলেন, আপনি ভালো পাত্র! মেয়েটিও ভালো, দেখলেই বোঝা যায় ভালো বংশের মেয়ে—ভালো যৌতুক হবে, আশীর্বাদ করছি—বিয়েটা কিন্তু তাড়াতাড়ি সেরে নেবেন, দেরী করবেন না। আনম্যারেড অবস্থায় বেশী ঘোরাঘুরি করা ভালো দেখায় না! এখান থেকে বাড়ি যাবেন কি করে? আমার জমাদারকে বলবো, ট্যাক্সি ডেকে দিতে?

অনিমেষ একেবারে বিগলিত ভাবে বললো, না, না, তার দরকার হবে না, আমরাই ডেকে নেবো—

বেরিয়েই কিন্তু অনিমেষকে আফশোষ করতে হলো। থানা থেকে ট্যাক্সি ডাকানো সে সম্মানজনক মনে করেনি, কিন্তু এখন ট্যাক্সি পাচ্ছে না। ট্যাক্সি আছে, কিন্তু বেশী রাত্তিরে যা হয়, ওদিকে যাবো না, সেদিকে যাবো না—এইসব বায়নাক্কা। অনিমেষ ট্যাক্সির পেছনে বেশ খানিকটা ছোটাছুটি করে শেষে অতি কষ্টে একটা ধরে ফেললো।

ভেতরে ঢুকে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললো, উঃ, ব্যাপারটা যে শেষ পর্যন্ত এমন ভালোয়-ভালোয় চুকবে—কল্পনাই করতে পারিনি। তোমার অসম্ভব দেরী হয়ে গেল অবশ্য, তোমার বাড়িতে সোওয়া এগারোটার মধ্যে নির্ঘাৎ পেঁছে যাবো—বলবে একদিন ঝোঁকের মাথায় নাইট শো-তে—

অপর্ণা শান্ত ভাবে বললো, আমি বাড়ি যাবো না!

অনিমেষ হকচকিয়ে গিয়ে বললো, বাড়ি যাবে না? তা হলে কোথায় যাবে?

—তা জানি না। কিন্তু আমি বাড়িতে যাবো না আর!

—অপর্ণা, কি বলছো কি? তোমার মেয়ে—একেই এত রাত হয়ে গেছে—

—আমার মেয়ে জানবে, তার মা মরে গেছে। তার বাবাও নেই, মা-ও নেই।

—অপর্ণা, একি পাগলামি করছো! একদিন হঠাৎ,—মানে, এটা তো একটা অ্যাকসিডেণ্ট, তুমিই বলো, আমার কি কিছু করার উপায় ছিল?

—এর পর আমার আর বাড়ি ফেরার কোনো মানে হয় না! আমার এখন মরে যাওয়াই ভালো।

—ছিঃ, একি বলছো? এরকম ভাবে বলো না, সওয়া এগারোটা— এমন কিছু অস্বাভাবিক বেশী রাত নয়—হঠাৎ আটকে গেলে—

অপর্ণা এতক্ষণ শান্ত ছিল, এখন তার মুখ চোখের চেহারা হিংস্র হয়ে উঠেছে—অন্ধকারেও তা টের পাচ্ছে অনিমেষ। কোনো মেয়ের এরকম জ্বলজ্বলে মুখ অনিমেষ আগে দেখে নি। অপর্ণা বললো, আমি এর পর আর বেঁচে থাকবো কেন বলতে পারেন? কি সুন্দর দিন ছিল আজ—সব নষ্ট হয়ে গেল! এই অপমানের পর কেন বাঁচতে হবে! কেন?

অনিমেষ বললো, তুমি বাঁচবে আমার জন্য। তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না! আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই!

—এ রকম ভাবে বুঝি বিয়ে হয়? এ রকম বিপদ থেকে বাঁচবার জন্য? লোকের কাছে সম্মান রাখার জন্য বলে ফেলতে হয়েছে বলে? আমার বুঝি ইচ্ছে অনিচ্ছে কিছু নেই?

অনিমেষ ম্লান গলায় বললো, না, সেজন্য নয়। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই, আমি তোমাকে ভালবাসি বলে। তুমি জানো না, আমি তোমাকে কতটা—

ঠিক ভালোবাসা কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই অপর্ণা কান্নায় ভেঙে পড়লো একেবারে! ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সারা শরীর মুচড়ে কাঁদতে লাগলো। অনিমেষ একেবারে বোকার মতন চুপ করে বসে রইলো। অপর্ণার পিঠের ওপর তার হাত রাখবে কি রাখবে না—তাও ঠিক করতে পারলো না।

অপর্ণার বাড়ির সামনে এসে যখন ট্যাক্সি থেমেছে, তখনও অপর্ণার কান্না থামে নি। অনিমেষ বিব্রত ভাবে বললো, এই, চোখ মুছে নাও, বাড়ি এসে গেছে, প্লিজ, কেউ যদি এ অবস্থায় দেখে—

অপর্ণা ধীরে সুস্থে চোখ মুছে ট্যাক্সি থেকে নামলো। অনিমেষ আর দাঁড়ালো না, জানলা দিয়ে অপর্ণার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে দূরে মিলিয়ে গেল।

দরজার কাছে এসে অপর্ণা ওপরে তাকালো। ভেবেছিল, ওপরের বারান্দায় বাবাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবে। কিন্তু বারান্দায় কেউ নেই, কোথাও কোনো শব্দ নেই, গোটা বাড়িটা অন্ধকার। বেল টিপতে গিয়ে অপর্ণার হাত কেঁপে উঠলো।

(ক্রমশ)

সরকারী উদ্যোগে ভোগ-সামগ্রীর উৎপাদন

সরকারী উদ্যোগে ভোগ-সামগ্রী উৎপাদন করার কথা সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে। বেসরকারী ক্ষেত্রেই সাধারণত ভোগ-সামগ্রীর উৎপাদন চালিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু যখন একান্ত আবশ্যক সামগ্রীগুলির কৃত্রিম দুষ্প্রাপ্যতা সাধারণ মানুষের অভাব দূর করতে এবং প্রয়োজন মেটানোয় বাধার সৃষ্টি করে তখন সরকারকেই সংশ্লিষ্ট জিনিসগুলির উৎপাদনে এগিয়ে আসতে হয়। বিশেষ করে ভারতের মত দেশে, যেখানে আমরা সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের সহাবস্থান দেখতে পাই, একান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলির জন্য শুধু বেসরকারী উদ্যোগের উপর নির্ভর করে থাকা সম্ভব হয় না। সম্প্রতি কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা খুবই তীব্র হয়েছে। প্রকাশক মহলে কাগজের অভাবে নতুন কর্মপ্রচেষ্টা চালানোয় অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। ভারত সরকার এজন্য স্থির করেছেন যে, কাগজের মত একান্ত প্রয়োজনীয় ভোগসামগ্রীগুলির ক্ষেত্রে যদি চাহিদা ও উৎপাদনের মধ্যে কোন ফাঁক থাকে তবে সেই ফাঁক দূর করার জন্য সরকার এগিয়ে আসবেন। সরকারী উদ্যোগে একটি কাগজের কারখানা স্থাপন করার প্রচেষ্টা চলছে। সরকার আশা করছেন, বর্তমান বছরে এবং আগামী বছরে কাগজের উৎপাদন যথাক্রমে ২৮০০০ টন এবং ৪৫০০০ টন বাড়বে; ১৯৭৪-৭৫ সালে কাগজের উৎপাদন আরও ১ লক্ষ টন বাড়বে বলে সরকার আশা করছেন। নিউজ-প্রিন্টের অভাবও বর্তমানে খুব বেড়ে গেছে। সরকার আমদানির মাধ্যমে নিউজপ্রিন্টের অভাব দূর করার চেষ্টা করছেন। প্রতি বছর ৭৫,০০০ টন নিউজপ্রিন্ট উৎপাদন করার ক্ষমতাসহ কেরালায় একটি নতুন কারখানা স্থাপন করার কথাও ভারত সরকার ভাবছেন। কাগজ-কারখানাগুলির উৎপাদন বাড়াবার অনুপ্রেরণা হিসেবে ভারত সরকার উন্নয়ন-রেয়াত-এর (Development Rebate) পরিমাণ ২৫ শতাংশ থেকে ৩৫ শতাংশ বাড়িয়েছেন এবং রপ্তানি শুল্কের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ রেয়াত দিয়েছেন।

শুধু কাগজ-শিল্পেই যে চাহিদা ও উৎপাদনের মধ্যে ফাঁক দেখা যাচ্ছে তা নয়। ভোগ-সামগ্রীগুলির কৃত্রিম সঙ্কট যদি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সংকটের সৃষ্টি করে এবং সেজন্য যদি বেসরকারী ক্ষেত্রে কাঁচামালের অভাব দেখা যায় তবে তা দূর করার দায়িত্বও সরকারের। ভারত সরকার যে মিশ্র-অর্থনীতি (Mixed Economy) ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চান তাতে বেসরকারী উদ্যোগের পরিপূরক হিসেবে সরকারী উদ্যোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে, এটাই সাধারণ মানুষের কাম্য।

বিশ্ব-বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি

সম্প্রতি জেনেভার G. A. T. T. (General Agreement on Tariffs and Trade) সেক্রেটারিয়েট থেকে জানানো হয়েছে যে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাণিজ্য-ধারা নিম্নমুখী প্রভাবের আওতায় এসেছে। প্রথমত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি নিয়মিত হওয়ায় ওই দেশের আমদানি চাহিদা এখন কমের দিকে যাচ্ছে, এবং দ্বিতীয়ত, ইউরোপের অধিকাংশ দেশে ও জাপানে আভ্যন্তরীণ চাহিদা কমে যাওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বরং ব্রিটেনে এখন অবস্থা ক্রমশ উন্নতির দিকে যাচ্ছে। উন্নতিকামী দেশগুলির রপ্তানি বাড়াবার প্রচেষ্টা যেমন জোরদার হচ্ছে, অনুরূপভাবে আমদানির জন্য প্রদেয় অর্থের পরিমাণও বেড়ে যাচ্ছে, এবং তার একটি কারণ হল জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি। প্রাথমিক পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের (European Common Market) অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির মোট রপ্তানি-মূল্য ১৯৬৯ সালে শতকরা দশ ভাগ বেড়েছে। ১৯৬৯ সালে বিশ্বের সামগ্রিক উৎপাদন শতকরা ৫ ভাগ বেড়েছিল; ১৯৬৮ সালে উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৬ ভাগ। কিন্তু উৎপাদন হার কমে যাওয়া সত্ত্বেও ১৯৬৮ সালের তুলনায় ১৯৬৯ সালে রপ্তানি মূল্য সামগ্রিকভাবে শতকরা ১৩·৫ ভাগ বেড়েছে; রপ্তানির পরিমাণ বেড়েছে শতকরা ১১ ভাগ।

কলকাতা কর্পোরেশনের আর্থিক দুর্গতি

১৯৭০-৭১ সালের জন্য কলকাতা কর্পোরেশনের যে বাজেট তৈরী হয়েছে তাতে ৮ কোটি ৫২ লক্ষ ২২ হাজার টাকার ঘাটতি রয়েছে। কলকাতা কর্পোরেশন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ১৫ কোটি টাকার এককালীন সাহায্য এবং বাৎসরিক ১০ কোটি টাকার সাহায্য দাবি করেছেন। কলকাতা মহানগরীর পৌরপ্রতিষ্ঠান যে অর্থের অভাবে আবর্জনা দূরীকরণ, রাস্তাঘাট উন্নয়ন, শিক্ষা সম্প্রসারণ, জল নিকাশের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি কোন উন্নয়নমূলক কাজেই হাত দিতে পারছেন না এ কথা সুবিদিত। কলকাতা মহানগরীর সমস্যা যে একটি জাতীয় সমস্যা—এ কথা কেন্দ্রের কর্তাগণ বুঝেও বুঝতে চান না। কর্পোরেশনের বাজেট উত্থাপিত করে ফিনান্স কমিটির সভাপতি বলেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার যদি অনুমতি দেন তবে কলকাতার "Terminal Tax" ধার্য করে প্রতি বছর অন্তত ছয় কোটি থেকে সাত কোটি টাকা পাওয়া যেতে পারে। কর্পোরেশনের আর্থিক সংগতি বাড়াবার জন্য এই দাবি খুবই যুক্তিসঙ্গত; বিশেষ করে এ ধরনের কর ভারতে নতুন নয়। বরং কেন্দ্রীয় বাজেটে শহর অঞ্চলে সম্পত্তির উপর যে কর ধার্যের প্রস্তাব রয়েছে তাতে কলকাতার মত বড় বড় শহরের পৌর প্রতিষ্ঠানগুলির আয় বাড়াবার সুযোগ আরও কমে যাবার সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। কলকাতা কর্পোরেশনকে আর্থিক দুর্গতির চরম সীমা থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের যতটা দায়িত্ব আছে ততটা যে ঠিকভাবে পালিত হচ্ছে না সেজন্য কেন্দ্রের উপর চাপ সৃষ্টি করার কাজে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের এগিয়ে আসা উচিত। কিন্তু এ কথাও ভুললে চলবে না যে শুধু কেন্দ্রের উপর দোষারোপ করেই পৌরপিতাগণ দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। যে হারে কর্পোরেশনের কর ফাঁকি হয় তা বন্ধ করার জন্য এবং যে দুর্নীতির দুষ্টচক্রে কর্পোরেশন ঘুরপাক খাচ্ছে তা দূর করার জন্য পৌরপিতাগণ কতটা এগোতে পেরেছেন সে বিষয়ে কৈফিয়ত দাবি করার অধিকারও নাগরিকদের আছে।

সুব্রত গুপ্ত

একটি অসাধারণ কবিতার বই

॥ ১ ॥

গত ১৪ই মার্চের দেশের সাহিত্য সংবাদে সনাতন পাঠকের 'একটি অসাধারণ বই' পড়লাম। একবার নয়—বারবার। 'সাহিত্য-সংবাদ' সত্যি বলতে কি, এমন কিছু একটা অসাধারণ ফিচার নয় যে, বার বার পড়তে হবে। তবু পড়েছি; এবং হয়ত, একাধিক বার আরও পড়তে পারি। কেন, তা জানি না। সনাতন পাঠকের এই লেখাটা আশ্চর্য মমতায় ভরা। মনকে দারুণভাবে নাড়া দিয়ে যেন কি রকম একটা স্বয়ং-সাহিত্যের রূপে পরিগ্রহ করতে পেরেছে। এবং সনাতন-বাবুর নিজস্ব কবি এবং লেখক সত্তাও (এক অদৃশ্য আলোতে ধরা পড়ে) একই সঙ্গে এই ফটোগ্রাফ প্লেটে ধরা পড়েছে। যাকগে, বিষয়টা যখন সনাতনবাবুকে নিয়ে নয়, তখন আসল প্রসঙ্গেই আসা যাক।

স্মৃতি যদি প্রতারণা না করে তবে, যতদূর মনে পড়ে, বেশ কয়েক বছর আগে, 'স্টেটসম্যানের' 'ক্যালকাটা নোটবুক' কলামে বোধ হয় বিনয় মজুমদারের কথাই লেখা হয়েছিল; আরও যতদূর মনে পড়ে, সেখানে বিনয় মজুমদারের কবিতা রচনা এবং একই সঙ্গে দুরূহ গাণিতিক সমীকরণ সৃষ্টি করার ব্যাপারেরও উল্লেখ ছিল।

বিনয় মজুমদার যদি জিনিষ্ট হয়ে থাকেন, হবেন। ইঞ্জিনীয়ার ভাইপো ভাগনেদের কাছে পরে পরে এঁর সম্বন্ধে আরও কিছু কিছু যে না শুনেছি তা নয়। তবে, সে সব শোনার মধ্যে রঙ্গ কৌতুকের অংশটাই যেন একটু বেশী ছিল।

"ফিরে এসো, চাকা"র কবি বিনয় মজুমদারকে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে এসে শ্রীমতী মীণাক্ষী দত্ত নিঃসন্দেহে একটি পবিত্র কর্তব্য সম্পাদন করেছেন এবং সেই আলোটাকে আরও একটু উস্কে ধরে সনাতন পাঠকও যে অনেকের ধন্যবাদভাজন হবেন এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সনাতন পাঠকের বিবরণ থেকেই জানছি, "বিনয়কে কিছুতেই সুস্থির মস্তিষ্ক বলা যায় না", বা "বিশ্বসংসারে উনি কারুর কোনো ক্ষতি করছেন না, নিজের ছাড়া" বা "..নিজেকে নিগ্রহের এমন একটা স্তরে নিয়ে গেছেন, যেখানে মানুষ হয়তো অনেকটা মোহমুক্ত হতে পারে।" আমার ত মনে হয়েছে উনি (সন্তোষকুমার ঘোষের ভাষায়) অস্তিত্বের অন্য একটা ছায়ায় জুড়োচ্ছেন, স্থান-কালের খড়ি আঁকা গণ্ডির বাইরে। না কি উনি একজন টোট্যাল আউটসাইডার—না কি একজন অ্যাণ্টি-পোয়েট? গাণিতিক হিসাবে যাকে ঠিকই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে অথচ যার নিজস্ব কোনও স্তর (ম্যাস) নেই।

এত কথা, (প্রাসঙ্গিক? না কি, অপ্রাসঙ্গিক?) মনে আসবার কোনও কারণই ঘটত না যদি না সনাতন পাঠক বিনয় মজুমদারের কিছু অনবদ্য কবিতা পংক্তি উপহার না দিতেন। "সুর হয়ে লিপ্ত হবো পৃথিবীর সকল আকাশে।" কিংবা "এমন বিপন্ন আমি, ব্যক্তিগত/পবিত্রতাহীন", বা "কিন্তু তবু সে মুখের অধিকারিণীর স্নিগ্ধরূপ/আলেখ্য—আসে না।"—এই সব পংক্তি যে কবিতা সমগ্রের ভগ্নাংশ, তাদের সৃষ্টিকর্তার হাত ও ক্ষমতা যে অসাধারণ এই তীক্ষ্ণ খবরটুকু, আশা করি, একমাত্র জেদী কবিতা বর্বর ছাড়া আর কারুকেই বিশদ করে বুঝিয়ে বলবার অপেক্ষা রাখে না। আফসোস এই যে, ঠিক এই মুহূর্তে, "ফিরে এসো, চাকা"র কোনও কপি হাতের কাছে পাচ্ছি না।

সনাতন পাঠকের সংবাদেই জানা গেল যে, এই গ্রন্থের কবিতাবলী ১৯৬০ থেকে মধ্য বাষট্টির মধ্যে লেখা। তা হলে ত এই দাঁড়ায় যে, এর পর থেকে বিনয় মজুমদার কবিতা রচনা এবং জীবিকার্জন দুটোই সমান অবহেলায় ত্যাগ করেছেন। তাঁর এই ব্যাধি দুরারোগ্য—এটাই ভাবতে অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছে। না কি, অসাধারণ কিছু একটা করবার দুর্দম আগ্রহের মধ্যেই একটা ইনহেরেণ্ট ধ্বংসের বীজ লুকিয়ে থাকে।

যাই হক, বিনয় মজুমদারের মত একজন তীক্ষ্ণ ব্যক্তির নিশ্চয়ই এ খবরটা অজানা নয় যে, ন্যারালিকারও হঠাৎ চমকের পথ

ধরেই উদয় হয়েছিলেন কিন্তু (যতদূর খবর রাখবার সুযোগ হয়—সেই সূত্রেই) শেষ পর্যন্ত কনভেনশনালিজমের বন্ধুর পথ বেয়েই তাঁর বৃহত্তর সিদ্ধির পথে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন। জানিনা, আমার এই সব কথাগুলো নেহাতই অপ্রাসঙ্গিক হল কি না। কিন্তু আরও একটা উদাহরণ না দিয়ে এই পত্রের পরিসমাপ্তি টানতে পারছি না। বিনয়কে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর "না এলে না-ই বা এলে" কবিতাটা আরও একবার পড়ে দেখতে অনুরোধ করছি :

"অথচ নিশ্চিত জানি, রক্ত ও মাংসের সেই মূর্তিকে যদি না
হাতে পাই, তবে তাকে শব্দের ভিতরে
সমূহ ফোটাতে হবে, না-ফোটালে এজন্মে আমার
পরিত্রাণ নেই।"

শুভ্রা চট্টোপাধ্যায়
গিরিডি।

॥ ২ ॥

গত ১৪ই মার্চ সংখ্যার 'দেশে' একটি অসাধারণ কবিতার বই 'ফিরে এসো, চাকার আলোচনার মাধ্যমে একটি অসাধারণ কবি বিনয় মজুমদারকে 'জাতে ওঠাবার' জন্য সনাতন পাঠক ধন্যবাদার্হ। পাবলিসিটিই যেখানে জাতে ওঠার একমাত্র সোপান সেখানে 'দেশে'র পাতায় বিনয় মজুমদারকে নিয়ে আলোচনা নিঃসন্দেহে একাজে সাহায্য করেছে। কিন্তু সনাতন পাঠক যে আগেই বলে দিয়েছেন—মাথায় তোলা হোক অথবা জাতে ওঠানো হোক—এ সবই বিনয় মজুমদারের কাছে কুস্থান।

'এই কবি প্রকাশ্যে সীমান্ত মানেন না' কবিতা লিখতে বসেও নয়। তাই 'কৃত্তিবাসে'র পাতায় তাঁর কবিতার সাথে লেখচিত্র (graph) দেখে সীমান্তরক্ষী রক্ষণশীল পাঠকদের সমালোচনার আগ্নেয়াস্ত্র গর্জন করে ওঠে।

বিনয় মজুমদার সম্পর্কিত আলোচনায় শ্রীজ্যোতির্ময় দত্তের নাম উচ্চারণ না করে সনাতন পাঠক বোধ হয় শ্রীদত্তের প্রতি কিছুটা অবিচার করেছেন, কারণ বিনয় মজুমদারের কবিতার প্রসঙ্গে এই কবির সর্বশ্রেষ্ঠ আলোচক শ্রীদত্তের নাম উচ্চারিত হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবু সাহিত্য সংবাদ বিভাগে 'ফিরে এসো, চাকা'র আলোচনার জন্য বাংলা কবিতার পাঠকদের কাছ থেকে সনাতন পাঠকের প্রাপনীয় ধন্যবাদে একটুকু ঘাটতি পড়বে না।

বিনয় মজুমদারের কবিতার সাথে পরিচিত যে কোনো পাঠকই শ্রীজ্যোতির্ময় দত্তের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে বলবেন—'বিনয় মজুমদার একজন বেদনার্ত, সত্যদ্রষ্টা কবি, একজন শহীদ, যিনি নিজের সবটুকু নিঃশেষে উজাড় করে দিয়েছেন এবং যাঁর কৃপায় আমরা অনেক নতুন অভিজ্ঞতা আস্বাদনে সমর্থ হয়েছি। বিনয় মজুমদারের আবির্ভাব তিরিশের কবিদের বাংলা ইতিহাসে প্রধানতম ঘটনা।'

সুব্রত ঘোষ
ধানবাদ

'সরগমের নিখাদ'

প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত শচীনদেব বর্মণ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সলিল ঘোষ মহোদয়কে আমি কিছু তথ্য পাঠিয়েছিলাম। ১৪-৩-৭০ তারিখের 'দেশ'-এ প্রকাশিত পত্রে সলিলদা সেগুলি উল্লেখ করেছেন। শচীনদেব বর্মণ যাতে সংগীত পরিচালনা করেছিলেন ও গান গেয়েছিলেন, এমন একটি বাংলা ছবির নাম সলিলদাকে জানাতে আমি ভুলে গিয়েছিলাম। ছবিটির নাম 'রাজগী'। এই ছবিতে শচীনবাবু দুটি গান গেয়েছিলেন—(১) সাজে নওল-

কিশোর ও (২) ওরে বন্ধুরে মনের কথা কইবার। 'রাজকুমারের নির্বাসন' ছবির সংগীত পরিচালকও শচীনবাবুই। 'রাজগী' ও 'রাজকুমারের নির্বাসন'কে নিয়ে শচীনদেব বর্মণ কর্তৃক সুর-সংযোজিত কলকাতায়-তোলা বাংলা ছবির সংখ্যা দাঁড়াল সাত। শচীনবাবু বোম্বাইতে তোলা দুটি বাংলা ছবির সুর-সংযোজনা করেছিলেন—(১) বম্বে টকিজের 'সমর' ও (২) গুরু দত্ত ফিল্মসের 'গৌরী' (অসম্পূর্ণ)।

সলিলদার তাঁর চিঠিতে ফিল্মিস্তানের 'আট দিন' ছবিতে গাওয়া শচীন দেব বর্মণের একটি মাত্র গানের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ঐ ছবিতে শচীনবাবুর একাধিক গান ছিল।

২৮-২-৭০ তারিখের 'দেশ'-এ প্রকাশিত 'সরগমের নিখাদ'-এর কিস্তিতে দেখি শচীনবাবু বলছেন যে, "অজয় ভট্টাচার্য কলকাতায় আসার পর কেবলমাত্র তিনিই শচীনবাবুর জন্য গান রচনা করতেন। কিন্তু অজয়বাবু জীবিত ও কলকাতায় থাকার সময়েও শচীনবাবু অন্য গীতিকারের লেখা গান গেয়েছেন; দৃষ্টান্তস্বরূপ শৈলেন রায়ের লেখা বিখ্যাত 'প্রেমের সমাধি-তীরে' (১৯৪০ সালে রেকর্ড হয়) গানটির উল্লেখ করতে পারি। ঐ কিস্তিতেই শচীনবাবু লিখেছেন যে, "খুব সম্ভব ১৯৪৭ সাল থেকে" তিনি হিজ মাস্টার্স ভয়েস-এ গান রেকর্ড করছেন। কিন্তু ১৯৪৭ সালের পরও শচীনবাবুর হিন্দুস্থান রেকর্ডে সাতটি গান (রেকর্ড নং H 1231, H 1320, H 1321, H 1328, H 1340, H 1384, H 1437) বেরিয়েছে। শচীনবাবু এইচ এম ভি-তে যোগদান করেন ঐ সালের অনেক পরে।

৭-৩-৭০ ও ১৪-৩-৭০ তারিখের 'দেশ'-এ কয়েকজন পত্রলেখক শচীন দেব বর্মণের ফিল্মের গান সম্বন্ধে ভুল কথা লিখেছেন। শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার বিশ্বাস (৭-৩-৭০-এ) লিখেছেন যে, শচীনবাবু 'মরণ তোদের ডাকে আজ' ও 'সাজে নওল-কিশোর চাঁদের তিলকে আজ' এই দুটি গান ফিল্মে গেয়েছিলেন। কিন্তু 'মরণ তোদের ডাকে আজ' বলে শচীনবাবুর গাওয়া কোন গান নেই; দিলীপবাবু বোধ হয় 'মাটির ঘর' ফিল্মের 'শ্যামরূপে ধরিয়া এসেছে মরণ' গানটির ভাবকেই গোলমাল করে ফেলে এইভাবে গুলিয়ে ফেলেছেন। 'সাজে নওলকিশোর' গানটি অবশ্য শচীনবাবু 'রাজগী' ফিল্মে গেয়েছিলেন। শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (৭-৩-৭০-এ) লিখেছেন শচীনবাবু জীবনে একটি মাত্র রবীন্দ্র সংগীত—'মিলন রাতি পোহাল'—গেয়েছিলেন কোন ফিল্মে এ কথা সর্বৈব ভুল। শচীন দেব বর্মণ কর্তৃক সুর-সংযোজিত 'প্রতিকার' ফিল্মে (ঐ ফিল্মেই গোপালবাবু কর্তৃক উল্লিখিত 'যদিও পরীরা ভুলেও কখনও রাতে' গানটি ছিল) 'মিলন-রাতি পোহাল' গানটি সন্নিবিষ্ট হয়েছিল বটে, কিন্তু গানটি শচীন দেব বর্মণ গান নি, গেয়েছিলেন জনৈকা মহিলা শিল্পী (তখন ফিল্মের প্লে-ব্যাক আর্টিস্টদের নাম বিজ্ঞাপিত হত না)—ঐ ফিল্মের 'ডালিয়া' নামে এক নারী চরিত্রের গান এটি, ঐ চরিত্রের অভিনেত্রী ছিলেন শ্রীমতী বনলা। শচীন দেব বর্মণ জীবনে কোনদিন কোন ফিল্মে বা রেকর্ডে রবীন্দ্র সঙ্গীত গান নি।

শ্রীযুক্ত মিহিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৪-৩-৭০ এ) লিখেছেন যে, 'সমর' ছবির 'সুন্দরী লো সুন্দরী' গানটি শচীন দেব বর্মণ গেয়েছিলেন। কিন্তু তা ঠিক নয়; 'সুন্দরী লো সুন্দরী' গানটি ছিল বহু নারী ও পুরুষের মিলিত কণ্ঠে গীত 'কোরাস' গান, তার মধ্যে শচীন দেব বর্মণের কণ্ঠ ছিল না। গানটির রেকর্ডেও অন্য শিল্পীদের নাম লেখা আছে। শচীনবাবু 'সমর' ছবির সুরকার, তার কোন গানের গায়ক নন।

সুখময় মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন

মহাভারতের অনুবাদ

৩১।১।১৯৭০-এর দেশ পত্রিকার সাহিত্য সংবাদে (৮১ পৃষ্ঠা) মহাভারতের ইংরেজী অনুবাদ সংক্রান্ত তথ্য এবং এ বিষয়ে ২০।২।৭০ তারিখের দেশ পত্রিকায় (৩৮৭ পৃষ্ঠা) শ্রীযুক্ত ক্ষিতেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের আলোচনা পড়িলাম। 'রমেশচন্দ্র দত্তও ইংরেজীতে মহাভারতের সংক্ষিপ্ত পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন। মহাভারতের অনুবাদ তিনি মারকুইস অব রিপনকে উৎসর্গ করেন।

অপ্রাসঙ্গিক হইলেও উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না যে, অনুরূপভাবে রামায়ণেরও ইংরেজী অনুবাদ করিয়া তিনি অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারকে উৎসর্গ করেন। ছন্দের মাধুর্যে এবং ভাষার গাম্ভীর্যে এই দুইটি অনুবাদই অপূর্ব। Jaico Publishing House অনুবাদগুলি প্রকাশ করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছে।

কুসুমকুমার দত্ত
কলিকাতা-১৪

মানবদরদী রাসেল

রাসেলের আত্মজীবনী প্রকাশের পর তাঁর মূল্যায়ণে হয়ত আমরা তাঁর করুণা এবং হৃদয়বোধকে নতুন মূল্য দিচ্ছি। কিন্তু তাঁর মানবদরদী মনের বিশিষ্ট চরিত্র আমরা যেন ভুলে না যাই। শ্রীচৈতন্য বা যিশুখৃষ্টে মানবপ্রেম এবং করুণার যে প্রকাশ, রাসেলের ব্যক্তিত্বে তার প্রকাশ স্বল্পই। তাঁর জীবনের সর্ব বিশ্বাসের মূল বুদ্ধি এবং যুক্তির শক্ত খুঁটিতে বাঁধা। এমন কি তাঁর মানবপ্রেমও করুণার আপ্লুত, বেদনায় আর্দ্র বা অশ্রুসজল নয়। তাঁর মননধর্মী তাঁর জীবনচর্চা, জাগ্রত, বিজ্ঞানমার্গী চেতনার আলোতে উদ্ভাসিত তাঁর জীবনবোধ। যে গাণিতিক নিশ্চয়তা তিনি সমাজজীবনে খুঁজেছিলেন যুক্তিবাদেই তার পুষ্টি। চিন্তায়, পরীক্ষায়, বিশ্লেষণে, জিজ্ঞাসায় রাসেলের প্রতিভা প্রায় একক। নিজের পরীক্ষিত বিশ্বাসে যিনি অটল থেকেছেন। ডাইনের পলিটিক্স বা বামের রাজনীতিতে নিজেকে সুবিধার মত সঁপে দেননি, সাহসী (আশ্চর্য নয়ও বটে!) চিন্তার বিচ্ছুরণ যাঁর বইয়ের প্রতি পাতায় প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধ অট্টহাস্যে যিনি উপহাস করেন—এই যোদ্ধা, ঋজু, জ্ঞানতাপস, শুদ্ধ রাসেলের মূর্তি আমরা যেন বাষ্পাকুল না করি। যে বেদনায় মানব কঠিনতর হয়, শাণিত বিদ্রূপে ব্যঙ্গ করে, সব অন্যায়ের মূলে যিনি সামাজিক অযৌক্তিক বিন্যাস দেখেন—হয়ত রাসেলের মানবপ্রেম সেই জাতের। ভলটেয়রের মত, রুসোর মত নিশ্চয় নয়। হৃদয় উৎসারিত অশ্রুপ্লাবন শ্রীচৈতন্য বা যিশুখৃষ্টে সত্য, রাসেলে নয়। রাসেলের জীবনবোধ আলোচনা প্রসঙ্গে এই বক্তব্য কেন্দ্রিক।

অশোকদেব চৌধুরী
নয়াদিল্লি-১৬

সাহিত্য-সংবাদ

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী 'সাহিত্য সংবাদ' বিভাগে জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন বসু স্বাক্ষরিত "বাংলা প্রবর্তন সমিতি"র যে আবেদন পত্রটি উদ্ধৃত করা হয়েছে তার জন্য ধন্যবাদ।

সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হল বাংলাদেশে বাংলা প্রবর্তনের জন্য আন্দোলন করতে হচ্ছে—যা স্বাভাবিক নিয়মেই হওয়া উচিত ছিল এবং এই সীমিত প্রচেষ্টাও হয়ত সম্ভব হত না যদি পূর্ব বাংলা আমাদের পথ না দেখাতো। স্থানীয় ভাষা প্রবর্তনে ভারতের অনেক প্রদেশই বাংলাদেশের থেকে অনেক এগিয়ে যাওয়ার কারণ বোধ হয় ঐসব প্রদেশের রাজনীতিক দলগুলোও এ বিষয়ে যথেষ্ট সক্রিয় এবং বাংলাদেশে মনে হয় তার অভাব আছে। প্রবর্তন সমিতি যে সপ্তাহব্যাপী তাদের কার্যসূচী হাতে নিয়েছিল তার জন্য সমিতি নিশ্চয়ই সাধুবাদ পাবেন। কিন্তু আমার মনে হয়, যে কোনো কারণেই হোক তা জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট সাড়া জাগাতে পারেনি এবং সেইজন্য মনে হয় এই কার্যসূচী আরও ব্যাপকতর ও দীর্ঘস্থায়ী হওয়া দরকার বাংলা প্রবর্তন সমিতি বা অন্য কোনো সংস্থা এ বিষয়ে আরও কিছু করছেন কিনা জানতে পারলে ভালো হয় এবং এই বিষয়ে যারা আগ্রহী তাদেরও সুবিধা হবে

সব্যসাচী ঘোষদস্তিদার
কলকাতা-১৯

কবির লক্ষ্য

সোভিয়েট রাশিয়ার তরুণ কবিদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিভাবান এবং খ্যাতিমান এখন আন্দ্রেই ভজনেসেনস্কি। তিনিও এবার কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হয়েছেন।

রুশ দেশের বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা নোভি মির-এর সম্পাদক কবি আলেকসান্দর টারডভস্কি যখন চাপে পড়ে পদত্যাগ করলেন, তখনই মনে হয়েছিল সোভিয়েট রাশিয়ার আরও কিছু লেখকের ওপরে চাপ আসবে। এটা শুরু হয়েছে সোলঝেনিৎসিনকে লেখক সঙ্ঘ থেকে বিতাড়ন থেকে।

ভজনেসেনস্কি কবিতা লেখেন যেমন আন্তরিক অনুভব থেকে, তেমনি নানা ব্যাপারে প্রতিবাদ করতেও তাঁর দেরী হয় না। চেকোশ্লোভাকিয়ার ঘটনার সময় তিনি লন্ডন থেকে এক প্রতিবাদ টেলিগ্রাম পাঠান মস্কোতে। ১৯৬৭ সালে তিনি সেনসর প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে লিখেছিলেন, "আমি একজন সোভিয়েট লেখক, রক্ত মাংসের মানুষ—পুতুল নাচের পুতুল নই যে আমাকে সুতোয় টেনে নাচাতে হবে।"

ইদানীং রুশ কর্তৃপক্ষ লেখকদের সম্পর্কে বেশী কড়া মনোভাব অবলম্বন করেছেন। আমি আজও বুঝতে পারি না, রুশ দেশের মতন এমন বিরাট শক্তিশালী দেশ—সমস্ত নাগরিকদের খাদ্য বস্ত্রের সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে, সামরিক শক্তি ও অর্থনৈতিক অবস্থায় সুদৃঢ়—তবে কয়েকজন লেখকের সামান্য সমালোচনা সহ্য করতে পারেন না কেন? কি ক্ষতি হবে তাতে অতবড় দেশের? বরং লেখকদের চিন্তা ও প্রকাশের স্বাধীনতা দিলে সাহিত্যের উপকার হয়। এইসব কোনো লেখকেরই রচনা স্বদেশদ্রোহী নয় কিংবা দেশের আদর্শ বিরোধী নয়—বড়জোর, বর্তমান ব্যবস্থায় কিছু সমালোচনা থাকে। সেটাই খুব দোষের?

ভজনেসেনস্কি একটা নাটক লিখেছেন, নাম "শুক আউট ফর ইওর ফেসেস"। নাটকটির অভিনয়ের অনুমতি দেবার ব্যাপারে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় দোনামনা করছিলেন, ন' মাস সেটা রিহার্সালে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত সেটি একটা রঙ্গালয়ে মুক্তি পেল, কিন্তু দুটি অভিনয়ের পর সেটা বন্ধ করে দেওয়া হলো কর্তৃপক্ষের আদেশে। সেটাকে নাকি কাটাছাঁটা করতে হবে—এবং আবার কবে মুক্তি পাবে তার ঠিক নেই।

কি কারণে নাটকটির ওপর এমন কোপ পড়লো, তা আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। কারণ আমরা নাটকটা পড়িনি, সোভিয়েট দেশের এসব খবরও জানা যায় না। তবে টাইম ম্যাগাজিন খুব ফলাও করে ব্যাপারটা ছাপিয়েছে। মার্কিন কাগজ হিসেবে টাইম ম্যাগাজিনের পক্ষে স্বার্থ প্রণোদিত হয়ে কিছু বেঁকিয়ে-চুরিয়ে লেখা অসম্ভব নয়। তবে, নাটকটি সম্পর্কে আপত্তি উঠতে পারে—এমন দু' একটি সম্ভাব্য তথ্য ওখানে উল্লেখ করা হয়েছে। পড়লে মনে হয়, রসিকতা।

একটি দৃশ্যে বলা হয়েছে যে, চাঁদ অদৃশ্য হয়ে গেছে। এতে অনেকে মনে করতে পারেন হয়তো, রুশরা চাঁদে পদার্পণ করতে পারেনি, আমেরিকানরা সেটা নিয়ে নিয়েছে। তবে, একটা লাইন আছে, "ওরা চাঁদের আত্মায় নোংরা জুতো পরা পা রেখেছিল।"

আর একটি দৃশ্যে, ফুটবল খেলায় এক পক্ষের লেফট উইং নিজের দিকেই সেম-সাইড গোল দিয়ে দিয়েছে। এখানে মন্তব্য

"কেউই এখন ঠিক জানে না, কে এখন দক্ষিণপন্থী, কে বামপন্থী!"

এছাড়া আর একটি কারণ হতে পারে এই যে, কিছুদিন আগে ভজনেসেনাস্কি "নোভি মির" পত্রিকায় একটি কবিতা লিখেছিলেন, সেটার নাম "লিখতে পারছি না"। এই ধরনের কবিতা প্রত্যেক কবিই জীবনে একবার না একবার লেখেন কিংবা লেখার কথা ভাবেন। হৃদয়-জগতে মাঝে মাঝেই নানারকম সংকট, সংশয় দেখা দেয় —কবিতায় তার তরঙ্গ এসে স্পর্শ করে। কর্তৃপক্ষ কিন্তু লেখকদের এই ধরনের সংকট থাকা পছন্দ করেন না—তাঁরা মনে করেন, লেখকরা সব সময় একটা উদ্দেশ্য মনে রেখে লিখে যাবেন, অনবরত লিখে যাবেন। তাঁদের কে বোঝাবে, এই ধরনের সংকট, সংশয় ছাড়া কবিতা লেখাই যায় না। তাহলে, কবিতা লেখার ব্যাপারটা আইন করে বন্ধ করে দিলেই হয়!

ভজনেসেনাস্কি লিখেছেন, "আমি এখন সংকটের মধ্যে রয়েছি, আমার আত্মা এখন বোবা......"

,.....কিন্তু আমার সমালোচকরা
নিশ্চয়ই প্রবন্ধ লিখে ফেলবেন যে
এই সম্পূর্ণ সংকটমুক্ত
সমাজ ব্যবস্থায়
আমিই যেন একমাত্র সংকটে
জড়িয়ে আছি......"

রূপসী বাংলা

নামটি যেমন সুন্দর, পত্রিকাটিও সে-রকম সুদৃশ্য। একটি পরিচ্ছন্ন মাসিক পত্রিকা, সম্পাদক সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। বড় গল্পকে উপন্যাস না বলে বড় গল্পই বলেছেন, এছাড়া আছে ছোট গল্প, প্রবন্ধ, অনুবাদ, কবিতা ও নানা বিষয়ে আলোচনা।

স্বতোৎসার

এই পত্রিকাটিকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে, 'অটোমেটিক রাইটারদের প্রকল্পনা আন্দোলনের মুখপত্র।' সম্পাদক, ভট্টাচার্য চন্দন ও দিলীপ গুপ্ত। লম্বা ধরনের পত্রিকা, অনেকটা পুঁথির মতন, কিন্তু সম্পাদকদ্বয় বলেছেন, এটি একটি কুড়ুলের ফলার প্রতীক—যার অর্থ গতানুগতিকতার মূলে কুঠারাঘাত। এবং উদ্দেশ্য হিসেবে ঘোষণা করা আছে, কবিতা, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ, উপন্যাস ইত্যাদির সমস্ত গতানুগতিক রচনারীতি এবং প্রথার শৃঙ্খল থেকে বেদনার্ত সাহিত্যকে মুক্ত করতে চাই আমরা। বাঃ, খুব ভালো প্রস্তাব। এই-রকম রচনা পড়ার জন্য আমরা আগ্রহী হয়ে রইলাম।

লেখা

একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা, বেরুচ্ছে ভাগলপুর থেকে, সম্পাদক বিনয়কুমার মাহাতো। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে ভাগলপুরের যোগাযোগের কথা সবারই জানা। ভাগলপুরে এবং কাছাকাছি এলাকায় লেখক-দের রচনা স্থান পেয়েছে এখানে, সম্পাদনায় নিষ্ঠার পরিচয় আছে। শরৎচন্দ্রের মামা সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের এযাবৎ অপ্রকাশিত ডায়েরি বেরুচ্ছে এতে ধারা-বাহিকভাবে, এছাড়া অন্যান্য গল্প, উপন্যাস, কবিতা ইত্যাদি।

সাহিত্য

আসামের তরুণদের খুব উঁচু জাতের পত্রিকা এই 'সাহিত্য।' সম্পাদক বিজিৎ কুমার ভট্টাচার্য। প্রাণবন্ত, তেজী কবিতা ও খাঁটি সত্যভাষী প্রবন্ধ এতে স্থান পায়। এই দশকের বাংলা কবিতা বিষয়ে আলোচনা করেছেন রুচিরা শ্যাম; অসমীয়া ও বাংলা ছন্দের বৈচিত্র্য ও ঐক্য বিষয়ে লিখেছেন বীরেন্দ্র রক্ষিত, ইরানের তরুণ কবি বিষয়ে —শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়। শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, শান্তনু ঘোষ, রণজিৎ দাস, পীযূষ রাউত ও আরও অনেকে খুব ভালো কবিতা লিখেছেন।

সীমান্তিক

কুমুদরঞ্জন মল্লিক এই মার্চ মাসে ৮৮ বছরে পড়লেন। জলপাইগুড়ি থেকে "সীমান্তিক" পত্রিকা একটি "কুমুদরঞ্জন সংখ্যা" প্রকাশ করে তাঁর প্রতি সম্মান জানিয়েছেন। ৭টি কবিতা ছাপা হয়েছে ওঁকে উপলক্ষ করে এবং ওঁর কবিতা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা। দেখে খুব ভালো লাগলো। তবে একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলা যায়। কোনো বর্ষীয়ান কবিকে সম্মান জানাতে গিয়ে আধুনিক কবিতার নিন্দে কি খুবই দরকার আছে? একটা কিছুকে খারাপ না বললে বুঝি আর একটা কিছুকে ভালো বলা যায় না?

অভিনয়

নাটক ও থিয়েটার বিষয়ক এই মাসিকটির সম্পাদকমণ্ডলীতে আছেন ৮ জন। এখন নাটক ও শৌখিন অভিনয়ের ব্যাপারে যে-রকম উদ্দীপনা এসেছে, তাতে এই ধরনের পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। প্রবন্ধ লিখেছেন সুধী প্রধান, অনিল দে, প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঋত্বিক-কুমার ঘটক প্রভৃতি।

মিনি ঘটিত

সত্যি বলছি, এত মিনি পত্রিকা বেরুচ্ছে যে, চোখে অন্ধকার দেখছি। সত্যি কথা বলতে কি, কাগজের সাইজ ছোট হলেও আলাদা কোনো সাহিত্যরীতি এখনো গড়ে ওঠে নি।

যাই হোক, এত মিনি পত্রিকা আসছে আমাদের কাছে যে, সব কটির কথা লিখতে গেলে পাতার পর পাতা ভরে যাবে। তা সম্ভব নয়! কয়েকটি এলোপাথাড়ি বেছে নিয়ে উল্লেখ করছি, কেউ হয়তো আমাকে পক্ষপাতিত্বের দোষ দেবেন, কিন্তু উপায় কি!

এক—একটি দ্বিভাষিক মিনি পত্রিকা, ইংরিজি ও বাংলায়। সম্পাদক প্রদীপ ভট্টাচার্য, জগদীশ বসাক, কুমারেশ চক্রবর্তী। অনেক লেখা, প্রায় পঞ্চাশ জনের, পি লাল, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, সুনীল রায়—সব নাম দেওয়া যায় না!

প্রান্তরেখা—বেরুচ্ছে জলপাইগুড়ি থেকে। সম্পাদক রতন বিশ্বাস ও তপন গঙ্গো-পাধ্যায়। এটা উত্তরবঙ্গের প্রথম অনু-পত্রিকা এবং প্রথম সংখ্যার নাকি দ্বিতীয় সংস্করণ বেরিয়েছে। বাঃ!

কণ্ঠস্বরের সম্পাদক সত্যরঞ্জন বিশ্বাস। এটা বেরিয়েছে ২১শে ফেব্রুয়ারি স্মরণ সংখ্যা হিসেবে।

গিরিধারী কুণ্ডুর সম্পাদনায় প্রতিবিম্ব মিনি পত্রিকা নয় এমনিই ছোট পত্রিকা—সব নামকরা লেখক।

মানব পালের সম্পাদনায় বেরিয়েছে মুহূর্ত, একে বলা হয়েছে 'মিনি প্রিন্স'। এই পত্রিকাটি দেখতে বেশ ভালো, লাইনো টাইপে ছাপা, সে হিসেবে মিনি প্রিন্সেস-ই তো বলা উচিত ছিল।

সনাতন পাঠক

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তিতর্কের অবতারণা করেছেন। আধুনিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর অধিকারী একটি বাঙালী সমাজ যাতে গড়ে উঠতে পারে, সেজন্য বিদ্যাসাগর শিশুপাঠ্য বইও লিখেছিলেন। বিদ্যাসাগরের শিশুপাঠ্য গ্রন্থের কোন কাহিনীতে বেদ, উপনিষদ প্রভৃতির কোন চরিত্র স্থান পায়নি। এসব বিষয়ে বিদ্যাসাগর ততটা অবহিত ছিলেন না (পৃঃ ১৪৭) বলে লেখক যে-মন্তব্য করেছেন, তা সম্ভবত সত্য নয়। শৈশব থেকেই নীতিপরায়ণতার জীবনাদর্শে ছেলেমেয়েদের গড়ে তুলবার জন্য সম্ভবত তিনি ধর্মীয় কাহিনী একেবারেই পরিহার করেছিলেন। কিন্তু তাই বলে তিনি যে ভারতীয় ঐতিহ্য বাতিল করতে চান নি, সংস্কৃত চর্চা ও সংস্কৃত সাহিত্যের বাংলায় অনুবাদ তার প্রমাণ। আবার "গীতার নিষ্কাম কর্মযোগের আদর্শে" বিশ্বাসী না হয়েও বিদ্যাসাগরের "সমগ্র জীবনসাধনা ওই নিষ্কাম ব্রতের সবচেয়ে কাছাকাছি" (পৃঃ ১৪০) বলে যে মন্তব্য করা হয়েছে, সেটাও ঠিক মনে হয় না। ব্যক্তিগত ফললাভের কথা তিনি ভাবেন নি, তিনি ভেবেছিলেন গোটা সমাজের কথা। শিক্ষাপ্রসার, শিশু-পাঠ্য রচনা, বাংলা গদ্যের সৃষ্টি, সমাজ-সংস্কার আন্দোলন প্রভৃতির মারফত গোটা সমাজকেই তিনি উন্নত করতে চেয়েছিলেন।

টেকচাঁদ ঠাকুর 'আলালের ঘরে দুলাল' গ্রন্থে মানুষের মুখের ভাষা ব্যবহার করে-ছিলেন। বর্তমান গ্রন্থের লেখক সেই ধারার ধারাবাহিকতা দেখতে পেয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে। শ্রীরামকৃষ্ণের গল্প ও উদাহরণের মাধ্যমে বাংলার গণজীবন সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। কিন্তু এই ধারার মধ্যে মাইকেলের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। বর্তমান গ্রন্থে অক্ষয় দত্ত আছেন অথচ মাইকেলের সম্পর্কে কোন বিশেষ আলোচনা নেই, ভাবতেই খারাপ লাগে। তা সত্ত্বেও, সাহিত্য, সমাজ ও ধর্মীয় চিন্তার একত্র সমাবেশ গ্রন্থটিকে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দিয়েছে।

সেই সময়ে বাংলা দেশে মুসলিম সমাজও ছিল, চিন্তাধারার দিক থেকে তাঁরা ঠিক আদিবাসী সমাজের মত একেবারে 'গতিহীন' ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সৈয়দ আহমেদ মুসলিম সমাজে সামাজিক সংস্কার, পর্দা-প্রথার অবসান, নারীশিক্ষা ও ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের জন্য আন্দোলন করলেও বাংলা দেশে তার কোন ঢেউ লাগে নি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী-মননের আলো-চনার সময় বাঙালী মুসলমানদের মানসিক গতিবিধির হদিশ পেলে অনেকেই খুশী হতে পারতেন। (৭৭/৭০)

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যায় (২১শ সংখ্যা) পুস্তক পরিচয় বিভাগে "রাক্ষসী তিস্তা" নামক গ্রন্থটির সমালোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থের লেখক শ্রীঅরুণ নিয়োগীর পরিবর্তে আলোচনার মধ্যে ভুলক্রমে শ্রীনিয়োগীর পরিবর্তে শ্রীমৈত্র প্রকাশিত হয়েছে। এই মুদ্রণ প্রমাদের জন্য আমরা দুঃখিত।

তীয় হকি থেকে বাংলার হকি দলের বিদায়ের পর জাতীয় ক্রিকেট অর্থাৎ র্ণজি প্রতিযোগিতার খেলা থেকেও বাংলার ক্রিকেট দলকে বিদায় নিতে হয়েছে।

হকিতে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বাংলার বিদায়। ক্রিকেটে বিদায় সেমি-ফাইনাল থেকে। তবে হকির চেয়ে ক্রিকেট থেকে বিদায় আরও বেদনাদায়ক। কেননা জয়পুরে ৪ দিনের সেমিফাইনাল খেলা দুদিনেই শেষ হয়ে গিয়েছে। দুদিনের মধ্যে রাজস্থান বাংলাকে পরাজিত করেছে ইনিংস ও ৩৪ রানে। রণজি প্রতি-যোগিতার দীর্ঘ ইতিহাসে দুদিনের মধ্যে সেমিফাইনাল মীমাংসা হবার ঘটনা সম্ভবত এই প্রথম ঘটল।

দায়িত্ব বোধের অভাব পরাজয়ের কারণ

যে রাজস্থান কোনবার রণজি ট্রফি জয় করতে পারেনি, তাদের কাছে বাংলার এই শোচনীয় পরাজয়ের কারণ কি? জয়পুরের রিপোর্ট থেকে বলা যায় দায়িত্ব-বোধের অভাব এবং খেলার গুরুত্ব অনুযায়ী মনোনিবেশ না করে খেলার ফল।

অভিজ্ঞ ও তরুণ খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া রাজস্থান অবশ্যই শক্তিশালী দল কিন্তু টেস্ট থেকে বাতিল খেলোয়াড় সেলিম দুরানী, কৈলাস ঘাটানি এবং সি যোশীর বল এমন মারাত্মক নয় যে বাংলার প্রথম ইনিংস মাত্র ৭৪ রানে শেষ হয়ে যাবে। খেলার উপর উপযুক্ত গুরুত্ব না দিয়ে খেলার ফলে এবং দায়িত্ববোধের অভাবেই বাংলার প্রথম ইনিংস ওই ৭৪ রানে শেষ হয়ে যায়। বাংলার রান অতিক্রম করে আরও ৯৬ রানে এগিয়ে গিয়ে ওইদিনই রাজস্থান যখন দিনের শেষে প্যাভিলিয়নে ফিরে যায় তখন হাতে তাদের ৮টি উইকেট। অর্থাৎ প্রথম দিনের খেলায় বাংলার ৭৪ রানের উত্তরে রাজস্থান করে ২ উইকেটে ১৭০ রান।

এর পর আর বাংলার পক্ষে ম্যাচ জেতার আশা করা যায় না। কিন্তু ক্রিকেটের গ্লোরিয়াস আনসার্টেনিটির কথা ভেবে বাংলার খেলোয়াড়দের মরদের মত লড়াই করা উচিত ছিল। সে সুযোগও এসে গিয়েছিল প্রধানত সুব্রত গুহর বোলিং নৈপুণ্যে। এক সময়ে ৯·৪ ওভার বোলিং-এর মধ্যে মাত্র ১৮ রান দিয়ে সুব্রত পেয়েছিলেন ৫টি উইকেট। ফলে বাকি ৮টি উইকেটে রাজস্থানের পক্ষে ৭৩ রানের বেশী যোগ করা সম্ভব হয়নি। ২৪৩ রানে তাদের ইনিংস শেষ হয়ে যায়।

আরও কম রানেও রাজস্থানের ইনিংস শেষ হতে পারত যদি বাংলার ফিল্ডসম্যানরা ৬টি সহজ ক্যাচের অপব্যবহার না করতেন। পরিবর্ত ফিল্ডসম্যান দীপঙ্কর সরকার একাই ফেলে দিয়েছেন ৩টি সহজ ক্যাচ।

যাই হোক ওই অবস্থায় পরাজয় এড়ানো বাংলার পক্ষে অবশ্য খুবই কষ্টকর ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে ১৬৯ রান করে ইনিংস পরাজয় এড়ানো কি একেবারে অসাধ্য ছিল? সম্ভবত বাংলার খেলোয়াড়রা

বাংলার বালিকা সাইক্লিস্ট শিখা সেন

এই মনোভাব নিয়ে দ্বিতীয় দফায় মাঠে নেমেছিলেন যে, জয় যখন সম্ভব নয় তখন তাড়াতাড়ি সব শেষ হয়ে যাওয়াই ভাল। না হলে প্রথম ইনিংসের মত দ্বিতীয় ইনিংসেও দায়িত্ব চেতনার অভাব দেখা যাবে কেন? কেন পড়বে ঝপাঝপ উইকেট? জয়পুর থেকে খেলার যে রিপোর্ট এসেছে তাতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে শেষ-দিকের ব্যাটসম্যানরা যে দৃঢ়তায় দুরানী, ঘাটানি ও যোশীর বলের আক্রমণ দুঘণ্টা ধরে প্রতিরোধ করেছেন প্রথম দিকের ব্যাটস-ম্যানরা তার অর্ধেক দৃঢ়তা দেখাতে পারলে বাংলাকে ইনিংসে হার স্বীকার করতে হত না। সত্যি কথা বলতে কি, বাংলার প্রথম ইনিংসে গোপাল বসু এবং দ্বিতীয় ইনিংসে অধিনায়ক অম্বর রায় ছাড়া কেউ দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যাট করতে পারেন নি। গোপাল বসুর রান আউটের ক্ষেত্রে আবার দায়িত্ব-বোধের অভাব দেখা গিয়েছে।

অনেকে আশা করেছিলেন বাংলা এবার রণজি ট্রফির ফাইনাল খেলবে এবং খেলার ব্যবস্থা হবে ইডেনে। এ বছরের মত সে আশা শেষ।

জাতীয় হকি সমীক্ষা

জাতীয় হকিতে বাংলার পরাজয়ের কথা আগের সপ্তাহেই আলোচনা করা হয়েছে। এ সপ্তাহে সামগ্রিক খেলার কথা।

এবার জাতীয় হকি ফাইনালে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে গতবারের বিজয়ী পাঞ্জাব ও রানার্স রেলওয়ে। কিন্তু দুদিনের ফাইনালে মোট ১৮৫ মিনিট খেলার মধ্যেও কোন গোল না হওয়ায় দুই দলকে যুগ্ম বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। এবার নিয়ে দুই দলই পেয়েছে ১১ বার করে জাতীয় হকি জয়ের সম্মান। এর মধ্যে রেলের যুগ্ম জয় ৩ বার, পাঞ্জাবের এই প্রথম। তবে ফাইনালে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দুই দলের অবস্থা সমান সমান। ১৯৩০ সালের ফাইনালে রেলের কাছে পাঞ্জাবকে হার স্বীকার করতে হয়েছিল, গতবার ফাইনালে পাঞ্জাব পরাজিত করেছিল রেলকে। এবারের ফাইনাল গোলশূন্য।

তুলনামূলক বিচারে পাঞ্জাব ছিল অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী। কারণ তাদের দলে ছিলেন ৪ জন অলিম্পিক খেলোয়াড় বিনোদকুমার, হরমেক সিং, অজিত পাল সিং ও বলবীর সিং। অপরদিকে রেল দলে অলিম্পিক খেলোয়াড় ছিলেন দুজন—হরবিন্দার সিং ও ইন্দার সিং।

কিন্তু যে দল দ্বিতীয় দিনের ফাইনাল খেলায় ১৪টি শর্ট কর্নার এবং লং কর্নার পেয়ে একটিও গোল করতে পারেনি তাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করাও শক্ত। শর্ট কর্নারে সিদ্ধহস্ত বলে খ্যাত বিনোদকুমার যিনি এবারের জাতীয় হকিতে পাঞ্জাবের ২৫টি গোলের মধ্যে ৬টি গোল করেছেন শর্ট কর্নার থেকে, ফাইনালে তাঁর পক্ষে ১৪টি শর্ট কর্নারের অপব্যবহার একদিকে যেমন তাঁর ব্যর্থতার পরিচয় অপরদিকে রেল খেলোয়াড়-দের পরিচয় দৃঢ়তার। শুধু বিনোদকুমারের ব্যর্থতা কেন, গোল করার দিক দিয়ে অনেক খেলোয়াড়েরই এবার ব্যর্থ ভূমিকা।

জাতীয় হকির মোট ৭৪টি খেলায় ২০৬টি গোল হয়েছে। প্রতি ম্যাচে গোলের গড় ২·৭। বলা বাহুল্য, গ্রুপ লীগে দুর্বলের বিরুদ্ধে শক্তিশালীর বেশী

গোলের হিসাব সহ। তা না হলে যেথানে প্রায় সমানে সমানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সেখানেই গোলের অভাব।

সকসদ্ধ ৮২টি শর্ট কর্নার এবং ১০টি পেনাল্টি স্ট্রোকের মধ্যে গোল হয়েছে ২১টি শর্ট কর্নার ও ৬টি পেনাল্টি স্ট্রোকে। এটাও আমাদের হকির পক্ষে আশার কথা নয়। অবশ্য কয়েকজন তরুণ খেলোয়াড়, বিশেষ করে সার্ভিসেস দলের এইচ জে এস চিমনী সুযোগ-সন্ধানী হিসাবে সুনাম কুড়িয়েছেন। চিমনীই এবার সর্বোচ্চ গোলদাতা। একটি খেলায় ডাবল হ্যাট্রিকের কৃতিত্ব সহ ৬টি খেলায় গোল করেছেন ১৪টি।

অযথা ফাউল করে খেলার জন্য ৬ জন খেলোয়াড়কে এবার মার্চিং অর্ডার পেতে হয়েছে। এ'রা হচ্ছেন ইউনিভার্সিটির রাজিন্দার সিং, বিদর্ভের বসকো জোসেফ, মহারাষ্ট্রের গিলবার্ট, পাঞ্জাবের রোশন সিং, রেলওয়ের অশোক কুমার এবং বাংলার ইনাম-উর রহমান। কোন খেলোয়াড়েরই মাঠ থেকে বের হয়ে যাবার শাস্তি পাবার মত আচরণ করা উচিত নয়। বিশেষ করে ইউনিভার্সিটির খেলোয়াড় রাজিন্দার সিং এবং অলিম্পিক খেলোয়াড় ইনাম-উরের পক্ষে আরও সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন।

জাতীয় হকির খেলা যেমন এবার উ'চু পর্যায়ে পৌছয়নি তেমন আম্পায়ারিংও ভাল হয়নি। অনেক খেলার আম্পায়াররা তো ভুলচুক করেছেনই। তার উপর ফাইনাল খেলায় আম্পায়ারদের পরিচালনা সমালোচনার ঊর্ধ্বে ছিল না। দুদিনের ফাইনালেই রেলের উপর অবিচার করা হয়েছে। অপরদিকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে পাঞ্জাবকে। জলন্ধরের হকি আসরে পাঞ্জাবের দর্শকরাই ছিলেন গ্যালারি ভরে। কিন্তু দর্শকরাও আম্পায়ারকে সমর্থন করতে পারেননি। এমন কি কয়েকটি ক্ষেত্রে রেলের বিরুদ্ধে অহেতুক শর্ট কর্নারের নির্দেশে দর্শকেরা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন আম্পায়ারের বিরুদ্ধে।

ভারতীয় হকির পরিচালকরা ২৪০ জনেরও বেশী খেলোয়াড়ের গুণাগুণ পরীক্ষা করার সুযোগ পেয়েছেন জলন্ধরের জাতীয় আসরে। ইউরোপ সফরে দল গড়ার উদ্দেশ্যে খেলার বোম্বাই ট্রেনিং ক্যাম্পের জন্য ৪০ জন খেলোয়াড়কে ডাকা হয়েছে। তার পরে আছে এশিয়ান গেমস এবং বিশ্ব অলিম্পিক। কিন্তু জাতীয় আসরের খেলার নজির থেকে বলা যায় যদি খেলোয়াড়দের আরও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সৃষ্টি না হয়, যদি আন্তরিকতা নিয়ে কঠিন অনুশীলনের মধ্যে তাঁরা নিজেদের প্রস্তুত করে গড়ে না তোলেন, মাঠের মধ্যে এবং মাঠের বাইরে তাঁদের আচরণ যদি আদর্শ-স্থানীয় না হয় তবে আন্তর্জাতিক হকিতে ভারতের হৃত সম্মান পুনরুদ্ধার করা শক্ত।

সাইক্লিস্ট শিখা সেন

কটকের জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানে সাইকেল চালনায় দুটি স্বর্ণ পদকের অধিকারিণী বাংলার বালিকা সাইক্লিস্ট শিখা সেন কয়েকদিন আগে এসেছিল আমাদের দপ্তরে ক্রীড়া-উৎসাহী বাবা নবীন সেনের সঙ্গে।

কদিন পরেই শুনি ময়দানের রেড রোডে সাইকেলের অনুশীলনের সময় একটি টেম্পোর সঙ্গে সংঘর্ষে শিখা শরীরের ৬ জায়গায় আঘাত পেয়েছে। রেড রোডের সেই 'অভিশপ্ত' স্থানেই শিখা দুর্ঘটনায় পড়েছে যে স্থানে গত বছর এই মার্চ মাসে বাংলার প্রখ্যাত সাইকেল চালক জিয়াউর রহমান দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন।

অথচ রেড রোডে টেম্পো, লরি, বাস এবং মন্থরগতির যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ বলেই বাংলার সাইকেল চালকরা অনুশীলনের জন্য ওই রাস্তা বেছে নিয়েছেন। ভাবতে ভয় হয়, শিখার অবস্থা আরও খারাপ হতে পারত, বিপদ আরও বড় হতে পারত।

যাই হোক, এই মেয়েটির উপর আমাদের আশা রাখার কারণ আছে। মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তোমার খেলাধুলার এই অনুপ্রেরণা এলো কোথা থেকে? মেয়েটি তার বাবার দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল। বলল, 'আমি ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি খেলাধুলায় আমাকে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হতে হবে। সেইভাবেই বাবা আমাকে তৈরী করেছেন। বোবাজার ক্লাবে ভর্তি করে সাঁতার শিখিয়েছেন, ময়দানে নিয়ে গিয়ে সাইকেল চালনা শিখিয়েছেন, রেসিং সাইকেল কিনে দিয়েছেন। আমার আন্তরিকতা ও সাইকেল চালনা দেখে জিয়াউর রহমান আমাকে ভবিষ্যৎ জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হিসাবে চিহ্নিত করে রেখেছিলেন। ও'দের কথায় আমিও পেয়েছিলাম দারুণ উৎসাহ। তাই অনুশীলনে কোনদিন ছেদ দিইনি।'

শিখাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম খেলাধুলার জন্য তোমার পড়াশুনার ক্ষতি হয় না? ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী শিখার উত্তর: পড়ার সময় পড়ি, খেলার সময় খেলি। ক্ষতি হবে কেন?

পরের প্রশ্ন ছিল—তোমার জীবনের লক্ষ্য কি?

শিখা বললো, 'সাইকেলে আরও সুনাম অর্জন করতে চাই। আর বড় হয়ে বিমান বাহিনীতে চাই বৈমানিক হতে।'

বলা বাহুল্য মেয়েটির কথার ভেতর ছিল আত্মবিশ্বাসের সুর।

দশজন অর্জুন

১৯৬৯ সালের খেলাধুলোর কৃতিত্বের জন্য যে ১০ জনকে অর্জুন পুরস্কার দেবার জন্য মনোনীত করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে দুজন বাঙালীর কৃতিত্ব বিশেষভাবেই উল্লেখ করার মত। একজন রেলওয়ের ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় দীপু ঘোষ, অপরজন দূরপাল্লার সাঁতারু বৈদ্যনাথ নাথ। দুই রকমের স্পোর্টসে এ'দের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। একাধিকবার পক প্রণালীর সাঁতারে বিজয়ী বৈদ্যনাথ দূরপাল্লার সাঁতারে ভারতে অদ্বিতীয়। দীপু ঘোষ ব্যাডমিন্টনে ভারত-শ্রেষ্ঠ এবং জাতীয় চ্যাম্পিয়ন। দীপুর কৃতিত্ব এই কারণে আরও বেশী যে, বছর দেড়েক আগে এক স্কুটার দুর্ঘটনায় তাঁর ক্রীড়াজীবনে ছেদ পড়ার আশঙ্কা সত্ত্বেও অদম্য মনোবল এবং কঠিন অধ্যবসায়ে আবার খেলাধুলোয় নিজের জায়গা করে নিয়ে শীর্ষে আরোহণ করেছেন।

অর্জুন পুরস্কারের জন্য যাঁদের মনোনীত করা হয়েছে তাঁদের নাম: হরনেক সিং (অ্যাথলেটিক), দীপু ঘোষ (ব্যাডমিন্টন), হরি দত্ত (বাস্কেটবল), বিষেণ সিং বেদী (ক্রিকেট), ইন্দার সিং (ফুটবল), কোটার রাজকুমারী ভুবনেশ্বরী (রাইফেল শুটিং), বৈদ্যনাথ নাথ (সাঁতার), অনিল নায়ার (স্কোয়াশ), মীরকাশিম আলী (টেবল টেনিস) এবং চাঁদগী রাম (মল্লযুদ্ধ)।

একলব্য

এখন ?
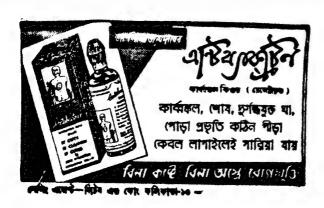
ফিল্ম কনসালটেটিভ কমিটি গঠিত হয়েছে বেশ কিছুদিন হল, কিন্তু এর ফলে বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পের কি সুফললাভ হবে তা এখনও আমাদের বুদ্ধির অগোচর। এই কমিটি গঠিত হওয়ার আগে বাংলা ছবির মঙ্গলসাধনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতি আন্দোলন চালিয়েছিলেন। ক্রমশ সেই আন্দোলন একমাত্র একটি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধেই কেন্দ্রীভূত হল। সে গোষ্ঠী হল বাংলা ছবির রিলিজ-চেনের মালিকগোষ্ঠী। অর্থাৎ বাংলা ছবি রিলিজের বিধিব্যবস্থা, প্রদর্শকদের উপর চাপ সৃষ্টি, সিনেমা-হলের সামনে পিকেটিং ইত্যাদির মধ্যেই সমিতির কর্মধারা প্রধানত কিছুকাল আবদ্ধ ছিল।

সে যাই হোক, কনসালটেটিভ কমিটি প্রথমেই যে কাজ কিছুটা দেখালেন সে হল সেন্সর-ভিত্তিক চিত্রমুক্তি। সমিতির আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করাই কমিটির প্রথম কর্তব্য দাঁড়াল। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, কমিটি পুরোদমে কাজ আরম্ভ করবার আগেই সেন্সর-ভিত্তিক নীতিকে এড়িয়ে গিয়ে কোন কোন প্রযোজক নিজেদের ছবি রিলিজের ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছিলেন। অবশ্য সেন্সর-ভিত্তিক নীতি যে অনেকের কাছেই অস্বস্তি ও অসুবিধার বিষয় তা আর বলে লাভ নেই। সেন্সর-ভিত্তিক নীতি অনুসরণ করা কতখানি সম্ভব সে বিষয়ে আগেই আলোচনা হয়েছে, পুনরালোচনার প্রয়োজন নেই।

কনসালটেটিভ কমিটির কর্মব্যস্ততা দেখে মনে হয়েছিল, না জানি কত বাংলা ছবি মুক্তির অপেক্ষায় স্তূপীকৃত হয়ে আছে। মনে হয়েছিল, কোথাও সেন্সরওয়াইজ রিলিজ বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হলে বাংলা ছবির সমূহ বিপদ। এখন তো দেখছি উল্টো। গত সপ্তাহের কথাই ধরা যাক, তিনটি বাংলা চেনে পুরোনো ছবি—হয় বাংলা নয় হিন্দী নয় ইংরাজী—চলছে। একটি চেনে একাধিক সপ্তাহ ধরে পুরোনো ছবি টিঁকিয়ে বসে আছে। এ সপ্তাহে কোন নতুন বাংলা ছবি মুক্তি পাবে এমন সম্ভাবনাও দেখছি না। আগামী সপ্তাহেও নয়।

কিশোর সাহু প্রোডাকসন্স-এর "পুষ্পাঞ্জলি" ছবির নায়িকা নয়না সাহু—ছবিটি এ সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে

নতুন বাংলা ছবি তৈরী নেই, এমন হয়তো নয়। আগে যা ধারণা হয়েছিল অথবা যে ধারণা তৈরি করা হয়েছিল যে বহু ছবি বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে আছে তা এখন আর মেনে নিতে পারছি না। তবে কিছু ছবি যে সম্প্রতি তৈরী হয়ে আছে সে সংবাদ রাখি। আবার এমনও শোনা যাচ্ছে যে, কোন কোন প্রযোজক ছবি সম্পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তা সেন্সর করাবার জন্য মোটেই নাকি আগ্রহী নন। কারণ, সেন্সর হলেই তো কনসালটেটিভ কমিটি তা মুক্তির ব্যবস্থা করে দেবেন। অন্যদিকে শুনেছি কোন কোন ছবি সেন্সর হয়ে গেছে কিন্তু সেগুলির মুক্তির ব্যাপারে প্রযোজকের এখনই নাকি কোন তাড়া নেই। বোধ হয় এ ব্যাপারে সকলেই দিন-ক্ষণটাই বড় করে দেখছেন। এবং নিজের পছন্দমত বিশেষ চেন-ও নয় কি?

আসলে চিত্রজগতে, অন্য ব্যবসার ক্ষেত্রের মতই, ব্যবসায়িক সুবিধা-অসুবিধাই একমাত্র ভাববার বিষয়, আদর্শের কথা পরে। তবে বড় বড় নীতির কথা বলতে হয় বৈকি। আগে যা বলছিলাম, নতুন বাংলা ছবি এখন হাউসে নেই, অথচ কিছুসংখ্যক বাংলা ছবি যে আসতে পারত না তও নয়। এদিকে তো

"দুটি মন" (পরিচালনা : পীযূষ বসু) ছবিতে উত্তমকুমার ও সুপর্ণা সেন

আদি অভিযোগ এখনও শোনা যাচ্ছে যে হিন্দী ছবি বাংলা চিত্রকে কুক্ষিগত করে রেখেছে। এবং যে চেনে বাংলা ছবি চলে এবং চলতে পারে সেখানেও হিন্দী ছবির জামাই-আদর। এমনও দেখা গেছে যে ওই চেনে যদিও বা কনসালটেটিভ কমিটির নির্দেশে একটি বাংলা ছবি দেখানো হল, তার পরেই আবার হিন্দী ছবি। যেন কোনরকমে দায় সারা। প্রদর্শকদেরও যে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের প্রতি একটা কর্তব্য আছে তা যেন তাঁরা ভুলেই যান। তাঁরা ভুলতে পারেন, কিন্তু কনসালটেটিভ কমিটির কি কিছুই করবার নেই? তাঁদেরই বা করনীয় কি—যাঁরা "অরণ্যের দিনরাত্রি"-র মুক্তির বিরুদ্ধে আকাশ পাতাল কাঁপিয়ে তুলেছিলেন? এখন হলে ছবি নেই কেন? তাঁরা এখন কি বলবেন?

"টাইম টু লিভ"—পূর্ব জার্মানীর ছবি

[জি ডি আর ফিল্ম ভাল করে দেখার সুযোগ এবার পেলেন কলকাতার দর্শকরা। ম্যাজেস্টিক সিনেমায় সাতদিনব্যাপী ফেস্টিভ্যালের আয়োজন হল। ভারত সরকারের কালচারাল এক্সচেঞ্জ কর্মসূচী অনুযায়ী এই উৎসবের আয়োজন।]

টাইম টু লিভ : টেকনিকাল কাজ এবং কালারের দিক থেকে পূর্ব জার্মানীর ছবি যে অন্য কোন দেশের ছবির তুলনায় পিছিয়ে নেই তার প্রমাণ "টাইম টু লিভ"। এই ছবির পরিচালক হর্স্ট সীমান কয়েক-দিন আগে কলকাতায় এসেছিলেন। কথায় কথায় তিনি বলেছিলেন, ফরাসী নভেল ভাগ ছবি এবং য়ুরোপের অন্যান্য দেশের ছবির সঙ্গে তিনি পরিচিত। এই পরিচয়ের প্রভাব তাঁর ছবিতে খুব বেশি একটা পড়েছে তা নয়। জাম্প-কাট ফ্ল্যাশব্যাক কারো একচেটিয়া নয়। পরিচালক সীমানের একটা নিজস্ব স্টাইল আছে মনে হয়, যেটা রোমান্টিক এবং লিরিকাল। সাধারণত সমাজতান্ত্রিক দেশের ছবিতে বক্তব্যটাই প্রধান হয়ে ওঠে, স্টাইল কিংবা টেকনিক যদি কিছু থাকে তবে বক্তব্যকে সুব্যক্ত করার জন্যই। এ-ছবিতে স্টাইল সর্বথা বক্তব্যের অনুসারী মনে হয়নি। পরিচালকের একটা নিজস্ব মেজাজ প্রকাশ পেয়েছে।

ছবিটি সমাজতান্ত্রিক। একজন খাঁটি কম্যুনিসট এ-ছবির নায়ক। শিল্প-ব্যবসার মধ্যে থেকে সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনই তাঁর প্রথম ও প্রধান কাজ। ছবিতে একটা করুণ সুর আছে। নায়ক লাঙ্গে রেজার জেনেছেন তাঁর আয়ু আর বেশিদিন নেই। জীবনের বাকি সময়টুকু তিনি সমাজের কল্যাণেই নিয়োগ করতে মনস্থ করেছেন। এর জন্য তাঁকে সংগ্রামও করতে হয়েছে খুব।

পরিচালক সীমান এ-কাহিনীতে সম সাময়িক কালের মানুষ ও তার আশা আকাঙ্ক্ষার রূপটি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। অতীতের কথা যে পরিচালক তথা আজকের পূর্ব জার্মানীর লোকের ভুলতে পারেননি সে-পরিচয়ও ছবিতে রয়েছে। ফ্ল্যাশব্যাকে দেখানো হয়েছে রেজারের স্ত্রী কী ভাবে ফ্যাসিস্টদের হাতে নিহত হয়েছিলেন।

ছবিটি সম্পর্কে বড় কথা এই এ একটি দেশের সমাজ-জীবন ও চিন্তাভাবনা অনেকখানি পরিচয় পাওয়া যায়। যদি ছবিতে কথা অত্যন্ত বেশি। এবং সামাজিক বক্তব্য ও আদর্শ প্রচারের বাড়াবাড়িও খুব। এ কারণে অনেক সময় ছবিটি ক্লান্তিকর লাগে। পরিচালক যেখানে ছবিতে দ তরুণ দম্পতির জীবনের প্রেম ও মাধু বিশ্লেষণ করেছেন সেখানে তিনি কল্পনা শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, অন্যত্র তিনি বহু নরনারীর ঘনিষ্ঠ দেহসম্পর্ক তিনি দর্শ বোধের সঙ্গেই দেখিয়েছেন, কিন্তু ক অংশে তা অশ্লীল মনে হয়নি। র রোমান্টিক সম্পর্কের মাধুর্য ছবিটিকে এক আলাদা ডাইমেনশন দিয়েছে, যা ছবির ম সমাজতান্ত্রিক বিষয়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভ জড়িত থাকলেও একটা ভিন্ন রসের আ এনে দিয়েছে।

অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত "এই করেছে ভাল" ছবিতে অনুপকুমার
[illegible]

বোম্বাই বিচিত্রা

বহুদিন বম্বেতে আছি, তবু আসলে বাঙ্গালী তাই হরতাল, মিছিল, সোডার বোতল এমন কি দেশী বোমা-টোমাও আমার কাছে ডাল-ভাত। কিন্তু দীর্ঘদিন এখানে থেকে 'আরব্য সাগরের নোনা জল' খেয়ে কেমন যেন নিরীহ হয়ে গেছি। নেহাৎই নির্ঝঞ্ঝাট শহর বম্বে। বাসের ভাড়া বাড়লে এখানে আন্দোলন হয় না। বাস কন্ডাক্টার দুর্ব্যবহার করলে কেউ বাস পোড়ায় না, দিনের পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ রেশনের দোকানে চাল বা চিনি না থাকলে বিক্ষোভ প্রকাশ করে না, সিনেমার টিকিটের দাম বাড়লে কেউ সিনেমা হলের চেয়ার ভাঙে না। সবাই এখানে রোদ-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে লাইনে দাঁড়াতে অভ্যস্ত। সবাই এখানে ঝামেলা এড়িয়ে চলে। এখানে যাঁরা বয়স্ক তাঁরা সবাই শান্ত। যৌবন এখানে [illegible]।

সম্প্রতি শিবসেনার হুকুমে বম্বের [illegible] বন্ধ ছিল একদিন। অনেক হরতাল দেখেছি, কিন্তু এমনটি আর দেখিনি। আগের দিন ভুল করে প্রয়োজনীয় সিগারেটের স্টক করতে ভুলে গিয়েছিলাম, তাই সকাল থেকেই পেট [illegible] শুরু করেছিল। হঠাৎ মনে পড়ল এক প্রতিবেশীর কথা। প্রতিবেশী ভদ্রলোক মারাঠি এবং আমারই মত সিগারেট খোর এবং চাকরী করে ফিল্ম কোম্পানীতে। সিগারেটের সন্ধানে তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখি সেখানে চলচ্চিত্র জগতের আরো কয়েকজন এসে জুটেছে এবং সাতসকালেই তাদের পার্টি জমেছে। আমাকে সেখানে দেখে দু একজন একটু অবাকই হল এবং আমার কল্যাণে জমা তাদের পার্টিটা ভেঙে গেল, শুরু হল গল্পগুজব। কথায় কথায় কোলকাতার কথা উঠলো, তারপর রাজনীতির সঙ্গে চাটনি হিসেবে ফিল্ম লাইনের দু-একটা কেচ্ছা কাহিনীও উঁকি মারলো আলোচনার মধ্যে। আমাদের মধ্যে ফিল্ম লাইনের এক সিন্ধি ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি আসল বম্বেটের মত নির্বিকার, পকেট থেকে একটা শিবসেনার ব্যাজ বার করে দেখালেন। বললেন "এটা বর্তমানের 'রক্ষা কবচ', কাল যদি অন্য কোন সেনা শিবসেনার চেয়েও শক্তিশালী হয় তাহলে তাদের ব্যাজ পকেটে রাখব, আমরা ব্যবসায়ী আমরা 'দলে' বিশ্বাস করি না, দলাদলি বেকারদের কাজ।" "ঠিক বলেছেন" বললেন মারাঠি বন্ধু, "কিন্তু বেকারদের সংখ্যা যদি আপনারা বাড়িয়ে দেন তাহলে

অজিত লাহিড়ি পরিচালিত "পদ্মগোলাপ" ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও অপর্ণা সেন

কিন্তু কোলকাতার মত অবস্থা হবে বম্বের, তখন আবার বম্বে থেকে ব্যবসা গুটিয়ে অন্য কোথাও পালাবার কথা ভাবতে হবে আপনাদের।" আমি বোকার মত বললাম, "হঠাৎ কোলকাতার কথা কেন, বেশ তো শিবসেনার কথা হচ্ছিল সেইটেই হোক না।" মারাঠি বন্ধু বললো "দেখুন কোলকাতার বাঙ্গালীদের অবস্থা এবং বম্বের মারাঠিদের অবস্থা প্রায় এক। কোলকাতার অর্থনীতি অবাঙ্গালীদের হাতে, বম্বের অর্থনীতি অমহারাষ্ট্রীয়দের হাতে।" অন্যজন বললেন, "কসমোপলিটান শহরে কিন্তু এমনটিই হওয়া উচিত, বম্বের মত শহর আসলে কেন্দ্রীয় শাসনে থাকা উচিত।" আমি বললাম, "কেন আবার এসব ঝামেলার প্রশ্ন তুলছেন মশাই, শিবসেনা টের পেলে এক-বারে ঠেঙিয়ে ঠান্ডা করে দেবে।" ভদ্রলোক একটু ভয় পেলেন এবং চুপ করে গেলেন। আমরা হাসলাম। এমন সময় একজন আমাদের মারাঠি বন্ধুকে প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা একটা কথা বলুন, আমি আজ সাত বছর বম্বেতে আছি অথচ সাতটা মারাঠি কথা জানি না, কিন্তু মাত্র দেড় বছর কোল-কাতায় ছিলাম, প্রচুর বাংলা ছবি দেখেছি, বাংলা নাটক দেখেছি, 'আমি তোমায় ভালবাসি' জাতীয় বেশ কয়েকটি সেনটেন্স বলতে পারি। মাত্র দেড় বছর কোলকাতায় ছিলাম কিন্তু সেখান থেকে চলে আসার সময় বেশ কষ্ট হয়েছিল, কিন্তু এতদিন এখানে আছি অথচ এখান থেকে যদি আজই চলে যাই তাহলে তেমন কোন কষ্ট হবে বলে মনে হয় না। বলুন তো এমন কেন হয়?" সবাই ভাবলাম। হঠাৎ আমার এক বন্ধুর মন্তব্যের কথা মনে পড়ল। বন্ধুটি বহুদিন আগে একবার এখানে এসেছিলেন কাজ করতে, তারপর এখানে থাকতে না পেরে চলে গিয়ে আমাকে লিখেছিলেন, "তোমাদের বম্বে খুব সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, সাজসজ্জায় পটিয়সী, কিন্তু তার স্বভাব বারবনিতাসুলভ, সে সেলাম করতে সেলামী চায়, তার সঙ্গে প্রেম করা চলে, তাকে নিয়ে ককটেল পার্টিতে নাচা যায়, তাকে ডেকে বাগানবাড়ির শোভা বাড়ানো যায়, কিন্তু তাকে বিয়ে করা চলে

না, ঘরের বৌ বানানো যায় না, সন্তানের জননী বানানো যায় না। কিন্তু কোলকাতা সেই বন্ধ্যা স্ত্রী, যার অনেক বাচ্চা সূতিকায় ভুগছে, সারাক্ষণ ঘ্যানর ঘ্যানর করছে, তবু স্ত্রী—সন্তানের জননী—তাই।" কথাটা মনে পড়ল, কিন্তু বলা হল না। এক প্যাকেট সিগারেট ধার করে বাড়ি ফিরে এলাম।

সরল শর্মা

অল্ ইণ্ডিয়া পাপেট ফেস্টিভ্যাল

ইউ পি সঙ্গীত নাটক আকাডেমীর সহযোগিতায় লখনউর লিটারেসী হাউস্ এবার ইণ্ডিয়া পাপেট ফেস্টিভ্যাল-এর তিনদিনব্যাপী আয়োজন করেন। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে অনেক সংস্থা এই আসরে যোগদান করেন। বিষয়বস্তু ছিল পুতুল-নাচ ও আলোচনা চক্র।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে একমাত্র দল এই আসরে যোগ দিয়েছিল তা কলকাতার আত্ম-পরিচিত ইউথ পাপেট্ থিয়েটার, ইণ্ডিয়া। স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী দ্বারা গঠিত এই সংস্থা তাদের সুন্দর ও সুষ্ঠু পুতুল নাট্য পরিবেশন করে সমবেত সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। শুধু তাই নয়, তাদের চিত্তাকর্ষক পুতুল নাচ "রড, গ্লাভস্ ও ম্যারিওনেট্স্" তিন বিভাগেই শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখায় "অল্ রাউণ্ড বেস্ট পারফরমেন্স্ ট্রফি" পুরস্কার পেয়ে বাংলার সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

জয়-জয়ন্তী

এমকেজি প্রোডাকশন্স-এর নতুন ছবি 'জয়-জয়ন্তী'-র কাজ আরম্ভ হয়েছে। নায়ক-নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করছেন উত্তমকুমার ও অপর্ণা সেন। অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে আছেন ললিতা চ্যাটার্জি, তরুণকুমার, মণ্টু ব্যানার্জি। সংগীতপ্রধান এই ছবির সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

টাল-টিপ্পনী

গল্পের গরু গাছে চড়ুক ক্ষতি নেই, ছবিতে জনপ্রিয় নায়ক-নায়িকার মৃত্যু নৈব নৈব চ। কারণ, প্রিয় শিল্পীর মরণ "ফ্যান"-দের কাছে "শ্যাম সমান" নয়। সমাপ্তিতে নায়ক-নায়িকার মিলন দৃশ্য চাই। অন্যথায় দর্শকরা নাকি সে ছবি নিতে চান না। বাংলা দেশের অধিকাংশ চলচ্চিত্র-প্রযোজকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল। নতুন শিল্পী নিয়ে ছবি করলে শুনি এই সমস্যা থাকে না। নবাগতার মৃত্যু মেনে নিতে ফ্যানদের আপত্তি হয় না। হাস্যকর হলেও সত্যি, জনপ্রিয় তারকা নিয়ে বিয়োগান্ত ছবি করতে অনেক প্রযোজকই ভরসা পান না। কি জানি ছবি যদি না চলে! এমনও শুনতে পাই, সুচিত্রা-উত্তম অভিনীত একটি বিয়োগান্ত ছবিকে কেন্দ্র করে একবার বাংলার বাইরে কোন এক জায়গায় তুমুল হৈচৈ হয়েছিল, শেষ দৃশ্যে উত্তমকুমারের মৃত্যু দেখে উত্তম-অনুরাগীরা নাকি রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। হাউসের চেয়ার ভাঙাচোরা ইস্তক ব্যাপারটা গড়িয়েছিল। প্রমাদ গুনে ছবির পরিবেশক একটি অভিনব কাজ করে বসলেন। একই জুটির আরেকখানি মিলনান্ত ছবি তখন তাঁর হাতে। সেই ছবি থেকে শেষ দৃশ্যের একটা মিলনান্তক শট ছবিটির শেষ রীলে জুড়ে দেওয়া হল। এই অভিনব ঘটনাকে একটা দুর্ঘটনা বলে ভাবতে অনেকেই নারাজ। একাধিক চিত্রনির্মাতা ইদানীং সার কথা বুঝে নিয়েছেন, ছবিতে জনপ্রিয় নায়ক-নায়িককে কিছুতেই মেরে ফেলা চলবে না। ব্যতিক্রম যে নেই তাও নয়, অনেক সময় আবার এমনও হয়, প্রযোজক হয়তো ভরসা পেলেন কাহিনীর চাহিদা মত নায়ক বা নায়িকার মৃত্যু দৃশ্য ছবিতে রাখতে, কিন্তু শিল্পী রাজী হলেন না মরতে। তখনই যত সমস্যা দেখা দেয়।

"আয়ে-আদরে" (পরিচালনা : বাসু ভট্টাচার্য) ছবিতে সন্ধ্যা শিবপুরী ও ওম শিবপুরী

*

প্রযোজিকা অসীমা ভট্টাচার্যের "মেম-সাহেব" নামের একটি ছবির ঠিক এক বছর আগে মহরৎ হয়েছিল। রীতিমত রাজকীয় মহরৎ। প্রতিরক্ষামন্ত্রী ওয়াই বি চাবনও সেদিন টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে হাজির ছিলেন। উত্তমকুমার ছিলেন মহরৎ শিল্পী। নানা কারণে এতকাল ছবিটির শুটিং শুরু হতে পারেনি। নিমাই ভট্টাচার্যের গল্প "মেমসাহেব"। যাই হোক আগামী এপ্রিল মাস থেকে শুরু হচ্ছে ছবিটির শুটিং। পরিচালক পিনাকী মুখার্জি। নায়ক চরিত্রে অবশ্যই উত্তমকুমার থাকবেন। নায়িকা কে? অসীমা দেবী "এখনই" এই প্রশ্নের উত্তর দিতে নারাজ।

বিচক্ষ

আর ডি বনসালের "ঠকাজি" (পরিচালনা : সুধীর মুখার্জি) ছবিতে বিশ্বজিৎ ও অনুভা ফটো—দপণ

নাট্য-সমালোচনা

শৃংখল

(ক্লাস থিয়েটার)

নবগঠিত নাট্য সংস্থা ক্লাস থিয়েটার তাঁদের প্রচারপত্রে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন—আজকের সংগ্রামী শোষিত জীবনের শিকল ভাঙার গান গাইতে তাঁরা বদ্ধপরিকর। তাঁদের প্রথম নাট্যপ্রযোজনা "শৃংখল" (বিশ্বরূপা মঞ্চে সম্প্রতি অভিনীত) এই বক্তব্যের সঙ্গে সংগতিসূচক। বেলজিয়ান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আফ্রিকার মহান বিপ্লবী প্যাট্রিস লুমুম্বার নেতৃত্বে সংগ্রামের পটভূমিকায় এই নাটক রচিত। নাটক নির্বাচনের ক্ষেত্রে ক্লাস থিয়েটারের বাস্তব বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়। বাংলা-দেশের সাধারণ দর্শক, তা তিনি যে কোন

মারিক পরিচালিত "এখানে পিঞ্জর" ছবিতে অপর্ণা সেন ও গঙ্গাপদ বসু ফটো—দেশ

রাজনৈতিক মতবাদেরই পৃষ্ঠপোষক হোন না কেন—আফ্রিকার কালো চামড়ার মানুষদের এই সংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম বোধ করবেনই। সেক্ষেত্রে এ নাটকের ব্যবসায়িক সাফল্যের দিকটি সম্পর্কে তাঁরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আসলে ক্লাস থিয়েটার তাঁদের রাজনৈতিক মতবাদে কতটা সততা রক্ষা করতে চান তা পরবর্তী নাটক নির্বাচন দেখে বলা যাবে। আমাদের দেশের বহু-বিভক্ত রাজনৈতিক মতবাদের ভিতর কোন্‌টির সংগ্রামে তাঁরা নিজেদের সামিল করতে চান তাও স্পষ্ট হয়ে উঠবে তখনই।

এ তো গেল মতবাদের কথা। কিন্তু "শৃংখল" নাটকের প্রযোজনায় যে শক্তিমত্তা তাঁরা দেখিয়েছেন তার প্রশংসা করতেই হয়। এমন সুসংহত সুশৃঙ্খল টিমওয়ার্ক একটি নবজাত প্রতিষ্ঠানের কাছে সত্যিই আশা করিনি। কম্পোজিশনের ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও তো চলচ্চিত্রের আমেজ। বিপ্লবীদের একতা বোঝাতে দেওয়ালে বজ্রমুষ্টির ছায়াপাত কিম্বা অপারেশন টেবলের করুণ দৃশ্যটির পরিকল্পনা সত্যিই সুন্দর। এ নাটকের প্রয়োগ-প্রধান নিমাই ঘোষ এ জন্য সুধী দর্শকের ধন্যবাদ পাবেন।

টিমওয়ার্কের কথা আগেই বলেছি। প্রায় সকলেই নিজ নিজ ভূমিকায় দক্ষতা দেখিয়েছেন। ডাঃ জোন্‌স্‌-এর চরিত্রে অজিত সান্যাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন গৌরীশংকর পাল, রমেন সরকার, সুকুমার দাস, পাহাড়ী ভট্টাচার্য, সুনীল দত্ত, সর্বানী দত্ত, প্রশান্ত বসু, মিন্টু দাস, সুশীল ব্যানার্জি, সমীর চ্যাটার্জি, পরিমল ভট্টাচার্য, প্রশান্ত রায়, সুনীল চক্রবর্তী। ছোট একটি চরিত্রে দীপক রায়ের অভিনয়ও বেশ ভাল।

আলোর ব্যবহার (রবীন দাস) এ নাটকের বক্তব্য প্রকাশে প্রচুর সাহায্য করেছে। সেই সঙ্গে আবহ-সংগীত (শ্রীপতি দাস)। মঞ্চ স্থাপত্যও (অরুণ ঘোষ) প্রশংসনীয়।

"প্রতিচ্ছবি" অভিনয়

কড়েয়া থানার কর্মচারী কর্তৃক নীলোৎপল দের 'প্রতিচ্ছবি' নাটকটি সম্প্রতি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। সেদিন প্রফেসার প্রতাপের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ নন্দী ও সেকেণ্ড অফিসারের ভূমিকায় গজেন ঘোষ এবং কেদারের ভূমিকায় বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় নাটকের প্রধান আকর্ষণ ছিল। এছাড়া শুভেন্দু ভট্টাচার্য, অলক সান্যাল পঞ্চানন দাস, চিত্ত মুখোপাধ্যায়, শংকর বোস, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় ও অজিত রায় সুঅভিনয় করেছেন। স্ত্রী চরিত্রে বীথি গঙ্গোপাধ্যায় সকলের প্রশংসা অর্জন করেন। সুষ্ঠু নাট্য পরিচালনার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বুদ্ধ গঙ্গোপাধ্যায়। নাটকের আগে শ্রীমতী কানন দেবীর ভাষণ ও কাজী সব্যসাচীর আবৃত্তি বিশেষ আকর্ষণ ছিল।

পদ্মানদীর মাঝি

কোনো কবিতাকে নাচে-গানে রূপ দেবার নজীর অনেক আছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার তো কথাই নেই, বহু প্রাচীন কাব্য-কাহিনী কিংবা পৌরাণিক ভাববস্তু অবলম্বনে নৃত্যনাট্য পরিবেশনার সংবাদ প্রায়ই পাওয়া যায়। কিন্তু একটা উপন্যাস নিয়ে নৃত্যনাট্য? নাচের ছন্দে আর যন্ত্র-সংগীতের সুরে ঘটনাবহুল বাস্তবধর্মী উপন্যাসের মঞ্চরূপারোপ? এর সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে যদি-বা কিছু সংশয় থাকে, তার নিশ্চিত নিরসন ঘটেছে সম্প্রতি রবীন্দ্র-সদনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পদ্মানদীর মাঝি"র অনুষ্ঠানে, যেখানে কুবের মাঝি, কপিলা, হুসেন মিঁয়া নাচের ছন্দে আর গানের সুরে, একটা আশ্চর্য পরিপূর্ণতা নিয়ে ফুটে উঠে আমাদের অবাক করে দিয়েছে। কুবেরের বউ, তার মেয়ে কিংবা গ্রামের আরো যাদের আনাগোনায় পদ্মা-তীরের প্রাণস্পন্দন জেগে উঠেছিল, তাঁরা কিন্তু কেউই সাধারণ গদ্যে কথা বলেনি। অথচ, আশ্চর্য, তাদের কত স্বাভাবিক, কত জীবন্ত, কত কাছের মানুষ বলে মনে হয়েছে। আসল কথা, গ্রামীণ-গীতি সংস্থা প্রযোজিত এই অনুষ্ঠানে বরুণ হালদার ও দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যঞ্জনাময় কণ্ঠ-স্বরে যথাক্রমে ইংরেজী ও বাংলায় বিবৃত কাহিনীসার থেকে আরম্ভ করে এমন একটি পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল সুন্দর ও সমগ্র পরিকল্পনা ও পরিবেশনার গুণে, নিখুঁত-ভাবে টেপ-রেকর্ড-বিধৃত আবহসংগীত আর তাপস সেন-কৃত দৃষ্টিনন্দন আলোক-সম্পাতের সংযোগে, যে একদিকে শিল্পীরা যেমন স্বচ্ছন্দে রসসৃষ্টি করেছেন, অন্য একদিকে অভিভূত দর্শকমণ্ডলী তা অনায়াসে আকণ্ঠ পান করেছেন। কখনও করুণরসাশ্রিত, কখনও বা কৌতুকপূর্ণ পরিস্থিতি সংবলিত সর্বাঙ্গ পরিকল্পনা-সম্পন্ন এই মঞ্চপ্রযোজনার নৃত্যনাট্য-রূপারোপের কৃতিত্ব প্রথিতযশা সংগীতজ্ঞ রাজেশ্বর মিত্রের। তাঁর কল্পনাশক্তি, সৃজন-নৈপুণ্য এবং রসবোধের এ এক অপূর্ব নিদর্শন।

পরিবেশনার ক্ষেত্রে লোকগীতি এবং লোকনৃত্যের রূপটি যে সর্বত্র অবিকল অনুসৃত তা নয়, কিন্তু তাতে নাটকীয় রসসৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটেনি। সংগীত-পরিচালক দিনেন্দ্র চৌধুরী এবং নৃত্য-নির্দেশক অসিত চট্টোপাধ্যায় তাঁদের নির্দেশনার দায়িত্ব যেমন সুদক্ষভাবে পালন করেছেন, কুবেরের চরিত্রটিকে তাঁরা দুজনে তেমনই মর্মস্পর্শী করে পরিস্ফুট করেছেন গানে আর নাচে। কপিলার নৃত্য-ভূমিকায় প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়ের কৃতিত্বও কম নয়। আর প্রশংসা করতে হয় মালার চরিত্রাভিনেত্রী অরুন্ধতী চাকলাদারের। সাধন গুহর রাসু কিংবা শম্ভু ভট্টাচার্যের নকুলও উল্লেখযোগ্য। গানে বনশ্রী সেনগুপ্ত, অংশুমান রায় আর শুকদেব চক্রবর্তী যথাক্রমে কপিলা, হুসেন মিঁয়া এবং আমিনুদ্দীনের মর্মবেদনার দরদী অভিব্যক্তি দিয়েছেন। মঞ্চসজ্জায় যদিও সুরেশ দত্তর নাম ছিল, কিন্তু সেদিনকার অভিনয় শূন্য মঞ্চেই সম্পন্ন। "পদ্মানদীর মাঝি"র প্রযোজনায় এইটাই সম্ভবত একমাত্র অভাব।

—আনন্দবর্ধন

অরণ্যদেব
লী ফক
চার্লস, আমি তোমার সঙ্গে যাব।
তুমি এখানেই থাকো, সেলা।
ঝুঁকে আসতে দাও। তোমার কাছেই উনি থাকবেন।

সেখানেই থাকবে।
রক্ষীদের বলো, চোরাই প্লেনগুলোকে ওরা যেন ঠিকমত পাহারা দেয়।
পাহারা দিস।

সবাই ভিতরে গিয়ে ঢোকো!
?!

কোথায় যাচ্ছ আমরা?
সে কথা তোমাকে আগেই বলেছি — ফাটিয়েছে।
!

!?!

বিশ্ববার্তা
নিখোঁজ প্লেনের খোঁজ মিলেছে
প্রিন্স চার্ল

কিন্তু কে যে তাদের ধরল, খবরে তার উল্লেখ নেই। তাজ্জব ব্যাপার!
না থাক, আমরা তো জানি!
নিখোঁজ প্লেনের খোঁজ মিলেছে

অজানাতেও ব্যানারগুলোতে কিছু-কিছু মানছে বই কী। সবাই বুঝতে পারছে, এ সেই রহস্যময় মানুষটারই কাজ---
অরণ্যদেব!
তা আর বলতে
১৫
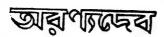
পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন আলোচ্য সপ্তাহের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর এই দ্বিতীয়বার পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যপালের শাসন প্রবর্তিত হলো। কারণ রাজ্যপাল জানিয়েছেন, সাংবিধানিক যন্ত্র এই রাজ্যে অচল হয়ে পড়েছে। ১৯ মারচ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে এ সম্পর্কে রাজ্যপালের প্রতিবেদন রাজধানীতে পৌঁছয়। তারই ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং রাষ্ট্রপতি তাঁর ঘোষণার বয়ানে স্বাক্ষর করেন। এই ঘোষণায় পশ্চিম বাঙলায় চৌদ্দ দলের তের মাসের শাসনের আনুষ্ঠানিক অবসান ঘটল। কিন্তু বিধানসভা বাতিল হয়নি। রাজ্য বিধানসভার সব অধিকার রাষ্ট্রপতির শাসনকালে সংসদে বর্তাবে। রাজ্যপাল সুপারিশ করেছেন—রাষ্ট্রপতির শাসন বহাল থাকুক স্বল্পকাল। তারপরে আবার জনপ্রিয় সরকার গঠন করার চেষ্টা করা হবে। রাজ্যপালের উপদেষ্টা হিসাবে দুজন অভিজ্ঞ অফিসার নিযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা। ঘোষণায় স্পীকারের পদটি বিলুপ্ত করা হয়নি। রাজ্যপাল রাজ্যের মুখ্য সচিব, আই জি, স্বরাষ্ট্র সচিব এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ হলে তা কঠোর হস্তে দমন করার নির্দেশ দেন। এখন রাজ্যের বাজেট পাস করাবার জন্য সংসদে আসবে। শোনা যাচ্ছে যে, রাষ্ট্রপতির শাসনকালে রাজ্যপালের উপদেষ্টা নিযুক্ত হচ্ছেন মুখ্য সচিব শ্রীমৃগাঙ্কমৌলি বসু ও বোর্ড অব রেভিনিউ-এর প্রাক্তন সদস্য শ্রীকরুণাকেতন সেন।

দেশী সংবাদ

১৬ মারচ—শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় আজ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন। অজয়বাবুর পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিমবঙ্গের চৌদ্দ দলের যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটল। রাজ্যপাল "কোন বিকল্প ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত" অজয়বাবুকে কয়েকদিনের জন্য কাজ চালিয়ে যেতে অনুরোধ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী সেই অনুরোধ গ্রহণ করেন।

কংগ্রেসের আদি, নব এবং ঐক্যপন্থী এই তিনটি গোষ্ঠীই মারকসবাদী কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে সরকার গঠন প্রচেষ্টার তীব্র বিরোধিতা করেছেন। বিধানসভার বিরোধী দলের নেতা শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় আজ রাজ্যপালকে বলেছেন যে, সি পি এম সরকার গঠনের জন্য ক্ষমতা রাখে কিনা এটি যেন রাজভবনে বসেই তিনি (রাজ্যপাল) যাচাই করেন। এজন্য বিধানসভা ডাকার প্রয়োজন নেই।

১৭ মারচ—ইতস্তত কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা বাদ দিলে আজ কলকাতা ও শহরতলীতে হরতাল মোটামুটি শান্তিপূর্ণ ছিল। ট্রাম-বাস-রেল-বিমান কিছুই চলেনি। দূরপাল্লার ট্রেনগুলি মাঝপথে আটক পড়ে। স্কুল-কলেজ বাজার বন্ধ। পথে কোন যানবাহন নেই। এই হরতালের অন্যতম বৈশিষ্ট্য—এই হরতালকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পাড়ায় পক্ষে ও বিপক্ষে মিছিল বের হয়। কোথাও কোথাও কিছুটা সংঘর্ষও হয়।

আজ হরতালের দিন চব্বিশ পরগণা, বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া এবং কোচবিহার এই পাঁচটি জেলা থেকে হাঙ্গামার খবর পাওয়া যায়। এ সবই দলীয় সংঘর্ষ। গভীর রাত পর্যন্ত ২৪ জন নিহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া যায়। আহত হয়েছেন নানাস্থানে শতাধিক। সব মিলিয়ে গ্রেফতার করা হয় দুশোজনের কাছাকাছি। বেসরকারী হিসাবে নিহতের সংখ্যা তিরিশ জন। চিত্তরঞ্জন, নৈহাটি, হালিশহর এলাকায় বুধবার সকাল পর্যন্ত বারো ঘণ্টার জন্য কারফু জারি করা হয়।

১৮ মারচ—রাজ্যপাল শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ান আজ উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুকে সি পি এম ও সি পি এম-এর বন্ধু দলগুলির সদস্য ছাড়াও অন্যান্য দলের যে সব 'বিদ্রোহী' এম এল এ-র সমর্থনের উপর তিনি

নির্ভর করছেন, তাঁদের হাজির করাতে বলেন। ওই সমর্থকদের তাঁর সামনে এসে যদি সেই সমর্থন ঘোষণার সাহস না থাকে তবে তাঁর (রাজ্যপাল) পক্ষে সি পি এম নেতাকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানানো 'অসম্ভব'।

সারা পশ্চিমবঙ্গে মঙ্গলবারের হরতালের মোট বলি দাঁড়ায় ৩১। এই সংখ্যার মধ্যে বাঁশবেড়িয়া, ত্রিবেণী এবং নৈহাটি থেকে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে আনীত মোট ১১টি মৃতদেহের সংখ্যাও ধরা হয়েছে। ২৪ ঘণ্টা হরতালের পর বুধবার কলকাতা স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় জেগে ওঠে। তবে এদিনটিও একেবারে হাঙ্গামামুক্ত ছিল না।

১৯ মারচ—রাজ্যপাল শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ান আজ অধিক রাত্রে রাজ্যের মুখ্যসচিব, আই-জি, স্বরাষ্ট্র সচিব এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ হলে তা কঠোর হস্তে দমন করার নির্দেশ দেন। তিনি আগামী কাল শুক্রবার মহাকরণে যেতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার গুণ্ডা-বদমাশদের একটা নামের তালিকা তৈরি করছে। তাদের ভারতীয় পুলিশ কোডের ১৫১ ধারায় কিংবা ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর কোডের ১১৭ (সি) এবং ১০৭ ধারায় গ্রেফতার করা হবে। রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতর সূত্রে জানা যায় আজ রাত্রেই তাঁরা জেলা কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছেন : নজর রাখুন গুণ্ডারা যাতে গা ঢাকা দিতে না পারে। এ ছাড়া কিছু রাজনৈতিক কর্মীর একটি তালিকা তৈরি করতে পারে যাঁদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ আছে।

২০ মারচ—স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীবিদ্যাচরণ শুক্ল আজ রাজ্যসভায় এই আশ্বাস দেন যে, পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন থেকে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সতর্কতা সহকারে আগাছার মত উৎপাটিত করা হবে।'

আজ কলকাতার পৌরসভায় ১৯৭০-৭১ এর জন্য পেশ করা সাড়ে আট কোটি টাকার ঘাটতি বাজেটকে নতুন কর প্রস্তাব যোগ করে ও বকেয়া আদায়ের আশা জানিয়ে প্রায় দু'-কোটি টাকার উদ্বৃত্ত দাঁড় করানো হয় এবং 'আইনসিদ্ধ' করে বাজেট অনুমোদিত হয়। তিন দিনব্যাপী একটানা এই বাজেট বিতর্ক চলে।

২১ মারচ—প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় সহ অধুনালুপ্ত যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন দলের নেতা বর্ধমানের 'নারকীয় হত্যাকাণ্ড' সম্পর্কে অবিলম্বে বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেছেন। প্রায় প্রত্যেকেরই প্রশ্ন : উচ্চপদস্থ অফিসারদের উপস্থিতিতে এইরকম ঘটনা ঘটল কি করে।

বিদেশী সংবাদ

১৬ মারচ—আজ ঢাকায় পুলিশের একজন মুখপাত্র বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের চৌমোহনী গ্রামে ধর্মঘটকারী চটকল শ্রমিকজনতার উপর পুলিশের গুলিবর্ষণের ফলে গতকাল একজন শ্রমিক নিহত হয়েছে। উচ্চতর মজুরির দাবিতে শ্রমিকরা ১১ মারচ থেকে ধর্মঘট করছে।

১৭ মারচ—টোকিওর এক সংবাদে প্রকাশ : দলাই লামা ও তাঁর তিব্বতী অনুচরদের পিকিং বিরোধী কার্যকলাপ এবং চীনের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপে প্ররোচিত করার জন্য চীন আজ আবার ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। ওই সংবাদে বলা হয়েছে যে, প্রতিক্রিয়াশীল ভারত সরকারের প্রশ্রয়ে বিশ্বাসঘাতক দস্যুদলের নেতা দলাই লামা চীন প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে ৯ মারচ এক বিবৃতি দিয়েছেন।

১৮ মারচ—কামবোডিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান প্রিন্স নরোদম সিহানুক এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের ফলে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন। এই সময়ে তিনি মসকোয় ছিলেন। রেডিয়ো নোম পেন-এর ঘোষণায় প্রকাশ, প্রকৃত ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী জেনারেল লোন নোল এবং উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিরিক মাটারের হাতেই গিয়েছে। সায়গনে এক বেতার ঘোষণায় প্রকাশ : ভবিষ্যতে নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত রাজকীয় জাতীয় আইনসভার সভাপতি শ্রীচ্যাং হেং অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধানের পদে থাকবেন।

১৯ মারচ—আজ নিউ ইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত এক রিপোরটে বলা হয় যে, গত সপ্তাহে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রে বহু সংখ্যক সোভিয়েত সৈন্য এবং ক্ষেপণাস্ত্র পাঠানো হয়েছে। কায়রোর কূটনৈতিক মহলের সূত্রে এই খবর দেওয়া হয়েছে।

২০ মারচ—তিব্বতীদের ওপর চীনাদের উৎপীড়নের কথা ভারত রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার কমিশনে উত্থাপন করে ভারত চীনা নীতিকে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ বৈষম্য নীতির সঙ্গে তুলনা করে। তিব্বতীদের দুরবস্থা সম্পর্কে ভারতের বক্তব্য আমেরিকা, ফিলিপিনস ও গুয়াতেমালা সমর্থন করে।

২১ মারচ—মারকিন যুক্তরাষ্ট্র তুরস্কের মাধ্যমে পাকিস্তানকে ১০০টি ট্যাঙ্ক নাম মাত্র মূল্যে বিক্রির পরিকল্পনা নিয়েছে। আজ নিউ ইয়রকে বলা হয় :—এই বিক্রির ব্যাপারটি হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেনট নিকসনের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীঅলক ধর

ক্লান্তির মানে হ'ল, শরীরে
গ্লুকোজের প্রয়োজন। আর
গ্ল্যাক্সোজ-ডি হল এমন বিশুদ্ধ
গ্লুকোজ পাউডার, যা খেলে মুহূর্তে
দেহের শক্তি ফিরে আসে।

আপনার শরীরের গ্লুকোজ অনবরত ক্ষয় হ'য়ে যাচ্ছে। আর সেই গ্লুকোজ যখন একেবারে কমে যায় তখন আপনার ক্লান্তি আসে। সেই সময়ে আপনার একটু গ্লুকোজ খাওয়া বিশেষ দরকার। মনে রাখবেন যারা গ্লুকোজ ব্যবহার করেন তাঁদের প্রায় সবারই পছন্দ মিষ্টি স্বাদের গ্ল্যাক্সোজ-ডি। এতে মুহূর্তে আপনার শরীরে শক্তি ফিরে আসে। আপনি একে জলে, দুধে, ফলের রসে কিম্বা সোজাসুজি প্যাকেট থেকে খেতে পারেন।

নিমেষে শক্তি অথচ কত কম দাম!

গ্ল্যাক্সোজ-ডি

গ্ল্যাক্সোর তৈরী গ্লুকোজ পাউডার

GLAXOSE-D

GCA-GL 4a ben

ডি সি এম বিপ্লব এনে দিয়েছে
নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না ?
আবার দেখুন! ডি সি এম-এ ফ্যাশানের ছড়াছড়ি-
বর্ণবৈচিত্র্যের এক নতুন জগৎ, ডিজাইনের
এক নতুন পরিধি। ডি সি এম-এর ওয়াশ 'এন' ওয়্যার পপলিনের ওপর
প্রিন্ট এবং অপরূপ ট্রিকা রুবাইয়াৎ আয়োজন-সম্ভার তোলপাড়
ক'রে তুলেছে। এ আন্দোলনে আপনিও স্বচ্ছন্দচিত্তে যোগদান করুন।
ডি সি এম স্টোরে যখনই যাবেন নতুন কিছু না কিছু অবশ্য পাবেন
Bensons/2637-B

'বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

৩৭ বর্ষ ॥ সংখ্যা ২৩
শনিবার ২১ চৈত্র ১৩৭৬

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৫৫১

চাঁদার হার

কলিকাতায়

বার্ষিক	— ২৫.০০
ষাণ্মাসিক	— ১২.৫০
ত্রৈমাসিক	— ৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	— ৩০.০০
ষাণ্মাসিক ,,	— ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক ,,	— ৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	— ৩০.০০
ষাণ্মাসিক ,,	— ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক ,,	— ৮.০০

ভারতের বাইরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	— ৫২.০০
ষাণ্মাসিক ,,	— ২৬.০০
ত্রৈমাসিক ,,	— ১৩.০০

এশিয়া অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	... ৩৯.০০
ষাণ্মাসিক	... ১৯.৫০
ত্রৈমাসিক	... ১০.০০

দাম ৫০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাসুল ৭ পয়সা

DESH

Saturday 4 April, 1970

শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর

আমাদের যুক্তফ্রন্ট সরকার বরাবরই দাবি করে এসেছিলেন তাঁরা জনপ্রিয় সরকার। জনগণের রায়ে তাঁরা ক্ষমতা পেয়েছিলেন যখন তখন নিশ্চয় জনপ্রিয়। এই জনপ্রিয় সরকারের রাজত্বেই কিন্তু গত তেরো মাসে প্রায় সাড় শো-র মতন লোক নিহত হয়েছেন। জ্যোতিবাবু যখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তখনই সরকারীভাবে স্বীকার করা হয়েছিল নিহতের সংখ্যা ছ' শো-তে দাঁড়িয়েছে। তারপর শেষের ক'দিন কেটেছে—ফ্রন্টের তখন অন্তিম অবস্থা, আর আমরাও সেই ক'দিনে দেখলাম শেষের ক'দিন সত্যিই কী ভয়ঙ্কর হতে পারে। এই শেষ ক'দিনে পশ্চিমবঙ্গের সাত আটটি জেলায় খুনোখুনির অন্ত ছিল না। বিশেষ করে মার্কসিস্ট কম্যুনিস্টদের ডাকা হরতালের দিন যা ঘটেছে তার তুলনা একমাত্র লীগের আমলের সেই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিনটিই হতে পারে। কত সহজে, কী অক্লেশে জন-নিধন যজ্ঞ হতে পারে তা দেখে লক্ষ লক্ষ মানুষ যদি আজ শিহরিত ও বিহ্বল হন তাহলে বলার কী থাকতে পারে।

হরতালের দিনের সমস্ত ঘটনাই যে আজ লোকচক্ষুতে উপস্থিত হয়েছে তা বলা যায় না। তবে এর মধ্যে বর্ধমানের ঘটনাটি এখন নিত্যকার সংবাদ ও আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। সেখানে পুলিসের উপস্থিতিতে সশস্ত্র তিন হাজার মানুষের আক্রমণে তিনটি প্রাণ শেষ হয়েছে। পুলিস নীরব দর্শক ছিল। দ্বিতীয় ঘটনা, ওই একই দিনের, ঘটেছে দক্ষিণদাঁড়িতে। বর্ধমানের ঘটনার পূর্ব প্রস্তুতি কীভাবে ঘটেছে আমরা জানি না, তবে এই ধরনের নৃশংস ঘটনা সর্বত্রই ঘটতে পারে তার আশঙ্কা নিশ্চয় ছিল। সতেরোই মার্চ—হরতালের দিন যা ঘটেছে তার ইন্ধন কোথায় জুটেছিল, কারা জুটিয়েছিল? রাতারাতি সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে তাণ্ডব করার পরিকল্পনা নিশ্চয় হয়নি, সম্ভবও নয়, হয়ত এ-ধরনের নারকীয় কাণ্ড করার দুর্বুদ্ধি আগেই এসেছিল। তবু হরতালের মাত্র দুদিন আগে কলকাতার ময়দানে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির ডাকে এক জনসমাবেশ হয়। জনগণ সশস্ত্র ছিল। সেই সভায় নেতা শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত 'প্রাণ দেওয়া নেওয়ার' সংগ্রামী বাণী বিতরণ করেন; হরেকৃষ্ণবাবু সশস্ত্র জনতাকে উদ্দেশ করে যা বলেন তার মর্মার্থ: বাঙলা দেশের লোক মিলিটারীর হুমকিতে ভয় পাবে না, প্রয়োজন হলে লাঠি বল্লম শুধু নয় আরও কিছু দিয়ে লড়ে যাবে। পনেরোই তারিখের এইসব উত্তেজিত ভাষণ যে পরোক্ষে প্ররোচনার কাজ করেছে—আজ নানা কারণেই তা মনে করা হচ্ছে। অভিযোগ উঠেছে এ-সবেরও তদন্ত হোক।

দমদমের দক্ষিণদাঁড়ির ঘটনাও নৃশংস। বলা হয়েছে যে, হরতালের দিন মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট দলের হাজারখানেক লোকের এক সশস্ত্র জনতা ফরওয়ার্ড ব্লকের তিন কর্মীকে গুলি, ছোরা ও অন্যান্য অস্ত্র দিয়ে খুন করে। এই ঘটনারও তদন্ত দাবি করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত আসানসোলের শ্রীপুর কয়লাখনি অঞ্চলের কথাও এসে পড়ে। দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকা রাজনৈতিক খুনোখুনির নরক হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি সেখানে এক রহস্য উদ্ধার করা হচ্ছে। ওই কয়লাখনি এলাকায় নিশ্চিন্তা গ্রামের জোকার ডোর এ একটি গুপ্ত কবরখানা আবিষ্কৃত হয়েছে। কী করে সেই কবরখানা গড়ে উঠল, কেমন করেই বা সেই কবরখানা থেকে বেশ কয়েকটি মৃতদেহ বার হচ্ছে তা এক বিরাট রহস্য। জনৈক অশেষ ভাগ্যবান কর্মী যদি এক কুৎসিত বন্দীঘর থেকে পালিয়ে এসে এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের খবর না দিত তবে নরহত্যার এই পাপ চিরদিনের মতন মাটির তলায় লুকিয়ে থাকত। আজ আসানসোল কয়লাখনি এলাকায় মানুষের মনে ভয়, বিস্ময় ও ক্রোধের সীমা নেই। তাঁরা জানতে চান, কেন এ-কাজ করা হয়েছে? কতজন লোক নিহত হয়েছেন? নিখোঁজই বা কতজন? কী ভাবে তাঁদের হত্যা করা হয়েছে এবং কেন? এই ঘটনা এতদিন চাপা থাকল কি করে? পুলিস কোথায় ছিল? জনসাধারণের এইসব প্রশ্নের জবাব চাই। তাঁদের সন্দেহ, ভয় অচিরেই দূর করতে হবে সরকারকে। শ্রীজ্যোতি বসু অবশ্য এস এস পি-র শ্রীফারনেনডেজকে চিঠি লিখে বলেছেন, মাটি খুঁড়ে ষোলোটি মৃতদেহ পাবার সংবাদ থেকে কেন শ্রীফারনেনডেজ মনে করছেন, এ-কাজ তাঁদের দলই করেছে? শ্রীবসু আরও বলেছেন: শান্তি স্থাপন ও সহধর্মিতার জন্যে সংশ্লিষ্ট দলের নেতাদের বিরোধ-মীমাংসায় এগিয়ে আসা দরকার। সৌভ্রাত্রের এমন উদার ডাকে কারা সাড়া দেন তা অবশ্য দেখার বিষয়।

অশুভ মিতালি

মুখে ও কাজে
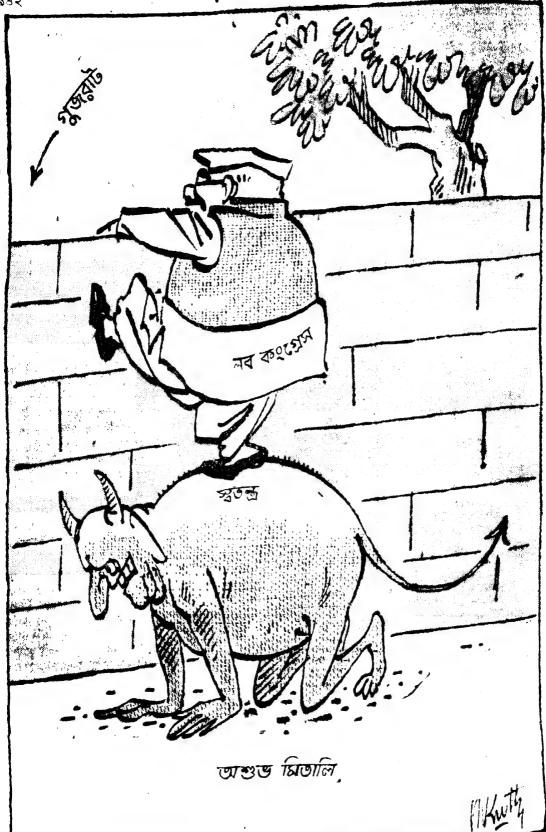
মুখে যদিও পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ বামপন্থী দল বলছেন 'নির্বাচন চাই' 'নির্বাচন চাই', তাঁদের অন্তরের কথা কিন্তু আজও সেই 'বিকল্প সরকার'। এই বিকল্প সরকার গঠনের জন্য আজও ছোট-বড় প্রায় সব বামপন্থী পার্টিই সমানে তৎপর। সকলেরই উৎসাহের অন্ত নেই, চেষ্টার বিরাম নেই। তফাৎ শুধু এইমাত্র—কেউ অতি সঙ্গোপনে এগোচ্ছেন, কেউ বা কথাটা প্রায় খোলাখুলিই বলে ফেলেছেন।

রাষ্ট্রপতির শাসনের প্রথম ছ' মাসের মেয়াদ যতই ফুরিয়ে আসবে বামপন্থী দল-[illegible] এই [illegible] উঠবে। একদিকে [illegible] নির্বাচন [illegible] অভিযোগ [illegible], আর একদিকে [illegible] বিকল্প সরকার গঠনের গোপন [illegible]।

প্রথম ছ' মাসের আগেই অবশ্য এ খেলা শেষ হতে বাধ্য। কারণ, তারপরও রাষ্ট্রপতির শাসন চালু রাখতে হলে বিধানসভাই [illegible] দিতে হবে। তখন আর নির্বাচন ছাড়া পথ থাকবে না। তাই তখন বাধ্য হয়েই শুধু তাড়াতাড়ি নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতেই সোচ্চার হতে হবে।

অবশ্য বিকল্প সরকার গঠন বা [illegible] নির্বাচন অনুষ্ঠান—এর কোনও [illegible] এখনও বামপন্থীরা খুব বেশি [illegible] নন। তাঁরা মানেন এবং বোঝেন [illegible] পরিস্থিতিতে বিকল্প কোন সরকার [illegible] অত্যন্ত কঠিন কাজ। নানা দল ছাড়া [illegible] সরকারই হতে পারে না। এই নানা দলের আবার নানা মত। এদের সকলকে [illegible] করে, সকলের সব নৈতিক ও মৌখিক [illegible] রক্ষা করে সরকার গঠন প্রায় [illegible] ব্যাপার।

আবার যতই মুখে যে যা বলুন পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সকল বামপন্থী দলই [illegible], অবিলম্বে নির্বাচন অনুষ্ঠানেরও এমন সম্ভাবনা নেই। এ ব্যাপারটা কেন্দ্রের হাতে। তাঁরা জানেন, কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গে এখনই নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোরতর বিরোধী। নির্বাচন অবশ্যম্ভাবী হলেও এই [illegible] কেন্দ্রকে যে অন্তত বছর খানেকের আগে কেউ নির্বাচন করাতে পারবেন না বামপন্থীরা প্রায় সব নেতাই তা বোঝেন।

কিন্তু তবু তাঁরা চেষ্টা করে যাচ্ছেন এবং যাবেনও [illegible] বিকল্প সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে, এবং ছ' মাসের মধ্যে তা সম্ভব না হলে অবিলম্বে অর্থাৎ অন্তত '৭১-এর ফেব্রুয়ারির মধ্যে অন্তর্বর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য। এ চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া ছাড়া এখন যে তাঁদের সামনে আর কোনও পথও নেই!

> **"মানুষ জীবনানন্দ"**
>
> **স্বর্গত কবি জীবনানন্দ দাশের ব্যক্তি-জীবনের বহু রোমাঞ্চকর ও অজানা তথ্যে সমৃদ্ধ "মানুষ জীবনানন্দ" আগামী কয়েকটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে। এটি রচনা করেছেন কবির সহধর্মিণী শ্রীমতী লাবণ্য দাশ।**

*

কিছুদিন আগেও আমার ধারণা ছিল পার্টি, কৌশলে এবং মুখে এক বলে কাজে আর এক করার ব্যাপারে সি পি আই-র তুলনা নেই। এখন দেখছি আমার সে ভুল। সি পি এম ও এদের [illegible] কম যায় না। দল হিসাবে সি পি এম এর যতই বয়স বাড়ছে, পার্টি নেতৃত্ব ততই অনেক বেশি সি পি আই নেতৃত্বের পথ অবলম্বন করছেন। অর্থাৎ, লড়াইয়ের রাজনীতির চেয়ে ম্যানিপুলেশনের রাজনীতির উপর সি পি এম নেতৃত্বও যেন দিন দিন বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন।

যুক্তফ্রন্ট ভাঙলেই লড়াই এবং নির্বাচনের দাবি তোলা হবে—এই মূল বক্তব্য থেকে সি পি এম নেতৃত্ব কী ভাবে সরে গিয়েছেন আমি আগেই তা আলোচনা করেছি। অজয়বাবুর পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার পরই জ্যোতিবাবুরা কীভাবে ব্যাকুল হয়ে যারতার সমর্থনে বিকল্প সরকার গঠনে উদ্যোগী হয়েছিলেন সে প্রসঙ্গেও কতগুলি তথ্য আগেই জানিয়েছি। এটা অবশ্য এখনও আমার অজানা, দলের সাধারণ সদস্যরা নেতৃত্বের এই নীতি পরিবর্তনকে কীভাবে গ্রহণ করেছেন। প্লেনামে গৃহীত "ব্লাক পার্টিজান ওয়ারফেয়ারের" সিদ্ধান্ত কি ভাবে পাল্টে বিকল্প সরকার গঠনের উদ্যোগে পরিণত হতে পারল তাও এখনও ঠিক বুঝতে পারি নি।

তবে, এ জিনিসটা এখন পরিষ্কার দেখা এবং বোঝা যাচ্ছে যে, যখন দলের পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে অবিলম্বে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি তোলা হচ্ছে ঠিক তখনই দলের নেতারা গোপনে বিকল্প সরকার গঠনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। যখন দলের প্রকাশ্য সিদ্ধান্তে ফরওয়ার্ড ব্লক, এস ইউ সি, এস এস পি প্রভৃতি পার্টির মুণ্ডুপাত করা হচ্ছে তখনই দলীয় নেতারা গোপনে ওইসব দলের নেতাদের সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা করছেন।

সি পি এম রাজনীতি হালফিল একটা নতুন পথ ধরেছে। সেই পথ কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে একান্ত আলাপ আলোচনার পথ। আগে কোনও দিন কেউ [illegible] নিয়ে সি পি এম নেতাদের [illegible] ছুটতে দেখেছেন? দেখেছেন কেউ তাঁদের প্রধান-

মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রভৃতির সঙ্গে গোপনে কথা বলতে? সি পি এম আগে যদি অবিলম্বে নির্বাচনের দাবি তুলতেন তাহলে সেটা নিয়ে শুধু গণ-আন্দোলনই গড়ে তুলতেন—সে প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার জন্য জ্যোতিবাবুকে দিল্লি ছুটতে হত না। এটা এতদিন ডাঙ্গে, ভূপেশ গুপ্তদেরই পথ ছিল। এখন সে পথে সুন্দরায়া, জ্যোতিবাবু, রামমূর্তিও আনাগোনা শুরু করেছেন!

একটা কথা বুঝে রাখা ভাল—সি পি এম নেতারা অজয়বাবুর নেতৃত্বে বিকল্প সরকারের চেয়ে রাষ্ট্রপতির শাসনের পক্ষে। সেইজন্য একদিকে যেমন তাঁরা নিজেরা বিকল্প সরকার গঠনের চেষ্টায় ব্যস্ত, অন্যদিকে তেমনি অজয়বাবুর নেতৃত্বে বিকল্প সরকার গঠনের পথও অবরোধ করে রাখতে চান। এইজন্যই তাঁদের নেতারা দিল্লি ছুটছেন এবং নব কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে কথা বলছেন। এইজন্যই তাঁদের দূতেরা আদি কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে গোপনে আলোচনা চালাচ্ছেন। এবং প্রধানত এইজন্যই পারটির কর্তারা নিজ উদ্যোগে জর্জ ফারনানডেজ, অশোক ঘোষ, নীহার মুখার্জী প্রভৃতির কাছে অনুরোধ উপরোধ জানাচ্ছেন। সি পি এম-এর নেতৃত্বে বিকল্প সরকার হলো ভাল কথা—না হলে অজয়বাবুর নেতৃত্বে বিকল্প সরকার যেন কিছুতেই না গঠিত হতে পারে।

*

ওদিকে বাংলা কংগ্রেসও চুপচাপ বসে নেই। কিন্তু তাঁদের শক্তি এবং সামর্থ্য অত্যন্ত কম। অজয়বাবুর নেতৃত্বে বিকল্প সরকার গঠিত হোক—এমন ইচ্ছা বাংলা কংগ্রেসের নেতাদের ষোল আনা আছে। কিন্তু এমন ইচ্ছা পূরণের ক্ষমতা তাঁদের চার আনাও নেই। একাজে সাফল্য অর্জন করতে হলে অনেকের সাহায্য তাঁদের চাই-ই। এবং, এ ব্যাপারে এই অনেকে যে বাংলা কংগ্রেসের চেয়ে নিজেদের স্বার্থ বেশি করে দেখবেন তাতে আর আশ্চর্যের কী আছে!

বাংলা কংগ্রেসের দুই প্রধান বন্ধু নব কংগ্রেস এবং সি পি আই। নব কংগ্রেস এবং সি পি আই গোপনে নিজেদের মধ্যে বেশ কিছুটা সমঝোতা করে চললেও আসলে বহু মৌলিক প্রশ্নে দুই দলের স্বার্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন।

নব কংগ্রেস নেতৃত্ব আসলে পশ্চিমবঙ্গে সি পি এম রাজত্বের অবসান ঘটাতে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। এখনও তাঁরা চান, সি পি এমকে বাদ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বিকল্প সরকার গঠিত হোক। কিন্তু একথা তাঁরা প্রকাশ্যে আনতে মোটেই রাজি নন। অন্তত নব কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কিছুতেই বুঝতে দিতে চান না যে, তাঁরা সি পি এমকে বাদ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বিকল্প সরকার গঠনে উৎসাহী। তাঁরা গোপনে গোপনে বরং সি পি এমকে একটু খুশীই রাখতে চান। আর, বাইরে দেখাতে চান আমরা নিরপেক্ষ!

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং পশ্চিমবঙ্গে তাঁর দুই বিশেষ দূত শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এবং শ্রীস্বরূপ ধাওয়ান ও শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় মোটামুটি সাফল্যের সঙ্গে এ কাজটা করতে গিয়েছেন। ইন্দিরা গান্ধী ধাপে ধাপে পশ্চিমবঙ্গের যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের পতনকে ত্বরান্বিত করে আনলেন; কিন্তু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সাধারণ মানুষ দেখল ও শুনল তিনি ফ্রন্ট সরকারের দীর্ঘায়ু কামনা করেন। শ্রীমতী গান্ধীর এই সাফল্যের তুলনা নেই।

এখন দেখার, চুল না ভিজিয়ে শ্রীমতী গান্ধী পশ্চিমবঙ্গে অজয়বাবুর নেতৃত্বে বিকল্প সরকার গড়তে পারেন কিনা।

অবশ্য, এটা ঠিকই যে ইতিমধ্যে সর্ব-ভারতীয় রাজনীতির প্রয়োজনে প্রধান-মন্ত্রীকে পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কিত তাঁর পরিকল্পনা পাল্টাতে হতে পারে। এমনও হতে পারে যে পশ্চিমবঙ্গের ঘটনাপ্রবাহের চাপেই তিনি বিকল্প সরকার না চেয়ে রাজ্যপালের শাসনের দীর্ঘায়ু কামনা করলেন।

প্রধানমন্ত্রী যে অজয়বাবুকে তাঁর নিজ দলে পেতে চান এটা অনেকেই জানেন। এই ব্যাপারে সি পি আই প্রধানমন্ত্রীর সবচেয়ে বড় শত্রু। সি পি আই-র নেতারা জানেন, অজয়বাবু নব কংগ্রেসে গিয়ে যোগ দিলে পশ্চিম বাংলার বামপন্থী রাজনীতিতে তাঁদের ম্যানুভারিং ক্ষমতা অনেক কমে যাবে। সি পি এম-এর হাত অনেক বেশি শক্ত হবে। সি পি আই তাই প্রাণপণে অজয়বাবুর নব কংগ্রেসে গমন আটকাতে চাইবেই।

আবার প্রধানমন্ত্রী যদি মনে করেন যে, পশ্চিমবঙ্গে এখন বিকল্প সরকারের চেয়ে '৭২ সনে রাষ্ট্রপতির শাসনের আওতায় নির্বাচনই তাঁর দলের পক্ষে ভাল, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই আস্তে আস্তে অজয়বাবুকে নিজ দলে নিয়ে আসার চেষ্টা করবেন।

সি পি আই প্রকাশ্যে যতই দিল্লিকে [illegible] বলুন না কেন, না হয় নির্বাচন চাই, আসলে তাঁরা এখন পশ্চিমবঙ্গে সি পি এমকে বাদ দিয়ে সরকার গঠনে মোটামুটি রাজি। তবে, যতক্ষণ ফরওয়ার্ড ব্লক এবং এস ইউ সি রাজি না হচ্ছে ততক্ষণ সি পি আই এ ব্যাপারে এক পাও এগোতে রাজি নন। তাঁরা আশা করছেন, বাংলা কংগ্রেস যদি [illegible] চালাতে পারে তাহলে পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত ফরওয়ার্ড ব্লক এবং এস ইউ সিকেও বিকল্প সরকার গঠনের প্রস্তাবে রাজি হতে বাধ্য করবে। তাঁরা মনে করেন, এজন্য অন্তত মাস ছয়েক সময় প্রয়োজন।

সি পি আই নেতাদের এটা মোটামুটি [illegible] ফরওয়ার্ড ব্লক এবং এস ইউ সি [illegible] সি পি এম-এর [illegible] হাতে [illegible] এই আশা করে আছেন রাষ্ট্রপতির শাসনের বহর দেখে, আরেকবার নির্বাচনের নামে বিরাট খরচের কথা ভেবে এবং [illegible] সি পি এম-এর চাপে শেষ পর্যন্ত ফরওয়ার্ড ব্লক, এস ইউ সিও বিকল্প সরকার গঠনে রাজি হবেন।

এই প্রসঙ্গে এমন একটা ফর্মুলার কথা বলা হচ্ছে, যেখানে সরকার গড়তে ও চালাতে গিয়ে কোনও কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ সমর্থনের উপরই নির্ভর করতে হবে না। অর্থাৎ, সব কংগ্রেসীরাই সর্বদা নিরপেক্ষ থাকবেন এবং সরকারপক্ষ সর্বদা সি পি এম পক্ষের চেয়ে বেশি ভোট পেয়ে জিতে যাবেন।

এটাও কিন্তু আসলে কংগ্রেস সমর্থন-পুষ্ট সরকারই হয়ে দাঁড়াবে—প্রত্যক্ষ সমর্থন না হলেও পরোক্ষ সমর্থন তো বটেই। ফরওয়ার্ড ব্লক, এস ইউ সি প্রভৃতি কি এতে রাজি হবেন?

নবারুণ গুপ্ত

সূর্যোদয়ের আগে

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

ভেতো ঘাসের মধ্যে পা ডুবিয়ে বসে আছি দীর্ঘকাল।
চেনা উপকূলে অবিরাম অদৃশ্য ঘড়ির শব্দ
যেন
তিন শো কোটি মানুষের নিঃশ্বাস মাপছে,
বুকের স্পন্দন।

আমি শিশিরে চোখ ভিজিয়ে জাগরণের গান শুনি :
রহস্যময় ঝর্ণার উৎসে অস্পষ্ট গম্ভীর সমুদ্রের সঙ্গীত।
কে বা কারা চিৎকার করে
ঘাসের শীর্ষে, মাঠের ধুলোয়।
পায়ের তলা কাঁপিয়ে ওঠে মাটির কান্নার প্রতিধ্বনি :
আমি আছি, আমি ছিলাম, আমি থাকবো চিরদিন।

জলঘড়ির শব্দে কাঁপতে থাকে শেষ বিন্দু চোখের জল।

কালরাত্রি

শান্তনু দাস

কালকে যা ভাল লাগে
লেডি লর্ড বেহেস্তের রাজা
আজকে সকালে তা দিনের বেশ্যার মতো
বিপর্যস্ত ম্লান মনে হয়

আসলে কি ভাল লাগে
আসলে কি ভালবাসা বলে
এতগুলো মাইল-স্টোন ভেঙে এসে বোঝাই গেল না
যে-কোন বিশ্বাস আজ রামনাথ বিশ্বাসের মতো
ঘুরে ঘুরে কোথায় উধাও

একই সঙ্গে মৃত্যু প্রেম লম্পটের মতো মুখ ঘষে
কখন দুজনে শালা বেজন্মা দোসর হয়ে ঘোরে
চুমু খায়
থুতু লাগে ঠোঁটে
যেন চামড়া খুলে বানিয়ে ঢোলক আদিম উলঙ্গ নৃত্যে বাজা
যেন দিন থেকে প্রতিদিন একই বাজনা ঘুরে ফিরে বাজে
যেন উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ

সাতাশটা মাইল-স্টোন খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে দেখি
ধূসর আকাশ মোড়া সন্ন্যাসী রাস্তায় আমি একা
দু হাতে আমাকে নিংড়ে প্রতিদিন ঠেলে দিচ্ছে
কালরাত্রি
অথর্ব সময়।

আমি

প্রতিমা সেনগুপ্ত

সমস্যাটা থমকে আছে পূব আকাশে, যেখানে
নিত্য সূর্য ওঠে, কিন্তু তবু যার অস্থির পরিণতি পশ্চিমে।
সত্যি কি আমি তাই পশ্চিমে ঘুরে চলেছি ?
সবকটা স্বাভাবিক নিয়ম—
সব নিশ্চিন্ত তুচ্ছতার বিরুদ্ধে এই আমি অভিযান চালিয়েছি;
স্তব্ধ শরতে সূর্যালোক, প্রতিশ্রুতি, স্তব,
তবু মাঝ আকাশের এই আমিটা হঠাৎ
দাউ দাউ করে গড়িয়ে চলেছি পশ্চিমে
এমনও হয়।
আমায় যদি স্বয়ং সূর্য ডোবাল,
তাহলে কি করব ?

মজা

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

ঐ তো তোমার ভুল বার বার কেন
ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়তে হবে আমাকে
কে আমি যে আমাকে না হলে তোমার চলে না ?
আমি ফটক পেরিয়ে এসে জানলুম
ঘর ও বাইরের মধ্যে অল্পই প্রভেদ
কোনোখানে কোনো দেয়াল দেখি না
শুধু কালো জ্যোৎস্না
নিস্তব্ধ নির্জন পাথরের রাজপ্রাসাদের জানলায়
এখন কি রাজকন্যার সঙ্কেত পাঠানোর সময় ?
এখন কি আমাকে সাজতে হবে নকল রাজা ?
অথবা পরে নিতে হবে পরচুলা
প্রহরীদের ধোঁকা দেওয়ার জন্যে ?

তুমি শুধু একবার

ফিরোজ চৌধুরী

তুমি শুধু একবার দেখে যাও
আমি এখনো কেমন শুদ্ধ মানুষ
চার পাশে অতিরিক্ত পাওনা অনেক
যে-কোনো মুহূর্তে হিমবাহ নেমে আসতে পারে
তবু আমি সব কিছু দু পায়ে গিয়েছি মাড়িয়ে
নির্বিকার হেঁটে চলেছি ক্লান্তিহীন
তবু আমি বিষপানে বিমুখ

তুমি শুধু একবার দেখে যাও
আমি এখনো কেমন শুদ্ধ মানুষ।

'ক্ষুদে জার্নাল'

একটি আণবিক পত্রিকাকে (না—'মিনি' নয়, যেদিন থেকে শব্দটা স্কার্টের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, সেদিন থেকেই ওর সম্পর্কে আমার অ্যালার্জি এসেছে। এমনকি মিনি বেড়াল দেখলেও বিরক্তি লাগে!) অভিনন্দন জানিয়ে আমি খুব খুশি

বাঘ নয়, ভাল্লুক নয়, সামান্য মশার ভয়ে মহানাগরিকের চোখে ঘুম নেই

ছিলুম। মনে হয়েছিল বেশ বিবেকসম্মত একটা মহৎ কাজ করা হয়েছে। কিন্তু তারপর থেকে বাংলা দেশে ক্ষুদে পত্রিকার বান ডেকেছে, অ্যান্টোজন-মাঝারি মিলে এখন ক্ষুদ্রতারই প্রতিযোগিতা। ঢেউ দূর-দূরান্তেও পৌঁছেছে, উত্তর বাংলা থেকেও একটি পেলুম—'প্রান্তরেখা'।

অনেকেই বেশ চটে গেছেন এর মধ্যে। আমার অতি প্রিয়জন, অতি বিখ্যাত কোনো কবি, আশ্চর্য সুন্দর কবিতা যিনি লেখেন, সেই সজ্জন মানুষটিও ক্ষিপ্তভাবে বলেছেন, 'মিনি পত্রিকায় লেখার জন্যে এলেই লাঠি নিয়ে তাড়া করব।'

আমি তবু বলব, মন্দ কী! লিটল ম্যাগাজিন তো বাঙালী তারুণ্যের প্রাণ, না হয় লিলিপুট হয়েই বেরুল। খরচ কম। নামী লেখকেরাও পয়সা চান না—যাঁদের একটি গল্প আদায় করতে সম্পাদককে ছমাস তাগাদা দিতে হয়, তাঁরাও একদিনে লিলিপুট পত্রিকার জন্যে গোটা ছয়েক গল্প লিখতে পারেন।

তারপর? তারপর আর কী? নয়দিনের দিন ফুরিয়ে যাবে। লিলিপুটরাও ইতিহাস হতে থাকবে। সময়ের 'মিনিস্যাক'-নিবিয়ে দেবে এই উদ্দীপনার আগুন। কিন্তু ইতিহাসে একটি রেখাও যে এরা রাখবে না, এমন ভবিষ্যদ্বাণী কি করতে পারি আমরা?

কমনম্যান সুনন্দ সাহিত্যিক নয়, তার কাছে কেউ লেখার জন্যে আসে না। তাই ভেবে-চিন্তে মনে হল, আমিই বা এ-যাত্রা 'মিনি'—না—না, ক্ষুদে জার্নাল লিখে ফেলি না কেন? কিন্তু যে জায়গাটুকু আমার জন্যে রয়েছে একটি ছোট্ট জার্নালে তো সেটা হারানো যাবে না। তা হলে কয়েকটাই নমুনা দেবার চেষ্টা করা যাক।

এক

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংক্ষিপ্ত এম-বি-বি-এস কোর্সের দাবিতে ভাবী দন্ত-চিকিৎসকেরা অবস্থান ধর্মঘট করছিলেন। এবং নানাভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিলেন তাঁরা।

নানা টানা-হ্যাঁচড়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁদের দাবি মেনে নিয়েছেন। ভালোই করেছেন।

কারণ এঁরাই উদীয়মান দন্ত-চিকিৎসক। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন এগজিকিউটিভ থেকে সিনেটর-সিন্ডিকেটরা ভবিষ্যতে কখনো দাঁত তোলবার প্রয়োজন বোধ করবেন না—এমন হতেই পারে না। তখন এঁদের কাছেই তো যেতে হবে।

সেই বিখ্যাত ডেন্টিস্টের চেয়ারে তাঁদের কেউ যখন সম্পূর্ণ নিরুপায়ভাবে শায়িত হবেন, তখন এঁদের প্রতিহিংসার মহালগ্নটি আসবে। পট্‌পট্‌ করে সাঁড়াশী দিয়ে কাঁচা দাঁত উপড়ে শোধ তুলবেন এঁরা।

পরীক্ষার টুকলি নয় টুকরো কাগজে বিনি উত্তর অপরিহার্য

সুতরাং অসাধারণ-বিখ্যাত দাবিটা ভাবিত হয়েই বোধ হয় এঁদের দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে। ভালোই হয়েছে। জয়তু সম্ভবং রক্ষেৎ প্রেস্টিজকেরাণি, আইনিরাণি।

দুই

এ বছর সর্বত্রই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা খুব শান্তিপূর্ণভাবে গৃহীত হচ্ছে। কোথাও কোনো গোলমালের খবর পাওয়া যাচ্ছে না।

এই যেমন অ্যাটম কেন জটিল, সেটা বোঝবার জন্যে যে-কোনো পরীক্ষা গ্রহণ কেন্দ্রের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই যথেষ্ট। রাইফেল বাগিয়ে সশস্ত্র পুলিস বসে আছে সেখানে। সুতরাং অবধারিত শান্তি, "যুদ্ধের বেশে পরমা শান্তি" ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে, আমার এক সমালোচক বন্ধুর পরিভাষায়—একটি 'অনুচিন্তন' জাগ্রত হল আমার।

পরীক্ষা-কেন্দ্র নিয়ে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিরঃপীড়ার অন্ত নেই। কেউ তাদের জায়গা দিতে চান না—সম্পত্তি-হানি (এবং 'মানবিক-হানি')-র আশঙ্কায়। অতএব তাঁরা গড়ের মাঠে ঢালাও সেন্টার করে দশ-বিশ হাজার পরীক্ষার্থী বসিয়ে দিন এক সঙ্গে। অদূরেই দুর্গ। সেখান থেকে চলে আসুক সৈন্যবাহিনী। মাঝখান দিয়ে সাঁজোয়া গাড়ি চলাচল করুক।

অতীব নির্বিঘ্নে কবরের সৌন্দর্য

অ্যাটম নয়, হাইড্রোজেন নয়, ক্ষুদে পটকার এক্ষণ সামলাতে পুলিস অস্থির

শান্তিতে, সব পরীক্ষা গৃহীত হতে পারবে।

তিন

কলকাতার কোনো কলেজের উপাধ্যক্ষ ঘেরাও হয়েছেন। ঘেরাওকারীদের অভিযোগ প্রকাশ, দুটি ছাত্রকে টেস্টে অ্যালাউ করা হয়নি।

উপাধ্যক্ষ জানিয়েছেন, তারা মোটেই পাশ করতে পারেনি।

পাশ করতে পারেনি? এও কি একটা কথা হল? বিক্ষোভকারীদের পাল্টা জিজ্ঞাসা: কেন অ্যালাউ করবেন না স্যর, কেন? সবাই টুকে বেরিয়ে গেল, ওরা ভালোমানুষ বলে, টুকে উঠতে পারেনি বলে ওদের আটকে রাখবেন? এই কি সততার পুরস্কার?

নিঃসন্দেহ—এই কি সততার পুরস্কার?

বরং একদিক থেকে দেখতে গেলে, নকল না করার এই চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্যেই ওদের নাম সর্বাগ্রে ঘোষণা করা উচিত ছিল।

উপাধ্যক্ষ এর কোনো উত্তর দিতে পারেননি। কোথা থেকে দেবেন? তিনি যা কিছু লেখাপড়া করেছেন, তার মধ্যে এই কূট প্রশ্নের জবাব তো কোথাও ছিল না।

চার

পুলিশ হঠাৎ বোমা আবিষ্কারে আশ্চর্য তৎপর হয়ে উঠেছে। তারা যেখানেই যাচ্ছে, সেখানেই বোমা। মনে হচ্ছে, তাদের বিস্ফোরকের গুদামের ওপর বসে কাটাচ্ছিলুম, কেন যে সবাই মিলে বোমা উড়ে যাইনি, সেইটেই গবেষণার বিষয়।

দু'চারজন এই মর্মে জিজ্ঞাসা করেছেন, বোমা সন্ধানে পুলিশের এই নৈপুণ্য এতকাল কোথায় লুকিয়ে ছিল? বিগত আমলে কি তারা তৎপর হতে পারতেন না?

না, পারতেন না। কারণ—

উত্তর দিচ্ছি না—না, স্বয়ং জ্যোতি ... বোমা আমাকে নিয়ে সম্ভব হল না। এই কলেজ স্ট্রীটে বক্তৃতাও দিয়ে দেখেছি, একটা দীর্ঘ বিবৃতিদের বক্তৃতা কলম দিয়ে প্রকাশ করছি। বুদ্ধির বদ অভ্যাস যাবে কোথায়?

পৃথিবীতে অনেক কাজই আমাকে দিয়ে সম্ভব নয়: যেমন বোমা তৈরী করা, ক্যালকুলাসের অঙ্ক কষা, অফিস-টাইমে বাসে চাপা অথবা—অথবা আণবিক কবিতা রচনা করা।

রাত্রে পাসকাল একটি দীর্ঘ চিঠি লেখা শেষ করে তার একটা ... দিয়েছিলেন। লম্বা চিঠির জন্য ক্ষমা চেয়ে ছোট চিঠি লেখবার মতো সময় তাঁর হাতে নেই।

অগত্যা—আমারও সেই এক কসরৎ।

মা একটু হেসে বললেন, 'সব ছাড়বেন কেন।'

তারপর পিতলের ছোট্ট একখানি রেকাবিতে করে কয়েকটি লবঙ্গ এলাচ এনে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'ঠাকুরদাকে দাও।'

ঠাকুরদা রেকাবি থেকে সেগুলি তুলে নিয়ে পকেটে রাখলেন। একটি লবঙ্গ মুখে দিলেন, আর একটি আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'খাবে নাকি একটা?'

আমি বললাম, 'খেলে ভবঘুরে হতে পারব?'

তিনি হেসে বললেন, 'পারবে।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে একটি লবঙ্গ মুখে দিলাম। স্বাদটা ভালো লাগল না। বললাম, 'বিশ্রী। ঝাল।' ঠাকুরদা হেসে বললেন, 'দাদু, ভবঘুরে বৃত্তিতেও অমনি ঝাল আছে।'

মা এবার সামনে এগিয়ে এসে মাটিতে মাথা রেখে তাঁকে প্রণাম করলেন। কিন্তু তাঁর পা ছুঁলেন না।

ঠাকুরদাও তাঁকে স্পর্শ না করেই আশীর্বাদ করলেন 'ভালো ভালো। সুখী হও বউমা। স্বামী পুত্র নিয়ে সুখে শান্তিতে থাকুন।'

তিনি চলে যাওয়ার পর আমি মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'মা, তুমি অমন আড়ালে দাঁড়িয়ে কথা বললে কেন।'

মা বললেন, 'মামাশ্বশুরের সঙ্গে সামনা সামনি কথা বলতে নেই। আগে তো একেবারেই বলতাম না। এখন পুরোন হয়ে গেছি। আড়াল থেকে বলি।'

'প্রণাম করলে, পায়ের ধুলো নিলে না যে।'

মা হেসে বললেন 'ওদের সব ব্যাপারে লজ্জা। মামাশ্বশুরকে ছুঁতে নেই। তিনিও ছুঁতে পারেন না। শুনেছি ভাগ্নেবউকে যদি জলে ডুবে যেতেও দেখেন মামাশ্বশুর তার হাত ধরতে পারেন না, পা ধরতে পারেন না। শুধু চুল ধরে টেনে তুলতে পারেন।'

আমি বললাম 'ব্যথা লাগে না?'

মা হেসে বললেন, 'কী জানি বাপু, ডুবে তো আর দেখিনি।'

বললাম 'তোমার মামাশ্বশুরের নাম কি মা?'

মা হেসে বললেন, 'পাজী ছেলে। নাম নিতে নেই জানিসনে?'

'বানান করে করে বল না।'

মা বললেন, 'আমি কি লেখাপড়া জানি? তোর বাবার কাছে শুনে নিস নামটা। কি তোর দিদি-ভাইয়ের কাছে। বংশে ওঁরা শুনেছি চাকলাদার।'

পরে জেনেছি ওটা বংশ নয়, নবাবী আমলের পদবী। বংশে যে কী ছিলেন ঘোষ বোস গুহ মিত্র না কি ধর কর দত্ত দাস তা আর জানা হয়নি। নামটাও পরে শুনে নিয়েছিলাম—কার কাছ থেকে ঠিক মনে নেই, অবিনাশ চন্দ্র।

তারপরও ঠাকুরদার কয়েকবার যাওয়া আসা চলল। তিনি যখনই আসেন তাঁর কাছ ছাড়া হতে আমার ইচ্ছা করে না। কোন না কোন অজুহাতে আমি স্কুল কামাই করে ঠাকুরদার কাছে বসে থাকি। বসে বসে গল্প শুনি। আমার সেদিন মাথা ধরে পেটে ব্যথা হয়।

দিদিভাই বলেন, 'চাকলাদার, পণ্টু দেখি তোমার শিষ্য হয়ে উঠল।'

ঠাকুরদা বলেন, 'হোক না। দু একজন শিষ্যসেবক তো থাকা চাই বোন। কাজটা কি আপনাদের ওই ব্রজকিশোর গোঁসাইর এক চটিয়া?'

দিদিভাই হেসে বলেন, 'তা মন্দ না। ব্যবসাটা তুমি জমাতে পারবে। কী মন্ত্র কানে দেবে তাই শুনি?'

ঠাকুরদা জবাব দেন, 'বীজ মন্ত্র কি অমন সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলা যায়? না কি বললে তার কোন মাহাত্ম্য থাকে?'

এসব কথার অর্থ তখন বুঝতাম না। কিন্তু শুনতে ভালো লাগত। ঠাকুরদা আর দিদিভাইয়ের মধ্যে বয়সের তফাত অনেক। কিন্তু দুজনের মধ্যে সম্পর্কটা ঠাট্টা তামাশার। সেই রঙ্গ রসের সবখানি উপভোগ করবার বয়স তখন হয়নি। তবু যেটুকু বুঝতাম ভালো লাগত।

তারপর মা একদিন বললেন 'জানিস তোর সেই চাকলাদার ঠাকুরদা এবার আমাদের বাড়িতে একেবারে পাকাপাকি ভাবে আসছেন।'

খুশি হয়ে বললাম, 'তাই নাকি মা? তাহলে তো খুব মজা হবে।'

মা হেসে বললেন, 'মজাই তো। তিনি এলে তোর পেটের অসুখ আর সারতে চাইবে না। স্কুলও একদম বন্ধ হয়ে যাবে।'

তারপর মালপত্র নিয়ে নৌকো করে ঠাকুরদা সত্যিই এসে হাজির হলেন। খবর পেয়ে আমি কুন্দ, বাঞ্চু, সবাই নদীর ঘাটে ছুটে গেলাম। খুব বড় নৌকো নয়, দু' মাল্লার একখানি ঘাস নৌকোয় ঠাকুরদা এসেছেন। মাঝিরা নৌকো থেকে জিনিসপত্রগুলি নামাতে লাগল। বাক্স তোরঙ্গ হাঁড়িকুড়ির অবধি নেই। সেই সঙ্গে আরো দুজনকে মা জেঠীমা দিদিভাই হাত ধরে নামালেন। একজন লালপেড়ে শাড়ি পরা একটি সুন্দরী বউ—আমাদের ঠানদি। আর একজন বছর পাঁচসাতের ছোট একটি মেয়ে সুন্দর পুতুলের মত দেখতে। অবাক কাণ্ড। কেন এক ভোজবাজি। ঠাকুরদার যে এত জিনিসপত্র আছে, বউ

মাঠে গিয়ে ঘাস কাটতেও তাঁকে দু-একদিন দেখেছি।

ঠাকুরদা সংসারের সব কাজ জানেন। কিন্তু এই দশকর্মা মানুষটি তাঁর কোন কাজকেই জীবিকার প্রয়োজনে লাগাতে পারলেন না। না কি চেষ্টা করলেন না।

বাবা একদিন আমাদের প্রতিবেশী এবং পরিবারের বন্ধু দিগিনকাকার সঙ্গে ওঁর সম্বন্ধে কথা বলছিলেন, 'জানো দিগিন, মানুষটা চিরজীবন একভাবেই কাটাল। অমন চালাক চতুর মানুষ। বুদ্ধি তোমার আমার চেয়ে কম নয়। বরং বেশি। কিন্তু হলে হবে কি, কিছুই কোন কাজে লাগল না। ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত পড়েছেন। লেখাপড়া যেটুকু জানেন ভালোই জানেন। অমন সুন্দর হাতের লেখা। আমি একদিন ওঁকে বলেছিলাম, 'ঠাকুরমামা, চলুন ভাংগার রেজিস্ট্রি অফিসে আপনার কাজ ঠিক করে দিই। দলিলটলিল লিখবেন। কতজনে এই করে সংসার চালাচ্ছে, বাড়ি ঘর করছে, কিন্তু তিনি বললেন, 'দূর ওসব আমার দ্বারা হবে না।'

দিগিনকাকা হেসে বললেন, 'ঠাকুরমামা কাজের বাইরে চলে গেছেন মেজদা।'

বাবা বললেন, 'কবেই বা উনি কাজের ভিতরে ছিলেন? পৈতৃক বিষয় আশয় যা ছিল সবই তো নষ্ট করেছেন। ভিটেঘরটা দু চার কাঠা যা আছে তাও যেত কিন্তু আমিই নিজের নামে লিখিয়ে নিয়ে কোনক্রমে রক্ষা করেছি। লোকের ধারণা খুব মাতুল সম্পত্তি পেয়েছি আমি।'

দিগিন কাকা বলতেন, 'না না মেজদা, সে কথা কেউ ভাবে না। যারা ভিতরের খবর জানে—'

বাবা বললেন, 'কলকাতার অলিতে গলিতে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। কাণ্ড-কারখানা জীবনে কম করেননি। বিয়ে করবেন না পণ করে বসেছিলেন। বলে কয়ে বুঝিয়ে শুনিয়ে আমি ওঁকে রাজি করলাম। গরীবের ঘরের একটি সুন্দরী মেয়েকে পছন্দ করে আনলাম। ভাবলাম এতে যদি ঘরে মন বসে, মতিগতি ফেরে। কিন্তু মজা দেখ দিগিন, শেষ পর্যন্ত দায় এসে আমার ঘাড়েই পড়ল।'

আমি সব শুনছি দেখে বাবা ধমক দিলেন, 'যা এখান থেকে। সব হাঁ করে গিলছিস। পড়াশোনা নেই তোর?'

ঠাকুরদার নিন্দা করলে আমার খুব লাগত। সেই সময় আমি চাকলাদার ঠাকুরদাকে বাবার চেয়েও যেন বেশি ভালোবাসতাম। সংসারে যারা বেমানান অকেজো অসফল তাদের মধ্যেই যেন যত রস আর রহস্য। কাজের মানুষ নিরেট ইটের মত। যদিও তাঁরাই জগৎ সংসারের ভিত্তি। আমি দূর থেকে তাদের শ্রদ্ধা করেছি। কিন্তু কাছে যেতে পারিনি, বন্ধুত্ব করতে পারিনি।

ঠাকুরদা অবশ্য আমাকে আরো আনাড়ী আরো অকর্মণ্য মনে করতেন। মনে করার কথাই বা কেন বলি। ওঁদের বিচার নির্ভুল ছিল।

ঠাকুরদা বলতেন, 'তুমি আমার নেছরা-দাদা। আমার দশের ঘরের নামতা। তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না খবরদার দাদা, সংসারের ভিতরে ঢুকতে চেষ্টা কোরো না। বাইরে বাইরে থেকো। ভিতরে ঢুকতে গেলেই মরবে। আমার মত দশা হবে।'

কারো বিয়েটিয়ে হচ্ছে শুনলে বলতেন, 'এই-রে কার যেন আবার কপাল পড়েল।' ঠাকুরদা যখন বাড়ির কাজকর্ম করতেন, আমাকে ডাকতেন না, সাহায্যের জন্যে কানুবাঙ্কুকে ডাকতেন। কিন্তু আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন তাঁর সেই বইয়ের বাকসের চাবি। সেখানেই আমি প্রথম পেয়েছিলাম

মলাটছেঁড়া কৃত্তিবাসী রামায়ণ, বঙ্কিম গ্রন্থাবলী, মাইকেল গ্রন্থাবলী, নবীন সেনের পলাশীর যুদ্ধ, অমরেন্দ্র গ্রন্থাবলী, ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী। আবার সেই সঙ্গে তবলা তরঙ্গিনী, আতস বাজি প্রস্তুত শিক্ষা, হস্তরেখা পরিচয়, কাকবিদ্যা, কোকশাস্ত্র, যাদু বিদ্যা প্রবেশ। আরো নানা বিষয়ের নানা বই ছিল। কোনটা আস্ত কোনটা ছেঁড়াখোড়া।

আমি বেছে বেছে পড়তাম। ঠাকুরদার মত আমার কৌতূহল অত ব্যাপক ছিল না। সব কিছু হৃদয়ঙ্গম করবার সামর্থ্যও ছিল না।

তবে একদিন সশব্দে বিদ্যাসুন্দর পড়তে গিয়ে জেঠীমার কাছে ধমক খেয়েছিলাম মনে আছে।

তিনি আমার হাত থেকে বইখানা কেড়ে নিয়ে বলেছিলেন, 'এই বয়সেই বিদ্যাসুন্দর! তুমি তো ইঁচড়ে পেকে গেলে বাবা। নাকি ঠাকুরমামা কিলিয়ে কাঁঠাল পাকালেন?'

ঠাকুরদা বারবাড়ির উঠোনে বসে বসে বাঁশের বাখারি তৈরি করতেন, কি দারের আছাড়ি লাগাতেন আমি তাঁর কাছে বসে বলতাম, ঠাকুরদা, মেঘনাদ বধ থেকে পড়ুন।

তিনি গড়গড় করে পড়ে যেতেন। তাঁর মুখস্থ করবার শক্তি দেখে অবাক লাগত।

রাম রাবণের যুদ্ধের পর ক্লাইভ আর সিরাজউদ্দৌলার যুদ্ধের কাহিনীর ফরমায়েশ করতাম।

সেই বেলা দুপুরে ঠাকুরদা আবৃত্তি শুরু করতেন, 'দ্বিতীয় প্রহর নিশি নীরব অবনী।'

দিদিভাই এসে তাড়া দিয়ে বলতেন, 'চাকলাদার আর কবিয়ালি করতে হবে না। যাও এবার নাইতে যাও। নইলে সব না খেয়ে দেয়ে তোমার জন্যে বসে রয়েছে।'

শুধু আবৃত্তি নয়, অনুরোধ করলে গান গেয়েও শোনাতেন ঠাকুরদা। কবিগানই বেশি গাইতেন। সুরের সঙ্গে সঙ্গে কবিয়ালদের মত মাঝে মাঝে পদ বানাতেনও। ঠাকুরদার হাত চলত আর গান চলত,

'মন পাগলারে আমার
বিরজা নদীর কূলে বসে
না-জানো সাঁতার।
ভাই বন্ধু দারা সুত কেউ তো কারো
নয়
ও মন কেউ তো কারো নয়
দুই চার দিন সাথের সাথী
শুধু পথের পরিচয়।'

ঠাকুরদা বড় বড় ঘুড়ি তৈরি করে ঘুড়ি ওড়াতেন। একবার সাপ ঘুড়ি তৈরি করেছিলেন, তার লেজটা মাটিতে লতাটা আকাশে। শেষ পর্যন্ত লেজটাও আকাশে উঠল। মাঠের সেই প্রদর্শনীতে সারা গাঁয়ের লোক জড় হয়েছিল।

নানারকম বাজি তৈরি করতে ভালোবাসতেন। বোম, তুবড়ী, চরকি বাজি, ফানুস।

গাঁয়ের আতসকর মঙ্গল ধুপী তাঁর কাছে এসে শিক্ষা নিত। জাত ব্যবসা জামাকাপড় ধোয়ার কাজ সে বড় একটা করত না। ওসব তার ভাইয়েরা দেখত। বোমা ফেটে মঙ্গল ধুপীর কয়েকটা আঙুল উড়ে গিয়ে ছিল। তবু বাজির নেশা যায় নি।

মঙ্গল ধুপী এসে ঠাকুরদার জন্যে তামাক সাজত। তারপর সবিনয়ে বলত, 'চাকলাদার মশাই দশ বছর আপনার পায়ের কাছে বসে শিখলেও আপনার যোগ্য হতে পারব না। আপনার মত ওস্তাদ এই তল্লাটে আর নেই।'

ঠাকুরদার মুখে হাসি, কিন্তু গলার সুরে উদাসী ধরা পড়ত, 'এসব করে কী বা হল মঙ্গল। বাজির আগুনে তোমার তিনটে আঙুল গেছে। আর আমি পুরো একটা জীবনকেই পুড়িয়ে শেষ করলাম।'

অমন রসিক স্ফূর্তিবাজ মানুষের মুখে এ ধরনের কথাবার্তা শুনতে আমার খুব খারাপ লাগত। মনে হত ভিতরে ভিতরে কিসের যেন একটা দুঃখ ওঁর মনে লেগে রয়েছে।

আমি ভাবতাম হয়তো বাবাই এর জন্যে দায়ী। কাজের কথা বলে বলে ওঁর মেজাজটা খারাপ করে দিয়েছেন। উনি যে কত কাজ জানেন, কতরকম ওঁর কত গুণ-যোগ্যতা তা কি বাবার চোখে পড়ে না? বাজির লেখাটাই সবচেয়ে বড় কাজ হল!

নানারকম সাংসারিক সমস্যা জট পাকাতে লাগল। তখন এর কারণ ভালো করে বুঝতে পারতাম না। পরে বুঝেছিলাম। একেই বলে একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবার। ঠাকুরদারা আসাম না শহরের ভাঙনের হাওয়া লেগেছিল।

ঠানদির সঙ্গে কাজকর্ম নিয়ে মা কি জেঠীমার খিটিমিটি বাধলে আমি ঠানদির পক্ষ নিতাম। ঠাকুরদাকে কেউ কিছু বললে আমি তাঁর হয়ে ওকালতি করতাম।

লক্ষ করতাম ঠাকুরদা প্রথম যখন আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসতেন তখন যেমন আদর আপ্যায়ন চলত এখন আর তেমন হয় না। এখন আর তিনি তো অতিথি কুটুম্ব নন, এখন এ বাড়ির স্থায়ী বাসিন্দা।

বাবা একদিন বললেন, 'ঠাকুরমামা কী যে আপনার স্বভাব, গাঁয়ের পাঁচজন বামুন কায়েত ভদ্রলোকের সঙ্গে আপনাকে তো মিশতে দেখিনে। যতসব ধোপা নাপিতের সঙ্গে আপনার আড্ডা। ওদের সঙ্গে যদি ওইভাবে মেশেন তাহলে কি মান থাকে?'

ঠাকুরদা বললেন, 'আমি তো তোমার মত মানী লোক নই মাহিন্দর। আমাকে

ওরা ডাকে খোঁজে ভালোবাসে তাই ওদের কাছে যাই। তাতে দোষ কী?'

এর মধ্যে কান্ড এক ঘটল। সুবর্ণ পিসীর বিয়ে হয়ে গেল। কতই বা তখন ওর বয়স। এগার বার বছরের বেশি হবে না। ঠাকুরদাই গরজ করে ওর সম্বন্ধ আনলেন। কামারদিয়ার সতীশ নাগ। লেখাপড়া তেমন জানে না। কিন্তু দেখতে শুনতে মন্দ নয়। বছর পঁচিশ ছাব্বিশ বয়স। স্বাস্থ্য ভালো। চাকরিবাকরি কিছু করে না। গাঁয়ে কিছু ক্ষেতখামার আছে। তাই দেখাশোনা করে। বিধবা মা আছেন। সংসারে আর কেউ নেই। নিজেই বাড়ির কর্তা।

সুবর্ণ তার বাবার কাছে বড় একটা ঘেঁষত না। ঠাকুরদাও বোধ হয় তেমন চাইতেন না। নিজের পুতুল খেলা নিয়েই সুবর্ণের দিন কাটত। মাঝে মাঝে অন্দর মহলে এর ওর কাজের যোগান দিত। ঠানদির তাগিদে কখনো কখনো বই নিয়ে আসত পড়া দেখাবার জন্যে। কিন্তু পড়াশুনোয় তেমন মন ছিল না। খেলা ঘরে সংসার পাতাই ছিল তার নেশা। পুতুলের বিয়ে দিতে দিতে সুবর্ণ শুনেছে তার নিজেরই বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।

বাবা বললেন, 'মেয়ের বিয়ের জন্য এত তাড়া হচ্ছেন কেন ঠাকুরমামা? ওর কি এমন বয়স হয়েছে? সুন্দরী মেয়ে। বড় হোক। এর চেয়েও কত ভালো সম্বন্ধ ওর আসবে।'

ঠাকুরদা বললেন, 'না মহিমের, তোমার মত ওর কথা ভেবেই ভালো। আমিও তাড়াতাড়ি দায়মুক্ত হতে চাই। তুমিই আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছ। এত বন্ধনের তো কোন দরকার ছিল না।'

বাবা ওঁর আড়ালে একদিন হেসে বললেন, 'ঠাকুরমামা এদিকে খুব বন্ধন বন্ধন করেন। ওদিকে নিজের জামা-কাপড় জিনিসের ওপর কী যত্ন দেখেছিস? এখনো কী তেমন বহাল!'

আমরা হেসে সায় দিই। তা ঠিক। নিজের জিনিসপত্রের ব্যাপারে ঠাকুরদার পরিপাট্যের অন্ত নেই। জামা কাপড় গেঞ্জি সেগুলো সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। [illegible] নিত্য বাস করেন। বিছানা-পাতার মশারির খাটানোয় একটু এদিক ওদিক হলে ঠানদি বকুনি খেয়ে মরেন।

একদিন ঠানদিকে দিয়ে তিনি তিন তিনবার মশারি টানালেন। বারবার মাথা নাড়েন আর বলেন, 'জীবনভর তালিম দিলাম তবু শিখতে পারলে না। আমি কি বউমার মেড়ামুখো স্বামী যে আমার জন্যে অমন উটমুখো মশারি টানাবে?'

একদিন দেখি ঠাকুরদার সাদা পাঞ্জাবিটায় তিলে পড়ে গেছে। অসতর্কতার জন্যই হয়তো পড়েছে। বর্ষার দিনে ভিজে জামা রোদ পায়নি।

আমি বললাম, 'ঠাকুরদা দেখুন কান্ড। আপনার মত মানুষের জামাতেও তিলে পড়ল।'

ঠাকুরদা নিজেই মহাদুঃখে মগ্ন হয়েছিলেন। আমার কথায় চোখ তুলে তাকালেন, তারপর ম্লান হেসে বললেন, 'আর ভাই জামা তো জামা আমি মানুষটাতেই এখন তিলে পড়ে গেছি। কারো কারো চোখে তিলে খচ্চর।'

নিজের ব্যবহারের জিনিসপত্র কাউকে ছুঁতে দিতেন না ঠাকুরদা। বলতেন, 'নষ্ট করে ফেলবে।' নিজের দা ছুরি, ছাতা লাঠি সব সাবধান করে তুলে রাখতেন।

একবার যত্ন করে একখানা বাঁশের লাঠি তৈরি করলেন। বেড়াবার ছড়ি।

তপাদার মশাই ছিলেন পেশাদার ঘটক। আমাদের বাড়িতে অবশ্য তখন ঘটকালির কোন ব্যাপার ছিল না। যাতায়াতের পথে অমনিই আসতেন। রাত্রে থাকতেন খেতেন। পরদিন ভোরে উঠে চলে যেতেন।

ঠাকুরদার সেই লাঠিখানা দেখে তাঁর খুব ভালো লেগে গেল। তিনি খুশি হয়ে বললেন, 'চাকলাদার মশাই, আপনার হাতের কাজ তো ভারি চমৎকার। আমার লাঠিখানা হারিয়ে গেছে। রাস্তায় চলাফিরি। কোন কোন দিন দিনে দশ পনের মাইলও হেঁটে পাড়ি দিই। একখানা লাঠি হলে বড় ভালো হয়। দেবেন আমাকে আপনার লাঠিখানা?'

ঠাকুরদা প্রসন্ন তপাদারের মুখের দিকে একটুকাল অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন, তারপর হেসে বললেন, 'তপাদার মশাই আজ লোভ কি ভালো? আজ চোখে সুন্দর লাগছে বলে আমার লাঠিগাছটি চাইলেন।

ভগবান বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, আত্মদীপো ভব—নিজেই নিজের আলো হবে অর্থাৎ নিজ বুদ্ধির আলোকেই নিজের পথ বেছে নেবে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে বুদ্ধদেব স্বয়ং নিজ গুণে, নিজ সাধন বলেই বোধি লাভ করেছিলেন। কিন্তু শিষ্যরা যখন ত্রিশরণ মন্ত্র উচ্চারণ করলেন, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি অর্থাৎ বুদ্ধির আশ্রয় না নিয়ে তাঁরা বুদ্ধের আশ্রয় নিলেন। প্রত্যেক মহাপুরুষই জীবন জিজ্ঞাসার কাছে কিছু সূত্র দিয়ে যান। তবে সাধনা এবং প্রত্যেকেই স্ব স্ব বুদ্ধি মত যে যে করে নেবে, এই তাঁরা চান। গুরু শিষ্যের সম্পর্ক যে প্রভু ভৃত্যের সম্পর্ক নয়। সেখানে উভয়ে আদান-প্রদান, বুদ্ধির অনুশীলন। একজনের মধ্যে ভাবনার মিল যতখানি সাধনার মিল ততখানি নয়। রামকৃষ্ণের সাধনা এবং বিবেকানন্দের সাধনা এক নয়, মার্কস লেনিন এক নন, গান্ধী নেহেরুও এক পথের পথিক নন। অতিশয় অনুগত শিষ্য হলেও নিজ নিজ পথ তাঁরা নিজেরাই করে নিয়েছেন। অনুগামী হলেই পশ্চাদ্‌গামী হতে হবে এমন কোন নিয়ম নেই। অনেক ব্যাপারে অনুগামীরাই অগ্রগামী হন। কোন মহাপুরুষই কোন কালে মানুষের বুদ্ধিকে শৃঙ্খলিত করতে চান নি। মহাপুরুষ মাত্রই মুক্তিদাতা, মানুষের মনকে তাঁরা সকল বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। কিন্তু ফল হয়েছে বিপরীত, কারণ মানুষ মুক্তি চায় না, সে চায় অবলম্বন। একটা কিছুকে ভর করে দাঁড়াতে চায়। বেশির ভাগ মানুষেরই মন নিরানন্দ, নিরুৎসুক। ভাবনা চিন্তার দায় এড়াতে পারলে আরাম বোধ করে, নিজের মতো করে কিছু ভাবতে চায় না। জীবনযাত্রার ব্যাপারে যেমন দোকানের রেডিমেড পোশাক, হোটেলের রেডিমেড খানা, ঘরে কম্পানীর চা কফি, চিন্তার ব্যাপারেও তৈরি করা মত, দলেরই নীতি সম্বল। জীবন যত বেশি জটিল হয়ে উঠছে তত বেশি আমরা সহজ পথের অনুসন্ধানী হয়ে উঠছি। ভুলে যাচ্ছি যে জীবন যেখানে জটিল, বুদ্ধিচর্চার প্রয়োজন সেখানেই বেশি।

আমাদের সমাজে বিচারের চাইতে আচারের প্রাধান্য চিরকালই বেশি। সমাজপতিরা কথায় কথায় শাস্ত্রের দোহাই দিয়েছেন, মনু পরাশরের বিধান মতে সমাজ চলেছে। এখনও অবস্থার খুব যে একটা পরিবর্তন হয়েছে এমন নয়। এখন সমাজপতির স্থান নিয়েছেন রাজনৈতিক নেতৃবর্গ। তাঁরাও আগের মত সেই শাস্ত্রবাক্যই আওড়াচ্ছেন। মনু পরাশরের স্থান নিয়েছেন কোন ক্ষেত্রে গান্ধী, কোন ক্ষেত্রে মার্কস লেনিন মাও সে-তুঙ। সেকালের সমাজপতিদের কিছু তবু দয়ামায়া ছিল। শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করলে বড় জোর এক-ঘরে করা হত, ধোপা নাপিত বন্ধ হত। এখন আর এক-ঘরে করে না, তার বদলে একমাত্র ঘরটি পুড়িয়ে দেয়। ধোপা নাপিত বন্ধ করে না, নিজেরাই মাথা মুড়িয়ে দেয়। সজ্ঞানে বিরোধিতা করলে অঙ্গহানি, চাই কি প্রাণহানি ঘটে। আগেকার সমাজে শাস্ত্রের দৌরাত্ম্য ছিল, এখন শাস্ত্রও আছে, শস্ত্রও আছে। ফলে আজকের মানুষ ঢের বেশি সন্ত্রস্ত, সশঙ্ক।

অবশ্য এ কথাও সত্য যে, শাস্ত্রের ঘাড়ে যতখানি দোষ চাপানো হয় শাস্ত্র ঠিক ততখানি দোষী নয়। কোন শাস্ত্রই এমন কথা বলেনি যে শাস্ত্রবাক্য বিনা বিচারে মেনে নিতে হবে। এমন যে হিন্দু শাস্ত্র সেও বলেছে—

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যো বিনির্ণয়ঃ
যুক্তিহীনে বিচারে তু ধর্মহানি প্রজায়তে।

দেখা গিয়েছে শাস্ত্র ব্যাখ্যাতারা যতখানি অবিবেচক শাস্ত্র ততখানি নয়। তাছাড়া বাঙালী সমাজে শাস্ত্রবিদরাও খুব বড় রকমের জখম কিছু করতে পারেন নি। কারণ এক তরফা শাস্ত্রের বিধান এ দেশে খুব বেশি লোক মেনে নেয়নি। বাঙলা দেশ নৈয়ায়িকের দেশ। তাঁরা প্রতি পদে যুক্তির তর্ক তুলেছেন। তাতে আর কিছু না হোক বুদ্ধিচর্চার যথেষ্ট সহায়তা হয়েছিল। প্রাচীন গ্রীসে sophist সম্প্রদায় যে কাজ করেছেন বাঙলা দেশে নৈয়ায়িকরা তাই করেছেন। যুক্তিবাদ এবং বুদ্ধিবৃত্তিকে মূল্য এবং সম্মান দিতে এ'রা শিখিয়েছিলেন। অবশ্য এর একটা অন্য দিকও আছে। কোন জিনিসেরই আতিশয্য ভাল নয়। অতিরিক্ত তার্কিকতার ফলে কোন বিষয়ে কোন মতবাদই ঠিক শিকড় গেড়ে বসতে পারেনি। বাঙালীর সহজাত বুদ্ধিবৃত্তি এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যেমন তাকে একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দিয়েছে তেমনি আবার ঐ স্বভাবই তাকে কোন বিষয়ে দলবদ্ধ বা জোটবদ্ধ হতে দেয়নি। কোন ব্যাপারেই কোন একজন নেতা অবিসম্বাদিত নেতৃত্ব লাভ করেন নি। একমাত্র বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনে হৃদয়াবেগের প্রাধান্য ছিল বলে সকল বাঙালী কিছুকালের জন্যে এক মন এক প্রাণ হয়েছিল। বাঙালীর বুদ্ধিবৃত্তি এবং স্বাতন্ত্র্যবোধকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়েও তার সামাজিক ঐক্যবোধের অভাব রবীন্দ্রনাথ গোড়াগুড়িই লক্ষ্য করে এসেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে তিনি যে স্বদেশী সমাজের পরিকল্পনা করেছিলেন সেই সম্পর্কে তিনি একজন সমাজপতির প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছিলেন। শিক্ষায় দীক্ষায় কর্মে চিন্তায় চরিত্র-মহিমায় সর্বজনবরেণ্য কোন ব্যক্তিকে ঐ সমাজপতির আসনে সমগ্র সমাজ বরণ করে নেবে এবং সকলে তাঁর নেতৃত্বকে বিনা দ্বিধায় মেনে নেবে, এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। এ সম্পর্কে তিনি সেদিনের সর্বজন-শ্রদ্ধেয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়ের নাম করেছিলেন। "একটি লোককে আশ্রয় করিয়া আমাদের সমস্ত সমাজকে এক জায়গায় আপন হৃদয় স্থাপন, আপন ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে, নাহলে শৈথিল্য ও বিনাশের হাত হইতে আত্মরক্ষার কোন উপায় দেখি না।"

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বাঙালী একবার ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। গান্ধী নেতৃত্বের প্রথম পর্বে শুধু বাঙলা দেশ কেন, সমস্ত ভারতবর্ষকেই আমরা এক পতাকার তলায় মিলিত হতে দেখেছি। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, এমনটি কোন কালে ঘটেনি। বাঙলা দেশের নেতা হিসাবে সেদিন ছিলেন চিত্তরঞ্জন। স্বদেশী আন্দোলনের পরে সেই দ্বিতীয় বার বাঙালী এক ছত্রছায়ায় মিলেছিল। এমনকি গান্ধীজির কংগ্রেস ত্যাগ করে চিত্তরঞ্জন যখন স্বরাজ্য পার্টি স্থাপন করলেন তখনও তিনি বাঙলা দেশের একচ্ছত্র অধিপতি হলেন। তাঁর অধিনায়কত্ব অপর কোন বাঙালী নেতা এক দিনের জন্যও চ্যালেঞ্জ করতে পারেননি। চিত্তরঞ্জনের পরে বাঙলার রাজনীতিতে সেই যে ভাঙন ধরেছে আজ পর্যন্ত সে আর জোড়া লাগেনি। এখন সেই ভগ্ন দশা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। রবীন্দ্রনাথের দূরদৃষ্টিতে দেশের এই দুর্দৈব ধরা পড়েছিল। এজন্যে স্বদেশী যুগে যে কথা বলেছিলেন মৃত্যুর মাত্র দু বছর আগে বাঙলা দেশকে তিনি আবার সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্রকে দেশনায়ক-এর পদে বরণ করে সমগ্র বাঙালী জাতিকে তাঁর পতাকা তলে মিলিত হবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। "আমি আজ তোমাকে বাঙলা দেশের রাষ্ট্রনেতার পদে বরণ করি, সঙ্গে সঙ্গে আহ্বান করি তোমার পার্শ্বে সমস্ত দেশকে.....একজনের কেন্দ্রাকর্ষণে দেশের সকল লোক এক হতে পারলে তবেই হবে অসাধ্য সাধন।"

রবীন্দ্রনাথ এমন একজন মানুষের প্রতি জাতির আনুগত্য প্রার্থনা করেছিলেন যিনি দেশপ্রেমের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ যাঁর শক্তিমত্তা এবং চরিত্রমাহাত্ম্য প্রশ্নাতীত রূপে প্রমাণিত। একে কোন মতেই অন্ধ আনুগত্যের আবেদন বলা চলে না। কিন্তু

এই ব্যাপারেও আমাদের অন্ধতা এবং বিচার-বুদ্ধিহীনতা প্রকাশ পেয়েছে অন্য আকারে। সে কথাটি বলা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের নিকট দেশনায়ক আখ্যা লাভের বৎসর কাল পরে দেশ থেকে সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান। অতি বড় বিস্ময়ের কথা যে রবীন্দ্রনাথের 'দেশনায়ক' রাতারাতি, দেশবাসীর একাংশের কাছে দেশদ্রোহী কুইস্লিং হয়ে গেলেন। শুধু তাই নয়, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ এঁদের মতে আমাদের পরম মিত্র বিবেচিত হল। আরো কি, দেশ বিভাগের দাবিতে এঁরা মুসলিম লীগের সমর্থক হলেন। রাজনৈতিক illiteracy-র চরম দৃষ্টান্ত বলতে হবে। যুক্তিহীনের বিচারে কতখানি বুদ্ধিহানি ঘটতে পারে এসব তার শোচনীয় দৃষ্টান্ত। যুক্তিবাদী বুদ্ধিজীবী বাঙালীর ইতিহাসে এ এক কলঙ্কময় অধ্যায়।

একদা বুদ্ধিজীবী জাতি হিসাবে বাঙালীর খ্যাতি ছিল। আজ সে গৌরব [illegible]। নিজের বিচারবুদ্ধিকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে বাঙালী আজ তোতাপাখীর মত শেখানো বুলি আওড়াচ্ছে। যূথবদ্ধ পথ-পরিক্রমা আর দলবদ্ধ শ্লোগান উচ্চারণ বিরুদ্ধ মতকে যে পরিমাণে দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে বাঙালীর বুদ্ধিবৃত্তি সে পরিমাণে ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে। তিরিশ বছর আগে শেখানো বুলি উচ্চারণ করে করে যাঁরা রাজনীতির পাঠ নিয়েছেন আজকে তাঁরাই দেশের নেতা হয়েছেন। এখন তাঁর [illegible]: তাঁরা ধুয়া তুলে দেন আর [illegible] কণ্ঠে জিন্দাবাদ মুর্দাবাদ ধ্বনিত হতে থাকে। যুক্তফ্রন্টের চৌদ্দ শরিক পক্ষ [illegible] বাজারের মাঝে [illegible] করছে, তা চোখে দেখেও [illegible] দিয়ে বাঙালী সন্তান সহস্র কণ্ঠে ধ্বনি তুলছে ফ্রন্ট [illegible] জয়। ফ্রন্টের নাভিশ্বাস উঠেছে দেখেও চেঁচাচ্ছে যুগ যুগ জিও। বাঙলা হবার কী দশাই হয়েছে! [illegible], রাহাজানি, লুটপাট অগ্নিসংযোগ নিত্যকর্ম পদ্ধতি অথচ ফ্রন্ট-মন্ত্রী আমাদের সজ্ঞানে বিশ্বাস করতে বলছেন যে এটি নাকি পৃথিবীর সুসভ্যতম গবর্নমেন্ট। ফ্রন্টমন্ত্রীর এই উক্তি বাঙালীর বুদ্ধির প্রতি সব চাইতে বড় affront।

বাঙালী স্বভাবত তার্কিকের জাত, প্রতি পদে তর্ক করেছে। অতিরিক্ত তার্কিকতা অনেক কর্মের উদ্যোগকে বাধাও দিয়েছে। নিরন্তর রন্ধ্রসন্ধানী তার্কিকতাকে রবীন্দ্রনাথ নিষ্কর্মা বুদ্ধির নিষ্ফল কৌশলতা বলে তিরস্কারও করেছেন। কোন জিনিসেরই আতিশয্য ভাল নয়। তথাপি এটুকু বলতে হবে যে তর্ক আর কিছু না করুক, মানুষকে একটু সতর্ক করে। অপরিণত বুদ্ধির অসতর্ক আত্মসমর্পণের চাইতে পরিণত বুদ্ধির সতর্কতা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে, সব শেয়ালের এক রা যতখানি স্বাভাবিক সব মানুষের এক রা ততখানি অস্বাভাবিক। কর্মে কথায় কাজে যে regimentation-এর চেষ্টা চলছে সে আর কিছু নয়, সকল মানুষের নাবালকীকরণ। এটা সভ্যতার স্বভাবধর্ম বিরোধী। মানুষের বুদ্ধিকে পরিণতি দিয়ে তাকে সাবালক করে তোলাই সভ্যতার উদ্দেশ্য। পরিণত বুদ্ধির পথে অগ্রগতিকেই বলে evolution। অবশ্য আজকের মানুষ evolution-এ বিশ্বাসী নয়, revolution-এ বিশ্বাসী। কিন্তু কর্মে কথায় চিন্তায় regimentation-এর দ্বারা রিভলিউশন আসবে এমন কথা যাঁরা ভাবেন তাঁরা রিভলিউশনকে পূর্ণ মর্যাদা দেন না। কারণ মানুষকে নাবালক বানিয়ে বিপ্লব ঘটানো যায় না, বিপর্যয় ঘটানো যায়।

অর্বাচীন নেতৃত্বের নির্বিচার আত্মাবহন কতখানি সর্বনাশের হেতু হতে পারে হিটলার-এর জার্মেনী তার দৃষ্টান্ত। জার্মেনী বুদ্ধিজীবীর দেশ, কিন্তু

মতিভ্রান্ত হয়ে চোখ বুজে আজ্ঞা বহন করেছে আর হাইল হিটলার বলে চেঁচিয়েছে। স্বভাববিরুদ্ধ কাজ করেছে বলেই এত বড় সর্বনাশ ঘটতে পেরেছে. জার্মেনীর মত দেশ আজ দ্বিধা বিভক্ত। জার্মেন জাতির একাংশ অপরাংশের শত্রু, মুখ দেখাদেখি নেই। মজার কথা এই যে, এ কুকীর্তি যার কর্মফল সেই হিটলার-এর নাম আজ পূব-পশ্চিম দুই জার্মেনী থেকেই বিলুপ্ত। ঐ তো হয়, নেতারা নিজ কর্মফল ভোগ করেন না, ভুগতে হয় দেশবাসীকে বহুকাল ধরে। বাঙলা দেশেও ঐ একই ট্র্যাজেডী ঘটেছে। প্রাচীনের নেতৃত্বে দেশ দ্বিধা বিভক্ত হয়েছে, অর্বাচীনের নেতৃত্বে দেশ আজ শতধা বিদীর্ণ হতে চলেছে। ভ্রান্ত নেতৃত্ব সমস্ত দেশকে বিভ্রান্ত করে।

মানুষের বুদ্ধিকে যদি ঘুম পাড়িয়ে রাখা যায় তাহলে নেতৃত্ব মাত্রেই অভ্রান্ত হয়ে ওঠে। কারণ ভ্রান্তি ঘটলেও ভ্রান্তি দর্শাবার লোক থাকে না। এ যুগের রাজনৈতিক সংহিতা মতে ভাববার বুঝবার দায় একমাত্র দলনায়কের, বাদবাকী সকলে শুধু আজ্ঞা পালন করবে। অগ্রগমনের অধিকার কেবল দলপতির আর সকলে অনুগামী। যথাবিহিত অনুগমনের জন্যে বুদ্ধিদমন অত্যাবশ্যক। দলের ভার বাড়াতে হলে বুদ্ধির ধার কমাতে হয়। এর ফল আখেরে ভাল হয় না। কারণ এর মধ্যেই ভবিষ্যতের দুর্বলতা সংক্রামিত থাকে।

দ্বিধাহীন একনিষ্ঠ আনুগত্যের প্রয়োজন অবশ্যই আছে। সে একনিষ্ঠতা দাবি করবার জন্যে যে মনীষা, যে কল্পনা-শক্তি, যে চরিত্রমাহাত্ম্য এবং হৃদয়বত্তার প্রয়োজন, অপ্রিয় সত্য হলেও স্বীকার করতে হবে যে, বাঙলাদেশের নেতৃত্বে আজ তার অভাব ঘটেছে। দেশবন্ধুর পরে একমাত্র সুভাষচন্দ্রই প্রকৃত দেশনায়কের যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। দেশনায়ক এককালে একজনই মাত্র হতে পারেন, কারণ তিনি সর্বপ্রকারে অনন্য এবং অদ্বিতীয়। দেশ-নায়কের অভাবেই বহুনায়কের উদ্ভব। সমস্ত দেশের মন পায় না বলে ছোট ছোট দল তথা গোষ্ঠীর সৃষ্টি করতে হয়। ফলে বহুনায়কের দেশ বহুধা বিভক্ত হয়—আজ বাঙলাদেশের যা অবস্থা হয়েছে। অমিয় রায়ের একটি উক্তি সামান্য অদল-বদল করে বলা যেতে পারে—সতী দেহ খণ্ড খণ্ড হয়ে যেখানে পড়ল সেখানেই একটি করে পীঠস্থান তৈরি হল। আমাদের দেশপ্রেমও টুকরো টুকরো হয়ে যেখানে সেখানে নেতৃত্বের আখড়া তৈরি করেছে। খুদে খুদে নেতায় দেশ ছেয়ে গেল। তাদের কোন গাম্ভীর্য নেই, কেননা তাদের কোন ডিগনিটি বোধ নেই।

দলের দাবিতে বড় জোর দলপতি হওয়া যায়। সমগ্র দেশের দাবিকে যিনি নিজ দায়িত্ব বলে গ্রহণ করেন তিনিই দেশনায়ক। বাঙলাদেশে আজ সবচেয়ে বড় প্রয়োজন দেশনায়কের কারণ নিত্য দেখা যাচ্ছে দলের প্রয়োজনে দেশের প্রয়োজন উপেক্ষিত। দুঃখিনী বঙ্গমাতা বহু দলের পদতলে দলিত নিপীড়িত। বঙ্কিমচন্দ্র যাঁকে বলে-ছিলেন বহুবলধারিণীং আজ তিনি হয়েছেন বহুদলধারিণীং। সেদিন কথা প্রসঙ্গে বলেছিলাম, আজ যদি আবার প্রশ্ন হয়, অবলা কেন মা এত বলে তাহলে বঙ্গমাতাকে বলতে হবে, অবলা করেছে মোরে এত দলে মিলে। কারণ দলনেতারা দল নিয়ে এত ব্যস্ত যে দেশের কথা ভাববার সময়ই তাদের নেই।

অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে দলনিরপেক্ষ দেশ-অন্ত-প্রাণ কোন নেতার আবির্ভাব হলে তবেই দেশ রক্ষা পাবে। বলা নিষ্প্রয়োজন দেশে আজ সেই নেতা নেই। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে তাঁর আবির্ভাব সুনিশ্চিত। দেশনায়কের জন্ম দেশের স্বতঃউদ্যত ইচ্ছাশক্তি বা will power-এর মধ্যে নিহিত। 'ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে'—সকল দেশের সকল জননায়ক সম্বন্ধেই এই কথা খাটে। বাঙলা দেশের সেই অনাগত নেতা আজকের তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যেই রয়েছেন। অবশ্য আজকের বিক্ষোভকারী স্লোগান-উচ্চারী অস্থিরচিত্ত তরুণ সমাজে ভাবী দেশনায়কের উদ্ভব সম্ভব একথা ভাবা কঠিন। কিন্তু যে মুহূর্তে তাঁরা তাঁদের ভবিষ্যৎ দায়িত্ব সম্বন্ধে সজ্ঞান হবেন সে মুহূর্তেই তাঁরা সম্বিৎ ফিরে পাবেন। মানুষ পথভ্রান্ত হয়, আমাদের যুবকেরা দলভ্রান্ত। তাঁরা ভুলে গিয়েছেন যে, যুবক সম্প্রদায়ই একটা দল এবং দেশের বৃহত্তম দল। বিভিন্ন দলের সম্মিলিত United Front-এর কথা না ভেবে তাঁদের উচিত সমগ্র দেশের হয়ে একটি Youth Front গঠন করা। তাঁরা কোন দলের কথা না ভেবে দেশের কথা ভাববেন, তাঁদের আনুগত্য দেশের সকল মানুষের প্রতি, কোন দলের প্রতি নয়। কোন দলগত ideology-র কথা না ভেবে যুবক সম্প্রদায়ের উচিত সর্বাগ্রে যৌবনধর্ম পালন করা। যৌবন itself একটা ideology। যৌবনকালে সেই ideology পালন করলে তবেই ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা তাঁদের কাছে সুস্পষ্ট হবে। আমাদের যুবক সমাজ যৌবনের স্বভাবধর্ম পালন করছেন না। যৌবন যুক্তিপন্থী, সে প্রশ্ন করে তর্ক করে; অন্ধের মত আজ্ঞা বহন করে না। গতানুগতিক জীবনযাত্রার, সেকেলে ধ্যান-ধারণার বিরোধিতা করা যৌবনের স্বভাব—'দস্যুর মতো ভেঙেচুরে দেয় চিরাভ্যাসের মেলা'—ইংরেজিতে যাকে বলে iconoclast। আজকের যুবকরাও ভাঙছেন কিন্তু ভাঙছেন জানালা দরজা, ফাটাচ্ছেন মানুষের মাথা। যৌবনশক্তির এমন স্থূল ব্যবহার দেখলে কষ্ট হয়। একে সুস্থ বলিষ্ঠ শক্তি বলা চলে না।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন বাঙলা দেশের তরুণ একদিন 'স্বতঃউদ্যত ইচ্ছা' বলে বলীয়ান হয়েছিল। আজ সেই তরুণ সম্প্রদায় স্ব-ইচ্ছার বল হারিয়ে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করছে, এ কথা ভাবতে ভাল লাগে না। বাঙলা দেশের যৌবন একদিকে যেমন দুঃখ-বরণের মহিমায় উজ্জ্বল অপর দিকে তেমনি নির্ভীকতায় সমুজ্জ্বল। সন্ত্রাসবাদের সমর্থন রবীন্দ্রনাথ কোন কালে করেন নি, তথাপি গর্বের সঙ্গে বলেছেন, "একদিন ইচ্ছার অগ্নি-গর্ভ রূপ দেখেছি বাঙলার তরুণদের চিত্তে। দেশে তারা দীপ জ্বালাবার জন্যে আলো নিয়ে জ্বলেছিল—ভুল করে আগুন লাগালো, দগ্ধ করল নিজেদের, কিন্তু সেই বার্থতার মধ্যে বীর হৃদয়ের যে মহিমা ব্যক্ত হয়েছিল সেদিন ভারতবর্ষের আর কোথাও তা দেখি নি।" বাঙলার তরুণ চিত্ত আজও তেমনি নির্ভীক, তেমনি তেজস্বী, কিন্তু তার পূর্ব গরিমা বা মহিমা নেই। কারণ আগে যে সংগ্রাম ছিল প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে আজ সে সংগ্রাম অতি ক্ষুদ্র দলীয় সংঘর্ষে পরিণত হয়েছে। সেদিনের যুবকরা যা করেছেন দেশের জন্যে আজকের যুবকরা তা করছেন দলের জন্যে। এ দু-এর মধ্যে যোজন ব্যবধান। দেশ আর দল এক নয়। যেখানে দেশনায়কের প্রয়োজন সেখানে যদি দলনায়কের আবির্ভাব হয় তাহলে উদ্যোগ আয়োজন সাধনা এবং সিদ্ধি সমস্তই ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হতে থাকে। আজকের তরুণ সম্প্রদায় সেই ক্ষুদ্রতার পাকে জড়িয়ে পড়েছেন।

কিন্তু দেশের আশা ভরসা তাঁরাই। এ গুরু দায়িত্ব তাঁদেরকেই গ্রহণ করতে হবে। দেশনায়কের যোগান দিতে হবে তাঁদের মধ্য থেকেই। এ জন্যে চাই অসীম ধৈর্য, নিরলস সাধনা। এখন যে ভুল তাঁরা করছেন সেটি হল, প্রস্তুতি পর্বের পূর্বেই তাঁরা সম্মুখ সমরে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। বহু ধৈর্য ধরি নিবস শর্বরী কাটাতে হবে। গুরু গোবিন্দের মত বলতে হবে, বন্ধু এখনো সময় নয়। তিল তিল করে শক্তি সঞ্চয় করে, 'আপনার মাঝে আপনারে আমি পূর্ণ দেখিব যবে' সেদিন সময় হবে। যথার্থ দেশনায়কের আবির্ভাব সেদিনই হবে যাহার জীবনে লভিয়া জীবন জাগিবে সকল দেশ।

আসতে যেতে সর্বক্ষণ সর্বত্র 'মাবুহোয়'।

মেয়েটির হাতে তাঁর বেলফুলের মালা।

'বেলফুলের মালা? এ কোথায় পেলেন?'

'কেন, কেন, কেন, এ যে আমাদের ন্যাশনাল ফ্লাওয়ার শাম্পাগুইতা। চেনেন নাকি এ ফুল?' চিনি মানে। এই ফুলের গন্ধে চমক লেগে কতবার উঠেছে মন মেতে। এ যে আমাদের বড় প্রিয় ফুল মল্লিক আদর করে বলি বেলি। আমাদের দেশের মেয়েরা খোঁপায় পরে, সন্ধে হলে কলকাতার গলিতে প্রিয়জন দরশনে উন্মুখ মেয়েদের কানের কাছে এসে ফুলওয়ালা ডাকে- 'চাই বেল ফুল।' এমন মনমাতানো গন্ধ আর কে বিলায়?'—'ঠিক বলেছেন। এই জন্যেই তো এ আমাদের জাতীয় ফুল- প্রেম, যৌবন আর বন্ধুত্বের প্রতীক। এই ফুল কোন তরুণের হাত থেকে কোন তরুণী গ্রহণ করলে বুঝতে হবে তরুণের প্রেমের আহ্বান ব্যর্থ হয়নি, সে তার দয়িতার কাছে গ্রাহ্য।'

শুধু কি বেলফুল। পরদিন ভোরে ম্যানিলার অভিজাতপল্লী মার্কিনার রাস্তা ধরে যখন হারবারের দিকে হেঁটে বেড়িয়েছি, দেখেছি জবা, কাঠগোলাপ ইত্যাদি আমাদের দেশী ফুলে সারা শহর ভরতি, গ্রামে আমকাঁঠালের গাছ, আর শহরে বেল আর জবা—এমন দেশটি কোন বাঙালীর ভাল না লাগে!

ফিলিপিনসে আমার আমন্ত্রণ কর্তা প্রেস ফাউন্ডেশান অব এশিয়া এবং ফিলিপিনস প্রেস ইনস্টিটিউট। প্রেস ফাউন্ডেশনের দুই কর্মকর্তাই আমার পূর্ব পরিচিত। একজন টার্জি ভিট্যাচি, সিংহলী, নামকরা সাংবাদিক। দ্বিতীয়জন আমার সমনামী এবং আকৈশোর বন্ধু শ্রীনিরপেক্ষ অমিতাভ চৌধুরী। অমিতাভ তাঁর শিশু পুত্র নীল আর শিল্পী সহধর্মিণী নীপাকে নিয়ে দীর্ঘকাল এখানে আছে। আছে বঙ্গদেশী পতাকা সগৌরবে উঁচে তুলে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংবাদপত্র জগতে তাঁর অসীম সমাদর, ম্যানিলায় সে একজন কেষ্টবিষ্টু। এই সম্মান সে পেয়েছে তাঁর সংগঠন ক্ষমতা আর সাংবাদিকতার স্বীকৃতিতে। ম্যানিলায় এসে সরকারী ও বেসরকারী মহলে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব দেখে আনন্দের সঙ্গে মনে মনে বলেছি, আমি সত্যি সত্যিই পরনামধন্য।

অবশ্য আমাদের দুজনের নাম নিয়ে গত পঁচিশ বছর যে বিভ্রান্তি চলেছে, তার জের ম্যানিলায় এসে আরও বেড়েছে। যুগান্তরের সাংবাদিক বন্ধু নিরঞ্জন সেনগুপ্ত আমার সঙ্গে না থাকলে কদাচিৎ-বাঙালী-দেখা ফিলিপিনোরা হয়ত ধরেই নিত বঙ্গভাষী মাত্রেরই নাম হয় অমিতাভ চৌধুরী।

ফিলিপিনো তরুণী

নাম নিয়ে দেশেই কি আমাদের কম ঝামেলা হয়েছে! ও ম্যাগসাইসাই পুরস্কার পেলে আমার কাছে অভিনন্দন বার্তা এসেছে। বিশ্বভারতীর কর্মসমিতিতে নির্বাচিত হলে ওর কাছে টেলিফোন গিয়েছে। আমার লেখা কোথাও ছাপা হলে প্রশংসা বা নিন্দা ওর কপালে জুটেছে। ওর বিয়ের খবর পেয়ে আমার বাড়িতে লোক এসে হাজির হয়েছে। সমবয়সী, সহপাঠী ও সমনামী হওয়ার যে কী বিপদ তার পরিচয় আরও পেয়েছি স্নাতকোত্তর ক্লাসে পড়ার সময় কলকাতায় একই বাড়িতে থাকতে থাকতে। খামের চিঠি, বিশেষ করে তা যদি নীলরঙের হয়, তাহলে তা কে খুলবে তা নিয়েও কম ঝকমারি পোহাতে হয়নি আমাদের।

সেই ঝকমারি তাড়া করল দূরে ফিলিপিনসেও। এসেছি ম্যানিলা থেকে মাইল চল্লিশ দূরে লাসবানোস-এ কৃষি প্রতিবেদন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে যোগ দিতে। দুজনেই একই চক্রে উপস্থিত। দুজনেই ঘুরি একসঙ্গে। 'মিসটার চৌধুরী' বলে সম্বোধন করলে সাড়া দিতে হয় একসঙ্গে। একডাকের-র দুই সাড়া-র বিস্মিত প্রশ্নকর্তা নাম রহস্য জানতে পেরে তদধিক বিস্মিত হন।—ইজ দ্যাট সো? হাউ স্ট্রেনজ!' ইত্যাদি নানা রকম আশ্চর্য বোধক মন্তব্য শুনে শুনে আমাদের দুজনের মজা আরও বেড়ে যায়। শেষের কদিন ছিলাম ওর বাড়িতে—যে বাড়ি শ্রীমতী নীপার শিল্পনৈপুণ্য ও অতুলনীয় গৃহিণীপনার দৌলতে ম্যানিলার ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের আবাস হাওয়ার যোগ্য।

সেখানেও সমস্যা। প্রতি সন্ধ্যায় সমাগত অতিথি ও বাড়ির গৃহকর্মিণীর দল জলজ্যান্ত দুই অমিতাভ চৌধুরীকে এক বাড়িতে দেখে হতবাক। আর বন্ধুবরের পূর্বপরিচিত ও আমার নতুন পরিচিত কোন ফিলিপিনোর ফোন এলে তো কথাই নেই, নামবিভ্রাটে প্রায়-ভূপাতিত ফোনের অপর প্রান্তের ভদ্রলোকটি প্রায়ই হতবুদ্ধি হয়ে লাইন ছেড়ে দিয়েছেন।

অমিতাভ ও নীপা সঙ্গী থাকায় ফিলিপিনস, বিশেষ করে লুজন দ্বীপের

নানা জায়গা ঘুরেফিরে দেখার সুযোগ সহজেই আমার হয়েছিল। কোনদিন গিয়েছি ইউনিভার্সিটি অব ফিলিপিনসের অত্যাশ্চর্য সুন্দর ও অতিকায় ক্যাম্পাসে, কোনদিন গিয়েছি এক আগ্নেয়গিরির প্রান্তদেশে তাগাইতাই-এর মনোরম ভোজনশালায় (সেখানেই হঠাৎ দেখা রাষ্ট্র-অতিথি আমাদের সুপ্রিম কোরটের প্রধান বিচারপতি হিদায়েতুল্লা সাহেবের সঙ্গে), কখনও বা ঘুরেছি খোদ ম্যানিলার এপাশে ওপাশে। দেখেছি পাসিগ নদীর পারে বৃহৎ শপিং সেনটার এসকোল্টা, ফিলিপিনো কংগ্রেস ভবন ক্যাপিটোল, প্রেসিডেনটের বাসভবন মালাকানং, ফোর্ট সানটিয়াগো। ঝকঝকে তকতকে ছবির মতন শহর, সমুদ্রের পার ঘেঁষে ঘেঁষে সুরম্য অট্টালিকার সারি, দিনে সূর্যের আলোয় ঝকঝক, রাত্রে রঙীন বিজলীতে ঝলমল। বিরাট চওড়া রাস্তায় রাস্তায় হাল মডেলের গাড়ির স্রোত আর হাসিখুশি ফিলিপিনো তরুণ-তরুণীর দল।

শহরের চেয়েও সুন্দর 'বারিও'—গ্রাম। বাড়ি ঘরদোর যেমন পরিচ্ছন্ন, তেমনি পরিচ্ছন্ন সাধারণ লোকের জামাকাপড়। ভিতরে বাইরে এমন পরিষ্কার জাত আমি কদাচিৎ দেখেছি। প্রাতঃস্নান সর্বজনীন, মোষের গাড়ি চালিয়ে যে যাচ্ছে, তার জামাকাপড়ও ধবধবে।

এবং গানবাজনার নামে পাগল ছেলেবুড়ো সবাই। সন্ধে হলেই কেউ ছোটে পানাগারে কেউ বাড়ির দোরগোড়ায় বসে স্পেনীশ গিটার কিংবা বাঁশের বাদ্যযন্ত্র মুসিকং নিয়ে। এদের খিল খিল আর বাজনার টুংটাং মিলে এক অনবদ্য অরকেসট্রা বেজে চলে শহরে গ্রামে। আর পিনাকরিস, অর্থাৎ মুরগির লড়াইয়ের সময় এলে তো কথাই নেই। হাজার হাজার পেসো (প্রায় দু' টাকার সমান এক পেসো) বাজি ধরা হয় এক একটি মুরগির পিছনে। সারা তল্লাট উৎসব মুখর হয়ে যায়। চেনা-অচেনা সামনে যে আসবে তাকেই বলবে তাগালোগ ভাষায় মাবুহেয়া —স্বাগত ও বিদায় জানানোর সেই সর্বজনীন সম্ভাষণ।

গ্রামের হাটে একদিকে যেমন বিক্রি হচ্ছে লাউকুমড়ো কচুশাক, উচ্ছে আম কাঁঠাল পেঁপে আনারস, তেমনি কোন চাষীর বাড়ি থেকে ঢাউস গাড়ি বেরোলে কিংবা গ্রামের ভিতরেই হালফ্যাশনের কাফেটেরিয়া দেখলে ব্যতিক্রম বলে ধরা যায় না। গরিব যে নেই এমন নেই, ফিলিপিনস স্বর্গরাজ্য এমন কথাও বলিনা, কিন্তু আমাদের দেশের কথা ভাবলে ফিলিপিনসের উজ্জ্বল প্রাণবন্ত জীবন দেখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না করে পারা যায় না। একান্তভাবে কৃষিনির্ভর দেশ, শতকরা আশীভাগ লোক চাষবাস করে চাল তামাকপাতা, নারকেল আম ফলায়, জঙ্গল থেকে কেটে আনে দামী কাঠ, সোনা লোহা, রুপো তামা তেল সিমেন্ট, কয়লা টিন ক্রোমাইট এসফালট—অল্পবিস্তর সবই মেলে মাটির তলায় এবং তারই দৌলতে হাস্য-গীতমুখরিত এক সুখী বর্তমান নিয়ে ফিলিপিনসের লোক মশগুল। জীবনযাত্রার মান বাড়াতে সবাই উদগ্রীব। তাই চলছে আরও পরিশ্রম আরও রোজগারের ফন্দিফিকির।

মারকিন মুলুকের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে অশান্তি, অ-সুখ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু যেহেতু দেশটা মূলত প্রাচ্যভূমির, তাই শত অন্তর্জ্বালা সত্ত্বেও প্রাচ্যসুলভ প্রশান্তি মানুষ আর প্রকৃতির মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছে। এবং কিছুদিন থাকলেই বোঝা যায় মারকিনীদের অনুকরণে আগ্রহী ফিলিপিনোরা ধীরে ধীরে নিজের অতীত আর ঐতিহ্যকে জলাঞ্জলি দিলেও আধুনিক বিশ্বের দরবারে নিজেকে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে সর্বতোভাবে পণবদ্ধ হয়েছে। শতকরা আশীজন লোক আজ সেখানে শিক্ষিত, এক ম্যানিলার চারপাশেই বারোটা বিশ্ববিদ্যালয় তার মধ্যে একটি হারভারড-এর চেয়ে পঁচিশ বছরের পুরানো। এশিয়ান ডেভেলাপমেন্ট ব্যাংকের সদর দপ্তর ম্যানিলায়। ম্যানিলাতেই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় সীয়াটো-র। ম্যানিলার অনতিদূরে ইন্টারন্যাশনাল রাইস রিসার্চ ইন্সটিটিউট—যেখানে গবেষণারত রয়েছেন ভারত সমেত আটানটি দেশের নামী কৃষিবিজ্ঞানী। এখানেই আবিষ্কৃত হয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যুগান্তকারী অধিক ধান ফলনের আই-আর-এইট। ফিলিপিনস ছোট ছোট নয় সে মারকিন রাজনীতির সঙ্গে নয়, কিন্তু ঔপনিবেশিক মারকিন দেশের অনুকরণ করলেও দেশের উঁচুতে [illegible] তাদের [illegible] সর্ববিষয়ে [illegible] প্রতিষ্ঠা করতে দিতে নারাজ। রুজভেল্ট বা কেনেডি নয়, তাঁদের ন্যাশনাল হীরো রিজাল-এর নাম নিয়েই তাঁদের গর্ব। দেশের রিজাল পার্ক, রিজাল অ্যাভিনিউ ইত্যাদি নাম দিয়ে তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়ককে অবিরাম স্মরণ করে।

তবে স্বীকার করতেই হবে, ফিলিপিনস নৈশজীবনের ক্ষেত্রে খাস আমেরিকাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। ম্যানিলার নাইট ক্লাবের কাছে নিউ ইয়র্ক লস এনজেলেস, প্যারিস হামবুর্গের নাইট ক্লাব নিরামিষ। যে কোন ছোট শহরে গেলেই গোটা তিন চার নাইট ক্লাবের সাক্ষাৎ মিলবে। আর ম্যানিলাতে তো কথাই নয়, প্রতি পাড়ায় প্রতি পথে নাইট ক্লাব আর নাইট ক্লাব। আছাড়া সমুদ্রের ধারঘেঁষা বুলেভারদের পাশ ধরে মাইলের পর মাইল চলেছে নাইট ক্লাবের সারি। সংখ্যা দেখে মনে হয় যেন সারা ফিলিপিনস বারো মাস নিশিবাসর জাগে। এক একটি ক্লাবের ভিতরে শতাধিক উর্বশী এবং নাচগান হল্লার হুল্লোড়। দিস্কো কিংবা মুলারুজের মত বাজনার তালে তালে নির্মোক-নৃত্যের বালাই নেই, পূর্ণবিবসনার দল সেখানে স্বচ্ছন্দচিত্তে ইতস্তত বিচরণ করেন অতিকায় হলঘরের টেবিলে টেবিলে ঘুরে। বামা-ক্ষ্যাপা এই শহরের বনেদী হোটেলে পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্ন নিদ্রা দেওয়া অসম্ভব। হোটেলের বেলবয় থেকে শুরু করে রিসেপশনিস্ট পর্যন্ত অতিথির খিদমদগারে এমন লেগে যাবে যে, বার বার মানা সত্ত্বেও প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর শোবার ঘরের দরজায় কোমল অঙ্গুলীর টোকা পড়বেই।

সমনামী বন্ধুবরের প্রতিবেশী ও সাংবাদিক-বন্ধু এলবার্ট র‍্যাবেনহোলট বিদগ্ধ রসিক ব্যক্তি। এঁদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া আমার উপরি পাওনা। র‍্যাবেনহোলট-দম্পতির মত এমন সজ্জন ও সর্ববিষয়ে আগ্রহী পরিবার কদাচিৎ মেলে। কুয়ালালামপুরে দারুচিনির চাষ, আলী আকবরের সরোদ, পশ্চিমবঙ্গের যুক্ত ফ্রনট, সিন্ধু উপত্যকার মহেনজোদারো সভ্যতা, প্রাচীন চীনের সেচব্যবস্থা—কোন বিষয়ে যে এলবার্ট 'অথরিটি' নন অল্প পরিচয়ে ঠাহর করতে পারিনি। তাঁরই প্ররোচনায় এবং আমার বন্ধুটির পৃষ্ঠপোষকতায় ম্যানিলার একটি অভিজাত নাইট ক্লাবে দর্শকের ভূমিকা [illegible] আমার ও নিরঞ্জন [illegible] হয়েছিল। সেখানে কাণ্ডকারখানা দেখে দুজনেরই যুগপৎ মস্তকঘূর্ণন ও [illegible]।

নাইট ক্লাবটির বাইরে এসে নিরঞ্জন দম্পতির [illegible] বললেন—ম্যানিলা [illegible] ভুল, শহরটার নাম হওয়া উচিত উন্মাদ-নিলা।

সত্যিই ভাই ম্যানিলা নয়, উন্মাদ-নিলা। ভুলেই যাক নাইট ক্লাব, তার চেয়ে বন্ধুপত্নী রেকর্ড প্লেয়ার চালিয়ে রাত্রি নিঝঝুম ঘরের ভিতর আমার দেখা নাটকের [illegible]কুমারীদের গান শোনো, ঢের ঢের ভালো। আর তার সঙ্গে যদি বন্ধুপত্নীর নিজের হাতের তৈরী রসগোল্লা থাকে, তাহলে থেকে না দূর প্রবাসে, মনে হবে কলকাতাতেই আমাদের কোন বাড়িতে জেগে আছি। সেই কলকাতা-যেখানে আলোর তেজ কম, রাস্তাঘাটে গর্তের বিভীষিকা, অনাদরে অবহেলায় সে মৃতপ্রায়। সেই কলকাতা—রবীন্দ্র-সংগীত ও রসগোল্লার মত প্রত্যেক বাঙালী যাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। বিদায় ম্যানিলা—মাবুহেয়া।

অসিতকেই শেষ পর্যন্ত মুখ খুলতে হল, কারণ সে দেখল, লিলির দিক থেকে এ প্রসঙ্গ উত্থাপনের কোনও আগ্রহ নেই।

—তুমি ঠিক জান লিলি যে ওদের কোনও দল নেই, ওরা মাত্র তিনজনই ছিল?

লিলি বলল, হ্যাঁ। ওরা তিনজনেই একটা দল।

—এবং ওরা গুণ্ডা নয়, তুমি বলছ?

—ওরা গুণ্ডা নয়, তাতো বললাম। ওরা কেউ পেশাদার গুণ্ডা নয়।

অসিত বলল, এইটেই আমার কাছে অবাক লাগছে। আমি তো ভেবেই পাচ্ছি নে, ওদের মোটিভ্ কি ছিল। তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, আবার ঠিক পাঁচদিন পরে ফেরতও দিল। গাড়িটাও তুমি নিয়ে এলে!

লিলি হাসল।

—তুমি কি আশা করেছিলে অসিত?

—আমি?

অসিত যেন এতক্ষণে আবার ফিরে পেল নিজেকে।

—সত্যি বলতে কি, আমি একখানা চিঠি বা একটা ফোন কল আশা করছিলাম, ওরা এই পাঁচদিনের মধ্যে নিশ্চয়ই মুক্তিপণের টাকা দাবী করে পাঠাবে। একটা বিরাট টাকা।

—এবং তুমি পাঁচ টাকা দশ টাকার নোট ব্যাংক থেকে তুলে সেগুলোয় চিহ্ন দিয়ে রেখেছ। তুমি সেই মার্কা মারা নোট ওদের হাতে তুলে দেবে আর ওরা আমাকে অক্ষত দেহে ফেরত দিয়ে যাবে। আর তুমি পুলিসকে খবর দেবে, চিহ্নিত নোটের একটা নমুনাও গোয়েন্দা দফতরে পাঠিয়ে দেবে। তারপর তারা ওই সূত্র ধরে গোটা দলকে গ্রেফতার করে ফেলবে এবং আবার আমরা নিশ্চিন্ত মনে ডিনার টেবিলে খেয়ে নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে আগের মত নাইট শো-তে সিনেমা দেখতে যাব। এবং এই-ভাবেই আমরা অনন্তকাল ধরে সুখে কাল কাটিয়ে যাব। তাই নয় অসিত?

লিলির কথা শুনে অসিত হতবাক হয়ে গেল। তারপর বলল তার স্বরে রীতিমত বিস্ময়, আমি ব্যাংক থেকে টাকা তুলে চিহ্ন দিয়ে রেখেছি, তোমাকে কে বলল?

—তুমি রেখেছ কি না তাই বল না?

অসিত বলল, হ্যাঁ, রেখেছি। এতে অন্যায়ের কি হয়েছে? তোমার প্রাণ, তোমার সম্ভ্রম যেখানে জড়িত সেখানে আমার কাছে টাকা তুচ্ছ। ওরা যা চাইত তোমার নিরাপত্তার বিনিময়ে আমি সেই টাকাই ওদের দিতাম। লিলি, তুমিই আমার সব।

তুমি সেদিন ডবল মারচ করে বাড়ি ফিরেছিলে না কি দৌড়েছিলে না কি ট্যাক্সি চেপে ফিরেছিলে, অসিত?—লিলি

ভাবল, কথাটা জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু করল না। তার বদলে খিলখিল করে হাসতে লাগল।

—তোমার কাছে এটা তামাশার ব্যাপার হতে পারে লিলি, অসিত আহত হয়েছে বোঝা গেল, কিন্তু আমার কাছে ওটা ছিল জীবন-মরণ সমস্যা।

—তাই নাকি? লিলির চোখ ঝলসে উঠল। তুমি ছিলে এই বাড়ির নিরুপদ্রব পরিবেশে, নিরাপত্তার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে, এমন কিছু করনি বা করতে যাওনি যতে তোমার জীবন সামান্য পরিমাণেও বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে, এই তোমার জীবন-মরণ সমস্যার নমুনা। আর আমি? এই পাঁচদিন ছিলাম এমন তিনটি লোকের কবলে, যারা অপরাধের নোনতা আস্বাদ এই সবে পেয়েছে। ছুরির বাঁটের উপর যাদের হাত সদা সর্বদা নিসপিস নিসপিস করেছে। যে-কোনও সময়ে ওদের ছুরি আমার গলায় বা বুকে বা পেটে বা যে কোনও জায়গায় বসে যেতে পারত। কাজেই তোমার পেরি ম্যাসন মার্কা কাহিনী আমার কাছে তামাশার ব্যাপার ছাড়া আর কী মূল্য পেতে পারে, বল?

—না না লিলি, আমাকে ভুল বুঝো না প্লিজ। আমি তা মিন করিনি। আমি—

অসিত হঠাৎ থেমে গেল।

—তোমার অবস্থার সংগে আমার কোনও তুলনাই চলে না। অসিত হঠাৎ আবার শুরু করল।

—সে তুলনা আমি কিন্তু করিও নি। আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম—

অসিত আবার থামল।

—রিডিকুলাস্! ক্লান্ত স্বরে অসিত বলে উঠল, এ সব কথার কোনও মানে হয় না এখন। এখন কোনও কথারই কোনও মানে হয় না জানি, তবু লিলি, তোমাকে বলছি, এই পাঁচদিন, উঃ কী যন্ত্রণা, কী যন্ত্রণা! বিশ্বাস কর লিলি, অনেসট! খেতে পারিনে, শুতে পারিনে, ঘুম আসে না, কাউকে বলতে পারি নে। কি অ্যাকশন নেব, বুঝতে পারিনে। আর এটা কিন্তু আমার কথা ভেবে নয়, বিলিভ মি, ইন ফ্যাক্ট আমার সেফটির কথা ভাবার কোনও কারণ তো ঘটেনি, আমি তো বাড়িতেই ছিলাম, কোনও গুণ্ডা আমার দিকে তো ছুরি উঁচিয়ে ছিল না, বিশ্বাস কর লিলি, তোমার সেফটির কথা ভেবেই আমি কোনও রকম র‍্যাশ অ্যাকশন নিতে পারিনি। দিনরাত চিন্তা করেছি, বাড়িতে অফিসে নানা কাজের মধ্যেও ভাবতে চেষ্টা করেছি, কি চায় ওরা? কেন ওরা তোমাকে ধরে নিয়ে গেল? ওদের মোটিভ্ কী?

—ভেবে কি বের করলে অসিত? ওদের মোটিভের কোনও হদিশ পেলে?

তোমার কাছে এটা তামাশার ব্যাপার হতে পারে লিলি

অসিত হতাশভাবে মাথা নাড়ল না।

বলল, প্রথমে ভেবেছিলাম, ওরা বুঝি মুক্তিপণ দাবী করবে। রোজ আশা করে থাকতাম, হয়ত একটা চিঠি আসবে, তুমি একে পেরি ম্যাসন মার্কা কাহিনী হিসেবে ব্যঙ্গ করতে চাও করতে পার, সত্যি বলতে কি এই মুহূর্তে আমার কাছেও ব্যাপারটা যথেষ্ট হাস্যকর বা ছেলেমানুষি বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু তখন আমি যা করেছি তোমাকে অনেসটলি তাই বলছি। আমি টেলিফোনের সামনে বসে রাত কাটিয়েছি, যদি ওরা ফোন করে। ব্যাংক থেকে টাকা তুলে এনে রেখে দিয়েছি হাতের কাছে। হ্যাঁ, মার্কাও করে রেখেছিলাম, গোয়েন্দা গল্পে যেমন থাকে। কিন্তু দিন গেল রাত গেল, চিঠি এল না ফোন এল না। তুমি কি বেঁচে আছ? তোমাকে কি মেরে ফেলেছে ওরা? ওরা কি তবে টাকার লোভে তোমাকে নিয়ে যায় নি, এ কি কোনও ব্যক্তিগত আক্রোশ চরিতার্থের ঘটনা? কোনও প্রতিহিংসা গ্রহণ না কি প্র্যাকটিকাল জোক? কোনও কিছু ভাবতে বাদ দিইনি। হঠাৎ তোমার

ফোন। তুমি বললে, আমি বাড়িতে এসে গিয়েছি। আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। যখন বিশ্বাস হল, তখন আরও বিভ্রান্ত হয়ে পড়লম। তোমাকে যদি এত সহজেই ছেড়ে দিল, তবে অমন করে নিয়েই বা গেল কেন?

লিলি নির্বিকারভাবে বলল, আজকাল কত সহজে পরের বউকে ছিনিয়ে নিয়ে চম্পট দেওয়া যায়, হয়ত এইটেই ওরা দেখতে চেয়েছিল? এটাও তো একটা মোটিভ্ হতে পারে?

—তুমি ঠাট্টা কর না লিলি, প্লিজ।

—না অসিত, লিলি জোর দিয়ে বলল, আমি ঘটনা যা তাই বলছি। আমাকে সহজে নিতে পারল বলেই আমাকে নিয়ে গেল। আমরা যদি বাধা দিতাম, তবে আমাকে আর নিত না। হয়ত ছোরা মেরে খুন করে ওখানে ফেলে রেখে শুধু গাড়িটা নিয়েই পালাত। অবিশ্যি আমি বা তুমি মানে আমরা যদি তেমন বাধা দিতাম, তবে আমাদের মধ্যে একজনের কি দুজনেরই প্রাণহানির আশংকা থাকত। সেটা খুবেই রিস্কের ব্যাপার হত সন্দেহ নেই।

—আমি একেবারে কিছু বুঝতে পারছি নে। কী ওরা চেয়েছিল? অসিতের বিপন্ন স্বর প্রাণপনে একটা উত্তর খুঁজছে।

লিলি বলল, ওদের কোন পাকা পরিকল্পনা ছিল না। প্রথমে ওরা গাড়িটা নেবার মতলবই করেছিল আর তোমার কাছ থেকে পেট্রোলের টাকা।

অসিত : কেন?

লিলি : জয় রাইড করবে বলে।

অসিত : এই জন্যে! লিলি, দোহাই তোমার—

লিলি : আমি ঠাট্টা করছিনে অসিত, সত্যি কথাই বলছি। তিনটে ছেলেই ভদ্রঘরের অর্থাৎ মধ্যবিত্ত পরিবারের। অথচ কামনা বাসনা মেটাবার মত কোনও কিছুই ওরা পায়নি। পায় না। উপভোগের কোনও সামগ্রীই ওরা নাগালের মধ্যে পায়নি। দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখেছে, আর চোখ দিয়ে চেটেছে। সমাজে ন্যায় অন্যায় বোধ যতদিন টিঁকে ছিল, সরকারি প্রশাসন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে যতদিন একটা সম্ভ্রমের ভাব ছিল, পুলিস সম্পর্কে একটা সন্ত্রাস ছিল, ততদিন এইসব দাপুটদের প্রবৃত্তি নানা কুটিল শিকলে বাঁধা থাকত। তাই আমরা সুবিধাভোগীরা আমাদের জগতে নিরুপদ্রবে চলাফেরা করেছি। আজ শাসন যন্ত্র অচল হয়ে পড়ছে, তাই ওদের প্রবৃত্তির শিকল আলগা হয়ে গিয়েছে, ছিঁড়ে ফেলছে ওরা। তাই আজ ওরা যা চাইছে, গায়ের জোরে কেড়ে নিচ্ছে।

লিলি একটু থেমে আবার বলল, ক'দিন আগে আমাকেই কেউ যদি এ ঘটনা এসে বলত, আমিও তোমার মত অবিশ্বাস করতুম অসিত। যে [illegible] উপর আমরা নিশ্চিন্তে একটা ঘরের আশ্রয় পেয়ে [illegible] সুরক্ষিত করেই ভেবেছিলাম তাকে নিরাপদ এবং তাই ভেবেই আত্মতৃপ্তিতে ডুবে ছিলাম। ভাবিনি একদিন সেই অ্যাসোসিয়েশনটাই কেঁপে উঠে এক লহমায় সব চুরমার করে দেবে। ক'দিন আগেও একথা ভেবে দেখিনি। অ্যাসোসিয়েশন এখনও পুরো ভাঙেনি, শুধুমাত্র [illegible] ঘুমের খোঁয়াড়ি ভাঙতে হাই তুলছে মাত্র। তাতেই এই। আমি তুমি স্ত্রী স্বামী এই সম্বন্ধটাই [illegible] আমরা প্রমাণ করে দিলাম আমরা কেউ কারোর না। আমি আমার তুমি তোমার। এক ঝটকায় প্রমাণ হয়ে গেল, আমাদের পরম পবিত্র সম্পর্ক [illegible] কত পলকা! সেই অগ্নিসাক্ষী, বেদমন্ত্র, সেইসব আনুষ্ঠানিক অঙ্গীকারের ভড়ং, ঠিক যেন আমাদের এই ফ্ল্যাটের আড়ম্বরের মতই অর্থহীন। এত যে আসবাব, এইসব সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে এত তো পরিশ্রম, একটু এদিক ওদিক হলে কিম্বা একটা জিনিস খোয়া গেলে আমরা কত না আপসেট্ তো হই, কিন্তু ফস্ করে আগুন লাগুক, তক্ষুনি এসবের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে এক লাফে আমি তুমি রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াব।

এই সব আসবাবের প্রতি মমতাবশত ওদের সংগে পড়ে মরতে কিছুতেই রাজি হব না। নয় কি অসিত? আমরাও তেমনি আমাদের প্রত্যাখ্যান করেছি। তুমি আমাকে, আমি তোমাকে।

—লিলি, অসিত কুণ্ঠিতভাবে বলল, তুমি বরং এখন একটু বিশ্রাম নাও।

লিলি : তুমি শুনবে না, ওরা কেন আমাকে নিয়ে গেল? কোথায় নিয়ে গেল? কি করল আমাকে নিয়ে? শুনতে চাও না?

অসিত : পরে হবে লিলি, ওসব না হয় ডিনারের পর শুনব।

—না, অসিত, লিলি শান্তভাবে বলল, তুমি বরং আগেই শুনে নাও। কারণ তোমার সংগে আলাপ করিয়ে দেব বলে, ওদের আমি যে ডিনারের নেমন্তন্ন করেছি। ওরা আসার আগেই সবটা শুনে নাও।

—ওদের নেমন্তন্ন করেছ মানে? কাদের কথা বলছ?

লিলি : যে তিনজন আমাকে নিয়ে গিয়েছিল, তাদের।

সে! অসিত লাফিয়ে উঠল। তুমি! তোকে এ—

—আমার মাথার গোলমাল হয়নি, অসিত, লিলি বলল, বসো। উত্তেজিত হয়ো না।

—তোমাকে তুমি মিন, উত্তেজিত হয়ো না। অসিত হঠাৎ রাগে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। দোস্তরা রাসকেলগুলো, সোয়াইন! আমি ওদের খুন করব। ফাঁসিতে ঝোলাব!

লিলি দেখল অসিতের চোখ মুখ ক্রমেই হিংস্র হয়ে উঠল। ও যে এখন সেই আততায়ীদের একজন নয়, তা আর বোঝার উপায় রইল না।

—রাসকালস্!

লিলি দেখল অসিতের দাঁতগুলো ছুরির মত ঝলসে উঠল।

—ওদের গুণ্ডামী আমি—

অসিত রেগে লিলির সামনে এসে দাঁড়াল।

—জন্মের মত শেষ করে দেব।

লিলির সামনে অত্যন্ত হিংস্রভাবে ছুরি বার করে এগিয়ে এল, সেই লোকটা, না লোকটা যে গাড়ি চালাচ্ছিল। গালপাট্টা দাড়ি, বেশ রোগা। খুনের নেশায় পুরো আচ্ছন্ন।

—জন্মের মত শেষ করে দেব বেশি পেঁয়াজি করলে।

ছুরিটা লিলির চোখের উপর দিয়ে সে ঘুরিয়ে আনল। সেই বিরাট হল ঘরে একটি মাত্র বাল্বের ম্লান আলোতেও লিলির চোখের উপর চক চক করে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। লিলি দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর পিছোবার পথ নেই আর। জ্যাকেটের উৎস থেকে একটা

ভয়, ভয়ের ঢেউ, ঢেউয়ের পর ঢেউ পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বুকের দিকে উঠছে। কপাল গাল বেয়ে ঘাম ঝরছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে তার। তবু সে চোখ বুজল না এবার। সে পিছিয়ে পিছিয়ে এতদূর এসেছে। সেই প্রথম থেকেই ভয়ে কুঁকড়ে ক্রমাগত পিছু হটেছে লিলি। আর পিছোবার জায়গা নেই। তাই সে আর চোখ বুজল না। সেই হিংস্র মুখখানার উপর সে তার চোখ দুটোকে স্থির করে ধরে রাখতে চেষ্টা করল।

তারপর আঠা-আঠা গলায় জিজ্ঞাসা করল, কী চাও, তোমরা?

বাকি দুজন যেন একটা ভারি মজার খেলা দেখছে, হো হো করে হেসে উঠল।

চড়া গলার লোকটা বলল, আই বাপ্, মুল্লি আওয়াজ দিচ্ছে গুরু! বলছে, কী চাও? কী চাও গুরু?

গুরু মন্দ্রস্বরে : আবে চনটুলে, এখন গজটা সরিয়ে ফ্যাল। শালা চুন্নিক মালের সঙ্গে বিহেভ্ দিতে শিখলিনি। অত ভেবড়ে দিচ্ছিস কেন?

লিলি দেখল ছেলেটার উত্তেজনা কিছুটা কমে এল। সে ছুরিটা ভাঁজ করে পকেটে পুরল। কিন্তু সামনে থেকে নড়ল না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লিলিকে দেখতে লাগল।

চড়া গলা বলল, শুধোচ্ছে কী চাও? কী চাইবে গুরু? চিকুম কুম।

গুরু : শালা, ঝাড় খেতে না চাস যদি চন্দ্রভুবাজি থামা। কি বে, চনটুল, গুল গ্যাস-প্যাবানটি?

লিলির সামনের ছোকরা হঠাৎ শান্ত হয়ে এল। ওর নেশাগ্রস্ত ভাবটা কেটে গেল। শিস দিয়ে বলে উঠল, ফিট-পারটি নম্বর ওয়ান গুরু।

তিনজনই হো হো করে হেসে উঠল।

—আমার বাড়িতে ডিনার! এই সব উনওয়েলকামো ডিনার খেতে আসবে!

অসিত সিনেমার খলনায়কের মত হেসে উঠল।

—নাউ আই আনডারস্টানড। ইট্স্ এ গ্রেট আইডিয়া। লিলি তুমি গ্রেট্! সাবাস!

অসিত চট করে গিয়ে ফোন তুলল। লিলি বাঘিনীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ল অসিতের উপর। ফোন কেড়ে নিল।

—কী করছ, ইডিয়ট! উত্তেজিতভাবে ধমক মারল লিলি। যাও, শান্তভাবে বস।

অসিত অবাক হয়ে লিলির দিকে চেয়ে বলল, আমি পুলিসকে খবর দিচ্ছিলাম লিলি। লালবাজারে আমার বন্ধু আছে। ডি-সি। তুমি তাকে চেনো না লিলি? ক্যাপটেন বোসের পার্টিতে তোমার সঙ্গে তো আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম। হোয়াই, হি ডানসড্ উইথ্ ইউ।

—ডোনট্ গেট্ নারভাস লিলি। অসিত ভূতের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত ছোট মেয়েকে সান্ত্বনা দিচ্ছে যেন। লিলির দুটো ডানা আবেগভরে চেপে ধরল অসিত।

—কোনও ভয় নেই। গুণ্ডাদের সাধ্য নেই আর তোমার কোনও ক্ষতি করে। ফোনটা দাও। ডি-সিকে বললেই হি উইল কাম। ফোরস্ আনবে। ওই রাসকেলগুলোকে ধরবে। তারপর ওদের এমন শিক্ষা দেবার বন্দোবস্ত করব যা ওরা সারা জীবন ভুলতে পারবে না। পুলিসের হাতে এমন দাওয়াই আছে। ফোনটা দাও।

লিলি আবার শান্ত হয়ে এসেছে। ফোনটা অসিতের হাতে দিয়ে দিল।

—তোমার ডি-সিকে কি বলবে? আমার স্ত্রী স্বেচ্ছায় তিনজন মারাত্মক গুণ্ডাকে ডিনারে নেমন্তন্ন করে এসেছেন। আপনি দয়া করে আসুন, ফোরস্ নিয়ে, তাদের অ্যারেস্ট করে নিয়ে যান?

অসিত ডায়ালটা একপাক ঘুরিয়েই থেমে গেল।

—কি বলছ তুমি লিলি! তুমি গুণ্ডাদের স্বেচ্ছায় নেমন্তন্ন করে এসেছ!

লিলি : তারপর তোমার ডি-সি ফোরস নিয়ে ছুটে এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার স্ত্রী এই সব গুণ্ডাদের পেলেন কোথায়? তুমি বলবে, এরা আমার স্ত্রীকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। ডি-সি আঁতকে উঠে বলবেন, সে কী? আপনি কোথায় ছিলেন? তুমি বলবে, আমি, আমি ওর সঙ্গেই ছিলাম। ডি-সি অবাক হয়ে বলবেন, সঙ্গে ছিলেন! তা আপনি কিছু করলেন না? তুমি বলবে, করলাম বৈকি? গুণ্ডারা আমার কাছে টাকা চাইল টাকা দিয়ে দিলাম, স্ত্রীকে চাইল, স্ত্রীকেও দিয়ে দিলাম—

ফোনটা দড়াম করে রেখে দিল অসিত। চেঁচিয়ে উঠল, লিলি, প্লিজ-ই-জ—

শান্ত স্বরে লিলি বলে চলল, তারপর গুণ্ডারা হুকুম করল আমাকে, ডবল মারচ্—

স্টপ্ ইট্ লিলি, প্লিজ্ স্টপ ইট—

—আর আমি ডবল মারচ করে বাড়ি চলে এলাম।

স্টপ ইট্ ইউ স্লাট্।

অসিত পাগলের মত লিলির গলা টিপে ধরল। লিলি বাধা দিল না। অসিত এক ধাক্কা দিয়ে লিলিকে সোফায় ছুঁড়ে দিয়ে দু' হাতে নিজের চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলে উঠল, লিলি আমাকে ক্ষমা কর, দয়া কর। বার বার মনে করিয়ে দিও না আমি কাউয়ারড্, আমি ভীতু। আমি আমি জীবনে কখনও এক ঘাও মার খাইনি লিলি। মার খেতে আমার বড় ভয়। মারতেও শিখি নি। শুধু পালাতে জানি। আমি কাউয়ারড্, কাউয়ারড, ড্যাম্ কাউয়ারড।

লিলি দেখল অসিত দু' হাতে মুখ চেপে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। দেখতে দেখতে লিলির গলার কাছটাতে দলা পাকিয়ে এল, চোখ দুটো করকর করতে করতে জলে ভরে উঠল এবং একটু পরেই বুক তোলপাড় করে চোখ দুটো দিয়ে জলের বন্যা নেমে এল। আর সে থাকতে পারল না। উঠে এসে অসিতকে বুকে টেনে নিল। অসিত কোনও কথা না বলে লিলিকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মত চুমু খেতে লাগল। লিলিও। অকস্মাৎ দুজনের শরীরই চনমন করে উঠল। শোবার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে লিলি ভাঙা-ভাঙা গলায় বলল, দরজাটা আটকে দিও।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচরণেষু—মাকে ॥ নয় ॥

[ক]

আজ বিকেলে, আজ বিকেলেই", ক্লাসের ক্যাপ্টেন জগন্নাথ, আর মানিক ওরা টিফিনের সময় গোল হয়ে কী বলাবলি করছিল, আমাকে দেখে ওরা চোখে চোখে ইশারা করে চুপ হয়ে গেল। আমাকে ওরা দলেই ডাকে না, ওরা বয়সে আর গায়েও বড়ো, ওদের দু-তিন জন তো [illegible] পেয়ে এক ক্লাসেই আছে। জগন্নাথ বলে, আমরা [illegible] দেশের পার্লামেন্ট-সমান, এক বেঞ্চিতে দাঁড়িয়ে ফ্ল্যাগ উঁচিয়ে গাড়ি পাস করিয়ে দি।

সেই জগন্নাথ, আমি যখন সরে যাচ্ছি, তখন হাতছানি দিয়ে আমাকে ডাকল। ডাকল, ওরা মত বদলে থাকবে, অথচ আমাকে সরাসরি কিছু বলল না, কুড়মুড়ে ভাজার খানিকটা ভাগ দিয়ে, আমাকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলতে থাকল, "মৌচাকে ঢিল ছুঁড়েছি, আজ চাক ভাঙব। ডুবে ডুবে জল খাওয়া বের করছি।"

"ডুবে ডুবে কোথায়," আর-একজন ফোড়ন কাটল, "একেবারে ঘটঘটে অন্দোর, পাড়ায় বসে—"

"পাড়ায় বসে বের করছি। মাথা মুড়িয়ে দেব, ঘোল ঢালব, গাধার টুপি পরিয়ে, কিংবা বেড়াল-পার। বস্তায় পুরে কত বেড়াল দূরে দূরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে এসেছি, আর এই একটা হুলো আর একটা মেনিকে পারব না?"

"হুলো আবার কে, দুটোই মেনি", মানিক বলল মুখে গায়েনের ঢঙ-এ. আর বাকী সকলে হাসির দোহার ধরল।

"বাজারের শ্যামা পোদ্দার, ওই যে হলদে বাসায় হরিসভা বসে, সে আমাদের পাঁচটাকা দিয়েছে। যদি পার করতে পারি, তবে বলেছে আরও পাঁচ টাকা দেবে, কড়কড়ে. এ-ছাড়া একদিন পাঁঠার মোচ্ছব দেবে কবুল করে।"—ওরা কনকনে করে পাওয়া-টাকা নাড়াচ্ছিল, একজন টং করে টস্ করছিল এক-একটা টাকা, বাজো আর দ্বিতীয় আওয়াজ, অন্যরা হুমড়ি খেয়ে কুড়িয়ে নিচ্ছিল সেটা কিংবা লুফে নিচ্ছিল কায়দা করে।

টেকো চোখে আমার দিকে চেয়ে জগন্নাথ বলল, "তুই তো ওখানে [illegible] করিস। আজ বিকেলের পরে চলে আসিস, বাহার মজা দেখতে পাবি, দেখবি সে কী খেল্, বাছাধনকে চূড়ান্ত জব্দ করব।"

মা, আমার ভয় করছিল, গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। টিফিন পিরিয়ডের পরও ক্লাসে গেলাম, কিন্তু স্যারের অনুমতি নিয়ে বার দুই বাইরে এলাম, জালা থেকে তুলে তুলে জল খেলাম। আজ বিকালে, আজ বিকালে —কী? একটা মজার খেল, ওরা বলছিল। সত্যিই কি ওরা ওইসব করবে, যা-সব বলাবলি করছিল, ঘোল, গাধার টুপি, এইসব? লীডারি করবে জগন্নাথ, সেবার ফেল করার পরে সুধীরমামা নিজে যেচে যাকে পড়াতে শুরু করেছিলেন?

ওরা যখন ওইসব করবে, ঢিল, কাদার তাল, এই সব—আমি আমি তখন করব কী, ঠেকাব যে গায়ে সে জোর কই, কিংবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকব, দেখে যাব, গাছের আড়াল থেকে আর ছায়ার সঙ্গে মিলিয়ে গিয়ে? ভীরু, ভীরু কোথাকার। কিছুই করতে পারব না এই কথা স্থির জেনে নিজেকেই মনে মনে থুথু দিতে থাকলাম, তবুও চড়লাম গাছের পিঠে, তিলে তিলে যাচাই করতে থাকলাম, আমাকে আমি, কেন পারব না, কেন কিছু খুঁজে পাই না—জোর, সাহস, কিছু না?

[খ]

কিন্তু সেই ভয়ংকর সন্ধ্যায় আমি শেষ পর্যন্ত ওখানে যাইনি। কেন, মা তুমি তো তা জানো। সেদিন বিকেলটা এল খুব তাড়াতাড়ি, দেখতে দেখতে রোদ মিলিয়ে গেল, সময়ের আগেই যেন বুড়ো দারোয়ান শেষ ঢংঢং-টা বাজিয়ে দিল ঘটা করে, পিলপিল করে বেরিয়ে আসছি সকলে, কিন্তু

আমি কেন পিছিয়ে. পা টলছে, খাতা বই বার দুই খসে পড়ল হাত থেকে. ধুলো. ধুলো. কী ধুলো, ঝেড়ে মুছে বইগুলো তুললাম. তবু দাঁত কিচকিচ. মুখে নাকে বালি. কেননা বিকেল থেকেই সেদিন ধুলোর ঝড় বইছে, কেননা সেদিন দেখতে দেখতে রোদ মুছে আসছে. যদি বলি আমার ডান চোখের পাতাও নাচছে সেটা হবে বানানো. কারণ "বামে সর্প দেখিলেন দক্ষিণে শৃগাল." প্রভৃতি এ-সব ঘটিয়ে দিত সেকালে. সেই ত্রেতাযুগে, রামচন্দ্র যখন মারীচকে মেরে ফিরছিলেন. এখন সে-সব আর হয় না. তবু বুকের ভিতরে কে যেন পুট্ করে টিপে দিচ্ছিল একটা টিপকল. ওরা. জগন্নাথ আর মাণিকের দল অনেকটা এগিয়ে গেছে. দূর থেকেও শুনতে পাচ্ছি ওদের "হুররে". ভয়াৰ্ত আমি ভাবছি আজ একটা সৰ্বনাশ হবে। কিন্তু—

একটা সর্বনাশ যে ঘটে গেছে, তার একটুও আভাস পাইনি।

দরজা খোলা. উঠোনে পাড়া-প্রতিবেশী মাসিমারা কয়েকজন, ফিসফিস করে কথা বলছেন, ঘরের ভিতরটা কেউ ঝুঁকে ঝুঁকে

দেখছেন। থমকে গেছি, হাত থেকে বই-খাতা খসে পড়েছে আবার, এবার আমি কোনোদিকে না তাকিয়ে এক ছুটে ঘরে। মা, আমার মা, তুমি বিছানায় ওভাবে কেন, চাদরটা রক্তে ভাসাভাসি, তোমার চোখ সাদা, ওখানে মণিই নেই যেন, আকাশ থেকে অস্ত গেছে সন্ধ্যাতারা। বিছানা রক্তে মাখামাখি, তুমি মাথামাখি, আমাকে ভয় দেখাতেই কি এইসব দেখাচ্ছ? তুমি জানো না, রক্ত দেখলে আমি কত ভয় পাই, আঙুলটাও কাটলে চোখ বুজে ঠোঁট সেখানটা জোর করে চেপে ধরি, যে-বার বলিদান দেখি, সেবার অন্তত মাস দুয়েক মাংস মুখে তুলতে পারিনে? তুমি জানো সব জানো—তবু। মা, চোখ খোলো, বলো কী হয়েছে। তোমার শিয়রে বসে গাঙ্গুলি-বাড়ির পিসী, একখানা হাতে নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে আছেন। কী বলছেন উনি, আমাকেই কি, আমাকে যদি তবে অত চাপা গলায় কেন, বলছেন কি যে, তুমি পুকুরঘাটের পৈঠা থেকে হঠাৎ পা পিছলে— এ-সবের অর্থ কী, আমি শুনতে পাচ্ছি না মাথামুণ্ডু বুঝছি না। আমি বরং ওই বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ব, তোমার ঘ্রাণ নেব, এলানো চুলের, নিথর বুকের, তোমার আর-একটি হাত মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে, কী [illegible] চোখ বুজে, ব্যস, ঘুমিয়ে পড়ব।

"এখন কে, আমাকে ইস্কুলে কেন যেতে পাঠালি?"—বোকার মত এ-সব কী বলছি আমি, পিসীমার দিকে চোখ পাকিয়ে, এখন, এই ঘরে, এ-সব [illegible] কেনই মনে হয়?

"এই তো তেতে ঘণ্টাখানেক আগে, জানিস ঘাটে ও-পাড়ার ওরা ছিল, ওরাই গিয়ে ধরাধরি করে ঘরে তুলল। তুই বাছা, তোকে খবর দিয়ে কী হত, তখন আগে দরকার ছিল ডাক্তার ডাকা। ডাক্তারবাবু এইমাত্র দেখে গেলেন, অনেকক্ষণ ছিলেন, ওষুধ ইনজেকশন সব পড়েছে, জ্ঞান ফিরলেই দেখে যাবে উনি বেরিয়ে গেছেন। এখন [illegible]। ও ঘুমোচ্ছে, [illegible] তুই এসে পড়লি, [illegible] তোকে নিয়েই আর এক ঝঞ্ঝাট হত, কেঁদে-কেটে [illegible]। মা এখন [illegible] নিজেই নামিয়ে চিড়েমুড়ি যা আছে খেয়ে নে। ইস, মুখ শুকিয়ে গিয়েছে, যা বাইরে যা। এ-সব দেখতে নেই, মা-র এই অবস্থায় ছেলেরা ঘরে থাকে না। ওকে আমি একটু পরে তুলব, মোক্তার।"

গাঙ্গুলি পিসীমা বলছেন আদেশ করার মতো সুরে, কিন্তু আমি বোবা বনিয়ে গোঁয়ারের মতো দাঁড়িয়ে আছি, ওই ঘর নড়ছি না। চোখ খোলো, মা, শোনো, একটা কথা শোনো, ওরা আজ সুধীর-মামাকে তাড়াবে। সুধীরমামা, সুধীরমামা, শুনতে পাচ্ছ?)

পিসীমা হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন তোমার মাথায়, তুমি চোখ দিয়ে ওঁকে বলে দিলে, আর দরকার নেই। (মা, ওই দ্যাখ ওরা এতক্ষণে ওখানে গিয়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে। একজন উঠেছে গাছে, ঢিল ছুঁড়েছে। কে একজন এইমাত্র ভেঁপু বাজাল। ওটা সংকেত। সুধীরমামা নয়, প্রথমে বেরিয়ে এসেছে ভামতী, তার কপালে একটা ঢিল—তোমার কী? তা অবশ্য, ভামতীকে তো তুমি দেখতে পারো না।)

পিসীমা উঠলেন, তোমার মাথাটা বালিশেই কাত করে কাপড়-এ একটু জল ধরলেন। তুমি অস্ফুট গলায় বলে উঠলে "উঃ!" ('উঃ' কেন মা, সুধীরমামাও যে বেরিয়ে এসেছেন, ওঁর মাথাতেও যে তাক করে মারা একটা ঝামা এসে লাগল, তুমিও বুঝি তাই দেখতে পেলে? গাছ থেকে ওরা নেমে আসছে সরসর, ভামতী টেনে হিঁচড়ে ফের ঘরে নিয়ে যাচ্ছে সুধীর-মামাকে, ভামতীর এখন গাছকোমর, গলার পরদা চড়িয়ে বলছে, "কে আসবি আর, একবার এগিয়ে আয় দেখি!" এবার সুধীর-মামা ওকে ঠেকাচ্ছেন। ভামতী কি চাট্টি-খানি, ও হল গিয়ে বাঘিনী।)

তোমার বুক ওঠা-পড়া করছে, তুমি ও-রকম আঁ-আঁ করছ কেন। পিসীমা তোমার ঠোঁটের কষ মুছিয়ে দিচ্ছেন। (বড় রাস্তার গাছের তলায় একটা ছায়া, বলো

একা. পরে জেনেছি সব মানুষই আসলে একা. ভিতরে একটা জায়গা আছে যেখানে কাছে-পিঠে কেউ নেই, পাশে দাঁড়িয়ে কেউ ছায়া ফেলে না; কিন্তু তখন তো এ-সব জ্ঞান ছিল না। পুরনো দাদা তো কবে থেকেই নেই. নতুন হয়েও সে আসছে না. কোথায় চলে গেছেন সুধীরমামা. কোন্ দূর-দূর ঠিকানায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন বাবা—তখন, সেই সব শুকনো নির্জন নিঃসঙ্গ দুপুরে হঠাৎ হঠাৎ বাবার কথা মনে পড়ে যেত।

এইভাবে, মা, আমার সেই সকালের প্রথম বেলাটি শেষ হল।

[৭]

মা, তাড়াতাড়ি, একটু তাড়াতাড়ি। তোমার এখন আর তাড়া নেই, অফুরান সময়ের সাজি কোলে নিয়ে বসে আছ, যেন কোনও চির-শরৎকালের শিউলিতলার ছবিটি. ফুল ঝরছে, ঝরছে, ফুল তো নয় সময়ের ফুলকি, তাকে ইচ্ছে হলে গেঁথে তোলো, ইচ্ছে হল না তো দাও ছড়িয়ে, তোমার চারপাশে, তারা ক্রমে ক্রমে পাহাড় হয়ে উঠল তো কী এল গেল, সব তাড়ার পাড়ে তুমি, তোমার অবসর তো এখন অনন্ত।

কিন্তু তাড়া আছে আমার। আমি এখনও যে পড়ে আছি, তোমার ছেলেটি এখনও স্থানকালের গরাদখানার কয়েদী. খুব দুষ্টুমি করছিল বলে তুমি তাকে বাইরে থেকে শিকল তুলে দিয়ে ঘরের মধ্যে বসিয়ে রেখে গেছ, শাস্তি, এই তার শাস্তি, মা, শিকল খুলে দেবে না?

তবু আমি জানি এর মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে। ভালভাবে বাস করলে কয়েদী-দের দণ্ডভোগের মেয়াদ কমে যায়, জানো তো শেষ কটা বছর অত্যন্ত সদ্ভাবে বাস করেছি বলে, বাকী কালটা আরও সদ্ভাবে বাস করব স্থির করেছি বলে তোমারও উপরে যিনি, তিনি একটু তাড়া-তাড়িই মেয়াদটা মকুব করে দিচ্ছেন। আমি টের পেয়ে গেছি। ফুরিয়ে আসছে, এখানকার পালা ফুরিয়ে আসছে।

তার চিহ্ন—ফুরিয়ে আসছি আমি। আমি, আমার সব স্বপ্ন, সব শক্তি, সব আসক্তি আর বাসনা নিয়ে ফুরোচ্ছি। আগে পড়তাম ভীষণ কোনও জলপ্রপাতের মতো শব্দ করে, যেন এক নায়গারা, যেন ধুঁয়াধার, অথবা কোনও উত্রী, আজ পিছল কোনও চৌবাচ্চার নালা দিয়ে হড়হড় করে বেরিয়ে যাচ্ছি।

একে একে সব যাবে। আমার আশা, আমার সাধনা (কিসের সাধনা, একটা কিছু হব বলে? দূর দূর, কেউ কি কিছু হতে পারে, কোনোদিন পেরেছে—কেউ না। শুধু হতে চাওয়ার সাধটা ফুটতে থাকে, বড় জোর সাধের সঙ্গে যুক্ত হয় সাধনা) সব নিঃশেষে মিশে যাচ্ছে, সবাইকে একে একে রওনা করে দিচ্ছি. সাধ আশার সঙ্গে সঙ্গে যত নেশা, যত ভালবাসা, সবাইকে তুলে দিয়ে আমি উঠে পড়ব সব শেষে, পরিজনকে বাসে তুলে দিয়ে যেমন নিশ্চিন্ত হয়ে পা-দানিতে পা রাখেন গৃহস্বামী, তেমনই।

(পরিজনদের প্রসঙ্গে, মা, আমার কবে-লেখা কয়েকটা লাইন মনে পড়ছে:

"তার মৃত্যুকালে ওরা সকলে
পা ছড়িয়ে বসে কাঁদছিল,
তার আশা, তার ভালবাসা।
সুর করে করে ইনিয়ে বিনিয়ে
বলছিল, 'আমাদের কী দিয়ে
গেলে। আমাদের জন্যে কিছু
রেখে গেলে না?")

যাব। দিয়ে যাব। যাব বলেই তো

যাবার আগে কলম নিয়ে বসেছি, একটু আগে কয়েদীর মেয়াদ-টামার কথা বলছিলাম না? শেষ খানিটা বারকয়েক ঘুরিয়ে তবে নিষ্কৃতি। একে একে অনেককে চিঠি। যাকে যা বলতে চেয়েছি বলা হয়নি, মনে-মনে পুষে-রাখা অনেক পাখি উড়িয়ে দিয়ে হালকা হব; শুধু পাখিই না, খাঁচা খুলে ছেড়ে দেব হিংস্র কিছু প্রাণীও, যারা বিষাক্ত, যারা জিভের লালায় এতকাল আমারই ভিতরের দেয়ালগুলো চেটেছে, কিংবা আঁচড়েছে ধারালো নখরে, তারা এবার ছাড়া পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ুক সকলের উপরে—পড়ুক, পড়ুক না! কাউকে কামড়াক, কারও গা লেহন করুক একান্ত বশংবদ ধরনে, তপ্ত কিংবা হিমশ্বাস, হা-হা করে ফেলে চলুক, যত পারে।

এই সব করে, তবে আমার ছুটি। কিছু হতে পারা আর কিছু হতে না-পারা যখন একাকার হয়ে গেছে, তখনও এই একটু-খানি মোহ একফোঁটা টসটসে রক্তের মত জমিয়ে রেখেছি।

কিন্তু মা, একটি প্রণামেই এতখানি সময় কেটে যায় যদি, তবে চোখ তুলে বাকী সকলের দিকে তাকাব কখন, তাকাব কী-করে। ওদের খুঁজে পেতে আনতে আনতেও সময় ফুরিয়ে যাবে না?

"শ্রীচরণেষু মাকে" বলে একটি পর্ব শেষ করব ভেবেছিলাম, আর একটি পর্ব হবে "সুচরিতাসু তোমাকে", 'তুমি' এই একটি মাত্র আবাহনে সকলকে, অতীত যারা, যারা বিসর্জিত, যারা বাঞ্ছিত। "মাকে আর তোমাকে।"—এই সামগ্রিক পরিকল্পনাটাকে, পায়ে পড়ি মা, একাকার করে দিও না। সবখানি তুমি একাই শ্রাবণের সর্বব্যাপী মেঘের মতো ঢেকে রেখো না।

তাই বলছি, মা, আমাকে একটু তাড়াতাড়ি বড় হতে দাও, সেই বয়সে যখন আমি তোমার আবরণ, তোমার কুসুম ভেঙে ফুটে বের হচ্ছি।

আচ্ছা, আমিও একটা খেই ধরিয়ে দিচ্ছি। বাবার একটা চিঠি এল, মনে পড়ছে এলো? কত দিন পরে, কত দিন পরে, মা? এখন তুমি অনেকটা ঠিক হয়ে গেছ, মানে তোমার শরীরটা, যদিও চোখের তারা যেমন [illegible] মরা হয়ে গিয়েছিল, তেমনই রইল, সজীব ঝিকিমিকি আর ফিরে এল না, মনটাও ঠকঠক করে এদিক-ওদিক ঘুরত, যেন ফিউজ-লাগানো ছেড়ে দেওয়া একটা পুতুল, মেলায় যা বিক্রী হত, হয়তো-বা এখনও হয়, [illegible] তুমি নড়ছ, চড়ছ, উঠছ একটু, [illegible] কথা বলতে বলতে কী বলছ ভুলে গিয়ে হঠাৎ থেমে যাচ্ছ, তাকাচ্ছ আমার দিকে, [illegible] (পাখিরা যে না [illegible] একটু [illegible] সকালে [illegible] ধরেছিল, যত পাখি উড়ে গিয়েছিল, তারা ফের ফিরে ডাকাডাকি শুরু করেছিল পাঁচিলে আধো-অন্ধকারে—[illegible] আকাশের রঙ সোনা, কাঁসা, তামা, আবির, সিঁদুর, সীসে, সব রঙের মিছিল পরে পরে, যেমন যায়, যেমন বদলে যেত, তুই মনে হয় তুমিও যেন সেরে উঠছ, সামলে নিচ্ছ ধাক্কাটা। সব ধাক্কাই সামলানো যায়, যে গেল তার শোক যেমন সামলে নিয়েছিলে একবার, তেমনই, যে এল না, তার শোকও কি সামলে নিলে?), কত দিন কেটে গেল হিসেব নেই। মনে পড়ছে না এই মুহূর্তে, কিন্তু বাবার চিঠি হঠাৎ একদিন এল মনে আছে।

নিবারণ, ডাকপিওন, আমরা বলতাম নিবারণদা, ওর পরনে খাকি রঙের খাটো সম্পর্কে ছিল একটা সকৌতুক লোভ, সব অজ্ঞাত রহস্য বিষয়েই ওই বয়সে যেমন থাকে, একদিন দেখলাম সে বড় সড়ক ছেড়ে আমাদের বাড়ির দিকের রাস্তাটা ধরেছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, "মা, নিবারণদা আসছে, এ-দিকেই।"

উত্তেজনার মত ঘটনা বৈকি। এদিকে আসত এক সুধীরমামা; সে চলে যাবার পরে, ডাক-পিওন তো দূরে থাক, বিশেষ কেউ আমাদের বাড়ির দিকে আসে না।

"নিবারণদা, আসছে মা।"

তুমি নিরুৎসুক গলায় বললে, "আসুক গে"। আঙুলের কর গুনে গুনে তোমার নাম-জপ চলছিল, চলতে থাকল। আমি কিন্তু পারলাম না, ছুটতে থাকলাম নিবারণদার দিকে উর্ধ্বশ্বাসে, মাঝপথে ওকে ধরে হাত পেতে বললাম, "দাও।" সে মিটমিটি হাসছিল।—"কী দেব, বলো দেখি।"

"কী আবার? চিঠি।"

সে বলল, উঁহু, চিঠির চেয়ে ভারী আর বেশী। এর নাম ইনসিওর, ভেতরে [illegible] টাকা আছে। মাকে [illegible] আসবে।"

[illegible]

[illegible] ছিল, যেহেতু তুমি [illegible] 'উঃ!'"

[illegible]

দৌড়ে ঘরে গিয়ে আমি [illegible] রইলাম, কলম নিবারণদার কাছেই ছিল সে বাড়িয়ে দিল, [illegible] তুমি সই করলে [illegible] তোমার, অথচ সেদিন [illegible] গেল।

বসিয়ে [illegible] রেখে নিবারণদা [illegible] কিন্তু", [illegible] আঁচলের গিঁট খুলে তাকে কত দিলে, দিলে কি না দিয়েছিলে, আজ মনে নেই।

কী আশ্চর্য, নিজের হাতে খামটাও কি খুলবে না তুমি? নিবারণদা ফিরে যাচ্ছে দরজায় খিল তুলতে তুলতে খামটাই খসে পড়ল মাটিতে, আমি কুড়িয়ে তুলে খামটা ছিঁড়লাম। তিনটে দশ টাকার নোট, আর কী? একটা চিঠি। চোখ বুলিয়ে তুমি পড়লে কি পড়লে না, টাকা সমেত খামটা আমার হাতে দিলে। টাকা, খাম, একটা চিঠি।

[ক্রমশঃ]

স্বর্গত রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেনের হাত থেকে শচীনদেব বর্মনের "পদ্মশ্রী" উপাধি লাভ

আমি এখনও সঙ্গীত পরিচালনা করে চলেছি। কিন্তু বিমলদা ও গুরু দত্তর আমার গানের প্রতি ভালবাসা ও দরদের কথা সদাসর্বদা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করি। তাঁদের প্রীতি আমার জীবনের অমূল্য সম্পদ।

১৯৫০ সালে 'ফিল্ম আর্টস'-এর 'বুজ দিল' নামে একটি ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলাম। শহীদ লতিফ পরিচালক ও গীতিকার শৈলেন্দ্র। ছবিতে "ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ পায়েল বাজে" গানটির সুর রচনা সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। নট-বেহাগ রাগের উপর এই গানটি আগ্রা ঘরানার। ১৯৩৫ সালে ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর কণ্ঠে এই গান শুনে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। ছোট ছোট বোল তান ও ছন্দ সৃষ্টি করে খাঁ সাহেব এই গানে যে রস-মাধুরী তুলে ধরেছিলেন—তা এখনও আমার কানে ভাসে। আমি এই গানে এমনই প্রেরণা পেয়েছিলাম যে, কলকাতায় একটি বাংলা গানে এই সুরের সদ্ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছিলাম। 'বুজ দিল' ছবিতে এই গানটি ব্যবহার করলাম, একই প্রথম লাইন এবং লতাকে দিয়ে গানটি গাওয়ালাম। আগেই বলেছি হিন্দী [illegible] সঙ্গীতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সুরে গানকে জনপ্রিয় করা খুবই কঠিন। আমি অস্থায়ীতে গানটির উচ্চাঙ্গ রাগ বজায় রেখে, অন্তরায় কীর্তনের রূপ দিতে চেষ্টা করলাম। এ গানখানা ক্লাসিকাল রাগ ও কীর্তনের সংমিশ্রণে সুর দিয়েছিলাম বলে জনসাধারণেরও ভাল লেগেছিল এবং গোঁড়াপন্থীদেরও প্রশংসা পেয়েছিলাম, ক্লাসিকাল রাগ এভাবে জনপ্রিয় করাতে।

'মেরী সুরৎ তেরী আঁখে' ছবিতেও এই ধরনের আরেক পরীক্ষা করেছিলাম। শৈলেন্দ্রর লেখা একটি গান ছিল, যার প্রথম লাইন—"নাচে মন মোরা মগন তিগদা ধিগি ধিগি"। এই গানের সুরের আইডিয়া এসেছিল এইভাবে। কথক নাচের বিখ্যাত শিল্পী শ্রীবৃন্দাদীন মহারাজ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রদের নাচের তালিম দেবার সময় মুখে "তিগদা ধিগি ধিগি" এক নাচের বোল সবসময় বলতেন এবং এই বোল অনুযায়ী পায়ের কায়দা শেখাতেন। কলকাতায় অচ্ছন মহারাজের সঙ্গে আমার খুব হৃদ্যতা ছিল এবং এই নাচের বোলটি আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল। শৈলেন্দ্রকে দিয়ে গানটি লেখাই আমার সুরের উপর। আমি একে আইডিয়া দিলাম "মন ময়ূর নাচছে বা মন নাচছে" এইরকম কিছু প্রথম লাইন। সে লিখল "নাচে মন মোরা মগন" আমি তারপরে বোল বসিয়ে দিলাম, "তিগদা ধিগি ধিগি।" ফুটিয়ে তোলার জন্য লয়ের কাজ দেখালাম সুরে। বেনারসের পণ্ডিত শান্তাপ্রসাদ তবলা বাজিয়েছিলেন এই গানে। তাঁকে বিশেষভাবে আনান হয়, কথক নাচের বোলের সঙ্গে এই গানে তবলা বাজানোর। সকলেরই পছন্দ হয়েছিল আমার এই গান। এইরকম বিভিন্ন গানের সুর রচনায় এই ধরনের নানা ঘটনা বর্তমান।

[illegible] "জুয়েল থীফ" ছবিতেও (১৯৬৬) এইরকম এক নতুন ধরনের সুর দেবার প্রয়োজন ঘটেছিল। ছবির নটী নায়িকা। তনুজা অন্যতম ভূমিকায়, উচ্ছল তার চরিত্র, চলাফেরা, কথাবার্তা সবই বেপরোয়া, চপলতায় ভরা। এর জন্য একটি বিশেষ গান রচনার নির্দেশ এল, পরিচালক বিজয় আনন্দের নিকট থেকে। সাধারণত হিন্দী ছবির গানে প্রথমে অস্থায়ী, পরে অন্তরা আবার অস্থায়ীতে গান শেষ হয়। তনুজার জন্য সে রাস্তায় না গিয়ে আমি একটি গদ্য-কবিতার জন্য সুর রচনা করলাম। সুরটি চেয়েছিলাম চরিত্রানুযায়ী করতে। গানের দৃশ্য—এই দুরন্ত নায়িকা নায়কের নিকট একটি গান করছে—প্রথম

লাইন—"রাত একেলী হ্যায়—বুঝ গ্যায়ে দীয়ে— আকে মেরে পাশ, কানোমে মেরে —যোভি কহিয়ে"। বাংলাতে হল—"রাতি একেলা, দীপ নিবে গেছে—কাছে মোর —শুধু কানে কানে—কিছু বলো বলো বল।"

আমি সুরে দিলাম—নায়িকা প্রথম কথা ক'টি Croon করবে। তারপর হঠাৎ শেষ লাইনে—"যোভি চাহে কহিয়ে" নাটকীয়ভাবে চেঁচিয়ে উপরের সুরে গাইবে। প্রথম লাইন গাইবার পর মিউজিক, অন্তরা গদ্য কবিতায়। আশা ভোঁসলে গেয়েছিল গানটি। খুব সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল আমার এই প্রচেষ্টা। সুলতানপুরী গান লেখেন, আর তনুজা অভিনয়ে সেই আইডিয়া প্রাণবন্ত করেন।

আমার এই সামান্য জীবন গানে গানেতেই কেটেছে। জন্মাবার পর বাবার স্নেহেতে সুরেতে দীক্ষিত হয়ে আনোয়ার আর মাধবের স্নেহের ছায়ায়, তাদের সরল গ্রাম্য সংগীতের রসগ্রহণ করে, বহু গুণী গায়কদের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে সংগীত-সাধনায় জীবন উৎসর্গ করেছি। আমার জীবনে ভারতের বহু গুণী, জ্ঞানী সংগীত-প্রেমী ও কলাকারদের সংস্পর্শে এসেছি। এদের প্রীতি ভালবাসা পেয়ে ধন্য হয়েছি। এ ছাড়া, তিনবার পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণ করে সে সব দেশের বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ ও শিল্পীদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। তাঁদের গান শুনেছি আর শুনিয়েছি তাদের আমার সংগীতশৈলী। তাঁদের সংগীত পদ্ধতি

বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে শচীনদেব বর্মন। সঙ্গে মুকেশ, মহম্মদ রফি ও মেহমুদ।

ধারার সহিত সমাবেশ ঘটেছে আমাদের সংগীতের। দুই সংগীত ধারার বিনিময় ঘটেছে। আমার মন এখন আর এই সব ছুটোছুটি চায় না। মন চায় নিভৃতে সুর সৃষ্টি করে যেতে, সুরে সুরে ডুবে থাকতে আর শ্রোতাদের আনন্দ দিতে।

হিন্দী চলচ্চিত্র সংগীতের সুর রচনায় আমি সর্বদাই চেয়েছি নতুন কিছু দিতে, যাতে অন্য সংগীত পরিচালকদের থেকে নিজে একটি পৃথক শৈলীর উদ্ভাবক বলে পরিচিত হতে পারি। প্রথমদিকে এটিই ছিল আমার উদ্দেশ্য এবং এখনও এই নীতি সফল করার প্রচেষ্টাতেই নিজেকে নিয়োজিত রেখেছি। কোন সময় সাফল্য অর্জন করলে, কি আনন্দই না পেয়েছি তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। বা অর্থ দিয়েও সে আনন্দ পূরণ হবে না। সুকুমার কলার ক্ষেত্রে প্রত্যেক শিল্পীকে নিজস্ব সত্তায় প্রকাশিত করতে হবে, নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট হতে হবে। অবনীন্দ্র-নাথের ছাত্র নন্দলাল। কিন্তু নন্দলাল নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে, নিজস্ব পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন নিজেকে। আগ্রা ঘরানার ফৈয়াজ খাঁ। কিন্তু তবুও কতরকম নিজস্ব শিল্প-মনসের পরিচয় দিতেন তিনি, যা তাঁর ঘরানার মধ্যে পাওয়া যাবে না। তাঁর জয়জয়ন্তী রাগে "মন মন্দির মে আ" একান্তভাবে ফৈয়াজ খাঁর সৃষ্টি। কিরানা ঘরানার, ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁ। ঘরানার বাইরে কত নতুন কিছু সৃষ্টি করেছেন তিনি নানান পরীক্ষার মধ্য দিয়ে। আমিও আমার ক্ষেত্রে চেয়েছি এই ধরনের নতুন কিছু করতে। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পে কিছু করতে না পেরে, মনে অভিমান ও ব্যথা নিয়ে ১৯৪৪ সালে বম্বে চলে এসেছিলাম—এখন আর সে অভিমান নেই। এখন নিজের শুধু এই পরিচয়—যে আমি বাংলা মায়ের সন্তান এবং আমার সুরসৃষ্টি সমস্ত ভারতবাসীর সম্পদ—আমার সুর ভারতবর্ষের প্রতীক।

খতিয়ে দেখলে—আমার এ জীবনকে

তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়। শৈশব ও কৈশোরের দুরন্তপনা গোমতী নদীর তীরে কুমিল্লায়। যৌবনের উন্মত্ততা ভাগিরথীর স্পর্শে কলকাতায়—যা জীবনে প্লাবন এনে দিয়েছিল এবং প্রৌঢ়ত্বের ছোঁয়া দিল আরব সাগর—এই বোম্বাইতে।

ক্ষীণ জলের ধারা এবং তার সান্নিধ্যে এই জীবনের ধারা স্ফীত ও গভীর হয়ে যাচ্ছে। যে ক্ষীণা গোমতীর ধারার ছোঁওয়ায় জীবন আরম্ভ হয়েছিল সে তখন তরুণ মনেতে শুধু দৌরাত্মের ইন্ধন যোগাত—সে জলধারাটিই স্ফীতা হয়ে ভাগিরথী-রূপে যৌবনে উন্মাদনা ও চঞ্চলতা জাগিয়েছিল। এখন সে জলধারাই স্থির ধীর আরবসাগররূপে এ জীবনকে গম্ভীর ও গভীর করে তুলেছে।

এই তো আমার জীবনের তিনটি পর্ব।

জীবন সায়াহ্নে আমার শুধু কাম্য আমি আর কিছু এখন আর চাই না—শুধু চাই—

সকলের নিঃশ্বাস হয়ে, জলাগিতে পাড়ে থাকতে।

সমাপ্ত

হরিজন

বিহারের সাসারাম। বাদশা শের শা-র কবরখানা আমাদের গাঁও থেকে বেশি দূরে নয়। ছোটবেলায় ইস্কুল পালিয়ে কতদিন সেখানে যেতাম। সরষে, লঙ্কা, ইক্ষু, গম ক্ষেতের পাশে মহিষ-গরু চরাতাম ডান্ডা হাতে নিয়ে। 'কেলাস' ফাইভ পর্যন্ত পড়েছিলাম। ইস্কুলে মুচির ছেলে বলে আলাদা বসতাম। আমাদের দেশে সব হিন্দুদেরই ইয়া মোটা মোটা টিকি থাকে। সব পণ্ডিতদেরই টিকি ছিল। ছোট বেলায় গম কেটেছি, বয়েছি, ঝেড়েছি, মেড়েছি। মা যাঁতা ঘোরাতো। জোনার ছাতু কুটত। ভাজা জোনার নতুন ছাতু খেতে কি সোয়াদ ছিল বাবু! আর হরদম ভইষা অথবা বয়েলের দুধ, দহি, রাবড়ি, ঘোল খেতুম। মা চমৎকার হালুয়া তৈরি করতে পারত। তাতে আখের গুড় আর তেজপাতা দিত। সেই দিয়ে গরম-পনির-খামির-করা সোঁদা-সোঁদা-গন্ধ-ভরা নতুন গমের নরম মোলায়েম রুটি খেতাম। চার ভাই আমরা কুস্তি শিখতাম বাড়ো বাপের কাছে, লাঠি খেলা শিখতাম। কবাডি খেলতাম। বড়কা পাড়ে মিডল ইংলিশ স্কুলে যখন পড়ি বাবা মরা গেল। জমিজমা সামান্যই ছিল। সব বছর খোরাকী হত না। স্কুল ছেড়ে পরের গম ক্ষেতে জন খাটতে গেলাম। গরু মহিষের একবার খুব মড়ক হল। আমাদের তিনটে গাই গরু চারটে ভইষ মহিষ মারা গেল। মা মাথা কুটে কাঁদতে লাগল। আমরা ফকির হয়ে গেলাম। অনাহারে অনেকদিন কাটতে লাগল। আমি আর মেজো দু'ভাই পরের ক্ষেতিতে কাজ করতে লাগলাম। ছোট রামপ্রবেশ প্রসাদ ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়ল। আমার বিয়ে হল। দুটো বাচ্চা পেলাম। একদিন আমাকে আর ছোট ভাইকে কলকাতায় মুচির কাজ করবার জন্যে পাড়ের এক বুড়ো নিয়ে এল। কলকাতার গাড়ি ঘোড়া দেখে অবাক হলাম। আমরা ট্যাংরার এক মুচি-বস্তিতে উঠলাম। মুচির ছেলে, ছোটবেলা থেকেই আমরা কিছু কিছু মুচির কাজ জানতাম। হিন্দু হলে মুচি, মুসলমান হলে চামার। 'চাম' বোধ হয় উর্দু কথা। তাই থেকে চামার। কিন্তু চর্মকার বললে মুচি চামার উভয়কেই বোঝায়। আনন্দবাজার 'চর্মশিল্প সংস্কার সমিতির' সেক্রেটারী রামানন্দবাবুর কাছে রোজ রাত্রে আমি অথবা ছোট ভাই রামপ্রবেশ বাল্মীকি বা তুলসীদাসের রামায়ণ পড়ে শোনাতাম। কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে লেখা 'প্রেম সাগর' পড়তাম। আমাদের কথ্যভাষা মৈথিলী নয় ভোজ-

পুরী। মৈথিলী হল দারভাঙ্গার লোকের ভাষা আমরা লেখাপড়ার কাজ করি সব হিন্দুতে। পূজা, বিয়ের মন্ত্র, ধর্মকর্ম হয় সব সংস্কৃতে। আমাদের গাঁয়ে সিকি ভাগ মুসলমান। আর সাধারণ হিন্দু রাজপুত ছত্রী। কারো সঙ্গে কারো জল-চল নেই। ধরুন, কোনো মছ্‌লিভাজী বঙ্গালী

হরিরাম প্রসাদ

আমাদের দেহাতের কোনো চা-খানায় গিয়ে বসল। সেখানে সব থাকে মোটা সর-পড়া দুধ ফুটছে। উনি অবাক হয়ে দেখছেন ... দিয়ে বলল, 'খাও বাবু' এক চুমুক। তাহলে বঙ্গালী মাছলি খোরের পরশ-করা দুধ সবটাই ফেলে দেবে। কলকাতা থেকে দেশে ফিরে গেলে বড় বহু আমাকে গরুর গোবর খাওয়ায় আগে, তারপর বাড়িতে ঢুকতে দেয়! বউ আমার খুব নাচতে পারে। গাওনাও ভি গাইতে পারে। হোলির সময় তো এমন রঙ মাখামাখি, কাদা মাখামাখি, নাচ-গান-হররা— 'হো রা-রা-র-রা গজ' বলে উন্মাদ কাণ্ড হয় যে তিন চারদিন আর উঠতে পারে না কেউ। আমাদের দেশে মহুয়া বা 'মেড়ুয়া' ফল থেকে দিশী মদ তৈরি করা হয়। তাড়িয়াও পাওয়া যায়। আমরা পাল-পার্বণে ওসব খেয়ে থাকি। বিয়েতে আমাদের বরপণ লাগে। একশ টাকা দিতেই হবে। অবস্থা বুঝে যেমন। চার শো থেকে কুড়ি হাজার টাকা পর্যন্ত ওঠে। তারপর বয়েল, ভইষা, সোনা, রুপো। রুপোরই চল বেশি। ছুঁচি, হার, হাঁসুলি, কানের ফুল, পায়ের মল ছাড়া, তাবিজ, গোট, পৈঁছি। যত ভারী ভারী হয় তত ভাল। আমার মায়ের রুপোর গয়না ছিল প্রায় আধ মণ। আমার বউয়ের হাতে যে দুটো রুপোর রুলি আছে তা দিয়ে যদি ঘা দুই সাঁটায় যে কোনো মরদ জখম হয়ে যাবে বাবু। নাকের কানের ফুলের ওজনের ভারে অনেক আধা-বয়েসী মেয়ের নাক-কানের লতি কেটে যায়। মেয়েরা হাতে বুকে কপালে উল্কি পরে। মেহেদি বা জাফরানে হাত রাঙায়। আর ডানদিকে আঁচল রেখে ঘাগরা করে কোঁচা দিয়ে রঙচঙে পাটের বোম্বাই শাড়ি পরে মাথায় কাপড়ের পাড়ের তৈরি নকশাদার বিড়ে বসিয়ে তার উপরে তিনটে কলসী বা গাগরি পর পর সাজিয়ে নিয়ে বিকালে পাড়ার মেয়েরা দল বেঁধে পানির জন্যে যায় পাহাড়ী ঝরনা বা তালাওয়ে। আমাদের দেশে পাহাড় আছে। পাহাড়ের ঢেউ চলে গেছে আকাশের কোল পর্যন্ত। যখন কাল বৈশাখীর ঝড় ওঠে তখন বালু ওড়ে।'...

মাঝ বয়সী হরিরাম প্রসাদ জুতোর ফোঁড় তুলে তার খোবড়ার মধ্যে থেকে কনকন-করা ঘাড়টা একবার তোলে, কথা বন্ধ করে। আকাশের দিকে তাকায়। কালো মেঘের চূড়া ভেসে আসছে পশ্চিম থেকে। হরিরাম বলে, 'ওই মেঘটা আসছে বিহার থেকে। এতক্ষণে সেখানে বিষ্টি এলে গম, কলাই, লঙ্কা, সরষে, ঘুঁটে, কাঠ তাড়াতাড়ি তুলে নিচ্ছে মেয়েরা!'

ভাই রামপ্রবেশ খইনী ডলে দিলে গালের - কোলে - নামা - বড়-বড়-কালো গোঁফজোড়াকে এক হাতে তুলে ধরে হাঁ করে গালের মধ্যে ফেলে হরিরাম। জিব দিয়ে খইনীর দলাটা নিচের পাটির দাঁতের কোলে ঠুসি পাকিয়ে রাখে। মাঝে মাঝে

চরাৎ চরাৎ করে থুথু ফেলে। ওদিকে হাই স্কুলে মহা গণ্ডগোল বেধেছে। স্থানীয় এক ভদ্রলোক বললেন ঃ এম-এ 'অনার্স' ইতিহাসে—অনেক মাস্টারকে প্রায় তিন বছরকাল ডেপুটেশনে রেখে এখন নাকি অ্যাসিস্টান্ট হেড মাস্টারের একটা পদ খালি হতে স্থানীয় স্কুল-ক্লার্ক স্পেশাল গ্রাজুয়েটকে নিয়ে ডেপুটেশনের মাস্টারকে ছাঁটাই করছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। ছাত্ররা চিৎকার করছে ঃ 'এ জুলুম চলবে না।' 'বিচার চাই—বিচার চাই।'

ঝোবড়ার মধ্যে আর একটি ছেলে কাজ করছে—তার নাম সরযূ লাল। হরিরামের রঙ মিশ কালো। টিকলো নাক। মাথায় মাঝারি চুল। গায়ে ফতুয়া। খাটো আট হাতি ময়লা ধুতি পরনে। মাথায় টিকি নেই। রামপ্রবেশ তরুণ, ঈষৎ ফরসা। দু'পাশের কপালের চুল পাতলা হয়ে গেছে।

হরিরাম বলে, 'বাইশ বচ্ছর আছি বাবু এই বাখরাহাটে। জানবাজারে বেশি দিন থাকতে পারি নি। হঠাৎ একদিন আমরা রাত্রে তখন তুলসী দাস পড়ছি আর 'আল্লাহু আকবর' চিৎকার ধ্বনি উঠল। ১৯৪৬ সাল তখন। জিন্না সাহেব কলকাতায় বক্তৃতা করে গেলেন ঃ লড়কে লেঙ্গে। পাকিস্তান চাই। শুনলাম নাকি মেটেবোরোজে দাঙ্গা বেধেছে। ওড়িয়া হিন্দুস্থানীরা হরদম মরছে। আমরা সকলে 'রাসমণি কুঠি'তে গিয়ে উঠলাম। দশ হাজার লোক এক বাড়িতে। ওদিকে তালতলা, এদিকে চাঁদনীচক—চারদিকে মুসলমান। আমরা অনেক ইট

দাঙ্গার হুজুগ

তুললাম ছাদে। তারপর সবাই অস্ত্র লাঠি ধরলাম। মুসলমানরা ভেগে গেল। রামানন্দ বাবু এখনো বেঁচে আছেন—'চর্মশিল্প সংস্কার সমিতি'র সেক্রেটারী আছেন তিনি এখনো জানবাজার অঞ্চলে। তিনি আমাদের বাঁচিয়ে দিলেন। বাপসমাদ লোক। কদিন পরে 'বিরলা কোম্পানি' তার 'টেরেনে' করে আমাদের বিনা ভাড়ায় দেশে পাঠাল।...৪৬-এর দাঙ্গায় কত মানুষ মরে গেল বাবু কে আর সুমার করে রেখেছে!'...

১৯৪৬ সাল!...দাঙ্গার আগুন-নাচা রক্ত-ছোটা দৃশ্যের একটা ফিল্ম চলতে লাগল হঠাৎ আমার মনের মধ্যে।...

...কাক জ্যোৎস্না। দুটো লোক ওখানে কি করে? চাপা চওড়া ড্যানহেয়ালের মধ্যে কয়েকটি জ্যান্ত মানুষ গঙ্গার ঘোলা জলে পাক খাচ্ছে—বল্লম খোঁচা হচ্ছে তাদের মাথায়—মুখে—পেটে—পিঠে! তারা 'আগো—বাবা গো'—বলে কাতরাচ্ছে! বক্ বক্ করে রক্ত ঘুলিয়ে উঠছে! স্রোতের টানে তারা গড়িয়ে যাচ্ছে!

ট্রেন উপ্‌চে ময়লা ভাসছে পথে। আলো জ্বলছে দিন রাত। বস্তি পুড়ছে। বস্তির যত মাল—সেলাই কল, গ্রামোফোন, রেডিও, পাখা, সিন্দুক—সব পুকুরের জলে ডুবিয়ে রাখা হচ্ছে!...বস্তি হয়রান। পট কাচ ভাঙা চারদিকে। কারা যেন ভাতের থালা নিয়ে সবে খেতে বসে ছিল! ফেলে পালিয়েছে! পালাবে আর কোথায়? তারা মানুষ হলেও ধানুষের হাতেই মারা পড়েছে!

হঠাৎ একজন স্থানীয় বাসিন্দা তলোয়ার হাতে নিয়ে ছুটে এল—গায়ে, তলোয়ারে রক্ত। বললে, সাতজনকে কেটে এলাম।'...

পুলিসের গাড়ি আসছে!...

ছজন লোক আমার বাসার মধ্যে ঢুকে প্রাণ বাঁচাতে চাইল। তাদের রাখলাম। ভোরে তাদের বার করে দেবার সময় ধার্মিকরা জানতে পারল। তাদের টেনে নিয়ে গেল। আমার মাথার উপরে উঠল তলোয়ার!

সাবধান!

একটা লোক পায়খানার নিচে থেকে বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে পড়ল ওদের সামনে। বললে, মেরো না বাবারা, আমি এই এক ভরি আফিং খাচ্ছি!'...খেল সে। তারপর টলতে টলতে গিয়ে পড়ল পুকুরে। সেখান থেকে নাকি উঠছিল—পড়ে গেল ড্রেনে। তারপর সাফ!...

গোর্খা নেপালী মিলিটারী নামল। কারফু!...

তারপর কংগ্রেস লীগের পতাকা একসঙ্গে বেঁধে মৈত্রীর বাণী ছড়ানো হতে লাগল। হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই!...

বাকেক তারা তা করেছিল—নইলে এতদিন আমরা বাঁচতাম না।

সব দৃশ্য কি বলা যায়? দাঙ্গার কথা—এ যে মহামারীর মতন সংক্রামক! কার নাম বলব? সবাই যে সাধু! নয় তো, সবাই চতুর—সবাই ফতুর!

ফসিল! অসভ্য জানোয়ার!

ফিল্মটা বন্ধ করলাম। ওটা শঙ্খচূড়! মনের ঝাঁপিতে লুকিয়ে রাখলেও হঠাৎ হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে! একটু অসাবধান হলেই ওটা বেরিয়ে পড়েই মাথায় চোট করে! শিরে সর্পাঘাত! তাগা বাঁধবে কোথা?'

হরিরাম আবার এল কলকাতায়। পাঞ্জাবে নাকি তখন দাঙ্গা চলছে। এল

বাখরাহাটে। রামপ্রবেশ জোড়া বাগানে ১৫ দিন কাটিয়ে পি-জি হাসপাতালে ওয়ার্ড বয়ের কাজ পেলে।

সে কাজও তার বেশিদিন টিকল না। দাদার কাছে চলে এল বাখরাহাটে। মাথবিলা গ্রামের বাবু পূর্ণচন্দ্র মালের ঘর ভাড়া নিলে। ১১ টাকা ভাড়া। ৪ বছর কাটল। পূর্ণবাবু ঘর বিক্রি করে দিলেন।

হরিরাম বললে, 'নতুন বাবু হলেন সতীশচন্দ্র দত্ত। ১২ টাকা ভাড়া নিলেন ৪ বছর। তারপর ১৫ টাকা চোদ্দ বছর। ১৫+৫ আলো বা বিজলী খরচ=২০ টাকা, বাবুকে মনি অর্ডারে দিতে হয় এখন। এখন বলছেন, উঠে যাও। ঘর সারছেন না। হেলে পড়ছে। বত্রিশ হাজার খুঁটি লাগানো আছে। আমরাই লাগাচ্ছি। জল হলে বালতি নিয়ে ছেঁচতে হয়। ঝড় উঠলে প্রাণের ভয়ে মরি। রাম নাম জপ করি। আমরা বলছি ভাড়া বেশি নিন—ঘর সেরে দিন—তা দেবেন না। বলছেন, উঠে যা বেটারা! আমরা যখন একটা ঘর দেখলাম তখন বললেন, ঠিক আছে থাক। যতদিন না তুই ঘর ছাড়িস তোকে সরাবো না। ঘর যেই হাতছাড়া হয়ে গেল, অমনি বলছেন, এই বেটা, উঠে যা। আমরা বিদেশী, বাবু, মামলা লড়ব কেমন করে? বুড়ো হলাম! এখন কোথা যাই?'

হরিরামের চোখে জল টলটল করে। তার বউয়ের নাকি চিঠি এসেছে, ছোট ছেলেটার ভারী ব্যামো। বাড়ি যাবার টাকা নাই। ভাইরা সব এখন আলাদা। ছোট রামপ্রবেশ শ্বশুরবাড়ি শাহাবাদ-আরায় তার সংসার রেখেছে। আজ সারাদিন কাম করে মাত্তর দশটা পয়সা পেয়েছি। বইনীর নাম হয় নি। পথে ঘাটে অনেক মুচি। বাঁধা দোকানের অর্ডারী জুতো তৈরি করা অনেক কমে গেছে। তখন চাষীরা এক জোড়া বুট তৈরি করে নিত—দশ বছর যেত। এখন বাটা, লেডি, প্লাসটিক, রবার আমাদের মেরে ফেলে দিল বাবু। কোনোদিন পাঁচ টাকা হয়, কোনোদিন আবার দশ টাকাও হয়। আজ একেবারে ফাঁকা—মাত্তর দশ পয়সা।'

হরিরাম উঠে বাজারের দিকে চলে গেল।

রামপ্রবেশ কথা বলতে লাগল। সে বেশ খোস মেজাজী। বললে, 'বাঁধা দোকানেও আমরা কিছু কিছু মাল অর্ডার-সাপ্লাই দিই এই যে দুইঞ্চি চওড়া বারো ইঞ্চি লম্বা কাঠটা দেখছেন এর নাম 'ফরাহি' অথবা 'খরহর'। এটা হল জংলী চন্দন কাঠ। চির রসাল। যখনি কাটা হবে এর মধ্যে রস পাওয়া যাবে। এই যে সেগুন কাঠ এনেছিলাম, হল না। এর উপরে রেখে বাটালী দিয়ে চামড়া কাটতে হয়। চাঁছবার বাটালীকে 'খুরপি' বলে। কাটবার বাটালীকে বলে 'খুরপা'। এর স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ আছে। হিন্দীর লিঙ্গ ভেদ করা বড় কঠিন। এর নাম 'নেহ্রাই' বা হ্যান্ডেল। ওটা জুতোর মধ্যে ঢুকিয়ে 'কাঁটি' বা পেরেক মারতে হয়। সব মিস্তির কাছেই থাকে। তে-ক্যাকড়া লোহায় তৈরি। এটা 'বেলে সিল'। এটা 'পেনচিস' বা প্লায়ার্স। এর নাম 'তাঁজ করনী' মনে কৌড় বা 'সুই'। 'মুচির তাঁজ করনী' চক চক তো হাঁড়ি-পাতিলে চকচক।' 'তাঁজ করনী'—মাঝারী। মোটার নাম 'ওয়ালটি'। সরু ৩নং—'কোলোসী'। এটা হাতুড়ি বা 'হাম্বর'। যে হাতুড়ি কমিনিস্টরা পতাকায় লাগিয়েছেন! ওটা আমাদেরই হাতুড়ি।'

'কাকে গতবার ভোট দিয়েছেন?'

হে হে করে হাসলে রামপ্রবেশ।

শুধোলে, 'আপনি বিধানসভায় যান?'

'যাই।'

'কি রকম ঘরটা।'

'গোল ঘর।'

'গোল ঘর! 'গোল ঘর' তো চাষীরা 'গোয়াল ঘর'কে বলে।'

মুচি রামপ্রবেশ মাথা চুলকোতে লাগল।

সরয়ু ছোকরাটি আবার কাজের কথার সূত্র ধরিয়ে দিয়ে বললে, 'এইটা লকটোন' পাথর বাবু। চামড়া পেটাই করি এতে।'

রামপ্রবেশ বললে, 'সদা মারওয়ার'-এ বলা হয় কালো ইটের আকারের পাথরকে। এটা 'টাক উঠাউনী' নক্‌শা করা যন্ত্র। এটা প্রথম বন্ধনীর মতো দেখতে 'খল লোহানী' —মহিষের সিং। এটা 'কাইল'। এ হল 'জিগড়'। 'ঘিরনী'—হিলের নক্‌শা-যন্ত্র, 'লোহিয়া' বা হিল ওয়াল'—রঙ লাগানো হয় এ দিয়ে। 'তেড়ুয়া' রঙ লাগানো যন্ত্র।' 'সিটক' পালিশের যন্ত্র। 'রিং কিটুনী' পনচ, জালী কাজের যন্ত্র। 'জিন হামড়'। —শত শত যন্ত্র আমাদের।'

'কি কি জুতো করো?'

'যখন যেমন অর্ডার পাই। ঐ সব ফর্মা টাঙানো আছে কাঠের। চুস্ত, এ্যামবেসডার, প্যাণ্টেড, সু, নিউকাট, স্যাণ্ডেল।' 'চামড়া হল : 'ক্রুম লেদার'—কালো মাল—গরুর চামড়া। কাফ লেদার—বি, আর মানে ব্ল্যাক রেড। প্লেজ কিড—বি, আর, ব্রাউন, ডার্ক টান। মাদ্রাজী-গরুর চামড়া। সোল হয় মহিষের চামড়ার। আমরা কখনো ভেজাল মাল দিই না। খাঁটি মাল দিই বলে ব্যবসা চলে না। লোকে এখন শৌখিন

চকচকে কম-দিন-চলবে । এমন-মালই বেশি কেনে। আমাদের কাছে যখন সারতে আসে মাল হাতে পড়লেই জানতে পাই। আমরা এক জোড়া চটি বেচি ১০ টাকা। বুট ১৪ টাকা থেকে ১৮।২০ টাকা। এসব জুতো বড় সাইজ হল ১২।১১।১০।৯।৮।৭।৬ পর্যন্ত। মাঝারী ১ থেকে ৫ পর্যন্ত। ছোট সাইজ ১ থেকে ১৩ পর্যন্ত। রাজা মহারাজা থেকে চাষাভুষো, যার যেমন সাইজেরই পা জানুন, ঐ সব নম্বরের মধ্যে হবেই হবে।

'সুতো : ছুড়ি, সুতো, কাটিম, টোন, মারসেরাইজড। এইসব সুতো ভালো করে পাকিয়ে মোম দিয়ে নিতে হয়।'

'পেরেক : তিন রকম, ১ ইঞ্চি, ½ ইঞ্চি, টিপ্পেল।'

'রঙ : ক্রুম, পালিশ, ক্রিম, কসিস—কালো হবে দিলে।'

'আচ্ছা, চামড়া কোথায় থেকে আসে?'

'ট্যাংরা, ধাপা, বীরশূলে হাট—চার নম্বর পুলের কাছে। চুনা গলি বা ফিয়ার্স লেনের মুসলমান বা চীনারা আবদারদার। কসাই-খানা থেকে কাঁচা চামড়া এনে তারা নুন মাখিয়ে গোডাউনে রাখে। তাদের কাছ থেকে ট্যানিং-এ চলে যায়। ট্যানারেরা সবাই পাঞ্জাবী হিন্দু। চামড়ার দর হল ৬।৮ টাকা কিলো। ফুট দরে ১·৭৫—২·০০—৩·৫০—৪·০০ পর্যন্ত আছে। লেদার কিড ৪ টাকা থেকে ৬ টাকা পর্যন্ত দর ওঠে।'

'দেশিনি ছাড়া বাড়ি যাও?'

'ছমাস পরে পরে বাড়ি যাই। দেশে মাস দুই করে থাকি। আমার একটা ছেলে দুটো মেয়ে। দাদার দুটো ছেলে তিনটে মেয়ে। যেতে আসতে ৫০ টাকা ভাড়া লাগে। মনি অর্ডারে ২০।২৫ টাকা করে মাসে মাসে পাঠাই। নিজেদের খরচ, মাল কেনা, অসুখ বিসুখ আছে। এখনকার ক্ষেত্রে কিছু কিছু গম-কলাই হয়—সব মেয়েরাই গম কোটে ডাল ভাঙে, যাঁতা ঘুরিয়ে ছাতু কোটে—কষ্টেশিষ্টে চলে যায় বাবু।'

'বউয়ের জন্যে মন কেমন করলে কি কর?'

রামপ্রবেশ লজ্জা পেয়ে ঘাড় চুলকোয়। বলে, 'আমরা তো বাঙালী নই বাবু, আমরা বেহারী। পাথরের মানুষ। তবে বাঙলায় এসে পান্তাভাত খেয়ে খেয়ে মনটা আর শরীরটা নরম হয়ে যাচ্ছে। যখন মনটা উতলা হয়ে ওঠে—খুব হু হু করে—তখন বাল্মীকির রামায়ণ পড়ি। সীতাহরণের পর রামচন্দ্র যেমন সীতার বিরহে বন জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে পাগল হন, আমরাও তেমনি মনের অন্ধকারে বিরহিনীকে তপস্যা করি। পাপ আমরা জানি না। আমরা হরিজন।'

—আবদুল জব্বার

জ্বালানি/ কেন্দ্রীয় গবেষণাগার

যান্ত্রিক সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অত্যন্ত দ্রুতবেগে আর একটি চরম দুর্ভিক্ষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সে দুর্ভিক্ষ খাদ্যের নয়, জ্বালানির। ইউরেনিয়াম থেকে সংগৃহীত তাপ বা বিদ্যুৎ-শক্তির কথা থাক, এমন কি অতি আধুনিক কালে সিলিকন কোষের সাহায্যে পৃথিবীর একটি দেশ সরাসরি সূর্য থেকে যেভাবে বিদ্যুৎ-শক্তি সংগ্রহ করছেন, আপাতত তাদের কথা ধরছি না। কারণ এ দুটি পথ অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তির দিক দিয়ে যেমন ভারাক্রান্ত, কোন কোন ক্ষেত্রে ঝুঁকিও রয়েছে যথেষ্ট। মুখ্যত তাপ এবং বিদ্যুৎ-শক্তির জন্যে চিরাচরিতভাবে মানুষকে যার উপর নির্ভর করতে হয়েছে এবং যার উপর এখনও সে সব চাইতে বেশি নির্ভরশীল, ভূতাত্ত্বিকদের ভাষায় তার নাম জীবাশ্ম জ্বালানি। আমাদের কাছে পরিচয় খনিজ তেল অথবা কয়লা। শুধু শক্তিই নয়, গত তিন দশকে তেল বা কয়লা থেকে হাজারো রকমের রাসায়নিক পদার্থ সংগ্রহ করা হয়েছে। এবং যে হারে তা করা হচ্ছে, তাতে কেউ কেউ মনে করেন, আগামী দু'শ বছরের মধ্যে পৃথিবীর মাটির নীচে সঞ্চিত জীবাশ্ম-জ্বালানির ভাণ্ডার হয়ত একেবারে ফাঁকা হয়ে যাবে।

হিসেবটা করা হয়েছে এইভাবে। বৃহৎ পর্যায়ে শক্তি পরিমাপের জন্যে ইংরেজী বর্ণমালার 'কিউ' অক্ষরটি ধরা হয়ে থাকে। এক 'কিউ' হল ত্রিরিশ বিলিয়ন টন খনিজ কয়লা থেকে গড়ে যতটা উত্তাপ শক্তি পাওয়া যায় তার সমান। একটা হিসেবে বলা হয়েছে, মানব সভ্যতার আদি কাল থেকে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে মোট নয় 'কিউ' পরিমাণ শক্তি। পরবর্তী একশ বছর অর্থাৎ ১৮৫০ থেকে ১৯৫০ এই সময়ে খরচ হয়েছে চার 'কিউ'। ১৯৫০-এর পর সারা পৃথিবী জুড়ে হঠাৎ শক্তির চাহিদা দারুণভাবে বেড়ে যাওয়ায় কেউ কেউ অনুমান করছেন আগামী ২০৫০-এর মধ্যে আরও দশ 'কিউ' পরিমাণ শক্তি খরচ হয়ে যাবে। অথচ সে তুলনায় পৃথিবীর ভাণ্ডারে বর্তমান সঞ্চয় মাত্র সাতাশ 'কিউ'। অবশ্য একথাটা বলছেন অতি-বাস্তববাদী যাঁরা তাঁরাই। যাঁরা কিছুটা আশাবাদী তাঁদের ধারণা, পরিমাণটা আরও কিছু বেশিই হবে। অন্তত দু'শ 'কিউ'।

বিতর্কের কথা থাক। সাধারণের কাছেও এটা আজ পরিষ্কার, দুটি কারণে পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশই আজ খনিজ জ্বালানির শূন্যতার দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এক, জনসংখ্যার বৃদ্ধি। দুই, শিল্পের অস্বাভাবিক সম্প্রসারণ। ফলে সকলেই আজ দারুণ সচেতন। সকলেরই বক্তব্য, শুধু অপচয় রোধ করলেই চলবে না, জীবাশ্ম-জ্বালানির নিকৃষ্টতর অংশকেও যাতে কাজে লাগান যায়, তার চেষ্টা করতে হবে। সুখের বিষয়, ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় জ্বালানি বিষয়ক গবেষণাগার গত এক দশকের কিছু বেশি সময়ে শুধু খনিজ কয়লার উপরই যে সমস্ত মৌলিক গবেষণা চালিয়েছেন, জাতীয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের মূল্য আজ সর্বজন

ধানবাদ জ্বালানি বিষয়ক গবেষণাগারে প্রেসার গ্যাসিফিকেশনের পরীক্ষাধীন ছোট কারখানা বা পাইলট প্ল্যান্ট

স্বীকৃত। কয়লার উপর এ'দের কোন কোন আবিষ্কার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রীতিমত সাড়া জাগিয়েছে।'

ভারতে মাথাপিছু তাপ এবং বিদ্যুৎ-শক্তির খরচ প্রায় ছয় মণ কয়লা পুড়িয়ে যতটা উত্তাপ পাওয়া যায় তার সমান। এখানে উল্লেখ্য, তাপ থেকেই আমরা মুখ্যত বিদ্যুৎ-শক্তি পেয়ে থাকি। জাপানে মাথাপিছু এই হার ১·৭ টন, সোভিয়েত দেশে ৩·৫ টন, বৃটেনে ৫·১ টন, জার্মানি ৪·৩ টন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৮·৮ টন। কেউ কেউ মনে করছেন, বর্তমান শতাব্দীর শেষে ভারতের জনসংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় পঁচানব্বই কোটির মত। তখন মাথাপিছু কয়লার পরিমাণ বাড়িয়ে যদি বছরে এক টনও করা যায়, তাহলে কয়লা পুড়বে প্রায় একশ কোটি টন। তাপ অথবা তাপ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপারে আপাতত আমরা তিনটি সামগ্রীর উপর জোর দিয়েছি সব চাইতে বেশী। কয়লা, ইউরেনিয়াম এবং তেল। এদের মধ্যে কয়লার স্থান প্রথম। শুধু প্রথমই নয়, কয়লা এমন একটি সামগ্রী যা থেকে তাপ ছাড়াও নানা রকমের মূল্যবান রাসায়নিক পদার্থ সংগ্রহ করা যায়।

কিন্তু মুশকিল হল, উপাদানের দিক দিয়ে ভারতের খনিজ কয়লার মান খুব একটা উন্নত ধরনের নয়। জ্বালানি হিসেবে কয়লার মান নির্ভর করে কার্বনের অনুপাতের উপর। ভারতীয় কয়লায় কার্বনের ভাগ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শতকরা সত্তর ভাগেরও কম। এছাড়াও অনাকাঙ্ক্ষিত পদার্থরূপে মিশে রয়েছে নানা-রকম খনিজ সামগ্রী, জল, অক্সিজেন এবং ভস্ম। কোন কোন ক্ষেত্রে এই ভস্মের মাত্রা গিয়ে দাঁড়ায় শতকরা পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ ভাগের মত। কখনও বা আরও বেশি। এক সময়ে এ ধরনের কয়লা ফেলে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। এ ছাড়াও কয়লাকে যথাযথ ব্যবহার করার ব্যাপারে আরও নানা রকম অন্তরায় দেখা দিয়েছিল।

ডঃ আদিনাথ লাহিড়ী

কিভাবে এই নিম্নমানের কয়লাকে কাজে লাগান যেতে পারে, তার উপর নানাভাবে পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন ভারতের কেন্দ্রীয় জ্বালানি বিষয়ক গবেষণাগার। গত পনের বছরে এ'রা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের কয়লার উপর পাঁচ লক্ষেরও বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। জ্বালানি হিসেবে কয়লার উৎকর্ষ বৃদ্ধি এবং কয়লার বিভিন্ন ধরনের উপজাতীয় পদার্থ সংগ্রহের ব্যাপারে এখানকার বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে যে সমস্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তাদের মূল্য সর্বজন স্বীকৃত।

বিশেষজ্ঞদের অভিমত, ভারতে জ্বালানি কয়লার চেয়ে অ-জ্বালানি কয়লার পরিমাণ প্রায় দু-শ গুণ বেশী। অতএব ভবিষ্যতে এদেশের শিল্প সংস্থাগুলির অ-জ্বালানি কয়লার উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় থাকবে না। সম্প্রতি এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে কেন্দ্রীয় জ্বালানি বিষয়ক গবেষণাগারের প্রধান ডঃ আদিনাথ লাহিড়ী মন্তব্য করেছেন, জ্বালানি হিসেবে আমাদের যাবতীয় খনিজ কয়লাকে কাজে লাগানর আপাতত দুটি মাত্র পথ খোলা আছে। এক, খনি অঞ্চলের পাশেই তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদন করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চালান করা। এর জন্যে চাই জ্বালানি কয়লা। দুই, নিম্ন-মানের কয়লা বা অ-জ্বালানি কয়লা থেকে জ্বালানি তেল তৈরি করে কাজে লাগান।

শিল্প সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে জ্বালানি-গ্যাসের চাহিদাও দারুণভাবে বেড়ে গেছে। আধুনিক জীবনযাত্রায় গৃহস্থালীর কাজের জন্যেও এর চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন সারা ভারতে জ্বালানি-গ্যাসের মোট উৎপাদনের পরিমাণ বছরে প্রায় দু'শ কোটি কিউবিক মিটার। আর তার শতকরা পঁচানব্বই ভাগই কাজে লাগাচ্ছেন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি। অবশিষ্ট পাঁচ শতাংশ কলকাতা এবং বোম্বাই-এর অধিবাসীরা।

১৯৫০ সালে ধানবাদে কেন্দ্রীয় জ্বালানি বিষয়ক গবেষণাগারটি যখন প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তারপর থেকেই এখানকার বিজ্ঞানীরা জ্বালানি-গ্যাসের উৎপাদন বাড়ানর জন্যে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষায় হাত দেন। উল্লেখ্য, দুর্গাপুর থেকে জ্বালানি-গ্যাস সরবরাহ করার পরিকল্পনাটি এই গবেষণাগারেই জন্মলাভ করেছিল ১৯৫২ সালে। সম্প্রতি নিম্ন-মানের কয়লা থেকে কম খরচে জ্বালানি-গ্যাস প্রস্তুত করার জন্যে এ'রা কয়েকটি পরীক্ষামূলক উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, সচাপ বায়বীয়করণের পরীক্ষামূলক ধরনে কার-খানাটি। ইংরেজী নাম প্রেসার গ্যাসিফিকে-শন প্লান্ট। এই কারখানার কতকগুলি বিশেষ যন্ত্রপাতি এবং সাজ-সরঞ্জাম আম-দানী করা হয়েছে পশ্চিম জার্মানি থেকে। এর জন্যে খরচ হয়েছে প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা এবং এই টাকার সবটাই সাহায্য স্বরূপ দিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্ত-র্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা বা ইউ এস এ আই ডি। এশিয়ায় এ ধরনের প্রচেষ্টা এই প্রথম। সম্পূর্ণ অ-জ্বালানি কয়লা থেকে এর সাহায্যে উচ্চমানের জ্বালানি-গ্যাস তৈরি করা হচ্ছে, যা গৃহস্থালীর ক্ষেত্রে কাজে লাগান যেতে পারে। এছাড়াও তৈরি করা যাবে আরও নানারকম রাসায়নিক দ্রব্য, যেমন সার, জেট-প্লেনের জ্বালানি প্রভৃতি। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, শিল্প ক্ষেত্রে রূপায়িত হলে এ ধরনের কারখানা ভারতের জ্বালানি সমস্যার অনেকটা সুরাহা করতে পারবে।

বস্তুত কয়লা এবং খনিজ তেল কতকটা যেন সমগোত্রীয়। কয়লা থেকে অক্সিজেন, গন্ধক এবং নাইট্রোজেন অপসারিত করে যদি তার মধ্যে যৎসামান্য হাইড্রোজেন সংযুক্ত করা যায়, তাহলেই

তার রূপান্তর ঘটে খনিজ তেলে। পরে এই এই তেল বিশোধিত করে সহজেই নানা রকমের জ্বালানি এবং রাসায়নিক উপজাতীয় পদার্থ বা বাই-প্রোডাক্টস তৈরি করা তেমন কিছু শক্ত নয়। বিগত বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানরা এইভাবেই কয়লা থেকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রচুর তেল উৎপাদন করে যুদ্ধকালীন চাহিদা মেটাতে সক্ষম হন। তবে পরবর্তী সময়ে দেখা গেছে, পদ্ধতির দিক দিয়ে জটিল না হলেও এইভাবে তেল তৈরি করে যদি জনসাধারণের কাছে যথাসম্ভব কম খরচে সরবরাহ করতে হয়, তাহলে আরও কিছু দক্ষতা এবং বৈজ্ঞানিক খুঁটিনাটি জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। জ্বালানি বিষয়ক গবেষণাগার এ ব্যাপারে মৌলিক গবেষণা করেছেন এবং তাঁদের পরীক্ষাধীন কারখানায় নিম্নমানের কয়লা থেকে গ্যাসীয় এবং তরল জ্বালানি, মূল্যবান রাসায়নিক পদার্থ প্রভৃতি তৈরি করে চলেছেন।

গ্যাসিফিকেশন পদ্ধতিটি এই রকম: নিচুমানের ধুলোর মত কয়লার গুঁড়ো জলীয় বাষ্প এবং অক্সিজেনের সঙ্গে মিশিয়ে একটি চাপসহ সংকর ধাতুর পাত্রের মধ্যে গরম করা হয়। এর ফলে তৈরি হয় দুটি প্রধান সামগ্রী—গ্যাস এবং আলকাতরা যেমন বিভিন্ন তরল পদার্থের মিশ্রণ। এই গ্যাস থেকে পৃথক করা হয় জ্বালানি-গ্যাস, যা গৃহস্থালী বা শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। আর আলকাতরা যেমন বিভিন্ন তরল থেকে তৈরি করা হয় পিচ, ডিজেল, কেরোসিন, গ্যাসোলিন প্রভৃতি জ্বালানি তেল। অন্যান্য উপজাতীয় পদার্থের মধ্যে আছে ফিনোলস, মোম জাতীয় পদার্থ, বিভিন্ন ধরনের অ্যালকোহল, অ্যামোনিয়া এবং নাইট্রোজেন ঘটিত সার। গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য নানা রকমের অনুঘটক বা ক্যাটালিস্টও তৈরি করেছেন এবং এ ব্যাপারে আরও মৌলিক গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চলের কয়লায় যেমন অ-জ্বালানি ছাইয়ের ভাগ বেশি, আসামের বিস্তৃত অঞ্চলে যে কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে, তার মধ্যে তেমনি মিশে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ গন্ধক ঘটিত জৈব-রাসায়নিক পদার্থ। ধুলোমাটি কম থাকলেও এক সময়ে মনে হয়েছিল আসামের এই কয়লা কোন মতেই শিল্পক্ষেত্রে কাজে লাগান যাবে না। প্রথমত, এর প্রজ্জ্বলন ক্ষমতা কম। দ্বিতীয়ত, অতিরিক্ত গন্ধক থাকায় যখনই এই কয়লা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হবে, তখনই এ আংশিক বিক্রিয়া করে যন্ত্রপাতির ক্ষতিসাধন করবে। এমন কি বিদেশী বিশেষজ্ঞরাও মন্তব্য করেন, ভারতীয় কয়লা এত নিম্নমানের যে, তা দিয়ে ব্যাপক শিল্প সম্প্রসারণ করা সম্ভব
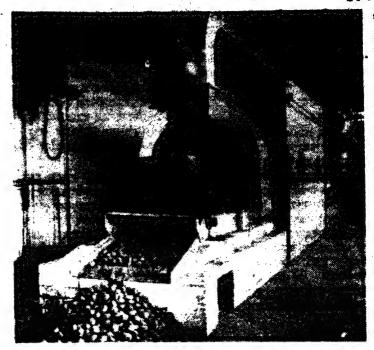
ধানবাদ জ্বালানি বিষয়ক গবেষণাগারে নিম্নমানের কয়লা থেকে তৈরি হচ্ছে বিশেষ ধরণের গ্যাস

নয়। কিন্তু এ ধরনের ভবিষ্যৎবাণী ব্যর্থ করেছেন ধানবাদের জ্বালানি বিষয়ক গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা। এঁরা সম্পূর্ণ নিজস্ব পদ্ধতিতে গবেষণা চালিয়ে প্রমাণ করেছেন, আসাম কয়লার গন্ধককে অনেক সহজেই পৃথক করা যেতে পারে। এবং এই কয়লাকে জ্বালানি তেলে রূপান্তরিত করা আদৌ কঠিন নয়। ডঃ অবিনাশ লাহিড়ী এবং তাঁর সহকর্মীরা ইতিমধ্যে এই কয়লা থেকে তেল এবং অন্যান্য রাসায়নিক সামগ্রী উৎপাদনের উপযুক্ত পরিকল্পনার একটা খসড়া তৈরি করে রেখেছেন, এতে করে আসামের কম ধুলোমাটি এবং প্রচুর গন্ধক মিশ্রিত কয়লা থেকে যতটা জ্বালানি এবং

বেনজিন, টলুয়েন, জাইলেন, ন্যাপথা, ফেনল, ক্রেসল, ইথাইলেন, প্রোপাইলেন, অ্যামোনিয়াম সালফেট, গন্ধক এবং ইলেকট্রোড বা তড়িৎদ্বার তৈরি করার মত প্রচুর কার্বন পাওয়া যাবে, তারা শুধু অর্থনৈতিক দিক দিয়েই লাভজনক হবে না, দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতেও তারা যথেষ্ট সাহায্য করবে।

জ্বালানি গ্যাস ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার মত অবস্থা আমাদের দেশে এখনও প্রায় কল্পকাহিনী। তবু জনস্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে ধানবাদের জ্বালানি বিষয়ক গবেষণাগার তার বিকল্প উপায়ের অনুসন্ধান ব্যাপারেও মাথা ঘামিয়ে আসছেন। নিম্নমানের কয়লা থেকে কার্বন সংগ্রহ করে তার সঙ্গে পরিশুদ্ধ আলকাতরা মাখিয়ে কতকটা 'গুলে'-এর মত এক ধরনের জ্বালানি তৈরি করার কাজে হাত দিয়েছেন এখানকার বিশেষজ্ঞরা। এর জন্যে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি বা সাজ-সরঞ্জাম দরকার নিজেদের চেষ্টায় তাঁরা তা তৈরি করেছেন কোন রকম বিদেশী সাহায্যের দিকে না চেয়ে। কোন রকম যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আমদানী না করে। আপাতত তাদের খুদে কারখানাটি দৈনিক দশ টনের মত বিভিন্ন আয়তনের 'গুলে' উৎপাদন করে চলেছে। এই গুলে ছোট বা মাঝারি ধরনের ধাতব সাজ-সরঞ্জাম তৈরির কারখানায় ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া স্বল্প ব্যয়ে ধোঁয়াহীন জ্বালানি কয়লা উৎপাদনের ব্যাপারেও এঁরা কাজ করে যাচ্ছেন, যা গৃহস্থলীর চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে।

দৃষ্টান্ত অনেক। সম্প্রতি ধানবাদের জ্বালানি বিষয়ক গবেষণাগার দেখে এলাম। এখানকার বিরাট চত্বরের মধ্যে গড়ে উঠেছে ছোট ছোট কারখানার শিল্প সংস্করণ। ভারতের জ্বালানি সমস্যার বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন এখানকার গবেষকরা। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও জ্বালানির চাহিদা দিন দিন বেড়ে চলেছে। এই চাহিদা কিছুটা আঞ্চলিক, কিছুটা সার্বিক। যানবাহন, ট্রাক্টার এবং বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি চালানোর জন্যে আমাদের প্রচুর তরল জ্বালানির প্রয়োজন। তবে খনিজ তেলের সম্ভার এদেশে খুবই সীমিত। অত্যন্ত নিম্নমানের কয়লা, যাকে কখনই সরাসরি জ্বালানি রূপে ব্যবহার করা চলে না, তা থেকে তরল জ্বালানি উৎপাদনের যে অভিনব পদ্ধতি এখানকার গবেষণাগার কাজে লাগানোর চেষ্টা হচ্ছে ভারতীয় জীবনে তার মূল্য অনেক। কয়লা থেকে নানা প্রকার রাসায়নিক পদার্থ তৈরির যে শিল্প কারখানাগুলি এখানে স্থাপিত হয়েছে, ইতিমধ্যে কয়েকটি বৃহৎ উৎপাদক সংস্থা তাদের কাজে লাগাতে শুরু করেছেন। এঁদের পরিকল্পিত পদ্ধতির সাহায্যে অন্ধ্রের কোন একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান এরই মধ্যে ধোঁয়াহীন কয়লা উৎপাদনে হাত দিয়েছেন। বর্তমানে সমস্ত তাপ-বিদ্যুৎ চুল্লীতে আমরা যে জ্বালানি ব্যবহার করছি, তার বেশির ভাগই অত্যন্ত নিম্নমানের কয়লা। যার শতকরা চল্লিশ ভাগেরও বেশি ধুলোমাটি। নিম্নমানের এই কয়লা থেকে তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির ব্যাপারে সব চাইতে বেশি জোরজবরদস্তি করেছিলেন জ্বালানি বিষয়ক গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা। এবং এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন এই গবেষণাগারের বর্তমান প্রধান ডঃ অমিনাথ লাহিড়ী। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক জ্বালানি বিশেষজ্ঞরূপে ডঃ লাহিড়ীর খ্যাতি ইতিমধ্যে বিদেশের অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। জাতীয় গবেষণা এবং জ্বালানি বিষয়ক গবেষণার স্বীকৃতি স্বরূপ ভারত সরকার ১৯৬৯ সালে তাঁকে পদ্মভূষণ উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন।

আমার সঙ্গে এক একান্ত সাক্ষাৎকারে ডঃ লাহিড়ী বললেন, এ পর্যন্ত আমরা যতটা জীবাশ্ম-জ্বালানি অর্থাৎ কয়লা এবং খনিজ পদার্থের সন্ধান পেয়েছি, তা যদি যথাযথ কাজে লাগানো যায়, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে আমাদের দুশ্চিন্তা করার কোন কারণ নেই। আমরা প্রমাণ করেছি, যদি জীবাশ্মের মধ্যে শতকরা মাত্র পাঁচ ভাগও কার্বন থাকে, তাহলেও এই জীবাশ্ম থেকে তরল জ্বালানি আমরা সংগ্রহ করতে পারব। এ ধরনের পরীক্ষায় আমরা সাফল্যও অর্জন করেছি। বর্তমানে এই গবেষণাগারে আবিষ্কৃত কোন কোন পদ্ধতি নিয়ে বিদেশেও যথেষ্ট সাড়া জেগেছে। আমরা পুরোপুরি দেশীয় কৃৎকৌশলের সাহায্যে এবং সম্পূর্ণ দেশজ সামগ্রী দিয়ে কয়লা এবং খনিজ তেল থেকে উন্নত ধরনের জ্বালানি বা বিভিন্ন উপজাতীয় পদার্থ তৈরীর যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম তৈরির চেষ্টা করছি। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় যন্ত্র বিষয়ক গবেষণাগারের সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা চলছে। আপাতত আমাদের লক্ষ্য চারটি: এক, প্রাকৃতিক জ্বালানি সম্পদকে যত বেশী সম্ভব ব্যবহার করার উপায় বের করা; দুই, শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জ্বালানির উৎকর্ষ বৃদ্ধি; তিন, গৃহস্থালীর জন্যে ধোঁয়াহীন কয়লা যাতে ব্যাপকভাবে তৈরি করা যায় এবং কম খরচে জোগান যায় তার অনুসন্ধান; চার, কয়লা বা খনিজ তেলের সম্ভারে উপজাতীয় পদার্থগুলি সহজে এবং কম খরচে যাতে সংগ্রহ করা যায়, তার চেষ্টা করা।

সমরজিৎ কর

উপসর্গ...। ইংরেজি ছন্দের নমুনা হিসেবে যে সমস্ত পদ তুলে দেওয়া হয়েছে, সেগুলোরও অনুবাদ (?) আছে : "Glory strives fame revives—অনুরাগ যত্ন করে/মর্যাদা চেতন হোক।"

পুস্তকান্তে সংযোজিত হয়েছে যথাক্রমে এক, দুই, তিন অক্ষরের ইংরেজি শব্দের এক অভিধান। বানান কিম্ভূতকিমাকার : Brightness দ্বিপ্তি, newness নুতুত্ত, art ত্রেপ্যাতা...; better-এর অনুবাদ ভালোতর। সংজ্ঞার শব্দগুলির মধ্যে কোনো ফাঁক রাখা হয় না : mulberry এক প্রকার বৃক্ষ যাহার আনারসের ন্যায় সুরস। দু-অক্ষরের শব্দের মধ্যে পাই orange [নারেঙ্গীকোমলা] আর তিন-অক্ষরে শব্দের মধ্যে oranges [নারঙ্গীলেবুসকল]। অনেক শব্দের অনুবাদ কেন, যথার্থ সংজ্ঞাও নেই : marquis—রাজমন্ত্রীর নিচের কর্তা; ballad—যৎসামান্য গীত...; mecanick—ক্ষুদ্র, যৎসামান্য, অধম...।

ভূগোল

শ্রীরামপুরে মুদ্রিত 'জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়' বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম ভূগোল (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮১৯)। প্রথম পৃষ্ঠায় লেখক বুঝিয়েছেন "পৃথিব্যপরিস্থাকর্ষণব্যবস্থা"; পুস্তকের শেষ অনুচ্ছেদে তিনি সন্তোষের সঙ্গে জানিয়েছেন : "এখন পৃথিবীর দর্শন সাঙ্গ করিলাম; পৃথিবীর মধ্যে কোন এক দেশ এমত নাই যে তাহার বিবরণ এ পুস্তকে পাওয়া না যায়। এই সকল হইতে আমরা এই২ জ্ঞাত হই যে যেখানে বিদ্যা ব্যাপ্ত আছে এবং ব্রহ্মের সত্য আরাধনা চলে সেখানে লোকেরা উচ্চাভিলাষী ও জ্ঞানী ও প্রবল ও সুখী, কিন্তু যেখানে বিদ্যার অভ্যাস নাই সেখানকার লোকেরা দীন ও হীন ও অসুখী ও দুর্বল।"

'ঈশ্বর' বলতে এই ব্রহ্ম-শব্দের ব্যবহার খ্রীষ্টীয় সাহিত্যের আর কোথাও দেখি নি। খ্রীষ্টকে লেখক [বরং অনুবাদক : "বাঙ্গালি ভাষাতে তর্জমা হইল"] "ব্রহ্মের পুত্র যিশু [যী কিংবা যি নয়—যি] বলেন।

গ্রন্থটি ভূগোল ও ধর্মপ্রচারের এক খিচুড়ি : "ইংলণ্ডীয়েরা পূর্বকালে দেবপূজা করিতেন; খ্রীষ্টের বাক্য সত্যরূপে গ্রহণ করিয়া পৃথিবীর মধ্যে এখন সকল হইতে অতিবড় এবং জ্ঞানবান হইয়াছেন; যদ্যপি তাঁহারা কখনো এই মত ছাড়েন, অন্য দেশের লোকের ন্যায় দুর্বল ও অজ্ঞান হইবেন।"

আমার ইংরেজেতর পূর্বপুরুষের দেশের বিষয়ে লেখক কি বলেছেন তা দেখার কৌতূহল ছিল খুব। বেলজিয়াম তখন নেদর্লণ্ডের অন্তর্গত : "সপ্তমণ্ডলের মত প্রটেস্টন্ত এবং দশ মণ্ডলের মত রোমাণকাতোলিক কিন্তু এই দুই মত পরস্পর অবিরোধে চলিতেছে। দশ মণ্ডলের মধ্যে প্রধান নগর এই ২ ব্রসল্স, গ্যাং, আন্তের্প, মনস ও ওস্তেণ্ড।

আমার নিজের শহরের নাম 'নেমর' [আসলে Namur] পেয়েছি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত 'ভূগোল বৃত্তান্ত'-এ [বিদ্যাকল্পদ্রুমের অষ্টম কাণ্ড, ১৮৪৮]; বেলজিয়াম তখন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত : "ব্রুসেলস বেলজিয়ম রাজ্যের রাজধানী তাহা পরিমাণে বৃহৎ নহে, কিন্তু ইউরোপস্থ অতি শোভাকর রম্য পুরীর মধ্যে গণ্য। বেলজিয়ম-লোকদিগের অধিকাংশ রোমান কাথোলিক ধর্মের অনুষ্ঠান করে কিন্তু তাহারা কোন ধর্মের দ্বেষ করে না। তাহাদের মধ্যে ফ্রেঞ্চ, জর্মান এবং ডচ ভাষা চলিত [এ কথাটা, ১২০ বছর পরেও আমার অনেক বাঙালী বন্ধু জানে না]; তাহারা বিদ্যাশীলনে যথেষ্ট অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকে।"

"বারাসতস্থ বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থে সংকলিত" আর এক 'ভূগোল বৃত্তান্ত'-এ (১৮৫৫) জানতে পারি যে বেলজিয়ামের "কোন কোন স্থান উর্বরা, কোন কোন স্থান নিকৃষ্ট, কিন্তু ইহারা পরিশ্রম ও বিদ্যাসহকারে সকল স্থানই উৎকৃষ্ট করিয়াছে। দেশ মধ্যে গাড়িবিধি জন্য উত্তম প্রশস্ত পথ আছে। চল্লিশ হাজার সৈন্য উপস্থিত আছে। প্রায় নবাংশ লোক শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।"

নাটক

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সম্পদ হল নাটক। 'বেশ্যাসক্তি নিবর্তক' নাটক "কোন সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ বা অন্য কোন ইংরাজী নাটকের অনুরূপ নহে"; 'বারাঙ্গণী-বিলাস নাটক' [১৮৬৭] "কলিকাতাস্থ সুরাপান-নিবারণী সভার বিজ্ঞাপনানুসারে" রচিত; 'নবরমণী নাটক' [১৮৬১,] আসলে নাটকই নয়, "নাগর ও নাগরী প্রণয় প্রসঙ্গ বর্ণন সূচক কাব্য"। 'মনোযাত্রা নাটক'-এর [১৮৬২] নির্ঘণ্টে দেখি : "ক্রোধ ও হিংসার সহিত ক্ষমার যুদ্ধ, ক্ষমা কর্তৃক ক্রোধ ও হিংসার নাশ, শমের হস্তে দেবের ও দুষ্ক্রিয়ার বিনাশ..."

'বিধবাবিকাস নাটক' [১৮৬৪] হল "অধুনা নবীনা বিধবা ললনাগণের বিবাহ প্রথা প্রচলিত না থাকাতে এতদ্দেশে যে সমস্ত দুরদৃষ্ট ঘটিতেছে তাহার যুক্তিসঙ্গত নানাবিধ কারণ প্রদর্শনপূর্বক অতি গোপনীয় সংবাদসহ এতৎ প্রস্তাব"। ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন : "যদিও অনেক নাটক না-টক না-মিষ্ট, এখানিও সেইরূপ না-টক না-মিষ্ট না হইয়া পাঠক বর্গের অরুচির মুখে রুচিজনক হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।"

হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' [১৮৫৩] এবং 'চারুমুখ-চিত্তহারা' [১৮৬৪] যথাক্রমে Merchant of Venice এবং Romeo and Juliet-এর ভাবানুবাদ। প্রথম নাটকে আছে considerable additions and alterations to suit the native taste; "নাট্যাগার কদা উজ্জয়িনী ও কদাচিম্বা গুজরাট দেশে হইবেক"; Shylock-এর নাম "লক্ষপতি রায়, গুজরাট দেশীয় উৎকট কুষীদগ্রাহী কৃপণ মহাজন"। দ্বিতীয় নাটকও 'এতদ্দেশীয় ভাষাপ্রবন্ধ পরিচ্ছদে' প্রস্থাপিত; "রঙ্গভূমি [ভেরোনে ও মান্তুয়া শহরে নয়,] কর্ণাটনগর ও কদা কদা ত্রিবঙ্কুর দেশে।" 'চারুমুখ-চিত্তহারার' সূচনায় সংস্কৃত-নাটক সুলভ সূত্রধারের আবির্ভাব : "অহো! আজি সভার কি চমৎকার শোভা হয়েছে!" 'ভানুমতী চিত্তবিলাস'-এর "নান্দ্যান্তে সূত্রধার নেপথ্যাভিমুখ হইয়া সুপ্রিয়াকে আহ্বান করিয়া কহিলেন : প্রিয়ে......"

'রোমিও এবং জুলিএটের মনোহর উপাখ্যান' অবশ্য "সেক্সপিয়ারকৃত নাটক গ্রন্থের সংগৃহীত ল্যেম্বসকৃত ইতিহাসের গ্রন্থ হইতে" অনূদিত—প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৪৮ সালে। 'বেনিস নগরীর বণিক' লেম্বসটেলের অনুবাদ বেরোয় ১৮৫৩ সালে, রোএর সাহেবের সংকলনে; তাতে আরও স্থান পেয়েছে হেমলেট, মেকবেথ, লিয়র রাজা, বড়দুঃখেতে, ভেনাদের যথেচ্ছা, অকারণ গোলযোগ, শিশির সমাজ রহস্য, নিদাঘ নিশীথ স্বপ্ন বিবরণ।

ফার্স্ট ?

'ব্যাকরণ দর্পণ'-এর [১৮৫২] লেখক বৈদ্য শ্রীনন্দকুমার রায় এই দাবি করেন যে তিনি নাকি পদ্যছন্দে সর্বপ্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেছেন। তাঁর দৃঢ় মত : "পদ্যছন্দ সহজে ধারণক্ষম—অনাধিক আয়াসে অভ্যস্ত ও দীর্ঘকাল পর্যন্ত স্মৃতিপথে আরূঢ় থাকে।" সুধী পাঠক নিজেই পরীক্ষা করে দেখুন : কণ্ঠতালু আদি অঙ্গে আঘাত করিলে রুঙ্গ/শব্দ তার বহুরূপে হয়/সেই শব্দ দ্বিপ্রকার গুণিগণে নাম তার/ধ্বন্যাত্মক বর্ণাত্মক কয়..."অতি সুকুমারমতি শিক্ষার্থী কুমার কুমারীদিগের ইহা একান্ত হৃদ্যতাজনক হইবার সম্ভাবনা।"

"সংবাদ সার" রীভার ভাইজেস্টের আদিপিতা : এতে সংবাদ প্রভাকর, সমাচার চন্দ্রিকা, সমাচার দর্পণ ও জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকায় প্রকাশিত রচনা পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। এদিকে ব্রহ্মানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'চরু বিচার'কে [১৮৫৯] চতুরঙ্গ ও

জাগরীর পূর্বপুরুষ বলা যেতে পারে। তাতে শুনি মাধবের উক্তি, গৌরের উক্তি, গোবিন্দের উক্তি, যাদবের উক্তি: চারজনে যথাক্রমে অদৃষ্টবাদী, গ্রহবাদী, উদ্‌যোগবাদী, ঈশ্বরেচ্ছাবাদী। আলোচ্য বিষয় : "এই অবনীমণ্ডল-নিবাসি মানবগণের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি বলবান, বিদ্বান অথবা বিপুল বিত্তাধিকারী হইয়া সুখে সংসারযাত্রা সুনির্বাহ করিতেছেন, কেহ কেহবা অবল অজ্ঞ ও অধন হইয়া অতি কষ্টে নিকৃষ্টাবস্থায় কালাতিপাত করিতেছেন, ইহার মূল কারণ কি?"

'গৌড়দেশ-চলিত সাধু ভাষায় শ্রীপ্রমথনাথ শর্মণকৃত নববাবু বিলাস নামক গ্রন্থ' [১৮৫৩] কিন্তু কোনো মতেই ফার্স্ট নয়: তার প্রকাশনের ত্রিশ বছর আগে ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ একই নামে এক গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন।

বিবিধ

"কলিকৌতুকেন নাটক গ্রন্থ" [১৮৫৩] "বর্তমান কলিযুগের প্রারম্ভাবধি অদ্য পর্যন্ত লোক সকলের যেরূপ আচার ব্যবহার হইয়াছে তাহা সংশোধনার্থ পরিহাসচ্ছলে" রচিত। 'পঞ্চাশৎ বর্ণ'প্রকাশ গ্রন্থের' [১৮৬৫] "প্রতি বর্ণার্থ সংক্ষেই পরমার্থ বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে।" 'ধাতু-বাক্যদীপিকা' [১৮৫৯] উপজীব্য—ধাতু নিয়ে ক্রিয়া: "ভীমের ভয়ানক ভীরু স্বভাব অভেত্তব্য ভয়ে ভীত হয়েন..."

"ছন্দঃকুসুম"-এ [১৮৬৩] ১৮৩ প্রকার ছন্দোবন্ধ ব্যবহৃত হয়েছে। লেখকের উদ্দেশ্য "সংস্কৃত ছন্দ সকল সাধু ভাষায় ব্যবহৃত হইলে সুললিত এবং সুশ্রাব্য হইতে পারে কি না" যাচাই করে দেখা। এদিকে 'দ্বাদশ শিশুর বৃত্তান্ত'-এ [১৮৬২] পরীক্ষিত হয়েছে দ্বাদশটি ছন্দ: পুরের একাবলী, নিমাইয়ের যমজ ত্রিপদী, বৃষকেতুর তরভী, কচের দ্বাদশাক্ষরী প্রভৃতি ছন্দ। ঐ দ্বাদশাক্ষরী ছন্দ ফরাসি ক্লাসিকাল Alexandrin-র সদৃশ।

'লম্পট চৈতন্যোদয়'-এর [১৮৬১] বৈশিষ্ট্য বক্তব্যে ততটা নয় যতটা বিন্যাসে: কাব্যটির প্রতিটি লাইনের মধ্যে এক-একটি পয়ার কিংবা ত্রিপদী সীমিত: কোনো লাইন ছোট-বড় নয়, কোথাও কোনো ফাঁক নেই। ওরকম ঠাসা বুনুনি বাংলা সাহিত্যে কি আর কোথাও মেলে?

এমন বই আছে যাদের প্রধান আকর্ষণ হল পুস্তকান্তে সংযোজন, যেমন ১৮২০ সালে ক্ষুদ্র অস্পষ্ট অক্ষরে মুদ্রিত উইলিয়ম কেরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ফেলিকস-রচিত 'ব্রিটিশ দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়ের' ১৯ পৃষ্ঠাব্যাপী শব্দকোষ: Chevalier ঘোটকারূঢ় কুলীন: Lieutenant প্রথম যোদ্ধ্যপদস্থ...; কিংবা রবিনসনের 'ইতিহাসের ব্যাকরণের' বিরাট অক্ষরে মুদ্রিত বঙ্গানুবাদে [১৮৩২] সেই 'বৃহৎ ২ ঘটনা সম্বন্ধীয় কালের সংক্ষেপ বিবরণ' জগৎ পত্তন থেকে ["ক্রাইস্টের জন্মশকের পূর্বে: ৪০০৪, পৃথিবীর সৃষ্টি ও আডাম ও ইবের জন্ম হয়; ৪০০২; স্ত্রীলোকের গর্ভে প্রথমোৎপন্ন বে কেন্ তাহার জন্ম হয়: ২৩৪৮, সর্বসাধারণ জলপ্লাবন হয় এবং নোয়া ও তাহার পরিবারেরা ডিঙা আরোহণপূর্বক রক্ষা পান...] ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত: "বিউনস আয়রস ও চিলি এবং বিনিজিউলা নামক স্থানে সাধারণ কর্তৃক রাজশাসন সংস্থাপন হয়।"

'রসিকসন্ধুপ্রেমবিলাস'-এ [১৮৫২] লেখক ও যন্ত্রালয়ের নামের সঙ্গে পুস্তকান্তে দেওয়া হয়েছে সম্পূর্ণতম তারিখের উল্লেখ: "সন ১২৫৯ সাল, তাং ১৮ বৈশাখ গ্রন্থ সমাপ্ত—বেলা আন্দাজ ৪টা..."

আবার কখনো বা ক্ষুদ্র একটি ফুটনোটে চোখ পড়ে; আনন্দিত বিস্ময়ে আমার মন সমর্থন জানায় লেখকের বক্তব্যের প্রতি: "এতদ্দেশীয় মিসনরি সাহেবেরা অনেক পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু হেনা কেথারাইন মলেন্সের 'ফুলমণি এবং করুণা' নাম্নী শুদ্ধ প্রণালীযুক্ত বাঙ্গালা পুস্তক তাঁহাদের একখানিও হয় নাই" [বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের সর্বজনপ্রিয় 'সুশীলার উপাখ্যান'-এ (১৮৬০) পাদটীকায় লেখক মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের অভিমত]।

মুসলমানী বাংলা

মুসলমানী বাংলা আমি বুঝি না [দেশে বিদেশে শেষ করতে যা বেগ পেতে হয়েছিল]। রেভেরেণ্ড W. Goldsack-এর অভিধানের সাহায্য নিয়েও না।

মুসলমানের যাবতীয় প্রাচীন রচনা—পিছন দিক থেকে মুদ্রিত হলেও—যে দুর্বোধ্য হবেই এমন নয়। ধরুন "শ্রীসমছদ্দিন ছিদ্দিকি খোনকার কৃত" সেই 'ভাবলাভ শুরুতজান'; বন্দনাতে শুনি "প্রথমে তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া/কলমেতে লিপি করি মনে বিচারিয়া/একেলা সেজন তার নাম নিরাঞ্জন/নৈরাকার বলে তারে সকল সুজন/আকার প্রকার নাই, নাই তাঁর মাতা/ভাই নাই ভগিনী নাই পুত্র নাই পিতা..." গল্প তেমনি সহজ সরল ভাষায় রচিত: "কাশ্মীর মুলুকেতে, নৃপ এক ছিল তাতে/যত রাজা প্রজা তার হয়ে/এই ছিল তার ভালে কর দিত সবে মিলে/সুখে ছিল আনন্দ হইয়ে...।"

'গোলে দেওগান্ধর' [১৮৫৩] অনেক বেশি দুরূহ। এতে অনেক স্থলে দাঁড়ির জায়গায় দেখি তারকা-চিহ্ন। নামপত্র আমার ধাঁধার মতো লেগেছিল: কত অভিধান ঘেঁটে, কত সহৃদয় বন্ধুর বাড়িতে শরণার্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত বুঝেছিলাম। পাঠকের পরীক্ষা নেওয়ার বড় ইচ্ছা করছে: শুনো জতো বেরাদর য়ারোজ আমার * তরজমা করিয়া কেচ্ছা ফিরোজ সাহার * গোলে দেওগান্ধা বলে রাখিলাম নাম * বহোত মজগল বাত এহাতে তামাম * আসোক ফিরোজ মাশুকানের সাহিতে * হাছেল করিলো কুম জের ছাই ছরতে * মহোব্বতানি মালুফাজেতে বাঙ্গলা বয়ানে * লিখীনু কএক জুজ কেতাবের গানে মুন্সি এতেজাম মিঞা করিলেন ছাহি * বাদে ছাপাইয়া দিনু মাদোতে এলাহি * এই কেতাবের জিনি খাহেন্দা হইবে * নজদিগে রাইলে মেরা কেতাব পাইবে * লোভা বাজারের বিচে চৌরাহার কোণে * ঠৈকানা জানিবে মেরা কাপোড়ের দোকানে * খেদমতে খাদেম লেখনা এনয়া নাম * পরগানে বালিয়া আকি মোকাতে।

অবশ্য এঁরা তো আর আমার মতো সাত সাগর তেরো নদী পারের মানুষদের কথা সাহিত্য-রচনা করতে বসেন নি। যদিও কেউ কেউ তা বসেছেন। 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর ইংরেজি ভূমিকায় টেকচাঁদ জানিয়েছেন যে, "এ কাহিনী সরল ভঙ্গিতে লিখিত হয়েছে; যেসব বিদেশী বাংলা দেশে চলিত ভাষা তথা হিন্দু সংসারজীবনের সঙ্গে পরিচিত হতে চান, তাঁদের উপকারে আসতে পারে।"

...তবে, 'আলালের ঘরের দুলাল' আমি পড়ি নি, পড়েছি অবনীন্দ্রনাথ ও সুকুমার রায়, পরশুরাম ও মুজতবা।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

নেপালের সঙ্গীতধারা

নগাধিরাজ হিমালয় দুহিতা নেপাল। নিসর্গ নিরুপমা।

উত্তর সীমানায় চিরতুষারমণ্ডিত মহিমময় হিমগিরি। আকাশস্পর্শী তার শৃঙ্গের পর শৃঙ্গে পৃথিবীর শীর্ষ দেশ। উত্তুঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘা, এভারেস্ট, নন্দাদেবী, মাকালু প্রভৃতি। বিশাল ধবল কান্তি, অতন্দ্র প্রহরীর শ্রেণী যেন।

দক্ষিণে পর্বতাবলীর শ্যামল সানুদেশ। দশ ক্রোশ পরিধির বেষ্টনী তরাই অঞ্চল বা পাহাড়তলি। ভারতের সঙ্গে ভৌগোলিক সীমাচিহ্ন রচনা করেছে। সে রেখার দক্ষিণে ভারতবর্ষের সমতলক্ষেত্র গিরিকন্যার দৃষ্টির সামনে প্রসারিত।

হিমাচলের ক্রোড়ে প্রাচীন পার্বত্যরাজ্য নেপাল। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ২৭৫ ও ৫৫ ক্রোশ। শীর্ষে তুষার কিরীটিনী। চরণ নিম্নে বনানীর শ্যাম ছায়া। এই তরাইভূমি বুদ্ধদেবকে লাভ করে বিশ্ববন্দিত। নেপাল রাজ্যের এক পঞ্চমাংশ এই তরাই সবচেয়ে উর্বর কৃষিক্ষেত্র।

চারটি প্রধানা স্রোতস্বিনী। কেন্দ্রে গণ্ডক। পশ্চিমে কর্ণালি। উপত্যকা অঞ্চলে বাগমতী এবং পূর্বভাগে কোশি।

এই অনন্য প্রাকৃতিক পরিবেশে নেপাল আত্মস্বতন্ত্র। গহনগিরি কান্তার তার মহিমা অক্ষুণ্ণ রেখেছে সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক-কাল যাবৎ। বিদেশী আক্রমণের বিপর্যয় ভোগ করতে হয়নি।

বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে নেপাল স্মরণাতীতকাল থেকে বিচ্ছিন্ন। জগতের রাজনৈতিক ঘনঘটা আলোড়ন আনেনি তার নিস্তরঙ্গ জীবনে।

তবে তার এই স্বাতন্ত্র্য শুধু ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেই। জাতি-গত ভাবজীবনে নয়। এক্ষেত্রে তার নিকট প্রতিবেশীদ্বয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ।

জাতীয় আচার আচরণে, ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধ্যান ধারণায় কিংবা শিল্পমানস ভাবনায় নেপাল বিযুক্ত থাকেনি। তিব্বতের সঙ্গে, বিশেষ ভারতের সঙ্গে তার আত্মিক, মানসিক সংযোগ বহুদিনের।

নেপালের নেওয়ারদের সঙ্গে তিব্বতী-দের ভাষার সম্পর্ক কিংবা তন্ত্রধর্মের আদান প্রদান লক্ষ্য করবার মতন। কিন্তু সেসব বিষয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক। ভারতের সঙ্গীতধারার সঙ্গে নেপালের সংস্পর্শ আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গ। ব্যাপক ভারত-নেপাল সম্বন্ধের যা একটি স্মরণীয় অধ্যায়।

নেপালের ধর্ম, সাংস্কৃতির অনেকখানি স্থান অধিকার করে আছে ভারতবর্ষের প্রভাব। আর তার একটি বড় অংশ সঙ্গীত, যা বৃহত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ। অঙ্গ ভারতীয় সঙ্গীত-পরম্পরা নেপালে অনুকূল ক্ষেত্র লাভ করে।

নেপালের সঙ্গীতধারা, বিশেষ তার দরবারী সঙ্গীতের কথা বলবার আগে উল্লেখ করে নিতে হচ্ছে ধর্মসংস্কৃতির প্রসঙ্গ। কারণ ভারতের মতন নেপালেও ধর্মসংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গীত বিজড়িত হয়ে আছে। সুদূর অতীতে ভারতীয় সঙ্গীত চর্চার প্রসঙ্গে যেমন ধর্মচর্চা সম্পর্কযুক্ত, তেমনি নেপালেও। ধর্ম, সংস্কৃতির সঙ্গে সংপৃক্ত হয়ে ভারতীয় সঙ্গীত এই পার্বত্য রাজ্যে স্থান করে নেয়।

অযোধ্যা, উত্তর মিথিলা ইত্যাদি অঞ্চলের একাধিক পথে প্রাচীনকাল থেকে ভারতের সঙ্গে নেপালের সংযোগ। সেজন্যে যুক্ত-প্রদেশ, বিহার ও বাংলা অর্থাৎ উত্তরপূর্ব ভারতের এই বৃহৎ ক্ষেত্র নেপালের সঙ্গে ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির আদান প্রদানের এক একটি কেন্দ্র হয়েছে।

নেপালের ধর্মজগতে দুটি প্রধান ধারা—বৈদিক-ক্রিয়াকাণ্ড অনুসারী সনাতনী হিন্দুদের ধর্ম এবং বুদ্ধদেব প্রবর্তিত ধর্ম।

সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে এই দুই সংস্কারের প্রভাবে দুটি বিভাগ লক্ষ করা যায়। গোর্খা, মগর, গুরুং প্রভৃতি জাতি হিন্দু। তাদের ধর্মাচরণ, আচার অনুষ্ঠান, জাতিভেদ প্রথা, জল চল ইত্যাদি ভারতের হিন্দুদের মতন। গোর্খা-দের ভাষার লিপি দেবনাগরী।

অপরপক্ষে নেওয়ার, লিম্বু, কিরাতী, ভোটিয়া প্রভৃতি জাতির লোক বৌদ্ধ। ধর্মীয় চেতনায় ও পালনে প্রথমোক্তদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য জাতিভেদহীনতায়।

পূর্ব ভারতের বিশেষ বাংলার মতন নেপালের বৌদ্ধধর্মের একটি বড় দল তন্ত্রের খাতে বয়ে যায়। সে জটিল প্রক্রিয়ার আলোচনা এখানে অপ্রয়োজনীয়।

শুধু উল্লেখ করা যায় যে, শৈব, গাণপত্য, নাথপন্থী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব থাকলেও নেপালের ধর্মচর্চার দুটি প্রধান বিষয়—নিগম ও আগম। নিগম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য সংস্কার পোষিত ধ্যান ধারণার ক্ষেত্র হয় কাশীক (পোখরা)—বেদচর্চা মুখরিত, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রধান কেন্দ্র। আর আগম অর্থাৎ তন্ত্রের পীঠস্থান—কাঠমণ্ডু।

নেপালে শাস্ত্রাদি চর্চার সঙ্গে সঙ্গীত অনুশীলনের জন্যেও প্রাচীনকাল থেকে কাসকি (পোখরা) বিখ্যাত হয়ে আছে। বেদজ্ঞ পণ্ডিত অধ্যুষিত এই ভূমি থেকে হিমালয়ের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান মুক্তিনাথ তিন ক্রোশ মাত্র। পরম রমণীয় সে তীর্থের অবস্থান। নীচে তার নয়নানন্দ উপত্যকার শ্যামলিমা আর চতুর্দিকে হিমালয়ের অনন্ত শুভ্রতা। সেই দুর্গম তীর্থের পথে কাসকি। এখানে যেমন মুক্তিক্ষেত্র, দামোদর ক্ষেত্রের পথ আছে, তেমনি সঙ্গীত লোকের মার্গও।

তবে নেপালের সঙ্গীতকেন্দ্র হিসাবে কাসকির চেয়ে কাঠমণ্ডুর স্থান আরো ঊর্ধ্বে। কারণ নেপালের শ্রেষ্ঠ নগর কাঠমণ্ডু বা কান্তিনগর রাজধানীর গৌরব দীর্ঘকাল লাভ করে সঙ্গীত চর্চারও শীর্ষস্থান হয়। বিশেষ দরবারী সঙ্গীতের। সেসব কথা পরে উল্লেখ করা হবে।

কাঠমণ্ডুর এক ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্বে ললিতপুর বা পাটান। ললিতপুর অর্থে সৌন্দর্যের নগর। নেপালে বৌদ্ধ সংস্কৃতির এক প্রধান কেন্দ্র ললিতপুর। মন্দির চৈত্য প্রভৃতি স্থাপত্যের নিদর্শনে সমৃদ্ধ এই নগর প্রাচীন নেপালী সভ্যতার স্মারক। এখানকার বহু মঠ মন্দিরের মধ্যে মৎস্যেন্দ্র-নাথের মন্দির সবচেয়ে বৃহৎ এবং শ্রেষ্ঠও। ১৪০৮ খৃঃ স্থাপিত এই মন্দিরের আভ্যন্তরীণ মর্মর কারুকর্ম অসামান্য নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। মৎস্যেন্দ্রনাথের বিগ্রহ লাল কাঠের তৈরি। বৌদ্ধ হিন্দু নির্বিশেষে সকলের পূজা পান মৎস্যেন্দ্রনাথ। নেপালে নাথ যোগী তথা বজ্রযান ও সহজযানের

বৌদ্ধাচার্যদের প্রভাব প্রতিপত্তির কথা পরে আলোচ্য। সে প্রসঙ্গে সঙ্গীতও থাকবে।

নেপালের যে রাজধানী ও প্রাচীন বাণিজ্য-কেন্দ্র কাঠমণ্ডু নামে বাইরের জগতে প্রসিদ্ধ, তার প্রকৃত নাম কান্তিপুর। কাঠমণ্ডু নামটি প্রচলিত হয়ে পড়ে ১৫৯৬ খৃঃ থেকে। ওই বছরে নগরের কেন্দ্রস্থলে সাধুদের জন্যে কাঠের একটি মণ্ডপ প্রস্তুত করা হয় এবং তাই থেকেই এই নামকরণ।

বহু কালের নগর কান্তিপুর। রাজা গুণকামদেব ৭৩৬ খৃঃ পত্তন করেছিলেন এই নগর বিষ্ণুমতী ও বাগমতী নদীর সঙ্গম-স্থলে। হিমমৌলির মুকুট ধারণ করে কান্তিপুরও তুষার রাণীর বৈভবে গৌরবান্বিতা। তার নৈসর্গিক সৌন্দর্যও যেন বিশাল চিত্রপটে সুনিপুণ তুলিকায় আঁকা।

নেপালে দরবারী সঙ্গীতেরও পীঠস্থান কান্তিপুর। কারণ রাজ্যের বৈভব সঙ্গীত দরবার ছিল এখানেই। সেই সব বহু মূল্য প্রাসাদ রাজন্যবর্গের ও প্রধানমন্ত্রী রাণাদের। এখন যা নেপাল সরকারের কেন্দ্রীয় কার্যালয় তা বিপুল অভ্যন্তর সিংহ দরবার। রাণা প্রধানমন্ত্রীদের সরকারী প্রাসাদ। সে প্রাসাদ ছিল সুবিন্যস্ত সব কক্ষ, অলিন্দ ইত্যাদির মনোরম পরিবেশে। প্রাঙ্গণে দর্শনীয় বিশাল সরোবর-উদ্যান। সেখানে সুদৃশ্য চিত্রাবলী, নানা মূর্তি, বৃহৎ খচিত দর্পণ, সিংহাসন। মর্মর গৃহতলে দুর্মূল্য বিদেশী আসবাব, কার্পেট, চীনামাটির বাস্তুপকরণ। ছাদ থেকে ঝুলন্ত অসংখ্য আলোর বিরাট ঝাড়। আলোকিত হলে অতি আড়ম্বরপূর্ণ দৃশ্য।

এই ধরনের বহু দরবারে দীর্ঘকাল ধরে সঙ্গীতের পরিমার্জিত পরিবেশ রচিত হত। রাণা দরবার। নারায়ণ হিটি। শ্বেত দরবার। লাল দরবার। প্রধানমন্ত্রীদের দরবার। রাজাদের দরবার।

এমনি সব দরবার মুখরিত হয়েছে শ্রেষ্ঠ ভারতীয় কলাবিদদের কণ্ঠসঙ্গীতে, যন্ত্র-সঙ্গীতে। পরবর্তী নর্তকীদের ছন্দিত কলস্বরে।

আজ থেকে দু'শ বছর আগে বিক্রম শাহ উপাধির গোর্খালি রাজাদের পূর্বপুরুষ গোর্খা থেকে অভিযানে এসে কাঠমণ্ডু জয় করেন। তার আশি বছর পরে রাণা উপাধি-ধারী প্রধানমন্ত্রী সর্বেসর্বা হন নেপাল রাজ্যের। সঙ্গীত দরবারের পত্তন এই রাজবংশ ও প্রধানমন্ত্রী বংশীয়দের আমলে। নেপালে ভারতীয় দরবারী সঙ্গীতের ঐতিহ্য গত দুই শতকে ধরা। হিন্দুস্থানী কলাবতদের আগমন সেখানে তার আগে তেমন হত না, বলা যায়।

এই দু'শ বছরের আগে কাঠমণ্ডুতে ও বৃহত্তর নেপালে ছিল মল্ল রাজাদের রাজত্ব। তাঁরা জাতিতে নেওয়ার। তাঁদের অনেকে সঙ্গীত ও নাটকপ্রেমী ছিলেন। কেউ বা সঙ্গীতজ্ঞ ও নাট্যকার থাকবার কথাও জানা যায়।

রাজা যক্ষ মল্লদেবের মৃত্যুতে রাজ্যটি ভাগ করে নেন তাঁর পুত্রেরা। এমনিভাবে ১৫ শতকের শেষ থেকে উত্তর নেপালের রাজধানী হয় কাঠমণ্ডু। দক্ষিণ নেপাল বা মোরঙ্গ দেশের রাজধানী হল ভাতগাঁও বা ভক্তগ্রাম বা ভক্তপুর। আর একটি রাজ্যও স্থাপিত হয়েছিল—ললিতপুর বা পাটান।

বাংলার সঙ্গে নেপালের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ মল্ল রাজাদের আমলে কত ঘনিষ্ঠ ছিল বাংলা ভাষা এবং বাংলায় প্রচলিত কথা-কাহিনী এই পার্বত্য রাজ্যে কত সমাদৃত হত তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। নাটক ও গানের এখানে বিশেষ স্থান।

এই সব আঞ্চলিক রাজাদের আনুকূল্যে সাহিত্য রচিত হত। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ১৭ থেকে ১৮ শতক পর্যন্ত মল্ল রাজাদের দরবারে অব্যাহত ছিল বাংলা সাহিত্যের চর্চা। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখ করতে হয় নাটকের—যেমন ধর্মগুপ্তের রামাঙ্ক নাটিকা। সংস্কৃত প্রাকৃতে লেখা এই নাটকের শেষে চারটি অঙ্কের বিষয়বস্তু দেওয়া আছে বাংলায়।

ভাতগাঁওয়ের ত্রৈলোক্য মল্লদেবের আমলের (১৬ শতকের শেষ ও ১৭ শতকের প্রারম্ভে) 'কৃষ্ণলীলা' নাটকের কথা বলা যায়। নাটকটির ভিতরে আছে বাংলা ও মৈথিলী ভাষার গান।

ত্রৈলোক্য মল্লদেবের পুত্র জগজ্জ্যোতি মল্লের নামে পাওয়া যায় হরগৌরী নাটক। তাতেও একাধিক বাংলা ভাষার গান আছে।

জগজ্জ্যোতি মল্লের পুত্র জগৎপ্রকাশ মল্লের নামেও যে নাটক পাওয়া গেছে তার মধ্যেও দেখা যায় বাংলা গান।

জগৎপ্রকাশ মল্লের পুত্র জিতামিত্র মল্ল 'গোপীচন্দ্র' ও 'মদালসাহরণ' নাটক দুটি রচনা করেছিলেন।

ললিতপুরের রাজা সিদ্ধি নরসিংহদেব, কাঠমণ্ডুর রাজা কবীন্দ্র প্রতাপমল্ল, রণজিত মল্ল প্রভৃতির ভাষা গান রচনার কথাও স্মরণীয়।

এই সব ভাষা গানের মধ্যে মৈথিলী ও পূর্বী হিন্দী (তুলসীদাসী) যেমন আছে, তেমনি বাংলা গানও।

নেপালে বাংলার সঙ্গীত ও সাহিত্যের প্রসারের এ হল একটি দিক। মল্ল রাজাদের দরবারে রচিত নাটক ও গানে বাংলা ভাষার নিদর্শন।

কিন্তু নেপালের বৃহত্তর জনজীবনে, ধর্মীয় ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বাংলার সম্পর্ক আরো ব্যাপক। আরো প্রাচীনও।

সে প্রসঙ্গ আরম্ভ করার আগে, মল্ল রাজাদের প্রাচীন প্রাসাদের উল্লেখ করে নেওয়া যাক। রাজ দরবার ও রাণা দরবারের কথায় এসে পড়েছিল মল্ল রাজাদের এবং তাঁদের রাজসভায় বাংলা গানের কথা। যে দরবার গৃহে তাঁদের সেসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হত তার কিছু বিবরণ দিয়ে মল্ল রাজাদের প্রসঙ্গ শেষ করা হবে।

তাঁদের আমলের সেই রাজপ্রাসাদ হনুমান ঢোকা (তোরণ) নামে সুপরিচিত। কাঠমণ্ডুর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এই বিশাল হর্মই ঐতিহ্যময় প্রাচীন নেপালী রাজভবন। সেকালের দরবার আসর সব এখানেই হত দীর্ঘকাল যাবত। কিন্তু হনুমান ঢোকা একটি মাত্র প্রাসাদ নয়, একটি দরবার অঞ্চল বলা যায়। প্যাগোডার আকারে গঠিত সৌধাবলী। সূক্ষ্ম কারিগরির সঙ্গে নানা স্থাপত্য সৌকর্যের প্রকাশ আছে সেসব প্রাসাদে। মসৃণ প্রস্তর ও দারুকর্মের শোভন গঠনশৈলী যেমন, তেমনি স্বর্ণবর্ণের পাতে সমুজ্জ্বল ধাতুকার্যও দেখবার বস্তু।

হনুমান ঢোকার মূল প্রাসাদের নামকরণ হয়েছে তোরণে বীর হনুমানের বিরাট রক্ত-বর্ণের প্রতিমূর্তিটির জন্যে। দরবার স্কোয়ারের কালভৈরবের বিশাল মূর্তি ভীতির উদ্রেক করে। এ সবই তান্ত্রিক মানসিকতার প্রতিফলন। কারণ মল্ল রাজারা ছিলেন তান্ত্রিক। নেপালে প্রাচীন কালগত তান্ত্রিকতার প্রাবল্য রাজাদের আনুকূল্যে প্রাসাদেও প্রকট। তাই হনুমান ঢোকা সৌধের মধ্যে ইতস্তত অতি শক্তিমন্ত সব মূর্তি আকীর্ণ। নানা গুপ্তপথ অজ্ঞাত অভ্যন্তরে নিয়ে যাবার জন্যে প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে সমস্ত আরও শুধু রহস্যজনক নয়, ভীতিপ্রদও।

প্রাসাদের কোন ছাদে নাকি বহু কাল আগে রাজাদের শ্মশান ছিল। সেখানে সে যুগে দেখা যেত অদ্ভুত আকারের সব নর-কপাল। বীরাচারী তন্ত্রের পরিবেশ। তখন-কার কালেই এখানে যে কত তান্ত্রিকতার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে ঘটে যায়, সেসব এখন লুপ্ত অতীত কাহিনী। শুধু আছে কিছু প্রতিস্মৃতি। যথা—একজন তান্ত্রিক সাধক নৃসিংহদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা ও পূজো-সাধনা করে অতি শক্তি-শালী হয়েছিলেন। তারপর সেই সাধকের ক্ষমতা হ্রাস করে জাগ্রত দেবতা নৃসিংহদেবের প্রভাব কাটাবার জন্যে আর একজন স্থাপন করেন হনুমান বিগ্রহ। আবার হনুমান-সেবক শক্তিশালী হয়ে উঠলে তার প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ করবার জন্যে মহাকালের অতিকায় প্রতিমূর্তি যথাবিধি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এইভাবে চলেছিল এক কালের হনুমান ঢোকায় শক্তিসাধনার দ্বন্দ্ব প্রতিদ্বন্দ্ব। তার স্মারক-রূপে অদ্ভুত মূর্তিগুলি মাত্র রয়ে গেছে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, মল্ল রাজাদের পরাস্ত করে কাঠমণ্ডুর সিংহাসন অধিকার করেন গোর্খা নিবাসী রাজপুত বংশীয় রাজা। এখন লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, মল্ল রাজারা তান্ত্রিক ভাবাপন্ন থাকায় এবং

রাজধানী কাঠমণ্ডুতে, বিশেষ প্রসাদে তন্ত্রের গভীর প্রভাবের ফলে নতুন রাজবংশও তান্ত্রিক হয়ে পড়েন। সুতরাং তন্ত্রের ধারা এখানে অব্যাহত থাকে প্রাচীন কাল থেকে।

নেপালে তন্ত্রের প্রসঙ্গ কিছু বিস্তারিত বলবার কারণ—নেপালের সঙ্গে বাংলার ধর্ম সংস্কৃতির গভীর যোগ তন্ত্রের মাধ্যমেই বেশি ঘটে। এবং এ ক্ষেত্রে সঙ্গীতের স্থান অনেকখানি, যেহেতু এই বিশেষ পর্যায়ের সঙ্গীত ছিল সেকালের সুপ্রচলিত চর্যাগীতি। বাংলা দেশের এগারো বারো শতকের চর্যাগান নেপালে তান্ত্রিকতার অনুকূল পরিবেশে নেওয়ারদের মধ্যেও প্রসার লাভ করে। নেপালের সাংগীতিক ক্ষেত্রে এইটিই বাংলার ঐতিহাসিক ও প্রথম অবদান।

প্রসংগত বলা যায় যে, নেওয়াররাই নেপালের আদি অধিবাসীদের মধ্যে প্রধান অংশ। উপত্যকায় তারাই সংখ্যাগুরু। কারুকর্মে নৈপুণ্য তাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য। জাতিসূচক নেওয়ার শব্দটিও নেপালের সঙ্গে সম্পর্কিত। নেপাল-নেওয়াল-নেওয়ার। আর তাদের ভাষা নেওয়ারী। সেই নেওয়ারদের মধ্যে বাংলার চর্যাগান প্রচলিত ছিল আজ থেকে প্রায় আট শ' ন'শ' বছর আগে। তখনকার ও পরবর্তী কিছু কালের নেপালের সঙ্গীত জগতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্থান চর্যাপদের। সেকালের বাঙালী বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের রচিত চর্যাগীতি। তা লোকসংগীত নয়; প্রবন্ধ সঙ্গীতেরই একটি প্রকার।

চর্যাগান বাংলার সঙ্গে নেপালকে ঘনিষ্ঠসূত্রে যুক্ত করেছিল। এই যোগাযোগের আর এক নিদর্শন এই যে, আধুনিক কালে বাংলা চর্যাগানের পুঁথি প্রথম নেপাল দরবার থেকেই আবিষ্কার করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

শুধু যে মুসলমান আক্রমণের ধ্বংস থেকে রক্ষা পাবার জন্যে ভারতের নানা মূর্তি, পুঁথি, চিত্রাদি শিল্পসম্পদ নেপালে আশ্রয় নিয়েছিল, তা নয়। ধর্ম সংস্কৃতির পরিবেশও অনেকখানি অনুরূপ ছিল নেপাল ও পূর্ব ভারতের, বিশেষ বাংলা ও মিথিলার। তাই সেকালের চর্যাগানও নেপাল পরিক্রমা করে।

লুইপাদ, কাহ্নুপাদ, ভুসুকুপাদ, কঙ্কনপাদ, সরহপাদ প্রভৃতি সিদ্ধাচার্যদের রচনা এইসব চর্যাগান ছিল তাঁদের সম্প্রদায়ের সাধন সঙ্গীত। চর্যাগীতির ভাষা পরবর্তী কালের বাংলার মতন নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেনি। তুলনায় অনেকটা তরল ছিল। সে জন্যে উড়িয়া, মৈথিলী, হিন্দী-ভাষী প্রভৃতিরাও তাদের ভাষা হিসাবে দাবি করে চর্যাপদগুলিকে। কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ এই চর্যাগানকে হাজার বছর পূর্বের বাংলা ভাষার নিদর্শনরূপেই সিদ্ধান্ত করেছেন। যা হোক, এইসব চর্যাগান নেপালেও গাওয়া হত রীতিসম্মতভাবে। নেপালের সঙ্গীত ধারার এ এক স্মরণীয় অধ্যায়।

নেপালে চর্যাগান বৌদ্ধ সম্প্রদায় বিশেষ বেশি গাইতেন। তাঁদের শুদ্ধ নাম 'বন্দ্র'—বন্দনা করা যাঁদের কাজ। বন্দ্র থেকে ক্রমে 'বন্দ' ও শেষে 'বাঁড়' নামে তাঁরা চলিত হন।

বাংলাতেও চর্যাগুলি বৌদ্ধ সহজিয়া মতের বা বৌদ্ধধর্মের সহজযানী ও বজ্রযানী শাখার সিদ্ধাচার্যদের গান এবং এইসব গানের ভাষা সাংকেতিক। একটি আপাত অর্থের আড়ালে সাম্প্রদায়িক গুপ্ত সাধন ভজনের ইঙ্গিত ও দর্শন নিহিত আছে। এ জন্যে গানগুলিকে বলা হয় 'সন্ধ্যা ভাষা'। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এ সম্পর্কে বলেছেন—'সন্ধ্যা ভাষার মানে আলো-আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার; খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না।' উদাহরণস্বরূপ চাটিলপাদের রচনা একটি চর্যাগান ও তার ভাবানুবাদ এখানে দেওয়া হল—

রাগ গুর্জরী

ভবনই গহন গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দুআন্তে চিখিল, মাঝে ন থাহী॥
ধামার্থে চাটিল সাংকম গঢ়ই।
পারগামি লোঅ নিভর তরই॥
ফাড়িঅ মোহতরু পাটি জোড়িঅ।
অদঅ দিঢ় টাঙ্গী নিবাণে কোরিঅ॥
সাংকমত চড়িলে দাহিন বাম মা হোহি।
নিয়ড়ি বোহি দূর মা জাহী॥
জই তুমহে লোঅ হে হোইব পারগামী।
পুচ্ছ তু চাটিল অনুত্তর-সামী॥

অর্থাৎ—এই গভীর ভব নদী বেগে প্রবাহিত হচ্ছে। দু' ধারে পাঁক, মাঝখানে অথৈ জল। ধর্মার্থে চাটিল তাই এক সেতু নির্মাণ করেছেন, পরপারে গমনেচ্ছু লোকেরা যার সাহায্যে ভবনদী পার হতে পারে। এই সেতু প্রস্তুত করবার উপায়—মোহরূপ তরু কেটে পাটগুলি পৃথক করে তারপর জ্ঞানের আলোকে তাদের যুক্ত করে। শেষে অদ্বয় জ্ঞানরূপ কুঠারের সাহায্যে নির্বাণ সুদৃঢ় করে সেতু প্রস্তুত করো। সেতুতে উঠে বামে বা দক্ষিণে যেও না। তাহলেই সিদ্ধি লাভ করতে পারবে। এই ভবনদী যারা অতিক্রম করতে চায়, তারা সিদ্ধাচার্য চাটিলকে জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারবে। (কারণ সহজিয়া গুরু ভিন্ন এ তত্ত্ব আর কারো গোচর নয়)।...

এইসব চর্যাগান সহজযানী সম্প্রদায়ের মধ্যস্থতায় প্রচলিত হয় নেপালে। তারপর নেওয়ার জাতির সঙ্গীতচর্চায় কয়েক শতক যাবৎ প্রবাহিত থাকে। বাংলা ও পূর্ব ভারতের সঙ্গে নেপালের সঙ্গীত ক্ষেত্রে এই এক আদি যোগাযোগ।

চর্যাগানের সূত্রেই পূর্ব ভারতের একটি সাম্প্রদায়িক ধর্ম নেপালের ধর্ম সংস্কৃতিতে স্থান করে নেয়। তা হল বাংলা দেশে বহুল প্রচারিত নাথধর্ম। সহজিয়া বৌদ্ধ মতের সাধকদের সঙ্গে নাথ গুরুদের মধ্যে পার্থক্য সামান্যই। নাথপন্থীরা পরবর্তী কালে একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও অনেক প্রাচীন সিদ্ধাচার্যদের তাঁরা গুরুরূপে মানে। এবং দুই সম্প্রদায়েরই উৎসমূলে আছে বৌদ্ধতন্ত্রের সাধন পন্থা।

শুধু বাংলায় নয়, বিহার উড়িষ্যা মধ্যপ্রদেশ পাঞ্জাব গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলেও বিস্তৃত থেকে নাথধর্ম নেপালে পর্যন্ত প্রচলিত হয়েছিল। নাথধর্মের গুরুদের মধ্যে চারজনের প্রসিদ্ধি সবচেয়ে বেশি। তাঁরা হলেন মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ, চৌরঙ্গীনাথ ও জালন্ধরীপাদ।

তাঁদের মধ্যে নেপালের জনসাধারণের জীবনে মৎস্যেন্দ্রনাথ (মচ্ছিন্দ্রনাথ) ও গোরক্ষনাথের গভীর প্রভাব। এই দুই সাম্প্রদায়িক গুরুর নাম নেপালের ধর্ম সংস্কৃতি ও জাতীয় সংস্কারের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীরূপে বিদ্যমান।

প্রায় তিন হাজার মঠ মন্দিরে চিহ্নিত নেপালের অসংখ্য জাতীয় উৎসবের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও চিত্তাকর্ষক হল মচ্ছিন্দ্র যাত্রা। মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মচ্ছিন্দ্রনাথ নেপালের সাধারণ অধিবাসীদের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। তাঁর স্মরণে ও সম্মানে প্রতি বৈশাখ মাসে তারা মহা আড়ম্বরে মচ্ছিন্দ্র যাত্রার উৎসব পালন করে। তা ছাড়া বাগমতী গ্রামের মন্দিরে নিত্য পূজিত হন মচ্ছিন্দ্রনাথের বিগ্রহ।

এদিকে বাংলায় ও পূর্ব ভারতের অন্যান্য নাথপন্থী অঞ্চলে এই সম্প্রদায়ের অনুগামীরা মৎস্যেন্দ্রনাথকে আদি গুরুরূপে মান্য করে। নাথ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং আদি যোগী তিনি। কৌলমার্গীরাও তাঁকে গুরুরূপে মানেন। অনেক পণ্ডিতেরই মত যে, তিনি বাংলার সন্তান এবং চন্দ্রদ্বীপের ধীবর শ্রেণী থেকে উদ্ভূত। তিনি অনেক গ্রন্থও রচনা করেছিলেন বলে প্রকাশ। তার মধ্যে পাঁচটি পাওয়া গেছে নেপালে, যার অন্যতম হল 'কৌলজ্ঞান নির্ণয়'। আরো কৌতূহল-উদ্দীপক কথা এই যে, শ্রেষ্ঠ সিদ্ধাচার্য লুইপাদ ও মৎস্যেন্দ্রনাথ সম্ভবত অভিন্ন ব্যক্তি। অনেক বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরই এই মত।

লুইপাদের সহজসিদ্ধি ধর্মমত যেমন বাংলা দেশে, তেমনি নেপালেও সুপ্রচলিত। লুইপাদ যে বাঙালী ছিলেন, পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তা স্পষ্টাক্ষরে বর্ণনা করেছেন তাঁর 'বেণের মেয়ে' উপন্যাসে। শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কৃত চর্যাপদের সংগ্রহে

লুইপাদ রচিত দুটি গীতি স্থান পেয়েছে। দুটিই পটমঞ্জরী রাগে গঠিত—

(১)

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল॥
দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ॥ ...ইত্যাদি

(২)

ভাব ন হোই অভাব ণ জাই।
অইস সংবোহেঁ কো পতিআই॥
লুই ভণই বট দুলক্‌খ বিণাণা।
তিঅ ধাএ বিলসই উহ লাগে না॥...ইত্যাদি

লুইপাদ-মৎস্যেন্দ্রনাথের একাত্মতা থেকে নেপালে বাংলার চর্যাগানের প্রচলনের আরো একটি ঘনিষ্ঠ কারণ ধারণা করা যায়।

মৎস্যেন্দ্রনাথের প্রধান শিষ্য গোরক্ষনাথ বাংলা দেশে সুপরিচিত। তিনিও তাঁর গুরুর মতন বাগ্‌গেয়কাররূপে গণ্য। গোরক্ষনাথ রচিত কোন পুঁথি পাওয়া না গেলেও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে জ্ঞানকারিকার রচয়িতা তিনি। সেই নাথযোগী গোরক্ষনাথের কাহিনী নানারূপে পল্লবিত হয়ে উড়িষ্যা বিহার মধ্যভারত মহারাষ্ট্র পাঞ্জাব এমন কি নেপাল তিব্বতে পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। ভারতের এই সমস্ত অঞ্চলের গোরক্ষপন্থী ভিখারী যোগীরা একতারা বাজিয়ে গেয়ে থাকে তাদের সাম্প্রদায়িক গান। উত্তর বিহারের গোরক্ষপুর নগর গোরক্ষনাথের নামাঙ্কিত।

গোরক্ষনাথের শিষ্যা রাণী ময়নামতী, রাজা গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচাঁদের জননী। বাংলার লোককাব্যে ময়নামতীর গান যেমন প্রসিদ্ধ তেমনি রাজা গোপীচাঁদের সন্ন্যাস ও তাঁর দুই রাণী উদনা পদুনার কাহিনীও। এবং এঁরা সকলেই নেপালের জনমানসে স্থান করে নিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে গোরক্ষনাথের স্মৃতি সেখানে অতিশয় জীবন্ত।

নেপালের গোর্খা নামে বিখ্যাত স্থানটির নামকরণ হয়েছে গোরক্ষনাথের নামে। হিমালয়ের অভ্রভেদী পর্বতমালার মুখোমুখী একটি সুন্দর ছোট পাহাড়ের উপর এই প্রাচীন গোর্খা গ্রাম। স্থানীয় জনশ্রুতি এই যে, এ পাহাড়ের একটি গুহায় গোরক্ষনাথ যোগজীবনে অবস্থান করতেন। গুহাটি এখনো বর্তমান। গোর্খা গ্রামে গোরক্ষনাথের মন্দিরও বিখ্যাত এবং দ্রষ্টব্য স্থান।

গোরক্ষনাথের স্মরণে গ্রামটিরও ক্রমে নাম হয়ে যায় গোর্খা। তাই থেকে আশপাশের অঞ্চলেরও গোর্খা নামে পরিচিতি। এবং এই অঞ্চলে বাসের সূত্রে বাসিন্দাদেরও গোর্খালি নাম হয়।

গত দু শ' বছরের নেপালী ইতিহাসের রাজবংশ এবং তাঁদের মন্ত্রী বংশ জাতিতে গোর্খালী। নেপালের এই রাজবংশের সংগীত দরবারও আরম্ভ হয়েছিল গোর্খায়। সে তাঁদের কাঠমণ্ডু জয় করবার আগের কথা। দরবারের অধ্যায়ে সেসব কথা আসবে।

এইসব দরবার পত্তনের অনেক আগে থেকেই নেপালে ছিল সংগীতচর্চার ব্যাপক পরিবেশ। প্রায় আট শ' ন' শ' বছর আগে থেকে নেওয়ারদের মধ্যে চর্যাগান যে সংগীতের ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিল, তার কিছু পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

সংগীতচর্চায় অন্যান্য ক্ষেত্রও ছিল নেপালে এবং সেসবও প্রাচীন কালাগত ধারা। ধর্মকর্মের সঙ্গে ওতপ্রোত থেকে সে রাজ্যের সংগীতপরম্পরা নিষ্ঠার সঙ্গে বাহিত ও রক্ষিত হয়ে এসেছে। এবং সে সংগীত মূলত ভারতীয় রাগ পদ্ধতি অনুসারী।

সমগ্রভাবে নেপালের সাংগীতিক অনুশীলনের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য তিনটি সংগীত কেন্দ্র। কান্তিপুর (কাঠমণ্ডু), পোখরা ও গোর্খা।

নেপালের দীর্ঘকালের রাজধানী কান্তিপুর সংগীতচর্চার প্রধান কেন্দ্র। এখানে প্রায় প্রত্যেক পাড়ায় এক একটি গুঠে (গোষ্ঠী?) সংগীতানুষ্ঠানের জন্যে চিহ্নিত। এই গুঠেগুলি এক একটি সম্মিলন স্থল বা ক্লাবের মতন। এখানে স্থানীয় খ্যাতিমান ও সাধারণ সব গীত শিল্পীদেরই নিয়মিত গানের আসর বসে। এক একটি মন্দিরকে কেন্দ্র করে তার সংলগ্ন বা নিকটস্থ কোন গৃহে হয় গুঠের অধিবেশন। তার প্রধান সূচী—ভজন গান। ভজন গান বলতে অধুনা যে একটি গীতরীতিকে বোঝায়, গুঠে অনুষ্ঠিত সংগীত তা নয়। এখানে ঈশ্বরের ভজনাত্মক সংগীত এই অর্থে ভজন। তার মধ্যে ধ্রুপদও অন্যতম। গেয়। গুঠে এমনি নিয়মিত আসরের উপরন্তু বছরে একদিন হয় বৃহৎ উৎসব। তখন মন্দিরে পূজারির সঙ্গে সংগীতের অনুষ্ঠান হয় প্রধান আকর্ষণ। বহু জনসমাগমে এই বার্ষিক সংগীত উৎসব সার্থক হয়ে ওঠে।

নেপালের দ্বিতীয় বৃহৎ সংগীত কেন্দ্র—পোখরা (কাস্কি)। এখানেও অনেক স্থানে আছে পূর্বোক্ত ধরনের নিয়মিত সংগীতের আসর। তার মধ্যে একটি বড় গুঠের অধিবেশন বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মন্দিরে হয়ে থাকে। কাঠমণ্ডুর মতন বার্ষিক সংগীতানুষ্ঠানের বৃহৎ আয়োজনও হয় পোখরাতে।

তৃতীয় সংগীত কেন্দ্র গোর্খা। এখানকার প্রধান সংগীতচর্চার স্থান—গোরক্ষনাথের মঠ। গানের দৈনিক অনুষ্ঠান এই মঠে হয়ে থাকে।

নেপালের প্রধান তিনটি কেন্দ্রে যে সংগীতচর্চার উল্লেখ করা হল, তা লোকসংগীত পর্যায়ের নয়। এই সংগীতধারা রীতিমত শিক্ষা সাপেক্ষ এবং রাগ অনুসারী বিধিবদ্ধ সংগীত। যেমন দূর অতীত কাল থেকে অনুষ্ঠিত গোরক্ষনাথের মঠের গান। রাগের ভিত্তিতে এবং রাগের নিয়ম অনুসরণে সেসব গীতের প্রচলন। সময়োচিত রাগের গান গাইবার এখানে প্রথা। প্রাতঃকাল, অপরাহ্ণ, সন্ধ্যা ও রাত্রির বিভিন্ন সময় অনুপাতে এইসব গান গীত হবার দীর্ঘকালাগত নিয়ম মঠে পালিত হয়ে এসেছে। বেশ ধারণা করা যায়, এ সমস্তই বিধিসম্মত সংগীতচর্চার দৃষ্টান্ত।

তেমনি কাঠমণ্ডু, পোখরা প্রভৃতির যজ্ঞস্থানও উল্লেখনীয়। সংগীতের একটি পরিশীলিত পরিমণ্ডল এখানকার ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে গড়ে উঠেছে। এইসব যজ্ঞস্থলে যে মণ্ডপ গঠিত হয়, তার চতুর্দিকে চারটি তোরণ। প্রতি দ্বারে বৈদিকরা যথাবিধি বেদ পাঠ করেন। আর নিয়ম অনুসারে গানও করা হয় প্রত্যেক তোরণে। এক একটি দ্বারে এক এক প্রকার গান গাইবার রীতি। এ সবও সাধন সাপেক্ষ রাগ গান।

তা ভিন্ন অন্যান্য ধর্মকর্মের সঙ্গেও নেপালে সংগীতের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। সব উল্লেখ করা সম্ভব নয়। দশ দিনের দুর্গাপুজো বা দশেরার কথা শুধু বলা যাক। নেপালী দশেরা অতিশয় আড়ম্বরে বিরাট জাতীয় উৎসবরূপে পালিত হয়ে থাকে। সেই উপলক্ষ্যে দেবীর গান গাওয়া হয় মালশ্রী রাগে। অন্য সময়ে মালশ্রী রাগের এমন প্রচলন নেই। অষ্টমীর দিন থেকে কোজাগরী তিথি পর্যন্ত এই বিশেষ সংগীতানুষ্ঠান নির্দিষ্ট। তারপরে আর হয় না। নবরাত্রিতে, বিশেষ সন্ধ্যার পুজোয় মালশ্রী রাগে গানের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে সর্বসাধারণের জন্যে। এবং সকলে তা উপভোগ করে। আর বলা বাহুল্য, এ সংগীতও লোক-গীতি নয়।

এইভাবে কাঠমণ্ডু ও নেপালের অন্যত্র সংগীতচর্চা ধর্মচর্চার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে চলে এসেছে। সংগীতের অনুশীলন হয়েছে সবিশেষ নিষ্ঠার সঙ্গে। তাই রাগভিত্তিক সংগীত সেখানে জনপ্রিয় এবং তার ব্যাপক প্রসার। সেই সংগীতানুষ্ঠানের এত রীতিনীতি খুঁটিনাটি পালনীয় ব্যাপার থেকে বোঝা যায় যে, তা প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ ধারা। সাধারণে তার আবেদনও সার্থক। কারণ যেমন গোরক্ষনাথের মঠে, তেমনি কাঠমণ্ডু প্রভৃতির যজ্ঞস্থানের সেই প্রণালীবদ্ধ সংগীত সাধারণের নিকট চিত্তাকর্ষক বোধ হয়েছে।

তৌর্যত্রিকের অন্যতম অঙ্গ নৃত্যও (ক্লাসিকাল) নেপালে বিশেষ প্রচলিত ও সমাদৃত। তার কয়েকটি প্রধান ধারা উল্লেখ্য। যথা—কাঠমণ্ডুতে মহালক্ষ্মী ও মহাকালীর দেবী নৃত্য। পোখরার ভৈরব নৃত্য। ভক্তপুরের নবদুর্গা নৃত্য। আগম সম্প্রদায়ের দেব নৃত্য (মুখোশ নৃত্য) ইত্যাদি।

সামগ্রিকভাবে, নেপালের নৃত্যধারা শিল্পগুণে এবং রসসমৃদ্ধ। বিশেষ ভক্তপুরে নৃত্যের ঐতিহ্যে ঐশ্বর্যময়।...

এমন সম্পন্ন নেপালের সাঙ্গীতিক পটভূমি। দীর্ঘকালের এই শ্রীময়ী পরিবেশ রচিত ছিল বলেই অত উচ্চাঙ্গের সংগীত দরবার সেখানে সম্ভব হয়েছিল। রাজারা বা রানারা পরবর্তী কালে দরবারী সংগীতের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে হন উপলক্ষ্য মাত্র। সৃজনশীল সংগীত-পরম্পরার একটি কীর্তিমন্ত অধ্যায়ের উদ্যোগ কর্তা। ক্ষেত্র আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল।

তাঁদের দরবারে সংগীতচর্চার বর্ণনা করবার আগে রাজা ও রাণাদের ইতিহাস সংক্ষেপে বলে নেওয়া দরকার।

নেপালের এই রাজ-বংশের পূর্বপুরুষ পৃথিবনারায়ণ শাহ্ গোর্খা থেকে অভিযানে এসে ১৭৬৮ খৃঃ কাঠমণ্ডু ও নেপাল উপত্যকা জয় করেন। সেই থেকে এ রাজবংশের রাজধানী কাঠমণ্ডুতে বাস আরম্ভ। সেই সময় থেকে গোর্খাদের কথা নেপালের ইতিহাসে প্রধান স্থান পায়। বলা হয়, তখন থেকে নেপালের ইতিহাস গোর্খারও ইতিহাস। তার ২০।২৫ বছর আগে পর্যন্ত গোর্খারা ছিল পাহাড়-ঘেরা একটি বিচ্ছিন্ন অঞ্চলের এক অখ্যাত উপজাতি।

পৃথিবনারায়ণ গোর্খানিবাসী হিসাবে গোর্খালিরূপে পরিচিত। কিন্তু তাঁর বংশীয়রা আদিতে গোর্খালি কিংবা নেপালী ছিলেন না। গোর্খার অধিবাসী এই বংশের আদি পুরুষ এখানে এসেছিলেন রাজপুতানার মেবার থেকে। সুতরাং আসলে তাঁরা রাজপুত।

১৪ শতকে মুসলমান আক্রমণে চিতোর বিধ্বস্ত হয়েছিল। সে সময় ফতে সিং-এর ভ্রাতা মনমথ রাণা শত্রুব্যূহ ভেদ করে চলে যান উজ্জয়িনীতে। মনমথের দুই পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ জন পরে হিমালয় অঞ্চলে নিষ্ক্রান্ত হন। কুমায়ুনের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়ে এসে বাস শুরু করেন নেপালের পাল্পা প্রদেশে। অবশেষে নেপালে তাঁদের বংশের স্থায়ী নিবাস আরম্ভ হয় গোর্খায়। বিবাহসূত্রে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে এই বংশীয়েরা গোর্খা অঞ্চলে বিস্তার লাভ করেন। স্বদেশ রাজপুতানার সঙ্গে পরে আর সম্পর্ক থাকে না বটে কিন্তু তাঁরা যে আদিতে রাজপুত ছিলেন এ চেতনা লুপ্ত হয় না বংশ-পরম্পরায়।

১৮ শতকের মাঝামাঝি এ বংশের পৃথিবনারায়ণ ক্ষমতাশালী হয়ে প্রথমে গোর্খা অঞ্চলে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। মগর, খস্, গরুং প্রভৃতি পার্বত্য উপজাতিদের ওপর প্রভুত্ব বিস্তারের পর জয় করে নেন নেপাল উপত্যকা। কাঠমণ্ডুর সিংহাসন অধিকার করে এখানে রাজধানী স্থাপন করেন। কাঠমণ্ডুর সঙ্গে পাটান, ভাতগাঁও ইত্যাদি নেপালের সমস্ত নগর রাজ্য পৃথিবনারায়ণের কর্তৃত্বে একীভূত হয়ে গঠিত হয় ঐক্যবদ্ধ নেপাল রাজ্য।

নেপালের প্রথম গোর্খালি রাজা পৃথিবনারায়ণ শাহ্ ১৭৭৪ খৃঃ পরলোকগত হন। তাঁর বংশীয় পরবর্তী রাজারা হলেন—প্রতাপ সিং শাহ্ (১৭৭৪—৭৭ খৃঃ), রণ বাহাদুর শাহ্ (১৭৭৭—৯৯ খৃঃ), গির্বাণ যুদ্ধ বিক্রম শাহ্ (১৭৯৯—১৮১৬ খৃঃ), রাজেন্দ্র বিক্রম শাহ্ (১৮১৬—৪৭ খৃঃ), সুরেন্দ্র বিক্রম শাহ্, ত্রিলোক বীর বিক্রম শাহ্, ত্রিভুবন বিক্রম শাহ্, মহেন্দ্র বিক্রম শাহ্ (বর্তমান রাজা)।

রাজা পৃথিবনারায়ণের মৃত্যুর ৭২ বছর পরে রাণা প্রধানমন্ত্রী হস্তগত করেন রাজ-ক্ষমতা। তারপর এক শ' বছর ধরে রাজ্যের শাসন-শক্তি প্রধানমন্ত্রীদের বংশেই থেকে যায়। এই রাণা প্রধানমন্ত্রী বংশের পূর্বপুরুষরাও ছিলেন রাজপুত এবং সেই সূত্রেই তাঁদের বিশিষ্ট পদবী রাণা (রাও বা রানার মতন তার অর্থ সর্দার কিংবা সম্মানিত ব্যক্তি) যুক্ত হয়ে আছে তাঁদের নামের সঙ্গে। তাঁদের পূর্বপুরুষও চিতোরগড় নিবাসী ছিলেন। চিতোরের উক্ত রাণার ভাইয়ের পৌত্র রামসিং রাণা। চিতোরে মুসলমান আক্রমণের পর রাম সিং নেপালে সেনাপতি হন। তাঁর বংশধরেরা পরে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান গোর্খায়। সেই থেকে পৃথিবনারায়ণ বংশীয়দের মতন রাণারাও গোর্খালি।

পৃথিবনারায়ণ থেকে তাঁর রাজবংশের পাঁচ পুরুষ পরে রাজেন্দ্র বিক্রমের রাজত্বের শেষ দিকে প্রত্যক্ষভাবে নেপালের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ঘটে। জঙ্গ বাহাদুর রাণা ১৮৪৬ খৃঃ প্রধানমন্ত্রী হয়ে অধিকার করে নেন সমস্ত ক্ষমতা। এই বছরে কাঠমণ্ডুর কোট প্রাসাদে যে নৃশংস পাইকারি হত্যাকাণ্ডের কাজে তিনি ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন, নেপালের ইতিহাসে তা এক কলঙ্কিত পরিচ্ছেদ।

জঙ্গ বাহাদুর শুধু ব্যক্তিগতভাবে নেপালরাজের কর্ণধার হলেন না। এই সার্বিক ক্ষমতা বংশানুক্রমে লাভের স্বীকৃতি পান একটি রাজ-সনদের সাহায্যে। দুর্বলচিত্ত অপ্রকৃতিস্থ রাজা রাজেন্দ্র বিক্রম শাহ্ জঙ্গ বাহাদুরের বংশে স্থায়ীভাবে প্রধানমন্ত্রী পদ অর্পণ করেন। এবং সে প্রধান মন্ত্রীদের শক্তি একেবারে নিরঙ্কুশ। কারণ শুধু প্রধানমন্ত্রিত্ব নয়। প্রধান সেনাপতি এবং রাজ্যের সামরিক ও বেসামরিক সমস্ত বিভাগের যাবতীয় উচ্চপদ জঙ্গ বাহাদুরের আমল থেকে রাণা বংশীয়দের অধিগত হয়ে যায়। রাণা বংশের এই স্বেচ্ছাচারতন্ত্র বজায় থাকে একশ' বছর যাবৎ। এই দীর্ঘ পর্বে রাজারা প্রধানমন্ত্রী রাণাদের হাতে ক্রীড়নক হয়ে থাকেন। নেপালের যাবতীয় রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তাঁরা হয়ে পড়েন নেপথ্যবাসী। অবশেষে ত্রিভুবন বিক্রম শাহ্ রাণাতন্ত্রের চক্রব্যূহ থেকে মুক্ত জীবনে বেরিয়ে আসেন। সদ্য স্বাধীন ভারতের দূতাবাসে তাঁর আশ্রয় গ্রহণ ও পরে নেপালের চমকপ্রদ রাষ্ট্রীয় পটপরিবর্তন সাম্প্রতিক কালের ঘটনা।...

১৮৪৬ খৃঃ ক্ষমতা অধিকার করবার পর জঙ্গ বাহাদুর তাঁর মৃত্যুকাল (১৮৭৫ খৃঃ) পর্যন্ত পূর্ণ ৩০ বছর কর্তৃত্ব করেন। তাঁর মৃত্যুতে প্রধানমন্ত্রিত্ব নিয়ে নিজ বংশে দ্বন্দ্ব বাধে এবং এই মহা পদ বর্তায় তাঁর ভ্রাতাদের মধ্যে। তাঁরা সাত ভাই। তাঁদের মধ্যে অন্যতম রণউদ্দীপ প্রধানমন্ত্রী এবং কনিষ্ঠতম ধীর সমশের প্রধান সেনাপতি হন। জঙ্গ বাহাদুরের পুত্রেরা নির্বাসিত হলেন কাঠমাণ্ডু থেকে।

তারপর ১৮৮৫ খৃঃ রণউদ্দীপ শাসন ষড়যন্ত্রে নিহত এবং ধীর সমশেরের পুত্র বীর সমশের প্রধানমন্ত্রী হন। ১৯০১ খৃঃ মৃত্যু হয় বীর সমশেরের। তাঁর পরবর্তী রাণা প্রধানমন্ত্রীদের উল্লেখের এখানে প্রয়োজন নেই। কারণ বীর সমশের পর্যন্ত কালের সংগীত দরবার এখানে বর্ণিতব্য বিষয়।

নেপালের সংগীত দরবার বলতে প্রধান দুটি ধরা কর্তব্য। রাণাদের দরবার এবং রাজাদের দরবার। তার মধ্যে রাজ দরবারের চেয়ে রাণা দরবার সংগীতচর্চায় বেশি সমৃদ্ধ। বেশি গুণীজন সমাগত রাণাদের দরবারেই হত। তার এক কারণ এই যে, নেপালের রাজা কার্যত ছিলেন তাঁরাই।

রাজবংশ ও রাণাবংশে যাঁদের নাম করা হয়েছে তাঁদের কয়েকজনের কথা সংগীত দরবারের প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হবে।

নেপাল দরবারে সঙ্গীতচর্চার প্রধান লক্ষণীয় বিষয় হল—দরবারী কলাবতেরা প্রায় সকলেই ভারতীয় এবং ভারতীয় সংগীতের মূল ধারারই শিল্পী তাঁরা। সুতরাং নেপালের দরবারী সংগীতও ভারতবর্ষেরই ধারা।

সেই আদি যুগের চর্যাগীতি, মঠ মন্দিরের গান, গঠ্ ও যজ্ঞস্থানের সংগীত প্রভৃতির ঐতিহ্য অনুসরণ করে নেপালের দরবারেও ভারতীয় সংগীতের চর্চা অব্যাহত প্রবহমান।......

মরণ —শিবকান্ত ঘোষ

শিক্ষা শেষ করে শিল্পী হিসাবে পরিচিত হবার চেষ্টা করছেন। রচনা দেখে মনে হয় তাঁর আশা একদিন সফল হবে। প্রদর্শনীতে তেলরঙে আঁকা ২৪টি নিদর্শন দেখা যায়।

শিল্পীর রচনা বিমূর্ত ও সমবিমূর্ত শ্রেণীর, কয়েক ক্ষেত্রে ইঙ্গিত প্রধান। সাধারণত রচনা ক্ষেত্রটির মধ্যভাগ বা অন্যান্য অংশ শূন্য রেখে বুরুশের মোটা আঁচড় দ্বারা নানা আকার সৃষ্টি করার প্রয়াসও চোখে পড়ে। শিল্পী বুরুশ চালনায় যে পটু সেটা তাঁর কয়েকটি রচনা দেখে বোঝা যায়। ১১ নং ইমেজ অনেকের ভাল লাগে। নীল ও কালো রঙের দাবার ছকজাতীয় পরিপ্রেক্ষিতে দুটি মূর্তির সুসংস্থাপনার মধ্য দিয়ে শিল্পীর পরিকল্পনার পরিচয় মেলে। কয়েক ক্ষেত্রে শিল্পী শূন্য স্থানের ওপর সুকৌশল রং ব্যবহার করে ইমেজারীর অবতারণা করেছেন। এই প্রসঙ্গে নীল রঙের ছোট ছোট ফোঁটা ও সবুজ রঙ ভিত্তিক ১৯ নং ইমেজের নাম করা চলে। আরও একটি ছবি অনেকের নজরে পড়ে—জন্তু বিশেষের প্রতীকমূলক ২১ নং আকারপ্রধান ইমেজ। দু'একটির মধ্যে ভাস্কর্য শিল্পের আভাষ (Sculpturesque) পাওয়া যায়—যেমন ১২ নং—দেখে চ্যাডউইকের গঠনরীতি অনেকের মনে পড়বে। এ শিল্পী প্রধানত রঙের টানের মধ্য দিয়েই বক্তব্যটুকু প্রকাশ করতে চান। কয়েক স্থলে এই টানের মধ্য দিয়েই ইঙ্গিতমূলক মূর্তি আত্মপ্রকাশ করেছে। উদাহরণ হিসাবে ১৬ নং-এর নাম করা চলে। তবে মনে হয় অধিকাংশ রচনাই পরীক্ষামূলক, এবং সেটা স্বাভাবিকও। আশা করি নিয়মিত পরীক্ষার মধ্য দিয়ে শিল্পী একদিন নিজস্ব পথের সন্ধান পাবেন।

✻

শিল্পী শান্তনু বোস, শিবকান্ত ঘোষ ও অসিত মণ্ডলও বিড়লা অ্যাকাডেমিতে তাঁদের যৌথ প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। সকলেই ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের ছাত্র। প্রদর্শনীতে প্রথম জনের ১১, দ্বিতীয় জনের ১০ ও তৃতীয় জনের ১১টি ছবি দেখা যায়। অধিকাংশই জলরঙে আঁকা, তবে কালিকলম ও কোলাজের নিদর্শনও ছিল। শান্তনু বোসের কোলাজগুলি নেহাত মন্দ লাগেনা

মহাভৈরবী মন্দির, (তেজপুর) —হরিলাল

—বিশেষ করে ইট হ্যাম্পেন্ড স্যাডেলার অনেকের চোখে পড়ে। ইমপ্রেশানিস্টিক স্কেচ হিসাবে মোরগও ভাল লাগে। শিবকান্ত ঘোষ জলরঙ ব্যবহারে পটু। তরল রঙ কাগজের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে তিনি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন—যেমন হোলি, মনসুন বা কেরোসিন রঙের উচ্ছ্বসিত কমপোজিশন। পৃষ্ঠভূমির বিষয়ে অধিকতর সচেতন হলে কোলাজ হিসাবে ইয়ং লেডি রসোত্তীর্ণ হতে পারত। অন্যান্য রচনার মধ্যে নাড়ে (২) ও [illegible] রচনা [illegible] নাম করা যায়। অসিত মণ্ডলের কয়েকটি তাঁর অঙ্কন চোখে পড়ে যায়, যদিও সেই সঙ্গে তাঁর [illegible] প্রভাবও [illegible] ধরা পড়ে। [illegible]

✻

শিল্পী হরিলালের প্রদর্শনীর আয়োজন হয় অ্যাকাডেমি [illegible]। প্রদর্শনীতে জলরঙ ও কালিকলমে আঁকা ২১টি ছবি ও স্কেচ দেখা যায়।

শিল্পী [illegible] ঠিক অপরিচিত নন—কারণ গত বছরেই এখানে তাঁর আঁকা বাংলা দেশের অনেকটি প্রাচীন মন্দিরের স্কেচ আমরা দেখেছি। বর্তমান প্রদর্শনীতে আসামের কয়েকটি প্রাচীন মন্দিরের স্কেচ জাতীয় ছবি দেখা যায়। এগুলি জলরঙ ও কালিকলমে রচিত। শিল্পীর রচনা রিয়ালিস্টিক। বিভিন্ন নিদর্শন দেখে মনে হয় কালিকলমের ক্ষেত্রেই তাঁর দক্ষতা অধিক। এই প্রসঙ্গে শিবসাগরের বিষ্ণুদেউল, কাশীর বিশ্বনাথ ঘাট ও তেজপুরের মহাভৈরবী মন্দিরের উল্লেখ করা যায়। জলরঙের নিদর্শনগুলি অনেক স্থলেই আশানুরূপ নয়, যদিও কামাখ্যাদেবীর মন্দির বা কাশীর বিশ্বনাথ-মন্দির নেহাত মন্দ লাগে না।

✻

অ্যাকাডেমি-পরিচালিত স্টুডিওতে যে সব ছেলেমেয়ে অঙ্কনবিদ্যা শেখে সম্প্রতি তাদের কয়েকজনের একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। প্রদর্শনীতে ১৩ জন ছাত্রছাত্রীর ৫০টি নিদর্শন দেখা যায়। অধিকাংশই প্রতিকৃতি বা বহির্দৃশ্যের স্টাডি বিশেষ। যাদের রচনা ভাল লাগে তাদের মধ্যে শীলা বসু (বঃ ১৭), কুসুম শিবস্বামী (বঃ ১৮), স্বপন চ্যাটার্জি (বঃ ১৪), কঙ্কন ঘোষ (বঃ ১৭) ও শান্তিময় ব্যানার্জি (বঃ ১৮)র নাম উল্লেখযোগ্য।

॥ ৩২ ॥

দিশেহারার মতন ছুটতে ছুটতে দীপু বস্তির গলিতে একটা বড় লোহার বালতিতে ধাক্কা খেল, পায়ে লাগলো খুব, একটা কুকুরের লেজ মাড়িয়ে দিয়েছিল প্রায়, কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে খানিকটা তেড়ে এলো। তারপর সে বস্তি পেরিয়ে এসে পড়লো বড় রাস্তায়। বস্তির মধ্যে তখন দারুণ গোলমাল শুরু হয়ে গেছে, ধড়াম ধড়াম শব্দ, দীপু আর ভ্রূক্ষেপ করলো না, ছোটা থামালো না।

সার্কুলার রোড এখন খুব ফাঁকা। মাঝে মাঝে কর্কশ লোহার শব্দ করে দ্রুত বেগে যাচ্ছে দু'একটা ট্রাম। একটা পুলিসের গাড়ি দীপুর ঠিক পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। দীপু ছুটেছে যেন ঘোরের মাথায়, নিশ্বাস প্রচণ্ড গরম, বুকের মধ্যে আগুনের হল্কা, তীব্র রাগ, অভিমান আর হতাশা মিলে মিশে তার শরীরটা এখন খুব লঘু হয়ে গেছে। কিংবা তার যেন কোনো শরীরই নেই, একটা বিষণ্ণ আত্মা ছুটে যাচ্ছে সার্কুলার রোডের হাওয়ায়।

খানিকটা বাদে ক্লান্ত হয়ে স্বাভাবিক-ভাবেই দীপুর গতি মন্থর হয়ে এলো। তারপর এক সময় থেমে গিয়ে হাঁপাতে লাগলো খুব। সায়েন্স কলেজের উল্টো দিকে একটা মেয়েদের পার্ক, এখন সম্পূর্ণ ফাঁকা, দীপু তার মধ্যে ঢুকে গিয়ে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়লো ঘাসের ওপর।

শুয়ে শুয়ে বেশ কিছুক্ষণ ঘন ঘন নিশ্বাস নেবার পর স্বাভাবিক হয়ে এল। স্বাভাবিক হবার পরই শরীরের কথা মনে আসে। শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আলাদা দাবি প্রকট হয়ে ওঠে। ঠোঁটের পাশের কাটা জায়গাটা থেকে এখনো একটু একটু রক্ত বেরুচ্ছে, থুতনির নিচেও খানিকটা কাটা। ঘাড়ের পেছনে জ্বালা করছে কেন? হাত দিয়ে অনুভব করলো, ডান কানের ঠিক পেছনে চুলের মধ্যে খানিকটা জায়গা খুবলে আছে। এখানে আবার কখন লাগলো কে জানে! মাঠ থেকে ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে হাত দিয়ে পাকিয়ে রস বার করে দীপু তার কাটা জায়গায় লাগাতে লাগলো।

এইসব জ্বালা ছাড়াও দীপু টের পেল তার খুব খিদে পেয়েছে। খেয়েছে সেই কখন! এখন কত রাত? এগারোটা-বারোটা হবে নিশ্চয়ই। দীপু বিকেল চারটের সময় দু' পীস মাখন রুটি আর চা খেয়েছিল। একথা মনে পড়তেই হু-হু করে তার খিদে বেড়ে গেল। দীপু একদম খিদে সহ্য করতে পারে না, খিদের সময় তার শরীর দুর্বল হয়ে যায়, চোখে কম দেখে। খিদে সহ্য করতে পারে তার দাদা নীলাঞ্জন, কতবার সে রাগ করে পুরো একদিন দেড়দিন না খেয়ে থেকেছে। সেইজন্যই নীলাঞ্জন জেলে গিয়ে অনশন করতে পারে, দীপু হলে কি পারতো?

অত খিদে পাওয়া সত্ত্বেও দীপু তক্ষুনি উঠলো না, চিৎ হয়ে শুয়েই রইলো। আকাশে অল্প অল্প মেঘ, পাতলা অন্ধকার। মাঝে মাঝে চাঁদটাকে দেখা যায়, আবার মেঘের আড়ালে হারিয়ে যায়। দীপুর চোখের সামনে ঐ বিপুল সুদূর, দেখতে দেখতে দীপু খুব অনামনস্ক হয়ে গেল। আগে গরমের দিনে ছাদে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেও দীপুর মনে হয়েছে, কি বিরাট এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, তার মধ্যে কত ছোট, একরত্তি এই পৃথিবী, সেই পৃথিবীর চারশো কোটি মানুষের মধ্যে সে একজন। এই মহাবিশ্বের তুলনায় সে একটা পিঁপড়ের চেয়েও ছোট, অথচ মাঝে মাঝে মনে হয় তার জন্যই এ পৃথিবীর সমস্ত আনন্দ বেদনা অপেক্ষা করে আছে।

আহত শরীর নিয়ে আকাশের দিকে মুখ করে শুয়ে থাকতে থাকতে দীপুর মনে হলো তার মা-বাবা ভাই বোন কেউ নেই, এই বিশাল জগতে সে সম্পূর্ণ একা, এমন কি শান্তার মুখটাও অস্পষ্ট আবছা হয়ে গেছে। যেন শান্তাকে সে গত জন্মে চিনতো, এ জন্মে আর দেখা হয়নি। এই অসীম শূন্যতার মধ্যে তার বেঁচে থাকার কোনো আলাদা মূল্য নেই। আজ ধনঞ্জয়ের দলবল ওকে হয়তো আর একটু হলে মেরেই ফেলতো। মারলো না কেন? মেরে ফেললেই তো চুকে যেত ঝামেলা! আর ভালো লাগে না! এক এক সময় মনে হয়, মৃত্যুর মতন শান্তি আর কিছুতে নেই।

ঠাণ্ডা হাওয়ায় দীপুর ঘুম এসে যাচ্ছিল, সে ধড়ফড় করে উঠে বসলো। এই মাঠের মধ্যে সারারাত ঘুমিয়ে থাকলেই হয়েছিল আর কি! সকালবেলা মেয়েরা বেড়াতে এসে তাকে দেখলে নিশ্চয়ই একটা মৃতদেহ ভেবে ভয় পেয়ে যেত! কিংবা পুলিস ডাকতো। তাছাড়া খিদের চোটে দীপু চোখে অন্ধকার দেখছে। বাড়ি যেতেই হবে। বাড়িতে গেলে আর যাই হোক, রোজ খাবারটা ঠিক পাওয়া যায়!

দীপু তক্ষুনি উঠে দাঁড়ালো না অবশ্য, হাঁটুতে মুখ গুঁজে তবু বসে রইলো। এখন আর তার একা মনে হচ্ছে না। বাড়ির কথা মনে পড়তেই তার হুড়হুড় করে অনেক মুখ মনে পড়ে যাচ্ছে। বাবা কি কল্পনাও করতে পারবেন যে আজ নিতাই অনেক কিছু বলেছে তাকে—তাতে দীপু অবশ্য নতুন করে অবাক হয়নি, শুধু মায়ের কথা মনে পড়েছিল তার। মা বড় দুঃখ নিয়ে মরেছেন! মায়ের গলায় একটা ভারী সেকেলে সোনার হার ছিল, মায়ের ইচ্ছে ছিল সেটা বড় ছেলের বউকে দেবেন—বাবা সেই হার খুলে নিয়ে জুয়া খেলার ব্যবসা করতে গিয়েছিলেন—শুধু ক্ষমতা আঁকড়ে রাখার জন্য, লুপ্ত বনেদিয়ানা ফিরিয়ে আনবার জন্য। মৃত্যুর আগে মা দাদার হাত জড়িয়ে ধরে বলে-ছিলেন, তোর বউয়ের জন্য আমি কিছু রেখে যেতে পারলাম না—টপ টপ করে চোখের জল পড়ছিল মা'র। দাদা তখন বাড়িতে সদ্য প্রকাশ করেছে মাধুরীকে তার বিয়ে করার ইচ্ছেটা।—মা বৌদিকে দেখে যেতে পারলেন না, তাহলে বুঝতেন, বৌদি কত ভালো মেয়ে, সোনার গয়না

গয়নার ওপর বৌদির একটুও লোভ নেই। বাবা তাই দাদার বিয়েতে ঐ রকম আপত্তি করেছিলেন—আর কিছু কারণে নয়, ভেবেছিলেন—দাদা আরও কিছুদিন পরে বিয়ে করলে বাবা তার মধ্যে যে-কোনো উপায়েই হোক—সোনার গয়নাটা ফেরৎ নিয়ে আসতে পারবেন অন্ততঃ।

দাদার জেল থেকে ছাড়া পাবার কথা ছিল, ফিরেছে কিনা দীপু জানে না। এখান থেকে সে কি পাইকপাড়া পর্যন্ত দেখতে পাবে? কোনো কোনো সময় পায়, এখন পাচ্ছে না। বউদি বড্ড অসহায় বোধ করছিল...মেজদি নাকি আবার বিয়ে করতে চায়, অথচ রণেনদা এখনো ডিভোর্স দেয় নি—টুলটুলের কথা যখনই মনে হয়... অরূপ স্বপ্না সম্পর্কে কি যেন বলতে চেয়েছিল তাকে...শান্তার সঙ্গে কতকাল দেখা হয় না, শান্তা কি তাকে এড়িয়ে যাচ্ছে? রমেনদা কি শান্তাকে...না, না, তা হতেই পারে না, শান্তাকে সে কিছুতেই ছেড়ে দেবে না, শান্তার জন্য সে পৃথিবী তোলপাড় করে দিতে পারে—

পৃথিবীতে এত ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে, আর সে এখানে চুপ করে হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসে আছে? না, এ ভাবে আর চলতে পারে না, এবার তার একটা কিছু করা দরকার। পৃথিবীতে বাঁচতে হলে নিজের পায়ে জোর দিয়ে দাঁড়াতে হবে। তার একটা কিছু করা দরকার, এ কথা অনেকেও তাকে বলে। কিন্তু কি করবে সে, এ কথা কেউ বলে দিতে পারে? কিছু করা মানে কি একটা চাকরি খুঁজে নিয়ে চুপচাপ বেঁচে থাকা? কি তবে? যাই হোক, একটা কিছু করতেই হবে, এ ভাবে আর বসে থাকা যায় না!

ঘাড়ের ক্ষতটায় দীপু একবার হাত বুলোলো, ঠোঁটের পাশ থেকে শুকনো রক্ত মুছলো। দীপুর হাতে চাপ চাপ রক্তের দাগ—নিজের রক্ত। সে দিকে তাকিয়ে রইলো এক দৃষ্টে। সে এমন কিছু আহত হয়নি অবশ্য, কিন্তু এক ধরনের অপমানে তার শরীরটা ঘিনঘিন করছে। তার শরীরে ওরা নোংরা হাত ছুঁইয়েছে। সে তো ওদের কোনো ক্ষতি করেনি, সে তো পৃথিবীর কোনো সম্পদ একা ভোগ করছে না—তবু ওরা কেন তাকে জড়ালো? আজ ঐ বস্তি থেকে ছুটে পালিয়ে আসা কি তার পক্ষে কাপুরুষতা হয়েছে? তার কি উচিত ছিল ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে লড়াই করা—তাতে যদি সে খুন হয়ে যেত, সেও ভালো ছিল? এর নাম বীরত্ব? ছেলেবেলা থেকেই তার লম্বা শক্ত সবল চেহারা, কখনো অসুখে ভোগেনি, গায় বেশ জোর আছে তার। ধনঞ্জয়েরা ছুরি ছোরা বার করলেও সে লাথি ঘুঁষি মেরে ওদের দু' একটাকে কাবু করতে পারতো। কিন্তু মারামারি করতে তার একটুও ভালো লাগে না, মানুষের গায়ে হাত তুলতে ইচ্ছে করে না তার নেহাৎ খুব রাগ না হলে! আজ সুকুমারকে মেরেছে একবার—তখন রাগে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সে মারতে চায় না—এমনকি ধনঞ্জয়কেও শাস্তি দিতে চায় না সে। এর পরও ধনঞ্জয়েরা যদি আর ওর পেছনে না লাগে, তা হলে সেও ওদের বিরুদ্ধে কিছুই করবে না! কিন্তু, যদি ধনঞ্জয়ের দল আবার ওকে জ্বালাতে আসে? যদি আজকের ব্যাপারে ব্যর্থ হয়ে ওরা আরও রেগে যায় তার ওপর? সে তখন কি করবে? একটা কিছু করা দরকার, কিন্তু কি করবে?

হঠাৎ মনে মনে একটা দৃশ্য দেখে দীপু দারুণ চমকে উঠলো। সে দেখলো, নিতাইয়ের সারা মুখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে, একটা মাত্র সবল হাত আত্মরক্ষার জন্য সামনে তুলে আর্ত গলায় কি যেন বলতে চাইছে সে! এ কি! নিতাইয়ের এ রকম অবস্থা হলো কি করে? অন্ধকার পার্কে একা বসে থেকেও দীপু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে এই দৃশ্য। সে মাঝে মাঝে দূরের ছবি দেখতে পায়, অন্যরা কেউ বিশ্বাস করে না, দীপু জানে, এই দৃশ্যটা অত্যন্ত সত্য, নিতাইয়ের মুখ সত্যিই রক্তে ভেসে যাচ্ছে এখন, একটা চোখ বেরিয়ে এসেছে...। না, না, দীপু নিতাইয়ের এই রকম অবস্থা চায় না, নিতাই তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু জগন্নাথকে খুন করে ফেরারী হয়ে আছে, তার বাবার কাছ থেকে টাকা নেয়, তবু নিতাই লোক খুব খারাপ নয়—তার কি শাস্তি পাওয়া উচিত দীপু তা জানে না। নিতাই অনুতাপ করে—এ রকম বীভৎস মৃত্যু তার প্রাপ্য নয়।

দীপু চট করে উঠে পড়লো। একবার ভাবলো নিতাইয়ের সাহায্যের জন্য সে আবার ফিরে যাবে। একটা কিছু তার করা দরকার, নিতাইকে সে অন্তত বাঁচাবে। ধনঞ্জয়রা কি নিতাইকে খুন করে ফেলছে? কিছু দূরে গিয়েও দীপু থমকে দাঁড়ালো। হয়তো এসব কিছুই ঘটেনি। যদি তার ঐ স্বপ্নটা সত্যি না হয়? তাই যেন হয়, এই ভেবে দীপু বাড়ির দিকে ফিরলো। তার অসম্ভব খিদে পেয়েছে, এখন কিছু না খেলে অন্যকারুকে বাঁচানো দূরের কথা, সে নিজেকেই আর বাঁচাতে পারবে না।

কিছু দূর এসে দেখলো, যত রাত হয়েছে ভেবেছিল, সে রকম কিছু হয়নি। সাড়ে এগারোটা-বারোটার বেশী নয়। নাইট শো-তে সিনেমা দেখে লোকেরা বাড়ি ফিরছে। দীপু হন হন করে হাঁটতে লাগলো।

বাড়ির কাছাকাছি এসে দেখলো, কে যেন একজন ভদ্রমহিলা তাদের বাড়ির দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। এত রাত্রে এখানে কে? সিনেমা-ফেরৎ দম্পতিরা রিকশায় করে যেতে যেতে তাকিয়ে দেখছে সেই মহিলার দিকে।

দীপু পৌঁছুবার আগেই মহিলাটি দরজার কাছ থেকে সরে এসে আবার রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগলো। দীপু একটু তাড়াতাড়ি ওর দিকে এগিয়ে গিয়েই চিনতে পারলো, অবাক হয়ে ডাকলো, এই মেজদি!

দীপুর দু'তিনটে ডাক শুনতে পেল না অপর্ণা। দীপু তার পাশে এসে জিজ্ঞেস করলো, এই মেজদি, কোথায় যাচ্ছিস?

অপর্ণা মুখ ফিরিয়ে বললো, দরজা খুলছে না।

—দরজা খুলছে না মানে?

—বাড়ির দরজা।

দীপু স্বাভাবিক ভাবেই ভেবেছিল, অপর্ণা এই মাত্র বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, কোথাও যাচ্ছে। হয়তো বাড়িতে কারুর অসুখ, ডাক্তার ডাকতে। সেইজন্যই, বুঝতে না পেরে দীপু আবার জিজ্ঞেস করলো, কে বন্ধ করলো দরজা? কি হয়েছে? তুই কোথায় যাচ্ছিলি?

অপর্ণা বললো, অনেকক্ষণ ধরে ডাকছি, কেউ দরজা খুলছে না।

দীপু এবার বুঝতে পারলো, অপর্ণা অন্য কোথাও থেকে এত রাত্রে বাড়ি

ফিরছে। কিন্তু জিজ্ঞেস করলো না কোথা থেকে। বললো, দরজা খুললো না তো তুই যাচ্ছিলি কোথায়?

অপর্ণা উত্তর দিল না।

—চল, আমি দেখছি।

রাস্তার আলো খুব বেশী না হলেও মানুষ দেখা যায়। কিন্তু দীপু লক্ষ্য করলো না, অপর্ণার চোখে তখনো শুকনো কান্নার দাগ লেগে আছে। অপর্ণাও লক্ষ করলো না, দীপুর মুখে এখানে সেখানে কাটা, রক্ত। ভাই বোন কেউ কারুকে মনোযোগ দিয়ে দেখছে না, ওরা নিজেদের ব্যাপার নিয়েই গভীরভাবে আপ্লুত।

বেল টিপেও সাড়া না পেয়ে দীপু বিড়বিড় করে বললো, সবাই বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। সবাই বলতে বাড়িতে আর কটাই বা লোক! একটা চাকরও নেই, ঠিকে ঝি, আর রাঁধুনি রাতে বাড়ি ফিরে যায়। এত বড় বাড়িটা খাঁ খাঁ করে।

দীপু দরজায় দুম দুম করে ধাক্কা দিতে লাগলো। অপর্ণা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। দীপু মনে মনে ইতস্তত করছে, চিৎকার করে ডাকবে কি না। বাবাকে সে বহুদিন ডাকে নি। বাবা তাকে ডেকে কখনো কখনো কথা বলেন, সে তো নিজে থেকে বাবার সঙ্গে কথা বলার কোনো উপলক্ষই খুঁজে পায় না।

পাড়ার দু'একজন লোকও সিনেমা থেকে ফিরছে, কেউ কেউ দাঁড়িয়ে দু'একটা কথা বলে যাচ্ছে। তারা অবশ্য অস্বাভাবিক কিছু দেখছে না, ভাই বোন এক সঙ্গে—ওরাও তো সিনেমা দেখে আসতে পারে। দীপুর মুখটা এখন অন্ধকারের দিকে ফেরানো। সারা পাড়া কাঁপিয়ে দরজায় দুম দুম ধাক্কা দিচ্ছে দীপু।

খটাং করে দরজাটা খুলে গেল। রাসমোহন দেখলেই বোঝা যায়, এতক্ষণ তিনি ঘুমোন নি। গম্ভীরভাবে তিনি দীপুকে বললেন, যেখান থেকে এসেছো, সেখানেই ফিরে যাও। এ বাড়িতে তোমার জায়গা হবে না।

কোনো উত্তর না দিয়ে দীপু দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বললো, আঃ মেজাজ!

রাসমোহন আবার বললেন, যাচ্ছো, কোথায়? এ বাড়ি আর তোমাদের নয়। এ বাড়ি আমি বিক্রী করে দিয়েছি। সামনের মাসেই পজেশান দিতে হবে। নিজের নিজের পথ দ্যাখো। আমি আর কলকাতায় থাকবো না!

বাড়ি বিক্রীর কথাটা গায়ে না মেখে দীপু বললো, তা বলে এক্ষুনি তো আর বাড়ি ছাড়তে হচ্ছে না। আমার খিদে পেয়েছে!

রাসমোহন এবার রাগে ফেটে পড়ে বললেন, খিদে পেয়েছে! লজ্জা করে না! রাত বারোটায় বাবু বাড়িতে খেতে এসেছেন দয়া করে! বাড়ির সঙ্গে শুধু খাওয়ার সম্পর্ক! সারাদিন বাঁদরামি করে বেড়ানো, যত রাজ্যের বখাটে হতচ্ছাড়া ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা—খাওয়াটা কোথা থেকে জোটে, তার খেয়াল নেই?

অপর্ণা দুর্বল ভাবে বললো, বাবা—

রাসমোহন অপর্ণাকে গ্রাহ্য না করে বললেন, আমি দারোয়ান? আমার কাজ বাড়ি পাহারা দেওয়া? দিয়েছি বাড়ি বিক্রির করে—এখন যার যা খুশী করো! যা বেরিয়ে যা বাড়ি থেকে, আমি এখন শান্তিতে একটু ঘুমোবো!

দীপু দৃঢ় ভাবে বললো, আমার খিদে পেয়েছে। আমি এখন খাবো!

—যেখানে এতক্ষণ ছিলে, সেখানে খাওয়া জুটলো না?

অপর্ণা আবার বললো, বাবা—

এখনো তিনজনের পরস্পর কেউ কারুকে ভালো করে দেখেনি। ওরা দেখেনি, দীপুর মুখে আর হাতে রক্ত, ওরা দেখেনি অপর্ণার চোখে শুকনো কান্নার দাগ, ওরা দেখেনি, রাসমোহনের চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, তিনিও ঠিক রেগে চিৎকার করছেন না, আসলে হাহাকার করছেন। এতদিনের একটা পুরোনো বিরাট শূন্য বাড়িতে হাহাকার করছে এক বৃদ্ধ।

অপর্ণার দিকে ফিরে রাসমোহন বললেন, তুই-ও গিয়েছিলি ওর সঙ্গে ধিঙ্গিপনা করতে? আমাকে না হয় গ্রাহ্যের মধ্যেই না আনিস, নিজের মেয়েটার কথাও একবারও মনে পড়লো না?

রাসমোহন ভেবেছেন, অপর্ণা বুঝি সারা সন্ধ্যে দীপুর সঙ্গেই ছিল, এক সঙ্গে বাড়ি ফিরেছে। এটা অপর্ণার পক্ষে খানিকটা স্বস্তির ব্যাপার হতে পারতো। কিন্তু এসব হিসেব করার মতন মনের অবস্থা অপর্ণার নয় এখন। সে বললো, বাবা, আমি দীপুর সঙ্গে ছিলাম না—

দীপুর তখন একমাত্র চিন্তা, এক্ষুনি কিছু খেতে হবে। সারা সন্ধ্যায় ঐ হুড়োহুড়ির ফলে শরীর অবসন্ন হয়ে এসেছে বলেই বোধ হয় তার বেশী খিদে পাচ্ছে। দোতলায় খাবার ঢাকা দেওয়া আছে, শুধু সেই কথাটাই মনে পড়ছে। সে বললো, দিদি, তুই-ও খাসনি তো এখনো? খেতে বসে কথা বললে হয় না?

—না, আমার বাড়িতে তোমাদের আর দেখতে চাই না। বেরিয়ে যাও, আমার বাড়ি থেকে!

অপর্ণা বললো, বাবা, আমি আর এ রকম কক্ষনো করবো না! আমি উমাদের কাছে যাবো!

দীপু ওদের দুজনকে পেরিয়ে এসে সিঁড়ির আলো জ্বালালো। এবার তিনজনে দেখতে পেল তিনজনের মুখ। রাসমোহনের মুখখানা শুকনো বিবর্ণ, চোখের দৃষ্টিতে করুণা, যেন একটু আগেই কেউ তার এই পৃথিবীর যথা সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে একেবারে নিঃস্ব করে দিয়ে গেছে। অপর্ণার চোখের শুকনো জলের রেখায় ফুটে উঠেছে নতুন করে অশ্রু। দীপুর জামা-প্যান্ট ধুলো মাখা, কপালে, ঠোঁটের কোণে, সার্টে রক্তের দাগ। তিনজনেই কয়েক মুহূর্তের জন্য নিষ্পলক হয়ে গেল।

অপর্ণাই প্রথম জিজ্ঞেস করলো, এ কি দীপু কি হয়েছে তোর?

দীপুর সামান্য হেসে বললো, বিশেষ কিছুই হয়নি। ট্রাম থেকে পড়ে গিয়েছিলাম!

(ক্রমশ)

চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপায়ণ

শেষ পর্যন্ত চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ স্থির করা হল। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ এবং সংসদের অনুমোদনও মিলেছে। ১৯৬৯ সালের ১লা এপ্রিল থেকেই এই পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়েছে। খসড়া চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় সরকারী ও বেসরকারী খাতে সামগ্রিকভাবে খরচের পরিমাণ ধরা হয়েছিল ২৪,৩৯৮ কোটি টাকা চূড়ান্ত পরিকল্পনায় বরাদ্দের পরিমাণ ধরা হয়েছে ২৪,৮৮২ কোটি টাকা। সরকারী খাতে এখন বরাদ্দ করা হয়েছে ১৫,৯০২ কোটি টাকা; খসড়া পরিকল্পনায় তার পরিমাণ ছিল ১৪,৩৯৮ কোটি টাকা। অপর দিকে বেসরকারী খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ১০,০০০ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে করা হয়েছে ৮৯৮০ কোটি টাকা। নতুন ব্যবস্থায় সরকারী খাতে কৃষিক্ষেত্র ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছে ২৭২৯·৬০ কোটি টাকা; জলসেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ধরা হয়েছে ১০৯৭·০৯ কোটি টাকা; বৈদ্যুতিক শক্তি বাবদ বরাদ্দ করা হয়েছে ২৪৫৫·৮৩ কোটি টাকা; গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষেত্রে ধরা হয়েছে ২৯৮·৪৫ কোটি টাকা। বৃহৎ শিল্প ও খনিজ সম্পদ এবং পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা খাতে ধরা হয়েছে যথাক্রমে ৩৩৩৮·৫৭ কোটি টাকা এবং ৩২৪৫·২২ কোটি টাকা। শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, জল সরবরাহ ও জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রেও বরাদ্দের পরিমাণে কিছু হেরফের হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন চতুর্থ পরিকল্পনায় ১৬০০ কোটি টাকা থেকে ২১০০ কোটি টাকা পর্যন্ত নতুন সম্পদ আহরণ করার প্রয়োজন হবে এবং তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার উভয়কেই চেষ্টা করতে হবে। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে সবগুলি রাজ্যই আরও কেন্দ্রীয় সাহায্যের দাবি করেছে। শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনা কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক ডি আর গ্যাডগিল বলেছেন যে, নয়টি রাজ্যকে আরও ৮০০ কোটি টাকার বিশেষ সাহায্য দেওয়া হবে। পশ্চিমবঙ্গের জন্য বিশেষ করে কলকাতা শহরের উন্নয়নের জন্য আরও বরাদ্দের দাবি পেশ করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল। বলা বাহুল্য, কলকাতার সমস্যার সমাধানকল্পে আরও বেশী সাহায্য করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার ও পরিকল্পনা কমিশন অক্ষমতা জ্ঞাপন করেছেন। তামিলনাড়ু সরকার চূড়ান্ত চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা অনুমোদন করেননি। সরকারী খাতে যে ১৫৯০২·৩৪ কোটি টাকা খরচ হবে তার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের খরচ ধরা হয়েছে ৮০৮৯·৯৯ কোটি টাকা, কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে অন্যভাবে খরচ হবে ৭৮০·৯৩ কোটি টাকা, কেন্দ্র-শাসিত এলাকায় খরচ হবে ৪২৫ কোটি টাকা এবং রাজ্যগুলির মোট খরচের পরিমাণ হবে ৬৬০৬·৪২ কোটি টাকা। রাজ্যগুলিকে কেন্দ্র কর্তৃক সাহায্যের পরিমাণ হবে ৩৫০০ কোটি টাকা।

অধ্যাপক গ্যাডগিল সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, রাজ্যগুলি যে অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ করবে তা দিয়ে যেন পরিকল্পনা-বহির্ভূত ঘাটতি ব্যয়ের সংস্থান না করা হয়। চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় চোদ্দটি ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ায় সম্পদ সংগৃহীতকরণের কাজ আরও এগোবে মনে হয়। যদি জাতীয় আয়ের অন্ততঃ শতকরা ১২ ভাগ সঞ্চয় করা সম্ভব হয়, তবেই শতকরা সাড়ে পাঁচ ভাগ জাতীয় আয় বাড়ানো, শতকরা পাঁচ ভাগ কৃষি-উৎপাদন ও শতকরা আট ভাগ শিল্প-উৎপাদন বাড়ানো, এবং শতকরা ৭ ভাগ রপ্তানি বাড়ানোর কাজে সফল হওয়ার সম্ভাবনা। চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার চূড়ান্ত পর্যায়ে যে অতিরিক্ত ব্যয়ের সংস্থান করা হয়েছে, তার অধিকাংশই খরচ করা হবে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে। যে হারে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ছে, তা যদি আরও বাড়ানো যায় তবে ১৯৭৩-৭৪ সালে ভারত খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন করবে আশা করা যায়। খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন করলে খাদ্য আমদানি বাবদ যে বৈদেশিক মুদ্রা দেশ থেকে বেরিয়ে যায় তা বাঁচবে। বৈদেশিক সাহায্যের অনিশ্চয়তা তো আছেই। চূড়ান্ত চতুর্থ-পরিকল্পনার অর্থ সংস্থানে বৈদেশিক সাহায্যের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা দেখা যায়নি,—ঘাটতি অর্থসংস্থানের (Deficit Financing) পরিমাণ বাড়াবার কথাও বলা হয়নি।

কৃষি-উৎপাদন বেড়ে যাওয়ায় গ্রামাঞ্চলে আয়ের পরিমাণ বাড়ছে; এই আয়ের অন্ততঃ শতকরা ১২ ভাগ যদি সঞ্চয় করা যায়, তবে চতুর্থ পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের জন্য সরকারকে খুব বিব্রত হতে হবে না। যাতে গ্রামীণ সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়ানো যায় তার জন্য এগিয়ে আসতে হবে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলিকে। কিন্তু গ্রামীণ সঞ্চয় বাড়ানো খুব সহজ নয়। গ্রামবাসীদের ভোগের প্রান্তিক প্রবণতা (Marginal propensity to consume) অপেক্ষাকৃত বেশী। তবে গ্রামবাসীদের সঞ্চয় বাড়ানো এবং খরচের পরিমাণ কমানোর ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়ার জন্য সরকারের বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ—যেমন কতিপয় ক্ষেত্রে বিশেষ রেয়াত (rebate) দেওয়া অথবা বোনাস ঘোষণা করা, কর-হারের পুনর্বিন্যাস করা প্রভৃতি। যদি স্বাভাবিকভাবে গ্রামীণ সঞ্চয় বা গ্রামাঞ্চলে ব্যাংকগুলির আমানত না বাড়ে, তবে উদ্বৃত্ত কৃষিগত আয়ের উপর এমনভাবে কর বাড়ানো যেতে পারে যাতে শুধু অপেক্ষাকৃত সম্পত্তিসম্পন্ন কৃষকদেরই বেশী কর দিতে হয়। শ্রীমতী গান্ধী ১৯৭০-৭১ সালের জন্য যে বাজেট প্রস্তুত করেছেন, তাতে গ্রামাঞ্চলে সঞ্চয় বাড়ানোর জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থার কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি। কিন্তু চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার অর্থসংস্থান কর্মসূচীকে সার্থক করার জন্য তার প্রয়োজন আছে। ঘাটতি অর্থসংস্থানের পরিমাণ ৮৫০ কোটি টাকার বেশী করা উচিত হবে না। আমাদের দেশে ঘাটতি অর্থসংস্থানের পন্থা হল নতুন নোট ছাপানো; নতুন মুদ্রা প্রচলনের ফলে যতটা না উৎপাদন বাড়ে তার চেয়ে বেশী বাড়ে জিনিসপত্রের দাম। জিনিসপত্রের দামের মৃদু বৃদ্ধি উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক হতে পারে; কিন্তু যখন প্রয়োজনীয় ভোগ-সামগ্রীর দাম অসম্ভব বেড়ে যায় তখন সমাজের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নষ্ট হয় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে তা পরিপন্থী হয়। ঘাটতি অর্থসংস্থানের পরিমাণ আর বাড়ানো হবে না এ ধরনের একটি সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি আমরা চূড়ান্ত চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় আশা করেছিলাম। সরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির অর্ধেকেরও বেশী ক্ষতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, অথচ পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের জন্য এগুলির দায়িত্ব খুবই বেশী। সরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত বাড়াতে পারলে ঘাটতি অর্থসংস্থানের উপর নির্ভরশীলতা কিছুটা কমানো যায়। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের আলোচনা-চক্রে এ জিনিসটা বিশেষ প্রাধান্য পায় নি।

সুব্রত গুপ্ত

মধুবনী দেওয়াল আলপনা

সম্প্রতি মধুবনী তথা মিথিলার ঘরোয়া শিল্প দেওয়াল আলপনার নমুনা জাপানের একস্পো ৭০এ যাওয়াতে এই মেয়েলী ব্রতপার্বণের দৈনন্দিন রূপরেখা সারা দেশে সাড়া জাগিয়েছে। মিথিলা আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। মৈথিলী কৃষ্টির ধারা আর বাংলার সংস্কৃতি বহুভাবে জড়িত। কাব্যে, শিল্পে, আচরণে, ভাবধারায় যে মধুর কোমলতা বাঙালী-জীবনের নির্মম সত্যগুলিকে মোলায়েম করে তার অনেকটা মৈথিলী জীবনে আছে। মিথিলার এই দেওয়াল আলপনাও আমাদের আলপনার মতই একান্ত স্ত্রীসুলভ সৌন্দর্য ও রুচির রীতি।

পরিবারের মেয়েরা মিলে আঁকেন এই দেওয়াল চিত্রের নমুনা। সাধারণত সবাই যোগ দেন কিন্তু যিনি ভাল আঁকার হাত পেয়েছেন, প্রথম নকশার রেখাগুলি তাঁরই হাতে রূপায়িত হয়। যেমন আলপনা কে ভাল দেন উৎসবে আয়োজনে তার ডাক আসে প্রধান মূল নকশার জন্য। তার পর সবাই মিলে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে আলপনার সব দিক। আলপনা যেমন এককালে লেপা অঙ্গনে বা ঘরের মেঝেতে দেওয়া হতো, মধুবনী চিত্রও তেমন ভালভাবে লেপা দেওয়ালেই দেওয়া হয়। রেখার সীমা টানা হলে তবে অন্য মেয়েরা কাঠির উপর পুরোনো কপড় জড়িয়ে রাঙ ভরাট করে তোলেন বর্ণাঢ্য চিত্রখানা।

আমাদের আলপনার জন্ম কবে হয়েছিল তা যেমন আমরা জানি না, মিথিলার এ শিল্প কোথা থেকে এসেছে তাও কেউ বলতে পারে না। তবে বিহারের দ্বারভাঙ্গা জেলার উচ্চবর্ণের মেয়েরাই এর চর্চা করে থাকেন। উচ্চবর্ণেও ভেদ আছে। ব্রাহ্মণ মেয়ে আর কায়স্থ মেয়ের কলা এক নয়। রং যা ব্যবহার হয় তাও এক নয়, নকশার নমুনা এক নয়। তবে একই ধারার বিভিন্ন রূপ মাত্র সে বিষয়ে কোন মতভেদ থাকতে পারে না। কায়স্থ আলপনায় খুব বেশী রং থাকে না। লাল আর কালোর প্রাধান্যে ভরা হয়, কিন্তু ব্রাহ্মণ ঘরে আলপনায় আসে কত শত রং—গোলাপী, সবুজ, হলদে, নীল কত কিছু। তার সঙ্গে লাল আর কালো তো আছেই। ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়েই হক বা কায়স্থ কন্যাই হক, আলপনার ধারা তার জীবনের এক বিশেষত্ব। শিশুকন্যাও সবার সঙ্গে তুলিতে আঁকে অল্পবিস্তর। বড় হয়ে শ্বশুর ঘর করতে যাবার সময় আলপনার নকশা আঁকা নমুনার কাগজ যায় আর পাঁচটা যৌতুকের সঙ্গে। ঐতিহ্যের এক সরলরেখা মা দিদিমার সঙ্গে নবীনাকে যুক্ত করে।

আলপনার বিষয়বস্তুও বৈচিত্র্যময়। বিবাহ বাসর উপলক্ষে আলপনায় দেখবেন হয়ত আছে নবদম্পতির নূতন জীবনে আশীর্বাদ করবেন দেবতারা, তাই শিব-পার্বতী, রাধাকৃষ্ণ, দেবী দুর্গা, গণেশ, মা কালী অরও অনেক চিত্র, না হয় আছে উর্বরতা ও সমৃদ্ধির চিহ্ন-স্বরূপ হাতি, মাছ, টিয়াপাখী, চন্দ্র সূর্য ইত্যাদি এবং সবার উপর বিকশিত দল বিরাট পদ্মফুল। আমাদের আলপনায়ও পদ্মফুলের মাঙ্গলিকত্ব সবত্র স্বীকার করা হয়। সব মাঙ্গলিক চিহ্নের ইঙ্গিত সার্থক ভবিষ্যৎ, সন্তানের জন্ম, সুখ ও সমৃদ্ধি। আলপনায় কল্পনার স্বরূপ সর্বত্র, কি বাংলা দেশ কি মিথিলায়। কখনও বা বর বউয়ের চিত্রও দেব-দেবীর কাছাকাছি আঁকা হয়। দেবাশিষের পাশে থাকুক তারা এই বোধহয় ইচ্ছা।

দেওয়ালচিত্র সাধারণত ঠাকুরঘর, বাসরঘর অথবা বাসরের অলিন্দে করা হয়। এককালে রংও আসতো সাধারণ দৈনন্দিন

মধুবনী চিত্র

ব্যবহার্য সামগ্রী থেকে। রং গুলে নেওয়া হতো ছাগল দুধে। যবের দানা জ্বালিয়ে মিলতো কালো, প্রদীপের কাজলও ব্যবহার হতো, কখনও বা গোবর পুড়িয়ে কালো রং হতো। পলাশ ফুলের রেণুতে হতো কমলা রং, কুসুম ফুলের রসে পাওয়া যেত লাল আর বেলপাতায় হতো সবুজ। আজকাল রাসায়নিক রং-এর চলন আসছে।

কখনও বা চিত্রগুলি কাহিনীর আকারে আঁকা হয়। যেমন ধরুন গোটা কুড়ি চিত্রে দুটি মেয়ের জীবনকথা হতে পারে। এরকম চিত্র কখনও বা কেবল সিন্দুরে লেপা হয় একটি সুখী সোহাগী মেয়ে, অপরটি অভাগিনী। চিত্রে যেন প্রচ্ছন্ন ঠাট্টার ভাব। সোহাগিনী দুঃখ কি তা জানেন না বলে নানাভাবে নিজেকে আঘাত দিয়ে কেঁদে নিয়ে বুঝতে চান কান্নার কি অনুভূতি! মেয়েলী কাহিনীতে এ কিছু নূতন কথা নয়। পূর্ব বাংলায়ও প্রচলিত গল্প আছে যে, শোক দুঃখ জানে না বলে এক গোয়ালিনীর আক্ষেপ। তাই সে মটর কলাই মাটিতে ছড়িয়ে তার উপর হেঁটে পড়ে গিয়ে কাঁদতে বসে। তবু তো জানা হলো দুঃখের কি দহন! বাসরে সাধারণত আঁকা হয় কৃষ্ণলীলার নানা দৃশ্য। কখনও বা গোপিকাদের বস্ত্রহরণ, কখনও বা আর কিছু। ময়ূরের পেখম তুলে নাচ ইত্যাদিও থাকে

কিছুদিন আগে মৈথিলী শিল্পী সীতা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। বড় শহরে এক আর্ট গ্যালারির দেওয়াল আঁকতে তিনি এসেছিলেন। শহরময় হইচই, শিল্পী-মেয়ের ভ্রূক্ষেপ নেই। দৃঢ়, দীপ্ত রং আর রেখায় আঁকছিলেন মস্ত এক পদ্ম। মাঙ্গলিক চিহ্নের শতদল। হৃদয় শতদলও হতে পারে। আরও কত নমুনা আঁকালাম, পুরাণ আর লোককথার শত চিত্রে ভরে উঠলো দেওয়াল।

সীতা দেবী বলছিলেন, এমনি করে বসে কি আর আঁকা যায়। সঙ্গে থাকবে ছোট বড় সব মেয়েরা, শিশুদের কলকল কথা থাকবে আশে পাশে, ভাঙ্গা ভাঙ্গা গানের কলি গেয়ে রং-এর তুলি চলবে আগে। উৎসবে, পার্বণেই তো চিত্রাঙ্কন হয়, কাজেই তার স্পর্শও তো কম নয়। বিশেষ উৎসবের বিশেষ চিত্র তাই সজীব হয়ে ওঠে। উপনয়নে এক আয়োজন, বিবাহে আর এক। বিয়ে বাড়ির শত অনুষ্ঠানে সীতা দেবী বসে এঁকেছেন বাসরের দেওয়াল। সেই বাসর যেখানে বরবধূর প্রথম পরিচয়, প্রথম শুভ দৃষ্টি। ভাবনায় আমেজে হাতের তুলি চলেছে, থামবার অবসর নেই। লাল গাই, তার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কৃষ্ণ। বাঁশীর ডাকে গোপীকুল মোহিত। আবার তারই পাশে উড়ে চলে নীল আর

ছন্দে রংএর ঘোড়া। ঘোড়ার উপর সওয়ার সাবলীল সুন্দর। কল্পনার রাজ্যে সবই সম্ভব।

সীতা দেবীকে দেখে তাই ভাবছিলাম আমাদের সংস্কৃতির যা কিছু ঐতিহ্য যেন মেয়েরা বিশেষ শহরের বাইরের মেয়েরা রক্ষা করে চলেছে আজও। জীবন আর সত্য সেখানে এক। ধার করা সংস্কৃতির ময়ূরপঙ্ক্ষী নিয়ে নাচানাচি চলে না। কি আমাদের পরম্পরা তাও আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি। ভারতীয় সংস্কৃতি নিয়ে তর্ক করি অথচ আমরাই বা কতটুকু জানি ভারতীয়তা কি? ঋতুর পরিবর্তন, ব্রতকথা, ঘরোয়া উৎসব, শস্য রোপণ, আহরণ, নতুন অন্ন ঘরে তোলার মহা আয়োজন—তার আত্মিক যোগসূত্র ফেলে কোথায় ছুটে চলেছি কে জানে। যান্ত্রিক সভ্যতায় শেষ করেছে পশ্চিমের সমাজ আর সংসার, পারিবারিক জীবন ভালবাসা ভক্তিশ্রদ্ধা। সেই যান্ত্রিক জগৎকে কেন্দ্র করে যে আমরাও এগিয়ে যাচ্ছি, গতির পরম ব্যস্ততায় বোধহয় নিজেদেরও মনে রাখতে পারি না।

শ্রীমতী

এবারের রবীন্দ্র পুরস্কার

শ্রীআবু সয়ীদ আইয়ুব মহাশয়কে রবীন্দ্র পুরস্কার দেওয়া হয়েছে জেনে বিশেষ আনন্দিত হলাম এই কারণে যে একজন প্রকৃত গুণীর মর্যাদা দেওয়া হল। আবু সয়ীদ আইয়ুব মহাশয় যেরূপ সুললিত বাংলা গদ্য লেখেন, খুব কম বাঙালীই তা লিখতে পারেন। এই উপলক্ষ্যে ছাত্ররা যদি শ্রীআইয়ুব-এর রচনাবলী পড়েন তো বিশেষ উপকৃত হবেন। বাংলা দেশে বাংলা ভাষার মাধ্যমে নতুন নতুন চিন্তাধারার প্রবর্তনের জন্য যে স্বচ্ছ এবং অর্থপূর্ণ গদ্য ভাষাই প্রয়োজন সেই গদ্যের সৃষ্টির পথে শ্রী আইয়ুবের দান অবিস্মরণীয়।

সুভাষচন্দ্র সরকার
পাটনা-৩

॥ ২ ॥

সনাতন পাঠক ২১শে মার্চের 'দেশ'-এ আমার সম্বন্ধে যেসব ভালো ভালো কথা লিখেছেন তাতে আমি স্বভাবতই খুশী এবং কৃতজ্ঞ। কিন্তু একটি কথায় অস্বস্তি বোধ করছি—"উর্দু, ইংরেজী, সংস্কৃত, বাংলা ও ফরাসী ভাষা তিনি সাবলীলভাবে ব্যবহার করেন।" ফরাসী অল্পস্বল্প জানি, সাবলীল কেন সচ্ছন্দভাবেও ব্যবহার করতে পারি না। ফরাসী কবিতা পড়বার সময় ইংরেজী অনুবাদটি সব সময় পাশে রাখি। বরঞ্চ হাফিজের ফারসী বয়েৎ অর্ডাউ যেতে পারি অবলীলাক্রমে। উর্দু অজস্র বয়েৎ মুখস্থ আছে। বাংলা কবিতা আমি প্রাণ দিয়ে ভালবাসি, কিন্তু শত চেষ্টা করেও মুখস্থ রাখতে পারি না। বয়স হওয়ার পর ভাষা শিখতে গেলে এই অসুবিধায় পড়তে হয়। অন্য অসুবিধা ইডিয়ম-প্রয়োগের অপটুতা। আমার বাংলা রচনা-রীতি যে সংস্কৃত প্রধান তা কতকটা বিষয়ের ভারে, কতকটা আমার ভাষা জ্ঞানের স্বল্পতার দরুন।

আমি গীতাঞ্জলি পড়ে মুগ্ধ হই প্রথমে ইংরেজীতে নয়, উর্দুতেই। তার পরে ইংরেজীতে। অবশেষে অভিধানের সাহায্যে বাংলায়। সে কথা স্মরণ করলে আজ লজ্জাও পায়, হাসিও পায়।

আবু সয়ীদ আইয়ুব
কলকাতা-১৭

ডাইরীর ছেঁড়া পাতা

দেশ পত্রিকা নিয়মিত পড়বার সুযোগ আমার হয় না; তবু হাতের কাছে সুযোগ এলে পারতপক্ষে ছেড়ে দিই না। সেদিন অনেকগুলো পুরোনো সংখ্যা একসঙ্গে পেয়ে পড়লাম। বেশ ভাল লাগল। বিশেষ করে ভাল লাগল ফাদার দ্যতিয়েনের 'ডাইরীর ছেঁড়াপাতা' পর্যায়ের রচনাগুলি। ফাদার বেশ কষ্ট, বিশেষ যত্ন করে বাংলা ভাষা শিখেছেন। সংস্কৃতেও তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় ভাষা শেখার শুভারম্ভ সংস্কৃত দিয়ে একথা লেখক নিজেই ডাইরীতে উল্লেখ করেছেন। এদেশে এসে গভীর শ্রদ্ধার মার মত পরজননীর সেবা করে চলেছেন অক্লান্তভাবে। তাঁর এ দুশ্চর সাধনা সার্থক—একথা জোর দিয়ে বলা চলে। কোনো নামজাদা লেখকের ছদ্মনামে লেখা বলে ভুল হওয়াও বিচিত্র নয়।

'আজীবন পক্ক নিয়ে এসেছি......তারপর বলব কি বাংলা ভাষা ও বাংলাভাষীদের।'—দেশ ২৭ ভাদ্র ১৩৭৬ সংখ্যা ৪৬, পৃষ্ঠা ৬৯৫। কিঞ্চিৎ পরিমাণে পরিহাস বিজড়িত হলেও লেখকের অন্তরের উক্তি। সাহিত্যকারের ভাল না বাসলে, পেছনে হৃদয়ের দরদ না থাকলে এমন লেখা কলমের ডগায় আসে না—সাথে অবশ্য প্রয়োজন গভীর পঠন ও অনুশীলন যার কোনোটাতেই লেখকের অভাব নেই।

এমনিতেই দুস্তর ব্যবধানের জন্য ইউরোপীয়ের পক্ষে ভারতীয় ভাষা শেখা সহজ কাজ নয়—বিশেষ করে বাংলা ভাষা প্রকাশ-বৈচিত্র্যে, অসংখ্য বাগ্‌বিধিতে, 'অজেয়' প্রবাদ প্রবচনে কত ঋদ্ধিমান—যা বিদেশীর পক্ষে ভালভাবে আয়ত্ত করা অত্যন্ত আয়াসসাধ্য। চলতি বাংলায় লেখা আরও কঠিন—গুরুচণ্ডাল দোষের সম্ভাবনা পদে পদে। ফাদার সে অসাধ্যসাধন করেছেন; বাংলা ব্যাকরণের হালচাল, পরভাষীর বেড়াজাল' স্বচ্ছন্দে ডিঙিয়ে অতিক্রম করেছেন। একজন বিদেশীর পক্ষে এ কম কৃতিত্বের কথা নয়।

'কষ্ট করে' শেখা, তাই বলে লেখা কষ্টকল্পিত নয়—সরস, সাবলীল, স্বচ্ছ, চটুলগতি—মাঝে মাঝে গুরুগম্ভীর বিষয়ের সমাবেশেও বেখাপ্পা হয়নি। বিষয়বস্তু বেশ চিত্তাকর্ষক, কৌতুককর—আলংকারিকদের ভাষায় কান্তাসম্মিত জ্ঞানপ্রদ। রবীন্দ্র-সাহিত্যে লেখকের জ্ঞান যে পল্লবগ্রাহী নয় তার প্রমাণ পাতায় পাতায়।

'আগামী বৎসরের প্রদর্শনীর লেবেলগুলিতে যেন বানান ভুল আর কালির দাগ একটু কম পরিমাণে প্রদর্শিত হয়।' ৩ আশ্বিন, ৪৭ সংখ্যা পৃষ্ঠা ৭৯৭।—লেখকের মন্তব্য পোস্টারে, বিজ্ঞাপনে এমন কি সাহিত্যিক রচনাতেও ক্রমবর্ধমান বর্ণাশুদ্ধির দিকে আমাদের অন্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করছে আর স্থূলে পৃষ্ঠে কিঞ্চিৎ-কশাঘাত। ইংরাজী রচনায় বানান ভুল এড়ানর জন্য আমরা যতটা সচেতন—দুঃখের বিষয় মাতৃভাষায় ততটা নই। এই শিথিল মনোবৃত্তি শ্রদ্ধার পরিচয় নয়।

ভিনদেশীর রচনা—ভাষা বাঙালীর কানে জায়গায় জায়গায় একটু বেসুরো বাজা অস্বাভাবিক নয়, দু-একটা অপপ্রয়োগও চোখে পড়ে। উপদেশ দেবার স্পর্ধা নিয়ে নয়—নিতান্ত বন্ধুভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই আলোচনার অবতারণা। বলা বাহুল্য এগুলি সংখ্যায় অধিক নয়, মারাত্মকও নয়—সামগ্রিক ভাবে রচনার পক্ষে ক্ষতিকরও নয়।

'প্যারিসে অনুষ্ঠিতব্য ভারতীয় চিত্রকলার প্রদর্শনী'—১০ শ্রাবণ, ৩৯ সংখ্যা ১৪০১ পৃষ্ঠা। অনুষ্ঠিতব্য শুদ্ধ নয়। স্থা ধাতু তব্য প্রত্যয় যোগে স্থাতব্য হয়—সংস্কৃতজ্ঞ লেখকের নিশ্চয়ই অজানা নয়। শব্দটি অনু-উপসর্গের যোগে ষত্ববিধানের নিয়মে অনুষ্ঠাতব্য হবে—অনুষ্ঠিতব্য নয়। শ্রুতিকটু দোষে অনুষ্ঠাতব্য যদি বাদ পড়ে, তবে একই নজিরে অনুষ্ঠিতব্যই বা কাজে পায় কি করে? লেখকের দোষ নেই, মনে হয় সংবাদপত্রে ব্যবহৃত এই অপপ্রয়োগটি দেখে তিনি রপ্ত করেছেন। কোনো নামকরা লেখকের ভাষায় এর হদিশ মিলবে না। হালে আবিষ্কৃত এই অদ্ভুত তৎসম (?) শব্দটির পিছনে পরিস্থিতির মত (শুদ্ধ সংস্কৃত রূপ—পরিস্থিতি) শ্রুতিমাধুর্যের, প্রয়োগ বাহুল্যের বা সজ্জন-স্বীকৃতির কোনো দাবী নেই। 'অনুষ্ঠাতব্য' বাতিল বলে বিবেচিত হলে 'অনুষ্ঠেয়' সহজেই চলতে পারে—শ্যাম কুল দুই-ই রক্ষা হয়।

'অতিরঞ্জিত সাধারণীকরণ'—১৭ শ্রাবণ, পৃষ্ঠা ৭০—বিদেশীয় বাক্যাংশের অনুবাদ হেতু বিদেশী গন্ধ কিঞ্চিৎ প্রকট। 'আধুনিক গানের আমি অমার্জনীয়ভাবে অনুরক্ত নই'—২৪ শ্রাবণ, ৪১ সংখ্যা পৃষ্ঠা ১৪৫—আ আ অ অ-তে কিঞ্চিৎ অনুপ্রাসের সৃষ্টি হয়েছে বটে (কট্টর আলংকারিকেরা আবার স্বরমাত্র সাদৃশ্যকে অনুপ্রাস বলে গণ্যই করেন না) অমার্জনীয় ভাবে অনুরক্ত সম্বন্ধেও একই বক্তব্য। অবশ্য মতভেদ হতে পারে। একই পাতায় 'লোক-সাহিত্যে আমার দুর্মর প্রলোভন'—দুর্মর শব্দটি

মানবতার আদর্শ, মহৎ প্রাণের মহতী সংকল্প সফল হবেই হবে। দেশীয় সমবেদনা, দেশীয় সহানুভূতি দেশীয় বদান্যতার ছায়াতেই মানবিক মর্যাদাসহ শান্তি ও সম্প্রীতির মধ্যে সুখে বাস করবে প্রত্যেক দেশবাসী। হ্যাঁ এই আশা—এই আশা যদি না রাখি কোন প্রবোধে ভুলিয়ে রাখবো শত বিক্ষোভে বিক্ষুব্ধ মনকে?

সৈয়দ শামসুন্নেহার বেগম
মুর্শিদাবাদ

ইন্দিরাজীর বাজেট

"দেশ" পত্রিকার ৩০শে ফাল্গুনের সংখ্যাটিতে "ভারতের অর্থনীতি" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীসুব্রত গুপ্ত এমন কতকগুলি মন্তব্য করেছেন যা কোনোমতেই গ্রহণযোগ্য নয়। শ্রীগুপ্ত লিখেছেন "শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭০-৭১ সালের জন্য যে বাজেট প্রস্তুত করেছেন, সাধারণভাবে জনসাধারণের কাছে তা গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। বিশেষ করে লোকসভায় শ্রীমতী গান্ধীর সরকারের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকা সত্ত্বেও বাজেটটি যথেষ্ট বলিষ্ঠ ও সাহসিক হয়েছে, সেজন্য প্রধানমন্ত্রী অভিনন্দন দাবি করতে পারেন।"

প্রথমত শ্রীমতী গান্ধীর ১৯৭০-৭১ সালের বাজেটটি সাধারণভাবে জনসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে এ ধারণা শ্রীগুপ্তের কিভাবে মনে হলো? হয়ত, ব্যক্তিগতভাবে শ্রীগুপ্তের কাছে শ্রীমতী গান্ধীর ১৯৭০-৭১ সালের বাজেট গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে, কিন্তু তাই বলেই কি এ কথা স্বীকার করতে হবে যে বাজেটটি সাধারণভাবে জনসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে? এই বিশাল ভারতের কজন লোকের সঙ্গে আলোচনা করে শ্রীগুপ্ত এইরকম একটি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন?

দ্বিতীয়ত শ্রীসুব্রত গুপ্ত শ্রীমতী গান্ধীর বাজেটটিকে "যথেষ্ট বলিষ্ঠ ও সাহসিক হয়েছে" বলে মন্তব্য করেছেন। দেখা যাক বাজেটটি কতটা "বলিষ্ঠ" এবং কি পরিমাণে "সাহসিক"। শ্রীমতী গান্ধী বাজেটে উল্লেখ করেছেন যে, ৫০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের ক্ষেত্রে আয়কর দিতে হবে না। এবং এর ফলে পাঁচ লক্ষ লোক উপকৃত হবে। বেশ, ভাল কথা। কিন্তু সারা ভারতে মাত্র পাঁচ লক্ষ লোক ছাড়া সবাই ধনী? তারপর ধরা যাক একজনের বাৎসরিক আয় ৫০০০ টাকা। কিন্তু সেই ব্যক্তির সংসারে আর কেউ নেই, যার ফলে তার খরচ অনেক কম। আবার অন্যদিকে আরেকটি লোক যার বাৎসরিক আয়, ধরা যাক, ১০০০০ টাকা। কিন্তু এই ব্যক্তিটির পরিবারে বেশ কয়েকজন লোক আছে। এবং সমগ্র পরিবারটি ঐ একটি মাত্র ব্যক্তির আয়ের উপর নির্ভরশীল। অথচ শ্রীমতী গান্ধী ৫০০০ টাকা আয়ের লোকটির উপর কোন কর ধার্য করলেন না। কিন্তু ১০০০০ টাকা যে আয় করে তার উপর বেশ মোটা পরিমাণ কর ধার্য করেছেন, যদিও আনুপাতিক হিসাবে ঐ ৫০০০ টাকা যে আয় করছে তার অবস্থা, ১০০০০ টাকা যে আয় করছে, তার থেকে উন্নত। অর্থাৎ, আয় বেশী হলেই যে অবস্থা সবসময় উন্নত হবে এ কথা ঠিক নয়। সংসারে কতজন লোক এবং কজন তার মধ্যে আয় করে, এ দুদিকই আয়কর ধার্য করার সময় বিবেচনা করা দরকার। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী আয়কর ধার্যের সময় এই দিকটি একবার চিন্তাও করলেন না। এখন এই রকম অবিবেচনাপ্রসূত বাজেটটিকে কি "বলিষ্ঠ" আখ্যা দেওয়া সমীচীন হবে? "সাহসিকতার" তো লেশমাত্রও নেই, কারণ শ্রীমতী গান্ধী আসল ব্যাপারটিকেই এড়িয়ে গিয়েছেন। শুধুমাত্র উচ্চ আয়ের ক্ষেত্রে, (বলে রাখা ভাল যে ৫০০০ টাকার ওপরের আয়ের লোক হলেই ধনী বলা যায় না কোনমতেই) ক্রমবর্ধমান হারে আয়কর বাড়ালেই কি সেই বাজেটটিকে "বলিষ্ঠ" ও "সাহসিক" বলতে হবে? এই অধিক পরিমাণ প্রত্যক্ষ করের বোঝার দরুণই আজ ভারতীয় অর্থনীতির এই দুর্দশা। কিছুদিন আগে বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপক পারকিনসন কলকাতায় এসেছিলেন। অধ্যাপক পারকিনসন তাঁর প্রতিটি বক্তৃতাতেই ভারতের এই অত্যধিক পরিমাণে করের বোঝার কথা উল্লেখ করেন এবং মন্তব্য করেন যে, এইভাবে ক্রমবর্ধমান হারে কর বাড়িয়ে ভারতের আর্থিক উন্নতি কোনমতেই সম্ভবপর নয়। আর তা ছাড়া এই ক্রমবর্ধমান হারে আয়কর বাড়ালে লোকের সঞ্চয় করার ক্ষমতা কতটুকু থাকবে? ক্রমবর্ধমান হারে আয়কর বাড়ালেই কিন্তু পরিমাণে কর ফাঁকি দেবার প্রবণতা দেখা যায়, কারণ এ দেশে আর যা কিছুর অভাব থাকুক না কেন অসৎ প্রকৃতির লোকের কোনো মোটেই অভাব নেই। অন্য লোকের কথা তো বাদই থাকুক, শ্রীমতী গান্ধীর নিজের দলের সদস্য ও "পরম প্রগতিবাদী" এবং "চরম সমাজতন্ত্রী" শ্রীজগজীবন রাম তো একাদিক্রমে দশ বছর আয়কর ফাঁকি দিয়েছেন এবং না ধরা পড়লে নিশ্চয়ই ঐ অভ্যাসটি চালিয়ে যেতেন। অথচ অদ্ভুত ব্যাপার, শ্রীরামের এর জন্য কোন শাস্তি তো হলোই না বরং উল্টে শ্রীমতী গান্ধীর আনুকূল্যই লাভ করলেন! শ্রীমতী গান্ধীও তাঁর প্রদত্ত বাজেটে এই কর ফাঁকি দেবার ব্যাপারটির উপর খুব একটা জোরও দেননি। তবুও কি এই বাজেটকে যথেষ্ট "বলিষ্ঠ" ও "সাহসিক" বলতে হবে?

তারপর, শ্রীমতী গান্ধী তাঁর বাজেটে চা, চিনি, পেট্রল, বিস্কুট, মাখন প্রভৃতির উপর কর বসালেন। ফলে অবস্থাটা হলো এই যে, গরীব এবং নিম্নমধ্যবিত্তদের উপর আরো চাপ সৃষ্টি করা হলো। চা এবং চিনি এই দুটি দ্রব্যই অপরিহার্য ও [illegible] প্রয়োজনীয়। তাহলে গরীবদের উপর কি জুলুম করা হোলো না? পেট্রলের [illegible] বাড়ানোর ফলে বাসের ভাড়া [illegible] পথটি আরও পরিষ্কার হয়ে গেল। এর [illegible] গরীব এবং নিম্নমধ্যবিত্তদের উপর [illegible] বোঝা চাপল না কি? যাদের পক্ষে [illegible] ব্যবস্থা করা ব্যয়সাধ্য তাঁরা হয়ত [illegible] মাখন খেয়েই দুধের সাধ ঘোলে [illegible]। তাছাড়া মাখন, বিস্কুট এসব তো শিশু এবং রোগীর খাদ্যও বটে। এমনিতেই তো এ সবের ভীষণ দাম। শ্রীমতী গান্ধী আরও বাড়িয়ে দিলেন। ফলে বাড়ীতে অতিথি এলে গরীব এবং নিম্নমধ্যবিত্তের পক্ষে এক কাপ চা ও দুটো বিস্কুট দেওয়াও দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। এ সবের পরও কি শ্রীমতী গান্ধীর বাজেট "অভিনন্দন যোগ্য" এবং "বলিষ্ঠ ও সাহসিক"? শ্রীমতী গান্ধী অতিরিক্তভাবে মোট ১৭০ কোটি টাকার কর ধার্য করেছেন। এই ১৭০ কোটি টাকার মধ্যে প্রায় ১২০ কোটি টাকাই আসবে মধ্যবিত্তদের পকেট থেকে। এ জিনিসকে কোনোমতেই বলিষ্ঠতার পরিচয় বলা যায় না। "অভিনন্দনযোগ্য" তো নয়ই। "সমাজতন্ত্রের" নামে তিনি গরীব ও মধ্যবিত্তদের ধাপ্পাই দিয়েছেন।

তুহিন শুভ্র ভট্টাচার্য
কলকাতা-২৯

ফুটবল খেলাতে হবে

আপনাদের পত্রিকায় শ্রীঅজয় [illegible] ফুটবল খেলার উপর লেখাটি পড়ে [illegible] আনন্দ পাচ্ছি। ফুটবল খেলা [illegible] [illegible] এর আর্থিক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] অন্ধকার।

[illegible] এ দিকটা [illegible] আছে [illegible] sportsকে আমরা [illegible] পাঠাচ্ছি এটা ঠিক কথা।

এ তো গেল ভূমিকা। আমার মনে হয় sportsকে সরকারীভাবে বাধ্যতামূলক করা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ে এর জন্য ডিগ্রী নিতে পারলে ভালো হোত।

শ্রী দত্তের লেখা ক্রীড়া সাহিত্যের একটি মূল্যবান বই হবে এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। তবে তাঁর অভিজ্ঞতার [illegible]

অরণ্যদেব ✡ লী ফক

নতুন গল্পের শুরু
গভীর অরণ্যের গোপন খুলি-গুহা ছাড়াও কয়েকটি প্রিয় জায়গা আছে অরণ্যদেবের। কখনো তিনি কিলা-উম্বির সোনাবেলায় সেই শ্বেত-পাথরের বাড়িতে থাকেন, কখনও থাকেন আমেরিকার মরু অঞ্চলের সেই জুজুর ঢিবিতে। তবু সন্দেহ নেই যে·····

স্বর্ণ-দ্বীপই তাঁর সব-চাইতে প্রিয় জায়গা।

যখন তিনি সম্পূর্ণ একা থাকতে চান, তখন গভীর অরণ্য থেকে যাত্রা করেন সেই দ্বীপের দিকে·····

আঃ, কয়েকটা দিন একারে চমৎকার কাটবে!

এই সেই স্বর্ণ-দ্বীপ। পৃথিবীতে এ এক আশ্চর্য জায়গা। এমন জায়গা কেউ কখনো দেখেনি।
৪/১০

জলের মধ্যে নাক ডোবাসনে ডেভিল।

স্বর্ণ-দ্বীপে বাঘ আর জেব্রা, সিংহ আর জিরাফ পাশাপাশি বাস করে। সকলকেই ভালবাসেন অরণ্যদেব।
অনেকদিন তোদের দেখিনি!

এ-চিঠি এখুনি অরণ্যদেবের হাতে পৌঁছনো চাই।

একটি সমসাময়িক চিন্তা

মার্চ মাসের মাঝামাঝি যখন বাংলা দেশের যুক্তফ্রন্ট সরকার টিঁকবে কি টিঁকবে না, অতি বাম কিংবা নরম বাম দলগুলি আলাদা মন্ত্রিসভা গঠন করবে কিনা এই নিয়ে একটা দারুণ সাসপেন্স চলছিল, সেই সময় কলকাতায় পথে ঘাটে পানের দোকান বা অন্যান্য দোকানে রেডিওর সামনে খুব ভিড় দেখা যেত টাটকা টাটকা খবর শোনার জন্য।

রাজনীতির এই সব জটিল ধাঁধা আমার মাথায় ঢোকে না, আমি এই সব মুখরোচক গরম খবরে খুব একটা উৎসাহ বোধ করিনি। তবু পথ চলার সময় নানান সমালোচনা শুনতেই হয়, ভিড় থেকে পাশ কাটাবার সময় দু' একটা মন্তব্য কানে আসেই। সেই রকম একটা মন্তব্য থেকেই আমার একটি চিন্তার উদয় হলো।

দিল্লির বাংলা সংবাদ কিংবা কলকাতার স্থানীয় সংবাদ আরম্ভ হবার একটু আগে থেকেই ঐ কদিন রেডিওর সামনে ভিড় জমতো, এবং নির্ধারিত সময়ের সংবাদ শেষ হওয়ার পরেও লোকের আশা মিটতো না। রাত দশটার স্থানীয় সংবাদ আরম্ভ হবার একটু আগেই একটা পানের দোকানের সামনে বেশ ভিড় জমেছে, ফুটপাথ থেকে রাস্তায় উপচে পড়ছে লোক। ধরা যাক, তখন দশটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি, একজন মহিলা খুব দরদ দিয়ে অতুলপ্রসাদের গান গাইছেন। "আমার পরাণ কোথা যায়, কোথা যায় উড়ে"। গানটা একটু শোনার জন্য আমি গতি মন্দ করেছিলাম। আমারই ভুল হয়েছিল, নইলে অতুলপ্রসাদের চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধারের বাণী শুনতে হতো না।

বস্তুত লোকে তখন অধীর আগ্রহে জানার জন্য অপেক্ষা করছে, অজয় মুখার্জি পদত্যাগ করলেন কি না, জ্যোতি বসু নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করলেন কিনা, অথবা রাষ্ট্রপতির শাসন হচ্ছে কিংবা নতুন নির্বাচন— অতুলপ্রসাদের গান শোনার ধৈর্য তখন থাকবে কেন! যদিও আর তিন চার মিনিট পরেই আরম্ভ হবে সেই সব বার্তা, কিন্তু এটুকু সময়ই আর ধৈর্য থাকছে না। জনতা মন্তব্য করছে, ধুর বাবা, কি প্যান-প্যানানি, চলছে তো চলছেই! থামা না বাবা!... এই এক ঘেয়ে গান কি এখন না দিলেই নয়!...আজকাল রেডিও খুললেই রবীন্দ্র সঙ্গীত! কেন বাবা আর কি কিছু নেই?... এটা রবীন্দ্র সঙ্গীত নয়, কেত্তন!...তা হলেও রবীন্দ্র সঙ্গীত-মার্কা কেত্তন!...আর কি এ গান গাওয়ার সময় পেলি না? থাম্, থাম্!...এটা বোধ হয় অতুলপ্রসাদের গান!...ওসব অতুলপ্রসাদ ফতুলপ্রসাদ আর চলবে না, ওসব ডেড্...ইত্যাদি!

কে গান গাইছিলেন জানি না, তবে এটুকু বলা যায়, খুব আন্তরিকভাবে গেয়েছেন, গলায় প্রতিটি সুর ঠিক ঠিক খেলা করছিল। আবার, এ কথাও ঠিক, সমসাময়িক খবর জানার জন্য লোকের আগ্রহ তখন এত প্রবল, এত রকম মত নিয়ে মারামারি যে বিশুদ্ধ সঙ্গীত উপভোগ করার মতন মনের অবস্থা অনেকেরই ছিল না। তা হলে, রেডিও স্টেশনের কি করা উচিত ছিল? ঐ সব দিনে, সমস্ত রকম গান বাজনা বন্ধ করে দিয়ে সারাক্ষণ খবর শোনানো তো সম্ভব নয়! তা ছাড়া, সারাদিন ধরে খবর তৈরীও হয় না, তা হলে একই খবর বারবার শোনাতে হয়। অতুলপ্রসাদের বদলে অন্য কারুর গান দিলে ভালো হতো? এই সব হুড়োহুড়ির দিনে রবীন্দ্রনাথ-অতুলপ্রসাদের গান বাদ? নজরুলের গান চলতে পারতো? কিংবা দেশাত্মবোধক গান? কিন্তু দেশাত্মবোধও তো এখনকার ফ্যাশান নয়—তাতেও অনেকের আপত্তি হতে পারে।

এই সব রাজনৈতিক নেতাদের বাণী পদ্মপত্রে জলবিন্দুর চেয়েও ক্ষণস্থায়ী। গত তিন বছরের খবরের কাগজ ওল্টালে দেখা যাবে, ভারতবর্ষের এমন কোন দলের এমন কোনো নেতা নেই, যিনি বা যাঁরা পরস্পরবিরোধী কথা বলেন নি। এই তিন বছরে, বিভিন্ন অঞ্চলে চরম বামপন্থীদের সঙ্গে চরম দক্ষিণ পন্থীদের হাত মেলামেলি হয়েছে, জন সঙ্ঘ-মুসলিম লীগে ভাব হয়েছে, অনবরত শত্রু মিত্র বদল হয়েছে। এই সব বাজে ব্যাপারের তুলনায় রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদের নিশ্চিত অনেক স্থায়ী মূল্য আছে।

এই প্রসঙ্গেই মনে আসে, এই রকম যখন আবহাওয়া, তখন সাহিত্যিকদের কি করা উচিত? তাঁদেরও কি লেখা বন্ধ রাখা উচিত? তাঁদের লেখাও তো সমসাময়িক উত্তেজক সংবাদের তুলনায়—নিছক প্যানপ্যানানি মনে হতে পারে!

অনেকে অবশ্য দাবি করছেন, যে-রকম আবহাওয়া, যে-সব আন্দোলন ও রাজনৈতিক মতবাদ এখন প্রবল—সাহিত্যিকদের এখন তা-ই নিয়েই লেখা উচিত। কিন্তু এ কথাও সত্য যে খুব বেশী লেখক সমসাময়িক ব্যাপার নিয়ে লিখছেন না। কেন? নিশ্চয়ই, লেখকরা অন্তর থেকে প্রেরণা পাচ্ছেন না—সাহিত্যকে এই ব্যাপারে জড়িয়ে ফেলতে। রাজনীতি যদি সাহিত্যকে আকৃষ্ট করতে না পারে, তবে সেটা রাজনীতির গঠনেরই দোষ বুঝতে হবে, রাজনীতির আবহাওয়া সৃষ্টিশীল লেখকদের উদ্বুদ্ধ করতে পারছে না। যদি অনবরত মত বদলায়, যদি মূলে লক্ষ্যের বদলে ছোট খাটো স্বার্থই প্রধান হয়ে ওঠে—সাহিত্য সেই স্রোতে গা ভাসাতে পারে না। ব্যর্থ হোক, সার্থক হোক—প্রতিটি লেখকই মনে মনে চায় এমন কিছু লিখতে—যার একটা স্থায়ী মূল্য থাকবে। যা শুধু একদল মানুষের জন্য নয়, গোটা মনুষ্য সমাজের কাছে একটা কিছু আবেদন রাখবে। দেশের পরিবর্তনের সময় যে-লেখক অংশ গ্রহণ করতে পারে না, সে হতভাগ্য। বস্তুত, দেশের অবস্থার পরিবর্তন ক্রমাগত বিলম্বিত হচ্ছে বলেই অনেক লেখক দুঃখিত।

অনেকে অবশ্য বলে, এই যে লেখকরা সমসাময়িক ব্যাপার নিয়ে—বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শ নিয়ে লিখছেন না—এর পেছনে কোনো একটা চক্রান্ত আছে। এই সব লেখকরা সাধারণ প্রেম ভালোবাসার গল্প লিখে দেশের বিপ্লবকে পিছিয়ে দিচ্ছে, মানুষের মন অন্য দিকে চালিত করতে চাইছে। এই সব লেখক স্বার্থান্বেষী, নিজের লাভের জন্য উন্মুখ—এমনকি এদের পেছনে কোনো বিদেশের টাকা পয়সা আছে, এই ইঙ্গিতও শোনা যায়।

এগুলো অবশ্য আলোচনার যোগ্য নয়। লেখকরা অন্যের কথা শুনে বা অন্যের নির্দেশে লিখবেন—এ কথা যারা ভাবতে পারে তাদের বুদ্ধি অত্যন্ত অপরিণত বলতে হবে। তাছাড়া, প্রেম-ভালোবাসা মোটেই সাধারণ ব্যাপার নয়, এগুলো বাদ দিয়ে বিপ্লব হয় না। আর প্রেম-ভালোবাসার কাহিনী পড়েই মানুষের মন যদি বিপ্লব থেকে বিমুখ হয়ে যায়— তাহলে সে সব মানুষদের দিয়ে সত্যিই কি কখনো বিপ্লব হতো?

সনাতন পাঠক

পরিধিটি সর্বাগ্রে মেনে নেওয়া দরকার এবং সেই পরিধির অন্তর্ভুক্ত যাবতীয় তথ্য বিবলিওগ্রাফিতে সংগৃহীত হওয়া দরকার। আমার বিবেচনায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীন-মধ্যযুগের বিবলিওগ্রাফি কোনো একজন লোকের দ্বারা একখণ্ডে সম্পূর্ণ হতে পারে না। এই ধরনের কাজ একেবারে না হওয়া দোষের নয়, কিন্তু আধাআধি হওয়া দোষের।

ক্যাটালগ এবং বিবলিওগ্রাফি যে গবেষণার বিষয় হতে পারে একথা **Cecil Bendall**-এর Catalogue of **Budhist Sanskrit** Manuscripts বইটির সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরাই স্বীকার করবেন। লাইব্রেরীয়ান এবং বিবলিওগ্রাফারও স্কলার, পাণ্ডিত্য এবং মর্যাদায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরের চেয়ে এঁরা কোনো অংশে ছোট নন। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের বহু বিভাগীয় প্রধান মিউজিয়াম থেকে সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। আমাদের দেশে লাইব্রেরিয়ানশিপ আর স্কলারশিপ কোনোদিনই একসঙ্গে মেলে নি (রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ব্যতিক্রম)। বিদেশে আগে মিলেছে, এখন মিলছে না— L. D. Barenet, F. W. Thomas, A. Master প্রভৃতিদের এখন লাইব্রেরীয়ান হিসাবে দেখলে আশ্চর্য হব। গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান এখন স্বতন্ত্র ডিসিপ্লিন, সে ডিসিপ্লিন আকাডেমিক ডিসিপ্লিন থেকে পৃথক ত নয়ই, পরন্তু পরস্পরের পরিপূরক। আমাদের দেশে এই দুটি ডিসিপ্লিনের পারস্পরিক যোগাযোগ দৃঢ় নয়। কোনো কনফারেন্সের কর্মসূচীতে লাইব্রেরীয়ানদের লেখা গবেষণা-প্রবন্ধ পড়া হতে শুনি নি, বিশ্ববিদ্যালয়ের Academic Board জাতীয় কমিটিতে লাইব্রেরীয়ানদের স্থান আছে বলে জানি না। বিবলিওগ্রাফি-র মর্যাদা গুরুত্ব এখনও অস্বীকৃত।

শিবদাস চৌধুরী মহাশয় যে-পদে এখন অধিষ্ঠিত আছেন সে-পদে এর আগে একাধিক প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি অধিষ্ঠিত ছিলেন। চৌধুরী মহাশয় তাঁর পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে নিজের শক্তি অনুসারে কাজ করে চলেছেন। সোসাইটির জার্নালের নিয়মিত পাঠকেরা চৌধুরী মহাশয়ের অন্যান্য কাজের খবর অবশ্যই জানেন।

আলোচ্য তালিকা-গ্রন্থ তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত। গ্রন্থকর্তৃসূচী (পৃঃ ১—৭৬), গ্রন্থনাম সূচী (৭৭—৯৬) এবং পরিশিষ্ট (৯৭—৩১৮)। দ্বিতীয় পরিশিষ্টে (পৃঃ ১০২—২৮২) ১৪টি সাময়িক পত্রের 'লেখ-সূচী' বর্ণানুক্রমে দেওয়া হয়েছে। এইটিই এই বই-এর সর্বাপেক্ষা মূল্যবান প্রসঙ্গ। নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলির বিষয়সূচী এই অংশে দেওয়া হয়েছে। (ক) উপদেশক পত্রিকা (১৮৪৭—১৮৫৭), (খ) প্রচার (১২৯১—৯৪), (গ) রহস্য-সন্দর্ভ (১৯২০—২৮ সম্বৎ), (ঘ) বিবিধার্থ সংগ্রহ (১ম—৭ম খণ্ড), (ঙ) সত্যার্ণব, (চ) বাণী (১৩১২—১৩১৪), (ছ) বঙ্গদর্শন (১ম—৬ষ্ঠ বর্ষ), (জ) ভারতবর্ষ (১৩২০-২১), (ঝ) রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (৪র্থ ভাগ), (ঞ) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৭৬৯—১৮৪৬), (ট) প্রকৃতি, (ঠ) পল্লীবিজ্ঞান (১৮৬৭-৬৮), (ড) খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি (১৮২২—২৪), (ঢ) মাসিক পত্রিকা (১৮৫৪-৫৫)।

গ্রন্থকার সোসাইটির সংগ্রহে যে সাময়িকপত্রগুলি আছে কেবলমাত্র সেগুলির বিষয়সূচী দিয়েছেন। আমরা আশা করব শিবদাসবাবু প্রবন্ধাকারে হোক গ্রন্থাকারে হোক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের বিবলিওগ্রাফি তৈরীর কাজে উৎসাহী হবেন। সোসাইটির জার্নালের বিষয়সূচী হয়েছে কিনা জানি না, না হলে হওয়া দরকার। আশা করি শিবদাসবাবু ক্রমে ক্রমে এগুলি প্রকাশ করবেন। বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের যে তালিকাটি শিবদাসবাবু প্রকাশ করেছেন সেজন্য বাংলাভাষার ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

একটি বিষয়ে গ্রন্থকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সূচী আর তালিকা সমার্থক নয়। আলোচ্য বই 'তালিকা', 'সূচী' নয় লেখক নিজেও একথা স্বীকার করেছেন, দ্রঃ পৃঃ ৭৭ 'গ্রন্থ তালিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা'। কিন্তু বই-এর নামে 'সূচী' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। 'বাঙ্গালা মুদ্রিত পুস্তক' বললে 'Bengali Printed Books'-এর অনুবাদ। 'বাঙ্গালা পুস্তক' বললে ক্ষতি কি। "পুস্তক" আর "পুঁথি" এক নয়, সুতরাং গোলমালের আশংকা অমূলক। তা ছাড়া, 'লেখসূচী' কথাটি আপত্তিজনক। 'লেখ' শব্দটি 'লেখমালা'-য় চলে গেছে ভিন্ন অর্থে, শব্দটির উপর আর একটি অর্থ চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন কি?

প্রাপ্তি স্বীকার

সমাজ ও কারিগর। অমূল্যধন দেব। মণীষা গ্রন্থালয় ঃ ৪/৩-বি, বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ঃ ৩·০০।

বিরহিনী। ফটিক মিত্র। শ্রীঅপরেশ সরকার ঃ ৬৬ গঙ্গাপুরী, কলিকাতা-৩৩। মূল্য ১·৭৫।

বিদ্যাসাগর। শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আনন্দধারা প্রকাশন ঃ ৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ১৮·০০।

শ্রীচৈতন্যলীলা প্রসঙ্গে। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। রথীন্দ্র গীতা প্রচার প্রতিষ্ঠান ঃ ১ রথীন ব্যানার্জি লেন, কলিকাতা-৩১। মূল্য ১·০০।

যারাম্মা। অমল চন্দ। অমার ঃ ৯২ [illegible] রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য ৩·০০।

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম ও শ্রীমা। পশুপতি ভট্টাচার্য। [illegible] ঃ [illegible], [illegible], ২৪ [illegible]। মূল্য ১·২৫।

নীলিমার নীবিবন্ধে। দীপেন্দ্র চক্রবর্তী। মূল্য ২·০০।

অরণ্য ছায়ার দুর্গে। শ্রীপরেশচন্দ্র [illegible]। [illegible] ঃ [illegible], কলিকাতা-১২।

পদ্মের মাটি। [illegible]। [illegible] ঃ ৫/১২ [illegible], কলিকাতা-৩২। মূল্য ২·৫০।

অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক টেনিস ফেডারেশনের সভায় ঠিক হয়েছে ১৯৭০ সালের ডেভিস কাপে দক্ষিণ আফ্রিকা অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। যদিও আন্তর্জাতিক টেনিস সংস্থায় এদের সদস্যপদ এখনো খারিজ হয়নি।

কৃষ্ণকায় খেলোয়াড়দের সঙ্গে নিজেদের দেশে খেলাধুলো না করার নীতির ফলে এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্ব অলিম্পিক, বিশ্ব টেবল টেনিস এবং আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের অধিকার হারিয়েছে। একই কারণে কমনওয়েলথ ক্রিকেট সংস্থা থেকেও তারা বিতাড়িত। এবার বিতাড়িত হল ডেভিস কাপ থেকে।

[illegible]

[illegible] দক্ষিণ আফ্রিকা [illegible] নীতিতে এখনো [illegible] অথচ সব দেশগুলোই দক্ষিণ আফ্রিকা [illegible] আন্তর্জাতিক খেলাধুলার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে আগ্রহী।

[illegible] ক্রীড়া পরিচালকদের ধারণা, ইংলণ্ড এবং অস্ট্রেলিয়া যদি দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে খেলাধুলার সম্পর্ক বজায় রেখে তাদের [illegible] প্রশ্রয় না দিতেন তবে দক্ষিণ আফ্রিকা তাদের নীতি পরিবর্তনে বাধ্য হত। কিন্তু ব্রিটেন মার খেয়েও মার হজম করছে। নিজেরা যে দেশে সফর করতে পারেনি, সেই দেশকেই ডেকে আনছে নিজেদের ঘরে।

তবে ইংলণ্ডের ক্রীড়া পরিচালকরা আর কতদিন দক্ষিণ আফ্রিকাকে কোল দিতে পারবেন সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট সফরকে কেন্দ্র করে ইংলণ্ডে এখন প্রবল বিক্ষোভ। শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা রয়েছে।

তা ছাড়া, কমনওয়েলথ গেমেও বিপদ দেখা দিয়েছে। আগামী জুলাই মাসে এডিনবরায় কমনওয়েলথ গেমসের আসর বসছে। কেনিয়ায় জন্ম ব্রিটিশ পার্লামেন্টে উদারনৈতিক দলের সদস্য ডেভিড স্টিল কেনিয়া, তানজানিয়া ও জাম্বিয়া সরকারের কাছে এই মর্মে আবেদন করেছেন যে, যদি দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট দল ইংলণ্ড সফর করে তবে তাঁরা যেন কমনওয়েলথ গেমস থেকে নিজ নিজ দেশের নাম তুলে নেন। দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

স্পোর্টস স্কলারশিপ

জাতীয় ও রাজ্য স্তরে যেসব স্কুল ছাত্র খেলাধুলায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেবেন তাদের উৎসাহ দেবার জন্য সরকার স্কলারশিপ প্রদানের পরিকল্পনা করেছেন। জাতীয় স্তরে ২০০ ছাত্রকে এবং রাজ্য স্তরে ৪০০ ছাত্রকে এই স্কলারশিপ দেওয়া হবে। এবং ১৯৭০-৭১ সালের ক্রীড়াবর্ষের থেকেই।

জাতীয় স্তরে কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য বছরে ৬০০ টাকা অর্থাৎ মাসে ৫০ টাকা হিসাবে। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ছাত্ররা এই বৃত্তি পাবেন যদি তাঁরা বার্ষিক পরীক্ষায় পাস করেন এবং ক্রীড়ানৈপুণ্য বজায় রাখেন। ১৪ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে যাদের বয়স তারা এই বৃত্তির অধিকারী।

রাজ্যস্তরের খেলাধুলোর কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্যও বৃত্তি প্রদানের একই নিয়ম। তবে বৃত্তির পরিমাণ মাসে ২৫ টাকা হিসাবে বছরে ৩০০ টাকা।

রাজ্যস্তরের ৪০০ বৃত্তির মধ্যে নাগাল্যাণ্ড সমেত ১৭টি রাজ্যের প্রতি রাজ্য পাবে ২০টি করে বৃত্তি। ৬টি করে যাবে ১১টি কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলে। তবে যোগ্যতা অনুযায়ী সংখ্যানুপাতে কিছু হেরফেরও হতে পারে।

ন্যাশনাল স্কুল গেমস ফেডারেশন পরিচালিত বা জাতীয় ক্রীড়াসংস্থা সংগঠিত সিনিয়র ও জুনিয়র খেলাধুলোর দলগত প্রতিযোগিতায় বা অ্যাথলেটিকস, সাঁতার, ডাইভিং প্রভৃতি ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারীরা এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। তবে ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় আবেদনকারীকে প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান দখল করতে হবে।

শারীরিক সক্ষমতা অর্জনের জাতীয় পরিকল্পনায় যে সব ছাত্র কৃতিত্বের পরিচয় দেবেন তাঁরাও বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনপত্র গ্রহণ এবং যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য নিখিল ভারত ক্রীড়া-পরিষদের সহ-সভাপতিকে চেয়ারম্যান করে এক কমিটি গঠন করা হয়েছে। পাতিয়ালার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ স্পোর্টস এবং গোয়ালিয়রের লক্ষ্মীবাঈ কলেজ অফ ফিজিক্যাল এডুকেশনের চেয়ারম্যান বা তাঁদের প্রতিনিধি, ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও সম্পাদক প্রভৃতি কমিটির সদস্য। কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন পাতিয়ালার এন আই এস-এর সম্পাদক।

খেলাধুলার উৎসাহ দানের জন্য ভারত সরকারের এই বৃত্তি পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে এক প্রশংসনীয় উদ্যম।

একলব্য

পড়েছে। মহীন্দ্রর ফাঁসি হল না, অর্ধেক দেবতা ও অর্ধেক পুলিশ জাতীয় এক স্বর্গীয় পুরুষ এসে মহীন্দ্রকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেল এবং কয়েকটি বর দিয়ে দিল; একটি হল—সে কারখানার মালিক হবে।

প্রশ্ন এইখানেই। এত আয়োজন ও পরিকল্পনা এবং আঙ্গিকের এইসব অভিনবত্ব কিসের জন্য? নতুন কিছুই তো নান্দীকার বলতে পারলেন না। তবে দেখালেন অনেক কিছু, মনের তৃপ্তি না মিললেও চোখ তৃপ্ত। এবং অক্ষুণ্ণ রাখলেন তাঁদের দলগত অভিনয়ের সুনাম। অভিনয় সকলেরই ভাল, যদিও বিশেষ প্রশংসা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (মহীন্দ্র), অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় (যতীন্দ্রনাথ), লতিকা বসু (যতীন্দ্রনাথের স্ত্রী), কেয়া চক্রবর্তী (পারুলবালা) এবং রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের (পুলিশ-কর্তা) প্রাপ্য। পতিতা জ্যোৎস্নার ভূমিকায় মঞ্জু ভট্টাচার্যের অভিনয়-ক্ষমতাও দেখা গেল। মহীন্দ্রর আর এক প্রেয়সীর চরিত্রে সীমন্তিনী দাসের অভিনয় মন্দ নয়।

নান্দীকারের টিম-ওয়ার্ক বরাবরই ভাল, নাট্য-পরিচালনায়ও সম্ভবত অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এত কৃতিত্ব এর আগে দেখাতে পারেন নি। আঙ্গিক রচনায় বাহাদুরির কথা আগেই বলেছি। কিন্তু সবই যেন শেষ পর্যন্ত এসে ভোজবাজির মত উড়ে গেল। বাইরের এত চাকচিক্য ও পারিপাট্যের অন্তরালে যেন কিছুই খুঁজে পেলাম না।

হৃদ-বদলের নাটক

স্কটিশ চার্চ কলেজ প্রাক্তন ছাত্র পরিষদ সম্প্রতি তাঁদের চতুর্দশতম নাট্যাভিনয় করলেন স্টার থিয়েটারে অধ্যাপক সুশীল মুখোপাধ্যায়ের আর কটি নতুন নাটক মঞ্চস্থ করে। নাটকের নামঃ গল্প বললে। বিষয় বস্তুঃ হার্ট ট্রান্সপ্ল্যানটেশন। নাটকের প্রশ্নঃ হৃদ-বদলে শারীরিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক কোনো পরিবর্তন হয় কিনা। হাস্যরসের ও কৌতুক পূর্ণ ঘটনার মাধ্যমে এই প্রশ্ন উপস্থাপিত করা হয়েছে। প্রেক্ষাগৃহের দর্শক প্রশ্নোত্তরে যোগদান করেছিলেন। মঞ্চ এবং প্রেক্ষাগৃহের ব্যবধান তিরোহিত এই নাটকে। সামগ্রিক অভিনয়ে নাটকটি সাফল্য মণ্ডিত। বিশেষ উল্লেখযোগ্য অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায়, অমর বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈশাখী সরখেল, তুষারিকা চক্রবর্তী, কেয়া চক্রবর্তীর অভিনয়। নাট্যকার একটি বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর পরিচালনা যথাযথ।

নিশিপদ্ম

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনীর ভিত্তিতে তৈরি চিত্রকল্প চিত্রের "নিশিপদ্ম" ছবির মুক্তির আর বিলম্ব নেই। ছবিটি পরিচালনা করেছেন অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। উত্তমকুমার ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ছবির নায়ক-নায়িকা। অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে আছেন অনুপকুমার, জহর রায়, গঙ্গাপদ বসু প্রভৃতি। নচিকেতা ঘোষ সংগীত পরিচালক।

অগ্রদূত পরিচালিত "মঞ্জরী অপেরা" ছবিতে গৌর শী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও উত্তমকুমার

সন্তানদের কথা উঠলো। ইউনিটের কর্তা, (যিনি অনায়াসে বাংলা কথা বলেন) বেশ দুঃখের সঙ্গে বললেন, "অনেক চেষ্টা করে-ছিলাম অ্যাডজাস্ট করবার কিন্তু পারলাম না। আপনি তো জানেন, বাংলা সংস্কৃতি, বাংলা সাহিত্যের আমি অত্যন্ত ভক্ত, সেই কারণেই আমার বাঙ্গালী প্রীতিও বেশ দৃষ্টি কটু ভাবেই প্রবল। কিন্তু কিছু মনে

করবেন না। আপনারা কেবল নিজের কথা আপনারা বড্ড বেশি বড় ভাবেন নিজেদের; নিজেকে বড় ভাবাটা দোষ বলছি না, কিন্তু আপনি নিজে কত বড় সেটা বুঝতে হলে অপরের মাপটাও তো জানা দরকার। এই অপরকে মাপবার চেষ্টা আপনারা কখন করেন না। আপনারা কেবল নিজের কথা বলেন অপরের কথা শোনেন না। আপনারা কেবল দেখাতে চান কিন্তু শিখতে চান না। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র ছাড়া আপনারা সাহিত্য আলোচনা করতে পারেন না, ছবির কথা উঠলেই সত্যজিৎ রায় বিমল রায়ের নাম করেন। আপনাদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ কিন্তু জ্ঞান কম। আপনাদের উচ্চাশা আছে কিন্তু অধ্যবসায় নেই। আপনারা চঞ্চল, আপনারা চটুল। আপনাদের সঙ্গে বসে গল্প করতে ভাল লাগে। সেখানে আপনারা জীবন্ত। কিন্তু আপনাদের সঙ্গে কাজ করা অকমারি। বাঙ্গালী মাত্রেই বস্। আপনারা আদেশ করতে পারেন কিন্তু আদেশ মানতে হলেই আপনাদের মানহানি হয়। আমার কোম্পানীতে এখনো কয়েকজন বাঙ্গালী আছেন, তাঁরা সবাই পুরোনো। তাঁরা সৎ এবং 'সলিড'। তাঁদের উপদেশে আমার অনেক মঙ্গল হয়েছে—পরিবর্তে তাঁদের জন্যেও সাধ্যমত কিছু করেছি আমি। কিছু মনে করবেন না, আমার মনে হয় আজকাল-কার বাঙ্গালী ছেলেরা প্রায় সকলেই (অন্তত যারা এ অঞ্চলে আসে) স্বপ্ন-বিলাসী, অতি-উচ্চাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু অর্ধ-শিক্ষিত, এবং সর্বদা অস্থিরতায় ভুগছে।

আপনিই বলুন আপনারও তাই মনে হয় না?" আমি বললাম, 'আজ উঠব। আমার কি মনে হয় সে কথা অন্য আরেকদিন হবে, আজ আপনার কথা শুনলাম, যদিও আমিও বাঙ্গালী, তবু কিন্তু ধৈর্য সহকারেই আপনার কথা শুনলাম মন দিয়ে। আশা করি যদি কোনদিন আমার কথা শোনাতে আসি আপনিও এমনি মন দিয়েই শুনবেন আমার কথা।

সরল শর্মা

"এখনই" চিত্রায়িত হচ্ছে

বিশ্বভারতীর সহায়তায় প্রকাশ, রমাপদ চৌধুরীর "এখনই" ছবি হচ্ছে। ছবিটি পরিচালনা করবেন তপন সিংহ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শ্রীসিংহের পরিচালনায় "সাগিনা মাহাতো" শেষ। ছবিটি সেন্সর করা হয়েছে।

ব্রজবুলি

বুদ্ধদেব গুহর "ব্রজদার গুল্প সমগ্র" অবলম্বনে একটি নতুন ধরনের কমেডি ছবি প্রযোজনা করছেন সংগীত শিল্পী মান্না দে। রূপা দেবী, শীতল বসু চিত্রটি পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

নন্দিতা পুরস্কার প্রতিযোগিতা

রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্রী নন্দিতা কৃপালনীর স্মৃতি রক্ষার্থে রবীন্দ্রসংগীত দ্বিতীয় বার্ষিক নন্দিতা পুরস্কার প্রতিযোগিতা এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার যথাক্রমে ৫০০, ৩০০ ও ২০০ টাকা।

কেবলমাত্র ১৪ থেকে ১৮ বৎসর বয়স্কা মেয়েদের মধ্যেই এই প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ থাকবে। প্রতিযোগিতায় যোগদানের নির্ধারিত আবেদনপত্র প্রতি বৃহস্পতিবার এবং রবিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টার মধ্যে বৈতানিক কার্যালয় ১৪ এলগিন রোড, কলকাতা-২০। হতে পাওয়া যাবে। নাম-ঠিকানা সহ ২০ পয়সার ডাক টিকিটযুক্ত খাম পাঠালে আবেদন পত্র পাঠানো হবে। খামের উপর নন্দিতা পুরস্কার কথাটি লিখে দিতে হবে। আবেদন পত্র জমা দেবার শেষ তারিখ ১৬ই এপ্রিল, ১৯৭০।

নাইনটি নাইন

পিকচারস এন্টারপ্রাইজারস যক্ষ্মারোগের ওষুধ "নাইনটি নাইন" নামে একটি পরীক্ষা-মূলক ডকুমেন্টারী ছবির প্রযোজনা করছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ এই ডকুমেন্টারী ছবিটি অনুমোদন করেছেন। সম্প্রতি যাদবপুর টি বি হাসপাতালে ছবিটির বেশ কয়েকটি দৃশ্য গ্রহণ করা হয়। এই শুটিং-এ শ্যামল ঘোষাল, নৃপতি চ্যাটার্জী, অমর বিশ্বাস, মীনা হালদার, গীতা প্রধান, দীপালী ঘোষ, ডাঃ মনোমোহন মণ্ডল, বরুণ সেন প্রভৃতি শিল্পীরা

ভোরবেলার মতই
দিনভোর
স্নিগ্ধ সতেজ
রাখবে

সূচিপত্র

মারফি মুসাফির
এই অপূর্ব ট্রানজিস্টরে প্রমাণ হয় মারফি
কিনলে আপনার লাভ হয়
আঠারো আনা...

MED
LOG
200 300 400 500
16 19 25 31
41 49 60 75 90
SW1
SW2
murphy SUPER TRANSISTOR
M
musafir
মারফি-কান্তিতে আনন্দের নির্ঝর

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুখের শোভায় আনে মুক্তো-আভা
ল্যাকমে ভ্যানিশিং ক্রীম
ল্যাকমে ভ্যানিশিং ক্রীম ফুটিয়ে তোলে মুক্তোর মত অপরূপ এক মায়াবী আভা। এই মুক্তো-আভা ফোটবার আগে মুখের চকচকে ভাব আর অবাঞ্ছিত সব দাগ একেবারে সাফ ক'রে দেয়। অপরূপ এক দীপ্ত সৌন্দর্য্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা আপনাকে বিভূষিত রাখে।
ল্যাকমে ভ্যানিশিং ক্রীমের মুক্তো-আভায় আপনার সারা মুখ মধুরতর ক'রে তুলুন। পরে, তার ওপর অল্প একটু ল্যাকমে ফেস-পাউডারের প্রলেপ বুলিয়ে দিন। দেখুন, এক অনন্য সৌন্দর্য্যে আপনাকে কেমন অপরূপা দেখাচ্ছে। আজই ব্যবহার করে দেখুন।
Lakmé
VANISHING CREAM
ল্যাকমে
ভ্যানিশিং ক্রীম

দেখুন কি
পোরা হচ্ছে

পার্লে
গ্লুকো

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

৩৭ বর্ষ ॥ সংখ্যা ২৪
শনিবার, ২৮ চৈত্র, ১৩৭৬

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার

কলিকাতায়

বার্ষিক	...	২৫.০০
ষাণ্মাসিক	...	১২.৫০
ত্রৈমাসিক	...	৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	...	৩০.০০
ষাণ্মাসিক "	...	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক "	...	৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	...	৩০.০০
ষাণ্মাসিক "	...	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক "	...	৮.০০

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	...	৫২.০০
ষাণ্মাসিক "	...	২৬.০০
ত্রৈমাসিক "	...	১৩.০০

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	...	৩৯.০০
ষাণ্মাসিক	...	১৯.৫০
ত্রৈমাসিক	...	১০.০০

দাম ৫০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাসুল ৭ পয়সা

DESH

Saturday 11 April 1970

প্রফুল্লকুমার স্মরণে

আগামী তিরিশে চৈত্র প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয়ের ষড়বিংশতি মৃত্যুবার্ষিকী। আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা প্রফুল্লকুমার আমাদের নিজের মানুষ, আত্মীয়তুল্য। এই দিনটিতে স্বভাবতই তাঁর বিয়োগ-ব্যথা আমরা অনুভব করি, তাঁর নানা স্মৃতি মনের কোণে ভেসে ওঠে। মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন সহৃদয়, বন্ধুবৎসল, নম্র, উদার-চিত্ত। তাঁর চরিত্রে বৈষ্ণবজনোচিত গুণের উল্লেখ সর্বদাই করা হত। আবার তিনি ছিলেন কর্মী পুরুষ, জাতীয়তাবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত, সেকালের অন্যতম খ্যাত সাংবাদিক। সাহিত্য তাঁর পেশা ছিল না, তবু তিনি সাহিত্য রচনায় আনন্দ পেতেন। হিন্দু সমাজের মানুষ হয়েও এই সমাজের দোষ ত্রুটি ও গ্লানির তিনি তীব্র সমালোচনা করেছেন তাঁর রচনায়। এই উদার দৃষ্টি তাঁকে কর্মে ও সমাজজীবনে বরাবরই শ্রদ্ধেয় করে তুলেছে। তাঁর বিয়োগের দিনটি স্মরণ করে আমরা তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

মেঘালয়

গত দোসরা এপ্রিল আসামের খাসি এবং গারো পার্বত্য জেলা দুটি নিয়ে একটি নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল : 'মেঘালয়'। এই ধরনের রাজ্য ভারতে প্রথম : প্রথম এই অর্থে যে, আসামের মধ্যেই স্বশাসিত রাজ্য হিসেবে এটি থাকবে। এই রাজ্যের রাজধানী শিলং, আসামেরও যা রাজধানী, আসামের রাজ্যপালই মেঘালয়ের রাজ্যপাল। একটি রাজ্যের মধ্যে ছোটোখাটো আর-একটি রাজ্যের সৃষ্টিতে নতুনত্ব যাই থাক ভারতীয় সংবিধানের দিক থেকে এটি একটি পরীক্ষা নিশ্চয়। শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন : সাংবিধানিক পরীক্ষা।

আসামে পার্বত্য জেলা একাধিক : এর মধ্যে খাসি এবং জয়ন্তিয়া পার্বত্য জেলা ও গারো পার্বত্য জেলা নিয়ে মেঘালয় রাজ্য গঠিত হবার নানা কারণ রয়েছে। তার মধ্যে যা প্রধান তা হল : এই পার্বত্য জেলা দুটি দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ করে আসছিল—তাদের প্রতি আসাম সরকার অবহেলা দেখিয়ে আসছেন, এবং পাহাড়িয়া জনসাধারণের ওপর জোর করে অসমীয়া ভাষা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আজ প্রায় দশ বছর ধরে পার্বত্য নেতারা নানাভাবে এই অভি-যোগ তুলে ধরেছেন এবং নিজেদের উন্নতি সাধনের জন্যে নিজেদের হাতে শাসন ক্ষমতা পেতে চেয়েছেন। নেহরুজী তাঁর জীবিতাবস্থায় এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সফল হতে পারেন নি। তারপর কেন্দ্রীয় সরকার কমিসন গঠন করে দেখতে চেয়েছিলেন পার্বত্য জেলাগুলি নিয়ে স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের যৌক্তিকতা আছে কি না। বার দুয়েক কমিসন গঠন, আসাম সরকার ও পার্বত্য নেতাদের মধ্যে নানা প্রস্তাব সম্পর্কে মতবিরোধ ইত্যাদির পর আসাম পুনর্গঠন বিলটি গত বছরের শেষে সংসদে গৃহীত হয়ে যায়। তারপর এই 'মেঘালয়' রাজ্য।

রাজ্য হিসেবে মেঘালয় আয়তনে ক্ষুদ্র, সাড়ে আট হাজার বর্গ মাইলের কিছু বেশী; জনসংখ্যা লাখ আষ্টেক। এই রাজ্যের বিধানসভার আসন সংখ্যা মোট একচল্লিশটি হলেও মনোনীত সদস্য হিসেবে থাকবেন তিনজন। বাকি আট-ত্রিশটির মধ্যে পার্বত্য নেত-সম্মেলনের প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চৌত্রিশটি আসন দখল করেছেন, বাকি চারটি আসন কংগ্রেসের।

আসামের ভৌগোলিক অঙ্গ হলেও এই পার্বত্য এলাকাগুলির সামাজিক বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করা যাবে না। খাসি এবং গারোদের সামাজিক রীতিনীতি, আইনকানুন, উত্তরাধিকার সূত্র, বিবাহ প্রভৃতি আলাদা ধরনের, মাতৃশাসিত সমাজ-ব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত।

ভাষা, আচার ব্যবহার, সামাজিক রীতিনীতি—ইত্যাদি যদিও ভিন্ন তবু এই পার্বত্য জেলা দুটিকে আসাম থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়, কারণও নেই। বরং উভয়ের সহাবস্থান, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি, সম্প্রীতি ভারতের পূর্ব সীমান্তকে শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন ও সমর্থ করে তুলতে পারে। আসাম এবং তার চারপাশের পার্বত্য জেলাগুলির গুরুত্ব যথেষ্ট, যদি আসামের পক্ষে এ-যাবৎ পার্বত্য জেলাগুলির উন্নতিসাধন সম্ভব না হয়ে থাকে তবে এবার সে বাধা অপসারিত হল। কেন্দ্র ছাড়াও আসাম সরকার মেঘালয়কে সহযোগিতা দানের আশ্বাস দিয়েছেন। **মেঘালয় ভবিষ্যৎ ভারতের পক্ষে যে একটি নতুন পরীক্ষা তাতে সন্দেহ নেই।**

ধিক্, ধিক্, দলত্যাগী!
রাজ্যসভার নির্বাচনে
বিপর্যয় ঘটবার জন্যে নব-কংগ্রেস
'টাকার থলে'র ওপরে দোষ
চাপিয়েছেন!

মাননীয় রাজ্যপাল সমীপেষু,

স্যার, আপনি আপনার শাসন প্রবর্তন করে আমাদের মানে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীদের যে কি বাঁচান বাঁচিয়ে দিয়েছেন, উঃ! কি বলে যে ধন্যবাদ দেব, ভাষা খুঁজে পাচ্ছিনে। যুক্তফ্রন্টের রাজত্বে আমরা যে কি রকম এক বিভীষিকার মধ্যে ছিলাম, স্যার, কি বলব, আবার ওরা পাওয়ারে ফিরে আসবে না তো স্যার, বুঝে দেখুন, গরীবকে আবার বিপদে ফেলবেন না, ওরা আর পাওয়ারে যাতে না আসে এমন গ্যারান্টি যদি দিতে পারেন, তবেই স্যার, যুক্তফ্রন্টের আমল সম্পর্কে রিয়েল পিকচার একটা দিতে পারি। না হলে একটি কথাও বলব না। বুঝেছেন না, দিন-কাল যা পড়েছে এখন, সমঝে না চললেই বিপদ।

এই দেখুন না, আমার ভায়রা ওই লোকটা বড্ড রগচটা, স্যার, সমঝে চলতে পারে না বলে কি কেলেঙ্কারীটাই না বাধিয়ে বসল। হয়েছিল কি জানেন, একটা কমিউনিস্ট পার্টি, যদিও কমিউনিস্ট পার্টি নয়, ঝোঁকের মাথায় কি বলতে কি বলে ফেলেছি, একটা লাল ঝাণ্ডা পার্টি, না না, একটা উগ্র বামপন্থী—উগ্র বামপন্থী? আচ্ছা উগ্র বামপন্থী বললে কি বিশেষ কোনও পার্টির কথা মনে পড়ে স্যার? আচ্ছা যাক গে, কোনও একটি রাজনৈতিক দল বললে তো ঝামেলা নেই, এই কথাটা স্যার নিউজ পেপার থেকে টুকলিফাই করেছি হেঁ হেঁ। যা বলছিলাম স্যার। কোনও একটি রাজনৈতিক দলের বড় জনসমাবেশ হবে, লোকজন আসবে দূর দূর থেকে, খাবে দাবে, মিছিল করবে। তো আমাদের পাড়ার মস্তানরা, না স্যার, না স্যার, মস্তান নয়, কর্মীরা চাঁদা তুলল বাড়ি বাড়ি, পঁচিশখানা করে রুটি আর এক কেজি গুড়ের জন্য। সত্যি বলতে কি স্যার, দিতে একটু কষ্ট হয়েছিল। ছা পোষা মানুষ তো, মাগ্গি বাজার থেকে দিতে কষ্টই হয়। ও নিয়ে আমাদের হাজব্যেণ্ড অ্যাণ্ড ওয়াইফের মধ্যে বেশ একচোট হয়েও গেল। বুঝলেন তো। অতগুলো রুটি একসঙ্গে বেলা, ওনার আবার আমাশা আছে, বেশি হাত লাগলে ঘাড়ে পিঠে ব্যথা হয়। কাটাকুটি বা অতিশ্রম ডাক্তারের বারণও আছে। তবু বুঝেছেন তো স্যার, ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করতে হয়, যত কষ্টই হোক, ট্যাকটিক্যালি চলতেই হয়। তাই ছেলেরা যখন বলল, মিষ্টি হেসেই বলল, 'দাদা জনগণের সেবায় এইটুকুই আপনার হিস্যা আশা করি নিরাশ করবেন না।' তখন স্যার আমাকেও বাধ্য হয়ে হাসতে হল।

স্যার, ওই যে আপনি সেদিন আপনার বেতার ভাষণে আমাদের পূজনীয় রাজ্যপাল-মাসীমার রেফারেনস্ দিয়ে যে কথাটা বললেন, আপনারা বাঙ্গালীর অন্তরটা চিনে ফেলেছেন, ওটা স্যার লাখ কথার এক কথা। সেদিনের ভাষণটা শুনে না, অজয়দাকে জ্যোতিদাকে যে কায়দায় লবীবাজি করলেন, উঃ, টপ্! আমি স্যার আপনার বউমাকে বললাম, এতদিনে আমরা একজন আপনার লোক পেলাম, আপনি স্যার,

বাঙ্গালী না হয়েও বাঙ্গালীর বাবা। আমাদের এই রাজ্যে নিরাপদে চলাফেরার একমাত্র কায়দা যে সাপের গালে চুমু, আর বাঁদরের গালে চুমু খাওয়া এবং কত সুন্দরভাবে খাওয়া, তা স্যার আপনি আমাদেরও শিখিয়ে ছাড়লেন। ধন্যি!

কিন্তু এই সাদা কথাটা আমার ভায়রাভাইকে কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না। কি করল জানেন, ওর বাড়িতে যখন সেই সব কর্মীরা রুটি চাইতে গেল, ও না স্রেফ বলে দিল, 'আমি তো আপনাদের নীতির সমর্থক নই, আমাকে কেন আপনাদের সমাবেশের জন্য রুটি দিতে হবে?' ওরা স্যার, ওর কাছেও প্রথমে হাসি হাসি মুখেই কিন্তু রুটি চেয়েছিল। যেই এ কথা শোনা, বাস্, তারপরেই সঙ্গে সঙ্গে স্বমূর্তি ধরল। স্বমূর্তি বলতে আমি আবার খারাপ কিছু মিন্ করিনি। মানে, মানে স্বমূর্তি ধরল মানে এই ওদের হাসিখুশি ভাবটা চলে গেল আর কি!

আচ্ছা, বলুন তো স্যার, এটা কি নিছক বোকামি নয়? আরে ওদের সঙ্গে নীতি-ফিতি নিয়ে আলোচনা করার কোনও মানে হয়। এখন, মানে তখন, এখনই বা নয় কেন, কার নীতি কে মানছে? বলুন? এই যে সি পি এম, সি পি এম-এর কি নীতি নেই? আছে। নীতিগতভাবে সি পি এম বরাবরই মিনি ফ্রন্টের বিরোধী। তা বলে অবজেকটিভ কনডিশন অনুসারে এম এল এ ভাগিয়ে এনে যদি মন্ত্রিত্ব করার সুযোগ একটা পাওয়া যায়, তবে তার চেষ্টা দেখতে হবে না? আর আঙুর ফল যে টক, নাগাল না পেলে একথা যে বলতে হয় তা তো বিদ্যাসাগরই বাঙ্গালীকে শিখিয়ে গিয়েছেন আর তারও ঢের আগে মহামতি ঈশপ মানবজাতিকে। নয় কি? মন্ত্রিত্ব হল হল, না হলে বিকল্প নীতি অবিলম্বে নির্বাচন, কিংবা বিপ্লব। সি পি আই-এর কথা ধরুন। ওদের কি নীতি নেই ভেবেছেন? কেরলের নীতি বলে যুক্তফ্রন্ট ভাঙতে একটুও বাধেনি। সেখানে মিনিফ্রন্ট দিব্যি চলছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের নীতি যুক্তফ্রন্ট। সি পি এম থাক বাংলা কংগ্রেসও থাক। বাঘ থাক, ছাগলও থাক। হ্যাঁ-ও থাক না-ও থাক। আ-ও থাক ও-ও থাক। সেই রকম নীতি এস ইউ সি-রও, ফরওয়ারড ব্লকেরও, আর এস পি-রও, এস এস পি-রও, পি এস পি-রও, ইনডিকেটেরও সিনডিকেটেরও।

সত্যি বলতে কি স্যার, আপনারও, আমারও। নীতির মত নীতি থাক, আমাদের মত আমরা থাকি। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। আমি তো স্যার, তাই বুঝি। তাই তো স্যার যে পার্টির যে আমার কাছে আসে, কাউকেউ ফেরাই না।

কিন্তু স্যার, আমার ওই ভায়রাভাই, গোয়ারতুমি করে কি যে ফাসাদ বাধিয়ে বসল! এখন আমাকেও স্যার জড়িয়ে ফেলেছে। ওই যে বলেছি, নীতিগতভাবে বলেছে যে, রুটি দেব না, তো দিলই না। জ্যোতিদা তখন স্যার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী! বাস, একদিন দিনেদুপুরে কে বা কাহারা এসে ভায়রাভায়ের গুষ্টির তুষ্টি করে দিয়ে গেল। যা হবার তা হল, ভাগ্যে হেনস্থা ছিল, লিখন কে খণ্ডাবে? এবার চেপে যা। তা নয়, বুদ্ধিভ্রংশ। থানায় নালিশ করলে। জ্যোতিদার পুলিস! চালাকি! শান্তিভঙ্গ করার অভিযোগে ভায়রাভাইকেই চালান করে দিলে! তারপর তো স্যার, জ্যোতিদাদের পতন এবং আপনার অভ্যুদয়।

ভায়রাভাই, স্যার সেই সব কে বা কাহারাদের নামে এখন কেস্ ঠুকে আমাকে এক নম্বর সাক্ষী মেনেছে। গিন্নী বলেছেন, ঠিকমত সাক্ষ্য না দিলে বেলুনে পেটা করে ছাড়বেন। কি স্যার, সাক্ষ্য দিতে যাব? পারবেন তো, ওরা যাতে আর পাওয়ারে না আসে, সেটা ঠেকিয়ে রাখতে? — ইতি মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী!

সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ

আবার সি পি এম নেতারা সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। মাঠে-ময়দানে খবরের কাগজের মুন্ডুপাত শুরু হয়ে গিয়েছে। ছোট বড় সব সি পি এম নেতা খবরের কাগজগুলিকে "দেখে নেব" বলে ভয় দেখাচ্ছেন।

এই সেদিন শহীদ মিনারের নীচে তাঁদের বড় মিটিং হয়ে গেল। দলের তিন প্রধান নেতা বক্তা। তিনজনের দুজনই দীর্ঘ সময় ধরে সংবাদপত্রকে 'সাবধান' করে দিলেন। কয়েকদিন আগে রাজ্যপালের কাছে গিয়েছিলেন একজন সি পি এম এম-এল-এ। অনেকগুলি আবেদনের মধ্যে লাটসাহেবের কাছে তাঁর একটা আবেদন ছিল : সংবাদপত্রগুলিকে সংযত করুন। কয়েকজন মারকসবাদী এম-পি প্রধানমন্ত্রীর কাছেও এ নিয়ে দরবার করতে গিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রীকে তাঁরা বলে এসেছেন : খবরের কাগজগুলি আমাদের বিরুদ্ধে বড় বেশি কুৎসা রটাচ্ছে। ওদের সম্পর্কে ব্যবস্থা নিন।

সব দিক দিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে আপাতত সি পি এমের 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের' একটা বড় টার্গেট সংবাদপত্র। দলের নেতারা সেদিন শহীদ মিনারের নীচে দাঁড়িয়ে শপথ নিয়েছেন : গ্রামে, গঞ্জে, হাটে, বাজারে গিয়ে আমরা সংবাদপত্রগুলির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করব।

দলের দুই নেতা শ্রীজ্যোতি বসু এবং শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার সংবাদপত্রগুলিকে এবং সংবাদপত্রের রিপোরটারদের প্রায় লাস্ট ওয়ার্নিং দিয়েছেন। জ্যোতিবাবু বলেছেন : আমি কাগজের মালিকদের কাছে জানতে চাইব আমাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা ওঁরা বন্ধ করবেন কিনা। তাতেও যদি কাজ না হয় তাহলে অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। হরেকৃষ্ণবাবুর মূল বক্তব্য ছিল : মালিকরা যা করছেন সেটা অভাবনীয় কিছুই নয়। তবে, রিপোরটাররাও এই কুৎসা প্রচারে যোগ দিয়েছেন। আপনারা গরীব রিপোরটার। আপনারা এ কাজ করবেন কেন? যদিও আপনাদের পেটানো উচিত বলে আমি মনে করি না, তবু এরপর যদি ছেলেপুলেরা উত্তেজিত হয়ে আপনাদের পেটায় ত আমাদের কিছুই করার থাকবে না।

সি পি এম নেতাদের এখন মূল অভিযোগ : সংবাদপত্রগুলি তাঁদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাচ্ছে। সংবাদপত্রগুলির কাছে তাঁদের মূল বক্তব্য : হয় এ জিনিস বন্ধ কর। না হয় পিটিয়ে বন্ধ করাব।

*

সি পি এম নেতাদের এই সংবাদপত্র বিরোধী অভিযানে আমি মোটেই আশ্চর্য নই। এরকম একটা জিনিস যে শুরু হবে তা কয়েকদিন থেকেই অনুমান করা যাচ্ছিল।

কিছুদিন থেকেই পত্রপত্রিকায় এমন কতকগুলি খবর বের হচ্ছিল যা সি পি এম নেতাদের পছন্দ হওয়ার কথা নয়। তাঁরা বুঝতে পারছিলেন, এগুলি দলের পক্ষে ক্ষতিকর হচ্ছে। কারু কোনও কাজ দলের পক্ষে, দলের নেতৃত্বের পক্ষে ক্ষতিকর মনে হলে সি পি এম নেতারা চিরকালই তাঁর বা তাঁদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। ভয় দেখিয়ে তাঁকে বা তাঁদের নিবৃত্ত করার জন্য সচেষ্ট হন। এ ক্ষেত্রেও সি পি এম নেতারা সেই জিনিসই করছেন।

দ্বিতীয়ত, সি পি এম নেতারা জানেন, গত তেরো মাসের বহু কীর্তিকলাপ এবার বের হবে। তাঁরা এও বোঝেন, এগুলি কাগজে বের হলে দলের চরম ক্ষতি হবে। তাই এখন থেকেই একটা জেহাদ ঘোষণা করে তাঁরা (এক) সংবাদপত্রগুলির কণ্ঠ যথাসম্ভব রুদ্ধ করতে চান এবং (দুই) যদি তা না সম্ভব হয় তাহলে অন্তত জনগণের মনে সংবাদপত্রগুলি সম্পর্কে যতটা সম্ভব অবিশ্বাস ও বিদ্বেষের ভাব জাগিয়ে তুলতে চান। যাতে তাঁরা সংবাদপত্রের খবরে আর বিশ্বাস না করেন। যাতে তাঁরা মনে করেন, সি পি এম সম্পর্কে যে সব খবর বের হচ্ছে তা অসত্য।

তৃতীয় একটা কারণেও এখন সি পি এম নেতৃত্বকে বাইরের কিছু শক্তি বা লোকের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে হবে বলে মনে হয়। সি পি এম এবং সার্বিকভাবে যে কোনও উগ্রপন্থী (তা দক্ষিণপন্থী উগ্রতার ক্ষেত্রেও সত্য) রাজনীতির সঙ্গে জেহাদ জিনিসটা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সমর্থক ও সক্রিয় কর্মীদের সব সময়ই "জেহাদ স্টেজে" রাখা চাই। উত্তেজনা জীইয়ে না রাখা গেলে দল রাখা যায় না। আবার, যখন দলের ভেতরে গণ্ডগোল বাড়ে তখন এই জিনিসের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি বাড়ে। তখন বাইরে এক বা একাধিক বড় শত্রু দাঁড় করিয়ে ঘরের লোকদের এক করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এইরকম একটা জরুরী প্রয়োজন নাকি এখন সি পি এমের দেখা দিয়েছে। দলের ভেতরে "সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি নেতৃত্বের একাংশের মোহবৃদ্ধি" নিয়ে নাকি বেশ কিছুটা ঝড় বইছে। এই ঝড়কে শান্ত করার জন্যও এখন সি পি এমের পক্ষে বড় কোনও বহিঃশত্রু দাঁড় করানো প্রয়োজন। বর্তমানে সংবাদপত্র তেমন একটা বড় বহিঃশত্রুর শূন্যস্থান পূরণ করতে পারে।

সত্যপ্রিয় ব্যানার্জীর নাম নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে। তিনি ফরওয়ারড ব্লকের নেতা ছিলেন এবং ফরওয়ারড ব্লক নেতাদের মধ্যেই আবার একটু বেশি কমিউনিসট পারটি ঘেঁষা ছিলেন। অবিভক্ত কমিউনিসট পারটি সব রকমের "ম্যাস ফ্রনটের" সামনে তাঁকে রাখতেন। কমিউনিসট পারটি পরিচালিত শ্রমিক আন্দোলনে, উদ্বাস্তু আন্দোলন, শান্তি আন্দোলন সব কিছুরই সামনে তাঁকে রাখা হত। এহেন সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় একবার ফরওয়ারড ব্লকের এক অধিবেশনে কমিউনিসটদের "বন্ধুত্ব ও বিরোধিতার" ব্যাপারটা বোঝাতে গিয়ে একটা মজার গল্প বলেছিলেন।

গল্পটা ছিল এইরকম : একবার এক বৃদ্ধ মৃত্যুর পূর্বে তাঁর সব ছেলেকে ডেকে পাঠালেন। ছেলেরা সবাই যখন খাটের পাশে হাজির, তখন বৃদ্ধ তাঁর সম্পত্তির হিসাব দিতে আরম্ভ করলেন। প্রত্যেক ছেলের নাম ধরে বললেন, তোমাকে এই বাড়ি এবং ওই সম্পত্তি দিয়ে গেলাম। এইভাবে পিতা হিসাব দিতে লাগলেন এবং ছেলেরা সকলে সমস্বরে বলে চললেন, "আহা, আমাদের পিতৃদেব সজ্ঞানে স্বর্গারোহণ করছেন!" পিতা সকলের পাওনা বুঝিয়ে দিয়ে থামলেন। এক গ্লাস জল চাইলেন। সব ছেলে জল আনতে ছুটলেন। বৃদ্ধ জল খেয়ে ছেলেদের বললেন, দাঁড়াও, আরও হিসাব আছে। ছেলেদের আনন্দের সীমা নেই। তাঁরা ভাবলেন, বাবা আমাদের জন্য আরও কিছু রেখেছেন। এবার তার হিসাব দেবেন। বৃদ্ধ বলতে শুরু করলেন : আমার বহু ঋণও আছে। তোমরা কে কোন ঋণ শোধ দেবে তার হিসাব এবার দিচ্ছি।......ছেলেরা বাবাকে আর এগোতে দিতে চাইলেন না। সবাই মিলে চিৎকার শুরু করলেন : ওরে, বাবা ভুল বকছে, তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাক—মাথায় জল দে।

সত্যপ্রিয় ব্যানার্জি উপসংহারে বলেছিলেন : সকলের মনে রাখা উচিত, এইটাই কমিউনিসটদের রীতি। তুমি যখন ওদের মনমত কথা বলছ তখন তুমি সজ্ঞানে আছ, তখন তুমি ভাল। যখন বিরুদ্ধে কিছু বলবে,

কোনও ভাবে ওদের অমতে চলবে, তখনই সেটা ভুল বকা হয়ে যাবে, তখনই ওরা তোমার মাথায় জল ঢালতে চাইবে।

আমার বহু দিন পরে আবার সত্যপ্রিয়-বাবুর সেই কথাগুলি মনে পড়ে গেল। যখন অজয়বাবু পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে যখন 'আনন্দবাজার' এবং 'বসুমতী' সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখল, এবার জ্যোতিবাবুর নেতৃত্বে বিকল্প ফ্রনট সরকার গঠিত হোক, তখন সি পি এমের নেতারা বললেন, "আনন্দ-বাজার, বসুমতীর রোল বড়ই ভাল, ওরা সত্যই জনগণের পালস বুঝতে পেরেছে।" আবার সেই বসুমতী এবং আনন্দবাজারে যখন বর্ধমানের ঘটনার বিবরণ বের হতে লাগল তখন ওঁরাই হুংকার দিতে শুরু করলেন: এই সব বুর্জোয়া সংবাদপত্র চিরকাল আমাদের নামে কুৎসা রটিয়েছে, এখনও রটাচ্ছে। এদের ঠাণ্ডা করা দরকার।

*

কোনও সংবাদপত্র কোনও দিন ভুল লেখে না, এ কথা আমি বলব না। এই ভুল বহু ক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃত, আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতও। কোনও সংবাদপত্র কখনও কারু বা কোনও গোষ্ঠীর স্বার্থ বিশেষভাবে দেখে না তাও আমি বলব না। তবে, একটা জিনিস আমি এর আগে আরও একবার বলেছি, এখনও বলব: কোনও সংবাদপত্র যদি নিয়মিত ভুল খবর দেয় বা নিয়মিত একের স্বার্থে অপরের বিরুদ্ধাচরণ করে তা হলে সে সংবাদপত্র চলতে পারে না। সেই জন্যই ব্যবসায়ী সংবাদপত্রের পক্ষে শুধু কোনও বিশেষ এক গোষ্ঠীর স্বার্থে চলা এবং নিয়মিত ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত-ভাবে অসত্য সংবাদ পরিবেশন অসম্ভব। বিশেষ করে আজ যখন পাঠকরা কোনও একটা শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

ধরুন, নকশালপন্থী আন্দোলনের কথা। এ দেশে কোনও ব্যবসায়ী সংবাদপত্রের মালিকই এই আন্দোলনকে পছন্দ করতে পারেন না। সি পি এম রাজনীতির চেয়ে তাঁরা নিশ্চয়ই নকশালপন্থী রাজনীতিকে বেশি ভয় ও ঘৃণা করেন। কিন্তু তা বলে পশ্চিম বাংলার কোনও ব্যবসায়ী সংবাদপত্রের মালিক আজ বলতে পারেন, "আমার কাগজে কোনও নকশালপন্থী নেতার কোনও বক্তব্য বের হবে না। আমি ওই আন্দোলনের কোনও খবর আমার কাগজে ছাপতে দেব না?"

যে আন্দোলনের পেছনে যত বেশি গণসমর্থন, যে আন্দোলন যত বেশি শক্তিশালী ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক ব্যবসায়ী সংবাদপত্র সেই আন্দোলনের খবর তত বেশি ছাপতে বাধ্য। কারণ, বিক্রির জন্য প্রতিদিন সকালেই যে ব্যবসায়ী সংবাদ-পত্রকে সাধারণ মানুষের কাছে যেতে হয়। তাই, মানুষ যার বা যে দলের কথা শুনতে চায় সেই দলের বা সেই নেতার বক্তব্য সংবাদপত্রের মালিক ব্যবসার স্বার্থেই ছাপতে বাধ্য। তাঁরা তাঁর বা তাঁদের বিরোধিতা করতে পারেন, কম কম করে খবরাখবর ছাপতে পারেন; কিন্তু দীর্ঘদিন জনপ্রিয় কোনও দল বা নেতাকে ব্ল্যাকআউট করা বা কারু সম্পর্কে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যা খবর ছেপে চলা এই সমাজে ব্যবসায়ী সংবাদপত্রের নিজের স্বার্থেই অসম্ভব।

সেই জন্যই পশ্চিমবঙ্গে একজন কংগ্রেসী এম পির কাগজে এবং আর একজন কংগ্রেসী এম এল এর পত্রপত্রিকাগুলিতে নানা অ-কংগ্রেসী নেতা ও দলের বহু খবরাখবর বের হয়। আমি বলছি না, তাঁরা ভালবেসে ভিন্ন দলের খবর ছাপেন। আমার বক্তব্য, তাঁরা নিজেদের ব্যবসায়ী স্বার্থেই তা ছাপতে বাধ্য। কেউ কেউ হয়ত ভয়ে বা গোপন অভিপ্রায়ের জন্য কাউকে একটু বেশি প্রাধান্য দেন। কিন্তু এই সব অবস্থায়, এই ব্যবসায়ী প্রতিযোগিতার যুগে তাও খুব বেশি করা সম্ভব নয়। জনগণ যাঁর কথা বা যে দলের বক্তব্য শুনতে বেশি আগ্রহী নন তাঁর বা তাঁদের কথা বেশি করে শোনাতে গেলে কাগজ বিক্রি হবে কেন? মানুষ তা পয়সা দিয়ে কিনবে কেন?

আর, সংবাদপত্রের মালিকরা যদি নিজেদের মনোবাসনা মতই কোনও নেতাকে বা কোনও দলকে তুলতে বা ফেলতে পারতেন তা হলে কি এ দেশের রাজনীতি এইভাবে এগোতো? তা হলে কি ওই কংগ্রেসী এম পি এবং এম এল এ-ও এতদিনে পশ্চিমবঙ্গের নেতা হয়ে যেতে পারতেন না? কিন্তু তা হতে পারেন নি। কারণ, তা হওয়া সম্ভব নয়।

*

সংবাদপত্রের উচিত, নির্ভয়ে সত্য ঘটনা ও দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি জনসাধারণকে জানানো। যে সংবাদপত্র যত বেশি এর ব্যতিক্রম করবে সে তত নিজের ও দেশের ক্ষতি করবে।

আমরা শুনতে অভ্যস্ত, মালিকরা স্বাধীনভাবে সৎভাবে সংবাদ পরিবেশনায় বাধা দেন। জ্যোতিবাবু, হরেকৃষ্ণবাবুর হুংকার কি সম্পূর্ণ বিপরীত সত্য উদ্‌ঘাটিত করে না? মারপিটের ভয় দেখানো কি সংবাদপত্রের জন্য স্বাধীন পরিবেশ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে?

সি পি এমের "মনোমত" খবর বের হলেই সংবাদপত্র ভাল, আর সি পি এমের ক্ষতি হতে পারে এমন খবর বের করলেই সংবাদপত্র বুর্জোয়া? কোনও সংবাদপত্র তাঁদের পছন্দমত না চললেই তাকে পিটিয়ে ঠাণ্ডা করতে হবে?

সি পি এম নেতাদের ধন্যবাদ, মানুষকে তাঁরা তাঁদের স্বরূপ চেনার সুযোগ দিচ্ছেন।
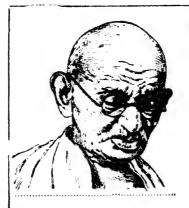
নবারুণ গুপ্ত

দেবরাজ

যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ এ কথাটা ফলে গিয়েছে ইটালিতে ২৯ মার্চ। তার আটচল্লিশ দিন আগে খ্রীস্টান ডেমোক্র্যাটিক দলের মারিয়ানো রুমর তাঁর আর তাঁর মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্র পেশ করেছিলেন প্রেসিডেন্ট সারাগাতের কাছে। কাজটা তিনি একটা শাসনতান্ত্রিক সংকট সৃষ্টি করার জন্যে করেন নি, বরঞ্চ তার উল্টোটাই তিনি চেয়েছিলেন। রুমর ছিলেন একটা সংখ্যালঘু সরকারের প্রধানমন্ত্রী। চেম্বার অব ডেপুটিজ অর্থাৎ লোকসভায় অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন না থাকলেও তিনি কাজ চালিয়ে যেতে পারছিলেন কোনও রকমে কেন না দলাদলি ইটালিতে বড্ড বেশী—তাই বিরোধী দলগুলি একজোটও হতে পারেনি, তাঁকে হটাতেও চায়নি। কিন্তু কপাল ঠুকে এমন ভাবে তো আর সরকার চালানো যায় না। তাই প্রধানমন্ত্রী রুমর চেয়েছিলেন তাঁর সরকারের বনিয়াদটা পাকা করে নিতে আরও দু-চারটে দলের সঙ্গে মিলেমিশে একটা কোয়ালিশন অর্থাৎ মিশ্র মন্ত্রিসভা তৈরি করে। তাঁর ভরসা ছিল উগ্রপন্থী দলগুলি বাদ দিয়ে তিনি একটা বাঁ-ঘেঁষা মধ্যপন্থী সরকার গড়ে তুলতে পারবেন তাঁর নিজের দল খ্রীস্টান ডেমোক্র্যাট, সোস্যালিস্ট, সোস্যাল ডেমোক্র্যাট আর রিপাবলিকানদের নিয়ে।

অবিশ্যি হয়েছেও তাই, তবে অনেক জল ঘোলা করে, বিস্তর কাঠখড় পুড়িয়ে। রুমর চেয়েছিলেন উগ্রপন্থীদের এড়িয়ে চলতে তা তারা দক্ষিণপন্থীই হোক আর বামাচারীই হোক। একদিকে তিনি নয়া ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখতে চাননি, আর একদিকে সম্ভব রাখেননি কম্যুনিস্টদের সঙ্গে যদিও তারা ইটালির আইনসভাতে দু' নম্বর দল। পাটিগণিতের হিসেবে সেটা মোটেই অসম্ভব নয়। কিন্তু রাজনীতি তো আর ধারাপাত মেনে চলে না। তাঁর বাঁ-ঘেঁষা মধ্যপন্থী সরকার তৈরির কাজে বাগড়া দিয়েছে সোস্যালিস্ট অর্থাৎ সমাজতন্ত্রীরা। তাদের এখন দু' শরিক। এক শরিক প্রচণ্ড কম্যুনিস্ট-বিরোধী, আর এক শরিক এমনই কম্যুনিস্ট ঘেঁষা যে লোকে বলে তারা কম্যুনিস্টদেরই বেনামদার। প্রথম শরিকের নেতা সারাগাত, দ্বিতীয়র নেন্নি। বছর চারেক আগে দু' শরিক এক হয়েছিল, এক দল হিসেবে মন্ত্রিসভায় তারা যোগ দিয়েছে। আবার তাদের ভিন্ন হাঁড়ি হয়েছে গেল বছর জুলাই মাসে। আবার তারা আদায় কাঁচকলায়। এ রকম দুটো দলকে নিয়ে মিশ্র মন্ত্রিসভা চালানো আর দুটো পাগলা ঘোড়া জুতে গাড়ি হাঁকানো একই কথা।

হয়রান হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন রুমর দিনকতক চেষ্টা করে যখন প্রেসিডেন্ট তাঁকেই মন্ত্রিসভা গড়ার ভার দিয়েছিলেন তাঁর সংখ্যালঘু সরকার ইস্তফা দেবার পর। তখন ডাক পড়েছিল আলডো মোরোর প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেবার। প্রধান মন্ত্রীত্ব তিনিও আগে করেছেন, জোট বাঁধার অন্ধিসন্ধি তাঁরও জানা। কিন্তু সে-সব কিছুই কাজে লাগলো না। হালে পানি না পেয়ে তিনি সরে দাঁড়ালেন। এবার আসরে নামলেন আমিনতোরে ফানফানি। প্রধানমন্ত্রীগিরি দিনকতক তিনিও করেছেন। কিন্তু মিশ্র মন্ত্রিসভার আঁক মেলাতে তিনিও পারলেন না। বেগতিক দেখে তিনিও রণে ভঙ্গ দিলেন। মনে হলো বুঝি ইটালির শাসনতান্ত্রিক সংকট আর ঘুচবে না। সরকারী শাসনযন্ত্র অবিশ্যি বিকল হয়ে পড়েনি। তল্পীদার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কাজ রুমরই চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সেটা তো অস্থায়ী ব্যবস্থা—কোনও রকমে কাজ চালিয়ে নেওয়ার ব্যাপার। একটা আইনমাফিক পুরোদস্তুর সরকার তো চাই। নইলে তো অকালে নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে আইনসভা মেয়াদ ফুরোবার আগেই ভেঙে দিয়ে।

তার কিন্তু হাজার ঝামেলা। ইটালিতে সাধারণ নির্বাচন হয়েছে মাত্র দু' বছর আগে ১৯৬৮-র মে-তে। রেওয়াজ মাফিক পরের নির্বাচন হবে তিন বছর পরে ১৯৭৩-এ। তাড়াতাড়ি আবার ভোট-যুদ্ধে নামতে সব দলেরই সমান অনিচ্ছা। নির্বাচন একে তো অনিশ্চিত ব্যাপার—যাকে বলে ভাগ্য পরীক্ষা—তার ওপর খরচপত্তরও তো কম নয়। কাজেই যাঁরাই নির্বাচনে জিতেছেন তাঁরাই চান পুরো পাঁচ বছর সদস্য থাকতে। এ ব্যাপারে ডান-বাঁয়ের ভেদ নেই। সেইজন্যে যখন মোরো আর ফানফানি সরে দাঁড়াবার পর শেষ চেষ্টা করবার জন্যে আবার আসরে নামলেন রুমরই তখন দেখা গেল পথ তাঁর অনেক পরিষ্কার হয়ে এসেছে, অনেক দলেরই অবস্থা 'আর একবার ডাকিলেই যাইব'—গোছের। ঘন ঘন নির্বাচনের ঝুঁকি নিতে কে আর চায়? আর নিলেও সুরাহার সম্ভাবনা কম। ইটালিতে নিয়ম হচ্ছে, যে দল যত ভোট পাবে সেই অনুপাতে তাকে আসন দেওয়া হবে আইনসভায়। তাতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া কোনও দলের পক্ষেই সম্ভব নয়—অন্তত এতদিন হয়নি। নির্বাচন হলেও আইনসভার চেহারা তেমন পালটাবে না বলেই মনে হয়।

যে জন্যেই হোক, রুমরের মন্ত্রিসভা গড়ার চেষ্টা ভেস্তে যায় নি। সাতাশজন মন্ত্রী আছেন তাঁর সরকারে। তাঁরা যে চারটি দলের লোক সেগুলি হচ্ছে খ্রীস্টান ডেমোক্র্যাট, সোস্যালিস্ট, সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট আর রিপাবলিকান। সোস্যালিস্ট দলের সেক্রেটারি ফ্রান্সেস্কো ডি মার্তিয়নো হচ্ছেন উপ-প্রধানমন্ত্রী। একেকালের প্রধানমন্ত্রী আলডো মোরো—যিনি এবারেও চেষ্টা করেছিলেন মন্ত্রিসভা গড়তে কিন্তু পারেন নি—হয়েছেন বৈদেশিক মন্ত্রী। ও সৌভাগ্য কার হবে তা নিয়ে তাঁর সঙ্গে টক্কর দিয়েছিলেন নামকরা সোস্যালিস্ট নেতা পিয়েত্রো নেন্নি। কিন্তু রুমর চেয়েছেন যতটা সম্ভব বড় দপ্তরগুলো তাঁর নিজের দল কিংবা তাঁর অনুগত লোকের হাতে থাকবে। ওটি তিনি তাই তুলে দিয়েছেন নিজের দলের আলডো মোরোর হাতে। খ্রীস্টান ডেমোক্র্যাট হলেও বামপন্থী বলে তাঁর খ্যাতি আছে। অন্য কোনও দপ্তর নিতে চান নি বলে নেন্নিকে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

ইটালির শাসনতান্ত্রিক সংকট ইতিমধ্যেই মিটে গিয়েছে বললে কিন্তু ভুল হবে। নতুন মন্ত্রিসভা শপথ অবিশ্যি নিয়েছেন, তবে ভাগ্য তাঁদের এখনও অনিশ্চিত। তাঁদের ওপর আইনসভার আস্থা আছে কি না তা নিয়ে যে বিতর্ক চলছে সংসদে তার নিষ্পত্তি হবে বিশে এপ্রিল নাগাদ। তখন যদি আস্থা প্রস্তাব পাস হয় তবেই রুমর মন্ত্রিসভা টিকে যাবেন। নইলে নতুন নির্বাচন ছাড়া আর পথ থাকবে না। সংসদের রুমরের ওপর বিরূপ হবার কথা নয়। কিন্তু রাজনীতিতে কী যে হবে তা কেউ তো আর সঠিক আগে থেকে বলতে পারে না—বিশেষ করে ইটালিতে মন্ত্রিসভা যেখানে চার শরিকের ব্যাপার। তার ওপর মাস দুয়েকের মধ্যেই হবে প্রাদেশিক নির্বাচন। তার তারিখ ঠিক হয়েছে ১৫ জুন। সে নির্বাচনেও চার দলই লড়বে তবে আলাদা আলাদা। তাদের আপাতত দুদিক সামলাতে হবে—সংসদে জোটাজুটি আর প্রদেশে প্রদেশে জোট যুদ্ধ। সে-সব শেষ না হলে বোঝা যাচ্ছে না নতুন মন্ত্রিসভার বরাতে কী আছে শেষ পর্যন্ত, কতদিন তার আয়ু।

'উপহার-টুপহার'

আমি কোনোদিন লটারীর টিকিট কিনি না—প্রলোভন-বিজয়ী আমার এই দুর্দান্ত মানসিক শক্তির কথা এর আগেই আমি ঘোষণা করেছি ; এবং আমার কোনো আত্মীয়জন, কোনো বন্ধু-বান্ধব যদি কখনো দু-তিন লাখ টাকা পেয়ে যান—তাহলে

নাকি কুপনের দৌলতে বাড়ী জুটবে, সেই সংগে ফাউ পাবেন বউ ছেলেমেয়ে ইত্যাদি।

তা থেকে আমাকে তিনি কিছু দেবেনই, এ আমার অতি 'দুর্মর' আশাবাদ। তারই অপেক্ষায় আমি আছি।

আমার জন্ম-কুণ্ডলীতে কী ছিল ঠিক বলতে পারব না, কারণ সেটি পাকিস্তানের বাড়ী-ঘরের সংগে বিলীন। কিন্তু একটি করুণ ঘটনায় জেনেছি, সৌভাগ্যের এ-রকম কোনো আকস্মিক সংঘাত আমার অদৃষ্টে নেই। বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, সেই তরুণ বয়সে যখন আমি কিছুকালের জন্যে অধ্যাপনার অব্যবসায়ে ব্যাপৃত ছিলুম—তখন ক্রস-ওয়ার্ড ধাঁধায় আমার বিশেষ অনুরাগ ছিল। কলেজ ছোট, মাইনে কম, কাজ আরো কম এবং 'ক্রস-ওয়ার্ডসের' তখন স্বর্ণযুগ। অর্থ প্রাপ্তির আশায় নয়—অবসর-বিনোদনের জন্যে আমি নিয়মিত কোনো নামজাদা ইংরিজি সাপ্তাহিকের শব্দ-শৃঙ্খল মোচন করতুম।

কখনো পাঠাই—কখনো পাঠাই না। পাঠিয়েও কিছুই পাইনি—বলাই বাহুল্য। কিন্তু একবার—এবং শেষবার—একটি মাত্রই নির্ভুল সমাধান তৈরী হয়েছিল, সেটি আমার, এবং তাকে আমি ডাকে দিইনি। গেল হাজার পনেরো টাকা।

সেই থেকে আমি হাল ছেড়েছি। কিন্তু কপাল যখন খোলে, এমনি করেই খোলে। লটারীর টিকেট না কিনেও আমি পেয়ে গেছি একখানা—পেয়েছি খানিকটা কাপড় কাচা সাবানের সংগে ফাউ হিসেবে। চেয়েও যাকে পাইনি—না চাইলে তাকে পাওয়া যায় কি না, দেখা যাক।

আজকাল অযাচিতভাবে এইসব উপহার প্রাপ্তি—বাস্তবিক, এ এক রোমহর্ষক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যত্রতত্র পেয়ে যাচ্ছি চায়ের পেয়ালা, প্লাসটিকের বাটি, স্টিলের চামচ, ডট পেন, ছোট তোয়ালে, দাড়ি-কামানোর ব্লেড। পেতে পেতে এমন আভাস হয়ে গেছে যে এক শিশি কাগজ কিনে একটা ফুল ফাউন্টেন পেন কেন পেলুম না—এই ভেবে মন খুঁত খুঁত করতে থাকে। সেদিন সিগ্রেট কিনছিলুম এক বাক্স, দোকানদার বেশ রুপোলী রাঙ দিয়ে মুড়ে মশলা দেওয়া চমৎকার একটা পান সাজছিল, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস দাঁড়ালো—পানটা আমাকেই ফাউ দেবে। দিল পাশের এক অবাঙালী ভদ্রলোককে—এবং—এবং আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল।

ব্যবসায়ীদের উপহার-দানের এই সাম্প্রতিককালে লটারী লাভ সম্পর্কে আমার নৈরাশ্য ক্রমেই ফিকে হয়ে আসছে। উপহার পাওয়াটা যখন মৌলিক অধিকার হিসেবেই দাঁড়িয়ে গেছে, তখন উপহারের টিকেট থেকেই বা আমি টাকা পাব না কেন! টিকেট যাঁরা দিয়েছেন, প্রাইজের টাকা দিতেও তাঁরা বাধ্য—ন্যায়ত এবং ধর্মত (এ-সব ক্ষেত্রে আমি গুরুতর ধর্মবিশ্বাসী)।

নাকি কুপনের লোভে বাজার উজাড় করে টুথপেস্ট কিনতে শুরু করুন।

ভাবতে ভাবতে মাথা ক্রমেই গরম হয়ে উঠতে লাগল। আমি লটারীর টিকেট কিনি না—তবু একটা টিকেট আমার হাতে এল—কেন? আমি কাপড়-কাচা সাবান কিনতে গিয়েছিলুম—সেই সংগে আমাকে টিকেট দেওয়া হল—কেন? আমি যে আশা কোনোদিন পোষণ করি না—সেই আকাঙ্ক্ষা আমার মধ্যে এভাবে জাগিয়ে দেওয়া হল—কেন? আর জাগিয়েই যদি দেওয়া হল, তাহলে আমাকে টাকা দেওয়া হবে না—কেন? কেন?

আজ পর্যন্ত যাঁরা লটারীতে টাকা

পেয়েছেন, তাঁরা আমার চেয়ে কিসে শ্রেষ্ঠ? তাঁরাও আমার মতো বাঙালী এবং ভারতীয়, তাঁদের বেশির ভাগই আমার মতো জীবন-সংগ্রামের কাটা-সৈনিক, আমার মতো বোমা-ছিনতাই-মস্তানির ভয়ে ভীত, রাজনৈতিক ঘোর-প্যাঁচে বিভ্রান্ত, হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়যুক্ত মনুষ্যজাতি এবং আমার মতোই তাঁরা জন্মেছেন এবং মারাও যাবেন। ভগবান - আল্লা - গড - আহুরমজ্দা-অলখ্ নিরঞ্জন-জেহোভা এঁদের কারো কপালেই রবার-স্ট্যাম্প এঁকে দিয়ে বলেন নি, 'এঁরাই আমার চোজেন পিপল'—লটারীর টাকা এঁরাই পাবেন! আর সর্বোপরি, আরো জোরালো ভাষায় বলতে গেলে, হিন্দী ফিল্মের সব চাইতে তেজস্বী সংলাপ মনে এসে যায়ঃ 'ইয়াদ রাখিয়ে, মায় ভি ইন্‌সান্ হুঁ!'

উত্তেজনা বাড়তে লাগল, আমি চা আনতে বললুম। ফ্রীতে পাওয়া প্লাস-টিকের পেয়ালায় ফ্রী-প্যাকেটের চা এল। কারা যেন আজকাল চিনিও উপহার দিচ্ছে—কাগজে দেখেছিলুম, এখনো সংগ্রহ করতে পারিনি। যাই হোক, সেই চা, ফ্রী পাওয়া চামচে দিয়ে নাড়াচাড়া করে, কয়েকটা চুমুক দিয়ে, আরো নিবিড় ভাবে আত্মস্থ হলুম আমি।

চায়ের পেয়ালা, চা, চিনি, চামচে—সবই যখন উপহার-হিসেবে প্রাপ্তব্য, এবং লটারীর টিকেটও—তখন লটারীর টাকাও আমার অবশ্য প্রাপ্য। আমি না চাইতেই আমাকে টিকেট দেওয়া হয়েছে, না চাইলেও টাকা আমাকে দেওয়া অবশ্যম্ভাবী। চা শেষ করে, উপহার-লব্ধ তোয়ালেতে মুখ মুছে আমি টিকেটটার দিকে দৃষ্টিপাত করলুম।

সাবান থেকে যেমন টিকেট, তেমনি টিকেট থেকে টাকা। কিন্তু চক্রবৃদ্ধি সুদের মতো এই লটারীর টাকার সঙ্গে আরো পাওয়া যাবে একটি মোটরগাড়ি—যদি আমি নিতে ইচ্ছে করি। কেন ইচ্ছে করব না—আমার ইচ্ছেকে ঠেকাচ্ছে কে? আমার মনে হল, সেই মোটরগাড়ির পিঠে বিলিতি হুইলেও একখানা লটারীর টিকেট উপহার হিসেবে

ফার্স্ট প্রাইজ মোটরগাড়ী, পেট্রল লাগবেনা।

কার্নেসো থাকবে—তাতে—কোনো একজন কুড়ি ফুট বাড়ির উপর এক বিঘে জমির বাগান আর সুইমিং পুলসমেত একটি বিলেতবাড়ি এবং উপরে রেল চক্রবৃদ্ধি হারে সেই বাড়িটিও আমি লাভ করব কোথা যেন লটারীর টাকার সঙ্গে বাড়ী-টাড়ীও দিচ্ছে, কিন্তু সে টিকেট কী কিনলে যে পাওয়া যায়, তা আমি এখনো আবিষ্কার করতে পারিনি। তবে সেই বাড়ির ফার্নিচার্, বসবার ঘরের টেবিল-অপারেটরটিকেই আর এক লটারী উপযুক্ত ঘরণী ছাড়া ঘরের কোনো মানেই হয় না—সেই টিকেটের বিজ্ঞাপনটিতেই আমি একবার পাব কোনো সাংস্কৃতিক বিশ্বপ্রতিযোগিতায় জয়মুকুটধারিণী ছবির মনোরমাকে—

সর্বনাশ, এখনই থামতে হচ্ছে, কারণ অনেকেই পড়বেন। আচ্ছা-আচ্ছা ভাবী থাক, ও টিকেটটার দরকার নেই, বাড়িটা পেলেই চলবে। কিন্তু দোহাই—আপনারা একে বিবেকানন্দ-কথিত ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রকুলজ বলে বিবেচনা করবেন না, আমি কেবল উপহার প্রাপ্তির অখণ্ড ধারার সিদ্ধান্তে টেনে আনছি।

নাঃ উঠতে হল। অফিস আছে।

দাড়ি কামাতে বসে গেলুম। উপহার-প্রাপ্ত একটি নতুন ব্লেড দিয়ে।

কী ভয়ংকর—লাঙলের ফলা দিয়ে কামাচ্ছি নাকি? মুখে এ ক্ষৌরকর্ম, না কৃষিকার্য? দাড়ি ওপড়াতে গিয়ে রক্তারক্তি হয়ে গেল যে। দূর করো রাবিশ! জানলা দিয়ে ব্লেডটাকে বাইরে ফেলে দিলুম।

কী থেকে যে কী হয়। রক্তাক্ত গালের দিকে তাকিয়ে লটারীর প্রস্পেক্টাস তো খুব উজ্জ্বল মনে হচ্ছে না এখন!

৮০০০ জীবন—প্রতি বছরে পথের বলি
আপনার জীবন বিপন্ন করবেন না

ডানলপ নির্দেশিকা
মন দিয়ে পড়ুন

ভাবতে অবাক লাগে প্রতি বছর দুর্ঘটনায় আমাদের দেশের রাজপথে ৮০০০-এর বেশী লোকের মৃত্যু হয়। যাঁরা আহত হন তাঁদের সংখ্যা ৫০,০০০-এর বেশী। অথচ দৈবের ওপর সবটা ছেড়ে দিয়ে বসে থাকা যায় না। কেননা দুর্ঘটনার কারণ, হয় গাড়ির চালক, না হয় পথচারী। দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলার জন্যে নিম্নে দেওয়া নির্দেশগুলি সতর্ক নিয়মে মেনে চলুন:—

এই লাইন বরাবর কাটুন

ডানলপ নির্দেশিকা

পথচারীদের জন্য

১। মনে রাখবেন ট্রাফিক সিগন্যাল শুধুই গাড়ির জন্যে নয়, পথচারীদের জন্যেও। ভাল করে সিগন্যাল দেখুন।

পেভমেন্ট কিংবা ফুটপাথ থাকলে, তার উপর দিয়ে হাঁটুন। ফুটপাথ না থাকলে রাস্তার ডান দিক ধরে হাঁটাই নিরাপদ—উল্টো দিক থেকে যেসব গাড়ি আসছে সেগুলো দেখতে পাবেন।

ভিড়ের রাস্তায় অনেকে মিলে পাশাপাশি হাঁটবেন না। এতে যানবাহনের অসুবিধা হয় এবং দুর্ঘটনায় আহত হবার আশঙ্কা থাকে।

রাস্তার বাঁকে কিংবা এমন কোথাও দাঁড়াবেন না, উল্টো দিক থেকে আসা গাড়ির চালক যেখানে আপনাকে দেখতে পাচ্ছেন না।

'জেব্রা' চিহ্নিত জায়গায় রাস্তা পারাপার করুন। প্রথমে ডানদিক, তারপর বাঁদিক এবং আবার ডানদিকে তাকিয়ে, পথ ফাঁকা দেখলে, চটপট রাস্তা পার হোন। ভয় পাবেন না, দৌড় লাগাবেন না, মাঝপথে গিয়ে মত পাল্টাবেন না।

৬। বাস কিংবা ট্রাম যখন চলছে, তখন ওঠানামা করবেন না।

৭। দাঁড়িয়ে থাকা কোনও গাড়িতে আপনার দৃষ্টি বাধা হলে, আরও বেশী সতর্ক হোন। রাস্তা পরিষ্কার কিনা সেটা ভাল করে না জেনে কোনও গাড়ির পিছন থেকে হট করে এগিয়ে যাবেন না।

৮। কীভাবে রাস্তা চলতে হয় বাচ্চাদের শেখান। রাস্তায় তাদের খেলতে দেবেন না।

৯। পিচ্ছিল রাস্তা বিপজ্জনক, রাস্তায় ফলের খোসা ফেলবেন না।

১০। সৌজন্য আর করুণার পরিচয় দিন। বাসে ট্রামে আর রাস্তায় শিশু, বৃদ্ধ, অন্ধ আর পঙ্গুদের সাহায্য করুন।

মোটর গাড়ির জন্য

১। ট্রাফিক লাইন আর সিগন্যালের উপরে সতর্ক চোখ রাখুন। মনে রাখবেন, ট্রাফিক পুলিশ আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।

২। আপনার গাড়ি ভাল অবস্থায় আছে কিনা দেখুন। বিশেষ করে ব্রেক, স্টিয়ারিং, টায়ার এবং আলোর দিকে নজর রাখবেন।

৩। ওভারটেক করা কিংবা ডাইনে বাঁক নেবার প্রয়োজন না হওয়া পর্যন্ত রাস্তার বাঁদিক ঘেঁষে চলুন।

৪। রাস্তায় ভিড় থাকলে খুব সাবধানে গাড়ি চালান। দাঁড়ানো কোনো গাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় খুব নজর রাখবেন, হঠাৎ কোনো পথচারী আপনার গাড়ির সামনে এসে পড়তে পারেন।

৫। চৌরাস্তায় একটু বেশী পরিমাণে সতর্ক থাকা চাই। ঠিকমত সিগন্যাল দিন। আপনার ডানদিকের যানবাহনের গাড়ি অবরোধ করবেন না, তাদের আগে যেতে দিন।

৬। ডানদিকে বাঁক নেবার সময় ঠিকমত গাড়ি ঘোরাবেন, নইলে বিপদ ঘটতে পারে।

৭। রাস্তার যে জায়গাটি পথচারীদের পারাপারের জন্যে চিহ্নিত সেখানে সতর্ক থাকুন, ট্রামের যাত্রীরা যেখানে ওঠানামা করছেন সেখানেও সতর্ক হওয়া চাই।

৮। নিজের কিংবা অন্যের বিপদ ঘটবে না, এমন বুঝলে তবেই ওভারটেক করবেন, নইলে নয়। একমাত্র ডানদিক দিয়ে ওভারটেক করবেন। তার আগে দেখে নিন, সামনের গাড়ির ড্রাইভার ডানদিকে মোড় নেবার সিগন্যাল দিচ্ছেন কিনা, সেক্ষেত্রে ওভারটেক করবেন না। কেউ যখন আপনাকে ওভারটেক করছে, তখন গতি বাড়াবেন না।

৯। ঠিক সময় আলো জ্বালুন, যেটুকু দরকার, তার চাইতে জোরালো আলো ফেলবেন না।

১০। এমনভাবে দরজা খুলুন, যাতে পথচারীদের ধাক্কা না লাগে, কিংবা অসুবিধে না হয়।

এই লাইন বরাবর কাটুন

রাস্তাঘাটের নিরাপত্তা সম্পর্কে আরও জানতে বিনামূল্যে প্রচারিত পুস্তিকার জন্যে লিখুন: জনসংযোগ বিভাগ, ডানলপ ইণ্ডিয়া লিমিটেড, [illegible] ফ্রি স্কুল স্ট্রীট কলকাতা ১৬।

পথের নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে

ডানলপ ইণ্ডিয়া লিমিটেড

কর্তৃক কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ ও সেফটি ফার্স্ট এসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়ার সহযোগিতায় প্রচারিত।

ওরা ঠিক পারে

হেনা হালদার

ভীষণ রোদ্দুরে তবু কোন কোন সবুজ বৃক্ষেরা
ছায়া দিতে পারে.
বালি শুধু বালি, ধু ধু বালি তবু অবুঝ নদীরা
ঢেউ তুলতে পারে।
কেউ কেউ খালি হাতে চন্দনের সুগন্ধ কী করে
বাতাসে ছড়ায়
কেউ বা শ্মশান থেকে মুঠো মুঠো ছাই এনে
আবির বানায়।
কী করে এসব পারে উত্তর মেলে না, কিন্তু
পারে ওরা পারে।

প্রতারণা

সাধনা মুখোপাধ্যায়

এই সমস্ত বিশ্বস্ত গাছেরা
কোনদিন প্রতারণা করেনি আমাকে,
পৃথিবীর সমস্ত সাধ্বী ফুলেরাও
এক চুলও নড়েনি যে সময়ের এদিক ওদিক;
ছটি ঋতুর পর্যায়ক্রমে
নিয়মিত কটি ঠিক ঠিক
—শুশ্বার অমলতাস চাঁপাফুলে সহিজন
আম্রমতী এবং শিমুল.
বারবার দৃশ্যপটে হয়েছে হাজির।
কবির ভূমিকা থেকে আমি তো নিজেই সরে গেছি,
কখনো বিবেক সাজি যাত্রাগানে.
কখনো নায়িকা-সখী.
কখনো ভূমিকা নিই ভাবনা-কাজের।
আসর প্রস্তুত ছিল
সূর্যের হ্যাজাক বাতি.
পূর্ণিমার চন্দ্রহার,
এবং নদের চাঁদ চলে গেলে
মহুয়ার অমাবস্যা
নিবিড় নিসুচ অন্ধকার,
সবই তো তৈরী ছিল:
বৈরী মন তবু, নানা বাবস্থার
পারঙ্গম হতে গিয়ে কখনো দর্শন ছোঁয়.
কখনো অর্থনীতি কখনো অপটু পায় বিজ্ঞান মাড়ায়।
গাছেরা বিশ্বস্ত ছিল
শিববাসিনী ছিল সব ফুল,
আকাশও বাধ্য ছিল
বৃষ্টিপাত শেষ হলে
মেলে দিতে নীলিমার চুল।
নদী তবু সমস্ত যৌবন নিয়ে তার
বয়ে গেল সাগরে উজানে.
স্বৈরিণী হৃদয়টাই দিল না সে আলিঙ্গন প্রকৃতিকে,
আত্মনিবেদনময়.
আত্মবিস্মরণময়
—যে আশ্লেষ ফুলের বুকেতে ফল আনে।

মধ্যরাত্রির কবিতা

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

সংঘর্ষে কখনও আমি স্পৃহা করিনি।
তবু এত পাথরে পাথর ঠোকে
উষ্ণ হয় কাছের বাতাস
আনত মুহূর্তগুলি বিদ্ধ হয় গভীর বর্শায়
অনায়াসে।

অথচ কখনও যদি মধ্যরাতে ভেঙে যায় ঘুম
মনে হয় মুগ্ধার্থীর শরীর কোমল
মুখশ্রী নিকটে

মনে হয় ঘুমের আড়ালে
রয়ে গেছে এক টুকরো ছোট ধান-জমি—
বাকি সব সুদৃশ্য খামার আর আঙুরের খেত
মাঠ হয়ে গেছে এতকাল।

ভয়ে অথবা নির্ভয়ে

বরুণ চৌধুরী

আমাকে একটুও প্রস্তুত হতে দিলে না
কালবৈশাখীও আসবার আগে
মানুষ পাখি জানোয়ারকে জানান দেয়
মাথার চাল উড়ে যাওয়ার অনুভবে
গরুর গলার দড়িতে টান পড়ে
ভয়ে [illegible]
পায়রাগুলোও উড়তে টের পায় গলানো শিসের ভার
অথচ তুমি আমাকে একদিনও
শুকনো ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে নেবার সুযোগ দিলে না।
আমি জানি তুমি বলবে : ভয়কে আমল দিতে নেই
পাঁচ আঙুলের কব্জিতে যতক্ষণ জোর থাকে
শুধু পড়ে যাও — [illegible]
আর হাততালি দাও যৌবনের শুরু থেকে শ্রাবণের বিষণ্ণ [illegible]
যখন মাঠে আর কোনো খেলোয়াড় নেই
দর্শক নেই একটিও — শুধু তুমি ছাড়া।
কিন্তু আমি তো জানি
ভয়টা আমার খুব-চেনা [illegible]
যাকে কাছে সুন্দর হওয়া যায়
সেও তো আমারই পরগাছা.
যাকে ভয় পাওয়া উচিত
সে-ই তো আমাকে মসৃণ মুখ দেবে।
মানুষ চেনা বড় সোজা নয়
ঘৃণার পাপ বেয়ে যে ছুটে আসছে
অভিমানের সোনার সাঁকো পেরুলে
তাকেই মনে ধরে বেশি করে।
অন্ধকারে থেকে-থাকা ইঞ্জিনের দিকে তাকিয়ে
সবজান্তা বাপও উত্তর দিতে পারে না ছেলেকে
ইঞ্জিনটা কোন গাড়িকে কখন কোথায় নিয়ে যাবে।
কালো ছাতার বাইরে আরো বড় কালো অন্ধকার
ভয়কেই ভালবাসার সময় এটা।

॥ এক ॥

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে আমি তখন সবেমাত্র ঢাকা ইডেন কলেজে ভর্তি হয়েছি। হস্টেলে থাকি। হঠাৎ একদিন সকালে শুনলাম জেঠামশাই বাড়িতে ডেকে পাঠিয়েছেন। পরদিন ক্লাশে অনেক পড়া, কাজেই মনে মনে একটু বিরক্তই হলাম।

আগের দিন বৃষ্টি হওয়াতে রাস্তায় কাদা জমেছে। আমি সেই কাদার ভিতর দিয়েই হেঁটে চলেছি। ফলে আমার শাড়ীর পাড় আর জুতোর রং দুয়েরেই চেহারা একেবারে অন্য রকম। সেই অবস্থায় বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম।

মাথায় লম্বা বেণী, কোমরে আঁচল শক্ত করে জড়ান। পায়ে আর শাড়ীর পাড়ে কাদা। আমার দিদি তো বেথুন কলেজে বি এ পড়ে। কয়েক দিনের জন্য ঢাকায় এসেছে। আমাকে দেখে হেসেই অস্থির। আমি চটে গিয়ে বললাম, "হাসি থামিয়ে এখন দয়া করে কিছু খেতে দিয়ে বাধিত কর।"

এমন সময় জেঠামশাই দোতলা থেকে হাঁক দিয়ে বললেন, "মা লাবণ, কয়েকখানা লুচি নিয়ে এস তো!"

দিদি লুচির পাত্রটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়েই হাসি চাপতে দূরে সরে গেল। আমিও সেটা নিয়ে দুম্‌দাম শব্দ করতে করতে উপরে চলে গেলাম।

জেঠামশাইকে ঝাঁজের সঙ্গে কি একটা বলতে যাব, তাকিয়ে দেখি সেখানে একজন ভদ্রলোক বসে আছেন। তিনি আমার দিকে একবার তাকিয়েই তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

জেঠামশাই আমাকে বললেন, "এই যে মা, এস আলাপ করিয়ে দি। এঁর নাম জীবনানন্দ দাশগুপ্ত। দিল্লী থেকে এসেছেন।"

আমার তখন রাগের বদলে হাসির পালা। ছোটবেলা থেকে বেশ ভালভাবেই হাসিটি আয়ত্ত করেছিলাম। হাসি সাম্‌লাতে না পেরে ভদ্রলোকের দিকে পিছন ফিরেই একটা টুলের উপরে বসে পড়লাম।

জেঠামশাই বারবারই বলতে লাগলেন, "ওকি, পিছন ফিরে বসেছ কেন? ঠিক হয়ে বস। বাড়িতে অতিথি এলে ঠিকভাবে আপ্যায়ন না করাটা খুবই অন্যায়। ইনি তোমাকে কি ভাবছেন?"

ইনি নামক ব্যক্তিটি আমাকে যাই-ই ভাবুন না কেন, ঠিক হয়ে বসব কি—আমি তখন আমার হাসি সামলাতেই ব্যস্ত। যাই হোক, কিছুক্ষণ চেষ্টার পর আমি তাঁর দিকে ফিরে বসলাম। কিন্তু অসীম ধৈর্য ভদ্রলোকটির। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি না ফিরলাম, তিনি চুপ করেই বসে রইলেন।

তাঁর দিকে ফেরার পরে তিনি আমাকে তিনটি প্রশ্ন করলেন। "আপনার নাম কি? আই এ-তে কি কি সাবজেক্ট নিয়েছেন এবং কোনটি আপনার বেশী পছন্দ।"

কোনও মতে প্রশ্ন তিনটির উত্তর দিয়ে ভদ্রলোককে কিছু না বলেই উঠে নীচে দৌড় দিলাম। রান্নাঘরে ঢুকেই দিদিকে গুম্ গুম্ শব্দে কিল মারতে আরম্ভ করলাম। দিদি আমার হাত দুখানা শক্ত করে ধরে রেখে বলল, "তোর হ'ল কি?"

আমি আরও রেগে গেলাম। "আমার কেন হতে যাবে? হয়েছে তোমাদের। আজ তোমরা আরম্ভ করেছ কি? ঐ ভদ্রলোকটি কে, আর আমাকে সাত সকালে ডেকে পাঠাবারই বা কারণ কি?" দিদি তখন "আমি কি জানি? ভদ্রলোকটির খবর তো তোরই রাখবার কথা।" বলেই অন্য ঘরে ঢুকে গেল।

কিছুক্ষণ পরে জেঠামশাই সেই ভদ্রলোকটিকে নিয়ে নিচে নেমে বাইরের দিকে

কবি জীবনানন্দের বংশ-তালিকা।

চলে গেলেন। আমি তাঁদের দেখেই মুখ ফিরিয়ে বসে রইলাম।

দুপুরবেলা জ্যেঠামশাই আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে এ-কথা সে-কথার পর হঠাৎ জিগ্যেস করলেন, "আচ্ছা, লাবণ মা, সকালের ভদ্রলোকটিকে তোমার কেমন লাগল?" আমি তখন পাল্টা প্রশ্ন করলাম, "উনি এসেছিলেন কেন?" উত্তরে জ্যেঠামশাই বললেন, তাহলে বলি শোন। উনি দিল্লীর রামযশ কলেজের একজন অধ্যাপক। তোমাকে দেখতে এসেছিলেন।" আমি তখন পরিষ্কার জানিয়ে দিলাম যে বি-এ পাশ না করে বিয়ের কথা ভাববই না।

ছোটবেলায় মাত্র তিন মাসের তফাতে বাবা, মা দুজনকেই হারিয়েছিলাম বলে আমাদের অকূলের জ্যেঠামশাই (অমৃতলাল গুপ্ত) তাঁর সবটুকু স্নেহ ঢেলে দুজনের জায়গাই পূর্ণ করাতে চেষ্টা করতেন। তিনি আমাকে অনেক বোঝালেন, "তুমি যে বিয়ে করতে চাইছ না, আমি চোখ বুজলে তোমাকে কে দেখবে? তোমার দিদির বিয়ের কথা চলছে। হয়ত শিগগিরই ঠিক হয়ে যাবে। তোমার ছোট বোনটি খুবই ছোট। তার বিয়ের কোন প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং তোমার জন্যই আমার এখন চিন্তা। তাছাড়া—উনি তো তোমাকে পড়াতে রাজী আছেন। তাহলে তোমার বিয়েতে আপত্তি করার কি আছে?"

সত্যিই তো, বাবা-মা নেই। দিদির বিয়েও ঠিক হচ্ছে। এখন আমার বিয়ে হয়ে গেলেই জ্যেঠামশাই দায়মুক্ত হবেন। অতএব মত আমাকে দিতেই হবে। তবুও শেষবারের মত বললাম, "ভদ্রলোকের মত না জেনেই—আমাকে এ কথা জিগ্যেস করছেন কেন?" তখন জ্যেঠামশাই হাসতে হাসতে বললেন, "তিনি সকালে তোমাকে দেখেই মত দিয়েছেন।"

আমার তখন অবাক হবার পালা। ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি—কত রকম ভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে তবে মেয়েকে বরপক্ষীয় লোকের সামনে হাজির করাতে হয়। তাঁরা হাজার রকম প্রশ্ন করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষা করে তবেই মতামত দেন। মেয়েদের সে এক অস্বস্তিজনক অবস্থা। কিন্তু আমার বেলা!

সে যাই হোক, ২৬শে বৈশাখ (৯ই মে) শুক্রবার ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে বিয়ে হয়ে গেল। কবির সঙ্গে কোন রকম পরিচয় তখনও আমার হয়নি। আমাদের কাছে তিনি অধ্যাপক হিসেবেই পরিচিত হলেন।

*

বিয়ে ঠিক হবার পরে কেন জানি না মা-বাবার কথা খুব বেশী করে মনে হতে লাগল। কিন্তু তাঁদের স্মৃতি আর আমার মনে কতটুকু? বড় হয়ে আমার দিদিমার মুখে শুনেছি যেটুকু স্মরণ।

আমার বাবা রোহিণীকুমার গুপ্ত ছিলেন যশোরের বৈদ্যপ্রধান অঞ্চল সেনহাটির কুলীন বৈদ্য সন্তান। আর আমার মা মনোহর জেলার ইতিনা গ্রামের তারাপ্রসন্ন সেনের একমাত্র মেয়ে সরযূ গুপ্ত (সেন)।

সেন রাজাদের আমলে মহারাজ লক্ষণ সেন যে আটজনকে কুলীন বলে চিহ্নিত করেন, তাঁদের মধ্যে বৈদ্য বংশের কাশ্যপ গোত্রীয় কানু একজন। তাঁর উপাধি ছিল গুপ্ত। কানু গুপ্তের ছেলে বনমালী সেনহাটিতে এসে বাস করতে আরম্ভ করেন। সেনহাটি সর্বপ্রধান কুলস্থান বলেই প্রসিদ্ধ। আমার বাবা রোহিণীকুমার গুপ্ত এই বংশেরই সন্তান। বাবার ঠাকুমায়ের এক পূর্বপুরুষ ছিলেন চন্দ্রদ্বীপের শেষ রাজার দেওয়ান। রাজার কাছ থেকে তিনি প্রচুর ভূসম্পত্তি পেয়েছিলেন। বাবার মুখে শুনেছি, বরিশালে [illegible] সুবিখ্যাত দুর্গা সরোবর নামে একটি দীঘিটি তিনিই তৈরী করিয়েছিলেন। এই সরোবরের কথা আজও সেখানকার গ্রামের লোকের মুখে শুনতে পাওয়া যায়।

ভগবান আমার বাবা মা দুজনকে অকৃপণ হাতে সৌন্দর্য ঢেলে দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। আমার মা ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু পরিবারের মেয়ে। পাপপুণ্য শুনেছি—তিনি মুরগীর মাংস খাওয়া তো দূরের কথা, বাড়িতে আনতে দিতেন না। কিন্তু তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী এবং তাঁর স্বভাবটি ছিল কঠোর ও কোমলের অপূর্ব সমন্বয়।

আমার বাবা যেমনি ছিলেন স্ফূর্তিবাজ তেমনি ছিল তাঁর সরল মন। হিন্দু সন্তান, কিন্তু কোন রকম কুসংস্কারের ধার দিয়েও তিনি যেতেন না।

আমার বয়স যখন সাত বছর [illegible] সেই সময় বাবা আগে ও [illegible] অল্প সময়ের ব্যবধানে একই সময় [illegible] চিরদিনের জন্য চলে গেলেন। এর পরে আমরা তিনটি বোন ও একটি ভাই আমাদের বড় জ্যেঠামশাই-এর কাছে আসি।

আমি গিরিডিতে উচ্চ ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে সেখান থেকে ম্যাট্রিক পাশ করি। [illegible] কলকাতায় [illegible] কলেজ থেকে [illegible] আই. এ. পরীক্ষা দিই। [illegible] বড় দিদি [illegible] [illegible] এর প্রাক্তন অধ্যক্ষ [illegible] অজিতকুমার ঘোষের স্ত্রী। [illegible] বছর হল পরলোকে [illegible] গিয়েছেন। ছোট বোন [illegible] বালিকা বিদ্যালয়ের [illegible] আমাদের একমাত্র ভাই [illegible] গুপ্ত (মিতুকে একটি বৃটিশ কোম্পানীর ম্যানেজার) ও ছোট বোন [illegible] [illegible] কোম্পানীর [illegible] অফিসার [illegible] আমাদের জ্যেঠামশাই [illegible] কাছে থাকে।

এইভাবেই শুরু হল [illegible] আমাদের চারটি ভাইবোনের জীবন [illegible] হয়ত যারা হারিয়েছেন তাঁদের দেখা পেলাম।

এবারে কবির পিতৃ ও মাতৃকুলের কথা বলতে হলে আমাকে অতীতে যেতে হয়।

কবির ঠাকুরদাদা সর্বানন্দ [illegible] আদিনিবাস ছিল বিক্রমপুরের [illegible] গ্রামে। গ্রামটি সর্বনাশী পদ্মার গ্রাসে পড়ায় তিনি বরিশালের সুন্দর পরিবেশে এসে বাস বাঁধলেন।

তাঁর ছিল সাত ছেলে ও চার

বিবাহের রাত্রে কবি জীবনানন্দ ও তাঁর স্ত্রী লাবণ্য দাশ।

তিনি দিল্লীর রামযশ কলেজে ছিলেন, সেই সময়েই আমার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের ব্যাপারে তাঁর যে চারিত্রবৈশিষ্ট্য ছিল, তার কিছুটা পরিচয় এখানে দিচ্ছি।

আমাকে বিয়ে করার আগে এক ধনী ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ের প্রস্তাব আসে। তিনি নিজেই মেয়ে দেখতে গেলেন—সঙ্গে ছিলেন তাঁর মেসোমশাই (বরিশাল বাণীপীঠ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক) রসরঞ্জন সেন।

পাত্রীপক্ষের আদর আপ্যায়নের ত্রুটি ছিল না। মেসোমশাই ত' তাঁদের ব্যবহারে মুগ্ধ। কবি কিন্তু সব সময় চুপ করেই রইলেন। এমন কি সম্প্রদানের মেয়েটিকে দেখে ও তাঁকে বিলেতে পাঠাবার প্রস্তাব শুনেও কোন কথাই বললেন না। বাড়ি ফেরার পরে মেয়েটিকে পছন্দ হয়েছে কি না সে কথা বারবার জিগেস করেও কবির কাছ থেকে কোন উত্তরই পাওয়া গেল না।

পরদিন দুপুরে আর একবার যাবার অনুরোধ জানিয়ে পাত্রীপক্ষ গাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। কবি তখনও কি যেন চিন্তা করছেন। মেসোমশাই তাঁকে যাবার জন্য তৈরী হতে বললেন। কিন্তু তিনি বললেন, "তুমি যাও। আমি যাব না।"

"সে কি কথা? বিয়ে করবি তুই, আর যাব আমি?" মেসোমশাই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

কবি কিন্তু ধীরভাবেই উত্তর দিলেন, "যেখানে বিয়ে করব না বলেই ঠিক করেছি, সেখানে দ্বিতীয়বার যাওয়াও আমি অনুচিত বলেই মনে করি।"

সেদিন মেসোমশাই-এর শত অনুরোধও তাঁকে তাঁর সংকল্প থেকে টলাতে পারেনি।

আবার এ ব্যাপারে তিনি যে কতটা উদার ছিলেন, তার পরিচয় পেয়েছি আমার বিয়ের সময়। বিয়েতে একটিমাত্র আংটি ছাড়া—বোতাম, ঘড়ি অথবা আসবাব কিছুই তাঁকে দেওয়া হয়নি। কিন্তু সেই আংটিটির জন্যই তিনি কত লজ্জিত কত কুণ্ঠিত। যেন মহা অপরাধে অপরাধী। বিয়ের পরে বরিশালে গিয়ে, তাঁর বড়পিসীমাকে বলেছিলেন, "তোমরা যদি বলে দিতে, তাহলে আমি নিজেই একটা আংটি কিনে নিয়ে যেতাম। আমার জন্য লাবণ্যর জেঠামশাইকে শুধু শুধু কতগুলো টাকা খরচ করতে হল। তাছাড়া বিয়ে করতে গেলে কিছু না কিছু পেতেই হবে—এ নিয়মই বা আছে কেন?"

কবির কথা শুনে বড়পিসীমা হাসিমুখে উত্তর দিলেন, "সমাজের দোহাই দিচ্ছিস কেন? তোরা না দিলেই পারিস। [illegible] আমি তো দেখি বিয়ের সময় [illegible] ছেলে বাপ-মায়ের আজ্ঞাবাধ্য হয়ে [illegible] মায়ের কথার উপরে আমি কি কিছু [illegible] পারি? এই কথাই বলে বসে।"

কবি তাঁর এই [illegible] ভাল করেই চিনতেন। তাই আর কথা না বাড়িয়ে সেখান থেকে সরে পড়াই শ্রেয় মনে করলেন।

ফুলশয্যার রাতে তাঁর প্রথম কথা হল—"আমি শুনেছি তুমি গাইতে পার, একটা গান শোনাবে?"

আমি আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলাম "কোনটা?"

"জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে, গানটি যদি জান তবে সেটাই শোনাও।"

আমার এখনও মনে পড়ে, প্রথমবার গাইবার পরে তিনি আরও একবার গাইতে বললেন।

অনেকদিন পরে আমি একদিন হাসতে হাসতেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "আচ্ছা, তুমি প্রথম দিনেই 'জীবন মরণের সীমানা ছাড়াতে' চেয়েছিলে কেন?"

তিনিও হেসেই উত্তর দিলেন, "এই গানের দুটোর অর্থ বল ত?"

আজি এ কোন্ গান নিখিল প্লাবিয়া
তোমার বীণা হতে আসিল নামিয়া!"

আমি চুপ করেই দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি তখন আস্তে আস্তে বললেন "জীবনের শুভ আরম্ভেই তো এ গান গাওয়া উচিত এবং শোনাও উচিত।"

(ক্রমশ)

এবং সেই সুখে নিয়ে ছুঁচোর অন্তর্ধান।

আবার মধ্য রাত্রির নিস্তব্ধতা।

বউয়ের মাথায় চকচকে একটি টাক রোদে ঝিলমিল করছে ঝিলের জলের মত। নকল খোঁপায় কখন ঢুকে পড়েছিল একটি নেংটি ইঁদুর—বয়েসে তরুণ এবং তাই দাঁতে যথেষ্ট ধার নেই বলে নিবিড় নাইলনের জাল কেটে বেরুতে পারেনি, বিরক্ত হয়ে মধ্যে মধ্যে বিজলীলতার চাঁদি কামড়ে পথ খুঁজতে চেয়েছে। এবং তার ফল—

সব স্তব্ধ। ক্ষুর হাতে নরসুন্দর, ঘিয়ের ভাঁড় হাতে মা, নীরব নিথর নববধূ এবং হাঁ-করা মুখে বিকুচরণ।

অতঃপর যবনিকা পতন।

কিন্তু শেষের পরও শেষ থাকে, "যেমন সলতে পাকানোর পর প্রদীপ জ্বালানো।"

রাত্রে বউয়ের ইঁদুর-দংশিত টাকে হাত বুলিয়ে, সস্নেহে ক্ষমাশীল স্বামী বিকুচরণ বললে, দুঃখ কি থোঁদু! তোমারও টাক, আমারও টাক। যাকে বলে রাজযোটক।

বিজলীলতা তখনও ফোঁপাচ্ছিল। স্বামীর বুকে মাথা গুঁজে বললেঃ হুঁ—, আ—চ্ছা!

ভারতের অর্থনীতি

১৯৭০-৭১ সালের আমদানি নীতি

ভারত সরকার ১লা এপ্রিল থেকে নতুন আমদানি নীতি গ্রহণ করেছেন। বৈদেশিক বাণিজ্যে সরকারী উদ্যোগের ভূমিকা আরও সম্প্রসারিত হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার অবস্থা কিছু উন্নত হওয়ায় আমদানি নীতি পূর্বাপেক্ষা অনেক উদার করা হয়েছে। পূর্বে ২২টি জিনিসের আমদানি সম্পূর্ণভাবে ভারত সরকারের হাতে ছিল; নতুন নীতি অনুযায়ী সরকার আরও ৩৮টি নতুন জিনিসের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন—তার মধ্যে আছে কিছু ওষুধপত্র, কাঁচা সিল্ক, স্টেনলেস স্টীল প্রভৃতি। আমদানি লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির জন্য বিশেষ উদার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে যে শিল্প ইউনিটগুলি তাদের উৎপাদনের দশ শতাংশ রপ্তানি করে থাকে, আমদানি করার ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহারের বিশেষ সুযোগ তারা পেয়ে থাকে। নতুন নীতিতে বলা হয়েছে, উৎপাদিত সামগ্রীর শতকরা [illegible] রপ্তানি করবে যে সকল শিল্প-ইউনিট তাদের অবাধে বেশী বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হবে। বড় বড় শিল্প-ইউনিটগুলিকে ১০ লক্ষ টাকার [illegible] বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহারের [illegible] দিয়ে আমদানি-লাইসেন্স দেওয়া হবে এবং ছোট ছোট শিল্প-ইউনিটগুলিকে পুরো লাইসেন্সের ক্ষেত্রেই স্বাধীনভাবে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হবে। যে সকল শিল্প চিরাচরিত জিনিসের বাইরে নতুন জিনিস রপ্তানির (export of non-traditional goods) ক্ষেত্রে অন্তত দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত [illegible] পেয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে পরবর্তী বছরে হিসাব সাপেক্ষে অগ্রিম আমদানি লাইসেন্স দেওয়ার ব্যবস্থাও নতুন নীতিতে রাখা হয়েছে।

কয়েকটি জিনিস আমদানি করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে; বিশেষ করে যে সকল জিনিস দেশের উন্নত মানে এবং বেশী পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব, সেগুলির ক্ষেত্রেই আমদানি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। ৬৬টি জিনিসের ক্ষেত্রে আমদানি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এবং ২৯টি জিনিসের ক্ষেত্রে আমদানি-কোটা কমানো হয়েছে; তা ছাড়া আমদানির ক্ষেত্রে অনুমোদিত তালিকা থেকে ১৬০টি জিনিস বাদ দেওয়া হয়েছে। রপ্তানিযোগ্য সামগ্রীর উৎপাদন বাড়ে সেজন্য আমদানি নীতি উদার করা হয়েছে; কিন্তু অবাঞ্ছিত ভোগ-সামগ্রী আমদানির ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে নতুন আমদানি-নীতিটি প্রশংসার্হ।

শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন

শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্ক যে গভীর তা নতুন করে আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। বহু অর্থনীতিবিদ এ সম্পর্কে গবেষণা করেছেন এবং এখনও করছেন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুধু মূলধন বিনিয়োগ বা শ্রম-নিয়োগের উপরেই নির্ভরশীল নয়; এমন বহু উপাদান আছে যেগুলি মাথাপিছু প্রকৃত উৎপাদনশক্তি বাড়িয়ে দেওয়ার পক্ষে সহায়ক। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, শ্রমিকদের কারিগরি শিক্ষা, কর্ম-নৈপুণ্য, সাধারণ শিক্ষা প্রভৃতি উপাদান অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে আরও দ্রুততর করে।

পশ্চিম আফ্রিকার কয়েকটি দেশ (বিশেষ করে ঘানা, নাইজেরিয়া প্রভৃতি) এবং ল্যাটিন আমেরিকার কয়েকটি দেশে শিক্ষা খাতে প্রচুর বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে। নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে রাতারাতি দেশের সব অধিবাসীদেরই

শিক্ষিত করে তোলার সাধু প্রয়াস থাকা সত্ত্বেও ওই দেশগুলিতে আজ একটি বড় সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, কিভাবে শিক্ষিত যুবকগোষ্ঠীর জন্য উপযুক্ত কাজের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের জন্য চাহিদা অনুযায়ী কাজের ব্যবস্থা করা অনগ্রসর দেশগুলির পক্ষে সর্বদা সম্ভব হয় না। আবার শিক্ষার ধারা এমনই হয়েছে যে, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে হয়ত একটি বিশেষ ধরনের কাজের জন্য উপযুক্ত শিক্ষিত কর্মী পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বেকার সমস্যার তীব্রতা বেড়েছে, তার অন্যতম কারণ হল শিক্ষা ব্যবস্থার কতিপয় ত্রুটি, বেকার সমস্যার সমাধানে শিক্ষা ব্যবস্থা কী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে তা আবার নতুন করে ভেবে দেখা দরকার।

সম্প্রতি এলাহাবাদে "Motilal Nehru Institute of Research and Business Administration"-এ রিজার্ভ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার গভর্নর শ্রী এল কে ঝা "শিক্ষা ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন" শীর্ষক আলোচনায় এ দিকটির উপর কিছু আলোকপাত করেছেন। শ্রীঝার মতে বেকার সমস্যার নিয়ন্ত্রণের জন্য আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ঢেলে সাজানো প্রয়োজন। তাঁর মতে, চাকরির ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর উপর অযথা গুরুত্ব আরোপ না করে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা-ক্রমকে এমনভাবে সংস্কার করা দরকার যেন ঐ পাঠক্রম শেষ করে যুবকগণ চাকরি-জীবনে প্রবেশ করার সুযোগ সন্ধানের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন, —শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করাই যেন একমাত্র উদ্দেশ্য না হয়ে দাঁড়ায়। উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন অস্বীকার করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তবে মনে রাখা দরকার, উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণ এমনভাবে হওয়া দরকার যেন উচ্চশিক্ষিত যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও থাকে। আমাদের দেশে এমন কাজের সুযোগও আছে যেখানে উপযুক্ত শিক্ষিত ও দক্ষ কর্মীর অভাব; আবার এমন কর্মক্ষেত্রও আছে যেখানে কর্মীর প্রয়োজন অপেক্ষা কর্মপ্রার্থীর যোগান বহুগুণে বেশী। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এই অসামঞ্জস্যের অন্যতম কারণ হল, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমনভাবে গড়ে তোলা হয়নি যাতে তা কোন অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যকে সার্থক করতে পারে। দেশের বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক প্রয়োজনভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষার সুযোগ আমাদের অনেক বেড়েছে এবং আরও বাড়বে। কিন্তু শ্রী ঝার মতে, "What we have to ensure is that this increase in educational opportunities given further stimulus to development effort". এই উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার হওয়া উচিত নিম্নরূপ :— (১) দেশের কিশোর-কিশোরী এবং প্রাপ্তবয়স্ক উভয় শ্রেণীর ক্ষেত্রেই নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য অগ্রাধিকার প্রদান; (২) এমন একটি উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন করা উচিত যা হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করার ছাড়পত্র হিসাবেই তা ব্যবহার করা হবে না। শিক্ষার্থীদের কর্মক্ষমতা বাড়াবার জন্য এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসার পর জীবিকা অর্জনের পক্ষে যেন এই শিক্ষা সহায়ক হয়। এর জন্য প্রয়োজন কোর্সের উন্নয়ন করা ও কর্মসংস্থান নীতির সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ করা; (৩) প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থার সঙ্গে বৃত্তিমূলক এবং শিক্ষামূলক সম্প্রসারণের কার্যক্রম সংযুক্ত করা; এবং (৪) উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমনভাবে নির্বাচনমূলক (Selective) করা যেন যারা উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করার উপযুক্ত, এবং গবেষণা করার আগ্রহ ও লেখাপড়া নিয়ে থাকার স্পৃহা যাদের আছে তারা যেন সর্বসময়েই ঐ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়।

আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বেকার সমস্যা। বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মধ্যে বহু কর্মসূচীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত বেকার সমস্যার মূল সমাধানের সূত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

লেখিকা রজনী পানিককর

হিন্দী সাহিত্যের লেখিকা হিসাবে যাঁরা যথেষ্ট যশ পেয়েছেন, শ্রীমতী পানিককর তাঁদের একজন তো বটেই, বরং বহু বৈশিষ্ট্যে বলিষ্ঠ ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি অনন্যা। সম্প্রতি ইউনেস্কো এবং ভারত সরকারের দুটি পুরস্কার পর পর পেয়েছেন। "ভারতীয় নারী প্রগতিকে পথ পর" এই বইখানার জন্য ইউনেস্কো

শ্রীমতী রজনী পানিককর

পুরস্কার দিয়েছেন। ভারতীয় নারী যুগে যুগে অপূর্ব মহীয়সী মহিমায় জ্যোতির্ময়ী ... এই বইতে লেখিকা বিভিন্ন মহীয়সীদের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু রজনী পানিককর যেখানে আমাদের আপন করেছেন তা কিন্তু প্রগতির ইতিহাসও নয়, পুরস্কারের স্বীকৃতিও নয়। লেখিকার কোন কোন উপন্যাসের সম্পূর্ণ পটভূমিকা বাঙালী মধ্যবিত্ত এবং উচ্চমধ্যবিত্তের জীবন নিয়ে। রজনী এখন অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কমার্শিয়াল সার্ভিসে উচ্চপদে বহাল আছেন। বিজ্ঞাপন কার্যক্রম পরিচালনা অল ইণ্ডিয়া রেডিওর নূতন দপ্তর। ভারতে আর কোন মহিলা শ্রীমতী পানিককরের সমকক্ষ পদে এখন নেই। এর আগে রজনী কলকাতায় রেডিওর অ্যাসিস্টেণ্ট স্টেশন ডাইরেক্টর ছিলেন। দীর্ঘদিন বাংলা দেশে বাস করেও কোন অবাঙালী বাঙালী সমাজের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা অনেক ক্ষেত্রেই করেন না। শ্রীমতী পানিককরের এই ঘনিষ্ঠতাটুকু আমাদের বিশেষ ভাল লেগেছে। বাঙালী জীবনকে বাইরের মানুষের মত না দেখে, দোষদর্শী না হয়ে আপনজনের মত দেখাটা বিশিষ্টতা বৈকি।

শ্রীমতী রজনী পানিককরের আর এক বৈশিষ্ট্য ঠিক একই ভাবে আমাদের কাছে এসেছে। গত বিশ বছর যাবৎ, তিনি

লিখছেন। ১০টি উপন্যাস, ১৫০টি ছোট গল্প ছাড়া ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের জন্য ডিকেন্সের 'টেল অফ্ টু সিটিজ' অনুবাদ করেছেন। তাঁর চরিত্রগুলির রূপায়ণে মহিলা চরিত্রে সাধারণতঃ শ্রেণী এবং মহিলা, বিশেষ যে মহিলা ঘরের বাইরের কর্মজীবন বরণ করেছেন সেই career woman তাঁর কাছে সহানুভূতি পায় প্রচুর। নারীর ভূমিকা আশ্চর্যভাবে বদলে যাচ্ছে। ক'দিন বা আগের কথা, নারী যেখানে দেবীর আসন পেয়েছে সেখানেও পুরুষ তার অভিভাবক এবং রক্ষাকর্তা। অন্তত গৃহসীমানার বাইরে তাই। আজ দৃপ্ত তেজে নারী পুরুষের মতই আর্থিক স্বাধীনতার সন্ধানে চলেছে। এই নূতন যাত্রার পুরুষের মনে প্রতিক্রিয়া কি ও কত রকম তার বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ রজনী পানিককরের বইতে পাওয়া যায়। কোথাও বা পুরুষ হিংসায় জর্জরিত, কোথাও অত্যন্ত সংকীর্ণমনা। বর্তমান সমাজের সমস্যা হিসাবে এবং আগামী দিনের ভাবনায় নারীর আর্থিক স্বাধীনতা এবং পুরুষের সঙ্গে কর্মজীবনের সমান সুযোগ সমাজের নূতন অধ্যায়। ভালমন্দ বিচার করার দিন চলে গেছে। প্রতিষ্ঠিত ধারা হিসাবে এখন তার স্থান। কাজেই চিন্তা করার অবকাশ নিতান্তই প্রয়োজন।

বাঙ্গালী জীবন নিয়ে লেখা সোনালীদি—বইখানা, সম্প্রতি ভারত সরকারের শিক্ষা-বিভাগে অ-হিন্দিভাষীর হিন্দী রচনার স্বীকৃতি হিসাবে পুরস্কার পেয়ে শিক্ষিত দুনিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বাংলার বাইরের অবাঙ্গালী সমাজ বাংলার জীবন-যাত্রার একটা দিক দেখতে পেয়েছেন। বাংলা বই-এর প্রচুর অনুবাদ হয় হিন্দি কেন ভারতের প্রায় সমস্ত ভাষায়। শরৎবাবু থেকে শুরু করে অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবীর উপন্যাস ভারতের দূরতম কোণেও মানুষ পড়েছে এবং সাগ্রহে পড়েছে। বরং আমরা এ ব্যাপারে একটু উন্নাসিক এবং সহজে অন্য ভারতীয় সাহিত্যে আগ্রহ প্রকাশ করি না। রজনীর বেলায় ব্যতিক্রম এই যে, রজনী অবাঙ্গালীর কলমে বাঙ্গালীর দৃষ্টিভঙ্গীতে বাঙ্গালীর সুখদুঃখের কথা লিখেছেন। তিনি নিজে পঞ্জাবী, বিবাহ করেছেন কেরলানিবাসীকে কিন্তু আত্মীয়ের মত বাঙ্গালীর সঙ্গে মিশেছেন।

সোনালীদির ঘটনাস্থল কলকাতা। কিশোরী রাণুর ডায়রি আর কিছু ঘটন-প্রবাহ মিলে উপন্যাসের কলেবর। জীবন দাস রাণুর বাবা। দৈনিক খবরের কাগজের মালিক বিত্তবান। নবীন লেখক, কবি সাহিত্যিককে উৎসাহ দেন, লেখা ছাপেন কিন্তু নবীনের দল রাণুর সঙ্গে বেশী মাখামাখি করে সেটা আবার অপছন্দ হয়। রাণুর জন্য খুঁজে পেতে সহচরী আনলেন। বয়সে রাণুর চেয়ে বছর দশেক বড়। ইনিই সোনালীদি। বিপত্নীক জীবন দাস আর সোনালীর কাছে আসার ইঙ্গিতেই উপন্যাস শেষ। তাও রাণুর ডায়রিতে এ ধরনের মহিলা Companion সাহিত্যের রাজ্যে সর্বদা মেলে। সেই জেন আয়ার মধুর মানুষটির জীবন চিত্র তুলেছে তারপর ছোট বড় বহু লেখক এ ভূমিকাকে সস্নেহে সবার সামনে পেশ করেছেন বৈচিত্র্য তাই সোনালীতে কম, রাণুতে বেশী। বর্তমান কিশোর সমাজের বল্গাহীন আচরণের পিছনে রাণু মেয়েটা মন্দ নয় কিন্তু। মহিমাকে নিয়ে যে মাতামাতি কফি হাউসের আসর। নতুন যুগের কবি ইন্দ্রজিৎ সবাই সরে যায় একদিন। তবু জীবনও বাঙ্গালী তরুণ-সমাজের সামনে এসেছে। রাণুর মত কত-শত কিশোর বেপরোয়া স্বাধীনতায় নিজেকে হারিয়ে ফেলছে। এও নারী সমাজের নুতন সমস্যা মানতে হবে।

সাত বছরের ঘনিষ্ঠ যোগ লেখিকা ...ার থিয়েটার, লেখক-সমাজ, কলাকার ...ভিনেতা ইত্যাদিতে প্রকাশ করেছেন মোটা...টি নিপুণভাবে। বাঙ্গালীর জীব... এমন কি মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর জীবনে আ... শিল্প, সাহিত্য, কবিতা কতটা প্রভাব ... তাঁর লেখায় পড়তে ভাল লা... অবাঙ্গালী সমাজের এক অংশ ... বাঙ্গালী কেবল বিলাপ, বিক্ষোভ ... আন্দোলন নিয়েই কাল কাটায়। লৌকিক ... মহানুভূতিতে তাই যেন ধরে যায়।

'মহানগরের মিতা' বইখানাতে শ্রীমতী পুনিককর কলকাতার তথাকথিত অভিজাত এবং আলোকপ্রাপ্ত উচ্চ-মধ্যবিত্ত সমাজ দেখিয়েছেন। এ সমাজে বাঙ্গালী অবাঙ্গালীর মেলামেশা সহজ। এ ইঙ্গ-ভারতীয় প্রভাবের একটা নুতন পর্যায়। কলকাতার সমাজ ভিন্ন, নায়িকার জীবন মহিলা সমাজের এক সমস্যার অবতারণা করেছেন। তা হচ্ছে বিবাহ বিচ্ছেদ। বিবাহ বিচ্ছেদ আইনে মানা হয়েছে মেয়েরা উপার্জন করার অধিকার পেয়েছে সম্পত্তিতে তার দাবি মানা হয় তবে মেয়েরা অপমান সহ্য করবে? ... পুরুষের স্বেচ্ছাচারকে সে উপেক্ষায় পিছনে ফেলে আসবে না? লেখিকার ... আপনি আমি সম্পূর্ণভাবে একমত ... হতে পারি। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ... সাতজীবনের না হতে পারে, বন্ধন স্বর্গীয় বলে স্বীকার না করতে পারি, কিন্তু বিবাহিত জীবন ঠিক আইন কানুন ও ফর্মুলাতে ফেললে যে পরিণাম খ... পরিতোষের হয় না তা' মানতে বেগ পে... হয় না। তবে তারও ক্রম আছে। ক... বিশেষে হয়তো বা ফর্মুলার সহায়তা

প্রয়োজন। মতামতের কথা না তুললে, বলতে পারি এখানেও শ্রীমতী রজনী পানিককর আধুনিক জীবনের, বিশেষভাবে নারীর ক্ষেত্রে এক সমস্যার অবতারণা করেছেন। উপন্যাসের কাঠামোতে নারীর অধিকার সম্বন্ধে তাকে সচেতন করতে চেয়েছেন। মিতা যখন অজিতকে বরণ করে তখন সে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র মাত্র। মিতার পিতা একেবারেই খুশী হন নি। অজিত ডাক্তার হয়ে চলে গেল লক্ষ্ণৌতে। মিতকে তার মনে রইল না। কোন এক বিদেশিনীর প্রেমে অজিত ভাসিয়ে দিল অগ্নি-সাক্ষীকরা অঙ্গীকার। বিচ্ছেদ চাই মিতার কাছ থেকে। মিতা ফিরে এল কলকাতায়। কিছুদিন পরে অজিতের ভুল ভাঙলো, সে ফিরে এল মিতার কাছে কিন্তু মিতা এতদিনে মনস্থির করেছে। তার বিচ্ছেদে আপত্তি নেই। বরং লক্ষ্ণৌতে আইন-ব্যবসায়ীকে জানিয়ে দিল কেস চালাবার জন্য।

রজনী পানিককর যে সমাজকে জানেন তাদের কথাই লেখেন। অন্যান্য লেখাতেও তাঁর সেই পরিচয়ই আমরা পেয়েছি। বাঙালী সমাজকে যদি ভাল করে জেনে থাকে আমরা আশা করবো তাঁর আরও উপন্যাসের পটভূমিকা কলকাতা হোক, বাংলার অন্যান্য স্থান হোক। বাংলার বাইরে বাঙালীর সমালোচনা তাতে হয়তো কমবে।

শ্রীমতী

আন্তর্জাতিক বিবাহ

আন্তর্জাতিক বিবাহ কথাটি শুনতে বেশ গালভারি। ছেলেরা বলে এই বিয়েটাই হল বিশ্ব মৈত্রীর প্রথম সোপান। বিভিন্ন দেশের ও নানা জাতের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিয়ের গাঁটছড়া বাঁধা হলে তাদের সন্তানরা হবে পৃথিবীতে শান্তির দূত। চারদিকে চোখ মেলে দেখলে কথাটা বিশ্বাস করা কঠিন। ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্ট বিয়ে বহু যুগ ধরে চলে আসছে, তবু হালে আয়র্ল্যান্ডে যে খণ্ড-যুদ্ধ হয়ে গেল একই ধর্মের দুই শাখাতে, তাতে নিশ্চয়ই মামাত পিসতুত ভাই দু পক্ষে দাঁড়িয়ে যুঝেছে। ভবিষ্যতে আগামী বাস অর্থাৎ আমাদের অনাগত বংশ নিখিল বিশ্বের নাগরিক হবে এ আশা যদি পোষণ করতে পারতাম, তবে কৃষ্ণ ও মার্গারেট কিম্বা অমল ও অ্যানেটের ভবিষ্যত সম্বন্ধে মনে কোন দ্বিধা থাকত না।

দেশে বসে মনে হতে পারে কটি ছেলেই বা বিদেশে যাবার সুযোগ পায় আর তার মধ্যে কজনই বা বিদেশী বউ নিয়ে ঘর করে। বিদেশে পরিস্থিতিটা একটু অন্যরকম। গুরু নানকের জন্মোৎসবে গেলাম, সর্দারজীদের অনেকের সঙ্গে একটি শাড়ি পরিহিতা বিদেশী সুন্দরী, কেউ স্ত্রী, কেউ বান্ধবী, কেউ বা ভাবী বধু। বাঙ্গালীদের বিজয়া সম্মেলনে গিয়ে দেখি বেনারসী শাড়ি পরে কপালে টিপটি দিয়ে মার্কিন মেয়েরা আমাদের সঙ্গে বসে দিব্যি লুচি, রসগোল্লা খাচ্ছে। অতি গোঁড়া হিন্দু তামিল কৃষ্ণনকেও দেখেছি তার টেক্সাস স্ত্রীর সঙ্গে বিফ স্টেক্ খাচ্ছে। তার বাপ ঠাকুর্দাকে জানি তার ইচ্ছা হলেও তার ম্যাগিকে ভয়, পরিবারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার পথ তার জন্য খোলা নেই। বিদেশিনীকে ঘরে নিয়ে যাবার প্রচলন আগেও ছিল। তাদের মধ্যে অনেকে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা মেনে নিয়ে সন্তানদের সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রথায় মানুষ করেছেন।

কিছুদিন আগে ওয়াশিংটন শহরে শ্রীমতী লীলা রায়ের সঙ্গে দেখা। পঞ্চাশ বছর পরে বাপের বাড়ি এসেছেন মেয়ের অতিথি হয়ে। স্বামীর দেশ ও সমাজকে ভালবেসে শ্রীমতী রায় নিজের টেক্সাস অস্তিত্বকে প্রভুত্ব করতে দেননি। দুদেশের সংস্কৃতির সামঞ্জস্য সুন্দর ভাবে রক্ষা করেছেন। দেশে যেদিন আমাদের চাকর চাপরাশীর অভাব ছিল না, সেদিনও দেখেছি নিজে সংসারের কাজ করেছেন

যেমন এরা করে; অন্যদিকে ভারতীয় সমাজের প্রতি সম্ভ্রম বোধও ছেলেমেয়েদের মধ্যে জাগিয়ে রেখেছেন।

আমাদের হরবানসিং, কৃষ্ণন বা অমল যদি তার বিদেশিনীকে নিয়ে ঘর করতে দেশে যেতে পারত, তাহলে কৃষ্ণনদের ছেলে ক্রীস্ বা অমলের ছেলে অ্যান্ডী হত না। এই ছেলেরা বিদেশে এসেছিল উচ্চ শিক্ষার সন্ধানে, পড়ার শেষে জীবিকা অর্জনের পথ পেয়ে থেকে গেছে, দেশে ফিরতে সাহস করেনি। রোমান্স তরুণের ধর্ম, দেশ কালের বিচার করা তার স্বভাব নয়। বিদেশিনীর সাহচর্য এদেশে চলার প্রতি পদক্ষেপে; দেশছাড়া, গৃহহারা যুবকের পক্ষে বিদেশিনীর হাত ধরে নূতন ঘরের সন্ধান করা অস্বাভাবিক নয়, অসম্ভব নয়। তাদের সামনে দুটি পথ খোলা—দু চার মাসের ছুটিতে দেশে গিয়ে পরিবারের মনোনীত প্রায় অচেনা তরুণীকে বিয়ে করে নিয়ে আসা, কিম্বা বিদেশে পরিচিত বিদেশিনীর গলায় মালা দেওয়া। দেশ থেকে যে সব মেয়েরা দুদিনের পরিচিত সঙ্গীর হাত ধরে সম্পূর্ণ অজানা দেশে পাড়ি দেয় ও অচেনা পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে সংসার করে তারা অতুলনীয়। স্বামী স্ত্রী দুজনেই নিজেদের আত্মীয় বন্ধুদের ছেড়ে আসার ফলে, নিজেদের সম্পর্ক সহজ ও ঘনিষ্ঠতম হয়, একে সম্পূর্ণভাবে অপরের ওপর নির্ভর করে। অল্পদিনে আঁট সুন্দর সুখের সংসার গড়ে ওঠে।

আবার এমন মেয়েও আসে যে বিদেশী পরিবেশে সম্পূর্ণ বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থায় নিজের একাকীত্ব মেনে নিতে পারে না, স্বামীর পক্ষে সে ভার বওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। জীবনে প্রেমের পরিবর্তে আসে অশান্তি, তরুণী স্ত্রীর ঠোঁটের হাসি চোখের জলে ধুয়ে যায়। সে অবস্থাকে এড়াবার জন্য অনেকে মনে করে বিদেশে যখন থাকতে হবে, পছন্দ মত এদের একজনকে নিয়ে পরদেশী হয়ে যাওয়াই সহজ পথ। পথ সহজ হলেও সব সময় সরল হয় না। কৃষ্ণর বিফ স্টেকের বদলে ইদলি দোসার স্বাদ পেতে ইচ্ছা করে, তার একমাত্র সন্তান কৃষ্ণর ক্রীস্ নামটি তার পছন্দ হয় না। সংসারের স্বচ্ছন্দ গতি পদে পদে ব্যাহত হয়। যৌবনে যে দেশ ও সমাজকে সে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছিল, প্রৌঢ়ত্বে সেই দেশবাসী ও স্বজন বন্ধুর জন্য তার মন কাঁদে। নিজের ছেলে পরদেশী হয়ে গেল ভেবে ক্ষুব্ধ হয়। দেশে যদি তার জীবিকার পথ খোলা থাকত, সে একবার অন্তত তার মার্গী ও কৃষ্ণকে নিয়ে দেশে বসবাসের চেষ্টা করত। কোন একটি ছুটিতে সে তার বউ ছেলেকে দেশে বেড়িয়ে আনবে—যেমন প্রতি বছর বহু আমেরিকান ইয়োরোপ দর্শনে পাড়ি দেয়—তার বেশী সে আশা করে না। আমাদের মার্গারেট কৃষ্ণন তার স্বামীর দেশে গিয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে ঘুরবে খাঁটি ভারতীয়ের সন্ধানে, বেনারসী শাড়ি ও সোনার কণ্ঠী পরে এসে আমাকে বলবে—কি আশ্চর্য তোমার দেশ! কিন্তু সে দেশে স্থায়ী বাসের বা তার অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় ছেলেকে মানুষ করার কথা কল্পনাও করবে না।

বহু দেশের বিচিত্র জাতির সমন্বয় আমেরিকায়—কৃষ্ণনের ক্রীসের পক্ষে তাদের একজন হয়ে যাওয়া কঠিন নয়। তবে এখানেও গাত্র বর্ণের সমস্যা উঠবে। নিগ্রো ও শ্বেতকায়দের মধ্যে বিয়ে আগেও হয়েছে, এখনও হচ্ছে। তাদের সন্তানরা এখনও জাতে ওঠেনি। ভবিষ্যতে উঠবে কিনা জানি না। আমাদের কৃষ্ণকায় ভারতীয়দের যে সোনার বরণী গলায় মালা দিল, তার সন্তান যদি নীচের স্তরের পোর্টোরিকান কিম্বা মেক্সিকান বলে গণ্য হয়, মায়ের মন আহ্লাদে নেচে উঠবে না।

আমাদের লোকসংখ্যা ও বেকার সমস্যা এমন আকার ধারণ করেছে যে একটি মেধাবী কৃষ্ণন, বা বিধবা মায়ের এক সন্তান অরুণ কোথায় কোন দেশে হারিয়ে গেল তার সন্ধান রাখা রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নয়, এবং তাদের সন্তান যে পরদেশী বনে গেল তাতেই বা কার কি আসে যায়। অরুণের ছেলে আনন্দ হয়তো একদিন তার বাবার মত খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক হবে, এদেশে সুযোগ সুবিধার তার অভাব হবে না; কিন্তু সেদিন সে ভারতীয় আনন্দ বসু নামে খ্যাত হবে, না আমেরিকান নাগরিক আন্ডী ব্যাস বলে পরিচিত হবে সে ভাবনাটা বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে তার নামকরণ করে এসে।

অরুণের মার বিশেষ অনুরোধে তার নাতির নামকরণে গিয়েছিলাম। শিশুকে পায়েস খাওয়ালাম, কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে তার নাম হল আনন্দ। আমাদের আমেরিকান বউমা সোৎসাহে নামের উচ্চারণটি শিখে নিলে। গলদ বাধল এই তামাটে বর্ণের নীল নয়ন শিশুটিকে ডাকতে গিয়ে। দেশে যাকে আমরা আনন্দ বলে ডাকতাম, তার বিদেশী মামা, মাসী সুবিধার জন্য তাকে Andy করে নিলে, বসু তো বাসুতে অনেকদিন আগেই পরিণত হয়েছে। আমাদের আনন্দ বিদেশে তার মায়ের আত্মীয়দের স্বজন বলে জানবে তাদের সংস্কৃতি ও রীতিনীতির প্রভাবে সে বড় হবে; কোথায় সুদূর ভারতবর্ষের কোন শহরে তার পিতামহী তার নামে একটি পুজোর ফুল দিচ্ছে, সে খবর তার কাছে পৌঁছবে না। বাসু থেকে ব্যাস হয়ে গেলে পুরোপুরি আমেরিকান নাগরিক। আমেরিকাকে মাতৃভূমি বলবার জন্মগত অধিকার সে পৃথিবীতে চোখ মেলেই অর্জন করেছে।

স্বপ্ন দেখার দিনকে বহু দূরে ফেলে এসেছি। বিশ্বনিন্দিত আবর্জনার স্তূপ কলকাতা শহরের ধোঁয়ার ঘোলাজলে চোখ রেখে একদিন বিশ্বমৈত্রীর স্বপ্ন দেখেছিলাম। চোখের সে রং কেটে গেছে, জগতের শ্রেষ্ঠ গণতন্ত্রের গর্বে গর্বিত জাতির রাজধানীতে খরস্রোতা পটোম্যাকের কূলে সারাদিন চোখ মেলে থাকলেও দৃষ্টি সুদূর প্রসারিত হয় না। ছেলেদের মত কল্পনা করতে পারি না এই সুন্দর ফুটফুটে ছেলেটি হবে বিশ্বের নাগরিক আনন্দ। ভয় হয় সে হবে অ্যান্ডী ব্যাস অর্থাৎ আমেরিকান নাগরিক। তার তামাটে রং আর নীল চোখের তারা তার সহায় হবে। এদেশের বহু মিশ্রিত জাতির মধ্যে সে মিশে যাবে। সেদিন আমাদের বসু পরিবারের একটি মাত্র নক্ষত্র হারিয়ে যাবে। ছেলেরা বলবে তারা কি কখনও হারায়? পূবের আনন্দ পশ্চিমে Anand হয়ে ভাস্বর হবে, তাতে ক্ষতি কি?

তাই তো, ক্ষতি কার?

প্রভা ঘোষাল
ওয়াশিংটন

চোর ও খুনীর মতো তোমার ফাঁসি হওয়া উচিত। এই দেশে এমন একজনও নেই যে তোমার বিরুদ্ধে নালিশ করে নি, সকলেই তোমার শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরা কিন্তু খ্রীশ্চান, এরা প্রতিশোধ চায় না, চায় শান্তি। তুমি যদি প্রতিজ্ঞা কর গ্রামবাসীদের আর ক্ষতি করবে না, এরা তোমার সব দোষ ক্ষমা করবে; আমাদের কুকুর পর্যন্ত তাড়া করে পিছু নেবে না তোমার।"

এই কথা শুনে নেকড়েটা মাথা নীচু করল; আর তার কান ও লেজ নেড়ে জানাল, ফ্রান্সিসের কথা সে মেনে নিয়েছে।

"ভাই নেকড়ে, তুমি যখন শান্তি বজায় রাখতে প্রস্তুত আছ, আমিও প্রতিজ্ঞা করছি যে, যতদিন তুমি বেঁচে থাকবে, ততদিন আমি গ্রামবাসীদের কাছ থেকে তোমার খাবার জোগাড় করে দেব। বেশ বুঝতে পেরেছি, খিদের জ্বালাতেই তুমি এ-সব অন্যায় করেছ..." হাত বাড়িয়ে দিলেন ফ্রান্সিস, নেকড়েটা তার ডানা-থাবা সাধুর হাতের উপর রেখে প্রতিজ্ঞা করল, সে এখন থেকে ফ্রান্সিসের শর্ত অনুযায়ী চলতে রাজি আছে।

"ভাই নেকড়ে, খৃস্টের নামে আমি তোমায় অভয় দিচ্ছি, তুমি আমার সংগে এসো..."। নেকড়েটা নম্রভাবে ফ্রান্সিসের পাশে পাশে চলতে লাগল।

গ্রামে ফিরে ফ্রান্সিস সমবেত জনতাকে জানাল নেকড়ের আর তার নিজের প্রতিজ্ঞার কথা। আর বললেন, "আমি বাঘটার জন্য জামিন রইলাম..." গ্রামবাসীরা নেকড়েটাকে রোজ খেতে দিতে রাজি হল।

নেকড়েটা এখন পোষা জন্তুর মতো গুব্বিওর পথে পথে গলিতে গলিতে ঘুরে বেড়ায়, কারও অনিষ্ট করে না। লোকেও ওকে বিরক্ত করে না; এমন কি কুকুরগুলো পর্যন্ত চিৎকার করে পিছু নেয় না ওর। গ্রামবাসীদের বাড়িতে বাড়িতে খেয়ে তার দিন কাটে মহানন্দে।

দু' বছর পরে একদিন হঠাৎ দেশময় খবর রটে গেল, বাঘটা মারা গিয়েছে। গুব্বিও-বাসীরা কাতর হয়ে পড়ল—তারা যে এই দু' বছরে ওকে ভালোবেসে ফেলেছিল...

তিনপেয়ে শুয়োরের কাহিনী

'পুষ্পিকা'র সব পশু-গল্পই অবশ্য এমনি মিষ্টনাত্মক নয়। এই ধরুন শিষ্য জুনিপারের কাহিনী :

"উপোস থাকলে কি হবে, ভাই? কি খাবে, শিগগির বলো, নিয়ে আসি..." শয্যাশায়ী রোগাক্রান্ত সন্ন্যাসী ভ্রাতাকে জিজ্ঞেস করল জুনিপার।

"আর কিছু ভালো লাগছে না ব্রাদার। তবে হ্যাঁ, এক টুকরো শুয়োরের মাংস যদি..."

আর বলতে হল না, জুনিপার বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এল রান্নাঘরের বড় ছোরা নিয়ে। মাঠে রাখালের তত্ত্বাবধানে চরছিল এক মস্ত শূকরপাল। এসে দাঁড়াল জুনিপার উৎসাহপূর্ণ নেত্রে—বাঞ্জর নির্বাচনে। হঠাৎ আপত্তিসূচক ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ সহকারে খোঁড়াতে লাগল তিনপেয়ে এক শুয়োর। জুনিপারের হাতে রইল জুনিপারের রোগাক্রান্ত সন্ন্যাসী ভ্রাতার শখের ডিনার।

শুভকর্মের পুণ্যফলের কথা ভাবতে ভাবতে ফ্রান্সিসের প্রিয় শিষ্য জুনিপার ধর্মাশ্রমে ফিরে এল। পা-টিকে ধুলে, মশলা দিয়ে রাঁধল, আর সগর্বে বেড়ে দিল শয্যাশায়ী রোগীর পাতে। অভুক্ত ভ্রাতাকে গোগ্রাসে খেতে দেখে জুনিপারের মন আহ্লাদে ভরে উঠল।

ইতিমধ্যে শূকরপালের রাখাল তার মনিবের কাছে গিয়ে বিবৃত করল তিনপেয়ে শুয়োরের মর্মন্তুদ কাহিনী। শুনে মনিব ফ্রান্সিসের আশ্রমে শোনাতে এল তীব্র অভিযোগের কথা। ফ্রান্সিস গল্পটার অর্ধেক বুঝে আর অর্ধেক না বুঝে, অভিযুক্ত ভ্রাতার নামে ক্ষমা চেয়ে ক্ষতি-পূরণের কথা পাড়তে লাগলেন। ক্রোধান্বিত লোকটি ফ্রান্সিসের যাবতীয় প্রতিশ্রুতি অগ্রাহ্য করল, প্রতিশোধ নেবে বলে প্রতিজ্ঞা করে আশ্রম ছেড়ে চলে গেল।

জুনিপারকে ডেকে পাঠিয়ে ফ্রান্সিস সবাইরের অড়ালে ওকে জিজ্ঞেস করলেন, "ঐ শুয়োরের পা তুমিই কি কেটেছ জুনিপার?" "আমি বইকি, গুরুদেব...আর নিজ হাতে রেঁধে খাইয়েছি অসুস্থ ভ্রাতাকে। ও এখন দিব্যি ঘুমোচ্ছে...বুঝিবা এতক্ষণ ওর রোগ সত্যি সত্যি সেরে গিয়েছে। হ্যাঁ, গুরুদেব, অসুস্থ ভ্রাতাকে ভালো করতে আমি এক শো শুয়োরের পা কাটতে প্রস্তুত। ভগবান এই সব শুয়োর সৃষ্টি করেছেন শুধু অসুস্থদের সুস্থ করবার জন্য।"

"ভাই জুনিপার, আমার প্রিয়তম মূর্খতম জুনিপার...ভদ্রলোকটি তাহলে আমাদের উপর অকারণে রাগ করেননি! যাও, জুনিপার, যে-কোনো উপায়ে পার, ওঁর সংগে দেখা করে ক্ষমা চেয়ে এসো..."

ফ্রান্সিসের এই উক্তিতে জুনিপার পরমাশ্চর্য হয়ে পড়ল। এক দিকে সুসমাচার প্রচারিত ভ্রাতৃপ্রেমের বীরসুলভ আদর্শ, আর এক দিকে কি? ওই চাষীর শুয়োরের একটি পা! জুনিপার ভাবতে পারছিল না যে ফ্রান্সিসের চোখে ভ্রাতৃপ্রেমের চেয়ে শুয়োরের পা-টা বেশি মূল্যবান! তবু সে কিছু বলল না; আদেশ পাওয়ামাত্রই চাষীর খোঁজে ছুটতে লাগল।

চাষীকে বোঝাল জুনিপার শয্যাশায়ী সন্ন্যাসী ভ্রাতার শোচনীয় অবস্থা, বোঝাল ভগবানের পরিকল্পনায় শূকর প্রভৃতি জন্তুর স্থান, বোঝাল জ্বরগ্রস্তদের পক্ষে শুয়োরের মাংসের পরম উপকারিতা...আর বর্ণিত করল, রোগাক্রান্ত সন্ন্যাসীদের জন্য যারা বিনা বাক্যব্যয়ে শুয়োরের পা উপহার দেয়, স্বর্গে তাদের শাশ্বত পুরস্কার।

বোঝাল জুনিপার, বুঝল না চাষী। রেগে দিশেহারা হয়ে সন্ন্যাসীর ঘাড়ের উপর বর্ষাল অশ্রাব্য গালিগালাজ। জুনিপার কিন্তু ফ্রান্সিসের মন্ত্রে দীক্ষিত : "দারিদ্র্যই তোমার সম্পদ, অপমানে সম্মান"; কটুবাক্যে বিচলিত না হয়ে চাষীকে আলিংগন করতে লাগল, শুয়োরের এই কাটা পায়ের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাল, এমন কি বাকি তিনটে পাও ভিক্ষা চাইল।

জুনিপারের এই অভাবনীয় সরলতায় অভিভূত হয়ে লোকটির মনে অনুতাপ জাগল। তার অধৈর্য আর স্বার্থপরতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে সে ওই তিনপেয়ে শুয়োরটিকে উৎসর্গ করতে গেল সেন্ট ফ্রান্সিসের শ্রীচরণে।

পাখিদের উদ্দেশে উপদেশ

পাখিদের সংগে ফ্রান্সিসের মিতালি বিশ্ববিখ্যাত :

চলেছেন ফ্রানসিস গ্রাম পেরিয়ে শহর ছাড়িয়ে; কখনও বা নামকীর্তন করতে নামছেন কোথাও, উপদেশ দিচ্ছেন, ব্যাখ্যা করছেন, বিবৃত করছেন ঈশ্বরপুত্রের জীবন ও বাণী। এমনি একদিন অপরাহ্ণকালে পথ চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গেলেন তিনি, পথ ছেড়ে মাঠে এসে নামলেন গাছদের ভিড়ে—তাদের শাখায় শাখায় ভরা পাখির কলকাকলি। সংগী সন্ন্যাসীরা অবাক। ফ্রানসিস তাঁদের ডেকে বললেন, "কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে তোমরা? আমি ততক্ষণ পাখিদের সংগে একটু বন্ধুত্ব পাতিয়ে নিই।"

পাখিরা গাছের শাখা থেকে নেমে এল—একে একে ঝাঁকে ঝাঁকে—কূজন থামিয়ে স্তব্ধ হল; আর অদূরে দাঁড়ানো সন্ন্যাসীরা

এক বিরাট পাখির ঝাঁকের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন ফ্রানসিস

দেখলেন, এক বিরাট পাখির ঝাঁকের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন ফ্রানসিস, তাদের দিকে তাকিয়ে কথা বলে চলেছেন :

"আমার ছোট্ট পাখি বন্ধুরা, তোমাদের এতজনকে একসংগে কাছে পেয়ে আমার যে কি আনন্দ, তা কেমন করে বোঝাই। তোমরা আমারই ভাইবোন, আমাকে ভালোবেসে যে আমার চারদিকে ভিড় করে এসেছ আমার সংগে বন্ধুত্ব পাতাতে, এর জন্য আমি সত্যিই সত্যিই ভারি খুশী। কি মিষ্টি গান গাও তোমরা, পথ চলতে চলতে তোমাদের কলকলাপ আমাকে মুগ্ধ করে দেয়, তোমাদের ঐকতান আমাকে শিহরিত করে তোলে। কেন জান? তোমাদের ঐকতানে আমি শুনতে পাই দেবদূতদের সম্মিলিত সংগীত—পবিত্র, মধুর, গভীর—ঢেউয়ের পরে ঢেউ তুলে যা ছুটে চলে তাঁরই উদ্দেশে, যিনি সকল কিছুর স্রষ্টা, সকল কিছুর ঊর্ধ্বে। হ্যাঁ, বন্ধুরা, গান মানেই প্রার্থনা, এবং প্রার্থনার উৎসই হল কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন, আর কৃতজ্ঞতা তো তোমাদের জানাতেই হবে, কেননা তোমাদের তিনি বেঁধেছেন অপরিমেয় ঋণের ডোরে। দিয়েছেন সুন্দর দুটি ডানা, মুক্ত আকাশে উড়ে বেড়াবার শক্তি, দিয়েছেন পালকের জামা, নীড়ের জন্য গাছ, তৃষ্ণার জন্য ঝর্ণা, আশ্রয়ের জন্য গুহা। আর দিয়েছেন সুর..."

বিকেলের শেষ রোদ্দুর পড়ল গাছগুলোর মাথায়, গাছের নীচে ঘন হয়ে এল ছায়া। ফ্রানসিস তাঁর আলাপ শেষ করলেন: "হ্যাঁ, সুর...। সূর্য যেমন আলো দিয়ে, আর বাতাস যেমন বীজন করে—তোমরাও তেমনি গানের দ্বারাই জানাবে ধন্যবাদ। আচ্ছা, আসি তবে।"

ফ্রানসিস তখন, ঊর্ধ্বদৃষ্টি হয়ে ক্রুশচিহ্ন অংকিত করলেন আশীর্বাদের ভংগীতে, পাখিরা সব গলা বাড়িয়ে, মাথা নোয়াল। বিদায় নিতে নিতে ফ্রানসিস দেখলেন, তারা উড়ে গেল সেই ক্রুশচিহ্নেরই অনুকরণে, চার ভাগে ভাগ হয়ে—যেন বলে গেল, খ্রীষ্টের বাণী ফ্রানসিসের দৌত্যে নতুন হয়ে উঠে, এমনিভাবেই ছড়িয়ে পড়বে চতুর্দিকে।

আর সংগের সন্ন্যাসীরা বুঝলেন, তাঁদের হতে হবে পাখিদের মতোই অনাড়ম্বর আর বিত্তহীন, কেননা ঈশ্বরের ঐশ্বর্যে শুধু রিক্তেরই পূর্ণাধিকার।

সূর্যস্তোত্র

...ফ্রানসিসের বয়স এখন ৪৫। মৃত্যুশয্যায় তিনি শেষবারের মতো গেয়ে শোনালেন তাঁর স্বরচিত 'সূর্যস্তোত্র'—আধ্যাত্মিক বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম চূড়ামণি :

হে পরম, হে সর্বশক্তিমান, প্রভু আমার প্রতাপ ও মহিমার আধার, সকল বন্দনা, সকল প্রশস্তি তোমারই উদ্দেশে! কার সাধ্য মুখে আনে তোমার অনিন্দ্য নাম!

সর্বভূত তোমার করুক স্তুতি; সবার উপরে করুক ভ্রাতা সূর্য, দিনের রাজা, জ্যোতির্ময়, অজেয়, রমণীয়, রশ্মিম—তারই মধ্যে, হে পরম, সার্থক তোমার প্রকাশ।

তোমার স্তব করুক ভগিনী চাঁদ আর অগণ্য তারা, উজ্জ্বল, সুন্দর হীরকপ্রভ, যাদের ভিড়ে ভরে রেখেছে আকাশ।

বায়ু, আমার ভাই, আর শূন্যচারী মেঘ, নির্মল নীলাকাশ, ন্যতোপর ঋতুকলাপ, লালন করে যারা জীবের জীবন, তোমার করুক স্তুতি।

তোমার স্তব করুক জল, বোন আমার, নম্র, শুচি, স্বচ্ছ, মানুষের ঘরে যার অসীম উপযোগ।

রাতের তমসা ছিঁড়ে আলো জ্বেলে দেয় আগুন, প্রোজ্জ্বল, উচ্ছল, দুর্দম, বলীয়ান ভাইটি আমার তোমার করুক স্তুতি।

আর স্তুতি করুক ভগিনী বসুন্ধরা—বিচিত্র ফল, বহুবর্ণ পুষ্প আর ফসলে ভরা—যার অংকে আমরা বেড়ে উঠি দিনে দিনে।

সেন্ট পিটার্স স্কুল, সেন্ট পল্‌স্‌ কলেজ, সেন্ট জেমস্‌ চার্চ, সেন্ট মেরীস কনভেন্ট... আমাদের কলকাতায় কত সেন্টের নামে আছে কত-না প্রতিষ্ঠান! কিন্তু কলকাতার খ্রীষ্টানেরা কল্পনাশক্তিতে এত দীন—ফ্রানসিস, বাঙ্গালীদের প্রিয় ফ্রানসিস, কোথাও কক্ষে পাননি। আগামী বড়দিনের ছুটিতে চিড়িয়াখানায় বেড়াতে যাব যখন, পাখিদের পুকুরটার রেলিঙে বড় বড় অক্ষরে লেখা একটা কাগজ টাঙিয়ে দিয়ে আসব : "ফ্রানসিস সরোবর।"

সন্তোষকুমার ঘোষ

শেষ নমস্কার

শ্রীচরণেষু—মাকে ॥ দশ ॥

[ক]

তোমাকে লেখা, বাবার চিঠি।

তুমি কি এতই সুদূর নিরপেক্ষ হয়ে গিয়েছিলে মা, যে, চিঠিটার পাঠ যে ছিল "প্রাণাধিকাসু", তাও খেয়াল করলে না, ওটা আমার হাতে দিতে একটুও কি সংকোচ হল না?

তখন অত সব বুঝিনি বা তলিয়ে দেখিনি, বুক ঢিপ্ ঢিপ্, মুঠোর মধ্যে দোমড়ানো নোট—আমি জড়ানো অক্ষরের জট ছাড়িয়ে যত তাড়াতাড়ি পারি পড়ছি। পড়া শেষ হল, চিঠিটা মস্ত খবরের মতো মুঠিতে ধরাই রইল, আমার চোখ দপ্ দপ্ করছিল, কথা ভীষণ উত্তেজনায় জড়ানো, অস্ফুট: বললাম, "মা, আমরা এখান থেকে চলে যাব। বাবা যেতে লিখেছেন।"

তুমি নিস্পৃহ, যেন তখনও বোঝনি, এইভাবে বললে "কোথায়।"

"কলকাতায়। সেইখান থেকেই তো বাবা লিখেছেন। চাকরি পেয়েছেন, লিখেছেন। বাসা নিয়েছেন।"

"কোথায়।"

বিরাট শব্দভাণ্ডারের ওই একটিমাত্র কথাই কি জানা তোমার, "কোথায়", শুধু "কোথায়।"

জোর দিয়ে বললাম, "থিয়েটারে, নূতন থিয়েটারে। নূতন থিয়েটার বুঝি খুব বড় থিয়েটার, মা?"

"জানি না।"

"পড়োই না। আচ্ছা, আমি পড়ছি, তুমি শোন। বাবা লিখছেন, 'দক্ষিণে যাইব বলিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম,, কিন্তু পুরীর পর আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইল না। জ্বরে পড়িলাম। তার চেয়েও সর্বনাশ, ধর্মশালায় পড়িয়া ছিলাম, একদিন সকালে উঠিয়া দেখি, সঙ্গে সামান্য যে-কয়টি টাকা ছিল, তাহা নাই। আমার জ্বর-বিকারের সুযোগে কে বা কাহারা লইয়া পলাইয়াছে। আলাদা আলাদা করিয়া ফতুয়ার পকেটে পাঁচ টাকার একখানি নোট রাখা ছিল, উহারা বোধ করি সন্ধান পায় নাই। অর্থশোক নাই, যাহা গিয়াছে তাহা তো সামান্য, গিয়াছে বেশ হইয়াছে, আমি সেইদিন চক্রতীর্থের নিকটে দাঁড়াইয়া সূর্যোদয় প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দে এক ভাবে আবিষ্ট হইলাম। জ্বর হঠাৎ সেদিনই যেন একেবারে ছাড়িয়া গেল, সেই সঙ্গে ছাড়িয়া গেল আমার অনেক দিনের কতগুলি ধারণা আর সংস্কারের ভয়। সবটুকু গেল, কিন্তু অন্য এক অনুভূতির সঞ্চার যেন শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হইয়া যাইতে থাকিল। আমি তোমাকে কি তাহা বুঝাইতে পারিব, তুমি কি তাহা বুঝিবে?

'আমার সম্মুখে সমুদ্র। এতদিন সমুদ্রকে দেখিতাম যেন ধোপধবল সদাহাস্যময়—উৎকট উল্লাসে দন্ত মার্জন করিলে যেমন ফেনা হয়। আজ দেখিলাম সাদা নয়, লালও আছে—ফেনার সঙ্গে যেন দাঁতের গোড়ার রক্ত মিশিয়াছে। আসলে অরুণ সকালের সূর্য ঢেউয়ের জলে নিজের ছায়া দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়া আপনাকে শতগুণ করিয়া গলাইয়া ফেলিতেছিল বলিয়াই ওই দৃষ্টিভ্রম।

'দৃষ্টিভ্রম? ভ্রমই বা কী করিয়া বলি। নূতন দৃষ্টি। আগে ভাবিতাম সমুদ্র মোহহীন, উদাসীন, ওই রক্ত দেখিয়া মনে হইল সমুদ্রেরও তবে কষ্ট আছে। আগে দেখিতাম সে মুঠা মুঠা ভাঙিয়া ঝিনুক ইত্যাদি যাহা কিছু তীরে ফেলিয়া ফিরিয়া যায়, চাহিয়াও দেখে না, কিন্তু সেদিন দেখিলাম, তাহা তো নয়, সে বারে বারে পাগলের মত ফিরিয়াও আসে, আছড়াইয়া পড়ে, ভাঙে আকুল হইয়া। তাহার কাছে অন্তরীক্ষের চন্দ্র-সূর্যের আকর্ষণ যতটা সত্য, স্থির তীরভূমির টানও ঠিক ততটাই সত্য। হয়ত যাহা রাখিয়া গিয়াছে তাহাকে আবার কুড়াইয়া লইতে চায়, হয়ত নিজেকে উজাড় করিয়া আরও দিতে চায়। তীরভূমি যে তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না, বরং

নিজেই ক্ষইয়া ক্ষইয়া গলিয়া যায়, সেই সার্থকতা তীরভূমির নিজের। নহিলে অলক্ষ্য আকর্ষণে অস্থির সমুদ্র তো ধরা দিবে বলিয়াই, আপনাকে সমর্পণ করিবে বলিয়াই, আশ্রয় আর সান্ত্বনার আশায় ক্রমাগত তীরের বুকে মুখ গোঁজে।

'সমুদ্রের বৈরাগ্য দেখিয়াছি। সেদিন প্রভাতের রক্তিমা দেখাইয়া দিল তাহার আসক্তি। যে ধীবরেরা ডিঙ্গি বাহিয়া ঢেউয়ে ঢেউয়ে দূরে দূরে ছায়াসম হইয়া গিয়াছিল, দেখিলাম তাহারা ছড়ানো জাল গুটাইয়া ফিরিয়া আসিতেছে।

'তখন স্থির করিলম, আমিও ফিরিব। আমাকেও জাল গুটাইতে হইবে, ফিরিতে হইবে পাড়ে—ওই দৃশ্য তাহারই ইঙ্গিত। পাথেয় যা ছিল হিজলী অবধি আসিতেই ফুরাইল। সেখান হইতে গ্রাম গ্রামান্তর পাড়ি দিয়া, এখানে নদী, ওখানে বন, পার হইয়া, গৃহস্থের আতিথ্য গ্রহণ করিতে করিতে পদব্রজে অবশেষে কলিকাতা।

'শিরোনামার ঠিকানা দেখিয়াছ তো? আনন্দ, আমি কাজ লইয়াছি মনে থিয়েটারে। ঠিক থিয়েটারে নয় অবশ্য, থিয়েটার-সংলগ্ন ছাপাখানায়, উহাদের নিজেদেরই ছাপাখানা। থিয়েটারের পোসটার, হ্যান্ডবিল, প্রোগ্রাম, এমন কী কখনও কখনও নাটক-টাটকও এখানেই ছাপা হয়। অগত্যা এখানেই। কেন না, অন্যান্য জায়গায়ও চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, সুবিধা হয় নাই। যে-সব ব্যবসায় আমার সহায়তা আর উদ্যোগে স্থাপিত হইয়াছে ধরো ইন্ডিয়ান প্রিন্টিং কোম্পানি, এখনও যাহারা স্বদেশীর নাম ভাঙাইয়া দিব্য ফলাও ব্যবসায় ফাঁদিয়া লইয়াছে, দেখিলাম আমাকে তাহারা আর চিনিতেই চায় না।

কিংবা, তোমার মনে আছে তো, সেই ন্যাশনাল সোডা, সেই মিসেলেনিয়াস ইন্ডিয়ান ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি—সংক্ষেপে এম-আই-এম অর্থাৎ "মিম্‌", আমারই প্রতিষ্ঠিত, টাকাটা অবশ্য এক বন্ধু সঞ্জীব রায়ের, আর চাঁদা তোলা, কিন্তু শ্রম আমার—সেই "মিম্‌"-এ প্রথম তৈয়ারি হইল "নবীন লেমোনেড" আর "মধু লেমন স্কোয়াশ" (কারণ দেখিয়াছিলাম কিনা যে বিলাতী সব কয়টি সোডা ইত্যাদিরই কবির নামে নাম, বায়রন, মিলটন বা স্পেনসার, তাই আমাদের পণ্যেরও দেশীয় কবিদের নামে নামকরণ করিয়াছিলাম)—ভাবিতাম স্বদেশী জাগরণের হেতু খুব চলিবে, রোজ গড়ের মাঠে, র‍্যামপার্টের আশেপাশে পাঠাইতাম কত বন্ধুবান্ধব যে নিত্য আসিয়া খাইয়া যাইত, দাম দিত না কেবল হিসাবটা টোকা থাকিত জাবেদা খাতায়—তারও কত কী তৈয়ারী করিবার সাধ ছিল, কিন্তু জেলে গেলাম, বাহির হইয়া আসিয়া ভারত ভ্রমণে, আসিয়া দেখি কোথায় সেই স্বদেশী শিল্প "মিমকো"? কারবার আগেই দেউলে হইয়া গিয়াছে, এখন তালা ঝুলিতেছে।

'তারপর সেই "কবরীকল্যাণ তেল", তোমাকে এক শিশি দিয়াছিলাম, মনে পড়ে? আর ছিল "সৌন্দর্য মলম" (ইংরাজীতে বিউটি বাম), জোর চলিতেছে, কিন্তু যাহারা গুছাইয়া লইয়াছে তাহারা আমাকে স্থান দিল না। বাড়তি ভাগীদার আর চায় না। গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর এখন আন্দোলন বন্ধ যে। ভাবিতেছি ইহার চেয়ে বরং বিপ্লবী হওয়া শ্রেয় ছিল, না-হয় দ্বীপান্তরই হইত, কিংবা ফাঁসি, কিন্তু বিশ্বাসী বন্ধুদের এই প্রতারণা!

'অবশ্য ইহাও হইতে পারে, আমিই ভুল বুঝিতেছি। যে-অশান্ত প্রণবকুমারকে ইহারা

চিনিত, আমি তো আর সে নই। শ্রান্ত, আশ্রয়-প্রার্থী' এই প্রণয়কে দিয়া ইহাদের প্রয়োজন নাই।

'তাই মনে থিয়েটার—অগত্যা। কাজটা খারাপ নয়, আমাকে মোটামুটি এই প্রেসটার ম্যানেজারই বলা চলে, বেতন আপাতত পঞ্চাশ। বাহিরের কাজ আনিতে পারিলে কমিশন। তা-ছাড়া থিয়েটারমহলের সঙ্গে জানাশোনা মঞ্চের সঙ্গে একটু সংযোগ, বলা যায় না, ইহাতে ভবিষ্যতে আমার বোধ হয় সুবিধাই হইবে। কী সুবিধা, চিঠিতে তাহা আর খুলিয়া লিখিলাম না। এখানে তোমরা আসিলে বলিব।

তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিও। ত্রিশ টাকা পাঠাইলাম। রেলভাড়া তো পাঁচ টাকার মতন। বাকিটায় বাহার যা পাওনা চুকাইয়া দিয়া আসিও—যত শীঘ্র পারো। যাত্রার দিন ঠিক হইলে জানাইও, স্টেশনে থাকিব।

মোটের উপর আর পারিতেছি না। বয়স হইতেছে, পাইস হোটেলের খাওয়া আর সহে না। তা-ছাড়া, একটু বিশ্রাম চাই। একটি বাসা দেখিয়া রাখিয়াছি, তোমাদের পত্র পাইলেই ঠিক করিয়া ফেলিব। আর, এতদিন পরে নিজেদের একটি নীড় রচনা করার স্বপ্ন তুমি নিশ্চয়ই সফল করিয়া তুলিবে। তুলিবে না?"

চিঠিতে আরও কয়েক ছত্র ছিল, আমার সম্পর্কে প্রশ্ন, শুভাশীর্বাদ ইত্যাদি। কিন্তু যেই আমার এই পর্যন্ত পড়া হল 'তুলিবে না?'—অমনই মা তুমি ছিনিয়ে নিলে কাগজ কয়টি, ছিঁড়ে ছিঁড়ে বললে "মিথ্যে কথা।"

কী শুকনো গলা তোমার, কী অপ্রত্যাশিত চোখ অনির্বাণ হয়ে উঠেছিল। বললে "মিথ্যে কথা। বিশ্রাম, শ্রান্তি ওসব কিছু না। শুধু কথার চালাকি। যে-ভাষায় ও পালা লেখে, সেই পালারই কয়েকটা পৃষ্ঠা ছিঁড়ে পাঠিয়েছে।"

উঠোনে শুকোতে দেওয়া কাঁচা মুগের উপরে কয়েকটা চিল ছায়া ফেলেছিল। ডালাটায় ডালগুলো তুলে ফেলতে ফেলতে আরও কঠিন হয়ে উঠলে তুমি। বলে উঠলে, "যাব না, কিছুতেই না। সব হবে ওর ইচ্ছেমত? চিরদিন আমাকে নিয়ে যা-ইচ্ছে করেছে, সব মুখ বুজে সহ্য করেছি। সমুদ্র-টমুদ্র ও-সব দু'দিনের খেয়াল, হঠাৎ যা মনে হল তাই লিখেছে। এখানে তবু যা-হোক একটা স্থির জায়গায় আছি, মাথা গুঁজে আছি নিজের বাড়িতে, কলকাতায় সবসুদ্ধ টেনে নিয়ে গিয়ে আবার কোন্ বিপদের মধ্যে ফেলবে কে জানে। যদি ও আবার পালায়? সমুদ্র না-হয় এবার ফিরিয়ে দিয়েছে, যদি ঝড় ডাক দেয়? দ্যাখ, ও-সব কাব্য করতে আমিও জানি। আমি ওকে চিনি। আমি যাব না। আমাকে পুরোপুরি ও নিজের কবলে নিতে চাইছে—আমি বুঝি না?"

বলতে বলতে মা, তুমি চিঠিটা ছিঁড়লে। কুটি কুটি করে। কী ভাগ্য যে ঝোঁকের মাথায় নোট ক'টাকে যে ছেঁড়োনি। (শুধু তোমার নয়, সব মানুষেরই বরাবর দেখেছি এক রীতি। তার একটা ভাগ অন্ধ, বেহিসেবী, অগ্রপশ্চাৎ কিছুমাত্র বিবেচনা নেই তার—আর একটা অংশ ওরই মধ্যে সংগোপনে সতর্ক সাবধানী)।

। খ।

"যাব না কিছুতেই," ওটাও কিন্তু তোমার শেষ কথা নয় মা। যে নিয়মে চিঠি ছিঁড়েও নোটগুলো তুমি বাঁচিয়েছ, সেই বিচিত্র নিয়মেরই একটা রকমফেরে কলকাতায় যেতেও তো তুমি চেয়েছ। না, শুধু ওখানে একটা বাসা বাঁধার লোভে নয়। আসলে এই জায়গাটা ক্রমশ কেমন শূন্য হয়ে যাচ্ছিল। দাদা—নেই। সুধীরমামার প্রস্থান—অভ্যস্ততায় আর একটা ছেদ। তুমি আর-একটা অভ্যাসে পৌঁছুতে চাও কিনা, মনে মনে তারই জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলে, তখনই বাবার চিঠি। অত জোরে জোরে যে বলেছ 'না—না—না,' সে কি ওই আকুলতাই চাপা দিতে? হায় মন, হায় তার তত্ত্ব। আমি তার কিছু যদি-বা বুঝি, বেশিটাই বুঝি না।

না, একা আমাকে দিয়ে তুমি পূর্ণ হয়ে উঠছিলে না। দাদার জন্যে হা-হুতাশ, আমার জন্যে স্নেহ, একটি আগন্তুক-সম্ভাবনার বিনষ্টি, বাবার অদর্শন, সুধীর-মামার অন্তর্ধান, এ-সব মিলেও তোমাকে সর্বক্ষণের জন্য ব্যাপৃত করে রাখতে পারেনি, কেন না, এত রেখে ঢেকে বলে আর কাজ কী মা, তুমি তখনও যুবতী।

তুমি তখনও অবিগতবয়সী, সেটা আমি এখন হিসাব করে খতিয়ে দেখে বলছি। নইলে, এই চিঠির গোড়ার দিকেই তো বলেছি, তোমাকে কোনও বয়সেই আমি

যুবতী ভাবতে পারিনি। মা—আমার কাছে শুধুই মা—তিনি মা, তিনি নিজে যে আবার যুবতী হতে পারেন, অন্তত হতে পারতেন, এই সব চমকলাগানো রূঢ় শলাকা সেই বারবীর বয়সের ধারণাকে বিদ্ধ করেনি। অথচ দ্যাখো, তোমার তখন যে বয়স, সেই বয়সের নারীদের আমি পরবর্তীকালে প্রার্থনা, এমন কী কামনা করেছি। বয়স শুধু দৃষ্টিশক্তি নয়, দেখার ভঙ্গিটাকেও বদলে ফেলে। মার্জনা কোরো, যদি অসহ্য লাগে এই স্বীকারোক্তি।

শুধু শোকে নয়, শুধু বাৎসল্যে নয়, তখন কত রাত্রি তোমার ঘুম হত না। শর-শয্যার গল্পটা মহাভারতের লেখক কোথা থেকে পেয়েছিলেন জানি না, আমি তো পরে জেনেছি, বিনিদ্র অন্ধকার রাত্রির নামই শর-শয্যা, প্রত্যেকটা তারা এক একটা তীক্ষ্ণ তীর, শুধু কি পিঠে?—বুকেও বেঁধে।

তখন জানতাম না, তোমার শরশয্যার শয়ন প্রত্যেক রাতে, সেখানে আমি নেই, আমি না, আমরা কেউই-ই কিছু না।

কিন্তু মা, তুমিও কি আমার কাছে ক্রম-ক্রমে কিছু-না হয়ে উঠছিলে? ঠিক কবে থেকে, মনে পড়ে না। একটু চঞ্চল হতে শুরু করেছি, সে তো কলকাতায় গিয়ে। রিনরিনে গলা শুনলেই মাথা ঝিনঝিন করা, গালে মেচেতা-ব্রণ, চোখে গর্ত—এ-সব অনেক পরে। লজ্জার ব্যাপারটুকু বিজ্ঞায় দিয়ে চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করছি, একদিন সকালে বিছানা তোলার সময়ে আমার চাদরে একটা দাগ দেখতে পেলে, মনে পড়ে? খুব যখন ছোট, তখনও বিছানা ভিজিয়েছি—সে অন্য রকম। তখন বকুনি খেতাম। সেদিন বকুনি খেলাম না তো। তুমি যেন কী-রকম চোখে খানিক-ক্ষণ তাকিয়ে ছিলে। আমি বড় হয়ে উঠছি, সেই ভয়?

এ-সব কথার দিন তো পড়ে আছে, আগে তখনকার পালা শেষ করি। আমাদের ওখানকার পাট তোলার কথা বলি।

তুমি কলকাতা যেতে চাওনি আবার এখানে থাকতেও পারছ না, তলে তলে অস্থির হয়ে উঠছ, এই পর্যন্ত বলেছি। সেই তুমি। আমি, সুধীরমামা আর বাবা, এই তিনজনকে নিয়ে তুমি। একজনকে ভালবাসো: একজন ভালবাসত তোমাকে, আর-একজন তোমাকে তীব্রভাবে টানছে—এই টানা-পোড়েনে বিশৃঙ্খল তোমাকে আমূল অসহায় দেখেছি।

চলে যাবে, মুছে যাবে এখানকার স্মৃতি, এখানকার সব কিছু মুছে দিয়ে যাবে। আমরা তৈরী হচ্ছি। কলকাতায় চিঠি গেছে। আমার নামে। বাবাকে। যেন স্টেশনে থাকে। বাঁধাছাঁদা সারা। কী আশ্চর্য দাদার সেই ফটোটা? মা, ওটা নামিয়ে নিতে

অত দেরি করলে কেন তুমি, তোমার হাত কেন কাঁপছিল, সেটা না-হয় বুঝলাম— স্নায়বিক অধীরতা। কিন্তু—

পাড়তে গিয়ে কাচ কেন ভেঙে গেল খান খান হয়ে, অবাক অবোধ আমি তার অর্থ বুঝতে পারছিলাম না। এ কি অসতর্কতা? এ কি—এখনকার, কালো পরকলা পরে ব্যাপারটা দেখে জিজ্ঞাসা করছি—এ কি দৈব অথবা ইচ্ছাকৃত? তার ইচ্ছা, আমরা যাকে অবচেতন বলে থাকি। এ কী এখানকার চিহ্ন লোপ করে নির্জ্ঞানে নতুন হবার বাসনা? ফটোর কাচগুলো আমার চোখে ফুটেছিল। আর ছবিটা কুড়িয়ে নিতে গিয়ে দেখি উই ধরে ঝরঝরে। না, এতদিন তোমার কি লক্ষ্য ছিল না, অথবা সময়ের দস্যুতার মুখে আমরা সবাই, ফতুর, সব ঝরঝরে, ফটোর কাগজ, দেয়ালের চুন-বালি-আস্তর, সব?

অতএব দাদা আমাদের সঙ্গে গেল না।

সেই স্টেশন, যেখান থেকে একদিন ফিরে এসেছিলাম। সেই ট্রেন, যে ট্রেনে সেদিন বাবাকে তুলে দিলাম। গাড়িটা দুলে উঠল, গাড়িটা ছাড়ল, টের পেলাম, আমরা সব ছেড়ে যাচ্ছি, আমরা দুজনে, দাদাকে, এখানকার সব কিছুকে। অথবা রেখে যাচ্ছি—আমাদের দুজনকেও।

আসলে আমরা, পরে জেনেছি মা, কিছুই কখনও সঙ্গে নিই না নিজেকেও না। সব রেখে রেখে ফেলে ফেলে যাই, অথচ ভাবি নাকি কিছুটা নিলাম। যা নিই, তার নাম স্মৃতি, বিবর্ণ একটি ছবি, মৃত, দীর্ঘকাল পরে যার পাঠোদ্ধারও করা যায় না, এমন বিবর্ণ কোনও প্রাচীন লিপি।

আমরাও সেদিন ওখানে সব কিছুকে রেখেই চলে এসেছিলাম। বাঁধাছাঁদা অতএব সব মিথ্যে, বাক্স-পুঁটুলি সব ভুয়া বোঝা, নিজেকে ঠকানো। আজ তো জানি, প্রতি যাত্রাই এক অর্থে শবযাত্রা, কোনও শব কোনও দিন কি সাদা আবরণ-বস্ত্র, পুষ্প প্রভৃতি সঙ্গে নেয়? ওগুলো শুধু মন সাজানো।

আমরা যাচ্ছি, কিন্তু যে-আমরা ছিলাম তারা থেকেই যাচ্ছি যদিও। যারা চলল তারা নতুন কিছু হতে চলল। চলল নতুন কিছু তৈরী করে নেবে বলে।

আগের বারে, যখন যাওয়া হল না তখন কত কেঁদেছিলাম। আর এবারে, সত্যি-সত্যি যখন বিদায় নিলাম, তখন, আশ্চর্য, চোখে এক ফোঁটা জল এল না। লিখেই ভাবছি ওই "আশ্চর্য" কথাটা কেটে দিই। আশ্চর্য আবার কী, কিছুই আশ্চর্য নয়। মানুষের জীবনে সব কিছুর বরাদ্দ রেশনের চাল-চিনির "কোটা"র মতো মাপা থাকে—হাসি-কান্না, প্রেম প্রভৃতি সব কিছুর নির্দিষ্ট মাত্রা পূর্ণ হলে পরের জন্যে কিছু বাঁচে না। যেমন [illegible]

দাদার সঙ্গে চূড়ামণি যোগে স্নান করতে গিয়েছিলে, যে-দিন ফেরার কথা সেদিন ফেরোনি বলে পিসীমাদের ঘরে শুয়ে আমি কত কান্না কেঁদেছি। যখন তোমাদের ফেরার কথা ফিরলে না, যেদিন আসার কথা ছিল সেদিনও পেরিয়ে গেল। প্রতিটি পায়ের শব্দে আমি চমকে উঠছি, বারে বারে দৌড়ে যাচ্ছি বাইরে, ফিরে এসে ছটফট ছটফট আর চোখ ছাপিয়ে জল।

ওটা তখন অপর্যাপ্ত ছিল। ক'দিন তোমাকে দেখতে পাইনি বলে সেবার কত চোখের জল ফেললাম, আর এই তো ক' বছর আগে, যেদিন জানলাম, আর কোনোদিন দেখতে পাব না?—তার সিকির সিকিও না। জানি না মা, তুমি উপর থেকে সেটা দেখতে পেয়েছ কি না। ক্ষমা করেছ? যদি না করে থাকো, তবে দোহাই, আমাকে নয়, দায়ী করো, আমার পরের বয়সকে, যখন আঙুলের গিঁটে গিঁটে কড়া পড়ার মতো মনেরও গিঁটে গিঁটে কড়া পড়ে। জলের উৎস শুকিয়ে যায়। ওই যে বলেছি, রেশনের মাপা বরাদ্দ, কান্নার কোটা! ওটা আমাদের, অধিকাংশ পুরুষের বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায় কিনা! বেহিসাবী বাবুদের মতো চোখের জলের পুঁজি কম বয়সেই খরচ করে ফেলি, বাকী জীবনের জন্যে কিছুই বাঁচে না, তখন শুধু ফুটিফাটা মাঠের বুক চিরে বেরিয়ে আসা বাতাস, তপ্ত দীর্ঘশ্বাস, মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠা, বিনা তেলের পলতের মতো চোখের শুকনো পাতা পোড়ানো—কিন্তু কান্না না। পরিণত কাল সকলের পক্ষেই নিঃসম্বল, নিস্ফল, শূন্য, কিন্তু পুরুষদের পক্ষে আরও বেশি, একটা নিরশ্রু অস্তিত্ব।

তাই মা, আমার প্রগাঢ় যৌবনে তোমার মৃত্যু হল, কিন্তু তেমন করে কাঁদতে পারলাম না।

[গ]

ট্রেন চলছে। তুমি একটানা জপ করে চলেছ। মাঝে মাঝে দোলানিতে আমার গায়ে এসে পড়ছ। জপ থামিয়ে আঙুল দিয়ে দিয়ে আমাকে দেখিয়ে দিচ্ছিলে বাইরের যা-কিছু আমাদের সঙ্গে চলছিল বা পাল্লা দিতে না পেরে পিছিয়ে পড়ছিল। কোনোটার মানে কী জানতে চাইছিলে। দূরে বক, কাছের ধানের ক্ষেত, লাইনের ধারের নালায় ফোটা ফুল, আলের রাস্তার ঘুমঘুম পালকি অনেক কিছুর সঙ্গে আমাদের চেনা হয়ে যাচ্ছিল। ডাকগাড়ি, সব স্টেশনে দাঁড়ায় না, যেখানে না-দাঁড়ায় সেখানকার মানুষেরা কেমন নির্বাক নালিশ নিয়ে চেয়ে থাকে।

এইভাবে বিকেল এল। কোন্ একটা বড় স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াতেই একজন লোক একটা বালতি আর পিতলের জগ্ নিয়ে "হিন্দু পানি হিন্দু পানি" বলে হেঁকে গেল, চা সিগারেট, নানা সুরে হাঁকাহাঁকি আর•

কত কী। একটা লোক যখন গাড়িতে উঠে কোম্পানটার লেখা আছে "ক্ষুড়িজম বীসবেক" সেখানে পিঠ ঠেকিয়ে বক্তৃতা দিতে থাকল, তখন মজার আমোদে তোমার চোখ জ্বল-জ্বল, ঘোমটা একটু সরিয়ে তুমি দেখছিলে। তখন তোমাকে লাগছিল নতুন-বিয়ে-হওয়া লাজুক বউটির মতো। কামরায় অনেক লোক, তাই ঝুঁকে পড়ে ফিস ফিস করে বললে, "ওর ঝুলিতে কী রে? কী বলছে এ এত ছড়া কেটে কেটে?"

"মিষ্টি মশলা, মা।"

এ-গাড়িতে আমিও নতুন, তবু আমি সব জানি। তোমার তুলনায় তখনই আমি বড় হয়ে গেছি। "বাঙালছেলে যে!" আমার গাল টিপে তুমি আদর করে বললে।

লোকটা দেখছিল, ভরসা পেয়ে এগিয়ে এল। —"নেবেন মা? নিন না। এক প্যাকেট এক পয়সা, তিনটে নিলে দু পয়সা।"

তুমি আঁচলের খুঁট খুললে। মশলাটা এক রতি মুখে পুরে বললে "কী ঠাণ্ডা রে। যেমন ঠাণ্ডা, তেমনি মিষ্টি। আমরা পানের সঙ্গে অবিশ্যি জৈত্রী, জায়ফল, এলাচ, এইসব খেয়েছি। কিন্তু এর কাছে কিছু লাগে না।"

লোকটা খুশি হয়ে বলল "আর দেব মা?" তুমি ফের আঁচল খুলে কিনে ফেললে পুরো এক আনার। ফলে একটু পরে একটা অন্ধ ছেলে যখন গাইতে থাকল "অন্ধকারে অন্তরেতে অশ্রু বাদল ঝরে রে—" তখন তুমি চোখ মুছে বললে "থিয়েটারে এ-গান শুনেছি। কোন্ পালাটায় যেন? তোর বাবা জানে। কিন্তু আমার কাছে আর তো ভাঙানি নেই রে, তোর কাছে কিছু আছে?"

•

আমি সব স্টেশনের নাম পড়তে পড়তে যাচ্ছিলাম, চেষ্টা করছিলাম যাতে মুখস্থ থাকে। সে কি সহজ ব্যাপার। ধরে রাখতে পারি না, যেন পিছলে পিছলে যায়। একটা কিন্তু মনে গেঁথে গেল। একটা স্টেশনে সবে সন্ধ্যা হল। রোদ্দুরের শেষ রেশ টালির চালের ইঁট-রঙের সঙ্গে এক হয়ে ছিল। একটা ফুল ছিল তারের বেড়ার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা গাছে। গেট পেরিয়ে নীচু জমি, একটাই মেঠো পথ। সেখানে মোটে একজনই নেমেছিল। নেমে এসে টিকিটবাবুর পাশ কাটিয়ে মাটির রাস্তাটা ধরেছে, আর পিছন ফিরে সেই টিকিটবাবু চেঁচাচ্ছেন, "ও মশাই, কই চললেন, শুনছেন— ও মশাই!" শেষ বেলায় দুপুরের পাতিহাঁসকে ডাঙায় তোলার জন্য মেয়েরা যেমন সুর করে করে ডাকে—চৈ-চৈ-চৈ, ঠিক সেইরকম গলা।

গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল। টিকিটবাবু লোকটার নাগাল পেয়েছিলেন কিনা জানিনে। কিন্তু সামান্য ওই ব্যাপারটা কাঠখোদাই ছবি হয়ে আছে। কেমন যেন আমরা ইদানীং যাকে বলি প্রতীক, তার মতো। এখনও যদি ট্রেনে চড়ি আর কোনও একটা স্টেশনে হঠাৎ সন্ধ্যা নামে, ভারী লোভ হয়, নেমে পড়ি—আচ্ছা নেমেই যদি পড়ি অজানা এই জায়গাতে? ধূসর পরিবেশের ভিতর দিয়ে ছুটছি, ঠিক নেই কোন্ দিকে যাচ্ছি, লোভ হয়, ভারী লোভ হয়, তা-হলে? পিছন থেকে কোনও টিকিটবাবু কি হেঁকে হেঁকে ডাকবেন, শুনছেন ও মশাই শুনছেন? তিনি ডেকেই চলেছেন আর আমি ছায়ার পুকুর সাঁতরে সাঁতরে যাচ্ছি, আমি অনির্দিষ্ট কোনও সন্ধ্যায় আকস্মিক নেমে-পড়া এক যাত্রী, নিজের এই ছবিটা সম্মোহিত হয়ে দেখি। জানি, ওটা শুধু স্বপ্ন, ওটা শুধু সাধ, এই মাপা-জোকা হিসাবী জীবনে ওই অসম্ভব সাধ কখনও পূর্ণ হবে না।

[ক্রমশ]

সরকারী বৃত্তি সম্বন্ধে কেন্দ্রের বিরোধিতা

গত সংখ্যার গানের আসরে প্রকাশিত শ্রীশান্তিদেব ঘোষের পত্রে জানা গেল কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় লোকসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত—এই দুটি বিষয়ে শিক্ষার জন্য বৃত্তিপ্রদান বন্ধ করতে উদ্যোগী হয়েছেন। এর কারণ এই দুটি সঙ্গীতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মত বিধিবদ্ধ নিয়মে কণ্ঠ সাধনা বা সুরসাধনা হয় না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুক্তি খুবই অদ্ভুত লাগছে এবং এটা আদৌ কোনও যুক্তি কিনা সন্দেহ। সোজাসুজি এটাই বোঝা যাচ্ছে যে, কেবল মাত্র উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ছাড়া গানের ব্যাপারে আর কোনও বৃত্তি প্রদান করতে তাঁরা ইচ্ছুক নন। হঠাৎ সঙ্গীত সম্বন্ধে এরকম প্রাচীনপন্থী হয়ে যাওয়াটা মোটেই শুভলক্ষণ নয় এবং সৎ কাব্যসঙ্গীত বা দেশী সঙ্গীতের আলোচনায় সমর্থন প্রত্যাহার করাটাও বিরাট অবুদ্ধির পরিচায়ক। আমরা তো বর্তমানে সরকার যে কটি বৃত্তি দিচ্ছিলেন সেগুলিকে যথেষ্ট নয় বলেই মনে করছিলুম এবং কীর্তন বা অপরাপর বিশিষ্ট দেশী সঙ্গীত সম্বন্ধেও অনুরূপ বৃত্তি দিয়ে উৎসাহ প্রদানের প্রস্তাব করে আসছিলুম। যে সময়টা সব রকম শিক্ষায় সাহায্যের আয়োজন বিস্তৃততর করবার কথা সবাই ভাবছেন সেই সময় স্বল্প কটি বৃত্তিরও সংকোচসাধন হবে—এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।

যদি কেউ এ যুগে বসে মনে করে যে, কেবল মহাকাব্য এবং অলঙ্কার শাস্ত্র পাঠ করাটাই কাব্যচর্চার প্রধান উপায় তাহলে তার বুদ্ধির সুস্থতা সম্বন্ধে সংশয় জাগবে। সাহিত্যের পরিধি বিরাট এবং তার নানান বিস্তৃতি ঘটেছে—এর কোনটিই রসের জগতে অপাংক্তেয় নয়। তেমনি সঙ্গীতের ক্ষেত্রও বিপুল এবং তার প্রতিটি বিভাগই একটা বিশেষ আদর্শে গড়ে উঠেছে। এরও কোনটিই অবহেলার যোগ্য নয়। এই বিশ্বায়ীকরণের যুগে এই সব নানা বিভাগেই অনুসন্ধিৎসুগণ গবেষণার কাজে ব্যাপৃত আছেন। তাঁদের অনুসন্ধানকে অযোগ্য বলাটা ধৃষ্ঠতারই পরিচায়ক।

আমাদের দেশে কোনকালেই দেশী সঙ্গীতকে হেয় করে দেখা হয়নি। এমন কথা কোনও শাস্ত্রই বলেননি যে, রাগ-সঙ্গীতের চর্চাটই একমাত্র আবশ্যক এবং অপরাপর দেশী পদ্ধতির গুরুত্ব নেই। বরঞ্চ সকল শাস্ত্রই প্রবন্ধ সঙ্গীতের সংকলন করেছেন এবং তাদের নিয়ে আলোচনা করেছেন। বর্তমানেও এই নীতির ব্যতিক্রম হবার কোনও কারণ দেখা যায় না। রাগ-সঙ্গীত কাব্যসঙ্গীত এবং লোকসঙ্গীত—এই কটিই প্রধানত প্রচলিত। এর মধ্যে কাব্যসঙ্গীত হচ্ছে লিরিক যা সমাজের শিক্ষিত ও বিদগ্ধ ব্যক্তিগণ রচনা করেন এবং গেয়ে থাকেন। আমাদের কাব্যগীতির মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীত অতি শ্রদ্ধার বস্তু, আমরা এই সঙ্গীতে শীলবত্তার উৎকৃষ্টতম প্রকাশ পর্যবেক্ষণ করি। অতএব রবীন্দ্র সঙ্গীতের শিক্ষা ও আলোচনাকে যে আমরা সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব প্রদান করব সেটা স্বাভাবিক। বাংলার কাব্যসঙ্গীতের এতবড় অনুশীলনকে কেন্দ্রীয় সরকার একটা নিরর্থক যুক্তিতে লঘু করে দেখবেন এবং এর পৃষ্ঠপোষকতা প্রত্যাহার করবেন এটা নিরতিশয় পরিতাপের বিষয়। তা ছাড়া রবীন্দ্র সঙ্গীতের ক্ষেত্রে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত তেমন গুরুত্ব পায় না এটাও তো ঠিক কথা নয়। রবীন্দ্র সঙ্গীতে অগ্রণী এমন বহু ব্যক্তি আছেন যাঁরা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শী। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের স্বরলিপি করেছিলেন দিনেন্দ্রনাথ, পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী, সঙ্গীতাচার্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি; আর গেয়েছেন রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী প্রভৃতি—এঁরা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে কম পারদর্শী ছিলেন না। অতএব কেন্দ্রীয় সরকারের যাঁরা উপদেষ্টা তাঁদের কোনও যুক্তিই খাটে না। বর্তমানে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যেসব প্রতিষ্ঠানে সেখানেও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সমন্বয় অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে করা হয় বলেই জানি। কাব্য-সঙ্গীতকে তার পরিপ্রেক্ষিতেই দেখতে হবে একথা শান্তিদেব ঘোষ মহাশয় যুক্তি দিয়েই ব্যাখ্যা করেছেন। এ বিষয়ে আর বেশী কিছু বলতে চাই না; শুধু এটুকুই কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরকে বলতে চাই যে, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মত উৎকৃষ্ট কাব্যসঙ্গীতের শিক্ষায় সহায়তা প্রদান করাটা তাঁদেরই গৌরব অন্যথায় তাঁদের সংকীর্ণতাই প্রকট হবে।

লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করবার কোনও হেতু নেই, কারণ এর বিকাশ ধারাটাই স্বতন্ত্র। লোকসঙ্গীত এমন একটা জিনিস যার চর্চায় সমগ্র দেশের সাধারণের সঙ্গে নানা-ভাবে পরিচিত হওয়া যায়। শুধু তাই নয় সমগ্র জাতিকে উপলব্ধি করবার একটি উপায় হচ্ছে লোকসঙ্গীতের অনুশীলন। কেন্দ্রীয় সরকার এটা নিশ্চয়ই অনুমোদন করবেন যে লোকসঙ্গীত সব সময় ঘরে বসে শেখা যায় না। এর জন্য বিভিন্ন গ্রামে জনপদে পরিভ্রমণ করতে হয়। তার জন্য প্রচুর খরচ হয়। এর কিছুটা এই বৃত্তি থেকে পূরণ করা সম্ভব। যদি এই বৃত্তিটি বিলোপ করা হয় তাহলে লোকসঙ্গীত শিক্ষার সুযোগ বিশেষভাবে ব্যাহত হবে। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন, সম্প্রতি লোকান্তরিত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য জীবনের অনেকখানিই ব্যয় করেছেন লোকসঙ্গীতের আলোচনায়। লোকসঙ্গীতে কী বস্তু আছে যা তাঁদের এতখানি আকর্ষণ করেছে তা তাঁদের কার্যাবলী থেকে বোঝা যায়। আজকের জগতে লোকসঙ্গীত নিয়ে ব্যাপক কাজ চলেছে। খোঁজ নিলে দেখা যাবে আমাদের দেশে অধুনা লোকসংগীতের প্রতি একটা বিরাট অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হয়েছে। অল ইণ্ডিয়া রেডিও তাঁদের প্রোগ্রামের একটা বৃহৎ অংশ নিয়োজিত করেছেন লোক-সঙ্গীতের প্রচারে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী অনবরত বলে চলেছেন যে তাঁর সরকার জনগণের জন্য সবকিছু করবে। অথচ কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তাঁরই একটি মন্ত্রণালয় জনগণের সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনার পথ রুদ্ধ করতে কৃতসঙ্কল্প হয়েছেন। এ কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলব যে, পশ্চিমবঙ্গে যে সব লোকসঙ্গীতের অস্তিত্ব আছে যে সম্বন্ধে অনেক পরিচয় গ্রহণ করা হয়নি। এ বিষয়ে এখনও ব্যাপক গবেষণা, অনুসন্ধান ও আলোচনার প্রয়োজন। বরঞ্চ এ বিষয়ে যাতে তরুণ সম্প্রদায় উপযুক্ত কাজে অগ্রসর হতে পারেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচিত সে বিষয়ে আরও অনেক উদারভাবে সাহায্য করা।

বাস্তবিকই প্রবহমান সঙ্গীতকে উপেক্ষা করার এই প্রয়াস অতিশয় ভ্রমাত্মক। কাব্য-সঙ্গীত এবং লোকসঙ্গীত এই দুটিই জাতির সাংস্কৃতিক অগ্রগতির পরিচায়ক। এর উন্নতিকল্পে যতটা পারা যায় ততটাই

করা উচিত। তা না করে কেবলমাত্র একটা সনাতন পদ্ধতিকে আঁকড়ে থাকাটা কোনক্রমেই যুক্তিযুক্ত হবে না।

আর একটা কথা, এই ধরণের প্রস্তাব সাবজেক্ট কমিটির কাছে পেশ না করে প্রথমেই কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটিতে গেল কেন? সাবজেক্ট কমিটিতে সঙ্গীতের নানা বিভাগ থেকে বিশেষজ্ঞদের নেওয়া হয়েছে। এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাঁদের মতামত উপেক্ষা করবারও কোনও সঙ্গত কারণ ছিল না।

যাই হোক, অচিরে এই অবুদ্ধি প্রণোদিত বৃত্তি সংকোচের প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে বলে আমরা আশা করি। সরকারের এক রকম নীতি হওয়া আবশ্যক। মুখে দেশের সর্বস্তরের জন্য সব কিছু করা হচ্ছে বলে কার্যত অন্যরকম করাটা অতিশয় নিন্দনীয় ব্যাপার। বরঞ্চ সবগুলি প্রদেশের কাব্যসংগীত, লোকসঙ্গীত ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সঙ্গীতের শ্রীবৃদ্ধি যাতে হয় সেজন্য আর্থিক সহায়তায় প্রসার কল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত হবে।

শার্ঙ্গদেব

এবার লক্ষ্য ফ্রা মাউরো। কোপারনিকাস জ্বালামুখ থেকে নিগত গলিত পদার্থ এবং ইম্ব্রিয়ামের অববাহিকার স্থানান্তরিত বস্তুসামগ্রী একদিন চাঁদের বুকের এই পাহাড়ে অঞ্চলটি গড়ে তুলেছিল। আগামী এপ্রিল ১১ অ্যাপলো-১৩র তিনজন নভোচর জেমস লোভেল, টমাস ম্যাটটিংলি এবং ফ্রেড হেইস এরই উদ্দেশে যাত্রা করছেন। আগের দুটি অ্যাপলোর অভিযাত্রীরা নেমেছিলেন চাঁদের সমতল ভূমিতে। এবারকার অবতরণ ক্ষেত্রে বড় বড় পাথরের স্তূপের ভীড়। স্থানটি অ্যাপলো-১২ যেখানে নেমেছিল সেখান থেকে ১৭০ কিলোমিটার দূরে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা এখান থেকে সংগ্রহ করা যাবে চাঁদের দেশের প্রাচীনতম ভূ-ত্বকের নমুনা। সেই নমুনা চাঁদ সম্পর্কে হয়ত আরও নতুন তথ্য জানাতে পারবে।

একটি সিগারেট / ক্যানসার ?

সম্প্রতি ওয়াটার টাউন, ম্যাসাচুসেটস-এর দুজন কোষ-বিজ্ঞানী বারট্রাম আইচেল এবং এইচ আরন্তো সাহরিক আবিষ্কার করেছেন, কাটা-ছড়ার ফলে মুখের ভেতর রক্তের যে সমস্ত শ্বেত-কণিকার সমাবেশ ঘটে একটি মাত্র সিগারেটের ধুঁয়োর পক্ষেই তাদের পুরোপুরি অকর্মণ্য করে দেওয়া সম্ভব। শুধু অকর্মণ্যই বা কেন, ওঁরা লক্ষ করেছেন, তামাকের ধুঁয়োর সংস্পর্শে এসে লক্ষ লক্ষ শ্বেত-কণিকা সামান্য সময়ের মধ্যেই তাদের স্বাভাবিক জৈবিক ক্ষমতা যেন হারিয়ে ফেলে। সেই সঙ্গে নিজেদের ধর্মও মানুষের একেবারে মুখের মধ্যে সিগারেটের ধুঁয়ো নিয়ে এ ধরনের পরীক্ষা চালনার ঘটনা এই প্রথম। সংবাদটি পরিবেশন করেছেন 'সায়েন্স' পত্রিকা তাঁদের একশ বেয়াট্ট নম্বর প্রকাশনায়।

বস্তুত বিভিন্ন প্রাণী-কোষের উপর তামাকের ধুঁয়ো অথবা তামাক জাতীয় পদার্থ কী ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে তা জানার জন্যে এর আগেও নানান পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ অনেকেই করেছেন। তবে এর সমস্ত কিছুই করা হয় ভিন্নতর প্রাণীর কোষ, রক্ত অথবা অন্যান্য জৈবিক প্রক্রিয়ার উপর। কখনও কখনও মানুষের দেহ-কোষ বা রক্তের উপরও পরীক্ষা চালান হয়। ভিন্নতর অবস্থায় এবং কৃত্রিম পরিবেশে। কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাভাবিক একজন মানুষের দেহে সরাসরি এ ধরনের গবেষণা চালিয়ে দেহে তামাক জাতীয় পদার্থজনিত বিষক্রিয়া সম্পর্কে নতুন তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা আর কখনও কেউ ভেবে দেখেন নি।

মুখের আভ্যন্তরীণ দেহ-ত্বক অত্যন্ত পাতলা। এতটুকু আঘাত বা ঘর্ষণ পেলেই এই ত্বক কেটে বা ছড়ে যেতে পারে। এমন কি সাধারণ অবস্থাতেও আমরা যখন কোন কঠিন খাদ্যবস্তু চিবিয়ে খাই তখন জিভ বা মুখের ভেতরের কোন কোন অংশ প্রায়ই ছড়ে যায়। ছড়ে যাওয়া অংশে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্তবাহী নালী থেকে বেরিয়ে আসে রক্তের শ্বেত-কণিকা বা লিউকোসাইটস। রক্ত নালীর কাছে বাইরে থেকে এসে বি সমস্ত ক্ষতিকর বীজাণু বা রাসায়নিক পদার্থ জড়ো হতে শুরু করে, এই শ্বেত-কণিকারা তাদের দিকে এগিয়ে যায়, সংগ্রাম চালায় এবং অবশেষে ধ্বংস করে ফেলে। আইচেল এবং সাহরিক দেহের এই প্রতিরক্ষাকারী সৈনিকদেরই বেছে নেন তাঁদের পরীক্ষার অন্যতম সামগ্রী রূপে। এর জন্যে এঁরা সুদেহী কয়েকজন ব্যক্তিকে নির্বাচিত করেন। মুখ পরিষ্কার করার পর এদেরকে বিশেষ এক ধরনের মোমজাতীয় পদার্থ চিবোতে দেওয়া হয়। ক্রমান্বয় চর্বনের ফলে এদের মুখের মধ্যেকার কিছু চামড়া ছড়ে যায়। তারপর ঐ মোম বাইরে নিক্ষেপ করে বীজাণুমুক্ত জল দিয়ে কিছুক্ষণ কুলকুচি করে মুখ ধুয়ে নেয়। এই জলে বিশেষ এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ মেশান ছিল।

সামান্য সময়ের জন্যে বিরতি। তারপর আবার এদের পরিষ্কার জল দিয়ে মুখ ধুতে বলা হয় এবং পরে সেই জল সংগ্রহ করা হয়।

আইচেল এবং সাহরিক ঐ জল পরীক্ষা করে দেখলেন তার মধ্যে লক্ষ লক্ষ লিউকোসাইট ভেসে বেড়াচ্ছে। জলের মধ্যে স্বাভাবিক জীবন-ধর্মকে বজায় রেখে তাদের কেউ সাঁতার কাটছে, কেউ বা ক্ষণপদ নিক্ষেপ করে ধেয়ে চলেছে কোন শত্রু-বীজাণুকে আক্রমণ করতে। কেউ তাদের টপাটপ খেয়ে ফেলছে, ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রাণচাঞ্চল্যের সমস্ত লক্ষণই তাদের মধ্যে বর্তমান।

এবার লোকগুলিকে একটি করে সিগারেটের ধূম পান করতে দেওয়া হল। ওরা বেশ আয়েস করে প্রত্যেকটি সিগারেট শেষ করল। তারপর আবার মুখ ভর্তি জল নিয়ে কুলকুচি চালাল কিছুক্ষণ ধরে। তাদের সেই কুলকুচি করা জল পরীক্ষা করে আইচেল এবং সাহরিক দেখলেন, সেই জলের মধ্যেও প্রচুর সংখ্যক লিউকোসাইট রয়েছে। তবে তারা সকলেই যেন নিষ্প্রাণ, অবশ দেহ। কুণ্ডলী পাকিয়ে সুক্ষ্মাণু বলের মত নিথর নিস্তব্ধ হয়ে এখানে সেখানে ছড়িয়ে। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখা গেল এই সমস্ত লিউকোসাইট-এর অনেকেই স্বাভাবিক শ্বাসকার্য চালানর মত ক্ষমতাও যেন হারিয়ে ফেলেছে। কারুর কারুর ক্ষেত্রে এই ক্ষমতা কমে গিয়ে নেমে এসেছে শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও নীচে। ওঁরা আরও দেখলেন, কিছু সংখ্যক শ্বেত-কণিকা শারীরিক অসুস্থও হয়ে পড়েছে।

অতএব আবার সেই চিরন্তন প্রশ্ন :

তাহলে ফুসফুসের ক্যানসারের এটাই কি অন্যতম কারণ? ইতিপূর্বে একটা পাকাপাকি অভিমত কিন্তু পৃথিবীর অনেক বিশেষজ্ঞই স্বীকার করে নিয়েছেন। ওঁরা মনে করেন ধূমপানের ফলে রক্তের মধ্যে নিকোটিন এবং আলকাতরা জাতীয় পদার্থ মিশে যায়। এই নিকোটিন এবং আলকাতরাই প্রাণী-কোষকে পরোক্ষভাবে আক্রমণ করে তার স্বাভাবিক জৈবিক ধর্মকে ব্যাহত করে। ব্যাপারটা পরীক্ষা করার জন্যে আরও সতর্কতার সঙ্গে এগোতে লাগলেন ম্যাসাচুসেটস-এর ঐ দুজন বিজ্ঞানী। ওঁরা একই ধরনের পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করলেন। তবে পরীক্ষাধীন লোকদের সাধারণ সিগারেটের বদলে এবার দেওয়া হল ফিলটারওয়ালা সিগারেট। ফিলটার তামাকের ধোঁয়ার মধ্যে যেটুকু অ্যাক্রোলিন এবং সায়ানাইড ঘটিত পদার্থ থাকে তাদের শুষে নেয়। ধূমপানের পর তাদের কুলকুচি করা জল সংগ্রহ করে যখন পরীক্ষা করা হল, দেখা গেল লিউকোসাইটরা এবার বহাল তবিয়তে চলাফেরা করছে। তাদের মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতাই আর চোখে পড়ল না। অতএব সিদ্ধান্ত করা হল, সম্ভবত অ্যাক্রোলিন ও সায়ানাইড আসল দুষমণ। শ্বেতকণিকার শারীরিক ক্ষতির কারণ তারাই।

অবশ্য ঠিক এই মুহূর্তেই এমন চাঞ্চল্যকর তথ্যের উপর কোন সঠিক সিদ্ধান্ত টানা শক্ত। আইচেল এবং সাহরিক মনে করেন, মুখের অভ্যন্তরে লিউকোসাইট কোষ সব সময়েই ভীড় করে থাকে। তারা নিয়ত রক্তের মধ্যে থেকে মুখের মধ্যে আসছে; অনিবার্য কারণে তারা দলে দলে মরে যায়। আবার নতুন দলের সেখানে আবির্ভাব ঘটে। তাছাড়া এই সমস্ত কণিকার প্রধান দায়িত্ব ক্ষতিকর সামগ্রীর হাত থেকে দেহকে রক্ষা করা। হয়ত এই বিশেষ ধর্মটির জন্যে তাদের কার্যপ্রণালীও সাধারণ দেহ-কোষের চেয়ে ভিন্নতর হতে পারে। মুখের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে বাস না করায় এদের ওপর দীর্ঘমেয়াদী পর্যবেক্ষণ চালানও শক্ত। অতএব প্রাণীকোষকে সত্যিই ঐ সমস্ত সামগ্রী ধ্বংস করে কিনা, অন্যান্য কোষের উপর অনেকটা সময় নিয়ে পর্যবেক্ষণ না চালিয়ে এখনই কিছু বলা ঠিক হবে না।

তবে প্রচলিত একটি তত্ত্বে বলা হয়েছে, প্রাণীদেহের যে সমস্ত কোষ যথাযথ শ্বাস-কার্য চালাতে পারে না, তারাই শেষ পর্যন্ত ক্যানসার রোগের উৎস হয়ে দাঁড়ায়। তাদের কেন্দ্র করেই শরীরে ক্যানসার দানা বেঁধে ওঠে। আইচেল এবং সাহরিকের সাম্প্রতিক পরীক্ষার ফল প্রমাণ করেছে, সিগারেটের ধোঁয়া জীবকোষের শ্বাস-কার্য ব্যাহত করে। যদি সত্যিই ঐ তত্ত্বটি নির্ভুল হয়, তাহলে ধূমপানের সঙ্গে ক্যানসার রোগের সত্যিকারের যদি কোন সম্পর্ক থাকেও অদূর ভবিষ্যতে তা খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে।

ছত্রাক ছত্রাক ছত্রাক

লোকে বলে জোঁকের প্রাণ! কথাটি কি সত্যই ঠিক? ছত্রাক সম্পর্কে যাঁরা মোটামুটি কিছু খবর রাখেন তাঁরা অন্তত একথা বলবেন না। অদ্ভুত এই জীব, এরা উদ্ভিদ না প্রাণী এমন কি বিজ্ঞানীদের কাছেও কখনও কখনও এর উত্তর ধাঁধার মত মনে হয়। বিচিত্র আকার, বিচিত্র বর্ণ এমন কি বিচিত্র তাদের স্বভাব প্রকৃতি। এরা জাতিতে হাজারো, চরিত্রে লক্ষ, ব্যবহারে যে কত সে হিসেব জোগান শক্ত। এমন কি এদের কোন সম্প্রদায় কখন, কোথায় এবং কিভাবে বোতলের ভূতের মত সর সর করে সামনে এসে দাঁড়াবে সে কথাও সঠিক বলা সম্ভব নয়। সাধারণতঃ ভাত, ডাল, রুটি একটু অবহেলা পেলেই এদের স্বর্গরাজ্য হয়ে পড়ে। রাতে কোন খাবার তৈরি করে রাখা হয়েছে, ভোরে অদ্ভুত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে এক শ্রেণীর ছত্রাক বেশ সাজান বাগান করে বসে রয়েছে, এমন অভিজ্ঞতা তো অনেকেরই আছে? অদ্ভুত

অদ্ভুত পরিবেশ, যেখানে জীবন নামক বস্তুটির অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না, প্রকৃতির বিভিন্ন নিয়মে খোঁজ করে দেখুন, হয়ত দেখবেন সেখানেও বিশেষ এক শ্রেণীর ছত্রাক দিব্যি বসবাস করতে শুরু করেছে এবং স্বচ্ছন্দে। উদাহরণ, ক্লাডোস্পোরিয়াম নামে এক জাতীয় ছত্রাক এবং সিউডোমনাস নামে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া। বিশ্বাস করুন, এরা বিমান চালনার জ্বালানির মধ্যে আশ্রয় করে বেঁচে থাকতে পারে। শুধু পারা নয়, বেঁচে থাকবার জন্যে যেটুকু খাদ্য দরকার তাও সংগ্রহ করে ঐ জ্বালানি তেল থেকে। অনেকেই জানেন, ছত্রাক পরজীবি। অর্থাৎ নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যে যে খাদ্য বা আশ্রয়ের দরকার হয়, তার জন্যে তাদের নির্ভর করতে হয় কোন প্রাণী, উদ্ভিদ বা বস্তুর উপর। তবে এইভাবে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যে অপরকে কাজে লাগানর উদাহরণ জীবজগতে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তবে এক বাধা। ছত্রাক সম্পর্কে এবার অভূতপূর্ব চমক সৃষ্টি করেছেন ওনতারিও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী জে ই জায়িক এবং তাঁর সহকর্মীরা। ওঁরা এই প্রথম নতুন এক ধরনের ছত্রাক আবিষ্কার করেছেন যারা প্রাকৃতিক গ্যাস থেকেই খাদ্য রূপে যেটুকু কার্বনের প্রয়োজন হয়, তা সংগ্রহ করে। সরাসরি প্রাকৃতিক গ্যাসের কার্বনকে জৈবিক কারণে কাজে লাগানর নজির এর আগে আর পাওয়া যায়নি। সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে ক্যানাডিয়ান জার্নাল অব মাইক্রো-বাইওলজি পত্রিকার পনেরতম সংখ্যার ১২৩১ পৃষ্ঠায়।

নতুন এই ছত্রাকের নাম রাখা হয়েছে গ্রাফিয়াম। এর জন্যে একটি চৌবাচ্চাকে কাজে লাগান হয়েছিল। চৌবাচ্চার মধ্যে প্রায় আঠাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় নিয়মিতভাবে মাটির নিচে ঢাকা একটি নর্দমা থেকে জল সংরক্ষিত করা হয়। মাঝে মাঝে সাইফন পদ্ধতিতে পুরনো জল সরিয়ে নতুন জল সরবরাহ করা হয়েছিল। জলের মধ্যে তাঁরা মিশিয়ে দেন কিছুটা ধাতব লবণ এবং বেশ কিছু পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাস। এই গ্যাসের মধ্যে মিশ্রিত অবস্থায় ছিল শতকরা সাড়ে নব্বই ভাগ মিথেন, দুই ভাগ ইথেন, তিন ভাগ নাইট্রোজেন, দশমিক পঁচিশ ভাগ কার্বন ডাই-অকসাইড দশমিক একুশ ভাগ প্রপেন এবং যৎসামান্য আইসোবিউটেন, এন-বিউটেন, আইসোপেনটেন এবং এন-পেনটেন।

অদ্ভুত যোগাযোগ। নতুন এই পরিবেশের মধ্যে এই প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া গেল গ্রাফিয়াম নামে সেই ছত্রাকের। ইতিপূর্বে সিউডোমনাস এবং মাইকোব্যাকটেরিয়ামদের অবশ্য প্রাকৃতিক গ্যাসের মধ্যে বেঁচে থাকতে দেখা গেছে। তবে নিজেদের জৈবিক প্রয়োজনে তারা প্রাকৃতিক গ্যাসের কার্বন কণাদের কাজে লাগাতে পারেনি। একমাত্র গ্রাফিয়ামদের ক্ষেত্রেই দেখা গেল, এ কাজটি তারা সম্পন্ন করতে পারে। বায়বীয় হাইড্রো-কার্বন অর্থাৎ মিথেন, ইথেন প্রভৃতি থেকে সহজেই তারা প্রয়োজনীয় কার্বন সংগ্রহ করে নেয়।

গবেষণা ক্ষেত্রে এই আবিষ্কার অবশ্যই নতুন এক দিগন্তের সৃষ্টি করবে। তবে পরবর্তী কতকগুলি পরীক্ষা চালিয়ে জায়িক এবং তাঁর দল সিদ্ধান্ত করেছেন, 'ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও একে আমরা কাজে লাগাতে পারব। গ্রাফিয়াম কৃত্রিম উপায়ে প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে মূল্যবান প্রোটিন জাতীয় খাদ্য উৎপাদন করতে সাহায্য করবে।'

কৃত্রিম
টি আর এফ

কোন সাংকেতিক বার্তা নয়। এটি একটি হরমোনের নাম। মস্তিষ্কের হাইপো-থ্যালামাস নামে যে অংশটি রয়েছে সেখানেই এটি নিঃসৃত হয়ে থাকে। টেকসাসের বেলার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেষজ-বিজ্ঞান শাখার কয়েকজন গবেষক কিছু দিন আগে লক্ষ করেন, মস্তিষ্কের বিশেষ এই হরমোনটি পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে থাইরোট্রোপিন নামে এক ধরনের জীব-রাসায়নিক যৌগ নিঃসরণ করে। থাইরোট্রোপিন অবশেষে মস্তিষ্কের থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে ক্ষরণ করে থাইরয়েড হরমোন। অতএব বলা চলে থাইরয়েড গ্রন্থির প্রধান নিয়ন্ত্রক টি আর এফ।

দেহের তাপমাত্রা, কোন কিছু খাওয়ার ইচ্ছে, তৃষ্ণা, ঘুম, রক্তে চিনির মাত্রা, লবণ এবং জলের পরিমাণ এমন কি মানসিক অবস্থা—এর সমস্ত কিছুরই অন্যতম পরিচালক মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস। কেউ কেউ মনে করেন, শুধু টি আর এফ-ই নয়, এখান থেকে আরও নানা রকমের রাসায়নিক যৌগ বেরিয়ে এসে দেহের অন্যান্য গ্রন্থিদেরও সক্রিয় করে তোলে এবং অবশেষে শরীরের বিভিন্ন কাজকর্ম যথাযথ সম্পন্ন হতে সাহায্য করে। টেকসাসের ঐ গবেষকরা প্রাণীদেহ থেকে খানিকটা টি আর এফ সংগ্রহ করে পরীক্ষা করে দেখেন এর

রাসায়নিক উপাদানগুলি নিতান্তই সাধারণ। তিনটি মাত্র অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে তৈরি। অবশেষে খুবই সরল একটি পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ কৃত্রিম উপায়ে তাঁরা গবেষণাগারেই এটি তৈরি করতে সমর্থ হন। এই সাফল্য থাইরয়েড গ্রন্থিজনিত বিভিন্ন রোগ চিকিৎসার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করবে সন্দেহ নেই।

সংবাদ

মার্কিন দেশের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ 'এক্সপ্লোরার—১' এবার পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসছে। মহাকাশে তার পরিক্রমণ পথ ক্রমেই পৃথিবীর নিকটবর্তী হচ্ছে। আশা করা যায় এ বছরের মে মাসেই উপগ্রহটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করে পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এ সংবাদ 'নাসা'র। উল্লেখ্য, একত্রিশ পাউন্ড ওজনের এই উপগ্রহটিকে ১৯৫৮ সালে মার্কিন বিজ্ঞানীরা মহাকাশের কক্ষপথে স্থাপন করেছিলেন। পৃথিবীকে ঘিরে মহাকাশে যে বিকিরণ-বলয় রয়েছে, যার নাম ভ্যান-অ্যালেন বেল্ট—এই উপগ্রহটিই সর্বপ্রথম তা আবিষ্কার করে।

সমরজিৎ কর

॥ পাঁচ ॥

ব পর্যন্ত বিছানায় এলিয়ে শুয়ে ছিল ওরা। লিলি উপড় হয়ে। একটা পাতলা চাদরে শরীরটা ঢেকে। অসিত চোখ বুজে শুয়ে শুয়ে একটা অদ্ভুত সুন্দর আলস্য চেখে আরাম পাচ্ছিল। একটা সিগারেট খাবার ইচ্ছে চাগিয়ে উঠছিল। হাত বাড়ালেই প্যাকেট আর লাইটার, সে জানে। কিন্তু সিগারেট ধরাতে যে পরিশ্রমটুকু লাগবে, সেটুকুও করতে তার মন চাইল না।

সে একটু পাশ ফিরে লিলির শরীরটার পাশে শরীরটা ঠেকিয়ে দিল। একটা রোমাঞ্চ তাকে কাঁপিয়ে দিল। অলসভাবে তার হাতখানা লিলির ঘাড়ের কাছ থেকে তার নরম আর মসৃণ পিঠের উপর দিয়ে যেন ভাসিয়ে দিল অসিত। হাতের তালু থেকে একটা স্পর্শসুখ তরঙ্গের মত অসিতের সারা শরীরে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল। এই লিলিকে অনেক দিন পায়নি অসিত। এ লিলি হারিয়ে গিয়েছিল। তাকে আবার ফিরে পেয়েছে অসিত। মাত্র পাঁচ দিন পরে নয়, অনেক অনে-ক বছর পরে।

অসিত এবার চোখ মেলল। ভারি পর্দা দিয়ে চারদিক ঢাকা। এয়ার কন্‌ডিশন যন্ত্রটা থেকে সংগীতের মত মৃদু একটা আওয়াজ আর পরিমিত শীতলটা ঘরময় অনবরত ছড়িয়ে পড়ছে। অত্যন্ত নিরাপদ মনে হল নিজেকে। এই আরামটুকু চুটিয়ে ভোগ করার জন্য একটা সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে হল তার। বালিশে হেলান দিয়ে বসতেই তার বুকের উপর থেকে চাদরটা কোমর পর্যন্ত নেমে এল। এবং পায়ের দিকে বড় আয়নাটার মধ্যে সে নিজের এই অর্ধ-অনাবৃত দেহটা দেখতে পেল। বুকের খাঁচা বেশ চওড়াই তার। বুক এবং হাতের পেশীর ফরমও চমৎকার। তার বেশ মজাই লাগল নিজের চেহারাটা দেখে। বেশ একটা বলিষ্ঠ-বলিষ্ঠ আদল আসে চেহারাটায়। অসিত ব্যায়াম করার ভঙ্গীতে হাত দুটো নেড়েচেড়ে অবাক হয়ে গেল। গুলো-টুলো বেশ ফুলে ফুলে উঠছে।

অসিত এবার সিগারেট ধরাল। একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে মুখটা লিলির কানের কাছে নিয়ে গেল।

বলল, জান লিলি, আমার শরীরে নিতান্ত কম জোর নেই। আমার বাইসেপটা অনেক লোকের চেয়েই ভাল। অথচ দেখ, আমি সেটা এইমাত্র টের পেলাম।

লিলি একটু সরে এসে অসিতের রোম-রোম বুকে মুখ গুঁজে দিয়ে স্বপ্নের ঘোরেই যেন নিঃশব্দে হাসল।

অসিত : আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি লিলি, আর তোমাকে কেউ আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারবে না। আমি ভাবছি লিলি, জুডো কিংবা কারাটি কিছু একটা শিখে ফেলতে হবে। তারপরেই বাচ্চা!

লিলি জড়ানো গলায় খুব আস্তে করে জিজ্ঞেস করল, আজ তোমার ভাল লেগেছে অসিত?

অসিতের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ফিসফিস করে বলল, খুউব ভাল লেগেছে লিলি। এরকম আর কখনও হয়নি। তোমার?

লিলিও ফিসফিস করে বলল, জান, আমি কিন্তু আজ সাবধান হইনি।

অসিত হঠাৎ যেন একটু বোকা হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করল, তার মানে?

লিলি যেন বেশ মজা পেয়েছে। হাসতে লাগল অসিতের দিকে চেয়ে।

বলল, এ'কদিন তো পিল খাইনি। আর আজ ব্যাপারটা এমন হঠাৎ হয়ে গেল, সাবধান হবার কথা মনেই হয়নি।

—ওঃ। এই কথা! অসিতের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। আমি ভাবছি কি না কি। এটা কোনও সমস্যাই নয়।

সিগারেটে একটা টান দিল অসিত। বেশ হালকা লাগছে তার।

—ওর জন্য তুমি ভেবো না লিলি। চল না-হয় কাল অমিয়দার ওখানে যাই। ওয়ান অর টু পিল খেলেই পারি। নো প্রবলেম্।

লিলি আবার হাসল।

অসিত : হাসছ কেন লিলি? হাসির কথা কি বললাম?

লিলি হাসতে হাসতে বলল, এবার প্রবলেম হচ্ছে এই যে, আমি একটা বাচ্চা চাই।

অকস্মাৎ গম্ভীর হয়ে গেল লিলি।

বলল, সত্যি, এইরকম রুট্‌লেস্ জীবনের কোনও মানে হয় না। সংসারে একটা বাচ্চা প্রয়োজন। অথচ এই সহজ কথাটা আমরা মানতে রাজি হইনি। কখনও তুমি হও তো আমি হই না, কখনও আমি হই তো তুমি বেঁকে বসো। এই দিকে অনর্থক কত ফাস্ না করেছি আমরা। এই পাঁচ দিনে, অসিত, নিজেকে একেবারে উল্টে-পাল্টে দেখে নিয়েছি। ঠিক করেছি কোনও ব্যাপারেই আর হাওয়ায় ভেসে বেড়াব না। এবার থেকে মাটিতে পা দিয়ে দাঁড়াব। আমরা যে রুখে দাঁড়াতে পারিনে, আমরা এই যে সব ব্যাপারে পিছু হটে আসি, তার কারণ আমরা ত্রিশঙ্কুর মত শুধু শূন্যে ভেসেই আছি।

এতক্ষণের আরাম, পরিতৃপ্তি, দাম্পত্য-জীবনের সুখাবেশ লিলির কথায় যেন এক ফুঁয়ে উড়ে গেল। অসিতের মুখখানা নিমেষে কালো হয়ে গেল।

লিলি বলল, জান অসিত, আমাদের বাচ্চাকে এমনভাবে তৈরি করতে হবে, সে যেন প্রথম থেকেই তার পায়ের তলায় শক্ত মাটির আশ্রয় পায়। তা হলেই, তুমি দেখো অসিত, ও আর কিছুতে ভয় পেয়ে পালাবে না। ও রুখে দাঁড়াবে। ও ঠিক পারবে, তুমি দেখো।

লিলির কথায় অসিতেরও উৎসাহ ফিরে এল।

বলল, ওকে আমি বেশ ছোট বয়েস থেকেই কারাটি শেখাব। অবিশ্যি যদি ছেলেই হয়।

—মেয়ে হলেই বা ক্ষতি কি? লিলি হাসল।

বলল, আসলে হচ্ছে, শিক্ষাটা এমন দিতে হবে, ও যেন বুঝতে পারে ও নৈতিকভাবে বলীয়ান। অন্যায়ের শক্তি যত বিরাটই হোক, ওর কাছে পরাজয় তাকে মানতেই হবে। এই বিশ্বাস মনে যদি একবার শক্ত হয়ে জমে বসতে পারে, তবে ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক, সে রুখে দাঁড়াবেই।

এবার অসিত হাসল।

বলল, কারাটি কি জিনিস, তুমি জান না, তাই বুঝতে পারছ না। কিছু দিন আগে ডঃ সোমের পার্টিতে একটা আমেরিকান ছোকরাকে মিট্ করেছিলাম। ওর গার্ল্ ফ্রেন্ডকে নিয়ে এ-দেশে বেড়াতে এসেছিল। কাশীতে থাকার সময় গোটা আষ্টেক গুণ্ডা আই মিন দুর্ধর্ষ কাশীর গুণ্ডা মেয়েটাকে লোপাট করে দেবার জন্য ওদের অ্যাটাক করেছিল। কী করে ওরা রক্ষা পেল জান?

অসিত লিলিকে খানিকটা সাসপেন্সে রাখার জন্য ধীরেসুস্থে একটা সিগারেট ধরাল।
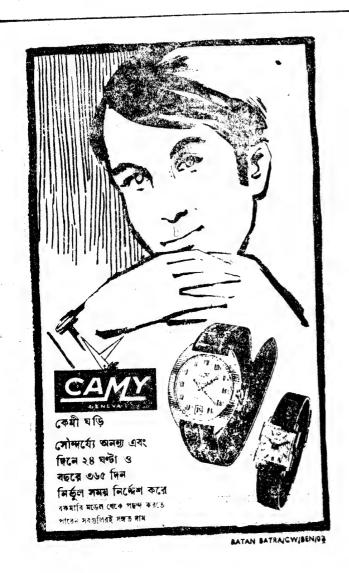
তারপর বলল, যেন নিজেরই কোনও কৃতিত্ব জাহির করছে, ছোকরাটা দারুণ,

কারাটি জানে। স্রেফ ভিড়িং করে লাফ দিয়ে সামনের গুন্ডাটার থুতনিতে মারল জোড়া লাথি, তার ঘাড়টা সঙ্গে সঙ্গে দুমড়ে ল্যাল ল্যাল করতে লাগল। পারমানেন্ট ড্যামেজ। আর একটা গুন্ডার ঘাড়ের নারভ সেন্টারে হাতটাকে দায়ের মত করে নিয়ে স্রেফ একটা চপ্‌ করল, সেও ফিনিশ। আর একটা গুন্ডার চোখের ভিতর বুড়ো আঙুলটা ঢুকিয়ে দিয়ে একটা চাপ দিতেই টিডলি তার চোখটা সকেট থেকে বেরিয়ে এল। তাকে এক চোখ কানা করেই ছেড়ে দিল। ডু ইউ নো, হোয়াই? ছোকরাটা বলল, ও চোখটাও সে ওইভাবেই উপড়ে নিতে পারত। নিল না, কারণ ও ইন্ডিয়ান মেন্টালিটি স্টাডি করে বুঝেছে যে, এ-দেশের লোক একেবারে পুরো অন্ধকে দয়া দেখায়, ভিক্ষে দেয়। কিন্তু এক চোখ কানা তাদের কাছে মূর্তিমান অমঙ্গল। সব থেকে আমাকে যা ইম্প্রেস করেছে লিলি, তা এই ছোকরার একটা নির্লিপ্ত এবং নিরুত্তেজ ভাব। এমন ম্যাটার অব্‌ ফ্যাক্ট ওয়েতে কথাগুলো বলছিল না, যে, শুনলেই রক্ত হিম হয়ে আসে। দিস্‌ ইজ্‌ কারাটি লিলি। এটা শিখতে পারলে আর মার নেই।

অসিত অত্যন্ত তৃপ্তি সহকারে সিগারেট খেতে লাগল।

লিলি বলল, বাচ্চাটা কার মত দেখতে হলে ভাল হয় অসিত?

অসিত সিগারেটে টান দিতে দিতে মুচকি মুচকি হাসল। লিলিকে আজ তার সম্পূর্ণ অচেনা লাগছে। এত-খানি মেয়েলিপনা করতে সে লিলিকে কখনোই দেখেনি। কিন্তু ব্যাপারটায় সে বেশ মজা পাচ্ছিল। আসলে লিলি মা হতে চাইছে। তারই স্বপ্ন সে বুনে চলেছে। অসিত হাসল।

বলল, বলব না। আগে তোমার ইচ্ছেটা শুনি?

লিলি বলল, সব দিক দিয়ে ভাল হয়, যদি আমার মত দেখতে হয়।

অসিত হা হা করে হেসে উঠল। ঠিক যা ভেবেছি তাই।

বলল, তোমার মত দেখতে হলেই যে সব দিক থেকে ভাল হয়, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার মত দেখতে হলেও খুব একটা আগ্‌লি হত না।

অসিত মাথাটা একটু উঁচু করে পায়ের দিকের লাইফ-সাইজ আয়নাটায় উঁকি মারল। তার চেহারাটা তার চোখে খুব খারাপ ঠেকল না। লিলির মুখখানাও দেখল সে। একটা স্বপ্ন-স্বপ্ন ভাব তাতে মাখানো। লিলির একটা পা চাদরের বাইরে বেরিয়ে এসেছে। অনাবৃত সেই পাটার উপর কিছুক্ষণ চেয়ে রইল অসিত। লাভলি! শী ইজ্‌ এ রিয়েল বিউটি। অসিত মনে মনে তারিফ করতে লাগল। লিলির পায়ে আলতোভাবে

হাতটা বুলিয়ে দিল অসিত। লিলির শরীরটা কেঁপে উঠল। অসিত আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। এক টানে লিলির পায়ের উপর থেকে চাদরটা সরিয়ে ফেলে তার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

লিলি বাধা দিতে লাগল।

—আর না, এখন আর না, অসিত, পরে, পরে।

অসিত কোনও বারণ শুনতে চাইল না।

চাপা ভাঙা-ভাঙা স্বরে মিনতি করল, প্লিজ, লিলি, একবারটি।

—না না অসিত, তোমার সঙ্গে আমার অনেক জরুরি কথা আছে। সিরিয়াস কথা। ছেলেমানুষি করো না।

লিলি বিরক্ত হল।

—লিলি, দোহাই।

—না না না অসিত। কথা শোনো। ওঠো।

লিলি দু হাত দিয়ে ক্রমাগত ঠেলছিল। অসিত চট করে ওর হাত দুটো ধরে ফেলল। বালিশের উপর জোর করে চেপে ধরল।

—না না না।

সে চেঁচিয়ে উঠল। কিন্তু শরীরের উপর থেকে ভারি দেহটা কিছুতেই সরাতে পারল না।

লিলি হঠাৎ হাটু দুটো গুটিয়ে এনে জোরে গুঁতো মারতেই সেটা অকস্মাৎ পড়াম করে ছিটকে পড়ল। লিলি ধড়মড় করে উঠে পাগলের মত দৌড় মারল। তারপর বন্ধ দেওয়ালে গুঁতো খেয়ে আরেক দিকে ছুটে দিল। সেদিকও বন্ধ। কোনও দিকেই পালাবার পথ নেই। দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে ভয়ে পরিশ্রমে কাতর হয়ে কুকুরের মত হাঁফাতে লাগল লিলি।

লিলির আচমকা হাটুর গুঁতোয় যে লোকটা ছিটকে পড়েছিল, এমনটা হবে সে আশা করেনি। সে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। বাকি দুজন ঠা ঠা করে হেসে উঠল।

ড্রাইভার ছোকরা হাসতে হাসতে বলল, ধুস্ শালা, একটা ঠিকরির লাথি খেয়েই আলুর দম। কোত্থেকে এই মদনাটাকে জোটালে গুরু!

—তুই শালা কত বড় সাওয়ান তা দেখা যাবে।

লোকটা এক লাফে মেঝে থেকে উঠে ড্রাইভার ছোকরার সামনে এগিয়ে এল। তারপর হিস্‌হিস্ করে বলে উঠল, সেই তখন থেকে শালা ডিং দিচ্ছ, গুরু আছে তাই সহ্য করছি। গুরু, ওকে সামলাও, নইলে শালার মাতব্বরি বার করে দেব।

ড্রাইভার ছোকরা হি হি করে হেসে উঠল, লাটাই গোটাও বাপ, ঢের হয়েছে। নিজে ম্যানেজ হয়েছ কি না, আগে সেটা দেখে নাও।

—মাইরি বলছি শালা, বেশি বাতেলা মারিসনি, কোন্ সময় হেভি ঝাড় খেয়ে যাবি।

—আবে ভেনটু, গুরুর মন্দ্রস্বর ভেসে উঠল, ধর্মকিবাজি রাখ। সারারাত ভ্যানতারা ভাজবি! যা পারটিকে ধর। বিছানায় পেড়ে ফেল। আমি আগে ওর চেকটা ভাঙি, তারপর তোরা শালারা প্রেমসে চালাবি।

লিলি চেয়ে দেখল, কোথাও পালাবার পথ নেই। একটা বিরাট সেকেলে আমলের ঘর। কত উঁচু সিলিং। একটা মাত্র বাল্বের আলোয় পুরো ঘরটায় ভাল আলো হয়নি। ঘরের একপাশে বিরাট একটা মেহগনির খাট পাতা। খাটের উপর মান্ধাতা আমলের গদি। চাদর, বেডকভার কিচ্ছু নেই। ওই গদির উপর ওরা ওকে আছড়ে ফেলেছিল। ওকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করেছিল। আবার আসছে। দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে সে দেখল আর পালাবার পথ নেই। হঠাৎ তার সর্বশরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল।

ওরা দুজনে গিয়ে লিলিকে চেপে ধরল।

চড়া গলা বললে, চল পারটি, আর দেরি কেন? গুরুর সঙ্গে তোমার ফুলশয্যা হবে। তারপর তো আমরা পেসাদ পাব।

লিলি থরথরিয়ে কাঁপতে কাঁপতে খুব ক্ষীণকণ্ঠে বলল, কত টাকা চাই তোমাদের বল। সব দেব। আমাকে ছেড়ে দাও।

ড্রাইভার ছোকরা তার নাকটা লিলির গালে ঠেকিয়ে উস্‌স্‌প করে সশব্দে ঘ্রাণ টানল।

—দারুণ সেনট মাইরি। দ্যাখ। চুলে গালে কাপড়ে কি সুন্দর সব গন্ধ মাইরি। আঃ!

—কত টাকা চাও। বল। সব দেব, সব দেব।

—টাকা নয় পারটি, তোমাকে চাই। হি হি।

লিলি দেখল, দেখতে দেখতে ওদের চেহারা কেমন বদলে গেল। ওদের চোখগুলো উত্তেজনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ওরাও কাঁপছে। চোখ মুখ দিয়ে ফুটে বের হচ্ছে নারীসঙ্গকামনার উদগ্র ইচ্ছা। ওদের কানে আর কোনও কথা ঢুকছে না। ঢুকবে না, লিলি জানে। ওরা ওকে হিঁচড়ে টেনে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে ওই বিরাট খাটে।

খাটের কিনারায় এসে লিলির প্রতিরোধ-ক্ষমতা আবার ফিরে এল। সে হঠাৎ জোর লড়াই শুরু করল। আঁচড়ে কামড়ে হাত পা ছুঁড়ে সে আবার নিজেকে মুক্ত করে নিল। সে ছুটে পালাতে যাবে, একজন ওর পায়ে মারল জোরসে লাথি। মুখ থুবড়ে মেঝেয় পড়ে গেল লিলি। অমনি ওরা লিলির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। একজন চুলের মুঠি ধরে ওর মাথাটা জোরে মেঝেয় ঠুকে দিল। লিলি চোখে অন্ধকার দেখল।

মন্দ্রস্বর বলল, পারটিকে খাটে তোল।

লিলির চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। শুধু অন্ধকার, চাপ চাপ অন্ধকারের তলায় সে ক্রমশ তলিয়ে যেতে লাগল। তবু সে হাল ছাড়ল না। তলিয়ে যাবার আগে সে শেষ লড়াই শুরু করল। সে নড়েচড়ে তড়পেটে ছটফটিয়ে ছটফট করে যত রকমে পারে বাধা দিতে লাগল।

মন্দ্রস্বরটা গর্জে উঠল, পারটির তেজ কম নয় তো। এই চানটুল, তুই হাত দুটো লম্বা করে টেনে ধরে থাক, খবরদার ছাড়বিনি।

ড্রাইভার ছোকরা লিলির হাত দুটো মাথার দিকে এক হ্যাঁচকায় লম্বা করে সেঁটে ধরে গর্জন করে উঠল, বেশি দেমাকি করেছ কি, এক টানে খাঁচা থেকে উপড়ে নেব।

মন্দ্রস্বরটা আবার হুকুম করল, তুই পা দুটো টেনে ধর।

—আই, চড়া-গলা চেঁচিয়ে উঠল।

লিলির বুকের উপর ঝপ করে ভারি শরীরটা আছড়ে পড়ল।

—ইতর, রেপিস্‌ট্। লিলি চেঁচিয়ে উঠল। অসিত অপরাধীর মত কাঁচুমাচুভাবে উঠে পড়ল।

বলল, ফরগেট ইট্ লিলি। প্লি-ই-জ। তুমি এতটা রেগে যাবে আমি বুঝতে পারিনি।

লিলি উত্তেজনায় ফেটে পড়ল, স্কাউনড্রেল। তোমার সঙ্গে ওদের তফাত কোথায়? কোথায়, কোথায়, কোথায়? ওরাও তো আমাকে—রাগের চোটে ফুঁসছে লিলি। অসিত একেবারে চুপসে গেল। ওর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠল।

—তোমাকে ওরা, ওরা রেপ করেছে লিলি!

লিলি জবাব দিল না। শাণিত চোখে অসিতের দিকে চেয়ে রইল শুধু।

॥ ছয় ॥

সেই ঘর, সেই বিছানা। এয়ার কনডিশান যন্ত্রটা সেই একইভাবে ঠাণ্ডা বিতরণ করে যাচ্ছে। শুধু ওরা দুজনই আর একভাবে নেই। এক রকম নেই। বিছানার উপর উঠে বসেছে দুজন। যে যার শরীর ঢেকে

ফেলেছে। অসিতের অবস্থা খুবে শোচনীয়।

লিলিকে রেপ্ করেছে ওরা। মনে মনে বারবার আউড়ে যাচ্ছে অসিত। লিলির দিকে আর একবারও চাইছে না। চাইতে পারছে না। লজ্জা, অনুশোচনা আর মাঝে মাঝে উথলে ওঠা প্রচন্ড ক্রোধে সে দগ্ধ হচ্ছে।

লিলি, তার লিলিকে ধর্ষণ করেছে তিনটে পশু, তিনটে স্কাউনড্রেল। উপায় থাকলে সে নিশ্চয় খুন করত তাদের। কোথায় অসিত তাদের খুন করে লিলির লাঞ্ছনার বদলা নেবে, তা নয় সে-ই লিলিকে—ছিঃ! ছি ছি। নিজেকে চাবকাতে চাইল অসিত।

—আমাকে মাপ করো লিলি। অসিত কাতরভাবে বলল। আমি জানতাম না। সত্যিই বুঝতে পারিনি ওরা তোমাকে—উঃ!

চুপ করে বসে আছে লিলি। অসিতের কাতরতা, তার যন্ত্রণা লিলিকে স্পর্শ করছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। অসিত ছটফট করছে। লিলির লাঞ্ছনার প্রতিশোধ তাকে নিতেই হবে। এনিহাউ। বাট হাউ? কেমন করে? অসিত সেইটাই বুঝতে পারছে না। লিলি তাকে কি ভাবছে? ভাবছে আমি একটা অপদার্থ, নপুংসক, ইমবেসাইল, এ মেয়ার নোবডি। আমি কি তা নই? আমার স্ত্রীকে গুন্ডারা ধরে নিয়ে গেল, আমি কোনও বাধা না দিয়েই তাদের যেতে দিলাম। তিনটে নৃশংস গুন্ডার সম্পূর্ণ মরজির উপর পাঁচ দিন লিলিকে ছেড়ে রাখলাম। ওকে উদ্ধার করবার কোনও চেষ্টা করলাম না। তারা অসহায় লিলিকে—ও গড্। আমি কী! আমি কী! স্বামী হিসাবে, ব্যক্তি হিসাবে আমার দাম কী? এক কানাকড়িও নয়।

কিন্তু তুমি কী-ই বা করতে পারতে অসিত? নিজেকে সে প্রশ্নও করল। আজকের সমাজে একা কে কী করতে পারে? সমস্যাটা সম্পূর্ণত ল অ্যানড অরডারের। নয় কি? ব্যর্থতা সরকারের। আমরা ভোট দিই, ওরা সরকার গড়ে। উই পে ট্যাকসেস, ওরা সরকার চালায়। সরকারের, পুলিসের এটা দেখা ডিউটি যে, আমরা, ইনডিভিজুয়ালরা যেন নিরাপদে থাকি। আমার বউ যেন লাঞ্ছিত না হয়, আমার সম্পত্তি যেন লুণ্ঠিত না হয়, আমার অধিকার যেন সবলের পদাঘাতে ক্ষুণ্ণ না হয়। এই হচ্ছে সভ্য সমাজের কানুন। দিস্ ইজ্ এ কাইনড অব এ কনট্রাকট। আজ এই কনট্রাকট বারবার পদদলিত হচ্ছে, অ্যানড দোজ রাস্কেল্স্ আর ডুয়িং নাথিং। খালি লেকচার ঝাড়ছে আর বিবৃতি দিচ্ছে। আর দেশময় অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ছে। এই অবস্থায় একজন লোক আলাদাভাবে কী করতে পারে? আমি একা কিছু কি করতে পারি? আমি কি এই ঘটনাটার জন্য নিজেকে দায়ী করতে পারি? কিন্তু লিলি যদি অভিযোগ করে, আমাকে গুন্ডারা ছিনিয়ে নিল, তুমি দেখেও পালালে, আমাকে ওরা রেপ করল, তুমি আমার মর্যাদা রক্ষা করতে ব্যর্থ হলে, অথচ তুমি যখন আমাকে বিয়ে কর, তুমি সর্বতোভাবে আমাকে রক্ষা করবে, এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে এবং তুমি তা ভঙ্গ করেছ, এ অভিযোগ করতে পারে লিলি, অভিযোগ সে করছে। অসিত অস্থির হয়ে উঠল।

আমাকে এর একটা ভাল জবাব দিতে হবে লিলিকে। অসিতের মাথার ভিতরে হাতুড়ির ঘা পড়তে লাগল। কিন্তু কী বলবে সে? সে কি এই কথা বলবে, সরকার তোমাকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে লিলি, পুলিস তার কর্তব্য করছে না, আধুনিক সমাজে ইনডিভিজুয়াল হিরোইজম্ অর্থহীন হয়ে পড়েছে লিলি, তাই গুন্ডারা তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, কিন্তু আমি তাদের হুকুম মেনে এয়ার কনডিশনড ঘরে বসে সেফলি আশ্রয় নিলাম, মনের অশেষ যন্ত্রণা উপশমের জন্য রাত জেগে বসে বসে হুইস্কির বোতল শেষ করলাম লিলি, আর গুন্ডারা তোমায় তখন ছিঁড়ে খাচ্ছিল। আর আমি দিনের বেলা রোজ যেমন অফিসে যাই, তেমনি গিয়ে অফিস করলাম, জানিনে তখন তোমার বরাতে আর কী-কী লাঞ্ছনা জুটেছিল। তুমি হিংস্র পশুদের দাঁতে নখে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিলে লিলি, আর আমি সন্তর্পণে সেফটি রেজর চালিয়ে স্মাগল্-করা আফটার-শেভ্ লোশন লাগিয়ে আমার মসৃণ গাল দুটো বীজাণুমুক্ত করে রাখছিলাম। এক যাত্রায় পৃথক ফল হল কেন? জিজ্ঞেস করছ লিলি? হোয়াই, ইট্ ইজ্ সো সিমপল। কারণ, নাগরিকদের রক্ষা করার যে কনট্রাকট সরকারের সঙ্গে হয়েছিল, সরকার তা খেলাপ করেছে। এ দায় আমার ছিল না লিলি। তুমি আমাকে কোনও মতেই দায়ী করতে পার না। তুমি আমার দিকে ওভাবে চেয়ো না, চেয়ো না লিলি, প্লি-ই-জ। বুঝতে চেষ্টা কর। প্লিজ, প্লি-ই-জ।

লিলি সেই তখন থেকে নীরবে চেয়ে

আছে তার দিকে। অসিতের মনে হল, সে এতক্ষণ যা ভাবছিল, তার আদ্যন্ত লিলি জেনে গিয়েছে। লিলির নীরব, স্থির কঠিন দৃষ্টির সামনে অসিত দেখল সে কেমন কুঁকড়ে যাচ্ছে। তার চেহারা বদলে যাচ্ছে। কোন্ সময় যে সে গায়ে ড্রেসিং গাউন চাপিয়েছিল তার মনে ছিল না। হঠাৎ, অতি দ্রুত সে একটা টিকটিকি হয়ে যেতেই ঝপ করে সেই বিরাট আর দারুণ ভারি গাউনটা তার ঘাড়ের উপর পড়ল। একটা দড়ির চাপে ওর ল্যাজটা খসে পড়ল। থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে সে খানিকটা পেচ্ছাব করে ফেলল। সে কাঁপছে, কাটা ল্যাজটাও কাঁপছে। সে ভাবল কাটা ল্যাজটা, ওখানেই পড়ে থাকবে। কিন্তু তাকে বেরুতে হবে। তারপর প্রাণভয়ে সেই ল্যাজকাটা বেঁড়ে টিকটিকিটা ড্রেসিং গাউনের বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করতে লাগল। অন্ধকার অন্ধকার সব গলি, ভাঁজে ভাঁজে ঢাকা। নিশানাবিহীন এক ভুলভুলৈয়ার অজস্র কানাগলির মধ্যে প্রবল আতঙ্কে দৌড়ে বেড়াচ্ছে সেই বেঁড়ে টিকটিকি। বেরুবার পথটা খুঁজে পাচ্ছে না। যত ছুটছে তত ভয় বাড়ছে, যত ভয় বাড়ছে তত নিকদ্রম হচ্ছে। তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। সে ছুটছে, ছুটছে, ছুটছে। আর টিকটিকিটার শ্রবণশক্তি ফাটিয়ে দেবার জন্য হাজার হাজার মাইক্রোফোনে তারস্বরে চারদিক থেকে আওয়াজ উঠছে, ডবল মারচ, ডবল মারচ।

—অসিত, অসিত।

বহু দূর থেকে কে যেন তাকে ডাকল। লিলি কি?

—অসিত, তুমি টলছ কেন? তুমি এত ঘামছ কেন?

কে তাকে এ কথা বলছে? চেয়ে দেখবার চেষ্টা করল অসিত। তার চারদিকে অন্ধকার ঘূরপাক খাচ্ছে।

তুমি বসে পড়ত অসিত। পড়ে যাবে। এস, শুয়ে পড়। তুমি বোধ হয় সিক্ হয়ে পড়েছ।

লিলি অসিতের হাত ধরে তাকে বিছানায় বসিয়ে দিল। অসিত হঠাৎ হিস্টিরিয়া রোগীর মত সর্বশক্তি দিয়ে লিলির ডানা দুটো চেপে ধরল। এত জোরে যে, লিলির মাংসের মধ্যে ওর আঙুল দুটো ঢুকে যেতে লাগল।

অসিত বলল, একটা সিংহই যেন ওর ভিতর থেকে গর্জে উঠল, আই ওয়ানট দেম।

লিলি বলল, ছাড়, হাতে লাগছে।

অসিত লিলিকে ঝাকুনি দিতে দিতে বলল, আমি ওদের চাই। তুমি জান ওদের হাইড-আউট কোথায়? বল লিলি, বল। আমি ওদের চাই।

লিলি শান্তভাবে বলল, ওরা এখানেই আসবে অসিত। তোমাকে তো বললাম, ওরা আজ খাবে এখানে, ভুলে গেলে। ওদের ডিনারে খেতে বলেছি। রিয়াজুদ্দীনের রান্নাও বোধ হয় হয়ে গেল।

—ওরা এখানে খাবে। তুমি ওদের নেমন্তন্ন করেছ! ইনক্রেডিবল্!

অসিতের গলা দিয়ে আওয়াজ বের হল না। আমি স্বপ্ন দেখছি না তো? ও ভাবল। না কি পাগল হয়ে গেলাম?

আস্তে সে বলল, এক গ্লাস জল দেবে?

অসিত এক চুমুকে গেলাসটা শেষ করে ফেলল। তার চোখমুখে স্পষ্টতই শ্রান্তির ভাব। হঠাৎ তার স্তিমিত চোখ দুটো ঝলসে উঠল।

প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে বলল, তুমি ওদের পয়জন করবে লিলি?

॥ সাত ॥

অসিত খানিকটা ধাতস্থ হয়ে বলল, তোমার প্ল্যান কি, আমি জানিনে লিলি। জানতেও চাইনে। তোমাকে শুধু এই কথাটা বলে রাখছি, তোমার অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য যে চরম পন্থাই তুমি গ্রহণ কর না কেন, তাতেই আমার সমর্থন পাবে। তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তুমি যায় ওদের বিষ খাইয়ে। কিন্তু দেখ, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, এর পরিণতি যাই হোক না কেন, আমি তা ফেস্ করব। আদালতে গিয়ে আমি কবুল করব, ইওর অনার আই অ্যাম দি মারডারার। আমার স্ত্রী নির্দোষ। বিষ আমি দিয়েছি। আমার স্ত্রীকে ওই তিনটে নরপশু যে লাঞ্ছনা করেছিল, আমি এইভাবে তার প্রতিশোধ নিয়েছি। এর পুরো দায়িত্ব আমার। এর জন্য যে শাস্তি দেবেন, মাথা পেতে নেব।

লিলির দিকে চেয়ে বলল, তোমার গায়ে আর আঁচটি লাগতে দেব না লিলি। তুমি আমার উপর নির্ভর করতে পার।

লিলি শান্তভাবে বলল, আমার ভাবনা তোমাকে আর ভাবতে হবে না অসিত, সেটা আমাকেই ভাবতে দাও।

অসিত : আমি জানতাম তুমি এই-রকমই কিছু একটা বলবে। আমি জানি, তুমি আর আমাকে মানুষ বলে জ্ঞান কর না। কিন্তু একটা চানস্ আমাকে দাও লিলি, দিয়ে দেখ, আমি প্রমাণ করে দেখাব, আমি টিকটিকি নই, আমি মানুষ। আমাকে এটা প্রমাণ করতেই হবে।

অসিত আর্তস্বরে বলে উঠল, না হলে আমি জীবনে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব না।

—পাগলামি ক'রো না অসিত। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখ, ছটা বাজে। ওরা আর ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই এসে পড়বে।

লিলির স্বর অত্যন্ত জরুরী শোনাল।

—তার আগে তোমাকে ব্যাপারটা সব জানিয়ে দিতে চাই। আমি কী করে এসেছি, ওরা কেন আসছে, সব তোমার জনা দরকার। চুপ করে বসো। মন দিয়ে শোনো। আমাকে বাধা দিও না।

অসিত বিছানার উপরই বসে পড়ল। সে অত্যন্ত নারভাস বোধ করতে লাগল। একটু ড্রিংক করতে পারলে ভাল হত।

—মে আই হ্যাভ্ এ হুইস্কি?

লিলি : ওসব খাবার সময় পরে ঢের

পাবে। এখন সংযত হয়ে থাক। এখন শুধু শুনে যাও।

লিলি ধীর স্বরে বলতে লাগল, আমিও ওদের প্রথমে পেশাদার গুণ্ডা বলেই ভুল করেছিলাম। বুঝতে পারিনি ওরা একেবারে আনাড়ী। ওরা যে অত আস্ফালন করছিল, অদ্ভুত ধরনের ভাষায় কথাবার্তা কইছিল, কথায় কথায় আমাকে টিটকার করছিল, সেটা যে ওদের আনাড়ীপনা ঢাকা দেবারই ছল, আমি তা ধরতে পারিনি। তাই প্রতি মুহূর্তেই মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করেছি। কিন্তু ওরা ধরা পড়ে গেল, অসিত, আমাকে রেপ করতে গিয়ে। একজনের পর একজন এল, আমাকে দলে পিষে ফেলল—

—আর না, আর না লিলি, প্লিজ, প্লিজ।

অসিত লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ওর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। থরথর করে কাঁপছে অসিত।

—উঃ গড্! গড্!

লিলি শান্তভাবে [illegible] কাঁদো না অসিত। চুপ করে বসো।

—তাই বলছি, [illegible] লিলি। এ অসহ্য। আমাকে একটু [illegible] লিলি। [illegible] একটু [illegible] করে দেবে।

লিলি এবার [illegible] হল।

—এটা [illegible] হয়েছে। [illegible]

অসিত [illegible] কী [illegible] কথা [illegible] ঈশ্বর! [illegible] লিলি আমি আর সহ্য করতে পারছিনে। [illegible] কী ঘটছে, আমি তোমাকে [illegible] পারছি নে।

লিলি : [illegible]। দেখছ, আমি হয়েছি, তুমি নও। বেশী ন্যাকামো কোরো না। চুপ করে শুনে যাও।

অসিতের মুখে চোখে এমন একটা অসহায় যন্ত্রণা ফুটে উঠল যে, লিলিও থেমে গেল। অসিতের দিকে স্থিরভাবে চেয়ে লিলি বলল, কিছু মনে কোরো না অসিত, তোমাকে অপমান করার বা আঘাত দেবার কোনও উদ্দেশ্য আমার নেই। যে সত্য ঠিক, সে সত্য নিতান্ত অসহায় ভাবে মুখোমুখি আমাকে হতে হয়েছে। সেই সত্যের আলোতে আমার বিভ্রান্তি কেটে গিয়েছে, আসল নকল চেনা হয়ে গেছে। আমার মৃত্যুভয়, যন্ত্রণা পাবার ভয়, লাজলজ্জা সব দূরে হয়েছে। এই কথাগুলোও কেতাবী-কেতাবী ঠেকছে আমার কানে। কিন্তু মনের ভাব আর কীভাবে যে ব্যক্ত করা যায়, আমার তা জানা নেই। তোমার কাছে আমার অনুরোধ, তুমি শান্ত হও। আমাকে শেষ করতে দাও।

অসিত মুখ না তুলে খুব ক্লান্ত স্বরে বলল, আমি খুব দুর্বল লিলি। আমি জানি। আমি স্বীকার করছি। তাই এত ছটফট করি। তোমাকে দেখে আমার অবাক লাগছে। পাঁচ দিন আগেও তুমি আমার মতই ছিলে। তোমার মধ্যে কোনও অসাধারণ কিছু দেখিনি। আমারই মত পার্টিতে যেতে, ক্লাবে যেতে। বিলাতী কসমেটিক সংগ্রহে তোমার জুড়ি কেউ ছিল না। কোনওদিন গভীর কিছু আলোচনায় যোগ দিতে তোমার আগ্রহ দেখিনি।

লিলি : তোমার অভিজ্ঞতা সহজে শেষ হবে না অসিত। এক কথায় উঁচু মাইনের একজিকিউটিভের বউরা সচরাচর যা হয়ে থাকে, আমিও তার বেশী কিছু ছিলাম না। কোনও গভীর কথা, তত্ত্বকথা আমার মগজে কিছু ঢুকত না। তুমি তোমার কিছু বন্ধুদের সঙ্গে নানারকম ইনটেলেকচুয়াল আলোচনা করতে, প্রবল তর্কে মাততে। তোমরা তারস্বরে জানাতে তোমরা এলিয়েনেশনের যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছ। এসটাবলিশমেনটের জগদ্দল পাথর তোমাদের বুকের উপর এমন চেপে বসেছে যে, তোমরা নিশ্বাস নিতে পারছ না। এইরকম কত গভীর কথা বলতে। আমি

ওসবের মানেই বুঝতাম না, যদিও আমি তোমার সঙ্গেই ইউনিভার্সিটির শেষ ঘাট পায় হয়েছিলাম।

অসিত : আমি দেখতাম, হয় তুমি ঘোরতর ফিল্ করছ, মাঝে মাঝে হুইস্কিতে চুমুক দিচ্ছ, কিংবা সিগারেট ফুঁকছ, যদিও তুমি হুইস্কি বা সিগারেট কোনটাই পছন্দ কর না।

লিলি : তোমার ওই দাড়িওয়ালা ভাস্কর বন্ধু আমাকে সিগারেটের ভিতর পুরে ম্যারিউয়ানাও খাইয়ে ছেড়েছে। একদিন স্রেফ গাঁজাও খাইয়েছিল।

অসিত : হ্যাঁ। তুমি ওর কথা শুনতে। ও ইদানীং তোমার সঙ্গে বেশ ফষ্টিনষ্টিও শুরু করেছিল। তুমি ওকে বেশ প্রশ্রয়ও দিতে।

লিলি : হ্যাঁ। ওর মধ্যে একটা বন্য আকর্ষণ ছিল। তোমার সম্পর্কে ওর বিন্দুমাত্রও শ্রদ্ধা ছিল না।

অসিত : বল কী?

লিলি : ও আমাকে বোঝাত তুমি শখের বিপ্লবী। আসলে তুমি একটা গ্যারুলাস্ মিডলক্লাস। এসটাবলিশমেন্টের চেন-বাঁধা কুকুর।

অসিত থ মেরে গেল।

—আমাকে তো কখনও বুঝতে দেয় নি যে, ও আমাকে এই চোখে দেখে।

লিলি : আমাকে প্রায়ই বলত, তুমি একটা ইমপোটেনট।

অসিত বিছানায় ঘুঁষি মেরে বলল, ড্যাম লায়ার।

লিলি : ও আমাকে একবার বলেছিল, তোমরা একসঙ্গে একবার বেশ্যাবাড়ি গিয়েছিলে এবং সম্পূর্ণ খরচ যদিও তুমিই দিয়েছিলে, দলের মধ্যে তুমিই একমাত্র মিজারেবলি ফেল করেছিলে।

অসিত চেঁচিয়ে উঠল : আই শ্যাল শুট হিম। রাসক্যাল। বদমাস। বিশ্বাস-ঘাতক।

লিলি : ও প্রায়ই আমাকে বোঝাত, যারা ক্রিয়েটিভ, মানে কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, সুরকার, চিত্রকর, ভাস্কর, তাদের পোটেন্সি ব্রহ্মার মত। এবং এদের সকলের সেরা হল ভাস্কর। এবং আমাকে প্রায়ই ওর স্টুডিয়োয় যেতে বলত ওর মডেল হতে। আমার ন্যুড্-স্টাডি করতে না পারলে ওর জীবন নাকি বৃথা হয়ে যাবে। ও বলত। লোভ দেখাত। ও আমাকে অনেক ফরাসী সেন্ট খুব দিয়েছে।

অসিত : হাউ ডেয়ার হি—

লিলি : কিন্তু আমি যাইনি। কারণ ওর দাড়ি আমার ভাল লাগত না।

একটু থেমে লিলি বলল, এই হচ্ছি আমরা অসিত। এই হচ্ছে আমাদের মধ্যবিত্ত চরিত্র। এইভাবেই আমরা আত্মীয়স্বজন বন্ধু পাড়া-প্রতিবেশী, সকলের চোখেই ধুলো দি। কাউকেই বুঝতে দিই না, আমরা কী। এই কপট ভূমিকায় অষ্ট প্রহর অভিনয় করতে করতে শেষ পর্যন্ত নিজেই বুঝতে পারিনে, আমার কোন আমিটা আসল আর কোনটাই বা নকল। তাই আমরা কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারিনে। যে সময়ে যেটা করার তা করতে পারিনে। আর তাই, আমাদের এই দুর্বলতা চাপা দেবার জন্য আমরা শুধু বড় বড় কথা ফেরি করে বেড়াই। সেকেন্ড্ হ্যান্ড্ সব কথা। আমাদের সব কিছুই সেকেন্ড্ হ্যান্ড্ অসিত। শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, বোধ, সব সব। আমাদের পুঁজি এই। তাই আমরা সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে ভয় পাই। জীবনের মুখোমুখি হতে ভয় পাই। ভয় ভয়, সর্বদাই কী হারাই কী হারাই ভয়। অথচ কী যে আমার আছে, কী খোয়া যাবে, কী খোয়া গেলে জীবনটা ফাঁকা হয়ে উঠবে, তাও জানিনে।

লিলি অসিতের মুখের উপর চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ। এখন সে একেবারে শান্ত হয়ে বসে আছে। আহত অভিমানে থমথম করছে মুখ।

লিলি ম্লান হাসল।

বলল, ওরা যখন খাটের উপর আমাকে নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করছিল তখনও বুঝিনি, আমি কোন জিনিসটা বাঁচাতে

একা তিনজনের বিরুদ্ধে গোঁয়ারের মত একটা অসম্ভব লড়াই করে যাচ্ছিলাম। তার চোখ দুটো আমি ভুলতে পারব না অসিত। এমন রাগ, এমন ক্ষুধা আমি আগে আর কারও চোখে দেখিনি। সমস্ত শরীরের চাপ দিয়ে আমাকে গদিটার উপর চেপে ধরে রাখতে চাইছিল। গদির স্প্রিং ফুটে আমার পিঠে জ্বালা করছিল। তবু আমাকে বশীভূত করতে ওই তিনটে মস্তান হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিল। প্রতি মুহূর্তে ভাবছিলাম, আর একটু ঠেকাই, আর একটু ঠেকিয়ে রাখি, আমার চরম লাঞ্ছনার আগে অসিত আসবে, নিশ্চয়ই পুলিস নিয়ে হাজির হবে অসিত আর আমি চরমতম অপমানের হাত থেকে অন্তিম মুহূর্তে বেঁচে যাব। কিন্তু তুমি এলে না, অসিত।

—তোমার সিকিউরিটির কথা ভেবেই, বিশ্বাস কর লিলি আমি চুপ করে ছিলাম।

অসিত ডুবে যাবার আগে দু হাত উপরে তুলে যেন অন্তিম আবেদন জানাচ্ছে।

—তুমি ভাবছ লিলি, আমি শুধু আমার প্রাণের মায়াটাকেই বড় করে দেখেছি, হয়ত হতচকিত হয়ে সেই হঠাৎ আক্রমণের মুহূর্তে আমি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম, অস্বীকার করছি না, তোমাকে ওদের কবলে তুলে দিয়ে যেভাবে চলে এসেছিলাম সেটা আদৌ গৌরবজনক নয়। কিন্তু তারপর—

লিলি ক্লান্তভাবে বলল, পুরনো কথা থাক।

—না না লিলি, আমাকে বলতে দাও প্লি-ই-জ্।

অসিত বলতে লাগল, তারপর আর আমি আমার কথা ভাবিনি। সারাক্ষণ ভেবেছি, তুমি ওদের হাতে, এই সময় আমার সামান্যতম র‍্যাশ্ অ্যাক্শনও তোমার সর্বনাশের কারণ হয়ে উঠতে পারে।

লিলির ঠোঁটে নিঃশব্দে দারুণ একটা কঠিন হাসি ফুটে উঠল।

শান্তভাবেই সে বলল, আমার সর্বনাশ! লিলির বুকে দুম করে একটা কিল মারল লোকটা। রাগে সে তখন একেবারে অন্ধ, প্রচণ্ড হিংস্র হয়ে উঠেছে। ওই কিল লিলি বোধ করল, তার ফুসফুস থেকে সবটুকু হাওয়া হঠাৎ বেরিয়ে গেল। সে খাবি খেতে লাগল।

লোকটা হাঁফাচ্ছে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, শালা, সেই তখন থেকে ভাবছি মেয়েছেলের গায়ে হাত তুলব না, তা পার্টির নকশাবাজির দেখি আর শেষ নেই!

চড়া গলা হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, সেই তখন থেকে বলছি গুরু, এ শালা খুব টেটিয়া পার্টি, হুকুম দাও, দিই শালীকে পিলিয়ে খতম করে। তা তোমার শালা খালি তাবিল তচ্ছরুপের মতলব।

গুরু হাঁকাড় দিল, ফের আওয়াজ দিয়েছিস্ কি, এক লাথিতে শালার থোবোড় বিলা করে দেব। চুপ করে থাক। খচরামি আমিই বার করছি।

গুরু লিলির তলপেটে মারল এক ঘুঁষি। দমকা এক যন্ত্রণার প্রচণ্ড ঝাপটে ককিয়ে উঠল লিলি। সর্বাঙ্গ টনটন করে উঠল। তারপর শুরু হল থর থর থর থর কাঁপুনি। ওকে কে যেন পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকারে বারবার ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। নাগরদোলায় বেঁধে ক্রমাগত দ্রুত পাক খাওয়াতে লাগল। একটা বমির বেগ ঠেলে ঠেলে উঠতে লাগল। শ্বাস ফেলতে খুব কষ্ট হচ্ছিল তার। মাঝে মাঝে সে টের পাচ্ছিল তার আঘাতের উৎসমুখ থেকে অসহ্য যন্ত্রণা ফোয়ারার মত ছিটিয়ে পড়ছে সারা শরীরে, তার স্নায়ুগুলিকে কারা যেন ধারাল দাঁতে কেটে চলেছে। তার প্রতিরোধের সমস্ত ক্ষমতা কে যেন শুষে বের করে নিয়ে গেল। সে অসহায় নিস্তেজভাবে আত্মসমর্পণ করল। অসিত আসবে, আসবেই। একটা দারুণ বিশ্বাস বারবার লিলিকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। কখন? কখন?

একজন নামল, অসিত এল না আরেকজন উঠল, অসিত এল না, সে নামল, অসিত এল না এবং তারপর আরেকজন। লিলি সেই আচ্ছন্নতার মধ্যেও ওদের শরীরের ওজনের তারতম্য বুঝতে পারছিল। কেউ একটু ভারি, কেউ কিছু হালকা সে বেশ টের পাচ্ছিল। আর, আর, এ কী! শেষ শরীরটা ওর উপর থেকে সেই একইভাবে নেমে পড়তে লিলি বিস্ময়ের প্রচণ্ড ধাক্কায় দেহের যন্ত্রণার কথাও প্রায় ভুলে গেল। এ কাদের পাল্লায় পড়েছে সে! এরা যে কিছুই জানে না! কেউ না! তিনজনই আনাড়ী! সমান আনাড়ী!

এই অবিশ্বাস্য আবিষ্কার যে মুহূর্তে করল লিলি, সেই মুহূর্ত থেকে তার ভয় ডর কোথায় ভেসে গেল। শ্রান্তিতে ক্লান্তিতে ডুবে সে মুহূর্তের মধ্যে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল।

আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

নাইসিল পাউডারে
আছে ক্লোরফেনোসিন—এই
অসাধারণ উপাদানটি ঘামাচি
রোধ করে ও ঘামাচির হাত থেকে
রক্ষা করে। নাইসিলের এন্টিসেপটিক
উপাদান আপনার ত্বককে সংক্রামণ
থেকে রক্ষা করে…তাড়াতাড়ি আরাম
এনে দেয়। (নিয়মিত ব্যবহারে
সত্যিসত্যিই ঘামাচির হাত থেকে
রেহাই পেতে সাহায্য করে।)
সারাদিন আরামে
তাজা থাকবার জন্য
আরামপ্রদ, মৃদু সুগন্ধযুক্ত
শরীরের গন্ধনাশক
নাইসিল পাউডার
ব্যবহার করুন।
রোধের জন্যে, রক্ষা পাবার জন্যে

গাড়োয়ান

'খেতে গাড়ি নিয়ে যাবার সময় সাঁজের বেলা দেখে গেনু মুই একটা গলায়-দড়ি-দেওয়া ষোল বচ্ছুরী ছুঁড়িকে পুঁততেছে ওই ট্যাংরাখালির মড়া-পোতাটায়। সিঁথিতে সিঁদুর, সবে এই ফাগুন মাসে বে' হয়েছে, হঠাৎ কি এমন হল যে গলায় দড়ি দিলে জিজ্ঞেস করতে শালারা কোনো বাত না করে হুম হুম করে কোদাল মেরে মেরে গত্তই খুলতে লাগল! পথে একটা আধবুড়ী মেয়েমানুষ বললে, জোর করে বিয়ে দিছিল গো, গোপন-আসনাই ছিল, স্বামীর ঘরে যাবে না, স্বামীকে কামড়ে-আঁচড়ে দিল...তারপর মার-ধর...নিজে কি আর গলায় দড়ি দিয়েছে অজায়গায় কুজায়গায় লেগে গেছে, তারপর তেঁতুল গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিয়েছিল...আবার শুনি পেটে নাকি বাচ্চা ছিল, দু' মাস বিয়ে হয়েছে, পাঁচ মাসের পোয়াতি...আর মেয়েরই বা দোষ কী! অত বড় ডাগর করে ফেলে রেখে দেবে বাপেরা, মেয়েদের চোখ-কান ফুটলেই ভয়, যেমন করে হোক পার করে দিতে হয়, মেয়ে হল বাপের মাথার বাজ...যখন হোক একবার পড়বেই'...

বাঁশের গাড়ি বোঝাই করতে করতে সাদা পাকা গোঁফজোড়ার ডগা দাঁত দিয়ে চিবুতে লাগল করিম গাড়োয়ান। চৈত্রের আকাশে মেঘ, পড়ন্ত বিকেল, ঝড়ো হাওয়া বইছিল। পাকা হলদে ঝরা বাঁশ-পাতাগুলো ছুরির ফলার মতো পাক খেতে খেতে উর্ধ্বে উঠে ছুটে চলছিল বাতাসে। কথা বলা বন্ধ করে করিম আসমানের দিকে একবার তাকালে। 'নাকদড়ি ধরে টান দিতে দিতে বললে, 'তা খানিকটা গাড়ি নিয়ে আসার পর দেখি মন্মথ রায় গামছায় চোখ পুঁছতে পুঁছতে আসতেছে। জিগেস করনু, এই মন্মথ, কি হয়েছে? সে বললে, করিমদা, মেয়েটা আমার 'অপঘাত' মরনে মরল! বলনু, তুই একটা শালার বেটা শালা! দোব শালা তোকে এক লাথি! কুত্তার বাচ্চা! মেয়েটার দোষ?...সে বললে, না মেরেও তো উপায় ছিল না করিমদা... কেলেঙ্কারী হত...জামাই যেন সেই কেলেঙ্কারীই রটাতে চেয়েছিল...যাক মেয়েটা মরে বেঁচে গেল! পুলিসকে আধ-ধমা পোঁতা কাঁচা টাকা দিতে হল। পাপ এসেছিল সংসারে। ভুল হয়েছে। ও পাড়ার গোঁসাই পদ্দনের ছেলে শংকরের সঙ্গে ওর বিয়েটা দিলেই হত। শংকরের বাবার সঙ্গে আমার যে চার নম্বর মামলা চলছিল আলিপুরে ফৌজদারী, দেওয়ানি কোর্ট!...'

করিম বললে, 'বজবজের তেলের 'ডিবু'তে খড় নিয়ে চলে গেনু, মনটা যেন খারাপ হয়ে গেল, গরু দুটোকে খুব করে চামড়ার চাবুক কষিয়ে মনের রাগ মেটালুম! বাঁশ কিনতে খড় কিনতে পাড়ায় আসতুম, মেয়েটা কাকা বলত, সে মরা গেল।

মেয়েটা আমার অপঘাত মরনে মরল

তাকে পুঁতে ফেলতেছে! মানুষের 'জান'টা বেরিয়ে গেল তো আর এই 'শরীল'র কোনো মূল্য নেই! 'শরীল'টা নিয়েই কেলেঙ্কারী হল, জানটার কথা কেউ ভাবলে না, অথচ জানটাকেই বার করে দিতে হল।...সে যাক, সদর-শহরে এসে সব ভুলে গেনু। মাল খালাস করে ফিরতে রাত হল। রাত তখন একটা। পথে জনো-মানিষ্যি নেই। এমনি 'চোত' মাস। ঝড়ো হাওয়া ছুটে যাচ্ছিল গাছ-পালা বাঁশঝাড়ে আড়মোড়া ভেঙে। ফিট 'জোচ্ছনা' রাত। বাওয়ালীর তেঁতুলতলায় এসে মনে পড়ে গেল, তাইত, মেয়েটাকে শালারা মেরে ফেলে পুঁতে রেখে গেছে তো! ট্যাংরাখালির মড়াপোতা! গা যেন শিউরে উঠল। এবার কাঁচা রাস্তায় নাবতে হবে। গাই দুধের মতন সাদা 'জোছনা'-ধোয়া পথ। মাঝে মাঝে পাক মেরে মেরে ধুলো উড়তেছে। রাতের বেলা মোরা গাড়ি চালাই—কত 'দিশ্য' দেখি! তা ট্যাংরাখালির মড়াপোতার গপ্প শুনলে দিনের বেলাতেই তখন ভয় হত—কলসীতে কলসীতে নাকি গড়াতে গড়াতে এসে ঠোকাঠুকি লাগত, মড়ার মাথা থেকে খনা খনা কথা শোনা যেত—শিস দিয়ে বাঁশি বাজত! ডজন ডজন শিয়াল দৌড়দৌড়ি করত! গরুর গাড়ির চাকার 'হাঁড়ি'র সঙ্গে ভেতরের লোহার 'ধুরো'র খটাখট শব্দ। মড়াপোতাটার কাছে এসে দেখি, ভয়ংকর ব্যাপার! মেয়েটাকে শিয়ালে তুলে এনেছে পথের মাঁধাখানে! আড়াআড়ি ভাবে শুয়ে আছে মেয়েটা চিৎ হয়ে। পরনের শাড়ি লম্বা হয়ে পড়ে আছে একটু দূরে! চারদিকে শিয়ালগুলো যেন বামাচার সাধনায় বসে আছে জ্যান্তমড়া নিয়ে কাপালিক বাবাজীদের মতন! তাড়া দিলেও সরে না। বারোটা শিয়াল। মেয়েটাকে যেন ঘেরাও করেছে। তখনো 'বিসমিল্লা' পড়ে নি। সবে টেনে তুলে এনেছে। শালারা সরতেছে না দেখে বাঁশের 'ঠেকনা'টা খুলে নিনু। গরু দুটো থির হয়ে দাঁড়িয়ে 'দিশ্য' দেখতেছে। জাবর কাটা পর্যন্ত বন্ধ। 'ঠেকনো' হাতে নিয়ে আমাকে চাকার হাঁড়িতে পা দিয়ে নাবতে দেখে শিয়ালগুলো 'আনচান' করতে লাগল। তাড়া দিনু, ভাগ শালারা! তারা খ্যাক খ্যাক করে হঠাৎ তেড়ে আসতেই একটার মাথায় সেঁটে কষালুম এক ঘা। তারপর নেবে পড়ে বাঁশ নিয়ে তাড়া করতেই সব পালাল! তখন গাড়ির তলা থেকে 'ল্যানটেন' (লণ্ঠন) বাতিটা হাতে নিয়ে এসে মেয়েটার মুখ দেখনু! চোখে পানি এল আমার! কি সোন্দর ভাসা ভাসা বড় বড় চোখ ছিল মেয়েটার! উল্টে আছে এখন! বুক খোলা। তলপেটটা সত্যিই বেশ ভারী মতন। মা হয়েছিল বেটি! পয়লা 'যৈবনের' এই রকম ভরাট চেহারা 'বিছেনার' মধ্যে কত শতবারই তো দেখেছি ইউনুসের মায়ের। নতুন আর কিছু নয়। কাকা বলত, তার 'শরীল'টার ওপর দিয়ে গাড়ির চাকা তুলে দিয়ে চলে যেতে মনে বাধল। মেয়েটার হাত পা ধরে টেনে তুলে এনে গত্তটার ভেতরে ফেলে দিতে চাইনু। বেঁকে যেন কাঠ হয়ে গেছে। পিঠে পাছার কয়েক খাবলা মাংস খেয়ে নিয়েছে শিয়ালে। চুল ধরে টেনে এনে গত্তটার মধ্যে ফেলে দিনু। দিলে কি হবে, শালা শিয়ালরা তো এক্ষুনি তুলে খেয়ে লেবে। গাড়িতে কোদাল কাটারি ছিল। কয়েক চাপ মাটি কেটে চাপা দিয়ে পথের ধারের সেঁকুল খোঁচ কাটা কেটে

দিয়ে তার ওপর আবার মাটি চাপা দিয়ে দিন্। তারপর আল্লার নাম করে গাড়ির ধোয়াঁয় উঠে জোরে গরু-গাড়ি ছুটিয়ে চলে এন্। ঝুম ঝুন করে ঘুঙ্গুর বাজতে লাগল গরু দুটোর গলায়। কি জানি কেন মনে হতে লাগল মেয়েটা যেন 'কাকা কাকা' বলে ছুটতে ছুটতে আসতেছে আমার পেছনে।...'কাকা আমাকে এখানে ফেলে যেও না!'...'শিয়ালে খেয়ে লেবে!'...'বাবা আমাকে মুগুরের বাড়ি মেরে মেরে ফেলেছে বলে তুমিও কি কাটাপালা চাপা দিয়ে পুঁতে রেখে যাবে?'...ঘরে এসে গা ধুয়ে খেয়ে শোব কি, ইউনুসের মাকে বলন্, এক ঘটি পানি দে—সেই পানি এক চোঁচায় খেয়ে নিয়েই অজ্ঞান হয়ে গেন্!...ভূতে আমি বিশ্বাস করি না। ভয়ও আমার কম। আমি রাতচরা। তবু কেন যে অজ্ঞান হয়ে গেছিন্ আজো ভেবে পাইনি। বোধ হয় ঝোঁকে পড়ে কিছু করতে নেই। সেই 'ভূতে বিশ্বাস করি না' বলে একটা শিক্ষিত ছোকরা নাকি 'তক্ক' করে গেল মড়া-পোড়ার একটা খোঁটা পুঁতে রেখে আসতে—গেল আর খোঁটাও পুঁতলে সে। কিন্তু আসবার বেলায় কাপড়ে টান পড়ল। তারপর

হাটকেল। আসলে সে ভয় পেয়েছিল আর উত্তেজনায় বাঁশি হারিয়ে ফেলেছিল। সে যে তার নিজের কাপড়েই খোটা পুঁতে বসেছিল তা দেখে নি।'

করিম গাড়োয়ান কাঁটাল কলার ছড়ার মতো হলদে দাঁতের পাটি বার করে হাসতে লাগল। চুলভরা একটা কানের ওপর থেকে আধপোড়া বিড়িটা নিয়ে ধরালে। ষাট বছর বয়স তার কিন্তু চেহারা যেন মাসল-ভরা। চোখ দুটো লাল। যেন খুনীর মুখ। বললে, 'ঐ তো সেবার তের মনে নেই, মিন্দেরানী ভেদবমি হয়ে মরে গেল কোরোঙ্গাদের। বেশ্যাগিরি করত বলে কেউ তাকে 'গতি' করতে গেল না। মুই গরুর গাড়িতে করে তুলে ঐ ডোঙাডের 'শ্মশানে'র ঝোপ জঙ্গলে ফেলে দিয়ে 'পদ-কাটি' মেরে উলু-বন ঝোপ-জঙ্গলটা শুদ্ধ বেটিকে পুড়িয়ে দিয়ে এনু।... লোকেরা বলে কলেরা রুগী, তার ওপর বেউলো মাগী, 'পরাচিত্তি' না করলে ছোঁবে কে? ধম্ম যাবে, জাত যাবে। দুস্ শালা—তোদের জাত-ধম্মের মায়ের নিকুচি করেছে! আমি 'মুসুল-ম্যান'—আমি গাড়ান—আমার ধম্ম হল এই: গরিব অসহায় অনাথ অভাগাকে দেখ! সে যে জাতই হোক, শালা, জাত আগে না মানুষ আগে? 'মানিষ্যি'র জন্যেই তো তোদের ঐ কোরআন-পুরান আল্লা-ভগবান সব হয়েছে। মানুষ না থাকলে ওসবের মূল্য নেই। শিয়ালে কি রামায়ণ পড়বে?'...

করিম লোকটি ছিল ভয়ংকর। খুনে ডাকাতের মতো। তার চেহারা দেখলে ভয় করত। তাকে গোয়াল ঘরের মধ্যে 'ঝাঁপা' বোঝাই তাড়ি বিক্রি করতে দেখেছি বটে, কখনো খেতে দেখিনি। তাড়ি খাবার গল্প করলে সে বলত, 'আগে জোয়ান বেলায় হরদম খেতুম। একবার 'আখানে'র (পৌষ-সংক্রান্তির) দিনে এক ঝাঁপা তাড়ি খেয়ে খুব নেশা করে আছাড় কাছাড় খেয়ে একটা মেয়ের শুকুতে দেওয়া ধানে গড়া-গড়ি খেতে সে খুব ঝাঁটা-পেটা করেছিল আমাকে, মাইরি! সেই থেকে 'তওবা' করে দিইছি তাড়িটা।'...

করিমের ছিল চুরি করে মাছ ধরার খুব ঝোঁক। হুইল নিয়ে রাত নামলে নাকি যেত সে নীলের পুকুরের ধারে। বহুকাল আগে ঘোষের বাগানে নীলকর সাহেবরা ছিল। তাই নীলের পুকুর নাম। ঘোষের বাগানের ওই পুকুর পাড়ের পশ্চিমে বিরাট কবরস্থান। ভীষণ সাপের ভয় ছিল! কাল কেউটে, বেনাফুলী কেউটে, চন্দ্রবোড়া এমনি বেয়ে বেড়াত দিনের বেলাতেই। তা করিম একটা ছোট এক সেলের টর্চ হাতে নিয়ে যেত গহিন রাতে ঐ নীলের পুকুরে হুইল ফেলতে একাই। ফাতনার মাথায় একটা জোনাকী পোকা

এক বালতি জল এনে দিলে ইব্রাহিমের মাথায় ঢেলে

গেঁথে দিত। সেটা দেখতে না পেলেই মারত এক টান। তারপর কতরকম শব্দ হুইল ঘরতে লাগত। গেঁথেছে শালা! শাপলা গাছে জড়িয়েছে? টেনে কেটে নেবে—মোটা মজবুত সুতো ডোর। করিম বলে, 'একটা রুই মাছ ধরে শালার 'গালাসি'তে হাত গলিয়ে পিঠের দিকে চাগিয়ে আনতিছি ঘরে—ল্যাজটা বাকিন ঠোকেঠোকে ভুঁয়েতে।' করিম ছিল খাটো পাঁচফুটে লোক। গাট্টাগোট্টা। মাছটা নাকি আধ মণের কম ছিল না, সে বলেছিল।

করিম মারা যাবার পর তার গাড়ি-গরু চালাত তার ভাইপো ইব্রাহিম। করিমের ছোট ছেলে ইয়াকুব গাড়ির 'পেছপাই' দিয়ে চাকা মারত—সংগে যেত। অবস্থা খারাপ হয়ে যেতে গাড়ি-গরু বেচে দিলে। তিরিশ বিঘে সম্পত্তি, যেন তার 'তমছ নমছ' হয়ে গেল।

এখনো বেশ মনে পড়ে ইব্রাহিম তাড়ি খেয়ে একবার উন্মাদের মতো কি কাণ্ড করেছিল। সে তার বউকে ধরে পীড়াপীড়ি, 'বল শালী, 'খালু' (মেসো) বল্!'... বউ তার দাড়ি ধরে ঠেলে দেয় আর বলে: 'মিনসে যেন এক ঢং! ওয়াক থু'...

করিমের স্ত্রী ইব্রাহিমের চাচী। সে রসিকতা করে বলল, 'বল না বাপু, একবার 'খালু' বল্—আপদ চুকে যাক।'

কিন্তু স্বামীকে কেউ কি মেসো বলতে পারে? মেসো তো অনেক দূরে, বাবা বলতেও নারাজ! বউটা শুধু খিলখিল করে হাসতে থাকে। তারপর এক বালতি জল এনে দিলে ইব্রাহিমের মাথায় ঢেলে। সেই ইব্রাহিম গলে গেল। তার ছোট চাচা দেদার গাড়োয়ান বলে, 'গাড়ি-গরু একবার গেলে করা কি সহজ? একজোড়া গরু কম করে ছ-সাত শো টাকা দাম। গাড়িতে চার শো টাকা।'

গাড়িতে চার শো টাকা কেন?

'ঐ তো খোসাল করে দিল ই-বচ্ছর মোর নতুন গাড়িটা—চারশো টাকা খরচ পড়ে গেল। দুটো চাকা তৈরি করতেই দুশো টাকা। শক্ত পাকা বাবলা কাঠ যোগাড় করে খোসালকে তিন টাকা মজুরী দিয়ে ঐ চাকার পুটে (বেড়ের কাঠ), 'পাকি' 'হাঁড়ি' এ সব করতে কতদিন গেল। ভেতরের 'ধুরো' লোহাটার দাম পঞ্চাশ টাকা। 'হাল' দুটো—চাকার ওপর লোহার বেড়ি— পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ সত্তর টাকা। 'তেতুলে'—যে কাঠ দুখনা ভেতরের তলায় পাতা আছে, ওর দাম দশ টাকা করে কুড়ি টাকা। 'ধুরো'র ওপর মাঝামাঝি এড়া কাঠ যেটা ওটার নাম 'তকাঠ'। ওর দাম পঁচিশ টাকা। 'ফড়ে'র বাঁশ বাছাই

চাই। মাথা থেকে শেষ পর্যন্ত—এক রকম ডোল হওয়া চাই। একটু বাঁকা ভাবে পড়ন—শেষ ধারে থাকে। এই বাঁশ এক একখানা তিন টাকা করে। লম্বা বাখারীর মতো গুলোর নাম 'লাপা'। এড়োগুলোর নাম 'চাপা'। মাঝখানের পাকানো দড়ির মধ্যে ভাং ঢোকানো এইটা হল 'লাট'। জোয়ালটাকে আমরা বলি 'জো'। 'জো'-এর মধ্যে যে বাড়িটা ঢোকানো থাকে ওটাকে বলে 'সিমলে।' চাকার মধ্যে যে লোহার 'খরো' আছে তার মুখে থাকে লোয়ার 'খংকিল'। তলায় যে বাঁশটা ঝোলে তার নাম 'ঠেকো' বা 'ঠেকনো'। 'নামদড়ি' দিয়ে বাঁশ বা খড় মালজাল বাঁধতে হয়। গরুর গলায় যে দড়িটা পরানো হয় তাকে বলে 'আজি'। গরুর পায়ে মারা লোয়ার পাতকে বলে 'নাল'। নাল মারতে লাগে সাড়ে তিন টাকা। বাখরার ভিরু নাল মারে। সে গাড়িও তৈরি করতে পারে। 'মিনিস্-প্যালটির 'পাস' নিতে লাগে সাড়ে তিন টাকা। কলকাতা করপোরেশনের সহরে যাবার 'পাস' নিতে লাগে বিয়াল্লিশ টাকা।'

আমাদের অঞ্চলে কয়েকটি গ্রামে গাড়োয়ান আছে অনেক। হানিফ, কোবাদ, দেদার, পিয়ার, নবা। কওসের, নুরে মহম্মদ, রুহু বকসে—এরা বাঁশের কারবার করে। একদিন ছাড়া বেহালায় মাল নিয়ে যায় রাতে রাতে, বাস চলা বন্ধ হলে। ১২।১৪ মাইল পথ বোঝাই গাড়ি ভরা বাঁশ নিয়ে 'হেট হেট' করে কি শীত কি বর্ষা কি গ্রীষ্ম ওরা চলেইছে। ওদের জনেরা বড় বড় আড়াই কেজি ওজনের কাটারি হাতে নিয়ে গেরস্থর বাঁশ কেটে বেড়ায়। সন্ধ্যায় সেই বাঁশ গাড়িতে তুলে 'নামদড়ি' দিয়ে সেঁটে বাঁধে 'হেঁইয়ো হেঁইয়ো' শব্দ করে। ৫০।৬০টা গাঁটঅলা হাত ২৫ বড় বড় 'ভেলকো', 'গাড়ি ভেলকো' বাঁশ বোঝাই করে জটা ছেঁটে ফেলে দেয়। বাঁশের ডগার দিকটা থাকে গাড়ির সামনে।

গ্রামে সওয়া শো দেড়শো টাকায় গোটা বাঁশ কেনে নুরে মহম্মদ। বেহালায় নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে আড়াই শো টাকা একশো খানাতে। 'খুঁটি বাঁশ কাহাতার' অথবা বাড়ি তৈরির জন্যে আড়তে বাঁশ নেয় মোটা মোটা দেখে। পাকা মজবুত দরকার নেই। মোটা হলেই হল। তাই গাড়োয়ানরা চায় কাঁচা দু' সনের মোটা বাঁশ। তাতে বাঁশ ঝাড়ের ক্ষতি হয়। নবা আর নুরে মহম্মদ দু' ভাই। নবা দেশ গাঁয়েই গাড়ি হাঁকে। মুদিখানা, কণ্ট্রোলের মাল বয়। টালি খোলা, কাঠ, খড় বয়। মোটা অর্জুন গাড়োয়ান আসে নারকোল ছোবড়া কিনতে। চোত বোশেখের গভীর রাতে মাঠের মধ্যে দিয়ে ২০।২৫ খানা করে খড়ের গাড়ি যায় লাইন ধরে ঘুঙুর ঘণ্টা বাজিয়ে বজবজের কেরোসিন তেলের ডিপোতে। হাজার হাজার কাহন খড় টেনে নেয় তেল কোম্পানি ড্রাম সাজাবার জন্যে।

বর্ষায় ওদের গরুর গাড়ির চাকা যখন পুঁতে যায় 'হাঁড়ি' পর্যন্ত এক কোমর, ওরা অমানুষিক খাটুনি খাটে— চাকার 'পাকি'র মধ্যে 'সেতপাই' বাঁশ ঢুকিয়ে দিয়ে কাঁধের ওপর রেখে অসুর বিক্রমে পঁচিশ তিরিশ মণ মাল সমেত ভরী পুঁতে-যাওয়া চাকাকে খানিকটা চাগিয়ে নাড়িয়ে দিলে কুঁকড়ে পড়ে গরু, পুরো টান দেয় চামড়ার চাবুকের সিপটি খেতে খেতে। গরুদের চোখ বেরিয়ে পড়ে। প্রায়ই পথে তখন দেখা যায় নবা, নুরে মহম্মদ কাদা মেখে হাঁফাচ্ছে। গাঁজা ভাঙছে গরু দুটো। নবার আবার অম্বলশূলের ব্যথা। যখন নুরে মহম্মদ শহরে গাড়ি নিয়ে চলে যায়, নবা তার কচি কচি ছিপুনে বাচ্চা দুটোকে গরু তাড়াতে দেয়। নিজে পেটটা ধরে, ডাক মারে। গরু দুটো এমনি শিক্ষিত যে অন্য কেউ তাড়া দিলে এক পাও নড়বে না। নবার বাপের মত বাঁশভারী হাঁক শুনলেই টানতে থাকবে চটচট করে। ২৪ পরগণার বিখ্যাত এঁটেল মাটির কাদা নেবা কালে গলে যায়। একটু কালো লেগে কণ্ট্রোলের মাল নিয়ে গেলে তবে ভোর থেকে লাইন মেরা দোকানীরা মাল পাবে। একদিন নবার গাড়ি আসছে না কেন দেখতে এসে কণ্ট্রোলঅলা দেখলো নবা কাদার ওপরে সটান অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। ছেলেটা তার কাঁদছে 'বাজী' মরে গেছে মনে করে। একটা গরু কাদায় শুয়ে পড়ে আছে জরজর হয়ে।

নবার বড় ছেলেটা আট বছরের। সে বলে 'বাজীর প্যাটে ব্যথা ধরেছ্যালো। টাঁক থেকে শিশির কৌটা বার করে টাউ-টাউ করে সোডা খেলো। তারপর 'পাকি'র ভেতরে 'সেতপাই' ঢুকিয়ে চাকা-নারতে যেয়ে বুকে লেগে গেল। 'বাবাগো—বাবাগো' বলে কাদাতেই শুয়ে পড়ল।'

লোকজন এসে তাদের উদ্ধার করলে।

নুরে মহম্মদের চেহারাটা সুন্দর, পাথর কোঁদা। সে অবিবাহিত। নুরে মহম্মদ রাতে বাঁশের গাড়ি নিয়ে যায় কলকাতার বেহালায়—সঙ্গে থাকে একটা ছেলে। তার নাকি শহরে ঢোকার 'পাস' নেই। রাত ডিউটির পুলিশ ধরলেই ফ্যাসাদ। নুরে মহম্মদ হাসে কথা বলতে গেলে। বলে: 'শালারা হাঁস। হয়তো বললে, 'পাস' দেখি। নেই? চল্ শালা থানায়। একটা টাকা দিলেই ছেড়ে দেয়। হয় তো বললে 'গরুর কাঁধে ঘা' কেন? দাও শালাকে দুটো টাকা। নয়তো বলবে 'গরুকে মারছ' কেন? মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ শালাদের। আমার গরু, সাত আটশো টাকা দাম, আমি মরছি কাজের জন্যে, শালাদের দরায় পিঁড়ে ফেটে যাচ্ছে। তবে তুই শালা টান না অত যেতিন্দরা! তারপর 'খাতিতে কালি পড়েছে' কেন, এত 'ওভার লোড' কেন? অন্তত টাকা না থাকলে চার আনা পয়সাও ঘুষ দিতে হবে। পথের ডিউটি পুলিশগুলো সাংঘাতিক। চেকপোস্টের চোরাই চালঅলী মেয়েদের ওরা ধরে থানায় এনে ভরে রাখে।'

'মাসে তোর কত লাভ হয় নুরে মহম্মদ?'

'প্রতি গাড়িতে ৪০ খানা বাঁশ নিয়ে যাই ৪০ টাকা লাভ। ২০ টাকা খরচা বাদ। মাসে ১৫ গাড়ি মাল গেলে ৩০০ টাকা। সব সময় পারিনে গাড়ি মাল হয়না। গরুর খরচা আছে। গমের ভুষি দশ আনা কিলো। 'দানা' (আভাঙা খেসারি কলাই) চোদ্দ আনা কিলো। খড় এখন চোদ্দ টাকা কাহন। বর্ষার পাঁচ মাস খড়ের দাম চল্লিশ টাকা কাহন ওঠে। তারপর 'খোলে'র দাম বাড়ছে। দু ভাই যা রোজগার করি আমাদের চলে যায়। পাঁচটা গরুর পায়ে রোজ দশ টাকা করে। সংসার খরচা লাগে তিন শো টাকা। কোনো মাসে পারি না।'

'গভীর রাতে কোনো ভূত প্রেত দেখিস নি?'

'কত কি দেখি! মাঠের অন্ধকারে আলো জ্বলছে! খ্যাঁক শিয়াল, শিয়াল, খরগোশ ছুটছে। ডাকাতের দল হৈ হৈ করে মশাল জ্বেলে হয়তো বেরিয়ে গেল! পাগলা পাগলী হাঁ হাঁ করে হাসছে। মড়াপোড়া থেকে রাস্তার ওপরে মড়া টেনে এনে খাচ্ছে শিয়াল-কুকুর। মড়ার ঠ্যাং ধরে উল্টে দিয়ে আল্লার নাম করে চলে গেনু। আমরা হনু রাতচরা। আমাদের ভূত, জীন, ডাকাত, ওরা নিশাচর সবাই বন্ধু। একশো 'শকুনি' মরলে তবে একটা গাড়োয়ান পয়দা হয়—তাদের কি ডর-ভর করলে 'গাড়োয়ানী' করা চলে? তবে ডর করি আমরা ভদ্দরলোকদের, ছোঁচো 'পুলুশদের —যারা দয়া দেখিয়ে আইন দেখিয়ে মারপিট করে আমাদের, হাজতে দেয়, ঘুষ নেয়। ভদ্দরলোকদের মতন খারাপ 'মাল' আর জগতে নেই!'

—আবদুল জব্বার

সিংহলের খ্যাতনামা শিল্পী সেনাকা সেনানায়াকে মাত্র ছয় বছর বয়স থেকেই ছবি এঁকে সুনাম অর্জন করেন। তাঁর বয়স যখন ১৪, তখন ইংলণ্ড, আমেরিকা, ইটালি, পশ্চিম জার্মানী, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া ও সিংহলে তাঁর শিল্পকলার ৩৬টি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। শুধু তাই নয় ঐ সময়েই নিউইয়র্কে সংযুক্ত রাষ্ট্রের সাধারণ সভার প্রধান প্রবেশপথে একটি প্রচারচিত্র (৯'×৬') আঁকার গুরুভার তাঁর ওপর অর্পণ করা হয়। তাছাড়া ১৯৬৫ সালে দিল্লীর AIFACS আয়োজিত প্রথম আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতেও সিংহলের চিত্রকলানিদর্শন হিসাবে তাঁর আঁকা একখানি রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়। অথচ পরিতাপের বিষয় আমাদের দেশের প্রতিভাবান বালকশিল্পীদের বিষয়ে কেউই চিন্তা করেন না। আমাদের দেশেও পপু (ডাকনাম না থাকলেও তার আঁকা ছবি আছে) বা অনমিত্র আছে—দেশের কয়জন তাদের প্রতিভার সন্ধান রাখে? এর কারণ কি? কারণ আমাদের দেশের কর্তৃপক্ষ ও তথাকথিত সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলি বালকশিল্পীদের প্রতিভা বিষয়ে আদৌ সচেতন নন। দ্বিতীয়, আমাদের বিকৃত মনোবৃত্তি! যতদিন না কোনও সুপরিচিত বিদেশী ব্যক্তি বা সংস্থা দেশের কারুর কপালে জয়তিলক এঁকে না দেবেন ততদিন আমরা দেশের কারুর প্রতিভার কথা স্বীকার করি না অথবা করলেও প্রকাশ করি না।

প্রথমে বিড়লা অ্যাকাডেমি ও পরে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস গ্যালারীতে যখন অনমিত্রর প্রথম প্রদর্শনী দেখি তখনই উপরের কথাগুলি মনে আসে। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন খ্যাতনামা ভাস্কর-শিল্পী ডাঃ দেবীপ্রসাদ রায়-চৌধুরী। প্রদর্শনীতে অনমিত্রর ৫৬টি সাম্প্রতিকতম বিভিন্ন শ্রেণীর রচনা দেখা যায়। সবগুলিই তেল ও পোস্টার রঙে আঁকা।

অনমিত্রর বয়স এখন ১২ বৎসর মাত্র। ইতিপূর্বে বলেছি এবং এখনও বলি যে অনমিত্রর মধ্যে একই সঙ্গে যেন তিনটি বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্পীসত্তা সহাবস্থান করছে। প্রথম হ'ল বালকশিল্পীসুলভ সত্তা। বালকের স্বভাবসুলভ কৌতূহল অথচ শিল্পীর চোখে যে পরিদৃশ্যমান জগতের বিভিন্ন বস্তু ও রূপ দেখেছে এবং সেগুলি দেখে তার মনে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছে তারই প্রতিফলন হয়েছে এক শ্রেণীর রচনায়। উদাহরণ, উন্মুক্ত আকাশ, সমুদ্রের নীল জলরাশি, বিস্তীর্ণ শস্যভূমি এবং নিবিড় ও শ্যামল তরুশ্রেণী এই শ্রেণীর রচনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। এই শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য রচনা—রেন। বৃষ্টির কথা মনে হলেই খ্যাতনামা জাপানী শিল্পগুরু হিরোশিগো রচিত চিত্রমালা চোখের ওপর ভেসে ওঠে। সূক্ষ্ম রেখা ও উড়ন্ত নিম্নগামী তীরের তীব্র গতিই সে চিত্রের বৈশিষ্ট্য। অনমিত্রর রেন অন্য জাতীয়—আঁকাবাঁকা বৃষ্টিধারা যেন মৃদু বাতাসে দুলতে দুলতে পুষ্প স্তবকের মত ঝুপ ঝুপ করে ঝরে পড়ছে। গাঢ় নীল রঙের পরিপ্রেক্ষিতে আঁকা সূক্ষ্ম ছন্দোবহুল সাদা রেখাসৌষ্ঠব লক্ষণীয়। এই শ্রেণীর অন্য নিদর্শনের মধ্যে ধানক্ষেত, কাশ্মীরে বৃষ্টি, শালগাছ (১৪নং) উল্লেখযোগ্য। বলা বাহুল্য নানা রঙ ও আলঙ্কারিক রূপই চোখে পড়ে। তৃতীয় হল অনমিত্রর অভিজ্ঞ ও পরিণত শিল্পীসত্তা যেটি দুই বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গিমার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ শ্রেণীর রচনা দেখে মন স্বভাবতই সন্দেহদোলায় দুলে ওঠে—কারণ অনমিত্রর পক্ষে এ জাতীয় ছবি আঁকা যেন অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়। ছোট বড় বৃত্তাকারে তরলতর পোস্টার রঙ সে রচনা-বিষয়বস্তু। ভাষা সরল ও ইঙ্গিত প্রধান। এখানে রেখা ও রঙের সংকেতের গুরুত্ব তথা চাতুর্যই প্রধান। ব্রাশের মোটা কয়েকটি টানে (নীল, হলুদ ও সবুজ রঙ) যে একাধারে সমুদ্র, শস্যক্ষেত্র ও শ্যামল তরু-শ্রেণীর রূপ যেন ইঙ্গিতে ফুটিয়ে তুলেছে। উদাহরণ হিসাবে সমুদ্র, পলাশ ফুল, শাল গাছ-এর নাম করা চলে। দ্বিতীয় হল অনমিত্রর বালকোত্তর শিল্পীসত্তা। এক্ষেত্রে তার চিন্তাধারা পৃথক, রচনভঙ্গী আলঙ্কারিক। বালক শিল্পী হিসাবে যা দেখে সে মুগ্ধ হয়েছিল হয়ত সেইগুলিকে কেন্দ্র করেই সে ছবি এঁকে গেছে কিন্তু রঙ ও রেখার মধ্য দিয়ে যেন কাব্যের সুললিত ছন্দ

ছড়িয়ে দিয়ে ইমেজারীর সৃষ্টি করেছে। বর্ষা সমাগমে আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘূর্ণায়মান মেঘদলকে যাঁরা বৃত্তের আকারে পুঞ্জীভূত হতে দেখেছেন তাঁরা হয়ত এ জাতীয় রচনা উপলব্ধি করতে পারবেন। পার্থক্য শুধু রঙ—মেঘের কালো রঙের পরিবর্তে নীল রঙ ও তারই বিভিন্ন স্তর তথা বিকাশ—রচনাক্ষেত্রের উপর যেন স্তবকে স্তবকে সাজান নীল রঙের বিভিন্ন ভেদ ও রূপ। যেমন ফেয়ারীল্যান্ড ৩৩, ৩১। অপরটি হল অ্যাকশন পেণ্টিং—দেখে স্বভাবতই ডিকুনিং ও পোলকের রচনার কথা মনে পড়ে। এ শ্রেণীর রচনায় অনামিত্র যেন তরল রঙ ছড়িয়ে, গড়িয়ে ও ছিটিয়ে দিয়ে অ্যাকশন তথা গতিবেগের সৃষ্টি করেছে। কয়েকটি দেখে মনে হয় বুঝি বা ফোয়ারার জল ঊর্ধ্বমুখী হয়ে শতবাহু মেলে বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। এই প্রসঙ্গে ফেয়ারীল্যান্ড ২১। আবার কয়েকটি দেখে মনে হয় যেন রঙের আতস-বাজী—যেন জ্বলন্ত তুবড়ী অপরূপ ছটায় জ্বলে উঠে চারিদিকে সপ্তরঙের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দিয়েছে—যেমন রিফ্লেকশনস বা

ফেয়ারীল্যান্ড ২৬। অনমিত্র ঠিক প্রতিকৃতি জাতীয় কোনও ছবি আঁকেনি—তবে যীশু-খ্রীষ্ট অবলম্বনে আঁকা রচনাগুলি কমপোজিশন হিসাবে সরল অথচ বলিষ্ঠ। এগুলিও প্রতীকপ্রধান বিশেষ করে ২ ও ৪৬নং উল্লেখযোগ্য।

*

কয়েকজন শিল্পী আছেন যাঁরা প্রতি বছর নিয়মিতভাবে তাঁদের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে যান, অথচ তাঁদের শিল্পকর্মে নতুন কোনও চিন্তাধারা অথবা বৈশিষ্ট্যের সন্ধান মেলে না। শিল্পী নির্মল দত্ত সেদিক থেকে ব্যতিক্রম। কেমল্ড গ্যালারীতে এবার তাঁর প্রদর্শনী দেখে আমার সেই কথাই মনে হল। এবারের প্রদর্শনীতে ১৬টি নিদর্শন দেখা যায়—একটি ব্যতীত সবগুলিই তেলরঙে আঁকা। সবগুলিই সুনির্বাচিত।

নির্মল দত্ত কলকাতা পৌরসভার শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেন। তরুণ শিল্পী মহলে তিনি পরিচিত ও ইতিপূর্বে বিভিন্ন প্রদর্শনীতে তাঁর শিল্পনমুনা দেখার সুযোগ ঘটেছে। তাঁর সাম্প্রতিকতম শিল্পকর্ম দেখে মনে হয় তিনি এখন শিল্পচর্চার উপর অধিক মনোযোগ দান করেছেন। প্রদর্শনীটি ঘুরলেই বোঝা যায় যে তিনি ধীর অথচ স্থির পদে অগ্রসর হচ্ছেন, এবং এই নিষ্ঠা ও মান বজায় রাখতে পারলে তিনি অচিরে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে যাবেন। শিল্পীর রচনাবলী রিয়ালিস্টিক নয় তবে বিমূর্ত শ্রেণীতেও পড়ে না। সেগুলি সমকালীন রীতির অন্তর্ভুক্ত। কয়েক ক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন বিষয়বস্তু আপন চিন্তাধারা ও রঙ ব্যবহার কৌশলের মধ্য দিয়ে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। শিল্পীর গাঢ় রঙের ওপর আস্থা অধিক। বস্তুত রঙ-প্রলেপ তথা রঙের ভাষাই তাঁর বর্তমান প্রদর্শনীর প্রধান উপাদান। বিশেষ করে নীল, সবুজ ও বেগুনী রঙেরই অধিক প্রাধান্য, সেখানে লাল রঙ যেন তিনি স্বেচ্ছায় পরিহার করেছেন। কয়েকটিতে সংকেত ও রঙ সহযোগে তিনি ইমেজারীর সৃষ্টি করেছেন। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই ডাস্ক-এর নাম করা উচিত মনে করি। আর একটি ছবি চোখে পড়ে—টেম্পল ক্লাস্টার। নীল ও সবুজ রঙের স্তরভেদের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি মন্দিরের চূড়ার অংশ ও পুরোভাগে আলোক ও আঁধারে আবৃত তীর্থযাত্রীদের অপসৃয়মান মূর্তি অনেককে মুগ্ধ করে। কয়েক স্থলে রচনাক্ষেত্রটি নীল রঙের বিভিন্ন স্তরে ভরে ফেলে সাদা রঙের প্রতীকমূলক ছোট ছোট টানের মধ্য দিয়ে তিনি বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করেছেন, যেমন ডন ইন ফিশারম্যান-ভিলেজ। রচনাক্ষেত্রের কারু-কার্যের দিক থেকে ইমপ্রেশানিস্টিক রচনা

টেম্পল ক্লাস্টার —নির্মল দত্ত

পিলগ্রিমস উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে জলরঙে আঁকা আরবান মেজ-এরও নাম করা চলে। লম্বমান, গ্রাফিকগুণপ্রধান ছবিখানি যেন নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে।

নিসর্গ চিত্র হিসাবে মাউনটেন স্ট্রীম-এর নিম্নাংশটুকু সুন্দর, উপরাংশটুকু দুর্বল না হলে ছবিখানি অপরূপ হয়ে উঠত। অপরাপর ছবির মধ্যে ডন ও বিশেষ করে

নারসিস্যান (অ্যালুমিনিয়ম ও পিতল) —অনীত ঘোষ

রহস্যাবৃত সলিচুড-এর নাম করা চলে।

*

সরকারী আর্ট কলেজ প্রাঙ্গণে নয়জন ভাস্করশিল্পী তাঁদের চতুর্থ বার্ষিক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রদর্শনীতে তাঁদের ১৯টি নিদর্শন ও সেই সঙ্গে অধ্যক্ষ শ্রীচিন্তামণি করেরও দুটি সাম্প্রতিক ভাস্কর্যনমুনা দেখা যায়।

ভাস্কর্য প্রদর্শনী এদেশে প্রায় অনুষ্ঠিত হয় না। তাই যখনই ভাস্কর্য নিদর্শন দেখি তখনই দুঃখ হয়—ছবি দু'একটি যদিও বা বিক্রী হয় কিন্তু এগুলির ভবিষ্যৎ কি? দিবারাত্রি কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করে ভাস্কর যে মূর্তিটি গড়ে তুলল তাকে কি কেউ কোনওদিন সমাদরে কোনও স্থান দেবে না? সেগুলি কি চিরকাল গুদামজাত হয়ে থাকবে? অন্তত দেশের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণেও যদি এক একটি নিদর্শন রাখা যায় তাহলেও ভাস্কর্যশিল্পের জনপ্রিয়তা বাড়ে ও সেই সঙ্গে ভাস্করেরও পরিশ্রম সার্থক হয়।

প্রথমেই বলে রাখি যে প্রদর্শনীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর উচ্চমান। প্রত্যেকটি নিদর্শন সুগঠিত ও সুনির্বাচিত। ভাস্করদের মধ্যে সকলেই তরুণ ও সরকারী আর্ট কলেজের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী। হয়ত সেজন্য কয়েকটি কাজের মধ্য দিয়ে একই রীতি চোখে পড়ে যায়। তাছাড়া কয়েকটিতে পাশ্চাত্য ভাস্করপণ্ডিত, বিশেষ করে বারবারা হেপওয়ার্থ বা চ্যাডউইকের কিছু প্রভাবও দেখা যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও পড়ে। মাধ্যম হিসাবে কাঠ, লোহা, অ্যালুমিনিয়ম, কংক্রীট ও পাথর ব্যবহার করা হয়েছে এবং প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই মাধ্যমের বিশেষত্ব, উপযোগিতা ও চাহিদা অনুযায়ী কাট, খোদাই করা, জোড়ানো বা জমানো হয়েছে। সমকালীন চিন্তাধারা ও গঠন-পদ্ধতি প্রদর্শনীর প্রধান আকর্ষণ। প্রথমেই চোখে পড়ে অ্যাক্রোব্যাটস ও টরসো। প্রতীকমূলকভাবে খোদাই করা টরসো। একটি কাঠের অংশের ওপর বিভিন্নভাবে খোদাই করা অপর দুটি অংশ স্থাপন করে করবী ঘোষ একটি সামগ্রিক আকার সৃষ্টি করেছেন। এটির আকারবৈচিত্র্য লক্ষণীয়। এক খণ্ড কাঠের নিম্নাংশটিকে মৌলিক রেখে ওপরের অংশটুকু খোদাই করে টরসোর মধ্যে মধুসূদন চৌধুরী নতুন রূপ আরোপ করেছেন। কাঠের ভাস্কর্য নিদর্শন হিসাবে বিমান দাসের ইনকোরেশন, —বিশেষ করে উপরের হলো অংশটির জন্য —গঠনরীতির আধুনিক বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায়। নিরঞ্জন প্রধানের কাছে সমকালীন চিন্তাধারা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। হোয়াইট ইনটু স্পেস এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কাব্যধর্মী নিদর্শনটির প্রতীকমূলক রূপ ও গঠন প্রণালীর পেলবতা অনেকের চোখে পড়ে যায়। পরিকল্পনার, আকারবৈচিত্র্য ও খোদাই কৌশলের জন্য দিলীপ সাহা স্টোন ট্রি-তে প্রতিভার স্বাক্ষর দিয়েছেন। কংক্রীট স্তূপ বিভিন্ন প্রতীকের আকারে জমিয়ে সুবল সাহা সিটি কম্পোজিশনে আধুনিক নগরের বিশেষত্ব দেখাবার চেষ্টা করেছেন। [illegible] বিভিন্ন জ্যামিতিক ক্ষেত্রের আকারে সংস্থাপিত করে তিনি আপরাইট ফর্ম-এ যেন সংগীতযন্ত্রের দ্যোতনা সৃষ্টি করেছেন। অশেষ মিত্রর দুটি কংক্রীট কাজের মধ্যে লম্বমান কম্পোজিশন অনেকের ভাল লাগে। অ্যালুমিনিয়ম পাত নানাভাবে মুড়ে ও ঘুরিয়ে তার সঙ্গে পেতলের পাইপ ব্যবহার করে অনীত ঘোষ নারসিস্যান-এ সুন্দর ও পেলব গঠন-কৌশলের পরিচয় দিয়েছেন। দেবব্রত চক্রবর্তী গোলক আকারের মধ্য দিয়ে গতি-বেগের সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন (আর উন্ড দি মুন)। অতিথি ভাস্কর হিসাবে অধ্যক্ষ চিন্তামণি করের দুটি কাজের মধ্যে একটি কাঠের ও অপরটি

অ্যাক্রোব্যাটস —করবী ঘোষ

অ্যালুমিনিয়মের। মাধ্যম হিসাবে অ্যালুমিনিয়মের ব্যবহার তথা প্রয়োজন অনুযায়ী রূপদান ও আকার বৈচিত্র্যের দিক থেকে নকচার্ন উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। বিষয়-বস্তু হিসাবে মাদার অ্যান্ড চাইল্ড-এর আদর্শে চিরন্তন। তিনি এই চিরনতুন বিষয়বস্তুরই সম্পূর্ণ একটি নতুন রূপদান করেছেন। কাঠটি কাব্যধর্মী—একটি কাষ্ঠখণ্ডকে খোদাই করে তিনি মাতার শান্ত, পবিত্র অথচ সাবলীল আকার সৃষ্টি করে তাঁরই জঠরে খোদাই করে শিশুর মূর্তির অবতারণা করেছেন। উচ্চ কোনও বেদীতে স্থাপনের উপযোগী এই ভাস্কর্য নিদর্শনটি যেন আপন মহিমায় স্বীয় স্বাতন্ত্র্যটুকু বজায় রেখেছে।

—চিত্রপ্রিয়

॥ ৩৩ ॥

রাসমোহন একটু আগেই দীপুকে বাড়ি থেকে বার করে দিতে চাইছিলেন, এখন উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞেস করলেন, ট্রাম থেকে পড়ে গিয়েছিলি মানে? এত রাত্তিরে ট্রাম চলে? কোথায় পড়ে গিয়েছিলি?

—এখন না অনেকক্ষণ আগে!

—হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল?

—না, না, সেরকম কিছু হয়নি। সামান্য একটু ছড়ে গেছে।

—দেখি, কোথায় কেটেছে? এদিকে আয়!

দীপু সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। নেমে এলো না। বললো, বলছি তো কিছু হয়নি! এমনিই একটুখানি—

অপর্ণা সিঁড়ির ওপর উঠে এসে বললো, ইস্, জামায় রক্ত...কি হয়েছে বল তো? দেখি, মাথাটা নিচু কর!

দীপুর ঠোঁটের পাশে আর থুতনিতে কাটা জায়গায় নিজেই ডেটল লাগিয়ে নিয়েছিল, তবু রক্ত বন্ধ হয়নি পুরোপুরি। ঘাড়ের খোঁদলানো জায়গাটা থেকে এখনো চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে, দীপু টের পায়নি তার জামার কলারের কাছটায় অনেকটা রক্তে ভেজা।

মেজদি অনেকদিন তার এত কাছে এসে দাঁড়ায় নি, গায়ে হাত রাখেনি, দীপুর বেশ অস্বস্তি লাগছে। এমনকি, বাবাও কাছে এসে বলছেন, কই দেখি, কোথায় কেটেছে? দীপু অবাধ্য ছেলের মতন মাথাটা সরিয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে বললো, আঃ, তোমাদের সব তাতেই বাড়াবাড়ি। বলছি, কিছু না—

রাসমোহন বললেন, চলন্ত ট্রাম বাস থেকে ওঠা নামাই তো এখনকার ছেলেদের ফ্যাশন! কোথায় পড়ে গিয়েছিলি?

দীপু আমতা আমতা করে বললো, ভবানীপুরের কাছে...ট্রামটা হঠাৎ ছেড়ে দিল ...সেখান থেকে এক বন্ধুর বাড়িতে—

—কি রকম বন্ধু! একটা ব্যান্ডেজও করে দিতে পারলো না? এতক্ষণ এই অবস্থায়...কলকাতা শহরের ধুলোবালি—যদি সেপটিক হয়—

দোতলায় এসেই অপর্ণা গরম জল চাপিয়ে দিল। বাইরের শাড়িও ছাড়লো না। টুলটুল ঘুমিয়ে পড়েছে—বিছানা পাতা হয়নি, বেড কভারের ওপরেই তাকে শুইয়ে দিয়েছেন রাসমোহন।

অনেকদিন বাদে এ পরিবারের সবাই খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। চেয়ারের ওপর গেঞ্জি পরে বসে আছে দীপু, গরম জলে তুলো ভিজিয়ে যত্নের সঙ্গে ধুয়ে দিচ্ছে অপর্ণা। রাসমোহন খুঁজছেন আয়োডিন। বড় কাঠের আলমারিটা—যেটার মধ্যে রাজ্যের আজেবাজে জিনিস জমানো, সেটাতেই কোথাও রয়েছে আয়োডিনের শিশি। রাসমোহন সেটা চট্ করে খুঁজে না পেয়ে আপন মনে বকাবকি করছেন, কাজের সময় একটাও জিনিস পাওয়া যাবে না। ঠিক যখন যে-টা খুঁজবো—

আয়োডিন ছোঁয়াতেই দীপু চেঁচিয়ে উঠলো, উঃ, উঃ, উহু-হু, কতখানি দিচ্ছো! অপর্ণা নরমভাবে বললো, এইতো, আর একটুখানি, ঘাড়ের এখানটা গর্ত মতন হয়ে গেছে—পাথর টাথর ফুটেছিলো নাকি? রাসমোহন বললেন, উঁহুঃ, মাথা নাড়িস না, মাথা নাড়িস না—একটুখানি চুপ করে বোস্ না—

বহুদিন এ পরিবারের তিনজন এত ঘন হয়ে দাঁড়ায়নি, কারুর গলায় ক্ষোভ বা অভিমান নেই। যতই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার চেষ্টা করুক, রক্তের সম্পর্কের মধ্যে কোথাও একটা বিনাশহীন মায়া লেগে থাকে। এই মুহূর্তে এদের পরিচয়, একজন সত্যিকারের বাবা, একজন দিদি, একজন এ বাড়ির ছোট ছেলে।

দীপুর ট্রাম অ্যাকসিডেন্টের গল্প এই নিয়ে তিনবার শোনা হয়ে গেছে। প্রত্যেকবার বলার সময় দীপু একটু একটু ঘটনা নতুন করে বানিয়ে গল্পটা বিশ্বাসযোগ্য করে তুলছে। ওদের দু' জনের দেরি করে বাড়ি ফেরার প্রসঙ্গ এখন মুলতুবি। গল্প শুনে শিউরে উঠে রাসমোহন বলছেন, উঃ, চাকার তলায় পড়িস নি যে, এই তোর ভাগ্য! প্রাণ হাতে নিয়ে ঘুরতে হয় এখন কলকাতা শহরে—

খাবার গরম করারও ত্বর সইছে না, এত খিদে পেয়েছে দীপুর। তার পেট ও বুকের মধ্যে এখন যে জ্বালা ও অস্থিরতা—তা শুধু খিদেরই জন্য, দীপু মনে করছে। অপর্ণা কিছুই খাবে না, তার খিদে নেই কিংবা খাওয়ার ইচ্ছে নেই একেবারে—তবু রাসমোহনের হুকুমে তাকেও বসতে হলো খাবার নিয়ে।

মধ্যরাত্রি পার হয়ে গেছে, সারা কলকাতা এখন নিঝুম। বারান্দায় খাবার টেবিলে বসেছে অপর্ণা আর দীপু—রাসমোহনও শুতে যান নি—বসেছেন একটা চেয়ার টেনে। কিছুক্ষণ তিনজনেই নিঃশব্দ। দীপু সাবান দিয়ে ভালো করে হাত ধুয়েছে, তবু যেন হাতে সে এখনো রক্তের গন্ধ পাচ্ছে। এত খিদে পেয়েছিল, কিন্তু সে ভালো করে খেতে পারছে না, তার একটু বমি বমি লাগছে।

গলা পরিষ্কার করে রাসমোহন বললেন, জানিস পুনি, আজ বাড়ি বিক্রির ব্যাপার সব পাকা করে ফেললাম। দলিল সই হয়ে গেছে, কাল রেজিস্ট্রি হবে!

রাসমোহনের কণ্ঠস্বরে এখন আর দর্প কিংবা অভিভাবকত্ব নেই। একটু যেন অনুতাপ। অপর্ণা কিংবা দীপু কোনো মন্তব্য করলো না।

রাসমোহন আবার বললেন, বিল্টু হালদার অনেকদিন থেকেই অফার দিয়ে রেখেছিল। তাকেই দিলাম—সাতষট্টি হাজারের এক পয়সা বেশী বাড়ালো না—শুধু জমির দাম, বাড়ির দাম কিছুই ধরেনি! আর একটু অপেক্ষা করলে—কোনো মাড়োয়ারি টাড়োয়ারির কাছ থেকে হয়তো বেশী দাম পাওয়া যেত—

রাসমোহনের ছেলেমেয়ের কারুরই যেন বাড়ির ব্যাপারে কোনো কৌতূহলই নেই। একটা কথাও বললো না কেউ—ঠাণ্ডা মাছের ঝোল মাখা ভাত নাড়াচাড়া করতে লাগলো।

—দীপু, তুই কাল আমার সঙ্গে যাবি রেজিস্ট্রি অফিসে।

—আমি? আমি গিয়ে কি করবো?

—আমার সঙ্গে যাবি! আমি বুড়ো মানুষ একা একা কি সব কিছু পারি? তোমাদের বুঝি কিছু দায়িত্ব নেই?

দীপু মুখে কোনো প্রতিবাদ জানালো না—কিন্তু তার মুখ গোঁজ করে বসে থাকার ভঙ্গির মধ্যেই একটা নিঃশব্দ প্রতিবাদ আছে। ছেলে আর মেয়ে যদি কিছু আপত্তি জানাতো—তাহলে রাসমোহন চেঁচামেচি করে নিজের অধিকার জাহির করতেন। কিন্তু ওদের এই চুপ করে বসে থাকার জন্যই তিনি বেশ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। একবার ভাবলেন, আজকালকার ছেলেমেয়েদের কি বিষয় সম্পত্তির ওপর একটুও লোভ নেই? আজ বাদে কাল বাড়ি ছাড়া হতে যাচ্ছে—

খানিকটা কৈফিয়তের সুরেই রাসমোহন আবার বললেন, এ বাড়ি রেখেই বা কি হতো? এ বাড়ি রিপেয়ার করাতেই এখন আট দশ হাজার টাকা লাগবে—আর রিপেয়ার না করে বেশীদিন থাকা—

হাত ধোয়ার জন্য দীপু উঠে পড়ছিল, রাসমোহন বললেন, বোস্, একটু কথা আছে। দীপু বসে পড়ে থালার ওপর আঙুল দিয়ে ছবি আঁকতে লাগলো।

—আমি ঠিক করেছি, কলকাতার পাট একেবারে তুলে দেবো। কলকাতার জল আমার আর সহ্য হচ্ছে না। সিমলা কিংবা নৈনীতালে গিয়ে বাকি জীবনটা কাটাবো। তোরা আমার সঙ্গে চল্। এখানে থেকে কি করবি? কি আছে কলকাতায়?

রাসমোহন আড়চোখে তাকাচ্ছেন অপর্ণার দিকে। এ সম্পর্কে অপর্ণার সঙ্গে তাঁর একবার কথা হয়ে গেছে, অপর্ণার আপত্তি তিনি শুনেছেন। তাঁর ক্ষীণ আশা, দীপু যদি তাঁর দলে আসে, তবে সে-ই হয়তো অপর্ণাকে বোঝাবে। ছেলেটা তো এমনিতেই এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়, পাহাড়ী জায়গার নাম শুনে বোধ হয় নেচে উঠবে।

দীপু বললো, আমি? আমি মাঝে মাঝে গিয়ে আপনাকে দেখে আসবো, কিন্তু আমি ওসব জায়গায় থাকতে পারবো না।

—যাবি না তো তুই কোথায় থাকবি এখানে?

—আমি একটা যে-কোনো জায়গা ঠিক ব্যবস্থা করে নেবো। দাদার ওখানেও থাকতে পারি;

—তোর দাদা কতদিন তোর খরচ টানবে? তার নিজেরই চল চুলোর ঠিক নেই—আবার জেলে যাবার শখ! যতদিন না কোনো চাকরি বাকরি পাস—তুই আমার সঙ্গেই থাকবি। ভালোই থাকবি—আমি বলে দিলাম! তা ছাড়া তোর চাকরি করার দরকার কি? আমার কাছে যা টাকা থাকবে—একটা যদি দোকান করা যায়—গরম জামা-কাপড়ের দোকান ওসব জায়গায় ভালোই চলবে—

রাসমোহন দেখতে পাচ্ছেন না, দীপু মুখ নিচু করে একটু একটু হাসছে। মুখ নিচু রেখেই বললো, আমি কাপড়ের দোকান করবো? আমি পারবো না—

—তুই এখানে থেকেই বা কি করবি?

—দেখি—

—অপু, তুই কি বলিস? এইটাই ভালো হবে না ওর পক্ষে?

অপর্ণা বললো, অনেক রাত হয়ে গেছে। কাল কথা বললে হয় না? তুমি এখন শুয়ে পড়ো, না হলে তোমার শরীর খারাপ হবে—

—কিচ্ছু শরীর খারাপ হবে না। আমি বেশ ভাল আছি। তুই কি বলিস, তুই যাবি না আমার সঙ্গে?

—আমি তো বলেছিই। টুলটুলের পড়াশুনো—

—ওসব জায়গার ছেলেমেয়েরা পড়া-শুনো করে না? অনেক ভালো ভালো ইস্কুল আছে। কলকাতার থেকে ঢের ভালো পড়াশুনো হয়—

—আমি এখানেই একটা স্কুলে চাকরি পেতে পারি। আমি এখানেই থাকবো। কল-কাতা ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয় এখন।

—কেন, কলকাতায় কি মধু আছে? কি আছে কলকাতায়?

দীপু আর অপর্ণার একবার চোখা-চোখি হলো। অপর্ণার একবার দীপুকে বলার ইচ্ছে হলো যে, আজ তার সঙ্গে শংকরের দেখা হয়েছে। কিন্তু সে কথা বলা যায় না। তারপর অনেক কিছু ঘটে গেছে। দীপু স্থির দৃষ্টিতে দেখছে অপর্ণাকে, এখন সে দেখতে পেয়েছে অপর্ণার চোখে শুকনো জলের রেখা—বাড়ি ফিরে মুখ ধুয়েছে অপর্ণা—তবুও বোঝা যায়, কিছুক্ষণ আগে সে কেঁদেছিল। হাতের এঁটো শুকিয়ে কড়কড়ে হয়ে গেছে, দু' জনে তাকিয়ে আছে দুজনের দিকে। অপর্ণা কেন কলকাতায় থাকতে চায়—সে কথা দীপু জানে, কিন্তু এই মুহূর্তে কিছুতেই মনে করতে পারছে না।

মানুষের সঙ্গে হুকুম করে কথা বলা অভ্যাস রাসমোহনের। কিন্তু বুঝতে পারছেন,

এখন ছেলে বা মেয়ে, কারুর ওপরেই হুকুমের জোর খাটবে না। ওরা না যেতে চাইলে তিনি কিছুতেই ওদের জোর করে সিমলা বা নৈনীতাল নিয়ে যেতে পারবেন না।

খানিকটা অসহায়ভাবে মিনতি করার মতন বললেন, আমি তাহলে কি করবো? আমি সারা জীবন একা থাকবো? তাই চাস তোরা? আমি সব ঠিক করে ফেলেছি, বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছি। কলকাতা ছেড়ে আমাকে যেতেই হবে—সম্মান খুইয়ে এখানে আমি থাকতে পারবো না। এখানে আমার এক মুহূর্ত শান্তি নেই।

দীপু একবার ভাবলো, বাবাকে কি বলবে যে আজ নিতাইয়ের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল! সে জানে, নিতাইয়ের জন্যই বাবা শান্তি পাচ্ছেন না—টাকা নিয়েও নিতাই কলকাতা ছেড়ে যাচ্ছে না। নিতাই একবার ধরা পড়লে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে কিলবিল করে অনেক সাপ হয়তো বেরিয়ে আসবে।

দীপু বললো, আপনার যেখানে ভালো লাগে আপনি সেখানেই গিয়ে থাকুন। আমি আর মেজদি মাঝে মাঝে গিয়ে দেখা করে আসবো—। মেজদি তো টুলটুলকে

ছেড়ে থাকতে পারবে না—ওকে হস্টেলেও রাখবে না—

—আর আমি বুঝি ওকে ছেড়ে থাকতে পারবো? আমি যে এতদিন ওকে মানুষ করলুম, সেটা কিছু না? তাতো ঠিকই, সব মিথ্যে হয়ে যায়! স্নেহ-মমতা সবই মিথ্যে হয়ে যায়! যাবোই তো, আমার যেখানে খুশী সেখানেই চলে যাবো। তোদের দেখা-শোনার তোয়াক্কা করি আমি? কারুকে একটা পয়সা দেবো না! টাকা থাকলে দেখাশুনো করার লোকের অভাব! স্বাধীন হয়েছে সব! আমার কথার কোনো দাম নেই! আমি বেঁচে থাকতেই এই—আমি যদি চোখ বুজতাম!—তবে সহজে মরবো না, এটা জেনে রাখিস! আমাদের দীর্ঘজীবীর বংশ, আমার ঠাকুর্দা বেঁচে ছিলেন সাতাশি বছর, আমার বাবা এইট্টি টু—

দীপু নিঃশব্দে উঠে গিয়ে [illegible] মুখ ধুয়ে ফেললো। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে ফের টেবিলের কাছে ফিরে এসে [illegible] বসলো। বাবা, বাড়ি বিক্রির ব্যাপারটা এখনো বন্ধ করা যায় না?

কিন্তু সময়টা ভুল হয়ে গেছে। এখন আর প্রশ্নটার [illegible] হবে না। নিস্তব্ধ পাড়া কাঁপিয়ে রাসমোহন চিৎকার করে উঠলেন, না! না! আমি বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছি! বাইনাপত্র! [illegible] না করলেও [illegible] তোরা [illegible]? [illegible] না করলে [illegible] দিতাম হাস-পাতালে দিতাম—তবু তোদের না।

—আমি সে কথা বলিনি। আপনি যদি কলকাতাতেই থাকতেন—আমি ঠিক করে-ছিলুম [illegible] একটা চাকরি [illegible] [illegible]ভাবে...আপনার আর কোনো কষ্ট হবে না। নতুনবউদিকে যদি এ বাড়িতে ফিরিয়ে আনা যেত—এতগুলো ঘর পড়ে আছে—আবার বাড়িটা জমজমাট হয়ে যেত—

—না, না, আমার কারুকে দরকার নেই। বাকি কটা বছর আমি ও নেই বাড়িটা নিয়ে [illegible] পারবো—কুলাঙ্গার ছেলেদের সেবা আমাকে নিতে হবে না! তোদের মা অভিশাপ দিয়ে গেছে, ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে আমি শান্তি পাবো না—

তিন ঘরে তিনজনে শুয়ে পড়ার পরও বহুক্ষণ জেগে রইলো। তিনজনেরই যন্ত্রণা আছে, কিন্তু কেউ কারুকে সান্ত্বনা দিতে পারবে না। দীপু শুনেছে পাশের ঘরে বাবা অনেকক্ষণ নিজের মনে কথা বলছেন। বড্ড বেশী রেগে গেছেন রাসমোহন, কিছু-ক্ষণের জন্য ছেলে আর মেয়ের কাছে বেশ কাতর হয়ে পড়েছিলেন তিনি, অনুনয় পর্যন্ত করেছিলেন তাঁর সঙ্গে যাবার—তাতে বাধা হয়ে এখন রাগের চোটে সব অন্ধকার দেখছেন।

দীপুর একবার মনে হলো বাড়িটা বিক্রি করে দেওয়াই বোধ হয় ভালো হবে। বাবা নিতাইদার ভয়ে কলকাতায় থাকতে পারছেন না। অথচ অন্য কোথাও গিয়ে থাকার মতন ক্যাশ টাকাও তো নেই। নিতাইদাও কলকাতা ছাড়তে চায় না—সত্যিই তো, একখানা হাত নিয়ে অচেনা জায়গায় সে হীন মানুষের মতন জীবন কাটাবেই বা কি করে? পুলিসের ভয়ে একটা লোক তো আর সারাজীবন পালিয়ে বেড়াতেও পারে না। বাবা একবার ভুল করেছেন, তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে সারা জীবন। দীপু তার বাবাকে ক্ষমা করতে চায়, কিন্তু বাবা সেই ক্ষমা চাওয়ার ভাষা বুঝবেন না।

সারাদিনের এত ঝঞ্ঝাট, এত ক্লান্তির পরও ঘুম আসছে না দীপুর। আকাশ-পাতাল ভাবছে। এবার তার একটা কিছু করা দরকার, একটা কিছু করা দরকার—এ কথাই মনে হচ্ছে বারবার। কিন্তু কি করবে? ঠিক কি? মাঝে মাঝে তার মনে পড়ছে সন্ধেবেলা ধরমতলার পাড়ায় পড়ে [illegible] সেই ঘটনা, বস্তির ঘরে সেই বীভৎস দৃশ্য, নিতাইয়ের রক্তমাখা মুখ, বোমার আওয়াজ। সেখান থেকে সে জোর করে ভাবনা ঘুরিয়ে নিচ্ছে—যেন ও সবকিছুই অলীক। বাবার কথাই সে ভাবতে চাইছে।

বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে বাবা বোধ হয় ঠিকই করেছেন। বাবার পক্ষে অন্য কোথাও চলে যাওয়াই ভালো। এ বাড়িটা কি রকম যেন ছাড়াছাড়া হয়ে গেছে। মা বড় দুঃখ নিয়ে মরেছেন এ বাড়িতে। অসুখের মধ্যে মা কথাই প্রায় বলতেন না কারুর সঙ্গে। চুপচাপ দেয়ালের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন। না, না, বাবা ভুল বলেছেন, মা অভিশাপ দিয়ে যাননি—মা তো রাগ করেননি, শুধু দুঃখ—দুঃখে কি অভি-শাপের কথা মনে আসে।

মায়ের মুখটা মনে পড়ে—অসুখের অনেক আগেকার হাস্যোজ্জ্বল মুখ। মায়ের ব্যবহার করা অনেক জিনিস এখনো আছে—নারকোল কুরুনিটার ফলা খুলে যাওয়ায় মা সেটা দীপুকে সারিয়ে আনতে দিয়েছিলেন একবার—সেই নারকোল কুরুনিটা এখন ব্যবহার হয় না—ছাদের সিঁড়ির পাশে পড়ে আছে। বাড়িটাতে অনেক আবর্জনা জমেছে, সব পরিষ্কার করে, সারিয়ে নতুন রং করে যদি আবার নতুন করে শুরু করা যেত জীবন! দীপু এ বাড়িতে জন্মেছে, এত-গুলো বছর কাটিয়েছে, তবু তেমন মায়া বোধ করছে না—এ মলিন শ্রীহীন বাড়ি ছেড়ে সে এবার চলে যাবে। কোথায়?

অরুপদের বাড়িটা ভারি সুন্দর—গোটা বাড়ির মেঝে আগাগোড়া শ্বেত পাথরে বাঁধানো। সব সময় বেশ একটা ধপধপে পরিচ্ছন্ন ভাব আছে। তবে অরুপরাও বড্ড বেশী ফার্নিচার দিয়ে বাড়ি সাজিয়েছে। একতলা আর দোতলার সিঁড়ির বাঁকেও কেন একটা আয়না দেওয়া ছোট ড্রেসিং টেবিল রেখেছে ওরা—দীপু কিছুতেই বুঝতে পারে না। ওটার কোনো দরকার ছিল? সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময়েও মানুষ নিজের মুখ দেখবে!

দীপুর মনে পড়লো গিরিডির মিশ্রজীর সেই ঘরটার কথা। ধপধপে সাদা চারটে দেওয়াল, ঠিক মাঝখানে একটি খাট ও একটা কম্বল, আর কিছু নেই। মানুষের জন্য ঠিক ঐ রকম একটা ঘরই শুধু দরকার। যত আসবাব বাড়ে, তত ধুলো জমে, জীবনটা তত গোলমেলে হয়ে যায়।

[ক্রমশ]

"দুধ আর চিনি দিই ?"
"তা কেন ? মিল্কমেড দিলেই তো হয় !"

শিক্ষা সমস্যা

সমস্যা ও সঙ্কট এতই তীব্র হয়ে চলেছে যে স্বাধীনতাও যেন স্বপ্নে মিলিয়ে যাচ্ছে। তবু স্বাধীনতা সত্য। কিন্তু সমস্যাগুলি অলীক নয়।

সমস্যা নেই কোন দিকে? জাতির চরিত্র, স্বাস্থ্য, খাদ্য, স্বাচ্ছন্দ্য, বৈষয়িক উন্নতি, মানসিক উৎকর্ষ, শাসন ব্যবস্থা—সবেতেই আমরা সমস্যাক্লিষ্ট। একটি মূল সমস্যা শিক্ষা, কারণ মানুষ তৈয়ারির এইটিই প্রধান উপায়।

যেমন প্রায় অন্যান্য ব্যাপারে, শিক্ষার ব্যাপারেও আমরা ইংরাজের শিক্ষা-কাঠামোর উপর দোষ দিয়ে শহীদের মনোভাব দেখাই। কিন্তু, ইংরাজ ত' নিজের প্রয়োজনের মাপে শিক্ষা-ব্যবস্থা করেছিলেন। আমরা স্বাধীনতা চেয়েছি ও এনেছি এই জন্যই যে আমাদের নিজের প্রয়োজন সব ব্যবস্থাই ঢেলে সাজবার সুযোগ পাব, আর কারুর ইচ্ছায় বাধ্য হয়ে কিছু করতে আর হবে না। কিন্তু, কই তা করছি বা পারছি? বরং বর্তমান যুগের সঙ্গে যোগ রেখে চলার অজুহাতে ঐ ইংরজী ও আর বিদেশী সব পদ্ধতি সমানে নকল করে যাচ্ছি। আর, নতুন প্রণালীর নামে নতুন অপব্যয়—একটার পর আরেকটা—করেই চলেছি।

আপনার 'দেশ' পত্রিকার, ৭ই চৈত্র, ১৩৭৬, সংখ্যায়, অধ্যাপক সমীরকুমার গঙ্গোপাধ্যায় "উচ্চশিক্ষার সমস্যা" বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত, সুচিন্তিত বক্তব্য রেখেছেন। এত সংক্ষেপে এই বিশাল ও জটিল সমস্যার কোন সমাধান পাওয়া সম্ভব নয়। তবুও নিপুণ হাতে তিনি গুটি কয়েক গোড়ার প্রশ্ন তুলে ধরেছেন।

শিক্ষার প্রতি অবহেলা একেবারে গোড়ার কথা। তারই আনুসঙ্গিক হচ্ছে—ইংরাজী শিক্ষার প্রতি অবহেলা। অভিভাবকের দায়িত্ব আর শিক্ষকের প্রেরণামূলক চরিত্র—এই দুটি প্রধান অভাবের কথা তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। মত্র অভিভাবক বিষয়ে অধ্যাপক মহাশয়ের সঙ্গে একমত হতে পারছিনে। শিক্ষার বায় মেটাতে গিয়ে অভিভাবকের এত শ্রম ও সময় যায় যে তারপর আর বাপ-মার পক্ষে ছেলেমেয়ের পড়া দেখাশোনার অবকাশ সম্ভব নয়। ন্যায়সঙ্গত ভাবেই তাঁরা আশা করতে পারেন, এরপর শিক্ষক আর সরকার সব দেখবেন। পুরাকালে, যখন শিক্ষার বায় জোগাতে হ'ত না তখনও গুরুর আশ্রমে ছাত্রকে পাঠিয় দিয়ে বাপ-মা নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন। যাই হোক, সরকারি অব্যবস্থিত চিত্তের নানা শৌখিন প্রয়াস শিক্ষার বনেদ যে স্থির ও শক্ত হতে পারছে না, এ বিষয়ে সম্ভবত কারুরই দ্বিমত হবে না। সরকারি কর্তৃত্বের আস্ফালনই যেন শিক্ষা-সংস্কারের প্রেরণা, এ কথা শিক্ষার গতি যিনিই লক্ষ্য করছেন তিনিই মানবেন। তবুও, মানুষ গড়ার শিল্পী যে শিক্ষক, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় যে "অন্যূন দেড় লক্ষ আত্মাভিমানী প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষকের" বিবেকের কাছে আবেদন করেছেন সেটি সমীচীন আবেদন।

সর্বোপরি, ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে রাজনৈতিক শিক্ষকদের কোথাও আপোস কোথাও বিরোধ—এটিই আজ সর্বাপেক্ষা মারাত্মক বিপর্যয়ের আকর। এইখানেই ছাত্রের চেয়ে শাসক ও শিক্ষক উভয়েরই অপরাধ গভীর। কি ভয়াবহ স্বার্থের মধ্যে তরুণ-তরুণীকে আমরা ফেলেছি। আমাদের কোন ত্রুটির পরিশোধ তারা এইভাবে নিচ্ছে। আমাদের কোন পাপে তারা তাদের নিদারুণ হতাশাকে রূপে, বিকৃত, রোমাঞ্চে রূপায়িত করছে। কি অভাবের ভাব-মূর্তি আজকের এই যুব-উচ্ছৃংখলতা?

অতুলানন্দ চক্রবর্তী
কলকাতা-২

॥ ২ ॥

'দেশ' পত্রিকায় সমীরকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সুচিন্তিত ও সময়োপযোগী প্রবন্ধ পড়ে অন্তত মনে হ'ল কয়েকজন আছেন যাঁরা দেশের উচ্চশিক্ষার সমস্যা সম্বন্ধে গভীর চিন্তা করেন। নানা কারণে এ প্রবন্ধের আলোচনা আরও দীর্ঘ ও ব্যাপক হওয়া উচিত ছিল কিন্তু লেখক কেবলমাত্র তিনটি মুখ্যগুণ সমস্যার কথাই বলেছেন। যদিও আমি একথা স্বীকার করি যে, সমস্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আমাদের দেশে কেন পৃথিবীর সব দেশেই অল্পবিস্তর আছে। ভারতবর্ষের যে সমস্যা তার বাহিরে এবং অন্তরে যে অদৃশ্য রাজনীতির নিছক প্রহসন আছে তাকে আমরা জাতীয়তা মনে করি। কিন্তু আমার দেশের মানুষ একথা স্বীকার করেন না যে, উচ্চশিক্ষার স্তরে ইংরাজীর ব্যাপক প্রচলন জাতীয়তার কোন সূত্র নেই।

যাই হোক, লেখকের মনে যে সমস্যা উদয় হয়েছে তা হচ্ছে প্রথমত সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন, দ্বিতীয়ত কলেজীয় শিক্ষায় ইংরাজীর স্থান না থাকা। একথা অনস্বীকার্য যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকের মৌলিক স্থান না থাকায় অধিকাংশ উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণ যুবকের দল আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সমস্যার কারণ হয়ে ওঠেন। কিন্তু আমি শুনেছি যে, জাপানে ইঞ্জিনিয়ারিং কিংবা ডাক্তারী পড়তে হ'লে আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে অবশ্যই পড়তে হবে। অথচ নামী জাপানী

কাহিনীগরবিদ ও শ্রেষ্ঠ আইনবিদ হিসাবে অনেকেই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হয়েছেন। অধিকদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকায় এবং বিদেশের শ্রেষ্ঠ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার পর আলোচনার মাধ্যমে আমি একথা জানতে পেরেছি যে, আজকে ভারতবর্ষের যে জাতীয়তাবাদ ভাষাক্ষেত্রে প্রচলন হ'তে চলেছে তার পরিণাম খুবই বিপজ্জনক। যেখানে পৃথিবীর সবদেশে ইংরাজী ভাষার একটা আন্তর্জাতিক সূত্র আছে, যার মাধ্যমে আমরা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদদের মৌলিক গবেষণার ইতিহাস জানতে পারি—শুধুমাত্র রাজনৈতিক মতভেদের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সংস্পর্শ কমে আসবে একথা সত্যই দুঃখজনক।

লেখকের তৃতীয় সমস্যা—স্কুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অমনোযোগী শিক্ষা প্রচারের প্রসঙ্গে। আমাদের দেশে অধ্যাপকদের বেতন ও সামাজিক সম্মান যে স্তরে আনা হয়, সেখানে মৌলিক চিন্তাবিদ শিক্ষকের মন ছাত্রদের গভীর শিক্ষা প্রচারের ক্ষেত্রে যে সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে এটা স্বাভাবিক। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের সঙ্গে ভারতবর্ষের অধ্যাপকদের তুলনামূলক আলোচনা করলে একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, উচ্চশিক্ষার সমস্যা মূলত নির্ভর করে দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর উপর। ভারতবর্ষের কথা ধরুন—বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে পরবর্তী যে উচ্চশিক্ষা সেটা অবশ্যই আন্তর্জাতিক শিক্ষার সঙ্গে একই সূত্রে আবদ্ধ। সুতরাং যদি মৌলিক গবেষণার জন্যে উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের সরবরাহ না থাকে তাহলে কেবলমাত্র জাতীয়তাবাদের দোহাই দিয়ে আমাদের দেশ উন্নত হবে কি করে? আমার স্থির বিশ্বাস—ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্রে উদার মনোভাব প্রয়োজন। ব্যক্তিগতভাবে আমার ক্ষেত্রেও এই সমস্যা ভীষণ ব্যাপক হয়ে দেখা দিয়েছে। ভারতবর্ষের আইনশিক্ষার পশ্চাতে ইংল্যাণ্ডের উচ্চশিক্ষার এক অদ্ভুত যোগসূত্র আছে। যে কোন আইনবিদ মাত্রই একথা জানেন যে, আইন শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদেশের আইন অপরিহার্য। অথচ বিদেশের শিক্ষা গ্রহণ করতে হলে প্রথম থেকে ইংরাজী ভাষার ক্ষেত্রে দখল থাকা প্রয়োজন। সমস্যা যখন দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদকে দুর্বল করে দেয়, রাজনীতির চক্রান্ত কখনই মানুষের শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত করতে পারে না। যাঁরা দেশের কর্ণধার তাঁরা রাজনৈতিক দলগত বৈষম্য ভুলে গিয়ে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে উদার মনের পরিচয় দেবেন। উচ্চশিক্ষা বলতে আমরা বুঝি মৌলিক গবেষণা বা স্নাতকোত্তর ব্যবহারিক শিক্ষা। এক্ষেত্রে পৃথিবীর সব দেশের ছাত্রদের মধ্যে

এক উচ্চ রুচিজ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষার সেতু রচনা করা উচিত।

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়
শিবপুর, হাওড়া।

॥ ৩ ॥

'দেশ' পত্রিকার (৩৭ বর্ষ, ২১ সংখ্যা) "উচ্চশিক্ষার সমস্যা" শিরোনামাঙ্কিত সমীরকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখাটি সুচিন্তিত এবং পরিচ্ছন্ন। কিন্তু তাঁর এই পরিচ্ছন্ন বক্তব্যে আমার মন কিঞ্চিৎ অচ্ছন্ন হলেও প্রচ্ছন্ন না রাখার ভঙ্গীতে আসল কথাটি প্রকট করতে চাইছি।

'ইংরেজীকে নির্বাসিত করে উচ্চশিক্ষা 'সফল' হবে না, এ কথা সত্য নয়; কিন্তু ইংরেজীকে পুনর্বাসন দিয়ে উচ্চশিক্ষা যে 'সবল' হবে সে কথাও অনুভববেদ্য। তাই "আংরেজী হটাও" বলে যতখানি হঠকারিতা করা হবে, তার থেকে বেশী করা হবে মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা দেখিয়ে। বলাবাহুল্য, একদিকে আমরা যেমন "আংরেজী"কে গ্রহণ করতে পারছি না, ঠিক অনুরূপভাবে "মাতৃভাষা"কেও রীতিমত হজম করতে অপারগ হচ্ছি। তাহলে আমাদের পরিগতি কি, আর পরিগতিই বা কোন্ পথে! এই পরিস্থিতিতে আমরা যেমন ইংরেজীকে যথাযথ আয়ত্ত করতে পারছি না, বাংলা ভাষাকেও প্রকৃত পাক্ষ করায়ও করতে অক্ষম হচ্ছি। এই অপটুত্বের জাজ্জ্বল্য চিত্র বাংলাদেশের বিদ্যালয়ের ছাত্রদের লেখাভঙ্গীতে সুস্পষ্ট। নতুন শব্দ সঞ্চয় করা দূরে থাক সচরাচর কথ্য বানানগুলির অবিকৃত ছাঁচগুলো বারবার বিকৃত হয়ে পরীক্ষকদের রীতিমত ভ্রান্তি উৎপাদন করে এবং নিরুপায় হয়ে আপন অধীত বিদ্যাকে শানিয়ে নিতে তাঁদের মাঝে মাঝে অভিধানেরও আশ্রয় নিতে হয়। ছাত্রদের এই দোষ মুখ্যতঃ শিক্ষকেরাই স্খলন করতে পারেন। কিন্তু এহেন দায়িত্বের কৃতিত্ব শিক্ষকেরা অবশ্যই পান যখন তাঁর ছাত্রেরা পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করে। বলাবাহুল্য, সেই সাফল্যের আনন্দে ছাত্র-অভিভাবক এবং অনুরক্তের দলে আহ্লাদিত হয়। বস্তুত, এমত আহ্লাদের অন্তরালে শিক্ষকদের কতখানি বেদনা লুকিয়ে থাকে তাঁরা কি কখনো লক্ষ্য করেন! গাল ফুলিয়ে অনেকেই যত্রতত্র বাগাড়ম্বর করেন "শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড।" কিন্তু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করেছেন কি তাঁরা এই মেরুদণ্ডী প্রাণীরা ক্রমশ মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়ছেন। শিক্ষার মান বাড়ানোর জন্যে শিক্ষকদের সংচর্য অত্যাবশ্যকীয় হয়, ছাত্র-ছাত্রীদের অনুজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্যেই শিক্ষকদেরই আবার কাঠগোড়ায় সোপর্দ করা হয়। কিন্তু কই, শিক্ষকদের সামাজিক মান বা সাংসারিক মান বাড়াবার জন্যে তো কোন কৈফিয়ৎ কেউ তলব করে না! কেবল একতরফা আন্দোলনে শিক্ষার মান বাড়ানো যায় না; সেই সঙ্গে শিক্ষকদের সম্পর্কটিও অচ্ছেদ্য এবং অভিন্ন। এতদ্ব্যতিরেকে শিক্ষার সাফল্য অনিশ্চিত।

প্রবন্ধের উপসংহারে বলা হয়েছে "...সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থার সাফল্যের চাবিকাঠি শিক্ষকদের হাতে"। হাঁ, কথাটা ঠিকই, তবে সিন্দুকটি তাঁদের নাগালের বাইরে অর্থাৎ জ্ঞান নিয়ে মন ভরে, উদর ভরে না।

রজতকুমার পাণ্ডা
কলিকাতা-৯

সরগমের নিখাদ

আমি কয়েক সপ্তাহ ধরে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীশচীনদেব বর্মণ লিখিত 'সরগমের নিখাদ' শীর্ষক নিবন্ধটি মনোযোগ দিয়ে পড়ে আসছি, কারণ কোন এক সময়ে বর্মণমহাশয় আমাদের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। তাই তাঁর রচনায় তাঁর জীবনের এক বিশেষ অধ্যায় সম্পর্কে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য ও মনোযোগের অভাব লক্ষ্য করে অত্যন্ত ব্যথিত হলাম।

প্রখ্যাত কবি অজয় ভট্টাচার্য আধুনিক সঙ্গীতের কথাকার হিসেবে যে প্রধানতম পথিকৃৎ সে বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই বলেই আশা করি। প্রকৃতপক্ষে চলতি শতকের চতুর্থ দশকে কাব্যধর্মী রাগাশ্রয়ী আধুনিক বাংলা সঙ্গীতের জন্ম হয় গীতিকবি অজয় ভট্টাচার্য, সুরকার হিমাংশু দত্ত ও গায়ক শচীনদেব বর্মণের ত্রিবেণী সঙ্গমে। এ সত্য অনস্বীকার্য যে, নিজ নিজ প্রতিভার স্ফুরণে এঁরা পরস্পর পরস্পরের সহায়ক হয়েছিলেন। এ ত্রয়ী পরস্পরের পক্ষে একরকম

অপরিহার্য ছিলেন এবং বঙ্গের ফিল্ম জগতে ফিল্মী গানের সুরকাররূপে প্রতিষ্ঠিত হবার অনেক আগেই বর্মণমহাশয় এই বাংলাদেশেই সংগীত-জগতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন মূলত অজয় ভট্টাচার্য লিখিত বিখ্যাত গানগুলির গায়ক হিসেবেই। উপযুক্ত বাণী না হলে সুর সহজে লীলায়িত হতে চায় না। তিনি ভাবসম্পদে ভরা কবির রসস্নিগ্ধ গান-গুলিতে সুমিষ্ট সুর প্রয়োগ ও স্বকীয় ভঙ্গিতে বিশিষ্ট কুশল কণ্ঠের সাহায্যে তাদের অসাধারণ জনপ্রিয় করে তোলেন। অজয় ভট্টাচার্য লিখিত এবং শচীনদেব বর্মণ গীত—'ওরে সুজন নাইয়া', 'তুমি কি আমার বন্ধুরে', 'ফুলের বনে থাক ভ্রমর', 'শ্রবণে বধির হব না শুনিব বাঁশী', অথবা 'প্রিয় আজো নয়, আজো নয়', 'আলোছায়া দোলা উতলা ফাগুনে', 'আজি গোধূলির ছায়া পথে', 'মম মন্দিরে এলে কে তুমি', 'আমি ছিনু একা' ইত্যাদি অজস্র বিখ্যাত গান যা আজও বাংলাদেশের সংগীতপিপাসু বিদগ্ধ সমাজ ভুলতে পারেন নি। অজয় ভট্টাচার্যের শেষ ছবি "ছদ্মবেশী"তেও বর্মণ মহাশয় সংগীত পরিচালক ছিলেন এবং

তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই তিনি বোম্বে চলে যান।

কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য ও দুঃখের সঙ্গে আমি লক্ষ্য করলাম যে, বর্মণ মহাশয় তাঁর সঙ্গীত জগতে প্রতিষ্ঠার প্রধানতম সহায়ককে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদাটুকু দিতে কুণ্ঠিত হয়েছেন। তাঁর জীবন কাহিনীতে অজয় ভট্টাচার্য সম্বন্ধে দু' লাইনে দায়সারা উল্লেখ করেই কর্তব্য সেরেছেন। আশ্চর্য! একটি গানেরও উল্লেখ করেন নি।

সঙ্গীত জগতে কবি অজয় ভট্টাচার্যের অবদান নিয়ে নতুন করে কিছু লেখার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। কারণ জনসাধারণের কবি ও গীতিকার হিসেবে তাঁর যে খ্যাতি বাংলার সর্বত্র একদিন ছড়িয়ে পড়েছিল তা বিশেষ কারুর স্বীকৃতি ছাড়াই আপন মহিমা ও বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে, যতদিন আধুনিক বাংলা গানের ধারা জীবিত থাকবে ও বাঙালীর রসবোধ অটুট থাকবে।

রেণুকা ভট্টাচার্য
কলকাতা-২৯

॥ ২ ॥

কবি গানের রূপদান করেন, সুরকার করেন প্রাণ প্রতিষ্ঠা, গীত শিল্পী তাকে দেয় গতি, সেই গান যখন শ্রোতার পরিতৃপ্তি আনে তখন হয় তার সার্থক পরিণতি। বাংলা গানের আধুনিক পর্বে রজনীকান্ত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, কাজী নজরুল ও দিলীপকুমার সকলেই ছিলেন কবি, সুরস্রষ্টা ও গায়ক। তাই তাঁদের গান হয়েছে স্বয়ংসম্পূর্ণ। হয়তো কোথাও গায়কের স্বাধীনতা সীমায়িত রাখা হয়েছে, কোথাও বা হয়নি। এর পরে একাধারে কথা ও সুরের একত্র সমাবেশ আর হয়নি। যেখানে গীতিকার ও সুরকার বিভিন্ন সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই কথা ও সুরের দ্বন্দ্ব দেখা দিল। কথা স্বরলিপির ফাঁসে বাকরুদ্ধ হতে চায় না যেমন, তেমনি সুরও বর্ণমালার ফাঁসে শ্বাসরুদ্ধ হতে নারাজ। এ সমস্যা শুধু গীতিকার সুরকারের-ই নয় গায়ক ও শ্রোতারও বটে।

বাংলা গানের এই পর্বে গীতিকার-সুরকার রূপকার সমঝদারের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টায় যারা সফল হলেন তাঁদের মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র দে, রাইচাঁদ বড়াল, হিমাংশু দত্ত, পঙ্কজ মল্লিক, শচীনদেব বর্মণ, শৈলেশ দত্ত গুপ্ত, কমল দাশগুপ্ত প্রমুখ সুরকার; হেমেন রায়, সুবোধ পুরকায়স্থ, অজয় ভট্টাচার্য, শৈলেন রায়, প্রণব রায় প্রমুখ গীতিকার এবং কৃষ্ণচন্দ্র দে, শচীনদেব বর্মণ, পঙ্কজ মল্লিক ও বাংলা গানের পরিপ্রেক্ষিতে ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র প্রমুখ কণ্ঠশিল্পীদের সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করি। ত্রিশ-চল্লিশ দশকে এ'দের শিল্পকর্ম যেমন উন্নাসিক তাত্ত্বিকদের রক্ষণশীলতার গণ্ডি থেকে মুক্ত করেছিল, তেমনি সাধারণ শ্রোতাদের রুচি ও রসবোধ জাগ্রত ও উন্নত করেছিল। একটা সুস্থ সাংগীতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হল।

হিমাংশু দত্ত, শচীন দেব বর্মণ, সুবোধ পুরকায়স্থ, অজয় ভট্টাচার্য এই শিল্পী গোষ্ঠীর বাংলা গানে একটা বিশেষ অবদান আছে। মিলন-বিরহ-বেদনা-আনন্দের গানের কাব্যে যেমন অতি কাল্পনিক দর্শনের রহস্য নাই, তেমনি অতি বাস্তব প্রদর্শনের নগ্নতাও নাই। রাগ সংগীতের ভিত্তির উপর প্রাদেশিক ও বৈদেশিক সংগীতের উপকরণে রচিত গানের সুরে যেমন অতি তাত্ত্বিক নিখুঁত সুরের খুঁতখুঁতোনি নাই, তেমনি অবাধ সুরের অবৈধ মেলামেশাও নাই। শব্দ ও সুর চয়নে সর্বাঙ্গসুন্দর গানে আছে কাব্যের সরল অনাবিল নিবেদন, আর সুরের সহজ সাবলীল আবেদন। ব্যঞ্জনার সুযোগ ও তার স্বীকৃতি রয়েছে এ'দের গানে। তাই এই শিল্পসৃষ্টি হয়েছে সর্বকালের ও সর্বজনের। অজয়ভট্টাচার্যের কথা-কাকলি, হিমাংশুকুমারের 'সুর-হিল্লোল' ও কুমার শচীনের স্বর-কল্লোল বাংলা গানের এক অমূল্য সম্পদ।

মিউজিক ডিরেক্টার শ্রী এস্ ডি বর্মণের খ্যাতি আজ ভারত ছাড়িয়ে বিশ্বের দরবারে পৌঁচেছে। কিন্তু ত্রিশ-চল্লিশ দশকের বিদগ্ধজনের মনে বাংলা গানের মরমী সুরকার ও দরদী রূপকার শচীনকর্তা এক বিশেষ অনুভূতিতে বিদ্যমান। লোক-সংগীতের আমেজ আর রাগ সংগীতের মেজাজে অভিনব সুর-সংযোজনা এবং অননুকরণীয় ভঙ্গিতে তার অপরূপ রূপায়ণ শ্রীদেব বর্মণের প্রগতিশীল সংগীতচিন্তা ও সৃজনশীল প্রতিভার ফলশ্রুতি। এ তার একান্ত নিজস্ব শৈলী। মূলত সুরপ্রধান হলেও তাঁর সংগীতে গানের বাণীর প্রত্যেটি কথা তিনি দরদ ঢেলে সুরায়িত করেছেন। অধিকাংশ গান রচনা করেছেন অজয় ভট্টাচার্য। নিজস্ব সুরের গান ছাড়াও তিনি অন্যের সুরে যে গান গেয়েছেন পরিবেশনের গুণে সে গানে সুরকারের বৈশিষ্ট্য ও শিল্পীর নিজস্ব গায়কী সমানভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সুরারোপ ও সংগীত ব্যাঞ্জনায় এই পরিমিতি বোধের জন্য তাঁর রাগভিত্তিক গানগুলি যেমন কেবলমাত্র বাংলা খেয়াল বা বাংলা ঠুংরী না হয়ে "রাগপ্রধান" বাংলা গানের প্রামাণিক নিদর্শন হয়ে আছে, তেমনি নানা সুরের সংমিশ্রণে রচিত তাঁর সেকালের "আধুনিক" গানগুলি আজো অভিনব। তাঁর গায়ন ভঙ্গি যেমন শহুরে সমাজে পল্লী সংগীতের প্রতিষ্ঠা করেছে তেমনি সাধারণ শ্রোতাদের রাগ সংগীতে আকৃষ্ট করেছে। প্রতিভাবান শিল্পীর শিল্পায়নে শ্রোতা সুস্থ সংগীত সচেতন হয়েছে।

বাংলা গানের এই শ্রদ্ধেয় শিল্পীদের সম্বন্ধে আলোচনা ও অনুশীলনের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। গীতিকার সুরকার ও

সুরকার, এবং শিল্পী ও শ্রোতার পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত করতে এইরকম আলোচনা ও অনুশীলনের প্রয়োজন আছে। "সরগমের নিখাদ" গভীর আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের সঙ্গে পড়ছি। এই প্রবীণ শিল্পীর কাছ থেকে নবীন শিল্পীদের অনেক জানার ও শেখার আছে। অভিজ্ঞ শিল্পীর সুচিন্তিত আলোচনা ও মূল্যবান অভিমত নবীন শিল্পীদের পথ নির্দেশ করুক।

প্রসঙ্গক্রমে ২১শে ফেব্রুয়ারী, ৭ই, ১৪ই ও ২৮শে মার্চ সংখ্যার আলোচনায় যে সব প্রশ্ন উঠেছে। সে সম্পর্কে আমার যতটুকু জানা আছে তা জানাবার চেষ্টা করছি।

শ্রীদেব বর্মণের সংগীত পরিচালনায় বাংলা ছবিঃ—১। অমর জ্যোতি (?) ২। রাজগী (ছবির টাইটেলে সংগীত পরিচালক ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় ও সুরকার শচীনদেব বর্মণ দেওয়া ছিল)। ৩। রাজকুমারের নির্বাসন। ৪। প্রতিশোধ। ৫। অভয়ের বিয়ে। ৬। মিলন। ৭। অশোক। ৮। জজ সাহেবের নাতনী। ৯। ছদ্মবেশী। ১০। মাটির ঘর। ১১। প্রতিকার। ১২। সমর। ১৩। চৈতালী (নির্মীয়মান)।

ছায়াছবিতে গাওয়া শ্রীদেব বর্মণের গানঃ ১। (?) (সেলিমা)। ২। ওরে সুজন নাইয়া (সাঁঝের পিদিম)। ৩। তুমিনি আমার বন্ধু (সুদূর প্রিয়া)। ৪। মনের কথা কইবার আগে (রাজগী)। ৫। সাজে নওল কিশোর চাঁদের তিলকে (ঐ)। ৬। বাঁশুরিয়া রে কোথায় শিখেছ বাঁশী বাজান (রাজকুমারের নির্বাসন)। ৭। হা দিল বেতব (অভয়ের বিয়ে)। ৮। চোখ গেল পাখী রে (নন্দিনী)। ৯। অবোধ নেয়ে উজান বেয়ে যাও (প্রতিশোধ)। ১০। কি মায়া লাগল চোখে সকাল বেলা (ঐ) ১১। বিদেশী রে উদাসী রে ফিরে তুমি যাও (এপার ওপার)। ১২। কে যেন কাঁদিছে আকাশ ভুবনময় (নারী)। ১৩। জনম দুখিনী সীতা (জীবনসঙ্গিনী)। ১৪। বাংলার মেয়ে বাংলারি তুমি (ঐ)। ১৫। শ্যামা নয় রে ভয়ংকরী (?)। (মিলন)। ১৬। বন্দর ছাড়ো যাত্রীরা সবে (ছদ্মবেশী)। ১৭। কাল সাগরের মরণ দোলায় (মাটির ঘর)। ১৮। শ্যামরূপে ধরিয়া এসেছে মরণ (ঐ)।

অন্যর সুরে গাওয়া শ্রীদেব বর্মণের রেকর্ডের গানঃ—

ক। সুর-হিমাংশু দত্তঃ—কথা অজয় ভট্টাচার্যঃ—১। তুমি তো বঁধু জানো কাঁদিছে কেন আঁখি। ২। বঁধু এলো মধু রাতে। ৩। যদি দখিনা পবন আসিয়া ফিরে গো দ্বারে। ৪। আলোছায়া দোলা। ৫। মম মন্দিরে এলে কে তুমি।

খ। কথা-শৈলেন রায় ঃ—১। প্রেমের সমাধি তীরে। ২। জনম দুখিনী সীতা। ৩। বাংলার মেয়ে বাংলারি তুমি। গ। কথা-বিনয় মুখোপাধ্যায়ঃ—১। নতুন ফাগুনে যবে আজি ধরা চঞ্চল। কথা ও সুর—কাজী নজরুলঃ—১। কুহু কুহু কোয়েলিয়া ২। মেঘলা নিশি ভোরে। ৩। পদ্মার ঢেউ রে। ৪। চোখ গেল পাখিরে। সুর-শৈলেশ দত্তগুপ্ত ঃ—কথা-অজয় ভট্টাচার্য ঃ—১। প্রিয় আজো নয়। ২। গোধূলির ছায়াপথে।

সুর-সুবল দাশগুপ্ত কথা-অজয় ভট্টাচার্যঃ—১। কথা কও দাও সাড়া।

শ্রীদেব বর্মণের নিজস্ব সুরে গাওয়া রেকর্ডের কয়েকটি বিখ্যাত গানঃ—কথাঃ অজয় ভট্টাচার্যঃ—১। স্বপন না ভাঙে যদি। ২। আজি রাতে কে আমারে। ৩। ঝলনে ঝুলিছে শ্যামরায়। ৪। প্রাণের প্রভু রহ প্রাণে। ৫। এই মহুয়া বনে। ৬। কণ্ঠে তোমার দুলবে বলে। ৬। স্বপন দেখেছে গিরিরানী। ৭। বিদায় দাও গো মোরে। ৮। জাগার সাথী গো মম। ৯। বল বল বঁধু। ১০। ঝন্ ঝন্ ঝন্ মঞ্জীরা। ১১। পোহাল রাতি জাগিয়া। ১২। তোমারি সাথে সুরে পরিচয়। ১৩। পরদেশে কেন গো রহিলে। ১৪। তুমি যে ছিলে মোর। ১৫। জাগো মম সহেলী গো। ১৬। প্রেম যমুনারি পারে। ১৭। তুমি যে গিয়াছ। ১৮। কাঁদিব না ফাগুন গেলে। ১৯। চম্পক জাগো জাগো। ২০। আমার মিলন মালাটি। ২১। মেঘ ঝরে যায়। ২২। ছিল মাধবী রাতি গো। ২৩। আমি ছিনু একা। ২৪। যবে অলকের ফুল। ২৫। ফিরে গেছি বারে বারে। কথা-শৈলেন রায়-১। এ পথে আজ এস প্রিয়া। কথা ঃ জসীমউদ্দীন—নিশিথে যাইও। কথা ঃ হেমেন রায়। ১। ও কালো মেঘ। ২। এই কাননের ফুল। কথাঃ অন্যান্য ১। মলয়া চল ধীরে। ২। মধু বৃন্দাবনে। ৩। ললিত মরমী সখি। ৪। প্রিয় রজনীগন্ধা বনে। ৫। ভুলায়ে আমায় দুদিন। ৬। বঁধু গো এই মধুমাস। ৭। বাসরের ফুল গেল যে শুকায়ে। ৮। আমি পথ চেয়ে রব। ৯। প্রেম যমুনায়। ১০। কি যে করি। ১১। ঝিলমিল ঝিলের জলে। ১২। মালাখানি ছিল হাতে। ১৩। আঁখি শুধু শুধু ঝরে যায়। ১৪। ঘুম ভুলেছি নিঝুম নিশিতে। পল্লীগীতি—১। রইব না আর উজান ঘরে। ২। মনদুখে মরি রে সুবল। ৩। বঁধু বাঁশী দাও মোর হাতে। ৪। কে যাবি চল বৃন্দাবনে। ৫। গৌর রূপ দেখিয়া। ৬। পিঞ্জিরার পাখির মত। ৭। বাঝি মোর প্রাণ যায়। ৮। আমার কি হল গো। ৯। তুই কি শ্যামের বাঁশী। ১০। রঙ্গিলা রে। ১১। ধিক্ ধিক্ আমার এ জীবন।

অন্যের রেকর্ড করা শ্রীদেব বর্মণের সুরে অজয় ভট্টাচার্যের কয়েকটি বিখ্যাত গান—১। মরমী গো চলে যায় (শিল্পী পদ্মা মীরা দেবী)। ২। প্রভাতে আজ কে এলে (ঐ)। ৩। চির হে চির (ঐ) ৪। তমালের হিয়া তল (ঐ)। ৫। আমার পিয়াল বনে (ঐ) ৬। ওরে যোগী প্রেম বিনা (ইভা গুহ) ৭। কে গো বাজায় (ঐ)। ৮। মঞ্জু রাতে আজি তন্দ্রা (হরিপদ রায়)। ৯। আজি কে মধুবনে (শৈল দেবী)।

রেকর্ড করা হয়নি শ্রীদেব বর্মণের সুরে এমন কয়েকটি বিখ্যাত গানঃ—কথাঃ অজয় ভট্টাচার্য ১। তুমি এলে হায়। ২। দেহ মোর দেউল করিয়া। কথা ঃ অন্যান্য—১। কৃষ্ণ বিহনে বৃন্দাবনে। ২। তুমি যেওনা চলে অভিমানে। ৩। আমি তো চলিনু সখি। ৪। চুপি চুপি কে এলে।

পরিশেষে বক্তব্য বর্ষীয়ান প্রবীণ শিল্পীর স্মৃতিচারণে সংখ্যা ও সালের বিভ্রান্তি থাকা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। এ সব হিসাব তো তাঁর অনুরাগীরা রাখবেন, যাঁদের কাছ থেকে আশা করব আরো তথ্য ও শিল্পীর তাত্ত্বিক মূল্যায়ন। 'সরগমের নিখাদ' প্রকাশ করার জন্য দেশ কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে ও শ্রদ্ধেয় শিল্পীকে প্রণাম জানিয়ে আমি আমার সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার অক্ষম লিখন শেষ করছি।

কনক দাশগুপ্ত
কলকাতা-৩৩

॥ ৩ ॥

২৮শে মার্চ '৭০, 'দেশ' সংখ্যায় "সরগমের নিখাদ" পর্যায়ের আলোচনায় শ্রীযুক্ত সলিল ঘোষ মহোদয়কে জানাই যে, ১৯৬১ সালের "মেঘ ও রৌদ্র আঁখে" ছবিটি ডঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত রচিত বাংলা ছবি "উল্কা"র উপর ভিত্তি করে তৈরী হয়েছিল, ভুলক্রমে "রিক্তা" ছবির নাম প্রকাশিত হয়েছে (পৃঃ ৮৭৫)।

আশা করি এই ভ্রম সংশোধন করিবেন।

দেবাশীষ সেন
কোলকাতা-২৯

ভ্রম সংশোধন

গত ৪ এপ্রিলের দেশ পত্রিকার আলোচনা বিভাগে শ্রীআবু সয়ীদ আইয়ুবের যে চিঠি প্রকাশিত হয়েছে অনবধানতাবশত তার কয়েকটি লাইন বাদ পড়ে গিয়েছে। তা হচ্ছে এই ঃ

"সংস্কৃত আমি শিখিনি। বাংলা ভাষ সাধনা করতে গেলে কতকগুলো সংস্কৃত বাক্য ও বাক্যাংশ আপনি শেখা হয়ে যা সেইটুকু আমার বিদ্যা।"

এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখি

—সম্পা

লিটল ম্যাগাজিন

'বামার' নামে একটি পত্রিকা "লিটল ম্যাগাজিন সংরক্ষণ সমিতি" সম্পর্কে এক প্রস্তাব তুলেছেন। এঁদের প্রস্তাবের মধ্যে আছে, "নিয়মিত প্রকাশিত রেজিস্টার্ড পত্রিকার তরুণ সম্পাকদের নিয়ে সমিতি গঠন করা"; "পাঁচ থেকে এগার জনকে নিয়ে কার্যকরী সদস্য এবং অন্যান্য কম শক্তিশালী গোষ্ঠীদের সাধারণ সদস্য করা"; "লিটল ম্যাগাজিনের প্রকৃত আদর্শ, সাধারণ লক্ষণ ইত্যাদি নির্ধারণ করা; "সেমিনার, মিছিল, প্রতিযোগিতা, প্রদর্শনী, সম্পাদক-সম্মেলন, লিটল ম্যাগাজিন দিবস ইত্যাদি।"

প্রস্তাব খুব সাধু। সফল হলে অনেকেরই আনন্দিত হওয়ার কথা। তবে এ ধরনের সমিতি গঠনের সাফল্য সম্পর্কে আমার ঘোর সন্দেহ আছে। এস্টাব্লিশমেন্ট বিরোধিতাই লিটল ম্যাগাজিনের জন্মের মূল কারণ—তারপর আবার সমিতি গঠন, সম্মেলন, প্রতিযোগিতা—ইত্যাদি আর একটি এস্টাব্লিশমেন্টেরই নামান্তর। পাঁচটি লিটল ম্যাগাজিনের পাঁচজন সম্পাদক মিলে যদি একটা কমিটি করেন, তাহলে, আমার ধারণা, তাঁদের অনবরতই মত পার্থক্য ঘটবে—নইলে আর পাঁচটা পত্রিকা বার করার মানে কি, একটা পত্রিকাই তো যথেষ্ট!

যতদূর মনে পড়ে, 'লিটল ম্যাগাজিন' কথাটা বাংলা দেশে প্রথম চালু করেন বুদ্ধদেব বসু, বছর পনেরো আগে তিনি এই বিষয়ে "দেশ" পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধটি তাঁর "সাহিত্য চর্চা" গ্রন্থে ছাপা হয়েছে। এখনকার লিটল ম্যাগাজিনের উদ্যোক্তারা প্রবন্ধটি পড়ে নিতে পারেন। লিটল ম্যাগাজিন মানে নিছক ছোট কাগজ নয়। বস্তুত আকারের ক্ষুদ্রত্বের সঙ্গে এর যোগাযোগ নেহাৎ আকস্মিক।

যিনি লেখক, তাঁর পক্ষেই আবার পত্রিকার সম্পাদক কিংবা প্রকাশক হওয়া অত্যন্ত বিড়ম্বনার ব্যাপার। প্রকৃত লেখকের পক্ষে এ ঝঞ্ঝাট না নেওয়াই ভালো। কিন্তু তরুণ বয়েসে অনেক লেখকের মনে হয়, হতে পারে, যে আমি যে-ধরনের লেখা লিখবো বা লিখতে চাই বা বিশ্বাস করি—সে-রকম রচনা প্রকাশ করার মতন কোনো কাগজ এ দেশে নেই। আমি প্রচলিত সাহিত্যরীতিকে তছনছ করে, ভয় পাইয়ে দিয়ে (ধ্বংস করে নয়, ওটা ভুল। সাহিত্য কোনো কিছুই ধ্বংস করে না।) নতুন সাহিত্য সৃষ্টি করতে চাই, এবং তার বাহন হবে নতুন একটি পত্রিকা। সেই থেকে নতুন পত্রিকার জন্ম। অনেক সময় একজন লেখকের বদলে, গুটি পাঁচ-ছয় তরুণ একমনস্ক হয়ে এরকম একটি পত্রিকা বার করেন। এই সব পত্রিকার শুধু যে সম্পাদক বা প্রকাশকই এঁরা হন, তাই নয়—দু'-একটা বিজ্ঞাপন পাবার জন্য স্বয়ং লেখকদেরই বিজ্ঞাপনদাতাদের অনুগ্রহের জন্য দু' এক শো' বার ঘুরতে হয়, ছাপাখানায় তদারক ও ধারের ব্যবস্থা, কাগজ কেনা সব দায়িত্বই এঁদের। পত্রিকা বেরুবার পর স্টলে স্টলে এঁদেরই পৌঁছে দিতে হয় ঘাড়ে করে—এ সবই সাহিত্যের জন্য, আর কোনো লাভের আশা এতে নেই। সাহিত্যের লাভ ছাড়া, আর সবটুকুই ক্ষতি।

এই সব লিটল ম্যাগাজিনের সঙ্গে খানিকটা অহংকার ও আত্মশ্লাঘা জড়িত। অমুক অমুক নামকরা পত্রিকা আমাদের রচনা প্রকাশ করছে না, সেই জন্যই নিজেদের একটা আলাদা পত্রিকা করার কোনো মানে হয় না। হীনম্মন্যতা এই সব পত্রিকাকে মানায় না। নামকরা পত্রিকায় সাধারণ প্রকাশিত রচনার চেয়ে আলাদা ধরনের রচনা প্রকাশই হওয়া উচিত এই সব পত্রিকার উদ্দেশ্য। সাধারণত এই সব লিটল ম্যাগাজিনে কোনো নিটোল ধরনের সাহিত্যের নমুনা দেখা যায় না, এতে প্রকাশিত হয় জ্বলন্ত তরুণ হৃদয়ের নানা বিস্ফোরণ, সাহিত্যের নানা পরীক্ষা ও নতুন রূপ। ভবিষ্যতের সাহিত্য কোন দিকে মোড় নেবে, তার সূচনা চোখে পড়ে এইসব ছোটখাটো পত্রিকাতেই। বড় বড় পত্রিকার সম্পাদকরা এই সব লিটল ম্যাগাজিনে নিয়মিত চোখ রাখেন, নতুন লেখকদের বেছে নেবার জন্য। ভুঁইফোড় লেখকদের বদলে, এই সব লিটল ম্যাগাজিনের মধ্য দিয়ে যেসব লেখক সাহিত্য ক্ষেত্রে আসেন, তাঁদের স্থান অনেক পাকা হবার সম্ভাবনা।

এখন বড় বেশী ছোট পত্রিকা বেরুচ্ছে। সবগুলোই লিটল ম্যাগাজিন নামের যোগ্য নয়—এবং এই ভিড়ের মধ্য থেকে খাঁটি পত্রিকাগুলোকে বেছে নেওয়াও মুশকিল। তবুও, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই সব পত্রিকা যাঁরা বার করছেন, তাঁরা সকলেই আমাদের শ্রদ্ধেয়। তাঁরা গুণ্ডামি বদমাইসি করছেন না, রকের আড্ডায় সময় নষ্ট করছেন না বা ঘুমিয়ে এবং সিনেমা দেখে কোনোক্রমে দিন অতিবাহিত করছেন না, তাঁরা নিজেদের অর্থ খরচ ও পরিশ্রম করে কোনো-না-কোনো উপায়ে সাহিত্যকে ভালোবাসার প্রমাণ রাখতে চাইছেন। একটা ৬৪ পাতার সম্পূর্ণ পত্রিকা (যদি ৫০০ কপিও ছাপা হয়) বার করতে খরচ হয় কমপক্ষে চার শো টাকা। এই দুর্দিনের বাজারে এ তো অনেক। এসব টাকা উদ্যোক্তাদের জোগাড় করতে হয়, পকেট খরচ বাঁচিয়ে, টিউশানি করে বা কমার্শিয়াল কাগজে ফিচার লিখে। কারণ, আমাদের দেশে বড়লোকের ছেলেরা সাধারণত সাহিত্যে উৎসাহী হয় না।

আমাদের দেশে যত এই ধরনের ছোট-খাটো পত্রিকা বেরোয়—পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে এত আছে কিনা জানি না। তবে দুঃখের বিষয়, এখন এই সব পত্রিকাই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কিংবা অহংকারের যোগ্য নয়। সম্পাদনা যিনি করবেন, যিনি লিখবেন—তাঁদের প্রত্যেকেরই নিম্নতম কয়েকটি যোগ্যতা থাকা দরকার। বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করতে হলে, অন্তত পুরাতন বাংলা সাহিত্য ভালো করে পড়া দরকার। আগে কি লেখা হয়েছে, সেটা না জানলে নতুন লেখা সম্ভব নয়। সেই জন্যই, এমন অনেক সব লেখা বা রীতিকে নতুন বলে দাবি করা হচ্ছে, যা আসলে বস্তাপচা পুরোনো।

আর, বাংলা সাহিত্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করার বদলে বিশ্বে প্রথম হওয়ার হুজুগটি অতি নিন্দনীয়। বছর কয়েক আগে, দৈনিক কবিতা, সাপ্তাহিক কবিতা, কবিতা ঘণ্টিকী ইত্যাদি বিশ্বে প্রথম বস্তুগুলি বেরুবার পরই এই বিশ্রী ব্যাপারটা শুরু হয়েছে। এই সব ডামাডোলের ফলে, সত্যিকারের নিষ্ঠার সঙ্গে যাঁরা লিটল ম্যাগাজিন বার করছেন, তাঁদের প্রচেষ্টার মূল্য কমে যায়। বেশ কিছু দিন ধরে লিটল ম্যাগাজিনের সঙ্গে যুক্ত—এরকম কয়েকজনের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। আমি তাঁদের মর্মবেদনা জানি। আগাছা বাদ দিয়ে, গোটা বাংলা দেশে আট-দশখানি লিটল ম্যাগাজিনই যথেষ্ট মনে হয়।

চন্দ্রিকা চর্চা

পূর্ণ চাঁদের আলোয় কিছু লেখক গায়ক শিল্পী চন্দ্রিকা চর্চার আসর বসান কখনো কলকাতায়, কখনো কলকাতার বাইরে, কখনো শান্তিনিকেতনে। সম্প্রতি "চন্দ্রিকা চর্চা" সম্পর্কে একটি পুস্তিকা আমাদের হাতে এসেছে। এতে চন্দ্রিকা চর্চার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুশীল রায় বলেছেন : আমাদের জীবন অনেক সময়ই বাদুড়ের মত ঝুলে থাকে অন্ধকারে। সেই অন্ধকারের গায়ে জ্যোৎস্নার একটু পুলকিত প্রলেপ লাগাবার জন্যেই এই উদ্যোগ। চাঁদে গিয়ে নামতে চাই নে, চাঁদকে নামিয়ে আনতে চাই নে, আমরা কিছুক্ষণের জন্য বসতে চাই চাঁদের নিচে...যাঁরা সব ব্যাপারের মধ্যেই অন্ধকার দেখেন তাঁরাও যেন তাঁদের মন জ্যোৎস্না দিয়ে একটু মেজে নেন।

লোকউৎসব ও পুজো

পশ্চিমবঙ্গের পুজো-পার্বণ ও মেলা (দ্বিতীয় খণ্ড)। সম্পাদনা : শ্রীঅশোক মিত্র। পশ্চিমবঙ্গ আদমসুমারী দপ্তরের উদ্যোগে ভারত সরকারের পাবলিকেশনস ডিভিশন, সিভিল লাইনস, দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চৌদ্দ টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

জাতীয় ইতিহাস সম্পর্কে ভারতীয়দের স্বাভাবিক ঔদাসীন্য প্রায় প্রবাদে দাঁড়িয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষোভ ছিল, অন্যান্য জাতির মতো আমরা কিছু লিপিবদ্ধ করে রাখি নি। আমাদের পুরাবৃত্ত নেই। স্বাধীনতা আমাদের আর কিছু দিতে পারুক বা না পারুক, এই বিষয়ে সচেতন করেছে। এখন নানা বিষয়ে গবেষণা হয়। পুজো-পার্বণ ও মেলা লৌকিক জীবনে সবচে বড় ঘটনা; আমাদের মতো প্রাচীন গ্রামীণ সভ্যতার দেশে তো বটেই। যেখানে শিল্প বা বিজ্ঞানের প্রসার আশানুরূপ হয় নি, সেখানে লোক-সংস্কৃতি মানুষ চেনার প্রধান উপায়। এতদিন পশ্চিমবঙ্গের পুজো-পার্বণ ও মেলা সম্পর্কে কেন যে বিস্তৃত ও ধারাবাহিক গবেষণা হয়নি, সেটাই খুব আশ্চর্যের। শুধু অভাব পূর্ণ করা নয়, আদমসুমারী দপ্তর এবং সম্পাদক শ্রীঅশোক মিত্র এখন একটি জাতীয় কর্তব্য সম্পন্ন করতে উদ্যোগী হয়েছেন। 'পশ্চিমবঙ্গের পুজো-পার্বণ ও মেলার' এটি দ্বিতীয় খণ্ড; ঘোষণায় প্রকাশ, আরো দুটি খণ্ড বেরুবে।

এর আগে সাধারণত, এ-বিষয়ে অন্যান্যের [illegible] আগ্রহ মিটত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'পল্লী চিত্র', 'পল্লী-বৈচিত্র্য' এবং যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির 'পূজা-পার্বণ' [illegible] বইগুলি পড়ে। ১৯৫১ সালের আদমসুমারীর পরে অবশ্য 'পশ্চিমবঙ্গের [illegible] ও পরব' নামে একটি খণ্ড পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছিল, কিন্তু আজোড়া বইটি [illegible] দিক থেকে বিশাল এবং তথ্যের দিক থেকে অনেকাংশে সম্পূর্ণ। তথ্য ও [illegible] জানার জন্য দীর্ঘ এক প্রশ্নমালা [illegible] হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের জন[illegible] কাছে। তাতে কেবল পুজো-পার্বণ ও মেলা ই নয়, পশ্চিমবঙ্গের জন[illegible] অপসৃয়মান ইতিহাস সামগ্রিক ভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাও ধরা [illegible]। অবশ্য সমাজ ও অর্থনীতি [illegible] আলোচ্য-বিষয় নয়। কিন্তু প্রশ্ন[illegible] পরিধি ততদূর ব্যাপক। কেবল [illegible] প্রণয়ন এ বইয়ের উদ্দেশ্য ছিল না [illegible] সংবাদ সংগ্রহ। দুশ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগুলির বসতে গেলে [illegible]

গ্রাম উজাড় হয়ে গেছে, সংস্কারের অভাবে অনেক মন্দির, আটচালা জীর্ণ, পড়-পড়। বহু মেলা, উৎসবই আর হয় না। প্রশ্নোত্তরের মারফত সেই ইতিহাসের আবশ্যকীয় উপাদান হয়তো সংগ্রহ করা সম্ভব কিন্তু তার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস তৈরি করা সম্ভব নয়। এই গ্রন্থের গুরুত্ব অনস্বীকার্য, তবু বলতেই হবে বইটি সংবাদ-প্রবণতা থেকে নিস্তার পায় নি। অথচ বইয়ের যে-সব জায়গায় কোন বিশেষজ্ঞের রচনা তুলে দেওয়া হয়েছে সেখানে খবর অনেক সম্পূর্ণ; খবর ইতিহাসে স্থিতি লাভ করেছে। যেমন, হুগলী জেলার পুজো-পার্বণ ও মেলার বর্ণনা-প্রসঙ্গে শ্রীসুধীরকুমার মিত্রের 'হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ' বইটির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। আমাদের পুজো-পার্বণ, ধর্মবিধি অনেকাংশে লোকায়ত সমাজের অবদান। কোথাও মানুষের সম্পূর্ণ বিশ্বাস থেকে জন্ম; কোথাও হয়তো আর্য ও বৈদিক সংস্কৃতি কালানুক্রমিক বিবর্তনের দরুন লোকায়ত চেহারা পেয়েছে। এইসব জরুরী সূত্রগুলি ধরিয়ে দেওয়া দরকার। তাতে যে শুধু ইতিহাসের কাজ সুষ্ঠু ও সম্পূর্ণ হয় তাই নয়, মানুষী সভ্যতার একটি আদ্যন্ত আভাসও মেলে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক এখানে। বিশালাক্ষীর পুজো বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র হয়, বিশালাক্ষী অত্যন্ত জাগ্রত দেবী বলে সাধারণের বিশ্বাস। মঙ্গল কাব্যে চণ্ডীকে ডাকিনী, বাশুলী বা বিশালাক্ষী বলা হয়েছে। দশ সমুদ্রে চণ্ডীদেবের পাশেও ডাকিনী-বাশুলী নিত্য সহচরী। আবার, সেই বাশুলী-ই বৌদ্ধদের নিরোধোদ্ভূণী দেবীর বারো সহচরীর এক সহচরী। এই বইয়ে বিশালাক্ষী দেবীর বর্ণনার সময় যদি এই প্রমবডিজ্যাল বা মৌল যোগসূত্রগুলি সংক্ষেপে ধরিয়ে দেওয়া যেত তাহলে পাঠে আগ্রহ বাড়ত বই কমত না। তেমনি, শ্রীমন্ত সওদাগরের কিংবদন্তীর সঙ্গে জড়িত গোলহাট গ্রামের জয়মঙ্গলা-ই যে আদি চণ্ডী বা ব্রাহ্মণ্য দেবী দুর্গা কিংবা যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের নির্বাণ প্রকরণের 'জয়া' নয় তাই বা জানা যাবে কী করে? উপাধীদের সম্পর্কে স্থানীয়

তথ্যের জন্য সেই বইটির সাহায্য নেওয়া যেতে পারত। তবু, 'পশ্চিমবঙ্গের পুজো-পার্বণ ও মেলা' একটি তাৎপর্যপূর্ণ কর্মকাণ্ড। পরিধি ও বিস্তারের দিক থেকে বইটি প্রায় অতুলনীয়। এই গ্রন্থের দুই নির্মাতা, আদমসুমারী দপ্তরের শ্রীসদ্যকুমার সিংহ ও শ্রীঅরুণকুমার রায় সাধারণভাবে বাঙালী সমাজের এবং বিশেষ ক'রে ভাবী ঐতিহাসিকদের ধন্যবাদভাজন বলে গণ্য হবেন। প্রতিটি জেলা, থানা, গ্রামে বইটি ভাগ করা। সেই অনুযায়ী গ্রামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পুজো-পার্বণ, মেলা কিংবদন্তী কিছু কিছু লোকাচারের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। মানচিত্রে প্রত্যেকটি জেলার পুজো-পার্বণ ও উৎসবের স্থান-নির্ণয় করা প্রকরণ ও নকশা দেখানো হয়েছে। অনেকেই

বিশেষত গবেষকরা বইটি হাতের কাছে রাখতে চাইবেন।

১৫।৬৯

ছোটগল্প

সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী ও অন্যান্য। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। অধুনা, ১৭১ ডি, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা-বারো। দাম তিন টাকা।

নিজের মুগ্ধ কণ্ঠ কে না শুনতে চায়! শিল্প-সাহিত্য অল্পবিস্তর সেই মুগ্ধতারই অবসেসন। এই বইতে লেখকের গভীর আত্মপ্রেম আবিষ্কার করা যাবে; এখনে তিনি কেবলই নিজের। অথচ তাঁর আগেকার গল্পের বইটিতে তিনি রক্ত-মাংস সঞ্জাত অভিজ্ঞতাকে অনেকাংশে সর্বজনীন করে তুলতে পেরেছিলেন। অথচ লেখক ফুরফুরে বাংলা লেখেন, চিন্তার ফুল তোলেন অনায়াসে। স্মার্ট ক্যামেরাম্যানের মতো কথায় কথায় ছবি সাজিয়ে বসতে পারেন। অবশ্য তাঁর বহু কৌশল নিষ্প্রভ ঠেকতে পারে অন্তত যাঁরা বিদেশী বই পড়েন তাঁদের কাছে। জয়েস থেকে জ্যাক কেরুয়াক পর্যন্ত মোটামুটি হ্রস্ব-দীর্ঘ যাঁদের জানা তাঁরা এই কৃশকায় গল্প-গ্রন্থের তলায় তলায় বহু বিদেশী স্মৃতির সূত্র অনুভব করবেন; জাতীয় সড়কে দেখবেন ওয়েস্টার্ন 'বাস চলতে, বাস চলতে, বাস বাস চলতে' ইত্যাদি। তবু 'সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী' গল্পটি এক কথায় ইংরেজীতে যাকে বলে 'সোয়েল'। ভাষায়, বিন্যাসে এবং নাটকীয়তায়। আর, স্বীকারোক্তিমূলক সাহিত্য আমার কাছে এক প্রবল ধাঁধা। সেটা কি চাইবাসার চিঠি? তাই যদি হয়, তবে জীবন ও সাহিত্য শীগ্‌গিরই কতকগুলো কাগজের বল হয়ে যাক। তাই নিয়ে আমরা অনায়াসে লোফা-লুফি খেলতে পারব। তা সত্ত্বেও বইটির সাফল্যের সম্ভাবনা কমছে না; সাফল্য বহুক্ষেত্রে সার্থকতার মুখাপেক্ষী নয়। পকেট সিরিজ গল্প-গ্রন্থের চল হওয়া দরকার। কেননা, ছোট গল্পের বই আজকাল আর বেরোয় না।

২৪৫।৬৯

জীবনী

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু। সম্পাদক—শান্তিকুমার মিত্র। প্রকাশক—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাস, ৭ বিধান সরণী, কলিকাতা। মূল্য ২·৫০।

রাসবিহারীর বাল্যজীবন কাটে চন্দন-নগরে। যৌবনের প্রথম দিকে তিনি থাকেন দেরাদুনে তাঁর চাকরিস্থলে। এই সময়েই ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে। দিল্লিতে বড়লাটের উপর বোমা নিক্ষেপের ব্যাপারে রাসবিহারীই অধিনায়ক ছিলেন। অসাধারণ সংগঠন নৈপুণ্য ও সহজাত নেতৃত্বের গুণে একদিকে লালা লাজপৎ রায়, লালা হরদয়াল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এবং অন্যদিকে শ্রীঅরবিন্দ, বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় রাসবিহারী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে সারা দেশে সশস্ত্র বিপ্লব সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর একাংশের উপর তিনি গভীর প্রভাবও বিস্তার করেছিলেন। এ প্রচেষ্টা বিফল হলে তিনি ১৯১৫ সালে ২৯ বছর বয়সে পি এন ঠাকুর-এর ছদ্মনামে জাপানে পলায়ন করেন। সেখানে তিনি একটি জাপানী মেয়েকে বিয়ে করে জাপানেই বসবাস করতে থাকেন। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার কথা তিনি ভুলে যান নি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যুদ্ধের সূত্রপাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাসবিহারী এই অঞ্চলে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন-ডেন্টস লীগ ও আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে নেতাজী সুভাষ বসুও ভারতবর্ষ থেকে পালিয়ে গিয়ে বার্লিনে বসবাস করতে থাকেন। ১৯৪২ সালে সিঙ্গাপুরের পতন ঘটলে রাসবিহারী বসুর চেষ্টায় নেতাজী সুভাষ বসু বার্লিন থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এসে পৌঁছেন ১৯৪৩ সালে। —— শ্রীরাসবিহারী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের হিন্দ ফৌজের ভার তুলে দেন। এই অনুষ্ঠানে সিঙ্গাপুরে প্রায় ৫০ হাজার ভারতীয় উপস্থিত ছিলেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার কিছুদিন আগে ১৯৪৫ খৃঃ জাপানেই রাসবিহারী বসুর মৃত্যু ঘটে।

২০৯/৬৮

পত্রিকা

ভগিনী নিবেদিতা জন্মশত বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ (দ্বিতীয় পর্যায়)। সম্পাদক: শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু ও শ্রীসুনীলবিহারী ঘোষ। নিবেদিতা শতবার্ষিকী সমিতি, ১৮।১ সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট, কলকাতা-৬। মূল্য: তিন টাকা।

নরম মলাটের, প্রায় মাসিক পত্রের মতো দেখতে এই গ্রন্থটির পরিচয় নামেই মিলবে। সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগ মিলিয়ে এই দ্বিতীয় পর্যায়ে লিখেছেন: মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, লীলা মজুমদার, মহাশ্বেতা দেবী, ডঃ রমা চৌধুরী, আশা দেবী, অবধূত অসিত গুপ্ত, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শঙ্খ ঘোষ এবং আরো অনেকে। সম্পাদক দুজন সাধারণভাবে প্রশংসা-ই পাবেন, কারণ অনেক কবিতা ও প্রবন্ধ সুলিখিত। কয়েকটি লেখায় ঔদাসীন্য ও আন্তরিকতার অভাব লক্ষ্য করা গেল। বইটির দাম আরেকটু কম করা গেলে সাধারণের উপকার হত। নিবেদিতাকে স্মরণ করাই যখন উদ্দেশ্য, ব্যবসায়িক লাভ নয় তখন দামের প্রশ্নটি বিবেচনা করা উচিত ছিল। বইটিকে পত্রতুল্য না করে স্থায়ী আকার দেওয়া যেতেও পারত।

প্রাপ্তি স্বীকার

সোনা রূপো নয়। জ্যোতির্ময়ী দেবী। অশোকা গুপ্তা: পি ৪০৪/৫ গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা-২৯। মূল্য ১৫·০০।

নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান। মতি নন্দী। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড: ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য ৪·০০।

দ্বাদশ ব্যক্তি। মতি নন্দী। ডি এম লাইব্রেরী: ৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা-৬। মূল্য ৫·০০।

প্রজাপতি জীবন। ভ্লাদিমির নবোকভ অনুবাদ: দেবব্রত রেজ। রূপা অ্যান্ড কোম্পানী: ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলিকাতা-১২। মূল্য ৬·০০।

পরগাছা ও আরো দুটি একাঙ্ক পুলকেন্দু দাশগুপ্ত। সুষমা প্রকাশনী ১২ ক্লাইপার রোড, কোন্নগর, হুগলি

কৃতীর ক্রীড়া-ভূমিকা

ময়মনসিংহে কিশোরগঞ্জের চাকি গ্রামের বাড়িতে ফুটবল-হকি খেলার ছোট মাঠ ছিল, ব্যাডমিণ্টনের কোর্ট ছিল। তাই পড়াশুনোর চেয়ে খেলাধুলোতেই ছিল বেশী আগ্রহ। বেশ আনন্দের মধ্যেই কেটে যাচ্ছিল ছোটবেলার দিনগুলো।

হঠাৎ কে যেন কানে কানে মন্তর দিল—"দলে ঢুকে পড়। এই তো সময়। হাতে রিভলবার পাবি, ডাকাতি করে টাকা লুট করবি আর দেশের কাজে বিলিয়ে দিবি সে টাকা।" তাজা রক্ত, নতুন উদ্যম। সুতরাং দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের সে আহ্বান তরুণের কাছে বৃথা বলে মনে হল না। যুগান্তর পার্টিতে নাম লেখালো চোদ্দ-পনেরো বছরের ছেলে মণীন্দ্র দত্ত রায়। সেখানে কাজকর্ম চলে, পরিকল্পনা হয়, অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহের তৎপরতা বাড়ে।

বছরখানেকের মধ্যে পাশের গ্রামের এক ধনী-বাড়িতে ডাকাতির পরিকল্পনা করা হল। বয়স কম বলে সে ডাকাতির সঙ্গী হতে পারল না ছেলেটি। কিন্তু পুলিসের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য ডাকাতি-করা হাজার সাতেক টাকা গচ্ছিত রাখা হল অল্পবয়সী ছেলেটিরই কাছে।

পুলিস কিভাবে টের পেয়ে গেল। একদিন খুব সকালে আশপাশটা ঘিরে ফেলল সারা বাড়ি। প্রমাদ গুনলেন বাড়ির কর্তারা। তাঁরা কিছুই জানতেন না। খবর নিয়ে জানলেন মণীন্দ্রের কাছে রিভলবারের কার্তুজ আছে না কি, আর আছে সাত হাজার টাকা। সবাই কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। [illegible] ছিলেন ওঁদের পারিবারিক বন্ধু। তিনি পরামর্শ দিলেন [illegible] আর টাকাগুলো রাখা হল মণীন্দ্রের মাতামহ রায়বাহাদুর নরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর সহধর্মিণীর বাক্সের মধ্যে। তাহলে [illegible] বাক্স থেকে ঐ হাজার টাকা বার হলেও সন্দেহের কারণ ঘটবে না।

সেইমত ব্যবস্থা হল। পুলিস হাতে-নাতে ধরতে না পারলেও মণীন্দ্রকে সন্ত্রাসমূলক গোপন কাজকর্মের অভিযোগে [illegible] করতে কসুর করল না। [illegible] মাতুলের প্রভাব-প্রতিপত্তিতেই শাস্তি লঘু হয়েছিল। মাতুলই সরকারের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, 'আমার বাড়িতে থেকেই মণীন্দ্র লেখাপড়া করবে।'

হ্যাঁ, এই সেই মণীন্দ্র দত্ত রায়—আজ যিনি সারা ভারতে, এমন কি ভারতের বাইরের ক্রীড়াক্ষেত্রেও এম দত্ত রায় নামে পরিচিত। কিংবা বলা যায় সারা বাংলায় যিনি বেশী পরিচিত 'বেচুদা' নামে—খেলার মাঠের সার্বজনীন বেচুদা।

ময়মনসিংহের সিটি স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করবার পর বেচুদা চলে আসেন কলকাতায়। বি-এ পড়তে আরম্ভ করেন বিদ্যাসাগর কলেজে। তখন তিনি মুক্ত-পুরুষ। মুক্তি শুধু পুলিসের নজর থেকেই নয়, মুক্তির স্বাদ খেলার মাঠেও। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি—তিনটি খেলাতেই নাম-করা ছাত্রদের মধ্যে ওঁর বিশেষ নাম

ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি এম দত্ত রায়

ছড়াতে লাগল অল্প দিনের মধ্যে। বি-এ পাস করার পর মাঠই হয়ে উঠল ঘরবাড়ি। ফুটবলে ছিলেন নামকরা লেফট ব্যাক, হকিতে সেন্টার হাফ। ক্রিকেটে লেগ ব্রেক বোলার। ক্রীড়াপীঠ ছিল স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাব। প্রথম ডিভিশন ফুটবল লীগে এক বছর অবশ্য ই বি আর দলে খেলেছেন। [illegible] দলের হয়ে খেলেছেন [illegible]। কিন্তু স্পোর্টিং ইউনিয়নের সঙ্গে চিরদিনই ওঁর আত্মিক সম্পর্ক। ১৯২৯ সালে আই এফ এ-র প্রথম বিদেশ সফর অর্থাৎ জাভা—(এখন ইন্দোনেশিয়া) ও সিঙ্গাপুর সফরে স্পোর্টিং ইউনিয়নের খেলোয়াড় হিসাবেই আই এফ এ দলে নির্বাচিত হয়েছিলেন। খেলা ছেড়ে যাবার পর স্পোর্টিং ইউনিয়নের প্রতিনিধি হিসাবেই এসেছিলেন ক্রীড়া-প্রশাসনে।

আই এফ এ পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য থেকে উনিশ শো অটত্রিশে আই এফ এ-র সম্পাদক, বিয়াল্লিশে সম্পাদক ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের। একষট্টি থেকে ফেডারেশনের সভাপতি। অতীতকালে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের খেলোয়াড় [illegible] সমিতির চেয়ারম্যান। উনিশ শো আট-চল্লিশের লণ্ডন অলিম্পিক থেকে শুরু করে হেলসিঙ্কি, মেলবোর্ন, রোম ও টোকিও অলিম্পিকে ফুটবলের প্রতিনিধিত্ব। এ ছাড়া নন-প্লেয়িং ক্যাপ্টেন হিসাবে আটান্নয় অস্ট্রেলিয়া ঘুরে এসেছেন। পঞ্চান্নয় ভারতীয় ফুটবল দলের নেতা হিসাবে ঘুরে এসেছেন সোভিয়েট রাশিয়া। টোকিওর এশিয়ান গেমস এবং জাকার্তায় এশিয়ান গেমও বাদ যায়নি।

বাংলার ফুটবল ও ক্রিকেট প্রশাসনের কিং মেকার এবং এশিয়ার সর্ববৃহৎ ফুটবল ফেডারেশনের বর্তমান সভাপতি এম দত্ত রায়কে অনেকে 'মেঠো লোক' বলেই জানে, এই ৬৯ বছরেও খেলার মাঠেই যাঁর বিচরণ এবং মাঠই যাঁর ধ্যানজ্ঞান ধর্মকর্ম।

কিন্তু শিক্ষাদীক্ষা এবং সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবেই মাঠের খেলাধুলো ওঁদের চেতনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ ব্যাপারে সংস্কৃতের বিরাট পণ্ডিত এবং সংস্কৃতির পূজারী অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায়, যাঁকে বাংলার ডব্লিউ জি গ্রেস বা বাংলার ক্রিকেট জনক বলা হত তিনিই দীক্ষাগুরু।

অনেকেই হয়তো জানেন না অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন সম্পর্কে ছিলেন এম দত্ত রায়ের মামা। নিজের মামা নন, তাই বলেছি সম্পর্কীয় মামা। একটু পরিচিতি প্রয়োজন। সারদারঞ্জনরা পাঁচ ভাই। উপেন্দ্রকিশোর, সারদারঞ্জন, কুলদারঞ্জন, প্রমদারঞ্জন ও মুক্তিদারঞ্জন। এর মধ্যে স্বনামধন্য সত্যজিৎ রায়ের বাবা সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোরকে শিশু বয়সে পোষ্যপুত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন এম দত্ত রায়ের মাতামহ। সেই সূত্রে এম দত্ত রায় সারদারঞ্জনকেও নিজের মামার মতই শ্রদ্ধা ভক্তি করতেন। তা ছাড়া খেলার মধ্য দিয়েই পারিবারিক বন্ধন আরও দৃঢ় হয়েছিল। এম দত্ত রায়, কে দত্ত রায় প্রভৃতি উপেন্দ্রকিশোরের বোনের পুত্র, আর সারদারঞ্জনের বোনের পুত্র হিতেন বসু, কার্তিক বসু, গণেশ বসু, বাপী বসু, বাদু বসু প্রভৃতিদের নিয়েই স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাব। ওদের সঙ্গে ছিলেন রায়বাড়ির শৈলজা, হৈমজা, নীরজা প্রভৃতি। এক-সময়ে স্পোর্টিং ইউনিয়নের ৯।১০ জন ক্রিকেট খেলোয়াড়ই ছিলেন রায়-বসু-দত্তরায় কাজিন। সত্যিই ওঁদের দান শিল্প-সাহিত্য ও কৃষ্টিতেও যেমন, খেলাধুলায়ও তেমন।

আমরা জানি, পঙ্কজ গুপ্ত, এম দত্ত রায় ও অমর ঘোষের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব, পারস্পরিক যোগাযোগ এবং খেলাধুলোর আন্তরিক আগ্রহের জন্য সর্বভারতীয় ক্রীড়া-প্রশাসনে বাংলার প্রাধান্য। এঁদের পর বাংলার স্বার্থ ও প্রাধান্য বজায় রাখার মত কাউকেও তো হাতের কাছে খুঁজে পাচ্ছি না।

অদ্ভুত পরিস্থিতি

আরও একটা সপ্তাহ চলে গেল, কোন নতুন বাংলা ছবি এল না। পরিস্থিতিটা সত্যিই অদ্ভুত, দুশ্চিন্তারও বটে। বাংলা ছবির জন্য এতকাল যাঁরা অশ্রুবিসর্জন করেছেন তাঁরাও নীরব। যাঁরা এতকাল বলে এসেছেন, বাংলা ছবির রিলিজের সুযোগ নেই তাঁরা এখন কী বলবেন? ছবির মুক্তির পথে বাধা কোথায় সে-বিষয়ে তাঁরা কিঞ্চিৎ আলোকপাত করলে দর্শকরা বুঝতে পারতেন কী নতুন সমস্যা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। সেন্সরের ছাড়পত্র পেয়েছে এমন ছবির সংখ্যা হয়ত সামান্য, কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহে একাধিক ছবি মুক্তি পেতে পারত।

জানা গেছে, কনসালেটেটিভ কমিটির হাতে এখন সেন্সার করা ছবি যে কটি আছে তার সংখ্যা আট-দশের বেশি নয়। তার মধ্যে বেশির ভাগ ছবি সবে সেন্সর হয়েছে। বাংলা ছবি বাক্সবন্দী অবস্থায় পড়ে থাকে, মুক্তির আলো দেখতে পায় না—এই বলে যাঁরা কিছুকাল আগেও বিলাপ করতেন তাঁদের বক্তব্যের সঙ্গে বাস্তবের ব্যবধান যে যথেষ্ট তা বোঝা যাচ্ছে।

ঘটনাচক্রে ছবি রিলিজের ব্যাপারটা এখন আর সরাসরি চিত্রপ্রদর্শক ও চিত্র-পরিবেশকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ছবি মুক্তি পাচ্ছে এখন কনসালেটেটিভ কমিটির রিলিজ-শাখার মাধ্যমে। অর্থাৎ কমিটির অনুমোদন বা ছাড়পত্র অনুযায়ী ছবি মুক্তি পাচ্ছে। চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নতির বিধানে পরামর্শ দানের জন্যই এই কমিটি। এই কমিটিরই পরের ধাপ ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট বোর্ড, যা এখনো জন্ম নেয়নি। কিন্তু মজার ব্যাপার এই, ছবি রিলিজের ঝামেলা পোয়ানোই এখন কনসালটেটিভ কমিটির একটা বিশেষ কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চিত্র নির্বাচনের স্বাধীনতা চিত্রপ্রদর্শকরা কী-ভাবে কিছু পরিমাণে হারালেন সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে লাভ নেই। কিন্তু সংরক্ষণ সমিতি চিত্রপ্রদর্শকদের বশে আনবার জন্য যে এত আন্দোলন করলেন, এবং কিছুটা আনলেনও, তার ফলে বাংলা

"কলঙ্কিত নায়ক" (পরিচালনা : সলিল দত্ত) ছবিতে উত্তমকুমার ও অপর্ণা সেন।

ফটো—দেশ

ছবির সম্পত্তি কী হল? সংকট দূর হল কই? আবার তো সেই শূন্যতা।

ছবি ভাল না চললে কোন নীতিতে কিছু হয় না। সেন্সর-ওয়াইজ নীতি তো দেখলাম। যে-সব ছবি চলে না, সেই সব নিম্নমানের ছবি যে-নীতির জোরেই মুক্তি লাভ করুক না কেন তাতে চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নতি হয় না। শিল্পব্যবসায়ের উন্নতির সঙ্গে গুণগত উৎকর্ষের যোগ বড় গভীর। আন্দোলন করে এক নীতির আওতায় সব ছবি আনলেই চলচ্চিত্রের মঙ্গল হয় না। বরঞ্চ দেখা গেছে, সমিতির নিয়মের বাইরে যে সব ছবি মুক্তি পেয়েছে চলচ্চিত্রশিল্প সেগুলি দ্বারাই বেশি উপকৃত। গুণের বিচারে তো বটেই, ব্যবসার দিক থেকেও।

এই প্রসঙ্গেও আগে অনেক আলোচনা হয়েছে। তাই পুনরুক্তির দরকার নেই। যে-সমস্যা এখন, যা রহস্যজনক মনে হয়, তা হল বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে নতুন বাংলা ছবি আসছে না। কেন আসছে না তার সঠিক কারণ আমরা জানি না। তবে এইটুকু জানি বাংলা চেন আছে, বাংলা ছবিও আছে, কনসালটেটিভ কমিটিও আছেন। ছবি মুক্তির পথে কী কাঁটা সেটুকুই আমাদের জানা নেই।

জানা গেল, গত সপ্তাহের শেষভাগে কনসালটেটিভ কমিটির বৈঠক হয়ে গেছে। বাংলা ছবির যে রিলিজ-চেনগুলি ফাঁকা পড়ে আছে সেখানে কোন্ কোন্ নতুন ছবি দেওয়া যায় এ-নিয়েই নাকি বৈঠক হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে বৈঠকের ফলাফল আমরা জানি না। হয়ত কিছু ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু সিদ্ধান্ত একবার হয়ে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে ছবি রিলিজ করা যায় না। পরিবেশকরা ছবি মুক্তির আগে প্রচার-বিজ্ঞাপনের জন্য কিছুটা সময় চান। "প্রি-রিলিজ পাবলিসিটি" না হলে ছবির ব্যবসার ক্ষতি হয়। অতএব কনসালেটেটিভ কমিটি তাঁদের ব্যবস্থার কথা জানিয়ে দেবার পরেও কিছু সময় চলে যাবে, তারপর ছবি আসবে। এইভাবে যে অনেক সময় চলে গেল এবং তাতে বাংলা ছবির যে ক্ষতি হল এর জন্য দায়ী হবেন কে?

॥ চিত্র-সমালোচনা ॥

পাগলা কাহী কা

(মার্স ও মুভীজ)

বাঙালী দর্শকের মোটেই বুঝতে অসুবিধা হবে না "পাগলা কাহী কা" চিত্রকাহিনীর উৎস কী। ছবির প্রথম ভাগ শেষ হবার পরই মনে হবে দর্শক "দীপ জেনলে যাই"-এর হিন্দীরূপ দেখছেন। রসের প্রভেদ থাকলেও কাহিনীর আঙ্গিকের দিক থেকে বাংলা ছবি "দীপ জেনলে যাই"-এর সঙ্গে এই হিন্দীচিত্রের সাদৃশ্য কিন্তু আসলে একটা বিসদৃশ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই মানসিক হাসপাতাল, সেই মানসিক রোগাক্রান্ত নায়ক (শাম্মী কাপুর), সেই চিকিৎসক নায়িকা (আশা পারেখ)। তবুও তফাৎ অনেক। শাম্মী কাপুরের স্মৃতিভ্রংশ দূর করবার জন্য

'পাগলা কাহী কা' : আশা পারেখ, শাম্মী কাপুর

আশা পারেখকে প্রেমের অভিনয় করতে হয়নি, অভিনয়ের ছলে ছলে সে নিজের অজান্তে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েনি, এবং রোগী সুস্থ হবার পর উভয়ের মধ্যে স্বাভাবিক বিচ্ছেদও ঘটেনি। এক্ষেত্রে আশা পারেখের চিকিৎসা ও ভালবাসা সমান তালেই চলেছে, শাম্মীর প্রতি আশা পারেখের অনুরাগ যে বড় ডাক্তারের সমর্থন পেয়েছে তাও নয় কিন্তু হাসপাতাল থেকে শাম্মীর বিদায় নেওয়ার সময় দেখা যায় ডাক্তার নায়িকাও অলক্ষ্যে এসে গাড়িতে বসেছে। নাটকরসের বালাই যতই থাক, কাহিনী-গঠনে "দীপ জ্বেলে যাই"-এর সঙ্গে এই হিন্দী ছবির মিল আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে—প্রেমে আঘাত পেয়ে নায়কের স্মৃতিশক্তি হারানো, নায়িকা ডাক্তারের মনেও অতীত ব্যর্থ প্রণয়ের স্মৃতি, নায়িকা যাতে কর্তব্য ফেলে হাসপাতাল ছেড়ে না যায় সেজন্য বড় ডাক্তারের চেষ্টা (সংলাপেও মিল) ইত্যাদি।

তবে শাম্মী যেহেতু আশা পারেখের পেশেন্ট-ই নয় আরও কিছু (এক নার্স একথাও বলেই দিয়েছে ডাক্তার আশা পারেখকে) তাই কাহিনীতে এই প্রণয়পর্বের একটা ভূমিকা রাখতে হয়েছে। শাম্মী কাপুর কয়েকদিন আগেও হাসপাতালে এসেছিল—তবে পাগল হয়ে নয়, পাগল সেজে। অভিন্নহৃদয় বন্ধু শ্যামকে (প্রেম চোপড়া) বাঁচাবার জন্য সে খুনের দায়ে কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে এবং ফাঁসি এড়াবার জন্য পাগল সেজেছে। মানসিক হাসপাতালে নকল পাগলকে ঠিক চিনে ফেলেছে ডাক্তার নায়িকা এবং পরে তার সব কথা জানার পর নায়িকার মনে তখন [illegible]। পরে [illegible]

শাম্মী দেখল তারই প্রেয়সীকে (হেলেন) শ্যাম বিয়ে করেছে তখন সে সত্যিই পাগল হয়ে গেল। এর পরেই শাম্মী-আশা পারেখের প্রণয়কাণ্ডের সূত্রপাত।

"দীপ জ্বেলে যাই"—অনুপ্রাণিত কাহিনী (রঞ্জন বসু রচিত) হলে কী হবে, ছবির নাম তো "পাগলা কাহী কা", এবং নায়কের নাম শাম্মী কাপুর। উভয় নাম-মাহাত্ম্য যাতে বজায় থাকে সে-বিষয়ে পরিচালক শক্তি সামন্ত যত্নবান হয়েছেন। তিনি ছবিতে মারামারি, ক্যাবারে নাচ ইত্যাদি নিয়মমাফিক উপাদান সবই রেখেছেন। তবে ওই বাংলা ছবির সঙ্গে এই চিত্রের আংশিক মিল আছে বলে, এবং হিন্দী চিত্রের সাধারণ দর্শক কী চান তা পরিচালক ভালভাবেই জানেন বলে, এই ছবি জনপ্রিয় হবে হয়তো। শঙ্কর-জয়কিষণের সুরে কিছু ভাল গানও আছে।

খোসলা কমিটির সুপারিশ

রাজ্যে রাজ্যে প্রতিক্রিয়া

ফিল্ম সেন্সরশিপ সম্পর্কে খোসলা কমিটির সুপারিশ সারা দেশে বিতর্কের ঝড় তুলেছে। ভারতীয় চিত্রে কাহিনী বা শিল্পের স্বার্থে নরনারীর সকাম চুম্বন কিংবা নগ্নদেহ থাকা উচিত কিনা এ-নিয়ে তর্কের শেষ নেই। সম্প্রতি জানা গেল, ভারতের চারটি রাজ্য খোসলা কমিটির সুপারিশের বিরুদ্ধে। রাজ্যগুলি হল : অন্ধ্রপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, এবং হরিয়ানা। মহীশূর এবং জম্মু ও কাশ্মীর সরকার খোসলা কমিটির সুপারিশের উপর কোন মন্তব্য করেন নি।

ভারতের সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় এবং ভারতীয় জীবনের পটভূমি ও সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে এবং তরুণরা যাতে বিপথে না যায় সে-কারণে ফিল্মে সকাম চুম্বন ও নগ্নদেহ প্রদর্শনের সুপারিশ অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছে এই বিশেষ "স্বাধীনতা" (চুম্বন ও নগ্নদেহ প্রদর্শন) খুব জরুরী নয়, এবং তা সমূহ ক্ষতি সাধন করতে পারে।

হরিয়ানা সরকার বলেছেন, যে-সব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ আমাদের বর্তমান সমাজে এখনও অটুট তার পরিপ্রেক্ষিতে ফিল্মে চুম্বন ও নগ্নতাকে উৎসাহ দেওয়া উচিত হবে না। তাছাড়া কোথায় আর্টের শেষ এবং অশ্লীলতার আরম্ভ তার সীমারেখা নির্ণয় করা খুব শক্ত ব্যাপার।

দীনেশ মিত্রের "ন্যায় নীতি" ছবিতে নিরঞ্জন রায় ও অনিল চট্টোপাধ্যায়।

টালি-টিপ্পনী

এখনো বাংলা চলচ্চিত্রে চতুর্দশী। এখনো সামনেই পূর্ণিমা না অমাবস্যা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এদিকে টালিগঞ্জ যেই ঝিমিয়ে সেই ঝিমিয়ে। এখন অবস্থাটা অনেকটা ন যযৌ, ন তস্থৌ। নতুন চিত্র নির্মাণের মাত্রা সংখ্যায় বেড়েছে অবশ্যই বলা যায় না। সাকুল্যে পাঁচটি স্টুডিওতে দশটির বেশী ছবির শুটিং হচ্ছে কিনা সন্দেহ। যতদূর জানি, নিউ থিয়েটার্স দু' নম্বর স্টুডিওতে এখন চলছে "মঞ্জরী অপেরা" আর "প্রথম প্রতিশ্রুতি"র শুটিং। ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে হচ্ছে "প্রতিদ্বন্দ্বী" আর "জয়জয়ন্তী"র কাজ। টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে "রাজকুমারী" ও "[illegible]"। নিউ থিয়েটার্স এক নম্বরে চলছে "নবরাগ" ও "[illegible]"-এর শুটিং। ক্যালকাটা মুভিটোনে "কুহেলী" ও "মাল্যদান"। বাস, শুটিং সংবাদ এই পর্যন্ত। গড়পড়তায় সারা মাসে দুটি করে ছবির শুটিং একটা স্টুডিওর পক্ষে নিশ্চয়ই যথেষ্ট নয়। মাসে দশ দিনের বেশী কাজ সাধারণত কোন "পার্টি" করেন না। সেই অবস্থায় দুটি করে ছবির শুটিং চললে একটা স্টুডিওকে অন্ততঃ দশ দিন ঠায় বসে থাকতে হয়। সেক্ষেত্রে স্টুডিওপাড়ার অচল অবস্থা দাঁড়ানো অত্যন্ত স্বাভাবিক। এখনো যে স্টুডিওগুলি সচল আছে তার কারণ এই টালিগঞ্জে শুধুই বাংলা ছবি হয় না, আঞ্চলিক আরো নানা ভাষার ছায়াছবি এখানে নির্মিত হয়ে থাকে। ওড়িয়া, নেপালী, ভোজপুরী এবং অসমীয়া চিত্রের শুটিং নিয়েই আসলে এখন কলকাতার স্টুডিওগুলি বেঁচে আছে। [illegible] বাংলা দেশ থেকে শুরু করে অন্ততঃ সাতটির মত ছবির নির্মাণ কার্য সম্পাদিত হয়ে থাকে। ইন্দ্রপুরী স্টুডিও পরিক্রমায় বেরুলে কোন না কোন স্টুডিওতে এই চার ভাষার যে কোন ভাষার ছবির শুটিং আপনার নজরে পড়বে। শুধু শুটিংই নয়, সেই সব ছবির গানের রেকর্ডিংও এই টালিগঞ্জেই অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতার অনেক গায়ক-গায়িকা আঞ্চলিক ভাষার ছবিতে কণ্ঠদান করেন। অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রীকে অভিনয় করতেও দেখা যায়। [illegible] বিশ্বাস বলছিলেন, কী একটা অসমীয়া চিত্রে সম্প্রতি তিনি অভিনয় করেছেন।

*

অসমীয়া চিত্রের অগ্রগতি এখন [illegible]। কিছুকাল আগেও বছরে বেশী অসমীয়া চিত্রের নির্মাণের কথা কল্পনা করা যেত না। এই বছর শুনলাম একযোগে সাতখানা ছবির শুটিং শুরু হয়েছে। টালিগঞ্জের চিন্তার কথা, আসাম সরকার গৌহাটিতে একটি স্টুডিও-ও চালু করেছেন। স্টুডিওর নাম "জ্যোতি চিত্রবন"। বিখ্যাত চিত্রনির্মাতা জ্যোতি-প্রসাদ আগরওয়ালার নামে এই চিত্রবন অর্থাৎ স্টুডিও। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, অনেকে শ্রীআগরওয়ালাকেই প্রকৃত অর্থে অসমীয়া ছবির জনক বলে মনে করেন।

'আই লাভ' ছবিতে শর্মিলা

আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে তিনি কলকাতার স্টুডিওর যন্ত্রপাতি নিয়ে গিয়ে আসামে ছবি তোলেন। সেই আসামে আজ স্বাধীন স্টুডিও গড়ে উঠেছে। পঁয়ত্রিশ বছর ধরে অসমীয়া চিত্রের অগ্রগতির মূলে রাজ্য সরকারের অবদান অনেকখানি। বাহান্ন বছর বয়সের বাংলা ছবির জন্যে বাংলা দেশের রাজ্য সরকার যা করেননি আসামের সরকার তাই করেছেন। আসামে এখন প্রতিটি হাউসে অসমীয়া ছবির বাধ্যতামূলক প্রদর্শন ব্যবস্থা চালু হয়ে গেছে। অসমীয়া ছবির প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও সরকার সেখানে প্রমোদকরের মাত্রা অনেক শিথিল করে দিয়েছেন। ফলে নির্মীয়মান ছবির সংখ্যা দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে। সেখানেও এখন "এক্সপেরিমেন্টাল" ছবি হচ্ছে। পরিচালক ব্রজেন বড়ুয়ার "ডক্টর বেজবড়ুয়া" নামের কাহিনী চিত্রটি সম্পূর্ণ আউটডোরে তোলা। ছবিটি ইতিমধ্যেই রসিক মহলে আলোড়ন তুলেছে। "যুগান্তকারী এক্সপেরিমেন্টাল" ছবি নির্মাণের ক্ষেত্রে এই টালিগঞ্জ আজো পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তেমন কোন সাহায্য পেলো না।

—বিচক্ষ

ওসাকায় "গুপী গাইন . . ."

ওসাকা ফিল্ম ফেস্টিভাল-এ (জাপান এক্সপো ৭০) সত্যজিৎ রায়-কৃত "গুপী গাইন বাঘা বাইন" ছবিটি দেখানো হয়েছে। ১ থেকে ১০ এপ্রিল ফিল্ম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ছবির প্রযোজক শ্রীনেপাল দত্ত বিশেষ আমন্ত্রণে উৎসবে যোগ দেন।

কুহেলী

তরুণ মজুমদার নির্দেশিত ভারত চিত্রের প্রথম ছবি "কুহেলী"র ব্যাপক বহির্দৃশ্য গ্রহণের কাজ শেষ হলো। সিকিম সীমান্তের গভীর অরণ্য ও নির্জন উপত্যকায় অনেক দৃশ্য গৃহীত হয়েছে। যেহেতু রহস্যচিত্র, অতএব তার কাহিনীর কোন ইঙ্গিতই চিত্র-নির্মাতারা প্রকাশ করতে চান না। বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন বিশ্বজিৎ, সন্ধ্যা রায়, সুমিত্রা সান্যাল, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় (অতিথি শিল্পী), রবি ঘোষ (অতিথি শিল্পী), অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, তরুণ রায়, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, কুমারী চুমকী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌর শী, নিখিল সেনগুপ্ত প্রভৃতি।

স্বরচিত চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করছেন '[illegible]'। সুরযোজনায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

ইন্দর সেন পরিচালিত "প্রথম কদম ফুল" ছবিতে ছায়া দেবী, শুভেন্দু চ্যাটার্জি তনুজা।

বোম্বাই বিচিত্রা

চিত্র নির্মাণ যে সমস্ত শিল্পের মধ্যে সবচেয়ে বারোয়ারী শিল্প একথা আজ নতুন করে বলবার কোন প্রয়োজন দেখি না। চলচ্চিত্র এবং তার দর্শকদের মাঝখানে তিন দল লোক আছেন। প্রথম দল যাঁরা চিত্রনির্মাণ করেন। দ্বিতীয় দলের নাম পরিবেশক, তৃতীয় দলকে আমরা প্রদর্শক নামে চিনি। আবার এই দলগুলির মধ্যে অনেক উপদল আছে। যেমন নির্মাতারা বিভক্ত স্টার এবং টেকনিশিয়ান, এই দুই দলে। বলাই বাহুল্য যে এই দুই দলের মধ্যে স্টারদল বেশী প্রভাবশালী।

চলচ্চিত্র জগতে যাঁরা চিত্রনির্মাণ করেন, অর্থাৎ যাঁরা কলাকুশলী, বর্তমানে তাঁরাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব। প্রচলিত প্রথার হাতে এ'রা সবাই ক্রীড়নক। চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের বর্তমান বিধি ব্যবস্থা এই কলা-কুশলীদের এমন এক জায়গায় এনে ফেলেছে যে এ'দের সকলেরই জীবনের বা শিল্পের বিবি জীবিকার সাহেবের কাছে হেরে যাচ্ছে। তাই আজ সর্বত্র ছবি তৈরী হচ্ছে হয় স্টার, নয় ফিনান্সিয়ার নয় ডিস্ট্রিবিউটার নয় প্রদর্শকের মর্জি মাফিক। একমাত্র টেকনিশিয়ানরা ছাড়া আর সবাই নাকি জানে জনতা কী চায়। জনতাকে সন্তুষ্ট করার নামে হিন্দী চলচ্চিত্র জগৎ কোথায় পৌঁছেছে সে কথা জনতার চেয়ে ভাল বোধহয় আর কারুরই জানার কথা নয়। কিন্তু কী আশ্চর্য এ নিয়ে জন-জীবনে কোন চাঞ্চল্য নেই! কোলকাতায় 'প্রেম পূজারী'র বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হয়েছে বলে লোকসভায় প্রশ্ন উঠেছে, কিন্তু "রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পাবার তিন বছর পর মাত্র পাঁচ সপ্তাহের ফিক্সড বুকিং-এ 'তিসরী কসম' রিলিজ হল কেন এ নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য নেই। 'উসকি কাহানী' আজো কেন রিলিজ হয়নি তা নিয়ে কোন আলোচনা হয় না। 'ভুবন সোম' পুরস্কৃত এবং সম্মানিত হয়েও এখনো কেন রিলিজ হচ্ছে না বম্বেতে তা নিয়ে কোন প্রশ্ন উঠছে না কোথাও।

ফিল্ম ফিনান্স করপোরেশন ছবি করতে টাকা দেয়। আর সেই টাকায় তোলা হিন্দী ছবি কেন মুক্তি পেতে বেগ পায় তার কারণ নির্ধারণ করতে কারো উৎসাহ নেই। বিমল রায় প্রডাকসনের ছবি "দো দুনি চার" আজ তিন বছর ধরে পড়ে আছে, কেন এ ছবি রিলিজ হচ্ছে না? কেন এতগুলি সরকারী মানে জনতার টাকা আটকা পড়ে আছে? তা নিয়ে কোন প্রশ্ন উঠছে না কারো মনে!

সেদিন এক তরুণ পরিচালক এবং প্রায় প্রবীণ স্টার-এর কথোপকথন শুনলাম। ঐ প্রবীণ স্টার নাকি আজ বেশ কয়েক বছর ধরে উক্ত তরুণ পরিচালকের সঙ্গে একটি ছবি করতে চাইছেন। কিন্তু সেই তরুণ পরিচালক কিছুতেই ও'র সঙ্গে ছবি করতে রাজি নন। কেন? সেইটেই শুনুন।

স্টার: দেখ আমি তো অকারণে পপুলার নই, আমার নিশ্চয়ই কোন গুণ আছে, অকারণে আমার পপুল্যারিটিকে ভয় পাচ্ছ কেন, আমার পপুল্যারিটি এবং তোমার প্রতিভা মিলে যে ছবি হবে তা জনসাধারণ মাথায় করে নাচবে!

পরিচালক: আপনার পপুল্যারিটিকে আমি ভয় পাই না। শিল্পী হিসেবে আপনাকে আমি শ্রদ্ধাই করি, কিন্তু

'জওয়াব' ছবিতে হেমা মালিনী

আপনি আমেই একটা সিলড্রীম, সেটাকে আমি ভয় পাই, আপনার থেকে আপনার ইমেজ বড়—সেই ইমেজটাকে আমি ভয় পাই সেইজন্যেই—!

স্টার: আমি উত্তর দিচ্ছি, এসো আমরা এক সঙ্গে একটা ছবি করি।

পরিচালক: ঠিক আছে! কিন্তু ছবির প্রযোজক আমি বা আপনি কেউ হবো না। বাইরের কোন প্রযোজক আপনাকে এবং আমাকে নাহ্যমত পারিশ্রমিক দিয়ে ভাড়া করবে—এই শর্তে আমি রাজি আছি!

স্টার: এতো জলের মত সহজ—কালই আমি প্রযোজকের লাইন লাগিয়ে দেব তোমার বাড়ির সামনে, সাবজেক্ট ঠিক করে ফেল।

জার্মান ব্যালে নাচ : হ্যামলেট, ক্লস বোলিংক

পরিচালক: সাবজেক্ট ঠিক হবে। কিন্তু প্রপোজিশনটা জলের মত সহজ নয়। আমাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক কথাটা বোধহয় আপনি ঠিকমত বিবেচনা করবেন!

স্টার: কেন করব না? কত চাই তোমার।

পরিচালক: আপনার বর্তমান পারিশ্রমিক কত?

স্টার: লাস্ট ছবিতে বারো লক্ষ নিয়েছি, তোমার সঙ্গে ছবি করতে কিছু কমই নেব, ধরো দশ লক্ষ!

পরিচালক: ঠিক আছে আপনি যদি দশ লক্ষ নেন আমি তাহলে দশ লক্ষ এক টাকা নেব। মানে আপনার পারিশ্রমিকের থেকে অন্ততঃ একটাকা বেশী!

স্টার: তথাস্তু! তারপর!

স্টার: কিন্তু এটা প্র্যাকটিক্যাল নয়!

পরিচালক: ...

"ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট" (পরিচালনা : দিলীপ বসু) ছবিতে লিলি চক্রবর্তী। ফটো—দেশ

নেব। এটাতো প্র্যাকটিক্যাল।

স্টার: হাল ছাড়লেন।

পরিচালক: সেইজন্যেই বলছিলাম আমরা একসঙ্গে ছবি করতে পারব না। ছবিটা করব আমি অথচ আমার অধীনে অন্ততঃ তিনজন কাজ করবে যারা সব দিক থেকে আমার চেয়ে বেশী ইমপরট্যান্ট। এটা কী করে প্র্যাকটিক্যাল হয় বলতে পারেন।

উত্তর নেই। স্তব্ধতা। এ স্তব্ধতা কি কখনো ভঙ্গ হবে।?

সরল শর্মা

কলকাতায় জার্মান ব্যালে

পশ্চিম বার্লিনের বিখ্যাত জার্মান অপেরা হাউস ব্যালে শিল্পীরা কলকাতায় কলা মন্দিরে আগামী ১২ ও ১৩ এপ্রিল ব্যালে নাচ প্রদর্শন করবেন। জাপানের ওসাকায় ১৯৭০-এর বিশ্বমেলায় যোগ দেবার পর কলকাতায় আসছে এই ব্যালে গ্রুপটি।

২৫ জন শিল্পী সমন্বিত এই দলটির পরিচালক গাভরান লেবেন। আধুনিক জার্মান ব্যালের সামগ্রিক পরিচয় এঁদের নাচে পাওয়া যাবে। বিশ্বের বিভিন্ন পত্রিকা এই দলটি সম্পর্কে প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত।

গদার ও ত্রুফোর ছবি

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি চারটি ফরাসী ছবি দেখাচ্ছেন এ-মাসে। জাঁ-লুক গদারের দুটি, এবং ফ্রাঁসোয়া ত্রুফোর দুটি —মোট চারটি ছবির শো হবে ১৭, ১৮, ২৪ ও ২৫ এপ্রিল, সরলা রায় হলে। ছবি চারটি হল; "আ বু দ্য সুফল", "লে কারাবিনিয়ের", "জুল এ জিম" ও "লা পো

দস"। প্রথম দুটি ছবি কলকাতায় এর আগে দেখানো হয়নি।

প্রথম প্রতিশ্রুতি

গ্রাম বাংলার পটভূমিতে গত শতাব্দীর এক কাহিনী আশাপূর্ণা দেবীর "প্রথম প্রতিশ্রুতি"। দীনেন গুপ্তের পরিচালনায় কস্তুরী ফিল্মসের "প্রথম প্রতিশ্রুতি" ছবির কাজ এখন শেষ। প্রধান চরিত্র কিশোরী সত্যবতীর রূপসজ্জায় অভিনয় করেছেন নবাগতা সোনালি। অন্যান্য ভূমিকায় রয়েছেন কাজল গুপ্ত, হাসু বন্দ্যোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অনুভা ঘোষ, বসন্ত চৌধুরী, সমিত ভঞ্জ, পার্থ মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, চিন্ময় রায়, শেখর চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। নীহার রায় ছবির সংগীত-পরিচালক।

তপন সিংহ পরিচালিত "সাগিনা মাহাতো" চিত্রে দিলীপকুমার ও সায়রা বানু।
ফটো—দেশ

বিন্দুর ছেলে

সম্প্রতি বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী হলে ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স ইউনিটের প্রযোজনায় এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বিন্দুর ছেলে নাটকাভিনয় হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অমিতাভ লাহিড়ীর আবৃত্তি এবং ধনি লাহিড়ীর সংগীত উল্লেখ্য হয়।

নাটকাভিনয়ে টিম-ওয়ার্ক সুন্দর। এর জন্য নাট্যপরিচালিকা মালতী মুখোপাধ্যায় প্রশংসা পাবেন। চরিত্রচিত্রণে অসীম দাস, স্বপন পাল, অমিত দাস, অসিত দাস, আরতি পাত্র, অন্নপূর্ণা সাহা, মেনকা সাহা, সুশান্ত পাল, হেনা দাস ও শাশ্বতী লাহিড়ী সুঅভিনয় করেছেন।

অরণ্যদেব ★ লী ফক

বাঘ আর সিংহের মাথায় দড়ি বেঁধে, তাদের পিঠে পা রেখে, ঘোড়ার মত তাদের ছোটাচ্ছেন অরণ্যদেব। স্বর্ণ-দ্বীপে এই তাঁর এক মজার খেলা!
হোঃ, বাবাজী, একটু ছুট লাগা।

এদিকে গভীর অরণ্যে সবাই চিন্তিত।
এক্ষুনি এই চিঠি অরণ্যদেবের কাছে পৌঁছে দেওয়া দরকার।

সবাই ভাবছে, কী করা যায়.....
আমার ধারণা, তিনি স্বর্ণ-দ্বীপে গেছেন। যাবেন তো সেইরকমই বলছিলেন।
কিন্তু এই চিঠি খুবই জরুরী। এখন কী করা?

আমার ফুম্বার পিঠে বসে স্বর্ণ-দ্বীপে চলে যাই। বগটিনা আমাদের সঙ্গে থাকবে। তাহলে আর ভয় কী
সত্যিই তো, ভয় আবার কিসের?

হাতির পিঠে চড়ে স্বর্ণ দ্বীপের দিকে চলেছে রাজা আর টমটম। প্রহরী হিসেবে তাদের সঙ্গে চলেছে এক পোষা-সিংহী।
কিন্তু নদীটা আমরা কী করে পার হব রাজা?
এ-পার থেকে এমন চেঁচাব যে ও-পার থেকে তিনি শুনতে পাবেন।

স্বর্ণ-দ্বীপের বাঘ-সিংহ মাংস খায় না। জল থেকে মাছ ধরে খায়।

?

চিঠি এসেছে! চিঠি!
দাঁড়া, আমি আসছি।

ঝুলন্ত দড়ি ধরে নদী পার হয়ে এ-পারে আসছেন অরণ্যদেব...
কার চিঠি? কী লিখল?

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

পণ্ড্স
ড্রীমফ্লাওয়ার ট্যাল্ক
এর চেয়ে মোলায়েম সৌখীন ট্যাল্কাম আর হয় না!
চীজব্রো-পণ্ড্স-ইনকরপোরেটেড
(সীমিত দায়ে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)

বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীপুলক মণ্ডল

প্রহরাধীন লেভেল ক্রসিং গেট-এ
আপনার গাড়ীর গতি কমিয়ে দিন
ক্রসিং-এ থামুন
গেট খোলা থাকলে গাড়ি চালিয়ে চলে যান
আপনি নিজে ক্রসিং-এর গেট খুলবেন না কিংবা গেটম্যানকে তা খুলে দেবার জন্য বলবেন না
এতে সাংঘাতিক বিপদের সম্ভাবনা
প্রহরাহীন লেভেল ক্রসিং গেট-এ
গাড়ি থামিয়ে দেখে শুনে যদি নিশ্চিন্ত হন যে কোন ট্রেন আসছে না তখন এগিয়ে যাবেন
সাবধান
রেলওয়ে নিরাপত্তা সপ্তাহ
১০-১৬ এপ্রিল, ১৯৭০
মনে রাখবেন লেভেল ক্রসিং-এর কাছাকাছি কোন হাসপাতাল না থাকবারই কথা
অকারণে ঝুঁকি নেবেন না গন্তব্যস্থানে যাতে নিরাপদে পৌঁছতে পারেন সেই রকম ভাবেই গাড়ি চালান।
পূর্ব রেলওয়ে

॥ ● ॥ জাতির সম্বিৎ আনতে হলে গান্ধী-সাহিত্য পাঠ করুন ॥ ● ॥

● গান্ধী-সাহিত্য ●

মহাত্মা গান্ধী—রোমাঁ রোলাঁ	৩,
গান্ধী-চরিত—ঋষি দাস	৮,
শিক্ষা—মহাত্মা গান্ধী	১৫,
সংক্ষিপ্ত আত্মকথা—গান্ধীজী	৩,
গান্ধীজী—অনাথনাথ বসু	২॥০
গান্ধী ও মার্কস—মশরুওয়ালা	৩,
বাদশা খান—ঋষি দাস	৬,
সীমান্ত গান্ধী—সুকুমার রায়	৩,
নোয়াখালিতে মহাত্মা—সুকুমার রায়	৮,
অহিংস বিপ্লব—জে. বি. কৃপালনী	২,
স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থনৈতিক সংগঠন—আলোয়ানী ও ভট্টাচার্য	৫,
বুনিয়াদী শিক্ষা—বিজয়কুমার ভট্টাচার্য	২॥০
বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি—বিজয়কুমার	৪,
মহাত্মা গান্ধী—প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক	১৬,
গান্ধীজীর দূত—সুধীর ঘোষ	১৫,
গান্ধী-রচনাসম্ভার, ৬ষ্ঠ খণ্ড	৫০,
নঈ তালিম—ধীরেন্দ্র মজুমদার	৩,
বুনিয়াদী শিক্ষার কথা, ১ম—অনিল গুপ্ত	৩॥০
বুনিয়াদী শিক্ষার কথা, ২য়—অনিল গুপ্ত	৩॥০
বুনিয়াদী শিক্ষায় সংগঠন—অনিল গুপ্ত	৪॥০

মহাত্মা গান্ধী

প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক

ঊনত্রিশ অধ্যায়ে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন-চরিত। ডিমাই সাইজ। ৬৭২ পৃষ্ঠা।

ছয় মাসে দ্বিতীয় সংস্করণ

দাম : ষোল টাকা

শুভ ১লা বৈশাখ বুধবার নববর্ষে উদ্বোধন হয়েছে

● সকাল ৮টায় ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীটের বিক্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন প্রধাত গান্ধীবাদী নেতা ●

প্রফুল্লচন্দ্র সেন

● বিকাল ৬টায় কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের দোতলায় গান্ধী সাহিত্য প্রদর্শনীর উদ্বোধন ও সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রিয় দেশ-নেতা আজীবন গান্ধী-শিষ্য ●

অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়

● গান্ধী-সাহিত্য প্রচারের উদ্দেশ্যে ১লা বৈশাখ হইতে ১৫ই বৈশাখ পর্যন্ত প্রত্যেক ক্রেতাকে শতকরা ১৫, হারে কমিশন দেওয়া হবে ●

● গান্ধী শতবার্ষিকী সমিতি; গান্ধী স্মারক-নিধি, নবজীবন ট্রাস্ট; পাব্লিকেশন্‌স ডিভিসন প্রভৃতি প্রকাশিত বই পাবেন ●

● ২৫শে বৈশাখ প্রকাশিত হবে ●

বাংলার বাউল ও বাউল গান

এই সুবৃহৎ গ্রন্থে আছে গুহ্য বাউলতত্ত্বের ঐতিহাসিক ও ধর্মগত পটভূমি সম্পর্কে সুবিন্যস্ত ও সুবিস্তৃত আলোচনা। এতে আলোচিত হয়েছে : বাউল শব্দের উৎপত্তি ও তাৎপর্য ● বাউল কাহারা ● বাউল গানের রচয়িতা ● বাউল গানের রূপ ও সাহিত্যের মূল্য ● বাউল ধর্মের আবির্ভাব ও বাউল গানের রচনাকাল ● বাংলায় ধর্মের ক্রমাবিবর্তনে বাউল ধর্মের উৎপত্তি ও স্থান ● বাউল ধর্মের উপাদান ● বাউল ধর্মের সাধনা ● তন্ত্রসাধনা ও বাউল সাধনা ● সুফীধর্ম ও বাউল ধর্ম ● উত্তর ভারতের সন্তগণ ও বাউল ধর্ম। তৎসহ বাংলার বিভিন্ন জেলার আট শতাধিক নির্বাচিত বাউল গান, বহু বিশিষ্ট বাউল-গুরু ও সাধকের দুর্লভ চিত্র এবং সহজিয়া-পুঁথির কয়েকটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি গ্রন্থটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

এই পুস্তকের স্বীকৃতি স্বরূপ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫৮ সালে গ্রন্থকারকে রবীন্দ্র-পুরস্কার এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডি-ফিল উপাধি প্রদান করেন।

অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

বাংলার বাউল ও বাউল গান

পরিবর্ধিত পরিমার্জিত সংযোজিত দ্বিতীয় সংস্করণ

দাম : চল্লিশ টাকা

গবেষণা সাহিত্য-ক্ষেত্রে একটি অমূল্য অবদান

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি

কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, দোতলা। কলিকাতা ১২

ওরিয়েণ্ট বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স

৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা ১২

(সি ৯৭১৫)

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৭ বর্ষ ॥ সংখ্যা ২৫
শনিবার ৪ বৈশাখ ১৩৭৭

*

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

*

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

*

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৫৪১

*

চাঁদার হার

কলিকাতায়

বার্ষিক	... ২৫.০০
ষাণ্মাসিক	... ১২.৫০
ত্রৈমাসিক	... ৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	... ৩০.০০
ষাণ্মাসিক ,,	... ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক ,,	... ৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	... ৩০.০০
ষাণ্মাসিক ,,	... ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক ,,	... ৮.০০

ভারতের বাইরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	... ৫২.০০
ষাণ্মাসিক ,,	... ২৬.০০
ত্রৈমাসিক ,,	... ১৩.০০

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	... ৩৯.০০
ষাণ্মাসিক	... ১৯.৫০
ত্রৈমাসিক	... ১০.০০

*

দাম ৫০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাসুল ৭ পয়সা

*

DESH

Saturday 18, April 1970

শিক্ষা পর্ষদ ও পরীক্ষা

প্রতি বছর এই সময়—মার্চ এপ্রিল মাসে একবার, আর সেই জুন জুলাই মাসে আর একবার এই রাজ্যের মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কিছু কিছু গুণপনার খবর আমাদের কানে আসে। মার্চ এপ্রিল মাসে পর্ষদের পরীক্ষাগুলো হয়ে থাকে, আর জুন জুলাই মাস নাগাদ ফল বেরোয় পরীক্ষার। পর্ষদের কাছে এই দুটোই বিরাট ফাঁড়া। আমরা তো দেখি না, এই ফাঁড়া কখনো অল্পস্বল্পের ওপর দিয়ে কাটে। পরীক্ষা শুরুর আগে পরীক্ষার তারিখ, অ্যাডমিট কার্ড বিলি, এর কিছু কিছু ঝঞ্ঝাট তো আছেই, তারপর আসল পরীক্ষা। পরীক্ষা শুধু ছাত্র-ছাত্রীরাই যে দেয় তা নয় পর্ষদকেও দিতে হয়, প্রশ্নপত্র যথোচিত হয়েছে কি হয়নি, কী ধরনের ভুলচুক ঘটেছে—এ-সব গুরু ব্যাপার ছাড়াও প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা নিয়ে কিছুদিন কাগজপত্রে খুব হইচই চলে। তবে, এবারে প্রশ্নপত্র ফাঁসের কথাটা যতটা ছড়িয়েছে এতটা বোধ হয় আগে আর শোনা যায় নি। বিভিন্ন সূত্র থেকে আমরা শুনেছি, এবারে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় একাধিক প্রশ্নপত্র পরীক্ষার আগেই ফাঁস হয়ে গেছে ; যেমন বাংলা, অর্থনীতি, পৌরবিজ্ঞান ইত্যাদি। বাণিজ্য বিভাগের বুক কিপিং ও বাণিজ্যিক গণিতের কয়েকটি অংকের কথাও পরীক্ষার্থীরা আগে থেকে নাকি জানতে পারে। এই সব অভিযোগ যে অসত্য নয় তা শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট মহলের কাছে খোঁজ নিলেই জানা যেতে পারে। বিভিন্ন কাগজে যে-সব চিঠিপত্র প্রকাশ পাচ্ছে তা থেকেও চক্ষুন্মীলন হতে পারে। আমাদের প্রশ্ন হল, কিভাবে পরীক্ষার আগে পরীক্ষার্থীদের প্রশ্নপত্র ফাঁক হয়? এর জন্যে কারা দায়ী? পর্ষদ কর্তৃপক্ষ? প্রশ্নপত্র যাঁরা তৈরী করেন তাঁরা? নাকি ছাপাখানার সঙ্গে কোনো দলের যোগাযোগ আছে? এই প্রশ্ন-পত্রের বাজার দর কত? বলতে দ্বিধা নেই, আমাদের এখানে বেশ কিছু-কাল ধরেই প্রশ্নপত্র ফাঁসের গল্প আর ঠিক গুজব হয়ে নেই ; অনেকেই সন্দেহ করেন—টাকা রোজগারের একটা উপায় হিসেবে একদল লোক এই কুকীর্তি করে চলেছে। যে যাই করুক, পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব যখন পর্ষদের তখন এই ব্যাপারে সব কিছু দায় দায়িত্ব তাঁদেরই ; এবং অবিলম্বে তাঁদের পরীক্ষা পরি-চালনার ব্যাপারে সরকারীভাবে তদন্ত হওয়া উচিত।

পরীক্ষা চুকলে দেখা যাবে খাতাপত্র হারানোর কোনো কোনো খবর কাগজে ছাপা হচ্ছে। পর্ষদ সেখানে ঢোঁক গিলে একটা কৈফিয়ত দিয়ে খালাস পাবেন। তারপর ফল বেরুলে অনেক ছাত্রছাত্রীই মাথায় হাত দিয়ে বসবে। রামের মাথা শ্যামের ঘাড়ে চলে গেলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। মার্কশিটের গোলমাল, বোর্ডের ছাপা বইয়ের গোলমাল এ এখন নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা এখানে নীরব দর্শক, করার কিছু নেই ; কাকেই বা বলব, পরীক্ষার নামে এ প্রহসন করে লাভ কি! এখানে পরীক্ষার আগে প্রশ্নপত্র ফাঁস হবে, পরীক্ষার সময় স্কুলে স্কুলে পুলিস বসাতে হবে, পরীক্ষার হলে-এ কিছু ছাত্র বেপরোয়া-ভাবে বই নকল করবে, পরীক্ষার খাতা দেখার সময় ভুলত্রুটি যোগ্যতার অভাব থাকবে না এবং এই প্রহসনকে বলতে হবে পরীক্ষা। আর সেই পরীক্ষার দৌলতে আমাদের ছেলেমেয়েরা হবে শিক্ষিত? হায় কপাল!

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নামে শিক্ষক সমাজের অভিযোগ বিস্তর। ক্রমেই সেটা বাড়ছে। ইদানীং এমন কথাও শোনা যাচ্ছে যে, এই জায়গাটা রাজনীতির উর্বর ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে যুক্তফ্রন্টের আমলে শিক্ষামন্ত্রী পর্ষদকে তাঁর মুঠোয় পুরে ফেলার সবরকম চেষ্টা করেছিলেন, সফলও হয়েছেন যথেষ্ট। তাঁর নির্দেশে কয়েক শ স্কুলের পরিচালনা কমিটি বাতিল করে দিয়ে এক-একজন প্রশাসক বসানো হয়েছে। এই প্রশাসক কারা? কোন দলের লোক? কোন যোগ্যতায় উনি প্রশাসক ? এই ধরনের প্রশ্ন উঠলেই অনেক রহস্য ফাঁস হয়ে যায়। তাছাড়া যেখানে পরিচালনা-কমিটি ভাঙা হয়নি সেখানে কমিটি নির্বাচনের নামে কী করা হয়েছে তা কি প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী জানেন না? নাকি স্কুলের শিক্ষকরাই জানেন না?

শিক্ষা নিয়ে যে অনাচার ও নৈরাজ্য আমাদের এখানে চলেছে তাতে মনে হয় এই প্রহসনের শেষ হওয়া উচিত। ছেলেমেয়েদের কথা ভেবে একটা কিছু করা দরকার। পর্ষদের দায়িত্বহীন কয়েক জনের হাতে শিক্ষার ভার এভাবে ছেড়ে দেওয়ার কোনো সঙ্গত কারণ নেই।

ভাগ বাঁটোয়ারা

এদেরও যথাসাধ্য মন জুগিয়ে চলার চেষ্টা করতে বাধ্য হচ্ছেন।

ইচ্ছা থাকলেও আজ শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষে সোজা কোনও পথে দৃঢ় পদক্ষেপে এগোনো সম্ভব নয়। তাঁর নিজের দলের ভেতরে নানা মতের নানা স্বার্থের লোক। আবার বাইরেরও নানা মতের নানা স্বার্থের লোকের সমর্থনের উপর তিনি নির্ভরশীল। আমার মনে হয়, অবিভক্ত কংগ্রেসে থেকেও তিনি যত দৃঢ় পদক্ষেপে এগোতে পারতেন আজ তাও তাঁর পক্ষে কঠিন। তখন শুধু ঘরের একটা গোষ্ঠীর সঙ্গে সুকৌশলে মানিয়ে চলার প্রশ্ন ছিল। আজ তাঁকে ঘরের এবং বাইরের নানা দল উপদলের মন জুগিয়ে চলতে হচ্ছে।

শুধু যে এগিয়ে যাওয়ার পথে বাধা আছে তাই নয়, দাঁড়িয়ে থাকলেও রেহাই নেই। সকলেই মনে করছেন, ক্ষমতায় থাকতে হলে শ্রীমতী গান্ধীর তাঁর বা তাঁদের সাহায্য চাই-ই, তাই প্রত্যেকেই এই সুযোগে তাঁর কাছ থেকে যতটা সম্ভব আদায় করে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। সবাই জানেন, কি করে কতটা চাপ দিয়ে কত বেশি বাগিয়ে নেওয়া যায়। কংগ্রেস ভাগের আগে শুধু দলের কয়েকজন নেতা এই চেষ্টা করতেন। আজ গোটা দেশের নানা দল, নানা ব্যক্তি ও নানা শক্তি সেই চেষ্টায় ব্যস্ত। এমনকি আজ দেশের বাইরের লোকেরাও ওই পথ ধরেছেন।

দিন দিন শ্রীমতী গান্ধীর অবস্থাটা এইভাবে আরও অসহায় ও আরও করুণ হয়ে উঠতে বাধ্য। এবং এই পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য তিনি নিজেই প্রধানত দায়ী।

যদি না তিনি অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইতিমধ্যে শক্তি সঞ্চয় করতে পারেন তাহলে দিন দিন তাঁর বিপদ বাড়বেই। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এগোতে হলে তাঁকে দশ জনের মন জুগিয়ে চলতেই হবে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অব্যাহত থাকলে তাঁর তথাকথিত মিত্ররা নানা ভাবে চাপ দেওয়ার এবং শত্রুরা বিভিন্ন পথে আক্রমণ চালাবার সুযোগ পাবেনই।

শেষ পর্যন্ত শ্রীমতী গান্ধী আত্মরক্ষা করতে পারবেন, না পারবেন না সে বিতর্কে না গিয়ে আমি শুধু একটা প্রশ্ন তাঁর শত্রু-মিত্র সকলকে স্মরণ করতে বলি: শ্রীমতী গান্ধী না হয় গেলেন, তাঁর সরকারের না হয় পতন ঘটল—কিন্তু তারপর? তারপর কি? আজ লোকসভার ভেতরে এবং রাজ্যে রাজ্যে যে পরিস্থিতি তাতে সুষ্ঠু কোনও বিকল্পের কথা কেউ ভাবতে পারেন? জগাখিচুড়ী গোছের একটা কিছু হয়ত দিল্লিতে দাঁড় করানো যেতে পারে, কিন্তু বিভিন্ন রাজ্যের জগাখিচুড়ীগুলির অভিজ্ঞতা থেকে কি মনে হয় ওভাবে ভাল কিছু হতে পারে? যা চলছে তা অনেকেরই মনঃপূত নয়। কিন্তু আসবে কি? যা আসবে তাই বা কজনার মনোমত হবে?

ভবিষ্যতের সবদিক না ভেবে, সাময়িক সাফল্যের উৎসাহে ধাপে ধাপে এগিয়ে আজ শ্রীমতী গান্ধী যে বিপদে পড়েছেন এবং দেশকে যে বিপদে ফেলেছেন তাঁর তথাকথিত মিত্র এবং শত্রুরাও কি অতি লোভে এবং অন্ধ বিদ্বেষবশত তার চেয়েও বড় বিপদের দিকে পা বাড়াচ্ছেন না?

[illegible]

*

দেবরাজ

আবার হার

বিরাশী সিক্কা ওজনের আর একটি চড় কসিয়েছেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিক্সনকে ও দেশের সিনেট অর্থাৎ কিনা আমেরিকার রাজসভা। উপলক্ষটা মার্কিন সুপ্রীম কোর্টে একজন নতুন বিচারপতি নিয়োগ করা। আমেরিকায় দস্তুর হচ্ছে সুপ্রীম কোর্টে কোনও বিচারপতির আসন খালি হলে সেটি পূরণ করার জন্যে নাম সুপারিশ করেন রাষ্ট্রপতি। তখন সে সুপারিশ যাচাই করে দেখেন সিনেট। রাষ্ট্রপতির সুপারিশ যদি তাঁরা মঞ্জুর করেন তা হলে পাকা চাকরি তিনিই দেন আর যদি সে সুপারিশ নামঞ্জুর হয় তা হলে তাঁর বাছাই করা প্রার্থী বাতিল হয়ে যায়। তখন রাগে গোমরানো ছাড়া তাঁর আর কোনও উপায় থাকে না, কেন না সুপ্রীম কোর্টে বিচারপতি নিয়োগের ব্যাপারে শেষ কথা বলবার অধিকার মার্কিন সংবিধান প্রেসিডেন্টকে দেয়নি, দিয়েছে সিনেটকে। নিক্সন চেয়েছিলেন ফ্লোরিডার জজ হ্যারল্ড্ কার্সওয়েলকে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি করে পাঠাতে। তবে সে সুপারিশ সিনেট মেনে নেবে তার জন্যে জোর তদ্বিরও করা হয়েছিল। কিন্তু সিনেটের ভবিরা ভুললেন না। কার্সওয়েলকে সুপ্রীম কোর্টের জজের আসনে বসাতে তাঁরা জানালেন আপত্তি।

নিক্সনের দিক থেকে চেষ্টার কসুর হয়নি। শুরুতেই তিনি বলেছিলেন এমন লোককে তিনি সুপ্রীম কোর্টের জজ করে পাঠাতে চান যিনি কড়া ধাঁচের ব্যাখ্যাকার হবেন —আইনের যিনি চুলচেরা বিচার করবেন, উদারতার দোহাই দিয়ে বাড়াবাড়ি তিনি করবেন না। এখন যাঁরা সুপ্রীম কোর্টের জজ তাঁরা নাকি বড্ড উদার, তাতে নাকি নিগ্রোদের উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। কাজেই বিচারের পাল্লার পাষাণ ভারের জন্যে সেখানে তিনি এমন দু-চারজন লোককে বসাতে চান যাঁদের মত অতটা একপেশে হবে না। তাই তিনি দেশের দক্ষিণ এলাকা থেকে এমন লোক বেছে নিয়েছিলেন উদারতার বালাই যাঁর নেই। ধলা-কালায় মন কষাকষি আমেরিকার দক্ষিণের অঙ্গ রাজ্যগুলিতেই বেশী। বর্ণ বিদ্বেষ সেখানে খুবই উগ্র। সেখান থেকে সুপ্রীম কোর্টে কাউকে জজ করে পাঠালে তিনি অন্তত খানিকটা অনামত প্রকাশ করতে পারবেন নিগ্রোদের অধিকারের ব্যাপারে, এই ছিল নিক্সনের আশা। তাই তিনি বেছে নিয়েছিলেন ফ্লোরিডার ফিফ্থ্ সার্কিট কোর্টের জজ হ্যারল্ড্ কার্সওয়েলকে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতির শূন্য আসনটি পূর্ণ করবার জন্যে।

মনে হয়েছিল নিক্সনের মনোবাঞ্ছা এবার পূর্ণ হবে, সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রীম কোর্টের শূন্য আসনও। ব্যাপারটা নিয়ে বেশ খানিকটা ঘোঁট যে নিক্সন-বিরোধীরা পাকালেন তা অনেকেই আঁচ করেছিলেন। তবে তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন শেষ রক্ষে তাঁদের হবে না, হবে নিক্সনেরই। সিনেট যে একমত হয়ে প্রেসিডেন্টের সুপারিশ মেনে নেবেন না তা বুঝতে অবিশ্যি কারুর বাকি ছিল না। এ নিয়ে ভোটাভুটি যে হবেই তাও সকলেই জানতেন। কোনও পক্ষই তাই হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকেননি, দু পক্ষই চেষ্টা করেছেন ও দল ভাঙিয়ে নিজের দল ভারী করতে। সিনেটের সদস্যদের নিয়ে দিন কতক রীতিমত টানাটানি চলেছে। নিক্সন-বিরোধীরা সিনেটে প্রস্তাব আনলেন কার্সওয়েলের নিয়োগের সুপারিশ বিচার বিভাগীয় কমিটিতে আরও বিবেচনা করে দেখবার জন্যে ফেরত পাঠানো হোক। কমিটিতে কিন্তু এর আগেই একবার ও সুপারিশ মঞ্জুর হয়েছে। দু বার সেখানে পাঠানোর মানেই হচ্ছে তাকে খতম করে দেওয়া। সিনেট থেকে কোনও প্রস্তাব যদি সেখানে ফিরে পাঠানো হয় তা হলে কোনও দিনই তা আর সিনেটে ফিরে আসে না—এই হচ্ছে রেওয়াজ।

এপ্রিলের ছ তারিখে সে প্রস্তাব সিনেটে নাকচ হয়ে গেল। তার পক্ষে পড়লো ৪৪ ভোট, বিপক্ষে ৫২। নিক্সন-বিরোধীদের মুখ চুন—কার্সওয়েল নির্ঘাত এবার তরে গেলেন। তবে কিন্তু তাঁরা ছাড়লেন না। অনেক হাপ খেয়ে তবে সিনেটের পাঁচিল ডিঙিয়ে পৌঁছনো যায় সুপ্রীম কোর্টের দরজাগোড়াতে। সেখানে পৌঁছুতে গেলে আরও এক ধাপ পেরোতে হবে কার্সওয়েলকে। তাঁর সম্বন্ধে নিক্সনের সুপারিশ সিনেটের বিচার বিভাগীয় কমিটিতে আর গেল না বটে তবে তাতেই ব্যাপারটার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হলো না। এর পরও ওই সুপারিশ মঞ্জুর করে সিনেটে একটা প্রস্তাব পাস হওয়া দরকার। তবেই কার্সওয়েলকে পাকা নিয়োগপত্র দিতে পারবেন নিক্সন। ৬ এপ্রিলে মনে হয়েছিল সেটা নিছক একটা নিয়ম রক্ষের ব্যাপার। আসলে কিন্তু তা হলো না। দু দিন পরে পাশা আবার উল্টে গেল। ৮ এপ্রিলের ভোটাভুটিতে কার্সওয়েলের বিপক্ষে ভোট পড়লো ৫১, পক্ষে মোটে ৪৫। তাঁর সম্পর্কে প্রেসিডেন্টের সুপারিশ বাতিল হয়ে গেল। সুপ্রীম কোর্টের জজ হওয়া তাঁর আর এ যাত্রা হলো না।

কার্সওয়েলের অপমান যা হবার তা হলো কিন্তু মাথা কাটা গেল প্রেসিডেন্ট নিক্সনের, তাও একবার নয়, দু-দুবার। সুপ্রীম কোর্টে বিচারপতির যে পদটি খালি রয়েছে সেটিতে ছিলেন আবে ফর্টাস। কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ে তিনি ইস্তফা দেওয়াতেই আসনটি শূন্য হয়েছে। নিক্সন সে আসন গোড়ায় দিতে চেয়েছিলেন ক্লেমেন্ট হেন্সওয়ার্থকে। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধেও এমন সব কেচ্ছা বেরলো যে সিনেট বেঁকে বসে প্রেসিডেন্টের সুপারিশ খারিজ করে দিলেন। রেগে আগুন হলেও নিক্সনের করবার কিছু ছিল না। তাঁকে নতুন করে প্রার্থী বাছাই করতে হলো। সে প্রার্থীই ছিলেন কার্সওয়েল। এবারও নিক্সনকে হার মানতে হয়েছে তাঁর বিরোধীদের কাছে। এমনভাবে অপদস্ত কখনও কোনও প্রেসিডেন্ট এর আগে হননি, যদিও সিনেটের সঙ্গে অবনিবনা অনেকেরই হয়েছে। নিক্সনকে অবিশ্যি এর জন্যে ইস্তফাও দিতে হবে না, তাঁর ক্ষমতাও কিছু কমবে না। এরপর তাঁকে খুব সমঝে চলতে হবে, নইলে সিনেট তাঁকে আবার কোন ফ্যাসাদে ফেলবে কে জানে। অনেক ব্যাপারেই তো তাঁকে চলতে হবে সিনেটের মত নিয়ে।

পর পর দু বার প্রেসিডেন্টকে সিনেট অপ্রস্তুত করতেন না যদি নিক্সন চালে ভুল না করতেন। এক তো তাঁর প্রার্থী বাছাই ঠিক হয় নি—কার্সওয়েল এমন কিছু তালেবর জজ নন, তা ছাড়া তিনি বর্ণ বিদ্বেষী। তার ওপর তিনি সিনেটকে দাবড়ি দিয়ে কায়েস্তা করতে চেয়েছিলেন। সিনেটও তাঁকে উচিত শিক্ষা দিয়েছে তাঁর পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে দিয়ে। কার্সওয়েল টাকাকড়ি নিয়ে কোনও কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েন নি বটে, কিন্তু গোড়া থেকেই তিনি কালা বিরোধী। পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তো তাঁর নেইই বরঞ্চ তিনি অতি সাধারণ মেধার লোক। এমন ধরণের লোকের সুপ্রীম কোর্টে বসার যোগ্যতা নেই বলে মত প্রকাশ করেছেন বিস্তর গুণী জ্ঞানী। তবুও হয়তো সিনেট নিক্সনের মুখ রাখার জন্যে কার্সওয়েলকে সুপ্রীম কোর্টের জজ বানিয়ে দিতেন যদি না নিক্সন দাবি করতেন বিচারপতি নিয়োগ করার অধিকার তাঁরই, সিনেটের কাজ পরামর্শ আর সম্মতি দেওয়া —তাঁরা অনধিকার চর্চা করছেন প্রেসিডেন্টের সুপারিশ না মেনে নিয়ে। তাঁর এ দাবি যে কত অসার তা আজ হাড়ে হাড়ে বুঝছেন নিক্সন। মার্কিন সিনেট বিলেতের হাউস অব লর্ডসও নয়, এ দেশের রাজ্যসভাও নয়। সিনেটরদের ক্ষমতা তাঁদের দিয়েছে সংবিধান আর সে ক্ষমতা তাঁরা খাটান কারুর মুখ না চেয়েই।

'প্রশ্ন-পত্রিকা'

হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষার বাংলার প্রশ্নপত্র নাকি আগেই পত্রিকার মতো প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল; এবং তার সাইক্লোস্টাইল করা কপি নাকি পুজোর বাজারের সেই সব শারীরবিদ্যামূলক স-অ্যালবাম পাঞ্চ করা পত্রিকাগুলোর চাইতেও দ্রুত বিক্রী হয়েছে। উক্ত ভালো পত্রিকাগুলো প্রায়ই প্রভূত জ্ঞানপূর্ণ বলে

বন্ধুগণ, তিন নম্বর প্রশ্নের উত্তর বলছি টুকে নিন

তাদের চাহিদা অত্যন্ত বেশি; হায়ার সেকেন্ডারীর বাংলার প্রশ্ন-পত্রিকা অনেক দিক থেকে তাদের চেয়ে ঢের বেশি জ্ঞানপূর্ণ এ কথা অস্বীকার করবে কে!

সুতরাং — একটি সময়োপযোগী — প্রয়োজনীয় পত্রিকা যদি ভালো বিক্রী হয়ে থাকে, তার প্রচারকেরা যদি এ থেকে বৃহত্তর কর্মোদ্যোগে প্রেরণা পান—অর্থাৎ স্কুল ফাইনাল থেকে এম-এ, এম-এস্‌সি, মায় ল - ডাক্তারী - এনজিনীয়ারিং — সব পরীক্ষার প্রশ্ন যদি তারা আগে থেকেই প্রচার করে দিতে পারেন, তা হলে দেশের সমূহ কল্যাণ হবার সম্ভাবনা। যদিও এই কর্মীরা আমার জন্যে বিন্দুমাত্রও পরোয়া করেন না, তবু আনন্দের উচ্ছ্বাসে, আগে থেকেই তাঁদের আমি সাধুবাদ জানিয়ে রাখছি।

সত্যি বলতে কি, খবরের কাগজের টনক নড়বার আগেই—মানে পরীক্ষার বেশ কিছু আগেই শুনেছিলুম, বাংলার প্রশ্নপত্র ঘরে ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে। আমি তখন ক্ষৌরিতে পাওয়া ব্লেডের সংঘর্ষে কাতর—অনেক

গুরুতর সমস্যা আমার—আদৌ কর্ণপাত করি নি। পরীক্ষার দিন বিকেলে, বাস স্টপে একটি পরীক্ষার্থিনী বালিকার খেদোক্তি কানে এল : 'দূর—সব কোয়েশ্চেন আউট হয়ে গিয়েছিল, ওরা সবাই জানত।'

তার মানে, এই বালিকা প্রশ্নপত্রটি পায় নি। কিংবা তার বাপ-মা গুজবে কান দেবার দরকার বোধ করেন নি।

যাঁরা এই নিয়ে থানা পুলিশ—তদন্ত-কোলাহলকারী ইত্যাকার উচ্চরবে চারদিক কাঁপিয়ে তুলছেন, তাঁদের একটিই সরল জিজ্ঞাসা আছে আমার। প্রশ্নপত্র আউট হওয়াটা এমন কি অঘটন যে তার জন্যে ঢাকাই-পড়া রোল তুলতে হবে? স্যার আশুতোষের আমলে, সেই দীর্ঘনিশ্বসিত স্বর্ণযুগেও কোনো পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তিন-বার আউট হয়ে নিজে রেকর্ড তৈরী করে নি কি? লম্বা কাহিনী আগেও মজঃফরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তর-স্নাতক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রগুলো কি খোলা বাজারে বিক্রী হয় নি? প্রত্যেক বৎসরই কি এই বাংলা দেশে কোনো-না-কোনো পরীক্ষার বিবিধ প্রশ্ন নানা সূত্রে বেরিয়ে আসে না? ট্র্যাডিশন চলেছে চলতেই থাকবে।

চারদিকে র‍্যাকেট তৈরী হয়েছে নির্ঘাত। কিন্তু রাজনীতি থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রেই তো র‍্যাকেটীয়র। পঙ্কের একদিকের জলে বাকি ঠিকা-ভাইরাস ছেড়ে দেওয়া হবে আর অন্য ঘাটের জল থাকবে নির্মল স্বচ্ছ, এমন স্বপ্ন দেখবার কোনো মানেই হয় না। সমস্ত দেশেই যখন

ন্যাশনাল ক্যারাক্‌টার বলে কোনো বস্তুর অস্তিত্ব নেই, তখন আর—

সর্বনাশ, আমি বক্তৃতা দিচ্ছি নাকি? আর আমিই বা কোন্ মহাপুরুষ যে, এই সব তত্ত্বকথা আওড়াতে যাব? আমরা কোনো পরীক্ষার প্রশ্নপত্র আগে থেকে পাই নি, তাই নিছক ঈর্ষাকাতর এখন ভালো কথার বুলি খুলে বসেছি। আগাম প্রশ্নপত্র পেয়ে গেলে সেটাকে অস্পৃশ্য বলে—না দেখেই ছিঁড়ে

টাকা পয়সা চাইনে, উত্তর লিখে দাও

ফেলে দেব—এমন যুধিষ্ঠির আমরা ক'জন ছিলুম? পাই নি বলেই আমাদের এই সততার অহঙ্কার—নিছক বাধ্যতামূলক সততার!

প্রশ্নপত্রের গোপনতা রক্ষার ক্ষেত্রে কিন্তু প্রায় সব প্রশ্নকর্তা—সব শিক্ষকই ব্রাহ্ম-মরালিটি মেনে চলেন—এদিক থেকে তাঁরা অতিমাত্রায় নীতিবাগীশ; বন্ধ ঘরে প্রশ্ন তৈরী করেন তাঁরা—খামটি গালা মোহর

করবার আগেই প্রশ্নের ড্রাফ্‌ট আত্মসাৎ করেন। এগুলো সাধারণত 'আউট' হয় অন্য সূত্রে। কিন্তু আমি নিশ্চিতভাবেই একজনকে জানি—যে প্রবীণ ব্যক্তিটি এইসব 'মর‍্যালিটি'র কোনো তোয়াক্কা রাখেন নি কখনো। সারা জীবন ধরে তিনি অবাধে এই ব্যবসা চালিয়েছেন। তাঁর যে-সব সমধর্মী নীতিজ্ঞান বজায় রেখে রিক্ত হাতে রিটায়ার করেছেন, তাদের মূঢ়তার প্রতিবাদে তিনি জমি-বাড়ী-নগদ টাকার সুখ-সৌধে আরূঢ়।

বদলোক বলবেন? না—তিনি অতি ধর্মভীরু। এর সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক কী? লোকধর্ম আর সনাতন ধর্মকে দুটো আলাদা চেম্বারে ভাগ করে নিলেই হয়। যস্মিন্ দেশে যদাচার। তা ছাড়া যদি মালিন্য কিছু লাগেই—তা হলে কিঞ্চিৎ প্রাণায়াম, ধৌতি-বস্তি এবং নামগানেই দেহ-আত্মার শুচিতা পুনরাগত।

তাঁর লজিক—যদিচ আমায় খুলে বলেন নি, কিছুই বলেন নি তিনি, তবু আমি তা অনুধাবন করতে পারি। কোয়েশ্চেন তো আউট হবেই—তার জন্যে পুরুষ-সিংহেরা থাপ পেতেই রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন করবেন তিনি—পাবেন মাত্র বত্রিশ টাকা (ঠিক জানি না, শুনেছি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশ্নপত্র রচনার রেট এই)। আর তাঁর প্রশ্ন থেকে অন্যে হাজার হাজার টাকা কামিয়ে নেবে? তিনি ফলাবেন ল্যাংড়া আম, অন্যে করবে তার সেবা? তার চেয়ে তাঁর গাছের আম তিনিই খাবেন। কে না খেতে চায়? নীতিবাগীশরা চুলোয় যাক।

অতএব প্রশ্নপত্র আউট হোক।

ভালোই হবে। কারণঃ

কারণ, পরীক্ষা 'প্রহসনে' দাঁড়িয়েছে—এ নালিশ তো নিত্য-নৈমিত্তিক। যাঁরা তথাকথিত 'পাহারাদার', তাঁদের অনেকেই নাকি (দোহাই আপনাদের, আমি অবশ্য, নিশ্চয়ই তাঁরা সকলেই নির্লোভ এবং সৎ—আমি কেবল জনশ্রুতির পুনরাবৃত্তি করছি) অর্থের বিনিময়ে পরীক্ষার্থী (এবং -'অর্থিনী'দেরও!) অবাধে টোকবার অধিকার দেন। কোয়েশ্চেন আগে থেকে আউট হলে এবং কিছু পরীক্ষার কাগজ বেরিয়ে গেলে সবাই বাড়ী থেকেই লিখে আনতে পারবে। ইনভিজিলেটরদের বদনাম হওয়ার ভয় থাকবে না—ছাত্রছাত্রীদের নার্ভাস টেনশান থাকবে না—সব অতি সুশৃঙ্খলভাবে চলতে থাকবে।

দ্বিতীয়ত প্রশ্নের কাঠিন্য নিয়ে কেউ আর হট্টগোল করবে না—চেয়ার-ডেস্ক ভাঙবে না—পরীক্ষাকেন্দ্রে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়বেন না। সম্পত্তিগুলো রক্ষা পাবে।

কম্পোজিটর, প্রুফরিডার, পেপার সেটার মডারেটর সবাইকে ভাগ দিয়ে হাতে তেমন থাকে না, সেজন্য

তৃতীয়ত কিছু মধ্যযুগীয় নীতিবাগীশ, যাঁরা হলে নকল ধরার তাগিদে অহেতুক অপ্রীতিকর ঘটাবার অথবা শহীদত্ব লাভের ঝুঁকি নেন, তাঁরাও নিস্তার পেয়ে যাবেন। অনেকেরই তো হাত-পা-মাথা ভেঙেছে মরেও পড়েছেন—মৈনপুরী কলেজে সাম্প্রতিক নিহত অর্থনীতির অধ্যাপক স্বর্গীয় সুরেশপ্রসাদ উপাধ্যায় তারই আর এক উদাহরণ। এই অপচয়ও বন্ধ হওয়া দরকার।

জিজ্ঞাসা করবেন, তা হলে পরীক্ষার কী হবে?

কেন, আমার অধ্যাপক বন্ধুর মতে 'হ্যাট্ ট্রিক'! অর্থাৎ মেজেতে একটি খোলা হ্যাট্ চিৎ করে রাখা। তারপর দূরে থেকে সেই হ্যাটে খাতা ছুড়ে মারা। যে খাতা ভেতরে পড়বে, সে ফার্স্ট ক্লাস; যে শুধু হ্যাট্ ছুঁয়ে যাবে, সে সেকেণ্ড ক্লাস, যে খাতা ছোঁবেও না—সে ফেল।

সুতরাং কোয়েশ্চেন আউট হলেই বা কী আসে যায়? আশ্চর্য উত্তর-পত্রের জন্য অত্যাশ্চর্য পরীক্ষা প্রবর্তন ছাড়া কী করা যায় আর?

গদ্যছন্দে মনোবেদনা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ভেবেছিলাম নিচু করবো না মাথা, তবুও
ভেতরের এক কুত্তার বাচ্চা
মাঝে মাঝে মসৃণ পায়ের কাছে ঘসতে চায়
মুখ; জানি তো অসীমে
ভাসিয়েছি আমার আত্মার পায়রা দূত, বলেছি
মৃত্যুর চেয়েও সাচ্চা
মানুষের মতন বেঁচে থাকা, তবু তার দু একটি পালক
খসে জ্যোৎস্নায় মন-খারাপ হিমে।

মাঝে মাঝে গদি মোড়া চেয়ারে বসলেও ব্যথা করে
পশ্চাৎদেশ, আমি জানি
অতর্কিতে পেয়ালা-পিরীচ ভেঙে উঠে দাঁড়ানো
উচিত ছিল আমার

জানলার বাইরে থেকে ব্যাকুল নিহত চোখ মারে,
শীর্ণ হাতে দেয় হাতছানি
আমি এখনো সময় হয়নি ভেবে অন্যমনস্ক হই,
ইস্ত্রি ঠিক রাখি জামার—

এসব ইয়ার্কি আর কদ্দিন হে—শুধু বেঁচে থাকতেই
হালুয়া বার করে দিচ্ছে
অথচ কথা ছিল সব মানুষের জন্য এই পৃথিবী সুসহ
দেখে যাবো, ঠিক যে রকম
প্রত্যেক মৌমাছির আছে নিজস্ব খুপরি, কিন্তু
যার যখন ইচ্ছে
উড়ে যাবার স্বাধীনতা, ফুলের ভেতরে মধু সে জেনেছে, তবু
সঙ্ঘ-সভ্যতার জন্য তার শ্রম।

গভীর অসুখ আজ, আমার দেশের

গোবিন্দ চক্রবর্তী

গভীর অসুখ আজ আমার দেশের।
গভীর অস্বস্তি তাকে ঘেরে পাকে পাকে।
এক বুক অন্ধকারে, এক গলা পাঁকে
ডুবে যেতে-যেতে;
দিগন্ত-বিদীর্ণ বাংলা ডাকে, ডাকে, ডাকে—
ঐদিকে নদীর কিনারে,
ঐ শোনো চারিদিকে প্রান্তরে-কান্তারে।

ভীষণ সংকট আজ খণ্ডিত বাংলার।
ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দে
অবিরত নরকের দোর খুলে যায়।
দলে পিষে পলাশের, শিরীষের দিন—
বেরে আসে সারি-বাঁধা ফ্র্যাংকেনস্টাইন,
কালো মুখ, কালো হাত
অট্টহাস্যে আতংকের আগুন ছড়ায়।
ছিন্ন চীৎকার ছন্দে,
সুন্দরী জননী দগ্ধ শ্মশানে গড়ায়।

চারিদিকে হাওয়ায়—ভাইরাস।
কার্বনে কার্বনে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে।
তবু দেখি—কেউ-কেউ চমৎকার হাসে
বুদ্ধিমান, সতর্ক, চতুর।
বলে—আজই কোলাহল করে সমুদ্দুরে,
আজই না কি বাংলাদেশে সাতো মধুমাস
আজই নাকি মুক্ত হাওয়া বয়!
উড়ছে প্রথম মৌমাছি।
জীবনও একান্ত এই, জীবনের এল কাছাকাছি!

হবে, হবে—
বুঝি তাই-ই হবে।
তা না হলে বেঁটে-লম্বা হাজার মস্তান
শিল্পের শিরোপা পায়,
না হলে কি পায় নাম — গণ-অভিযান?
মা যেখানে খেলার পুতুল,
দুধপোষ্য শিশু হয় ঘৃণার ফুটবল!
দুঃশাসনও ধরেছিল দ্রৌপদীর চুল,
অতঃপর কুরুকুল—ইতিহাসে খুবই ত' সফল।

চাঁদোয়ার চার কোণে—
মাকড়সারা অবিশ্রাম লুতাতন্তু বোনে।
ফাঁদে ভণ্ড রাজনীতি,
রাত্রি জেগে,
অবাস্তব বিবৃতির জাল—
ভাগাড়ের শকুন ও শেয়াল
রাজপথে নারী মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়।
প্রধান পুরুষ যত পরিণত, পরিণত বৃহন্নলায়

কোন দিকে, আমরা কোথায়?

পেঁচা ওড়ে প্রকাশ্য দুপুরে।
গো-বৎস প্রসব করে সিংহীরা—অদূরে।
মূষিকের ভয়ে ক্রুদ্ধ সিংহ পালিয়ে যায়।
সভ্যতা কি মাঝপথে থমকে দাঁড়ায়?

॥ আট ॥

চোখ মেলল লিলি। সিলিং। মুহূর্তের জন্য ঝাপসা লাগল তার। পরক্ষণেই পরিষ্কার হয়ে এল। অনেকখানি জায়গা থেকে পলেস্তারার চাঙড় খসে গিয়েছে। কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল লিলি। চোখ সরাল। বেলোয়ারী ঝাড়, চোরাগার নিলামদারের দোকানে এ জিনিস দেখেছে লিলি। একেবারে নিচটা যেন স্ফটিকের একটা মোচা। তার উপর ঝাড়। ঝাড়ের পর ঝাড়। এক দিকটা ভাঙা। মাকড়শার জাল ঘেরাটোপ দিয়ে ঢেকে রেখেছে এই বিচিত্র, এই সুন্দর ঝাড়টাকে। চোখ সরাল। ফাঁকা। চোখ সরাল। ন্যাড়া সিলিং। এক জায়গা থেকে খানিকটা পলেস্তারা খসে গিয়েছে। না, আর কোথাও কিছু নেই। ক্লান্ত হয়ে চোখ বুজল। কত উঁচু সিলিং, কত প্রশস্ত, এ বেশ পুরনো আমলের বাড়ি। তথ্যগুলো মনে মনে নিজেকেই সরবরাহ করল। আবার চাইল। ঘরের মধ্যে বেশ আলো ফুটেছে। পুব দিকের খড়খড়ি ফেলা জানালার মাথায় অর্ধ-বৃত্তাকার রঙিন কাচ কেটে তৈরি এক নকশা। সবুজ আর মেরুন আর নীল আর বেগুনী আর কমলা আর হলুদ। একটা বড় গাছ। মাঝটা চিড় খাওয়া। লাল লাল ফল। বিরাট এক অজগর। অজগরের চোখে প্রলুব্ধ করার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। গাছের তলায় বিরাট এক পেশীবহুল পুরুষের মূর্তি। দাড়িগোঁফে মুখ এবং সবুজ এক পাতা দিয়ে শুধু পুরুষাঙ্গ আবৃত আর তার পাশে এক নারীমূর্তি: সম্পূর্ণ নগ্নিকা। একটি আধ-খাওয়া ফল পুরুষের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে। ওপাশে আলোর রশ্মি মূর্তিগুলোকে দারুণ ভাস্বর করে তুলেছে। লিলি ওদের চিনতে পারল। ওই মাসলম্যান, উনি হচ্ছেন আদি পিতা আদম। উনি হবা। আদি নারী। ওটা সেই আপেল গাছ। আর ওই সাপটা, ও হচ্ছে শয়তান।

লিলি সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল। ওরা কোথায়? লিলির জড়তা কেটে গেল। ও উঠতে গেল। উঃ! কি ব্যথা, কি ব্যথা! বুক, তলপেট, মাথা, সর্বশরীর টনটন করে উঠল। কিন্তু আসেনি। ওরা কোথায়? লিলি জোর করেই ওর দেহের ঊর্ধ্বভাগ কনুইয়ের ভর দিয়ে চাগিয়ে তুলল। সেই খোলাই-

—কি, জবাব দিচ্ছ না কেন? এই বিদ্যা নিয়ে নারীধর্ষণ করতে এসেছ? লজ্জা করছে না মুখ দেখাতে? ফাজিল, অসভ্য, আনাড়ী! এই প্রথম? না কী?

এতক্ষণে ওরা লিলির কথার মর্ম ধরতে পারল। আর সঙ্গে সঙ্গে ওদের কানের ডগা ঝপ করে লাল হয়ে উঠল। এর খোঁচায় লিলি যেন বেলুন থেকে হাওয়া বের করে দিল। লিলি দেখল, ওরা কেমন চুপসে গেল।

লিলি আর কথা বলল না। খাটের উপর গিয়ে বসল। বসে স্থিরদৃষ্টিতে শুধু ওদের দিকে চেয়ে থাকল। কারোর মুখে একটা কথা নেই। একটু পরে চঞ্চলা ছুরিটা বুজিয়ে পকেটে রাখল। তারপর কারপেটের উপরে গিয়ে ধপ্ করে বসে পড়ল।

॥ নয় ॥

বেশ কিছুক্ষণ পরে লিলিই কথা বলল। ওর স্বর আর আগের মত অত কঠিন নয়, তবে বেশ সংযত।

—এই যে তুমি, তোমাকে বলছি। [illegible] দিকে আঙুল দেখাল।

—তুমিই তো এদের পান্ডা। [illegible] গোদা। গুরু!

সে বোকা-বোকা মুখ করে লিলির [illegible] চাইল। এবং তার চোখে চোখ [illegible] চোখ সরিয়ে নিল।

—[illegible] আমাকে [illegible] আমার [illegible] কে করেছিল? [illegible]

—না, না। গুরু, [illegible] দেখা। আপনাকে [illegible] আমাদের ছিল না।

—আমরা গাড়িটা নিয়েই কাটি [illegible] ছিলাম।

—আমরা ভাবতেই পারিনি, আপনি মানে—

—আমরা ওদিক দিয়ে আসছিলাম, জানেন—

—গাড়িটা আমাদের বেশ পছন্দ হল—

—আমরা ওটা গলিতে সরিয়ে—

—একটা ভিখিরিকে বলে এলাম, মালিককে বলবি—

—আসলে আমরা চাইছিলাম কদিন গাড়িটায় চড়ে আবার ওটা ফেরত দিয়ে দেব।

—ও শালা দারুণ গাড়ি চালায়, জানেন! একেবারে চাম্পি।

—কিন্তু কোনও শালা আমাকে গাড়িতে হাত ঠেকাতে দেয় না।

—তোর লাইসেন্স আছে যে গাড়ি দেবে!

—লাইসেন্স-ওয়ালা ঢের দেখেছি [illegible] ফিফটিতে কাটা ঠেকলে কি একসিডেন্ট [illegible] সামলাতে [illegible] আমাকে [illegible] একটা টিপটপ গাড়ি, শালা এক [illegible]

যা চা-টা নিয়ে আয়। আমার খিদে পেয়েছে। ফালতু ভড়ংবাজি করবি নে। আমার লাস্‌ট্‌ ওয়ার্নিং।

॥ দশ ॥

সেই কাঠিন, হিংস্র, খুনী চোখ দুটোর মধ্যে অতলস্পর্শী ব্যর্থতার এমন তীব্র জ্বালা লুকিয়ে থাকতে পারে, লিলি ভাবতে পারেনি। এক লহমার জন্য সেটা তার নজরে পড়েছিল। এবং লিলিকে এক ধাক্কায় তা যেন কাত করে ফেলে দিল। লিলির দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসেছিল সে. ওরা যাকে গুরু বলে। যে ওদের নেতা। চড়াগলার সেই কথাটা এখনও লিলির কানে বাজে 'এখন বাপ মায়ের কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা করে. তাই পারতপক্ষে বাড়িতেই যাই না।' তবে কি লিলির কাছেও মুখ দেখাতে লজ্জা করেছিল তার, না হলে অমনভাবে পিছন ফিরে বসেছিল কেন অতক্ষণ? কেন ব্যথা লুকোতে চাইছিল সে?

অসিতও মুখ লুকিয়ে থাকতে চাইছে তার কাছ থেকে। ওই গুরুরই মতন। কিন্তু অসিতের সমস্যা যত সহজে বুঝতে পারে

চরমে টেনে নিয়ে যাবে এ বুঝি তারাও জানে না। কী করব এদের নিয়ে অসিত? না কি তুমি বলবে, ফরগেট ইট্ লিলি। একবার যখন ওদের খপ্পর থেকে কপাল-গুণে ফিরিয়ে এনেছ, তখন ব্যাপারটা চেপে যাওয়াই ভাল। আকটার অল্, সমাজে আমাদের একটা প্রেস্টিজ আছে। এসব ব্যাপারে যাই করতে যাও, আনপ্লেজ্যান্ট্ পাব্লিসিটি হবেই। সেটা কারো পক্ষেই বাঞ্ছনীয় হবে না, কি বল? সব থেকে ভাল, ব্যাপারটা ভুলে যাওয়া। নয় কি? বরং চল, একটা লম্বা ছুটি নিই। কুলু ভ্যালিতে আমাদের ডিরেকটারের এক ফ্রেন্ড থাকেন। ওখানে একটা কটেজ অ্যারেনজ করে চল কিছু দিন বিশ্রাম নিই গে। কলকাতা ছাড়লেই দেখেছি, আমার টেনশন্ সঙ্গে সঙ্গে কমে যায়। আই ফিল্ বেটার। কলকাতা, উঃ, এ একটা দুঃস্বপ্ন।

তুমি কলকাতাকে দুঃস্বপ্ন বলতে পার অসিত, আমি পারিনে। আমার দেহে মনে যে আঁচড়-কামড়ের অজস্র দাগ রয়েছে অসিত। স্বপ্নে কি শরীরে কোনও দাগ পড়ে? তা ছাড়া আবার তো কলকাতাতেই ফিরতে হবে। না-হয় আমরা কলকাতা ছেড়েই যাব। কোথায়? কোন সমাজে? এমন কোন সমাজ আজ আছে অসিত যাতে তুমি শুধু আগের মত একতরফা উপভোগ করে যাবে, আর সমাজ তোমার ইচ্ছাসুখে ভোগদখলের পথ নিরাপদ রেখে দেবে? এ যুগে তোমাকে কিছু নিতে হলে প্রতিদানে তোমাকে কিছু দিতে হবে, এ কথা বুঝতে বেশী দেরি করলে কিছুই থাকবে না অসিত। কিছুই না।

আসলে লিলির এটা নারভাস[illegible] অসিত ভাবল। সে নিশ্চিত। [illegible] মনস্তত্ত্ব বিষয়ে যে সামান্য জ্ঞান [illegible] পড়াশুনোর মাধ্যমে অর্জন করেছে, [illegible] অসিত বইটই ভালই পড়েছে, এবং [illegible] বিনয় দান করে, সে এ কথাটাও [illegible], [illegible] কোনও কিছু প্রকাশ করতে গেলে সে বিনয়বশতই জানিয়ে রাখে, আসলে [illegible] আমার সামান্য যে জ্ঞান তার [illegible] কথা জোর দিয়েই বলতে পারি না। [illegible] অসিত নিশ্চিত, এটা তার কথার মাত্রা, [illegible] সে নিশ্চিত যে, লিলির নারভাস [illegible] হয়েছে। না হলে এই কথা [illegible] বলে না। বেশী কথা বলা লিলির স্বভাব নয়। এবং গত পাঁচ দিন ধরে যে [illegible] ধকল গিয়েছে তার শরীর [illegible] [illegible] আরও যে [illegible] কিছু, [illegible] [illegible] ও যে এখনও [illegible] [illegible] তাই ওর বাচালতা। [illegible] অসিত [illegible] করল স্বামী হিসাবে তার [illegible] [illegible] লিলির উত্তেজনা প্রশমন করা, তাকে শান্ত করা। লিলিকে নরমালে [illegible] আনা।

সে ভেবে দেখল, এতক্ষণ সে এমন কিছুই করেনি। বরং যা কিছু করেছে তাতে লিলির নারভকে উত্তেজিতই করা হয়েছে। নিজের উপর তার লজ্জাই হল। তাই সে স্ট্র্যাটেজি পালটাল।

অসিত খুব কোমল এবং স্নেহসিক্ত স্বরে বলল, কিছু মনে করো না লিলি, ব্যাপারটা এতক্ষণ আমি বুঝতেই পারিনি। এতক্ষণ আমার চোখ দিয়ে ব্যাপারটা দেখছিলাম কি না! আসলে তোমার এবং আমার অভিজ্ঞতা এমন দুটো আলাদা স্তরে রয়েছে যে, আমার চোখ দিয়ে তোমার কাছে পৌঁছুতে চেষ্টা করাই পাগলামি। [illegible] এ কথাটা বুঝতে আমার এতক্ষণ সময় নিল। আমি একটা ইডিয়েট। আমি এখন

স্বপারটা তোমার চোখ দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করছি। ভাবছি। আর যত ভাবছি ততই বুঝতে পারছি লিলি যে, তুমিই ঠিক। তুমি ঠিকই বলেছ।

লিলি এতক্ষণে যেন কূলে পৌঁছাল। অনেকক্ষণ ধরে সে উত্তেজনার অকূল দরিয়ায় সাঁতার কাটছিল। এখন স্বস্তি।

অসিত লিলির ভাবান্তর লক্ষ করছিল। দেখল, লিলির মুখে প্রশান্তির উজ্জ্বলতা স্পষ্ট হয়ে উঠল। লিলির রোগ নির্ণয়ে আমার ভুল হয়নি। তোমাকে আমি বুঝতে পেরেছি লিলি। সে নিজেকেই শোনাল। ডাক্তার অল তুমি মেয়ে। তোমরা এমনিতেই দারুণ স্পর্শকাতর। তার উপর তোমার স্নায়ুর উপর এ কয়দিন যে নিদারুণ চাপ পড়েছে তাতে সেগুলো যদি বিকল হয়ে উঠে তাতে বলার কিছু নেই। তখন তোমাকে আমি রক্ষা করতে পারিনি। কোনোই সন্দেহ নেই, আমি স্বামীর দায়িত্ব পালন করতে পারিনি। আর সেজন্য বিবেকের কশাঘাতে আমি সদা-জর্জরিত। তবে আর আমি কোনও কর্তব্যই এড়িয়ে যাব না। তোমার স্নায়ু আবার আমি স্বাভাবিক করে তুলব। ভাল ভাল ডাক্তার দেখাব লিলি। দরকার লাগলে তোমাকে সুইজারল্যানড নিয়ে যাব। আমার সে সোর্স্ আছে। আমার অর্থ, আমার ধৈর্য আমার প্রেম, সব কিছু উজাড় করে, সব কিছু ঢেলে তোমাকে আবার আমি সুস্থ করে তুলব, স্বাভাবিক করে তুলব। এই বিভীষিকাময় স্মৃতি তোমার মন থেকে মুছে ফেলার জন্য আমার যা কিছু করণীয় আমি সব করব লিলি, সব।

—তুমি কিচ্ছু ভেবো না লিলি। অসিত বলল। আমাদের আবার নতুন করে ভাবতে হবে। নতুন করে শুরু করতে হবে।

—হ্যাঁ। লিলি বলল। একেবারে গোড়া থেকে অসিত, মাটি থেকে। আমাদের একটা অবলম্বন চাই।

—নিশ্চয়ই চাই। অসিতের স্বর খুব জরুরী হয়ে উঠল। কেন লিলি, আমরা তো সে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি।

—কিসের সিদ্ধান্ত অসিত? লিলি অবাক হল।

অসিত : বাঃ! ভুলে গেলে! মনে কর!

অসিত এবার অনেকক্ষণ ধরে হাসতে লাগল। সিগারেটের ধোঁয়া দিয়ে রিং করল। লিলির বিমূঢ় ভাব সে বেশ উপভোগ করল কিছুক্ষণ। সে যে কত নির্ভুল, কেমন, তার প্রমাণ হাতে-নাতে পাওয়া গেল তো? এ সিওর কেস্ অব নারভাস ডিসঅরডার।

কালই সে লিলিকে ডঃ দাশগুপ্তের কাছে নিয়ে যাবে। তার বিচারবুদ্ধির উপর নতুন করে শ্রদ্ধা ফিরে এল।

বলল, মনস্তত্ত্ববিশারদ যেভাবে তার রোগীর সঙ্গে কথা বলে সেইভাবে বলল, কেন লিলি, আমরা তো ঠিক করেছি উই মাস্ট হ্যাভ এ বেবি।

লিলির মুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

—আমি ভেবেছিলাম তোমার বুঝি ওতে সায় নেই।

—আরে না না, হাঃ, তুমি কি ভাব, আমি অতটা ইরেসপনসিবল।

অসিত তার হাসিতে যতটা পারে আত্মপ্রত্যয় মিশিয়ে দিল।

বলল, ইন ফ্যাক্ট, আরো আগেই আমাদের একটা বাচ্চা হওয়া উচিত ছিল। বাচ্চা-টাচ্চা না থাকলে, এখন ভেবে দেখছি, সংসারে কেমন যেন শিকড় গাড়া যায় না। না?

—হ্যাঁ। বাচ্চা হলে বাপ মায়ের দায়িত্ব-বোধ বাড়ে তো।

—তুমি কিন্তু খুব চালাক লিলি।

অসিত হাসতে লাগল।

—ভেরি ক্লেভার, অ্যাঁ। তুমি কিন্তু কত সুন্দরভাবে আজ আমাকে ট্র্যাপ করেছ, অ্যাঁ।

অসিত সুন্দরভাবে, সেই আগের দিনের মত, প্রাণখোলা হাসি হাসতে লাগল।

লিলির স্বর নকল করে বলল, আমি কিন্তু আজ পিল খাইনি অসিত। উঃ! আচমকা কথাটা শুনে তোমাকে সত্যি বলছি লিলি, আমার পিলে চমকে গিয়েছিল। মানে আমি ঠিক এই জিনিসটার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না তো। হঃ হাঃ হাঃ।

—তোমাকে না জানিয়ে আমার কোনও উপায় ছিল না অসিত।

—না না, ঠিক করেছ। হাঃ হাঃ হাঃ। একটা দারুণ সারপ্রাইজ দিয়েছ। হুঃ হুঃ হুঃ। আমি তো—আমি তো আমার সে সময়কার মুখ দেখতে পাইনি। আই অ্যাম সিওর, আমাকে খুব বোকা-বোকা দেখাচ্ছিল। কেমন দেখাচ্ছিল লিলি, বোকা পাঁঠার মত? হাঃ হাঃ হাঃ! নিশ্চয়ই তাই। আমার এখন মনে পড়ছে, আমার সেই পাঁঠার মত মুখ তোমার ভাল লাগেনি। তাই তুমি চেয়েছিলে আমাদের বাচ্চার চেহারা যেন তোমার মত হয় অর্থাৎ তোমার মত স্মারট লুকিং হয়। তাই না?

অসিতের সেই উদ্ভাসিত মুখের দিকে লিলি কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল।

তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলল, কারণটা আরও সিরিয়াস অসিত। আমি ওই তিনটে ছেলেরও দাবি মিটিয়েছি। আর তখনও আমার কাছে পিল ছিল না। ছেলে যার মতই হোক আমার তাতে কিছু এসে যায় না, আমি তার মা-ই থাকব। কিন্তু আমাদের বাচ্চার মুখে অন্যের আদল এসে পড়লে তুমি পাছে বিরক্ত হয়ে পড়, তাই আমি আন্তরিকভাবে চেয়েছিলাম, চাইছি, সে যদি আসেই তবে আমার প্রতিচ্ছবি হয়েই আসুক।

অসিত কী শুনল, প্রথমটায় বুঝতে পারল না। কিছুক্ষণ হাসিটাকে মুখে বেশ ফুটিয়ে রেখেছিল। তারপর ও স্তব্ধ হয়ে গেল হঠাৎ। ধীরে ধীরে ওর চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল। লিলি পাগল হয়ে ফিরে এসেছে। শী ইজ ম্যাড! অসিত ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। পাগলকে কিভাবে ট্যাকল করতে হয়? সে কি চুপ করে থাকবে? কথা বলবে? হাসবে? হো হো করে হেসে লিলির গলাটা ঘুরিয়ে দেবে? না কি লিলি সত্যি বলছে? না না, না না, না। ও পাগলামি করছে। এখন দায়িত্বশীল স্বামী হিসাবে তার উচিত একেবারে আত্মস্থ না হওয়া। খুব ঠাণ্ডা মাথায়, নিজেকে একেবারে সামলে রেখে লিলির সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হবে। সে পারবে তো। পারতেই হবে তাকে। ও গড! গড!

লিলি শান্তভাবে বলল, আমি স্বেচ্ছায় তাদের সঙ্গ দিয়েছি অসিত। ওদের বোঝানো জরুরী হয়ে পড়েছিল নারীদেহ জবরদস্তি-ভাবে মন্থন করলে তা থেকে তিক্ত হলাহল ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। অমৃতের আস্বাদ পেতে হলে নারীর সম্মতির দরকার লাগে। এবং সে সম্মতি ছুরি দেখিয়ে, নিপীড়ন করে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় স্নেহে প্রেমে অনুরাগে। আর স্নেহ প্রেম অনুরাগ প্রবৃত্তিকে বাশ আলগা করে লেলিয়ে দিয়ে পাওয়া যায় না, থাবা মেরেও ছিনিয়ে আনা যায় না, তাকে সৃষ্টি করতে হয় মনে, কল্পনায়, ধ্যানে। এখানে মস্তানি খাটে না, কোনও রকম চালাকি না।

এই অবস্থায় একজন দায়িত্বশীল স্বামীর কর্তব্য কী, যার স্ত্রীর মধ্যে পাগলামির লক্ষণ দেখা দিয়েছে? খুব ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখার চেষ্টা করল অসিত। এখনই ডঃ দাশগুপ্তকে কনসালট করা উচিত। তারপর না-হয় কোনও সাইকিয়াট্রিস্টকে দেখালেই হবে। কিন্তু তার আগে লিলিকে আদৌ বুঝতে দেওয়া নয় যে, অসিত তাকে পাগল ভাবছে। যতক্ষণ না সে ডাক্তারকে খবর দিতে পারছে, এবং লিলিকে লুকিয়েই ডাক্তারকে খবর দিতে হবে, ততক্ষণ তার কর্তব্য হচ্ছে লিলিকে গাড়ু হিউমারে রাখা।

অসিত আবহাওয়াটা যথেষ্ট তরল করে আনবার জন্য বলল, প্র্যাকটিক্যাল জোকে তোমার জুড়ি নেই লিলি।

অসিত হাসবার চেষ্টা করল।

—মনে আছে, সেবার, আমি যখন দিল্লিতে, অসিত হাসি-হাসি মুখ করে বলতে লাগল, তুমি সেই মারাত্মক চিঠিটা লিখেছিলে? লিখেছিলে মাত্র দুটো লাইন। সঙ্গের নিমন্ত্রণপত্রটাই সব বলবে অসিত। বাবা মায়ের মিনতি অমান্য করতে পারলাম না। ভুলে যেয়ো আর পারো তো ক্ষমা কোরো। আর তার সঙ্গে ছাপা এই নিমন্ত্রণপত্র। আমাদের বন্ধুর সঙ্গে তোমার বিয়ে। উঃ! আমি প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। কারণ লাস্ট সে লিলি, তোমার সেই জোকটা সত্যিই মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। আমি এক ফাইল স্লিপিং ট্যাবলেট কিনে এনেছিলাম। সত্যিই প্রায় খেয়ে ফেলতাম লিলি, অনেস্ট। ছিপি-টিপি সব খুলে ফেলেছিলাম। লাস্ট মোমেন্ট-এ কী মনে হল, সেই রাতে তখনই তোমার বাবার ঘুম ভাঙালুম ট্রাংক কল করে। তোমার বাবা প্রথমে ভাবলেন আমি বোধ হয় নেশা করেছি, বেশ চটেছিলেন। তারপর ভাবলেন আমার মাথাটা খারাপ হয়ে গিয়েছে। তারপর আমি যখন তোমার চিঠি এবং সেই নিমন্ত্রণপত্রটি আদ্যোপান্ত পড়ে শোনালাম এবং জানালাম আজই এ চিঠি পেয়েছি, তখন উনি হো হো করে হেসে উঠে বললেন, লিলি তা হলে তোমাকে এপ্রিল ফুল করেছে। সত্যি লিলি, তুমি খুবই সাংঘাতিক।

লিলি বলল, তার মানে তুমি এটাকেও তামাশা বলে ধরে নিতে চাইছ। কিন্তু আজ তো পয়লা এপ্রিল নয় অসিত। তা ছাড়া তুমিও কি এটা সত্যি সত্যিই ঠাট্টা বলে ধরে নিয়েছ? বল, বল।

না ধরে উপায় কি লিলি! আর্তকণ্ঠে অসিত বলে উঠল। এ কি কেউ করে?

কখনও শুনেছ, কোনও সুস্থ মানুষ এ কাজ করেছে? আমার বুদ্ধিশুদ্ধি সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

—তার মানে তুমি এখন আমার সুস্থতাকেও সন্দেহ করছ? লিলি সোজা অসিতের দিকে চেয়ে থাকল।

অসিতের পায়ের নিচে রঙিন টালির যে শক্ত মেঝেটা ছিল, হঠাৎ তার মনে হল সেটা দ্রুত গলতে শুরু করেছে। একটা চটচটে কাদার কুণ্ডে সে ডুবছে, ডুবে চলেছে। তার পতন রোধ করবার জন্য সে ক্রমাগত মুঠো করে করে হাওয়া চেপে ধরছে। তার কোনও অবলম্বন সে খুঁজে পেল না।

—আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে লিলি! সে মরিয়া হয়ে স্থির থাকবার চেষ্টা করতে করতে বলে উঠল।

লিলি বলল, শোন অসিত। হয় ওরা আমাকে বশীভূত করবে, না-হয় আমি ওদের বশে আনব। আমার নিয়তি আমাকে এমনই একটা জায়গায় ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল। আমার আচমকা সাহস এবং ওদের আনাড়ীপনা ওদের সাময়িকভাবে মুহ্যমান করে দিয়েছিল। আমাকে নিয়ে কী করবে, ওরা বুঝে উঠতে পারল না। একটার পর একটা দিন যেতে লাগল, তোমার তরফ থেকে কোনও সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। আমার সাহস ওদের অহং-এ খুব ঘা দিয়েছে, আমার কাছে ওদের চরম দুর্বলতা ধরা হয়ে গিয়েছে, ওদের ভিতরে শঙ্কা ঢুকেছে, এ ওরা সহ্য করতে পারবে না, [illegible] হয়েছিল। আমি একবার ভেবেও ছিলাম, তারপর ওরা বুঝি আমাকে ছেড়ে দেবে। কিন্তু দেখলাম ছাড়ল না। [illegible] থেকে দূরে দূরে থাকতে লাগল, আমাকে এড়িয়ে চলতে লাগল। ওরা নিজেদের মধ্যে শুধু গুজগাজ ফিসফাস করে [illegible] পরামর্শ আঁটতে লাগল। এবং মাঝে মাঝে আমি দেখতে লাগলাম, ওদের চোখের তারায়, মুখের রেখায় হিংস্রতা ফুটে উঠছে, লালসা উপচে পড়ছে। আমি বুঝতে পারলাম, অবিলম্বে আমি যদি কিছু না করি, শুধু অসহায়ভাবে ওদের মর্জির উপর নিজেকে ছেড়ে দিই তবে আমার সর্বনাশ রোধ করতে পারব না। ওরাই আক্রমণ করবে। নিয়তি আমাকে যেখানে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল অসিত, তার পিছনে গভীর খাদ আর সামনে দুরন্ত চড়াই। নিষ্ক্রিয়ভাবে থেমে থাকবার উপায় নেই, গভীর খাদে তলিয়ে যেতে হবে। আমি তাই চড়াই ভাঙবার শক্ত কাজটাই বেছে নিলাম। আর তখনই আমার মনে হল, আমার যা শ্রেষ্ঠ সম্পদ তা আমাকে রক্ষা করতেই হবে। আর অসিত, তখনই বুঝতে পারলাম, কেমন করে বলতে পারব না, সম্ভবত আমার অন্তরাত্মাই বলে দিল, আত্মমর্যাদাই মানুষের সব থেকে বড় সম্পদ। এর চেয়ে বড় কিছু নেই। দেহের শুচিতা না, কিছু না। আর তখনই কেমন যেন এক দারুণ প্রেরণা এসে আমার নিষ্ক্রিয়তাকে ভেঙে চুরমার করে দিল। আমাকে অনেক বড় করে দিল। আমি স্থির করলাম, শুধু আমার মর্যাদা রক্ষা করলেই চলবে না, ওদের মর্যাদাবোধকেও জাগিয়ে তুলতে হবে। নরনারীর সম্পর্কের মধ্যে মাধুর্য কোথায়, কাম্য কী, তা ওদের একে একে হাতে-কলমে বুঝিয়ে দেবার জন্য নিঃসংকোচে এগিয়ে গেলাম।

—সত্যিই ওরা আনাড়ী, অসিত। আনন্দের মন্দিরে আমিই গাইড করে একে একে ওদের নিয়ে গেলাম। খুব সহজ কাজ ছিল না এটা। ফল যা হল, তা আমার পক্ষেও অভাবনীয়। ওদের জীবনে শুধু বঞ্চনা ছাড়া পরিতৃপ্তিরও একটা জগৎ আছে এবং সে জগতে প্রবেশের চাবিকাঠি হিংস্রতায় নেই, হিংসায় নেই, লোভে নেই, লালসায় নেই, সেটা এই প্রথম ওরা আবিষ্কার করল। কবে ওরা অভিভূত হয়ে পড়ল, অসিত।

শিথিল এবং প্রশান্ত লিলির কোলের কাছে শুয়ে সেই ড্রাইভার ছেলেটা, ওদের মধ্যে যার বয়েস সব থেকে কম, যে কিশোর, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। ধর নিরেট

অন্ধকারে ঢাকা। বাকি দুজন কারপেটে শুয়ে সিলিং-এর দিকে চেয়ে কি এক ভাবনায় মগ্ন। রাত্রি কত হয়েছে কে জানে? লিলি অনেকক্ষণ ধরে তার কান্না শুনল। তারপর পাশ ফিরে সেই শ্রান্ত দেহটার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। মুখের উপর হাত পড়তেই দেখল তার দাড়িটা ভিজে সপসপ করছে।

লিলি ফিসফিস করে বলল, মেয়েদের দেহটা সেতারের মত। অজস্র তার, কত জটিল বিন্যাস। বাজাতে যে জানে, পরিশ্রম করে যে শিখেছে, সেই শুধু সেই নিরেট তার থেকে আশ্চর্য সুর তুলতে পারে। আনাড়ী হাতে টানাটানি করলে তা শুধুই ছিঁড়ে যায়। জান তো, আদি পিতা আদম নিজের পাঁজরের হাড় থেকে নিজের সঙ্গিনী সৃষ্টি করে নিয়েছিলেন। প্রত্যেকটি পুরুষকেই তার মনের মত সঙ্গিনী সৃষ্টি করে নিতে হয়। এবং তার জন্য নিজের পাঁজরের হাড় খসাবার মত ত্যাগস্বীকারও করতে হয়। এ জিনিস কেড়ে নেওয়া যায় না।

ছেলেটা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, আমাদের কাছে কেউ কখনো আসে না, আসবে না।

লিলি চুপ করে ওর কথা শুনছিল।

ছেলেটা বলল, লোকে আমাদের ভয় পায়, আমরা তাই মস্তানি করি। তখন না আমাদের মনে কেমন একটা দারুণ শক্তি এসে যায়। বেশ ভাল লাগে। না হলে, কে আমাদের পুছত? মনে হয় আমরা যা খুশি করে যেতে পারি। আসলে জানেন, এই জন্যই আমাদের রুস্তমি। এমনি কেউ পুছবে না, কিন্তু মস্তান বলে আপনার নামডাক একবার ছড়িয়ে যাক, তখন দেখবেন সব শালা খাড়িঅলা, গাড়িঅলা, পার্টিঅলা কি খাতিরটাই না করবে।

একটু থামল ছেলেটা।

তারপর বলল, আপনি কি ভেবেছেন, কোনও মেয়ে আমাদের ভালবাসতে আসবে? কেউ আসবে না। আমাদের কাছ থেকে কাজটাই শুধু আদায় করে নেবে। তারপর কাটকলা। আসলে কি জানেন, কাউকে বিশ্বাস করা যায় না।

ছেলেটা চুপ করল। লিলিও। ছেলেটি একসময় ঘুমিয়ে পড়ল। লিলির চোখে ঘুম নেই। সে টের পেল তার ওপাশে আরেকজন এসে শুলো। তার বুকে একটা হাত এসে পড়ল। সে আস্তে করে সেটা সরিয়ে দিল। কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। লিলি টের পেল এ সেই চড়াগলা।

লিলি আস্তে বলল, যাও, নেমে যাও। ছেলেমানুষি কোরো না।

সে লিলির মুখে হাত চাপা দিয়ে চাপা এবং উত্তেজিত স্বরে বলল, চুপ। ওরা শুনতে পাবে।

—তবে, যাও, চুপচাপ নেমে যাও।

—না।

—না কি?

লিলিকে বাধা দেবার মুহূর্তমাত্র অবসর না দিয়ে লিলির গায়ের কাপড় সরিয়ে সে বিদ্যুৎবেগে তার উপর উঠে পড়ল। লিলি লাথি মেরে তাকে নিচে ফেলে দিল। এবং উঠে বসে হঠাৎ কেঁদে ফেলল। সব ভুল, সব ভুল? বুকের ভিতরে দারুণ কষ্ট হচ্ছে লিলির। বাইরে ঘুম ভেঙে ওঠা পাখিগুলো শব্দ করে ডানা ঝাপটাতে লেগেছে।

হঠাৎ ঘরের আলো জ্বলে উঠল এবং গুরুর মূর্তি দেখে চড়াগলার মুখ একেবারে ফ্যাকাশে মেরে গেল। হতচকিত হয়ে সে দরজার দিকে দৌড় দিল। গুরু বাঘের মত লাফিয়ে পড়ল তার উপর। চড়াগলার ঘাড় ধরে পেটে দুম করে মারল এক ঘুঁষি! ওর শরীরটা বেঁকে গেল। শিরদাঁড়ায় আরেকটা পড়ল। কোঁক করে শব্দ করে উঠল চড়াগলা।

—কুকুর! লুচ্চা! লোভ আর মিটছে না! গুরু সমানে ওকে পিটে চলেছে।

—শালা, বাজারের মাল পেয়েছ। মাফ চা শালা। নইলে আজ তোর জান নিয়ে নেব।

ড্রাইভার ছেলেটাও ধড়মড় করে উঠে বসল। কাঁচা ঘুম ভেঙে তার চোখ দুটো জ্বালা করছে। দু হাতে চোখ রগড়াতে রগড়াতে ব্যাপারটা সে বুঝে নিল।

আশ্চর্য করুণ তার স্বর, বলল, ছেড়ে দাও গুরু, ছেড়ে দাও। আমরা সকলেই তো এই। যেটা আমাদের পাওয়ার নয়, তার দিকেই হাত বাড়াই। যা বে, এবার থেকে লগ যদি দিতে চাস, নিজের একটা জুটিয়ে নিবি। মন না লাগলে ও মজা আর কিছুতে পাবিনি। এত পেয়েও বুঝলি নি?

চড়াগলা মুখ নিচু করে বসে থাকল। তার একটু দূরে গুরু। লিলি নির্বাক হয়ে ওদের দেখছিল। সবাই চুপ। হঠাৎ বাইরে ঘুমভাঙা পাখিগুলো ক্যা ক্যা করতে লাগল।

ছেলেটা হঠাৎ বেশ জোরে এবার বলে উঠল, একটা জব্বর স্বপ্ন দেখলাম মাইরি। এক সারজেনট আমার ট্রায়াল নিচ্ছে। সামনে যাও, ব্যাক কর, জোরে চালাও, ব্রেক মার। আমি মাইরি পাস। আর সেই সারজেনটের মুখখানা না, ঠিক এই আপনার মত।

ওরা সবাই লিলির মুখের দিকে চাইল। লিলির চোখ দুটো নতুন করে টলটলিয়ে উঠল।

লিলি বলল, ওদের কিন্তু আসবার সময় হয়ে এল অসিত। কি করবে ঠিক করে ফেল। সমস্ত ঘটনা তোমাকে বললাম। ওরা আসবে আমি জানি। এও জানি, যদি ওরা আসে, যদি দেখে আমরা ওদের ফিরিয়ে দিচ্ছিনে, তবে আর ওরা মস্তানের দলে নাও ভিড়তে পারে। এইভাবেই আমরা যদি আমাদের দল ভারি করতে পারি তবেই না আমাদের পথ, আমাদের সন্তানসন্ততিদের পথ নিরাপদ করতে পারব। আর কি উপায় আছে, আমি তো জানিনে। ওরা আসবে অসিত, তবে দরজা থেকে ফিরে যাবে কিনা, তা তোমার উপর নির্ভর করছে, কারণ এ বাড়ি তোমার।

অসিত ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, সে কি কথা। লিলি, এ বাড়ি তোমারও।

—সেটা নির্ভর করবে, লিলি বলল, আমরা একসঙ্গেই থাকব, না ডাইভোর্স করব, তার উপর।

—ডাইভোর্স! অসিত আঁতকে উঠল। ডাইভোর্সের কথা উঠছে কেন?

—তুমি তো সব শুনলে। লিলি শান্তভাবে বলল। এর পর আমাকে নিয়ে কি করবে, তুমিই ঠিক করো।

অসিত কি বলতে যাচ্ছিল, কলিং বেল ক্রিং-রিং-রিং করে বেজে উঠতেই সে চমকে গেল। লিলি দেখল, অসিতের মুখ থেকে কে যেন সমস্ত রক্ত পাম্প করে নিল।

লিলি তাগাদা দিল, ওরা এসে গেছে অসিত, তৈরী হয়ে নাও।

আবার বেল বাজল। অসিত অসহায়ের মত লিলির দিকে চাইল।

লিলি বলল, তবে আমিই যাই।

—দাঁড়াও লিলি। প্লিজ! অসিত যেন খাবি খাচ্ছে। একা যেয়ো না। আমিও যাব। ওদের অন্তত এটা বুঝতে দিতে হবে আমি—আমরা ওদের আর ঠিক তেমন ভয় করছিনে।

ড্রেসিং গাউনের সিল্কের দড়িটা কোমরে বাঁধতে বাঁধতে অসিত বলল, শুধু এক সেকেন্ড দাঁড়াও। প্লিজ লিলি।

॥ এগার ॥

অসিত দ্রুত বাথরুমে ঢুকল। তারপর মেডিসিনের ড্রয়ারটা হাতড়ে স্নায়ুসঞ্জীবক একটা পিল বের করে নিয়ে চট করে খেয়ে ফেলল। তারপর দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল, কালই ডঃ দাশগুপ্তর কাছে যাবে, কেননা তার নারভ্ ফেল করছে, তার একটা থরো চেকিং দরকার। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে, সে দেখল, তার একটুও সময় লাগল না।

মানুষ জীবনানন্দ

লাবণ্য দাশ

॥ দুই ॥

কবিতার খাতা ছিল কবির প্রাণ। সে-সব খাতা তিনি কাউকে ছুঁতেও দিতেন না। এমন কি তাঁর টেবিলের সামনে গেলেও তটস্থ হয়ে উঠতেন। কিন্তু প্রয়োজন বোধে—আমার জন্য সেসব খাতার চরম দুর্গতিও তাঁকে হাসিমুখে সহ্য করতে দেখেছি।

আমার বিয়ের কিছুদিন পরের কথা। সে যুগে স্বাধীনতা-সংগ্রামের বীজ দিকে-দিকে, দেশে-দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, নিজেকে সেই যজ্ঞে আহুতি দেবার জন্য বিনয়, বাদল, দিনেশ, প্রীতি হাসিমুখে এগিয়ে এসেছিলেন—আমি সেই যুগেরই মেয়ে। কাজেই ইংরেজের কৃপাদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হইনি।

একদিন সকালে হঠাৎ আমার নামে ওয়ারেন্ট ও বেশ কয়েকজন পুলিস নিয়ে আই বি ডিপার্টমেন্টের তিনজন অফিসার আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। কবি তখন সামনের দিকের ঘরেই ছিলেন। একজন অফিসার তাঁকে জিগ্যেস করলেন, 'লাবণ্য দাশগুপ্ত কার নাম?'

কবি উত্তর দিলেন, 'আমার স্ত্রীর নাম।'

অফিসারটি সঙ্গে সঙ্গেই বললেন, 'তাঁর নামে ওয়ারেন্ট আছে। আপনি কয়েক-জন ভদ্রলোক ডাকুন। আমরা ঘর সার্চ করব।'

কবি নিঃশব্দে তাঁর ঘর দেখিয়ে দিলেন। দু'টি ঘণ্টা ধরে পুলিসের তাণ্ডব নৃত্যের ফলে তাঁর অতিপ্রিয় কবিতার খাতাগুলির যা অবস্থা হয়েছিল তা দেখে আমার মত কারাবরণসর্বস্ব মানুষের চোখেও জল এসে গিয়েছিল।

শুধু সার্চ করেই অফিসাররা থামলেন না। জেরার জন্য আমাকেও তাঁদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হল। তাঁরা একটা নাম জানবার জন্য অনেক চেষ্টা করে শেষে হাল ছেড়ে দিলেন।

এতসব গোলমালের মধ্যেও একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি। যিনি পদস্থ অফিসার, তিনি আমার পড়ার টেবিলের উপরে বসে কবির 'ঝরাপালক' নামে কবিতার বইখানি পড়তে আরম্ভ করে দিয়েছেন—মাঝে মাঝে কবির দিকে সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেনও। যিনি প্রশ্ন করছিলেন, তিনি আমার খাটের উপরে বসেছিলেন।

সার্চ করতে করতে হঠাৎ আয়র্ল্যাণ্ড-বিপ্লবের একখানা ইতিহাস পাওয়া গেল।

কবি জীবনানন্দ দাশ

বইখানা দেখে আমি নিজেও অবাক হয়ে গেলাম। সেখানা তো আমার নয়-ই—এমন কি কে এনেছে তাও জানি না। বই পেয়ে খাটের উপরের জন কবির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখুন, আপনার স্ত্রী রীতিমত বিপ্লববাদীদের দলে যোগ দিয়েছেন।' কথাটা শুনে কবি কিছুক্ষণ হতবাক হয়েই রইলেন। পরে, আস্তে আস্তে বললেন—'আমার স্ত্রীর বিপ্লবের সঙ্গে কোনই যোগাযোগ নেই।'

'মশাই, এরা ঢাকার মেয়ে। এদের কতটুকু আপনি চেনেন?' মাথা উঁচু করে গর্ব-ভরে অফিসার উত্তর দিলেন।

এ-কথায় কবির সমস্ত মুখে একটা ম্লান আভা ছড়িয়ে পড়ল। তিনি ব্যথাভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে নীরবেই দাঁড়িয়ে রইলেন। টেবিলের উপরের জনও আমার দিকেই তাকিয়েছিলেন। খাটের আরোহী এখন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ বই কি আপনার?'

'হ্যাঁ।'

'এরপর আপনার কি আর কিছু বলার আছে?' কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এক হাতে ওয়ারেণ্ট ও অন্য হাতে কলম ধরলেন।

কবি তখনও নিষ্পলক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে। আমি এবারে গম্ভীর হয়েই উত্তর দিলাম, 'বলবার আমার এইটুকুই আছে যে ওখানা বি এ ক্লাসে ইতিহাসের রেফারেন্স বই হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ইচ্ছে হলে বি এম কলেজে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বেশ রাগের সঙ্গেই অফিসারটি বললেন, 'বি এ ক্লাসের বই আপনার কাছে কেন? তাছাড়া এত-

রকম গল্পের বই থাকতে বিদ্রোহের ইতিহাসই বা পড়েন কেন?'

আমি তখন হেসে ফেলেছি। হাসতে হাসতেই উত্তর দিলাম, 'আই এ-তে আমার ইতিহাস আছে। তাছাড়া ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসও বাংলার ছেলেমেয়েকে পড়তে হয় বলেই জানি। তবে আপনি যদি সঠিক খবর জানতে চান, তাহলে অবিশ্যি ইতিহাসের অধ্যাপককেই ডেকে আনতে হয়।'

আমার কথা শুনে অফিসারটি সম্ভবত অপমানিত বোধ করলেন। তাঁর মুখে বেশ একটা থমথমে ভাব দেখা গেল। কিন্তু টেবিলের উপরের জন হো-হো শব্দে হেসে উঠলেন। হাসি থামলে বললেন, 'ওহে, আর কেন? অনেকভাবেই তো পরীক্ষা করলে। এবারে nil লিখে দিয়ে উঠে পড়।'

কবির মুখের ম্লান আভা সরে গিয়ে তৎক্ষণে সেখানেও হাসি ফুটে উঠেছে।

চলে যাবার সময় পদস্থ অফিসারটি পরমাগ্রহে কবির বইখানি চেয়ে নিলেন এবং সস্নেহে আমার দিকে তাকিয়ে বলে গেলেন, 'আমাদের জন্য অনেক কষ্টই আজ আপনাকে ভোগ করতে হল।'

পুলিসের হাঙ্গামার জন্য অনেকেই আমার উপর বিরক্ত হলেন। কিন্তু কবিকে দেখে সত্যিই আমি অবাক হয়ে গেলাম। বিরক্ত তো তিনি হলেনই না, বরং আমি যে দেশের কথা চিন্তা করি সেজন্য তিনি গর্ব বোধ করলেন। কারো স্বাধীনতা খর্ব করতে অথবা ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোন কাজ করাতে আমি তাঁকে কোনদিনও দেখিনি। তিনি সব সময়েই বলতেন, 'বড় হলে যে যেটা উচিত বলে মনে করবে সে সেটাই করবে। কারো তাতে বাধা দেওয়া ঠিক নয়।'

এ বিষয়ে একটি মজার ঘটনা বলি। আমি যেবারে বি এ পরীক্ষা দিলাম, সেবারে কবি সেই কলেজেই (বরিশাল — ব্রজমোহন কলেজ) ইংরেজীর অধ্যাপকের পদে ছিলেন। ইতিহাস পরীক্ষার দিন শরীর খুব খারাপ বোধ হওয়াতে আমি পরীক্ষা দেব না স্থির করে বাড়ি চলে যাচ্ছিলাম। কিন্তু একজন অধ্যাপক আমাকে বাধা দেন। এমন কি আমাকে পরীক্ষা দিতে বাধ্য করাবার জন্য কবিকে ডেকে নিয়ে এলেন। তাঁর সামনেই আমি বললাম, 'আমি পরীক্ষা দেব না, বাড়ি যাব।' তিনি আমার মুখের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'ইচ্ছে না থাকলে পরীক্ষা দিও না। শরীর বেশী খারাপ লাগলে বাড়ি চলে যাওয়াই উচিত।' কথাটি বলেই মুহূর্তমাত্র সেখানে অপেক্ষা না করে নিজের কাজে চলে গেলেন। কিন্তু শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ... কবির উপর ... চটে গিয়ে বলেই ফেললেন, 'বাড়ি যাবার অনুমতি

তুমি দিতে পার, কিন্তু আমি কিছুতেই দেব না।' তাঁরই ব্যবস্থায় আমি পরীক্ষা দিতে বাধ্য হলাম। তিনি যদি সেদিন আমার জন্য অতখানি কষ্ট স্বীকার করতে এগিয়ে না আসতেন, তাহলে হয়ত নিজের পায়ে দাঁড়াবার সুযোগ আর পেতামই না।

আমরা যে সময়ে বরিশালে ছিলাম, তখন সেখানে স্ত্রী-স্বাধীনতা তো ছিলই না বরং পর্দাপ্রথার প্রচলনই বেশী ছিল। আমাকে কলেজে যেতে হ'ত ঘোড়ার গাড়ির দরজা বন্ধ করে। বাড়িতে কোনও ভদ্রলোক এলে তাঁর সামনে যাওয়া বা কথা বলার অধিকার আমার ছিল না। কারণ, এসব ব্যাপারে সমাজে খুবই সমালোচনা হ'ত। কিন্তু কবি উৎসাহ যুগিয়ে লেখাপড়া শেখার সুযোগ করে দিতেন বলেই আমি অনেক কাজেই এগিয়ে যেতে পেরেছি।

একবার আমাদের বাড়িতে চুরি হয়ে গেল। খবর পেয়ে তো দারোগা এসে হাজির। কিন্তু তাঁর সঙ্গে কথা বলবে কে—সেটাই হল সমস্যা। আমার শ্বশুরমশাই বুড়ো মানুষ, কাজেই তিনি এ সব কথাবার্তায় থাকবেন না। কবি তাঁর লেখা নিয়ে ব্যস্ত। তিনি তাঁর অমূল্য সময়ের একটুখানিও নষ্ট করতে রাজী নন। তবুও আমার শাশুড়ী কবিকেই গিয়ে বললেন, 'দারোগা এসে বসে আছেন। তুই একবার যা। বাড়িতে আর কোন ছেলে নেই। তুই না গেলে কথাবার্তা বলবে কে?'

'কেন লাবণ্য কোথায়?'—লিখতে লিখতেই কবি উত্তর দিলেন

উত্তর শুনে আমার শাশুড়ী বিস্ময়ে প্রায় আঁতকেই উঠলেন। 'ওমা, সে কি কথা! বাড়ির বউ দারোগার সঙ্গে কথা বলবে? কেন, তুই কি এদেশের রীতি-নীতির খবর রাখিস না?'

'দেখছি লেখাপড়া জানা মেয়ে বিয়ে করা ঠিক হয়নি। তাদের কোন সাহায্যই তোমাদের দেশে পাবার উপায় নেই। তা বেশ তো, সে না পারলে, তুমি নিজেই যাও, আমাকে আর বিরক্ত ক'র না।'—কথাগুলো শেষ করেই তিনি আবার নিজের কাজে মন দিলেন।

শাশুড়ী তখন বাধ্য হলেন আমাকে পাঠাতে। শেষ পর্যন্ত এই ব্যাপারে খবরাখবর দেওয়া, যা কিছু আলোচনা করা সবই আমি করলাম।

আগেই বলেছি, আমি শৈশব কাটিয়েছি ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চল গিরিডিতে। শালবনের আলো-আঁধারি ছায়াঘেরা পথে ঘুরে বেড়িয়ে, বর্ষায় উচ্ছল-যৌবনা পাহাড়ী নদী উস্রীর রূপোলী ধারায় পা ডুবিয়ে এবং ছোট ছোট পাহাড়ের উপর দৌড়ঝাঁপ করেই আমার দিন কেটেছে। বন্ধন কাকে বলে জানতাম না। তাই বরিশালে প্রতিপদে পরাধীনতার শিকল ফাঁস হয়েই আমার
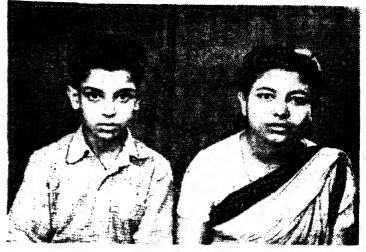
জীবনানন্দের পুত্র সমরানন্দ ও কন্যা মঞ্জুশ্রী

গলা আটকে ধরল। টানাটানি করে সে ফাঁস আলগা ক'রতে গিয়ে চোখের জলেই ভেসেছি, কিন্তু তাকে তার জায়গা থেকে একটুও নড়াতে পারিনি।

আমার সে পরাজয়ের গ্লানি কবির চোখে ধরা পড়েছে বইকি। তিনি তখন এই কথা বলেই আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন—'তুমি চোখের জল ফেলো না। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, যেদিন বরিশালের এই আবহাওয়ার বাইরে যেতে পারব, আমার প্রথম কর্তব্য হবে তোমাকে স্বাধীন হবার সুযোগ দেওয়া। আজ তুমি যতটা কষ্ট সহ্য করছ, ভবিষ্যতে ঠিক সেই পরিমাণেই স্বাধীনভাবে তুমি চলতে পারবে। তখন যদি কেউ বাধা দিতে আসে, বোঝাপড়া হবে আমার সঙ্গে।' তাঁর সে কথা তিনি সত্যিই রেখেছিলেন।

১৯৫৪ সনের ১২ মার্চ আমি যখন 'চলোর্মি' ক্লাব থেকে রঙমহলে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' বইতে মেজো বউরানীর পার্ট করলাম, তখন বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়েছিল বৈকি। কেউ কেউ এ মন্তব্যও করেছিলেন, 'তুমি কি শেষে তোমার বউকে স্টেজে নামাবে নাকি?' উত্তরে কবি বলেছিলেন, 'আমি এখনও মরিনি। আমার স্ত্রী কি করবেন না করবেন সে দায়িত্ব আমার উপরে ছেড়ে দিলেই সুখী হব। আর, এ তো সামান্য একটা ক্লাব থেকে থিয়েটার। যদি তাঁর ইচ্ছে থাকে—সিনেমাতে অ্যাকটিং ক'রতে দিতেও আমার আপত্তি হবে না।'

কবির সেই বজ্রগম্ভীর স্বর শুনে আমি নিজেও সেদিন কম অবাক হইনি। তাঁর সে চেহারা চোখ বন্ধ ক'রলে আজও আমার সামনে ভেসে ওঠে।

একটি জায়গায় শুধু তাঁর ভীষণ আপত্তি ছিল। সেটি হচ্ছে—অসুস্থ শরীরে আমার পড়াশুনো করা।

বঙ্গ বিভাগের পরে যখন কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাস ক'রতে আরম্ভ করলাম,

তখন পড়াশনো অথবা চাকরী—দ্বটোর একটা করব বলেই ঠিক করলাম। কিন্তু কোনটাতেই কবির মত পাওয়া গেল না। বাধ্য হয়ে আমাকে কিছুদিন চুপ করে ঘরে বসেই কাটাতে হ'ল। শেষে আর বসে থাকতে না পেরে আমি ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজে বি টি পড়তে গেলাম।

কিছুদিন আগেই 'অ্যানজাইনা' রোগটি আমার শরীরের উপর দিয়ে তার প্রথম আক্রমণপর্ব চালিয়ে গিয়েছে। জের তখনও ভালভাবে কাটেনি। কাজেই, কবির বাঁধা ঠেলে ভর্তি হবার কাজটা খুব সহজ হয়নি। অসুখটা হবার ফলে তাঁর একটা ধারণা হয়েছিল যে, আমার পৃথিবীর মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছে. হঠাৎই একদিন সকলকে ফাঁকি দিয়ে আমি চলে যাব। সেজন্য সর্বদাই বলতেন, 'তুমি রাস্তাঘাটে যত খুশী দৌড়ে বেড়াও—আপত্তি করব না। শুধু গলায় একটা চাকতি ঝুলিয়ে রেখো।'

আমি যখন চটে গিয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করতাম, তিনি তখন আর একদিকে ফিরে আস্তে আস্তে বলতেন—'না, চাকতিটা থাকলে মর্গ থেকে চিনে বের ক'রতে অসুবিধে হবে না। এই আর কি।'

কথাটা শুনে আমি আর কিছুই বলতে পারতাম না—শুধু তাঁর দিকে তাকিয়েই থাকতাম। আজ কেবলই মনে হয়—আমাকে মর্গ থেকে আনবার ভয়েই কি তিনি তাড়াতাড়ি আমার চোখের আড়ালে চলে গেলেন?

যাই হোক—বি টি কলেজে ভর্তি তো হলাম। কোর্সটা হ'ল ন' মাসের। কিন্তু চার মাসেরও বেশী আমি দুর্বলতার জন্য বিছানাতেই শুয়ে রইলাম। সুস্থ হয়ে যেদিন কলেজে রওনা হচ্ছি—কবি গম্ভীরভাবে বললেন, 'শোন, তুমি কোথায় যাচ্ছ? যদি কলেজে যাও, তবে আমি এখুনি প্রিন্সিপালের কাছে চিঠি পাঠাব কলেজের খাতা থেকে তোমার নামটা বাদ দেবার জন্য। তিনি যদি আমার কথা না শোনেন, তবে আমি তাঁর নামে কেস করব।'

আমার তখন মনে দারুন চিন্তা—এত ক্ষতি হ'ল, কী ক'রে পাস ক'রব। কাজেই তাঁর কথা কানে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই রেগে গিয়ে বললাম—বেশ তো চেষ্টা করে দেখতে পার। কিন্তু তার আগে তোমার কবিতার খাতা সামলিও। আমার নাম কাটার সংগে সঙ্গে তোমার কবিতার খাতাও পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।' কথা শেষ করেই আমি কলেজে চলে গেলাম। যতক্ষণ দেখা গেল—দেখলাম, তিনি আমার যাবার পথের দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন।

কবিকে নিয়ে মুশকিল বাধল রেজাল্ট বের হবার দিন। সেদিন কোথায় গেল তাঁর কবিতা লেখা আর কোথায়ই বা কাজকর্ম। সকাল থেকে কেবলই বারান্দায় অস্থিরভাবে ঘুরছেন আর বলছেন—'দেখ, তুমি কিন্তু বেশী কান্নাকাটি ক'রতে পারবে না। একে তো তোমার দুর্বল শরীর, তার উপরে যদি কাঁদতে শুরু কর—তবে তোমাকে বাঁচানই যাবে না।'

আমি অবাক হয়ে জিগ্যেস করেছি—'কাঁদিব কেন? কি এমন কারণ ঘটল, যার জন্য আমাকে কাঁদতে হবে?'

তিনি আমতা আমতা ক'রে বললেন—'এই, বলছিলাম আর কি, আজ তো রেজাল্ট বের হবে। তাছাড়া এত অসুখে ভুগে তুমি তো আর পড়াশুনো করবার সময় পাওনি—পাস করাটা কি তোমার পক্ষে সম্ভবপর?'

'এ তো আচ্ছা লোকের পাল্লায়
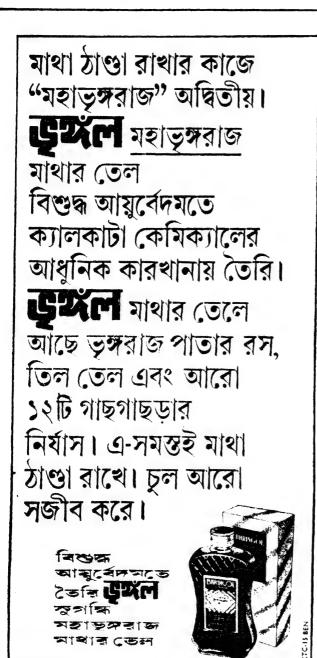
পড়লাম। স্ত্রীর যাতে নাম হয়, লোকে তার জন্য কত কিছু করে। তোমাকে দিয়ে তো সে সব কিছু হলই না। উল্টে পরীক্ষা দেবার পর থেকেই শুরু করেছ যে আমি ফেল করবই। পাস করতে পারি—এ কথাটা ভুলেও একবার মনে করতে পার না?' বেশ ঝাঁঝের সঙ্গেই কথাগুলি কবিকে শুনিয়ে দিলাম।

আমার কথা শুনে তিনি খুব দুঃখের সঙ্গেই বললেন, 'শুধু সান্ত্বনা দেবার জন্যেই এতবড় মিথ্যে কথাটা তোমাকে বলি কি করে? যদি কলেজটাও পুরোপুরি অ্যাটেন্ড করতে পারতে, তাহলেও না হয় পাসের কথা ভাবা যেত। সবকিছু জেনেও আমি কেমন করে ভাবব যে, তুমি পাস করবে?'

সমস্তটা দিন তিনি নিজেও কোন কাজ করলেন না, আমাকেও রেহাই দিলেন না। পাস করব না ভেবে আমি নিজে যে একটু মন খারাপ করব সে সুযোগই পেলাম না। সেই সময়ে আমার ছোট-জা শ্রীমতী নীলিমা দাশ (এখন বেথুন কলেজের প্রিন্সিপাল, ডেভিড হেয়ারে অধ্যাপিকার পদে ছিলেন। বিকেলের দিকে তিনি আমার নামে একখানি চিঠি দিয়ে একটি লোককে আমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন।

তখনকার অবস্থা অবর্ণনীয়। কবি দৌড়ে এসে চিঠিখানা ছোঁ মেরে নিয়েই লোকটিকে বিদায় করে দিলেন। তারপরে নিজেও চিঠি খুলবেন না—আমার হাতেও দেবেন না। কবির অবস্থা দেখে আমি হাসব কি কাঁদব কিছুই বুঝতে পারছি না।

অনেকক্ষণ পরে তিনি চিঠিটা একটুখানি খুলে দেখেই হাসিমুখে আমার হাতে দিলেন। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। মনে হল যেন পরীক্ষাটা আগে দিইনি, এতক্ষণ ধরে কবির সামনে বসেই দিলাম।

তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম চিঠিতে আর যা-ই থাক না কেন, ফেলের সংবাদ নেই। থাকলে কবিকে সামলানোই দায় হত। চিঠি পড়ার পরে আবার তাঁর উল্টো কথা শুরু হল। 'হ্যাঁ, তুমি কি কাদের জান? তা না হলে—' ইত্যাদি ইত্যাদি।

পৃথিবী থেকে চিরবিদায়ের আগে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে কবি যে অদ্ভুত মনোবল, অপরিসীম ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন—তা সত্যই অতুলনীয়। আমার দেওর (কবির খুড়তুতো ভাই) ডাক্তার অমল দাশ আমাকে কতবার বলেছে, 'বৌদি, দাদা যে কি সাংঘাতিক যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করছেন সেটা মানুষের কল্পনাতীত।' কিন্তু এই মানুষই আমাদের ব্যথা বেদনায় কতটা ব্যাকুল হয়ে পড়তেন—আমাদের সামান্য অসুখে কতখানি বিচলিত হতেন, তারই দু-একটি ঘটনা বলছি।

তখন আমরা বরিশালে ছিলাম। আমার ছেলে সমর (খোকন) সবে দু'বছরের শিশু। একদিন আমাদের পাশের বাড়িতে তারই সমবয়েসী এক খুড়তুতো ভাই-এর সঙ্গে খেলা করবার সময় পড়ে গিয়ে তার মাথার অনেকটা জায়গাই কেটে যায়। সে বাড়ির ঝি এসে আমাকে খবরটা দিতেই আমি ছুটে সেখানে চলে গেলাম।

গিয়ে দেখি সমর বারান্দায় দাঁড়িয়ে। মাথার রক্তে তার মুখ ভেসে যাচ্ছে। ফুঁপিয়ে কান্নার সঙ্গে ছোট্ট দুখানি হাত দিয়ে রক্ত ঠেকাতে গিয়ে সে হাঁফিয়ে উঠছে। আমি তাকে কোলে তুলে নিয়েই এক ছুটে সোজা আমাদের স্নানের ঘরে ঢুকে তার মাথাটা নীচু করে ধরে অনবরত জল ঢালতে লাগলাম। মাথা নিচের দিকে করাতে ছেলেও তারস্বরে চিৎকার শুরু করল। হঠাৎ পিছন থেকে কবির আর্তস্বর শুনতে পেলাম, 'মরে যাবে, ছেলেটা এখনি মরে যাবে। শিশুর ওর মাথা সোজা কর। তোমাকে এ ডাক্তারি কে শেখাল?'

আমি মাথা না তুলেই উত্তর দিলাম—'আমার ডাক্তারি নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে তুমি তাড়াতাড়ি আসল ডাক্তারকে ডাকার ব্যবস্থা কর।'

আমার কথা শুনতে পেয়ে বাড়ির চাকরটি দৌড়ে গিয়ে কবির বাল্যবন্ধু ডাক্তার অমল ঘোষকে ডেকে নিয়ে এল। ইঁটের আঘাতে মাথা কেটেছে শুনে প্রথমেই তিনি ইঁটের কুচি আছে কিনা সেটা ভালভাবে পরীক্ষা করলেন। তারপরে কবিকে বললেন, 'সেলাই করতে হবে। তুই খোকনকে কোলে নিয়ে বোস।'

ব্যাস—কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই কবি ঘর থেকে উধাও। তাঁকে কোথাও দেখতেই পাওয়া গেল না। তখন আমিই ছেলেকে কোলে নিয়ে বসলাম। ডাক্তার সেলাই করলেন। প্রায় দশ মিনিট পরে দেখলাম—কবি জানালা দিয়ে ঘরে উঁকি দিয়ে ডাক্তারকে ভয়ে ভয়ে জিগেস করছেন, —'কখন সেলাই করবি?' ডাক্তারও হেসে উত্তর দিলেন, 'সত্যিতো তোর অপেক্ষাতেই বসে আছি। তুই এলেই সেলাই করে ফেলব।' ছেলের মাথায় ব্যাণ্ডেজ দেখে তবে কবি নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ঢুকলেন। তাঁর এই দুর্বলতার জন্য অবিশ্যি তাঁকে অনেক কথাই শুনতে হল, কিন্তু ছেলের দিকে তাকিয়ে সব কিছুই তিনি হাসিমুখে মেনে নিলেন।

আমার মেয়ে মঞ্জুশ্রী যখন খুব ছোট, তখন তার একবার আমাশা হয়েছিল। কিছুতেই সারে না। এদিকে মেয়ে তো দারুণ দুর্বল হয়ে পড়ল। শেষে এমন হল যে কিছুতেই আর বিছানায় শুতে চায় না। কেবলই বলত—কোলে শুয়ে ঘুরব।' সে কাজ আমার দ্বারা হত না। কিন্তু আমি অবাক হয়েছি কবির ধৈর্য দেখে। মেয়েকে কাঁধের উপরে শুইয়ে রাতের পর রাত তিনি ঘরের ভিতরে ঘুরে বেড়াতেন। একটু ক্লান্তি বোধ করতেও কোনদিন দেখি নি।

এসব কথা লিখতে গিয়ে আজ কেবলি মনে হচ্ছে—আমাদের সামান্য অসুখেও যাঁর এত চিন্তা ছিল, আমাদের দুঃখ বেদনায় যিনি এতটা অধীর হয়ে পড়তেন—তিনি আজ কোথায়? সত্যিই কি তিনি পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে আমাদের একেবারেই ভুলে যেতে পেরেছেন? না-কি অন্য কোথাও জন্ম নিয়েছেন?

কিন্তু তাঁর আবার জন্মাবার কথা চিন্তা করতে যাওয়াটাও আমার পক্ষে অসহ্য। কিছুদিন আগে কবির এক ছাত্র আমাকে বলেছিলেন, 'আমরা প্ল্যানচেটের সাহায্যে স্যারের আত্মা এনেছিলাম। পৃথিবীতে ফিরে আসার ইচ্ছে তিনি প্রকাশ করেছেন।'

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমরা সত্যিই বড় বেশী স্বার্থপর। আমাদের প্রিয়জন পরলোকে চলে গেলেও আমরা তাঁদের মন থেকে বিদায় দিতে পারি না। কল্পনার ভিতরেও যতক্ষণ পারা যায় আঁকড়ে ধরে রাখতে চেষ্টা করি। তাঁরা অন্যরূপে আবার পৃথিবীতে আসবেন—কথাটা ভাবতে গেলেই যে আমাদের সে কল্পনার পরিসমাপ্তি ঘটে, তাইতো আমরা সে চিন্তা মনেও আনতে পারি না।

[ক্রমশঃ]

Bensons 12123 Ben

রঙীন ইয়েরা গেলাস গৃহে আধুনিকতার ছোঁয়া এনে দেয়

মজবুত ও চকচকে

ইয়েরা গেলাসগুলি আপনার দৈনন্দিন জীবনে সৌন্দর্য্য এনে দেবে। নিখুঁত গেলাসগুলি বিচিত্ররকমের স্থায়ী পাকা রঙে ও ডিজাইনে পাওয়া যায়। গেলাসের ধারগুলি অতি মসৃণ এবং প্রতিদিনের ব্যবহারের চোটচাপটেও ফাটল ধরে না! দেরী না ক'রে ইয়েরা গেলাস বেছে নিন—নিঃসন্দেহে সবার সেরা।

সবরকমের উপলক্ষের জন্য মানানসই ইয়েরা কাচের জিনিস

প্রস্তুতকারক :
অ্যালেম্বিক গ্লাস ইণ্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, বরোদা-৩।

ভারতের সর্ববৃহৎ সম্পূর্ণ স্বয়ংচালিত কাচকারখানা

শ্রীচরণেষু—মাকে ॥ এগারো ॥

[ক]
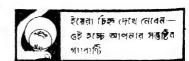
সূর্যাস্তের আলো যত পিছিয়ে গেল, ট্রেনটা মরীয়া হয়ে উঠল তত। একটা কমলা রঙের বল যত ফসকে ফসকে গড়িয়ে যাচ্ছে, একপাল শিকারী কুকুর ক্ষেপে উঠে তাড়া করছে তত।

রেলে চড়ে যতবার পশ্চিমে গেছি, ততবারই সন্ধ্যার মুখে মুখে এই ব্যাপার ঘটতে দেখেছি।

সেদিন বাইরে হঠাৎ একটা বাঁকের পরে দেখলাম মালা, তারার পর তারার মালা। আকাশটা চৈত্র মাসের বকুল গাছ হয়ে গেছে নাকি? হাওয়ায় হাওয়ায় সব ফুল ঝরিয়ে দিয়েছে নীচে? না। তারা তো নয়, আলো। বিজলীর আলো—তীব্র: চোখ ধাঁধানো। কলকাতা কাছে এসে পড়েছে।

এতক্ষণ তুমি কেমন একটু উদাস, হয়ত-বা খানিকটা উৎফুল্লই ছিলে, হঠাৎ দেখি তুমি ধীরে ধীরে আবার শক্ত হয়ে উঠছ। এক সময়ে দেখি জোরে আমার কাঁধ চেপে টেনে আনছ। টিনের ছাদে টপ টপ বৃষ্টি পড়ার মত তোমার এক-একটা কথা শুনছি। —"এই, সাবধান। ওখানে ও কেন আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে জানি না। আমার ভীষণ ভয় করছে, মনে হচ্ছে কোনদিন আর ফিরব না। তোকে—তোকেও হয়ত ও গ্রাস করে ফেলবে। তুই—তুই ওর হয়ে যাবি, আলাদা হয়ে যাবি। এই দ্যাখ আমার শরীর কাঁপছে, ধড়ফড় করছে বুক, হাতটা জোর করে চেপে ধর। ধরে থাক থাক না। আমাকে ছুঁয়ে বল যাই ঘটুক, যাই আসুক, আমি আর তুমি একই থাকব, আমাকে কোনোদিন ছাড়বি না?"

না বুঝে বলেছিলাম "ছাড়ব না।"

"মার ছেলেই থাকবি, বাবার হবি না, বাবার মতো তো কখনই না!"

প্রতিজ্ঞা করলাম, "কখনো না।"

কিন্তু মা, সেই প্রতিজ্ঞা থাকে নি। সেদিন তুমি জানতে না, আমিও বুঝি নি। বুঝি নি যে, আমি তোমারও থাকব না, বাবারও হব না। আমি হয়ে যাব আর-একজনের—কলকাতার। তার মমতা, মর্ম, হৃদয় এসব আছে কিনা জানিনে, কিন্তু খর আবর্ত, প্রখর রূপ আর অহরহ মুখরতা আছে। তুমি নও, বাবাও না, সেই কলকাতার ঘনশ্বাস বিলাসিনী আমাকে তার রূপে-রসগন্ধমোহের দাহে নিমজ্জিত করবে।

[খ]

কেই রূপ! আর দেখি না। সেই গন্ধ! আর পাই না। আমার চোখ গেল আর নাক গেল, না সেই রূপ আর গন্ধ উবে গেল? তখন কিন্তু পেতাম। চুন-বালি, নর্দমার ঝাঁঝরি, আলোয় আলোয় বিজ্ঞাপিত লেখা কালো পীচের সপাং বিনুনি সব ঝিম ধরিয়ে দিত, অবশ করত, যদিও এবং যখনও নগরজীবনের গভীরে ডুব মারি নি। সবে উন্মোচিত হচ্ছে মাত্র, পরে স্বাদ পাচ্ছি।

জমকালো স্টেশনে বাবাই এসেছিলেন। তুমি ঘোমটা-টানা জবুথবু, ওখানেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেলে।

বাবা বললেন 'উহুঁহুঁ', এখানে নয়, এখানে নয়। এখানে রাস্তাঘাটে লোকের সামনে কেউ পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে না। লোকে হাসে। চেয়ে থাকে। তা-ছাড়া উপুড় হয়েছ কি ধাক্কা দিয়ে চলে যায়। দেখছ না, কী ভিড়, কী ভিড়! অ্যাই কুলি—উধর নেহি, ইধর ইধর—

বাবা একটু বদলে গেছেন। আমাদের সেই দেশের বাড়িতে যেমন দেখেছি তার চেয়ে একটু রোগা,- কিন্তু অন্য দিকে আলাদা, যেন কমবয়সী বলছে কী সেই হৃষ্টপুষ্ট ভাবটা কেটে যেতে বাবাকে একটু কম রাগীরাগী লাগছিল। জোড়া ভুরুর

মাঝখানে আঁচলটা আছে কিনা আমি লক্ষ করছিলাম।

বাবা এক হাতে আমাকে ধরেছিলেন, অন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন তোমার দিকে. তুমি সরে যেতে গিয়ে ঠোক্কর খেলে. বাবা বললেন, "ধরো ধরো, এখানে ও-রকম কলা-বউটি হয়ে থাকলে চাপের তলায় চেপটে যাবে।"

কিন্তু মা, তুমি তো কলা-বউটি ছিলে না। তোমার ঘোমটা নিজে থেকেই কখন অন্যমনস্ক, ঘাড় তুলে তুলে, মুখ এদিক-ওদিক ফিরিয়ে তুমি অবাক হয়ে চাইছিলে।

বাবা তাড়া দিলেন, "সামনের দিকে তাকিয়ে চলো. নইলে হোঁচট খাবে, এখানে তাই নিয়ম।"

আমি কিন্তু শক্ত করে ধরেছিলাম বাবার কব্জি। কোন্‌টা নিয়ম? সামনে চেয়ে চলা, না হোঁচট খাওয়া ঠিক ধরতে পারছিলাম না।

মা, তুমি খালি আড়চোখে তাকাচ্ছ আমি কোথায়, আমাকে ইসারায় বলছ তোমার কাছ ঘেঁষে চলতে, বাবা ধরেছেন তোমার হাত, আর আমি ধরব বলে খুঁজছি বাবারটা, এইভাবে তিনজনে মিলে কলকাতায় আমাদের প্রথম পথ-চলা শুরু হল।

আজ পিছন ফিরে ভাবছি, ওটাও একটা প্রতীক না-তো! সজ্ঞানে মা, সেই কি প্রথম আমি তোমার হাত ছাড়লাম, খুঁজলাম আর-একজনের? টিনের দোচালার ঠিক নিচে প্রচণ্ড একটা শক্তিকে হেঁইও বলে কসে-রাখা ইঞ্জিন, তার ধোঁয়া—অন্তরের কালিমা; তার সোঁ-সোঁ বাষ্প—ভিতরের জ্বালা, এই সব নিয়ে শহরটার চেহারা ফুটছিল. আর সেই গম্‌গম ঘরে সর্বক্ষণ একটা অদ্ভুত আওয়াজ, যা বাড়ে কমে. কিন্তু কখনও থামে না, তার গোপন কোনও প্রাণকেন্দ্র থেকে অবিরত উঠিত হচ্ছিল।

এই শব্দ আমি দীর্ঘকাল ধরে শুনেছি, অনেক রাত্রে কান পেতে পেতে. যখন শেষ ট্রামও চলে গেছে তখন নাচের একটানা ঝর্ঝর ধারায়। গ্রামে যেমন ঝিঁঝি ডেকে, রাতের কোনও রাত-জাগা পাখি, দূরের শেয়াল, খালপাড়ের আটচালায় সংকীর্তন, এই শহরের তেমনই নিজস্ব কিছু আছে, অনর্গল একটা স্রোত, তার সংগীতের আকার অন্যরকম।

মা, তুমি মৃদুস্বরে বলছিলে, "অনেক আগেও তো এসেছি, সেই যে মামীমার সঙ্গে ছেলেবেলায় একবার। তখনও মানুষ গিজগিজ করত, কিন্তু এমন আর ছিল না। এখানে কত লোক হবে—দশ হাজার?"

দশ হাজার কী বলছ, ওরে গুণে কি দুশো গুণ কি তারও বেশী আন্দাজ করো। তখন স্রোত ছিল, এখন সমুদ্র।"

"তোমার সেই সমুদ্র!" তুমি মিষ্টি হাসলে। "সমুদ্র আমি দেখি নি, একদিন দেখব।"

"কুলি, কুলি, আই কুলি", বাবা এগিয়ে গেছেন কুলিটাকে ধরতে। এখানে ওঁকে আলাদা লাগছে কেন এবার বোঝা যাচ্ছিল. এই শহর বিরাট বটে, কিন্তু এখানে বাবাই সপ্রতিভ, কী চটপটে, চতুর, অনায়াসে সব কিছুর মধ্য দিয়ে চলাফেরা করছেন. আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।

তখন কি জানি, এ-সব কিছুই না. ভিড় মেরে শহুরেপনার চূড়ায় চড়া যায়. কিন্তু চড়ায় পরে আর মজা থাকে না. আমিও তো চড়ে দেখেছি এখনকার... প্রাণ এক না। ও কেবল একটা কথার

ঘরানা, হাসির চালাকি, পালিশের ঝকমকি, জুতো থেকে কণ্ঠবন্ধনীতে জুতসই একটা চৌকস ব্যক্তিত্ব, প্রয়োজনের পর প্রয়োজন বাড়ানো, তৃপ্তিকে চিতায় চড়িয়ে তৃষ্ণার শূন্য কলসীটি আছড়ে স্নেহহীন পাথর আর কাঁকর আর ঝুটো মোতি, পোশাকের পর পোশাক, আঃ পোশাক তো নয় যেন পেঁয়াজের খোসা, পেঁয়াজে চোখ জ্বলে, পেঁয়াজে চোঁয়া ঢেকুর ওঠে, কিন্তু সেদিন—

সেদিন আমি মোটরের ভেঁপু, ট্রামের টিকিতে বিজলীর ঝলক, মেওয়ার দোকানে কাটা নাসপাতির গন্ধে, বাঁধানো রাস্তায় ফিটন গাড়ির ঠকাঠক শব্দে ভরপুর হয়েছিলাম। একই সঙ্গে আমাকে আচ্ছন্ন করেছিল বিস্ময় আর দীনতা, দীনতা আর লজ্জায়। নিজের সরলতাকে অতিক্রম করব, গ্রাম্যতাকে অস্বীকার করে শহুরে হব, সব ভঙ্গি, সব নাগরিক নৈপুণ্য আয়ত্ত হবে এখন, আয়ত্ত করতেই হবে—এই সংকল্প মনে মনে গঠিত হচ্ছিল মনে। তাই বুঝি, মা, কলকাতার মাটিতে মাটিই বা বলি কেন, শান; পাথর আর শান; এখানে তো মাটিও কেনা-বেচা হয়—কলকাতায় পা দিয়ে তোমার হাত ছাড়লাম। যদিও তোমার অসহায় সরু আঙুলগুলো তখনও আমাকে খুঁজেছিল।

তখন কি জানি, শহুরে অভ্যাস, ভাবভঙ্গি ছানা এসব হল মেক্-আপের মতো, প্রলিপ্ত করতে বেশি সময় লাগে না, একেবারে অন্য চেহারা হয়ে যায়, কিন্তু মুশকিল ঘটে যখন ফিরতে চাই স্বরূপে। তখন বাটি বাটি গরম জল আর ঘষে ঘষে রগড়ালেও প্রলেপ যেতে চায় না, এই যে আমি গত কত বছর ধরে তো চোখের জলে সে জলও গরমই তো সব ধুয়ে ফেলতে চাইলাম, তবু টাইয়ের ফাঁস গলায় সেঁটেই রইল, কোন্ পর্বতের তলায় চাপা পড়ে গেছে আমার আপন স্বরূপ, ঘষে ঘষে বরং রক্ত বের হল, তবু সেই ধুলোমলিন পাড়াগেঁয়ে গ্রামীণ চামড়া তো আর ফুটে বেরোল না!)

দশ হাজারের দু' তিন শ' গুণ কত হয় আন্দাজ ছিল না, তবু কিন্তু সেদিন ওই সংখ্যাটাই সম্ভ্রম এনে দিয়েছিল মনে। আড়চোখে বাবার দিকে চাইছিলাম। উনি কি সত্যিই একটু মায়াবী একটু আলাদা হয়ে গেছেন, ভাবছিলাম, নাকি এই যে চোখ-ধাঁধানো নীল আলোই ওঁকে এমন নরম অন্যরকম করে দিল? সচেতনভাবে না হলেও অস্পষ্টভাবে বোধ করছিলাম, এই চড়া আলোরও অবদান কিছু আছে, আমার অভিভূতভাব ক্রমেই বাড়ছিল, ঘোড়ার গাড়ির ঘেরাটোপে বসেও অনেকক্ষণ আমি বাক্‌হারাই ছিলাম। শুনেছিলাম চাবুকের শিস, চোখে-কানে গয়নার সাজসজ্জা পরা তেজীয়ান টগবগে ঘোড়ার সঙ্গে তার গাড়োয়ানের দুর্বোধ্য ভাষায় কথোপকথন, অথবা বলা উচিত কথা একতরফা—শুধুই কথন।

গাড়ি গড়াচ্ছিল, ভিতরটা অন্ধকার, তুমি-আমি একপাশে, বাবা ও-পাশে। উঁকি দিয়ে দেখছিলাম একটা আলো জ্বলে জ্বলে কী লিখে ফের নিবে যাচ্ছে। বললাম, "বাবা, ও কি বিদ্যুৎ?"

"বিদ্যুৎ?" বাবা কী ভাবলেন। "ঠিক বিদ্যুৎ নয়, গ্যাস। নিয়ন। বিদ্যুতের মতো দেখায়।"

['মতো দেখায়'—তখন যদি চোখকান অভিজ্ঞ হত, এই শহরটার চরিত্রের আর-একটা দিক দেখা যেত। এখানে যে জিনিস যেমন দেখায়, সবটাই তাই নয়, এক জিনিস অন্য জিনিসের চেহারা নিয়েও বেরিয়ে আসে।]

গাড়ি চলছিল। বাবা তোমার পায়ে আলগোছে রাখলেন একটা হাত, টের পাচ্ছি, বলছেন "তার পর?"

"কিসের পর। পরে যা তা তো তোমার হাতে। সব তো চুকিয়ে দিয়েই এসেছি।"

"সে তো বটেই।" বাবা একটু কি কাশলেন? "চুকিয়ে দিয়েই তো এলে। বলছি যে, তা-হলে এলে?"

"এলাম।"

"দুজনে?"

"দুজন, শুধু দুজন।" একটা শ্বাস চাপতে তুমি বাইরের দিকে মুখ ফেরালে কিনা জানিনে। মা, তোমার কি লাগছিল? আস্তে আস্তে বাবার হাতটা ঠেলে কেন দিচ্ছিলে?

"তিনজন হতে পারত।" বাবা বললেন, একটা স্বগত স্বরে।

"সে তো চলে গেছে।"

"কোথায়?"

"জানি না।"

"এখন দুজন? তিনজন হল না কেন?"

পারে পড়ি, তোমরা একটু সহজ ভাষায় কথা বলো না, যাতে আমি বুঝতে পারি!

"হল না। ভগবানের বোধ হয় ইচ্ছে ছিল না।"

"ভগবানের, না তোমার? ঠিক বলো তো, সে এল না, না তুমি ইচ্ছে করেই আসতে দিলে না?"

তুমি মুখ ফিরিয়ে রইলে। মাথা বাড়িয়ে দিলে গাড়ির বাইরে, হু-হু ঠাণ্ডা হাওয়া। তখন আমি, মা, মরীয়া হয়ে আমি বোকার মতো বলে উঠলাম, "কেন, আমরা তিনজনই তো। আমি, মা আর আপনি। আপনাকে নিয়ে তিনজন।"

"হ্যাঁ, আমাকে নিয়ে।" বাবা অন্যমনস্ক ভাবে সায় দিলেন, তার পরেই সোজা হয়ে—

"ও হো, ভুলে গিয়েছিলাম। আরও একজন তো ছিল?"

তুমি, মা, চমকে বললে, "কে?"

বাবা সোজা উত্তর দিলেন না। নিজের হাঁটুতেই টোকা দিতে দিতে বললেন, "ছিল তো! সেই যে একজন! সে তোমাকে আসতে দিল?"

তুমি তো অনায়াসে কথাটাকে উড়িয়ে দিতে পারতে। তবু কেন যে আবার কঠিন হয়ে উঠছিলে! ওই অস্পষ্ট আলোতেও তোমার চোয়ালের দৃঢ়তা ধরা পড়ছিল। তারপরই, মা, সহসা তোমাকে নরম হয়ে লুটিয়ে পড়তে দেখলাম। দু' হাতে মুখ ঢেকেছ তুমি, অনুনয় এমন-কী প্রার্থনার সুরে বলছ "এখানেও ওসব কথার জের টেনে আনছ কেন। সমুদ্র-টমুদ্র—এই বুঝি তোমার নতুন হওয়া? চিঠিতে তবে বুঝি

সব বাজে কথা লিখেছিলে? আমাদের নিয়ে এসেছ নতুন করে সব শুরু করবে বলে নয়, ইনিয়ে-বিনিয়ে চিঠিতে কত-কী লিখেছিলে শুধু ভোলাতে।"

বাবা কিছু বলছিলেন না।

আর সেই সময় একটা বোকার মতো কাজ করলাম আমি। আমি যে বড় হয়েছি, আমার যে বুদ্ধি আছে, বাবার কাছে যেন সেটাই জাহির করতে ফশ্ করে বলে বসলাম "সুধীরমামা নেই তো। চলে গেছেন।"

বাবা এক দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন। পলক পড়ছিল না। মায়ের আঁচলটাকে সাক্ষী রেখে ভুরু দুটো আবার কি জুড়ে গেল? এই শহরে এত আলো অথচ এই গাড়িটার ভিতরে কত অন্ধকার, রক্ত শুকিয়ে যেমন চাপচাপ কালো হয়ে যায়, তেমনই শুকনো ছোপ ছোপ অন্ধকার, একটা ভয়ংকর ঘর্ঘর তুলে ঘোড়ার গাড়িটা ছুটছিল।

"কী ভাবছ।" তুমি বললে আস্তে আস্তে, সন্তর্পণে, যেন ভয়ে ভয়ে, নিজে থেকেই এবার বুঝি বাবার পায়ে আন্দাজে একটা হাত রাখলে।

"ভাবছি।"

"তোমার নতুন কোনও পালা?"
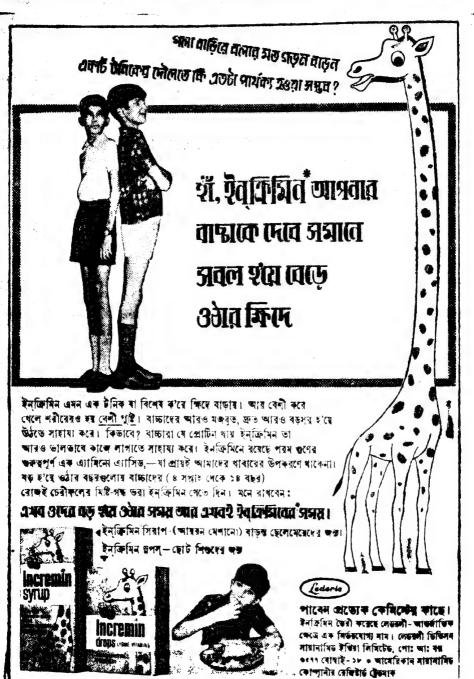
স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকেই বাবা ধীরে ধীরে বললেন, "হ্যাঁ, এই আমাদের নতুন পাল্লা।"

তার কত পরে বাবা বাইরে গলা বাড়িয়ে বলেছেন, "এই গাড়োয়ান রোখ্‌কে, না, না, ডাহিনা গলি, ডাহিনা গলি, যাও, যাও, অউর থোড়া, আচ্ছা এইবার, এইখানে—বিলকুল রোখ্‌কে।"

আমাদের দিকে চেয়ে বাবা বললেন "পৌঁছে গেছি।"

[গ]

আর কত বছর তো কেটে গেছে, এখনও ঠিক বুঝতে পারি না বাবা সেদিন যা বলেছিলেন তার অর্থ কী। কোথায় পৌঁছে গেছি। কখনও মনে হয়, অলীক অদ্ভুত একটা ধারণা, মনে হয়, সেদিন গাড়িটা ওখানে, ওই গলিতে বসতবাড়িটার সামনে সত্যি সত্যিই দাঁড়িয়েছিল তো? সেখানে নিবু নিবু একটা গ্যাসের বাতি সাক্ষী ছিল? কে জানে, হয়ত সবটাই ভ্রম, বাবা রোখ্‌কে বললেও গাড়িটা দাঁড়ায়নি, এ-গলি ও-গলি, কাঁথায় ছুঁচের মত এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে চলেইছে, ক্রমাগত চলেছে, চাকা টলমল-টলমল, কটা রিকশাকে সে ধাক্কা দিল কে জানে, তার পাশ কাটাতে গিয়ে কোন্ মোড়ে বেচাল বেহেড একটা লোকের মাথা ঠুকে গেল দেয়ালে, একটা পা হড়কে পড়ল খোলা নালীতে, উবুড় ডাস্টবিনটার কিনারা জাপটে ধরে সে গোঙাতে থাকল ক্রমাগত, কী সে আর্ত গদগদ চিৎকার, এসব মিলিয়েই কলকাতা, কিন্তু সব কি সেদিনই ঘটেছিল, সেই প্রথম দিনে, যখন গাড়িটা একটুও না-থমকে না-থেমে বেপরোয়া ছুটেছিল, খেয়াল করল না কী হল তার সওয়ারীদের, তারা কি হুমড়ি খেয়ে রইল গাড়ির ভিতরেই, অথবা এক সময়ে ঝাঁপ দিল বাইরে কিংবা ছিটকে পড়ল?

যে-কোচোয়ান অদৃশ্য কোচবাকসে বসে, কারও কথা শোনে না, থামে না, থামতে দেয় না, কাউকে পৌঁছে দেয় না কোথাও, কেবলই গাড়ি হাঁকায়, আমি প্রথম দিনের স্মৃতি থেকে তার অস্তিত্ব সম্পর্কে অনবহিতগ্রস্ত, তার ধরনধারণ সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে আছি, থেকে থেকে তার চাবুকের সাঁ সাঁ শাসানি শুনি। হয়ত আমার ভ্রান্তি। কিন্তু আমি পুষে রেখেছি।

[ঘ]

"এই বাড়ি?"

"এই বাড়ি।"

তুমি জিজ্ঞাসা করেছিলে, তোমার যে প্রশ্ন, বাবারও সেই উত্তর।

প্যাসেজে আলো ছিল না, এই শহরটা, তখনই কি টের পেলাম, একই সঙ্গে উদাম আর গোপন, নানা স্থানে নানা রকম, এখানে আলো ওখানে আঁধারি, অনেককে নিয়ে তার অনেক ধরনের লুকোচুরি।

"এই বাড়ি।" বাবা বললেন, যেন অমোঘ কোনও নির্দেশ, হাত বাড়িয়ে প্রথমে নামালেন আমাকে, তুমি হাতল ধরে কোনক্রমে টাল সামলে নামলে।

আলো ছিল না, তাই বাবাকে দেশলাই জ্বালাতে হল। মোটঘাট নামানো হল দেউড়িতে। পুরো একটা টাকা পেয়ে গাড়োয়ান খুশী হয়ে শিস দিতে দিতে চলে গেল, তার পায়ের চাপে একটা ঘণ্টি টমটম বাজছিল। গলির মোড় যখন ঘুরে গেল গাড়িটা তখনও তার মুখে হিন্দী একটা গানের কলি শুনছি—কাহে নজর বাঁচাকে হমসে প্রিয়তম, ছিপাকে বাতে হো। এখন হাজারবার মাইকে শুনলেও কথাগুলো ধরতে পারি না, আর ওই বয়সে একবার শুনেই হিন্দী গানের একটা কলি মনে গেঁথে গেল।

"মাল আমি নেব পরে। তোমরা আগে চলো।" দেশলাই জ্বেলে জ্বেলে বাবা চলেছেন আগে, আমরা পিছনে, পাশাপাশি জালঘেরা পর পর কয়েকটা জানালা, কিন্তু ঘরগুলো অন্ধকার, একটা খিলেনের তলা দিয়ে একটু এগোলে স্যাঁতসেঁতে একটা উঠোন, অল্প অল্প আলোতেও শ্যাওলা দেখা গেল, মনে হল কী পিছল, একটা কল ভালো করে বন্ধ হয়নি তাই চুইয়ে

চুইয়ে পড়ছে জল, টপ-টপ, টপ-টপ—আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে দেখতে থাকলাম. বাবা তখন দেশলাইয়ের কাঠি ধরে তাড়া দিচ্ছেন, "দেখছিস কী, তাড়াতাড়ি চল". কাঠিটা নিবে গেল, তখন সামনে দেখা গেল একটা কাঠের সিঁড়ি, যেন কাত করে শোয়ানো একটা মইয়ের মতন, সিঁড়িটার একদিকে হাতল। কাঠিটা নিবে গেছে, অনেক দূরের লাল তারাটির মতো বাবার মুখে তখন জ্বলছে বিড়ি, উনি স্বদেশী কিনা তাই তখন সিগারেট খেতেন না, বিড়ির আলো কতটুকু আর, তবু আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছিল উঠোনটার পাশে ছিল শানবাঁধানো একটু উঁচু রক, তার ধার ঘেঁষে ঘেঁষে সিঁড়িটার মুখে পেঁছিনো গেল।

থরথর করে কাঁপছিল সেই সিঁড়ি, মাঝরাতে ঘুম ভেঙে চটে গিয়ে খচখচ শব্দ করছিল, সেই প্রথম ওঠা, তারপর কত ঝকঝকে সিঁড়ি দেখেছি জীবনে, এমন-কী বেলে-পাথর মারবেলেরও, কিন্তু কলকাতার প্রথম কাঠের সিঁড়িটা আজও থেকে থেকে কাঁপে, ক্যাচ ক্যাঁচ করে বিলাপিতে, তবু নানা প্রসঙ্গে তার ফিরে ফিরে আসা শেষ হল না।

সিঁড়িতে পা দিতেই তার তলায় একটা কুকুর গোড়ায় থমকে উঠে হঠাৎ কঁকিয়ে কঁকিয়ে অহেতুক কাঁদতে থাকল. উপরে কোথাও দুটো বিড়ালের চলছিল ঝটোপটি, সিঁড়িটার মাথায় ঠিক ওই উঠোনটার মাপে চৌকো করে কাটা আকাশ, একফালি কাটা চাদর যেন. আমাদের পায়ের শব্দে কোন্ এক চোরা ঘুলঘুলিতে কয়েকটা গোলা পায়রা ডানা ঝটফট করে উঠল. তারপর

"এই ঘর?"

"এই ঘর।"

"আলো নেই?"

"জ্বালছি। লনঠন একটা আছে ওই কোণে। দ্যাখো।"

আমাদের সাড়া পেয়ে কারা যেন এসেছিল, তারা ভিতরে এল না, খালি তাদের ছায়ারা চাপা গলায় কথা বলতে থাকল। বাবা বেরিয়ে গিয়ে কী বলে এল তাদের, তারপর আবার সব চুপচাপ। এই তো এইমাত্র দেখে এলাম সদর রাস্তায়, আলোগুলো সব জ্বলজ্বলে, শহরটা ঘুমোয়নি, একেবারে ডাবডেবে চোখে জেগে, অথচ এই গলিটা, গলিটার এই বাড়িটা কিনা এত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে।

নীচের ঘরে কে কাশছিল, অন্য দিক থেকে একটা বেসুরো জড়ানো গলার চিৎকার ঝনঝন বেজে উঠল, সিঁড়িতে শব্দ, সেই সঙ্গে মিষ্টি একটা রিনিরিনি, যারা এসেছিল, তারা কারা, ওই মিষ্টি আওয়াজটা কি তাদের হাতের চুড়ির?

কলকাতা, কলকাতা, এই সব মিলিয়ে প্রথম দিনের কলকাতা।

মা, তুমি কোমরে আঁচল বেঁধে ঘর সাফ করছিলে, একবার মুখ তুলে বাবাকে বললে "কেমন ভাপসা গন্ধ, না?"

"প্রাসাদ কোথায় পাব। এই ঘরটারই ভাড়া কুড়ি টাকা, তা জানো?"

তুমি একটা জানালা খুলতে যাচ্ছিলে, বাবা হাত তুলে ইসারায় মানা করলেন।—"ওই জানালাটা খুলো না।"

"খুলব না, সে কী!"

"কারণ জেনে কী হবে, ও দিকটা মানে ওদিকটা ভালো না, আর কী। মানে জানতে নেই না। সেই যে এক রূপকথায় আছে উত্তরের জানালা খুলতে নিষেধ, তেমনই ধরে নাও আর কী। পরে আস্তে আস্তে টের পাবে।"

"কিন্তু জানলা না খুললে গন্ধটা—"

"ইঁদুরে নোংরা করেছে। কালো কালো বড়িগুলো দেখছ তো, ওর মানে হল তাই। অনেক দিন কেউ বাস করেনি কিনা! পরে দেখো, সয়ে যাবে। যখন টের পাবে লোক এসেছে তখন আরশোলাগুলোও পালাবে।"

"আরশোলাও আছে বুঝি?"

"আছে, আছে, সব আছে। এই নিয়েই তো—"

সবটা না শুনেই আমি মনে মনে বললাম, "কলকাতা।"

"সব জেনেশুনে তুমি এখানে—"

"এর চেয়ে ভালো পাব কোথা। তবু তো সতীশ রায় খবরটা দিয়েছিল, তাই। সতীশ কে জানো তো? আমাদের থিয়েটারে প্রম্‌ট করে, মানে আড়াল থেকে সব্বাইকে পার্টের খেই ধরিয়ে দেয় আর কী। সতীশও এখানে থাকে, সপরিবারে। চমৎকার লোক, কাল দেখবে।"

"ওর বউ?"

"আছে। একটি মেয়েও আছে, ফুটফুটে। ওরাই তো একটু আগে এসেছিল, খবরটবর নিয়ে গেল। কাল সকালে আবার আসছে।"

"দ্যাখো, এত কাজ থাকতে তুমি শেষ পর্যন্ত থিয়েটারে—আমার যেন কেমন-কেমন লাগছে।"

"আমার জন্যে জজিয়তি নিয়ে কে বসে আছে বলো তো। হাকিম করতে হয়, কোরো তোমার ছেলেকে।"

তুমি আমার মাথায় হাত রেখে বললে, "হাকিম হবে, হবেই তো। জানো, ও পড়াশুনোয় কত ভালো। এবার ইয়ারলি পরীক্ষায়—কত যেন পেয়েছিস রে?"

বললাম, "ছশো তিরিশ—সাতশোর মধ্যে।"

"বাস্‌", হেসে উঠলেন বাবা, "তবে তো হাকিম হবার অর্ধেকটা রাস্তা পার হয়েই এসেছে। কিন্তু আমার কথা যদি খাটে, ও হাকিম হবে না। হাকিমী মানেও তো সাহেবদের গোলামী।"

"তবু সম্মান, স্থায়িত্ব, এই সব তো পাবে?"

চোখ টেরচা করে বাবা বললেন, "তোমার সেই কী রকম দাদা যেন, সে যা পেয়েছিল? সেরেস্তা না কোথায় কাজ করত না? আসলে আমি জানি ও ছিল পুলিসের টিকটিকি। ছদ্মবেশী, ওর সবটাই ছদ্মবেশ। আমার ছেলে—" হাঁপাতে হাঁপাতে বাবা বললেন, ঈষৎ উত্তেজিত, "ও আমারই ছেলে যদি হয় তবে গোলাম কখনও হবে না। টিকটিকি ইঁদুর কিচ্ছু না। ও হবে বাঘ, বাঘের বাচ্চা বাঘ।"

এই বলে বাবা আমার পিঠ চাপড়ে দিলেন।

"বাঘ তো এখন থিয়েটারের খোঁয়াড়ে ঢুকেছে। ছি-ছি, এত জেল-টেল খেটে শেষে"--

"চিঠিতে তা তো বুঝিয়ে লিখেছি। দ্যাখো, খোঁয়াড় বোলো না। কপালে থাকে তো ওই থিয়েটারই আমাকে তুলে ধরবে। হয়ত ওখানেই—" বলতে বলতে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল বাবার চোখ, নাকের ডগা স্ফীত, কপালের শিরাও ফুলে উঠেছে—"হয়ত ওখানেই একদিন আমার লেখা নাটকও প্লে হবে।"

"তোমার নাটক!"

"হতে তো পারে। সেই আশাতেই তো ঢুকেছি। ছুঁচ হয়ে। ছিদ্র পথে। সব্যসাচীবাবু, নাম জানো? এখনকার সবচেয়ে নামী অ্যাক্টর। তিনি কথা দিয়েছেন—"

"প্লে করবেন?"

"না। ফুরসুত পেলে দু-একটা পাণ্ডুলিপি পড়ে দেখবেন। এক সঙ্গে উনি দুটো বোর্ডে নামেন, ফী বেস্পতি, শনি আর রবিবারে, তা-ছাড়া টকি-স্টুডিও—নিশ্বাস ফেলারই বা সময় কই?"

ঝাঁটা হাতে নিয়ে তুমি ছবির মত স্থির হয়ে চেয়ে রইলে। বোধ হয় আশা আর অবিশ্বাসের মধ্যে দুলছিলে।

"আজ আর বেশী কিছু কোরো না। আমি চট করে দোকান থেকে কিছু খাবার নিয়ে আসি। পুরী-তরকারি আর রাবড়ি, কিংবা দই, মিষ্টি দই। কলকাতার দই একেবারে আলাদা জিনিস, জানিস তো?"

এই বলে বাবা আমার দিকে চোখ টিপে একটা লোভ-দেখানো ইসারা করে বেরিয়ে গেলেন।

(ক্রমশ)

ওসাকার সেঞ্চুরি হিলসে বিশ্বমেলা প্রাঙ্গণের একাংশ

বিশ্বমেলা

দ্বিজেন্দ্রনাথ বকসী

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থাৎ ১৭৫৬ সালে ইংলণ্ডে অনুষ্ঠিত শিল্প-প্রদর্শনী থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিগত ২১৯ বৎসর ধরে নানা ধরনের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অসংখ্য প্রদর্শনী আয়োজিত হয়েছে। পৃথিবীর সব দেশের মানুষই ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গীতে বিচিত্র সাজ-সরঞ্জাম সাধারণ দর্শকের সামনে উপস্থিত করেছে প্রদর্শনী ও মেলার মাধ্যমে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই সব প্রদর্শনী কখনও বা শহরে স্থানীয় আর কখনও বা জাতীয় পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে।

কিন্তু আধুনিক সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কাছে সমুদ্র-পর্বত-প্রান্তরের ব্যবধান ক্রমে ক্রমে সংকুচিত হয়ে এল। চিন্তার পরিধিও হল বিস্তৃত। প্রদর্শনীর আয়োজন আর উদ্দেশ্যও করল প্রসার লাভ।

স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়কে অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক আকারে বৃহদায়তন প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত করবার ভাবনাটা অবশ্য প্রথম লক্ষ্য করা যায় বিগত শতাব্দী থেকেই যখন ১৮৫১ সালে লণ্ডনের হাইড পার্কে অনুষ্ঠিত হল সুবিশাল বিশ্বমেলা। এই বিশ্বমেলার পর পরই ইউরোপের ফ্রান্স, ইংলণ্ড, বেলজিয়াম, অস্ট্রিয়া, জার্মানী, সুইজারলাণ্ড, স্পেন, নেদারল্যাণ্ড, সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রভৃতি দেশে প্রায় প্রত্যেক বৎসরেই উৎসাহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে জাতীয় পর্যায়ে বড় বড় প্রদর্শনী।

১৮৫৩ সালে অনুষ্ঠিত হল দ্বিতীয় বিশ্বমেলা আমেরিকার নিউইয়র্কে আর এর ফলে আমেরিকা ও ইউরোপের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্র হল সম্প্রসারিত।

ইউরোপের অন্যতম প্রধান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্যারিসে তৃতীয় বিশ্বমেলা বসল ১৮৫৫ সালে। এ ছাড়া প্যারিস আরও কয়েকবার বিশ্বমেলার উৎসবে মুখর হয়ে উঠেছিল। ১৮৮৯ সালে নবম বিশ্বমেলায় প্রদর্শিত হল উনবিংশ শতাব্দীর লৌহ যুগের বিস্ময় নব-নির্মিত এইফেল টাওয়ার (Eiffel Tower)। এই প্রদর্শনী উপলক্ষে এক অভিনব আকর্ষণীয় পরিকল্পনার চমৎকারিত্ব দেখে মুগ্ধ হতে হয়। ফ্রান্সের তৎকালীন জনপ্রিয় অভিনেত্রী সরা বের্নার্দ (Sarah Bernardt) প্রকাণ্ড এক বেলুনে চড়ে প্যারিস শহরের উপর দিয়ে উড়ে গেলেন। সে যুগে এ এক অভাবনীয় ব্যাপার! পরবর্তী ১৯০০ সালের বিশ্বমেলাকে কেন্দ্র করে প্যারিসে গড়ে উঠেছিল ছোট-বড় নানা ধরনের গ্যালারী আর মিউজিয়াম। ফ্রান্সের জনজীবনে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এগুলি আজও বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

১৮৭৬ সালে ফিলাডেলফিয়া বিশ্বমেলায় টেলিফোন, টাইপ-রাইটার, সেলাই-এর কল ইত্যাদি প্রদর্শিত হয়েছিল আর পৃথিবীর অনেক দেশের মানুষই এখানে প্রথমবার প্রত্যক্ষ করলেন সে যুগের বিজ্ঞানের বিশিষ্ট অবদানগুলি।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ১৯০৪ সালে সেণ্ট-লুই বিশ্বমেলায় দেখা গেল সে যুগের শিল্পের সার্থক অবদান মোটর গাড়ির মেলা।

ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত করার ব্যাপারটা বিভিন্ন দেশ-

গ্নলিতে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করল এবং কোন কোন দেশ অত্যুৎসাহী হয়ে প্রায় প্রতি বৎসরই বিশ্বমেলার অনুষ্ঠান করতে এগিয়ে এল। কিন্তু যাতে এক সুনির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে ১৯১২ সালে এশিয়ার একমাত্র জাপান সমেত বিশ্বের অন্যান্য কয়েকটি দেশ বার্লিনে মিলিত হয়। কিন্তু এদের কোন পরিকল্পনাই কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি। কারণ অল্প কিছুকাল পরে শুরু হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এই প্রথম প্রচেষ্টার পর ১৯২৮ সালে ফরাসী সরকারের উদ্যোগে জাপান সমেত ৩১টি দেশ সম্মিলিতভাবে বিশ্বমেলা সম্পর্কে নিয়ম বিধিবদ্ধ করল আর প্যারিসে প্রতিষ্ঠিত হল আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী বিষয়ক সংস্থা—ব্যুরো অফ ইণ্টারন্যাশনাল এক্সপোজিসনস। এই সংস্থার নিয়মাবলী অনুসারেই বর্তমানের বিশ্বমেলাগুলি অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর মানুষের মনে ঘটল এক বিরাট পরিবর্তন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মননশীলতায় ছিল বস্তুর অস্তিত্বের প্রতি মুগ্ধ বিস্ময়ের ভাব। কিন্তু যুদ্ধের পরবর্তী যুগে মানুষের মন যেন

কেবল এই বস্তুর জাঁকজমকপূর্ণ অভিনবত্বে আর তৃপ্তিলাভ করতে পারল না। তাই প্রদর্শনীগুলিতে তারা চাইল কোন এক সূক্ষ্ম ভাবধর্মী বিষয়বস্তুর সংমিশ্রণ। ফলস্বরূপ, ১৯২৬ সালের ফিলাডেলফিয়া মেলায় প্রদর্শিত হল আধুনিক স্থাপত্যকলার প্রথম নিদর্শন। আত্মপ্রকাশ করল যুক্তিবাদনির্ভর নব্য-ক্লাসিকধর্মী প্রদর্শনী। অনেকে মনে করেন, আধুনিক শিল্পকলা ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসারের পথ নির্দেশিত হল এখানে।

এতদিন বিশ্বমেলাকে সামগ্রিকভাবে কোন Central Theme বা একক সমন্বয়ধর্মী বিষয়বস্তু বা আদর্শের ভিত্তিতে রূপদান করবার চিন্তা দেখা দেয়নি। ১৯৩৩ সালের চিকাগো বিশ্বমেলায় প্রথমবার এই প্রচেষ্টা দেখা গেল। সমগ্র প্রদর্শনীটির মূলগত ঐক্যের সূত্রটি ধরা পড়ল 'প্রগতির একটি শতাব্দী' অর্থাৎ A Century of Progress এই আখ্যাটির ভিত্তিতে প্রদর্শনীটিকে রূপায়িত করার মাধ্যমে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সর্বনাশা ভয়াবহ নারকীয় ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করার পর মানবতার অবমাননায় ক্ষুব্ধ বিশ্ববাসীর প্রাণ কেঁদে উঠেছিল। তাই এরই প্রতিফলন বুঝি ঘটল যুদ্ধপরবর্তী যুগের সর্বপ্রথম বিশ্বমেলা ব্রাসেলসে, ১৯৫৮ সালে। ব্রাসেলসের আন্তর্জাতিক মেলার সমন্বয়ী ভাবটির ভিত্তি ঘোষিত হল 'বৈজ্ঞানিক সভ্যতা ও মানবতাবাদ'।

১৯৬৭ সালে মন্ট্রীলের আন্তর্জাতিক মেলার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে, 'মানুষ ও তার পৃথিবী'–ম্যান এণ্ড হিজ ওয়ার্লড।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লণ্ডন (১৮৫১, ১৮৬২), নিউইয়র্ক (১৮৫৩, ১৯৩৯-৪০), প্যারিস (১৮৫৫, ১৮৬৭, ১৮৭৮, ১৮৮৯, ১৯০০, ১৯৩৭), ভিয়েনা (১৮৭৩), ফিলাডেলফিয়া (১৮৭৬), চিকাগো (১৮৯৩, ১৯৩৩-৩৪), সেণ্ট-লুই (১৯০৪), সানফ্রান্সিসকো (১৯১৫), ব্রাসেলস (১৯৩৫, ১৯৫৮), আমেরিকার সিয়াট্‌ল (১৯৬২) এবং মন্ট্রীলে (১৯৬৭) যে গ্রেট একজিবিসনস, ওয়ার্লডস ফেয়ার, এক্সপোজিসন ইউনিভার্সেলে, একসপো প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেগুলিকেই প্রকৃত প্রস্তাবে বিশ্বমেলা আখ্যা দেওয়া সমীচীন। এই হিসাবে ওসাকার এক্সপো-৭০ একবিংশতিতম বিশ্বমেলার মর্যাদা লাভ করতে পারে।

আজ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বে প্রায় চল্লিশটি বড় রকমের আন্তর্জাতিক মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সমসাময়িক কালের শিল্প ও বিজ্ঞানের সমৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির পরিচয়ের বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল বিশ্বমেলার অঙ্গন। আন্তর্জাতিক পরিবেশে পারস্পরিক ভাবের আদান প্রদানের সুযোগ অবশ্যই ঘটেছে আর এই প্রসঙ্গে এটি অস্বীকার করলে চলবে না যে, বাণিজ্যিক ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ বা বাণিজ্যের নূতন ক্ষেত্র প্রস্তুতের কথাটি প্রকট না হলেও সেটিই এই ধরনের মেলার অন্তর্নিহিত মূল সুর।

এবারের বিশ্বমেলায় ভারতীয় মণ্ডপটির মডেল—দর্শনীয় অনেক কিছুর মধ্যে আছে দুষ্প্রাপ্য শ্বেত ব্যাঘ্র; মার্বেল পাথর, কাঠ আর ধাতুনির্মিত ৪ মিটার উঁচু তাজমহলের প্রতিরূপ; প্রাচীন এবং আধুনিক প্রায় সবরকম শিল্পের নিদর্শন; ছয় ফুট উঁচু উড়িষ্যার দুর্গা প্রতিমা; এ ছাড়া দেখান হবে এভারেস্ট অর্থাৎ পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গের শিলাখণ্ড আর বিজয়ী তেনজিং ব্যবহৃত পর্বতারোহণের সাজসরঞ্জাম

এ বছর ১৫ই মার্চ থেকে জাপানে ওসাকার সেনরি হিলে যে বিশ্বমেলা এক্সপো-৭০ শুরু হয়েছে, সেটি এশিয়ায় এই ধরনের সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক মেলা এবং এশিয়াবাসীর গর্বই বলতে হবে কারণ, এশিয়ায় সর্বপ্রথম মেলাটির বিশ্বের বৃহত্তম।

এবারের বিশ্বমেলাতেও মানবতাবাদের সুরটিকে বজায় রেখে সমগ্র প্রদর্শনীটিকে রূপায়িত করবার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় একটি কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে—মনুষ্য জাতির প্রগতি ও সমন্বয় Progress and Harmony for mankind এই মূল বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিশেষ যোগদানকারী সব দেশগুলি রূপদান করেছেন নিজেদের প্যাভিলিয়নগুলিকে, আর অনেকেই বেছে নিয়েছেন পৃথক বিষয়বস্তু বা Sub Theme।

কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত সামগ্রিক ভাবের ভিত্তিতে ভারতবর্ষও তার মণ্ডপটির পরিকল্পনা করেছে। অবশ্য ঘোষণা করেছে নিজস্ব আলাদা বিষয়বস্তু Cultural Heritage and Expanding Friendship অর্থাৎ 'সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও বন্ধুত্বের সম্প্রসারণ' আর চেয়েছে শিল্পায়ন ও আধুনিকীকরণের আবেগে প্রাণচঞ্চল ভারতবর্ষের ভাবমূর্তিটিকে ফুটিয়ে তুলতে।

জাপানের এই সুবৃহৎ বিশ্বমেলাটি হয়ে উঠেছে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের শিল্প ও জাতীয় সংস্কৃতির পরিচয়জ্ঞাপক একটি মহামিলন ক্ষেত্র।

এক্সপো-৭০-এর পরিচালকমণ্ডলী আশা করেন যে, বর্তমান শতাব্দীর মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার অভিনবত্ব ও চমৎকারিত্বের সমারোহ ছাড়াও এখানে সৃষ্টি হবে এমন এক ঐক্যবোধের পরিবেশ আর গড়ে উঠবে বোঝাপড়া ও সহিষ্ণুতার আদর্শ যার ভিতর দিয়ে সমাদৃত হবে বিশ্বের নানা জাতির সভ্যতা। মানব জাতির অতীত ও বর্তমানের পরিচয়ের মধ্যেই ফুটে উঠবে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। তাইতো এক্সপো-সংগীতের ছত্রগুলির ভাবার্থে ধ্বনিত হয়েছে:

উপরে তাকাও, চেয়ে দেখ ঐ,
সূর্যরশ্মি পড়ছে ঝরে তোমার উপরে।
দৃষ্টি মেলে দাও, বাহু কর উত্তোলন,
আর এস, আমরা সবাই এখানে
ভবিষ্যতকে করি আবাহন।

'আর কোন হিরোশিমা নয়' এই মন্ত্রের উদ্গাতা যুদ্ধনীতি বর্জনকারী জাপানের আগামী শতাব্দীর ভাবনায় স্পন্দিত এক্সপো-৭০ কি সত্যিই সহায়ক হতে পারবে পারস্পরিক 'বোঝাপড়া ও সহিষ্ণুতার' আদর্শ সৃষ্টি করে ভবিষ্যতে পৃথিবীর মানুষের শান্তিপূর্ণ ইতিহাসের সেতুবন্ধ রচনা করতে?

একসপো-৭০এ নেদার ল্যান্ডের প্যাভিলিয়ন—পিছনে রুশদেশের মণ্ডপের অংশ দেখা যাচ্ছে

জাপানে একস্‌পো-৭০

বিকাশ বিশ্বাস

আমার দাদু প্রায়ই একটা কথা বলতেন, "দেখ্, পেটে যদি খেতে পাস— শরীরে আপনা-থেকেই 'বল' পাবি; শরীরে 'বল' পেলে, জীবনে সব করতে পারবি...।" জাপানে না এলে কথাটা বোধহয় সম্যক উপলব্ধি করতে পারতাম না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলাকে উপলব্ধি করে, বোধহয় শুধু ওইটুকু চিন্তাসূত্রের পরিপ্রেক্ষিতেই জাপান রাজনৈতিক এবং মানসিক দিক্ থেকে সব কিছু স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিল। মধ্যবয়সী অনেক লোকের মুখে সেই কঠিন কষ্টের দিনগুলোর কথা অনেকবার শুনেছি। শুধু দুটি ভাত, যার জন্য দিনের পর দিন তারা অপেক্ষা করেছে। এমনকি পরিধেয় জিনিসের বিনিময়েও তারা শুধু চেয়েছে শুধু সেই একটি জিনিস। আর অন্য কিছু না, কল্পনা করা যায় না। তাদের মুখে সেদিনগুলির কথা শুনলে আমার মত বহিরাগতের কাছে রূপকথা মনে হয়। আমারই বা শুধু কেন? আজকের অধুনা যুব-সমাজ বা যুব সম্প্রদায়, যাদের অভ্যুত্থান এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীতে, তারাই হয়ত বিশ্বাস করতে চাইবে না। তবে গল্প তারাও শুনেছে। বড়দের সঙ্গে তাদের মনেও গাঁথা হয়ে গেছে একটি জিনিস,—যেটা ছোট্ট একটা গল্প করে বললেই ভাল শোনাবে।

সেদিন বলছি কেন, এই তো মাস ছয় হয়ে গেল, দেশে গিয়েছিলাম। আমি বেশ একটু ভালমন্দ খেতে পছন্দ করি, বোধহয় বংশানুক্রমিক ধারা। সেই সঙ্গে সদা বাড়িছাড়া কলকাতার কর্মজীবনে যেখানেই মায়ের মতন করে একটু স্নেহের ছোঁয়া পেতাম সেখানেই হানা দিতাম। আমার এমনই এক পিতৃবন্ধু জ্যাঠামহাশয় এবং জেঠিমার কাছে এই দুটো জিনিসেরই অভাব কোনদিন বোধ করিনি। এবারেও তেমনই সকলে মিলে গল্প করছি। স্বভাবতই পরিপাক যন্ত্রের আলোচনায়, জাপানের কথায় দুর্দিন এবং সুদিনের কথা এসে পড়ল। জ্যাঠামহাশয় কয়েকবার জাপানে এসেছেন, ওঁর কাছেই গল্পটি শোনা। উনি জাপানে এসেছেন কর্মসূত্রে। স্বভাব সুলভ ভাবেই জাপানের ব্যবসায়ী মহলের আদর যত্নের ত্রুটি নেই। কয়েকদিন থাকলেন, অনেক কিছুই দেখলেন। উচ্ছ্বসিত হবার মত বা প্রশংসা পাবার মত বহু কিছুই দর্শনীয় এবং শিক্ষণীয় জাপানে উপস্থিত। মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করলেন। জাপানী চরিত্রের নম্রতা এবং বিনয় সহকারে তারা সেগুলি গ্রহণ করল। চলে আসবার দিন। সবশেষে উনি গাড়িতে উঠতে যাবেন, সকলে বিদায় জানাতে এসেছেন। শেষ মুহূর্তে, যিনি সবচেয়ে কাছে থেকে ওঁর সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন, এগিয়ে এলেন. একটু থেমে বললেন "মিঃ বাসু, আপনার সব কথাই ঠিক্। আমাদের আজকের এসব উন্নতি অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু ভুলে যাবেন না—Japan Lost the War" এই শেষ কথা। কথাটা আমার কাছে একটা নূতন দৃষ্টিকোণ খুলে দিয়েছিল। হ্যাঁ—আজকের জাপানের প্রতিটি পদক্ষেপে, কর্মের প্রেরণায়, আমি যেন সেই মানসিকতার অতল আত্মপ্রত্যয় খুঁজে পাই, যা আজকের জাপান সেদিনের অস্ত্র-সজ্জার পরাজয়কে পেছনে রেখে এক নূতন জয়ের আনন্দে এগিয়ে চলেছে—যার বিচার ইতিহাস একদিন অবশ্যই বহন করবে।

একস্‌পো-৭০, এই জয়েরই এক নবতম রূপায়ন। আজ যখন লিখতে বসেছি, তার অনেক আগেই ১৪ই মার্চ পার হয়ে গেছে, এখন একস্‌পো-৭০ সকলের জন্য উন্মুক্ত। কিন্তু কদিন আগেও এমন ছিল না। শুধু কাজ আর কাজ। পুজোর আগে প্রতিমার খড়-বাঁধা, কাদা দেওয়ার দিনগুলোতে যেমন একটা রোমাঞ্চ আছে, যেমন একটা আনন্দের আবাহনের নেশা আছে, তেমনই এখানেও আছে 'শুধু

একসপো'-র অত্যন্ত আকর্ষণীয় দৃশ্যের এ কটি সুইটজারল্যাণ্ডের এই অ্যালুমিনিয়ামে তৈরি জাফরিকাটা বৃক্ষসদৃশ ইমারতটি যাতে জ্বলছে ৩৫,০০০ বাতি

কাজ আর কাজের দিনগুলিতে। ইচ্ছা ছিল সেই স্মৃতিটুকুকেই ধরে রাখব, আমার সাধ্যমত উপহার দিতে চেষ্টা করব আপনাদের। নিজের মাঝেই দুটো চোখে দেখা, একবার বাইরে থেকে, আর একবার ভিতর থেকে।

আমাকে মাসে বার তিন চার ওসাকা যেতে হয়। হয়ত সেই কারণেই বাঙ্গালী সুলভ গড়িমসি "দেখলেই হবে, গেলেই হবে।" ইতিমধ্যে আত্মীয় বন্ধু, বিশেষত যাঁরা বিদেশে, তাঁরাই পত্রাঘাত শুরু করেছেন, কই এক্‌স্‌পো-৭০-এর কিছুই তো জানাচ্ছ না। তার মানে তাদের কাছে এক্‌স্‌পো-৭০-এর বহুল খবরাখবর সেই সময়েই পৌঁছে গেছে। শুধু আমারই দেখা বাকি। সেই কারণে মার্চের প্রথম সপ্তাহে ওসাকাতে পৌঁছেই প্রতিজ্ঞা করলাম, না এবারে যেতেই হবে। সেদিন ছিল রবিবার। ওসাকা থেকে এক ছোট লাইনে চেপে বসলাম। অনেক গাড়ি--কোন অসুবিধা নেই। পৌঁছে দেবে একেবারে "Heart of Expo-70"-এ। হাজির হলাম SENRI-LAND, এখানেই এই কয়েক বছর আগে, ছোট ছোট টিলা-গুলি আর পাঁচটির মত একান্ত নিভৃতে হয়ত দীর্ঘশ্বাস ফেলত। কিন্তু আজ সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি এই একটি জায়গায়। সেনরি-ল্যাণ্ড হঠাৎ কোন মন্ত্রবলে এক আশ্চর্যপ্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছে। নানান রঙে নানান বাহারে, লক্ষ মানুষের মনন-শীলতা এই নীরব প্রাণের মায়ায় আকাশের সীমাহীন আনন্দে হারিয়ে গেছে। সেদিন
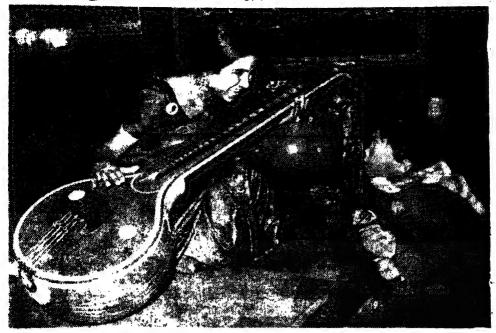
ভারতীয় প্যাভিলিয়নে দক্ষিণী বীণার সঙ্গে জাপানী মেয়েদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে

গাড়ি থেকে বাইরে পা ফেলেই, সমস্ত যান্ত্রিক আচ্ছাদনের বাইরে, শুধু এই কথাটুকুই আমার মনে হয়েছে, আমার সমস্ত অনুভূতিকে আচ্ছাদিত করে ফেলেছিল।

প্রকৃতিকে মন্দের মাঝে আবদ্ধ করা হয়েছে। ৩,৩০০,০০০ (স্কোয়ার-মিটার) জমি ঘেরা হয়েছে লোহার জাল দিয়ে। তারই পাশে পাশে বড় বড় গাছ তুলে এনে লাগান হয়েছে। আমার মত হাজার হাজার দর্শনার্থী ছুটে এসেছে ছুটির দিনে। সঙ্গে ছেলে-মেয়ে আরও কত কে। সারাটা চারপাশ ঘিরেই শুধু আনন্দ আর আনন্দ।

পৃথিবীর নানান দেশ ছুটে এসেছে—"দেখ আমাকে দেখ—আমার ঐশ্বর্য-উন্নতি-অগ্রগতি..." সেখানে কোনও দুঃখ-দৈন্যের স্থান নেই।

সকাল গড়িয়ে দুপুর। একটা গেটের পাশে একদল মজুর দুপুরের খাবার খেতে খেতে ঘাসের উপরই গড়িয়ে নিচ্ছে। ঘামে ক্লান্তির ছাপ, চোখ বাইরের মানুষগুলোর দিকে, যারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে সেই শুরুর দিনটার জন্য। তার আগে এমনই বাইরে থেকেই ঘুরে-ফিরে ফিরে যাওয়া। জাপানের এমনই হাজার হাজার মজুর হলদে হেলমেট মাথায়, সমস্ত পৃথিবীর বাছা বাছা মানুষের সুন্দরের ইচ্ছাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করছে। সমাপ্ত প্রায়। চোখের দৃষ্টিতে ওরা যেন এই বাইরে ঘরের বেড়ান মানুষকে বলছে "কি, পছন্দ হয়েছে তো?" বাইরের মানুষও সঙ্গে এনেছে দ্বিপ্রাহরী খাবার, নয়ত এখানে সেখানে ছড়ান-ছিটোন হট-ডগ-এর গাড়ি থেকে এটা ওটা কিনে খাওয়া শুরু করেছে। ভাবছিলাম এই বাইরে আর ভিতরের দুটো দলের ঠিক ওই মুহূর্তের সময়-বিলাসের মাপকাঠি একই, কিন্তু মনের আস্বাদনের কি অদ্ভুত বৈসাদৃশ্য। চোখ-মুখে ওদের দৃষ্টির ভাষায় দেওয়া জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তরই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—"সে কি আর বলতে?" ওরাই তো আজকে পৃথিবীর সামনে জাপানের মান-মর্যাদার মূর্ত প্রতীক।

যে যেখানে পারছে একটু উঁচু জায়গা পেলেই দাঁড়িয়ে ভিতরটা ভাল করে দেখবার চেষ্টা করছে। কোন কোন নারী পুরুষ হয়ত ছেলে-মেয়েকে ঘাড়েই চাপিয়ে ফেলেছে। সকলেরই উদ্দেশ্য—যতটুকু পারা যায় দেখে নিই—এই আর কি?

এশিয়াতে শিল্প-মেলা এই প্রথম। ১৫ই মার্চ থেকে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার শুরু হয়ে গেছে। ১৪ই মার্চ ১১·৩৪ মিঃ (সকাল) পাঁচটি অগ্নুৎগারক গোলার শব্দে এই উদ্বোধনের পর্ব শুরু হয়েছে। জাপানের সম্রাট-সম্রাজ্ঞী, সেই সঙ্গে সারা পৃথিবীর বড় বড় মানুষ সেদিন এই উদ্বোধনকে প্রত্যক্ষ করেন। জ্বলে উঠেছে লক্ষ লক্ষ বৈদ্যুতিক আলো।

তিন বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম। সর্বমোট এতে খরচ হয়েছে ১,০০০,০০০ মিলিয়ন ইয়েন। এর জাঁক-জমক প্রত্যক্ষ করে নিশ্চয়ই জাপানের এতদিনের দুর্নাম "Economic Animal"-এর ভুল সংজ্ঞা, পৃথিবীর মানুষ শুধরে নেবে, এমন আশাও কেউ কেউ করেছেন। এর আগে আর কোনও শিল্প মেলাতে এত দেশের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় নি। সর্বমোট ৭৬টি দেশ এই শিল্প মেলাতে উপস্থিত। গত ১৯৫৭তে যে শিল্পমেলা মনট্রীল-এ

হয়েছিল তাতে যোগদান করেছিল মোট ৬০টি দেশ। জাপানের প্যাভেলিয়নকে সেখানে সকলে বলেছিল "Salesman-Suitcase."। এবারে তাই বুঝি সকলে উঠেপড়ে লেগেছে, তেমনটি যেন কেউ না বলে।"

জাপানে উপস্থিত এই ৭৬টি দেশের মধ্যে আছে ১৮টি পশ্চিম ইওরোপ, তিনটি পূর্ব ইওরোপ, দুটি নর্থ আমেরিকা, সাতটি সেণ্ট্রাল আমেরিকা, আটটি সাউথ আমেরিকা ১৬টি জাপানের আশে পাশের এশিয় প্রতিবেশী দেশসমূহ থেকে, সাতটি মধ্য প্রাচ্য, ১৩টি আফ্রিকা, দুটি অস্ট্রেলেশিয় অঞ্চলের। এর থেকে একটা জিনিস বিশেষ ভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠছে তা হলো আজকের পৃথিবীর এতগুলো দেশের সঙ্গে জাপানের সৌহার্দ্য। খুঁজে দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে এদের অনেকেই একে অপরের দিকে সঙ্গীন উঁচিয়ে আছে। সেই কারণেই বোধহয় সেদিন সব থেকে বেশী ভাল লাগল, টোকিওতে বসে টেলিভিসনে যখন দেখলাম, দেশ-জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে একই পাটাতনে দাঁড়িয়ে, একই আন্তরিকতা বহন করে, একের পর এক দেশের মেয়েরা

এসে তাদের নিজস্ব পোশাকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে একই জনতার উদ্দেশ্যে স্বাগত জানিয়ে গেল। ভারতীয় মেয়েরা তার মাঝেই শাড়ি সজ্জায় সেদিন সকলকে জানিয়ে গেল "নমস্তে"। শিল্পমেলার সেই মুহূর্তে জাপানের সকল মন্দিরে, গির্জ্জায় এক সঙ্গে বেজে উঠেছিল মঙ্গল ঘণ্টা। আমার দৃঢ় বিশ্বাসে মনে হয়েছিল, জগতের কাছে যেন সেই ব্রাহ্ম মুহূর্তের আত্মিক আবেদন "ওঁ শান্তি"-র বাণী।

ঊনত্রিশটা দেশ ছাড়া, সকলেই তাদের নিজস্ব পরিচিতিকে আলাদা বহন করছে। সকলেই প্রস্তুত করেছে তাদের নিজস্ব প্যাভিলিয়ন। এর জন্য চারটি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উপস্থিতি ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। এই দেশগুলি ছাড়া চারটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানও এখানে উপস্থিত। (1) United Nations (2) The organisation for Economic Co-operation & Development (3) European Community (4) Asian Development Bank। জাপান সরকার এবং তার সঙ্গে ২৭টি শিল্প এবং চারুকলা পরিষদও নিজ উপস্থিতিতে স্বয়ং-সম্পূর্ণ।

আশা করা যাচ্ছে যে ৫০ মিলিয়ন জাপানের লোকসংখ্যার অর্দ্ধেক এবং এক মিলিয়ন বিদেশী পর্যটক সর্বমোট এ মেলায় উপস্থিত হবে। এখন পর্যন্ত এ মেলার স্থায়িত্ব ১৫ মার্চ, ১৯৭০ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭০ মোট ১৮৩ দিন ধার্য করা হয়েছে। কিন্তু প্রথম দিন যেরকম মানুষের ভিড় আশা করা গিয়েছিল, তেমন উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় নি। আশা করা হয়েছিল ৫০০,০০০-এর বেশী, কিন্তু প্রথম দিন সেখানে উপস্থিত হয়েছিল ২৫০,০০০ হাজারের কিছু বেশী। এইসব নানান কারণে মনে করা হচ্ছে যে এর স্থায়িত্ব হয়ত আরও কিছুদিন বাড়িয়ে দেওয়া হবে।

সেদিন বাইরে থেকে মানুষের দৃষ্টি বেশী আকর্ষণ করেছিল 'সূর্য-প্রতীক' (TOWER OF THE SUN) উচ্চতা ৭০ মিঃ, "যৌবনের দূত" (TOWER OF YOUTH) উচ্চতা ২৩ মিঃ; "মাতৃত্বের বন্দনা" (TOWER OF MOTHER HOOD)

এই 'সূর্য প্রতীকে'র স্রষ্টা হচ্ছেন TORO-OKAMOTO। মানুষের আকৃতি এই TOWER, দুটো হাত দুদিকে পাখার মত মেলে ধরেছে। ১১ মিটার পরিধি বিস্তৃত এক স্বর্ণময় মুখাবয়ব, সূর্যকিরণে সদা জাজ্জ্বল্যমান। আর এরই নাভিতলে বিরাট এক দানবীয় ক্রুদ্ধ মুখাবয়ব। এই সূর্যপ্রতীক বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল ওকামোতো-সানকে। তাঁর মতে এটা তিনি এমন কিছু বিশেষ ভাব নিয়ে তৈরী করেন নি। এমনই একটা প্রতীক। কিন্তু অনেক

প্রধান তোরণের মধ্যে ১৯৮ ফিট উঁচু সূর্য প্রতীক

মননশীল মানুষ মনে করেন, "এক অতি-মানব, মানুষের এই বস্তু-তান্ত্রিক সভ্যতাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে।" আর একদল মনে করেন ". . . it as a symbol of man's eternal persuit of progress."

এই মেলার পরিচালনার জন্য মোট ২৫০,০০০ ছাত্র কর্মী গৃহস্থ-বউ সমবেত ভাবে এক হয়েছেন। এঁদের মাঝে ৩০ হাজার আছেন বহিরাগত, যাঁরা নানান কারণে আগামী ছয় মাসে এই মেলাতে অংশ গ্রহণ করবেন।

স্ব-স্ব সরকার পরিচালিত ৬৫টি এবং ১৬টি স্বতন্ত্র পর্যায়ে অনুষ্ঠান, নিজ নিজ জাতীয় দিবস উপলক্ষে বিশেষ ভাবে এই ছয় মাসে অনুষ্ঠিত হবে।

দেখলাম এই মেলার চারপাশ ঘিরে তৈরী হয়েছে স্বয়ং-চালিত (automatic controlled) Monorail গাড়ি দাঁড় করাবার অজস্র জায়গা, এক কথায় এলাহী কাণ্ড।

অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে দেখলাম, বাইরে থেকে সবকিছুই মনে হচ্ছে দানবীয়। সূক্ষ্মতার ছাপ থাকলেও বড় একটা চোখে ধরা পড়ছে না। আধুনিক চিন্তাধারা এবং তারই শিল্প-প্রতীক-এর ছড়াছড়ি, কোথাও কারোর সাথে কোনটার সাদৃশ্য নেই। নিজের মাঝেও বৈসাদৃশ্য। হয়ত এইটিই আধুনিক রূপকথার বা শিল্প-চিন্তার মাপকাঠি। হয়ত এইটিই আধুনিক জগতের মঙ্গল বা অমঙ্গলের পরিপূর্ণ জিজ্ঞাসা, মননশীলতার অমোঘবার্তা। সমগ্র ভাবে এখানে অবশ্যই বৈচিত্র্য আছে, বিরাটত্ব আছে, তাই একা আমি অতি ক্ষুদ্র মনুষ্যকীট তখন বিশালত্বের মাঝে হারিয়ে গেলাম; ও যেন আমার ক্ষুদ্রতাকে ব্যঙ্গ করছে। চোখ ভরা বিস্ময়ে আধুনিক মানুষের দম্ভ আর দক্ষতাকে প্রত্যক্ষ করে ফিরে এলাম। মনকে জিজ্ঞাসা করে পেলাম না কোন উত্তর।

প্রতি রাতেই ফুলশয্যা
ফুলশয্যার মধুর রোমান্স ও অব্যক্ত প্রেমাবেগের মুহূর্তগুলি জীবনের সব রাতেই
আরো মধুরতর হয়ে ওঠতে পারে গোলাপের কোমল স্পর্শে।
সেই স্বপ্নময় ও রসে ভরা মধুর যামিনী আবার ফিরিয়ে আনুন গোলাপ আবৃত বিছানায়
আপনার শয্যাকে শোভিত করবার জন্যে বম্বে ডাইং-এর তৈরী আরো রয়েছে
নানা বিচিত্র রঙে ফুল ও ডিজাইনের চাদর যা দেখা মাত্রই আপনার মনে ধরবে।
(কনের পরিহিত রাত্রিবাসটি বম্বে ডাইং-এর সেরা ভয়েল থেকে তৈরী)
(বরের পরিহিত রাত্রিবাস বম্বে ডাইং-এর পপলিন থেকে তৈরী)
বোম্বে ডাইং

মেদিনীপুরের ফকির

দর্জির দোকানের 'ফ'চড়ো' বা বাতিল ছাঁট কাপড়ের বহু বিচিত্র, রাজকীয়, বর্ণাঢ্য সত্তর তালি দেওয়া একখানা আল-খাল্লা গায়ে। কাঁধে পূর্ব বাংলার মা জননীদের হাতের ফুল নকশী কাঁথা সেলায়ের মতো মিহি এবং সুচারু 'ধাগা' দেওয়া লম্বা একটি ঝোলা। মাথায় তেমনি নকশাদার জালি টুপি। পাকা-কাঁচা সুন্দর দাড়ি। পরনে গেরুয়া লুঙ্গি। হাতে আঁকা-বাঁকা সাপের মতো লতার লাঠি। একটা সিঙ্গাপুরী নারকোলের তেলচুকচুকে নৌকো সদৃশ খোল আর-এক কাঁধে ঝোলানো। গলায় কাঁচকড়ার পাথরের মালা —লাল, নীল, হলদে, সাদা, সবুজ—বিচিত্র শোভাময়।

টিকোলো নাক। কপাল বড়। চোখ দুটি যেন পদ্ম পলাশের পাপড়ি। মধুর একে-বারে মিহি, মোলায়েম, মিঠে গলার স্বর। সঙ্গে দুটি লব কুশ। যেন রামায়ণ গান গাইতে এসেছে পুরবাসীর দুয়ারে। কান পেতে আমি শুনলাম। শুনে আমি মুগ্ধ হলাম। সদ্যোজাত উপন্যাসিকের বকবকে নায়িকাদের নিয়ে লেখা উপন্যাসখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শাঁকের মধ্যে সমুদ্রের গর্জন শুনতে পেয়ে যেন শিশুর মতন ছুটে বেরিয়ে এলাম সদরে। মেদিনীপুরের ফকির। গান গাইছে। অপূর্ব গলা। দোয়ারকী গাইছে দুটি নতুন কিশোর। পাড়ার ছেলেমেয়েরা ছুটে এসেছে। সবাই চায় ফকির সাহেব তাদের বাড়ি যান। এক সরা চাল দেবে। আনা, দশ পয়সা দেবে। ছেলেবেলা থেকে আমিও এমনি মেদিনীপুরের ফকিরের ভক্ত। সমঝদার। মনে করতাম বুঝি বা এরা স্বর্গের স্বর্গীয় দেবদূত! ঝুলিতে ওদের অনেক মজার গান আছে। বড় বড় পুঁথি মুখস্থ। যাদের বাড়ি রাত থাকবে তাদের বড় কপাল। সারা রাত ওরা গজল, বয়ান, পুঁথি, কবি গাইবে। কত কাহিনী ধর্মকথা শোনাবে। শিরি-ফরহাদ, লায়লা-মজনু, সোহরাব-রুস্তম, হজরত মুসা, হজরত ইউসুফের কাহিনী। ঝাড়লো-ঝাদুরী বলতে বলতে বাড়ির কর্তা শুনবে, গিন্নি শনের পাট কাটবার টাকা ঘোরাতে ঘোরাতে—বউরা থাকবে আটচালার আড়ালে 'মৌলুদ' শোনার মতন সারারাত বসে। বুড়োরা হুঁকো টানবে ভুড়ুক ভুড়ুক করে।

এক ঝাঁক রঙিন উড়ো পাখির মতো সেই সব স্বর্গীয় দেবদূতেরা কোন্ কুমের, দ্বীপের দিকে উড়ে চলে গেল অজানের দুনিয়া থেকে বয়েস বাড়ার সিঁড়ি ভাঙতে গিয়ে তার হদিস রাখিনি। এখন হিসেব মেলাতে গেলে 'ফাজিল' হয়ে যায়। যোগের চাইতে বিয়োগের অঙ্ক, মহাবীর হনুমানের চাইতে তার ল্যাজের মতন বড় হয়ে যায়। সেই ল্যাজের লঙ্কাকাণ্ডে সীতা উদ্ধার হল বটে কিন্তু জননী সীতা আগুনে নেবার জন্যে আমাদেরই মুখে আগুন গুঁজতে বললেন!

আধুনিক সীতা এখন কোথায়? বন-বাসে না পাতালে?

শুধু হঠাৎ এতদিন পরে লাল মেঘের

মেদিনীপুরের ফকির

আকাশ ফাটিয়ে হজরত মুসার 'আসাবাড়ি' হাতে নিয়ে যে এল একজন—তাই ভাল। মন ক্ষোভ করে বললো, কোথায় ছিল এতদিন?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফকিরের গান শুন-ছিলাম। তাঁর রূপ দেখছিলাম। ইনি যে একেবারে দরবেশ! ফকির গাইছেন:

বন্যায় আমাদের ভেসে গেল দেশ
মোরা ভেসে এনু পেয়ে কত ক্লেশ॥
ঘরদোর গরু-গোলা ভেসে গেল জলে
জলের অতলে
দেহ মাগো ভিক্ষা কিছু করুণা করে
চাল গম কাপড় যা খুশী
ডাক্তারি ভরে
আল্লার করুণা পড়িবে ঝরে
নাই তার শেষ
বন্যায় আমাদের ভেসে গেল দেশ
মাগো ভেসে এনু মোরা পেয়ে কত ক্লেশ॥'

ছেলে দুটি সমবয়সী, যমজের মতো দেখতে। তারা গেয়ে যাওয়া প্রতিটি লাইনের শেষ রতিটুকুর ধুয়ো ধরছিল। ফকিরের হাতে খঞ্জনী। ছেলে দুটোর হাতে চালুনীর আকারের ঝুমঝুমি। তাদের হাত নাড়ার কায়দাও অপূর্ব।

'বুকে নিয়ে কচি ছেলে ভেসে গেল মা—
টাকা কড়ি ধান খড়
বউ ছেলে বাড়ি ঘর
ভেসে কোথা গেল মাগো কেউ জানে না।...'

মা বললেন, 'আর একটা গান গাও বাছা —আর একটা।' একটা একটা করে ফকির সাহেব সাত সাতটা গান গাইবার পর সাঁঝবাতি জ্বলে গেল।

তাঁরা 'আস্তরা' গাড়লেন আমাদের বাড়ি। তাঁদের খেতে দেওয়া হল।

রাত্রে ভীড় কাটতে আমি গল্প জুড়লাম ফকিরের সঙ্গে।

'আপনার নাম?'

'মোহম্মদ আলী- আহমদ জিয়া হায়দার আল্-তমলুকি।' বলে হাসলেন। বললেন, 'এ আমার বনেদী সায়েরী নাম। বাবাজী রেখেছিলেন জিয়া হায়দার। মিলাদ মহফিলে যাই। কেউ কেউ 'ফকির-দরবেশ' বলে। তাই একটু জাঁকিয়ে নাম না বললে ভক্তরা 'গেরাহ্যি' করে না বাবা।'

বললাম, 'এক ভদ্রলোক অমনি বড় নাম

লিখতেন, তিনি আমার দূর সম্পর্কিত এক মামু। চিঠি দিয়েছেন 'মোহম্মদ আবুল কাশেম বোরহানউদ্দিন' নাম লিখে। আসলে তাঁর নাম বোরহান। আমি তাঁকে চিঠি লিখি আরো খানিকটা তোয়াজ করি নামটার বহর বাড়িয়ে দিয়ে।'

'কি লিখেছিলে বাবা?'

'জনাব হাফেজ আলি সিদ্দিকী মওলানা মোহম্মদ আবুল কাশেম বোরহানউদ্দিন টক্‌করউদ্দিন-কা ঢেকাই আল্‌ভেল্লা-বাড়িয়া!'

ফকির হাসতে হাসতে ফেটে পড়লেন। আমার হাত চেপে ধরলেন। বললেন, 'টক্‌করউদ্দিন-কা ঢেকাই মানে উনি কি ঢেঁকির মতন টক্‌কর মেরে মেরে কথা বলতেন? রাগী লোক? তা কি উত্তর এল?'

'তুমি একটা আস্ত শুয়োরের পয়দাস!'

ফকির জিয়া হায়দার আর হাসলেন না। হঠাৎ গুম হয়ে গিয়ে মোমবাতির আলোটার দিকে করুণ চোখ মেলে মাথা নিচু করে তাকিয়ে রইলেন। ছেলে দুটি তখন তাঁর ঘুমিয়ে পড়েছে ফুলতোলা নক্‌শী-কাঁথা মুড়ি দিয়ে।

শিয়াল ডাকছে দূরে। একপাল শিয়াল। হুয়া হুয়া স্বর। একই অনুকরণ। কবর-স্থানের ভাঙা কবরের মধ্যে ওদের বাসা।

বাঁশবনের মধ্যে জোনাকিরা আলোর জাল বুনছে।

ক্রু ক্রু শব্দে উই-চিংড়ি ডাকছে।

কানা বক ডাকছে—কুব্‌...কুব...কুব...

বললাম, 'ঋষি বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়কে কে যেন একজোড়া জুতো পার্শেল করে লিখেছিলেন, 'জিনিসটা কেমন?'

তিনি উত্তর দেন, 'তোমার মুখের মতন!'

ফকির বললেন, 'না বাবা, তুলনাটা ঠিক হল না। তোমার মামু অহঙ্কারী লোক—শূন্যগর্ভ—মানে ফোঁফরা ঢেঁকি! বঙ্কিম-বাবাজী কি তাই? তাঁকে জুতো পাঠাবার স্পর্ধা দুনিয়াতে কারো ছিল কি? তবে 'বঙ্কিম' নাম না হয়ে যদি 'সরল' নাম হত তাহলে জুতো জোড়াটা পরতে পারতেন!

...তোমার মামুর মতো অনেক পীর আলি আছেন, যাঁরা বাঙলা দেশটাকে বখরা করে নিয়ে ভোগ করছেন, রস-রসিকতা বোধহীন। যাঁরা নিজেদের নামের আগে 'জনাব' পর্যন্তও লেখেন! তা লিখুন, নিজে না লিখলে অন্যে লিখবে কেন? তুমি তো 'সাহিত্য' করো, তুলনাটা যদি ভাল না দিতে পার, ভাষাটা যদি রপ্ত করতে না পার, তাহলে তোমার দ্বারা ভাল সৃষ্টি হবে না। তবে তোমার মামাকে লেখা উচিত ছিল, অধম শুয়োরের বাচ্চা হলে আপনি শুয়োরের শালা!'

'আপনি'......

'আমি নাকি ভাল লেখাপড়াই শিখে-ছিলাম ছোটবেলায়। আমাদের ৭০০ বিঘে সম্পত্তি ছিল। চোদ্দ জোড়া হাল লাঙল ছিল। বাবা ঘোড়ায় চড়ে সদর থেকে ফেরার পথে শত্রুদের দ্বারা তীরবিদ্ধ হয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে যান। টাকার লোভে শত্রুরা কাছে এলে তিনি অকস্মাৎ উঠে পড়ে তলোয়ার খুলে চারজন লোককে কেটে কুচিয়ে ফেলে ঘোড়া ছুটিয়ে রক্তমাখা শরীরে বাড়িতে এসেই পড়ে গিয়ে মারা যান' তারপর গ্রামে আগুন জ্বলে যায়। আমাদের পৈতৃক শরিকী বিবাদ ছিল এই জিঘাংসার মূলে। মামলা মোকদ্দমায় সব 'তনছো নন্‌ছো' হয়ে গেল। মা আমাকে নিয়ে মামার বাড়ি চলে গেলেন। আমি তখন নাকি এনট্রান্সে পড়ছি। তারপর মা হঠাৎ এক প্রণয়ীর গর্হিত প্রেমের পাপ হজম না করতে পেরে গায়ে আগুন ধরিয়ে পুড়ে মারা গেলে আমি নাকি পাগল হয়ে যাই। পাগলা গারদে অনেকদিন রাখার পর আবার ভাল হয়ে যাই। আমাকে ছেড়ে দিলে পথে পথে ঘুরে বেড়াই।'

'আচ্ছা আপনার মা'র নিকাহ্ হল না কেন?'

'শুনেছি নাকি সেটা অসামাজিক, অবৈধ প্রণয় ছিল।'

'কেমন?'

'থাক না, সে শুনে কি লাভ তোমার! ওসব দিয়ে মনকে কৃমির মতো ময়লা ঘাটতেই সাহায্য করে!'

ফকিরের পলাশ চোখের আগুনে বেশ একটা অন্ধকার ঊর্ধ্ববাহু অরণ্য পুড়তে পুড়তে ছাই হয়ে গেল।

তবু তিনি হাসলেন। বললেন, 'আমার রূপ ছিল, এক বড় চাষী তাঁর সুন্দরী কন্যা দান করে আমাকে ঘর-জামাই রাখেন। এই দুটি ছেলে আমারই। একবার ভীষণ ঝড় জল বন্যা হল মেদিনীপুরে। এরা তখন পাঁচ বছরের। ঘরদুয়ার সব ভেসে গেল। ওই যমজ বাচ্চা দুটোকে নিয়ে আমি একটা তেঁতুল গাছে উঠে প্রাণ বাঁচাই। বউকে গাছে তুলতে পারিনি। ছেলে দুটোকে গাছে রেখে আবার ঝাঁপ দিয়ে পড়ে ওদের মাকে উদ্ধার করবার জন্যে এগোতেই ওদের কি কান্না!
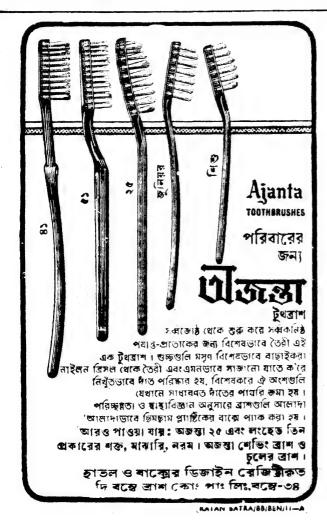
বাবা যদি আর না আসতে পারে! বন্যার তোড় ঠেলে বউকে টেনে আনছিলাম। সে অনেক পানি খেয়ে আউমাউ করতে লাগল। শাড়ি জড়াল কাঁটা গাছে। খুলে ফেলে দিয়ে তার চুলের গোছা দাঁতে কামড়ে সাঁতার কেটে কোনোক্রমে তেঁতুল গাছের গোড়ায় এলাম। ছেলে দুটো কাঁদছে। হেঁকে বলছি, সাবধান, ভয় নেই, আল্লাকে ডাক, হাত ছাড়িস না!'

হঠাৎ চিৎকার করে নাটকীয় স্বরে কথা বলাতে বাড়ির সবাই বোধহয় চমকে উঠল আমাদের।

'বউকে কিন্তু তুলতে পারলাম না। সে তখন অজ্ঞান হয়ে গেছে। ছেলেদের বাঁচাবার জন্যে তাকে আল্লার নামে ছেড়ে দিলাম। তার নগ্ন যৌবনভরা দেহটা চকিতে একবার আল্লা যেন আমাকে দেখিয়ে দিলেন।... তারপর ভীষণ বন্যার তোড়ে সে হারিয়ে গেল। গাছে উঠে বাচ্চাদুটোকে কাছে টেনে নিলাম। সারা রাত কাঁপুনি। ঝড় চলেছে। পরদিনও। তার পরদিন আকাশ কাটল। সমস্ত জলে ভেসেছে। গাছটাতে আরো অনেক লোক। সাপ জড়িয়ে আছে ডালে ডালে। ঘরের চাল, খড়, গরু, মোষ, ছাগল কত কি ভেসে চলেছে। ক্ষুধায় তেঁতুল পাতা চিবিয়ে খেয়েছি। ছেলে দুটোর প্রচণ্ড জ্বর উঠল। তারপর মানুষজনের সাহায্য এল, নৌকো এল। আমাদের সদরে নিয়ে গেল। ছেলে দুটো আর আমি বেঁচে গেলাম।'

'আপনি ভিক্ষাবৃত্তি নিলেন কেন?'

'মেদিনীপুরের অনেক লোকের এই পেশাই। অনেক চাষআবাদ আছে, অথচ যখন ধান রোয়ার কাজ শেষ হল, ফকিরী করে থেকে দু'পয়সা কামাবার জন্য ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমানে অনেকে ঝোলা কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ফের ধান কাটবার টাকা জোগাড় হলে আবার চলে এসে ক্ষেতে নামে।'

'আমি দেখেছি মেদিনীপুরের ফকিররা এখানে এসে কারো সদরে আশ্রয় নেয়। জনা চারেক করে, ভাই ভাই মিলে ভিক্ষে মেগে এনে সেই বাড়ির কোনো অনাথা মেয়েকে তাদের খোরাকীর মতো চাল রাঁধতে দিয়ে বাকীটা বাজার-দর থেকে কিছু কম দরে বিক্রি করে দেয়। একদিনে তারা দশ কিলো, পনেরো কিলো পর্যন্ত চাল পায়। এক টাকা ন' আনা কেজিতে পাড়ার গরিব-দের। তাদের কাছ থেকে চাল নিতে দেখেছি। যে মেয়েটা রান্না করে দেয় তাকে ওরা খোরাকী দিত। রাতে ফেরার পথে রোজই দেখতাম লম্ফের আলোয় একটা বুড়ো ফকির বসে বসে তার 'গেজে' বা 'তবিল' খুলে টাকা পয়সা গুণছে। অঘ্রাণ-পৌষ মাসে ধান কাটার সময় আসতে, সে যখন যাবে যাবে করছে, একদিন হঠাৎ তাকে বুক চাপড়ে কাঁদতে দেখলাম। কী ব্যাপার! বললে, বাবু খুন শালা মোর সব টাকা চুরি করে লেছে

"যদি বলি আল্লা আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন?"

রাত্তিরে 'সিঁদ' পড়ে যেতে।'

ফকির আলী হায়দার সাহেব হাসলেন। বললেন, 'ওটা পাট্টিবাজী! নাহলে ব্যবসা-দারী করে মোটা টাকা নিয়ে গেল কেউ ভাবতে পারে, পর বছর এলে লোক তাড়িয়ে দিতে পারে অথবা কোনো চোর ছ্যাঁচড়া খুন জখম করতে পারে তাই ওই মিথ্যা কান্না।'

'আপনার ঘরবাড়ি আছে?'

'করেছিলাম। তাও গত বন্যায় আবার ভেসে গেল! এখন পথে পথে, জেলায় জেলায় কাটছে। কি হবে সংসার করে? ঘর বাঁধার পর অনেকে বলেছিল আবার শাদী করবার কথা। নাউজো বিল্লাহ্। ঘরে সুখ নেই। ছেলে দুটোর মা এখনো আমার মধ্যে বেঁচে আছে। বন্যায় ভাসা তার শরীরটা এখনো মনে পড়ে।'

'আমি সাহিত্য করি জানলেন কি করে?'

'যদি বলি আল্লা আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন?'

'তাহলে ভাতের ভেতরে তরকারী দিয়ে আপনাকে বসিয়ে রাখার পর তরকারী না আসার জন্য খাচ্ছেন না জানালেই পীর-গীরি ঘুচিয়ে দিতাম! এক ফকির নাকি হঠাৎ ছি-ছি করে কুকুর তাড়াতে থাকে এক-জনের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে। কুকুর সেখানে কোথায়, শুধোলে সে বেটা বলে মক্কার মসজিদে কুকুর উঠছিল, আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি সব! তখন গৃহস্থ তার চালাকি বোঝার জন্য ভাতের মধ্যে তরকারী দেয়। বেটা মক্কার মসজিদে কুকুর উঠলে বাঙলা দেশ থেকে দেখতে পায় কিন্তু ভাতের ভেতরে তরকারি দিলে দেখতে পায় না? দে ঝাঁটার বাড়ি! আমি অলৌকিকতায় বিশ্বাস করি না। যাদের বুদ্ধি কম তারা কোনো ব্যাপার ভাল করে বুঝতে না পারলে কিংবা বোধশক্তি বা ক্ষমতার বাইরে কিছু ঘটতে দেখলে তাকে অলৌকিক বলে বিশ্বাস করে। যেমন প্রমত্তা পদ্মায় রবীন্দ্রনাথের নৌকো যখন ঝড়ের বেগে আর তরঙ্গের আঘাতে যায় যায় তখন নাকি হঠাৎ একজন কে একাই তীরবেগে পানশি বেয়ে চলে যেতে যেতে হেঁকে বলে যায়—'চলে যাও ভয় নেই!' রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, একে যদি কেউ অলৌকিক ব্যাপার বলতে চায় তবে বলুক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ভদ্রলোক, সুখে লালিতপালিত, মাল্লামাঝিদের জীবনের ভয়ঙ্করতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় যতখানিই থাক তা তাদের দুর্জয় সংগ্রামশীল জীবনের সঙ্গে একই সমতার বা ওজনের নয়। হজরত মোহম্মদও ঝড়কে ভীষণ ভয় পেতেন। প্রাণের দায় যখন তখন যে উদ্ধার করে তাকে অলৌকিকতার বিভূতিতে মণ্ডিত করে আমরা সুখ পাই। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'জীবনে আমি ওইরকম সাহসের বাণী আর

কাউকে উচ্চারণ করতে শুনিনি।' কেউ যদি একে অলৌকিক বলে সুখ পান আমার আপত্তি নেই। কারণ এতে আছে প্রেরণা, বীর্যবান চেতনা তবে আধ্যাত্মিকতার সাধারণ ব্যাখ্যায় বেশি ভক্তিরসের রঙ পড়লে আমার ব্যক্তিগত আপত্তি। কেননা 'জীবন তারই লক্ষ্য এবং ভোগ্য যে প্রতিদিন জয় করে এ দুটি।' যাহোক, নিজেকে মিথ্যে প্রচার করলে ফকির সাহেব আপনি আমার শ্রদ্ধা পাবেন না। আল্লার কিসের গরজ আমার পরিচয় আপনাকে দেবার জন্য?'

ফকির সাহেব হাসতে লাগলেন। বললেন, 'মাঝে মাঝে নাকি আমি পাগল হয়ে যাই। তখন সব ভুলে যাই। আবার ঠিক হয়ে যায়। লেখাপড়া যা শিখেছিলুম, তা ভুলে গেছি। তবে একটা গুণ আমাকে আল্লা দিয়েছেন। আমি লোক চিনতে পারি।'

'লোক চেনাই তো সব বিদ্যার শেষ বিদ্যা!'

'হ্যাঁ। পথে আসতে ছেলেরা বলছিল, অমুকে লোকদের বাড়ি যাবে? শুধোলাম, সে কি করে? তখন তারাই বলে দিলে। এই আমার আল্লায় বলা!'

দুজনেই হেসে উঠলাম।

ফকিরকে এর পর আবিষ্কার করলাম। তিনি বললেন, 'বাংলা দেশটাকে জানি বলে অহংকার করবে না। কেউই সম্যক জানে না। আচ্ছা, বলো তো বাছা, আমার ঝোলা থেকে কুড়িটা মাটির ঢেলা বার করে রাখছি—কোন্ জেলার কোন্ অঞ্চলের বলো তো দেখি।'

মাটিগুলো দেখলাম। কতক বলতে পারলাম, কতক বলতে পারলাম না। তিনি সব জানালেন: 'এটা ঘাটালের মাটি, এটা বর্ধমান জেলার কুলগাড়িয়া গ্রামের, এই মাটিটা হুগলী জেলার বালি-কুখাড়ি গ্রামের, এই মাটি হল বীরভূমের সিউড়ীর। নদীয়া, কৃষ্ণনগর, কালিংপঙ, এসব মাটির ঝোলা বয়ে বেড়াই আমি—পাগল নয়তো কি? এই ঝোলাতে আছে গাছপালার শেকড় আর পাতা। কত রকমের গাছপাতা, লতাগুল্ম, ঘাস, আগাছা পরগাছা আছে তার হদিস রাখি। এ আমার অভ্যাস। বড় বড় গাছের নাম অনেকেই জানে। লতা-গুল্ম বা ঘাস-আগাছার নাম সবাই জানে না। হাজার হাজার গাছ, জেলায় জেলায় নামের তফাত। কিছু নাম শোন: মুক্তোঝুরি, আপাং, পাতাল গুলগুলি, চাঁপ পটপটি, পাতাল ভৈরবি, কোকশিমা, মণিরাজ, মাথা ওকড়া, তেলাকুচো, ছাগলভাঁটি, দোয়েল, আড়জালি, ঘৃতকুমারী, গোদানী, মাড়ামারা, থানকুনি, পানকৌটি, ভেরাণ্ডা, জীবদণ্ড, গোদানি, আদা বিড়াল, বিলঝাঁন, কালমেঘ, চিরতা, জোঁকার পাতা, ধুতোরা, হাড়ভাঙ্গা, বনতুলসী, ইনচিরি, পাথরকুচি, মিছরিকুদো, রাঙচিতা, বন-চাঁড়াল, ঘি-চাঁড়াল, বনবেগুন, কন্টিকারী, চোকলমি, বসন্ত বিহার, শ্বেত বেড়াল, স্বর্ণ খিরুই, ঘোড়া খিরুই, আয়াপান, নিসিন্দা, বাড়িগোপাল, পানিশউলি, আকন্দ, টিকচোনা, নাকদানা, ঘারফুলি, ভেটকোল, ঘন্টানবোড়া, ওলট কম্বল, তেল-সমুদ্র, হরকোচ, তেকাটাল, বাঁইচি, সোনাকাটি, সোয়াকুল, কুকুরছাড়ি, গিড়িম, গোলঞ্চ, বামনআটি, হাতীশুঁড়, দইখই, নিমুখী, বাটনালি, বেনে বউ, বন কেওড়া, সেপুনো, চিগুনি, হিঞ্চে, কুলপো, জালকেটে, সোকরাতে, সুসনি, বিছুটি, কুনকো, ভৃঙ্গরাজ, কেশুত, কুঁচ, কানাচিঁড়ে, ফুলকো, চেঁচকো—কত আর নাম বলব? যে-সব নাম বললাম, এসব গাছ কি চেনো বাবা?'

'চিনি। আরো অনেক জানি। কয়েকটা গাছের নাম এ অঞ্চলের কোনো প্রবীণ লোকও বলতে পারে না। আপনাকে দেখাব আমি। তবে আপনি যেমন বললেন, মিছরিকুঁদো, বসন্ত বিহার, শ্বেত বেড়াল—এ তিনটি নামই কিন্তু একটা গাছের। এর শিকড় পান দিয়ে চিবিয়ে খেলে শ্বেত-প্রদর ভাল হয়। কুঁচের শিকড় হল জৈষ্ঠ্য মধু। আফলা শিমুলের মূল হল মেহরোগের ওষুধ। পৃথিবীর সব গাছই ওষুধ। আমরা জানি না কোনটা কোন কাজে লাগে। কোনোটা আবার তীব্র বিষ। যেমন গেঁয়ো গাছের আঠা, কুঁচলে ছাল, কুঁচ, পটল মূল, কোলকে ফল, ধুতরো দানা, বাজবরণের আঠা, ভেরাণ্ডা বিচি। মানুষ জনের চাইতে আমি বোধ হয় আমাদের অঞ্চলের মাটি এবং গাছ-পালাকেই বেশি চিনি। আর পশুপাখি, জীবজন্তু, পোকা-মাকড়, মাছ সাপের খবর আমার নিজের রক্ত-মাংসের মতো জানা।'......

মেয়েদের খাওয়া-দাওয়ার পর ফকির সাহেব বয়েৎ গাইতে শুরু করলেন। পয়ার ছন্দের পুঁথির ছড়া। সাপ খেলানো সুর। প্রেমের উপাখ্যান না ধর্মীয় কাহিনী তার মূল বস্তু। শুনতে চমৎকার লাগে। মুলত বাংলা সাহিত্যের বিশাল মহাকাব্য 'কাসাসল আম্বিয়া'র কাহিনীর খণ্ড, বিচ্ছিন্ন অংশ তিনি সুর করে গাইছিলেন। তাঁর গান শুনতে শুনতে রাত পার হয়ে গেল।

'কাসাসল আম্বিয়া' এবং 'শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত'—এই দুটি মাত্র মহাকাব্য বাঙালীর।' ফকির সাহেব বললেন। 'রামায়ণ, মহাভারত মহাকাব্য বটে, কিন্তু মূলত এ দুটি সংস্কৃতের। 'কাসাসল আম্বিয়া' এখনো অনেকের ঘরে আছে। কোনো মুসলিম সংস্থা এটিকে রক্ষা করতে এগুচ্ছে না অনেক খরচ বলে, কেননা এটি মহাভারতের চাইতে বড় বই। বহু নবীদের কাহিনী এতে আছে। মানুষ মনুষ্যত্বের মহত্ত্বের অনুসরণ অনুকরণ ছেড়ে দিয়ে ক্ষুদ্রের এবং ক্ষণসুখের লালসায় বৃহৎ মহৎকে ভুলে গেছে—একালে এ বড় অভিশাপ। জেনে রাখো বাছা, মহৎ না হলে মহৎ চরিত্র সৃষ্টি সম্ভব নয়।'

মেদিনীপুরের ফকির সকালে উঠে নামাজ পড়ার পর গাছপালা দেখিয়ে এসে নাশতাপানি খেয়ে ছেলে দুটির হাত ধরে পথে পথে আবার কোথায় যে কত দূরে চলে গেলেন, আজ তা আমি জানি না। ছেলে দুটি নাকি তাঁর বন্ধন। দুটি চোখ যদি তাঁর অন্ধ হয়ে যায় কোনোদিন, ছেলে দুটি তাঁর চোখ হয়ে জ্বলতে থাকবে। তাদের বাসা নেই, ডেরা নেই, তবু ঘরে ঘরে পথে পথেই বেঁচে থাকবে। জিয়া হায়দার মারা গেলে তারা ঘর বাঁধে তো বাঁধবে কোথাও।

সেই মানিকজোড়কে কোথায় কোন জেলায় বাসা বেঁধে দিয়ে যাবেন, তা নাকি মনস্থির করতে পারছেন না ফকির সাহেব। বন্যার আতঙ্ক তাঁর আজো কাটেনি, কাটেনি মায়ের পুড়ে মরার অগ্নিময় দৃশ্যের বিভীষিকা। ভাবতে গেলেই নাকি মনে পড়ে বাবার খুন হয়ে খুন করে মরা আর গোটা গ্রামে আগুন জ্বলার দৃশ্য। তিনি পাগল হয়ে যান।

তিনি যাবার সময় তাঁর গলার বহু বিচিত্র রঙবেরঙের পাথরের একটি মালা আমার হাতে দিয়ে গেলেন আশীর্বাদ-স্বরূপ। বলে গেলেন, 'যদি কোনোদিন ভীত, অহংকারী, ঈর্ষাপরায়ণ, লোভাতুর, লালসাপরায়ণ হয়ে পড়ো, তবে এই পাথরের মালাটা মুঠোয় চেপে সংসার-বিবাগী জিয়া হায়দারকে স্মরণ করো বাবা—শান্তি পাবে।'

আমি তাঁর কথা রাখতে পারিনি। মালাটি মেদিনীপুরের আর-একজন ফকিরকে দিয়ে দিয়েছি।

কেননা, আমি একজন সাধারণ মানুষ। ষড়রিপুর আন্দোলনে সংসারে থেকেই সকল সংসারের মানুষের মনে আমাকে সাড়া দিতে হবে। আমার চাইতে দরবেশ ফকিরের মালাটির প্রয়োজন বেশি।

—আবদুল জব্বার

পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রীম মাখুন
—আপনার মুখশ্রী এমনি মসৃণ,
কমনীয় ও তারুণ্যমণ্ডিত হয়ে উঠবে
POND'S
VANISHING CREAM
পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রীম
—নিখুঁত পাউডার বেস

টেকটাইটস

বছর চারেক আগে বিলি পি গ্লাস এবং ব্রুস সি হিজেন নামে দুজন সমুদ্র-ভূবিজ্ঞানী ভারত মহাসাগর এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের অতল গর্ভে অনুসন্ধান চালিয়ে কাচের মত কতকগুলি বস্তুকণা সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন। বিভিন্ন বর্ণ, গঠন এবং আকৃতির এই কাচ-পাথরের অজস্র কণা ঐ দুটি মহাসাগরের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে আছে প্রাচীন সামুদ্রিক প্রাণী, উদ্ভিদের দেহাবশেষ বা ভস্মস্তূপের সঙ্গে। এরও আগে অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর স্থলভাগের কোন কোন জায়গায় অনুরূপ পাথরের সন্ধান পাওয়া যায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এদের মূল উপাদান সম্পর্কে মোটামুটি কথা জানা সম্ভব গেছে। শুধু, জটিল রহস্য, তা হল, কেন এবং কিভাবে এরা তৈরি হয়েছিল সে কথার সঠিক ব্যাখ্যা আজও কেউ দিতে পারেননি। গ্রীক ভাষায় 'টেকটোস' কথাটির অর্থ 'গলিত'। ঐ সমস্ত কাচ-পাথর এক দিন যে গলিত অবস্থায় ছিল তার কিছু কিছু প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে। তাই এদের নাম রাখা হয়েছে টেকটাইটস। বিগত দু' শ বছরের বেশী সময় ধরে এই বিচিত্র বস্তুকণা নিয়ে বিজ্ঞানী এবং কল্পকাহিনীকারদের মধ্যে হাজারো জল্পনার জাল বিস্তৃত হয়েছে। কেউ মনে করেছেন, পৃথিবীর ভূ-তাত্ত্বিক আদিযুগে অগ্ন্যুৎপাতের ফলেই এরা সৃষ্ট হয়েছিল। অন্যদের ধারণা, সম্ভবত অলৌকিক কোন প্রভাবে মহাকাশ থেকেই বৃষ্টি বিন্দুর মত এরা একদিন পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়েছিল। কারুর ধারণা, চাঁদ বা অনুরূপ কোন উপগ্রহ বা গ্রহই এদের উৎপত্তিস্থল। অদ্ভুত ব্যাপার, অ্যাপোলো-১১-র অভিযাত্রীরাও চাঁদের বুকে এই ধরনের কাচ-পাথরের সন্ধান পান। তাঁরা সেখান থেকে কিছুটা নমুনা সংগ্রহ করে আনেন এবং তার উপর পর্যবেক্ষণ চালান হয়। কিন্তু চাঁদের দেশেও কিভাবে তারা এল, এখনও পর্যন্ত সে রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয়নি।

জুন ৩০, ১৯০৮। ঐ দিন সকাল সাতটার কিছু পরে আকাশ থেকে একটি দৈত্যাকার আগুনের পিণ্ড ঝাঁপিয়ে পড়ল

ডঃ বিলি পি গ্লাস ভারত মহাসাগরের গর্ভ থেকে অত্যন্ত ছোট আকারের এই টেকটাইটস সংগ্রহ করেন। ছবিতে এক শ' গুণ বড় করে দেখান হয়েছে

সাইবেরিয়ার টুনগুসকা উপত্যকার গভীর জঙ্গলের উপর। প্রথমে প্রচণ্ড আগুনের ঝলসানি। তারপর মুহূর্তেই বিস্ফোরণ। এই বিস্ফোরণ প্রায় পঁচিশ মাইল ব্যাস বিশিষ্ট একটি অঞ্চলের সমস্ত গাছপালা যেন উপড়ে ফেলে জায়গাটিকে একেবারে মরুভূমিতে পরিণত করে দেয়। এই দৃশ্যের একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী দুটি যাযাবর পরিবার। পুরোপুরি বিধ্বংস অঞ্চলের সামান্য দূরে তাঁবুর মধ্যে তারা তখন ঘুমিয়ে ছিল। প্রচণ্ড শব্দ তাদের তাঁবু উৎপাটিত করে এবং ওরা নিজেরা বধির হয়ে যায়। ওদের সঙ্গে যে সমস্ত বল্গা হরিণ ছিল তারাও ভয় পেয়ে কেউ মারা যায়, কেউ ছুটে পালিয়ে যায়। প্রায় আড়াই শ' মাইল দূর থেকে ঐ বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছিল। তার কাঁপুনি ধরা পড়েছিল পৃথিবীর সর্বত্র বায়ুচাপমান যন্ত্রে এবং ভূ-কম্পনজ্ঞাপক যন্ত্রে। বিস্ফোরণের পর বেশ কয়েক দিন সারা ইউরোপ এবং এশিয়ার উত্তরাঞ্চলের আকাশ এক প্রস্থ হালকা রূপালী মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করেছিলেন, হয়ত বিরাট কোন একটি উল্কার পতনই ঐ বিস্ফোরণের কারণ। কিন্তু জায়গাটিকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেও উল্কা অথবা উল্কার আঘাতের দরুন কোন গর্ত—এর কোনটিরই চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়নি। যা পাওয়া গিয়েছিল তা হল, অত্যন্ত ছোট ছোট কাচের মত কণিকা। চারপাশে সেই কণিকা ছড়িয়ে ছিল। রুশ এবং মার্কিন বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেন, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্যে হঠাৎ কোন একটি ধূমকেতু প্রবেশ করে ঠিকরে পড়ে কঠিন মাটির বুকে। আর

তারই ফল ঐ বিস্ফোরণ। সেখানে যে সমস্ত কাচ-কণা পাওয়া গেছে হয়ত সেগুলি ঐ ধূমকেতুরই মূল বস্তুকেন্দ্র বা নিউক্লিয়াসের ভগ্নাবশেষ। কেউ কেউ এ কথাও বলেছেন, অ্যানটি-ম্যাটার বা প্রতি-বস্তু দিয়ে তৈরি কোন উল্কার সঙ্গে পার্থিব বস্তুর আঘাতের ফলেও এমনটি ঘটে থাকতে

পারে। এ সমস্ত ধারণার সপক্ষে আজও পর্যন্ত কোন সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে প্রায় সকলেরই ধারণা, মহাজাগতিক কোন বস্তুর আঘাতেই ঐ বিস্ফোরণটি ঘটেছিল এবং তার চারপাশে ছড়িয়ে থাকা কাচ-কণার সৃষ্টির মূলেও ঐ বস্তু।

অতএব প্রশ্ন : সাইবেরিয়ার ঐ কাচ-কণা, ভারত এবং প্রশান্ত মহাসাগরের গর্ভ থেকে সংগৃহীত কাচ পাথর বা অ্যাপলো-১১-র অভিযাত্রীরা যে কাচের ধুলোর নমুনা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন, তারা সকলেই কি সমগোত্রীয়? শুধু জ্যোতির্বিজ্ঞানী নয়, ভূ-তত্ত্ববিদ, রসায়নবিদ থেকে শুরু করে যাঁরা গতিবিদ্যার উপর অনুসন্ধান চালিয়ে থাকেন তাঁরাও এই কাচ পাথর বা টেকটাইটস নিয়ে আজ মাথা ঘামাচ্ছেন। সঠিক সিদ্ধান্তে কেউই পৌঁছতে পারেননি।

প্রশ্ন : পৃথিবীর কয়েকটি বিশেষ অঞ্চল ছাড়া অন্যত্রই বা এই বস্তুটি পাওয়া যায়নি কেন? বিলি এবং হিজেন অস্ট্রেলিয়ার উপকূল থেকে শুরু করে দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত মহাসাগরীয় অঞ্চলে একটানা এদের ছড়িয়ে থাকতে দেখেছেন। এ ছাড়াও মোটামুটি

আরও চারটি অঞ্চলে এদের পাওয়া যায়, এবং প্রাপ্তিস্থানের নাম অনুসারে এদের ভিন্ন ভিন্ন নামকরণও হয়েছে। **এক,** মলডেভাইটস। বিশেষ ধরনের এই টেকটাইটস-এর কথা প্রথম জানা যায় ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে। জোসেফ মেয়ার নামে জনৈক বিজ্ঞানী এদের আবিষ্কার করেন পশ্চিম চেকোস্লোভাকিয়ার মলদাউ নদীর উপত্যকায়। **দুই,** অস্ট্রেলাইটস। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের কাছ থেকে এই নতুন ধরনের কাচ-পাথর সংগ্রহ করেন চার্লস ডারউইন। পরবর্তীকালে অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণাঞ্চল, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটি অঞ্চল সহ ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপিনস-এর ব্যাপক অঞ্চলে এদের পাওয়া গেছে। **তিন,** আইভরি কোস্ট-এর টেকটাইট। পরিমাণে এই কাচ-পাথর খুবই নগণ্য। প্রথম এদের আবিষ্কার করেন লাক্রোইক্স ১৯৩৫-এ। **চার,** উত্তর আমেরিকার টেকসাস, জর্জিয়া প্রভৃতি অঞ্চল থেকে পাওয়া টেকটাইটস।

চেকোস্লোভাকিয়া থেকে যে সমস্ত টেকটাইট পাওয়া গেছে তাদের বেশির ভাগই ঈষৎ স্বচ্ছ। গাঢ় অথবা হাল্কা সবুজ রং। ওপরটা দেখলে মনে হয় কে যেন তাদের গায়ে খানিকটা কারুকার্য করে দিয়েছে। জর্জিয়ার কাচ পাথরও কতকটা এই রকমই দেখতে। এ ছাড়া অন্যত্র যে সমস্ত টেকটাইট পাওয়া গেছে তাদের রং মসীকৃষ্ণ। পাশ বরাবর থেকে দেখলে মনে হয়, অদ্ভুত আলাদা ধরনের যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে এদের মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সভ্য জগতের কাছে এই কাচ পাথরের অস্তিত্ব হয়ত স্বল্প দিনের ইতিহাস। তবে অস্ট্রেলিয়া এবং আইভরি কোস্ট-এর আদিবাসীরা প্রাচীনকাল থেকেই এদের সন্ধান রেখেছিল। অদ্ভুত দর্শন পাথরগুলি তাদের কাছে অলৌকিক শক্তির উৎস বলে দীর্ঘকাল ধরে পূজো পেয়ে এসেছে। তারা মনে করত এই পাথর তাদের রোগ, শোক এবং পার্থিব বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে।

বিজ্ঞানীরা এই কাচ পাথর নিয়ে আপাতত দুটি কথা ভাবছেন। এক, পৃথিবীতে কতকগুলি নির্দিষ্ট অঞ্চল ছাড়া কেন এদের অন্যত্র পাওয়া যায়নি? দুই, এদের অদ্ভুত গঠন বৈচিত্র্য। আগ্নেয় শিলার মধ্যে যে ধরনের কাচ পাওয়া যায় অথবা পৃথিবীর বুকে প্রচণ্ড বেগে আঘাত হানার পর উল্কাপিণ্ড গলে গিয়ে যে কাচ জাতীয় পদার্থ সৃষ্টি করে তার সঙ্গে টেকটাইট-এর মিল খুবই কম। এদের মধ্যে যেন একটি স্বকীয় ভৌতিক এবং রাসায়নিক ধর্ম ফুটে উঠেছে যা আর কোন প্রকারে পাওয়া কাচ-পাথরের মধ্যে দেখা যায়নি। সাধারণ কাচের থেকে এরা বেশী ভারী। এদের মধ্যে

এই টেকটাইটগুলির কোনটাই এক মিলিমিটারের চেয়ে বড় নয়। ডান দিকে দুটি ডামবেল, দুটি অশ্রুবিন্দুবৎ, বাঁ দিকে পাঁচটি গোলাকৃতি টেকটাইটস

সিলিকার পরিমাণ শতকরা ৬৮ থেকে ৮২ ভাগ। অবশিষ্টের অর্ধেক অ্যালুমিনা। তা ছাড়া ম্যাগনেসিয়াম এবং লোহার অকসাইডের মাত্রাও অনেক বেশী এবং জলের পরিমাণ অস্বাভাবিক রকমের কম।

বেশীর ভাগ টেকটাইট-এর বাইরের গঠন দেখে মনে হয়েছে, পৃথিবীর বায়ুস্তর ভেদ করে এক সময়ে এরা ছুটে এসেছিল। প্রচণ্ড বেগে অগ্রসর হওয়ার সময় বাতাসের ঘর্ষণ তাদের সামনের দিকটাকে গলিয়ে বাষ্পে পরিণত করে। এর দরুণ খানিকটা অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যেটুকু বস্তু অবশেষ থাকে তার সামনের দিকটা সূঁচলো হয়ে ওঠে। পেছনের অংশ এলোপাথাড়ি বিক্ষিপ্ত হয়। পরে দীর্ঘকাল পৃথিবীর পিঠে থাকায় সময়ও বাতাস, জলপ্রবাহ বা ধূলোবালির ঘর্ষণে খানিকটা অংশ ক্ষয়ে যায়। অবশেষে বিভিন্নভাবে অবক্ষয়ের পর শেষ পর্যন্ত তাদের কারুর চেহারা গিয়ে দাঁড়ায় বোতামের মত, লেন্স, ডামবেল অথবা নৌকোর মত। কোন কোন টেকটাইটকে দেখলে মনে হয় কে যেন এক বিন্দু অশ্রুকণাকে হঠাৎ জমিয়ে পাথরের মত কঠিন করে তুলেছে। আয়তনে বেশীর ভাগ টেকটাইটই খুব ছোট। গড় ওজন কয়েক গ্রাম মাত্র। কিছু কিছু বৃহৎ আয়তনের টেকটাইটও পাওয়া গেছে। বৃহত্তমটির ওজন ৩·২ কিলোগ্রাম। এ পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজারটি টেকটাইট সংগ্রহ করা হয়েছে। অব এদের মধ্যে
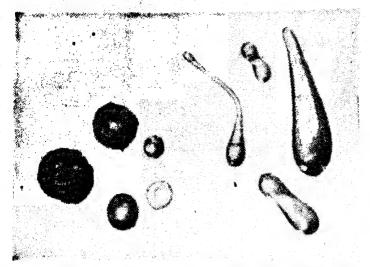
৩৫ থেকে ১০০ মিলিমিটার লম্বা এই টেকটাইটগুলি সুদূর পূর্বাঞ্চলের স্থলভূমিতে পাওয়া গেছে

পঞ্চাশ হাজারের একমাত্র সংগ্রাহক ম্যানিলার এইচ ও বেয়ার। তবে সংখ্যার দিক দিয়ে হিসেব করলে আইভরি কোস্ট-এর টেকটাইটের সংখ্যাই সবচাইতে কম দাঁড়াবে। প্রায় তিন শ'র মত।

সম্প্রতি টেকটাইটের বয়েস সম্পর্কে কিছু কিছু গবেষণার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞরা অস্ট্রেলাইটের উপরই নির্ভর করেছেন সবচাইতে বেশি। কারণ এ ধরনের টেকটাইটের মধ্যে নৈসর্গিক প্রভাব খুব একটা বিকৃতি ঘটাতে পারেনি। যে সমস্ত ভূ-স্তরের মধ্যে এদের পাওয়া গেছে তাদের আনুমানিক বয়সের কথা বিবেচনা করে মেলবোর্ন-এর জর্জ বেকার এবং স্মিথসোনিয়ান ইনসটিটিউসনের ব্রেইন ম্যাসন মন্তব্য করেছেন, অস্ট্রেলাইটের বয়েস প্রায় দশ হাজার বছরের মত হতে পারে। তবে পদার্থ এবং রসায়ন বিজ্ঞানীরা তেজস্ক্রীয় পদ্ধতিতে পরীক্ষা চালিয়ে লক্ষ করেছেন, এই বয়েস সাত লক্ষ বছরের কম হতে পারে না। পরে জেনারেল ইলেকট্রিক রিসার্চ সংস্থার আর এল ফ্লিশার তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে গবেষণা চালিয়ে ঐ একই মতামত পোষণ করেছেন। বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ কে ভি এটিমজার, সি ক্লেন্তোদেলিদে, ডি এ হ্যানকক এবং ডঃ সৈয়দ দুরানী মিলিতভাবে বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগৃহীত টেকটাইটের উপর পর্যবেক্ষণ চালিয়ে প্রমাণ করেছেন, ফরমোসা এবং ফিলিপিন অঞ্চলের টেকটাইটের বয়েস ছয় থেকে সাত লক্ষ বছরের মত। অস্ট্রেলাইটের বয়েস সাত লক্ষ বছর, চেকোস্লোভাকিয়া, টেকসাস এবং আইভরি কোস্টের টেকটাইটস-এর বয়েস যথাক্রমে এক কোটি চোদ্দ লক্ষ, তিন কোটি চৌত্রিশ লক্ষ এবং দশ লক্ষ বছর।

অতএব শেষ প্রশ্ন : লক্ষ লক্ষ বছরের পুরনো এই বস্তুকণাগুলি উৎপত্তির কারণই বা কি? এ নিয়েও এ পর্যন্ত নানা রকমের মতবাদের ঝড় বয়ে গেছে। তবু তারই মধ্যে দুটি মতবাদ দীর্ঘকাল ধরে মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছিল। এর একটিতে বলা হয়, অনিবার্য কোন কারণ বশত প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ডের ফলে পাথর বা বালিকণা গলে গিয়ে টেকটাইটগুলি তৈরি হয়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত এই মতবাদটি ধোপে টেকেনি। এটিকে যাঁরা নাকচ করে দেন, তাঁদের বক্তব্য, অগ্নিকাণ্ডের ফলেই যদি তারা সৃষ্ট হয়ে থাকে, তাহলে সমুদ্র গর্ভে তাদের পাওয়া গেল কি করে? নিশ্চয় জলের

মধ্যে কোন আগুন জ্বলতে পারে না?

দ্বিতীয় মতবাদে বলা হয়, মস্ত বড় আয়তনের কোন উল্কা পিণ্ড অথবা ধূমকেতুও টেকটাইট তৈরি করতে পারে।

উল্কার কথা প্রস্তাব করেছিলেন ব্রিটিশ মিউজিয়ামের এল কে স্পেনসার। তাঁর মতে অতিকায় কোন উল্কা যখন বায়ুস্তরের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসতে থাকে, বাতাসের ঘর্ষণে তখন তার কিছু অংশ বিগলিত হয়ে যায় এবং সেই গলিত দেহাবশেষ বিন্দু বিন্দু বৃষ্টির মত অথবা ছোট বড় বিভিন্ন কণিকার আকার নিয়ে পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ে। সেই সব গলিত কণিকারাই শেষ পর্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে টেকটাইটে পরিণত হয়ে গেছে। কিন্তু এ মতবাদও শেষ পর্যন্ত নাকচ হয়ে গেছে। এক, যে সমস্ত বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে টেকটাইটদের পাওয়া গেছে আকাশ পথে ততটা দূরত্ব ভ্রমণ করতে গিয়ে উল্কার কোন বিগলিত কণিকার পক্ষেই গলিত অবস্থায় থাকা সম্ভব নয়। তাদের বাষ্প হয়ে যাওয়ার কথা। দুই, এমনও হতে পারে, উল্কার আঘাতে স্থানীয় কোন পাহাড় চূর্ণ হয়ে গলে গিয়েছিল এবং সেই গলিত পাথরই অবশেষে তৈরি করে দেয় টেকটাইটস। সে ক্ষেত্রে যেখানে টেকটাইটস পাওয়া গেছে তার আশপাশে মূল পাহাড়ের কিছু অংশ অবশিষ্ট হিসেবে থেকে যাওয়ার কথা, যার মৌলিক উপাদান ঐ টেকটাইট এর অনুরূপ। অন্তত সেই উল্কার কিছু অংশ তো অবশ্যই সেখানে পড়ে থাকবে। কিন্তু এসবের কোন কিছুই সেখানে পাওয়া যায়নি।

অবশেষে এক জটিল মতবাদের প্রস্তাব করে বসলেন প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী উউরে। তিনি বললেন, এসব আসলে ধূমকেতুর কাজ। জ্বলন্ত ধূমকেতুর প্রায় সবটাই তো গ্যাস বা বাষ্প। পৃথিবীর আকর্ষণের মধ্যে যদি কোন ধূমকেতু এসে পড়েছিল। পরে সেই গ্যাসই ঘনীভূত হয়ে ছোট বড় টেকটাইটস তৈরি করে থাকবে। এবং যেহেতু ধূমকেতু কোন কঠিন বস্তু নয়, অতএব তার আঘাত পৃথিবীর বুকে কোন গভীর খাদ তৈরি করতেও পারেনি। কিন্তু আরও কিছু জ্বলন্ত প্রশ্ন থেকে গেছে, যাতে করে উউরের এই মতবাদও কেমন যেন সপ্রশ্ন হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে অ্যাপোলো-১১-র অভিযাত্রীদের আনা সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাচ-পাথরের উপর পরীক্ষা চালিয়ে 'নাসা'র গবেষকরা মন্তব্য করেছেন, ঐ পাথরগুলির সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার কাছাকাছি সমুদ্র গর্ভ থেকে সংগৃহীত টেকটাইটদের যথেষ্ট মিল রয়েছে। অতএব আবারও প্রশ্ন : তাহলে যে কারণে পৃথিবীর বুকে ঐ কাচ-পাথরগুলি একদিন সৃষ্ট হয়েছিল, সেই একই কারণে চাঁদের বুকেও কি তারা জন্মলাভ করে? অবশ্য চাঁদ থেকে আনা কাচ-পাথরগুলির আয়তন খুবই ছোট, এক মিলিমিটারের চেয়েও ছোট।

ইতিমধ্যে আরও একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে। বলা হয়েছে, পৃথিবীর চুম্বক মেরু নাকি চিরন্তনভাবে একই রকম থাকে না। সৃষ্টির পর বেশ কয়েকবার তারা পরিবর্তিত হয়েছে। মাঝে মাঝে উত্তর মেরু পরিবর্তিত হয়ে গেছে দক্ষিণ মেরুতে—দক্ষিণ মেরু লাভ করেছে উত্তর মেরুর চরিত্র। সময়ের হিসেবে এই 'মাঝে মাঝে'র ব্যবধান হয়ত কয়েক লক্ষ বৎসর। তবু পৃথিবীর জন্ম-ইতিহাসে বার বার এই চৌম্বক মেরুর পরিবর্তন ঘটেছে। মাত্র বছর চারেক হল বিজ্ঞানীরা ভূত্বকের বহু নীচে অবস্থানরত জীবাশ্মের মধ্যেকার চুম্বক-কণা নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ শুরু করে দিয়েছেন। সমুদ্র গর্ভের কিছু কিছু জীবাশ্ম পরীক্ষা করে স্ক্রিপস ইনস্টিটিউসনের সমুদ্র বিজ্ঞানী ব্রেইন ফানেল এবং ক্রিস্টোফার হ্যারিসন জানিয়েছেন, শেষবারের মত পৃথিবীর ভূ-চুম্বকের মেরুর পরিবর্তন ঘটেছিল আজ থেকে প্রায় সাত লক্ষ বছর আগে। আর সবচাইতে বিস্ময়ের ব্যাপার, অস্ট্রেলিয়ার দূরবর্তী অঞ্চলে ভারত এবং প্রশান্ত মহাসাগরে যে সমস্ত টেকটাইট পাওয়া গেছে তাদেরও অধিকাংশের বয়েস প্রায় সাত লক্ষ বছর। আর যে সমস্ত জীবাশ্মের মধ্যে ঐ টেকটাইটদের পাওয়া যায় তাদের মধ্যে কিছু কিছু চৌম্বক পদার্থও পাওয়া গেছে যাদের পরীক্ষা করে বোঝা যায় ঐ সময়ে পৃথিবী তার চুম্বক মেরু দুটিকে পাল্টে নেয়। অর্থাৎ আগে তার যেটি ছিল উত্তর মেরু, তখন থেকে সেটা হয়ে পড়ে দক্ষিণ মেরু, আর দক্ষিণ হয়ে যায় উত্তরে।

রুশ ভূবিজ্ঞানীরা পৃথিবীতে কোন কোন সময়ে চৌম্বক মেরুর পরিবর্তন ঘটে, তার মোটামুটি একটা হিসেবও তৈরি করে ফেলেছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার ঐ ঐ সময়ে জন্মলাভ করেছিল এমন টেকটাইটদেরও পাওয়া গেছে।

অতএব আবারও প্রশ্ন : তাহলে টেকটাইট তৈরির সঙ্গে কি পৃথিবীর ভূ-চুম্বক মেরুর দিক পরিবর্তনের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে? অন্তত আজ থেকে সাত লক্ষ বছর আগে শেষবারের মত যে পরিবর্তনটি হয়ে গেল, তার কী কারণ হতে পারে? সেদিন কি কোন ধূমকেতু, দৈত্যাকার কোন উল্কা, ভিন্ন কক্ষে পরিক্রমণ রত কোন গ্রহ অথবা চাঁদেরই কোন অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথিবীর বুকে ঠিকরে এসে আঘাত করেছিল, যার ফলে মুহূর্তে পৃথিবীর উত্তর চৌম্বক মেরু পেয়ে গেল দক্ষিণ মেরুর ধর্ম এবং দক্ষিণ চুম্বক মেরু পেয়ে গেল উত্তর মেরুর ধর্ম? বিশেষজ্ঞদের ধারণা, পৃথিবীর বুকে বহির্জাগতিক কোন জায়গা থেকে আসা বিরাট কোন ভারী বস্তুর প্রচণ্ড আঘাতের ফলেই এটি হওয়া সম্ভব। এবং যেহেতু, টেকটাইটের জন্মকালের সঙ্গে ভূ-চুম্বক মেরুর পরিবর্তনের একটা সম্পর্ক পাওয়া যাচ্ছে, সম্ভবত কোন বহির্জাগতিক বস্তু থেকেই টেকটাইটরা জন্ম লাভ করে থাকবে।

তবু এ সমস্ত হিসেব-নিকেশ সত্যিকারের প্রমাণ এখনও খাড়া করতে পারেনি। ভূ-চুম্বক মেরুর দিক পরিবর্তনের যথাযথ কারণ আজও প্রশ্নাতীত নয়। টেকটাইটসের জন্ম-ইতিহাসের অবস্থাও তাই। ভবিষ্যতের ভূ-পদার্থ বিজ্ঞানীরা এ সম্পর্কে হয়ত আরও নতুন তথ্য যোগাতে সমর্থ হবেন। কিভাবে টেকটাইটদের জন্ম হয়েছিল, ভূ-চুম্বক পরিবর্তনের সঙ্গে আদৌ এর কোন সম্পর্ক আছে কিনা, একমাত্র তখনই তা জানা সম্ভব হবে।

সংশোধন :

শনিবার, ১৬ ফাল্গুন, ১৩৭৬ তারিখে প্রকাশিত 'বিশ্ববিজ্ঞান' পর্যায়ে 'বৃহস্পতির রক্ত কলঙ্ক' প্রবন্ধে "(বৃহস্পতি) 'প্রতি এগার দশমিক আট মাসে একবার করে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে' ছাপা হয়েছে। হবে এগার দশমিক আট বছরে। আর পৃথিবীর নিকটতম স্থানে এলে গ্রহটি উজ্জ্বলতায় **'লুব্ধক নক্ষত্রের মত'** হবে না, হবে **লুব্ধক নক্ষত্রের প্রায় দ্বিগুণ।** 'At opposition, when both planets are in the line with the sun on the same side of it, Jupiter is twice as bright as Sirius . . . Ref. Jupiter's Great Red spot : by Raymond Hide.

সমরজিৎ কর

মডার্ন ব্রেড কোলকাতায় এসে গেল

মডার্ন ব্রেড ইতিমধ্যেই হাজার হাজার লোকের কাছে বিপুল সমাদর লাভ করেছে বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ, আমেদাবাদ, কোচিন, হায়দ্রাবাদ, কানপুর আর ব্যাঙ্গালোরে। এবার···কোলকাতার লোকেরাও ভারতের সবচেয়ে পুষ্টিকর এই রুটি উপভোগ করতে পারবেন।

মডার্ন ব্রেড প্রোটিনে ভরপুর।

মডার্ন ব্রেডকে আরও পুষ্টিকর ক'রে তুলেছে ভিটামিন "এ"। একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের রোজ যতটা ভিটামিন-এ দরকার ৮০০ গ্রামের সুস্বাদু একটি রুটিতে তা'র পুরোটাই দেওয়া আছে। উজ্জ্বল চোখ ও সবল দৃষ্টিশক্তির জন্য এই ভিটামিন-এ একান্ত দরকার। এছাড়া, মডার্ন ব্রেডকে পুষ্টির দিক থেকে আরও সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছে ভিটামিন বি-১, বি-২, নায়াসিন আর আয়রন। আপনার পরিবারের সবাইকে আজ থেকেই সবচেয়ে পুষ্টিকর মডার্ন ব্রেড খেতে দিন।

সম্পূর্ণ আধুনিক বেকরী : কোলকাতার মডার্ন বেকরীস্ বসানো হয়েছে অস্ট্রেলিয়া সরকারের সহযোগিতায়—কলোম্বো পরিকল্পনা অনুসারে। সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উপকরণ দিয়ে—পুরো স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তৈরী পুষ্টিকর মডার্ন ব্রেড আপনি পাবেন সব সময় একেবারে টাটকা। তাই আপনার পরিবারের সবার জন্য যদি পুষ্টিকর সবচেয়ে ভাল রুটি চান তা'হলে কিনুন মডার্ন ব্রেড। বাড়ীর সবাইকে সবচেয়ে সেরা রুটি মডার্ন ব্রেড খেতে দিন।

মডার্ন

ভারতে সবচেয়ে পুষ্টিকর রুটি

মডার্ন বেকরীস্ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড, (ভারত সরকারের একটি প্রতিষ্ঠান)
বেকরীস্ : আমেদাবাদ, ব্যাঙ্গালোর, বোম্বাই, কোলকাতা, কোচিন, দিল্লী, হায়দ্রাবাদ, কানপুর, মাদ্রাজ।

আঠার শ' চয়ান্ন সালে বাইকুল্লা স্টেশনের অপেক্ষমান কসমোপলিটান যাত্রীদের একাংশ

'ধরাতে পুষ্পক রথ এনেছে ইংরাজ'

নারায়ণ দত্ত

গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস একদা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন পারসিক ঘোড়াদের সম্বন্ধে। বলেছিলেন, পৃথিবীর কেউই এদের হারাতে পারবে না। টপকাতে পারবে না গতিতে। হেরোডোটাসের কাল খৃষ্টপূর্ব চার শতাব্দী। শুনলে অবাক হবার কথা, হেরোডোটাসের এই ভবিষ্যদ্বাণী দীর্ঘ তেইশ শ' বছর উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম চব্বিশ বছর পর্যন্ত অক্ষরে অক্ষরে সত্য ছিল। কিন্তু তারপরেই একটি ছোট্ট ঘটনা—একটি যন্ত্র—তৎকালীন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী এই চতুষ্পদের তাদের রাজাসন থেকে সরিয়ে দিল। এ ঘটনার সূত্রপাত হল সেখানেই, যেখানে এখনও একটি রাজপরিবার নিরুপদ্রবে বহাল তবিয়তে তাদের রাজপাট চালিয়ে যাচ্ছেন। স্থানটি ইংল্যাণ্ড। স্টকটন এবং ডারলিংটনের মধ্যে পাতা সমান্তরাল একজোড়া লোহার পাতের উপর দিয়ে আটত্রিশ গাড়ির একটি ট্রেন চলল। লাইন পাতা শুরু হয়েছিল আঠার শ' একুশে। করেছিলেন সেই বিখ্যাত জর্জ স্টিফেনসন। কিন্তু নানা কারণে ট্রেন চলাচল আঠারশ পঁচিশের আগে শুরু হয়নি।

এই ঘটনার ঝড় একদিন আরব সাগরের লোনা জলে এসে আছড়ে পড়ল। প্রায় আটাশ বছর পরের কথা। সাত সমুদ্দুর তের নদী পেরিয়ে ভারতবর্ষের মাটিতে ঐ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার সানুদেশে বম্বে—বোরিবন্দরে। আঠার শ' তিপান্ন। ষোলই এপ্রিল। বিকাল সাড়ে তিনটা। দুম...দুম...দুম...করে পড়ল কেল্লা থেকে একুশটি তোপ। সেই সুন্দর অপরাহ্নে সচকিত বোম্বাই শহরের মানুষেরা হয়ত সেদিন সবাই জানতেও পারেনি কিসের মহৎ অভ্যুদয়ে সেদিন ধন্য হল ভারতবর্ষ। কেবল চারশ জন অতিথি নিয়ে চোদ্দটা কামরার গাড়িটা সিটি দিয়ে থানার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করল সমাগত জনতার প্রবল হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে। অভিনন্দন জানালেন পাগড়ি বাঁধা অজস্র মানুষ রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে। তামাম বোম্বের সেদিন ছুটি। সরকারী অফিস, ব্যাঙ্ক সব বন্ধ।

বৈশাখ মাসের বেলা তখন পৌনে পাঁচটা। ভারতবর্ষের প্রথম ট্রেন এসে পৌছাল থানা। একশ মাইল পথ। যেতে সময় লাগল সওয়া এক ঘন্টা। সেখানে সেদিন যাত্রীদের জন্যে [illegible] খানা। [illegible] ব্যাপার। রেল কোম্পানীর সেদিনের চীফ ইঞ্জিনিয়ার—মিস্টার বার্কলে। সব মান্যগণ্য ব্যক্তিরা তাঁকে জানালেন আন্তরিক শুভেচ্ছা—যাত্রা শুভ হোক।

ভারতবর্ষের প্রথম ট্রেনের যাত্রীরা অবশ্য সেদিনই ফেরেননি থানা থেকে। পরদিন—সতেরই এপ্রিল, সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ তাঁরা বম্বে ফিরে এসেছিলেন। আঠারই এপ্রিল কিন্তু সাধারণের জন্যে কোন ট্রেন চলেনি, কেননা, সার্ জামসেদজী জীজীভাই সারা ট্রেনখানিই রিজার্ভ করে রেখেছিলেন সেদিন তাঁর পরিবারের জন্যে। ব্যারন জামসেদজী সেদিন বম্বে থেকে যাত্রা করে সেইদিনই থানা ঘুরে এসেছিলেন!

এই যে ভারতবর্ষে প্রথম ট্রেন চলল, এর পিছনে কিন্তু অনেক ঘটনা ঘটে গিয়েছিল যবনিকার অন্তরালে। সাঁঝের প্রদীপ জ্বালাবার আগে বিকেল বেলায় সলতে পাকানোর মত। যতদূর জানা যায় বম্বে থেকে থানা, কল্যাণ প্রভৃতি জায়গায় রেলপাতার পরিকল্পনা মাথায় আসে যে ভদ্রলোকটির, তাঁর নাম জর্জ ক্লার্ক। বম্বে গভর্নমেন্টের তিনি ছিলেন চীফ ইঞ্জিনীয়ার। সালটা আঠারশ তেতাল্লিশ। ভদ্রলোক ভাণ্ডুপে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেই সময়েই প্ল্যানটা তাঁর মাথায় এসেছিল। সাহেবদের যত দোষই থাকুক, যে কোন ব্যাপারে কোমর বেঁধে লেগে

প্রথম ট্রেনটি প্র্বাদ কের স্ড়ঙ্গে চ্কছে

পড়তে তাদের জ্বড়ি নেই। ক্লার্ক সাহেব ব্যাপারটা নিয়ে সরকারী মহলে কথাবার্তা শ্বর্ করলেন। আগেই অবশ্য এই নিয়ে একটা 'ব্ল্ প্রিণ্ট' তৈরি করেই ফেলেছিলেন।

তেরই জ্বলাই। অঠার শ' চুয়াল্লিশ। স্যার্ এরসকিন পেরী তখন বম্বের চীফ জাস্টিস। তাঁকে সভাপতি করে' বোম্বেতে একটা মিটিং হয়ে গেল। কি ব্যাপার না?—'ট্ কনসিডার এডভাইসেবিলিটি অফ হ্যাভিং এ রেলওয়ে ট্ বি নেমড্ বম্বে গ্রেট ইস্টার্ন রেলওয়ে কনসট্রাকটেড ফ্রম বম্বে ট্ থালঘাটস এন্ড ভোর ঘাটস ভায়া সালসেটি, ইন একরডেন্স উইথ মিসটার ক্লারকস স্কীম।'

ক্লার্ক সাহেব কিন্তু বসে ছিলেন না। ইতোমধ্যে তিনি কুরলা থেকে থানা অবধি ট্রেন চালাবার একটা প্ল্যানও করে ফেললেন। এতে তিনি দলে নিলেন বম্বের চীফ সেক্রেটারি—হেনরি কানবীয়ারকে। উনিশে এপ্রিল। আঠার শ' পঁয়তাল্লিশ। বম্বের টাউন হলে হইহই করে একটা সভা হয়ে গেল। কর্নেল জি-আর জার্ভিস হলেন সভাপতি। ক্লার্ক সাহেবের প্ল্যান-কল্পনা কাজে পরিণত করতে এখানেও একটা রেলওয়ে অ্যাসোসিয়েশনও তৈরি হয়ে গেল।

কিন্তু শ্বধ্ ভারতবর্ষে কেন। খাস লণ্ডন শহরে ভারতবর্ষে রেল পাতার ব্যাপারে একটা কোম্পানীই তৈরি করা নিয়ে চলছিল জোর জল্পনা-কল্পনা। এই কোম্পানীর নামই শেষবেশ ভারতবর্ষে চাল্ হয়—গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনস্লার রেলওয়ে কোম্পানী। উদ্যোক্তা একদল সলিসিটার—হোয়াইট অ্যাণ্ড ব্যারেট আর জন চ্যাপমেন নামে আর এক সাহেব। সলিসিটারের হাতের কাজ, কাজেই সব পাকাপোক্ত ব্যাপার। কয়েকদিনের মধ্যেই পনরই জ্বলাই—আঠার শ' চুয়াল্লিশ; কোম্পানীর একটা প্রসপেকটাস বাজারে বেরিয়ে গেল। সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা - এই কোম্পানীর আখিরে একজন ভারতীয় ডিরেকটারও জ্বটে গেল—এ'র নাম স্যার্ জামসেদজী জীজীভাই। এ'র হাতে লেখা এক দলিলের স্ত্রে জানা যায় প্থিবীর প্রথম রেল ইঞ্জিন নির্মাতা—জর্জ স্টিফেনসন স্বয়ং ছিলেন এই কোম্পানীর অনারারি ডিরেকটর। বাপকা বেটা—জর্জ স্টিফেনসনের ছেলে রবার্ট স্টিফেনসন ছিলেন এই কোম্পানীর কনসাল্টিং ইঞ্জিনীয়ার। তারপর যা হয়, ভারতীয় আর বিলিতী রেল কোম্পানী মিলে মিশে কাজ শ্বর্ করল। আঠার শ' উনপঞ্চাশ সালের পয়লা অগস্টের এক আইনের বলে গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনস্লার রেল কোম্পানী বিলেতে সমিতিবদ্ধ বা 'ইংকরপোরেটেড' হয়ে গেল এবং পাঁচ লক্ষ পাউণ্ডের লগ্নীকৃত ম্লধন হবার ঠিক হ'ল। জেমস বারকলে সাহেব এলেন বিলেত থেকে। লাইন 'সারভে' করতে।

আঠার শ' পঞ্চাশ সালের একত্রিশে অক্টোবর বাঙলা দেশে তখন কাশ বনের মেলা বসে গেছে। নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা। ঝরা শেফালী ফ্বলের চাদরে গাছের তলাগ্বলো ঢেকে গেছে। বাঙলা দেশের বাতাসে তখন আগমনীর স্বর। স্দ্রে বম্বেতেও সেদিন একটা উৎসব। না দশেরার নয়। সায়নের কাছে একটা জায়গায়। শত শত লোক এসে সেদিন ভীড় করেছিল। বহ্ গণ্যমান্য লোক সেই সমাবেশে। বম্বের চীফ জাসটিস এসেছেন সভাপতিত্ব করবেন বলে। ভারতবর্ষের কুমারী মাটির ব্বকে সেদিন রেল পাতার কাজ শ্বর্ হ'ল। তাই এই সভা, এই সমারোহ। ভারতবর্ষ কেন—মধ্যপ্রাচ্য বা প্র্ব এশিয়ায় এই প্রথম রেলের অন্বষ্ঠান। গ্রেট ইসটারন পেনিনস্লার রেলওয়ে লাইন পাতবে বম্বে থেকে কল্যাণ। এই রেল লাইন পাতার কাজ অবশ্য আসলে শ্বর্ করেন ফেরিএল অ্যাণ্ড ফাউলার নামে এক ব্রিটিশ কোম্পানী। লোক লেগেছিল দশ হাজারের মত।

কিন্তু লাইন পাতলেই ত হয় না? ইঞ্জিন এল কবে? প্রায় বছর দ্বই বাদে। ইঞ্জিনের নাম 'ফকল্যাণ্ড'। তখনকার বম্বের
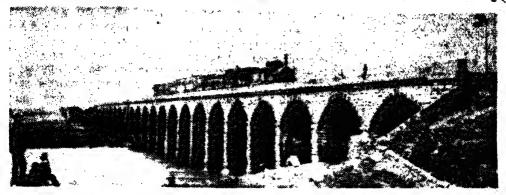
ভারতবর্ষের প্রথম ট্রেনটি আদি থানা ব্রিজের ওপর দিয়ে যাচ্ছে।

গভর্নর লর্ড ফকল্যাণ্ডের নামে। যতদূর জানা যায় জাহাজে করে এসে বোম্বাই-এর মাটিতে পা দিয়ে 'ফকল্যাণ্ড' যেদিন 'শাণ্টিং' শুরু করত তখন নাকি নিত্য ভিড় জমে যেত।

কিন্তু আঠার শ' তিপান্ন সালে সরকারী ভাবে চলবার আগে এই ট্রেন বহুবার যাকে বলে 'ট্রায়াল রান' দিয়েছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে স্মরণীয় আগের বছর আঠারই নভেম্বরের 'ট্রায়াল রান'। এদিন কোম্পানীর বড়কর্তারা সব ইয়ার দোস্ত নিয়ে ট্রেনে চেপে গিয়েছিলেন বম্বে থেকে থানা। সেদিন সময় লেগেছিল অনেক কম—মিনিট পঁচাত্তরিশ। সাহেবেরা গাড়িতেই ব্রেকফাস্ট করেছিলেন ক্রুরলা সুড়ঙ্গে। ভারতীয় রেলের এইটিই প্রথম সুড়ঙ্গ।

প্রায় ঠিক একই সময়ে পূর্ব ভারতে—বাঙলা দেশেও ট্রেন চলাচল শুরু হ'ত কেননা আঠার শ' তেপান্ন সালেই হাওড়া থেকে পাণ্ডুয়া—আটত্রিশ মাইল রেল লাইন পাতার কাজ শেষ হয়ে যায়। কিন্তু বিধিবাম। রেল গাড়ির যে মডেল আসছিল 'গুডউইন' জাহাজে করে' সেই জাহাজটা গেল ডুবে। যে জাহাজে করে ইঞ্জিন আসছিল সেটা চলে গেল অষ্ট্রেলিয়া। কাজেই দেরি। আঠার শ' চুয়ান্ন সালের পনরই আগস্ট পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না ম্যাকডোনাল্ড স্টিফেনসন সাহেবের।

কিন্তু এর পরও কথা আছে। নবযুগের বাঙালীরা নিজেরাই রেল লাইন পাতার স্বপ্ন দেখেছিল—আঠার শ' পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ সাল নাগাদ। এই রেললাইন পাতার পরিকল্পনা করা হয় হাওড়া থেকে ভগবানগোলা—গঙ্গার পশ্চিমকূল দিয়ে। পনের লক্ষ পাউণ্ডের মূলধন হবার কথা ছিল এই কোম্পানীর। নাম হয়েছিল সেণ্ট্রাল বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানী। কলকাতার টাউনহলে এই কোম্পানীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানের একটা সভাও হয়েছিল বলে জানা যায় সেকালের কাগজে—'এ স্প্লেনডিড এনটারটেনমেণ্ট ওয়াজ গিভন অ্যাট দি টাউন হল বাই দি প্রোমোটারস টু সেলিব্রেট দি ইভেণ্ট। সর্টলি আফটার ওয়ার্ডস দি প্রোমোটারস অ্যাণ্ড মানি বোথ ডিসঅ্যাপিয়ারড্।'

কিন্তু রেল ত হ'ল, রেল নিয়ে কবিতা হল কবে? বলা শক্ত। তবে ভাবতে ভালো লাগে মাতলা বা ক্যানিং-এর রেলে চড়ে 'সোমপ্রকাশে'র দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ চলেছেন চাংড়িপোতা বা আজকের সুভাষ-গ্রাম। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র চলেছেন চুঁচুড়া, চলেছেন হেমচন্দ্র, দীনবন্ধু। বিদ্যাসাগর চলেছেন কর্মাটাঁড়, রামগোপাল চলেছেন মগরা, রবীন্দ্রনাথ বোলপুর। "আর তরুশ্রেণীর সবুজ নীল পাড় দেওয়া বিস্তৃত মাঠ এবং ছায়াচ্ছন্ন গ্রামগুলি রেলগাড়ির দুই ধারে দুই ছবির ঝরণার মতো বেগে ছুটিতে লাগিল, যেন মরীচিকার বন্যা বহিয়া চলিয়াছে"—আর সেই থেকেই একদিন জন্ম নিল কোন এক রেলের কবিতা। তবু যুগ-সন্ধিক্ষণের কবি ঈশ্বর গুপ্ত কেন যেন ঠিক রেল গাড়ি নিয়ে কবিতা লেখেননি! 'রসময় রসভরা রসের ছাগল নিয়ে' কবিতা লিখলেন অথচ রেলগাড়ি তাঁকে উদ্বুদ্ধ করতে পারলে না, এটাই অবাক লাগার কথা। বোধ করি, রেল এসেছিল গুপ্ত কবির জীবনের অপরাহ্নে—যে সময় কবির স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছিল না। সেই কারণেই হয়ত বা কবির এই নীরবতাকে মানিয়ে নেওয়া যায়। তবে উনবিংশ শতককে রেলগাড়ি মোটামুটি মাতিয়ে রেখেছিল। বাঙলা কাব্যে তার হদিস আছে। গুপ্ত কবির সাক্ষাৎ শিষ্য দীনবন্ধু মিত্রের কথাই ধরা যাক। তাঁর দ্বাদশ কবিতার শেষটি রেলগাড়ি নিয়ে। এবং ভাবতে আশ্চর্য হতে হয়, তাতে ভারতের ঐক্যসাধনায় এই রেল

লাইনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাই বার বার এসে পড়েছে :

"অন্বেষে গজে দিয়ে ছাই,
হাসিতে হাসিতে ভাই,
বোম্বাই নগরে যাই,
পথে নেবে নাই খাই
কি সুবিধা হয়েছে
এপাড়া ওপাড়া কাশী
পঞ্জাবীয়া প্রতিবাসী,
সহজে মান্দ্রাজী আসি
পবিত্র গঙ্গায় ভাসি,
দিবা নিশি রয়েছে।
রেলের কল্যাণে কবে
মঙ্গল সাধন হবে,
ভারতের জাতি সবে
একমত হয়ে রবে,
সুমিলনে মিশিয়ে।'

অবশ্য কবি হেমচন্দ্র 'দূরেকে করিলে নিকট'—এই বলেই রেলগাড়ীকে বাহবা দিয়েছেন বেশি। সেখানে রেলের ভাব-মূর্তির চেয়ে তার ছবিই বেশি। সেখানে কবি 'ট্রাভেল ওয়াইডলি'র ডাক দিয়েছেন বঙ্গজনকে—

'এস কে বেড়াতে যাবে—শীঘ্র কর সাজ।
ধরাতে পুষ্পকরথ এনেছে ইংরাজ।
শীঘ্র উঠ—ত্বরা করি
বাক্স, ব্যাগ, তল্পি ধরি;
এখনি বাজিবে বাঁশী,
ঠং—ঠং—ঠং কাঁসী
বাজিবে ইস্পাত—বোলে
ছাড়িবে নিশান-দোলে
শীঘ্র উঠ পড়ে থাক ছড়ি, ঘড়ি তাজ;—'

কবি এখানেই থামেননি, সেকালের টিকেট বুকিং ঘরের ছবি, ভিড়ের ছবি, মানুষের ট্রেন ধরার তাড়াতাড়ি—সবই তাঁর কাব্যে ছবি হয়ে আছে। ভারতবর্ষের একদিকে হরিদ্বার, অপর দিকে সেতুবন্ধ রামেশ্বর, গয়া-গঙ্গা-বারানসী নানা তীর্থ, নানা নগরী সব কিছুই হেমচন্দ্রের কাব্যে ঠাঁই পেয়েছে। কবি বলছেন—

'বোম্বাই কিম্বা কলিঙ্গ
শিলং দুর্জয় লিঙ্গ,
সিমলা পাহাড় পাঠ,
কাশ্মীর মারাহাট্টা ঘাট
যেখানে করে গমন
সাধিতে পারহে পণ

তবে সেকালের রেল ভ্রমণ, হাওড়ার টিকিটবাবু, হাওড়া স্টেশনে ভিড়, ট্রেনচাপার নিখুঁত ছবি পেতে হলে 'হুতোমের পাতা ওল্টান ছাড়া গতি নেই। সেখানে হুস্ হুস্ হুস্ করে ট্রেন টারমিনাসে উপস্থিত হলো, টুনুনোংটাং টুনুনোংটাং করে পুনরায় ঘণ্টা বাজলো, লোকেরা রল্লা করে গাড়ি চড়তে লাগলো, গার্ড ও দুজন বরকন্দাজের সহায়তায় লোক পোরা হতে লাগলো, ভেতর থেকে "আর কোথা আসচো!" "সাহেব আর জায়গা নাই" "আমার বুচকি! আমার বুচকিটা দাও।" "ছেলেটি দেখো! আ মলো মিন্সে ছেলের ঘাড়ে বসচিস্ যে" চীৎকার হতে লাগলো, কিন্তু রেলওয়ে কর্মচারীরা বিধিবদ্ধ নিয়মের অনুগত বলেই তাদৃশ চীৎকারে কর্ণপাত করেন না।"

শুধু কি রেল ভ্রমণ? সেই বুকিং ক্লার্কের অনুপম ছবি আছে না? "মশাই টিকিটগুলি শীঘ্র দিন শীঘ্র দিন ইস্টিম খুল্লো ইস্টিম খুল্লো" বলে যাত্রীরা চিৎকার করছে কিন্তু "কাটা কপাটের হাজুরের ভ্রূক্ষেপ নাই, শিস দিয়ে "মদন আগুনে জ্বলচে দ্বিগুন কল্লে কি গুণ ঐ বিদেশী" গান বল্লেন।"

তবে শুধু এই সব কবিতা আর নক্শা নয়। ঊনবিংশ শতকের রেল-আবির্ভাবের সেই আদি লগ্নে রেল নিয়ে 'ইউটিলিটি' বইও ছাপা হয়েছিল। লিখেছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত—'বাষ্পীয় রথারোহীদের প্রতি উপদেশ' রেল ভ্রমণে যাত্রীদের ইতি কর্তব্য কি, তাই নিয়ে।

তবে রেল নিয়ে কাব্যের বোধ করি শেষকথা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। কিনু গোয়ালার গলির বাসিন্দা সদাগরি আপিসের কনিষ্ঠ কেরানি শিয়ালদহ স্টেশনের যে ছবি দেখেছে তা চিরকালের সোনার ফ্রেমে বাঁধা আছে—

'শেয়ালদা ইস্টিশনে যাই,
সন্ধেটা কাটিয়ে আসি,
আলো জ্বালাবার দায় বাঁচে।
এঞ্জিনের ধস ধস,
বাঁশির আওয়াজ,
যাত্রীর ব্যস্ততা,
কুলির হাঁকাহাঁকি।'

এর আগে পরে বহুবার এসেছে হাওড়া স্টেশন, রেল গাড়ি, রেল কামরা রবির কাব্যে, সেখানে নায়ক নায়িকার দেখা হয়েছে হঠাৎ—'

রেল গাড়ির কামরায় হঠাৎ দেখা
ভাবিনি সম্ভব হবে কোনদিন।

এবং এক সময় রাতের রেলগাড়ী এ প্রাণের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। 'অন্ধের হাতে, প্রাণ মন সঁপে দিয়ে বিছানা সে পাতে।' বলে, 'সে অনিশ্চিত তবু জানে অতি-নিশ্চিত তার গতি।'

রবীন্দ্রনাথ পেরিয়ে রেলগাড়ী সুখদেবের কাব্যে উত্তীর্ণ হয়েছে, আধুনিক কবির কাব্যেও তার অবাধ পরিক্রমণ, কখনও ইমেজে কখনও পটভূমিকায়। অত্যাধুনিক বাঙলা কাব্যে তার কি গতি হবে, কে জানে?

না জানা যাক, তবে এটা ঠিক যে একশ সতের বছরের জীবনে সে সাধারণ মানুষের অনেক কাছে এসে গেছে, আরও আপন হয়েছে। তার ভালো মন্দ, দোষগুণ নিয়েই সে আরও নিকটতর হয়েছে সাধারণ মানুষের। সেদিনের সেই তেত্রিশ কিলোমিটার রেললাইন হয়েছে ষাট হাজার কিলোমিটারেরও বেশি। প্রথম দিনের চারশজন রেল যাত্রী আজ হয়েছে দৈনিক ষাট লক্ষ। সেদিনের মুষ্টিমেয় রেলকর্মী হয়েছে আজ প্রায় চোদ্দ লক্ষের এক সুবৃহৎ পরিবার।

শুধু তাই নয়। তার কর্মকাণ্ডও বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হয়েছে। কিন্তু ঠিক আছে তার সেবা। খণ্ডছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে ঐক্যসূত্রে বেঁধে দেবার সাধনা। সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে। চলবেও।

জীবন যে-রকম

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ তন ॥

সকাল বেলাতেই হু হু করে খবর রটে গেল যে, গতকাল রাত্রিরে এ পাড়ার একটা সাংঘাতিক দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়ে গেছে। খবরের কাগজে অবশ্য বেরিয়েছে "দুই দলের সংঘর্ষ" হিসেবে আট দশ লাইনের ছোট্ট খবর — অধিক রাত্রে প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী, কিন্তু পাড়ার লোকের মুখে মুখে নানান গল্প পল্লবিত হতে লাগলো।

পাশের বাড়ির ছাদ থেকে অনপূর্ণা মাসি অপর্ণাকে ডেকে চোখ গোল গোল করে বললেন, ওমা, শুনেছিস, কাল রাত্তিরে কি কাণ্ড হয়ে গেছে? এ দিকে আমরা কিছু টের পাইনি! ধড়াম ধড়াম আওয়াজ শুনেছিলুম বটে, কিন্তু ওতো প্রায়ই হয়; শুনেছি নাকি দশজন না বারোজন লোক মরেছে!

ঠিকে ঝি এসে খবর দিল, ও পাড়ার বস্তিতে। সে নিজে অবশ্য অন্য বস্তিতে থাকে, একেবারে রক্তগঙ্গা বয়ে গেছে, গোটা বস্তিটাই আগুনে পুড়ে ছাই হোয়েরা কিছু টের পাওনি দিদিমণি?

রিটায়ার্ড হেড মাস্টার গিরীনবাবু রাসমোহনের সঙ্গে দেখা করতে এসে নির্ভুল এবং সঠিক খবর দেবার ভঙ্গিতে বললেন, আসলে মারা গেছে পাঁচজন। দুটো পলিটিক্যাল পার্টির ক্ল্যাশ, এই তো হয়েছে আজকাল দেশের অবস্থা রাজনীতির নাম করে ভাই এসে ভাইয়ের বুকে ছুরি বসাচ্ছে!

রাসমোহন বেশ আড়ষ্ট হয়ে গেছেন খবরটা শুনে। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলেন, বস্তির মধ্যেও পলিটিক্সের ঝগড়া?

গিরীনবাবু বললেন, বুঝলেন না, ওরা দলেরই তো গুণ্ডা আছে। আদর্শবাদিতা সবই তো এখন শিকেয় উঠেছে। এখন তো পলিটিক্স মানেই গুণ্ডার লড়াই! আমাদের আমলে আমরা শত্রু বুঝতাম ব্রিটিশকে — এখন দেশের লোকই দেশের লোককে....

বারান্দায় খবরের কাগজটা চওড়া করে মেলে চায়ের কাপ নিয়ে বসে আছে দীপু। দীপু জানে, বস্তির মারামারিটা কিসের। পলিটিক্সের নামগন্ধও নেই। এক হিসেবে সেই তো উপলক্ষ। তাকে বাঁচাবার জন্যেই নিতাইদের সঙ্গে ধনঞ্জয়দের ঝগড়া। কিংবা এটাও আসল কারণ নয় — সব সময় উগবগে লোভ ফুটছে, যে-কোনো সময় বেরিয়ে এলেই হলো। হয়তো দীপু যেটুকু দেখে এসেছে, তারপর ঘটনা অনেক দূরে গড়িয়েছে, অন্য অনেকগুলো উপলক্ষ যোগ হয়েছে, পলিটিক্স এসে পড়াও বিচিত্র নয়। কিংবা লোকেরা সেই ঘটনার কথাই বলছে তো, নাকি অন্য কোনো ব্যাপার?

খবরের কাগজের দিকে চেয়ে আছে দীপু, কিন্তু পড়ছে না। সকালের রোদ্দুরেই বেশ তাপ, গায়ে এসে লাগছে, তবু সরে বসছে না, চায়ের কাপে চুমুক দিতে ভুলে যাচ্ছে। অনেক বেলায় ঘুম ভেঙেছে, মাথার মধ্যে এখনো আচ্ছন্ন ভাব।

সাড়ে ন'টা আন্দাজ কে যেন ডাকতে এসেছে দীপুকে। গেঞ্জি আর পাজামা পরা ছিল, সেই অবস্থাতেই নিচে নেমে এলো। এই গরমেও সুট পরেছে, টাই বেঁধেছে ইন্দ্রজিৎ, তবে হাতের তালু দিয়ে থুতনি ঘষছে, অর্থাৎ বেশ চিন্তিত। রাসমোহন এখনো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন গিরীনবাবুর সঙ্গে, দীপু ইন্দ্রজিৎকে বসবার ঘরে নিয়ে এলো। কাছেই যে দীপুর বাবা আছেন, এ ব্যাপারটাকে অগ্রাহ্য করে সিগারেট ধরালো ইন্দ্রজিৎ, তারপর সরাসরি জিজ্ঞেস করলো, তুই কাল ধনঞ্জয়দের সঙ্গে কতক্ষণ ছিলি?

এখনো বাথরুম-টাথরুম সারা হয়নি, ঘুমের জড়তা এখনো কাটেনি দীপুর, মাথা ঠিক মতন কাজ করছে না। বললো, আমি? কেন? বেশীক্ষণ না —

—মারামারির সময় তুই কোথায় ছিলি?

—মারামারি?

—তুই কিছু জানিস না?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি। কাল ধনঞ্জয়রা মারামারি করেছে। এ রকম তো প্রায়ই করে।

—তুইও শেষকালটায় ওদের দলে ভিড়লি?

—আমি? না, ভিড়িনি তো!

—কাল রাত্তিরে তুই ধনঞ্জয়দের হয়ে আমার কাছ থেকে টাকা খি'চতে গিয়েছিলি কেন?

অফিস যাবার পথে দেখা করতে এসেছে ইন্দ্রজিৎ, তার বেশী সময় নেই হাতে। তাই উকিলের মতন জেরা করছে দীপুকে। দীপু ওর লম্বা শরীরটা কু'কুড়ে 'দ' হয়ে চেয়ারে বসেছিল আলস্যে। এবার সে গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসলো। টাকা খি'চতে গিয়েছিলি—এ কথাটা তার একদম পছন্দ হয়নি, ধাঁ করে রাগ চড়ে গেছে। এখন সে সব ব্যাপার স্পষ্ট করে ভাবতে পারছে। রাগ হলেও চেঁচিয়ে কথা বলা যাবে না, কাছেই বাবা আছেন। নিচু গলায় দীপু বললো, তোর কাছে কেন গিয়েছিলাম, ইডিয়েট, তুই সেটা বুঝতে পারিসনি?
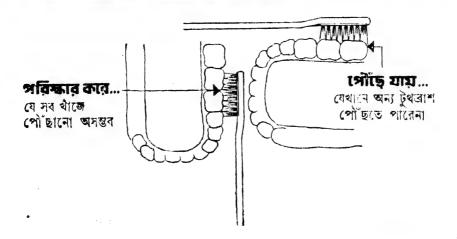
অ্যাশট্রে নেই, ঘরের মেঝেতেই সিগারেটের ছাই ফেলছে ইন্দ্রজিৎ। ভারিক্কি গলায় বললো, এর মধ্যে বোঝার কি আছে? চাকরি না পেলে আজকাল সবাই রংবাজ। রংবাজি করাটাই সবচেয়ে সোজা কি না এখন! আমরা যে কষ্ট করে চাকরি যোগাড় করেছি, অফিসে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে মাইনে পাচ্ছি—সেটা আমাদের দোষ হয়ে গেল? এজন্য আমার টাকা তোদের দিতে হবে?

—ধ্যাৎ তেরি কা! এ সব কথা আমাকে বলতে এসেছিস কেন? তুই-ই তো আগে ধনঞ্জয়দের সঙ্গে খুব মেশামিশি করতিস। ওরা আমাকে জোর করে পাঠিয়েছিল তোকে ভুলিয়ে বাইরে ডেকে আনতে—তোকে মারবার জন্য। তোকে আমি বাইরে আনতে চাইনি—ভেবেছিলাম কিছু টাকা দিয়ে যদি ভুলিয়ে ভালিয়ে—

—মারবে? আমাকে? তুই আমাকে বললি না কেন—আমি বেরিয়ে দেখতাম, কে আমাকে মারে! কার কতখানি হিম্মৎ!

—এ সাহস কাল রাত্তিরে তোর কোথায় ছিল? তুই নিজেই তো টাকা এনে দিলি!

—তুই এমনভাবে বলছিলি, আমি ভাবলাম তোর পার্সোনাল দরকার—তুই যে ওদের হয়ে আমার কাছে আসবি—এ ব্যাপারটাই আমার কাছে এমন অস্বাভাবিক ঠেকলো।

—ঠিক আছে, তোর টাকা তো আমি তোর হাতে ফেরত রেখেছি! —বলে চায়।

—টাকার কথা হচ্ছে না। আমাকে দীপ্যান! এক গ্লাস জল খাওয়া তো আগে—

দীপু নিজেই উঠে গিয়ে জল নিয়ে এলো। ইন্দ্রজিতের সঙ্গে কথা বলতে তার ভালো লাগছে না। মনটা আজ অন্য রকম হয়ে আছে। কালকের ঘটনা নিয়ে ভাবতে একটুও ইচ্ছে করছে না। ইন্দ্রজিৎকে সে জিজ্ঞেস করলে, তোর অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে না?

ইন্দ্রজিৎ অনবরত হাতের তালুতে চিবুক ঘষছে। বারবার তার চোখ যাচ্ছে দীপুর মুখের কাটা দাগগুলোর দিকে। চাপা উত্তেজনায় তার মুখটা উজ্জ্বল। সে বললো, তা হোকগে একটু দেরি। তুই কাল কতক্ষণ ওদের সঙ্গে ছিলি?

—কেন?

—বল না, তোর ভালোর জন্যই জিজ্ঞেস করছি।

—ছিলাম কিছুক্ষণ। মানে থাকতে বাধ্য হয়েছিলাম।

—তোর মুখে এরকম ভাবে কাটলো কি করে?

—এমনিই, পড়ে গিয়েছিলাম।

—কাল্ড শেষ পর্যন্ত কি হয়েছে তুই জানিস না?

—না। কি হয়েছে?

—কাল তিনজন খুন হয়েছে, বস্তির দুটো ঘরে আগুন লেগেছিল, একজন লোকের নাকি হাত-পা কেটে টুকরো টুকরো করে—

হঠাৎ দীপু খুব নিরাসক্ত হয়ে গেল। তার কোনো কৌতূহল জাগলো না, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শোনার ইচ্ছে হলো না। সে তেতো গলায় বললো, তুই সকালবেলায় আমাকে এসব শোনাতে এসেছিস কেন!

—বারে! মাইরি, কারুর ভালো করতে নেই এ যুগে! আমি এলুম তোর জন্য—তুই আমাকে মুখ খিঁচোচ্ছিস। জানিস, পাড়াটা পুলিসে ছেয়ে গেছে?

—তাতে আমার কি হয়েছে?

—ন্যাকা সাজছিস এখন? তুই ধনঞ্জয়দের সঙ্গে কাল রাত্তিরে ছিলি—কাল ওরা খুন-জখম করেছে, তোকেও পুলিসে ধরবে না?

—কেন? আমাকেও তো ধনঞ্জয়রাই জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল! আমি কোনোরকমে ছাড়া পেয়েই চলে এসেছি!

—সে কথা প্রুভ করতে পারবি? এখন তো ওর দলের যে-কেউ ধরা পড়লেই অন্য কারুর ওপর দোষ চাপাবে। তুই-ও যে সে রকম বলছিস না, মানে, পুলিসের চোখে—

—না, না, ওঃ, অফিস যা! তুই আমাকে ভয় দেখাতে এসেছিস! পুলিস জানবে কি করে আমি ওদের সঙ্গে ছিলাম?

ইন্দ্রজিৎ একবার ঢোক গিললো। তার একটা নতুন সিগারেট ঠোঁটে চেপে ফের আগুন ধরালো। কয়েকবার বেশ খানিকটা আন্তরিকতা এনে বললো, আমার মনে হয়, তোর এখন কয়েক দিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকা ভালো। কেউ না কেউ তো ধরা পড়বেই—অপনেণ্ট পার্টিরও তো দু' একজন মারা গেছে, যদি তোর নামে সেই দোষ দেয়? যদি বলে, তুই-ই মেরেছিস।

—আমার নামে সে-রকম দোষ কেউ দেবে না।

—তুই মানুষ চিনিস না দীপু!

—সকালবেলা তোকে এসে আর মানুষ চেনাতে হবে না। তুই অফিসে যা—আমি এখন বাথরুমে যাবো—

—শোন, কাল তুই চলে যাবার পর আমি পুলিসে ফোন করেছিলাম। আমার চেনা আছে, তোর নামও বলেছিলাম—মানে, তোকে ওরা জোর জবরদস্তি করে ধরে নিয়ে গেছে—সেই কানেকশানে পুলিস তোরও খোঁজ করবে!

দীপু আস্তে আস্তে বললো, তুই-ই আমার নাম বলেছিস?

—মানে, তোকে যে জোর করে ধরে রেখেছে, ওরা যে প্রায়ই এ রকম গুণ্ডামি করে—তুই কিছুদিন অন্য কোথাও গিয়ে থাক—

—কোথায় যাবো?

—যে-কোনো জায়গায়। কোনো আত্মীয়-টাত্মীয়ের বাড়িতে। সত্যি তো তোর এগেইনস্টে কোনো প্রুফ নেই—আমাকেও যদি পুলিস থেকে আবার কিছু জিজ্ঞেস করে, আমি বলবো, ওটা অন্য দিনের ঘটনা। কাল রাত্তিরে নয়, তোকে ওরা আগে একদিন জবরদস্তি করেছিল।

—আমি কোথাও যাবো না। এখানেই থাকবো। পুলিস যদি আমার কাছে আসে, আমি সত্যি কথা বলবো।

—তুই জানিস না, পুলিস যদি একবার ধরে...সত্যি কথাটাই প্রমাণ করা এত শক্ত।

—ঠিক আছে, আমার ব্যাপার আমি নিজেই ভাববো।

—তোর মুখেচোখে এ রকম টাটকা ইনজুরি—এটাতেও সন্দেহ হতে পারে।

তোকে এ নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না।

ইন্দ্রজিৎ উঠে দাঁড়ালো। খুবই সহৃদয় উৎকণ্ঠার ছাপ তার মুখে। রাসমোহন গিরীনবাবুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে রাস্তার মোড়ে চলে গেছেন—দরজার কাছটা এখন ফাঁকা। ইন্দ্রজিৎ বললো, দ্যাখ, তোর ভালোর জন্যই আমি পুলিসকে জানিয়েছিলাম—ধনঞ্জয়দের খানিকটা কড়কে দেবার জন্য। তারপর যে এ রকম বীভৎস ব্যাপার হবে—

—ঠিক আছে, ঠিক আছে।

—আমার অ্যাডভাইস শোন, তুই দিনকতক অন্তত অন্য কোথাও থেকে আয়—পুলিশ আজকাল এসব কেস নিয়ে বেশীদিন মাথা ঘামায় না।

—ঠিক আছে, বললাম তো, সেটা আমিই বুঝবো!

ইন্দ্রজিৎ চলে যাবার পর দীপু দাড়ি কামাতে বসলো। দাড়ি কামাবার সাবানটা ফুরিয়ে গেছে অনেকদিন, এক টুকরো কাপড় কাচা সাবান দিয়েই ও কাজ চালিয়ে নিচ্ছে। থুতনিতে কাটা থাকলে দাড়ি কামাবার অনেক অসুবিধে। জ্বালা করছে বেশ। তবু দীপু আজ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে চায়। বাথরুমে ঢুকে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলো, মেজদির সাবানটা ক্ষইয়ে ফেললো প্রায় সিকি ভাগ। কাল রাত্তিরের গ্লানি দীপু যেন সাবান দিয়ে ধুয়ে দিতে চেষ্টা করছে।

ইন্দ্রজিতের কথা শুনে দীপু ভয় পায়নি। সে গত রাত্তিরটা একেবারে ভুলে যেতে চাইছে—যেন ওরকম কিছুই তার জীবনে ঘটেনি। সত্যি সত্যিই ভোলা যাবে না অবশ্য, কিন্তু দীপু চায়—এখন কয়েকদিনের জন্য ঐ ঘটনাকে মন থেকে সরিয়ে রাখতে। সেইটাই পারছে না। তিন চারজন মারা গেছে—কে কে? দীপু কাল নিতাইয়ের রক্তাক্ত মুখের প্রতিচ্ছবি দেখেছিল, সত্যি কি নিতাই বেঁচে নেই? অথচ ধনঞ্জয়দের দেখেও নিতাইয়ের মুখে ভয়ের চিহ্নমাত্র ফোটেনি—বরং ছিল খানিকটা অবহেলার ভাব। নিতাইয়ের সঙ্গীরাও যে-রকম ঠাণ্ডা ধরনের হিংস্র, ওরাও তো সহজে মরার মতন মানুষ নয়। ধনঞ্জয়, সুকুমার, ভুপে—ওদের কারুর মৃত্যুর কথাও ভাবাই যায় না। প্রত্যেকটি জীবিত সুস্থ মানুষকে দেখলেই তো মনে হয়—এদের কারুর আকস্মিক মৃত্যু একটা অসম্ভব ব্যাপার। তবু মানুষ এভাবে মরে।

স্নান সেরে বেরিয়ে, পাট ভাঙা জামা-প্যান্ট পরে দীপু হাঁটতে হাঁটতে চলে এলো সেই বস্তির দিকে। নিজের চোখে একটু দেখা, নিজের কানে একটু শোনা দরকার। কাল রাত্তিরে ঘটনা ঘটেছে, আজ সকালে সেখানে অনেক পুলিস। প্রচুর মানুষের ভিড়। নিরাসক্তের মতন সিগারেট টানতে টানতে দীপু ভিড়ের মধ্যে উঁকি মারলো।

বস্তিতে আগুনে পাড়া ছাই হবার খবরটা সম্পূর্ণ মিথ্যে, তবে একটা দ্বন্দ্ব যুদ্ধের ছাপ আছে, বেশ কয়েকটা ঘরের দরজা জানলা ভাঙা, দেয়ালে বোমার দাগ। নিহতের সংখ্যা গুজবে বাড়তে বাড়তে এক ডজন ছাড়িয়ে গিয়েছিল—দীপু আসল খবরটা যাচাই করে নিল, মারা গেছে একজন। নামও জানা গেল, সুকুমার, পাড়ার অনেকেই তাকে চেনে। হাত পা কেটে টুকরো টুকরো করার খবরটাও ভুয়ো, তবে, একজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তার নাকি একটা হাতও কাটা গেছে। দীপু বুঝলো, সেই লোকটিই নিতাই—তার হাতও কাল কাটা যায়নি—নিতাইয়ের একটি হাত আগে থেকেই কাটা, সেটাই গুজব হয়ে ছড়িয়েছে। ধরা পড়েছে তিনজন, তাদের মধ্যে ধনঞ্জয় নেই, ধনঞ্জয় পলাতক। পুলিস ধনঞ্জয়ের খোঁজেই নানা জায়গায় তল্লাস করছে। নিতাই তাহলে এখনো বেঁচে আছে! দীপু তার রক্তাক্ত মুখের প্রতিচ্ছবি দেখেছিল, মৃত মুখ তো দেখেনি।

দীপুর সঙ্গে ফার্স্ট ইয়ার পর্যন্ত পড়েছিল সুকুমার, তারপর পড়া ছেড়ে দেয়। ইস্কুলে পড়ার সময় সুকুমার কি লাজুকই না ছিল! খুব গরীবের ছেলে, ইস্কুলে অন্য কেউ সুকুমারকে কখনো খাওয়াতে চাইলে কিছুতেই খেতে রাজী হতো না। ওর দাদা মারা যাবার পর—সংসারটা যখন একেবারে ভেঙে পড়ে, তখন থেকেই সুকুমার আস্তে আস্তে গুণ্ডামির দিকে পা বাড়ায়। কাল সুকুমারই প্রথম দীপুকে রাস্তায় আটকেছিল। সুকুমার এখন বেঁচে নেই। কাল ওর টগবগে রক্তওয়ালা জোয়ান শরীরটা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল দীপুর মুখোমুখি, আজ সে নেই, একথা বিশ্বাস করা যায়? দীপু একটা দীর্ঘশ্বাস কিছুতেই চাপতে পারলো না। বুকের মধ্যে বিষমভাবে মোচড়াচ্ছে। পঁচিশটা বছর এ পৃথিবীতে কাটিয়ে সুকুমার হঠাৎ চলে গেল। প্রত্যেক মানুষের জীবনের একটা কিছু সার্থকতা খোঁজা দরকার—একথা কি সুকুমার একবারও ভেবেছে? ওরা মৃত্যু নিয়ে ছেলেখেলা করছিল, অন্যকে মারবার অথবা নিজে মরার খেলা।

বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো দীপু। ভিড় কেটে যাচ্ছে, নতুন মানুষের ভিড় জমছে, দীপু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে। দু' একজন পুলিস ইনস্পেক্টরের সঙ্গে তার চোখাচোখি হলো—দীপুর ভয় করলো না। কেউ তো তার দিকে আঙুল দেখিয়ে ঐ যে ঐ যে বলে চেঁচিয়ে ওঠেনি! কেউ তো তার দিকে সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছে না! ইন্দ্রজিৎ মিথ্যে ভয় দেখিয়ে গেছে। কিংবা এখনো হয়তো পুলিস সব খবর পায়নি, পরে বেরুবে। যাদের গ্রেপ্তার করেছে, তাদের জবানবন্দী থেকে যদি পুলিস খবরটা বেরোয়—। দীপু খুনোখুনিতে অংশ গ্রহণ করেছিল—পুলিস একথা সন্দেহ করবে, এজন্য দীপু একটুও চিন্তিত নয়। কারণ, সেটা মিথ্যে। কিন্তু তার জন্যই প্রাণ যাবে—মারটা শুধু হয়—এজন্য যদি কেউ ওকে অভিযুক্ত করে? এ খবরটা তো আর মিথ্যে নয়!

বাড়ি ফিরে দেখলো, বাবা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে কোথায় বেরিয়ে গেছেন। অপর্ণা টুলটুলকে খাওয়াচ্ছে। দীপুও খেতে বসে গেল। ডাল দিয়ে মেখে ঝিঙে পোস্ত দিয়ে দু' তিন গ্রাসও খেতে পারলো না। বমি করে ফেললো। মুখ ধুয়ে আবার এসে বসলো। মাছের ঝোল মেখে মুখে তুলতে না তুলতেই আবার বমি! অপর্ণা দীপুর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললো, কি হলো, এত বিষম খাচ্ছিস কেন?

দীপু অসহায় মুখ করে বললো, আমি কিছুতেই খেতে পারছি না। কালকের হাঙ্গামায় সুকুমার মারা গেছে, ওকে আমি চিনতাম, একসময় ও আমার বন্ধু ছিল। যতবার ওর মুখটা মনে পড়ছে, আমার গা গুলিয়ে উঠছে। আচ্ছা মেজদি, সুকুমারের বাড়িতে এখন কি হচ্ছে বলো তো। ওর মা, ওর ছোট ছোট ভাই বোন—

অপর্ণা বললো, যা, উঠে গিয়ে এখন একটু শুয়ে থাক্। ওসব আর ভেবে কি হবে! আমি দই আনতে দিচ্ছি, একটু বাদে দই দিয়ে মেখে দুটি ভাত খেয়ে নিস্।

—আমি আজ কিছু খেতে পারবো না।

(ক্রমশ)

স্বপনের খাতা

আমার বন্ধু স্বপন তুলনাত্মক শব্দতত্ত্বের ছাত্র: আমার কাছে শিখতে আসে লাতিন আর গ্রীক। সম্প্রতি ওর মাথায় খেয়াল চেপেছে দেবভাষার সঙ্গে শুধু লাতিন আর গ্রীক কেন, য়ুরোপীয় যাবতীয় আর্যভাষার তুলনা করে দেখবে।

এই সেদিন ওর খাতাটা নিয়ে এসেছিল স্বপন। দেখি, অভিধান ঘাঁটতে ঘাঁটতে এক তালিকা সে প্রস্তুত করেছে:

মাতৃ, লাতিনে mater, গ্রীকে meter — ১। রোমীয় শাখা: ইতালিয়ান madre, স্প্যানিশ madre, পর্তুগীজ mae, ফরাসী mère, রুমানিয়ান mama, ২। জার্মানিক শাখা: জার্মান Mutter, ডাচ moeder, ইংরেজী mother, ড্যানিশ Moderen, সুইডিশ Modern, নরওয়েজিয়ান moren; ৩। স্লাভ শাখা: রুশ mat, বুলগেরিয়ান mayka, স্লভীন mati, সার্বো-ক্রোয়াট majka, পোলিশ matka, চেক matka [রুশ ও বুলগেরিয়ান অবশ্য সিরিলিক অক্ষরে লেখা হয়: সার্ব এবং সেই একইভাবে, ক্রোয়াটেরা নয়]; ৪। বাল্টিক শাখা: লেট্টিশ mate, লিথুয়ানিয়ান motina......

স্বপনের এত দূর পর্যন্ত পাণ্ডিত্য-প্রদর্শনেও এতটুকুও বিচলিত না হয়ে বলেছিলাম, 'আর যদি বলি, বিভিন্ন আর্যভাষার অন্তর্লীন সাদৃশ্যের নমুনো হিসেবে 'মা'-শব্দটির বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা যেতে পারে? স্তন্যপায়ী শিশু-মাত্রের মুখে ম-ব্যঞ্জনটা সর্বপ্রথমে উচ্চারিত হওয়া স্বাভাবিক; মম্ মম্ শব্দের সঙ্গে শিশু যাঁর দুধ পান করে, তাঁর নামের প্রথম অক্ষর ম হওয়া বিচিত্র নয়। বস্তুত হিব্রু, আরবী প্রভৃতি সেমিটিক ভাষাতেও মায়ের নামে সেই ব্যঞ্জন মেলে: Imm, onim . . .

বাড়ি ফিরে স্বপন নতুন করে ঘাঁটতে লাগল তার অভিধান; আজ এসেছে আরো তিনটি শব্দের তালিকা নিয়ে।

নক্ত, লাতিনে noctis গ্রীকে nuktos 1. notte, noche, noite, nuit, nooptea; 2. Nacht, nacht, night, natten, natten, natten; 3. noch, nosht, noc, noc, noc, noc; 4. nakts, naktis . . .

ত্রি লাতিনে tres গ্রীকে tris — ১ tre, tres, tres, trois, trei, 2. drei, drie, three, tre, tre, tre, tri, tri, tri, tri, trzy, tri, tris, trys!

me 1. mi, me, me, moi, ma; 2. mich, mij, me, mig, mig, meg; 3. menya, mene, mene, me, mnie, mne; 4. man, mani.

স্বপনের পূর্বসূরী

বলা বাহুল্য, স্বপনের ঢের আগেই দুর্দ [illegible] ভাষাগুলির মধ্যে এই সাদৃশ্য নিয়ে [illegible] আবিষ্কার করেছিলেন। প্রশ্ন [illegible] কঠিন ঠেকে? প্রশ্ন হলো প্রথম আবিষ্কারকটি কে?

[illegible] chauvin [illegible] [chauvin [illegible] [illegible] দেশপ্রেমী] আমি যদি বলি, এই আবিষ্কারক হলেন দক্ষিণ ভারতের এক ফরাসী জেসুইট মিশনারী: ফাদার ক্যর্দু [Coeurdoux: জন্ম ১৬৯৫, ভারতাগমন ১৭৩২; মৃত্যু ১৭৭৯]। মাকস্ ম্যুলার-এর ভাষায় he anticipated some of the most important results of comparative philology by at least fifty years.

গ্রীক, রোমীয় প্রভৃতি য়ুরোপীয়দের—এমন কি, একশো বছর ধরে পর্তুগীজদেরও—কোনো লেখায় বোধ হয় দেবভাষার অস্তিত্বের ইঙ্গিত নেই।

সংস্কৃতের প্রথম উল্লেখ করেছেন এক ইতালীয় বণিক, ফিলিপ্পো সাসেত্তি [মৃত্যু ১৫৮৮, গোয়াতে]। ১৫৮৫ সালে লিখিত এক চিঠিতে তিনি জানান: শাস্ত্রভাষা লিখতে ব্রাহ্মণদের Bramene: Bra মানে ঈশ্বর, mene মানে অনুধাবন] ছয় বছর লাগে। ভাষাটার ধ্বনিগুলি মধুর ও বিচিত্র: তার আছে ৫৩টি বর্ণ—মুখ ও জিভের সর্বপ্রকার ভঙ্গিতে উচ্চার্য। ঐ ভাষায় ওরা নাকি আমাদের যাবতীয় শব্দ অনায়াসে লিখতে পারে; আমরা কিন্তু উপযুক্ত বর্ণমালার অভাবে ওদের শব্দগুলির যথার্থ অনুলিখন করতে পারি না। আর সত্যি, ঐ ভাষার ধ্বনিগুলির উচ্চারণ আমাদের পক্ষে বড় কঠিন। কারণটা হয়তো এই যে, ওদের ও আমাদের জিভের 'উষ্ণতা' পৃথক: ওরা Betle নামে এক আশ্চর্য পাতা [আর Areca নামে এক ফল] চুনের সঙ্গে মিশিয়ে সারাদিন চিবিয়ে থাকে। ঐ পাতাটা এত সংকোচক যে, ওদের জিভ ও মুখ সর্বদাই শুষ্ক ও স্ফীত—আর আমাদের তো উল্টো।

ইতালীয়দের পক্ষে কঠিন উচ্চার্য বর্ণগুলো নিলেওদের সমগ্র ট-বর্গ [illegible]

যাবতীয় মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন। আর পাঠকের কৌতূহল প্রশমনার্থে জানাই, পান আমিও খেয়েছি কম নয়—মিষ্টি পান, এমনি পান, দোক্তা-দেওয়া কড়া পান—আর তবু দেখুন, আমার এই সাহেবি উচ্চারণের সামান্যতম উন্নতি হয়েছে বলে মনে হয় না।

সংস্কৃত নামটা সাসেত্তির আগে কোনো য়ুরোপীয় ব্যবহার করেনি। ১৫৮৮ সালে তিনি লেখেন: ওদের যাবতীয় শাস্ত্র Sanscruta [অর্থাৎ উত্তম-উচ্চারিত!] বলে এক ভাষায় রচিত। সেই ভাষা কবে চালিত ছিল কে জানে! আজকাল কিন্তু ওরা ওটাকে মৃতভাষা হিসেবে শেখে, আমরা যেমন শিখি লাতিন আর গ্রীক। সেই প্রাচীন ভাষা এবং আধুনিক ভারতীয় ভাষার মধ্যে সাদৃশ্য আছে খুব—এমন কি আমাদের ভাষার সঙ্গেও কিছুটা মিল আছে, যেমন sei—ষষ, sette—সপ্ত, otto—অষ্ট nove—নব......কিংবা Dio—দেব, serpe—সর্প ইত্যাদি।

গবেষণার সূত্রপাত

কিন্তু য়ুরোপীয়দের মধ্যে ফরাসি জেসুয়িটেরাই সর্বপ্রথম সংস্কৃত ভাষার [তাঁরা লিখতেন sam(ou)scroutam, Lingua samscrudamica sanscret এমন কি hanscret,] পণ্ডিতসুলভ অধ্যয়ন করেন। ত্রাঙ্কুবার-এর মিশনারী B. Schultze-ও ১৭২৫ সালে লিখিত এক চিঠিতে সংখ্যাবাচক সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে জার্মান ও লাতিন শব্দের সাদৃশ্যের উল্লেখ করেছেন।

সেই সব জেসুয়িটের নাম: মজাক-কালমেং [অথর্ববেদের আবিষ্কারক], বুশে [যাঁর মতে কন্যাকুমারী অর্থ হল 'কন্যাকা মারী'—কুমারী মারিয়া!]; পোঁস ওরফে দুপেৌ [যিনি—হ্যালহেডের বাংলা ব্যাকরণের ভূমিকায় উল্লিখিত — ধাতু-মস্তকের অর্থাৎ ধাতুসম্ভারের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন]; আর মোদুই, যিনি লিখেছেন: "বিজ্ঞদের ভাষা [অজ্ঞেরা যাকে বলে 'গ্রান্থনিক', বিজ্ঞেরা কিন্তু 'সংস্কৃত'] সত্যকার দেবভাষা; তার নিয়মাবলী উৎকৃষ্ট ও সুদৃঢ়; অল্পসংখ্যক লোকে তা বোঝে। ভাষাটা শিখতে অতিশয় কঠিন বটে, আর তবু বলি মিশনারীদের পক্ষে অতি উপযোগী, এমন কি আবশ্যক।"

ফাদার কার্দু

আর আছেন ফাদার কার্দু। তাঁর মতে, সংস্কৃত ভাষার অধ্যয়ন-পথে প্রধান অন্তরায় হল প্রতিশব্দের বাহুল্য—আর উচ্চারণ। আর সংস্কৃত বর্ণমালা? না, তাতে বিশেষ অসুবিধে নেই; লাতিন বর্ণ-মালাকে সাত-আটটি অক্ষরচিহ্ন যোগ দিয়ে দিলেই হল।

১৭৬৭ সালে তিনি ফ্রান্সে পাঠান তিনশতাধিক লাতিন-সদৃশ তথা গ্রীক-সদৃশ শব্দের তালিকা: মৃত, অগ্নি, রীতি, ধরা, মধ্য.........[mortuus, ignis, ritus, terra, medius...]; কোণ, ভার, মৌনী, মহা......[knos, baros, monos, mega...]। সংখ্যাবাচক শব্দ এবং ক্রিয়াপদের সাদৃশ্যও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। শব্দসাদৃশ্য অবশ্য কখনো-কখনো সম্পূর্ণ আকস্মিক হতে পারে, যেমন ধরুন বাংলা 'মশায়' [মহা-আশয়] এবং ফরাসি monsieur [আসলে mon—আমার, sieur—প্রভু], কিন্তু ব্যাকরণগত সাদৃশ্য এত সহজে ব্যাখ্যাত হয় না — উদাহরণ-স্বরূপ কার্দু উল্লেখ করেছেন: অস্মি, অসি, অস্তি [sum, es, est]; স্মঃ, স্থ সন্তি [sumus, estis, sunt]।

কার্দু আরও লক্ষ্য করেছেন, গ্রীকে যেমন, সংস্কৃতেও তেমনি আছে দ্বিবচন, মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন, নেতিবাচক তথা অতীত-কালসূচক আদ্যক্ষর 'অ' [সুর, অ-সুর, ভবামি, অ-ভবম], লক্ষ্য করেছেন ক্লীবলিঙ্গ নির্দেশক সংস্কৃত অম্-এর সঙ্গে লাতিন um এর সাদৃশ্য: দানম্, donum। তাঁর মতে ভাষাতুলনার ক্ষেত্রে স্বরবর্ণ নয়, ব্যঞ্জন-ই বিবেচ্য।

কার্দুর মন্তব্য সম্পূর্ণ ভ্রান্তিহীন নয় [মনু-কে তিনি 'মহা-নোয়া', অর্থাৎ বাইবেলের মহর্ষি নোয়া বলেছেন];

তামিল ভাষার কোনো কোনো বৈশিষ্ট্যকে তিনি সংস্কৃত বলে মনে করেছেন।

সাদৃশ্যের মূলে

ল্যাটিন-গ্রীক, এমন কি স্লাভ্ ভাষার সঙ্গে দেবভাষার সাদৃশ্যের বিভিন্ন সম্ভাব্য ব্যাখ্যা তিনি একের পর এক উত্থাপন ও খণ্ডন করেন।

য়ুরোপ ও ভারতের মধ্যে যে বাণিজ্য-জনিত যোগাযোগ ছিল, তা হিসেব-মালপত্র-নৌকা প্রভৃতি জাতীয় শব্দের সমুদ্রতীরে-আমদানির উৎস হতে পারে বটে; কিন্তু ঐ ধরনের শব্দসাদৃশ্য—নাবম, navem শব্দটি ছাড়া—খুব একটা মেলে না; অন্যদিকে বাণিজ্য সম্পর্কীয় নয় এমন অনেক শব্দ পাওয়া গিয়েছে—আর শুধু সমুদ্রতীরে কেন, দেশের অভ্যন্তরেই। এ ছাড়া য়ুরোপ ও ভারতের মধ্যে সেই বাণিজ্য খুব বেশি দূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল কি?

সাংস্কৃতিক যোগাযোগ হয়েছে। ধরে নেওয়া যাক, পিথাগোরাস্ প্রভৃতি য়ুরোপীয় মনীষী ভারতে এসেছিলেন বিদ্যালাভার্থে নয় নিশ্চয়ই, [illegible]। এদিকে ভারতীয় দার্শনিকেরা তো অহংকারী খুব..... তাঁরা এইসব বিদেশীর কাছে শব্দ ধার করতে যাবে কোন দুঃখে .....পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পদ, [illegible] দন্ত প্রভৃতি শব্দ তাঁদের ভাষায় কি ছিল না বিদেশীদের আগমনের আগে?

নিকটবর্তী দেশের মধ্যে শব্দ বিনিময় অনিবার্য—ফ্রান্স ও স্কটল্যান্ডের মধ্যে যেমন হয়। কিন্তু কোথায় ইটালি আর কোথায় [illegible].....তবু Seleucid সাম্রাজ্যের কথা যদি বলেন, তাহলে উত্তর দেব : ভারতে আমদানি করা [illegible]-সদৃশ শব্দগুলির জন্য তারা দায়ী হতে পারে না ওদের ভাষা যে ছিল গ্রীক!

কিন্তু ধর্মের প্রভাব?.....র [illegible] আগমনে কিছু কিছু হিব্রু শব্দ য়ুরোপীয় ভাষার মধ্যে প্রবেশ করেছে বটে, যেমন cherub, eden, gehenna, jubilee sabbat.....ভারত যেমনি ইসলামের কাছ থেকে কিছুটা শব্দ গ্রহণ করেছে—তা কিন্তু নামমাত্র।

সামরিক অভিযান?.....ধরুন, গ্রীকেরা একদিন সারা ভারতে রাজত্ব করেছিল—তবুও তাতে ভাষাগত ঋণের যথার্থ ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না। গ্রীকেরা যখন বর্বরতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন, ভারত তখনই শিল্প, বিজ্ঞান ও বাণিজ্যে সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছে।

তাই অবশিষ্ট ব্যাখ্যাটিই ঠিক : ব্রাহ্মণদের সেই সংস্কৃত ভাষা—[illegible] সনাতন আদিভাষা।

য়ুরোপীয় ও ভারতীয় ভাষার উৎস এক :

চিত্র প্রদর্শনী

গত বছর পুজোর সময়ে পর্যটন বিভাগ আয়োজিত ক্যালকাটা ফেস্টিভাল উপলক্ষে আকাডেমি কর্তৃপক্ষ কলকাতা ও দেশের নানা স্থানের বহু পুরানো গ্রাফিক চিত্রের প্রতিলিপি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। বলা বাহুল্য, তৎকালীন বিভিন্ন বিদেশী শিল্পীর আঁকা ছবিগুলি দর্শকমনে বিশেষ কৌতূহলের সৃষ্টি করে। ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছাড়া তদানীন্তন শিল্পকর্মের নিদর্শন হিসাবেও সেগুলির একটি বিশেষ মূল্য আছে। নিয়মিত দর্শকদের সুবিধার জন্য আকাডেমি কর্তৃপক্ষ গত বছরে প্রদর্শিত ছবিগুলির মধ্য থেকে কয়েকটি নির্বাচিত করে সম্প্রতি একটি স্থায়ী গ্যালারী স্থাপন করেন। গ্যালারীর অধিকাংশ গ্রাফিক প্রতিলিপিই শ্রী পরিমল মুখার্জির ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা থেকে আনা। ইতিপূর্বে আকাডেমিতে কার্পেট ও হস্তশিল্পের স্থায়ী গ্যালারী স্থাপিত হয়—সেই সঙ্গে পুরানো ছবিরও একটি স্থায়ী গ্যালারী স্থাপন করে আকাডেমি কর্তৃপক্ষ সকলের ধন্যবাদ ভাজন হলেন। পুরানো গ্রাফিক প্রতিলিপিগুলি নিয়ে ইতিপূর্বে লেখা হয়েছে, সুতরাং পুনরুল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। একটি বিশেষত্ব হল সুপরিচিত শিল্পী ডেসমণ্ড ডইগ-এর আঁকা কলকাতার পুরানো ঐতিহাসিক বাড়ী তথা বাসভবনের কালিকলমের কয়েকটি স্কেচ। গ্যালারীর পুরানো গ্রাফিক প্রতিলিপির মধ্যে জোহান জোফানীর কবরটি (১৭৮৬), কোলব্রুকের লেক নিয়ার সেরিঙ্গাপটম (১৭৯৩), লর্ড অকল্যান্ডের ভগিনী এমিলি ইডেন-এর নাচনের দল ও দুই পত্র (১৮৩৬), চার্লটার ক্রিটিনাস সিপস (১৮৫৮) ও স্যার চার্লস ডি'অয়লির সিরামপুর রোড (১৮৩০) উল্লেখযোগ্য। ডেসমণ্ড ডইগ-এর স্কেচগুলির মধ্যে রাজা নবকৃষ্ণের প্রাসাদ ও বিশেষ করে রাস্তার পাশে বিদ্যুৎস্তম্ভের তারের ওপর ঝুলন্ত একটি ছেঁড়া ঘুড়ি দেখে শিল্পীর অনুসন্ধিৎসু চোখের পরিচয় পাওয়া যায়।

✻

ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস-এর উদ্যোগে তাঁদের গ্যালারীতে শিল্পী বিমল ব্যানার্জির একটি গ্রাফিক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে শিল্পীর

সাম্প্রতিক গ্রাফিক ও ড্রয়িং-এর অনেকগুলি নিদর্শন দেখা যায়।

বিমল ব্যানার্জি তরুণ। কলকাতার ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে শিক্ষা শেষ করে তিনি কয়েক বছর দিল্লিতে কাজ করেন ও পরে ভারত সরকারের বৃত্তিলাভ করে দিল্লি আর্ট কলেজে খ্যাতনামা গ্রাফিক শিল্পী শ্রীসোমনাথ হোড়-এর কাছে গ্রাফিককলা শিক্ষা করেন। (জানি না, কেন ক্যাটালগে শিল্পী তাঁর নাম উল্লেখ করেন নি!)। পরে তিনি ফরাসী সরকারের বৃত্তিলাভ করেন ও ফ্রান্সে গ্রাফিকবিদ্যা শিক্ষা করেন। দু বছর পরে প্রাট বৃত্তিলাভ করে নিউইয়র্কের প্রাট গ্রাফিক সেন্টারেও গ্রাফিক কলা শিক্ষা করেন। বিমল ব্যানার্জি দেশে ও বিদেশে বহু প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন এবং ১৯৬৭ ও এই বৎসরও আকাডেমি পুরস্কার লাভ করেন।

ইতিপূর্বে, ও বিশেষ করে ১৯৬৭ সালে কলকাতার অলিয়াজ ফ্রাঁসেতে যাঁরা তাঁর প্রদর্শনী দেখেছেন তাঁরা শিল্পীর সাম্প্রতিক কাজে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ করবেন। প্রিন্টের মধ্যে নানা কারুকার্য ও রঙবৈচিত্র্য ছিল এককালে তাঁর বৈশিষ্ট্য। সাম্প্রতিক প্রিন্ট দেখে মনে হয় সূক্ষ্ম খোদাই কাজ অপেক্ষা প্রিন্টে গতিবেগের আভাস দেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য। কয়েক ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম ও গভীর ক্ষত অর্থাৎ ডিপ বাইটিং-এর সুন্দর সমন্বয় ঘটিয়ে শিল্পী প্রিন্টে তীব্র গতিবেগ সঞ্চার করেছেন। ফলে তির্যক রেখাসমন্বিত কোনও কোনও প্রিন্ট দেখে মনে হয় বুঝি বা কোনও রকেট মহাকাশ ভেদ করে তীব্র বেগে ছুটে চলেছে—যেমন এ ফর্ম স্পিরিচুয়াল। প্রিন্টখানি সত্যিই সুন্দর। প্রিন্টের জন্য অতি হালকা রঙ ব্যবহার করে শিল্পী সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। শিল্পীর রেখা ব্যবহারে নতুন চিন্তাধারার সন্ধান পাওয়া যায়। রেখাগুলি যেন
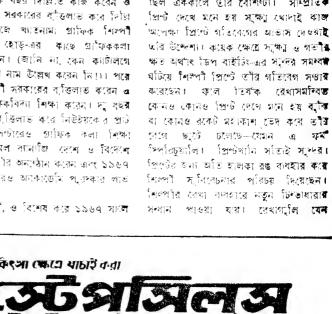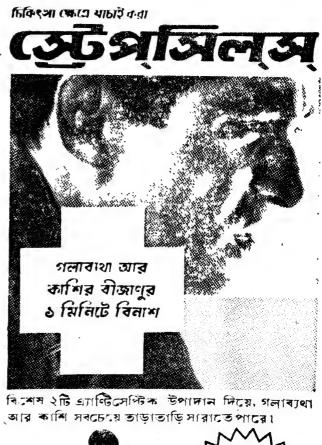
কার্ডিওগ্রাফজাতীয়—দেখে মনে হয় বুঝিবা এগুলি ঠিক শিল্পীর চিন্তাপ্রসূত নয়, যেন বিশেষ কোনও অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে শিল্পীর অগোচরে এই সূক্ষ্ম রেখাগুলি আপন খেয়ালে বিভিন্ন গতিপথ বেছে নিয়েছে এবং সেজন্যেই সূক্ষ্ম রেখাগুলিতে যেন চরিত্রগত বিশেষত্ব ফুটে উঠেছে। শিল্পীর প্রিন্টে সমকালীন নানা প্রয়োগ-কৌশল দেখা যায়। ড্রয়িংগুলিও মুখ্যত গ্রাফিক শ্রেণীর। এগুলি অ্যাকশন পেন্টিং—এবং হালকা রঙ যেন রচনাক্ষেত্রের ওপর তিনি বিছিয়ে ও ছড়িয়ে দিয়ে বিভিন্ন গ্রেন ও কারুকার্যের সৃষ্টি করেছেন। তার ওপর আছে গভীর তাৎপর্যময় কয়েকটি লম্বমান ও সমান্তরাল রেখার সুদৃঢ় ভিত্তি। এই প্রসঙ্গে স্পিরিচুয়াল নেচার-৫-এর নাম করা যায়। শিল্পী যে যত্নসহকারে গ্রাফিক-কলা তথা সমকালীন প্রয়োগকৌশল আয়ত্ত করেছেন তা তাঁর সাম্প্রতিক প্রিন্ট দেখে বোঝা যায়।

কালকাটা আর্ট সোসাইটি আয়োজিত লিওনার্দো দা ভিঞ্চি আর্ট ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে : বাঁদিক থেকে—ভি এন ভর্জি (অ্যাক্টিং ইটালিয়ান কনসুলেট জেনারেল), মিসেস রস, চিফ জাস্টিস পি বি মুখার্জী, মিঃ এইচ রস (কালচারাল কাউনসিলার—ইটালিয়ান এমব্যাসী (নিউ দিল্লি), ও জাস্টিস এন সি তালুকদার।

ফটো—প্রণব মুখার্জী

*

অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে উত্তরপাড়ার চেতনা-কলা বিজ্ঞান কেন্দ্রের পঞ্চম বার্ষিক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হল। প্রদর্শনীতে ছয়জন শিল্পীর ৩২টি রচনা নিদর্শন দেখা যায়। প্রথমেই একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। শিল্পচর্চা স্থল হিসাবে চেতনা কলা বিজ্ঞান কেন্দ্র উত্তরপাড়ায় পরিচিত এবং ইতিপূর্বেও এই সংস্থার বার্ষিক প্রদর্শনী দেখার সুযোগ হয়েছে। তবে এবারে কর্তৃপক্ষের কাছে আমার অনুরোধ যে, তাঁরা যেন ভবিষ্যতে ছবি নির্বাচন ব্যাপারে অধিক সচেতন হন। বাধ্য হয়ে একথা বলতে হল, কারণ বর্তমান প্রদর্শনীর বহু ছবি অনায়াসে বাদ দেওয়া উচিত ছিল। অধিকাংশই শিক্ষার্থীসুলভ কিন্তু প্রদর্শনী-ভুক্ত করতে হলে সে জাতীয় রচনারও একটি সাধারণ মানদণ্ড থাকে। শিল্পীদের মধ্যে মুকুন্দলাল ভাদুড়ীর কাজ দেখে মনে হয় তিনি নিয়মিতভাবে ছবি আঁকেন ও আঙ্গিকের বিষয়ে তিনি সচেতন। জলরঙে ছবিতে তিনি গাঢ় রঙ ব্যবহার করেছেন। সেই সঙ্গে তুলির ছোট ছোট টান ও আঁচড়ে রচনাক্ষেত্রে কারুকার্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। দু'একটিতে গগনেন্দ্রনাথের প্রভাব দেখা যায়—যেমন থ্রি ইন ব্লাক অ্যান্ড হোয়াইট। কয়েকটিতে আলংকারিক রূপ ফুটে উঠেছে, উদাহরণ হিসাবে কালি কলমে আঁকা কাঠের পুতুলজাতীয় আইকন্‌স-এর নাম করা যায়। অপরাপর ছবির মধ্যে লাস্ট ও অ্যাসপিরেশন উল্লেখ্য। ন্যাপ্রিয় রাহার রচনাও চোখে পড়ে, যদিও অ্যাকশন পেন্টিং হিসাবে এগুলির ওপর পোলকের প্রভাব দেখা যায়। লাল রঙের রেখাবৈচিত্র্য ও রচনাক্ষেত্রের কারুকার্যের জন্য উৎকণ্ঠিতা অনেকের নজরে পড়ে। পুরোভাগে কোলাজ জাতীয় নারীমূর্তি স্থাপন করে নীল, সবুজ ও লাল রঙ সমানভাবে ছড়িয়ে দিয়ে শিল্পী এটির মধ্যে বৈচিত্র্য দান করার চেষ্টা করেছেন। শচীন ব্যানার্জি রঙ ও রেখা সহযোগে মিনিয়েচার জাতীয় ছবি এঁকেছেন। চতুষ্কোণের রচনা হিসাবে মাইসেলফ মন্দ লাগে না। অন্যান্য রচনার মধ্যে [illegible] জাপানী প্রথায় আঁকা দি ওয়েভ [illegible] ও দিলীপ মুখার্জির ওয়ার্ক-এর নাম করা যায়। [illegible] চট্টোপাধ্যায়ের হাত অন্যান্য শিল্পীদের তুলনায় কাঁচা। তাঁর রচনা ও স্কেচের মধ্যে প্রাকৃতিক চলনসই।

*

শিল্পকলার কেন্দ্রস্থল হিসাবে কলকাতা শহর সুধীমহলে সুপরিচিত। চিত্রকলা চর্চা তথা ঐতিহ্যের দিক থেকে দেশের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই শহর একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। অথচ সকলে স্বীকার করবেন যে, সেই অনুপাতে এই শহরে আর্ট গ্যালারীর সংখ্যা নিতান্তই অল্প। শহরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে কোনও গ্যালারী নেই বললেই চলে। অন্য স্থলে যে দু'একটি আছে তাও প্রায় সব সময় পাওয়া যায় না। তা ছাড়া সাধারণ মধ্যবিত্ত শিল্পীদের পক্ষে সেগুলি ব্যয়সাপেক্ষ। এই অসুবিধাটুকু দূর করার জন্য শিল্পী সুভাষ সিংহ রায় ধর্মতলার কাছে সাকলাত প্লেসে একটি নতুন গ্যালারী স্থাপন করেছেন—গ্যালারী ইউনিক। উদ্বোধন করেন ম্যাক্সমুলার ভবনের নতুন অধিকর্তা ডাঃ ওহ্‌লাউ। নতুন গ্যালারীর প্রথম শিল্পী হিসাবে সুপরিচিত শিল্পী সুনীল দাস এখানে তাঁর সাম্প্রতিক রচনার একক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন। নতুন গ্যালারীর উদ্বোধন উপলক্ষে বহু শিল্পী, কলা-সমালোচক, অভিনেতা ও সিনেমা পরিচালক উপস্থিত ছিলেন।

—চিত্রপ্রিয়

একক-এর শততম সংখ্যা

শুদ্ধসত্ত্ব বসু সম্পাদিত 'একক' কবিতা পত্রিকার ১০০টি সংখ্যা পূর্ণ হয়েছে. সেই উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছে একটি নির্বাচিত সংকলন। এবং একটি অনুষ্ঠান হলো ইনফরমেশন সেনটারে।

বাংলা দেশে কবিতার পত্রিকা বেরোয় অনেক, মরে যায় খুব তাড়াতাড়ি। সেই হিসেবে একটি পত্রিকা দুই যুগ ধরে ক্রমাগত প্রকাশিত হয়ে আসছে। এটা কম কথা নয়, এবং এই জন্য শুদ্ধসত্ত্ব বসুকে কবিতা প্রেমিকরা নিশ্চিত কৃতজ্ঞতা জানাবেন। এর আগে বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত **"কবিতা"** এবং সুশীল রায় সম্পাদিত **"ধ্রুপদী"**রও একশো সংখ্যা বেরিয়েছে। **কিন্তু সাহিত্যের** জগতে কোনো প্রতিযোগিতা নেই—"একক"-এর কৃতিত্বও আগের দুটির সমান।

ইনফরমেশন সেনটারে এই শতপূর্তি উৎসবের উদ্বোধন করেন রাধারাণী দেবী। ভাষণ দিয়েছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, কালীকিংকর সেনগুপ্ত, সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। শুদ্ধসত্ত্ব বসু "একক"-এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানটি খুবই মনোজ্ঞ হয়েছিল তবে, অন্তত দু'একজন তরুণ কবিকে মঞ্চে দেখতে পেলে আরও ভালো লাগতো।

ইংরেজিতে ভারতীয় কবিতা

"রূপাম্বরা" পত্রিকার সম্পাদক স্বদেশ ভারতী ইংরেজিতে ভারতীয় কবিতা প্রকাশের গুরুভার স্বয়ং নিয়েছেন। হাতে এলো তিনটি খণ্ড—একটি 'ইনটারন্যাশনাল পোয়েট্রি নামবার', আর দুটি ইংরেজিতে তেলেগু ও মারাঠী কবিতার সংকলন। সব কটিরই সম্পাদনা করেছেন স্বদেশ ভারতী। স্বদেশ ভারতী কলকাতাতে থাকেন, পত্রিকাও প্রকাশ করেন কলকাতা থেকে, ইংরেজি পত্রিকা, নিজে হিন্দীভাষার কবি।

ইনটারন্যাশনাল পোয়েট্রি নামবার-এ ভারতীয় কবিতার প্রতিনিধিত্ব করেছে শুধু হিন্দী কবিতা। কোনো আপত্তি নেই। কবিতাগুলো ভালো হলেই হলো। তবে, হিন্দী কবিতার মর্মরস ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে গ্রহণ করার ক্ষমতা আমার অন্তত নেই। বুলগেরিয়ান কিংবা সার্বো ক্রোয়াশিয়ান কবিতাগুলো ঠিক কিরকম, তাও বুঝতে পারলুম না—তবে, রাশিয়ান কবিতা যে-কটি আছে, সবই পুরোনো। খ্যাতিমান তরুণ ইয়েফতুশেংকো বা ভজনেসেনস্কি বাদ। সাগেই এসেনিনের রচনায় যে উর্দু কবিতার ফ্রিজেস আছে, আগে জানা ছিল না, পরিচিতি দেখে জানলাম। আমেরিকান কবি হিসেবে হাওয়ার্ড ম্যাককউ ইত্যাদি যে তিনজন রয়েছেন, তাঁরা অত্যন্ত বাজে কবি হিসেবে প্রায় প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছেন। ইংরেজি কবিতা লিখেছেন পি লাল, প্রতীশ নন্দী, নিসিম ইজকিয়েল, কাম্‌লা ডাস্। সংকলনটি বেশ এলোমেলো, আর একটু মনোযোগ দিয়ে করলে ভালো হতো।

মারাঠী ও তেলেগু সংকলন দুটি বেশ ভালো। মারাঠী কবিতার অনুবাদ করেছেন প্রভাকর মাচওয়ে। সংক্ষিপ্ত ভূমিকাটি সুলিখিত।

তেলেগু সংকলনটি উৎসর্গ করা হয়েছে দিগম্বর কবুলুদের। দিগম্বর কবুলুদের কথা আগে একটু একটু শোনা ছিল—এবার পড়ে চেনা গেল। কথাটার মানে 'নগ্ন কবি'। এঁদের কবিতা পাঠের সময় নাকি খুব ভিড় হয়। কবিতা পড়ার সময় এঁরা উলঙ্গ হয়ে থাকেন কিনা, সেটা জানতে চাইছিলাম, তাহলে কিছুটা নতুনত্ব হতে পারতো। সে কথা উল্লেখ করা নেই। এরা তেলেগু সাহিত্যের ট্রাডিশানের বিরুদ্ধে একটা আপোসহীন সংগ্রাম শুরু করে, সব কিছু ভেঙে চুরে নতুন সাহিত্য তৈরী করতে চান। এসব অবশ্য নতুন কথা নয়। তবে, নতুনত্ব এই যে, এই দলের ছজন কবি নিজেদের নাম পরিত্যাগ করেছেন—কারণ, নামের মধ্য দিয়ে জাতি, ধর্ম ইত্যাদি ফুটে ওঠে। ছজনের একটি দল গঠন করে—এঁরা ছজনেই ছদ্ম নাম নিয়েছেন—নগ্নমুনি, নিখিলেশ্বর, জ্বালামুখী ইত্যাদি। কবিতার বই প্রকাশ উপলক্ষে এরা ভিড়ের রাস্তার মাঝখানে রিক্‌শাওয়ালা, হোটেলের বয়, ভিখারিনী প্রভৃতিকে দিয়ে বই উদ্বোধন করান। তা তো হলো, কবিতাগুলো কিরকম? ভারতীয় কারুর কবিতা অন্য কোনো ভারতীয় ইংরেজিতে অনুবাদ করলে যে-রকম পড়তে লাগে, সেইরকমই। মাঝে মাঝে দু'চারটে অসভ্য শব্দ আছে—অনুবাদক এরকম দাবি করেছেন। আমার চোখে তো সেরকম শব্দ পড়লো না।

মণীন্দ্র রায়ের সম্বর্ধনা

এবার সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন মণীন্দ্র রায়, সেই উপলক্ষে তাঁর অনুরাগীরা একটি সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেছিলেন স্টুডেন্টস হলে, ১১ এপ্রিল, শনিবার। আহ্বায়ক ভবানী মুখোপাধ্যায়, কমল চৌধুরী, সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ।

বিদুর প্রসঙ্গে

সাহিত্য সংবাদ বিভাগে আমার পূর্বসূরী ছিলেন 'বিদুর', পাঠকরা সবাই সে কথা জানেন। আমার মতন অযোগ্য ব্যক্তির হাতে এরকম একটি গুরু দায়িত্ব দিয়ে আপাতত তিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন। বিদুর ছদ্মনামের আড়ালে যিনি আছেন, তাঁর স্বনামের লেখা পাঠকরা নিয়মিত উপহার পাচ্ছেন—কিন্তু ছদ্মনামের রহস্য ফাঁস করা রীতিবিরুদ্ধ তাই আমি তাঁর আসল নাম জানালাম না।

যাই হোক, সম্প্রতি একটি রাজনৈতিক

বইয়ের গ্রন্থকার হিসেবে বিদুরের নাম ঘোষিত হয়েছে। পাঠকদের জানানো দরকার এই বিদুর নামধেয় লেখক সম্পূর্ণ পৃথক ব্যক্তি। পাঠকদের পরিচিত বিদুর সাহিত্য সংবাদ বিভাগের শুরু থেকে শুধু দু' বছরের বেশী সময় ধরে প্রতি সপ্তাহে সাহিত্যের নানা বিষয়ে লিখেছেন, রাজনীতি নিয়ে কখনো লেখেননি—রাজনীতি তাঁর বিষয় নয়।

আজকাল আসল নামই অনেক জাল হচ্ছে। ছদ্মনাম সম্পর্কে আর বিশেষ কি বলবো। একই ছদ্মনাম দুই ব্যক্তি ব্যবহার করতে পারেন কিনা—এ সম্পর্কে আইনের ব্যাখ্যা জানি না, তবে নৈতিক দিক থেকে এটা নিশ্চিত অশোভন। তা ছাড়া, একজনের ছদ্মনাম আর একজনের ব্যবহার করার ব্যাপারে আত্মসম্মানের প্রশ্নও তো জড়িত।

সনাতন পাঠক

ধর্ম ও দর্শন

'নাম-মাধুরী' ভজন ও কীর্তন-মাধুরী। রচয়িতা সাধকপ্রবর বঙ্কিমচন্দ্র সেন। মূল্য আট টাকা। প্রকাশক—শ্রীরাইমোহন আচার্য। ৩।৩২, সি আই টি বিল্ডিংস, কলিকাতা-১০।

ভক্ত শ্রেষ্ঠ, সাধক শ্রেষ্ঠ, গুরুশ্রেষ্ঠ, পুণ্যশ্লোক বঙ্কিমচন্দ্র সেন বিরচিত 'নাম-মাধুরী' নামক গ্রন্থটি সর্বদিক থেকেই একটি অভিনব, অত্যাশ্চর্য, অতুলনীয়, অপরূপ সৃষ্টি। কারণ, সার্থকনামা এই রমণীয় রসঘন গ্রন্থটি একটি সাধারণ ধর্মপুস্তক মাত্রই নয়; কিন্তু ঈশ্বরোপলব্ধ ধন, মুক্তাত্মার হৃদয়নিঃসৃত অমৃতনির্ঝর প্রেম-প্রস্রবণ, মধুধারা পরিপূর্ণভাবে। সেজন্য এই যুগোপযোগী মহাগ্রন্থটি পাঠে দেশ-বিদেশের সহস্র সহস্র মুমুক্ষুজন শাশ্বত শান্তি লাভ করবেন, মুক্তির অমল-অনিন্দ্য আনন্দের আস্বাদ লাভ করবেন, দুরূহ সাধন পথের নির্দেশ লাভ করবেন—তা নিঃসন্দেহ।

আমাদের ভারতীয় দর্শনে মোক্ষলাভের জন্য বহু বিবিধ বিচিত্র পন্থার উল্লেখ আছে। বিভিন্ন বিভিন্ন মুমুক্ষু স্ব স্ব রুচি ও শক্তি অনুসারে সেই সকল পন্থা অনুসরণ করে। আনন্দ রসঘন মোক্ষ লাভে কৃতকৃতার্থ হতে পারেন। সেই সকল পন্থা বা সাধনের মধ্যে একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধন হল "নাম-সাধন" যেহেতু আমাদের বরণো বৈষ্ণব শাস্ত্রানুসারে 'নাম' ও 'নামী' অভিন্ন এবং সেজন্য 'নামের' চিন্তন, 'নামের' ভজন, 'নামের' পূজন—'নামী' বা পরমেশ্বরেরই ভজন, পরমেশ্বরেরই পূজন। এই 'নাম-সাধনের' শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এই অপূর্ব সাধনটি একটি সার্বজনীন, সর্বজনবোধ্য, সর্বজনসাধ্য সাধন। সাধারণত আমাদের ভারতীয় শাস্ত্রে তিনটি প্রধান মোক্ষমার্গের নির্দেশ পাওয়া যায়—জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ। কিন্তু এই তিনটি মার্গ বা যোগই আমাদের মত সাধারণ জনদের সাধ্যাতীত হতে পারে এবং হয়ও তা প্রায়ই। কিন্তু 'নাম-মার্গ' কারো পক্ষেই বিন্দুমাত্রও কঠিন নয়—উচ্চ নীচ, পণ্ডিত-মূর্খ, ব্রাহ্মণ শূদ্র, নর-নারী নির্বিশেষে সকলেরই আছে এতে সমান অধিকার, সমান কৃতিত্ব, সমান সার্থকতা, সমান আনন্দ। সেজন্য বর্তমান যুগে—যখন সুকঠিন জীবন-সংগ্রামে 'ক্লিষ্ট-পিষ্ট' এবং নিত্য-নৈমিত্তিক অন্নবস্ত্রের সমস্যায় জর্জরিত আমরা ধর্মসাধনার জন্য অধিক সময় ব্যয় করতে পারি না—তখন এই সহজ-সরল-

...ন্দ্রের নামসাধনাই ত আমাদের একমাত্র ভরসা। কেবল তাই নয়, এই অনুপম নাম-সাধনার মাধ্যমে একাধারে অন্যান্য সাধনেরও পূর্ণফল লাভে আমরা পরিশেষে ধন্যাতিধন্য হব—পাব পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানেরও অনির্বাণ আলোক, পাব পূর্ণ ঈশ্বর-ভক্তিরও অফুরন্ত রস-ধারা, পাব পূর্ণ ঈশ্বরসেবারও অনন্ত আনন্দ সুনিশ্চিত। সেই সঙ্গে পাব বিশ্ব-প্রীতি—বিশ্বমৈত্রী—বিশ্বশান্তিরও মহিমময় —মঙ্গলময়—মধুরিমময় মহামন্ত্র—যেহেতু পরমেশ্বরের মূর্ত্ত রূপ মানবের পূজাই ত ঈশ্বরের পূজা, মানবের সেবাই ত ঈশ্বরের সেবা, মানবে প্রীতিই ত ঈশ্বরে প্রীতি। বর্তমান পরিস্থিতিতে এরূপ প্রীতি-মৈত্রী-শান্তির প্রয়োজনই আমাদের সকলের সর্বাধিক। সেজন্য মহাসাধক বঙ্কিমচন্দ্র সেন আমাদের জন্য এই অপূর্ব, অতি সময়োপ-যোগী, অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থটি রচনা করে আমাদের চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। সকল স্তরের, সকল শ্রেণীর, সকল সম্প্রদায়ের, সকল জনের অবশ্যপাঠ্য ও নিত্য ধ্যের এই সুন্দর গ্রন্থটির বহুল প্রচার বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

(৫)

প্রাপ্তি স্বীকার

প্রেমের রং ময়ূরকন্ঠী। আমিয়া চক্রবর্তী। রূপা অ্যান্ড কোম্পানী : ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৫·০০।

আমার দৃষ্টিতে শ্রীঅরবিন্দের দি লাইফ ডিভাইন (১১-১২ অধ্যায়)। শ্রীশম্ভুনাথ ভদ্র। চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স : ১/১/১এ-বি বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

চন্দ্রে ভ্রমণ রহস্য। শ্রীসত্যেন মুখোপাধ্যায়। মাণিকপুর, মেদিনীপুর। মূল্য ০·৫০ পয়সা।

অরণ্যে দিন বদলাচ্ছে। অর্ধেন্দু চক্রবর্তী। মুক্তপত্র প্রকাশনী : বি ৪৮ রবীন্দ্রনগর, কলিকাতা-১৮। মূল্য ০·৫০ পয়সা।

Fifteen Longer Poems of Rabindranath Tagore: Translated by: Rabindranath Choudhury. 125 Satyanagar, Bhubaneshwar-7, Orissa. Price Rs. 27.00.

সনেট সপ্তক অথবা অভিমান। শ্রীহরিনারায়ণ রায়। শিক্ষক প্রগতি বিদ্যা ভবন : আগরতলা, ত্রিপুরা। মূল্য ৩·০০।

গান্ধী। রম্যাঁ রলাঁ। অনুবাদ : লোকনাথ ভট্টাচার্য। সাহিত্য অকাদেমী : রবীন্দ্র ভবন, ফিরোজ শাহ্‌ রোড, নিউ দিল্লী-১। মূল্য ৮·০০।

(২৯৯১৫)

কৃতীর ক্রীড়া-ভূমিকা

কলকাতার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের এক বিরাট এলাকা নিয়ে যেমন ভাগ্যকুলের রায় পরিবারের শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে আছে, তেমন খেলার মাঠে ছড়িয়ে আছে ওই পরিবারের বহু কৃতী খেলোয়াড়।

আমরা জানি ইস্টবেঙ্গল ক্লাব সৃষ্টির মূলে ওই পরিবারের অবদান অনেকখানি এবং ভাগ্যকুলের রায় বাহাদুর তড়িৎভূষণ রায় ছিলেন ক্লাবের প্রথম যুগ্ম সম্পাদক। আবার এ-ও জানি আজ মোহনবাগান ক্লাবেরও সভাপতি ভাগ্যকুলের কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়। শুধু মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল কেন, স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাব, টাউন ক্লাব, কুমারটুলি ক্লাব, হাইকোর্ট ক্লাব প্রভৃতি অনেক ক্লাবেই ভাগ্যকুলের রায় পরিবারের ক্রীড়াদক্ষতার স্বীকৃতি। তার মধ্যে বোধ করি স্পোর্টিং ইউনিয়নই ওঁদের কীর্তিতে বেশী সমুজ্জ্বল। কারণ, এই ক্লাব ভারতকে যে দুজন টেস্ট খেলোয়াড় উপহার দিয়েছে সে দুজনই ভাগ্যকুলের রায় পরিবারের সন্তান। সবাই জানেন এ দুজনের নাম পংকজ রায় এবং অম্বর রায়।

ক্রিকেট খেলায় পংকজ ও পংকজের ভ্রাতুষ্পুত্রের এতখানি প্রতিষ্ঠার মূলে অবশ্যই ওদের অনুশীলন অধ্যবসায় এবং সাধনার কথা অনস্বীকার্য। তবু, ওদের ক্রিকেট প্রীতির উৎস সন্ধান করতে হলে আরও দু' এক পুরুষ পেছনে দৃষ্টি ফেরাতে হয়।

ভারতের প্রখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় বিজয় মার্চেণ্ট বলেছেন, ইডেনের ঘাসে ঘাসে ক্রিকেটের গন্ধ লেগে আছে। অতীত দিনের নামকরা ক্রিকেট খেলোয়াড় এবং বর্তমানে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীকিরণলাল রায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ওঁদের বাড়িতেও সেদিন এমন একটা ক্রিকেটের গন্ধ পেলাম। ক্রিকেটের সাজ-সরঞ্জামে ক্রিকেটের আলোচনায় এবং ক্রিকেটের গন্ধে ভরপুর ৮বি অভয় মিত্র স্ট্রীটের ওই বাড়ি পুরুষানুক্রমে ক্রীড়ানুরাগী, বিশেষ করে ক্রিকেট অনুরাগী।

পংকজ, অজিত, গোবিন্দ, অম্বর, গোপাল, রতন, রবীন—এমন কি পংকজের বারো-তেরো বছরের পুত্র ফুচাকে নিয়ে এখন ওই বাড়ি থেকে একটি ক্রিকেট টীম বার করা যেতে পারে। অতীতে পূর্বসূরীদের নিয়েও হয়তো একটি টীম তৈরি করা যেত।

পংকজের পুত্র ফুচা বা অজিতের পুত্র অম্বর যেমন বাবা কাকার কাছ থেকে খেলার অনুপ্রেরণা পেয়েছে তেমন জাস্টিস কে এল রায়ও খেলাধুলার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন বাবা-কাকাদের কাছ থেকে।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাব সৃষ্টির আগে ভাগ্যকুলের রায়েদের উদ্যোগে কুমারটুলী অঞ্চলে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব নামে একটি ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এবং তড়িৎভূষণ রায়, জাস্টিস রায়ের বাবা ননীলাল রায়, কাকা ক্ষীরোদ লাল রায় (পংকজ রায়ের বাবা) ও রঙ্গলাল রায় প্রভৃতি ছিলেন সে ক্লাবের

বিচারপতি কে এল রায়ের ক্রিকেট জীবনের ছবি

পুরোধা এবং প্রথম সারির খেলোয়াড়। পরে অবশ্য এঁরা কুমারটুলি পার্ক ছেড়ে গিয়েছেন বড় ইস্টবেঙ্গলের মাঠে। কিরণলালও গিয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে। তবে কিরণলালের ব্যাট-বলে হাত পেকেছে প্রেসিডেন্সী কলেজ মাঠেও একই সময়। শুধু ক্রিকেটের ছোট বলে নয়, বড় বলেও। ফুটবলে ছিলেন গোলকিপার।

১৯২৫-২৬ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গলে খেলে ব্যারিস্টারী পড়বার জন্য বিলেত গিয়েও খেলার চর্চা ছাড়েননি। খেলতেন উত্তর-পশ্চিম লণ্ডনের এজওয়ার ক্লাবে। ১৯৩৫-এ দেশে ফিরে আবার ইস্টবেঙ্গলে এবং আটত্রিশে টাউন ক্লাবে।

তখনকার দিনে লীগ বা নক আউট ক্রিকেট ছিল না। শনিবার রবিবার এবং ছুটির দিনে ক্লাবে ক্লাবে খেলা হত। জাঁদরেল টীম ক্যালকাটার বিরুদ্ধে ইডেনে সেঞ্চুরি করার পৃথক মর্যাদা ছিল। নিজের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলতে অনিচ্ছুক জাস্টিস রায় সম্বন্ধে শুনেছি ওঁর বহু সেঞ্চুরির মধ্যে পর পর তিন বছর ইডেনে সেঞ্চুরি করা এক দুর্লভ কৃতিত্ব। পুরনো দিনের খেলোয়াড়রা বলেন, ব্যাটিং-এর ছিল কারেক্ট টেকনিক—বিশেষ করে ফ্রন্ট অব দি উইকেটে মার ছিল চোস্ত। সুইং বোলার হিসাবে সুনাম কিনেছিলেন।

কিন্তু গুণী খেলোয়াড় হিসাবে পরিচয়ের চেয়ে খেলোয়াড়ের গুণই ছিল ওঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং সেখানেই উনি সার্থক ক্রিকেটার।

ওঁর খেলোয়াড় জীবনের বন্ধু অ্যাডভোকেট জেনারেল শ্রীস্নেহাংশুকান্ত আচার্য বলছিলেন, 'অনেক বড় খেলোয়াড় দেখেছি কিন্তু মহাদেবের (জাস্টিস রায়ের ডাক নাম) মত সত্যিকারের স্পোর্টসম্যান বেশী দেখিনি। কোনদিন দেখিনি আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে কণামাত্র সন্দেহ প্রকাশ করতে। বরং এল বি ডবলিউ বা ক্যাচের ক্ষেত্রে আম্পায়ার আউট দিতে দ্বিধা করলে কিরণ নিজেই ক্রিজ ছেড়ে চলে গেছে কিংবা পরে উইকেট থ্রো করেছে লোফ্ফা ক্যাচ তুলে দিয়ে।'

মোহনবাগান ও টাউন ক্লাবের খেলার একটি ঘটনা বললেন স্নেহাংশুকান্ত আচার্য।

'খেলা শেষ হতে মিনিট পনেরো বাকি। আমাদের অর্থাৎ টাউনের হার নিশ্চিত। অধিনায়ক কিরণই শেষ উইকেটে ব্যাট করছিল। বীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী ছিলেন টাউন ক্লাব-গত প্রাণ। হার সহ্য করতে পারতেন না। তিনি হঠাৎ সমাপ্তি সূচক ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেন। কিরণ ক্রিজ ছেড়ে এসে দেখে তখনো সময় বাকি রয়েছে। আবার সবাইকে ডেকে নিয়ে খেলতে গেল এবং খেলায় হার স্বীকার করল।'

জাস্টিস রায় নিজে বলছিলেন, 'আমরা যখন খেলতাম বয়োজ্যেষ্ঠ খেলোয়াড়দের বড় ভাইয়ের মত শ্রদ্ধা ভক্তি করতাম, অধিনায়ককে গুরুর মত ভয় করতাম, বিনা প্রতিবাদে তাঁদের আদেশ পালন করতাম। খেলা ছিল জীবনের আনন্দ, খেলার মাঠ ছিল শিষ্টাচারের অঙ্গন।

জাস্টিস রায় পরে হাইকোর্ট ক্লাবেও ক্রিকেট টেনিস খেলেছেন, এন সি সি ক্লাবেও খেলেছেন। কিন্তু গত ১০ বছরের মধ্যে খেলার মাঠে যাননি। কারণ হয়তো সহজেই বোধগম্য।

— মুকুল

অরণ্যদেব

লী ফক

ঝুলন্ত দড়ির সাহায্যে নদী পার হচ্ছেন অরণ্যদেব .....
ভারী মজা, তাই না?
হুঁ।
নদীর ওপারে জুম্বার পিঠে বসে ওরা লক্ষ্য করছে—

...সেকেন্ডের মধ্যেই...

অরণ্যদেব এ-পারে এসে পৌঁছে গেলেন।

শিক্ষাপাস্ত্রি-পিওন এই চিঠি এনেছে!
তোদের তো দেখছি দারুণ সাহস। এই জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এতটা পথ চলে এসি...

আমাদের একবার ...-দ্বীপে নিয়ে চলো না!
যাব। তবে নদী পার হবার সময় সাবধান। আর্কাদি, পিরানহা মাছ না পায়ের আঙুল খেয়ে নেয়!
হুম, এ যে দেখছি কর্নেল ওরুরুর চিঠি!
সীমান্ত-প্রহরী।
8/24
* অরণ্যদেবকে রাজা বলে ওয়াকার মানে

JUNGLE
HEADQUA
সীমান্ত-প্রহরী বাহিনীর অধিনায়কের সমীপে

উঁদের বলেছি, অনুমতি দেওয়া কেন সম্ভব নয়।
যেতে আমাদের হবেই। বিজ্ঞানের এক বিরাট রহস্য উদ্‌ঘাটন করব আমরা।
ও-এলাকায় দস্যুদলের ছড়াছড়ি। একদল নিরীহ অনুমতি দেওয়া নতুন নয়।

বাধা আপনি দিতে পারেন না, কর্নেল। ও-জায়গা আপনার এক্তিয়ারের বাইরে।
নিজেকে রক্ষা করবার ক্ষমতা আমাদের আছে।

'আমার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে তার দুদিন বাদেই তাঁরা হেলিকপ্টার নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন .....'
বিজ্ঞানের বিরাট রহস্য?

জন ওয়েন ও ম্যাগি স্মিথ

নিরর্থক ওই বিদেশী-বিদেশিনীর ছবিগুলি। রাস্তার ছেলের দিনযাপনের গ্লানি, আক্রোশ, সাধ ও সততা দেখাতে গিয়ে ওই সাহেব-মেমদের টেনে আনা কেন? পরিচালকের বক্তব্য দুর্বোধ্য নয়। সম্ভবত উচ্চবিত্ত, পুঁজিবাদী সমাজের চেহারা ও বিলাস বৈভব তিনি সর্বহারার জীবনের পাশাপাশি রেখেছেন। শ্রেণী-বৈষম্য দেখানোই যখন ছবিটির বিশেষ উদ্দেশ্য তখন পরিচালক অবশ্যই বিদেশীদের ডেকে এনে তাঁদের গায়ে কাদা ছিটোতে পারেন। কিন্তু তাতে ছবির বক্তব্য খুব শক্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে কি?

ছবিতে একটি সংলাপই আছে—'রাবিশ'। ওই ছেলেটি যখন বড়লোকের গাড়িতে আমের আঁটি ছুঁড়ে ফেলে তখন যাদের গাড়ি তাদেরই একজন, একটি মেয়ে বলে ওঠে "রাবিশ"। খুব সহজে বলেছি, গাড়িতে নোংরা বস্তু ছুঁড়ে মারলে যে-কোন লোকই তা বলতে পারে। এই 'রাবিশ' কথাটিই পরিচালক চাবুকের আওয়াজের মত বার বার আমাদের শুনিয়ে দিয়েছেন। বড়-লোক সমাজ যে গরীবের জীবনকে 'রাবিশ' বলে সেটাই হয়ত পরিচালকের অভিযোগ। কিন্তু পরিচালক তাঁর বক্তব্য আরও বিশ্বাস-যোগ্য ভাবে উপস্থিত করতে পারতেন। ছেলেদের প্রকৃতিতে আক্রোশ বা 'স্যাডিজম' থাকতেই পারে। বড়লোকের ছেলেদেরও থাকে, তবে তার প্রকাশ ভিন্ন ধরনের। এক্ষেত্রে পরিচালক গরীব ছেলের অসহায়তার দুঃখ বা প্রতিবাদ জানাই দেখিয়েছেন। এবং এর পর যে-কোন লোকের রাবিশ বলাই স্বাভাবিক, দোষ দেবার কিছু নয়।

শ্রেণী-বৈষম্যের ছবি 'লেটেন্ট'। এটাকে বক্তব্যের দিক থেকে এক্সপেরিমেন্টাল বলা যায় না, কারণ এই বক্তব্য ফিল্মে বা নাটকে মোটেই নতুন নয়। আঙ্গিকের দিকে এক্সপেরিমেন্টাল কি? হলে আমাদের বিভিন্ন দেশের আধুনিক চিত্র যাঁদের দেখা তাঁদের কাছে এই ছবির টেকনিক অভিনব মনে হবে না। বরঞ্চ টেকনিকের অপব্যবহারই তাঁদের পীড়া দেবে।

তবু বলি অনেক দৃশ্যগঠনে পরিচালকের কৃতিত্ব আছে, একটা স্টাইলের পরিচয়ও পাওয়া যায়। রামানন্দ সেনগুপ্ত ও পিণ্টু দাশগুপ্তের ক্যামেরার কাজও উচুদরের। এই ইউনিট আরও ভাল ছবি করতে পারেন।

অস্কার পুরস্কার (১৯৬৯)

হলিউডের অস্কার প্রতিযোগিতায় ১৯৬৯ সনের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হিসাবে পুরস্কার পেয়েছে **মিড নাইট কাউবয়**। জন শেলেসিঙ্গার পরিচালিত এই ছবি একাধিক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রশংসা অর্জন করে। পরিচালক শেলেসিঙ্গার শ্রেষ্ঠ পরিচালনার জন্য পুরস্কৃত। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সম্মান পেয়েছেন যথাক্রমে জন ওয়েন (ট্রু গ্রিট) এবং ম্যাগি স্মিথ (দ্য প্রাইম অব মিস জন ব্রডি)।

লস এঞ্জেলসের মিউজিক সেণ্টার হলে অস্কার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বব হোপ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। টেলিভিশনে সারা পৃথিবীর প্রায় ২৫ কোটি চিত্রামোদী এই অনুষ্ঠান দেখেন।

"ট্রু গ্রিট" ছবিতে জন ওয়েনের একটি চোখে ঠুলি ছিল। এক মারশালের ভূমিকায় তাঁর অভিনয়—ওই মারশালের একটি চোখে ঠুলি। পুরস্কার পেয়ে জন ওয়েন বলেন, "আগে জানলে ওই ঠুলিটা আরও পঁয়ত্রিশ বছর আগেই পরতাম।" ম্যাগি স্মিথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি। চিত্রতারকাদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান জ্বল জ্বল করছিল। এলিজাবেথ টেলর এসেছিলেন তাঁর পঞ্চাশ লক্ষ ডলারের নেকলেস পরে। অন্য যাঁরা অস্কার পুরস্কার পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—বারট বাকারাক—শ্রেষ্ঠ আবহ-সুরকার ও শ্রেষ্ঠ গানের সুর রচয়িতা; গিগ ইয়াং—শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা ("দে শুট হরসেজ, ডোণ্ট দে"?); গোলডিজ হন ("ক্যাকটাস ফ্লাওয়ার")। "মিডনাইট কাউবয়" এবং "হেলো ডলি" এই দুটি চিত্র তিনটি বিষয়ে পুরস্কার জয় করেছে। আলজিরিয়ায় তোলা, কসটা গাভ্রাস-পরিচালিত "জেড" শ্রেষ্ঠ বিদেশী চিত্র হিসাবে পুরস্কৃত।

কলকাতায় হাঙ্গেরীয় চলচ্চিত্র প্রতিনিধি দল

কলকাতায় গত সপ্তাহে হাঙ্গেরীয় চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই উপলক্ষে হাঙ্গেরির দুই চলচ্চিত্রশিল্পী—অভিনেতা ফ্রিগিজ বেরানি এবং অভিনেত্রী ইলোনা কাল্লাই—কলকাতায় এসেছিলেন। কলকাতার প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো অফিসে তাঁদের সঙ্গে সাংবাদিকদের এক বৈঠক হয়। রিজিওন্যাল সেন্সর অফিসর শ্রী এ কে সরকার সাংবাদিকদের সঙ্গে হাঙ্গেরীয় চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদলের পরিচয় করিয়ে দেন। প্রারম্ভে ওঁদের স্বাগত জানান ডেপুটি প্রিন্সিপাল ইনফরমেশন অফিসার শ্রী ডি এন রথ।

সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে প্রতিনিধিদল তাঁদের দেশের ফিল্মের কথা বলেন। তাঁরা জানান, তাঁদের দেশে টেলিভিশন অত্যন্ত জনপ্রিয়। ফলে সিনেমা অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত। সেই ছবিগুলি ভারতে এসেছে সেগুলিতে, প্রতিনিধি দলের মতে জানান, সমসাময়িক হাঙ্গেরীয় জীবনের পরিচয় নিহিত। অন্যদেশের সঙ্গে যুগ্ম চিত্রপ্রযোজনায় হাঙ্গেরির আগ্রহ আছে বলে তাঁরা জানান। আমেরিকার সঙ্গে তাঁদের যুগ্ম চিত্রপ্রযোজনার সংবাদও তাঁরা জানান। যুগ্ম-প্রযোজনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে মুখ বলেন, ধরুন যদি রাজস্থানের পটভূমিতে কোন ছবি আমরা তৈরি করি তবে ভারতের সঙ্গে যুগ্মভাবেই তা করতে হবে।

প্রসঙ্গত হাঙ্গেরির চলচ্চিত্র-প্রতিনিধি-দল বলেন, সত্যজিৎ রায়-কৃত "গুপী গাইন বাঘা বাইন" ছবিটি তাঁরা কিনবেন।

অভিনেতা ফ্রিগিজ বেরানি ও অভিনেত্রী ইলোনা কাল্লাই কলকাতায় থাকা-কালীন একাধিক বাংলা ও হিন্দী ছবি দেখেন; থিয়েটার তাঁরা ভালবাসেন, তাই নাটক দেখতেও গিয়েছিলেন। তা-ছাড়া তাঁরা কলকাতার ফিল্ম স্টুডিও পরিদর্শন করেন।

বঙ্গ নাট্যসাহিত্য সম্মেলন

প্রতিবারের মত এবারেও বঙ্গ নাট্য-সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের উদ্যোগে। চারদিনব্যাপী এই সম্মেলন শুরু হচ্ছে ২৩ এপ্রিল, বিশ্বরূপা প্রাঙ্গণে। প্রতি-দিন নাটকের বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা হবে। আলোচনায় যোগ দেবেন প্রখ্যাত নাট্যকার, নাট্যপরিচালক, নাট্য-সমালোচক ও সাহিত্যিকবৃন্দ।

টলি-টিপ্পনী

টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওর বড় মাঠটার অনেকটা অংশ জুড়ে এখন স্থায়ী "ভলিবল কোর্ট।" আগে এই জায়গাটাতে আউট-ডোর শুটিং হতে পারত। এখন স্টুডিওতে ইনডোর শুটিংই কম হয়, আউটডোর তো অনেক পরের কথা। তাই কর্তৃপক্ষ মাঠটাকে এখন "ভলিবল কোর্ট" করে ফেলেছেন। রোজ বিকেলে শিল্পী ও কলাকুশলীরা এখানে খেলতে আসেন। দুপুরের পর থেকেই লোক জমতে শুরু করে। অনেক পরিচালক আসেন, ক্যামেরাম্যান আসেন, শিল্পী ও কলাকুশলী আসেন। দেখে দেখে বোঝা যায়, অনেকের হাতেই এখন কোন কাজ নেই। দুচারজন আসেন না, বোঝা যায়, ওঁরা কোন না কোন স্টুডিওতে কাজে (শুটিংয়ে) ব্যস্ত।

টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে গত এক মাসের মধ্যে একমাত্র "দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন" ছাড়া আর কোন বাংলা ছবির শুটিং হয়নি।

এদিকে সামনেই পয়লা বৈশাখ। প্রতি বছরই এই শুভ দিনটিতে প্রত্যেকটি স্টুডিওতেই কোন না কোন ছবির শুভ মহরৎ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এবছর একমাত্র ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে "নিষ্কাজ দো" ছাড়া আর কোন স্টুডিওতে নতুন কোন 'পার্টি' মহরতের "ডেট" বুক করেছেন বলে খবর পাইনি।

এই নৈরাশ্যকর অবস্থার মধ্যেও রোজ সন্ধ্যেবেলায় টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে একটি অদ্ভুত দৃশ্য প্রায়ই আমাকে অবাক করে তোলে। একদিকে শিল্পী ও কলাকুশলীরা মাঠে ভলিবল খেলেন, অন্যদিকে কাজ চাইতে অনেক নতুন আগন্তুক স্টুডিওর মধ্যে ঢুকে পড়েন। এক্সট্রা সাপ্লাইয়ারদের অসংখ্য এক্সট্রা তো আছেনই, তাছাড়াও নিত্য নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রীর আমদানী। "একটা চান্স দিয়ে দেখুন স্যার, কী করি।" অনেকে আবার এই কথা কটিও পরিষ্কার করে বলতে পারেন না। অস্পষ্ট উচ্চারণ।

এই টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতেই সেদিন নৃপতি চ্যাটার্জীর সঙ্গে দেখা। কমেডিয়ান নৃপতি চ্যাটার্জী, ফিল্মে যাঁর "ক্যারিয়ার" শুরু হয়েছিল "ভিলেন আর্টিস্ট" হিসাবে। "দ্বীপান্তর" "মুক্তিস্নান" ও "রিক্তা"র সেই দিনগুলিতে নৃপতিবাবুর জনপ্রিয়তা ছিল সীমাহীন। রোজ তাঁর বাড়িতে প্রযোজক ও পরিচালকের ভিড়। এদিকে ফিল্মে নেমেছেন বলে বাবা তাঁকে "ত্যাজ্য পুত্র" করলেন। নৃপতি হাল ছাড়লেন না। তিনি তখন অভিনয়ের সহবাসে মশগুল। জীবনে

দীনেন গুপ্ত পরিচালিত "প্রথম প্রতিশ্রুতি" ছবিতে হাসু বন্দ্যোপাধ্যায়

বিয়েই করলেন না। ক্রমে কমেডিয়ান হিসেবে স্বীকৃতি পেলেন। আজকের কথা নয়, সেই [illegible] আমল থেকে ফিল্মে তিনি অভিনয় করছেন। সত্যজিৎ রায়ের ছবিতেও তিনি কাজ করেছেন। হালফিলের "গুগাবাবা"তেও নৃপতির অদ্ভুত অভিনয়ের কথা ভোলা যায় না। সেই নৃপতি চ্যাটার্জীও সেদিন বললেন, "অনেক দিন কোন কাজ নেই।"

—বিচক্ষ

"ফাঁস" নাট্যাভিনয়

সম্প্রতি কোলগাস রিক্রিয়েশন, ডিফেন্স আকাউন্টস [illegible] মহাজাতি সদনে শৈলেশ গুহনিয়োগীর "ফাঁস" নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। রবীন্দ্রনাথ শূর ও সতীশ মল্লিকের যুগ্ম পরিচালনায় এ-নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে সুন্দর অভিনয় করেন কালিদাস মুখার্জি, কল্যাণ মিত্র, নিতাই মুখার্জি, সতীশ মল্লিক, দীপালি ঘোষ প্রমুখ শিল্পী। সংগীত পরিচালনায় কৃতিত্ব দেখান ঘনশ্যাম পাইন।

বোম্বাই বিচিত্রা

সেদিন এক বন্ধুর এক্সপেরিমেন্টাল ছবি রিলিজ করাবার জন্য একজন নামকরা পরিবেশকের কাছে গিয়েছিলাম আমরা ক'জন। পরিবেশক সাদরে আপ্যায়ন করলেন আমাদের। তারপর আগমনের হেতু শুনে পুরো দেড় ঘণ্টা উপদেশ দিলেন। ফিল্মটা যে প্রথমে ব্যবসা তারপর শিল্প সেটা ব্যাখ্যা করে বোঝালেন। দর্শকদের

"মাল্যদান" (পরিচালনা : অজয় কর) ছবিতে নন্দিনী মালিয়া ও সৌমিত্র চ্যাটার্জি
—ফটো-দেশ

ছবিটা সম্বন্ধে কিছু না জেনেই, ছবিটা না দেখেই ছবিটাকে নাকচ করে দিলেন। আমার ধারণা ছিল যে, এমন কাজ সাধারণত ইনটেলেকচুয়াল স্নবরাই করে থাকে। যারা ব্যবসাদার তারা চাল না টিপে ভাত হয়েছে কিনা সে বিষয়ে রায় দেয় না।" ভদ্রলোক একটু অপ্রস্তুত হলেন এবং তারপর বললেন, "কিন্তু আপনারা নিজেরাই তো বললেন যে ছবিটা এক্সপেরিমেন্টাল।" আমি বললাম, "আমার তো মনে হয় ছবি মাত্রেই এক্সপেরিমেন্টাল"। পরিবেশক ভদ্রলোক বাধা দিলেন, "তা ঠিক, কিন্তু স্টারকাস্ট ছবির একটা মিনিমাম সিকিউরিটি আছে, আপনাদের ছবির সেটা নেই, তাই আপনাদের ছবি কেউ নেয় না।" আমি বললাম, "ব্যাপারটা যদি এতই সহজ, তাহলে এতক্ষণ যাবৎ এত উপদেশ এবং জ্ঞান কেন দিলেন বুঝতে পারলাম না। আপনি একজন প্রবীণ, অভিজ্ঞ পরিবেশক তবু নতুন কিছুর প্রতি আপনার কোন শ্রদ্ধা নেই দেখে সত্যি খারাপ লাগছে।" ভদ্রলোক বললেন, "ভাল লাগায় বা খারাপ লাগায় কোন খরচ নেই সুতরাং ওটা যার যেমন ইচ্ছে লাগুক, আমাদের কোন ক্ষতি নেই, আমরা এখানে ছেলেখেলা করতে বসিনি, ছবি ডিসট্রিবিউট করা আমাদের কাজ পাবলিক কি চায় আমরা জানি, সুতরাং—" আমার এক বন্ধু হঠাৎ বলে উঠলো, "সত্যি বলছেন, পাবলিক কি চায় আপনি জানেন ?" পরিবেশক বললেন, "নিশ্চয়ই।" বন্ধুবর বললেন, "দেখুন আমার ঔদ্ধত্য মাপ করবেন, আপনার প্রতিষ্ঠান স্বনামধন্য তবু আমার ধারণা আপনার নেট লাভ নিশ্চয়ই দৈনিক পঁচিশ হাজার কোর বেশী নয়।" পরিবেশক বললেন, "না তা নয়"। কিন্তু হঠাৎ

রুচি কোন্ পথে তার অগণিত উদাহরণ দিলেন। ফিলিম মিউজিকের মাহাত্ম্য বোঝালেন। এবং সর্বশেষে সহানুভূতি জানিয়ে এক্সপেরিমেন্টাল ছবি রিলিজে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। প্রায় উঠতে উঠতে আমি বললাম, "আপনি কিন্তু

পাবলিক টেস্ট জানেন বললেন, তার মানে আপনি জানেন কি ধরনের ছবি করলে সে ছবি হিট হবে, তা সেটা যদি আমাদের আপনি নিয়মিত বলতে থাকেন, তার জন্য আমি আপনাকে দৈনিক পঁচিশ হাজার টাকা বেতন দিতে রাজি আছি!" কথা শুনে পরিবেশকের মুখ চোখ লাল, হঠাৎ তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, "আমারই অফিসে বসে আমাকে অপমান করার সাহস আপনার হোল কোত্থেকে আমি বুঝতে পারছি না।" এতটুকু উত্তেজিত না হয়ে বন্ধুটি বললেন, "এ প্রস্তাবকে অপমান ভাবছেন কেন, একটু আগেই তো নিজেই বললেন যে, যা কিছু করছেন সবই অর্থের জন্য। আর আপনিই স্বয়ং বললেন যে, আপনার প্রতিষ্ঠানের নেট লাভ দৈনিক পঁচিশ হাজারের কম। আমার মনে হল যে যিনি এমন গুণবান লোক, যিনি জনতার চাহিদা জানেন পুরোপুরি, তাঁর মত

'মুক্তিস্নান" (অজিত গাঙ্গুলি) অনিল চ্যাটার্জি ও সাবিত্রী চ্যাটার্জি

লোকের সাহচর্য যদি দৈনিক পঁচিশ হাজার টাকার পরিবর্তেও পাওয়া যায়, তবুও লাভজনক!" পরিবেশক চটে গিয়ে বললেন, "এক সঙ্গে পঁচিশ হাজার টাকা দেখেছেন কখনো যে দৈনিক পঁচিশ হাজার টাকার চাকর খুঁজছেন।" বন্ধুটি এখনো চটেনি, বলল, "খুঁজছি না, আপনাকে দেখে রাখার কথা ভাবছি, যদি আপনি রাজি থাকেন তো এক মাসের টাকা অগ্রিম দিয়ে যাই ?" চেক বার করল বন্ধুটি। আমাদের তো চক্ষু স্থির। পরিবেশক চেঁচিয়ে উঠলেন, "গেট আউট, গেট আউট ফ্রম হিয়ার।" আমরা বেরিয়ে এলাম। বাইরে এসেই বন্ধুটিকে

জিজ্ঞেস করলাম, "এত টাকা সত্যি আছে নাকি তোর?" উত্তরে ও প্রশ্ন করলো, "সত্যিই পাবলিক টেস্ট জানে নাকি ও?" মনে মনে ভাবলাম বোম্বাই বিচিত্রার খোরাক হল।

সরল শর্মা

রবীন্দ্রসংগীতে কীর্তনের প্রভাব

৫ এপ্রিল রবিবার শ্রীঅশোককুমার সরকার মহাশয়ের বাসগৃহে রবিবাসর উপলক্ষে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ রবীন্দ্রসংগীতের একটি দিক নিয়ে আলোচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছু কীর্তনাঙ্গ গান বিভিন্ন কালে রচনা করেছিলেন। এই সব গানের একটি পটভূমিকা আছে। অপরাপর লোকসংগীতের মত প্রচলিত নানাপ্রকার সহজ ঢঙের কীর্তনাঙ্গ গান, বিশেষ করে মধুকান-এর (মধুসূদন কিন্নর) ঢপ রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল এবং তিনি এই সব গান ভেঙে কিছু গান রচনা করেছিলেন। এ ছাড়া তৎকালে প্রচলিত সাধারণ কীর্তনের রীতিতে অক্ষয় চৌধুরী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরও কয়েকটি গান রচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেই সব গানের আদলেও কিছু গান রচনা করেন। এমনকি, জনপ্রিয় কথকতার এই ধরনের গানও রবীন্দ্রনাথ দু একটি গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ আলোচনা প্রসঙ্গে মূল গানগুলি প্রামাণিক সূত্র থেকে উদ্ধার করে গেয়ে দেখান এবং সেগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাঙা গানগুলিও গেয়ে শোনান। এই তুলনামূলক আলোচনায় কতিপয় কীর্তনাঙ্গ রীতির প্রভাব কবিগুরুর উপর কিভাবে পড়েছিল সেটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং উপস্থিত সুনির্বাচিত বিদগ্ধ শ্রোতাদের মর্মাংগম হয়। এই ধরনের আলোচনা শুনলে অনুভব করা যায় রবীন্দ্র সংগীতে এখনও খুঁজে দেখবার কত জিনিস আছে। আর, যাঁরা প্রায়ই সমালোচনা করেন যে, রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা প্রসঙ্গে বাংলার অপরাপর গান শেখা নিষ্প্রয়োজন তাঁরা নিঃসন্দেহে বুঝতে পারবেন তাঁদের ধারণা কত ভুল। এই সব রীতি গ্রহণ করেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব চিন্তার প্রয়োগে যে সব নূতনত্বের উদ্ভাবনা করেছিলেন শ্রীশান্তিদেব ঘোষ সেইগুলিও প্রদর্শন করেন। আলোচনাটি যে শুধু মনোজ্ঞ তাই নয়, একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণার বীজও এর মধ্যে রয়েছে।

শার্ঙ্গদেব

'মঞ্জরী অপেরা' (পরিচালনা : অগ্রদূত) ছবিতে বনানী চৌধুরী ও সাবিত্রী চ্যাটার্জি
ফটো-দেশ

রাগের শাস্ত্রীয় রূপ ও রবীন্দ্র-সংগীত : একটি আলোচনাসভা

রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে ভারতীয় সংগীতের প্রচলিত কাঠামোর মধ্যেই সংগীত রচনা শুরু করেন কিন্তু কালক্রমে তাকে অতিক্রম করে নিজের সৃজনশীল সত্তার তাগিদে স্বকীয় পন্থায় সুরসৃষ্টি করে চলেন। এই সুপরিজ্ঞাত তত্ত্বটি সেদিন উপযুক্ত বিশ্লেষণের সাহায্যে পরিস্ফুট করেন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ম্যাকসমূলার ভবনে 'ব্রাহ্ম যুব সমাজ' কর্তৃক আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে। সেই সঙ্গে একদিকে শংকর ঘোষের সংগতসহ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের খেয়াল এবং অন্যদিকে সুচিত্রা মিত্রের গান কেবল সেই বিশ্লেষণের সহগামী দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখযোগ্য নয়, একটি রসনিবিড় পরিবেশ গড়ে তুলে তাঁরা আলোচিত তত্ত্বকে যেভাবে মর্মগ্রাহ্য করে তুলেছেন, তাও প্রশংসনীয়।

শাস্ত্রনির্দিষ্ট রাগরূপকে কখনও অবিকল গ্রহণ করে, আবার কখনও তাকে ভেঙে ভেঙে একেবারে নিজের মতন করে কীভাবে সৃষ্টি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তার দৃষ্টান্ত যদিও রবীন্দ্রনাথের ভাণ্ডারে প্রচুর, সৌম্যেন্দ্রনাথ সেদিন তিনটি রাগ নির্বাচন করেই এই তত্ত্বটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। পূরবী, বাহার এবং বেহাগ। প্রথমে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় এই তিনটি রাগের শাস্ত্রীয় রূপটি বিলম্বিত আর দ্রুত খেয়ালের পরিমিত পরিবেশনায় ফুটিয়ে তোলবার পর সুচিত্রা মিত্র প্রতিটি রাগাশ্রয়ী একাধিক রবীন্দ্র সংগীতের সাহায্যে দেখিয়ে দেন, কীভাবে মূল রূপটিকে রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ ছাড়িয়ে গেছেন, কিংবা মিশিয়ে দিয়েছেন অন্য কোনো রাগের সঙ্গে। যেমন পূরবীতে 'আজি এ আনন্দসন্ধ্যা' থেকে আরম্ভ করে ক্রমান্বয়ে পরিবেশিত হয়েছে 'তুমি তো সেই যাবেই বলে', 'সন্ধ্যা হল গো' এবং 'ডেকো না আমারে ডেকো না'। কিন্তু 'ডেকো না আমারে'র কেবল সঞ্চারীতেই তো পূরবীর ছোঁয়া। সুরের সাদৃশ্য ইমনের সঙ্গেই কি বেশি নয়?

প্রসঙ্গত সৌম্যেন্দ্রনাথ যথার্থই উল্লেখ করেছেন, এটা কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল নয়, বরং এ হল আত্মলীন সৃজনশীলতার সহজ ও সচ্ছন্দ পরিণতি। গানগুলির মধ্যে সুচিত্রা মিত্রের বাহার রাগে 'আজি বহিছে বসন্ত' এবং প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোমল নিখাদযুক্ত বেহাগের পরিবেশনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আনন্দবর্ধন

পুলিসের আচরণ সম্পর্কে লোকসভায় মুলতবী প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা বর্তমান সপ্তাহের বিশেষ আলোচ্য বিষয়। সংসদ ভবনের বাইরে সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী শোভাযাত্রীদের উপর পুলিসী অত্যাচারের প্রতিবাদে তারা সরব হন। তাঁদের মুলতবী প্রস্তাবটি ৩৯ ভোটে পরাস্ত হয়, কিন্তু কার্যত তাঁরা সরকার পক্ষকে বাহির্বিষয়ক মন্ত্রকের ব্যয় বরাদ্দের দাবি নিয়ে আলোচনা মুলতবী রাখতে বাধ্য করেন। চার ঘণ্টা ধরে নিজেদের বক্তব্য নিয়ে বিতর্কে সরকারকে নিয়োজিত রাখেন। মন্ত্রীদের আত্মরক্ষামূলক তৎপরতা গ্রহণে বাধ্য করেন। প্রথম সুযোগে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী জানান যে, তিনি বিষয়টি সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্তের আদেশ দিবেন। তদন্ত করবেন হাইকোর্টের কার্যরত কোন বিচারপতি। যা ঘটেছে তার জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচবন বলেন যে, তিনি শতবার ক্ষমা চাইছেন। কথা দিচ্ছেন প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এমন কি কংগ্রেস সদস্যরাও পুলিসের কাজ সমর্থন করতে পারেন নি। বিরোধীদের সঙ্গে তারাও একমত হন যে, এ জন্য দায়ী অফিসারদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া আবশ্যক।

দেশী সংবাদ

৬ এপ্রিল—এস এস পির একদল স্বেচ্ছাসেবক আজ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সংসদ ভবনের দিকে ধাওয়া করবার চেষ্টা করলে পুলিস প্রথমে লাঠি চার্জ করে, পরে কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে। ফলে সংসদ-সদস্য জর্জ ফারনানডেজ, মধু লিমায়ে, রাজনারায়ণ, অর্জুন সিং সহ প্রায় ৫০ জন আহত হন। গ্রেফতার করা হয় প্রায় ৪০ জনকে।

সি পি এম-এর সঙ্গে আর কিছুতেই নয়—বাংলা কংগ্রেস নেতাদের এই দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার পর সি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস ইউ সি প্রভৃতি আট পার্টিকে এবার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তারা সি পি এম-কে বাদ দিয়ে বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে বা বাংলা কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে সি পি এম-এর সঙ্গে বিকল্প সরকার করবেন, না নতুন সরকারের সব আশা ছেড়ে দিয়ে শুধু নির্বাচনের জন্যই প্রস্তুত হবেন।

৭ এপ্রিল—আজ কলকাতা ও শহরতলীতে সরকারী দুধ সরবরাহ হয়নি। হাসপাতালেও দুধ যায়নি। রোগী, শিশু ও বৃদ্ধদেরও সরকারী দুধের যোগান বন্ধ। গতকাল বেলগাছিয়া সেন্ট্রাল ডেয়ারিতে এক শ্রেণীর কর্মী কয়েকটি দাবিতে হঠাৎ ধর্মঘট করে বসেন। তারই ফলশ্রুতি আজ সরকারী দুধের যোগান দেওয়া হয়নি।

আসামের রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীমহেন্দ্রমোহন চৌধুরী আজ রাজ্য বিধানসভায় জানান, নকশালপন্থীরা চীন থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত নাগাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের যে চেষ্টা চলছে, সে সম্পর্কে আসাম সরকার অবগত আছে।

৮ এপ্রিল—কিছুদিন আগে পাকিস্তান রাশিয়ার কাছ থেকে প্রায় দেড়শটি ট্যাংক পেয়েছে বলে ভারত সরকার খবর পেয়েছেন। আজ লোকসভায় এই তথ্য দিয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীস্বর্ণ সিং বলেন, মাননীয় সংসদের সঙ্গে তিনিও এই ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। কারণ বহুবারই পাকিস্তান জানিয়ে দিয়েছে যে, তাদের ভারত ছাড়া আর কোন শত্রু নেই।

শ্রী বি বি ঘোষ রাজ্যপালকে জানিয়ে দিয়েছেন—উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করতে তিনি রাজি নন। এদিকে রাজ্যপাল আরও তিনজন উপদেষ্টা চেয়েছেন। তিনি মনে করেন, তাঁদের একজন মুসলমান হলেই ভাল হয়।

৯ এপ্রিল—প্রধানমন্ত্রীর জরুরী তলব পেয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ান আজ দিল্লি যাচ্ছেন। জনশ্রুতি নাকি এতই জরুরী যে, নেপালের মহারাজার কলকাতা আগমন না ঘটলে বৃহস্পতিবারই রাজ্যপালকে রাজধানী যেতে হত। রবিবার রাজ্যপালের কলকাতা ফেরার কথা আছে।

মফঃস্বলের নানা জেলায় বিনা লাইসেন্স ও বিনা টিকিটের ফেরিওয়ালার সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থক মস্তানেরা চাঁদা নিয়ে সিগনালের কথা শুনিয়ে দেয়। ওই পার্মিট নিয়েই ফেরিওয়ালারা বেপরোয়া ভেজাল খাদ্য, পানীয় ও ওষুধপত্র ট্রেনে ফলাও কারবার চালিয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের খড়্গপুর ডিভিশনের সুপারিনটেনডেন্ট সাংবাদিকদের কাছে এই কথা বলেন।

১০ এপ্রিল—যুক্তফ্রন্টের আমলে পুলিসের মধ্যে রাজনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে সি বি আই দিয়ে তদন্ত করানোর দাবি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী চবন আজ লোকসভায় নাকচ করে দেন। তিনি বলেন, এই ব্যাপারটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারই পর্যালোচনা করে দেখবেন।

আজ একদল ছাত্র যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গান্ধী ভবনের তালা ভেঙে ঢুকে গান্ধীজীর একখানি তৈল চিত্রসহ প্রায় চার হাজার মূল্যবান বই আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। প্রকাশ, বাইরের কিছু লোকের সাহায্যে নকশালপন্থী ছাত্ররা এই কাজ করেন। এছাড়া বিক্ষোভকারীরা অ্যাডাল্ট এডুকেশন সেন্টার ভবনটির আসবাবও ভেঙে চুরমার করেন।

১১ এপ্রিল—কারিগরি ও আর্থিক অসুবিধা এবং বিলম্বের আশংকায় দীর্ঘ প্রতীক্ষিত চক্ররেল পরিকল্পনা বাতিল করে প্রাত্যহিক যাত্রীদের জন্য কলকাতার ভূগর্ভে পাতাল রেল স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে দক্ষিণে কালীঘাট থেকে মধ্য-কলকাতার বহুবাজার-চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ের মোড় পর্যন্ত। এই মাইল পাঁচেক পথের জন্য আনুমানিক ব্যয় চল্লিশ কোটি টাকা।

জুন-জুলাই মাস নাগাদ শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একটি বিকল্প সরকার গঠনের জোর চেষ্টা হবে—এই ধারণা নিয়ে নব কংগ্রেস হাই-কম্যানডের দুই প্রতিনিধি বাবু জগজীবন রাম এবং শ্রীগুলজারিলাল নন্দ কলকাতা ত্যাগ করেন।

১২ এপ্রিল—ভারতে নির্বাচন সংক্রান্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং দুর্নীতি দূর করবার উদ্দেশ্যে নির্বাচন আইনের সংশোধন করে ব্যাপক এবং কঠোর ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়েছে। ভারতের প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন যে, কতকগুলি সুপারিশ একটু কঠোর মনে হতে পারে।

সি পি আই (এম) নেতা শ্রীজ্যোতি বসু আজ জলপাইগুড়িতে বক্তৃতা করতে এলে বিক্ষোভ দেখানো হয়। কংগ্রেসের পতাকা নিয়ে একটি মিছিল থেকে ধ্বনি ওঠে, 'জ্যোতি বসু, ফিরে যাও'। তবে কোন হাঙ্গামা হয়নি।

বিদেশী সংবাদ

৬ এপ্রিল—সোভিয়েট পররাষ্ট্র দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র আজ এই সংবাদ স্বীকার করেন যে, ক্রেমলিনের উপর-মহলের চারজন অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী আছেন। এই চারজন নেতা হচ্ছেন—প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন, প্রেসিডেন্ট পদগর্নি, মিখাইল সুসলভ ও আলেকজান্ডার শেলেপিন। শেষোক্ত দুজন পলিট-ব্যুরোর সদস্য।

৭ এপ্রিল—পাকিস্তান চীনের কাছ থেকে দুই ডিভিসন পদাতিক বাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় সব রকমের সাজ-সরঞ্জাম প্রায় ২৫০টি ট্যাংক, ১২০টি মিগ বিমান, দুই স্কোয়াড্রন বোমারু বিমান, বহু কামান, গাড়ি এবং ট্যাংক ও বিমানের যন্ত্রাংশ পেয়েছে।

৮ এপ্রিল—ওয়াশিংটনের এক খবরে প্রকাশ : বর্তমানে বিশ্বের জনসংখ্যা মিনিটে ১৩৮ জন করে বাড়ছে। পৃথিবীর জনসংখ্যা এখন দাঁড়িয়েছে ৩৬৩ কোটি ৩০ লক্ষ। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির এই হার চলতে থাকলে আগামী ৩৫ বছরে পৃথিবীর জনসংখ্যা বর্তমান সংখ্যার দ্বিগুণ হবে।

৯ এপ্রিল—গতকাল মিশরের আল বাহর-এ একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপর ইজরায়েলি জেট-বিমান থেকে বোমা নিক্ষিপ্ত হওয়ায় ৩০ জন ছাত্র নিহত হয়েছে। ওই ৩০ জন ছাড়া আরও ৪০ জন বালকবালিকা আহত হয়েছে। কয়েকজনের আঘাত গুরুতর।

১০ এপ্রিল—মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ সংস্থা অ্যাপোলো—১৩-কে আগামীকাল পূর্ব-নির্ধারিত সময়মতই চন্দ্রযাত্রায় এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। শেষ মুহূর্তে স্থির হয়েছে, ম্যাটিংলির জায়গায় বদলী মহাকাশযাত্রী হিসাবে অ্যাপোলো—১৩-তে জন সুইগার্ট চাঁদে [illegible] দিবেন।

১১ এপ্রিল—আজ রাত্রে ভারতীয় [illegible] ১২-৪৩ মিনিটে তিনজন মহাকাশচারীকে নিয়ে অ্যাপোলো—১৩ মহাকাশযান চাঁদের পথে পাড়ি দিয়েছে। এটি আমেরিকার তৃতীয় [illegible] অভিযান। অ্যাপোলো—১৩ পৃথিবীর কক্ষপথে প্রবেশ করেছে।

১২ এপ্রিল—শনিবার ভারতীয় সময় [illegible] ১২-৪৩ মিঃ চাঁদের পথে মানুষের [illegible] অভিযান শুরু হয়ে স্বচ্ছন্দগতিতে এগিয়ে চলেছে। তাঁরা পৃথিবী থেকে এক লক্ষ [illegible] দূরে চলে গিয়েছেন।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

নিরাপত্তা
যখন একটি তালা'র
ওপর নির্ভর করে
তার জন্যে একটিমাত্র
তালা আছে—

সূচিপত্র

আর মিত্রের
ময়ূর মার্কা
তিল তৈল
বিশুদ্ধ ও সুপরিষ্কৃত তিল তৈল হইতে প্রস্তুত
চুল উঠা বন্ধ করে মাথা ঠাণ্ডা রাখে
অর্দ্ধ শতাব্দীর সুনামের উপর প্রতিষ্ঠিত

সূচিপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীপাঁচুগোপাল দে

॥ ● ॥ জাতির সম্বিৎ আনতে হলে গান্ধী-সাহিত্য পাঠ করুন ॥ ● ॥

● গান্ধী-সাহিত্য ●

মহাত্মা গান্ধী—রোমাঁ রোলাঁ	৩৲
গান্ধী-চরিত—ঋষি দাস	৮৲
শিক্ষা—মহাত্মা গান্ধী	১৫৲
সংক্ষিপ্ত আত্মকথা—গান্ধীজী	৩৲
গান্ধীজী—অনাথনাথ বসু	২॥০
গান্ধী ও মার্কস—মশরুওয়ালা	৫৲
বাদশা খান—ঋষি দাস	৬৲
সীমান্ত গান্ধী—সুকুমার রায়	৩৲
নোয়াখালিতে মহাত্মা—সুকুমার রায়	৮৲
অহিংস বিপ্লব—জে. বি. কৃপলানী	২৲
স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থনৈতিক সংগঠন—আগরওয়ালা ও ভট্টাচার্য	৫৲
বুনিয়াদী শিক্ষা—বিজয়কুমার ভট্টাচার্য	২॥০
বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি—বিজয়কুমার	৪৲
মহাত্মা গান্ধী—প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক	১৬৲
গান্ধীজীর দূত—সুধীর ঘোষ	১৫৲
গান্ধী-রচনাসম্ভার, ছয় খণ্ড	৩৭৲
নঈ তালিম—ধীরেন্দ্র মজুমদার	৩৲
বুনিয়াদী শিক্ষার কথা, ১ম—অনিল গুপ্ত	৪॥০
বুনিয়াদী শিক্ষার কথা, ২য়—অনিল গুপ্ত	৪॥০
বুনিয়াদী শিক্ষায় সংগঠন—অনিল গুপ্ত	৪॥০

শুভ নববর্ষ ১৩৭৭

গান্ধী-সাহিত্যের প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধন

● সকাল ৮টায় ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীটের বিক্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধন ও বিক্রয় করেন প্রখ্যাত গান্ধীবাদী নেতা ●

প্রফুল্লচন্দ্র সেন

● প্রধান অতিথি দান করেন গান্ধী শতবার্ষিকী সমিতির সম্পাদক ●

শ্যামাদাস ভট্টাচার্য

● বিকাল ৬টায় কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের দোতলায় গান্ধী-সাহিত্য প্রদর্শনীর উদ্বোধন, বিক্রয় ও সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রিয় দেশনেতা আজীবন গান্ধী-শিষ্য ●

অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়

● উদ্বোধন করেন ●

প্রমথনাথ বিশী

● প্রধান অতিথি দান করেন গান্ধী শতবার্ষিকীর চেয়ারম্যান মাননীয় বিচারপতি ●

শঙ্করপ্রসাদ মিত্র

● গান্ধী-সাহিত্য প্রচারের উদ্দেশ্যে ১লা বৈশাখ হইতে ১৫ই বৈশাখ পর্যন্ত প্রত্যেক ক্রেতাকে শতকরা ১৫৲ হারে কমিশন দেওয়া হবে ●

● গান্ধী শতবার্ষিকী সমিতি; গান্ধী স্মারক-নিধি, নবজীবন ট্রাস্ট, পাবলিকেশনস ডিভিশন প্রভৃতি প্রকাশিত বই পাবেন ●

গান্ধী ও মার্কস

কিশোরলাল মশরুওয়ালা

অনু: শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

● ডিমাই সাইজ। সুবৃহৎ বই। প্রত্যেক গান্ধীবাদী ও মার্কসবাদীর অবশ্য পাঠ্য ●

দাম : পাঁচ টাকা

নোয়াখালিতে মহাত্মা

সুকুমার রায়

● গান্ধীজীর আশীর্বাদপূত ও নির্মলকুমার বসুর গ্রন্থ পরিচিতি সম্বলিত ●

ডিমাই সাইজ। চিত্রবহুল

দাম : আট টাকা

বাংলার বাউল ও বাউল গান

অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

পরিবর্ধিত পরিমার্জিত সংস্করণ

দাম : চল্লিশ টাকা

● ২৫শে বৈশাখ প্রকাশিত হবে ●

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি

কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, দোতলা। কলিকাতা ১২

ওরিয়েণ্ট বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স

৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা ১২

(সি ১৭৮০)

প্রকাশিত হল

দাম ৪·০০

দমদমের পুরনো ভাঙা দেউলবাড়িটা আর তার মালিক ফতুয়া-পরা ভুবন মজুমদার যেন সনাতন ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসীরই এক ক্ষুদ্র প্রতিরূপ। নানারকম সংস্কার, বিশ্বাস আর উপকথায় জড়ানো এর প্রতিটি স্থান, প্রতিটি বস্তু। পূর্বপুরুষদের গৌরবময় ঐতিহ্য আষ্টেপৃষ্ঠে বহন করে বিশ শতকেও সে যেন অষ্টাদশ শতকীয় হয়ে বেমানান এবং বেখাপ্পাভাবে বেঁচে রয়েছে। বিশ শতকের জড়বাদী সভ্যতা তার প্রগতিশীলতা, ঐশ্বর্য এবং অহংকার নিয়ে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না, কেমন করে আজও টিঁকে আছে ঐ মূর্তিমান সেকেলেপনাটা প্রাচীন সংস্কৃতির নামাবলী গায়ে জড়িয়ে? কিসের জোরে? তার শ্রেয়োমন্যতা, তার ঐশ্বর্যগর্ব তাকে কৌতূহলী এবং ঈর্ষান্বিত করে তোলে। এবং তার সেই অহংকারী ঈর্ষা শান্তি পায় কেবল সেইদিনই, যেদিন

সুবোধ ঘোষের

চিরায়ত উপন্যাস

বাসরদত্তা

সে বুঝতে পারে ঐ পিছিয়ে-থাকা জীর্ণতাটার অবিনাশী প্রাণশক্তি নিহিত তার হৃদয়বত্তায়, আকাশের মত উদার তার মানবতাবোধে।

স্বনামধন্য সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ বহুকাল পরে প্রকাশিত তাঁর নতুন উপন্যাস 'বাসরদত্তা'য় এমনই একটি মহৎ বিষয়কে চিরায়ত শিল্পরূপে দান করেছেন।

● এই লেখকের অন্যান্য বই ●

বন উপবন ৪·০০ **জিয়া ভরলি** ৬·০০ **বসন্ততিলক** ৫·০০
শতকিয়া ৮·০০ **ভারত প্রেমকথা** ৭·০০

প্রকাশিত হল

দাম ৭·০০

কাগজে-কলমে যদিও নাম 'বলরামপুর হাই স্কুল', লোকে কিন্তু বলে গৌর পণ্ডিতের স্কুল। গৌর পণ্ডিতই লোকের সঙ্গে চেয়ে-চিন্তে ভিক্ষে করে এই স্কুলের ভিত পত্তন করেছিলেন। এবং সারা জীবন বুকের রক্ত দিয়ে, স্ত্রীর গয়না-বেচা টাকা দিয়ে একটু একটু করে তিনি গড়ে তুলেছেন এই স্কুল। স্কুল তারপর আস্তে আস্তে বড় হয়েছে, আর সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃত্ব থেকে একটু একটু করে সরে আসতে হয়েছে গৌর পণ্ডিতকে। কিন্তু তাতে কোনও ক্ষোভ ছিল না তাঁর যদি না তিনি শেষ জীবনে পৌঁছে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করতেন, কর্তৃত্ব বদলের সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের সব কিছুই যেন বদলে যাচ্ছে—স্কুলের ভালো-মন্দ সব কিছু। তখন অভিমানাহত বৃদ্ধ পণ্ডিতের মনে প্রশ্ন জাগে : রাজাবদলের সঙ্গে সঙ্গে কি রাজ্যেরও আমূল বদল হয়ে

বিমল মিত্রের

অনন্যসাধারণ উপন্যাস

রাজাবদল

যায়? বদলে যায় কি রাজ্যের মানুষগুলো পর্যন্ত—এমন কি, তাদের ভালো-মন্দ বোধ, শুভ-অশুভ—সব কিছু?

বাংলা দেশের বর্তমান ক্রান্তিকালের একটি বিরাট সমস্যা অত্যন্ত নগ্নভাবে দেশের মানুষদের সামনে তুলে ধরেছেন লেখক তাঁর এই নবতম উপন্যাসের মাধ্যমে।

● এই লেখকের অন্যান্য বই ●

নিশিপালন ৬·০০ **প্রেম পরিণয় ইত্যাদি** ৭·০০ **হাতে রইলো তিন** ৬·০০ **চলো কলকাতা** ৫·০০ **বেগম মেরী বিশ্বাস** ২৫·০০
নিবেদন ইতি ৫·০০ **রং বদলায়** ৩·৫০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড

অফিস : ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলি: ৯ ॥ ফোন ৩৪-৮২৪৭
বিক্রয়-কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা ৯

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৭ বর্ষ ॥ সংখ্যা ২৬
শনিবার ১১ বৈশাখ ১৩৭৭

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৪৩ ২৩-৪৫৪১

চাঁদার হার
কলিকাতায়

বার্ষিক	— ২৫.০০
ষাণ্মাসিক	— ১২.৫০
ত্রৈমাসিক	— ৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	— ৩০.০০
ষাণ্মাসিক "	— ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক "	— ৮.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	— ৩০.০০
ষাণ্মাসিক "	— ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক "	— ৮.০০

ভারতের বাইরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	— ৫২.০০
ষাণ্মাসিক "	— ২৬.০০
ত্রৈমাসিক "	— ১৩.০০

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	— ৩৯.০০
ষাণ্মাসিক	— ১৯.৫০
ত্রৈমাসিক	— ১০.০০

দাম ৫০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাসুল ৭ পয়সা

DESH

Saturday 25 April 1970

লেনিন : জন্মশতবর্ষ

বাইশে এপ্রিল লেনিনের জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হল। রুশ দেশের ভলগা নদীর তীরে সাধারণ একটি শহরে একশো বছর আগে যে শিশুটির জন্ম হয় আজ সমগ্র বিশ্ব তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছে। এই শ্রদ্ধা নিবেদনে কোনো গোঁড়ামি নেই, রাজনৈতিক মত-বিরোধ নেই, মালিন্য নেই, জাতীয় সংকীর্ণতাও নেই, বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রতি সকল মানুষের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা বোধটুকু মাত্র রয়েছে। উনিশ শতকের শেষ আর বিশ শতকের প্রায় তিন দশক ধরে যে মানুষটি মানুষের অগ্রগতির ইতিহাসে এক মূল্যবান অধ্যায় রচনা করে গিয়েছেন তাঁর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করে সমগ্র মানবজাতি আজ গৌরব বোধ করছে।

লেনিনের জন্মের পর আজ একশো বছর কেটে গেল। এই একশো বছরে মানব-সভ্যতার ইতিহাসে অনেক কিছু ঘটেছে, অনেক ঘটনাই ইতিহাসের শীলমোহর পেয়ে সযত্নে রক্ষিত হবে, তবু এই ঘটনাসমষ্টির মধ্যে একটি ঘটনা নিশ্চয়ই আমাদের মনে রাখতে হবে, অতীতের পশ্চাৎপদ একটি দেশ—বিশেষ করে পাশ্চাত্যের সবচেয়ে দুঃস্থ, সংস্কারাচ্ছন্ন, নিপীড়িত একটি জাতি আজ পৃথিবীর অতি উন্নত দেশের অন্যতম; বৃহৎ একটি শক্তিরূপে স্বীকৃত; আর এর মূলে যাঁর অনলস সাধনা, কর্ম ও আদর্শের প্রেরণা রয়েছে তিনি লেনিন। রুশ দেশের একশো বছরের ইতিহাসে এতবড় ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব আর যেমন হয়নি, শ্রমিক মুক্তি-আন্দোলনের এমন মহান নেতার সাক্ষাতও আর কোথাও দেখা যায়নি। লেনিনকে তাঁর সহকর্মীরা বলতেন, প্রিয়তম বন্ধু; বলতেন, নতুন পৃথিবীর প্রতীক। এ কথা যে কতদূর সত্য তা প্রমাণ হয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অতগুলি দেশকে আজ কম্যুনিস্ট দেশ হিসেবে দেখার পর।

লেনিনের জীবনকথা বলার অবকাশ এখানে নেই, তবু তাঁর অসামান্য চরিত্রের উল্লেখ অপরিহার্য। সাধারণভাবে আমরা মনে করি, লেনিন ছিলেন রাজনৈতিক নেতা। কিন্তু আজকের দিনে যে অর্থে রাজনৈতিক নেতা বলা হয় সেই অর্থে তিনি নিছকই নেতা ছিলেন না, তাঁর নেতৃত্ব ছিল সর্বদিক দিয়েই উন্নত, নৈতিক। তাঁর আদর্শ ছিল দৃঢ়। কর্মশক্তি অফুরন্ত। জীবনে বার বার তাঁকে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছে—কারাবাস, নির্বাসন, চূড়ান্ত দারিদ্র্য, বিরোধী পক্ষের বিদ্বেষ ইত্যাদি, তবু তিনি হতোদ্যম বা নিরাশ হননি। তিনি স্বীকার করতেন যে, তাঁরা পাহাড়ের মতন মজবুত; হতভম্ব হয়ে পড়া বা হঠকারিতায় গা ভাসিয়ে দেবার মতন লোক তাঁরা নন। তাঁর সংগঠন-শক্তির তুলনা হয় না, অসীম ধৈর্য, মনোবল এবং কর্মশক্তি দিয়ে তিনি নিপীড়িত রুশ জনগণকে একত্র করেছিলেন। লেনিনের পাণ্ডিত্যও সর্বজনবিদিত। বিভিন্ন বিষয়ে—বিশেষ করে রাজনীতি, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর অবিশ্বাস্য পাণ্ডিত্য ছিল। সমাজ-বিকাশ সম্পর্কিত সকল শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন। অর্থনীতি, এনজিনিয়ারিং, শিল্প, কৃষি—এ সব বিষয়েও তাঁর পাঠ ছিল প্রচুর। সাহিত্যও তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল। আমরা হয়ত জানি না, জীবনের এক সময় তিনি শুধু প্রবন্ধাদি লিখে রুজি রোজগার করেছেন। অর্থাভাব তাঁর পাঠস্পৃহাকে দমন করতে পারে নি।

বিপ্লবের পর যে কর্মভার তাঁর ওপর পড়ে সেই দায়িত্ব পালন করা কোনো অর্থেই সহজ ছিল না। ভবিষ্যৎ রুশ দেশের যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন তাতে অলস কল্পনা ছিল না। তিনি বার বার বলেছিলেন, শিল্পের দ্রুত প্রসার প্রয়োজন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার কর্মকাণ্ড দিয়েই দেশ গঠন করতে হবে। তিনি বিশ্বাস করতেন, সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্যে উচ্চ বৈষয়িক বনিয়াদ, উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি, কারিগরীবিদ্যা, উৎপাদনশক্তির প্রভূত উন্নতি প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, লেনিনের জীবদ্দশায় তিনি যতটুকু দেখে যেতে পেরেছিলেন, আজ তাঁর স্বদেশ রাশিয়ায় তার শত সহস্র গুণ কর্ম অনুষ্ঠিত হয়েছে। লেনিনের স্বপ্ন নিশ্চয় সফল হয়েছে অনেকটা।

চরিত্রে, আদর্শে, কর্মশক্তিতে, মানুষের প্রতি অনুরাগে যিনি নব পৃথিবীর প্রতীক হয়ে দেখা দিয়েছিলেন সেই লেনিনকে আজ আমরা তাঁর জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধা জানাই।

পাতাল প্রবেশ!

[একটি মিনি চিত্রনাট্য]

সিকোয়েন্স্ ১, দৃশ্য ১। ইন্দিরাপ্রস্থের আলো-ঝলমল একটি প্রাসাদ। প্রধান তোরণে দুজন সান্ত্রী। একাগ্র চিত্তে খইনি ডলছে। একজন অন্যকে কিছুটা খইনি দিল। দুজনে একসঙ্গে তা নিজ নিজ মুখে ছুঁড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সব আলো ঝপ্ করে নিবে গেল।

প্রথম সান্ত্রী : বাত্তিয়া বুৎ গইল বা।

দ্বিতীয় সান্ত্রী : (জোরে চেঁচিয়ে উঠল) হুঁ-শি-য়া-র।

চারিদিক থেকে সান্ত্রীরা সাড়া দিল : হুঁ-শি-য়া-র।

নেপথ্যে গীত :

রাম ভজনা কর প্রাণী
দো দিন কা জিন্দগানী

দৃশ্য ২ : লঙ্ শট্। একটা মোমের আলো প্রাসাদের কোন একটি কক্ষের ভিতর গাঢ় অন্ধকার ঠেলে কাঁপিতে কাঁপিতে এগিয়ে চলেছে।

দৃশ্য ৩ : মিড শট। নাইটি পরিহিত প্রিয়দর্শিনী হাতে মোমবাতি নিয়ে এগিয়ে চলেছেন।

প্রিয়দর্শিনী : (অস্ফুটে বলেন) উঃ কি অন্ধকার। চোখ দুটোও কেমন ঘুলিয়ে যায়।

দৃশ্য ৪ : ঘরের এক কোণে তিন ডাইনী।

প্রথম ডাইনি : ক্লোজ। ওই যে সে।

দ্বিতীয় ডাইনি : ক্লোজ। ওই যে সে। ওই যে সে।

তৃতীয় ডাইনি : ক্লোজ। ওই যে, ওই যে, ওই যে সে।

দৃশ্য ৫ : ক্লোজ। মোমবাতির কাঁপা-কাঁপা আলোয় প্রিয়দর্শিনীর মুখখানাকে ভয়াল চেহারা বলে মনে হচ্ছে।

প্রিয়দর্শিনী : অন্ধকারে থাকতে আজকাল আমার ভয় করে। প্রখর আলোতে যেসব অংক নির্ভুল বলে মনে হয় এবং যার ফলে নিজেকে অভ্রান্ত বলে মনে হয়, নিজের উপর কেমন একটা প্রচণ্ড আস্থা আসে, গভীর অন্ধকারে সেই অংকেরই কেমন যেন উত্তর মেলে না। ফলে সংশয় কেবলই খোঁচা মারে। আত্মবিশ্বাসটা পুরনো চেয়ারের মত নড়বড় নড়বড় করতে থাকে! উঃ, কি ঘন বিশ্রী অন্ধকার। এইখানেই কোথাও ড্রেসিং টেবিলটা থাকবার কথা। এই ঘরেই তো আমি শুই। ড্রেসিং টেবিলের উপরেই তো স্লিপিং পিলের শিশিটা থাকে। কিন্তু কোথায় সেটা? হায়! দেখ, অভ্যস্ত জীবনও সময় সময় কত অপরিচিত হয়ে ওঠে, বিশেষত এইরকম নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের, আততায়ীর মত, অতর্কিত আঘাতে। কেন এত ক্লান্ত লাগে? কেন দিশা লাগে? কেন মনে হয়, এই অন্ধকারের এক প্রান্ত, উৎসমুখ আমারই হৃদয়ে, হৃদয়ের অন্তস্তলে? কেন শঙ্কা জাগে এই কথা ভেবে, এই অন্ধকার অক্ষয়,

অব্যয়, অনিবার্য? অযুত অযুত উৎসারিত ধারা মহাবেগে ধেয়ে যায় উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে, পশ্চিমের সীমানায়? তবে কি প্লাবন নামছে ভারতে, অন্ধকারের ঘাতক প্লাবন, যার উৎস আমারই হৃদয়ে?

দৃশ্য ৬ :

প্রথম ডাইনি : (ক্লোজ)। সর্বনাশ, ও যে বেসুরো গাইছে!

দ্বিতীয় ডাইনি : (ক্লোজ)। সর্বনাশ, ও যে ভুল বকছে!

তৃতীয় ডাইনি : (ক্লোজ)। সর্বনাশ, ও যে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে!

তিন ডাইনির সমবেত গীত ও নৃত্য :

এ খেলা মজার খেলা
এ খেলা এমনি যাদু
একবার খেলতে নামলে যায় না ফেরা
ও যাদু, হাতে যদি ময়লা মাখো
সে ময়লা আর যায় না ধোয়া
সাবান সোডা যতই ঘষো
চোখের জলে যতই ভাসো
সে এমন মজার ময়লা যাদু
সে হাতে থাকে হাতেই থাকে
ও সে ছেলের হাতে নয় কো মোয়া

দৃশ্য ৭ : প্রিয়দর্শিনী চমকে উঠলেন। হাত থেকে মোমবাতি পড়ে যাচ্ছিল। অতি কষ্টে সামলে নিলেন।

প্রিয়দর্শিনী (ক্লোজ)। কে, কে এ ঘরে?

ডাইনিরা : কি গো ভালমানুষের বেটী।

প্রিয়দর্শিনী (ক্লোজ)। কে তোমরা?

ডাইনিরা : আমরা তোমার আমরা গো, তোমার তুমি। তোমার সব। তোমার সর্বস্ব। তোমার নিয়তি।

প্রিয়দর্শিনী : বুঝেছি, তোমরাই সেই তিনজন কুহকিনী। সেই উচ্চাভিলাষ, সেই ক্ষমতাপ্রিয়তা, সেই হঠকারী নির্বোধ আবেগ, সেই তিন প্রচণ্ড ছলনা।

ডাইনিরা : কি গো ভালমানুষের বেটি! মুখটা অত তেতো করে কথা কইছ কেন?

প্রিয়দর্শিনী : তোমাদের পরামর্শেই আমি কংগ্রেসকে হত্যা করেছি।

ডাইনিরা : না হলে, ওই ঘাটের মড়া, বুড়ো কংগ্রেসই যে তোমার দফা রফা করে দিত। তখ্‌ত-এ-তাউসে বসবার হাউসটা মিটত কি?

প্রিয়দর্শিনী : Yet who would have thought the old man to have had so much blood in him?

ডাইনিরা : ও সব আবার কি কথা?

প্রিয়দর্শিনী : ও তোমরা বুঝবে না। আমিও বলতে চাইনি। মুখ দিয়ে কেমন বেরিয়ে গেল হঠাৎ। যাক, এসেছো যখন, সামনে এস। আমি বড় একা! বড্ড একা!

ডাইনিরা : একা কি গো। কত লোক তোমার দলে।

প্রিয়দর্শিনী : ওদের কাছ থেকে পালাতে পারলে বাঁচি! কি দাম দিতে হচ্ছে জানো? আমার ভাণ্ডার শূন্য হয়ে এল, তবু ওদের পাওনা মিটছে না। হায়, আগে যদি বুঝতাম, আমার দেবার ক্ষমতা এত সীমাবদ্ধ!

ডাইনিরা : তোমার মনটা আজ তাই ভাল নেই। আমরা যাই।

প্রিয়দর্শিনী (আর্তস্বরে) : না, না, যেও না। দোহাই, যেও না।

ডাইনিরা : আবার আসব গো, আসব।

প্রিয়দর্শিনী : কবে, কবে?

প্রথম ডাইনি : যেদিন হা হা করে ঝড় উঠবে, কড় কড় করে বাজ পড়বে, বৃষ্টির ছাট সপাং সপাং চাবুক আছড়াবে—

দ্বিতীয় ডাইনি : যেদিন ধুন্দুমার কাণ্ড বাধবে, এলোমেলো হয়ে যাবে সব—

তৃতীয় ডাইনি : যেদিন সূর্য খাবি খেতে খেতে ডুবে যাবে অস্তাচলে—

ডাইনিরা সমস্বরে : সেদিন আবার দেখা হবে তোমার সঙ্গে, আগাছার জঙ্গলে ঢেকে যাওয়া এই ভারতে।

রাষ্ট্রপতির শাসন

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন যেভাবে শুরু হয়েছে এবং তার প্রথম মাসটা যে পথে এগিয়েছে তাতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, এ রাজ্যেরও ভবিষ্যৎ ভাল নয়।

একমাস চলে গেল, এখনও নতুন সরকার কাজই শুরু করতে পারলেন না। এখনও শুধু দিল্লি কলকাতা আলোচনা চলছে। এখনও অফিসার নিয়োগ ও বদলির ঝগড়া অব্যাহত। এখনও রাইটারস বিলডিংস থেকে জেলা পর্যায়ে স্পষ্ট কোনও নির্দেশ গেল না। এখনও শুধু সরকারী দফতরে দফতরে জটলা আর ঘোট পাকানো চলছে।

এদিকে সমস্যা কিন্তু দিন দিনই বাড়ছে। যুক্তফ্রন্টের তেরো মাসের রাজত্বের বহু সমস্যা তো আছেই। গত একমাসেও নতুন অনেক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। আছে আইন ও শৃংখলার সমস্যা। আছে জমি উদ্ধার ও বিলির সমস্যা। আছে খাদ্যের সমস্যা। আছে কলকারখানায় শান্তি ও শৃংখলা ফিরিয়ে আনার সমস্যা। আছে বন্ধ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি চালু করার সমস্যা। আছে প্রশাসন যন্ত্রকে দলগত রাজনীতির প্রভাবমুক্ত করার জরুরী প্রয়োজনীয়তা।

আশু সমস্যাই অনেক অনেক। দীর্ঘমেয়াদী সমস্যার তো আদিঅন্ত নেই। পশ্চিমবঙ্গ চিরকালই সমস্যাসঙ্কুল রাজ্য। দেশবিভাগের পর থেকে এ রাজ্যে যত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তার সিকিভাগেরও সুরাহা হয়নি। সমস্যার পিঠে সমস্যা জমে সমস্যার পাহাড় সৃষ্টি হয়ে রয়েছে এই রাজ্যে।

আশু এবং দীর্ঘমেয়াদী ঝুড়ি-ঝুড়ি সমস্যার এই রাজ্যের দায়িত্ব নিয়ে নতুন সরকার এক অদ্ভুত দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিচ্ছেন। দিল্লি থেকে, কলকাতা থেকে শুধু ঘোষণার পর ঘোষণা প্রকাশিত হচ্ছে। কর্তারা শুধু প্রতিশ্রুতিই দিয়ে যাচ্ছেন। কাজের কাজ কিন্তু এক ইঞ্চিও এগোচ্ছে না। আমি সাত আট বছর ধরে নিয়মিত রাইটারস বিলডিংসে যাচ্ছি। আজকের মত এমন অচল অবস্থা মহাকরণে কোনও দিন দেখিনি। যুক্তফ্রন্টের চরমতম মুহূর্তেও সরকারী কাজকর্ম এভাবে অচল হয়নি।

✲

কিন্তু রাষ্ট্রপতির শাসনেও পশ্চিমবঙ্গে এই অদ্ভুত অচলাবস্থা সৃষ্টি হলো কেন? যন্ত্রারম্ভ আটকাচ্ছে কোথায়? প্রশাসন ব্যবস্থা এগোতে পারছে না কেন? রাষ্ট্রপতির শাসন মানেই দিল্লির হুকুমৎ। দিল্লিতে তো দশমতের দশদলের সরকার

নেই। তাহলে দৃঢ় পদক্ষেপে এগোতে বাধা কোথায়? ধাওয়ান সাহেবকে তো চোদ্দ দলের মন্ত্রিসভার অনুমতি নিয়ে সিদ্ধান্ত করতে হয় না। তাহলে তিনি কোনও স্পষ্ট নির্দেশ দিতে পারছেন না কেন?

প্রথমে মনে হয়েছিল এর জন্য শুধু রাজ্যপালই দায়ী। রাজ্যপাল তাঁর প্রথম ভাষণে এমন কতকগুলি কথা বলেছিলেন যা শুনে সকলেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। নানা স্তরে প্রশ্ন উঠেছিল ভদ্রলোক কি চান?

রাজ্যপাল বলেছিলেন, আমি চোদ্দদলের যুক্তফ্রন্ট সরকার পুনরুজ্জীবনের জন্য চেষ্টা করে যাব। রাজ্যপাল তারপরে আরও বলেছিলেন, আমি যুক্তফ্রন্টের মূল নীতিগুলি অনুসারেই চলব। প্রায় এর সঙ্গে সঙ্গেই এসেছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীবিদ্যাচরণ শুক্লার ঘোষণা: আমরা দৃঢ় পদক্ষেপে এগোবো। পশ্চিমবঙ্গের নানা সমস্যা সমাধানের জন্য সচেষ্ট হব। রাজ্যের প্রশাসনব্যবস্থায় দলীয় রাজনীতির যে প্রভাব পড়েছে তা দূর করার চেষ্টা করব।

স্বভাবতই মনে হয়েছিল, কেন্দ্র দৃঢ় পদক্ষেপেই এগোতে চান, কিন্তু ধাওয়ান সাহেবের জন্য তা পারছেন না। ধাওয়ান সাহেব যখন ফাইলের পর ফাইল জমিয়ে রাখলেন, যখন উপদেষ্টা নিয়োগে চরম "করছি করব" নীতির পরিচয় দিলেন এবং প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় বিচিত্র সব বিবৃতি দিতে শুরু করলেন তখন রাজ্যপাল সম্পর্কে এই সন্দেহটা আরও বাড়ল। সবাই মনে করলেন, ভদ্রলোক হয় কেন্দ্রীয় নীতি-ফিতির পরোয়া না করে নিজের খেয়াল-খুশী মতই এগোতে চান, না হয় রাজ্য চালনার কোনও যোগ্যতাই তাঁর নেই। দিন যত এগলো, রাজ্যপালের ক্রিয়াকলাপ মানুষ যতই দেখল ততই মনে হতে লাগল সব-কিছুর জন্য ধাওয়ান সাহেবই দায়ী।

রাইটারস বিলডিংসেও সব বিচিত্র জিনিস দেখতে ও শুনতে লাগলাম। ধাওয়ান সাহেব হুকুম দিলেন, কোনও অফিসার কোনও নীতিগত কথা বলবেন না, তাতে নানা জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে এবং বিভিন্ন লোকের বক্তব্যে ও দিল্লি কলকাতায় ফারাক দেখা দিতে পারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেই এমন কতকগুলি কথা বলে চললেন যাতে সবচেয়ে বেশি জটিলতা সৃষ্টি হতে থাকল—যাতে দিল্লি ও কলকাতায় বিস্তর পরস্পরবিরোধিতা ধরা পড়ল।

শ্রীবিদ্যাচরণ শুক্লা বলেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনকে দলীয় রাজনীতির প্রভাবমুক্ত করার জন্য 'সংক্রামিত' অফিসারদের সরিয়ে নেওয়া হবে। ধাওয়ান সাহেব বললেন, না তেমন কাজ করলে প্রশাসন ব্যবস্থার মনোবল ভেঙ্গে যাবে। দিল্লিতে নানা কর্তা বললেন, পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন ব্যবস্থা ও পুলিশ আইন মাফিকই চলবে। রাজ্যপাল জানালেন, আইন ও শৃংখলা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় আমি দৃঢ়সংকল্প হলেও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশ কোথাও বাধা দেবে না।

রাজ্যপাল নির্দেশ দিলেন, সব গুরুত্বপূর্ণ ফাইল তাঁর কাছে পাঠাতেই হবে। তিনিই দেখে শুনে নির্দেশ দেবেন। ফাইল যাওয়া শুরু হলো। কিন্তু দেখা গেল রাজ্যপাল ফাইল দেখতে জানেনও না, তাতে তাঁর উৎসাহও নেই।

ফাইল হাতে নিয়েই তিনি গোটা ফাইল পড়তে শুরু করে দিলেন। সাধারণত প্রায় প্রত্যেকটি ফাইলেই অন্ততঃ বিশ তিরিশটি পৃষ্ঠা থাকে। নানা অফিসারের নোট নানা স্তরের নানা প্রস্তাব পাল্টা প্রস্তাব নিয়ে এক একটা ফাইল তৈরী হয়। সাধারণতঃ মন্ত্রিরা বা সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ ফাইলের সর্বশেষ অংশটি দেখেন। বুঝে নিতে চান, সর্বশেষ পরিস্থিতিটা কী এবং বিভাগীয় সর্বোচ্চ অফিসার কী বলেছেন। প্রয়োজনে কখনও কখনও কেউ কেউ পেছনের আরও দু একটা পাতা উল্টে-পাল্টে দেখেন। ধাওয়ান সাহেব কিন্তু সে পথে গেলেন না। তিনি গোটা ফাইলের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে দেখার চেষ্টা করলেন। ফলে একটা দুটো ফাইল বুঝে উঠতেই তাঁর দিনের পর দিন চলে গেল। তিনি হাঁপিয়ে উঠলেন এবং মোটামুটি ফাইল দেখাই ছেড়ে দিলেন। পরিণতিস্বরূপ রাজ্যপালের দফতরে ও রাজভবনে ফাইলের পাহাড় জমে উঠল। সব অচল হয়ে পড়ল।

এইভাবে ধাওয়ান সাহেবের নানা বিবৃতি এবং ক্রিয়াকলাপের ফলে অবস্থাটা যখন চরমে উঠল তখন দিল্লি থেকে জরুরী ডাক এল। রাজ্যপাল দিল্লি গেলেন। দিল্লিতে রাজ্যপালকে ঠিক কী কী বলা হয়েছে তা জানা যায়নি। তবে, এটা দেখা গিয়েছে যে, রাজ্যপাল (১) দফতর পুনর্বণ্টন করে ও মুখ্যউপদেষ্টা পদসৃষ্টি

করে শ্রী বি বি ঘোষকে নিতে বাধ্য হলেন, (২) শ্রীসুকুমার মল্লিককে মুখ্যসচিব করতে "সম্মত" হলেন, এবং (৩) তাঁর প্রীতি সম্ভাষণ বিবৃতি দান বন্ধ হল। রাজ্যপালকে নিশ্চয়ই শুধু এই ক'টা নির্দেশ দেওয়ার জন্য চার-পাঁচ দিন দিল্লীতে আটকে রাখা হয়নি। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর নিশ্চয়ই আরও বহু বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

যা প্রকাশ্যে জানা যায়নি তার আলোচনা থাক। যা জানা গিয়েছে, দেখা গিয়েছে তা থেকেই কিন্তু পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে যা কিছু ঘটছে তার জন্য শুধু ধাওয়ান সাহেব দোষী নন—কেন্দ্রের অস্থিরচিত্ততাও দায়ী।

শ্রী বি বি ঘোষ যেভাবে উপদেষ্টা পদ প্রত্যাখ্যান করলেন এবং যেভাবে তাঁকে আবার ফিরিয়ে আনা হল, শ্রীসুকুমার মল্লিককে যেভাবে প্রথমে বাতিল করে দিয়ে পরে আবার কেন্দ্র মুখ্যসচিব করতে রাজি হলেন তা থেকে পরিষ্কার, দিল্লীর কর্তারা অফিসার পর্যায়ের চাপের কাছেও নীতি-স্বীকার করেন। হতে পারে শ্রীঘোষ খুব কাজের লোক, হতে পারে শ্রীমল্লিকেরই মুখ্যসচিব হওয়া উচিত—কিন্তু গোড়ায় সে সব বিবেচনা কোথায় ছিল? শুরুতেই শ্রীঘোষকে গুরুত্বপূর্ণ দফতরগুলি দিয়ে মুখ্য উপদেষ্টা করা হলো না কেন, শুরুতেই শ্রীসুকুমার মল্লিককে মুখ্যসচিব করতে কি বাধা ছিল? পরে যা হলো তাতে এইটাই বোঝা গেল, কেন্দ্র সব রকমের চাপের কাছে নতি স্বীকার করেন। নেহরু পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে বলেই যদি কারু সব চাপের কাছে মাথা নত করা হয়, তপশিলী বলেই যদি কারু জন্য রাষ্ট্রপতি থেকে আরম্ভ করে নবকংগ্রেস সভাপতি পর্যন্ত তদবির শুরু করেন তাহলে কি প্রশাসন চলতে পারে?

শ্রী বি বি ঘোষ প্রসঙ্গের সমাপ্তি ঘটেছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত (১৯ এপ্রিল) শ্রীসুকুমার মল্লিক প্রসঙ্গে সুরাহা হয়নি। শ্রীমল্লিক দিল্লীতে তদবির করতে গিয়েছিলেন। শ্রী ভি ভি গিরিও নাকি তাঁর জন্য রাজ্যপালকে টেলিফোন করেছিলেন। তার আগে প্রধানমন্ত্রী এবং নবকংগ্রেস সভাপতি শ্রীজগজীবন রামও নাকি তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি মুখ্যসচিব হবেন।

এখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে, রাজ্যপাল তাতে রাজি নন। দিল্লীতে নাকি তিনি সম্মত হয়েছিলেন। কলকাতা এসেই মত পাল্টেছেন। এ এক বিচিত্র অবস্থা সন্দেহ নেই!

*

এদিকে সমস্যা কিন্তু বেড়েই চলেছে। আইন ও শৃংখলার পরিস্থিতি স্বাভাবিক-ভাবেই কয়েকদিনের জন্য কিছুটা ভালর দিকে গিয়েছিল। সরকার সেই সুযোগটার সদ্ব্যবহার করতে এগিয়ে গেলেন না। এখন তাই অবস্থা আবার দ্রুত খারাপ হচ্ছে। জটিল ভূমিসমস্যা সম্পর্কেও সরকার এখনও পর্যন্ত কোনও নীতিই স্থির করতে পারেন নি। অথচ আবাদের সময় এগিয়ে আসছে। খাদ্যসমস্যার জটিলতাও ক্রমেই বাড়ছে। গ্রামাঞ্চলে চালের দাম প্রতিদিনই বর্ধমান। সমগ্র প্রশাসন ব্যবস্থার মধ্যে কলহ ক্রমেই দানা বাঁধছে। যাঁরা দলগত রাজনীতির প্রভাবে পড়েছিলেন রাষ্ট্রপতির শাসনের প্রাথমিক ভয়টা কাটিয়ে উঠে এখন তাঁরাই আবার শক্ত হয়ে বসছেন। এক গোত্রের সকলে জোট বাঁধার চেষ্টা করছেন।

যেভাবে কাজ শুরু হয়েছে তাতে এই সরকার আর কখনও ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ পাবেন কিনা সন্দেহ। এর পর সমস্যা যত বাড়বে, রাজ্যের রাজনীতির উত্তাপ যত বৃদ্ধি পাবে নতুন সরকারের অসহায় ভাবও ততই বাড়বে। দিল্লীতেও রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়ছে। রাজধানীর কর্তারা যখন নিজেদের সামলাতে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়বেন তখন পশ্চিমবঙ্গের দিকে নজর দেওয়ার ততটা সুযোগই বা তাঁরা পাবেন!

নবারুণ গুপ্ত

দেবরাজ

নিয়তির খেয়াল

অ্যাপোলো তেরোর চাঁদে অভিযান সফল হয়নি। তা বলে চাঁদে পাড়ি দেওয়ার এবারের বিপুল আয়োজন বিফলে গিয়েছে এমন কথা ভুলেও কেউ বলছেন না। ঠিক ছিল অ্যাপোলো এগারো আর বারো চাঁদের যে সমতল জায়গায় নেমেছিল অ্যাপোলো তেরো সেখানে কী তার কাছাকাছি কোথাও না নেমে নামবে শক্ত জমিতে, উঁচু ডাঙায়। তা হলে নাকি চাঁদের উৎপত্তি রহস্য ভেদ করা সম্ভব, হয়তো বা, সহজ হবে। সে রহস্য কিন্তু যেমন অজানা ছিল তেমনই রয়ে গিয়েছে অ্যাপোলো তেরো পৃথিবীতে ফিরে আসার পরও। যে ষোলো-সতেরো এপ্রিল মহাকাশচারীদের চাঁদের ফ্রা মোরো মালভূমিতে পায়চারি করার কথা সে দু'দিনই তাদের প্রাণ নিয়ে চলছিল টানাটানি। হিউস্টন থেকে যাঁরা অ্যাপোলো তেরোর অভিযান নিয়ন্ত্রণ করছিলেন কেবল তাঁরা নয় সারা দুনিয়ার লোক পাঁচ দিন ধরে একমন হয়ে প্রার্থনা করেছে তিন দুঃসাহসী মহাকাশচারী যেন ভালোয় ভালোয় ঘরে ফিরে আসেন। এতগুলি লোকের শুভ কামনা বৃথা যায়নি। বহাল তবিয়তে তাঁরা পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন।

যে কাজের জন্যে এত ঝুঁকি নিয়ে জেমস্ লোভেল, ফ্রেড হেস আর জন সুইগার্টকে পাঠানো হয়েছিল মহাশূন্যে তা তাঁরা করতে অবশ্য পারেন নি, কিন্তু যা তাঁরা করেছেন তা সামান্য তো নয়ই, বরঞ্চ অতি-অসাধারণ। একটা মাত্র ভেলা সম্বল করে মহাকাশে হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে শেষে একটা ভাঙা জাহাজে চেপে পৃথিবীতে ফিরে আসা একেবারে অসম্ভবকে সম্ভব করা। সাধারণ মানুষের পক্ষে অমন কৃতিত্ব দেখানো সাধ্যের বাইরে। মর্ত্যে থেকে যাঁরা অ্যাপোলো প্রকল্প চালিয়েছেন তাঁরা অবশ্য বলেছেন বেকায়দায় পড়ার পর তাঁদের নির্দেশে মহাকাশচারীরা যা করেছেন সে সবেরই মহড়া তাঁরা দিয়েছেন মহাশূন্যে পাড়ি দেবার আগে এক পৃথিবীতে ফেরার পথে মূল জাহাজ থেকে চাঁদের ভেলাকে আলাদা করে দেওয়া ছাড়া। নির্বিঘ্নে মর্ত্যে ফিরে আসার জন্যে যা যা করার সে সবই তাঁরা নিখুঁতভাবে করেছেন —যা মহড়া দিয়েছেন তা তো বটেই যা মহড়া দেননি তাও। হিউস্টন থেকে তাঁদের দেওয়া হয়েছে নির্ভুল নির্দেশ, তা তাঁরা পালনও করেছেন অক্ষরে অক্ষরে পরিপাটি-ভাবে।

কিন্তু উপদেশ যতই খাঁটি হোক আর মহড়া যত ভালো দেওয়াই থাক বেকায়দায় পড়লে সে উপদেশ মেনে মহড়া অনুযায়ী কাজ করা খুবই শক্ত ব্যাপার। যে কেউ তা পারেও না। লোভেল-হেস-সুইগার্ট যদি বিপদে পড়ে ঘাবড়ে যেতেন তা হলে প্রাণ নিয়ে ফেরা আর তাঁদের হতো না, তাঁদের জাহাজ কিংবা ভেলার কোনও চিহ্নই থাকতো না, মহাশূন্যেই হতো তাঁদের সমাধি। চরম সংকটের মুখে পড়েও তাঁরা যে ভেঙে পড়েননি, বরং মাথা ঠাণ্ডা রেখে যখন যেমনটি করার তখন তেমনটি করেছেন সেটা সম্ভব হয়েছে তাঁদের মনের জোর অসাধারণ বলে। নইলে যে অবস্থায় তাঁরা পড়েছিলেন তাতে সাধারণ লোক পাগল হয়ে যেতো, ধৈর্য ধরে হিউস্টনের নির্দেশ শোনা, শান্ত হয়ে তা পালন করা এ সব কিছুই করতে পারতো না। অবশ্য ভাগ্যও কিছুটা মহাকাশচারীদের সহায় ছিল। তাঁরা বেঁচে গেছেন ভেলায় চেপে চাঁদে নামবার আগেই তাঁদের জাহাজে দুর্ঘটনা ঘটাতে। কাণ্ডটা যদি ভেলাটা ছেড়ে দেওয়ার পর ঘটতো তা হলে মহাশূন্যে মৃত্যুর হাত তাঁরা এড়াতে পারতেন না, সব শেষ হয়ে যেতো মহাকাশেই।

তিন মহাকাশচারীকে নিয়ে নিয়তি এবার এক নিষ্ঠুর খেলা খেলেছে। এমনিতেই তো মহাশূন্যে পাড়ি দেওয়া প্রাণ হাতে করে। ট্রেনে কী মোটরে যন্ত্র বিকল হলে লাফিয়ে বাঁচা যায়, জাহাজ ডুবি হলে ডিঙিতে চেপে তীরে ওঠা সম্ভব, বিমান দুর্ঘটনা হলে প্যারাসুটে করে লোক নিচে নির্বিঘ্নে নামতে পারে—যদিও এ সবই সাধারণ মানুষের অসাধ্য। কিন্তু মহাশূন্যে জাহাজ বিগড়োলে করার কিছুই নেই ভগবানকে ডাকা ছাড়া। সেখানে তো আর কোনও কার-খানা নেই যে কোনও মতে দু দশ মাইল যেতে পারলেই জাহাজটা সারিয়ে সুরিয়ে নেওয়া যাবে। তার ওপর মহাশূন্যে পাড়ি দেওয়াতে মানুষের এই তো হাতে খড়ি। অঘটন সে যাত্রায় কী কী যে হতে পারে তা এখনও পর্যন্ত জানা নেই। অ্যাপোলো তেরোর বরাত ভালো যে এমন কোনও সমস্যা এ যাত্রা দেখা দেয়নি যার জবাব হিউস্টনের বৈজ্ঞানিক আর ইঞ্জিনিয়ারদের জানা ছিল না। বিস্ফোরণ ঘটে অক্সিজেন কমে গিয়েছে, বিজলী সরবরাহে টান পড়েছে, জাহাজে বিষাক্ত গ্যাস জমেছে, ফিরতি পথে টাল খেয়ে জাহাজ বিপথে চলেছে—এ সব সমস্যার উত্তর জানা ছিল হিউস্টনের, সেখান থেকে জানানো হয়েছে মহাকাশ-চারীদের। তাই তাঁরা নেহাৎ যমের মুখ থেকে ফিরে এসেছেন।

কেন এমন হলো এ প্রশ্নের জবাব এখনও অজানা। সঠিক জবাব এর কখনও জানা যাবে কিনা সন্দেহ। অ্যাপোলো তেরোর ভাগ্য বিপর্যয় নিয়ে একটা তদন্ত কমিশন বসাবার ব্যবস্থা মহাকাশচারীরা ফিরে আসার প্রায় সংগে সংগেই হয়েছে। কিন্তু সরেজমিনে তদন্ত তো আর করা যাবে না, পাকা প্রমাণও কিছু মিলবে না। আন্দাজের ওপর নির্ভর করে যতটা করা যায় তার বেশী কিছু করা তো সম্ভব নয়। অনেকে বলছেন উল্কাপাত হওয়ার ফলেই ওই বিভ্রাট বেধেছে। তা যদি সত্যি হয় তা হলে মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার বিপদ আরও বাড়লো। হাজার হাজার উল্কা ছুটে চলেছে মহাশূন্যে। কখন তাদের কোনটার সংগে মহাকাশযানের ধাক্কা লাগবে তা কে বলতে পারে? মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার জাহাজ যদি আরও বড়, মজবুত আর পোক্ত হয় তা হলে হয়তো ও ধরনের ধাক্কার টাল সামলাতে পারবে। কিন্তু তার জন্যে তো চাই টাকা। কে সে টাকা দেবে? এক অ্যাপোলো তেরোর জন্যেই তো আমেরিকার তিনশো কোটি টাকা জলে গিয়েছে। চাঁদে অভিযানের জন্য অত টাকা খরচ করার বিরুদ্ধে আপত্তি উঠেছে। আরও বাড়তি বরাদ্দ আদায় করা শক্ত হবে।

লোকে মনে করছে চাঁদে আসা যাওয়া একটা বাহাদুরি ছাড়া আর কী? রুশীদের টক্কর দিয়ে প্রেসিডেন্ট কেনেডি বলেছিলেন চাঁদে প্রথম মানুষ যে পা দেবে সে হবে আমেরিকার বাসিন্দা। সে গোঁ তো আমেরিকা বজায় রেখেছে, আর কেন? বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে যেটুকু জানা দরকার তা তো যন্ত্র মারফতই জানা যায়। চাঁদে মানুষ পাঠাবার পথ পরিষ্কার করে দিয়েছিল রুশীরা সেখানে আস্তে আস্তে যন্ত্রপাতি নামিয়ে। জলজ্যান্ত মানুষ দিয়ে আর এ খেলা কেন? অ্যাপোলো প্রকল্পে এতকাল কোনও খুঁত দেখা দেয়নি বলে মনে হয়েছিল মহাশূন্যে পাড়ি বুঝি একেবারে নিরাপদ, বিপদের ঝুঁকি কিছু বুঝি নেই। সে ভুল ভাঙিয়ে দিয়েছে অ্যাপোলো তেরো। অঘটন ঘটতে চলেছিল ও সংখ্যাটা অপয়া বলে নয়, বিজ্ঞানী আর প্রয়োগবিদদের অতিরিক্ত আত্মপ্রত্যয়ের ফলে। কথা উঠেছে আগে তাঁরা যতটা সাবধানী ছিলেন পর পর দু' দুটো অভিযান আশ্চর্য রকম সফল হওয়ার দরুন তাঁরা খানিকটা অসতর্ক হয়ে পড়েছিলেন এবারে। বিভ্রাটের মূলে যদি থাকে দৈব ঘটনা তাহলে তাঁদের দোষ খণ্ডে যাবে। কিন্তু এর পর এতটুকু ত্রুটি রাখলে তাঁদের চলবে না। রাখলে তাঁদের সামান্য ভুলের খেসারত দেবে তিনজন মানুষ নিজেদের অমূল্য জীবন খুইয়ে।

'নববর্ষের উপদেশ'

দক্ষিণ কলকাতার কোনো অধ্যাপকের বাড়ির দেওয়ালে জনকয়েক বালক আলকাৎরা দিয়ে কিছু উদ্দীপনাময় বাণী লিখছিল। গ্রন্থজীবী সেই অধ্যাপক এ-কালের জটিলতা বোঝেন না, অথবা উক্ত বাণীগুলো তাঁর ঠিক মনঃপূত নয়, কিংবা নতুন রং করা দেওয়াল সম্পর্কে তাঁর কিছু কাতরতা জেগে থাকবে। কারণ যাই হোক, 'পতঙ্গবং বহ্নিমুখং' তিনি প্রতিবাদ করতে গিয়েছিলেন। ফলে প্রচণ্ড প্রহারে লাঠি এবং
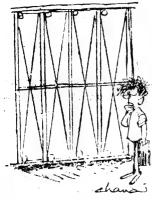
দেওয়ালের বদলে কোলাপসিবল গেট লাগিয়ে দিন

সমস্ত মুখে আলকাৎরা-প্রলেপন। মর্মদের মনে হচ্ছে, এই প্রহারটা তাঁর আকাঙ্ক্ষিত ছিল না, উক্ত প্রসাধনেও তিনি খুব প্রসন্ন হননি।

ইতি সংবাদপত্র।

সেই মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ! অধ্যাপকের যা পাওনা, তাই তিনি পেয়েছেন। "কেননা পাপের বেতন মৃত্যু"—স্বর্গীয় বাইবেলের এই বাণীটি বার-বার উদ্ধৃত দেখেও তাঁর চৈতন্য হয়নি—তিনি যে সেদিন পুরো 'বেতন'টি পাননি, কেবল আলকাৎরার ওপর দিয়েই গেছে—এ তাঁর সৌভাগ্যই বলতে হবে। না—সেই আলকাৎরারঞ্জিত বিধ্বস্ত অধ্যাপকের জন্যে আমার কোনো সহানুভূতি হয় না।

একদল এরকম অধ্যাপক এখনো 'বহাল' (অবশ্য তাঁরা ক্রমেই সংখ্যালঘু হয়ে আসছেন—উনবিংশ শতাব্দীর ওসব স্কুপুলস্ আর কতদিন টেঁকে!)—যাদের ধারণা, সকলকেই তাঁরা উপদেশ দিতে পারেন, ভ্রম-সংশোধন করতে পারেন; এমন কি গৃহিণীর ওপর চটে গিয়ে তাঁরা মনের ভুলে চেঁচিয়ে ওঠেন: 'সাতটা পার্সেন্টেজ কেটে নেব!' তাঁদের আরো বিমূঢ় বিশ্বাস যে: অধ্যাপনাই তাঁদের অক্ষয় রক্ষা-কবচ—ওই পরিচয়টি তুলে ধরলেই সবাই মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মতো মাথা নীচু করবে।

এই রকম একটি অধ্যাপকের দুর্গতি একবার দেখেছিলুম যাদবপুরের বাসে।

পূর্ব-ভূমিকা দেখিনি, আমি ছিলুম পেছনে। চেঁচামেচি বেড়ে উঠতে চক্ষু-কর্ণ নিবদ্ধ করতে হল সেদিকে। মধ্য বয়সী, চশমাধারী, চাদরশোভিত এক ব্যক্তি রড-ধরে দাঁড়িয়ে উঠে গণ্ডা-চারেক তরুণকে শাসাচ্ছেন: 'ইয়ার্কি' মারার জায়গা পাওনি আর? জানো—আমি অমুক ইউ-নিভার্সিটির প্রফেসর?'

'—যান—যান—বেশি চেল্লাবেন না, অমন অনেক প্রফেসার দেখেছি।'

'অসভ্য বাঁদর ছেলে সব—একটু ম্যানার্স জানো না, বাপের বয়সী ভদ্রলোককে—'

'বেশি ওস্তাদী করবেন না, দাঁতগুলো সব খুলে নেব!'

দন্ত-উৎপাটনের সেই চমকপ্রদ ঘটনাটি দেখবার জন্যে বাসসুদ্ধ আমরা

রাতের বেলা দেওয়ালে যা লেখা হবে দিনের বেলা তার উপর আপনি মন্তব্য লিখে দিন

সবাই প্রতীক্ষা করছিলুম। কিন্তু প্রফেসারটিই বোধ হয় দন্তহারা হওয়াটা পছন্দ করলেন না। চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে এক জায়গায় নেমে গেলেন, খুব
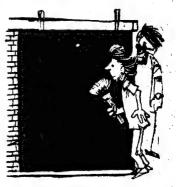
রাতে দেওয়ালের সামনে ফলস্ দেওয়াল বসান। দিনে সেটা খুলে নেবেন

সম্ভব সেটি তাঁর টার্মিনাস নয়।

উদ্দেশ্যে একটা যুৎসই গাল ছুড়ে দিয়ে একজন তরুণ বললে, 'পালালো, নইলে—'

নইলে 'পাপের বেতন' কিছু দিয়ে যেতেই হত, অন্তত কয়েকটি দাঁত তো নির্ঘাত।

বাস্তবিক, এইসব নীতিবাদীরা মধ্যে মধ্যে আমাদের শান্তিময় জীবনযাত্রাকে, স্বাধীন মানসিকতাকে কিভাবে যে বিপর্যস্ত করে তোলেন কলেজে পড়বার সময় নিয়মিতভাবে আমি 'ফরাসী ছুটি' (ফরাসীরা উল্টোর গেয়ে যাকে 'ইংরেজি ছুটি' বলে থাকে) গ্রহণ করতুম। আর এই প্রয়োজনে, অবশ্যই পেছনের বেঞ্চিতে বসতে হত।

ভাবতুম, আমার এই নিঃশব্দ অপসরণ ক্ষীণদৃষ্টি অধ্যাপক কখনো দেখতে পান না। কিন্তু একদা—অকস্মাৎ—

তাঁর 'ডেইস' থেকে অধ্যাপক হঠাৎ নাটকীয় ভঙ্গিতে আঙুল বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে। তারপর গম্ভীর রবে বললেন, 'দ্যাট লীন জেণ্টলম্যান—দ্যাট ব্যাক-বেঞ্চার'—বঙ্গানুবাদ করলে বাক্যটি এই দাঁড়ায় : 'পিছনের বেঞ্চিবিহারী উক্ত রোগা ভদ্রলোকটি আমার ক্লাসে সর্বদাই ফরাসী ছুটি নেবার সুযোগ সন্ধান করে থাকেন।'

তাতেও কুলোল না। তারপর 'আরোহ তর্কবিদ্যা' থেকে এমন একটি প্রশ্ন আমার দিকে নিক্ষেপ করলেন, যেটি ক্লাসে পূর্ব-পঠিত হলেও আমার মানসপটে তার চিহ্ন-মাত্র ছিল না। 'অ্যাডিং ইন্সাল্ট্ টু'—না কেবল 'ইনজুরি' নয়—একেবারে 'গ্রীভাস ইনজুরি' যাকে বলে!

আলকাৎরা-লিপ্ত অধ্যাপকের কথা ভেবে কেবল অপ্রীতিকর স্মৃতিগুলোই আসছে।

মনে পড়ছে বি-এ পরীক্ষার আগে শেষ সেদিন। অধ্যাপক সযত্নে বিষয়টি করে আনছেন। আমি তাতে গুরুত্ব দিইনি—পরীক্ষার সঙ্গে সম্পর্ক অন্য একটি গ্রন্থপাঠে নিমগ্ন আছি।

আচমকা অধ্যাপক নাম ধরে ডাক আমার। চমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

ইংরিজিতেই প্রশ্ন করলেন, 'লক্ষ করছি, তুমি যা পড়ছ তা আমার বইটি নয়?'

নিরুত্তরে স্বীকৃতি জানাতে হল।

অধ্যাপক আহত বিষণ্ণ স্বরে বল 'তোমার কাছ থেকে অন্তত এটা করি নি।'

গালাগাল দিলে অত খারাপ লাগত আর সহপাঠিনীদের চাপা হাসি উদ্ভাসিত মুখ অবস্থাটাকে আরো করে তুলল। শেষবারের মতো ছাড়বার দিনে এই অপমানটুকু না কি চলছিল না?

নববর্ষের সন্ধ্যায় কলেজ পাড়া যেতে যেতে চিন্তাটা জাগছিল। চাটার্জি স্ট্রীটে পা দিয়ে হঠাৎ অন হয়ে গেলাম।

অনেকদিন আগে এই পথ দিয়ে সিগারেট খেতে খেতে চলেছিলাম। কাঁধে হাল্কামতো একটি লাঠির তাকিয়ে দেখি রোগা, খোটখাটো সেই মানুষটি। বিপ্লবী কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সকলের কিরণদা। তাঁরই ছড়ির ঘা কাঁধে পড়েছে।

'এই ছ্যামড়া—অত সিগারেট খাস

'আমি ছ্যামড়া নই কিরণদা—

বয়েস।'

'বেশি চালাকি করবি না। এইসব দ্যাশ-ট্যাশের কথা একটু ভাব যে গোল্লায় গেলি হতভাগারা।'

আমি সিগারেট ছাড়ি নি দেশের কিছু করিনি। কিরণদার এই উপদেশও আমার দরকার ছিল না। এই পথ দিয়ে যেতে যেতে সে কথা পড়ে, কেন জানি না, চোখে জল এল।

এখন বুঝতে পারছি, কেন অধ্যাপক ভয় করতুম, তাঁদের শাসন মানতে হত মাথা নামিয়ে। আমাদের মেরুদণ্ডের ছিল না। তাই কিরণদার সামনে সিগারেট খাই নি আমি।

এখনকার কালের মেরুদণ্ড অনেক সোজা। এখন বেঁচে থাকলে অনেক ছিল কিরণদার কপালে। লাঠির ঘা উপদেশ দিতে গেলে আলকাৎরা লিন্চিংয়েরই ব্যবস্থা হত তাঁর!

ভালো কথা, বিলম্বিত হলেও বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা নিন। আর সেই সঙ্গে একটি উপদেশও নিনা : দয়া করে কাউকে কখনো উপদেশ দেবেন না।

অকাল-সন্ধ্যা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ব্যাসবাক্য মিথ্যা নয়।
পরবর্তী কবিরাও মৌসলপর্বের অন্ত্য ঘটনার বর্ণনায়
অসত্যের আশ্রয় নেননি। তাঁরা
যথাসাধ্য ব্যাসের পদাঙ্ক-অনুসরণ করেই
যা-কিছু বলবার বলেছেন।
ব্যাখ্যা বহুবিধ, কিন্তু তথ্য এক।
সত্যি সেই সংকটের মুহূর্তে একটিও
দিব্যাস্ত্র আমার
স্মৃতির সড়কে, অন্ধকারে
ভাসিত হয়নি।
ব্যাসবাক্য মিথ্যা নয়, সে-কথা আমার চাইতে বেশী আর কে জানে,
তবুও।
মাঝে-মাঝে
নিজেকেই প্রশ্ন করি,
স্মৃতিভ্রংশ না-হলেই আমি কি সেদিন
শরযোজনার জন্য
ধনুকে টান্ ক'রে ছিলা পরাতে পারতুম?
স্মৃতিভ্রংশে নয়,
অন্যত্র আমার লজ্জা, অন্যত্র আমার পরাজয়।

কুরুক্ষেত্র শান্ত, মহাযুদ্ধের আগুন
কবেই নিবেছে।
তবুও যাদের কথা ভেবে আমি সাগ্রহে আবার
পরেছি যুদ্ধের সজ্জা,
যাদের সম্মানরক্ষা করবার মানসে আমি গাণ্ডীবে সেদিন
জ্যারোপণ করতে গিয়েছিলাম, যখন
তারাই অনেকে—অগ্নিকুণ্ডের-উদ্দেশে-ধাবমান
মূর্খ পতঙ্গের মতো—
লাস্যভরে
লুঠেরা-দলের দিকে চলে গেল,
তখন, স্বীকার করি, ঠিক সেই মুহূর্তে আমার
শরসন্ধানের কোনো ইচ্ছাই ছিল না।

সকলেই আমাকে নিমিত্তমাত্র ভেবেছেন।
সকলেই বিশ্বাস করেন, আমি
কৃষ্ণের ইচ্ছার
অধীন পুতুলমাত্র, তাঁরই অভিপ্রায়ে
একদা অসংখ্য মহারথীকে পরাস্ত ক'রে তারপর
জীবনসন্ধ্যায়

সামান্য দস্যুর হাতে পরাস্ত হয়েছি, এতে
আমার গৌরব কিংবা অগৌরব—কোনোটাই নেই।
কিন্তু যদি তা-ই হবে, তাহলে এখনো
এত শত বর্ষ যুগ অতিক্রান্ত হবার পরেও
পিছনে তাকালে
চোখের ভিতরে কেন জ্বালা করে ওঠে? কেন
সেই দূর ধূসর সন্ধ্যার স্মৃতি আজও
তীক্ষ্ম শলাকার মতো
বুকের ভিতরে বিঁধে আছে?

কৃষ্ণ, তুমি যেখানেই থাকো,
জেনে রাখো,
নিতান্ত নিমিত্ত নই. আমারও উদ্যম
অথবা নৈরাশ্য বলে কিছু ছিল:
ইচ্ছা ও অনিচ্ছা ছিল। জেনে রাখো,
অর্জিত বিশ্রাম ছেড়ে যাদের রক্ষার জন্য আমি
প্রবীণ বয়সে
তপ্ত বালুকার পথ, নদী ও পাহাড়
পার হয়ে ছুটে গিয়েছিলাম সমুদ্রতীরে, তারা অনেকেই
অর্জুনের হাত ধ'রে
নিরাপদ ভূমিতে উত্তীর্ণ হতে চায়নি, অনেকে
সেই ঘোর সংকটের মুহূর্তে সেদিন—
অর্জুনকে নয়—
অরণ্যের একদল আভীর দস্যুকে
প্রাপণীয় প্রেমিকপুরুষ ব'লে সাগ্রহে বরণ করেছিল।
জেনে রাখো,
কোথায় আমার লজ্জা, কোথায় আমার পরাজয়।

না। কোনো তস্কর কিংবা দস্যু নয়,
ব্যাখ্যার অতীত সেই অকালসন্ধ্যার
কোনো লুঠেরার হাতে অর্জুন সেদিন পঞ্চনদের অঞ্চলে
পরাস্ত হয়নি।
যাদের জয়ের জন্য অশক্ত শরীরে আমি গাণ্ডীবের ছিলা
টান করে বাঁধতে গিয়েছিলাম, তারাই
আমাকে সেদিন
অরণ্যের অন্ধকারে হারিয়ে দিয়েছে।

আমাদের দেশের একজন বিখ্যাত চিত্রকর আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে বললেন, "এই পরিবেশে মানুষ কী করতে পারে?"

কথাটা শুধু ওই একজনের নয়, আমাদের সকলের মনের কথা। আমরা যারা লিখি। আমরা যারা আঁকি। আমরা যারা সৃষ্টি করি, যারা মানুষের সৃষ্টিধারাকে বহমান রাখি। যেমন প্রকৃতির সৃষ্টিধারাকে বহমান রেখেছে প্রকৃতি।

আমার শিল্পীবন্ধুর সঙ্গে একমত হয়ে আমিও তাঁর উক্তির পুনরুক্তি করতে পারতুম। বলতে পারতুম, "এই পরিবেশে আপনি আমি কী করতে পারি?"

কিন্তু তা না করে আমি তাঁকে পাল্টা প্রশ্ন করি, "কে বড়ো? পরিবেশ না মানুষ?" তিনি উত্তর দিতে না পেরে নীরব হন।

আমি শুধু প্রশ্নই করেছি। প্রশ্নের উত্তর হাতে রেখেছি। তবে তিনি অনুমান করেছেন নিশ্চয় যে পরিবেশের চেয়ে আমি মানুষকেই বড় বলে জানি।

তাতে কি তাঁর বিষাদের অবসান হলো? না, তা হবার নয়। যে দেশে আর যে যুগে আমরা জীবন ধারণ করছি সে দেশে ও সে যুগে পরিবেশকেই মনে হচ্ছে সর্বশক্তিমান। মানুষ অর্থাৎ ব্যক্তি তার তুলনায় অসহায়। যদি না সে দলভুক্ত বা শ্রেণীবদ্ধ হয়ে সঙ্ঘশক্তিতে শক্তিমান হয়।

আমরা শিল্পীরা সাহিত্যিকরা কোনোকালেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়ে যূথ গঠন করিনি। সে প্রবণতাই আমাদের নেই। আমরা মাঝে মাঝে সমিতি বা সম্মেলন করে থাকি। কিন্তু সেখানেও আমরা এক একজন ব্যক্তি। ব্যক্তিত্ব থেকে ভ্রষ্ট হয়ে দলচর হওয়া আমাদের স্বভাব নয়। দলাদলি আমরাও জানি, তার কারণ আমাদের নানা মুনির নানা মত। আর মানুষ যখন, তখন আমরাই বা কী করে স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠব? কিন্তু তুলনা করলে দেখা যাবে শিল্পী বা সাহিত্যিকরা যত না দল সচেতন তার চেয়ে বহুগুণে ব্যক্তি সচেতন।

পাঠকের সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের আলাদা চুক্তি। পাইকারী চুক্তি শ্রমিকদের বেলা খাটে, কিন্তু প্রেমিকদের বেলা নয়। শিল্প বা সাহিত্য একটা প্রেমের ব্যাপার। ছবি এঁকে বা উপন্যাস লিখে কিছু পয়সা পাওয়া যায়, তার থেকে ধরে নিলে ভুল হবে যে শিল্পীর বা সাহিত্যিকের ব্যাপারটা পাওনাগণ্ডার ব্যাপার।

বলতে ভালোবাসি, লিখতে ভালোবাসি, গাইতে ভালোবাসি, আঁকতে ভালোবাসি এমনি করেই আমাদের হাতেখড়ি হয়। তারপর সারাজীবন চলতে থাকে সে সাধনা। সিদ্ধি জোটে অতি অল্পসংখ্যকের ভাগ্যে। অনেককেই আহ্বান করা হয়, কয়েকজনকেই মনোনয়ন করা হয়। লক্ষ্মী কৃপণ হলেন কি না সেটা অবান্তর, সরস্বতী কঠোর হলেন কি না সেইটেই আসল। আমার নিজের অভিজ্ঞতা এই যে, লক্ষ্মীকে খুশি করা তেমন দুঃসাধ্য নয় যেমন সরস্বতীকে।

লক্ষ্মী নিষ্ঠুর, কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সরস্বতী নিষ্ঠুরতর। তাঁর কাজে ফাঁকি দিলে তিনি কাউকেই ক্ষমা করেন না। নামকরা লেখকদেরও নাম নিষ্প্রভ হয়ে যায়, বই অচলিত হয়। একদিন যা উজ্জ্বল ছিল এক পুরুষ বা দু'পুরুষ বাদে তার খাদ বেরিয়ে পড়ে। লক্ষ্মীর কৃপা তখন মর্যাদা দেয় না।

ফাঁকি না দিয়ে যাঁরা খাঁটি জিনিসটি দিয়ে যান তাঁরাও কি বাণীর করুণা দাবি করতে পারেন? না, সেখানেও তাঁর মর্জি। কাকে তিনি মনোনয়ন করবেন তিনিই জানেন। আমাদের শুধু কর্মেই অধিকার। মা ফলেষু কদাচন।

পরিবেশ অনুকূল হোক, প্রতিকূল হোক, দক্ষিণ হোক, বাম হোক, আমাদের কাজ আমাদের করে যেতে হবে। এই ভেবে করে যেতে হবে যে, আমরা না করলে আর কেউ করবে না। করণীয় কর্ম অকৃত থেকে যাবে। সৃষ্টির প্রবাহে ছেদ পড়বে। নদীর মাঝখানে চড়া পড়বে। ভাবীকাল এর জন্যে

আমাদেরই দুয়ারে। কেউ বিশ্বাস করবে না যে, আমরা চেষ্টা করলে পারতুম না ঝড়ের রাতে দীপশিখাটিকে অনির্বাণ রাখতে।

এই ঝড়ঝাপটার যুগে সাহিত্যের দীপশিখাটিকে অনির্বাণ রাখা একটি প্রাথমিক লক্ষ্য। তার থেকে ভ্রষ্ট হয়ে খ্যাতিলাভ হয়তো বা জনাকতক ভাগ্যবানের পক্ষে সম্ভব, কিন্তু সিদ্ধিলাভ কারো পক্ষে সম্ভব নয়। গত মহাযুদ্ধের সময় সাহিত্যের দীপ জার্মানীতে ও জাপানে নিবে যায়। রাশিয়াতেও নিবু নিবু হয়। ছেদ পড়ে যায় সে সব দেশের সাহিত্যে। তবে বিস্তর লোক দেশত্যাগী হয়ে সাহিত্যের প্রদীপখানি আঁচল দিয়ে ঢেকে রাখেন। দেশত্যাগ ভালো নয়, কিন্তু সাহিত্যত্যাগের চেয়ে ভালো। সাহিত্যিকেরা যে সাহিত্য ত্যাগ করেননি এর অর্থ ধার্মিক তাঁর স্বধর্ম ত্যাগ করেন নি। ধর্মকে রক্ষা করলে ধর্মই রক্ষা করে।

আমরা একদেশের লোক এক পরম অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবন যাপন করছি। সমাজে ও রাষ্ট্রে নিত্য নতুন পরিবর্তন ঘটছে, কিন্তু পুরাতনের প্রাণশক্তিও অফুরান। একই কালে নতুন ও পুরাতন হওয়া কি সম্ভব? আমার মতে তা সম্ভব নয়। একদিন না একদিন পরিবর্তনকে পথ ছেড়ে দিতে হবেই। সেটা যদি বিনা রক্তপাতে পথ ছাড়েই সেই মঙ্গল হবে। নয়তো এ সংকট মহামারী ডেকে আনবে।

এ সংকটে আমরা যদি অসহায় বোধ করি তবে সেটা ক্ষমাযোগ্য অসহায়তা। কিন্তু ক্ষমার অযোগ্য হবে যদি আমরা সৃষ্টির স্রোত প্রবহমান না রাখি। সৃষ্টির স্রোত প্রকৃতিতে যেমন প্রবহমান রয়েছে সাহিত্যেও তেমনি থাকবে। শিল্পেও তেমনি থাকবে। আমার কাছে এটা একটা স্বতঃসিদ্ধ।

সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ শোনা যায় যে, তাঁরা সমাজ সচেতন নন, তাঁরা গজদন্তের মিনারে বাস করেন, তাঁদের চোখের সমুখে লোকগুলো পড়ে মরলেও তাঁদের রসভাবনা থামে না।

এই ধরনের একটি অভিযোগের উত্তরে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এইচ জি ওয়েলস (H G Wells) বলেছিলেন, "আমিই হচ্ছি সেই সভ্যতা যাকে রক্ষা করার জন্যে তোমরা লড়াই করছ।"

এর মর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি হচ্ছে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের চাষের ফসল। তাঁরা যদি ফসল না ফলান তবে অজন্মা হয়। সভ্যতা বা সংস্কৃতি বলে কিছু জন্মালে তো তার জন্যে তোমরা লড়বে? কিছু জন্মেছিল বলেই না তোমরা লড়ছ? সুতরাং চাষীকে দাও চাষ করতে, সাহিত্যিককে দাও সংস্কৃতির ফসল ফলাতে। লড়াই যারা করতে চাও তারা লড়াই করো। কিন্তু লড়াইতে যারা নেই তারা যে স্ফূর্তি করে বেহালা বাজাচ্ছে তাও নয়। তারা যা নিয়ে আছে তা মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় রস আর রূপ। যা না হলে সংস্কৃতি হয় না, সভ্যতা হয় না। তারাই সেই নিত্যপদার্থ যাকে রক্ষা করতে তোমরা যুধ্যমান।

নিত্যপদার্থ হচ্ছে সেই যা ঝড়ঝাপটার পরেও থাকবে।

এমন কথাও মাঝে মাঝে শোনা যায় যে, সাহিত্যিকরাও ইচ্ছা করলে পরিবেশকে বদলে দিতে পারতেন। কেন তা হলে তাঁরা তা করেন না?

একথা সত্য যে, সাহিত্যিকরা বা দার্শনিকরাও রাজনীতি বা অর্থনীতির গতি বদলে দিতে চেষ্টা করেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সে চেষ্টা ব্যর্থ যায় নি। এই যেমন রাস্কিনের বই "আন্টু দিস লাস্ট" গান্ধীজীর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। তিনি ওর অনুবাদ করে গুজরাটি সংস্করণের নাম রাখেন "সর্বোদয়"। গান্ধীজীর গঠনমূলক কর্মসূচীর মূলে রাস্কিনের প্রভাব কাজ করেছে। এখন তো সর্বোদয় বলে আস্ত একটা আন্দোলনই চলছে। এর ফলাফল সুদূরপ্রসারী।

আরো অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন ভলতেয়ারের উদাহরণ। রুশোর উদাহরণ। তলস্তয়ের উদাহরণ। এঁরা সাহিত্য যেমন রেখে গেছেন তেমনি সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় কর্মপ্রেরণায়। চোখের সামনে এই সব উদাহরণ রয়েছে বলেই লোকে আশা করে যে, আজকের দিনের সাহিত্যিকরাও সমাজ ও রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করতে সচেষ্ট হবেন। সেটাও তাঁদের কর্তব্য।

একজন ব্যক্তি একই এক সময় এক এক ভূমিকায় নামে। কখনো সে সাহিত্যিক, কখনো সে নাগরিক, কখনো সে সমাজকর্মী। তার এই সব বিভিন্ন ভূমিকাকে আলাদা আলাদা করে দেখা উচিত। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যিকও ছিলেন, ম্যাজিস্ট্রেটও ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জমিদারি করেছেন, আশ্রমদারিও করেছেন। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করার অধিকার আমাদেরও আছে, কিন্তু যেকালে আমরা কবি সেকালে আমরা রাজনীতিবিদ বা সমাজবিপ্লবী নই। সেই জন্যে এটা স্বতঃপ্রমাণিত নয় যে, কবির কর্তব্য সমাজবিপ্লব বা সংগীতকারের কর্তব্য রাজনৈতিক জাগরণ।

তারপর সমাজবিপ্লব বা রাজনৈতিক জাগরণ এক আধদিনের ব্যাপার নয়। এ নিয়ে লেগে থাকলে সাহিত্য বা সংগীত অবহেলিত হবেই। বছরে একটা কি দুটো দিন অবহেলা করা মারাত্মক নয়, কিন্তু দু'বেলা তিরিশ দিন বারো মাস অবহেলা করলে সর্বনাশ। সেই জন্যে এ বিষয়ে কাউকে বাধ্য করা উচিত নয়। যাঁর খুশি তিনি সাহিত্যিকের ভূমিকা ছেড়ে অপর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেন। সফলও হতে পারে তাঁর প্রয়াস। তবে মাশুল আদায় না করে ছাড়বে না। সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

রবীন্দ্রনাথের মতো সব্যসাচী ইতিহাসে বিরল। সবাইকে তাঁর মতো হতে বলা কি ঠিক। যার যেটুকু প্রতিভা বা বৈশিষ্ট্য আছে সেটুকুই তার কাছে প্রত্যাশা করতে হয়। তাকে সব কাজে নামালে সে তার আপন কাজটাই ভুলে যায়। আমাদের দেশে এরকম পথভোলা পথিকের সংখ্যা কম নয়। এতে রাজনীতিরও যে তেমন কিছু সুরাহা হয় তা নয়। অপর পক্ষে সাহিত্যের বা শিল্পের ক্ষতি হয়।

আজকের দিনের সমস্যাগুলো এমন জটিল আর সংকট এমন ঘোরালো যে উপেক্ষা সাধ্য জানিও তুমি আমি এর কোনো ফয়সালা করতে পারিনে। মাঝখান থেকে সব উঠিয়ে যে আমাদের উপেক্ষা সাধু নয়। যেহেতু আমরা শ্রমিক বা কৃষক নই। শ্রেণীর দিক থেকে আগেকার দিনের সাহিত্যিকদের মতো প্রত্যাশা করতে না। তাই তাঁরা তাঁদের জন্য বুদ্ধি বিবেকের অনুরোধে যা লেখবার তা লিখে গেছেন। এখন আর সেদিন নেই যে, আমরা নিরপেক্ষ বলে পরিচয় দিলেই সে পরিচয় নির্বিবাদে স্বীকৃত হবে। এখন এক একটা পার্টির লেবেল নামের গায়ে আঁটতে হবে। সাহিত্যিকের পক্ষে এটা খুব গৌরবের নয়। সাহিত্য টিকিট সেঁটে কোনো ধার ধারে না। লেবেল টিকিটেরও না। "ইস্ট" বলে পরিচয় দিতে হলে আমি বলব আমি "আর্টিস্ট"। ও ছাড়া আর কোনো "ইস্ট" আমার ইষ্ট নয়।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, সাহিত্যিকরা চেষ্টা করলে সমাজকে বা রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করতে পারেন, কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে সে ধারণা উলটে গেছে। সমাজ বা রাষ্ট্রই এখন সাহিত্যকে প্রভাবিত করতে চায় বাড়ায়। সাহিত্যিকদের দিয়ে তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে লেখায়। এর চূড়ান্ত দেখা গেল হিটলারী ও স্টালিনী আমলে। পরিবেশকে প্রভাবিত করা এখন দূরের কথা, পরিবেশের দ্বারা যাতে প্রভাবিত না হতে হয় এই এখন ভাবনা। কোথাকার আত্মরক্ষাই এখন প্রথম প্রশ্ন, সে যদি আপনাকে রক্ষা করতে না পারে তো আর কাউকেই রক্ষা করতে পারবে না। না সমাজকে, না রাষ্ট্রকে, না সভ্যতাকে, না সংস্কৃতিকে।

(বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের জামশেদপুর অধিবেশনে মূল সভাপতির ভাষণ। পরিবর্ধিত ও পুনর্লিখিত।)

খবরটা এল দিনের শেষে।
শীতের এই অবেলায় রোদের রঙ বাসি হলুদের মতন; তার তাপ দ্রুত জুড়িয়ে যাচ্ছে। লাটাইতে সুতো গোটানোর মতন শেষবেলার রোদটুকু কেউ যেন খুব তাড়াতাড়ি টেনে নিচ্ছিল।

আজ ছুটির দিন। বাড়ির সামনে এক চিলতে ঘাসের জমিটায় ইজিচেয়ার পেতে শুয়ে ছিলাম। এখান থেকে যেদিকেই চোখ ফেরানো যাক, আমাদের এই শহরের বাড়ি-ঘর—বেশির ভাগই পুরনো, দীন, ভাঙা-চোরা। আচমকা এক আধটা নতুন। কোথাও একটানা নিশ্চল ঢেউয়ের মতন টিনের চালের বস্তি, আঁকাবাঁকা রাস্তা, কাঁচা নর্দমা। মাঝে মধ্যে দু-চারটে ঢ্যাঙা চেহারার গাছ অনেক উঁচুতে মাথা তুলে আকাশের গায়ে বিঁধে রয়েছে। দূরে দূরে কারখানার চিমনি। তারপর সব ঝাপসা; এর মধ্যেই ওখানে কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে বুঝিবা।

আকাশের যেদিকে কুয়াশা তার ঠিক উল্টোদিকে প্রকাণ্ড লাল বলের মতন সূর্যটা স্থির হয়ে আছে; তার গা ঘেঁষে কটা পাখি উড়ছিল। পাখির ঝাঁক, সূর্য, ধ্বংসস্তূপের মতন বাড়িঘর—সব একাকার হয়ে শীতের এই বিকেল যেন অলৌকিক একখানা ছবি।

আমাদের এই শহর কলকাতার কাছে;

বলা যায় তারই অংশ। কলকাতার তো শেষ নেই; 'ইতি'র পর 'পুনশ্চ'র মতন বেড়েই চলেছে। অবশ্য এ শহরের পরিচয় দেবার মতন আলাদা একটা নাম আছে; ধরা যাক মানবাজার।

সেই দুপুর থেকে ইজিচেয়ারটায় পড়ে আছি। প্রথম প্রথম টাটকা উজ্জ্বল রোদে বেশ আরাম লাগছিল; সমস্ত শরীর দিয়ে সূর্যের আরক শুষে নিচ্ছিলাম। কিন্তু এখন, এই অবেলায় দিন যত জুড়িয়ে আসছে, বাতাসে গুঁড়ো গুঁড়ো হিমও মিশতে শুরু করেছে। খানিক আগে থেকেই টের পাচ্ছি গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

এবার উঠে পড়তে হবে। উঠতে যাব সেই সময় চোখে পড়ল, সামনের খোয়া-ওঠা নোংরা রাস্তা আর কাঁচা নর্দমা পেরিয়ে লোকটা ঐ পারে ঘাসের জমিতে এসেছে। তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম।

লোকটা মধ্যবয়সী। মাথার চুল কাঁ পাকায় মেশানো। দশ বারো দিনের জমা দাড়ি-গোঁফ মুখময় কাঁটার মতন য আছে। শক্ত চোয়াল, ভারী ঠোঁট, ভাঙা গ ছোট ছোট চোখ অনেকখানি ভে ছড়ানো মোটা নাক, পেটানো লোহার ম

চেহারা। পরনে ময়লা ধুতি আর লং ক্লথের হাফ শার্টের ওপর জ্যালজেলে একটা চাদর এলোমেলোভাবে জড়ানো।

মুখটা চেনা-চেনা মনে হল। কিন্তু কোথায় দেখেছি, এই মুহূর্তে মনে করতে পারলাম না।

আমি তাকিয়েই আছি; প্রায় পলকহীন। বড় বড় পা ফেলে লোকটা আরো কাছে এসে পড়ল।

আধ ফোটা গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'কাকে চাই?'

লোকটা বলল, 'আপনাকে।' তার স্বর খাদে-বসা, ভাঙা-ভাঙা।

কাছাকাছি আসতে আরো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্তের মতন মনে হচ্ছে লোকটাকে। লক্ষ করলাম, তার চোখের সাদা জমি টকটকে লাল; রক্তের ডেলার মতন। চোখ দুটো শুকনো না, ঘোলাটে জলের ভেতর ডুবে আছে।

লোকটার চোখেমুখে চেহারায় এমন কিছু সংকেত রয়েছে যাতে আমার স্নায়ু-গুলো অস্থির হয়ে উঠেছে। অনুভব করছি বুকের গভীরে কোথায় একটা ছায়া পড়েছে। অস্বস্তি আর উদ্বেগ নিয়ে আমি তাকিয়েই থাকলাম।

আগের মতন ভাঙা গলায় লোকটা এবার বলল, 'আমাকে চিনতে পারছেন?'

খুবই বিব্রত বোধ করলাম, 'না, মানে ঠিক—তবে চেনা-চেনা—'

লোকটা বলল, 'আমি মন্মথ, মন্মথ দাস। সেই গয়ারপুরে—'

বাকিটুকু শেষ করার আগেই চিনে ফেললাম। ব্যস্তভাবে, খানিকটা আপ্যায়নের সুরে বললাম, 'বসুন—বসুন—'

সামনের একটা বেতের চেয়ারে কুণ্ঠিত-ভাবে বসল মন্মথ।

বলতে লাগলাম, 'অনেকদিন পর আপনাকে দেখলাম; প্রথমটা তাই ঠিক করতে পারি নি। তারপর আপনাদের খবর সব ভাল?'

'ঐ এক রকম।'

'সুবিনয়দা ভাল আছেন?'

জলপূর্ণ স্থির চোখে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকল মন্মথ। তারপর মুখ নামিয়ে ঝাপসা গলায় বলল, 'ওনার খবর নিয়েই এইচি।'

'কী, কী খবর?'

'আজ দুকুরবেলা সুবিনয়বাবু মারা গেচে।'

মন্মথর কণ্ঠস্বর আমার হৃৎপিণ্ডের ভেতর দিয়ে কনকনে ঠাণ্ডা স্রোতের মতন নেমে গেল। মুহূর্তের জন্য মনে হল, আমার হাত-পায়ের জোড় আলগা হয়ে শরীর থেকে খুলে খুলে যাচ্ছে। প্রায় আর্তধ্বনির মতন করে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'মারা গেছেন!' মৃত্যুর কথাটা স্পষ্ট শুনবার পরও যেন বিশ্বাস করতে পারছি না।

আস্তে করে অপরাধীর মতন মাথা নাড়ল মন্মথ, 'হ্যাঁ।' তার ভাবভঙ্গি দেখে এবার মনে হচ্ছে সুবিনয়দার মৃত্যুর সবটুকু দায়িত্ব তারই।

খানিক আগে লোকটাকে দেখেই মনে হয়েছিল, একটা ভয়ঙ্কর অমঙ্গলের দূত হয়ে এসেছে। আমার ধারণা সত্যি প্রমাণিত হয়েছে।

সুবিনয়দার মৃত্যু-সংবাদ শুনবার পর স্বাভাবিক হতে সময় লাগল। অনেকক্ষণ পর বললাম, 'হঠাৎ মারা গেলেন; কী হয়েছিল?'

'ক'দিন ধরেই জ্বর; খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আজ ভোর থেকে শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। ডাক্তার ডাকবার আগেই মারা গেলেন।'

কৈফিয়ত চাইবার মতন তীক্ষ্ন গলায় চেঁচিয়ে উঠলাম, 'শরীর খারাপ চলছিল; আমাকে খবর দ্যান নি কেন? চোখের সামনে বিনা চিকিৎসায় বিনা ওষুধে লোকটাকে মরে যেতে দিলেন? রাসকেল—'

মন্মথর ঘাড় ভেঙে মাথাটা ঝুলে পড়ল। গলার ভেতর থেকে অস্পষ্ট ফিস ফিস করল সে, 'কী করব বলুন। সুবিনয়বাবু কাউকে খবর দিতে বারণ করে দিয়েছিল। উনি কেমন মানুষ আপনি তো জানেন। খবর দিলে বিপদ হত।'

মন্মথর অসহায়তা কিছুটা অনুভব করলাম। সুবিনয়দা যেমন জেদী তেমনি একগুঁয়ে এবং আত্মাভিমানী। তাঁর আপত্তি সত্ত্বেও আমাকে খবর দিলে ফল ভাল হত না। এবার অনেকটা নরম গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'মৃত্যুর আগে সুবিনয়দা কিছু বলে গেছেন?'

'না।' বলেই হঠাৎ কী যেন মনে পড়ে গেল মন্মথর। একটু চুপ করে থেকে দ্বিধাগ্রস্তের মতন সে মুখ তুলল। ছড়ানো গলায় বলল, 'তবে—'

স্থির উৎসুক চোখে মন্মথর দিকে তাকালাম. 'তবে কী?'

'এদানি শরীর খারাপ হবার পর বন্দনাদিদির কথা খুব বলতেন।' মন্মথর মুখ আবার নীচের দিকে ঝুলে গেল।

আমার সবটুকু বিস্ময় আর বিমূঢ়তা একসঙ্গে জড়ো হয়ে বিস্ফোরণের মতন ফেটে পড়ল, 'বন্দনা!'

আস্তে করে মাথা নাড়ল মন্মথ।

আমি পলকহীন তাকিয়েই থাকলাম।

অনেকক্ষণ পর মন্মথ বলল, 'আমি আর বসতে পারব না। আপনি তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিন; আমার সঙ্গে যাবেন।'

আমার বিমূঢ়তা এখনও কাটে নি। বললাম, 'আপনার সঙ্গে কোথায় যাব?'

'কোথায় আর, পয়ারপুরে। সুবিনয়বাবুকে নিয়ে শ্মশানে যেতে হবে না? আপনি ছাড়া ওঁনার আর কোন আত্মীয়-স্বজনকে চিনি না। এই শেষ সময়ে আপনার লোক একজন থাকা দরকার; মুখাগ্নি তো করতে হবে।'

আমার কাছে মন্মথর ছুটে আসার কারণটা পরিষ্কার হয়ে গেল। ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম। সেই দুপুরবেলা সুবিনয়দা মারা গেছেন; এখন দিনের আয়ু ফুরিয়ে আসছে। সুবিনয়দার শব এতক্ষণে নিশ্চয়ই শক্ত হতে শুরু করেছে। এখান থেকে পয়ারপুর যেতে কম করেও ঘণ্টাতিনেক লাগবে। তার মানে আমরা পয়ারপুরে পৌঁছে সুবিনয়দাকে নিয়ে শ্মশানে যেতে যেতে বেশ রাত হয়ে যাবে।

মন্মথও উঠে পড়েছিল। বললাম, 'দাঁড়ান: বাড়িতে বলে আসছি।'

বাড়ির ভেতর গিয়ে প্রথমে সুবিনয়দার মৃত্যু-সংবাদ দিলাম। তারপর জানালাম, পয়ারপুর যাচ্ছি; আজ রাত্তিরে আর ফিরব না।

কিছু টাকা পকেটে পুরে একটু পর মন্মথকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

আমাদের এই শহরের ঠিক মাঝ-মধ্যিখানে রেল স্টেশন, তার ঠিক গা ঘেঁষেই বাস টারমিনাস। সেখানে গিয়ে মন্মথ আর আমি পয়ারপুরের বাসে উঠে বসলাম।

বাড়ি থেকে বাস টারমিনাস পর্যন্ত পথটুকু আমরা কেউ কথা বলিনি। নিতান্ত অপরিচিতের মতন নীরবে পাশাপাশি হেঁটে এসেছি।

বাস ছাড়তে এখনও কিছু দেরি আছে। কন্ডাক্টাররা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে প্যাসেঞ্জার ডাকছিল, 'নবীনগঞ্জ—বিবির হাট—পয়ারপুর যাবেন বাবুরা—' তাদের চিৎকার যেন পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিলাম না; আমার কানে অস্পষ্টভাবে তা বেজে যাচ্ছিল।

বাসে উঠবার পর মন্মথই প্রথম কথা বলল, 'সুবিনয়বাবুর আত্মীয়-স্বজনদের একটা খবর দেওয়া দরকার; আমি আবার ওঁনাদের ঠিকানা-টিকানা জানি না।'

আত্মীয়-টাত্মীয় বলতে সুবিনয়দার তেমন কেউ নেই। আমি ছাড়া এক জেঠতুতো দাদা আছেন; অনেক কাল কানপুরে প্রবাসী। তাঁর সঙ্গে সুবিনয়দার কোন রকম যোগাযোগ ছিল না। তবু বললাম, 'আমি খবর দেব'খন।'

'তাড়াতাড়িই দেবেন। কেউ দূরে থাকলে টেলি করবেন।'

'আচ্ছা।'

একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ বলে বসলাম, 'সুবিনয়দার মৃত্যুর খবর ও'র পার্টি অফিসে দিয়েছেন?'

মন্মথ চমকে উঠল। বাথিত করুণ চোখে আমার দিকে একটু তাকিয়ে পরক্ষণেই চোখ নামাল। ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বিষণ্ণ ভারী গলায় বলল, 'না।'

মন্মথ আর আমার মাঝখানে মুহূর্তের জন্য ঘন কুয়াশার মতন কী নেমে এল। দু হাতে সেই কুয়াশা সরিয়ে এক সময় বললাম, 'এ খবরটা দিলে পারতেন; হাজার হোক লোকটা মরে গেছে। একদিন দলের জন্যে কী না করেছেন সুবিনয়দা!'

বিস্ময়ের সুরে মন্মথ বলল, 'সব জেনে-শুনেও পার্টি অফিসে যাবার কথা বলছেন!' তার গলা ভয়ানক কাঁপতে লাগল।

উত্তর দেবার কিছু ছিল না; আমি চুপ করে রইলাম।

কিছুক্ষণ পর মন্মথ খুব নীচু গলায় ফিস ফিস করল, 'তবে—'

'কী?'

'আপনার কাছে যাবার আগে বন্দনাদিদির বাড়ি গিয়েছিলাম। ওঁনাকে সুবিনয়বাবুর খবরটা দিয়েচি।'

চাপা ক্রুদ্ধ সুরে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'কেন —কেন গিয়েছিলেন তার কাছে? জানেন না, সুবিনয়দার কতখানি ক্ষতি করেছে সে? লোকটার জীবন একেবারে ধ্বংস করে দিল, তবু তার কাছে গেলেন?'

মন্মথ আমার চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেল। থতিয়ে থতিয়ে ভীরু গলায় বলল, 'ঠিক বুঝতে পারি নি। এদানি মরবার আগে বন্দনাদিদির কথা খুব কইতেন সুবিনয়বাবু; তাই ভাবলাম—'

মানসিক কোন প্রতিক্রিয়া থেকে মন্মথ বন্দনার কাছে গিয়েছিল, কিছুটা অনুভব করতে পারলাম। ঈষৎ নরম সুরে এবার বললাম, 'সুবিনয়দার মৃত্যুর কথা শুনে বন্দনা কী বললে?'

'কিচ্ছু না; শুধু বোবার মতন তাকিয়ে রইল। অবিশ্যি—'

'কী?'

'খবরটা দিয়ে আর দাঁড়াই নি; সিধে আপনার বাড়ি চলে গিয়েছিলাম।'

আমি আর কোন প্রশ্ন করলাম না।

কখন বাস চলতে শুরু করেছিল, জানি না। এতক্ষণ সূর্যটা পশ্চিম আকাশের ঢালু পাড়ে সরু সুতোয় ঝুলছিল। সুতো ছিঁড়ে কখন যে সেটা টুপ করে গাছপালার আড়ালে নেমে গেছে তাই বা কে বলবে।

আমাদের বাস এখন একটা বড় মাঠের মাঝখান দিয়ে ছুটছে। দু ধারে ফসলকাটা শূন্য খেত, মজা খাল, নড়বড়ে বাঁশের সাঁকো। দূরে দূরে অস্পষ্ট আঁচড়ের মতন এক-আধটা গ্রাম, কারখানার চিমনি।

মাঝে মাঝে বাস থামে; দু-চারটে প্যাসেঞ্জার নামে, এক-আধজন ওঠে; তারপরেই আবার ছোটে।

সেই বিকেল থেকে বাতাসে হিমের কণা মিশতে শুরু করেছিল; এখন তার সঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো অন্ধকার মিশছে। গাঢ় বিষাদের মতন শীতের এই মলিন সন্ধ্যা গাছপালা-মাঠ-আকাশ, সব কিছু ঝাপসা করে দিচ্ছে।

জানলার ধার ঘেঁষে বসে ছিলাম। শীতের নির্জন মাঠ, আবছা আকাশ, ঘন কুয়াশা—কোনদিকে আমার লক্ষ ছিল না। সুবিনয়দার কথাই ভাবছিলাম।

কিছুদিন আগেও সুবিনদা ছিলেন সম্মান, প্রতিষ্ঠা এবং জনপ্রিয়তার শীর্ষ-বিন্দুতে। তখন যদি তিনি মারা যেতেন, শীতের এই বিষণ্ণ সন্ধ্যার মতন আমাদের রানীবাজার শহরের ওপর শোকের ছায়া নেমে আসত। সুবিনয়দার মৃত্যু-সংবাদ শুনবার সঙ্গে সঙ্গে রানীবাজারের হৃৎস্পন্দন যেত স্তব্ধ হয়ে। গাড়িঘোড়া দোকানপাট বন্ধ হয়ে যেত। অন্তত কয়েক শ' নরনারীকে উচ্ছ্বসিত হয়ে কাঁদতে দেখতাম। কম করে পঁচিশ হাজার শোকাচ্ছন্ন মানুষ দীর্ঘ মৌন মিছিল করে শ্মশানে তাঁকে শেষ বিদায় জানাতে যেত। পরের দিন মিউনিসিপ্যালিটির সামনের প্রকাণ্ড মাঠটায় বিরাট শোকসভা বসত; কলকাতা থেকে বড় বড় নেতারা ছুটে আসতেন। জনমনে সুবিনয় মজুমদারের প্রভাব কতখানি, জাতিকে তিনি কী দিয়ে গেছেন, তাঁর সততা, তাঁর মহত্ত্ব ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা নতুন করে শুনতে হত। কিন্তু হায়, মৃত্যুর সেই বিপুল সমারোহ সুবিনয়দার জন্য নয়। রানীবাজার থেকে অনেক দূরে প্রায় নির্বাসনে করুণ বিষণ্ণ অগৌরবের মৃত্যু তাঁকে মাথা পেতে নিতে হল। অথচ কয়েক মাস আগেও কে ভাবতে পেরেছিল এমন নিষ্ঠুর পরিণাম তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে।

সুবিনয়দাকে প্রথম দেখেছিলাম কবে? বছর বারো আগের সেই দিনটা আমার স্পষ্ট মনে আছে; চোখ বুজলে ছবির মতন দেখতে পাই।

পশ্চিম বাঙলার সুদূর মফঃস্বল থেকে

জীবিকার খোঁজে সেদিন আমি রানীবাজারে এসেছিলাম। সুবিনয়দার সঙ্গে আমাদের লতায়-পাতায় কি রকম একটা আত্মীয়তা ছিল।

সে সময় রানীবাজারে সুবিনয়দা ছিলেন সর্বভারতীয় একটা বড় রাজনৈতিক দলের স্থানীয় শাখার নেতা। তাঁর নাম, তাঁর খ্যাতি রানীবাজারের গণ্ডি ছাড়িয়ে সমস্ত বাঙলা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। আমার উদ্দেশ্য ছিল, সুবিনয়দার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা ভাঙিয়ে নিজের সুবিধা করে নেওয়া।

আগে থেকে চিঠি দিয়ে যোগাযোগ করেছিলাম; সুবিনয়দা আমাকে সোজা পার্টি অফিসে চলতে আসতে লিখেছিলেন। চিঠিতে আমার উদ্দেশ্য জানাই নি; শুধু লিখেছিলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

রানীবাজারে নেমে সুবিনয়দা এবং তাঁর পার্টি অফিস খুঁজে বার করতে অসুবিধা হয় নি। তখন দুপুর। পুরনো একতলা বাড়ির মাঝারি একখানা ঘরে পার্টির অফিস; সামনে দরজার মাথায় ছোট সাইনবোর্ড ঝুলছিল। ভেতরে গোটা দুই কাঠের আলমারি, খানকতক চেয়ার, দুটো টেবিল। একধারে তক্তপোশে ময়লা চিটচিটে বিছানা পাতা। সেই দুপুরবেলায় পার্টি অফিসে বিশেষ ভিড় ছিল না। তিন চারটি যুবক, একটি তরুণী আর দুজন প্রৌঢ় চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে ছিলেন।

মনে আছে, আমি ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে যুবকেরা চলে গিয়েছিল। তরুণী এবং প্রৌঢ় দুজন তখনও বসে। তরুণীর বয়েস সাতাশ আটাশের মতন, গায়ের রঙ উজ্জ্বল। মুখ চোখ কাটা-কাটা, সুশ্রী। মেয়েটির ঐশ্বর্য হচ্ছে তার স্বাস্থ্য; এমন সুদেহিনী কদাচিৎ চোখে পড়ে। পরনে সাদা খোলের সবুজ-পাড় শাড়ি আর হাতায় ফুলতোলা সাদাসিধে একটা ব্লাউজ।

প্রৌঢ়দের একজন গোলগাল, থলথলে। চোখ দুটি ছোট ছোট কিন্তু তীক্ষ্ণ। চাপা ঠোঁটে কাঠিন্য। অন্য প্রৌঢ়টি রীতিমত সুপুরুষ। লম্বাটে মুখ, বড় বড় দূরমনস্ক চোখ, হাত দুটি অস্বাভাবিক লম্বা—প্রায় জানুর কাছাকাছি নেমে এসেছে। তাঁর দিকে তাকালে অরণ্যের মাঝখানে সমুন্নত ঋজু গাছের কথা মনে পড়ে যায়। পরনে খাটো ধুতি আর আধময়লা হাফ শার্ট, পায়ে মোটা চপ্পল।

তিনজনেই জিজ্ঞাসু চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। সুবিনয়দাকে আগে কখনও দেখিনি; তাই চিনতে পারছিলাম না। লম্বা সুপুরুষ প্রৌঢ়টি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কাকে চান?'

কাঁপা গলায় উত্তর দিয়েছিলাম, 'সুবিনয় মজুমদারকে।'

'আমিই সুবিনয়।'

দেশজোড়া যাঁর নাম সেই সুবিনয় মজুমদার আমার সামনে বসে। থাক আত্মীয়তা, তবু হঠাৎ শীত লাগার মতন গায়ে কাঁটা দিয়েছিল। পরক্ষণেই এগিয়ে গিয়ে অনেকখানি ঝুঁকে প্রণাম করেছিলাম।

বিব্রতভাবে পা সরাতে সরাতে সুবিনয়দা বলেছিলেন, 'আরে আরে, প্রণাম কেন?'

মুখ তুলে বলেছিলাম, 'আজ্ঞে আমি অমিয়।'

সস্নেহে হেসেছিলেন সুবিনয়দা, 'তুমিই অমিয়? বেশ বেশ, বোসো। তোমার শেষ চিঠিটা পরশু দিন পেয়েছি।'

ওধারের তক্তপোশটায় গিয়ে বসতেই সুবিনয়দা আবার বলেছিলেন, 'রাস্তায় আসতে কষ্টটষ্ট হয় নি?'

'আজ্ঞে না।'

'আমাদের পার্টি অফিস খুঁজে বার করতে অসুবিধে হয়েছিল?'

'একটুও না। সাইকেল রিকশায় উঠে আপনার নাম বলতেই সোজা এখানে নিয়ে এসেছে।'

একের প্রশ্ন করে করে আমার বাবা-মা ভাই-বোন থেকে শুরু করে আমাদের সংসারের অনেক কথা জেনে নিয়েছিলেন সুবিনয়দা। তারপর কী মনে পড়ায় দ্বিতীয় প্রৌঢ় এবং তরুণীটির দিকে ফিরেছিলেন। তাঁরা তখনও উৎসুক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে।

সুবিনয়দা বলেছিলেন, 'তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই।'

গোলগাল প্রৌঢ়টির নাম এতক্ষণে জানা গিয়েছিল—পরমেশ সান্যাল। সুবিনয়দার পার্টির লোকাল কমিটির সেক্রেটারি। মেয়েটির নাম বন্দনা দত্ত; সেও স্থানীয় শাখার সভ্য, খুব ভাল কর্মী।

আমাকে দেখিয়ে সুবিনয়দা বলেছিলেন, 'আর এ হল অমিয়—অমিয় চক্রবর্তী, আমার মাসতুতো ভাই।'

পরিচয় টরিচয়ের পর পরমেশ সান্যাল আর বন্দনার সঙ্গে আমার সামান্য দু-এক কথা হয়েছে। তারপর ও'রা উঠে পড়েছিলেন।

বন্দনারা চলে গেলে ঘর ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। পার্টি অফিস সম্বন্ধে আমার আগেই কিছু ধারণা ছিল, সবসময় লোকের মেলা লেগে থাকে। তার ওপর সুবিনয় মজুমদারের মতন নেতাকে একা পাওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার। কাজেই এ সুযোগ ছাড়তে চাইনি। ভয়ে ভয়ে, খানিকটা দ্বিধাগ্রস্তের মতন বলেছিলাম, 'আপনার কাছে একটা বিশেষ দরকারে এসেছি সুবিনয়দা।'

সুবিনয়দা বলেছিলেন, 'সব শুনব। তার আগে স্নান টান করে খেয়ে নাও। অনেকটা রাস্তা এসেছ; নিশ্চয়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছ।'

আগে লক্ষ করিনি, আমি যে তক্তাপোশটায় বসেছিলাম তার তলায় হাঁড়ি-ডেকচি, এনামেলের থালা-গেলাস, স্টোভ—রান্নার নানারকম সরঞ্জাম। সুবিনয়দা স্টোভ-টোভ বার করে রান্না চড়িয়ে দিয়েছিলেন। রান্না আর কী, স্রেফ ভাতে ভাত।

হাঁড়ির ভেতর একসঙ্গে চাল, আলু, ডিম-টিম ছাড়তে ছাড়তে সুবিনয়দা বলেছিলেন, 'সেদ্ধভাত ছাড়া আমি আর কিছু রাঁধতে পারি না; তোমার কিন্তু খেতে খুবই কষ্ট হবে।'

বিব্রতভাবে বলেছিলাম, 'না-না, কষ্ট কিসের—'

'আসলে ব্যাপারটা কী জানো অমিয়, পাঁচরকম রান্না যে শিখব তার সময় নেই। সারাদিনই পার্টির কাজ। তার ভেতর এক ফাঁকে চাট্টি ফুটিয়ে নিই। সমস্ত জীবন এইরকম চলছে।'

হঠাৎ একটা কথা মনে হতে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আপনি কি এই পার্টি অফিসেই থাকেন সুবিনয়দা?'

'তা হলে আর কোথায় থাকব?' তক্তাপোশের ওপর ঢালা নোংরা বিছানাটা দেখিয়ে হাসতে হাসতে সুবিনয়দা বলেছিলেন, 'ঐ যে অনন্তশয্যা পাতা রয়েছে। সকাল থেকে মাঝরাত্ত পর্যন্ত পার্টির কাজে কেটে যায়; তারপর চোখের পাতা যখন আর মেলে রাখতে পারি না তখন ওখানে লম্বা হয়ে পড়ি।'

এবার আর উত্তর দিইনি; কিছুটা অন্যমনস্কই হয়ে পড়েছিলাম যেন। ছেলেবেলা থেকে সুবিনয় মজুমদার নামে এই মানুষটির কথা শুনে এসেছি। আমার মনের মধ্যে তাঁর 'ইমেজ' কোন বিস্ময়কর রূপকথার নায়কের মতন। শুনেছি অসাধারণ ছাত্র ছিলেন সুবিনয়দা; ম্যাট্রিক এবং ইন্টারমিডিয়েট স্কলারশিপ পেয়েছিলেন। বাবা ছিলেন নামকরা অ্যাডভোকেট। শিল্পপতি, বড় বড় ব্যবসায়ী, আই-সি-এস অফিসার—সমাজের উচ্চ চূড়ের মানুষগুলোর সঙ্গে ছিল তাঁর খানাপিনা, চলাফেরা, ওঠাবসা। মোট কথা, লোভনীয় ফলের মতন একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সুবিনয়দার হাতের কাছেই ছিল; পেড়ে নেবার শুধু অপেক্ষা। কিন্তু থার্ড ইয়ারে উঠেই কী হয়ে গেল, রাজনীতি তাঁকে সম্মোহিত করল। একদিন দেখা গেল, পার্টির টানে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন। সেই যে বেরুলেন, আর ফেরেননি। সুখের মোড়কে-ঢাকা ভবিষ্যতের কাম্য জীবন হাজার মাইল দূরে পড়ে রইল।

সুবিনয়দা অবিবাহিত। শুনেছি পার্টির জন্যই তাঁর ঘর-সংসার করা হয়ে ওঠেনি। রক্ত-মজ্জা-অস্থি-মেদ, নিজের বলতে সব কিছুই তিনি পার্টির কল্যাণে উৎসর্গ করেছেন। কিন্তু সুবিনয়দা যে পার্টি-অফিসেই থাকেন এবং নিজের হাতে রেঁধে খান, এতটা ভাবিনি।

একসময় সুবিনয়দার গলা কানে এসেছিল, 'ভাত ফুটতে থাক; এসো আমরা স্নান-টান করে নি।'

পার্টি-অফিসের ঠিক পেছনেই টিনের চালের বাথরুম। সুবিনয়দা আর আমি একে একে স্নান করে এসেছিলাম।

খাওয়া-দাওয়ার পর সুবিনয়দা বলেছিলেন, 'এবার যে জন্যে এসেছ, বল—'

করুণ মুখে জানিয়েছিলাম, আমার একটা রোজগারের পথ চাই। চাকরি-বাকরি অথবা অন্য যে কোন রকমের জীবিকা। এবং সুবিনয়দাকে তার ব্যবস্থা করে দিতেই হবে।

শুনে গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন সুবিনয়দা। অনেকক্ষণ পর ধীর শিথিল স্বরে বলেছিলেন, 'কিন্তু—' ছুরি দিয়ে দাগ টানার মতন তাঁর কপালে চিন্তার কটি রেখা ফুটে উঠেছিল।

ব্যাকুলভাবে বলেছিলাম, 'অনেক আশা নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। আমি জানি আপনার সঙ্গে অনেক লোকের জানাশোনা। আপনি একটু বলে দিলেই আমরা বেঁচে যাই।'

'অনেক লোকের সঙ্গে জানাশোনা আছে ঠিকই; অনুরোধ করলে তারা হয়তো রাখবেও। কিন্তু ব্যাপারটা কী জানো?'

আকণ্ঠ উদ্বেগ নিয়ে সুবিনয়দার দিকে তাকিয়েছিলাম।

সুবিনয়দা থামেননি, 'ব্যাপারটা হল তোমার জন্যে কারোকে বলার অসুবিধে আছে।'

রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কেন?'

'তুমি আমার আত্মীয় যে। লোকে বলবে সুবিনয় মজুমদার নিজের লোকের জন্যে উমেদারি করে বেড়াচ্ছে। তাতে পার্টির ইমেজ খারাপ হয়ে যাবে।'

'কিন্তু আমার একটা কিছু না হলে আমাদের সংসারটা একেবারে ভেসে যাবে।' আমার গলা হতাশায় বুজে আসছিল।

সুবিনয়দা কঠোর নীরস গলায় এবার বলেছিলেন, 'পার্টির ক্ষতি হয়, এমন কোন কাজ আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়। তবু তুমি যখন এসেই পড়েছ তখন দেখি, কী করা যায়। তবে খুব একটা ভরসা কোরো না।'

সেদিন আমার যা মানসিক অবস্থা তাতে সুবিনয়দার ওপর রাগ হয়েছিল, ক্ষোভ হয়েছিল, দুরন্ত অভিমানে মন ভারাক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরে বুঝেছি, সুবিনয়দার ঐ কথাগুলোর মধ্যেই তাঁর রাজনৈতিক চরিত্রের আভাস ছিল। সে চরিত্র দৃঢ়, কঠিন, আপসহীন এবং সৎ। রাজনীতির ব্যাপারে সততা ছাড়া আর

কিছুতেই তাঁর বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু আমার এই বোঝাটা অনেক পরের ব্যাপার।

সুবিনয়দা আমায় কী বলতে যাচ্ছিলেন, সেই সময় পার্টি অফিসে লোকজন আসতে শুরু করেছিল। তাদের বেশির ভাগই তরুণ কর্মী, ক'টি মেয়েও ছিল। আমার প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে সুবিনয়দা তাদের সঙ্গে আলোচনায় মেতে উঠেছিলেন।

ওদের আলোচনার মধ্যেই বন্দনা দত্ত আবার পার্টি অফিসে ফিরে এসেছিল। তার কিছুক্ষণ পর পরমেশ সান্যালও।

সেই তক্তপোশটার ওপরেই আমি বসে ছিলাম। সুবিনয়দারা কী বলছেন, সেদিকে আমার মনোযোগ ছিল না। নিজের কথাই শুধু ভাবছিলাম আর অন্যমনস্কের মতন পার্টি অফিসের খোলা দরজার বাইরে তাকিয়ে ছিলাম।

তখন ঠিক দুপুরও না, আবার বিকেলও না। রোদে সবে হলুদ আভা লাগতে শুরু করেছে। আকাশের গড়ানে পার বেয়ে সূর্যটা পশ্চিম দিকে অল্প একটু নেমে গেছে। পার্টি অফিসের সামনের রাস্তাটা তখন প্রায় নির্জন। কদাচিৎ দু-একটা লোক, এক-আধটা সাইকেল-রিকশা নজরে পড়ছিল।

মনোযোগ ছিল না, তবু সুবিনয়দাদের টুকরো টুকরো কথাবার্তা আমার কানে আসছিল।

'ঢালীপাড়ার ঐ দিকটায় পোস্টারগুলো মারা হয়েছে?'

'হয়েছে।'

'ওখানে আমাদের 'বেস' খুব উইক। প্রথম থেকেই ভাল করে নজর দেওয়া হয়নি। মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন এসে গেল; তাড়াতাড়ি মীটিং ডাকা দরকার।'

'এখনও তোমরা মীটিং ডাকার কথা ভাবছ! ওদিকে -পার্টি আসছে রবিবার মীটিং ডাকবে বলে শুনেছি।'

'সে কি!'

'তোমরা নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছ বলে আর সবাই হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে, এ কথা ভাবছ কেন?'

'তা ঠিক। কিন্তু ঢালীপাড়ায় ওদের দারুণ হোল্ড: তার ওপর মীটিং-টীটিং করতে দিলে আমাদের কোন চান্স থাকবে না। ওরা যাতে মীটিং করতে না পারে, দেখতে হবে। বার বার আমরা ওখানে হারছি; এবার আমাদের ক্যান্ডিডেটকে যেমন করে হোক জিতিয়ে আনতেই হবে।'

হঠাৎ সুবিনয়দার উত্তেজিত চড়া গলা শুনতে পেয়েছিলাম, 'সমীর—'

সমীর নামের ছেলেটা তক্ষুনি সাড়া দিয়েছিল, 'কী বলছেন?'

সুবিনয়দা বলছিলেন, 'ঢালীপাড়ার সংগঠনের ভার দেওয়া হয়েছিল তোমাকে। এক বছর সময় পেয়েছিলে, কিন্তু তার মধ্যে কিছুই করে উঠতে পারনি। এখন অন্যেরা মীটিং করলেই তোমার আপত্তি!'

এবার পরমেশ বলেছিলেন, 'পলিটিকসে একটু-আধটু কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। ওটা এমন কিছু দোষের না। ওদের মীটিং ভেঙে দিলে আমাদের যদি কিছু লাভ হয় ক্ষতি কী?'

কঠিন গলায় সুবিনয়দা বলেছিলেন, 'এ লাভে আমার বিশ্বাস নেই। যদি মনে কর আমাদের ক্যান্ডিডেট জিততে পারবে না, তা হলে এ বছর ক্যান্ডিডেট দিও না। পরের বার ভাল করে অর্গানাইজ করে দিও। কিন্তু নিজেদের সুবিধের জন্য অন্যের ওপর হামলা করতে যাওয়া, এতে আমার সায় নেই। আখেরে তাতে ফল ভাল হয় না।'

পরমেশ এবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলেন, 'শুধু ঢালীপাড়ায়? নতুন বাজার, কাপড় পট্টি, রিফিউজি এলাকা—অনেক জায়গাতেই আমাদের 'বেস' উইক। আপনার যুক্তি মানলে তো এই সব জায়গায় ক্যান্ডিডেট দেওয়া যায় না।'

'না দেওয়াই তো উচিত। সস্তায় বাজিমাৎ না করে সংগঠনের দিকে নজর দাও। পার্টিকে দীর্ঘজীবী করতে চাইলে সংগঠন সবার আগে দরকার; পার্টির পক্ষে ওটা টনিক। একবার যদি ভিত তৈরী করে দিতে পার তারপর আর মার নেই। একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে।'

'কী?'

'শুধু ইলেকশন জেতার জন্যে কোন পার্টির সৃষ্টি হয় না; হয় মানুষের কল্যাণের জন্যে।'

'কিন্তু—'

'বল।'

'ইলেকশনে জিতে ক্ষমতা দখল করতে পারলে মানুষের আরো ভাল করা যায়। যেভাবেই হোক পাওয়ার দখল করাই আসল কথা।'

হঠাৎ ঘরের দূর প্রান্তে কে একজন সতর্ক চাপা গলায় বলে উঠেছিল, 'ও সব কথা এখন থাক সুবিনয়দা; পরে আলোচনা করা যাবে।'

তারপরই লক্ষ করেছিলাম, সমস্ত ঘরখানায় অদ্ভুত স্তব্ধতা নেমে এসেছে। এমন স্তব্ধতা যা আমার অন্যমনস্কতাকেও নাড়া দিয়েছিল। বাইরের রাস্তা থেকে মুখ ফিরিয়ে ঘরের ভেতর তাকিয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠেছি। ঘরের সব ক'টা চোখ তখন আমার ওপর স্থির, নিবদ্ধ।

বুঝতে পারছিলাম, আমার মতন একটা লোক যে পার্টির মেম্বার না, পার্টির সঙ্গে যার বিন্দুমাত্র সংযোগ নেই—অফিস ঘরে বসে থেকে সুবিনয়দার আলোচনায় রীতিমত ব্যাঘাত ঘটাচ্ছি। খুবই অস্বস্তি বোধ করছিলাম, কিন্তু উঠে যে বাইরে চলে যাব, তাও পারছিলাম না।

সুবিনয়দার কাছে সেই যে এসেছিলাম, তারপর দিন তিনেক কেটে গেছে। আমি পার্টি অফিসেই আছি। সুবিনয়দা স্পষ্ট করে আমাকে কিছু বলেননি, তাই বাড়ি ফিরে যেতে পারছিলাম না। 'দেখি, কী করা যায়—' এরকম একটা ভাব সুবিনয়দার। আমাকে নিয়ে তিনি যে চিন্তায় পড়েছেন, টের পাচ্ছিলাম। আমারও সামনে-পেছনে কোন পথ খোলা ছিল না। যতক্ষণ সুবিনয়দা স্পষ্টাস্পষ্টি 'না' বলে দিচ্ছেন ততক্ষণ রানীবাজারের মাটি কামড়ে পড়ে থাকব, ঠিক করেছিলাম।

এই তিন দিনে সুবিনয়দাকে খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল। রানীবাজারে আসার পরদিনই জানতে পেরেছিলাম সুবিনয়দা তাঁদের পার্টির লোকাল কমিটির প্রেসিডেন্টও নন, সেক্রেটারিও না; সাধারণ একজন সভ্য মাত্র। তবে সেই সময়টা তাঁকে ট্রেজারারের কাজও চালিয়ে যেতে হচ্ছিল। কেননা যিনি কোষাধ্যক্ষ ছিলেন কিছুদিন আগে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু ঘটেছে। যতদিন নতুন কেউ ট্রেজারার নির্বাচিত না হচ্ছেন, পার্টির আপার কমিটি থেকে সুবিনয়দাকে এই দায়িত্ব নিতে বলা হয়েছিল।

ইচ্ছা করলে অনায়াসেই সুবিনয়দা লোকাল কমিটির সেক্রেটারি বা প্রেসিডেন্ট হতে পারতেন। লোকাল কমিটিই বা কেন, তাঁদের সর্বভারতীয় দলে আরো অনেক অনেক উঁচুতে উঠতে পারতেন, সে সুযোগ তাঁর কাছে এসেছিল। কিন্তু এই রানীবাজারে যেখানে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু, বিকাশ এবং প্রতিষ্ঠা, সেখান থেকে কোথাও যেতে চান না সুবিনয়দা। এখানকার লোকাল কমিটিতে সামান্য একজন সভ্য হিসেবেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে চান তিনি। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা বা ক্ষমতার দিক থেকে এর বেশী আকাঙ্ক্ষা তাঁর নেই।

লক্ষ করেছি, সাধারণ সভ্য হওয়া সত্ত্বেও পার্টির সবাই তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত; পার্টির ওপর তাঁর প্রভাব ছিল সর্বব্যাপী ঈশ্বরের মতন। সুবিনয়দার চরিত্রে সারল্যের সঙ্গে দৃঢ়তা এমনভাবে মেশানো ছিল যা মুগ্ধ করে। সততা, সংযম, নিষ্ঠা এবং নীতির প্রতি আনুগত্য—সুবিনয়দার মধ্যে এতগুলো আকর্ষণের মেলা সাজানো ছিল।

তবে ট্রেজারার হিসেবে তাঁর কাজে আমার খটকা লেগেছে। তালাহীন একটা টিনের বাক্সে টাকা-পয়সা থাকত। পার্টির কাজে যখন যা দরকার সুবিনয়দাকে বলে ছেলেমেয়েরা সেখান থেকে নিয়ে যেত। সুবিনয়দা কোন হিসেব রাখতেন না। শুধু বলতেন, 'কে কি নিলি, লিখে রাখিস—'

সুবিনয়দাকে একলা পেয়ে একদিন বলেছিলাম, 'এ আপনি কী করছেন সুবিনয়দা; হিসেব টিসেব রাখুন। পরে গোলমাল হতে পারে।'

একদৃষ্টে আমাকে দেখতে দেখতে সুবিনয়দা বলেছিলেন, 'বন্দনাও হিসেব রাখার কথা বলে। কিন্তু সামান্য ক'টা টাকার জন্যে ওরা আমাকে বিপদে ফেলবে ভেবেছ? কক্ষনো না।'

আমার কান লাল হয়ে উঠেছিল। বুঝতে পারছিলাম, মানুষকে অবিশ্বাস করতে শেখেননি সুবিনয়দা। কিন্তু সেদিন কে ভাবতে পেরেছিল, মানুষের প্রতি অসীম বিশ্বাসের মধ্যেই সুবিনয়দার মৃত্যু-বাণ শাণিত হচ্ছে!

সুবিনয়দা আমার চোখমুখ লক্ষ করে এবার নরম গলায় বলেছিলেন, 'আসলে তোমরা আমাকে ভালবাস, তাই একথা বলেছ। আসলে টাকা-পয়সার ব্যাপারে দুর্ভাবনার কিছু নেই।'

যাই হোক, পার্টি অফিসে থাকার জন্য খুবই অসুবিধে হচ্ছিল। আমার দিক থেকে বটেই, সুবিনয়দাদের দিক থেকেও।

পার্টি অফিসে নানারকম কথাবার্তা হয়। দলের নীতি এবং সেই নীতির রূপায়ণ সংক্রান্ত আলোচনাই বেশি। তার ফাঁকে অন্য দলগুলোর উদ্দেশ্য এবং কর্ম-পদ্ধতি নিয়ে রসালো ঝাঁঝালো মন্তব্য। তা ছাড়া প্রতিদ্বন্দ্বী দলের প্রভাব খর্ব করে নিজের দলকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ছক কাটা তো আছেই।

আমার মতন একজন বাইরের লোক সামনে বসে থাকলে গোপন রাজনৈতিক আলোচনা চালিয়ে যাওয়া কঠিন। অনেকে বা উত্তেজনার বশে কথা বলতে বলতে হঠাৎ আমার দিকে নজর পড়লে থেমে যাচ্ছিল।

রানীবাজারে কেন এসেছি, সুবিনয়দার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী, পার্টির লোকেরা কদিনে জেনে গিয়েছিল। আমার সম্বন্ধে ওদের সহানুভূতি ছিল যথেষ্ট, কিন্তু হাজার হোক আমি বাইরের লোক। অষ্ট-প্রহর পার্টি অফিসে শেকড় গেড়ে বসে থাকা, এটা নিশ্চয়ই কারো কাম্য নয়।

আমি খুবই কুণ্ঠিত হয়ে পড়েছিলাম। দিন তিনেক কাটাবার পর ঠিক করেছিলাম, সুবিনয়দাদের আর অসুবিধে ঘটাব না। একটা উপায়ও মাথায় এসেছিল। সেদিন থেকেই সকালবেলা পার্টি অফিসে লোক-জনের যাতায়াত শুরু হবার আগেই চা-টা খেয়ে বেরিয়ে পড়তাম, ফিরতাম দুপুরে। ফিরেই চান-খাওয়া সেরে আবার যে বেরুতাম, এবার ফেরার পালা মাঝরাতে সবাই চলে যাবার পর। মোট কথা, পার্টি অফিসে ভিড়ের এবং কাজের সময়টা বাইরে বাইরেই কাটিয়ে দিতাম।

রানীবাজারে সেই প্রথম এসেছি। এখানকার রাস্তাঘাট অলিগলি মানুষজন, সবই আমার অচেনা। লক্ষ্যহীনের মতন ঘুরতে ঘুরতে দু-দিনেই কিন্তু টের পেয়ে গিয়েছিলাম, সুবিনয়দা এই রানীবাজারের মুকুটহীন সম্রাট, মানুষের হৃদয়ের গভীরে তাঁর সিংহাসন পাতা। এমন কি বিরুদ্ধ দলগুলো, যাদের মত-পথ-আদর্শ এবং কর্মপদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা, তারা পর্যন্ত সুবিনয়দাকে শ্রদ্ধা করত; তাঁর সম্বন্ধে সম্ভ্রমের সুরে কথা বলত।

আরো দিনকয়েক পর সারা সকাল ঘোরাঘুরি করে দুপুরবেলা পার্টি অফিসে ফিরেই থমকে যেতে হয়েছিল। ভিড় অবশ্য ছিল না। কিন্তু পরমেশ সান্যাল আর বন্দনা তখনও বসে।

ঘরে পা দিয়েই আভাস পেয়েছিলাম, আমাকে নিয়েই কথাবার্তা হচ্ছে। পরমেশ সান্যাল বলছিলেন, 'এভাবে চলতে পারে না। ভদ্রলোক পার্টির কেউ নন অথচ পার্টি অফিসে তাঁকে থাকতে হচ্ছে। এতে তাঁরও অসুবিধে, আমাদেরও অসুবিধে। ওঁর যা অবস্থা তাতে চলেও যেতে বলা যায় না। আপনি ভদ্রলোকের জন্যে একটা কিছু ব্যবস্থা করে দিন সুবিনয়বাবু।'

পরমেশ সান্যাল সুবিনয়দাকে সুবিনয়-বাবু বলতেন। ও'রা প্রায় সমবয়সী।

আমি বিপন্ন বোধ করছিলাম। এদিকে বিব্রতভাবে সুবিনয়দা বলেছিলেন, 'অমিয়র জন্যে কী করা যায় বলুন তো পরমেশবাবু? আমি যে কিছুই ভেবে উঠতে পারছি না।'

'সেদিনই তো বললাম, রামগঙ্গা জুট মিলের জি এম-কে একটা চিঠি লিখে দিন। ওদের মিলে চীপ ক্যান্টিন খুলেছে। আপনি লিখে দিলেই অমিয়বাবু ওটা পেয়ে যেতে পারেন।'

বুঝতে পারছিলাম আমার আড়ালে আমাকে নিয়ে সুবিনয়দাদের মধ্যে আলো-চনা হয়েছে।

সুবিনয়দা বলেছিলেন, 'কিন্তু—'

পরমেশ সান্যাল জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিলেন।

দ্বিধান্বিতের মতন সুবিনয়দা বলে-ছিলেন, 'আমার মন এতে সায় দিচ্ছে না। প্রথমত, এভাবে সুবিধে নিতে যাওয়ার আমি বিরোধী। দ্বিতীয়ত, অমিয় আমার আত্মীয়।'

সুবিনয়দার এমন দ্বিধাগ্রস্ত ভঙ্গি আমি প্রথম দিনই দেখেছি; তাঁর এ জাতীয় কথাও শুনেছি।

পরমেশ সান্যাল বলেছিলেন, 'ব্যক্তিগত-ভাবে আপনি তো সুবিধে নিতে যাচ্ছেন না। আর আত্মীয় হলেও মানুষ তো। পার্টি যখন মানুষের জন্যে আর আত্মীয়ও যখন মানুষ তখন তার জন্যে কিছু লিখলে অন্যায় হয় না।'

'আরেকটু ভাবতে দিন আমাকে।'

এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল বন্দনা। হঠাৎ পরমেশের দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠেছিল, 'সুবিনয়দার যখন আপত্তি তখন এ চিঠি না-ই বা লিখলেন। সত্যিই তো, ব্যাপারটা জানাজানি হলে পার্টির সুনাম বাড়বে না।'

এই ক'দিনে লক্ষ করেছি, বন্দনা সুবিনয়দাকে দারুণ শ্রদ্ধা করে। সুবিনয়-দাও পার্টির অন্য ছেলেমেয়েদের চাইতে বন্দনাকে বেশী স্নেহ করেন। সেটা তার গুণে। নাওয়া-খাওয়া ভুলে সারাদিন হয়তো পোস্টারই আঁকতো; মহল্লায় মহল্লায় ঘিরে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিত। সুবিনয়দাকে বাদ দিলে রানীবাজারের স্থানীয় শাখায় বন্দনার মতন এমন নিষ্ঠা, পরিশ্রমের এত ক্ষমতা, পার্টির নীতির প্রতি এত আনু-গত্য আর কারো ছিল না।

পরমেশ সান্যাল অসহিষ্ণু হয়ে উঠে-ছিলেন, 'আপত্তি—আপত্তি কিসে? একটা চিঠি লিখে দিলে যদি একটা সংসার বেঁচে যায়, আমার মতে লিখে দেওয়াই তো উচিত।'

যাই হোক, সুবিনয়দাকে বেশী ভাবা-ভাবির সুযোগ দেননি পরমেশ সান্যাল। পরের দিনই একরকম জোর করে তাঁকে দিয়ে রামগঙ্গা জুট মিলের জেনারেল ম্যানেজারের নামে একটা চিঠি লিখিয়ে নিয়েছিলেন।

রাজনৈতিক ক্ষমতা বা প্রভাবের সুযোগ নিয়ে কোন রকম সুবিধা আদায় করার বিরোধী ছিলেন সুবিনয়দা। আজীবন তিনি এই নীতি পালন করে এসেছেন। কিন্তু আমার ব্যাপারে হয়তো তাঁর কিছু দুর্বলতা হয়ে থাকবে। কিংবা পরমেশ সান্যালের চাপ, অনুরোধ, দিনের পর দিন পার্টি অফিসে পড়ে থাকা—সব একাকার হয়ে তাঁকে সাময়িকভাবে এমন বিচলিত করে তুলেছিল যাতে আমার জন্য চীপ ক্যান্টিনের উমেদারি না করে পারেননি। কিন্তু সেদিন কে ভাবতে পেরে-ছিল, রামগঙ্গা জুট মিলের জেনারেল ম্যানেজারকে লেখা ঐ চিঠিটার মধ্যে সুবিনয়দার আরেকটা মৃত্যুবাণ লুকনো রয়েছে।

যাই হোক, চিঠিটা লেখা হয়ে গেলে চিন্তিত মুখে সুবিনয়দা বলেছিলেন, 'এই চিঠি নিয়ে রামগঙ্গা জুট মিলে কে যাবে?'

পরমেশ সান্যাল বলেছিলেন, 'আমি যাব। অমিয়বাবুও আমার সঙ্গে যাবেন।'

সুবিনয়দা এবার নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়ে-ছিলেন, 'আপনি গেলে আমার ভাবনা নেই। জেনারেল ম্যানেজারকে চিঠিটা দেখিয়েই কিন্তু ফেরত নেবেন। তাঁকে বলবেন, ব্যাপারটা যেন গোপন রাখা হয়। জানাজানি

হয়ে গেলে আমার চাইতে পার্টির ক্ষতি অনেক বেশি।'

'তা, আমি জানি।' পরমেশ সান্যাল বলেছিলেন, 'চিঠিটা চেয়ে নিয়েই ছিঁড়ে ফেলব; এ-জাতীয় কোনো রকম ডকুমেণ্ট অন্যের হাতে থাকা ঠিক নয়।'

সেদিনই সন্ধ্যেবেলায় পরমেশ সান্যাল আমাকে নিয়ে রামগঙ্গা জুট মিলের জেনারেল ম্যানেজারের বাংলোয় গিয়েছিলেন। সুবিনয়দার চিঠি দেখে জেনারেল ম্যানেজার অবাক; সুবিনয়দা যে এরকম চিঠি লিখতে পারেন সেটাই তাঁর বিস্ময়ের কারণ। ব্যক্তভাবে তিনি বলেছিলেন, 'মিস্টার মজুমদার কখনও তো কোন অনুরোধ করেন না; এই প্রথম করলেন। আপনি ভাববেন না মিস্টার সান্যাল, অমিয়-বাবু চীপ ক্যাণ্টিনটা পাবেনই। মিস্টার মজুমদার পাঠিয়েছেন; তাঁর ক্যাণ্ডিডেটের কথাই আলাদা।'

এরপর সুবিনয়দার চিঠিটা চেয়ে নিয়েছিলেন পরমেশ সান্যাল। জেনারেল ম্যানেজারকে অনুরোধ করেছিলেন, ব্যাপারটা সংশিলষ্ট কজনের মধ্যেই যেন সীমাবদ্ধ থাকে; বাইরে প্রকাশ না পায়।

জেনারেল ম্যানেজার পরমেশ সান্যালকে আশ্বস্ত করেছিলেন; তাঁর অনুরোধের মর্যাদা নিশ্চয়ই রাখবেন।

সেদিন পরমেশ সান্যালের ওপর কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে গিয়েছিল। ইনি ছাড়া কারো সাধ্য ছিল না আমার স্বপক্ষে সুবিনয়দাকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে নেয়। বার বার মনে হচ্ছিল, এই পরমেশ সান্যাল আমার পরিত্রাতা, আমাকে পুনর্জীবন দিয়েছেন। নইলে মৃত্যু—অবধারিত মৃত্যুই ছিল আমার নিয়তি।

জেনারেল ম্যানেজারের বাংলো থেকে রাস্তায় বেরিয়ে পরমেশকে বলেছিলাম, 'আপনি আমাকে রক্ষা করলেন। আপনি ওভাবে না বললে সুবিনয়দা কিছুতেই চিঠি লিখে দিতেন না।'

পরমেশ সান্যাল হেসেছিলেন, 'সুবিনয়-বাবু এসব ব্যাপারে বড় বেশী কঠোর।' একটু থেমে আবার, 'অনেস্টি টনেস্টি নিয়ে খুব বাড়াবাড়ি করেন। তাতে পার্টির ইমেজ বাড়ে, এ কথা হাজারবার মানি। কিন্তু আশেপাশের মানুষগুলোর দিকেও তো তাকাতে হয়।'

চীপ ক্যানটিন বললেই খোলা যায় না; তার জন্য টাকার দরকার। সেই টাকাও আমি গোপনে রামগঙ্গা জুট মিল থেকে পেয়েছিলাম। এ ব্যাপারে সুবিনয়দা অনুরোধ করেননি। ছিদ্র যখন পেয়েই গেছি তখন তার ভেতর দিয়ে কাল হয়ে ঢুকে যাওয়াই তো উচিত। সুবিনয়দাকে না জানিয়েই তাঁর নাম করে টাকাটা আদায় করেছিলাম।

চীপ ক্যানটিন খুলবার পর পার্টি অফিসে থাকার প্রয়োজন ফুরিয়েছিল। রানী বাজার রেল স্টেশনের কাছে একটা বাড়ি ভাড়া করে সুদূর মফঃস্বল থেকে বাবা-মা-ভাই-বোনদের নিয়ে এলাম।

এদিকে ক্যানটিন নিয়ে এমন জড়িয়ে পড়লাম যে আর কোনদিকে মুখ তুলে তাকাবার সময় রইল না। রামগঙ্গা জুট মিলে আড়াই হাজারের ওপর শ্রমিক; অন্যান্য স্টাফও আড়াই শ'র মতন। সকাল-দুপুর-রাত্রি, তিন শিফ্‌টে কাজ চলে। এতগুলো লোকের তিন বেলা টিফিন আর মিলের ব্যবস্থা ঐ ক্যানটিন থেকেই।

প্রথম প্রথম বেশি লোকজন রাখতে পারিনি; নিজেকেই অমানুষিক খাটতে হত। ভোরবেলা ক্যানটিনে চলে যেতাম, ক্লান্ত অবসন্ন শরীর টানতে টানতে বাড়ি ফিরতে ফিরতে মাঝরাত। ফিরেই টান হয়ে শুয়ে পড়তাম; সঙ্গে সঙ্গে চেতনার শেষ অন্তরীপটিও গাঢ় ঘুমের ভেতর ডুবে যেত।

দেখতে দেখতে ক'টা বছর কেটে গেল। এর ভেতর এই রানীবাজার শহরে দু-দুবার মিউনিসিপ্যাল ইলেকসান হয়ে গেছে। এক-বার হয়েছে সাধারণ নির্বাচন।

আমার নিজেরও ওই সময়টুকুর মধ্যে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। ক্যানটিন চালিয়ে দু-চার পয়সার মুখ দেখতে পাচ্ছি। লোকে অবশ্য বলে, আমি—অমিয় চক্রবর্তী—নাকি লাল হয়ে গেছি। ব্যাংকে টাকার পাহাড় জমছে।

লোকে যতটা রটায় ততটা ঠিক নয়। তবে ক্যানটিনের কল্যাণে এই রানীবাজারে খান দুই বাড়ি করেছি, চারটে বোনকে পার করতে পেরেছি, ভাইগুলোর কারোকে ইঞ্জিনিয়ার করেছি, কারোকে ডাক্তার। এমন কি বেশি বয়েসে বাড়িতে তিনদিন নহবত বসিয়ে নিজেও একটা বিয়ে করে ফেলেছি। আজকাল আমাকে আগের মতন খাটতে হয় না। অনেক লোকজন রেখেছি; তারাই সব করে, আমার কাজ এখন হাল্কা।

যাই হোক, এই ক'বছরে সুবিনয়দাদের পার্টি অফিসে দু-একবারের বেশি যাওয়া হয়ে ওঠে নি। যাঁরা আমাকে পুনর্জীবন দিয়েছেন সেই সুবিনয়দা আর পরমেশ সান্যালের সঙ্গেও চার পাঁচবারের বেশি দেখা হয়নি। তবে খবর পাচ্ছিলাম, পৃথিবীর আহ্নিক গতি বার্ষিক গতির মতন সুবিনয়দা পার্টির সংগঠন নিয়ে সেই আগের মতনই মেতে আছেন।

ক্যানটিন আর বাড়ি, এইটুকুর মধ্যেই চলাফেরা, গতিবিধি। তবু অস্পষ্টভাবে একটা কথা কানে আসছিল। আমি রানী-বাজারে আসার পর সারা দেশব্যাপী যে সাধারণ নির্বাচন ঘটে গেছে তারপর থেকেই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ভাঙন শুরু হয়েছিল। এক-একটা দল দুভাগে তিন ভাগে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিল। এই আত্মবিভাজনের বীজ কোথায় লুকিয়ে ছিল, কে জানে। কারণ হিসেবে বলা হচ্ছিল, দলীয় নীতি এবং সেই নীতি রূপায়ণের প্রশ্নে নেতারা এক-মন এক-আত্মা হতে পারছিলেন না। মতবিরোধ দলগুলোকে ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছিল।

সমস্ত দেশের অস্থির রাজনৈতিক আবহাওয়ায় যে বিষ ভেসে বেড়াচ্ছিল, তার স্পর্শ থেকে সুবিনয়দাদের দলও রক্ষা পেল না। নীতি এবং কর্মপন্থা নিয়ে সেখানেও উঁচু মহলের নেতৃত্বের মধ্যে সংঘর্ষ বাধল। পরিণতিতে পার্টি দু'টুকরো হয়ে গেল। দলভাঙার আঁচ আমাদের এই রানীবাজারেও এসে লাগল।

আমার ক্যানটিনের ক্যাশিয়ার ছেলেটি, নাম অজয়, হঠাৎ একদিন এসে বলল, 'সুবিনয়বাবুর পার্টি অফিসে খুব গোল-মাল হচ্ছে।'

সুবিনয়দা যে আমার আত্মীয় সে কথা অজয় জানত। উদ্বেগের গলায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'গোলমাল কেন?'

'ওঁদের পার্টি ভাগ হয়ে গেছে। এখান-কার ইউনিটও আর আস্ত নেই; তাই নিয়ে গণ্ডগোল। শুনলাম—'

'কী শুনলে?'

'এখানকার ইউনিটের বেশির ভাগ মেম্বার সুবিনয়বাবুকে আর নেতা বলে মানতে রাজী নয়।'

'সে কী!' আমি চমকে উঠেছিলাম। সুবিনয়দা এ অঞ্চলের, বিশেষ করে পার্টি মেম্বারদের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র। পার্টি ভাগ হয়ে গেলেও সে শ্রদ্ধায় ভাঁটা পড়বে এ ভাবিনি! সুবিনয়দার জন্য অজ্ঞাত ভয় বুকের ভেতর সেই মুহূর্ত থেকে জমতে শুরু করেছিল।

সেদিনই বিকেলের দিকে সুবিনয়দার খোঁজে তাঁদের পার্টি অফিসে গিয়েছিলাম। অজয় যা খবর দিয়েছিল, অবস্থা তার চাইতে অনেক খারাপ। পার্টি অফিসের সামনে তখন দু'দল ছেলেমেয়ে মুখোমুখি ঘুষি পাকিয়ে শ্লোগান দিচ্ছিল।

একদল বলছিল, 'সুবিনয় মজুমদার—'

'মুর্দাবাদ।'

'দলের নীতি ভাঙছে কে?'

'সুবিনয়বাবু, আবার কে—'

'প্রগতিবাদের শত্রু কে?'

'সুবিনয়বাবু, আবার কে?'

'সুবিনয় মজুমদার—'

'পার্টি ছাড়ো, পার্টি ছাড়ো—'

আরেক দল ছেলেমেয়ে সুবিনয়দার স্বপক্ষে শ্লোগান দিচ্ছিল।

লক্ষ করেছিলাম, সুবিনয়দা পার্টি অফিসের ভেতর বিমূঢ়ের মতন বসে আছেন। তাঁর সঙ্গে সেদিন দেখা করতে পারিনি, একটা কথাও বলতে পারিনি। যারা শ্লোগান দিচ্ছিল তারা আমাকে পার্টি অফিসের ভেতর ঢুকতে দেয়নি।

দিন কয়েক পর আরো সাংঘাতিক খবর কানে এসেছিল। সুবিনয়দাকে নাকি পার্টি অফিস থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ; রেল স্টেশনের কাছে একটা মেসে গিয়ে তিনি উঠেছেন। খবর পেয়েই ছুটেছিলাম কিন্তু মেসে গিয়ে তাঁকে ধরতে পারিনি। মেস-ম্যানেজার জানিয়েছিল, ভোর বেলা উঠেই সুবিনয়দা বেরিয়ে যান; সারাদিন কোথায় কোথায় ঘোরেন, ফিরতে ফিরতে রাত দুপুর। অর্থাৎ মাঝরাত্তিরে না গেলে সুবিনয়দাকে ধরবার সম্ভাবনা নেই।

এরপর দ্রুত অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠবার পর রানীবাজার-বাসীদের সঙ্গে আমিও দেখেছিলাম, এ শহরের দেয়াল পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেছে। পোস্টারগুলোতে লেখা ছিল, সুবিনয় মজুমদার সাময়িক কোষাধ্যক্ষ থাকার সময় পার্টির সাত হাজার টাকা তছরূপ করেছেন। দেখতে দেখতে আমার হৃৎপিণ্ড যেন থমকে গিয়েছিল।

পরের দিন আরো মারাত্মক ব্যাপার। রানীবাজারের দেয়ালে সেদিন অন্যরকম পোস্টার পড়েছে। সুবিনয় মজুমদার পার্টির সুনাম ভাঙিয়ে আত্মীয়-স্বজনদের চাকরি-বাকরি এবং নানারকম সুযোগ সুবিধা আদায় করে দিয়েছেন। পোস্টার-গুলোর সঙ্গে সুবিনয়দার একটা চিঠির নকল রয়েছে। সেই চিঠিটা যাতে রাম-গঙ্গা জুট মিলের জেনারেল ম্যানেজারের কাছে আমার নামে সুপারিশ ছিল। পড়তে পড়তে আমার চোখমুখ ঝাঁ-ঝাঁ করতে শুরু করেছিল। মনে মনে ঠিক করেছিলাম, যেভাবেই হোক, সুবিনয়দার সঙ্গে দেখা করবই।

সেদিনই মাঝরাত্তিরে মেসে গিয়ে সুবিনয়দাকে ধরেছিলাম। অত্যন্ত বিচলিত দেখাচ্ছিল তাঁকে এবং উদ্‌ভ্রান্ত। চেহারা ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে। পরনে চিটচিটে ময়লা ধুতি আর হাফ শার্ট। মুখময় মাসখানেকের জমানো দাড়ি গোঁফ; চোখ ভেতরে ঢুকে গেছে। চুল উসকো খুসকো কণ্ঠার হাড় ফুটে বেরিয়েছে। আমি মুখ খুলবার আগেই তিনি বলে উঠেছিলেন, 'আচ্ছা তুমিই বল অমিয়, একটা পয়সাও কি আমি সরিয়েছি? আমি যখন ক্যাশি-য়ার তখন কিছুদিন তো তুমি পার্টি অফিসে ছিলে—'

মুখ নীচু করে বলেছিলাম, 'আপনাকে তখনই বলেছিলাম, সুবিনয়দা, হিসেব রাখুন। পার্টির ছেলেমেয়েরা যেভাবে খুশি টাকা নিয়ে যাচ্ছে; পরে গোলমাল হতে পারে। আপনি তো শুনলেন না—'

'হ্যাঁ মানুষকে বিশ্বাস করার পুরস্কার পাওয়া গেল।'

একটু চুপ করে থেকে সুবিনয়দা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন, 'আমার নামে আজ কতকগুলো পোস্টার মারা হয়েছে। দেখছ অমিয় ?'

আমার ঘাড় ভেঙে মাথাটা ঝুলে পড়েছিল যেন, 'দেখেছি ?'

'অথচ—অথচ, কেন আমাকে ও চিঠি লিখতে হয়েছিল তা তো তুমি জানো।'

অপরাধবোধ আমার সমস্ত মন আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। সম্পূর্ণ না হলেও, সুবিনয়দার এই অসম্মান আর লাঞ্ছনার আধাআধির জন্যও আমি দায়ী। ক্লান্ত ফিস ফিস গলায় বলেছিলুম, 'জানি বৈকি।'

'তবু দেখ কিভাবে চিঠিটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে! আমি জানি, এর পিছনে কে আছে ?'

'কে ?'

বুঝতে পারছ না ?

বিদ্যুৎ-চমকের মতন একটা কথা আমার মনে পড়ে গিয়েছিল। সুবিনয়দা বলেছিলেন রামগঙ্গা জুট মিলের জেনারেল ম্যানেজারকে দেখিয়েই যেন চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলা হয়। তবে কি পরমেশ সান্যাল চিঠিটা নষ্ট করেন নি? এমন মারাত্মক অস্ত্র হিসেবে কাজে লাগাবেন বলেই কি এতকাল রেখে দিয়েছিলেন ?

কি ভেবে সুবিনয়দা আবার বলেছিলেন, 'আমাদের পার্টি দুভাগ হয়ে গেছে।'

'শুনেছি।'

'কারণটা জানো ?'

'পরিষ্কার জানি না।'

'কারণটা হল পার্টির কর্মপন্থা। উঁচু নেতৃমহলের একাংশ চান পুরনো নিয়মেই দল চলুক; আরেক দল চান আমূল পরিবর্তন। এই নিয়ে দল ভাগ হয়ে গেল। আমি পুরনো পথেই বিশ্বাসী। এদিকে রানীবাজারের পার্টি ইউনিটের বেশির ভাগ লোকই চায় পরিবর্তন। তারা সরা-সরি আমাকে অস্বীকার করতে চায়। আমি নাকি পার্টির কেউ না। কেউ যদি না হব, তাহলে সারা জীবন পার্টির জন্যে নিজেকে ডেডিকেট করলাম কেন?' একটু থেমে বার কয়েক শ্বাস টেনে সুবিনদা আবার শুরু করেছিলেন, 'আমার যদি ভুল হয়ে থাকে, এসো বসি, আলোচনা করি। যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পার, নিশ্চয়ই মেনে নেব। কিন্তু তার বদলে এসব কি নোংরামি। আমাকে পার্টি অফিস থেকে গায়ের জোরে ওরা বার করে দিলে, তারপর এই কুৎসা রটাচ্ছে। আমার সততা, সাধুতা, আমার সম্মান, মর্যাদা, চরিত্র—সব ওরা বদলে করে দিতে চায়। কিন্তু তা হবে না।'

পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম, একটা ফাঁস ক্রমশ ছোট হতে হতে সুবিনয়দার দিকে এগিয়ে আসছে। ভয়ে ভয়ে বলেছিলাম, 'কী করতে চান আপনি ?'

'পরশু রানীবাজারের সব লোককে কাছারী পাড়ার মাঠে ডাকব। পার্টির অবস্থা, আমার কথা—সব তাদের কাছে খুলে বলব। সারা জীবন যাদের মধ্যে কাজ করেছি তারা অন্তত আমাকে বুঝবে, বিশ্বাস করবে।'

'পরশু দিনের ব্যাপার পরশু দিন হবে। আজ আপনি আমার সঙ্গে চলুন।'

'কোথায় ?'

'আমার বাড়িতে। এখন থেকে আপনি আমার কাছেই থাকবেন।' আমার জন্য সুবিনয়দা যে নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত, এই ভাবনাটা আমাকে যেন হাজার নখে চিরছিল। আমি জানি, সুবিনয়দার সম্বল কানাকড়িও নেই। কিভাবে মেসের খরচ চালাচ্ছেন, কে জানে। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে যদি তাঁর কিছুটা ক্ষতিপূরণ করতে পারি। অন্তত খাওয়া-পরার দুশ্চিন্তা থেকে তাঁকে নিশ্চয়ই মুক্ত রাখতে পারব।

সুবিনয়দা বলেছিলেন, 'তোমার বাড়িতে গিয়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব না অমিয়।'

'কেন ?'

'নিজেই ভেবে দেখ।'

সুবিনয়দাকে হাজার কাকুতি-মিনতি করেও নিজের বাড়িতে আনতে পারি নি।

পরশুর মিটিং আর হয় নি; তার আগেই রানীবাজারের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গিয়েছিল। ঝড়টা উঠেছিল নতুন একটা পোস্টারকে ঘিরে। সুবিনয়দা নাকি পার্টি মেম্বার বন্দনা দত্তকে একা পেয়ে তার গায়ে হাত দিয়েছেন।

নিজের চোখে দেখেও প্রথমটা বিশ্বাস করতে পারি নি; আমার মাথা ঝিমঝিম করতে শুরু করেছিল। মনে হচ্ছিল, সব রক্ত কপালের দু ধারে দুটো শিরায় গিয়ে জমা হয়েছে। যে কোন মুহূর্তে সে দুটো ফেটে যাবে। সেই অবস্থাতেই সুবিনয়দার মেসে ছুটেছিলাম। এই পোস্টার নিশ্চয়ই সুবিনয়দার চোখে পড়েছে; এর প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে ভাবতেই আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল।

কিন্তু মেসে গিয়ে লাভ হয়নি, সুবিনয়দা ছিলেন না। কোথায় গেছেন, ম্যানেজার বলতে পারে নি। তবে এই

খবরটা সে দিল, সুবিনয়দা আর ফিরবেন না।

উন্মাদের মতন এবার আমি ছুটেছিলাম বন্দনাদের বাড়ি। সোজা তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম, 'আজকে কতকগুলো কদর্য পোস্টার পড়েছে। সেগুলোতে আপনার সঙ্গে সুবিনয়দার নাম জড়িয়ে জঘন্য ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।'

আবেগহীন শীতল গলায় বন্দনা বলেছিল, 'দেখেছি।'

'আপনি এর প্রতিবাদ করুন।'

'না।'

'কিন্তু এর পরিণাম বুঝতে পারছেন?'

'পরিণাম বুঝেছি বলেই তো প্রতিবাদ করব না।' বন্দনাকে অত্যন্ত হিংস্র আর উগ্র দেখাচ্ছিলাম।

আমার সমস্ত অস্তিত্ব স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল, 'তবে কি আপনার মত নিয়েই এ পোস্টার লাগানো হয়েছে! ছি— ছি—

বন্দনা চিৎকার করে উঠেছিল, 'গেট আউট—গেট আউট। বেরিয়ে যান—'

এ কোন্ বন্দনাকে সেদিন আমি দেখেছিলাম? এই কি সেই, যাকে সব চাইতে বেশি স্নেহ করতেন সুবিনয়দা; পার্টির মেম্বারদের মধ্যে সে ছিল সুবিনয়দার কাছে সব চাইতে প্রিয়? বন্দনাও তো তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত। কিন্তু কী এমন ঘটেছে যাতে বন্দনার এত পরিবর্তন?

পার্টির তহবিল তছরূপ বা স্বজন-পোষণের ব্যাপারে রাণীবাজারের মানুষ যেমন মাথা না ঘামালেও, কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। ব্যাপারটা তারা বিশ্বাসও করেনি, আবার অবিশ্বাসও করেনি। পোস্টারের অভিযোগগুলো ছিল অনেকটা বিতর্কের বিষয়। কিন্তু বন্দনার সঙ্গে জড়িয়ে যে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল তাতে রাণীবাজারের জনমত সম্পূর্ণ সুবিনয়দার বিপক্ষে চলে গিয়েছিল। পথেঘাটে চলতে-ফিরতে আমি তা টের পাচ্ছিলাম। বন্দনার ব্যাপারটা একটা চটচটে অশ্লীল এবং মুখরোচক কেচ্ছা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। চায়ের দোকানে, পানের দোকানে, এমন কি রান্নাঘরেও এই আলোচনা চলছিল। ভেবে পাচ্ছিলাম না, এত বড় একটা দুর্নাম মাথা পেতে নিয়েও কেন বন্দনা প্রতিবাদ জানাল না?

যাই হোক দেশ থেকে সেই যে সুবিনয়দা নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন তারপর কয়েক মাস কেটে গেছে এদিকে পরমেশ সান্যাল পার্টি অফিস দখল করে রাজ্যাধিপতি হয়ে বসেছেন।

হঠাৎ একদিন খবর পেলাম, এখান থেকে মাইল পঞ্চাশেক দূরে পয়ারপুর বলে একটা জায়গায় মন্মথ দাসের বাড়িতে আছেন সুবিনয়দা। মন্মথ দাস পার্টির মেম্বার না; সামান্য একজন কৃষক সামান্য জমিজমা আছে। এক সময় সুবিনয়দার তার কিছু উপকার করেছিলেন। লোকটা অকৃতজ্ঞ নয়; দুঃসময়ে তাঁকে আশ্রয় দিয়েছে।

খবর পেয়েই পয়ারপুরে গিয়েছিলাম। সুবিনয়দাকে দেখে চোখে জল এসে গিয়েছিল। এ সুবিনয়দা যেন আগের সুবিনয়দার ধ্বংস স্তূপ কিংবা আমি তাঁর মৃতদেহ দেখছি। সে সময় নিজের শব যেন বয়ে বেড়াচ্ছিলেন তিনি। আমার দিকে কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে সুবিনয়দা হঠাৎ দুহাতে মুখ ঢেকেছিলেন।

রুদ্ধ কাঁপা গলায় বলেছিলাম 'কেমন আছেন সুবিনয়দা?'

জোরে জোরে প্রবলবেগে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে সুবিনয়দা বলেছিলেন, 'বেশ আছি, —বেশ। এখানেও খাদ্য আছে, পানীয় আছে, বায়ু আছে, বাঁচবার মতন সবরকম উপকরণ রয়েছে। বেশ আছি, বেশ। তোমরা এখানে আর এসো না। যাও, এক্ষুনি চলে যাও—'

উত্তর না দিয়ে উঠে পড়েছিলাম। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস হচ্ছিল না। ফেরবার সময় বারবার মনে হচ্ছিল, সুবিনয়দা আর বেঁচে নেই। পার্টি, রাণীবাজার, তাঁর আদর্শ, নীতি, সংগঠনের অফুরন্ত কাজ—এ সবই ছিল সুবিনয়দার সেখানকার মাটিতেই পোঁতা। একটা বিরুদ্ধ প্রচণ্ড শক্তি প্রবল হাতে মূলসুদ্ধ তাঁকে টেনে উপড়ে এতদূরে এই পয়ারপুরের নিষ্ফল নির্বাসনের ভেতর ছুঁড়ে দিয়েছে।

সুবিনয়দা বেঁচে থাকতে আর পয়ারপুরে যাই নি।

তারপর?

তারপর তো খবর এসেছে, সুবিনয়দা মারা গেছেন। মারা কি তিনি আজই গেলেন? অনেক আগেই তাঁর চারপাশে তিল তিল মৃত্যু জমা হয়েছিল। আজ শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে খবরটা পেলুম।

✻

পয়ারপুরে মন্মথ দাসের বাড়ি যখন পৌঁছলাম; বেশ রাত হয়ে গেছে। শীতের রাত; এর মধ্যেই চারদিক নির্জন হয়ে গেছে। এই নিশ্চিন্তপুরের ঝিঁঝিঁদের একটানা বিলাপ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

মন্মথর ঘরের দাওয়ায় কটি লোক ডেলা পাকিয়ে বসে ছিল। তাদের সামনে বাঁশের চাঁচাড়িতে সুবিনয়দার দেহ শোয়ানো রয়েছে। একধারে একটা কেরোসিন ধোঁয়াতে ধোঁয়াতে অন্ধ হয়ে এসেছে।

হঠাৎ দাওয়ার অন্য কোণে একটি মুখের উপর চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম। বন্দনা—বন্দনা দত্ত এসেছে। এক পলক তাকিয়ে থেকে পরক্ষণেই ঘৃণায় অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

মন্মথর বাড়িতে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। দাওয়ায় যারা বসে ছিল একসময় সুবিনয়দার শব সমেত বাঁশের চালি কাঁধে তুলে নিল। তারপর হরিধ্বনি দিয়ে শ্মশানের দিকে চলতে শুরু করল।

আগে আগে যাচ্ছে শব বাহকেরা। তাদের পেছনে মন্মথ, বন্দনা আর আমি। কোন রকম আড়ম্বর নেই, সমারোহ নেই। শীতের নির্জন রাতে অন্ধকার আর কুয়াশার ভেতর দিয়ে এমন স্বজনহীন করুণ শেষ বিদায় সুবিনয়দার জন্য অপেক্ষা করছে, কে ভাবতে পেরেছিল।

শ্মশান মন্মথর বাড়ি থেকে মাইল চারেক দূরে, একটা মজা নদীর ধারে। সেখানে পৌঁছেই মন্মথর লোকেরা চিতা সাজিয়ে আগুন লাগিয়ে দিল। যতক্ষণ দাহ চলল বন্দনা আর আমি চিতার দুধারে বসে থাকলাম।

সুবিনয়দার দেহ নিশ্চিহ্ন হতে হতে ভোর হয়ে গেল। আমি আর মন্মথর বাড়ি গেলাম না, সোজা রেল স্টেশনের রাস্তা ধরলাম। এত ভোরে বাস পাওয়া যায় না, ট্রেনেই রাণীবাজার ফিরতে হবে।

অনেকখানি হাঁটবার পর হঠাৎ মনে হল, কেউ আমার পেছনে আসছে। মুখ ফেরাতেই দেখতে পেলাম, বন্দনা। তাকে কিছু বললাম না।

আমার সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে স্টেশন পর্যন্ত এল বন্দনা, গাড়িতেও উঠল এবং মুখোমুখি বসল। এবার তাকে ভাল করে লক্ষ করলাম। বন্দনার চোখ ফোলা ফোলা, আরক্ত, কালো মণি দুটো জলে ডুবে আছে।

ট্রেন ছাড়বার পর হঠাৎ ভাঙা ভাঙা ফোঁপানির মতন আওয়াজ করে বন্দনা বলতে লাগল, 'সুবিনয়দা এভাবে মারা যান, আমি চাই নি—আমি চাই নি।' তার ঠোঁট দুটো, গলার কণ্ঠা থরথর করছে।

উত্তর দিলাম না।

বন্দনা আবার বলল, 'পরমেশবাবু বুঝিয়েছিলেন, সুবিনয়দা পার্টির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন; তাঁর আদর্শের বিরুদ্ধে যাচ্ছেন। উত্তেজনার মাথায় দুর্নামের ঝুঁকি নিয়েও সুবিনয়দার ক্ষতি করতে গেলাম। পার্টিকে আমি প্রাণের মতন ভালবাসি। কিন্তু তখন কি জানতাম, আদর্শ-টাদর্শ নয়, সুবিনয়দাকে সরিয়ে পরমেশবাবু দলের সর্বেসর্বা হতে চান।'

আমি আর কী বলব, চুপ করেই থাকলাম। বন্দনার ঐ সব কথা শোনবার জন্য সুবিনয়দা আজ আর বেঁচে নেই। থাকলেই বা কী হত! হায়, মৃত্যুর অনেক আগেই তিনি নিহত হয়েছিলেন।

॥ তিন ॥

কবিকে অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে থাকতে আমি খুব কমই দেখেছি। কিন্তু যদি কখনও সামান্য একটু অসুখ হ'ত, তিনি অস্থির হয়ে যেতেন। শুধু তাই নয়—চাইতেন যে সবাই এসে তাঁর কাছে বসে থাকুক। সেজন্য বিছানায় শুয়েই বলতে আরম্ভ করতেন—"ওগো, তোমরা কে কোথায় আছিস—আমার কাছে আয়। আমার শরীর যেন কেমন করছে—অবস্থা মোটেই ভাল বোধ হচ্ছে না—কতক্ষণ আছি কে জানে?"

তাঁর কথা শুনে সবাই (সবাই অর্থে আমি এবং আমার ছেলে সমর) যদি ছুটে তাঁর কাছে না যেতাম, তাহলেই তাঁর রাগ হয়ে যেত।

তখন আমি শিশু বিদ্যাপীঠ নামে একটা সেকেণ্ডারী স্কুলে সবে ঢুকেছি। একদিন রাত প্রায় ৯টার সময় বাইরে থেকে বেড়িয়ে এসে ঘরে ঢুকতে যাব, এমন সময় কবিকে বলতে শুনলাম, "হাঁরে খোকন, তোর মা কি বাড়ি ফিরেছেন?"

'খোকন' আমার ছেলের ডাক নাম। সে উত্তর দিল—"না।"

তিনি তখন বলতে শুরু করলেন—"তা ফিরবে কেন? এদিকে আমি যে জ্বরে পড়ে আছি—সেটা কে দেখে—কেই বা মুখে একটু জল দেয়?" বলেই মনে হল যেন সারাদিন রোদখাওয়া লেপখানাকে বেশ আরামের সঙ্গেই গায়ে জড়িয়ে পাশ ফিরলেন।

কবির কথা শোনার পরে আমি আর ঘরে ঢুকলাম না। নিঃশব্দে বেরিয়ে সোজা একটা ওষুধের দোকানে গিয়ে হাজির হলাম। কারণ আমি জানি যে কবির জ্বর হলেও সেটা অতি সামান্য। অ্যানাসিন খেলেই ঠিক হয়ে যাবে। একে তো শীতকাল, তাতে আবার বেশী রাত জেগে লেখাপড়ার কাজ করেছেন—তাতেই হয়ত শরীরটা বেশী খারাপ লাগছে।

শেষ পর্যন্ত দুটো অ্যানাসিন ট্যাবলেট নিয়েই বাড়ি ফিরলাম। ট্যাবলেট ও জলের গ্লাস টেবিলে রেখে বললাম, "ওষুধ রইল। ডাক্তার আজ বার্লি খেতে বলেছেন।"

কবি এতটার জন্য তৈরী ছিলেন না। আমি যে তাঁর কথা শুনে ফেলব সেটা তিনি ভাবতেই পারেননি। কাজেই, চুপ করেই রইলেন।

আমি অন্য ঘরে বসেই শব্দ শুনে বুঝতে পারলাম যে তিনি উঠে অ্যানাসিন খাচ্ছেন। খানিক বাদে আমি খোকনকে খেতে দেবার জন্য রান্নাঘরে গেলাম। তাকে খাবার ভাত দিয়েছি, এমন সময় বারান্দা থেকে কবির স্বগতোক্তি শুনতে পেলাম। —"এখন যে মনে হচ্ছে জ্বর আর নেই। গরম ভাত একটু ডিমের ঝোল দিয়ে খেলেও খাওয়া যেতে পারে। তবে কেন যে বেশী জ্বর বাড়া মনে হল।...খিদেটাও তো পেয়েছে। একটা মানুষ সারাদিন খেটেখুটে কাজ করে এসে সন্ধ্যাবেলা যদি একটু খেতে না পায়, তবে তার শরীর টিকবে কি করে?"

আমি কিন্তু চুপ করেই রইলাম। কিছুক্ষণ তাঁর কোনও সাড়াশব্দ পেলাম না। বোধ হয় খাবার ঘরে ঢুকতে একটু ইতস্তত করছিলেন। তারপরেই দেখি খোকনকে ডাকতে ডাকতে খাবার জায়গায় এসে হাজির। ছেলেকে ডিম খেতে দেখে আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। তাড়াতাড়ি থালা নিয়ে বসে পড়লেন। ডিম ছিল তাঁর অতি প্রিয় খাদ্য। ছেলেকে ডিম খেতে দেখলে তিনিও তখন নিতান্তই ছেলেমানুষ হয়ে যেতেন এবং তার ভাগ থেকে কিছুটা ভেঙে মুখে দিতে তিনি একটুও দ্বিধা বোধ করতেন না। সুতরাং তখন আর কি করি—ভাত তাঁকে দিতেই হল। আর তিনিও গরম ভাত ডিমের ঝোল দিয়ে তৃপ্তি করে খেয়ে তবে উঠলেন।

পরীক্ষা দিতে যাবার সময় আমার ছেলে মেয়ে অথবা আমি কেউই কোনদিন পেন্সিল কেটে নিয়েছি অথবা কলমে কালি ভরেছি বলে তো মনে পড়ে না। এসব কাজ কবি নিজেই করতেন। তাঁর কাজ ছিল নিখুঁত। চিহ্নস্বরূপ এখনও তাঁর হাতের কাটা একটি পেন্সিল আমি সযত্নে রেখে দিয়েছি। পেন্সিলটি দেখলে স্মৃতির আলোড়নে কত কথাই ভেসে আসে। জগতে জড় পদার্থের মূল্য কতটুকু! কিন্তু যার জন্য সেই জড় পদার্থ অমূল্য সম্পদ হয়ে ওঠে—যাকে নিয়েই স্মৃতির আলোড়ন—থাকে না সেই মানুষ। সংসারের ভাঙা গড়ার কাজে বিধাতাপুরুষ মানুষের মন নিয়ে যেন ছিনিমিনি খেলছেন। যে মনে চেতনা দিয়েছেন বলেই মানুষ আজ শ্রেষ্ঠ জীব—আবার সেই মনকেই ভেঙে গুঁড়ো করে দিয়ে প্রিয়জনকে টেনে নিয়ে যেতে একটুও বাধছে না! বিধাতার এ কী খেলা!

কারো উপরে রাগ করে তিনি পাঁচ মিনিটও থাকতে পারতেন না। তাঁর ব্যবহারে অন্যে কষ্ট পাবে একথা বোধহয় তিনি ভাবতেই পারতেন না। কাজেই সে-রাতের সেই মন্তব্যের জন্য তার পরদিন তিনি কিছুতেই স্থির হয়ে কাজে মন দিতে পারছিলেন না। আমিও গম্ভীর হয়েই রইলাম। এমনকি সন্ধ্যেবেলা বাইরেও বের হলাম না। একখানা বই হাতে নিয়ে খোকন যেখানে বসে পড়ছিল, সেখানেই

কবি জীবনানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র শিশু অমিতানন্দ ও কবির মেয়ে মঞ্জুশ্রী

বসে রইলাম। কিন্তু বেশ বুঝতে পারছিলাম, আমি বাইরে না বেরনোতে কবি কিছুতেই সোয়াস্তি পাচ্ছিলেন না। অথচ আমাকে কিছু বলতে সাহসও পাচ্ছেন না। হঠাৎ শুনি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করছেন—"খোকন, কলকাতার সব সিনেমাই আজ বন্ধ নাকি রে?"

খোকনের বয়স তখন কম—নিতান্তই ছেলেমানুষ। সে তার বাবার কথার অর্থ ধরতে না পেরেই উত্তর দিল—"না বাবা, সিনেমা তো চলছে। বন্ধ থাকবে কেন?"

কবি হেসে বললেন, "তুই জানিস না। তোর মাকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, আজ সব সিনেমা হলের দরজাই বন্ধ।"

তখন আর কি করি। আমিও হেসে ফেলেছি। আমার মুখে হাসি দেখে তবেই তিনি নিশ্চিন্ত মনে লেখার টেবিলের সামনে গিয়ে বসলেন।

কবি যখন লেখার কাজ নিয়ে বসতেন, সে সময় কতদিন কতভাবে যে তাঁকে বিরক্ত করেছি, সেকথা বলে শেষ করা যায় না। এজন্য কিন্তু তাঁকে রাগ করতে কোনদিনই দেখিনি।

আমার একটা খারাপ অভ্যাস ছিল যে পরীক্ষার খাতা দেখার সময় বানান সম্বন্ধে সন্দেহ হলে কষ্ট করে অভিধানের পাতা না উল্টিয়ে সোজা কবিকেই জিগ্যেস করতাম। স্বভাবে আমি চিরকাল কবির একেবারে উল্টো। তিনি ছিলেন ধীর, শান্ত। আর আমি ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতার ধার দিয়েও যাই না। প্রায় সময়ই তিনি আমার অভিধানের কাজ করে দিতেন। ফলে তাঁর নিজের কাজে বাধা পড়ত। মাঝে মাঝে বলতেন, "দেখ, তোমার যেসব শব্দ অথবা অর্থের দরকার সেগুলো একটা কাগজে লিখে আমার টেবিলে রেখে দিও। তাহলে তোমাকেও চেঁচিয়ে গলাবাথা করতে হয় না আর আমারও সময় নষ্ট হবে না।"

মঞ্জুশ্রী ও সমরের কাছে কবি শুধু বাবাই ছিলেন না—তাদের বন্ধুও ছিলেন তিনি। তাই তাদের যত কথা যত গল্প সবই ছিল তাঁর সংগে। লেখক শ্রীসুবোধ রায় আমাদের ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ির খুব কাছেই থাকতেন। তিনি প্রায় রোজই আমাদের বাড়িতে এসে কবির সঙ্গে নানারকম গল্প করতেন। সে গল্পে বাবার সংগী হিসেবে সমরও নিয়মিতভাবেই যোগ দিতো। খেয়ে দেয়ে তাঁরা গল্প করতে বসতেন। সুবোধবাবুও সে পাট চুকিয়েই আসতেন। কোন কোন দিন রাত প্রায় একটা বেজে যেত—তবুও তাঁদের গল্প শেষ হত না। আমি এক ঘুম দিয়ে উঠে ছেলেকে তাড়া দিয়ে শুতে পাঠাবার চেষ্টা করলে সে দু-হাতে তার বাবাকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকত। আমি রাগ করলে সুবোধবাবু ও কবি দুজনেই হাসতেন।

তাঁদের আসরে শুধু যে মজার মজার গল্পই হত, তা নয়। সাহিত্যের আলোচনাও হত। ছোট ছেলে হয়েও সমর মন দিয়ে সেসব কথা শুনত। এমনকি মাঝে মাঝে সাধ্যমত নানারকম প্রশ্নও করত। কবি ও সুবোধবাবু দুজনেই যতটা পারতেন, তাকে বুঝিয়ে দিতেন। ছেলে যে সেসব কথায় কি স্বাদ পেত জানি না—মন দিয়ে বসে বসে শুনত। কোন কারণে যেদিন সুবোধবাবু না আসতে পারতেন, সেদিন সমরের মন খারাপ হয়ে যেত। সে তার বাবার কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কেবলি জিজ্ঞাসা করত—"বাবা, সুবোধকাকা কখন আসবেন—কখন আমাদের গল্প হবে?"

ছেলের ম্লান মুখ দেখলে কবিও কোন কাজে মন দিতে পারতেন না। সবকিছু ফেলে ছেলের সঙ্গে গল্প করতে বসতেন। বাবার রোজকার সংগী হিসেবে ছেলেও ক্রমে সাহিত্যকে ভালবাসতে শিখল।

কোথাও যেতে হলে অথবা কোন কাজ শুরু করবার আগে তিনি প্রথমেই ছেলের মতামত জিগ্যেস করতেন। 'তুই কি বলিস?' ছেলে মত দিলে তিনি খুশী হয়ে সে কাজ করতেন। আমি হাসলে বলতেন—"বুড়ো হয়ে তো এই ছেলের উপরেই নির্ভর করতে হবে। এখন থেকেই তার তালিম নিচ্ছি"—কথাটা বলেই দুহাতে ছেলেকে জড়িয়ে ধরতেন।

ছোট ছেলের সিনেমা দেখা পছন্দ করতাম না বলে আমি সমরকে বিশেষ সিনেমায় যেতে দিতাম না। তবে, তার যেদিন যেতে ইচ্ছে হত, বাবাকে দিয়েই ব্যবস্থা করিয়ে নিত। বাবা ও ছেলে বুঝুক আর নাই বুঝুক—ব্যাপারটা কিন্তু আমার নজর এড়িয়ে যেতে পারত না। কোন এক রবিবারের দুপুরে হঠাৎ আমার চোখে পড়ল—সমর তার বাবার কানে কানে ফিসফিস করে কি যেন বলছে। তিনি মাথা নাড়ছেন আর আমি যে ঘরে ছিলাম, সেদিকে আড়চোখে তাকাচ্ছেন। পর মুহূর্তে সমর বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে আমি যেন কিছুই

জানি না—এইরকম ভাব দেখিয়ে কবিকে জিজ্ঞাসা করলাম—"খোকন কোথায়, তাকে দেখছি না যে?"
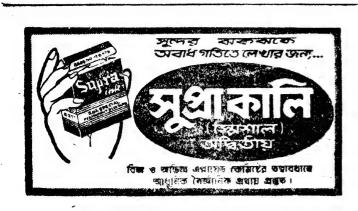
তিনি আর একদিকে তাকিয়ে উত্তর দিলেন—"যাবে আবার কোথায়, কেন, তোমার কি দরকার? চাকরকে পাঠাও না।"

তাঁর কথার ধরনে আমি হেসে বললাম, "তাকে তো কোথাও পাঠাতে চাইছি না। শুধু জানতে চাইছি সে কোথায় গেল।"

তখন তিনিও হেসে ফেলেছেন। হাসতে হাসতেই বললেন—"বাবা, তোমাকে কি ফাঁকি দেবার যো আছে? সে যেখানেই যাক, আমাকে বলেই গেছে। তুমি আবার তাকে বকাবকি করতে যেও না।"

সন্ধ্যেবেলা দেখি কবি বারান্দায় দাঁড়িয়ে কাকে যেন ইশারায় কি বলছেন। বুঝতে পারলাম ছেলে এসেছে। যাতে আমার চোখে না পড়ে, তাই এই সতর্কতা। তখন আমি ঘর থেকে বেরিয়ে খোকনকে জিগ্যেস করলাম, "কি বই দেখলি?" ছেলে বুঝল সে আমি রাগ করিনি। তখন হাসিমুখে আমার কাছে এসে দাঁড়াল।

"আচ্ছা মা, তুমি কি করে জানলে যে আমি সিনেমা দেখেছি?"

আমি হেসে উত্তর দিলাম—"আমার মন বলেছে।"

কবি তখন ছেলের কাঁধের উপরে এক-খানা হাত রেখে বললেন, "তোর মাকে ফাঁকি দিয়ে কোন কাজ করার ক্ষমতা তোর কেন, তোর বাবারও নেই।"

মঞ্জুশ্রী স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা পর্যন্ত শিলঙে তার পিসিমা শ্রীমতী সুচরিতা দাশের কাছেই ছিল। আমাদের কাছে এসে আই এ-তে ভর্তি হল। কবির কবিত্ব-শক্তির কিছুটা অংশ নিয়েই সে জন্মেছে। আট বছর বয়েস থেকেই সে কবিতা লিখতে শুরু করে। প্রথম প্রথম ভাল না হলেও সে হতাশ হয়নি। দশ বছর বয়েসে ভালই লিখতে শিখল। মঞ্জুর সেই সময়কার একটি কবিতা তার পিসেমশাই শ্রীচিদানন্দ দাশগুপ্ত কোন একটি পত্রিকায় ছাপিয়ে-ছিলেন। মেয়ে যত না পড়াশুনো করেছে—কবিতা লিখেছে তার চাইতে অনেক বেশী। এ বিষয়ে সে তার বাবার কাছ থেকে যথেষ্ট উৎসাহ পেত।

বহুবার কবিকে বলতে শুনেছি—"লেখ, তুই লেখ। তোর মাকে দিয়ে ত' আর এসব কাজ হবে না। তুই-ই আমার নাম রাখবি।"

মেয়েও হাসত আর বলত, "আচ্ছা বাবা, মা কেন কবিতা লেখেন না?"

—"কাব্যলক্ষ্মী তোর মাকে ভীষণ ভয় পান যে, তাই তো তিনি তোর মায়ের ধারে কাছেও ঘেঁষেন না।" হেসে কবি উত্তর দিতেন।

মঞ্জু তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করত—"সত্যি নাকি মা?"

—"সেটা আমার চাইতে তোর বাবাই ভাল জানেন।" আমি গম্ভীর হয়েই উত্তর দিতাম।

কবি এবং তাঁর মেয়ের এই মনোভাবের ছোট্ট একটি ঘটনা বলছি।

এক ছুটির দুপুরে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ মেঘের শব্দে জেগে দেখি ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছে—আর বাইরে যত কাপড় মেলা ছিল সব ভিজছে। বাবা ও মেয়ের দৃকপাতও নেই। তারা দুজনে কবিতার আলোচনায় গভীরভাবেই মগ্ন।

আমি মেয়েকে বললাম—"কাপড়গুলো সব ভিজে গেল, তুই একটু কষ্ট করে তুলতেও পারিস নি!"

—"ওমা, কাপড়গুলো বাইরে ছিল বুঝি?" মেয়ে হাসিমুখেই উত্তর দিল।

কিন্তু কবি বেশ বিরক্তির সঙ্গেই বললেন, "তোমার কেবল সংসার আর সংসার। তুমি কি কিছুতেই তার উপরে উঠতে পার না? কোনদিনও দেখলাম না যে তুমি কবিতার আলোচনায় মুহূর্তের জন্যও যোগ দিয়েছ।"

আমি কাপড় তুলতে তুলতেই বললাম, "আমি কাব্য-জগতের ধার ধারি না। কবিতার চাইতে সংসারকেই বেশী ভালবাসি।"

কবিবন্ধু বুদ্ধদেববাবু একদিন কবিকে বলেছিলেন—"আপনার মনখানি দেখলে কবিতা আপনা থেকেই আসতে চাইবে। কিন্তু এ কবিতা কার? নিশ্চয়ই আপনার না।"

তাঁর কথার কোনও উত্তর না দিয়ে কবি মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

মঞ্জুকে আমি প্রায়ই বলতাম, "বড় হয়েছিস, কিন্তু রান্নাবান্না তো কিছুই শিখলি না।"

আমার কথায় মেয়ে সত্যি সত্যিই এক-দিন রান্নাঘরে এল। রান্নার কোন কিছু ধরেওনি—এমন সময় কবি কোথা থেকে দৌড়ে এসে বলতে শুরু করলেন, "পুড়ে মরবার ইচ্ছে হয়েছে নাকি? শিগগির বেরো। তোর মায়ের যেমন কাণ্ড, তোকে শেষ না করে ছাড়বে না।"

মঞ্জু রান্নাঘর থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত কবি সেখান থেকে এক পাও নড়লেন না।

তিনি নিজে ত' স্টাইলের ধার দিয়েও যেতেন না, কিন্তু মেয়ের বেলায় কতখানি যে চিন্তা করতেন তার প্রমাণ পেয়েছি ছোট্ট একটি ঘটনায়।

মঞ্জু তখন আই এ পড়ে। কবির অমত থাকা সত্ত্বেও আমি মেয়ের বিয়ের চেষ্টা করছিলাম। অবিশ্যি মেয়েকে না জানিয়েই। একবার একটি ছেলে মঞ্জুকে দেখতে এল। ছেলেটি ভাল ঘরের এবং বেশ ভাল চাকরি করে। তবে অতি সাদাসিধে। কবিকে যখন ছেলেটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম, দেখলাম ছেলের চাইতে তার বেশভূষা—বিশেষ করে কোঁচার দিকেই তাঁর ব্যগ্র দৃষ্টি। আমি ব্যাপারটা তখুনি আঁচ করে নিলাম।

কবির তো এই ভাব—ওদিকে মেয়ের কাণ্ড দেখে তো আমি হতভম্ব। সে তো আর জানে না যে তাকে দেখতে এসেছে। যেন অদ্ভুত কিছু একটা দেখছে এমন ভাবেই দেখতে লাগল ছেলেটিকে।

ছেলেটি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই কবি আমাকে জিগ্যেস করলেন—"তুমি একে যোগাড় করলে কোথা থেকে?"

—"কেন, ওর দোষটা কি হল?"

—"না, দোষের কিছু হয়নি। তবে এই ছেলের সঙ্গে বিয়ে হলে একে ধুতি পরানো শেখাতে শেখাতেই মেয়ের জীবন কেটে যাবে।" মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কি বলিস রে?"

মেয়েও ত' তেমনি—তখুনি উত্তর দিল—"ও বাবা, এই ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে নাকি? যেভাবে উঁচু করে কোঁচা

ঝ্‌লিয়েছে—আমি তো বাঙালী হলে ব্‌ঝতেই পারিনি—"

—"ঠিকই বলেছিস। একট্‌ সাবধানে থাকিস। এর পরে তোর মা আবার কি এনে হাজির করবেন কে জানে?"

আমি তখন বেশ রাগের সঙ্গে বলতাম —"খ্‌ব হয়েছে। আর বলতে হবে না। কিন্তু মেয়ের বাবা যখন রোহিনী গ্‌প্তের মেয়েকে বিয়ে করতে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর কোঁচাটা কত লম্বা ছিল শ্‌নি?"

কবি তাঁর ঘরে যেতে যেতে আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলতে বলতে গেলেন

"সে য্‌গ হয়েছে বাসী,
সে য্‌গেতে আর এ য্‌গেতে এবে
তফাৎ অনেক বেশি।"

হায়রে! অসময়ে এবং অতর্কিতে প্‌থিবী থেকে বিদায় নেবার সময় তাঁর এত আদরের মঞ্জ্‌ ও সমরকে দেখতে পাবেন না—তাদের কোলে টেনে নিয়ে ব্‌কভরা শান্তি আর মনভরা তৃপ্তি কোনদিনই অন্‌ভব করতে পাবেন না—একথা ভেবে না জানি কত দ্‌ঃখ, কত ব্যথা নিয়েই তাঁকে যেতে হয়েছে—তার নীরব সাক্ষী রইলেন শ্‌ধ্‌ অন্তর্যামী ভগবান। [ক্রমশ]

শ্রীচরণেষু—মাকে ॥ বারো ॥

[ক]

সেই বাড়ি, সেই ঘর।

সে ঘর কেমন, তার চেহারা ফুটে উঠল পরদিন সকালে। সাঁতরে সাঁতরে আমরা যেমন দেশের পুকুরে ডুব জল থেকে পৌঁছে যেতাম পাড়ে, এই ঘরটাতেও, তেমনই, সকাল হতে না হতে এক-একটা জিনিস যেন অন্ধকার থেকে আকার নিয়ে পাড়ে উঠে আসছিল—ছোপ-ধরা দেওয়াল, মাথার উপরে উই-ধরা কড়ি, মরচে-ধরা জানলার শিক। রোদ একটুখানি ঠিকরে পড়ছিল অবশ্য, কিন্তু ঘরটা কিনা খুব লাজুক, কাউকে মুখ দেখাতেই চায় না, তাই ঘরে-ঘরে-ধরানো উনুনের ধোঁয়ায় নিজেকে ঢেকে ফেলছিল। চোখে জ্বালা, আমি উঠে পড়লাম। দেখলাম তুমি উঠেছ তার আগেই। দেয়ালের একটা দিকে পেরেক না কী-একটা ঠুকে বসাতে চাইছ।

বাবা একটু পরেই ফিরলেন থলেতে কাঁচা বাজার নিয়ে। "কী, করছ কী। এমনিতেই তো দেয়ালটার আস্তরখসা, চুনবালি সব ঝুরঝুর করে ঝরে পড়লে বাড়িওয়ালা বলবে কী।"

—"আমি—আমি একটা জিনিস করব।"

—"কী করবে তাই তো জিজ্ঞেস করছি।"

তোমার চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছে, হাওয়ায় চুনের গুঁড়ো তাই নাকে সুড়সুড়ি, তুমি স্পষ্টই বোঝা যায় কী-একটা গোপন করতে চাইছ।

—"তুমি যাও, তুমি যাও না। ফিরে এসে দেখবে।" কোনো দিকে না তাকিয়ে তুমি একমনে পেরেক ঠুকতে লাগলে, ঠোকার মন্ত্র তো ওই একটাই, ছোট্ট জাঁতি, পেরেক বসল না, কিন্তু একবার তোমার আঙুল থেঁতলে গেল, শুয়ে শুয়েই আমি দেখছি। বাবা রাগ করে গেলেন বেরিয়ে—"ফিরে এসে ভাত যেন পাই। রোজ বাজারের খবর, এত বড়মানুষী পোষাবে না, তাই বলছি।"

—"ফিরে এসে দেখো।"

শেষ পর্যন্ত পেরেকটা বসল, যদিও তেমন মজবুত হল না, খানিকটা হেলেই রইল।

আমি দেখছি তুমি প্রথমে বের করলে রাধাকৃষ্ণের একটা পট, কোলে নিয়ে দেখলে। সেটা পাশে রেখে দিয়ে বের করলে আর-একটা—হরগৌরীর। না, সেটাও পছন্দ হল না। ততক্ষণে পা টিপে টিপে উঠে পড়েছি আমি, সবার নিচে সাবধানে ছিল যে-ছবিটা সেইটে টেনে বের করেছি। বলেছি ফিসফিস করে, একমাত্র ছেলেই মাকে ও-রকম অন্তরঙ্গ স্বরে বলতে পারে, "এইটে—এইটে টাঙাবে তো। এই নাও। কিন্তু টাঙাবে কী করে। যেমন তোমার দেয়াল এই ছবিও তো ঠিক তাই। ভাঙা কাচ, খসে পড়ছে ঝুরঝুর করে।"

আর তখন যা ঘটবার তাই ঘটল। ফটোটা কেড়ে নিয়ে ঠাস করে একটা চড় মারলে আমাকে,—কেন?—তোমার মনের কথা টেনে বের করেছি বলে? কিন্তু সে জন্যে, মা, ওই ফটোটাকে বুকে চেপে কেঁদে ওঠার কী দরকার ছিল।

কিন্তু আজ ভেবে দ্যাখো, যা ভবিতব্য তাই তো ঘটল? দাদার ছবিটা পুরনো, ঝরঝরে, আনা হবে না হবে না করেও সেটা যদি বা এল, সেটা ফের চলে গেল বাক্সের তলাতে, কলকাতায় এসে-ছিলাম তুমি আর আমি, আমরা দুজন, থেকেও তো গেলাম সেই দুজনই? এখানে এমন কী এখানকার দেওয়ালে ফটো হয়েও, দাদার স্থান হল না।

তাই কি ফটোটা বুকে চেপে কাঁদলে তুমি। দাদার জন্যে কলকাতা এসে সেই প্রথম আর এক রকম সেই শেষ।

[খ]

সেকালে বিয়ে করতে যাবার আগে ছেলেরা যেমন বলত "অনুমতি দাও মা, তোমার জন্যে দাসী আনতে যাচ্ছি", তেমনই মা আমি, এতক্ষণ ধরে কলম টেনে টেনে ক্লান্ত, বুঝতে পারছ, এখন কী বলতে চাইছি?—"অনুমতি দাও মা, সেই বয়সে প্রবেশ করি।"

কোন্ বয়স? যে-বয়সে কলকাতা আমাকে তাড়াতাড়ি তৈরি করে নিচ্ছিল, হাতে-গড়া রুটি যেভাবে উলটেপালটে চাপড়ে আগুনের তাতে সেঁকে নেয়, সেইভাবে, আমি ফেঁপে উঠেছি, ভিতরে চাপা ভাপ, মুখে কপালে ফুসকুড়ি, আমাকে দেখে কে বলবে সেই ভিতু, বোকা-বোকা গ্রামের ছেলেটি?

বন্ধ চালের হাঁড়িতে কলা যেমন তাড়াতাড়ি মজে, আমিও তেমনই মজে উঠেছিলাম, যদিও স্কুলের শেষ পরীক্ষার তখনও অন্তত বছর দুয়েক বাকী। অতি ধীরে ধীরে সেই বৃত্তান্ত উন্মোচন করলে পরিসরে কুলোবে না, তা ছাড়া বয়সের ঝাঁকুনি দিয়ে অনেক স্মৃতি গলে গেছে।

আমিও মজে উঠেছিলাম, মজা পাচ্ছিলাম, নানা বই পড়ে, নানা লোকের কথায়, ঠারে-ঠোরে ইসারায়, তা ছাড়া বিবিধ পারিবারিক অভিজ্ঞতায়। আমিও।

একটু পাউডার নাকের কাছে ধরে কেমন কেমন লাগত, কেন যে ফাল্গুনে পড়তে-না-পড়তে রাস্তার দু পাশের সংযমী গাছগুলো ওড়া ধুলোতে মস্ত হয়ে যেত! আমি তখন থেকেই দেখতাম।

হায়, পুরুষের বয়ঃসন্ধিকালের কথা কোনও কাব্যগ্রন্থে লেখেনি, পুরুষেরা জানতে পারে শুধু নিজেদের কঠিন কষ্টে, বিগলিত নিষ্কৃতিতে, আর—আর মেয়েদের অনুরূপ বয়সের বর্ণনার সঙ্গে আপনার যন্ত্রণা মিলিয়ে। আমিও জানছিলাম।

কলকাতা, মোটের উপর আমার ক্রমে ক্রমে রপ্ত হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তোমার নয়। নতুন জুতোর কামড়-কাকর আমার সহ্য হয়ে এল, কিন্তু চটি জুতো পরে চলাফেরা কিছুতেই তোমার অভ্যাস হচ্ছিল না।

বাবা বলতেন, "তুমি সেই গেঁয়ো ভূতই রয়ে গেলে।"

তুমি : "রাতারাতি শহুরে পরী হব, তাই কি ভেবেছিলে তুমি?"

বাবা : "যাও না, তবে তিলক কেটে রোজ বুড়িদের মতো গঙ্গাচ্চান করো।"

তুমি : "করবই তো, করব। একেবারেই একদিন গঙ্গাযাত্রা করব। রাস্তাটা তুমি এক দিন দেখিয়ে দাও না।"

বাবা : "সোজা রাস্তা। পশ্চিমমুখো হেঁটে গেলে পুরো আধমাইলও না।"

এই রকম বিশ্রী কথা কাটাকাটি। আমি পালিয়ে যেতাম। বুলাদের ঘরে।

সেই যে যারা প্রথম দিন রাত্রে আমরা আসতেই ছায়ার মতো বাইরে দাঁড়িয়েছিল, তারাই বুলা। বুলা আর বুলার মা। যে-সতীশবাবু থিয়েটারে প্রমটার, এই বাড়ির খোঁজ বাবাকে দিয়েছিলেন যিনি, তিনিই বুলার বাবা।

মা, প্রথম দিকে তুমি কিন্তু ভুলে গিয়েছিলে। সেই ডুরে শাড়ি, চওড়া করে সিঁদুর পরা সব ফিরে এসেছিল। বাবাও রোজ সকালে বাজারে তো যেতেনই, সন্ধ্যার পর কোন-না-কোন মিষ্টির ঠোঙা নিয়ে ফিরতেন। যেখানে বসে আমি পড়তাম, যে দেওয়ালের গায়ে বড় বড় করে লিখে-ছিলাম "পাঠ-পীঠ", মানে নেই, ওম্নি-ওম্নি, তুমি ঠোঁট বেঁকিয়ে বলতে 'সব থিয়েটারি ঢঙ, নাটুকে', বাবা বলতেন, 'হবেই তো, আমার ছেলে যে", সেই পাঠ-পীঠের সামনে বসে ঢুলছি, বাবা ঠেলে ঠেলে আমাকে তুলে দিতেন।

মা, তুমি এগিয়ে এসে আমার মুখে গুঁজে দিতে মিষ্টি। বাবা যখন মুখ ধুতে বাইরে গেছেন, তখন নিজেও একটু চোখে বলতে, "আমি ভুল করেছিলাম রে"—বলতে আস্তে আস্তে। কী ভুল? "তোর বাবা সত্যিই বদলে গেছে। আগের চেয়ে সংসারের ওপর ওর কত মায়া পড়েছে, দেখছিস?"

দেখছি না? দেখব কী, তখন তো হাতে হাতে আরও বড় প্রমাণ—চাখছি।

কিন্তু ক'দিন আর, ক্যালেনডারে তো দাগ দিয়ে রাখিনি। বাবার সকালে বাজার করা বন্ধ হল। থলে নিয়ে নিচে যেতে ঠিকই, কাটায় কাটায় ন'টায় উঠেও আসত। কিন্তু তুমি যা-যা আনতে বলে দিতে, ফ সঙ্গে তার সবটা মিলত না। রাগে এক দিন সব ছড়িয়ে দিলে, ফুঁসতে ফুঁসতে বললে "কী আনতে বললাম, আর তুমি এ এনেছ কী।"

বাবা চুপচাপ রইলেন, চোখে কেমন-একটা নিরর্থক দৃষ্টি। এখন ওই দৃষ্টির মানে আমি জানি—অপরাধীর।

অপরাধটা কী, সেটা একদিন ধরিয়ে দিল বুলা। একদিন নীচে থেকে বাজারের থলিটা সে-ই উপরে নিয়ে এল।

তুমি একটু অবাক হলে। বললে, "তুই?"

"বাবা পাঠিয়ে দিল, মাসিমা।"

"বাবা—মানে তোর বাবা? কেন তোর মেসোমশাই—"

"মেসোমশাই গল্প করছেন, মাসিমা।"

"বাজার থেকে ফিরে অমনই গল্প করতে বসে গেল? আচ্ছা আক্কেল তো মানুষটার!"

"মেসোমশাই তো বাজারে যাননি মাসিমা।"

"বাজার আনল কে।"

"কেন বাবা! বাবাই তো রোজ যান। মেসোমশাই নীচে গিয়ে রোজ করেন কী, বাবাকে টাকা ধরিয়ে দিয়েই গল্প করতে বসে যান।"

"গল্প? কার সঙ্গে?"

"কেন, আমার মা নেই? মা খুব ভাল চা বানাতে পারেন মাসীমা। খাবেন এক দিন?" ফ্রকের কোণ মুখে তুলে বুলো হাসছিল। আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম। মা, আমার শরীরের যন্ত্রণায় সেই শুরে, অথচ বুলোর পা দুটো দেখতে মোটেই সুন্দর ছিল না, হাঁটুর কাছে কালচে দাগ, তার উপরে পাতলা চামড়ার পরতে নীল শিরা, আমার গা শিরশির করত।

মা, তুমিও কি লক্ষ করতে? নইলে বলতে কেন "বুলো জামা নামিয়ে দাঁড়াও, ও কী বিচ্ছিরি অভ্যেস।" খুন্তির ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ তোমার রাগটাকে চেঁচিয়ে বলে দিত।

বয়স কত ছিল বুলোর, আমার চেয়ে বড়, না সমান? তবে বুলোর মা, যাকে আমিও বলতাম মাসি, লীলা মাসি, তোমার চেয়ে বোধ হয় ছোটই ছিল, অন্তত তাকে ছোট দেখাত। আসলে ছোট কি বড় জানি না, তাকে একেবারে আলাদা দেখাত। ঠিক সেই ভামতীকে দেখেই যেমন টের পেয়েছিলাম এ একেবারে অন্য ধরনের, লীলা মাসিকেও তেমনই। কারণ নিজের অজান্তে তোমাকেই আমি অনেক কাল ধরে স্বাভাবিকতার প্রামাণিক মাপ ভাবতাম কিনা।

ভামতী কালো ছিল, লীলা মাসি ফরসা, বোধ হয় তোমার চেয়েও ফরসা। কিংবা খুব সাজগোজ করে থাকত আর মুখে চটচটে কী-সব মাখত বলে তোমার চেয়ে দু'এক পোঁচ ফরসাই লাগত। তোমাকে একদিন সে কথা বলতে তুমি হঠাৎ রেগে গেলে। আয়না সামনে রেখে খোঁপা ঠিক করছিলে, দাঁতে কালো ফিতে চাপা, ঘাড় ফিরিয়ে বললে "মুখ ধুয়ে একদিন সকালে ওই লীলাকে আমার পাশে দাঁড়াতে বলিস, ওই সাদা মলম-টলম যেন না থাকে। তখন দেখা যাবে কে বেশি—" আর বলা হল না, মুখ থেকে ফিতেটা খসে পড়ল। প্রসাধনের ব্যাপার-ট্যাপারকে তুমি বলতে "মলম", তোমার সাজ-সজ্জা বলতে তো ছিল খালি সিঁদুর আর আলতা। পাউডার? না, তা-ও মনে পড়ছে না।

ভামতী ছিল গোলগাল, মোটা, লীলা মাসি রোগা। গাল কেমন ভাঙাভাঙা, গলার হাড় তো আমি সর্বদাই দেখতে পেতাম, তা ছাড়া লীলা মাসির ব্লাউজের গলা ছিল তে-কোণো করে কাটা। আর তোমার? তুমি তো ব্লাউজই পরতে না। কলকাতা এসেও শুধু শেমিজই নিয়ে ছিলে।

বলতে "ও তো একটা বেহায়া। মেয়েটাকেও করে তুলছে তেমনি ধিঙ্গি। তুই ওদের সঙ্গে মিশিস না।"

মা, আমার মা, তুমি তো মা। তুমি কেন ওদের হিংসে করবে?

প্রায় রোজ সন্ধ্যাবেলা লীলা মাসি ঘটা করে সাজসজ্জা সেরে কোথায় বেরুতো। ফিরতে সন্ধ্যা পেরিয়ে যেত। ফিরত রিকশা করে। কদাচিৎ-কখনও ট্যাকসিতে। আঃ, সেই ট্যাকসির ভেঁপু, পিছনে ছড়িয়ে যাওয়া ধোঁয়া, আমি ছুটে যেতাম, বুক ভরে তার গন্ধ নিতাম। কতদিন আর সেই গন্ধ পাই না। মোটরগাড়ির না, কোনও গাড়িরই না। আগে প্রত্যেকটা বাস ছেড়ে দেবার সময় শব্দ হত "ভোঁ-ও-ও", এখনও কি সেই চনমন-করা আওয়াজটা বাজে? বোধহয় না, অন্তত আমি শুনি না। অথবা আজকাল-কার বাস তো, কলকব্জা, চালানোর কায়দা সবই হয়ত বদলে গেছে।

লীলা মাসিকে যারা নামিয়ে দিয়ে যেত, তাদের মুখ কোনোদিন দেখতে পাইনি। ওদের মুখ ছিলও না সম্ভবত। ছিল অন্ধকারে আধো-ঢাকা শরীর। তাদের মুখ যদি-বা থাকে, সেই মুখে কথা ছিল না, ছিল অদ্ভুত এক ধরনের হাসি, খানিকটা খলখল বোতল উপুড় করে তরল কিছু ঢাললে শোনায় যেমন—সেই তারা! লীলা মাসি নাকি কোন্ একটা গানের ইস্কুলে গান শেখাতে যায়। বুলোর কাছে শুনেছিলাম। একটু অবাক লেগেছিল বৈকি। লীলা মাসির মুখ দেখে মনে হয় চামড়া তেল-তেলে, অথচ গলা কী-রকম খসখসে। ওই গলায় গান শেখানো যায়?

বুলোর বাবা সতীশ রায়। তোমাকে বলতেন 'বউদি', কিন্তু তুমি আমল দিতে না। বলতে মেনিমুখো। বাবা বলতেন, "তুমি শুধু ওর মেয়েলি গলাই শুনেছ, ও বড় একটা অসুখে পড়েছিল যে, লিভারের অসুখ, সেই থেকে গলা ওইরকম হয়ে গেছে।"

"লিভারের অসুখে গলা খারাপ?"

"হয়, হয়। কিন্তু লোকটার অনেক গুণ জানো, প্রাণ দিয়ে প্রম্পট করে, শুধু ওই গলা আর চেহারার জন্যেই কিছু হল না। নইলে যে-কোনো পার্ট ওর আগা-গোড়া মুখস্থ, যে-কোনো নাটকের যে-কোনো পার্ট। শুনতে চাও তো একদিন, যেদিন থিয়েটার নেই, ডেকে শুনিয়ে দেব—আলেকজানডার চাও তো আলেকজানডার, আলমগীর বলো তো আলমগীর, নইলে আবন কি নাদির শাহ্ কি সিরাজ—"

"থাক, থাক, ওই গলায় বরং মেয়ের পার্টই মানাবে ভাল।"

"বেশ, তা-ও পারবে। সীতা, জনা, কৈকেয়ী—এমন ডায়ালগ দিয়ে পড়বে যে সেকালের তারাসুন্দরী কুসুমকুমারী চারু-শীলারা কোথায় লাগে। লোকটা যে কী মজলিসী জমজমাটি, তুমি না শুনলে বুঝবে না।"

আড়চোখে চেয়ে তুমি বলেছ, "সেই জন্যেই ওখানে রোজ আড্ডা দাও বুঝি?"

"সেই জন্যেই তো।"

"চুপ করো।" যেন তোপ পড়ল, যেন আমাদের নড়বড়ে দেওয়ালের চুনবালি আরও খসে যাবে। "তুমি যাও ওই পটের বিবির টানে।"

"কার কথা বলছ।" বাবার মুখে কথা ফুটছে না, আমি তখন ঠিক বাবাকেও তো দেখছি না, যেন ছোট্ট একটি পোকা, আরও ছোট্টটি হয়ে নিজের জুতোর তলাতেই সেঁধিয়ে যাবেন।

"কার কথা বলছি তুমি ভাল করেই জানো। রোজ যে চা খাওয়ায়, গল্প করে, বিকালে ফিটফাট হয়ে বের হয়—"

"তখন তো আমি থাকি না।"

"সেইটেই আপশোস বুঝি।" ঘাড় হেলিয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে এত কথা বলতে কবে শিখলে তুমি মা! না কি কলকাতাই এত কম সময়ের মধ্যে শেখাল?

"সতীশের বউ, জানো, একেবারে ফেলনা নয়। ওর অনেক গুণ।"

"জানি না? নইলে তোমাকে গুণ করেছে?"

"বাজে কথা বোলো না। ও গান জানে, নাচও শিখছে, তা-ছাড়া ভালো প্লেও করতে পারে। খুব শীগগিরই চানস পাবে একটা থিয়েটারে।"

"কোন্ থিয়েটারে?"

(আমার সামনেই আজকাল এইসব চলে, আমি যে আছি তোমাদের সে-সম্পর্কে একটুও হুঁশ নেই কেন, মা, আমার মা, তোমাকে একটা রোঁয়া-ওঠা বিড়ালের মত লাগছে কেন, আর বাবাকে. লিখতেও বাধছে সেই ঘিয়ে-ভাজা ঘেউঘেউটার মতন যে নিত্য কাঠের সিঁড়িটার নিচে শোয়, আর যত লোক আসে যায় সকলকে শাসায়, বিড়ালগুলোর সঙ্গে মাছের কাঁটা আর সক্‌ড়ি নিয়ে কাড়াকাড়ি করে।)

"বলো, কোন্ থিয়েটারে?"

এবার বাবা থতমত খেলেন। —"ওই, যে-কোনও একটায়। তুমি আর ক'টার নাম জানো। মহলা চলছে, তা-ই তো ওকে রোজ বেরোতে হয়।"

"পাড়াটি কেটে, চুনকাম করে, ঝলমল ঝলমল শাড়ি, জরি—মহারানীর পার্ট নাকি? তবে যে গান শেখাতে যায় শুনি? সেটা তবে মিথ্যে?"

বাবা আমতা আমতা করে বললেন, "না, গান না, মানে বোধহয় না। নাটক। হ্যাঁ, নাটকই তো।"

"কার নাটক—তোমার?" (তর্ক করতে হলে যে কোমরে আঁচল পেঁচিয়ে নিতে হয়, সেটা, মা, তুমি শিখলে কোথায়! কলকাতায়? এই শহর শুধু আমাকে নয়, আমাদের প্রত্যেককে বদলে দিচ্ছিল, বাবাকে, তোমাকে; অথচ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রোজ সকালে চুল আঁচড়ানোর সময় আমরা টের পেতাম না কে কতটা বদলে গেলাম: সহজ সময়ে পরস্পরের চোখের দিকে চেয়েও না। চুলের সিঁথিতে ও-সব পরিবর্তনের কথা লেখা থাকে না, কোন-কোনোটা এত ধীর এত সূক্ষ্ম যে ধরা পড়ে অনেক দিন কেটে গেলে তবে। রোজই তো দেয়ালে

একটু-একটু দাগ পড়ে, ঘরের মেঝের কোণে কোণে, সারাক্ষণই ধুলো জমে, আমরা কি টের পাই?)

তুমি জিজ্ঞাসা করেছিলে "কার নাটক, তোমার?" আর বাবা অত্যন্ত কুণ্ঠিত, লজ্জিতের মতো বলেছিলেন "না, মানে এখনই না। এটার পরে, পরে হয়ত ওরা আমারটাও ধরবে।"

"বাঃ চমৎকার! উনি নায়িকা আর তুমি নাট্যকার। এই তো নাটক। আমাকে একটা পার্ট দেবে না? বলো, আমার কী পার্ট, বলো, বলো!" হঠাৎ হিংস্র হয়ে বাবার কাঁধটা খামচে ধরেছিলে। ফতুয়া ছিঁড়ে একটা নখের দাগ ওঁর গলা থেকে কোমর পর্যন্ত নেমে এসেছিল।

হাঁপাতে হাঁপাতে তুমি বলছিলে, "কী পার্ট আমার, দেবে না একটা? কোন্‌টা, বলো না, কোন্‌টা—বাঁদির?"

বলতে নেই, লিখতেও নিজের উপর ঘৃণা হচ্ছে, তোমার উপরে ঠিক ওই সময়টাতে ঘৃণা হচ্ছিল বলে নিজের উপরই ঘৃণা—তখন তোমাকে সত্যি সত্যি কিন্তু তেমনি দেখাচ্ছিল, যে-শব্দটা তুমি উচ্চারণ করেছিলে।

বাবা আর কিছু বলছিলেন না। অসহায় অপ্রতিভ, পরাভূতের মত সেখান থেকে আস্তে আস্তে সরে গেলেন।

আর তুমি? সেমিজের কাঁধ ছিঁড়ে, পিঠেও আঁচল নেই, কাঁপতে কাঁপতে মেঝেয় বসে পড়ে ভেঙে ভেঙে কাঁদতে থাকলে। আমি পিঠের কাছে দাঁড়ালাম। তুমি একবার মুখ তুলে দেখলে। হাত দিয়ে ঠেলে ভাঙা ভাঙা গলায় বললে, "সরে যা, চলে যা এখান থেকে।" তারপর ওই দুটি হাতেই আবার ডুবিয়ে দিলে মুখ। সেদিন অভিমান হয়েছিল। আজ নেই। জানি কিনা, এমন অনেক মুহূর্ত আছে, যারা সারা দিনমানে কতবার যে ফিরে ফিরে আসে, যখন নিজেরই দুটি করতল ছাড়া মানুষ নিজেকে লুকোনোর কোনও আশ্রয়, কোনও বিশ্বস্ত সুহৃদ খুঁজে পায় না।

[৭]

তবু আমি যাইনি। তোমারই কোলের কাছে ঝুপ করে বসে পড়লাম, সেই বসে পড়তাম যেমন আগে, কতকাল পরে আমার সেই শিউলি-শিশুকাল ফিরে এল। কল-কাতায় শিউলি গাছ নেই?

অনেক পরে তোমার কাঁপুনি থামল, বুঝলাম তুমি আর কাঁদছ না, তখন তোমার পিঠে একটা হাত রাখলাম। তুমি মুখ তুললে। এই কয় মিনিটে কী ভয়ানক বিস্ফারিত হয়ে গেছে তোমার মুখ চৌবাচ্চার জলে কোনও জিনিস ডুবিয়ে ধরে থাকলে যেমন ছাড়িয়ে-পড়া দেখায়।

আমার থুতনিটা তুলে ধরলে তুমি। খুব স্থির গলায় বললে, "এখানে থাকব না, এই নরকে। চল আমরা চলে যাই। ফিরে যাই সেখানে। তুই আমাকে নিয়ে যেতে পারবি?"

কিছু বলছিলাম না। আমার ভিতরে যে ইতিমধ্যেই বড় হয়ে গেছে, সে বলে দিচ্ছিল, চুপ করে থাকো, এখন শুধু শোনো, এ-সব সময়ে কথা বলতে নেই।

মাথা সোজা তুলে ম্রিয়মাণ দুটি চোখ অনেক দূরে পাঠিয়ে দিয়েছ, এই নোনা-ধরা দেওয়াল ভেদ করে চটের পর্দা উড়িয়ে দিয়ে চৌকো-করে কাটা আকাশ আর কাঠের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে চিলেকোঠা পেরিয়ে। অথবা সেখানেই পৌঁছে গেছ, অনেক দূর থেকে বলছ, অতি-মৃদু এক-একটি শব্দ-তরঙ্গ তোমার স্বর বয়ে নিয়ে আসছে. "ভুল বুঝেছিলাম। ও বদলায়নি। কলকাতায় এসে ওকে যখন একটু আলাদা দেখেছিলাম, জানিস, মনে হয়েছিল, ওই চিঠির কথাটাই বোধহয় ঠিক, সেই যে সমুদ্র-টমুদ্র কী-সব লিখেছিল না? —ভালো করে বুঝিওনি। মনে হয়েছিল সত্যিই বুঝি ওর মন ফিরেছে সংসারের দিকে। তোর দিকে, আমার দিকে। এখন দেখছি", একটু থেমে বলতে থাকলে "এখন দেখছি, কী দেখছি? কিছু না। সব মিথ্যে। বদলায়নি। কিংবা যদি-বা বদলেও থাকে, তোর জন্যে আমার জন্যে তো নয়। ওকে বদলে নিয়েছে অন্য জন। এর চেয়ে ও যখন জেলে জেলে থাকত, নয়ত বিবাগী হয়ে ঘুরত, সে-ও যে ভালো ছিল। শেষে কিনা শামুকে পা কাটল?"

বেশ তো আস্তে আস্তে বলছিলে, হঠাৎ আবার অস্থির হয়ে উঠলে কেন তুমি? কেন আমার হাতের কব্জিটা চেপে ধরে বললে, এইমাত্র মহীয়সী ছিলে, এক্ষুনি যেন ভিখারিনী, "চল আমরা চলে যাই।"

"কোথায়।"

"যেখান থেকে এসেছি, সেখানে। ফেরা যায় না? তুই তো এখন রাস্তা চিনিস, আমাকে নিয়ে যেতে পারবি না?"

মুহূর্তও না ভেবে বললাম "পারব, মা।"

তুমি জানো না, আমিও মিথ্যা কথা বলেছিলাম। কোথাও ফেরা যায় কিনা, ফেরা সম্ভব কিনা, এ-সব তত্ত্ব তখনও আমার বিচারবুদ্ধিকে আঘাত করেনি ঠিক, কিন্তু তোমাকে বলতে পারতাম না, সেখানে ফেরার আগ্রহ-উৎসাহ আমারও আর ছিল না। আমারও মন বদলে গিয়েছিল। গাঢ় চিনির রসে মাছি যেমন, আমিও তেমনই লেপটে যাচ্ছিলাম। [ক্রমশ]

তাঁত বোনে তাঁতী

মায়ের পেট থেকে যেই না মাটিতে পড়েছি অমনি টাঁ টাঁ করে আওয়াজ তুলেছি, 'মাগো গালে মধু দাও, দুধ দাও!'

আর যখন একটু বড় হয়েছি মা একটু আচ্ছাদন জড়িয়ে দিয়েছে কোমরে। টেনে খুলে ফেলে দিয়ে দিগম্বর হতে গেলেই মা বলেছে, 'ছি বাবা, ন্যাংটো থাকতে নেই।'

তারপরে আর একটু বড় হতেই সিঁথি কেটে পাততাড়ি বগলে দিয়ে মুখে চুমু খেয়ে বলেছে, 'যাও সোনামণি, ইস্কুলে যাও—মানুষ হও।'

সভ্য মানুষের জন্যে এ তিনটি জিনিস চাই-ই। অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা। প্রথম অধিকার অন্নের, পরে বস্ত্র। তারপর শিক্ষা। বস্ত্রের বয়স কত হাজার বছর? কলকাতার যাদুঘরে মিশরের যে মমিটা রয়েছে তার গায়ের বস্ত্রটির বয়স নাকি চার হাজার বছর। তার রঙ, বুনোন দেখে মনে হয় কেউ বুঝি ধোঁকা দিয়েছে! আধুনিক মেশিনে বোনা থান কাপড় নিয়ে মমির গায়ে চড়িয়ে দিয়ে লোককে বোকা বানাতে চেয়েছে যাদুঘরের কোনো যাদুকর! কিন্তু না। অত সহজে মানুষ যাদুর গোলাম বনে না। তাহলে মিশরের আকাশচুম্বী তিন কোণা যে সব পিরামিডগুলো রয়েছে তার পাথরের হাজার হাজার টন ওজনকে বিজ্ঞানের কোন্ কৌশলে টেনে তুলেছিল মশায়? কোন্ ছাঁচে হুবহু করে মানুষের মুখের হুবহু নকল তুলেছিল শিল্পীরা? কোন আরক তৈরি করেছিল ভেষজবিদরা যা হাজার হাজার বছর পরেও অক্ষয় অব্যয় সমান ক্রিয়াশীল?

অথচ এখন? কোন্ ওষুধের ক্রিয়া কতদিন থাকে? কোন্ কাপড়ের রং কতদিন টেকে? আড়াইশো টাকায় একটা জামদানী শাড়ি কিনে এনে দশদিন রোদে রাখুন রং জ্বলে ভ্যানিসড!

যাদু আমরাই জানি, আমরাই নকলনবিশের নবাব। হাজার হাজার বছর আগে আমাদের চৌদ্দ পুরুষের চৌদ্দ হাত মা-বাবারা নকল দাঁত, নকল পরচুলা, নকল ভুরু, নকল চোখ পরতেন না—তাঁরা ছিলেন খাঁটি এবং অবৈজ্ঞানিক হলেও আমাদের চাইতেও আধুনিক। তাহলে ৪/৫ হাজার বছরের মিশর সভ্যতা,—অজন্তা ইলোরা, দ্রাবিড় সভ্যতা যদি আধুনিক হয়, বাকল অথবা কাপড় পরার বয়স কোন্ না হাজার পাঁচিশ বছর হবে! পণ্ডিত ডারউইনের বাপ ঠাকুরদাদারা যাদের হনুমান ছিলেন বলে তিনি জানাবার আগে তার কোমরের কাপড় খুলে পড়ে গিয়েছিল বোধ হয় কত হাজার বছর আগে মানুষ প্রথম কাপড় বুনতে এবং পরতে শিখল সেই গভীর গবেষণার কংকালে শলা পাশ করতে গিয়ে!

যা হোক, আমরা মানুষ, ভগবানের চেলা, সভ্য জীব, বহু হাজার বছর পরে হলেও একেবারে ন্যাংটা থাকি নি, কাপড় পরতে শিখেছি! আমরা গরু ঘোড়া, ছাগলের মতন আর ন্যাংটো নেই। এমন কি মাটির ঠাকুর, পাথরের বা কাঠের ঠাকুরকেও কাপড় পরিয়ে ছেড়েছি! শুধু আমাদের বুকে আর জঙ্ঘায় নয়, কাপড় এখন ফানুস হয়ে মানুষ নিয়ে আসমানে উড়ছে। কাপড় এখন জীবন থেকে জীবিকা হয়ে গেছে।

বৈশাখ মাসেও যাদের সুট পরতে হয় কলকাতায়, তাঁরা অত্যন্ত কষ্ট-সহিষ্ণু ব্যক্তি।

মানুষের চারপাশে শুধু কাপড় আর কাপড়ের রাশি। বালিশ, কাঁথা, লেপ, তোষক, গদি উড়ানি, শালোয়ার, পায়জামা, পীরহান, আচকান, শাড়ি ধুতি, পাতলুন, ব্লাউজ, শার্ট, পাঞ্জাবি, বোরখা, ব্রেসিয়ার, সায়া, গেঞ্জি, গামছা, তোয়ালে, চাদর, মশারি, টুপি, পাগড়ি, কোট, কোচ, সুজনি, গেলাপ, সামিয়ানা, কম্বল, গালিচা, সতরঞ্চ, দোর-জানলার পর্দা, সুটকেশ-রেডিও-বন্দুকের ঢাকনা-জামা—কোথায় আমাদের বেপর্দা জীবনের ইজ্জত ঢাকবার জন্যে কাপড় নেই? এমন কি মানুষের শরীরের ওপরে কাপড়, ভেতরে কাপড়, তার ভেতরে কাপড়। কবরে পর্যন্ত কাফন জড়ানো। কাফনের ভেতরে মরা মানুষের দেহের সব কটি ছিদ্রপথ কাপড়ের পুঁটুলি দিয়ে ছিপি এঁটে বন্ধ করা! স্বর্গেও নাকি থাকবে হীরা মুক্তা মানিক্যের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুময় বসন-বিলাস! সুটপরা সাহেবরাও পেট্রো কেমিকেলের জামা কাপড় কেন রেডিয়াম বা নিউক্লিয়ার-অক্সিজেনের পোশাক পরে গ্রহে গ্রহান্তরে ঘুরে বেড়াবে! সংসারে যে যত বিত্তবান তার তত বেশি কাপড়। তত বেশি পোশাক।

বাবু চেনা যায় শীতকালে।

শীত প্রধান দেশে কাপড় জন্ম নেয় মানুষ জন্মাবার আগে থেকেই। আমাদের গরম দেশেও মায়েরা বাচ্চা হবার আগেই কাঁথা সেলাই করে রাখেন। ছোট ছোট মিনি কাঁথা।

গরম দেশে আমরা প্রায় সবাই ন্যাংটা ফকির—গান্ধী-বাবা! ইংরিজি-সাহেব হয়ে বৈশাখ মাসেও যাঁদের সুট পরতে হয় কলকাতায়, তাঁরা অত্যন্ত কষ্ট-সহিষ্ণু ব্যক্তি!

গরম দেশে ধুতি গামছা লুঙ্গি গেঞ্জি পাঞ্জাবি শাড়িতেই হয়ে যায়। শীতে পশম বা মোটা খদ্দর। গরমে সুতি বা সিল্ক।

কিছুদিন আমি লক্ষ্য করছিলাম, কে কি পরে আছে। কোথায় সেইসব তৈরি হয়। এর হদ্দ হদিস রাখা কঠিন। বিদেশী কাপড় বাদ দিলেও কাশ্মীরী সার্জ থেকে শুরু করে গামছা বা ল্যাঙ্গোট পর্যন্ত কোথায় কোনটা জন্মায় সে সব তথ্য নিতে গেলে দোরাস পাগল মেরে যেতে হবে। হঠাৎ নেড়া হয়ে নিজের মাথার চুল গুণতে বসার মতো! মিলের কাপড় আলাদা। বোম্বাই, দিল্লী, মোরাদাবাদ, হায়দরাবাদ, সিঙ্গাপুর, পশ্চিমবাংলা, কটকের মিলের বহু রকমের কাপড়—পৃথিবীর নানান নগরে বন্দরে গ্রামে গ্রামান্তরে জাহাজ বোঝাই হয়ে গাঁটকে গাঁট ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছে।

তাঁতের কাপড় বুনেছে ছায়া সুনির্বিড়

গ্রামের ঘরে ঘরে কত শত সহস্র মানুষেরা। পশ্চিমবাংলার তাঁত শিল্পীদের কথাই ধরুন। হুগলী জেলায় বড়-ডঙ্গল, শ্রীরামপুর, চন্দননগর, রাজবলহাট, বেগমপুর, গুলটিয়া রশিদপুরে, দাসপুরে, ধনেখালি, সমাসপুর, গোরহাটি, মায়াপুরে—কত গ্রামেই না খটাখট খটাখট শব্দে রাতদিন হাজার হাজার তাঁত চলেছে। শিল্পীরা নকশা-আঁচলা, পাড় বুনেছে। জরির কাজ হচ্ছে।

বর্ধমানের গ্রামে গ্রামে চলছে হাতের তাঁত।

২৪ পরগনার ফলতা থানায় রুখে, গোপালপুরে, শত্তোল, কলসা, বেলে, আসুনে, চিলে গ্রামে ১২০০ ঘর মুসলমান জোলার বাস। প্রায় ৬০০০ লোক। কোন্ আদিকাল থেকে ওরা তাঁত বুনে চলেছে!

রুখে-গোপালপুরে পাশাপাশি গ্রাম। তাল নারকোল খেজুর বাবলা বাঁশ গাছের জমাটি জঙ্গল গ্রামের মধ্যে। দুপুর দুরন্ত মাঠ চারদিকে। ধূ ধূ করছে। দূরে কলাপাতার জঙ্গলে রোদ্দুরের লেলিহান শিখারা ঝিলমিল কিলবিল করছে। মাঠের মাটি ফেটে চৌচাকলা। আকাশ-পাতাল ছুঁয়ে নীলকণ্ঠ চিৎকার করছে।

রহিম মিদ্দে তাঁত বুনেছে। ষাট বছর বয়েস। মাথার সব চুলই সাদা। ঝোলা গোঁফ দুটো পর্যন্তও। তার ডাগর মেয়েটা বালতিতে করে লাল রঙ এনে সুতোর তানা ডুবিয়ে ভারাতে ভরাতে শুকোতে দিচ্ছে। মেয়েটার বিয়ে হয়েছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। মুসলমান মেয়েদের বিয়ে হয়েছে কিনা ধরা কঠিন যদি শরীর দেখে বোঝা না যায়।

রহিম জোলা বলে, 'এই গামছা বুনেছি বাবু। গামছা আর মশারিই আমরা এ অঞ্চলে বেশি বুনি। ১২০০ ঘর জোলার বাস এখানে। কলকাতার বড় বাজার থেকে সুতো কিনে আনি। মাল বেচতে যাই মঙ্গলবারে হাওড়া মঙ্গলাহাটে। বিরলাপুরে, বাঁড়ুয্যের হাট, মাখরা, কালীঘাট বেহালাতেও মাল 'নে-যাই।' 'ম্যাড়া' এটার নাম। 'দক্তি', 'ঝাঁপ' 'সানা', 'মাকু', 'পুলি,'—'বপিন' এসব গুলোর নাম। এই সব নিয়ে তাঁত। ধুতি শাড়িও বোনা হয়। ৬০ সানার ছোট শাড়ি হয়। ১½ তানা সুতো লাগে। গামছার 'সানা' ৩২—২৮—২৬ থাকে। রং সাবান দিয়ে সুতো রাঙাই। ১ বাণ্ডিলে ২০ 'ফেটি' করে সুতো থাকে। ৩৭—৩৭½—৪০—২০—৩০ টাকা করে বাণ্ডিল সুতোর। ভেরাইটি সুতো আছে। গামছার আবার অনেক রকম আছে। এই যেটা বুনছি খুচরো এক একখানার দাম সাড়ে তিন টাকা করে। বেনারসি গামছা বারো আনা দাম। এই মাঝারি গামছাটার দাম এক টাকা ছ' আনা। মশারি বুনছে ওরা। একখানা বড় মশারি—চার পাঁচজন শুতে পারে—মানুষ সমান খাড়াই—বারো টাকা দাম। এখন সুতোর দাম চড়েছে, পনেরো টাকা হয়তো পড়ে যাবে।'

কয়েকটা ভেড়া বাঁধা আছে সোঁদালি গাছটার তলায়। ছোট ছোট ভেড়া-বাচ্চাগুলো মাথার গুঁতো মেরে মেরে দুধ খাচ্ছে। বড় বড় নোনা পেকে লাল হয়ে আছে তাঁত ঘরের পাশেই। রহিমের স্ত্রী ফেন দিয়ে কুঁড়ো গুলে 'আয় আয় আ-তি-তি...' বলে মোরগ-মুরগিদের ডাকতে থাকলে তারা চারদিক থেকে ছুটে এসে গপ্ গপ্ করে গলা ঠেসে কুঁড়ো খেতে থাকে।

রহিম বলে, 'চার ছেলে আলাদা থাকছে বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে। আমাদের এক কাঠাও জমি নেই বাবু। ঐ মেয়েটা 'কেলাস' এইট পর্যন্ত পড়েছে। এখনো বে দিতে পারিনি। আমাদের জোলাদের ঘরেই দিতে হবে। দু' চারটে দেখিছি, পসন্দ লয়। জোতদার আহসান মিয়ার কুড়িটা তাঁত চলে। তার ছেলের জন্যে বলছে। জমি তো এখন গ্রামের দু' তিনটে লোকের হাতে। সব গ্রামেরই। ওদের হাতেই বন্দুক, 'কন্ট্রোল', মদিখানা, থানা 'পুলুস'—সব। গাঁয়ের মোড়ল, পঞ্চায়েতের কর্তা ওরা। ওর ছেলেটা লেখাপড়া জানে না। আকাট মুখ্যু। রাজনীতি এমন যেনো জালের মতন আমাদের মতন মুখ্যু গরিবদের ঘরে ঢুকেছে যে ঐ জোতদারের ঘরে মেয়ে দিতে ভয় পাই। কবে পঞ্চাশ হাজার হাজারে মানুষ এসে একদিন ঘেরাও করে গুষ্টিসুদ্ধ সবাইকে টিপে মেরে ফেলে দিয়ে যাবে তার ঠিক আছে নাকি! জোতদার আহসান সাহেবের চরিত্র খর। অনেক বদনাম। ছোট বড় তার জ্ঞান নেই। মামলা-মোকদ্দমা খুন-জখম দাঙ্গা বাধাবার লোক-বল অর্থবল আছে তার। তার গরু-মোষ লোকের ফসল নষ্ট করলেও খোঁয়াড়ে দেবার উপায় নেই। শালার পো বলে,
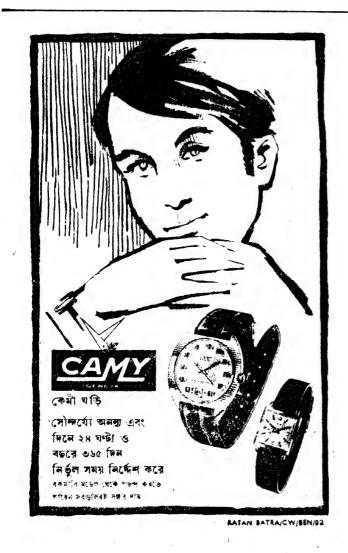
রহিম চাচা, তোর মেয়েটাকে মোর ভারি পসন্দ। মোর ছেলেকে না দিস তো না হয় মোকে দে! শোনো শালার পো-র কথা! মেয়েটা একদিন টিউকলে পানির জন্যে গেছিল, পথে নির্জনে পেয়ে বাঁশবনের আড়ালে নাকি ওর একটা হাত চেপে ধরেছিল। মেয়েটা গালে চড় কষিয়ে দিয়ে কলসী ফেলে দিয়ে পালিয়ে আসে। আহসান মিয়া চোখ রাঙিয়েছে, আচ্ছা সে যদি বাপের বেটা হয়, মায়ের দুধ খেয়ে থাকে তো শোধ নেবে! আমাকে পার্টির লোকেরা উস্কাচ্ছে, লাগাও শালাকে!'...

খটাখট খটাখট খটাখট খটাখট...তাঁত চলেছে সমানে। রহিমের সুন্দরী ষোড়শী মেয়েটা রঙ মাথা লাল হাতে কাপড়টা মাথায় তুলে দিয়ে বললে, 'বাবাজী, রহমত-চাচা এসেছে, পাইকারি গামছা মশারি দেবে নাকি? বললে তো এ হাটে হাওড়াতে যাবে না? রাত্রে ফেরার সময় আহসানের লোকজন খুন করতে পারে!'

রহিম মুখ তুলে মেয়ের দিকে তাকালে। মেয়েটার চোখ দুটো বেশ সুন্দর। ভাসা ভাসা। পাকা ফরসা রঙ। ভাবান্তর কাটিয়ে রহিম বললে, 'আল্লা যার হাতে মরণ রেখেছে মরতেই হবে মা। মঙ্গলা হাটে না গেলে বড় বাজার থেকে সুতো আনব কেমন করে? সামাদ, হাসিম, হামিদ, গোবরা, পদো, নিমু—সবাই একসঙ্গে যাব আসব, ভয় কি! এই যে, ছুরি থাকবে আমার টাঁকে!'

ছ' ইঞ্চি ফলার একখানা চকচকে ছুরি খুলে দেখালে রহিম বুড়ো।

হাসিনা হাসলে।

পাশের বাড়ির তাঁতঘরের লোকগুলো একবার চোখ তুলে চাইলে। আবার মাড়ার ঘা মেরে মেরে মাকুকে চলন্ত ঝাঁপের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করাতে লাগল। মেয়েরা ওদিকে চরকা ঘুরোচ্ছে ক'জন। হাসিনার গায়ে ব্লাউজ নেই। হাত তুলে ভারায় রঙিন সুতো শুকোতে দিতে দিতে মিটমিট করে হাসছিল।

হঠাৎ একটা দাঁড়-কাক পাকা নোনা ফলের গায়ে ঠোকর বসাতেই সে একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে যখন ছুঁড়তে গেল তার অপরূপ মনোহর কোমল একটি বক্ষচূড়া বসনমুক্ত হয়ে গেল এক নিমেষ! রহিম জোলারও তা চোখে পড়ল। মেয়েটি লজ্জা পেয়ে দীপ্ত চোখ দুটোতে কাতর এবং তির্যক হাসি উপচে দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল অন্দরে।

রহিম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে শুধু।

চলে আসতে আসতে পথে রহিম জোলা আর তার মেয়েটার কথা ভাবছিলাম। রহিমের লাসটা হয়তো একদিন পড়ে থাকবে মাঠের জাঙালের ধারে অথবা তালবাগিচার মধ্যে—কারণ রহিমের মেয়েটা

মেয়েটা সোনার পিদিম। আমাকে পুড়িয়ে মেরে ফেললে

ভরা যুবতী—সুন্দরী—তার চোখ দুটো যাদু জানে! আহসান মোড়লের টাকা আছে, লোকবল আছে। আর সেই লোকেদের মধ্যে নাকি রহিমের ছেলেরাও আছে। তারাও নাকি 'জানের গোলাম'! রহিমের ভাষায় 'আগুনের জান হল অহসান মিয়া!'

রুখে, গোপালপুর, খড়োল, কলসা, চিলে—সব কটা গ্রাম ঘুরে ঘুরে তাঁত দেখে, মানুষ দেখে বেড়াতে সারাদিন গেল।

আহসান মিয়ার বাড়িতে গেলাম সন্ধ্যায়। লোকটাকে দেখা দরকার। বসতে চেয়ার দিলে সে। খাটো মোটা কালো চেহারা। মাথায় চাঁদের মতো টাক। ডান হাতের বাজুতে প্রায় আড়াই ভরি একটা সোনার 'পদো'। তাতে মিনেকরা তাজমহল। খালি গা। কাঁধে তোয়ালে। পরনে সিঙ্গাপুরী ফুলদার লুঙ্গি। গোল গোল চোখে ধূর্ত ভাব। বললে, 'বসুন। আমাদের জোলাদের খবর নিয়ে কি হবে? হুগলী জেলায় যদি তাঁতীদের খবর জানবেন! এখন তাঁতী জোলারা অভাবে দুর্দিনে সব মরে গেছে। ১৯৫২ সালে 'ভারত তাঁত সংস্থা' হল। ১৯৫৬ সালে 'তাঁত শিল্প সাহায্য কেন্দ্র' হয়েছে। শ্রীরামপুরে অফিস আছে, 'ইনেস-পেকটার' আছে। তাঁরা রেজিস্টার শেয়ার খাতা দেখেন। সুতোর দাম দেখেন। নতুন নতুন ডিজাইন দেখান। সমিতি, সরকারের কাছে কাপড়ের বিক্রয় বাবদ ৫% সাধারণ রিবেট আর পুজোর ৭ দিন ১০% স্পেশাল রিবেট পেয়ে থাকে।'

'সে সব কথা থাক—আপনি আপনাদের কথা বলুন।'

'বসো বাবা একটু। বয়েস কম, ছেলে-মানুষ, তাই তুমি বললাম, মনে করো না কিছু! তাঁতী, মজুরদের দাম কড়ি দিতে হবে, বসে আছে। একদিন রোজ না দিলে আর ভাত হয় না। শালারা সব হাভাতে হাঘরে। বাপকেলে তাঁতটা পর্যন্তও আমড়া ভাতে দেবার মতন বেচে খেয়েছে। এই রাহিলা, ভাতারছাড়ি মাগী, তোর কি?'

'মোর কি, তুমি জাননি?' মাঝ বয়েসী মেয়েটি টেরা চোখে তাকায়। ব্যাপার দেখে সহজেই বোঝা যায় মেয়েটার সঙ্গে আহসান-ব্যাটা আছে। ওর কোন রুচি নেই। হলেই হল একটা। আরো দুটো দোয়াল-গাই বসে আছে যেন একেবারে ছাপোষা ভিজে বেড়াল।

আহসান বললে, 'তোর নাসিকে পাওনা।'

পাঁচ টাকার নোটটা খপ করে টেনে নিয়ে দৌড় মারতে গেলে পেছন থেকে আঁচল চেপে ধরে কাছে টেনে আনে আহসান মিয়া। কানে কানে কি যেন বলে। মেয়েটা ফণা তুলে কৃত্রিম ক্রোধ দেখিয়ে বলে, 'ওলাউঠা!'

হাহা করে বিকট হাসে আহসান মোড়ল।

জোলারা তাঁত বন্ধ করে মুখহাত ধুয়ে এসে দাম নিয়ে চলে যায়।

মিয়া ফিরে এসে বলে, 'আজ্ঞ বাবা তোমার যাওয়া হচ্ছে না। কাঠুরে সাধু মল্লিকের কাছে তোমার কথা শুনিছি।'

'সেই আপনার নাম বলে দিয়েছিল। আর রহিম জোলার কাছে আপনার কথা শুনেছি।'

'কোন রহিম জোলা?'

'যার মেয়ের নাম হাসিনা। পরীর মতন দেখতে! মেয়েটা নাকি আপনাকে চড় মেরে-ছিল?'

হারিকেনের আলোয় মুখখানা আহসান মিয়ার হঠাৎ ঝুলে গেল। গোল হয়ে গেল চাকার মতন। চকচকে টাকের ওপরে তার লকলক করছে যেন প্রজাপতির শুঁড়ের মতন দু'গাছা কালো বাঁকা চুল।

বললে, 'হাঁ। চড় মেরেছিল।! মেয়েটা সোনার পিদিম। পিদিমের শিখা! আমাকে পুড়িয়ে মেরে ফেললে!'

'গরিবের মেয়ে। আপনার নাতনির বয়সী। আপনি চাইলেও সে যদি না চায়? তা ছাড়া আপনার ছেলেমেয়ে রয়েছে।'

'কিন্তু লেখক-বাবাজী, মানুষের চরিত্র বড় বিচিত্র। কেউ তার ভেতরের কথা, সব কথা জানে না। কেউ বলেও না। কিন্তু আমি বলছি, আমার গায়ে যত লোম আছে তত নারীদেহ উপভোগ করেছি আমি। আমি পাপিষ্ঠ, দোজখের শেষ ঘরটা আমার। তবু হাসিনাকে আমার চাই। সে বাঘের মুখে চড় মেরেছে!' জন্তুর মতন সে, যেন একবার আড়মোড়া মারলে শরীরের।

অন্ধকার কলকাতার 'নাইট' বন্ধুবর হেমন্ত পোদ্দার আমাকে একবার 'ভানু-মতীর খেল' নামে একখানা বই দিয়েছিল। সে ধনী ব্যবসায়ীর দুলাল, উচ্চশিক্ষিত হয়েও ঐ একই কথা শুনিয়েছিল, 'আমার দেহে যত লোম আছে তত সুন্দরী

উপভোগ করেছি।'

তাই অবাক হলাম না। বিত্ত থাকলেই চিত্ত রসাসিক্ত হয়।

রাতের খানা এল। সীতাশাল চালের ভাত। ডিমের মামলেট, ভেটকি মাছের তরকারী, মুরগির তরকারী, মাছ ভাজা, চিংড়ি মাছের মালাইকারী। শেষে দই মিণ্টি! এত সব খেয়ে শরীরের পোণ্টাই করলে, মেদমজ্জার ভার কমাবার জন্যে যদি শরীর বেচারা উতলা হয় তো তার দোষ কি!

'কত বিঘে সম্পত্তি আপনার?'

লোকে বলে ২০০ বিঘে।'

আসলে?'

'আসলে ছেলে, বউ, আমার নামে ভাগ করা আছে সব।'

'ক'টা বউ?'

একটা। দো'তাড়ি, ফেদাড়ি!'

কেন বিত্ত আছে, মুসলমান লোক, ইন্দ্রিয়পরায়ণ বলে স্বীকার করতেও যখন লজ্জা পেলেন না তখন চারটে সাদি না করা কি উচিত হয়েছে? বাদশারা তো 'মীনা-বাজার' থেকে রোজ সন্ধ্যায় একটা করে 'কুসুম' চয়ন করতেন!...আচ্ছা, আপনি তো বিত্তবান, আপনি কি সুখী?'

না। জগতে কেউ সুখী নয়। টাকা সোনার জন্যে আমার কোনো রাতেই ভাল করে ঘুম হয় না। যখনি ওদের মিছিলের শ্লোগান শুনি, ছাদে উঠে পর পর বন্দুক ফায়ার করে শোনাই। এস শালারা, মদ্দের বাচ্চা হও তো এগিয়ে এস।'

কিছুক্ষণ নীরবতার মধ্যে কাটল। চন্দ্রবোড়া ডাকছে কোথায় করর—কররকর... শব্দে।

'মজলা হাটে আপনার দোকান আছে?'

'হাঁ। দুখানা। গরুর গাড়ি বোঝাই করে পাইকারী আর নিজের মাল নিয়ে যাই। বাখরা থেকে বাসে তুলে নিই।'

'ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখান নি কেন?'

'ওদের কপাল! আচ্ছা, ঘুমোও বাবা। আমি চলে যাই শুতে। রাত্রে কেউ ডাকলে দোর খুলবে না।'

সকালে নাস্তাপানি করার পর তবে ছাড়লে আহসান মিয়া। ফেরার সময় বললে, 'যাবার সময় রহিম মিদ্দের মেয়ে হাসিনাকে বলে যেও বাবা, আহসান মিয়ার বাইরেটা বুড়িয়ে গেছে বটে ভেতরে সে এখনো 'এ্যাক্কেরে' ডালিম-বেদানা। গাছের শেকড়-মূলেই রস, পাতার চাকচিক্যে কি হবে? তাকে বিশ ভরি সোনা দেব, দশ বিঘে জমি দেব, যদি আমার সঙ্গে সাদিতে মত দেয়।'

ইয়ার্কি করে বললাম, 'সে আশা দুরাশা! তাকে আমি এখনি নিয়ে চলে যাচ্ছি, আমার এক বি এ পাশ আত্মীয় ছোকরার সঙ্গে

বিয়ে দিয়ে দেব কথা দিয়েছি। রহিম মিঞা আমার মাসতুতো ভাইয়ের ছেলে হয়।'

আহসান মিয়ার ঠোঁট দুটো রসগোল্লার মতন গোল হয়ে গেল! বললে, 'আই সি!'...

হুগলীর পথে পথে গ্রামে গ্রামে ঘুরছি, মনটা বিষণ্ন—বলে তো এলাম আহসান মিয়া তোমাকে কলা দেখাব, সে তো মিথ্যে, কিন্তু কি করছে শয়তানটা কে জানে! লেখাপড়া জানা ছেলে নেই, থাকলেও সাদিতে সবাই টাকা, ঘড়ি, আংটি, রেডিও, খাট-পালঙ্ক চায়! জন্মনিয়ন্ত্রণ, ভ্রূণ হত্যায় এখন আর পার্লামেন্টারী পাপ নেই কিন্তু কন্যাহন্তার মহম্মদপূর্ব আরবীয় বিধান লাভে এখনো আমরা বঞ্চিত আছি যদিও কন্যাদায়ে মধ্যবিত্ত বাবারা ফতুর হয়ে আমাদের শ্মশানের রাজা করে রেখে গংগাযাত্রা করছেন! কিন্তু রহিমের কি আছে? কাজেই হাসিনা......

বড় জংগল। মনোরঞ্জন দাস তাঁত চালাচ্ছেন। বললেন, 'এই গ্রামেই প্রফুল্ল সেন মশায় ইস্কুল-টিচার ছিলেন। তাঁর একটা কুঁড়েঘর, লাইব্রেরী আছে।...আমরা ধুতি, চাদর, শাড়ি, থান কাপড়, গামছা, মশারি, সব-রকম করি। সমিতির আমি সম্পাদক। মগড়া হাটে আমরা মাল বেচতে যাই। মগড়া হাটের পরেই নবদ্বীপ হাট। সেটা শুক্রবারে বসে। নবদ্বীপের কাছাকাছি হুগলী জেলার চিত্তরঞ্জন, মিলনগড়, শান্তিপুর, রাণাঘাটের তাঁতীরা মাল নিয়ে যায় সেখানে। দরকার হলে কিছু কিছু সরকারী লোন নিতেও পারি। 'ডবি' দিয়ে নতুন নতুন ডিজাইন করছি আমরা। নকসা করে 'গ্রাফে' তুলে বুনতে হয়। ১০০—১২৫ সানায় শাড়ি বোনা হচ্ছে এসব। কোহার সানা, ডবি, জ্যাকার্ড, জালা এই সব নিয়ে তাঁতের কারবার। শান্তিপুরে, সমুদ্রগড়ের শিল্পীদের চাইতেও এখানে নকসার কাজ ভাল হচ্ছে 'ডবি' আর 'গ্রাফে'। ১০০ থেকে ১৫০ টাকা মাসে উপায় করে তাঁতীরা। কারো ভাল করে সংসার চলে না। আমার পাঁচজন লোক সংসারে। সবায়ের পাঁচ সাতজন করে লোক। হুগলীর মাটি ভাল, দামোদর পরিকল্পনার জল আসছে, তাইচুং, আলু, পিঁয়াজ, শাকপাত ভাল হচ্ছে। তবু সমস্যা হল মিলের কাপড়ে বাজার ছেয়ে গেছে। তবে এটা ঠিক ধনেখালি ইত্যাদির তাঁতের শাড়ি আজ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা পরছেন বেশি। বাবুরা খদ্দর পরছেন, টাঙ্গাইল, ফরাসডাঙার তাঁতের ধুতি পরছেন। ভাল একখানা খাদি ধুতির দাম ৮০ টাকাও আছে বাবু। তা ছাড়া ৭৫—১০০—১৫০ ২০০—২৫০ টাকা দামের শাড়ি আছে। মুর্শিদাবাদের সিল্ক, আংটির মধ্যে শাড়ির একটা কোণ ঢুকিয়ে দিয়ে হড়হড় করে টেনে বার করে নিন, খাঁটি মাল হলে আটকাবে না। ঢাকাই মসলিন, জামদানী, টাঙ্গাইল, গঙ্গাজলী, নীলাম্বরী, শান্তিপুরী, বেনারসী, ভেঙ্কটগিরী, চান্দেরী, পায়রা খোপা, ময়ূর পেখম, ময়ূর চশম, বালুচরী—কত রকমের শাড়ি আছে। জরি সাচ্চার কাজ হয়। সোনার পাড় হয়, ফুল হয়। নানা গাঁয়ে নানান শিল্পীরা ছড়িয়ে আছেন—সমবেত হয়ে যদি একটি সংস্থায় কাজ করতেন অনেকের গুণপনা কাজে লাগত। শুধু নকসার কাজ জানলেই হবে না, কত দামের কাপড়ে কত মজুরির নকসা তুলতে হবে সে হিসেবও জানা চাই। নকসারও অনেক রকম নাম আছে। কল্কা, বাটি, চিত্রা, ভারতী, গোলকধাঁধা, কুকুর-ছুঁড়ি, বিন্তি, পেখম, জংলা, ঝরণা—নানা জায়গায় নানা নাম। আগে মাল ভাল ছিল, নকসা ছিল সাধারণ। এখন সাধারণ কাপড়ও অসাধারণ ভাল নকসা হচ্ছে। আর্টিস্ট সংলগ্ন হয়েছে।'

সহজ সরল সাদা মানুষ, কর্মব্যস্ত মনোরঞ্জন দাসের কাছ থেকে আরামবাগ তারকেশ্বর ঘুরে শ্রীরামপুরে ফিরে এলাম। তাঁতীদের বাড়ি বাড়ি ঘুরলাম। পথে এক তাঁতীর বাড়ির ছেলে, চশমা চোখে, ধুতি পাঞ্জাবি পরা, বি-এ, বি টি ইস্কুল মাস্টার, 'দেশ' পত্রিকার রীতিমতো গুণগ্রাহী পাঠকের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। রাতের অতিথি হতে বাধ্য হলাম তাঁর।

ভাইবোন, মা-বাবা সকলের সঙ্গে আলাপ করে দিলেন মাস্টারমশায়। বৃদ্ধ বাবার চোখে পুরু কাঁচের ভারী পাওয়ারের চশমা। অমূল্য দাস নাম। মাটির দেওয়াল, টিনের বাড়ি। গোয়ালে গরু, খামারে খড়ের গাদা। রাত্রে অনেকক্ষণ গল্প করলেন বৃদ্ধ হুঁকোয় তামাক টানতে টানতে। বললেন, গোড়ায় গলদ বাবা, মাল খারাপ পাই। সুতো খারাপ। তাঁতীদের দোষ দিলে কি হবে! আমার বাবার একখানা জামদানী পশমের শাল আছে, দশ টাকায় কেনা ছিল। এখন দু'শো টাকাতেও সে মাল পাওয়া যাবে না। তবে সূঁচের কাজ, নকশার কাজ সেকালের চাইতে আমার বড় মেয়ে সেলাই এখন ঢের ভাল পারে। ও যে আর্টিস্ট, ছবি আঁকতে পারে। বি-এ পাশ করেছে। তিনটে মেয়ে বাবা, কি করে পার করব ভাবনায় আছি। ছেলে মহেন্দ্রর বিয়ে দিয়ে যা পাই তাই দিয়ে রমলাকে পার করব ভেবেছিলাম, কিন্তু বিধি বাম। মহেন্দ্র 'লাভ-ম্যারেজ' করে আনলে কলকাতা শহর থেকে! কিছু পেলেও না। শিকারী মেয়ে। এ সব কথা যেন আবার মনাকে বল না বাবা! দোহাই তোমার।'

রমলা এল। বেশ শান্ত গম্ভীর মেয়ে। কম কথা বলে। বৃদ্ধ বললেন, 'বসো মা, আলাপ করো।'

রমলা বসল। মাথা হেঁট করে কাপড়ের পাড় কুঁচোতে লাগল।

বললাম, 'তুমি একটা মাস্টারী পাচ্ছ না?'

'আজ্ঞে না। দেখছি।'

শিয়াল ডাকছে দূরে। বৃদ্ধ বললেন, 'যাই বাবা, তাঁতে বসে সারাদিন গতরটা ধরে গেছে, একটু লম্বা হই গিয়ে।' হেসে সবিনয়ে তিনি যেন বিদায় প্রার্থনা করলেন।

মহেন্দ্রবাবু এলেন। বললেন, 'তাঁত-শিল্পীরা সব মরে গেল। এই বাংলার তাঁতীরা একদিন এমন ঢাকাই মসলিন তৈরি করত যে, একখানা শাড়ি নাকি একটা নস্যকের মধ্যে ঢোকানো যেত। শিশিরে ঘাসের ওপরে বিছিয়ে দিলে সকালে দেখা যেত না। বাদশা আওরংগজেবের কন্যা জেবুন্নিসা নাকি একবার বালিকা বেলায় সাত পরদা ঢাকাই মসলিনের পোশাক পরে দরবারে আসতে বাদশা মেয়েকে নগ্ন দেখে হারেমে গিয়ে পোশাক পরে আসতে বলেছিলেন?'

আমি হাসলাম। নাইলন টেরেলিনও তো তাই হয়েছে। কিন্তু সেগুলো তো মিলের। লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যাপার।

শ্রীরামপুর থেকে ফিরে এসে শুনলাম বুখে গোপালপুরের রহিম জোলার মেয়ে হাসিনার সংগে আহসান মিয়ার সাদি পড়ানো হয়েছে! জমি আর সোনার লোভে রহিম জোলা নাকি শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেছে! রাজি না হলে তাকে কেটেই ফেলে দিত আহসান মিয়া। হাসিনা খুব কান্নাকাটি করেছে। বলেছে, 'আমি গলায় দড়ি দেব।' খবর এনেছে একটা চুড়িওলী মেয়ে।

পাকা লাল জোনাফলটা দাঁড়কাকেই যখন খাবে তখন ঢিল ছুঁড়তে গিয়ে বুক উদোম করে ফেলে লজ্জা পেয়ে হাসিনার পালানোর মধ্যে আজ আর কোনো কাব্যই খুঁজে পেলাম না। মনে হল দাঁড়কাকটা হাসিনার নাকের মধ্যে ঠোঁট ঢুকিয়ে দিয়ে তার মগজ টেনে বার করে করে খাচ্ছে। খাবেই তো। জীবনটা তো উপন্যাস নয়!

—আবদুল জব্বার

(বাংলার চালচিত্র পর্যায়ের রচনা এখানেই শেষ হল।)

যে মুখখানির দিকে
সবাই তাকিয়ে আছে
তিনিই বলবেন

কারণটা :

হেজলীন স্নো

হেজলীন স্নো-র মোলায়েম হাল্কা পরশ সেরা বিউটি ক্রীমেরই মতন।
আপনার মুখখানিকে দিব্যি সুন্দর নিটোল লাবণ্যে ভ'রে দেয়।
অপরূপ তরুণ কোমল কান্তিতে আপনার মুখখানি নির্মল হয়ে ওঠে।
ছোটোখাটো দাগ অতি অনায়াসে ঢাকা পড়ে যায়...আপনার মুখে
ফুটে ওঠে এক স্নিগ্ধ কমনীয় আভা।
আজই আপনার হেজলীন স্নো-র সঙ্গে পরিচয় হোক...দিনের পর দিন
সে পরিচয়ের সার্থকতা আপনার মুখখানিকে ফুলের মত সহজ
সুন্দর ক'রে তুলবে।

হেজলীন স্নো-তরুণের স্বপ্নমাখানো স্বাভাবিক কান্তির উৎস

১৯৪৯ সালে দামোদর উপত্যকা প্রকল্প প্রায় ৭২০০ বর্গমাইল জুড়ে একটি বিস্তৃত অঞ্চলের মাটির অবক্ষয় রোধের কাজ শুরু করেছিল। উদ্দেশ্য, উত্তর দামোদরের বুকে মাটির উর্বরা শক্তি বাড়ান, তার বুকে সবুজের জোয়ার সৃষ্টি করা। সে চেষ্টা আজ সাফল্যের দ্বার প্রান্তে। ছবিতে দেউচাঁদ গবেষণা কেন্দ্রের এক খণ্ড জমিতে কেমন সব্জী কুমড়ো ভীড় করে রয়েছে, লক্ষ করুন। এই গবেষণা কেন্দ্রের প্রায় ৩৫৫ একর জমির সর্বত্রই এ ই একই দৃশ্য। অথচ কয়েক বছর আগেও এখানকার মাটির বুক থেকে উঠত মুষ্টির শ্বাস খাদ্যশস্য তো দূরের কথা, সেহাং বনজ জঙ্গাল গাছও এখানে জন্মাতে সাহ স পেত না। দামোদর প্রকল্প ইতিমধ্যে বহু পতিত জমি উদ্ধারের সহায়তা করেছে

হাড় জোড়া

ঠিকানা : দি অর্থোপেডিক অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন ইনস্টিটিউট অব্ দি পোজনান মেডিকেল অ্যাকাডেমি, পোল্যান্ড। আকস্মিক দুর্ঘটনায় যদি কারুর হাড়ে চিড় ধরে অথবা জটিল রোগের দরুন হাড়ের কোন অংশ ক্ষয়ে গিয়ে কমজোর হয়ে যায়, তাহলে এই ঠিকানায় খোঁজ নিয়ে একবার দেখতে পারেন। বর্তমানে পৃথিবীর এটাই একমাত্র স্বাস্থ্যকেন্দ্র যেখানে বিশেষ এক পদ্ধতিতে অস্থি-কোষ প্রতিস্থাপিত করে ঐ ধরনের রোগ নিরাময় হয়ে থাকে এবং এর ফলে কারুরই পঙ্গু হয়ে যাওয়ার কোন আশঙ্কা থাকে না। সম্প্রতি এই খবরটি সরবরাহ করেছেন 'পোলিশ ফ্যাক্টস অন্ ফাইল' নামে একটি সাময়িক পত্রিকা।

বস্তুত হঠাৎ কোন কঠিন বস্তুর আঘাতে দেহের হাড় দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাওয়া এমন কোন আশ্চর্য ঘটনা নয়। এই আঘাতে হাড়ের খানিকটা অংশ হয়ত থেঁতলে যেতে পারে, অথবা গুঁড়িয়ে কুচি কুচি হয়ে মূল প্রত্যঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্নও হয়ে যেতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে হাড়ের মধ্যে চিড় খাওয়াটা অসম্ভব নয়। শারীরিক কোন অসুস্থতার দরুন অথবা ক্ষতিকর কোন বীজাণুর আক্রমণে অনেক সময় হাড়ের কোষ-কলা নষ্ট হয়ে যায়। তখন হাড়ের কিছু অংশ ক্ষয়ে গিয়ে অবশিষ্ট অংশ দুর্বল হয়ে পড়ে। এ ছাড়াও বীজাণুর দংশন ক্রমে অন্যত্রও ছড়িয়ে থাকার আশঙ্কা থাকে। তখন প্রচলিত ওষুধপত্র তেমন কোন সুরাহা করতে পারে না। এ ব্যাপারে দেহের অবশিষ্ট অংশকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচান অথবা দৈহিক কষ্ট লাঘব করার ব্যাপারে এ পর্যন্ত একটাই পথ খোলা ছিল। সেটা হল, রোগীর হাড়ের আক্রান্ত অংশটিকে কেটে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। কারণ দেহের পেশী বা অন্যান্য অংশ কেটে বা ছড়ে গেলে সেখানে আবার নতুন কোষ সৃষ্ট হয়ে যেমন কাটা বা ছড়া অংশ জুড়ে যায়, হাড়ের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু ঘটে না। হাড়ের কোন অংশের কোষ যদি একবার নষ্ট হয়ে যায়, সেখানে নতুন করে আর হাড়ের-কোষ জন্মায় না। পোল্যান্ডের বিশেষজ্ঞরা যে পদ্ধতিটি কাজে লাগাচ্ছেন তার সার কথা : এঁরা রোগীর দেহেরই হাড়ের অন্য কোন অংশ থেকে খানিকটা হাড়ের কোষ-কলা বা টিস্যু তুলে নিয়ে আক্রান্ত অংশে প্রতিস্থাপিত করে চিড় খাওয়া বা ক্ষয়ে যাওয়া অংশকে জুড়ে দেবেন। প্রয়োজন হলে তাঁরা অন্য কোন লোকের দেহ থেকেও প্রয়োজনীয় কোষ-কলা সংগ্রহ করে কাজে লাগাতে পারবেন।

প্রথম দিক রোগীর নিজস্ব দেহ কোষকেই কাজে লাগান হচ্ছিল। পরে দেখা গেল, অনেক সময় অনিবার্য কারণে রোগীর দেহ থেকে হাড়ের কোষ-কলা সংগ্রহ সম্ভব হয়ে ওঠে না। বর্তমানে ওয়ারসা মেডিকেল অ্যাকাডেমিতে নিয়মিত মানুষের হাড়ের কোষ-কলা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর জন্যে তাঁরা সদ্য মৃত ব্যক্তির হাড়ই কাজে লাগিয়ে থাকেন। সংগৃহীত হাড় প্রথমে অত্যন্ত ঠাণ্ডা করে জমাট বাঁধিয়ে নেওয়া হয়। তারপর বায়ুশূন্য পাত্রে নিয়ে গিয়ে পুরোপুরি জলশূন্য করে সইয়েকের পরমাণু গবেষণাগারে গামা রশ্মির বিকিরণ দিয়ে বিশোধিত করা হয়। প্রয়োজন মত এই হাড়ের কোষ প্রতিস্থাপিত করার পর রোগ সংক্রামণের কোন আশংকা থাকে না।

ইতিমধ্যে পোজনান অর্থোপেডি অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন ইনস্টিটিউটের চিকিৎকরা বেশ কিছু সংখ্যক রোগীর দেহে হাড়ের-কোষ জুড়ে অভূতপূর্ব সুফল লাভ করেছেন। এবং বেশীর ভাগ রোগীকে তাঁরা সারিয়ে তুলেছেন। দুই একটি ক্ষেত্রে সামান্য বিকলাঙ্গ ভাব থেকে গেছে। তবে তেমন মারাত্মক ধরনের কিছু নয়। দেহে অস্থি-কোষ প্রতিস্থাপন না করলে হয়ত এদের কারুর হাত অথবা পাই পুরোপুরি কেটে বাদ দিয়ে দিতে হত। তখন কৃত্রিম ব্যবস্থা নিয়ে কাজ চালান ছাড়া আর কোন উপায় থাকত না। তাতে অসুবিধেও হত অনেক বেশী। উল্লেখ্য, এ ধরনের অস্থি-কোষ প্রতিস্থাপনের ব্যাপারে পোলিশ চিকিৎসকরাই বর্তমানে একমাত্র পথিকৃৎ।

নতুন শিল্প উদ্যোগ/ভারত

নতুন শিল্প রূপায়ন এবং তাদের উত্তোরত্তর সাফল্যে ভারত ক্রমেই স্বয়ং-সম্পূর্ণ হয়ে উঠছে। বিগত দশক পর্যন্ত বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান বিদেশী কুশলী, কাঁচা মাল এবং অনুদানের উপর যতটা নির্ভর করে ছিল, আশা করা যায়, বর্তমান দশকের গোড়া থেকেই ততটা আর নির্ভর করতে হবে না। ভারী শিল্প থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠান, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা, প্রভৃতিতে যাঁরা প্রধান কুশলী রূপে কাজ করবেন তাঁদের বেশীর ভাগই ভারতীয়। ভারতীয় কাঁচা মাল আরও বেশি পরিমাণে কাজে লাগিয়ে উৎপাদন বাড়ান

হবে। কোন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান বিদেশ থেকে আমদানী করা যন্ত্রপাতির কথাও আর ভাবতে চান না। এ'দের বক্তব্য, আমাদের দেশেই যে সমস্ত কুশলী রয়েছেন এবং যা কাঁচা মাল পাওয়া যায় তাদের যথাযথ কাজে লাগাতে পারলে এবং নিয়মমাফিক পরিকল্পনা মত যদি নতুন শিল্পোদ্যোগগুলি রূপায়িত করা যায়, তাহলে দেশের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বস্তুর উৎপাদন বাড়ান মোটেই শক্ত হবে না।

ঠিক এই নিয়মমাফিক পরিকল্পনা নিয়ে সম্প্রতি একটি নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান মাদ্রাজের অনতিদূরে গড়ে উঠতে চলেছে। গড়ে উঠছে একেবারে মাদ্রাজ তৈল শোধনাগারের পাশাপাশি। নাম নাগপাল অম্বরী পেট্রো-কেম রিফাইনিং লিমিটেড। সর্বসাধারণের এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের ব্যাপারে সাহায্য করেছেন তামিলনাড়ু সরকার। এখানকার কারখানায় তৈরি করা হবে ট্রান্সফরমারের তেল। এবং আরও আড়াই শরও বেশী খনিজ তৈলজাত সামগ্রী। আপাতত কাঁচা মাল হিসেবে এ'দের দরকার পেট্রোলিয়াম বিশোধনের

সময় যে অতিরিক্ত উপসামগ্রী পাওয়া যায়, তাই। মাদ্রাজ তৈল শোধনাগার এই বস্তুটি এ'দের নিয়মিত সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং বছরে এর পরিমাণ দাঁড়াবে ৩১০০০ মেট্রিক টন। একমাত্র যে বস্তুটি এ'দের আমদানী করতে হবে সেটা হল বিশেষ এক ধরনের মোম। মার্কিন দেশের একটি প্রতিষ্ঠান থেকে এটি এ'রা সংগ্রহ করবেন। তবে ভবিষ্যতে হলদিয়ার তৈল শোধনাগারের কাজ শুরু হয়ে যাওয়ার পর হয়ত আর আমদানী করতে হবে না। মাদ্রাজ শোধনাগারের পাশে এই কারখানাটি তৈরি হওয়ায় সহজেই তাঁরা সেখানকার কাঁচামাল সংগ্রহ করে নিতে পারবেন। এবং অনেক কম খরচে। সম্পূর্ণ দেশজ সামগ্রী নিয়ে এ'রাই সর্বপ্রথম এদেশে 'হোয়াইট অয়েল' উৎপাদনে হাত দিলেন।

বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারের কার্যকারিতা অক্ষুন্ন রাখার জন্যে এদেশে বিশেষ এক ধরনের তেলের চাহিদা দিন দিন দারুন ভাবে বেড়ে যাচ্ছে। অথচ এর আগে এই মূল্যবান সামগ্রীটির বেশির ভাগই আমাদের বিদেশ থেকে চড়া দামে কিনে আনতে হত। এ ছাড়া উচ্চ পর্যায়ের বিশোধিত হোয়াইট অয়েল-এর চাহিদা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে প্রসাধন সামগ্রী, সাবান, শস্যপালন বিষয়ক সামগ্রী প্রভৃতি তৈরি করার জন্যে। বস্ত্রশিল্প, প্লাস্টিক এবং [illegible] দরকারী [illegible] ব্যবহারের মত প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্যেও বিশেষ ধরনের এই তেলটির ভূমিকা অপরিহার্য। মাদ্রাজ তৈল শোধনাগারের সহযোগিতায় সহজেই এই বস্তুটি সংগ্রহ করা যাবে।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নতুন এই শিল্প সংস্থার মুখ্য পরিচালক শ্রী এস আর [illegible] আমাকে বলেন, তিনটি বিষয়ের উপর তাঁরা সব চাইতে বেশি জোর দিয়েছেন। এক, দেশের পেট্রোলিয়ামজাত উপসামগ্রীগুলি তাঁরা যতটা সম্ভব বেশি কাজে লাগাবেন। দুই, বিদেশী দ্রব্যের আমদানীর উপর নির্ভর করবেন না। তিন, দেশে সাবান, বিভিন্ন ধরনের প্রসাধন দ্রব্য প্রভৃতির উৎকর্ষ বৃদ্ধির ব্যাপারে এঁদের প্রচেষ্টা যথেষ্ট সহায়ক হবে।

একটি সার্থক প্রচেষ্টা

শীতকালে পশমী জামা কাপড় অনেকেই পরে থাকেন। এই পশম বা 'উল' সাধারণত ভেড়া বা অনুরূপ কোন জন্তুর লোম থেকেই তৈরি করা হয়। ইদানিং পলি-এস্টার গোত্রীয় বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির দেওয়া লোমের কদর যেন অনেকটা কমে গেছে। হাজারো কৃত্রিম-পশমী কাপড়ে আজ পৃথিবীর হাটবাজার জম জমাট। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এরা দামে শস্তা অথচ সর্ব-সাধারণের রুচি এবং প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট।

কিন্তু 'উল' বলতে শুধু জামা কাপড় তৈরির 'উল'কেই বোঝায় না। শিল্প ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যাপারে আরও নানা রকমের 'উল' ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উদাহরণ 'গ্লাস উল'। ঠিক যে যে সামগ্রী থেকে কাচ তৈরি করা হয়, তাদের দিয়েই তৈরি করা হয় এই 'গ্লাস উল'। সম্পূর্ণ কাচের তৈরি অত্যন্ত হাল্কা অথচ পশমের মত নরম এই পদার্থটি দেখলে যেন ভাবাই যায় না, ধারাল, ভঙ্গুর এবং কঠিন কোন বস্তু দিয়ে এটি তৈরি হয়েছে।' দেখতে ঠিক বন বন মিঠাই-এর মত। সেই মিঠাই যা তুলোর মত নরম, ফিরিওয়ালারা বাক্সের মধ্যে পুরে দুই অথবা তিন পয়সায় বাচ্চাদের কাছে বিক্রি করে। দেখতে এক একটি বড় সড় তুলোর বলের মত। অথচ মুখে দিলেই যা নিমেষে চুপসে ছোট হয়ে যায়।

সাধারণত তাপ, চাপ, জলীয় বাষ্প এবং শব্দ রোধক হিসেবে 'গ্লাস উল' এর চাহিদা আমাদের দেশে দিন দিন বেড়েই চলেছে। তবে চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন এখনও কম।

এবার আর এক ধরনের 'উল' উৎপাদনের কাজ শুরু করে দিয়েছেন দুর্গাপুরের 'পিবকো'। নতুন এই পশমী বস্তুর নাম স্ল্যাগ উল। লোহা বা ইস্পাত তৈরি করার সময় প্রচুর পরিমাণ স্ল্যাগ বা ধাতুমল বেরিয়ে আসে। দীর্ঘকাল এই স্ল্যাগ লোহা বা ইস্পাত কারখানাগুলির কাছে একটা বিরাট সমস্যা রূপে পরিগণিত ছিল। জামশেদপুর, দুর্গাপুর প্রভৃতি অঞ্চলে গেলেই দেখা যাবে দৈনিক হাজার হাজার টন স্ল্যাগ ব্লাস্ট ফার্নেস থেকে বেরিয়ে আসছে। দিনের পর দিন সেই স্ল্যাগ জমতে জমতে তৈরি হয়ে গেছে এক একটি স্তূপে স্তূপে পাহাড়। কয়েক বছর আগেও এর প্রায় অব্যবহার্য রূপেই জমা থাকত।

সম্প্রতি স্ল্যাগ দিয়ে কিছু কিছু রাস্তা মেরামতের কাজ করা হচ্ছে। সাধারণ পাথরের পরিবর্তে স্ল্যাগের পাথর ব্যবহার করে পথঘাট তৈরির ব্যাপারে ভাল ফলাফলও পাওয়া গেছে। কোন কোন সিমেন্ট তৈরির কারখানাও সিমেন্টের কাঁচামাল হিসেবে স্ল্যাগকে কাজে লাগাচ্ছিলেন। এবার দুর্গাপুরের 'পিবকো' দীর্ঘকালের এই আবর্জনা বস্তুটিকে ব্যবহার করতে শুরু করে দিয়েছেন 'স্ল্যাগ উল' তৈরির কাজে।

দুর্গাপুরের 'পিবকো' দেখে এলাম। 'দুর্গাপুর স্টীল প্লান্ট'-এর সামান্য দূরে দামোদরের বাঁধটির কাছ বরাবর ভারতে এই প্রথম তৈরি হয়েছে 'স্ল্যাগ উল' তৈরির কারখানা। কারখানার প্রায় সমস্ত যন্ত্রপাতিই তৈরি করেছেন দেশীয় কুশলী। যন্ত্রপাতি তৈরির কাঁচা মালও সংগৃহীত হয়েছে এদেশ থেকেই। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে দ্রুত লয়ে এখানকার সমস্ত কাজ যেন চোখের নিমেষে শেষ হয়ে যাচ্ছে। দুর্গাপুর স্টিল থেকে এ'রা ছয় টাকা টন দরে কিনছেন স্ল্যাগ। সেই স্ল্যাগ বয়ে নিয়ে আসার খরচ পড়ছে টন-প্রতি মাত্র চোদ্দ টাকা। কাঁচা মাল হিসেবে আর দরকার ফ্লুরোস্পার, চুন, কোক এবং টুকিটাকি অন্যান্য সামগ্রী। চুল্লির মধ্যে এই সমস্ত পদার্থ ভরে নিয়ে প্রায় ছ শ' ডিগ্রী ফারেন-হাইট পর্যন্ত গরম করা হচ্ছে। তারপরই দেখলাম কিছুক্ষণের মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সুতোর মত সামগ্রী কনভেয়ারে চড়ে ঢুকছে আরও একটি ফারনেসে। এখানে সেই সুতোর সঙ্গে মেশান হয় রেজিন। এক প্রান্ত দিয়ে মাপমত কেটে বেরিয়ে আসছে 'স্ল্যাগ উল'-এর গালিচা। দেখতে ঠিক যেন ডানলোপিলো রবারের প্যাডের মত। অত্যন্ত নরম এবং হাল্কা। এই হল স্ল্যাগ উল-এর অন্যতম পণ্যদ্রব্য। ভারতের শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা, শব্দরোধী ঘরবাড়ি অথবা বরফ তৈরির কারখানার কাজে এদের প্রয়োজন আজ যথেষ্ট।

পিবকো ঐ 'মূল্যহীন' স্ল্যাগ থেকে

আরও বিভিন্ন ধরনের বস্তু উৎপাদনে হাত দিয়েছেন। এদের মধ্যে প্রধান, সাধারণ জ্যাগের পণম। হিমঘরের জন্যে এটি ব্যবহৃত হবে। গ্যাস-পৃথকীকরণ কারখানা-গুলিতে এদের চাহিদা যথেষ্ট। এ ছাড়াও চুল্লী বা বিভিন্ন ধরনের 'বার্নার' এর প্রলেপও তৈরি করছেন এ'রা। এই প্রলেপ উচ্চ তাপ প্রতিরোধে সাহায্য করবে। যন্ত্রপাতি নির্মাণের ব্যাপারে এ'রা দুর্গাপুরের কেন্দ্রীয় প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণাগারের সঙ্গেও নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলছেন। ফলে নতুন যন্ত্রপাতি তৈরির জন্যে এ'দের আর বিদেশের মুখাপেক্ষী হতে হবে না। সেপ্টেম্বর ১৯৬৯-এ কারখানাটি কাজ শুরু করেছে। প্রাথমিক ব্যয় নির্বাহের জন্যে যে খরচ হয়েছে তার চল্লিশ লক্ষ টাকা এ'রা সংগ্রহ করেছেন 'কুল ফান্ড' থেকে। 'কুল ফান্ড' মার্কিনী পি-এল ৪৮০ অন্তর্ভুক্ত একটি তহবিল। ভবিষ্যতে এই কারখানা প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে পারবে।

সমরজিৎ কর

এ এক নতুন দেশ

পোল দ্রায়ফ্যুসের ভারত ভ্রমণের কাল নেহরু-আমলের শেষ পর্যায়। দেশে ফিরে তিনি লেখেন, 'ভারত আরেক গ্রহের নাম'। গ্রন্থটি তথ্যভিত্তিক, নকশা-ধর্মী, সংক্ষিপ্ত, মনোরম।

"ভারতে চলেছি আমি, দেখব শুনব, স্বচক্ষে স্বকর্ণে, কোনো আগাম ধারণার বালাই রাখব না।" নিজের মনেই সিদ্ধান্ত নেন দ্রায়ফ্যুস। ভারতে আসছেন তিনি—সেই ভারত, আন্তর্জাতিক দরবারে যে এক অভূতপূর্ব খ্যাতির অধিকারী তখন; যেহেতু অহিংসা-নীতি ও উপনিবেশিকতা-অবসানের সৌহার্দপূর্ণ পদ্ধতির উদ্ভাবনে, প্রাচী ও প্রতীচীর মধ্যে নিরপেক্ষ অবস্থানে। এই ভারতকে তিনি দেখতে ও দেখাতে চান তার সম্বন্ধে লোকের যা ধারণা, সেভাবে নয়; লেখক তাকে যেভাবে দেখতে ভালোবাসে, সেভাবে নয়; অতীতের ঐতিহ্যকে যে-চোখে দেখে এসেছে, যে রূপরেখায় কল্পনা করে তার ভবিষ্যৎ, সেভাবেও নয়। বাদ দিতে চান পদে পদে প্রতিতুলনার বদভ্যাস, যুক্তিধারার পরিপন্থী বলে; ছেঁটে নিতে চান পাণ্ডিত্যও অতি-স্ফীতি, ক্যামেরার লেন্সের স্বচ্ছ দৃষ্টি যার দরুন কলুষিত হয়; সর্বোপরি এড়িয়ে যেতে চান ফরাসি-সুলভ চাঁচাছোলা স্পষ্টভাষিতা—কারণ ভারতীয় সত্তা অধিকাংশত বিবৃতি-প্রতিবর্তির আলো-আঁধারেই ফুটে ওঠে।

প্রায় গোড়াতেই, অন্য অনেকের মতো, যা চোখে পড়ে তাঁর, তা হল এদেশের মানুষের সময়-উদাসীন মনোভাব। কর্মরত লোকদের উদ্দেশে তাঁর বলতে ইচ্ছে হয় : ওভাবে নয়, এভাবে করুন কাজটা, সময় বাঁচবে। কিন্তু কার মাথাব্যথা সময় নিয়ে? য়ুরোপে তো এক ঘণ্টা মানে ষাট মিনিট, এক মিনিট মানে ষাট সেকেন্ড। এখানে? কে জানে…

তিনি উপলব্ধি করেন ভারতীয়দের বহু প্রশংসিত চরিত্রলক্ষণ—স্বভাবমাধুর্য ও শীলিত রুচি, বুদ্ধি ও সৌজন্য, দয়ার্দ্রতা ও শিল্পবোধ। আর ভালো লাগে ঈর্ষার অভাব : ভারতীয় মানসে মাৎসর্য আশ্চর্যভাবে অনুপস্থিত। এই যে এতগুলি মানুষ সর্বতোভাবে মেনে নিয়েছে নিজেদের

গোলক ধাঁধা

দুর্দশা, আর তবু অতিথির জন্য রেখে দেয় উদার হাসিময় আমন্ত্রণ—দেখে তিনি অনুভব করেন সহানুভূতি ও বন্ধুতার স্বতোৎসার। য়ুনিয়ন-কর্মী, ছাত্র ও কারুশিল্পীদের স্বদেশের জন্য শ্রমপ্রয়াস তাঁকে মুগ্ধ করে। শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সেইসব লেখক ও দার্শনিকের উদ্দেশে, যাঁদের অভিঘাত দেশের সীমা ছাড়িয়ে সাগরপারেও পৌঁছেছে। আর এদিকে অবিরাম দেখাশোনা, মেলামেশা ও অসংখ্য সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃবোধের আস্বাদও তিনি লাভ করেন। শুধু চোখে ঠেকে ভারতীয় চেহারার স্বাস্থ্যম্লানতা : অন্য জাতের চেয়ে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে এরা দীন বড়ো, উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে আশু ক্লান্ত, নিস্তেজ, মন্থর।

অবশ্য ভারতীয়দের মধ্যে অনশন-উপবাস খুব চালু। অনশন? তার মানে তো খাদ্য-বর্জন? তার মানে, খাদ্য এদের আছে?…খটকা লাগে দ্র্যায়ফ্যুসের। খটকা লাগে আরো নানা ব্যাপারে। সিদ্ধান্তে আসেন : এদেশের কোনো কিছু পুরোপুরি বুঝে ওঠা সম্ভব নয়।

তাঁর ধারণা ছিল, ভারতের লোকের আহার্য হল ভাত—আর তার সংগে মশলার ঝোল। দেখেশুনে 'ভুল' শুধরোন : ঐ মশলার ঝোলটাই আসল, আর ভাতটা সাহায্যকারী উপখাদ্য। এদেশের খানা-পিনার সংগে ভাবসাব জমেনি তাঁর; কৌতুক-মেশানো নিন্দের সুরে বলেন, "যকৃৎ, অন্ত্র, পাকস্থলী—এগুলোর বালাই যদি না থাকে আর মুখের ভেতরটা যদি হয় ইস্পাতে মোড়া, তবে হ্যাঁ, য়ুরোপীয়েরা এদেশের খাদ্য খেয়ে উচ্চণ্ড ঔদরিক তৃপ্তি লাভ করতে পারবে বটে। আপত্তি শুধু এই, বৈচিত্র্যের বড় অভাব : জ্বলন্ত অংগারই বলুন আর জলদঙ্গারই বলুন, গ্রাসে গ্রাসে মনে হয় আগুন গিলছি…" ঝালে সাহেব নাজেহাল।

আবহাওয়ার সংগেও তাঁর খুব বেশি বনিবনা হয়নি—কারণটা মজার। দেশ যখন ছাড়েন, পরামর্শ পেয়েছিলেন : ডিনার-জ্যাকেট লাগবে না ওখানে, শুধু সংগে নিয়ে যেও দুখানা স্যুট, একটা মোটাসোটা, একটা হালকাগোছের। "ফলত, উত্তরাংশে মোটা কোটের ভিতর শীতে কেঁপেছি, আর হালকা স্যুটেও দক্ষিণ ভারতে দরদরিয়ে ঘাম ঝরেছে।"

আর ধর্ম? তত্ত্বের গভীরতা কিংবা তথ্যের বাহুল্য, দুটোকেই এড়িয়ে দ্র্যায়ফ্যুস এক প্রশ্নের ক্রমমালা গাঁথেন : জগতের মধ্যে এরাই কি সবচেয়ে ধর্মপ্রাণ জাত? হ্যাঁ, তা-ই। কুসংস্কারে আচ্ছন্নতম দেশগুলির মধ্যে একটি?—হ্যাঁ, তাও বটে। আর সেইসব কুসংস্কার কি এশিয়া-আফ্রিকা দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য দেশের কুসংস্কার থেকে আলাদা আর অদ্ভুত কিছু?—মোটেই নয়। ধর্মের ক্ষেত্রে এদেশে মুনাফাখোর, হাতুড়ে আর ভণ্ড মুনিঋষির সংখ্যা কি প্রচুর?—যথার্থ। তাহলে প্রকৃত সন্ত?—তাঁরাও আছেন। য়ুরোপের চেয়েও বেশি? আমার তো

তাই ধারণা। আমাদের সন্তের তুলনায় যাঁরা অধিক শক্তিমান, অধিকতর অগ্রণী? তাঁদের জীবন ও রচনা নিয়ে যাঁরা প্রতি-তুলনার কাজে ব্রতী, তাঁরা পর্যন্ত এ ব্যাপারে কৃতনিশ্চয় নন। তবে এসব নিয়ে যাঁরা লেখালেখি করেন, তাঁদের আরেকটু বিশদ ও বিস্তারিত হওয়ার প্রয়োজন আছে।

বস্তুতন্ত্রী দৃষ্টিকোণে

সাধারণ দেখাশোনার পরিসীমা পেরিয়ে দেশের অর্থনীতি রাজনীতির খবরাখবরে মন দেন দ্রায়ফুস। তথ্য-প্রতিতথ্যের টানা-পোড়েনে প্রকৃত অবস্থা নিরূপণের প্রয়াস করেন:

কারুবিদ্যায় পিছিয়ে আছে ভারত অথচ এদেশে কারুবিদের সংখ্যা অন্য কুড়িটা অনুন্নত দেশের চেয়ে বেশি। কল-কারখানা আছে, আফ্রিকা তথা গোটা মধ্যপ্রাচ্যেও ততগুলি নেই।

দুর্দশার ত্রিবিধ কারণ: প্রচণ্ড জন-সংখ্যা, মনুষ্যমান হ্রাস, খাদ্যের অপ্রতুলতা। জনসংখ্যা তো আফ্রিকা আর দক্ষিণ আমেরিকার যোগফলেরও বেশি। প্রতি তিন সেকেণ্ডে একজন ক'রে বাড়ছে। খাদ্যের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ পদ্ধতির ত্রুটির কথা পাড়েন: "শতকরা দশগুণ খাদ্য এরা বাঁচাতে পারত একটা উপায়ে—সুশৃংখল-ভাবে নির্মূষিকীকরণ...।" কর দেয় দশ লক্ষেরও কম। প্রত্যক্ষ করের দুই-তৃতীয়াংশ আসে মাত্রই হাজার পাঁচেক পরিবারের কাছ থেকে।

তাঁকে বিস্মিত করে পরিকল্পনায় অভাব। পরিকল্পনার মূলমন্ত্র—একটি উদ্দেশ্যের ঘাটতি তত নয়, যতটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের রূপায়ণ। এখানে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের ঘাটতি তত নয়, যতটা নির্দিষ্ট তারিখ নিয়েই গোলযোগ...।" লোকসংখ্যায় দ্বিতীয় এই দেশ পরিচালিত হচ্ছে কেমন যেন এক কুটির-শিল্পের ধরনে"...আর তবু "এখানে ভালোটা যদি আশানুরূপ ভালো নয়, মন্দটাও তেমনি, যতটা মন্দ হবে বলে আশংকা করা যায়, সে তুলনায় ভালোই।" আর তাই, তিনি লক্ষ্য করেন আপাত-বিশৃংখলার আড়ালে-আড়ালে শিক্ষা-প্রকল্প-বিদ্যুৎ-পরিবহণ ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভারতের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি।

প্রেসের মান তাঁর অনুন্নত ঠেকেছে। প্রতি ৮৩ জনের জন্য এক কপি দৈনিক কাগজ। তুলনা করেন: যুক্তরাজ্যে প্রতি ২ জনের একটি, জাপানে ও যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ৩ জনে একটি, ফ্রান্স-জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ায় যথাক্রমে প্রতি ৪, ৫ ও ৬ জনে একটি ক'রে। ভারতীয় খবর রাশি রাশি, এশিয়া বিষয়ে অল্পস্বল্প, বাইরের পৃথিবীর সংবাদ নগণ্য, বিশেষত য়ুরোপীয়। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বহির্জগতের প্রতি তারা বধির ও মূক—আর কিছু উদাসীন।

মন্ত্রীদের খোঁজে

দেখা করতে গেছেন বৈদেশিক বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সঙ্গে, শুনলেন তিনি ব্যস্ত, কোয়ায়েতের আমীরকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। তাহলে তথ্যমন্ত্রী?...উনি আসেননি। শিক্ষামন্ত্রী বিদেশে, সফরে। স্বরাষ্ট্র?...উনিও। প্রতিরক্ষা?...তিনিও। সবাই সফরে। বেশির ভাগ সময়ই প্লেনে প্লেনে কাটে তাঁদের—এক অঙ্গরাজ্য থেকে আরেক অঙ্গরাজ্য ঘুরে বেড়ান, বক্তৃতা দেন, উৎসব-অধিবেশন উদ্বোধন করেন...। তার ওপর গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবার আগে তাঁরা নাকি জ্যোতিষীর পরামর্শ নেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যিনি, গণকের উপদেশ না নিয়ে কোনো ফরমানেই তিনি স্বাক্ষর দেন না।

শাস্ত্রীজী কায়রো থেকে ফেরেন। তারপর তিন দিন কাটান লোকচক্ষুর আড়ালে। মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে

বিদেশ-প্রত্যাগত ব্রাহ্মণের জন্য ঐ রকম প্রায়শ্চিত্তেরই নির্দেশ রয়েছে। "তিন-তিনটে দিন আমাকে অপেক্ষা করতে হল।"

শাস্ত্রীর কর্মব্যস্ততা : হিন্দী শিক্ষার উপর একটি সংশোধনী প্রস্তাব নিয়ে পার্লামেণ্টে ভাষণ ৩০ ঘণ্টা, পুষ্প, তন্তুশিল্প, গ্রন্থ ও বুদ্ধমূর্তির প্রদর্শনী উদ্বোধন ২৪ ঘণ্টা; জাতীয় তুলো-উৎপাদক সংস্থা, সাপুড়েদের সম্মেলন এবং তেলেগু অধ্যাপকদের সিম্পোজিয়মে বক্তৃতা ১০ ঘণ্টা।

নেহরু একটু বিশেষভাবে চিত্রিত হয়েছেন : "উজ্জ্বল ও আত্মতৃপ্ত এক পুরুষ। তাঁর প্রধানতম কাজ যেন বক্তৃতা-দান : ভাষণ আর ভাষণ, আরো ভাষণ, অবিশ্রাম। উৎকৃষ্ট বক্তা, শ্রোতাদের ধরে রাখেন, টেনে রাখেন, বুঝিয়ে ছাড়েন, ভাসিয়ে নিয়ে যান। অবিসংবাদিত এক-নায়ক, কিন্তু ক্ষুরধার বুদ্ধি, মাঝে মধ্যে সমাজতন্ত্রী ভাব-ভাবনা মিশেল দিতে জানেন—নিজের গণতন্ত্রী রূপটাকে লোক-চক্ষে ফুটিয়ে তুলতে। নিজের সংশয়ের কথা, উদ্বেগের কথাও বলেন, অধি-নায়কোচিত অম্লান মহিমায়। শোনে সারা জগৎ; শোনে না ভারত, সে 'ঘুমিয়ে রয়'।" দুরন্ত ভারতের প্রসঙ্গে নেহরুর উক্তি মূল্যবান মনে হয় তাঁর : দুর্দশা ভারতে নতুন কিছু নয়; যা নতুন, তা এই যে, এত-দিনে তার দুর্দশা সে বুঝতে পারছে। "তবে নেহরু তাঁর শ্রোতৃবর্গ খুঁজে পেয়েছেন, তাদের সন্তুষ্ট করতেও পেরেছেন। অতি-ভাষণ করছি না; নেহরু-আমলের ভারতে যারা থেকেছেন, তাঁরাও একই রেখায় আঁকবেন : ব্যক্তিত্বের সীমাহীন সম্মোহন, তারই সঙ্গে মিশে আছে 'অকার্যকারিতা'—তা-ও অপরিসীম। প্রতিমাভঞ্জক ভাববেন না আমায়। প্রতিমা অনেক আগেই ভেঙ্গে গিয়েছে, যদিও এরা এখনো তা মানতে ভয় পায়।"

উল্লোল কলকাতা

"জল, শুধু জল, দেখছি প্লেনের নিচে (বর্ষার জলাভূমি?) আর ভাবছি কোথায় কিভাবে নামবে প্লেনটা? দমদম থেকে এঁকেবেঁকে পথ করে নিয়ে এগোবে আপনার ট্যাক্সি, অবিশ্রান্ত হর্ন দিতে দিতে, ঐ ট্রাম, বাস, লরি, ঠেলা, রিকশা, সাইকেল, কুলি, ভিখিরি, পথচারী, পবিত্র গোমাতা আর বিচরণকারী কুকুরের গোলকধাঁধার পাশ কাটিয়ে। এত লোক পথে? অথচ হোটেলে পৌঁছে প্রশ্ন করুন, 'পথে ভিড় কেন আজ?' বিমূঢ় উত্তর পাবেন, 'কিসের ভিড়, সার?' আপনি তবু হাল ছাড়েন না, লেগে থাকেন, জিগ্যেস করেন, আজ কি মার্কেট-ডে কিংবা কোনো অধিবেশনের দিন? কিংবা মেলা চলছে কোথাও? নাকি, তীর্থযাত্রার পরব? শহরের এতদঞ্চলে এত লোকের আনাগোনা যখন, তখন তার নিশ্চয়ই কারণ আছে

মাতাবাড়ি কিংবা বাচালতার ভয় করবেন না —বকেই চলুন

একটা। কিন্তু কারণ নেই, ও-রকমই নাকি হয়, হয়ে থাকে রোজই—'প্রথার প্রভাবে'।"

পরের দিন, ট্যাক্সির ক্ষুরে দণ্ডবৎ হয়ে, পায়দলেই বেরোলেন। দেখলেন, দিতেই হবে কনুইয়ের গুঁতো, এক জায়গায় যদি আটকা পড়ে না থাকতে চান। উঠলেন এক স্টপ থেকে বাসে, নামলেন পরের স্টপেই—ভিড়টা অসহ্য। আর ট্রাম...হায়, আছে পা-দান, কিন্তু পা দেবেন কোথায়, গাদাগাদি করে কাঁদির মত ঝুলেছে জনতা, তাদের পেরিয়ে? শোনা যাচ্ছে বটে ভূগর্ভস্থ রেলের কথা, কিন্তু দুদিন বাদে তা-ও জল-স্ফীতিতে ভুগবে। পথে মানুষ ছাড়াও আছে গরু—হাড়-জিরজিরে গরু—যেন যাদুঘর থেকে কঙ্কাল নিয়ে এসে কোনো রকমে তার উপর গোচর্ম সেঁটেসুঁটে দেওয়া হয়েছে

না কলকাতা ঠিক শহর নয়—পেল্লায় এক মাছির ঝাঁক যেন, থই থই করছে, ম ম করছে। সমস্যাও অন্তহীন—সমাধান নগর-বাসীদের তো দূরের কথা, রাজ্য কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারেরও সাধ্যের বাইরে। প্রায় এক আন্তর্জাতিক সমস্যা।

প্রাচ্যের নানান আপাত-বিশৃঙ্খল শহরের তুলনায়, কলকাতা কিন্তু তাঁর সুবিন্যস্ত। প্রায় প্রতিটি বস্তি নিয়ে একেকটি রাস্তা গড়ে উঠেছে—দড়িদড়া, রন্ধনসামগ্রী, বীজ, কেরোসিন-বাতি—একেকটি ব্যবসা একেকটি রাস্তায় কেন্দ্রী-ভূত : প্রায় প্রতিটি পথেরই এক নিজস্ব চরিত্র আছে।

"তার আছে হাওড়া স্টেশন। বারবার, ফিরে ফিরে, ফিরে আসি এইখানে। ট্রেন ধরতে নয়, কোনো বন্ধুকে স্বাগত জানাতে নয়, কোনো খোঁজখবর নিতেও নয়; টিকিট কিনব না কোনো—তবুও, মাল বুক করার নেই—তবুও। আমি বিনা প্রয়োজনে—শুধু দেখতে আসি কলকাতার এই প্রধান স্টেশনের অতুলনীয় চলচ্ছবি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবার অপূরণীয় বাসনায়। সারা এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম এই স্টেশন, আরেক

জগতের প্রবেশদ্বার, ভারতাগত সকল য়ুরোপীয়ের পক্ষে অবশ্য-অতিক্রম্য এক উপলক্ষ।

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই......

য়ুরোপীয় ভ্রমণকারীরা এ-দেশে এসে প্রায়ই মস্ত এক অসুবিধেয় পড়েন—পদে পদে 'জায়গা নেই' শুনে : জায়গা নেই প্লেনে, জায়গা নেই ট্রেনে, জায়গা নেই হোটেলে, রেস্তোরাঁয়, ট্যুরিস্ট বাংলোয়। প্র্যায়ফুস উবাচ : মা ভৈঃ। দাওয়াই বাৎলাচ্ছেন তিনিঃ মুখ খুলুন, কথা বলুন, অবিশ্রান্ত বকে যান। অধীর হবেন না, তাতে থোড়াই লাভ। বরং ধৈর্য হারালে লোকে আপনাকে ভাববে অশিক্ষিত: উত্তেজনা, রাগ, বিরক্তি—সবই এ-দেশে নিষ্ফল, প্যাচকল দিয়ে দুর্গের বর্ম-আঁটা তোরণ খুলতে যাওয়ার মতোই শুধু কথা চালান, কথার পিঠে কথা বুনুন, যুক্তির জাল ছড়ান, খোশামোদ করুন... বক্তব্যের শেষ প্রান্তে এসে উপনীত হলে আবার ফিরে যান গোড়ায়, নতুন করে শুরু করুন। সত্যের সীমা পেরোলেও সহ্য করুন, আধঘণ্টা ধরে শান্তভাবে বিবৃত করুন আপনার আবেদন, আরো আধঘণ্টা ধরে পুনর্বিবৃত করুন। তাতেও যদি দেখেন কাজ হচ্ছে না, বলুন : জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করব। হ্যাঁ, একেবারেই জেনারেল ম্যানেজারের নাম করুন, ও'র চেয়ে অধস্তন কারুর কথা বললে, আপনি দ্বিতীয় শ্রেণীর খদ্দের বলে গণ্য হবেন। তাঁর কাছে আবার আপনার ঝুড়ি খুলে বসুন, আনুপূর্ব রাখুন আপনার বক্তব্য, মোলায়েম স্বরে তাঁকে বলুন, সারা ভারতে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি আপনাকে যিনি এই অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে পারেন। আরো বলুন, কত শুনেছেন তাঁর দক্ষতার কথা, তাঁর সৌজন্যের কথা, তাঁর বুদ্ধির প্রশংসা। তাঁকে বুঝিয়ে ছাড়ুন, একমাত্র তাঁরই উপর নির্ভর করছে আপনার ভাগ্য, এমন কি ইন্দো-ফরাসী পারস্পরিক সম্পর্কের সৌহার্দ্যপূর্ণ অগ্রগতি। আগে বাড়ুন আরেক ধাপ। তুলুন অহিংসার প্রসঙ্গ, পাড়ুন প্রাচী-প্রতীচীর বোঝাপড়ার কথা, মায় বিশ্বশান্তির প্রশ্ন। বাড়াবাড়ি কিংবা বাচালতার ভয় করবেন না—বকেই চলুন।

"জেনারেল ম্যানেজার অবশ্য শুরুতেই বলবেন : তাঁর কিছুই করার নেই হাত-পা একেবারে বাঁধা। কিন্তু ঘণ্টা তিনেকের বাগাড়ম্বরের পর আপনি চরিতার্থ হবেনই। প্রণালীটা সময়সাপেক্ষ, কিন্তু অব্যর্থ বটে, খাটেনি, এমন একটা দৃষ্টান্তও আমার জানা নেই। ভারতভূমি তার শ্রেষ্ঠ উপহার-গুলি তাদেরই জন্য জমিয়ে রাখে, যারা তাকে তোষণ করে; যারা জোর খাটাতে যায় তাদের সে করে প্রত্যাখ্যান। এখানে এলে ভুলে যান নির্ভুল অঙ্কের হিসেব, ভুলে যান দুয়ে-দুয়ে চার; এখানে সেটা কখনো পাঁচ, কখনো তিন।"

গণতন্ত্রী ভারত

প্র্যায়ফুস মানেন, ভারত গণতন্ত্রী দেশ। এতগুলি রাজনৈতিক দলের সহাবস্থান এখানে; আছে অতগুলি সংবাদপত্র, নেই উৎপীড়ন কিংবা বন্দীশিবির; যে-কেউ যত্র-তত্র যথেচ্ছ যেতে পারে, কারও অনুমতির দরকার হয় না; বলতে পারে প্রধানমন্ত্রীকেঃ আমি মনে করি, আপনার বুদ্ধিসুদ্ধি একটু খাটো; আর সরকারকে দিতে হয় পার্লামেন্টের কাছে জবাবদিহি—এমন দেশকে গণতন্ত্রী না বলে উপায় কি? পক্ষান্তরে প্রকৃত গণতন্ত্র সে-দেশে আছে কি, যেখানে তিন-চতুর্থাংশ লোকই নিরক্ষর?

"আসলে ভারতের যা দরকার, তা কামাল আতাতুর্কের মতো শক্তিমান এক ব্যক্তিত্ব, যিনি স্বপ্নকুহকের জাল ছিঁড়ে জাতটাকে কর্মক্ষেত্রে নামাবেন, ঝেড়ে ফেলে দেবেন নিষ্ক্রিয় নিশ্চেষ্টতার পাষাণ ভার, পদে-পদে বাধা-ছাদা, নিষেধ-প্রতিষেধ-ঐতিহ্য-কিংবদন্তির কথন ঘুচিয়ে জনতাকে দাঁড় করিয়ে দেবেন বাস্তবের মুখোমুখি, জাতীয় জীবনে বিশ শতকের আবির্ভাব ত্বরান্বিত করবেন; যিনি কথার খই ফোটাবেন কম, বুনবেন বেশি করে ধানের বীজ; দেবদেবীর কথা ছেড়ে বলবেন ক্যালোরির কথা; আর জনতার গোঁয়ার গোঁড়ামিকে মুক্তি দেবেন দেশের উন্নয়ন-ব্রতে...আর যিনি এসব সম্পন্ন করেও অক্ষুণ্ন রাখবেন ভারতাত্মাকে।"

ক্যালকাটা কেমিক্যাল-এর তৈরী

করেন নি?' দিলীপকুমার তো অবাক। এই অপ্রত্যাশিত অভিযোগের কারণ কি জানতে চাইলে তিনি বললেন—'আমি আমি গুটা তাল গান কিন্তু আমি আরও এত যে গান গাইলাম তার একটাও কি আপনার তেমন ভাল লাগল না?' সুতরাং দিলীপকুমার কেবলমাত্র পুরোনো গানের পুনশ্চারণের পক্ষপাতী নন—তবে তিনি মাঝে মাঝে তাঁর পিতৃদেব, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত প্রভৃতি বহু সুরকারের গান গেয়ে থাকেন।

আমার মনে হয় তিনি আজকাল কেবলমাত্র ভজন গান করেন বলেই অনেকের কাছে তা একঘেয়ে ঠেকেছে। ভজন নিশ্চয়ই ভাল জিনিস কিন্তু তার আবেদন সীমিত একথা মানতে হবে। এছাড়া তাঁর ভজনগুলি সুদীর্ঘ এবং নানা আসরে তাকে আরও দীর্ঘায়িত করা হয়। অনেকে এত বিলম্বিত গানে ক্লান্তিবোধ করেন। গানগুলিকে আরও ছোট করে যদি সুরবৈচিত্র্য প্রদর্শন করা হয় তাহলে বোধ হয় শ্রোতারা আরও ভাল করে রসগ্রহণ করতে পারবেন।

কথায় কথায় রবীন্দ্র প্রসঙ্গ উঠল। কবিগুরুর স্মৃতিচারণে দিলীপকুমার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। বললেন বাল্যকাল থেকে তাঁর স্নেহ পেয়ে এসেছেন। তাঁকে অন্তরঙ্গভাবে দেখবার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে এবং সে যে কী অপূর্ব স্মৃতি তা বলে বোঝবার নয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সংগীতের ক্ষেত্রে মতভেদ হয়েছে এবং সেই ব্যাপারে কখনও কখনও উত্তর প্রত্যুত্তর দিয়ে কবিকে ব্যথিত করেছেন বলে তিনি আজ দুঃখিত। আজ মনে হয় তর্কবিতর্ক না করলে বোধ হয় ভাল হত। রবীন্দ্রনাথের গান তাঁর ভাল লাগে না একথা যাঁরা বলেন তাঁরা ঠিক বলেন না। তবে তিনি চেয়েছিলেন রবীন্দ্রসংগীতে শিল্পীর নিজস্ব কিছু কারুকলা সংযোগ করতে, কবি সেটা অনুমোদন করেন নি। কিন্তু যাই হোক না কেন শেষ পর্যন্ত তিনি যে রবীন্দ্রনাথের অতিশয় স্নেহভাজন ছিলেন এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ব্যক্তিগত বিদ্বেষের বহু উর্ধ্বে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'অমন চরিত্র আর আমি দেখিনি'—একথা বলতে বলতে তাঁকে আমি শিহরিত হতে দেখলুম। গান্ধীজীর সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল। কিন্তু দিলীপকুমার বললেন 'একথা আমি অকুণ্ঠভাবেই বলব, রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর চেয়ে অনেক বড় ছিলেন। তাঁর তুলনা হয় না।'

একজন প্রশ্ন করলেন, দেশের এই পরিস্থিতিতে যথার্থ সঙ্গীতসৃষ্টি সম্ভব কিনা। উত্তরে দিলীপকুমার বললেন—'রাজনৈতিক কোনও বিষয়ে আমি কিছু বলব না, আমাকে এ সম্বন্ধে অনুরোধ করবেন না।' কিন্তু একটু পরেই বললেন—'কেনই বা হবে না? অন্যদেশে খুব গোলমালের সময়ও তো অনেক বড় সৃষ্টি হয়েছে। রাশিয়ায় যখন খুব ত্রাসের রাজত্ব চলছে তখন টলস্টয়, গোর্কী প্রভৃতির অভ্যুদয় হয়েছিল। প্রথম যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই তিনি জার্মানিতে গিয়েছিলেন তখনও সেখানে সংগীত সৃষ্টির বিরাম ছিল না। আসলে আন্তরিকতা থাকা চাই। যাঁদের প্রতিভা আছে, আন্তরিকতা আছে, সবকালেই তাঁরা যথার্থ সৃষ্টি করতে সমর্থ হন। (দিলীপকুমার অবশ্য বলেননি, কিন্তু আমাদের তো মনে হয় নানা দুর্গোগের মধ্যেই সৃষ্টিধর্মী চিন্তার পরিবর্তন হয়েছে এবং নতুন আর্টের সৃষ্টি হয়েছে।)

নিজের কথা বলতে গিয়ে বললেন, 'খুব ছেলেবেলাতেই গান গাইতে পারতাম। শোনো একটা মজার ঘটনা। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার স্বয়ং বলেছেন। তাঁরা তখন তরুণ এবং পিতৃদেব তখন বেঁচে। তাঁদের ইচ্ছা হল পিতৃদেবের একটি নাটক করবেন। তখন পিতৃদেবের নাটক নিয়ে চারদিকে খুব আলোড়ন চলেছে, তিনি খ্যাতির উচ্চতম শিখরে প্রতিষ্ঠিত। চারদিকেই তখন অভিনীত হচ্ছে পিতৃদেবের নাটক। তাঁরাও নাটক করবার সব আয়োজন করে ফেললেন। কিন্তু মুশকিল হল গান নিয়ে। গানগুলি ঠিকভাবে গাওয়া চাই। শেখাবার লোক পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রলালের কাছেই যাওয়া যাক। কিন্তু ব্যাপারটা সোজা নয়। তাঁরা একেবারে তরুণ আর কবি তখন অতি বিখ্যাত বয়স্ক ব্যক্তি। কে জানে কিভাবে তিনি তাঁদের অনুরোধটা নেবেন। যাই হোক, তাঁরা কবির কাছে গেলেন শেষ পর্যন্ত। কবি পদচারণা করছিলেন। (কবি এইভাবে গান গাইতে গাইতে পদচারণা করতেন। দিলীপকুমার স্মরণ করলেন 'পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে' গানটি গাইতে গাইতে যখন তিনি পদচারণা করতেন তখন কী অপূর্ব লাগত সেই গান শুনতে।) কবি তাঁদের কথা শুনলেন। তারপরেই চেঁচিয়ে ডাকলেন—'মণ্টু মণ্টু শুনে যাও'। মণ্টু তখন বছর দশেকের ছেলে। বাবার কাছে এসে দাঁড়াতেই তিনি বললেন—এঁরা আমার নাটকের কতকগুলি গান শিখতে এসেছেন তুমি এঁদের শিখিয়ে দাও'। তাঁরা বেশ অবাক হলেন। কিন্তু সেই দশ বছরের দিলীপকুমার তাঁদের প্রয়োজনমত সবকটি গানই শিখিয়ে দিলেন। হাসতে হাসতে দিলীপকুমার বললেন—বুঝলে হে, একেবারে হিস্টোরিয়ান আর সি মজুমদারের নিজের মুখে বলা—অথারিটি সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন নেই।'

বেশ খানিকক্ষণ কথা বলেছিলেন একনাগাড়ে। আগামী দিন আবার গানের অনুষ্ঠান আছে। ইন্দিরা দেবী এবারে তাঁকে নিবৃত্ত করলেন। আমরাও উঠলুম। ঘরোয়া কথায় দিলীপকুমারের তুলনা পাওয়া ভার, কিন্তু বক্তৃতা তিনি করতে পারেন না। বললেন, কেমব্রিজে সুভাষচন্দ্র তাঁকে বক্তা করে তুলতে চেয়েছিলেন,

কিন্তু তিনি সে চেষ্টা করেন নি। সম্প্রতি অবশ্য তিনি কিছু কিছু বলেন। আমেরিকায় সফরে তাঁকে কিছু কিছু বক্তৃতাও দিতে হয়েছে। সেই থেকেই এই অভ্যাসের শুরু। আমি কিন্তু তাঁকে ইংরেজি বাংলায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেভাবে বলতে শুনেছি তাতে তাঁকে ভাল বক্তা এবং রসিক বক্তা বলেই মনে হয়েছে।

আনন্দময় স্মৃতি নিয়ে ফিরে এলুম। কেবল কথাই নয়, মিষ্টিমুখের আয়োজনেও আপ্যায়িত হয়েছি। সুরেকাব্য সংসদকে ধন্যবাদ।

গুণীজন সম্বর্ধনা—শ্রীকালীপদ পাঠক, শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র

নৈহাটিতে ফাল্গুনীর ষষ্ঠ বর্ষপূর্তি উৎসবে ১০ এপ্রিল গুণীজন সম্বর্ধনা ও বসন্তোৎসবের আয়োজন করা হয়। অশীতি বৎসর অতিক্রান্ত শ্রীকালীপদ পাঠক এবং স্বনামধন্যা শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্রকে সম্বর্ধনা জানিয়ে এই সংস্থা একটি গৌরবজনক কর্তব্য পালন করেন। বর্তমানে প্রাচীন বাংলা গানের সর্বশ্রেষ্ঠ ধারক কালীপদ পাঠক মহাশয়ের গান শোনার সুযোগ যতটা পাওয়া যায় ততটাই গ্রহণ করা উচিত। কেননা তাঁর সংগেই একটি বৃহৎ ধারার অনেকটাই অবলুপ্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনা। রবীন্দ্রসংগীতের যে পর্যায় আজ চলেছে সেখানে যে অল্প কয়েকজন সংগীতশিল্পী যথার্থ প্রস্তুতি ও অভিজ্ঞতা নিয়ে বর্তমান, শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র তাঁদের পুরোভাগে রয়েছেন। এঁর গান আজ শুধু উপভোগের বস্তু নয়, শিক্ষার বস্তু। আজ তিনি প্রতিষ্ঠার উচ্চশিখরে অবস্থান করছেন এবং স্বীয় নিষ্ঠায় সর্বত্র সমাদৃত হয়েছেন। এই সম্বর্ধনা উৎসবে উপস্থিত থেকে লেখক নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেছেন। অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীসমরেশ বসু মহাশয়ের বাটীসংলগ্ন প্রাঙ্গণে। সেদিন তাঁর উদ্যোগ, পরিশ্রম এবং যত্নের অবধি ছিল না। আয়োজনের মূলে প্রেরণাই ছিলেন সমরেশবাবু ও তদীয় সহধর্মিণী গৌরী বসু। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন নৈহাটি কলেজের অধ্যাপক শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে কয়েকটি গান গেয়ে উভয় সম্মানিত শিল্পীই শ্রোতাদের অভিভূত করেন। ফাল্গুনীর অনুষ্ঠানে একক সংগীতে বুলবুল ভট্টাচার্য, সুকন্যা চক্রবর্তী, একক নৃত্যে মৌসুমী বসু, চন্দনা দে, বিভা ভট্টাচার্য ও গীতা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া এই অনুষ্ঠানে কয়েকজন উত্তম প্রতিশ্রুতি-সম্পন্ন শিল্পীর পরিচয় পাওয়া গেল। এই সভায় সংস্কার বিদ্যালয়ের পুরস্কারও বিতরণ করা হয়।

কলকাতায় ভূগর্ভস্থ রেল

শেষ পর্যন্ত ভারত সরকারের রেলমন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দ ঘোষণা করেছেন যে কলকাতায় ভূগর্ভস্থ রেলপথ চালু করা হবে; তা না হলে এই মহানগরীর যানবাহন অবস্থার উন্নতি হবে না। একটু বিলম্বে হলেও সরকারের যে এ বিষয়ে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়েছে, এটাই আশার কথা। অবশ্য ইতিমধ্যে অর্ধ-চক্র রেলপথ খোলার সম্ভাব্যতা নিয়ে সমীক্ষা করা হয়েছে এবং বেশ কিছু অর্থব্যয়ও হয়েছে। বিগত ২৩ বছর ধরে, অর্থাৎ দেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই কলকাতা শহরের পরিবহণ সমস্যা নিয়ে বিস্তর সমীক্ষা, কার্যসূচী গ্রহণের আশ্বাস, দিল্লীতে পশ্চিমবঙ্গের দরবার, কেন্দ্রীয় সরকারের ঔদাসীন্য এবং এই মহানগরীর অফিসযাত্রীদের নাভিশ্বাস আমরা দেখেছি। একবার শোনা গিয়েছিল, কলকাতার ভূগর্ভ নাকি রেলপথের জন্য উপযুক্ত নয়। এখন শ্রীনন্দ বলেছেন, কথাটা ঠিক নয়। লণ্ডন শহরে যখন টেমস নদীর নীচ দিয়ে রেলপথ বসানো সম্ভব হয়েছে এবং সমুদ্র থেকে লণ্ডন শহরের দূরত্ব যখন কলকাতা থেকে সমুদ্রের দূরত্বের চেয়ে কম, তখন কলকাতার মাটির নীচে রেলপথ বসানো কেন অসম্ভব হবে সে বিষয়ে অনেকেই বহু প্রশ্ন তুলেছেন। হয়তো এই প্রশ্নের উত্তর একমাত্র ভূতত্ত্ব বিশেষজ্ঞগণই দিতে পারেন। আমরা শুধু একথা শুনে আশ্বস্ত হয়েছি যে কলকাতায় ভূগর্ভস্থিত রেলপথ চালু করা সম্ভব। এখন সমস্যা হচ্ছে টাকার। রেলমন্ত্রী জানিয়েছেন, কালীঘাট থেকে বৌবাজার পর্যন্ত ভূগর্ভস্থিত রেলপথ প্রবর্তন করতে ৪০ কোটি টাকা খরচ হবে এবং এটা হবে প্রথম পর্যায়ের কাজ। ১৯৭১ সালের ১লা এপ্রিল থেকে কাজ শুরু হলে এটা সম্পূর্ণ হতে চার বছর লাগবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে কাজ হবে শেয়ালদা স্টেশন থেকে বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ পর্যন্ত এবং ওই রেল লাইন শেষ পর্যন্ত হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হবে। তাছাড়া দ্বিতীয় পর্যায়ে বৌবাজার (অর্থাৎ, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ ও বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটের সংযোগস্থল) থেকে দমদম পর্যন্ত পাতাল রেলপথ খোলারও ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তৃতীয় পর্যায়ে দমদম থেকে প্রিন্সেপ ঘাট পর্যন্ত রেলপথ খোলার ব্যবস্থা হবে এবং গঙ্গার উপর যে নতুন সেতু তৈরী হবে তার উপর দিয়ে রেল লাইন আনা যেতে পারে। রেলমন্ত্রীর পরিকল্পনায় বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ, যাদবপুর, পার্ক সার্কাস প্রভৃতি অঞ্চল আসেনি। অবশ্য প্রস্তাবিত ভূগর্ভস্থিত রেলপথ খোলা হলে শহরের বর্তমান পরিবহণ ব্যবস্থার একটি বড় অংশকে ঐ অঞ্চলগুলির জনসাধারণের সুবিধায় ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে। টাকার অসুবিধা তো আছেই। কিন্তু কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রকে ব্যবসায়িক লোকসানের দিকটি ছেড়ে দিয়েও জন-কল্যাণের জন্য সব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। আমাদের মনে হয় সমগ্র কলকাতা পৌর এলাকার জন্যই ভূগর্ভস্থিত রেলপথ খোলার একটি কর্মসূচী গ্রহণ করা উচিত, এবং যেহেতু এ-ব্যবস্থা খুবই খরচ সাপেক্ষ, সেজন্য ধাপে ধাপে কাজে এগিয়ে যাওয়া উচিত। কেন্দ্রকে এ বিষয়ে অর্থ সাহায্য করার ক্ষেত্রে দাক্ষিণ্য দেখাতে হবে। যে সমস্যা আমরা কলকাতায় দেখতে পাচ্ছি, বোম্বাই শহরেও একই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। শুধু টাকার অভাবের দোহাই দিয়ে এই বিরাট সমস্যার সমাধান ঠেকিয়ে রাখা উচিত হবে না।

রপ্তানি বৃদ্ধির নতুন কর্মসূচী

রপ্তানি বাড়াবার জন্য ভারত সরকার বহুবার বিভিন্ন দফায় কর্মসূচী তৈরী করেছেন। যতগুলি কর্মসূচী এখন পর্যন্ত তৈরী হয়েছে তার একটিও যদি ঠিকভাবে কার্যকর হত তবে আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যে আশানুরূপ উন্নতি হওয়ার পথে কোনও অসুবিধার সৃষ্টি হত না। চতুর্থ যোজনায় রপ্তানি বাণিজ্য যাতে ৭ শতাংশ চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ে সেজন্য সরকার চার দফার একটি নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। প্রথম দফায় বলা হয়েছে, শিল্পকে রপ্তানি-পণ্য উৎপাদনমুখী করা। রপ্তানি-পণ্যের উৎপাদন বাড়াবার জন্য প্রধান প্রয়োজন মূলধন সরবরাহ এবং শ্রমিকদের কারিগরী দক্ষতা; তাছাড়া প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির সরবরাহ অক্ষুণ্ণ থাকা দরকার। রপ্তানি-বাণিজ্য সম্প্রসারণে মূলধন সরবরাহের দায়িত্ব ব্যাংক-ব্যবস্থাকেই গ্রহণ করতে হবে। একমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলিই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। দ্বিতীয় দফায় বলা হয়েছে শ্রমভিত্তিক শিল্পে বেশি করে রপ্তানি-পণ্য উৎপাদন বাড়াতে হবে। শ্রমভিত্তিক শিল্পে দ্রুত উৎপাদন বাড়ানো যেমন সম্ভব, তেমনি বহু লোকের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়; তাছাড়া শ্রমভিত্তিক শিল্পে উৎপাদন খরচও কম হয়। তৃতীয় দফায় উন্নতিকামী দেশসমূহে যৌথ উদ্যোগের প্রচেষ্টা চালাবার কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি (ব্রিটেন বাদে) যেমন একটি ইউরোপীয় সাধারণ বাজার (European Common Market) গঠন করেছে, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিরও একটি সাধারণ বাজার গঠন করার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত। তাহলে এই অঞ্চলের সবগুলি উন্নতিকামী দেশই উপকৃত হবে। চতুর্থ দফায় উন্নতিকামী দেশসমূহের সঙ্গে শিল্পায়নে সহযোগিতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সম্প্রতি লোকসভায় বাজেট বিতর্কের সময়েই বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রী বি আর ভগৎ এই চার দফা কর্মসূচীর কথা ঘোষণা করেন। শ্রীভগৎ আরও ঘোষণা করেন, যে সব ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প রপ্তানির ক্ষেত্রে উৎসাহ ও কৃতিত্ব দেখিয়েছে তাদের সাহায্য করার জন্য বাণিজ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন করা হবে। ভারতে রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। একদিকে রপ্তানি উন্নয়ন এবং অপরদিকে আমদানির বিকল্প জিনিস উৎপাদন বাড়াবার কর্মসূচীকে সফল করার জন্য যে-সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার তার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় একটি রপ্তানি-আমদানি ব্যাংক (Export Import Bank) গঠন করার ব্যবস্থা রাখা উচিত ছিল।

সুব্রত গুপ্ত

শিল্পী নকুল দাস সম্প্রতি অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে তাঁর প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। শিল্পী অ্যালবার্ট টেম্পল অব সায়েন্স ও স্কুল অব আর্টস-এ অঙ্কনবিদ্যা শিক্ষা করেন। প্রদর্শনীতে শিল্পীর আঁকা ২০টি স্কেচ দেখা যায়।

শিল্পী চীনা কালি ব্যবহার করেছেন। শ্রেণী হিসাবে তাঁর রচনা সমকালীন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি তুলির মোটা টানের মধ্য দিয়ে মানব শরীরের অংগ-প্রত্যংগ অযথা বর্ধিত ও বিকৃত করেছেন—সেই বর্ধিত বা বিকৃত আকারের মধ্য দিয়েই সমকালীন এবং ক্ষেত্র বিশেষে সর্বাবয়ব রচনা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। ফলে অনেক স্থলেই আকার অকারণে ভেঙে গিয়ে বিকৃত ও বিচ্ছিন্ন রূপ ধারণ করেছে—যেমন ১৬ ও ১৭নং স্কেচ। তবে যেখানে তিনি সমগ্র মূর্তিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন আকারের অবতারণা করেছেন সেখানে তাঁর রচনা কিছু সার্থকতা লাভ করেছে, অর্থাৎ সেগুলির মধ্য দিয়ে আকারভিত্তিক অখণ্ড রূপ প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রসংগে ১৮নং স্কেচের নাম করা চলে। রমণী দেহলতাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অংগ প্রত্যংগ অস্বাভাবিকরূপে বর্ধিত হয়ে উঠেছে, অথচ চোখে বিসদৃশ ঠেকে না। কারণ দেহের সামগ্রিক আকারের ওপর প্রাধান্যদান করে তারই ভিতর থেকে ছোট ছোট বিভিন্ন আকারের অবতারণা করেছেন। এই জাতীয় রচনার মধ্যে ১নং ও বিশেষ করে ১৪নং স্কেচের আকারপ্রধান বিশিষ্ট ভংগীটুকু অনেকের ভাল লাগে। তবে শিল্পীর তুলিচালনা পদ্ধতি প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই এক রকম, সেজন্য পৌনঃপুনিকতা দোষ দেখা যায়। তুলি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে শিল্পী যদি রেখার বৈষম্য ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে পারতেন তাহলে বোধ হয় প্রত্যেক স্কেচেরই স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকত।

✻

অ্যাকাডেমি গ্যালারিতে অ্যাকাডেমি পরিচালিত স্টুডিও সভ্যদের ছবি ও ভাস্কর্য নিদর্শনের বার্ষিক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। প্রদর্শনীতে ২১ জন শিক্ষার্থীর ৪৭টি রচনা ও তিনজনের ভাস্কর্য নমুনা দেখা যায়।

তের বছর পূর্বে অ্যাকাডেমি কর্তৃপক্ষ এই স্টুডিওটি স্থাপন করেন—উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদের যোগ্য শিল্পী শিক্ষকের অধীনে ড্রয়িং শিক্ষা ও বিশেষ করে লাইফ মডেল থেকে স্টাডি করার সুবিধা দান করা। বলা বাহুল্য, যাঁরা গত কয়েক বছর যাবৎ এই স্টুডিওর বার্ষিক প্রদর্শনী দেখে আসছেন তাঁরা স্বীকার করবেন যে, কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। শিল্পচর্চার দিক থেকে স্টুডিওটি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। শুধু তাই নয়, এই স্টুডিওতে শিক্ষালাভ করে কয়েকজন শিল্পী হিসাবে পরিচিতও হয়েছেন।

প্রদর্শনীতে ড্রয়িং ও স্কেচের সংখ্যাই অধিক, তবে প্রতিকৃতি ও ন্যুড স্টাডিও

স্কেচ—২ —নকুল দাস

দেখা যায়। কয়েকজনের কাজে সমকালীন অঙ্কনরীতিরও পরিচয় পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীগণ চারকোল, জল ও তেলরঙ ব্যবহার করেছেন। শিক্ষার্থীর দিক থেকে বিচার করলে অধিকাংশ নিদর্শন ভাল লাগে, যদিও ছবি নির্বাচন ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ অধিকতর সচেতন হলে প্রদর্শনীর মান উন্নত হত। ২নং ও ৪৫নং অনায়াসে বাদ দেওয়া চলত। তাহলেও কয়েকটি ড্রয়িং ও ন্যুড স্টাডি প্রথমেই চোখে পড়ে, এবং শিল্পশিক্ষক সমরেশ চৌধুরীর ১২নং স্কেচটি দেখে অনেকেই আনন্দলাভ করেন। তপন বিশ্বাস তাঁর স্কেচের নিম্নভাগটুকু সুন্দরভাবে এঁকেছেন, উপরিভাগ দুর্বল। উপবিষ্ট দুই রমণীর স্টাডির মধ্য দিয়ে লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন (৪৯ ও ৫১নং)। এগুলি দেখে বোঝা যায় যে সকলেই যত্নসহকারে লাইফ ক্লাসে কাজ করে থাকেন। প্রতিকৃতির মধ্যে লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাসের স্কেচ ও মেহাত মন্দ লাগে না। গ্রাফিকের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প, এবং তাদের মধ্যে শিক্ষার্থী-সুলভ প্রচেষ্টা ব্যতীত প্রিন্টে কোনও বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না। এ বিভাগে লিপিকা গুপ্ত ও কুমারেশ ব্যানার্জীর নাম করা যায়। রঙীন স্কেচ ও কম্পোজিশনের দিক থেকে দুজন দৃষ্টি আকর্ষণ করেন—বি আর পানেসর ও বরেন বসু। কথাকলি নৃত্য অবলম্বনে ইমপ্রেশানিস্টিক স্কেচে (২৪নং) পানেসর প্রশংসা দাবী করতে পারেন। এই প্রসঙ্গে একই শ্রেণীর নিসর্গ দৃশ্যটিও (২৩নং) উল্লেখযোগ্য। বরেন বসু কালি ও জলরঙযোগে কাজ করেছেন। তাঁর ৫নং কম্পোজিশন অনেকের ভাল লাগে।

ভাস্কর্য নিদর্শনের মধ্যে সত্যেন মজুমদারের হেড স্টাডি কল্যাবয়সোচিত সরলতার জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাসের হেড স্টাডি (৪৮) ও কুণালকান্ত সাহার বাস্ট (৩১)এরও নাম করা চলে।

✻

সাউথ এন্ড চিলড্রেনস স্টুডিওর উদ্যোগে অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে ছেলে-মেয়েদের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। চার বছর বয়স থেকে শুরু করে ১৭ বছর বয়স্ক ২৮ জন ছেলেমেয়ের ৫৬টি রচনা প্রদর্শনীতে দেখা যায়। মাধ্যম হিসাবে তারা প্যাস্টেল জল ও তেলরঙ ব্যবহার করেছে—তাছাড়া কালি কলমের আঁকা ছবিও চোখে পড়ে।

ছবির বিষয়বস্তু সচরাচর এক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে—অর্থাৎ প্রতিকৃতি, স্কেচ, নিসর্গ তথা বহির্দৃশ্য। ঊর্মিলা দত্তর (বয়স ১৫) ইন দি সাবার্ব অনেকের ভাল লাগে। রাস্তার নলকূপের কাছে তিনজন রমণী দাঁড়িয়ে আছেন—পিছনে তিনটি কুটীর দেখা যাচ্ছে—এই পরিচিত দৃশ্যটুকু শিল্পী বর্ণনা করেছেন। মাত্র পাঁচ বছরের বালক শ্যামল দে কেবলমাত্র কয়েকটি কালো রঙের আঁচড়ের মধ্য দিয়ে ফিয়ার ছবিখানির মর্মার্থ প্রকাশ করে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে। আট বছরের বালক নারায়ণ দের প্ল্যাটফরম ছবিখানি অনেকের চোখে পড়ে। আলো-ছায়ার সুকৌশল বিন্যাসগুণে গৌতম সেনগুপ্ত (বয়স ১৪) মেলাঙ্কলি-তে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। অন্যান্য ছবির মধ্যে ভূপেন্দ্র সিংহের (বয়স ৪) কালি কলমে আঁকা ওয়ার্লড অব বিস্টস ও প্যাস্টেলে আঁকা ইন এ ড্রিম, ঊর্মিলা দত্তর কলকাতা, গৌতম সেনগুপ্তের কনগ্র্যাচুলেশনস ও সুদক্ষিণা দত্তর (বয়স ১৭) ফ্লাওয়ারি উল্লেখযোগ্য। পাঁর-

প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। প্রায় ১৬।১৭ বছর পূর্বে শঙ্কর আয়োজিত আন্তর্জাতিক ছেলেমেয়েদের প্রদর্শনী তথা প্রতিযোগিতা প্রবর্তিত হবার পরে ভারতের সর্বত্রই ছেলেমেয়েদের মধ্যে ছবি আঁকার স্বাভাবিক স্পৃহা জেগেছে এবং বহু সংস্থাই এ জাতীয় প্রদর্শনীর আয়োজন করছেন। প্রায় প্রত্যেক প্রদর্শনীতে দু'একটি শিশু প্রতিভার সন্ধান মেলে। সুতরাং যে সংস্থাগুলি এ জাতীয় প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন তাঁরা যদি কেবলমাত্র পুরস্কার দিয়েই মনে করেন যে তাঁদের কর্তব্য শেষ হল তাহলে তাঁরা ভুল করবেন। যে যে বালক বালিকার মধ্যে প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় তাদের ওপর লক্ষ্য রেখে তারা যাতে নিয়মিত অঙ্কনবিদ্যা শিক্ষা করে সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারে সে বিষয়েও কর্তৃপক্ষের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ সম্ভাব্য বালক তথা বালিকা শিল্পীদের বাৎসরিক রেকর্ড রাখা একান্ত কর্তব্য—নতুবা এ জাতীয় প্রদর্শনী কেবলমাত্র বাৎসরিক আনন্দমেলায় পরিণত হবে।

—চিত্রপ্রিয়

গ্রীষ্মের জন্য

গ্রীষ্মের পরিবেশনে ঘোলবড়া অতি উপাদেয়। উপকরণ : মাষকলাই ডাল আধপোয়া, সরষের তেল এক ছটাক, নুন, আদা, হিং, জিরে আন্দাজমত, তিন পোয়াটাক ঘোল আর একটি বা দুটি শুকনো লঙ্কা।

প্রণালী :

১। মাষকলাই ডাল ভিজতে দেবেন।

২। আদা মিহি কুচি করে কাটুন ও হিং অল্প জলে গুলে নিন।

৩। সামান্য হিং, জিরে আর শুকনো লঙ্কা সেঁকে গুঁড়ো করবেন। ঘোলে নুন মিলিয়ে রাখবেন।

৪। ডাল মিহি করে বেটে নুন, আদা-কুচি, হিং গোলা মেশাবেন।

৫। এবার বড়ির ডালের মত করে খুব ফেটাবেন। একবাটি জলে এক ফোঁটা ডাল ফেললে যদি ভেসে থাকে তবে বুঝবেন ভাল ফেটেছেন।

৬। এবার তেল চড়িয়ে বড়া ভেজে ঘোলে ফেলুন আর উপরে হিং জিরে আর শুকনো লংকার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিন।

আমের মুকুলের অম্বল

এখনও যদি কোথাও আমের মুকুল মেলে তবে পরীক্ষা করবেন আর না হলে সামনের বছরের জন্য রইল। উপকরণ ও পরিমাণ : হাতখানেক লম্বা আমের মুকুলের দুটি ডাল, হলুদ, সরষে, শুকনো লংকা, নুন, তেঁতুল দুই ছড়া, ছোলার ডাল এক ছটাক, জল আধ সের, সরষের তেল দু' ছটাক, পাঁচফোড়ন সামান্য।

প্রণালী :

১। ছোলার ডাল ভিজিয়ে, পিষে, ফেটিয়ে রাখুন।

২। হলুদ, সর্ষে শুকনো লঙ্কা পিষে রাখুন এবং ঐ আধ সের জলে তেঁতুল গুলে রাখুন। তেঁতুলের ছিবড়ে ফেলে ঐ জলে বাটা মশলাটি গুলে দেবেন।

৩। আমের মুকুল টুকরো করে কাটুন এবং তেল পাকপাত্রে দিয়ে প্রথম বড়া ও পরে আমের মুকুল ভাজবে।

৪। একটি জলসহ পাকপাত্রে তেঁতুল গোলা চড়িয়ে দিন। ফুটে এলে আমের মুকুল ও বড়া দিন এবং তিনিট দশেক রান্না করুন।

৫। এখন এক ছটাক তেলে শুকনো লঙ্কা এবং পাঁচফোড়ন দিয়ে সবটা সাঁতলে নিন এবং একটু গাঢ়ভাব হওয়া অবধি আঁচে রাখুন।

তেঁতুল পাতার ঝোল

উপকরণ ও পরিমাণ : সরষের তেল অল্পমাত্র, তেঁতুল পাতা তিনটি ডাল, জল তিন পেয়ালা, নতুন তেঁতুল এক ছড়া অথবা একটি লেবু, চিনি, নুন।

প্রণালী :

১। তেঁতুলপাতা কচি হওয়া দরকার। ডাল থেকে পাতা ছিঁড়ে রাখুন।

২। পাকপাত্রে তেল চড়িয়ে, সরষে ফোড়ন দিন ও তেঁতুল পাতা দিন।

৩। নেড়ে চেড়ে জল দিন। সিদ্ধ হ'লে লেবুর রস বা তেঁতুল মাড়ি দিয়ে দেবেন।

৪। নুন ও চিনি দিন আর দুফুট হলে নামিয়ে ঠাণ্ডা পরিবেশন করবেন।

আমাদের দেশে প্রথম অন্নের গ্রাস তিক্ত-সহযোগে হওয়া প্রশস্ত মনে করা হয়। শুক্তো, পলতার ডালনা ইত্যাদি গ্রীষ্মের রুচিকর এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্য। শ্রীমতী প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর বইতে আছে পলতার ডালনায় পটোল দিতে নেই। মায়ে ছায়ে খাওয়া নিষেধ। আজকের অনেক রান্নাতেই প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর শরণ নিয়েছি। কাজেই তাঁর নির্দেশমত একটি পলতার ডালনার প্রণালী দিচ্ছি।

উপকরণ : আলু চারটে, একটি কাঁচকলা, একটি মুলো, বড়ি-দশ-বারোটি, পলতা পাতা, নুন, সামান্য ঘি, ধনে, সরষে, হলুদবাটা, দুখানা তেজপাতা, ফোড়নের জন্য অল্প অল্প সর্ষে, সামান্য দুধ, জিরা-মরিচ বাটা সামান্য, ছিটেমাত্র চিনি ও খুব সামান্য ময়দা।

প্রণালী :

১। পলতার ডালনার প্রথম পর্ব তরকারী কাটা। মাঝারি আলুর খোসা ছাড়িয়ে ছয় টুকরো করে কাটুন। কাঁচকলার খোসা ছাড়িয়ে বারো টুকরো করে কাটুন। মুলো ছোট ছোট করে কাটুন। অন্যান্য তরকারী আন্দাজমত। পলতার কচি কচি ডাঁটা ও পাতা ছিঁড়ে নিন।

২। এবার পলতায় এবং থোড়ে নুন মাখিয়ে, আলু মুলো কাঁচকলা ভুমুরে হলুদ মাখিয়ে রাখুন।

৩। সামান্য ঘি পাত্রে চড়িয়ে বড়ি ভেজে তুলুন।

৪। বেগুন ও পলতা ছাড়া সমস্ত তরকারী ঐ ঘিতে দিন, থোড়টা নিংড়িয়ে নেবেন।

৫। তরকারী সাঁতলিয়ে তুলুন।

৬। অন্য পাত্রে জলে সর্ষেবাটা, হলুদ-বাটা এবং ধনে বাটা গুলে ছেঁকে নিন। ঐ ছাঁকা মশলা জল পাত্রের মুখ বন্ধ করে জ্বালে রাখুন।

৭। দু'তিন বলক উঠলে বেগুন পলতা সমেত সাঁতলানো তরকারী ঢেলে দিন।

৮। নুন দিন ও তরকারী সিদ্ধ হ'লে বড়ি দিন।

৯। বড়ি নরম হ'লে দুধে চিনি ময়দা ও জিরামরিচ গুলে দিয়ে দিন।

১০। এবার হাঁড়ি থেকে অন্য পাত্রে সবটা রেখে হাঁড়ি ধুয়ে আবার চড়ান।

১১। তরকারি সাঁতলানো যেটুকু ঘি আছে তাতে তেজপাতা ও সরষে ফোড়ন দিয়ে শুক্তো সাঁতলে

নিন। এরপর আদার রস দিয়ে নামিয়ে নেবেন।

১২। রোগীর জন্য হ'লে সরষে বাটা বাদ দিতে পারেন।

মসুর ডালের রকমফের

উপকরণ ও পরিমাণ : মসুর ডাল এক পোয়া, দুধ এক ছটাক, কাঁচালঙ্কা ৬টা, ঘি এক ছটাক, আদা, জল এক সের ও নুন।

প্রণালী :

১। কাঁচালঙ্কা চারটি পিষে রাখুন, বাকী দুটি কুচি করুন। আদাও কুচিয়ে রাখুন।

২। পাত্রে জল চাড়িয়ে গরম হ'লে ডাল দিন।

৩। সিদ্ধ হ'লে দুধে কাঁচালঙ্কা বাটা গুলে ঢেলে দিন। নুন দিন।

৪। হাতা দিয়ে ঘুটে দিন এবং দু'-চার ফুট হ'লে নামান।

৫। পাত্রে ঘি চড়িয়ে আদা ও কাঁচালঙ্কা কুচি ফোড়ন দিয়ে ডাল সম্বার দিন।

ডালের পোরো অতি উপাদেয় হয়। নানা মশলা বা ভাল ঘি ব্যবহার করেও পোরো হয়। আবার অতি সাধারণ পোরোও মন্দ হয় না। মুগের ডালের একটি সহজ পোরো পরীক্ষা করুন।

উপকরণ : ডাল এক পোয়া, জল তিন পোয়া, কাঁচালঙ্কা ৬টি, সরষের তেল এক ছটাক ও নুন।

প্রণালী :

১। পাত্রে জল চাড়িয়ে, জল ফুটলে ডাল দেবেন।

২। কাঁচালঙ্কা চিরে দেবেন।

৩। ডাল সিদ্ধ হ'লে কাঁচা তেল উপরে দিয়ে নামাবেন। শুকনো হবে।

টুকিটাকি

ডালে কাঁচা তেল বা ঘি দিয়ে সিদ্ধ করলে সহজে গলে। যদি ডাল পুরোনো হয়েছে বলে গলাতে দেরি হয় তবে দু'চার ফোঁটা পেঁপের আঠা দিলে গলবে। অনেকে খাবার সোডা দেন। কিন্তু সোডাতে খাদ্যপ্রাণ নষ্ট হয়। পরিমাণের একটু এদিক ওদিক হ'লে একটু গন্ধও হয়।

ডাল বা তরকারী ধরে গেলে সাবধানে অন্য পাকপাত্রে ঢেলে ফেলবেন। পোড়া অংশ সবটা বাদ দিয়ে নেবেন। তাতেও যদি গন্ধ না যায় দু'তিনটে পান ফেলে দিয়ে দেখবেন গন্ধ অনেকটা চলে গেছে।

দই যদি মাটির হাঁড়িতে পাতেন তবে ভাল। মাটির হাঁড়ির দই ফুরিয়ে গেলে খুব ভাল করে ধুয়ে নিয়ে অল্প আঁচে শুকিয়ে নেবেন। ভাল করে শুকিয়ে নিয়ে দই পেতে দেখবেন ঐ হাঁড়ির দই অনেক বেশী সময় ভাল অবস্থায় থাকে।

দই কখনও গরম করতে চেষ্টা করবেন না, তবে কিন্তু দই ছানা হয়ে যাবে।

ব্যঞ্জনে লবণ বেশী হ'লে বড় বড় করে কেটে আলু দরকার মত দিয়ে ফুটিয়ে নেবেন। কিছু লবণ ঐ আলুতে টেনে যাবে। পরে ঐ আলু অন্য তরকারীতে দিলে চলবে।

যাঁরা নিরামিষ রান্নায় পেঁয়াজ ব্যবহার করেন না তাঁরা আদার রসে হিং ভিজিয়ে তরকারিতে ব্যবহার করে দেখবেন অনেকটা পেঁয়াজের গন্ধের মত হবে।

কলাইশুটি তেলে দিলে ফট্‌ফট্‌ করে। তখন উপরে লবণ ছড়ালে সেটা বন্ধ হয়। ব্যঞ্জনে দিতে শেষের দিকে দিলে কলাইশুটির রং সুন্দর থাকে।

শ্রীমতী

॥ ৩৫ ॥

ঘর অন্ধকার করে শুয়ে থেকেও ঘুমোতে পারলো না দীপু। খালি এপাশ ওপাশ করছে। শরীরের কোনো অংশই বিছানায় ছুঁইয়ে ঠিক স্বস্তি হচ্ছে না। বসে থাকতেও ইচ্ছে করছে না, অথচ শুয়েও আরাম নেই। শয্যাকণ্টকীর মতন। এত প্রিয় বিছানাটাও আজ আশ্রয় দিতে চাইছে না তাকে।

দীপু উঠে পড়লো। তার স্যুটকেশ, টেবিলের ড্রয়ার ট্রয়ার খুঁজে খুচরো পয়সায় দু'টাকার বেশী পেল না। নাঃ, এরকমভাবে আর চলে না। একটা কিছু করা দরকার! হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় দীপু একটা চাকরির দরখাস্ত লিখে ফেলতে শুরু করলো। অবাঙালির অফিসের নামে। সমস্ত চাকরিই অপমানের, বাঙালির অফিসে চাকরি নিলে তার বেশী কি অপমান হবে? নিজের ইংরেজি লেখা সম্পর্কে বেশ একটু গর্বের ভাব আছে দীপুর, বেছে বেছে লাইন দশেক লিখলো। তারপর পড়লো সেটা আগাগোড়া, কোনো খুঁত চোখে পড়লো না—হাতের লেখাই দেবে, না টাইপ করাবে? টাইপ করাতে আবার আট আনা খরচ।

মানুষ যখন একা একা ঘরের মধ্যে থাকে, কেউ তাকে দেখছে না, তখন কিন্তু অনেক নাটকীয় বা হাস্যকর কান্ড করে। একা একা ঘরে আয়নার সামনে মুখ ভেংচিয়ে নিজের মুখটা অন্যরকম করে দেখতে চায় না, এমন মানুষ ক'জন? দীপুও তো ঘরের মধ্যে একা একা বিছানায় ছটফট করছিল, অকারণে মাথার বালিশটা উল্টে দিচ্ছিল বারবার, তারপর হঠাৎ তড়াক করে উঠে বাক্স-প্যাটরা ঘাটাঘাটি শুরু করলো, আবার খসখস করে একটা কাগজে কি লিখছে। আলাদাভাবে দেখলে এই দৃশ্যগুলোর কোনো সামঞ্জস্য নেই।

দরখাস্তটা লেখা শেষ করে দীপু আবার একটা সামঞ্জস্যহীন কাজ করে ফেললো। আসলে ভেতরে ভেতরে সে ছটফট করছে, কিন্তু কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছে না। পাজামা ছেড়ে দীপু আবার প্যান্ট-সার্ট পরলো, খুচরো পয়সাগুলো ভরলো পকেটে, দরখাস্ত লেখা কাগজটা তুলে নিয়ে আর একবার পড়লো, তারপর খাঁচ করে ছিঁড়ে ফেললো সেটা। ছিঁড়ে কুচিকুচি করে উড়িয়ে দিল জানলা দিয়ে।

বইয়ের আলমারি খুলে দেখলো, দামি বই আর বিশেষ নেই। তবু মোটামুটি খান চারেক বই নিয়ে বেরিয়ে পড়লো বাড়ি থেকে। অপর্ণাকে কিছু বললো না। বইগুলো কলেজ স্ট্রীটে বিক্রী করে মোটমাট চোদ্দ টাকা পেয়ে গেল। এত বেশী পাবে সে আশা করেনি। ধনঞ্জয়-সুকুমার ওরা আজকাল ওর হাতে বই দেখলেই কেড়ে নিত। আজ আর রাস্তায় ওদের কারুর থাকার সম্ভাবনা নেই। দীপু মনে মনে বললো, না, আমি সুকুমারের মৃত্যুর জন্য দায়ী নই!

শান্তা বারণ করেছিল ওদের বাড়িতে গিয়ে দেখা করতে। কেন, তা কিছু বলেনি। কিন্তু দীপু এখন শান্তার কাছে ছাড়া আর কোথায় যাবে? শান্তাকে সব ঘটনা খুলে না-বললে তার নিষ্কৃতি নেই। একমাত্র শান্তাই তাকে ঠিক ঠিক বুঝতে পারে—বেশী কথা বলতেও হয় না।

শান্তাদের টেলিফোন নেই—নীচতলার ডেকরেটার্সের দোকান থেকে শান্তা মাঝে মাঝে টেলিফোন করে। কিন্তু ওদের ওখানে টেলিফোন করলে ওরা সহজে ডেকে দিতে চায় না। বিশেষ কোনো ছেলে যদি শান্তার মতন মেয়েকে ডেকে দিতে অনুরোধ করে, তাহলে তো শান্তাই দেবে না—সবাই মরাল গার্জেন কিনা! তবু চান্স নেবার জন্য দীপু একবার টেলিফোন করলো।—বেজেই চলেছে, বেজেই চলেছে, কেউ ধরেই না। কাছে পিঠে বিয়ের তারিখ নেই, তাই ডেকরেটার্সের দোকানের সবাই নিশ্চয়ই ঘুমোচ্ছে এখন।

তাহলে শান্তার বাড়িতে না গিয়ে আর উপায় নেই! শান্তার এ রকম বারণ করার কোনো মানে হয় না! শান্তা বলেছে,

ভালো চা
কম খরচা

ব্রুক বণ্ড রেড লেবেল—প্রতি প্যাকেট থেকে পাবেন
আরও বেশী কাপ আর সত্যিই ভালো চা

এখন থেকে সে নিজে থেকেই দেখা করবে। কিন্তু হঠাৎ দেখা করার ইচ্ছে হলে কি হবে? ইচ্ছে নয়, দরকার—দীপুর একদিন বিষম দরকার!

শান্তাদের কলিং বেল নেই, খটখট করে কড়া নাড়ছে দীপু। দুপুরের রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে—পাশের ডেকরেটার্স-এর দোকানটা আজ বন্ধ। বাড়িতে সবাই বোধ হয় ঘুমোচ্ছে—এই সময় ডাকতে লজ্জা করে, কিন্তু না ডেকে দীপুর উপায় নেই। শান্তার দাদাকে ডাকতে হলে সে নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকতে পারতো, কিন্তু মেয়েদের নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকা যায় না।

বেশ কিছুটা বাদে দরজা খুলে দিল এ বাড়ির চাকর। জানালো শান্তা বাড়ি নেই।

দীপু একথা মানতে রাজী নয়। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, বাড়ি নেই? তুমি ঠিক জানো? যাও, আবার দেখে এসো—

—দেখেছি তো, একটু আগে দিদিমণি বেরিয়ে গেলেন।

—একটু আগে মানে কতক্ষণ আগে?

—এই তো, খানিকটা আগে—

—কোথায় গেছে?

—তা তো জানি না।

দীপু তখনও ভুরু কুঁচকে আছে। এ বাড়ির সবাই তার চেনা, আগে যখন সে এসেছে, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলেনি, সোজা ওপরেই উঠে গেছে। আগে সে এখানে এসে প্রথমেই শান্তার খোঁজ করতে পারেনি কোনোদিন, লজ্জা পেয়েছে— মাসীমার সঙ্গে, শান্তার বোনদের সঙ্গে গল্প করেছে—আর এদিক ওদিক চোখ দিয়ে খুঁজেছে শান্তাকে—শান্তার দাদাকে তো আজকাল কখনই বাড়িতে পাওয়া যায় না!

আজ দীপুর সে সব খেয়ালই নেই। শান্তা কোনো রহস্যময় কারণে এ বাড়িতে আসতে বারণ করেছিল, সেটাকে অগ্রাহ্য করেছে বলেই সে বেপরোয়া হয়ে গেছে। বাইরের লোকের মতন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থামছে। দীপু বললো, যাও ওপর থেকে জিজ্ঞেস ক'রে এসো, শান্তা দিদিমণি কোথায় গেছেন, কখন ফিরবেন!

—কে রে লক্ষণ? কার সঙ্গে কথা বলছিস?

শান্তার দিদি সুরভি নেমে এলো। ঘুম ভেঙে উঠে আসে নি, চোখে ঘুমের চিহ্ন নেই। দীপু জানে, সুরভিদির টুকিটাকি জিনিসপত্র গোছগাছ করার বাতিক আছে। এখানকার জিনিস অনবরত ওখানে সরিয়ে রাখছেন, কিছুতেই তৃপ্তি নেই। বিয়ের আগে সুরভিদির নিজের সাজগোজের ব্যাপারেও খুব যত্ন ছিল, বিয়ের পর সেটা অবশ্য একেবারেই চলে গেছে।

সুরভিদি বড় ভালো মানুষ, ওঁকে দেখলেই ভালো লাগে। সুরভিদির মুখে দীপু কোনোদিন কারুর কোনো নিন্দে শোনেনি।

—কি দীপু? ওখানে দাঁড়িয়ে! লক্ষণ তোমাকে চিনতে পারেনি নাকি?

—সুরভিদি, শান্তা কোথায়?

সুরভি মুখে কোনো বিস্ময় ফোটালো না। দীপু যে শান্তার খোঁজ করতে আসবে—এইটাই যেন সবচেয়ে স্বাভাবিক ব্যাপার, এই রকম ভাবে বললেন, ওপরে যুমোচ্ছে বোধ হয়। এসো, তুমি বসবে এসো। লক্ষণ শান্তাকে ডাক—

লক্ষণ আবার জানালো যে, শান্তাকে সে বেরিয়ে যেতে দেখেছে। বি এস সি পাশ করে এম এস সি-তে ভর্তি হতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত ভর্তি হয়নি শান্তা। কি কারণে, তা সে নিজেই [illegible] বলেনি। এখন দুপুরের [illegible] বাড়ি থাকারই কথা।

দীপু জিজ্ঞেস করলো, সুরভিদি শান্তা কোথায় গেছে জানেন?

সুরভি হেসে বললেন, শান্তা কখন কোথায় যায়, তাতো আমাকে বলে যায় না। এমনও হতে পারে যে তোমার সঙ্গেই দেখা করার জন্য বেরিয়েছে!

—আমার সঙ্গে? কোথায়?

সুরভি আবার হেসে বললো, বাঃ, আমি সেটা জানবো কি করে! সেটা তো তোমারই জানার কথা।

দীপু এবার লজ্জা পেল। মুখ নিচু করে বললো, না, আমার সঙ্গে তো [illegible]

সুদীর্ঘ কেশ পরিকল্পনা-

চুল থাকতে চুলের যত্ন নিন। অল্পবয়স থেকে চুলের সর্বাঙ্গীন যত্ন নিতে সিংহমার্কা নারকেল তেলের জুড়ি নেই। বাছাই করা নারকেলের শাঁস ভেজে নিয়ে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে এই তেল তৈরী হয়। ফলে সিংহমার্কা নারকেল তেল হয়ে ওঠে খাঁটি, গাঢ় এবং বিশিষ্ট গন্ধে ভরপুর

চুলের গোড়া শক্ত করতে, চুলকে ঘন এবং চিকন কালো করে তুলতে সিংহমার্কা নারকেল তেল অদ্বিতীয়।

সিংহ মার্কা

খাঁটি নারকেল তেল

চুল থাকতে চুলের মর্ম বুঝুন।

হিন্দুস্থান কোকোনাট অয়েল মিলস্

দেখা করার কথা নেই! অনেকদিন দেখা হয়নি।

—শান্তাও তাই বলছিল! আমি শান্তাকে জিজ্ঞেস করলাম তোমার কথা, কাল না পরশু, কালই তো—শান্তা বললো, তোমার সঙ্গে নাকি ওর দেখা অনেকদিন দেখা হয়নি! হয়তো তোমার বাড়িতেই গেছে। একটু বসবে? শান্তা হয়তো তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে পারে!

দীপু লোকজনা করতে লাগলো। সে এখনো এসেছিলো শান্তা তার বাড়িতে গেছে—এটা যেন ঠিক বিশ্বাস হতে চায় না। শান্তা আর কোথায়ই বা যাবে!

—এসো, চা খাবে নাকি? আমি চা খাবার জন্যই নিচে নেমে এলাম!

দীপুর আজ মিথ্যা কথা বলার কোনো ক্ষমতা নেই। শান্তার সঙ্গে যখন দেখা হয়, শান্তাকে সে একটাও মিথ্যা কথা বলতে পারে না। আজও মনটা সেই রকম ভাবেই প্রস্তুত হয়ে আছে। সে বললো, না, সরোজদি, আমি চা খাবো না। কিছু খেলেই আমার বমি হয়ে যাচ্ছে আজ—

—ওমা, সে কি? কেন, এ রকম হচ্ছে কেন?

—খালি পেটে খেয়েছি তাই।

—আর সেই অবস্থায় তুমি রোদ্দুরে ঘুরে বেড়াচ্ছো? এসো তোমাকে ঠাণ্ডা সরবৎ করে দিচ্ছি। দুপুরে কি খেয়েছো?

—কিছু না।

—কিছুই খাওনি? চিঁড়ে ভিজিয়ে খাবে? জলে নুন দিয়ে চিঁড়ে দিয়ে—খেয়ে দ্যাখো, ভালো লাগবে।

অপর্ণাও তাকে সঙ্গ দিতে ছোটবেলাতে ফেরাচ্ছিল, তখন দীপু বুঝতে পারলো—এখন সরোজদির অনুরোধ সে এড়াতে পারলো না। ওপরে আর উঠলো না দীপু, একতলাতেই বারান্দার পাশে বসে বসলো, সরোজদি তাদের জন্য দীপুর চিঁড়ের যোগাড় যন্ত্র করতে লাগলো।

এখন আর অতটা খারাপ লাগছে না, চামচে দিয়ে একটু একটু করে চিঁড়ে মুখে তুলছে দীপু। মনের ভেতরটা অবশ্য এখনো বিশ্রী হয়েই আছে, খিদেও পাচ্ছে না তেমন।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে সরোজদি জিজ্ঞেস করলো, দীপু, তোমার মুখে খাওয়ানিতে ওরকম ভাবে কাটলো কি করে?

উত্তর না দিয়ে দীপু সরোজদির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। শান্তা এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে, করতোই, দীপু ঠিক যা হয়েছে তা-ই বলতো। সরোজদিকে অত কথা বলার মানে হয় না। কিন্তু মিথ্যে কথাও আজ বলতে পারবে না—দীপু লাজুক ভাবে হেসে বললো, এই-ই—

সরোজদি বললো, করে নাও, যদ্দিন বয়েস আছে! মারামারি হুড়োহুড়ি—না খেয়ে দুপুর রোদ্দুরে ঘোরা—এই দেখো না, শান্তাও তো খেয়ে উঠেই রোদ্দুর মাথায় করে বেরিয়েছে—বিয়ের আগে আমিও এ রকম করতাম! তখন খুব ভাল লাগতো, বন্ধুদের সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরা—হঠাৎ যে-কোনো সিনেমা হলে ঢুকে পড়তাম। কলেজ ক্যান্টিনে কাপের পর কাপ চা—এখন আর ওসব হয় না। বিয়ের পর আর এসব হয় না!

—আপনি আপনার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে যান না?

—বন্ধু কোথায়! বিয়ের পর মেয়েদের আর কোনো বন্ধু থাকে! আর মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেলে, মেয়েদের আর বাইরের জীবন বলে কিছুই থাকে না। বিয়ের আগেই বেশ ছিলাম।

—সরোজদি, শান্তা তো এলো না! আমি তাহলে এখন যাই!

—বলে! আচ্ছা, ঐতো—শান্তাকে কিছু বলতে হবে?

—আচ্ছা, আমি আর একটু বসে যাই। দেখি, যদি আসে—

—তুমি আজ খুব উতলা হয়ে আছো, মন ঠিক করতে পারছো না বুঝি?

—এক একদিন এ রকম হয় না? কি কারণ, তা নিজেও ঠিক করা যায় না।

—দীপু, তুমি শান্তাকে খুব ভালোবাসো না?

একটুও লজ্জা পেল না, দীপু উত্তর দিল, হ্যাঁ।

—কিন্তু, এ কি রকম ভালোবাসা তোমাদের! কি রকম যেন একটা আলগা আলগা ভাব—তুমি কোথায় একা একা ঘোরো, শান্তা এদিকে—

—ক'বার দেখা হলো, তার ওপর কি ভালোবাসা নির্ভর করে।

—হয়তো তাই! আমাদের সময় অন্য রকম ছিল! আমাদের সময় আমরা এক মুহূর্ত চোখের আড়াল করতে পারতাম না!

—আমাদের সময় বললেন কি! আপনি কি বুড়ি নাকি?

—এখন দশ বছর আগে মানেই অনেক কাল! এত তাড়াতাড়ি সব কিছু বদলে যাচ্ছে—

—সুরীতিদি, আমি আর বসবো না, যাই এবার!

—আচ্ছা—

—শান্তা যদি ফেরে, ওকে একটু বলবেন বাড়িতে থাকতে? আমি সন্ধ্যার পর আবার আসবো—

সুরীতি একটু চিন্তিত ভাবে বললো, সন্ধ্যার পর? আচ্ছা, বলবো ওকে, তবে সন্ধ্যার সময় রমেনদা আসবে—আমাদের সবাইকে কোথায় যেন নিয়ে যাবার কথা—

দীপুর হঠাৎ চিৎকার করতে ইচ্ছে হলো, ওসব রমেনদা ফমেনদা কিছু শুনতে চাই না! আমি বলছি শান্তা থাকবে, ব্যাস, আর কোনো কথা নয়!

কিন্তু সুরীতিকে দীপু সত্যিই বেশ সম্ভ্রম করে, তার সামনে চেঁচিয়ে উঠতে পারবে না। সে আস্তে আস্তে বললো, আচ্ছা ওকে বলবেন বিশেষ কোনো জরুরী ব্যাপার না হলে, শান্তা যেন না বেরোয়, বাড়িতেই থাকে। আমি আবার আসবো—

—আচ্ছা, তাই বলবো। শোনো শোনো দীপু, দাঁড়াওতো একটু। দেখি, তোমার হাতটা দেখি?

—হাত?

—আমি এখন হাত-দেখা শিখছি। তোমারটা দেখি তো!

দীপুর শক্ত হাতখানা সুরীতি আলতো-ভাবে বেশ কিছুক্ষণ ধরে রইলো। মুখখানা খুব বিজ্ঞ হয়ে গেছে তার। মুখ তুলে আস্তে আস্তে বললো, মেয়েরা অনেক কষ্ট সহ্য করতে পারে। ভুলে যেতেও খুব বেশী দিন লাগে না। কিন্তু পুরুষ মানুষকে কষ্ট পেতে দেখলে আমার খুব খারাপ লাগে।

—হঠাৎ এ কথা বলছেন কেন?

—দীপু, তোমাকে আমি অনেক ছোট বয়েস থেকে দেখছি। আমার কাছে তুমি এখনো ছেলেমানুষ। তোমাকে কষ্ট পেতে দেখলে আমারও সত্যিই খুব খারাপ লাগবে। কিন্তু তুমি শিগগিরই একটা দারুণ আঘাত পাবে।

হাত টেনে নিয়ে সামান্য একটু হেসে দীপু বললো, এই! হয়তো, আপনি যা বলছেন, সে রকম দারুণ আঘাত আমি ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছি। সেটা সামলেও উঠেছি!

—না, সেটা এখনো পাওনি। তুমি এর মধ্যে কি আঘাত পেয়েছো আমি জানি না—কিন্তু যে-টা পাবে, সেটা বড় সাংঘাতিক!

—সুরীতিদি, আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন!

—না, তোমাকে ভয় দেখাচ্ছি না। আমার যদি কোনো ক্ষমতা থাকতো তোমার সেই আঘাতের সম্ভাবনা দূর করবার—আমি নিশ্চয়ই করতাম। কিন্তু আমার সে ক্ষমতা নেই।

—এটা তো হাত-দেখার কথা নয়। এটা আপনি এমনিই বলছেন। কি? কি ব্যাপার বলুন তো?

—না, না, এটা তোমার হাতেই আছে। তোমার ফেট লাইনে।

—ওসব কথা ছাড়ুন! কি হবে কি? আমি কিসে আঘাত পাবো আপনি কি করে জানলেন? আমি অনেক কিছুতেই আঘাত পাই না—

—তা হলে তো খুব ভালো কথা। তা যদি হয়—

রাস্তায় বেরিয়ে দীপু কিছুক্ষণ সুরীতির কথা ভাবলো। সুরীতিদি কি যেন বলতে চাইছে তাকে, অথচ স্পষ্ট করে বললো না। মেয়েদের সব ব্যাপারেই একটু রহস্য করা স্বভাব, খোলাখুলি কিছুই বোঝাতে পারে না। যাক গে, ওসব হাত দেখার গাঁজাখুরি নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই তার।

পাঁচ মাথার মোড়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো, যদি শান্তা আসে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দীপুর পা ব্যথা হয়ে গেল, শান্তা এলো না। এখন রাস্তায় রাস্তায় ঘোরা কিংবা বোকার মতন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকার কোনো মানে হয় না। সে এখন অনায়াসেই দাদার বাড়িতে যেতে পারে।

—কি দীপু চন্দর, এ বাড়ির রাস্তা যে ভুলেই গিয়েছিলে!

রতনদার সঙ্গে সত্যিই অনেকদিন দেখা হয়নি দীপুর। রতনদা আর শুভ্রা সেজে গুজে কোথা থেকে যেন ফিরছেন। দীপু জিজ্ঞেস করলো, রতনদা, আজ অফিস যান নি?

—না ভাই, আজ কাট মেরে দিলাম। আজ তোমার শুভ্রাদি'র জন্মদিন, ওরই বাবা মা-কে প্রণাম করতে গিয়েছিল, একটা নেমন্তন্ন জুটে গেল। অনেকদিন বাদে গুড অ্যান্ড ব্যাড খাওয়া হলো, বুঝলে। অবশ্য নেমন্তন্নটা রাত্তিরেই ছিল, কিন্তু আমাদের এখানে ক্লাবে আবার ব্রিজের টুর্নামেন্ট চলছে, আমি ক্লাবের সেক্রেটারি—আমার না থাকলে চলে না—

একবার শুভ্রার জন্মদিনে দীপু ওকে দু' খানা রুমাল কিনে উপহার দিয়েছিল। শুভ্রা অবশ্য প্রথমে নিতে চায় নি, রুমাল উপহার নিলে নাকি বিচ্ছেদ হয়ে যায়—শেষ পর্যন্ত দু' টো রুমালের জন্য দু' পয়সা দাম দিয়েছিল শুভ্রা। তখন শুভ্রার জন্মদিন দীপুর মনে থাকতো।

শুভ্রা আপন মনে পান চিবোচ্ছে, দীপুর দিকে একবারও তাকায় নি। যেন তার স্বামী রাস্তায় দাঁড়িয়ে বাড়িওয়ালা কিংবা খবরের কাগজের হকারের সঙ্গে কথা বলছে, ওদিকে তার মনোযোগ দেবার দরকার নেই।

রতন বললো, মাধুরী যেদিন চলে গেল, আমি আশা করেছিলুম, সেদিন অন্তত তুমি আসবে।

দীপু দারুণ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, বউদি চলে গেছে? কোথায়?

—তুমি জানো না? প্রথমে যাবে এলাহাবাদ, তারপর সেখান থেকে...

—দাদা সঙ্গে গেছে?

—তোমার দাদা? তার সময় কোথায়? তাকে দেশ উদ্ধার করতে হবে না?

হঠাৎ খুব অভিমান হলো দীপুর। বউদি তাকে এত ভালোবাসতো, অথচ যাবার সময় একটা খবরও দিয়ে গেল না? অবশ্য দীপুও বেশ কয়েকদিন এদিকে আসতে পারে নি—কিন্তু বউদি তো একটা চিঠিও লিখতে পারতো!

দীপু থমকে দাঁড়িয়ে বললো, তা হলে তো দাদার ঘর বন্ধ?

রতন হা-হা শব্দে হেসে বললো, দাদার ঘর বন্ধ বলে কি তুমি ফিরে যাবে নাকি? কেন, আমরা কি কেউ নই? তোমার দাদার ঘর বন্ধ থাকলেও চাবি তো রেখে যায় শুভ্রার কাছেই। এসো, ওপরে এসো—।

(ক্রমশ)

গোবিন্দ মাণিক্য ও তাঁর মুদ্রা

'দেশ' পত্রিকার ৭ই চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত আগরতলা নিবাসী শ্রীসুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গোবিন্দমাণিক্যের মুদ্রা' প্রসঙ্গে প্রকাশিত আলোচনার জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে লেখক হিসেবে আমাদের কিছু বক্তব্য রাখতে চেষ্টা করছি।

শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় গোবিন্দমাণিক্যের মুদ্রায় শিবলিঙ্গ প্রথম উৎকীর্ণ করা সম্বন্ধে প্রশ্নটি তুলে ভালই করেছেন। কারণ এই প্রসঙ্গে যে মুদ্রণ প্রমাদ ঘটেছে সেটা অবহেলিত থেকে যেতো। ত্রিপুরার মুদ্রায় শিবলিঙ্গ চিহ্ন যে গোবিন্দের সময়ই প্রথম নয় সে সম্বন্ধে আমরা পূর্ণ অবহিত এবং গোবিন্দ পিতা কল্যাণমাণিক্যের মুদ্রায় যে শিবলিঙ্গের উল্লেখ সুপ্রসন্নবাবু 'রাজমালা'র উদ্ধৃতি দ্বারা বলতে চেয়েছেন তাও আমাদের জানা। তবে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় রাজমালায় যে মুদ্রা ও তার মুদ্রিত প্রতিলিপির উল্লেখ করেছেন এবং যাতে শিবলিঙ্গ উৎকীর্ণ রয়েছে বলে মনে করছেন—সেটি আদৌ শিবলিঙ্গ চিহ্ন নয়। এ বিষয়ে সুপ্রসন্নবাবু এবং রাজমালা উভয়েই ভ্রান্ত। ওই চিহ্নটি কল্যাণের পূর্ববর্তী বিভিন্ন রাজাদের মুদ্রায় মুদ্রিত অতি সুপরিচিত 'অর্ধ চন্দ্র' চিহ্ন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে শুধু কল্যাণ মাণিক্যেরই নয়, তার পুত্র গোবিন্দমাণিক্যের রাজ্য লাভের প্রায় এক শত বৎসর আগের ত্রিপুরেরাজ বিজয়মাণিক্যের মুদ্রাতেও শিবলিঙ্গ চিহ্নের প্রমাণ আমাদের কাছে বর্তমান। সুতরাং শিবলিঙ্গ চিহ্ন সম্বন্ধে আমরা যে অবহিত ছিলাম না—যা সুপ্রসন্নবাবু ভেবেছেন তা ঠিক নয়। যে মুদ্রণ প্রমাদটি ঘটেছে "এইপ্রথম শিবলিঙ্গ চিহ্ন উৎকীর্ণ করা হ'ল") তার সঠিক পাঠ হবে— এই প্রথম "শিবঃ" ও লিঙ্গ চিহ্ন উৎকীর্ণ করা হল। লিঙ্গ চিহ্ন সমেত শিবঃ কথাটি সম্ভবত এই প্রথম যুক্ত হলো, যা আমরা বলতে চেয়েছি।

দ্বিতীয়ত নক্ষত্রমাণিক্যের মোগল সহায়তা প্রসঙ্গে সুপ্রসন্নবাবুর যা বক্তব্য তাতেও আমরা মনে করছি প্রমাদ রয়েছে। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় ধরে নিয়েছেন যে আমরা মোগল সৈন্য বাহিনীর সহায়তার কথা বলতে চেয়েছি। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য এই—আমরা 'আনুকূল্য' শব্দটি ব্যবহার করেছি কিন্তু সৈন্য বাহিনীর উল্লেখ একবারও করিনি। কারণ ওই ব্যাপারে যখন বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন মত পোষণ করেন তখন যুক্তি পরম্পরায় অনুমান নির্ভর হওয়া ছাড়া উপায় নেই। আনুকূল্য প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য এই যে নক্ষত্রের মোগল রাজ দরবারে উপস্থিতি, পালিয়ে অথবা দূত হিসাবে, সেটা প্রায় প্রমাণিত। এখন, সেই সময় যে ত্রিপুরা রাজ্য মোগলের রাজশক্তির কাছে আংশিক বশ্যতা স্বীকার করেছিল তারই প্রতিষ্ঠিত রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করার ব্যাপারে মোগল শাসন কর্তা একেবারে উদাসীন এটা ঐতিহাসিক যুক্তিতে ভাবতে অসুবিধে হয়। নক্ষত্র যে পরোক্ষ অথবা প্রত্যক্ষ আনুকূল্য পেয়েছিলেন সেটাই বরং সুদৃঢ় ঐতিহাসিক যুক্তি সমর্থন করে। আনুকূল্যের অভিধানিক অর্থ সহায়তা, পোষকতা, অনুগ্রহ ইত্যাদি ধর্মীয় ব্যাপারে বিক্ষুব্ধ প্রজাবর্গের সমর্থন যা শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন তাও তো অতি স্পষ্টভাবে আমাদের প্রবন্ধে উল্লেখিত সুতরাং কোন নতুন তথ্য [illegible] দেইনি।

তৃতীয়ত সুপ্রসন্নবাবু কোন [illegible] মাণিক্যের রাজত্ব কালের পরিধি প্রায় [illegible] বৎসর ধরে নিয়েছেন?, গোবিন্দমাণিক্যের রাজ্যলাভের প্রাপ্ত তারিখ ১৩ই [illegible] ১৫৮২ শক। এরপর গোবিন্দের শিলালিপিতে উল্লেখ পাওয়া যায় [illegible] কার্ত্তিক পূর্ণিমা ১৫৮০ শক। তারপর আমরা ১৫৮৩ শকে ছত্রের উল্লেখ পাই তাঁর মুদ্রায়। ছত্রের পুনরুল্লেখ আমরা পাচ্ছি ১৫৮৪ শকে উৎকীর্ণ সোনার পৃষ্ঠে একটি ধাতব অশ্ব মূর্তিতে। এরপর ছত্রের আর কোন উল্লেখ নেই। আমরা গোবিন্দের পুনরুল্লেখ পাচ্ছি ১৯ কার্ত্তিক ১৫৮৯ শকের তাম্র শাসনে। অতএব ধরে নেওয়া যায় যে ১৫৮৩ শকে কার্ত্তিক পূর্ণিমার পর কোন সময় থেকে ১৫৮৯ শকের ১৯শে

কার্তিকের মধ্যেই ছত্রের রাজত্ব সীমা। তবে গোবিন্দের উল্লিখিত তাম্র শাসনে কোথাও বলা নেই যে সেটিই তাঁর দ্বিতীয়বার রাজ্য লাভের বছর এবং ছত্র মাণিক্যের মৃত্যু সম্বন্ধে যখন নিশ্চিত কোন তারিখ এখনও নির্ণীত হয়নি সে ক্ষেত্রেও ছত্র মাণিক্যের রাজত্বকালের সময় প্রায় ছয় বছর ধরে নেওয়ার কোন সঙ্গত যুক্তি আমরা দেখি না।

চতুর্থ প্রসঙ্গে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের প্রবন্ধে কোথায় পেয়েছেন যে ১৫৯৮ শকের রামদেবের মুদ্রা তাঁর অভিষেককালীন? আমাদের প্রবন্ধে ঐ শকের উৎকীর্ণ রামদেবের মুদ্রার উল্লেখ করেছি গোবিন্দ মাণিক্যের রাজত্ব পরিধি সম্বন্ধে আলোচনা সূত্রে। কোথাও বলা হয়নি ঐটি তাঁর সিংহাসনারোহনের বৎসর। সুপ্রসন্নবাবু মন্দিরে প্রাপ্ত অসম্পূর্ণ শিলালিপির উল্লেখ করেছেন যাতে কল্যাণ গোবিন্দ ও রামের নাম লিখিত আছে সেটা গ্রহণযোগ্য প্রমাণ বলে মনে হয়নি। প্রসঙ্গক্রমে ঐ শিলালিপির ভিত্তিতে ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষা অধিকার প্রকাশিত 'শিলালিপি-সংগ্রহ' এ উল্লেখিত—'১৫৯৫ শকে রাম মাণিক্য রাজা ছিলেন'—এই উক্তিটির সমর্থন যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে, কারণ শিলালিপিতে রাজা হিসেবে রামের নাম না হয়ে রাজপুত্র হিসেবেও রামের নাম থেকে থাকতে পারে—অবশ্য যদি আদৌ ওটি রামের নাম হয়। কারণ এই শিলালিপির তারিখ ১৫৯৫ শকের জ্যৈষ্ঠ অথচ ১৫৯৫ শকের ২২শে কার্তিক তারিখে উৎকীর্ণ গোবিন্দের তাম্র শাসন পাওয়া যায়। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ যে আমরা গোবিন্দ মাণিক্যের রাজত্বকাল আলোচনা প্রসঙ্গে শিলালিপি ও তাম্র শাসনের বিষয়ে অমনোযোগী তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ আমাদের প্রবন্ধ বিশ্লেষণ করলে তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেন যে প্রবন্ধের ভিত্তিতে তাম্র শাসন ও শিলালিপির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। যে হেতু আমাদের বিশেষ লক্ষ ছিল মুদ্রা বিষয়ে এবং প্রবন্ধে আলোচিত প্রায় ৭/৮টি মুদ্রা তখনও পর্যন্ত অনালোচিত ছিল তাই স্থানাভাববশত তাম্র শাসন ইত্যাদির উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি।

পরিশেষে উল্লেখযোগ্য শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনাতেও মনে হয় দুটি মুদ্রণ প্রমাদ থেকে গেছে—

(১) রাজমালার ২৮৩ পৃষ্ঠার বদলে ২৩৮ পৃষ্ঠা হবে।

(২) ১৮৫৩ শকের জায়গায় ১৫৮৩ শক হবে।

শ্রীবসন্ত চৌধুরী
শ্রীপরিমল রায়

॥ ২ ॥

গত ২৪শে মার্চ সংখ্যায় আমার 'গোবিন্দমাণিক্যের মুদ্রা' সংক্রান্ত আলোচনাটি প্রকাশের জন্য প্রথমে ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু ঐ আলোচনায় একটি মুদ্রণ প্রমাদ চোখে পড়লো। পত্রিকার ৮০৭ পৃষ্ঠার প্রথম কলমের অষ্টম লাইনে ছাপা হয়েছে—"রাজমালার উক্তি ছাড়াও ১৫৮৩ শকে প্রচারিত কল্যাণমাণিক্যের শিবলিঙ্গ ও সিংহমূর্তিযুক্ত মুদ্রার উল্লেখ পাওয়া যায় কালীপ্রসন্ন সেন সম্পাদিত রাজমালার তৃতীয় লহরের ২৮৩ পৃষ্ঠায়।" ঐ লাইনে কল্যাণমাণিক্যের মুদ্রার শকাব্দ ও রাজমালার পৃষ্ঠাঙ্ক ভুল ছাপা হয়েছে। ঐ লাইনটির পাঠ হবে এরকম:—"রাজমালার উক্তি ছাড়াও ১৫৪৮ শকে প্রচারিত কল্যাণমাণিক্যের শিবলিঙ্গ ও সিংহমূর্তিযুক্ত মুদ্রার উল্লেখ পাওয়া যায় কালীপ্রসন্ন সেন সম্পাদিত রাজমালার তৃতীয় লহরের ২৩৮ পৃষ্ঠায়।"

এই সংশোধনটুকু প্রকাশিত না হলে আমার বক্তব্য সম্বন্ধে অনেকের মনে সংশয় দেখা দিতে পারে।

সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
আগরতলা

উচ্চশিক্ষার সমস্যা

গত ২১ সংখ্যায় 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত সমীরকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উচ্চ শিক্ষার সমস্যা' প্রবন্ধটির জন্যে লেখক ও দেশ কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই। কেননা শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে যে নৈরাজ্য চলছে এবং যা ভেবে আমরা প্রায় সকলেই মনেপ্রাণে শঙ্কিত, তার একটা বিশদ চিত্র লেখক তাঁর এই প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। আলোচনাটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুলিখিত ও যুক্তিপূর্ণ।

লেখক trust বা অছি কলেজগুলো সম্বন্ধে যা বলেছেন তা ভেবে দেখার মতন। এই-ই যদি যথার্থ চিত্র হয়, তবে এর প্রতিকার অবশ্যই দরকার। পশ্চিমবঙ্গে, শুনেছি এ ধরনের বহু কলেজ আছে এবং এ কলেজগুলো সম্বন্ধে আমাদের ধারণাও খুব স্পষ্ট ছিল না, সমীরবাবুর প্রবন্ধে তার চিত্র পেয়ে আমরা চমকে গেছি। রীতিমত স্তম্ভিতও। সবচেয়ে ভয়ের ব্যাপার, trust আইন অনুসারে বাইরের কোন লোক trust কলেজগুলোতে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না, অথচ এসব কলেজ নাকি অনেক ক্ষেত্রে জমিদারী প্রথায় চলে; তা চলুক, আমাদের কোনই আপত্তি নেই, আপত্তি এখানেই, যদি কলেজের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা থাকে, যদি পড়াশুনোর ক্ষতি হয়, এবং আবহাওয়া পারস্পরিক প্রতিকূল বোঝা-পড়ার বিষ বাষ্পে দূষিত হয়; যদি এমন হয়, এঁদের অযোগ্যতার প্রশ্রয়ে সামগ্রিকভাবে শিক্ষার কাজ ব্যাহত হচ্ছে, তবেই প্রশ্ন ওঠে। শিক্ষাটা যেহেতু জাতীয় স্বার্থ, সেজন্যে মুষ্টিমেয়ের সংকীর্ণ স্বার্থপর দুষ্টিভঙ্গির জন্যে তার অমঙ্গল হতে পারে না, হতে দেওয়া উচিতও নয়। সমীরবাবু স্পষ্টতই বলেছেন, 'নির্বাচন এবং বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই খামখেয়ালিত্ব ও পক্ষপাতিত্ব শুধুমাত্র অধ্যক্ষের ক্ষেত্রেই সীমিত নয়—বহু অধ্যাপকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।' এ থেকে ব্যাপারটা আমাদের কাছে অনেকখানি বোধগম্য হচ্ছে। দলমত নির্বিশেষে যে কোন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই মনে করেন, প্রয়োজন হলে trust কলেজের আইন পরিবর্তন করতে হবে, সরকার বা ইউনিভার্সিটির হস্তক্ষেপ প্রয়োজনবোধে অপরিহার্য। কর্তৃপক্ষের অনুগ্রহপুষ্ট মুষ্টিমেয় কয়েকজনের খেয়াল চরিতার্থ করার জন্যে বৃহত্তর স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়া উচিত নয় নিশ্চয়ই। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলই অবহিত হবেন আশা করি।

শ্রীঅমূল্য সেন
মুর্শিদাবাদ

॥ ২ ॥

"দেশ"-এর ৭ই চৈত্র সংখ্যায় উচ্চশিক্ষার সমস্যা প্রসঙ্গে শ্রীসমীরকুমার গঙ্গোপাধ্যায় যা বলেছেন তার অনেক কিছুর সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু সমীরবাবু বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার প্রথম যে ত্রুটিটি বের করেছেন তা হ'ল ইংরেজী শিক্ষাদানে অযত্ন। তিনি বিদ্যাসাগর-রামমোহনের নজীর দিয়ে বলেছেন, আধুনিক জগতে টিকে থাকতে হলে "সকল বিদেশী ভাষার মধ্যে অগ্রণী" ইংরেজী না শিখে গতি নেই।

যেসব ইংরেজীপ্রেমীরা পৃথিবীর ইংগমণ্ডলের বাইরে তাকিয়ে দেখতে অনিচ্ছুক, তাঁরা এ ধরনের কথা বলেই থাকেন। জাপান যে আধুনিক প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে আছে তা অনস্বীকার্য; অথচ জাপানের শিক্ষামন্ত্রণালয়ের নিযুক্ত একটি কমিশনের মতে—গত একশ' বছর ধরে ইংরেজীকে বিদ্যালয়ে অবশ্যপাঠ্য বিষয় হিসেবে রেখে জাপানের কোনোই লাভ হয় নি, বরং অনেক টাকা, সময়, শক্তি জলে গেছে, যা আরো গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত করা যেত। তাই ১৯৭৩ সাল থেকে ইংরেজীকে ঐচ্ছিক বিষয় করে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জাপানী সরকার। এই সিদ্ধান্ত, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের সিদ্ধান্ত, যেদিন ভারত সরকার নেবেন, সেইদিনই আমরা প্রকৃত স্বাধীনতা পাব। সমীরবাবু মনে করেন যে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের ইংরেজী জ্ঞানের অভাবের কারণ শিক্ষকদের অযোগ্যতা এবং শিক্ষা বিভাগের অবহেলা; ছাত্রছাত্রীদের

মধ্যে যে বিদেশী ভাষা শিখবার সহজাত-অপটুতা থাকতে পারে এই সম্ভাবনাটা কি একেবারে উড়িয়ে দেবার মতো? ৫৪ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেছিলেন..."মাতৃভাষা বাংলা বলিয়াই কি বাঙালীকে দণ্ড দিতেই হইবে। এই অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য সে চিরকাল অজ্ঞান হইয়া থাক—সমস্ত বাঙালীর প্রতি কয়েকজন শিক্ষিত বাঙালীর এই রায়ই কি বহাল রহিল। যে বেচারা বাংলা বলে সে-ই কি আধুনিক মনুসংহিতার শূদ্র। তার কানে উচ্চশিক্ষার মন্ত্র চলিবে না? মাতৃভাষা হইতে ইংরেজী ভাষার মধ্যে জন্ম লইয়া তবেই আমরা দ্বিজ হইব?" আমার খুবই আশ্চর্য লাগল যে সমীরবাবুর মতে "যে ছাত্র বাংলায় ভালো, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে ইংরেজীতেও ভালো।" কথাটা সত্য নয়; মাতৃভাষা শেখা আর বিদ্যালয়-পরিবেশে বিদেশী ভাষা শেখার মধ্যে যে একটা প্রকৃতিগত পার্থক্য রয়েছে এটা খুবই প্রাথমিক ভাষাতত্ত্ব থেকে জানা যায়। তা ছাড়া বিদেশী ভাষাটি মাতৃভাষার কাছাকাছি, না দুটি ভাষার মধ্যে অনেকখানি ব্যবধান রয়েছে—এর উপরেও নির্ভর করে, ছাত্রের মাতৃভাষা জ্ঞান আর বিদেশী ভাষার পটুতা পরস্পর সম্পৃক্ত কিনা।

মূল প্রশ্নটিই আমরা এড়িয়ে যাচ্ছি। আমাদের সামনে দুটি পথ খোলা রয়েছে: হয় ইংরেজীর মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা দেওয়া, নয় মাতৃভাষার মাধ্যমে। প্রথম পদ্ধতি বেছে নিলে শিশুর জন্মের পর থেকেই তাকে ইংরেজী শেখানো বাঞ্ছনীয়, নইলে তার ব্যক্তিগত চিন্তা আর বৈজ্ঞানিক চিন্তার ভাষা পার্থক্যের দরুন তার চিন্তায় অসামঞ্জস্য দেখা দেবে; বাংলা ভাষায় বই আর ইংরেজীতে জ্ঞান অর্জন করব এ ঠিক করলে জ্ঞান আর জীবনের মধ্যে বিচ্ছেদ আসতে বাধ্য। দ্বিতীয় পদ্ধতি বেছে নিলে মাতৃভাষা শিক্ষার মান নিশ্চয়ই অনেক উন্নত করতে হবে; এ ব্যাপারে আমি সমীরবাবুর সাথে সম্পূর্ণ এক মত। শিক্ষা পদ্ধতির আধুনিকীকরণ আবশ্যক, শিক্ষকদের যত্ন করে প্রশিক্ষিত করতে হবে, বাংলা শিক্ষকদের আরো সতর্ক হয়ে বাছতে হবে। কিন্তু আমাদের সরকার একটা মধ্য-পথ ধরে চলতে গিয়ে দু দিকই নষ্ট করছেন।

আর একটি কথা। বিদেশী ভাষার মধ্যে অনেকগুলিই গুরুত্বপূর্ণ; ইংরেজী ছাড়া ফরাসী, রুশ আর জার্মানেরও অস্তিত্ব আছে পৃথিবীতে, আর ওই ভাষাগুলিতে যে কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্য প্রকাশিত হচ্ছে তার পরিমাণ ইংরেজীর চেয়ে কম নয়। তাই আমরা যদি মাতৃভাষাকেই উচ্চশিক্ষার মাধ্যম করি, ফরাসী, ইংরেজী, রুশ আর জার্মান এই চারটি ভাষাকেই ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে রাখা উচিত, কোনোটিই বাদ দেওয়া সমীচীন হবে না।

আমাদের ইংরেজীপ্রেমীরা প্রায়ই ভয় দেখান, যেন অসীম জ্ঞানপিপাসা মেটাবার জন্যেই তাঁরা আমাদের সবাইকে ইংরেজী একেবারে রপ্ত করিয়ে ছাড়বেন। তাঁদের জ্ঞানপিপাসা এতো সীমাবদ্ধ কেন, জানতে ইচ্ছে করে।

প্রবাল দাশগুপ্ত
কলকাতা-১৯

সরগমের নিখাদ

'সরগমের নিখাদ' রচনাটি 'দেশ'-এর মারফত পড়বার সুযোগ পেয়ে আমার মত অনেক বাঙালীই পরিতৃপ্ত হয়েছেন। তবে বর্তমান সংখ্যা (২৮শে মার্চ, ৭০) দেখে জানলাম রচনাটির আয়ু শেষ হয়ে এসেছে, আশা ছিল আরও অনেক কিছু তাঁর কলমের ভাষায় জানব—শুনব তাঁর সুরসাধনার—সংগীত সৃষ্টির অনেক বিরল মুহূর্তের কথা। তাই মনে হয় তাঁর মত লোকের জীবনকাহিনী এত অল্প কথায় শুনে মন ভরে না। আশা করি, ভবিষ্যতে আবার কখনও তাঁর জীবনের অনেক না-বলা কথার কিছু বলবেন। তাই সেদিনের পাওয়ার আশাতে আর বর্তমানে তাঁর দেওয়া রচনাটি উপহার পাওয়ার গৌরবে তাঁকে আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

পরিশেষে বর্তমান সংখ্যায় তাঁর রচনাটিতে ২।১টি ত্রুটির উল্লেখ করার জন্য মার্জনা চাইছি। তিনি একস্থানে তাঁর দেওয়া সুরে যাঁরা গান গেয়েছেন সেই শিল্পী-তালিকায় শ্রদ্ধেয় তালাত মামুদের নাম না দেখে যৎপরোনাস্তি অনুতপ্ত হলাম। যদিও আগের ২।১টি সংখ্যাতে তালাত মামুদের উল্লেখ করেছেন, তবুও বিশেষভাবে উল্লিখিত শিল্পী-তালিকায় তাঁকে ভুলে যাওয়া সমীচীন বোধ করি না। তাঁর কি একবারও মনে এল না তাঁর সুরেই একদিন তালাত মামুদ "ট্যাক্সি ড্রাইভার" ছবিতে "যায়ে তো যায়ে কাঁহা" গানটি গেয়ে দেশকে মাতিয়েছিলেন, বিমল রায়ের দেবদাস ছবিতে উনিই আবার "মিতুয়া..." গানটি গেয়ে বিদগ্ধ শ্রোতাদের মন কেড়ে নিয়েছিলেন, এমন কি তাঁরই সুরে 'সুজাতা' ছবিতে "জ্বলতে হেঁ জিসকে লিয়ে" গানটি গেয়ে বছরের সেরা গায়কের সম্মান পেয়েছিলেন। এমনি ধারা অনেক উদাহরণ আছে। তাই মনে হয় তাঁর শিল্পী-তালিকায় প্রথম চারটি পুরুষ শিল্পীর নাম হওয়া উচিত—কিশোর, মান্না, হেমন্ত ও তালাত মামুদ।

দ্বিতীয়টি হল তাঁর সুরে গাওয়া মান্না দের "পুছো না কৈসে" (মেরি সুরৎ তেরী আঁখে ছবির) গানটির প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, [illegible] গল্প বাংলা 'রিক্তা' ছবির হিন্দী রূপ। তিনি বোধ করি ভুলেই [illegible] ছবিটির গল্প বাংলা 'উল্কা' ছায়াছবি থেকে নেওয়া। সেটি রচনা করেছিলেন শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত। তাঁর স্মৃতিকথার মূল্য ও মর্যাদার কথা ভেবে এই ত্রুটিগুলি উল্লেখ করলাম, যাতে তিনি তাঁর রচনাটি সংশোধন করে নিতে পারেন।

প্রশান্তকুমার সিংহ
ধানবাদ

খাদ্য অখাদ্য

গত ৭ই চৈত্র, ১৩৭৬ সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকার 'আলোচনা' বিভাগে প্রকাশিত শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ ঘোষাল মহাশয়ের পত্রটির জন্য তাঁকে 'প্রাচীনপন্থী' বৈষ্ণব-সমাজের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রাণীহত্যা সম্পর্কে আমাদেরও বক্তব্য তিনি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন।

একই সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মুরারিপ্রসাদ গুহ মহোদয়ের পত্রের উত্তরে বলতে চাই, গৃহপালিত পশুদের জন্ম-নিয়ন্ত্রণ দ্বারাই পশুর মালিকেরা প্রাণী-সংখ্যা হ্রাস এবং আমাদের খাদ্যের উপর চাপ কমানোর ব্যবস্থা করতে পারেন। তা ছাড়া সরকারি উদ্যোগে কুকুর হত্যা যদি সম্ভব হয়, তাহলে এই ব্যাপারেও সরকারি সাহায্য আশা করা যাবে না কেন?

হেমন্তবালা দেবী
'সুভদ্রা মন্দির', পুরী

চালচিত্রে মুসলমান সমাজ

আবদুল জব্বার সাহেবের 'বাংলার চালচিত্র' নিশ্চয়ই একটা বিশেষ আকর্ষণ। ধূলি-ধূসরিত পল্লী বাংলার সুষ্ঠু সমাজচিত্র অংকনের প্রয়াস অনেক সাহিত্যিকদের আজকাল দেখা যায়। কিন্তু তাঁদের কল্পনা-রঙের ছোপটা একটু বেশী চড়া এবং সেই-জন্যে বাস্তব থেকে একটু দূরের একটা আলো-ছায়া অস্পষ্ট রূপায়ণ লক্ষ্য করি। কিন্তু জব্বার সাহেবের 'বাংলার চালচিত্র'-এর অবয়ব শরীরে বাংলা গ্রামের কাদামাটি বিলকুল লেগে আছে। এবং রচনাগুলি এত জীবন্ত সেইজন্যেই। হয়তো তাঁর লেখার মধ্যে 'মাস্টারি' গুণ তেমন বিশেষ নেই, এবং যদি থাকত তা হলে নিশ্চয়ই তাঁর অনেক রচনা আরো অনেক সুন্দর হতে পারতো, কিন্তু তাঁর লেখার মধ্যে দুর্লভ আন্তরিকতা, প্রগাঢ় সহানুভূতি আমাদের মনকে অনেকখানি নাড়াচাড়া দেয়। হিন্দু মুসলিম উভয়েরই সমাজ সমস্যা সম্পর্কে জব্বার সাহেবের স্পষ্টবাদিতায় অসাধারণ সাহসিকতার পরিচয় মেলে। নাই বা তাঁর লেখা হতে সেগুলো উদ্ধৃত করলাম।

বিশেষ করে বিভক্ত বাংলার পরবর্তীকাল থেকে মুসলমান সমাজ-জীবন সম্বন্ধে একটা বৈরাগ্য উদাসীনতা লক্ষ্য করা গেছে

একটু জিরিয়ে নিন!
একটা চারমিনার খান
এতে পাবেন টোস্ট-করা
খাঁটি তামাকের স্বাদ।
চারমিনারের স্বাদের জন্যেই আজ এর
বিক্রী ভারতের মধ্যে সব চেয়ে বেশী।
CHARMINAR
THE VAZIR SULTAN
TOBACCO CO LTD.
HYDERABAD DECCAN
৩৩ পয়সায় ১০টি
CMVS-6-253

আধুনিক সাহিত্যিকদের। মুসলমানরা একটু গোঁড়া, ধর্মীয় চেতনা একটু উগ্র এইরকম একটা ধারণা জনসাধারণে প্রচলিত; সুতরাং এদের ধর্মের বিরুদ্ধে এদের সমাজ-জীবনের বিরুদ্ধে কোন কিছু বললে পাছে তারা রুষ্ট হয় সেইজন্যে সম্ভবতঃ বেশীর ভাগ সাহিত্যিক বাংলা-দেশের বিশেষ একটা জনসমষ্টিকে খুব সতর্কভাবে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কেন? সাহিত্যিকরা তো কোন বিশেষ রাজসভার মাইনে-করা ভৃত্য নয় সুতরাং তাঁদের এড়িয়ে চলার সতর্ক পদ্ধতি সাহিত্যিক কর্তব্যচ্যুতির নামান্তর। যাই হোক, জব্বর সাহেব সেই এড়িয়ে চলা মুসলমান সমাজ সম্পর্কে তাঁর নিষ্ঠুর কটাক্ষপাত, তিক্ত সমালোচনা ও গভীর সহানুভূতি একই সঙ্গে সচেতন পাঠক-বর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এতে বাংলা-দেশের মুসলমান সমাজ আরো ভাল করে জানতে পারবে তার সমাজ-জীবনে কোন-খানে ব্যাধি ধরেছে। তাহলে আগে-আগেই শুধরে নিতে পারবে। এ ছাড়া জব্বার সাহেবের 'চালচিত্র' মারফৎ মুসলমান সমাজ অনেক কিছু জানাতে পেরেছে অন্য সমাজকে এবং জানাতে পারার যে সুযোগ তিনি দিয়েছেন তার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের সম্পর্কে অন্য সমাজের অনেক ভ্রান্ত ধারণা সহজেই নির্মূলিত হতে পারে এর থেকে। ফলে আমরা আমাদের আরো ভাল করে জানবার সুযোগ পাব। পরিশেষে লেখককে আবেদন জানাই তিনি যেন মুসলমান সমাজকে ছুঁয়ে এবং এর ব্যাধি-গ্রস্ত অংশকে নাড়া-চাড়া দিয়ে বার বার তাঁর মূল্যবান 'চালচিত্র'কে আরো বেশী আকর্ষণীয় করে তোলেন।

সাজেদুল হক
২৪ পরগণা

স্পোর্টস লাইব্রেরী

গত ১৪ই মার্চ দেশ পত্রিকায় 'খেলার মাঠে' বিভাগে 'একলব্য' স্পোর্টস লাইব্রেরী তৈরী করা বিষয়ে যা বলেছেন, জনসাধারণ, ক্রীড়ামোদী এবং ক্রীড়াবিদ্ প্রত্যেকেই তা সমর্থন জানাবেন।

আমাদের এই হাকিমদের লাইব্রেরীতেও স্পোর্টস-এর বিষয়ে নানা পুস্তক রাখা আছে, তা হাকিমদের খেলোয়াড় তৈরী করবার জন্য নয়—খেলার নানান বিষয়ে জ্ঞান উপলব্ধির জন্য। কলকাতা ভারতের ক্রীড়াকেন্দ্র। 'একলব্যর' সাথে সুর মিলিয়ে আমিও বলি এবারের ফুটবল মরসুমে একটি বা দুটি ম্যাচ নির্দিষ্ট হোক স্পোর্টস লাইব্রেরীর জন্য। তা ছাড়া মেম্বার করে ক্রীড়ারসিক এবং ক্রীড়াবিদদের কাছ থেকে যৎসামান্য চাঁদা নেওয়া হোক। তৈরী হোক একটি বোর্ড। শ্রীনিখিল তালুকদার এই জ্ঞানের আলোটি জ্বালবার ভার নিন।

অজিত বিশ্বাস
প্রাচী

কবি প্যারীমোহন

গত ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৬৯-এর "দেশ"-এ শ্রদ্ধেয় সুনন্দ তাঁর জার্নালে লিখেছিলেন—"আমার মনে পড়ে কবি অধ্যাপক প্যারীমোহন সেনগুপ্ত এইরকম একটি শব্দ-সংঘাতেই মারা গিয়েছিলেন।"

এই উক্তির মধ্যে একটু তথ্যগত ভুল ছিল। আমার স্বর্গত পিতৃদেব কবি অধ্যাপক প্যারীমোহন সেনগুপ্ত একটি পথদুর্ঘটনায় মারা যান ২০শে মে, ১৯৪৭ সালে। তিনি হাই ব্লাড প্রেসারের রোগী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর মাত্র কুড়িদিন আগে তাঁর পত্নীবিয়োগ ঘটে। সুতরাং মানসিক দিক থেকেও তিনি বিপর্যস্ত ছিলেন। তখন তাঁর গ্রীষ্মাবকাশ যাচ্ছিল। পত্নীবিয়োগের পর সেইদিনই তিনি প্রথম বাড়ির বাইরে যান। লালদীঘির উত্তর-পশ্চিম কোণে ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে (বা উঠতে গিয়ে—সঠিক কেউ বলতে পারে নি) লাইট পোস্টের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। অচৈতন্য হয়ে পড়ে যান এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

অরুণাভ সেনগুপ্ত
কলিকাতা-৯

জয়পাল সিং

১৪ই চৈত্র সংখ্যা 'দেশে' কৃতীর ক্রীড়া-ভূমিকা পর্যায়ে সদ্যপরলোকগত মারাং গোমকে' শ্রীজয়পাল সিংয়ের জীবনী পড়ে আনন্দিত হলাম। 'মুকুল' ঐ প্রবন্ধে এক জায়গায় লিখেছেন, "লেখাপড়া এবং খেলা-ধূলায় জয়পালের আন্তরিক আগ্রহ দেখে কলকাতার তখনকার লর্ড বিশপের দৃষ্টি পড়ে জয়পালের দিকে" ইত্যাদি। এ তথ্য ঠিক নয়। শ্রীজয়পালকে উন্নতির শিখরে তুলে তাঁর প্রতিভাকে লোকচক্ষে প্রকাশ করে-ছিলেন এক মানবদরদী প্রচারবিমুখ বিটিশ ধর্মযাজক। তাঁর নাম The Rev. Canon Cosgrave। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও বিপুল বিত্তের অধিকারী হয়েও এই Cosgrave সাহেব ছোটনাগপুরের আদিম অধিবাসীদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। আজও ঝাড়খণ্ডে গ্রামবৃদ্ধরা তাদের পৌত্রপৌত্রীদের কাছে শ্রদ্ধার সঙ্গে Cosgrave সাহেবের অসংখ্য মানবসেবার গল্প করে থাকে। ভারত ত্যাগ করার সময়ে ঐ মহাপ্রাণ ইংরাজ শ্রীজয়পালকে বিলাত নিয়ে যান এবং তাঁরই আন্তরিক চেষ্টায় ছোটনাগপুরের অখ্যাত গ্রামের আদিবাসী তরুণটি অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পান এবং কালক্রমে কুশলী বক্তা ও নিপুণ খেলোয়াড় হিসাবে স্বদেশ বিদেশে অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেন। শ্রীজয়পাল সিং আমার পূজনীয় পিতৃদেবের ছাত্র এবং আমাদের পরিবারের উপকারী বন্ধু ছিলেন।

শ্রীঅজিতকুমার চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা

তলিয়ে যাবার আগে

ভারতীয় দণ্ডবিধির ১০০ ধারা মতে, ধর্ষণের উদ্দেশ্যে আক্রান্ত হলে, আক্রান্তকারীকে হত্যা পর্যন্ত করা যায়; এই হত্যার কোনো অপরাধ হয় না। এর একটিমাত্র শর্ত আছে : আক্রান্ত হলে যদি সরকারী নিরাপত্তার আশ্রয় গ্রহণ করবার সময় না থাকে, তবেই হত্যার অধিকার। (৯৯ ধারা)

এই আইন সম্বন্ধে আমাদের দেশের রমণীগণ যথেষ্ট অবহিত নন। এটা জেনে রাখা ভাল তাঁদের নিজেদের স্বার্থেই। যে সব রমণীর মনে ধর্ষিত হবার সজ্ঞান বা অবচেতন ইচ্ছা নেই, তাঁরা আত্মরক্ষার এই আইনসম্মত উপায়টিকে কাজে লাগাতে পারবেন, যদি অবশ্য তাঁরা ভয়ে অর্ধমৃত হয়ে না পড়েন।

মধ্যবিত্ত সমাজ, বিশেষ করে "শিক্ষিত" মধ্যবিত্ত সমাজ, একটা গলিত শবদেহের বীভৎসতা নিয়ে ভৌতিক উপায়ে নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। নড়াচড়াটা আসলে ভ্রম। মৃত-দেহের ওপর অজস্র পোকা কিলবিল করছে, তাতে এই ভ্রম সৃষ্টি হচ্ছে। এই "শিক্ষিত" পোকারা খুঁটে খুঁটে পচা মাংস খাচ্ছে, দর্শন ও রাজনীতি আওড়াচ্ছে আর দুষ্ট সম্প্রদায়ে কালাতিপাত করছে। এদের একমাত্র উদ্দেশ্য বেঁচে থাকা, শুধু বেঁচে থাকা।

পোকার সঙ্গম থেকে জন্ম নিচ্ছে নতুন আরেক দল বিপজ্জনক পোকা, পোকান্তর বলা যায়। (রেডিও একটিভিটির ফলে মিউটেশন হয় না?) পোকান্তররা সব কিছু বেশী বোঝে, কোনো কিছু বিশ্বাস করে না এবং পচা মাংসের আইনসংগত অধিকার পায়নি। এরা তাই চায় যা কিছু এখনো ভালো এখনো সুস্থ এখনো জীবিত তাকে আক্রমণ করে পচিয়ে গলিত করে ভোজনোপ-যোগী করে তুলতে।

"শিক্ষিত" পোকাদের কেউ কেউ এই পোকান্তরদের নেতা।

মধ্যবিত্ত সমাজে, আমার বিশ্বাস, এখনো রমণীকুলই সুন্দর ও সুস্থ। কুৎসিত পোকার হাত থেকে আত্মরক্ষার দায়িত্ব এঁরা নিজেরাই বহন করবেন। পোকারা এঁদের বাঁচানোর জন্যে কখনোই চেষ্টা করবেন না। পোকার একমাত্র ধর্ম হল যেমন করে হোক বেঁচে থাকা, অন্যকে বাঁচানো নয়।

সবশেষে তলিয়ে যাবার আগে কোনো ইনসেকটিসাইড আবিষ্কৃত হবে না? এই ভয়াবহ মেটামরফসিসের চেয়ে মৃত্যুই তো ভালো।

অরুণ ভট্টাচার্য
জলপাইগুড়ি

রবীন্দ্র পুরস্কার '৭০

শ্রী আবু সয়ীদ আইয়ুব কর্তৃক ১৯৬৯-৭০এর 'রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্তি দুটি কারণে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমতঃ জন্মসূত্রে বাংলা তাঁর প্রথম ভাষা না হলেও অসাধারণ ধৈর্য এবং অনুরাগের সঙ্গে তিনি পরিণত বয়সে ও মনে এই ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা করেছেন এবং নিজ রচনায় এর সম্পদ বৃদ্ধি করেছেন। সর্বপ্রথম তথাকথিত অবাঙ্গালী কর্তৃক বাংলা সাহিত্যে পশ্চিমবঙ্গের শ্রেষ্ঠ সরকারী পুরস্কার প্রাপ্তির ঐতিহাসিক গৌরবে ভূষিত হওয়ার জন্য তিনি বঙ্গভাষী ও বঙ্গসাহিত্যপ্রেমিক মাত্রেরই গভীর কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। প্রসঙ্গত, অতীতের কতিপয় অগ্রণী অবাঙ্গালী বঙ্গ সাহিত্য ও ভাষাবিদের সঙ্গে বর্তমানের শ্রদ্ধেয় কাদার দাতিয়েনের নাম উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয়ত এবারের রবীন্দ্র পুরস্কার প্রবন্ধ গ্রন্থের প্রতি অর্পিত হওয়ায় একথা প্রতিপন্ন হল যে বর্তমানে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য বাংলা উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা ও রম্য রচনার তুলনায় অনগ্রসর থাকার অধ্যায়টি অতিক্রম করতে চলেছে। সাহিত্যের উন্নতিতে লৌকিক কথা-সাহিত্য ও কবিতার ভূমিকা প্রধান হলেও, সভ্যতার উন্নতিতে প্রবন্ধ-সাহিত্যের ভূমিকা ব্যাপকতর। বিশ্লেষণাত্মক প্রজ্ঞাসাহিত্যের, তথা দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প ও সমাজতত্ত্বের, সকল বিভাগই কোন না কোন প্রকার প্রবন্ধের মাধ্যমেই আধুনিক অর্থে প্রকাশ, সংরক্ষণ ও অনুশীলন লাভ করে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের প্রাবন্ধিক ভূমিকার মহনীয়তাকে স্বীকার করেই একথা অবশ্যমান্য যে, আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদীশচন্দ্র বসু, সগোষ্ঠী প্রমথ চৌধুরী, জগদানন্দ রায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখের প্রচেষ্টায় বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, নন্দনতত্ত্ব, সাহিত্যতত্ত্ব ইত্যাদির মননশীল আলোচনার একটি সার্থক মাধ্যম রূপে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। জীবিত বাঙ্গালী প্রাবন্ধিকদের রচনায় সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনা প্রাধান্য পেলেও—প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শ্রীঅম্লান দত্ত প্রমুখের প্রচেষ্টায় রাষ্ট্র ও অর্থনীতির ন্যায় সমাজবিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়েরও সাহিত্যগুণে সমন্বিত আলোচনা বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে উত্তরোত্তর প্রসার লাভ করছে। 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ-গ্রন্থের রবীন্দ্র পুরস্কার-প্রাপ্তি বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের এই ক্রান্তিকালীন গৌরবের স্বীকৃতি।

পরিশেষে উল্লেখ্য, উক্ত গ্রন্থে আধুনিক কাব্য আন্দোলনের প্রতীকধর্মী—শূন্যতাবাদ, আগ্রাসী অমঙ্গলবোধের প্রাবল্য ও আপাতিক-সর্বস্বতার সঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যের সৃজনশীল এবং অমঙ্গল সচেতন, অথচ মঙ্গল-মুখী আত্মবোধ ও বিশ্ববোধের তুলনামূলক আলোচনায় গভীর প্রজ্ঞার সঙ্গে শ্রীআইয়ুব এমন একটি সমভূমির সন্ধান দিয়েছেন, যেখানে ভাববাদী ও বস্তুবাদী জীবন-দর্শনদ্বয়, সকল পরস্পরবিরোধিতা

সত্ত্বেও, আত্মকেন্দ্রিকতার প্রতি অনীহার সাধারণ ভিত্তিতে একে অপরের নিকটবর্তী হ'তে পারে। তিনি দেখিয়েছেন, 'মানুষের অন্তর তো স্বয়ং সম্পূর্ণ স্বাশ্রয়ী সত্তা নয়, বিশ্বজাগতিক সত্তার আধার মাত্র। সে আধারের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে, বৈচিত্র্য আছে, তবু তা আধার—অর্থাৎ ভরে না দিলে শূন্যই থাকবে।' ('আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ'—পৃঃ ২৩০)।

কান্তি গুপ্ত
কলকাতা ৪৮

দরবারি নটী কলাবন্ত

গত ৪ঠা এপ্রিলের 'দেশ'-এ শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিত "দরবারি-নটী কলাবন্ত" নামক তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধটি পড়লাম। লেখক এক জায়গায় লিখেছেন "উত্তর বিহারের গোরক্ষপুরে 'নগর গোরক্ষনাথের নামাঙ্কিত"—কিছুটা ভুল। গোরক্ষপুরনগর উত্তর বিহারের নয়, উত্তর প্রদেশের পূর্বভাগে অবস্থিত।

সুধারঞ্জন সরকার
জনপুর-১২

আনন্দ পুরস্কার ও অন্যান্য

প্রত্যেক বারে কয়েকটি সংবাদপত্র সাময়িক পত্রের পক্ষ থেকে 'বাংলা সাহিত্যের জন্য ছ'টি পুরস্কার দেওয়া হয়, এ বছরের জন্য পুরস্কৃত লেখকদের নাম সম্প্রতি ঘোষণা করা হয়েছে।

আনন্দবাজার, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড ও দেশ-এর পক্ষ থেকে দুটি আনন্দ পুরস্কার হিসেবে প্রফুল্ল স্মৃতি পুরস্কার পাবেন বিখ্যাত ছান্দসিক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন এবং সুরেশ স্মৃতি পুরস্কার পাবেন ঔপন্যাসিক শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন বাংলা ছন্দ ও ইতিহাস বিষয়ে আমাদের সব সময় সচেতন করে রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের ছন্দ বিষয়ক বইটি তিনি অত্যন্ত সুচারু-ভাবে সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন, এ ছাড়া তাঁর নিজস্ব বিখ্যাত বই ছন্দগুরু রবীন্দ্রনাথ, ছন্দ পরিক্রমা, অশোক, ধম্মপদ।

শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ নিয়ম না-মানা, বিতর্কিত দুঃসাহসী, তেজী ঔপন্যাসিক হিসেবে সুবিদিত, তাঁর নানা লেখা নিয়ে নানা সময়ে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। মনের বাঘ, জল পড়ে পাতা নড়ে, সাগিনা মাহাতো, লোকটা প্রভৃতি তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই।

যুগান্তর, অমৃতবাজার ও অমৃত পত্রিকার পক্ষ থেকে শিশিরকুমার পুরস্কার পেয়েছেন কাজী আবদুল ওদুদ এবং মতি-লাল পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীপরিমল গোস্বামী। কাজী আবদুল ওদুদ বাংলা সাহিত্যের সমালোচক এবং ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যাকার হিসেবে পরিচিত। পরিমল গোস্বামীর শ্লেষধর্মী রস রচনা ও স্মৃতি কাহিনী পাঠকদের অত্যন্ত প্রিয়।

এই পুরস্কারগুলির প্রত্যেকটির অর্থ-মূল্য এক হাজার টাকা। এ ছাড়া, শিশু সাহিত্য ও কবিতার জন্য পাঁচশো টাকার দুটি পুরস্কার আছে।

মৌচাক পত্রিকার সুধীরচন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীসতীকান্ত গুহ।

কবিতার জন্য পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীতরুণ সান্যাল। এই পুরস্কারটি দিয়েছেন উল্টোরথ পত্রিকা। শ্রীতরুণ সান্যাল পঞ্চাশের কবিদের মধ্যে সুপরিচিত, "মাটির বেহালা", "রণক্ষেত্রে দীর্ঘবেলা একা" তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য। এ ছাড়া অর্থনীতির ওপরেও তাঁর নানা রচনা আছে।

তিন ভাষার কবি সম্মেলন

গৌহাটিতে অসমীয়া, বাংলা ও হিন্দী ভাষার কবিদের একটি সম্মেলন হয়ে গেল। উদ্যোক্তা, "একাল" পত্রিকা। "যুগ সমস্যা ও কবিতা" এবং "জীবন বোধ ও কবিতা" বিষয়ে আলোচনা করেছেন অসমীয়া কবি কেশব মোহন্ত, দীপক সেন, ভবানী সরকার। এ ছাড়া তিন ভাষায় কিছু কবি-দের কবিতা পাঠ।

কয়েকটি পত্র পত্রিকা

বার্নিক রায় সম্পাদিত 'লা পোয়েজি' পত্রিকাটি বেশ বড় আকারে প্রায় নিয়মিতই বেরোয়। এতে কিছু বাংলা কবিতা ও প্রবন্ধ ছাড়া রোমান হরফে বাংলা কবিতা ও তার ইংরেজি অনুবাদও থাকে। নতুন সংখ্যাটিতে প্রবন্ধ, আলোচনা ও পুস্তক সমালোচনার ওপর বেশ জোর দেওয়া হয়েছে। সুখেন্দু মল্লিক ও রত্নেশ্বর হাজরার চমৎকার এক গুচ্ছ কবিতা, এ ছাড়া মনীশ ঘটক, জগন্নাথ চক্রবর্তী, রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরী, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

টাউন স্কুল প্ল্যাটিনাম জুবিলি সংখ্যা। উত্তর কলকাতার টাউন স্কুল একটি নাম করা বিদ্যাভবন। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠানটির পঁচাত্তর বছর পূর্ণ হলো। এই উপলক্ষ্যে একটি পরিচ্ছন্ন ও শোভন স্মারক গ্রন্থ বেরিয়েছে। সাধারণত এই ধরনের বই প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষকদের কাছে স্মৃতি মন্থন ইত্যাদির জন্য আকর্ষণীয় হতে পারে। তা ছাড়া, অন্যান্য শিক্ষাবিদরাও সম্ভবত আগ্রহ বোধ করবেন। সম্পাদনা করেছেন শ্রীদেবপ্রিয় গঙ্গোপাধ্যায়।

জিরাফ। অরুণেশ ঘোষ সম্পাদিত এই তেজী পত্রিকাটি প্রকাশিত হচ্ছে কুচবিহার থেকে। কিছু বাড়াবাড়ি আছে, তবে পত্রিকাটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অনায়াসে পড়ে কখনো কৌতুক বোধ, কখনো মুগ্ধতা আসে। তবে কথা হচ্ছে এই, প্রাণীদের মধ্যে জিরাফ একেবারে বোবা, তার আত্মপ্রকাশের কোনো ভাষাই নেই, সেই প্রাণীর নাম এঁরা পত্রিকার নাম হিসেবে বেছে নিলেন কেন?

জীবনানন্দ। জীবনানন্দ দাশ বিষয়ক নয়, তাঁর সম্মানে আধুনিক কবিতা বিষয়ক রুচিসম্মত পত্রিকা। সম্পাদক পলাশ মিত্র। প্রেমেন্দ্র মিত্র, দিনেশ দাস, লাবণ্য দাশ, কৃষ্ণ ধর প্রভৃতির রচনা ছাড়াও আছে এক শো বছর আগেকার কবিতা পত্রিকা "সুধাকর" সম্পর্কে সচিত্র আলোচনা। এ ছাড়া এঁরা জীবিত সমস্ত বাঙালী কবিদের নামের তালিকা প্রকাশ করছেন ধারাবাহিক ভাবে। শুধু 'অ' দিয়েই নামের আরম্ভ এমন কবি আছেন ৩৬ জন! তাও এঁরা অনেকের নাম দিতে ভুলে গেছেন—অরুণাচল বসু, অরুণেশ ঘোষ, অরুণ বসু, অরুণি বসু, অসিত দত্ত প্রভৃতির নাম তো আমার এক্ষুনি মনে পড়ছে!

পারাবত-এর সম্পাদক আনন্দ বাগচী এবং অবনী নাগ। নগর ও গ্রাম বাংলাকে এক সঙ্গে উপস্থিত করে এই পত্রিকাটি ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। প্রকাশিত হয় বাঁকুড়া থেকে। এতে বেরুচ্ছে একটি ধারাবাহিক বারোয়ারি উপন্যাস, লিখছেন বাংলা দেশের প্রখ্যাত লেখকরা— প্রেমেন্দ্র মিত্র, নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ। গল্প ও কবিতার গুচ্ছটিও খুব সুনির্বাচিত।

সাহিত্য সেতু পত্রিকাটি বেরোয় বাঁশবেড়িয়া থেকে, সম্পাদিকা শ্রীমতী স্মৃতি সেন। "সুপ্ত প্রতিভাকে প্রেরণা দিয়ে জাগিয়ে তোলাই সাহিত্য সেতুর মূল উদ্দেশ্য"।

অভিযান প্রকাশিত হয় উত্তরবঙ্গের রায়গঞ্জ থেকে, সম্পাদক তপন কিরণ রায় ও জয়-নারায়ণ সাহা। উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতির প্রসার এঁদের অন্যতম কাম্য। তবে, "হয়তো আর সৎ সাহিত্য সংস্কৃতি মূলক সংকলন প্রকাশ করা যাবে না। কেননা যে হারে কাগজের মূল্য ও ছাপা খরচ বাড়ছে...। রায়গঞ্জের জনৈক অসাধু ব্যবসায়ী কাগজ থাকা সত্ত্বেও কাগজ দেয়নি, কারণ সম্মুখে বাজেট।"

এবং কৃত্তু একটি ছোট সাহিত্য পত্রিকা, "সময় ?" নাম একটি দীর্ঘ প্রবন্ধই নতুন সংখ্যার প্রধান আকর্ষণ। **জিগীষার** সম্পাদক রানা চট্টোপাধ্যায় ও স্বজিত ভাদুড়ী। এঁদের বর্ষ শেষ সংখ্যায় কাব্য নাটক বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন অরুণকুমার সরকার, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, আলোক সরকার ও শঙ্খ ঘোষ। রত্নেশ্বর হাজরা ও রথীন্দ্র মজুম-দারের কবিতা ভারী উজ্জ্বল।

"**আত্মপ্রকাশ**" এর সম্পাদক সমরেন্দ্রনাথ দাশ। এতো কবিতার পত্রিকার ভিড়ে এটি মূলত একটি গল্পের পত্রিকা। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, তুষারাভ রায় চৌধুরী, বাণীব্রত চক্রবর্তী, বরুণ গঙ্গোপাধ্যায়, শংকর দাশগুপ্ত, শক্তিপ্রসাদ সেনগুপ্ত, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, যীশু চৌধুরী প্রভৃতি লিখেছেন। "**আধুনিক সাহিত্য**" বেরোয় কুচবিহার থেকে, সম্পাদক রণজিৎ দেব। একটি গল্প ও অনেক কবিতা ছাড়াও, প্রবন্ধ দুটি বেশ ভালো লাগলো। এঁদের আগামী সংখ্যাটি অমিয়ভূষণ মজুমদারকে সম্মান জানাবার জন্য বিশেষ ভাবে প্রকাশিত।

হবে। অন্যটি একটি বলগা ছেঁড়া কবিতার পত্রিকা, বেরোয় ত্রিপুরা থেকে, সম্পাদক পীযূষ রাউত। শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, কালীপদ কোঙার প্রভৃতি দুটু কবিতা লিখেছেন। অন্যটি প্রকাশিত হচ্ছে কলকাতা-৪০ এর নেতাজী নগর থেকে, সম্পাদক নগেন্দ্র দাশ। ভারী সুদর্শন পত্রিকাটি—ছাপা বাঁধাইয়ের দিক থেকে, লেখাগুলিও মনে দাগ কাটে। সীমান্তের ব্যবধান ঘুচিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলাকে সাহিত্যে মেলাবার চেষ্টা আছে।

ইদানীং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক বিভাগীয় ছাত্ররা বার করছেন, সম্পাদক হরিনারায়ণ বসু, অঞ্জন রায় ও উৎপল সেনগুপ্ত। প্রবন্ধ, কবিতা ও গল্প আছে—তবে বাইরের লেখকদের বাদ দিয়ে শুধু সাংবাদিক বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের লেখা থাকলে বেশী ভালো লাগতো।

এ ছাড়া আছে ঝাঁকে ঝাঁকে মিনি পত্রিকা। এবং মিনি বই, পোস্ট কার্ড সাহিত্য, ইনল্যানড সাহিত্য, কত কি। তাদের সবার কথা লিখতে গেলে হাত ব্যথা হয়ে যাবে, তা ছাড়া আর জায়গাও নেই। আগামী সপ্তাহে দেখা যাবে।

সনাতন পাঠক

উপন্যাস

দয়িতা। নরেন্দ্রনাথ মিত্র। পরিবেশক : কথা ও কাহিনী, ১৩ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। ছ' টাকা।

'দয়িতা' নরেন্দ্রনাথের সাম্প্রতিক উপন্যাস। এক কথায় বলতে গেলে দয়িতার উপজীব্য বিষয় : প্রেম। কিন্তু দয়িতাকে শুধুই প্রেমের উপন্যাস বললে ভুল হবে। কারণ এর নায়ক-নায়িকা দুই ভিন্ন সম্প্রদায়ের। সেদিক থেকে এর তাৎপর্য আরও গভীর, সমস্যা আরও তীব্র, সামাজিক পটভূমিকা বৃহত্তর। এ ছাড়া আরও-একটি প্রশ্নও নায়কের জবানীতে হাজির হয়েছে, সে প্রশ্ন অধিকতর কঠিন প্রশ্ন, সাধারণভাবে সব দাম্পত্যজীবনের সামনেই এই সন্দেহের গুরুত্ব রয়েছে। বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েও নায়ক নিজেই নিজের কাছে জানতে চেয়েছে : "যখন আমরা দিনের পর দিন এক সঙ্গে বাস করব কেমন হবে সেই সহবাসের স্বাদ? আমরা কি দীর্ঘকাল ধরে পরস্পরকে নিত্য নতুন করে সৃষ্টি করতে পারব? অভিনবত্বের স্বাদ আনতে পারব?" সে জানে, "ধর্ম বড় কথা নয়। সম্প্রদায়গত ধর্ম নিয়ে কেইবা মাথা ঘামায়! সবচেয়ে বড় হল দুটি নারী পুরুষের মর্মগত সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য। সেখানে কতখানি আমরা মিলতে পারি; সেই মিলন ক্ষেত্রকে কিভাবে স্থায়ী করে তুলতে পারি সেইটিই প্রধান সমস্যা।"

অবশ্য প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে মাত্র। নায়কের জীবনে, এর উত্তর যাচাই করার সুযোগ ঘটেনি। নায়িকা শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে পড়েছে। কারণ হিসেবে নায়িকার নিজের মুখে যে কথা বলানো হয়েছে তা মেনে নিলেও তৃপ্তি হয় না। শিরিনের চরিত্রের প্রতি লেখক হয়তো পুরোপুরি সুবিচার করেননি—এখন মনে হতে পারে। সামাজিক সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত অঞ্জনের ডায়েরিতেই ছিল। সুতরাং সে-প্রশ্ন ওঠে না। তাহলে কেন শেষ মুহূর্তে শিরিন পিছিয়ে পড়ল?

প্রসঙ্গত 'চেনামহল' উপন্যাসের বিজু-প্রীতির কথা মনে পড়ল। সেখানে সমাধান দুঃখজনক হলেও সামাজিক সত্যের খাতিরে মেনে নেওয়া যায়। এখানে এ ছাড়াও আরও বড় সত্যের দাবি ছিল। সাম্প্রদায়িক অন্ধতার ঊর্ধ্বে প্রেমের ফুল ফুটিয়েও তাকে দেবতার অর্ঘ্য করা গেল না। এর দায়িত্ব কি পুরোপুরি নায়িকার?

অবশ্য এহ বাহ্য। নরেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব এইখানে যে, প্রেমের মুকুটটি ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি রূপদক্ষ শিল্পীর অসামান্য হাতে। ছোট-খাট আঁচড়ে নায়কের পারিবারিক বন্ধন, নায়িকার পরিবারের

অন্দরমহলের ছবি তুলে ধরেছেন। মা-বাবার চরিত্র জীবন্ত, নিখুঁত। ছোট হলেও কাদেরের জীবনকাহিনীটি অদ্ভুত আকর্ষক। সব মিলিয়ে দয়িতা পরম উপভোগ্য রোমান্টিক উপন্যাস সন্দেহ নেই।

১২।৫০

সরল সত্য। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা-৯। পাঁচ টাকা।

শক্তিমান ঔপন্যাসিক হিসেবে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। চিন্তার ঋজুতা ও প্রকাশ-ভঙ্গির সাবলীলতা তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বক্তব্য বিষয়কে তিনি প্রায়ই প্রত্যক্ষভাবে হাজির করেন, তা সত্ত্বেও এমন একটি সূক্ষ্ম অন্তঃপ্রবাহ ও সরস আধুনিকতা তাঁর লেখায় রয়েছে যা বিস্মিত করে। 'সরল সত্য' নিঃসন্দেহে তাঁর আত্মবিশ্বাস উপন্যাস। এবং স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, বিষয়ে গভীর, চিন্তায় পরিণত

এমন সুস্থির রচনা ইতিপূর্বে তিনি লেখেন নি।

সরল সত্য একজন আধুনিক যুবকের অকপট স্বীকারোক্তি। ডায়েরি ফর্মে লেখা এই উপন্যাসের ঘটনা-কাল মাত্র আড়াই মাসের। নায়কের ধারণা তার ক্যান্সার হয়েছে, আধুনিক বুদ্ধিজীবীজনোচিত এই আশংকা নিয়ে সে ডাক্তারের কাছে গিয়েছে—এখানে উপন্যাসের শুরু; শেষ পর্বে গিয়ে দেখা যায় যে, সে অমূলক ভয় পেয়েছিল। আসলে সে রোগাক্রান্ত হয়নি। কিন্তু মধ্যবর্তী দীর্ঘ আড়াই মাস তার কেটেছে অসম্ভব বোঝা-পড়ার মধ্যে। প্রতি মুহূর্তে বদল ঘটেছে তার; তার চিন্তা-আচার-আচরণ-সদসদবোধ-প্রবৃত্তি-রিরংসা—সব কিছুর পরিবর্তন কিভাবে ঘটেছে দিনপঞ্জীতে লিপিবদ্ধ করে রেখেছে সে কথা। একজন সৎ লোক হয়ে জীবন কাটাবে এই ধারণা নিয়ে বাঁচার ইচ্ছে যে কত হাস্যকর বারংবার তা প্রমাণিত হয়েছে তার জীবনে। সৎ থাকা মানেই হেরে যাওয়া; সর্বস্ব-খোয়ানো, অস্তিত্ব বিপন্ন-করা, পাগলামি। সে দেখেছে, যে "ক্রমশই খারাপের দিকেই গেছে, খারাপের চেয়ে আরো খারাপ" সেই জিতে যাচ্ছে সব জায়গায়। "এ কি রকম খেলার নিয়ম? এ কি অন্যায় যুদ্ধ। ভালোমন্দের অর্থ কি তাহলে ভুল জেনেছি?" বলা বাহুল্য, এই ভয়ংকর নিষ্ঠুর প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই। তবু শেষ পর্যন্ত সে অনুতাপের গ্লানিতে আত্মশুদ্ধি করে মহত্তর হয়েছে। উত্তরকালকে উদ্দেশ্য করে সে বারংবার নানা প্রার্থনা করেছে। বড় নিদারুণ সেই দৃশ্য।

সন্দেহ নেই যে, সরল সত্য আসলে একটি প্রতীকী উপন্যাস। ভাল-মন্দের চিরন্তন দ্বন্দ্ব নিয়ে ইতিপূর্বে কতিপয় মহৎ সাহিত্য রচিত হয়েছে। 'সরল সত্য' সেই মহৎ সাহিত্যের অন্তর্গত হবে এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

একটা কথা বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন। প্রতীকী, মননশীল—উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই ধরনের কথা শুনলে মনে হয় যে, বোধ হয় সাধারণভাবে বইটির পাঠযোগ্যতা কম। কিন্তু সুনীল তার আশ্চর্য ব্যতিক্রম। তিনি বলার কথা গোপন রেখেই গল্প লিখেছেন। সাধারণভাবে সে কাহিনী অসম্ভব আকর্ষক সেটাও তাঁর রচনার প্রসাদগুণ। কিন্তু পড়ার পর অনিবার্যভাবেই মনে হবে যে, অন্তরের ব্যঞ্জনার আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এটা আরও কঠিন ক্ষমতার পরিচায়ক।

৭।৭০

প্রাপ্তি স্বীকার

চিদম্বরা সঞ্চয়ন। সুমিত্রানন্দন পন্থ অনুবাদ : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতীয় জ্ঞানপীঠ প্রকাশন : ৯ আলিপুর পার্ক প্লেস, কলিকাতা-২৭। মূল্য ৭·০০।

লেনিনের জীবন কথা। নিকোলাই মিখাইলোভ। সোভিয়েট দেশ প্রকাশনী : ১/১ উড স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬। মূল্য ১·০০।

মানুষের মাঝে এভারেস্ট। এল ডি মিত্রোখিন। সোভিয়েট দেশ প্রকাশনী : ১/১ উড স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬। মূল্য ০·৭৫।

অধিকার রক্তের, কবিতার। গণেশ বসু। সীমান্ত প্রকাশনী : ৬০এ রমেশমোহন ঘোষ লেন, কলিকাতা-১০। মূল্য ১০·০০।

কৃতীর ক্রীড়া-ভূমিকা

খেলাধুলাকে একদিন যাঁরা জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন এবং পরবর্তী জীবনে দশজনের একজন হিসাবে পেয়েছেন কৃতীর সম্মান তেমন পুরুষদের কথাই এ যাবং লিখে আসছি। আরও হয়তো অনেক কৃতী পুরুষ আছেন কৈশোরে ও যৌবনে যাঁদের খেলাধুলো ছিল জীবনসাধনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

কিন্তু অতীতে যাঁরা খেলাধুলোয় নাম করেছেন এবং পরবর্তী কালে সমাজ ও দেশের কাজে যাঁদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা তেমন নারীর সংখ্যা সীমায়িত। হাতের কাছে অন্তত একজনকে পাচ্ছি যিনি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেন, একদিন খোলা মাঠে খেলাধুলো করে জীবনটাকে কঠিন সংগ্রামের উপযোগী করে গড়ে তুলেছিলেন বলেই মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন। এই নারীর নাম ইলা মিত্র। এখন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্যা, পশ্চিমবঙ্গ স্পোর্টস কাউন্সিলেরও মেম্বার।

ইলা মিত্রকে শুধু নারী বা মহিলা বললে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কিছুই অ-বলা থেকে যায়। কারণ, মহিলা বা নারীর আগে অবলা বিশেষণ প্রয়োগ সনাতন ভারতের সাধারণ নীতি। ব্যতিক্রমের মধ্যে অবশ্যই ইলা মিত্রের বিশিষ্ট স্থান। তাই শুধু নারী নয়, বীর নারীই ইলা মিত্রের বিশেষণ।

হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, দৈন্য-বিভব এবং সংগ্রাম ও সংগঠনের বিচিত্র জীবন। ছোটবেলার নেশা ছিল খেলাধুলো, সঙ্গীত ও অভিনয়। বর্তমানের পেশা অধ্যাপনা ও রাজনীতি, ধর্ম গৃহস্থালী ও সমাজসেবা।

স্পোর্টসের বড় আসরে বিজয়িনীর পুরস্কার নিতে হলে সিঁড়ি বেয়ে উঠে বিজয়মঞ্চে দাঁড়াতে হয়। জীবনে কৃতীর সম্মান পেতে হলে ভাঙতে হয় কঠিন সংগ্রামের সিঁড়ি আর বিস্তর বন্ধুর পথ। খেলাধুলো এবং রাজনীতি—দুই ক্ষেত্রেই সংগ্রামের সিঁড়ি ভেঙে সাফল্যের পথ প্রস্তুত করতে হয়েছে ইলা মিত্রকে।

খেলাধুলোর কথাই আগে বলা যাক। যশোরের মেয়ে। আদি বাড়ি ছিল ঝিনেদার বাঘুটে গ্রামে। কিন্তু পল্লীর সঙ্গে পরিচয় ঘটেনি ছোটবেলায়। কলকাতাতেই জন্ম। শিক্ষাদীক্ষাও কলকাতায়। কুমারীজীবনে ইলা সেনের খেলাধুলোর আগ্রহ বাবার উৎসাহে। বাবা নগেন্দ্রনাথ সেন এ জি বেঙ্গলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন। পরে হয়েছিলেন অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল। থাকতেন কলেজ স্কোয়ারের কাছাকাছি কানাই ধর লেনে। নগেনবাবু রোজ ভোরে ছেলেমেয়েদের ঘুম থেকে উঠিয়ে নিয়ে যেতেন [illegible] মাঠে দৌড়-ঝাঁপ করাতে। সেখান থেকে নিয়ে আসতেন কলেজ স্কোয়ারে সাঁতারের জন্য। নিজে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকতেন আর ছেলেমেয়েরা সাঁতার কাটত। শুধু খেলাধুলাতেই উৎসাহ দিতেন না নগেনবাবু। লেখাপড়ার দিকেও তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল।

ইলা মিত্র

খেলাধুলোর সেই শুরু, শেষ উনিশ শো বিয়াল্লিশে। পঁয়ত্রিশ থেকে বিয়াল্লিশ পর্যন্ত খেলাধুলোয় পারদর্শিনী বাঙালী মেয়ে হিসাবে ওঁর ছিল প্রথম স্থান। তখন কাগজে কাগজে প্রায় ছাপা হত ওঁর ছবি। প্রায়ই দেখা যেত ভূরি ভূরি কাপ-মেডেলের মধ্যে কাগজের পাতায় বসে ইলা সেন হাসছেন। জুনিয়র অ্যাথলীট হিসাবে দু হাত ভরে পুরস্কার সংগ্রহ করেছেন। আন্তঃ স্কুল স্পোর্টস, উইমেন্স অ্যাথলেটিক স্পোর্টস, জাতীয় যুব সংঘ স্পোর্টস, বেঙ্গল অ্যাথলেটিক স্পোর্টস, সিটি ক্লাব স্পোর্টস, মোহনবাগান স্পোর্টস, কলকাতা অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপ এবং আরও বহু স্পোর্টসে দৌড়, স্যাক রেস, স্কিপিং রেসে ওঁর প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান। বেশির ভাগ স্পোর্টসে সিটে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপ। বেথুন কলেজিয়েট স্কুল ও কলেজে বাস্কেটবল, ব্যাডমিন্টন ও টেনিকয়েটে এক নম্বর মেয়ে। একচল্লিশ ও বিয়াল্লিশে আন্তঃ কলেজ ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ন। দু বছরই টেনিকয়েট চ্যাম্পিয়ন [illegible]।

কিন্তু খেলাধুলোয় এমন নজির হয়তো আরও অনেক মেয়েরই আছে। ইলা সেনের কৃতিত্ব বাঙালী মেয়ে হিসাবে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ের রেকর্ড ম্লান করা এবং প্রথম বাঙালী মেয়ে হিসাবে ভারতীয় অলিম্পিকে বাংলার প্রতিনিধিত্ব।

যখনকার কথা বলছি তখন বারবারা বিক, লোলা সিভিল, এডনা জনসন, বারবারা এডওয়ার্ড, এল ক্যার, জয়োথী বেলগার্ড প্রভৃতি ক্রীড়াপটু অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েরাই ছিলেন অ্যাথলেটিকসের আসর জাঁকিয়ে। কোন বাঙালী মেয়েই তাঁদের কাছে পাত্তা পেতেন না। কিন্তু ১৯৩৭-এ প্রথম বাঙালী হিসাবে ইলা সেনই ভেঙে দিয়েছিলেন বারবারা এডওয়ার্ডের ৫০ মিটার দৌড়ের রেকর্ড।

আগে লিখেছি, ইলা মিত্র মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেন, খোলা মাঠে খেলাধুলো করে জীবনটাকে কঠিন সংগ্রামের উপযোগী করে গড়ে তুলেছিলেন বলে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন।

মৃত্যুর মুখ থেকে? হ্যাঁ, সত্যিই তাই। কলকাতার কাগজে কাগজে তো খবরই বেরিয়ে গিয়েছিল পুলিসের অত্যাচারে পাকিস্তান জেলে ইলা মিত্র মারা গিয়েছেন। সে খবর অবশ্যই ছিল অতিরঞ্জিত। কিন্তু পাকিস্তানে ওঁর উপর অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী অতিরঞ্জন নয়—মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্ররক্ষকদের নির্মম অত্যাচারে মর্মাহত মুসলমান কবি গোলাম কুদ্দুস 'ইলা মিত্র' নামীয় কাব্যগ্রন্থে সে কাহিনী রক্তের অক্ষরে লিখে রেখেছেন।

দেশবিভাগের পর শ্বশুরবাড়ির গ্রাম রামচন্দ্রপুর সমেত মালদার নবাবগঞ্জ সাব-ডিভিসন রাজশাহীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পাকিস্তানভুক্ত হবার পর ইলা মিত্র পাকিস্তানকেই রাজনৈতিক জীবনের কর্মকেন্দ্র হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। কৃষক নেত্রী ইলা মিত্রের সঙ্গে পাক সরকারের সংগ্রামের সে কাহিনী এবং বিখ্যাত নাচোল মামলার রক্তঝরা অধ্যায় আজ নতুন করে বলবার প্রয়োজন নেই। শুধু এইটুকুই বলবার আছে, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এড়াবার জন্য তিন বছর 'আণ্ডারগ্রাউণ্ডে' থেকে ইলা মিত্রকে কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্ব করতে হয়েছে। কখনো দৌড়ে, কখনো কুয়োর মধ্যে লাফিয়ে, কখনো নদীতে সাঁতার কেটে, আবার কখনো হাতের শাঁখা ভেঙে, নোয়া খুলে, এয়োতির চিহ্ন মুছে, কিংবা কেশগুচ্ছ ছেঁটে ফেলে পাক পুলিসের চোখে ধুলো দিতে হয়েছে। তারপর ফাঁসির কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে খালাস হয়ে এসেছেন। আরও বলবার কথা, ওই রক্তঝরা অধ্যায়ে ইলা মিত্র ছিলেন ভবিষ্যৎ সন্তানের মা, যে সন্তান এখন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এম কমের ছাত্র।

মুকুল

অরণ্যদেব ✫ লী ফক

ডঃ উইবার ও তার কন্যা আমার
আদেশ অমান্য করে বেরিয়ে
পড়েছেন। রহস্য-পাহাড়
আমাদের আওতার বাইরে।
তাই ব্যাপারটা আপনাকে
জানালুম। বিনীত
স্বর্ণ গুরুং।

কী লিখেছে?

ওয়াকার-কাকা, চিঠিতে কী লিখেছে?
ডঃ উইবার নামে বোকা একজন লোক তার মেয়েকে নিয়ে একটা বিপজ্জনক জায়গায় গেছে!
* অরণ্যদেবকে রাজা বলে ওয়াকার-কাকা

ওদের খুঁজে বার করতে হবে। জানি না বেঁচে আছে কিনা।
বিজ্ঞানের কোন রহস্যই বা ওরা উদ্‌ঘাটন করতে চায়!

স্বর্ণ-দ্বীপ থেকে বিদায়।
চললুম রে। তোদের সঙ্গে যে কটা দিন কাটাব, তা ভুলব না। ভাল হয়ে থাকিস।

রহস্য-পাহাড়! অনেক দিন সেখানে যাইনি! শুনেছি সেখানে দস্যুদের বড় উৎপাত।
সেখানে ওরা কেন গেল? আশ্চর্য!

ওয়াকার-কাকা, আমরা তোমার সঙ্গে রহস্য-পাহাড়ে যাব।
না রাজা, তুই আর টমটম এখানে ভাল হয়ে থাকিস। শিগগিরই আমি ফিরে আসব।

রহস্য-পাহাড়ে ওরা গেল কেন? ... সেইটেই দেখছি সবচাইতে বড় রহস্য।
৪-৩।

ওপু লাভা-নদীর ওপারে রহস্য-পাহাড়। বিপজ্জনক এলাকা। পারতপক্ষে কেউ সেদিকে যেতে চায় না।
আগামী সপ্তাহে: রহস্য-পাহাড় ④

"Godard's words-on-images suggest an agnostic, nay nihilistic Bresson....."

ফাঁ-লুক গদার সমালোচকদের যতটা ভাবিয়েছেন ততটা আর কেউ নয়। এর একটা কারণ সম্ভবত এই যে গদারের ছবি দেখতে হয় বুদ্ধি দিয়ে; তাঁর ছবি উপভোগের জন্য চাই প্রকৃষ্ট মনন। এ-যাবৎ গদারের তিনটি ছবি আমরা দেখেছি। প্রত্যেকটি ছবিই গদারের। কথাটার একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়ত আছে। গদারের ছবি তাঁর নিজেরই, নিজের জন্যই; গদার দর্শককে কাছে টানবার চেষ্টা করেন না, দর্শককেই গদারের পিছু দৌড়তে হয় তাঁকে ধরবার জন্য। বুদ্ধি দিয়ে যে-দর্শক গদারকে যতটুকু ধরতে বুঝতে পারেন তাঁর ততটুকুই আনন্দ, ততটুকুই মননজাত সুখ।

গদারের **লে কারাবিনিয়ের** (১৯৬৩) সম্পর্কেও ওই কথা। ছবির ইংরেজি নাম : দি সোলজারস, অর্থাৎ সৈন্যরা। কিন্তু লে কারাবিনিয়ের যুদ্ধচিত্র নয়, যুদ্ধবিরোধী চিত্রও নয়; আদর্শবাদের ছবি নয় বলে লে কারাবিনিয়ের আবেগহীন, যুদ্ধবিরোধী ছবি নয় বলে যুদ্ধের ভীষণতা বা আতঙ্ক এতে নেই। লে কারাবিনিয়ের-এর প্রধান, দুই চরিত্র সৈন্য, আবার সৈন্যও নয়। ছবিতে যুদ্ধ নেই, কিন্তু যুদ্ধের অস্তিত্ব ও পরিবেশ আছে। বেশ কয়েকটি হত্যা আছে, কিন্তু হত্যাকাণ্ডের নির্দিষ্ট রোমাঞ্চ নেই।

তবে কী বলতে চান গদার? এই মামুলি প্রশ্ন এখানে অচল। কিছুই বলতে চাননি গদার। ঘটনা ঘটে, বলে না কিছুই। ঘটনার অর্থ ও তাৎপর্য খুঁজে বার করার দায়িত্ব চিন্তাশীল মানুষের। গদারের ছবি সম্পর্কেও দর্শকের এই একই দায়িত্ব। এর দৃশ্যে দৃশ্যে, ইমেজে ইমেজে অর্থ ছড়িয়ে রয়েছে। তা বুঝতে পারা, বুঝতে চেষ্টা করার মধ্যেই সুখ। দুজন সাধারণ লোক রাজার সৈন্যদলে যোগ দিল, কেননা যুদ্ধে গেলে মন যা চায় সবই করতে পারবে তারা। তাদের জন্য কোন আইন খাটবে না। প্রভূততর স্বাধীনতা-ভোগের জন্য যারা যুদ্ধে গেল তাদেরই একজন অবৈধ অত্যাচার চালাবার কালে এক রমণীকে আদেশ করে জামা খুলিয়েও শুধু নতজানু করিয়েই ছেড়ে দিল। সবটাই যেন গদারের পরিহাস। যুদ্ধে গেলে দুই সৈন্য অনেক কিছু পাবে এই কথাই ছিল। তারা ফিরে এল বাক্স-ভর্তি পিকচার-কার্ড নিয়ে। তাদের স্ত্রীরা প্রথমে অপ্রসন্ন হলেও পরে ওই পিকচার-কার্ড নিয়ে মেতে পড়ল। ওই পিকচার-কার্ডগুলি দেখানো হল অনেকক্ষণ ধরে—নানা দেশের নানা ছবি, মানুষের তৈরি কীর্তি-স্তম্ভ, জীব-জন্তু ও প্রকৃতি এবং অনেক কিছু। এ-যেন গদারের ইতিহাস-পরিক্রমা। তার মধ্যে যুদ্ধও একটি, যা তিনি সবে দেখালেন, পিকচার-কার্ডের মতই। এ তো শুধু ছবি—এতে দেশপ্রেম নেই, আবেগ নেই, আদর্শবাদ নেই, ভয় নেই, আতঙ্ক নেই। গদার নির্লিপ্ত, নিরাসক্ত। যুদ্ধ-ফেরত সৈন্যরা তখনও 'কিংস আর্মি'র সাজ ছাড়েনি, তারা পুরস্কার পাবার লোভে তখনও রাজাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। যুদ্ধ থামার পর পুনর্বিন্যাসের সময় তারা নিহত হল আগের সহকর্মীর হাতেই। এই হত্যাও ঘটেছে সংবাদ-চিত্রের মত, কোন আবেগের প্রতিক্রিয়া যুক্ত নয় এর সঙ্গে। সর্বত্রই গদারের একটা নির্মায়িক ভাব তারই অন্তরালে তাঁর চিন্তার সূত্রগুলি খুঁজে বের করতে হয়; অসংখ্য চিন্তারাশি যেমন জমাট বেঁধে রয়েছে এই আপাত-সরল ছবিটির সহজ দৃশ্যগুলির আড়ালে।

ব্রেস'র সঙ্গে সম্ভবত এইখানেই গদারের অমিল। ব্রেস' আমাদের বুঝতে দেন, যদিও পরিষ্কার বলেন না, বড় একটা তাৎপর্য কখন রূপ নিচ্ছে কোন্ প্রতীকী ঘটনা বা ব্যঞ্জনার মাধ্যমে। এবং ব্রেস'র ছবি প্রতীক ও ব্যঞ্জনায় আরও জটিল। গদার সেদিক থেকে আরও সরল, হয়ত আরও বেশি দুর্বোধ্য। কিছু বোঝাতে চান না

বলেই তাঁকে বুঝতে আরও অসুবিধা। আবার তাঁর ছবি শুধু উপর-উপর দেখে চুপ করেও থাকা যায় না, যেন ঘটে যা তা সব সত্য নয়, গদারের মনোভূমিই বুঝি বেশি সত্য এক্ষেত্রে। অপরদিকে, রেনে একটা বক্তব্যে এনে দর্শককে পৌঁছিয়ে দিতে চান, গদার সব প্রত্যাশিত বক্তব্য ভেঙেচুরে অন্য এক প্রবল তাৎপর্যে তাঁর ছবিকে তাৎপর্যময় করে তোলেন। রেনে'র জ্ঞানবাদ, গদারের অজ্ঞেয়বাদ। দুইয়ের এই পার্থক্য বিশেষভাবে ধরা পড়ে লে কারাবিনিয়েরে দেখার পর।

গদারের যে তিনটি ছবি আমরা দেখলাম তার মধ্যে নিঃসন্দেহে লে কারাবিনিয়ের শ্রেষ্ঠ। তাঁর ফিল্ম ফিল্মই, ফিল্ম নামধেয় নাটক কিংবা গল্প নয়। লে কারাবিনিয়ের-এ কতগুলি ঘটনা ঘটেছে স্বাভাবিকভাবে—এর মধ্যে গল্পসূত্র কেউ খুঁজলেও খুঁজতে পারেন কিন্তু তা গল্পের আঙ্গিক নেয়নি। এবং পরিচালক ওইসব ঘটনাগুলি যেন দেখেছেন অনাসক্তভাবে, কোন কিছুর প্রতিই তাঁর পক্ষপাত নেই। তবে যে বিপ্লবী মেয়েটিকে রাজার সৈন্যরা গুলি করে মেরেছে সেই মার্ক্সবাদী মেয়েটির প্রতি গদারের সমবেদনা কিছুটা প্রকাশ পেয়েই আবার তা নিরাসক্ত শিল্পীর ঔদাসীন্যে মিলিয়ে গেছে। গদারের দৃষ্টি "অবজেকটিভ" এবং সে-কারণ আসক্তি-হীন। দর্শকের মনে কখনো তিনি করুণা বা মমতা জাগাবার চেষ্টা করেননি। দুই সৈন্য যে শেষ সময়ে নিহত হয়েছে—ধরে নিতে পারি প্রগতিশীল শক্তির হাতে—তার জন্য দর্শকের মনে বেদনা জাগতে পারে, ওই দুই সরল-বোকা ব্যক্তির জন্য দর্শক দুঃখ পেতে পারেন। পরিবেশের অনেক কিছুই আমাদের মনে দুঃখ অথবা
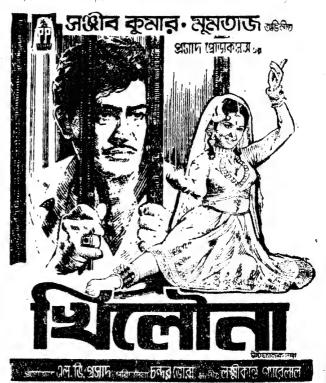
আনন্দ জাগায়—আমাদের মনে দুঃখ বা আনন্দ দেওয়ার জন্য কোন সচেতন সক্রিয় মন যেমন কোন ঘটনা সাজায় না তেমনি গদারও, ছবিটি দেখে মনে হবে, দর্শকের মনে সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার দিকে নজর রেখে কোন ঘটনাই সাজাননি। এখানেই লে কারাবিনিয়ের-এর, গদারের ফিল্মের গুণ—যা একান্তভাবেই ফিল্মের। গদারের কাছে ফিল্ম শুধু ফিল্ম শুধু ফিল্ম (তাঁরই উক্তি)। লে কারাবিনিয়ের-ও তাই।

(সম্প্রতি গদারের এই ছবি ও তাঁর আরও একটি এবং ত্রুফোর দুটি ছবির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন ক্যালকাটা ফিল্ম সোসায়েটি, ক্যালকাটা সিনে ইনস্টিটিউট, সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা প্রভৃতি সংস্থা।)

॥ চিত্র-সমালোচনা ॥

জবাব

(আর আর পিকচার্স)

এ ছবিতে অশোককুমার নিহত। কার হাতে? না মীনাকুমারীর হাতে। এ ছাড়া বুঝি গত্যন্তর ছিল না "জবাব" হিন্দী চিত্রে। কারণ প্রায়-বৃদ্ধ জমিদার অশোককুমার গ্রাম্য বিধবা মীনাকুমারীর ইজ্জত নষ্ট করেছেন। তাই এই বদলা।

জমিদার অশোককুমারের একমাত্র মেয়ে লীনা চন্দ্রভারকর (এই নবাগতা সুন্দরী ইতিমধ্যেই দর্শকের মন জয় করেছেন) ছবির নায়িকা রানী, নায়ক রাজা (জিতেন্দ্র) মীনাকুমারীর ভাই। রানীর বড় ভাই অভিনেতা প্রেম চোপড়া ছবিতে ভিলেন, বিশেষ করে যার সদা আক্রোশ জিতেন্দ্রর উপর।

নাটক ও প্রমোদ উপকরণ প্রয়োগের ব্যাপারে দক্ষিণ ভারতের চিত্র নির্মাতারা একটু উগ্রপন্থী। এই ছবির পরিচালক রামান্না নিজেও যথাসাধ্য সে প্রমাণ দিয়েছেন। তিনি পুরাকালের দৃষ্টান্তে জিতেন্দ্র ও প্রেম চোপড়ার মধ্যে লাঠি যুদ্ধ দেখিয়ে দিয়েছেন, যে জিতবে সেই বিয়ে করতে পারবে লাঠিয়াল গুরুর কন্যাকে। এই মেয়েটির সঙ্গে জিতেন্দ্রেরই বিয়ে হবার কথা ছিল, কিন্তু বাদ সাধেন জমিদার। তাই এই শক্তি পরীক্ষা। নায়ক জিতেন্দ্র যে অপরাজেয় গ্রামসুদ্ধ লোক তা জানে, তবে কী জানি লাঠিযুদ্ধের সময় হঠাৎ তার মাথা ঘুরে গেল। ভাইয়ের জন্য এই গোপন কারসাজি রানীর। পরে সব ষড়যন্ত্রই ফাঁস হয়। রাজা বামনও নয় চাঁদে হাত দিতেও কুণ্ঠিত নয়। এর জবাব সে রানীকে দেবেই। কী-ভাবে? রানীকে সে বলে, তোমাকে বাঁদী করে নিয়ে আসব ঘরে।

আইনত নায়ক-নায়িকারই তো বিয়ে হবার কথা—জিতেন্দ্র এবং লীনা চন্দ্রভারকরের। কিন্তু গেঁয়ো অশিক্ষিত রাজা এবং এম এ পাঠরতা রানীর বিয়ে কী করে সম্ভব? অসম্ভব কথাটি হিন্দী চিত্রের পরিচালকের অভিধানে লেখা নেই। কেন, পিগম্যালিয়ন-এর নজির রয়েছে না? গেঁয়ো জিতেন্দ্রকে সোসায়েটির সেরা ছেলে তৈরি করে দিল রানীর এক ব্যর্থ প্রেমিক অভিনেতা মেহমুদ। এমন চাঁদের টুকরো ছেলের হাতে কোন জমিদার না তার মেয়ে তুলে দেবেন। অর্থাৎ জমিদার নিহত হয়েছেন জিতেন্দ্র-লীনার বিয়ের পরে, হত্যাকারিণী মীনাকুমারী (লোকে জানত সে মরে গেছে, রাজাও তাই জানত) পুলিসের হাত এড়াবার জন্য নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মরে প্রমাণ করল সে মরে নাই। দর্শকের কাছে এই সাসপেন্স অবশ্য আগেই ফাঁস হয়ে গিয়েছিল।

পরিচালক দর্শকের মনোবাঞ্ছা পূরণের সর্বপ্রকার চেষ্টাই করেছেন। ভিলেন, বিলিতি ও গ্রাম্য নাচ-গান কোনটাই বাদ যায়নি। লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলালের সুরের গানেও ছবি জমজমাট! জোলো নাটকীয়তা এবং অকারণ বাহুযুদ্ধের টানাপোড়েনের পর শেষ অবধি দেখা গেল ছেলে হবার পর রাজা ও রানী সুখী। কিন্তু দর্শক?

"ভগবান পরশুরাম" ছবিতে জয়শ্রী গাদকার

রবীন্দ্র সদনে রবীন্দ্র জন্মোৎসব

রবীন্দ্র সদন আগামী ৯ থেকে ১৯ মে পর্যন্ত ১১ দিনব্যাপী রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালনের জন্য একটি কর্মসূচী তৈরি করেছেন। ৯ মে সকালে রবীন্দ্র সদন প্রাঙ্গণে বাংলার জনপ্রিয় শিল্পী ও বিশিষ্ট গুণীজনের কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হবে। সদনের অন্যান্য অনুষ্ঠানে উদয়শঙ্কর ব্যালে ট্রুপ, রঙ্গসভা, সুজন, বৈতানিক, নান্দ থিয়েটার্স, সুরমন্দির, মর্মর, সুরসপ্তক, সঙ্গীতচক্র, গীতমালিকা, রবীন্দ্র কলাকেন্দ্র ও রবীন্দ্রভারতী প্রভৃতি সংস্থা যোগ দেবেন। তার মধ্যে একদিন বিশিষ্ট রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী সমন্বয়ে একটি রবীন্দ্র সঙ্গীত আসরের বিশেষ ব্যবস্থাও থাকছে।

[illegible] প্রোডাকসন্স-এর "খিলোনা" ছবিতে সঞ্জীবকুমার ও মমতাজ

টীকা-টিপ্পনী

বাংলা ছবির এই সঙ্কটের দিনে একটা জরুরী সমস্যার সঙ্গে সবাই কিন্তু একমত হয়েছেন, "কস্ট্ অব প্রোডাকসন" কমাতে হবে। সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছেন, দেশ বিভাগের পর বাংলা ছবির 'মার্কেট' অনেক ছোট হয়ে গেছে। এদিকে ফিল্মের দাম দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছে। স্টুডিও ভাড়াও আগের চাইতে এখন অনেক বেশী। শিল্পীর "রেট"-ও বাড়তে বাড়তে যে অঙ্কে পৌঁছেছে, তাতে করে "তারকা" নিয়ে ছবি করলে লাভের গুড়ে শুধুই বালি। এই কারণেই মনে হয়, "তারকা বিহীন" ছবির রিলিজের গ্যারাণ্টি পেতে সেন্সর ভিত্তিক ছবি রিলিজের আন্দোলন হয়েছে, এই ব্যবস্থা চালুও হয়েছে। সমস্যা মিটেছে কি? আজো "তারকা" না নিয়ে কটা ছবি হচ্ছে? শতকরা নব্বুই ভাগ নির্মীয়মান ছবির ভূমিকালিপিতে আজো সেই "তারকা", কাহিনী নির্বাচনে আজো সেই সস্তা মেলোড্রামার প্রতি অন্ধ আনুগত্য, চিত্রনাট্যে সেই নাচ-গানের বাধ্যবাধকতা, সেই ছকে বাঁধা ফরমুলা, সবকিছু। অথচ নতুনদের নিয়ে নতুন ধরনের ছবি করলে সেই ছবিও যে চলে তার অনেক নজির গত কয়েক বছরের মধ্যে আমরা অনেক দেখেছি। এই নিয়ে আলোচনাও অনেক করেছি। পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

এই অবস্থার হাত থেকে মুক্তির উপায় কী? পরিচালক মৃণাল সেনের সঙ্গে সেদিন এই [illegible] আলোচনার অবকাশে। মৃণালবাবুর কম খরচের "তারকাবিহীন" ছবি "ভুবন সোম" অতি সম্প্রতি ব্যবসায়িক আনুকূল্য লাভে ধন্য হয়েছে, তথাপি "তারকাবিহীন" নতুন ছবি করতে উনি প্রযোজক পাচ্ছেন না, পরিবেষক পাচ্ছেন না, বললেন সে কথা। নতুনদের নিয়ে বুদ্ধিদীপ্ত ছবি না হওয়ার পিছনে লব্ধপ্রতিষ্ঠ চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীদের কিছু "অবদান" আছে, এই অভিযোগও করলেন তিনি। রাজনীতিবিদের মতই কিছুটা উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন তিনি, "সংগ্রাম করে যাওয়া ছাড়া এই সমস্যা সমাধানের আর কোন পথ নেই।"

মৃণাল সেনের পরবর্তী ছবির নাম "ইণ্টারভিয়ু"। আশিস বর্মণের কাহিনী। জনৈক উন্নতি কামী যুবকের চাকরীর "ইণ্টারভিয়ু" দিতে যাওয়ার ব্যাপার নিয়ে সমগ্র কাহিনীর বিস্তার। মাত্র একদিনের ঘটনা নিয়ে সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য। পটভূমিকা শহর কলকাতা। ভূমিকালিপিতে সবই নতুন মুখ। জানালেন মৃণালবাবু। আগামী মে মাস থেকে শুরু হবে ছবির শুটিং।

*

মে মাস থেকে আরো একটি নতুন ছবির শুটিং শুরু হচ্ছে। ছবির নাম "এখনই"। রমাপদ চৌধুরীর ঐ নামেরই কাহিনী অবলম্বনে ছবির পরিচালনা করছেন তপন সিংহ। চিত্রনাট্য, সংলাপ ও সংগীত-পরিচালনার দায়িত্বও তাঁরই। কে এল কাপুর প্রোডাকসন্সের এই নতুন ছবির ভূমিকালিপিতে কে কে থাকবেন? তপনবাবু "এখনই" বলতে নারাজ। অনেক নতুন মুখের সঙ্গে কিছু কিছু পুরনো মুখের দেখাও পাওয়া যাবে। বললেন তপনবাবু। এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে উনি জানালেন, বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির অবস্থা এখন খুবই খারাপ। এই নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির হাত থেকে বাঁচবার উপায় কি? তপন সিংহ সঠিক কোন পথের নির্দেশ দিতে পারলেন না। শুধু এই কথা বললেন, সকলকে "সিনসিয়ার" হতে হবে। শিল্পের বৃহত্তর স্বার্থে আত্মত্যাগের প্রশ্নটাও এখানে খুবই জরুরী। তপনবাবুর পরবর্তী পরিকল্পনার খবর জানতে চাইলাম। উনি বললেন, পরিকল্পনা তো একাধিক আছে। "সাগিনা মাহাতো"-র হিন্দী করার কথা আছে। ইতিমধ্যে আবার আরো একখানি নতুন গল্পের চিত্র সত্ব কেনা হয়েছে। কালকূটের "কোথায় পাবো তারে"

—বিচক্র

স্কচ অ্যান্ড সোডা

স্কচ অ্যান্ড সোডা—একটি এল-পি রেকর্ডের নাম, যাতে রয়েছে ইংরেজি পপ-গান। গানগুলি গেয়েছেন একজন ভারতীয় মহিলা—কুমারী উষা আয়ার। দক্ষিণ

ভারতের এই শিল্পী ইতিপূর্বে বোম্বাই ও মাদ্রাজে পপ-গান গেয়ে শ্রোতাদের খুশি করেছেন। কলকাতার নাইট-ক্লাব জগতেও উষা আয়ার এখন একটি পরিচিত নাম। তাঁরই গাওয়া বারোখানি ইংরেজি গানের রেকর্ড বের করেছেন গ্রামোফোন কোম্পানি।

গ্রামোফোন কোম্পানি গত সপ্তাহে এক বৈঠকে শ্রীমতী আয়ারের সঙ্গে সাংবাদিকদের পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁর এল-পি রেকর্ডটিও শোনানো হয়, পরে ট্রিংকার রেস্তোরাঁয় সাংবাদিকদের নিয়ে গিয়ে শ্রীমতী আয়ারের গান শোনানো হয়। তাঁর কণ্ঠ সতেজ, গানে প্রাণ-সঞ্চারের ক্ষমতাও শিল্পীর আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শ্রীমতী আয়ার মার্চেণ্ট আইভরি প্রোডাকসন্স-এর পরবর্তী ছবিতে গান করছেন।

পঞ্চদশ রেল সপ্তাহ

গত ১৯ এপ্রিল শেয়ালদার নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউটে "পঞ্চদশ রেলওয়ে সপ্তাহ" উদ্যাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ান। রেলওয়ে সপ্তাহের পুরস্কারগুলি বিতরণ করেন শ্রীমতী ধাওয়ান। অনুষ্ঠানের শেষ ভাগে ছিল পূর্ব রেলের হেড কোয়ার্টার্স স্টাফ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের সভাবৃন্দ কর্তৃক নৃত্য-নাট্যে "দুই বিঘা জমি" এবং "ডাউন ট্রেন" একাঙ্ক নাটক অভিনয়। উভয় অনুষ্ঠানই সুন্দর। বিশেষ করে "দুই বিঘা জমি"-র পরিকল্পনা অতীব প্রশংসনীয়।

বোম্বাই বিচিত্রা

কিশোরকুমারের বাড়ি। সেখানে শ্যুটিং হচ্ছে। কিশোরের নিজের ছবির। নাম "দূরে কা রাহী"। ছবির প্রযোজক, পরিচালক, লেখক, সংগীত নির্দেশক, নায়ক, গায়ক সবই কিশোর স্বয়ং। নিজের বাড়ির গ্যারেজকে ভেঙে পাহাড়ী অঞ্চলের এক বাংলোর একটি কামরায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। এই রূপান্তরের পেছনে শিল্প-নির্দেশকের হাত নেই, যা কিছু করেছে, তা করেছে সাধারণ রাজমিস্ত্রী এবং কিশোরের খাস ছুতোর, কিশোরকুমারের নির্দেশে। ঘরের বাইরে ভীষণ গরম। ভেতরে ভীষণতর। এই ঘ্যান-প্যাচপেচে গরমের দিনে কিশোর তাঁর গ্যারেজের মধ্যে একটি শীতের সকালের দৃশ্য তোলার জন্য তৈরী হচ্ছে। ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছে। সত্যিকারের আগুন। তার ধোঁয়ায় উপস্থিত সকলেরই চোখ জ্বলছে। এ ছাড়াও একসট্রা ধোঁয়ার ব্যবস্থা কুয়াশার হুবহু রূপ দেবার জন্য। এ দৃশ্যে অভিনয় করছেন কিশোর-অগ্রজ অশোককুমার, চিত্রাভিনেতা ইফতেখার এবং কিশোর স্বয়ং। ফায়ার প্লেসের সামনে একটা ইজি চেয়ারে বসে অশোককুমার ওরফে দাদামণি। পাইপের টুং টুং আওয়াজ তুলছেন। ক্যামেরাম্যান লাইট করছেন। দাদামণি বললেন, "কিশোর এবার বল কি করতে হবে?" কিশোর বললেন, "তুমি তো জানো গল্প, এটা হচ্ছে সেই পোরশানটা—" দাদামণি থামিয়ে দিলেন, "তুই আমাকে গল্প আবার করে বললি—" কিশোর সঙ্গে সঙ্গে শুধরে নিল নিজেকে, "হ্যাঁ, তোমাকে তো গল্পটাই বলা হয়নি।" দাদামণি বললেন, "ঠিক আছে আয় গল্পটা শোনা।" কিশোর বললেন, "দাদামণি আজ শ্যুটিং করার ডেট দিয়েছ এতদিন পরে এখন তো গল্প শোনানো যাবে না, আজ শ্যুটিং করার দিন। গল্প শোনাবার জন্যে তোমার কাছে ডেট পাওয়া যাবে সেটা তোমার সেক্রেটারীকে বলে দিও আমার সেক্রেটারীকে জানিয়ে দিতে।" হো হো করে হেসে উঠলো দুই ভাই। মুহূর্তে উপস্থিত সকলেই হেসে উঠলো। কিশোর বললেন, "সাইলেন্স।" সব চুপ। দাদামণিও। খুব গম্ভীরভাবে কিশোর আবার শুরু করলো, "না দাদামণি কবে গল্প শুনবে সেটা তুমিই আমাকে বলো।" দাদামণি বললেন, "কিন্তু আমি কবে খালি আছি তা তো ঐ সেক্রেটারীর ডায়েরি না দেখলে জানা যাবে না, —তাছাড়া তুই-ই বা কি করে জানবি তুই কবে খালি আছিস?" কিশোর তার সপ্রতিভ গাম্ভীর্য বজায় রেখে শান্ত গলায় জবাব দিলো, "গল্প-লেখক এবং পরিচালক কিশোরকুমারের কোন সেক্রেটারী নেই—এই দুই কিশোরকুমার অত্যন্ত আত্মাভিমানী এবং গরীব। প্রযোজক, গায়ক, নায়ক কিশোরকুমার হচ্ছে নাক-উঁচু, টেমপারা-মেন্টাল, বিজনেসম্যান, ধান্ধাবাজ এবং বিপজ্জনক লোক। তার সঙ্গে লেখক পরিচালক কিশোর-কুমারের কোন সদ্ভাব নেই।" দাদামণি অবাক হয়ে শুনছিলেন হঠাৎ হো হো করে অট্টহাসে ফেটে পড়লেন। কিশোর বললে, "হাসবেন না দাদামণি, মাঝে মাঝেই লেখক পরিচালক কিশোরকুমারের সঙ্গে, নায়ক-প্রযোজক কিশোরকুমারের প্রচণ্ড ঝগড়া হয়। নায়ক, গায়ক কিশোরকুমার প্রযোজক কিশোরকুমারের সঙ্গে একজোট। কারণ নায়ক-গায়ক কিশোর প্রযোজক কিশোরকে ফাইনান্স করে, সেই জন্য সে দলে ভারী, কিন্তু লেখক পরিচালক কিশোর-কুমার অন্য মানুষ, তার যা চাই তা না পেলে সে শ্যুটিংই করবে না, সুতরাং নায়ক-গায়ক প্রযোজক কিশোরকুমারকে সব সময়েই সমঝোতা করতে হয় লেখক-পরিচালক কিশোরকুমারের সঙ্গে, কিন্তু টেনশান তো থাকেই তাই—' কথাটা শেষ না করেই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো কিশোর—"আডারজ্ঞ কিশোরকুমারকে সেট থেকে বার করে দাও।" বলেই সেট থেকে বেরিয়ে গেল কিশোর। সবাই হতভম্ব। পরমুহূর্তেই ফিরে এলো কিশোর, পরিচালক কিশোর। "লাইটস অন" সব আলো জ্বলে উঠলো। "ইয়েস মিস্টার অশোককুমার—আপনার পার্টটা বুঝে নিন।" অশোককুমার হেসে বসলেন। কিশোর নিচু গলায় যা বোঝাবার বোঝালেন। মেকআপম্যান বরফজলে ভেজা মলমল দিয়ে দাদামণির মুখের ঘাম মুছে দিলো। কিশোর বললেন, "স্টার্ট সাউন্ড।" শ্যুটিং আরম্ভ হল। পর-পর কয়েকটা সট নেওয়া হল তারপর লোকেশন চেঞ্জ। লাইট চেঞ্জ। সুতরাং কিছু সময় লাগবে। সবাই গ্যারেজের বাইরে এলো। বাগানের মধ্যে এলোমেলো চেয়ার বিছানো সেখানে সকলেই বসল। কিশোরও। হঠাৎ সদর গেট খুলে গেল এবং মহাস্মার্ট মডেল গাড়ীর মত দেখতে একটি লেটেস্ট মডেলের আমেরিকান গাড়ি ভেতরে এলো। তার ভেতর থেকে নামলেন নেহাৎই দেশী মডেলের বেঁটে-খাটো-খাওয়া কয়েকটি প্রাণী। তাদের দেখে কিশোর আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে লাগল। আগন্তুকদের মধ্যে একজন মাখন মাখন হাসিমুখে কিশোরের দিকে এগিয়ে এলেন। এই অতিপরিচিত সংগীত নির্দেশকটিকে কিশোর চিনতে পারল না। আগন্তুক সংগীত নির্দেশক অবাক হলেন কিন্তু হতবাক হলেন না, পরন্তু তাঁর রেকর্ডিং আজ এবং কিশোরকুমারকেই সেই গানটি গাইতে হবে, সেকথা সবিনয়ে জানালেন। সব শুনে কিশোরকুমার যেমন গম্ভীর ছিল তেমনি গম্ভীরভাবেই জবাব দিল, "গায়ক কিশোরকুমার তো এখন বাড়ি নেই, সন্ধ্যেবেলায় আসবেন তখন তার সঙ্গে দেখা হবে।" "সত্যি আপনার ঠাট্টা অতুলনীয়।" বলে একটি খালি চেয়ারে জাঁকিয়ে বসলেন সংগীত নির্দেশক। কিশোর বলে উঠলেন, "আর উই রেডি?" উত্তর এলো ক্যামেরাম্যানের "ইয়েস স্যার।" আবার সবাই গ্যারেজের ভেতরে। আবার শ্যুটিং আরম্ভ হল। ইতিমধ্যে কিশোরের সেক্রেটারী এলো। সংগীত নির্দেশক হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

মানু সেনের পরিচালনায় শরৎচন্দ্রের "বিরাজ বৌ" ছবির কাজ আরম্ভ হয়েছে—নববর্ষের দিন ছবির মহরৎ অনুষ্ঠানে ক্ল্যাপস্টিক দিচ্ছেন কানন দেবী, পাশে শিল্পী (বিরাজ বৌ) মাধবী মুখোপাধ্যায় ফটো—দেশ

সেক্রেটারী সঙ্গে কথা বলে হাসিমুখে পরিতৃপ্ত হৃদয়ে ফিরে গেল।

সূর্য ডোবার আগেই শ্যুটিং শেষ হল। কামার্মাণ বললেন, "কিশোর, প্রযোজক কিশোরকুমারকে একবার ডাকো তো, আমার পাওনা-কড়ির ব্যাপারে একটু কথা বলতে চাই!" কিশোর বললেন, "তার সংগে আজকাল আমারই দেখা হচ্ছে না; তার সংগে দেখা করতে হলে ইনকাম ট্যাক্স অফিসের দরজায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে।" দাড়ি, গোঁফ খুলে, মেকাপ তুলে কিশোর এলো, "আসুন এবার একটু শান্তিতে বসে চা খাওয়া যাক—কেমন লাগলো বলুন?" বললাম, "বেশ লাগলো।" কিশোর বললেন, "হই হই" করে কাজ করতে আমার ভাল লাগে, তাই এসব করি, জীবনকে নিয়ে ঠাট্টা করতে না পারলে জীবনটা বড় দুর্বিসহ হয়ে পড়ে—নিন চা নিন, গরম চা!"

বিরল শর্মা

"লাইফ" স্বর্ণ স্পুটনিক বিজয়ী

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

"লাইফ" নামে ফিল্ম ডিভিসনের ১০ মিনিটের একটি রঙীন তথ্যচিত্র রোম চলচ্চিত্র উৎসবে (১৯৭০) প্রথম পুরস্কার "স্বর্ণ স্পুটনিক" বিজয়ী হয়েছে।

প্রকৃতি সম্বন্ধে বিজ্ঞানভিত্তিক এই ধরনের তথ্যচিত্র এদেশে ইতিপূর্বে আর নির্মিত হয়নি। ছবিটি প্রধানত জীববিদ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরী। কেমনভাবে মাটি, জল, গাছপালা, খাদ্যশস্য, জীবজন্তু সচল অচল জড়পদার্থ একে অপরের উপর নির্ভর করে পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে তুলেছে, এটাই ছবির বক্তব্য। প্রকৃতির এই বিচিত্র প্রণালী, এই ছবির মধ্যে সাধারণের বোধগম্য করে এমনভাবে তোলা হয়েছে, যা খুবই প্রশংসনীয়।

ফিল্ম ডিভিসনের শ্রীশঙ্কর গাঙ্গুলী এই তথ্যচিত্র পরিচালনা, লেখা ও পরিকল্পনা করেছেন। তিন বছর লাগে এই চিত্র নির্মাণে, "টাইম-ল্যাপস্ ফটোগ্রাফীর" আঙ্গিকে মাটি ভেদ করে অঙ্কুরিত হয়ে গাছপাল খাদ্যশস্য, ফুল ইত্যাদি ধীরে ধীরে কীভ

বেরোচ্ছে তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে চিত্রায়িত হয়েছে। লাউ-ডগা কিভাবে ধীরে ধীরে একটি কাঠিতে সাপের মত জড়িয়ে বেড়ে উঠছে—সে দৃশ্যটি অপূর্ব বলা চলে। বহু সময় ব্যয় করে, বহু ক্যামেরার সাহায্যে, দিনের পর দিন ২৪ ঘণ্টা ধরে এইসব ছবি নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া "এক্স-রে টিভি" ফটোগ্রাফীতে মানুষের শরীরের মধ্যে কীভাবে খাদ্যসামগ্রী বেঁচে থাকতে সাহায্য করে বা "মাইক্রো-ফটোগ্রাফী" অনুবীক্ষণ-যন্ত্রের মাধ্যমে অদেখা জগতের পরিচয় কেমন করে এনে দেয় তা দেখানো হয়েছে।

হোটেল ব্যবসায়ে শক্তি সামন্ত

গত ৭ই এপ্রিল খুব ধুমধাম করে বম্বের নবতম হোটেল "হোটেল হিলটপ"-এর উদ্বোধন হ'ল। এখনকার হিট হিন্দী ছবি "আরাধনা"র নির্মাতা শক্তি সামন্ত এই হোটেলের চেয়ারম্যান এবং চলচ্চিত্র পরিবেশক, প্রদর্শক শঙ্কর ভ্রাতৃদ্বয় প্রধান ডিরেক্টর।

মুক্ত-অঙ্গন মঞ্চে "অজ্ঞাতক"

এন বি এন্টারপ্রাইজ প্রযোজিত "অজ্ঞাতক" (রচনা : সন্তোষকুমার ঘোষ) আবার অভিনীত হচ্ছে মুক্ত-অঙ্গন মঞ্চে আগামী ৬ মে সন্ধ্যায়। অশোক মিত্র নাটকটির পরিচালক এবং নাট্য পরিচ্ছন্ন ভূমিকার শিল্পী। প্রধান দুই চরিত্রের শিল্পী নিমু ভৌমিক ও মমতা চট্টোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালনা করেছেন ভাস্কর মিত্র, মঞ্চসজ্জায় আছেন সুরেশ দত্ত।

হাঙ্গেরির ছবি

কলকাতায় সাম্প্রতিক হাঙ্গেরিয়ান চলচ্চিত্র উৎসবে (১০ থেকে ১৬ এপ্রিল) সাতখানি ছবি দেখানো হল। এর মধ্যে তিনখানি ছবি ফেস্টিভালে প্রদর্শিত হবার যোগ্য নয়। বাকি চারখানি ছবির মধ্যে "দি হোপলেস ওয়ানস" (পরিচালনা : মিকলোস জাংকসো) এদেশে ইতিপূর্বে প্রদর্শিত।

বাকি তিনটি ছবির মধ্যে জানোস হারসকো পরিচালিত "দ্য আয়রন ফ্লাওয়ার" নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। তার মানে এই নয় যে এটি একটি মহৎ সৃষ্টি। তবে একটি ভাল ছবির অনেক গুণ এ ছবিতে আছে। ১৯৫৭ সনে তোলা এ ছবির পটভূমি ১৯৩০ সালের। এর নায়ক গতানুগতিকতায় বিশ্বাসী নয়। জীবন সম্পর্কে তার চিন্তাধারা স্বতন্ত্র। নায়িকা তার সাহচর্যে এসে এমনি এক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েও গতানুগতিকতার হাতছানি কিন্তু এড়াতে পারেনি। তাই উভয়ের বিচ্ছেদ। কিন্তু এ বিচ্ছিন্নতা কি চিরকালের? না, নায়কের ধারণা, তার বিশ্বাসের পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে নায়িকা আবার একদিন তার কাছে ফিরে আসবেই।

"ম্যাককেনাজ গোল্ড" ছবিতে ওমর শারিফ —ছবিটি এলিটে চলছে

ছোট ছোট সুন্দর দৃশ্য পরিকল্পনায়, কিছু উচ্চারিত কিছু বা অনুচ্চারিত কথায় চরিত্রের প্রতিষ্ঠা—পরিচালকের ক্ষমতার পরিচয় দেয়। বিশেষ কোন প্রতীকের ব্যবহার ছাড়াই চরিত্রগুলির মানসিক বিশ্লেষণ বিস্মিত করে। নিঃসন্দেহে এটি একটি পরিচ্ছন্ন ছবি।

কিন্তু এই একই পরিচালকের "হ্যালো, ভেরা" (১৯৬৭ সালে তোলা) গভীর কোন বক্তব্যের প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। সবই যেন ওপর-ওপর, ভাসা-ভাসা। এ ছবির নায়িকার বিক্ষিপ্ত মানসিকতা শেষ পর্যন্ত কোন কিছুকেই অবলম্বন করতে পারলো না। কেবল শূন্যতা আর শূন্যতা। তার সমস্যা কি সেটাও যেমন প্রতিষ্ঠিত নয়, তার সমাধানের কোন চেষ্টাও ছবিতে নেই। এবং ওই চরিত্রের মানসিক নিঃসঙ্গতাও কোন গভীরতর ব্যঞ্জনায় প্রতিভাসিত নয়।

ফ্রিগিস বন পরিচালিত "দি সয়েল আন্ডার ইওর ফীট" ছবিটি বিত্তহীন বনাম বিত্তবানদের সংগ্রামের পটভূমিকায় তোলা। নেহাতই মামুলী বক্তব্য। স্থানে স্থানে মেলোড্রামার চূড়ান্ত। তবে কৃষিজীবীদের ঘর-সংসারের ছবি নিখুঁত এবং সংগ্রাম মুহূর্তের দৃশ্য-পরিকল্পনাটি খুবই সুন্দর।

সামগ্রিকভাবে হাঙ্গেরিয়ান চলচ্চিত্রের এই উৎসব দর্শকদের খুশি করতে পারেনি। একটি উৎসবে কিছু কিছু আধুনিক ছবির প্রত্যাশা থাকে। এক্ষেত্রে তার সামগ্রিক ব্যতিক্রম ঘটেছে। তবে একটি দেশের ছবি দেখা মানেই নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করা। সেদিক থেকে এই উৎসবের কিছুটা মূল্য অবশ্যই আছে।

কলকাতায় "দি ড্যায়মন্ড"

ভারতের চতুর্থ আন্তর্জাতিক উৎসবে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার স্বর্ণ ময়ূর পেয়েছিল ইতালির ভিসকন্তি পরিচালিত "দি ড্যায়মন্ড"। ছবিটি কলকাতায় মুক্তি পাচ্ছে পয়লা মে, নিউ এম্পায়ারে। ইনগ্রিড থুলিন ও ডার্ক বোগার্ড ছবির দুই বিশিষ্ট শিল্পী।

মর্জিনা-আবদুল্লা

আরব্যোপন্যাসের গল্প "মর্জিনা-আবদুল্লা" নিয়ে ফিল্ম তৈরি করছেন পরিচালক দীনেন গুপ্ত। ছবিটি হবে রঙীন। কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন মন্মথ রায়।

ইন্দিরা সংগীত শিক্ষায়তনের অনুষ্ঠান

বাংলা গানের একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় অতিক্রান্ত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে। বিগত শতাব্দী থেকে শুরু বাংলা গানের এই যে আশ্চর্য আলোকস্নাবিত দিগন্ত, তার উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক যদিও নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু তা হলেও তিনি তো সেখানে একক, নিঃসঙ্গ নন। তাই এ যুগের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পেতে হলে আরও যাঁদের সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি দিতে হবে, তারই পরিচয় দেবার প্রয়াস ছিল 'ইন্দিরা সঙ্গীত-শিক্ষায়তন প্রযোজিত গত ৮ই এপ্রিলের 'বাংলা গান'-এর অনুষ্ঠানে। এই যুগের প্রত্যেক রচয়িতার গানই যে সেদিন এঁরা উপস্থিত করেছিলেন তা নয়, তবে মোটামুটি একটি যুগের প্রাণস্পন্দন সেদিনকার অনুষ্ঠানে উপলব্ধি করা গেছে, এটা স্বীকার করতেই হবে।

ইন্দিরা শিল্পীগোষ্ঠী প্রথমে কয়েকটি দুর্লভ গান পরিবেশন করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের 'তব উৎসব প্রাঙ্গণে', রামমোহনের 'বিনাশ বিনাশ ঘোর বিষয়ের অভিলাষ', জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'হে অন্তর্যামী' প্রভৃতি গান এই অনুষ্ঠানটিতে বিশেষ মাত্রা যোজনা করেছিল। শেষোক্ত গানটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'কে বসিলে আজি'-র সাদৃশ্যটুকু লক্ষণীয়। এ ছাড়াও এঁরা দেবেন্দ্রনাথ এবং সত্যেন্দ্রনাথের দুটি গান গেয়ে শোনান। রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ এবং দিলীপকুমার রায়ের কয়েকটি গান সেদিন পরিবেশন করেন প্রসাদকুমার সেন, সুশীল চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জু গুপ্ত এবং অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়। এর মধ্যে মঞ্জু গুপ্তের কণ্ঠে দিলীপকুমার রায়ের 'রূপে বর্ণে ছন্দে' এবং অতুলপ্রসাদের 'কেন যে গাহিতে বলো' বিশেষ উপভোগ্য হয়েছিল।

আনন্দবর্ধন

মহাকাশযান অ্যাপোলো-র চন্দ্রাভিযানের চাঞ্চল্যকর পরিসমাপ্তি আলোচ্য সপ্তাহের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গত ১১ এপ্রিল চাঁদের পথে মানুষের তৃতীয় অভিযান শুরু হয়ে স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে চলছিল। ১৪ এপরিল হঠাৎ মহাকাশযানের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা বানচাল হয়ে তিন চন্দ্রযাত্রী—অধিনায়ক লোভেল, মূল-মহাকাশযানের চালক সুইগারট, চাঁদের ভেলার মাঝি হেইস পৃথিবী থেকে প্রায় দুই লক্ষ মাইল দূরে চাঁদের অভিকর্ষ সীমার মধ্যে গুরুতরভাবে বিপন্ন হয়ে পড়েন। ফলে এই আমেরিকান মহাকাশচারীদের চাঁদে পদার্পণের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয় এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হ্রস্বতম পথে, দ্রুততম গতিতে তাঁদের পৃথিবীতে চলে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়। তখন অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও অশক্ত চাঁদের ভেলাই মহাকাশযানকে পৃথিবীর দিকে টেনে নিয়ে আসতে থাকে। ১৫ এপ্রিল অ্যাপোলো পৃথিবীর অভিকর্ষ সীমার মধ্যে প্রবেশ করে। ১৬ এপ্রিল ঘণ্টায় ৫০৭১ মাইল বেগে অ্যাপোলো পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে। লক্ষ্য স্থল প্রশান্ত মহাসাগর। এই অভিযানের তিন নায়ক যাত্রা করেছিলেন মহাকাশ-পোতে চড়ে, ফিরে এলেন ভেলায় চড়ে। ১৭ এপ্রিল তাঁরা পদার্পণ করলেন প্রশান্ত মহাসাগরে। এই বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধানের জন্য একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হবে।

দেশী সংবাদ

১৩ এপ্রিল—কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ নাকি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালকে বলে দিয়েছেন: রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি হওয়ার পর তাঁরা তাঁকে পাঁচজন উপদেষ্টা দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাই বহাল থাকবে। অর্থাৎ পাঁচজনের বেশী উপদেষ্টা রাজ্যপাল পাবেন না। রাজ্যপালের অন্যতম উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করতে শ্রী বি বি ঘোষকে শ্রীমতী গান্ধী ও চবন নাকি রাজি করিয়েছেন।

১৪ এপ্রিল—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ডঃ ত্রিগুণা সেন ও উপাচার্য অধ্যাপক হেমচন্দ্র গুহ পদত্যাগপত্র পেশ করেছেন। এ নিয়ে আলোচনার জন্য শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির জরুরী বৈঠক বসছে।

শিবপুর ইনজিনিয়ারিং কলেজ এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে কোন-রকম হাঙ্গামার খবর পেলেই পুলিস সেখানে ঢুকে পড়বে। এজন্য এই দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে পুলিস বাহিনী সদাসর্বদা মোতায়েন থাকবে। আজ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে রাজ্য সরকার একথা জানিয়ে দিয়েছেন।

১৫ এপ্রিল—রাজ্য সরকার স্থির করেছেন পশ্চিমবঙ্গে সরকারে বর্তানো জমি তাড়াতাড়ি খাস করে তা ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিলির ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করা হবে। বেনামী জমি উদ্ধারের কাজ সরকারই করবেন। জমি জবর দখল বন্ধ করা ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে মোটামোটি যুক্তফ্রন্টের নীতিই অনুসরণ করবেন সরকার।

আজ সকালে বর্ধমান স্টেশন ইয়ারডে রেলরক্ষী এবং গ্যাংম্যানদের মধ্যে এক সংঘর্ষের সময় রেলরক্ষীদের গুলিতে দুজন গ্যাংম্যান নিহত হন। মোট আহতের সংখ্যা ৪০। তার মধ্যে পাঁচজনকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ওয়াগন ভাঙ্গা দলকে অনুসরণ করা থেকেই এদিনের হাঙ্গামার সূত্রপাত। এদিন হাওড়া লাইনে সমস্ত ট্রেন চলাচল বিপর্যস্ত হয়।

১৬ এপ্রিল—আজ দুপুরে ঠিক একই সময়ে কয়েকজন যুবক কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্যের ঘর ও নতুন লাইব্রেরির লবিতে ঢুকে টেবিল-চেয়ার, টেলিফোন, আলমারি, দেওয়াল ঘড়ি। বুক-শেলফ-শো-কেস সব ভেঙে-চুরে লণ্ডভণ্ড করে দেয়। এরা লাইব্রেরির মধ্য থেকে ধর্ম-সংস্কৃতির পুস্তক, পাণ্ডুলিপি ও মার্কিন সাময়িকপত্র বার করে এনে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণের মধ্যে আগুন লাগায়।

১৭ এপ্রিল—আজ পুরুলিয়ায় এক বিরাট জনসভায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়-কুমার মুখার্জি মার্কসবাদী কমিউনিস্ট নেতা শ্রীজ্যোতি বসুর বিরুদ্ধে সরাসরি বিশ্বাসঘাতকতা ও বেইমানির অভিযোগ করলে শ্রোতাদের মধ্য থেকে একজন বলে ওঠেন অজয়বাবু ফিরে যাও। ফলে সভায় কিছু সময় গণ্ডগোল হয়। রাজ্যের ভূমি সমস্যা প্রসঙ্গে অজয়বাবু বলেন, যুক্তফ্রন্টের নীতি অনুসারে দখল নেওয়া জমি কৃষকদের হাতেই থাকবে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি ও সংশ্লিষ্ট সকলের প্রাণরক্ষার দায়িত্ব রাজ্য সরকারকেই নিতে হবে। সিনডিকেটের সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে একথা বলা হয়; প্রয়োজন বোধে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবনের বাইরে এমন কি ভিতরেও পুলিস বসিয়ে এই দায়িত্ব পালন করা উচিত বলে ওই প্রস্তাবে মন্তব্য করা হয়।

১৮ এপ্রিল—দিল্লির কর্তৃপক্ষ আজ টেলিফোনে রাজ্যপাল শ্রী ধাওয়ানকে নির্দেশ দিয়েছেন: কী-করে কী-ভাবে জানি না, অবিলম্বে কলকাতায় এবং পশ্চিমবঙ্গে "নকশালপন্থীদের উৎপাত" বন্ধ করতে হবে। প্রয়োজনীয় যে-কোন ব্যবস্থা নিতে যেন দ্বিধা না করা হয়। এই নির্দেশ পাওয়ার পরই রাজ্যপাল কয়েকজন উচ্চ-পদস্থ অফিসারকে ডেকে "পুলিসী ব্যর্থতার জন্য চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং ইনসপেকটর জেনারেল ও কমিশনার অফ পুলিসকে হুকুম দিয়েছেন—অবিলম্বে নকশালদের ঠাণ্ডা করা চাই।

দমদম প্রিনসেপঘাট লাইনে লোকসান যাবে যুক্তি রেলওয়ে বোরড যোজনা প্রকল্পটি বাতিল করার জন্য পর কিন্তু কমিশন তাতে ভ্রূক্ষেপ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই এ রিপোরট তৈরির কাজ শেষ ক বোরডকে নির্দেশ দেন।

১৯ এপ্রিল—শ্রী এম এম বস শ্রী এস মল্লিককে পশ্চিম বাংলার পদে নিয়োগ করতে রাজ্যপাল শ্রী ধাওয়ান অস্বীকার করায় কেন্দ্র বিস্মিত। শ্রী বসুর সম্প্রতি পদোন্নতি তিনি এখন রাজ্যপালের অন্যতম কেন্দ্র চেয়েছিলেন শ্রী ধাওয়ান তাঁ উপদেষ্টার মধ্যে কে কোন্ দফতর ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রী মল্লিক মুখ্যসচিব নিযুক্ত করেন। রাজ্যপাল ব্যাপারে আপত্তি তোলেন। কিন্তু কো বলেন, শ্রী মল্লিককেই মুখ্যসচিব করে

বিদেশী সংবাদ

১৩ এপ্রিল—নেপালের রাজা প্রধানমন্ত্রী শ্রীকীর্তিনিধি বিস্তার পদ গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর নিজের সভ নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন। বর্ত নেপালের দিকে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা হওয়ার পর এই প্রথম রাজা তাঁর নিজে পতিত্বে মন্ত্রিসভা গঠন করলেন।

১৪ এপ্রিল—ইতালীয় পুলিস ই বেআইনীভাবে চরস চালান দেওয়ার অ পাতকাল ভিক্টোরিয়ার পাকিস্তানী প্রিন্স হারুন-অল-রশিদকে গ্রেফতার তাঁকে রোমের কুইন অব হেভেন জেলে রাখা হয়।

১৫ এপ্রিল—পাকিস্তানের স শিল্প আজ সাংবাদিকদের ধর্মঘটের হয়ে যায়। নতুন বেতনহার নিয়ে অচলাবস্থার প্রতিবাদে সাংবাদিকরা এই করেন। কয়েকটি বড় কাগজ ধর্মঘটের প্রকাশনা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ

১৬ এপ্রিল—ফ্রান্সের সেনট সক্ষ্যারোগী স্বাস্থ্যনিবাসের তিনটি ওপর পাতকাল তুষার-ধস ভেঙে পড়ায় নিখোঁজ হয়েছেন। এঁদের মধ্যে প্রা শিশু। বিধ্বস্ত বাড়ি তিনটির দুটি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত ৬০টি শিশু। ডু জনাদশেক চিকিৎসক।

১৭ এপ্রিল—নতুন কামবোডিয়া সেনাবাহিনী ওই দেশের ভিয়েতনামীদে যে নির্যাতন চালিয়েছে উত্তর ভিয়েত প্রতি 'ভারতসহ সব মিত্র-রাষ্ট্রগুলির' আকর্ষণ করেছে। ভারতে উত্তর ভিয়ে কনসাল জেনারেল এক সাংবাদিক এ-সংবাদ জানান।

১৮ এপ্রিল—পাক প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খাঁর পাঁচদিনব্যাপী রাশি শুরু হবে ২০ জুন। আজ ইসল একটি সরকারী ঘোষণায় একথা বল প্রেসিডেনট হওয়ার পর এই প্রথম তিনি বৃহৎ শক্তির রাজধানীতে যাচ্ছেন।

১৯ এপ্রিল—ভিয়েতকং বাহিনী কামবোডিয়ার রাজধানী নমপেনের ১ দক্ষিণে নদীতীরের একটি শহর দখ তারা একটি সেতু পুড়িয়ে দেয় এ চালিয়ে বাজার দখল করে।